দ্বিজেন্দ্রলাল রায় প্রতিষ্ঠিত

সচিত্র মাসিক পত্র

ত্রিংশ বর্ষ

প্রথম খণ্ড

আষাঢ় ১৩৪৯—অগ্রহায়ণ ১৩৪৯

সম্পাদক—

শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম-এ

প্রকাশক—

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স

২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ভারতবর্ষ

সূচীপত্র

ত্রিংশ বর্ষ—প্রথম খণ্ড ; আষাঢ় ১৩৪৯—অগ্রহায়ণ ১৩৪৯

লেখ-সূচী—বর্ণানুক্রমিক

চিত্র-সূচী—মাসানুক্রমিক

আষাঢ়—১৩৪৯

বহুবর্ণ চিত্র

১। কিরাতার্জ্জুন   ২। ঐ বুঝি বাঁশী বাজে

শ্রাবণ—১৩৪৯

বহুবর্ণ চিত্র

১। কাঞ্চনজঙ্ঘায় সূর্য্যোদয়
২। শ্রীশিক্ষা

ভাদ্র—১৩৪৯

বহুবর্ণ চিত্র

আশ্বিন—১৩৪৯

বহুবর্ণ চিত্র

কার্ত্তিক—১৩৪৯

বহুবর্ণ

অগ্রহায়ণ—১৩৪৯

বহুবর্ণ চিত্র

ষাণ্মাসিক গ্রাহকগণের দ্রষ্টব্য—২০ অগ্রহায়ণের মধ্যে যে ষাণ্মাসিক গ্রাহকের টাকা না পাইব, তাঁহাকে পৌষ সংখ্যা পরবর্ত্তী ছয় মাসের জন্য ভিঃ পিঃতে পাঠাইব। গ্রাহক নম্বর সহ টাকা মনিঅর্ডার করিলে ৩।০ আনা, ভিঃ পিঃতে ৩॥/০ টাকা। যদি কেহ গ্রাহক থাকিতে না চান, অনুগ্রহ করিয়া ১৫ অগ্রহায়ণের মধ্যে সংবাদ দিবেন।

কার্য্যাধ্যক্ষ—ভারতবর্ষ

শিল্পী—শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী　　　কিরাতার্জ্জুন　　　ভারতবর্ষ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

আষাঢ়—১৩৪৯

প্রথম খণ্ড | ত্রিংশ বর্ষ | প্রথম সংখ্যা

রাষ্ট্র ও নাগরিক

এস-ওয়াজেদ আলি বি-এ (কেণ্টাব), বার-এট-ল

একই ধরণের শাসনপ্রণালী একদেশে আনে সুখ এবং সমৃদ্ধি, আর অন্যদেশে আনে দুঃখ, অশান্তি আর অরাজকতা। দক্ষিণ আমেরিকার বিভিন্ন রাষ্ট্রে প্রায় সেই ধরণের শাসনপ্রণালীই প্রচলিত আছে—যার দ্বারা ইংলণ্ড এবং আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র পরিচালিত হচ্ছে। অথচ পূর্ব্বোক্ত দেশগুলি অশান্তিময়; অন্তর্বিপ্লব, অরাজকতা প্রভৃতি ঐসব দেশের নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার; আর শেষোক্ত দেশগুলিতে এসব গ্লানি প্রায় দেখাই যায় না। এই আমাদের ভারতবর্ষেই বিলাতের ধরণের মিউনিসিপাল স্বায়ত্তশাসন এখন প্রায় সর্ব্বত্র প্রচলিত, অথচ এদেশের প্রত্যেক করদাতাই মিউনিসিপ্যালিটীর অনাচারের বিষয় অভিযোগ করে থাকেন। বিলাতে এরকম অভিযোগ একান্ত বিরল। এই বৈষম্যের কারণ কি?

রাষ্ট্রের মঙ্গলামঙ্গল যতটা শাসনপ্রণালীর উপর নির্ভর করে, তার চেয়ে অনেক বেশী নির্ভর করে রাষ্ট্রনায়কদের এবং নাগরিকদের চরিত্রের এবং দায়িত্বজ্ঞানের উপর। রাষ্ট্রনায়কদের যদি দায়িত্ব এবং কর্ত্তব্যজ্ঞান থাকে এবং নাগরিকেরা যদি তাঁদের দায়িত্ব, কর্ত্তব্য এবং অধিকার সম্বন্ধে যথাযথভাবে অবহিত হন, তাহলে যে কোন শাসন প্রণালীতেই দেশে সুখ এবং সমৃদ্ধি না এসে থাকতে পারে না। পক্ষান্তরে রাষ্ট্রনেতাদের দায়িত্ব এবং কর্ত্তব্যজ্ঞান যদি শিথিল হয় এবং রাষ্ট্রের জনসাধারণ যদি তাঁদের দায়িত্ব, অধিকার এবং কর্ত্তব্য সম্বন্ধে উচিতভাবে সজাগ এবং অবহিত না হন, তাহলে কোন ধরণের শাসনপ্রণালী থেকেই সুফলের আশা করা যায় না। সে অবস্থায় রাষ্ট্রে দুঃখ, অশান্তি এবং অরাজকতা আসা অনিবার্য্য। রাষ্ট্রের মঙ্গলামঙ্গল প্রকৃতপক্ষে জাতির চরিত্র, ন্যায়নিষ্ঠা এবং কর্ত্তব্যজ্ঞানের উপরই একান্তভাবে নির্ভর করে।

যে সব প্রাতঃস্মরণীয় মহাপুরুষ বিভিন্ন জাতিকে গঠন করেছেন, বিভিন্ন সমাজকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন, তাঁরা এই সত্যকে সম্যকভাবে উপলব্ধি করতেন বলেই—চরিত্র সৃষ্টির দিকে বিশেষ-ভাবে তাঁরা মনোনিবেশ করেছিলেন এবং বিধিনিষেধ, ধর্ম্মীয় অনুশাসন, নৈতিক উপদেশ প্রভৃতির সাহায্যে ব্যষ্টি এবং সমষ্টির চরিত্রকে উচ্চতর স্তরে নিয়ে যাবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন। রোমের Twelve tables বা দ্বাদশ অনুশাসনের প্রণেতারা, গ্রীসের সোলোন, লাইসারজাস প্রভৃতি রাষ্ট্র-জনকেরা, ভারতবর্ষের মনু, বেদব্যাস প্রভৃতি সমাজস্রষ্টারা, চীনের সমাজগুরু কনফুসিয়াস, ইহুদিদের জাতীয় জীবনের প্রতিষ্ঠাতা মুসা, মুসলিম জাতির গুরু এবং পথপ্রদর্শক হজরত মোহাম্মদ প্রভৃতি সকলেই মানব চরিত্রের এবং সমাজজীবনের উৎকর্ষ সাধনের জন্য প্রাণপণ

করে চেষ্টা করেছেন। তাঁরা স্পষ্টই বুঝেছিলেন যে জাতির মঙ্গলামঙ্গল একান্তভাবে নির্ভর করে ব্যষ্টির চরিত্রের উৎকর্ষের উপর। এই সব মহাপুরুষদের শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্যের কথা ভুলে গিয়ে তাঁদের তথাকথিত শিষ্যের দল এখন অর্থহীন ক্রিয়া-কলাপকেই তাঁদের শিক্ষার মূল বস্তু ধরে নিয়েছেন! আর এই করে তাদের শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্যকে ব্যর্থ করে দিয়েছেন। তবে সত্য, সত্যই থেকে যায়। যখন যে জাতি সত্যের অনুসরণ করে তখন সে জাতি বড় হয়; আর যখন কোন জাতি সত্যকে ছেড়ে মিথ্যার আশ্রয় নেয়, তখন সে জাতির পতন ঘটে। ব্যষ্টির চরিত্র উন্নত না হলে সমষ্টির কখনও মঙ্গল হতে পারে না। জনসাধারণের মনে এবং জীবনে উচ্চ আদর্শ সুপ্রতিষ্ঠিত না হলে সমষ্টির জীবনে কখনও সুখ, শান্তি এবং সুশৃঙ্খলা আসতে পারে না—তা রাষ্ট্রের বাইরের আকার যাই হোক না কেন।

স্পার্টা এক সময় জগতের অন্যতম আদর্শ রাষ্ট্ররূপে গণ্য হত। স্পার্টার রাষ্ট্রগুরু হচ্ছে লাইসারজাস। তার জীবনের আলোচনা প্রসঙ্গে দার্শনিক Plutarch (প্লুটার্ক) বলেছেন:

Upon the whole he taught his citizens to think nothing more disagreeable than to live by (or for) themselves, Like bees, they acted with one impulse for the public good and always assembled about their prince. They were possessed with a thirst for honour, an enthusiasm bordering upon insanity and had not a wish but for their country.

দুঃখের সঙ্গে স্বীকার করতে হয় যে আমাদের দেশের লোকের চরিত্রে সে একাগ্র দেশপ্রেম দেখতে পাওয়া যায় না—যা মানুষকে ত্যাগে উদ্বুদ্ধ করে: সে ন্যায়নিষ্ঠা দেখতে পাওয়া যায় না—যা সাধারণ মানুষকে বা সাধারণ রাজকর্ম্মচারীকে জনসেবায় অনুপ্রাণিত করে: সেই নির্ভিক স্পষ্টবাদিতা দেখতে পাওয়া যায় না—যা ক্ষমতাশালীকে কর্ত্তব্য পালনে বাধ্য করে; সেই Public spirit দেখতে পাওয়া যায় না—যা মানুষকে অন্যায় এবং অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে কৃতসঙ্কল্প করে; আর স্বার্থপরতা, কাপুরুষতা এবং সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতার প্রতি ঘৃণা এবং বিতৃষ্ণাও দেখতে পাওয়া যায় না—যা মানুষকে এই সব গ্লানি বর্জ্জন করতে বাধ্য করে। সুস্থ, উন্নতিশীল রাষ্ট্রীয় জীবনের এই সব গুণাবলীর অভাব যতদিন আমাদের মধ্যে থাকবে, ততদিন শাসনতন্ত্রের আকার প্রকারের সংস্কার এবং পরিবর্ত্তন থেকে আমরা বিশেষ কোন সুফলের আশা করতে পারি না।

প্রকৃতপক্ষে এই গত কয়েক বৎসরে আমরা স্বায়ত্বশাসনের অধিকার কিছু কিছু পেয়েছি, আর অদূর ভবিষ্যতে যে আরও অনেক কিছু আমাদের হাতে আসবে সেটা আশা করা অসঙ্গত হবে না। তবে যে ক্ষমতা আমাদের হস্তগত হয়েছে, তার যে প্রকৃত সদ্ব্যবহার করতে পারিনি, তার কারণ হচ্ছে আমাদের পূর্ব্বোক্ত বিভিন্ন নৈতিক দুর্ব্বলতা—আর এই দুর্ব্বলতা যতদিন থাকবে ততদিন ক্ষমতার প্রকৃত সদ্ব্যবহার করতে আমরাও পারব না। আমাদের রাষ্ট্রীয় জীবন অনাচার, অত্যাচার এবং উচ্ছৃঙ্খলতার একটা দৃষ্টান্তে পরিণত হবে।

বিভিন্ন রাষ্ট্রের ইতিহাসের পর্য্যালোচনা করলে দেখতে পাওয়া যায়, জাতীয় এবং রাষ্ট্রীয় জীবনে স্থায়িত্ব নাগরিকদের নৈতিক স্বাস্থ্যের উপর একান্তভাবে নির্ভর করে। যতদিন নাগরিকদের নৈতিক জীবন সুস্থ থাকে ততদিন রাষ্ট্রও সুস্থ এবং শক্তিশালী থাকে; আর যখন নাগরিকদের নৈতিকজীবন গ্লানিপূর্ণ হয়, তখন রাষ্ট্রের জীবনও গ্লানিপূর্ণ হয়ে উঠে, আর সেই জরাগ্রস্ত রাষ্ট্র অচিরে মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

গ্রীসের সাধারণতন্ত্রগুলির পতনের আলোচনা প্রসঙ্গে Encyclopædia Britannicaর সুযোগ্য লেখক বলেছেন:

"But it is too moral rather than too political or economic causes that the failure of Greece in the conflict with Mecedon is attributed by the most famous Greek statesman of that age. Demosthenes is never weary of insisting upon the decay of patriotism among the citizens and of probity among their leaders. Venality had always been the besetting sin of Greek statesmen......In the age of Demosthenes the level of public life in this respect had sunk at least as low as that which prevails in many states of the modern world.

নৈতিক অধোগতি যেমন জাতীয় এবং রাষ্ট্রীয় জীবনের পতনের সূচনা করে, পক্ষান্তরে নৈতিক উৎকর্ষ তেমনি জাতিকে রাষ্ট্রীয় উন্নতির পথে প্রতিষ্ঠার পথে নিয়ে যায়। ঐতিহাসিক ইবনে খালদুন আরব জাতির উত্থান-পতনের আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন:

"রাষ্ট্র এবং সাম্রাজ্যের অস্তিত্ব সামাজিক জীবনের জন্য একান্ত প্রয়োজনীয়। মানুষ তার প্রকৃতিদত্ত স্বভাবের দরুণ এবং ভাবপ্রকাশের শক্তির (ভাষার) অধিকারী হওয়ার দরুণ স্বাভাবিকভাবে নীচ এবং নিন্দনীয় আচরণ বর্জ্জন করে এবং প্রশংসনীয় আচরণের পথে অগ্রসর হয়। মানুষের আচরণে যে সব নিন্দনীয় কাজকর্ম্ম দেখা দেয়, তার অনাচার এবং দুর্নীতি, এসব হচ্ছে তার চরিত্রের পাশবিক অংশের উত্তেজনা এবং প্ররোচনারই স্বাভাবিক ফল। মানুষ হিসাবে তার স্বভাব-ধর্ম্ম হচ্ছে মঙ্গলের পথে, প্রশংসনীয় আচরণের পথে অগ্রসর হওয়া। রাষ্ট্র এবং রাষ্ট্রধর্ম্ম হচ্ছে মানবধর্ম্মের, মানবপ্রকৃতির স্বাভাবিক সুচারুবিকাশ। আর তাই রাষ্ট্রের এবং রাষ্ট্রধর্ম্মের সম্যক বিকাশের জন্য মানুষের প্রশংসনীয় গুণাবলীরও সম্যক বিকাশের প্রয়োজন। ন্যায় এবং সদ্বিচারের ভিত্তির উপরই সমাজ-জীবন সুপ্রতিষ্ঠিত হতে পারে। এই হ'ল প্রকৃত রাষ্ট্র-নীতি। আর স্বাভাবিক মানুষ এই ধরণের জীবনযাত্রার জন্মগত শক্তি এবং অধিকার রাখে। তার জন্য যে গুণাবলীর প্রয়োজন প্রকৃতি তাকে তা দিয়েছে।

স্বজাতি-প্রীতি এবং জাতির জন্য ত্যাগ স্বীকারই হচ্ছে প্রকৃত আভিজাত্যের মূল। ভদ্র ব্যবহার এবং স্বাধীনতা হচ্ছে সেই আভিজাত্যের শাখা প্রশাখা। এই সব গুণাবলীর সাহায্যেই আভিজাত্য পূর্ণতা লাভ করে, আর এদের সাহায্যেই তার সম্যক বিকাশ হয়।

সাম্রাজ্য যেমন স্বজাতিপ্রীতির স্বাভাবিক ফল, তেমনি মহৎ চরিত্র এবং ভদ্র ব্যবহারের ফলও বটে। প্রকৃতপক্ষে চরিত্রের মহত্ব এবং ভদ্রআচরণবর্জ্জিত যে স্বজাতিপ্রীতি, সে হচ্ছে কতকটা অঙ্গহীন অথবা উলঙ্গ মানুষেরই মত। আমাদের মেনে নেওয়া দরকার যে মহত্বহীন ভদ্রতাহীন জাতীয়তা একটা অভিজাত বংশের কলঙ্ক ছাড়া আর কিছু নয়। তাই যদি হয়, তাহলে এই সব গুণাবলীর অভাব কি একটা জাতির সমূহ ক্ষতি এবং দুঃখ-দুর্দ্দশার কারণ হবে না।

আমরা সেই সব স্বজাতি-প্রেমিক জাতিদের দিকে যদি লক্ষ্য করি যাদের রাজ্য দুর দুরান্তর পর্য্যন্ত বিস্তৃত, যারা বিভিন্ন জাতির বিভিন্ন সমাজের উপর আধিপত্য করছে, তাহলে দেখতে পাব যে, সেই সব জাতির প্রত্যেকটি ব্যক্তির মধ্যে ভদ্রতা এবং প্রশংসনীয় আচারব্যবহার সম্যকভাবে বর্ত্তমান আছে। দয়া, দাক্ষিণ্য এবং সহনশীলতা হচ্ছে তাদের স্বভাবধর্ম্ম। অসহায় এবং উৎপীড়িতের দুঃখ তাঁরা কান দিয়ে শুনেন। আতিথেয়তা তাদের নিত্যকার ব্রত। তাঁরা শ্রমকাতর নন। সাধনায় তাঁরা মোটেই বিমুখ নন। অন্যের নীচ আচরণ তাঁরা ধৈর্য্যের সঙ্গে সহ্য করেন। প্রতিশ্রুতি পালনে তাঁরা একনিষ্ঠ। আত্মসম্মান রক্ষার জন্য তাঁরা অকাতরে ত্যাগস্বীকার এবং অর্থব্যয় করেন। ধর্ম্মগুরুদের তাঁরা যথেষ্ট সম্মান করেন। ধর্ম্মের পথ থেকে তাঁরা বিচলিত হন না। ধার্ম্মিকদের তাঁরা ভক্তি করেন এবং তাঁদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেন। তাঁদের উপদেশ তারা শ্রদ্ধার সঙ্গে শুনেন। তাঁদের আশীর্ব্বাদ পাবার জন্য তারা লালায়িত। সুফী, দরবেশ প্রভৃতির তাঁরা যথেষ্ট সম্মান করেন। শালীনতা এবং ভদ্রতার পথ কখনও তাঁরা বর্জ্জন করেন না। ন্যায়কথা যার মুখ থেকেই আসুক না কেন, সম্ভ্রমের সঙ্গে তাঁরা তা শোনেন, আর তার নির্দ্দেশমত কায করেন। দুর্ব্বলের প্রতি তাঁরা ন্যায় বিচার করেন, তাদের প্রতি তাঁরা করুণা দেখান। মুক্তহস্তে তাঁরা দান করেন, অকাতরে তাঁরা খরচ করেন। দরিদ্রদের সঙ্গে নম্রভাবে তাঁরা মেলামেশা করেন। ধৈর্য্যের সঙ্গে বিচারপ্রার্থীর আবেদন তাঁরা শুনেন। ধর্ম্মকর্ম্মে, খোদার এবাদত বন্দেগীতে তাঁরা কখনও শৈথিল্য করেন না। ভণ্ডামি, ধর্ম্মদ্রোহিতা, শপথভঙ্গ প্রভৃতি নীচতা তাঁরা বর্জ্জন করে চলেন। এই সবই হচ্ছে রাজার যোগ্য গুণাবলী। এই সবের বলেই তাঁরা রাজত্ব করেন, এই সবের বলেই তাঁরা রাজক্ষমতার অধিকারী হয়েছেন, আর এই সবের দরুণই জনসাধারণের উপর তাঁদের আধিপত্য। আর এও নিশ্চিত যে খোদা তাঁদের স্বজাতি-প্রেম এবং ঐশ্বর্য্যের অনুপাতে এই সব গুণাবলীর দ্বারা তাঁদের বিভূষিত করেছেন। এই সব গুণাবলী অর্থহীন এবং অপ্রয়োজনীয় মোটেই নয়। সাম্রাজ্য এবং রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা তাঁদের স্বজাতিপ্রেম এবং সদগুণাবলীর স্বাভাবিক পরিণতি মাত্র।

বোঝা যাচ্ছে খোদা যখন কোন জাতিকে রাজ্য এবং রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দিতে চান, তিনি তখন তাদের স্বভাব চরিত্রকে সংশোধিত করান এবং বিবিধ সদগুণাবলীর দ্বারা তাদের বিভূষিত করেন। পক্ষান্তরে তিনি কোন জাতিকে রাজ্য এবং রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত তখনই করেন, যখন সেই জাতির স্বভাব চরিত্রে বিভিন্ন রকমের আবিলতা এসে দেখা দেয়, নানা রকম পাপপ্রবৃত্তি তাদের জীবনে আত্মপ্রকাশ করে। তাদের মধ্যে থেকে প্রশংসনীয় গুণাবলী অদৃশ্য হয়; আর বিভিন্ন প্রকারের অনাচার এবং গর্হিত আচরণ আত্মপ্রকাশ করে। ধীরে ধীরে রাজ্য এবং রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা তাদের হাত থেকে অন্যের হাতে চলে যায়। খোদা এইভাবে দেখান যে, তিনি সেই হতভাগ্য জাতির অনাচার অত্যাচারে বিরক্ত হয়ে তাঁর কৃপা এবং তাঁর প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব তাদের কাছ থেকে তুলে নিয়ে যান, আর তাদের যায়গায় তাদের চেয়ে চরিত্রবান এবং যোগ্যতর জাতির উপর তাঁর প্রতিনিধিত্বের এবং বিশ্ববাসীর প্রতিপালন, রক্ষা এবং শাসনের ভার অর্পণ করেন। প্রাচীন জাতিসমূহের ইতিহাসের পর্য্যালোচনা করলে দেখতে পাওয়া যাবে যে রাষ্ট্রের উত্থান-পতন এবং রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার একের হাত থেকে অন্যের হাতে যাওয়া আসা, আবহমান কাল থেকে এইভাবেই চলে আসছে।"

ইবনে খালদুন অতি খাঁটি, অতি সত্য কথাই বলেছেন। জাতির চরিত্রের উৎকর্ষই হচ্ছে তার সর্ব্ববিধ উন্নতির, তাঁর রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার মূল উৎস। আমরা যদি সত্যই রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অধিকারী হতে চাই, তাহলে আমাদের জাতীয় চরিত্রকে তার উপযোগী করে তুলতে হবে। কতকগুলি দুর্বলতা আমাদের জাতীয় চরিত্রে সর্ব্বত্র পরিলক্ষিত হয়। যার প্রতিপত্তি আছে তাকেই আমরা মাথায় তুলে নিতে চাই। ভক্তি আমাদের এত বেড়ে যায় যে প্রতিবাদ এবং সমালোচনার ক্ষমতা অনেক ক্ষেত্রে আমরা হারিয়ে ফেলি। যাঁরা ক্ষমতা পান, তাঁরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে সেই ক্ষমতাকে ব্যক্তিগত এবং বংশগত স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যেই ব্যবহার করেন। স্বার্থসিদ্ধির জন্য সত্যের অপলাপ আমাদের দেশে নিত্যকার ঘটনা। আত্মসম্মান যে মনুষ্যত্বের প্রধান গুণ এবং সর্ববিধ গুণাবলীর উৎস, সেকথা অনেক ক্ষেত্রেই আমাদের দেশের লোক ভুলে যায়। মিথ্যা এবং ভণ্ডামির সাহায্যে যে ক্ষমতা লাভ করে তার জয় গান করতে আমরা বড় একটা কুণ্ঠা দেখাই না। ব্যক্তিগত স্বার্থে আঘাত না লাগলে অন্যায়ের প্রতিবাদে আমাদের দেশের লোক বিশেষ আগ্রহ দেখায় না, কথার পটুতা কাজের পটুতার চেয়ে এদেশে অনেক বেশী। বড় বড় কথা বলার অভ্যাস আমাদের আছে, কিন্তু কথার সঙ্গে কাজের সামঞ্জস্য রাখার প্রয়োজন আমরা অনুভব করি না। আমাদের দেশের লোকের সঙ্গে স্বাধীন উন্নতিশীল কোন দেশের জনসাধারণের তুলনা করলে আমাদের জাতীয় চরিত্রগত দুর্ব্বলতা সহজেই ধরা পড়ে। ফিরিস্তি বাড়াবার দরকার নাই।

জাতির মঙ্গলের জন্য, রাষ্ট্রের স্থায়িত্বের জন্য চরিত্রে যে কত প্রয়োজনীয় একটা দৃষ্টান্ত দিলে পাঠক সহজেই তা বুঝতে পারবেন। ধরুন আত্মরক্ষার জন্য জাতিকে ক্ষমতাশালী এক জাতির সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হতে হল। সাফল্যের সঙ্গে যদি সেই যুদ্ধ চালাতে হয় তা হলে কি কি জিনিসের দরকার হবে? প্রথমতঃ দরকার, রাষ্ট্রবাসীদের মধ্যে সাহসের, বিপদকে তুচ্ছ করে দেখবার ক্ষমতা। কাপুরুষ যুদ্ধে জয়ী হতে পারে না। সাহস হ'চ্ছে একটা নৈতিক গুণ।

তার পর দেশের জন্য, দশের জন্য আত্মোৎসর্গের প্রেরণা এবং ক্ষমতা থাকা চাই। দেশের এবং দশের মঙ্গলের চেয়ে যে নিজের

জীবনকে মূল্যবান বলে মনে করে, সে যুদ্ধে কৃতিত্ব দেখাতে পারে না। দেশের সম্মিলিত শক্তি যাঁরা পরিচালিত করবেন, তাঁদের মধ্যে যদি কর্ত্তব্যজ্ঞান এবং স্তায়নিষ্ঠা না থাকে তাহলে সবই পণ্ড হয়ে যাবে। জনসাধারণের মনে যদি এ ধারণা জন্মায়, যে দেশের নেতারা যুদ্ধকে উপলক্ষ করে নিজ নিজ ব্যক্তিগত স্বার্থ-সিদ্ধির চেষ্টায় ব্যস্ত আছেন, তাহলে দেশরক্ষার ব্যাপারে তাদের সব উৎসাহ, সব উদ্দীপনা চলে যাবে; যুদ্ধের জন্ম স্বার্থ এবং জীবন বিসর্জ্জন করবার মত মনের অবস্থা তাদের আর থাকবে না।

সমর সাধনা সার্থক করতে হলে নেতাদের মধ্যে যথেষ্ট আত্ম-সংযম থাকা চাই। যুদ্ধের জন্ম কোটি কোটি টাকা খরচ করতে হবে, কোটি কোটি টাকার Contract দিতে হবে। জন-সাধারণের মনে যদি এ বিশ্বাস জন্মায়, যে যুদ্ধের সুযোগে নেতারা বেশ দু'পয়সা করে নিচ্ছেন, জাতীয় ধনের সাহায্যে নিজেদের উদরপূর্ত্তি করছেন, তা হলে দেশময় অসন্তোষের সৃষ্টি হবে, যুদ্ধ প্রচেষ্টা ব্যর্থ হবে, দেশ শত্রুকবলিত হবে।

নেতাদের কথা ছেড়ে এবার শ্রমিকদের বিষয় একবার ভাবুন। যুদ্ধের সাফল্য—শ্রমিকদের দেশপ্রেম, ত্যাগ এবং কর্ত্তব্যজ্ঞানের উপর একান্তভাবে নির্ভর করে; শ্রমিক যদি তার কর্ত্তব্য যথোচিত ভাবে না করে তাহলে অজস্র অর্থব্যয় করেও কোন ফল পাওয়া যাবে না। সময় মত জিনিস তৈয়ার হবে না। যা তৈয়ার হবে তা ঠিক কাজে লাগবে না। ধর্ম্মঘট প্রভৃতির আশঙ্কায় সমস্ত প্রচেষ্টা বিপদগ্রস্ত হয়ে পড়বে। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে নৈতিক স্বাস্থ্য এবং নৈতিক উৎকর্ষই হল রাষ্ট্রীয় জীবনের ভিত্তি। প্রাচীন পারসিকেরা দুইটী জিনিসকে জাতীয় শিক্ষার আদর্শরূপে গ্রহণ করেছিলেন; যথা, To tell the Truth সত্য বলা এবং To pull the law ধনুক যোজনা করা। তাঁরা ভুল করেন নি।

প্রশ্ন উঠে, জাতীয় চরিত্রের উৎকর্ষসাধন কি করে করা যেতে পারে, সে সমস্তার আলোচনা বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্যের বহির্ভূত। শিক্ষা, অনুশীলন এবং জীবন্ত আদর্শের সাহায্যেই এ কায করতে হবে।

বিদায়-বেদনা

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী

তুচ্ছ একটা বিড়ালের লাগি' ঘরে টেকা হ'ল ভার ;—
যা-কিছু খাবার, যেখানেই থাক্, আগে মুখ পড়ে তা'র !
যেখানেই যাই, যতই তাড়াই, বেড়ায় সে পাছে-পাছে,
শয্যাটি ঘরে পাতা না হইতে সেই দেখি, শুয়ে আছে।

এততেও তবু নাহিক স্বস্তি—ঘরে, আঙিনায়, ছাদে
সারা দিন রাতে বিশবার করে' এমনই ভীষণ কাঁদে,
ভাবি মনে-মনে, কোন্ কুক্ষণে কথন কিবা যে হয়,
বিশেষ করিয়া রাত্রি-আঁধারে মনে লাগে ভারী ভয়।

স্বভাব-রোদন, হয় তো বা তার প্রকৃতিরই আবেদন
বুঝেও বুঝি না, অজ্ঞাত ভয়ে ভরে' থাকে সদা মন ;
এত বাড়ী আছে, এই বাড়ীতেই কেন এত বাড়াবাড়ি,
যেমন করে'ই ভেবে দেখি, ভয় কিছুতে যায় না ছাড়ি'

ছেলেপুলে নিয়ে বাস করি ঘরে রোগ তো লেগেই আছে,
চুপ করে' থাকি, কোনো কথা বড় বলি না কাহারো কাছে
খোকাটার জ্বর ছাড়ে না কিছুতে তাই ওই কান্নাতে
আপদ বিদায় কালই করা চাই, ভাবিলাম বসে' রাতে !

বহু চেষ্টায় ধরে' বেঁধে' তা'রে করে' দিনু নদী পার,
সন্ধ্যার দিকে মনেরে বুঝাই, বালাই নাহিক আর।
তবু সেই সাথে কেন মনে হয়, ওপারের বালুচরে
গৃহহীন সেই করুণ কণ্ঠ যেন কেঁদে-কেঁদে মরে !

ওপারের ধ্বনি এপারে আসে কি ? সেই পুরাতন সুর !
অন্ধকারের বক্ষ পেরিয়ে দূরত্বে করি' দূর !
গায়ে হাত দিয়ে দেখি খোকাটার জ্বর তো তেমনি আছে,
ভগবানে ডাকি, কত অপরাধ জানাই যে তাঁর কাছে !'

গৃহবাস থেকে বনবাসে যা'রে করেছি বিসর্জ্জন,
বিশবার করে' সেই কথাটাই ভেবে মরে এই মন !
কাঁদে বলে' যারে বিদায় করিতে হয়েছিনু চঞ্চল,
কাঁদে নাক বলে' তা'রি তরে আজি কেন এই আঁখিজল !

জঙ্গম

বনফুল

১২

প্রফেসার গুপ্ত একটু বিপদে পড়িয়াছিলেন। পত্নী সুলেখা তাঁহার গতি-বিধির উপর লক্ষ্য রাখিতে আরম্ভ করিয়াছেন। শুধু লক্ষ্য নয়, গতি প্রতিরোধ করিতেও তিনি উদ্যত। পুত্র কন্যাকে লইয়া তিনি ব্যস্ত থাকিতেন, স্বামীর প্রতি এমন করিয়া মনোযোগ দিবার অবসর এমন কি প্রবৃত্তিও তাঁহার এতদিন ছিল না। স্বামীকে অবশ্য তিনি চিনিতেন। বেলার সহিত তাঁহার সম্পর্কটা তাঁহার চোখের সম্মুখেই ঘনাইয়া উঠিয়াছিল, আধুনিক শিক্ষা দীক্ষা রুচি এবং এম-এ ডিগ্রী সত্ত্বেও এইজন্য তাঁহাকে নিতান্ত সেকেলে ধরণে অহিফেনও গলাধঃকরণ করিতে হইয়াছিল। কিন্তু এতদিন তাঁহার মনের অন্য অবলম্বন ছিল—পুত্র কন্যা। কন্যাটির বিবাহ হইয়া গিয়াছে, পুত্রটি মারা গিয়াছে। আর সন্তান নাই, বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে নিজেই তিনি অধিক সন্তানের জননীত্ব হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়াছেন, অন্য কোন বন্ধনও নাই, স্বামীই তাঁহার একমাত্র অবলম্বন।

তিনি নিজে যদিও স্বামীকে চিনিতেন কিন্তু, পাঁচজনের কাছে যাহা বলিয়া বেড়াইতেন তাহা ঠিক বিপরীত। পরিচিত মহলে আকারে ইঙ্গিতে তিনি এতদিন এই কথাই প্রচার করিয়া আসিয়াছেন যে স্বামী তাঁহার দেবচরিত্র ব্যক্তি, কাব্য লইয়া আত্মহারা হইয়া থাকেন এবং তাঁহার পত্নী-প্রীতি অনন্যসাধারণ। তাঁহার ধারণা ছিল যে লোকে তাঁহার কথা বিশ্বাস করে, কিন্তু সহসা সেদিন তিনি জানিতে পারিয়াছেন কেহই তাঁহার কথা বিশ্বাস করে না, বিশ্বাস করিবার ভান করে মাত্র। আসল কথাটা সকলেই জানে। এক নিমন্ত্রণ বাড়িতে স্বকর্ণে সেদিন তিনি আড়াল হইতে শুনিয়াছেন—একটা ঘরে মিষ্টিদিদির সহিত তাঁহার স্বামীর নাম জড়াইয়া একদল মেয়ে হাসাহাসি করিতেছে। মিষ্টিদিদি না কি তাঁহার স্বামীকে ফেলিয়া কোন এক মুসলমান যুবকের সহিত কাশ্মীর ভ্রমণে গিয়াছেন। তাঁহার মেয়ের বয়সী মেয়েরা ইহা লইয়া হাসাহাসি করিতেছে! প্রফেসার গুপ্ত সান্ধ্য ভ্রমণে বাহির হইতেছিলেন। প্রতিদিন সন্ধ্যায় তিনি তাঁহার আলাদা বাসাটিতে চলিয়া যান, আজও যাইতেছিলেন, সুলেখা আসিয়া দাঁড়াইলেন।

"কোথা যাচ্ছ?"

প্রফেসার গুপ্ত একটু বিস্মিত হইলেন। এ রকম প্রশ্ন সুলেখা সাধারণত করে না।

"যেখানে রোজ যাই।"

"কোথায়?"

প্রফেসার গুপ্ত দাঁড়াইয়া পড়িলেন, রিমলেস চশমাটা একবার ঠিক করিয়া লইলেন।

"জবাবদিহি করতে হবে না কি।"

"হবে।"

সুলেখার গলার স্বরটা একটু কাঁপিয়া গেল, কিন্তু চোখের দৃষ্টিতে যাহা ফুটিয়া উঠিল তাহা করুণ বা কোমল কিছু নহে, তাহা আগুন। একটু ইতস্তত করিয়া প্রফেসার গুপ্ত বলিলেন, "হঠাৎ আজকে এসবের মানে?"

"মানে সন্ধের পর তুমি আর কোথাও বেরুতে পাবে না, যদি কোথাও যাও আমাকে নিয়ে যেতে হবে।"

"বিয়ের সময় এরকম কোন সর্ত্ত ছিল বলে তো মনে পড়ছে না।"

"ছিল বই কি, তুমি আমাকে সুখে রাখতে বাধ্য।"

"ও। আচ্ছা, চেষ্টা করা যাবে।"

সুলেখার দৃষ্টি অগ্নিবর্ষণ করিতে লাগিল। প্রফেসার গুপ্ত তাহার মুখের দিকে ক্ষণকাল চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন, "দেখ, কেউ কাউকে সুখী করতে পারে না, নিজে সুখী হতে হয়। তোমার সঙ্গে আমার যে সম্পর্ক দাঁড়িয়েছে তাতে জীবনে তুমি কখনও সুখী হতে পাবে না। আমি অবশ্য চেষ্টা করব।"

"আমাকে সুখীই যদি না করতে পারবে তাহলে বিয়ে করেছিলে কেন?"

"ঠিক ওই একই প্রশ্ন আমিও তোমাকে করতে পারি, কিন্তু তা আমি করব না। আমার উত্তর সমাজে থাকতে গেলে একটা বিয়ে করা প্রয়োজন তাই করেছি। ভেবেছিলাম—যাক সে কথা।"

"কি ভেবেছিলে?"

"এখনই বলতে হবে সেটা?"

"বলই না শুনি।"

"ভেবেছিলাম তুমি যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষা পেয়েছ তখন তোমার সঙ্গে আমার মনের খানিকটা মিল হবে। এখন দেখছি সেটা মহা ভুল। পরীক্ষা পাশ করলেই মিল হয় না।"

"তুমিই কি মিল হবার মতো লোক?"

"সেটা তো নিজের মুখে বলা শোভা পায় না। তোমার সঙ্গে মিল হচ্ছে না এইটুকু শুধু বলতে পারি। যতদূর দেখছি উচ্চশিক্ষা তোমার দেহকে রুগ্ন বিগতযৌবন এবং মনকে অহঙ্কারী করেছে, আর কিছুই করে নি। সাধারণ মেয়ের মতই তুমি বিলাসী, লোভী, স্বার্থপর। ডিগ্রিটা তোমার নতুন প্যাটার্ণের আর্মলেট বা নেকলেসের মতো আর পাঁচজনকে তাক লাগিয়ে দেবার আর একটা অলঙ্কার মাত্র, ওতে তোমার মনের কোন উন্নতি হয় নি। তোমার কাছে যে কালচার আশা করেছিলাম তা তোমার নেই।"

"আমার কালচার আছে কি নেই সে বিচার তোমাকে করতে হবে না। কিন্তু একটা কথা তোমাকে জিগ্যেস করি—"

প্রফেসার গুপ্ত সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন।

"আমার সঙ্গে কেবল কাব্য আলোচনা করবে এই আশা করেই আমাকে বিয়ে করেছিলে না কি? তা যদি করে থাকো তাহলে হতাশ হবার কারণ আছে। তোমার মতো কাব্যরোগ আমার নেই তা স্বীকার করছি।"

প্রফেসার গুপ্ত হাসিয়া উত্তর দিলেন, "আমার যে সব পুরুষ

বন্ধু আছে তাদের কারো কাব্য-রোগ নেই, কিন্তু তবু তাদের মনের সঙ্গে আমার মনের সুর ঠিক মেলে। দেখ, এসব কথা তর্ক করে' বোঝান যায় না।"

"আসল কথাটা চাপা দিচ্ছ কেন? আমি পুরুষ বন্ধুদের কথা বলছি না, মেয়ে বন্ধুদের কথা বলছি। যাদের সঙ্গ পাবার জন্যে তুমি কাঙালের মতো ঘুরে বেড়াও, তারা কি আমার চেয়ে বেশী কাব্য-রসিকা?"

"তা কেন হবে?"

"তাহলে যাও কেন?"

"সব কথা কি খোলাখুলি আলোচনা করা যায়?"

"গোপন তো আর কিছুই নেই, সবাই তো সব কথা জেনে ফেলেছে। আমি জানতে চাই আমাকে বারবার এমন অপমান কেন করবে তুমি?"

"আমার তো মনে পড়ছে না জ্ঞাতসারে কখনও তোমাকে অপমান করবার চেষ্টা করেছি। আমি বরং বরাবর বাঁচিয়েই চলেছি তোমাকে। তুমিই বরং আপিং টাপিং খেয়ে আমাকে অপদস্থ করেছ।"

"আমি কি সাধে আপিং খেয়েছিলাম? বাধ্য হয়ে খেয়েছিলাম।"

"আমিও যা করছি বাধ্য হয়েই করছি।"

"বাধ্য হয়ে করেছ! তাই নাকি? কি রকম?"

সুলেখার চোখের দৃষ্টি ব্যঙ্গশাণিত হইয়া উঠিল।

প্রফেসার গুপ্ত বলিলেন, "তবে শোন। আমার মনের একটা অবলম্বন চাই। তুমি তা' হতে পার নি। তুমি—শুধু তুমি নয় তোমাদের অনেকেই সুয়ের বার হয়ে গেছ। কাব্যলোকের প্রিয়া কিম্বা গৃহলোকের লক্ষ্মী কোনটাই তোমরা হতে পার নি। সেকালের মতো তুমি পতি পরম গুরু এই কথা বিশ্বাস করে' যদি আমার ঘরের লক্ষ্মী হতে পারতে তাহলে হয়তো—"

"ঘরের লক্ষ্মী মানে।"

"মানে সেই মেয়ে যে আমার সুখের জন্যে সর্ব্বতোভাবে দেহমনপ্রাণ উৎসর্গ করেছে, যে শুধু আমার শয্যাসঙ্গিনী নয় আমার সর্ব্বপ্রকার তৃপ্তিবিধায়িনী, যে আমার জন্যে নিজে হাতে রান্না করে, আমি কি কি ভালবাসি তার খোঁজ রেখে তদনুসারে চলে, আমি যাতে অসুখী হই কখনও এমন কাজ করে না, আমি অসুস্থ হলে যে দিবারাত্র আমার সেবা করে, আমার পিকদানি বা কমোড পরিষ্কার করেও যে নিজেকে কৃতার্থ মনে করে, আমার পুত্রকন্যার জননী হয়ে যে নিজেকে বিব্রতা মনে করে না—গর্ব্বিত হয়, নিজের সমস্ত সুখ বিসর্জ্জন দিয়েও যে আমাকে সুখী করবার জন্যে সতত উন্মুখ—"

"অর্থাৎ যে তোমার দাসী"

"শুধু দাসী নয়, সর্ব্বতোভাবে কায়মনোবাক্যে দাসী। এরকম দাসীর পায়ে নিজেকে বিলিয়ে দিতে আমার আপত্তি নেই, কোন পুরুষেরই নেই বোধহয়। এরা দাসী নয় এরাই লক্ষ্মী, এরাই রাণী। কিন্তু এখন তোমরা পুরুষের দাসত্ব করতে চাও না, সে ক্ষমতাই নেই তোমাদের, এখন তোমরা চাও স্বাধীনতা।"

"চাইই তো।"

"বেশ স্বাধীন হও, আমাকেও স্বাধীন হতে দাও।"

"আমি যদি তোমার মতো স্বাধীন হই তাহলে কি ভদ্রসমাজে মুখ দেখানো যাবে?"

"ভদ্রসমাজে মুখ দেখানো যাবে কি না এই ভেবে যারা কাজ করে তারা স্বাধীনচিত্ত নয়, তারা সুবিধাবাদী। তোমাদের স্বাধীনতার মানে কি জান? তোমাদের স্বাধীনতার মানে স্বামীর অর্থে শাড়ি গাড়ি গয়না কিনে ভদ্রতার মুখোস পরে' সমাজের পাঁচজনের কাছে 'ফ্লারিশ' করে' বেড়ান! ঠাকুর রান্না করুক, চাকর বিছানা করুক, বেয়ারা ফরমাস খাটুক, বয় হাতে হাতে সব জিনিস এগিয়ে দিক, দাই বোতল খাইয়ে ছেলে মানুষ করুক, স্বামী রাশিরাশি টাকা রোজকার করে' তোমার পদানত হয়ে থাকুক, তোমার সুবিধার জন্যে সবাই সব করুক কেবল তুমি নিজে কুটোটি নাড়বে না। এই হল তোমাদের আদর্শ স্বাধীনতা। মাঝে মাঝে রান্না শেলাই অবশ্য তোমরা যে না কর তা নয়, কিন্তু তা সৌখীন রান্না শেলাই, তাতে গৃহস্থের কোন উপকার হয় না, তারও একমাত্র উদ্দেশ্য 'ফ্লারিশ' করা; এত স্বার্থপর তোমরা যে মা হতেও রাজি হও না পাছে ফিগার খারাপ হয়ে যায় এই ভয়ে—"

"আমাদের সবই খারাপ বুঝলাম, কিন্তু যাদের পিছনে পিছনে তুমি ঘুরে বেড়াও তারা কিসে আমাদের চেয়ে ভাল? তাদের কি আছে?"

"রূপ আছে, যৌবন আছে। পুরুষের কাছে এগুলোও কম লোভনীয় জিনিস নয়। তোমাদের তা-ও নেই। দেহের খোরাক মনের খোরাক কিছুই জোগাতে পার না, কি লোভে থাকব তোমার কাছে?"

সুলেখা হঠাৎ হাসিয়া উঠিলেন।

"মিষ্টিদিদির যৌবন আছে না কি?"

"যৌবন না থাক এমন একটা মাদকতা আছে যা তোমার নেই। আসল কথা কি জান? আমরা মুগ্ধ হতে চাই। রূপ, যৌবন, প্রেম, প্রেমের অভিনয়, সেবা, রান্না, আত্মত্যাগ যাহোক একটা নিয়ে আমরা মেতে থাকতে চাই। তুমি আমাকে কি দিয়েছ? তোমার সঙ্গে আমার অতি স্থূল টাকাকড়ির সম্পর্ক এবং সে সম্পর্ক আশা করি কড়ায় ক্রান্তিতে ঠিক আছে।"

"মিষ্টিদিদিও তো তোমাকে আর আমোল দিচ্ছে না শুনছি। এক মুসলমান ছোঁড়ার সঙ্গে চলে গেছে—"

"এক মিষ্টিদিদি গেছে আর এক মিষ্টিদিদি আসবে। পৃথিবীতে মিষ্টিদিদিদের অভাব ঘটবে না কখনও।"

বেয়ারা আসিয়া প্রবেশ করিল।

"শঙ্করবাবু এসেছেন।"

শঙ্কর অনেকক্ষণ আসিয়াছিল, বাহিরে কেহ ছিল না বলিয়া এতক্ষণ সংবাদ পাঠাইতে পারে নাই। শয়নকক্ষের ঠিক পাশের ঘরেই বাহিরের ঘর। শঙ্কর সব শুনিয়াছিল!

"কি খবর—"

প্রফেসর গুপ্ত আসিয়া প্রবেশ করিলেন।

শঙ্কর হাসির জন্য আসিয়াছিল। হাসি কোন বোর্ডিংএ থাকিয়া লেখাপড়া করিতে চায়। বাড়িতে নিজের চেষ্টায় সে ম্যাট্রিক ষ্টাণ্ডার্ড পর্য্যন্ত পড়িয়াছে, এখন সে স্কুলে ভরতি হইতে চায়। প্রফেসার গুপ্তের সাহায্যে তাহাকে একটি ভাল স্কুলে ভরতি করিয়া দিবার ব্যবস্থা করিতেই শঙ্কর আসিয়াছে।

প্রফেসার গুপ্ত এ কার্য্য যত সহজে ও সুষ্ঠুরূপে পারিবেন অপরে তাহা পারিবে না। শিক্ষয়িত্রী মহলে প্রফেসার গুপ্তের খাতির আছে, তাছাড়া তিনি নিজেও শিক্ষাবিভাগের লোক, কোন স্কুলটা ভাল তাহা হয়তো ঠিক মতো বাছিয়া দিতে পারিবেন।

সব শুনিয়া প্রফেসার গুপ্ত বলিলেন, "মেয়েদের লেখাপড়া শিখিয়ে লাভ আছে কোন? আমি তো যতদূর দেখছি লেখাপড়া জানা মেয়েরা ঠিক খাপ খাচ্ছে না সমাজের সঙ্গে।"

"লেখাপড়া জানা ছেলেরাই কি খাপ খাচ্ছে? আপনি খাপ খেয়েছেন?"

প্রফেসার গুপ্ত স্মিতমুখে ক্ষণকাল চুপ করিয়া রহিলেন। তাহার পর বলিলেন, "পুরুষরা বেখাপ্পা হলে ততটা এসে যায় না। মেয়েরা বেখাপ্পা হলে বড় মুস্কিল।"

"আমার তো ধারণা মেয়েরা কিছুতেই বেখাপ্পা হয় না। ওদের প্রকৃতি জলের মতো, যে পাত্রেই রাখুন ঠিক সেই পাত্রের আকার ধারণ করবে।"

"করবে—যদি ওদের প্রকৃতিকে শিক্ষা দিয়ে বদলে না দাও। শিক্ষা পেলেই জল জমে বরফ হয়ে যায়।"

একটু উত্তাপ পেলে কিন্তু গলেও যায় আবার। জল কতক্ষণ বরফ হয়ে থাকবে বলুন।"

"কিন্তু আমরা উত্তাপ দিই কি করে' বল, আমাদের নিজেদেরই যে উত্তাপ প্রয়োজন, আমরা নিজেরাই যে বরফ হয়ে গেছি—বিলিতি রেফ্রিজারেটারে ঢুকে।"

"ওদেরও আপনারাই ঢুকিয়েছেন। একটা কথা ভেবে দেখছেন না কেন—ওরা প্রাণপণে আমাদের মনের মতো হবারই তো চেষ্টা করছে। যখন যা বলেছেন তখনই তাই করেছে। ন বছরে গৌরীদান করতেন যখন তখনও ওরা আপত্তি করে নি। চিতায় পুড়িয়ে মারতেন যখন তখনও বেচারিরা দলে দলে পুড়ে মরেছে। যখন পালকি করে' নিয়ে গেছেন পালকি করে' গেছে, যখন হাঁটিয়ে নিয়ে গেছেন হেঁটেই গেছে। ও বেচারিদের দোষ কি। আজ আপনারা চাইছেন ওরা স্কুল কলেজে পড়ুক নাচগান শিখুক—ওরা প্রাণপনে তাই করছে। কাল যদি আপনাদের চাহিদা বদলায় ওদেরও রূপ বদলাবে।"

"সব ঠিক। কিন্তু আমি সমাজ-সংস্কারক নই, আমি সামান্য মানুষ, যে ক'দিন বাঁচি একটু সুখে থাকতে চাই। I am fed up with the present lot. I would like to have—"

প্রফেসার গুপ্ত কথাটা শেষ করিলেন না, একটু থামিয়া বলিলেন, "মেয়েটির নাম কি বললে? হাসি? আচ্ছা আজ আমি ফোনে কয়েকজনের সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলে রাখব, তুমি কাল এসো। তোমার সাহিত্যচর্চ্চা কেমন চলছে? তোমার "জীবন পথে" বইখানা তত ভাল লাগে নি আমার কিন্তু। বড় পানসে।"

"ভাল হবে কি করে' বলুন, চাকরি করতে করতে সাহিত্যচর্চ্চা করা যায় না।"

"তার কোন মানে নেই; উনুনের ভেতর পুরলেও আগুন আগুনই থাকে, ওসব লেম এক্‌স্‌কিউজ।"

শঙ্কর মুচকি হাসিল বটে কিন্তু মনে মনে সে খুব দমিয়া গেল। সে আশা করিয়াছিল 'জীবনপথে' বইটা পড়িয়া প্রফেসার গুপ্ত উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিবেন।

"তুমি বসবে, না যাবে এখুনি?"

"আমাকে যেতে হবে।"

"চল তাহলে আমিও তোমার সঙ্গে যাই।"

উভয়ে বাহির হইয়া গেলেন।

সুলেখা পাশের ঘরে স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলেন।

১৩

"আমাকে চিনতে পারেন?"

"কই, মনে পড়ছে না—"

"চিবুকের ডানদিকে কালো তিলটা দেখেও মনে পড়ছে না?"

শঙ্করের সহসা মনে পড়িল। সে অবাক হইয়া চাহিয়া রহিল।

"আমার সম্বন্ধে অত কথা আপনি জানলেন কি করে?"

"কল্পনা করেছি।"

"সবটা কিন্তু অলীক কল্পনা বলে' মনে হয় না।"

"অলীক কে বললে? কল্পনাতেই সত্য বলে' অনুভব করেছি বলেই লিখেছি।"

"আমার সম্বন্ধে ওই সব অনুভব করেছেন সত্যি সত্যি?"

"করেছি বলেই তো লিখেছি।"

"আমার সব কথা জানেন?"

"জানি বই কি।"

"ত্রিশ বছরের একটা মেয়ের মনে সংসার সম্বন্ধে অতখানি বৈরাগ্য এসেছিল হঠাৎ? ডাক্তারকে পেলাম না বলেই ক্ষিধে চলে যাবে? পোলাও পেলাম না বলে ভাত খাওয়াও বন্ধ করে দেব!"

"পোলাও না পেলে মনের যে ভাবটা হওয়া স্বাভাবিক তাই আমি লিখেছি। ভাত খাওয়ার খবর দেওয়া আমার বিষয়ের বাইরে।"

"বুভুক্ষাই যখন আপনার বিষয়, তখন ও খবরটা বাদ দিলে চলবে কেন?"

"ওই নোংরা খবরটা দেবার দরকার কি?"

"ইচ্ছে করলেই তো আপনারা নোংরাকেও সুন্দর করে' তুলতে পারেন। স্বামীকে ত্যাগ করে' চলে আসার খবরটাও কম নোংরা নয় কিছু।"

মেয়েটি মুচকি মুচকি হাসিতে লাগিল। তাহার পর বলিল, "জানেন? ডাক্তারকে পাই নি বলে দুঃখ হয়েছিল অবশ্য আমার, কিন্তু তা'বলে তার কম্পাউণ্ডারটিকে ছাড়তে পারি নি আমি। পরের সংস্করণে যোগ করে' দেবেন খবরটা। আরও রিয়ালিষ্টিক হবে—"

শঙ্করের ঘুম ভাঙিয়া গেল। সে উঠিয়া বসিল। আশে পাশে চাহিয়া দেখিল। সত্যই স্বপ্ন তাহা হইলে! অদ্ভুত স্বপ্ন। তাহার 'পান্থনিবাস' পুস্তকের নায়িকা যমুনা স্বপ্নে দেখা দিয়া গেল।

আশ্চর্য্য!

১৪

বিনিদ্র নয়নে হাসি একা শুইয়াছিল।

কাঁদিতেছিল না, ভাবিতেছিল। নিজের দুর্ভাগ্যের কথা নয়, দুর্ম্মতির কথা ভাবিতেছিল। স্বর্ণলতার চিঠিগুলি আবিষ্কার করিবার পর মৃন্ময়কে সে কত অপমানই না করিয়াছে। মৃন্ময়

কিন্তু সে অপমান গায়ে মাখে নাই। অসংলগ্ন ভাষায় অসহায়-ভাবে কেবল তাহাকে বুঝাইতে চাহিয়াছে যে ইহা তাহার যে কর্ত্তব্য তাহা হইতে সে যদি বিচ্যুত হয় তাহা হইলে হাসিই বা তাহার উপর নির্ভর করিবে কোন ভরসায়। মৃন্ময় এতকথা এমনভাবে গুছাইয়া বলিতে পারে নাই, কিন্তু বারবার এই কথাই বলিয়াছে। হাসি বুঝিতে পারে নাই, বুঝিতে চাহে নাই। ঈর্ষার কৃষ্ণধূমে তাহার আকাশ বাতাস তখন অস্বচ্ছ হইয়াছিল।

"আমাকে অনুমতি দাও তুমি।"

মৃন্ময়ের কথাগুলি এখনও তাহার কানে বাজিতেছে। আমাকে সত্যিই যদি ভালবেসে থাক, সত্যিই যদি শ্রদ্ধা করতে চাও আমার মনুষ্যত্বকে খর্ব্ব কোরো না। এই ঘৃণিত পশুজীবন থেকে অব্যাহতি পেতে দাও আমাকে।"

মৃন্ময়ের মুখখানা মনে পড়িল। প্রশস্ত উন্নত ললাট, রক্তাভ গৌরবর্ণ, তীক্ষ্ণদৃষ্টি তীক্ষ্ণ নাসা। ক্ষণিকের জন্য হাসি যেন এক মহাপুরুষের দর্শনলাভ করিয়া ধন্য হইয়া গিয়াছিল।

চিন্ময়ের কথাও মনে পড়িল। সে-ও আর ফিরিবে না। সহসা হাসি উঠিয়া বসিল। আলুলায়িত কুন্তল দুই হাত দিয়া ঠিক করিতে করিতে আবার মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিল—তোমার সহধর্ম্মিনী হইবার যোগ্যতা আমি লাভ করিবই। আমি যত ছোট ছিলাম সত্যই তত ছোট আমি নই।

আলো জ্বালিয়া সে মৃন্ময়কে চিঠি লিখিতে বসিল। এ চিঠি মৃন্ময় কোন দিন পাইবে না জানিয়াও লিখিতে বসিল। আজ সে সমস্ত অন্তর দিয়া বুঝিয়াছিল কেন মৃন্ময় স্বর্ণলতাকে চিঠি লিখিত। ক্রমশঃ

খেলার কনে

শ্রীজনরঞ্জন রায়

পাচক-ব্রাহ্মণীর খুকী ও বাড়ির বাবুর খোকা না ঘুমানো পর্য্যন্ত কাছ ছাড়া হয় না। ছেলেটি দেখিতে যেন নাড়ুগোপাল, আর মেয়েটি যেন একটি পুতুল। বামুনের মেয়েটির সঙ্গে খোকা খেলাঘর পাতে, বর-কনে খেলে। খোকা বাগান হইতে এটা-ওটা ছিঁড়িয়া 'বাজার' করিয়া আনে। খুকীটি তাহা দিয়া কত কি রাঁধে। দেখিয়া শুনিয়া কর্ত্তা গিন্নী বলেন—তোদের বিয়ে দিয়ে দেবো, রাধা কেষ্টো বেশ মানাবে।

কোন্ বস্তি হইতে আসে এই অল্পবয়সী পাচিকাটি, বড়লোক মুনিব তাহার খোঁজ রাখেন না। বিশেষতঃ কোনো দিনই সে দেরী করিয়া আসে না। সেই সকালে চাকরে দোর খুলিতে-না-খুলিতে আসে, আর যায় রাত্রে সবাই খাইলে ঘুমন্ত মেয়েটিকে কাঁধে ফেলিয়া।

বাবু আফিসে গেলে আর এখন খোকার উৎপাত থাকে না। গিন্নী দিব্য রেডিও খুলিয়া গান শোনেন, না হয় নভেল পড়েন। খোকা খুকী আপন মনে খেলা ঘর নিয়া ব্যস্ত থাকে।

এক দিন কর্ত্তা আদর করিয়া একটি আংটি আনিয়া গিন্নীর হাতে পরাইয়া দিলেন। খোকা তাহা দেখিল। গিন্নীর অনুরোধে খোকারও একটি আংটি আসিল।

শীতে জড়সড় ব্রাহ্মণী ভোরের সময় একটা ছেঁড়া কাপড়ে জড়াইয়া মেয়েটিকে আনিয়া সেই খেলাঘরে বসাইয়া দেয়। গরম ওবালটিন্ খাইয়া পোষাক পরিয়া খোকা যখন খেলিতে আসে তখনও মেয়েটি কাঁপিতেছে। খোকার দৌরাত্ম্যে তাহার কনের একটা জুটফ্লানেলের পেনী আসিয়াছে। কিন্তু গেল কয়দিনের পৌষের শীতে খুকীর খুব সর্দ্দি হইয়াছে, গাও গরম হইতেছে।

কয়দিন হইতে ব্রাহ্মণী আর আসিতেছে না। রাঁধিবার জন্য অন্য ব্রাহ্মণ রাখা হইয়াছে। কিন্তু খোকাকে লইয়া বাধিল ভারি গোলযোগ। শুধু কাঁদাকাটি নয়, কনের অভাবে শেষে তাহার প্রবল জ্বর হইল। এদিকে কলিকাতা হইতে পলাইবার হিড়িক উঠিয়াছে, খোকা একটু সারিলে এক দিন ডাক্তার বলিলেন—এইবার আপনারা বেরিয়ে পড়ুন। খোকার তাতে ভারি উপকার হবে। তার পাতানো কনের বিরহ ভোলাতে আপনাদের কলিকাতা ছাড়তেই হোতো। যেখানেই যা'ন সেখানে খোকা যেন ছেলেপিলেদের সঙ্গে আর বর-কনে না খেলে। এ ঝোঁকটা কেটে গেলেই সে সেরে উঠবে।

পশ্চিমের কোনো সহরে তাঁরা চলিয়া গেলেন। সেখানে ছোট ছেলেরা দৌড়াদৌড়ি করে, নদী পার হইয়া পাহাড়ে গিয়া ওঠে, পাহাড়ে ফল খায়। খোকাও তাহাদের সঙ্গে মিশিয়া গেল। শরীরও সারিয়া উঠিল। কর্ত্তা তাহাদের রাখিয়া কলিকাতায় ফিরিয়া যাইবেন স্থির করিলেন।

একদিন খোকা তাহার মায়ের হাতের আংটিটা লইয়া নাড়াচাড়া করিতেছে। হঠাৎ তাহার বাবা বলিলেন—খোকা তোমার হাতের আংটিটা···হারিয়ে ফেলেছো বুঝি ?

খোকা অম্লান বদনে বলিল—না, সেটা তো সেই কনের হাতে পরিয়ে দিয়েছি !

প্রণতি

শ্রীমানকুমারী বসু

দেবি !
রয়েছ স্বরগধামে
তোমারি পবিত্রনামে
মাতৃভক্ত পুত্র রত্ন দত্ত-অলঙ্কার

সে দেব-বাঞ্ছিত নিধি
দীন হীনে দিলা বিধি
যত শুভ কামনায়, শত নমস্কার।

তোমারি করুণামাখা মাতৃত্ব মহিমা আঁকা
তোমারি শুভ্রতা প্রেম ল'য়ে আজি শিরে
প্রণমি করিনু যাত্রা বৈতরিণী তীরে।

আগড়ম বাগড়ম

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি

কেহ কেহ আগড়ম বাগড়ম কত কি বকে, তার মাথা নাই, মুণ্ড নাই। কেহ কেহ আগড়ম বাগড়ম কত কি কাজে খাটে, তারও মাথা থাকে না, মুণ্ড থাকে না। আমরা অসম্বদ্ধ বাক্যকে আগড়ম বাগড়ম বকা বলি। কেহ কেহ অনুবন্ধহীন কাজকে আগড়ম বাগড়ম কাজ বলে।

ছেলেখেলার এক ছড়ায় আগড়ম বাগডম শব্দের উৎপত্তি। ছড়াটি এই—

আগডোম বাগডোম ঘোড়াডোম সাজে।
লাল মেঘে ঘুঙ্গুর বাজে।
বাজাতে বাজাতে চ'লল ঢুলী।
ঢুলী গেল কমলা পুলী।
কমলা পুলীর টিয়েটা।
সুজ্জি মামার বিয়েটা।

ছড়াটি বহুকালাবধি বঙ্গদেশের সর্বত্র প্রচলিত আছে। কিন্তু আপাততঃ ইহার কোন সানুবন্ধ অর্থ পাওয়া যায় না। এই হেতু আগড়ম বাগড়ম শব্দের উৎপত্তি। ইহার সহিত বহুপ্রচলিত নিম্নলিখিত ছড়া তুলনা করুন, প্রভেদ বুঝতে পারা যাবে।

আয় রোদ্দ্ হেনে।
ছাগল দিব মেনে।
ছাগলীর মা বুড়ী।
কাঠ কুড়াতে গেলি।
ছ খানা কাপড় পেলি।
ছ বউকে দিলি।
আপনি মরে জাড়ে।
কলাগাছের আড়ে।
কলা পড়ে টুপ্‌টাপ্।
বুড়ী খায় লুপ্‌লাপ্।

ছড়াটির এক এক চরণের অর্থ আছে, কিন্তু প্রস্তুত বিষয়ের সহিত সম্বন্ধ নাই। শীত ঋতুর প্রাতঃকালে শিশু রোদ পোয়াতে চায়। ব'লছে, 'আয় রোদ্দ্, সমুখের ঘর-বাড়ী, গাছ-পালা হানিয়া ভাঁগিয়া আয়।' রোদ্দুকে লোভ দেখাছে, 'তোকে ছাগল মান্য দিব, তুই খাবি।' 'আগে ছাগল দে, তবে যাব।' 'ছাগল দিব, কিন্তু দেখ, ছাগলের এক বুড়ী মা আছে,' ইত্যাদি। কথাপ্রসঙ্গে ছাগল ঢাকা প'ড়ল। ইতিমধ্যে সূর্য উঠেছেন। ছড়াটিতে কৌতুক আছে, কিন্তু কবিত্ব নাই।

আগডোম বাগডোম ছড়াটি গূঢ়ার্থ, ছন্দে ও লালিত্যে মধুর, ব্যঞ্জনায় অপূর্ব। প্রথমে শব্দার্থ দেখি।

প্রথম চরণ—তিন ডোম সেজেছে। প্রথম ডোম আগে আগে যাচ্ছে, জনাকীর্ণ রাজপথের লোক সরিয়ে দিচ্ছে। দ্বিতীয় ডোম অশ্বের বল্গা ধরে'ছে। তেজী ঘোড়া বাগ মানছে না। তৃতীয় ডোম ঘোড়ার পাশে পাশে চ'লছে। সে পূর্বকালের অশ্বারোহীর পাদ-গোপ বা পার্শ্ব-রক্ষক।

দ্বিতীয় চরণ—লাল মেঘে ঘুঙ্গুর বাজে। কোথাও কোথাও ছড়াটির 'ঘুঙ্গুর' স্থানে 'ঘাগর' বলে। কিন্তু লাল মেঘে ঘুঙ্গুর বাজে না, ঘর্‌ঘর শব্দও হয় না। তিন ডোম সেজে চলে'ছে, ঘোড়া অবশ্য আছে, আরোহীও আছে। ঘোড়াটি লাল মেঘের মত সিঁদুর্‌য়া ও বৃহৎ। তার গলায় ঘুঙ্গুর আছে, ঠুং ঠুং শব্দ হ'চ্ছে।

তৃতীয় চরণ—ঢুলী ঢোল বাজাতে বাজাতে যাচ্ছে। কেন?

চতুর্থ চরণ—ঢুলী কমলাপুলীতে গেল। কমলাপুলী—কমলাপুরী। ল স্থানে র হয়। যেমন, নারিকেলের পুর-দেওয়া পিঠাকে কোথাও কোথাও পুলী-পিঠা বলে। কমলাপুরী—কমলালয়, মহার্ণব, যেখানে—যে দিব্যলোকে কমলার উদ্ভব হয়ে'ছিল। নীল নভোমণ্ডল সে অর্ণব। ঋগ্বেদের কাল হ'তে আকাশ-সমুদ্র শোনা আছে।

পঞ্চম চরণ—কমলাপুলীর টিয়েটা। টিয়েটা = টিয়াটা = টিআ-টা (টা' অবজ্ঞায়, যেমন লোকটা নির্বোধ, 'টি' আদরে)। এই 'টিআ' শব্দ ভাবিয়েছিল। দেখা যাচ্ছে, সুজ্জি মামা বিয়ে ক'রতে যাচ্ছেন, কন্যা অবশ্য আছে। এই সূত্র ধরে' 'টিআ' শব্দের অর্থ কন্যা আসে। সংস্কৃত দুহিতা = সংস্কৃত-প্রাকৃতে ধীতা, ত লুপ্ত হয়ে' ধীআ। ত লুপ্ত হয়, যেমন ধাত্রী, ধাই; মাতা, মা। ধ স্থানে ঝ হয়ে' ঝীআ, ঝিআ, বর্তমান ঝী, ঝি। ধ স্থানে ঠ হয়। যেমন ধাম = ঠাম। ধ স্থানে ট ও হয়, যেমন ধিক্কার, বাঙ্গালা-প্রাকৃতে টিটকার। টিআ, কমলাপুরীর ঝিআ, কন্যা, অর্ণব-কন্যা। (হয়ত প্রথমে 'ধীআ' কিম্বা 'ঠীআ' শব্দ ছিল, পরে 'টা' থাকাতে ধীআ ঠীআ স্থানে 'টিআ' হয়েছে।

ষষ্ঠ চরণ—এই কন্যার সাথে সুজ্জি মামার বিভা হবে। এখানেও 'টা' অবজ্ঞায়।

কিন্তু কোন্ সুবাদে সুজ্জি আমাদের মামা হ'লেন? মায়ের ভাই মামা। একদা ক্ষীরোদ-সাগর-মন্থনে চন্দ্র ও লক্ষ্মী উত্থিত হয়ে'ছিলেন। তাঁরা ভাই-বইন। লক্ষ্মী আমাদের মাতা। এইহেতু চন্দ্র আমাদের মামা। কিন্তু সূর্যের ভগিনী, যিনি আমাদের মা হ'তে পারেন, এমন কা-কেও দেখতে পাই না। চন্দ্র-সূর্যের একটু দূর সম্পর্ক আছে। তাঁরা এক গাঁয়ের লোক। দুজনেই আকাশ সমুদ্রে সন্তরণ করেন। পূর্ব সমুদ্র হ'তে উঠেন, পশ্চিম সমুদ্রে ডুবেন। বোধহয়, এই গ্রামসম্পর্কে সুজ্জি আমাদের মামা।

কিন্তু কস্মিন্‌কালে কেহ তাঁর বিভা দেখে নাই, শুনে নাই। দেখার কথাও নয়। তখন কে ছিল, কার বা জন্ম হয়ে'ছিল? কিন্তু শোনা কথা, বিবস্বানের দুই পত্নী ছিলেন। একটি ত্বষ্টা বিশ্বকর্মার কন্যা। বেদে নাম সরণ্যু (তিনি সরেন, থাকেন না), পুরাণে সংজ্ঞা (যার আগমনে জীবগণ জেগে উঠে)। তাঁরই গর্ভে এক মনুর (বৈবস্বত মনুর) ও যমের জন্ম হয়ে'ছিল। যমের এক যমজ ভগিনী ছিল, তিনি যমী, ভূ-লোকে নাম যমুনা। অন্য পত্নীটি সংজ্ঞার ছায়া, দর্পণে যেমন প্রতিবিম্ব দেখা যায়, ইনি

প্রথমার তেমন ছায়া। প্রথমা পত্নী গ্রীষ্মশেষ দিনের উষা, দ্বিতীয়া পত্নী প্রথমার প্রতিচ্ছবি। উষা পূর্ব আকাশে থাকেন, তাঁর ছায়া পশ্চিম আকাশে সূর্যাস্তকালে সন্ধ্যারাগরূপে দৃষ্টি-গোচর হন। রূপে ও বর্ণে সমান, এইহেতু নাম সবর্ণা। পুরাণে নাম ছায়া—সংজ্ঞা। এঁরও দুই পুত্র হয়ে'ছিল, সাবর্ণি মনু ও শনি। শনিরও এক যমজ ভগিনী ছিল, নাম তপতী, ভূ-লোকে নাম তাপ্তী।

উপাখ্যানটি এই। মার্কণ্ডেয় পুরাণে বিস্তারিত আছে। ত্বষ্টার কন্যা গ্রীষ্মকালীন সূর্যের তেজ সইতে না পেরে পিত্রালয়ে পালিয়ে গেলেন। পাছে সূর্য টের পান, তাঁর সবর্ণাকে রেখে গেলেন। সূর্য বঞ্চনা বুঝতে পারলেন না। কিছুদিন গেল, সবর্ণার পুত্র হ'ল, সপত্নীর পুত্রদ্বয়ের প্রতি অনাদর হ'তে লাগল। যম সইতে পারলেন না, পিতার কর্ণগোচর করালেন। সূর্য ধ্যানযোগে ব্যাপারটা জানলেন। অগত্যা স্বীয় প্রখর তেজ কমাতে সম্মত হ'লেন। বিশ্বকর্মা জামাতাকে ভ্রমিযন্ত্রে (কুঁদে) চড়িয়ে তার তেজ চেঁচে ফেললেন। অল্প নয়, পনর আনা! এক আনা মাত্র রইল। কেহ বলেন, দুই আনা মাত্র ছিল। তখন তাঁর গ্রীষ্মকালীন প্রচণ্ডতা গেল, শীতকালীন সৌম্যতা এল। সংজ্ঞাও শ্বশুর-ঘরে ফিরে এলেন।

তবে সূর্যের দুই পত্নী ছিলেন। "ছিলেন" কেন, "আছেন"। কে না প্রথম পত্নী উষা ও দ্বিতীয় পত্নী সন্ধ্যা দেখেছেন। কবি কোনটির সাথে বিভা দেখেছেন? একটিরও সাথে নয়। কারণ কোন্ এক অতীত যুগে সে বিবাহ হয়ে'ছিল, এখন সে প্রসঙ্গ উঠতে পারে না। সূর্যের যোগ্যা একটি কন্যার সন্ধান পাওয়া গেছে। দুর্গা পূজার সময় চণ্ডী পাঠ হয়। চণ্ডীর অনেক টীকা আছে। গোপাল চক্রবর্তীর টীকা উৎকৃষ্ট। ইনি সূর্যতনয় সাবর্ণির টীকায় লিখেছেন, সূর্য পত্নী সংজ্ঞার সমানবর্ণা যে সবর্ণা, সাবর্ণি তাঁরই পুত্র। 'এই সাবর্ণি মনু সমুদ্রকন্যা সবর্ণার অপত্য নহেন।' (এতেন সমুদ্রকন্যায়াঃ সবর্ণায়াঃ অপত্য-ব্যাবৃত্তিঃ।) কে এই সমুদ্রকন্যা সবর্ণা, তা তিনি লেখেন নাই। আমিও কোন পুরাণে পাই নাই। কিন্তু দেখছি, চক্রবর্তী মশায় সূর্যপত্নী এক অর্ণবকন্যার বৃত্তান্ত জানতেন। আমাদের কবিও জানতেন।

কোথায় বিভা হয়ে'ছিল? সবর্ণার বিভা নিশ্চয় পশ্চিম আকাশে হয়ে'ছিল। অপর হেতুও আছে। সূর্যের বিবাহ নিশ্চয় বৈদিক বিবাহ। গোধূলি লগ্নে বিবাহ, বৈদিক বিবাহ। সে বিবাহ দিবাতেও নয়, রাত্রিতেও নয়। বঙ্গদেশের জোষী সুতহিবুক-যোগকে বিবাহের শুভ-লগ্ন মনে করেন, রাত্রিকালে সে যোগ অন্বেষণ করেন। যোগটি কিন্তু পুষ্কর দ্বীপের (মেসো-পোটেমিয়ার) প্রাচীন যবন জোষীদের নিকটে শেখা। (সুতহিবুক নামটি যাবনিক।) সূর্যের বিভায় যবন স্মৃতি থাকতে পারে না। গোধূলিতে বিভা সবর্ণার সাথেই বিভা সিদ্ধ হ'চ্ছে।

অস্তগামী সূর্যের চারিদিকে রক্তরাগ দেখতে পাওয়া যায়। সেটা সন্ধ্যারাগ। প্রতিদিনের উষার অরুণরাগ সমুজ্জ্বল হ'লেও বহুদূরব্যাপী হয় না, সন্ধ্যারাগও হয় না। সকল দিনের সন্ধ্যারাগ বৃহৎ হয় না, তাতে বৃহৎ অশ্বও দেখতে পাওয়া যায় না। সুজ্জি মামার বিভা যে সে ঋতুতে হ'তে পারে না।

বসন্ত ঋতুই বিবাহের প্রশস্ত কাল। কিন্তু বসন্তকালের সন্ধ্যারাগ আমাদিকে মোহিত করে না। গ্রীষ্মেরও নয়, হেমন্তেরও নয়, শীতেরও নয়, বর্ষাকালেরও প্রায় নয়, ব'লতে পারা যায়। বর্ষার শেষাশেষি ও শরৎকালে এক একদিন সন্ধ্যাকালে লাল রংএর হাট বসে, তার তুলনা নাই। কে যেন অস্তগত সূর্যের বামে দক্ষিণে উর্ধ্বে হিঙ্গুল গুঁড়িয়ে ছড়িয়ে দিয়েছে। তখন কত সিঁদুর্যা ঘোড়া দেখতে পাওয়া যায়। মেঘ নয়, লাল আলো।

এখন আগেডাম বাগেডাম ছড়াটির সম্পূর্ণ অর্থ করা যেতে পারে। একদিন শরৎকালে সন্ধ্যারাগে পশ্চিমাকাশ দীপ্ত হয়ে'ছিল। শিশু পুত্র-কন্যা শুধালে, "বাবা, ওটা কি দেখা যাচ্ছে?" ব্রাহ্মণপণ্ডিত পিতা বলিলেন, "ওটা লাল ঘোড়া। তেজী ঘোড়া লাফাচ্ছে। এক ডোম আগিয়ে যাচ্ছে, আর এক ডোম লাগাম ধরে'ছে, আর একজন পাশে পাশে চ'লছে। এত বড় ঘোড়া একজনে বাগাতে পারছে না।" [তখন দেবালয়ে আরতির ঘণ্টা ও ঢোলের বাজনা শুনা যাচ্ছিল।] "ঘোড়ায় যাচ্ছে?" "তোমাদের সুজ্জিমামা বিয়ে ক'রতে যাচ্ছে।" "কোথায় বিয়ে ক'রতে যাচ্ছে?" "তোমাদের মামাবাড়ীর গাঁয়ে, নদীর ওপারে। ঐ দেখ, নদীর ঘাটের পাটে বসে'ছে, এখুনি ডুবে' সেখানে যাবে। সারারাত সেখানে থাকবে।"

শিশু যাই বুঝুক, এমন ছড়া বাংলা ভাষায় আর একটি নাই। এটি ছড়া, ভাবের অবিচ্ছেদে একটির পর একটি জুড়ে' একটি সম্পূর্ণ ধারাকে পূর্ণ ক'রেছে। রক্তরাগ দিগন্তপ্রসারিত হ'য়ে সন্ধ্যাকে উদ্দীপ্ত করে'ছে। বিস্ময়রসের সহিত কৌতুক মিশ্রিত হ'য়ে একখানি ছোট কাব্য সৃষ্টি হ'য়েছে। ছড়াতে বিশেষণ থাকে না, সর্বনাম থাকে না। এই কারণে শিশুর বোধগম্য হয়। তথাপি অল্প সোজা কথায় প্রকৃতির বৈচিত্র্য প্রস্ফুটিত হয়েছে। পূর্বকালে ডোমেরা সৈনিক হ'ত। তার সাক্ষী লাউসেন-চরিতে আছে। ছড়াটি অল্প দিনের নয়, ইহা স্বচ্ছন্দে ব'লতে পারা যায়। যদি "টিয়া" শব্দ 'ধীআ' হ'তে এসে থাকে, ছড়াটি বহু পুরাতন।

উল্লিখিত ছড়াটির পরে কোথাও কোথাও আর একটু শুনতে পাওয়া যায়।

আয় রঙ্গ-হাটে যাই।
পানসুপারি কিনে খাই।
একটি পান ফোঁপরা। ইত্যাদি

এটি পরে কোন অকবির রচিত। তথাপি তিনি রঙ্গের হাট ভুলতে পারেন নাই।

শ্রীআশালতা সিংহ

৩৬

বিপিন অনন্তর সঙ্গতিপন্ন প্রতিবেশী। সে কয়েকদিন হইল কলিকাতা গিয়াছিল। একটা গ্রামোফোন এবং একরাশ রেশমী কাপড়চোপড় ও নানাপ্রকার সৌখীনদ্রব্য ক্রয় করিয়া আনিয়াছে। ভাবী বধূর মনোহরণ করিবার জন্য সর্ব্বদিকে আয়োজন চলিতেছে। বিপিনের ছেলে নাই, মেয়ে-জামাই এবং তাহাদের ছেলেমেয়েরা আছে। সে প্রায়ই এজন্য দুঃখ করিয়া প্রতিবেশীদের নিকট বলে, আর দাদা, একটা ছেলে নেই। মেয়ে তো হ'লো পরস্যাপি পর। জামাইদের কথা না বলাই ভালো। আমাদের শাস্ত্রে বলে, জন জামাই ভাগ্না, এ তিন নয় আপনা। এত বড় বাড়ীটা যেন খাঁ খাঁ করছে। এক তিল মন ব'সেনা। কোন জিনিষেব একটা জৌলুস নেই, তাইতেই···

মেয়েদের খবর দেওয়া হয় নাই। কাবণ খবর তাহাদের পক্ষে সুখবর হইবেনা এবং এপক্ষ হইতেও নাতিনাতনি জামাই মেয়ে প্রভৃতির অস্তিত্ব বেমালুম ভুলিয়া যাওয়াই স্বস্তির। মজুররা আসিয়া ভারা বাঁধিয়া বাড়ীর চূণ ফিরাইতেছে। নূতন ক্রীত কলের গানে যখন তখন রেকর্ড বাজিতেছে। সন্ধ্যাবেলায় একটা কীর্ত্তনের রেকর্ড বাজিতেছিল:

"একে পদ পঙ্কজ পঙ্কে বিভূষিত
কণ্টকে জর জর ভেল।
তুয়া দরশন আশে কছু নাহি গনলু
চির দুখ অব দূরে গেল।"

মালতী নিজের ঘরে চুপ করিয়া বসিয়াছিল। ঘরে আলো জ্বালে নাই। চুপ করিয়া বসিয়া থাকিবার অবসরও তাহার বড় একটা হয়না। তবে আজ কয়েকদিন হইতে দুর্গামণি তাহার উপরে সদয় ব্যবহার করিতেছেন। বড় একটা বকাবকি প্রায় করেন না। নীহার ঘরে ঢুকিয়া ভীতস্বরে বলিল—সই, তোর কাছে ওডি-কলোন আছে? দাদার দুপুব থেকে খুব জ্বর এসেছে। নিশ্চয়ই ম্যালেরিয়া ধরলো। যারা বাইরে থেকে আসে, তাদেরই চট্ করে ধরে কিনা। আগুনের মত গা যেন পুড়ে যাচ্ছে। কি করব ভেবে পাচ্ছিনে। গাঁয়ে আবার ডাক্তার নেই···

মালতী বাক্স খুলিয়া অনেকদিনের পুরাণ একশিশি ওডি-কলোন বাহির করিল। একটু ইতস্তত করিয়া অবশেষে বলিল—চল আমিও যাই, দেখে আসি। যদি দরকার হয় অন্য জায়গা থেকে ডাক্তার আনতে হবে।

নীহার অবাক হইয়া বলিল—তুই যাবি? কিন্তু··

ছেঁড়া পুরানো গায়ের শালটা ভালো করিয়া গায়ে টানিয়া দিয়া মালতী বলিল, যাব বইকি। এদিকে আবার ভালো ডাক্তার পাওয়া যায়না এই মুস্কিল। এই ভর্ত্তি ম্যালেরিয়ার সময়ে কেনইবা উনি এ'লেন? কি দরকার ছিল আসবার। ভারি অবুঝ কিন্তু।

নীহার আর কিছু বলিলনা। সে শুনিয়াছিল মালতীর আসন্ন বিবাহের উদ্যোগ চলিতেছে। তাহাদের বাড়ী যাওয়া নিয়া যত কথা উঠিয়াছিল তাহাও শুনিয়াছিল। তাহার সৎ-মাকেও চিনিত। তবু যে কি সাহসে ভর করিয়া মালতী এই সন্ধ্যার অন্ধকারে আবার সে-ই বাড়ীতে যাইতেছে তাহা বুঝিল না।

বিনয়ের ঘরে ঢুকিয়া ওডিকলোনের সহিত জল মিশাইয়া নীহার পটি মাথায় দিয়া দিল। মালতী শিয়রের কাছে দাঁড়াইয়া পাখা করিতে লাগিল।

জ্বরটা একটু বেশি হইয়াছিল, এখন কমিয়াছে। সন্ধ্যার প্রদীপ জ্বালিয়া আনিতে নীহার চলিয়া গেল। মাথার কাছে কে দাঁড়াইয়া পাখা করিতেছে তাহা বিনয়ের মাথা হইতে পা পর্য্যন্ত সমস্ত ইন্দ্রিয় অনুভব করিতেছিল। অনেকদিন অনেক আবেগকে সে দমন করিয়াছে, কিন্তু আজ অসুস্থ দেহে নিজের উপর তাহার বিশ্বাস শিথিল হইয়া আসিল। মালতী যে কতখানি বাধাবিঘ্ন এবং অপমান ঠেলিয়া আসিয়া তাহার কাছে—তাহার রোগ শয্যার পাশে দাঁড়াইয়াছে বুঝিতে পারিয়া সমস্ত মন উতলা হইয়া উঠিল।

উত্তেজিত হইয়া বলিল—তুমি কেন এসেচ মালতী? কেন এ'লে তুমি? তুমি কি জানোনা এইটুকুর জন্যে তোমাকে কতখানি সইতে হবে?···

মালতী চুপ করিয়া পাখা করিতে লাগিল, কেবল একটু আগে পাশের বাড়ীর গ্রামোফোনের রেকর্ডে যে কীর্ত্তনের সুর শুনিয়াছিল; তাহাই দুই কান ভবিয়া বাজিতে লাগিল তাহার: 'পঙ্কক দুখ তৃণহুঁ করি গণলু···'

বিনয় একটু থামিয়া বলিল—বল মালতী? আজও কি চিরদিনের মত চুপ করেই থাকবে? বল আমি কি তোমার কোন কাজেই লাগতে পারিনে? তুমি তো জান আমি কত নিঃস্ব কত দরিদ্র, আমার শক্তি সামর্থ্যের পরিমাণ কতই অল্প। তবু যদি কোন কাজে লাগতে পারি তুমি হুকুম কর···

মালতী মৃদুস্বরে বলিল—আপনি নিজের সম্বন্ধে যখন ঐ রকম করে কথা ব'লেন আমার বড় কষ্ট হয়। কোনদিক থেকে কারও চেয়েই ছোট বলে আমি আপনাকে ভাবতে পারিনে। আপনি যদি দরিদ্র হ'ন তবে পৃথিবীতে ঐশ্বর্য্য কার আছে?

বিনয় একটু হাসিল। বলিল, এবারে পাখাটা রেখে দাওনা, আর দরকার হবেনা। আমার জ্বর নিশ্চয় কমে গেছে! কিন্তু এইমাত্র যে কথাটা বললে সেটা কত মিথ্যে জানো কি? জ্বর যদি না'ও কমে থাকে, আমাকে কালই কলকাতা যেতে হবে।··· কেন? কারণ না গেলে চাকরি যাবে। পরশু আমার ছুটির শেষ দিন। তার মধ্যে যে কোন উপায়েই হোক পৌঁছতে হবে। অসুখে পড়ে আমার প্রথম ভাবনা, কি করে ছুটি ফুরোবার আগে যেয়ে পড়ব। আজ যদি চাকরি যায় সে কথা ভাবলে বুকের রক্ত

হিম হয়ে যায়। যে এত অযোগ্য এত নিঃসম্বল, সে কি তোমার কোন কাজে লাগবে মালতী? তবুও…আচ্ছা—

মালতী বাধা দিয়া দৃঢ়কণ্ঠে কহিল, পাগলামি করচেন কেন? কাল আপনার যাওয়া হয়! আপনার ম্যানেজারের ঠিকানা দিন, আমি আপনার নাম দিয়ে কাল সকালেই চিঠি পাঠিয়ে দেব। রাধা-গোবিন্দজীউর মন্দিরে আরতি দেখিয়া রত্নময়ী বাড়ী ফিরিয়াছেন। পাশের ঘরে তাঁহার গলার স্বর শোনা গেল: বিনয় কেমন আছেরে এখন? মালতী পাখা রাখিয়া সামনের দরজা দিয়া চলিয়া গেল। অন্ধকার পথে তাহার ক্ষীণ দেহ মুহূর্ত্ত মধ্যে অদৃশ্য হইয়া গেল।

সেইদিকে চাহিয়া বিনয় একটা নিঃশ্বাস ফেলিল। কেমন করিয়া কত সহিয়া সে যে আসিয়াছিল এবং এই আসার ফলে তাহার কতখানি যে সে ফেলিয়া গেল তাহাও যেন সর্ব্বদেহমনে অনুভব করিতে লাগিল। দুর্ব্বল মস্তিষ্ক আর কিছু বড় একটা ভাবিতে পারিল না; কেবল সমস্ত মন দিয়া অত্যন্ত মাধুর্য্যের সহিত এই কথাটাকেই লালন করিতে লাগিল।

৩৭

ইহারই দিন তিনেক পরে যেদিন বিনয় পথ্য করিল সেইদিনই কলিকাতার অভিমুখে রওয়ানা হইল। যাইবার আগে মালতীর সঙ্গে দেখা করিবার খুব ইচ্ছা ছিল, কিন্তু কেমন করিয়া দেখা হইবে ভাবিয়া পাইবার আগেই ট্রেণের সময় হইয়া আসিল। নীহারকে বলিল, আমাকে চিঠি লিখিস আর মালতীকে বলিস যদি কোন প্রয়োজন বোধ করে আমাকে যেন লেখে। যেন লজ্জা করে না। আর…

বিপিনের সহিত মালতীর বিবাহ প্রস্তাবটাকে এমন অসম্ভব বোধ হইল বিনয়ের কাছে যে, সে কথাটা তাহার বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হইল না। তথাপি সে একবার নীহারকে প্রশ্ন করিল, হ্যাঁরে, সেই যে বুড়ো বিপিনের সঙ্গে ওর বিয়ের কথা হচ্ছিল সেটা সত্যি নয় তো?

পাছে ভাঙ্‌চি পড়ে বলিয়া বিপিনের সহিত মালতীর বিবাহের প্রস্তাব ও আয়োজন এতই গোপনে করা হইতেছিল যে, বাহিরের লোকের তাহা জানিবার বড় উপায় ছিলনা। তাই বিনয়ের প্রশ্নের উত্তরে এক মুহূর্ত্ত চিন্তা করিয়া নীহার বলিল, কই আর কিছু শুনতে পাই নে তো। বোধহয় সই আপত্তি করাতেই ভেঙ্গে গেছে। নইলে শুনতে পেতাম বোধহয়।

বিনয় খুসী হইয়া বলিল, আহা, বেচারা এই বয়সে এত কষ্ট পেয়েছে তবু ঠিক পথে চলছে। চারিদিকের সঙ্গে লড়াই করতে করতেও। কিন্তু নীহার তুই সেদিন যা বলেছিলি তা আমার মনে আছে। আমি ক'লকাতা যেয়েই মাকে বুঝিয়ে চিঠি লিখব। তারপরে তাঁর মত যদি পাই ভালো, না পাই তবুও আমি ওকে বাঁচাব। কেন একটা জীবন ওভাবে নষ্ট হয়ে যাবে? এই ক'দিন ঐ কথাই শুধু আমার মনে পড়চে। কিছুতেই ভুলতে পারচিনে।

নীহার বুঝিতে পারিয়া খুসী হইয়া বলিল—বুঝেচি। সত্যি তাহলে আমার মনে এত আনন্দ হয়। টাকার কথা কেন তুমি এত ভাব দাদা? তুমি বেটা ছেলে, লেখাপড়া শিখেচ। আজ না হয় কাল—রোজগার করবেই। মিথ্যে তোমার ভাবনা। তখনও বিনয়ের গরুর গাড়ী আসিবার ঘণ্টা দুই দেরী ছিল। নীহার অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া উঠিয়া বলিল—যাই আমি চট্ করে একবার সইয়ের সঙ্গে দেখা করে আসি। সে যে সমস্ত খবর ভালো করিয়া জানিবার এবং প্রয়োজন হইলে জানাইয়া দিবার জন্য গেল তাহা বুঝিতে পারিয়া বিনয় পুলকিত চিত্তে বসিয়া রহিল।

৩৮

সেদিন সেই প্রায়ান্ধকার সন্ধ্যায় মালতী যখন নিঃশব্দে বিনয়ের রোগশয্যা হইতে বাহির হইয়া চলিয়া আসিল তখন তাহার মনে হইতেছিল একটা স্নিগ্ধ পরিপূর্ণতায় তাহার সমস্ত জীবন কাণায় কাণায় ভরিয়া উঠিয়াছে। এতদিন যত অনাদরে যত ক্লেশে দিন কাটাইয়াছে সে সমস্তই অকিঞ্চিৎকর হইয়া তাহার জীবনেতিহাস হইতে কখন খসিয়া পড়িয়াছে। কোনদিন যে সে সব ছিল মনেও পড়েনা। নারীর পূর্ণ গৌরবে সে আজ মহীয়সী। যে নিগূঢ় অভিমান তাহার হৃদয়ের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ব্যাপ্ত হইয়া তাহাকে সমস্ত বিষয়ের প্রতি উদাসীন করিয়াছিল আজ সে অভিমান ছিন্ন হইয়া গেল। পৃথিবীতে অপর কোন তথ্যে তাহার প্রয়োজন নাই। সে কেবল এইটুকু জানিয়া খুসী যে তিনি তাহাকে চা'ন। তাহার কথা সর্ব্বদাই ভাবেন। এ কথা জানিবার পর আর কোন দুঃখকষ্টকে সে গ্রাহ্য করেনা।

নিজেকে নষ্ট করিবার যে দুর্দ্দমনীয় ইচ্ছা জাগিয়াছিল তাহা তাহার শেষ হইয়া গেছে, এখন অবসাদের স্থানে আসিয়াছে উৎসাহ।

বাড়ীতে পৌছিয়া দেখিল তাহার বাবা অনন্ত মুটের মাথায় একরাশ কি জিনিষপত্র দিয়া হন্‌হন্ করিয়া বাড়ী ঢুকিল। সে সমস্তই যে তাহার আসন্ন বিবাহের, তাহা বুঝিতে পারিয়া তাহার মুখ নিমেষে পাংশু হইয়া গেল। এইযে একটা সর্ব্বনাশ তাহার চারিদিকে ঘনাইয়া আসিতেছে, কেমন করিয়া তাহার হাত হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায় সে কথাটা সে এতদিন ভাবিয়া দেখে নাই। তাহার চারিদিকে কি ঘটিতেছে না ঘটিতেছে খেয়ালও করে নাই। কিন্তু আজ চমক ভাঙ্গিয়া দেখিল ইহার হাত হইতে উদ্ধার পাওয়া বড় সহজ নয়। নিজের ঘরে আসিয়া সে দ্বার বন্ধ করিয়া দিল। মুখে তাহার দৃঢ় প্রতিজ্ঞার রেখা ফুটিয়া উঠিল।

ঘর বন্ধ করিয়া মালতী ভাবিতে লাগিল—কি করিয়া সে নিজেকে বাঁচাইতে পারে। বাবাকে সে চেনে। তিনি যে কতদূর নিষ্ঠুর-প্রকৃতির এবং কেমন স্বার্থপর তাহা আজ বলিয়া নয়, অনেকদিন হইতেই জানে। যেখানে তিনি টাকার গন্ধ একবার পাইয়াছেন সেখানে যত বাধাই আসুক শেষ অবধি অটল হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিবেন। স্নেহমমতা কাকুতিমিনতি কিছুই তাঁহাকে টলাইতে পারিবেনা। তবে কি করা যায়? … বিপিনের কাছে তিনি যে পাঁচশো টাকা লইয়াছেন অগ্রিম, সেকথা মালতী জানিত। অবশেষে অনেক ভাবিয়া সে তাহার বড়মামীকে একখানা চিঠি লিখিল। তাহার মামাতো ভাই সুধীর কলিকাতার এক সদাগরী অফিসে নূতন বাহাল হইয়াছে—তাই মামীমা এতদিন পর পিতৃ-গৃহের বাস তুলিয়া ছোটখাট বাসা করিয়া ছেলের কাছেই আছেন। মামীকে সে লিখিল:

"মামীমা, তুমিতো জানতে বড়মামা ছোটথেকে আমাকে তাঁর শিষ্যার মত ক'রে মানুষ করেছিলেন। তাঁর আপন হাতে গড়া আমি এ গাঁয়ে কিছুতেই নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারলুম না। এখন আমার জীবনের এমন একটা অধ্যায়ে এসে পৌঁছেছি, যে তুমি না সাহায্য করলে কিছুতেই এ বিপদ থেকে উদ্ধার পাবনা। যখন তোমার সঙ্গে দেখা হ'বে সব কথা ব'লব। তুমি কাল রাত্রির ট্রেণে সুধীরদাকে এখানে পাঠিও। এখানে গাঁয়ে আসবার দরকার নেই। সে রেলোয়ে ষ্টেশনের ওয়েটিং রুমে অপেক্ষা করবে, আমি এই মাইল তিনেক রাস্তা পায়ে হেঁটেই যাব। তারপর ভোরের গাড়ীতে তার সঙ্গে ক'লকাতা চলে যাব তোমার বাসাতে। খুব একটা সুবিধে এই যে, তোমার ক'লকাতার বাসার ঠিকানা এখানে কেউ জানে না। ভগবানের কাছে আমি সর্ব্বদাই কামনা করছি তিনি যেন তোমার ভিতর দিয়ে আমাকে রক্ষা করেন। কাল শনিবার তুমি এই চিঠিখানা পাবে। কালই সুধীরদাকে অফিস ফেরত পাঁচটার ট্রেণে পাঠিও। সে রাত আড়াইটায় আমাদের গাঁয়ের সবচেয়ে কাছে যে ষ্টেশন সেই বাজিতপুরে নামবে। আমি ভোর চারটে আন্দাজ পৌঁছব ওয়েটিং রুমে, তারপর সকাল ছ'টার ট্রেণটা ধরতে পারব। তোমার কোন ভয় নেই। আমি যেজন্যে ঘর ছেড়ে পালাচ্ছি সে জন্যে আমাকে পালাতেই হোত। আর এক উপায় ছিল মরা। কিন্তু বাঙ্গালী মেয়ে চিরকাল মরেই এসেছে, কখনো বাঁচতে শেখেনি। আমি আজ সমস্ত পণ করেও দেখতে চাই মৃত্যুর সদর দরজা ছাড়া আর অন্য কোন পথই কি তার ভাগ্যে নেই। আপন ভাগ্যকে জয় করে নেবার ক্ষমতা কি ভগবান তাকে দেননি।"

৩৯

মালতী এত শান্ত এত চুপচাপ এতই নিরীহ যে তাহার মনের কোণে কোথায় যে অগ্নিকাণ্ড হইতেছে বাড়ীতে কেহই তার খবর রাখে নাই। কেমন করিয়া খবর রাখিবে, সংসারে যথার্থ স্নেহ করিবার কিংবা খবর লইবার লোক তাহার নাই। বিমাতা দুর্গামণি খাটাইয়া লইয়াই খুসী। যথাসময়ে কাজ পাইলে এবং আপন স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যতিক্রম না হইলেই তিনি সন্তুষ্ট, আর কোন খবর লইবার তাঁহার অবসরও নাই। শনিবার রাত্রিতে যথানিয়মিত তিনি দোতালায় শুইতে গেলেন। রাত্রি এগারোটা সাড়ে এগারোটার সময় অনন্তও গাঁজার আড্ডা হইতে ফিরিয়া উপরে শুইতে গেল। খোকা তাহার পিতামাতার ঘুমের ব্যাঘাত করে বলিয়া বরাবর দিদির কাছে নীচে শুইত, সেদিনও শুইয়াছিল।

পরের দিন বেলাতে ঘুম ভাঙ্গিয়া চিরাচরিত নিয়ম মত বিমাতা চায়ের পেয়ালা পাইলেন না। হুঁকায় জল ফিরাইয়া তামাক সাজিয়া অনন্তর হাতে কেহ আনিয়া দিলনা। দুর্গামণি রাগিয়া বলিলেন, মালতী মুখ পুড়ি এখনও বাসনের গোছা নিয়ে ঘাটেই আছে। দিন দিন মেয়ের আক্কেল বাড়ছে! মালতী তখন কলিকাতার পথে ইন্‌টার ক্লাসের কামরায় সুধীরকে বলিতেছিল, উঃ সুধীরদা, যত ভোর হয়ে আসে ততই ভয়ে সর্ব্বাঙ্গে কাঁটা দেয়, যদি এই পথটা হেঁটে ঠিক সময়ে না পৌঁছতে পারি। যদি তুমি না আস তাহলে কি হয়!

সুধীর একটুখানি হাসিয়া সস্নেহে বলিল, দূর বোকা, তোর ঐ চিঠি পাবার পরে আমি কেমন করে না এসে থাকি বলত? কিন্তু বাঙ্গালী মেয়েদের চিরকালের প্রথাকে লঙ্ঘন করে কেমন করে তুই এতটা সাহসী হয়ে উঠ্‌লি ভেবে আমার অবাক লাগে। তখন সূর্য্য পূবের আকাশ লাল করিয়া উঠিতে আরম্ভ হইয়াছে সেই রক্তরাগরঞ্জিত আকাশের দিকে চাহিয়া মালতী মনে মনে কহিল, কে আমাকে এত সাহসী করে তুলেছে তা কি আমি জানিনে? সংসারে চিরদিন অনাদর পেয়ে এসেছি, অনাদরে ও অবজ্ঞায় কি মানুষের মনে সাহস থাকতে দেয়?—কিন্তু যেদিন তাঁর মুখে শুনেচি তিনি বলচেন, তুমি হুকুম কর মালতী আমি তোমার কিছু করতে পারি কিনা, সেইদিনই সাহস ফিরে পেয়েচি। সেই একটি কথায় আমার জীবনের ছন্দ বদলে গেচে। তাই আজ বুঝতে পারচি সেদিন যে উনি রবীন্দ্রনাথের কবিতা থেকে পড়ছিলেন :—

আনন্দে আজ ক্ষণে ক্ষণে জেগে উঠ্‌ছে প্রাণে,
আমি নারী, আমি মহীয়সী,
আমার সুরে সুর বেঁধেছে জ্যোৎস্না বীণায় নিদ্রাবিহীন শশী।
আমি নইলে মিথ্যা হোতো সন্ধ্যা-তারা ওঠা,
মিথ্যা হোতো কাননে ফুল-ফোটা।"……

সে কথার মানে কি। সে মানে বাইরে থেকে ব'লে তো কেউ বোঝাতে পারেনা, অসীম সৌভাগ্য বশে মেয়েমানুষে কোন একদিন নিজের জীবন দিয়ে যদি তা বুঝতে পারে তবেই বোঝে।

মন তাহার পরিপূর্ণ ছিল, ট্রেণেও কোন লোকজন ছিল না। অনেক কথাই সে সুধীরের কাছে বলিয়া ফেলিল আপন অজ্ঞাতসারে। সুধীর বিশেষ কিছু না বলিয়া মৃদু হাসিয়া কহিল, আগ্নেয়গিরির উৎস কোথায়, মনে হচ্চে যেন কিছু কিছু তার আভাষ পাচ্চি। সত্যি আমার মনে হয় মালতী, আমাদের বাঙ্গালী সমাজে আর বাঙ্গালী জীবনে মেয়েদের আমরা ছোট করে দেখেচি—তাই আমরা নিজেরাও দিন দিন ছোট হয়ে যাচ্চি, তারাও বড় হতে পাচ্চেনা। বড় করে দাবী না করলে বড় হবার লোভ জাগবে কেন? কবে আমরা দাবী করতে শিখব?

তারপর কিছুকাল চুপ করিয়া থাকিয়া আবার একটু হাসিয়া কহিল, মনে হচ্চে যেন তোর জীবনে দাবী এসে পৌঁছেচে, তাই কোন বাধাই যথেষ্ট কঠিন হয়ে তোকে বাধা দিতে পারলেনা। মেয়েদের জীবনে আমরা এই দাবী ধ্বনিত করে তুলতে পারিনে; যদি পারতুম তাহলে আমাদের সমাজের চেহারা আজ বদলে যেত। ক্রমশঃ

ইভাকুইজ্ ফ্রম্ রেংগুন্

শ্রীঅশ্বিনীকুমার পাল এম-এ

স্বপ্ন। একটা বিরাট স্বপ্ন-সমুদ্রের প্রবাহস্রোতে ভেসে চলেছে সমস্ত সভ্য জগতের মানব-ইতিহাস! বর্তমান শিক্ষা দীক্ষা, জ্ঞান বিজ্ঞান, শিল্প সাহিত্য ইত্যাদি যত প্রকার ব্যবস্থা রয়েছে মানব-চরিত্র গঠনের জন্য, তার মূলে রয়েছে দুঃখবাদ; উচ্ছৃঙ্খল জীবনস্বপ্ন। মানব-জীবনের মর্মভেদী করুণ আর্তনাদ। আজ প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তে তারই বিষাদ ধ্বনি দিক্‌দিগন্তরে ধ্বনিত হতেছে।

গত ২৩শে ও ২৫শে ডিসেম্বর বোমাবরিষণের পর রেংগুনের ঘরে-বাইরে, রাস্তায় ঘাটে যে দৃশ্য দেখলাম সে সব বলে কোন লাভ নেই, তখন রেংগুন থেকে পালাতে পারলেই বরং লাভ। কিন্তু পালাতে চাইলেই পালান যায় না। কোন্ পথে পালাতে হবে? স্থলপথে, না জলপথে—এখন এ চিন্তাই বিপুল আকার ধারণ করে সম্মুখে এসে দাঁড়াল। তার উপর ন্যাশনাল্ ইনৃডিয়্যান্ লাইফ অফিসে কাজ করি, আপিসের সমস্ত ভার আমার উপর। জেনারেল ম্যানেজার মিষ্টার বোসের কাছে টেলিগ্রাম করলাম কলিকাতায়। জবাব এলো—প্রথম শ্রেণীর টিকেট করে জলপথে সত্বর চলে এসো আপিসের দরকারী কাগজপত্র নিয়ে।

শুনতে পেলাম বঙ্গোপসাগরে জাহাজ ডুবছে; ত্যাগ করলাম এ পথ। আপিসের দারোয়ান রামকিষণ ও পিয়ন মণীন্দ্রকে সঙ্গে নিয়ে চলে গেলাম চায়লট্। এখানে সঙ্গী জুটল সতর-আঠারজন। সুরেশ; বন্ধু ডাক্তার পালের স্ত্রী, তার ছেলেপুলে এবং হাসপাতালের কম্পাউণ্ডারবাবু, তার স্ত্রী শকুন্তলা দেবী ও তাদের ছেলেপুলে। বশীর ও সৈব—দুইজন ভৃত্যও এলো।

১৩ই ফেব্রুয়ারী চায়লট্ থেকে আমরা ষ্টীমারে রওনা হয়ে আসলাম হ্যান্‌জাদা। এখান থেকে আবার একটি বাংগালী পরিবার আমাদের সঙ্গ ধরল। ভদ্রলোকের নাম সুধাংশুবাবু; সে নিজে, স্ত্রী, বয়স্থা মেয়ে নাম বাসন্তী। আমাদের দল বেশ ভারী হয়ে উঠল। হ্যান্‌জাদা থেকে আবার ষ্টীমারে দুই দিনে এসে পৌছলাম প্রোম—রাত্র এগারটার সময়। অপরিচিত শহর; ব্ল্যাক আউটের রাত; এতগুলি লোক নিয়ে কোথায় যাই? প্রোমে একজন পরিচিত বন্ধু ছিল; অনেক খুঁজে তার বাসা পেলাম; বললাম—ভাই, পরের কতগুলি মেয়েছেলে সঙ্গ ধরেছে, আজ রাত্রের জন্য তোমার এখানে স্থান হবে? কালই আবার এখান থেকে রওনা হবো। বন্ধুটি আগুনের মত জ্বলে উঠে আমাকে একপ্রকার তাড়িয়ে দিলে; তার বাসায় স্থান হবে না, রেংগুন থেকে নাগ-পরিবার এসে তার ওখানে উঠেছে; সে দুশ্চিন্তায় তার রাত্রে ঘুম আসে না, অনেকগুলি ছেলেপুলেও নাকি আছে; শহরে কলেরা লেগেছে, কখন কি হয় বলা যায় না; ইত্যাদি কারণে সে স্থান দিতে অক্ষম।

ফিরে এলাম। পথে এক বাংগালী ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা হলো: তাঁকে সব বৃত্তান্ত খুলে বললাম: শুনে তিনি বললেন—মেয়েছেলেরা এখন কোথায়?

ষ্টীমার থেকে নেমে নদীর পাড়ে বসে আছে।

ভদ্রলোকের দয়া হলো। নিজের স্ত্রী-পুত্র আগেই দেশে পাঠিয়ে দিয়েছেন। বললেন, আমি ত এখন মেসে থাকি: তবে আমার ঘরটা খালি আছে: এই নিন্ চাবি—চলুন আপনাদের ঘরে পৌছে দিয়ে আসি।

ভদ্রলোকের অনুগ্রহে শেষে স্থান পেলাম। কিন্তু সে রাত্রটা আমাদের ভয়ানক অশান্তিতে কাটল। রাত একটার সময় চার-পাঁচজন বর্মী এসে আমাদের সম্বন্ধে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করে গেল। মনে হলো, এদের কোন দুরভিসন্ধি আছে। এদিকে চারিদিকে লুটপাটের কথা শুনছি। তার উপর বন্ধুর কাছে শুনে এলাম কলেরার কথা: ছেলেপুলে আমাদের সঙ্গেও একপাল।

একটু আলোর যোগাড় না করলে চলে না: সমস্ত অন্ধকার—ঘরটা যেন গিলে খেতে চাচ্ছে।

সমুখের রাস্তায় একটা পানের দোকানে তখনও কেরোসিন লণ্ঠন জ্বলছে, কালো কাগজে ঢাকনি দেওয়া: আলো যেন বাইরে না পড়ে। সেখানে গিয়ে মোমবাতি পেলাম। একত্র চার-পাঁচটা মোম জ্বেলে ঘরে আলোর ব্যবস্থা করলাম। মেয়েরা সব ছেলেপুলে নিয়ে বসে আছে: সকলের মনেই বিষাদের ছায়া: কারো সঙ্গে কথা বলতে সাহস হয় না। এদিকে ছেলেপুলের দল ক্ষুধা তৃষ্ণায় ভয়ানক কান্না ও বায়না শুরু করে দিয়েছে: কিছু খাবার কিনতে গেলাম, কিন্তু কোথাও কিছু মিলল না, সব দোকান বন্ধ। ষ্টীমারের চা'য়ের দোকানে বিস্‌কুট দেখে এসেছি: ষ্টীমার ঘাট এখান থেকে প্রায় এক মাইল, শর্টকাট করে একটা রাস্তায় ঢুকতেই কয়েকজন বর্মী এসে পকেটে হাত দিতে চাইল: ভয়ে এতটুকু হয়ে গেলাম: সঙ্গে ছিল কম্পাউণ্ডারবাবুর ভৃত্য বশীর: সেও এদের চেয়ে কম গুণ্ডা নয়। একজন বর্মীকে এক ঘুষিতে পপাত ধরণী তলে—করে দিল। বাকী সব দৌড়িয়ে সম্মুখের আমবাগানে পালাল। অক্ষত পকেটে সেখান থেকে ষ্টীমারে গিয়ে বিস্‌কুট্ কিনলাম।

রাত্রে শোবার জন্য বিছানাপত্র কিছু নেওয়া হয়নি। বিছানা, ট্রাঙক্, সুটকেস্ ও অন্যান্য মালপত্র নদীর পাড়ে নামিয়ে রাখা হয়েছে। রামকিষণ, মণীন্দ্র, সুরেশ আর সুধাংশুবাবু এঁরা কজন মালের কাছে বসে মাল পাহারা দিচ্ছেন। এত রাত্রে কুলী মিলল না ব'লে, মালপত্র আজ এখানেই থাকবে স্থির হয়। সুরেশ মণীন্দ্র আর সুধাংশুবাবুকে সেখানে রেখে রামকিষণ ও বশীরকে বললাম গোটা দুই বিছানা নিয়ে আমার সঙ্গে আসতে। এসে দেখি প্রায় সবাই কাঠের মেঝের উপর ঘুমিয়ে পড়েছে। ছেলেপুলের গায়ের জামা খুলে বালিসের পরিবর্তে মাথার নীচে দেওয়া হয়েছে। বাসন্তীর বালিশ একখানা পিঁড়ি: এভাবে শু'লে নিশ্চয়ই মাথায় বেদনা হবে। পিঁড়িখানা সরিয়ে নিজের গায়ের শার্টটা খুলে মাথার নীচে দিলাম। ডাক্তার পালের স্ত্রীর মাথা তার দক্ষিণ বাহুর উপর। কম্পাউণ্ডারবাবুর স্ত্রী শকুন্তলাদি আর বাসন্তির মা

শুধু বসে। এঁদের বললাম—ডাকাডাকি করে সবার ঘুম ভাঙ্গিয়ে লাভ নেই: রাত্র অনেক হয়ে গেছে: আপনারা এই বিছানা পেতে শুয়ে পড়ুন। বিস্কুট এনেছি, ছেলেপুলে ত ঘুমিয়ে পড়েছে; আচ্ছা থাক: ওদের জন্ম রেখে দেন, কাল সকালে ঘুম থেকে উঠে খাবে। দিনকাল ভাল নয়, কলেরা লেগেছে। পরদিন সকালে উঠেই বাজার করতে গেলাম, চাউল, ডাল, তরকারী, যা পেলাম নিয়ে এলাম; লবণ পেলাম মাত্র দু'আনার, বেশী বিক্রী করবে না; তাড়াতাড়ি রান্নাবান্না করে খেয়ে আবার রওনা হওয়ার যোগাড় করলাম। প্রোমনদী বয়ে প্রায় পাঁচ মাইল দূরে গিয়ে নামতে হবে। একখানা বড় শামপান (ঐদেশী নৌকা) পঞ্চাশ টাকা দিয়ে ভাড়া করলাম, আগে এ জায়গাটুকু যেতে মাত্র দুই টাকা ভাড়া লাগত!

নদী পার হয়ে যেখানে নামব, তার নাম পাডাং; নদীর পারে একটা মাঠ। এ পাডাং থেকে একশ দশ মাইল পাহাড়ের উপর দিয়ে হেঁটে গেলে টাংগুর পড়ে। এ রাস্তায় ভাত জল কিছুই পাওয়া যায় না। আমরা এক বস্তা চাউল ও আনুমানিক মাল মশলা কিনে নিলাম; জলের জন্ম এগারটা কেরোসিন তেলের টিনও এগার টাকা দিয়ে কিনে প্রোম নদী থেকে জল ভরে, শামপানে উঠলাম। নদীর পার থেকে মালপত্র এনে শামপানে উঠান হয়েছে। তাতে কুলী খরচ লেগেছে পাঁচ টাকার জায়গায় পঁচিশ টাকা।

এ সময় আর একজন সঙ্গী জুটল—নিতাই। আমাদের সকলেরই পূর্ব্বের জানা-শোনা। কম্‌পাউণ্ডারবাবু বললেন, ভালই হলো। মেয়েছেলে নিয়ে চলেছি। বিপদসঙ্কুল পথ, আমাদের অনেকটা সাহায্যই হবে। আর ছোকরার সাহসও আছে, শক্তিও আছে। একবার একজন বর্মীকে ও এক ঘুষিতে নৌকা থেকে জলে ফেলে দিয়েছিল; বেশ সাহস। আমার ত সাহস বল কিছুই নেই। যা ছিল এ যুদ্ধের ঠ্যালায় তাও আর নেই।

বেলা একটার সময় পাডাং এসে পৌঁছলাম। দেখলাম প্রায় হাজার দুই লোক এখানে জমা হয়েছে। এখানে সেখানে পড়ে রয়েছে। ফাল্গুনের দুরন্ত রৌদ্র সবার মাথার উপরে। সেই রৌদ্রতপ্ত মাঠের মধ্যেই কেউকেউ রান্না করেখাচ্ছে। আশে পাশে কলেরা রোগী। মৃত্যু-যাতনায় কেউ কেউ ছটফট করছে। কিন্তু সেদিকে কে চায়? সবাই ব্যস্ত যার যার জীবন নিয়ে; সকলেই আপন প্রাণের মায়ায় সচেষ্ট। এখান থেকে যত তাড়াতাড়ি পারা যায়, সরে পড়াই ভাল। আশে পাশের দৃশ্য দেখলে প্রাণ আতঙ্কে ভরে ওঠে। পীড়িত লোকদের মধ্যে প্রায় সবাই ছোট জাতির; মাদ্রাজী কুলীশ্রেণীর লোক। টাকা পয়সা সঙ্গে কিছু নেই, শুধু পরনের কাপড়খানা সম্বল। সম্মুখের সুদীর্ঘ পাহাড়ী পথ হেঁটে পার হওয়া অসম্ভব ভেবে তারা আর এগোতে সাহস পায়নি। এখানেই দিনের পর দিন পড়ে আছে। শেষে কলেরাক্রান্ত হয়ে কেউ মরছে, কেউ বা অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করছে।

এই একশো দশ মাইল পাহাড়ী পথ অতিক্রম করবার জন্ম এখানে গরুর গাড়ী পাওয়া যায়; কিন্তু দুর্মূল্য। পঞ্চাশ-ষাট টাকা একখানা গাড়ীর ভাড়া। পঞ্চাশ-ষাট টাকার কথা শুনে সুধাংশুবাবু দমে গেল; সে হানজাদায় আবার ফিরে যাবে; এত টাকা তার সঙ্গে নেই; বললাম, চলুন টাকার জন্ম ভাবতে হবে না।

সকলে মিলে সাতখানা গাড়ী করলাম; একখানা খাদ্য সামগ্রী বহন করে নেবার জন্ম। গাড়ীর মধ্যে দেড়হাত পরিমাণ উঁচু খড় বোঝাই; গরুর রাস্তার খাবার। তার উপরে বিছানা পেতে আমাদের বসবার জায়গা করলাম। উপরে কোন ঢাকনি বা ছই নেই। খোলাগাড়ী—আমাদের মালপত্রেই ভরে গেল। কাজেই বর্মী গাড়োয়ান ওদের ভাষায় গালাগালি করতে লাগল এবং একখানা গাড়ীতে দুইজনের বেশী উঠতে দিতে চাইলে না, আমরা বাধ্য হয়ে আর একখানা গাড়ী করলাম। টাকার দিকে এখন চাইবার সময় নেই, যে পথে বের হয়েছি এবং যে দৃশ্য চক্ষের সামনে দেখছি, আর এক মুহূর্তও দেরী করা চলে না।

একত্র আটখানা গাড়ী চলছে মাঠের উপর দিয়ে, আমি একা একখানা গাড়ীতে উঠেছি, সকলের আগে চলেছে গাড়ীখানা, কারণ দলপতি আমি: কিন্তু বিপদের কথা কি বলব, গরুর গাড়ীতে জীবনে কোন দিন উঠিনি। একটা জায়গা ভাঙ্গা; গাড়ী সেখান দিয়ে যেতেই হুড়ুম করে নীচে পড়ে গেলাম; ভাগ্যি, হাত পা ভাঙ্গে নেই, তাড়াতাড়ি গা ঝাড়া দিয়ে উঠে আবার গাড়ীতে বসলাম; পিছনের ওরা দেখে সব হো হো করে হেসে উঠল, হাসল না শুধু বাসন্তী; আমার ঠিক পিছনের গাড়ীতেই সে বসে, ডেকে বলল: লাগেনি ত?

রাত্রি বারটার সময়, একটা নির্জ্জন কাশবনের ধারে এসে গাড়ী থামিয়ে দিল; মেয়েরা গাড়ীর উপরেই বসে রইল; আমরা চা' তৈরী করতে লাগলাম। ভয়ানক শীত পড়েছে, দাউ দাউ আগুন জেলে দিয়েছি। সকলেই আগুনের চারিদিক ঘিরে বসলাম, বশীর আর রামকিষণ চা তৈরি করে গ্লাসে ঢেলে সকলকেই দিল।

রাত্র ভোর হতেই গাড়ী ছাড়ল, বেলা এগারটার সময় এসে পৌঁছলাম একটা ছোট পাহাড়ের গায়; প্রকাণ্ড একটা কুল-গাছ, তার নীচে গাড়ী রেখে রান্নার জোগাড় করা হলো, এখানে আরও কেউ কেউ রান্না করে খেয়ে গিয়েছে, হাঁড়ি পাতিল ও ইটের উনুন পড়ে রয়েছে, একটু দূরেই তুলা-বের-হয়ে-পড়া বালিশ। শকুন্তলাদি বলে উঠলেন—এখানে নিশ্চয়ই কেউ মারা গেছে, দেখছেন না ঐ ছেঁড়া বালিশটা?

বললাম—মরণপথের যাত্রী আমরা সবাই, ভয় করলে চলবে না, এখানেই রান্না করতে হবে, এই উনুনেই। সামনে একটা কুয়া ছিল, সেখান থেকে হাত মুখ ধুয়ে জল এনে রান্না করে খেয়ে বেলা চারটার সময় আবার পথ ধরলাম। এখন থেকে রীতিমত পাহাড় আরম্ভ হলো; শুধু পাহাড়ের মরুভূমি, উত্তপ্ত বহ্নিজ্বালায় পরিপূর্ণ; শুধু আগ্নেয় নিঃশ্বাসে ভরা, তারই পার্শ্বে আবার গহন অরণ্য: দিগন্তব্যাপী; ভীষণ হিংস্র জন্তুর লীলাভূমি, মাঝখান দিয়ে সংকীর্ণ পথ, পাহাড় কেটে পথ বের করা হয়েছে, শুধু এক খানি গাড়ী যেতে পারে সে পরিমাণ মাত্র প্রশস্ত। এক পার্শ্বে প্রায় চার হাজার ফিট উঁচু পাহাড়, অপর পার্শ্বে তলহীন গিরি-গহ্বর, বিরামহীন এই দৃশ্য; পাহাড়ের পর পাহাড়; অরণ্যের পর অরণ্য; গহ্বরের পর গহ্বর, এক বিরাট বিশাল নির্জনতায়

পরিপূর্ণ: সারা বিশ্ব যেন এখানে এসে মৃত পড়ে রয়েছে—সর্ব প্রাণশক্তিহীন হয়ে।

ভয়ে বুক কাঁপে; গাড়ী একটু অসাবধানে চললেই হলো, দুই মাইল নীচে গিরিগহ্বরে শ্বাপদসংকুল অরণ্যের মাঝে মৃত্যুবক্ষে স্থান অনিবার্য্য। গাড়ী ক্রমাগত উপরের দিকেই উঠছে, গাড়ী থেকে নেমে মেয়েদের গাড়ী পিছন থেকে ঠেলে ধরতে হয়, আবার গাড়ী নীচের দিকে নামবার সময়ও পিচন থেকে টেনে ধরতে হয়, নচেৎ গাড়ী উল্টে গেলে মৃত্যু অনিবার্য্য। এর মধ্যেই একটি গুজরাটী পরিবার ছেলেপুলে সহ কোন্ গিরির সানুদেশের পাতালপুরীতে ঢুকে পড়েছে, তার কোন খোঁজ নেই। প্রতি মুহূর্তে মৃত্যু এখন আমাদের পিছন পিছন হাঁটছে। ভয়ে গাড়ী থেকে নেমে হাঁটতে লাগলাম, মেয়েদের ও ছেলেপুলে শুধু গাড়ীতে রেখে, কারণ তাদের পক্ষে হেঁটে যাওয়াও অসম্ভব: প্রত্যেক গাড়ীর পিছনে আমরা একজন করে পুরুষ পাহারা দিয়ে চলছি, একটু অসাবধান হলেই গাড়ী মারা যাবার কথা। যেখানে রাস্তা ভাঙ্গা বা অত্যন্ত খাড়া, সেখানে মেয়েদের ছেলেপুলে সহ নামিয়ে দিয়েছি। কিন্তু মেয়েরা আবার সব সময় ভয়ে নামতে চায়নি, রাস্তার দুইপার্শ্বে মৃতদেহ, পচা, গলা, মাংস বের হওয়া। দ্বিতীয় দিন রাত্রি বারটার সময় জ্যোৎস্না অস্ত গেল; সকলেই আমরা গাড়ীর উপরে, হঠাৎ একটা জায়গায় এসে দেখি—সম্মুখে পঞ্চাশ-ষাটখানা গাড়ী রাস্তা বন্ধ করে দাঁড়িয়ে রয়েছে, পাশ কেটে কারো আগে যাবার সাধ্য নেই; কারণ রাস্তা সঙ্কীর্ণ, দুইখানা গাড়ী পাশাপাশি চলতে পারে না; বাধ্য হয়ে সেখানে আমাদের গাড়ীও থামাতে হলো, প্রায় ঘণ্টাখানেক পর জানা গেল, সকলের আগের গাড়ীর গরু ভয়ানক দুর্ব্বল হয়ে জিহ্বা বের করে রাস্তায় শুয়ে পড়েছে; আজ আর কোন গাড়ী চলবে না। এখানেই থাকতে হবে। গাড়োয়ানরা গাড়ী থেকে গরুগুলিকে ছাড়িয়েনিয়েপাহাড়ের গায়ে বাঁধল, গাড়ী থেকে আমাদের নামিয়ে দিয়ে মালপত্র ও বিছানা যেমন খুশী ঠেলে সরিয়ে নীচে থেকে গরুর খড় টেনে বের করে গরুগুলিকে খেতে দিল। আমাদের দাঁড়াবার পর্য্যন্ত এতটুকু স্থান নেই; একদিকে উঁচু পাহাড়; অপর দিকে সেই পাহাড়ের তলহীন গহ্বর; একটু অসাবধান হলে রক্ষা নেই; ছেলেপুলে কোলে নিয়ে গাড়ী ধরে মৃত্যুর হাতে প্রাণ সমর্পণ করে ভয়ব্যাকুল চিত্তে রাস্তার উপর আমরা দাঁড়িয়ে রইলাম। কমপাউণ্ডারবাবুর মেয়ে আভা আমার কোমর জড়িয়ে ধরে দাঁড়িয়ে ভয়ে কাঁপছে। ছেলেপুলেগুলি জল জল করে চীৎকার করছে, একটা জলের টিনে সামান্য একটু জল আছে; তাই সকলকে একটু একটু দিয়ে ঠাণ্ডা করলাম; শুনা গেল, কাল বেলা বারটার পূর্ব্বে কোথাও জল পাওয়া যাবেনা। ভেবে কোন ফল নেই, অদৃষ্টে যা আছে তাই হবে। জলের অভাবেই শেষে দেখছি মরতে হবে।

আভা একটু জল খেয়ে অমনি আবার বমি করে দিল; হঠাৎ কোত্থেকে ভয়ানক পচা গন্ধ এলো; পকেটের টর্চটা জালিয়ে আশে পাশে ভাল করে চেয়ে দেখি—তিন-চারটা মৃত দেহ; প'চে গ'লে পড়ছে। চুপ করে গেলাম কাউকে কিছু না বলে; এমনিই ভয়ে অস্থির, তার উপর পাশের এ দৃশ্য দেখলে হয়ত ফিট হয়ে পড়বে।

গরুগুলির ঘাস খাওয়া শেষ হলো; এখন আর খড় টেনে বের করতে হবে না; তাড়াতাড়ি মেয়েদের ও ছেলেদের গাড়ীতে উঠে বসতে বললাম। আমরা পুরুষেরা গাড়ীতে উঠে বসতে চাইলে দা' দেখিয়ে বারণ করল; বলল—কেটে ফেলব গাড়ীতে উঠলে। আমাদের পরিবর্তে গাড়োয়ানরাই উঠে আমাদের বসবার বিছানা তুলে তাদের শোবার ব্যবস্থা করল এবং শুল। সারা রাত মৃত গলিত শবের গন্ধ সহ্য করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে রাত্রি ভোর করলাম।

পরদিন আবার গাড়ী চলল: এবার একত্রে শ'খানেক গাড়ী। আমাদের সুমুখের গাড়ীগুলি আগে আগে: মনে হলো আমরা যেন জগতের আদিম অধিবাসী; অসভ্য বর্বর গুহাবাসী, যেখানে যাই, দল বেধে যাই; সেখানে পাহাড়ে পর্বতে, অরণ্যে বাস করি; দল বেঁধে বাস করি; সেখানে পাহাড়ের পুরাতন তরু-শ্রেণীর ছায়া শীতল স্থানে বিশ্রাম করি, দল বেঁধে বিশ্রাম করি; এ পাহাড় এ অরণ্য, গিরিগহ্বর আমাদের জন্মস্থান; এ অরণ্যের শ্বাপদকুল আমাদের ভক্ষ্য: আমরা হিংস্র জন্তুর মত মাংসাশী, তাই সুসভ্য জগৎ হ'তে বিচ্ছিন্ন হয়ে পাহাড়ে অরণ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছি, শীকারের সন্ধানে। সমস্ত বাহির বিশ্ব আজ আমাদের কাছে লুপ্ত, সমস্ত জ্ঞান বিজ্ঞান; সমস্ত রাজনীতি, অর্থনীতি, সমস্ত প্রকার প্রগতিশীল আচার, ব্যবহার, চালচলন—সবই যেন আজ আমাদের কাছে অর্থশূন্য; মৃত কঙ্কালে পরিণত। শহরের স্কুল, কলেজ, কাছারি, আদালত, ধর্মমন্দির, পূজা অর্চনা—সব এক মিথ্যার ছায়ায় ভরা। শুধু সত্যের তিক্ত জীবন-ছবি আমাদের নয়ন সম্মুখে। সেখানে দেখি, বহ্নিতপ্ত পথের ধূলি, বিশ্ববিহীন নির্জন পাহাড়ের গা ঘেঁষে অনির্দিষ্টের পানে ছুটে চলা। পথ সংকীর্ণ; পথশ্রান্ত ও উত্তপ্ত ক্ষুধিত তৃষিত দেহ, ধূলিধূসরিত জীর্ণ শীর্ণ প্রতি অঙ্গ: পরিহিত ছেঁড়া কাপড় ছেঁড়া জুতা, এ রুক্ষ কেশ; পরিব্রাজকের অনাড়ম্বর বেশ, সন্ধানী আত্মার আকুল কান্না যাত্রাপথের প্রান্ত খুঁজে—এ সকলই যেন জীবনের পরিপূর্ণ মর্মভেদী সত্যের বাণী নিয়ে আমাদের সম্মুখে বিপুল বিরাটরূপে দাঁড়াল।

আস্তে আস্তে গাড়ী উঠছে পাহাড়ের উপরে: ঠিক আগের মতো নেতা সেজে বসে আছি সম্মুখের গাড়ীতে, এবার রাস্তা নাক-বরাবর সোজা; সম্মুখের প্রায় শখানেক গাড়ী স্পষ্ট দেখা যায়, সারবন্দী হয়ে চলছে, একেবারে সকলের আগের গাড়ীখানা সকলের পশ্চাতের গাড়ী থেকে প্রায় একশ ফুট উপরে; মনে হলো, আমরা সব ভীমের বড় ভাইয়ের দল, সশরীরে স্বর্গারোহণ করছি। কিন্তু স্বর্গের পথ শুনেছি সুধার সরোবরে ভরা; এ পথ তা নয়; এ পথ মরুময়, সাহারার তপ্ত রুদ্ধ শ্বাসে পরিপূর্ণ; ধরার সামান্য একফোটা জলও এখানে নেই; পিপাসা বুকের তল মরুভূমি করে মুখে চোখে উত্তপ্ত নিঃশ্বাস ছাড়ছে, সমস্ত প্রশান্ত মহাসাগরের জলও যদি এখন সম্মুখে পেতাম, তবুও যেন আমাদের এ শ'খানেক গাড়ীর লোকের দেহের জ্বালা শান্ত হ'ত না। আমরা যেন ছুটে চলেছি পৃথিবীর নদ নদী, সাগর উপসাগর মহাসাগর খুঁজে বের করবার জন্যে, কিন্তু বৃথা চেষ্টা! সম্মুখে পশ্চাতে, ডাইনে, বাঁয়ে, শুধু এক একটানা পাহাড়, আমাদের মতোই ক্ষুধিত, তৃষিত পাষাণে পরিপূর্ণ। পাহাড়ের

দেহ ভেদ করে সে পাষাণের শুষ্ক জিহ্বা যেন রাস্তার উপর বের হয়ে পড়েছে। গিলতে চায় যেন আমাদের।

বেলা তখন বারোটা-একটা বাজে; হঠাৎ সম্মুখের গাড়ী থেমে গেল; সঙ্গে সঙ্গে আমাদের গাড়ীও। ব্যাপারটা প্রথম বুঝতে পারলাম না; তবে কি বন্য জন্তু সামনে পড়ল? কিছু দূরে সম্মুখের দিকে অসংখ্য লোকের কোলাহল শুনেছি; লোক দেখি না, শুধু কোলাহলধ্বনি; সামনের পাহাড়টার ঐ পাশ থেকে আসছে। দেখলাম সকল গাড়ীর গাড়োয়ানরাই গরু ছেড়ে পাহাড়ের গায় বেঁধে ঘাস দিচ্ছে। গাড়ী থেকে নেমে কত দূর এগিয়ে গিয়ে দেখি প্রায় দুই হাজার লোক রাস্তার উপরে বসে রান্নাবান্না করছে; এরা প্রায় সকলেই পায়ে হেঁটে এসেছে। তাদের কোলাহলে সমস্ত পর্বতভূমি মুখরিত। এত কোলাহলের কারণ কি? কারণ, এখানে নাকি জল পাওয়া যায়। আনন্দে নিজের বুকও ভরে উঠল নিঃশব্দে। তাড়াতাড়ি আমাদের লোকের কাছে এসে বললাম—সব গাড়ী থেকে নেমে এসো; রান্না করা হবে; এখানে জল পাওয়া যায়। সকলের মুখেই শুষ্ক ম্লান খুশীর হাসি। এসে একটা ভাল জায়গা খুঁজতে লাগলাম, রান্না করার জন্য; কিন্তু অসম্ভব। আশে পাশে মড়ার অন্ত নেই। সে কি দুর্গন্ধ! কিন্তু তাতেও কারো ঘৃণা বা অপ্রবৃত্তি নেই, মৃত পচা দেহের কাছে বসে খেতে। দুর্গন্ধ ও পচা শবদেহ দৃশ্য আমাদের সয়ে গেছে; আমরা যেন গলিত স্খলিত পচা দেহের প্রবাহ-স্রোতেই ভেসে চলেছি; আমাদের কাছে মৃত্যু ও মৃত্যুময় দেহই সত্য; জীবন, সমাজ, সংসার—সব মিথ্যা।

মেয়েরা সব রান্না করতে বসে গেল; কিন্তু জল কোথায়? এখানেও কোন সাগর সরোবর দেখি না; তবে লোকের এত আনন্দধ্বনি কেন? শেষে শুনা গেল, জল আছে, এ পথ ধরে অনেকখানি নীচে নামলে জল মিলবে। দু-একজন ছাড়া আমরা সবাই এগারটা জলের টিন নিয়ে জল আনতে গেলাম। গহন অরণ্য; মাঝখান দিয়ে একজন লোক চলবার মত রাস্তা; প্রায় এক মাইল নীচে নেমে শেষে জল পেলাম। ঝরণা নয়, স্বচ্ছ নীল সরোবর নয়; এক বিঘা পরিমাণ বৃহৎ একটি গর্ত; তার মধ্যে সামান্য টলটলে জল; টিনের গ্লাসে আর চা'য়ের কাপে করে আস্তে আস্তে জল তুলে জলের টিনে ভরলাম। কিন্তু আশ্চর্য্য এই, যত তোলা যায়, গর্তের জল নিঃশেষ হয়ে যায় না; যেমন তেমনি থাকে। এ রকম জলের গর্ত প্রায় সাত-আটটা, সবাই জল তুলে নিচ্ছে। কিন্তু এ জল যে সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ তাহাও বলা যায় না। কারণ এ জলের কিনারাতেই দেখলাম কতগুলি মৃতদেহ। জল খেয়ে ক্লান্ত হয়ে শুয়ে পড়েছে চির-জীবনের তরে।

এভাবে সমস্ত পাহাড়ী পথ পার হয়ে এলাম সাত দিনে। সাতটা জ্বলন্ত শ্মশানবহ্নি যেন আমাদের সকলকে অর্দ্ধ দগ্ধ করে ছেড়ে দিয়েছে; মরে গেছি আধা: সন্দেহপূর্ণ আধা-জীবিত দেহ নিয়ে এসে পৌঁছলাম টাংগুবে। এখান থেকে ছোট জাহাজে আকিয়াব যেতে হবে। কিন্তু টাংগুবের দৃশ্য আরও মর্মভেদী। প্রকাণ্ড মাঠ; প্রায় সত্তর পঁচাত্তর হাজার ভারতীয় এখানে খোলা মাঠে এসে জমা হয়েছে। দিনের বেলা প্রচণ্ড রৌদ্রের তাপ; রাত্রে ভয়ানক শীত। এ-হেন মাঠের মধ্যে হাজার হাজার লোক এখানে সেখানে পড়ে। শহরে যাবার হুকুম নেই; কারণ আমাদের গায়ে মৃত্যু-গন্ধ; ছোঁয়া লাগলে শহরের কর্পোরেশন-দেহ রুগ্ন হ'তে পারে। পড়ে আছি মাঠে; বিশ্বের অনাদৃত হয়ে; ঘৃণা, অবহেলা, তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যে আমাদের জীবন নুয়ে পড়া। এতটা রাস্তা এসে হয়ত এখানেই শেষে মারা যাব। দিনে অন্তত দশবার করে খবর নিতে যাই, ষ্টীমার এখান থেকে কবে ছাড়বে; এ মাঠের কিছু দূরেই ষ্টীমার ষ্টেশন, একটা খালের মত ছোট্ট লবণাক্ত জলার ধারে। ষ্টীমার আজ তিন দিন যাবৎ নেই; এদিকে আমাদের সঙ্গে এবং আর সকলের সঙ্গে যে চাউল ডাল ছিল, তা শেষ হয়ে গেছে। শহরে ঢুকতে দেয় না; চাউল ডাল কিনব এমন সাধ্য নেই; কাছেই বর্মীবস্তী আছে, সেখানে চাউল ডাল কিনতে গেলাম; পৌনে দুই সের চাউল আড়াই টাকা দাম; মুসরী ডালের সেরও আড়াই টাকা, একটা দিয়াশলাইর বাক্স চার আনা; বাধ্য হয়ে এ সুলভ মূল্যেই জিনিষপত্র কিনে জীবন বাঁচিয়ে রাখলাম। এখানে আবার সেই পাহাড়ের মতোই জল নেই। মনে করেছিলাম, ষ্টীমার ষ্টেশন, নদী যখন আছে, জলের চিন্তা দূর হবে; কিন্তু জলের ত ঐ অবস্থা, মুখে দেওয়া যায় না এত বিষাক্ত। গেলাম বস্তীতে জল আনতে, এক টিন জল এক টাকা। রোজ আমাদের দশ টাকার জল লাগত।

এখানেও জলের ও খাদ্যের অভাবে শত শত লোক মরতে লাগল; এখান থেকে তাড়াতাড়ি জাহাজ পেলে লোকগুলি হয়ত পার হয়ে গিয়ে বাঁচতে পারত, কিন্তু দৈনিক হাজার হাজার লোক এসে জমা হচ্ছে; চেহারা সকলেরই আমাদের মতো কংকাল-সার। মাত্র হাড় ক'খানা কোন রকমে ঠেলে আনা হয়েছে, মানুষের চেহারা কারো নেই! জীবনের উত্তপ্ত অভিশাপ সকলের চোখে মুখে।

এখানে আমরা প্রায় কুড়িটি বাংগালী পরিবার একত্র হয়েছি, সকলেই একটা পাহাড়ী ঝোপের ধারে ক্ষেতের উপর বিছানা পেতে তিন-চার দিন যাবৎ বসবাস করছি। দিনের বেলা ঝোপের ভিতরে বসে থেকে রৌদ্রতপ্ত দেহ বাঁচাই; আর রাত্রি বেলা কাপড়ের তাঁবু তৈরী করে তার নীচে শীতে বরফ হয়ে ঘুমাই। মিষ্টার সুরেশ বোস, হেডমাষ্টার লাহিড়ীবাবু, অজিত ঘোষ, ডাক্তার দত্ত ইত্যাদি আমরা সকলে মিলে পরামর্শ করলাম—কেউ কাউকে ফেলে যেতে পারবে না, যেতে হয় সকলে একত্র এক সঙ্গে টিকেট করে যাব, না হয় এখানে সকলে এক সঙ্গে মরব। সংকল্প উদার; অন্তত বাংগালীর পক্ষে।

পরদিন তিনখানা জাহাজ এক সঙ্গে এলো। লোক পাগলের মত ছুটাছুটি করতে লাগলো টিকেটের জন্য: কিন্তু কার সাধ্য টিকেট ঘরের কাছে যায়; টিকেট ঘর থেকে প্রায় আধ মাইল পর্য্যন্ত লোকের ভিড়; তার উপর পুলিশের তাড়না। বিনয়-নম্র বচনে এখানে টিকেট মিলে না; গায়ের বলেও নয়, শিক্ষার ছাপেও নয়, একমাত্র উপায় টাকা। আমরা একশ টাকা ঘুষ দিলাম একশ টিকেটের জন্য, মিলল টিকেট অনায়াসে। পরে আমাদের মধ্যে টিকেট ভাগাভাগির পর জাহাজে উঠবার বন্দোবস্ত হলো। মালপত্র যা-কিছু সব নদীর তীরে এনে সব একত্র করে রাখা হয়েছে, জাহাজ একটু দূরে নঙ্গর ফেলে দাঁড়িয়ে রয়েছে, এখনও তীরে লাগে নেই, আমরা সব প্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছি; কিন্তু যখন জাহাজ

তীরে এসে ভিড়ল তখনকার অবস্থা চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না, প্রায় হাজার তিনেক লোক এসে ঝুঁকে পড়ল; এদের মধ্যে টিকেট অনেকেই করে নাই বা করতে পারে নাই। মেয়ে ছেলে নিয়ে ভীষণ চাপে পড়ে গেলাম; রামকিষণ, বশীর, নিতাই ও সুরেশ আমার আগে ভিড় ঠেলছে, আমার পিছনে—বাসন্তী আমার ডান-হাত ধরে, পরে ডাক্তার পালের স্ত্রী, শকুন্তলা-দেবী, বাসন্তীর মা। সকলের পিছনে কম্পাউণ্ডারবাবু ও সুধাংশুবাবু। প্রত্যেকের কোলে ছেলেপুলে। কুলীরা সমস্ত মালপত্র নিয়ে অনেক পিছনে রয়েছে এদিকে পুলিশ লাঠির চোটে ভীড় তাড়াচ্ছে। পকেটে দশটাকার নোট গুঁজে দিতেই পথ ছেড়ে দিল। জাহাজে উঠতেই জাহাজ ছাড়বার বাঁশী বাজল। নইলে জাহাজ লোকের ভিড়ে ডুবে যায়, ছোট্ট জাহাজ; আরোহী দুই গুণ। চেয়ে দেখি আমার দারোয়ান মণীন্দ্র, ভৃত্য শৈব আর মালপত্র সহ কুলী—কেউ উঠতে পারেনি। মেয়েরা কান্নাকাটি করল তাদের সর্ব্বস্ব টাংগুবে পড়ে রইল, আমি মনে মনে কেঁদে আকুল হলাম দু'জন মানুষের জন্য। ওদের হাতে টাকা পয়সা নেই, না খেয়ে মরবে নিশ্চয়; পড়ে থাকবে ওদের মৃতদেহ বিজ্ঞান ও সমরের দুঃখ-বাদ-ব্যথা বাক্স বহন করে।

আকিয়াব তখনও শত্রুর বোমা হ'তে অনেক দূরে। দুইদিনে এসে পৌঁছলাম এখানে। এখানকার বাংগালীরা যথেষ্ট সাহায্য করল; প্রকাণ্ড একটা ঘর আমাদের জন্য ঠিক করে দিয়ে স্নান আহারের ব্যবস্থা করে দিল। তেইশ দিনে এসে আকিয়াব পৌঁছেচি। স্নান আহার কা'কে বলে ভুলে গিয়েছি। স্নান আহারের কথা শুনে মনে প্রশ্ন জাগল—আমরা এ কোন্ রাজ্যে এলাম। স্নান, আহার, সমাজ, সংসার, সভ্যতা, ভদ্রতা? এ সকলের প্রয়োজন আছে কি?

পরদিন "বরদা" জাহাজে চট্টগ্রাম রওনা হলাম। বঙ্গোপসাগরের এক কোণ ঘেঁষে ভয়ে ভয়ে জাহাজ চলছে। অনন্ত জলরাশি: অনন্ত আনন্দ ও জীবনউচ্ছ্বাস আমাদের বুকে। গিরি-মরুপথে যে জলের জন্য প্রাণসাগর সমুদ্র খুঁজে বেড়াচ্ছিল, এখন তারি বক্ষে। অথচ এখন একফোঁটা জলের পিপাসা নেই। বিচিত্র এ মানবজীবন; বিচিত্র তার বক্ষের ক্ষুধা তৃষ্ণা।

চট্টগ্রাম এসে পৌঁছলাম। ইভাকুইজদের জন্য রেলগাড়ীর ভাড়া নেই। কিন্তু আমাদের টিকেট করতেই হলো, আমরা ইভাকুইজ হতে চাই না; এখন আমরা সভ্য। অরণ্য ও গৃহ-বাসীর পোষাক পরিচ্ছদ আমাদের আর নেই। ভুলে গেছি আমাদের আদিম ইতিহাস।

চট্টগ্রাম থেকে সকলকে টিকেট করে দিয়ে দেশে পাঠিয়ে দিলাম, সকলেই আন্তরিক আশীর্ব্বাদ জানাল। আমি অপর গাড়ীতে চলে এলাম কলিকাতা হেড আপিসে।

—যাত্রা—

শ্রীরবীন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী

সব অপরাধ মোর সব কিছু ত্রুটি যায় যেন টুটি—
অসীম ক্ষমায় তব হে ভাগ্য-বিধাতা! তোমার বারতা—
মনে যেন জাগে অনুক্ষণ, আমার নয়ন—
যেন চিনে নিতে পারে সীমাহীন পথ, মোর যাত্রা-রথ—
অবিরাম চলে যেন নভঃ নীলিমায় কালের উষায়।
পথের দু'ধারে কত পত্র-পুষ্প-শোভা দৃশ্য মনলোভা—
পড়িবে সম্মুখে মোর, নদী কত শত
কলস্বনে বহে বহে যাবে অবিরত
সীমাহীন সাগরের পানে, সে কল্লোল গানে—
পুলকের শিহরণ জাগিবে হিয়ায়, কত অজানায়—
লব জানি নীরব ইঙ্গিতে তব
আমার অন্তর মাঝে শুনিবারে পাব
তব জয়-বাণী, কবে নাহি জানি।

তারপরে অস্ত যাবে প্রদীপ্ত ভাস্কর—বিহগ নিকর
দলে দলে যাবে ফিরি নীড়ে, ক্রমে ধীরে ধীরে—
স্বর্ণাঞ্চল বিছাইবে আসি সন্ধ্যা রাণী,
আরতি করিবে বধূ লয়ে দীপখানি
সহসা উঠিবে ঝড় অট্ট অট্ট হাসে—
প্রলয় উল্লাসে—নদীজল তটপ্রান্তে পড়িবে আছাড়ি
গম্ভীরে গর্জ্জিবে মেঘ নভঃ বক্ষ ফাঁড়ি
মুহুর্মুহু ঝলিবে বিজলী—দিয়ে করতালি,
সে দুর্য্যোগে মনে মোর জাগিবে না ত্রাস,
নাহি পাবে হ্রাস—
আমার রথের গতি হে ভাগ্য বিধাতা!
তুমি মোর সাথে রবে সর্ব্ব-ভয়ত্রাতা
সকল সময়—নাহি করি ভয়।

কালিদাস

(চিত্রনাট্য)

শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

রাণী ভানুমতীর কক্ষ। লূতাজালের মত সূক্ষ্ম একটি তিরস্করিণীর দ্বারা ঘরটি দুইভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। এক ভাগে রাণীর বসিবার আসন, অন্য ভাগে কালিদাসের বসিবার জন্য একটি মৃগচর্ম্ম ও তাহার সম্মুখে পুঁথি রাখিবার নিম্ন কাষ্ঠাসন। ভানুমতী নিজ আসনে বসিয়া অপেক্ষা করিতেছেন। কক্ষে অন্য কেহ নাই।

ত্বরিত অথচ সতর্ক পদক্ষেপে মালিনী দ্বারের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল; একবার ঘরের চারিদিকে ক্ষিপ্র দৃষ্টিপাত করিয়া মস্তক সঞ্চালনে রাণীকে জানাইল যে কালিদাস আসিয়াছেন। রাণীও বেশবাস সম্বরণপূর্ব্বক ঘাড় নাড়িয়া অনুমতি দিলেন। তখন মালিনী পাশের দিকে হাতছানি দিয়া ডাকিল।

কালিদাস অলিন্দে অপেক্ষা করিতেছিলেন, দ্বারের সম্মুখে আসিলেন; উভয়ে কক্ষে প্রবেশ করিলেন। মালিনী ভিতর হইতে দ্বার বন্ধ করিয়া দিল।

রাণীকে দেখিতে পাইয়া কালিদাস হাত তুলিয়া সংযতকণ্ঠে কেবল বলিলেন—

কালিদাস: স্বস্তি।

কালিদাসের প্রশান্ত অপ্রগল্‌ভ মুখচ্ছবি, তাঁহার অনাড়ম্বর হ্রস্বোক্তি ভানুমতীর ভাল লাগিল; মনের ঔৎসুক্যও বৃদ্ধি পাইল। তিনি স্মিত-মুখে হস্ত প্রসারণ করিয়া কবিকে বসিবার অনুজ্ঞা জানাইলেন।

কালিদাস আসনে উপবেশন করিয়া পুঁথির বাঁধন খুলিতে লাগিলেন; মালিনী অনতিদূরে মেঝের উপর বসিল।

কাট্।

অবরোধের উদ্যানে রাণীর সখীরা পূর্ব্ববৎ গান গাহিতেছে, ঝুলায় ঝুলিতেছে, ছুটাছুটি করিয়া খেলা করিতেছে। একটি সখী কোমরে আঁচল জড়াইয়া নাচিতেছে, অন্য কয়েকটি তরুণী তাহাকে ঘিরিয়া কর-কঙ্কণ বাজাইয়া গান ধরিয়াছে—

"ও পথে দিস্‌নে পা
দিস্‌নে পা লো সই
মনে তো রইবে না
(সুখ) রইবে না লো সই—
যদি বা মন বাঁচে,
কালো তোর হবে সোনার গা লো সই—"

কাট্।

ভানুমতীর কক্ষে কুমারসম্ভব পাঠ আরম্ভ হইয়াছে। ভানুমতী করলগ্ন কপোলে শুনিতেছেন; প্রতি শ্লোকের অনুপম সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া মাঝে মাঝে বিস্ময়োৎফুল্ল চক্ষু কবির মুখের পানে তুলিতেছেন। কোথা হইতে আসিল এই অখ্যাতনামা ঐন্দ্রজালিক! এই তরুণ কথা-শিল্পী!

কালিদাস পড়িতেছেন—উমার রূপবর্ণনা—

"দিনে দিনে সা পরিবর্দ্ধমানা লব্ধোদয়া চান্দ্রমসীব লেখা—"

কাট্।

উপরি উক্ত কক্ষের পাশে একটি গুপ্ত অলিন্দ—দেখিতে কতকটা সুড়ঙ্গের মত। প্রাচীরগাত্রে মাঝে মাঝে রন্ধ্র আছে; সেই রন্ধ্রপথে কক্ষের অভ্যন্তর পর্য্যবেক্ষণ করা যায়। অবরোধের প্রতি কক্ষে যাহাতে কঞ্চুকী নিজে অলক্ষ্যে থাকিয়া লক্ষ্য রাখিতে পারে এইজন্য এইরূপ ব্যবস্থা।

রাণীর একটি সহচরী—নাম ভ্রমরী—পা টিপিয়া টিপিয়া অলিন্দ পথে আসিতেছে। একটি রন্ধ্রের নিকটে আসিয়া সে কান পাতিয়া শুনিল—কক্ষ হইতে একটানা গুঞ্জনধ্বনি আসিতেছে। তখন ভ্রমরী সন্তর্পণে রন্ধ্রপথে উঁকি মারিল।

রন্ধ্রটি নীচের দিকে ঢালু। ভ্রমরী কক্ষের কিয়দংশ দেখিতে পাইল। কালিদাস কাব্য পাঠ করিতেছেন—স্বচ্ছ তিরস্করিণীর অন্তরালে রাণী উপবিষ্টা। মালিনী রন্ধ্রের দৃষ্টিচক্রের বাহিরে ছিল বলিয়া ভ্রমরী তাহাকে দেখিতে পাইল না।

কিছুক্ষণ একাগ্রভাবে নিরীক্ষণ করিয়া ভ্রমরী রন্ধ্রমুখ হইতে সরিয়া আসিল; উত্তেজনা-বিবৃত চক্ষে চাহিয়া নিজ তর্জ্জনী দংশন করিল; তারপর লঘু দ্রুতপদে ফিরিয়া চলিল।

ওয়াইপ্।

[অতঃপর কয়েকটি মণ্টাজ্ দ্বারা পরবর্ত্তী ঘটনার পরিব্যাপ্তি প্রদর্শিত হইবে]

উদ্যানের এক অংশ। ভ্রমরী তাহার প্রিয় বয়স্যা মধুশ্রীকে একান্তে লইয়া গিয়া উত্তেজিত হ্রস্বকণ্ঠে কথা বলিতেছে। নেপথ্যে আবহ যন্ত্রসঙ্গীত চলিয়াছে। ভ্রমরীর কথা শেষ হইলে মধুশ্রী গণ্ডে হস্ত রাখিয়া বিস্ময় জ্ঞাপন করিল।

ওয়াইপ্।

উদ্যানের অন্য অংশ। একটি বৃক্ষতলে দাঁড়াইয়া মধুশ্রী তাহার প্রিয়সখী মঞ্জুলাকে সদ্য-প্রাপ্ত সংবাদটি শুনাইতেছে। নেপথ্যে আবহ-সঙ্গীত চলিয়াছে।

ওয়াইপ্।

প্রাসাদমূলে এক নিভৃত স্থানে দাঁড়াইয়া মঞ্জুলা রাজভবনের একটি বর্ষীয়সী পরিচারিকাকে গোপন খবরটি দিতেছে। নেপথ্যে যন্ত্র-সঙ্গীত।

ওয়াইপ্।

কঞ্চুকীর কক্ষ। পরিচারিকা কঞ্চুকী মহাশয়ের নিকট সংবাদ বহন করিয়া আনিয়াছে; সম্ভবত পরিচারিকা কঞ্চুকীর গুপ্তচর। কঞ্চুকীর স্বাভাবিক তিক্ত মুখভাব সংবাদ শ্রবণে যেন আরও তিক্ত হইয়া উঠিল। সে কুঞ্চিত চক্ষে কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া হঠাৎ কক্ষ হইতে বাহির হইয়া গেল।

[মণ্টাজ এইখানে শেষ হইবে]

কাট্।

ভানুমতীর কক্ষে কালিদাস রতিবিলাপ নামক চতুর্থ সর্গ পাঠ শেষ করিতেছেন। এই পর্য্যন্তই লেখা হইয়াছে। রতির নব-বৈধব্যের মর্ম্মান্তিক বর্ণনা শুনিয়া ভানুমতী কাঁদিয়াছেন; তাঁহার চক্ষু দুটি অরুণাভ। মালিনীর গণ্ডস্থলও অশ্রুধারায় অভিষিক্ত।

পাঠ শেষ করিয়া কালিদাস ধীরে ধীরে পুঁথি বন্ধ করিলেন। অশ্রুলে চক্ষু মুছিয়া ভানুমতী আর্দ্র তদ্‌গত কণ্ঠে বলিলেন—

ভানুমতী : ধন্য কবি ! ধন্য মহাভাগ !—

কাট্।

গুপ্ত অলিন্দ। কঞ্চুকী রন্ধ্রমুখে উঁকি মারিতেছে। কক্ষ হইতে কণ্ঠস্বর ভাসিয়া আসিল ; রাণী বলিতেছেন—

ভানুমতী : আবার কতদিনে দর্শন পাব ?

কালিদাস : দেবি, আপনার অনুগ্রহ লাভ করে' আমি কৃতার্থ ; যখন আদেশ করবেন তখনই আসব। কিন্তু কাব্য শেষ হতে এখনও বিলম্ব আছে—

কাট্।

ভানুমতীর কক্ষ। কালিদাস পুঁথি লইয়া উঠিবার উপক্রম করিতেছেন। ভানুমতী আবেগভরে বলিয়া উঠিলেন—

ভানুমতী : না না, শেষ হওয়া পর্য্যন্ত আমি অপেক্ষা করতে পারব না—

কালিদাস : (স্মিতমুখে) বেশ, পরের সর্গ শেষ করে' আমি আবার আসব।

যুক্ত করে শির অবনত করিয়া কালিদাস ভানুমতীকে সসম্ভ্রমে অভিবাদন করিলেন ; তারপর মালিনীর দিকে ফিরিলেন।

কাট্।

গুপ্ত অলিন্দ। কঞ্চুকী রন্ধ্রমুখে উঁকি মারিতেছে ; কিন্তু কক্ষ হইতে আর কোনও শব্দ আসিল না। তখন সে রন্ধ্রমুখ হইতে সরিয়া আসিয়া ক্ষণকাল ভ্রূবদ্ধ ললাটে চিন্তা করিল। তারপর শিখার গ্রন্থি খুলিয়া আবার তাহা বাঁধিতে বাঁধিতে প্রস্থান করিল।

বিক্রমাদিত্যের অস্ত্রাগার। একটি বৃহৎ কক্ষ ; নানাবিধ বিচিত্র অস্ত্রশস্ত্রে প্রাচীরগুলি সুসজ্জিত। এই অস্ত্রগুলির উপর মহারাজের যত্ন ও মমতার অন্ত নাই ; তিনি স্বহস্তে এগুলিকে প্রতিনিয়ত মার্জ্জন করিয়া থাকেন।

বর্ত্তমানে, কক্ষের মধ্যস্থলে একটি বেদিকার প্রান্তে বসিয়া তিনি তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় তরবারিটি পরিষ্কার করিতেছেন। তাঁহার পাশে ঈষৎ পশ্চাতে কঞ্চুকী দাঁড়াইয়া নিম্নস্বরে কথা বলিতেছে। রাজার মুখ বৈশাখী মেঘের মত অন্ধকার ; চোখে মাঝে মাঝে বিদ্যুদ্বহ্নির চমক খেলিতেছে। তিনি কিন্তু কঞ্চুকীর মুখের পানে তাকাইতেছেন না।

কঞ্চুকী বার্ত্তা শেষ করিয়া বলিল—

কঞ্চুকী : যেখানে স্বয়ং মহাদেবী—এঁ—লিপ্ত রয়েছেন সেখানে আমার স্বাধীনভাবে কিছু করবার অধিকার নেই। এখন দেবপাদ মহারাজের যা অভিরুচি।

মহারাজ তাঁহার চক্ষু তরবারি হইতে তুলিয়া ঈষৎ ঘাড় বাঁকাইয়া কঞ্চুকীর পানে চাহিলেন ; কয়েক মুহূর্ত্ত তাঁহার খরধার দৃষ্টি কঞ্চুকীর মুখের উপর স্থির হইয়া রহিল। তারপর আবার তরবারিতে মনোনিবেশ করিয়া রাজা সংযত ধীর কণ্ঠে কহিলেন—

বিক্রমাদিত্য : এখন কিছু করবার দরকার নেই। শুধু লক্ষ্য রাখবে। সে—সে-ব্যক্তি আবার যদি আসে, তৎক্ষণাৎ আমাকে সংবাদ দেবে।

কঞ্চুকী মাথা ঝুঁকাইয়া সম্মতি জানাইল। তাহার বিকৃত মনোবৃত্তি যে এই ব্যাপারে উল্লসিত হইয়া উঠিয়াছে, তাহা তাহার স্বভাব-তিক্ত মুখ দেখিয়াও বুঝিতে বিলম্ব হয় না।

ডিজল্‌ভ্।

স্ফটিক নির্ম্মিত একটি বালু-ঘটিকা। ডমরুর ন্যায় আকৃতি ; উপরের গোলক হইতে নিম্নতল গোলকে বালুর শীর্ণ ধারা ঝরিয়া পড়িতেছে।

উপরের ঘটনার পর কয়েকদিন কাটিয়া গিয়াছে।

ডিজল্‌ভ্।

ভানুমতীর কক্ষ। কবির জন্য মৃগচর্ম্ম ও পুঁথি রাখিবার কাষ্ঠাসন যথাস্থানে ন্যস্ত হইয়াছে। ভানুমতী নতজানু হইয়া পরম শ্রদ্ধাভরে কাষ্ঠাসনটি ফুল দিয়া সাজাইয়া দিতেছেন। কক্ষে অন্য কেহ নাই।

মালিনী দ্বারের নিকট প্রবেশ করিয়া মস্তক-সঞ্চালনে ইঙ্গিত করিল। প্রত্যুত্তরে ভানুমতী ঘাড় নাড়িলেন, তারপর তিরস্করিনীর আড়ালে নিজ আসনে গিয়া বসিলেন।

মালিনী হাতছানি দিয়া কবিকে ডাকিল। কবিও পুঁথিহস্তে আসিয়া দ্বারের সম্মুখে দাঁড়াইলেন।

কাট্।

বিক্রমাদিত্যের অস্ত্রাগার। রাজা একাকী বসিয়া একটি চর্ম্মনির্ম্মিত গোলাকৃতি ঢাল পরিষ্কার করিতেছেন।

কঞ্চুকী বাহির হইতে আসিয়া দ্বারের সম্মুখে দাঁড়াইল ; মহারাজ তাহার দিকে মুখ তুলিলেন। কঞ্চুকী কিছুক্ষণ স্থিরনেত্রে চাহিয়া থাকিয়া, যেন রাজার অকথিত প্রশ্নের উত্তরে ধীরে ধীরে ঘাড় নাড়িল।

রাজা ঢাল রাখিয়া দ্বারের কাছে গেলেন। দ্বারের পাশে প্রাচীরে একটি কোষবদ্ধ তরবারি ঝুলিতেছিল, কঞ্চুকী সেটি তুলিয়া লইয়া অত্যন্ত অর্ঘ্যপূর্ণভাবে রাজার সম্মুখে ধরিল। রাজা একবার কঞ্চুকীকে তীব্র দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিলেন ; তারপর তরবারি স্বহস্তে লইয়া কক্ষের বাহির হইলেন। কঞ্চুকী পিছে পিছে চলিল।

কাট্।

রাণীর কক্ষে কালিদাস পার্ব্বতীর তপস্যা অংশ পাঠ করিয়া শুনাইতেছেন। কপোল-ন্যস্ত-হস্তা ভানুমতী অবহিত হইয়া শুনিতেছেন ; তাঁহার দুই চক্ষে নিবিড় রস—তন্ময়তার স্বপ্নাভাস।

কাট্।

গুপ্ত অলিন্দ। কোষবদ্ধ তরবারি হস্তে মহারাজ আসিতেছেন, পশ্চাতে কঞ্চুকী। রন্ধ্রের সম্মুখে আসিয়া মহারাজ দাঁড়াইলেন ; রন্ধ্রপথে একবার দৃষ্টি প্রেরণ করিলেন ; তারপর সেইদিকে কর্ণ ফিরাইয়া রন্ধ্রাগত স্বর-গুঞ্জন শুনিতে লাগিলেন। তাঁহার মুখ পূর্ব্ববৎ কঠিন ও ভয়াবহ হইয়া রহিল।

রন্ধ্রপথে ছন্দোবদ্ধ শব্দের অস্পষ্ট গুঞ্জরণ আসিতেছে। শুনিতে শুনিতে রাজা প্রাচীরে স্কন্ধভার অর্পণ করিয়া দাঁড়াইলেন। কিন্তু হাতের তরবারিটা অস্বস্তিদায়ক ; সেটা কয়েকবার এহাত-ওহাত করিয়া শেষে কঞ্চুকীর হাতে ধরাইয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন। কঞ্চুকী মহারাজের দিকে বক্র কটাক্ষপাত করিল ; কিন্তু তাঁহার মন্ত্র কঠিন মুখ দেখিয়া মানসিক ক্রিয়া অনুমান করিতে পারিল না। সে ঈষৎ উদ্বিগ্ন হইয়া

মনে মনে ভাবিতে লাগিল—কী আশ্চর্য্য! মহারাজ এখনও ক্ষেপিয়া যাইতেছেন না কেন?

ডিজলভ্।

রাণীর কক্ষ। কালিদাস পাঠ শেষ করিয়া পুঁথি বাঁধিতেছেন। রাণীর দিকে মুখ তুলিয়া স্মিতহাস্যে বলিলেন—

কালিদাস: এই পর্য্যন্তই হয়েছে মহারাণী।

ভানুমতী প্রশ্ন করিলেন—

ভানুমতী: কবি, বাকিটুকু কতদিনে শুনতে পাব? আমার মন যে আর ধৈর্য্য মানছে না? কবে কাব্য শেষ হবে?

কালিদাস: মহাকাল জানেন। তিনিই স্রষ্টা, আমি অনুলেখক মাত্র। এবার অনুমতি দিন, আর্য্যা।

কবি উঠিবার উপক্রম করিলেন।

কাট্।

গুপ্ত অলিন্দ। রাজা এতক্ষণ দেয়ালে ঠেস দিয়া ছিলেন, হঠাৎ সোজা হইয়া দাঁড়াইলেন। কঞ্চুকী মনে মনে অস্থির হইয়া উঠিয়াছিল, তাড়াতাড়ি তরবারিটি বাড়াইয়া দিল। রাজা তরবারির পানে আরক্ত দৃষ্টিপাত করিয়া সেটি নিজ হস্তে লইলেন; এক ঝট্‌কায় উহা কোষমুক্ত করিয়া, কোষ ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া দীর্ঘ পদক্ষেপে বাহিরে চলিলেন।

কঞ্চুকীর মনে আশা জাগিল, এতক্ষণে রাজার রক্ত গরম হইয়াছে। উৎফুল্ল মুখে কোষটি কুড়াইয়া লইয়া সে তাঁহার অনুবর্ত্তী হইল।

কাট্।

রাণীর কক্ষ। কালিদাস উঠিয়া দাঁড়াইয়াছেন; ভানুমতীও দাঁড়াইয়া যুক্তকরে কবিকে বিদায় দিতেছেন। মালিনী দ্বারের দিকে চলিয়াছে; কবিকে অবরোধের বাহির পর্য্যন্ত সাবধানে পৌঁছাইয়া দিতে হইবে।

সহসা প্রবল তাড়নে দ্বার উদ্ঘাটিত হইয়া গেল। মুক্ত তরবারি হস্তে বিক্রমাদিত্য সম্মুখে দাঁড়াইয়া। মালিনী সভয়ে পিছাইয়া আসিয়া একটি আর্ত্ত চীৎকার কণ্ঠমধ্যে রোধ করিল।

রাজা প্রবেশ করিলেন; পশ্চাতে কঞ্চুকী। রাজার তীব্রোজ্জ্বল চক্ষু একবার কক্ষের চারিদিকে বিচরণ করিল: মালিনী এক কোণে মিশিয়া গিয়া থরথর কাঁপিতেছে; কালিদাস তাঁহার নিজের ভাষায় 'চিত্রার্পিতারম্ভ' ভাবে দাঁড়াইয়া; মহাদেবী ভানুমতী প্রশান্তনেত্রে রাজার পানে চাহিয়া আছেন, যেন তাঁহার মন হইতে কাব্যের ঘোর এখনও কাটে নাই।

কবির দিকে একবার কঠোর দৃক্‌পাত করিয়া রাজা ভানুমতীর সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইলেন; দুইজন নিষ্পলক স্থির দৃষ্টিতে পরস্পর মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন। ক্রমে রাণীর মুখে ঈষৎ কৌতুক হাস্য দেখা দিল। রাজা অন্তর্গূঢ় চাপা গর্জ্জনে বলিলেন—

বিক্রমাদিত্য: মহাদেবি ভানুমতি, এই কি তোমার উচিত কাজ হয়েছে!

ভানুমতী: কী কাজ আর্য্যপুত্র?

বিক্রমাদিত্য। এই দেবভোগ্য কবিতা তুমি একা-একা ভোগ করছ! আমাকে পর্য্যন্ত ভাগ দিতে পারলে না! এত কৃপণ তুমি!!

কক্ষ কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া রহিল। কালিদাসের মুখে-চোখে মনোদিত বিস্ময়। কঞ্চুকী হঠাৎ ব্যাপার বুঝিতে পারিয়া খাবি খাওয়ার মত শব্দ করিয়া কাঁপিতে আরম্ভ করিল। মহারাজ তাহার দিকে পরুষ দৃষ্টি ফিরাইলেন; কঞ্চুকীর অন্তরাত্মা শুকাইয়া গেল, সে ভয়ে প্রায় কাঁদিয়া উঠিল—

কঞ্চুকী: মহারাজ, আমি—আমি বুঝতে পারিনি—

বিক্রমাদিত্য ঈষৎ চিন্তা করিবার ভাণ করিলেন।

বিক্রমাদিত্য: সম্ভব। তুমি জানতে না যে পাশার বাজি জিতে মহাদেবী আমার কাছ থেকে এই পণ চেয়ে নিয়েছিলেন। যাও, তোমাকে ক্ষমা করলাম। কিন্তু—ভবিষ্যতে মহাদেবী ভানুমতী সম্বন্ধে মনে মনেও আর এমন ধৃষ্টতা কোরো না।

বিক্রমাদিত্য হাতের তরবারিটা কঞ্চুকীর দিকে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিলেন। মসৃণ মেঝের উপর পড়িয়া তরবারি পিছলাইয়া কঞ্চুকীর দুই পায়ের ফাঁক দিয়া গলিয়া গেল। কঞ্চুকী লাফাইয়া উঠিল; তারপর তরবারি কুড়াইয়া লইয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে ঘর ছাড়িয়া পলায়ন করিল।

রাজার মুখে এতক্ষণে হাসি দেখা দিল। তিনি কালিদাসের দিকে অগ্রসর হইয়া গেলেন; কবির স্কন্ধে হস্ত রাখিয়া বলিলেন—

বিক্রমাদিত্য: তরুণ কবি, তোমার ধৃষ্টতা ক্ষমা করা আমার পক্ষে আরও কঠিন। তুমি আমাকে উপেক্ষা করে রাণীকে তোমার কাব্য শুনিয়েছ! তোমার কি বিশ্বাস বিক্রমাদিত্য শুধু যুদ্ধ করতেই জানে, কাব্যের রসাস্বাদ গ্রহণ করতে পারে না?

কালিদাস ব্যাকুলভাবে বলিয়া উঠিলেন—

কালিদাস: মহারাজ—আমি—

বিক্রমাদিত্য কপট ক্রোধে তর্জ্জনী তুলিলেন।

বিক্রমাদিত্য: কোনও কথা শুনব না। তোমার শাস্তি, আবার আমাকে তোমার কাব্য গোড়া থেকে পড়ে' শোনাতে হবে। আড়াল থেকে যেটুকু শুনেছি তাতে অতৃপ্তি আরও বেড়ে গেছে—

রাণীর দিকে হস্ত প্রসারিত করিয়া বলিলেন—

বিক্রমাদিত্য: এস দেবী, আজ আমরা দু'জনে কবির পায়ের কাছে বসে দেব-দম্পতীর মিলন-গাথা শুনব।

বিক্রমাদিত্য ও ভানুমতী পাশাপাশি ভূমির উপর উপবশন করিলেন। কালিদাস ঈষৎ লজ্জিতভাবে নিজ আসনে উপবশনের উপক্রম করিলেন।

মালিনী এতক্ষণ এক কোণে লুকাইয়া কাঁপিতেছিল, এবার পরিস্থিতির পরিবর্ত্তন অনুমান করিয়া দ্বিধাজড়িত পদে বাহির হইয়া আসিল। কবিকে অক্ষতদেহে পুনরায় পাঠের উদ্যোগ করিতে দেখিয়া তাহার মন নির্ভয় হইল—তবে বুঝি বিপদ কাটিয়া গিয়াছে।

রাজা মালিনীকে দেখিতে পান নাই, কালিদাসকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন—

বিক্রমাদিত্য: কবি, কাব্যপাঠ আরম্ভ করবার আগে তোমাকে একটা কথা বলতে চাই। আজ থেকে তুমি আমার সভার সভা-কবি হলে।

কালিদাস বিব্রত ও ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন।

কালিদাস: না না মহারাজ, আমি এ সম্মানের যোগ্য নই।

বিক্রমাদিত্য: সেকথা বিশ্ববাসী বিচার করুক। আগামী বসন্তোৎসবের দিন আমি মহাসভা আহ্বান করব, দেশ দেশান্তরের

রাজা পণ্ডিত রসজ্ঞদের নিমন্ত্রণ করব—তাঁরা এসে তোমার গান শুনবেন।

কালিদাস অভিভূত হইয়া বসিয়া রহিলেন ; রাজা পুনশ্চ বলিলেন—

বিক্রমাদিত্য : কিন্তু বসন্তের কোকিলের মত তুমি কোথা থেকে এলে কবি ? কোথায় এতদিন লুকিয়ে ছিলে ? কোথায় তোমার গৃহ ?

মালিনী এতক্ষণে রাজার পিছনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল ; কালিদাস ইতস্তত করিতেছেন দেখিয়া সে আগ্রহভরে বলিয়া উঠিল—

মালিনী : উনি যে নদীর ধারে কুঁড়ে ঘর তৈরি করেছেন, সেইখানেই থাকেন !

রাজা ঘাড় ফিরাইয়া মালিনীকে দেখিলেন, তাহার হাত ধরিয়া টানিয়া পাশে বসাইলেন।

বিক্রমাদিত্য : দূতী ! দূতী ! তুমি ফুলের বেসাতি কর, না—ভোমরার ?

মালিনী : (ঈষৎ ভয় পাইয়া) ফ-ফুলের, মহারাজ।

বিক্রমাদিত্য : হুঁ। ভেবেছ তোমার কথা আমি কিছু জানিনা ! সব জানি। আর শাস্তিও দেব তেমনি। কঞ্চুকীর সঙ্গে তোমার বিয়ে দেব—তখন বুঝবে।

পরিহাস বুঝিতে পারিয়া মালিনী হাসিল। রাজা কালিদাসের পানে ফিরিলেন।

বিক্রমাদিত্য : কিন্তু নদীর তীরে কুঁড়ে ঘর ! তা তো হতে পারেনা কবি। তোমার জন্যে নগরে প্রাসাদ নির্দ্দিষ্ট হবে, তুমি সেখানেই থাকবে।

কালিদাস হাত যোড় করিলেন।

কালিদাস : মহারাজ, আপনার অসীম কৃপা। কিন্তু আমার কুটীরে আমি পরম সুখে আছি।

বিক্রমাদিত্য : কিন্তু কবিকে বিষয় চিন্তা থেকে মুক্তি দেওয়া রাজার কর্ত্তব্য। নৈলে কবি কাব্য রচনা করবেন কি করে ? অন্নচিন্তা চমৎকারা কাতরে কবিতা কুতঃ !

কালিদাস : মহারাজ, আমার কোনও আকাঙ্খা নেই। মহাকাল আমাকে যা দিয়েছেন তার চেয়ে অধিক আমি কামনাও করিনা। মনের অভাবই অভাব মহারাজ।

বিক্রমাদিত্য : ধন সম্পদ চাও না ?

কালিদাস : না মহারাজ। আমি মহাকালের সেবক। আমার দেবতা চির-নগ্ন, তাই তিনি চিরসুন্দর। আমি যেন চিরদিন আমার এই নগ্নসুন্দর দেবতার উপাসক থাকতে পারি।

রাজা মুগ্ধ প্রফুল্ল দেহে কিছুকাল চাহিয়া রহিলেন, তারপর অস্ফুটস্বরে কহিলেন—

বিক্রমাদিত্য : ধন্য কবি ! তুমিই যথার্থ কবি !—কিন্তু—(মালিনীর দিকে ফিরিয়া) মালিনী তুমি বলতে পারে, কবি তাঁর কুটীরে মনের সুখে আছেন ?

মালিনী কালিদাসের পানে চাহিল ; তাহার চক্ষু রসনিবিড় হইয়া আসিল। একটু হাসিয়া সে বলিল—

মালিনী : হ্যাঁ মহারাজ, মনের সুখে আছেন।

বিক্রমাদিত্য একটি নিশ্বাস ফেলিলেন।

বিক্রমাদিত্য : ভাল। এবার তবে কাব্যপাঠ আরম্ভ হোক।

কালিদাস পুঁথি খুলিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

ফেড আউট্।

ক্রমশঃ

নববর্ষ

শ্রীসুবোধ রায়

পশ্চিমে পিঙ্গলজটা নীলাম্বরে মেঘপুঞ্জ স্তূপ
রোষক্ষুব্ধ ঈশানের সর্ব্বধ্বংসী উদ্যত স্বরূপ
বিদ্যুতের অট্টহাসি বিচ্ছুরিছে প্রতি ক্ষণে ক্ষণে ;—
মৃত্যুর হুঙ্কার যেন কর্ণে বাজে বজ্রের গর্জ্জনে।
ধূলি ঝঞ্ঝা-ভয়ঙ্করী এ মূরতি ক্ষণিকের জ্বালা !
তর্জ্জন-গর্জ্জন-শেষে সুরু হ'বে বর্ষণের পালা,
শান্ত হ'বে নীলাম্বর, রুদ্র র'বে ধ্যানস্তব্ধ শিব ;
নবরূপ ল'বে সৃষ্টি—নবজন্ম ল'বে সর্ব্বজীব
ভয় হ'তে অভয়ের ক্রোড়ে। বর্ষশেষে আঁখি-আগে
বিশ্ববিধাতার এই লীলাময় রূপান্তর জাগে।

আজি গত-অনাগত-যোগসেতু খুলি' মধ্যদ্বার,
জীবন তোমারে নমি'—হে মৃত্যু তোমারে নমস্কার।

এবারের নববর্ষ আনিয়াছে নূতন সংবাদ,
মৃত্যুর ইঙ্গিত বহি' জীবনের নব আশীর্ব্বাদ।
বলিছে সে—"ভয় নাই, হে পথিক, নাই নাই ভয়,
চিরন্তন মৃত্যু ছাপি' হেথা জীবনের চিরজয়।
যে-দেশ দেবতা পূজে মহাকাল শিব মৃত্যুঞ্জয়,
তাহারে কি সাজে ক্লৈব্য, মিথ্যা দৈন্য, আঁধার সংশয় ?
জয় হোক্ আনন্দের, জয় হোক্ চিরসত্য বাণী—
'ওহে বিশ্ববাসী শোন, অমৃতের পুত্র মোরা জানি।'

কে? কেন?

শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত

কে? কেন?

এরা চিরন্তন প্রশ্ন। এদের উৎস মানুষের অন্তরাত্মার। সহজাত কুতূহল মানুষের বুদ্ধিকে সচেতন করে, জ্ঞানকে সমৃদ্ধ করে।

মহিলা কে?

কেন সে প্রতিদিন প্রভাতে বাসে চড়ে দমদমা যায়?

আমি সেনেদের কাঁচের কারখানায় কাজ করি। আমাকে প্রত্যহ বেলা সাড়ে আটটায় কর্ম্মস্থলে হাজিরা দিতে হয়। আটটার সময় শ্যামবাজারের মোড়ে গাড়িতে উঠি। তাকে প্রথম দেখি তেসরা জানুয়ারী। একাকিনী মেয়েদের আসনে স্থির হয়ে বসে থাকে, আপনার দৃষ্টি গাড়ির বাহিরে অথচ সে নিজে সকল যাত্রীর আঁখিপথের পথিক! কে সে?

চার তারিখে আবার ঠিক্ ঐ একই সময় তাকে গাড়ীর একই আসনে দেখে ভাবলাম—সে আজ আবার কেন যাচ্চে। কোথায় যাবে জানি না। প্রথম দিন জেনেছিলাম তার নামবার ঘাঁটি। আমিও সেই স্থলে অবতরণ করেছিলাম। আমার কারখানা ষ্টেশনের দিকে। সে গির্জ্জা-বাড়ি ও জেলখানার মাঝে দাঁড়িয়ে রহিল, কে জানে কার প্রতীক্ষায়।

আমি বাসে চড়ি শ্যামবাজার পুলের এপারে। তৃতীয় দিন যখন বাস এলো, ভাববার আগেই, আমার দৃষ্টি অতর্কিতে মহিলা আসনে নিক্ষিপ্ত হল। মহিলা আমাকে দেখলে, কিন্তু অচিরে নিজের চক্ষু সরিয়ে নিলে।

তারপর দেখা আর ভাবা অভ্যাস দাঁড়িয়ে গেল। এক একদিন প্রথম গাড়িতে তাকে দেখতে পেতাম না। তখন বুঝিনি। এখন বুঝছি, যে মন ঠিক্ একটা না একটা ছলনায় সে গাড়িখানা ছেড়ে দেবার সিদ্ধান্ত কর্ত্ত। পরের গাড়িতে সে নিশ্চয় থাকত। সোৎসাহে সেই গাড়িতে চড়তাম।

এক পক্ষ এমনি ভাবে কেটে গেল।

একদিন মনের টুঁটি টিপে ধরলাম। কেন? কলিকাতার সহরে বিশ লক্ষ লোক আছে। তাদের মধ্যে একজন মহিলা একই সময় প্রত্যহ একই স্থলে কেন যায়, এ অশিষ্ট সমস্যা আমার চেতনায় জাগে কেন?

কুতূহল। ব্যাপারটা অসাধারণ। যা' অসাধারণ তা' মনকে আকর্ষণ করে। মিথ্যা বলে লাভ কি? অবশ্য স্ত্রীলোকটি সুন্দরী। পোষাক-পরিচ্ছদ সাদাসিধা, কিন্তু পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। সঙ্গে অভিভাবক নাই। চিত্তের আরও গভীরে ডুব দিয়ে বুঝলাম —সমস্ত ব্যাপারটা রহস্যময়। হেঁয়ালির সমাধান করা মনের বৃত্তি। তাই তার চিন্তা মনকে আলোড়িত করে।

কিন্তু কই অন্য যাত্রীকে তো লক্ষ্য করি না।

মনে পড়লো অন্তত আর একটি লোককে। হ্যাঁ। সেও আমার সহযাত্রী। সে গাড়িতে ওঠে টালার রেলের পুলের এধারে। যতক্ষণ সে গাড়িতে বসে থাকে প্রায় মহিলাটির দিকে তাকিয়ে থাকে। বেয়াদব। অথচ বেচারা। অপরিচিতার প্রতি তাকিয়ে থাকে ব'লে কি সে আমার দৃষ্টিপথে এসেছিল? উঁহু! তা নয়। লোকটা বেচারা!

বেচারা! কারণ সে নিজের দেহটাকে বস্তাবন্দী ক'রে সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ কর্ত্ত। অবশ্য সে নিজে নিরন্তর মহিলাটির দিকে তাকিয়ে থাকে। নিজে কেন দ্রষ্টব্য হ'য়েছিল, শেষোক্ত কাণ্ডটাও তাব একটা কারণ। মাথায় জড়ানো শালে ঘুঘনী-দানার প্যাঁচ, পায়ে মোজার উপর ক্যাম্বিসের সু, গায়ে কালো কোট, বোধ হয় তার নিচে পট্টুর ফতুয়া। একটা পশমের গলাবন্ধ গলায় জড়ানো। তার দুটা দিক শালের উপর শীর্ণ বক্ষের দুধারে দোদুল্যমান।

যারা সর্ব্বদা নিজেকে রোগী ভাবে এ তাদের মধ্যে একজন। রোগের চিন্তা এদের অন্তরঙ্গ। নিশ্চয় একটু রোগের লক্ষণ এদের এ মনোবৃত্তির বুনিয়াদ। যদি কোনোরূপে এরা নিরোগ হয়, তাহলে নিঃসঙ্গ হয়ে মরে যাবে—এই শ্রেণীর লোক দেখলে আমার মনে সে আশঙ্কা জাগতো। নিজের কল্যাণে এমন লোক নিরাময় না হওয়া বাঞ্ছনীয়।

একদিন সে আমার পাশে এসে বসলো। ভেবেছিলাম গায়ে ইউক্যালিপ্‌টাসের গন্ধ পাব। কিন্তু সে ধারণা ভুল প্রতিপন্ন হ'ল। মাঝে মাঝে তার কম্ফার্টারের দুদিক ধরে টানবার প্রবল ইচ্ছা হ'ত। কিন্তু সে যেদিন আমার পাশে বসলো, বুঝলাম আমার তিতিক্ষার জোর। তার গলা-বন্ধর মুক্ত প্রান্ত দুটি ধ'রে মোটেই টান মারলাম না।

মহিলাটি আমাদের পিছনে ছিল। বস্তাবন্দী ঘাড় ফিরিয়ে মাঝে মাঝে তাকে দেখতে লাগলো। ঘুঘুডাঙ্গা পার হবার পূর্ব্বে সে আমাকেও বোধ হয় বার কুড়ি দেখে নিলে। আমার ধৈর্য্যে মহা টান পড়ছিল। শেষে যখন গাড়ি-রেলের পোলের নিচে ঢুকলো, আমি তার দিক চেপে একটু পাশমোড়া দিলাম। লোকটা আর একটু হলে ঠিক্‌রে পড়ত। আমি তাকে ধরে বললাম—ক্ষমা করবেন।

—বিলক্ষণ—বলে লোকটা বার তিন কাশলে।

আমি উদ্বিগ্ন হয়ে তার মুখের দিকে তাকালাম। সে কাশির দমটা সামলে নিয়ে বল্লে—আমার চেষ্ট্‌ উইক ছিল। এখন জোর হ'য়েছে।

—ওঃ!

—হ্যাঁ। কেবল টাট্‌কা, তাজা হাওয়া খেয়ে। ডাক্তার গুডইড থেকে ওর-নাম-কি অবধি সকল ডাক্তারের মত যে গায়ে চাপা দিয়ে প্রভাতের বিশুদ্ধ বাতাস খেলে ফুস্‌ফুস্ বেলে পাথরের চাকীর মত শক্ত হয়।

এই বিজ্ঞান পরিবেশন ক'রে, বিশুদ্ধ বায়ুতে একটা শেষ টান মেরে, পিছনের সুন্দর মুখখানি একবার দেখে নিলে।

আমি বল্লাম—সত্য। কিন্তু আপনার যে রকম পুরু গোঁপ

তাতে বাতাসের স্রোত বাধা পায়। আপনি যদি গোঁপ কামিয়ে ফেলেন তো আপনার ফুস্‌ফুস্‌ মার্বেল পাথরের চাকীর মত শক্ত আর চক্‌চকে হবে।

এবার আমাকে নিজের দুর্গে পেয়ে সে আমার দুর্গতি কর্ত্তে কৃতসঙ্কল্প হ'ল। প্রেরণার জন্ত একবার অপরিচিতার দিকে তাকিয়ে নিলে। তারপর শালের ঝোলা আঁচলটা একটু টাইট করে বল্লে—মোটেই নয়। আধুনিক বাঙ্গালীর ভাঙ্গা স্বাস্থ্যের জন্ত দায়ী সস্তার ক্ষুর। গোঁপ কামিয়ে মানুষ খোদার উপর খোদকারী করতে চায়। লক্ষ লক্ষ জীবাণু হাওয়ার ওপর সাঁই সাঁই করে ঘুরছে। গোঁপ তাদের ধরে ফেলে—পুলিস যেমন চোর ধরে।

ঢাকের বাদ্য থাম্‌লে মিষ্ট। কথা বাড়াবার ভয়ে আমি আর তার কথার প্রতিবাদ কল্লাম না। মাত্র বল্লাম—হুঁ!

ভীমরুলের চাকে ঢিল মারলে হুলের কামড় সহ্য কর্ত্তে হয়। এর বচন-কেন্দ্রের সুইচ্‌ টিপে দিয়েছি—সে থাম্‌লো না। ঘ্যান ঘ্যান করতে লাগলো। কিন্তু সকলের চেয়ে অসহন হ'ল তার ক্ষণে ক্ষণে পিছনে তাকানো।

আমি বল্লাম—আপনার কি গর্দ্দানে ব্যথা হ'য়েছে?

এবার লোকটা দমে গেল। একটু ইতস্ততঃ করে বল্লে—আজ্ঞে কম্ফাটারটা টাইট্‌ ক'রে বাঁধা হয়েছে কিনা তাই মুণ্ডটাকে একটু হের ফের করে নিচ্ছি।

কৈফিয়ত দিলে বটে কিন্তু তার সিংহাবলোকন বন্ধ হ'ল না। আমার গন্তব্য-স্থানের সন্নিকটে মহিলাটির দিকে তাকালে। তার পর আমার দিকে তাকিয়ে বল্লে—আপনাদের নামবার সময় হয়েছে। উনি উঠেছেন। নমস্কার।

আমি এবার বুঝলাম। দিনের পর দিন উভয়কে একই স্থলে অবতরণ কর্ত্তে দেখে লোকটি আমাদের উভয়ের মধ্যে যোগ-সূত্রের সন্ধান পেয়েছিল। নিশ্চয় অন্যান্য লোকের মনেও ঐ রকম একটা ধারণা ছিল।

আমি বল্লাম—ওঃ! নমস্কার।

আমরা উভয়ে বাস হতে নামলাম।

কারখানায় যাবার পথে, মনে প্রশ্ন হ'ল—যদি একজন খোঁড়া কিম্বা বদ-চেহারা লোককে আমার সঙ্গী ব'লে কেহ নির্দ্দেশ করত, আমি কি সে কথার প্রতিবাদ কর্ত্তাম না? মানুষের কথা জানি না। কেহ যদি একটা ভাঙ্গা বদনা দেখিয়ে বলত—মশায় আপনার সম্পত্তি ফেলে যাচ্চেন, আমি নিশ্চয় দৃঢ়ভাবে বদনার স্বত্বস্বামিত্ব অস্বীকার করতাম।

সরস্বতী পূজার দিন কারখানা বন্ধ ছিল। কিন্তু আমরা সেদিন সকলে মিলে ফ্যাক্‌টারীতে দেবী-অর্চ্চনার আয়োজন করেছিলাম। বেলা দশটা আন্দাজ সময় জেলখানার সামনে বাস হ'তে নেমে দেখলাম, কোম্পানীর আমলের কামানের কাছে দাঁড়িয়ে একজন ওয়ার্ডারের সঙ্গে সেই মহিলা বাক্যালাপ করছে। অদূরে বাগানে কয়েকজন কয়েদী কাজ করছিল। তাদের মধ্যে একজন ফুল-গাছের মাটি খুঁড়ছিল আর নির্নিমেষ চক্ষে মহিলার দিকে তাকিয়েছিল। মুখে মৃদু হাসি, সারা অঙ্গে উৎসাহের সঙ্কেত। মহিলাটির মুখে আনন্দ আবেগের ছায়া।

আমার কানে প্রহরীর কথা পৌছিল—আভি বড়া বাবু আবেঙ্গা। আপ্‌ লোগ্‌ উস্‌তরফ যাইয়ে।

মহিলা তার হাতে কি দিল। সম্ভবতঃ বখসিস। তার পর রাস্তার এপারে এলো। আমি সেদিকে অপেক্ষা করছিলাম। রহস্য সমাধানের প্রবল প্রলোভন আমার শিষ্টাচার এবং সংযমকে ব্যাহত করলে। আমি ধীরে ধীরে তার দিকে অগ্রসর হয়ে বল্লাম—নমস্কার। আপনি প্রত্যহ এখানে—

সে আমার দিকে তাকিয়ে বিনয়ের সাথে বল্লে—নিত্য এক কয়েদী দেখ্‌তে আসি।

তার পর এমন ভাবে ঘুরে দাঁড়ালো যার সরল অর্থ—এবার তোমার ধৃষ্টতা ক্ষমা করলাম। ভবিষ্যতে আর পরের কথায় থেকো না।

চাবুক খাওয়া কুকুরের মত হীনদর্প হ'য়ে আমি বাণী-পূজার উৎসবে যোগ দিতে গেলাম। দুষ্ট সরস্বতী আরাধনার কু-ফল সারাদিন মনকে ব্যথিত করলে।

(২)

আমি যে এ বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের একটা অংশ, তিন দিন, মহিলা সে রকম উপলব্ধির কোনো আভাস দিলে না। তার সম্বন্ধে আমার মনোভাবের সম্যক পরিবর্ত্তন হ'য়েছিল। বন্দীবেশে যে ভদ্রলোকটি ফুল-গাছের পরিচর্য্যা করছিলেন, তিনি নিশ্চয় একজন দেশ-হিতৈষী। যে ভদ্র-ঘরের মেয়ে দিনের পর দিন কারারুদ্ধ আত্মীয়কে দূর হ'তে দেখ্‌তে আসে সমাজে তার স্থান বহু উচ্চে। দেখতে আসা মানে, আমার মত শত শত অশিষ্ট লোকের অভদ্র চাহনীর লাঞ্ছনা, ওয়ার্ডারের তোষামোদ, কারা-রক্ষক বড়বাবুর অপমানের ভয়ে দূরে সরে যাওয়া, ইত্যাদি ইত্যাদি শত অসুবিধার সন্তাপ। কিন্তু প্রেমের আবেগ অমোঘ রক্ষা-কবচ।

এ কয়েক দিন বস্তাবন্দী আমার পিছনে বস্‌তো। একদিন সে আমাদের সঙ্গে জেলখানার কাছে নামলো। মহিলা সোজা কামানের দিকে গেল, আমি চল্লাম কারখানার দিকে, রোগী পথের মাঝে দাঁড়িয়ে দুদিকে তাকাতে লাগলো।

কিছুক্ষণ পরে সে আমাকে ডাকলে—আজ্ঞে! মশায়!

আমি তাকে আমার দিকে আস্‌তে সঙ্কেত করলাম।

সে বল্লে—আপনাদের কি ঝগড়া হ'য়েছে? উনি জেল-খানার দিকে যান যে। ওদিকে সব দুষ্ট লোক আছে।

মারপিট না ক'রে তাকে বল্লাম—দেখুন ঝগড়া পুনর্মিলনের অগ্রদূত। ওঁর যেখানে ইচ্ছা উনি যেতে পারেন। আমি ওরিয়েণ্টাল গ্লাস ফ্যাক্টরীতে চল্লাম।

—ছিঃ! রাগ করবেন না। আমি ওঁকে কিছু বলব?

এমন লোকের শাস্তি নিশ্চয় বিধাতার অভিপ্রায়। আমি কৃত্রিম কোপের ভান ক'রে ফ্যাক্টরির দিকে বেগে চলে গেলাম। যাবার সময় বল্লাম—যা' ইচ্ছা করুন।

এক ঘণ্টা পরে কারখানার দ্বারবান সংবাদ দিলে যে মহীতোষ বাবু আমার দর্শনপ্রার্থী।

মহীতোষ?

বাহিরে এসে বুঝলাম—বস্তাবন্দীর নাম মহীতোষ।

কি ব্যাপার? এখানে কেন?

—আপনি তো মশায় বেশ ভদ্রলোক।

—কেন ?

—কেন ? আমি গিয়ে তাঁকে বল্লাম একটা কথা আছে। তিনি একটু হেসে আমাকে বল্লেন—গির্জ্জার পাশে গিয়ে বসতে। আমি কালীঘাটি না গিয়ে গির্জ্জের পাশে বসেই আছি, বসেই আছি—

—আজ্ঞে আমার কাজ আছে। শীঘ্র বলুন।

আবার সে বকতে লাগলো। মোট কথা বুঝলাম। মহীতোষ এক ঘণ্টা কামানের ওপর বাগানের দিকে তাকিয়ে বসে রহিল। পরে মহিলা তার কাছে এসে তার প্রয়োজন জিজ্ঞাসা করলে। তার কথায় বলি।

—আমি বল্লাম—আজ্ঞে বলছিলাম কি যে ওদিকে জেলখানা আছে দুষ্টলোকের বাস—মানে হ'চ্চে—

—তার পর মশায় মেয়েলোকটির চোখ দুটো জ্বলে উঠ্‌লো। সে বল্লে—অনেক দুষ্ট লোক ওর বাহিরে থাকে। দু'টিকে প্রত্যহ বাসে দেখি—একটি আপনি, আর একটি সেই তিনি।

—আমার মশায় চেষ্ট্ উইক্। কেমন একটা ভয় হ'ল। আমি বল্লাম—ক্ষমা করুন। ওরে বাবা। কে কাকে ক্ষমা করে। কি বল্লে জানেন ? বল্লে—ক্ষমা করতে পারি যদি কান মলেন।

আমি বিস্মিত হ'লাম না। কিন্তু বিচলিত হলাম, আমাকে মহিলাটি মহীতোষের সমশ্রেণীভুক্ত করেছে, এ সমাচার আমাকে ক্ষুণ্ণ করলে। পরের মন্দ চেষ্টায় ফাঁদ পাততে গেলে নিজেকে সেই ফাঁদে পড়তে হয়। ছিঃ !

মহীতোষ বল্লে—মেয়েলোকটি কে বলুন তো ? অসাধারণ ! আপনাকে বিশ্বাস ক'রে কি কুকর্ম্মই করেছি, শেষে কাণ মলতে হ'ল। ওঃ। কি বলব চেষ্ট উইক। তবে হ্যাঁ যাক্ সে কথা—

পরদিন আমি সটান গাড়িতে তার পাশের বেঞ্চে বসে বল্লাম —একটা কথা বলতে পারি ?

—বলুন।

—বস্তাবন্দী লোকটি আমার অপরিচিত। আমি আপনার কোনো অসম্মান করিনি। বুঝি আপনি মহৎ। আপনার কর্ত্তব্য-বোধ—

সে হেসে বল্লে—এ-কথা উঠ্‌ছে কেন ?

আমি বল্লাম—সে আমায় সব কথা বলেছে। আপনি সন্দেহ করেন আমি তার সহযোগী—

সন্দেহ করব কেন ? জানি। আমাকে অসহায় ভেবে অনেকে প্রেম করতে চায়। সে উদ্দেশ্য ছিল সে ভদ্রলোকটিরও। সে দুর্ব্বল। তার পক্ষে আবার একটা নূতন রোগে পড়া অমঙ্গল হ'বে বলে একটু চিকিৎসা করলাম। দেখছেন না আজ আর ভয়ে বাসে চড়েনি। অন্যেরও সাবধান হওয়া উচিত।

আমি বল্লাম—আমি নিজের কথা বলছি। আমার পক্ষ থেকে—

সে বল্লে—আপনার কথা কস্মিন কালে আমার ভাবনার বিষয় হয় নি।

তার পর বাসের বাহিরে সাতপুকুরের বাগানের দিকে চাহিল। একেবারে পাথরের কমনীয় মূর্ত্তি !

আমি এদিক ওদিক তাকিয়ে নিজের জ্বালা আগুনের আঁচে ঝলসাতে লাগলাম।

তার পর সুবিধা পেলে অন্য বাসে চড়তাম। কিন্তু এক এক দিন সাক্ষাৎ হ'ত অনিবার্য্য। পনের ফেব্রুয়ারির পর আর তাকে দেখলাম না।

(৩)

মার্চ্চ মাসের প্রথমে কারখানায় একটি নূতন ফোরম্যান ভর্ত্তি হ'ল। তার চেহারা দেখে মনে হ'ল—সে সেই মহিলার আদরের আত্মীয়—দমদম জেলের কয়েদী। কয়েদিকে মাত্র দূর হ'তে দেখেছিলাম। কিন্তু আমার মনে দৃঢ় বিশ্বাস হ'ল যে নূতন ফোরম্যান তুলসী বিশ্বাস দমদম জেলের সেই দেশ-হিতৈষী বন্দী।

এ সমস্যা সমাধানের কোনো সুষ্ঠু উপায় ছিল না। একজন সহকর্ম্মী সম্বন্ধে কাহাকেও ও রকম কথা জিজ্ঞাসা করা যায় না। তুলসী নির্দ্দোষ। নিজের মনে কাজ করে। কলকব্জা সম্বন্ধে তার শিল্পচাতুরী অসাধারণ।

আমার কাজ ছিল কারখানার হিসাব পরিদর্শন করা, পত্রের উত্তর দেওয়া, মাল মসলার বিল পাশ করা ইত্যাদি। আমার পদ ছিল সহকারী ম্যানেজারের, কিন্তু আসলে আমি ছিলাম কেরাণী। কারিকরেরা আমায় বলত ছোটবাবু।

একদিন কয়েকজন কারিকর আমার নিকট অভিযোগ করলে যে তুলসীবাবু কারখানার সমস্ত বিধি নিয়ম ভেঙ্গে নূতন সব নিয়ম-কানুন-জারি করেছে। বুঝলাম এ-সব নূতন নিয়মের ফলে লোকেদের অবিরত পরিশ্রম করতে হয়—আর যে কাজ ক'রে তারা দুরোজ পেতো সে কাজ একদিনে শেষ হয়। বলাবাহুল্য ডিরেকটারদের পক্ষে এ ব্যবস্থা মঙ্গলময়। কিন্তু শ্রমিকের পক্ষে সেগুলা অশুভ। তারা বড়বাবু বা ডিরেকটারদের কাছে কোনো শুনানী পায় নি। আমি একটা কিছু ব্যবস্থা না করলে ফ্যাকটারিতে ধর্ম্মঘট অনিবার্য্য !

আমি এ অভিযোগের তদন্তে তুলসীর পরিচয় পাবার চেষ্টা করলাম। অবশ্য তার সঙ্গে সেই কোমল-দেহ কঠোর মেজাজের মহিলার। কেহ তার অতীতের ইতিহাস বিদিত নয়। তাকে সেন সাহেব বাহাল করেছেন।

কর্ম্ম-অন্তে সন্ধ্যার সময় আমি তুলসীবাবুকে সব কথা বল্লাম। সে হেসে বল্লে—এরা যদি এভাবে কাজ করে ছয়মাসের মধ্যে কারখানায় দ্বিগুণ মাল জন্মাবে। এরাও নূতন পদ্ধতি শিখবে। তখন কলের অধিস্বামীরা এদের প্রত্যেকের পারিশ্রমিক শতকরা ত্রিশটাকা বাড়ালেও লাভের হার দ্বিগুণ হবে। সে কতকগুলা সংখ্যার সাহায্যে আমাকে তার বক্তব্য বুঝিয়ে দিলে।

আমি বল্লাম—আপনি এ সব শিখলেন কোথা ?

সে বল্লে—ঘরে, বাহিরে, জেলখানায়, সংসারের পাঠশালায়।

যেরকম হেসে কথা বল্লে তাতে মনে হ'ল সে রসিকতা করছে। আমি কিন্তু সে সমাচার অনুসরণ করতে পারলাম না। তাকে বল্লাম—আপনি মিস্ত্রীদের সঙ্গে একবার কথা কয়ে দেখবেন ? ধর্ম্মঘট হলে বড় ঝঞ্ঝাট হবে।

সে বল্লে—ওরা গেলে তো হয়। শিক্ষিত লোক পাওয়া

যায়। আমি সেন সাহেবের সঙ্গে এ বিষয় কথা কয়েছি। আপনি উদ্বিগ্ন হবেন না।

তারপর মৃদুহেসে চলে গেল। সমস্ত ব্যাপারটা অবজ্ঞায় উপেক্ষা করলে।

আমার মনে দারুণ হিংসার উদ্রেক হ'ল। এর দর্প একটু খর্ব্ব হওয়া আবশ্যক। তার সঙ্গে মনের পটে ভেসে উঠলো সেই পাথরের মূর্ত্তি—সরল, নির্ভীক, দরদী অথচ কঠোর নারী।

রবিবার সন্ধ্যায় ময়দানে মহীতোষের সাক্ষাৎ পেলাম। বেশ গরম পড়েছিল। সাঁঝের দখিন হাওয়ার বুকে কনক চাঁপার সুবাস ভেসে আসছিল। ময়দানে অসংখ্য নরনারী নবীন বসন্তকে সাদরে অভ্যর্থনা কর্ব্বার জন্য ঘুরছিল।

মহীতোষের গায়ে জড়ানো কাপড়গুলা ছিল না। একটা গলা অবধি বোতাম আঁটা সাদা কোটে মাত্র তার দেহ আচ্ছন্ন। এতদিন ভাল ক'রে দেখিনি। মহীতোষের বয়স ত্রিশের কম। মুখে আর পীড়ার শঙ্কা নাই। দেহ খুব সবল নয়। তবে উইক চেষ্ট—বল্লে যে শীর্ণতা বোঝায়, মহীতোষ তেমন শীর্ণ নয়।

একমুখ হেসে সে আমাকে অভিবাদন করলে।

আমি বল্লাম—আপনি সব মোড়াগুলা খুলে ফেল্লেন কেন মহীতোষ বাবু? আর কাদীহাটি যান্?

সে বল্লে—এখন বসন্ত। শীতকালে ময়দানে কুয়াশা হয়। তাই সহরের ভিতর দিয়ে, গ্রামের মাঝে মাঝে অথচ সবুজ গাছের আবহাওয়ায় বাসে চড়ে কাদিহাটি যেতাম। এখন দুবেলা মাঠে আসি। আঃ কি অপ্রতিবন্ধ হাওয়া! একেবারে সোজা সাগর থেকে সোঁ সোঁ ক'রে বয়ে আসছে।

পাঁচ রকম কথা কহিতে কহিতে দুজনে প্রিনসেপ ঘাটের দিকে গেলাম।

আমি বল্লাম—আপনার দেহ বেশ ভাল হয়েছে। মুখে লাবণ্য এসেছে। রোগের ভাবনা ছেড়েছেন বুঝি।

—কি বলেন মণিবাবু? চেষ্ট আমার উইক। কিন্তু যাক সে কথা। তবে কয়লার কী ময়লা ছোটে—যাক্ সে কথা।

—ওঃ! প্রেম প্রবেশ করেছে? কিন্তু প্রেমের দায়ে কান দুটা যেন—মাপ করবেন।

সে রাগ করলে না। বল্লে—কষ্ট না পেলে কি আর কেষ্ট মেলে মণিবাবু?

—তা বটে।

প্রিনসেপস্ ঘাটের কাছে একখানা মোটর ছিল। সে আমাকে বল্লে—পৌঁছে দেব। আসুন না। আমি তো টালা যাব।

লোকটা ক্রমশঃ নিজেকে রহস্য জালে বেঁধে ফেলছিল। মোটরগাড়ির অধিস্বামী মহীতোষ! আজ সে বস্তাবন্দী নয়। ফাল্গুনের দখিন হাওয়া তার উইক চেষ্টকে প্রবল প্রেমের আগুনে গরম করেছে। তারপর সে আমার কুতূহল অতি মাত্রায় বাড়ালে, যখন বল্লে—তুলসী বিশ্বাস আপনাদের কারখানায় কাজ করে মণিবাবু?

আমি বিস্মিত হয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করলাম—আপনি তুলসীবাবুকে জানেন?

—কতক কতক।

সে মোটরে উঠে বসেছিল। আমি তাকে বল্লাম—তুলসী বিশ্বাসের সঙ্গে সেই বাসের মহিলাটির কি সম্পর্ক?

সে বল্লে—তা জানিনি। নমস্কার।

গাড়ি চলে গেল।

(৪)

একটা দারুণ অস্বস্তি সারা প্রকৃতিটা তোলপাড় করতে লাগলো। গঙ্গার ধারে একটা বেঞ্চের উপর বসলাম। মনের ভাবগুলোকে কেটে টুক্রা টুক্রা ক'রে পরীক্ষা করলাম। এরা তিনজন আমার কে? কেন তাদের রহস্য জানবার জন্য নিজেকে ব্যথিত করছি?

তুলসীর উপর হিংসা ছিল। সে সুপুরুষ, স্বাবলম্বী, দক্ষ শিল্পী। কেবল কি তাই? সত্য কথা মনে জাগলো। সে ভাগ্যবান—কারণ সে সেই মহিলাটির কেহ একজন।

আর এই নগণ্য বায়ু-গ্রস্ত মহীতোষ নিশ্চয় ধনী অথচ প্রেমপাগল। সে নির্লজ্জের মত তার দিকে চেয়ে থাকতো। স্ত্রীলোকের দিকে তাকিয়ে থাকাটা তার অন্তরের প্রেম-পীড়ার লক্ষণ। তুলসী বিশ্বাসকে সে জানে। কিন্তু অসৌষ্ঠব আচরণের ফলে সে, কে জানে কোথায়, এক প্রেমের মানুষ পেয়েছে। হাসি এলো। সে অভাগা মহিলাটিকে দেখতে সাধ হল। বলিহারি রুচি!

আর সে? সে কে? কেন আমার জীবনপথে এসে আমার মনে সে এসব প্রশ্ন তোলে? আমার সংস্কার এবং সংস্কৃতি চিরদিন পরচর্চ্চা-বিমুখ। আমি মনের নিভৃতে তার চর্চ্চা করি কেন? সে আমায় অপমান করেছিল বলে? শুধু তাই? তার নির্ম্মল উদাসীনতা আমার ব্যক্তিত্ব এবং যৌবনকে হতমান করেছিল। মাত্র এই কারণ? কে জানে কেন তার মিত্রতার কল্পনা ছিল সুখের।

পরদিন যখন আমার কর্ম্ম-কক্ষে তুলসী হাজিরা লেখাতে এলো, তাকে জিজ্ঞাসা করলাম—আপনি মহীতোষকে জানেন?

সে বল্লে—মহীতোষ? হ্যাঁ মহীতোষ মল্লিক। ওঃ। হাঁ জানি। দেখুন মণিবাবু আপনাকে একটা অনুরোধ করছি। শ্রমিক বা মিস্ত্রিরা আপনার কাছে এসে অভিযোগ করলে, আপনি তাদের উৎসাহ দেবেন না।

আমার মাথায় রক্ত উঠ্‌লো। আমি দৃঢ়স্বরে বল্লাম—উৎসাহ?

সে অমায়িকভাবে মৃদু হেসে বল্লে—দিয়েছেন বলছি না। দেবেন না, অনুরোধ করছি। তা'হলে ডিসিপ্লিন রাখতে পারব না।

তার কথার প্রত্যুত্তর পাবার পূর্ব্বে সে চলে গেল। তার নিয়মনিষ্ঠার চাতুরী যেদিন ধর্ম্মঘটের কারণ হবে, ফ্যাক্টারির কর্ত্তৃপক্ষ ঘাড় ধরে তাকে বার করে দেবে। অনুশাসন! পুরাতন পাপী। রাজার অনুশাসন উপেক্ষা ক'রে যে কারারুদ্ধ হয় তার মুখে নিয়মনিষ্ঠার কথা! ভূতের মুখে রাম নাম।

ইষ্টারের ছুটিতে আমার টুটল সবহি সন্দেহ। কারণ ইডেন গার্ডেনে ঝোঁপের ধারে একটা বেঞ্চের উপর তুলসীকে আর তাকে একসঙ্গে দেখলাম।

উভয়ের মুখ গম্ভীর। তারা কি বাদানুবাদে রত ছিল।

আমার শিক্ষা, দীক্ষা, শম, দম সকল সদগুণ জলাঞ্জলি দিয়ে গাছের আড়াল থেকে তাদের কথাবার্ত্তা শুনলাম। দীনতা, হীনতা, নীচতার কোনো উপলব্ধি তখন মনে ছিল না। সারা প্রকৃতি জুড়ে বিদ্যমান ছিল কৌতূহল। এরা কে? কেন এ নিভৃত আলাপ?

তুলসী বল্লে—প্রমীলা, দাবীর কথা তুলছ কেন? দাবী কিসের? তোমায় ভালবাসি—তার দাবী যদি তোমার চিত্তের প্রসাদ দাবী করে, সে ধৃষ্টতা ক্ষমা দাবী করতে পারে।

প্রমীলা বল্লে—প্রেমের কথা কেন ওঠে তুলসী বাবু? আমি আমার কর্ম্মের শেষে এই বাগানে বেড়াচ্ছিলাম। একটা অশিষ্ট ফিরিঙ্গি আমায় অপমান করেছিল। তুমি ভদ্রলোক, শিক্ষিত। আমার কাতর আর্ত্তনাদে ছুটে এসে সেই ফিরিঙ্গিটাকে আছাড় মেরে তার হাতের দুটা হাড় ভেঙ্গে দিয়েছিলে। তার পূর্ব্বে তোমাকে জানতাম না। তারজন্য—

তুলসী বাধা দিয়ে বল্লে—সে কথা তুলছ কেন প্রমীলা? আমি জরিমানা না দিয়ে ছয় সপ্তাহ জেলে গিয়েছিলাম লোক-শিক্ষার জন্য। কর্ত্তব্য পালন করতে গেলে জেলের ভয়, প্রাণের ভয় বিসর্জ্জন দিতে হয়। কিন্তু তুমি কেন দেবীর মত দিনের পর দিন উষার প্রভাতী আলো হ'য়ে সেই কারাগার আলোকিত কর্ত্তে যেতে প্রমীলা? সেই দেবীকে যদি আমার মন ভালবাসে, সে কি দোষী?

প্রমীলা বল্লে—নিজের কর্ত্তব্য বুদ্ধিকে যে বেদীতে বসিয়েছ, আমার কর্ত্তব্য-বুদ্ধিকে সে বেদী থেকে ঠেলে-ফেলে দিচ্চ কেন? তোমায় আমি নিজের ভাই মনে করি—আমার রক্ষক, অভিভাবক। আমি দীন—পেটের দায়ে শিক্ষয়িত্রীর কাজ করি—আর তুমি অনেক বড়।

—ওসব কথার মোচকোফের প্রমীলা। আমায় গ্রহণ কর। দুজনে বাসা বাঁধব। দেশের শিল্পবাণিজ্য প্রসার কর্ত্তে জীবন স'পেছি—তুমি তার প্রেরণা হও প্রমীলা।

সে উত্তর দিলনা।

তুলসী পাথর-গলা স্বরে বল্লে—বল প্রমীলা। আমার জীবনকে সরস কর।

নির্ম্মম নিষ্ঠুর প্রমীলা। সে বল্লে—সে ভালবাসা নাই তুলসী। তুমি আমার ভাই, বরেণ্য, শ্রদ্ধার পাত্র। তুমি নারীর মন বোঝনা তুলসী। আমি অনুগত স্বামী চাই—

—আমার আনুগত্য—

—যাকে শ্রদ্ধা করি, ভক্তি করি তার কৃতদাসী হওয়া অসম্ভব। আমি নারী—নারীর অধিকারকে বড় ভাবি। সত্য কথা শুনবে তুলসী? আমি প্রভু চাহিনা—কৃতদাস চাই।

—আমি হ'ব—প্রেমের রাজ্যে—

—অসম্ভব! তুমি যুগযুগান্তরের প্রভু নর, প্রভুত্ব তোমার দেহে, মনে, অন্তরাত্মায়। ক্ষমা কর।

কিছুক্ষণ স্থির থেকে তুলসী বল্লে—আচ্ছা আমায় নিয়োনা। কিন্তু তোমার মঙ্গলের জন্য বলছি প্রমীলা—ঐ যক্ষ্মারোগী, পথের ধূলা—

—যক্ষ্মা ওর দেহে নাই। মনে রোগ আছে। আমি ধূলা চাই। সে দিনের পর দিন আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকত, কৃতদাসের মত, পোষা কুকুরের মত। ও কান মলেছিল আমার দাবড়ানীতে। আমার প্রকৃতি চায় মহীতোষকে, তোমায় নয়।

আমার হৃদ্‌পিণ্ড আমার পাঁজরাগুলার উপর মুষলের আঘাত করতে আরম্ভ করলে। মহীতোষ মল্লিক! শিক্ষিত, উদার সুপুরুষ তুলসীর প্রেম-ভাগীরথীর পুণ্যস্রোত উপেক্ষিত কর! মহীতোষের প্রেমের পঙ্কিল কূপে এ স্ত্রীলোকটির আত্ম-সমর্পণ! কেন?

কে জানে?

প্রাচীনরা বিজ্ঞ। তাই তাঁরা মদন দেবতার অন্ধ রূপ পরিকল্পনা করেছিলেন।

ইয়াসীন্

শ্রীকনকভূষণ মুখোপাধ্যায়

তোমারে দেখিয়াছিনু পরিপূর্ণ জীবন-গৌরবে
স্বদেশের সাধনায় হে প্রদীপ্ত মুক্তির সৈনিক—
তব দীপ্তি বিচ্ছুরণে জীবনের মহিম সৌরভে
মন্ত্রমুগ্ধ একদিন অকস্মাৎ হারাইনু দিক্।

ভুলি নাই আজো বন্ধু অপরূপ সে জীবন-ছবি
জীবন-নন্দিত-করা সে মাধুরী ভুলিবার নয়—
মৃত্যুর মুহূর্ত্ত আগে জানিত না অবজ্ঞাত কবি
তুমি ছিলে এত প্রিয় হৃদয়ের আনন্দ সঞ্চয়।

মৃত্যুর তীর্থের পারে যেথা বন্ধু মিলিয়াছ আজ
সেথা কি পড়িবে মনে সর্বহারা নিরন্নের দল—
যাদের অন্তর্লোকে নির্বিচারে ছিলে অধিরাজ
শেষের শয়ানে যারা নিবেদিল বেদন-বাদল?

পরিশ্রান্ত হে সৈনিক নিদ্রা যাও কবরের কোলে
অনাগত ভবিষ্যতে রবে লেখা তব ইতিহাস—
তোমার সে সৌম্যরূপ গেল মিশে অনন্ত কল্লোলে
ধন্য তুমি কর্ম্মবীর জীবনের প্রদীপ্ত আভাষ!

মধু ও মোম *

অধ্যাপক শ্রীমণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ বি-এল

বাংলা দেশের সর্ব্বত্রই মৌমাছি আছে, মধুও সকল জেলাতেই অল্পবিস্তর পাওয়া যায়। কিন্তু বাংলার মধ্যে একমাত্র সুন্দরবন অঞ্চলেই মধুর প্রাচুর্য্য। এখানে মধু ও মোম সংগ্রহের পরোয়ানা বিলি করিয়াই বাংলা সরকারের কমবেশী বাৎসরিক বিশহাজার টাকা রাজস্ব আদায় হয়। সুন্দরবন ছাড়া অন্যান্য অঞ্চলে উৎপন্ন মধুর পরিমাণ যৎসামান্য, রাজস্বের পরিমাণও গণনার মধ্যে নহে। কাজেই বাংলাদেশের মধু ও মোম বলিতে সুন্দরবনের মধু ও মোমই বুঝায়।

২৪ পরগণা, খুলনা ও বরিশাল এই তিনটি জেলার দক্ষিণাংশ লইয়া সুন্দরবন পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমে ১৮০ মাইল ও উত্তর হইতে দক্ষিণে ৭০ মাইল পর্য্যন্ত বিস্তৃত। ইহার পরিমাণ ১৫,৮২,৫৮১ একর অর্থাৎ প্রায় ৪০০০ বর্গ মাইল। এই প্রকাণ্ড পরিসরের মধ্যে অসংখ্য নদী ও খাল এবং ইহার অধিকাংশই প্রাকৃতিক অরণ্য। দক্ষিণ বাংলার বহু অধিবাসী এবং চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার অঞ্চলের একদল মগ এই সুন্দরবন হইতে আরণ্য পণ্য সংগ্রহ করিয়া জীবনধারণ করে। সুন্দরী, গেঁউয়া, গরাণ, আমুর ইত্যাদি নানা জাতীয় কাঠ, গোলপাতা, মাছ, মধু, ঝিনুক ইত্যাদি বহুপ্রকার ব্যবহার্য্য দ্রব্য সংগ্রহ করিবার জন্য এই সমস্ত সংগ্রাহক সুন্দরবনের বনকর অফিসে আসিয়া নাম লিখাইয়া উপযুক্ত বনকর (Royalty) দিয়া অরণ্যে প্রবেশ করে ও পরোয়ানায় লিখিত আদেশমত বস্তু সংগ্রহ করিয়া ফিরিবার সময় বনকর আফিসে জিনিষগুলি দেখাইয়া বহির্গমনের অনুমতি পত্র লইয়া প্রস্থান করে। মধু-সংগ্রাহকও এইভাবেই কাজ করিয়া থাকে। ইহাদের চলিত ভাষায় এই অঞ্চলে 'মৌআলা' বা 'মৌআলী' (১) বলে।

সুন্দরবনে মধু-সংগ্রহের সময় প্রতি বৎসর ১লা এপ্রেল হইতে ১৫ই জুন পর্য্যন্ত। ইহার পূর্ব্বে বা পরে তেমন মধু পাওয়াও যায় না. সরকারী বনবিভাগ মধু-সংগ্রহ করিবার অনুমতিও দেন না। মৌআলারা এই সময়ের পূর্ব্ব হইতেই উপযুক্ত উপকরণ সংগ্রহ করিয়া সুন্দরবনে আসিয়া থাকে। কারণ প্রত্যেকেই 'গোড়ার মধু' অর্থাৎ এপ্রেলের প্রথম দিকে মধু ভাঙ্গিতে চেষ্টা করে।

সুন্দরবনে জীবন যাপন নিতান্ত কষ্টসাপেক্ষ। দশ, বিশ বা ত্রিশ ক্রোশের মধ্যে গ্রাম, বাজার ও পোষ্ট অফিস নাই, দু'চার জন বোয়ালি ও বনবিভাগের দু'এক জন কর্ম্মচারী ছাড়া অন্য কোন মানুষের চিহ্ন নাই ; ঝড়-জলে কোনরূপ আশ্রয় নাই, হিংস্র পশু, বৃহৎ সাপ ও হাঙ্গর-কুম্ভীরে সুন্দরবনের জীবন প্রতিমুহূর্ত্তেই বিপদাপন্ন। সেজন্য সহজেই অনুমান করা যায় যে, নিতান্ত অভাবগ্রস্ত লোক ছাড়া সুন্দরবনে কাঠ ভাঙ্গিতে বা মধু সংগ্রহ করিতে কেহই যায় না। মৌআলারাও ইহাদেরই মধ্যে একজন। ইহাদের মধ্যে অধিকাংশই কৃষক। কৃষিকার্য্যের অবকাশে মধু-সংগ্রহ করে। এ সমস্ত লোকেরা মহাজনের নিকট হইতে উচ্চসুদে টাকা ধার করে, মাসিক ২৷০ হইতে ৩৲ টাকা ভাড়া দিয়া পঞ্চাশ মণ বা পচাত্তর মণ মাল বহনের উপযোগী ছোট ছোট নৌকা ভাড়া করে এবং কোন নৌকায় একজন. কোন নৌকায় দুইজন—এইরূপে পাঁচ সাত দশখানি নৌকা একত্র দলবদ্ধ হইয়া বাহির হইয়া পড়ে ; ইহাদের এক একটি দলে সাধারণতঃ পাঁচ হইতে কুড়ি জন পর্য্যন্ত লোক থাকে। মৌআলারা মধু আনিবার জন্য সঙ্গে 'পাকা জালা' (২) টিনের ক্যানেস্তারা ইত্যাদি আনিয়া থাকে এবং মধুর চাক ভাঙ্গিয়া সাময়িক ভাবে মধু সমেত চাকখানি রাখিবার জন্য ঘন বেতের বোনা ঝুড়িও সঙ্গে রাখে (এই ঝুড়িগুলি এরূপভাবে নির্ম্মিত যে ইহার উপর মধু রাখিলেও উহা সহজে বেতের ফাঁক দিয়া গলিয়া যায় না)। এই সঙ্গে যে কয়দিন জঙ্গলে থাকিবে বলিয়া উহারা অনুমান করে সেই কয়দিনের উপযুক্ত চাল ডাল ও পানীয় জল (৩) সঙ্গে থাকে। অরণ্যে থাকিবার সময় বন হইতে কাঠ ভাঙ্গিয়া ও নদী হইতে ছিপের দ্বারা মাছ ধরিয়া আহারাদি করিয়া থাকে। বাঘের হাত হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য বিশেষ কোন উপকরণই ইহাদের সহিত থাকে না। বনকর অফিস হইতে কাঠুরিয়াদের সময় সময় গাদা বন্দুক ধার দেওয়া হয়, কিন্তু মৌআলারা সে সুবিধাও পায় না। তবে এক একটি মৌআলার দলে একজন করিয়া 'গুণী' থাকে। ইহাদের বিশ্বাস, হয়ত কুসংস্কারও বলা যায় যে, এই গুণী বাঘের মন্ত্র জানে এবং মন্ত্রের দ্বারা ইহারা মৌআলার দেহকে নিরাপদ করিতে পারে এবং বাঘকে দূরে তাড়াইয়া দিতে পারে। কিন্তু দেখা যায় যে, সুন্দরবনে বাঘের মুখে যাহারা প্রাণ দেয়, তাহাদের অধিকাংশই মৌআলা। যাহা হউক, গুণীর যাবতীয় ব্যয়ভার—গুণী যে দলে থাকে সেই দলই চাঁদা করিয়া বহন করে।

মৌআলার দল সুন্দরবনে প্রবেশ করিবার সময় নিকটস্থ বনকর অফিসে যাইয়া আপন আপন নৌকা এবং যে কয়টি মধু-সংগ্রহের ভাণ্ড আছে, সেইগুলি সমস্তই রেজেষ্ট্রী করাইয়া লয়। রেজেষ্ট্রী করিবার সময় প্রত্যেকটি মৌআলার জন্য মাথা-পিছু মাসিক পাঁচ টাকা করিয়া কর দিতে হয়। এই পাঁচ টাকার জন্য এক একজন আড়াই মণ করিয়া মধু ও

---

(১) সুন্দরবন অঞ্চলে যাহারা কাজ করে, তাহাদের সাধারণতঃ 'বোয়ালি' বলা হয়। বোয়ালি অর্থে কাঠুরিয়া ; পূর্ব্বে অধিকাংশ কাঠুরিয়াই বরিশাল জেলার বর্ধাকাঠি গ্রাম হইতে আসিত বলিয়া ইহাদের নাম হইয়াছিল 'বর্ধাকাঠী বোয়ালি'। তাহা হইতে এখন সুন্দরবনে যাহারাই কাজ করে, তাহাদিগকেই অনেক সময় 'বর্ধাকাঠী' বলা হয়। মৌআলাদিগকেও অনেক সময় বোয়ালি নামে অভিহিত করা হয়। তবে জালিকদের কখনও বোয়ালি বলা হয় না, তাহারা জেলে। যদি বলা যায়, সুন্দরবনে মাত্র দুই শ্রেণীর লোক কাজ করে, বোয়ালি ও জেলে, তাহা হইলে ভুল হয় না।

(২) 'পাকা জালা' ভালো মাটী দিয়া গ্রামেই প্রস্তুত হয়। উহা সাধারণ জালা অপেক্ষা অনেক বেশী মোটা, কারণ সাধারণ জালায় মধু রাখিলে উহা ফাঁসিয়া যাইবার সম্ভাবনা।

(৩) সুন্দরবনে নদীর জল অল্পবিস্তর লবণাক্ত, সেইজন্য সুন্দরবনে যাইবার সময় পানীয় জল সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতে হয়।

---

* বাংলা সরকারের আবগারী ও বনবিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী শ্রীউপেন্দ্রনাথ বর্ম্মণ মহোদয়ের সহিত সুন্দরবন অঞ্চলে ব্যাপকভাবে ভ্রমণ করিবার সময় এই প্রবন্ধে উল্লিখিত তথ্যগুলি সংগ্রহ করিয়াছিলাম। প্রবন্ধে উল্লিখিত সংখ্যাগুলি দক্ষিণ বাংলার conservator of Forests S. J. Curtis সাহেবের Working plan for the Forests of Sundarbans (১৯৩১-৫১) নামক পুস্তক হইতে গৃহীত। এই পুস্তকখানি বিক্রয়ের জন্য প্রকাশিত হয় নাই ; ইহা For official use only। প্রবন্ধের কতকগুলি তথ্যের জন্য সুন্দরবন বাগেরহাট রেঞ্জের 'Ranger' শ্রীভূপেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী মহাশয়ের নিকট হইতে বিশেষভাবে সাহায্য লাভ করিয়াছি। এজন্য তাঁহার নিকটেও ঋণী রহিলাম। —লেখক

সাড়ে বারো সের করিয়া মোম আনিতে পারে। [সুন্দরবনের চাক হইতে প্রাপ্ত মধু ও মোমের অনুপাত ৮ : ১ অর্থাৎ যতগুলি চাক ভাঙ্গিয়া আড়াই মণ মধু মিলিবে, সেই সমস্ত চাক হইতে সংগৃহীত মোমের পরিমাণ কম বেশী সাড়ে বারো সের হইবে।] ইহার অধিক সংগৃহীত হইলে তাহার উপর মধুর জন্য মণ করা দেড় টাকা ও মোমের জন্য মণ-করা চার টাকা হিসাবে বনকর দিতে হয়, তবে কম সংগৃহীত হইলে টাকা ফেরৎ পাওয়া যায় না। কোন মৌআলা দুই সপ্তাহ বা এক সপ্তাহ কাল জঙ্গলে থাকিবার জন্য প্রবেশ করিলে মাথা পিছু মাসিক (অর্থাৎ চার সপ্তাহে) পাঁচ টাকা এই হিসাবেই অগ্রিম দিতে হয়। নৌকা রেজেষ্ট্রী করিবার মাশুল বৎসরে আট আনা ; মধু সংগ্রহের পাত্রগুলিও রেজেষ্ট্রী করিতে হয়, তবে সেজন্য কোন খরচ লাগে না।

বনকর অফিস হইতে মধুসংগ্রহের পরোয়ানা লইয়া মৌআলারা জলপথে নৌকাযোগে অরণ্যে প্রবেশ করে। ইহারা অরণ্যের যে কোন স্থানেই যাইতে পারে কেবল যে সকল স্থানে কাঠ-ভাঙ্গা বা অন্যান্য কাজ হয় (৪) সেই সকল স্থানে তাহারা যাইতে পারে না। কারণ যেখান হইতে মধু সংগ্রহ করা হয়, সেখানে স্বভাবতঃই মক্ষিকার দল ক্ষিপ্ত হইয়া উড়িতে থাকে এবং সেখানে কোন কাঠুরিয়ার পক্ষে কাজ করা সম্ভব হয় না। সেইজন্য ঐ সকল স্থানকে Bee sanctuary বা মক্ষীরক্ষণের স্থান বলিয়া পূর্ব্ব হইতেই ঘোষিত করা হয়। এই সূত্রে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, সমগ্র সুন্দরবনে মধু পাওয়া যায় না, মাত্র সাতক্ষিরা ও বসিরহাট রেঞ্জেই মধুর প্রাচুর্য্য। এই দুইটি রেঞ্জের মধ্যে সাতক্ষিরায় বুড়ি গোয়ালিনী, কদমতলা ও কৈখালি বনকর অফিস এবং বসিরহাটে বাঘ্না ও রামপুরা অফিসেই মধুর কার্য্য সমধিক হইয়া থাকে।

জলপথে সরু খাল দিয়া গভীর অরণ্যে প্রবেশ করিয়া মৌআলারা গুণীর দ্বারা আপন আপন দেহকে মন্ত্রপূত করিয়া নৌকা ছাড়িয়া জঙ্গলে উঠিয়া পড়ে ও কোথায় মৌচাক আছে তাহারই সন্ধান করিয়া হাঁটিতে থাকে। অনেক সময় তাহারা উড়ন্ত মৌমাছি দেখিতে পায় এবং তাহারই পশ্চাদনুসরণ করিয়া (৫) তাহার চাক খুঁজিয়া বাহির করে। এই সময়টিই তাহাদের পক্ষে বিপজ্জনক, কারণ মাছির দিকে বা গাছে কোথায় চাক আছে সেই দিকে দৃষ্টি থাকায় বাঘের দ্বারা অতর্কিতে অনেক মৌআলাই আক্রান্ত হয়। এই সময় নৌকায় তাহাদেরই দলের দু'একজন লোক নৌকা রক্ষণের ভার লয়। এই সমস্ত নৌকা-রক্ষীরা মধ্যে মধ্যে শিঙ্গা বাজায়, যাহাতে শিঙ্গার শব্দ শুনিয়া নিবিড় জঙ্গলের মধ্যে চাক-অন্বেষণকারীগণ পথ হারাইয়া না যায়। এইরূপে চাকের সন্ধান করিয়া মৌআলারা হেঁতালের লাঠির মাথায় হেঁতাল গাছের পাতা জড়াইয়া উহাতে আগুন দিয়া ধোঁয়া করে এবং ঐরূপ হেঁতাল-মশালের ধোঁয়ায় চাকের সমস্ত মাছি তাড়াইয়া দিয়া চাক হইতে মধুকোষটিকে কাটিয়া লইয়া উহা পূর্ব্ববর্ণিত বেতের ঝুড়ির মধ্যে ধারণ করে ও ঝুড়িটিকে কাঁধে করিয়া নৌকায় রক্ষীদের শিঙ্গার শব্দ অনুসরণ করিয়া গভীর জঙ্গল হইতে নৌকায় ফিরিয়া আসে। মৌমাছিদের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য মৌআলারা অনেক সময় কেরোসিন তেল মাখে, পূর্ব্বে গায়ে তুলসী পাতার রস মাখিত। সুন্দরবন অঞ্চলে অধিকাংশ চাকই গাছের ডালে মাটি হইতে পাঁচ সাত ফুট উচ্চতার মধ্যে হইয়া থাকে। এখানকার চাক বিশেষ বড় হয় না। একখানি বড় চাক হইতে ১৪।১৫ সের মধু ও সেই অনুপাতে মোম পাওয়া যায়। বাংলা দেশের অন্যান্য স্থানের তুলনায় সুন্দরবনের চাকগুলি মাঝারী সাইজের বলা যায়। উত্তর-বঙ্গের বৃহত্তম চাকে ৩০।৩৫ সের মধুও হয়। তবে সুন্দরবনের চাক পৃথিবীর অন্য দেশের তুলনায় ছোট নহে, কারণ 'মধু ও দুধের দেশ' যে পোল্যাণ্ড এবং বৈজ্ঞানিক উপায়ে মৌমাছি ও চাকের শ্রীবৃদ্ধির জন্য যে দেশ পৃথিবীর মধ্যে অগ্রণী হইয়া উঠিয়াছিল, সেই দেশের একটি চাকে চল্লিশ পাউণ্ডের অধিক মধু বড় একটা হয় নাই। সে তুলনায় সুন্দরবনে কোনরূপ চেষ্টা না করিয়া স্বাভাবিক ভাবেই ঐ পরিমাণ মধু পাওয়ায় সুন্দরবনের বেশ কিছু কৃতিত্বই প্রমাণিত হয়।

সুন্দরবনে চাক ভাঙ্গিবার নিয়ম আছে। চাকের উপরের অংশে মক্ষিকাদের বাসা, নিম্ন অংশে মধুকোষ। ছুরীর ন্যায় ধারালো যন্ত্রের সাহায্যে মৌআলারা নিম্নের মধুকোষটুকু মাত্র কাটিয়া লইতে পারে, উপরের অংশ ভাঙ্গিলে উহা অপরাধ বলিয়া গণ্য করা হয় এবং উহার জন্য আইনত জরিমানা হইতে পারে। কারণ, উপরের অংশ ভাঙ্গিলে উহার মধ্যস্থিত মক্ষিকার ডিম নষ্ট হইয়া ভবিষ্যতে মাছিদের বৃদ্ধি বন্ধ হইবার আশঙ্কা আছে। উপরের অংশকে এই অঞ্চলে চলিত ভাষায় 'ধাড়ী' বলে, নিম্ন অংশের নাম 'মৌভাণ্ড'। মৌআলারা ধাড়ী বাদ দিয়া মাত্র মৌভাণ্ডটুকুই কাটিয়া লয়, কারণ ধাড়ী সমেত ভাঙ্গিলে সমস্ত মধুর রঙ লাল হইয়া যায় এবং উহাতে মধুর হাটে মধুর দামও কমিয়া যায়।

মৌভাণ্ড কাটিয়া লইয়া মৌআলারা নৌকার শিঙ্গা শব্দ অনুসরণ করিয়া জঙ্গল হইতে নদীর তীরে আসিয়া নৌকায় উঠে এবং ঝুড়ি হইতে চাকটি লইয়া চাপ দিয়া উহার মধু নিষ্কাশিত করিয়া মধু ও মোম আলাদা করিয়া ফেলে। এইরূপে সরকারী বনবিভাগের পরোয়ানানির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যতটা সম্ভব মধু সংগ্রহ করিয়া মৌআলারা বনকর অফিসে ফিরিয়া যায় ও সেখানে অতিরিক্ত মোম ও মধুর জন্য নির্দ্দিষ্ট কর দিয়া সুন্দরবনের এলাকা হইতে বাহিরে চলিয়া যায়।

সুন্দরবনে ১লা এপ্রেল হইতে ১৫ই জুন পর্য্যন্ত মধু সংগ্রহের পরোয়ানা দেওয়ার কারণ এই যে, মার্চ্চ মাসের মাঝামাঝি হইতে এখানে নানা জাতীয় ফুল ফুটিতে থাকে এবং মাছিরা এই সময়েই আপ্রাণ পরিশ্রম করিয়া মধু আহরণ করে। ইহার আগে এবং পরে তেমন মধু পাওয়া যায় না, অথচ মৌআলারা সর্ব্বদাই জঙ্গলে প্রবেশ করিলে মাছিরা তাড়া পাইয়া ভবিষ্যতের উৎপাদন ব্যাহত হইবার আশঙ্কা থাকায় মধু সংগ্রহের সময় এইরূপে বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছে।

সুন্দরবনের মধু তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়।—

১। খল্সী গাছের ফুল হইতে 'খল্সী মধু'—এই মধু এপ্রেল মাসের প্রথমার্দ্ধে পাওয়া যায়। ইহা বর্ণহীন (colourless), তরল, লঘু এবং সুগন্ধী ; ইহা খুব কম পরিমাণে উৎপন্ন হয়। এই মধু অত্যন্ত সুস্বাদু এবং বাজারে ইহার বিক্রয় মূল্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। খল্সী মধুর লোভেই মৌআলারা এপ্রেল মাসের পূর্ব্ব হইতে ছুটাছুটি করে।

২। গরাণ ও কেওড়া গাছের ফুল হইতে 'মোটা মধু'—ইহা এপ্রেল মাসের মধ্যভাগ হইতে মে মাসের মাঝামাঝি সময় পর্য্যন্ত পাওয়া যায়। ইহার রঙ ঘোর লাল এবং ইহা গাঢ় ভারী গন্ধহীন ও অত্যন্ত মিষ্ট। ইহা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে পাওয়া যায়, এমন কি সুন্দরবনের সমগ্র মধুর প্রায় শতকরা পঁচাত্তর ভাগই এই শ্রেণীর মধু।

৩। গেঁউয়া ও বাইন গাছের ফুল হইতে 'তিতা মধু'—ইহা মে মাসের শেষ হইতে জুন মাসের মাঝামাঝি পর্য্যন্ত পাওয়া যায়। ইহা গাঢ় ও ভারী এবং ইহার বর্ণ হরিদ্রাভ ; কিন্তু ইহার আস্বাদ তিক্ত ও অল্প ঝাল। ইহার তেমন কোন চাহিদা নাই, গ্রামের স্থানীয় দরিদ্রগণ ইহা নিতান্ত সস্তা বলিয়া ক্রয় করে। তিতা মধুর চাক হইতে অধিক পরিমাণে মোম

---

(৪) সমগ্র সুন্দরবনকে ছয়টি রেঞ্জে ভাগ করা হইয়াছিল। পরে উহা পাঁচটি রেঞ্জে পরিণত করা হয়। প্রত্যেক রেঞ্জে একই সময় সর্ব্বত্র কাঠ কাটা হয় না। কাঠ, গোলপাতা ইত্যাদি সংগ্রহ করিবার জন্য এক এক রেঞ্জে কতকগুলি করিয়া স্থান বনবিভাগ হইতে নির্দ্দিষ্ট করা হইয়া থাকে। ঐগুলিকে coupe বলে। যে বৎসর যেখানে 'কুপ' করা হয়, সেই বৎসর সেই স্থানটি Bee Sanctuary বা মক্ষীরক্ষণী বলিয়া ঘোষিত হইয়া থাকে।

(৫) সুন্দরবনের মৌমাছি মধু সংগ্রহের জন্য চাক হইতে প্রায় এক মাইল দূর পর্য্যন্ত উড়িয়া যায়। মক্ষিকা বিশেষজ্ঞ Pettigrew সাহেবের মতে মাছিরা মধু আনিতে দুই মাইল পর্য্যন্ত দূরে যাইতে পারে।

পাওয়া যায় এবং মধু অপেক্ষা মোমের দাম বেশী বলিয়াই মৌআলারা তিতা মধু সংগ্রহ করে, নচেৎ খলসী মধুর সহিত সম পরিমাণে বদনকর দিয়া তিতা মধু কেহই সংগ্রহ করিতে আসিত না।

এই তিন শ্রেণীর মধুই অধিক পরিমাণে পাওয়া যায়, যদি এপ্রিলের প্রথম ভাগে বা মার্চ্চের মাঝামাঝি নাগাদ সুন্দরবনে ভালরকম বৃষ্টি হয়। কারণ এই সময় বৃষ্টি হইলে সকল ফুলই ভালোভাবে ফুটিয়া থাকে এবং ফুলের মধুকোষগুলি মধুতে পরিপূর্ণ হয়। ১৯৩৬/৩৭ খৃষ্টাব্দে সুবৃষ্টির জন্য সংগৃহীত মধুর পরিমাণ কিরূপ হইয়াছিল তাহা বর্ত্তমান প্রবন্ধের শেষে উৎপন্ন মধুর পরিমাণ তালিকা দেখিলেই প্রতীয়মান হইবে।

মধু ও মোমের হাট

মধু ও মোম সংগ্রহ করিয়া মৌআলারা তাহাদের সংগৃহীত দ্রব্য হাটে বিক্রয় করে অথবা আপন আপন মহাজনের নিকট জমা দেয়। প্রায় সমস্ত মধু মৌআলাই মহাজনের নিকট হইতে ঋণ করিয়া মধু সংগ্রহ করিতে যাত্রা করে। ঐ সমস্ত মহাজনদের মধ্যে কেহ বা টাকার সুদ লইবে এই সর্ত্তে ঋণ দেয়, কেহ বা সমস্ত মধু তাহাকেই নির্দ্দিষ্ট মূল্যে দিতে হইবে, এই সর্ত্তে দাদন হিসাবে প্রয়োজনীয় অর্থ অগ্রিম দিয়া থাকে। যে সমস্ত মৌআলা দাদন হিসাবে অর্থ লইয়া আসে, তাহারা তাহাদের সংগৃহীত সমস্ত মধু ও মোমই মহাজনের নিকট জমা দেয়, যাহারা ধার হিসাবে টাকা লয়, তাহারা সুবিধামত দরে হাটে বিক্রয় করিয়া মহাজনের ঋণ শোধ দিয়া থাকে।

বর্ত্তমানে মধু ও মোমের হাট তিনটি। প্রথমটি ২৪ পরগণার হিঙ্গলগঞ্জে, দ্বিতীয়টি খুলনা জেলার নওবাকীতে ও তৃতীয়টি কলিকাতায় বড়বাজারের কটন ষ্ট্রীটে। বর্ত্তমান বৎসরে হিঙ্গলগঞ্জের হাটে মধুর দাম সাতটাকা হইতে নয় টাকা মণ, মোমের মূল্য মণ-করা পঁচিশ হইতে ত্রিশ টাকা। অনেক সময় মৌ-আলারা মোমকে জ্বাল দিয়া ছাঁকিয়াও বিক্রয় করে। এই প্রকার পরিষ্কৃত (refined) মোমের দাম মণকরা পঁয়ত্রিশ হইতে চল্লিশ টাকাও হইয়া থাকে।

মধু ও মোম পূর্ব্বে কি দামে বিক্রয় হইত, তাহার মোটামুটি আভাস তিনখানি Working plan হইতে পাওয়া যায়। ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে Mr. Heinig, ১৯১১ খৃষ্টাব্দে Mr. Trafford ও ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে Mr. Curtis মধু ও মোমের তদানীন্তন বাজার দর লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। নিম্নে তাহাই উল্লিখিত হইল :—

১৮৯২—

মধু—প্রতিমণ পাঁচটাকা হইতে ছয় টাকা।

মোম—প্রতিমণ বরিশাল অঞ্চলে পঁচিশ টাকা, কলিকাতায় পঞ্চাশ টাকা।

১৯১১—

মধু—প্রতিমণ ষোল টাকা।

মোম—প্রতিমণ ষাট টাকা।

১৯৩৩—

মধু—হিঙ্গলগঞ্জ হাটে পাইকারী দাম প্রতিমণ তের টাকা।

ঐ খুচরা দাম প্রতিমণ সাড়ে সতেরো টাকা।

বড়দল, বেদকাশী ও কয়রাহাটে পাইকারী প্রতিমণ পনেরো টাকা।

কলিকাতা কটন ষ্ট্রীটে পাইকারী প্রতিমণ পনেরো হইতে কুড়ি টাকা।

ঐ খুচরা প্রতিমণ কুড়ি হইতে একুশ টাকা।

মোম—হিঙ্গলগঞ্জ হাটে অল্প পরিষ্কৃত প্রতিমণ আটচল্লিশ হইতে পঞ্চান্ন টাকা। ঐ বিশুদ্ধ প্রতিমণ পঁচাত্তর হইতে আশী টাকা।

বড়দল, বেদকাশী ও কয়রাহাটে পরিষ্কৃত প্রতিমণ ষাট টাকা।

কলিকাতা কটন ষ্ট্রীটে কাঁচা (raw) পাইকারী প্রতিমণ পঁয়ত্রিশ হইতে চল্লিশ টাকা

কলিকাতা কটন ষ্ট্রীটে

ঐ ঐ খুচরা প্রতিমণ পঁয়তাল্লিশ হইতে পঞ্চাশ টাকা

ঐ পরিষ্কৃত পাইকারী প্রতিমণ পঁয়ষট্টি—সত্তর টাকা

ঐ ঐ খুচরা প্রতিমণ সত্তর হইতে পঁচাত্তর টাকা

অবশ্য এই সমস্ত মূল্যগুলি সেই আমোলের সাহেবদের দ্বারা সংগৃহীত হইয়াছিল, কাজেই ইহা যে কতদূর নিখুঁতভাবে সেই সময়ের বাজার দর দিতেছে, তাহা অনুমান করিয়া লইতে হইবে।

মধু ও মোমের চাহিদা সম্বন্ধে দেখা যায় যে, মধু খাদ্য হিসাবে জনসাধারণের মধ্যে বিক্রীত হয় ; কবিরাজী শাস্ত্রে মধুর নানা গুণও বর্ণিত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে পদ্মমধু চক্ষুর পক্ষে বিশেষ হিতকারী বলিয়া কবিরাজী শাস্ত্রে পরিচিত। কবিরাজগণ মধুকে আট শ্রেণীতে ভাগ করিয়াছেন, যথা মাক্ষিক, ভ্রামর, ক্ষৌদ্র, পৌত্তিক, ছাত্র, আর্ঘ্য, ঔদ্দালক ও দাল। ইহাদের মধ্যে শেষোক্ত দালমধু মক্ষিকার দ্বারা সংগৃহীত নহে, ইহা ফুল হইতে আপনা-আপনি ঝরিয়া পাতার উপর পড়ে ও সেইস্থান হইতে সংগৃহীত হয়। সকল শ্রেণীর মধুই মনুষ্যের পক্ষে সুখাদ্য, কেবল পৌত্তিক মধু অপকারী। ইহা রুক্ষ, উষ্ণবীর্য্য, পিত্তবর্দ্ধক, দাহজনক, রক্তদূষক, বাতবর্দ্ধক ইত্যাদি রূপ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে অবশ্য এত বিভিন্ন প্রকারের মধু সম্বন্ধে আমরা অবগত নহি, কিন্তু প্রাচীনকালে ভারতে এবং বহির্ভারতেও বিষাক্ত মধুর অস্তিত্ব সম্বন্ধে নানা কাহিনী প্রচলিত আছে। ভাব-প্রকাশের মধুবর্গে এইরূপ 'বিষমধু'র উল্লেখ পাওয়া যায়। Plinyও এইরূপ একটি বিষমধুর উল্লেখ করিয়াছেন। 'বিষমধু' পান করিলে মানুষ নাকি উন্মাদ রোগগ্রস্ত হইয়া পড়ে। জেনোফন কৃত 'দশ সহস্রের পলায়ন' বিবৃতিতে রোমক সেনাগণের বিষমধু পানের আখ্যায়িকা পাওয়া যায়।

মধু সম্বন্ধে বিশেষ বিস্ময়কর ঘটনা এই যে বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক যুগেও মধুর সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ হয় নাই। মধুতে সাধারণতঃ নিম্নলিখিত উপকরণগুলি পাওয়া যায়

জল ১৭.৭০% ; Lavulose ৪০.৫০% ; Dextrose ৩৪.০২% ; Sucrose (আখের চিনি) ১.৯০% ; Dextrins & Gums ১.৫১% ; Ash ০.১৫% ; মোট ৯৫.৭৮% ; কিন্তু অবশিষ্ট ৪.২২% যে কি বস্তু, তাহা আজিও অজ্ঞাত। বর্ত্তমানে চিকিৎসকগণ এই পর্য্যন্ত স্বীকার করিয়াছেন যে, মধু রোগবীজাণু নাশক (mild disinfectant) এবং রোগীর পক্ষে হিতকারী। উমেশচন্দ্র দত্ত প্রণীত Materia Medica of the Hindus নামক গ্রন্থে মধু সম্বন্ধে প্রাচীন ভারতের নানা মতামত লিপিবদ্ধ আছে (১৮৭৭ সংস্করণ, পৃঃ ২৭৭)।

প্রাচীনকালে ভারতে এবং বহির্ভারতে মধুর বিশেষ আদর ছিল। সেকালে মিষ্টদ্রব্য বলিতে মধুই সবিশেষ পরিচিত ছিল। প্যালেষ্টাইনের সমৃদ্ধি বুঝাইতে গিয়া বাইবেল গ্রন্থ এককথায় বলিয়াছে "the land flowing with milk and honey" (Ex. iii 17) রাজসভায় আসীনা ক্লিওপেট্রা হইতে অসুর যুদ্ধে প্রবৃত্তা দুর্গা পর্য্যন্ত সকলেরই মধুপানের উল্লেখ পাওয়া যায়। কিন্তু বর্ত্তমানে মধু সভ্যসমাজ হইতে অনেক পশ্চাৎপদ হইয়া পড়িয়াছে। কেবল কবিরাজী ঔষধ সেবনের জন্য আমরা নানারূপ ভেজালমিশ্রিত মধু সময় সময় বাজার হইতে কিনিয়া থাকি। ইহা অধিকাংশ সময়েই দুর্গন্ধ ও অখাদ্য হইয়া পড়ে এবং ইহা হইতেই হয়ত সাধারণের বিশ্বাস যে মধু টাট্‌কা না হইলে সেবনের যোগ্য থাকে না। কিন্তু ইহা একটি ভ্রান্ত ধারণা, পরিষ্কার শীতল স্থানে রাখিয়া দিলে খাঁটী মধু তিনবৎসর পর্য্যন্ত অবিকৃত অবস্থায় থাকে, তবে জল লাগিলে দু'একমাসের মধ্যেই নষ্ট হইয়া যায়।

মোমের চাহিদা জনসাধারণের মধ্যে প্রত্যক্ষভাবে না থাকিলেও ইহা নানাবিধ কারখানায়, বিশেষ করিয়া যাহাদের শিশিবোতল প্যাকিংএর কাজ করিতে হয়, তাহাদের দ্বারা সর্ব্বদাই ব্যবহৃত হয় ; মলম ইত্যাদি প্রস্তুতের

জন্যও মোমের প্রয়োজন হয়। বন্দুকের গুলি প্রস্তুতের কারখানায় মোমের বিশেষ চাহিদা আছে। এ ছাড়া খৃষ্টীয় ধর্ম্মস্থানে জ্বালিবার জন্য মোমবাতী চাকের মোম ছাড়া অন্য মোমে হয় না। পালিশের কাজে ও প্রতিকৃতি গঠন করিবার জন্যও চাকের মোম প্রয়োজন হয়। পূর্ব্বে অবশ্য মৌচাকের মোম ছাড়া অন্য মোম পাওয়া যাইত না ; এখন মৌচাকের মোম ছাড়া অন্য নানাপ্রকার মোম আবিষ্কৃত ও নানাকাজে ব্যবহৃত হইতেছে। ইহাদের মধ্যে কতকগুলি বৃক্ষজাত মোম, যথা Candlebury, Hyrtle বা Wax tree হইতে উৎপন্ন মোম। এই গাছ প্রথমে আমেরিকায় আবিষ্কৃত হইয়াছিল, পরে ইহা আফ্রিকায় বসাইয়া ইহা হইতে প্রচুর পরিমাণে মোম উৎপাদন করা হইতেছে। এইরূপ আর এক শ্রেণীর গাছ জাপানে পাওয়া যায়। জাপানীমোমগাছহইতেউৎপন্ন মোমকে Japan wax বলে। ইহা আফ্রিকার বৃক্ষজাত মোম অপেক্ষা নিকৃষ্ট। এ ছাড়া পেট্রল ও কেরোসিন উৎপাদনের সঙ্গে সঙ্গে Paraffin wax বা খনিজ মোমের উৎপাদনও বিশেষভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। বর্ত্তমানে বাজারের অধিকাংশ মোমই 'খনিজ মোম'। বাজারের সাধারণ মোমবাতি সমস্তই প্যারাফিন মোমের দ্বারা প্রস্তুত। কাজেই চাকের মোমের চাহিদা এখন কিছু কমিয়াছে। চাকের মোম মহার্ঘ্য বলিয়া উপরে উল্লিখিত কয়টি মাত্র প্রয়োজনেই উহা ব্যবহৃত হয়।

চাকের মোম আমেরিকা, আফ্রিকা ও ভারত হইতে প্রচুর পরিমাণে বিলাতে চালান যায়। যুদ্ধের অব্যবহিত পূর্ব্বে বিলাতে পরিশুদ্ধ মোমের গড়পড়তা মূল্য ছিল হন্দর-প্রতি সাত পাউণ্ড। বর্ত্তমানে চালানের অসুবিধার জন্য এই দর প্রায় দ্বিগুণের কাছাকাছি উঠিয়া গিয়াছে।

মধু ও মোম সংগ্রহের জন্য সরকারী বনকর

সুন্দরবনে মধু ও মোম সংগ্রহের জন্য রাজস্ব গ্রহণ করিয়া পরোয়ানা দিবার ব্যবস্থা বৃটিশ রাজত্বে প্রথম আরম্ভ হয় ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দ হইতে। ইহার পূর্ব্বের ৯ বৎসর সুন্দরবন অঞ্চলটি পোর্ট ক্যানিং কোম্পানীর লীজভুক্তরূপে ছিল। সেই সময় বা তাহার পূর্ব্বে মধুসংগ্রহের জন্য কোন সেলামী দিতে হইত না। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দের পর হইতে রাজস্বের পরিমাণ অল্পে অল্পে বর্দ্ধিত করা হইয়াছে।

যে বৎসর হইতে রাজস্ব ধার্য্য হইয়াছে	প্রতি মণ মধু সংগ্রহের জন্য দেয় রাজস্বের পরিমাণ	প্রতি মণ মোম সংগ্রহের জন্য দেয় রাজস্বের পরিমাণ
১৮৭৫	এক পয়সা	এক পয়সা
১৮৯২	এক টাকা	এক টাকা
১৯০৯	দেড় টাকা	চারি টাকা
১৯২৯	ঐ	ঐ

জঙ্গলে মোম পরিষ্কৃত করিলে উহার উপর মণকরা রাজস্ব আট টাকা

অদ্যাবধি এই হিসাবেই রাজস্ব গৃহীত হইতেছে।

উপরোক্ত হিসাবে রাজস্ব ও মহাজনের সুদ এবং নৌকার মালিকের নৌকা ভাড়া দিয়া মৌআলাদের আহারাদি বাদে দৈনিক চারি আনা হইতে ছয় আনা পর্য্যন্ত লাভ থাকে। এইরূপ বিপজ্জনক স্থানে বাস করিয়া কালবৈশাখীর ঝড় ঝঞ্ঝা মাথায় করিয়া এত দুঃখের উপার্জ্জিত মধু পূর্ব্বের বনবিভাগের সরকারী কর্ম্মচারীরা জোর করিয়া বিনা দামে 'খাবার মধু' বলিয়া খানিকটা আদায় করিয়া লইত। এইরূপ ঘুষ লওয়া বন্ধ করিবার জন্য নানাভাবে চেষ্টা করিয়া বর্ত্তমানে আইন করা হইয়াছে যে, কোন সরকারী কর্ম্মচারী বাসায় মধু রাখিতে পর্য্যন্ত পারিবে না, এমন কি কিনিয়াও রাখিতে পারিবে না। তদবধি 'খাবার মধু' জোগাইবার হাত হইতে গরীব মৌআলারা রেহাই পাইয়াছে বলিয়াই মনে হয়।

উৎপন্ন মধুর পরিমাণ

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে বাংলাদেশে বিক্রয়যোগ্য মধুর উৎপাদন একমাত্র সুন্দরবনেই হয়। অন্যত্র যাহা হয়, তাহা সেই জেলাতেই ব্যয়িত হইয়া থাকে ; কাজেই বাংলার মধু ও মোম বলিতে মোটামুটি সুন্দরবনের মধু ও মোমই বুঝায়। নিম্নে যে সংখ্যাগুলি দেওয়া হইল তাহা সুন্দরবনের সমগ্র উৎপাদনের পরিমাণ। ইহাদের মধ্যে প্রথম হইতে ১৯২৯-৩০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত সমগ্র হিসাব Curtis সাহেবের working plan হইতে গৃহীত এবং ১৯৩০-৩১ হইতে শেষ পর্য্যন্ত সমস্ত সংখ্যাগুলি Forest utilization office এ রক্ষিত Forest Department এর বার্ষিক বিবরণী হইতে শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ রায় কে এফ সি মহাশয়ের সৌজন্যে সংগৃহীত।

বৎসর	মধু ও মোম রাজস্ব
১৮৭৯-৮০ হইতে ১৮৯২-৯৩	৯৪৩২ মণ ৩৮০৮ টাকা
১৮৯ —৯৩	—— ৬২৮৭ টাকা
১৮৯৩-৯৪ হইতে ১৯০২-০৩	৭৭৯৪ মণ ১০,০২৭টাকা
১৯০৩-০৪ হইতে ১৯০৯-১০	৮১৯১ মণ —১৪,৪৫২টাকা

বৎসর	মধু	মধু খাতে আদায়ী রাজস্বের পরিমাণ	মোম	মোম খাতে আদায়ী রাজস্বের পরিমাণ
১৯১০-১১	৬২৭৯ মণ	৯৪৪৮ টাকা	৭৭৮ মণ	৩০৯০ টাকা
১৯১১-১২	৬৬৪৮ „	৮৯২৩ „	৮০১ „	২৯৪৭ „
১৯১২-১৩	৫৫৪৮ „	৯৩০০ „	৬৬৪ „	২৯৩৭ „
১৯১৩-১৪	৫০৬৬ „	৮৫৪৪ „	৬০৫ „	২৭৪০ „
১৯১৪-১৫	৮১৫৮ „	৯৩৬৫ „	৯৭২ „	২৯৯৮ „
১৯১৫-১৬	৬০৬২ „	১১,২৬৯ „	৭১৮ „	৩৫৬১ „
১৯১৬-১৭	৮৪৪০ „	৯৪৩৪ „	৯৬১ „	২৯৫০ „
১৯১৭-১৮	৯৮২৪ „	১৩,০১৪ „	১১৪৭ „	৩৯৯১ „
১৯১৮-১৯	৯৪০৭ „	১৫,৭৩৫ „	১১৫৫ „	৪৯৪৩ „
১৯১৯-২০	৬৯৩৮ „	১৪,৯১১ „	৮৫৩ „	৪৮৮৩ „
১৯২০-২১	৭৭০ „	৭১৫৯ „	৯৬ „	২৩৩৫ „
১৯২১-২২	৮০২৩ „	১২,০৩৫ „	৯৮৭ „	৩৯৪৯ „
১৯২২-২৩	৭৩০০ „	১০,৯৫২ „	৮৭৪ „	৩৫০১ „

১৯২৩-২৪	৮৪৫৯ „	১২,৭০০ „	৯৬৩ „	৬৮৫৫ „
১৯২৪-২৫	৮২৩৯ „	১২,৩৫৯ „	৯২৮ „	৩৭১৩ „
১৯২৫-২৬	৯১০২ „	১৩,৬৬৮ „	১০৬২ „	৪,৭৩৯ „
১৯২৬-২৭	৮১৩৩ „	১২,২০৬ „	৯২৬ „	৪০৬০ „
১৯২৭-২৮	৮২৮৭ „	১২,৪৪২ „	১০০৪ „	৪১৮৪ „
১৯২৮-২৯	১৩৭৬৬ „	২০,৬৫৬ „	১৫৬৭ „	৬৯০৭ „
১৯২৯-৩০	১০৪৬৩ „	১৫,৮৪৮ „	১২৯৪ „	৫২৪৬ „
১৯৩০-৩১	৯০৬৩ „	১৩৬২২ „	৯৬৭ „	৪৪৮৪ „
১৯৩১-৩২	৬০৩৪ „	৯১০০ „	৬৭৫ „	২৫৪৯ „
১৯৩২-৩৩	৭২০১ „	১০৮৫০ „	৮০৬ „	৩৪০৭ „
১৯৩৩-৩৪	৬৪৮৫ „	৯৭৬৮ „	৭৮৬ „	২৯৯১ „
১৯৩৪-৩৫	৮০৫৩ „	১২১০৯ „	৮৪৭ „	৩৪৮৮ „
১৯৩৫-৩৬	৯৬৫৫ „	১৪৬৮৭ „	১০৩০ „	৪১৭২ „
১৯৩৬-৩৭	১৫২৪৬ „	২২৯০৯ „	১৬৪৮ „	৬৬২০ „
১৯৩৭-৩৮	৬৬৬৮ „	১০২০৮ „	৭৮৬ „	২৭২৬ „
১৯৩৮-৩৯	১০২৫৫ „	১৫৪২৬ „	১১৫০ „	৪৬০৮ „
১৯৩৯-৪০	১০৯২৭ „	১৬৪০০ „	১২২০ „	৫৯৬৮ „

Curtis সাহেব ১৯৩৩ সালের working planএ বলিয়াছেন যে মধু ও মোম খাতে সুন্দরবন হইতে গড়ে ২১,৭৬১ টাকা রাজস্ব আদায় হইতে পারে। ঐ অনুমান কতদূর সফল হইয়াছে, তাহা উপরোক্ত হিসাব হইতেই দেখা যায়।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, সুন্দরবনে মধু ও মোমের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য কোনরূপ বৈজ্ঞানিক প্রণালী অবলম্বিত হয় নাই, বর্তমান উৎপাদন সম্পূর্ণ স্বভাবজ। দ্বিতীয়তঃ, মধুর বিশেষ কোন রপ্তানি কারবার ভারতে নাই বা পোল্যাণ্ড কিম্বা ফ্রান্সের মত মধু হইতে মদ্য প্রস্তুতের ব্যবস্থাও ভারতবর্ষে নাই। এই সমস্ত ব্যবস্থা অবলম্বিত হইলে মধু খাতে রাজস্বের পরিমাণ বহুগুণে বৃদ্ধি পাইবে এবং মধু হইতে বহু লোকের জীবিকার্জ্জন হইবে।

রাজেন্দ্র সমাগম

(নাটিকা)

শ্রীঅমরেন্দ্রমোহন তর্কতীর্থ

দার্শনিকপ্রবর বাচস্পতি মিশ্র সংস্কৃত ব্যক্তিগণের সুপরিচিত। রাজা নৃগ, অধ্যাপক ত্রিলোচন, স্ত্রী ভামতী, দুইটি গাভী কালাক্ষী ও স্বস্তিমতী এই কয়টি প্রাণী ব্যতীত অন্য কাহারও সহিত তাঁহার সম্পর্কের কথা তাঁহার গ্রন্থরাজি হইতে পাওয়া যায় না। ঐ সকলের সহিত তাঁহার স্মৃতিরক্ষা এই ক্ষুদ্র রচনার উদ্দেশ্য।

প্রথম অঙ্ক

স্থান—কক্ষ। পদ্মনাভ ও ভামতী

পদ্মনাভ। মা।

ভামতী। বাবা।

পদ্মনাভ। রাত্রি কি শেষ হ'য়ে এসেছে?

ভামতী। না বাবা। পাখী এখনও দুপহরে ডাক ডাকে নি। আপনি কি একটু ঘুমিয়েছিলেন?

পদ্মনাভ। ঘুম ঠিক নয়। তবে তন্দ্রা এসেছিল বটে। তাতে কতক্ষণ কেটেছে বুঝি নাই। আর এভাবে পারি না। বাচস্পতি এসেছে?

ভামতী। না তো।

পদ্মনাভ। তা হ'লে বোধ হয় আমার সংবাদ পায় নাই। যারা এসেছিল সকলেই চলে গেছে?

ভামতী। হাঁ। তাঁ'রা অনেকক্ষণ চলে গেছেন। এতক্ষণ হয় তো সকলেই ঘুমিয়েও পড়েছেন।

পদ্মনাভ। তুমি একাই আছ তা হ'লে? ও ঘরের কেউ নেই?

ভামতী। না। ওঁরা অনেকক্ষণ দরজা বন্ধ করেছেন। এই বাইরে থেকে দেখে এলাম কোন ঘরে আলোর চিহ্নও নেই।

পদ্মনাভ। আচ্ছা। আমার কি মনে হয় জান মা?

ভামতী। কি? বলুন তো।

পদ্মনাভ। ওরা আমার অসুখের খবর বাচস্পতিকে দেয় নাই। নইলে সে এতক্ষণে এসে পড়ত। যতই দরকার থাক্‌না আমার এই রকম অসুখ শুন্‌লে ত্রিলোচন তাকে বাড়ী না পাঠিয়ে কিছুতেই ছাড়্‌ত না। আসল কথাটা হচ্ছে এই—আমাকে ওরা ভয় করে। আমি সামনে থাকলে গোলমাল হবে। সে দূরে থাকতে আমি চোখ বুজলে ওদের উদ্দেশ্য সিদ্ধি সহজ হবে। মা তারা। সবই তোমার ইচ্ছা।

দেখ মা, তুমি তাকে আমার আশীর্বাদ জানিও। ব'লো—তার প্রাপ্য যে কিছু নাই তা নয়। তবে কেবল ভোগ করার ভাগ্য নাই। প্রাপ্য হ'লেই পাওয়া যায় না। সংসার এই রকম। আমি যা দেখছি কেউ হয় তো তার কথা শুনবে। কিন্তু ঐ পর্য্যন্তই। সমর্থন তাকে একজনও করবে না। ন্যায়ের মর্য্যাদা রক্ষার জন্য স্বার্থের লোভ ছাড়বে এ একালে হয় না। সমস্ত জাতিটাই এখন এমন ভয় হ'য়েছে। যাক্। তাই বলছি মা, সে যেন কোন ঝঞ্ঝাটের মধ্যে না যায়। আমি আশীর্বাদ করছি সে কষ্ট পাবে না। অক্ষয় কীর্ত্তি তার হবে সে তার সাধনা নিয়ে থাকুক। উপরে তিনি আছেন, ভয় কি?

তুমি সব কথা গুছিয়ে বলতে পারবে না? তা তুমি পারবে। আমি যে তোমাকে নিজ চোখে দেখে ঘরে এনেছিলাম। আমার ভুল হয় না।

ভামতী। বাবা আপনি এত নিরাশ হচ্ছেন কেন? সাদা জ্বর। শীগ্‌গিরই সেরে উঠবেন।

পদ্মনাভ। না মা। এবার আর উঠব না। যে নক্ষত্রে জ্বর হয়েছে তা ধন্বন্তরিও সারাতে পারবে না। তবে আরও দুদিন আছি। হয় তো

শেষে বলবার সুযোগ পাব না তাই আজ তোমাকে ব'লে রাখলাম। তুমি তাকে ব'লো।

ভামতী। আপনার আদেশ তাঁকে জানাব।

পদ্মনাভ। তুমি জানাবে সেও তা শুনবে এ তো জানি। তার প্রকৃতি আর কেউ না বোঝে আমি তো বুঝি। বলতাম না এত কথা, তবে জান কি? সেই ছোট কাল থেকে কোলে পিঠে করেছি, আজ যখন সে ঠিক মনের মতনটি হ'ল তার পরিণামটা ভাল দেখে যেতে পারলাম না এই দুঃখ। হয় তো শেষ সময়ে চোখেও দেখে যেতে পারবনা। দেখ মা তুমি তাকে একখানা চিঠি লেখ। কাল আমি পাঠাবার চেষ্টা করব। যদি এসে পড়ে। ওঃ।

ভামতী। বাবা অস্থির হবেন না। আর কথা বলবেন না। খুব কষ্ট হচ্ছে?

পদ্মনাভ। হাঁ। গলা শুকিয়ে যাচ্ছে।

ভামতী। আমি গরম দুধ নিয়ে আসছি।

দ্বিতীয় অঙ্ক

স্থান—গৃহ। জীবনাথ, হরিশ, বক্কেশ্বর ও সুরপতি।

জীবনাথ। এইবার ঠিক হয়েছে, টের পাবেন যাদু। গ্রাহ্যই করেন না কাউকে। কেবল কাকা কাকা কাকা। এবার দেখুক এসে কাকা।

হরিশ। মজাটা দেখ ভাই। এত পিতৃব্য ভক্তি অথচ তাঁর শ্রাদ্ধে দ্বাদশটি মাত্র ব্রাহ্মণ ভোজন।

বক্কেশ্বর। মুখে না হয় তাই বলেছিল। শেষে করেছে তো সবই। গোটা সমাজ আশে পাশের সব, সকলেই তো খেয়ে গেল। আর খাইয়েছেও খুব। সকলেই ধন্যি ধন্যি করেছে। কিন্তু এত নেমন্তন্ন হ'ল কি করে। টাকাই বা পেল কোথায়!

জীবনাথ। আরে সে খবরে তোমার কাজ কি? সে সব তুমি বুঝবে না।

সুরপতি। কাকাজী ছিলেন পুণ্যবান্। তাঁর ভাগ্যেই সব হয়েছে। যা হ'ক্ দায়টা উদ্ধার হ'ল তোমাদের দয়ায়।

জীবনাথ। আর ওকথা ব'লে লজ্জা দাও কেন ভাই! আমরা কি তোমার পর।

সুরপতি। না, তা কখনও ভাবিনা। তবে শেষ পর্যন্ত যেন এই ভাবেই চলে।

তৃতীয় অঙ্ক

স্থান—বাচস্পতির গৃহ। ভামতী ও বাচস্পতি

ভামতী। এমনভাবে এলে যে? কি হ'ল।

বাচস্পতি। সব পরিষ্কার। এখন কি ইচ্ছা?

ভামতী। আমি তো বলেছি। এখন আর আমি কিছু বলব না। তোমার যা ইচ্ছা তাই কর। আমি আর পারি না।

বাচস্পতি। বেশ তাই। কি ঠিক হ'ল জান?

ভামতী। কি?

বাচস্পতি। সমস্ত দেনা দায় শোধ করতে হ'লে আমার এই ঘরখানি আর কাঁঠালতলার ভিটা বাদে কিছুই থাকবে না। দেনা শোধও দেরিতে করা চলবে না। তাঁরা বলছেন—বড় দুর্বৎসর।

ভামতী। কালী সত্তিও থাকবে না?

বাচস্পতি। না। তারা থাকবেই। অনাবৃষ্টিতে সব পুড়ে গেছে। কোন জমিতেই ঘাস নাই। বোধ হয় সেই জন্যই তোমার প্রিয় জিনিষ তাঁরা নিতে চান না।

ভামতী। দেখ একটা কথা বলি রাগ ক'রো না। তোমার পৈতৃক ভিটা, ছাড়তে কখনই বলতে পারব না। তবে কালীর আর সত্তির এ অবস্থা আমি কিছুতেই সইতে পারছি না। ঘাস তো দেবই না। পেট ভরা জলও দিতে পারব না? এ অবস্থায় ভাত মুখে দিই কি ক'রে? যা ভাল বোঝ কর।

বাচস্পতি। বেশ।

চতুর্থ অঙ্ক

স্থান—পথ। ভামতী

ভামতী। সেই কখন প্রাতঃকৃত্য করতে গেছেন এখনও এলেন না। আমি একা কি ক'রে এই গাছতলায় ব'সে থাকি? ও আমাকে কিছু না ব'লেই গরু দু'টো নিয়ে চ'লে গেল। কখন আসবে কে জানে। ও আবার কে আসে?

ভিক্ষুকের প্রবেশ

ভিক্ষুক। এই যে মা। মা তিনদিন কিছুই জোটে নাই। বাঁচাও মা।

ভামতী। আমার কাছে তো কিছুই নেই বাবা। তিনি আসুন। যদি কিছু থাকে তবে পাবে।

ভিক্ষুক। কিছুই নেই কি মা! ঐ যে তোমার হাতে এমন কাঁকণ রয়েছে—ইচ্ছে থাকলে ওটাও দিতে পার। ওটাতে কাচ্চা বাচ্চা শুদ্ধ অনেক দিন চলবে।

ভামতী। ওটার কথা আমার মনে ছিল না। এতেই যদি খুসী হও নাও। (কঙ্কণ অর্পণ)

ভিক্ষুক। জয় হ'ক মা। দ্রুত প্রস্থান

দুইদিক হইতে বাচস্পতি ও ভৃত্যের প্রবেশ

ভৃত্য। তুমি দিয়ে দিয়েছ মা? না কেড়ে নিয়েছে? ব্যাটা জোচ্চোর। আমি ওকে চিনি।

ভামতী। কেড়ে নেয় নি। বললে তিনদিন খাইনি। আহা ছেলে-পুলে শুদ্ধ উপোস ক'রে আছে। তুমি গাল দিও না।

বাচস্পতি। অন্নপূর্ণাকে খুব ফাঁকি দিয়েছে তাহ'লে?

ভামতী। ফাঁকি দিয়ে যাবে কোথায়? সুদ শুদ্ধ আবার ফিরিয়ে দিতে হ'বেই।

বাচস্পতি। এখন আর দেরি নয়। চল। সময় মত যেতে না পারলে আজ থেকেই একাদশী আরম্ভ হ'বে দেখছি।

পঞ্চম অঙ্ক

স্থান—নৃগ রাজার সভা। রাজা ও পারিষদগণ

নেপথ্যে সভাভঙ্গের ঘণ্টাধ্বনি

পরিষদ। সভাভঙ্গের সময় হ'ল। মহারাজের আদেশ অপেক্ষা।

রাজা। দেখ তো আর কেউ দর্শনার্থী এসেছে কিনা? আমার নেত্র স্পন্দিত হচ্ছে।

প্রতিহারীর প্রবেশ

প্রতিহারী। মহারাজের জয় হ'ক। একজন ব্রাহ্মণ সস্ত্রীক দ্বারে উপস্থিত। দর্শন চাইছেন।

রাজা। মাকে কঞ্চুকীর নিকটে রেখে ব্রাহ্মণকে অবিলম্বে নিয়ে এস।

প্রতিহারীর প্রস্থান

বাচস্পতির প্রবেশ

বাচস্পতি। বিজয়তাং মহারাজঃ

রাজা। (স্বগত) দেখছি পণ্ডিত। সংস্কৃতে আলাপ করাই ভাল। (প্রকাশ্যে) অভিবাদয়ে। সমাসেনাগমন প্রয়োজনং শ্রোতুমিচ্ছামি।

বাচস্পতি। দ্বন্দ্বো দ্বিগুরপি চাহং মদগৃহে নিত্যমব্যয়ী ভাবঃ। তৎপুরুষ কর্মধারয় যেনাহং স্যাং বহুব্রীহিঃ॥

রাজা। বাঢম্। (পার্শ্বে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া) মন্ত্রী পুণ্ডরীকাক্ষকে একবার দেখিতে চাই। একজন পারিষদের প্রস্থান

পুণ্ডরীকাক্ষের প্রবেশ

পুণ্ডরীকাক্ষ। মহারাজের জয় হ'ক। আদেশ করুন।

রাজা। মন্ত্রী, এই ব্রাহ্মণ আশ্রয়ার্থী। মনে হয় উচ্চ শ্রেণীর পণ্ডিত। ব্যবস্থা করা দরকার।

পুণ্ডরীকাক্ষ। মহারাজের আদেশ শিরোধার্য। (বাচস্পতিকে দেখিয়া) কে বাচস্পতি?

বাচস্পতি। আজ্ঞে।

পুণ্ডরীকাক্ষ। মহারাজ, আমাদের মনোরথ পূর্ণ হয়েছে। ইনি আমার জ্যেষ্ঠের ছাত্র বাচস্পতি। মহারাজ ঠিকই ব'লেছেন। অসাধারণ পণ্ডিত। ইনি স্বয়ং এসেছেন এ রাজ্যের সৌভাগ্য।

রাজা। আনন্দের বিষয়। এঁকে বিশ্রাম করান।

সকলে। মহারাজের জয় হ'ক।

গল্প-লেখক

শ্রীসন্তোষকুমার দে

কবুতরের বাসার মত এই ছোট ছোট ঘরগুলিতে মানুষ বাস করে; পশুর পাল যেমন জমায়েৎ হয়, তেমনি করে কোন রকমে মাথা গুঁজে দিন গুজরান করে। ইঁদুরের গর্ত যেমন অন্ধকার ভূগর্ভের রহস্যপুরীতে এধার ওধার বেঁকে, মোটা-সরু, সোজা-ঘুরান, শত শাখাউপশাখায় বিস্তৃত রেল লাইনের মত লতিয়ে চলে—তেমনি ঘরে মানুষ বাস করে পঞ্চতল অট্টালিকার পশ্চাতে ময়লা বস্তির ঘরে, অন্ধকার গলির নির্বাত তামসিকতায় তার প্রচ্ছন্ন পরিস্থিতি। মূক দেওয়ালগুলির মধ্যে যেন কি বিষের ধোঁয়া অদৃশ্যভাবে কুণ্ডলী পাকায়, যা অধিবাসীর শরীরে মনে তিলে তিলে মৃত্যুর যন্ত্রণা যোগাতে থাকে।

সার্পেনটাইন লেনের এই ঘরে এসেই শেষ আস্তানা গাড়তে হয়েচে। চল্লিশ টাকার কেরাণীর এর চেয়ে ভালো ঘর আশা করা অন্যায়। ভিজা স্যাঁতসেঁতে ছোট উঠানের এক পাশে জলের চৌবাচ্চা—মেসের ক'টি প্রাণীর স্নান, কাপড় কাচা ইত্যাদি সেই জলে হয়। অপর পাশে কয়লার ছাই লেবুর খোসা—মেসের কর্তা সেখানে বসে বাসন মাজে। কর্তা—অর্থাৎ তদ্বির তদারক সবই তারকনাথের হাতে। উঠোনের উর্ধে উঠানের মাপে সতেরো—বারো ফুট মাপের একখণ্ড আকাশ—সেখানেই সূর্য আছেন, চন্দ্র আছেন, গ্রহ উপগ্রহ সবই ঠাসাঠাসি করে ঐ আকাশটুকুর মধ্যে যায়গা করে নিয়েছেন, কারণ মেসের লোকগুলিও তো মানুষ, তাদেরও তো কোনক্রমে বাঁচিয়ে রাখতে হবে।

কিন্তু এমনভাবে বাঁচবার কোনও সার্থকতা নেই। কোন ক্রমে নিঃশ্বাস ফেলে বেঁচে থাকবার মধ্যে কিছু গৌরব নেই। যে সংসার বহনের জন্য এই কঠোর ক্লেশবরণ, সেই সংসার—পিতামাতা, স্ত্রী-পুত্র সবার কাছ হতে পৃথক হয়ে একাকিত্বের গণ্ডিতে শ্বাসবদ্ধ হয়ে হাঁফিয়ে ওঠা, এ যেন সংসারে থেকেও সংসার হতে নির্বাসন—যেন কি প্রচ্ছন্ন অভিশাপ এর কোটরে বাসা বেঁধেছে।

খোলা জানালার সামনে ঝুঁকে পড়ে লিখে চলেছি। জানালাটা জীর্ণ, উন্মুক্ত দৃষ্টি অদূরের নভোস্পর্শী প্রাসাদের প্রাকারে বেধে ফিরে আসে। আকাশ নেই, বাতাস নেই, আলোক নেই। শুধু অদূরের দেওয়ালটিতে অযত্নবর্ধিত একটি অপুষ্ট বটের চারার বিবর্ণ পত্রক'টি অকস্মাৎ কখন দুলে উঠে জানিয়ে দেয়, ভুল করে এক ঝলক বাতাস এই দুই বাড়ীর মাঝে সাপের জিহ্বার মত সরু গলিটিতে পথ খুঁজতে এসেছিল।

আমার মাঝে মাঝে গ্রামের কথা মনে পড়ে; মনে পড়ে সেই দূর-বিস্তৃত উন্মুক্ত প্রান্তর, দিগ্বলয়ে ধূসর অরণ্য, সকাল সন্ধ্যায় আকাশের কি উদার মুক্তি, বিচিত্র বর্ণ-বিভূতি। ক্ষেতে ক্ষেতে ফুটে ওঠে রাই-সরিষার ফুল, পাটের বনে যেন নিবিড় কালো মেঘ নেমে আসে, আউষের ক্ষেতে সোনার বন্যা। পথের পাশে ছোট ছোট ঝোপ, চালিতা-তলার পাড়ভাঙ্গা পুকুরে একখানা গাছ ফেলে ঘাট করা, তার পাশের খুঁটাটায় একটি মাছরাঙ্গা চুপ করে বসে থাকে। বাঁশঝাড়ের তলায় খ্যাঁকশিয়ালী সশঙ্কচিত্তে চলা ফেরা করে, শুকনো পাতায় তার পায়ে চলার শব্দ। বাগানটা পার হলেই ছোট ছোট ঘর, কোনটার খড়, কোনটার বা গোলপাতার ছাউনি। ছোট উঠোনটির একপাশে লঙ্কা বেগুনের ক্ষেত, কঞ্চির অমুচ্চ বেড়া দেওয়া—তার উপর বসে দোয়েল নাচে, শালিক কিচিরমিচির করে, হাড়ি-চাচা ঝগড়া বাধায়। বারান্দায় বসে খোকা দেখে দেখে হাততালি দেয়, আর গোয়ালে নতুন বাছুরটী চাঞ্চল্য প্রকাশ করতে থাকে।

বিশ্ব বুঝি ঐ স্বপ্নের জগতে ছড়িয়ে আছে। ঐ মমতাময় গ্রামের শীতল ছায়ায় পৃথিবী ঘুমিয়ে থাকে। ঐ দোয়েল শ্যামার গীতে, স্নেহের পল্লীনীড়ে, উদার প্রান্তরের অবারিত আলো-বাতাসের অপরিসীম প্রাচুর্য্যে আমার শৈশব বাল্য ও কৈশোর কেটেছিল—একথা ভাবতেও আবেশে চোখে জল আসে—যেন বুকের ভিতর কোন অতি স্পর্শকাতর অংশ বেদনায় সংকুচিত হতে থাকে। কোন আর ফ্যান, ট্রাম আর বাসের মায়া কাটিয়ে আর কি ঐ গ্রামে ফিরে যেতে পারি না?

কিন্তু শুধু কি মায়া? মানুষের ধর্মই এই—যেখানে সে থাকে, তারই মধ্যে সে আপন বিশেষত্ব বিকশিত করে তোলে। অদূরের জানালায় একটি সুন্দর শিশু দাঁড়িয়ে লাফালাফি করছে। তার মা তার পিছনে দাঁড়িয়ে ধরে রেখেছেন, পাছে খোকা পড়ে যায়। মায়ের মুখের ঐ অকৃত্রিম স্নেহের হাসিটির মূল্য সমগ্র সার্পেনটাইন লেনের কুটিল জীবনের সমস্ত বীভৎসতা ছাপিয়ে উঠেছে। এই তো সেই চির আনন্দ-নন্দিত সুন্দর মূর্তি, স্বর্ণ-শস্য-আন্দোলিত ধান্যক্ষেত্রের মত এই তো নয়নানন্দকর।

আনন্দ যে কোথায় কোন বস্তুর আকারে একান্ত রসঘন হয়ে দেখা দেয় তাতো নিশ্চয় করে বলা যায় না। সেণ্ট জেমস্ স্কোয়ারের শ্রেণীবদ্ধ পামগাছের মধ্যে পিচ ঢালা পথ, সবুজ ঘাসে মোড়া খোলা জমি, অনেকখানি আকাশ, বাঁধানো ছবির কারুকার্য-খচিত ফ্রেমের মত পার্ক ঘিরে চারি পাশে নানা আকারের নানা ভঙ্গিমার বাড়ী। আর তারই একটি বাড়ীতে ফুটে আছে একটি শতদল—শতদলই তাকে বলা যায়, মৃণালের তন্বী দেহশীর্ষে সেই ঢলঢল মুখকে প্রফুল্ল কমল বই কিছু বলা চলে না। মৃণাল-এর চেয়ে মিষ্টি নাম তার কিছু হতে পারত না, অন্য কোনও নামে তার যেন স্বরূপ বিকশিত হ'ত না। ওই নামের মধ্যেই কোথায় যেন অজস্র কোমলতা, অপরিমেয় মাধুর্যের ইঙ্গিত আছে। আর আছে যেন কিঞ্চিৎ পৌরুষ শক্তির প্রকাশ—যা না থাকলে তাকে আধুনিকা বলা যেত না। তার চলায়, বলায়, গলায় সমগ্র সার্পেনটাইন লেনগুলি যেন উচ্ছ্বসিত হয়ে থাকে। বস্তুত মৃণালের সন্ধান পেয়েই যেন এই সেণ্ট জেমস স্কোয়ারের মর্যাদা বেড়েছে, সার্পেনটাইন আর নেবুতলা, শশীভূষণ দে ষ্ট্রীট আর বৌবাজারের একটা বিশেষ মূল্য উপলব্ধি করছি।

রাস্তার পাশে পড়ার ঘর, পিয়ানো আছে একপাশে। যেদিন

সে প্রথম আমায় তার ঘরে নিয়ে গেল, সেই ঘরে বসিয়ে ভিতরে যেয়ে চায়ের কথা বলে এলো। এসে বল্লে—নক্ষত্রের প্রভাব মানেন তো? আমার ঠাকুরদার আবার ঐ সব বাতিক আছে। তিনিই বলেছিলেন এমন কিছু ঘটবে। তবে লোকটির কিছু নির্ণয় দেননি।

আমার চোখে মুখে ঘাড়ে তখনও যথেষ্ট ধুলা জমে আছে। রুমাল দিয়ে সেটা মুছবার চেষ্টা করতে করতে বল্লাম—আমায় এভাবে বাঁচাবার কোনও প্রয়োজন ছিল না। আমার জীবনের কিছু মূল্য নেই, কিন্তু আপনার গাড়ীর হেড্‌লাইটটা চূর্ণ হয়েছে, বোধ হয় বাঁ দিকের মাড্‌গার্ডটাও—

বাধা দিয়ে মৃণাল বল্লে—সে কথা থাকুক। কিন্তু এতবড় ঝড়ের মধ্যে আপনি কেন অমন দিগ্বিদিক্‌ জ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটে চলেছিলেন? আমার গাড়ীতে না হয়ে অপর যে কোনও গাড়ীর সংগে তো ধাক্কা লাগতে পারত। আর অতবড় ঝড়ের মুখে, লোকজন নেই, চাপা দিয়ে সরতে কেউ ইতস্তত করত না।

কৃতজ্ঞ চিত্তে মৃণালিনীর কোমল হৃদয় অনুভব করলাম, আর স্মরণ করলাম, তার গায়ে যথেষ্ট শক্তি আছে, একাই সে আমার আহত বেপথুমান শ্লথ দেহটা টেনে তুলেছিল।

ব্যাপারটা ঘটেছিল শশীভূষণ দে ষ্ট্রীটে। স্তব্ধ প্রকৃতি অকস্মাৎ যেন মত্ত হস্তীর প্রলংকররূপে দেখা দিলে। কোথা দিয়ে যে ঘূর্ণিবায়ু নামল, দিগদিগন্ত আচ্ছন্ন করে ধুলো আর জঞ্জালের প্রবল আক্রমণ পথিক জনকে ত্রস্ত ও বিপর্যস্ত করে দিলে। মেসের কাছাকাছি এসে পড়েছি—তাই ফুটপাথ বদলে সেণ্ট জেমস্‌ স্কোয়ারে যেতে চেষ্টা করতেই পথের মাঝখানে কি কাণ্ড ঘটে গেল। অনুভব করলাম, আমার কোথায় চোট লেগেছে, আর গাড়ীটা, ঘুরিয়ে আমাকে বাঁচাতে যেয়ে বাঁ দিকের আলোকস্তম্ভে আঘাত পেল। গাড়ী থেকে নেমে এলো মৃণাল, ঐ ধূলির অন্ধকারেও তাকে চিনতে কষ্ট হল না। আমায় হাত ধরে তুলে সে গাড়ীতে নিলো।

বল্লাম—আমায় আপনি চিনলেন কেমন করে?

মৃণাল মুচকি হেসে বল্লে—পাড়ার লোককে কি চেনা অসম্ভব? আপনি নিকটেই কোথাও থাকেন নিশ্চয়।

স্বীকার করলাম—সার্পেনটাইন লেনে।

মৃণাল আমায় বাথরুম দেখিয়ে দিলে। আমার আঘাতটা গুরুতর হয়নি, হাঁটুর কাছে একটু ছড়ে গিয়েছিল, তাও স্বীকার করলাম না। তারই মুখোমুখি বসে আছি—যার আগমনে সেণ্ট জেমস্‌ স্কোয়ার নন্দনকাননের মত কমনীয় মনে হত। যার কথা স্মরণেও আমার প্রবাস জীবনের তিক্ততা মুহূর্তে তিরোহিত হয়ে যেত। মৃণাল কি সে কথা—

'কথা কানেই ঢুকছে না। বলি শুনছ? এখনও বসে লিখবে, আজ আর ইস্কুলে যাবে না? বেলা যে দশটা বাজে।' মলিনা স্বামীর কাছে আসিয়া দাঁড়াইল।

"দশটা?" নিতাই চমকিয়া উঠিয়া বলিল—দশটা? দশ মিনিট আগেও কি ডাকতে পারো নি? গেল বুঝি চাকরিটা। তেল দাও, তেল দাও—বলিতে বলিতে সে খাতার উপর কলমটা রাখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। মৃণালও "সে কথা" ভাবে কিনা তাহা আর বিচার করা হইল না।

কিঞ্চিৎ তৈল নাসিকা গহ্বরে নিষেক করিয়া ও কিঞ্চিৎ তৈল ব্রহ্মতালুতে মর্দন করিতে করিতে নিতাই উঠিয়া দাঁড়াইয়া হাঁকিল, —মৃণাল, আই-মিন্‌ মলিনা, একটা ঘটি দাও দিকি, আজ আর ডুবোবো না, শরীরটা ভালো নেই।

মলিনা ঘটি আনিয়া দিল, তার পর একটু ভাবিয়া বলিল, চক্কোত্তিদের পুকুরে না যেয়ে বরং গাংগুলিদের ঘাটে যাও। চাদ্দিকে ভারি জ্বর জাড়ি হচ্ছে।

নিতাই চলিতে চলিতে বলিল—ছুত্তোরি, এর চেয়ে বরং তোমার কাকাবাবুকে বলে কয়ে সেই কেরাণীর কাজটা জোটালেই ভালো ছিল। তুমিই শুনলে না, বল্লে গ্রাম ভালো, গ্রাম ভালো। এই তো ভালো, চাকরি এই মাষ্টারি, আর রোজ ভয়—এই বুঝি জ্বর হয়। আর কি বিচ্ছিরি মশা দেখেছ, দিনের বেলায় একটু লিখতে বসেছি তাও কটা কামড়েছে। হবে না, বিল্‌ ভরে যা পাট পচিয়েছে—এবার দেশ উজোড় হবে।

বকিতে বকিতে নিতাই চলিয়া গেল। মলিনার ইহা শোনা অভ্যাস হইয়া গিয়াছে। তবু স্বামীর কাগজপত্র গুছাইতে গুছাইতে একবার সে ভাবিল—হয়ত সহরে গেলেই ভালো হইত। তাহার স্বামী লেখেন—আর সবাই তাই পড়ে, ইহা ভাবিতেও সে আনন্দ পায়। কিন্তু গ্রামের এই অন্ধকারে, অপরিচয়ে, দৈন্যে, দুর্দশায়, রোগপ্রাবল্যে তাহাদের উভয়েরই অস্বস্তির সীমা নাই। তাহার স্বামী যদি সহরে থাকিতেন—হয়ত কত নাম হইত, টাকা হইত—এই চাষাভুষোর মধ্যে তাঁহাকে কে চিনিবে?

একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়িয়া মলিনা উঠিল—চচ্চড়িটা পুড়িয়া উঠিতেছে, নামাইতে হইবে।

নিন্দুক ও তস্কর

শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত

সঞ্চিত মণি-কাঞ্চন-রূপা
বঞ্চনা করি চুরি
তস্করে যাহা লয় তাহা পুন
পুঞ্জিত হ'য়ে উঠে,

নিন্দুক মোর সুনামের ঘরে
চালায়ে সিঁধের ছুরি
যাহা কাটে তাহা জোড়ে না কখনো
বারেক যদি সে টুটে।

রেমব্রাণ্টের দেশে

শ্রীশৈলজ মুখোপাধ্যায়

অনেকক্ষণ এক গ্রাম্য কফিখানায় রেমব্রাণ্টের আলোচনার মধ্যে দিয়ে আমাদের মন ভ'রে উঠিল! ক্রমে রাত্রি হওয়ায় বাহিরে রাস্তার আলো সব একটার পর একটা জ্বলে উঠ্‌তে লাগ্‌লো। আমরা আবার কাফি ও কিছু আহার্য্য চাইলাম—প্রফেসর বলে যেতে লাগলেন, "তখন দেনার দায়ে দেউলিয়া আদালত থেকে রেমব্রাণ্টের আমষ্টার্ডামের অ্যাণ্টনি ষ্ট্রীটের রাস্তার বাড়ীতে তাঁর সমস্ত স্থাবর সম্পত্তি ক্রোকের পরওয়ানা জারি হয়ে গেছে। তাঁর বন্ধু-বান্ধব ও শুভানুধ্যায়ীরা সবাই ব্যগ্র ও চিন্তিত মুখে এই বিপদ থেকে রেমব্রাণ্টের পরিবারকে উদ্ধার কববাব উপায় উদ্ভাবনায় আকুল। এই সময়ে তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু ডাক্তার লুন একদিন রেমব্রাণ্টের বাড়ীতে ঢুকেই দেখতে পেলেন যে তিনি অতি যত্নে তাঁর রঙের Pallette টী ও তুলিগুলি মুছ্‌চেন ও পরিস্কার করে রাখছেন। বন্ধুকে দেখে রেমব্রাণ্ট বল্‌লেন—"এগুলি বোধহয় আর এখন আমার নয়, কিন্তু তা বলে যারা এত বছর বিশ্বস্তভাবে আমায় সেবা করেছে তাদের ত আমি নষ্ট হয়ে যেতে দিতে পারি না।" হঠাৎ একটী ডাক্তারী সূচ তিনি মেঝের থেকে ইতঃস্তত বিক্ষিপ্ত তৈজসপত্রের মধ্যে কুড়িয়ে পেলেন। এটি ডাঃ পুন তাঁকে Etching করার জন্য দেন। রেমব্রাণ্ট বল্‌লেন "আচ্ছা, এটি ত ডাক্তার তুমি আমায় দিয়েছিলে?" ডাক্তার বল্‌লেন "না, আমি এটী একেবারে দিয়ে দিইনি, কেবল ব্যবহার করতে দিই।" "তাহলে এটী তোমার, এখনো তোমার, আমাকে এটা তবে তুমি আরো কিছুদিন ব্যবহার করতে দাও, কেমন?" "নিশ্চয়ই" ডাক্তার বল্‌লেন। খুঁজে পেতে একটী পুরানো ছিপির টুক্‌রো জোগাড় করে রেমব্রাণ্ট ও সূচটীর আগাতে লাগিয়ে দিলেন—যাতে ধার ভোঁতা হ'য়ে না যায়। এক টুক্‌রো Etching করবার তামার পাতও সংগ্রহ হ'লো, বল্‌লেন, "পাওনাদারদের এই সামান্য জিনিষ দুটো থেকে আমি বঞ্চিত করবো। যদি জেলও যেতে হয় তাও স্বীকার। কিন্তু আমায় ত আবার কাজ করে খেতে হবে।" এই বলে তামার পাতটি ও সূচটি পকেটে সাবধানে রেখে দিলেন। ঠিক এই সময়ে দরজায় করাঘাত হলো। ডাক্তার গিয়ে দরজা খুলে দেখেন—দেউলিয়া আদালতের পেয়াদা দাঁড়িয়ে, সম্পত্তির ফিরিস্তি করার জন্য এসেছে। ডাক্তারের প্রশ্নের উত্তরে সে জানাল যে এত শীঘ্র আসার কারণ—পাওনাদারদের অনেকের আশঙ্কা যে বিলম্বে কিছু জিনিষ সরিয়ে ফেলা হতে পারে। রেমব্রাণ্ট ডাক্তারের ঠিক

হল্যাণ্ডের একটি আধুনিক চিত্রশালার অভ্যন্তর

কফিখানার সন্ধ্যাদীপ জ্বললো। অবসর বিনোদনের জন্য কর্ম্মক্লান্ত দিনমজুর, কেরাণী ও অখণ্ড-অবসরযুক্ত সৌখীন লোকের আগমনে ক্রমে ক্রমে কফিখানার শূন্য স্থান পূর্ণ হ'য়ে গেল।

ভ্যানগক

পিছনেই ছিলেন এবং সব কথা শুনতে পেয়েছিলেন। "ঠিকই বলেছ" পকেট থেকে স্থূচ ও তামার পাতটি বার করে তিনি পেয়াদাকে বল্লেন "আমি এ ছুটি চুরি কর্চ্ছিলাম"। পেয়াদা সেলাম জানিয়ে বল্লে "মহাশয় আপনার মানসিক অবস্থা কিরূপ তাহা আমি বুঝি; কিন্তু আপনি ধৈর্য্যহারা হইবেন না। দেখিবেন কয়েক বছরের মধ্যেই আপনি আবার এখানে ফিরে আসবেন চার ঘোড়ার গাড়ী করে"। এই বলে সে ক্ষমা চেয়ে নিজের কাজে লেগে গেল এক টুকরো কাগজ আর একটি পেন্সিল
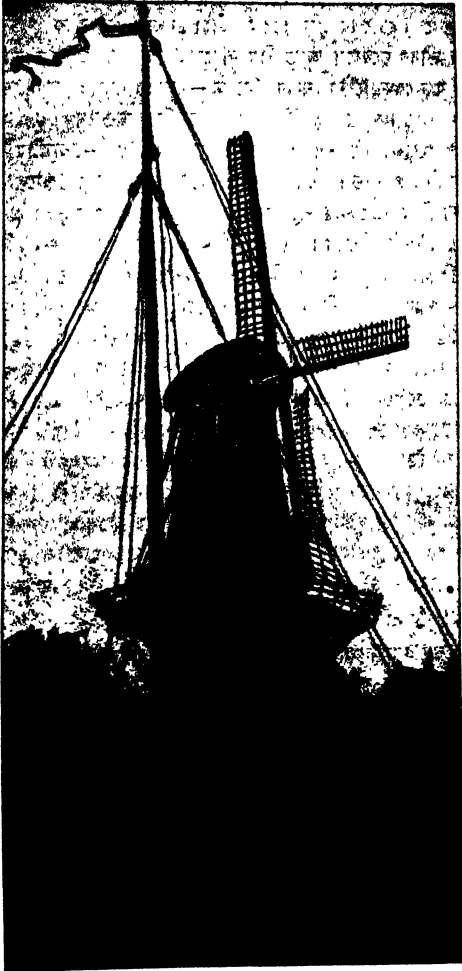
উইণ্ডমিল—হল্যাণ্ড

নিয়ে। বাইরের ঘর—১টী ছবি—কার আঁকা?...রেমব্রাণ্টের হাত ধরে ডাঃ লুন্ ধীবে ধীবে ঘরের বাইরে গিয়ে রাস্তায় দাঁড়ালেন। ডাক্তারেব হাতে একটী ব্যাগে রেমব্রাণ্টের কিছু জামা কাপড়—একবার দুজনে শুধু বাড়ীর দিকে তাকিয়েই দৃঢ় পদক্ষেপে অন্যদিকে চলে গেলেন। এ বাড়ীতে রেমব্রাণ্ট আর ফেরেন নি। দু'এক বছরের মধ্যেই বাড়ীটি একজন মুচি কিনে নেয়। সে এটীকে দু অংশে ভাগ করে। এক অংশে নিজে বাস করত ও অপর অংশ একজন কসাইকে ভাড়া দেয়। হল্যাণ্ডের বিখ্যাত চিত্রকর ফ্রানস্ হলস্ এই ঘটনায় অত্যন্ত বিচলিত হন। তিনি তখন হারলেমের অনাথ আশ্রমে থাকতেন। তিনি বল্লেন "রেমব্রাণ্টের ত কপাল ভাল, তার কারবার বড় বড় প্রসিদ্ধ লোকের সঙ্গে—তার বাড়ী মূল্যবান ছবি ও আল্‌বামে ঠাসা। আব আমি একটী সামান্য রুটীওয়ালার তাগাদায় অস্থির হ'য়েছিলুম—আমার থাকার মধ্যে ছিলো ছেঁড়া মাদুর ও কতকগুলো পুরোনো তুলি ও রং। সভ্য দেশে শিক্ষার কি পরিণাম, রেমব্রাণ্টের বাড়ী কেনে মুচি, আর ভাড়া নেয় কসাই।"

ইতিমধ্যে কাফিখানার গ্রাম্য অর্কেষ্ট্রা নেদারলাণ্ডীয় সুরে সকলকার মনে আলোড়ন আনিতেছিল। যদিও একটু উচ্চ-শ্রেণীর কাফিখানা ছাড়া কোথাও সান্ধ্য মজ্‌লিসে অর্কেষ্ট্রার বন্দোবস্ত থাকে না—তবুও এই জায়গায় সামান্য একটু বন্দোবস্ত ছিলো—তার কারণ গ্রামেব বাদক দল সন্ধ্যায় এখানে একত্রিত হয় এবং তাহাবা গ্রামবাসীদিগকে তাহাদের ঐক্যতান শুনাইয়া থাকে। কাফিখানার মালিক ও শ্রোতারা এদের বিয়ার বা অনুরূপ পানীয় দিয়া থাকেন। যাই হোক আমরা প্রফেসরের আবেগপূর্ণ প্রসঙ্গে মাতিয়া উঠিয়াছিলাম; তবুও মাঝে মাঝে ওই গ্রাম্য বাদকদলের প্রাণ-মাতান সুর আমাদের বিচলিত করছিলো। ডাচ সঙ্গীতে জার্মান প্রভাব বিশেষ ক'রে Handel
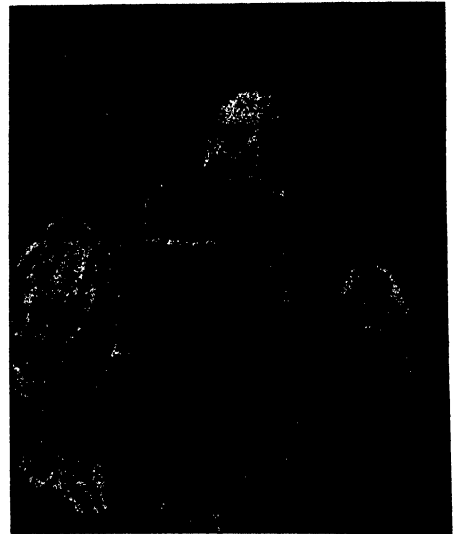
মহিলার প্রতিকৃতি—ফ্রান্স হল্‌স্ অঙ্কিত

ও Mozart প্রমুখ প্রসিদ্ধ সুরসাধকদের দান লক্ষ্য করলুম। ইহারা অদূরবর্ত্তী Haarlem সহরেও ছিলেন এবং সেখানকার প্রসিদ্ধ গীর্জ্জায় বাজাইয়াছিলেন। কিন্তু আমরা রেমব্রাণ্টের জীবনের অধ্যায়গুলি এত মনোযোগ সহকারে শুনতে লাগলুম যে রেমব্রাণ্টের আত্মকাহিনী ঐ সুরের সাথে মিশে যেন এক নতুন নাটকীয় রূপের প্রাণশক্তি-ভরা প্রতিচ্ছবিভাবে সমগ্র

ঘরের প্রতি কোনে ডাচ জাতির জাতীয় মন্ত্র প্রতিধ্বনিত হ'তে লাগলো—

"JE MANTIENDRAI"

যাহার অর্থ "আমি চিরন্তনী"। প্রফেসর আমাদের আগ্রহ লক্ষ্য করিয়া দ্বিগুণ উৎসাহে বলিয়া যাইতে লাগিলেন—"রেমব্রাণ্টের পরলোকগমন কাহিনী—তাঁহার জীবনের আর এক আধ্যাত্মিক অধ্যায়। রোগশয্যায়ও তিনি আঁকবার চেষ্টা করেছেন, শরীর দুর্ব্বল, কোমরে পিঠে ব্যথা, রং মাখান জামা পরেই ক্লান্ত দেহ শয্যায় এলিয়ে দিচ্ছেন। এমনি একদিনে ডাঃ লুন্ রেমব্রাণ্ট কেমন আছেন দেখতে এলেন; রেমব্রাণ্ট তাঁকে বাইবেল থেকে জেকবের গল্পটী পড়ে শোনাতে বল্লেন। অনেক খোঁজা-খুঁজির পর কন্যা কর্ণেলিয়ার সাহায্যে ঠিক জায়গাটী বেরুলো।
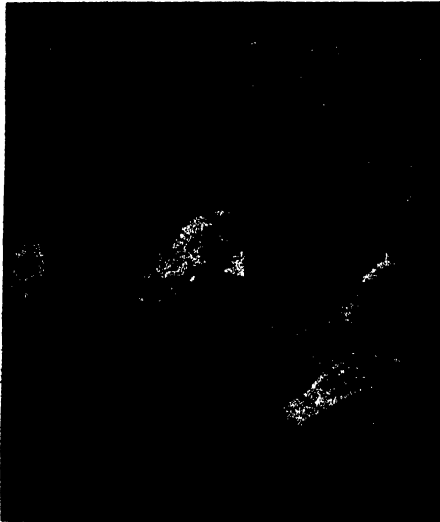
মদ্যপানরত যুবকের হাত—ফ্রান্স হল্স্ অঙ্কিত

রেমব্রাণ্ট বল্লেন, জেকব্ যেখানে প্রভুর সহিত যুদ্ধ করিতেছেন, সেই স্থানটী আমায় প'ড়ে শোনাও, আর কিছু না। ডাক্তার লুন্ পড়তে লাগলেন "জেকব একলা, সারারাত ধরে তাঁকে যুদ্ধ করতে হলো অন্য একটি লোকের সঙ্গে; যুদ্ধে পরাজিত হ'য়ে লোকটী জেকবকে বল্লে, এখন থেকে তোমার নাম হল ইস্রাইল—কারণ তুমি জয়ী ও ঈশ্বরাশ্রিত"। শুনিতে শুনিতে রেমব্রাণ্ট উত্তেজিত হইয়া উঠিয়া বস্‌বার চেষ্টা করলেন এবং বল্লেন "তোমার নাম আর জেকব নয়, রেমব্রাণ্ট"—কারণ রাজারূপে তুমি সকলের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া জয়ী হইয়াছে ও তুমি ঈশ্বরানুগৃহীত—এই বলিয়া অসহায়ভাবে ডাক্তারের দিকে তাকালেন, বালিশ থেকে মাথা তুল্‌তে পারলেন না। কালির দাগ মাখা ফোলা হাত দুটী বুকের উপর রেখে তিনি স্থির হলেন। কর্ণেলিয়া বললে "যাক বাবা এখন একটু ঘুমিয়েছে।" ডাক্তার লুন কর্ণেলিয়ার কাছে গিয়ে সস্নেহে তাহার হাত ধরে বল্লেন "ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, তোমার বাবা স্বর্গে গেছেন"। ডাক্তারের চোখের জল কয়েক ফোঁটা রেমব্রাণ্টের বুকে পড়্‌লো। এক ভীষণ দুর্যোগে অতি দীন দরিদ্রের এক খণ্ড জমিতে ডাক্তার লুন বন্ধু রেমব্রাণ্টের কবর দিলেন—সহরের কেহই জান্‌তে সে দিন পারেনি যে এই বিরাট পুরুষ জাতির অন্যতম শ্রেষ্ঠ মানব এক অন্ধকারময় জীবন থেকে মুক্তি নিয়েছে—রেমব্রাঁর মৃত্যু রেমব্রাঁর প্রভাত। সে রাত্রে আমাদের এই অভিনব আলোচনার মধ্যে দিয়ে প্রফেসর আমাদের প্রাণে এক নব প্রভাতের প্রাণময় আলো ঢেলে দিলেন। রেমব্রাণ্টের কথা যেন সন্ধ্যার সঞ্জীবতা আবিষ্কার কর্‌লে। এমনি ভাবে রেমব্রাণ্টের দেশে ভ্রমণের অভিজ্ঞতা—আর ভিতরের গভীর প্রেরণা ও শিক্ষা এবং মানুষের কীর্ত্তির রচনা স্বচ্ছ মনের মধ্যে মানুষের চলাফেরার মুহূর্ত্তগুলিকে জয় করার সাহস এনে দিচ্ছিলো। আমরা এর মধ্যে এত আপন হ'য়ে উঠেছি যে প্রবাসের পথে পৃথিবীর ছেলে মেয়ে নানান রকমে মিশে গেছে। প্রফেসর আমাদের তাঁর বাড়ীতে আমষ্ট্রাডামে নিমন্ত্রণ ক'রে সে রাত্রে বিদায় নিলেন। আমরা আমাদের পথে বেরিয়ে পড়ে অনেক রাত্রে বাড়ী ফিরলুম। অনেক রাত্রি হওয়ায় হ্যারির মা খাবার নিয়ে ব'সে আছেন—আর আমার দেশেরই মার মত ভাবছিলেন যে আমাদের কি হ'লো? এখোনো বাড়ী এলো না, খাবার পড়ে, কারণ কি? তখন মনে হ'লো পৃথিবীতে সব মা গুলোই কি ওই রকম।

রাত্রে জানালার বাইরে জলপাইয়ের গাছগুলো কালো কালো দৈত্যের মত যেন পাহারা দিচ্ছে—ঘুম আস্‌তে আস্‌তে নেশার মত কেবল ঝাপ্‌সা ঝাপ্‌সা স্বপন ক্লান্ত, অবসন্ন আর পরিশ্রান্ত দেহকে মধুরতর নিদ্রা থেকে মনের অন্দর মহলে পট-লিপিকা রচনা করছিলো—মানুষের বুকের রক্ত শুকিয়ে নিঃশেষ ক'রে কত কীর্ত্তি রচনা করেছে, কত মানুষ আজ সমাধিস্থ—পৃথিবীর ইতিহাস লেখা হ'য়ে যাচ্ছে মাটির ভিতরকার প্রাচীন অস্থির সঙ্গে সঙ্গে এই চলমান জগতে—একজনের দীর্ঘনিঃশ্বাস—অপরের সীমাহীন দীর্ঘপথের আনন্দ।

নব-বরষায়

শ্রীরথীন্দ্রকান্ত ঘটক-চৌধুরী

নব-শ্রাবণের পরশন দিল বাদলধারা,
এ বরষা দিনে ব্যাকুল পরাণ ভাঙিল কারা।
মাধবী মুকুল ঝরিল বৃথাই
ঝড়ের দেবতা কুড়াইল তাই,
নীপদল আজি বারি বরিষণে আপনা হারা।

পথিক বধূরা ভিজেছে নবীন বরষা জলে,
লুকালো বিরহ সজল নয়ন গোপন ছলে।
সে বেদনা যেন মেঘের আঁধারে
কাঁদিয়া ফিরিছে আজি বারে বারে,
উদাসীর গানে কোন কাজ তাই হলো না সারা।

ভুল ঠিকানা

শ্রীমতী প্রকৃতি বসু

সেদিন সন্ধ্যার পর মেসে ফিরে "লেটারবক্স"এ হাত দিতেই একখানা ভারী খাম হাতে ঠেকল; নিজের নামের প্রথম দিকটা চোখে পড়তেই চিঠিটা পকেটে ফেলে উপরে চলে এলাম। ছুটীতে যে যা'র বাড়ী চলে গেছে, শুধু একা আমি মেসে পড়ে আছি; ছুটীর অভাবে নয়, আপনজনের অভাবে। চিঠি পেয়ে তাই আমার মনে হ'ল, খামে চিঠি দেবে এমন কে আছে আমার? ঘরে এসেই তাই খামটা তাড়াতাড়ি ছিঁড়তে গেলুম; কিন্তু, একি! এ তো আমার চিঠি নয়। এ যে সুকুমার চ্যাটার্জ্জী, আর আমি সুকুমার সেন, সুকুমার নামে দ্বিতীয় এ মেসে কেউ নাই; পিওনটা বোধ হয় ভুল করেছে। ভাল করে ঠিকানাটা ফের পড়লাম, না পিওনের ভুল নয়, আমাদের মেসের বাড়ীর নম্বর; ভাবলাম কাল পিওনকে ডেকে চিঠিটা ফেরত দেব; কিন্তু কেমন একটা নীতিবিরুদ্ধ কৌতুহল মনে জেগে উঠল, খামের ভেতরের পত্রটীর সম্বন্ধে। মেয়েলী হরফের সুকুমার চ্যাটার্জ্জী নামটা দেখে বোধ হয় মনে হ'য়েছিল যে, স্বামী স্ত্রীর পত্র এবং খুব সম্ভব নব-বিবাহিতার, কল্পনায় মন অনেক দূর যায়, কল্পনার স্বপ্ন দেখতে দেখতে কখন যে খাম ছিঁড়ে পত্র বা'র করেছি, নিজেই তা' বুঝলাম না। খামটা ছেঁড়ার সঙ্গে সঙ্গেই একটা কেমন মিষ্টি গন্ধ নাকে ভেসে এল, মনটাও আমার দুলে উঠল অজানা প্রেমের ছোঁয়ায়। কিন্তু আমার ভুল ভেঙ্গে গেল, চিঠির প্রথম সম্বোধনেই। চিঠি আস্‌ছে কোথাকার এক কলিনপুর গাঁ থেকে, লিখ্‌ছে একটা পাড়াগাঁয়ের মেয়ে, তা'র ছোটবেলার শিক্ষাদাতা "সুকুমার" দা'কে।

বড় বড় গোটা গোটা অক্ষরে সে লিখ্‌ছে—

"সুকুমার দা,, অনেক দিন পরে তোমায় পত্র দিচ্ছি, তুমি নিশ্চয় খুব অবাক হ'য়ে যাবে, ভাববে, তোমার লতু, এখন তোমায় ভোলেনি? সত্যিই তোমায় ভুলিনি। প্রতিদিন অলস দ্বিপ্রহরে তোমার কথা আমার মনে হয়। এই পাড়াগাঁয়ের নানা ঢেউএর আঘাতেও তোমায় ভুলিনি। যখন দুপুরে যে যা'র ঘরে বিশ্রাম নেয়, ঘরের দরজা বন্ধ করে—সে সময়, পুকুর ধারে জানলার কাছে গিয়ে আমি বসি, গাছের ছায়ায়, পাখির ডাকে, আর বাতাসের ছোঁয়ায় ভেসে আসে আমার পুরাণো দিনের কথা। মনে পড়ে তোমার সেই কথাগুলি, "লতু, সব জিনিষই নিজের ভাবে বুঝে তবে নিবি, পরের কথায় অন্ধের মত চলবি না, হয়তো তোর ক্ষমতা থাকবে না সব সময়ে, তবু মাথা নোয়াবি না চেষ্টা করে যাবি আমরণ।" তোমার সেই উপদেশের জোরেই আজ আমার মনে যে সব কথা জেগে উঠেছে তা' তোমায় শুনতেই হ'বে; আর তুমি ত জান, তোমাকে না বলে আমি তৃপ্তি পাই না কোনদিন। একটু আগে পড়ছিলাম শরৎবাবুর "শেষ প্রশ্ন"।" পথের দাবীর "সব্যসাচী" আর শেষ প্রশ্নের "কমল"কে নিয়ে আমার মনে যে দ্বন্দ্ব জেগে উঠেছে, সেই কথা তোমায় বলব। তুমি হাস্‌বে আমার পাগলামী দেখে? কিন্তু সুকুমারদা', ভগবান ফুলের বুকে মধু দেন কোন বিশেষ ভ্রমরের জন্য নয়, সকলেরই জন্য; লেখকের লেখার সম্বন্ধেও কি সেই কথা খাটে না? তিনি দিয়েছেন তাঁর লেখা আমাদের সকলের মাঝে ফেলে, যা'র যে ভাবে ইচ্ছা গ্রহণ করুক তা'তে তাঁর কিছু এসে যায় না।

কমল আর ডাক্তার দুজনেই শরৎবাবুর অভিনব বিরাট সৃষ্টি, দুজনেই মনে আনে বিরাট বিস্ময়; মনে হয় এরা যেন আমাদের ধরা ছোঁয়ার ভেতর নয়। দুজনেই মানে না পুরাতনকে, মানে না কোন শক্তিমানকে। পুরাতনের ধ্বংসস্তুপের উপর দিয়েই এদের জয়যাত্রা। কিন্তু তবুও মনে হয় "কমল" ও "সব্যসাচী"তে অনেক তফাৎ।

ডাক্তার আনে আমার মনে, শ্রদ্ধা, বিস্ময়, ভালবাসা; আর কমলের কাছ থেকে পাই, বিস্ময় ও বিতৃষ্ণা। কমলের অভিযান শুধুই "মহানে"র বিরুদ্ধে নয়; যা' কিছু আমাদের চোখে সুন্দর, ভাল, পবিত্র, তারই বিরুদ্ধে।

আমার মনে হয় কমল দেখেছিল শুধু আমাদের সব কিছুরই বাহিরের রূপ, অন্তর থেকে বোধ হয় সে কোন দিন এর অন্তরের জিনিষ দেখতে পাই নি বা চেষ্টা করে নি। এর কারণ ছিল, কমল যাদের কাছে নিজেকে বিকিয়েছিল, যা' থেকে তার জন্ম তা' হ'চ্ছে পদ্মপত্রের জলবিন্দুর মত প্রেমের পরিণাম। তাঁরা যতই গুণী বা জ্ঞানী হোন, তাঁদের পরিচয় নেই সেই চির-সুন্দর প্রেমের সঙ্গে। যা' সুন্দর, যা' ধ্রুব, তা'কে যুক্তি তর্ক দ্বারা স্থাপনা করতে হয় না। যা' মিথ্যা তা'কেই যুক্তি তর্ক দিয়ে স্থাপনা কর্ত্তে হয়।

কমলের যুক্তি আমাদের মনে আনে সংশয়। ওর কথার এমন একটা ভঙ্গি আছে যা'র জন্য এই সন্দেহ। হৃদয়ে ঢেউ তুলে দিয়ে যায় কমলের যুক্তি। কিন্তু মীমাংসা হয় না।

অনেকে বলেন, তুমিও অনেক সময় বলেছ—"কমল হ'চ্ছে ভবিষ্যৎ ভারত"। জানি না একথা তোমাদের সত্যি কিনা, তবে আমার মনে হয়, যদি তাই হয়, এই ভবিষ্যৎ আনবে না কল্যাণকে, আনবে অকল্যাণকে।

অতীতকে বর্ত্তমানে টেনে আনা মূর্খতা, একথা যেমন সত্য তেম্‌নি এও সত্য, যা' আনন্দময়, যা' কল্যাণময়, যা' সুন্দর যে সত্য আমরা অন্তর দিয়ে অনুভব করি, তা'কে অস্বীকার করা আরো বেশী মূর্খতা নয় কি?

কমলের কাছে জীবনের অনেক দরজা খুলেছিল, তা'র নিজের একনিষ্ঠ ব্যক্তিত্বে। কিন্তু মনে হয় অনেক দ্বার খুললেও একটী দরজা খোলে নি। ডাক্তারের কাছে সে দরজা খুলেছিল। ডাক্তার নাস্তিক একথা ঠিক, আবার এও ঠিক যে সে দেখা পেয়েছিল সেই চিরন্তনী প্রেমের। ডাক্তার যা'কে অগ্রাহ্য করে এসেছে তা' এরই বাহিরের রূপ, আসল যা' রূপ তা'কে জেনেছে ডাক্তার তা'র প্রতি রক্ত বিন্দু দিয়ে। তাই ডাক্তারের ভীষণতা মনে ঘৃণা বা ভয় আনে না, তাকে যেন পাই অতি প্রিয়জনরূপে।

বার বার তাই নেমে আসে আমার সংস্কারাচ্ছন্ন উদ্ধত মাথা, তাঁর ধূলি ধূসরিত পায়ের 'পরে।

আমার যেন মনে হয়—শরৎবাবু পথের দাবী লিখেছেন তাঁর বুকের রক্ত দিয়ে। ডাক্তারের মুখ দিয়ে যে কথা তিনি বলিয়েছেন, তা' আর কা'রো মুখে শোভা পেত না। যে দুঃখের মশাল তিনি ডাক্তারের বুকে জ্বেলেছেন, সে মশাল ছিল সকলেরই বুকে, কিন্তু সে অমন জলন্ত নয়, প্রদীপের আলোর মত।

কিন্তু কমলের ভেতর আমরা কি পেয়েছি শুধুই বিদ্রোহ? আর কিছুই নয়? না অনেক কিছুই পেয়েছি, কমলের ভেতর। আর সেই জন্যই পারি না কমলকে হেলা ভরে দূরে সরিয়ে দিতে। ওর স্বাতন্ত্র্যই ওকে ফুটিয়ে তুলেছে। কোন সুখ দুঃখই যেন ওকে ছুঁয়ে যেতে পারে না। কমল যেন ঠিক পদ্মফুলের পাপড়ির মত; জলের মাঝে ডুবিয়ে রাখ্‌লেও পাপড়ী যেমন জলে ভেজে না, কমলও যেন তেমনি, ওর গায়ে যেন সুখ দুঃখের ছোঁয়া লাগে না। গত দিনকে কমল ডেকে আনতে চায় না, তা' সুখেরই হোক বা দুঃখেরই হোক। কবির ভাষাকে সে অন্তর দিয়ে গ্রহণ করেছিল—

"ফুরায় যা, দে রে ফুরাতে
ছিন্ন মালার ভ্রষ্ট কুসুম
ফিরে যাসনে কো কুড়াতে।
* * * *
যখন যা পাস্ মিটায়ে নে আশ
ফুরাইলে দিস ফুরাতে"

কমল যেমন করে বুঝেছিল এই চরম সত্যকে, এমন পারে ক'জন? অতীতের স্মৃতির কুসুমে কমল মালা গাঁথেনি বলেই শিবনাথের কাছে আত্মসমর্পণ করেছিল যত সহজে—ঠিক তত সহজেই সে তাকে ভুলতে পেরেছিল। মনে হয় 'ওর' স্বভাব বুঝি প্রজাপতির মত, কিন্তু তা'তো নয়। চির রহস্যময়ী কমল।

"শেষ প্রশ্নের" উত্তর মেলেনি, আর "ডাক্তারের" সাধনার ফলও কই দেখ্‌তে পেলুম না।

* * * *

এইখানেই মেয়েটী তা'র মনের উচ্ছ্বাস বা পাগলামী শেষ করেছে। এর পরে দু' চার লাইন ঘরের কথার আদান প্রদান করেই ইতি হ'য়েছে।

আমি আশ্চর্য্য হ'য়ে গেলাম, একটা অতি তুচ্ছ মেয়ের স্পর্দ্ধা দেখে।

দুঃখোত্তরী

শ্রীশৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

তোরা আয় কে যাবি এই ধরণীর আনন্দেরি ছন্দপুরে
সেথা রাস্তা ঘাট আর আকাশ-বাতাস মগ্ন লীলানন্দসুরে।
সেথা শাশ্বত প্রেম রঙ্গাভিসার সদাই রসরঙ্গে ঘোর,
চলে যৌবনেরি অঙ্গবিলাস নন্দলালের ছন্দে ভোর।
ওরে শাশ্বত তাই বস্তু সেথায় 'অস্তি' সেথায় অস্ত নয়,
সেথা মরণ-বাঁচন মুক্তি পেল মুক্ত চেতনবস্তুময়।
তোরা দুঃখতরণ তরবি কে?
চল্ মৃত্যুহরণ নিত্যবঁধুর পদ্মচরণ ধরবি কে?

এই মরজগতের স্মরগরলের রক্তসাগর গর্জ্জে ওই,
এর ঊর্দ্ধে নাচন হাস্যসুখের নেইকো নীচে দুঃখ বই।
এই রক্তসাগর সাঁৎরে যাবি ভক্ত-প্রেমিক চলবি চল্,
আজ করতে হবে আনন্দের ওই ছন্দলোকের দিলদখল।
সেই ছন্দলোকের মানবলোকে নেইকো কোনই দ্বন্দ্ব রণ,
সেথা সঙ্গীত এবং নৃত্যকলায় চিরন্তনের দিনযাপন।
চির রাজ্য সেথায় বসন্তের,
সেথা যুক্তভাঙ্গা এই জীবনের তালবাজেরে হসন্তের।

সেথা আইন কানুন ঘণ্টা-ঘড়ির সময় বাঁধার নেই বালাই,
বাঁধা গৃহস্থদের গৃহস্থালী খেয়াল খুশীর মনবীণায়।
ওরে লক্ষ্মী বাণী সেথায় হলেন মনের সাধে বন্দী রে,
সদা তারুণ্য আর যৌবনেতে জীবন বাজে ছন্দি' রে।
এই বিশ্বেরি সব সুন্দরেরি সেথায় পাতা বক্ষতল,
শুধু হৃদয় দেওয়া হৃদয় নেওয়ায় মৃত্তিকা তায় রসমহল।
সে যে স্বর্গ চেয়েও দেশ বড়ো,
ওরে মনহারাণোর সকল চিঠি সেথায় গিয়ে হয় জড়ো।

সেথা এই ধরণীর সকল রীতি পড়লো হয়ে উল্টোবে,
চির মুক্তকিশোর পড়লো বাঁধা কুলবালাদের ফুলডোরে।
যত গাছের পাতা রইল উপুড় উল্টো বহে নদীর জল,
সব অন্নজলের ক্ষুধার দাহ চুম্বনেতে হয় শীতল।
সেথা সকল ভাবের উৎস-তলায় লুকিয়ে খেলেন জনার্দ্দন,
সদা ছাতার মতন সবার মাথায় রাখেন ধরে গোবর্দ্ধন।
হবে সেথায় গেলে সব শীতল।
সেথা মৃত্যুহরণ জন্ম নিতে আয় যাবি কে চল্‌বি চল্।

সেথা অনন্ত যে পড়লো বাঁধা রসের মহাবিন্দুতে,
ওরে বিন্দু সেথায় প্রকাশ পেল অসীম মহাসিন্ধুতে।
সেথা সকল তরু কল্পতরু সব বনানী কুঞ্জবন,
সেথা সকল দেহ নন্দলালার সকল গেহ বৃন্দাবন।
সেথা বিশ্বেরি সব মানব হৃদয় বাজলো এসে বংশীতে,
পথে শ্রীভগবান ফিরেন সদা ত্রিতাপ দাহে' ধ্বংসিতে।
ওরে তোদের তবে আর কি ভয়?
চল শাশ্বত সেই মাটীর তলায় দুঃখমরণ কর্ব্বি জয়।

আয় জগন্নাথের নাম নিয়ে আজ জীবনদোলা দুলিয়ে দে,
এই যৌবনেরি ঝুলন-ঝোলা চরণতলায় ঝুলিয়ে দে।
আর কাল্‌কালীয়ের হিংসাবিষে মরবেনা কেউ মরবেনা,
কভু যমরাজারি ডঙ্কাতে ভয় করবেনা কেউ করবেনা।
আর দুঃখত্রিতাপ থাকবে নাকো জীবন হবে চিরন্তন,
হবে শাশ্বত এই বিশ্বেরি প্রেম চুম্বন এবং আলিঙ্গন।
ওরে বাঁশীর সুর ওই দিচ্ছে দোল,
আজ সর্ব্বজয়ী জন্ম নিতে আর যাবি কে নৌকা খোল্।

শিল্পী— শ্রীযুক্ত পান্না সেন ঐ বুঝি বাঁশী বাজে— ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়াকস্

কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মৈত্র

মানুষের কথা শুধু নৈর্ব্যক্তিক বাক্যমাত্র নয়। কথার ইন্দ্রজাল আছে সন্দেহ নেই। সাহিত্যিক যাঁরা তাঁরা বোবার মর্মবাণীকে ভাবা দেন, আমাদের মনের কথা টেনে বলেন, যেটা অবচেতনায় সুপ্ত ও লুপ্ত, তাকে জাগ্রত ও ব্যক্ত করেন মায়িক স্বপ্নের বিচিত্র আকারে। তবু আসল জলজ্যান্ত মানুষটীকে যখন দেখি তখন তাঁর রচনা উদ্ভাসিত হয় তাঁর ব্যক্তিত্বের কিরণ সম্পাতে, বিশেষতঃ যখন তাঁর প্রকৃতিতে থাকে সারল্য, স্বচ্ছতা ও প্রতিভার দীপ্তি।

একদা বাংলার ঘরে দ্বিজেন্দ্রলালের হাসির গান উচ্ছ্বসিত হয়েছিল। সে সব গান যখনই স্মৃতিতে জাগে তখনই তাঁর মুখে তাঁর গান শোনবার ছায়াচ্ছবি মনে ফুটে ওঠে। গঙ্গাস্নান ত অনেকেই করে। কিন্তু হরিদ্বারে গঙ্গোত্রীধারায় অবগাহন করবার সৌভাগ্য কজনের হয়? সে সৌভাগ্য একদিন হয়েছিল—যখন দ্বিজেন্দ্রলালের কাছে ব'সে সত্যো-রচিত গানের পর গান তাঁর মুখে শুনে মুগ্ধ হয়েছি। একটি দিনের কথা কখনো ভুলব না। শারদোৎসবের সময় একদিন তাঁর বৈঠকে নিমন্ত্রণ হয়েছে। কবি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মুদ্রাভঙ্গীর সঙ্গে "আমরা ইরাণ দেশের কাজি" এই গানটির গীতাভিনয় আমাদের শোনাচ্ছিলেন। বাঁদিকে শ্রীমান দিলীপ (বয়স তখন বোধ হয় দশের বেশী হবে না) ও ডানদিকে কন্যা মায়া দেবী সেই গানের সঙ্গে দিচ্ছেন দোহার। কবির শ্মশ্রুগুম্ফ-মুণ্ডিত মসৃণ মুখ, কিন্তু গাহিবার সময় ঘন ঘন আনাভিবিলম্বিত নিশ্ছিদ্র দাড়িতে করছিলেন ঘন ঘন অঙ্গুলি সঞ্চালন, চিরুণী দিয়ে দীর্ঘ কেশিনীর কেশ প্রসাধনের ভঙ্গীতে। জুড়িদ্বয়ও সেই সঙ্গে সমচ্ছন্দে করছিলেন নিজ নিজ শ্মশ্রুতে চম্পকাঙ্গুলির হলাকর্ষণ। ফুলের মতন দুটি কচি মুখে দাড়ি আঁচড়াবার ভঙ্গীটি ভুলবার নয়। দিলীপকুমার মাঝে মাঝে ঊর্দ্ধমুখে আড়চোখে পিতার অশ্রুকণ্ডুতির ভঙ্গিমাটি লক্ষ্য ক'রে হুবহু করছিলেন তার নকল, সেই সঙ্গে মায়াও অপাঙ্গ দৃষ্টিতে দাদার খেই ধ'রে অনুকরণ নৈপুণ্যে দেখাচ্ছিলেন কৃতিত্ব। দিলীপের গোলাপী পাঞ্জাবীর উপর জরিপেড়ে পাকানো চাদরটি কোমর বুক জড়িয়ে বাঁধা, বুক ফুলিয়ে পিছনে ঘাড় হেলিয়ে তার গর্বোদ্ধত অভিনয়টি কবির ব্যঙ্গ-সঙ্গীতকে অপূর্ব কৌতুকময় ক'রে তুলেছিল। বিশেষতঃ, বাহবা বাহবা বাজি গম্ভীর ও মিহি সুরের ধুনটী এখনো কানে বাজে। সেই সঙ্গে মনে পড়ে স্নেহময় পিতার প্রগাঢ় বাৎসল্যের বিচিত্র নিদর্শন—সেই মাতৃহীন সন্তান দুটিকে বক্ষে ধারণ ক'রে বিপত্নীক জীবনের মরুযাত্রার পথে।

কবির সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় স্বর্গীয় গিরীশচন্দ্র শর্মার গৃহে। তিনি ছিলেন কবির ভায়রাভাই—কবিপত্নীর দ্বিতীয়া অনুজার সঙ্গে গিরীশবাবুর বিবাহ হয়। গিরীশচন্দ্র তাঁর 'দ্বিজুদা'র অভিন্নহৃদয় আত্মীয় ছিলেন, আমারও ছিলেন। তাই প্রথম দর্শনেই কবি আমাকে বুকে টেনে নিলেন, চুম্বক যেমন লোহাকে টানে। গিরীশ শর্মার সম্বন্ধে কেবল একটি কথা এখানে উল্লেখ না ক'রে থাকতে পারলাম না। দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁকে একদিন বলেছিলেন, "গিরীশ, যদি কোনো দিন আমার হাতে লেখার শক্তি থাকে, তবে সেদিন তোমার একটি ছবি আঁকব।" সে ছবি সাহিত্যের চিত্রপটে রেখাঙ্কিত না হোক, যাঁরা গিরীশ শর্মার সংস্পর্শে এসেছিলেন তাঁদের হৃদয়ে হৃদয়ে চির মুদ্রিত হয়ে আছে। দ্বিজেন্দ্রলালের অকৃত্রিম বন্ধুবাৎসল্যের পরিচয় যাঁরা পেয়েছিলেন, তাঁরা জানেন তাঁর কাব্যজীবনের উৎসমূল কোথায়?

কবির বাড়ীতে বৈঠকটি ছিল হরদম তাজা। যখনই গিয়েছি প্রায়ই দেখেছি লোকের ভিড়, মিছরির টুক্‌রোতে যেমন পিঁপড়ে লাগে। তাঁর সুকিয়া ষ্ট্রীটের বাসা বাড়ীতে প্রথম "পূর্ণিমা সম্মিলনে"র উদ্বোধন হ'ল। পূর্ণিমায় পূর্ণিমায় প্রতিদিনের বৈঠকে নামত আনন্দের ঢল। মনে পড়ে দোলপূর্ণিমায় রাত্রে রবীন্দ্রনাথ এলেন শুভ্রবাসে। দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁর মুখে মাথায় দিলেন আবীর মাখিয়ে, তাঁর পট্টাম্বর রঞ্জিত হল রক্তরাগে, ভালবাসার দৌরাত্ম্য গ্রহণ করলেন কবি হাসিমুখে। সান্ধ্য আসরে সর্বদাই দেখা হত নায়কের সম্পাদক পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, কবি ৺দেবকুমার রায় চৌধুরী, ৺ললিত মিত্রের সঙ্গে (ইনি বাংলার প্রসিদ্ধ নাট্যকার ৺দীনবন্ধু মিত্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র)। বাংলার সর্বজনপ্রিয় কান্ত কবির সঙ্গে সেখানে পরিচয় হয়। তাঁর স্বরচিত হাসির গান সেদিন তাঁর মুখে প্রথম শুনলাম। রসায়ন-বিজ্ঞানীর মুখে শুনি, মৌলিক ধাতুর পরমাণুতে নানা সংখ্যার হাত আছে। সেই হাতে তারা অন্য পরমাণুদের চেপে ধরে। দ্বিজেন্দ্রলাল ছিলেন শতবাহু। বিভিন্ন প্রকৃতির বিচিত্র লোক বাঁধা পড়ত তাঁর নির্বিচার প্রীতির বন্ধনে এবং সকলে মিলে তাঁকে কেন্দ্র করে রচিত হত একটি জমাট আত্মীয়মণ্ডলী। স্বর্গীয় কবি ও সেবাব্রতী ইন্দুভূষণ রায়ের একটি গান আছে—

> "বঁধুয়া রে, ছেঁড়া ন্যাকড়ার পুঁটুলি তুই মোর,
> তোরে বুকে ক'রে আমি পাগলিনী তোর।"

এই গানটি দ্বিজেন্দ্রলাল বড় ভালবাসতেন। আমি গেলে প্রায় ওই গানটি আমাকে গাইতে হ'ত। চুপ করে চোখ বুজে শুনতেন, মাঝে মাঝে চোখ দিয়ে জল গড়াতো। সার্থক হ'ত আমার গান গাওয়া।

একবার কবি তাঁর বৈঠকে আইন জারি করলেন যে, কথাবার্তার সময় ইংরাজি শব্দ ব্যবহার করলেই অপরাধীকে একআনা জরিমানা দিতে হবে। তথাস্তু। কিন্তু বদ অভ্যাস ও অক্ষমতা এমনই যে, পদে পদে হয় পদস্খলন, না হয় তুষ্ণী অবলম্বন ছাড়া গত্যন্তর ছিল না দণ্ডের ভয়ে। একদিন কথা প্রসঙ্গে একটা ইংরাজি কথা আমার মুখ-কস্‌কে বাহির হয়ে গেল, অমনি কবি হাঁকলেন 'আপনার একআনা 'ফাইন' হল।' আমিও মহাস্ফূর্ত্তিতে বলে উঠলাম "আপনারও হ'ল, জরিমানা না ব'লে 'ফাইন' বলেছেন!' সকলে মিলে অট্টহাস্য। বাক্যস্রোত মন্দীভূত হ'য়ে আসে দেখে শেষকালটা এই ফতোয়া হ'ল যে, সহজে যে ইংরাজি কথা বা পদাংশ মুখে আসবে তাকে বাধা না দিয়ে যদি আগে, "যাকে ইংরাজিতে বলে" এই মুখবন্ধ ক'রে সেই ইংরাজি বুলি উচ্চারণ করা হয়, তবে জরিমানা মাপ হবে এবং সকলে মিলে সেই ইংরাজি শব্দ বা পদটির লাগ-সই বাংলা অনুবাদে প্রবৃত্ত হওয়া যাবে। "ছিদ্রেষণর্থা বহুলী-ভবন্তি"। সুতরাং "যাকে ইংরাজিতে বলে"—এই নলিচার আড়ালে দিব্যি ইংরাজিতে গুড়ুক ফোঁকা অভ্যস্ত হয়ে গেল। বাংলা তর্জমার দিকটা পড়ল ধামা-চাপা।

কালিদাস ত্র্যম্বকের অট্টহাস্যকে হিমালয়ের পুঞ্জিত তুষারের সঙ্গে তুলনা করেছেন। বাংলা সাহিত্যে শুভ্র হাসির ফোয়ারা খুলে দিয়েছেন দ্বিজেন্দ্রলাল। তাঁর ব্যঙ্গ গীতিকায় কশাঘাত ছিল কিন্তু বিদ্বেষ ছিল না। বুদ্ধির সঙ্গে যেখানে নিকলুষ হৃদয়ের যোগ থাকে সেখানে হিংসা বিদ্বেষের কালকূট উদ্‌গীর্ণ হয় না। আমাদের জাতীয় চরিত্রে অনেক দৌর্বল্যও অপূর্ণতা আছে। দ্বিজেন্দ্রলালের হাসির গানে এই মন্দটাই বিদ্রূপের অভিনব ছন্দ সুরে উপহাসও হয়েছে। যা কিছু সত্য সুন্দর ও কল্যাণকর কোথাও লেশমাত্র অমর্যাদা হয় নি তার। চোখে আঙুল দিয়ে আমাদের ত্রুটি প্রমাদ দেখিয়েছেন, কোনো শ্রদ্ধেয় গুণ বা আদর্শকে উপহাসাস্পদ

করবার হীনতা তাঁর অনবদ্য গানগুলিকে স্পর্শ করেনি। সুরের মৌলিকত্বে রুচির বিশুদ্ধতায় ও অম্ল মধুর রসে দ্বিজেন্দ্রলালের ব্যঙ্গ গীতি বাংলার প্রগতির ইতিহাসকে গুটিকতক রঙ্গময় স্বরলিপি চিত্রে হাস্তোজ্জ্বল ক'রে রাখবে। রোদের আলোয় অনেক রোগের বীজাণু নষ্ট হয়। এই কৌতুক সঙ্গীতের দীপ্তি অনেক কপটতা মিথ্যা ও ধাপ্পাবাজির ভূর ভেঙ্গে দিয়েছে।

ঈর্ষা দ্বেষ কুৎসা ইতরতার প্রসাদে কিরূপ পূতিগন্ধময় পঙ্কিল পল্বলের উদ্ভব হ'তে পারে, তার নিদর্শন ডোবা জঙ্গলভরা ম্যালেরিয়া-কালাজ্বর-প্রপীড়িত বাংলা দেশের আত্মীক প্রতীক যে সাহিত্য, তাতে আমরা সকলেই লক্ষ্য করেছি। কিন্তু আমরা স্বভাবভীরু, সিনেমার পিস্তল-ওচানো দুর্বৃত্তের সামনে সন্ত্রস্ত ভদ্রলোকের মত, ঊর্দ্ধ বাহু হয়ে আত্মরক্ষা করি। দুর্মুখ দুর্বৃত্ত পায় অবাধ প্রশ্রয়। মা সরস্বতীকে কুপুত্রের অনেক দৌরাত্ম্যই সহ্য করতে হয়, বরপুত্ররা যখন নিরীহ ও নির্বিবাদী। ফলে দাঁড়ায় এই, যে সর্ষে দিয়ে ভূত ছাড়াতে হবে, সেই সর্ষেতেই ভূত যেঁট হয়ে বসে। সাহিত্যের জাহ্নবী ধারায় এসে মেশে দুর্গন্ধময় নর্দমার জল। তা মিশুক, আমার গঙ্গাজলে আস্থা আছে। যে সাহিত্যের আকাশে বঙ্কিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথ দ্বিজেন্দ্রলাল শরৎচন্দ্রকে পেয়েছি, যে পূর্বাশায় নব নব তরুণ জ্যোতিষ্কের অভ্যুদয় দেখে আশায় আনন্দে বৃদ্ধের প্রাণ উৎফুল্ল হয়ে ওঠে, সেখানে এরকম দুএকটা নর্দমার উপদ্রব বরদাস্ত করা যেতে পারে। সাহিত্যের Conservancy Department এর কল্যাণে ও গৃহস্থের সতর্কতায় এর একটা সুরাহা হবেই হবে।

দ্বিজেন্দ্রলালের জাতীয় সঙ্গীতগুলি সংখ্যায় বেশী নয়। কিন্তু প্রত্যেকটি সুরের মৌনমাধুর্য্যে এবং ভাষা ও ভাবের বৈদগ্ধ্যে অতুলনীয়। তাঁর "বঙ্গ আমার জননী আমার", "ধনধান্যে পুষ্পভরা," "যেদিন সুনীল জলধি হইতে" যখন রচিত হয়েছিল তখন তাদের সদ্যোস্ফুট ছন্দসুর শুনেছিলাম কবির গম্ভীর কণ্ঠে, শুনিছি পরে দিলীপকুমারের অমৃত কণ্ঠে, আর শুনেছি বহু কণ্ঠের সমস্বরে উদ্গীত ঐক্যতানে।

আমরা সকলেই এই ভঙ্গুর দেহে মৃত্যুপথযাত্রী, যে যাত্রাপথের গানটি কবি বেঁধেছিলেন পত্নীর মৃত্যুর অব্যবহিত পরে—

"একই ঠাঁই চলেছি ভাই ভিন্ন পথে যদি"। "প্রতিমা দিয়া কি পূজিব তোমারে, নিখিল সংসার প্রতিমা তোমার"—এই গানটিতে অমৃতের চিন্ময় মূর্তি ফুটেছে ভক্ত পূজারির অধ্যাত্ম দৃষ্টিতে। সুরে ও পদলালিত্যে এ গান বাংলার শ্রেষ্ঠ ব্রহ্ম সঙ্গীতাবলির অন্যতম।

দ্বিজেন্দ্রলালের তর্ক করবার উৎসাহ ছিল অসীম। ও রোগটা আমারও ছিল! তাই দেখা হলে প্রায়ই বেধে যেতো বাক্যিক মল্ল যুদ্ধ। যে বিষয়ে সম্পূর্ণ মতের ঐক্য ছিল তাই নিয়েও বিপক্ষের হয়ে জুড়ে দিতেন তর্ক। জীবনটা এমনি রহস্যময় স্ববিরোধী ব্যাপার, যাকে ঠিক কাটা ছাঁটা সূত্রের মধ্যে বাঁধতে পারা যায় না, যার সম্বন্ধে কোন্‌টা ঠিক সত্য কোন্‌টা মিথ্যা হলপ করে বলা মুস্কিল, হয়ত যুগপৎ সত্য অবস্থা বিভেদে। সুতরাং এ ক্ষেত্রে হারলেও জিত, জিতলেও হার। হার জিতে বিশেষ কিছু আসে যায় না। তবে তাঁর সঙ্গে তর্কের ব্যায়ামে যুক্তি হত বলিষ্ঠ ও প্রয়োগকুশলী এবং যুদ্ধশ্রান্ত রসনার শ্রমাপনোদন ও পরিতৃপ্তি লাভ হ'ত গোলযোগান্তিক জলযোগে।

সেদিন রবিবার, ছুটির দিন। মুষলধারে বৃষ্টি পড়ছে। দ্বিজেন্দ্রলাল ছাতি মাথায় এসে উপস্থিত, বেলা তখন আন্দাজ দশটা হবে। ছাতিটা পাশের ঘরে খুলে কাৎ ক'রে রেখে দিলুম। কবি হেসে বল্লেন, "মানুষের যেমন খিদে পায়, কি ঘুম পায়, কি আর কিছু পায় তেমনি আজ আমার তর্ক পেয়েছে, তাই এই বর্ষায় ছুটে এলুম।" আমি বল্লুম, "বহুৎ আচ্ছা, যুদ্ধং দেহি।" কবি তাল ঠুকে বল্লেন "উর্ব্বশী কবিতাটা কিছু নয়!"

এইখানে বলে রাখি, রবীন্দ্রনাথের ওই কবিতাটি নিয়ে দ্বিজেন্দ্রলালের সঙ্গে ইতিপূর্বে একদিন জমাট আলোচনা হয়েছিল। তিনি সেদিন উর্ব্বশীর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছিলেন, আমি ত 'গণ্ডায় আণ্ডা' দিয়েছিলাম। বুঝলাম, আমার মতামতটাকে একবার ভাল করে চাক্‌নে দেখতে চান। বল্লাম—বসুন, আমি উপর থেকে গ্রন্থাবলিটা নিয়ে আসি। তারপর উর্ব্বশীকে সামনে রেখে লড়াই হবে। জয়মাল্য দেবার ভার তার হাতে। বেধে গেল তুমুল রণ। পঞ্চ নদীর তীরে নয়,

—কর্ণওয়ালিস্ street এ
বসি নিজ নিজ seat এ
দেখিতে দেখিতে মৈত্র ও রায়ে বাধিল ভীষণ রণ,
কেউ পিছ-পা নন।
একটি কণ্ঠে হাজার বুলিতে উর্ব্বশী জয়-গাথা,
—আবোল তাবোল যা' তা'
সুরেন্দ্র যত বলে,
দ্বিজেন্দ্র তারে পাল্টা জবাবে দহে বিদ্রূপানলে

বেণী পাকাইয়া নয়,
টাকে টাকে শুধু হয়
ঘন ঠোকাঠুকি জ্বলে চকমকি ঝিলিকে ঝিলিকে যেন,
বৃকপালে কভু হেন।
দ্রুত কলিশন্ হয়নি কখনো, ফাটিল না তবু মাথা,
টু-এ টু-এ মালা গাঁথা
চলিল অবাধে কণ্ঠ নিনাদে মুখরিত দশদিক,
উর্ব্বশী অনিমিখ
রহিল চাহিয়া কেতাবের পাতে মুখে নাই কোনো বাণী!
কি ভীষণ হানাহানি
ঘণ্টা তিনেক চলিল সপদি কমাও সেমিকোলনে
বিশ্রাম নাহি জানে!

আসিল দ্বিপ্রহর।
থামিল বাদল অম্বরতলে দেখা দিল দিবাকর।
আসিল বিরতি তর্ক যুদ্ধে তূণে নাই আর শর।
গ্রন্থ সাগরে ডুবিল সাগরী উর্ব্বশী সত্বর।

ঘড়িতে সবকটা বেজে গিয়ে কাঁটা পুনশ্চ একের কোঠায় প্রায় এসে পড়ে। কবি লাফিয়ে উঠে দুহাতে আমার করমর্দ্দন করে বল্লেন—"কখনো তর্কে হার মানিনি, এইবার মানলুম।" আমি বল্লুম 'জয়মাল্য আপনার, রূপসীর কাছে হার মেনেই হয় জয়লাভ।' পাশের ঘর থেকে খোলা ছাতাটা এনে দিয়ে বলি—'এই নিন আপনার জয় পতাকা।' এই তর্কের মধুর স্মৃতি আমার অন্তরে অমর হয়ে আছে।

তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণী বুদ্ধির সঙ্গে এরূপ উদার প্রেমপ্রবণ বন্ধুবৎসল হৃদয় দীর্ঘ জীবনে কম দেখেছি। সাহিত্যের ক্ষেত্রে তাঁর আত্মপ্রকাশ কিরূপ কৃতিত্ব লাভ করেছে তা সাহিত্যিকেরা বিচার করবেন। তাঁর নির্ভীক সত্যনিষ্ঠ প্রেমিক হৃদয়ের যে পরিচয় লাভ করেছিলাম তা খুদে রেখেছি তাঁর স্মৃতির সমাধি প্রস্তরের উপরে, আমার অন্তরের একটি নিভৃত কোণে।

এ জীবনে ত্রুটি দুর্বলতা অপূর্ণতা কার নেই? চিতানলের সঙ্গে সে সব ভস্মীভূত হয়ে যায়। চরিত্রে যা শাশ্বত ও চিরসুন্দর তার অনির্বাণ দীপ্তি ধ্রুবতারার মত আমাদের অন্তরে জ্বল্ জ্বল্ করে।

কথা ঃ—শ্রীনিত্যানন্দ দাস   সুর ও স্বরলিপি ঃ—কুমারী বিজন ঘোষ দস্তিদার

"শ্যামা সঙ্গীত"

(আড়ানা—তেওড়া)

পাইমা তোরে হৃদি মাঝারে নীরব আমার পূজার ধ্যানে।
পাইযে খুঁজে নয়ন মুদে তোরি নামের মন্ত্র গানে॥
বাইরে শুধু হারিয়ে তোরে
মায়ার অশ্রু পড়ছে ঝ'রে
অন্তরে তোর মূর্ত্তি হেরি মানস পূজার অবসানে॥

ফুলের পূজায় পাইনা শান্তি মনকে শুধু ভুলিয়ে রাখি,
অন্তরে মোর রেখেছি তাই তোরি রূপের ছবি আঁকি।
লোকে তোরে বলে 'শ্যামা'—
কেউবা 'কালী' কেউবা 'উমা',
আমি শুধু ডাকব গো—'মা', শিশুর মত সরল প্রাণে॥

\+ ২ ৩ + ২ ৩
II পণা -র্সর্া র্া ¦ র্সণা -র্সা | ণা পা I মা ণপা ণণা | পমা -ণপা | মজ্ঞা -া I
পা০ ০ ই মা তো০ ০ রে ০ হৃ দি মা০ ঝা০ ০ রে০ ০

\+ ২ ৩ + ২ ৩
মজ্ঞা মজ্ঞা মা | রমা -পণা | পমা -ণপা I জ্ঞমা মপা -া | সরা -া | সা -া I
নী র ব আ০ ০ ০ মা০ র্ পূ০ জা০ র্ ধ্যা০ ০ নে ০

\+ ২ ৩ + ২ ৩
সা -া রা | মজ্ঞা -মা | রা -সা I ণ্া ণ্সরা সা | ণ্দ্া -দ্ণ্া | প্া -া I
পা ই যে খুঁ ০ জে ০ ন য়০ ০ ন মু ০ ০ দে ০

\+ ২ ৩ + ২ ৩
প্ণ্া -সরা রা | রা -া | রা -া I রমা -পণা পমা | পণা -র্সর্া | ণর্সা -পণা I
তো০ ০ ০ রি না ০ মে র্ ম০ ০ণ্ ত্র০ গা০ ০ ০ নে০ ০ ০

\+ ২ ৩ + ২ ৩
মা মা পা | রমা -পণা | পমা -মজ্ঞা I জ্ঞমা মপা -া | সরা -া | সা -া II
নী র ব আ০ ০ ০ মা০ র্ পূ০ জা র্ ধ্যা০ ০ নে ০

+ ২ ৩ + ২ ৩
II মা -া পা | ণদা -ণদা | দা -ণা I ণা -ণা র্সা | র্র্সা -ণর্সা | ণর্সা -া I
বা ই রে শু ০ ধু ০ হা রি য়ে তো০ ০০ রে০ ০

+ ২ ৩ + ২ ৩
পা পণা -ণর্সা | র্সা -া | র্সা -া I ণা -র্সা র্সা | দা -ণা | পা -া I
মা য়া০ ০য়্ অ ০ শ্রু ০ প ড়্ ছে ঝ' ০ রে ০

+ ২ ৩ + ২ ৩
পণা -র্সর্রা র্রা | র্রা -া | র্রা -া I র্মজ্ঞা -া জ্ঞর্মা | র্সর্রা -া | র্সা -া I
অ০ ০ন্ ত রে ০ তো র্ মূ র্ তি০ হে০ ০ রি ০

+ ২ ৩ + ২ ৩
পা র্র্সা র্সা | ণপা -মণপা | মজ্ঞা -া I সরা রমা -মপা | পা -া | পা -া I
মা ন০ স পূ০ ০০০ জা০ র্ অ০ ব০ ০০ সা ০ নে ০

+ ২ ৩ + ২ ৩
মা মা পা | রমা -পণা | পমা -ণপা I জ্ঞমা মপা -া | সরা -া | সা -া II
নী র ব আ০ ০০ মা০ র্ পূ০ জা০ র ধ্যা০ ০ নে ০

+ ২ ৩ + ২ ৩
II সা সা -া | রা -া | রা -া I মজ্ঞা -া জ্ঞমা | সরা -া | সা -া I
ফু লে র্ পূ ০ জা য্ পা ই না০ শান্ ০ তি ০

+ ২ ৩ + ২ ৩
সা রা মা | মা -া | মজ্ঞা -া I জ্ঞমা মপা পা | পা -া | পা -া I
ম ন্ কে শু ০ ধু০ ০ ভু০ লি০ য়ে রা ০ খি ০

+ ২ ৩ + ২ ৩
দা -া দা | দণা -দণা | পা -া I মা -পা ণণা | পমা -পা | মা -জ্ঞা I
অন্ ০ ত রে০ ০০ মো র্ রে ০ খে০ ছি০ ০ তা ই

+ ২ ৩ + ২ ৩
রা -মা মা | রা -া | সা -ণ্া I প্ণ্া সরা -া | রসা -া | সা -া I
তো ০ রি রূ ০ পে র্ ছ০ বি০ ০ আঁ০ ০ কি ০

+ ২ ৩ + ২ ৩
সা রা -মা | পা -া | পা -া I ণদা দা -া | দণা -দণা | পা -া I
লো কে ০ তো ০ রে ০ ব লে ০ শ্যা০ ০০ মা ০

\+ ২ ৩ + ২ ৩
মপা -ণা ণা | ণা -া | ণা পা I পণা -ণর্সা র্সা | র্সা -া | র্সা -া I
কেউ ০ বা কা ০ লী ০ কেউ ০০ বা উ ০ মা ০

\+ ২ ৩ + ২ ৩
মা মপণর্সা -র্রা | র্রা -া | র্রা -া I র্মজ্ঞা -া জ্ঞা | জ্ঞা -জ্ঞর্মা | জ্ঞর্মা -া I
আ মি০০০ ০ শু ০ ধু ০ ডা০ ক্ ব গো ০০ মা ০ ০

\+ ২ ৩ + ২ ৩
-া র্রা -া | -া -া | -া -া I র্সর্রা -ণর্সা -ণর্সা | -া -া -া -া I
০ ০ ০ ০ ০ ০ মা০ ০০ ০০ ০ ০ ০ ০

\+ ২ ৩ + ২ ৩
পা র্রর্সা -ণর্সা | ণপা -মপা | মজ্ঞা -া I সরা রমা -মপা | পা -া পা -া I
শি শু০ ০র্ ম০ ০০ ত০ ০ স০ র০ ০ল্ প্রা ০ ণে ০

\+ ২ ৩ + ২ ৩
মা মা পা | রমা -পণা | পমা -ণপা I জ্ঞমা মপা -া | সরা -া | সা -া II II
নী র ব আ০ ০০ মা০ র্ পু০ জা০ র্ ধ্যা০ ০ নে ০

মাথুর

কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায়

আপনারে সংগোপন করি কত দিন র'বে
শ্রীমধুসূদন,
গোকুলের সখাদের সখীদের লীলা রসে
করি নিমগন ?

সখারা চড়িল কাঁধে মানিনী ধরাল পায়ে
হইয়া ভামিনী,
জননী খাওয়াল ননী, কহিল কঠোর কটু
ব্রজের কামিনী।

লীলার মাধুর্য্য ভুলি অসতর্ক একদিন
দেখালে বিভূতি,
তব পীতবাস ভেদি বিকীর্ণ হইল কবে
ভাগবতী দ্যুতি।

গোকুলের সখা-সখী চাহিল স্তম্ভিত নেত্রে
কুণ্ঠা ভয়াতুর,
হয়ে গেল স্বপ্নভঙ্গ সমাপ্ত লীলার রঙ্গ
জলিল মাথুর !

মাধুর্য্য বিদায় নিল ঐশ্বর্য্যের বাধা এলো
জীবনের পথে,
গোষ্ঠের রাখাল তুমি, তব দূর্বাসন ভুলি
আরোহিলে রথে।

সে রথ ত মনোরথ, হৃদয় দলিয়া গেল।
কোথায় অক্রুর ?
মন ছাড়া কোথা পাবে ? মানসেই বৃন্দাবন
আর মধুপুর।

যুগে যুগে দেশে দেশে এই লীলা অভিনীত
মানুষের মনে
কৃতাঞ্জলি দাস্যভাব মাথুর ঘটায় হায়
প্রেমের স্বপনে।

সাক্ষী

শ্রীচিত্রিতা গুপ্ত বি-এ

'ওগো-শুনেছ, সাবিত্রীকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না ; কাল রাত্তিরেই বাড়ী ছেড়ে নাকি কোথায় চলে গেছে ?'

উপরের পাঠাগারে বসিয়া সমাপ্তপ্রায় নাটকখানি লইয়া পড়িয়াছিলাম। ভোরের দিকে এই স্বল্প সময়টুকু কাটছাঁট করিয়া সাহিত্য-চর্চ্চার জন্য রাখিয়াছি। ঘড়িতে সাতটা বাজিতে না বাজিতেই নিচের বৃহৎ ঘরখানি মামলাবাজ মক্কেলদের সমাগমে ভরিয়া যাইবে, আর বীণাপাণির সাধনা অসমাপ্ত রাখিয়া ছুটিতে হইবে আমাকে কমলার বরপুত্রদের মনোরঞ্জনে। কিন্তু এমনই অদৃষ্টের পরিহাস, নাটকের নায়িকার উক্তিটি লিপিবদ্ধ করিতে সবেমাত্র কলমটি উদ্যত করিয়াছি, এমন সময় ঝড়ের বেগে গৃহিণী সম্মুখে আসিয়া এই নির্ঘাত সংবাদটি শুনাইয়া দিলেন ; উপরন্তু শ্লেষের সুরে মন্তব্যও করিলেন—তুমি ত অদ্ভুত লোক দেখছি, এই নিয়ে মহা হৈ চৈ পড়ে গেছে ওবাড়ীতে, পাড়ার লোক ভেঙ্গে পড়েছে, আর তুমি দিব্যি নিশ্চিন্ত হয়ে বসে বসে লিখছ !

সংবাদটা শুনিবামাত্রই মস্তিষ্কের স্নায়ুপুঞ্জে এমন একটা ঝাঁকুনি লাগিল, আর সেই সঙ্গে সমস্ত অন্তরটা মোচড় দিয়া উঠিল যে, স্ত্রীর কথার উত্তরে প্রতিবাদ করিবার মত কিছু পাইলাম না ; বরং স্মৃতিপথে গত রাত্রির অস্পষ্ট দৃশ্যটি ছায়ার মত ভাসিয়া উঠিয়া আমাকে যেন বিহ্বল করিয়া তুলিল।—রাত্রির দুঃসহ গরম উপেক্ষা করিয়া গৃহিণী যখন অকাতরে গভীর নিদ্রার কোলে দেহখানি সমর্পণ করিয়াছিলেন, আমি তখন সহধর্ম্মিণীর প্রতি বিরামদায়িনী দেবীটির এই পক্ষপাতিত্বে বোধ হয় ঈর্ষান্বিত হইয়া উঠিয়াছিলাম। নিজের অজ্ঞাতে ধীরে ধীরে কখন যে কক্ষের বাহিরে আসিয়া উন্মুক্ত ছাদের আলিসাটির গায়ে ভর দিয়া দাঁড়াইয়াছিলাম ঠিক মনে পড়ে না। বাহিরের নির্ম্মল বায়ুর মেদুর পরশ এবং অন্ধকারাচ্ছন্ন প্রকৃতির গভীর সৌন্দর্য্যের আকর্ষণ যুগপৎ বুঝি আমার শ্রান্ত দুটি চক্ষুকে তন্দ্রাতুর করিয়াছিল—সহসা কি একটা শব্দে তন্দ্রা ভাঙ্গিয়া যায়, সঙ্গে সঙ্গে দুই চক্ষুর অস্পষ্ট দৃষ্টি অদূরবর্ত্তী রাজপথে নিবদ্ধ হইতেই স্তব্ধ বিস্ময়ে অনুভব করি, যেন ছায়ামূর্ত্তির মত এক অবগুণ্ঠনবতী পাশের বাড়ীর পিছন দিয়া বাহির হইয়া নিঃশব্দে রাস্তার ধারে গ্যাস পোষ্টটির পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল। প্রথমে ভাবিয়াছিলাম, তন্দ্রাচ্ছন্ন দৃষ্টিতে বুঝি দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া স্বপ্ন দেখিতেছি। কিন্তু দুই হাতে জোরে জোরে দুই চক্ষু রগড়াইয়া তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে রাস্তার দিকে চাহিতে যাহা দেখিলাম, তাহাতে মূর্ত্তিটির অস্তিত্ব সম্বন্ধে আর কোন সন্দেহই রহিল না ; গ্যাসের অস্পষ্ট আলোকে তখন দেখিলাম—মুখের অবগুণ্ঠনটি দুই হাতে তুলিয়া সে যেন গভীর দৃষ্টিতে পশ্চাতের পদচিহ্নগুলির সহিত সমস্ত বাড়ীখানি দেখিয়া লইল, পরক্ষণেই মুখ ফিরাইয়া ক্ষিপ্রপদক্ষেপে সম্মুখের রাস্তাটি ধরিয়া মাতালের মত টলিতে টলিতে গঙ্গার অভিমুখে ছুটিল।

ছাদের আলিসাটি ধরিয়া মর্ম্মর মূর্ত্তিটির মতই স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া আমি সে দৃশ্য দেখিয়াছি। গ্যাসের মৃদু আলো তাহার অবগুণ্ঠনমুক্ত অশ্রুময় সুন্দর মুখখানির উপর প্রতিফলিত হইতেই চিনিয়াছিলাম—সে আর কেহ নহে, পাশের বাড়ীর কুললক্ষ্মী সাবিত্রী। তাহার এইভাবে আবির্ভাব ও অন্তর্দ্ধানের পিছনে কি রহস্য প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে, সমগ্র অন্তরের জাগ্রত অনুভূতি দিয়া তাহা উপলব্ধিও করিয়াছি, কিন্তু হায়! তাহার কোন প্রতিবিধানই আমার পক্ষে সম্ভবপর হয় নাই। ইচ্ছা করিলে আমি হয়ত তাহার যাত্রাপথে প্রতিবন্ধক হইতে পারিতাম ; অন্তত, সেই নিশীথ রাত্রির নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া সুপ্ত পল্লীকে জাগাইয়া তোলা সে সময় কঠিন হইত না ; এমন কি, যেমন নিঃশব্দে সে বাহির হইয়াছিল—তেমনই নিঃশব্দেই তাহাকে ফিরাইয়া পিছনের পথটি দিয়া পুনরায় গৃহপ্রবিষ্ট করা শুধু আমার পক্ষেই তখন সহজসাধ্য ছিল ; কিন্তু এতগুলি সুযোগ-সুবিধা সত্ত্বেও আমি সে সম্বন্ধে কিছুই করিতে পারি নাই, মোহাবিষ্ট ও অভিভূতের মতই তাহার অবস্থা কেবলমাত্র উপলব্ধিই করিয়াছি, নিষ্পলক দৃষ্টিতে সেই অভাগিনীর মহাপ্রস্থানের মর্ম্মস্পর্শী দৃশ্যটি দেখিয়াছি ; কাহাকেও এ পর্য্যন্ত কোন কথা বলি নাই—বলা আবশ্যকও মনে করি নাই। অথচ যে বিয়োগান্ত নাটকের শেষ দৃশ্যটি গত রাত্রিতে আমার সম্মুখেই অভিনীত হইয়াছে এবং আমি ছিলাম যাহার একমাত্র মৌনমুগ্ধ প্রত্যক্ষ দর্শক—তাহারই কল্পিত অসম্পূর্ণ ও মনগড়া একটা কাহিনী লোকমুখে শুনিয়া সহধর্ম্মিণী রুদ্ধনিশ্বাসে আমাকেও শুনাইতে আসিয়াছেন !

বুঝিতে বিলম্ব হয় নাই যে, পাশের বাড়ীর বধূটির ব্যাপারে গৃহিণী অত্যন্ত বিচলিতা হইয়াছেন এবং ততোধিক বেদনা পাইয়াছেন আমাকে এ ব্যাপারে নিশ্চিন্ত ও একেবারে উদাসীন দেখিয়া ; কেননা এই বধূটির প্রতি আমি যে কতটা সহানুভূতি-সম্পন্ন ছিলাম, তিনি ভাল ভাবেই তাহা জানিতেন। আপনারাও নিশ্চয়ই এ-ব্যাপারে আমার প্রতি অপ্রসন্ন হইয়াছেন এবং আপনাদের এই বিরাগ যে অসঙ্গত নয়—তাহাও বুঝিতেছি। আমার মত এক মার্জ্জিত-রুচি সাহিত্যভাবাপন্ন শিক্ষিত ব্যক্তির চক্ষুর উপর দিয়া এমন একটা শোচনীয় ঘটনার স্রোত বহিয়া গেল, প্রচুর শক্তি সামর্থ্য ও সুযোগ সত্ত্বেও আমি তাহাতে নির্লিপ্ত রহিলাম—এই চিন্তাই যে আপনাদিগকে ব্যথিত করিয়াছে, তাহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই।

কিন্তু এখন প্রশ্ন হইতেছে, কেন এরূপ হইল ? কেন আমি নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া একাকী সেই শোচনীয় দৃশ্যটির অভিনয় দেখিলাম ? গৃহস্থের অজ্ঞাতে গৃহের বধূটি মরণের পথে উন্মত্ত আবেগে ধাবিত হইয়াছে জানিয়াও কেন তাহাকে গৃহে ফিরাইবার চেষ্টা করিলাম না ?—এই প্রশ্নগুলির উত্তর দিতে হইলে শুধু গত রাত্রিতে অভিনীত এই বিয়োগান্ত নাটকখানির শেষ দৃশ্যটির উল্লেখ করিলে চলিবে না, ইতিপূর্ব্বে সংগোপনে ও সর্ব্বসমক্ষে যে দৃশ্যগুলি অভিনীত হইয়া গিয়াছে এবং স্থলবিশেষে আমাকেও যাহার উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করিতে হইয়াছে—

স্মৃতিপৃষ্ঠা হইতে চয়ন করিয়া সেই মর্ম্মস্পর্শী দৃশ্যগুলি আপনাদের কৌতূহলী চক্ষুর উপর তুলিয়া ধরিতে হইবে। এই বাস্তব জীবন-নাটকের পৃষ্ঠাগুলিই আমাদের চোখে আঙুল দিয়া দেখাইয়া দিবে —মানুষের মন ও জীবন সম্বন্ধে আমাদের ধারণা কত অস্পষ্ট, অজ্ঞতার মাপকাঠি দিয়া কত বড় আনাড়ীর মত আমরা মানুষের প্রকৃতির বিচার করিয়া থাকি। সেই কথাই বলিতেছি।

আমাদের উপরের ঘরের বারান্দায় দাঁড়াইলে পাশের বাড়ীর উঠানটির কিয়দংশ, সিঁড়ি ও খিড়কীর ছোট দরজাটি স্পষ্ট দেখা যায়। আমাব শয়নকক্ষ হইতে প্রতিবেশিনী বধূটির ঘরখানিও নজরে পড়ে। এই বধূটিকে লইয়াই আমাদের কাহিনী,তাহার নাম সাবিত্রী। ঘটনাচক্রে পাশের বাড়ীর এই অভাগিনী তরুণী বধূটি এ-বাড়ীর নিঃসন্তান দম্পতির আলোচনার বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়া-ছিল। আমার স্ত্রী বধূটিকে এমনই ভালবাসিয়া ফেলিয়াছিলেন যে, তাহার অভাব-অভিযোগ সম্বন্ধে খুঁটিনাটি অনেক কথাই আমাকে শুনাইতেন।

আমার বয়স হইয়াছে অর্থাৎ যে বয়সে মন বায়ুময় ঘোড়ায় চড়িয়া দিক্‌দিগন্তে ছুটিয়া চলে কল্পিত দুর্লভ পদার্থের সন্ধানে, যে বয়সে আদর্শ ও বাস্তবের সমন্বয় সাধনে অসমর্থ হইলে জীবন ব্যর্থ মনে হয়, সে বয়স আমি পার হইয়া আসিয়াছি। তাহার উপর ওকালতী ব্যবসায়ে ক্রমবর্দ্ধমান খ্যাতি আমার প্রকৃতিকেও রীতিমত গম্ভীর করিয়া তুলিয়াছে। সুতরাং প্রতিবেশিনী বধূটির সম্বন্ধে ঔৎসুক্য বা উৎকণ্ঠা মাত্রা অতিক্রম করিতে পারে নাই। স্ত্রীর মুখে ইহাদের সম্বন্ধে নীরবে যাহা শুনিতাম, তাহা এই :

সাবিত্রীর স্বামীর নাম পরেশ। পরেশের বিবাহিত জীবনের পশ্চাতে নাকি একটা রোমান্স আছে। বাল্যকাল হইতে সে একটি মেয়েকে ভালবাসিয়াছিল। কিন্তু পিতা মাতার অনিচ্ছা তাহাতে প্রবল অন্তরায় হইয়া দাঁড়ায়। ফলে যৌবনে পদার্পণ করিয়াই পরেশকে সুবোধ বালকের মত বাল্যপ্রেমের বন্ধন ছিন্ন করিয়া প্রচুর অর্থের সহিত সালঙ্কারা সাবিত্রীর পাণিগ্রহণ করিতে হয়। এই বিবাহ-ব্যাপারে পিতা মাতার ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ তুলিতে সে সাহস পায় নাই বটে, কিন্তু পরিণীতা নিরপরাধিনী পত্নীর প্রতি অবহেলার আঘাত দিতে তাহাকে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত দেখা যায় নাই। স্বামীর আশা ভঙ্গের মনস্তাপ বেচারী বধূকেই নির্ব্বিচারে বরণ করিয়া লইতে হয়। পরেশের মতে তাহার বিবাহ-ব্যাপারে কাঞ্চন ও কামিনী পিতা-পুত্রের মধ্যে তুল্যাংশে ভাগা-ভাগি হইয়াছে ; পিতা লইয়াছেন কাঞ্চন, তাহার অংশে পড়িয়াছে কামিনী—অর্থাৎ অভাগিনী বধূ সাবিত্রী। সুতরাং তাহার অংশলব্ধ সম্পত্তির উপর সে যদৃচ্ছা ব্যবহার করিবার অধিকারী। সহধর্ম্মিণীর প্রতি স্বামীর এই অভিমত বধূ সাবিত্রী নীরবেই শুনিত, কোন প্রতিবাদ কোনদিন করে নাই। বরং এহেন হৃদয়হীন স্বামীর প্রতি তাহার নিষ্ঠাপূর্ণ অনবদ্য আচরণ বাড়ীর সকলকে চমৎকৃত করিয়া দিত।

পরেশের দৃষ্টিতে সাবিত্রী ছিল—কালপেঁচী। অসঙ্কোচেই সে সাধ্বী স্ত্রীর প্রতি এইরূপ মন্তব্য প্রয়োগ করিত। কিন্তু সাবিত্রী কোনদিনই তাহা গায়ে মাখে নাই। অথচ, দেখিতে সাবিত্রী খারাপ ত নয়ই, বরং তাহার শ্যামল মুখশ্রীর উপর দৃষ্টি পড়িলেই মনে হয়, অনুপম শান্ত সৌন্দর্য্যে বিকশিত হইয়া সর্ব্বদাই যেন ঝলমল করিতেছে ; তাহার নির্ম্মল ললাট ও দীর্ঘায়ত স্বচ্ছ দুইটি চক্ষু হইতে সরল ভক্তির এমন একটি আভা বিচ্ছুরিত হইতেছে—দূরাগত সঙ্গীতের মতই যাহা চিত্তকে আকৃষ্ট করে। স্বামীর স্নেহ সে পায় নাই বলিয়া, নারী হৃদয়ের স্বাভাবিক অভিমান ভুলিয়া সেই দুর্লভ বস্তুর জন্য সে যেন সর্ব্বক্ষণই কঠোর সাধনায় রত।

প্রবৃত্তির স্রোতের আবেগে স্বামীকে বিপথগামী দেখিয়াও তাহার এই কঠোর সাধনা কোনদিন ভঙ্গ হয় নাই। সে জানিত, যে বাল্য-প্রণয়কে উপলক্ষ করিয়া স্বামী তাহাকে বঞ্চিত করিয়াছে, বিবাহের পর সেই রূপজ মোহের স্রোত শহরের রূপজীবিনীদের রঙমহলে পর্য্যন্ত গড়াইয়াছে। আশাভঙ্গ স্বামী গণিকাবিলাসে তৃপ্তির জন্য লালায়িত, কিন্তু অতৃপ্তা পত্নীর দিকে তাঁহার দৃষ্টি নাই। তথাপি গণিকালয়-প্রত্যাবৃত্ত স্বামীর প্রতীক্ষায় দীর্ঘরাত্রি পর্য্যন্ত সাবিত্রী তাহার শয়নকক্ষের গবাক্ষে বসিয়া থাকিত, স্বামীর সাড়া পাইবামাত্র নিঃশব্দে নিদ্রিত ভবনের দ্বার খুলিয়া দিত। কোন প্রশ্ন তাহার মুখে উঠিত না, চোখে কোন অভিযোগ প্রকাশ পাইত না, ভঙ্গিতে কোনরূপ বিরক্তিও ধরা দিত না ; সযত্নে স্বামীকে আহার করাইয়া বাংলা দেশের আদর্শ স্ত্রীর মতই সে স্বামীর পদসেবা করিতে বসিত এবং অল্পক্ষণ পরেই তাহার নাসিকাগর্জ্জন শুরু হইলে ঘরের মেঝেয় বিছানো ছোট মাদুরটিতে গিয়া শয়ন করিত। এইভাবে স্বামী-সান্নিধ্যটুকু লাভ করিয়াই সে বুঝি আনন্দে অভিভূত হইয়া পড়িত, কিছুক্ষণের জন্য বোধ হয় দেবতার নিকট স্বামীর প্রসন্নতা প্রাপ্তির নিষ্ফল প্রার্থনাটুকু জানাইতেও ভুলিয়া যাইত। এই ত গেল স্বামীর ব্যবহার। ইহার উপর শাশুড়ী ও অন্যান্য পরিজনদের আচরণও অল্প বেদনাদায়ক নয়। সাবিত্রী কিন্তু নীরবেই সকল অত্যাচার সহ্য করিতে অভ্যস্ত হইয়াছিল।

স্ত্রীর মুখে এই পরিবারটির সম্বন্ধে এমনি করিয়া অনেক কথাই শুনিতাম। সময় সময় বধূটির সহনশীলতার কথাও হয় ত মনে মনে ভাবিতাম, ক্বচিৎ কখন দৃষ্টিপথে পড়িলে বুঝি সহানুভূতির দৃষ্টিতে চাহিয়াও দেখিতাম, সমবেদনায় অন্তরটি তৎক্ষণাৎ দুলিয়া উঠিত।

সেদিন কি একটা পর্ব্বোপলক্ষে ছুটি থাকায় নিশ্চিন্ত মনে নাট্যসাধনায় ব্রতী হইয়াছিলাম। প্রায় সমস্ত দিন অবিশ্রান্ত-ভাবে লেখনী চালাইবার পর একটি অঙ্কের শেষাংশে আসিয়া লেখনী যেন স্তব্ধ হইয়া থামিয়া গেল। যে কথাটির পর প্রথম অঙ্কের যবনিকা পড়িবে, সেই কথাটি শ্রান্ত লেখনীর মুখে যেন আটকাইয়া গিয়াছে। চিন্তাশক্তির উপর আর জবরদস্তি না করিয়া উপসংহারটি গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত মুলতুবী রাখিলাম।

সে রাত্রিও ছিল এমনই অন্ধকার, কৃষ্ণপক্ষের ত্রয়োদশী কিম্বা চতুর্দ্দশী তিথি হইবে। দ্বিপ্রহর অতীত হইয়া গিয়াছে, চারিদিক নিস্তব্ধ, সমস্ত পল্লী যেন ঘুমঘোরে আচ্ছন্ন। নিশীথ রজনীর এই নিস্তব্ধতার সুযোগটুকু লইয়া নিঃশব্দে সে একাকী উন্মুক্ত বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইল। মানস-পটে তখন আমার নাটকের নায়িকার উত্তেজিত মুখশ্রী মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে, তাহার মুখের দুই ছত্র পরিমিত একটি সংলাপের উপরেই নাট্যবর্ণিত নায়কের জীবন-মরণ নির্ভর করিতেছে। সেই দুইটি ছত্রের শব্দগুলি আমার

মস্তিষ্কের ভিতরে যেন দৌড়ঝাঁপ শুরু করিয়া দিয়াছে। কিন্তু তখন কি একবারও কল্পনা করিয়াছিলাম যে, পাশের বাড়ীতে আর একখানি বাস্তব নাটকের বিয়োগান্ত দৃশ্যটিই প্রথমে চোখের সামনে অভিনীত হইতে দেখিব? রাত্রির সে দৃশ্যটি মনে পড়িলে এখনও সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠে।

…গৃহ হইতে এক অবগুণ্ঠনবতী বাহির হইয়া আসিয়া আস্তে আস্তে পরেশদের খিড়কীর দরজাটি খুলিয়া দিল। তাহার পরিধেয় শাড়ীর দীর্ঘ অঞ্চলে দক্ষিণ বাহুটি আবৃত ছিল। দ্বার উন্মুক্ত হইতে চব্বিশ পঁচিশ বৎসরের এই সুশ্রী যুবা ভিতরে প্রবেশ করিল, তাহার মুখ ও চক্ষু দিয়া যেন পুলকের ঝলক বাহির হইতেছিল। অবগুণ্ঠিতা ক্ষিপ্রহস্তে দরজাটি যেমন বন্ধ করিয়াছে, যুবা তাহাকে বাহুপাশে আবদ্ধ করিতে আগাইয়া গেল। সে কিন্তু তৎক্ষণাৎ মাথার অবগুণ্ঠন খসাইয়া হাসিয়া উঠিল। সে হাসি কি কর্কশ! দুই চক্ষু কপালে তুলিয়া দেখিলাম, সে আর কেহ নহে—সাবিত্রীর স্বামী পরেশ। আগন্তুক যুবকটিও বোধ হয় আমার মতই বিস্ময়ে স্তব্ধ হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু পরেশ তাহাকে আর আত্ম-সম্বরণের সুযোগ দিল না, সাড়ীর আঁচলে আবৃত তীক্ষ্ণধার দা খানি দুই হাতে তুলিয়া সে স্তম্ভিত যুবাকে আক্রমণ করিল। নিষ্ঠুর আঘাতের শব্দ আক্রান্ত যুবার উচ্চ আর্ত্তস্বরে মগ্ন হইয়া গেল, নিশীথ রাত্রির নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া ধ্বনি উঠিল—খুন করলে বাঁচাও। দেখিতে দেখিতে ভিতরে বাহিরে ভীড় জমিয়া গেল। পরেশের স্ত্রী সাবিত্রী, তাহার বৌদি, মা ও অন্যান্য পরিজনেরা উঠানে আসিয়া পরেশকে সামলাইতে ব্যস্ত। উন্মত্তের মত আঘাতের উপর আঘাত হানিয়া পরেশ তখন শ্রান্ত হইয়া হাতের অস্ত্র ত্যাগ করিয়াছে, উঠানের একপাশে যুবার প্রাণহীন দেহ রক্তস্রোতে ভাসিতেছে। চীৎকার শুনিয়া প্রতিবেশীরা দরজায় ঘন ঘন আঘাত দিয়া জানিতে চাহিতেছে, ব্যাপার কি!

যেমন আচম্বিতে এত বড় একটা দুর্ঘটনা ঘটিয়া গেল, পরের ব্যবস্থাগুলিও তদ্রূপ তৎপরতার সহিত সম্পন্ন হইতে কোনরূপ ব্যতিক্রম দেখা গেল না। পুলিসের ইন্সপেক্টর আসিলেন, তদন্ত করিলেন, লাস যথাস্থানে পাঠাইয়া পরেশকে গ্রেপ্তার করিয়া রাত্রির মত বিদায় লইলেন।

দুর্ঘটনার সময় সাবিত্রীকে যখন প্রথম দেখি, বেশ মনে আছে, তাহার দুই চক্ষু যেন জ্বলিতেছিল। কিন্তু খুনের দায়ে পরেশকে যখন পুলিস গ্রেপ্তার করিয়া লইয়া গেল, তাহার দুই চক্ষু দিয়া বুঝি অশ্রুর বন্যা নামিয়া আসিল!

পরদিন প্রত্যূষে—তখনও ভাল করিয়া সূর্য্যোদয় হয় নাই—গৃহিণী আসিয়া খবর দিলেন, সাবিত্রী, তাহার শাশুড়ী ও জা পার্শ্বের কক্ষে অপেক্ষা করিতেছে। তাহারা পরেশের মামলা চালাইবার সম্পূর্ণ ভার আমার উপরেই দিতে চায়। সাবিত্রী তাহার সমস্ত অলঙ্কার আনিয়া আমার স্ত্রীর পায়ের কাছে ঢালিয়া দিয়াছে—সেগুলি নাকি তাহার দিদিমার যৌতুক, সেকেলে ভারী ভারী গহনা। তাহার একান্ত প্রার্থনা, গহনাগুলি বিক্রয় করিয়া মকদ্দমা চালাইতে হইবে। তাহাদিগকে আমার বসিবার ঘরে ডাকিলাম। সাবিত্রীর শাশুড়ী ঘটনার বিবরণটি এইভাবে আমাকে শুনাইলেন—নিহত যুবকটীর নাম রজনী; সে অদূরবর্ত্তী এক মেসে থাকিয়া কোন এক প্রেসে কাজ করে। ঘটনার কিছুদিন পূর্ব্ব হইতে সাবিত্রী ও তাহার জা, লক্ষ্য করে যে রজনী সুযোগ পাইলেই সাবিত্রীর দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকে। ক্রমশ ইহা যেন তাহার বাতিক হইয়া দাঁড়ায়, সাবিত্রীর সাড়া পাইলেই সে তাহার বিশেষ স্থানটিতে আসিয়া বেচারীকে ক্ষুধিত দৃষ্টির দ্বারা বিদ্ধ করিতে থাকে। ফলে সাবিত্রীর চলা ফেরাও মুস্কিল হইয়া উঠে। ঘটনার দুই দিন আগে সে সাবিত্রীকে লক্ষ্য করিয়া নানারূপ ইসারা করে এবং পরে একটী প্রকাণ্ড গোলাপের তোড়া তাহাকে উপহার দিবার ছলে বাড়ীর ছাদে ফেলিয়া দেয়। ইতরটার আচরণে অতিষ্ঠ হইয়া সাবিত্রীর শাশুড়ী ব্যাপারটি পরেশকে জানাইয়া প্রতিবিধান করিতে বলে। উপেক্ষিতা পত্নীর প্রতি অন্যের আসক্তি এবার পরেশকে ক্ষিপ্ত করিয়া তুলে। পরদিন কোথা হইতে এক বৃহৎ দা সংগ্রহ করিয়া খাটের নীচে লুকাইয়া রাখে। ঘটনার একটু আগে সাবিত্রীর বড় জা দেখিতে পায় যে পরেশ তাহার স্ত্রীর কাপড় পরিয়া জানলায় দাঁড়াইয়া রজনীকে ইসারা করিতেছে। তাহার পর যে দুর্ঘটনা ঘটে, তাহা ত আর অবিদিত নহে।

স্পষ্ট বুঝিলাম ইহা deliberate খুন—রীতিমত আগে হইতে plan করিয়া ঠিক করা। সুতরাং কেমন করিয়া ইহাকে বাঁচাইব? তাহা ছাড়া নরঘাতী পাষণ্ডকে কেনই বা বাঁচাইব। অর্থের কথা গণ্যই করি না—এই অভাগীর গহনা লইতে প্রবৃত্তিও নাই।—কহিলাম, এ খুন ইচ্ছাকৃত। বাঁচান যায় না। এতক্ষণে সাবিত্রী কথা কহিল। তাহার বিশাল সজল নয়নের দৃষ্টি আমারই মুখের উপর নিবদ্ধ করিয়া কহিল—"খুনের বদলে যদি আইনের বিধি হয় আমার প্রাণ দিয়েও তাকে বাঁচান যায় না?"

কথাটা মনে আঘাত দিল। কহিলাম—যায়, তবে প্রাণ দিয়ে নয়—প্রাণের চেয়েও দামী জিনিষ—তোমার নারীত্বের শুভ্রতার উপরে কলঙ্কের কালির ছোপ দিয়ে বাঁচান যায় তোমার স্বামীকে।

দিব্য সহজকণ্ঠে সে কহিল—তাহলে বলুন কি করতে হবে?

একটু থামিয়া বক্তব্য বিষয়টা ভাবিয়া লইয়া এবং একটু শক্ত হইয়াই বলিলাম—'কলঙ্কের কালি নিজের হাতে সারা মুখখানায় মাখতে হবে অর্থাৎ কোর্টে সকলের সামনে দাঁড়িয়ে হলপ করে বলতে হবে যে, তুমিই রজনীকে ইসারা করে ডেকে এনেছিলে—তারপরে দরজা খুলে দিতে সে যখন তোমাকে জড়িয়ে ধরতে যায়, ঠিক সেই সময় তোমার স্বামী সেখানে এসে দুজনকে সেই অবস্থায় দেখে ক্রোধে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে, সঙ্গে সঙ্গে উঠানের এক পাশে যে কুড়ুলটা পড়ে ছিল, তাই দিয়ে ওর মাথায় পাগলের মত আঘাত করতে থাকে।'—কথাগুলি বলিয়া একবার সাবিত্রীর মুখের দিকে চাহিলাম। ভাবিলাম—মেয়েটা একেবারে নিবিয়া যাইবে, কোন মেয়ে কি এমন করিয়া কলঙ্কের ডালি মাথায় লইতে পারে? কিন্তু সাবিত্রী উৎসাহে দীপ্ত হইয়া উঠিল, কহিল—'শুধু এই? নিশ্চয় বলব।'

ইহার পরও তাহাকে আর কোন প্রশ্ন করিতে প্রবৃত্তি হইল না। শুধু তাহার শাশুড়ীকে বলিলাম—"কোর্টে, উকিল, ব্যারিষ্টার, জজ এবং তাছাড়াও অসংখ্য লোকের সামনে কলঙ্ক রটনা হবার পর বউকে আপনারা ঘরে নেবেন

ত?" শাশুড়ী আমাকে কিছুই বলিলেন না, কিন্তু কাঁদিতে কাঁদিতে বধূর মস্তক বক্ষে চাপিয়া ধরিয়া কহিলেন—"মা আমার বাছাকে ফিরিয়ে আন্—তোকে চিরকাল মাথায় করে রাখব।" সাবিত্রীর মুখের পানে চাহিতেই মনে হইল, শাশুড়ীর কথায় তাহার মুখখানা সহসা কালো হইয়া গিয়াছে, শাশুড়ীর এই আদর সে যেন গা হইতে ঝাড়িয়া ফেলিতে চায়—কহিল, "ঘরে না নিলেই বা এমন কি ক্ষতি, তাঁর ত প্রাণ বাঁচবে।"

যাহা হউক ইহার পর সাতদিন ধরিয়া সাবিত্রীকে লইয়া আমাদের রিহার্সেল চলিল। কেমন করিয়া শপথ করিয়া তাহাকে মিথ্যাবাদিনী সাজিতে হইবে—সব সে আস্তে আস্তে শিখিয়া লইল এবং কোর্টেও সহস্র চক্ষুর সামনে একটুও না ঘাবড়াইয়া এই কল্পিত মিথ্যাকাহিনীটি অভিনয় করিয়া গেল। জুরীগণ ও জজসাহেব একমত হইলেন। রায় বাহির হইল—পরেশকে ১০০০৲ টাকা জরিমানা এবং একমাস সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইবে।

কাল সেই একমাস শেষ হইয়াছে, পরেশ গৃহে ফিরিয়াছে। এই একমাস পরিবারের সকলে সাবিত্রীকে মাথার মণি করিয়া রাখিয়াছে। যে সাবিত্রী এতকাল স্বহস্তে রন্ধন করিয়া সকলের আহারের পর দুটী শাকান্ন খাইয়া থাকিয়াছে, আজকাল সকাল হইতে না হইতে সেই সাবিত্রীর জলখাবার লইয়া শাশুড়ী নিজে ডাকাডাকি করেন। শত সেবা করিয়াও যাঁহার এতটুকু স্নেহ-সম্ভাষণ কখনও পায় নাই, পুত্রের বিমুখ মন আয়ত্ত করিতে না পারায় যিনি বধূকেই দায়ী করিয়াছিলেন এবং তাহার সেই অপরাধ মুহূর্তের জন্যেও ভুলেন নাই, এখন সেই শাশুড়ীর মুখ দিয়া বধূর উদ্দেশ্যে 'মা' ছাড়া আর কথা বাহির হয় না।

সাবিত্রীর বর্ত্তমান জীবনে গৃহের এই আচারগুলি যেমন অভিভূত করিবার মত, বাহিরেও এই ঘটনাটিকে উপলক্ষ করিয়া যে সকল কথা পল্লবিত হইয়া উঠিতেছিল, সেগুলিও তেমনই বেদনাদায়ক। বুদ্ধিমতী সাবিত্রীও উপলব্ধি করিতে পাবে, যে কলঙ্ক সে স্বেচ্ছায় বরণ করিয়া লইয়াছে, তাহা অপনোদন করিবার কোন ক্ষমতা তাহার নাই, যে গৃহকে আশ্রয় করিয়া আছে সে তাহারও নাই। যে কুৎসা আজ বাহিরে সঞ্চিত হইতেছে, ক্রমশই তাহা পুষ্ট হইতে থাকিবে, হয়ত তাহার আবর্ত্ত এমনই প্রচণ্ড হইয়া উঠিবে যে যাহারা আজ তাহাকে পুরাণের সাবিত্রীর আসনে বসাইয়া আদর্শ গৃহলক্ষ্মীর মর্য্যাদা দিয়াছে—তাহাদের পক্ষেও সে আবর্ত্তের গতিরোধ করা সম্ভবপর হইবেনা, বরং তাহার জন্যই এই গৃহের শান্তি চিরদিনের মতই ভাঙ্গিয়া যাইবে।

সাবিত্রীর জীবনে যখন ঘরে-বাহিরের সমস্যা লইয়া এইরূপ দ্বন্দ্ব চলিয়াছে,ঠিক সেই সময় মুক্তিলাভ করিয়া তাহার স্বামী পরেশ গৃহে ফিরিয়া আসিল। শুনিলাম, বাড়ীতে পদার্পণ করিয়াই সে অনাদৃতা পত্নীর প্রতি আদরের এমন পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করে যে সাবিত্রীর পক্ষে তাহা অনাস্বাদিত ও একেবারে অভিনব। কালই অপরাহ্নে সে আমার স্ত্রীর সমক্ষে তাহার চরম সৌভাগ্যের পরিচয় দিয়া আর্ত্তস্বরে বলিয়াছিল—'নারী জীবনের যে দুর্লভ নিধি পাবার জন্য আমি এতদিন তপস্যা করেছি দিদি, আজ বিধাতা আমাকে তা দিয়েছেন সত্যি, কিন্তু ভোগ করবার শক্তি আমি হারিয়েছি। কেবলি আমার মনে হচ্ছে—এ সংসারে সর্ব্বময়ী হয়েও আমি আজ সর্ব্বহারা।'

বধূর অন্তরের কথাগুলি গৃহিণী বোধহয় তলাইয়া ভাবেন নাই। কিন্তু সায়াহ্নে আমাকে যখন বলিয়াছিলেন, মনটা যেন ছঁাত করিয়া উঠিয়াছিল। তখনও ভাবি নাই, গভীর রাত্রিতে নিঃশব্দ পদসঞ্চারে ছাদপ্রান্তে গিয়া দাঁড়াইতেই এই সর্ব্বত্যাগিনী সাধ্বীর শেষ মর্ম্মবাণী আমার চক্ষুর সমক্ষে মূর্ত্তিমতী হইয়া উঠিবে, আমাকেই হইতে হইবে তাহার মহাপ্রস্থানের সাক্ষী।

রাত্রির কথাটা স্ত্রীকে বলিতেই তিনি স্তব্ধদৃষ্টিতে ক্ষণকাল আমার পানে চাহিয়া রহিলেন। একটু পরে জোরে একটা নিশ্বাস ফেলিয়া আর্ত্তস্বরে কহিলেন—আমি কিন্তু ভেবে পাচ্ছিনে, সে এ রকম করে চুপি চুপি চলে গেল কেন? যে গৃহকে সে মন্দির বলে মনে করত, যে নিষ্ঠুর স্বামীর সেবাকেই সে বধূ-জীবনের কাম্য বলে জানত, আজ এত আদরের দিনে—সব ফিরে পেয়ে—সেই গৃহ সেই স্বামী সেই স্নেহ তার পক্ষে এমন অসহ্য হল কেন?

নিজের অজ্ঞাতেই বুঝি কণ্ঠ দিয়া আবেগের সুরে প্রশ্নটার উত্তর বাহির হইল—এখনো বুঝতে পারনি, এসব ফিরে পেয়ে এগুলোকে বাঁচাবার জন্যই সে জয়পতাকা উড়িয়ে মহাপ্রস্থানের পথ বেছে নিয়েছে। আর আমাকেই হতে হয়েছে তার মহাযাত্রার সাক্ষী।

প্রতীক্ষায়

শ্রীশ্যামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়

এ মোর সৌভাগ্য-বন্ধু, জন্মিয়াছি বিংশ শতাব্দীতে
মৃত্যু যেথা মানুষের কণ্ঠলগ্না প্রেয়সীর প্রায়,
আকাশে নিঃশব্দরাতে বিমানের বিচিত্র সঙ্গীতে
যুগান্তের স্বপ্ন যতো অসময়ে ঝরে মুছে যায়।
কামান গর্জ্জনে শুনি অনাগত জীবনের সুর,
কলঙ্কের ভগ্নস্তূপে গড়ে ওঠে বৈজয়ন্তধাম,
মানুষের জীর্ণবুকে জাগে সেই পাষাণ ঠাকুর
অশ্রুর সমুদ্রতটে যাহারে হারায়ে ফেলিলাম।
বিলাসী ফাল্গুন এলো নবরূপে দুয়ারে আমার,
শিবসুন্দরের হাতে প্রলয় বিষাণ ওঠে বাজি,
বিগত প্রিয়ার প্রেমে রূপায়িত হ'ল চারিধার,
ঘরের সোনার মেয়ে বিশ্বভরি দেখা দেয় আজি।
—মৃত্যু কোলাহল মাঝে তাই বন্ধু কান পেতে শুনি
নৃত্যপরা ভবিষ্যের চরণের নূপুর শিঞ্জিনী।

নগাধিরাজের শ্রীচরণে

শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্র

রোহিলখণ্ড কুমায়ুন রেলের ছোট কামরাতে—আরও ছোট বেঞ্চেতে শুয়ে ঝাঁকানি খেতে খেতে কখন যে একটু তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়েছিলুম তা জানি না, হঠাৎ এক সময়ে চমকে উঠে দেখি—কী একটা ছোট ষ্টেশনে গাড়ী ঢুকছে। ঘড়ীর কাঁটাটার দিকে চেয়ে দেখলুম আমাদের দেশের সময় প্রায় পৌনে পাঁচটা অর্থাৎ আইনতঃ এবার হলদোয়ানি পৌঁছানই উচিত।

একটু পরেই একস্থানে গাড়ীটা এসে দাঁড়াল, বাইরের দিকে চেয়ে বোঝবার উপায় নেই কি ষ্টেশন, তবে সামান্য আলোর ব্যবস্থা দেখে মনে হ'ল, যে ষ্টেশন একটা বটে! মুখ বাড়িয়ে কুলীদের প্রশ্ন করলুম, 'কোন ষ্টেশন?' জবাব এল, 'হলদোয়ানি'!

তখন 'ওঠ্-পঠ্' আর 'বাঁধ-বাঁধ'। টিকিট আমাদের দুজনের ছিল কাঠ গুদাম পর্য্যন্ত, আর দুজনের ছিল হলদোয়ানি। কাঠ গুদাম পর্য্যন্ত টিকিট কেটে কোন লাভ নেই, এ সংবাদটা পূর্ব্বেই নিয়েছিলুম, কারণ বাসগুলো অধিকাংশই ছাড়ে হলদোয়ানি থেকে এবং ভাড়া দু' জায়গা থেকেই সমান, অথচ হলদোয়ানি থেকে কাঠ গুদাম, মাত্র সাড়ে তিন মাইল পথের জন্য ট্রেণে নেয় ছ' আনা!

যাই হোক্—হলদোয়ানির প্লাটফর্ম্মে পা দিয়ে দেখি তখনও চারিদিকে গাঢ় অন্ধকার। উষার চিহ্ন মাত্র কোথাও নেই। পাহাড় আছে কি নেই বোঝা যায় না, তবে বেশ ঠাণ্ডা অথচ শুকনো তাজা হাওয়া এসে আমাদের অভিনন্দন জানিয়ে বুঝিয়ে দিয়ে গেল যে আমরা নগাধিরাজ হিমালয়ের কাছাকাছি এসে পড়েছি।

কুলীদের প্রশ্ন করলুম, 'নৈনীতাল যাবার বাস কোথা?' তারা সংক্ষেপে শুধু 'চলিয়ে না' বলে আমাদের মালপত্র তুলে নিয়ে এগিয়ে চলল, আমরাও অগত্যা তাদেরই সাময়িকভাবে মহাজনের পদবী দিয়ে পদাঙ্ক অনুসরণ করলুম। ষ্টেশনে তবু আলো ছিল একটু, প্লাটফর্ম্মের বাইরে দেখি আরও অন্ধকার। নক্ষত্রের আলোতে কোনমতে বোঝা যায় যে পথ একটা আছে, এই মাত্র। দূরে দুই একটি আলোর বিন্দু, বুঝলুম যে ঐখানেই বাসের আড্ডা হবে। আর যথার্থই তাই—মাঠ ভেঙ্গে ষ্টেশন কম্পাউণ্ডের বাইরে পৌঁছতেই দেখলুম সার সার বোধ হয় পঞ্চাশ ষাটখানা মোটরবাস ও লরী অন্ধকারে স্তব্ধভাবে দাঁড়িয়ে আছে। তারই দুদিকে অসংখ্য দোকান কিন্তু তারা তখনও কেউ ঝাঁপ খোলেনি; শুটি দুই চায়ের দোকান খুলেছে মাত্র, দোকানীরা জলের ডেকচি চাপিয়ে উনুনের ধারে বসে হাত গরম করছে, আমাদের দেখে একটু আশান্বিত হয়ে বার-কতক চেঁচিয়ে শুনিয়ে দিলে, 'চা গরম!!'

কিন্তু এধারে চেয়ে দেখি যে কুলীগুলো বেশ নিশ্চিন্ত মনেই মালপত্র রাস্তার ওপর নামাচ্ছে। জিজ্ঞাসা করলুম, বাস কৈ রে?

কুলীপুঙ্গবরা তখন যা নিবেদন করলে তার তর্জ্জমা করলে ব্যাপারটা দাঁড়ায় এই যে—বাসওয়ালাদের এখানে একটা এসোসিয়েসন আছে, তাদের হুকুম না পেলে কোন্ বাস আগে যাবে তা ঠিক হবে না। সুতরাং বাসে মাল চাপিয়ে লাভ নেই, এখনও 'নম্বর' হয়নি! এসোসিয়েসনের আফিসে উঁকি মেরে দেখলুম, তার দোর খোলা, ভেতরে একটি কেরাণীও বসে আছে, অন্ধকারে ভূতের মত গা ঢেকে। তাঁকে প্রশ্ন করতে শোনা গেল যে ভোরের আলো না উঠলে বাসও ছাড়বে না, নম্বরও দেওয়া হবে না। শেষ রাত্রে অফিসে আলো জ্বালাবার হুকুম নেই বোধ হয়!

যাই হোক, তাঁকে বিনীতভাবে নিবেদন জানালুম, 'সামনের বেঞ্চিটা অধীনদের জন্যে থাকবে ত?' তিনি জবাব দিলেন, 'সে আমি বলতে পারি না, আগে সিট নিলেই থাকবে।' অর্থাৎ এইখানে দাঁড়িয়ে তাঁদের মর্জ্জির অপেক্ষা করতে হবে। আগে টাকা জমা দিতে চাইলুম, কিন্তু তিনি নিতে নারাজ।

অগত্যা আমরা চারটি প্রাণী অন্ধকারে অসহায়ভাবে দাঁড়িয়ে রইলুম। প্রাতঃকৃত্যের তাগিদ যথেষ্ট, এ অবস্থায় কী করা যায় ভাবছি এমন সময়ে সেই অন্ধকারেই একটি মানুষ এসে পাশে দাঁড়াল, 'হোটেল, বাবু?'

মনে মনে বিরক্ত হয়েইছিলুম, বেশ একটু ঝাঁজের সঙ্গে তাকে জানিয়ে দিলুম, 'আমরা নৈনীতাল যাব!'

সে পরিষ্কার হিন্দুস্থানী ভাষায় জবাব দিলে যে সে কথাটা তারা ভাল-রকমই জানে। তবে যাবার ত এখনও দেড় ঘণ্টা দু-ঘণ্টা দেরী, এই সময়টা আমরা তাদের ঘরে 'আরাম' করতে পারি। চৌপাই আছে, শোওয়া বসার কোন ব্যবস্থারই ত্রুটি নেই। গোসলখানাতে জল-টলের আয়োজনও আছে প্রচুর।

'গোসলখানা শুনেই লাফিয়ে উঠলুম, প্রশ্ন করলুম, 'কত নেবে বাপু?'

সে জবাব দিলে, 'মাথা পিছু দু-আনা!'

বেশ দৃঢ়কণ্ঠে বললুম, 'চলবে না। এক আনা করে দিতে পারি। দেখ—'

একটু ইতস্ততঃ করেই সে রাজী হয়ে গেল। পুজোর সময় এদেশে ঠাণ্ডা আসে নেমে, যাত্রীও এখন নামার দিকে। সুতরাং এই সময়টা এদের বড়ই দুরবস্থা। আর সেই জন্যেই এখান থেকে নৈনীতাল সর্ব্বত্রই দেখেছি হোটেলওয়ালারা অসম্ভব রকম সস্তা রেটে নামাতে প্রস্তুত। যাক্—সেই লোকটির পিছু-পিছু বাস-অফিসেরই দোতালায় উঠে গেলুম। হোটেলটির নাম বেশ জাঁকালো, যতদূর মনে পড়ছে 'রয়্যাল'; ঘরগুলোও মন্দ নয়। দড়ীর ভালো খাটিয়া, চেয়ার, আয়না-লাগানো টেবিল, অনুষ্ঠানের কোনই ত্রুটি নেই। যদিচ তাতে আমাদের তখন কোন দরকার ছিল না, আমাদের মন তখন গোসলখানার দিকেই একাগ্র।

সবাই মুখ-হাত ধুয়ে যখন নামলুম তখন অন্ধকার ঝাপ্‌সা হয়ে এসেছে। উষা আসেন নি, শুধু তাঁর আগমনের আভাস পাওয়া গেছে ম'ত্র। কিন্তু সেই আব্‌ছায়াতেই ফুটে উঠেছে চারিদিকে মেঘের মত পর্ব্বত-শ্রেণীর ছায়া। বেশ একটা চনচনে ঠাণ্ডা বাতাস বইছে, রাস্তায় পায়চারী করতে ভালই লাগছিল। রাস্তা-ঘাটগুলিও ভাল, তখন অতটা বুঝতে পারিনি কিন্তু ফেরবার দিন দিনের আলোয় দেখেছিলুম হলদোয়ানি শহরের মতই গুলজার। বিরাট বাজার, সিনেমা স্কুল সবই আছে। কাঠগুদামে রেলের গুদাম ছাড়া আর কিছু নেই, শহর হ'ল এইটিই। হাওয়াও এখানকার ভাল, কাছেই আলমোড়া নৈনীতাল না থাকলে, চাই কি এইখানেই হাওয়া বদলাতে আসা চলত।

আর একটু পরেই এসোসিয়েশনের সেই বাবুটি ডেকে আমাদের জানালেন যে বাসের নম্বর হয়ে গেছে (মানে কোন্‌খানা যাবে স্থির হয়েছে) এখন আমরা ইচ্ছে করলে স্থান নিতে পারি। বলাই বাহুল্য, আমরা তৎক্ষণাৎ ছুটলুম সামনের সিটের দিকে তীরবেগে, স্থানও দখল করলুম, মালপত্রও উঠল—যথাসময়ে বাসও দিলে ছেড়ে। ভোরের প্রথম আলো ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদের মত এসে লেগেছে আমাদের মাথায়, ঠাণ্ডা বয়ে আনছে যেন নগাধিরাজেরই অভ্যর্থনা, আর তারই মধ্য দিয়ে আমাদের বাসখানি উর্ব্বরা, স্নেহশীলা সমতলভূমিকে পেছনে ফেলে রেখে কলরব করতে করতে ছুটল আঁকাবাঁকা পথ ধরে নৈনিতালের উদ্দেশ্যে।

তখনও পাহাড়ের রুক্ষ, বন্ধুর রূপ চোখের সামনে স্পষ্ট হয়ে উঠেনি, তখনও তা নীলাভ মেঘের মতই অস্পষ্ট, সুন্দর।

হলদোয়ানি থেকে কাঠগুদাম সামান্য চড়াই থাক্‌লেও পথটা সোজা, কিন্তু কাঠগুদাম ছাড়িয়েই পথ অবিরাম পাক্ খেতে খেতে গেছে। এই পথটিই নাকি ভারতবর্ষের মধ্যে সবচেয়ে ভাল মোটর পথ, অন্ততঃ বিজ্ঞাপনে তাই বলা হয়। বাস্তবিকই রাস্তাটি ভারি সুন্দর। দার্জ্জিলিং মুসৌরী-পাহাড়ের রাস্তাও দেখেছি, কিন্তু এর পথটিই সবচেয়ে ভাল লাগ্‌ল। খানিকটা ওঠবার পরই সমতলভূমি গেল চোখের সামনে থেকে মুছে, এব্‌ড়ো-খেব্‌ড়ো টুক্‌রো-টাক্‌রা পাহাড় একদিকে ছড়িয়ে পড়ল, আর এক দিকে খাড়া পাষাণ-প্রাচীর, অভ্রভেদী, কঠিন। একটি পার্ব্বত্য নদী বহুদূর পর্য্যন্ত চলল আমাদের সঙ্গে সঙ্গে, এখন বেচারী বড় শীর্ণ, যদিও তার বর্ষাকালের পরিপূর্ণ যৌবনের চিহ্ন দেহসীমা থেকে একেবারে ঘুচে যায়নি, তখনকার রূপটাও কল্পনা করা চলে। আরও একটু ওঠ্‌বার পর সে-ও বিদায় নিলে ; ডানদিকের টুক্‌রো পাহাড়গুলোও কখন দেখি ডেলা পাকিয়ে ডাগর হয়ে উঠেছে, তাকে আর অবহেলা করা যায় না কোনমতেই।

রাস্তায় ক্রমশঃ আরও চোখা-চোখা বাঁক দেখা দিলে। দার্জ্জিলিং-এ উঠতে উঠতে যেমন সব লুপ দেখা যায়, এখানে দেখলুম তার সংখ্যা বেশী। দেখলুম, আর মনে মনে শঙ্কিত হলুম নামবার দিনের কথা চিন্তা করে, যখন এইসব বাঁকের মুখে দেহের নাড়ীতে এমন ঝাঁকানি দেবে যে অন্নপ্রাশনের অন্ন পর্য্যন্ত উঠে আসতে চাইবে। আমাদের সুমথবাবুরই ভয় বেশী, তিনি ত দেখি ওঠবার পথেই চোখ বুজে মুহ্যমান হয়ে বসে আছেন, বুঝলুম প্রাণপণে বমনেচ্ছা সম্বরণ করছেন।

নৈনিতালের কাছাকাছি এসে বাসটা একবার দাঁড়াল, এইখানে 'টোল্' দিতে হবে। এর আগেই একবার পথে দাঁড় করিয়ে সবাইকে গুণে নেওয়া হয়েছিল, এখানেও একবার মাথা গুণে টোল বুঝে নিয়ে আবার ছেড়ে দিলে। মাইল-পাথর দেখে বুঝলুম যে আর আমাদের বেশী দেরী নেই, নৈনিতাল এসে পড়েছে। বেশ গা ঝাড়া দিয়ে আশান্বিত হয়ে বসলুম, যদিও তখন আর আমাদের গা-ঝাড়া দেবার মত বিশেষ অবস্থা ছিল না, বাসের ঝাঁকানিতে সবাই একটু নিস্তেজ হয়ে পড়েছিলুম।

যাই হোক—একটু বাদেই বাসটা এক জায়গায় এসে থামল, শুনলুম আমাদের যাত্রা শেষ—এইখানেই নামতে হবে।

যেখানে এই বাসগুলো এসে থামে (ঐখান থেকে আবার ছাড়েও) সেটাকে ওরা বলে তল্লিতাল। এটা হ'ল লেকের লম্বা দিকের এক প্রান্ত। বাস থেকে নেমে একবার বিস্মিত দৃষ্টিতে চারদিকে তাকালুম, ঝলমল্ করছে রোদ, কিন্তু তখনও সকালের রোদ, পাহাড়ের গায়ে ধোঁওয়া গুলোকে তখনও নীলাভ দেখাচ্ছে। চারদিকে পাঁচীল ঘেরা বাগানের মত ব্যাপার, মধ্যে লেকটি টলটল্ করছে—তাকে ঘিরে তিনদিকে উঁচু উঁচু পাহাড় দাঁড়িয়ে আছে। সহরটা সেই পাহাড়গুলোর ওপরই। দার্জ্জিলিংয়ের চেয়ে ঢের ছোট জায়গা, ঘর-বাড়ীর সংখ্যাও অনেক কম, আর সেই জন্তেই রাস্তাগুলো অধিকাংশই এত খাড়া যে দু'পা হাঁটলেই দম বন্ধ হয়ে আসে। লেকটিও ছবি দেখে যতটা বড় অনুমান হয়েছিল অতবড় নয় দেখলুম, এমন কি বোধ হ'ল আমাদের ঢাকুরিয়া লেকের চেয়েও ছোট।

যাক্—তবু মোটের ওপর ভালই লাগল। বেশ কন্‌কনে ঠাণ্ডা বাতাস, গায়ের কাপড়টা ভাল করে জড়িয়েও যেন শরীর তাতে না,

শীতের দিনে তুষারমণ্ডিত নৈনিতাল

রৌদ্রে দাঁড়াতে ইচ্ছে করে।...কুলীরা মালপত্র নামিয়েছে, হোটেলের লোকেরা ছেঁকে ধরেছে, যেখানে হোক্ একটা বাসা ঠিক করতে হবে। এখন যাত্রীর ভীড় নেই, হোটেলের ঘর অধিকাংশই খালি, সুতরাং প্রতিযোগিতা চলেছে সস্তার পথ ধরে। সবাই বলছে এক টাকার ভাল ঘর দেবে এবং সবাই বলছে যে অপরের মত মিথ্যা আশা সে দেয় না, সে যা বলে তা কাজেও করে।

বন্ধুদের সেইখানে রেখে আমি হোটেল দেখতে গেলুম। ঠিক বাস-ষ্ট্যাণ্ডের ওপরই 'হিমালয় বোর্ডিং'—সেটা দেখলুম, আরও দু-একটা দেখলুম কিন্তু পছন্দ হ'ল না, কেমন যেন ঘরগুলো অন্ধকার মত আর ঠাণ্ডা। শেষে দুর্গাদত্ত শর্ম্মা বলে এক গাইড্ ধরে নিয়ে গেল 'ভিজিটার্স হোম' দেখাতে। সেখানে পৌঁছেই মন বলে উঠল, 'ঠিক এই রকমই চাইছিলুম!' পুব-মুখো নতুন বাড়ী, কাঠের সিঁড়ি, কাঠের মেঝে আগাগোড়া কার্পেট মোড়া। প্রত্যেকটা ঘরেরই সামনে একটু ক'রে ঘেরা বারান্দা স্বয়ং সম্পূর্ণ ফ্ল্যাটের মত। বারান্দাটিও ভারী চমৎকার, কাঁচের ফ্রেম, কাঁচেরই সারসী জানলা দেওয়া, তাতে ধবধবে সাদা পর্দ্দা মোড়া। ঘরগুলিও পরিষ্কার, ফার্ণিচার ভাল আর সবচেয়ে যেটা লোভনীয়—চমৎকার বাথরুম।

দুর্গা দত্ত জানালে সিজ্‌নের সময় নাকি ঐ ঘর গুলোই তারা তিনটাকা ক'রে ভাড়া নেয়, এখন সে একটাকাতেই দিতে রাজী আছে। কিন্তু গোল বাধল খাট নিয়ে, প্রত্যেক ঘরে ওরা দুটো ক'রে খাট দেয় কিন্তু লোক আমরা চার জন। দুর্গা দত্তকে সমস্যার কথাটা জানাতে সে তৎক্ষণাৎ তারও সমাধান ক'রে দিলে, বললে দৈনিক দুআনা হিসেবে সে আর দুখানা বাড়তি খাট আমাদের ঘরে লাগিয়ে দেবে।

যাক্—বাঁচা গেল। নীচে গিয়ে মালপত্র নিয়ে আবার উঠে এলুম্। এখানে এক বাঙ্গালীরও হোটেল আছে, মিসেস্ গাঙ্গুলীর হিন্দুস্থান বোর্ডিং কিন্তু সেটা এত উঁচু যে তাঁর হোটেলের এক ভদ্রলোক ঘর দেখে আসতে অনুরোধ করা সত্ত্বেও আমাদের সাহসে কুলোল না। পরে জেনেছি যে ঈশ্বর যা করেন মঙ্গলের জন্ত।

ঘরে এসে বিছানাপত্র বিছিয়ে আরাম করে বসা গেল। হোটেলের চাকর, ঠাকুর, বয় যা বলুন ঐ একটি ছেলে ছিল, রতন সিং তার নাম।

ভারী সুন্দর চেহারা এবং খুব বাধ্য। এই চাকরটির মত এত পরিশ্রমী এবং নির্লোভ ছেলে খুব কমই দেখেছি। বিশেষতঃ হোটেলে যারা চাকরী করে, তাদের চোখটা সর্ব্বদাই থাকে যাত্রীদের পকেটের দিকে। বখশীষের একটা নির্দ্দিষ্ট অঙ্কের আশা না পেলে তাদের কাজের উৎসাহ যায় কমে।

রতন সিং গরম জল এনে দিলে। গরম জলের চার্জ্জ কম নয়, দু-আনা বালতি (অবশ্য দার্জ্জিলিংয়ের তুলনায় কমই)। তবে আমাদের প্রথম দিন ছাড়া গরম জল আর লাগেনি। শীত অতিরিক্ত হ'লেও আমরা ঠাণ্ডা জলেই স্নান করেছি—আর তা সহ্যও হয়েছে। স্নান সেরেই চিঠিলেখার পালা। এখানে আবার সকাল এগারটায় কলকাতার ডাক যায় বেরিয়ে। সুবিধের মধ্যে পোষ্টাফিসটা ঠিক বাস ষ্ট্যাণ্ডটার সামনেই। শেষ মুহূর্ত্তে ফেললেও চলে যায়।

আহারাদি ও বিশ্রামের পর রতন সিংহের জলবৎ চা খেয়ে যাত্রা করা গেল নগর ভ্রমণের উদ্দেশে। এইবার নগরের কথা কিছু বলা যাক্।

আগেই বলেছি যে ঈষৎ লম্বাটে ধরণের লেক্‌টা, রেলের টাইমটেব্‌লের মতে প্রায় একমাইল লম্বা এবং চারশ'গজ চওড়া। এই লেকটিকে ঘিরে একটি সমতল পথ আছে বরাবর, তার খানিকটা পিচ্ দেওয়া এবং খানিকটা কাঁকর দেওয়া অশ্বারোহীদের জন্যে। দার্জ্জিলিংয়ের মত এখানেও ঘোড়া ভাড়া পাওয়া যায়, তবে এদের বিশ্বাস যে পিচ্ দেওয়া রাস্তায় ঘোড়া চালানো হয় না, তারই ফলে এখানে পাহাড়ে ওঠবার একটি পথও পিচ্‌দেওয়া নয়—আমাদের মত শ্রীচরণভরসা পদাতিকদের
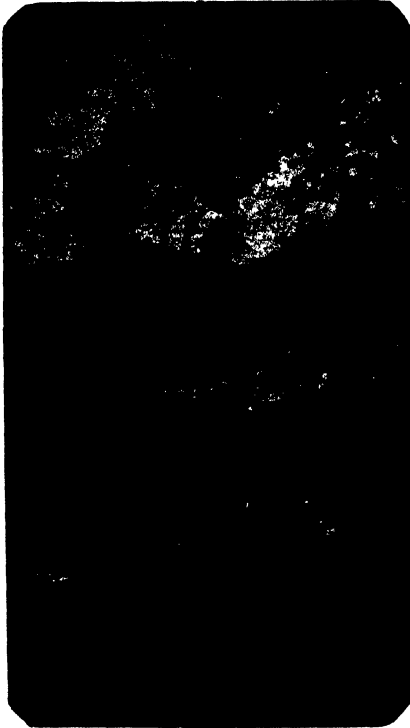
পাহাড়ের উপর হইতে মল্লীতালের দৃশ্য

কী বিপদ যে হতে পারে সেকথা এঁরা চিন্তা করেননি একবারও। একে ঐ খাড়াপথ, তায় কাঁকর দেওয়া, প্রতিমুহূর্ত্তেই পদস্খলনের সম্ভাবনা। এই লেকের চার পাশের রাস্তাটি বা ভাল। তা-ও একটা বড় 'ল্যাণ্ডস্লিপ' হয়ে আমাদের হোটেলের দিকের রাস্তাটা গেছে বন্ধ হয়ে, লেক পরিক্রমার সুবিধে আর নেই। লাটসাহেবের বাড়ী যাবার সোজা রাস্তাই নাকি ধসে পড়েছে, তার ফলে সে বেচারীকে অনেক কষ্ট ক'রে আর একটা খাড়া পথে যেতে হয়।

লেকের লম্বাদিকের শেষ প্রান্তে হ'ল তল্লিতাল (বাসষ্ট্যাণ্ডের দিকটা), এদিকেও বাজার-হাট-পোষ্টাফিস আছে, তবে অপর প্রান্তে মল্লিতালই হ'ল আসল শহর। মল্লিতাল যাবার পথে দুই একটা বিলাতী হোটেল, রেস্তোরাঁ এবং একটা দেশী ও একটা বিলিতী সিনেমা পড়ে। সাহেবদের বসবাসের বাড়ীও অধিকাংশ এই পথে যেতেই পড়ে—মল্লিতালে পৌঁছেই যেটা পাওয়া যায় সেটা হ'ল বিরাট একটা মাঠ, শুনলুম এইখানে ক্রিকেট খেলা হয়, দরবার জাতীয় কিছু করতে হ'লেও এইখানেই করতে হয়। এক লাটসাহেবের বাড়ী ছাড়া এতখানি সমতল ভূমি আর নৈনিতালে কোথাও নেই। আর এই মাঠ পেরিয়েই সাহেবদের 'রিঙ্ক' ও 'ক্যাপিটল' নামে দুটি সিনেমা, থিয়েটার ক্লাব স্কেটিংকম প্রভৃতি আমোদ-প্রমোদের আস্তানা। আর তার পরেই হ'ল, একেবারে জলের ধার ঘেঁষে, নৈনি দেবীর মন্দির !

আমরা তখন জানতুম না মন্দিরটা কার, হঠাৎ উগ্র বিলিতী ব্যাপারের পরেই হিন্দুমন্দিরের ঘণ্টাধ্বনিতে আকৃষ্ট হয়ে গিয়ে দেখি পাশাপাশি দুটি মন্দির ; তার একটি অবিসম্বাদী ভাবে শিবের মন্দির, আর একটিতে অনুমানে বুঝলুম, কোন দেবী মূর্ত্তি আছেন। অনুমান, মানে সে পাষাণ মূর্ত্তি দেখে চট্ ক'রে বোঝা কঠিন যে 'পুরুষ কি নারী !' মন্দির দুটি ছোট, কিন্তু স্থানীয় পাহাড়ী নরনারীর ভীড় দেখে বুঝলুম যে তাদের মর্য্যাদা ছোট নয়। মনে বড় কৌতুহল হ'ল, কয়েকটি সাহেবী পোষাক-পরা পাহাড়ী ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে মন্দিরের সামনে ঝোলানো ঘণ্টাগুলি বাজাচ্ছিলেন, তাদেরই একজনকে গিয়ে প্রশ্ন করলুম, 'এ মন্দিরটি কার ?'

তিনি ইংরাজীতে জবাব দিলেন, 'বলছি। একমিনিট অপেক্ষা করুন।'

তারপর উভয় মন্দিরের সামনেই বহুক্ষণ ধরে প্রণাম ক'রে তিনি আমাদের ডেকে নিয়ে গিয়ে জলের ধারে এক বেঞ্চিতে বসিয়ে যে ইতিহাস বিবৃত করলেন তা সংক্ষেপে এই—

অনেকদিন আগে এই কুমায়ুন রাজ্যের (অধুনা জেলা) নয়নী দেবী বা নন্দা দেবী বলে এক পুণ্যশীলা রাণী ছিলেন। তিনি সাক্ষাৎ ভগবতীর অংশে জন্মেছেন এই ছিল সবাইকার বিশ্বাস। পাহাড়ীরা তাঁকে এতই ভক্তি করত যে বলতো—এখান থেকে আশে পাশে বহুদূর পর্য্যন্ত প্রায় ষোল হাজার মন্দির আছে, সবগুলিই তাঁর নামের সঙ্গে জড়িত। নন্দাদেবী পর্ব্বত নামে হিমালয়ের যে শৃঙ্গ, তাও নাকি তাঁরই নামে। নৈনিতালের এই মন্দিরটি তাঁরই প্রতিষ্ঠিত, বহুকালের প্রাচীন মন্দির। এখন যেখানে মন্দিরটি আছে আগে এর থেকে বহু পেছনে ছিল, তখন লেকও ছিল ততদূর অবধি বিস্তৃত। পরে দেবী স্বপ্ন দেন যে শীঘ্রই বিরাট একটা পাহাড় ধ্বসবে, তাতে তাঁর মন্দিরও ভেঙ্গে যাবে, কিন্তু তাতে ভয় পাবার দরকার নেই ; তাঁর পুরোনো মন্দিরের চূড়ো যেখানে গিয়ে পড়বে সেইখানেই আবার নতুন মন্দির গড়ে তুলতে হবে। সেই আদেশ মতই নাকি বর্ত্তমান মন্দির গঠিত হয়েছে, আর ঐ যে এতখানি সমতলভূমি সেও সেই পাহাড় ধ্বসারই ফলে পাওয়া গেছে, মানে লেক গেছে অতটা বুজে।

আমরা যথাসাধ্য ভক্তিভরে এই কাহিনী শুনলুম। তারপর নন্দাদেবীকে প্রণাম করে উঠলুম মল্লিতালে।

মন্দির পেছনে ফেলে সোজা যে পথ মল্লিতাল বাজার ও ডাক-ঘরের দিকে উঠেছে সে পথে প্রথমেই পড়ে খানিকটা মুসলমান পাড়া। তার পরই বাজার—কতটা মল্লিতালের মতই, তবে দু-একটা অপেক্ষাকৃত বড় দোকান আছে ; এ-পারে এই হিসেবে এটাকেই বড়-বাজার বলা চলে। তাছাড়া একটা মিউনিসিপাল বাজারও আছে এখানে, তার মধ্যে ফলের দোকানই সব। বাজারের ওপরই ডাকঘর। তারও ওপরে

শহর আছে, অধিকাংশই বিলিতী পাড়া, অফিস অঞ্চলও বলা চলতে পারে। এই মল্লিতালেরই পাশ দিয়ে সোজা রাস্তা উঠেগেছে 'চিনাপিকে' অর্থাৎ নৈনিতালের সর্ব্বোচ্চ চীনাপিকই হ'ল নৈনিতালের সব চেয়ে বড় দ্রষ্টব্য। কারণ এখান থেকে প্রায় পাঁচশ' মাইল পর্য্যন্ত হিমালয়ের তুষার-মণ্ডিত গিরিশ্রেণী দেখা যায়, সে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য। সে কথা পরে বলছি।

এমনি নৈনিতাল সহরের কোথাও থেকে 'তুষার' দেখা যায় না, কারণ আগেই বলেছি যে এ যেন পাঁচীল ঘেরা শহর, পাঁচীলের ওপরে না উঠলে ওপারের কিছু নজরে পড়ে না। তবে শুনলুম যে ডিসেম্বর মাস নাগাদ এই পাহাড় ও গাছপালাগুলি বরফে ঢাকা পড়ে সাদা হয়ে যায়, তখনকার অবস্থাটা কল্পনা ক'রেই শিউরে উঠলুম, এখনই এত ঠাণ্ডা, তখন না জানি কী অবস্থাই হয়!

বেড়িয়ে যখন বাসায় ফিরে এলুম তখনও বোধহয় আটটা বাজেনি—কিন্তু তখনই পথঘাট নির্জ্জন হয়ে এসেছে, শহর যেন তন্দ্রাতুর। কন্‌কনে ঠাণ্ডা বাতাস চলেছে হু-হু করে, সে ঠাণ্ডায় বাইরে কেউ থাকতে চায় না, দোকান-বাজারে যায় কে? সুতরাং দোকানীরাও তাড়াতাড়ি ঝাঁপ বন্ধ ক'রে বাড়ী ফেরবার যোগাড় করছে। আমরাও আমাদের ঘরটিতে ফিরে এসে যেন বাঁচলুম, হাড়ের মধ্যে পর্য্যন্ত কন্‌কনানি ধরে গিয়েছিল।

সেদিন লক্ষ্মীপূর্ণিমা, কোজাগরী। সবচেয়ে মধুর জ্যোৎস্না পাওয়া যায় বছরের এই দিনটিতেই। এখানে পাহাড়ের প্রাচীর ডিঙিয়ে চাঁদ উঠতে কিছু বিলম্ব হয়, সুতরাং নীচে থাকতে মনেই পড়েনি যে আজ পূর্ণিমা, হোটেলের কাঁচের বারান্দাটিতে উঠে মুগ্ধ হয়ে গেলাম। ঠিক আমাদের সামনেই দেখা দিয়েছেন পূর্ণচন্দ্র, আর তারই আলোতে সমস্ত পাহাড়গুলোর ছায়া স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে লেকের জলে। আমরা বারান্দার বিজলী আলো নিভিয়ে শুব্ধ হয়ে সেই দিকে চেয়ে বসে রইলুম—অনেকক্ষণ ধরে। শান্ত, রহস্যময়, ঈষৎ ভয়াবহ সেই পাহাড়গুলির নিবিড় ছায়া, আর তার কাছে একফালি নীল আকাশ এবং শুভ্র চন্দ্রের শোভা, সবগুলো মিলিয়ে কী অপূর্ব্ব ছবিই রচনা করেছিল! সে সৌন্দর্য্য ভাষায় প্রকাশ করা যায় না, অনুভূতি দিয়ে বুঝতে হয়।

পরের দিন সকালে আমাদের হোটেলের ঠিক সামনেই যে উঁচু চুড়োটা দেখা যায় সেইটের ওপরে উঠেছিলুম। এমন কিছু উঁচু নয় অবশ্য, কিন্তু পথগুলো খুব খাড়া বলে তাইতেই কষ্ট হ'ল। আর পাহাড়ে ওঠার কোন সম্ভাবনা রইল না। অগত্যা আমরা নৌকা বিহার করেই সেদিনের মত বেড়ানর সাধ মিটিয়ে নিলুম। এই নৌকাগুলি এখানকার বেশ। খুব হাল্‌কা পান্‌সি, বেশ দুখানি চেয়ারের মত করা আছে, তাতে চমৎকার কুশান দেওয়া। সামনে আরও বসবার জায়গা আছে বটে তবে সেগুলিতে অত আরামের ব্যবস্থা নেই। প্রথমদিন এসেই দর জিজ্ঞাসা করেছিলুম, বলেছিল মাথা পিছু ছ' আনা। আজ আমরা ইন্দুকে এগিয়ে দিয়েছিলুম আগে, সে দরদস্তুর ক'রে গোটা নৌকোটা সাত আনায় ঠিক করে ফেললে। তখন নিশ্চিন্ত হয়ে আমরা আরাম ক'রে নৌকায় চেপে বসলুম। পরিষ্কার কালো জল, তারই মধ্যে দিয়ে ছপ্‌ ছপ্‌ ক'রে দাঁড় ফেলে নৌকোগুলো বেয়ে চলে যায়, চারদিকে সুন্দর ছবির মত সহরটি দেখা যায়—খুবই ভাল লাগে ব্যাপারটা। একটা কথা এইখানে বলে রাখি, এর পর থেকে আমরা রোজই নৌকো চড়েছি এখানে, কিন্তু দরটা ক্রমশ কমিয়ে চার আনা এমন কি তিন আনাতে দাঁড় করিয়েছিলুম। তিন আনাতে পাঁচজন পর্য্যন্ত চড়েছি।...

দূর হইতে মল্লীতালের দৃশ্য

তার পর দিন স্থির হ'ল লাট সাহেবের বাড়ী যেতে হবে। সকালে নয়, বিকেলে। সে ইচ্ছা আমাদের আরও প্রবল ক'রে তুললে মাষ্টার শিবু; আমরা যখন দুপুরবেলা আহারাদির পর একটুখানি 'গা গড়িয়ে' নিতুম সে তখন শুতোনা, খিদে করবার জন্য তখনই আপেল চিবোতে চিবোতে বেরিয়ে পড়ত, বোঁ বোঁ ক'রে ঘুরতে! (আপেল বস্তুটি এখানে ভারী সস্তা, চার আনা থেকে ছ' আনা সের, যেমন সরস, তেমনি সুস্বাদু। ঈষৎ টক্‌-রস-যুক্ত, ঠিক আমাদের দেশের বাক্সমোড়া আপেলের মত পানসে নয়, কিন্তু ভারী চমৎকার। আর পাকা 'পিয়ার-'—যাকে কাবুলি নাসপাতি বলা যেতে পারে, তাও খুব সস্তা, চার আনাই সের) যদিচ, এম্‌নিই তার যা খিদে বেড়ে গিয়েছিল, বলতে নেই তাতে আমরা ঈষৎ ভীতই হয়ে পড়েছিলুম। মানে, অত দ্রুত চেঞ্জ্‌টা ঠিক স্বাস্থ্যকর কিনা, এই আশঙ্কায়! যাই হোক্—ও সেদিন ঘুরে এসে বললে যে ও নাকি লাটসাহেবের বাড়ীর রাস্তা-ঘাট দেখে এসেছে, প্রায় কাছাকাছি গিয়েছিল, ভারী চমৎকার রাস্তা, ইত্যাদি—।

সুতরাং স্থির হ'ল যে আজই যাওয়া হবে। কিন্তু চা প্রভৃতি উদরসাৎ করতে করতেই চারটে পার হয়ে গেল। যদিও তাতে আমরা দমলুম না, মহোৎসাহে পাহাড় চড়তে শুরু করলুন। এ পথটি তল্লিতাল বাজারের মধ্যে দিয়েই উঠে গিয়েছে, বাজারকে পিছনে রেখে। খাড়া পথ, আস্তে-আস্তে এখানের কোন পথই ওঠেনা, সবই প্রায় এমনি, তবে এ পথটা যেন আরও অভদ্ররকমের খাড়া। অনেক কষ্টে, হাঁপাতে হাঁপাতে, বিশ্রাম করতে করতে উঠতে লাগলুম। বড় একটা কলেজ, মেয়েদের আধা-আশ্রম আধা-কলেজ এবং গির্জ্জে পথে পড়ল। এসমস্ত অতিক্রম ক'রে যখন শেষ পর্য্যন্ত লাট প্রাসাদের সিংহদ্বারে এসে পৌঁছলুম, তখন আবিষ্কার করলুম, ও হরি—সেদিন "প্রবেশ নিষেধ!"

কিন্তু কী আর করা যায় বাইরে থেকেই যতটা সম্ভব দেখে আবার প্রত্যাগমনের পথ ধরা গেল। তখন সন্ধ্যা নেমে আসছে, বড় বড় গাছের ছায়ায় বিশেষ কিছু দেখা যায় না, তবে এইটুকু বেশ বুঝলুম যে এই স্থানটিই সমস্ত শহরের মধ্যে একমাত্র সমতল জায়গা এবং এর মধ্যে বড় বাগান, মাঠ, গল্‌ফ্‌ কোর্স সব আছে। এইরকম খাড়া পাহাড়ের চুড়োয় এতখানি স্থান সমতল করতে, বাগান করতে এবং এতবড় প্রাসাদ গড়ে

ঘুরতে আর তার মধ্যে সমস্ত রকম স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করতে কত অকারণ অর্থব্যয়ই না হয়েছে, কত লক্ষমুদ্রা, এই কথা চিন্তা করতে করতে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে আমরা আবার মন্থর গতিতে চলতে শুরু করলুম। এবার আর পুরোনো পথে নয়, মল্লিতাল থেকে যে রাস্তায় লাটসাহেব আগে আসতেন সেই পথ ধরে মল্লিতাল নামতে লাগলুম। এই পথটিই অপেক্ষাকৃত সহজ, এটা ভেঙ্গে যাওয়ায় মোটর আসা বন্ধ হয়েছে বটে কিন্তু পদচারীদের যাওয়ার ব্যবস্থা আছে। মল্লিতাল থেকে যে পথে আমরা উঠেছিলুম, ওটা এতই খাড়া যে মোটর ওঠা অসম্ভব। কেবল শুনলুম, যে এক পাঞ্জাবী ড্রাইভার ওপথেও একদিন গাড়ী তুলে লাট সাহেবের কাছ থেকে একশ' টাকা বখশীষ পেয়েছিল।

অতখানি শকর ক'রে আমাদের পায়ের অবস্থা কাহিল হয়ে উঠেছিল; কিন্তু আশ্চর্য্য মল্লিতাল বাজার পেরিয়ে লেকের ধারে সমতল রাস্তায় পৌঁছতেই অনেকখানি সুস্থ হয়ে উঠলুম। এই সব ঠাণ্ডা পাহাড়ে হাওয়ার এই একটা আশ্চর্য্য গুণ, পথ ভাঙ্গতে যত কষ্টই হোক না কেন, একটু বিশ্রাম ক'রে নিলেই আবার চাঙ্গা হয়ে ওঠা যায়। যাই হোক্—লেকের ধারের 'মরুমু' গাছের ছায়াবীথি দিয়ে আসছি (এই গাছগুলি ভারী চমৎকার—এর শাখা-প্রশাখার অগ্রভাগগুলি সব নিম্নমুখী, লেকের ধারে এই গাছগুলিই বেশী, জলের ওপর থেকে ভারী চমৎকার দেখায় একে, যেন কোনও সুন্দরীর সোনালী চুল জল স্পর্শ ক'রে আছে। কে যেন বলেছিল যে একেই weeping willow বলে) এমন সময় তিনটি বাঙ্গালী ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা! প্রথমটা বাঙ্গালী দেখেই আনন্দ হচ্ছিল, পরে
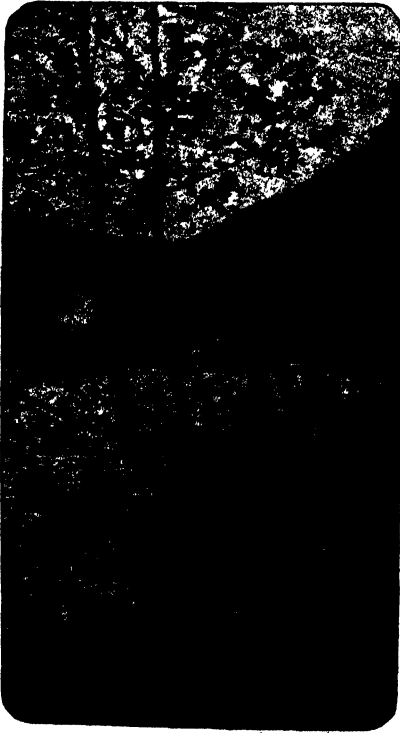
উর্ম্মিমুখর লেক

আবার দেখা গেল তাঁরা পরিচিত। ইন্দুরই জ্ঞাতিভাই একজন, কাশীপুরের ডাক্তার সুশীল দাশগুপ্ত; তাঁর বন্ধু কারমাইকেলের ডাক্তার হেমন্তবাবু, আর একজন সর্ব্বশেষ কিন্তু সর্ব্বাধিক উল্লেখযোগ্য ডাঃ প্রভাত সিংহ! এঁরা সেই দিনই এসেছেন, সুশীলবাবু সপরিবারে—এবং এসে উঠেছেন হিন্দুস্থান বোর্ডিং-এ। এত উঁচু ও খাড়া তায় পথ যে বৌদি একবার কোনমতে উঠে আর 'পাদমেকং' না যাবার সঙ্কল্প করেছেন, এঁদেরও প্রাণান্ত। তাছাড়া মাথাপিছু বারআনা ক'রে দিয়েও এঁরা আহারাদির দিক দিয়ে নাকি সন্তোষ পাচ্ছেন না। ব্যস্—তখনই কথা হ'ল যে পরের দিন সকাল বেলাই ইন্দু গিয়ে ওঁদের মালপত্র সুদ্ধ আমাদের হোটেলে নিয়ে আসবে।

তাই হ'ল! এতে আমাদের সুবিধে হ'ল খুব, প্রথমত এতগুলি বাঙ্গালী এবং পরিচিত প্রতিবেশী, দ্বিতীয়তঃ প্রভাতদার মত রসিক লোকের সঙ্গে বাস—আর তৃতীয়ত এঁদের আওতায় ও বৌদির কল্যাণে আহারের উত্তম ব্যবস্থা। সুশীলবাবু এতরকম আহার্য্যের ব্যবস্থা করলেন, ভোজনবিলাসীদের পক্ষে একান্ত উপভোগ্য হলেও নগাধিরাজ্যের রাজ্যে সেগুলি দুর্লভ বলেই ধারণা ছিল। বৌদির সঙ্গে আমাদের পরিচয় আরও বেরিয়ে পড়ল, তিনি আমাদের বন্ধু, সাহিত্যিক-শিল্পী অখিল নিয়োগীর ভগ্নী! অর্থাৎ সুবিধে ষোল আনার ওপর আঠারো আনা।

সেদিনটা এমনি বেড়িয়ে কাটল। পরের দিন আমরা গেথিয়ার দিকে অভিযান করলুম। যাবার পথটি ভাল, কেবলই নিম্নগামী, রিজার্ভ ফরেষ্টের মধ্য দিয়া বেশ লাগছিল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বুক শুকিয়ে গেল এই ভেবে যে এতখানি পথ ভেঙ্গে আবার খাড়া উঠ্‌ব কি ক'রে! সঙ্গীরা আশ্বাস দিলেন, খেয়ে দেয়ে সেই ওবেলা, নয়ত কাল সকালে আস্তে আস্তে ওঠা যাবে'খন। তাইকি যাদের বাড়ী যাচ্ছি তারা একটা ব্যবস্থা ক'রে দিতে পারবেন। একবার চলোনা, দেখবে আর কিচ্ছু ভাবতে হবেনা।

অবিশ্যি ভাবতেও হ'লো না কিছু, কারণ সেখানে পৌঁছে শোনা গেল যে তাঁরা মিরাটে কোন্ আত্মীয়ের বাড়ী পুজো দেখতে গেছেন, এখনও ফেরেননি, বাংলায় তালা দেওয়া!

তৎক্ষণাৎ আবার সেই খাড়া দীর্ঘ পথ! সম্বলের মধ্যে গেথিয়া থেকে গোটাকতক আপেল নেওয়া হয়েছিল। খানিকটা ক'রে যাই আর বসি, মধ্যে মধ্যে আপেলের মধ্যে সান্ত্বনা খুঁজি—এই ভাবে যখন বেলা একটা নাগাদ ফিরে এলুম তখন আর গায়ের ব্যথায় কেউ নড়তে পারছি না।

এর পরের দিন পড়ল রবিবার, সেদিন লাটপ্রাসাদ দেখতে যাবার দিন।• বিকেলে সেই উদ্দেশ্যে যাত্রা করা গেল। কিন্তু তার পূর্ব্বে সুশীলবাবু একটি দুষ্কার্য্য ক'রে গেলেন। এখানে এসে পর্য্যন্ত ডিম আর মাংস খেয়ে তাঁর বাঙ্গালীর রক্ত বিদ্রোহ করেছিল। তিনি অনেক দুঃখে, অনেক খুঁজে বাজার থেকে পাঁচসিকা সের দিয়ে কিছু রুই মাছ (তার মৃত্যুর তারিখ যে অন্ততঃ দশবারো দিন পূর্ব্বে চলে গেছে তা সহজেই অনুমেয়) ও কিছু লেকের টাট্‌কা ট্রাউট মাছ সংগ্রহ ক'রে চাকরকে দিয়ে বাসায় পাঠিয়ে দিলেন ও সেই সঙ্গে আমাদের শাসিয়ে রাখলেন, 'আপনারা একটু দেরী ক'রে খাবেন, মাছ তৈরী হ'লে তবে!'…কে জানত যে ঐ মাছ তাঁর সঙ্গেই শত্রুতা করবে।

যাই হোক্ মল্লিতালের পথ বেয়ে আমরা ত সন্ধ্যা হচ্চে-হচ্চে সময়ে লাট প্রাসাদে পৌঁছলুম, বেশ মনের সুখে ঘুরে বেড়াচ্ছি, পাহাড়ের ওপর বিস্তৃত গল্‌ফ্‌ কোর্ট দেখে মনে মনে ঈর্ষিত হচ্ছি, দূর থেকে কোন ঘরটায় দরবার হয় সেই সম্বন্ধে নিজেদের মধ্যে তর্ক করছি, এমন সময় এক অঘটন ঘটল। প্রাসাদের মধ্যে একটা অংশ ছিল নিষিদ্ধ। অত খেয়াল নেই আমাদের, আমরা গল্প করতে করতে সেইদিকে গিয়ে পড়েছি, আর তখন বেশ অন্ধকারও হয়েছে, অকস্মাৎ অত্যন্ত পরুষ এবং বিজাতীয় কণ্ঠে প্রশ্ন হ'ল—'হুজ্ দাট্!'…আমরা ত আর নেই। শিবু একেবারে এক লাফে প্রভাতদার পেছনে, আমাদের যে কী অবস্থা তা আর বর্ণনা না করাই ভাল। সুবিধের মধ্যে প্রভাতদা বহুদিন ভারতবর্ষের বাইরে চাকরী করেছেন, এসব মিলিটারী ব্যাপারের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল, তিনিও মুহূর্ত্ত মধ্যে দুই হাত বিস্তারিত ক'রে জবাব দিলেন, 'ফ্রেণ্ড্‌স্!'

দেবতা প্রসন্ন হলেন, আদেশ হ'ল, 'পাস্' অর্থাৎ যেতে পারো।

তখন অন্ধকারই হয়ে এসেছিল, আমরা আর জীবন বিপন্ন না ক'রে কটকের পথই ধরলুম।

পরের দিন সকালে 'চীনাপিক্'-এ যাবার কথা। কিন্তু ভোরবেলা উঠে শোনা গেল যে সুশীলবাবুর পেটে কলিক্ ধরেছে, ভীষণ কষ্ট পাচ্ছেন, প্রভাতদা এবং হেমন্তবাবু দুজনেই ছুটোছুটি করছেন। ভীষণ কাণ্ড! অতএব সে দিনটা স্থগিত রইল, পরের দিনও সুশীলবাবু ও হেমন্তবাবু রয়ে গেলেন, আমরা চারজন আর প্রভাতদা মাত্র যাত্রা করলুম। যাত্রার পূর্ব্বে ইন্দুর তৈরী চা আর হালুয়া খেয়ে নেওয়া হয়েছিল, সেই ভরসায় অতগুলি প্রাণী কোন রকম জল বা খাবারের ব্যবস্থা না ক'রেই পাহাড়ে উঠ্‌তে শুরু করলুম, কারণ শুনেছিলুম পথ মাত্র মাইল তিনেক, কতক্ষণই বা লাগবে!

ও মশাই! তখন কে জানত যে সে ডালভাঙ্গা মাইল।

কাশী থেকে আসবার সময় মিঃ ব্যাস নামক এক বৃদ্ধ জহুরীর সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। তাঁর ওখানে বাড়ী আছে, বলে দিয়েছিলেন যে চীনাপিকে ওঠবার ঠিক আধা পথে তাঁর বাড়ী, দৃশ্য যা কিছু তাঁর বাড়ী থেকেই দেখা যায়, অনেকেই আর উঠতে পারে না, সেইখান থেকেই দেখে। আর বেশী ওঠবার দরকারও নেই, দৃশ্য নাকি একই রকম দেখায়, সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গ থেকেও যা, তাঁর বাড়ী থেকেও তাই। তিনি দিন-দুই সেখানে থেকে আলমোড়া যাবেন, আমাদের নিমন্ত্রণও জানিয়ে ছিলেন। কিন্তু আমরা দু'দিনের মধ্যে যাইনি।

যাই হোক্—খানিকটা ওঠবার পরই আমরা 'ব্যাস ভিলা' খুঁজছি, কিন্তু কোথায় ব্যাসভিলা? একেবারে খাড়া পথ, উঠছে ত উঠ্‌ছেই—মিনিটের পর মিনিট, ঘণ্টার পর ঘণ্টা তবু ব্যাসভিলার দেখা নাই। আটটার সময়ে পাহাড় উঠতে আরম্ভ করেছি, ঠিক দশটার সময় দেখলুম মাঝামাঝি একটি সঙ্কীর্ণ শৃঙ্গের ওপর ব্যাস সাহেবের বাড়ী—ব্যাস ভিলা! বাড়ী বন্ধ, তালা দেওয়া—হয় ত কোন দারওয়ান আছে কিন্তু তারও পাত্তা নেই। তবে ভাগ্যিস্ ফটকটা খোলা ছিল, বাগানে অবাধ প্রবেশাধিকার। কারণ ভিলার বাইরে গাছের ফাঁক থেকে তুষার রাশির যা সামান্য আভাস পাওয়া যাচ্ছিল তাই আমাদের চঞ্চল ক'রে তুলেছিল। কিন্তু বাগানে ঢুকে আমরা স্তম্ভিত হয়ে গেলুম। সে কী দৃশ্য, ইংরিজীতে যাকে বলে 'গ্লোরিয়াস্'। সাদা তুষারমণ্ডিত গিরিশ্রেণী, পরিষ্কার নীল আকাশের কোলে প্রখর সূর্য্য কিরণে চক্ চক্ করছে। দার্জ্জিলিং থেকেও দেখা যায় বটে দিনরাত, কিন্তু সে যেন বড় দূর, এখানে মনে হ'ল হাতের কাছে একেবারে। হয়ত দূরত্ব সমানই, তবে আমাদের মনে হ'ল এগুলো খুব কাছে। হাত বাড়ালেই পাওয়া যাবে। তাছাড়া আকাশ খুব পরিষ্কার না থাকলে দার্জ্জিলিং থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘা ও এভারেষ্ট ছাড়া আর বিশেষ কোন শৃঙ্গ দেখা যায় না—কিন্তু এ একেবারে শৃঙ্গের পর শৃঙ্গ—বহু দূর বিস্তৃত গিরিশ্রেণী। পরে শুনেছিলুম যে

নন্দাদেবী পর্ব্বত

চীনাপিক্ থেকে যতটা পর্য্যন্ত দেখা যায় তার দৈর্ঘ্য পাঁচশ' মাইলেরও বেশী।

বহুক্ষণ পর্য্যন্ত ব্যাস ভিলা থেকে আমরা নানা ভাবে এ দৃশ্য দেখলুম। ব্যাস ভিলার আর একটি বৈশিষ্ট এই যে এর বাগানে দাঁড়িয়ে ওধারে
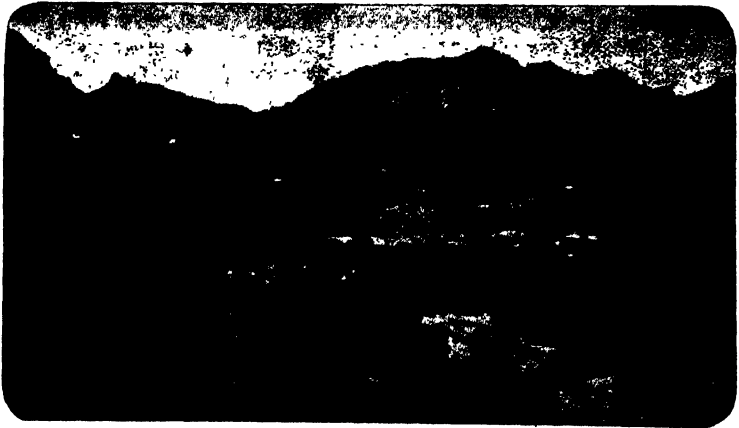
মল্লীতাল—উপরে চীনা পিক

যেমন তুষার দেখা যায় এধারে তেমনি সমস্ত নৈনিতাল সহরটিও চোখের সামনেই জ্বল্-জ্বল্ করে। নীল সারা চরটি সহরের মধ্যস্থলে যেন মনে হয় সবুজ ফ্রেমে আঁটা আয়না, তাতে প্রতিফলিত হয়ে সূর্য্যদেবও স্নেহে ছল্-ছল্ করতে থাকেন।

আমরা বহুক্ষণ ব্যাসভিলায় রইলুম তারপর আবার উত্থান। আমি ব্যাস সাহেবের কথা বুঝিয়ে বল্লুম কিন্তু বলা বাহুল্য যে ওঁরা কেউই তা

বিশ্বাস করবেন না। আর সত্যি কথা বলতে কি, আমারও মনে হচ্ছিল যে এমনই দৃশ্যটি পিক্-এর ওপর থেকে না জানি আরো কী চমৎকারই দেখায়! কিন্তু উঠতে আর পারি না, আমাদের মধ্যে ইনু ছিল যাকে বলে পালক ভার, সুতরাং ও বেশ অবলীলাক্রমে এগিয়ে যেতে লাগল, এমন কি একটার পর একটা, ওর যতগুলো গান জানা ছিল সবই শেষ করতে লাগল কিন্তু যত বিপদ আমাদেরই। সমস্ত দেহ বিদ্রোহ করতে থাকে, শ্যামা মেদিনীর আকর্ষণ ক্রমেই প্রবলতর হয়ে ওঠে!

যাই হোক্—আরও বহুক্ষণ ওঠবার পর আর একটি স্থান পাওয়া গেল—যেখান থেকে বেশ ভাল দৃশ্য পাওয়া যায়। এইখানে কতকগুলি কুমায়ুন জেলার লোকের দেখা পাওয়া গেল, তারা বললে এইখান থেকেই সবচেয়ে বেশী তুষারমণ্ডিত গিরি-শৃঙ্গ নজরে পড়ে, আর না উঠলেও চলে। তারা কতকগুলো পাহাড়ের সঙ্গে পরিচয়ও করিয়ে দিলে; ঠিক সামনেই নাকি নন্দাদেবী পর্ব্বত, আরও অনেক নাম করলে, তা আর আজ মনে নেই।

এখানে খানিকটা জিরিয়ে আবার উঠতে লাগলুম। এবার অবস্থা খুব কাহিল হয়ে পড়েছিল, পিপাসায় বুক অবধি শুক্নো, পেটে আগুন জ্বলছে, পা বিষম ভারী। বল্লুম, চলুন ফিরে যাই—কিন্তু প্রভাতদা' নাছোড়বান্দা, তিনি উঠবেন ত বটেই, আমাদেরও তুলবেন শেষ পর্য্যন্ত। অবিশ্যি প্রভাতদার জন্যই ওঠা সম্ভব হয়েছিল শেষ অবধি, কারণ এমন রসিক লোকের সঙ্গে সুমেরু অভিযানও করা যায়, চীনাপিক ত তুচ্ছ। যখনই দেহ অবশ হয়ে আসছে, ঠাণ্ডা কন্কনে শুকনো হাওয়ায় হাড় পর্য্যন্ত হিম হবার জো, প্রভাতদার অপূর্ব্ব রসিকতা আবার আমাদের চাঙ্গা করে তুলছে। প্রভাতদা ভারতবর্ষের বাইরে বহু স্থান ঘুরেছেন, তারই বিচিত্র ও সরস অভিজ্ঞতা শুনতে শুনতে কোন-মতে চলতে লাগলুম।

কিন্তু শেষের এই পথটুকু আরও খাড়া, একসঙ্গে পঞ্চাশ গজের বেশী ওঠা যায় না বিশ্রাম না নিয়ে। তার ওপর সঙ্গে কোন পানীয় পর্য্যন্ত নেই। ফেরবার পথে এক সাহেবের সঙ্গে দেখা হয়েছিল, তিনি দেখলুম রীতিমত এক ফ্লাস্ক জল নিয়ে উঠ্ছিলেন—বুঝলুম 'ইহাই নিয়ম'—আমরাই বেকুবী করেছি। আর সবচেয়ে ট্রাজেডী কি জানেন? ব্যাসভিলা ছাড়বার পরই, বেলা বাড়বার সঙ্গে সঙ্গেই মেঘ জমতে আরম্ভ হ'ল ওধারে হিমালয়ের গায়ে, ফলে অনেকগুলি শৃঙ্গই ক্রমে ঢাকা পড়ে গেল। এত দুঃখের পর যখন উঠলুমই ওপরে, তখন দেখলুম যে আর দেখবার মত বিশেষ কিছুই নেই চোখের সামনে। ঐ জন্যেই হোটেলওলা ভোরে আসতে বলেছিল কেন, বুঝতে পারা গেল!

আর সবচেয়ে অভদ্র এখানের মিউনিসিপ্যালিটী—এইটেই যখন এখানকার বলতে গেলে একমাত্র দ্রষ্টব্য স্থান এবং সবাই আসে, তখন এখানে কি একটা কিছু বিশ্রামের ব্যবস্থা ক'রে রাখা উচিত ছিল না? সে ব্যবস্থা ত নেই-ই, এটা কত উচু কিংবা এখান থেকে কোথাকার কোন্ কোন্ শৃঙ্গে দেখা যায় তার কোন নির্দ্দেশ পর্য্যন্ত দেওয়া নেই। যে যা পারো বুঝে নাও! এর সঙ্গে দার্জ্জিলিং মিউনিসিপ্যালিটীর তুলনা করলে বোঝা যায় যে, দুটোর মধ্যে ব্যবস্থার তফাত কত!

ওপরে আমরা অনেকক্ষণ বসে বিশ্রাম করলুম। এদিকে সাবধানে একটু এগিয়ে এসে নৈনিতাল দেখা যায়, ওদিকে আলমোড়া এমন কি রাণীখেত পর্য্যন্ত দৃষ্টিগোচর হয় এর ওপর থেকে। তবে মোট কথা এই বুঝলুম যে—এত কষ্ট করে এত ওপরে না উঠলেও চল্ত, এর আগে যেখান থেকে আমরা দেখেছি সেইখান দিয়ে গেলে কিছুমাত্র ঠকতুম না। একেই বলে আশার ছলনা!

এবার প্রত্যাবর্ত্তনের পালা। ক্লান্ত দেহ, পা আড়ষ্ট, তৃষাতুর কণ্ঠ—তবে কিনা মাধ্যাকর্ষণ প্রবল তাই উঠতে যেখানে চার ঘণ্টা লেগেছিল সেই পথ আমরা অনায়াসে এক ঘণ্টায় নেমে এলুম। তবুও বাসায় যখন ফিরে এলুম তখন বেলা দুটো। স্নান করারও ধৈর্য্য নেই তখন, কোনমতে রতন সিংহের প্রস্তুত ডালভাত চারটি খেয়ে একেবারে শয্যা গ্রহণ।

সেইদিন থেকেই বিসর্জ্জনের বাজনা বাজল, সেইদিনই গেলেন হেমন্ত-বাবু, পরের দিন শিবু আর প্রভাতদা, তার পরের দিন আমরা সবাই। সেই মোটঘাট বাঁধা, দেশের জন্য আপেল কেনা এবং বাস যাত্রা। স্থানটি আমাদের এমন কিছু আকর্ষণ করতে পারেনি, দার্জ্জিলিংয়ের মত প্রতিনিয়ত স্নেহবন্ধনে জড়িয়ে ধরেনি, কিন্তু তবুও আজ বিদায়ের ক্ষণে একটু মন খারাপ হয়ে গেল বৈকি! তিনদিকের সেই রুক্ষ বন্ধুর পাষাণ প্রাচীর, আর তার মধ্যের ছলো-ছলো সরোবর সবই যেন আজ মনের উপরে ভালবাসার দাগ টেনে দিল। ক্রমে বাসে চড়ে যখন অবিরত নামতে লাগলুম, বড় বড় পাহাড়গুলিও ক্রমে দূর হতে দূরে সরে যেতে লাগল, চোখের সামনে একটু একটু ক'রে সমতল জমি জেগে উঠে সঙ্গে সঙ্গে মনে জাগিয়ে দিল আবার সেই জীবন সংগ্রামের কথা, আবার সেই দুশ্চিন্তা, অশান্তি ও সহস্র অভাব! মনে হ'ল যে বেশ ছিলুম নগাধিরাজের শ্রীচরণতলে, তাঁর শীতল আশ্রয়ে এই পৃথিবীর সকল দুঃখ ভুলিয়ে রেখে-ছিলেন তিনি। শুধু শরীরটাই আমাদের পৃথিবীপৃষ্ঠ থেকে ঊর্দ্ধে ওঠেনি, বোধহয় মনটাও উঠেছিল।...

শীতল কোমল শান্তিদায়িনী সে আশ্রয় থেকে বিচ্যুত হয়ে আবার এসে পড়লুম আমরা উষ্ণ, পঙ্কিল, কোলাহলপূণ ধূলির ধরণীতে—

এক সময়ে চমকে চেয়ে দেখলুম, হলদোয়ানী!

গান

শ্রীঅসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়

আমার শেষের প্রদীপ জ্বালিয়ে দিলাম
তোমার বেদীর মূলে।
সাজিয়ে দিলাম ফুলে—ফুলে—ফুলে॥
মন্দিরে আজ সারা রাতি,
জ্বলবে আমার শেষের বাতি,
জাগবো বোসে তোমার পায়ের তলে॥

সারা নিশি গাইব বসি তোমার ভজন;
ভোরের বাতাস নিভিয়ে দেবে
প্রদীপ যখন—
তখন তোমার নামটি বুকে ধরি',
তোমার পায়ে লুটিয়ে যেন পড়ি,
তখন তুমি চেয়ো গো আঁখি তুলে॥

(পঞ্চগ্রাম)

শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

তেত্রিশ

দেবুঘোষ আসিয়াছিল কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে। কর্ত্তব্যের খাতিরে কৃতজ্ঞতা, প্রেম বা প্রীতির অংশ তাহার মধ্যে অত্যন্ত কম। শ্রীহরি ঘোষের বাগান নষ্ট করার অপরাধে পুলিশ তাহাকে চালান দিলেও সে তাহাতে ভয় পায় নাই। অনিরুদ্ধ নিজেই যেখানে সমস্ত অপরাধ স্বীকার করিয়া লইল—সেখানে অপরের সাজা হইবে না—একথা সে জানিত। সুতরাং নিজের মুক্তি সম্বন্ধে এতটুকু দুশ্চিন্তা তাহার হয় নাই। কয়েকটা দিন হাজত বাস করিতে সে প্রস্তুতই ছিল। ইচ্ছা করিলে মোক্তার বা উকীলকে ফি দিয়া নিজেই জামীনের ব্যবস্থা করিতে পারিত। কিন্তু তবুও যখন বিশ্বনাথ অকস্মাৎ কলিকাতা হইতে আসিয়া তাহাকে ও পাতুকে জামীনে খালাস করিল তখন কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার প্রয়োজন সে বোধ করিল। আরও একটা কথা তাহার জানিবার আছে। কলিকাতায় বসিয়া বিশ্বনাথ এ সংবাদ কেমন করিয়া জানিল ?

বিশ্বনাথ কিন্তু সমাদর করিয়া বন্ধুর মর্য্যাদা দিয়া দেবুকে বসাইল। নাটমন্দিরে সতরঞ্চি পাতিয়া দেবুকে হাত ধরিয়া বসাইয়া নিজে তাহার পাশেই বসিল। হাসিয়া বলিল—এ যে বিরাট কাণ্ড ক'রে ব'সে আছ দেবু।

এ-কথায় দেবু খুসী হইল। বিশ্বনাথের প্রতি সে অন্তরে-অন্তরে গভীর ঈর্ষা পোষণ করে। বাল্যকালে তাহারা সহপাঠী ছিল, স্কুলে তাহারা দুইজনেই ছিল ক্লাসের ভাল ছেলে, দুজনের মধ্যে প্রচণ্ড প্রতিযোগিতা ছিল। ইংরাজী, বাংলা, সংস্কৃতে বিশ্বনাথকে সে আঁটিয়া উঠিত না—কিন্তু অঙ্কের পরীক্ষায় সে বিশ্বনাথকে মারিয়া বাহির হইয়া যাইত। দুই চারি নম্বরের পার্থক্যে তাহারা ক্লাসে প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিত। সেই বিশ্বনাথ আজ বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র, বি-এ পরীক্ষাতে সে প্রথম হইয়া এম-এ পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছে। আর সে গ্রাম্য পাঠশালার পণ্ডিত, অতি তুচ্ছ নগণ্য ব্যক্তি। বিশেষ করিয়া বিশ্বনাথের কথা উঠিলে বা তাহার সহিত দেখা হইলে ঈর্ষায় তাহার অন্তর টন্ টন্ করিয়া উঠে। আজ কিন্তু বিশ্বনাথ তাহার প্রশংসা করায় সে খুসী হইয়া উঠিল। অল্প হাসিয়া সে বলিল—হ্যাঁ—ব্যাপারটা খানিকটা বড়ই হয়েছে বটে। আমাদের দেখাদেখি দশ বারোখানা গ্রামে ধর্ম্মঘটের তোড়জোড় চলছে। তবে ও-সবের সঙ্গে আমার সম্বন্ধ নাই।

বিশ্বনাথ বলিল—সম্বন্ধ রাখতে হবে ভাই। মাথার লোকের অভাবেই এরা কিছু করতে পারে না। তুমি এদের মাথা হও, নেতা হও।

দেবু স্থিরদৃষ্টিতে বিশ্বনাথের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। বিশ্বনাথ বলিল—এক কাজ কর, এই দশ বারোখানা গ্রামের লোক নিয়ে একদিন একটা মিটিং করে ফেল। আমি বরং কৃষক প্রজা পার্টির বড় একজন নেতাকে এনে দিচ্ছি। তিনি বক্তৃতা দেবেন। শুধু তো বৃদ্ধি বন্ধের আন্দোলন করলেই হবে না, দেশ থেকে যাতে জমিদারী প্রথা পর্য্যন্ত উঠে যায়—তার জন্যে আন্দোলন করতে হবে। মধ্য-স্বত্বাধিকারী পর্য্যন্ত থাকবে না, জমির মালিক হবে চাষী, যে নিজে হাতে জমি চাষ করে, Tillers of the soil.

দেবুর চোখ দুইটা মুহূর্ত্তে দপ করিয়া যেন অগ্নিস্পৃষ্ট বারুদের মত জ্বলিয়া উঠিল। সেই মুহূর্ত্তেই নাটমন্দিরের ও-পাশ হইতে ন্যায়রত্ন ডাকিলেন—বিশ্বনাথ।

'বিশ্বনাথ' ডাকে বিশ্বনাথ একটু চকিত হইয়া উঠিল। দাদু ডাকেন 'দাদু' বা 'বিশু' নামে, অথবা সংস্কৃত নাটক-কাব্যের নায়কদের নামে, কখনও ডাকেন—রাজন্, কখন রাজা দুষ্যন্ত, কখনও অগ্নিমিত্র ইত্যাদি—যখন যেটা শোভন হয়। বিশ্বনাথ নামে দাদু কখনও ডাকিয়াছেন বলিয়া তাহার মনে পড়িল না। চকিত হইয়া সে সসম্ভ্রমেই উত্তর দিল—আমাকে ডাকছেন ?

ন্যায়রত্ন বলিলেন—হ্যাঁ। খুব ব্যস্ত আছ কি ?

দেবু উঠিয়া ন্যায়রত্নকে প্রণাম করিল। ন্যায়রত্ন আশীর্ব্বাদ করিয়া হাসিয়া বলিলেন—পণ্ডিত !

দেবু সবিনয়ে হাসিয়া বলিল—আর পণ্ডিত নয় ঠাকুর মশায়, পাঠশালা থেকে আমার জবাব হয়ে গিয়েছে। এখন কেবল দেবু ঘোষ কিম্বা মোড়ল।

—তা' মণ্ডল হবার যোগ্যতা তোমার আছে। মণ্ডল তো খারাপ কথা নয়, মণ্ডল মানেই তো নেতা—মুখ্য ব্যক্তি। তারপর বিশ্বনাথকে বলিলেন—তোমাদের কথাবার্ত্তা শেষ হলে আমার সঙ্গে একবার দেখা করবে। কথা বলিয়া তিনি বাড়ীর ভিতরের দিকে অগ্রসর হইলেন, কিন্তু আবার ফিরিলেন। এবার আসিয়া ছোট চৌকী একখানা টানিয়া বসিয়া বলিলেন—মণ্ডল, তোমাদের ধর্ম্মঘটের ব্যাপারটা আমায় বলতে পার ? পাঁচজনের কাছে পাঁচরকম শুনি, কিন্তু আসল ব্যাপারটা কি ?

ন্যায়রত্ন অকস্মাৎ আজ চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছেন। পুত্র শশি-শেখরের আত্মহত্যার পর হইতে তিনি নিরাসক্তভাবে সংসারে বাস করিবার চেষ্টা করিয়া আসিয়াছেন। স্ত্রী বিয়োগে তিনি একফোঁটা চোখের জল ফেলেন নাই, এমন কি মনের গোপনতম কোণেও একবিন্দু বেদনাকে জ্ঞাতসারে স্থান দেন নাই। তাহার পর পুত্রবধূ মারা গেল—সেদিনও তিনি অচঞ্চলভাবেই আপনার কর্ত্তব্য করিয়াছিলেন; কিন্তু আজ অকস্মাৎ চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। এখানকার প্রজা ধর্ম্মঘট লইয়া দেবু ঘোষ, অনিরুদ্ধ কর্ম্মকার, পাতু মুচী গ্রেপ্তার হইয়া চালান গেল, সে সংবাদ বিশ্বনাথ কলিকাতায় বসিয়া কেমন করিয়া পাইল ? কেনই বা সে সঙ্গে সঙ্গে ছুটিয়া আসিয়া তাহাদের জামীনে খালাস করিল ? দেশ-কালের পরিচয় তাঁহার অজ্ঞাত নয়, রাজনৈতিক আন্দোলনের

সংবাদ তিনি রাখিয়া থাকেন ; দেশের বিপ্লবমূলক আন্দোলন ধীরে ধীরে প্রজা আন্দোলনের মধ্যে কেমন করিয়া সঞ্চারিত হইতেছে—তাহাও তিনি লক্ষ্য করিয়াছেন। তাই আজ দেবু ঘোষের সহিত বিশ্বনাথের এই যোগাযোগে তিনি চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। অকস্মাৎ অনুভব করিলেন যে এতকালের নিরাসক্তির খোলসটা আজ খসিয়া পড়িয়া গেল ; কখন আবার ভিতরে ভিতরে আসক্তির নূতন ত্বক সৃষ্ট হইয়া নিরাসক্তির আবরণটাকে জীর্ণ পুরাতন করিয়া দিয়াছে। তাই তিনি যাইতে যাইতেও ফিরিয়া দেবুকে বলিলেন—আসল ব্যাপারটা কি ? ঘটনাটা জানিয়া তিনি প্রাণপণ চেষ্টায় এটাকে এইখানেই মিটাইয়া ফেলিবেন—সংকল্প করিলেন। এ অঞ্চলের তিনি ঠাকুর, তিনি চেষ্টা করিলে সে চেষ্টা ব্যর্থ হইবে না সে বিশ্বাস তাঁহার আজও আছে।

দেবু ঘোষ বলিল—শ্রীহরি ঘোষ বৃদ্ধি চাইছে, টাকায় চার আনা—ছ-আনা—

—উঁহু, শ্রীহরির সঙ্গে তোমাদের বিরোধের কথা আগা-গোড়া বল আমাকে। আমি তো শুনেছি, প্রথম প্রথম তুমি শ্রীহরির দিকেই ছিলে। জমিদারের গমস্তা-গিরি তো তুমিই তাকে গ্রহণ করিয়েছিলে।

দেবু আরম্ভ করিল—সেই প্রারম্ভ হইতে।

* * * *

সমস্ত শুনিয়া ন্যায়রত্ন শুধু বলিলেন—হুঁ।

দেবু বলিল—অন্যায় যদি আমার হয় বলুন আপনি, যে শাস্তি আপনি বলবেন আমি নিতে প্রস্তুত আছি।

ন্যায়রত্ন একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, শাস্তি দেবার শক্তি আমার আর নাই মণ্ডল, তবে আমি বলছি—আমি যদি তোমাদের আপোষ ক'রে দিতে পারি, তাতে কি তুমি রাজী আছ ?

দেবু কিছু বলিবার পূর্ব্বেই বিশ্বনাথ হাসিয়া বলিল—'সাপও না মরে লাঠিও না ভাঙে' ব্যবস্থাটা নিতান্ত অর্থহীন ব্যবস্থা দাদু। কারণ সাপ না মরলে অহরহই লাঠি হাতে সজাগ থাকতে হবে। নইলে সাপের কামড়ে মৃত্যু অবধারিত। আপোষের মানেই তাই—সাপও মরবে না, লাঠিও ভাঙবে না।

ন্যায়রত্ন পৌত্রের মুখের দিকে একবার চাহিলেন—তারপর মৃদু হাসিয়া বলিলেন—রাজা জন্মেজয় সর্পযজ্ঞ করেও সর্পকুল নির্ম্মূল করতে পারেন নি ভাই। সাপ তো থাকবেই—সুতরাং লাঠি ধরে অহরহ যুদ্ধমান থাকার চেয়ে সম্ভবপর হলে সাপের সঙ্গে আপোষ করতে দোষ কি ? তোমার লাঠি থাকলই—যখন সে দংশনোদ্যত হবে—তখনই না হয় লাঠিটা বের করবে।

দেবু ঘোষ এবার বলিল, বিশু ভাই—তুমি প্রতিবাদ ক'র না ; ঠাকুর মশায়, আপনি যদি মিটিয়ে দিতে পারেন—দিন, আমরা আপত্তি করব না।

—বেশ, তোমার সর্ত্ত বল।

দেবু একে-একে সর্ত্তগুলি বলিতে আরম্ভ করিল। অধিকাংশই বৃদ্ধির ব্যাপার লইয়া আইনের কথা। তারপর সে বলিল—ফাঁকি দিয়ে যাদের জমি শ্রীহরি ঘোষ নিয়েছে—তাদের জমিগুলি ফেরৎ দিতে হবে। পাতু মুচী—অনিরুদ্ধ—

বাধা দিয়া বিশ্বনাথ বলিল—অনিরুদ্ধের যে জেল হয়ে যাচ্ছে—তার কি হবে দেবু ?

দেবু চুপ করিয়া খানিকটা ভাবিয়া লইয়া বলিল—ওর আর উপায় নাই। অনিরুদ্ধ নিজে সমস্ত স্বীকার করেছে। আর মামলাও এখন শ্রীহরির হাতে নয়।

ন্যায়রত্ন দেবুঘোষের দিকে চাহিয়া বলিলেন—তোমার কাছে যা শুনলাম তাতে মনে হচ্ছে কর্ম্মকারের স্ত্রী তো সংসারে একা। দেখবার শুনবারও কেউ নাই।

দেবনাথ এ-কথার উত্তর দিতে পারিল না ; অনিরুদ্ধ ও পদ্মের কথা মনে জাগিয়া উঠিতেই আপোষের প্রস্তাবের জন্য একটা লজ্জা আসিয়া তাহাকে যেন মূক করিয়া দিল।

ন্যায়রত্ন বলিলেন—তাকে তুমি আমার বাড়ীতে পাঠিয়ে দিয়ো মণ্ডল। অনিরুদ্ধ যতদিন না ফেরে ততদিন সে আমার এখানেই থাকবে। নাতবউও আমার একা থাকেন, তাঁর সঙ্গী সাথীর মতই থাকবে। বুঝলে ?

দেবু ঘোষ অভিভূত হইয়া গেল। সে ভূমিষ্ট হইয়া ন্যায়রত্নকে প্রণাম করিয়া বলিল—আপনি আমাকে বাঁচালেন ঠাকুর-মশায়, অনিরুদ্ধের স্ত্রীকে নিয়ে আমার ভাবনার অন্ত ছিল না।

দেবু চলিয়া গেলে বিশ্বনাথ পিতামহের মুখের দিকে চাহিয়া অল্প একটু হাসিল ; ন্যায়রত্নের অন্তরের আকুলতার আভাষ সে খানিকটা অনুভব করিয়াছিল। হাসিয়া বলিল—আগুন যখন চারিদিকে লাগে তখন এক জায়গায় জল ঢেলে কি কোন ফল হয় দাদু ?

ন্যায়রত্ন পৌত্রের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন—তারপর ধীরে ধীরে প্রশ্ন করিলেন—বাঁকা কথা ক'য়ে লাভ নাই দাদু—আমি সোজা কথাই বলতে চাই। প্রজা ধর্ম্মঘটের সঙ্গে তোমার সম্বন্ধ কি ? দেবু ঘোষদের এই হাঙ্গামার খবর তোমাকে জানালেই বা কে ?

বিশ্বনাথ হাসিয়া বলিল—টেলিগ্রাফের কল এখানে টিপলে—হাজার মাইল দূরের কল সঙ্গে সঙ্গে সাড়া দেয়, আর কলকাতায় খবরের কাগজ বের হয় দু'বেলা। আর আপনি তো জানেন যে, দেবু আমার ক্লাসফ্রেণ্ড।

—আমি তো বলেছি বিশ্বনাথ, আমি সোজা কথা বলতে চাই ; উত্তরে তোমাকেও সোজা কথা বলতে অনুরোধ করছি। আর আমার ধারণা তুমি অন্তত: আমার সামনে সত্য কখনও গোপন কর না। ন্যায়রত্নের কণ্ঠস্বর আন্তরিকতায় গভীর গম্ভীর, বিশ্বনাথ পিতামহের দিকে চাহিল—দেখিল মুখখানা আরক্তিম হইয়া উঠিয়াছে। বহুকাল পূর্ব্বে ন্যায়রত্নের এ মুখ দেখিলে এ অঞ্চলের সকলেই অন্তরে অন্তরে কাঁপিয়া উঠিত। তাঁহার বিদ্রোহী পুত্র শশিশেখর পর্য্যন্ত এ মূর্ত্তির সম্মুখে চোখে চোখ রাখিয়া কথা বলিতে পারিত না। সে বিদ্রোহ করিয়াছে পিতার সহিত, তর্ক করিয়াছে কিন্তু নতমুখে মাটির দিকে চোখ রাখিয়া। সেই মুখের দিকে চাহিয়া বিশ্বনাথ ক্ষণেকের জন্য স্তব্ধ হইয়া গেল। ন্যায়রত্ন আবার বলিলেন—কথার উত্তর দাও ভাই !

বিশ্বনাথ মৃদু হাসিয়া বলিল—আপনার কাছে মিথ্যে কখনও বলিনি, বলবও না। এখানে—মানে ওই শিবকালীপুর গ্রামে একজন রাজবন্দী ছিল জানেন ? তাকে এখান থেকে সরিয়ে দিয়েছে। খবর দিয়েছিল সেই।

—তার সঙ্গে তোমার পরিচয় আছে?

—আছে।

—তা হ'লে—; ন্যায়রত্ন পৌত্রের মুখের দিকে স্থিরদৃষ্টিতে কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন—তোমরা তাহ'লে একই দলভুক্ত?

—এককালে ছিলাম। কিন্তু এখন আমরা ভিন্ন মত ভিন্ন আদর্শ অবলম্বন করেছি।

অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া ন্যায়রত্ন বলিলেন, তোমাদের মত তোমাদের আদর্শটা কি আমাকে বুঝিয়ে দিতে পার বিশ্বনাথ?

পিতামহের মুখের দিকে চাহিয়া বিশ্বনাথ বলিল—আমার কথায় আপনি কি দুঃখ পেলেন দাদু?

—দুঃখ? ন্যায়রত্ন অল্প একটু হাসিলেন, তারপর বলিলেন—সুখ দুঃখের অতীত হওয়া সহজ সাধনার কাজ নয় ভাই। দুঃখ একটু পেয়েছি বই কি।

—আপনি দুঃখ পেলেন দাদু? কিন্তু আমি তো অন্যায় কিছু করি নি। সংসারে যারা খেয়ে দেয়ে ঘুমিয়ে জীবন কাটিয়ে দেয়—তাদেরই একজন হবার আকাঙ্ক্ষা আমার নাই বলে দুঃখ পেলেন?

—বিশ্বনাথ, দুঃখ পাব না, সুখ অনুভব করব না, এই সংকল্পই তো শশীর মৃত্যুর দিন গ্রহণ করেছিলাম। কিন্তু জয়াকে যেদিন তোমার সঙ্গে বিয়ে দিয়ে ঘরে আনলাম, আজ মনে হচ্ছে সেইদিন শৈশবকালের মত গোপনে চুরী করে আনন্দরস পান করেছিলাম—তারপর এল অজুমণি অজয়। আজ দেখছি—শশীর মৃত্যু দিনের সংকল্প আমার ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে। জয়া আর অজয়ের জন্যে চিন্তার দুঃখের যে সীমা নাই।

বিশ্বনাথ চুপ করিয়া রহিল।

ন্যায়রত্নও কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিলেন—তোমার আদর্শের কথা তো আমাকে বললে না ভাই।

—আপনি সত্যিই শুনতে চান দাদু?

—হ্যাঁ শুনব বই কি।

বিশ্বনাথ আরম্ভ করিল—তাহাদের আদর্শের কথা। ন্যায়রত্ন নীরবে সমস্ত শুনিয়া গেলেন, একটি কথাও বলিলেন না। রুশ দেশের বিপ্লবের কথা—সে দেশের বর্ত্তমান অবস্থার কথা বর্ণনা করিয়া বিশ্বনাথ বলিল—এই আমাদের আদর্শ দাদু। সাম্যবাদ।

ন্যায়রত্ন বলিলেন—আমাদের ধর্ম্মও তো অসাম্যের ধর্ম্ম নয় বিশ্বনাথ। যত্র জীব তত্র শিব, এতো আমাদেরই কথা, আমাদের দেশেরই উপলব্ধি।

বিশ্বনাথ হাসিয়া বলিল—তোমার সঙ্গে কাশী গিয়েছিলাম দাদু, শুনেছিলাম শিবময় কাশী। দেখলাম সত্যিই তাই। বিশ্বনাথ থেকে আরম্ভ করে মন্দিরে মঠে পথে ঘাটে কুলুঙ্গীতে শিবের আর অন্ত নাই, অগুন্তি শিব। কিন্তু ব্যবস্থায় দেখলাম বিশ্বনাথের বিরাট রাজসিক ব্যবস্থা—ভোগে শৃঙ্গারবেশে—বিলাসে প্রসাধনে—বিশ্বনাথের ব্যবস্থা বিশ্বনাথের মতই। আবার দেখলাম কুলুঙ্গীতে শিব রয়েছেন—গুণে চারটি আতপ আর একপাতা বেলপাতা তাঁর বরাদ্দ। আমাদের দেশের যত্র জীব—তত্র শিব ব্যবস্থাটা ঠিক ওই রকম ব্যবস্থা। সেই জন্যেই তো ছোটখাটো এখানে ওখানে ছড়ানো শিবদের নিয়ে বিশ্বনাথের বিরুদ্ধে আমাদের অভিযান—

—থাক বিশ্বনাথ, ধর্ম্ম নিয়ে রহস্য ক'র না ভাই; ওতে অপরাধ হবে তোমার।

—অঙ্কশাস্ত্র আর অর্থশাস্ত্রই আমাদের সর্ব্বস্ব দাদু—ধর্ম্ম আমাদের—

—উচ্চারণ ক'র না বিশ্বনাথ—উচ্চারণ ক'র না।

ন্যায়রত্নের কণ্ঠস্বরে বিশ্বনাথ এবার চমকিয়া উঠিল। ন্যায়রত্নের আরক্তিম মুখে চোখে এবার যেন আগুনের দীপ্তি ফুটিয়া উঠিয়াছে। বহুকালের নিরুদ্ধ আগ্নেয় গিরির শীতল গহ্বর হইতে যেন শুধু উত্তাপ নয়—আলোকিত ইঙ্গিতও ক্ষণে ক্ষণে উঁকি মারিতেছে।

—নারায়ণ নারায়ণ! বলিয়া ন্যায়রত্ন উঠিয়া পড়িলেন। বহুকাল পরে তাঁহার খড়মের শব্দ কঠোর হইয়া বাজিতে আরম্ভ করিল। ঠিক এই সময়েই জয়া অজয়কে কোলে করিয়া বাড়ী ও নাটমন্দিরের মধ্যবর্ত্তী দরজায় আসিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—নাতি ঠাকুর্দ্দায় খুব তো গল্প জুড়ে দিয়েছেন—এ দিকে সন্ধ্যে যে হ'য়ে এল।

ন্যায়রত্ন নীরবে বাড়ীর ভিতরের দিকে অগ্রসর হইলেন। বিশ্বনাথও কোন উত্তর দিল না। জয়াই আবার কাহাকে সম্বোধন করিয়া প্রশ্ন করিল—কে গো—কে গো তুমি?

ন্যায়রত্ন ও বিশ্বনাথ উভয়েই পিছন ফিরিয়া দেখিল—দীর্ঘ অবগুণ্ঠনবতী দীর্ঘাঙ্গী একটি মেয়ে দাঁড়াইয়া আছে। মেয়েটির মুখ দেখা যায় না, কিন্তু তাহার চোখের দৃষ্টি দেখা যাইতেছিল; মেয়েটি অবগুণ্ঠন ঈষৎ উন্মুক্ত করিয়া বিচিত্র দৃষ্টিতে দেখিতেছিল জয়াকে—জয়ার কোলের অজয়কে—সময়ে সময়ে বিশ্বনাথকে। সে দৃষ্টির অর্থ ভগবান জানেন, কিন্তু সে দৃষ্টি দেখিয়া অশ্বস্তি হয় মানুষের। স্থির জলজলে দৃষ্টি।

ন্যায়রত্ন বলিলেন—কে বাছা তুমি?

মেয়েটি ন্যায়রত্নকে প্রণাম করিয়া নীরবে একখানি চিঠি বাহির করিয়া নামাইয়া দিল।

পত্রখানি পড়িয়া ন্যায়রত্ন বলিলেন—এস মা বাড়ীর ভেতর এস; দেবু ঘোষকে আমি বলেছিলাম। অনিরুদ্ধ যতদিন না-ফেরে ততদিন তুমি আমার বাড়ীতেই থাক।

(ক্রমশঃ)

নারী

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত এম-এ, পিএচ্‌-ডি, সি-আই-ই

মেয়েদের শক্তি ও অধিকারের তারতম্য নিয়ে কিছুদিন পূর্ব্বে য়ুরোপে বেশ একটা তুফান উঠেছিল। আমাদের সঙ্গে য়ুরোপের এমন একটা সম্বন্ধ আছে যে ওদেশে তুফান উঠ্‌লেই তার একটা ধাক্কা এসে আমাদের দেশে লাগবেই। পশ্চিমের দক্ষিণ সমুদ্রে একটা বিশেষ সময়ে পুঞ্জীভূত মেঘের জন্ম হয়। সেই মেঘ তার রাজবৎ উদ্ধত গতিতে "আষাঢ়স্য প্রথম-দিবসে" আমাদের দেশের পর্ব্বতের সানুমণ্ডলকে ব্যাপ্ত করে ফেলে। এই হোল বর্ষারাজের আবির্ভাব। যথাবদ্‌বর্ষণে আমাদের দেশ শস্যশ্যামল হ'য়ে ওঠে, আবার অতিবর্ষায় উপদ্রবে বন্যা হ'য়ে লক্ষ লক্ষ লোক বা সহস্র সহস্র লোক ভেসে যায়। য়ুরোপের নানা হাওয়া, নানা ভাব আমাদের দেশে চালিত হয়ে অনেক সময় আমাদের দেশের অনেক মঙ্গল করেছে এবং কোন কোন সময় অমঙ্গলের সীমানাও বাড়িয়ে দিয়েছে। য়ুরোপের মেয়েরা রাষ্ট্রনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যাপারে এবং শিক্ষাবিষয়ে এমন কি বেতনভোগী রাজকার্য্যের জন্য সমানাধিকার চেয়ে আপনাদের ইচ্ছাকে য়ুরোপীয় কোলাহলময় উপায়ে ব্যক্ত করেছিল; তাদের সেই চৈতন্যকে জাগ্রত করেছিল পুরুষ। ফরাসী বিপ্লবের সময় থেকে যে সাম্য মৈত্রী ও স্বাধীনতার বিজয়-বৈজয়ন্তী উড্ডীন হয়েছিল, সেটা, তার সীমানা, নানা অবস্থার নানা স্তরের পুরুষের মধ্যে, সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতা স্থাপন ক'রে শেষ হ'তে পারে নি। যে যুক্তিতে চাষী তার জমীদারের সঙ্গে এক অধিকারের দাবী করেছে সে যুক্তির স্বাভাবিক পরিণতি পুরুষ ও স্ত্রীর মধ্যে অধিকারের বেড়া উল্লঙ্ঘন না ক'রে পারে না। যুক্তির মধ্যে এমন একটা খরধার ক্ষুর আছে যার মুখে পড়লে অনেক কালের শক্ত বেড়াও অনায়াসে ছিন্ন হয়ে যায়। আমাদের দেশে যুক্তির এই খরধার সম্বন্ধে পণ্ডিতেরা অত্যন্ত সচেতন ছিলেন ব'লে, তাকে যেখানে সেখানে চালাবার অবকাশ দিতেন না। শাস্ত্রের মন্দার পাহাড় সম্মুখে চাপিয়ে দিয়ে তাঁরা যুক্তি চালনার পথকে সঙ্কীর্ণ করে দিয়ে যেতেন। তাঁরা জানতেন যে অনেক সত্যের সঙ্গে অনেক মিথ্যার ভেজাল দিয়ে সমাজ তৈরী হয়েছে। সত্য ও মিথ্যার টানা পোড়েনে সমাজের জাল নিরন্তর তৈরী হচ্ছে। তাই তাঁরা সমাজের মধ্যে খাঁটী সত্যকে যায়গা দিতে চাইতেন না। সমাজের মধ্যে আমাদের যে সমস্ত কাজ, তা দৃষ্টফল অর্থাৎ তার ফল চোখে দেখা যায়। কাজেই সেখানে যুক্তির ছুরি চালাতে কোন দ্বিধা হবার কথা নয়, তাই তাঁরা আমাদের সমাজের আচরণকে আচারে পরিণত করে তুলেছিলেন এবং আমাদের প্রত্যেকটি দৈনন্দিন কাজের মধ্যে একটা অলৌকিক বা পারলৌকিক ব্যাপার নিয়ত জড়িত রয়েছে, একথা অতি স্পষ্ট করে লোককে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। পারলৌকিক ব্যাপার সম্বন্ধে যুক্তি বড় সুবিধে করতে পারে না, কারণ যুক্তিকে একটা প্রত্যক্ষের ঘাটী থেকে রওনা হ'তে হয়, কিন্তু পারলৌকিক ব্যাপারে সমস্ত ভূমিকা বৈতরণী নদীর ওপারে; কাজেই সেখানে যেতে হলে শাস্ত্র-সুরভির লেজ ধরে যাওয়া ছাড়া অন্য উপায় নেই। পরলোক অপ্রত্যক্ষ ব'লেই ভয়াবহ। যম নচিকেতাকে বলেছিলেন যে, যারা পরলোক মানে না তারা বারবার আমার কবলগ্রস্ত হয়।

আমাদের দেশের প্রাচীন আর্য্যেরা এসে পড়েছিলেন একটা অনার্য্য দেশে; তখন তাঁদের প্রধান চিন্তা এই হয়েছিল যে বুঝি বা অনার্য্যদের সঙ্গে মিশে তাঁদের আর্য্যস্বভাব নষ্ট হয়ে যায়।

আমাদের দেশের বৈশাখ মাসের গরমে যখন প্রাণ আইঢাই ক'রে ওঠে, তখনও সাহেবরা তাদের পাতলুন কোট ছাড়ে না। বিলেতে শীতের দিনে ন'টায় ভোর হয় এবং আটটা ন'টা পর্য্যন্ত লোক ঘুমিয়ে থাকে। কিন্তু এ দেশে যদিও পাঁচটা বা ছটাতেই ভোর হ'য়ে থাকে তথাপি মানী সাহেবরা ন'টার আগে ওঠেন না। তাদের দেশের খাদ্য খাবার সময় বল্‌তে গেলে তাদের সমস্ত আচার তারা একান্ত অটুট রেখেছে। অথচ আমাদের জাহাজে উঠলেই চিন্তা হয় কেমন করে কাঁটা-চামচ ধরব, মাংসের ছুরিটা মাছ কাটতে হঠাৎ ব্যবহার ক'রে ফেললে সে কি দারুণ অসভ্যতা। আমাদের দেশে সাহেবদের বাড়ীতে নেমন্তন্ন ক'রে খাওয়াতে গেলে আমরা থালায় কিম্বা কদলীপত্রে ভাত ও ডাল মেখে হাপুস হুপুস ক'রে খাওয়ার ব্যবস্থা তাদের জন্য করি না। এমন কি কোন সাহেবের সন্নিধিতে খেতে হলে আমাদের চিরাভ্যস্ত ধুতি-পাঞ্জাবী ছেড়ে দারুণ গ্রীষ্মে অনভ্যস্ত পোষাকের মধ্যে আমাদের শরীরটাকে কোন রকমে ভরে নিই। প্রথম যখন টাই বাঁধতে শিখি তখন দু'তিন দিন আয়নার সামনে বসে গলদঘর্ম্ম হয়েও শিখতে পারিনি। পরে সৌভাগ্যক্রমে কোন ব্যারিষ্টার আত্মীয়ের টাই বাঁধবার সময় তাঁর নিপুণ হাতের অঙ্গুলী চালনা দেখে তাঁর প্রয়োগের প্রণালী অভ্যেস করে নিই। এই গরমদেশে সকল সাহেবের যে বিলাতী আচারটা ভাল লাগে তা আমার মনে হয় না, কিন্তু এটা তাদের মধ্যে অলঙ্ঘনীয় আচার হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। এর ব্যতিক্রম ঘটলে বোধহয় তাঁদের স্বদেশী-ভ্রাতাদের কাছে তাঁরা অস্পৃশ্য হন। পারলৌকিক ভয় না থাকলেও ইহলৌকিক ভয়টা বড় কম নয়। আমার মনে হয় যে আমাদের দেশের প্রাচীন আর্য্যেরাও এই একই কারণে বৈদিক আচারটা বাঁচিয়ে রাখবার প্রাণপণ চেষ্টা করেছিলেন। ইহলৌকিক কারণ দেখিয়ে যখন সব আচার বাঁচিয়ে রাখতে পারবেন বলে তাঁরা ভরসা পেলেন না তখন পারলৌকিক দোহাই দিয়ে তাঁরা সেই আচার বাঁচাবার চেষ্টা করেছিলেন। যে বেদ আমরা পাই, তার নানা আখ্যান বা উপাখ্যানের মধ্যে সমস্ত আচার ধরা পড়ে না; তখন তাঁরা বল্লেন যে অনেক বেদের শাখা লুপ্ত হয়েছে; সেই সব শাখার কথা স্মরণ ক'রে যাঁরা বই লিখেছেন সেগুলোও আমাদের অবশ্যপালনীয়। এতেও যখন কুলালো না, তখন তাঁরা বল্লেন যে ব্রহ্মাবর্ত্ত দেশে অর্থাৎ ভারতবর্ষের মধ্যপ্রদেশে যেখানে মধ্যযুগের বৈদিকেরা বাস করতেন সেই দেশের যে আচার তাই সকল শিষ্ট ব্যক্তিকে পালন করতে

হবে। এর কোন কেন নেই ; কারণ এইরূপ আচার পালন না করলে অধর্ম্ম হবে এবং তার ফল পারলৌকিক দণ্ড। সেই থেকে সেই বৈদিক আচারকে অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চলেছে—মনস্বী হিন্দুদের এবং হিন্দুরাজাদের। দিলীপের প্রশংসা করতে গিয়ে কালিদাস বলেছেন যে মেঠোপথে গাড়ীর চাকা যেমন চাকার দাগের মধ্য দিয়ে চলে, তেমনি দিলীপের প্রজারা মনু যে পথ দেখিয়ে গেছেন সেই পথ দিয়ে চলত, তা থেকে একটুও তাদের ব্যতিক্রম ঘটত না। পরবর্ত্তীকালে আর্য্য অনার্য্যের বহুল মিশ্রণ হ'য়ে গেছে, শক হূণ এবং গ্রীক রক্ত ভারতবর্ষের আর্য্যরক্তের সঙ্গে মিশে গেছে, মোগল পাঠানের দাপটে শত শত বৎসর ধরে ভারতবর্ষে বিপ্লবের তরঙ্গ ছুটেছে। এই সমস্ত দুর্ঘটনার মধ্যে নানা বিপদের ঝটিকাঘাতের মধ্যে ভারতবর্ষের হিন্দু তার স্বতন্ত্রতা রাখবার জন্যে আঁকড়ে ছিল তার পূর্ণ আচারকে। ভারতবর্ষের উচ্চ অঙ্গের ধর্ম্ম এত উদার যে তা সার্ব্বজনীন। কোন জাতির সীমানা দিয়ে তার সীমানা নির্দ্দেশ করা যায় না। ইরাণেও বাস করত আর্য্যেরা, কিন্তু সপ্তম অষ্টম শতাব্দীতে যখন মুসলমানেরা তাদের আক্রমণ করল তখন তাদের পুরোনো আচারের মধ্যে এমন কিছু ছিল না যাতে তাদের স্বতন্ত্র করে রাখতে পারে। তাই মুসলমান আক্রমণের বন্যায় তারা ভেসে গেল, তাদের স্বতন্ত্রতা ধ্বংস হ'ল। পুরোনো সভ্যতার জায়গায় ইরাণী আর্য্যেরা তাদের বুদ্ধিকে নিয়োজিত করলে সাহিত্যে, দর্শনে, ধর্ম্মে ইস্‌লাম সভ্যতাকে গ'ড়ে তুলতে। ভারতীয় আর্য্যেরা যেখানে আচারের কঠোরতা দিয়ে একটা স্বতন্ত্রতার করতে চেষ্টা করেনি সেখানে ইস্‌লাম প্রবেশ করেছে। লক্ষ লক্ষ অন্ত্যজদের আর্য্যেরা তাদের নিবিড় আচারের বন্ধনে বাঁধতে চেষ্টা করে নি, তাদের স্বতন্ত্র করে রেখেছিল, তাই তারা সহজে ইস্‌লামের মধ্যে ডুবে গেছে। আজকের ভারতবর্ষে জাতীয়তা গঠনের চেষ্টা এমন দুরূহ হ'ত না—যদি তার পেছনে এ ইতিহাস না থাকত। উচ্চ ধর্ম্মের উচ্চ উপদেশ সাধারণকে বাধ্য করে না, তাই সাধারণকে বাঁধবার জন্য এই আচারের বন্ধনের কঠোরতার প্রয়োজন হয়েছিল। বেদ ও পরলোকের ভয় দেখিয়ে মনস্বীরা আর্য্যদের স্বতন্ত্রতা আচারের মধ্য দিয়ে রক্ষা করতে চেষ্টা করেছিলেন।

ভারতবর্ষের সভ্যতার একটা প্রধান লক্ষণ হচ্ছে এই যে, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির চেয়ে মানুষের পক্ষে আর বড় রকমের কাম্য কিছু নেই। এই উন্নতিকে সার্থক ও সফল করতে হ'লে সমাজের বিভিন্ন স্তরের, বিভিন্ন প্রকারের কর্ম্মানুবর্ত্তীদের পরস্পরের সম্বন্ধ অক্ষুণ্ণ রাখতে হয়। আজকালকার দিনের বড় বড় নয়-পণ্ডিতেরা বলেন যে state বা রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য হচ্ছে সমাজের বিভিন্ন স্বার্থের মধ্যের, বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যের সম্বন্ধকে একটা সামঞ্জস্যের অক্ষুণ্ণতায় স্থাপন করা। যাঁরা বলেন যে সমাজের মধ্যে মাত্র দু'টী শ্রেণী আছে, একটী capitalist বা বুর্জ্জোয়া এবং অপরটি proletariat বা শ্রমিক তাঁরা বলেন যে এই ধনিক ও শ্রমিকের পারস্পরিক সম্বন্ধের মধ্যে যাতে একটা বিপ্লব না ঘটে তাহাই ষ্টেটের প্রধান উদ্দেশ্য এবং তা লক্ষ্য ক'রেই যতনিয়ম ও আইন রচিত ও প্রবর্ত্তিত হচ্ছে।

ভারতবর্ষীয় প্রাচীন সমাজ-বন্ধনের মধ্যে সাধারণতঃ মেয়েদের স্থান ছিল অন্তঃপুরে। বিবাহই ছিল তাদের একমাত্র সংস্কার। অবশ্য এর ব্যতিক্রমও ছিল নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারিণীদের সম্বন্ধে এবং ব্রহ্মবাদিনীদের সম্বন্ধে। উচ্চ জ্ঞান লাভের প্রয়াসে যাঁরা ব্রতিনী হ'তেন হিন্দুর শাস্ত্রে তাঁদের ঠেকাবার চেষ্টা করেনি। শুধু হিন্দু নয়, বৌদ্ধ এবং জৈনধর্ম্মেও মেয়েদের এ উচ্চ অধিকার থেকে বঞ্চিত করে নি। কিন্তু সমাজের দৈনন্দিন জীবন যাত্রার মধ্যে যে ব্যবহার-নীতি আছে তার মধ্যে মেয়েদের কোন স্থান ছিলনা এবং পরবর্ত্তীকালে বেদপাঠে মেয়েদের কোন অধিকার ছিল না, অথচ বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিদের মধ্যে আমরা মেয়েদের নাম পাই।

পরবর্ত্তীকালে দেখা যায় যে পূর্ব্ববর্ত্তীকালের পত্তি-সংগ্রহ সম্বন্ধে মেয়েদের যে স্বতন্ত্রতা ছিল সে স্বাতন্ত্র্য ক্রমশঃ লোপ পেয়ে এসেছে। মেয়েদের দেখবার চেষ্টা হয়েছে কেবলমাত্র সন্তান উৎপত্তির দিক থেকে। তাদের সম্বন্ধ দেখবার চেষ্টা হয়েছে স্বামীর প্রতি একান্ত আনুগত্যের দিক থেকে এবং বিধবা অবস্থায় একান্ত ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করে পতিপ্রেমের মহত্বকে প্রধান ধর্ম্মরূপে জাজ্জ্বল্যমান করে রাখবার চেষ্টা থেকে যে সময় আট থেকে দশের মধ্যে বিবাহের প্রথা প্রবর্ত্তিত হয়েছিল তখন নিশ্চয়ই সমাজের অবস্থা এমন ছিল যে যৌবনকল্পা হ'লেই পুরুষের লোভ থেকে তাকে রক্ষা করা অসম্ভব হয়ে উঠতো। ভারতবর্ষের রাষ্ট্রবিপ্লবের যে করুণ ইতিহাস আমরা জানি তাতে রাজা বা রাজকর্ম্মচারীদের এ জাতীয় দৌরাত্ম্যের কথা আমরা অনায়াসেই অনুমান করতে পারি। সন্তানোৎপত্তি বিষয়ে প্রকৃতি মেয়েদের এমন শক্তিহীন করেছেন যে সম্পূর্ণ সভ্য সমাজ না হলে মেয়েদের কোন বলিষ্ঠ পুরুষের আশ্রয় ব্যতীত থাকা চলে না। বাল্যকালে মেয়েদের রক্ষা করবেন পিতা, যৌবনে স্বামী এবং প্রৌঢ় অবস্থায় ও বার্দ্ধক্যে পুত্র।

বিভিন্ন প্রতিকূল জাতির সংঘর্ষ এবং এমন সকল জাতির আধিপত্য ভারতবর্ষের ভাগ্যকে কালিমাময় করে রেখেছিল—যারা অরক্ষিত স্ত্রীলোক মাত্রকেই ভোগ করতে ধর্ম্ম ও আচারে কুণ্ঠাবোধ করত না। এ দুর্ভাগ্য য়ুরোপে তেমন ঘটেনি। আফ্রিকার জঙ্গলে যদি কাউকে থাকতে হয়, সেখানে রাত্রি হ'লেই যখন বাঘ ভালুক হানা দিতে পারে তখন দরজা বন্ধ করে থাকা ছাড়া উপায় নেই।

এই কারণে আমাদের ইতিহাসে শত শত বৎসরের অভ্যাস মেয়েদের একান্তভাবে পুরুষাশ্রয়িণী ক'রে তুলেছে এবং যাঁরা এই প্রাচীন ইতিহাসের দিকে দৃষ্টি করেন না তাঁরা এই রকমই ভাবতে শিখেছেন যে পুরুষাশ্রয় ব্যতিরেকে বিবাহ বন্ধনে একান্তভাবে পুরুষানুবর্ত্তিনী হ'য়ে থাকা ছাড়া, আর সমস্তই মেয়েদের পক্ষে অশোভন, এমন কি অন্যায়। যখন মেয়েদের উচ্চশিক্ষা প্রথম বাংলা দেশে প্রবর্ত্তিত হয়েছিল তখন অনেক প্রতিভাশালী লেখক তা নিয়ে ব্যঙ্গ করেছিলেন। কিন্তু একটা কথা ভুললে চলে না, যে দীর্ঘকালের সমাজ সংরক্ষণের ব্যবস্থা ও দীর্ঘকালের অভ্যাসে বুদ্ধি ও প্রবৃত্তির যে জড়তা ঘটে অবস্থার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে অতি অল্পকালের মধ্যে সে অভ্যাস দূর হইতে পারে। এ কথা যদি সত্য না হ'ত তবে ইটালি বা জার্ম্মানী ফ্যাসিষ্ট হতে পারত না, এবং Czar শাসিত রাশিয়া communist হতে পারত না; ফরাসী republicএর সভাপতি শ্রমিকদের সঙ্গে সন্ধি করতে পারতেন

না। Laski বলেন, যে যদিও England শত শত বৎসর ধরে গণতন্ত্রতার অভ্যাস ঘনিয়ে তুলেছে তবুও চারিদিকের পরিস্থিতির পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে Englandকে হঠাৎ Socialist হয়ে যেতে দেখলে বিস্মিত হ'বার কারণ নেই। বর্ত্তমান যুদ্ধে Englandএর পক্ষে যে নিয়ম করা সম্ভব হয়েছে যে, প্রজাদের যথাসর্ব্বস্ব যে কোন সময় রাষ্ট্রের কাজে নিয়োজিত হতে পারবে এ ব্যাপারটীও তার সাক্ষ্য দেয়।

পুরুষের মধ্যে যে বুদ্ধি, যে বিচারশক্তি, যে চরিত্রবল আছে নারীর মধ্যেও তাই আছে। যে ক্ষেত্রে এতদিন নারীকে চলতে হয়েছে সে ক্ষেত্রে নারী তার পরিচয় দিয়েছে। নারীর মধ্যে গার্গী, মৈত্রেয়ী প্রভৃতি বহু ব্রহ্মবাদিনী জন্মেছেন, পুরুষের ন্যায় সম্মুখ যুদ্ধে আত্মত্যাগ করতে পারেন এমন বীরাঙ্গনার বহু চিত্র ভারতবর্ষের ইতিহাসে দেখা যায়; স্বামীর চিতায় সহাস্যে অগ্নি প্রবেশ করেছেন, এমন দৃঢ়তার দৃষ্টান্ত অনেক মেয়ে দেখিয়েছেন। নারীদের মধ্যে বহু কবি জন্মগ্রহণ করেছেন। কবি বিজ্জকা সম্বন্ধে একটী শ্লোক শুনতে পাওয়া যায়।

নীলোৎপলদল-শ্যামাং বিজ্জকাং তাম্ অজানতা।
বৃথৈব দণ্ডিনা প্রোক্তং সর্ব্বশুক্লা সরস্বতী।

অর্থাৎ নীলোৎপলদলশ্যামা বিজ্জকাকে জানেন না বলেই দণ্ডী সরস্বতীকে সর্ব্বশুক্লা ব'লে বর্ণনা করেছেন। একথা অবশ্য বলা চলে যে নারীর মধ্যে দু'একজন কালিদাস বা রবীন্দ্রনাথ হন নি। কিন্তু ভারতবর্ষের কোটি কোটি লোক সহস্র বৎসর পূর্ণভাবে বিদ্যা-শিক্ষার সুযোগ পেয়ে আসছে, তাদের মধ্যে কয়জনই বা কালিদাস বা রবীন্দ্রনাথ হয়েছে। ভারতবর্ষের রাষ্ট্রনৈতিক বা অন্তবিধ কারণে মেয়েদের সমস্ত সামর্থ্য, সমস্ত বুদ্ধি, সমস্ত ত্যাগের অবসর প্রযুক্ত হয়ে এসেছে অন্তর্মুখে, পরিবার গঠনের মধ্যে। কচিৎ কখনও দু'একজন নারী শিক্ষার অবসর লাভ করেছেন। এই অল্প-সংখ্যক নারীদের মধ্যে অনেক মেধাবিনী নারীদের নাম ইতিহাস আমাদের কাছে আবাহন করে এনেছে। এমন অনেক শক্তিমতী, সাহসিকা, ত্যাগশীলা বীরাঙ্গনা নারীর নাম আমরা শুনতে পাই যে আমাদের বিস্মিত হতে হয়।

অতি অল্পদিন হয় বাংলাদেশে স্ত্রীশিক্ষা প্রবর্ত্তিত হয়েছে। কিন্তু গত পনর কুড়ি বৎসরের মধ্যে মেয়েদের মধ্যে শিক্ষার জন্য এমন একটা উৎসাহ দেখা যাচ্ছে যা বিস্ময়কর। পরীক্ষার প্রতিযোগিতায় পুরুষকে তারা অনায়াসে হারিয়ে দিচ্ছে, কিন্তু একথা এখনও বলা যায় যে পুরুষের মধ্যে যেরূপ উদ্ভাবনী শক্তি আছে, সমাজে দশের সঙ্গে নানা সংঘর্ষের মধ্য দিয়ে প্রবল তুফানের মধ্যে হাল ধরে এগিয়ে যাবার যে শক্তি দেখা যায়, যে বাগ্মীতা দেখা যায়, মেয়েদের মধ্যে তার পরিচয় কই? কিন্তু তবুও বলতে হবে যে শ্রীমতী সরোজিনী নাইডুর ন্যায় ইংরাজী বলতে পারেন এমন বক্তা এদেশে ওদেশে কোথাও দেখিনি। এ কথাও বলতে হবে যে মেয়েরা আমাদের দেশে যে বিদ্যাশিক্ষার সুযোগ পেয়েছে সে অতি অল্পদিন মাত্র। একটা প্রশ্ন উঠতে পারে যে পুরুষের অধীন হয়ে মেয়ে থাকবে কেন? আজ যে মেয়েরা লেখাপড়ার সুযোগ পেয়েছে, সে সুযোগও পুরুষরা তাদের দিয়েছে বলে, তারা পেয়েছে, এ তারা নিজের বলে অর্জ্জন করেনি। কিন্তু পুরুষ দিয়েছে কেন নারীদের এ সুযোগ? য়ুরোপে আমরা দেখতে পাই যে রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে এমন সংগ্রাম বেধেছে যে প্রত্যেক জাতির সমস্ত নারী ও পুরুষের সংহত চেষ্টা ব্যাতিরেকে কোন জাতিরই মুক্তির উপায় নেই। তাই পুরুষ ডেকেছে নারীকে। পুরুষ বলেছে, আমাকে যুদ্ধে যেতে হবে, সমাজের যে কাজ আমরা করতুম, সে কাজ এখন তুমি কর। নারী সে ডাকে সাড়া দিয়েছে, সে অন্তঃপুরের প্রাঙ্গণ থেকে পুরুষাভ্যস্ত সর্ব্ববিধ কাজে যোগ দিয়েছে। সে গাড়ী চালাচ্ছে, রাস্তাঘাট পরিষ্কার করছে, বাড়ী তৈরী করছে, যুদ্ধের অস্ত্র তৈরী করছে, উপরন্তু শুশ্রূষা করছে। অনভ্যস্ত নারীকে পুরুষ যখন তার হাতে নিজের কাজ সঁপে দিল, তখন নারী যে কেবল পরাঙ্মুখ হয় নি তা নয়, পুরুষের ন্যায় পূর্ণ যোগ্যতায় সে কাজ চালিয়ে এসেছে, পুরুষের মুখ রক্ষা করেছে, দেশের স্বাধীনতা রক্ষা করেছে। ভবিষ্যতের প্রয়োজন যদি আরও নিবিড় ও ভয়াবহ হয়ে ওঠে এবং নারীকে যদি যুদ্ধক্ষেত্রে যেতে হয় তাতেও যে সে পশ্চাদ্‌পদ হবে বা ব্যর্থ হবে একথা মনে হয় না। আজকালকাল যুদ্ধ ভীমের ন্যায় গদাযুদ্ধ নয়, দুঃশাসনের বক্ষ চিরে রক্তপানের কোন ব্যবস্থা নেই, আজকালকার যুদ্ধ, কৌশলের যুদ্ধ, বুদ্ধির যুদ্ধ, কষ্ট সহিষ্ণুতার যুদ্ধ, সে যুদ্ধে নারী কখনও পরাঙ্মুখ হবে না। নারীর মধ্যে যে প্রচ্ছন্ন শক্তি আছে তা ভারতবর্ষীয়েরা ভাল করেই জানতেন। য়ুরোপে শক্তির দেবতা পুরুষ, ভারতে শক্তির দেবতা নারী। তিনি যেমনি জগদম্বা, জগৎপালিনী, তেমনি তিনি সংহর্ত্রী কালী করালী। তিনি দুর্গা দুর্গতিনাশিনী এবং সেই সঙ্গে অসুর-বিনাশিনী।

পুরুষের কাছ থেকে নারী যে সুযোগ সুবিধা ও ক্ষমতার জন্য কাড়াকাড়ি দ্বন্দ্ব করে নি, তার একটী প্রধান কারণ এই যে প্রকৃতি তার নিয়মে জগৎরক্ষার জন্য নারীকে এই প্রকৃতিই প্রধানভাবে দিয়েছেন, যে সৃষ্টিতে তার আনন্দ, পালনে তার উল্লাস। তাই সৃষ্টির সহায় যে পুরুষ তার প্রতি তার আত্মদান স্বচ্ছন্দ স্বাভাবিক প্রেমে, অধীনতার আনুগত্যে নয়। আপনাকে একান্তভাবে মুছে দিতে আপন প্রিয়জনের জন্য, আপন সন্তানের জন্য, নারী যেমন পারে পুরুষ তেমন পারে না। প্রকৃতির ব্যবস্থায় নারীর সমস্ত জীবনের শক্তি কেন্দ্রীভূত হয়েছে ভালবাসায়, প্রেমে। পুরুষের পক্ষে ভালবাসা বা প্রেম অতি প্রগাঢ় হতে পারে বটে কিন্তু তা তার জীবনের একদেশ মাত্র। যে পুরুষ নারীর ভালবাসার মধ্যে আপনাকে একান্ত বিলোপ করে, তার বিরাট কর্ম্মজগত থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে, নারী তাকে শ্রদ্ধা করতে পারে না। পুরুষের বিরহে নারী দুঃখ পায়। পুরুষ যখন কর্ম্মের মধ্যে আপনাকে সম্পূর্ণভাবে ছেড়ে দেয় নারী তখন নিঃসঙ্গ ও অসহায় বোধ করে, গভীর দুঃখে আর্ত্ত হয়ে ওঠে; কিন্তু তবুও সে চায় না যে পুরুষ তার অঞ্চল ধরে, তার ভালবাসার বিলাসে, তার বিরাট কর্ম্মক্ষেত্র হ'তে আপনাকে বিচ্যুত করে। সেই জন্যে পুরুষ যখন নারীকে অন্তঃপুরে বন্দিনী করেছে, আপন স্বর্ণ-কঙ্কনের বন্ধনের সঙ্গে সে স্বেচ্ছায় সোল্লাসে তা গ্রহণ করেছে; কারণ প্রকৃতি প্রতিষ্ঠিত করেছেন তাকে এইখানে তার মহিমা বিস্তার করতে। প্রেমে, কোমলতায়, ত্যাগে, আপনাকে একান্ত রিক্ত করে দেবে এইটেই হচ্ছে মেয়েদের

অন্তর্মুখীন বৃত্তি। কিন্তু তাই বলে একথা বলা চলে না যে পুরুষাভ্যস্ত যে কোন কাজে নারী একান্তভাবে তার মনুষ্যত্ব, তার বীর্য্য দেখাতে অক্ষম। আজই আমরা বাংলাদেশে দেখছি এমন অর্থনৈতিক সমস্যা এসে উপস্থিত হয়েছে যে সুশিক্ষিত বিবাহিত স্ত্রী পুরুষ একত্র বাস করছেন, মেয়েরা গৃহস্থালীর সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন করছেন এবং পুরুষের ন্যায় চাকরী করে অর্থোপার্জ্জন করছেন। আজও পর্য্যন্ত বাংলাদেশের সমাজ ব্যবস্থা মেয়েদের চেপে রেখেছে। গুটি কত মেয়ে স্কুলে বা মেয়ে-কলেজে চাকরী করা ছাড়া স্বতন্ত্রভাবে অর্থোপার্জ্জনের মেয়েদের কোন পথ নেই। এমন কি সরকারী কলেজেও এই দুর্নীতিটা বিনা প্রতিবাদে চলে আসছে যে সমযোগ্যতা সম্পন্ন নারী পুরুষের চেয়ে কম বেতন পান। এর মধ্যে কোন যুক্তি নেই, কোন কারণ নেই, এটা নারীর প্রতি পুরুষের অসম্মান ও অবিচার। এমন অনেক মেয়েদের কথা আমি জানি যাঁরা কলেজের দুর্দান্ত পুরুষ ছেলেদের অত্যন্ত সফলতার সঙ্গে বশে রাখেন ও শিক্ষা দেন। অথচ সেই ছেলেরাই অতি বড় বড় প্রবীণ পুরুষ অধ্যাপকদের পড়াবার সময় পিছন থেকে জামায় কালী ঢালতে কসুর করেনা। যদি ভবিষ্যতে বাংলা দেশের অর্থনৈতিক সমস্যা আরও কঠিন হ'য়ে ওঠে এবং সমাজের কাজের নানা দরজা মেয়েদের কাছে উন্মুক্ত হয় তবে মেয়েরা তাদের যোগ্যতা প্রমাণ করতে অসমর্থ হবে বলে আমি মনে করি না। পারম্পরিক প্রতিযোগিতায় যে সমস্ত পরীক্ষা আছে তাতে পুরুষ মেয়েদের স্থান দেয় নি। দেওয়া হয়েছিল পারে নি, এর দৃষ্টান্ত নেই। এই জন্য পুরুষের মধ্যে যে মনুষ্যত্ব দেখা যায় সে মনুষ্যত্ব নারীর মধ্যে পূর্ণভাবে আছে একথা অস্বীকার করা যায় না। অধিকন্তু নারীর মধ্যে যে আত্মভোলা প্রেম আছে, যে সহজ স্বার্থত্যাগ আছে, যে কোমলতা আছে, যে সেবা এবং শুশ্রূষা-পরায়ণতা আছে তা পুরুষের মধ্যে অতি বিরল।

সারা পৃথিবীর মানুষের দেশ—

শ্রীনরেন্দ্র দেব

সে দেশ আমার স্বদেশ যে দেশে মানুষের বাস ভাই,
সারা পৃথিবীর মানুষের দেশে স্বদেশের দেখা পাই ;
মানুষ আমার স্বজন স্বজাতি,
আমি মানুষের আত্মীয় জ্ঞাতি,
দেহে মনে আছে আমাদের যোগ, রক্তে প্রভেদ নাই ;
সারা পৃথিবীর মানুষের দেশ আমার স্বদেশ ভাই !

যে দেশে আকাশে আলোক বিকাশে একই রবি শশী তারা,
ফুলে ফলে ঝরে মধু পরিমল, জীবকোষে প্রাণ ধারা ,
স্নেহ দয়া মায়া ঘিরি সমাবেশ
যেথা কুটিলতা হিংসা ও দ্বেষ ;
মনোরাজ্যের মনসিজ লোকে প্রভেদ যেথায় নাই ;
সেই পৃথিবীর মানুষের দেশ আমার স্বদেশ ভাই !

যাদের ইসারা ইঙ্গিত বুঝি, আঁখির চটুল ভাষা
অন্তর মাঝে অনুভব করি অকথিত ভালবাসা
বুঝি যাহাদের প্রেম অনুরাগ
ঘৃণা উপেক্ষা আদর সোহাগ
যাদের সঙ্গ সাহচর্য্যের আনন্দ আমি পাই
সেই পৃথিবীর মানুষের দেশ আমার স্বদেশ ভাই !

যেথায় অর্থ পরমার্থের চলেছে অন্বেষণ
মাতৃক্রোড়ের অধিকার ল'য়ে দ্বন্দ্ব অনুক্ষণ,
ক্রোধে অপমানে যারা চঞ্চল
মান অভিমানে সম বিহ্বল
হৃদয় রাজ্যে প্রণয় বিরোধে বিভেদ যেথায় নাই
সেই পৃথিবীর মানুষের দেশ আমার স্বদেশ ভাই !

সঙ্গীত সুরে অন্তর ঝুরে, নৃত্যে চিত্ত দোলে,
কারু শিল্পের আল্পনা যার কল্পনা দিঠি খোলে ;
চিত্র রেখায় লেখায় যাহার
মনের স্বপন মিশে একাকার,
জ্ঞানে বিজ্ঞানে দর্শনে যেথা অনুরাগে ডুবে যাই ;
সেই পৃথিবীর মানুষের দেশ আমার স্বদেশ ভাই।

আমার ভাবনা আমার কামনা আমার চিন্তা-ধারা,
আমার প্রাণের আশা আকাঙ্ক্ষা অবিকল বহে যারা ;
দুঃখে ও সুখে যারা হাসে কাঁদে,
দেশে দেশে এসে যারা বাসা বাঁধে,
গৃহ পরিজন প্রিয় পরিবেশে যে দেশে যাদের ঠাঁই ;
সেই পৃথিবীর মানুষের দেশ আমার স্বদেশ ভাই !

মানসিক প্রবণতা

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন ভড়

বহুদিনের মেলামেশায় যাঁহারা আমাদের নিকট অত্যন্ত পরিচিত হইয়া উঠিয়াছেন, স্থির মনে তাঁহাদের প্রকৃতি বা স্বভাব সম্বন্ধে চিন্তা করিতে বসিলে, নানা বিষয়ে বৈষম্য লক্ষ্য করিয়া বেশ খানিকটা কৌতুক অনুভব করিতে হয়। একের চেহারা যেমন অপরের সঙ্গে মেলে না, মনের গঠনের দিক দিয়াও তেমনই কতই না তাঁহাদের পার্থক্য। পরিচিত বন্ধু বান্ধবগণের মধ্যে হয় ত একজনের কথা মনে পড়িয়া যায় যিনি অত্যন্ত নিরীহ প্রকৃতির, শত কড়া কথা শুনিয়াও কখনও প্রত্যুত্তর করেন না, কেবলই মৃদুভাবে হাসেন, দীর্ঘ পাঁচ বৎসরের পরিচয় সত্ত্বেও ঘুণাক্ষরে জানিতে দেন না, গোপনে লিখিত তাঁহার কবিতাগুলি ছদ্মনামে বহু প্রথম শ্রেণীর পত্রিকায় সযত্নে প্রকাশিত হয়, এমন কি মধ্যে মধ্যে সমালোচকগণ কর্ত্তৃক প্রশংসিতও হইয়া থাকে। পরমুহূর্ত্তেই হয় ত আর এক জনের চিত্র স্মৃতিপথে ভাসিয়া উঠে—নিত্যই যিনি ঘুরাইয়া ফিরাইয়া প্রমাণ করিতে চাহেন, সিনেমা ও খেলাধূলা হইতে আরম্ভ করিয়া সাহিত্য, দর্শন, ধর্ম্ম, বিজ্ঞান প্রভৃতি সকল বিষয়ই তাঁহার নখদর্পণে আছে, তাঁহার ন্যায় সমঝদার ব্যক্তি সহজে মেলে না, যখনই যাহা কিছু তিনি বলেন বা করেন, নিঃসন্দেহে তাহা অভ্রান্ত হইতে বাধ্য, ইত্যাদি।

এইরূপ ব্যক্তিগত পার্থক্যের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া সচরাচর আমরা "স্বভাব," "প্রকৃতি", "মেজাজ", প্রভৃতি শব্দের প্রয়োগ করিয়া থাকি। "ছেলে দুইটির স্বভাব একেবারে ভিন্ন" "তোমার প্রকৃতি কই তোমার দাদার মত হয় নি ত", "যাই বল না কেন, তার মেজাজ তার বাপের সঙ্গে একটুও মেলে না,"—এরূপ উক্তি নিত্যই আমরা শুনিয়া থাকি ও নিজেরাও করিয়া থাকি।

মনোবিদের দৃষ্টিভঙ্গি লইয়া পর্য্যবেক্ষণ করিলে নিত্য ব্যবহৃত এই সকল সাধারণ কথার সূত্র ধরিয়াই মানব মনের গঠন সম্বন্ধীয় বহু তথ্যের সন্ধান পাওয়া যায়। মানুষের স্বভাব বলিতে সাধারণতঃ যাহা কিছু আমরা বুঝিয়া থাকি, নানা দিক হইতে তাহার আলোচনা চলিতে পারে। বিস্তৃতভাবে সকল কথার উল্লেখ না করিয়া আপাততঃ আমরা স্বভাবের অন্তর্গত একটিমাত্র বিষয় সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

সহজেই যিনি রাগিয়া যান, ঝি চাকর হইতে আরম্ভ করিয়া গৃহিণী পর্য্যন্ত সকলেই যাঁহার ভয়ে সর্ব্বদা তটস্থ থাকেন, বাড়ীর পড়ুয়া ছেলেরা বিদ্যালয়ের পরীক্ষায় অঙ্কে বা ইতিহাসে শতকরা পঁচিশ মার্ক পাইয়া যাঁহার কাছে পঞ্চাশ পাইয়াছি বলা ভিন্ন গত্যন্তর দেখে না, তাঁহাকে আমরা "কোপন-স্বভাব" বলিয়াই জানি। অন্ধকার রাতে একা বাহিরে যাইতে হইলে যাঁহার বুক ঢিপ ঢিপ করে, ষ্ট্র্যাণ্ড রোড বা কলেজ ষ্ট্রীটের মোড়ে পনেরো মিনিট দাঁড়াইয়া থাকিয়াও যিনি রাস্তার এপার হইতে ওপারে যাইবার যোগ্য মুহূর্ত্তটি খুঁজিয়া পান না, গভীর নিশীথে শববাহীদের "হরিবোল" ধ্বনি কানে আসিলেই তাড়াতাড়ি যাঁহাকে শয্যা হইতে উঠিয়া আশপাশের নিদ্রামগ্ন ব্যক্তিগণকে ঠেলিয়া তুলিতে হয়, তাঁহার সম্বন্ধে "ভীরু স্বভাব" কথাটি প্রয়োগ করিতে বোধ হয় আমরা ইতস্ততঃ করি না। বর্ত্তমান মহাযুদ্ধের গতি, ভারতের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, ১২ই বৈশাখের মহাপ্রলয়, যে বিষয় লইয়াই আলোচনা আরম্ভ হউক না কেন, শেষ পর্য্যন্ত যিনি তাহাকে ঠেলিয়া লইয়া যান গলদা চিংড়ির কালিয়ায়—কিংবা কচি পাঁঠার মুড়িঘণ্টে, তাঁহাকে "পেটুকস্বভাব" নামে অভিহিত করিয়াই যেন আমরা তৃপ্তি পাই। মোট কথা, ভিন্ন ভিন্ন স্বভাবের অতি চমৎকার দৃষ্টান্তসকল এতই প্রচুর পরিমাণে আমাদের চারিদিকে ছড়ান রহিয়াছে যে তাহা সংগ্রহ করিতে হইলে কিছুমাত্র কষ্ট পাইতে হয় না। *

মানুষের স্বভাবগত পার্থক্যের মূলে কি আছে তাহা বিচার করিতে বসিলে নানা বিষয়ের মধ্যে প্রথমেই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে মনের বিভিন্ন রকমের প্রবণতা। কোপন-স্বভাব, ভীরুস্বভাব বা পেটুকস্বভাব ব্যক্তির মনে যথাক্রমে কোপনতা, ভীরুতা বা পেটুকতার প্রতি প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়, ইহার উল্লেখ বোধ হয় নিষ্প্রয়োজন। সকলের মন সমভাবাপন্ন না হইয়া ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের প্রতি প্রবণ হইয়া পড়ে, ইহার বিজ্ঞানসম্মত কারণ কি? আধুনিক মনস্তত্ত্বের দিক হইতে এ প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিতে হইলে সর্ব্বাগ্রেই সহজাত বৃত্তি (instinct) ও তৎসংক্রান্ত কয়েকটি বিষয় সম্বন্ধে আলোচনা করিতে হইবে।

পশুপক্ষীর গতিবিধি ও আচরণ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখা যায়, এমন কতকগুলি অদ্ভুত শক্তি লইয়া তাহারা জন্মিয়াছে যাহার বলে নির্দ্দিষ্ট অত্যন্ত জটিল কাজও অনায়াসে তাহারা সম্পন্ন করিতে পারে। দৃষ্টান্তস্বরূপ পাখীর বাসা বাঁধা, ডিমে তা দেওয়া, পশুর খাদ্য সংগ্রহ করা, শাবক রক্ষণাবেক্ষণ করা প্রভৃতি বহুবিধ আচরণের উল্লেখ করিতে পারা যায়। এই সকল কাজ সুচারুরূপে সম্পন্ন করিবার উদ্দেশ্যে যে শক্তির সাহায্য লওয়া হয়, মুখ্যতঃ তাহা বুদ্ধি সাপেক্ষ নহে। পশু বা পাখী জীবদ্দশায় বুদ্ধি প্রয়োগ করিয়া এ শক্তি আয়ত্ত করিতে শিখে না। ইহা তাহাদের সহজাত বৃত্তি। মানুষ হিসাবে আমরা আমাদের ব্যবহারিক জীবনে যে সকল কাজ করিয়া থাকি—সম্পূর্ণরূপে তাহা বুদ্ধির দ্বারা সম্পন্ন হইল এইরূপ মনে করিয়া মনে মনে আমাদের বুদ্ধিশক্তি সম্বন্ধে বেশ একটু গর্ব্বের ভাব পোষণ করি ও পশুপক্ষীর জীবন হইতে মানব জীবনের সর্ব্বাঙ্গীণ স্বাতন্ত্র্য উপলব্ধি করিয়া হয় ত বা খানিকটা আত্মতৃপ্তিও লাভ করিয়া থাকি। কাহাকেও গালাগালি দিতে হইলে বলি, "তুমি একটি পশু।"

মানুষের ঠিক এতখানি আত্মতৃপ্তির উপযুক্ত কারণ আছে কি না আধুনিক বিজ্ঞান সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দিহান। ক্রমবিকাশের ধারা বাহিয়া মানুষের উৎপত্তি হইয়াছে পশু হইতেই। সত্য বটে, পশুর স্তর ছাড়াইয়া মানুষ বহু ঊর্দ্ধে উঠিয়া গিয়াছে, কিন্তু তাই বলিয়া পশুজীবন হইতে মানবজীবন একেবারে বিচ্ছিন্ন হইয়া যায় নাই। মানুষ সম্পূর্ণরূপে বুদ্ধিজীবী নহে। যে সহজবৃত্তির অভাবে পশুর পক্ষে জীবনধারণ অসম্ভব হইয়া উঠে, মানুষকেও প্রধানতঃ নির্ভর করিতে হয় তাহারই উপর। পশুর মত মানুষও তাহার সহজবৃত্তির পরিচালনাধীনে থাকিতে বাধ্য। সদ্যোজাত মানবশিশু যে সকল বৃত্তি লইয়া ভূমিষ্ঠ হয়, তাহার অভাবে মানবের দেহযন্ত্র কিছুই হয় ত আর করিতে পারে না, একেবারে পঙ্গু হইয়া যায়। বৈজ্ঞানিকের ভাষায় বলা চলে, স্প্রিং বিহীন হইলে অপূর্ব্ব কলকব্জা সমন্বিত হইয়াও ঘড়ি যেমন নিষ্ক্রিয় ও গতিহীন হইয়া পড়ে, সহজবৃত্তির অভাবে মানুষের অবস্থাও হয় সেইরূপ।

গবেষণার ফলে মনোবিদগণ স্থির করিয়াছেন, মানবের বহুমুখী কর্ম্মের উৎসস্বরূপ সহজবৃত্তিসমূহের সহিত অনুভূতিমূলক বিশেষ বিশেষ মনোভাব (emotion) সংযুক্ত হইয়া আছে। যথা, আত্মরক্ষা, যোধন,

---

* বলিয়া রাখা ভাল, বর্ত্তমান প্রবন্ধে Hormic Theory নামক মতবাদ অবলম্বিত হইয়াছে।

সন্তানোৎপাদন, সন্তানরক্ষা, খাদ্যান্বেষণ প্রভৃতি সহজ বৃত্তির সহিত যথাক্রমে গ্রথিত হইয়া আছে ভয়, ক্রোধ কাম, স্নেহ, ক্ষুধা প্রভৃতি। মনোভাব কথাটি ভাল করিয়া বুঝাইবার উদ্দেশ্যে বোধন বৃত্তির দৃষ্টান্ত লইয়া বিস্তৃততর আলোচনা করিলে মন্দ হয় না।

আদিম যুগের অরণ্যচারী গুহাবাসী জীব অসংখ্য শত্রুর অত্যাচারে উৎপীড়িত হইত, তাহাতে আর সন্দেহ কি শত্রুকর্ত্তৃক রচিত বাধার সম্মুখীন হইয়া যখনই সে অনুভব করিত ঈপ্সিত বস্তু লাভ করা সম্ভব হইবে না, তখনই তাহাকে শত্রুর সহিত যুদ্ধ করিতে হইত। প্রথমে ভীতি প্রদর্শন করিয়া—প্রয়োজন হইলে পরে আক্রমণ করিয়া, সে তাহার শত্রুকে বিদূরিত করিত বা বধ করিত। ভীতি প্রদর্শন ও আক্রমণ সংগ্রামেরই ভিন্ন দুইটি অবস্থা। যে সহজবৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়া আদিম জীব এমনই করিয়া সংগ্রাম করিত, তাহারই নাম বোধনবৃত্তি ও এই বৃত্তির সহিত অনুভূতিমূলক যে মনোভাবটি সংযুক্ত হইয়া আছে তাহাই হইল ক্রোধ। ক্রোধের দৈহিক অভিব্যক্তি পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায়, সংগ্রামের সহিত তাহার অতি নিকট সম্বন্ধ। স্ফীত বক্ষ, আরক্ত লোচন, তেজোদৃপ্ত হুঙ্কার, ইহাদের সার্থকতা ভীতি প্রদর্শনে ; মুষ্টিপ্রয়োগ ও পদাঘাতের সার্থকতা আক্রমণে।

সহজ প্রবৃত্তির সহিত সংযুক্ত ভাবসমূহের মধ্যেই কর্ম্মপ্রেরণা (impulse) নিহিত হইয়া থাকে। সহজাত প্রবৃত্তি, তৎসংলগ্ন ভাব ও কর্ম্মপ্রেরণা পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকে না, উহারা একত্রে গ্রথিত হইয়া মানবজীবনকে সার্থক করিয়া তুলে।

বৃত্তিগুলি যেমন সহজাত, বৃত্তিমূলক কর্ম্মপ্রেরণাগুলিও তেমনই। পূর্ব্বে যে মানসিক প্রবণতার কথা বলা হইয়াছে, তাহা সহজবৃত্তিমূলক কর্ম্মপ্রেরণা হইতেই উদ্ভূত।

মানসিক প্রবণতার বিভিন্নতা বশতঃ একের স্বভাব অপরের সহিত মেলে না কেন, এইবারে সে প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সম্ভব হইবে। সহজবৃত্তির বিভিন্নতা অনুসারে নানা রকমের কর্ম্মপ্রেরণা লইয়া মানুষ জন্মগ্রহণ করে। কিন্তু ব্যক্তিবিশেষের মধ্যে সকল প্রকার প্রেরণা বর্ত্তমান থাকিলেও সকলের মনে তাহা সমশক্তিতে বিরাজ করে না, ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে প্রেরণাগুলির শক্তিগত তারতম্য ঘটে। যে প্রেরণা একজনের মধ্যে অত্যন্ত শক্তিশালী হইয়া উঠে, আর একজনের মনে হয়ত তাহা তেমন শক্তি সঞ্চয় করিতে পারে না। পক্ষান্তরে অপর কোন প্রেরণা প্রবলতা লাভ করে। ফলে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির মনে বিভিন্ন রকমের প্রবণতা পরিলক্ষিত হয় ও তাহাদের স্বভাব পৃথক হইয়া যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা চলে, কোপনস্বভাব ব্যক্তির মনে কোপনতার প্রতি যে প্রবণতা লক্ষিত হয়, তাহার মূলে থাকে বোধনবৃত্তিজনিত কর্ম্মপ্রেরণার আপেক্ষিক প্রবণতা, তেমনই ভীরুস্বভাব, পেটুকস্বভাব বা কামুকস্বভাব ব্যক্তির স্ব স্ব মানসিক প্রবণতার পিছনে যে প্রেরণাগুলি প্রবল হইয়া থাকে তাহাদের উৎপত্তি হয় যথাক্রমে আত্মরক্ষা, খাদ্যান্বেষণ ও সন্তানোৎপাদনের সহজবৃত্তি হইতে।

যাহার স্বভাবে সাম্যের ভাব বর্ত্তমান থাকে, বুঝিতে হয়, তাহার মনে বিশেষ কোন প্রেরণা অপর প্রেরণার তুলনায় প্রবলতর শক্তি সঞ্চয় করিবার সুযোগ পায় নাই, পক্ষান্তরে সকল প্রেরণাই সমশক্তিতে বিরাজ করিতেছে।

প্রশ্ন উঠিবে, ব্যক্তিবিশেষের মনে সহজবৃত্তিজনিত বিশেষ কোন প্রেরণা অপর প্রেরণা অপেক্ষা অধিকতর শক্তিশালী হইয়া উঠে, ইহারই বা ন্যায়সঙ্গত কারণ কি? এ বিষয়ে মনোবিদগণ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, সকল ক্ষেত্রে সহজবৃত্তিসমূহ সমভাবে সক্রিয় হইবার সুযোগ পায় না। সহজবৃত্তিজনিত কর্ম্মপ্রেরণার শক্তি প্রধানতঃ নির্ভর করে বৃত্তিবিশেষের সক্রিয়তার উপর। বৃত্তির অব্যবহারের ফলে বৃত্তিজনিত প্রেরণা অসাড় বা নিস্তেজ হইয়া যায় ; তেমনই অধিক ব্যবহারের ফলে অত্যন্ত শক্তিশালী হইয়া উঠে।

তাহাই যদি হয়, কাহারও মনে বিষয়বিশেষের প্রতি প্রবণতা পরিলক্ষিত হইলেও কি তবে তাহার মানসিক পরিবর্ত্তন অসম্ভব নহে? অসম্ভব যে নহে, অন্ততঃ আমরা যে উহা অসম্ভব বলিয়া বোধ করি না, তাহার প্রমাণ নিহিত হইয়া আছে শিক্ষার ক্ষেত্রে যাহা কিছু আমরা করিতে চাই তাহারই মধ্যে। প্রবণতাজনিত মানসিক ত্রুটির সংশোধন ও নানা শক্তির মধ্যে সামঞ্জস্য সাধন করিয়া মনের সাম্যভাব আনয়ন— ইহা কি শিক্ষার প্রধান লক্ষ্যসমূহের অন্যতম নহে?

রবি-লোক

শ্রীব্রহ্মগোপাল মিত্র

কোথা অভিসার?
কোন পথে, কোন রথে, কোথা যাত্রা তার
কোন লোকে। ধ্রুবতারা রয়েছে নিশ্চল
হেরি দুটি আঁখিতারা ম্লান ছলছল
স্তব্ধা ধরিত্রীর! মূক যত জগতের নর—
নতশিরে রয়েছে দাঁড়ায়ে সবে নিস্পন্দ, নীথর—
ভাষা শুধু নয়নের নীরে। আশ্রয়হীনের দল ফিরিছে কুলায়
দ্রুতগতি নিজপক্ষভরে। শনশনি বহিয়া পবন
ভুলায় জীবেরে আজি জীবন স্পন্দন।

সহসা এ ধরিত্রীর বক্ষ ভেদ করি
জ্যোতির্ম্ময় শিখা এক ধরারে আবরি'
উঠে ঊর্দ্ধপানে। সে মহান আলোক সম্পাত—
সে দুর্দ্দাম প্রচণ্ডগতি, সে মহা-সংঘাত—
বিহ্বল করিয়া দেয় সবে ক্ষণেকের তরে।
অমাবৃত হইল ধরণী।

পার হয়ে ধরণীর সীমা
শিখা ক্রমে উঠে ঊর্দ্ধলোকে। চাঁদের সুষমা
তারে ধরিতে না পারে। জ্যোতিঃপুঞ্জ তারকামণ্ডলী
ম্লান হয়ে যায় তার প্রদীপ্ত আভায়। তাই বলি
কোন লোক তাহারে বরিবে, আছে তার ঠাঁই
কোন স্থানে
শুনি যত নভলোক মুখরিত আপনার তানে—
"হেথা নয়, হেথা নয়, অন্য কোনখানে।"

যত লোক অতিক্রমি আসে রবিলোক—
সহসা শিখারে হেরি বিকীরিয়া সুতীব্র আলোক
মিশে যায় নভ-ভানু সনে। দুই রবি এক হয়ে যায়—
গগন-রবির ম্লানিমা ঘুচায়
মরত-রবি মিশে তার সনে।
তাইত রবিরে হেরি পূর্ণ জ্যোতির্ম্ময়
লুটায় কিরণ বিশ্বে—এতো ভ্রান্তি নয়॥

প্রতিবাদ

শ্রীজগদীশচন্দ্র ঘোষ

অক্ষম স্বামীর বাক্যবাণ, সংসারের নানা অনাটন, ছেলেমেয়েদের অনাহারে শুষ্ক মুখ—এই সব সুবাসিনীকে একেবারে পাগল করিয়া দিয়াছে। স্বামী কোন্ এক কলে কাজ করিত; হঠাৎ একদিন উপর হইতে একখানা লোহার 'বিম' পড়িয়া তাহার ডান পায়ের হাড় একেবারে ভাঙ্গিয়া যায়, তারপর হাসপাতালে নিয়া তাহার একখানা পা কাটিয়া ফেলিতে হইয়াছে। সেই হইতে আজ বছর দুই পঞ্চানন খোঁড়া হইয়া ঘরে বসিয়া আছে। নিজের সামান্য যা কিছু সঞ্চয় ছিল—কোন্ কালে ফুরাইয়া গিয়াছে। তার পর আজ ছয়টা মাস সে আর সংসারের কোন ধার ধারে না—সমস্ত সুবাসিনীর উপরেই ছাড়িয়া দিয়াছে। সংসারের যাহা কিছু আসবাবপত্র ছিল একে একে বেচিয়া ধার কর্জ্জ করিয়া সুবাসিনী এই ছয়টা মাস কোন প্রকারে চালাইয়াছে। সে কোনদিন এক বেলা খাইয়াছে—কোনদিন খায় নাই—তবু সংসারের অনাটন কিছুমাত্র ঘুচে নাই। কেমন করিয়া ছেলে মেয়ে দুটীকে বাঁচাইবে স্বামীকে বাঁচাইবে এই চেষ্টাই করিয়াছে—কিন্তু এমন কোন পথ খুঁজিয়া পায় নাই যে স্ত্রীলোক হইয়া কিছু উপার্জ্জন করিতে পারে। মেয়ের নাম লক্ষ্মী—বছর সাতেক বয়স—সেইই বড়। ছেলেটী ছোট, নাম রাখাল। কিন্তু তাহাকে লইয়াই সুবাসিনীর চিন্তার অন্ত নাই। এই পাঁচ বৎসরে সে পড়িয়াছে, কিন্তু এখন পর্য্যন্ত সে না পারে ভাল করিয়া হাঁটিতে, না হইয়াছে তাহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গের ভাল করিয়া গঠন। পিঠের শিরদাঁড়া একেবারে পিঠ ফুঁড়িয়া যেন বাহির হইয়া পড়িয়া সামনের দিকে খানিকটা বাঁকিয়া গিয়াছে। সরু হাত দুইখানি পাটকাঠির মত ও শীর্ণ শরীরের দুই পাশে দুই গাছি রসির মত ঝুলিতে থাকে। পঞ্চানন ভাল থাকিতে দুই একবার তাহাকে ডাক্তারের নিকট লইয়া গিয়াছিল, ডাক্তার ভাল খাবার—কড্‌লিভারের তেল মালিশ, আরও দুই একটা ভাল ভাল ঔষধের কথা বলিয়া দিয়াছিল, কিন্তু ঐ পর্য্যন্তই; তাহার পর অর্থাভাবে আর এ সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই করা হয় নাই। এই ছয়টা মাসের ভিতরে একটা দিনও তো তাহার মুখে একটু দুধ পর্য্যন্ত দিতে পারে নাই। এরূপ অনেক দুঃখেই সুবাসিনী পাশের বাড়ীর নন্দর মাকে বলিয়া রাখিয়াছিল—কোন ভদ্রলোকের বাড়ীতে তাহার জন্ত যদি একটা কোন কাজ ঠিক করিয়া দিতে পারে।

সেদিন নন্দর মা আসিয়া বলিল—কাজ করবি সুবাসিনী? বালিগঞ্জের দত্ত সাহেবের বাড়ী একজন ধাই খুঁজছে। আমাকে আজ ডেকে বল্লো, ছোট্ট বছর তিনেকের একটা ছেলেকে সারাদিন খবরদারী করে বেড়াতে হবে, মাইনে দেবে মাসে দশ টাকা, খোরাক পোষাকও পাবি। সুবাসিনী প্রশ্ন করিল—খুব অনেকটা দূর হবে নাকি দিদি?

—নারে এই তো—আমাদের সাহেবের বাড়ীর পাশের বাড়ী। মাইল তিনেক হবে এখান থেকে।

—আমার রাখালকে সঙ্গে নিয়ে যেতে পারবো তো? নন্দর মা কিছুক্ষণ ভাবিয়া বলিল—তা বোধ হয় চলবে না—তবে বলে দেখতে পারি। রাখাল মায়ের পিঠ ধরিয়া দাঁড়াইয়াছিল—সুবাসিনী তাহাকে কোলের মধ্যে টানিয়া আনিয়া বলিল—তাই বলে দেখ দিদি—তা নইলে রাখালকে আমার সারাদিন কার কাছে ফেলে রেখে যাব? সুবাসিনীর চাকুরী হইল। রাখালকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইবারও অনুমতি মিলিল। সেদিন ভোর রাত্রে ঘুম হইতে উঠিয়া ঘরদোরের কাজ সারিয়া রাখালকে চাট্টি মুড়ি মুড়কি খাওয়াইয়া লইয়া সুবাসিনী কাজে গেল।

দত্ত সাহেবের ছেলের নাম অসিত—বয়স বছর দুই হইবে, যেমন ফুটফুটে সুন্দর চেহারা তেমনি স্বাস্থ্য, দুই গালে যেন রক্ত জমিয়া টস্ টস্ করিতেছে। সুবাসিনী ছেলেটীকে কোলে তুলিয়া লইয়া আদর করিয়া চুমু খাইল। রাখাল একটী কথাও না বলিয়া ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া মায়ের আঁচল ধরিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। সকাল বেলা অসিতকে ঠেলা গাড়ীতে বসাইয়া তাহার মা নিকটের মাঠে বেড়াইতে লইয়া গেল। মাঠ হইতে ফিরিয়া অসিতের খাওয়া হইলে পুনরায় তাহাকে কোলে লইয়া ঘরের ভিতরে শোয়াইয়া ঘুম পাড়াইতে লাগিল। অসিতের ঘুম ভাঙ্গিলে পুনরায় তাহাকে কোলে লইল। পুনরায় রৌদ্র পড়িলে তাহার মা গাড়ীতে করিয়া অসিতকে লইয়া মাঠে আসিল। রাখাল হাঁটিতে পারে না তবু তাহাকে পিছনে পিছনে ঘুরিতে হইল। অবশেষে নন্দর মা, আরও তিন চারজন ধাই তাহাদের খোকা খুকু লইয়া মাঠের এক গাছতলায় বসিয়া জটলা করিতে-ছিল, তাহার মা সেখানে আসিয়া অসিতের ঠেলা গাড়ী থামাইল। অসিত গাড়ী হইতে মাঠে নামিয়া খেলিতে লাগিল। সারা দিন মায়ের পিছু পিছু ঘুরিতে ঘুরিতে রাখাল এ সব লক্ষ্য করিল, কোনটি তাহার দৃষ্টি এড়াইল না। এখন সেও একপাশে ঘাসের উপর চুপটি করিয়া বসিয়া পড়িল। এ কি হইল আজ? তাহার মা ঐ ছেলেটাকে আজ এত আদর করিতেছে কেন? ও, কে? কিন্তু তাহাকে তো সারাদিনের মধ্যে একবারও কোলে করিল না—আদর করিল না। সারাদিন হাঁটিয়া হাঁটিয়া তাহার পা ধরিয়া গিয়াছে—ব্যথায় টন্ টন্ করিতেছে—মা তো ফিরিয়াও একবার তাকাইল না। অভিমানে রাগে রাখাল বসিয়া বসিয়া ফুলিতে লাগিল। সন্ধ্যার আগে বাড়ী ফিরিবার সময় সুবাসিনী রাখালকে কোলে লইতে গেলে—রাখাল মুখ ফিরাইয়া বাঁকিয়া বসিল। সুবাসিনী বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—কেন রে—তোর আবার হলো কি? চল বাড়ী যাই—

রাখাল মুখ গোঁজ করিয়া বলিল—আমি হেঁটে যাব।

সুবাসিনী হাসিয়া বলিল—তবেই হয়েছে আর কি—নে আয়। বলিয়া জোর করিয়া রাখালকে কোলে লইয়া বাড়ী রওনা হইল। রাত্রে মায়ের কোলের মধ্যে শুইয়া রাখালের মনের মেঘ অনেক-খানি কাটিয়া গিয়াছিল। মা তাহাকে বুকের মধ্যে টানিয়া

আনিয়া চুমু খাইয়া আদর করিয়া জিজ্ঞাসা করিল—হাঁরে রাখাল, আজ ভাল করে কথা কচ্ছিস না কেন রে—কি হয়েছে ?

রাখাল তাহার শীর্ণ বাহু দ্বারা মায়ের গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল—আজ তুমি আমাকে একবারও কোলে নাওনি কেন ? ঐ ছেলেটাকে খালিখালি আদর করে নিয়ে বেড়ালে—হেঁটে হেঁটে আমার পায়ে যা ব্যথা হয়েছে ! সুবাসিনী হাসিয়া বলিল—ও এরই জন্যে রাগ করেছিস ? রাখাল পুনরায় গাল ফুলাইয়া বলিল—না, রাগ করবে না—আমার এমনি কান্না পাচ্ছিল।

সুবাসিনী তাহাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিল—ছিঃ রাখাল, রাগ করতে নাই—ঐতো এতটুকু ছোট্ট ছেলে—ওকে কোলে নিলে কি রাগ করতে আছে। দেখিস না হরিপদ কি আর এখন তার মার কোলে চড়ে—তার ছোট ভাই শ্যামা রাতদিন মার কোলে কোলে থাকে—কই হরি তো তোর মত রাগ করে না।

—ইস্ কি যে তুমি বল মা ! কেন রাগ করবো না শুনি ? শ্যামা যে হরির ছোট ভাই। ওকি আমার ছোট ভাই যে আমি রাগবো না ? তা যদি হতো আমি নিজে ওকে কোলে করতাম—কত আদর কবতাম। ওকে তুমি আদর করতে পারবে না মা, হোক সে সুন্দর ছেলে।

সুবাসিনী তাহাকে বুঝাইয়া বলিতে লাগিলেন—তুই বুঝিসনে রাখাল—ও যে দত্ত সাহেবের ছেলে, দত্ত সাহেব আমাকে মাসে মাসে টাকা দিবেন যে।

—চাইনে আমরা টাকা ; কি হবে টাকা দিয়ে ?

—টাকা না হলে খাবি কি ?

—কেন তুমি বাড়ীতে যে রোজ ভাত রান্না কর—তাই তো আমরা খাই—

সুবাসিনী হাসিয়া বলিল—বোকা ছেলে, ভাত আসবে কোথা থেকে।

—কিন্তু তুমি বল মা—কাল থেকে আর ওদের বাড়ী কক্‌খনো যাবে না ; তা না হলে—আমি খুব রাগ করবো—কিচ্ছু খাব না—তা বলে রাখছি। সুবাসিনী বিরক্ত হইয়া বলিল—নে এখন ঘুমা—আর জ্বালাতন করিসনে।

সকালে উঠিয়া সুবাসিনী রাখালকে চাট্টি মুড়ি মুড়কি দিয়া ঘর-দোর ঝাঁট দিতে গেল—ফিরিয়া আসিয়া দেখে রাখাল খাবার সম্মুখে করিয়া তেমনি বসিয়া আছে একটুও মুখে তুলে নাই। সুবাসিনী প্রশ্ন করিল—হাঁরে চুপ করে বসে আছিস যে—খাচ্ছিস না ?

—আমার এত সকালে খিদে পায় নি।

—না খিদে পায় নি—এখনি বেরুতে হবে যে।

—আমি কোথাও বেরুব না !

—না বেরুবে না ! বলিয়া সুবাসিনী তাহাকে জোর করিয়া খাওয়াইতে গেল। রাখাল মুখ সরাইয়া লইয়া একটানে সমস্ত খাবার ঘরময় ছড়াইয়া দিল। সুবাসিনী রাগে দুঃখে স্তব্ধ হইয়া রাখালের মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল। পঞ্চানন নিকটেই ছিল—জিনিষের অপচয় তাহার সহ্য হইল না—খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে আসিয়া রাখালের পিঠে কসিয়া একটা চড় বসাইয়া দিল। সুবাসিনী একমুহূর্ত্তে একেবারে বারুদের মত জ্বলিয়া উঠিয়া বলিল—বলি ঠেঙাতে তো পার খুব, কিন্তু ও কি চায় জান ?

পঞ্চানন জিজ্ঞাসা করিল—কি ?

—নিজের মাকে পরের ছেলের দাসী বাঁদী হতে দিতে চায় না—টাকার লোভে নিজের মায়ের কোলে অন্য একজন ভাগীদার জোটাতে চায় না—বলিয়াই জোর করিয়া রাখালকে কোলে তুলিয়া লইয়া ঘরের বাহির হইয়া গেল। রাখাল আর কাঁদিল না ; সারা পথ শুধু মায়ের কোলে গুম হইয়া বসিয়া রহিল।

২

আরও দিন পনর কাটিয়া গেল। রাখাল রোজ সকালে মায়ের কোলে চড়িয়া দত্ত সাহেবের বাড়ী আসে, আবার সন্ধ্যায় ফিরিয়া যায়। কিন্তু তবু এখন পর্য্যন্ত এ বাড়ীতে সে স্বাভাবিক ভাবে চলিতে পারিল না। পাঁচ বৎসরের ছেলে সে—কিন্তু সারাটা দিন বৃদ্ধের মত গুম্ হইয়া বসিয়া থাকে ; না হয় মায়ের আঁচল ধরিয়া নিজেকে লুকাইয়া লুকাইয়া ঘুরিতে থাকে। মেঝের তক্‌তকে পালিশ করা পাথরের উপর দিয়া চলিতে তাহার ভয় করে, হয়তো কখন পা ফস্‌কাইয়া যাইবে। নীচের তলায় বাঁধা বড় কুকুরটা তাহাকে দেখিলেই এমন গোঙাইয়া উঠে যে তাহার সমস্ত অন্তরাত্মা ভয়ে কাঁপিতে থাকে—সে ভাল করিয়া কুকুরটার দিকে তাকাইতেও পারে না। অত মোটা লোহার শিকল গাছা দিয়া বাঁধা না থাকিলে কি যে করিত কে জানে ? বাড়ীতে যে কয়টী মানুষ, তাহাদের মধ্যে সে সব চাইতে ভয় করে মানদা ঝিকে। যেমনি তাহার স্থুলদেহ, তেমনি তাহার কর্কশ কণ্ঠ। রাখালের দিকে সব সময় যেন শ্যেন দৃষ্টিতে তাকাইতে থাকে। সেদিন সাহেবের ঘরের কাছে গিয়া দাঁড়াইয়া ছিল, আর অমনি কি তাহার ধমকানি। রাখাল পলাইয়া আসিয়া চুপ করিয়া সিঁড়ির ধারে সারা দিন বসিয়াছিল। রাখালের মাঝে মাঝে দুঃখে বুক ভাঙিয়া কান্না আসে—তাহার মা সারাদিন ঐ ছেলেটাকে লইয়াই ব্যস্ত থাকে—এ সব দেখিয়াও দেখে না কেন ? সাহেবের আরও দুইটী ছেলে আছে—তাহারা যেমন দুরন্ত তেমনি খারাপ, তাহাকে তাহারা কুঁজো বলিয়া খেপায়—একটুও দেখিতে পারে না। সে দিন শুধু শুধু তাহাকে ঘাড় ধরিয়া মেঝের উপরে ফেলিয়া দিয়াছিল—ব্যথা পাইয়া কাঁদিয়া ফেলিয়াছিল সে। মা সারাদিন পরে আজকাল রাত্রে যা একটু তাহাকে আদর করে ; রাখালের তাহাতে মন উঠে না। সেদিন ঘুমন্ত রাখালের সারা দেহে হাত বুলাইতে বুলাইতে সুবাসিনী ভাবিতেছিল—কই এই পনর কুড়িটা দিনে একটুও তো রাখালের শরীরের উন্নতি হয় নাই। দত্ত সাহেবের বাড়ী পূর্ব্বাপেক্ষা দুই বেলা অনেকটা ভাল খাবারই তো জুটিতেছে। মাসটা গেলে যেদিন সে মাহিনার টাকা হাতে পাইবে সেই দিনই একশিশি 'কডলিভারের' তেল—আর কিছু ঔষধ কিনিয়া আনিবে—ডাক্তারের দেওয়া সে কাগজখানা এখনও তাহার ঘরে তোলা আছে। ভাবিতে ভাবিতে সুবাসিনীর দুই চোখ জলে ভরিয়া আসে—ছেলে তাহার শুষ্কমুখে ফ্যাল ফ্যাল করিয়া তাহার পিছনে পিছনে ঘুরিতে থাকে ; আর সে পরের ছেলেকে সারাটা দিন যত্ন শুশ্রূষা করিয়া, আদর করিয়া কাটায়—

নিজের ছেলের দিকে একটীবার ফিরিয়া তাকাইতেও সময় পায় না। রাখাল যে কেন মন-মরা হইয়া থাকে—কেন যে

অভিমান করিয়া কথা কহিতে চাহে না—সুবাসিনী তাহা বোঝে, কিন্তু প্রতিকারের যে কোন উপায় নাই।

সেদিন রাত্রে মায়ের কোলের মধ্যে শুইয়া রাখাল চুপি চুপি বলিল—একটা জিনিষ দেখবে মা। সুবাসিনী বলিল—কি জিনিষ রে?

—আমি কিন্তু গলায় পরবো মা—তুমি বারণ করতে পারবে না।

—কি তুই গলায় পরবি দেখি?

রাখাল সন্তর্পণে জামার পকেটের মধ্যে হাত ঢুকাইয়া দিয়া একগাছি সোনার হার বাহির করিয়া সুবাসিনীর চোখের সম্মুখে মেলিয়া ধরিল।

—এই দেখ আমি গলায় পরি মা?

সুবাসিনী বিস্ময়ে অবাক হইয়া চাহিয়া রহিল।

—এ তুই করেছিস্ কি হতভাগা—এযে অসিতের গলার হার। কি সর্ব্বনাশ! এখন কি করি বলতো? কি জবাব দেব সেখানে? রাখালের হাত হইতে হার গাছা একটানে ছিনাইয়া লইয়া সুবাসিনী স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল।

রাখাল কাঁদিয়া ফেলিয়া বলিল—আমিও হার গলায় পরবো। সুবাসিনী সশব্দে রাখালের গালে কয়েকটী চড় বসাইয়া দিয়া বলিল—তোমাকে হার পরাচ্ছি হারামজাদা ছেলে! পঞ্চানন বাহির হইতে ঘরে ঢুকিয়া বলিল—হয়েছে কি? সুবাসিনী জবাব দিল—হয় নি কিছু। রাখাল মার খাইয়া পাশ ফিরিয়া শুইয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে ঘুমাইয়া পড়িল। ভাবনায় সুবাসিনীর সারারাত্রি একটুও ঘুম হইল না।

পরের দিন সকালে পথ চলিতে চলিতে সুবাসিনী ঠাকুর-দেবতার পায়ে মাথা কুটিতে লাগিল—হে হরি—হে মা কালী—কেউ যেন টের না পায়—সকলের অলক্ষ্যে অসিতের গলায় হারগাছা পরাইয়া দিতে পারিলে বাঁচে। যত দত্ত সাহেবের বাড়ীর নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল—তত তাহার বুক দুরু দুরু করিয়া কাঁপিতে লাগিল।

সিঁড়ি বাহিয়া উপরে উঠিতেই—মানদা ঝি চেঁচাইয়া উঠিল—এই যে সুবাসিনী—খোকার গলার হার কি করেছিস আগে বল—নইলে পুলিশ ডেকে থানায় নিয়ে কি কাণ্ডটা করি দেখে নিস্। মানদার চীৎকারে বাড়ীর সকলেই ছুটিয়া আসিল। সুবাসিনী একটা কথাও না বলিয়া আঁচলের খুট হইতে হারগাছি খুলিয়া অসিতের মায়ের হাতে দিয়া অকপটে সমস্ত কথা খুলিয়া বলিল।

মানদা চীৎকার করিয়া উঠিল—এখনই বাড়ী থেকে বের করে দাও মা—না হয় পুলিশে দাও। দত্ত গিন্নী বলিলেন—তুই থাম মানদা। সুবাসিনীর দুই চোখ দিয়া তখন ঝর ঝর করিয়া জল গড়াইতেছিল। পরে তাহার দিকে ফিরিয়া তিনি বলিলেন—এখন থেকে তোর ছেলেকে বাড়ী রেখে আসিস সুবাসিনী—আবার কবে কি করবে কে জানে—বলিয়া তিনি চলিয়া গেলেন।

রাত্রে সমস্ত শুনিয়া পঞ্চানন বলিল—আমি সমস্ত দিন ঐ হতভাগা ছেলেকে কিছুতেই খবর্দ্দারী করতে পারবোনা তা বলছি।

সুবাসিনী রাগিয়া বলিল—না পার ওর মাথায় বাড়ি দিয়ে গঙ্গার জলে ফেলে দিয়ে এসো।

এ কয়দিন লক্ষ্মী পাকের সমস্ত যোগাড় করিয়া দিত—পঞ্চানন বসিয়া কোন প্রকারে পাক করিত। পরের দিন সুবাসিনী রাত থাকিতে উঠিয়া চাট্টি ভাতে ভাত সিদ্ধ করিয়া—লক্ষ্মীকে কাছে বসাইয়া রাখালকে দেখিবার জন্য ভাল করিয়া বুঝাইয়া পথে বাহির হইল। রাখাল তখন পর্য্যন্ত ঘুমাইতেছিল।

রাখালের ঘুম ভাঙিলে লক্ষ্মী তাহাকে বলিল—মা কাজে গেছে রাখাল, তুই কাঁদিসনে; আমি তোকে ভাত খাইয়ে দেব; কোলে করবো—কাঁদবিনে তো?

রাখাল বলিল—না দিদি। বস্তুতঃ রাখাল যেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল—সেই বাড়ীতে যে আর তাহাকে যাইতে হইবে না—এইটাই তাহার নিকট মস্ত লাভ যেন।

৩

রাখাল বরাবরই তাহার পিতাকে দেখিয়া ভয় করিত। একখানা পা নষ্ট হইয়া যাইবার পর আজকাল তাহার মেজাজ আরও বিগড়াইয়া গিয়াছে। রাখাল পারতপক্ষে তাই পিতার নিকট ঘেঁসিতে চাহে না, বিশেষতঃ আজকাল পঞ্চাননের দুই বগলে দুইখানি লাঠি লইয়া ঝুলিয়া পড়িয়া চলিবার যে বিশেষ ভঙ্গিটা, তাহা রাখালকে আরও ভীত করিয়া তোলে। লক্ষ্মী খাবার সময় রাখালকে ভাত মাখিয়া দেয়—কোন দিন হাতে তুলিয়া খাওয়ায়। কিন্তু তাহা ছাড়া সে সমস্তটা দিন প্রায়ই পাড়ায় পাড়ায় খেলা করিয়া বেড়ায়। রাখালদের বাড়ীর আশে পাশে পাড়ার কত ছেলে মেয়ে ছুটাছুটি করিয়া খেলা করিয়া বেড়ায়। সে সময় রাখাল বাড়ীর সম্মুখে যে আমগাছটী—তাহারই তলায় চুপটি করিয়া বসিয়া চাহিয়া চাহিয়া দেখে। একটু বেশী হাঁটাহাঁটি করিলেই তাহার বসিয়া পড়িতে ইচ্ছা করে—বুক ধড় ফড় করে। কয়দিন হইতে সকালের দিকে তাহার মাথাটার ভিতরে টন্ টন্ করে—হাত পা ঠাণ্ডা হইয়া শীত করিতে থাকে—রাখাল ঘাসের উপরে রৌদ্রে গিয়া শুইয়া পড়ে। বিকালের দিকে আবার ঘাম দিয়া জ্বর ছাড়িয়া যায়—শরীরটা তখন একটু ভাল মনে হয়। সুবাসিনী রাত্রে আসিয়া কিছুই বুঝিতে পারে না—তবে ছেলে তাহার যে দিনদিন আরও দুর্ব্বল হইয়া যাইতেছে, তাহা বুঝিতে পারে। কোন কোন দিন রাত্রে শুইয়া জিজ্ঞাসা করে—হাঁ রে রাখাল, তোর জ্বর হয় নাকি রে? রাখাল জবাব দেয়—না জ্বর হবে কেন?

—তবে শরীর এমনি হচ্ছে কেন রে?

রাখাল কথা কহে না। দিনের বেলা কখনও কখনও সে বসিয়া বসিয়া হঠাৎ কাঁদিয়া ফেলে—মার জন্য তাহার মন কেমন করে।

সুবাসিনী পঞ্চাননকে বলে—তুমি ছেলেটাকে একটু দেখো—আমার মনে হয় ওর রোজ একটু একটু জ্বর হয়।

পঞ্চানন তাচ্ছিল্য করিয়া বলিয়া উঠে—হাঁ জ্বর হয়। রোজ তিন বেলা করে ভাত গিলছে—জ্বর আবার হয় কখন?

সুবাসিনী আর কিছু বলে না—স্বামীর সহিত কথা কাটাকাটি

করিতে তাহার প্রবৃত্তি হয় না। লক্ষ্মীকে ডাকিয়া বলে—রাখালকে একটু দেখিস মা—লক্ষ্মী মাথা নাড়িয়া বলে—হাঁ দেখি তো মা, ওকে ভাত মেখে খাইয়ে দেই—কেমন দেই না-রে রাখাল ?

রাখাল মাথা নাড়িয়া স্বীকার করে।

সে দিন বিকাল বেলা লক্ষ্মী রাখালকে খাইবার জন্য ডাকিতে গিয়া দেখে রাখাল আমগাছ তলায় ধূলার মধ্যে শুইয়া আছে। কাছে আসিয়া তাহার গায়ে হাত দিতেই দেখিল তাহার সারা গা জ্বরে পুড়িয়া যাইতেছে। ডাকাডাকি করিতে রাখাল একবার মাথা তুলিয়া তাকাইয়া পুনরায় ধূলার মধ্যেই মুখ গুঁজিয়া পড়িল। তাহার দুই চোখ একেবারে জবা ফুলের মত রাঙা হইয়া উঠিয়াছে।

—ইস্, জ্বরে যে গা একেবারে পুড়ে যাচ্ছে রাখাল, চল তোকে বিছানায় শুইয়ে দিই গে। ভাত খেয়ে কাজ নাই। লক্ষ্মী কোন প্রকারে টানিয়া লইয়া—রাখালকে বিছানায় শোয়াইয়া দিয়া—পিতার নিকটে আসিয়া বলিল—রাখালের খুব জ্বর হয়েছে বাবা—ওর খেয়ে কাজ নাই।

পঞ্চানন মুখ খিঁচাইয়া বলিল—জ্বর হয়েছে—আর হারামজাদা ছেলে পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

—আমগাছতলায় শুয়ে ছিল—আমি বিছানায় রেখে এসেছি।

—বেশ করেছিস—এখন খেয়ে নে।

৪

সন্ধ্যার পূর্ব্বে সুবাসিনী মাহিনার টাকা কয়টী গণিয়া আঁচলে বাঁধিয়া মনিব বাড়ী হইতে রওনা হইল। আধ মাইলটাক দূরে যে বাজার সুবাসিনী সেখানে গিয়া ঢুকিল। একটা মণিহারী দোকান হইতে কয়েক গণ্ডা পয়সা দিয়া এক গাছা পিতলের চক্‌চকে হার কিনিল। কয়েক বার ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখিয়া হারগাছা আচলে বাঁধিল। হারগাছা রাখালের গলায় বেশ মানাইবে—সুবাসিনীর খুসীতে চোখ দুটী চক্ চক্ করিয়া উঠিল। আহা—অবোধ ছেলে—ওকি আর অত বুঝতে পারে—সেদিন অসিতের হার লুকাইয়া আনিয়া কি দুর্দ্দশাই না হইল। ভাল দেখিয়া বাছিয়া বাছিয়া গোটা চারেক কমলা লেবু কিনিয়া দ্রুত-বেগে বাড়ীর দিকে ছুটিয়া চলিল। হার আর লেবুর দাম বাদে অবশিষ্ট রহিল নয় টাকা কয়েক আনা তাহার আঁচলে বাঁধা।

সুবাসিনী চলিতে চলিতে ভাবিতে লাগিল—একশিশি কডলিভারের তেল, আর কিছু ঔষধ কালই কিনিয়া আনিতে হইবে। খুব সকালে একবার উঠিয়া ডাক্তারখানায় যাইবে—সেখান হইতে ঔষধ কিনিয়া রাখিয়া তবে কাজে যাইবে ; তাতে যদি কাল একটু বিলম্ব হয়—না হয় হইবে। ঘরে ঢুকিতেই লক্ষ্মী বলিল—মা রাখালের খুব জ্বর হয়েছে।

—জ্বর ? কখন হলো রে ?

বলিতে বলিতে—সুবাসিনী রাখালের গায়ে হাত দিয়া একেবারে শিহরিয়া উঠিল—এ কি ? জ্বরে যে গা একেবারে পুড়ে যাচ্ছে। কয়েকবার নাড়া দিয়া রাখালকে ডাকিল—কিন্তু রাখাল কোন সাড়া দিল না। ঘরের এক পাশে টিম্ টিম্ করিয়া একটী তেলের প্রদীপ জ্বলিতেছিল—সুবাসিনী সেটি কাছে আনিয়া উস্কাইয়া দিয়া দেখে—রাখালের দুই চোখ একেবারে জবা ফুলের মত রাঙা। কোন্ সময় হইতে জ্বরের ঘোরে সে একেবারে অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া আছে—কে জানে ? সুবাসিনী হাউ মাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। কিছুক্ষণ পরে—পাশের বাড়ীর নন্দর মা আসিল, নন্দ আসিল। নন্দ গিয়া ডাক্তার ডাকিয়া আনিল, ডাক্তার সমস্ত দেখিয়া মুখ ভার করিয়া বলিলেন—অবস্থা অত্যন্ত কঠিন—কি হবে কিছু বলা যায় না—এ এক সাংঘাতিক রকমের ম্যালেরিয়া।

সুবাসিনী আঁচল হইতে তাহার সারা মাসের উপার্জ্জন ডাক্তারের হাতে তুলিয়া দিয়া কাঁদিয়া ফেলিয়া বলিল—আমার রাখালকে বাঁচান ডাক্তারবাবু। ডাক্তার অনেকটা নিরুপায়ের মত মুখ করিয়া বলিলেন—আচ্ছা দেখি কি করতে পারি। তার পর রাখালের মাথায় দিবার জন্য বরফ আসিল, ঔষধ আসিল, সারা রাত্রি ধরিয়া কতকগুলি ইনজেকশান হইল—কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না।

শেষ রাত্রির দিকে রাখাল মাথা নাড়িয়া কি যেন বলিতে চাহিল। সুবাসিনী তাহার মুখের কাছে মুখ লইয়া গিয়া ডাকিল—রাখাল—রাখাল রে বাবা ! এই যে আমি এসেছি একবার কথা বল্ মাণিক। আর আমি তোমায় ছেড়ে কোথাও যাব না। কিন্তু রাখাল আর কথা কহিল না—তাহার চোখের তারা দুইটি দুই একবার এদিকে ওদিকে ঘুরিয়া একেবারে উপরের দিকে স্থির হইয়া আটকাইয়া গেল। সুবাসিনীর বুক-ভাঙা ক্রন্দনে সমস্ত পাড়া ভরিয়া উঠিল।

আষাঢ়

কাদের নেওয়াজ

সুখ যে আমার পর হ'য়েছে, সাঙ্গ সকল আশা।
ডাক্‌ছে দেয়া, বন্ধ খেয়া, নীরব বুকের ভাষা।
সাম্‌নে কাঁপে অকূল পাথার,
হাত-ছানিয়ে ডাকছে আষাঢ়,
ডাকছে কঠিন কণ্ঠে আমায়, কোন্ ঋষি দুর্ব্বাসা ?

২

বহুদিনের আকুল-চাওয়া, বাদল-হাওয়ার গান,
কান যদি বা বরণ করে, চায় না নিতে প্রাণ।
হারিয়ে গেছে অঙ্গুরী তার
তাই দয়িত শকুন্তলার—
ভুলে গেছে সকল স্মৃতি প্রীতির অবসান।

৩

আষাঢ়ে হায় ! আজকে যদি ঝরেই শুধু আঁখি,
ছন্ন-ছাড়া ঘৃণ্য জীবন, কেমন ক'রেই রাখি।
বন্ধু ! এ বুক ভেঙেই গেছে,
তবু রে মন ! চল্‌না নেচে,
আকাশ-ছাওয়া আষাঢ় এল, দিস্‌নে তারে ফাঁকি।

বিদ্যাপতির শ্রীরাধা

শ্রীশুভব্রত রায়চৌধুরী

দুর্যোগ রজনীর তমসা কালো করে' ফেলেছে পৃথিবীকে। ক্ষণে ক্ষণে দুর্ণিবার অশনি ছুটে আসছে ধরণীর বুকে। ক্রুদ্ধ মেঘ যেন ত্রাস সঞ্চার করবার তরে বিপুল গর্জন করে' অম্বরে বারি বর্ষণ করছে। এমনি ভীতি-চকিত যামিনীতে রাধার অভিসার ?......

—চাঁদ হরিনবহ রাহু-কবল-সহ
পেম পরাভব থোল।—

মৃগাংক চন্দ্র রাহুর গ্রাসের কাছে পরাভব সহ্য করে করুক, প্রেম তো কোথাও পরাভব স্বীকার করে না—করতে পারে না। দুর্যোগের বাধা রাধার প্রেমের কাছে ক্ষীণ, লীনশক্তি ! কিন্তু তার চারিদিকে যে বিপদের বেড়াজাল ! 'চরণ বেঢ়িল ফণি'—বিষময় করাল ভুজঙ্গ তার চরণ বেষ্টিত করে' ধরেছে !......হ্যাঁ। তবু ভয় কিসের ? রাধা বরং আনন্দিত !—'নেপুর ন করএ রোল'—তার মুখর মঞ্জীর আর গুঞ্জরণ করবে না ! ত্রাস সংকোচ সরম, সব দূরে নিক্ষেপ করে' চিরজয়ী প্রেমের শক্তিতে সঞ্জীবিত হয়ে সে এগিয়ে চলেছে আপনার প্রাণপ্রিয়ের সাথে মিলিত হবার তরে। প্রেমের দুর্জয় শক্তির কাছে দুর্বার বাধা বিঘ্ন আজ লাঞ্ছিত-পরাভূত।

এমনি করে' এগিয়ে যেতে তাকে হবেই। তার দেহ, তার হৃদয়, তার জীবন—সকলই একটিমাত্র চির-আকাংক্ষিত প্রীতি-ভরা প্রিয়-পরশনের পানে তাকিয়ে আছে। সেই স্পর্শের স্নিগ্ধতা তাদের অস্তিত্বকে সফল করে' তুলবে—রাধার অন্তরকে অভিনন্দিত করবে।

সেই মিলনের দিনের পানে রাধা ব্যাকুল আশায় চেয়ে আছে।

—পিয়া যব আওব এ মঝু গেহে।
মঙ্গল যতহুঁ করব নিজ দেহে॥—

সে তার তরুণ তনুর মাঝে সযতনে বেদী রচনা করেছে তারি প্রিয়তমকে বরণ করবার জন্য। বিচিত্রিত আভরণে সাজিয়েছে আপনার দেহলতাকে প্রাণপ্রিয়ের অভিবন্দনার তরে। রাধা জেনেছে দেহের সার্থকতা তখনই যখন সে দেহ তার প্রভুর অন্তরকে আনন্দে অভিসিঞ্চিত করতে পারবে। মাধবই যে তার সব—'দেহক সরবস গেহক সার'—তার 'জীবক জীবন' !

রাধার অন্তরের আকুল আশাকে সফল করে' মাধবের সাথে সেই মিলনের দিন উদিত হ'লো। কিন্তু এ মিলন কি তার হৃদয়ে অভীপ্সিত তৃপ্তির পূর্ণতম স্বাদ দিল ?

—জনম অবধি হম রূপ নেহারলুঁ
নয়ন না তিরপিত ভেল।—

রাধার মনে হয় শ্যামের অপরূপ রূপের মাঝে যেন হর্ষ-অচেতন অযুত বর্ষ ধরে' আপনার আবেশবিভোর দৃষ্টি নিমজ্জিত করে' রেখেছে—কিন্তু নয়ন তো তৃপ্ত হয় না !

—লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখলুঁ
তব হিয়া জুড়ন না গেলি।—

যেন মনে হয় রাধা কৃষ্ণকে হৃদয়ের 'পরে রেখেছে যুগযুগান্ত ধরে'—কিন্তু কৈ !—প্রেমোচ্ছল হৃদয়ের আকুলতা তো স্তব্ধ হলো না। রাধা আর তার প্রাণপ্রিয়ের মাঝে রয়ে গেছে যেন এক ব্যবধান—যতই ক্ষীণতম হোক না কেন। সে যে চায় আরও নিবিড় হয়ে, গভীর হয়ে তার মাঝে মিলিয়ে যেতে। সে যে চায় আপনার তনুকে তার তনুর ঈশ্বরের আশা আকাংক্ষা অভিলাষের মাঝে নিশ্চিহ্নে বিলীন করে' দিতে। সেইখানেই তো তার সার্থকতা—তার চরম পরম-প্রাপ্তি—তার জীবনের মুক্তি। সেই ব্যবধানহীন বিলয়ের আনন্দ কি রাধাকে অভিষিক্ত করবে না ?

কিন্তু সেই আনন্দের সাধনাকে সফলতার শুভ্র আলোকে সঞ্জীবিত করবার পূর্বেই নেমে এল বাসনার ব্যর্থতার দাহ। বিরহের অভিসম্পাতে রিক্তপ্রায় হলো তার সাধনার আয়োজন উপচার। 'অব মথুরাপুর মাধব গেল'—মাধব মথুরাপুরে চলে গেলেন। রাধার মিলন-মুখর হৃদয় একেবারে শূন্য হয়ে গেল।

—শূন ভেল মন্দির শূন ভেল নগরী।
শূন ভেল দশদিশ শূন ভেল সগরী॥—

তার শূন্য জীবনের অসহ ব্যথা কেবলি গুমরে গুমরে হাহাকার করে' —তার দীর্ণ অন্তরের নিবিড় নিরাশা কেবলি কেঁদে কেঁদে বলছে

—কালিকা অবধি কইএ পিয়া গেল।
লিখইতে কালি ভীত ভরি' ভেল॥
ভেল প্রভাত কহত সবহি।
কহ কহ সজনি কালি কবহি॥—

নিত্য প্রভাত আসে—কিন্তু হায়, প্রিয়তমের 'কাল' তো সমাগত হ'লো না। তবে বুঝি সত্যই সে 'কাল'—সে প্রিয়সমাগমের দিন আর আসবে না !......

রাধার জীবনের 'পরে গোধূলি-মলিন ছায়ার শেষ রেখা যেন ঘন যবনিকা টেনে দিল। তার অস্তিত্ব বুঝি বা ব্যর্থতার অন্ধকারে মিলিয়ে যেতে লাগল। হায় ! তার আশা আকাংক্ষা—তার সাধনা সব কি শেষে শুষ্ক হয়ে ধূলিতে ঝরে' তার দেহমনপ্রাণকে নিষ্ফল করে দেবে ?—

লোকে সান্ত্বনা দেয়

—জো জন মন মাহ সো নহ দূর।
কমলিনী-বন্ধু হোয় জইসে সূর॥—

দৈহিক দূরত্বই কি সব ? মনের মাঝে যার আবাস সে যে দূরে থাকলেও দূরে নয় ! সুদূর আকাশের মাঝে সূর্য ও মাটির ধরণীর বুকে সরসীর কমলিনী—কী চিরন্তন অলংঘ্য ব্যবধান তাদের মাঝে ! কিন্তু তাই বলে' তাদের প্রেম প্রীতি তো এতটুকুও ক্ষীণ হয়নি। 'উদয় অচলে অরুণ উঠিলে কমল ফুটে যে জলে'। পূর্বাশার কোলে উদয়গিরির শিখর 'পরে যেই তরুণ সূর্যের অরুণ কান্তি প্রকাশিত হ'লো, কমলিনী অমনি চাইল তার প্রেমস্নিগ্ধ নয়ন মেলে, তার সদ্য-জেগে-ওঠা প্রাণের মুকুলিত হাসির মাধুর্য ছড়িয়ে—নিঃশেষে নিজেকে আলোর দেবতার কাছে বিলিয়ে দেবার আকাংক্ষা নিয়ে।......শুভ শুভ্র প্রভাতী লগ্নে এই যে মিলন যেথায় শুধু অন্তর সাড়া দেয় অন্তরের আহ্বানে—এখানে কি দেহের কোন স্থান আছে, কোন রব আছে ? এই প্রেম দেহাতীত প্রেম। এই প্রেমে দৈহিক দূরত্ব কতটুকু বাধারই বা সৃষ্টি করতে পারে ? দূরত্বের ব্যবধানকে হৃদয় তখন অন্তরের পরিপূর্ণ প্রেমের নিবিড়তম সান্নিধ্যে ভরে' ফেলে—দেহের বিরহের বিধুরতাকে প্রাণের নিগূঢ়তম মিলনোৎসবে নন্দিত করে' তোলে। এ প্রেমে সব কিছু মিলিয়ে গিয়ে থাকে শুধু দু'খানি হৃদয়ের এক অভিনব একক মিলিত মূর্ত্তি।

লোকে তাই বলে। কিন্তু সে কথায় তো রাধার হৃদয় সাড়া দেয় না। 'হমর হৃদয় পরতিত নহি হোয়'। সে যে পেতে চায় তার প্রাণপ্রিয়কে তারি বাহুর নিবিড়তম আলিংগনে—তারি বক্ষের নিরন্তর পরশনে। কেমন করে' সে লোকের কথায় প্রতীতি স্থাপন করবে ?

—জকর পরশ-বিশলেষ জর আগি।
হৃদয়ক মৃগমদ শোভ নহি লাগি।—

কেমন করে' সেই প্রাণস্বামীর বিরহ রাধা সহ্য করবে ? যার প্রগাঢ়

পরশ হতে ক্ষুদ্রতম মুহূর্তের বিচ্ছেদে তার বক্ষে জ্বলে ওঠে আগুনের দুঃসহ দহন—হৃদয়ের মৃগমদ হয়ে ওঠে তীব্র জ্বালাময়—তারি সাথে বিচ্ছেদ !—রাধার বুক কেঁপে ওঠে ত্রাসে। তার সমস্ত হৃদয় উদ্বেলিত বেদনায় হাহাকার করে' কেঁদে ওঠে—'কৈসে গমায়বি হরি বিনু দিন রাতিয়া'। যার এইটুকু স্পর্শ তার সকল ব্যথাবেদনাকে আনন্দের উচ্ছলতায় তরংগায়িত করতে পারে, সেই হরি আজ তার কাছে নেই। দিন যে তার কাটবে না ! রাত্রি যে আর পোহাবে না ! মর্মতল শূন্য করে' দুঃখের তীব্রতার মাঝে রাধাকে ফেলে চলে' গেছে তার প্রিয়তম দূরে—বহুদূরে—সংগে নিয়ে গেছে তার সকল ধৃতি, শক্তি, আশা, ভরসা। দুঃখে এ অভিঘাত রাধা সহ্য করবে কি দিয়ে ? প্রিয়হীন প্রহর উদ্‌যাপন করবে কোন আশার উদয়-আলোকের পানে তাকিয়ে ? রাধার কাছে তার জীবন আজ মূল্যহীন হয়ে পড়েছে—'পিয়া বিছুরল যদি কি আর জীবনে'। বিরহের রুদ্র তাপে তার 'পাঁজর ঝাঁঝর' হয়েছে—জীবনের রসমাধুর্য শুকিয়ে গেছে। যে সৌন্দর্যের অর্ঘ্য সে রচনা করেছে তার প্রিয়তমের তরে সে অর্ঘ্য যে বিরহেই ম্লান হয়ে যায়, তবে তার প্রাণ-প্রিয়কে কী দেবে সে—তার পূজা নিবেদন যদি এমনি করেই বিফল হয়, কী করে' সে তার প্রেমকে সার্থক করে' তুলবে সুদিন-সমাগমে ? কী দেবে সেদিন সে তার অন্তর-দেবতাকে ? রাধার জীবনের সকল সার্থকতা যেন কুহেলীম্লান পদ্মের মত বিলীন হয়ে যেতে লাগল। তার এ অশ্রুসাগর মথিত করে' মিলন-মধুর হাসির অমিয়া কি তাকে আর কখনও অভিনন্দিত করবে না ?……

সেই অভিনন্দনের পরম দিন সমাগত হ'লো। সফলতার অপরূপ আলোকে উজ্জ্বল হয়ে উঠল রাধার অশ্রুবিলীন জীবন। চির-অভীপ্সিত প্রভাত এল তার অন্তরতম আশাকে উজ্জীবিত করে'। সব দ্বিধা দ্বন্দ্ব দুঃখ জ্বালার মধুর পরিসমাপ্তি হ'লো অপূর্ব মিলনোৎসবের মাঝে। তার জীবন যৌবন সত্যই এবার সফল হয়ে উঠল। আজ প্রভাতের উদার আলোকে সে 'পিয়া-মুখ-চন্দা' দর্শন করেছে।

—আজু মঝু গেহ গেহ করি মানলুঁ
আজু মঝু দেহ ভেল দেহা।—

আজ তার দেহ মন্দির প্রকৃত মন্দির হলো। সেথায় যে শূন্য বেদী এতদিন পড়েছিল, আজ সেখানে তার অন্তরদেবতা সমাসীন হ'লো। তাই, শুধু আনন্দ—চারিদিকে শুধু আনন্দ ! প্রিয়সংগের মাধুর্য আজ যে তার অস্তিত্বকে অর্থপূর্ণ করে' তুলেছে।

আপনার অস্তিত্বকে অর্থপূর্ণ করে' তোলাই যে রাধার প্রাণের সাধনা। পৃথিবীর বুকে রাধা এসেছে জীবন যৌবনের অপরূপ সাজে বিভূষিত হয়ে—অন্তরের কূল-প্লাবী আশা আকাংক্ষা স্নেহ প্রেম প্রীতি নিয়ে।

কিন্তু কি করবে সে তার তনুর এত রূপ, অন্তরের এত ঐশ্বর্য দিয়ে ? এরা কি বিফলতার মাঝেই বিলীন হয়ে যাবে ? রাধার দেহের প্রতিটি রক্তবিন্দুর সাথে মিশে আছে তার যে চাওয়া যে আশা যে অভিলাষ—কেমন করে সে তাদের উপবাসে জর্জরিত করে' বধ করবে ? না না—তা সে পারবে না। উপবাসী অন্তরের তীব্র হাহাকার তার জীবনকে দুর্বিষহ করে' তুলবে—বেদনার দুঃসহ শিখায় তার দেহ মন্দিরকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দেবে। তার জীবনযৌবন যে তারই প্রাণপ্রিয়ের পূজার উপচার !—তাকে তো সে ধ্বংস করতে পারে না ! সেখানেই যে তার পূজাবেদী—'বেদী বনাব হম আপন অঙ্গমে'—তাকে তো সে ভেঙ্গে টুটে মুছে ফেলতে পারে না ! তার দেহমনপ্রাণকে যে সার্থক করে' তুলতেই হবে প্রিয়-সংগের পূর্ণতম তৃপ্তির স্বাদে।

তার জীবন যৌবনকে সফল সার্থক অর্থপূর্ণ করে' তুলবে। আবেশ-বিহ্বল চিরমধুর প্রেমের পরশে সে দেহের প্রতি অণুপরমাণুর শূন্যতা ভরে' ফেলবে—তার সব চাওয়া সব পাওয়াকে সফল করে' তুলবে। পরিপূর্ণ সৌন্দর্য্যের ডালি সাজিয়ে সে অর্ঘ্য দেবে প্রিয়তমের চরণে। সে অর্ঘ্য যদি মাধব প্রীতিভরে তুলে নেয়—তবে ধন্য হবে তার জীবন, পূর্ণ হবে তার সাধনা। রাধার প্রেম যে বাঁচতে চায়—জানতে চায়—তার সকল চাওয়া পাওয়া আশা বাসনার মধ্য দিয়ে—রূপ রস শব্দ গন্ধ স্পর্শের মধ্য দিয়ে—তার প্রিয়ের আনন্দের মধ্য দিয়ে। কী অভিনব সুন্দর এই প্রেম ! নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে পূর্ণ করতে চায়—কী অপরূপ তার সাধনা !

আজ রাধার তাই পরিতৃপ্তির দিন—পূর্ণতার লগ্ন। মিলন-বসন্তে বিরহের দৈন্য আজ বিমোচিত হ'লো। যে শূন্যতা এতদিন তার তনুমন ভরে' ছিল আজ সে পূর্ণ হ'লো রঞ্জিত সম্ভারে। জগতের প্রতি শব্দ প্রতি রূপ প্রতি স্পর্শ রাধার কাছে নূতনতম মধুরতম হয়ে জেগেছে। আজিকার প্রভাতের কুহুতান মলয়পবন—সবকিছু স্নিগ্ধ সুন্দর অপরূপ ! রাধা তার প্রেমের পরিপূর্ণতার দৃষ্টি নিয়ে যেদিকে আঁখিপাত করছে সেদিকেই সে দেখছে সৌন্দর্যের অনন্ত বিকাশ। তার অন্তরের আনন্দ আজ নিজত্বের সীমারেখা অতিক্রম করে' বিশ্বের মাঝে ফুটে উঠেছে মানবের চিরপ্রেয় চিরশ্রেয় আনন্দের প্রকাশ নিয়ে। যে প্রেম এমনি করে' ভূমানন্দের বিচিত্র অনুভূতি জাগায় সে মহান্ প্রেম যে অলৌকিক—অভিনব ! প্রেমের কবি বিদ্যাপতি তাই বিমুগ্ধ হৃদয়ে আনন্দ-ঝংকৃত কণ্ঠে গেয়ে উঠলেন—

—ধনি ! ধনি ! তুয়া নব নেহা !—

পাথেয়

শ্রীদেবনারায়ণ গুপ্ত

ভ্রমরের গুঞ্জরণে, হয়ত সে সঙ্গোপনে
শুনে তার গান
আমার হৃদয় দেশে, তাহারে কি ভালবেসে
দিল গো সম্মান ?
ফুলের কলিকা যত, ফুটে ঝরে অবিরত
দিবসে ও রাতে—
কে তাহারে দেয় আশা, কেবা দেয় ভালবাসা
নবীন প্রভাতে ?
কর্ম্ম ক্লান্ত অবসর, হিয়া যবে জর জর
তখন তোমায়,

পেয়েছি কুড়ায়ে আমি, সূর্য্য ছিল অস্তগামী
জীবন বেলায় !
তুমি না থাকিলে কাছে, ভুল হয় তাই পাছে
কাজের সময় ;
এসেছি গিয়েছি চলে, কতবার নানা ছলে
মিথ্যা কথা নয়।
সব কিছু আজ শেষ, নাই দুঃখ নাই ক্লেশ
বিদায় ! বিদায় !
এবার যাবার পালা, জুড়াইল সব জ্বালা
স্মৃতি নিয়া হায় !

অবাঞ্ছিত

শ্রীকাশীনাথ চন্দ্র

যত রাগ গিয়া পড়িল ছেলেটার উপর। তাহারই যত কিছু অপরাধ যেন। অবশ্য অপরাধ যে তাহার একেবারে নাই এমন কথা বলা চলে না। এই অভাবের সংসার…নিত্য এখানে নাই নাই রব লাগিয়াই আছে। যাহারা এ সংসারে আছে বা পূর্বে আসিয়াছে তাহাদেরই খাইতে কুলায় না, আবার একজন অংশীদার আসিল কিসের জন্য। কত নারী একটা ছেলের কামনায় কত কি করিয়া ফেলিতেছে, তাহাদের কাহারও সংসারে গিয়া জন্ম লইলেই পারিত, নিজেও সুখী হইতে পারিত, তাহাদেরও সুখী করিতে পারিত। তাহা না হইয়া তাহার এই বৃদ্ধ বয়সে এ কি শাস্তি! ছিঃ ছিঃ, লজ্জার একশেষ…হৈমবতী প্রায় কাঁদিয়া ফেলিলেন…

পয়সার অভাবে ছোট মেয়ে গৌরীর বিবাহ দেওয়া হয় নাই। তাইতো কুড়ি একুশ বছরের মেয়ে হইয়াও গৌরী খুকী সাজিয়া নাচিয়া নাচিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। বড় ছেলের বিবাহ হইয়াছে আজ পাঁচ বৎসর। বউ ও ছেলেমানুষ নয়, গৌরীরই সমবয়সী। তাহার এখনও মোটে সন্তানাদি হয় নাই, কেন তাহার একটা সন্তান হইলে কোন ক্ষতি হইত কি। এই ছেলেটাই হৈমবতীর না হইয়া তাহার হইলেই কত সুখের কত আনন্দের হইত। এই ছেলেটা তাহার হইলে যে পরিমাণ সুখের ও আনন্দের হইত, হৈমবতীর হইয়া ঠিক সেই পরিমাণ লজ্জার কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

হৈমবতীর ছেলে হওয়ার সংবাদে পাড়ার হিতৈষিণীরা দলে দলে তাঁহার সন্তান দেখিতে আসিয়াছে, যেন কখনও কাহারও ছেলে হইতে দেখে নাই। ছেলে দেখিয়া সকলে আনন্দও প্রকাশ করিয়াছে। কিন্তু তিনি বেশ জানেন যে সত্যকার আনন্দ সে নয় কঠিন বিদ্রূপের উচ্ছ্বাস। দাইটাই বা কি! ছেলের নাড়ী কাটিতে গিয়াও বাঁশের পাতলা চটাখানা নামাইয়া রাখিয়া বলিল…কই খুড়ো মশায় গেলেন কই—গ্রাম সম্পর্কে সে কর্তাকে খুড়া বলে।

গৌরী উত্তর দিল…কেন বল্ ত—

…কই ট্যাকা দেন, ঘড়া দেন, তবে তো নাড়ী কাটব—

গৌরী হাসিয়াই লুটাইয়া পড়িল, বলিল…দাঁড়া দাই বৌদি, বাবাকে ডেকে দিই—বলিয়াই সে মুখে কাপড় দিয়া হাসিতে হাসিতে ছুটিয়া পলাইল। হৈমবতী মনে মনে বলিলেন—ধরিত্রী, দ্বিধা যও। গৌরী— গৌরী সেদিনকার মেয়ে, সেও বুঝিয়াছে যে ইহা হওয়া উচিৎ হয় নাই, ইহা লজ্জাকর। এমন সময় শুনিতে পাইলেন, তাঁহার স্বামী চেঁচাইতেছেন "একি তামাসা নাকি, যে টাকা চাইচে, ঘড়া চাইচে—কাটতে হবে না নাড়ী—তার চেয়ে গলা টিপে মেরে ফেল্‌তে বলগে যা। আরে 'মোলো'—বলে কি না ঘড়া দাও—"

হৈমবতী একেবারে মরমে মরিয়া গেলেন।

দাই-বৌ সমস্তই শুনিতে পাইতেছিল। শুনিয়া সে হাসিতে হাসিতে ছেলের নাড়ী কাটিতে আরম্ভ করিল; এমন সময় সেখানে গৌরী হাসিতে হাসিতে আসিয়া উপস্থিত হইল, বলিল… বৌদি, বাবা টাকা দিলে না—

হৈমবতী আর একবার বেদনা অনুভব করিলেন। বৃদ্ধ বয়সের সন্তান হইলেও সন্তান তো। তাহাকে এত তুচ্ছ করিবার কারণ কি। এবার বধূ কথা বলিল; "তোমারও যেমন খেয়ে দেয়ে কাজ নেই ঠাকুরঝি, তাই গিয়েছ বাবার কাছে টাকা আর ঘড়া চাইতে—যত সব ছেলেমানুষী"—

গৌরী সাশ্চর্য্যে বলিল "বাঃ! বৌদি বল্‌লে যে—"

—"সে কি আর সত্যি বলেছিল—"

দাই-বৌ ততক্ষণে নাড়ীটা কাটিয়া ফেলিয়াছিল। সুকৌশলে সেটাকে লাল সুতা দিয়া বাঁধিতে বাঁধিতে সেও সায় দিয়া বলিল "বোঝদিকিনি ভাই—"

গৌরী বোধ হয় নিজের নির্বুদ্ধিতার জন্য একটু অপ্রস্তুত হইয়া পড়িল। সে তাড়াতাড়ি সেখান হইতে সরিয়া গেল। কি জানি কি ভাবিয়া বধূও সেখান হইতে উঠিয়া পড়িল। তখন হৈমবতী চুপি চুপি ডাকিলেন "দাই, বৌ"—

দাই বউ শিশুকে স্নান করাইতে করাইতে চোখ তুলিয়া তাঁহার পানে চাহিল।

—"ওটাকে একটা কিছুর মধ্যে পূরে কোথাও ফেলে দিয়ে আসতে পারিস্"—তাঁহার প্রস্তাব শুনিয়া দাই-বউ প্রথমটা বিস্ময়ে অবাক হইয়া গেল। তার পর মৃদু হাসিয়া বলিল, "তাই কি আর হয় মা—ফেলে দিতে কি আর পারা যায়"—তার পর একটু থামিয়া আবার বলিল "কেন কি হয়েছে কি যে ফেলে দিতে যাবেন। ছেলে কারও হয় না? একটু বেশী বয়সে হয়েছে এই যা…তা আর কি করা যাবে…এর চেয়েও কত বেশী বয়সে লোকের ছেলেপুলে হয়—"

হৈমবতী এইবার সত্য সত্যই কাঁদিয়া ফেলিলেন, বলিলেন "বুড়ো বয়েসে আমার এ কি শাস্তি বল্ তো মা—বাড়ীতে বৌ রয়েছে, সোমত্ত হাতীর মত মেয়ে এখনও গলায় ঝুলচে… আর এ কি…"

হৈমবতী আর কথা বলিতে পারিলেন না। অশ্রুর উৎস কথা বন্ধ করিয়া দিল।

দাই বলিল "কাঁদবেন না খুড়ি মা—এ সবই ভগবানের হাত"—।

তিনি সেই যে ছেলের দিকে পিছন ফিরিলেন আর ফিরিয়াও দেখিলেন না। কিছুক্ষণ পরে ঘরের দরজাটা ভেজাইয়া দিয়া দাই-বৌ চলিয়া গেল।

হৈমবতীর দুই চোখ দিয়া অকারণে অশ্রু ঝরিতেছিল। কি এক দুঃসহ মর্মব্যথায় আজ এই সংসারটাকে যেন তাঁহার নিতান্তই অসার বলিয়া মনে হইতেছিল। শুধু ভাবিতেছিলেন এই লজ্জার হাত হইতে কি করিয়া মুক্তি পাওয়া যায়। এমন সময়

শিশু কাঁদিয়া উঠিল। হৈমবতী শিশুর দিকে ফিরিলেন। অসহায় সদ্যজাত অন্ধকারের জীব সহসা ধরণীর অত্যুজ্জ্বল আলোর পরিবেষ্টনীর মধ্যে আসিয়া যেন দিশাহারা হইয়া পড়িয়াছিল। তাই সজোরে মুষ্টিবদ্ধ করিয়া চোখ বুঁজিয়া পৃথিবীর বিরুদ্ধে যেন যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া আকুল হইয়া কাঁদিতেছিল।

হৈমবতী শিশুর দিকে ফিরিয়া দেখিলেন। না, দেখিতে কুৎসিৎ হয় নাই, বরং দেখিতে বেশ সুশ্রীই হইয়াছে। তবে লোকে এত ঘৃণা করিতেছে কেন? কি জানি কি ভাবিয়া তিনি একবার শিশুর গায়ে হাত দিলেন, শিশু সংস্পর্শে যেন একটা পরম অবলম্বন পাইল। তিনি শিশুকে কোলের কাছে টানিয়া লইলেন।

* * * *

শেষ পর্যন্ত শিশুকে গ্রহণ করিল পুত্রবধূ প্রতিমা।

শিশুকে কোলে লইয়া নাচাইতে নাচাইতে বলিল···দেখুন দেখি মা, কি সুন্দর···আপনি বলছিলেন কিনা ফেলে দিয়ে আয়—নবজাত শিশুর প্রতি পুত্রবধূর এই আকর্ষণ দেখিয়া হৈমবতী মনে মনে সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। কিন্তু প্রকাশ্যে সেকথা স্বীকার করিতে কেমন যেন লজ্জা বোধ হইতেছিল। তিনি চুপ করিয়াই রহিলেন। প্রতিমা একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল—"খোকাটাকে আমায় দেবেন মা"—

বোধ হয় তাহার অতৃপ্ত মাতৃ হৃদয়ে মাতৃত্বের ক্ষুধা জাগিয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু গৌরী ফোঁস করিয়া উঠিল, বলিল "তুই যে কি বৌদি, তার ঠিক নেই···ওই 'হিলি বিলি' করা কেঁচোর মত ছেলেটাকে নিতে তোর ইচ্ছে করচে? দিয়ে দে মা'র জিনিষ মাকে···মা'র লক্ষ্মণের ফল···ধরে বসে থাকুন—

প্রতিমা সে কথায় কান দিল না, বলিল···"দেবেন মা"—

বধূর কথা হৈমবতীকে যে পরিমাণ আনন্দ দিয়াছিল, কন্যার কথা ঠিক সেই পরিমাণে আঘাত দিয়াছিল। তিনি মুখ নীচু করিয়া অস্ফুট স্বরে বলিলেন "নাওগে"—

—"আর দেব না কিন্তু"—

এইবার হৈমবতী হাসিয়া ফেলিলেন। গভীর তৃপ্তিতে বধূর মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন "না, আর তোমায় দিতে হবে না"—

শিশুকে পাইয়া প্রতিমা একেবারে মাতিয়া উঠিল। কি করিয়া সে শিশুকে যত্ন করিবে তাহা সে ভাবিয়া পায় না। যত্ন করিবার শত প্রকার উপায় আবিষ্কার করিয়াও সে তৃপ্ত হয় না। হৈমবতী মনে মনে সন্তুষ্ট হইলেও, মুখে শিশুর প্রতি তাচ্ছিল্য দেখাইয়া বলেন "বাবা, বেঁচেছি"—

হৈমবতীর ভাসুরের পুত্রবধূ প্রতিমাকে একান্তে পাইয়া বলিল—"ও আবার তোর কি হচ্ছে"—

—"কই, কি হচ্ছে"—

—"মরণ তোমার···পরের পাপ বয়ে মরচ কেন"—

প্রতিমা সাশ্চর্যে বলিল "পরের পাপ হবে কেন, ওকি আমাদের পর"—

পাড়ার লোকে আসিয়া প্রতিমা শিশুকে লালনপালন করিতেছে দেখিয়া বলিল·· যতই করুক গৌরীর মা, ও আদর কখনও চিরকাল থাকবে না—

বধূর মুখখানি বিষণ্ণ হইয়া উঠিল।

তাহা লক্ষ্য করিয়া হৈমবতী ব্যস্তভাবে বলিলেন—"না—না থাকবে বই কি···বউ মা কি আমার তেমনি—"

—তুমি কি পাগল হলে গৌরীর মা—বলে পর লাগে না পরে, তেঁতুল লাগে না জ্বরে···এখন নিজের কোলে তো আর একটা আধটা নেই, তাই এত টান। এর পর যখন নিজের হবে, তখন এত যে দেখচ মায়া মমতা, কোন চুলোর দুয়োরে দূর হবে—

প্রতিমা ভাবিতে লাগিল। তাহাই হইবে নাকি···এত মায়া মমতা সব দূর হইয়া যাইবে। ভাবিয়া চিন্তিয়া সে স্বামীকে এক পত্রে লিখিল·· সামনের শনিবারে নিশ্চয় বাড়ী আসা চাই। আমি একটা জিনিষ পেয়েছি তোমায় দেখাব। মা'র নূতন খোকাটা ভারী সুন্দর হয়েচে। আমি তাকে মা'র কাছ থেকে চেয়ে নিয়েছি। ভাল করিনি? উত্তর আসিল "পাগলের সংগে পাগলামী করবার আমার সময় নেই। নিজে তো—না বিইয়ে কানাইএর মা—হয়ে থাকতে চাইচ, কিন্তু বোঝাটি চিরকাল বইতে হবে আমায় সে খবর রাখো?"

তাহা হইলেও সে পরের শনিবারে বাড়ী আসিল।

প্রতিমা শিশুকে দেখাইয়া বলিল···দেখ দিকিনি কি সুন্দর বাচ্চাটা, দেখলেই কোলে নিতে ইচ্ছে হয়—

—ও তুমিই দেখ, আমার দেখে কাজ নেই—

—বারে! তুমিই বা দেখবে না কেন···তোমার ভাই—

প্রতিমার স্বামী বলিল—হ'তে পারে ভাই···ভাই নয় বলে আমি অস্বীকারও করচি না, কিন্তু ভাইও সময় সময় বালাই—

ঘরের বাহিরে থাকিয়া হৈমবতী পুত্র ও পুত্রবধূর কথা শুনিতেছিলেন। এইবার তাঁহার মনে হইল ছেলেটার মরাই উচিৎ।

প্রতিমা স্বামীকে বলিল—"ছিঃ! ওকথা বলতে নেই···এর কি দোষ বল—এই শিশুর"—

তারপর উভয়েই কিছুক্ষণ চুপ চাপ।

স্বামীর মুখ ক্রমশঃই গম্ভীর হইতেছে দেখিয়া শেষ পর্যন্ত প্রতিমাই আবার কথা বলিল? বলিল···"কি ভাবচ বলত"—

—"ভাবচি? ভাবচি পয়সার অভাবে আইবুড়ো মেয়ে ঘরে, বুড়ো বয়সে আবার এসব কেন—"

হৈমবতী লজ্জায় একেবারে মাটির সহিত মিশাইয়া গেলেন। ছি: ছি: শেষ পর্যন্ত ছেলেও ওই কথা বলিল। মরুক···মরুক··· ছেলেটা মরিলেই আপদ যায়···তাহার মরণই উচিৎ। মরুক, মরিয়া তাঁহাকে এই লজ্জা এই কলংকের হাত হইতে মুক্তি দিক। ঘৃণায় লজ্জায় হৈমবতী আর সেখানে দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিলেন না।

নিতান্ত মর্মব্যথায় ব্যথিত হইয়া অভিশাপ দিলে নাকি অভিশাপ এ যুগেও খাটিয়া যায়। বড় দুঃখেই হৈমবতী নবজাত পুত্রের মৃত্যুকামনা করিয়াছিলেন। পুত্রের মৃত্যুকামনা মা বড় সহজে করিতে পারে না। তাই হৈমবতীর অভিশাপ ছেলেটার উপর সদ্য সদ্য খাটিয়া গেল।

ছেলেটা প্রতিমার কাছেই ঘুমাইত। গভীর রাত্রে হঠাৎ সে আর্তনাদ করিয়া উঠিতেই প্রতিমা জাগিয়া উঠিল এবং সংগে সংগে স্বামীকে ডাকিল···ওগো শিগ্‌গির একবার ওঠতো—

—"কেন?"—

—"আমার পায়ের ওপর দিয়ে কি যেন সড়সড় করে চলে গেল"—

—"ইঁদুর টিঁদুর বোধ হয়"—

—"না ইঁদুর নয়"—

—"তবে আবার কি?"

প্রতিমা একটু ইতস্তত: করিয়া বলিল—"আমার বোধ হয় লতা"—

আলো জ্বালা হইলে সত্যই 'লতা' নাম ধারী ভয়ানক জীবটিকে ঘরের মধ্যে দেখা গেল না। কিন্তু দেখা গেল, শিশুর বাঁ পায়ে কিসের যেন দংশনের চিহ্ন, দষ্ট স্থান দিয়া অল্প অল্প রক্তও ঝরিতেছে। বেশ করিয়া দেখিয়া লইয়া অনিল বলিল—"ওই ইঁদুরে কামড়েচে"—

—"কিসে বুঝলে"—

—"লতার কামড়ের দাগ এ রকম হয় না—তা' ছাড়া, লতার কামড় দিয়ে রক্ত ঝরলে, সে রক্তের রং হয় কাল"—

—"ঠিক বলচ তো"—

—"হ্যাগো হ্যা"—

প্রতিমা নিশ্চিন্ত মনে আলো নিভাইয়া শুইয়া পড়িল।

কিন্তু প্রভাত হওয়ার সংগে সংগে প্রতিমার ক্রন্দনধ্বনি শুনিয়া বাড়ীর সকলে তো জাগিয়া উঠিলই, পাড়ারও কয়েক জন মহিলা আসিয়া জুটিল। দেখা গেল বারান্দায় প্রতিমা এক মৃত শিশুকে কোলে লইয়া বসিয়া আছে। শিশুর দেহ একেবারে নীল!

হৈমবতী বলিলেন, "কি হল কি—"

প্রতিমা কাঁদিতে কাঁদিতে গত রাত্রির কাহিনী বর্ণনা করিল। মনে হইল মুহূর্তের জন্য হৈমবতীর মুখের উপর বেদনার ছায়া দেখা দিল, কিন্তু সে ওই মুহূর্তের জন্য। পর মুহূর্তে তিনি নিজেকে সামলাইয়া লইয়া বলিলেন, "তার আর কি হয়েচে, এর জন্যে আর এত কান্না কিসের···একটা আবর্জনা বইত নয়। গেল, না আমি বাঁচলাম—"

বলিয়া মৃত শিশুকে পুত্রবধূর কোল হইতে লইয়া তুলসীতলায় শোয়াইয়া দিয়া পুত্রের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "ওটাকে ফেলবার ব্যবস্থা কর অনিল···কিছুই করতে হবে না, অমনি পুঁতে থুয়ে আয়। বৌমা যাও, স্নান করে এস—এরতো আর অশৌচ নেই, ডুবে শুদ্ধ"—

পাড়ার মেয়েদের মধ্যে কে একজন বলিল, "বাবা, কি কাঠ প্রাণ···এতটুকু দুঃখ নেই! হলই বা বুড়ো বয়সের ছেলে, ছেলে তো"—

হৈমবতী সে কথায় কান না দিয়া ধীরে ধীরে নিজের ঘরে গিয়া দরজায় খিল্ দিলেন। অকস্মাৎ কোথা হইতে অশ্রুপ্রবাহ আসিয়া তাঁহাকে ভাসাইয়া দিল। মাটিতে লুটাইয়া তিনি কাঁদিতে লাগিলেন, কিন্তু নিঃশব্দে·· সেকথা আর কেহ জানিলনা।

যাত্রা

শ্রীগোবিন্দপদ মুখোপাধ্যায় বি-এ

লেগেছে আমারে নয়নে তোমার অতি অপরূপ ভালো,
তাই মনে হয় পেয়েছি আলোক, চলে গেছে সব কালো,
তবে সাথি আজ প্রেমদীপ তব জ্বালো।
জীবন দুয়ারে করাঘাত করি,
সমুখের পথে নিব আজি বরি,
মরণের মুখে বেয়ে যাব তরী
শরতের মাখি আলো,
জ্বালো তবে আজ জীবনের সাথী, প্রেমদীপ তব জ্বালো।

বনানীর শিরে অস্তরবির শেষ রক্তিম রেখা,
বালিকা-বধূর সিঁথী মূলে যেন অরুণ সিঁদুর লেখা,
গহন বনেতে কলাপীর শুনি কেকা।
নিশীথরাতের ঘন আঁধারিমা,
বরষা দিনের শাঁওন জড়িমা,
দুখদিবসের শতেক গ্লানিমা,
যদি বাধা দেয় পথে;
চূর্ণ করিব সে বাধা বিঘ্ন অসীমের জয় রথে।

তবে এস সাথী, ভেসে চ'লে যাই, জীবনের ঘাটে ঘাটে,
লভিব বিরাম, শ্রান্ত জীবনে, অতীত স্মৃতির বাটে,
অস্তরবির অসীম গগন পাটে।
চলার পথের যাত্রী দু'জনে,
টলিব না কোন মেঘ গর্জ্জনে,
থেমে যাব সেই অতি নির্জ্জনে, পথের প্রান্তে মোরা;
অসীম-মিলনে, হ'য়ে যাবে শেষ, জীবনের পথে ঘোরা।

অসতী ও দায়াধিকার

শ্রীনারায়ণ রায় এম-এ, বি-এল

পরলোকগতের আত্মার সংগতির সহিত হিন্দুর দায়াধিকারের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান। যে ব্যক্তির দ্বারা মৃতের আত্মার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পারলৌকিক মঙ্গলসাধন হয় তিনিই তাহার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী। এইরূপ ব্যক্তি সংখ্যায় এক না হইয়া বহু হইলে সম্পত্তি তাঁহাদিগের মধ্যে বিভক্ত হয়। (অবশ্য এইরূপ বিভক্ত হওয়ার সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম আছে যথা—যে পরিবারে মাত্র একজনের উপরই দায়াধিকার বর্ত্তাইবার চিরাচরিত প্রথা রহিয়াছে বা যে সম্পত্তি বিভক্ত হইবার নহে সেইরূপ সম্পত্তি সম্বন্ধে এই নিয়ম প্রয়োগযোগ্য নহে।)

বঙ্গদেশীয় হিন্দুগণের মধ্যে মৃতের সম্পত্তির উত্তরাধিকার নির্ণয় পিণ্ড-সিদ্ধান্তের সাহায্যে হয়। সপিণ্ডগণের দাবী সর্ব্বাগ্রে, সাকুল্যগণ তৎপরবর্ত্তী, সকলের শেষে সমানোদক।

পিণ্ড-সিদ্ধান্ত অনুসারে সপিণ্ডগণের মধ্যে পুত্রই সর্ব্বোত্তম। পুত্রের অভাবে পৌত্র ও তদভাবে প্রপৌত্র। পুত্র, পৌত্র ও প্রপৌত্রের পর আসেন মৃতের বিধবা (বর্ত্তমানে ইহার পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে), তাঁহার পরে কন্যা। কন্যার পরে ভাগিনেয় ও ভাগিনেয়ের পর মাতা।

দায়াধিকার ব্যাপারে স্ত্রীলোকের দাবী খুব প্রাচীনকাল হইতে চলিতেছে বলিয়া মনে হয় না। বর্ত্তমান আইন স্ত্রীলোকের অধিকার সুদৃঢ় করিয়াছে (১)। পূর্ব্বেই বলিয়াছি পারলৌকিক মঙ্গল সাধনের ক্ষমতার উপর উত্তরাধিকারত্ব নির্ভর করে; সেই কারণে মৃতের সম্পত্তি কোন স্ত্রীলোক পাইবার পূর্ব্বে দেখিতে হয় সেই স্ত্রীলোক সাধ্বী কি না। অসতী স্ত্রীলোক সমাজের চক্ষে মৃতস্বরূপ। শাস্ত্রে অসতী স্ত্রীলোককে বর্জ্জন করিবার ব্যবস্থা আছে। অবশ্য অসতীত্বের আবার শ্রেণীনির্ণয় করাও আছে। লঘু অপরাধে যেন গুরুদণ্ড না হয় সেরূপ নির্দ্দেশও আছে। অসতী নারী মৃতের পারলৌকিক মঙ্গল সাধন করিতে পারে না এই কারণে মৃত ব্যক্তির স্ত্রী অসতী হইলে সেই নারী তাহার স্বামীর বিষয় সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত হয় (২)। তবে স্বামী যদি তাহাকে ক্ষমা করিয়া থাকেন তাহা হইলে ঐরূপ স্ত্রী সম্পত্তি পাইতে পারেন (৩)। পূর্ব্বে ধারণা ছিল মাত্র স্ত্রীর সম্বন্ধেই সতী কিম্বা অসতী এই বিবেচনার প্রয়োজন হয় কিন্তু সে ধারণা ভ্রমাত্মক। বিচারপতি আশুতোষ মুখার্জ্জী মহাশয় ত্রৈলক্য নাথ বনাম রাধাসুন্দরীর (৪) মামলায় বলিয়াছেন অসতী মা পুত্রের বিষয়ের উত্তরাধিকারী হইতে পারে না। ঐ মামলার রায়দানকালে বিচারপতি ব্যানার্জ্জী রামানন্দ বনাম রাইকিশোরী (৫) মামলায় যে রায় দিয়াছেন তাহার পৃষ্ঠপোষকতা করিয়া বলিয়াছেন যে দায়ভাগ অনুসারে কন্যা অসতী হইলেও সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী হইতে পারে—এই যে ধারণা তাহা শেষোক্ত মকদ্দমায়, ঠিক নহে ইহাই নির্দ্ধারিত হইয়াছে। স্ত্রীলোকের উত্তরাধিকারীত্ব জীবন-স্বত্ব মাত্র। দেখাই যাইতেছে যে প্রত্যেক স্ত্রীলোকের উত্তরাধিকারীত্ব ব্যাপারেই তাহার চরিত্র কিরূপ তাহা দেখিবার প্রয়োজন রহিয়াছে। অসতী স্ত্রীলোক মৃতের বিষয় সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইতে পারে না এবং এই নিয়ম মাত্র মৃতের বিধবা সম্বন্ধে প্রয়োগযোগ্য নহে, তাহার মাতা ও কন্যার পক্ষেও প্রযোজ্য। ইহার কারণও পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে—অসতী স্ত্রীলোক মৃতের পারলৌকিক মঙ্গল সাধন করিতে পারে না।

বিধবা-বিবাহ ভাল কিম্বা মন্দ তাহা তর্কের বিষয়, তবে একথা ঠিক যে, বর্ত্তমানে হিন্দুদিগের মধ্যে বিধবা-বিবাহ প্রচলিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। আইন বিধবা-বিবাহকারীকে নিজ পক্ষপুটে আশ্রয় দিয়াছে (৬)। বিধবা-বিবাহকারীকে সমাজচ্যুত করিবার পক্ষে উক্ত আইনই অন্তরায়। কিন্তু পত্যন্তরগ্রহণ করিলে সেই স্ত্রীর তাহার পূর্ব্বস্বামীর পারলৌকিক ক্রিয়ার অধিকার থাকে না এই বিবেচনায় উক্ত আইনে বলা হইয়াছে পত্যন্তরগ্রহণকারী স্ত্রী স্বামীর নিকট হইতে যে সম্পত্তি নিব্যূঢ়স্বত্বে পায় নাই অর্থাৎ যে সম্পত্তিতে তাহার অধিকার বিশেষভাবে সীমাবদ্ধ, পরলোকগত স্বামী যদি স্পষ্টভাবে তাহাকে পত্যন্তর গ্রহণ করিবার অনুমতি না দিয়া থাকেন, সেইরূপ সম্পত্তির অধিকার হইতে সে বঞ্চিত হইবে (৭)।

মাতা বা কন্যা সম্বন্ধে কিন্তু ইহা বলা চলে না, মাতা বা কন্যা পত্যন্তর-গ্রহণ করিলে পুত্র বা পিতার পারলৌকিক ক্রিয়ায় কোন ব্যাঘাত জন্মে না সুতরাং মাতা বা কন্যা পত্যন্তর গ্রহণ করিলেও পুত্র বা পিতার সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী হইতে পারে। ভারতীয় হাইকোর্ট সমূহে ইহার নজীর রহিয়াছে। বহু মামলায় মহামান্য হাইকোর্টসমূহ রায় দিয়াছেন যে, পত্যন্তর-গ্রহণকারী মাতা প্রথম স্বামীর ঔরসজাত পুত্রের উত্তরাধিকারী হইতে পারে (৮)।

আকোরা বনাম বোরিয়াণি মামলায় দেখা যায় যে, একটি হিন্দু, বিধবা স্ত্রী, নাবালক পুত্র ও কন্যা রাখিয়া মারা যায়। তাহার সম্পত্তি তাহার পুত্রে বর্ত্তাইবার পর উক্ত বিধবা পত্যন্তর গ্রহণ করে। পরে তাহার পুত্র মারা যায় ও তাহার (পুত্রের) সৎ-ভ্রাতা সেই সম্পত্তি দখল করে। উক্ত পত্যন্তরগ্রহণকারী স্ত্রীলোক ইহাতে মামলা রুজু করেন ও বিচারালয়ে তিনিই পুত্রের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী সাব্যস্ত হন।

কিন্তু হিন্দু বিধবা পুত্রের সম্পত্তি পাইবার পর পত্যন্তর গ্রহণ করিলে সেই সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত হইবে (৯)।

অবস্থাটা তাহা হইলে দাঁড়াইতেছে এই যে, হিন্দু বিধবা অসতী হইলে

---

(১) Hindu Women's Right to Property Act.

(২), (৩) রাণী দাস্তা বনাম গোলাপী ৩৪ ক্যালকাটা উইকলী নোটস্ ৬৪৮

(৪) ৩০ সি, এল, জে ২৩৫

(৫) (১৮৯৪) আই, এল, আর ২২ ক্যালকাটা ৩৪৭

(৬) Remarriage of Hindu Widows Act

(৭) All rights and interests which any widow may have in her deceased husband's property by way of maintenance or by inheritance to her husband or to his lineal successors, or by virtue of any will or testamentary disposition conferring upon her, without express permission to remarry; only a limited interest in such property, with no power of alienating the same, shall upon her remarriage cease and determine as if she had then died; and the next heirs of her deceased husband, or other persons entitled to the property on her death, shall thereupon succeed to the same. (Section 2)

(৮) আকোরা সুথ বনাম বোরিয়াণী ১১ ডব্লিউ, আর ৮২ = ২বি, এল, আর ১৯৯

ফকিরাপ্পা বনাম রাঘব কোম বাসাপ্পা ২৯ বম্বে ৯১

হরকিশোর শীল বনাম ঠাকুরধন বৈষ্ণব ২৬ ক্যালকাটা উইকলী নোটস্ ৯২৫

মিঃ পলটী বনাম নির্ধন গোপ ১৯২৪ পাটনা ২৩৩

(৯) ২২ বম্বে ৩২১ ফুল বেঞ্চ

সম্পত্তির উত্তরাধিকারীত্ব পাইবে না বা পাইবার পর পত্যন্তর গ্রহণ করিলে উক্তরূপে প্রাপ্ত সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত হইবে। কিন্তু প্রশ্ন হইতেছে এই যে, হিন্দু বিধবা যদি ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিয়া পত্যন্তর গ্রহণ করে তাহা হইলে কি হইবে? Caste Disabilities Removal Act (১০) অনুসারে ধর্ম্মান্তর গ্রহণের ফলে সম্পত্তির অধিকার নষ্ট হয় না। কিন্তু ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিয়া পত্যন্তর গ্রহণ করিলে উক্তরূপ উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত হইতে হয় (১১)। এলাহাবাদ হাইকোর্ট কিন্তু ভিন্নমত পোষণ করেন। আবদুল আজিজ বনাম নির্মা (১২) মামলায় উক্ত হাইকোর্ট রায় দিয়াছেন যে, হিন্দু বিধবা মুসলমান হইয়া মুসলমান বিবাহ করিলে হিন্দু স্বামীর সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত হইবে না। কারণ স্বরূপ বলা হইয়াছে যে যেহেতু সে পত্যন্তর গ্রহণকালে হিন্দু বিধবা নহে সেই হেতু সে Hindu Widows Remarriage Act-এর আমলে আসে না।

আমরা দেখিয়াছি সম্পত্তি পাইবার পূর্ব্বে অসতী হইয়া থাকিলে সেই-রূপ স্ত্রীলোক স্বামী পুত্র বা পিতার সম্পত্তি পাইতে পারে না। কিন্তু সম্পত্তি পাইবার পর যদি উহাদিগের চরিত্রদোষ জন্মে তাহা হইলে কি হইবে? নজীর বলে উত্তর-অসতীত্ব পূর্ব্বপ্রাপ্ত সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত করিতে পারে না ("Subsequent unchastity won't divest which is already vested in her") মণিরাম বনাম কেরী কোলিতানী (১৩)—এই মকদ্দমায় (unchastity case) এই প্রশ্ন মীমাংসিত হইয়াছে। শাস্ত্রের প্রমাণ উভয় পক্ষই তুলিয়াছিলেন সন্দেহ নাই। বিচারপতিগণের মধ্যে সংখ্যাগুরুগণ যে রায় দিয়াছেন তাহার সহিত উক্ত মামলার অন্যতম বিচারপতি মিত্রমহাশয়ের মতভেদ ঘটিয়াছিল কিন্তু উহা সংখ্যাল্পের মত বলিয়া টিকে নাই। তবে মিত্র মহাশয় যে প্রশ্ন তুলিয়াছিলেন তাহার প্রতি আমাদিগের দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন (১৪)।

অসতী নারী সম্পত্তি পাইবে না বা সম্পত্তি পাইয়া পত্যন্তর গ্রহণ করিলে সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত হইবে—ভাল কথা ইহার অর্থ আমরা বুঝিতে পারি কিন্তু যে স্থলে পত্যন্তর গ্রহণ করিলে প্রাপ্ত সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত হইতে হয় সে স্থলে অসতী নারীই বা কেন সমসূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তি ভোগ করিবার অধিকার পাইবে? অসতী নারী সম্পত্তি হইতে পায় না কেন? ইহার উত্তরস্বরূপ বলা হয় যে অসতী নারী মৃতের পারলৌকিক মঙ্গলসাধন করিবার জন্য যে ক্রিয়া তাহা করিবার অধিকারী নহে সেই কারণে সে মৃতের সম্পত্তি পাইতে পারে না কেননা হিন্দুধর্ম্মে দায়াধিকার নির্ণয়ের মূলে রহিয়াছে ঐরূপ ক্রিয়া যথা শ্রাদ্ধাদি করিবার অধিকারত্ব। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি—সম্পত্তি পাইবার পূর্ব্বে অসতী হইলে যদি ঐ ক্ষমতা বিলুপ্ত হয় তাহা হইলে সম্পত্তি পাইবার পর অসতী হইলে কি ঐ ক্ষমতা লুপ্ত না হইবার কোন কারণ আছে? যে সমাজ, যে ধর্ম্ম অবৈধ প্রণয়ের ফলে কোন স্ত্রীলোকের গর্ভসঞ্চার হইলে সেইরূপ স্ত্রীলোকের পররাজ্যে নির্ব্বাসনের ব্যবস্থা দেন (১৫) সেই ধর্ম্মে সেই সমাজে কি করিয়া উত্তর-অসতী পূর্ব্বপ্রাপ্ত সম্পত্তি ভোগের অধিকার পাইতে পারে? আমাদের মনে হয় মণিরাম বনাম কেরী কোলিতানী মামলায় উক্ত প্রশ্ন চূড়ান্তভাবে নিষ্পত্তি হয় নাই।

পত্যন্তর গ্রহণ করিলে যদি প্রাপ্ত সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত হইতে হয় তাহা হইলে অসতী হইলেই বা উহা হইবেনা কেন? আইন বলিতেছে যে পত্যন্তর গ্রহণে স্বামীর স্পষ্ট অনুমতি না থাকিলে স্বামীর সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত হইতে হইবে। স্বামী পত্যন্তর গ্রহণে সম্মতি না দেওয়া স্বত্বেও পত্যন্তর গ্রহণ করিলে যদি অধিকার নষ্ট হয় ত' স্বামীর স্পষ্ট সম্মতি ব্যতিরেকে অসতী হইলেই বা ঐ অধিকার নষ্ট হইবেনা কেন? তবে কি বুঝিব যে আইন ধরিয়া লইয়াছে যে পত্যন্তর গ্রহণে স্বামীর সম্মতি না থাকিলেও অসতীত্বে স্বামীর সম্মতি থাকিবে অথবা পত্যন্তর গ্রহণে স্বামীর সম্মতি আবশ্যক হইলেও অসতী হইতে হইলে সে সম্মতির কোন প্রয়োজন হয়না অথবা ইহাই কি ধরিয়া লইব যে আইন মনে করে বরং অসতী হওয়া ভাল তবু পত্যন্তর গ্রহণ করা ভাল নয়?

হিন্দু বিধবা-বিবাহ হিন্দু সমাজে প্রচলিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে (বিশেষ বিশেষ শ্রেণীর মধ্যে অবশ্য বিধবা-বিবাহ চিরকালই রহিয়াছে ও সেই সকল শ্রেণীর মধ্যে বিধবা বিবাহকালে সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত হইবার প্রশ্নও উঠেনা (১৬)।) আইন এইরূপ বিবাহকে স্বীকার করিয়াও লইয়াছে অথচ হিন্দু বিধবা শত সহস্র অনাচার করিয়াও যে সম্পত্তি রাখিতে পাইবে, সৎপথে থাকিয়া পত্যন্তর গ্রহণ করিলে তাহা পারিবেনা—ইহা অপেক্ষা অসামঞ্জস্য আর কি হইতে পারে? শ্রাদ্ধাদি করিবার অধিকার লোপের ফলে যদি সম্পত্তির অধিকার নষ্ট হয় তাহা হইলে সম্পত্তি পাইবার পূর্ব্বে অসতী হইলে যেমন সম্পত্তির অধিকার নষ্ট হয় এবং পত্যন্তর গ্রহণ করিলেও যেরূপ হইয়া থাকে পরবর্ত্তীকালে অসতী হইলেও তদ্রূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করাই কর্ত্তব্য; সেই সঙ্গে এলাহা-বাদ হাইকোর্টের সিদ্ধান্তও অসমর্থন যোগ্য।

হিন্দু বিধবা পত্যন্তর গ্রহণ করিলে যে সম্পত্তি হারাইবে—পত্যন্তর গ্রহণ না করিয়া হিন্দু থাকিয়া বেশ্যাবৃত্তি করিলে বা এলাহাবাদ হাইকোর্টের বিচার অনুযায়ী মুসলমান হইয়া পরে পত্যন্তর গ্রহণ করিলে সেই সম্পত্তি করতলগত করিয়া রাখিতে সক্ষম (১৭) হইবে—যেন হিন্দু বিধবার পত্যন্তর গ্রহণ অপেক্ষা তাহার বেশ্যাবৃত্তি বা ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিয়া পত্যন্তর গ্রহণ প্রশংসনীয় ব্যাপার!

(১০) উক্ত আইনের সারমর্ম্ম:—এই আইনের দ্বারা ধর্ম্ম পরিবর্ত্তনের বা জাতিপাতের ফলে যে সকল আইনের বা প্রচলিত রীতির জন্য কোন অধিকার লুপ্ত বা আংশিক নষ্ট হয় তাহার প্রয়োগ বন্ধ হইল।

(১১) মাতঙ্গিনী গুপ্ত বনাম রামরতন রায় ১৯ ক্যালকাটা ২৮৯ ফুল বেঞ্চ। বিত্ত বনাম ছাতকণ্ডু ৪১ ম্যাড্রাস ১০৭৮ ফুল বেঞ্চ

(১২) ৩৫ এলাহাবাদ ৪৬৬

(১৩) ৫ ক্যালকাটা ৭৭৬

(১৪) মণিরাম বনাম কেরী কোলিতানী ১৩ বেঙ্গল ল রিপোর্ট ১

(১৫) পরাশর রচিত শ্লোকের (১০।১০) বঙ্গানুবাদ:—স্বামী নিরুদ্দিষ্ট বা মৃত হইলে জারের দ্বারা যে স্ত্রীলোকের গর্ভসঞ্চার হয় সেই অসতী ও পাপচারিণী স্ত্রীলোককে পররাজ্যে নির্ব্বাসন দিবে।

(১৬) রঞ্জনী বনাম রাধারাণী ২০ এলাহাবাদ ৪৭৬
নীহালি বনাম কন্দক সিং ২৫ আই, সি পাটনা ৬১৭

(১৭) ইহা যুক্তপ্রদেশবাসী হিন্দুগণের সম্বন্ধে মাত্র।

এই যুদ্ধ

প্রবোধকুমার সান্যাল

ধলভূমের যে পাকা রাস্তাটা রঁাচীর দিকে এঁকে বেঁকে চ'লে গেছে, তারই একান্তে বিপিনবাবুর বাংলাটা অনেক দূর থেকে দেখা যায়। সেই বাংলার বারান্দায় একদিন সকালের দিকে ব'সে ব'সে বিপিনবাবু সংবাদপত্র পড়ছিলেন। অদূরে একটি বছর দুয়েকের ছোট ছেলে গোটা দুই কাঠের খেলনা নিয়ে তখন খেলায় মত্ত। নতুন বসন্তকালের সকাল, বারান্দায় রোদ এসে পড়েছে।

এমন সময় একখানা মোটর তাঁর বাগানের গেট পেরিয়ে ভিতরে এসে ঢুকলো। গাড়ী থেকে একটি যুবক নেমে সোজা সিঁড়ি বেয়ে উঠে এসে তাঁর সামনে দাঁড়ালো।

চশমাটা খুলে মুখ তুলে বিপিনবাবু বললেন, কা'কে চান্?

এখানে মিস চৌধুরী থাকেন?

মিস চৌধুরী!—বিপিনবাবু একটু বিস্মিত হয়ে বললেন, কই, মিস চৌধুরী ব'লে ত কেউ এখানে নেই?

যুবকটি প্রশ্ন করলো, এ বাড়ীর মালিকের নাম কি বিপিন রায়?

হ্যাঁ, আমিই বটে।

হাতের কাছে একখানা চেয়ার টেনে নিয়ে যুবকটি নিজেই বসলো। পরণে তার সস্তা সাহেবী পোষাক। ওল্টানো হাফ শার্টে নেকটাই নেই, শার্ট-প্যাণ্ট্ দুটোই ময়লা আর দাগ লাগা। মাথায় এলোমেলো রুক্ষ চুল, দাড়ি-কামানো নয়, মুখে একমুখ পান—এবং সেই পানের রসের ছিটে জামায় একটু আধটু লেগে রয়েছে।

বিপিনবাবুর মুখের দিকে চেয়ে একটু হেসে সে বললে, তাহলে আর দয়া ক'রে দেরী করবেন না, আমাকে তাড়াতাড়ি ফিরতে হবে। একটু ডেকে দিন্।

বিপিনবাবু বললেন, কী বলছেন আপনি?

ছোকরা বললে, আপনি যদি বিপিন রায় হন্, তবে মিস চৌধুরী নিশ্চয়ই এখানে থাকেন। দয়া ক'রে ডেকে দিন্, বলুন যে রঞ্জিত সেন এসেছে, দেখা করতে চায়।

বিপিনবাবু তবুও তা'র মুখের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে আছেন দেখে রঞ্জিত নামক ব্যক্তিটি পুনরায় বললে—ও, আপনি এখনো বুঝতে পারেননি দেখছি। আপনারই বাড়ীর ভাড়াটে তিনি, অথচ তাঁর নাম জানেন না?—আরে, ওই যে ছেলেটা রয়েছে দেখছি! তবে ত ঠিকই হয়েছে! ওটি আমারই ছেলে, বুঝলেন মিষ্টার রয়? এবার দয়া ক'রে উঠুন, একবার ডেকে দিন্ মিস চৌধুরীকে। মানে—বনশ্রী, বনশ্রী দেবী—বুঝতে পেরেছেন?

হ্যাঁ, পেরেছি—ব'লে বিশিষ্ট ভদ্রলোক এবং নিরীহ ব্যক্তি বিপিনবাবু চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। ছোট ছেলেটি ছুটে এসে ভয়ে ভয়ে তাঁর গা ধ'রে দাঁড়ালো। বললে, তাতা, নাও।

বিপিনবাবু ছেলেটিকে কাঁধে তুলে নিয়ে বললেন, ছেলেটি কা'র বললেন?

রঞ্জিত বললে, আমার, মানে আমিই ওর বাবা—থাক্—থাক্—এই যে এসেছেন উনি, আপনাকে আর ডাকতে হবেনা, মিষ্টার রয়! এসেছেন!

বছর পঁচিশ ছাব্বিশ বছরের একটি মহিলা হাতে বই-খাতা নিয়ে বেরোচ্ছিলেন, সহসা রঞ্জিতকে দেখে মাঝপথে তিনি থমকে দাঁড়ালেন। অত্যন্ত বিবর্ণ ভীত মুখে একবার বিপিনবাবুকে লক্ষ্য ক'রে এদিকে ফিরে তিনি বললেন, আপনি? আপনি কখন্ এলেন? আবার কেন এসেছেন?

ব্যাপারটা কেবল বিস্ময়করই নয়, একেবারে নাটকীয়ও বটে। ঠিক এই প্রকার দৃশ্যের অবতারণা ঘটলে নিরীহ ও নৈতিক বুদ্ধি-সম্পন্ন বিপিনবাবুর মতো লোকের কিরূপ মনের অবস্থা হয় সেটি প্রণিধানযোগ্য। আর কিছু নয়, মিস চৌধুরী শব্দ দুটি শুনে কেবল তাঁর কোলের ছেলেটা যেন সহসা তাঁর হাতের মধ্যে অগ্নিকুণ্ডের মতো অসহ্য উত্তাপময় এবং গুরুভার বোঝার ন্যায় মনে হোলো। সমস্ত দৃশ্যটার কদর্য চেহারাটা এক মুহূর্তে দেখতে পেয়ে তিনি প্রায় কাঁপতে কাঁপতে অন্যদিকে চ'লে গেলেন।

বনশ্রী কম্পিত কণ্ঠে বললে, এখানে এলেন কেন আপনি?

নির্লজ্জের মতো রঞ্জিত হাসলে। বললে, পরের ছেলে নিয়ে কেমন ঘরকন্না করছ দেখতে এলুম। ছ'মাস পরে তোমাকে আজ আবিষ্কার করলুম। খবর পেয়েছি, এখানকার ইস্কুলে তুমি চাকরি নিয়েছ।

আপনি কি আমাকে নিশ্চিন্ত হয়ে কোথাও থাকতে দেবেন না?

নিশ্চয় দেবো। আমি ত' তোমার শান্তি নষ্ট করতে আসিনি?

তবে কেন এলেন? কী মতলব নিয়ে?

রঞ্জিত আবার হাসলে। বললে, ভারি অকৃতজ্ঞ তুমি! ছেলেটাকে তোমার কাছে রেখে কতখানি উপকার করেছি, একবারও বললে না। তার একটা প্রতিদান নেই?

বনশ্রী বললে, আমার অপেক্ষা করার সময় নেই, এখুনি বেরোতে হবে। আপনি যে-কারণে এসেছেন, সে আমার পক্ষে আর সম্ভব নয়।

ও-কথা বলতে নেই, বনশ্রী, পাপ হয়। মোটর ভাড়া ক'রে এসেছি ত্রিশ মাইল দূর থেকে। আমার নিজেরও হাতে কিছু নেই, টাকা আমার চাই-ই চাই।

উত্তেজনায় এতক্ষণে বনশ্রীর মুখখানা রক্তাভ হয়ে এলো। বললে, আপনি মিছিমিছি এখানে হাঙ্গাম করবেন না, এটা পরের বাড়ী। এখানে আপনার ব'সে থাকবারও দরকার নেই। আপনি যান্। আমার মান-সম্ভ্রম নষ্ট করবেন না।

বনশ্রী হ'পা বাড়ালো বটে, কিন্তু বিদায় নেবার কোনো লক্ষণ রঞ্জিতের দেখা গেল না। বরং পকেট থেকে একটা সিগারেট বা'র ক'রে সে ধরালো। আরাম ক'রে বসলো গা এলিয়ে।

দিব্যি সেজেছ দেখছি। দামী শাড়ী, দামী জুতো, হাতে চিকচিকে সোণার চুড়িও উঠেছে—শরীরটাও সেরেছে দেখছি। লোভ একটু হয় বৈ কি—

বনশ্রী বিপন্নভাবে এদিক ওদিক তাকালে। বললে, নোংরামি করবেন না, এটা অসভ্যতার জায়গা নয়।

রঞ্জিত বললে, বেশ যা হোক, আমার ওপরেও মাষ্টারি! বাস্তবিক কী নিষ্ঠুর তুমি! ছ'মাস বাদে খুঁজে বা'র করলুম, একটা মিষ্টি কথাও বললে না?

বনশ্রী হঠাৎ চলে যাচ্ছিল, কিন্তু চেয়ার থেকে ঝুঁকে শিকারীর মতো রঞ্জিত খপ ক'রে তা'র ঠাণ্ডা হাতখানা ধ'রে ফেললে। বললে, টাকা কিছু আমার চাই, বনশ্রী। পালাতে তোমাকে দেবো না।

হাত ছাড়ুন বলছি। টাকা আমি দেবো না। আপনার জন্যে আমি সর্বস্বান্ত হয়েছিলুম, আমাকে পথের ভিখিরী করেছিলেন। হাত ছেড়ে দিন্।—ব'লে একটা ঝটকা দিয়ে বনশ্রী তা'র হাতখানা ছাড়িয়ে নিল।

রঞ্জিত হাসিমুখে বললে, এখানকার জল-হাওয়া সত্যিই ভালো, গায়ে তোমার বেশ জোর হয়েছে!

দ্রুত নিশ্বাসের দোলায় দুলে বনশ্রী বললে, জোর আমার বরাবরই ছিল, অন্যায় আমি কোনোদিন করিনি, মনে রাখবেন।

কিন্তু সেকথা কেউ বিশ্বাস করবে না, মনে রেখো। সাত বছর হোলো তোমার সঙ্গে আমার আলাপ। মেয়েদের কলঙ্ক রটনার পক্ষে এই যথেষ্ট। মনে রেখো, দুর্নাম রটলে তোমার ইস্কুলের চাকরিটিও থাকবেনা, বনশ্রী।

আপনি এদেশ থেকে এখনই চ'লে যান্!

যাবো ব'লেই ত' এসেছি, কেবল কিছু টাকা নিয়ে যাবো।

কঠিন মুখে বনশ্রী বললে, বিপিনবাবুকে ব'লে যদি এখানকার মালীদের এখুনি ডাকি, তাহলে কিন্তু আপনার মান থাকবেনা!

রঞ্জিত বললে, তা'রা অপমান করবে আমাকে, এই ত? কিন্তু আমি যদি বলি তুমি বিবাহিত নও, তবে ছেলের কী পরিচয় দেবে? কলঙ্ক রটবেনা, বলতে চাও?

বনশ্রী উত্তেজিত হয়ে বললে, আমি আগে থেকেই আপনার সব রকম শত্রুতার প্রতিকার ক'রে রেখেছি, মনে রাখবেন।

ও, তাই নাকি?—রঞ্জিতের চতুর দুটো চোখ যেন কথাটা শুনে পলকের জন্য একটু নিষ্প্রভ হয়ে এলো। বললে, তাহ'লে টাকা তুমি দেবেনা, বলতে চাও?

না, টাকা আমার নেই।

রঞ্জিত বললে, একদিন তোমাকে বিয়ে করব, এই স্থির ছিল। মনে পড়ে?

ঘৃণাকুঞ্চিত দৃষ্টিতে তা'র দিকে তাকিয়ে বনশ্রী বললে, বাবার দরুণ ব্যাঙ্কে মোটা টাকা ছিল, তারই লোভে আপনি আমার পায়ে ধরেছিলেন, মনে পড়ছেনা?—যাক্, আপনি যাবেন কিনা বলুন?

সংশয়াচ্ছন্ন দৃষ্টিতে রঞ্জিত বললে, তাহলে বলতে চাও, তুমি একটুও ভালোবাসোনি সেদিন আমাকে?

কঠিন কণ্ঠে বনশ্রী বললে, আপনার পরিচয় জেনে আমার সব ভুল ভাঙলো। আপনি অন্যত্র বিয়ে করেছেন, আমি বেঁচে গেলুম।

কিন্তু ভালোবাসাটা?

বনশ্রীর ঘৃণা আকণ্ঠ হয়ে এলো। বললে, ভালোবাসা! জানোয়ারের সঙ্গে মানুষের? চেয়ারটা ছেড়ে চ'লে যান্, ওটা আমি চাকরকে দিয়ে ধুইয়ে দেবো।

বাতাসটা আজ নিতান্তই প্রতিকূল। হাসিমুখে নিশ্বাস ফেলে রঞ্জিত উঠে দাঁড়ালো। বললে, আচ্ছা, এখন আমি যাচ্ছি। কিন্তু ছেলেটাকে একবার আনলে না, দেখে যেতুম!

না, ছেলে যারই হোক, সে এখানে আসবে না। আমি চললুম।—ব'লে বনশ্রী মুখ ফিরিয়ে দ্রুতপদে অন্দর মহলের দিকে চ'লে গেল।

রঞ্জিত ভ্রূকুঞ্চিত কৌতুকে একবার সেদিকে তাকিয়ে নেমে এসে মোটরে উঠলো।

স্কুলে সেদিন বনশ্রী গিয়েছিল, কিন্তু আতঙ্কময় অবসাদে তা'র মন যেন আচ্ছন্ন। ঘণ্টা দুই পরে মাথা ধরার অজুহাতে ছুটি নিয়ে স্কুল থেকে সে বেরিয়ে পড়লো। পথ নিরিবিলি, বিস্তৃত, জনবসতিশূন্য। পথে লোক নেই। কিন্তু অনেক লোক যদি থাকতো, যদি অসংখ্য অগণ্যের জনতায় তা'র সম্মুখে ওই প্রান্তর-পথ ভ'রে উঠতো, তবে সেই ভীড়ে আত্মগোপন করার সুবিধা হোতো। ভীরু পদক্ষেপে বনশ্রী তার বাসার দিকে চলতে লাগলো। তা'র পা কাঁপছে, মন কাঁপছে। বর্বরের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে একদিন সে পালিয়ে এসেছিল এই দেশে, এখানে স্বাধীন ও স্বচ্ছন্দভাবে সে বাস করবে, দোহন-শোষণ-প্রলোভনের অতীত জীবন ছিল তা'র কাম্য।

আশ্চর্য হয়ে বনশ্রী ভাবলে, ওই লোকটার প্রতি একদিন তা'র ভালোবাসা ছিল! বাঙ্গালীর ঘরে স্বভাব-দৌর্বল্য নিয়ে তা'র জন্ম, পুরুষের জাত-বিচার করবার সংশিক্ষা তা'র ছিল না। তাদের পরিবারে সমৃদ্ধি ছিল, কিন্তু অভিভাবকশূন্য সেই পরিবারে বিশৃঙ্খলা ছিল অনেক বেশী। সুতরাং বায়ু যেখানে শূন্য, সেইখানেই ঝড়ের আবির্ভাব। রঞ্জিত তাদের মাঝখানে হঠাৎ একদিন এসে দাঁড়ালো রঙীণ প্রজাপতির মতো। উনিশ কুড়ি বছরের মেয়ের মন সস্নেহ কৃতজ্ঞতা আর সুখস্বপ্নে ভ'রে উঠবে, সে আর বিচিত্র কি? সে প্রায় আট বছরের কথা হোলো।

কিন্তু অভিভাবকের আসনে রঞ্জিত এসে বসেছিল যে আপন স্বার্থে, একথা কি কেউ কল্পনা করেছিল? তা'র সঙ্গে এসেছিল আলো, এসেছিল স্বচ্ছন্দ মুক্তির বাতাস, এসেছিল বাহিরের আনন্দময় কল্পনা—কুমারী হৃদয়ের পক্ষে তা'র সত্য উপলব্ধি কিছু ছিল বৈ কি। তাদের পরিবার ছিল প্রাচীনপন্থী, সংরক্ষণশীল, সংস্কার বুদ্ধির জীর্ণতায় তাদের পারিবারিক স্বভাব ছিল আচ্ছন্ন। রঞ্জিত এসে দাঁড়িয়েছিল একটা মহাপ্লাবনের মতো, দূর সমুদ্রের থেকে উৎক্ষিপ্ত হয়ে আসা একটা প্রকাণ্ড তরঙ্গের

মতো। সহজেই সকলে তা'কে স্বীকার ক'রে নিল, সমাদর করলে, শ্রদ্ধার আসনে বসালে এবং স্তবস্তুতিতে ভ'রে দিল তা'র আনাগোনার পথ। তা'র পারিবারিক ঐশ্বর্যের সঙ্গে যে জড়তা, অন্ধতা এবং অকর্মণ্যতা মিশানো ছিল, রঞ্জিত এসে অনেকটা যেন সেই অন্ধকূপ থেকে তাকে তুলে আনলে বাহিরের আলো বাতাসে।

কিন্তু তা'র আয়ুষ্কাল কতটুকু? বনশ্রী চলতে চলতে ভাবলে, ওর হৃদয় জয় করার শক্তির পিছনে যে-সর্বনাশা স্বার্থপরতা, যে-নীচাশয়তা, যে-শোষণপ্রকৃতি আত্মগোপন ক'রে ছিল, সেই কথাটা জানতে গিয়ে তাদের অনেক গেছে। সামুদ্রিক প্রাণীবিশেষ তা'র বহুসংখ্যক বাহু প্রসারিত ক'রে যেমন অপর এক প্রাণীর রক্ত দোহন করে, তেমনি রঞ্জিতের লোভাতুর প্রকৃতি এই পরিবারের মর্মে মর্মে বহু শাখাপ্রশাখা বিস্তার ক'রে সমস্ত জীবনীরস শোষণ করতে লাগলো। দুর্ভাগ্য সে, সন্দেহ নেই। নিজেকে অশ্রদ্ধেয় অনাদৃত ক'রে তুলতে তা'র প্রয়াসের অন্ত ছিল না। অনাচারে, আত্ম-অপমানে নিজেকেই সে ভরিয়ে তুললো সকলের চক্ষে। বনশ্রী আপন হৃদয়কে সরিয়ে আনলো রঞ্জিতের কক্ষপথ থেকে। সেই বেদনাময় ব্যর্থতার কাহিনী মনে করলে আজো তা'র চোখে জল আসে।

বাসায় এসে পৌঁছে বনশ্রী সটান তা'র বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়লো। একটা অস্বস্তিকর আশঙ্কা নিয়ে ঘণ্টা দুই সে চোখ বুজে প'ড়ে রইলো। আজ আবার সত্যিই সে বিপন্ন।

দিন চারেক পরে বিকালের দিকে বিপিনবাবু তাঁ'র কাজ সেরে গাড়ী ক'রে ফিরলেন। ছোট ছেলেটি তাঁর সঙ্গে গিয়েছিল, সে ছুটতে ছুটতে এসে বনশ্রীর আঁচল ধ'রে দাঁড়ালো। বিপিনবাবু বারান্দায় উঠে এসে হাসিমুখে বললেন, তোমার হুকুম না নিয়েই আজ টুনুবাবুকে নিয়ে বেরিয়ে ছিলুম, বনোদিদি।

হাসিমুখে বনশ্রী বললে, আপনারও হুকুম না নিয়ে আমি আপনার টেবল গুছিয়ে রেখেছি।

তাই ত দেখছি। রাঙা-কৃষ্ণচূড়ার গোছা আনলে কোত্থেকে? বাঃ, এ যে মরুভূমিতে একেবারে বাগান বানিয়ে রেখেছ!—বিপিনবাবু বললেন, কিন্তু বাড়ীতে ঢোকবার আগে আমি কি ভাবছিলুম জানো?—এই ব'লে গায়ের জামাটা ছাড়বার জন্য তিনি তাঁর ঘরে গেলেন।

টুনুকে একবার কোলে নিয়ে চুম্বন ক'রে বনশ্রী তা'কে নামিয়ে দিল। টুনু ছুটলো মালীর ঘরের দিকে।

বিপিনবাবু এসে তাঁর আরাম চেয়ারে বসলেন। বনশ্রীর মনে সেদিনের ঘটনার অস্বস্তিটা তখনও সুস্পষ্ট হয়ে ছিল। সে বললে, কই দাদা, বললেন না ত', কি ভাবছিলেন?

বিপিনবাবু বললেন, বলা কি বাহুল্য নয়? এখনো কি বুঝতে পারোনি?

বনশ্রী প্রস্তুত হয়েই ছিল। কিন্তু তবুও বিপিনের কথায় তা'র মুখে রক্তাভাস দেখা দিল। সে বললে, সন্দেহের একটা খোঁচা আপনার মনে ফুটছে, তা জানি দাদা।

বিপিন সহজ গলায় বললেন, হা ভগবান, আসল কথাটাই তুমি ধরতে পারোনি, বনোদিদি। তোমার ছেলেকে বেড়িয়ে আনলুম, তা'র বদলে বক্শিস চাইছি। বলি, গান-টান কি একেবারে ভুলে গেছ?

ওঃ, এই আপনার দাবি?—ব'লে বনশ্রী হেসে উঠলো। মনের ভার যেন সহসা তার লঘু হয়ে গেল।

বিপিনবাবু বললেন, শুনেছি চল্লিশ বছর বয়স হ'লে পুরনো অভ্যাসগুলো পাকা হয়, নতুন অভ্যাসের আর দাঁড়াবার জায়গা মেলেনা। কিন্তু তুমি যে আমাকে গান শোনার অভ্যাস ধরালে, তুমি যেদিন থাকবেনা সেদিন আমি কী করবো বলো ত?

বনশ্রী কিয়ৎক্ষণ চুপ ক'রে রইলো। তারপর মুখ তুলে বললে, আমার কি মনে হচ্ছে, জানেন দাদা?

বিপিন তা'র প্রতি তাকালেন।

বনশ্রী বললে, আপনার চোখে যদি কেউ অশ্রদ্ধেয় হয়ে ওঠে, তার গলার আওয়াজ কি আপনার ভালো লাগে?

বিপিন বললেন, তুমি যে হঠাৎ আমার চোখে অশ্রদ্ধেয় হয়ে উঠেছ, কেমন ক'রে জানলে?

বনশ্রী হাসলে। বললে, আপনার না হয় চল্লিশ, কিন্তু আমারও তিরিশ হ'তে চললো দাদা। শ্রদ্ধা স্নেহ হারিয়েছি, একথা বুঝতে কি আমার দেরী হয়েছে?

আমাকে আঘাত দিতে পারো, কিন্তু অহেতুক ভুল বুঝতে পারো না, বনোদিদি।

একে আপনি অহেতুক বলেন?

নিশ্চয়! যা জানিনে, যা জানতে ইচ্ছে করিনে, তা'র সম্বন্ধে মনে সংশয় এনে তোমাকে ছোট করব কেন?

বনশ্রী বললে, আপনি করেন নি দাদা, আপনার কাছে আত্মগোপন ক'রে আমিই আপনাকে হয়ত ছোট করেছি, নিজেকে অশ্রদ্ধেয় ক'রে তুলেছি!

বিপিনবাবু বললেন, এও তোমার ভুল বনোদিদি, আমার বিচার-বুদ্ধি, আমার ধ্যান-ধারণার ওপর তোমার মতামত খাটতে ত' দেবো না। তোমার আসল রূপটি আমার কাছে সত্য, তুমি যদি কিছু গোপন ক'রে থাকো, সে তোমার পক্ষে সত্য নয়?

কিন্তু সামাজিক নীতির দিক থেকে?

অদূরে টুনু মালীদের ছেলের সঙ্গে লনের উপরে খেলা করছিল। সেইদিকে তাকিয়ে বিপিন বললেন, এই কথাটায় সেদিন আমার মন যে একটু মোহগ্রস্ত হয়নি, তা নয়। কিন্তু তোমার সব কথা যদি কখনো জানার সুযোগ হয় বনোদিদি, হয়ত সেদিন বুঝতে পারবো, সমাজনীতির চেয়ে জীবনের নীতি অনেক বড়।

মুখ ফিরিয়ে উঠে বনশ্রী বিপিনবাবুর ড্রয়িংরুমে গিয়ে ঢুকলো এবং আর কোনোদিকে না তাকিয়ে টেবল-অর্গানে গিয়ে বসলে।

দূরের মাঠে বসন্তকালের গোধূলি প্রায় ঘনিয়ে এসেছে। বিপিনবাবু শান্ত মনে বাহিরের দিকে তাকালেন। ধলভূমের রাঙা কাঁকর-পাথরের আঁকাবাঁকা পথ প্রান্তর পেরিয়ে চ'লে গেছে অদৃশ্যে। আকাশ সূর্যাস্তের মেঘে-মেঘে রঙীণ। তারই নীচে পার্বত্য ধলভূমের মাঠে পলাশের শোভা উঠেছে ফেনিয়ে।

বনশ্রীর গান ভেসে উঠলো সুরের তরঙ্গে তরঙ্গে। তার করুণ কণ্ঠস্বর যেন আহত পক্ষীর মতো এই বাংলা থেকে বেরিয়ে দূরের

প্রান্তর পেরিয়ে গোধূলি কালের কোনো প্রান্তের দিকে উড়ে চললো। বিপিনবাবু স্তব্ধ হয়ে ব'সে রইলেন।

গানের পরে বনশ্রী আবার বারান্দায় এসে বসলো। চাকর আলো দিয়ে গেল। আলো দেখে বিপিনবাবু সজাগ হয়ে তাকালেন।

বনশ্রী বললে, বকশিস পেয়ে খুশী হলেন দাদা ?

বিপিন হাসিমুখে বললেন, বকশিসে যাদের লোভ, তারা ত কোনোদিন খুশী হয়না, দিদি। কলকাতায় ফিরি-ফিরি করেও আজ একমাস হ'তে চললো। কিন্তু আমি কি ভাবছি জানো ? তোমার গানের সুর যেদিন থেকে আমার কানে উঠবেনা, সেদিন থেকে আমি হতভাগ্য।

বনশ্রীর চোখ দুটো হারিকেনের আলোয় চকচক ক'রে উঠলো। বললে, সে কি, আপনি কি এই কারণে কলকাতায় ফেরেন নি ? কই, একথা ত জানতুম না ?

ভারি আতিশয্য মনে হচ্ছে, নয় ?—বিপিনবাবু আবার হাসলেন।

নতমুখে বনশ্রী কিছুক্ষণ চুপ ক'রে রইলো। তারপর মুখ নীচু ক'রেই বললে, এমন গৌরব আমি কোথাও পাইনি, দাদা।

তা'তে তোমার কোনো ক্ষতি হয়নি, বোন।—বিপিন বললেন—গৌরব যারা তোমাকে দিতে পারলে না, তারা সকলের চক্ষেই ছোট হয়ে গেছে। অপমানে আর অপবাদে তোমার জীবনকে যারা মলিন করতে চায় সেই দস্যুদের কানে তোমার গানের মর্ম্মবাণী কোনোদিন পৌঁছয়নি! বড় হতভাগ্য তারা, বোন!

বনশ্রীর চোখ দুটি বিপিনের কথায় যেন সহসা সংশয়ে ভ'রে এলো। চেয়ারটা টেনে আর একটু কাছে স'রে গিয়ে সে কম্পিত-কণ্ঠে বললে, আপনি কি জানেন, আমি কী কষ্ট পাচ্ছি ?

বিপিনবাবু বললেন, আমি এ বাড়ীর মালিক, আর তুমি হ'লে ভাড়াটে ; তোমার কষ্ট ত' আমার জানবার কথা নয়, দিদি ?

কিন্তু আমার বিপদ ত' আপনার অজানা নেই।

হয় ত তুমি ভালো ক'রে বিচার করতে পারোনি, সেটা তোমার সত্যই বিপদ কিনা।

আপনি কি বলছেন, দাদা ?

বিপিন বললেন, এমন ত হ'তে পারে, বিপদকে তুমি ভাবের আশ্রয়ে মনে মনে লালন করছ ?

স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বনশ্রী বললে, যাক্, আপনার আগের কথায় ভয় পেয়েছিলুম, এখন বুঝেছি আপনার আসল কথাটা। বিপদকে কেউ লালন করেনা দাদা, ডেকেও আনেনা। কিন্তু লজ্জার কথা এই, একদিন সে এসেছিল আশ্রয় পাবার জন্যে, মাথা নীচু ক'রে। সেদিন তা'র চাকচিক্য দেখে মুগ্ধ হয়েছিলুম, বন্ধু ব'লে মনে করেছিলুম। সেই ভুল নিষ্ঠুরভাবে আজ ভেঙেছে।

সত্যিই কি সেই ভুল ভেঙেছে ?

সত্যিই ভেঙেছে। তা'র ছদ্মবেশ খু'লে পড়েছে। তা'র অসভ্যতা আর বর্বরতার ওপর যে রংয়ের পালিশ ছিল, সেই পালিশ উঠে গিয়ে কদাকার হয়ে দেখা দিয়েছে, দাদা।

বিপিন নিশ্বাস ফেলে বললেন, যদি সঙ্কোচ না থাকে, তোমার কথা স্পষ্ট ক'রে বলো, বনোদিদি।

বনশ্রী বললে, সঙ্কোচ আমার নেই, কারণ উৎপীড়নের হাত থেকে আমাকে বাঁচতেই হবে। আগে বুঝতে পারিনি, যত বড় সভ্যতা আর উচ্চশিক্ষাই থাকুক না কেন, রঞ্জিত আমাদের পরিবারে দস্যুর মতো ঢুকেছিল। সে যে কেবল আমাদের সর্ব্বস্ব লুঠ করেছে তাই নয়, আমাদের আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধেছে, এমন কি পাছে তা'কে সরিয়ে দেবার কথা ভাবি, এজন্য আমাদের স্বাধীনভাবে চলাফেরা করতেও দেয়নি। আর কিছুনয়, আজ আমাদের যত বড় বিপদই হোক, সুধু তা'র দস্যুবৃত্তির শতপাকের বাঁধন থেকে মুক্তি চাই।

বিপিনবাবু বললেন, বুঝতে পেরেছি। কিন্তু আর একটা কথা যে দুর্বোধ্য রয়ে গেল, দিদি।

জানি আপনি কি বলবেন—বনশ্রী নতমুখে বললে—সুধু এইটুকুই আপনাকে জানাই, আমি বিবাহিতও নই, বিধবাও নই, আজো আমি কুমারী!

কিন্তু—

হাসিমুখে বনশ্রী বললে, সন্তান ? সন্তান রঞ্জিতের—আমি কেবল টুনুকে মানুষ ক'রে তুলছি।

বিপিনবাবু বললেন, অস্পষ্ট র'য়ে গেল দিদি।

ম্লান হেসে বনশ্রী বললে, অস্পষ্ট আমার কাছে নেই, দাদা। সন্তান ভূমিষ্ঠ হবার পরেই রঞ্জিতের স্ত্রী গেল মারা। আমি তখন তা'র ফাঁদ এড়িয়ে পালিয়ে বেড়াই। একদিন আমার কাছে এসে সে ছেলেটাকে দিয়ে হাত ধ'রে কাঁদলে—তা'র ছেলেকে যেন আমি মানুষ ক'রে তুলি। বুঝতে সেদিন পারিনি তার ভবিষ্যৎ অভিসন্ধি!

তুমি নিলে কেন ?—বিপিনবাবু প্রশ্ন তুললেন।

নিলুম এই সর্ত্তে, সে কোনোদিন আর আমার ছায়া মাড়াবেনা, কোনোদিন আর তা'র মুখ দেখবো না! কিন্তু সেদিন একথা কল্পনাও করিনি, শিশুর সূত্র ধ'রে আমার কাছে আনাগোনা সে কায়েমী করবে। শিশুকে রাখলে শোষণের কৌশল হিসেবে।

বিপিনবাবু প্রশ্ন করেলেন, ছেলের প্রতি তা'র মনোভাব কিরূপ ?

বনশ্রী বললে, ঘনিষ্ঠতাতেই বাৎসল্যের সঞ্চার। কিন্তু সে তা'র ছেলেকে গোড়া থেকে ফেলে দিয়েছে আমার কাছে। বিন্দুমাত্র স্নেহমমতা তা'র নেই।

হ্যাঁ, এটা খুবই স্বাভাবিক।—বিপিনবাবু আস্তে আস্তে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। পুনরায় বললেন, তুমি কি তা'র ছেলেকে এখন ফিরিয়ে দিতে পারো না ?

একটা আচমকা ধাক্কায় বনশ্রী যেন শিউরে উঠলো। হারিকেনের আলোয় দেখা গেল, তা'র শুষ্ক মুখের উপর দুইটি নিরুপায় চক্ষু যেন থর-থর ক'রে কাঁপছে। বিপিনবাবুর মুখের দিকে একবার তাকিয়ে সে ঢোক গিললো। তারপর ধরা গলায় বললে, সে কি সম্ভব, দাদা ?

বিপিনবাবু যাবার আগে অবিচলিতকণ্ঠে বললেন, সম্ভব বৈ কি। ছেলে তা'র, তুমি গর্ভেও ধরোনি দিদি—তা'র ছেলে তা'কে ফিরিয়ে দাও, সকল সম্পর্ক মুছে দিয়ে তুমি সম্পূর্ণ স্বাধীন জীবন যাপন করো। এইটিই ভালো হচ্ছে।

উৎকণ্ঠিত নারীর ক্ষুধাতুর বাৎসল্যের নীচে যেন ভূমিকম্প

হ'তে লাগলো। ভয়ার্ত ব্যাকুল কণ্ঠে বনশ্রী পুনরায় শুষ্কজড়িত কণ্ঠে বললে, সে কি সম্ভব ?

অন্ততঃ আমার বিচারবুদ্ধি এই কথা বলে !—বলতে বলতে বিপিনবাবু তাঁর ঘরের দিকে গেলেন।

হারিকেন লণ্ঠনের আলোটা পেরিয়ে অন্ধকার রাত্রির দিকে চেয়ে বনশ্রী কতক্ষণ ব'সে রইলো। তারপর সহসা সে উঠে দাঁড়ালো এবং আর কোনোদিকে না তাকিয়ে নিজের ঘরের কাছে সে এসে দাঁড়ালো।

ভিতরে আলোটা টিপ-টিপ ক'রে জ্বলছিল। টুনু ঘুমিয়ে পড়েছে, মালী তার উপর মৃদু মৃদু বাতাস দিচ্ছে। বনশ্রীর পায়ের শব্দ পেয়ে মালী পাখা রেখে উঠে এলো। বনশ্রী প্রশ্ন করলে, ওকে খাইয়েছিলি রে ?

হ্যাঁ মা—এই ব'লে মালী বেরিয়ে গেল।

বনশ্রী বিছানার কাছে গিয়ে হেঁট হয়ে ধীরে ধীরে টুনুর মুখের উপর মুখ ঠেকালে এবং নিজের মনেই জড়িত বিকৃত কণ্ঠে বললে, না, না, না—এ কিছুতেই সম্ভব নয়! এর আশ্রয় ছাড়লে আমার কোথাও জায়গা নেই !

বিচারবুদ্ধিহীন নারীর চোখ বেয়ে উত্তপ্ত অশ্রু গড়িয়ে নামলো দানবশিশুর মুখের উপর।

খট্ খট্ খট্ ক'রে বাইরে জুতোর শব্দ হ'তেই সেলাইটে রেখে বনশ্রী উৎকর্ণ হয়ে তাকালে। বিপিনবাবু একটু আগে কাজে বেরিয়েছেন, এমন পায়ের শব্দ তাঁ'র নয়।

রঞ্জিত এসে সটান ঘরে ঢুকলো। বনশ্রীর গা কেঁপে উঠলো।

অত্যন্ত ঘনিষ্ঠের মতো একখানা চেয়ার টেনে নিয়ে ধীরে সুস্থে ব'সে রঞ্জিত হাসিমুখে বললে, বেড়াতে বেড়াতে আবার এসে পড়লুম।

তা ত' দেখছি—বনশ্রী বললে।

হ্যাঁ, এই কাছেই মাইল দুই দূরে একটা হোটেলে থাকি। তোমার এখানে ঢুকে দেখি সেই গোবেচারী ভদ্রলোকটি নেই—খুশী হলুম। পাষণ্ড সেদিন আমাকে এক পেয়ালা চা-ও অফার করেনি। তারপর ? কেমন আছ ?

বনশ্রী বললে, বাড়ীতে এখন কেউ নেই, এসময় আপনার বেশীক্ষণ থাকার দরকার দেখিনে।

রঞ্জিত বললে, সে ত' বটেই, এখুনি যাবো। শুধু তোমার রাগ পড়েছে কিনা দেখতে এলুম।

তা'র কণ্ঠস্বরের মিষ্টতার পিছনে চাতুরীর আভাসটা স্পষ্টই কানে ঠেকে। কিন্তু তা'র সঙ্গে বিতর্ক নিষ্ফল মনে ক'রে বনশ্রী বিরক্তভাবে চুপ ক'রে রইলো।

রঞ্জিত হাসলে। হেসে বললে, তোমাদের জাতের কাছে অনাদর আর অসম্মান সহ্য করা আমার অভ্যাস হ'য়ে গেছে। ওতে আমি আর কিছু মনে করিনে। জানি, বশ্যতা স্বীকার তোমরা করবেই। তোমাদের এই দুর্বলতার জন্যেই ত আমরা টিঁকে আছি।

বনশ্রী উঠে দাঁড়ালে। বললে, এঘরে আপনার বসার দরকার নেই, বারান্দার দিকে চলুন। সেদিনই ত আপনাকে বলেছি, আমার সঙ্গে দেখা করা মিথ্যে, তবে আবার কেন এলেন এখানে ?

রঞ্জিত বললে, না, এখানে আসার ইচ্ছে ছিল না। মনে ক'রেছিলুম, তোমার ইস্কুলে গিয়েই তোমার সঙ্গে—

বনশ্রী শিউরে উঠলো—কদাচ যেন অমন কাজ করবেন না। আপনি ইস্কুলে যাতায়াত করলে আমাকে চাকরী ছাড়তে হবে !

হাসিমুখে রঞ্জিত বললে, কই, সে-ভয় ত' তোমার নেই !—যাই হোক, অত রোদ্দুরে ইস্কুলের দিকে আর যাওয়া হয়ে উঠলো না। কাজ ত' আর এমন কিছু নয়, সামান্যই।

চলুন আপনি ওদিকে।

কিন্তু এক পা নড়বার লক্ষণ রঞ্জিতের দেখা গেল না। বললে, ব্যস্ত হোয়ো না, বসো, এ ঘরটা বেশ নিরিবিলি। আমাকে যেন তুমি তাড়াতে পারলেই বাঁচো, বনশ্রী।

বনশ্রী বিব্রত উত্যক্তভাবে দাঁড়িয়ে রইলো।

একটা দুঃখ কি রয়ে গেল জানো, তোমাকে আমি বাগ মানাতে পারলুম না। যেন জাল ছিঁড়ে পালাবার সব কৌশল-গুলো তুমি জানো।

বনশ্রী বললে, আপনি কি এখানে ব'সে ব'সে কেবল প্রলাপ বকবেন ? আমি কিন্তু বেশীক্ষণ এসব বরদাস্ত করবো না।

রঞ্জিত বললে, কী করবে ? মালীদের ডাকবে বুঝি ? ভয় নেই, তাদের আমি বুঝিয়ে বলতে পারবো ! যদি তাদের বলি, আমি স্বামী, আমার ছেলেকে নিয়ে তুমি পালিয়ে বেড়াচ্ছ, তা'রা অবিশ্বাস করবে না। মনে রেখো, মেয়েদের কলঙ্ক একবার রটলে আর থামবে না। স্কুলের চাকরিটা ত যাবেই।

বনশ্রী বললে, বুঝতে পারছি, ছ'মাস পরে আবার এসে আপনি ফাঁদে ফেলতে চান্। কিন্তু যেমন ক'রেই বলুন, টাকা আর আপনাকে দিতে পারবো না। কলঙ্ক রটলে, চাকরি গেলে বরং সইবে, কিন্তু দস্যুতাকে আর সহ্য করবো না।

রঞ্জিত বললে, চাকরি গেলে ছেলেকে খাওয়াবে কি ?

সে ভাবনা আপনার ত নেই !

বেশ, কিন্তু কলঙ্ক রটলে কেউ ত দয়া করবে না, বনশ্রী ?

বনশ্রী উগ্রকণ্ঠে বললে, আমার নাম ধ'রে আপনি বা'র বার ডাকবেন না, ঘেন্না ক'রে আমার। কলঙ্ক আপনি রটিয়ে দিন গে, ভয় পাইনে। কেউ দয়া না করে, বেশ্যাবৃত্তি কেউ কেড়ে নেবে না।

হাসিমুখে রঞ্জিত বললে, তুমি বেশ্যাবৃত্তিতে রাজি, অথচ আমাকে বিয়ে করতে আজো তুমি রাজি নও ?

এ সম্বন্ধে আপনি দ্বিতীয়বার আলাপ করবেন না, আমি ব'লে দিচ্ছি।—তীব্র দৃষ্টিতে বনশ্রী তাকালে।

বেশ, করবো না, কিন্তু আমাকে কিছু টাকা দাও, এখুনি আমি চ'লে যাচ্ছি।—ব'লে রঞ্জিত উঠে দাঁড়ালো।

বনশ্রী বললে, না। টাকা আমার নেই, থাকলেও দিতুম না। কারণ, টাকা আপনাকে যতবারই দিই, আমার মুক্তি নেই। আপনি আবার আসবেন !

তুমি চাকরি করছ, তোমার হাতে-গলায়-কানে গয়না দেখা যাচ্ছে—বলতে চাও সংস্থান কিছু নেই তোমার ? গয়নাগুলো কি গিল্‌টির ?

বনশ্রী বললে, যেদিন আপনার প্রতি শ্রদ্ধা ছিল, সম্মান ছিল, সেদিন সবাই মিলে দুহাতে আপনাকে দিয়েছি। আপনি

আমাদের সমস্ত নষ্ট করেছেন, ধ্বংস করেছেন, আমাদের আনন্দের ঘরে আগুন দিয়েছেন। অশান্তি, দারিদ্র্য, অন্নাভাব আর চরম দুর্গতিতে আমাদের ঘর আপনি ভরিয়ে তুলেছেন, কেবল পাপ আর অনাচার ছড়িয়ে বেড়িয়েছেন আপনি সর্বত্র—

ঈষৎ উত্তেজিতভাবে রঞ্জিত বললে, এ তোমার অত্যুক্তি, আমি কত উপকার করেছি তা'র হিসেব কই দিলে না ত?

বিন্দুমাত্র নয়—বনশ্রী চেঁচিয়ে বললে, এক ফোঁটা কৃতজ্ঞতা আর নেই আপনার প্রতি। উপকার তা'কে বলেন? ওটাও আপনার চক্রান্ত। একটা মনোহর অবস্থার সৃষ্টি ক'রে কেবল বুকের ওপর ব'সে-ব'সে আপনি রক্ত খেয়েছেন! এমন শৃঙ্খলার সঙ্গে উৎপীড়ন করেছেন যে, সহজে কেউ আপনাকে দায়ী করতে পারে নি—ব'লে সে হাঁপাতে লাগলো।

ঘরের মধ্যে দুই এক পা পায়চারি ক'রে রঞ্জিত বললে, মনে ক'রেছিলুম তোমার মন ভালো আছে, নিজের কথাটা তোমাকে বুঝিয়ে বলতে পারবো। কিন্তু—

না, ভুল ধারণা আপনার।—বনশ্রী বলতে লাগলো, প্রশ্রয় আর আমি দেবোনা। আমার মন ভালো হবে, যদি এখনই আপনি এ-দেশ ছেড়ে চ'লে যান্, আর আমার ত্রিসীমায় না আসেন। আপনার দস্যুতার হাত থেকে মুক্তি পেলে হয়ত আজো আমি বাঁচতে পারি।

রঞ্জিত বললে, তুমি কি বলতে চাও, তোমাদের আর কোনো শত্রু নেই?

না, কেউ নেই। আমরা কা'রো সঙ্গে অসদ্ব্যবহার করিনি, কেউ আমাদের ওপর বিরূপ নয়।

বটে! তোমাদের পাড়ার চাটুজ্যেরা? তা'রা বুঝি তোমাদের বন্ধু?

বনশ্রী বললে, তাদের সঙ্গে আমাদের কোনো বিবাদ ছিলনা। আপনারই জন্যে ওদের সঙ্গে ঝগড়া। আপনি সকলের বড় শত্রু।

রঞ্জিত নিশ্বাস ফেললে। বললে, বেশ, আমি যাবো—কথা দিলুম। কিন্তু আপাতত আমার অনুরোধ রাখো। আমি বিশেষ বিপন্ন!

কী চান্ আপনি?

বা'র বা'র বুঝি তোমাকে মনে করিয়ে দিতে হয়? টাকা, সোনা, যা তুমি সহজে দেবে!

সহজে আপনাকে কিছুই দেবো না।

হাসিমুখে রঞ্জিত বললে, জোর ক'রে নেবার আগে সহজেই দাও, বনশ্রী!

জোর ক'রে নিতে পারেন আপনি?—বনশ্রী মুখ ফিরালে।

আলবৎ! পৃথিবীর সবাই এসে যদি তোমার পক্ষে দাঁড়ায়, তবুও জোর ক'রে নেবো। জানো, তোমাকে সাংঘাতিক শাস্তি দিতে পারি? জানো, তোমার বাড়ীতে ঢুকে তোমার গলা টিপে মেরে যেতে পারি?

সন্ধ্যা প্রায় আসন্ন, বাড়ীর ভিতর মহলের দিকে তখন কেউ কোথাও নেই। বাগানের ওদিকে মালীরও কোনো আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছেনা। বনশ্রী সভয়ে এদিক ওদিক তাকালে। পরে কম্পিতকণ্ঠে বললে, পারেন সব, আমি জানি। সেইটেই আপনার বাহাদুরী। কিন্তু আজ আপনি ফিরে যাবেন, কাল ত আমি পুলিশে জানাতে পারি, আপনি ডাকাতি ক'রে গেছেন?

রঞ্জিত হা হা হা হা ক'রে হেসে উঠলো। বললে, পুলিশকে বুঝিয়ে বলতে পারবো, এটা ডাকাতি নয়, ন্যায়সঙ্গত অধিকার।

তা'র মানে কি, বলুন। আজ সব পরিষ্কার হোক!

হাতখানা প্রসারিত ক'রে রঞ্জিত বললে, ওই ছাখো বিছানায় ছেলেটা। প্রমাণ করবো তুমি ওর মা, প্রমাণ করবো তুমি আমার স্ত্রী। কলঙ্ককে তুমি ভয় করো না জানি, কিন্তু পুলিশের ডাক্তাররা তোমার দেহ নিয়ে টানাহেঁচড়া করবে যেদিন, সেদিন কোথায় দাঁড়াবে?

ভীতকণ্ঠে বনশ্রী বললে, আপনার ছেলেকে আর আমি রাখতে চাইনে! আপনি ওকে নিয়ে চ'লে যান্।

রঞ্জিত বললে, তাই নাকি? ঠিক বলছ?

হ্যাঁ—বলছি—

রঞ্জিতের চোখ জ্ব'লে উঠলো। বললে, আঁতুড় কাটবার আগে থেকে তুমি ওকে তুলে নিয়েছ, ছাড়তে গেলে লাগবেনা?

না।

কাঁদবেনা?

বনশ্রীর কণ্ঠরুদ্ধ হোলো। বললে, না, একটুও না।

রঞ্জিত তা'র ধারালো চোখ বাঁকিয়ে বললে, কিন্তু মনে রেখো, যাকে তুমি একটুও বিশ্বাস করো না, তা'র হাতে ছেলেকে সঁপে দিচ্ছ!

ছেলে আমার নয়, আপনার!

হ্যাঁ, সে সত্যি। কিন্তু এর রোগ হ'তে পারে, আহার আশ্রয় জুটতে না পারে। পথে—রোদ্দুরে—বৃষ্টিতে—হিমে—অর্থাৎ কোনোদিন কেউ জানবেনা, এ ছেলে কোন্ দুর্গতির দিকে ভেসে গেল! মূঢ় নির্বোধ শিশুর অপঘাত মৃত্যু কি তোমার সইবে, বনশ্রী?

বনশ্রী অনেক সহ্য করেছিল, কিন্তু আর পারলে না। চেঁচিয়ে উঠে বললে, সইবে, সইবে—একশোবার সইবে। আমি ওর মা নই, কেউ নই। যেখানে খুশি নিয়ে যান্—যে-কোনো দেশে, যে-কোনো পথে—আমি বাধা দেবো না। যদি কান্না পায়, নিজের টুঁটি টিপে ধরবো; যদি থাকতে না পারি, বিষ খেয়ে মরবো।—বলতে বলতে বনশ্রী, যা কোনোদিন নিজে সে কল্পনাও করেনি—সে আজ তাই ক'রে বসলে। সহসা রঞ্জিতের পায়ের কাছে ব'সে প'ড়ে সে বললে, নিয়ে যান্ আপনার ছেলেকে, আমি শুধু আপনার হাত থেকে বাঁচতে চাই, মুক্তি চাই—আমার বুকের মধ্যে শুকিয়ে উঠেছে স্বাধীনতার জন্যে, আমাকে মুক্তি ভিক্ষা দিন্। ওকে সঙ্গে নিয়ে এদেশ ছেড়ে আপনি দূর হয়ে যান্, আপনার পায়ে ধরি।

বনশ্রী কাঁদতে লাগলো।

রঞ্জিত বললে, আচ্ছা যাচ্ছি, কেঁদোনা, কান্নাটা নিরর্থক, লোকে শুনলে হাসবে। কিন্তু মনে রেখো, আমি না হয় অপরাধী, শিশু নিষ্পাপ, নিরপরাধ—তবু বাৎসল্যের আশ্রয় আজ ওর কাছে শূন্য হোলো!—এই ব'লে সে বেশ সমারোহ সহকারে বিশেষ ভঙ্গীতে বিছানার দিকে অগ্রসর হোলো।

কোথা যান্?—ব'লে বনশ্রী উঠে দাঁড়ালে।

আমার ছেলেকে আমি এখুনি নিয়ে যাবো।

ঘুরে বিছানার ওপাশে গিয়ে বনশ্রী ঘুমন্ত টুনুকে আগলে দাঁড়ালে। বললে, দুদিন থেকে ওর সর্দি-জ্বর, আজ ত ছেড়ে দিতে পারবো না ?

রঞ্জিত বললে, ওর অসুখের চিন্তা আমার, তোমার নয়।—এই ব'লে টুনুর দিকে সে হাত বাড়ালে।

খবরদার বলছি—ডাকিনীর মতো চীৎকার ক'রে বনশ্রী এক ঝটকায় রঞ্জিতের হাত দুখানা সরিয়ে দিল—ছেলের গায়ে আপনি হাত দেবেন না—

চেঁচামেচিতে টুনু সহসা ধড়ফড়িয়ে জেগে উঠে পড়লো এবং স্বল্প অন্ধকারে সহসা অপরিচিত ব্যক্তিকে দেখে আর্তনাদ ক'রে সে বনশ্রীকে জড়িয়ে ধরলে।

এমন সময় বাইরে মস মস ক'রে জুতোর শব্দ ক'রে বিপিনবাবু দরজার কাছে এসে দাঁড়ালেন। ডাকলেন, বোনোদিদি ?

টুনুকে কোলে নিয়ে কাঁপতে কাঁপতে বনশ্রী যেন অকূলে কূল পেয়ে গেল। বিছানার পাশ দিয়ে সে দরজার কাছে দ্রুতপদে এসে বললে, দাদা, অসুস্থ ছেলেকে উনি এখুনি নিয়ে যেতে চান। আজ আমি ত' ছেড়ে দিতে পারবো না ?—রুদ্ধ নিশ্বাসে তার গলার স্বর বন্ধ হয়ে আসছিল।

রঞ্জিত এগিয়ে এসে সহজকণ্ঠে বললে, নমস্কার, স্যার।

ব্যাপারটা সহসা বুঝতে না পেরে বিপিন বললেন, সে কি, ছেলেটি যে আজ দুদিন অসুস্থ !

একটা সিগারেট ধরিয়ে রঞ্জিত বললে, আজকে অসুস্থ, কালকে কান্নাকাটি, পরশু হাঁচি-টিকটিকি—এসব দেখলে ত' আমার চলবেনা। আমাকে তাড়াতাড়ি দেশে ফিরতে হবে।

ছেলেটিকে নিয়ে বনশ্রী পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে আড়ালে চ'লে গেল। বিপিনবাবুর পাশে পাশে রঞ্জিত বেরিয়ে এসে বারান্দায় দাঁড়ালে। সিগারেটে টান দিয়ে খুব হাসি-খুসী মুখে সে পুনরায় বললে, হৃদয়ের কারবার ত' বড় নয়, যুক্তিটাই বড় !

বিপিনবাবু বললেন, সেটা আপনার বিচারে।

হ্যাঁ, তা' ত' বটেই। ছেলেকে ছাড়তে কষ্ট হ'লে ত' চলবেনা। আচ্ছা—এবার আমি যাবো। দয়া ক'রে আপনারা ভাই-বোনে মিলে দিন তিনেকের মধ্যে ছেলেটাকে সুস্থ ক'রে তুলবেন, শনিবারে এসে আমি ওকে নিয়ে- যাবো।—এই ব'লে বারান্দা পেরিয়ে নেমে হন্ হন্ ক'রে রঞ্জিত চ'লে গেল। পায়ে-পায়ে তা'র খুশীর আনন্দ যেন উছলে পড়ছে। বাঁধন যত শক্ত হবে ততই তা'র সুবিধে।

চাপা উত্তেজনায় বিপিনবাবু থরথর করছিলেন। মুখ ফিরিয়ে তিনি তাঁর শোবার ঘরের দরজায় ঢুকতেই দেখলেন, টুনুকে কাঁধে নিয়ে বনশ্রী দাঁড়িয়ে। জলে তা'র মুখ ভেসে যাচ্ছিল, বিপিনবাবু বললেন, ছেলেকে আট্‌কে রাখার অধিকার ত' তোমার নেই, বনশ্রী !

বনশ্রী বললে, সত্যিই নেই। যার ছেলে তা'রই হাতে তুলে দেবো, দাদা।"

"হ্যাঁ, তাই দিয়ো। শনিবারে ও-লোকটা আসবে, দিয়ে দিয়ো। একটু ব্যথা হয়ত বাজবে তোমায়, কিন্তু তারপরে তোমার অবাধ স্বাধীনতা, অখণ্ড মুক্তি। তোমার জীবনে নতুন প্রভাতের আলো দেখা দেবে !

ফুঁপিয়ে কেঁদে বনশ্রী বললে, তাই আমি চাই, দাদা।

*

* *

মালী বিছানা বাঁধছে, চাকর জিনিসপত্র গোচাচ্ছে। একখানা চেয়ারে ব'সে বিপিনবাবু এ-বাড়ীর বিলিব্যবস্থা সম্বন্ধে নির্দেশ দিচ্ছিলেন। বারান্দার নীচে তাঁ'র মোটর দাঁড়িয়ে। বেলা এগারোটার গাড়ীতে তিনি কলকাতায় ফিরবেন।

এমন সময় অদূরে গেটের ভিতর দিয়ে ঢুকে রঞ্জিত হন্ হন্ ক'রে এসে বারান্দার উপর উঠলে। এ-বাড়ীতে যেন তা'র চিরস্থায়ী অধিকার, এমনই তা'র স্বচ্ছন্দগতি। তা'র পরণে সেই লক্ষ্মীছাড়ার বেশ, সেই ধূলাবালিমাখা। মলিন চেহারাটায় পুরণো আভিজাত্যের আভাসটা কিছু পাওয়া যায়।

থমকে দাঁড়িয়ে একবার বিপিনবাবুর দিকে তাকিয়ে সে বললে, গুডমর্‌নিং, স্যার !—এই ব'লেই সে অন্দরমহলের দিকে নিজের মনে গিয়ে ঢুকলো।

বিপিনবাবু চুপ ক'রে ব'সে রইলেন।

মিনিট দুই পরে রঞ্জিত বেরিয়ে এলো। বললে, কই, মিষ্টার রয়, মিস চৌধুরী ত' নেই ?

মুখ তুলে বিপিনবাবু বললে, তিনি আপনার ফাঁদ কেটে ছেলে নিয়ে পালিয়েছেন।

কোথায় ?

কোথায় তিনি গেছেন আমি জানি, কিন্তু আপনাকে বলবো না !—এই ব'লে বিপিনবাবু পকেট থেকে একখানা চিঠি বা'র ক'রে রঞ্জিতের হাতে দিলেন। বললেন, পড়ুন, পড়ে কিছু জ্ঞানলাভ করুন।

চিঠিখানা হাতে নিয়ে রঞ্জিত খু'লে ফেলে বললে, আপনাকেই লেখা দেখছি !—ও, আপনাকেও জানিয়ে যায়নি সে ?

বিপিন বললেন, না, ছেলের সম্পর্কে তিনি কাউকেই বিশ্বাস করেন না ! কাল সারাদিন আমাকে বাইরে থাকতে হয়েছিল, সেই সুযোগে জিনিসপত্র নিয়ে, গাড়ী ডেকে তিনি—

চিঠি প'ড়ে রঞ্জিত হাসলে। বললে, আমাকে না বলুন, কিন্তু তা'কে খুঁজে পাবোই একদিন। সে আমাকে ত্যাগ করতে পারে, আমি পারিনে, আমি তা'র অভিভাবক।

তীব্রদৃষ্টি মেলে বিপিন তা'র দিকে তাকালেন। বললেন, তাঁর ঘৃণা, তাঁর অশ্রদ্ধা নিয়েও আপনি পিছু পিছু ঘুরবেন ?

অশ্রদ্ধা করলেও তা'র প্রতি আমার আইনসঙ্গত একটা দায়িত্ব আছে, মিষ্টার রয় !

কিছুমাত্র না। মানুষের ওপর মানুষের প্রভুত্ব আজ কেউ সইবেনা।—বিপিনবাবু উত্তেজিত হয়ে বললেন, একদিন ভদ্রবেশী দস্যুর মতো এসে কৌশলে তাকে আপনি বেঁধেছিলেন, আজ সে আপনার হাত থেকে মুক্তি চায় !

রঞ্জিত বললে, কিন্তু আমার ছেলে—

সে আপনার অপসৃষ্টি! আপনার সেই অভিশপ্ত স্মৃতি নিয়ে সে পালিয়ে গেছে নির্জনে কাঁদবার জন্যে। আপনার পাপের বোঝা সে বয়ে বেড়াবে চিরদিন।

রঞ্জিত বললে, আপনি কি বলতে চান্ সে স্বাধীনতা পাবার যোগ্য?

বিপিন বললেন, থাক্ সে কথা, আপনি উঠুন এখান থেকে। সকলের অশ্রদ্ধা আর উপেক্ষা নিয়ে কোন্ লজ্জায় আপনি মুখ দেখান? লোভে, হিংসায়, স্বার্থপরতায়, প্রভুত্ব পিপাসায় আপনার আগাগোড়া পঙ্কিল। যান্, এখনই এদেশ ছেড়ে যেদিকে খুশি চ'লে যান্। ভদ্র মনের ওপর আর কখনো উৎপীড়ন করবেন না!—ব'লে তিনি চিঠিখানা হাতে নিয়ে ভিতরে চ'লে গেলেন।

রঞ্জিত উঠে দাঁড়ালো। ময়লা প্যান্টের পকেটে হাত দুটো ঢুকিয়ে বিপিনবাবুর পথের দিকে তাকিয়ে সে বললে, বলুন আপনারা আমাকে অসচ্চরিত্র, ঘৃণ্য, লোভী—কিন্তু আমি ক্ষমতাবান, মনে রাখবেন। সহজে তাকে মুক্তি দেবোনা, আমার দায়িত্ব আমি পালন করবো।—এই ব'লে সে বারান্দার সিঁড়ি দিয়ে নেমে বাগান পেরিয়ে চ'লে গেল।

সতী ডাঙ্গার স্মৃতি

কবিকঙ্কন শ্রীঅপূর্ব্ব কৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

চরের বুকেতে নভোচারী চিল মেলেছে তখন পাখা,
নদীর উপরে উড়ে যায় সাদা বক।
দেখা যায় চরে বিগত দিনের চরণ চিহ্ন আঁকা,
সেথায় আসিয়া দাঁড়ানু ক'জন কবি ও সম্পাদক।
শীর্ণা যমুনা কচুরিপানার পরেছে অঙ্গবাস,
এপারে শূন্য বালিয়ানি গ্রাম, ওপারেতে গৈপুর;
ভাবিতেছি মোরা কেমনে হয়েছে গ্রামের সর্ব্বনাশ!
বাঁশের বাঁশীতে রাখাল ছেলের দূরে বাজে মেঠো সুর।
চৈত্রদিনের প্রভাতের রবি বসেছে আপন পাটে,
চপল ভ্রমর অন্ধ-নেশায় ভ্রমিছে পথে ও ঘাটে।

শত বছরের পথ বেয়ে এলো ধূসর স্মৃতির ছায়া,
দুলে দুলে হেথা কি যেন কহিতে চায়!
ওর পশ্চাতে শিশির-ভেজানো সবুজ মনের মায়া
পেতেছে আসন পল্লী মায়ের গভীর শূন্যতায়।
নবধরণীর স্বপ্ন কি কাঁপে ওর গগনের পিছু!
অন্তরালে কি নিশীথ রাতের তারার চিত্র লেখা?
অতীত দিনের পড়ে আছে হেথা মৃত কঙ্কাল কিছু,
নদীচরে কোনো মানুষের নাহি দেখা।
ধেনুচরে আর দেখা যায় কুঁড়ে দূরের আম্রবনে,
বঞ্চিত দিনে কত কথা পড়ে মনে!

এ চরে একদা হয়ে গেছে হোম শত বরষের আগে,
মন্ত্র-মুখর দিক্ মণ্ডল প্রখর জ্যৈষ্ঠ দিনে।
দেশ বিদেশের যাজ্ঞিক যোগী বসেছে বহ্নি-যাগে,
সকল সাধনা হবেগো বিফল বারেক বৃষ্টি বিনে!
বন্ধ্যার মত ব্যর্থতা নিয়া রহে কর্ষিত ভূমি,
তাহারি বক্ষে জ্বলে হোমানল—মেঘ-চুম্বিতশিখা,
বারিপাত বিনা মরণের কোলে তরুলতা পড়ে ঘুমি,
শস্যশ্যামল দেশে দেখা দেয় সাহারার বিভীষিকা!
শীতল হাওয়ার পথ চেয়ে চেয়ে দিনগুলি যায় চলে,
মেঘের করুণা ঝরেনাক আর মৃত মৃত্তিকা তলে।

সপ্তাহব্যাপী চলেছে যজ্ঞ যমুনা নদীর তটে,
করে হবি পান হরষিত হয়ে' যজ্ঞের হুতাশন।
গৈরিক বাস পরিয়া সন্ধ্যা গোধূলি বেলার মঠে
জটাজুটধারী তাপসী বটেরে করিতেছে আরাধন।
এমন সময় কহে যাজ্ঞিক—'শোন গো বন্ধু সবে,
পূর্ণ আহুতি দিতে হবে এবে—ডাকো কোন সতী নারী,
তাহারি আহুতি লভিয়া এবার বাদলের গান হবে;
মেঘের মাদল বাজিবে গগনে, ঝরিবে করকা বারি—'

আসেনাক কোনো পল্লীর বধূ শঙ্কিত সবে সদা,
পাছে যদি বারি নদী পথে নাহি ঝরে!
অপবাদ নিয়ে যেতে হবে ঘরে কাণে শুনে' অপকথা,
উপহাস আর বিদ্রূপভরা জীবন কি হবে ধরে!
কালীপ্রসন্ন সমাজের পতি জমিদার ভাবে—'হায়!
হবে কি পণ্ড এত আয়োজন!—' ভেঙ্গে পড়ে তাঁর বুক।
ব্যর্থ হবে কি যদি কুশদহে সতী নাহি পাওয়া যায়!
মৌন মলিন দলপতিদের মুখ।

বিষাদের ছায়া ঘনায়ে আসিল কুশদ্বীপের মাঝে,
'—এই তো তোমার দেশের সতীরা!—' কহে ঋত্বিকবর।
সমাজপতির বুকে ব্যথা যেন শেল সম সদা বাজে;
দিন আসে—যায়—তবুও বহ্নি জ্বলিছে নিরন্তর।

সমাজ-মালার ছিন্ন কুসুম-রূপে রহে যারা পাশে,
তাহাদেরি শ্যামা কল্যাণী বধূ কহে—
'—পূর্ণ আহুতি আমি দিতে চাহি—' দলপতিগণ হাসে,
লাজ-গুণ্ঠিত আননে ললনা যত উপহাস সহে।
'কৈবর্ত্তের এত তেজ হবে!—' হাসিলেন জমিদার,
কহে যাজ্ঞিক— 'করোনাক ঘৃণা তুমি—
সমাজ যাদের ধর্ম্মের নামে করিতেছে অবিচার,
তারাই করিতে পারে উজ্জ্বল জাতি ও জনমভূমি।'

শেষে বধূ আসি হবি দিয়ে 'দিয়ে' একপাক যায় ঘুরে,
দুই পাক দিতে হোমের আগুন বরিষণে যায় নিবে।
বাদল নটীরা নেচে ওঠে নভে মেঘ-মল্লার সুরে;
হারানো জীবন ফিরে পে'ল সব জীবে।
সেদিনের স্মৃতি ভুলেছে নিঃস্ব দেশের যাত্রিদল,
হায় সভ্যতা! হ'লে যাযাবর—রিক্ত হৃদয়তল!

চলতি ইতিহাস

শ্রীতিনকড়ি চট্টোপাধ্যায়

বিগত চার সপ্তাহে যুদ্ধের অবস্থা যথেষ্ট পরিবর্তিত হইয়াছে। বিভিন্ন রণাঙ্গনের সৃষ্টি, কয়েকটি নূতন স্থানে বোমা বর্ষণ, অথবা কয়েকখানি জাহাজ ডুবিতে এই পরিবর্তন পর্য্যবসিত নয়, প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য উভয় রণাঙ্গনের যুদ্ধই বর্তমানে উপনীত হইয়াছে এক সন্ধিক্ষণে। অদূর ভবিষ্যতের অনাগত দিনগুলির অন্তরালে রণদেবতার কোন্ গোপন ইতিহাস সংরক্ষিত, যুযুধান শক্তিবর্গের নিকট এখনও তাহা দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট হইয়া আপনাকে উন্মুক্ত করিয়া ধরিতে পারে নাই সত্য, কিন্তু বিশ্বসংগ্রাম তাহার গতিপথে আজ যে স্থানে উপনীত হইয়াছে, অনতিদূরাগত দিবসে যে তাহাকে চরম সিদ্ধান্তের পথে পদক্ষেপ দ্বারা আপনাকে প্রকাশ করিয়া দিতে হইবে সে বিষয়ে আজ আর কোন দ্বিমত নাই।

সুদূর প্রাচীর সঙ্ঘর্ষ

রেঙ্গুনের পতনকালে জাপবাহিনী ব্রহ্মদেশের অভ্যন্তরে কি ভাবে কোন্ পথ দিয়া অগ্রসর হইতে ইচ্ছুক আমরা সে বিষয়ে আলোচনা করিয়াছিলাম। মিত্রশক্তি সাধ্যমত শত্রুবাহিনীকে যে বাধা প্রদানে পরাঙ্মুখ হয় নাই ইহা সত্য; কিন্তু তৎসত্ত্বেও জাপবাহিনী সাময়িকভাবে ব্রহ্মদেশে সাফল্য লাভ করিয়াছে এবং আমাদের অনুমান দ্বারা স্থিরীকৃত পথাবলম্বন করিয়াই মধ্য ও ও উত্তর ব্রহ্মে অগ্রসর হইয়াছে (এ সম্পর্কে চৈত্রের 'ভারতবর্ষ' দ্রষ্টব্য)। ভামো, লাসিও, মান্দালয় এবং মিট্‌কিয়ানায় বর্তমানে চার ডিভিসন জাপবাহিনী অবস্থিত। ব্রহ্মপথ ধরিয়া জাপবাহিনীর একাংশ ব্রহ্ম সীমান্ত অতিক্রম করিয়া চীনের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়াছে। এদিকে আকিয়াবের ঘাঁটি শত্রুহস্তগত। চট্টগ্রাম এবং আসামের কোন কোন অঞ্চলে বোমা বর্ষিত হইয়াছে। সম্প্রতি জেনারেল ওয়াভেল জানাইয়াছেন যে, সাময়িকভাবে ব্রহ্মযুদ্ধের অবসান হইয়াছে। ব্রহ্মদেশ হইতে বৃটিশ বাহিনী ভারতে সরিয়া আসাতে জেনারেল আলেকজাণ্ডারের অধিনায়কত্বের প্রয়োজন শেষ হইয়াছে; বর্তমানে জাপবাহিনী যদি আরও অগ্রসর হইয়া অভিযান পরিচালনা করে তাহা হইলে তাহাদিগকে উপযুক্তভাবে বাধা প্রদান করা নির্ভর করিতেছে দূর-প্রান্তস্থ ভারতীয় বাহিনীর উপর।

ব্রহ্মযুদ্ধ সম্পর্কে জেনারেল ওয়াভেল এবং আরও অনেকে বিবৃতি প্রদান করিয়াছেন। ঐ সকল বিবৃতি বিশ্লেষণ করিলে ব্রহ্মযুদ্ধে শত্রুবাহিনীর অগ্রগতি ও সাময়িক সাফল্যের কারণ যেরূপ ধরা পড়ে, জাপানকে সাফল্যজনক বাধা প্রদানের উপায়ও তেমনই ভারতের নিকট পরিস্ফুট হইয়া ওঠে। ভারতবর্ষের পক্ষে ব্রহ্মযুদ্ধের অবস্থা বিশেষভাবে পর্য্যালোচনা করা প্রয়োজন।

অবস্থা বিপর্য্যয়ের কারণ প্রসঙ্গে জেনারেল ওয়াভেল প্রথমেই বলিয়াছেন—শত্রুপক্ষ সর্বতোভাবে প্রস্তুত ছিল, কিন্তু আমরা ছিলাম অপ্রস্তুত। পার্ল বন্দর আক্রমণের ৫ বৎসর পূর্ব হইতেই জাপান যে কিরূপভাবে তাহার শক্তি বৃদ্ধি করিতেছিল, বিশেষ নৌশক্তি বৃদ্ধির জন্য কিরূপ ব্যবস্থা সে অবলম্বন করিয়াছিল তাহা জানিতে পারা যায় যাই। অতি গোপনে অথচ দ্রুতগতিতে জাপান আপনার শক্তি বৃদ্ধি করিয়াছে। অবশ্য কোন্ দেশ কি ভাবে সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করিতেছে এবং কোন্ গোপন উদ্দেশ্য সাধনে সচেষ্ট তাহা অবগত হইবার জন্য প্রতি দেশই প্রত্যেক দেশে গুপ্তচর রাখিয়াছে, গোপন তথ্য সংগ্রহই তাহাদের কাজ।

মাদাগাস্কার

মিত্রশক্তির বিরুদ্ধে জাপানের এই মনোভাব এবং শক্তিবৃদ্ধি যে পূর্বাহ্নে জানা যায় নাই ইহা দুঃখের বিষয় সন্দেহ নাই, কিন্তু আজ তাহার জন্ম অনুতাপ করা বৃথা। কারণ বর্তমানে জাপান রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হওয়ায় তাহার শক্তির পরিমাণ যেরূপ জানা গিয়াছে, ব্রহ্মদেশস্থ মিত্রশক্তির প্রবল প্রতিরোধের ফলে মিত্র-বাহিনী অনাক্রান্ত ঘাঁটিগুলিতে তেমনই আপনাকে সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করিতে সক্ষম হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ ব্রহ্মদেশে শত্রুপক্ষের তুলনায় মিত্রশক্তির সৈন্যসংখ্যা ছিল অল্প। তৃতীয়তঃ, উপযুক্ত পরিমাণ বিমানের অভাব। মালয়ের যুদ্ধের সময়ই বিমানের অভাব তীব্রভাবে অনুভব করা গিয়াছে, এরূপ অভিমত অনেকে দিয়াছেন এবং ইহা আদৌ অসত্য নয় যে, উপযুক্ত বিমান বহরের সাহায্য পাইলে মালয়ের যুদ্ধের ফল অন্যরূপ হইত। এতদ্ব্যতীত নূতন সৈন্য ও সমরোপকরণ রণাঙ্গনে প্রয়োজনমত প্রেরণ করাও সম্ভব হয় নাই। নূতনবাহিনী ও সমরসম্ভারে বঞ্চিত হইয়া দিনের পর দিন সংখ্যাল্প মিত্রবাহিনী যেভাবে জাপ সৈন্যকে বাধা প্রদান করিয়াছে তাহা আদৌ উপেক্ষার নয়। আক্রমণাত্মক যুদ্ধ পরিচালনে বিবিধ বাধা এবং অসুবিধা থাকায় মিত্রশক্তি ব্রহ্মদেশে জাপ গতিকে বিলম্বিত করিবার পন্থা গ্রহণ করিয়াছিল এবং সাম্রাজ্যবাহিনী পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী যথেষ্ট সাফল্যের সহিত এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিয়াছে। চতুর্থত সংযোগ রক্ষা। ভারতের সহিত ব্রহ্মদেশের উপযুক্ত সরহবরাহের নিমিত্ত স্থল পথ নাই। রেঙ্গুনের পতনের সঙ্গে সঙ্গে সামুদ্রিক পথ বন্ধ হইয়া যায়। গুরুভার লরী চলাচলের উপযোগী স্থলপথ অতি দ্রুত নির্মাণ করা সম্ভব হয় নাই। ফলে সরবরাহে যথেষ্ট ব্যাঘাত ঘটিয়াছে। পঞ্চমতঃ বর্ষা। মে মাসের প্রথমেই কয়েক দিন অন্তর রণাঙ্গনে যথেষ্ট বৃষ্টি হইয়াছে। পার্বত্য অরণ্য অঞ্চলে বারিপাত যথেষ্ট অধিক হয় এবং পূর্বোক্ত কয়েক দিনের বৃষ্টি আসন্ন প্রবল বর্ষার সূচনা। বৃষ্টির ফলে সরবরাহ পথ একেবারেই নষ্ট হইয়া যায়, চিন্দুইন নদীর আয়তন ও গতিবেগ যথেষ্ট বর্দ্ধিত হয়। মিত্রশক্তিকে খেয়া ষ্টীমারে চিন্দুইন পার হইতে হইয়াছে। ফলে গুরুভার সমরোপকরণ সঙ্গে আনা সম্ভব হয় নাই। অবশ্য সেগুলি যাহাতে শত্রুর হাতে না পড়ে তাহার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। জাপান যেভাবে ব্রহ্মদেশের প্রতি অবহিত হইয়াছিল তাহাতে ধারণা করা গিয়াছিল যে, বর্ষার পূর্বেই সে ব্রহ্মের যুদ্ধ শেষ করিয়া ফেলিতে ব্যগ্র। আমাদের এই ধারণার কথা "ভারতবর্ষ"-এর গত জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় আমরা প্রকাশ করিয়াছি। মিত্রশক্তির পশ্চাদপসরণে জাপানের সেই উদ্দেশ্য অবশ্য সফল হইল। তবে সামরিক দিক দিয়া বিচার করিলে সাম্রাজ্যবাহিনীর পশ্চাদপসরণ একাধিক কারণে উপযুক্ত ও যুক্তিসঙ্গত হইয়াছে। দারুণ বর্ষায় নূতন সাহায্য প্রেরণ যেখানে অসম্ভব, অকারণে লোকক্ষয় সেখানে অসঙ্গত। কিন্তু ইহাই শেষ নহে। ষষ্ঠতঃ ব্রহ্মের যুদ্ধে স্থানীয় অধিবাসীদের সক্রিয় সাহায্য ও আন্তরিক সহযোগিতার অভাবও যুদ্ধ বিপর্য্যয়ের একটি কারণ। একাধিক ব্যক্তির বিবৃতিতে এই অসহযোগিতার কথা বিশেষ জোর করিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। সপ্তমতঃ, ব্রহ্মদেশের ভৌগলিক অবস্থান গিয়াছে মিত্রশক্তির প্রতিকূলে। অরণ্য, পর্বত এবং নদীর দ্বারা শত বিভক্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অঞ্চলে বিরাট বাহিনীকে সংযোগ রক্ষা করিয়া পরিচালন করা কঠিন। জাপবাহিনী যে রণকৌশল অবলম্বন করিয়াছে, মিত্রশক্তির সৈন্যদল তাহা অনুসরণ করিতে পারে নাই। সাম্রাজ্যবাহিনীর অধিনায়কমণ্ডলী এখনও স্থানিক যুদ্ধের মোহ সম্পূর্ণ কাটাইয়া উঠিতে পারেন নাই। এক বিশাল বাহিনীকে সকল দিক হইতে সংযোগ ও সরবরাহ অক্ষুন্ন রাখিয়া ইচ্ছামত পরিচালন করা উন্মুক্ত প্রান্তরেই সম্ভব। মুক্ত স্থানে এই বিরাট সৈন্যদল অটল পর্বতের ন্যায় শত্রুপক্ষকে ঠেকাইয়া রাখিতে সক্ষম হয়। কিন্তু রণক্ষেত্র যেখানে নদী, পর্বত এবং অরণ্য দ্বারা বিভক্ত এবং সঙ্কীর্ণ, উক্ত পদ্ধতিতে সেখানে সৈন্য পরিচালন ও বিভিন্ন বাহিনীর মধ্যে সংযোগ রক্ষা করা কঠিন। কিন্তু অক্ষশক্তির যুদ্ধ গতির যুদ্ধ। ভৌগলিক অবস্থান অনুযায়ী যেমন তাহারা ছোট ছোট দলে বিভক্ত হইয়াছে, অবস্থানুযায়ী ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্যও তেমনই তাহাদিগকে সৈন্যাধ্যক্ষের মুখের দিকে তাকাইয়া থাকিতে হয় নাই। ফলে, প্রয়োজন হইলে যেমন তাহারা হাল্কা দ্রব্যাদি লইয়া সাঁতরাইয়া নদী অতিক্রম করিয়াছে, প্রয়োজনমত তেমনই তাহারা যুদ্ধস্থলে অসঙ্কোচে হস্তী পর্য্যন্ত ব্যবহার করিতে সক্ষম হইয়াছে। সমগ্র বনাঞ্চলে, নদী-তীরে, পর্বতান্তরালে ছড়াইয়া পড়া তাহাদের পক্ষে অসুবিধাজনক হইয়া ওঠে নাই। শেষতঃ, মালয় এবং ব্রহ্মের যুদ্ধে সৈন্যদিগকে যেভাবে শিক্ষা প্রদান করা আবশ্যক ছিল তাহা সময়াভাবে হইয়া ওঠে নাই। একদিকে যেমন ইয়োরোপ, আফ্রিকা প্রভৃতি স্থানে সৈন্যদিগকে প্রেরণ করিতে হইয়াছে, ব্রহ্ম ও মালয়ের যুদ্ধেও সেইরূপ তাহাদিগকে নিযুক্ত করিতে হইয়াছে। কিন্তু একই শিক্ষা দুই রণাঙ্গনের উপযোগী নয়। "The Japanese is not a better man or a better soldier, but he is a better trained soldier, particularly for the form of fighting that took place is Malaya and Burma."

কিন্তু ব্রহ্মের যুদ্ধে এই বিপর্য্যয়ের কারণ দৃষ্টে যে অভিজ্ঞতা লাভ হইয়াছে, ভারতের নিকট তাহার মূল্য যথেষ্ট অধিক। যে সকল সৈন্য ভারতে ফিরিয়া আসিয়াছে জাপানী সৈন্যের রণ-কৌশলের সহিত তাহারা পরিচিত। এই অভিজ্ঞ বাহিনী একদিকে যেমন জাপানকে সাফল্যজনকভাবে প্রতিরোধ করিতে সক্ষম হইবে, অন্যান্য সৈন্যদিগকে প্রয়োজনীয় কৌশলাদি শিক্ষাদানেও তেমনই সমর্থ হইবে। এতদ্ব্যতীত ব্রহ্মে যে সকল বাধা মিত্র-শক্তির প্রতিকূলে দাঁড়াইয়াছিল, ভারতে তাহা নাই। সৈন্য, সমরোপকরণ ও বিমানাদি দ্বারা ভারতের ঘাঁটিগুলি যথেষ্ট সুদৃঢ় করা হইয়াছে। আক্রান্ত হইবার কালে সিঙ্গাপুরের যে সর্বোচ্চ শক্তি ছিল, বর্তমানে কলিকাতা এবং সিংহলে বিমানশক্তি তদপেক্ষা বহুগুণ বর্দ্ধিত হইয়াছে। সিংহলের গুরুত্ব কতখানি তাহা "ভারতবর্ষ"-এর গত জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় আমরা আলোচনা করিয়াছি। কিন্তু এই সিংহলকে রক্ষার জন্য যে কি বিপুল ব্যবস্থা করা হইয়াছে কলম্বোতে বিমান আক্রমণকালে জাপান তাহার কিঞ্চিৎ পরিচয় লাভ করিয়াছে। ব্লেনহিম ফ্লাইং ফোর্ট্রেস্ প্রভৃতি বিভিন্ন শ্রেণীর বিমান দ্বারা কলম্বোর বিমান ঘাঁটিকে যথেষ্ট শক্তিশালী করিয়া তোলা হইয়াছে। লণ্ডনের ন্যায় কলম্বোতে বেলুন অবরোধের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছে। অদূর ভবিষ্যতে জাপানকে আক্রমণ করিবার জন্য যে শক্তি সঞ্চয়ের প্রয়োজন, ভারত এবং

সিংহলকে সেই দিক হইতে সর্বতোভাবে উপযোগী করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে।

দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরেও জাপানকে ইতিমধ্যে এক নৌসংগ্রামে লিপ্ত হইতে হইয়াছিল—কিন্তু তাহার ফলাফল জাপানের অনুকূলে যায় নাই। টিমর, নিউগিনি, সলোমন প্রভৃতি দ্বীপে স্বীয় ঘাঁটিগুলিকে অধিকতর নিরাপদ করিবার এবং আমেরিকার সহিত অষ্ট্রেলিয়ার সামুদ্রিক সংযোগ বিচ্ছিন্ন করিবার উদ্দেশ্যে এক বিরাট জাপ নৌবাহিনী প্রবাল সাগরে তৎপর হইয়া ওঠে। কিন্তু মার্কিন নৌশক্তির সহিত সঙ্ঘর্ষে জাপ নৌবাহিনী যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত হয়। জাপান যে অবিলম্বে অষ্ট্রেলিয়ার চতুর্দিকে নিকটবর্তী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপগুলি অধিকার করিয়া অষ্ট্রেলিয়াকে অবরোধ করিতে প্রয়াসী এবং মার্কিন-অষ্ট্রেলিয়া সংযোগ বিচ্ছিন্ন করিতে সমুৎসুক, একথা আমরা একাধিকবার ভারতবর্ষের পাঠক-পাঠিকাগণকে জানাইয়াছি। উপরোক্ত উদ্দেশ্য সফল করিবার নিমিত্ত অতর্কিতে প্রবাল সমুদ্রে জাপ নৌবহরের অভিযান। কিন্তু তাহার এই অভিযান ব্যর্থ হইয়াছে। ফলে সম্প্রতি জাপ প্রধান মন্ত্রী টোজো অষ্ট্রেলিয়াকে শাসাইয়াছেন যে, বৃহত্তর পূর্ব এশিয়ার সংগঠন কার্য্যে অষ্ট্রেলিয়া জাপানের সহিত সহযোগিতা করিবার কথা যেন বিশেষ করিয়া পুনর্বার চিন্তা করিয়া দেখে, নতুবা তাহাকে ইহার ফল ভোগ করিতে হইবে! অষ্ট্রেলিয়ায় সম্প্রতি যথেষ্ট মার্কিন সৈন্য আনীত হইয়াছে, সুশিক্ষিত অষ্ট্রেলিয়ানবাহিনী আপন মাতৃভূমিকে রক্ষা করিবার ক্ষমতা রাখে। প্রধান মন্ত্রী টোজো যে একটা হুমকি দিয়া অষ্ট্রেলিয়াকে স্বীয় নিয়ন্ত্রণাধীনে আনিতে পারিবেন, এতটা দু'রাশা তিনি নিজেও মনের গোপন কোণে পোষণ করেন কিনা সে বিষয়ে আমাদের যথেষ্ট সন্দেহ আছে। কিন্তু তাহা হইলে জাপানের উদ্দেশ্য কি?

ব্রহ্মের যুদ্ধ সাময়িকভাবে শেষ হইয়া গিয়াছে। চীন-ব্রহ্ম সীমান্তে জাপান চার ডিভিসন সৈন্য আনিয়াছে। য়ুনানস্থ ওয়াংটিং-এ জাপ-সেনানায়ক সম্প্রতি সৈন্য সমাবেশ করিতেছেন। চীনাবাহিনীর প্রতিরোধ ভেদ করিয়া জাপ সৈন্য য়ুনানের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে সচেষ্ট। এদিকে আসামেও বোমা বর্ষিত হইয়াছে; চট্টগ্রামও জাপ বোমা বর্ষণে ক্ষতিগ্রস্ত। জাপানের প্রকৃত উদ্দেশ্য তবে কি? জাপান কি ভারতে যুদ্ধ পরিচালনে ইচ্ছুক? কি কি কারণে ভারতে জাপানের অভিযান পরিচালনা করা সম্ভব এবং তাহাতে বাধা কোথায় সে সম্বন্ধে আমরা 'ভারতবর্ষ'-এর বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় আলোচনা করিয়াছি। পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু বাংলা এবং আসামে জাপ বিমানবহর হইতে বোমা বর্ষিত হইলেও ইহা জাপান কর্তৃক ভারত আক্রমণের পূর্বাভাস কিনা সে সম্বন্ধে বিচার করা প্রয়োজন। ব্রহ্মদেশে জাপানের পক্ষে আভ্যন্তরীণ শাসন ব্যবস্থাদি অবলম্বনের জন্য মনোনিবেশ করা আবশ্যক। ভারতের আত্মরক্ষাশক্তি পূর্বাপেক্ষা যথেষ্ট বর্দ্ধিত হইয়াছে ইহাও জাপানের অজ্ঞাত নয়। বিশাল ভারতবর্ষে অভিযান পরিচালনা করিলে একদিকে যেমন বিরাট বাহিনী ও প্রভূত সমরোপকরণ নিযুক্ত

ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ

করিতে হইবে, অন্যদিকে তেমনই ইহা যথেষ্ট সময়সাপেক্ষ। ইহার উপর জাপ-জার্মান প্রশ্নও আছে। আবার চীনের প্রতি অভিযান পরিচালনা করিতে হইলেও যে বঙ্গদেশ ও আসামের প্রতি অবহিত না হইয়া উপায় নাই ইহাও অস্বীকার করা যায় না। চীনকে বহির্জগত হইতে বিচ্ছিন্ন-সংযোগ করিতে হইলে যেমন ব্রহ্মপথ জাপ নিয়ন্ত্রণাধীনে আনা প্রয়োজন, বাংলা এবং আসামের প্রতিও সেইরূপ অবহিত হওয়া সম্ভব। ভারত হইতে চীনের সরবরাহ এবং সংযোগ বিচ্ছিন্ন করিবার অভিপ্রায়ে এই বোমা-বর্ষণ একেবারে অসম্ভব না-ও হইতে পারে। বিশেষ জাপানকে বর্তমানে চীনের প্রতি অত্যধিক মনোযোগী বলিয়া বোধ হয়। মাত্র কয়েকদিন পূর্বে করমোজায় জাপান বিরাট স্থল ও নৌশক্তি সন্নিবিষ্ট করিয়াছে। চেকিয়াং প্রদেশে জাপ অভিযান শুরু হইয়াছে প্রবলভাবে। চেকিয়াং প্রদেশের রাজধানী কিন্‌ওয়া বর্তমানে অবরুদ্ধ। শেষ সংবাদে জানা গেল চীনাবাহিনী কিন্‌ওয়া পরিত্যাগ করিয়াছে এবং জাপানের বিরুদ্ধে আসিয়াছে গ্যাস ব্যবহারের অভিযোগ। চীন হইতে অবিলম্বে বিমানবহর প্রার্থনা করা হইয়াছে। চীনের প্রতি জাপানকে এতাদৃশ অবহিত হইতে দেখিয়া মনে হয় অদূর ভবিষ্যতে সে চীনের সহিত একটা বোঝাপড়া করিতে ইচ্ছুক। বৃটেন জাপানের বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক অভিযান পরিচালনার্থ প্রস্তুত হইবার পূর্বেই জাপান হয়তো চীনকে সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রণাধীনে আনিতে চাহে এবং সেইজন্য চীনের প্রতিরোধ শক্তি অবিলম্বে নষ্ট করিতে বদ্ধপরিকর। প্রাচ্যের যুদ্ধের গতি বর্তমানে সন্ধিক্ষণে আসিয়া উপনীত হইয়াছে এবং অন্যান্য রণাঙ্গনের সহিত ইহা বিচ্ছিন্ন সম্পর্ক নয় বলিয়া এই যুদ্ধের গতি কিয়ৎপরিমাণে ইয়োরোপের যুদ্ধের গতির উপর নির্ভরশীল।

আফ্রিকা ও ম্যাডাগাস্কার

বসন্ত অভিযানে জার্মানী কোন্ কোন্ রণক্ষেত্রে তৎপর হইয়া উঠিবে সেই প্রসঙ্গ আলোচনার সময় "ভারতবর্ষ"-এর গত জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় আমরা উত্তর আফ্রিকার যুদ্ধের কথা উল্লেখ করিয়াছিলাম এবং কি কারণে জার্মানীর পক্ষে উক্ত রণক্ষেত্রে অবহিত হওয়া প্রয়োজন তাহার যৌক্তিকতাও প্রদর্শন করিয়াছিলাম। এবারেও আমাদের অনুমান সত্যে পরিণত হইয়াছে। সম্প্রতি সংবাদ আসিয়াছে লিবিয়াতে জার্মান বাহিনী জেনারেল রোমেলের অধিনায়কত্বে বিশেষ তৎপর হইয়া উঠিয়াছে। কয়েকদিন পূর্বে সংবাদ প্রদত্ত হইয়াছিল যে, জেনারেল রোমেলকে রুশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনার্থ আফ্রিকা হইতে সরাইয়া আনা হইয়াছে এবং তাঁহার স্থান অধিকার করিয়াছেন ফন্ বিসমার্ক। কিন্তু রয়টার প্রদত্ত অধুনাতন সংবাদে প্রকাশ, লিবিয়াস্থ শত্রু সৈন্য পরিচালিত হইতেছে জেনারেল রোমেলের অধীনে। সম্প্রতি অক্ষশক্তি টব্রুকের পঞ্চাশ মাইল দক্ষিণে বীর হাকিমের অভিমুখে ট্যাঙ্ক সহযোগে অগ্রসর হয়। টব্রুকের পঁচিশ মাইল দক্ষিণ পূর্বে তাহাদের গতিরোধ করা হইয়াছে এবং অবস্থা সম্পূর্ণভাবে আয়ত্বে আসিয়াছে বলিয়া জেনারেল রিচি দৃঢ় অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। রুশ যুদ্ধের সহিত মধ্যপ্রাচীর এই অভিযানের যেমন অবিচ্ছেদ্য সংযোগ রহিয়াছে, প্রাচ্যের সংগ্রামের সহিতও তেমনই এই অভিযানের সম্পর্ক বিদ্যমান। বিশেষ ম্যাডাগাস্কার দ্বীপ বৃটিশবাহিনী কর্তৃক অধিকৃত হওয়াতে উত্তর আফ্রিকার এই অভিযান জার্মানীর পক্ষে অবশ্য প্রয়োজনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

বর্তমান সমষ্টিযুদ্ধে ম্যাডাগাস্কারের গুরুত্ব অসাধারণ। ম্যাডাগাস্কারের প্রসঙ্গ আলোচনাকালে গত সংখ্যায় আমরা বলিয়াছিলাম যে, জাপান ম্যাডাগাস্কারের প্রতি অবহিত হইতেছে এইরূপ কোন সংবাদের আভাষও যদি মিত্রশক্তিবর্গ জানিতে পারেন তাহা হইলে পূর্বাহ্ণেই তাহারা উক্ত দ্বীপটি স্বীয় নিয়ন্ত্রণাধীনে আনয়ন করিয়া জাপানের আশায় 'ছাই' দিবেন। জাপানকে সত্যই নিরাশ হইতে হইয়াছে। অতর্কিতে উষাকালে দ্বীপের উত্তর পশ্চিম অংশে দুইস্থানে বৃটিশবাহিনী অবতরণ করিয়া প্রতিপক্ষ আত্মরক্ষার্থ প্রস্তুত হইবার পূর্বেই দ্বীপটি অধিকার করে। ম্যাডাগাস্কারের উত্তরে দায়েগো সুয়ারেজ নৌঘাঁটি বিশেষ শক্তিশালী। কিন্তু এই নৌঘাঁটি অধিকার করিতে মিত্রশক্তির মাত্র কয়েকশত হতাহত হইয়াছে। একাধিক কারণে ম্যাডাগাস্কারের গুরুত্ব উপেক্ষণীয় নয়। দক্ষিণ আফ্রিকার নিরাপত্তা এই দ্বীপের উপর নির্ভরশীল। ম্যাডাগাস্কার যাহার হাতে থাকিবে, পোর্ট এলিজাবেথ, কেপটাউন প্রভৃতি দক্ষিণ আফ্রিকাস্থ বন্দরগুলির নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতাও তাহারই হাতে। সম্প্রতি ভূমধ্যসাগরে বৃটিশ জাহাজ গমনাগমনের পথ যথেষ্ট বিঘ্নসঙ্কুল হওয়ায় ভারত মহাসাগরাভিমুখী বৃটিশ জাহাজ-সকল উত্তমাশা অন্তরীপ ঘুরিয়া পূর্বাভিমুখে অগ্রসর হয়। পূর্বে সিঙ্গাপুর যেমন দুই সমুদ্রের দ্বার-রক্ষী, পশ্চিমে ম্যাডাগাস্কারও তদ্রূপ। ম্যাডাগাস্কার অক্ষশক্তির নিয়ন্ত্রণে যাইলে পূর্বাভিমুখী মিত্রশক্তিবর্গের জাহাজের একমাত্র পথও যথেষ্ট বিঘ্নসঙ্কুল হইয়া ওঠে। কাজেই ম্যাডাগাস্কারকে হস্তচ্যুত হইতে দেওয়া বৃটেনের পক্ষে অসম্ভব। ইহার উপর রুশ-যুদ্ধের প্রশ্ন আছে। বর্তমানে প্রভূত পরিমাণে মার্কিণ সাহায্য সমুদ্রপথে রুশ রণক্ষেত্রে প্রেরিত হইতেছে। ম্যাডাগাস্কার যদি শত্রুর অধিকারে যায় তাহা হইলে ইয়োরোপের যুদ্ধের উপরও তাহার যথেষ্ট প্রভাব পড়িবে। তদুপরি জাপান ম্যাডাগাস্কার স্বীয় নিয়ন্ত্রণাধীনে আনিতে পারিলে এডেনের পথে জার্মানীর সহিত সমুদ্রপথে তাহার যোগাযোগ রক্ষার ব্যবস্থা সম্ভব হইত। কিন্তু পূর্বাহ্ণে মিত্রশক্তি ম্যাডাগাস্কার অধিকার করায় অক্ষশক্তির এই সকল সুবিধাই নির্মূল হইয়াছে। বিশেষ ম্যাডাগাস্কার বৃটেনের হাতে যাওয়ায় রুশ-জার্মান যুদ্ধে ইহার যে অবশ্যম্ভাবী প্রভাব অপরিহার্য্য, তাহারই ফলাফল চিন্তা করিয়া জার্মানী আরও উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিয়াছে এবং পশ্চিম এশিয়ায় মিত্রশক্তির অখণ্ড সমর প্রচেষ্টা ক্ষুণ্ন করিবার উদ্দেশ্যে মিত্রপক্ষের সামরিক শক্তি ও মনোযোগ উত্তর আফ্রিকায় কিয়ৎ পরিমাণে নিযুক্ত করার জন্যই হিটলারের নির্দেশে জেনারেল রোমেলের এই অভিযান।

রুশ-জার্মান সংগ্রাম

বিগত একমাসে ইয়োরোপের রণাঙ্গনেও যথেষ্ট পরিবর্তন ঘটিয়াছে। কাহারও বিস্ময়, কাহারও বা জার্মানীর সামরিক শক্তি সম্বন্ধে সন্দেহ উদ্রেক করিয়া সোভিয়েট বাহিনী একাদিক্রমে

গ্রামের পর গ্রাম দখল ও জার্মানীর প্রচুর সমরোপকরণ হস্তগত করায় যে অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছিল, সম্প্রতি সেই অবস্থায় আসিয়াছে পরিবর্তন। জার্মানীর বহু প্রত্যাশিত গ্রীষ্মাভিযান আরম্ভ হইয়াছে। দক্ষিণ রুশিয়াতেই জার্মানী প্রথমে বিশেষ তৎপর হইয়া উঠিয়াছে—এবং তাহাই স্বাভাবিক। জার্মানী বিগত অভিযানে ক্রিমিয়ার যুদ্ধের সময় কার্চ দখল করিয়াছিল। পরে শীতকালে সোভিয়েট বাহিনী তাহা পুনরধিকার করে। গ্রীষ্মাভিযানের প্রারম্ভে জার্মানী পুনরায় কার্চেই প্রবল আক্রমণ চালায় এবং রুশ সৈন্যকে কার্চ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য করে।

কিন্তু দক্ষিণ রুশিয়ায় কার্চ জয়ই যে যুদ্ধের আসল উদ্দেশ্য নয়, তাহা স্পষ্ট। ককেশাশই জার্মানীর লক্ষ্য। কিন্তু ককেশাশ দখল করিতে হইলে কার্চে বিজয়লাভই যথেষ্ট নহে। একদিকে যেমন বাটুম দখলের জন্য কৃষ্ণসাগরস্থ রুশ নৌবাহিনীর শক্তি খর্ব করা প্রয়োজন, অপর পক্ষে তেমনই অষ্ট্রাখান দখল এবং কাস্পিয়ানের তীরদেশ পর্য্যন্ত প্রাধান্য বিস্তার করা আবশ্যক। অষ্ট্রাখানের গুরুত্ব কতখানি, ককেশাশ বিজয়ের গুরুত্ব, জার্মান বাহিনীর পক্ষে কোন্ পথে ককেশাশে অভিযান পরিচালন করা সম্ভব তাহার সম্ভাব্যতা, পথের অবস্থা ইত্যাদি সম্বন্ধে ১৩৪৮ সালের পৌষ মাসের 'ভারতবর্ষ'-এ বিস্তারিতভাবে আলোচনা করিয়াছি; পুনরুল্লেখে স্থান ও কাল হরণ না করিয়া আমরা অনুসন্ধিৎসুদিগকে উক্ত পৌষ সংখ্যা দেখিতে অনুরোধ করি।

জার্মানী ক্রিমিয়ায় গ্রীষ্মাভিযান আরম্ভ করিবার সঙ্গে সঙ্গে সোভিয়েটবাহিনী খারকভে প্রবল আক্রমণ সুরু করিয়াছে। ১২৫ মাইল বিস্তৃত রণাঙ্গনে মার্শাল টিমোশেঙ্কো ফণ্ বকের বাহিনীর উপর প্রবল আক্রমণ করিয়া ক্রমশঃ অগ্রসর হইতেছেন। যান্ত্রিক যুদ্ধের ইতিহাসে খারকভের যুদ্ধ অতুলনীয়। সোভিয়েট ব্যূহ ভেদ করিবার উদ্দেশ্যে জার্মান বাহিনী রণক্ষেত্রে শত শত ট্যাঙ্ক প্রেরণ করিতেছে। সমুদ্রতরঙ্গের ন্যায় ট্যাঙ্কবাহিনী একের পর এক অগ্রসর হইয়া আক্রমণ পরিচালনা করিতেছে; সোভিয়েট বাহিনী হইতেও তাহার প্রতিরোধের নিমিত্ত উপযুক্ত পরিমাণ ট্যাঙ্কবহর নিযুক্ত হইয়াছে। খারকভের সংগ্রামকে বলা হইয়াছে "ইস্পাতের যুদ্ধ।" রুশব্যূহের দুর্বল স্থান ভেদ করিবার জন্য জার্মান ট্যাঙ্ক বাহিনীর একাংশ মাঝে মাঝে মূল বাহিনী হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া সোভিয়েট সৈন্যের মধ্যে প্রবেশ করে। কিন্তু সোভিয়েট ট্যাঙ্ক ও ট্যাঙ্ক-বিধ্বংসী কামানের গোলায় তাহারা নিশ্চিহ্ন হইয়া যায়। ফলে সোভিয়েট বাহিনীর চাপ কিয়ৎ পরিমাণে কমাইবার জন্য জার্মান বাহিনী এক কৌশল অবলম্বন করে। ফণ্ বকের সৈন্যদল খারকভ হইতে ৭০ মাইল দক্ষিণে ইজুম্ ও বারভেন্‌কোভোর দিকে প্রতি আক্রমণ পরিচালনা করে। কিন্তু সোভিয়েট বাহিনীর প্রচণ্ড বাধা প্রদানে তাহা প্রতিহত হইয়াছে। খারকভের সংগ্রাম পৌঁছিয়াছে চরমে। নাৎসী সৈন্যের প্রাণপণ করিয়া বাধা প্রদান এবং সোভিয়েট বাহিনীর 'মার আর চল' নীতি গ্রহণ করিয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইবার চেষ্টা—খারকভের যুদ্ধে বর্তমান অবস্থা দাঁড়াইয়াছে এইখানে। এখন যুদ্ধের ফলাফল নির্ভর করিতেছে নূতন সৈন্য ও সমরোপকরণ আমদানীর উপর। যে পক্ষ নবোৎসাহদীপ্ত সৈন্য, ট্যাঙ্ক, বিমান প্রভৃতি প্রচুর সংখ্যায় খারকভে নিযুক্ত করিতে পারিবে, জয় হইবে তাহারই। আক্রান্ত শক্তি অপেক্ষা আক্রমণকারীর সৈন্য ও সমরোপকরণের সংখ্যা সর্বদা প্রভূত পরিমাণে অধিক থাকা আবশ্যক। সেই জন্য সোভিয়েট বাহিনীর পক্ষে নূতন আমদানী বিশেষ প্রয়োজন। খারকভের যুদ্ধে মার্শাল
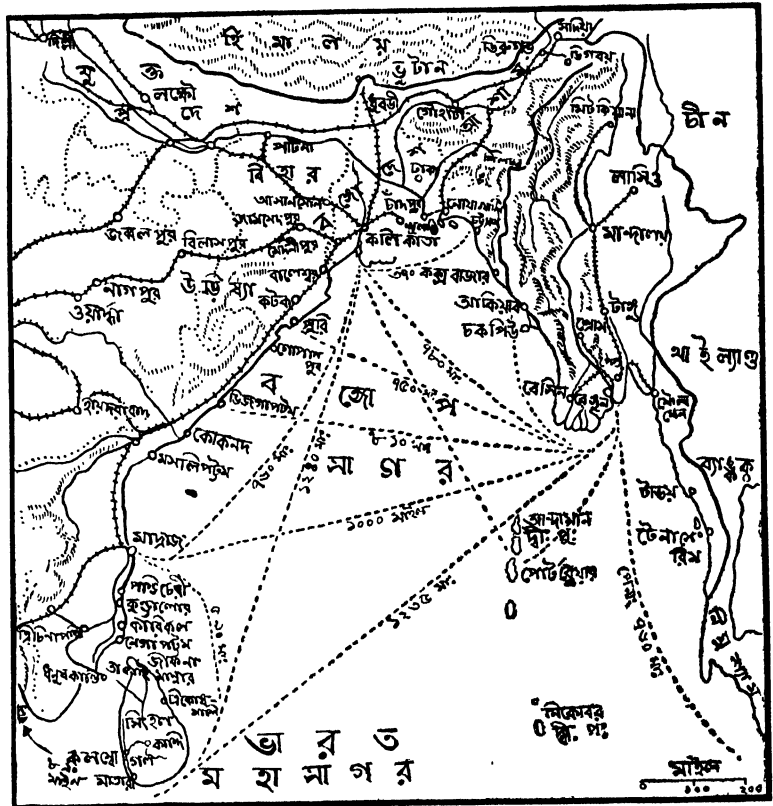
বঙ্গোপসাগর ও ভারত মহাসাগর

টিমশেঙ্কো যদি বিজয় লাভ করেন,তাহা হইলে সোভিয়েট বাহিনীর কার্য ত্যাগের গুরুত্ব যথেষ্ট হ্রাস পায়। খারকভে নাৎসী বাহিনী পরাজিত হইলে ক্রিমিয়াস্থ জার্মান সৈন্য মূল বাহিনী হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িবে এবং রষ্টোভের দিকে অগ্রসর হইতে সচেষ্ট নাৎসী সৈন্যের উপরও ইহার নিদারুণ প্রতিক্রিয়া উপস্থিত হইবে। অর্থাৎ সংক্ষেপে হিটলারের ককেশাশ অভিযান এইখানেই প্রথম 'ঘা খাইবে।' গ্রীষ্মাভিযানের প্রারম্ভে নাৎসী বাহিনী যদি এই বিরাট যুদ্ধে পরাজয়কে বরণ করিতে বাধ্য হয়, তাহা হইলে ১৯৪২ সালেই নাৎসী জার্মানীর সহিত সোভিয়েট রুশিয়ার সংগ্রামের চরম জয় পরাজয়ের মীমাংসা হইয়া যাইবে।

অক্ষশক্তির বিরুদ্ধে দ্বিতীয় রণাঙ্গন

"ভারতবর্ষ"-এর গত জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় জার্মানীর বিরুদ্ধে মিত্রশক্তির দ্বিতীয় রণাঙ্গন সৃষ্টির যৌক্তিকতা ও প্রয়োজনীয়তা লইয়া আমরা আলোচনা করিয়াছি। আমেরিকাস্থ সোভিয়েট দূত মঃ লিটভিনফ্ এবং ইংলণ্ডস্থ রুশদূত মঃ মেইস্কি জার্মানীর বসন্তাভিযানের প্রাক্‌কালে তাহাকে অন্য কোন এক রণক্ষেত্রে আক্রমণ করিবার জন্য আবেদন জানাইয়াছিলেন। কোন এক রাষ্ট্রের পক্ষে একই সময়ে একাধিক রণক্ষেত্রে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার অসুবিধা অনেক। জার্মানী যে একাধিক রণাঙ্গন সৃষ্টি করিতে অনিচ্ছুক, জার্মান যুদ্ধের গতি লক্ষ্য করিলেই তাহা ধরা যায়। জার্মানীর এড়াইয়া যাইবার কারণ সম্বন্ধেও যথাস্থানে আমাদের বহু আলোচনা হইয়াছে। ১৯১৭-১৮ সালে গত মহাযুদ্ধের যে অবস্থা দাঁড়াইয়াছিল, আজিকার বিশ্বসংগ্রামে জার্মানীর অবস্থা বর্তমানে সেই স্থানে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। সৈন্য এবং সমরোপকরণের ক্ষয় হইয়াছে নিদারুণ, বহু দেশের পক্ষে যুদ্ধের এই দীর্ঘ স্থায়িত্ব হইয়াছে দুর্বহ, শোচনীয় অর্থনীতিক অবস্থা একাধিক পাশ্চাত্য রাজ্যে প্রকট হইয়া উঠিয়াছে, স্বাধীনতা-হারা হৃতস্বাতন্ত্র্য বহু দেশের গণমণ্ডলীর নৈতিক শক্তি, ধৈর্য্য এবং স্থৈর্য্য পৌঁছিয়াছে চরমে, ২৮ বৎসর পূর্বেকার মহাযুদ্ধের আক্রমণকারী শক্তি এবারেও শিল্পোৎপাদন শক্তির শেষ সীমায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। গত মহাযুদ্ধের ন্যায় এবারেও সুদূর য়্যাটল্যান্টিকের অপর তীরে এক প্রবল শক্তি প্রচণ্ড যান্ত্রিকশক্তির সাহায্যে আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে বিশাল অস্ত্রাগার নির্মাণ করিয়া চলিয়াছে।

কিন্তু তবুও একাধিক রণাঙ্গন সৃষ্টির প্রয়োজনীয়তার কথা উচ্চারিত হইতেছে কেন? একথা অবশ্যই স্বীকার্য্য যে নাৎসী বাহিনীর প্রবল আক্রমণ প্রতিরোধ করিবার দায়িত্ব প্রধানত বহন করিতেছে রুশিয়া। গ্রীষ্মাভিযানে জার্মানী যে সোভিয়েট প্রতিরোধ শক্তি চূর্ণ করিবার জন্য প্রকৃতপক্ষে সমগ্র ইয়োরোপের সংহতশক্তি লইয়া প্রচণ্ড বেগে রুশিয়ার উপর শেষবারের ন্যায় আপনার সকল শক্তি প্রয়োগ করিবে, ইহা অনস্বীকার্য্য। কাজেই মিত্রশক্তি যদি এই সময় অন্য কোন নূতন রণাঙ্গন সৃষ্টি করিয়া নাৎসী শক্তির একাংশকে সেইখানে আত্মরক্ষার্থ নিয়োজিত করিতে বাধ্য করেন তাহা হইলে নাৎসী জার্মানীর ধ্বংসের সময় যেমন আগাইয়া আসিবে দ্রুততর বেগে, সোভিয়েট রুশিয়ার বিজয়লাভও হইবে তেমনই সহজতর। গোলযোগের আশঙ্কা করিয়া হিটলারকে নরওয়েতে সৈন্য প্রেরণ করিতে হইয়াছে। বৃটিশ বোমারু বিমান কয়েকদিন নরওয়ের উপর প্রবল বোমা বর্ষণ করিয়াছে। নরওয়ের উপকূলে বাস করা অসাধ্য হইয়া উঠায় সেখান হইতে লোকাপসরণ করিতে হইয়াছে। কেহ কেহ বলিতেছেন যে, বৃটেন বিমান আক্রমণের দ্বারাই দ্বিতীয় রণক্ষেত্রের প্রয়োজনীয়তা মিটাইতেছে। ফ্রান্সের উপকূল, বেলজিয়ম, নরওয়ে, খাস জার্মানী প্রভৃতি বিভিন্ন স্থানে বোমা বর্ষণ করিয়া বৃটেন নাৎসী বিমান শক্তির একাংশকে রুশ রণক্ষেত্র হইতে দূরে রাখিয়া আপন আত্মরক্ষার্থ তাহাকে ব্যাপৃত থাকিতে বাধ্য করিতেছে। বিমান আক্রমণে জার্মানী অসুবিধায় পড়িলেও দ্বিতীয় রণাঙ্গন সৃষ্টির প্রয়োজন ইহাতে মিটে কি? জার্মানী খাস ইংলণ্ডে দুই বৎসরের অধিককাল প্রচণ্ড বোমা বর্ষণ করিয়াছে, কিন্তু বৃটেনকে হীনবল করিতে পারিয়াছে কি? কাহারও মতে স্থলপথে জার্মানীকে কোন নূতন স্থানে আক্রমণ করা দুঃসাধ্য। ইহার জন্য চাই অগণিত সৈন্য, প্রচুর রণসম্ভার, যথেষ্ট জাহাজ, সংযোগ রক্ষার সকল প্রকার সুব্যবস্থা। তদুপরি সমুদ্রোপকূলস্থ সকল ঘাঁটিই রাজকীয় বিমানবাহিনীর বোমা বর্ষণে ক্ষতিগ্রস্ত। কাজেই এইভাবে জার্মানীকে নূতন এক রণাঙ্গনে আক্রমণ করা সহজে সম্ভবপর নয়। কিন্তু লিট্‌ভিনফ্ ও তাঁহার সমর্থনকারীরা বলেন যে, আক্রমণাত্মক যুদ্ধ পরিচালনার সময় খানিকটা দায়িত্ব গ্রহণ করিতেই হয়। নিষ্ঠুর সর্বগ্রাসী যুদ্ধে নাৎসী বর্বরতাকে চূর্ণ করিতে হইলে প্রতি পক্ষকেও যথেষ্ট দায়িত্ব শিরে লইয়া দৃঢ়হস্তে প্রতি আক্রমণ করিতে হইবে। ৩১।৫।৪২

আশুতোষ-প্রশস্তি

শ্রীমুণীন্দ্রপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী

জ্ঞান-গঙ্গা-বিরাজিত শির, প্রতিভা-ইন্দু শোভিত ভাল,
আশুতোষ নাম সার্থক তব, কীর্ত্তি মহিমা ঘোষিছে কাল!
বিদ্যামঞ্চে নটরাজ তুমি, প্রাচীনে দিয়াছ নূতন রূপ,
বিশ্ববিদ্যা-দেউলে জ্বেলেছ, সাধন-প্রদীপ পূজার ধূপ!
বাঙলা মায়ের, বাঙলা ভাষার, বাঙালীর তুমি রেখেছ মান,
সিন্ধুপারেও জানে জনগণ ভারতের তুমি সুসন্তান!

হস্তে তোমার শাসন-ত্রিশূল, হৃদয় পূর্ণ করুণায়,
শরণাগতের সঙ্কটত্রাতা, কেঁদেছ দীনের বেদনায়!
দুষ্টদমন, শিষ্টপালন তোমার মন্ত্র-ছন্দ,
নন্দিত তুমি বন্দিত ভবে আশুতোষ ভবানন্দ!
অপূর্ব্ব প্রভাবে জাগাইয়াছিলে দেশ ও সমাজ জাতি,
আজিকে সহসা নির্ব্বাণপ্রায় বাণীর দেউলে বাতি!

অলোক হইতে আলোক বিতর বরাভয় কর দান,
প্রলয় আঁধার মাভৈ-বিষাণে বাঁচাও ভয়ার্ত্ত-প্রাণ!

খাদ্যশস্যবৃদ্ধি প্রচেষ্টা

শ্রীকালীচরণ ঘোষ

দেশের মধ্যে ভোজ্যশস্য উৎপাদন বৃদ্ধির প্রচেষ্টা অত্যন্ত সময়োপযোগী হইয়াছে। শস্যের মূল্য বর্ত্তমানে যেরূপ চড়া, তাহাতে উৎপন্ন শস্য হইতে চাষী ও ব্যাপারীর কিছু মোটা আয় হইবার সম্ভাবনা। পাট ও তুলা ভারতের প্রধান আয় ছিল; কোন কোন বৎসর পাট প্রায় চল্লিশ কোটী টাকার এবং তুলা ৯৫ কোটী টাকার ভারতহইতে বিদেশে রপ্তানি হইয়াছে। এখন তাহা যথাক্রমে দশ কোটী ও ষোল কোটী টাকায় নামিয়াছে। রপ্তানি যে শীঘ্র বৃদ্ধিপাইবে এরূপ আশা করা যায় না। বিশেষতঃ যুদ্ধ যত চলিতে থাকিবে সমস্যা ততই জটিল হইবে। এ সময় ভোজ্য শস্যের মূল্য চড়িয়াছে। আমদানি বন্ধ হওয়ায় এবং যুদ্ধের কাল বিস্তৃত হওয়ায় এই জাতীয় পণ্যের মূল্য হঠাৎ নামিয়া যাইবার সম্ভাবনা অল্প। আমদানি না থাকায় দেশের মধ্যে খাদ্যাভাব হইবে এবং স্থানিক দুর্ভিক্ষ ঘটিবার যথেষ্ট সম্ভাবনা রহিয়াছে।

এই সকল দিক বিবেচনা করিলে ভোজ্যশস্য বৃদ্ধি আন্দোলনের উপযোগিতা সহজেই অনুমান করা যায়। কিন্তু ইহার পিছনে আন্তরিকতা এবং কার্য্য পরম্পরার যোগাযোগ স্থাপন করিতে না পারিলে, সরকারী চাকুরিয়াদের বর্দ্ধিত সংখ্যা ও বেতনের হার বৃদ্ধি ব্যতীত আর কিছুই সম্ভব নহে।

দেশে অন্নাভাব ঘটিয়াছে, তাহার প্রমাণ প্রয়োজন নাই। যখন লোকে গড়ে ৬ টাকা, সাড়ে ৬ টাকা মণ চাউল ক্রয় করিতেছে, মাঝে মাঝে আটা বাজার হইতে অদৃশ্য হইতেছে, তখন (১৯৪১-৪২) ৮ কোটী ৯৬ লক্ষ টাকা মূল্যের চাউল, গম ও আটা রপ্তানি করিতে দেওয়া কতদূর যুক্তিযুক্ত তাহা ভাবিবার কথা। এই রপ্তানিতে চাষীর আয় বৃদ্ধি পাইলে কথা ছিল না। কিন্তু যাহারা ফড়িয়া, দালাল, কুঠীওয়ালা ধনবান, তাহারা সময়মত কম মূল্যে কিনিয়া মাল ধরিয়া রাখিয়াছে। তাহাতে দরিদ্র চাষী অতিরিক্ত কিছুই পায় নাই। বরং বলা যায় ধনী রপ্তানিকারকেরা কমমূল্যে কিনিয়া না লইলে ঐ সকল জিনিষ এদেশেই অধিক মূল্যে বিক্রীত হইত এবং দেশবাসী পেট পুরিয়া খাইতে পাইত। যাহারা এই রপ্তানির সংবাদ জানে, তাহাদের নিকট ভোজ্যশস্য অধিক মাত্রায় উৎপাদনের পরামর্শ রহস্য বা পরিহাস বলিয়া মনে হইবে।

অধিক শস্য উৎপাদন করিতে হইলে অধিক জমি, অনুকূল আবহাওয়া ও সেচ (irrigation), উন্নত চাষ ও বীজ এবং সার এই সকলের কোনও না কোনও একটী বা দুইটীর ব্যবস্থার প্রয়োজন। তাহা ছাড়া মাটীর বিশ্লেষণ দ্বারা জমীতে চাষের উপযোগিতা নির্ণয় করা আবশ্যক।

হঠাৎ নূতন জমি হাঁসিল্ করিয়া চাষ করার সুবিধা অসুবিধা চাষী বুঝিবে। যে জমিতে চাষী বহুকাল চাষ করে না বা ভোজ্য শস্যের অনুপযোগী বলিয়া ফেলিয়া রাখিয়াছে তাহার পিছনে অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানকে উপেক্ষা করা চলিবে না। একেবারে অনাবাদী জমিতে চাষ করিবার পূর্ব্বে জমি বিশ্লেষণ করিয়া না দেখিয়া কেবলমাত্র চাষের উৎসাহ দিলে চাষ হইতে পারে, কিন্তু আশানুরূপ ফসল হইবে না, চাষী ক্ষতিগ্রস্ত হইবে।

প্রতি একরে ইতালীতে ৪০৩২ পাউণ্ড, জাপানে ৩৩৭০, মিশরে ২৯১২, তুরস্কে ২৬৭১, চীনে ২৪৬৪, ফরমোসায় ২২৪০, কোরিয়ায় ১৭৫০ পাউণ্ড ধান হয়: সেস্থলে ভারতে ১২৯৯ পাউণ্ড মাত্র। এ জ্ঞান ভারতসরকারের অবশ্যই ছিল, কিন্তু এ পর্য্যন্ত উন্নতির কোনও চেষ্টা হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। আজ "নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ" হইয়াছে; তাই বেগে আন্দোলন চলিতেছে। আবহাওয়ার উপর কোনও হাত নাই; সেচের উন্নতি করা রাতারাতি সম্ভব নহে। এখন বাকী রহিল সার ও বীজ, তাহা সাধারণের পক্ষে পাইবার কি ব্যবস্থা হইয়াছে তাহা জানা যায় নাই। লোকে যে এ সকলের সুবিধা পাইতে পারে এবং কোথায় তাহা পাওয়া যায়, তাহা চাষী না জানিলে ইহা সাধারণের কি উপকারে আসিতে পারে? সরকারী চাকুরিয়াদের মস্তিষ্কের মধ্যে বা সরকারী কুঠীর বারান্দা বা দালানে বীজ ও সার থাকিলে জমিতে চাষ হইবে না; যেখানে ঐসকল বস্তুর অবস্থান কল্পনা করা যাইতেছে, তাহাই উর্ব্বর হইবে মাত্র। এতদিনে সরকার হইতে সার ও বীজ পাইবার কেন্দ্রগুলি প্রকাশ করা উচিত ছিল এবং এই সকল কেন্দ্র যাহাতে দূর পল্লীর চাষীর পক্ষে সহজগম্য হয়, তাহা করা একান্ত প্রয়োজন।

সরকারী কৃষিবিভাগের বিশেষজ্ঞরা জানেন কি না বলিতে পারি না, এক এক জাতীয় বীজ কোনও কোনও বিশেষ জমি পছন্দ করে; সুতরাং জমি হিসাবে বীজের তারতম্য হইতে পারে; ইহা সকলকে জানাইবার কোনও ব্যবস্থা হইয়াছে কি? তাহা না করিয়া চাষ করিতে দিলে ব্যয়ের তুলনায় আয় নিতান্ত কম হওয়া স্বাভাবিক।

কোনও প্রদেশে যে ফসলের চাষ হয় না, তাহা প্রবর্ত্তন করিতে হইলে চাষীকে সম্পূর্ণ শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন। সরকার পক্ষ হইতে ইহার ব্যবস্থা করিতে হয়। তাহা না করিয়া মুখের কথা বলিয়া ছাড়িয়া দিলে লোককে ক্ষতিগ্রস্ত করা হইবে।

সহরে বসিয়া মঞ্চের উপর বক্তৃতা বা বেতারযোগে বাতাসে বাণী ছাড়িয়া দিলে কাজ অগ্রসর হইবে না। সমস্ত জেলার মধ্যে কেন্দ্রীয় স্থান নির্ব্বাচন করিয়া সরকার পক্ষ হইতে আদর্শ কৃষি-ক্ষেত্র স্থাপন করিয়া লোকশিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা হউক। লোকে দেখিয়া আশ্বস্ত হউক যে, তাহাদের জমিতেও ঐরূপ সম্ভব। এই সকল সরকারী প্রতিষ্ঠানের নিখুঁত হিসাব দ্বারা প্রমাণ করা প্রয়োজন যে নূতন বীজ, সার ও উন্নত প্রণালীতে চাষ করিলে লাভবান্ হওয়া যায়। তাহা না হইয়া যদি একমণ "অত্যাশ্চর্য্য" ধান উৎপাদন করিতে আট টাকা পড়ে তাহাতে কাহারও কোনও লাভ নাই। তাহা ছাড়া এইরূপ পরীক্ষাক্ষেত্র হইতে সহজেই

ধরিতে পারা যাইবে, সরকারী কৃষি বিভাগে কতকগুলি পুস্তকপড়া পণ্ডিত "শ্বেত হস্তী" গরীব প্রজাদিগকে শোষণ করিতেছে।

জমির পরিমাণ বৃদ্ধি করা সম্পর্কে অসুবিধার কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। যে বৎসর 'grow more food' বিশেষ প্রয়োজন বলিয়া রাজসরকারের "টনক্ নড়িয়াছে' সেই বৎসর নূতন অন্তরায় বর্ত্তমান। অনেক স্থলে স্থান ত্যাগের আদেশ হইয়া গিয়াছে। সে সকল স্থলে চাষ হইবে না। অন্যান্য নানা স্থান 'non-family area' অর্থাৎ এই সকল স্থানে (সরকারী চাকুরিয়াদের) পরিবার-বর্গ রাখা নিরাপদ নয়—বলিয়া ঘোষিত হইয়াছে। সে স্থানের আয়তন কম নহে। চাষীরা সেখানে কি করিবে? চাষ করিবার পর যে কোনও মুহূর্ত্তে "ইভাকুয়েসন" হুকুম জারি হইতে পারে। চাষীর নিকট ফলনোন্মুখ বৃক্ষ সন্তানের ন্যায় প্রিয়; তাহা ত্যাগ করিয়া যাওয়া আত্মীয় বিয়োগব্যথার সহিত সমান। যদি ইহার জন্য ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা থাকে, কি হিসাবে তাহারা খেসারত পাইবে? কতদিনে এবং কাহার নিকট পাইবে? ঐ টাকা আদায় করিতে তাহা অপেক্ষা অধিক টাকা ঘর হইতে খরচ করিতে হইবে না ত? তাহা ছাড়া 'grow more food" (বৃটিশের নিকট ধার করা বুলি) উদ্দেশ্য কিরূপে সিদ্ধ হইবে?

যুদ্ধায়োজনে শত্রুর গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করিতে বহু পরিমাণ জমি এ বৎসর অনাবাদী রাখিতে হইবে। ইহাতে ঐ সকল স্থানে চাষ হওয়া সম্ভব নহে; ফলে অন্য বৎসর অপেক্ষা কম ফসল পাওয়া যাইবে এরূপ আশঙ্কা অমূলক নহে।

যখন আন্দোলন সুরু হয়, তখন জমিতে নয় ইঞ্চি হইতে এক ফুট পাট গাছ জন্মিয়াছে এবং পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা অধিক জমিতে পাট বুনিবার জন্য তখন কর্ত্তারা উৎসাহ দিয়াছেন। এখন কি পাট ক্ষেত নষ্ট করিয়া ধান বুনিতে হইবে? এ কথা স্পষ্ট করিয়া কেহ বলেন নাই। পাট চাষের সমস্ত ব্যয় এবং ধান উৎপাদনের ব্যয় উৎপন্ন ধানের উপর ধরিয়া দিলে যে দর পড়িবে, তাহার মূল্য বাজারে কে দিবে? সরকার পক্ষ হইতে কি ইহার ব্যবস্থা হইয়াছে?

লোকের আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত খারাপ, প্রাত্যহিক দ্রব্যাদি দুর্ম্মূল্য; লোকে বীজ ধান খাইতেছে, হাল গরু বিক্রয় করিতেছে, অনাহারে মৃতপ্রায়। নূতন চাষের ব্যয় এবং দৈহিক শক্তির অভাব এবার ভোজ্যশস্য উৎপাদনের প্রবল পরিপন্থী। চাষের জন্য অগ্রিম অর্থ দিবার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

অধিক ভোজ্য শস্য উৎপাদনের আন্দোলন প্রয়োজন তাহা বলিয়াছি। কার্য্যক্ষেত্রে তাহার কয়েকটী মাত্র অসুবিধা দেখাইয়াছি। ইহা ছাড়া মানসিক অবস্থা সরকারের অনুকূল নহে বলিয়া আরও কয়েকটী ঘোরতর অসুবিধা আছে; তাহার আলোচনা বর্ত্তমান সময়ে সমীচীন নহে। অন্তরের সহিত কামনা করি সরকারের প্রচেষ্টা ফলবতী হউক, কিন্তু আলোচ্য বর্ষে ধান্যোৎপাদনের কাল অত্যাসন্ন বলিয়া অন্ততঃ বাঙ্গলাদেশে পূর্ব্বাপেক্ষা কম পরিমাণ ভোজ্যশস্য উৎপন্ন হইবে বলিয়া আশঙ্কা করা যাইতেছে।

দেবী সুহাসিনী

শ্রীবীণা দে

আহা থাক্ থাক্ ঘুমাক্ ঘুমাক্
জাগিয়ো না আর জাগিয়ো না।
সাধনার ধন এ মহাশয়নে
কাঁদিয়ো না আর কাঁদিয়ো না।
দেখ দেখি ঐ নিমীলিত আঁখি
শান্ত আবেশে মুদিত নহে কি?
দেখ অমৃত রূপ—মুছে ফেল আঁখি
ফেলো না জল ফেলো না।
মা'র ভালে চন্দন, রক্ত-সিঁদুর
কী শোভা সঁপেছে বদনে অই!
এ যে মহা-শিল্পীর শ্রেষ্ঠ প্রতিমা!
হেথা ব্যথা বেদনার কালিমা কই?
আজ "রোগ-রাহু হ'তে মুক্ত চাঁদিমা,"
শায়িতা যেন গো ধ্যানরতা উমা,
এ যে নারী-জনমের মূর্ত্ত মহিমা
কিছু নাই মুখে শান্তি বই।

শুনি পৃথিবী ছড়িয়া প্রলয়-বিষাণ
মহারুদ্রের পিণাকধ্বনি
আজ মা'র কানে শুধু মরণ-শ্যামের
মোহন বাঁশরী উঠিল রণি!
তাই রাঙা হাসি ভরা মধুর মু'খানি,
অলক্তে রাঙা চরণ দু'খানি—
চ'লেছেন মাতা দেবী সুহাসিনী
লাজ, মায়া, ভয় মনে না গণি'।
মাগো, আজ শুধু এইটুকু চাহি
তোমার চরণে প্রণাম করি—
তোমার মতই পতি-প্রেম পেয়ে
তোমারই মতন যেন গো মরি।
ফুল-সাজে সাজি' নিলে মা বিদায়,
নব-বধূ বেশে শুলে মা চিতায়,
দীপ মিশে গেল মহান্-শিখায়
পতি-দেবতার আরতি করি—

পুড়ে গেল ধূপ নিঃশেষ হ'য়ে
রহিল সুরভি বক্ষ ভরি'।
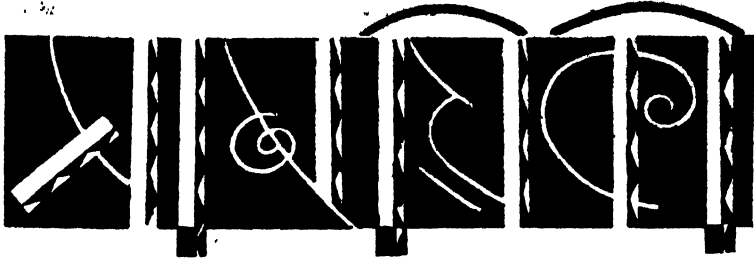
ভারতবর্ষের ত্রিংশবর্ষ—

বর্ত্তমান আষাঢ় সংখ্যায় ভারতবর্ষের ত্রিশ বৎসর বয়স আরম্ভ হইল। গত ২৯ বৎসর কাল যাঁহাদের কৃপালাভ করিয়া বাঙ্গালা সাহিত্যক্ষেত্রে ভারতবর্ষ তাহার আসন সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছে, আমরা আজ তাঁহাদের সকলকে আমাদের সশ্রদ্ধ অভিবাদন জ্ঞাপন করিতেছি। আজ আমরা শ্রদ্ধার সহিত প্রতিষ্ঠাতা স্বর্গত কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ও গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের কথা স্মরণ করিতেছি। তাঁহাদের প্রদর্শিত পথে যেন আমরা চিরদিন চলিতে সমর্থ হই, আজিকার দিনে সর্ব্বদাই এই প্রার্থনা করি। গত কয়েক বৎসরেব মধ্যে আমরা রায় বাহাদুর জলধর সেন মহাশয় ও সুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে হারাইয়া দারুণ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছি! রায় বাহাদুর পরিণত বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন বটে, কিন্তু সুধাংশুবাবুর বিয়োগে 'ভারতবর্ষে'র যে ক্ষতি হইয়াছে, তাহা কখনও পূর্ণ হইবার নহে। লেখক, গ্রাহক, বিজ্ঞাপনদাতা প্রভৃতি সকলের শুভেচ্ছা যেন আজ ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ গৌরবোজ্জ্বল করে, শ্রীভগবানের নিকট এই আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করি।

দ্বিজেন্দ্রলাল স্মৃতি উৎসব—

গত ১৭ই মে হাওড়া বালীর সরস্বতী পাঠাগারের কর্তৃপক্ষ স্বর্গত কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায় মহাশয়ের বার্ষিক স্মৃতি পূজার অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। বিশ্বভারতীর ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক শ্রীযুত দেবব্রত মুখোপাধ্যায় ঐ উৎসবে পৌরহিত্য করিয়াছিলেন। ২৯ বৎসর পূর্ব্বে ঐ তারিখে দ্বিজেন্দ্রলাল ভারতবর্ষের প্রথম বর্ষের প্রথম সংখ্যাব সম্পাদন কার্য্য করিতে করিতে মহাপ্রয়াণ করিয়াছিলেন।

কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদ—

কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদ ও রাষ্ট্রীয় পরিষদের জীবন আরও এক বৎসর বাড়াইয়া দেওয়া হইবে বলিয়া স্থির হইয়াছে। পরিষদ দুইটি ইতিপূর্ব্বে ৪বার সময় বিস্তৃতি পাইয়াছিল, এবার পঞ্চমবার পাইল। পরিষদের সদস্যগণ ভাগ্যবান—কারণ নির্ব্বাচকমণ্ডলীর সম্মুখে উপস্থিত না হইয়াও তাঁহারা দীর্ঘকাল সদস্যের অধিকার ভোগ করিতেছেন। মহাযুদ্ধের অজুহাতে ও ব্যয় সঙ্কোচের জন্য এই ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ইহার পর বর্ত্তমান সদস্যগণের আর কোন অভিযোগের কারণ থাকিবে না।

বাস্তুত্যাগের দরুণ ক্ষতিপূরণ—

একদল প্রতিনিধির নিকট বাঙ্গালার অন্যতম মন্ত্রী শ্রীযুত প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় জানাইয়াছেন যে বাস্তুত্যাগের ফলে যাঁহাদের আয় হ্রাস হইবে বাঙ্গালার মন্ত্রিসভা তাঁহাদিগকে ক্ষতিপূরণ প্রদানের কথা বিবেচনা করিতেছেন। প্রয়োজন হইলে এ বিষয়ে ভারত সরকারের সহিতও পরামর্শ করা হইবে। গুরুতর সামরিক প্রয়োজনে বাঙ্গালা দেশের বহু গ্রাম হইতে অধিবাসীদিগকে সরাইয়া দেওয়া প্রয়োজন হইয়াছে। এ জন্য যে লোকের অসুবিধা ও কষ্ট হইতেছে, তাহা মন্ত্রী মহাশয় স্বীকার করিয়াছেন।

যতীন্দ্রকৃষ্ণ দত্ত—

কলিকাতার প্রসিদ্ধ কাগজবিক্রেতা মেসার্স জন ডিকিনসন কোম্পানীর বড়বাবু যতীন্দ্রকৃষ্ণ দত্ত মহাশয় গত ১১ই জ্যৈষ্ঠ সোমবার ৫৮ বৎসর বয়সে তাঁহার বাগবাজারস্থ ভবনে সহসা পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি রামকৃষ্ণ মিশনের স্বামী সারদানন্দের মন্ত্র শিষ্য ছিলেন এবং নিজেও একজন ভক্ত ছিলেন। ২০ বৎসর বয়সে তিনি উক্ত কোম্পানীতে সামান্য কাজ আরম্ভ করিয়া নিজ অধ্যবসায়, কর্ম্মদক্ষতা ও পরিশ্রমের গুণে মাসিক হাজার টাকার বেতনের বড়বাবু হইয়াছিলেন। তিনি স্বামী নির্ম্মলানন্দের ভ্রাতুষ্পুত্র ছিলেন এবং আজীবন কুমার ছিলেন। সাধু ও সন্ন্যাসীগণের সেবায় তিনি আনন্দ লাভ করিতেন এবং তাহাই তাঁহার জীবনের ব্রত ছিল। কাগজের ব্যবসায়ে তাঁহার
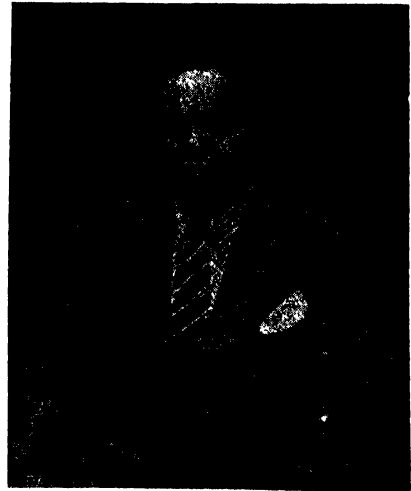
যতীন্দ্রকৃষ্ণ দত্ত

মত অসাধারণ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তি অতি বিরল। কলিকাতার সকল সংবাদ ও সাময়িকপত্রের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল

এবং তিনি সকলকে সাহায্যদানে কখনও কার্পণ্য করিতেন না। আমরা তাঁহার পরলোকগত আত্মার সদগতি কামনা করি।

শাসন পরিষদের সদস্য গ্রহণ—

সম্প্রতি ভারত সরকারের শাসন পরিষদের অন্যতম সদস্য ডাক্তার রাঘবেন্দ্র রাও অসুস্থতার জন্য পদত্যাগ করিয়াছেন। পরিষদে এখন কয়েকটি সদস্যের পদ খালি হইয়াছে—(১) সার আকবর হায়দারীর মৃত্যুর পর নূতন সদস্য গ্রহণ করা হয় নাই (২) অন্যতম সদস্য সার এণ্ড্রু ক্লো আসামের গভর্ণর নিযুক্ত হইয়াছেন (৩) ডাক্তার রাঘবেন্দ্র রাও পদত্যাগ করিলেন (৪) খুব সম্ভব সার রামস্বামী মুদালিয়ার বড় চাকরী পাইয়া ইংলণ্ডে যাইবেন। এই ৪টি পদে কোন কোন ভাগ্যবান নিযুক্ত হইবেন, তাহা লইয়া নানারূপ জল্পনা চলিতেছে। বাঙ্গালা হইতেও অনেকে ঐ সকল পদ লাভের জন্য যে চেষ্টা না করিতেছেন, তাহা নহে।

চিনি সমস্যা—

দেখিতে দেখিতে কয়দিনের মধ্যে কলিকাতার বাজারে চিনি দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিয়াছে। ১২ টাকা মণের চিনি এখন ২২ টাকা মণ দরেও বাজারে পাওয়া যায় না। সাধারণতঃ ২০ টাকা মূল্যে চিনি পাওয়া গেলেও বহু দোকানদার নিঃসঙ্কোচে ২৫ টাকা মণ দরে চিনি বিক্রয় করিতেছেন। ফলে আখের গুড়ের দামও বাড়িয়া ৮ টাকা স্থলে ১৫ টাকা পর্য্যন্ত হইয়াছে। দরিদ্র জনসাধারণের দুঃখের শেষ নাই। চায়ের দরও হঠাৎ বাড়িয়া দ্বিগুণ হইয়াছে। চা ও চিনি এখন ধনীদরিদ্র সকলের নিকটই অপরিহার্য্য ও নিত্যব্যবহার্য্য সামগ্রী। কাজেই সর্ব্বত্র এই সকল জিনিষের অভাবের কথা আলোচিত হইতেছে।

অধ্যাপক নলিনী চট্টোপাধ্যায়—

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরাজি সাহিত্যের অধ্যাপক নলিনীমোহন চট্টোপাধ্যায় মহাশয় গত ১২ই মে ৫৫ বৎসর বয়সে সহসা পরলোকগত হইয়াছেন। নলিনীবাবু সুপণ্ডিত ছিলেন এবং ইংরাজি (এ. ও বি গ্রুপ), লাটিন, গ্রীক ও আরবী ভাষায় এম-এ পাশ করেন। তাহা ছাড়া তিনি ফরাসী, জার্ম্মাণ ও হিব্রু ভাষা জানিতেন। বাঙ্গালা ও ইংরাজি উভয় ভাষায় তিনি সুন্দর কবিতা লিখিতেন।

ঢাকার মামলা প্রত্যাহার—

প্রধান মন্ত্রী মিঃ এ-কে-ফজলল হক, মন্ত্রী ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতির ঢাকা পরিদর্শনের ফলে সেখানে সকল সাম্প্রদায়িক মামলার অবসান ঘটিয়াছে। কতকগুলি মামলায় উভয় পক্ষ স্বাক্ষর করিয়া মামলা আপোষ করিয়া লইয়াছেন এবং গভর্ণমেণ্টের আদেশে অবশিষ্ট মামলাগুলি প্রত্যাহার করা হইয়াছে। এবারে তো এই ভাবে সাম্প্রদায়িকতার অবসান ঘটিল। ভবিষ্যতে যাহাতে আর কখনও সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা না হয়, সে জন্য এই শিক্ষা যেন সকলকে সাবধান করিয়া দেয়।

বাঙ্গালার ইতিহাস রচনা—

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে বাঙ্গালার ইতিহাস রচনার ব্যবস্থা হইয়াছে। সার যদুনাথ সরকার ও ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় এই নূতন ইতিহাস সম্পাদনের ভার গ্রহণ করিয়াছেন। ইতিহাস তিন খণ্ডে সমাপ্ত হইবে এবং ইহার প্রথম খণ্ড কলিকাতায় মুদ্রিত হইতেছে। উহা এক হাজার
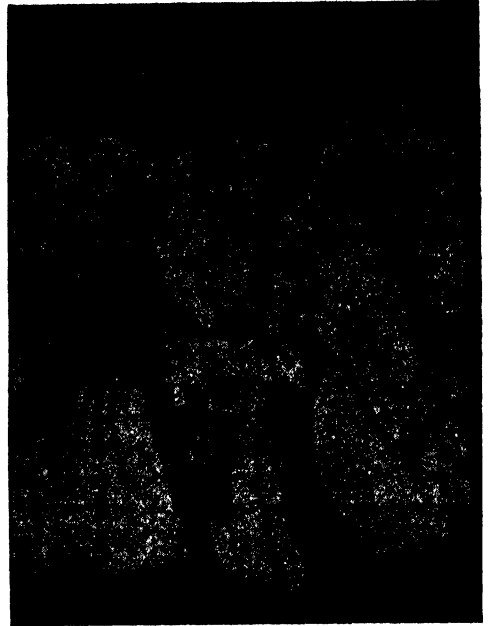
২৫শে বৈশাখ নিমতলা শ্মশান ঘাটে রবীন্দ্রনাথের স্মৃতি তর্পণ
—সভাপতি শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ

পৃষ্ঠা হইবে ও উহাতে ২০০ ছবি থাকিবে। পরে ঐরূপ দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড রচিত ও প্রকাশিত হইবে। সম্পাদকদ্বয় উভয়েই বরেণ্য পণ্ডিত, কাজেই তাঁহাদের নিকট দেশবাসী বাঙ্গালার প্রকৃত ইতিহাস পাইবার আশা রাখে।

রমাপ্রসাদ চন্দ—

সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ও প্রত্নতত্ত্ববিশারদ রায় বাহাদুর রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয় গত ২৮শে মে এলাহাবাদে ৭০ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি ১৩ই মে তারিখে কলিকাতা হইতে এলাহাবাদ গিয়াছিলেন। রমাপ্রসাদবাবু শিক্ষক হিসাবে জীবন আরম্ভ করেন। রাজসাহীতে বাস করার সময় তিনি স্বর্গত সুধী অক্ষয়কুমার মৈত্র ও দিঘাপতিয়ার কুমার শরৎকুমার রায় মহাশয়ের সংস্পর্শে আসেন ও বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি গঠন ও বিস্তারে রমাপ্রসাদবাবু তাঁহাদিগের দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ ছিলেন। সেখান হইতেই তাঁহার পুরাতত্ত্ব অনুসন্ধানের প্রবৃত্তি বর্দ্ধিত হয় ও পরে তিনি কলিকাতা মিউজিয়ামের পুরাতত্ত্ব বিভাগের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট হইয়া ১২ বৎসর পূর্ব্বে সরকারী চাকরী হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছিলেন। পুরাতত্ত্ব বিষয়ে তিনি বহু প্রামাণ্য গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন এবং ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে লণ্ডনে আন্তর্জাতিক কংগ্রেসে যোগদান করিতে গিয়াছিলেন। তিনি ভারতবর্ষের লেখক এবং আমাদের একজন সহৃদয় বন্ধু ছিলেন। তাঁহার

মৃত্যুতে আমরা স্বজন-বিয়োগ-বেদনা অনুভব করিতেছি এবং তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

বন্য-বরাহ শিকার—

অমৃতবাজার পত্রিকার শ্রীযুত ভোলানাথ বিশ্বাস সম্প্রতি ভাগলপুর জেলার সুপাউল মহকুমার এক জঙ্গলে একটি প্রকাণ্ড

বন্য বরাহ
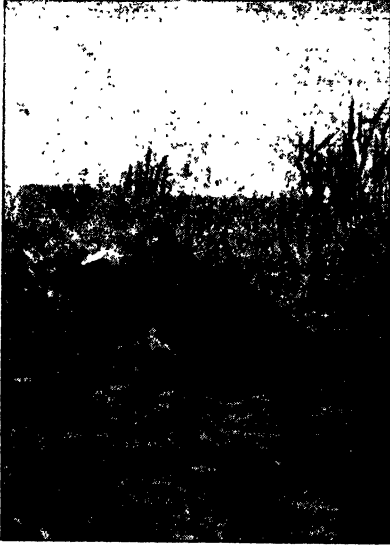
বন্য বরাহ শিকার করিয়াছেন। বরাহটির চিত্র এই সঙ্গে প্রদত্ত হইল। বহু লোক এই বরাহের অত্যাচারে সন্ত্রস্ত হইয়া বাস করিত।

ডাক্তার সৌরীন্দ্রনাথ ঘোষ—

কলিকাতা কর্পোরেশনের চিফ হেল্‌থ অফিসার ডাক্তার সৌরীন্দ্রনাথ ঘোষ গত ২৭শে মে মধুপুরে মাত্র ৫৪ বৎসব বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি ৩০ বৎসর কাল কর্পোরেশনের চাকরী করিয়াছিলেন এবং ১৯৩৯ সালের ১৭ই নভেম্বর তারিখে তাঁহাকে চিফ্ হেলথ অফিসার করা হইয়াছিল। ১৯১০ সালে তিনি এল-এম-এস পরীক্ষা পাশ করেন ও তদবধি চাকরী করিতেছিলেন। তাঁহার পত্নী, এক পুত্র ও এক কন্যা বর্ত্তমান।

বস্ত্র সমস্যা—

বর্ত্তমানে যুদ্ধের দরুণ অন্ন সমস্যার সহিত বস্ত্র সমস্যাও ভীষণ ভাবে দেখা দিয়াছে। এ সম্বন্ধে খ্যাতনামা অর্থনীতিবিদ ও ব্যবসায়ী শ্রীযুত কে-এন-দালাল জানাইয়াছেন যে ভারতে বিশেষ ভাবে চেষ্টা করিলে বস্ত্র সমস্যা দূর হইতে পারে। যুদ্ধের জন্য বিলাত হইতে কাপড় আমদানী প্রায় বন্ধ—জাপান এতদিন এদেশে প্রচুর কাপড় পাঠাইত—তাহা আর এখন সম্ভব নহে। তবে এদেশে তুলার অভাব নাই। যদি কাপড়ের কলগুলি সূতা প্রস্তুত বাড়াইয়া দেয়, তাহা হইলে তাঁতে বুনিয়া প্রচুর কাপড় প্রস্তুত হইতে পারে। কর্ত্তৃপক্ষের এখন এ বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন হইয়াছে, নচেৎ গরীবদুঃখী লোকদিগের পক্ষে সত্য-সত্যই বস্ত্রাভাবে লজ্জা নিবারণ করা অসম্ভব হইবে।

সার ব্রজেন্দ্রলাল মিত্র—

সার ব্রজেন্দ্রলাল মিত্রের নাম ভারতের সর্ব্বত্র সুপরিচিত। তিনি ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে ৫ বৎসরের জন্য ভারত গভর্ণমেণ্টের এডভোকেট জেনারেল নিযুক্ত হইয়াছিলেন। সম্প্রতি তাঁহার কার্য্যকাল আরও এক বৎসর বাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে জানিয়া আমরা আনন্দিত হইলাম। তাঁহার মত আইনজ্ঞ ও প্রতিভাশালী ব্যক্তি ভারতে খুবই কম আছেন।

দীনবন্ধু স্মৃতি ভাণ্ডার—

মহাত্মা গান্ধী বোম্বায়ে যাইয়া দীনবন্ধু এণ্ডরুজের স্মৃতি-ভাণ্ডারের জন্য ৫ লক্ষ টাকা সংগ্রহ করিয়াছেন। ঐ টাকা

দিল্লীতে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সভার অবসরে পণ্ডিত জহরলাল নেহরুর সমাগত ধনী দরিদ্র সকলকে সাক্ষাৎ দান

বিশ্বভারতীর জন্য ব্যয় করা হইবে। দুঃখের বিষয় বিশ্বভারতী বাঙ্গালা দেশে অবস্থিত হইলেও বাঙ্গালার ধনীরা ঐ ভাণ্ডারে

অর্থ দান করেন নাই। বাঙ্গালা দেশে বোধ হয় সার রাসবিহারী ঘোষ বা সার তারকনাথ পালিতের মত বদান্য ব্যক্তির অভাব ঘটিয়া থাকিবে।

বাঙ্গালায় নূতন মন্ত্রী গ্রহণ—

গত ২৭শে মে বাঙ্গালার প্রধান মন্ত্রীর সভাপতিত্বে বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদ ও ব্যবস্থাপক সভার প্রগতিশীল সদস্যদের যে

সম্রাট ও সাম্রাজ্ঞী কর্ত্তৃক প্যারাশুট দ্বারা সৈন্য অবতরণ পর্য্যবেক্ষণ

নূতন দল গঠিত হইয়াছে, সেই দল মন্ত্রিসভায় নূতন কয়েকজন মন্ত্রী গ্রহণের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। এই নূতন দলে প্রগতিশীল দল, কৃষক প্রজাদল, কংগ্রেস পার্লামেন্টারী দল, জাতীয় দল, তপশীলভুক্ত দল, হিন্দু মহাসভা, এংলো ইণ্ডিয়ান, ভারতীয় খৃষ্টান, বৌদ্ধ, শ্রমিক দল ও স্বতন্ত্র দলের বহু সদস্য যোগদান করায় দলের সদস্য সংখ্যা ভালই হইয়াছে। বর্ত্তমান দুর্দ্দশার মধ্যে নূতন দল যদি তাঁহাদের নির্ব্বাচিত মন্ত্রীদিগের দ্বারা দেশবাসীর প্রকৃত উপকার করিতে পারেন, তবেই এই দল গঠন সার্থক হইবে।

লবণ সমস্যা—

অন্যান্য খাদ্যদ্রব্যের সমস্যার সঙ্গে বাঙ্গালা দেশে এবার লবণ-সমস্যা ব্যাপক ও ভীষণ ভাবে দেখা দিয়াছে। যে লবণ ৪ পয়সা সের দরে বিক্রয় হইত, তাহা ৪ আনা সের হইয়াছিল। অথচ বাঙ্গালার সমুদ্রোপকূলে সর্ব্বত্র প্রচুর লবণ পাওয়া যায়। সরকারী ব্যবস্থার ফলে সাধারণ লোক লবণ তৈয়ারী করিয়া তাহা নির্দ্দিষ্ট এলাকার বাহিরে লইয়া গিয়া বিক্রয়ের অধিকারে বঞ্চিত, সে জন্য আমাদের পক্ষে এখনও বিদেশী লবণের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হইতেছে ও ৪ গুণ দামে লবণ ক্রয় করিতে হইতেছে। সম্প্রতি গভর্ণমেণ্ট এই সমস্যার সমাধানে উদ্যোগী হইয়াছেন বটে, কিন্তু কাজে এখনও কোন ফল হয় নাই। দেশী লবণ কোম্পানীগুলির মালিকদিগকে ও লবণ আমদানী-কারকদের লইয়া বৈঠকও হইয়া গিয়াছে। গান্ধী আরউইন চুক্তির ফলে কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট এলাকার লোককে নিজ ব্যবহারের জন্য ও স্থানীয় বাজারে খুচরা বিক্রয়ের জন্য লবণ প্রস্তুত করিবার অধিকার দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু সে এলাকা হইতে একসঙ্গে এক মণের অধিক লবণ বাহিরে আনা যায় না। ফলে নির্দ্দিষ্ট এলাকাগুলির বাহিরের লোকদিগের পক্ষে সে লবণ পাইবার সুযোগ হয় না। লবণের উপর অত্যধিক শুল্ক থাকার ফলেও লবণের দাম এত বেশী। গভর্ণমেণ্ট এ বিষয়ে ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন না করিলে দরিদ্র লোক লবণের অভাবে বড়ই কষ্ট পাইবে। আমরা জানিয়া আনন্দিত হইলাম মন্ত্রী ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও মন্ত্রী শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এ বিষয়ে নূতন ব্যবস্থার জন্য

বোম্বায়ে মহাত্মা গান্ধী—দীনবন্ধু এণ্ডরুজ স্মৃতি ভাণ্ডারের জন্য অর্থ সংগ্রহ

বিশেষ যত্নবান হইয়াছেন। এ জন্য শ্যামাপ্রসাদবাবুকে দিল্লী পর্য্যন্ত যাইতে হইয়াছে। এ দিকে কয়লার অভাবে বাঙ্গালার লবণের কারখানাগুলিতে লবণ প্রস্তুত কার্য্য বন্ধ হইয়া গিয়াছে।

গভর্ণমেণ্ট কারখানাগুলিতে কয়লা সরবরাহেরও কোন ব্যবস্থা করেন নাই। লবণ সমুদ্রের এত কাছে থাকিয়াও যদি কলিকাতা-বাসীদিগকে লবণের অভাব বোধ করিতে হয়, তবে তাহা অপেক্ষা লজ্জার বিষয় আর কিছুই থাকে না।

পুস্তক-প্রকাশকগণের অসুবিধা—

গত ডিসেম্বর মাসের মধ্যভাগ হইতে বাঙ্গালা দেশের বিশেষতঃ কলিকাতার অধিকাংশ স্কুল কলেজ বন্ধ হইয়া যাওয়ায় পুস্তক-বিক্রেতাদিগকে এবার দারুণ ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইয়াছে। দেশের বর্ত্তমান আর্থিক দুরবস্থাও পুস্তক বিক্রয় হ্রাসের অন্যতম কারণ। এ অবস্থায় যাহাতে বর্ত্তমান ১৯৪২ সালের পাঠ্যপুস্তক ১৯৪৩ সালেও ব্যবহৃত হয়, সে জন্য প্রকাশকদিগের একদল প্রতিনিধি প্রধান মন্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে অনুরোধ জানাইয়াছেন। ১৯৪২ সালের ব্যবহারের জন্য যে সকল পুস্তক মুদ্রিত হইয়াছিল, সেগুলি বিক্রয় হয় নাই। কাজেই এ অবস্থায় নূতন পুস্তক ছাপাইতে হইলে প্রকাশকগণকে আরও ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইবে।

পাটকল শ্রমিকদের দুরবস্থা—

বাঙ্গালা দেশের আমদানী রপ্তানী ব্যবসা যুদ্ধের জন্য বন্ধ হওয়ায় বাঙ্গালার পাটকলসমূহের মালিকগণ শীঘ্রই শতকরা ১০ খানা তাঁত বন্ধ করিয়া দিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। তাহার ফলে ৫০ হাজার শিক্ষিত তাঁতি অন্নহীন হইবে। অথচ পূর্ব্বে যখন পাটকলওয়ালারা প্রভূত লাভ করিয়াছে, তখন এই সকল শ্রমিকদের জন্য কোনরূপ অতিরিক্ত ভাতার ব্যবস্থা হয় নাই। একদল শ্রমিক নেতা বিষয়টি বাঙ্গালার প্রধান মন্ত্রীকে জানাইয়াছেন। পাট কলের মালিকগণ এত অধিক লাভ করেন যে কিছুদিন যদি এই সকল তাঁতিকে বসাইয়া বেতন দেন, তাহাতেও তাঁহাদের কোন ক্ষতি হইবে না। বর্ত্তমানের এ দুর্দ্দিনে লোক কর্ম্মচ্যুত হইলে না খাইয়া সপরিবারে মারা যাইবে।

সুহাসিনী দেবী—

শিল্পাচার্য্য ডক্টর শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের সহধর্ম্মিণী সুহাসিনী দেবী সম্প্রতি বেলঘরিয়ার বাগানবাটীতে

সুহাসিনী দেবী শ্রীমতী বীণা দে'র সৌজন্যে

স্বামী, তিন পুত্র ও দুই কন্যা রাখিয়া পরলোকগমন করিয়াছেন। একপ পরিণত বয়সে স্বামীপুত্রাদি রাখিয়া স্বর্গলাভ হিন্দু মহিলা-মাত্রেরই কাম্য। আমরা অবনীন্দ্রনাথের এই দারুণ শোকে আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করি।

ভারতের পূর্ব্ব সীমান্ত—নূতন মণিপুর রোডে মোটর গাড়ী

পল্লীগ্রামে বাড়ী ভাড়া—

বোমার ভয়ে কলিকাতার লোক যখন দলে দলে বাঙ্গালার পল্লীগুলিতে ফিরিয়া যায়, তখন পল্লীগ্রামের বাড়ীওয়ালারা অত্যধিক ভাড়ায় বাড়ী ভাড়া দিতে আরম্ভ করেন। মফঃস্বলে যে বাড়ীর মাসিক ভাড়া ৫ টাকাও হয় না, সে বাড়ী লোক মাসিক ৫০ টাকায় ভাড়া লইতে বাধ্য হয়। সম্প্রতি বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্ট বাড়ী ভাড়া নিয়ন্ত্রণের জন্য এক আইন করিয়াছেন। সে আইনও কিন্তু অদ্ভুত। বাড়ী ভাড়া লইয়া ভাড়া সম্বন্ধে অভিযোগ জানাইলে, তবে এ বিষয়ে গভর্ণমেণ্ট প্রতিকারের ব্যবস্থা করিবেন। এখনও এরূপ মামলার কথা শুনা যায় নাই।

দিল্লীতে নিখিল ভারত সংবাদপত্র সম্পাদক সম্মেলন—প্রথমেই অমৃতবাজার পত্রিকা সম্পাদক শ্রীযুত তুষারকান্তি ঘোষ

ইণ্ডিয়ান এয়ার ফোর্সের পাইলটবৃন্দ—অধিকাংশই বাঙ্গালী

ব্লড্ ব্যাঙ্ক—

বোমাবর্ষণের ফলে যাহারা আহত হইবে, তাহাদের দেহে টাটকা রক্ত ইনজেকসন করার প্রয়োজন হইবে। সেই রক্ত সংগ্রহের জন্য কলিকাতায় ট্রপিকাল স্কুলে ডাক্তার জে-বি-গ্রাণ্ট এক ব্লড্ ব্যাঙ্ক স্থাপন করিয়াছেন। ১৫ হাজার লোকের নিকট হইতে রক্ত সংগ্রহ করিয়া তথায় জমা রাখা প্রয়োজন। রক্ত দান করিতে কোন কষ্ট হয় না বা রক্ত দানের পর কেহ কোনরূপ দৌর্ব্বল্য অনুভব করেন না। রক্ত মোক্ষণের ফলে অনেকের উপকারও হইয়া থাকে। আমাদের বিশ্বাস, বাঙ্গালার স্বাস্থ্যবান যুবকগণ রক্তদান করিয়া এই প্রচেষ্টাকে সাফল্যমণ্ডিত করিবেন।

ভারতে পশম বাণিজ্য—

ইংরেজিতে একটা প্রবচন আছে "Better late than never" অর্থাৎ মোটেই না হওয়া অপেক্ষা বিলম্বে হওয়াও ভাল। কথাটি মনে পড়িল ভারত সরকারের ভারতীয় পশমের গুণাগুণ সম্বন্ধে পুস্তক পাঠে। বিদেশী বাণিজ্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ভারতীয় কাঁচামাল রপ্তানি হইতেছে, কিন্তু তাহার উন্নতি সম্বন্ধে উৎপাদনকারীকে সাহায্য বা সজাগ করিবার উদ্দেশ্যে এ যাবৎ কোনও চেষ্টাই হয় নাই। সুতরাং পণ্য বিক্রয় সম্পর্কে জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য কয়েক মাস হইতে যে সকল পুস্তিকাদি প্রকাশিত হইতেছে, তাহার বিশেষ প্রয়োজন ছিল। ভারতের পশম সম্বন্ধে কতগুলি ত্রুটী রহিয়াছে। যে সংখ্যক মেষ পালিত হয়, অন্যান্য দেশের তুলনায় তাহা হইতে প্রাপ্ত পশমের পরিমাণ নিতান্ত কম; অর্থাৎ প্রতি মেষে দুই পাউণ্ড এবং অষ্ট্রেলিয়ার পরিমাণ প্রতি মেষে নয় পাউণ্ড। ভাল পশম উৎপাদনকারী

মেষের সংখ্যা নিতান্ত কম অথচ স্বল্প চেষ্টায় বর্ণশঙ্কর দ্বারা উন্নতি সাধিত হইতে পারে। পশমের শ্রেণীবিভাগ না করিয়া বাজারে তাহা বিক্রয়ার্থ প্রেরিত হয়; তাহার জন্য আশানুরূপ দাম পাওয়া যায়

ফেদা হোসেন—পদব্রজে ৬৯ দিনে ব্রহ্মদেশ (রেঙ্গুন) হইতে ফিরিয়া আসিয়াছেন

না। অথচ পশম ছাঁটিবার সময় দেহের ভিন্ন ভিন্ন অংশের এবং বিভিন্ন রঙের পশম স্বতন্ত্র করিয়া রাখিলে এই অসুবিধা সহজেই দূর করা যায়। সাধারণতঃ পশম ছাটিবার পূর্ব্বে মেষকে ভাল করিয়া স্নান করাইয়া লইতে পারিলে প্রাপ্ত পশম হইতে ময়লা দূর হইয়া যায় এবং পশমের রঙ ভাল হয়। এই পশম ধোয়া জল নানা কাজে বিশেষতঃ সারের কাজে ব্যবহার করা যায়। পশমের গায়ে যে আঠাল পদার্থ থাকে তাহা হইতে "ল্যানোলিন" নামক স্নেহ পদার্থ উদ্ধার করিয়া ঔষধাদির কাজে ব্যবহৃত হইতে পারে। ভারতীয় পশম কেবল "মোটা" কাজের জন্য রপ্তানি হয় এবং আমাদের দেশে যে পশমী কাপড় ব্যবহার করি তাহার অধিকাংশই তৈরী মাল আমদানি-করা—আর না হয় আমদানি করা পশমী সুতা হইতে প্রস্তুত। এই আমদানির পরিমাণ সময় সময় চার হইতে পাঁচ কোটী টাকা (১৯২৭২৮ সালে ৪,৯১,৮৭,০০০৲) অথচ দেশের মধ্যে অজস্র পশম রহিয়াছে। মোটা কম্বল ও কিছু কার্পেট তৈয়ারী করিয়া আমরা নিশ্চিন্ত। বাকী পশম বিদেশী লইলে কিছু টাকা পাওয়া যায়, আর না লইলে বিপদের অন্ত নাই। এই নিরক্ষর দেশের পণ্য উৎপাদনকারীদিগকে বাঁচাইবার জন্য ভারত সরকারের অনেক কাজ এখনও বাকী।

মৎস্যের চাষ বৃদ্ধির চেষ্টা—

বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্ট সম্প্রতি রায় বাহাদুর এস, এন, হোরাকে বাঙ্গালার মৎস্য চাষ বিভাগের ডিরেক্টার নিযুক্ত করিয়াছেন। রায় বাহাদুর পূর্ব্বে ভারত সরকারের জুলজিকাল সার্ভে বিভাগের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ছিলেন। বাঙ্গালা দেশে অধিকাংশ লোক মাছ খায়, কিন্তু পর্য্যাপ্ত পরিমাণে ও সুলভ মূল্যে মাছ সরবরাহের কোন ব্যবস্থা নাই। বর্ত্তমান মন্ত্রিসভা যদি সত্যই এই প্রয়োজন অনুভব করিয়া হোরা সাহেবকে নূতন কাজে নিযুক্ত করিয়া থাকেন, তাহা হইলে এ ব্যবস্থায় সকলেই সন্তুষ্ট হইবেন। বহু দিন বাঙ্গালা দেশে মৎস্য চাষ বিভাগের কাজ বন্ধ রাখা হইয়াছিল। কেন, তাহার কারণ জানা যায় নাই। এখন সত্বর ইহার একটা ব্যবস্থা হইলে সকলের পক্ষেই আনন্দের বিষয় হইবে।

ভাটপাড়া মিউনিসিপ্যালিটী—

ভাটপাড়া মিউনিসিপালিটীতে শাসনের অনাচার হওয়ায় গত মার্চ্চ মাসে বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্ট মিউনিসিপালিটীর পরিচালন ভার নিজেদের হাতে গ্রহণ করিয়াছেন। অনাচার সম্বন্ধে মামলা বিচারাধীন, কাজেই সে সম্বন্ধে এখন কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু দরিদ্রের প্রদত্ত কর যাহাতে অপব্যয়িত না হয়, সে বিষয়ে অবহিত থাকা যে জননির্ব্বাচিত কমিশনারদের কর্ত্তব্য তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন। যাহা হউক, এখন রায় বাহাদুর শ্রীযুত সুকুমার চট্টোপাধ্যায় এম-বি-ই মহাশয়কে মিউনিসি-

আর্ট ইণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রি একজিবিসন গভর্ণমেণ্ট আর্ট স্কুল, ১৯৪২

পালিটীর প্রধান কর্ম্মকর্ত্তাপদে নিযুক্ত করা হইয়াছে। রায় বাহাদুর সরকারী কার্য্যে যথেষ্ট দক্ষতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন এবং জনহিতকর প্রতিষ্ঠানসমূহের সহিতও পরে সংশ্লিষ্ট হইয়াছিলেন। কাজেই আমাদের বিশ্বাস, তিনি ভাটপাড়ার অধিবাসীদিগের প্রকৃত উপকার করিতে সমর্থ হইবেন।

খাদ্যের অভাব পূরণ—

মহাযুদ্ধের জন্য সকল প্রকার খাদ্যের অভাব আরম্ভ হওয়ায় এখন কেন্দ্রীয় সরকারের সহিত সকল প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টও অধিক পরিমাণে খাদ্য শস্য উৎপাদনের জন্য কৃষকদিগের মধ্যে আন্দোলন আরম্ভ করিয়াছেন। এ আন্দোলন কিন্তু শুধু মুখের কথায় সফল হইবে না। চীনদেশে ১৯৪০ খৃষ্টাব্দে এ বিষয়ে আন্দোলন করিবার জন্য সেখানকার গভর্ণমেণ্ট ১৮ লক্ষ মুদ্রা ব্যয় করিয়াছিলেন। আমাদের দেশে ভাল বীজ ঋণ দেওয়ার যে ব্যবস্থা হইতেছে, তাহাতে সুদসমেত সে বীজ ফেরত লওয়া হইবে। সুদের হারও শতকরা ২৫ ভাগ। কাজেই এ দেশের দরিদ্র কৃষক সুদের ভয়ে বীজ ধার লইতে সাহসী হইবে না। আর শুধু বীজ হইলেই ত চাষ হয় না। হুগলী জেলার বহু স্থান হইতে সংবাদ আসিয়াছে, জলের অভাবে সেখানে বহু জমীর চাষ বন্ধ আছে। আমাদের দেশে সেচের ব্যবস্থা এতই কম যে চাষীদিগকে জলের জন্য সকল সময়ে আকাশের দিকে চাহিয়া থাকিতে হয়। অথচ সে অবস্থায় যে অধিক ফসল উৎপাদন করা অসম্ভব, এক দল লোক তাহা বুঝিয়াও বোধ হয় বুঝেন না। কাজেই যাঁহারা অধিক শস্য উৎপাদনের আন্দোলন আরম্ভ করিয়াছেন, তাঁহাদেব প্রথম হইতে সকল দিক রক্ষা করিয়া কাজ করা উচিত।

বি এণ্ড এ রেলপথে সিমুরালীতে রেল দুর্ঘটনার দৃশ্য—ডাউন চিটাগং মেলের সহিত ডাউন রাণাঘাট প্যাসেঞ্জারের সংঘর্ষের পরের অবস্থা

কলিকাতায় দুগ্ধের অভাব—

কলিকাতায় বর্ত্তমানে খাঁটি দুধ ক্রমশ দুর্ম্মূল্য ও দুষ্প্রাপ্য হইয়া পড়িতেছে। গত ডিসেম্বর মাসে আসন্ন জাপানী বোমার ভয়ে যখন শহরত্যাগের হিড়িক পড়িয়া যায়, সে সময় দুই এক সপ্তাহের জন্য দুগ্ধের বাজারে ক্রেতার অভাবে দরও খুব নামিয়া গিয়াছিল। দুঃসাহসের উপর নির্ভর করিয়া যাঁহারা সহরে ছিলেন, ভাবিয়াছিলেন যে সস্তায় দুধ খাইয়া বোমার দুর্ভাবনাকে ঠেকাইয়া রাখিবেন। কিন্তু জানুয়ারী মাস পড়িতে না পড়িতেই তাঁহাদের সে আশা 'গরল ভেল!'—দুগ্ধের দর পুনরায় চড়িতে থাকিল। সপ্তাহ দুই শহরবাসীরা যে সুবিধাটুকু ভোগ করিয়াছিলেন, দেখিতে দেখিতে দুগ্ধ-ব্যাপারীরা তাহা ত সুদসমেত উশুল করিয়া লইলই—উপরন্তু দুর্ম্মূল্য ও দুর্লভ্যের আভাস দিয়া শহরের নিরুপায় দুগ্ধপায়ীদিগকে বিপন্ন করিয়া তুলিল। দুগ্ধব্যবসায়ীদের অজুহাত এই যে, বোমার ভয়ে অধিকাংশ খাটালওয়ালা তাহাদের দুগ্ধবতী গোমহিষগুলি বাহিরে পাঠাইয়া দিয়াছে, দুগ্ধ মিলিতেছে না, সুতরাং দুগ্ধের দর ত চড়িবেই। কথাটা যে কতকাংশে সত্য, তাহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই। ডিসেম্বর মাসের শেষাশেষি

শহরের দুগ্ধপ্রধান অঞ্চলগুলির অধিকাংশ খাটাল সম্পূর্ণ বা আংশিক ভাবে খালি হইয়া গিয়াছিল। শহরসন্নিহিত অঞ্চলগুলি হইতেও দুগ্ধের আমদানী কমিয়াছিল। কিন্তু বর্ত্তমানে আর সে অবস্থা নাই; শূন্য বা আংশিকভাবে-শূন্য খাটালগুলি পুনরায় ভরিয়া উঠিতেছে, বাহির হইতেও দুগ্ধের চালান আসিতেছে, কিন্তু দুগ্ধের দর নামা ত দূরের কথা—ক্রমশই বাড়িতেছে, এমন কি ভাল দুগ্ধ দুষ্প্রাপ্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

মার্কিণ কারিগরী মিশন—

সম্মিলিত রাষ্ট্রসমূহের স্বার্থরক্ষায় মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের তত্ত্বাবধানে ভারতবর্ষে সমর-সংক্রান্ত শিল্প-সামগ্রী উৎপাদন ব্যাপারটি ব্যাপক-ভাবে সম্পন্ন করা কতদূর সম্ভবপর, সে-সম্পর্কে ভারত-সরকারের প্রতিনিধিগণের সহিত মার্কিণ টেকনিক্যাল মিশনের যে আলাপ-আলোচনা ও অনুসন্ধানাদি চলিতেছিল, তাহার কাজ এতদিনে শেষ হইয়াছে। উক্ত মিশন এদেশে আসিবার পূর্ব্বেই তাহার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে ভারতীয় শিল্পপতিগণের মধ্যে এবং সংবাদপত্র মহলে একটা সন্দেহের ভাব দেখা গিয়াছিল। অতীতের অভিজ্ঞতা হইতে ভারতবাসীদের মনে এমন একটা আতঙ্কের সৃষ্টি হইয়াছিল যে, এই কারিগরী মিশনটির ভিতর দিয়া মার্কিণ পুঁজীপতিরা হয় ত ভারতের উদীয়মান শিক্ষা-সংহতির উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া তাহাকে দাবাইয়া রাখিবেন। শুধু তাহাই নহে, ইয়োরোপ ও এসিয়ার বিভিন্ন রাষ্ট্রগুলিতে যুক্তরাষ্ট্রের যে বিপুল অর্থ খাটিতেছিল, তাহাদের অধিকাংশ চক্রশক্তির অধিকৃত হওয়ায় মার্কিণ জাতির অসুবিধার একশেষ হইয়াছে। সুতরাং ভারতবর্ষের বাজারের উপর একাধিপত্য স্থাপনের উদ্দেশ্যটিও ইহার পশ্চাতে প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে, অতএব ভারতবর্ষের বুকের উপর মার্কিণ পুঁজীপতিদের আর্থিক স্বার্থের ভিত্তি স্থাপনেরই ইহা সূত্রপাত মাত্র। কিন্তু উক্ত মার্কিণ মিশনের প্রধান কর্ত্তা ডাঃ হেনরি গ্রেডি ভারতবর্ষকে এ-ব্যাপারে আশ্বস্ত করিবার জন্য বলেন যে, মার্কিণ টেকনিক্যাল মিশনের সম্বন্ধে ভারতীয়দের অন্তরে যে সন্দেহ উঠিয়াছে, তাহা অমূলক। এই মিশন ভারতে টাকা খাটাইতে আসে নাই, কিম্বা আমেরিকার তরফ হইতে কল-কারখানা খুলিয়া ব্যবসা-বাণিজ্য ফাঁদিয়া বসাও মিশনের উদ্দেশ্য নয়। ভারতবাসীদের আত্মরক্ষা-ব্যাপারে মার্কিণ বিশেষজ্ঞদের দ্বারা প্রচুরভাবে সামরিক সামগ্রীসমূহ নির্ম্মাণ করাই মিশনের প্রকৃত অভিপ্রায়। ইহার ফলে, যুদ্ধের পর ভারতীয় শিল্পের ক্ষমতা ও প্রতিষ্ঠা এমনভাবে বৃদ্ধি পাইবে যে শত্রুপক্ষ কিছুতেই তাহাকে দাবাইতে পারিবে না।

সার ইব্রাহিম রহিমতুল্লা—

কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদের ভূতপূর্ব্ব সভাপতি সার ইব্রাহিম রহিমতুল্লা গত ১লা জুন ৮০ বৎসর বয়সে বোম্বায়ে পরলোকগমন করিয়াছেন। ১৮৬২ সালে জন্মগ্রহণ করিয়া তিনি ১৮৮০ সালে ব্যবসা আরম্ভ করেন এবং তাহার ১২ বৎসর পরে বোম্বাই মিউনিসিপাল কর্পোরেশনে যোগদান করিয়া জনসেবা আরম্ভ করেন। ১৯৩১ সালে তিনি কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদের সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন এবং ২ বৎসর পরে ঐ পদ ত্যাগ করিতে বাধ্য হন।

জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ—

গত ১৭ই মে কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ দাতা জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ মহাশয় ৮৮ বৎসর বয়সে পরলোকগত হইয়াছেন। তিনি তাঁহার দানের জন্য রায় বাহাদুর ও সি-আই-ই উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতা রায় বাহাদুর হরচন্দ্র ঘোষ ছোট আদালতের জজ ছিলেন এবং বেথুন কলেজের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র কলিকাতাস্থ স্কটীশ চার্চ্চ কলেজ, সেণ্ট পল্‌স কলেজ, অক্সফোর্ড মিশন, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কারমাইকেল মেডিকেল কলেজ প্রভৃতি বহু প্রতিষ্ঠানে বহু লক্ষ টাকা দান করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার মত জ্ঞানী ব্যক্তিও খুব কম দেখা যায়।

শ্রীজ্যোতিশ্চন্দ্র সেন—

ত্রিপুরা রাজ্যের প্রধান মন্ত্রী রায় বাহাদুর শ্রীযুত জ্যোতিশ্চন্দ্র সেন সম্প্রতি অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে বেঙ্গল সিভিল সার্ভিসে প্রবেশ করিয়া ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে ত্রিপুরা রাজ্যে প্রেরিত হন। তদবধি ১৯৪২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তিনি উক্ত

শ্রীজ্যোতিশচন্দ্র সেন

রাজ্যের বহু উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া রাজ্যের উন্নতি বিধান করিয়াছেন। জ্যোতিশ্চন্দ্র বোম্বাই হাইকোর্টের সিভিলিয়ান বিচারপতি শ্রীযুত ক্ষিতীশচন্দ্র সেনের অগ্রজ।

প্রতাপচন্দ্র দত্ত—

অবসরপ্রাপ্ত সিভিলিয়ান প্রতাপচন্দ্র দত্ত গত ২০শে মে ৬৬ বৎসর বয়সে তাঁহার কলিকাতা রাসবিহারী এভেনিউস্থ বাস-ভবনে পরলোকগমন করিয়াছেন। ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে তিনি সিভিল সার্ভিসে চাকরী গ্রহণ করেন এবং কিছুদিন কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রীয় পরিষদের সদস্য ও ত্রিবাঙ্কুরের মহারাজার পরামর্শদাতা ছিলেন। প্রতাপচন্দ্রের এক পুত্র সিভিলিয়ান মিঃ আর-সি-দত্ত আলিপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট।

শ্রীক্ষেত্রনাথ রায়

ফুটবল ঃ

যুদ্ধকালীন অবস্থার জন্য কলকাতার মাঠে ফুটবল খেলা হবে কি না এ বিষয়ে অনেকেরই যথেষ্ট সন্দেহ ছিল। কিন্তু সাধারণের এই সন্দেহ দূর করে কলকাতার মাঠে আই এফ এ পরিচালিত সকল বিভাগের লীগ খেলাগুলি রীতিমত আরম্ভ হয়ে গেছে।

প্রথম বিভাগের খেলায় যুদ্ধের বর্ত্তমান পরিস্থিতির জন্য সৈনিকদল যোগদান করতে পারেনি। ফুটবল খেলায় সৈনিকদলের দান যথেষ্ট। দুর্দ্ধর্ষ সৈনিকদল বনাম ভারতীয় দলের জয় পরাজয় আজও ক্রীড়ামোদীরা ভুলতে পারেনি। কলকাতার ফুটবল ইতিহাসের সেই সমস্ত গৌরবময় দিনগুলি আমাদের দীর্ঘদিন মনে থাকবে।

আলোচ্য বৎসরের প্রথম বিভাগের ফুটবল লীগ তালিকায় এ পর্য্যন্ত ইষ্টবেঙ্গল দল প্রথম স্থান অধিকার করে আছে। দল হিসাবে ইষ্টবেঙ্গলের নাম বিশেষ করে উল্লেখযোগ্য। লীগের প্রথম দিকে এই দল কয়েক বারই শীর্ষস্থান অধিকার ক'রে খেলার শেষের দিকে মাত্র দু'এক পয়েণ্টের জন্য লীগ বিজয়ের গৌরব থেকে বঞ্চিত হয়েছে। শক্তিশালী খেলোয়াড় পেয়েও নিতান্ত দুর্ভাগ্যের জন্য তারা শেষ রক্ষা করতে পারে নি। এ বৎসর পর পর ৬টি খেলায় জয়লাভ করে তারা প্রথম পরাজয় স্বীকার করেছে পুরাতন প্রতিদ্বন্দ্বী মহমেডান দলের কাছে। এই ক্লাবের অনেক নামকরা খেলোয়াড় অন্যত্র ছাড়পত্র নেওয়াতে ক্রীড়ামোদী এবং ক্লাবের সমর্থকের মধ্যে একটা হতাশার ভাব এসেছিলো তারা নিজেদের সম্মান রাখতে পারবে কিনা ভেবে। মহামেডান দলের নিকট ২-১ গোলে পরাজিত হলেও অগৌরবের কিছু নেই। কারণ ক'লকাতা কেন ভারতীয় ফুটবল প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে ইষ্টবেঙ্গল ক্লাবই সব থেকে বেশী বার শক্তিশালী মহমেডান দলকে পরাজিত করবার গৌরব অর্জ্জন করেছে। রক্ষণভাগের খেলায় একটু পরিবর্ত্তন করলে এই দলের আক্রমণভাগ অধিকতর ক্রীড়ানৈপুণ্যের পরিচয় দিয়ে আরও বেশী গোলের সুযোগ পাবে বলে আশা করি। লীগে এ পর্য্যন্ত ১৩টা খেলে ২৪ পয়েণ্ট পেয়েছে। মাত্র ৫টা গোল খেয়ে ৩৬টা গোল দিয়েছে।

লীগের তালিকায় দ্বিতীয় স্থানে আছে মহমেডান স্পোর্টিং। ১২টি খেলায় তাদের ১৭টা পয়েণ্ট হয়েছে, মাত্র একটা খেলাতে হার হয়েছে। এই দলের সেণ্টার হাফ, নূরমহম্মদকে বহুদিন পরে পুনরায় খেলায় যোগদান করতে দেখা গেছে। দলের খেলোয়াড়দের মধ্যে এখনও সেই পুরাতন উদ্দীপনা দেখা দেয়নি, লীগের খেলার শেষের দিকে খেলোয়াড়দের মধ্যে খেলার তীব্রতা বৃদ্ধি পায় বলে দলের সমর্থকেরা হতাশ হয়নি। ইউরোপীয় ক্লাবের শিরোমণি ক্যালকাটা ক্লাবকে ৮-০ গোলে লীগের প্রথমার্দ্ধের খেলায় পরাজিত করে ইতিমধ্যে তারা এ বৎসরের নূতন রেকর্ড করেছে।

লীগের তৃতীয় স্থানে আছে মোহনবাগান দল। মহমেডানের সঙ্গে সমান খেলে এবং ১৮টা পয়েণ্ট করেছে। একটা কম খেলে ইষ্টবেঙ্গল দলের সঙ্গে ৭ পয়েণ্টের ব্যবধান। দল হিসাবে মোহনবাগান ক্লাবের খ্যাতি বহুদিনের। সেই পুরাতন দিনের ইতিহাস আজও লোকে ভুলতে পারেনি। মোহনবাগানের খেলার দিন যে পরিমাণ দর্শকের সমাগম হয় তাতে তার সর্ব্বজনপ্রিয়তারই পরিচয় দেয়। খেলোয়াড়দের দল পরিবর্ত্তনের ফলে মোহনবাগান ক্লাব অন্য কয়েকটি দলের মত লাভবান হয়েছে সত্য। কিন্তু সেইসব খ্যাতনামা খেলোয়াড়রা নিজেদের সুনাম বজায় রেখে ক্রীড়াচাতুর্য্যের পরিচয় দিতে পারছেন না। আশা করি দলের সম্মান রক্ষার্থে খেলোয়াড়রা শীঘ্রই সচেষ্ট হবেন। পুরাতন প্রতিদ্বন্দ্বী এরিয়ান্স দলকে মোহনবাগান ২-০ গোলে পরাজিত করেছে। কিন্তু বি এণ্ড এ রেলদলের নিকট মোহনবাগানের ৩-০ গোলে পরাজয়ের গ্লানিমা সমর্থকদের হতাশ করেছিল। রেলদল লীগ তালিকার সপ্তম স্থানে আছে। এরিয়ান্স আছে চতুর্থ স্থানে। পূর্ব্বেকার তুলনায় এই দলের খেলার ষ্ট্যাণ্ডার্ড উন্নত হয়েছে। খেলায় আরও উন্নতি না হলে লীগ তালিকার মাঝামাঝি স্থানেই এরা থেকে যাবে। এখন লীগ তালিকার নীচের দিকে যারা আছে তাদের কাছে আমরা খুব বেশী আশা করতে পারি না। তবে ভবানীপুর ক্লাব কম খেলে যে পয়েণ্ট সংগ্রহ করেছে তাতে আমরা এই দলের পদোন্নতির আশা করতে পারি। এপর্য্যন্ত এরা লীগের মাত্র একটা খেলায় হেরেছে। ইউরোপীয় দলগুলির অবস্থা এ বৎসর খুবই শোচনীয়। ফুটবলে দুর্দ্ধর্ষ কাষ্টমস দলের যথেষ্ট খ্যাতি ছিল। লীগের মাঝামাঝি স্থানে থেকেও লীগ বিজয়ী দলকেও তারা কম পর্য্যুদস্ত করেনি। খেলায় নাটকীয় ঘটনার অবতারণা করতে এদের মত দ্বিতীয় দল খুঁজে পাওয়া মুস্কিল। সেই কাষ্টমসের আজ শোচনীয় অবস্থা দেখে ক্রীড়ামোদী মাত্রেরই দুঃখ হবে। এ পর্য্যন্ত তারা লীগের সর্ব্বনিম্ন স্থান

অধিকার করে আছে এবং পর পর ৯টি খেলার একটিতেও জয়লাভ করেনি বা ড্র' করে নি। পুলিসকে ২-১ গোলে হারিয়ে তারা এবারের লীগে প্রথম জয়লাভ করে। বিপক্ষ দলকে মাত্র ৪টি গোল দিয়ে ৪৪টি গোল খেয়েছে আর ২ পয়েণ্ট মাত্র পেয়েছে। বলাবাহুল্য এ ব্যাপারেও তারা সর্ব্বনিম্ন স্থান পেয়েছে। রেঞ্জার্স প্রথম বিভাগে 'প্রমোশন' পেয়েই কয়েক বছর যে ক্রীড়াচাতুর্য্যের পরিচয় দিয়েছিল তার কণামাত্র আজ পাওয়া যাবে না।

মহামেডানদলের সঙ্গে ইষ্টবেঙ্গলের প্রথম খেলায় ভাগ্যদেবী ইষ্টবেঙ্গল দলের প্রতি সুপ্রসন্ন ছিলেন না। ইষ্টবেঙ্গল বিপক্ষ দলের অপেক্ষা গোল দেবার বেশী সুযোগ পেয়েও শেষ পর্য্যন্ত খেলায় জয়লাভ করতে পারেনি। কিন্তু মোহনবাগানের সঙ্গে খেলায় তাদের ভাগ্য সুপ্রসন্ন ছিল। তারা ঐ দিন সৌভাগ্য-ক্রমেই যে খেলায় জয়লাভ করেছে একথা সেদিনের খেলার নিরপেক্ষ দর্শকমাত্রেই স্বীকার করবেন। খেলার সর্ব্বক্ষণই মোহনবাগান দলের খেলোয়াড়রা নিজেদের প্রাধান্য রক্ষা করেছিল। একাধিক গোলের সুযোগও ঐ দলের খেলোয়াড়রা নষ্ট করেছেন। দ্বিতীয়ার্দ্ধের খেলা আরম্ভের আট মিনিট পরে মোহনবাগানের এন বোস যে গোলটি করেন তা রেফারী অস্বীকার করেন। বলটি গোলে ঢুকবার পূর্ব্বে বিপক্ষ দলের গোল-রক্ষককে নাকি ফাউল করা হয়। ঐদিন রেফারীর পূর্ব্বের একাধিক ত্রুটীর বিরুদ্ধে দর্শকদের বিক্ষোভ লক্ষিত হয়েছিল। রেফারী ঘটনা স্থান থেকে দূরে থেকে সঠিক অবস্থা না জেনে কেন যে গোলটি বাতিল করলেন তা নিরপেক্ষ দর্শকেরও বোধগম্য হয়নি।

ইষ্টবেঙ্গলের আক্রমণ ভাগের খেলোয়াড়রা বিপক্ষদলের তুলনায় খুব কম সময়েই গোলে হানা দিয়ে উদ্বেগের সৃষ্টি করেছিলেন। সমস্ত খেলার মধ্যে মাত্র কয়েক সেকেণ্ডের জন্য মোহনবাগান গোলের সম্মুখে ইষ্টবেঙ্গলদল সঙ্কটজনক অবস্থা এনেছিল। সেই চরম অবস্থায় বেণীপ্রসাদ নিজদলকে কোন প্রকারে রক্ষা করেন। কিন্তু অপর দুটী সুযোগে ইষ্টবেঙ্গল কোন রকম ভুল করেনি। প্রথম গোলটি সুনীল ঘোষ দেন। খেলা শেষ হবার মাত্র তিন মিনিট পূর্ব্বে সোমানা অনেক দূর থেকেই ডি সেনকে পরাভূত করে দ্বিতীয় গোলটি করেন। খেলাটিতে ইষ্টবেঙ্গল ২-১ গোলে জয়ী হয়। খেলায় কম সুযোগের সদ্ব্যবহার করাটাও কৃতিত্বের পরিচয়।

মোহনবাগানের আক্রমণ ভাগের খেলায় সুসংযত আক্রমণ কৌশল না থাকলেও অন্য দিনের তুলনায় ঐ খেলাটি যথেষ্ট উন্নত হয়েছিল। মধ্যভাগে একমাত্র নীলু এবং বেণীর নাম করা যায়। রক্ষণভাগে গড়গড়ির খেলা দর্শকদের বিশেষ করে আকৃষ্ট করে। বিপক্ষ দলের খেলোয়াড়দের কাছে থেকে কৌশলে বল সংগ্রহ করা এবং দলের খেলোয়াড়দের বল সরবরাহ ক'রে তিনি যথেষ্ট পরিশ্রম করেছেন। সর্ব্বোপরি তাঁর খেলায় কোথাও কৃত্রিমতা চোখে পড়েনা। কিন্তু তাঁর সহযোগী এ দত্তের খেলায় বহু ত্রুটী দেখা যায়। ইষ্টবেঙ্গলের রক্ষণভাগ এই দিন সম্পূর্ণভাবে বিপর্য্যস্ত হয়েছিল। আক্রমণ ভাগের খেলায় সুনীল ঘোষের খেলা ভাল হয়েছিল।

মোহনবাগান-মহমেডান চ্যারিটি ম্যাচে মোহনবাগান উন্নততর খেলা দেখিয়ে ২-১ গোলে জয়লাভ ক'রেছে। দর্শক সমাগম ভালই হ'য়েছিলো; টিকিট বিক্রয় হয় আট হাজার টাকার উপর। এই খেলাটিকে নিঃসন্দেহে এবারের লীগ ম্যাচের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ খেলা বলা যেতে পারে। তবে মহমেডানদের খেলার জৌলুষ অনেকাংশে ক'মে গিয়েছে। একটা গোল খেলে যে মহমেডানদের আটকে রাখা প্রায় অসম্ভব হ'য়ে পড়তো তাদের ফরওয়ার্ডরাও হাফ লাইনের সে দৃঢ়তা ও তীব্রতা আর নেই। রক্ষণভাগের দুর্ব্বলতাও বারবার প্রকাশ পেয়েছে। মোহনবাগানের খেলা সেদিন সত্যসত্যই ভাল হ'য়েছিলো। আক্রমণভাগের খেলোয়াড়রা চমৎকার সহযোগিতা ক'রে খেলেছেন। সেণ্টার হাফ হতাশ ক'রলেও সাইড হাফে বেণী ও অনিল ফরওয়ার্ডদের বেশ ভাল ভাবেই খেলিয়েছেন। রক্ষণভাগে সরোজ দাস ও গড়গড়ি উভয়ে ভাল খেললেও গড়গড়ই শ্রেষ্ঠ। ডি সেন একেবারেই নির্ভরযোগ্য নয়।

মোহনবাগানের কাছে মহমেডানদের এই পরাজয় ইষ্টবেঙ্গলকে লীগ চ্যাম্পিয়ান হবার যথেষ্ট সুযোগ দেবে। মহমেডানের এবারের লীগে এই সর্ব্ব প্রথম পরাজয়।

প্রথম বিভাগের লীগে এ পর্য্যন্ত যতগুলি খেলা হয়েছে তার ফলাফল থেকে ইষ্টবেঙ্গল, মোহনবাগান এবং মহমেডানদলের মধ্যে থেকেই একজন লীগচ্যাম্পিয়ান হবে বলে আশা করা যায়। লীগের খেলায় খেলোয়াড় সুলভ প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্যে যদি অপর কোনদল লীগ বিজয়ী হয়ে আমাদের এই ধারণা ভেঙ্গে দেয় তাহলেও আমরা এতটুকু কম খুশী হবনা। প্রবল প্রতি-দ্বন্দ্বিতার মধ্যে এই বিজয়লাভকে আমরা সকল সময়েই উৎসাহিত করব।

এবার দ্বিতীয় বিভাগের লীগ খেলায় নূতন নিয়ম হয়েছে। এই বিভাগে ১৬টি দল প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে। পূর্ব্বের মত লীগ খেলাকে দু'টি অধ্যায়ে শেষ করা হবে না। এবার প্রতিদল একবার করে অপর দলের সঙ্গে খেলবে। তৃতীয় বিভাগের রবার্ট হাডসন, গ্রীয়ার স্পোর্টিং, মাড়োয়ারী এবং বেনিয়াটোলা ক্লাব এই চারটি দলকে দ্বিতীয় বিভাগে 'প্রমোশন' দেওয়া হয়েছে। ফলে তৃতীয় এবং চতুর্থ বিভাগেও অতিরিক্ত দলকে 'প্রমোশন' দিতে হয়েছে।

রেফারী ঃ

আমাদের এখানে রেফারী সমস্যার সমাধান এখনও হয়নি। সম্পূর্ণ ত্রুটী বিচ্যুতিহীন খেলা পরিচালনা কোন দেশের রেফারীর পক্ষেই সম্ভব নয়। সহস্র সহস্র দর্শকের চোখে যে অতি সামান্য বিচ্যুতি ধরা পড়ে তা একজন রেফারীর দৃষ্টি এড়িয়ে যাওয়া স্বাভাবিক। এর জন্য রেফারীর উপর দোষারোপ করা চলে না। আমাদের যতদূর মনে হয় আমাদের এখানে যে সব মারাত্মক ত্রুটী খেলার পরিচালনার মধ্যে দেখা যায় তা পরিচালকের অজ্ঞতার জন্যই ঘটে থাকে। অথবা এই মারাত্মক ভুলত্রুটী স্বেচ্ছাকৃত হতে পারে। পৃথিবীর অন্যান্য সুসভ্যদেশের খেলার বিবরণ থেকে আমরা পেয়েছি সেখানে প্রচুর অর্থের বিনিময়ে রেফারীরা খেলায় অসম্ভব ঘটনার মধ্যে সম্ভাবনা এনে দেন। কেবল রেফারি নয় খেলোয়াড়রাও উৎকোচ নিয়ে দলকে কোন রকম সহযোগিতা করে না। এইরূপভাবে উৎকোচ গ্রহণ

রেফারী এবং খেলোয়াড়দের পক্ষেও নিষিদ্ধ। বহু নামকরা খেলোয়াড় এবং রেফারী প্রায় প্রতি বৎসরই এইভাবে ধরা পড়ে শাস্তি পেয়ে সুনাম হারাচ্ছেন। আবার যাঁরা অতি সাবধানী তাঁরা এই কাজে হাত পাকাচ্ছেন। এদেশেও রেফারী সমস্যা কম নয়! ওদেশে দর্শকেরা রেফারীর উপর যে ব্যবহার করে সে তুলনায় আমাদের দেশের দর্শকেরা সহস্রগুণ ভদ্র এবং সংযত।

ব্যক্তিগত চ্যাম্পিয়ান শ্রীমুকুল দত্ত

আমাদের এখানে আজ যেপ্রকারে রেফারী সমস্যা দেখা দিয়েছে তাতে রেফারী এসোসিয়েশনের কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করা উচিত। যাঁদের খেলা পরিচালনায় মারাত্মক ভুল ক্রটী দেখা যাচ্ছে তাঁদের ভবিষ্যতে কোন গুরুত্বপূর্ণ খেলা পরিচালনা করতে দিলে আমাদের এই ধারণাই স্পষ্ট হবে এসোসিয়েশনের ব্যক্তিগত স্বার্থই এই অন্যায়কে প্রশ্রয় দিচ্ছে। যদি আমরা ধরে নিই পরিচালনায় মারাত্মক ক্রটী বিচ্যুতি অজ্ঞতা এবং অসাবধানতার জন্য ঘটছে তাহলে আমরা আশ্চর্য্য হচ্ছি এসোসিয়েশন এই সব রেফারীদের কি কারণে পুনবায় খেলা পরিচালনার ভার দিচ্ছেন। এর ফলে উত্তেজিত জনতা নিরীহ রেফারীর সামান্য ভুলকেও উপেক্ষা করতে পাচ্ছে না। মারাত্মক ভুলের জন্য রেফারীরা শারীরিক লাঞ্ছিত হচ্ছেন। দর্শকদের এ[illegible] শ্রেণীর বিদ্রোহকেও আমরা যেমন সমর্থন করিনা তেমনি রেফা[illegible] এসোসিয়েশনের এই বিষয়ে কোন ব্যবস্থা না করাতেও আমরা তাঁদের কার্যকে সমর্থন করতে পারি না। অর্থের বিনিময়ে খেলা দেখতে এসে খেলোয়াড়দের নিম্নশ্রেণীর খেলা এবং রেফারীর মারাত্মক ভুল ক্রটী উপেক্ষা করা দর্শকদের পক্ষে সম্ভব যে নয় তা আমরা সমর্থন করি। খেলায় ভদ্রোচিত সমালোচনা নিন্দনীয় নয়।

বোম্বাই নদকারিণী কাপ ঃ

বোম্বাইয়ে নদকারিণী ফুটবল কাপ প্রতিযোগিতার ফাইনালে ওয়েষ্টার্ণ ইণ্ডিয়া অটোমোবাইল দল ২-০ গোলে বি ই এস টি দলকে পরাজিত করেছে। খেলাটি প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্যে শেষ হয়। বিজয়ী দলের এই বিজয় সম্পূর্ণ ন্যায়সঙ্গত হয়েছে। খেলার প্রথম থেকে শেষ পর্য্যন্ত অটোমোবাইল দল নিজেদের প্রাধান্য বজায় রাখে। তাদের রক্ষণভাগে গোলরক্ষক কাদের ভালু নিজ খ্যাতি অনুযায়ী ক্রীড়াচাতুর্য্যের পরিচয় দিয়েছিলেন। আক্রমণভাগে ভীমরাও এবং টমাসের খেলা উল্লেখযোগ্য। বিজিত দলের রক্ষণভাগের খেলোয়াড় আলেকজাণ্ডারের নাম করা যায়।

এখানে উল্লেখযোগ্য, নদকারণী কাপ বিজয়ী ওয়েষ্টার্ণ ইণ্ডিয়া অটোমোবাইল দল ওয়েষ্টার্ণ ইণ্ডিয়া ফুটবল চ্যাম্পিয়ানসীপ প্রতিযোগিতার দ্বিতীয় দিনের ফাইনালে ৩-১ গোলে বি ই এসটি দলকে পরাজিত করে চ্যাম্পিয়ানসীপ পেয়েছে।

ঢাকায় ফুটবল খেলা ঃ

সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামার দরুণ এক বৎসর পরে ঢাকা ফুটবল লীগ খেলা আবার এ বৎসর আরম্ভ হয়েছে। লীগ প্রতিযোগিতায় [illegible]টি ফুটবল দল প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে। আমরা আশা করি [illegible]য় সাম্প্রদায়িক মনোভাব যেন কোন সম্প্রদায়ের খে[illegible]য়াড় প্রাধান্য না দেন। ৯।৬।৪২

সাহিত্য-সংবাদ

নবপ্রকাশিত পুস্তকাবলী

শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত উপন্যাস "কুমারী-সংসদ"—২৲
বনফুল প্রণীত নাটক "বিদ্যাসাগর"—২৲
শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত গল্প-গ্রন্থ "কাঁচা মিঠে"—২৲
মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত উপন্যাস "চতুষ্কোণ"—২৲
সমরেন্দ্র ভট্টাচার্য প্রণীত গল্প-গ্রন্থ "ইন্দ্রধনু"—১৷৹
প্রদোষ সেন প্রণীত উপন্যাস "আবর্ত্তন"—১৲
শ্রীশশধর দত্ত প্রণীত উপন্যাস "মানুষ সত্য"—২৲
শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র চক্রবর্ত্তী প্রণীত "অদৃষ্টের পাঁচালী"—২৷৹
শ্রীপীযূষকান্তি বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত কাব্যগ্রন্থ "বন্দিনী-বালিকা"—১৲
শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র প্রণীত স্বরলিপি-গ্রন্থ "কীর্ত্তন-গীতি-প্রবেশিকা"—২৷৹
শ্রীরাধারমণ দাস-সম্পাদিত ডিটেক্টিভ উপন্যাস "পিশাচিনী"—৸৹
শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় প্রণীত ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস "উল্কা"—১৷৹
শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী প্রণীত শিশু-উপন্যাস "হত্যার প্রতিশোধ"—৷৹

সম্পাদক—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম-এ

২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা, ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত
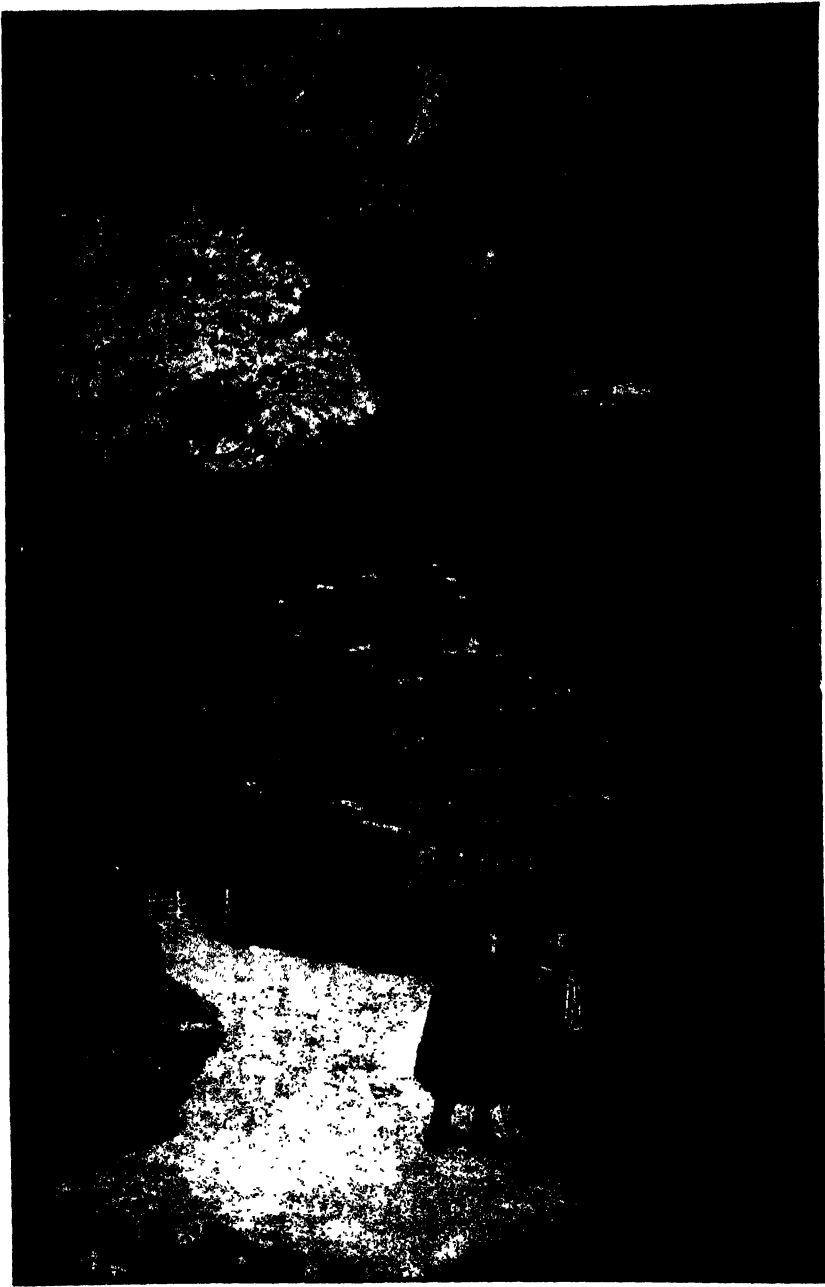
শিল্পী—শ্রীযুক্ত প্রমোদ চট্টোপাধ্যায় কাঞ্চনজঙ্ঘায় সূর্য্যোদয় ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

শ্রাবণ—১৩৪৯

প্রথম খণ্ড | ত্রিংশ বর্ষ | দ্বিতীয় সংখ্যা

প্রাক্-খৃষ্ট যুগে ভারতীয় পৌরনীতি

শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বসু এম-এ, পি-আর-এস, পিএচ্-ডি

বসতির আর্থিক বিকাশের সঙ্গে গ্রাম থেকে সহরের জন্ম। এ সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম ভারতবর্ষেও হয় নি। মানসার, ময়মত, যুক্তিকল্পতরু, দেবীপুরাণ ইত্যাদি শিল্পশাস্ত্রে দেখা যায় সহর ও গ্রামের একই স্থাপত্য কল্পনা, দ্বার, প্রাকার, পুষ্করিণী—এর ব্যবস্থা সর্বত্রই আছে; আসন্ন বনোদক গ্রাম ও সহরের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার জন্যে সমান কাম্য। জাতকে কোথাও কোথাও একই স্থানকে একবার বলা হ'য়েছে 'গ্রাম', একবার 'নিগম' (৫।৫১১)। কখন ৫।৭টা গ্রাম যুড়ে হয়েছে সহর—যেমন সপ্তগ্রাম, চট্টগ্রাম (চতুর্গ্রাম), পেণ্টাপোলিস (টলেমি, ২।২)। কখন হাট বাজারের কল্যাণে এসেছে নাগরিক সমৃদ্ধি—যেমন কক্সবাজার, বাগেরহাট, নারায়ণগঞ্জ। কখন শিল্প ও প্রাকৃত সম্পদের জোরে উন্নতি হয়েছে—যেমন হীরার জন্যে গোলকুণ্ডা, পাথরের জন্যে আগ্রা, গরদের জন্যে ঢাকা এবং বর্তমানে কয়লার জন্যে রাণীগঞ্জ, লোহার জন্যে জামসেদপুর। আবার কখন সমুদ্রতীরে বা নদীতীরে অবস্থিতির দরুণ বহির্বাণিজ্যের সুবিধা পেয়ে গ্রাম হয়েছে 'পত্তন'। কাজেই প্রাচীন পালি-গ্রন্থ 'গাম'গুলির যে যৌথজীবনের চিত্র এঁকেছে,* 'পুর' ও 'নিগম'গুলিতে দেখতে পাই স্বায়ত্তশাসন ও জনপ্রতিষ্ঠানে তার পরিণতি।

সহর এবং গ্রামে অবশ্য বিচ্ছেদ কোনদিনই হয় নি, তবে ব্যবধান একটা এসেছিল। সংস্কৃত 'পৌর', 'জানপদ' ও পালি 'নেগমা', 'জনপদা' এই পার্থক্যসূচক শব্দ দুটী তার প্রমাণ। এখনকার মতই সহরদের কাছে দেহাতি গেঁয়ো ছিল ভিন্ন সমাজের লোক, যদিও সব সময়ে সম্পর্ক খারাপ ছিল না। দুই পক্ষে বৈবাহিক অনুষ্ঠান কখন নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হোত (রাজগহসেট্ঠি অওলো পুত্তন্স জনপদসেট্ঠিনো ধীতরং আনেসি, জাঃ (৪।৩৭), কখন' বা মারামারি বা বাগবিতণ্ডা হ'য়ে ভেঙ্গে যেত' (১।২৫৭)। ব্যবসা-বাণিজ্যের লেন দেনও ছিল' (সাবত্থিনগরবাসী কিরেকো কুটুম্বিকো একেন জনপদকুটুম্বিকেন সদ্ধিং বোহারম্ অঝাসি, ২।২০৩)।

এ ব্যবধানের মূলে ছিল সহর ও গ্রামের আর্থিক গঠনে পার্থক্য। চাষ ও গৃহশিল্প ছিল প্রধানত গ্রামে—যেখানে উৎপন্ন হোত দেশের ধন, —এই ধন জড়ো ক'রে সহর ব্যবসাতে খাটাত, লগ্নির কারবার করত, বিদেশে লেনদেন করত, যৌথ শিল্প গড়ত, ধনকে বাড়িয়ে করত দৌলত। এই দৌলতের টানে সহরে আকৃষ্ট হোত শিক্ষা ও সংস্কৃতি আর তার সঙ্গে বিলাসের উপচার—যেমন অভিনয়, নাচ, গান, বিদূষক, জুয়া, মাদক, নারী। সহরের লোকাচার গ্রামের চেয়ে কৃত্রিম, বিলাসী ও মিশ্র। অর্থশাস্ত্র-রচয়িতার 'জনপদনিবেশঃ' নামক অধ্যায়ে এ ইঙ্গিত সুস্পষ্ট। স্থানীয় যৌথ-শিল্প প্রতিষ্ঠান ছাড়া আর কোন শিল্পশ্রেণী গ্রামে ঢুকতে পারবে না। সেখানে প্রমোদশালা স্থাপিত হবে না,—নট, নর্তক, গায়ক, বাদক, রসিক, এরা গিয়ে 'নিরাশ্রয় ক্ষেত্রাভিরত গ্রামবাসীদের'

* Associate Life in the gama, Jour. of the Dept. of letter, CV., XXXIII. এই প্রবন্ধে এ প্রসঙ্গ আলোচনা করেছি।

চিত্তচাঞ্চল্য ঘটাতে পারবে না (১।১)। সহরের বিলাসব্যসন থেকে কৃষিচর্যাকে রক্ষা করার এই প্রয়াস দেখে বোঝা যায় গ্রাম্য ও নাগরিক জীবনে কতটা ব্যবধান এসে পড়েছিল—যার জন্তে মেগাস্থিনিস্ বলিয়াছিলেন—চাষীরা তাদের স্ত্রীপুত্র নিয়ে গ্রামেই থাকে এবং মোটেও সহরে যায় না (ডায়োডোবাস্, ২।৪০)।

কিন্তু এ পরিবর্তন এসেছিল ধীরে, ক্রমে ক্রমে ;—এবং গ্রাম্য-জীবনের বৈশিষ্ট্যগুলি সব সহরে লোপ পেয়েও যায় নি, বরং দেখতে পাই গ্রামের যৌথজীবন সহরে পরিণত হ'য়েছে পৌরচেতনায়—সহর গ'ড়েছে পুরপ্রতিষ্ঠান আর তার আনুষঙ্গিক আইন-কানুন।

'গাম'এর মত' 'নিগম'এরও যৌথ কর্ম তালিকায় ছিল—বিচারকার্য, জলাশয় খনন, রাস্তা ঘাট নির্মাণ, দান ও লোক হিতকর অনুষ্ঠান, বিত্তালয় প্রতিষ্ঠা, যাগযজ্ঞ, ধার্মিক ভরণ, মন্দির স্থাপন, গোষ্ঠী গঠন ইত্যাদি। এই সমবায় প্রয়াসের হাওয়া 'বীথি' বা পৌরবিভাগ (municipal ward) পর্যন্ত সংক্রামিত হয়েছিল, ভগিনী নিবেদিতা'র কথায়, "রাস্তাটা যে একটা ক্লাব, সে তার রোয়াক ও পাথরের কৌচ-সমেত স্থাপত্য দেখলেই বোঝা যায়।" (Civic and National Ideals)। শ্রাবস্তি ও রাজগৃহের নাগরিকরা কখন 'বীথিভাগে', কখন 'গণবন্ধনে বহু একত্র হ'য়ে' ও কখন 'সকল নগরবাসী ছন্দক সংগ্রহ করে' বুদ্ধ ও ভিক্ষুদের তৃপ্ত করত (জাঃ ১।৪২২, ২।১৫, ১৯৬, ২৮৬)। "এবারও অধিবাসীরা এইভাবে প্রয়োজনীয় জিনিষগুলি চাঁদা করে সংগ্রহ করলে। কিন্তু মতভেদ হোল, কেউ বোল্‌ল ভিক্ষুদের দেওয়া হোক, কেউ বোল্‌ল বিরুদ্ধ বাদীদের (দেবদত্তের দল) দেওয়া হোক। শেষে সাব্যস্ত হোল ভোট নেওয়া হ'বে। দেখা গেল যারা বুদ্ধের পক্ষে তারা সংখ্যাধিক।" এই গণতান্ত্রিক প্রথা চুল্লবগ্‌গে সবিস্তারে বর্ণিত হ'য়েছে (৪।৯।১০।১৪)।

সাঁচি ও ভট্টিপ্রোলু'র লিপিগুলিতে যৌথধর্মাচারে 'গোষ্ঠি' নামে এক প্রতিষ্ঠানের পরিচয় পাওয়া যায়। বুহলার'এর মতে এই গোষ্ঠি হচ্ছে ট্রাষ্টি-পরিষদ, পুরবাসী বা পৌরাংশবাসী যখন কোন স্থায়ী সম্পত্তি যৌথ-ভাবে দেবদ্বিজ ভিক্ষুকে উৎসর্গ করত তখন সে সম্পত্তি তদারক করবার জন্তে ট্রাষ্টি নির্বাচন করে পাঠাত। পৌরসূচিতে ধর্মাচারের পরেই ছিল জনসেবা। কাশীর নাগরিকরা দুঃস্থ ছাত্রদের বিনা ব্যয়ে আহার ও অধ্যয়নের বন্দোবস্ত করে দিত (জাঃ ১।২৩৯, ৪৫১) কোন একটী নিগমে টিকিট (শলাকা) বিলিয়ে বিনামূল্যে আহার দেওয়া হোত (২।২০৯)। মগধ ও বঙ্গের সহরগুলিতে ফা-হিয়েন অসহায় দরিদ্রদের জন্তে স্থাপিত বহু অবৈতনিক চিকিৎসালয় ও হাসপাতাল দেখেছিলেন এবং তাদের পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা লিখে গেছেন।

জাতকের একটী গাথায় ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে এসব কাজ একটা স্থায়ী নাগরিক প্রতিষ্ঠানের নিয়মিত কর্তব্য ব'লে গণ্য হোত—আর পৌরজন ও রাষ্ট্রের কাছে পৌরসভার একটা আইনস্বীকৃত ব্যক্তিত্ব ছিল। মূল গাথার ইঙ্গিতকে টীকাকার ব্যাখ্যা ক'রে পরিষ্কার করেছেন। যদিও 'পূগ' ও পৌরসভা সর্বত্র এক অর্থে ব্যবহৃত হয় না, তবু কার্যত তফাৎ বিশেষ নেই। কারণ ভাষ্যকার বীরমিত্রোদয় (নারদ, ১০।২) ও মিতাক্ষরা (যাজ্ঞবল্ক্য, ২।৩১) বলছেন 'পূগ' বলতে বিভিন্ন জাতি ও বৃত্তির লোকদের সম্মিলিত প্রতিষ্ঠান বোঝায়। পৌরসভাও এই সব বিভিন্ন আর্থিক শ্রেণী বা স্বার্থের সমষ্টি। গাথা ব'লছে—যারা মিথ্যাচারে পূগ প্রতিষ্ঠানের নাম ক'রে ঋণ তুলে সে টাকা আত্মসাৎ ক'রেছে তারা নরকে একটা জ্বলন্ত চুলায় ভাজা হচ্ছে—

যে কেচি পূগায়তনস্‌স হেতু
সথ্‌খিং করিত্বা ইনং জাপয়ন্তি, ৪।১০৮

টীকা : ওকাসে সতি দানং বা দস্‌সাম পূজং বা পবত্তেস্‌সাম বিহারং বা করিস্‌সাম সংকড্‌ঢিত্বা উপিতস্‌স পূগসন্তকস্‌স ধনস্‌স হেতু, জীপয়ন্তীতি তং ধনং যথারুচিং খাদিত্বা গণজেট্‌ঠকানং লঞ্চং দত্বা অমুকট্‌ঠানে এত্তকং ব্যয়করণং গতং অমুকট্‌ঠানে অমূহেহি এত্তকং দিন্‌নন্তি কূটসক্‌খিং দত্বা তং ইণং জীপয়ন্তি বিনাসেন্তি।

দেখা যাচ্ছে দান-ধ্যান বা বিহার নির্মাণের জন্তে পূগ সাধারণের কাছ থেকে ঋণ তুলতে পারত। পুরজ্যেষ্ঠ, যার অকৃত্রিম ইংরাজি প্রতিশব্দ হচ্ছে অল্ডারম্যান, তাঁদের ওপর থাকত এই টাকার দায়িত্ব ; বিভিন্ন বিভাগে আলাদা আলাদা খরচের হিসাব তাঁদের পৌরসভায় দিতে হোত', কখন' কখন' এঁরা ঘুষ খেয়ে সাধারণের বিশ্বাসের অমর্যাদা করতেন। কিন্তু তাঁদের প্রলুব্ধ ক'রে এভাবে যারা লোকসম্পত্তি হরণ করে তাদের অদৃষ্টে আছে নরকচুল্লী। এই পৌরনীতি বিরোধী মনোবৃত্তি স্মৃতিকারদেরও দৃষ্টি এড়ায় নি। কাত্যায়ন ব'লছেন,—কেউ যদি সাধারণের জন্তে উদ্ধৃত ঋণ খরচ ক'রে ফেলে বা নিজের কাজে লাগায়, তা হ'লে সে অর্থ তাকে প্রত্যর্পণ ক'রতে হবে।

গণমুদ্দিশ্য যৎকিঞ্চিৎ কৃত্যার্ণং ভক্ষিতং ভবেৎ
আত্মার্থং বিনিযুক্তং বা দেয়ং তৈরেব তদ্ভবেৎ।

বিষ্ণু ও যাজ্ঞবল্ক্য (৫।১৬৭ ; ২।১৮৭) ও অনুরূপ বিধান দিয়েছেন। পুরসভার জৈনদের কথা অনেক শিলালিপিতে পাওয়া যায়। ভটিপ্রোলু'র ৮নং লিপিতে একুশজন 'নেগম'এর নামোল্লেখ আছে (Ep. In. II. 25)।

অর্থশাস্ত্রের 'গ্রামবৃদ্ধ'ই যে সহরে 'নেগম' বা 'জ্যেষ্ঠক'রূপে দেখা দিয়েছে এতে ভুল নেই। কিন্তু ভটিপ্রোলু'র লিপিগুলো থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে গ্রামের চেয়ে সহরে যৌথজীবন বিস্তার লাভ করেছিল বেশী। এর আরো ভালো প্রমাণ মেগাস্থিনিস'এর পাটলিপুত্র বর্ণনা। "সহরের কার্য্যভার যাঁদের হাতে, তাঁদের ছ'টা কমিটিতে ভাগ করা হ'য়েছে,—প্রত্যেক কমিটিতে পাঁচজন করে আছেন।" প্রথম কমিটির কাজ শিল্প-গুলির তদারক করা, দ্বিতীয়টার বিদেশীদের যত্ন ও খবর নেওয়া, তৃতীয়টার জন্ম ও মৃত্যু রেজেষ্ট্রী করা, চতুর্থটার ব্যবসা-বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করা, পঞ্চমটার বিক্রি ও নিলাম তদ্বির করা, ষষ্ঠটার শুল্ক আদায় করা। এই তিরিশজন সভ্য একসাথে দেখাশুনা করেন "সাধারণ স্বার্থ,—যেমন যৌথশালাগুলি আবশ্যকমত' সংস্কার করা ; মূল্য নিয়ন্ত্রণ করা ; বাজার, বন্দর ও মন্দির পরিচালন করা" (ষ্ট্রাবো, ১৫।১।৫১) অবশ্য এ চিত্র সম্পূর্ণ রাষ্ট্রীয় অধিকারের, স্বায়ত্তশাসনের নয়। কিন্তু এই যে বিভাগীয় ব্যবস্থা, এক একটা বিভাগের জন্তে কমিটি গ'ড়ে দেওয়া, কতগুলি কাজ আবার পৌরপরিষদের যৌথ কর্তব্যের মধ্যে রাখা, এই সব সমেত কূট শাসন-যন্ত্রটা নিশ্চয়ই প্রাক্‌সাম্রাজ্য যুগ থেকে বিকাশ পাচ্ছিল'.—এবং এই ধরণের ব্যবস্থা সম্ভবত রাজগৃহ, শ্রাবস্তি, বারাণসী, অযোধ্যা, মিথিলা, বৈশালী, কপিলাবস্তু ইত্যাদি বড় বড় নগরে কিছু কিছু প্রচলিত ছিল।

এ অনুমানও অসঙ্গত হবে না—যে যখন সম্রাটের প্রতাপশীল শাসন অপনীত হোত' তখন ঐ যন্ত্রটাই চলত' গণতান্ত্রিক চালনায়। পরবর্তী স্মৃতিকাররা সভার কার্যসচিবদের (সমূহহিতবাদিনঃ, কার্য্যচিন্তকাঃ) জন্তে যোগ্যতার দুরায়ত্ত আদর্শ স্থির করে দিয়েছেন,—তাঁরা হবেন কুলীন, বেদজ্ঞ, সংযমী, শাসনদক্ষ, দেহে মনে পবিত্র, নির্লোভ (বৃহস্পতি, ১৭।৯ ; যাজ্ঞবল্ক্য, ২।১৯১)। তাঁদের নিয়োগ করবার ও শাস্তি দেবার ক্ষমতা পৌর-সভার হাতে (বৃঃ ১৭।১৭-২০) কোন দুর্ধর্ষ রাজার প্রত্যক্ষ শাসনাধীনে না থাকলে স্বাতন্ত্র্যপ্রিয় ও অর্ধ-স্বাধীন পুরপ্রতিষ্ঠান কখন' কখন' দস্যু-দুর্বৃত্তের আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা করবার জন্তে নিজেদের পুলিশ ও সৈন্যদলও গড়ত' (বৃঃ ১৭।৫-৬, নাঃ ৩৪, ১০।৫)। কোন কোন সময়ে তারাই অগ্রবর্তী হয়ে লুঠপাট করত' আর রাজ্যকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলত' (বৃঃ ১৪।৩১-৩২ ; অর্থশাস্ত্র, ৫।৩)

প্রত্নতাত্ত্বিক উপকরণে আরো বিশদ এবং বিশ্বাসযোগ্য তথ্যের সংবাদ মেলে ! শক আমলে নাসিক সহরে রাজা বা কোন ব্যক্তি যখন কোন প্রতিষ্ঠানকে সম্পত্তি দান করে ব্যাঙ্কে গচ্ছিত রাখতেন, তখন সেই

সম্প্রদানের সর্তগুলি 'নিগমসভা'য় ঘোষণা ক'রে (শ্রাবিত) রেজিষ্ট্রি করা (নিবদ্ধ) হোত' (নাসিক লিপি, ১২।৫, ১৫।৮) কর্পোরেশনের নিজ নামাঙ্কিত শীলমোহর ছিল', কখন' কখন' তারা নিজ নামে মুদ্রা প্রচলনও করত'। এলাহাবাদে ভিটা নামক জায়গায় মার্শেল একটী বাড়ির নীচে 'শাহিজিতিয়ে নিগমশ' লিপি সহ একটী পোড়ামাটির সীলমোহর পেয়েছিলেন। লিপিবৈজ্ঞানিকের মতে এটা খৃষ্টপূর্ব ৩য় বা ৪র্থ শতকের ব'লে অনুমিত হয়েছে, আর মার্শেল মনে করেন ঐ বাড়িটা ছিল' নিগমেরই আপিস ঘর।* ঐ স্থানেই পাঁচটী ছাপা সীল পাওয়া গেছে—চারটীতে কুশান অক্ষরে লেখা 'নিগম' বা 'নিগমস' একটীতে উত্তর গুপ্ত অক্ষরে লেখা 'নিগমস্য'। বসাড় বা বৈশালীতেও গুপ্ত সম্রাটদের আমলের অনুরূপ সীল পাওয়া গেছে। তক্ষশীলায় কানিংহাম চারটী মুদ্রা পেয়েছিলেন তার এক পিঠে লেখা 'নেগমা', আর এক পিঠে একজন লোকের নাম,—সম্ভবত রাজা বা পৌরপতির হবে। অক্ষরগুলি ব্রাহ্মি বা ব্রাহ্মি-খরোষ্ঠি যা থেকে খৃষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকের আগে ব'লে মনে হয়।† বিশুদ্ধিমগ্‌গতেও উল্লেখ আছে কোন কোন 'নৈগম' ও 'গাম' নিজ নামে মুদ্রা ছাপত' (১৪)।

বসাড়ের সীলগুলি থেকে পরবর্তীকালের পৌরশাসন পদ্ধতি সম্বন্ধে আরো কিছু কিছু আভাস পাওয়া যায়। সভ্য ও 'প্রথম কুলিক' দের উল্লেখ লক্ষ্য করার মত। 'শ্রেষ্ঠি', 'সার্থবাহ', 'কুলিক' ইত্যাদি শক্তিমান সওদাগরি স্বার্থ পৌরসভা অধিকার করেছিল। দামোদরপুরের তাম্রলিপিতে দেখি 'বিষয়'-এর শাসনে তারাই সর্বেসর্বা। গুপ্ত রাজাদের আমলে শিল্পশ্রেণী ও ব্যবসায়শ্রেণীগুলি যে তাদের আর্থিক প্রতিপত্তির বলে নগরগুলির শাসনযন্ত্র হাত করেছিল' এতে সন্দেহ নেই।

কেউ কেউ বলেন এই সব সীল ও মুদ্রা'য় উল্লিখিত 'নিগম' শিল্পশ্রেণী; পৌরপ্রতিষ্ঠান নয়। দেবদত্ত ভাণ্ডারকরের মতে এই প্রতিবাদ ভিত্তিহীন।‡ রমেশ মজুমদার মধ্যমত অবলম্বন ক'রে বলেছেন "গুপ্ত আমলে ভারতবর্ষের অনেক নগরে শাসনক্ষমতাপন্ন শক্তিমান শ্রেণী-প্রতিষ্ঠান বিদ্যমান ছিল।"§ শিল্পপ্রধান গ্রামগুলির যে বর্ণনা পালি-সাহিত্যে পাওয়া যায় তাতে মনে হয় সেখানে শিল্পসঙ্ঘ ও পৌরসভা একই বস্তু। এই অভিন্নতা নিঃসন্দেহ অনেক 'নিগম'-প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধেও অনুমান করা যায়—কারণ গ্রাম থেকেই নিগমের উদ্ভব, শুধু একটী সঙ্ঘবদ্ধ শিল্পের জায়গায় নিগমে সম্মিলিত হয়েছে অনেকগুলি সঙ্ঘবদ্ধ শিল্প। 'পুগ' বলতেও বোঝায় বিভিন্ন 'শ্রেণী' বা শিল্পসঙ্ঘের সমবেত প্রতিষ্ঠান। অতএব 'নিগম', 'পুগ', 'শ্রেণী' এদের মধ্যে তফাৎ ভাবায় ও মাত্রায়। বাস্তবক্ষেত্রে শিল্পকেন্দ্রিক সহরগুলিতে এরা হ'য়ে দাঁড়ায় এক। পৌরশাসন কেমন করে সওদাগরি স্বার্থের হাতে গিয়েছিল' তার আরো দৃষ্টান্ত খনন আবিষ্কারে মেলে (Ep. In. I. 20; XIV. 14)।

অতএব গঠনকৌশলে বা দায়িত্বশীলতায়, সব দিক দিয়ে প্রাচীন পৌরশাসন বর্তমান মিউনিসিপালিটির সমকক্ষ ছিল। শিল্পশাস্ত্রগুলিতে সহরের কোন কোন অংশ ভেঙ্গে প্রয়োজনমত নতুন স্থাপত্যকল্পনায় গড়বার যে বিধান দেওয়া হ'য়েছে, দ্বারকা নগরী নির্মাণের যে বর্ণনা হরিবংশ দিয়েছে, তক্ষশিলা'র ভগ্নাবশেষ দেখে নগর-বিস্তারের যে প্রণালী অনুমান করা যায়, এ সব থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে নাগরিকদের স্থাবর সম্পত্তির ওপর পৌরসভার অসীম কর্তৃত্ব ছিল—যা আজকালকার ইম্‌প্রুভ্‌মেন্ট ট্রাষ্টও দাবী করতে পারে না। শহরের ভূসম্পত্তি কেউ এক পুরুষের বেশী ভোগ করতে পারবে না—শুক্রনীতিতে এমন পুরোদস্তুর সমাজতান্ত্রিক বিধান পর্যন্ত আছে। নারদ, বৃহস্পতি, যাজ্ঞবল্ক্য ইত্যাদি স্মৃতিকাররা নগরীর যৌথব্যক্তিত্বকে (corporate person) আইনের স্বীকৃতি দিয়েছেন, তাঁদের বিচারসভায় দাঁড়াবার, সম্পত্তির মালিক হবার ও ঋণ তুলবার অধিকার দিয়ে। সাধারণের কাজে, পুরবাসীদের সুখ-সুবিধায় বন্দোবস্ত তারা কিছু কম করত না। নগরীর সাধারণ আবাসগুলির মধ্যে উল্লেখ আছে—বাজার, খেলার মাঠ, অভিজাতশালা, আরামকানন, বাগান, কর্মচারীদের দপ্তর ও কাইন্‌সিল ঘর (মহাভারত-শান্তিপর্ব, ৬৯)। পালি-সাহিত্য থেকে এ তালিকায় যোগ করা যেতে পারে—অতিথিশালা বা 'আবসথাগার', তার সংলগ্ন জলাশয়, টাউন হল সভাঘর বা 'নগরমন্দির', পাঠশালা, দেবমন্দির ইত্যাদি, নির্মল দীঘির চারধারে শিল্পী বাগান বা পার্ক সাজিয়ে তুলত', জলের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করত' কুমুদ-পদ্ম; পারে নির্মাণ হোত' ছায়াছাদ, স্নানের ঘাট, কুঞ্জ, দোলনা, বেদী। রাস্তার চৌমাথায় থাকত' কূপ, জলসত্র (প্রপা)। তে-মাথায় বা চৌ-মাথায় ছিল' ত্রিকোণ-চতুষ্কোণ তৃণলতাভূমি। শিল্পশাস্ত্র ও বাস্তুবিদ্যার সাক্ষ্য ছেড়ে দিলাম; রামায়ণের অযোধ্যা (১।৫), মহাভারতের ইন্দ্রপ্রস্থ (১।২১৭), হরিবংশের দ্বারকা (বিষ্ণুপর্ব, ৫৮, ৯৮), কহ্লানের শ্রীনগরী (রাজতরঙ্গিনী, ১।১০৪), মহাবগ্‌গের বৈশালী (৮।১), জাতকের মিথিলা (৬।৪৬ ইত্যাদি), মিলিন্দ পঞ্হো'র শাকল (পৃঃ ১ ইত্যাদি), মেগাস্থিনিসের পাটলিপুত্র (ষ্ট্রাবো, ১৫।১।৩৫-৩৬; এরিয়ান, ১০)—এ সব পাঠ করে বোঝা যায় খৃষ্টপূর্বাব্দেও ভারতবর্ষে পৌরপ্রতিভা কতদূর বিকাশ পেয়েছিল—উত্তর ভারতে কাশ্মীর, পাঞ্জাব, সিন্ধু, বঙ্গ সর্বত্র কবি, ঐতিহাসিক, গাথাকার, ধর্মোপদেষ্টা, বিদেশী রাজদূত সবাই মুক্তকণ্ঠে নাগরপ্রশস্তি গেয়ে গেছে। আর্থিক সম্পদ ও যৌথচেতনা নগরকে দিয়েছিল' সৃজনশক্তি জীবনের আনন্দ—তার বিকাশ কর্মীর কাছে, স্থপতির শিল্পে, কবির গাথায়।

* Annual Report of Archeological Survey, 1911:12, P. 47.
† Coins of Ancient India, P. 63 & Pl III.
‡ Carmichael Lectures 1918, Pp. 170 ff.
§ Corporate Life in Ancient India, P. 45.

গান

শ্রীসুবোধ রায়

মরণ তোদের ডাক্ দিয়ে যায়
দুয়ারে দেয় নাড়া,
কণ্ঠ তোদের নীরব কেন
আনন্দে দে সাড়া।

বল্ না তারে—জনম জনম ধরি'
তোমায় চিনি, হে মৃত্যু-সুন্দরী,
যদিও আজ অন্ধ বিভাবরী
চাঁদের জ্যোতিহারা।

তবুও হায় জানি তাহার গলে
তারার আলোর বরণমালা ঝলে,
সেই আলোকে চিনব তোমায় জানি,
ধরব তোমার ব্যগ্র ব্যাকুল পাণি;
গাইবে তখন মিলন-মন্ত্র-বাণী
উষার ধ্রুবতারা।

স্বয়ম্বরা

শ্রীআশালতা সিংহ

৪০

ক্রমশঃ বেলা হইয়া উঠিল। হতবুদ্ধি অনন্তর চোখ দিয়া এই প্রথম তাহার চির-উপেক্ষিতা মেয়ের জন্ম অশ্রু গড়াইয়া পড়িল। মন তাহার বলিতে লাগিল: নিশ্চয়ই বিপিনের সঙ্গে বিবাহের উদ্যোগ হওয়ায় সে লুকাইয়া ডুবিয়া মরিয়াছে। দুর্গামণি প্রাণের ঝাল মিটাইয়া যে চীৎকার করিয়া লইবেন সে আশা নাই। পাড়াপ্রতিবেশীরা আছে, তাহারা জানিতে পারিলে রক্ষা নাই। সর্ব্বোপরি বিপিন কাল বাকী আড়াইশো টাকা দিয়া গেছে। এক পয়সাও বাকী রাখে নাই। তাই অনন্ত তখন অশ্রুবিকৃত স্বরে তাহার সন্দেহের কথা বলিল; আর একবার যখন পরেশের সঙ্গে কথা উঠেছিল তখন যে সে মনের জ্বালায় বলেছিল মুখ ফুটে—আমি শুনি নাই। অভিমান করে মা আমার তাই···

তখন দুর্গামণি সব কথাটা শেষ করিতে না দিয়াই মুখের একটা বিশ্রী ভঙ্গী করিয়া কহিলেন, তাই হোক, হে মা জগদম্বে তাই হোক। তাহ'লে তবু আমাদের ইজ্জত থাকে। নইলে আর কিছু হ'লে যে মুখ একেবারে পুড়ে যাবে মা। দোহাই মা, তোমার তাই কোর।

ঠিক এমনই সময়ে মালতীকে খুঁজিতে নীহার আসিয়া প্রাঙ্গণে দাঁড়াইল। দুর্গামণি তাহাকে যেরূপভাবে অভ্যর্থনা করিলেন তাহা অত্যন্ত কটু। তিনি স্পষ্টই বলিয়া দিলেন, আজ বাদে কাল মালতীর বিয়ে হবে, ঐ সংসর্গে তিনি অতবড় মেয়েকে মিশিতে দিবেন না। সে যেন আর না আসে।

গরুর গাড়ী দাঁড়াইয়াছিল, নীহারের মুখে খবর পাইয়া বিনয়ের চোখের উপর হইতে একটা পর্দ্দা সরিয়া গেল। সে আজ যেমন করিয়া বুঝিতে পারিল এবং তেমন করিয়া কোনদিন বুঝিতে পারে নাই তাহার কতখানি ঐ মেয়েটির সঙ্গে জড়াইয়া গেছে। একান্ত স্নেহের বস্তুকে নানা জটিলতা ও প্রতিকূলতার মাঝে ফেলিয়া যাওয়ার যে অসহায় ক্ষোভ, সেই ক্লেশ বহন করিয়া সে গাড়ীতে উঠিল। বস্তুতঃ আর অপেক্ষা করিবার সময়ই ছিল না। গাড়োয়ান ক্রমাগত তাগাদা দিতেছিল।

সমস্ত গাড়ী ও তাহার পর ট্রেণে তাহার এক অদ্ভুত ভাবে সময় কাটিতে লাগিল। কাহারও জন্ম এমন উদ্বেগ—এমন আকুলতা জীবনে কখনো সে অনুভব করে নাই। মনে মনে সে সহস্রবার আবৃত্তি করিল: মালতী, মালতী! আমার মত যে অসহায় ভীরু তুমি কেন জোর করে তার উপর দাবী করলে না? আমার সঙ্কোচ কি কেবল আমার অক্ষমতা ভেবে, না তা নয়। আমার যোগ্যতা বা অযোগ্যতার বিচার তুমি নিজেই কেন করলে না, করতে কি পারতে না?

যে কথা শুধু আভাসে গুঞ্জনে টের পেতেম, জোর করে মুখ ফুটে কেন সেই কথা বললে না একবার। তা যদি বলতে আমি কি পারতুম নিশ্চেষ্ট হয়ে থাকতে? কিন্তু এখনও আমার সঙ্কোচ যে যায় নাই। কি করে জানতে পারব আমার সাহায্যকে তুমি অযাচিত করুণা বলে নেবে না?

কিন্তু বিনয় জানিত না তখনও যে অদৃশ্যবর্ত্তিনীর কাছে সে শতসহস্রবার প্রশ্ন করিতেছে, সে বিনয়ের উপর দাবী করিতে আরম্ভ করিয়াছে এবং এই দাবীই তাহাকে বিদ্রোহের ও বিপদের দুর্গম পথে যাত্রায় প্রবৃত্ত করাইয়াছে।

৪১

অফিসে পৌঁছিয়া ম্যানেজারকে বিলম্বের কৈফিয়ৎ দিতে তিনি হাসিয়া কহিলেন, আপনার চিঠি তো আমরা যথাসময়ে পেয়েছি। অবশ্য আপনার হাতের লেখা ছিল না, জ্বর হ'য়েছিল ব'লে আর কেউ লিখে দিয়েছিলেন। যথাসময়ে একটা মেডিকেল সার্টিফিকেট জোগাড় করে দাখিল করিয়ে দিয়েচি। কোন ভাবনা নেই বিনয়বাবু। কিন্তু একটা সুখবর শুনবেন?

বিনয়ের কিছুই ভালো লাগিতেছিল না। সমস্ত মন তাহার উদ্‌ভ্রান্ত হইয়াছিল, নিরুৎসুক কণ্ঠে বলিল, আমার পক্ষে আর সুখবর কি আছে? কি-ই বা হ'তে পারে বুঝতে পারছিনে।

ম্যানেজার নিম্নস্বরে কহিল, অবশ্য কথাটা এখনই যেন রাষ্ট্র করবেন না, হয়তো কত বাধা আসবে কে বলতে পারে। আমার জামাই একটা কলিয়ারি কিনেচে, আমাকে ডেকেচে তার ম্যানেজার হয়ে চালাতে। বারংবার চিঠি আসচে যাবার জন্মে। আজ দোকানের প্রোপ্রাইটরের সঙ্গে দেখা হ'তে বললুম, আমি তো আর থাকতে পারব না বিনোদবাবু। অন্যলোক তাহলে দেখুন—কাগজে বিজ্ঞাপন যদি দেবার হয় তাই দে'ন। আগে থেকে জানিয়ে দিলুম। বিনোদবাবু একটু চুপ করে থেকে ব'ললেন, বাইরে থেকে আর লোক খুঁজে কি হবে। আমাদের বিনয়বাবু রয়েচেন, ভাবচি তাঁকেই অফার কোরব। লোকটি সৎ; নির্লোভ, আর প্রকৃতই শিক্ষিত। যাক বিনোদ হালদার মানুষ চিনবার ক্ষমতা রাখে বটে। একটা কিছু গুণ আছে বই কি, নইলে এত অল্পদিনের মধ্যে ব্যবসায়ে এত উন্নতি করেচে কেমন করে। কিন্তু আপনি কেমন যেন মুষড়ে রয়েচেন বিনয়বাবু। হয়তো কোন কারণে মন ভালো নেই। বাড়ীর সব ভালো তো?

হ্যাঁ, ভালোই।—বিনয় সংক্ষেপে জবাব দিয়া তাহার নির্দ্দিষ্ট টেবিলে যাইয়া বসিল। হাত যন্ত্রের মত কাজ করিয়া চলিয়াছিল, কিন্তু মন যে কেন এত অশান্ত হইয়া উঠিয়াছে তাহার সমাধান করিতে যাইয়া দেখিল: নিজের দ্বিধা এবং দুর্ব্বলতার জন্ম নিজের উপর প্রচণ্ড রাগ হইতেছে। ম্যানেজার যে এইমাত্র সুখবর দিয়া গেল, অন্যসময় হইলে আশায় আনন্দে মনটা নাচিয়া উঠিত। কিন্তু আজ কি জানি মনে হইতেছে কি হইবে তার এ সবে? যে থাকিলে সকল আয়োজনই সম্পূর্ণ হইতে পারিত, তাহার চিরজীবনের সেই সফলতা চোখের সামনে দিয়া বহিয়া চলিয়া গেল। হাত বাড়াইলে ধরিতে পারিত কিন্তু এখন আর পারিবে

না। সময় বহিয়া গেছে। আরও একটা ভালো চাকরি তাহার কপালে জুটিয়া যাইবে হয়তো, কিন্তু এইটুকুর জন্য কত তাহারই মত শিক্ষিত যুবক পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। একদিন সে'ও বেড়াইয়াছে। লক্ষ্যহীন সফলতাহীন কত শত জীবনের অরুন্তুদ ব্যাকুলতা সে আজ সফলতার পথে ঢুকিতে গিয়া যেমন করিয়া বুঝিতে পারিল, বেকার জীবনে একদিনও তেমন করিয়া অনুভব করে নাই। অতুলের কথা মনে পড়িল।

শিক্ষার সুযোগ নাই, পল্লীগ্রামে সৎশিক্ষিতের সাহচর্য্য নাই বলিলেও চলে। যে আসঙ্গে ও যে পরিবেশে সেখানে মানুষকে দিন কাটাইতে হয় বিনয় তাহা হাড়ে হাড়ে জানে। অমনই ভাবে থাকিয়া অতুল যে লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া গেছে ইহাতে তাহাকে খুব বেশী দোষ দেওয়া যায় না। কি জানি কেন পৃথিবীতে যেখানে যত বেদনা আছে যত বিফলতা আছে সে সমস্তর ব্যথা একীভূত হইয়া বিনয়ের মনে আলোড়ন তুলিল।

কাজকর্ম্ম সারিয়া উঠিতে সন্ধ্যা হইয়া গেল। অফিসের ঘরে তখন আলো জ্বলিয়া উঠিয়াছে। ক্লান্ত অসুস্থ দেহ লইয়া চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বিনয় শূন্য মনে দেয়ালের দিকে চাহিল। একটা টিক্‌টিকি অত্যন্ত তৎপরতার সহিত শিকারীর নিঃশব্দ নিপুণ লক্ষ্যে একটা পোকাকে গ্রাস করিতেছে। দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া বিনয় দেখিতে লাগিল। তাহার মনে হইল দেয়ালের গায়ে অদূরবর্ত্তী ঐ পতঙ্গ হত্যার সহিত সমস্ত মানব সমাজের একটা নিগূঢ় সাদৃশ্য আছে। সমাজে চলিয়াছে ঐ নিঃশব্দ নৃশংস হত্যালীলা, রাষ্ট্রেও অভিনয় হইতেছে ঐ একই ক্রূর হত্যাকাণ্ডের। মানুষের সঙ্গে মানুষের সংস্পর্শেও সংগুপ্ত রহিয়াছে স্বার্থের সংঘাত, একজনের সুখ এবং শান্তিকে স্বার্থের খাতিরে পদদলিত চূর্ণ করিবার অদম্য প্রবৃত্তি। বাইরে আসিয়া যাহাই তাহার চোখে পড়িতে লাগিল সেখানেই তিক্ততা এবং একটা সর্ব্বব্যাপী প্রবঞ্চনা ছাড়া আর কিছুই সে দেখিতে পাইল না। ট্রামের পাশ ঘেঁষিয়া বাসগুলা সশব্দে দ্রুতগতিতে চলিতেছে। যাইতে যাইতে পরস্পর পরস্পরের উচ্ছেদ কামনা করিতেছে। একটা দোকানে বিজলী বাতির হরফে মোটা মোটা অক্ষরে বিজ্ঞাপনের স্তম্ভ জ্বলিয়া উঠিতেছে! ভিতরে আর তাহার অন্য কোন কামনা নাই, আলোকে সজ্জায় চাতুর্য্যে দক্ষতায় আশে-পাশের সমব্যবসায়ীদের নিষ্প্রভ করিয়া নিজের বিজয় পতাকা উড়াইয়া চলা ছাড়া।

বিশ্বসংসারে এই নিয়ম। নিজের উপর তাহার রাগ হইল। কেন সে সবল দুইহাত দিয়া স্নেহাস্পদকে ধরিয়া রাখে নাই। দ্বিধায় সংশয়ে নিজের সকল কথা সকল কামনাই একটা অস্পষ্ট কুহেলিকার মধ্যে অনিশ্চিতের পথে ছাড়িয়া দিয়াছে।

একটি পঁচিশ ছাব্বিশ বছরের যুবক আসিয়া বিনয়ের অফিসে ঢুকিল এবং প্রশ্ন করিল, এখানে বিনয়বাবু কার নাম বলতে পারেন?

—আমারই নাম।

ছোট একটুকরা কাগজ ছেলেটি বিনয়ের হাতে দিল। দিয়া হাসিল। কাগজে মালতীর নাম এবং তাহার মামা বাড়ীর ঠিকানা ছিল।

বিনয় রুদ্ধ নিঃশ্বাসে কহিল, আপনি কে হ'ন তাঁর? উনি এখানেই আছেন?

সুধীর হাসিয়া বলিল, হ্যাঁ, মালতী তার মামার বাড়ীতে কাল এসে পৌঁছেচে। আপনি কি শোনেন নি, সে ছেলেবেলা থেকে এই ক'লকাতাতে তার মামার বাড়ীতেই মানুষ হয়েছিল। তার মা মারা যাবার পরে থেকেই সে একরকম আমাদের কাছে ছিল। আমি ওর মামাতো ভাই। কিন্তু বোলব সব কথা। চলুন না আমাদের ওখানে। রাস্তায় যেতে যেতে আপনার সঙ্গেও ভালো করে আলাপ হবে।

বিনয় মন্ত্রমুগ্ধের মত কহিল, চলুন।

রাস্তায় আসিতে আসিতে সুধীর সমস্ত কথা বলিল। মালতী অসীম সাহসে ভর করিয়া কেমন করিয়া একলাই তাহার জটিল জীবনের চরম সর্ব্বনাশ হইতে নিজেকে রক্ষা করিবার জন্য চলিয়া আসিয়াছে—কোনদিকে তাকায় নাই।

শুনিতে শুনিতে বিনয়ের চোখে জল আসিয়াছিল, সে মুখ নামাইয়া রাখিয়াই কহিল, ধরুন সেদিন যদি কোন কারণে আপনি সন্ধ্যের ট্রেণ ধরে রাত্রির মধ্যেই ষ্টেশনের ওয়েটিং রুমে পৌঁছতে না পারতেন তাহলে তাঁর কি বিপদ হ'তে পারত!

সুধীর কিন্তু স্বচ্ছন্দে হাসিয়া কহিল, শুধু আমার উপর নির্ভর করেই যে সে এত বড় দুঃসাহসিক কাজে বল পেয়েচে আমার মনে হয় না।

বিনয় বিস্মিত হইয়া কহিল, তার মানে? আপনাকে ছাড়া আর কাহাকেও তো তিনি কিছু লেখেন নি বা জানান নি।

সুধীর পুনশ্চ হাসিয়া কহিল, কি জানি মশায় মেয়েদের কথা অত্যন্ত গোলমেলে। সব সময় সবাই বুঝতে পারে না সব কথা। আপনার মত লোকে বোধকরি একটুও বুঝতে পারে না। আপনার সঙ্গে আলাপ হয়ে তাই তো আমার মনে হচ্চে। কিন্তু আমার যদি পরামর্শ শোনেন, এবার থেকে একটু চেষ্টা কোরবেন বুঝতে।

বিনয়ের হঠাৎ কেমন লজ্জা করিতে লাগিল, আর একটা কথাও জিজ্ঞাসা করিতে পারিল না—অথচ অনেক কথাই জানিবার ইচ্ছা হইতেছিল। কিন্তু তাহাকে প্রশ্ন করিতে হইল না। আপনা হইতেই সুধীর বলিল, আমার বাবার কাছেই ছোট বেলা থেকে মালতী মানুষ হ'য়েছিল। আপনি তাকে জানতেন, মনে হোত না তাকে আপনার সবারই চেয়ে স্বতন্ত্র? সেটা আমার বাবার কাছে ছোট থেকে থাকার ফল। আপনি মনে ক'রবেন আমার গর্ব্ব করা হচ্ছে। কিন্তু এ আমার গর্ব্ব নয়, যাঁরা তাঁকে কিছুমাত্র জানতো তারাই বুঝবে এ কথার মানে। তারপরে তিনি হঠাৎ মারা গেলেন, তখন আমি প্রেসিডেন্সিতে সবে আই-এতে ঢুকেচি। আমার অন্য ভাই বোনেরা নেহাৎ ছোট। বাবা চাকরী করতেন কিন্তু কখনো সঞ্চয় করেন নি। তাই তাঁর মৃত্যুর পরে ক'লকাতায় থাকবার আমাদের কোন উপায় রইলো না। আমি একটা সস্তার মেসে উঠে কোনক্রমে পড়াশোনা চালিয়ে নিতে লাগলুম, মা আমার ছোট ভাইবোনগুলিকে নিয়ে বাপের বাড়ী গেলেন। এই মাত্র মাস তিনচারেক আগে বি-এ পাশ করে বাবা যে অফিসে কাজ করতেন সেই অফিসে কাজে ঢুকেচি। মা' এসেচেন, এখন আমরা সবাই আবার এখানে আছি। মালতীকে তার বাবা এসে নিয়ে যান যখন মা বাপের বাড়ী গিয়েছিলেন। তার বাবা যে এমন প্রকৃতির একথা জানলে আমরা কখনও তাকে ছেড়ে দিতুম না—এ কথা নিশ্চয় করে বলতে পারি।

সুধীরদের বাড়ীর সম্মুখে তাহারা আসিয়া পড়িল। ছোট একতলা বাসাবাড়ী। সামনের ঘরে মালতী চুপ করিয়া বসিয়াছিল। পাশের প্রাঙ্গণে কল হইতে জল পড়িতেছে, কাহাদের কথাবার্ত্তার আওয়াজ আসিতেছে। কোথায় কাহার সহিত দেখা করিতে হইবে, ভদ্রতাসূচক কেমন ব্যবহার করিবে সে সমস্ত বিনয় বিস্মৃত হইয়া গেল। কোথায় আসিয়াছে কেন আসিয়াছে সে কথাও সে স্মরণ করিতে পারিল না। কেবল অসীম তৃপ্তির সহিত চাহিয়া দেখিল: মালতী তাহার সামনেই বসিয়া আছে। তাহার কোন বিপদ হয় নাই। সে ভালো আছে। সুস্থ এবং নিরাপদেই আছে এবং তাহার সামনেই বসিয়া আছে।

মালতী উঠিয়া প্রণাম করিল। বলিল, আপনার শরীর এখনও তো সারে নি। আমাকে এখানে দেখে খুবই অবাক হয়ে গেছেন, নয়?

বিনয় অবাক হইয়া চাহিয়া রহিল। সে বুঝিতেই পারিল না এখন এই মুহূর্ত্তে মালতী কেমন করিয়া সহজে স্বচ্ছন্দে সাধারণ কথা বলিতেছে। কেমন করিয়া বলিতে পারিতেছে?

মালতী আবার বলিল, আপনাকে বড় দুর্ব্বল দেখাচ্ছে। আপনাকে এই দুর্ব্বল শরীরে এতটা পথ আসতে বলে ভালো করিনি। হয়তো কষ্ট হয়েছে। হয়তো কেন নিশ্চয়ই হয়েছে।

বিনয় তবুও চুপ করিয়া রহিল। উত্তরোত্তর অবাক হইয়া সে ভাবিতে লাগিল: এখন কেন মালতী এ সব বাজে কথা বলচে?......যা আমার সমস্ত মন তোলপাড় করচে তা কি তাহলে ভুল? কেবলমাত্র পরিচিত একগ্রামের লোক ব'লে ও আমাকে দেখা করতে আসতে বলেচে, তার বেশি আর কিছু নয়। কি করে আমি বুঝব?...তাই কি? .....

কোন এক সময় আপন অজ্ঞাতসারে অস্ফুট কণ্ঠে সে বলিল, মালতী, আজ তোমার কাছে একটা প্রার্থনা কোরব, এ প্রার্থনার যোগ্যতা আমার আছে কিনা জানিনে, তবুও বলচি। আজ থেকে তুমি নিজের জন্যে নিজে আর কিছু ভাবতে পাবে না। তোমার সমস্ত ভাবনার ভার আমার উপর দাও।

মালতীর অশ্রুসজল চোখের দৃষ্টি ছাড়া বিনয় আর কোন উত্তর পাইল না। কিন্তু হঠাৎ সমস্ত বুঝিতে পারিল। আর কোন সংশয় রহিল না। কিছুক্ষণ পর আপনাকে সংবরণ করিয়া লইয়া মালতী কহিল, পাশের ঘরে মামীমা আছেন, তাঁর সঙ্গে দেখা না করে যেন চলে যাবেন না। তিনি রাগ করবেন তাহলে।

এতক্ষণ পরে সহজভাবে হাসিয়া বিনয় কহিল, চলে যাবার জন্যে আমি যে খুব ব্যস্ত হয়ে পড়েচি এমন কথা তুমি কি করে আন্দাজ করলে বুঝতে পারচিনে তো। বরঞ্চ চিরকাল এর উলটোই দেখে এসেচি। আমার কাছে কিছুক্ষণ ব'সলেই বাড়ী পালাবার জন্যে তুমি ব্যস্ত হয়ে উঠ্‌তে। কিন্তু মালতী আমি ভেবে পাচ্চিনে আমার মত......

মালতী রোষারুণ আঁখি দু'টি তাহার পানে তুলিয়া চাহিয়া থাকিয়া কহিল, কার মত, কিসের মত কখন ভেবে দেখিনি। বেশি কিছু চাইবার মত আশাও জীবনে কখনো করি নি। কিন্তু সূর্য্য উঠ্‌লে আলোর দিকে যেমন করে দৃষ্টি যায়, তেমনই তোমার কথা মনে করেই জীবনের চরম অন্ধকার আর দুর্গতি অনায়াসে ছেড়ে চলে এসেচি। একবারও ভাবনা হয় নি। এখন অবাক লাগে......হঠাৎ মালতী কথা শেষ না করিয়াই অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া বলিল, শুধু বাজে গল্প করচি। আপনি হয়তো সেই ন'টা থেকে কিছু খাননি, অফিস ফেরতই এখানে এসেচেন নিশ্চয়...... বলিতে বলিতে সে ব্যস্ত হইয়া বাহির হইয়া গেল।

তাহার লজ্জিত মুখের অপরূপ আরক্ত আভা মুগ্ধ বিনয়ের কাছে মধুর লাগিল; কিন্তু সে পুনশ্চ অবাক হইয়া ভাবিল, এতক্ষণ মালতী 'বাজে গল্প' বলছিল, সে কি? এসব কথা কি তাহার কাছে বাজে? কিন্তু চিন্তা করিয়া হদিশ মিলিবার আগেই মালতীর বড় মামীমা জলখাবারের রেকাবি লইয়া ঘরে ঢুকিলেন। ধীর শান্ত ধরণ। অথচ খুব দুরন্ত এবং সমীহ করিয়া চলিবার প্রয়োজন আছে বলিয়া বোধ হয় না।

বিনয় প্রণাম করিল।

তিনি বলিলেন, বোস। একটু জল খাও। মালতী চা আনছে। তুমি তো সবই শুনলে। এখন কি করলে ভালো হয়? মালতীর বাবা আমাদের ঠিকানা জোগাড় করে নিশ্চয়ই শীগ্‌গীর খোঁজ করতে আসবে এবং যে মা-মরা একটি মেয়ের উপর এমন ব্যবহার কর্ত্তে পারে সে যে এসে সহজে ছাড়বে, তা'ও আশা করতে সাহস হয় না।

বিনয় কোথা হইতে সাহস পাইয়া সপ্রতিভভাবে কহিল, পৌষ মাস পড়বার আগেই অগ্রহায়ণের যে শেষ দিনে ওর বাবা তার বিয়ের দিন ঠিক করেছিলেন, সেইদিনেই আমি তাকে বিয়ে কোরব। আমার যতদূর মনে হয় আপনার সাহায্য পেলে সেটা খুব বেশি অসম্ভব হবে না। অবশ্য আপনারা আমাকে......

মালতীর মামীমা ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, তুমি স্থিরভাবে সব ভেবে দেখেচ কি যে, এটা তোমার সত্যকার মনোভাব না মালতী হঠাৎ একটা বিপদে পড়েছে বলে তুমিও হঠাৎ মত স্থির করেচ?

বিনয় এবার যথার্থই শ্রদ্ধা অনুভব করিয়া মামীমার দিকে চাহিল। এমন একটা বিব্রত অবস্থার মধ্যে পড়িয়াও যে কোন স্ত্রীলোকের মুখ দিয়া এমন কথা বাহির হয়, সে ধারণা করিতে পারে নাই। সে নিজেও সমস্ত সঙ্কোচ পরিহার করিয়া বলিল, না এ আমার হঠাৎ মন স্থির করা নয়। মালতী আপনাদের কাছে মানুষ হয়েচে, তাকে ভালো করে জানবার পর আমার মনে অনেক সময় প্রবলভাবেই এ কামনা হ'য়েচে। তবে আমার আর্থিক অবস্থা ভালো নয়, সেজন্যে এবং আরও অন্য কারণেও বোধ করি আমি নিজেকে যোগ্য বলে মনে করতুম না।

মামীমা হাসিলেন, মালতী গরীবের মেয়ে, গরীবের ঘরে মানুষ। গরীব বাঙ্গলা দেশের মেয়ে সে। স্বামীর ঘরে অর্থের স্বপ্ন সে দেখে না। তোমার ভয় অমূলক। কিন্তু যদি তুমি আপত্তি না কর তাহলে পরশুই আমি সব আয়োজন করি, পঁচিশে। কারণ তাছাড়া আর দিন নেই। অনর্থক দেরী করলে নানা প্রতিকূলতা হ'তে পারে। তারপর পৌষ মাস পড়বে। তখন তো হবার উপায় নেই।

বিনয় বুঝিতে পারিল তিনি বিবাহের আয়োজনের কথা বলিতেছেন। সে লজ্জিত হইল, সুখী হইল। ঘাড় নাড়িয়া তাহার কোন আপত্তি নাই জানাইয়া উঠিবার উপক্রম করিল।

মামীমা বলিলেন, মালতী আমাদের একরকম স্বয়ম্বরা

হো'ল, বাংলা দেশের সবারই যদি স্বয়ম্বরা হবার মতন মনের জোর থাকত।

বিনয় বলিল, মনের জোর আপনি কাহাকে বলচেন?

মামীমা বলিলেন, মনের জোর আমি বলচি সেই বস্তুকে—যা সুখদুঃখ ক্ষতি বিপদকে গণনার মধ্যে না এ'নে মিথ্যা ছিন্ন করে সত্যের দিকে ছুটে যায়। আর সে ছুটে যাবার মত সংযম সহিষ্ণুতা আর তেজ রাখে। নইলে শুধু ছোটাছুটির তো কোন সার্থকতা নেই।

বিনয় একটু কুণ্ঠিত হইয়া কহিল, কিন্তু আমি সত্যি ভেবে পাইনে, আমার জন্যে অত ত্যাগের কি প্রয়োজন ছিল? আমি কি ঠিক তার উপযুক্ত……

মামীমা বলিলেন, ওসব কথা পুরুষমানুষের কথা নয়। তাদের মুখে ও কথা কিছুতেই সাজে না। ও ভাবে বিচার করতে গেলে কোনদিনই তাকে ঠিক তার মর্য্যাদা দেওয়া হয় না। যে ভালোবাসে সে তার ভক্তি দিয়েই স্নেহাস্পদকে ভক্তিভাজন করে নেয়। নইলে একজন মেয়েমানুষের মনে যত স্নেহ যত ভক্তি যত ত্যাগ আছে তার যোগ্য কোন পুরুষমানুষ দেখাতে পার? গুণের মাপকাঠি দিয়ে কি হৃদয়ের ইয়ত্তা করা যায়? একথা তোমাকে কে শেখালে?

৪২

রাত্রিবেলায় একা বিছানায় শুইয়া মামীমার কথাগুলি একান্ত শ্রদ্ধার সহিত ভাবিতে ভাবিতে বিনয়ের মনের কুণ্ঠা অনেক কমিয়া গেল এবং কুণ্ঠার পরিবর্ত্তে একটা বিমল আনন্দে তাহার সমস্ত মন ভরিয়া উঠিল। সে নিজের মনে অনেকবার বলিল, আমার উপর যখন সে দাবী করবে তখন আমাকে তার যোগ্য হ'তেই হবে, না হয়ে উপায় নেই। মামীমা ঠিকই বলেচেন, ভালোবাসাই স্নেহাস্পদকে মহিমান্বিত করে নে'য়। রবীন্দ্রনাথের সেই কবিতাটা:

"তুমি মোরে করেছ সম্রাট। তুমি মোরে
পরায়েছ গৌরব-মুকুট। পুষ্পডোরে
সাজায়েছ কণ্ঠ মোর। তব রাজটীকা
দীপিছে ললাট মাঝে মহিমার শিখা
অহর্নিশি। আমার সকল দৈন্য লাজ,
আমার ক্ষুদ্রতা যত, ঢাকিয়াছ আজ
তব রাজ-আস্তরণে।"

বারংবার সে মনে মনে আবৃত্তি করিতে লাগিল। মামীমার মুখের ঈষৎ পরিহাস করিয়া বলা আর একটি কথা তাহার মনে পড়িতে লাগিল, "মালতী আমাদের একরকম স্বয়ম্বরা হোল।". একটা কথা বিনয়ের নিশ্চয় করিয়া প্রতীতি হইল, আমাদের দেশের পুরুষরা পুরোহিতের হাত হইতে তোমাদের পক্ষে অর্থহীন মানে-না-বোঝা মন্ত্রের সহিত বিস্তর বরপণের দর কষাকষির পর বস্ত্রালঙ্কারমণ্ডিত যে জড়পিণ্ডটি গ্রহণ করে সে ব্যাপার নামেই মিলন হয়। সে মিলনে তাহাদের শৌর্য্য জাগ্রত হয় না, পৌরুষ সার্থক হয় না। সে মিলন তাহাদের মনন শক্তিকে দ্বিগুণিত, তাহাদের কর্ম্মস্পৃহাকে অদম্য করে না। তাহা জীবনের অধ্যায়ে খানিক নূতনত্বের সঞ্চার করিয়া আবার অবসাদের স্তরে মিশিয়া যায় মাত্র। আমাদের বধূ কোনদিন তো স্বয়ম্বরা হইয়া বিশ্বের উন্মুক্ত সভাতলে আমাদের বরণ করে নাই। অনেকের মধ্যে একজনের উপর প্রেমপূর্ণ মোহন মন্ত্রের মায়া স্পর্শ করিয়া তাহাকে মানুষ করিয়া তোলে নাই। অনেক কাল আগে পুরাণ রামায়ণ মহাভারতের যুগে যে কল্পলোকের কাহিনী পড়া যায় তাহাতে স্বয়ম্বরা নারী এমনই করিয়া নিজের দাবী নিজের আকর্ষণ জগত-সভায় শুধু একজনেরই উপর কেন্দ্রীভূত করিয়া তাহাকে চরিতার্থ সার্থক করিয়াছে বলিয়া শোনা যাইত। কিন্তু সে কতকাল কোন বিস্মৃত যুগের কথা?……সে যুগের নিষ্ঠা, তেজ এবং সাধনা, সে যুগের সেই চাওয়ার অদম্য বেগ এবং পাওয়ার পরিপূর্ণ গভীরতা আধুনিক যুগে নবতররূপে আর ফিরিয়া আসিবে না? তাহা না হইলে নূতন যুগের নূতন মানুষকে সঞ্জীবিত করিবে কে? সার্থক করিয়া তুলিবে কে?

অন্ধকার রাত্রিতে নির্জ্জন শয্যায় শুইয়া বিনয়ের মনে হইতে লাগিল—সমস্ত দুঃখ এবং বিপদের মাঝে তাহাকে বরণ করিয়া লইয়া মালতী তাহার সুপ্ত আত্মাকে জাগাইয়া তুলিয়াছে। সে আগে যা ছিল এখন আর তাহা নাই। অনেক দায়িত্ব আসিয়া তাহার উপর পড়িয়াছে। তাহার সমস্ত পৌরুষ উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে, যেমন করিয়া হোক তাহাকে ইহার যোগ্য হইতেই হইবে। কুণ্ঠা এবং দুর্ব্বলতার দোহাই দিয়া নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকা কিছুতেই চলিবেনা। এ দাবীর উপযুক্ত যেমন করিয়া হোক তাহাকে হইতে হইবে।

৪৩

গোধূলিলগ্নে বিবাহের সময় ছিল। সমস্ত অনুষ্ঠানের পর মেয়েরা যখন বরকন্যাকে একত্রে পাশাপাশি দাঁড় করাইয়া বরণ করিয়া তুলিবার উদ্যোগ করিতেছে, ঠিক সেই সময় একটা ঠিকা গাড়ী আসিয়া দ্বারপ্রান্তে থামিল এবং অনন্ত উদ্‌ভ্রান্ত দিশাহারা-ভাবে তথায় ঢুকিল।

চন্দন এবং নববস্ত্রে মণ্ডিত সলজ্জ আনন্দিত হাস্যাভায় স্মিতমুখী মালতীকে বিনয়ের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া সে বিমূঢ়ের মত ক্ষণকাল সেইদিকে চাহিয়া রহিল। বিনয়ের গায়ে জামা নাই, ক্ষৌমবস্ত্র এবং উত্তরীয়ের অবকাশে তাহার সুগঠিত সুন্দরদেহ ফুটিয়া উঠিয়াছে, হোমধূমে তাহার চোখের প্রান্ত ঈষৎ সজল এবং মুখে একটি সৌম্য প্রশান্তভাব। ডানহাত দিয়া সে মালতীর বামহাত ধরিয়া রাখিয়াছিল। হঠাৎ এ দৃশ্যটা অনন্তর এত ভালো লাগিল। তাহার মনে হইল তাহার সারা-জীবনেও সে এমন ছবি আর একটিও কোথাও দেখে নাই।

মালতীর বাবাকে দেখিয়া সেখানে একটা চাঞ্চল্য গুঞ্জন এবং অস্বস্তি দেখা দিল। মালতীর মামীমাও বড় ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। মনে করিলেন এখনই একটা রাগারাগি বকাবকি আরম্ভ হইয়া শুভকাজের বিঘ্ন হইবে। বিনয় তথা হইতে বহির্ব্বাটিতে চলিয়া যাইবে বলিয়া উঠিবার উপক্রম করিল। কিন্তু অনন্ত হঠাৎ খুব কাছে সরিয়া আসিয়া বিনয়ের একটা হাত ধরিয়া বলিল, যেওনা। তোমরা দু'জনে পাশাপাশি একটু দাঁড়াও, আমি দেখি। এমন দেখতে পাব কখনো ভাবি নি। তখন অশ্রুভারনম্রা মালতী আসিয়া পিতার পায়ের কাছে মাথা রাখিয়া প্রণাম করিল। তাহার এতদিনকার সমস্ত অভিমান গলিয়া অশ্রুর আকারে ঝরিয়া পড়িল। অনন্ত তাহার চির-অনাদৃতা কন্যার মাথায় হাত দিয়া জীবনের মধ্যে প্রথম অনুভব করিল, জীবনটাকে সে যাহা বলিয়া জানিয়াছিল সেটাই সব নয়। তাহার এতদিনকার জানাকে ছাপাইয়াও ইহার অর্থ আছে।

সমাপ্ত

বঙ্কিমচন্দ্রের ঐতিহাসিক উপন্যাস

শ্রীদয়াময় মুখোপাধ্যায় এম-এ, বি-এল

ইতিহাসের পটভূমিকা আশ্রয় লইয়া বঙ্কিমচন্দ্র দুর্গেশনন্দিনী, চন্দ্রশেখর, মৃণালিনী, দেবীচৌধুরাণী, আনন্দমঠ, সীতারাম ও রাজসিংহ মোট সাতখানি উপন্যাস রচনা করেন। আপাত দৃষ্টিতে ইহাদের সব কয়খানিকেই ঐতিহাসিক সংজ্ঞায় বিশেষিত করা চলে, কিন্তু ইহাতে বঙ্কিমচন্দ্রকে ভুল বুঝিবার সম্ভাবনা আছে।

শতবার্ষিক সংস্করণে স্যার যদুনাথ সরকার বঙ্কিমচন্দ্রের ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলির ভূমিকা লিখিয়াছেন। কিন্তু ভূমিকাগুলি আলাদা আলাদা লেখার দরুণ এ বিষয়ে ধারাবাহিক ও সুসংলগ্ন আলোচনার বিঘ্ন হইয়াছে; যদিও সব কয়টি ভূমিকা একত্র পড়িলে ঐতিহাসিক উপন্যাস সম্বন্ধে যাহা জ্ঞাতব্য সব কিছুই জানা যায়।

আনন্দমঠের ভূমিকায় স্যর যদুনাথ Times পত্রিকা হইতে ঐতিহাসিক উপন্যাসের দুইটি সংজ্ঞা উদ্ধৃত করিয়াছেন—

'A novel is rendered historical by the introduction of dates, personages or events to which identification can be given.' (Prof. Neild)

'Novels the background of which is laid in a recognizable historical period, even though no single character in the book may have a genuine historical prototype.'

দ্বিতীয় সংজ্ঞায় recognizable historical period ও শেষের অংশ no single character in the book may have a genuine historical prototype একটু মাত্রা ছাড়াইয়াছে মনে হয়। সাধারণ পাঠক ঐতিহাসিক উপন্যাস বলিতে যাহা বুঝে, দ্বিতীয় সংজ্ঞায় তাহাই বলা হইয়াছে। ফলে, মুড়ি মিছরির একদর দাঁড়ায়,—বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠকে স্কট বা ডুমার পাশে আসন লইতে হয়।

স্যর যদুনাথ এতটা মানিতে প্রস্তুত নহেন। দুর্গেশনন্দিনীর ভূমিকায় তিনি লিখিয়াছেন—

'কোন নভেলে ঐতিহাসিক ব্যক্তি বা ঘটনা বর্ণিত হইলেই সব সময়ে সেই গ্রন্থকে ঠিকমত ঐতিহাসিক উপন্যাস বলা যায় না। প্রকৃত ঐতিহাসিক উপন্যাসের চিহ্ন এই যে, তাহার মধ্যে ঘটনায় এবং চরিত্রে ইতিহাস হইতে যাহা জানা গিয়াছে, এইরূপ উপাদান বেশী পরিমাণে এবং নিছক দেওয়া হইয়াছে; লেখকের কল্পনা তাহার পরিকল্পনায় এবং অধম চরিত্রগুলিতেই প্রকাশ পাইয়াছে। উহাতে বর্ণিত শহর গ্রাম, ঘর বাড়ি, পুরুষ স্ত্রী, অস্ত্র শস্ত্র, কথাবার্ত্তা, রীতিনীতি—আর যাহা সব চেয়ে বড় চিন্তার ধারা এবং বিশ্বাস, এমন কি কুসংস্কার পর্য্যন্ত—ঠিক সেই যুগের জ্ঞাত সত্যের ব্যতিক্রম করিবে না।......এই যথার্থ ঐতিহাসিক উপন্যাসের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত সার ওয়াল্টার স্কট প্রথমে রচনা করেন।......কলেজের ছাত্র অবস্থায় বঙ্কিম এই আদর্শে অনুপ্রাণিত হন এবং তাঁহার প্রথম বাংলা উপন্যাস স্কটের প্রণালীর অনুকরণে লিখিত হয়; যদিও একথা সত্য নহে যে 'দুর্গেশনন্দিনী' 'আইভ্যানহোর' ছায়ামাত্র। আরও একটা পার্থক্য মনে রাখিতে হইবে;—দুর্গেশনন্দিনীর আকার এক একখানা ওয়েভার্লি নভেলের সিকিমাত্র; সুতরাং স্কট্ নিজ নভেলের মধ্যে যে সব জিনিষ দিয়াছেন, বঙ্কিম তাহার সমস্তগুলি অথবা কোন একটি জিনিষ প্রচুর পরিমাণে দিতে পারেন নাই।

শেষ জীবনে বঙ্কিমচন্দ্র যে সব গল্প রচনা করেন, তাহার পিছনে একটা করিয়া ইতিহাসের চিত্রপট ঝুলাইয়া দিয়াছেন বটে, কিন্তু সেগুলিকে প্রকৃত ঐতিহাসিক উপন্যাসের মধ্যে ধরা যায় না। তাহারা অতিমাত্রায় রোমান্টিক এবং ঊর্দ্ধ প্রবাহিনী ভাবধারার দ্বারা চালিত হওয়ায় বারো আনারও অধিক কল্পনার দেশে গিয়াছে—নিছক ইতিহাস হইতে বড় দূরে। মৃণালিনীতে রোমান্স দুর্গেশনন্দিনী অপেক্ষা বেশী, তথাপি উহা ইতিহাসকে অতিক্রম করে নাই। চন্দ্রশেখরও সেইরূপ প্রকৃত ঐতিহাসিক উপন্যাস—যদিও রোমান্সের বুকনী দেওয়ায় অতি মনোরম হইয়াছে।'

অতএব স্যর যদুনাথের মতে দুর্গেশনন্দিনী, মৃণালিনী, চন্দ্রশেখর ও রাজসিংহ এই চারিখানি গ্রন্থকে ঐতিহাসিক উপন্যাস বলা যায়, আনন্দমঠ, দেবীচৌধুরাণী ও সীতারামকে এই পঙ্‌ক্তি হইতে বাদ দিতে হয়।

কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র একমাত্র রাজসিংহকেই ঐতিহাসিক উপন্যাস বলিয়াছেন, অন্যগুলি তাঁহার মতে ঐতিহাসিক উপন্যাসের পর্য্যায়ে পড়ে না।

তাঁহার গ্রন্থগুলির ভূমিকায় এই কয়টি কথা আছে—'পাঠক মহাশয় অনুগ্রহপূর্ব্বক আনন্দমঠ বা দেবী চৌধুরাণীকে ঐতিহাসিক উপন্যাস বিবেচনা না করিলে বড় বাধিত হইব।'...'আমি পূর্ব্বে কখনও ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখি নাই। দুর্গেশনন্দিনী, সীতারাম বা চন্দ্রশেখরকে ঐতিহাসিক উপন্যাস বলা যাইতে পারে না। এই (রাজসিংহ) প্রথম ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখিলাম।'

স্যর যদুনাথ আনন্দমঠের ভূমিকায় বঙ্কিমচন্দ্রের এই কথাগুলির আলোচনা প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন—

'বঙ্কিম নিজে এই শ্রেণীর সাহিত্যকে বড়ই একটি সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ করিয়াছিলেন। বোধ হয় তাঁহার বিশ্বাস ছিল যে, ইতিহাসের সত্য ঘটনা মাত্র উপন্যাসের ভাষায় বিবৃত করিলে তবেই তাহা ঐতিহাসিক উপন্যাস নামের যোগ্য; অর্থাৎ তাহাতে 'অধিকাংশ পুরুষগুলি ইতিহাস পরিচিত ব্যক্তি হইবে এবং অতি কম সংখ্যায় কাল্পনিক চরিত্র থাকিবে; কথাবার্ত্তাগুলি প্রায়শঃ তাঁহার নিজের রচিত কিন্তু বর্ণিত ঘটনা এবং বিষয় পরিকল্পনা একেবারে নিছক সত্য ইতিহাস হইতে তোলা।...

তাঁহার এই সঙ্কীর্ণ সংজ্ঞায় রাজসিংহ ভিন্ন অপর ছয়টি গ্রন্থ ঐতিহাসিক উপন্যাস হইতে পারে না।'

ঐতিহাসিক উপন্যাসের মূল্য নির্দ্ধারণের যে মাপকাঠি স্যার যদুনাথ দিয়াছেন, তদনুসারে এই শ্রেণীর উপন্যাস রচনায় লেখকের কৃতিত্ব নির্ভর করে একমাত্র তাঁহার বর্ণনাচাতুর্য্য ও লিপিকৌশলের উপর। লেখক ইতিহাস বর্ণিত সময়ের একখানি নিখুঁত ও পূর্ণাঙ্গ চিত্র অঙ্কনে সমর্থ হইয়াছেন কিনা তাহাই সর্ব্বাগ্রে বিচার্য্য। এই চিত্রের কোন অঙ্গহানি হইলে লেখকের রেহাই নাই—পাঠকের নিকট তাঁহার আংশিক অকৃতকার্য্যতার জন্য জবাবদিহি করিতে হইবে। স্যর ওয়াল্টার স্কটকে এরূপ জবাবদিহি করিতে হয়। Talisman পুস্তকের ভূমিকায় দেখি:—

'The Bethrothed did not greatly satisfy one or two friends, who thought that it did not well correspond to the general title of the Crusaders. They urged therefore, that, without dire t allusion to the manner of the Eastern tribes, and to the romantic conflicts of the period, the title a 'Tale of the Crusaders' would resemble the playbill which is said to have announced

the tragedy of Hamlet, the character of the Prince of Denmark being left out ?

শুধু ইহাই নহে ;—অধম চরিত্রের পরিকল্পনার জন্যও স্কট্ সমসাময়িক ঐতিহাসিকের হাতে নিস্তার পান নাই—

'One of the inferior characters introduced was a supposed relation of Richard Cour-de-Lion—a violation of truth which gave offence to Mr. Mills, the author of the 'History of Chivalry and the Crusades', who was not, it may be presumed, aware that romantic fiction naturally includes the power of such invention, which is indeed one of the requisites of the art.' (Introduction to Talisman)

সুতরাং ঐতিহাসিক উপন্যাসে ইতিহাসের ভিত্তি যথাসম্ভব দৃঢ় হওয়াই বাঞ্ছনীয়। Romanceএর গল্প তাহাতে থাকিতে বাধা নাই ; কিন্তু Romanceএর দোহাই দিয়া অনৈতিহাসিকতার আমদানি করার অধিকার লেখকের আছে কি না সন্দেহ। ডিটেকটিভ উপন্যাসে Romantic ঘটনা যেমন লেখকের মূল উদ্দেশ্যের সহিত অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত, সেইরূপ ঐতিহাসিক উপন্যাসেও Romanticএর আমদানি করা হয় ঐতিহাসিকতার একঘেয়েমি কাটাইবার জন্য ; Romance লেখকের আসল উদ্দেশ্যের পরিপন্থী হইলে চলিবে না। ঐতিহাসিক উপন্যাসের ঐতিহাসিক সত্যকে দূরে পরিহার বা ঐতিহাসিক সত্যকে অতিক্রম করার চেষ্টা কোনও মতেই সমর্থিত হইতে পারে না।

স্যর যদুনাথ দেবী চৌধুরাণী, আনন্দমঠ ও সীতারামকে এইজন্যই ঐতিহাসিক উপন্যাস বলেন নাই, কারণ ইহারা 'নিছক ইতিহাস হইতে বড় দূরে।' বঙ্কিমচন্দ্র এই গ্রন্থ কয়খানিকে লোকশিক্ষামূলক উপন্যাস, তাঁহার 'অনুশীলনতত্ত্ব প্রচারের কল' মনে করিতেন। ইহাদের রচনায় বঙ্কিমের যে গূঢ় অভিপ্রায় ছিল, পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়—'বঙ্কিমচন্দ্রের ত্রয়ী প্রবন্ধে' তাহার যথার্থ মর্ম্মোদ্ঘাটন করিয়াছেন। তাহার পুনর্ব্বাদ নিস্প্রয়োজন।

প্রথম সংস্করণের আখ্যাপত্রে বঙ্কিমচন্দ্র দুর্গেশনন্দিনীকে 'ইতিবৃত্তমূলক উপন্যাস' বলিয়াছিলেন। স্যর ওয়াল্টার স্কটের প্রকৃত 'ঐতিহাসিক উপন্যাস' হইতে পার্থক্য সূচনার জন্যই বোধ হয় এই আখ্যা দেওয়া হয়।

চন্দ্রশেখরকে স্যর যদুনাথ ঐতিহাসিক উপন্যাস বলিয়াছেন, বঙ্কিমের আপত্তি সত্ত্বেও। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে চন্দ্রশেখর 'রোমান্সের বুকনী' দেওয়া ঐতিহাসিক উপন্যাস নহে। চন্দ্রশেখর সমাজ সমস্যা ও চরিত্র নীতির প্রেরণায় রচিত। ইহার ছয়টি খণ্ডের নাম, পাপীয়সী, পাপ, পুণ্য, পুণ্যের স্পর্শ, প্রায়শ্চিত্ত, প্রচ্ছাদন ও সিদ্ধি।

ফলকথা, দেবীচৌধুরাণী, আনন্দমঠ, সীতারাম ও চন্দ্রশেখরকে ঐতিহাসিক উপন্যাস বলিতে বঙ্কিমের আপত্তি দুই কারণে—প্রথম ঐতিহাসিক উপাদানের অভাব, দ্বিতীয় তাঁহার গ্রন্থ প্রণয়নের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইবার আশঙ্কা। দুর্গেশনন্দিনী নিরবচ্ছিন্ন সাহিত্য-সৃষ্টির প্রেরণায় রচিত, সুতরাং ঐতিহাসিক উপাদানের অপ্রাচুর্য্যের জন্যই বঙ্কিমচন্দ্র ইহাকে ঐতিহাসিক বলিতে নারাজ। মৃণালিনী সম্বন্ধেও এই এক কথা খাটে, যদিও যে স্বদেশ প্রেমের আনন্দমঠে পরিণতি তাহার প্রথম উন্মেষ মৃণালিনীতে আমরা পাই।

রাজসিংহকে বঙ্কিমচন্দ্র ঐতিহাসিক উপন্যাসের সম্মান দিয়া এই গ্রন্থ প্রণয়নে তাঁহার অন্য যে উদ্দেশ্য ছিল তাহাও স্পষ্টভাবে জানাইয়াছেন—

'ইতিহাসের উদ্দেশ্য কখন কখন উপন্যাসে সুসিদ্ধ হইতে পারে। উপন্যাস লেখক সর্ব্বত্র সত্যের শৃঙ্খলে বদ্ধ নহেন। ইচ্ছামত অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য কল্পনার আশ্রয় লইতে পারেন। তবে সকল স্থানে উপন্যাস ইতিহাসের আসনে বসিতে পারে না। কিন্তু এই গ্রন্থে আমার যে উদ্দেশ্য তাহাতে এই নিষেধ বাক্য খাটে না।

'ভারত কলঙ্ক' নামক প্রবন্ধে আমি বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছি, ভারতবর্ষের অধঃপতনের কারণ কি কি ? হিন্দুদিগের মধ্যে বাহুবলের অভাব সে সকল কারণের মধ্যে নহে। এই ঊনবিংশ শতাব্দীতে হিন্দুদিগের বাহুবলের কোন চিহ্ন দেখা যায় না। ব্যায়ামের অভাবে মনুষ্যের সর্ব্বাঙ্গ দুর্ব্বল হয়। জাতি সম্বন্ধেও সে কথা খাটে। ইংরেজ সাম্রাজ্যে হিন্দুর বাহুবল লুপ্ত হইয়াছে। কিন্তু তাহার পূর্ব্বে কখনও লুপ্ত হয় নাই। হিন্দুদের বাহুবলই আমার প্রতিপাদ্য।…যখন বাহুবল মাত্র আমার প্রতিপাদ্য তখন উপন্যাসের আশ্রয় লওয়া যাইতে পারে।… ……স্থূল ঘটনা ইতিহাসে যেমন আছে প্রায় তেমনই রাখিয়াছি। কোন যুদ্ধ বা তাহার ফল কল্পনাপ্রসূত নহে। তবে যুদ্ধের প্রকরণ ইতিহাসে যাহা নাই তাহা গড়িয়া দিতে হইয়াছে।……ঔরঙ্গজেব, রাজসিংহ, জয়েব উন্নিসা ও উদিপুরী বেগম ঐতিহাসিক ব্যক্তি। ইহাদের চরিত্র ইতিহাসে যেরূপ আছে সেইরূপ রাখা গিয়াছে তবে ইঁহাদের সম্বন্ধে যে সকল ঘটনা লিখিত হইয়াছে সকলই ঐতিহাসিক নহে। উপন্যাসে সকল কথা ঐতিহাসিক হইবার প্রয়োজন নাই।……

পরিশেষে বক্তব্য যে আমি পূর্ব্বে কখনও ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখি নাই। দুর্গেশনন্দিনী বা চন্দ্রশেখর বা সীতারামকে ঐতিহাসিক বলা যাইতে পারে না। এই প্রথম ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখিলাম।'

ঐতিহাসিক উপন্যাস সম্বন্ধে বঙ্কিমের নিজের ধারণা কি ছিল, ইহা হইতেই বুঝা যাইবে। বঙ্কিমের বক্তব্য টীকা টিপ্পনীর অপেক্ষা রাখে না। তথাপি এই প্রসঙ্গে দুই একটি কথার আলোচনা আবশ্যক।

প্রথম কথা—ইতিহাসবর্ণিত সময়ের যথাযথ সামাজিক চিত্র অঙ্কন করাই ঐতিহাসিক উপন্যাসের মূল উদ্দেশ্য। Romance-এর বুকনী না দিলে উপন্যাস জমে না,কাজেই ঐতিহাসিক উপন্যাসে Romantic ঘটনার আমদানি করিতে হয়। ঐতিহাসিক উপন্যাস ইতিহাসের স্থান কখনই লইতে পারে না।—ঐতিহাসিক উপন্যাস সম্বন্ধে ইহাই স্থূল কথা। কিন্তু রাজসিংহ সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র দাবী জানাইয়াছেন—'সকল স্থানে উপন্যাস ইতিহাসের আসনে বসিতে পারে না। কিন্তু এই গ্রন্থে আমার যে উদ্দেশ্য তাহাতে এই নিষেধবাক্য খাটে না।' বোধহয় বঙ্কিমের অভিপ্রায় এই—হিন্দুদের বাহুবল ঐতিহাসিক সত্য ; ঐতিহাসিক উপন্যাসে যদি ঐতিহাসিক সত্যের পুনরুদ্ধার হয়, তাহা হইলে ঐতিহাসিক উপন্যাস ইতিহাস অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন নহে। সুতরাং বঙ্কিমচন্দ্রের মতে ঐতিহাসিক উপন্যাসের সাহায্যে ঐতিহাসিক সত্যের পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করিতে হইবে। ইতিহাসের সত্য চিত্তাকর্ষক ও লোকরঞ্জক রচনার ভিতর দিয়া সকলের নিকট পৌঁছাইয়া দেওয়াই ঐতিহাসিক উপন্যাসের প্রকৃত তাৎপর্য্য। বঙ্কিমের রাজসিংহ বাঙ্গালা ভাষার অভিনব ঐতিহাসিক উপন্যাস ; ইহাতে তিনি ভারতের কলঙ্ক কথঞ্চিৎ অপনোদন করিয়াছেন।

দ্বিতীয় কথা—যে আত্মবিস্মৃত বাঙ্গালী জাতির ইতিহাস উদ্ধারের জন্য বঙ্কিম নিরন্তর ব্যাকুল ছিলেন, সেই বাঙ্গালী জাতির গৌরবময় অতীতের চিত্র কোন যথার্থ ঐতিহাসিক উপন্যাসে চিত্রিত করেন নাই কেন ? আনন্দমঠ, দেবী চৌধুরাণী বা সীতারামে বাঙ্গালার শৌর্য্য বীর্য্যের পরিচয় তিনি দিয়াছেন, কিন্তু এগুলিকে ঐতিহাসিক উপন্যাসের সম্মান পর্য্যন্ত তিনি দিতে কুণ্ঠিত। সম্ভবতঃ বঙ্কিমচন্দ্র মনে করিতেন, প্রকৃত ইতিহাস পুনরুদ্ধার না হইলে ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনা পণ্ডশ্রম মাত্র। বাঙ্গালা দেশের ইতিহাস উদ্ধারের কোন আশাই বঙ্কিম করেন নাই এবং তাঁহার 'অনন্ত দুঃখ' ও হতাশার কথা কমলাকান্তের মুখে শুনাইয়াছেন—

'……যাহার নষ্ট সুখের স্মৃতি জাগরিত হইলে সুখের নিদর্শন এখনও দেখিতে পায় সে এখনও সুখী—তাহার সুখ একেবারে লুপ্ত হয় নাই। যাহার সুখ গিয়াছে, সুখের নিদর্শন গিয়াছে—বঁধু গিয়াছে, বৃন্দাবনও গিয়াছে—এখন আর চাহিবার স্থান নাই, সেই দুঃখী—অনন্ত দুঃখে দুঃখী।

আমার এই বঙ্গদেশে সুখের স্মৃতি আছে, নিদর্শন কই ? দেবপাল

দেব, লক্ষণ সেন, জয়দেব, শ্রীহর্ষ—প্রয়াগ পর্য্যন্ত রাজ্য, অরত্তের অধীশ্বর নাম, গৌড়ী রীতি, এ সকলের স্মৃতি আছে, -কিন্তু নিদর্শন কই? সুখ মনে পড়িল, কিন্তু চাহিব কোন দিকে? সে গৌড় কই? সে যে কেবল যবন-লাঞ্ছিত ভগ্নাবশেষ। আর্য্য রাজধানীর চিহ্ন কই? আর্য্যের ইতিহাস কই? জীবনচরিত কই? কীর্ত্তি কই? কীর্ত্তি স্তম্ভ কই? সমর ক্ষেত্র কই? সুখ গিয়াছে, সুখচিহ্ন গিয়াছে, বঁধু গিয়াছে, বৃন্দাবনও গিয়াছে—চাহিব কোন্ দিকে?' (কমলকান্তের দপ্তর, একটি গীত)

বাঙ্গালার ইতিহাস উদ্ধারের জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াও বঙ্কিমচন্দ্র কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। এজন্য কল্পনানেত্রে বাঙ্গালার সমৃদ্ধি ও গৌরবের বর্ণনা তাঁহার অন্যান্য উপন্যাসগুলির বিষয়ীভূত করিয়াছেন। এগুলি তাঁহার মানসী সৃষ্টি। বাঙ্গালার রামচাঁদ বা শ্যামচাঁদ শ্রেণীর পাঠকগণ ইহাদিগকে 'হিন্দুদের গড়া পচা উপন্যাস' বলিলেও তাঁহার ক্ষোভ নাই। কারণ রাজসিংহ রচনার মূলে আমরা যে ঐতিহাসিক সত্যনিষ্ঠা লক্ষ্য করি, অন্যান্য উপন্যাস রচনার বেলায় সেই আত্মপ্রত্যয় বঙ্কিমের ছিল না। কিন্তু তথাপি তাঁহার দৃঢ়বিশ্বাস ছিল, এই গ্রন্থগুলি বাঙ্গালার জাতীয়তার উদ্বোধন করিবে। বাঙ্গালার সমগ্র গৌরবময় ইতিহাস পুনরুদ্ধার হইলে যে ফল ফলিত, আনন্দমঠের লেখক সত্যদ্রষ্টা ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার 'বন্দেমাতরম' সঙ্গীতে সেই প্রয়োজন সুসিদ্ধ করিয়াছেন।

শেষ কথা—ঐতিহাসিক উপন্যাসের বৈশিষ্ট্য ও উপাদানের সীমারেখা তেমন সুনির্দ্দিষ্ট নহে। বঙ্কিমচন্দ্রের ৭খানি উপন্যাসের মধ্যেই তিনটি বিভিন্ন স্তরের সত্তা লক্ষ্য করা যায়—১। রাজসিংহ ২। দুর্গেশনন্দিনী ও মৃণালিনী ৩। চন্দ্রশেখর, দেবী চৌধুরাণী, আনন্দমঠ ও সীতারাম। এখন ঐতিহাসিক উপন্যাসের তেমন প্রচলন নাই, কিন্তু বাংলা ভাষায় এই শ্রেণীর উপন্যাসের সংখ্যা নিতান্ত অল্পও নহে। বঙ্কিমচন্দ্রের আবির্ভাবের পর একশত বৎসর কাটিয়া গিয়াছে, সুধীবর্গের চেষ্টায় বাংলার কৃষ্টির ইতিহাসের পুনরুদ্ধারও কতক পরিমাণে হইয়াছে। সুতরাং ভবিষ্যতে কেহ যে ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখিবেন না এমন কথা বলা যায় না। বাঙ্গালা সাহিত্যে কেবলমাত্র আধুনিকতম Realistio উপন্যাসেরই প্রয়োজন, ঐতিহাসিক উপন্যাসের প্রবেশ নিষিদ্ধ—একথা বলার দুঃসাহসও আমাদের নাই। এ কারণ, এ বিষয়ে আদর্শগত নীরস আলোচনার প্রয়োজন বুঝিয়াছি; সিদ্ধান্তের ভার সুধীবর্গের উপরে।

চরম ক্ষণে

আচার্য্য শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত

লেগেছে আজ বজ্রে আগুন মেঘের কোলে,
কড়মড়িয়ে অস্থি কাঁপে মরণ-দোলে;
ফেলে দে আজ বিয়ের শানাই শ্মশান মাঝে
কোমল প্রেমের কাব্যগাথা লাগবে রে কোন্ কাজে;
আজকে শুধু হট্টগোলের মেলা
নাওয়া খাওয়ার নাইকো সময় এমন দুপুর বেলা।
গগন ফাটা আওয়াজ হানে, বিপদ বাধা কেউ না মানে,
আজকে আসে আকাশ ফাটা ডাক
তালের বনে ঘূর্ণী হাওয়া দিয়েছে আজ হাঁক্।
মরণ দ্রাবণ আসছে রাবণ লঙ্কাপুরীর থেকে
সেই ঘোষণা কলোচ্ছ্বাসে যাচ্ছে সাগর হেঁকে।
আজকে শুধু আসছে ভেসে কবন্ধেরি খাদ্য
শিরায় আমার নেচে বেড়ায় দুন্দুভিরই বাদ্য;
নইকো আমি কোমল কবি, কইনা কোমল কথা,
হৃদয় আমার ছাপিয়ে আসে ভুবন জোড়া ব্যথা;
আকাশ-জোড়া অন্ধকারে আজকে মোদের পাড়ি
করতে হবে একটা কিছু আকাশ-পাতাল ফাড়ি;
প্রেতের পুরী লুঠব রে আজ আনব দৈত্য দানা,
করুক না সব নন্দী ভৃঙ্গী যত ইচ্ছে মানা;
লাগিয়ে দেব এই ভুবনে মহান ভূমিকম্প
যাই ত যাব জাহান্নামে দেব ভীষণ লম্ফ;
বাঁধা শাসন মানব না আর খুলে মনুর শাস্ত্র
হবনা আর বিদ্যালয়ের চুপ্‌টি করা ছাত্র।
একটা কিছু করতে হবে এমন চরম ক্ষণে
বাধল যখন হানাহানি দেশ-হানাদের সনে;
হয় ত না হয় বন্দী হব নয় ত যাব ফাঁসী
বাজিয়ে যাব শেষকালেতে শিবের ঢক্কা কাশী।

আলোকের অভিযান

শ্রীআভা দেবী

আলোকের উদ্দীপনা এসেছে জীবনে
অসীমের এসেছে আহ্বান।
ঊর্দ্ধে, ঊর্দ্ধে, আরও ঊর্দ্ধে সুদূর গগনে
ছুটে চলে পিয়াসী পরাণ।

হাতে তার সন্ধানী প্রদীপ রাত্রি অন্ধকার,
অসীম দুর্য্যোগ-ভরা অনন্ত পাথার,
সেই পথে ছুটিয়াছে নির্ভীক সে চির নির্ব্বিকার।

ঝঞ্ঝা-ক্ষুব্ধ নিবিড় নিশীথে
আনন্দে পরমানন্দ জাগে তার চিতে
ত্রস্ত ভীত সর্ব্ব প্রাণী, সকল সংসার,
দিকে দিকে শোনা যায় শুধু হাহাকার
তারি মাঝে সে পেল সন্ধান
অরূপের অপূর্ব্ব আহ্বান।

কার আকর্ষণ-বলে
আত্মার এ অভিসার যুগে যুগে চলে,
কাহার কারণ, ছিন্ন করি' সকল বন্ধন
অতৃপ্ত অন্তরে জাগে চির অন্বেষণ।
অসীম ব্রহ্মাণ্ড-মাঝে নীরবের ভাষা
বুঝিলাম ভবে
আলোক সে আপনারে দিকে দিকে বিস্তারিয়া
পূর্ণ করে তবে।

অমানুষ মানব

শ্রীশচীন্দ্রলাল রায় এম-এ

শীতের প্রভাত। তাঁবুর বাহিরে বসিয়া প্রভাতকালীন সূর্য্যতাপ উপভোগ করিতেছি। বিশ্বজগতের অনিশ্চিত আবহাওয়ার সংবাদ এদিকে কতটা পৌঁছিয়াছে—ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না। সহর ছাড়িয়া গ্রামের উন্মুক্ত প্রান্তরে বাস করিতেছি মাত্র দিন চারেক। সহরের চাঞ্চল্য, মিথ্যা গুজব, রেডিওর রকমারি সংবাদ, দৈনিক সংবাদপত্রের একঘেয়ে উক্তির হাত হইতে পরিত্রাণ পাইয়া যেন নিশ্বাস ফেলিতে পারিতেছি। সসাগরা ধরিত্রীর আর্ত্ত ক্রন্দনের একটানা সুর এখানে যেন কানে প্রবেশ করিতেছে না।

উত্তরে ধনুকের মত বাঁকা গারো পাহাড় পাতলা কুয়াশায় আচ্ছন্ন। কুয়াশার ফাঁকে পাহাড়ের শ্যামল শ্রী আরও মনোরম বোধ হইতেছে। যদি কবি হইতাম তাহা হইলে ইহার সহিত যৌবনপুষ্টা শ্যামাঙ্গী তরুণীর সূক্ষ্ম ওড়নায় আবৃত অর্দ্ধনগ্ন রূপের সহিত তুলনা দিতে পারিতাম।

সম্মুখে বিস্তৃত ধূসর ক্ষেত্র। শস্য কাটা হইয়া গিয়াছে। চতুষ্পার্শ্বের গ্রামের অগণিত গরু মহিষ নিঃশঙ্কচিত্তে ধান গাছের অকর্ত্তিত মূল অংশের শুষ্ক রসাস্বাদন করিতেছে। পূর্ব্ব পার্শ্বে 'চৈতার' বিলের জল প্রভাত সূর্য্যে চিক্ চিক্ করিতেছে। ঝাঁকে ঝাঁকে বন্য হাঁস জলে পড়িতেছে আবার কিছুক্ষণ পর উড়িয়া যাইতেছে। ইহাদের নিরুপদ্রপ শান্তির ব্যাঘাত করিতে কোনও হিংস্র শিকারীর উপস্থিতি চোখে পড়িতেছে না।

আরাম করিয়া গরম চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিতেছি—এমন সময় জমিদারের কাছারির নায়েব রামশঙ্করবাবু আসিয়া নমস্কার করিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহাকে বাসতে বলিলাম—তিনি চেয়ারখানা একটু দূরে সরাইয়া লইয়া সঙ্কুচিতভাবে উপবেশন করিলেন।

চারিদিকের সুন্দর পরিবেষ্টনীর মধ্যে একাকী বসিয়া থাকিতেই ভাল লাগে—কিন্তু উপায় নাই। আমি আসিবার পর হইতেই এই ভদ্রলোক যথেষ্ট তদ্‌বির করিবার চেষ্টা করিতেছেন—সুতরাং আমার পক্ষেও নিশ্চিন্ত হইবার সুযোগ কোথায়? বলিলাম—একটু চা খাবেন?

ভদ্রলোক বিনীত হাস্যে কহিলেন—আজ্ঞে না সার। এই বুড়ো বয়সে আর নতুন অভ্যাস করবো না। যখন দিনকাল ছিল তখনই কোনও কু-অভ্যাসে আমল দিইনি—আর এখন!

এতক্ষণে তাঁহার সঙ্কুচিত ভাব কাটিয়া গিয়াছে—তিনি উৎসাহভরে বলিতে লাগিলেন—সেবার সেজ হিস্যার ছোটবাবু ধরে বস্‌লো যে চা খেতেই হবে। জন্মাতে দেখেছি তাকে—কোলে পিঠে করে একরকম মানুষ করেছি কিনা—কাকা বলতে অজ্ঞান। আমাকেই কাকা বলে কিনা। অতি ভাল ছেলে—জমিদারের ছেলে বলে কোনও অহমিকা তার কেউ দেখেনি। কলকাতায় গিয়েছিল পড়তে—যখন ফিরে এলো একেবারে আদব কায়দা দুরস্ত। ঘণ্টায় ঘণ্টায় তার চা চাই। আমাকে তখন কি সাধাসাধি। আমি বললাম—উঁহু। তোমরা বড়লোক—শত অভ্যাস তোমাদের শোভা পায় বাবা—আমি গরীব মানুষ, বড়লোকের অভ্যেস ধরলে—। সে হেসে বল্ল—বলেন কি কাকা—আপনি কি আমার পর? এষ্টেট যখন হাতে পাব—দেব আপনার চা খাওয়ার জন্য পাঁচ টাকা মাইনে বাড়িয়ে। আহা বড় ভাল ছেলে সে···জমিদার গোষ্ঠীতে এমন ছেলে আর জন্মায় নি। জ্ঞানবুদ্ধিও টন্‌টনে। তিন তিনবার আই-এ ফেল করলো বটে, কিন্তু ইংরাজী বিদ্যে তার মত আর আমার চোখে পড়েনি। হাতে ইংরাজী বই—আর সাম্‌নে চায়ের পেয়ালা—সর্ব্বক্ষণ এই। পাশ করতে পারবে কেন—বলুন দেখি। বই কেনার টাকা যাচ্ছে মাসে মাসে—তাই দিয়ে বই কিনে গরীব দুঃখীদের বিলোচ্ছেন। অমায়িক ছেলে পেয়ে কতজনই যে তাকে ঠকিয়েছে সার! তাই সেজো 'হুজুর' আর পড়াতে চাইলেন না। অথচ এমন ধারালো ছেলে—পাঁচটা পাশ করতেও তার বাধতো না।

কৌতুক অনুভব করিলাম। কিন্তু মুখে কিছু বলিলাম না। ভদ্রলোক একটু দম লইয়া বলিলেন—আপনার কিছুমাত্র অসুবিধে হলে জানাবেন আমাকে। এদেশে তো আজকাল কিছুই মেলে না। পাপ ঢুকেছে কিনা! নইলে অভাব ছিল কিছুর। আপনি সার—সরকারি চাকুরে। আগের দিন হলে—মাছ দুধে জায়গা থৈ থৈ করতো। খেয়ে মেখে গাঁ শুদ্ধ বিলিয়েও শেষ করতে পারতেন না। এখন বলুন দেখি কাউকে? পয়সা আগাম দিয়েও পাবেন না। হায়রে কি দিনই ছিল! কৈ-জুড়ি বিলের ইয়া মোটা মোটা কৈ মাগুর, চিংলি বিলের লাল টক্‌টকে 'আধ মুনে' রুই মাছ, আর বাউসামের বাথানের মোষে দৈ—দৈ তো নয় যেন জমাট মাখন—একবার হাত দিলে রক্ষে আছে? একটা গোটা সাবানই যাবে হাতের মাখন তুল্‌তে। রামরাজত্ব ছিল শুনেছি বটে—কিন্তু পনেরো বিশ বছর আগেই যে আমরা চোখে দেখেছি মশায়—ওকে যদি রামরাজত্ব না বলবো তো কাকে বল্‌বো বলুন দেখি?

আমি হাসিয়া বলিলাম—তা বটে।

—রামরাজত্যি কি আর একদিকে ছিল সার। লোকজন, প্রজা পাইক—সব ছিল বিনে মাইনের গোলাম। শুধু একটু মুখের কথা খসানোর ওয়াস্তা। এখন একটা কথা বলুন দেখি—একেবারে মারমুখী। 'লেহ্য' খাজনা দিতেই ব্যাটাদের কত সাধাসাধি করতে হয়। আপনি আবার সরকারি লোক, সব কথা খুলে বল্‌তেও ভয় হয়। সেকালে খাজনা তো খাজনা—তার উপর দিতে হতো চার আনা করে টাকা প্রতি সরঞ্জামি খরচ, আট আনা করে প্রতি প্রজার তলপ চিঠির প্যায়দার রোজ। জমিদারবাবুদের আগমন হলে তো কথাই নেই—প্রতি প্রজা পিছু চার কাহন করে খরচা। ওঃ—সে একটা মহোৎসব কাণ্ড। ঐ যে তেঁতুল গাছটা দেখছেন—ওখানে তো বিশ পঁচিশটে পাঁঠা খাসি বাঁধাই রয়েছে। তাও বলি—বড় উদার মন বাবুদের।

কোনও লোক এলে না খাইয়ে ছাড়তেন না—তা ইতর ভদ্দর যেই হোক। একটা মজার গল্প বলি শুনুন। সেবার মেজ-হিস্যার কর্ত্তা এসেছেন কাছারিতে। মহালে একেবারে তুমুল কাণ্ড। দেউড়িতে ঝুলনো আঠারো ইঞ্চি লম্বা একপাটি লোহার মত শক্ত চামড়ার জুতার আর ঝুলিয়ে রাখার অবসর নাই—কেবল প্রজাদের পিঠে পড়ছে। ভোজপুরী দরওয়ানদেরও বিশ্রাম নাই—পরিশ্রম কি কম সার। হাতুড়ি পেটার মত ঐ জুতো দিয়ে পিটিয়েই চলতে হচ্ছে কিনা! হ্যাঁ, আমদানি সেবার হয়েছিল বটে। পনরো দিনে বিশ হাজারের কম নয়। যে কথা বলছিলাম। গরগাঁওয়ের কেনারাম নমদাসের কি যে মতি হলো—সে কর্ত্তার সামনেই বলে ফেললো—এবার খাজনা মাপ দিতে হবে রাজা। বন্যার জলে তার নীচু জমির সব ধান পয়মাল হয়েছে। খোরাকির ধান জোগাড় করতেই নাকি এবছর দু বিঘে জমি বাঁধা পড়েছে।

কর্ত্তা মৃদু হেসে বল্লেন—বটে! আর দু' বিঘে বাঁধা রেখে খাজনা খরচা সব মিটিয়ে দিয়ে যা।

কেনারাম মূর্খ কিনা, তাই বল্লে—সব জমি বাঁধা দিলে খালাস করবো কি করে হুজুর। বউ ছেলে মেয়েদের পালবো কি ভাবে কর্ত্তা?...দেখুন দেখি ব্যাটার আস্পর্দ্ধা। আমাদের সামনে যা ইচ্ছে বল্—কিন্তু স্বয়ং মেজ হুজুরের সামনে! কি বেয়াদপি দেখুন দেখি।

কর্ত্তা তেমনি হেসেই বল্লেন—ওঃ! তোরা সবাই খাবি—আর আমরাই উপোস করে থাকবো—না? তারপর আমার দিকে চেয়ে বল্লেন—বুঝলে হে নায়েব, ওদের দশ কর্ম্মো চলবে, কেবল যার জমির উপসত্ত্ব ভোগ করে সুখে স্বচ্ছন্দে আছে—সেই করবে উপোস। ভাল যুক্তি ব্যাটার। এরই নাম কলিকাল—বুঝলে। আচ্ছা খাওয়াচ্ছি তোকে! পাঁড়ে!

'জি হুজুর'—বিশাল দেহ ভোজপুরী জমাদার সেলাম করিয়া দাঁড়াইল। 'পঞ্চাশ জুতি—লে যাও'।

পঞ্চাশ 'জুতির' দরকার হ'লো না। গোনা পনেরোটির পরই কেনারাম ধূলোয় লুটিয়ে পড়েছে, মুখ দিয়ে গ্যাঁজা ভাঙছে।...কর্ত্তা খবর শুনে হেসেই খুন। আমাদের মেজ হুজুর যেমন রাসভারি, তেমনি রসিক পুরুষ ছিলেন কিনা। হেসে বল্লেন—পনেরো ঘা জুতো যে ব্যাটাদের সহ্য হয় না তাদের আবার খাজনা না দেওয়ার অজুহাত। আস্পর্দ্ধাটা একবার দেখতো নায়েব মশায়।...চোখে মুখে জলের ঝাপটা দিতে দিতে ঘণ্টখানেক পর কেনারামের জ্ঞান হ'লো—সে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে চাইতে লাগ্‌লো।

কর্ত্তার কাছে খবর গ্যালো। তিনি বল্লেন—ও ব্যাটাকে ভরপেট খাইয়ে ছেড়ে দাও আজ। তিন দিন পর যেন খাজনা নিয়ে আসে।—

বিরাট আয়োজন খাওয়ার। কর্ত্তার হুকুম—তাঁর জন্য যত পদ রান্না হয়েছে—সব কেনারামকে খাওয়াতে হবে। সে আর এক শাস্তি। দুইখানি কলার পাতে থরে থরে সমস্ত খাওয়ার জিনিস দেওয়া হ'লো। কেনারামের সেই ফ্যাল্ ফ্যালে দৃষ্টি। সে একবার পাতের দিকে আর একবার তার সম্মুখের লোকের দিকে বেকুবের মত চায়, পাতে হাত দিতে যেন তার আর সাহস হয় না। আমি তাকে আশ্বাস দিয়ে বলি—ভয় কি কেনারাম। হুজুর দয়া করে খেতে দিয়েছেন—ভয় কি তোমার? আমার কথায় সে হাত দিয়ে ভাত মুখে দিতেই গলায় তার আট্‌কে গ্যালো। সে কাঁদো কাঁদো সুরে বল্লে—গলায় নামেনা হুজুর! বল্লাম—ভয় কিরে—খা, খা। দুই তিনবার সে চেষ্টা করলো, কিন্তু বাবুর বাঁশ ফুল চালের অন্ন তার গলা দিয়ে নামবে কেন। আবার খবর গেলো কর্ত্তার কাছে। হুকুম হোলো—তিনজনের মত খাওয়ার জিনিষ ওকে বেঁধে দেওয়া হোক—ও বাড়ীতে নিয়ে যাবে। কিন্তু তিন দিনের মধ্যেই যেন খাজনা নিয়ে হাজির হয়।

সেই রকমই ব্যবস্থা হ'লো। খাবারের এক মোট সে ঘাড়ে তুলে নিয়ে স্খলিত পদে রওনা হলো। সবাই বলতে লাগ্‌লো—হ্যাঁ দয়ার শরীর বটে আমাদের মেজ হুজুরের। মুখে একটু রাগ দেখান বটে—কিন্তু অন্তরটা ঠিক দেবতার মতন।—

এতক্ষণ চুপ করিয়া শুনিতেছিলাম, বলিলাম—তারপর কেনারামের কি হোলো? তিন দিন পর খাজনা দিল তো?

—আর দিলো। বিকেল বেলায় খবর পাই—কেনারাম তার সমস্ত খাবার মাঠে ছড়িয়ে দিয়ে গিয়েছে—আর সেখানে কাক চিল আর কুকুর বেড়ালের 'মচ্ছোব' আরম্ভ হয়েছে! তিন দিন পরেই খবর আসে যে কেনারাম সপরিবার হাঁসচড়া মিশনে আশ্রয় নিয়েছে—আর পবিত্র খৃষ্ট ধর্ম্মে দীক্ষাও শেষ হয়েছে। দেখবেন এখন তার বড় ছেলে কত বড় সাহেব। হ্যাট্‌কোট পরে প্রতি সপ্তাহে এই হাটে খৃষ্ট ধর্ম্ম প্রচার করে কিনা! বলিয়া নায়েব মশায় হাসিতে লাগিলেন।—

সকাল বেলায় পল্লীর মুক্ত প্রান্তরের মধ্যে যে শান্তির আমেজ অনুভব করিতেছিলাম—এই লোকটির রামরাজত্বের কাহিনী শুনিতে শুনিতে তাহা উবিয়া গিয়া মন বিষাইয়া উঠিয়াছে। ভাবিলাম—বর্ত্তমানের জগদ্ব্যাপী দাবানলের নেতা যাহারা তাহাদের যদি বা ভগবান ক্ষমা করিতে পারেন, কিন্তু নায়েব-বর্ণিত রাম-রাজত্বের নায়ককে ক্ষমা করিবেন কোন ভগবান?

বোধ করি মনের ভাব মুখেও ফুটিয়া উঠিয়াছিল। বৃদ্ধ চতুর লোক তাহা অনুভব করিয়া কহিলেন—সেদিন আর নাই সার, চাকা ঘুরেছে। এখন একজন ছেড়ে দশজন প্যায়দা পাঠান—কোথায় জন মনিষ্যি। বাড়ী বাড়ী গিয়ে সাধাসাধি করলেও একটা পয়সা বেরোবে না। একটু জোরে কথা বলবার হুকুম কোথায়? অমনি গাঁ শুদ্ধ তেড়ে মারতে আসবে না? আমাদের হয়েছে মরণ আর কি! এদিকে খাজনা পত্তর আদায় নাই—ওদিকে সাত সরিকের জুলুম কত। এখন প্রজাদের তো কিছু বলতে পারেন না—নায়েব গোমস্তাদেরই মরণ। কি খাই নিজে, আর ছেলে বৌকেই বা খাওয়াই কি বলুন দেখি। তিন তিনমাস এক কানা কড়িও মাইনে পাইনি। সদরে এত্তালা করলে বলবে—চাকরি না পোষায় তো ছেড়ে দাও। এই বুড়ো বয়সে এখন না খেয়ে মারা যাব সার। পাঁচ টাকা আদায় হ'লো—সাত সরিকের সদরের প্যায়দা মোতায়েন—একেবারে কেড়ে ছিঁড়ে নিয়ে যাবে। নাঃ—আপনারা বেশ সুখে আছেন। মাস গেলে মাইনে—আমাদের দুঃখ আপনারা বুঝবেন না। যাক্, অনেক বিরক্ত করে গেলাম আপনাকে, এখন উঠি। এখনও পাঁচ সাত

দিন আছেন তো? বেশ—বেশ। একবার কাছারিতে দয়া করে যাবেন। আগেকার দিন হলে কি আর এই মাঠের মধ্যে পড়ে থাকতে হয়। আর এখন? কোথায় নিয়ে বসাই তার স্থান নাই। ঘর কি কমগুলো ছিল? একে একে এক এক তরফের বাবুরা লোক পাঠান—আর চালের টিন, বাঁশের বেড়া খসিয়ে নিয়ে যান, যেন তাদের মধ্যে—ঐ কি বলে—কম্পিটিশন্ চলেছে।

তাঁহার কথায় পুনরায় মনটা আবার হালকা হইয়া উঠিয়াছে, সহাস্যে কহিলাম—আর দেউড়ি? সেই আঠারো ইঞ্চি লম্বা লোহার মত শক্ত জুতার এক পাটি? সেটা এখনও ঝুলছে তো?

তিনি হাসিয়া বলিলেন—আপনি হাসালেন দেখ্ছি। দেউড়ির চাল গিয়েছে ফাঁক হয়ে—বেড়া গিয়েছে খসে। যত রাজ্যের ছাগল গরুর আড্ডা সেখানে। জুতো কি আর রাখা চলে সার? এখন কার পিঠে পড়ে তার ঠিক কি! আর সে ভোজপুরী দরওয়ানই কি আছে? তাদের রসদ জোগাবে কে। আছে দুই ব্যাটা মেড়ো—তাল পাতার সেপাই, লোক দেখলেই ঘরের মধ্যে সেঁধোয়। সাত টাকা মাইনে আর এর চেয়ে কি বেশী আশা করা যায়। আগে অবিশ্যি চার টাকাতেই পাওয়া যেত—ঘিউ, দুধ, আটা, রুপেয়া তো ছিটোনোই ছিল কিনা, মাইনের দিকে তখন কে তাকাত! আচ্ছা, বেলা হয়ে গেল, এখন আসি সার। অনেক বাজে কথা বল্লাম—কিছু মনে করবেন না সার। নমস্কার!

২

হাটের দিন। কাল বৈকাল হইতে হাটে লোক জড় হইতে আরম্ভ করিয়াছে। গারো পাহাড়ের বহুদূরের পথ হইতে গারো নামিতেছে। দুই তিন দিনের পথ ভাঙ্গিয়া তাহারা আসিতেছে—পাহাড়ের নানাবিধ তরিতরকারি, বেতের জিনিষ, লাঙ্গল লইয়া। এইগুলি বিক্রয় করিয়া লইয়া যাইবে—ঝুড়ি বোঝাই করিয়া শুট্‌কি মাছ, কচ্ছপ আর লবণ। গারো পুরুষ আর স্ত্রীর পিঠে প্রকাণ্ড ঝুড়ি, ঝুড়ি সংলগ্ন বেতের দড়ি মাথায় আটকানো। প্রায় প্রত্যেক গারো রমণীর সঙ্গে একটি করিয়া শিশু। পৃষ্ঠে যাহাদের বোঝা—বুকের সঙ্গে কাপড় দিয়া বাঁধা তাহাদের সন্তান। আর যাহাদের মস্তকে বোঝা—পিঠে তাহাদের সন্তান বাঁধা। বহুদূর হইতে তাহাদের আসিতে হয়—মাতৃতন্ত্রে পালিত শিশুদের তাই ফেলিয়া আসিবার উপায় নাই। অভ্যস্ত শিশুদের কোনও সাড়া নাই—মাতৃদেহের আবেষ্টনে তাহারা পরম সুখে নিদ্রামগ্ন।—

অগণিত লোকের প্রসেসন চলিয়াছে—হাটের দিকে। কাল সন্ধ্যা হইতেই হাটের গুঞ্জন ধ্বনি শুনিতেছি—আজ সকাল হইতে একেবারে সোরগোল উঠিয়াছে, দুই মাইল দূর হইতেও সে ধ্বনি শোনা যায়।—

সত্যই প্রসেশন। অগণিত মানুষ, ঘোড়া, গরুর বন্যা নামিয়াছে হাটের দিকে। তাহাদের গতিতে ছন্দ আছে, উদ্দেশ্য আছে। বেশ লাগিতেছে দেখিতে।—

ভাবিতেছিলাম—ভালই তো আছে ইহারা। পৃথিবীব্যাপী আলোড়নের সংবাদ ইহারা জানেনা। সপ্তাহে একবার হাটে আসিয়া সরল অনাড়ম্বর জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের উপকরণ সংগ্রহ করিয়া লইয়া যায়—বহির্জগতের সঙ্গে তাহাদের সম্বন্ধ এইটুকু।

বড় ভারি খবর আছে—যুদ্ধের খবর তিন্ তিন্ পয়সা। লাখ টাকার খবর তিন পয়সায়। চাই খবরের কাগজ।··· চমকাইয়া উঠিলাম। যে ধারার চিন্তা সুরু করিয়াছিলাম—তাহাতে বাধা পাইলাম। এই সুদূর পল্লীতেও উৎপাত তাহা হইলে সুরু হইয়া গিয়াছে? নিরুপদ্রব শান্তি কি তাহা হইলে এখানেও নাই?

—নমস্কার।···নায়েব মহাশয় আসিয়া দাঁড়াইলেন—হাটের লোক দেখছেন বুঝি?

বলিলাম—এখানে কি খবরের কাগজ বিক্রি হয় নায়েবমশায়?

নায়েব মহাশয় বলিলেন—হয় না? সেদিন কি আর আছে সার! সহর, সহর হয়ে গ্যালো একেবারে। কেবল টাকার মুখই দেখতে পারিনে এখন আমরা। চলুন না একবার হাটের দিকে—দেখবেন কতগুলো চায়ের ষ্টল বসেছে। রুটি, বিস্কুট, চা—আর কি বিক্রির ধুম! আমি এই বয়সে এক কাপ চা মুখে তুলিনে—আর ঐ ব্যাটাদের কাণ্ড দেখবেন এখন। সব সাহেব হয়ে গ্যালো কিনা? বেলা দশটা পর্য্যন্ত হা পিত্যেস করে বসেছিলাম খাতাপত্তর নিয়ে। কাকস্য পরিবেদনা—কাছারিতে—বলুন তো—জমিদারী-টমিদারি উঠে যাবে নাকি? এদিকে তো জোর গুজব শুনি, খবরের কাগজেও তাই লেখে। তা' উঠে গেলেও বাঁচা যায়—এ লাঞ্ছনা আর সহ্যি হয় না। আচ্ছা আসি এখন—দেখি কোনও ব্যাটা যদি দয়া করে কাছারিতে পায়ের ধুলো দ্যায়। হাটবাজার যে করবো তারও পয়সার জোগাড় নাই কিনা। 'শক্তিশেল'—আর কাকে বলে।

বেলা তিনটা হইতে হাট ভাঙ্গিতে সুরু হইয়াছে। হাটের যাত্রী বাড়ীর পথ ধরিয়াছে এতক্ষণে। জমিদারী কাছারি সংলগ্ন পুকুরপাড়ে এক একদল বসিয়া বিশ্রাম করিতেছে—কেহ কেহ বা শুঁটকি মাছ পোড়াইয়া পরম পরিতৃপ্তির সহিত ভাত খাওয়া সুরু করিয়াছে। দগ্ধ শুঁটকি মাছের দুর্গন্ধে স্থানটি ভারাক্রান্ত।

সন্ধ্যা নাগাদ স্থানটি নির্জ্জন হইয়া গেল প্রায় এক সপ্তাহের মত। যে চাঞ্চল্য কাল সন্ধ্যা হইতে সুরু হইয়াছিল—মনে হইতেছে কোন যাদুদণ্ডে তাহা একেবারে প্রশমিত হইয়া গিয়াছে।

চারিদিক নিস্তব্ধ। পাহাড়ের গায়ে অনেক স্থান জুড়িয়া আগুন জ্বলিতেছে—গারোরা জঙ্গল পুড়াইয়া 'হাদাং' করিবে। তাহারা সেইখানে চাষ করিবে পাহাড়ী ধান, ভুট্টা, লঙ্কা, তুলা এবং আরও হরেক রকমের সবজি গাছ। বিনিময়ে তাহারা রোপণ করিবে—গজারি গাছ—যাহার মালিক থাকিবেন সরকার। দুই বৎসর পরে আবার তাহারা 'হাদাং' করিবে অন্যস্থানে—এম্নি ভাবে। আবার তাহারা সরিয়া যাইবে।—

পাহাড়ের দিকে চাহিয়াছিলাম মুগ্ধনেত্রে। অগ্নিশিখায় উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে—উত্তর দিকটা। পাহাড়ের প্রান্তে সমতলভূমিতে গ্রামগুলি অন্ধকার রাত্রেও স্পষ্ট চোখে পড়িতেছে। অগ্নিশিখা গ্রামগুলির বাঁশঝোপের উপর পড়িয়া চিক্ চিক্ করিতেছে—পাতার কাঁপন যেন এখান হইতেও দেখা যাইতেছে।

—প্রণাম হই হুজুর।···গ্রামের মোড়ল বিশম্ভর হাজং পায়ের

উপর লুটাইয়া প্রণাম করিল। বলিলাম—কি হে বিশ্বম্ভর, কোথা থেকে ফিরছো ?

—গেইছিলাম মনস্থরপুরের দিকে পরশু। ফিরতে হয়ে গ্যাল বিলম্ব। হাট ধরতাম্—পারলাম না।

বিশ্বম্ভরের গল্প আমি শুনিয়াছিলাম এখানে আসিয়া। কাছারীর নায়েব মশাই আর গ্রামের বিশ্বম্ভর মোড়লই আমার এখানকার আলাপ করিবার লোক। তাহারাই সাহস করিয়া কাছে আসে—অযাচিতভাবে আসিয়া গল্প শুনাইয়া যায়।

হাসিয়া বলিলাম—তোমার এমন কি কাজ ছিল বিশ্বম্ভর যে হাটই ধরতে পারলে না ? গারো পাহাড়ের কতদূরের পথ থেকে লোক এলো—আর তোমার ঘরের কাছে হাট—।

মাথা ঝাঁকাইয়া বিশ্বম্ভর কহিল—ওদের সাথি 'সমতুল' করবেন না হুজুর। ওরা তো মনিষ্যি নয়—জানোয়ার, একেবারে পশুর তুল্যি। 'জঙ্গলকাটি' আদি প্রজা আমি শ্রীবিশ্বম্ভর হাজং, এই হাট আমি নিজের চোখিৎ বসৃতি দেখলাম। কত 'সাহাষ্যি-স্থবো' করতি হলো এই হাট বসাতি আমাকে—একটা হাট ফাঁক গেলি কি আমার কম দুঃখ্খু হয়! কিন্তু কি করবাম্ হুজুর—বাড়ীতে যতখন্ থাকি, বেশ থাকি, একবার যত্তপি বাহির হইলাম—কত বন্ধু-বন্ধুনীর সাথি দেখা হয় সহজে কি ফেরন্ যায় কর্ত্তা। আপনি বিচক্ষণ ব্যক্তি—রাজার তুল্যি লোক—আপনি না বুঝলি আর বুঝবি কেডা!

বুঝিয়াছি বৈকি! বাড়ীতে মট্‌কি বোঝাই 'পচাই' তৈরী হয়—'লাইসেন্স' নেওয়া আছে। বাড়ীতে থাকিতে সময় নাই অসময় নাই এক একবাটি লইয়া বসিলেই হইল। কিন্তু তাহাও যখন একঘেয়ে বোধ হয়, বিশ্বম্ভর বাড়ীর বাহির হইয়া যায়—দুই তিন দিন না গেলে আর ফিরিতে পারে না। যেখানেই যায় বিশ্বম্ভর মোড়লের আদর আপ্যায়নের ত্রুটি হয় না। 'পচাই' মেলে সব জায়গাতেই—নেশায় সে বুঁদ হইয়া থাকে কিন্তু মাতলামি করিতে তাহাকে দেখা যায় না।

জিজ্ঞাসা করিলাম—ওহে মোড়ল, জমি-জায়গা তো তোমার অনেক শুনি—তুমি তো ঘুরে ফিরেই বেড়াও—তোমার ক্ষেত-খামারের তত্ত্ব করে কে ?

—হয় কর্ত্তা, একথাডা বল্‌তি পারুন আপনারা। জোয়ান বয়সেই দেখলম্ ভারী—এখন তো বুড়ো হতি চল্‌লাম। উঁহু, কথাডা ঠিক হলো নি। জঙ্গলকাটাই প্রজা আমি শ্রীবিশ্বম্ভর হাজং—এই যেহানে আপনি তাম্বু ফ্যালাইছেন—এহানে আর যদ্দূর চোখ যায়—জঙ্গল—জঙ্গল—এক্কিবারে 'অরাণ' জঙ্গল। জমিদার সরকার থনে পেরথম পত্তন আমার—সাধে কি আর মোড়ল কয় আমারে হুজুর। তারপর তো এক্কিবারে যুদ্ধ লাগি গ্যালো—বাঘ, বরা' আর বুনো মোষির সাথি। জোয়ান বয়সি খাট্‌লম্ বৈকি! পাঁচ বচ্ছর কি খাট্‌নি রে বাবা জঙ্গল ছাপ করতি। এই হাতে কয় গণ্ডা বাঘ মার্‌ছি জানেন হুজুর? হুঁ—কিন্তু মোড়লের এক্কিবারে অব্যর্থ লক্ষ্য ছিল কিনা! পাঁচ 'পূরা' জমি নিলম্ জমিদার সরকার থনি। জমিদার তো হুকুম দিয়্যা দিল্ যত ইচ্ছা নাও—চোখ যদ্দূর যায়। জঙ্গলা জমি পোছে কে? এক আড়ার মত জমি কোনও রকমে পোড়া দিয়া দুবার লাঙ্গল ঠেলি'—দিলম্ ধান ফ্যালায়ে। বল্‌লি বিশ্বাস করবেন না হুজুর—ফলন এক্কিবারে আশি মণ। আর শর্ম্মাকে পায় কেডা। তারপর হয়্যাগ্যাল্ জমির জন্তি কাড়াকাড়ি। গারো নামলো পাহাড় হতি', 'স্তাক্'য়া আইলো 'ঢাহা'র জেলা হতি, 'নমদাস' আইলো ফরিদপুর জেলা হতি। কাছারি বাড়ী, পুকুর, হাট সব কিন্তু মোড়লের চোখ্যির সামনি গড়তি দেখলম্ কি না!

বিশ্বম্ভর একটুখানি দম লইয়া পুনরায় আরম্ভ করিল—পাঁচ বচ্ছর পর করলাম পেরথম বিবাহ।—তারপর আমার বিচ্ছ্রাম। ওরাই সব দেখশুন্ করে। পাঁচজন মোড়ল বলি ডাকে—জঙ্গল কাটি' পেরজা আমি শ্রীবিশ্বম্ভর হাজং—লোকির ভালমন্দ হলি ডাক ছ্যায়—এতেই সন্তুষ্টি আমার। বউ কডা বাঁচি থাকলি আমার দুখ্খু নাই কিছুরই। সাতটা পোলা—পাঁচটা বিটি পোলা, দিন চলি যায় আপনাদের কিরপায় একরকম করে।

সহাস্যে কহিলাম—না মোড়ল তুমি ভালই আছ। তা তোমার পরিবার কয়টি বল্লে না তো।

—আজ্ঞে শাঁখা-পরা পরিবার একটাই। নিকে করলাম দুই বিধ্‌বেকে। ফ্যালারাম যখন মারা যায় বউডোর কি গগন-ভেদী ক্রন্দন হুজুর। নিয়ে আলাম বাড়ীতে। পর সনই বিনন্দার বউডা বিধ্‌বে হলো। আহা ছেলেমানুষ বউডা—ফেল্‌তি পারলাম না।

আমি হাসিয়া ফেলিয়া বলিলাম—বেশ করেছো। তোমরা কি—।

জঙ্গলকাটি' প্রজা বিশ্বম্ভর চতুর লোক, আমার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া কহিল—আজ্ঞে হিন্দু, খাঁটি হিন্দু। হজ রাজার বংশধর আমরা—পরম ক্ষত্রিয়। আমাদের ধর্ম্মটা ইদানীং বষ্টম ধম্ম কিনা। ওসব চলে হুজুর। তাছাড়া—।

বিশ্বম্ভর থামিয়া সলাজহাস্য সহকারে কহিল—তা ছাড়া 'দায়মারা' করলাম—তিনটা।

বিস্মিত হইয়া কহিলাম—দায়মারা? দায়মারা আবার কি জিনিষ ?

হো হো করিয়া হাসিয়া বিশ্বম্ভর কহিল—আপনারা ভদ্দরলোক—বলতে আমাদের লজ্জা হয় ইদানীং। 'দায়মারা' মানে আজ্ঞে, সধবার সাথে ঘর বসত। ওডাও আমাগো মধ্যি চলে কিনা। অর্থাৎ মন চল্‌লো যার সাথে তার সাথেই থাকন্ আর কি! আগের স্বামী পরিত্যজ্য করে যে আমার ঘরে ঢুক্‌লো তাকে ছাড়ন্ যায় কি ভাবে হুজুর। কিন্তু মোড়লের নাম ডাকের মাহাত্ম্যি এম্‌নি কর্ত্তা—এখনও এই বয়সিও ইচ্ছে করলি—না হুজুর থাক আর প্রেয়োজন নাই। দুয়ডার হাতে ভালই আছি—কোনও আর ঝামেলা নাই। হ্যাঁ তাও বলি দুয়ডা পরিবার বটে—কিন্তু শাঁখা পরতি অধিকারী ঐ একমাত্তর পেরথম বিবাহের পরিবার।

এতটা জানিতাম না। না—ইহারা তো প্রগতির চরম সীমায় পৌঁছিয়াছিল। কি জানি সভ্যতার ধাক্কায় আবার নামিয়া পড়িবে কিনা। 'মন চলে যার সাথে'—অতি সত্য কথা! ইহা অপেক্ষা বড় নীতি কথা আর কি হইতে পারে ?

নায়েব মহাশয় আসিলেন। বিশ্বম্ভরকে দেখিয়া নায়েবের মুখ আঁধার হইল, কহিলেন—বলি মোড়লের পো, হাটের দিনেও একবার কাছারিতে এলে না—ব্যাপারখানা কি হে? তোমরা

কি সাপের পাঁচ পা দেখেছো? দেড় শো টাকা করে তোমার বাৎসরিক খাজনা, তুমি গাঁয়ের মোড়ল—দিন দিন তোমরা হলে কি বলো দেখি! এ সব 'আদর্শবাদ' ভাল নয়। জমির যত ধান নিয়ে গোলা বোঝাই করলে—আর 'মালিক' উপোস্ করে থাকুন। কাল বাপু টাকা শোধ করে দিও।

বিশ্বম্ভর কহিল—চটেন্ ক্যান্ নায়েব মশয়। ধানের দর কম এই সময়ডাই—বিক্রি করি ক্যামনে ধানগুলো। জঙ্গল কাটি' প্রজা আমি শ্রীবিশ্বম্ভর হাজং—কোনও দিন খাজনা বাঁকি রাখি আমি? তাগিদটে আমারই ওপর বেশী নায়েব মশয়—গাঁয়ে ভিতে তো আরও লোক আছে। যে স্থায় তারেই ঠ্যাঙ্গান্ বেশী। হুজুরের সাথি গল্প করত্যাছি—এখানিও তাগিদ। জমি যখন খাই—খাজনা দিবাম্ না? একটু দাম হলিই ধান টান বেচি—এবার ফসল ক্যামন হইছে দেখ্ছেন তো? আচ্ছা এখন আসি হুজুর—রাত হলো।···এই বলিয়া বিশ্বম্ভর আমাকে নত হইয়া প্রণাম করিয়া এবং নায়েব মহাশয়কে নমস্কার করিয়া বাহির হইয়া গেল।—

নায়েব মহাশয় গরম হইয়া বলিলেন—দেখলেন তো আস্পর্দ্ধাটা ব্যাটার। অত বড় প্রজা—গ্রামের মোড়ল—বলে কিনা ধানের দর নাই—দর হোক তার পর দেখা যাবে। কেমন দায়সারা কথা দেখলেন তো সার। ও ছিল ভাল—গ্রামের ছোঁড়াগুলো বিগ্ড়ে দিল ওকেও। আজ মশায় বল্লে বিশ্বাস করবেন না, মাত্র পাঁচ সিকে আমদানি। সকালে আপনার এখান থেকে যাবার পর এক ব্যাটা দয়া করে দিয়ে গ্যালো। এদিকে সদরের দরওয়ান মোতায়েন আছে—প্রত্যেক তরফ থেকে টাকার তাগিদ। ঝকমারি সার—জীবনটা অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে।

ভাবিলাম—আমারও। এই লোকটির একঘেয়ে কাহিনীতে আমাকেও অতিষ্ঠ হইয়া উঠিতে হইল দেখিতেছি।—

৩

পাহাড়ের মায়ায় আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছি। হাতের কাজ শেষ হইয়া গিয়াছে। পাহাড় ঘেরা পল্লীর শোভা ত্যাগ করিয়া সহরে ফিরিবার তাগিদ মনের মধ্যে খুঁজিয়া পাইতেছি না। তবু ফিরিতে হইবে—কাল এখানকার ডেরা উঠাইব।

সম্মুখে যতদূর দৃষ্টি যায় শুধু রংয়ের খেলা দেখিতেছি। সূর্য্য বোধ হয় খণ্ড মেঘের সঙ্গে লুকোচুরি খেলিতেছে। রাত্রে এক পশলা বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। সম্মুখের মাঠে স্থানে স্থানে চাষীরা লাঙ্গল দেওয়া সুরু করিয়াছে।

নায়েব মহাশয়কে আসিতে দেখিয়া অত্যন্ত বিরক্তি বোধ করিলাম! না—লোকটির নির্লজ্জতার সীমা নাই। সময় নাই—অসময় নাই—আসিলেই হইল? ভাবিতেছিলাম—কটু কথা শুনাইয়া দিব—কিন্তু তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া আর কিছু বলিতে পারিলাম না। কহিলাম—এ কি, মুখ এমন শুক্নো কেন? অসুখ বিসুখ করেছে না কি?

নায়েব মহাশয় একেবারে কাঁদো কাঁদো হইয়া বলিলেন—অসুখ হয়ে মরলেও তো বাঁচতাম সার। কিন্তু এ যে বেঁচে থাকতেই মরণ হ'লো আমার।—এই দেখুন।—এই বলিয়া তিনি একখানি কাগজ আমার হাতে তুলিয়া দিলেন।—পড়িলাম—লেখা আছে—

সদর কাচারি—সেজ হিস্যা
৭ই পৌষ, বুধবার

হুকুম নং ১৪

সদাশয়েষু,

এতদ্দারা তোমাকে জানানো যায় যে যেহেতু তুমি বৃদ্ধ ও অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িয়াছ এবং যেহেতু তোমার কাণ্ডজ্ঞান ও বিবেক বুদ্ধি একেবারে লোপ পাইয়াছে সেই হেতু তোমাকে কাজে বহাল রাখিবার ইচ্ছা এই সরকারের নাই। 'এজ্মালি' চাকর যে কতদূর নেমকহারাম হইতে পারে তাহার দৃষ্টান্ত তুমিই। খাজনার টাকা আদায়ে তোমার শৈথিল্য দেখা যায়—যাহা আদায় কর তাহার ন্যায্য অংশও এই সরকার পান না। তাহা ছাড়া কাছারি বাড়ীর ভাঙ্গা ঘরের এজমালি টিনগুলির অধিকাংশই অন্য হিস্যা লইয়া আসিয়াছে—এমত খবর পাওয়া গিয়াছে। তোমার যোগ সাজস না থাকিলে ইহা কখনই সম্ভবপর হইত না।—তোমার ন্যায় বিশ্বাসঘাতক এজমালি চাকরের উপর আস্থা না থাকায়—তোমাকে আদেশ দেওয়া যায় যে তুমি তোমার চার্জ্জ তোমার সহকারীকে বুঝ প্রবোধ করিয়া দিবে। আগামী ১লা মাঘ হইতে তোমার এই হিস্যার সঙ্গে কোনও সম্বন্ধ থাকিবে না। এই হুকুম কোনও রকমে অন্যথা করিলে আইন আমলে আসিবে ও দণ্ডনীয় হইবে।—ইতি।—

কাগজখানি তাঁহার হাতে ফিরাইয়া দিয়া বলিলাম—হুকুমজারি করেছে কে নায়েব মশায়?

—আজ্ঞে সেজ হিস্যার ছোটবাবু। তিনিই এখন এষ্টেট দেখছেন কিনা।

—ওঃ। যিনি কাকা বলতে অজ্ঞান? আপনার চা খাওয়ার জন্য ইনিই তো পাঁচ টাকা মাইনে বাড়িয়ে দেবেন বলেছিলেন না?···নিজেকে সম্বরণ করিতে পারিলাম না—হাসিয়া ফেলিলাম।

তিনি কান্নাবিজড়িত স্বরে বলিলেন—আজ্ঞে, বড়লোক ওনারা—গরীবের কথা কি আর মনে থাকে! কিন্তু এই বুড়ো বয়সে আমি যে মারা যাই সার!—

হাসিয়া অপ্রস্তুত হইয়াছিলাম—গম্ভীর হইয়া গেলাম।

নায়েব মহাশয় বলিতে লাগিলেন—নিশ্চয় রাগ করে ঐ রকম লিখে ফেলেছেন। ধরে পড়লে নিশ্চয় এ হুকুম রদ করবেন। এতদিন নিমক খেয়েছি—অনুরোধ উপরোধ করলে—কি শুনবেন না? আপনি কি বলেন সার?

—আমি যা বলি তা আপনি করবেন না। সুতরাং সে কথা থাক।

নায়েব মহাশয় জিব কাটিয়া বলিলেন—ও কি কথা! আপনারা জ্ঞানী ব্যক্তি, মহৎ লোক—আপনাদের কথা না শুনে কি মঙ্গল আছে! আপনার মনোভাব আমি স্পষ্টই বুঝেছি সার।—ন্যায় অন্যায় যাই হোক, যার খেয়ে এতদিন মানুষ—তাঁর হাতে পায়ে ধরলে আমার লজ্জা নাই—এই তো আপনার কথা? আজ্ঞে হ্যাঁ, তাই করবো আমি। সেজ হিস্যার ছোটবাবু সত্যই অমায়িক লোক—রাগ তিনি আমার উপর বেশী

দিন রাখতে পারবেন না। একবার ধরে পড়লে—আচ্ছা আমি আপনাকে চিঠি লিখে জানাব। নিশ্চয় কোনও ব্যাটা লাগিয়েছে আমার নামে। কত শত্তুরই যে পিছনে আছে সার —পরের ভাল তো কেউ দেখতে পারে না। বাবুদের কাছে আমার খাতির প্রতিপত্তি দেখে সবাই হিংসেয় জলছে কি না।

অসহ্য বোধ হইল। কোনও উত্তর দিলাম না।—নায়েব মহাশয় আরও খানিকক্ষণ বক্ বক্ করিয়া চলিয়া গেলেন।

ভাবিতে লাগিলাম—মানুষের চেয়ে কে বেশী অমানুষ? মানুষ নামধারী যাহারা—অমানুষিকদের বিষ গোটা পৃথিবীতে তাহাদের চেয়ে কে বেশী ছড়াইয়াছে? প্রভুভক্ত নায়েব মশায় এবং অতি অমায়িক সেজ হিস্তার ছোটবাবু ইহাদের মধ্যে তফাৎ কোনখানে? যে জমিদার প্রজার পিঠে আঠারো ইঞ্চি লম্বা জুতার পঞ্চাশ ঘা পড়িবার হুকুম দিল সে—অথবা যে প্রজা জুতার ঘা অসহ্য মনে করিয়া ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিল—সে বেশী অমানুষ? এ প্রশ্নের জবাব দিবে কে?

না—ভুল করিয়াছিলাম। পৃথিবীর একটানা আর্ত্ত ক্রন্দন এখানেও শোনা যাইতেছে বৈকি। চারিদিকে ধ্বনিত হইতেছে—নিউ অর্ডার, নিউ অর্ডার চাই! ভাবিতে লাগিলাম—কোন নবযুগ মানুষ সৃষ্টি করিবে? কোন বিদ্রোহ, কোন বিপ্লব, এই নবযুগ আনিতে পারে? ধরিত্রীর জন্ম হইতে কোন বিপ্লব মানবকে দিয়াছে—মানবতার অবদান? কোন বিদ্রোহ করিয়াছে —মানবের দেহ ও মনের শৃঙ্খল মুক্তি?

সম্মুখে চাহিলাম—গারো পাহাড় ধনুকের মত বাঁকা হইয়া পড়িয়া আছে। মাটি হইতে ধোঁয়ার ন্যায় কি একটা জিনিষ রজ্জুর আকার ধারণ করিয়া পাহাড়ের একপ্রান্ত হইতে আর একপ্রান্ত ছাইয়া ফেলিতেছে। হরধনুতে জ্যা যোজনা হইতেছে কি?

নিশীথ শ্রাবণে

শ্রীতিনকড়ি চট্টোপাধ্যায়

রজনী শ্রাবণ, ঘন বরিষণ, গগন ভরেছে মেঘে,
কেয়া মেলে আঁখি, নীপ শিহরায়, আমি বাতায়নে জেগে।
মেঘে মেঘে বাজে উতলা মাদল,
ঝর ঝর ধারে ঝরিছে বাদল,
আমি আনমন, নিশীথ শয়ন, ছাড়ি উঠি কোন ক্ষণে
ধীরে ধীরে আসি, অজানিতে বসি, শিয়রের বাতায়নে।

আঁধারে বিলীন, পথ জনহীন, ঝলকে বিজলী হাসি,
বেতসী নদীর, বুকে বাঁধা তরী, নিদ্রিত পুরবাসী।
দূর কুটীরেতে ক্ষীণ দীপ জ্বলে,
কি জানি কে নারী জ্বেলেছে কি ছলে,
কোন্ পথিকের, অভিসারকের, ভাঙিতে শঙ্কা ত্রাসে—
ঘাল-বন্দিনী, রাজপুতানীর, রাজপুত্রের আশে।

বারি ঝুরু ঝুরু, গুরু গুরু দেয়া, মায়া রচে মোরে ঘিরে,
মন চলে যায়, দূর অতীতের, স্মৃতির সমাধি তীরে।
কবে কার প্রাণে দিয়াছি বেদনা,
নয়নের জলে কে শুধেছে দেনা,
কার হাসিমুখ, করেছি মলিন, ফিরেও দেখিনি চেয়ে,
চমকিয়া দেখি, ভিড় করে তারা, মনের আঙিনা ছেয়ে।

কবে রাজপথে ভিখারী বালক ধরেছে ভিক্ষা লাগি,
কতদূর পথ ছুটে গেছে পিছু একটি পয়সা মাগি!
দিয়াছি ধমক, চক্ষু রাঙাণি,
দশটাকা নোটে চেয়েছি ভাঙানি,
আশা লয়ে মনে ছুটেছে পিছনে আমি গেছি ট্রামে উঠে।
পড়েছে দাঁড়ায়ে কাতর নয়নে উঠেছে হতাশা ফুটে।

কবে ট্রেনে যেতে কোন্ ষ্টেসনেতে হিমেলী পৌষ নিশা,
কোন্ চা-অলায় ডাকি জানালায় মিটায়েছি চা-র তৃষা।
গাড়ি গেছে ছাড়ি, জানালা গলায়ে
পয়সা তাহার দিয়াছি ফেলায়ে,
পেল কি না পেল দেখি নাই চেয়ে, আমি ফিরি মোর ধাম:
আজ রাতে ভাবি—আজিও সে বুঝি খুঁজে ফেরে তার দাম!

কোন্ গল্পের নায়িকারে মোর রেখেছি সকল সুখে,
দিই নাই শুধু স্বামীর সোহাগ, বুক ভেঙে গেছে দুখে।
কোন্ নিঠুরা কিশোরীর লাগি
নায়কে কোথায় করেছি বিরাগী
রাজারে কোথায় ফকির করেছি, পরায়েছি কারে ফাঁসী—
আজ দেখি সবে তোলে অভিযোগ মনের দুয়ারে আসি।

কবে যৌবনে সপ্তদশীর লেগেছিল মোরে ভাল,
মোর নয়নের তারার আলোকে জ্বেলেছিল তার আলো।
সঙ্গিনী সবে দোলে দোলনায়,
সে গিয়াছে সরি কোন্ ছলনায়,
বসি নির্জনে পাঠায়েছে লিপি, ধরেছে হৃদয় খুলে:
আজি রজনীর বাদল বাতাসে সেই স্মৃতি ওঠে দুলে।

কবে ভালবেসে শ্যামলা কিশোরী বসেছে হিয়ার পাশে;
দুয়ার আড়ালে দাঁড়ায়ে কেঁদেছে ক্ষণ বিচ্ছেদ ত্রাসে।
বুকে রেখে মাথা ফেলে আঁখিজল,
মুছাতে নয়ন মুছেছি কাজল,
আজ চেয়ে দেখি দুটি করতল অশ্রুতে আছে ভিজে!
মোরে মনে ক'রে এ বাদল রাতে স্বপন গড়ে কি নিজে?

আঁধারেতে হারা শ্রাবণের ধারা ঝর ঝর পড়ে ঝরে,
পূবালী বাতাস বাতায়নে মোর ডাক দিয়ে যায় সরে।
আমি চেয়ে থাকি দূরে আঁখি মেলে,
ভারি লাগে বোঝা এসেছি যা ফেলে,
কার কতটুকু দাবী মিটায়েছি, কতখানি আছে বাকি!
কার রোক-শোধ ঋণ-পরিশোধ, কতখানি তার ফাঁকি!

ত্রিবাঙ্কুর

শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত

প্রাচীন ত্রিবেন্দ্রম সহরটি ছোট কিন্তু পরিষ্কার। সমৃদ্ধ অট্টালিকা বিরল। বিস্তৃত রাজ-প্রাসাদকে কেন্দ্র ক'রে নগর। শ্রীপদ্মনাভ স্বামীর সুদৃশ্য মন্দির প্রাসাদেরই এক অংশে বিদ্যমান। ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যের অধীশ্বর, শ্রীপদ্মনাভ স্বামী। মহারাজা মাত্র তাঁর
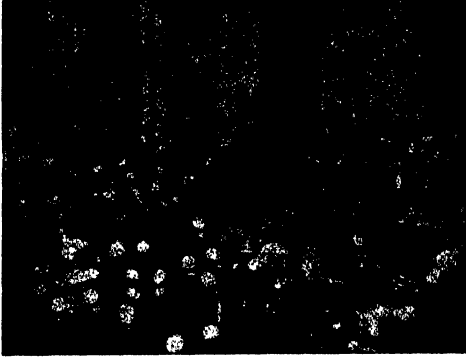
ত্রিবাঙ্কুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্ত্তন

প্রতিনিধি। তরুণ মহারাজা প্রত্যহ প্রভাতে স-পরিবারে মন্দিরে আরাধনা করেন। তাঁর উদারতায় আজ ব্রাহ্মণ-শূদ্র সবার মন্দিরপ্রবেশের সমান অধিকার। প্রাসাদের মন্দির পথের পল্লীতে ব্রাহ্মণেতর লোকের বাস কর্ব্বার অধিকার নাই। এ পূর্ব্বদিনের ব্রাহ্মণ-প্রাধান্যের স্মৃতি-পথ। একদিকের পল্লীতে কেবল রাজ-আত্মীয়দের বাস-ভূমি। এগুলি বাগানবাড়ীর মত। উপবনের মাঝে নাতি-উচ্চ গৃহ। পুরাতন সহরের বাহিরে নূতন বিশ্ব-বিদ্যালয়, হাইকোর্ট প্রভৃতি সুদর্শন অট্টালিকা। এ পল্লী সবুজ গাছে ভরা ঢেউ-খেলানো জমি। প্রাচীন গির্জ্জা বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য, এখানে অনেক বিশ্ব-বিশ্রুত ইউরোপীয় পর্য্যটক প্রার্থনা করেছিলেন।

এক মনোরম বিশাল বাগানের মাঝে যাদু-ঘর, চিত্র-শালা এবং পশু-শালা। গড়ানে জমি—নীচে নদী—ভাবি বন্য-স্থান। উচ্চ ভূ-খণ্ডে যাদু-ঘর। বড় সহরের কোনো যাদু-ঘরের সঙ্গে তার তুলনা করা অন্যায়। তবে স্থানীয় ইতিহাস বুঝতে গেলে এ যাদুঘরের কয়েকটি পদার্থ দ্রষ্টব্য। প্রাচীন মালাবারের অস্ত্র-শস্ত্র এবং আদিম জাতির পোষাক পরিচ্ছদ নৃ-তত্ত্ব অনুশীলনের সহায়ক। এমনি একটি যাদুঘর কোয়ালা-লাম্পুরে ছিল। ছিল বলছি—কারণ জাপানী আততায়ীর আক্রমণে রেল ষ্টেশনের সন্নিকটবর্ত্তী এ-সৌধ আজিও বিদ্যমান আছে—এ আশা পোষণ করা অসমীচীন। ত্রিবাঙ্কুরের নবীন মহারাজার প্রতিষ্ঠিত শ্রীরঙ্গ-বিলাসনম শ্রীচিত্র এবং লয়ম না দেখলে প্রাচীন আর্য-দ্রাবিঢ়-মালায়ালম চিত্রকলার উৎকর্ষতা বোঝবার উপায় নাই। ত্রিবাঙ্কুর-নিবাসী চিরদিন সৌন্দর্য্যের উপাসক। সস্তার বিলাসিতায় এরা সুন্দরের উপাসনা করেন। নবীনের অন্তরে প্রাচীন শিল্পের প্রতি প্রীতির সঙ্কেত সর্ব্বত্র।

ত্রিবাঙ্কুর পশু-শালার বাঘগুলা এক নাবাল-জমির মাঝে ছাড়া থাকে। গুহার ভিতরের পথে উপরের কক্ষের সঙ্গে এই নাবাল জমির সংযোগ আছে। তার মাঝে একটি কৃত্রিম অতি-ছোট শৈল। গাছপালা অনেক। আমি সেই পরিবেশের মধ্যে তাদের ফটো নেবার জন্য বহু চেষ্টা করলাম। চেষ্টার ফলে আমার চারিদিকে লোক জড় হল। লজ্জাশীলা বাঘিনী আশ্রয় নিলে একটা গুহার মাঝে। তার কুনো স্বামী একটা গাছের ঝোপে আত্ম-গোপন করলে। দর্শকেরা হৈ চৈ ক'রে তাদের বার কর্ব্বার চেষ্টা করলে। তার ফলে শার্দ্দূলদম্পতি বিশেষভাবে গা ঢাকা দিলে।

আমাদের সমবেত প্রচেষ্টাকে সফল করবার জন্য একজন রক্ষী এলো। সে ক্যামেরা দেখে বুঝলে ব্যাপারটা। একটি স্কুলের ছেলে মলয়ালম ভাষায় আমাদের অভিসন্ধি তার মনের মাঝে আরও সুস্পষ্ট করে দিলে। সে হাসলে। লুঙ্গির তলার দিকটা তুলে কোমরে গুঁজে হাফ্-লুঙ্গি করলে। তারপর বাঘের নাম ধরে ডাকতে লাগ্‌লো—বয়, বয়। কিন্তু অশিষ্ট বাঘ তার আজ্ঞাকে অবজ্ঞা ক'রে মাত্র একবার হাই তুললে।

তখন দু'দিকে মাথা নেড়ে, স্বস্তি-মুদ্রায় দু'হাত তুলে, আমাদের আশ্বাস দিয়ে লোকটি ছুটলো। ছাত্র বল্লে—ও এখনি আসবে। প্রতীক্ষার অবসরে ভিড় বেশ গাঢ় হ'ল।

রক্ষী বড় বড় চার টুকরা মাংস নিয়ে এসে বাঘদের ডাকলে। এদের উদাসীনতা লুপ্ত হ'ল। লোলজিহ্বা রস-ক্ষরণ করতে

হাতীর দাঁতের চতুর্দ্দোলায় মহারাজার মন্দির গমন

লাগলো। মৌন বেড়ালের মত সুড় সুড় করে তারা মাংস খেতে এলো। ছবি তুলে রক্ষীকে এক মুঠা অর্দ্ধচক্রম দিয়ে পিঞ্জরান্তরে প্রস্থান করলাম।

চক্রম ও দেশের পয়সা। অর্দ্ধ-চক্রম এক পয়সা অপেক্ষা কিছু বেশী। এক টাকায়, ঠিক কতগুলা চক্রম তা ভুলে গেছি। বোধহয় আটাশ চক্রমে ইংরাজি এক টাকা। এক্‌সচেঞ্জটা কায়দা কর্ত্তে পারিনি। রাজ্যের মধ্যে একস্থল হ'তে অন্যত্র পত্র পাঠাতে হ'লে রাষ্ট্রের টিকিট লাগাতে হয়। পোষ্ট অফিসকে বলে—অঞ্চল।

ত্রিবাঙ্কুরের মৎস্য-শালাও নূতন। মাদ্রাজের মাছের ঘরের মত অত শ্রেণীর মাছ এখানে নাই। তবু স্থানটি চিত্তাকর্ষক। বড় বড় কাঁচের হৌজে সমুদ্রের মাছ খেলে বেড়াচ্ছে—একদিকে নোনা জল প্রবেশ কর্চ্চে, অপরদিকে নিষ্ক্রান্ত হ'চ্চে। তার উপর কাঁচের নল দিয়ে অনবরত হৌজের মধ্যে অম্লজান সরবরাহ হচ্চে। মাছ-ঘর সমুদ্র-কূলের অনতিদূরে।

ত্রিবেন্দ্রম হতে কন্যাকুমারী ৬০ মাইল। মাঝে অনেক গ্রাম এবং নগর। প্রায় দু সারি বাড়ি। কলিকাতা হতে চুঁচুড়া অবধি যেমন জনপদ তেমনি। অবশ্য পথে চটকল নাই বা কুলির ভিড় নাই। অদূরে পশ্চিম-ঘাটের পাহাড় দেখা যায়। সবুজের লীলা-ভূমি। ত্রিবেন্দ্রম হতে নাগরকয়েল অবধি বাস ভাড়া বারো আনা। নাগরকয়েল বড় সহর। তিনবল্লী হতে একটা মোটর পথ এখানে এসে এই পথের সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছে। তার পর জলা-পাহাড়ের পাদভূমি ধানের ক্ষেত প্রভৃতির ভিতর দিয়ে দশ বারো মাইল গেলে কন্যাকুমারী। নাগরকয়েলে বাস বদলাতে হয়।

কন্যাকুমারীতে মন্দিরের সন্নিকটে যাত্রীনিবাস আছে। সেই অবধি বাস যায়। সেখানে বাজার আছে। তীর্থ-স্থানের রীতি অনুসারে সমগ্র ভারতের লোক এখানে আসে। স্থানটি খুব জম-জমাট।

বাসের আড্ডার অব্যবহিত দূরে রেষ্ট হাউস আছে। বিস্তৃত প্রাঙ্গণের মাঝে বেশ ভালো বাড়ি, সম্মুখে তরঙ্গায়িত ভারত মহাসাগর। এখানে দুই দিন থাকতে পারা যায়। প্রতিদিনের ভাড়া প্রতি লোকের এক টাকা। পাশে কেপ হোটেল আছে। সেখানকার খানসামাদের সঙ্গে বন্দোবস্ত করলে সকল রকম খাদ্য পাওয়া যায়।

আমরা কেপ হোটেলে ছিলাম। এটি নামে হোটেল, প্রকৃতপক্ষে মহারাজের অতিথি নিবাস। যাঁরা রাজ-অতিথিরূপে যান তাঁরা সম্ভ্রমের সাথে এখানে বিনা ব্যয়ে থাকতে পান। আমাদের অবস্থিতির সময় কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ এটর্ণী শ্রীযুক্ত সৌরেন্দ্রমোহন বসু মহাশয় সপরিবারে সেখানে এক রাত্রি রাজ-অতিথিরূপে ছিলেন। বলা বাহুল্য বিদেশে অপ্রত্যাশিত বন্ধুসমাগম মধুর।

আমরা উপরের এক সু-সজ্জিত কক্ষে ছিলাম। তার সঙ্গে পোষাক-ঘর ও স্নানাগার সংযুক্ত। ভাড়া প্রতিদিন পাঁচ টাকা। খাওয়ার বন্দোবস্ত স্বতন্ত্র। খানসামা অতি আদরে স্বল্প মূল্যে খাবার সরবরাহকর্ত্তা। টাটকা মাছ, তাজা ফল, ভালো দুধ ইত্যাদি।

কিন্তু ষ্টেট তিনদিনের অধিক কোনো পথিকের পক্ষে হোটেলে থাকা পছন্দ করে না। তাই তিনদিনের পর ভাড়ার হার দ্বিগুণ। স্থানটি আমাদের এত ভাল লেগেছিল যে আমরা ঐ কঠোর নিয়মে দ্বিগুণ ভাড়া দিয়েও কিছুদিন রহিলাম। বলা বাহুল্য, এ বিধি সম্বন্ধে খাঁটি বাঙলায় যে মন্তব্য প্রকাশ কর্ল্লাম,

ত্রিবান্দ্রাম—একটি পথের দৃশ্য

মলয়ালীতে অনুদিত হয়ে সেগুলা কর্তৃপক্ষের কানে উঠ্‌লে, জেল থেকে বার হ'য়ে বাড়ি ফিরতে অন্ততঃ তিন মাস দেরী হত।

কমোরিণে সমুদ্রে নেমে স্নান করা অসম্ভব। মন্দিরের সন্নিকটে পাথরের চাঙড়ার আড়ালে এক স্নানের ঘাট আছে। সেখানে মাত্র হাঁটু ডোবে। যখন ঢেউ আসে, তখন উচ্ছ্বসিত জল মাথার উপর দিয়ে চূর্ণ হয়ে বেরিয়ে যায়। কেপ হোটেলের সম্মুখে তাই এক স্নানাগার গাঁথা আছে। এটি লম্বে প্রায় পঞ্চাশ ফুট, প্রস্থে পঁচিশ ফুট। এর একদিক দিয়ে সমুদ্রের জল আসে, অন্যদিকে বাহির হয়। চার ফুট থেকে সাত ফুট অবধি জল—কারণ তলাটা ক্রমশঃ নেমে গেছে। সেখানে প্রত্যেকে এক আনা ক'রে দিয়ে দু'বার করে সাঁতার কাটতাম। কাপড় ছাড়বার ঘর আছে। তীরের দিকে উচ্চ প্রাচীর। বাহিরের লোক-দৃষ্টির অন্তরালে সুখে সমুদ্র স্নান হয়। পুরী ওয়ালটেয়ার প্রভৃতির স্নানের সুখ পাওয়া যেহেতু এদেশে সম্ভবপর নয়, মধুর অভাবে গুড়ের ব্যবস্থা।

কন্যা কুমারীর সমুদ্রবেলার বালি নানা বর্ণের। মাটির সঙ্গে ঠিক চালের মত পাথরের টুকরা পাওয়া যায়। এগুলা আকারে এবং প্রকারে হুবহু চাল। এই পাথরের চাল কুড়ানো যাত্রীদের এক সখের কাজ।

কন্যাকুমারীতে বিবেকানন্দ লাইব্রেরী বাঙ্গালীর চিত্তকে আনন্দিত করে। স্বামীজির প্রথম সাধনার যুগে তিনি ভারতের প্রান্তে সমুদ্রের মাঝে এক পাথরের উপর বসে দেশ-মাতৃকার ধ্যান করেছিলেন। সেই পুণ্য-স্মৃতিকে জাগিয়ে রাখবার জন্য এক

মাদ্রাজী সাধু এখানে একটি স্মৃতিপাঠাগার করেছেন। শুনলাম এবার ষ্টেট্ এক বৃহৎ "বিবেকানন্দ হল" নির্ম্মাণ করতে সঙ্কল্প করেছেন। কিন্তু যুদ্ধের হিড়িকে সে শুভ সঙ্কল্প নিশ্চয়ই বিলুপ্ত হয়েছে।

কেপ কমোরিনের সন্নিকটে উত্তরে ভট্টকোট্টার প্রাচীন দুর্গ। ১৭৭৭ খৃষ্টাব্দে ত্রিবাঙ্কুরের ওলন্দাজ নৌ-সেনাপতি ইউসটেস্ ডি ল্যান্নয় এ দুর্গ নির্ম্মাণ করেছিলেন। সে সময় বোম্বেটেদের অত্যাচারে ভারতবর্ষের সমুদ্র-কূল বিব্রত হয়েছিল। তারা বেশীর ভাগ ছিল পর্ত্তুগীজ এবং ওলন্দাজ। তাই বোধ হয় বিষস্য বিষমৌষধম হিসাবে তখনকার মহারাজা ডি ল্যান্নয়কে সেনাপতি পদে নিযুক্ত করেছিলেন। তাঁরই পূর্ব্ব-পুরুষ—মহারাজ মার্ত্তণ্ড বর্ম্মণ (১৭২৯-১৭৫৮ খৃষ্টাব্দ) নিজ রাজ্য পদ্মনাভ স্বামীকে নিবেদন ক'রে—শ্রীনারায়ণের প্রতিনিধিরূপে রাজ্য-শাসন কর্ব্বার ব্যবস্থা করেছিলেন।

উদয়গিরির সন্নিকটে পদ্মনাভপুরম। চৌদ্দ শতকে সেখানে রাজধানী ছিল। তার পূর্ব্বেও নাকি ঐ জনপদে প্রাচীন রাজপ্রাসাদ ছিল। সে প্রাচীন প্রাসাদ এখনও বিদ্যমান। ডি ল্যান্নয়ের কর্ত্তৃত্বাধীনে উহা নির্ম্মিত হয়েছিল। তার প্রাচীর প্রভৃতি অতি দৃঢ়। আর দেওয়ালের গায়ে আঁকা ছবি প্রমাণ করে ত্রিবাঙ্কুরবাসীর সৌন্দর্য্যের সাধনা।

পেরিয়ার হ্রদের মত মনোরম স্থল জগতে বিরল। ষ্টেটের লাঞ্চ আছে। আমাদের ভাগ্যে তা' জোটেনি। এদের নৌকাকে

কুমারিকা অন্তরীপে মন্দিরের প্রবেশ পথ

বলে—বল্লম। সেগুলো দেখতে তালতলার চটীর মত। অরণ্যানীর শোভা অপরিমেয়।

পাহাড়, হ্রদ এবং সকল শ্রেণীর গাছ ত্রিবাঙ্কুরকে প্রকৃতির লীলাভূমি করেছে।

যেদিন আবার ত্রিবেন্দ্রম ফেরবার জন্য হোটেলের অধ্যক্ষকে মোটর গাড়ির বন্দোবস্ত কর্ত্তে বল্লাম, প্রাণের মধ্যে একটা বেদনা অনুভূত হ'ল। অখণ্ড ভারতের এ স্থান যুগ-যুগান্তর কত দেশ-প্রাণ পথিককে দেশ-জননীর অপূর্ব্ব রূপ দেখিয়েছে। যেমন হিমালয়ের শিরে সাধক তপস্যা ক'রে সত্যের সন্ধান পেয়েছিলেন, তেমনি দক্ষিণ-ভারতের সাধু সন্ন্যাসী আমাদের জ্ঞান-ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করেছিলেন। উদার ভারতমাতা নিজের কোলের মাঝে কত বিদেশীকে স্থান দিয়ে তাকে সস্নেহে অপত্য-নির্ব্বিশেষে পালন করেছিলেন। আর আজ তাদেরই কত অকৃতজ্ঞ সন্ততি ভারতবর্ষকে ভারত মাতা বলতে কুণ্ঠা-বোধ করে। অধুনা এক কৃতবিদ্য দ্রাবিড় ভারতবর্ষকে টুকরা টুকরা কর্ব্বার অবাঞ্ছনীয় পরিকল্পনাকে সফল কর্ব্বার হীন-প্রাণতায় বহু স্বদেশ-ভক্তকে অবনম্রশির করেছেন।

ত্রিবাঙ্কুরে পেরিয়ার হ্রদের ধারে জঙ্গল আছে। এখানে বন্য-পশুদের স্বাভাবিকভাবে বসবাস কর্ত্তে দেওয়া হয়। বনানীর অন্তরালে অট্টালিকা আছে। তার মাঝে বসে পশুদের দৈনিক জীবনের ধারা পর্য্যবেক্ষণ করবার অবসর লাভ করা যায়।

সুচিন্দ্রমের মন্দির সু-গঠিত। নাগরকয়েলের সন্নিকটে এই সুদৃশ্য মন্দির। পাণ্ড্যে বংশের এক রাজকুমারী ত্রিবাঙ্কুরে বধূরূপে এসেছিলেন। তাঁর সম্মানের জন্য এই মন্দির স্থাপিত হয়েছিল।

পূর্ব্বেই বলেছি নথি-পত্র না দেখে, কেবল নিজের সাক্ষাৎ জ্ঞান ও পর্য্যবেক্ষণের ফল এই বর্ণনা। ত্রিবাঙ্কুর মনোমুগ্ধকর বিচক্ষণ সচিবোত্তমের ধীর শাসনে উন্নতিশীল এবং শিক্ষিত নরনারীর দেশ-হিতৈষিতার ফলে ত্রিবাঙ্কুর সমৃদ্ধির পথে আগুয়ান। রাজ-মাতা মহারাণী পার্ব্বতী বাঈ এবং প্রধান মন্ত্রীর সু-পরামর্শে নবীন মহারাজা হিন্দু-মাত্রেরই আরাধনার জন্য জাতি ও বর্ণ নির্ব্বিশেষে সকলের পক্ষে মন্দির দুয়ার খুলিয়া দিয়া অমর-কীর্ত্তি অর্জ্জন করেছেন। তিনি ধন্য। তিনি বরেণ্য। অনুদার ব্রাহ্মণের প্রভাব অতিক্রম করে তিনি উদার হিন্দুশাস্ত্রের সার মর্ম্ম বুঝেছেন।

> সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি।
> ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্ব্বত্র সমদর্শনঃ॥
> যো মাং পশ্যতি সর্ব্বত্র সর্ব্বং চ ময়ি পশ্যতি।
> তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি॥

সর্ব্বত্র সমদর্শীযোগযুক্তাত্মা পুরুষ সর্ব্বভূতে আত্মাকে এবং আত্মাতে সর্ব্বভূত দর্শন করেন। যিনি সকল পদার্থে আমাকে এবং আমার মধ্যে সর্ব্ব প্রপঞ্চ দেখতে পান। আমি তার কাছে অদৃশ্য হই না এবং সে আমার পরোক্ষ হয় না। কবির কথা—

> হে মোর দুর্ভাগা দেশ যাদের করেছ অপমান
> অপমানে হতে হবে তাদেরই সমান—

মেনে নিলে আজ বাঙলা দেশে ও মালাবারে হিন্দু জাতির সংখ্যা এত হ্রাস হ'ত না। এই অপমানে বহু হিন্দু উদার মোস্লেম এবং খৃষ্টান সমাজের আশ্রয় নিয়েছে।

বনফুল

১৫

হাস্যোজ্জ্বল দৃষ্টি রমজানের মুখের উপর স্থাপিত করিয়া মুকুজ্যে মশাই বলিলেন, "তুমি এটা ঠিক জান তো যে সে বাড়িতে বড়-সড় বিবাহযোগ্য আর কোন মেয়ে নেই ?"

"না"

"মেয়েটির নাম সেলিমা ?"

"হাঁ"

"বাড়ির পিছনেই ঠিক পুকুর আছে ?"

"ঠিক পিছনেই"

"সামনে পাশাপাশি ছুটো আমগাছ ?"

"হাঁ"

"বাস আর কিছু দরকার নেই, ঠিক দেখে আসব আমি। তোমার যাবার দরকার নেই আমি নিজেই চিনে বার করতে পারব। তোমার হবু শ্বশুরের নাম আলিজান—ঠিক মনে থাকবে আমার, তুমি যাও"

মুকুজ্যে মশাই আর একবার সহাস্যদৃষ্টি রমজানের মুখের উপর নিবদ্ধ করিলেন।

"পাশেই কাজিগ্রাম, সেখানে তোমার পিসির কাছে চলে যাও তুমি"

"আচ্ছা"

একটু অনিচ্ছা সহকারেই যেন রমজান রাজি হইল।

উভয়ে নীরবে পথ অতিবাহন করিতে লাগিলেন।

কিছুদূর গিয়া একটা গোলমাল শোনা গেল। দেখা গেল একজন লোক ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া আসিতেছে। দেখিতে দেখিতে লোকটা আসিয়া পড়িল।

"পালান শিগ্‌গির, একটা পাগল একটা লাঠি নিয়ে সকলের মাথা ফাটিয়ে বেড়াচ্ছে, দুজন খুন হয়ে গেছে ওদিকে যাবেন না, পালান"

সে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া চলিয়া গেল, কোন প্রশ্ন করিবার অবসর দিল না। মুকুজ্যে মশাই মুচকি হাসিয়া রমজানের দিকে চাহিলেন।

রমজান বলিল, "চলুন এই গলিটার ভেতর ঢুকে পড়ি"

"আগে থাকতেই ? এই লোকটাই পাগল কি না তার ঠিক কি। একটু এগিয়ে দেখাই যাক না"

মুকুজ্যে মশাই গলিতে ঢুকিলেন না, থামিলেনও না, যেমন চলিতেছিলেন চলিতে লাগিলেন। বাধ্য হইয়া রমজানকে অনুসরণ করিতে হইল। একটু পরে সত্যই কিন্তু পাগলকে দেখা গেল। একটা মোটা লাঠি ঘুরাইতে ঘুরাইতে সগর্জ্জনে ছুটিয়া আসিতেছে। দৈত্যের মতো চেহারা, ভীষণ-দর্শন। রমজান তাড়াতাড়ি পাশের একটা দাওয়ার উপর উঠিয়া পড়িল; আশপাশের কপাট জানালা সব নিমেষের মধ্যে বন্ধ হইয়া গেল। মুকুজ্যে মশাই রাস্তার মাঝখানেই দাঁড়াইয়া পড়িলেন, কোথাও পলাইবার চেষ্টা করিলেন না। পাগলটাও এক অদ্ভুত কাণ্ড করিল। সে-ও মুকুজ্যে মশায়ের সামনে আসিয়া থমকাইয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। রক্ত-চক্ষু মেলিয়া ক্ষণকাল তাঁহার মুখের পানে নির্নিমেষে চাহিয়া থাকিয়া হঠাৎ হেঁট হইয়া প্রণাম করিল এবং যেমন আসিয়াছিল তেমনি আবার লাঠি ঘুরাইতে ঘুরাইতে চলিয়া গেল।

রমজান দাওয়া হইতে নামিয়া আসিল। মুকুজ্যে মশাই হাসিয়া বলিলেন, "তোমার বউ বিপত্তারিণী হবে বোঝা যাচ্ছে। এতবড় একটা ফাঁড়া কেটে গেল! লাঠিটা মাথায় বসিয়ে দিলেই হয়েছিল আর কি ?"

রমজান অবাক হইয়া গিয়াছিল।

"ওরকম করলে কেন বলুন তো"

"তবে আর পাগল বলেছে কেন"

"আপনি দাওয়ায় উঠলেন না, কেন,"

"ফুরসত পেলাম কই, এসে পড়ল যে! তাছাড়া পালালেই যে সব সময় নিস্তার পাওয়া যায় তা ভেবো না। সিঙ্গাপুরে একবার একটা মাতাল গোরা পিস্তল দিয়ে রাস্তায়—"

গল্প করিতে করিতে উভয়ে পথ চলিতে লাগিলেন।

আসমিকে খুঁজিয়া বাহির করিবার পর মুকুজ্যে মশাই কিছুদিন মনোরমার খোঁজ করিয়াছিলেন, কিন্তু কোথাও তাহার সন্ধান পান নাই। এখন তিনি রমজানের হবু-বধূকে দেখিতে চলিয়াছেন। রমজানকে তিনি বড় স্নেহ করেন। নিজের চেষ্টায় লেখাপড়া শিখিয়া রমজান এখন একটি ভাল চাকরি পাইয়াছে। রমজানের বাপের সহিতই মুকুজ্যে মশায়ের বহুকাল হইতে হৃদ্যতা, রমজানের পড়ার খরচও মুকুজ্যে মশাই কিছুকাল চালাইয়াছেন। একথা অবশ্য রমজান অথবা রমজানের বাবা জানে না, তাহারা জানে যে মুকুজ্যে মশায়ের কোন ধনী বন্ধু মুকুজ্যে মশায়ের অনুরোধে এই সাহায্যটুকু করিয়াছিলেন। ঘুরিতে ঘুরিতে মুকুজ্যে মশাই ছুই দিন আগে রমজানের বাড়ি গিয়াছিলেন। গিয়া শুনিলেন—আলিজানের কন্যা সেলিমার সহিত রমজানের বিবাহের কথাবার্ত্তা চলিতেছে। গোঁড়া মুসলমান সমাজে নাকি মেয়ে-দেখানোর প্রথা নাই। ইংরেজি লেখাপড়া শিখিয়া রমজানের গোঁড়ামি ঘুচিয়াছে, প্রথা কিন্তু বদলায় নাই। রমজানের মুখ দেখিয়াই মুকুজ্যে মশাই বুঝিলেন রমজান মনে মনে ক্ষুব্ধ। রমজানের বাবাকে লুকাইয়া তাই উভয়ে বাহির হইয়া পড়িয়াছেন। মুকুজ্যে মশাই ঠিক করিয়াছেন—আলিজানের বাড়ির পশ্চাতে যে পুষ্করিণী আছে তাহারই ঝোপে ঝাড়ে আত্মগোপন করিয়া সেলিমাকে স্বচক্ষে দেখিয়া আসিবেন। সমস্ত দিনের মধ্যে সে নিশ্চয়ই ছুই একবার ঘাটে আসিবে। রমজানেরও মুকুজ্যে মশায়ের সহিত যাইবার ইচ্ছা—কিন্তু পাছে জানাজানি হইয়া যায় এই ভয়ে মুকুজ্যে মশাই তাহাকে সঙ্গে লইয়া যাইতে

ইচ্ছুক নহেন। রমজান সুতরাং মুকুজ্যে মশাইকে শ্বশুর বাড়ির গ্রামের রাস্তাটা দেখাইয়া দিয়া কাজিগ্রামে পিসির বাড়িতে চলিয়া যাইবে। আলিজানের বাড়ি রেল ষ্টেশন হইতে দশক্রোশ। কাঁচা রাস্তা, হাঁটিয়া যাইতে হইবে, বৈশাখের দারুণ দ্বিপ্রহর। মুকুজ্যে মশাই কিন্তু দমিবার লোক নহেন।

বিখ্যাত শক্তিমান লোকের সম্মুখে বসিতে পাইলে অবিখ্যাত অশক্ত ব্যক্তি যেমন কাঁচুমাচু হইয়া পড়ে, অপূর্ব্বকৃষ্ণও সেই নীতি অনুযায়ী অতিশয় সসঙ্কোচে শঙ্করের নির্দ্দিষ্ট আসনটিতে উপবেশন করিলেন।

"একটি অনুগ্রহ আমাকে করতে হবে"

"বলুন"

"আমার বিয়ে, আপনাকে নিমন্ত্রণ করতে এসেছি। আপনি যদি দয়া করে', মানে যদিও এটা আমার দুঃসাহস, তবু অনেক দিনের পরিচয়ের জোরে—"

"এর সঙ্গে প্রিয়বাবুর উকিল জগদীশ সেনের সম্পর্ক কি"

"এর সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই, মানে তাঁর সঙ্গে মোড়ে দেখা হওয়াতেই দেরি হয়ে গেল; অবশ্য আর একদিক দিয়ে দেখলে বিয়ের চেয়ে সেটাও কম ইম্‌পরট্যাণ্ট নয়, কিন্তু—"

"কেন হয়েছে কি"

অপূর্ব্বকৃষ্ণের চোখে বিস্ময় ফুটিয়া উঠিল।

"শোনেন নি? প্রিয়নাথ মল্লিক এক কাণ্ড করে' বসেছেন যে। কাগজে বেরিয়েছে তো খবরটা"

"আমি পড়িনি। প্রিয়নাথ মল্লিক কে?"

"বেলা মল্লিকের দাদাকে এর মধ্যেই ভুলে গেলেন! মানে আমি এক্‌স্‌পেক্‌ট্‌ করেছিলুম, যদিও অবশ্য আপনার—"

"কি হয়েছে তাঁর"

অপূর্ব্বকৃষ্ণ ক্ষণকাল থামিয়া ইতস্তত করিতে লাগিলেন। বোধহয় চিন্তা করিতে লাগিলেন যে খবরটা শঙ্করকে বলা সমীচীন হইবে কি না; কিন্তু ব্যাপারটা খবরের কাগজে প্রকাশিত হইয়াছে মনে পড়িয়া যাওয়াতে তাঁহার দ্বিধা বিদূরিত হইল।

"কি হয়েছে প্রিয়বাবুর"

"তিনি এক অদ্ভুত রগচটা মেজাজের লোক, মানে তা না হলে আপিসের মধ্যে অমন করে' প্রফুল্লবাবুকে, তাছাড়া ভদ্রলোকের দোষও এমন কিছু"

"কি করেছেন প্রফুল্লবাবুকে"

"রুল পেটা করেছেন"

"কেন হঠাৎ"

"হ্যাঁ, হঠাৎই। প্রফুল্লবাবুর দোষ ছিল না তত, তিনি এমনই ঠাট্টার ছলে, ঠিক ঠাট্টার ছলেও নয়—ভাল ভেবেই কথাটা বলেছিলেন অথচ প্রিয়বাবু, মানে বোধহয়—"

শঙ্কর অধীর হইয়া উঠিতেছিল। আশ্চর্য্য স্বভাব ভদ্রলোকের! কিছুতেই কোন কথা সোজা করিয়া বলিতে পারেন না।

"কি কথা বলেছিলেন"

"আমরা সকলেই জানতাম অর্থাৎ আমার অন্তত তাই ধারণা ছিল যে বেলা দেবীর ওই সব কাণ্ড কারখানার ফলে প্রিয়বাবু আজকালকার লেখা-পড়া-জানা মেয়েদেরই ওপর চটা। তাই প্রফুল্লবাবু তাঁকে খুশী করবেন ভেবে—অবশ্য তিনি যে খুশী হবেনই একথা প্রফুল্লবাবুর ইম্যাজিন করাটা একটু মানে ফারফেচেড্‌ বলতে পারেন কিন্তু—"

"কি বলেছিলেন তিনি"

"তেমন কিছু নয়, এই একটু মানে ভাষাটা অবশ্য একটু, ইয়ে গোছের, মানে অশ্লীলই বলতে হবে, কিন্তু প্রিয়বাবু ইচ্ছে করলে স্বচ্ছন্দে ওভারলুক করতে পারতেন"

"এর জন্যে রুলপেটা করলেন তিনি প্রফুল্লবাবুকে"

"সে এক ভীষণ রক্তারক্তি কাণ্ড, ভদ্রলোক মাথা ফেটে অজ্ঞান, পুলিশ কেস"

"কি বললেন তাঁর উকীল"

"খুব বেশী আশা দিলেন না—দেওয়া শক্ত, মানে"

শঙ্কর চুপ করিয়া রহিল। প্রিয়নাথ মল্লিকের মুখখানা তাহার মনে পড়িতে লাগিল।

"আমার বিয়েতে যাবেন তো? আপনি এরকম নিমন্ত্রণ রোজই পান নিশ্চয়, তবু যদি দয়া করে—"

"হ্যাঁ নিশ্চয়ই যাব"

"সেইজন্যেই চিঠি না পাঠিয়ে পারসোনালি এলাম, জানি আপনি বিজি লোক অর্থাৎ ইচ্ছে থাকলেও হয় তো"

"যাব"

"জায়গাটা চিৎপুরের গলি, এই চিঠিতেই ঠিকানা দেওয়া আছে—"

সুদৃশ্য কার্ডে ছাপানো নিমন্ত্রণ লিপিটি অপূর্ব্বকৃষ্ণ বাহির করিলেন। তাহার পর পকেট হইতে সুগন্ধি রুমাল বাহির করিয়া নাক মুখ কান মুছিয়া অপূর্ব্বকৃষ্ণ বলিলেন, "লোকে বসতে পেলেই মানে, প্রোভার্বটা জানা আছে নিশ্চয়ই আপনার—" এবং হাসিলেন।

লোকনাথবাবুর নিরন্ধ্র সমালোচনার পর অপূর্ব্বকৃষ্ণ মল্লিকের তোষামোদ শঙ্করের বড় ভাল লাগিতেছিল। সে প্রসন্ন দৃষ্টি তুলিয়া বলিল, "আবার কি"

১৬

চুনচুন বেথুন কলেজে ভরতি হইয়াছে, হাসিও বেথুন স্কুলে ভরতি হইয়া গেল। চুনচুনের খরচ পীতাম্বরবাবু দিবেন, হাসি নিজের খরচ নিজেই চালাইবে। দুইটা ব্যাপারই শঙ্করকে বিস্মিত করিয়াছে। মনে মনে সে একটু আহতও হইয়াছে। যদিও তাহার নিজের আয় যৎসামান্য—চুনচুন কিম্বা হাসির পড়ার ব্যয়ভার অংশও বহন করাও তাহার পক্ষে দুঃসাধ্য—তথাপি তাহা যদি বাধ্য হইয়া তাহাকে করিতে হইত তাহা হইলে সে যেন মনে মনে তৃপ্তিলাভ করিত। দুইটি জটিল ব্যাপারেরই এমন সহজ সমাধানে সে একটুও খুশী হয় নাই। কিন্তু এ অস্বস্তি যে কিসের জন্য তাহাও সে ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছিল না। চুনচুন কিম্বা হাসির কৃতজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়া অবশেষে তাহাদের প্রেমাস্পদ হওয়ার বাসনা তাহার আর নাই, তাহার মনের সে বহ্নি নিবিয়া গিয়াছে, বস্তুত নারী বলিয়াই যে তাহাদের সম্বন্ধে তাহার চিত্ত সমুৎসুক এ কথা সত্য নহে, উহারা নারী না হইয়া পুরুষ হইলেও সে হয়তো এই অস্বস্তিভোগ করিত। অবহিতচিত্তে

আত্মবিশ্লেষণ করিলে সে বুঝিতে পারিত যে বাহাদুরি দেখাইবার দুই দুইটা সুযোগ এমনভাবে হাতছাড়া হইয়া যাওয়াতেই সে অস্বস্তিভোগ করিতেছে। কিন্তু এই মনস্তত্ত্ব লইয়া বেশীক্ষণ সময়ক্ষেপ করিবার মতো সময় সে পাইল না, লোকনাথবাবু আসিয়া পড়িলেন।

কবি লোকনাথ ঘোষালের সহিত তাহার পরিচয় ঘনিষ্ঠতর হইয়াছে। কি একটা ছুটিতে তিনি কয়েক দিনের জন্য কলিকাতা আসিয়াছেন। গৃহিণীর নিকট কলিকাতা আসিবার কয়েকটি গুরুতর কারণ অবশ্য তিনি দেখাইয়া আসিয়াছেন কিন্তু কলিকাতায় আসিবার তাঁহার একমাত্র কারণ শঙ্কর। কন্যার জন্য পাত্র অথবা নিজের গণ্ডমালার জন্য চিকিৎসক অন্বেষণ করা তাঁহার ওজুহাত মাত্র। সাহিত্যিক ছাড়া জগতে আপনার বলিতে তাঁহার কেহ নাই, থাকিলেও তাহাদের তিনি গ্রাহ্য করেন না। কন্যার পাত্র অথবা গণ্ডমালার চিকিৎসক জুটিবার হইলে ঠিক সময়ে আসিয়া জুটিয়া যাইবে ইহাই তাঁহার বিশ্বাস, এসবের জন্য ব্যস্ত হইয়া লাভ নাই। পৃথিবীতে মনুষ্যপদবাচ্য সভ্য ব্যক্তির যাহা লইয়া সত্যই ব্যস্ত হওয়া উচিত তাহার নাম সাহিত্য। সাহিত্যিক মাত্রেই তাঁহার প্রিয়, অসাহিত্যিক মাত্রেই তাঁহার শত্রু। লোকনাথ সুদর্শন ব্যক্তি নহেন। কালো রং, খর্ব্বাকৃতি, কদমছাঁট চুল, আরক্ত চক্ষু, চোখের কোণে পিচুটি। চোখে মুখে একটা দর্প প্রচ্ছন্ন থাকিয়াও পরিস্ফুট।

কিছুদিন পূর্ব্বে শঙ্কর কয়েকটি সনেট লিখিয়াছিল। বিভিন্ন মাসিকপত্রে সেগুলি প্রকাশিতও হইয়াছিল। লোকনাথবাবু তাহার প্রত্যেকটি পড়িয়াছিলেন। যে সব লেখকদের সম্বন্ধে তিনি কিঞ্চিন্মাত্রও আশা পোষণ করেন তাহাদের কোন লেখা তাঁহার দৃষ্টি এড়ায় না। সনেট লইয়াই আলোচনা চলিতেছিল।

লোকনাথবাবু সাধারণত মৃদু হাসিয়া আস্তে আস্তে কথা বলেন। তিনি বলিতেছিলেন, "আপনার সনেটগুলি গীতি কবিতা হিসেবে উৎকৃষ্ট হয়েছে, কিন্তু সনেট হয়নি"

শঙ্কর সবিস্ময়ে বলিল, "সনেট কি এক জাতীয় গীতি-কবিতা নয় ?"

"কিন্তু গীতি-কবিতা মাত্রেই সনেট নয় ?

লোকনাথবাবু মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিলেন, তাঁহার চোখে একটা দীপ্তি প্রখর হইয়া উঠিতে লাগিল। শঙ্কর বুঝিতে পারিল তাঁহার মনে বেগ আসিয়াছে, সে চুপ করিয়া রহিল।

"না গীতি-কবিতা মাত্রেই সনেট নয়, দুধ মানে যেমন ক্ষীর নয়। বুঝুন ব্যাপারটা ভাল করে', লিরিকের সমস্ত উপকরণই ওতে থাকবে, অথচ স্বাতন্ত্র্যও যথেষ্ট থাকা চাই"

শঙ্কর বলিল, "তার মানে সনেটে কোন রকম বাহুল্য থাকবে না, এই তো বলতে চান ?"

"যে কোন রস-রচনাতেই বাহুল্য বর্জ্জনীয়, কেবল সনেটেরই বিশেষত্ব নয় তা। সনেটের ব্যাপারটা কি জানেন ?"

লোকনাথবাবু খানিকক্ষণ চক্ষু বুজিয়া রহিলেন। তাহার পর বলিলেন, "রসেটি বলেছেন

> A sonnet is a moment's monument
> Memorial from the soul's Eternity
> To one dead deathless hour—

এই হল সনেটের পরিচয়। অন্যান্য লিরিক কবিতার মতো সনেটে আবেগ থাকা চাই, গভীরতা থাকা চাই, গভীর রসবোধের পরিচয় থাকা চাই—কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে থাকা চাই একটা বিশিষ্ট বাঁধন, কেন্দ্রীভূত ঘনীভূত একটা জিনিস, যাতে বাঁধন সত্ত্বেও অথবা বাঁধনের জন্যেই একটা চমৎকার রসরূপ ফুটে উঠেছে। সেই জন্যেই যে কোন লিরিক ভাবকেই সনেটের রূপ দেওয়া যায় না"

"ও"

লোকনাথবাবু বলিলেন, "সুতরাং বুঝতে পারছেন আপনার ওগুলো সনেট হয় নি"

"বুঝতে পারছি"

শঙ্কর কিন্তু বুঝিতে পারে নাই। পরিচয় ঘনিষ্ঠতর হওয়াতে লোকনাথবাবুকে কিন্তু সে বুঝিয়াছিল তাই কোনরূপ প্রতিবাদ করিল না, করিলেই তাঁহার সহিত হৃদ্যতা আর থাকিবে না।

লোকনাথবাবু বলিয়া চলিলেন, "অন্তরের অন্তস্তল থেকে উৎসারিত গভীর ভাবধারা একটা বিশিষ্ট শৃঙ্খলে শৃঙ্খলিত হয়েও অর্থাৎ ছন্দমিলের বিশিষ্ট বন্ধনে বন্দী হয়েও যখন রসোত্তীর্ণ হবে তখনই তাকে সনেট বলব। আগেই বলেছি তাই যদি হয় তাহলেই বুঝতে পারছেন—যে কোন ভাব সনেটের উপযোগী নয়। অর্থাৎ মিলবন্ধনের কৃত্রিমতা এবং ভাবোচ্ছ্বাসের অকৃত্রিমতা যেখানে স্বাভাবিক প্রবণতাবশত রসকেন্দ্রে ঘনীভূত হচ্ছে—"

একই ভাবকে নানা ভাষায় নানা কথায় বারম্বার রূপান্তরিত করিয়া বক্তৃতা করা লোকনাথবাবুর স্বভাব। আজ কিন্তু বক্তৃতায় বাধা পড়িল, অপূর্ব্বকৃষ্ণ পালিত আসিয়া প্রবেশ করিলেন। তাঁহার পোষাক পরিচ্ছদ বা প্রসাধনে কোন পরিবর্ত্তন ঘটে নাই, কিন্তু লক্ষ্য করিলে শঙ্কর দেখিতে পাইত তাঁহার চোখের দৃষ্টিতে পূর্ব্বে ভীত লুব্ধ যে অনিশ্চয়তা ক্ষণে ক্ষণে আত্মপ্রকাশ করিয়া লোকটিকে সকলের নিকট খেলো করিয়া তুলিত তাহা এখন আর নাই। তাঁহার হাবভাবে বেশ একটা সপ্রতিভতা ফুটিয়া উঠিয়াছে। বেশ ভঙ্গীভরে নমস্কার করিয়া অপূর্ব্বকৃষ্ণ বলিলেন, "আপনাকে ঠিক এ সময়ে বাড়িতে পাব ভাবিনি, যদিও এ সময়ে ঠিক অফিস যাওয়ার নয় তবু মানে—"

লোকনাথ উঠিয়া পড়িলেন। বক্তৃতায় বাধা পড়িলে তিনি আর বসেন না। বলিয়া গেলেন সন্ধ্যাবেলা আবার তিনি আসিবেন এবং যদি পান কয়েকটি বিখ্যাত সনেটও জোগাড় করিয়া আনিবেন।

"আমি আরও আগেই আসতাম, কিন্তু মোড়ে প্রিয়বাবুর উকীল জগদীশ সেনের সঙ্গে দেখা হওয়াতেই—অথচ—"

"ব্যাপারটা কি খুলেই বলুন না। বসুন—"

কাচুমাচু মুখ করিয়া অপূর্ব্বকৃষ্ণ বলিলেন, "শুধু আমার নয় মীনুরও অনুরোধ—দয়া করে' একটি কবিতা যদি লিখে দেন! বেশী বড় নয় একটি সনেট শুধু, সেদিন কি একটা কাগজে আপনার সনেট একখানা পড়লাম, ওয়াণ্ডারফুল, সিম্প্লি ওয়াণ্ডারফুল—"

শঙ্করের চক্ষু দুইটি প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল।

"দেবেন লিখে ?"

"আচ্ছা চেষ্টা করা যাবে"

অপূর্ব্বকৃষ্ণ চলিয়া গেলেন। শঙ্কর খানিকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল, তাহার পর সহসা তাহার মনে হইল একি শোচনীয়

অধঃপতন হইয়াছে তাহার! অপূর্ব্বকৃষ্ণ মল্লিকের প্রশংসায় জন্ত সে লালায়িত!

পিওন চিঠি দিয়া গেল। আর একটি বিবাহের নিমন্ত্রণ। পড়িয়া শঙ্কর বিস্ময় বোধ করিল—চুনচুনের সহিত পীতাম্বরবাবুর বিবাহ! বিস্মিত হইল কিন্তু ইহা লইয়া তাহার অন্তরে তেমন কোন আলোড়ন জাগিল না। তাহার সমস্ত অন্তর জুড়িয়া লোকনাথবাবুর কথাগুলিই কেবল ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হইতেছিল —আপনার ওগুলো সনেট হয়নি"

১৭

শঙ্কর সবিস্ময়ে চণ্ডীচরণ দস্তিদারের বিদ্যাবত্তার কথা চিন্তা করিতে করিতে আপিস হইতে বাড়ি ফিরিতেছিল। লোকটাকে এতদিন সে অবজ্ঞার চক্ষে দেখিয়া আসিয়াছে, কিন্তু এমাসে সংস্কারকের জন্য যে প্রবন্ধটি তিনি দিয়াছেন, যাহার প্রুফ সে এইমাত্র সংশোধন করিয়া ফিরিতেছে, তাহা পড়িবার পর লোকটির প্রতি শ্রদ্ধাবিষ্ট না হইয়া পারা যায় না। "প্রাচীন মিশর সম্বন্ধে দু'টি কথা" প্রবন্ধের নাম, কিন্তু দুটি নয় অনেক জ্ঞাতব্য কথাই তিনি লিখিয়াছেন। আর যাহারই থাক শঙ্করের অন্তত এসব কিছুই জানা ছিল না। আবিসিনিয়ার পর্ব্বত কন্দর হইতে নীল নদের উৎপত্তি-বৃত্তান্ত, নিম্ন মিশরের সহিত ব-অক্ষরের সাদৃশ্য, পেলুশিয়ান কেনোপিকের উদ্ভব, প্রাচীন ইজ্‌রেলাইট্‌দের কাহিনী, জেসোফের ইতিবৃত্ত, ফারাওদের পূর্ব্ববর্ত্তী রাখাল রাজাগণের ইতিহাস, হিলিওপোলিস ফিনিক্স সম্বন্ধে তথ্য, আলেকজাণ্ড্রিয়া নগরীর অতীত মহিমা—শঙ্কর সত্যই অভিভূত হইয়া গিয়াছিল। সে এসব কিছুই জানিত না, অথচ চণ্ডীচরণ দস্তিদার—

"আমাকে চিনতে পারেন দাদা"

একটি রোগা লম্বা গোছের যুবক প্রণাম করিয়া শঙ্করেব পথরোধ করিয়া দাঁড়াইল। শুষ্ক শীর্ণ চেহারা, দেখিলেই মনে হয় তাহার শরীরের সমস্ত রস কে যেন শোষণ করিয়া লইয়াছে, অস্থি এবং চর্ম্ম ছাড়া দেহে আর কিছু অবশিষ্ট নাই। শঙ্কর চিনিতে পারিল না।

"আমি আপনার মামাতো ভাই নিত্যানন্দ"

"ও"

উভয়ে পরস্পরের দিকে চাহিয়া চুপ করিয়া রহিল।

"আপনার পড়ার খরচ বন্ধ করে' পিসেমশাই আমাকেই এম-এ পড়ার খরচ দিয়েছিলেন"

"ও হ্যাঁ মনে পড়েছে। তোমাকে সেই কোন ছেলেবেলায় একবার দেখেছিলাম তাই চিনতে পারছি না। কোথায় আছ, এখন কি করছ"

"কিছুই করছি না"

"কতদিন এম-এ পাশ করেছ"

"পাশ করতে পারিনি। বার তিনেক চেষ্টা করেও পারিনি। করলেও বা কি হত বলুন"

হাসিল। এবড়ো খেবড়ো পানের ছোপ ধরা বিশ্রী দাঁতগুলা বাহির হইয়া পড়িতেই নিত্যানন্দের স্বরূপ যেন উদ্ঘাটিত হইয়া গেল।

"কোথা আছ এখানে"

"দেশ থেকে আজই এসেছি, একজন ফ্রেণ্ডের বাড়ীতে উঠেছি"

"আমার বাসায় এসো, ঠিকানাটা হচ্ছে—"

"ঠিকানা জানি। আপনার ঠিকানা কে না জানে, আপনি আজকাল বিখ্যাত লোক..."

তারপর হাসিয়া বলিল, "কাল যাব। এখন অন্য জায়গায় কাজ আছে একটু। বৌদি এখানেই আছেন ত?"

"আছেন"

নিত্যানন্দ চলিয়া গেল।

শঙ্কর তাহার প্রস্থান-পথের দিকে চাহিয়া কিছুক্ষণ ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া রহিল। তাহার আপন মামাতো ভাই, অথচ কত অপরিচিত!

ক্রমশঃ

ঋগ্বেদ *

শ্রীমতিলাল দাশ

প্রথম মণ্ডল, উনবিংশ সূক্ত।

যজ্ঞ চারু, চারু মধু,
তোমায় ডাকি বারে বারে,
তোমার চেয়ে মহৎ নাহি,
ক্রতু তোমার সবার শ্রেষ্ঠ,
বর্ষণেরি তত্ত্ব জানে
দীপ্ত যাদের দিব্যদ্যুতি
বীর্য্য যারা অপরাজেয়,
জলধারা বর্ষে যারা

অগ্নি এস মরুৎ সহ,
এস মোদের অর্ঘ্য লহ।
দেবতা কি মানুষ কহ,
অগ্নি এস মরুৎ সহ।
দ্রোহবিহীন সর্ব্বজনে
অগ্নি এস মরুৎ সনে।
উগ্র যারা উদকবহ,
অগ্নি এস মরুৎ সহ।

মরুৎ যারা শুভ্র অতি,
অসুর দলন ক্ষত্র যারা,
দুঃখ বিহীন স্বর্গ-শেষে
দীপ্ত দ্যুলোকবাসী যারা
চালান যারা মেঘের মালা,
মরুৎসহ হে হুতাশন!
বিশ্বভুবন ব্যাপ্তকরি,
সাগর মাতায় নিজ বলে,

উগ্র যারা পাপী জনে
অগ্নি এস মরুৎসনে।
জ্বলেন আপন দীপ্তিসনে
অগ্নি আনো মরুৎসনে।
ঢেউ তুলে দেন সাগর বুকে।
আজকে এস মনের সুখে।
ছড়িয়ে পড়ে কিরণ সনে।
অগ্নি আনো মরুদ্‌গণে।

পান কর সোম এখন আসি
পাত্র ভরি দিচ্ছি সুধা,
করলে যেমন পূর্ব্বক্ষণে,
অগ্নি এস মরুৎ সনে।

---

* লেখকের যন্ত্রস্থ ঋগ্বেদ গ্রন্থ হইতে

পাশাপাশি

এব্‌নে গোলাম নবী

অস্বাভাবিক অবস্থার জন্য অনাবশ্যক লোকের কলিকাতায় অবস্থান বিপদজনক বলিয়া বাঙলা সরকার এক ইস্তাহার জারি করিলেন। সুরমা খবরের কাগজের পৃষ্ঠা হইতে চোখ দুইটা তুলিয়া বলিল "ওগো শুনছো, আর তোমার ক'লকাতায় থাকা উচিত নয়। তুমি বাড়ী চ'লে যাও। আমার উপায় নেই, চাকরি—পেটের দায়ে থাকতেই হবে। কিন্তু তুমি অনাবশ্যক, চাকুরির বন্ধন নেই, সুতরাং ক'লকাতায় শঙ্কিত মন নিয়ে মৃত্যুর দিন না গুণে ক'লকাতার বাইরে অর্থাৎ আপাততঃ আমার শ্বশুর মশায়ের বাড়ীতে চ'লে যাওয়ার ব্যবস্থা কর।"

অদূরে মোহিত একটি ছোট্ট চারপায়ায় বসিয়া ডাল বাছিতেছিল। ডালের ভিতর অঙ্গুলী সঞ্চালন করিতে করিতে অনুযোগের স্বরে উত্তর দিল "সুরো, আমি কি অনাবশ্যক? তোমার রান্নার সাহায্য করি, বাজার ক'রে নিয়ে আসি, ছোট বড় ফাইফরমাস খাটি, ঘর দোরের তত্বাবধান করি, এমন কি মাঝে মাঝে তোমার বন্ধুদের পর্য্যন্ত এটা ওটা কাজ তাঁদের এবং তোমার অনুরোধে ক'রছি। এত ক'রেও আমি তোমার কাছে হলাম একটি অনাবশ্যক জীব? শেষের কথা কয়টি বলিতে বলিতে মোহিতের কণ্ঠরোধ হইয়া আসিল।

সুরমা উচ্ছ্বসিত হইয়া হাসিয়া উঠিল। শুভ্র গাল দুইটিতে এক চাপ রক্ত ছিটকাইয়া আসিয়া মিলাইয়া গেল। সুরমা হাসির বেগ সামলাইতে আচল টানিয়া মুখের উপর চাপিয়া ধরিল। হাসির শব্দ বাধা পাইল বটে, কিন্তু দেহটি কাঁপিয়া উঠিল। একটি "বাব্বা" শব্দ উচ্চারণ করিয়া সুরমা নিজকে কতকটা প্রকৃতিস্থ করিয়া লইল তারপর ধীরে ধীরে কহিল "ওমা, তুমি আমার কাছে অনাবশ্যক হ'তে যাবে কেন। যাট, অমন কথা মুখে আন্‌তে আছে? কিন্তু সরকারের কাছে তুমি অনাবশ্যক। অন্ততঃ যদি একটা ছোটখাট কেরাণীও হ'তে তবে অমন দুর্নাম তোমার অতি বড় শত্রুও দিতে পারত না।" মোহিতের মুখ গম্ভীর হইয়া উঠিল। সে হাতের কুলাটাকে একপাশে সরাইয়া রাখিয়া বলিল "সুরো আমি বেকার ব'লে তুমি কি আমার 'পরে বিরক্ত হও? আমার সামর্থ্যও নেই, যোগ্যতাও নেই এবং সেটা তুমি আগেও জানতে—এখনও জান। আজ কাল বি-এ, এম-এ চাকরি পায় না, আর আমার মত একজন অর্দ্ধশিক্ষিতের চাকুরি ত' দূরের কথা অফিসের চৌকাঠ ডিঙ্গোতে সাহস পাবে না। আমার এ অক্ষমতা জেনেও তুমি আমায় বিয়ে ক'রেছিলে কেন? জানো সুরো, মানুষের দুর্ব্বলতাকে খুঁচিয়ে তুললে কতখানি আঘাত দেওয়া হয় তাকে?" মোহিত রীতিমত সীরিয়াস। সুরমা ভাবিতেও পারে নাই সামান্য একটা কথাকে মোহিত এরূপ জট্‌ পাকাইয়া তুলিবে। সুরমা কথাটা ভাবিয়া আবার হাসিল, কিন্তু এবার উচ্ছ্বসিত হইয়া ফাটিয়া পড়িল না, কারুণ্যে মুখখানি ছাইয়া গেল। সুরমা খবরের কাগজখানি ভাজ করিতে করিতে তির্য্যক ভঙ্গীতে দাঁড়াইয়া উঠিল এবং অপাঙ্গে একবার মোহিতের দিকে চাহিয়া অভিমানের সুরে বলিল "সামান্য একটা কথাকে তুমি এমন সীরিয়াস ভেবে নেবে জান্‌লে উত্থাপনই ক'রতুম না। আমার ঘাট হ'য়েছে। কে জান্‌তো তুমি রসিকতা পছন্দ কর না।"

মোহিত গম্ভীরভাবেই উত্তর দিল "সুরো, বিশ্বাস কর আর নাই কর—মানুষের দুর্ব্বলতা নিয়ে যে রসিকতা সেটা রসিকতা নয়, ব্যঙ্গেরই নামান্তর মাত্র।" সুরমার কণ্ঠস্বর এবার ভারী হইয়া উঠিল। একে রাত্রি জাগরণ তায় প্রভাতেই এরূপ একটি গুরুতর পরিস্থিতির সম্মুখীন হওয়ায় সুরমার মাথা টিপ্‌ টিপ্‌ করিয়া ব্যথা করিতে লাগিল। সে আয়নার সম্মুখে সরিয়া আসিয়া চুলে তেল মাখাইতে লাগিল, পরে চুল মুঠো করিয়া বাঁধিয়া ঘাড়ের উপর দোলাইয়া আলনা হইতে সাড়ী ও তোয়ালে হাতের উপর তুলিয়া লইল এবং বাথরুমের দিকে যাইতে যাইতে বলিল 'আমি ওত ভেবে কথাটা বলিনি, ঠাট্টার স্থলেই প্রথমতঃ বলেছিলেম; তবে এইটুকু ভেবেছিলেম যেখানে একজন ম'বলেই যথেষ্ট, সেখানে দু'জন মরি কেন।" মোহিত কি যেন বলিতে গেল কিন্তু বোধহয় অত্যধিক ভাবাবেগে কণ্ঠরোধ হইয়া আসিল। সুরমাও ততক্ষণে বাথরুমের কল খুলিয়া দিয়াছে।

সুরমা নার্স, বয়স বৎসর পচিশ। মোহিত ওর বিবাহিত স্বামী, বয়স আটাশ বৎসর। সুরমা যাহা রোজগার করে বাড়ীতে বৃদ্ধা মাতাকে সামান্য কিছু পাঠাইয়াও স্বামী-স্ত্রীর সংসার একরূপ সচ্ছল অবস্থাতেই চলিয়া যায়। মোহিতের সহিত সুরমার দেখা হাসপাতালে চার বৎসর পূর্ব্বে। মোহিত সুশ্রী, ব্যবহার মধুর। মোহিতের সৌন্দর্য্য সুরমাকে আকর্ষণ করে, ব্যবহার মুগ্ধ করে। হাসপাতালেই উভয়ের প্রগাঢ় পরিচয় হয়। মোহিত রুগী, সুরমা নার্স। সুরমা মোহিতকে সেবা করিয়া আনন্দ পায়। মোহিত কৃতজ্ঞচিত্তে সুরমার সেবা গ্রহণ করে। ক্রমে কৃতজ্ঞতার ঋণ পরিশোধ করিতে গিয়া অনায়াসেই সুরমাকে ভালবাসিয়া ফেলে। ভাবিয়াছিল যদি সুরমাকে ভালবাসিয়া একটু আনন্দ দিতে পাবে তবে হয়ত কৃতজ্ঞতার ঋণ হইতে মুক্তি পাইতে পারিবে। মোহিতের বৃদ্ধ পিতা অন্যান্য পুত্রের রোজগারের সামান্য অংশ হইতে নিজের জীবন একরকম করিয়া চালাইয়া লইতেছিলেন। সর্ব্বকনিষ্ঠ সন্তান মোহিত, অত্যধিক ভাবাবেগেই হউক আর যে কারণেই হউক, পরীক্ষার কোন গণ্ডিই পার হইতে পারে নাই। পরিশেষে কলিকাতায় মোটর মেরামতের এক কারখানায় থাকিয়া সামান্য কিছু শিখিবার পূর্ব্বেই অসুখে হাসপাতাল যাইতে বাধ্য হয়। এইখানেই সুরমার সহিত ওর দেখা। হাসপাতাল হইতে কিছুদিন পর মোহিত মুক্তি পায় কিন্তু সুরমার নিকট হইতে নয়। মোহিতকে সুরমার ভয়ানক আবশ্যক হইয়া পড়ে। অবশেষে শুভমুহূর্ত্তে দুইজনে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়।

২

রামকমলবাবু ধুতির অগ্রভাগ দিয়া আর একবার চশমার কাচটি পরিষ্কার করিয়া লইয়া "অমৃতবাজারে" মনসংযোগ

করিল। মুখখানা তাহার অস্বাভাবিক রকম গম্ভীর হইয়া উঠিল। চিন্তায় কপালের রেখাগুলি সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। অদূরে রামকমলবাবুর স্ত্রী মাধুরীলতা একখানা চেয়ারে বসিয়া একবৎসরের শিশুকন্যা সুলতার ইজারের ছেড়া অংশটি সেলাই করিতেছিল। সুলতা সমস্ত রাত্রি জ্বালাইয়া প্রভাতের দিকে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে।

আজ রবিবার। মাধুরীর রান্নার তাড়া নাই। ইজার সেলাই করিতে করিতে মাধুরী সুলতার কথা ভাবিতেছিল। সুলতা কি দুষ্টুই না হইয়াছে। কিন্তু এই দুষ্টামিই মাধুরীকে সমস্ত দিন আনন্দে আচ্ছন্ন করিয়া রাখে। মাধুরী একবার আড়চোখে স্বামীর উদ্বিগ্ন মুখের দিকে তাকাইয়া প্রশ্ন করিল "আজকের খবর কিগো? খারাপ বুঝি?"

রামকমলবাবু চশমাটা নাকের উপর হইতে উঠাইয়া লইয়া কহিল—"লতা, তোমাদের আর ক'লকাতায় থাকা হবে না। অনাবশ্যক লোকের ক'লকাতা ত্যাগের জন্য বাঙলা সরকার এক ইস্তাহার জারি ক'রেছেন।" "আমি অনাবশ্যক বুঝি, আমি চ'লে গেলে তোমায় রান্না ক'রে খাওয়াবে কে? ঘর-দোর গুছিয়ে রাখবে কে শুনি?" মাধুরী অভিমানের সুরে উত্তর দিল। রামকমল স্বল্প হাসিয়া বলিল "তুমি আমার কাছে আবশ্যক, বাঙলা সরকারের চোখে একটি অনাবশ্যক জীব।" মাধুরী আর কথা কহিতে পারিল না। কণ্ঠরোধ হইল। শেষে সুলতার মাথার কাছে গিয়া সরিয়া দাঁড়াইল। আশু বিরহের কথা ভাবিয়া এখন হইতেই ওর মন বেদনায় টন্ টন্ করিতে লাগিল। মনে মনে রাগ হইল। শত্রুর কি আর কোন কাজ নাই। হতভাগারা শেষে নির্জ্জীব বাঙ্গালীর উপর—। মাধুরী ভাবিল, সুলতাকে জাগাইয়া দেয়, খানিকটা কাঁদুক, বড় ফাঁকা ফাঁকা লাগিতেছে। কিন্তু স্বামী পাছে বিরক্ত হন সেই ভাবিয়া সঙ্কল্প ত্যাগ করিল। ইজারের কাজ আপাতত স্থগিত রহিল। বাহিরে ঠিকা ঝি দরজার কড়া নাড়িল।

রামকমলবাবুর বয়স বত্রিশ বৎসর। কোন্ এক অফিসের কেরাণী। পত্নী মাধুরীলতার বয়স তেইস। বৎসর পাঁচেক হইল তাহাদের বিবাহ হইয়াছে। গেল বৎসর সুলতার আগমনে তাহাদের স্বামী-স্ত্রীর একঘেয়ে জীবনের মাঝে একটু নূতনত্বের সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। রামকমলবাবুর সংসার ছোট। আর্থিক অসচ্ছলতা নাই। সাধারণ মধ্যবিত্ত বাঙ্গালী ঘরের যা না থাকিলে নয় তাহার অতিরিক্ত রামকমলের কাছে। রামকমলের পিতা পশ্চিমের কোন্ এক জায়গায় এখনও চাকুরী করিতেছেন। নিজের স্ত্রী কন্যা ছাড়া আর কাহারও চিন্তা রামকমলকে করিতে হয়না। চাকুরী করিয়া যাহা পায় স্বচ্ছন্দেই তাহাদের চলিয়া যায়। মাধুরীলতা সুন্দরী ও অর্দ্ধশিক্ষিতা। মাধুরীলতায় প্রগল্‌ভতা নাই, আবার তীক্ষ্ণবুদ্ধিরও অভাব নাই। স্বামী এবং সংসার কি করিয়া প্রতিপালন করা যায় সে মন্ত্রজাল তাহার কণ্ঠস্থ। মাধুরীলতা স্বামীকে ভালবাসে এবং ভক্তি করে। রামকমল মাধুরীলতাকে ভালবাসে কিনা অত তলাইয়া দেখে নাই; আর সে সুযোগও আসে নাই, তবে মাধুরীলতাকে তাহার মন্দ লাগেনা। সুলতার আগমনে তাহাদের মনের পূর্ব্বাবস্থার কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই বরং রামকমলের উপর মাধুরীলতার আধিপত্য আরও একটু বাড়িয়া গিয়াছে।

৩

কলিকাতার অবস্থা ক্রমেই অস্বাভাবিক হইয়া উঠিল। সুরমা মনে মনে স্থির করিল আর নয়—এবার মোহিতকে কলিকাতার বাহিরে পাঠাইয়া দেওয়াই যুক্তিসঙ্গত। মোহিত বাজার করিয়া ফিরিল। সুরমা তরকারির ঝুড়ি হইতে তরকারিগুলি বাছিয়া উঠাইতে উঠাইতে কথাটা পাড়িয়া বসিল। মোহিত মৃদু আপত্তি তুলিল কিন্তু সুরমা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। দুইজনের একসঙ্গে কিছুতেই মরা হইবেনা। কার্য্যোপলক্ষে মরা এবং শুধু শুধু বসিয়া মরায় অনেক তফাৎ। বসিয়া মরা বীরত্বের লক্ষণ নয়। সুরমার যুক্তির জাল ছিন্ন করিয়া মোহিত অগ্রসর হইতে পারিলনা। কিন্তু মোহিতের এবার পৌরুষ জাগিয়া উঠিল, বলিল, "আমি পুরুষ মানুষ, আমার আবার ভয় কি। মেয়েদের অনেক জ্বালা।" শেষের কথাগুলিতে সুরমার নারীত্বে আঘাত লাগিল। সে ক্ষুব্ধ হইয়া বলিল, "আজকাল নারী-পুরুষ উভয়েই সমান। কাজের দিক থেকে অন্ততঃ"…কথাটা মাঝ পথেই থামাইয়া দিল। কি জানি, আবার যদি মোহিতকে কোন কথায় আঘাত দিয়া বসে। সুরমা অপ্রীতিকর আলোচনা মোটেই পছন্দ করেনা। সুরমা কথাগুলি শেষ করিতে না পারিলেও মোহিত মনে মনে সেগুলি সমাপ্ত করিয়া লইল এবং আর দ্বিরুক্তি না করিয়া নিজের আবশ্যকীয় জিনিষগুলি গুছাইতে প্রবৃত্ত হইল। বিদায়ের সময় সুরমার চোখে জল আসিল বটে, কিন্তু বাঙলা সরকারের ইস্তাহারের কথা স্মরণ করিয়া দৃঢ় হইয়া উঠিল।

রামকমলবাবুর পিতার পত্র আসিল। বৌমাদের এখানে পাঠাইয়া দাও। কলিকাতার অবস্থা সুবিধা নয়। নানা গুজব শুনিতেছি। এ ক্ষেত্রে মেয়েদের কলিকাতায় রাখা কোন মতেই যুক্তিসঙ্গত নয়। রামকমল চিঠি পাইয়া চিন্তিত হইয়া পড়িল। সত্যই মাধুরীদের আর এখানে রাখা নিরাপদ নয়। কালও একবার সাইরণ বাজিয়াছে। কিন্তু মাধুরীরা চলিয়া গেলে তাহার যে বড় কষ্ট হইবে। বিশেষ করিয়া সুলতার জন্য। এখন হইতেই সুলতা তাহার অর্দ্ধেক হৃদয় জুড়িয়া বসিয়াছে। কর্ম্মক্লান্ত হইয়া অফিস হইতে ফিরিতেই সুলতা পিতার কোলে ঝাঁপাইয়া পড়ে, রামকমলের সমস্ত গ্লানি এক মুহূর্ত্তেই কোথায় উঠিয়া যায়। সুলতার চঞ্চল চোখ দুইটির কথা স্মরণ করিয়া এক অপূর্ব্ব আবেগে রামকমল চেয়ার ছাড়িয়া ঘুমন্ত সুলতার কপালে ছোট্ট একটা চুমা খাইল। অদূরে মাধুরী রামকমলের বইয়ের টেবিলটা গোছাইতেছিল। রামকমলের হাতে চিঠি দেখিয়া মাধুরী প্রশ্ন করিল "কার চিঠি গো?"

"বাবা, তোমাদের যেতে লিখেছেন" রামকমল উত্তর দিল।

এক মুহূর্ত্তেই মাধুরীর মুখের সমস্ত রক্ত কে যেন শুষিয়া লইল। হাতের বইখানা সশব্দে মেঝের উপর পড়িয়া গেল। বইখানা হঠাৎ তুলিতে গিয়া টেবিলের কোণে কপালটা ঠুকিয়া গেল। রামকমল বলিল "আহা লাগ্‌লো"। মাধুরীর কপালে আঘাত লাগিল বটে কিন্তু ও চোখ দুইটা আঁচল দিয়া চাপিয়া ধরিয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। রামকমল মাধুরীকে বুকের উপর টানিয়া লইল। স্বামীর বুকে মুখ রাখিয়া মাধুরী আরও জোরে

কাঁদিয়া উঠিল এবং কাঁদিতে কাঁদিতেই বলিল "আমি তোমায় ছেড়ে কোথাও যেতে পারবো না। যদি মৃত্যু থাকে দু'জনাই একসঙ্গে ম'রবো।" রামকমল স্ত্রীকে আরও নিবিড়ভাবে বুকে টানিয়া লইল, মাথায় সস্নেহে হাত বুলাইতে বুলাইতে কহিল "ছি লতা কাঁদে না। বাবা যেতে লিখেছেন। না গেলে তিনি রাগ ক'রবেন। গুরুজনের কথা অবহেলা ক'রতে নেই। ক'লকাতায় ভয়ের আশঙ্কা কেটে গেলে তক্ষুণি তোমাদের নিয়ে আস্‌বো। তোমরা চ'লে গেলে আমার কত কষ্ট হবে, তবু গুরুজনের কথা উপেক্ষা ক'রতে নেই, ওতে অমঙ্গল হয়।" মাধুরী স্বামীর বুকে সজোরে মুখখানা চাপিয়া ধরিয়া মাথা দোলাইয়া তবুও অসম্মতি জানাইল। অবশেষে সপ্তাহে অন্ততঃ রামকমল দুইখানা করিয়া পত্র দিবে প্রতিজ্ঞা করায় মাধুরী অনিচ্ছাসত্বেও যাইতে রাজী হইল।

৪

বালিগঞ্জে একটি চৌতাল ফ্লাট সিষ্টেমের বাড়ী। অধিকাংশ ফ্লাটই এখন জনশূন্য। একেবারে জনশূন্য না হইলেও একেবারে নারীশূন্য। বাড়ীর মালিক সস্তা ভাড়াটিয়া পাইবার আশায় এ দুর্মূল্যের বাজারে তিরিশ পার্শেণ্ট ভাড়া কমাইয়া দিয়াছে। তবুও আশা মিটিবার লক্ষণ দেখা যাইতেছে না। এমন সময় কোথা হইতে একটি নার্সে'স ইউনিয়ান উঠিয়া আসিয়া এ বাড়ীর দ্বিতলের একটি ফ্লাট জাঁকাইয়া তুলিল। বাহিরে "দিবা রাত্র নার্স পাওয়া যায়"কাঠের উপর সুন্দর করিয়া লিখিত ফলকটিতে এখন অনেকেই একবার চোখ বুলাইয়া লয়। অনেক সন্ধ্যায় সুরুচিসম্পন্ন কোন নার্সের হারমোনিয়ম মিশ্রিত কণ্ঠসঙ্গীত বিরহ-কাতর পথিকের চিত্ত চঞ্চল করিয়া তোলে। সুরমা এই নার্সে'স ইউনিয়ানের অন্যতম সভ্য। খরচ কমাইবার জন্য ইউনিয়ানের সভ্য হইয়াছে। মোহিতকে মাসে কিছু করিয়া পাঠাইতে হয়। একলা থাকা তাই আর সম্ভব নয়।

রামকমল ও অফিসের আরও কয়েকটি বন্ধু মিলিয়া বাড়ী-ভাড়ার খোঁজে বাহির হইয়াছে। সকলেই সম্প্রতি পরিবার কলিকাতার বাহিরে কোথাও পাঠাইয়া দিয়াছে। দুইতরফা খরচ জোগাইতে প্রাণান্ত। একসঙ্গে থাকিলে খরচ অনেক কম পড়িবে বিবেচনা করিয়া একটি উপযুক্ত আলো-হাওয়াযুক্ত বাড়ীর সন্ধান করিতেছে। অবশেষে বালিগঞ্জের ঐ চৌতাল বাড়ীটি তাহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। একটি বন্ধু আপত্তি জানাইয়া কহিল "একেবারে নার্সে'স ইউনিয়ানের পাশের ফ্লাটটি নেয়া কি ঠিক হোল?" রামকমল উত্তর দিল "ওমন দুর্ব্বল মন নিয়ে জগতে বাস করা চলে না। আজ জগতে একই কর্ম্মস্রোতে ভেসে চ'লেছে নর ও নারী নিজেদের স্বাতন্ত্র্য নিয়ে। কালের স্রোতকে কি কেউ বাধা দিতে পারে? নারীকে সম্মান করতে শেখ—মনের ও সঙ্কোচ আর থাকবে না, ভাব আমরা সবাই একই পথের পথিক। যে দেশ নারীর যোগ্য সম্মান দিতে পারে না সে দেশের সামাজিক ও নৈতিক জীবন অধঃপতিত। ইউরোপে⋯।" রামকমলের কথার মাঝখানে বাধা পড়িল। একটি বন্ধু কহিল "রামকমল তোমার উদগ্র রসনা সংযত কর এবং আপাততঃ গাড়ী ভাড়া ক'রে মালগুলো আনাবার ব্যবস্থা দেখ, বেলা অনেক হ'য়েছে।" রামকমলের মানসিক কণ্ডুয়নের পূর্ণ বিকাশ না হওয়ায় বক্ষ ও উদর ঘন ঘন স্ফীত হইতে লাগিল। রামকমল যথাসম্ভব নিজকে সংযত করিয়া কহিল "হ্যাঁ, তাই চল।"

৫

রবিবার দ্বিপ্রহর। গ্রীষ্মের প্রখর রৌদ্রে গাছের পাতাগুলি নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছে। পিচঢালা রাস্তাটি তাতিয়া পথিকের মুখখানি বিবর্ণ করিয়া দিতেছে। অদূরে দেবদারু গাছের শাখায় বসিয়া করুণ সুরে একটি কাক ডাকিতেছে কা, কা। বালিগঞ্জের চৌতাল ফ্লাটটির অধিবাসীরা মধ্যাহ্ন ভোজন সমাপ্ত করিয়া দিবা নিদ্রার আয়োজন করিতেছে এমন সময় বাজিয়া উঠিল সাইরণ। ফ্লাটের বহির্গমনের দরজাগুলি একসঙ্গে খুলিয়া গেল। সকলে জ্ঞানশূন্য হইয়া সিঁড়ি বাহিয়া নিচে নামিতে লাগিল। তাড়াতাড়ি করিতে গিয়া রামকমলের সহিত নার্সে'স ইউনিয়ানের একটি সভ্যের মাথা ঠুকিয়া গেল। বিপদের সময় ভদ্রতা লোপ পাইল। রামকমল নিচে নামিয়া গেল। মেয়েটি একটি অস্ফুট শব্দ করিয়া সিঁড়ি বাহিয়া নিচে নামিল। শঙ্কায় নাড়ীর দ্রুত গতিতে সকলের মুখের রেখা বিচিত্রতায় ভরিয়া উঠিতে লাগিল। যাহারা অত্যধিক সাহসী তাহারা ঠোঁটের কোণে তাচ্ছিল্যের হাসি ফুটাইয়া নিজেদের জন্য অতি নিরাপদ জায়গাটি বাছিয়া লইল। রামকমল এইবার মেয়েটির পানে তাকাইবার সুযোগ পাইল। সত্যই ওর কপালের কোন্‌টা যেন একটু ফুলিয়া গিয়াছে। ভাবিল এইখানে দাঁড়াইয়াই একবার মাপ চাহিয়া লয়। কিন্তু এতগুলি লোকের সামনে⋯কে কি ভাবিবে⋯রামকমলের সাহস হইল না। আপাততঃ সমাজের ঘাড়ে দোষ চাপাইয়া নীরব রহিল। যে সমাজে মেয়েদের সহিত সাধারণ দু'টি কথা বলিতে ইতস্ততঃ করিতে হয় সে সমাজের নৈতিক জীবন প্রশংসার যোগ্য নয়। রামকমলের অন্ততঃ ইহাই ধারণা।

অল ক্লিয়ার সিগন্যাল হইল। অধিবাসীরা স্ব স্ব প্রকোষ্ঠে প্রত্যাগমন করিল। পুরুষদের ঘরের দেওয়ালগুলি অট্টহাস্যের অতিষ্ঠতায় কাঁপিয়া উঠিতে লাগিল। হাসির সহিত আলোচনা হইতেছিল মেয়েদের লইয়া। আলোচনার সারাংশ—মেয়েরা বিপদে কাণ্ডজ্ঞানহীন হইয়া পড়ে। উহাদিগকে সামলাইতে আর একজনের প্রয়োজন। নিজেদের কোন স্বাতন্ত্র্য নাই। অন্যের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল। পুরুষেরা বর্ত্তমান পরিস্থিতির সহিত নিজেদের গৃহিণীর তুলনা করিয়া স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিল। বর্ত্তমানে তাহারা কাছে নাই, থাকিলে উহাদিগকে লইয়া কি বিপদেই পড়িতে হইত।

মেয়েদের ঘরে চাপা কণ্ঠের অস্ফুট গুঞ্জনে জানালার সারসিগুলি প্রকম্পিত হইতে লাগিল। আলোচনার বিষয় পুরুষদের লইয়া। পুরুষেরা যে এত ভীতু এ তাহারা পূর্ব্বে জানিত না। বিপদে পড়িলে মানুষের সত্যিকার স্বরূপ প্রকাশ পায়। আজ পুরুষদের স্বরূপটি উপলব্ধি করিয়া মেয়েদের মুখের রক্তের চাপ হাসিতে উচ্ছল হইয়া উঠিল। বাবা, পুরুষেরা কি ভীরু, মেয়েদেরও হার মানায়। বিপদে নারী পুরুষ সগোত্র। সকলে এক সময় হঠাৎ আলোচনা বন্ধ করিয়া সুরমার দিকে তাকাইল। বেচারা সুরমার কপালটা এখনও ফুলিয়া আছে। একজন কহিল "তুই শেষ পর্য্যন্ত

মাৎ করলি সুরমা, যা আর একবার ঢু মেরে আয়, নইলে কপাল দিয়ে শিং বেরুবে যে।" কথাটায় আবার একটা উচ্চ হাসির রোল পড়িয়া গেল। হাসির শব্দ এবার মেয়েদের প্রকোষ্ঠের চৌকাট ডিঙাইয়া পুরুষদের গৃহে প্রবেশ করিল। পুরুষেরা উৎকর্ণ হইয়া উঠিল। সুরমার সলজ্জ মুখখানি গোধূলির মত ম্লান হইয়া গেল।

৬

পরদিন প্রভাতে রামকমল দরজা খুলিয়া বাহিরে যাইতেই সম্মুখে সুরমাকে দেখিয়া লজ্জায় অধোবদন হইল। সুরমার কপালটি পূর্ব্বের মত এখনও অতটা মসৃণ হয় নাই। রামকমলকে দেখিয়া সুরমার চোখের কোণে বিদ্রূপাত্মক হাসি ফুটিয়া উঠিল। সে পাশ কাটিয়া যাইবার উদ্যোগ করিতেই রামকমল কহিল "দেখুন, কালকের দুর্ঘটনার জন্য আমি লজ্জিত এবং অনুতপ্ত। কা'লকে অত লোকের সামনে আপনার কাছে মাপ চেয়ে নিতে পারি নি। চাইলে আপনাকে হয়ত আরও হাস্যাস্পদ করে তুলতুম।"

সুরমা মৃদু হাসিয়া উত্তর দিল—"না না তাতে কি হ'য়েছে, বিপদে মানুষের মাথা ওমন একটু আধটু খাবাপ হ'য়েই থাকে।" রামকমল বাধা দিয়া কহিল, "না না মাথা ঠিকই ছিল, ওটা পিওরলি একটা অ্যাক্সিডেণ্ট—এই যাকে বলে দুর্ঘটনা। বাঙলা তরজমায় সুবমার ঠোঁটের কোনে হঠাৎ একটা বাঁকা হাসির রেখা আলগোচে মিলাইয়া গেল; ও বলিল "অ্যাকসিডেণ্ট এর অর্থ আমি জানি—কারণ ওটার সঙ্গে প্রায়ই আমার চাক্ষুষ পরিচয় হয়।" রামকমল লজ্জিত হইয়া বলিল, "না না আমি তা ভেবে কথাটি বলিনি। ওটা প্রসঙ্গক্রমে এসে প'ড়েছে।" আরও কয়েকটি অনাবশ্যক কথার পর সুরমা নমস্কার করিয়া বলিল, "আচ্ছা এখন চলি।" রামকমল প্রতি-নমস্কার করিয়া নিচে নামিতে নামিতে ভাবিতে লাগিল সুরমার কথা। মেয়েটি বেশ, সুরুচিসম্পন্ন ভদ্র।

রামকমলের সহিত সুরমার পরিচয় ইদানীং বেশ গাঢ় হইয়া আসিয়াছে। উভয়ের অনুপস্থিতি উভয়েই অন্তরের সহিত অনুভব করে। বৈকালে সুরমাকে লইয়া রামকমল যখন লেকের দিকে বেড়াইতে যায় সে দৃশ্য অনেক বিরহীচিত্তের বেদনা নিবিড় করিয়া তোলে।

মোহিতের অসুখ। সুরমা চিঠি পাইয়া চিন্তিত হইয়া পড়িল। বার বার করিয়া একবার যাইতে বলিয়াছে। সুরমা দোটানায় পড়িয়া গেল। অথচ মোহিতকে না দেখিতে গেলেও নয়। বেচারা মোহিত, একদিন এই মোহিতই তাহার সমস্ত অন্তর জুড়িয়া বসিয়াছিল—আর আজ সে আসনে ভাগ বসাইয়াছে রামকমল। রামকমল তাহার জীবনে একটি দুর্ঘটনা। অবশেষে কর্ত্তব্যের জয় হইল। সুরমা মোহিতকে দেখিতে শিয়ালদহ ষ্টেশনে গাড়িতে চাপিল।

রামকমল আসিয়াছে তাহাকে ষ্টেশনে তুলিয়া দিতে।

সুরমার চোখে জল, সুরমা বলিল—আমি যে কয়দিন ফিরে না আসি—

রামকমল তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল—"কাল আমি সুলতাকে দেখ্‌তে যাচ্ছি।"

গাড়ী ততক্ষণে ছাড়িয়া দিয়াছে।

বরষায়

শ্রীসৌম্যেন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় বি-এ

ঝিম্ ঝিম্, ঝুপ্ ঝুপ্, বরষার বাজারে
ভিজে ভিজে, হায়রাণ, হাড়-মাস্ হাজা রে!
ভিজে জুতো, ছাদ ফুটো, শিক্-ভাঙা ছত্র
জলে জল, পথ-ঘাট, কাদা সর্ব্বত্র!
সপ্‌সপে, জামা সব, স্যাঁত স্যাঁতে ঘর-দোর
ম্যাজ্‌মেজে, ঠান্ডায়, "ফ্লু"র দাপ খুব জোর!
রোজ দেরী, আপিসেতে, ট্রাম-বাস বন্ধ!
গালাগাল, দুবচন, যত কিছু মন্দ
তাও সব, সয়ে চলি, চাঁদমুখে ভাই রে
তবু শেষে, দেখি হায়, সুবিচার নাই রে!
আপিসেতে বড়বাবু, যেন থেকি যমদূত!
এটা নাই, সেটা চাই, সব কাজে ধরে খুঁত!
চাকরী তো, যায়-যায়, কোনোমতে টেঁকে রই!
সংসারে, গৃহিণীর মুখে সদা ফোটে খই।
ওটা দাও, সেটা দাও, আব্‌দার সব'খন
ঝন্‌ঝাট, হায়রাণ, বুক-পিঠ ঝন্‌ঝন্!
ছেলে-মেয়ে, এক ঝাঁক, সুরে বাঁধা পঞ্চম
চীৎকার, ক্রন্দন..., সারা বাড়ী গমগম্!
মনে মনে, বুঝে নিছি, সংসার ফক্কা!
ভাবি যাই, হিমালয়, মদিনা কি মক্কা!
* * * *
লেজারের, খাতা খুলে, আকাশের পানে চাই
দেখি সেথা, মেঘ জমে, নীলিমার নেই ঠাঁই!
মনে পড়ে, মেঘ-দূত..., যক্ষের অলকায়...
বিরহিণী, প্রিয়া তার..., কষ্টেতে দিন যায়!
মেঘ-বায়, দয়িতের, পায় প্রেম-পরশন
মিলনের, আশা-ফুল, ছেয়ে রয় তার মন!
একা বসি, বিরহিণী, দিন গোণে চাহিয়া
প্রিয়তম, আসিবে সে মেঘ-পথ বাহিয়া!
* * * *
কত আশা, ভালবাসা, কত স্মৃতি হর্ষের...
মনে জাগে, কত ছবি, কত মধু বর্ষের!
ভুলে যাই, আপিসের, টেবিলেতে কেরাণী
লেজারের, খাতাখানা, চালানের ফেরানী!
ভুলে যাই, বড়বাবু, ঘর-দোর, সংসার!
বিরহের বেদনায়, অস্থির...মন-ভার!
নিঃশ্বাস, ফেলি...ভাবি—বাস্তব পৃথ্বী—
ইট-কাঠ, পাথরের, অদ্ভুত কীর্ত্তি!
নাই প্রাণ, নাই মন, নাই প্রীতি-ছন্দ
অচেতন, জড়-ভাব, প্রাণবায়ু বন্ধ!
সাড়া নাই, সুর নাই, চক্রের ঘর্ঘর...
চলে যেন দিনরাত যন্ত্রর বর্ব্বর!

কবি রামচন্দ্র

শ্রীসুবোধকুমার রায়

রামচন্দ্র যে সময়ের কবি তখন রবীন্দ্রযুগের সবে ভোর হ'চ্ছে। বাংলা-কাব্যাকাশে পুরাতন রাত্রিশেষের ইঙ্গিত দেখা দিয়েছে মাত্র, তরুণ রবির আলোকচ্ছটা তখনও ঠিকমত লোকের চোখে পড়েনি। সেই যুগটাকে বাংলা কাব্যের একটা যুগসন্ধি বলা যেতে পারে। সেই যুগসন্ধির মাঝখানে পল্লীর একপ্রান্তে দাঁড়িয়ে রামচন্দ্র আজীবন সাহিত্য সাধনা করেছেন, উচ্চাঙ্গের বহু সঙ্গীত ও কবিতা রচনা করে' বাংলা সাহিত্যকে পুষ্ট করে' তুলেছেন, কিন্তু তাঁর জীবিতাবস্থায় কোন পুস্তকাদি ছাপা অক্ষরে মুদ্রিত হয়নি। মৃত্যুর পর কবির বন্ধু আরিয়াদহ নিবাসী নারায়ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় 'রাম পদাবলী' নাম দিয়ে তাঁর কতকগুলি গান ও কবিতা সংগ্রহ করে' প্রকাশিত করেন, প্রথম সংস্করণের প্রায় ৩০ বছর পরে ১৩৪১ সালে বইখানির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। কবির সংক্ষিপ্ত জীবনী-পরিচয় ও আছে বইখানির গোড়াতে।

১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে আগষ্ট মাসে দক্ষিণেশ্বরের পার্শ্ববর্ত্তী আরিয়াদহ গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম ৺দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। খুব ছেলেবেলা থেকেই রামচন্দ্রের কবিত্বশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। কিশোর বয়সেই পাঁচালি, কবির গান, তর্জ্জা প্রভৃতি শুনে তিনিও মুখে মুখে গান রচনা করতে পারতেন। শ্রীমধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র প্রভৃতি কবিগণের কবিতা ছিল তাঁর কণ্ঠস্থ, আবার রবীন্দ্রনাথের লেখা যখন সবে মাত্র ছাপা অক্ষরে মুদ্রিত হয়ে সাধারণের সামনে আত্মপ্রকাশ করতে আরম্ভ করেছে, রবীন্দ্রনাথের নূতন ভাব ও ভঙ্গী যখন সাধারণের কাছে অবহেলিত, তখন কবির সমবয়সী এই কবিটী অধিকাংশের মত সেই নূতনের আবির্ভাবকে অবহেলা বা অশ্রদ্ধা করেন নি। সাহিত্যিক কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—১৩৩৫ সাল, মাঘ মাসের 'বসুধারা' পত্রিকায় 'রবীন্দ্র-প্রসঙ্গ' নামক প্রবন্ধে—রামচন্দ্রের কথা উল্লেখ করে' লিখেছেন যে "তিনিই (রামচন্দ্র) সর্ব্বপ্রথম রবীন্দ্রনাথের কবিতার সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দেন। এমন সহৃদয় ভাবুক মুগ্ধ অল্পই দেখেছি। যদিও তাঁর লেখায়ও প্রাচীন সুর বাজতো কিন্তু রবীন্দ্রনাথকে চিনতে তাঁর একটুও বিলম্ব হয়নি।"

"তাঁর (রামচন্দ্রের) নূতন একটি গান নিয়ে সন্ধ্যার সময় গঙ্গার ঘাটে বসে' একদিন আমাদের আনন্দোচ্ছ্বাস চলছিল। কৃষ্ণ-বিরহ-বিহ্বলা গোপীকারা মথুরায় উপস্থিত হয়ে' নগরবাসিনীদের জিজ্ঞাসা ক'রছেন—

'বুঝি তেমন বাঁশী বাজেনা হেথায়
তোদের মথুরায় !
যে বাঁশী শুনে আকুল প্রাণে
কুল ত্যজেছে গোপীকায়।
শুনতো বাঁশী সারী শুকে,
শুনতো কোকিল অধোমুখে,
ভুলে যেতো গুঞ্জরিতে
কুঞ্জ মাঝে ভ্রমরায় ॥"

ইত্যাদি

রাম বন্দ্যো বল্লেন,—'এ সুর আর চলবে না, সুর ফেরতার হাওয়া দিয়েছে।' এই বলে তিনি রবীন্দ্রনাথের দু'তিনটি গান আবৃত্তি ক'রলেন। বোধ হয় তার মধ্যে একটি ছিল,—

'আমার পরাণ লয়ে কি খেলা খেলিবে
ওহে পরাণ প্রিয়,
কোথা হতে ভেসে কূলে ঠেকেছি চরণমূলে
তুলে দেখিও।
এ নহে গো তৃণদল, ভেসে আসা ফুল ফল,
এ যে ব্যথা-ভরা মন মনে রাখিও।'

সন্ধ্যাবন্দনা সেরে প্রৌঢ় ও বৃদ্ধেরা উঠে এসে শুনছিলেন। একজন বল্লেন—'এতে পেলুম কি যে এত সুখ্যেত ? অত জড়ানে জিনিস বুঝবে কে, গান শোনবার সঙ্গে সঙ্গে সকলের প্রাণে চারিয়ে যাবে, যেন ব্লটিংএ জল পড়লো। তবে না বাঁধুনি ? দেখ দেখি কেমন—

"কুবের ভাণ্ডারে নয়নে
আলতা পরাবো মায়ের রাঙ্গা চরণে।"

শোনবামাত্রই সবাই সবটুকু পায়।

বয়সে বড়দের সকলেই সমীহ করতো, প্রতিবাদ বা হাস্য চলতো না। কেবল ধীরভাবে শোনা হতো।…তাঁরা চলে গেলে রাম বন্দ্যো বল্লেন, 'ও আর চলতে পারে না, ও আলতায় আর চটক থাকবে না, শুধু হাওয়া তো বদলায় না, হাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মানুষ ও বদলায়—রুচিও বদলায়, সে নিজেই মানুষ তয়ের করে চলে।" এই সকল কথা থেকে তাঁর চরিত্রের একটী দিক আমাদের চোখের সামনে ফুটে ওঠে ; পুরাতনকে আঁকড়ে ধরা প্রতিক্রিয়াশীল বৃদ্ধ পঙ্গু মন তাঁর ছিল না, তিনি চাইতেন এগিয়ে চলতে ; আর তাঁর দূরদৃষ্টি যে কতদূর তীক্ষ্ণ ছিল তা এই সকল কথাগুলি থেকে বেশ প্রমাণ পাওয়া যায়। তাঁর এই এগিয়ে চলা মনের আরও পরিচয় পাই স্ত্রী-শিক্ষা বিষয়ক একটি কবিতা থেকে। তখন দেশে মেয়েদের শিক্ষা দেওয়ার সমস্যা প্রকটভাবে দেখা দিয়েছে, অধিকাংশ লোকই স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রী স্বাধীনতার বিরোধী। তাই যাঁরা এই ঢেউ তুলেছিলেন যে—

"নাহি কাজ লেখাপড়া শিখাইয়ে আর।
সোণার সংসার দেখ হ'লো ছারখার !
সেজে গুজে বাজে কাজে সময় কাটায়।
বিশৃঙ্খল গৃহস্থালী আস্থা নাহি তায়।"

* * * *

আঁধারে ছিলাম ভাল, না চাই এ আলো।
অশিক্ষা কুশিক্ষা হ'তে লক্ষগুণে ভাল ॥"

তিনি তার জবাবে লিখেছিলেন,—

অশিক্ষা কুশিক্ষা হ'তে ভাল বটে নানা মতে,
মানিলাম কুশিক্ষার দোষ ;
তাই বলে সুশিক্ষায় কি দোষে ঠেলিলে পায়,
সুশিক্ষায় কেন মিছে রোষ !"

* * * *

"আজি যে কুশিক্ষা তরে গেছে দেশ ছারে খারে
সোনার সংসারে হাহাকার।
কেমনে এ পাপ হ'তে পাব মোরা উদ্ধারিতে
ভেবেছ কি ভাবনা তাহার ?
ভক্তি প্রীতি লজ্জা ভয় সত্যবটে সমুদয়
মানবের অন্তরে নিহিত।
কিন্তু বিনা শিক্ষা-বারি আকর্ষিত হৃদে তারি
কভু নাহি হ'বে অঙ্কুরিত।"

কবিতাটির শেষের দিকে তাঁর মনের আশা যেন মূর্ত্তি নিয়ে ফুটে উঠেছে।—

"আবার এ মরুভূমে নূতন স্বর্গের ফুল
নূতন সৌরভে পুনঃ উঠিবে ফুটিয়ে ;
ধরার গৌরব হেরি স্তম্ভিত দেবতা কুল
সতৃষ্ণ নয়নে রবে চেয়ে।
ভারত রমণী হেরি সসম্ভ্রমে দেবরাজ
দাঁড়াবেন আসন ছাড়িয়ে ;
আবার এ সুপ্ত প্রাণ জাগিবে নিশ্বাস ফেলি,
মহাপ্রাণে যাবে মিশাইয়ে।
বিস্ময় বিমুগ্ধ নেত্রে চমকি রহিবে বিশ্ব
ভারতের রমণী হেরিয়ে।"

ছাত্রাবস্থায় রামচন্দ্র ছিলেন অত্যন্ত মেধাবী ও বুদ্ধিমান। ইং ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে গভর্ণমেণ্ট সাহায্যকৃত স্থানীয় বাংলা স্কুল থেকে ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় ও ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে উত্তরপাড়া গভর্ণমেণ্ট ইংরাজী স্কুল থেকে এণ্ট্রেন্স পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়ে বৃত্তিলাভ করেন। তার পর দুই বৎসর কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্র ছিলেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় এফ, এ পরীক্ষার পূর্ব্বেই তাঁকে নানা কারণে কলেজ ত্যাগ করে গভর্ণমেণ্ট ক্লার্কশিপ্ পরীক্ষা দিয়ে কলিকাতা টেলিগ্রাফ বিভাগে ডাইরেক্টর জেনারেলের অফিসে একটি ৫০্ বেতনের কেরাণীগিরিতে প্রবৃত্ত হ'তে হয়। এই কেরাণীগিরি কবিত্ব প্রকাশের পথে যথেষ্ট অন্তরায় হ'লেও তাঁর কবি-মনটিকে—বিকৃত ক'রতে পারেনি। কবি রামচন্দ্রের জ্ঞান-পিপাসা ছিল অসাধারণ, প্রাণ ছিল উদার। আজীবন দৈন্যের মুখোমুখী দাঁড়িয়ে জীবন কাটিয়েছেন, কিন্তু গরীব দুঃখীর উপর দরদ, বন্ধুবান্ধবদের প্রতি ভালবাসা, প্রাণখোলা হাসিতামাসা, আনন্দে উচ্ছল প্রাণটিকে শতদৈন্যের কশাঘাতেও খর্ব্ব ক'রতে পারেনি। লোকের দুঃখে নিজের দৈন্যের কথা ভুলে গিয়ে দান করতেন মুক্ত হস্তে ; আর তাঁর সেই মুক্ত হস্তের ফলে এমন ঘটনা জীবনে অনেক ঘটেছে যাতে এই আত্মভোলা কবিটিকে নিয়ে অনেক সময় সংসারের আর সকলকে ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠতে হয়েছে। সেই সকল ঘটনার উল্লেখ ক'রে প্রবন্ধের আকৃতি বাড়িয়ে লাভ নেই ; 'রাম-পদাবলী'র গোড়াতে সংক্ষিপ্ত জীবনীর মধ্যে নারায়ণ বাবু তন্মধ্যে একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করেছেন।

সমাজে শিক্ষা বিস্তারের চেষ্টা তিনি করেছেন আজীবন। কয়েক বছর আরিয়াদহ উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের সেক্রেটারীর পদে প্রতিষ্ঠিত হয়ে স্কুলটির যথেষ্ট উন্নতি সাধন করতে পেরেছিলেন। দক্ষিণেশ্বর বাংলা বিদ্যালয়েরও কার্য্যকরী সমিতির বিশেষ সদস্য পদে প্রতিষ্ঠিত থেকে ঐ স্কুলটির উন্নতির চেষ্টাও করেছিলেন যথেষ্ট।

প্রথম বয়সে কবি অনেক কবিতা লিখেছিলেন কিন্তু সেই সকল কবিতার বিশেষ কোন নিদর্শন এই 'রাম-পদাবলী'র মধ্যে নেই ; তাঁর সারা জীবনের সৃষ্টির অতি অল্প অংশই স্থান পেয়েছে এই বইখানির মধ্যে। যে সকল গান ও কবিতা এই পদাবলীর মধ্যে স্থান পায়নি আমি তার কিছু কিছু সংগ্রহ ক'রতে পেরেছি, আর সেই সংগ্রহের মধ্যে অতি সুন্দর এই ব্যঙ্গ কবিতাটী পাওয়া গেছে।—

"তারতে কি পা'রবে হরি এ সব পাতকী,
যত হাটের নেড়া হুজুক পেয়ে গোলে মালে করছে কি !
কল্‌মা ছেড়ে 'সন্ধ্যা' পড়ে হলেন এখন হাঁদুটী,
বদনা ছেড়ে নাইতে চলেন হাতে লয়ে কোষাটী।
নিতাই ভাবে মত্ত কভু তত্ত্ব রেখে Blavatsky
পাদ্রি ভায়ার চার্চ্চে যাওয়া স্বভাব রেখে সভাটী।
বনমালা চূড়া হেলা হাতে মোহন বাঁশীটি,
ব্রজাঙ্গনা অন্যমনা বলো না আর ছি ছি ছি।
কৃষ্ণ বিষ্ণু পষ্ট বলি অষ্টরম্ভা সব ফাঁকি,
মুনি ঋষির মন গড়ানো বেনিয়ানি কারসাজি।
ভারত ছাড়া ভারত কথা আরও কত শুনব' কি ;
হায়রে কপাল, নাইকো সেকাল, বেদ শোনালে মৌলভী।
গোলাম হলো রংএর সেরা সেটাও প্রাণে সয়েছি,
এখন সাতা আটা ক্রাই রেখে গ্রাপু খেলা ছেড়েছি।
সাত তুরুপে খেলে গেল, কইলে না কেউ কথাটী,
ভাবতেছি তাই একলা বসি শেষের দশা হ'বে কি !
দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘণ্টা নেড়ে কলুকে দাও ফাঁকি,
সেথা শক্ত ঘানি যাদুমণি চলবেনা চালাকি।
হরি বলে খোল বাজালে হট্টগোলে হ'বে কি,
হোঁচট্ খেয়ে দৌড়ে হরি দরগায় এসে জুটবে কি !
সেথায় নাইকে 'ওপিন্' নাইকো কোপীন, নাইকো সেথা বুজরুকী,
নইকো উঁকি, নাইকো ঝুঁকি, নাই সে পথে 'চাঁদমুখী'।

এছাড়া ব্যঙ্গ কবিতায় তাঁর একখানি ভোটের প্যাম্‌ফ্লেট পাওয়া গেছে, সেই কবিতাটীতে নিতান্ত ব্যক্তিগত আক্রমণ থাকায় এখানে স্থান দিতে পারলাম না।

"রাম-পদাবলী"র মধ্যে তাঁর নানা বয়সের বিভিন্ন ভাবধারার সমাবেশ দেখতে পাওয়া যায়, কিন্তু কোন গান বা কবিতাগুলি যে কোন বয়সের লেখা তার সঠিক প্রমাণ পাওয়া যায় না ; তাই এই আলোচনায় আমি তাঁর সেই সকল বিভিন্ন ভাব ধারারই পরিচয় দেবার চেষ্টা করবো।

প্রকৃতিকে তাঁর অধিকাংশ কবিতা থেকেই বাদ দিতে পারেন নি। কবি হৃদয়ের সূক্ষ্ম রসানুভূতি, ভাবসম্পদ ও প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যের সমন্বয়ে তাঁর গান ও অনেক কবিতা সার্থক সৃষ্টিরূপে পরিণত হয়ে উঠেছে। আর তাঁর সহজ প্রকাশভঙ্গী ও ভাষার স্বচ্ছতায় গান ও কবিতাগুলি হয়ে উঠেছে যেমন মধুর তেমনি হৃদয়গ্রাহী।

"লাজে কলি কাঁপিল, অলি বুঝি এলো।
আদরে অধর ধ'রে মধুরে চুমিল॥
নব প্রেম রাগে, মধুর সোহাগে, টুটিল সরম, ধনি
আঁখি মেলিল—
ঢল ঢল পরিমল, হেরি আঁখি ছল ছল,
অধীর ভ্রমর বুঝি পাগল হ'লো॥"

রামচন্দ্রের কবিতা ও গানে প্রকৃতির বহু জিনিস ধরা দিয়েছে, এমনিতর জীবন্তভাবে। প্রকৃতির সব কিছুরই যেন জীবন আছে মানুষের মত, সব কিছুরই যেন অনুভূতি আছে, সুখ আছে, দুঃখ আছে, আনন্দ, বিষাদ সবই আছে। একটী অতি সাধারণ প্রাকৃতিক বর্ণনা দেখুন। মানুষের বিয়ে বাড়ীতে বর এলে যেমন একটা আনন্দ-উৎসব লেগে যায়, আকাশে চাঁদ ওঠায় ফুলদের সংসারেও যেন ঠিক সেই রকম আনন্দ লেগে গেছে।—

"এলো চাঁদ, দেখ্‌লো চেয়ে, প'রে গলায় তারার মালা।
কোনে বৌ কুমুদিনী, আড়নয়নে ঘোমটা খোলা॥
বরণডালা মাথায় নিয়ে চাঁপা বড় মানুসের মেয়ে
ঝিঝিঁর স্বরে দিচ্ছে উলু, কচ্ছে কান ঝালাফালা।
বাসর ঘরে রসের কথা কইছে টগর দুলিয়ে মাথা,
হেসে আকুল চামেলি ফুল, বেহায়া বকুল, বেলা॥
লাজুক মেয়ে সেঁউতি, যুতি, মল্লিকে, আর নবমালতী,
উঁকি মেরে দেখতেছে বর পাতার আড়ে বাড়িয়ে গলা॥
ফুলবালা ফুলবধূ অকাতরে বিলায় মধু,
এলিয়ে খোঁপা কনক চাঁপা আপন ভাবে আপনি ভোলা।

সবাই আসে, সবাই হাসে, দেখে না কেউ আশে পাশে,
সরসে বিরলে ব'সে কাঁদে শুধু কমলবালা ॥"

'সংসার-দর্পণ'এ প্রকাশিত 'জীবন-স্রোত' কবিতাটীতে ক্রমপরিবর্ত্তমান জীবনের একটী সুন্দর চিত্র তিনি এঁকেছেন। এই কবিতাটীতে তাঁর জীবনের দর্শনভঙ্গী অতি সুন্দর ভাবে ফুটেছে। এক্ষেত্রেও প্রকৃতির বহু জিনিসের সঙ্গে তুলনা করে তিনি মানুষের পরিবর্ত্তনশীল জীবনকে দেখিয়েছেন ;—

"শৈশবে সরল হাসি ফুল্ল শেফালিকাদল
ভুমে পড়ি' কাঁদে লুটাইয়ে,
কৈশোরে কোমল হাসি প্রভাতের শেষ তারা
ভানুকরে গেল মিলাইয়ে।
অতৃপ্ত বাসনা বক্ষে যৌবন চমকি' চায়
জরার ভীষণ বেশ হেরি ;
আঁখি পালটিয়ে দেখে শৈশব অনেক দূরে
কাছে জরা মৃত্যু সহচরী।"

আজীবন পল্লীর বুকে বাস ক'রে পল্লীর কবি প্রকৃতির রূপ ও লীলা-বৈচিত্র্যকে জীবন-লীলার সঙ্গে একীভূত করে' নিয়েছিলেন ; প্রকৃতির মধ্যে তিনি যেন দেখতে পেতেন মানুষের জীবন-লীলার ইঙ্গিত।

শাক্ত-ভাবধারা, শাক্ত-সংস্কৃতি ও দর্শন তাঁর কয়েকটী গানের মধ্যে এমন পূর্ণভাবে বিকাশ লাভ ক'রেছে যে সেইগুলি প'ড়লে কবিকে শক্তি উপাসক বলে' মনে হয়।

Coomaraswamy তাঁর বিশ্ববিখ্যাত "The Dance of Siva." নামক পুস্তকে বাঙ্গালী শক্তি উপাসকদের নৃত্য-জ্ঞানের কথা ব'লতে গিয়ে রামচন্দ্রের একটী গানের ইংরাজি অনুবাদ ক'রে উল্লেখ করেছেন।—

"Because Thou lovest the Burning-ground,
I have made a Burning-ground of my heart
That Thou, Dark One, haunter of the—
Burning-ground,
Mayest dance Thy eternal dance.
Nought else is within my heart, O Mother :
Day and night blazes the funeral pyre :
The ashes of the dead, strewn all about,
I have preserved against Thy coming,
With death-conquering Mahakala neath—
Thy feet
Do thou enter in, dancing Thy rhythmic dance,
That I may behold Thee with closed eyes."(১)

৺ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (আমোদর শর্ম্মা) 'পাগলা ঝোরা' পুস্তকে 'কাশীবাস' নামক প্রবন্ধে কবি রামচন্দ্রকে সাধক বলে অভিহিত করেছেন। সত্যই ধর্ম্মপ্রাণ কবির আধ্যাত্মিক-তত্ত্ব জিজ্ঞাসু কবিতা ও গানগুলি পড়লে তাঁকে তত্ত্বদর্শী সাধক ছাড়া আর কিছুই বলা চলে না। বাহিক ভাবোচ্ছ্বাস নয়, কবির তত্ত্বজ্ঞানী মন মহাশক্তির সন্ধান চায়, তারি তরে তাঁর ব্যাকুলতা। আধ্যাত্মিক ভাব সম্পদে সমৃদ্ধ কবিতা ও গানগুলির মধ্যে সেই ব্যাকুলতার সুর প্রকাশ পেয়েছে অতি সহজ ভাবে। ললিতবাবু লিখেছেন—

"যে শান্তির আশায় তাপিত হৃদয় জুড়াইবার জন্য শান্তিনিকেতন আনন্দ-কানন কাশীধামে আসিয়াছিলাম তাহা মিলিয়াছে কি? চিতাগ্নির অনির্ব্বাণ জ্বালা নিভিয়াছে কি? না, রহিয়া রহিয়া অর্জ্জুনের সেই আকুল বাণী—

কিংকরোমি জগন্নাথ শোকেন দহ্যতে মনঃ।
পুত্রস্তগুণকর্ম্মাণি রূপঞ্চ স্মরতো মম ॥"

এবং সাধকের সেই গীত—

"শ্মশান ভালবাসিস বলে' শ্মশান করেছি হৃদি।
শ্মশানবাসিনী শ্যামা নাচবি বলে নিরবধি ॥

হৃদয়ের বেদনা আরও তীব্র করিয়া তুলিতেছে ?"

ললিতবাবু গানটীকে কত উচ্চে স্থান দিয়ে গেছেন সেইটী দেখাবার জন্যই আমি তাঁর ঐ কথাগুলির পুনরাবৃত্তি করলাম। গানটীর শেষের কয়লাইন 'রাম পদাবলী' থেকে তুলে দিচ্ছি ;—

"আর কিছু নাহি মা চিতে, দিবানিশি জ্বলছে চিতে,
চিতাভস্ম চারিভিতে রেখেছি মা আসিস্ যদি ॥
মৃত্যুঞ্জয় মহাকালে ফেলিয়ে চরণ তলে,
আয় মা নেচে তালে তালে, হেরি তোরে নয়ন মুদি ॥"(২)

দাবাখেলা ছিল কবির জীবনে আমোদের একটী প্রধান উপকরণ, আর এই খেলাটিতে তিনি ছিলেন পাকা ওস্তাদ। তাঁর আধ্যাত্মিক চিন্তাতেও এই দাবাখেলা অনেকখানি স্থান দখল করেছে। মহাশক্তি মহামায়া যেন সংসারে দাবার ছক্ পেতে মানুষকে নিয়ে খেলিয়ে বেড়াচ্ছেন—

"সংসারে পাতিয়ে ছক্ কেন মা গো হক্ না হক্
সতরঞ্চ এ প্রপঞ্চ খেলাও মানবে ॥"

দাবাখেলার সঙ্গে মানুষের সাংসারিক জীবন যাত্রার তুলনা করে তিনি লিখেছেন—

"মাগো, দাবা হলো অর্দ্ধাঙ্গিনী থাকে কাছে কাছে।
চারিদিকে চায় ঘর নষ্ট হয় পাছে ॥
দু'পাশেতে দুই ভাই সাদা কালা গজে।
বক্রগতি সদা শুধু পথ খোলসা খোঁজে ॥
এক গজ এক রোকা ভাল নাহি খেলে।
দু-গজ দাবার মত খেলাতে পারিলে ॥
ভাগিনা দৌহিত্র দুই ঘোড়া পাশে তার।—
ঘুপ্‌টী মেরে মারে কিস্তি রোক্‌সায় বাঁচা ভার ॥
আড়াই পদে বাড়ায় পদ কে জানে কোথায়।
গাঁয় না মানে আপনি মোড়ল বড়াই পায় পায় ॥
পিতা মাতা দুই নৌকা দু'দিকে প্রহরী।
সোজা সুজি বোঝে এরা নাইকো লুকোচুরী ॥
দুই নৌকা বর্ত্তমানে কে বল হারায়।
নাইবা রহিল দাবা কি ভয় তাহার ॥
সম্মুখে বটিকা শিশু সন্তান সকল।
প্রধান সহায় এরা অন্তিমে সম্বল ॥
ধীরে ধীরে চলে সোজা, বাঁকা দেখলেই মারে।
চালাতে পারিলে এরা সবই হ'তে পারে ॥
কভু দাবা কভু গজ কভু নৌকা হয়।
বড়ের মায়া বিষম মায়া তাইতে অতিশয় ॥
শেষ খেলায় সকল বড়ে থাকে বর্ত্তমান।
কচিৎ দেখিতে পাই হেন ভাগ্যবান্ ॥"

(১) The Dance of Siva.—পৃঃ ৮২।

(২) Ananda Coomaraswamy এই গানটীরই ইংরাজি অনুবাদ করেছেন।

দেবীস্তোত্র, নানা দেব দেবীর রূপ বর্ণনা প্রভৃতিতেও তাঁর কবিত্ব ও তত্ত্বজ্ঞানী মনের যথেষ্ট পরিচয় পাই।—

"থর থর পদভরে কাঁপে ধরা।
কার রমণী এলো অসি ধরা॥
কেরে, লোল রসনা, বিকট দশনা,
বিবসনাধনী, লাজ বিহীনা,
নবীনা ললনা, দৈত্যদলনা,
করালবদনা কালভয় হারা॥
নরকরকটি বেশ বিভঙ্গে,
বিহরিছে বামা রণ তরঙ্গে,
ভ্রুকুটিভঙ্গে, যোগিনী সঙ্গে,
দর দর অঙ্গে রুধিরধারা॥
চুম্বিতক্ষিতি চিকুরভার,
লম্বিত গলে নৃমুণ্ডহার,
ষোড়শী রূপসী রমণী সার,
হর হৃদিভার হর মনোহরা॥
চরণ সরোজ লভিবারে আসি,
পদনখে পড়ে গগনের শশী,
নিকটে থাকিতে কেনরে পিপাসী—
মন মধুকর হয়ে দিশেহারা॥

আবার কতকগুলি কবিতায় ও গানে কবির বাসনা ব্যাকুলচিত্তের চঞ্চলতা যেন এক হতাশার ভাব নিয়ে মূর্ত্ত হয়ে উঠেছে ;—

"আমার আশায় আশায় দিন ফুরালো
পাড়িতো কৈ জমিল না।"

* * * * *

"বৃথা ভবে হলো আসা,
না মিটিল মনো আশা।" ইত্যাদি।

এই যে অতৃপ্তি, এই যে অতৃপ্ত বাসনার বেদনা, পূর্ণ উপলব্ধির জন্য বাসনার ক্রন্দন, এর হাত থেকে নিষ্কৃতি বোধ হয় কোন কবিই পান নি। এই বাসনার তাড়নেই কবি এগিয়ে চলেন পূর্ণ উপলব্ধির দিকে, হয়তো উপলব্ধি হয়, হয়তো হয়না।

আবার কতকগুলি গানে মনে হয় তিনি যেন তাঁর আধ্যাত্মিক তত্ত্বান্বেষণে একটা স্থির সিদ্ধান্তে এসে পৌঁচেছেন। যেমন—

"পারিবে নাত হে নাথ, তাড়াতে এ দীন জনে।
তব প্রেমরাজ্য হতে ভরসা বেঁধেছি মনে॥"

* * * * *

বা—

"রসময় হলে হৃদয়, রসময় কি থাকতে পারে।
সে যে আপনি আসে আপনার টানে
ডাকতে কভু হয়না তারে॥" ইত্যাদি।

নলিনীগুপ্ত মহাশয় যে বলেছেন,—"শিল্পীর মধ্যে শিল্পী ও সাধক ওতপ্রোত হয়ে আছে। শিল্পীর স্থির সমদৃষ্টিতে সর্ব্বভূতস্থ সৌন্দর্য্য যেন একই আদর্শের মধ্যে অপক্ষপাতে প্রতিবিম্বিত। কিন্তু শিল্পী এই স্থির নির্ম্মল অপক্ষপাত দৃষ্টি যে পেয়েছেন, এক হিসাবে তার কারণ তাঁর চেতনার ঊর্দ্ধায়িতগতি—যার প্রেরণায় তিনি স্বল্পে তুষ্ট নন। ক্রমেই চেয়ে চলেছেন উচ্চতরকে, বৃহত্তরকে, গভীরতরকে।" তাঁর এই কথা কয়টী কবি রামচন্দ্রের উদ্দেশ্যে অনায়াসেই প্রয়োগ করা যেতে পারে।

রামচন্দ্র একদিকে যেমন শক্তির উপাসক, অন্যদিকে তেমনি প্রেমিক কবি। তাঁর চরিত্রে শাক্ত ও বৈষ্ণব ভাবধারার একটী অপূর্ব্ব সমাবেশ চোখে পড়ে। এখানে সত্যান্বেষী কবি প্রেমের দ্বারা সত্যের সন্ধান চান, মনে প্রাণে অনুভব করতে চান প্রেমকে। বিশ্বের সকল বৈচিত্র্যকেই ভগবানের প্রেমলীলা বলে অনুভব করা, সসীমের মধ্যে অসীমকে উপলব্ধি করা, প্রেমের অন্তে সেই রসময়ের সন্ধান পাওয়া, বৈষ্ণব ধর্ম্মতত্ত্বের এই মূল কথাগুলি অতি সুন্দরভাবে প্রকাশ পেয়েছে তাঁর কয়েকটী লাইনের মধ্যে।—

"প্রেমে রয় না ভেদ জ্ঞান, স্থান কি অস্থান,
প্রেমে জল কি অনল, সুধা, গরল সকল হয় সমান,
প্রেমে মান অপমান জ্ঞান থাকেনা,
সমান ভাব তার সব সময়।
প্রেমযুক্তি জানে না, প্রেম মুক্তি মানে না,
নিক্তি ধরে ছোট বড় ওজন করেনা,
প্রেমে পাপ পুণ্য সমান গণ্য,
করে সুখে দুখে সমন্বয়।
প্রেমের ধর্ম্ম চমৎকার, মর্ম্মবোঝা ভার,
প্রেমে জড়েতে চৈতন্য দেখে, আলোকে আঁধার,
প্রেম নিরাকারে আকার দেখে,
আবার সাকার দেখে শূন্যময়।
প্রেমের জন্মধরাতে, ধরা দেয়না ধরাতে,
প্রেম বিরাট ব্রহ্মাণ্ড দেখে ধূলি মুঠিতে,
প্রেম বিন্দুমাঝে সিন্ধু দেখে,
বিশ্ব দেখে ব্রহ্মময়।......"

উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে বাংলা কাব্যে বৈষ্ণব ভাবধারার পুনরভ্যুত্থান হয়েছিল, তার প্রমাণ তখনকার প্রায় সকল শক্তিশালী কবির মধ্যেই দেখতে পাওয়া যায়। সেই সহজ-মধুর প্রেমানন্দেভরা বৈষ্ণবভাব রামচন্দ্রের অনেক গানে মিশে আছে ওতপ্রোতভাবে। বৈষ্ণব কবিদের কাব্যের মধ্যে শ্রীরাধিকার অভিসারের চিত্র আপনারা অনেক দেখেছেন, কবি রামচন্দ্রের কাব্যেও সেই চিত্র কেমন সুন্দর ভঙ্গীতে ফুটে উঠেছে ;—

"সঘন গগন ঘন গরজে গভীরে,
দমকে দামিনী, প্রাণ সভয়ে শিহরে,
চলিল কমলিনী রাই অভিসারে।
নীল নিচোল ভাল মিশিল তিমিরে,
সজল জলদজাল কুন্তল ভারে,
উজলি রূপছটায়, স্থির বিজলী ধায়
মিশিতে জলদ গায়, কে তায় নিবারে॥"

আবার বৈষ্ণব কবিদের ঢঙ ও ভঙ্গী বজায় রেখে তিনি যে সকল পদের সৃষ্টি করে গেছেন সেগুলি বৈষ্ণব কবিদের ঢংএ লেখা হ'লেও তাঁর নিজস্বতা আছে যথেষ্ট। শ্রীরাধিকা ও শ্রীকৃষ্ণের যুগল মিলনের একটী সম্পূর্ণ চিত্রে কবি তাঁর যে সৃষ্টি নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন তাতে তাঁকে সেই যুগের শক্তিশালী শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব কবিদের অন্যতম বলে ধরে নিলে বাহুল্য হ'বে না। পদটী অনেক বড়, এখানে সবটুকু তুলে দেওয়া সম্ভব নয়, তাই শ্রীরাধিকা যখন বাঁশীরব শুনে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে মিলনের আশায় যাত্রা করছেন শুধু সেই অংশটুকু তুলে দিচ্ছি।—

"কিবা শ্রীমুখমণ্ডল, শ্রুতিমূলে কুণ্ডল,
দিল মৃগমদ তিলক ভালে,
তাহে খঞ্জন-গঞ্জন, নয়ন রঞ্জন দিল অঞ্জন নয়ন কোলে।
তখন ধাওল ধনি, চন্দ্রবদনি, মঞ্জুকুঞ্জ কাননে,
অঞ্চল চির চঞ্চল, ধীর মন্দ মলয় পবনে।
সঙ্গেতে সঙ্গিনী নবরস রঙ্গিনী ভেটিতে চলিল ত্রিভঙ্গে,
ঘুঙুর রুনু রুনু, কটিতটে কিঙ্কিনী রুনু রুনু বাজিল সুরঙ্গে ;

কিবা গল্লিত গতি, মন্থর অতি, কুঞ্জরবরগামিনী,
পদ পঙ্কজে মণিমঞ্জির তাহে মত্তমধুপ গুঞ্জিনী।
তখন চলিল ধনি। (বাঁশীরব ধরি)"

পদটীর মধ্যে শ্রীরাধার ভাব-বিহ্বলতা এমন সুন্দরভাবে প্রকাশ পেয়েছে যা প'ড়লে মুগ্ধ হ'তে হয়।

"পাছে বাঁশী না শুনিতে পায়, নূপুর খুলিল পায়,
কটি হ'তে খুলিল কিঙ্কিনী।"

এমনিতর সুন্দরভাব ও কবির রস দৃষ্টির গভীরতায় পদটী যেমন প্রাঞ্জল, তেমনি মর্ম্মস্পর্শী।

রামচন্দ্র সে সময় পাঁচালী, কবির গানও লিখেছিলেন অনেক; তাঁর সেই সকল গানের একটী নিদর্শন আছে ১৩০৩ সালে প্রকাশিত অঘোরনাথ মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত "গীত-রত্নমালা" পুস্তকে। শ্রদ্ধেয় কেদারনাথের 'গুপ্তরত্নোদ্ধার' সঙ্কলনে রামচন্দ্র সাহায্য করেছিলেন যথেষ্ট, উক্ত পুস্তকের অবতরণিকায় কেদারবাবু সে কথায় উল্লেখ করেছেন।

'রামপদাবলী'র প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হ'লে সে সময় বইখানির দেশে আদর হয়েছিল। নারায়ণবাবু দ্বিতীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপনে লিখেছেন;—"তৎ সময়ে সমগ্র বঙ্গদেশে, এমন কি ভারতবর্ষের যে যে স্থানে বাঙ্গালীরা বাস করেন, সেই সমুদায় স্থানে এবং তদানীন্তন বিশিষ্ট বিশিষ্ট সংবাদপত্রে ঐ গীতগুলির অত্যধিক আদর হইয়াছিল। Bengali Indian Mirror, Amrita Bazar Patrika, বঙ্গবাসী, হিতবাদী প্রভৃতি তৎসাময়িক সংবাদপত্রগুলি গীতগুলির সুদীর্ঘ সমালোচনা করতঃ একবাক্যে মুক্তকণ্ঠে রামবাবুর যশোকীর্ত্তন করিয়াছিল।"

রামচন্দ্রের বহু সঙ্গীত বাঙ্গালা দেশের দূর পল্লী অঞ্চলের ও সহরের অনেক লোকের মুখে এখনও গীত হ'তে শোনা যায়।

শেষ বয়সে কবির সাংসারিক জীবনে শান্তি ছিল না। পূর্ব্বেই বলেছি—দানে তিনি ছিলেন মুক্তহস্ত। আর সেই মুক্ত হস্তের ফলে শেষ বয়সে বহু টাকার ঋণ জালে জড়িয়ে পড়ায় সাংসারিক অশান্তি ও মনঃকষ্টের অবধি ছিল না। কিন্তু যতই কষ্ট হোক কবির মনটী ছিল সতেজ, আর জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত জ্ঞান-পিপাসা ছিল প্রবল; দৈন্য তাকে ভয় দেখিয়ে বিহ্বল করতে পারেনি; এমন কি মৃত্যু ভয়কেও জয় করেছিল তাঁর জ্ঞান-পিপাসা।

ইং ১৯০৩ খৃঃ ৩রা সেপ্টেম্বর রাত্রি পৌনে দশটার সময় ৪৫ বৎসর বয়সে তিনি জ্বররোগে মানবলীলা সম্বরণ করেন। মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে তাঁর বন্ধু আরিয়াদহ নিবাসী ৺শরৎচন্দ্র মিত্র জিজ্ঞাসা ক'রেছিলেন, "রাম তুমি ভাবছো কি? তোমার কি যন্ত্রণা হ'চ্ছে?" কবি সেই মৃত্যুর সামনা সামনি দাঁড়িয়েও যা জবাব দিয়েছিলেন তাতে বিস্মিত হতে হয়।—"Sarat, don't disturb me, let me see how death comes......"

বর্ত্তমান রসিক পাঠক সমাজে রামচন্দ্রের কবিপ্রতিভা অজ্ঞাত হ'লেও যাঁরা তাঁর কবিত্ব শক্তির পরিচয় পেয়েছিলেন তাঁরা আজও তাঁকে ভুলতে পারেন নি; তিনি আজও তাঁদের মনে বেঁচে আছেন তাঁর সেই উদার কবি-প্রাণ নিয়ে।

একদিনের চিত্র

কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায়

প্রভাত হইতে আজ অবিরাম বৃষ্টিধারা ঝরে
সূর্য্যের পাইনা দেখা, কে জানে সে কোথায় সন্তরে।
পারে নি কি পার হ'তে? গাছপালা সব মুহ্যমান
করুণার আতিশয্যে তাহাদের কণ্ঠাগত প্রাণ।
নগরে সকল গৃহ-প্রাচীরের মুদিত লোচন
গৃহের কপোত শুধু কড়ি ফাঁকে করিছে কূজন,
আর কোন পাখী যেন নাই এই সমগ্র জগতে,
পথে নাই লোকজন। কুকুরেরো দেখা নাই পথে।
রিকস ও মোটর চলে মাঝেমাঝে আগাগোড়া ঢাকা,
মাঝেমাঝে হাঁটুজলে তাহাদের ডুবে যায় চাকা।
কেবল কেরাণীকুল খালি পেটে এক হাঁটু জলে
বাঁ হাতে কাপড় তুলি, জুতা জোড়া দাবিয়া বগলে
আনন্দবাজারে মোড়া, চলিয়াছে মেলি জীর্ণ ছাতা।
ঝি চলেছে বাড়ী বাড়ী গামছায় বাঁচাইয়া মাথা।
বাজার ভেসেছে জলে। আনাজের বহিয়া পশরা
পশারিণী এসেছিল, চোখ দুটি তার অশ্রু ভরা,
আশ্রয় নিয়েছে কাছে সিক্তবাসে মুদীর দোকানে
কেমনে ফিরিবে তাই ভাবে ব'সে চাহি মেঘপানে।
ফেরিওলা ব'সে আছে আপনার কুটীরের কোণে
দিন আনে দিন খায়, ক্ষুণ্ণ হ'য়ে ভাবে মনে মনে
আজি ভাগ্যে আনাহার। কোলে ধরি চানাচুর ডালি
চানাচুরওলা ভাবে তাজা ভাজা বিকাবে না কালি
সবই ত মিহায়ে গেল। কামারের অগ্নিকুণ্ডপাশে
চামার আশ্রয় নিয়ে খালি পেটে ব'সে ব'সে কাসে।
দোকানে খদ্দের নেই, আধখানি দ্বার তার খোলা।
রোয়াকে বসিয়া আছে ক্ষ্যাপা তার লয়ে ঝুলি ঝোলা।
যত গাড়ীবারেন্দায় জুটিয়াছে ভিখারীর দল
যত বেলা বাড়ে তত ক্ষুধা বাড়ে—বাড়ে কোলাহল।
আজিকে এমন দিনে, দূর দূরান্তরে শুধু ধায়
উদাসী কল্পনা মোর, কবিতা লিখিতে সাধ যায়।
কিন্তু লিখি কি বিষয়ে? লিখিবার বিষয় ত চাই।
যা দেখিনু লিখিনু তা সোজাসুজি মাথামুণ্ডু ছাই।
ভুগিতে হয়না কিন্তু আপনারে যখন দুর্ভোগ
পরের দুঃখের কথা লিখিবার সেইত সুযোগ।
কবিতা বলে না এরে, পদ্য ময়, নয় ইহা গীতি।
বাদলা দিনের এটি এলো মেলো ছন্দে গাথা স্মৃতি!

প্রার্থিনী

(নাটিকা)

শ্রীসমরেশচন্দ্র রুদ্র এম-এ

[খ্যাতনামা চিত্রকর পার্থসারথির নিজগৃহস্থিত অঙ্কন-প্রকোষ্ঠ। পার্থ অদূরে দণ্ডায়মানা এক ভিখারিণীর ছবি আঁকছে। নিকটে এক চেয়ারে উপবিষ্ট একটি মহিলা। সমস্ত নিস্তব্ধ। এমন সময় বাইরের দিকের দরজায় টোকা পড়ল। পার্থ এগিয়ে গিয়ে একখানা কপাট সামান্য আড় করে বাইরে কাকে জিজ্ঞেস করলে]

পার্থ। কে? (উত্তর শুনে) সঙ্গে করে তাঁকে এখানে নিয়ে এস। (দরজা বন্ধ করে মহিলার প্রতি) এসেছে, তুমি যাও।

মহিলা। (ভিখারিণীর দিকে একবার তাকিয়ে পার্থের প্রতি) কিন্তু—

পার্থ। কোনও কথা নয়, যাও এখন। (মহিলাটি অন্য-দিকের দরজা দিয়ে বেরিয়ে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিলে) তুমি যেমন আছ, তেমন থাক, চঞ্চল হয়ো না। আমি আর একটু কাজ এগিয়ে নিই। (তাড়াতাড়ি তুলি চালাতে লাগল। আবার দরজায় টোকা পড়ল। দরজা সামান্য খুলে) এই যে মণিময়, এস এস।

মণি। (প্রবেশ করতে করতে) এই তোমার ষ্টুডিও?

পার্থ। (দরজা বন্ধ করে দিয়ে) হাঁ। কাল পৌঁছেচ শুনেই তাড়াতাড়ি ফোন করলুম; না হলে বোধ হয় আসতে না।

মণি। (চারদিক দেখতে দেখতে) তা কি কখনও হয়। তোমার এখানে না এসে পারি? চমৎকার তো সব করেছ দেখছি। আর্টিষ্টের প্রয়োজনীয় দ্রব্যের কোনও ত্রুটি রাখনি। (হঠাৎ ভিখারিণীর দিকে চোখ পড়াতে সবিস্ময়ে) একি!

পার্থ। (সামান্য হেসে) এমন কিছু নয়, একটা সৃষ্টি হচ্ছে। তারপর ওখানে রিসার্চের কাজ কেমন চলছে বল।

মণি। (ভিখারিণীকে লক্ষ্য করতে করতে) ভাল। তারপর তোমার সব খবর ভাল তো?

পার্থ। হাঁ। কিন্তু তুমি দাঁড়িয়ে রইলে যে, বস।

মণি। বসছি। (মৃদু স্বরে) দেখ, কাপড়-চোপড় দেখে এ ভিখিরীটির তো অবস্থা বড় খারাপ বলে মনে হচ্ছে।

পার্থ। (সাধারণ স্বরে) নিশ্চয়, খারাপ বৈকি,. না হলে কি আর ভিক্ষে করে। (সামান্য হাসিমুখে) কিন্তু তোমার চুপি চুপি কথা বলার প্রয়োজন হবে না, সহজভাবেই বল— ও কালা।

মণি। (আশ্চর্য্য হয়ে) কালা?

পার্থ। হাঁ, চীৎকার করে না বললে শুনতে পায় না।

মণি। কিন্তু দেখতে তো বেশ ভাল বলেই মনে হচ্ছে।

পার্থ। তা হবে। তুমি বস, তোমার সঙ্গে গল্প করতে করতে কাজ চালাই। ওকে আবার ছেড়ে দিতে হবে কিনা সময় হলে।

মণি। ও—আচ্ছা, আরম্ভ করনা।

(পার্থ আঁকতে লাগল)

(চেয়ারে বসে) কিন্তু তুমি আর্টিষ্ট, তোমার চোখে পড়ল না, আশ্চর্য।

পার্থ। কি?

মণি। মেয়েটি দেখতে ভাল, এটা।

পার্থ। (সামান্য হেসে) বিশেষ তেমন কিছু দেখতে পাচ্ছি না, কি করি বল।

মণি। ভিখিরী, ভাল করে খেতে পরতে পায় না, তাই হয় তো তোমার চোখে লাগছে না, না হলে ভাল করে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে জামাকাপড় পরিয়ে দিলে সকলকেই একে সুন্দরী বলে মানতে হবে।

পার্থ। (ছবির দিক থেকে মুখ না ফিরিয়ে) তা হবে।

মণি। একে পেলে কোথায়?

পার্থ। রাস্তায়, আবার কোথায়।

মণি। ডাকিয়ে আনালে বুঝি?

পার্থ। হাঁ।

মণি। ও আসতে ভয় করলে না? বাড়ীতে কোন মেয়েছেলে নেই।

পার্থ। ওদের আবার ভয়! তাছাড়া বাড়ীতে তো আমার চাকরাণী আছে।

মণি। কত দেবে বলেছ?

পার্থ। চার আনা।

মণি। মাত্র চার আনা! কতক্ষণের জন্যে?

পার্থ। দু ঘণ্টার জন্যে।

মণি। আশ্চর্য! দুঘণ্টা এমনভাবে দাঁড় করিয়ে রেখে চার আনা!

পার্থ। ওই যথেষ্ট। ও দুঘণ্টা ভিক্ষে করে বেড়ালে কত পেত বলতো।

মণি। আর্টিষ্ট তোমরা—তোমরাও যদি এমন ব্যবসাদার হও—

পার্থ। আমাদের সম্বন্ধে হতাশ হয়ে পড়লে। কি করি ভাই বল। যে রকম বাজার পড়েছে, তাতে—

মণি। আর কতক্ষণ তোমার বাকী?

পার্থ। আর আধ ঘণ্টা। তোমাকে একটু চা দিতে বলিনা?

মণি। না না থাক, সে এখন পরে হবে। তুমি কাজ সেরে নাও।

পার্থ। আচ্ছা, লক্ষ্ণৌতে তোমার প্রায় একবছর কাটল, না? আজ একবছর পরে আবার তোমার সঙ্গে দেখা। চিঠি-পত্র এত কম দিতে কেন বলতো। তোমার বাবাও তো এই

কথা বলেন। তাছাড়া আর একটা বিষয়ের কি করছ, বয়স তো আর কমছে না?

মণি। তুমিই বা কি করছ শুনি।

পার্থ। আমার কথা ছেড়ে দাও। না মণি না, একটু তাড়াতাড়ি ব্যবস্থা কর, না হলে চম্পকাঙ্গুলিকে পাকা চুল তুলতে হলে বড় লজ্জায় পড়তে হবে। বলতো খোঁজ করি। আমাদের আর্টিষ্টের চোখের কিছু মূল্য আছে, তা তো তুমি স্বীকার কর? অবশ্য এই ক্ষেত্রের মতদ্বৈধের কথাটা বাদ দাও।

মণি। দেখ, আমি একটা কথা ভাবছি।

পার্থ। কি বল।

মণি। আচ্ছা—হাঁ—দেখ, এ কোন চাকরী করতে রাজী হবে না?

পার্থ। কেন হবে না? পেলে তো বেঁচে যায়। তবে কে দেবে, সেইটাই ভাববার কথা। তবে তুমি যদি তোমাদের বাড়ীতে—

মণি। না না, আমি তা বলছি না; তবে অন্য কারুর বাড়ীতে যদি ব্যবস্থা করে দেওয়া যায়—

পার্থ। সেটা কি সম্ভব হবে? অজানা অচেনা ওকে অন্য লোকে রাখতে চাইবে কেন?

মণি। তা বটে।

পার্থ। আমি বলি কি, তোমাদের বাড়ীতেই রাখ। কতজন রয়েছে সেখানে, আর একজনের জায়গা হবে না?

মণি। তা—আচ্ছা, একবার বাবাকে—

পার্থ। তাঁকে আমি বলব এখন। তুমি এখন দেখেশুনে নাও, যাতে পরে অচল বলে মনে না কর।

মণি। না না, অচল আর কি। তবে ওর আত্মীয়স্বজন যদি—

পার্থ। ওর আবার আত্মীয়স্বজন! সে আমি যা বলব, তাই হবে।

মণি। তোমার সঙ্গে চেনাশোনা আছে বুঝি?

পার্থ। কিছু কিছু।

মণি। এর আগেও বুঝি দুচারবার এসেছে?

পার্থ। হাঁ, কয়েকবার এসেছে।

মণি। ও। (একটু চুপ করে থেকে সামান্য দ্বিধাভরে) আচ্ছা, ওর স্বামী নেই?

পার্থ। নেই, তবে বোধ হয় খুঁজছে।

মণি। কি করে জানলে তুমি?

পার্থ। হালচাল দেখে মনে হয়।

মণি। (চিন্তিতভাবে) হুঁ, কিন্তু তোমার কাজ শেষ হল?

পার্থ। হল, একসঙ্গে দু'কাজই হল।

মণি। তার মানে?

পার্থ। তার মানে বুঝিয়ে দিচ্ছি। (বলে যে দরজা দিয়ে মহিলাটি বেরিয়ে গেছল, সেই দরজায় টোকা দিয়ে ডাকল) সুরমা, বেরিয়ে এস।

মণি। (বিস্মিত হয়ে দাঁড়িয়ে উঠে) পার্থ, কাকে ডাকছ?

পার্থ। (মুখ ফিরিয়ে হাসিমুখে) আমার স্ত্রীকে।

মণি। তোমার স্ত্রী! তুমি বিয়ে করেছ নাকি?

পার্থ। মার্জনা ভিক্ষা করছি, অপরাধটা তোমার অজ্ঞাতে সংঘটিত হয়েছে।

(পূর্বোক্ত মহিলাটি অর্থাৎ সুরমা দরজা খুলে বেরিয়ে এল) এই দেখ, সত্যিই আমার স্ত্রী, শ্রীমতী সুরমা। সুরমা, ইনি আমার বহুকথিত বন্ধু শ্রীযুক্ত মণিময়। (পরস্পরের নমস্কার) (ভিখারিণীকে দেখিয়ে) আর ইনি, শ্রীমতী ভিখারিণী—নেমে এস বরাননে—আমার প্রিয়ানুজা নারীরত্ন কুমারীরাণী সুপ্রভা। একটা সৃষ্টির সুযোগ দিচ্ছিলেন আমাকে, যাও লক্ষ্মী, চটপট কাপড়টা পাল্টে এস। (সুপ্রভার ক্ষিপ্রগতিতে প্রস্থান, মণিময় হতভম্ব) ব্যাপারটা কি কিছু গোলমেলে লাগছে মণি?

মনি। তুমি—এসব—

পার্থ। অতি জটিল অথচ সহজ ব্যাপার, বস, পরিষ্কার করে বলছি। (মণিময়ের হাত ধরে চেয়ারে বসিয়ে সুরমার প্রতি) যাও তুমি, এবার খাবার টাবার নিয়ে এস। সুপ্রভাকেও তাড়া দাও, চট করে আসুক, ক্ষণিক অদর্শনে চিত্ত যে বিশৃঙ্খল হয়ে পড়বার জোগাড়।

সুরমা। (হাসিমুখে) কার?

পার্থ। দেখ ভাই, দেখ কাণ্ড। কোথায় লজ্জায় বেপথু-মতী হবেন, না বলেন কার! আরে বাপু, আমার, যাও ধরে নিয়ে এস।

সুরমা। উনি পালাবেন না তো?

পার্থ। সে পথ কি আর ভিখিরী মেয়েটি রেখেছে! বন্ধুবর চাকরী দিয়ে বসে আছেন যে, এখন দিয়েই তো আর সঙ্গে সঙ্গে বরখাস্ত করা যায়না।

সুরমা। যাই আমি, নিয়ে আসি।

পার্থ। যাও, চটপট।

(সুরমার প্রস্থান)

তুমি এসেছ শুনে ভাবলুম, পরিণয়শৃঙ্খলে এবার তোমাকে না বেঁধে আর ছাড়চি না। আমার শ্যালিকাটিকে তোমাকে দেখানর কথা তোমার বাবার সঙ্গে আগেই আমার হয়ে গেছে। ইণ্টারমিডিয়েট আর্টসে এবার পাশ করেছে; আমার শ্বশুর একজন শেয়ারডিলার, ব্যবসা করে কিছু পয়সা করেছেন। অতএব আপত্তির আর কিছু থাকতে পারেনা।

মণি। তুমি মস্ত বড় ফন্দিবাজ হয়েছ দেখছি।

পার্থ। তা যাই বল, কিন্তু গবেষণাটা কেমন হয়েছে বল দেখি, তুমি তো ইতিহাসের গবেষক—পাত্রী-প্রদর্শনের ইতিহাসে এর চেয়ে বেশী অভিনব ব্যাপার আর কিছু হয়েছে বলতে পার?

(সুরমা ও সুপ্রভার প্রবেশ। চাকর চায়ের সরঞ্জাম এনে দিয়ে চলে গেল)

এখন ভিখিরীর পারিশ্রমিকটা তো দিতে হয়, তখন তো পারিশ্রমিকের পরিমাণ শুনে তুমি আমার সম্বন্ধে হতাশ হয়ে পড়েছিলে, এখন কি দেওয়া যায় বল।

মণি। (লজ্জায়) ওকথা আর কেন।

পার্থ। তুমি বলছ, ওকথা আর কেন, কিন্তু পাওনাদার

তো আমাকে ছাড়বেনা ; শ্রীমতী এবার তোমার শেষ দক্ষিণা বলে তোমাকে আর সামান্য চার আনা দিলুম না, একটি মণি দিচ্ছি, ভাঙ্গিয়ে নিও, সারাজীবন চলে যাবে।

(সুরমা চা দিলে)

কিন্তু একটা কাজ বাকী রয়ে গেল যে মণিময়।

মণি। কি ?

পার্থ। শুনলে তো কালা, কিন্তু কেমন কালা তা তো বাজিয়ে নিলে না ?

মণি। কি বলছ সব !

পার্থ। বলছ নয়, অবশ্য প্রয়োজন, কি বল সুরমা ?

সুরমা। হাঁ, কেমন কালা, তা একটু দেখে নেওয়া ভাল।

পার্থ। কেন দ্বিধায় থাকবে বাপু, দেখে নাও। সুপ্রভা !

(সুপ্রভা অবনতমুখে নিরুত্তর)

চাকরীর মূল্য বোঝ না বুঝি সুপ্রভা, উত্তর দাও। সুপ্রভা !

সুপ্রভা। কি বলছেন।

পার্থ। আমি আস্তে এবং জোরে তিনটি কথা বলব, তুমি পুনরাবৃত্তি করে ভদ্রলোককে জানিয়ে দাও, তুমি লম্বকর্ণ না হলেও সকর্ণ। বল, (আস্তে) তুমি

সুপ্রভা। তুমি

পার্থ। (অল্প জোরে) মোর

সুপ্রভা। মোর

পার্থ। (বেশী জোরে) প্রিয়তম।

(সুপ্রভা লজ্জায় পড়ে গেল, সকলে হাসতে লাগল)

যবনিকা

—মন্দ না !

শ্রীনরেন্দ্র দেব

সবাই বলে সুন্দরী সে—
আমার চোখেও মন্দ না !
রূপের দীপে দীপ্ত না হোক
দেখতে ভালই, মন্দ না !
পদ্ম-পলাশ নয় যদিও,
নয়ন নেহাৎ মন্দ না !
বুদ্ধি-শিখা উজল আঁখি
চাউনি চোখের মন্দ না !
চশ্‌মাখানির ফ্রেমটি ভাল
নূতন ঢঙের মন্দ না !
দুল দুটি তার দোলায় হৃদয়
টিপটি লাগে মন্দ না !
'আই-ব্রাউ' সে আপনি রচে
তুলির টানে মন্দ না !
পাতলা পেলব অধর পুটে
লালচে আভা মন্দ না !
গাল দু'টিতে দাড়িম-ভাঙা
রংটি লাগে মন্দ না !
হাসির স্বরে বকুল ঝরে
দাঁতগুলি তার মন্দ না !
প্রসাধনের আর্ট সে জানে
চুলটি বাঁধে মন্দ না !
খোঁপায় গোঁজে চাঁপার কুঁড়ি,
ফুলের বেণী মন্দ না !

রং বে-রঙের রঙীন ব্লাউস্
শাড়ীর ম্যাচে মন্দ না !
আঁচলখানি শিল্প-শোভন
ছড়ায় পিঠে মন্দ না !
গলায় সরু সোনার চেনে
সূক্ষ্ম লকেট মন্দ না !
চুড়ির কোলে চিকণ কাঁকন
আংটি হাতের মন্দ না !
নিবিড় কেশে অঙ্গে বেশে
সুগন্ধ বয় মন্দ না !
গাইতে জানে সব রকমই
সেতার বাজায় মন্দ না !
বন্ধুরা দেয় বিদুষী নাম
শিক্ষিতা সে মন্দ না !
সীবন বয়ন শিল্পে কুশল
আঁকার হাতও মন্দ না !
অশ্রু হাসির উভয় সভায়
সঙ্গিটি তার মন্দ না !
মজ্‌লিশী সে রসিক হলেও
সরম ভরম মন্দ না !
জমিয়ে তোলে চায়ের আসর
বাক্‌পটুতায় মন্দ না !
নিজের হাতের তৈরি খাবার
দেয় যা খেতে মন্দ না !

গৃহস্থালির কার্য্যে নিপুণ
গিন্নীপনায় মন্দ না !
গুছিয়ে চালায় সংসারটি
অল্প আয়ে মন্দ না !
দুঃখ পরের সইতে নারে
মনটি কোমল মন্দ না !
সত্য বলার সাহস আছে
মিছাও বলে মন্দ না !
কঠিন কাজে এগিয়ে যাবার
উৎসাহ দেয় মন্দ না !
ক্ষতির ক্ষণেও সম্ভাষণে
সান্ত্বনা পাই মন্দ না !
আপদ্ কালে অভয় দানে
সাহস আনে মন্দ না !
নিদ্রা হারা রোগের রাতেও
শুশ্রূষা তার মন্দ না !
রাগলে দেখি আগুন যেন
মুখটি রাঙায় মন্দ না !
অভিমানের আষাঢ় মেঘেও
বাদল ঝরে মন্দ না !
স্বর্গ মর্ত্ত্য একত্র মোর
প্রিয়ার মাঝেই মন্দ না !
মিত্র সখী সচিব আমার
সঙ্গিনীটি মন্দ না !

ভারতের কারখানা-শিল্প

শ্রীকালীচরণ ঘোষ

রক্ষণ-শুল্ক—লৌহ

লোহা ইস্পাত-জগতের এক বড় শিল্প এবং লোহার প্রয়োজনীয়তা বা ব্যবহারের কথা বেশী লিখে বোঝাবার কোন দরকার নেই। যারা মাহেঞ্জোদোরো হরাপ্পার সভ্যতা গ'ড়ে তুলতে পেরেছিল, যারা দামাস্কাসের প্রসিদ্ধ তরবারির জন্য ইস্পাত যোগাতো, যাদের দিল্লীর অশোকস্তম্ভ 'অশোকের' কীর্ত্তি প্রকাশ করুক আর নাই করুক, ইস্পাত ও মিশ্রিত ধাতু সম্বন্ধে ভারতবাসীর প্রাচীন ও অসাধারণ জ্ঞানের পরিচয় দিয়েছে তারা নতুন ক'রে কারখানা শিল্পে সমৃদ্ধ ও কৃতকার্য্য হয়েছে ১৯০৮ সালে। ১৯২৪ সালে (The Steel Industry Protection Act 1924) রক্ষণ শুল্ক ব'সে বিদেশীর প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে একে অনেকটা রক্ষা ক'রেছে। তা ছাড়া ১৯২৪ সালে ৩০শে সেপ্টেম্বর থেকে প্রতি টনে ২০ টাকা ক'রে সরকারী সাহায্য (bounty) দেবারও ব্যবস্থা হ'য়েছিল। আমদানি করা মালের দাম কম হওয়ায় এখানকার মাল প্রতিদ্বন্দ্বিতায় টিকতে পারে নি। সুতরাং এই সাহায্য (bounty) না এলে হয়ত কেবল রক্ষণ শুল্ক এই শিল্পকে প্রথম ধাক্কায় বাঁচাতে পারত না। ১৯২৭ সালে এই (bounty) রদ করা হয় (The Steel Industry Protection Act 1927)। রক্ষণ শুল্ক হিসাবে আমদানির ওপর ১৯৪০-৪১ সালে ৫০ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা সরকারী তহবিলে জমা হয়েছে।

এ দেশে লৌহ ইস্পাত ও অন্যান্য খনিজ শিল্পের প্রসার না হওয়া খুবই অস্বাভাবিক। প্রচুর আকরিক প্রস্তর বা প্রস্তর মাক্ষিক রয়েছে, অফুরন্ত কয়লা রয়েছে, সস্তায় মজুর ও বিশাল বাজার রয়েছে, সুতরাং এ শিল্প সমৃদ্ধ না হওয়াতে আমাদের দোষ বা অজ্ঞতা যে খুব বেশী পরিমাণে দায়ী নয়, এই আমাদের সান্ত্বনা।

লৌহ শিল্প সম্বন্ধে অনেক কথা লেখা যেতে পারে, কিন্তু এখনকার দিনে মাসিক পত্রিকায় স্থান সঙ্কীর্ণতার জন্য সব সম্ভব হ'ল না।

লৌহ ইস্পাত প্রস্তুত কার্য্যে ভারতবর্ষ আজ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করছে ; প্রথম United Kingdom। এ পর্য্যন্ত ৩৬০ কোটী টন অত্যুৎকৃষ্ট ores বা আকরিক লৌহের সন্ধান পাওয়া গেছে বিহারের সিংহভূম পালামৌতে, উড়িষ্যার কেঁওঝর ও ময়ূরভঞ্জে এবং মহীশূরে বাবা বুদন পর্ব্বত প্রদেশে। তার পর নিত্য নূতন সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে। সম্প্রতি মাদ্রাজের স্থানে স্থানে খুব ভাল ore-এর সন্ধান মিলেছে। আকরিক লৌহ হতে খাঁটী লৌহ স্বতন্ত্র করবার জন্যে ভারতবর্ষে বড় তিনটি কোম্পানী চার যায়গায় কারখানা রেখে কাজ করছে, বাঙ্গলা, বিহার ও মহীশূরে। তা ছাড়া অজস্র ছোট বড় কারখানা গ'ড়ে উঠেছে স্বল্প পরিমাণ লৌহ নিষ্কাসনে ও নানারূপ লৌহজাত দ্রব্যাদি প্রস্তুত করতে। দরকার ছিল খুব, কারণ লৌহজাত এই সকল মাল, যন্ত্রপাতি, কলকব্জা, চাদর, পেরেক, স্ক্রু, বাড়ী, পুল তৈয়ারীর কড়ি বরগা girder প্রভৃতি আমরা আমদানি করছিলাম প্রতি বৎসর ৬০ হ'তে ৭০ কোটি টাকার। এখনও বন্ধ না হ'লেও অনেক কমেছে, অর্থাৎ ১৯৪০-৪১ সালে ১০ কোটি ২২ লক্ষ টাকায় দাঁড়িয়েছে। ১৯৩৯-৪০ সালে ভারতবর্ষে pig iron ১৮ লক্ষ ৩৮ হাজার টন, steel ingots ১০ লক্ষ ৭০ হাজার টন এবং finished steel হ'য়েছে ১০ লক্ষ ৬৬ হাজার টন। মনে করা যেতে পারে যেন একটা প্রকাণ্ড ঘুমন্ত দৈত্য বা Leviathan, সজাগ হ'তে সুরু ক'রেছে মাত্র। সঙ্গে সঙ্গে আজ রপ্তানি বাণিজ্য গ'ড়ে উঠেছে। ভারতবর্ষের পরিত্যক্ত বা scrap iron ও কারখানার তৈরী pig iron নেবার জন্যে বেশ আগ্রহ দেখা দিচ্ছে বিদেশীদের মধ্যে। এই যুদ্ধের ঠিক পূর্ব্বে পাঁচ লক্ষ টন pig iron, ২ কোটি ৫৬ লক্ষ টাকায় রপ্তানি হ'য়েছে এক বৎসরে ; তা ছাড়া আরও অন্যান্য রকম লৌহ সংক্রান্ত মাল গেছে, তন্মধ্যে আকরিক লৌহ প্রায় ৩০ লক্ষ টাকার।

লৌহ সংক্রান্ত অন্যান্য শিল্প

লৌহ সংক্রান্ত আরও তিনটি শিল্প দেশে জন্মেছে ও তারা রক্ষণ-শুল্কের সাহায্যে সঞ্জীবিত হ'য়েছে। প্রথম টিন বা রাঙ্গ-মাখানো ইস্পাতের পাত (tinplate), দ্বিতীয় লোহার তার ও তৃতীয় ঢালাই পাইপ।

প্রথমটি ১৯২২ সালে কাজ সুরু করে। ১৯২৩ সালে (Steel Industry Protection Act 1924) আমদানি করা প্রতি টন টিন প্লেটের উপর ৬০ টাকা ক'রে শুল্ক নির্দ্ধারিত হয়। ১৯২৬এর ফেব্রুয়ারী ২৭ তারিখে সেটা বৃদ্ধি ক'রে ৮৫ টাকা করা হয়।

লোহার তারের (Wire & Wirenail Industry) ১৯২৪ সালে শুল্কের সাহায্য পায়, কিন্তু শিল্পের অবস্থা আশানুরূপ ভাল না হওয়ায় সেটা বিশেষ কার্য্যকরী হয়নি। সুতরাং ১৯৩২ সালে (Wire & Wirenails Industry Protection Act 1932) ৫ই মার্চ্চ প্রতি টন মালের উপর ৪৫৲ টাকা শুল্ক বসে।

ঢালাই পাইপ (Cast Iron Pipes) ১৯২৩ সালে শুল্কের সাহায্য প্রার্থনা করে এবং The Iron and Steel Industries Act 1934 অনুসারে প্রতি টন মালে ৫৭৷৹ শুল্ক বসে। ভারতবর্ষে দুইটি প্রকাণ্ড কারখানায় আজকাল ঢালাই নল প্রচুর তৈরী হচ্ছে। জাতির নব জাগরণে এরা সহায়তা করছে।

লৌহ-মাক্ষিক ও কয়লা

ভারতবর্ষের আকরিক লৌহের পরিমাণ আমেরিকা যুক্তরাজ্যের আকরিক লৌহের পরিমাণের তিন চতুর্থাংশ, কিন্তু দেখা যাচ্ছে ভারতীয় মাক্ষিক-প্রস্তর গুণ হিসাবে অনেক ভাল। তার ওপর রয়েছে প্রচুর কয়লা, স্থানে স্থানে লোহার খনির ধারে ধারে। কয়লা সম্পদে ও ভারতের অত্যন্ত সুবিধা। কারও কারও মতে ভারতে ৬,০০০ কোটি মণ কয়লা আছে, কেউ কেউ বলেন আরও বেশী। প্রতি বৎসর আড়াই কোটি টন কয়লা উঠছে বিহারের ঝরিয়া, বোকারো, রাণীগঞ্জ, গিরিডি, বাঙ্গলার বর্দ্ধমান (রাণীগঞ্জ খনি), মধ্যপ্রদেশের ছিন্দওয়ারা, হায়দরাবাদের বল্লী, সিঙ্গারেণী, তন্দুর, আসামের লখিমপুর বা লক্ষ্মীপুর, উড়িষ্যার তালচের, মধ্যভারতের সোহাগপুর উমারিয়া প্রভৃতি অঞ্চল থেকে। সারা পৃথিবীতে ১৪২ কোটি টন কয়লা প্রতি বৎসর খনি থেকে ওঠে এবং খরচ হয় ; সে হিসাবে ভারতবর্ষের স্থান অনেক নীচে। কিন্তু প্রয়োজন মত সমস্ত কয়লা পাওয়া যাচ্ছে এবং এখনও সঞ্চিত রয়েছে। এ সুবিধা কয়টা দেশের ভাগ্যে ঘটে ? ১৯২১-২২ সালে আমরা ৫ কোটি টাকার কয়লা আমদানী ক'রেছিলাম ; বর্ত্তমানে তা বন্ধ হবার উপক্রম হ'য়েছে এবং আমাদের রপ্তানি প্রায় দুই কোটি টাকাতে পৌঁচেছে। ব্রহ্ম, সিংহল, হংকঙ প্রভৃতি দেশ আমাদের ক্রেতা।

লৌহ শিল্পের আনুষঙ্গিক খনিজ

উৎকৃষ্ট এবং বজ্র কঠিন লৌহ ইস্পাত করতে যা লাগে তাও আমাদের দেশে বর্ত্তমান। ম্যানগানিজ (manganese) আজকাল-এর একটা প্রধান

উপকরণ। মধ্যপ্রদেশে বলাঘাট, ভাণ্ডারা, নাগপুর, মাদ্রাজের সন্দুর করদ-রাজ্য, ভিজাগাপট্টম, উড়িষ্যার কেঁওঝর প্রভৃতি স্থান বিশেষ সমৃদ্ধ। জগতের বাজারে কোনও কোনও বৎসর আমাদের স্থান প্রথম, আর নয় ত রুশের পরে বরাবরই।

ক্রোমাইট—Chromite এক অমূল্য এবং অত্যাবশ্যক বস্তু chrome steel করতে। বালুচিস্থানের Zhob, বিহারের সিংহভূম এবং মহীশূরের মহীশূর জেলা এখন বৎসরে ৫০ হাজার টন ক্রোমাইট জোগাচ্ছে, মোট পৃথিবীর ১০ লক্ষ টন উৎপাদিত ক্রোমাইটের মধ্যে। Wolfram, Tungsten ব্রহ্মে রয়েছে, আজ সে ভারত থেকে রাজনৈতিক সম্পর্কশূন্য, কিন্তু ভৌগোলিক সংস্থানে যেখানে ছিল, সেইখানেই আছে।

লৌহ ইস্পাত শিল্পের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কিছুই বলবার প্রয়োজন নেই। রপ্তানির কথা বাদ দিলেও আমাদের দেশে এর অভাব খুবই বেশী। যতই বাড়ী ঘর তৈয়ারী হবে, দেশে পুল প্রভৃতি বিস্তার লাভ করবে, যন্ত্রপাতি দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়বে এবং যুদ্ধ সরঞ্জাম তৈয়ারীর গতি বৃদ্ধি হবে, ততই লৌহ ইস্পাত দরকার। প্রয়োজন আমরা এখনও সম্পূর্ণ উপলব্ধি করছি না এবং কেনবার এখনও শক্তি পাচ্ছি না, তা না হ'লে দেশে এখনও বহু বৎসর ধ'রে বহু কোটী টন লোহার প্রয়োজন রয়েছে।

তাম্র ও তাম্র-শিল্প

সঙ্গে সঙ্গে তামারও দরকার। পিতল, কাঁসা, ভরণ প্রভৃতি কাজে তামা না হ'লে চলে না। ভারতবর্ষে একটা বড় কারখানা তামা নিষ্কাসন করছে। আমাদের অভাবের তুলনায় এটা কম। সিংহভূম ও হাজারিবাগ বারগাণ্ডা অঞ্চলে এবং মহীশূরে চিতলদ্রুগ বা চিতলদুর্গ প্রদেশে তামার খনির সন্ধান রয়েছে। আজকাল এর যেমন প্রয়োজন আগেও এমনি ছিল। আমাদের পূর্ব্বপুরুষে এর স্বতন্ত্রীকরণের ব্যবস্থাও জানত। পণ্ডিতপ্রবর Dunn বলছেন—"Today we can only surmise as to the race of the ancient people who mined and smelted these ores......The Skill of these ancients is indicated in the manner of their mining. Down to the depth at which they ceased working, usually water level, they have left no workable copper except in the pillars for holding up the walls; they have picked the country as clean as the desert vulture picks a carcass. Looking over some of these old workings it is often remarked that "they must have worked over it with tooth picks.' Even their spoil heaps provide no abundant specimen of copper.

আজ এটা বিস্ময়ের বস্তু; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তামা প্রভৃতি খাদ-মিশ্রিত ধাতুই অশোকস্তম্ভ; এই খাদমিশ্রিত ধাতুই পুরাতন অস্ত্র-শস্ত্রাদি নির্ম্মাণ সম্ভব করে তুলেছিল। আজ বিজ্ঞানের যুগে, বৈদ্যুতিক শক্তির বিস্তারের সঙ্গে তামার পাত চাদর, তার সবই অজস্র দরকার হবে। আমরা প্রয়োজনের হিসাবে ক্ষীণ-সম্বল; আশা হয় যখন স্থানে স্থানে খনির সন্ধান আছে, আরও হয়ত মাক্ষিক মিলবে। কারণ ভারতে Manganese, Ilmenite, Zircon প্রভৃতির সন্ধান ক্রমে ক্রমে মিলছে। জগতে ভারতের ঐশ্বর্য্যের কথা ক্রমে ব্যাপ্ত হ'য়ে পড়ছে।

১৮৫৭ সালে তাম্র নিষ্কাসনের চেষ্টা হবার পর (পূর্ব্ব প্রবন্ধ) ১৯০৬-০৮ সালে ভাল তাম্র মাক্ষিকের অনুসন্ধান চলে। এর মধ্যে Rajdoha Copper co, ১৮৯১ হতে ১৯০৮ পর্য্যন্ত এই চেষ্টায় লিপ্ত ছিল, সফল হয়নি। অন্যান্য সামান্য চেষ্টার পর ১৯২৮ সালে বর্ত্তমান কোম্পানী কাজ আরম্ভ করে, মৌভাণ্ডার ঘাটশিলায় এবং কৃতকার্য্য হয়। পিতলের চাদর হয় ১৯৩০ সালে। এখন প্রতি বৎসর নিষ্কাসিত তামার পরিমাণ ৫,৫০০ টন।

শর্করা বা চিনি

অন্যান্য প্রধান শিল্পের মধ্যে একটা হচ্ছে শর্করা বা চিনি। অজস্র পরিমাণে বাৎসরিক পৌণে তিন কোটী টাকার মত গুড় চিনি রপ্তানি ছিল ১৮৫০-৫১ সালেও। তারা এই নিয়ে গিয়ে আবার পরিষ্কার করে জগতের বাজারে বিক্রয় করত। কিন্তু West Indiesএ নূতন আবাদ বা Plantation গ'ড়ে তোলবার জন্যে ভারতের চিনির ওপর নানা শুল্ক বসতে লাগল এবং রপ্তানি বন্ধ হ'য়ে গেল। অনেক ইংরেজ রাজপুরুষ এর জন্যে প্রতিবাদ ক'রেছিলেন, তাতে কোনও ফল হয় নি। ক্রমে আমরা বিদেশী চিনি কিনতে কিনতে দেশের এই শিক্ষা একেবারে হারিয়ে ফেলি এবং এক বৎসর (১৯২১-২২) সাড়ে সাতাশ কোটীর টাকার চিনি আমদানী করি। এটা যে কেবল কলঙ্কের কথা তা নয়, অর্থনৈতিক দিক থেকে জাতির একটা প্রকাণ্ড ক্ষতি। এখনও ভারত আক এবং আকের গুড় উৎপাদনে জগতের প্রথম স্থান অধিকার করে, পরে কিউবা, জাভা বা যবদ্বীপ, ফরমোসা, ব্রেজিল প্রভৃতির স্থান। এক বৎসরে প্রায় ২৮ কোটী টাকার বিদেশী চিনি খাবার পর আমাদের জোর চেষ্টা চলতে লাগল—যাতে আমরা স্বাবলম্বী হ'তে পারি। ফলে ১৯৩২ সালে ৮ই এপ্রিল প্রতি হন্দরে ৭।০ ক'রে রক্ষণ শুল্ক বসল এবং তারই অন্তরালে আমাদের শর্করা শিল্প চক্ষের নিমেষে গ'ড়ে উঠল। অবশ্য ১৯৩১ থেকেই আমদানি শুল্ক হন্দরে ৭।০ ছিল, এখন হ'তে সেটা Protective Duty করা হ'ল। আজ আমরা ১৪৭টী মিলে ১ কোটী ১১ লক্ষ টন আক থেকে ১০ লক্ষ ৮২ হাজার ৫০০ টন চিনি উৎপাদন ক'রছি। দেশের লোকের অভাব মিটিয়ে আমরা বিদেশে রপ্তানি করতে সম্পূর্ণ সমর্থ, কিন্তু তা হবার উপায় ছিল না; আমরা আমাদের অনিচ্ছায় এক চুক্তিতে আবদ্ধ ছিলাম যে ব্রহ্ম ছাড়া আমরা আর কারও দেশে মাল রপ্তানি করতে পারব না। বলা দরকার, আমাদের দেশে শিল্পের উন্নতি হ'তেই ১৯৩৪ সালে সরকার হ'তে ঘরোয়া শুল্ক বা excise duty বসিয়ে দিয়েছেন; সেটা বাড়তে বাড়তে এখন প্রতি হন্দরে ৩্ হয়েছে এবং তা হ'তে কম বেশী চার কোটী টাকা আমরা বৎসরে এই শুল্ক বইছি।* তবে আমদানি অত্যন্ত কমে গেছে, নগণ্য বললেও চলে। আর বর্ত্তমান যুদ্ধের চাপে পড়ে, ব্রিটেন আমাদের কাছে চিনি কিনছে এবং বাইরেও কিছু কিছু বিক্রয় করবার অধিকার দিচ্ছে।

শর্করা শিল্পের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আমি খুব হতাশ নই। যতটা গোলমাল এখন হচ্ছে, এর অনেকটা কেটে যায়, আমরা নিকটবর্ত্তী স্থান-সমূহে যদি বরাবর রপ্তানি ক'রতে পারি। যে বিরাট excise duty চেপে ব'সে গেছে, এর কিছুটা ক'মলে চিনির দর কিছু কমে এবং অপেক্ষাকৃত অবস্থাহীন লোকে খেতে আরম্ভ করলে, ভারতবর্ষেই এর বিরাট বাজার প'ড়ে রয়েছে। মিল মালিকদের একটা কথা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। তারা যদি চেষ্টাচরিত্র ক'রে গড়পড়তা খরচ কিছু না কমান, তবে এক সময় বিদেশী চিনির বাধা দূর হ'লে, তারা একদিনও টিকতে পারবেন না। এই সম্পর্কে একটা ঘটনা মনে ক'রে রাখা দরকার। সরকার থেকে ইক্ষুর নিম্নতম মূল্য বেঁধে দেওয়া আছে, মালিকদের সেই দরে কিনতে হয়। কৃষিপণ্য মূল্য নিয়ন্ত্রণ ভারতে এই প্রথম। পরে ১৯৩৯ সালে আগষ্ট মাসে পাটের জন্য এই ব্যবস্থা হয়েছে।

দিয়াশলাই

শুল্কের সাহায্যে গড়ে উঠেছে ভারতের দিয়াশলাই শিল্প। ১৯২৮ সালে (Match Industry Protection Act) আর শুল্ককে (Revenue Duty) রক্ষণ শুল্কে রূপান্তরিত করা হয় এবং আমদানির

* ১৯৪১-৪২ সালে ৪ কোটী ৮৫ লক্ষ টাকা ধরা হয়েছে।

প্রতি গ্রোসের উপর ১৷৹ টাকাহার শুল্ক অপরিবর্ত্তিত রাখা হয়। এ বিষয়েও আমাদের অনেকের ধারণা ছিল, অত সস্তায় এ জিনিষ এখানে হয় না, পয়সায় দুটো বড় দিয়াশলাই, তা কি কখনও ভারতবাসী তৈরী করতে পারে! সত্যিই তা সম্ভব হ'য়েছিল। প্রকাণ্ড কারখানা আছে প্রায় ১৫৷১৬টা, প্রত্যেকটাতে পাঁচশত লোকের ওপর কাজ করে। তাছাড়া ক্ষুদ্রাকারের অনেক কারখানা আছে এবং কর্ম্মী সংখ্যা এগারো হাজারের কম নয়। ১৯৪০-৪১ সালে কিছু কম ৩০ লক্ষ গ্রোস দিয়াশলাই তৈরী হয়েছে। একটা শিল্প গড়লে কত লোকের অন্নসংস্থান হ'তে পারে, এই রকম ভাবে বুঝতে পারা যায়। ১৮৯৩-৯৪ সালের পূর্ব্বে দেশে মোটে দিয়াশলায়ের কারখানা ছিল না। তাকে দৃঢ় ভিত্তিতে স্থাপন করবার জন্যে বাঙ্গলা দেশে স্বদেশী আন্দোলনের ভিতর দিয়ে চেষ্টা হ'য়েছিল, (গত বৈশাখ সংখ্যার প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য) আজ তা সফল হ'য়েছে। ১৯৩৭-৩৮ সালে ২ কোটী ৩৯ লক্ষ টাকার দিয়াশলাই (১,৭২,২৬,৮৫৩ গ্রোস) আমদানী হ'য়েছিল। ১৯৩৬-৩৭ সালে মাত্র ১৮ হাজার টাকায় নেমেছিল, এখন আবার ১৩ লক্ষ টাকায় উঠেছে। তার কারণ ব্রহ্ম থেকে কিছু আসিল। প্রথম প্রথম কাঠের অভাব হ'য়েছিল, এখন দেখা যাচ্ছে ভারতে বহু রকম কাঠ রয়েছে—অন্ততঃ ৪০ রকম, যা থেকে সুন্দর দিয়াশলাই হয়। আরও সুখের বিষয়, এখানে কারখানা হয়েছে, যারা দিয়াশলাই তৈয়ারী যন্ত্রপাতি পর্য্যন্ত করছে। দেশের শিল্প গড়তে গড়তেই ১৯৩৭ সালে সরকারী excise duty একে বিব্রত ক'রে ফেলেছে। আজ যত দাম বেড়েছে, তার প্রধান কারণ সরকারী করভার! এর পরিমাণ ২ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা। গরীবের এই অবশ্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যটা কিছু রেহাই দিলে ভালই হ'ত, বিশেষতঃ দরের পার্থক্যটা বড়ই বেশী হ'য়ে পড়েছে। আমদানির উপর শুল্ক হিসাবে ৩১ লক্ষ টাকা (১৯৪০-৪১) পাওয়া গেছে। ১৯৪১-৪২তে মোট ২০ লক্ষ টাকা ধরা হয়েছে।

দিয়াশলায়ের সকল রাসায়নিক উপাদান এখানে মেলে না, বাইরে থেকে কতক আনতে হয়। এভাবে অভাব বেশী দিন চললে, সবই এখানে প্রস্তুত হ'তে পারবে। ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে হতাশ হবার নেই। বিজলী বাতি দেখে মনে হচ্ছে, দিয়াশলাই আর তত খরচ হবে না। কথাটা ঠিক নয়। যারা এখনও ব্যবহার করে না তারা ক্রমেই ব্যবহার করছে, আর বিড়ি সিগার সিগারেটের কৃপায় এর ভীষণ প্রচার বাড়ছে।

বাঁধন যদি একটু আল্গা হয়, তা হ'লে দিয়াশলাই তৈরী যে খুব দ্রুত বেড়ে যাবে এবং আমরা যে স্বচ্ছন্দেই বাইরে রপ্তানী করতে পারব, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহই নেই।

কাগজ

শুল্ক সাহায্যে বাড়ছে আর একটা শিল্প—সেটা কাগজ। তবে এই শুল্ক সকল প্রকার কাগজের ওপর খাটে না, সুতরাং খুব কাজের জিনিষ নয়। নাম থেকেই বোঝা যাবে "The Bamboo Paper Industry Protection Act, 1925" যে বাঁশের মণ্ডজাত কাগজের ওপর প্রযোজ্য। বহুকাল হ'তে ভারতে কাগজ তৈরী হ'য়ে আসছে। কলকজার যুগ আরম্ভ হ'য়ে গেলেও, বিদেশী প্রতিদ্বন্দ্বিতার মুখে এখানে কারখানা বিশেষ সুবিধা করতে পারে নি। তবে বিদেশী শিল্প প্রতিভা ভারতবর্ষে কাগজের কল স্থায়ী করার সঙ্গে সঙ্গে দেশীয় লোককে বহু প্রকারে নিরুৎসাহ ক'রেছে, যাতে ভারতবর্ষে আর তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী না জোটে। তা সত্ত্বেও কিছু কিছু হয়েছে, আজ চৌদ্দটী কারখানায় (১৯৪০-৪১) ৮৭ হাজার ৬৬২ টন কাগজ উৎপন্ন ক'রছে, তার আনুমানিক মূল্য সাড়ে তিন কোটী টাকা। কিন্তু ভারতের প্রয়োজনের তুলনায় ত এ কিছুই নয়! এখনও আমরা সওয়া তিন কোটী টাকার বিদেশী কাগজ আমদানি করছি। ১৯২০-২১ সালে এটা উঠেছিল ৭ কোটী ৬০ লক্ষ ৩৪ হাজার টাকায়! যত কারখানা আছে, আরও এত কারখানা সহজেই চলতে পারে, কারণ ৩৯ কোটী লোকের মধ্যে কিঞ্চিন্যূন মাত্র পাঁচ কোটী লোকের অর্থাৎ শতকরা ১২·১৭ লোকের অক্ষর পরিচয় হয়েছে। আপনারা ভুলে মনে করবেন না যে এরা শিক্ষিত। সুতরাং বুঝে দেখুন এই দেশে এখনও কত কাগজের প্রয়োজন। ঘাস, খড়, পাটের গোড়া, ছেঁড়া পচা কাগজ, ন্যাকড়া—যা কিছু আপনাদের অব্যবহার্য্য, প্রায় তার সব হ'তেই আমাদের কাগজ তৈরী হবে। আপনাদের পরিত্যক্ত অস্পৃশ্য ন্যাকড়ার টুক্‌রায় তুলার সেলুলোস থাকায় খুব ভাল কাগজ তৈরী হয়। এই শিল্পের সঙ্গে হাতে তৈরী কাগজের ব্যবসা চালাতে হবে। যে সকল স্থান মিল থেকে দূরে, সেখানে হাতের কাগজ বেশ চলতে পারে। কাগজ তৈরীতে আমরা অনেক পেছিয়ে আছি। আমেরিকা, কানাডা, জার্ম্মাণ, ফরাসী, নরওয়ে, নেদারলণ্ড প্রভৃতি সকল দেশই কাগজ শিল্পে আমাদের অপেক্ষা সমৃদ্ধ; আমাদের অবস্থা আরও ভাল হওয়া দরকার।

সংক্ষেপে বলি, বাঁশের মণ্ড থেকে কাগজ ভারতবর্ষে প্রথম তৈরী হ'য়েছে এবং অন্যান্য দেশের বড় বড় বনানী যখন কাগজ তৈরী করতে উজাড় হ'য়ে যাচ্ছে তখন বাঁশ একটা পরম সম্পদ এ দেশে ব্যবহার করা হয় না। দেড় হ'তে দুবছরের গাছ হ'লেই কাজ চলে; বাঁশ জন্মায় প্রচুর এবং ভারতের সর্ব্বত্রই পাওয়া যায়।

হচ্ছে না, সংবাদপত্রের roll গুলো; এখনও বিদেশের মুখ চেয়ে থাকতে হয়। যখন কাগজ আসতে কোনও কারণে বিলম্ব হ'য়ে পড়ে, সংবাদপত্রের মালিকদের মুখ শুকিয়ে যায়।

অন্যান্য প্রধান শিল্প

দিকে দিকে সাড়া প'ড়েছে, সুতরাং শিল্পেরও নানা দিক ফুটে উঠেছে, যে কটা অপেক্ষাকৃত বৃহৎ আকার ধারণ ক'রেছে, তা'দের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া যাক—

কাচ

ভারতে প্রায় আড়াই কোটী টাকার কাচ দ্রব্য বৎসরে লাগে, আজ এক কোটী টাকার অধিক তৈরী হচ্ছে ভারতবর্ষে। বৃহদাকার কারখানা আন্দাজ কুড়িটা, দশ হাজার লোক অন্ন সংস্থান করছে। যুক্তপ্রদেশের একটী কারখানায় পাত কাচ বা Sheet Glass করছে, বাঙ্গলার কারখানায় বৈজ্ঞানিক প্রয়োজনের কাচ তৈরী সুরু হয়েছে। এও স্বদেশী আন্দোলনের ফল বলতে হবে, কিন্তু ফিরোজাবাদ প্রভৃতি স্থানের কাচ-শিল্প বিশেষতঃ চুড়ি শিল্প বহুদিনের পুরাতন।

কাচের কারখানাগুলো ছড়িয়ে আছে সারা ভারতে; তার মধ্যে বাঙ্গলায় ১৩, যুক্তপ্রদেশ, বোম্বাই ও পঞ্চনদে প্রত্যেকটাতে ৭, মধ্যপ্রদেশে ৪, হায়দ্রাবাদে ২ ও মাদ্রাজে ১। এ সকল যদি না চলত আমরা যেমন বিদেশী কিনছিলাম, তেমনিই কিনতে হ'ত। ১৯২০-২১ সালে ৩ কোটী ৩৮ লক্ষ টাকার ঠুনকো কাচ কিনেছি, আমাদের পিতল, কাঁসা, তামা, ভরণ, সব ধাতুপাত্র ভেঙ্গে চুরে বিদেশে পাঠিয়েছি। কাঁসারি, মাজিয়ে, খালিয়ে প্রভৃতি সকলের মুখের অন্ন মেরেছি। আর ঐ যে মাল কিনেছি প্রায় সাড়ে তিন কোটী টাকার, সোনা পাঠিয়ে সেই দেনায় দায়ে উদ্ধার হয়েছি।

রবার

রবারজাত দ্রব্যের আমদানী ১৯২৯-৩০ সালে তিন কোটী টাকা ছাড়িয়ে গিয়েছিল (৩,৩০,১৩,৫১৭ টাকা); আরও কত বাড়ত তা বলা যায় না। কারখানার সংখ্যা ৩০।৩২, তার মধ্যে বাঙ্গলায় ১৬টা। ভারতে প্রচুর রবার জন্মে, অর্থাৎ সওয়া তিন কোটী পাউণ্ড; এতে ত্রিবাঙ্কুর, মাদ্রাজ ও কুর্গ প্রধান। এখন নানা রকম রবারের দ্রব্য ভারতবর্ষে

তৈরী হচ্ছে, তার কারখানায় মজুর সংখ্যা আট হাজার। ভারতের কারখানা না জন্মালে আমাদের আরও কত টাকার মাল নিতে হ'ত তার স্থিরতা নেই। এখন আমদানি (১৯৪০-৪১) ১ কোটী ৫৬ লক্ষ টাকায় দাঁড়িয়েছে। এখানে রবারের জুতা, সাইকেল টায়ার, টিউব ও অন্যান্য নল যে দরে বিক্রয় হচ্ছে, তাতে জাপানীরাও পারছে না। মনে ভরসা এতে বাড়ে এবং আশা হয়, বিদেশী বণিকেরা যদি আমাদের ঘরের মধ্যে প্রবেশ ক'রে আমাদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা না করত, তবে আমরা আরও প্রসার লাভ করতে পারতাম। তবুও ভাল, দেশের কারিগর খেতে পাচ্ছে; কিন্তু লোকসান এই, আমদানি করা মালের হিসাব ধরতে পারতাম, কিন্তু এই 'India Ltd.' কোম্পানিগুলিকে ধরা ছোঁয়ার জো নেই। এই শিল্পটা প্রকৃতপক্ষে ১৯২২-২৩ সালে পাকা হয়; তখন কেবল জুতা তৈরী হ'ত। তাতে জাপানীও হারতে সুরু করে। পরে অন্যান্য রকম মালে হাত দিয়ে দেখা গেল, তা'ও চলতে পারে। কিছু বিদেশী রবার (কাঁচা) আমরা এখনও আমদানি করি।

সিমেণ্ট

সিমেণ্ট কারখানা ১৮৭৯ সালে মাদ্রাজে স্থাপিত হ'লেও ১৯০৪ সালের পূর্ব্বে সিমেণ্ট প্রস্তুত হয় নি; ১৯১৪ সালই খাঁটী আরম্ভ বলা যেতে পারে। এখন প্রায় ১৬টী কারখানা কাজ করছে এবং ১৪ লক্ষ টন সিমেণ্ট প্রস্তুত হচ্ছে। এর কাঁচা মালের জন্যে কারও কাছে যেতে হয় না, তবুও আমাদের অনেক সময় নিয়েছে স্বাবলম্বী হ'তে। ১৯১৯-২০ থেকে ১৯২৩-২৪ পাঁচ বৎসরের গড়ে আমরা প্রতি বৎসর ১ কোটী ১০ লক্ষ টাকার মাল আমদানি ক'রেছি, এখন কেবল দশ লক্ষ টাকাও নেই। ১৯১৪ সালে আমরা হাজার টনও সিমেণ্ট করতাম না, ১৯২১-২২ সালে ১ লক্ষ টন ছাড়িয়ে যায়, ১৯৩৬-৩৭ সালে দশ লক্ষ টন হয়। ক্রমেই বেড়ে চলেছে। "বিলাতী মাটী" এখন "দেশী মাটী"তেই হচ্ছে, তাতে সে শক্তি হারায় নি। আর বিলাতী মাটী আনতে কাঠের পিপে বা Dooprage লাগত, এখন এখানে পাটের থলীতে বোঝাই হচ্ছে এবং পাটের কাটতি বেড়েছে। সঙ্গে সঙ্গে ১২ হাজার লোক কাজ পেয়েছে। এর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বুঝিয়ে বলবার কোনও প্রয়োজন নেই।

তামাক

তামাক ভারতবর্ষে প্রচুর হচ্ছে এবং উৎকৃষ্ট সিগারেটের তামাক পর্য্যন্ত পাওয়া যাচ্ছে; অনেকেই জানেন না বহুতর উৎকৃষ্ট সিগারেট ভারতের কারখানায় তৈরী হচ্ছে। এর আগে সবই বাইরে থেকে নিতে হ'ত, কিন্তু তামাক পাতা উৎপাদনে ভারতবর্ষ পৃথিবীর মধ্যে মাত্র আমেরিকার পশ্চাতে। বৎসরে প্রায় পাঁচ লক্ষ টন তামাক পাওয়া যাচ্ছে, তন্মধ্যে বাঙ্গলা প্রধান এবং বাঙ্গলার মধ্যে রঙ্গপুর শ্রেষ্ঠ।

এই সঙ্গে সিগারেটের কথা একটু ব'লে নি। তামাক শিল্পে জগতে সিগারেটের স্থান প্রথম; ১৯০০-০১ সালে ভারতে সিগারেট এসেছিল ১৭ লক্ষ টাকা; ১৯১৬-১৭ সালে ১ কোটি; ১৯২৬-২৭ সালে দুই কোটি এবং ১৯২৭-২৮ সালে আড়াই কোটি টাকায় পৌঁছে। এটা মাত্র সিগারেট, অন্য কথা বলছি না। হঠাৎ রাজনৈতিক আন্দোলনের ধাক্কা খেয়ে, অর্থাৎ যখন রাস্তা, ট্রাম, ট্রেণে প্রকাশ্যভাবে সিগারেট জ্বালানো কষ্টসাধ্য ব্যাপার হ'ল, তখন ১৯৩৩-৩৪ সালে মাত্র ১৯ লক্ষ টাকায় নেমে পড়ে। লক্ষ্য করবেন—আড়াই কোটি থেকে মাত্র ১৯ লক্ষ টাকা! সে খেলা আবার শেষ হ'য়েছে; আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা, বিশেষ ক'রে কলেজ এবং স্কুলের ছেলেদের ভেতর, ইউরোপীয়দের, বিশেষতঃ তরুণীদের মধ্যে সিগারেট ভীষণ চলিত হ'য়ে উঠেছে। সঙ্গে সঙ্গে বিড়ি ও প্রচুর চলছে, দেশের মধ্যেই তামাকের কাটতি বাড়ছে। বৎসরে আন্দাজ ১৮ কোটি টাকার তামাক পাতা জন্মে, তার মাত্র শতকরা দুভাগ রপ্তানি হচ্ছে। খৈনী, নস্য, হুঁকার তামাক, সিগার, সিগারেট ও বিড়ির আকারে বাকীটা ব্যবহৃত হচ্ছে। এখন ৩০টি বড় কারখানায় দশ সহস্রাধিক লোকে সিগার সিগারেট তৈরী করছে, ১৬৫টি বিড়ির কারখানায় ততোধিক লোক ব্যাপৃত আছে। আর ঘরে, দোকানে, রাস্তার ধারে অবসরকালে কত লোক বিড়ির দ্বারা জীবিকার্জ্জন করছে, তার আন্দাজ আপনারা করে নিন। নিঃসংশয়ে বলা চলে, এই বিড়ির ব্যবসার কল্যাণে অনেক ছিঁচ্‌কে চোর, গাঁটকাটা তাদের ব্যবসা ছেড়েছে। শিল্পের উন্নতি হ'লে দেশের মধ্যে এই সব লোক অভাবমুক্ত হ'লে সৎ হ'তে পারে; কারণ অনেক পাপ ক্ষুধার তাড়নায় ঘটে এবং প্রচুর সময় হাতে থাকলে devil নামক ভদ্রলোক মস্তিষ্কের কারখানায় নানারকম ভালোমন্দ ফন্দী আবিষ্কার করেন।

সাবান

আজ আর "দিশী সাবান" শুনলেই "নাক সিঁটকোতে" হয় না। সত্য সত্যই বিদেশীর প্রতিদ্বন্দ্বিতায় দাঁড়াতে পারে এমন সাবান অনেক হচ্ছে। কারখানা বলতে যেমন বোঝায় সেরূপ অন্ততঃ শতাধিক বা ১২০টী আছে, তাছাড়া ছোট ও মাঝারি ধরণের ঘরোয়া কারখানা জন্মেছে অনেক। স্বদেশী যুগের প্রভাবে প্রকৃত পক্ষে দেশী কারখানা গ'ড়ে ওঠে। তার আগেকার প্রচেষ্টার সুসংবদ্ধ ইতিহাস খুঁজে বার করা কঠিন ব্যাপার, অন্ততঃ আমার জানা নেই। এখন বিদেশী প্রকাণ্ড কারখানা বর্ণচোরা হয়ে ভারতে প্রবেশ করেছে, তার মধ্যে এক কোম্পানী বৎসরে আট দশ লক্ষ টাকা কেবল বিজ্ঞাপন বাবদে খরচ করেন। প্রকাণ্ড ক্ষেত্র এখানে ছিল এবং প্রভুত লাভ তারা ক'রেছে, সুতরাং সে স্বাদ আজও ভুলতে পারেনি। ১৯১৩-১৪ সালে ৪ লক্ষ ৪৮ হাজার হন্দর সাবান তারা এখানে ১ কোটী ৬৭ লক্ষ টাকার বিক্রী ক'রেছিল। এখন সেটা ৩০ হাজার হন্দর ও ১৪ লক্ষ ৩৯ হাজার টাকা দামে নেমেছে।

এখন ভারতবর্ষে ৫ বা ৬ লক্ষ হন্দর সাবান হচ্ছে তার আনুমানিক মূল্য দেড় কোটী টাকা; কেবল কারখানায় খাটে প্রায় ৪ হাজার মজুর; তা ছাড়া ঘরোয়া কারিগর ত অনেক আছে। এতদিনে আরও গ'ড়ে উঠতে পারত কিন্তু বিদেশী কষ্টিক সোডার ওপর নির্ভর ক'রে থাকাতে হ'য়ে ওঠে নি। এটা এমন একটা অদ্ভুত বস্তু নয়, যা এখানে হয় না। বিদেশী প্রতিদ্বন্দ্বিতাই কষ্টিক সোডা প্রস্তুতের প্রধান অন্তরায় ছিল। এখন তা দেশে হচ্ছে এবং এতদিন হ'তেও পারত।

সাবান শিল্পের ভবিষ্যৎ এখন বিরাট। সাধারণতঃ আমরা মাথাপিছু আধ পাউণ্ড সাবান বৎসরে ব্যবহার করছি। অন্য সভ্যদেশে ১৫ থেকে ২০ পাউণ্ড ব্যবহার করে। সে হিসাবে আমাদের অভাব এখনও খুব। তবে লোকের ক্রয়শক্তি বৃদ্ধি পাওয়া চাই। সাবানের ব্যবহারে রুচি লোকের খুব ফিরেছে। দেশে শিল্প গ'ড়ে উঠলে লোকের আয় বাড়বে, সুতরাং বেশী পরিমাণ সাবান ব্যবহার করলে দেহের ও বস্ত্রের আবর্জ্জনা দূর হ'লে নীরোগ কর্ম্মক্ষম দেহ নিয়ে আমরা কাজে এগিয়ে যেতে পারব।

পেন্সিল—কলম

একটী কারখানায় তিন শত গ্রোস পেন্সিল তৈরী হয় প্রত্যহ; এত দিনে অর্থাৎ ছ-মাসের মধ্যে তারা এটা বাড়িয়ে পাঁচ শত গ্রোসে দাঁড় করিয়েছে। এর মধ্যে দেশী কাঠ প্রচুর চলছে, দেশী গ্রাফাইট, দেশী মাটী বা clay। শুনে সুখী হবেন, যন্ত্রপাতির অধিকাংশ তাঁদের কারখানায় ঢালাই হয়। ঝর্ণাকলম, সাধারণ কলম, নিব সবই তাঁরা তৈরী করছেন। এ ছাড়া এইরূপ বৃহদাকার শিল্প আরও দুটী আছে, তন্মধ্যে একটী দক্ষিণ-ভারতে।

চর্ম্ম-শিল্প

আপনারা চক্ষের সামনে দেখলেন চামড়ার শিল্প গড়ে উঠল। আমাদের ছোট বেলায় Dawson, Latimerএর জুতা না হ'লে চলত না; চামড়ার ব্যাগ, strap, ঘোড়ার জিন্, বেল্টিং সবই ত বিদেশী ছিল। কিন্তু জগতের মধ্যে সংখ্যা গুণ্তি চামড়া ধরলে ভারতের স্থান প্রথম। বড় চামড়া (hides) বৎসরে সংখ্যায় নয় কোটী পাওয়া যায়, তন্মধ্যে ভারতের অংশ দু কোটি, আর ছোট চামড়া বা skins ২০ কোটির মধ্যে ভারতের সাড়ে তিন কোটি। পরিশোধিত চর্ম্ম (dressed and tanned) ও চর্ম্ম দ্রব্যের আমদানি দুই কোটি টাকার বেশী ছিল, এখন খুবই কম। ভারতে এখন বহু ট্যানারী হ'য়েছে তাদের সংখ্যা ৪২ এবং এক মাদ্রাজ তিন কোটি টাকার ওপর tanned and dressed leather রপ্তানি করছে। চামড়ার জুতার কারখানা এখন ১৫টি হ'য়েছে। বহু লোকের উপজীবিকার পথ হয়েছে। কেবলমাত্র ট্যানারী আর চামড়ার কারখানায় ১৫ হাজার লোকের অন্ন সংস্থান হচ্ছে। সস্তার আভারম ছাল মাদ্রাজে এটা সম্ভব ক'রে তুলেছে।

পশম

পশমের শিল্প আমাদের ভাল গড়ে উঠতে পারছে না। এখানেও প্রকাণ্ড আমদানী রয়েছে, কোনও কোনও সালে তা চার কোটি টাকা পার হ'য়ে যায়। "ব্রিটিশ ভারতে আন্দাজ কুড়ি এবং করদরাজ্যে দশটি পশমের মিল আছে। ইহাতে দিন মজুরের সংখ্যা প্রায় দশ হাজার; তন্মধ্যে যুক্তপ্রদেশে শতকরা ৩০ এবং পঞ্চনদে ২৯ জন মজুর খাটে। তাহার পরই বোম্বায়ের স্থান। অনুমান করা হয় এই সকল মিল হইতে বৎসরে, আড়াই বা তিন কোটি টাকা মূল্যের দ্রব্যাদি প্রস্তুত হইয়া থাকে।" (ভারতের পণ্য, ২য় খণ্ড ৮৯-৯০ পৃঃ)। বাঙ্গলা দেশে লোকে বহু টাকার পশমী দ্রব্য ব্যবহার করে, কিন্তু এখানে উল্লেখযোগ্য মিল বা কারবার নেই। এদিকে লোকের নজর পড়া দরকার।

হোসিয়ারী বা মোজা-গেঞ্জি

এই শিল্পটা বাঙ্গলার আশে পাশে গড়ে উঠেছে বেশী; স্বদেশী আন্দোলনই এর প্রাণ প্রতিষ্ঠা ক'রেছিল। প্রথম সুরু হয় ১৮৯৩ সালে খিদিরপুরে (The Oriental Hosiery Manufacturing Co)। এটা স্থায়ী না হ'লেও এর যে বিরাট সম্ভাবনা আছে সে বিষয়ে লোকের চোখ ফোটে। এর ফলে আজ ভারতের হোসিয়ারী (কার্পাস) শিল্প গড়ে উঠেছে। কেবল বাঙ্গলাতেই ১২০টা বড় ও মাঝারি কারখানা জমছে; তার একটাতেই প্রায় ৪০০ লোক কাজ করে। সারা ভারতে সংখ্যা বাঙ্গলার দ্বিগুণ হবে। বাঙ্গলার পরে পঞ্চনদের স্থান (সংখ্যা ৫০) পরে বোম্বাই, যুক্তপ্রদেশ, দিল্লী ও সিন্ধু। এর বাইরে যা আছে তার সংখ্যা খুব বেশী নয়। পঞ্চনদ পশমী হোসিয়ারী প্রচুর তৈরী করে, আর তৈরী করে সকল প্রকার হোসিয়ারীর যন্ত্রপাতি। এটা খুবই শুভলক্ষণ বলতে হবে।

মজুর খাটছে কারখানায় প্রায় দশ হাজার, তা ছাড়া বাইরের ছোট-খাটো হাতের কাজ কুটির শিল্প আছে। বাঙ্গলার ভেতর পাবনা, কলকেতা ও ঢাকাই (নারায়ণগঞ্জ) প্রধান কেন্দ্র। উৎপাদিত দ্রব্যের মূল্য প্রায় তিন কোটি টাকা। এর ভেতর একটা কথা আছে; অনেক ক্ষেত্রে বিদেশ হ'তে আমদানী করা বোনা (পাশ বালিশের ওয়াড়ের মত গোল ক'রে বোনা) দীর্ঘ বাণ্ডিল এনে তাকে গেঞ্জির মাপে কেটে গলা হাতা সেলাই ক'রে স্বতন্ত্র গেঞ্জি ব'লে বিক্রয় করা হয়। এটা নিছক প্রতারণা, তবুও চলছে।

এই শিল্প যে গ'ড়ে উঠেছে তার পিছনে রক্ষণশুল্কের প্রভাব দেখতে পাওয়া যায়। ১৯৩৪ সালের যে মাসে শুল্ক বসবার আগে বিদেশীর প্রতিদ্বন্দিতায় এই বাণিজ্য বড়ই বিপন্ন হ'য়ে পড়ে। তার পর ক্রমে গ'ড়ে উঠে যখন দাঁড়িয়ে গেল তখন আবার নিজেদের মধ্যে দর কাটাকাটি আরম্ভ হ'য়ে বিপদ উপস্থিত হ'ল।

কার্পাস হোসিয়ারি এখনও (১৯৪০-৪১) ১৭ লক্ষ ৮২ হাজার টাকার আসছে, তবে এটা যে পূর্ব্ব হ'তে অনেক কম সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। এই শিল্প এক অঘটন সম্ভব ক'রেছিল। ভারতীয় মালের গুণ ভাল হওয়ায় লোকে বেশী দর দিয়েও কিনতে থাকে, তখন শঠ বিদেশীরা নানাপ্রকার ছাপ দিয়ে দেশীয় নকল ক'রে এখানে তাদের মাল বিক্রী করতে বাধ্য হ'য়েছিল। ক্রমে সে অবস্থা কেটে গেছে।

যদি এই ভাবে দেখাতে যাই, আমরা একটু আশার রেখা দেখতে পাব। কিন্তু ৩৯ কোটী লোকের প্রয়োজনের তুলনায় এ যে কিছুই নয়, বিশেষতঃ চারিদিকে যখন কাঁচামালের ছড়াছড়ি এবং তাই কুড়িয়ে নিয়ে গিয়ে অপরাপর দেশ ধনী হচ্ছে, কিন্তু আমরা অনাহারে দিন কাটাই। কথাটা দাঁড়াচ্ছে—"India is a rich country, but her people are poor." আর কবির ভাষায় বলতে গেলে—

"এ শোভা সম্পদ মাঝে তুমি গো মা, অভাগিনি !
অশ্রুজল ঝরে তব দু নয়নে, বিষাদিনি !"

যা হ'য়েছে তার পরিচয়ে আপনারা আশান্বিত হবেন। রঙ বার্নিশের কারখানা ১২টা, এনামেলের ৪টা (একটি বোম্বায়ে), পাট ও তুলা গাঁট বাঁধবার কারখানা, ছাপার কাজ, চাল-কল, তেল-কল, দড়ির কারখানা, বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদনের কারখানা প্রভৃতি কাজে বহু লোক খাটছে। যুদ্ধের সুযোগে আরও অনেক গ'ড়ে উঠছে। তার, পেরেক, স্ক্রু, কব্জা, নানাপ্রকার যন্ত্রপাতি, ব্যাণ্ডেজ, লিণ্ট, বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম, যুদ্ধের গোলাগুলি, দড়িদড়া, তাঁবু পোষাক প্রভৃতি দু চার হাজার রকম জিনিষ হচ্ছে। ১৯৪০-৪১ সালে ৮,০৪,৬৬৬ হন্দর রঙ তৈরী হয়েছে।

ভবিষ্যতের কারিগর

ভারতের যুবকরা এর সুফল ভোগ করছে। আরও যা সব বাকী তাদের তার অংশভাগী হওয়া চাই। তারা এই শিল্পবাহিনীতে যোগদান করুক। দেশের মধ্যে এখনও যা হচ্ছে না, তাই করবার প্রতিজ্ঞা তারা করুক। বলুক সেলুলয়েড ও ফটোগ্রাফের ফিল্ম তারা করবে, কয়লার উপোৎপান্ন বা by-product যৌগিক রঙ, সুগন্ধি দ্রব্য, বিস্ফোরকের উপাদান, বিশোধক বা disinfectant, মিষ্টতম বস্তু saccharine প্রভৃতি হাজার দুই রকম পণ্য তারা প্রস্তুত করবে; দেশে প্রচুর বকসাইট রয়েছে, aluminium নিষ্কাসিত হ'ক, এটা ছাড়া এখন জগৎ অচল, কাঠ, অব্যবহার্য্য তুলা ও অন্যান্য বস্তু দিয়ে যৌগিক সুন্দর রেশম তৈয়ারী করবার পরিকল্পনা তাদের মাথায় গজিয়ে উঠুক। প্রতি বৎসর জাপান, ইংলণ্ড, আমেরিকা, ইটালী, জার্ম্মানী প্রভৃতি অন্ততঃ ৫০ কোটী টাকার বাণিজ্য করে এবং ভারতবর্ষ কমবেশ ছয় কোটী টাকার বস্তু ও বস্ত্রাদি আমদানি করে। আমাদের চাই বাষ্পীয় যান, বাষ্পীয় পোত, মোটর, এরোপ্লেন বা বিমান পোত; আমরা এখনও এ সকলের ক্রেতা মাত্র। কৃষিপ্রধান দেশ আমাদের; কৃষিজাত দ্রব্য শিল্পে পরিণত করা প্রকাণ্ড কাজ, তারা তাই করুক। বিজ্ঞান তার সহায় হ'ক; Science divorced from industry is like a tree uprooted from the earth—অর্থাৎ শিল্প-বিচ্যুত বিজ্ঞান মূলোৎপাটিত বৃক্ষের ন্যায়। নূতন যারা আসছেন বিজ্ঞান পড়বার সময় এ কথা যেন মনে রাখেন। প্রতিদিন জগতে বহু রকম বস্তু আবিষ্কৃত হ'চ্ছে এবং ক্রমে আরও কত হবে, তার ইয়ত্তা নেই। তারা যেমন এর অংশ গ্রহণ করবে, তেমনিই দেশকে তারা সমৃদ্ধ করবে। এতে দুঃখদারিদ্র্য অকালমৃত্যু অজ্ঞতা দূর হবে, "ভারত আবার জগৎ সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে।"

শিল্পী—শ্রীযুক্ত দুর্গাশঙ্কর ভট্টাচার্য্য

স্ত্রী শিক্ষা

ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
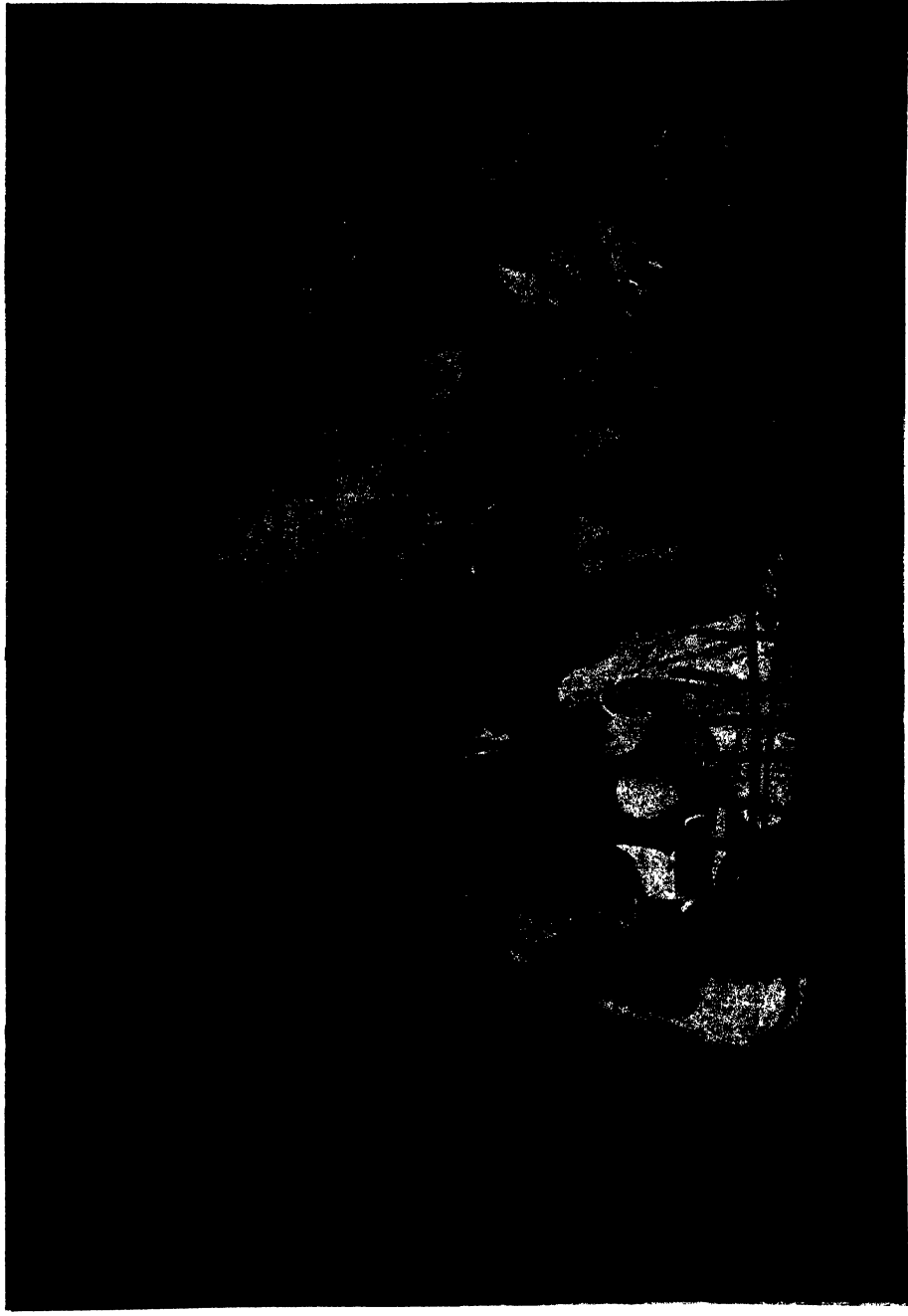
শিল্প, রাষ্ট্র ও সমাজ

মনে হ'ত সভ্যতার বিকাশ হবে—মানুষের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বাড়লে, নিজের এবং জগতের মঙ্গলের চিন্তা করবার সময়ের ওপর অধিকার এলে। প্রাণ রাখতে দিনরাত প্রাণান্তকর পরিশ্রম করতে না হ'লে মানুষ মহান হ'তে মহত্তর হবে। বর্ত্তমান সমাজ ও রাষ্ট্র একটা বিরাট আদর্শ প্রতিষ্ঠান হ'য়ে দাঁড়াবে। আশা ছিল এতে শান্তি শৃঙ্খলা এবং বিশ্রাম বাড়বে, লোকে প্রতিভার পরিচয় দিয়ে জগৎকে আরও উন্নত করবে, বিশ্বে স্রষ্টার উদ্দেশ্য প্রকট করবে। তাই দিকে দিকে শিল্পের সৃষ্টি, তারই উৎকর্ষতায় স্বল্পকালে দর্শনচারু, ব্যবহার-কুশল সর্ব্বপ্রকার দ্রব্যাদি প্রস্তুত হবে; ধনীর উপভোগ্য জিনিষ সাধারণের নিকট সুলভ হবে, দেশের অভাব দূর হবে।

কিন্তু মানুষের প্রয়োজনের অন্ত নেই। তারই একটা দিক আমরা দেখতে পাচ্ছি। বিজ্ঞান ও শিল্পের সমন্বয়ে আজ রুদ্রের তাণ্ডবকে হার মানিয়ে তারা নৃত্য সুরু করেছে। সমস্ত পৃথিবী ছারখার যাবার উপক্রম হ'য়েছে।

এই শিল্প, কলা, দর্শন, বিজ্ঞান, কোলাহল, সংগ্রাম এবং সংগ্রামের বলি, চ'লেছে সেই এক দিকে—

যথা নদীনাং বহবম্বুবেগাঃ সমুদ্রমেবাভিমুখাঃ দ্রবন্তি

যেমন সমস্ত নদীর গতি এক মহা পারাবারের দিকে ছুটেছে, সেই ভাবে এই নৃপতিমণ্ডলী, দেশনায়ক রাষ্ট্রগুরু মহামানবের দল, তাঁদের লোভ, দম্ভ, মদমত্তার অগ্নি দিয়ে আজ সাধারণ মানবকুলকে ইন্ধন ক'রে খাণ্ডব-দাহনে প্রবৃত্ত হ'য়েছে; আর এরই ভেতর দিয়ে এক মহান্ উদ্দেশ্য সাধিত হ'চ্ছে, তা এখন উপলব্ধি হ'ক আর না-ই হ'ক। আমার ক্ষুদ্রবুদ্ধিতে মনে হয়, বারে বারে এই বিপর্য্যয়ের ফলে দেশের মধ্যে শান্তির প্রচেষ্টা ক্রমেই বাড়বে এবং শিল্প ভবিষ্যতে সৃষ্টিনাশের জন্য প্রযুক্ত হ'তে পারবে না। জগতে সাম্য আসবেই আসবে। শিল্পকে বাহন ক'রে বিজ্ঞান আর দর্শন এই অসম্ভবকে সম্ভব করবে। উচ্চ নীচ, ধনী নির্ধন, জাতি বর্ণ, সাদা কালো, হ'লদে পাঁশুটে নির্ব্বিশেষে সব একাকার হবে। বিদ্বেষ, লোভ, ঈর্ষ্যা, পরশ্রীকাতরতা শিল্পের সাহায্যে ক্রমে বিনষ্ট হবে। ভবিষ্যৎ মানবসমাজ জ্ঞানে গুণে, গরিমায় অতুলনীয় হবে। একদিন সমস্ত পৃথিবী এক রাষ্ট্র, এক গোষ্ঠী ও এক ধর্ম্মী হবে।

মায়ার খেলা

কানাই বসু, বি-এল

"ওমা! কি দুষ্টু ছেলে গো! আমি বলি বুঝি ঘুমিয়েছে। তা নয়, পিটির পিটির চাইছে যে গো। ঘুমো, দস্যি ছেলে, শিগ্‌গির ঘুমো।"

বলিয়া কল্যাণী গান ধরিল—"খোকা ঘুমোলো, পাড়া জুড়োলো, বর্গী এলো দেশে। বুলবুলিতে ধান খেয়েছে খাজনা দোবো কিসে।"

হাত চাপড়ানোর তালে তালে এই গান একবার, দুইবার, তিনবার, চারিবার গাওয়া হইল। কিন্তু তথাপি দুষ্ট ছেলের চোখে বোধ করি তন্দ্রাবেশের কোন লক্ষণ দেখা গেল না। ছেলের মা কহিল—"ফের দুষ্টুমি করছ খোকন? না, এখন আর মিনু খায় না, লক্ষী ছেলে, এখন ঘুমোতে হয়। সোনা ছেলে, মাণিক ছেলে, ঘুমোও তো বাবা। কি? গরম হচ্ছে? আচ্ছা, আমি এই হাওয়া করছি, ঘুমোও।"

খোকনের মা পাখা নাড়িতে নাড়িতে আবার গান ধরিল—"খোকন আমাদের সোণা, স্যাকরা ডেকে, মোহর কেটে···"

পাশের ঘর হইতে কে ডাকিলেন—"কল্যাণি, উঠেছিস?" সাড়া না পাইয়া আবার ডাক আসিল—"অ কল্যাণি।"

খোকার মা স্বগত চাপা গলায় কহিল—"উঠ্‌ব আবার কি? ঘুমোতে কি দিয়েছে দস্যি ছেলে, যে উঠ্‌ব?"

আবার স্বর আসিল—"অ কল্যাণি, আর ঘুমোয় না, ওঠ্ মা, চুল বাঁধবি আয়।" বলিতে বলিতে এক বর্ষীয়সী মহিলা এ ঘরে প্রবেশ করিলেন।

কল্যাণী বলিল—"তোমরা তো আমাকে খালি ঘুমোতেই দেখছ—, ওমা ওমা, দেখ দেখ, দুষ্টু ছেলের কাণ্ড দেখ। ওমা দেখ না।"

কল্যাণীর মাতা হাসিয়া বলিলেন—"কি আবার কাণ্ড করলে তোর ছেলে?"

কল্যাণী বলিল—"দেখ দেখ, কি রকম পিটির পিটির করে চাইছে দেখ মা। এটুকু ছেলে, কি রকম দুষ্টু দুষ্টু চাউনি মা, ঠিক যেন পাকা বুড়ো।"

পরিপক্ক বৃদ্ধদিগের চাহনি দুষ্ট হয়, এ খবর কল্যাণী কোথা হইতে পাইল তাহা বলা শক্ত। কিন্তু কল্যাণীর মাতা কন্যার জ্ঞানের প্রতি সন্দেহ প্রকাশ করিলেন না। কল্যাণীর ছেলের দিকে একবার চাহিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন—"তোর ছেলে তুই দেখ। আমার এখন ছিষ্টির কাজ পড়ে আছে। কিন্তু ছেলে নিয়ে শুয়ে থাকলে তো চলবে না, বেলা গেছে, উঠে আয়, চুল বেঁধে জামা কাপড় পরে নে। এখুনি তো সব আসবে ডাকতে।" বলিয়া চিরুণী লইয়া তিনি বাহির হইয়া গেলেন।

কল্যাণী উঠিতে যাইতেছিল। কিন্তু তাহার খোকনের দিকে চাহিয়া তাহার আর উঠা হইল না।—"না, না, এই যে আমি, আবার কান্না কেন? কে বকেছে, আমার খোকনকে কে বকেছে।" বলিয়া পুনরায় ছেলের গায়ে হাত দিয়া কল্যাণী শুইয়া পড়িল। অভিমানী শিশুকে ভুলাইবার জন্য বাঙ্গলা দেশের মায়েদের শব্দ-শাস্ত্রে যত আদরের কথা আছে, তাহার প্রায় সবই শুইয়া শুইয়া কল্যাণী বলিয়া গেল। কিন্তু তাহার খোকন নিশ্চয় অত সহজে ভুলিবার পাত্র নয়। ছেলের অভিমান প্রকৃত কি কাল্পনিক তাহা ছেলের মা-ই জানে, কিন্তু কল্যাণীকে ছেলে কোলে করিয়া উঠিতে হইল। সে ছেলেকে কখনো বুকের উপর শোয়াইয়া, কখনো কটিতটে বসাইয়া, ঘরময় ঘুরিয়া ঘুরিয়া নানাবিধ ছড়া আবৃত্তি

করিতে লাগিল এবং বিবিধ উপায়ে সন্তানের অভিমানে জননীর কাতর ব্যাকুলতা প্রকাশ করিতে লাগিল।

বাহির হইতে বার বার কল্যাণীর মায়ের আহ্বান আসিল। কিন্তু স্বয়ং মায়ের ভূমিকা লইয়া নিজের মায়ের কথা সে তখন ভুলিয়া গিয়াছে।

কিছু পরে যখন পাশের বাড়ীর শোভা, কল্যাণীর শৈশবের বন্ধু, সাজিয়া গুজিয়া নিত্যকার মত তাহাকে ডাকিতে আসিল, তখনো কল্যাণী ছেলেকে কোলে করিয়া বসিয়া আছে। শোভা ঘরে ঢুকিতেই কল্যাণী নিজের ওষ্ঠে আঙ্গুল ঠেকাইয়া তাহাকে কথা কহিতে নিষেধ করিল। শোভা পা টিপিয়া টিপিয়া অতি সন্তর্পণে আগাইয়া আসিলে কল্যাণী চুপি চুপি বলিল—"তোরা যা ভাই, আজ আমার যাওয়া হবে না।"

শোভা চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করিল—"কেন ভাই?"

কল্যাণী কহিল—"না ভাই, আমার খোকনসোণাকে কার কাছে রেখে যাব বল? সারা দুপুর দস্যিপানা ক'রে এই সবে একটু চোখ বুজেছে।"

শোভা খোকার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল "তা এখন তো বেশ ঘুমিয়েছে, শুইয়ে রেখে এই বেলা একটু আয় না।"

কল্যাণী বলিল—"ও বাবা, এক্ষুণি উঠে আমাকে দেখতে না পেলে একেবারে কুরুক্ষেত্তর করবে। এই কত কেঁদে কেঁদে একটু চুপ করেছে। না ভাই, তুই যা।"

শোভা বিমর্ষ হইয়া কয়েক মুহূর্ত্ত দাঁড়াইয়া রহিল। তার পর বন্ধুর কানের কাছে মুখ লইয়া গিয়া বলিল—"মাসীমা কাল সকালে চলে যাবেন, তোর গান শোনবার জন্যে কখন থেকে বসে আছেন। তুই একবারটী যাবি না? রেখা, বুলা সব এসে বসে আছে।"

কল্যাণী একটু ভাবিল। তারপর বলিল—"আচ্ছা যাব, কিন্তু বেশীক্ষণ থাকতে পারব না ভাই।"

শোভা ঘাড় নাড়িয়া জানাইল তাহাতেই হইবে। তার পর ধীরে ধীরে খাটের ধারে বসিয়া হাত বাড়াইয়া বলিল—

"আমি একটু খোকনকে নেবো ভাই? তুই ততক্ষণ গা ধুয়ে আসবি?"

কল্যাণী ব্যস্ত হইয়া বলিল—"না, না, এক্ষুণি তা হলে উঠে পড়বে। এখন ওকে জাগাস নি ভাই, তা হলে আর আমার কোনো কাজ হবে না।"

শোভা হাত গুটাইয়া কয়েক মুহূর্ত্ত লুব্ধ দৃষ্টিতে কল্যাণীর খোকনের সুন্দর মুখের পানে চাহিয়া রহিল। তারপর একটী নিঃশ্বাস ফেলিয়া আস্তে আস্তে উঠিয়া পড়িল।

এই দুইটী বন্ধুর কাহারও মনের কোনো কথা অপরের কাছে গোপন থাকিত না। শোভাদের অবস্থা ভালোই, বরং কল্যাণীদের চেয়ে বেশী ভালো। জামা, কাপড়, স্নেহ, আদর, কিছুরই অভাব শোভার ছিল না। কিন্তু যেদিন কল্যাণীর এই পরম প্রিয় খোকন লাভ হইয়াছে, সেই দিন হইতে শোভার মনে হইয়াছে, তাহার সব থাকিয়াও কিছুই নাই। কল্যাণীর খোকনের মত একটী মনোহরদর্শন খোকন না থাকিলে জীবনে খেলা ধুলা, আমোদ-আহ্লাদ কিছুই কিছু নয়।

বন্ধুর মনের এই অপূর্ণ আকাঙ্ক্ষার দুঃখ কল্যাণীর অজানা ছিল না। সে একবার মনে করিল শোভাকে ডাকিয়া খোকনকে তাহার কোলে তুলিয়া দেয়। কিন্তু তখন শোভা দরজার কাছে চলিয়া গিয়াছে, কল্যাণীর ডাকিবার আগেই সে বাহির হইয়া গেল। কল্যাণী মনে করিল "রাগ করলে বোধ হয়। করলে তো করলে। তা বলে এখন আমি ছেলের ঘুম ভাঙ্গাতে পারি না বাবু।"

মা হিসাবে কল্যাণী ছোট হইলেও সন্তানের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি তাহার দৃষ্টি কোনো বয়োবৃদ্ধা মায়ের চেয়ে কম জাগ্রত নয়। মাতৃ-জাতির কর্ত্তব্যে সে কখনো সাধ্যমত অবহেলা ঘটিতে দেয় না। দিনে রাতে যতক্ষণ সে জাগিয়া থাকে, কেবল ছেলের চিন্তাতেই তাহার মন নিযুক্ত থাকে।

স্নানাহার ইত্যাদির জন্য যেটুকু সময় তাহাকে ছেলের কাছ হইতে দূরে থাকিতে হয়, সে সময় তাহার কিছুই ভাল লাগে না। দিনের চব্বিশটী ঘণ্টা ছেলেকে কোলে রাখিতে পারিলে তবে বুঝি তাহার তৃপ্তি হইত। প্রতিনিয়ত ছেলের হাসি কান্না সুবুদ্ধি ও দুষ্ট বুদ্ধির নানা পরিচয় কল্পনার চোখে দেখিয়া সে শুধু নিজেই মুগ্ধ হয় না, বাড়ীর সকলকে সেই সব বিবরণ ডাকিয়া ডাকিয়া শুনাইয়া মুগ্ধ করিতে চেষ্টা করে। ইহার জন্য বড়দের কাছে তাহাকে কম তিরস্কার লাভ করিতে হয় না এবং শোভার মত যে সকল অন্তরঙ্গ সঙ্গিনী পূর্ব্বের ন্যায় তাহার সঙ্গলাভ করিতে পায় না, তাহাদের পরিহাস ও অভিমান অনেক সহ্য করিতে হইয়াছে।

শোভা চলিয়া গেলে সে বড় খাট হইতে নামিয়া রেলিঙ্‌ ঘেরা ছোট্ট খাটে তাহার ছেলেকে শোয়াইয়া দিল ও কাঁথা ইত্যাদিতে সযত্নে ছেলের গা ঢাকা দিয়া ক্ষুদ্র মাথার বালিশটা একটু নাড়িয়া চাড়িয়া মনে করিল এইবার ঠিক হইয়াছে, সে যাইতে পারে। কিন্তু যাই যাই করিয়াও কল্যাণী দাঁড়াইয়া রহিল, সেই ছোট বিছানাটীর উপর, সেই অতি ছোট মুখখানির দিকে চাহিয়া।

চাহিয়া চাহিয়া তাহার মনে হইল, বেচারী শোভা! তাহার যে লোভ তাহা অতি স্বাভাবিক। তাহার খোকন-সোনার মত এমন লোভনীয় সামগ্রী আর কিছু আছে কি? তবু শোভার তো কত কি আছে। তাহার যে খোকন ছাড়া আর কেহই নাই। বন্ধুরা রাগ করুক, ঠাট্টা করুক, কিন্তু শীঘ্রই একদিন এই ছেলের অন্নপ্রাশন উপলক্ষে, এবং তারপর একদিন ছেলের বিবাহ উপলক্ষে সে যে অভূতপূর্ব্ব খাওয়া দাওয়া ও আমোদ প্রমোদের ব্যবস্থা করিবে তাহা দেখিয়া সকলে অবাক হইয়া থাকিবে।

খোকন ব্যতীত তাহার আর কেহ নাই, এরকম চিন্তা করিবার কল্যাণীর ন্যায়সঙ্গত কোনো কারণ নাই। স্বামী ও শ্বশুর বাটী না থাকিলেও তাহার বাপ, মা, ভাই, বোন সকলেই আছেন। ভাই বোনেদের মধ্যে সেই তাহার বাবার প্রিয়তম সন্তান। শিশুকাল হইতে আজ পর্য্যন্ত তাহার যত কিছু আবদার ও ইচ্ছা বাবার কাছেই পূর্ণ হইয়াছে। কিন্তু তথাপি খোকন-রূপ পরম সম্পদ লাভ করিবার পর হইতে মধ্যে মধ্যে তাহার ভাবিতে ভালো লাগিত যে তাহার আর কেহ নাই, শুধু খোকন আছে। সে রকম সময়ে ছেলের আদর মাত্রা ছাড়াইয়া যাইত। এমন কি একথা নিঃসংশয়ে বলা যায় যে বাক্‌শক্তি থাকিলে

কল্যাণীর খোকন নিশ্চয় যখন তখন এই আদরের অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবাদ করিত।

ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া কল্যাণী নীচে নামিয়া গেল। মিনিট দশেক পরে তাহার ছোট ভাই বিশু আসিয়া ঘরে ঢুকিল। ঘরের ভিতর ক্ষুদ্র খাটের উপর দৃষ্টি পড়িতেই বিশু উৎফুল্ল হইয়া সেইদিকে অগ্রসর হইল। তারপর বোধ করি দিদির ক্রুদ্ধ মুখ স্মরণ করিয়া সে বাহিরে আসিয়া ডাকিয়া বলিল—"দিদিভাই, তোমার ছেলেকে একবারটী নোবো?"

নীচে কলতলায় মুখে সাবান ঘষিতে ঘষিতে কল্যাণী উৎকণ্ঠিত স্বরে বলিল—"না বিশু, তুই ফেলে দিবি, নিসনি।"

মায়ের কোলের ছেলে বলিয়া বিশু এ বাড়ীর আদুরে ছেলে। তাহার বয়স ছ'বছর হইল। মাতৃবলে বলীয়ান থাকায় সে কাহাকেও ভয় করে না। দিদির উত্তর শুনিয়া বিশু খুশী হইল না। সে আর ছোট নয়, এতো বড় হইয়াছে। অথচ তবুও দিদি যে তাহাকে বিশ্বাস করিয়া তাহার ছেলে কোলে করিয়া বেড়াইতে দেয় না, ইহাতে সে ক্ষুব্ধ ও অপমানিত বোধ করিয়া থাকে। সে চিৎকার করিয়া বলিল—"একবারটী নিই দিদিভাই, ফেলে দোবো না, একটু খেলা করব।"

শুনিয়া কল্যাণীর উদ্বেগ বাড়িয়া গেল। সে বিশুর অপেক্ষা চিৎকার করিয়া বলিল—"তোমার তো অত খেলনা গাড়ী রয়েছে, আমার ছেলেকে না নিলে বুঝি তোমার খেলা হয় না?"

বিশু জবাব দিল না। খেলনা, গাড়ী ইত্যাদি তাহার অনেক আছে সত্য, কিন্তু আজকাল দিদির ছেলেটীকেই যে তাহার সবচেয়ে ভালো লাগে, একথা যে কেন দিদি বোঝে না কে জানে!

বিশুর সাড়া না পাইয়া তাহার দিদি আবার হাঁকিয়া বলিল—"খবরদার বিশু, মেরে পিঠ ভেঙ্গে দোবো, যদি আমার ছেলের গায়ে হাত দাও।"

ভয় দেখাইতে গিয়া কল্যাণী ভুল করিল। বিশুর পৌরুষে ঘা পড়িল। সে ক্ষণকাল ঘাড় কাত করিয়া ও ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তারপর মৃদু স্বরে যাহাতে নীচে দিদির শ্রুতি গোচর না হয়, বলিল—"হ্যাঁ নোবো।"

ঘাড় কাত করিয়াই শুনিল দিদি প্রতিবাদ করিল না। তখন উৎসাহিত হইয়া আরও মৃদুস্বরে নিজের সঙ্কল্প আবার ঘোষণা করিল—"বেশ করব নোবো।" বলিয়া নির্ভীক পদক্ষেপে ঘরের ভিতর প্রবেশ করিল।

* * * *

ইহার পরের ঘটনা অতি নিদারুণ হইলেও সংক্ষিপ্ত। "বিধিলিপি", দৈব-দুর্বিপাক" ইত্যাদি যে সকল সাধু ভাষার প্রচলন আমাদের কেতাবে পাওয়া যায়, বহু ব্যবহারে সেগুলি অতি সাধারণ ও সস্তা হইয়া গেলেও মানুষের নির্মম ভাগ্য-বিপর্য্যয়ের কথা বলিতে গেলে সেই সকল সাধু ভাষার সাহায্য লওয়া ছাড়া লেখকদিগের আর কী উপায় আছে। সতত উদ্বিগ্ন স্নেহ ও ঐকান্তিক শুভ ইচ্ছা, সব ডিঙ্গাইয়া যখন আকস্মিক বিপদ আসিয়া স্নেহের বস্তুকে গ্রাস করে, তখন বিধিলিপি না বলিয়া আর কী বলিতে পারা যায়।

ঘটনা যখন সংক্ষিপ্ত, তখন সংক্ষেপেই তাহা বলি।

ছেলেকে শোয়াইয়া গিয়া কল্যাণী নিশ্চিন্ত ছিল না। তাহার উপর, কখন ছেলে তাহার দুর্দান্ত বিশুর কবলে পড়িয়া যায় এই ভয় তাহাকে উদ্বিগ্ন করিল, চুল বাঁধা আর হইল না। মায়ের বকুনি নীরবে সহ্য করিয়া, কোন রকমে গা ধোওয়া, জামা কাপড় পরা ও জলযোগ সারিয়া কল্যাণী যথাসাধ্য শীঘ্র উপরে আসিতে-ছিল। এমন সময় বিলাতী ব্যাণ্ড ও ব্যাগপাইপের বাজনা শুনিতে পাওয়া গেল। তখন বিবাহের মাস। পথ দিয়া বর ও বরযাত্রীর মিছিল যাইতেছে বুঝিয়া কল্যাণী ছুটিয়া আসিল।

সিঁড়ি উঠিতে উঠিতে তাহার মনে হইল সেও ছেলের বিবাহে বিলাতী ব্যাণ্ড ও ব্যাগপাইপের বাজনা আনাইবে। কিন্তু ছেলের বিবাহ কবে হইবে? তাহার আগে ছেলের অন্নপ্রাশন উপলক্ষে কিছু বাদ্যভাণ্ডের ব্যবস্থা করিবে। আজই রাত্রে একবার কথাটা বাবার কাছে তুলিবে মনস্থ করিয়া কল্যাণী উপরে আসিল।

উপরে উঠিয়াই চোখে পড়িল—যে ঘরে ছেলেকে শোয়াইয়া রাখিয়া গিয়াছিল সে ঘরের দরজা খোলা। তখন সবে সন্ধ্যা হইয়াছে। ঘরের ভিতর অন্ধকার। ঘরে ঢুকিয়া সুইচ টিপিয়া আলো জ্বালিয়া কল্যাণী দেখিল যাহা ভয় করিয়াছিল তাহাই হইয়াছে। তাহার ছেলের খাট শূন্য। ছেলের বিছানার ছোট ছোট কাঁথা, বালিশ ইত্যাদি ইতস্ততঃ ছড়ানো।

বিশুর হাতে পড়িয়া ছেলেকে অক্ষত পাওয়া যাইবে কিনা এই দুশ্চিন্তায় কল্যাণী সন্ত্রস্ত হইয়া ডাকিল—"বিশু, বিশু।"

কিন্তু তখন বিবাহের বাজনা আরও কাছে আসিয়াছে। তাহার প্রবল ও বিচিত্র শব্দে কল্যাণীর ডাক ডুবিয়া গেল। জিজ্ঞাসা করিয়া সন্ধান লইবে এমন কাহাকেও দেখিতে পাইল না। উদ্বেগে ও আশঙ্কায় কল্যাণী কয়েক মুহূর্ত্ত এ ঘরে ও ঘরে 'বিশু' 'বিশু' বলিয়া ডাকিয়া ফিরিল। বিলাতী ব্যাণ্ড তাহার বিশাল ঢাক সমেত তখন তাহাদের বাড়ীর পাশ দিয়া যাইতেছে। সেই ঢাকের গুরু শব্দে তাহার বুকের ভিতর গুরু গুরু করিয়া উঠিল। বিশু কোথায় গিয়াছে তাহা সে ভাবিয়া পাইল না।

হঠাৎ তাহার মনে হইল নিশ্চয় সকলে বর দেখিবার জন্য পথের দিকের লম্বা বারান্দায় গিয়া জমিয়াছে এবং বিশুকেও সেই থানে পাওয়া যাইবে। স্খলিত অঞ্চল কোমরে জড়াইতে জড়াইতে সে ছুটিল পথের ধারের বারান্দার দিকে।

বারান্দার রেলিঙের উপরে সারি সারি নরমুণ্ড। কিন্তু সে সকল কিছুই কল্যাণী দেখিল না, শুধু দেখিল তাহাদের মধ্যে বিশু নাই।

কিন্তু সে তাহার ব্যস্ততার ভ্রম। বারান্দার প্রান্তে আসিয়া দেখিতে পাইল অপর প্রান্তে বিশু রেলিঙের ধারে দাঁড়াইয়া পথের দিকে দেখিতেছে, তাহার কোলে যেন কী রহিয়াছে।

দিদির ছেলে যে সে চুরি করিয়া আনিয়াছে এবং দিদি যে শাবকহারা বাঘিনীর মত তাহার দিকে ছুটিয়া আসিতেছে, ইহা বিশুর মনে হয় নাই। মনে করিবার অবসরও নাই। ঠিক সেই সময়ে বরের গাড়ী বারান্দার নীচে আসিয়া পৌঁছিল। ছোট্ট বিশু ভাল করিয়া দেখিতে না পাইয়া, রেলিঙের ফাঁকে ফাঁকে তাহার ছোট ছোট পা ঢুকাইয়া উঁচু হইয়া ঝুঁকিল নীচের দিকে চাহিয়া। তখনও সে দিদির ছেলেকে এক হাতে বুকের কাছে আঁকড়াইয়া ধরিয়া আছে।

বাড়ীর সকলেই তখন বর দেখিতে ব্যস্ত, বিশুর প্রতি কাহারো নজর নাই। মিছিলের অগণিত বাতির আলো কাঁপিয়া কাঁপিয়া সকলের মুখের উপর পড়িতেছে ও সরিয়া যাইতেছে। যাহারা বর দেখিতে পাইয়াছে তাহারা আঙ্গুল বাড়াইয়া সেই বর পরস্পরকে দেখাইতেছে। বেচারা বিশু তখনো বরকে নিরূপণ করিতে পারে নাই। চোখের নীচে দিয়া যে বর তাহাকে দেখা না দিয়া ফাঁকি দিয়া পলাইতেছে, সেই বরকে দেখিবার প্রাণপণ প্রয়াসে বিশু চঞ্চল হইয়া উঠিল। সেই মুহূর্ত্তে কল্যাণী বিশুর প্রায় পিছনে আসিয়া পড়িল।

বিশুও সেই মুহূর্ত্তে অধীর আগ্রহে এবারে দুই হাতে রেলিঙ ধরিয়া আরও উঁচু হইয়া রেলিঙের উপর দেহ বাড়াইয়া ঝুঁকিয়া দাঁড়াইল এবং সেই মুহূর্ত্তে কল্যাণী দেখিল বিশুর মাথার ওপাশে এতক্ষণ যে ক্ষুদ্র উজ্জ্বল মুখখানি উজ্জ্বল বাতির আলোকে চক্‌চক্ করিতেছিল, সেই মুখখানি অদৃশ্য হইল। কল্যাণী রেলিঙ ধরিয়া আর্ত্তকণ্ঠে চিৎকার করিয়া উঠিল—"ওমা, আমার ছেলে!"

* * * *

শোভাযাত্রীর দল তাহাদের বিবিধ বাজনা ও বিপুল আলোর সমারোহ লইয়া চলিয়া গিয়াছে। কোন্ মোটর গাড়ীর চাকার তলায় কাহার কী প্রিয়বস্তু চূর্ণ-বিচূর্ণ হইল, তাহার সংবাদ বরও জানিল না, বরযাত্রীরাও জানিল না। অত আলোর পর পথ যেন অন্ধকার দেখাইতেছে। দূর হইতে বাজনার শব্দ তখনো আসিতেছে, কিন্তু তত প্রবল নয়। সে শব্দকে ছাপাইয়া উঠিয়াছে কল্যাণীর কাতর আর্ত্ত ক্রন্দন। পথের উপর বুক দিয়া পড়িয়া কল্যাণী হাত-পা ছুঁড়িয়া পাগলের মত কাঁদিতে লাগিল। আর দুরন্ত বিশু অত্যন্ত অপরাধীর মত অতি ম্লান মুখে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া দিদির কান্না দেখিতে লাগিল।

* * * *

অনিমেষ জিজ্ঞাসা করিল—"কি রকম পড়লে গল্প?" অনিমেষের স্ত্রী জবাব দিলেন না। অনিমেষ আবার জিজ্ঞাসা করিল—"কি গো গল্পটা কেমন লাগল?"

অনিমেষের স্ত্রী ম্লানমুখে বলিলেন—"ছাই গপ্প।" তারপর সহসা যেন শিহরিয়া উঠিলেন। আপন মনে অর্দ্ধস্ফুট স্বরে "ষাট, ষাট" বলিয়া অনিমেষ-গৃহিণী তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিয়া ডাকিলেন "শম্ভু, খোকাকে দিয়ে যাও আমার কাছে।"

অনিমেষও সঙ্গে সঙ্গে উঠিয়া আসিয়া বলিল—"তোমার ভালো লাগল না?" তাহার পত্নী বলিলেন—"কী বাপু বিচ্ছিরি করে শেষ করলে, ও আমার ভাল লাগে না।"

অনিমেষ বলিল—"ঐ যাঃ, আর একটা পাতা যে আমার পকেটে রয়ে গেছে। এই নাও। গল্পের উপসংহারটুকু এতে আছে।"

কিন্তু অনিমেষের স্ত্রী উদ্যত কাগজের দিকে চাহিয়াও দেখিলেন না। বলিলেন—"ও থাকগে।" বলিয়া কণ্ঠ আরও একগ্রাম চড়াইয়া ডাকিলেন—"ও শম্ভু, খোকাকে নিয়ে এসো না! দুধ খাবে।"

অনিমেষ বলিল—"এই তো খোকা দুধ খেলে।"

"তা হোক।" বলিয়া তাহার স্ত্রী উচ্চৈঃস্বরে ডাকিলেন—"শম্ভু-উ।"

অনিমেষ বলিল—"আচ্ছা, খোকাকে আমি আনছি, তুমি ততক্ষণ কাগজটা পড়ো। একটুখানি আছে।"

উপরোধ এড়াইতে না পারিয়া অনিমেষের গৃহিণী নিতান্ত অনিচ্ছার সহিত সেই কাগজখণ্ড লইয়া পড়িতে লাগিলেন।

* * * *

তখন কল্যাণীর কান্নার শব্দে তাহার বাবা বাহিরে আসিলেন এবং তাহাকে বুঝাইয়া নিরস্ত করিতে না পারিয়া, জোর করিয়া কোলে তুলিয়া বাহিরের ঘরে ফরাসের উপর শোয়াইয়া দিলেন। সেখানে বাপের সস্নেহ সান্ত্বনায় কল্যাণী ফুঁপাইতে ফুঁপাইতে ছেলেকে কেন্দ্র করিয়া যে সকল সুখের দিনের পরিকল্পনা করিয়াছিল সেই সকল বলিতে লাগিল। সেই আশাভঙ্গের কথা বলিতে গিয়া তাহার কান্না দ্বিগুণ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। কল্যাণীর বাবা স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনি তাহার দাদাকে ডাকিলেন এবং একটু পরে কল্যাণীর দাদা গম্ভীর মুখে সাইকেল চাপিয়া দ্রুত কোথায় যেন গেলেন।

কয়েক মিনিট পরে,—তখনো কল্যাণীর ক্রন্দন প্রায় সমান বেগে চলিতেছে এবং মধ্যে মধ্যে তাহার মাতার তীক্ষ্ণ কণ্ঠও শোনা যাইতেছে,—কল্যাণীর দাদা আর একটা বড় ডলি পুতুল লইয়া ফিরিয়া আসিলেন এবং কল্যাণীর সম্মুখে পুতুলটা বসাইয়া দিয়া, তাহার পৃষ্ঠে একটা কিল মারিয়া চলিয়া গেলেন।

কল্যাণী কিল গ্রাহ্য করিল না। সে কান্না থামাইয়া উঠিয়া বসিল এবং নূতন ও পুরাতন দুইটা পুতুল মিলাইয়া দেখিল। দেখিয়া সন্তুষ্ট হইয়া, স্নেহময়ী জননীর মতই সস্নেহে নবাগতকে কোলে তুলিয়া লইয়া বাড়ীর ভিতর চলিয়া গেল। যাইবার সময়ে পুরাতন দলিত মথিত সন্তানটা বিশুকে দান করিয়া গেল।

কিন্তু কল্যাণী থামিলেও তাহার মা থামিলেন না। তিনি বাহিরের ঘরে আসিয়া কল্যাণীর বাবাকে ভর্ৎসনা করিলেন—

"আবার একটা পুতুল কিনে দেওয়া হল? টাকাগুলো তোমার কামড়াচ্ছিল, নয়? ভুগবে ঐ মেয়ে নিয়ে তুমি—এই বলে রাখলুম। আট বছর বয়েস হল, আদর যেন ধরে না। রাস্তায় শুয়ে শুয়ে কান্না!"

* * * *

অনিমেষ জিজ্ঞাসা করিল—"কি রকম লাগল? হ্যাগা?"

অনিমেষগৃহিণী হাস্যোজ্জ্বলমুখে উত্তর দিলেন—"বেশ গপ্প। তুমি এতও জানো বাপু।"

অনিমেষ বলিল—"খোকাকে নিয়ে আসি।"

খোকার জননী বলিলেন—"না, থাকগে। শম্ভুর কাছে আছে, খেলা করছে থাক। আমার কাছে এলেই দস্যিপানা করবে।"

মাল্‌টা

রায় বাহাদুর অধ্যাপক শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র এম-এ

সন্ধ্যার একটু পূর্বে মাল্‌টায় এসে আমাদের জাহাজ লাগ্‌লো। বিলাত যাবার সময় মাল্‌টা অতিক্রম করেছিলাম রাত্রির অন্ধকারে; সুতরাং তখন মাল্‌টা দেখা হয় নি। ফেরবার পথে দিনে দিনে মালটা পৌছুব, এই ভেবে আগে থেকেই মনে খুব কৌতূহল ছিল। যে জাহাজে আমি ফিরেছিলাম তার নাম 'রাওলপিণ্ডি'। এই জাহাজটিকে পরে merchantmanরূপে অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত করা হয়েছিল। কিন্তু তাতেও জাহাজটি রক্ষা পায় নি। শত্রুর আক্রমণে উত্তর-সাগরে এই জাহাজটি জলমগ্ন হয়েছিল। আজ তার কথা স্মরণ করে' মনে যে বেদনা জাগ্‌চে তা গোপন করে' কি ফল? সতের হাজার টনের জাহাজ, রাজপ্রাসাদের মত তার কক্ষগুলি ছিল। আমরা একসঙ্গে অনেকে এসেছিলাম ঐ জাহাজে, তাদের মধ্যে অনেকেই সুপরিচিত। বন্ধুবর অধ্যাপক ডাঃ মহেন্দ্র সরকার ছিলেন, ক্রিকেটবীর নিসার, নিখিল ভারত ক্রিকেটের সেক্রেটারী ডিমেলো এবং হকি খেলায় প্রসিদ্ধ দারা ছিলেন। এ ছাড়া সাবন্তবাদীর (বোম্বাই প্রদেশ) মহারাজ ও মহারাণী প্রভৃতি অভিজাত সম্প্রদায়ের লোকও কয়েকজন ছিলেন। জাহাজের কদিন যে আনন্দে কেটেছিল, তার স্মৃতি বেদনার মত বাজে—যখনই জাহাজটির পরিণামের কথা মনে পড়ে।

মাল্‌টা ভূমধ্য সাগরের ঠিক মাঝখানে বল্‌লেও চলে। মাল্‌টায় যখন জাহাজ লাগ্‌ল, তখন মনে হয়েছিল যে, এটা একটা নীরেট পাহাড়ের দুর্গ। জাহাজ লাগতেই কতকগুলি ছোট ছোট জেলেডিঙ্গি জাহাজের চারিদিকে ঢেউয়ে দুল্‌তে দুল্‌তে এগিয়ে এলো।
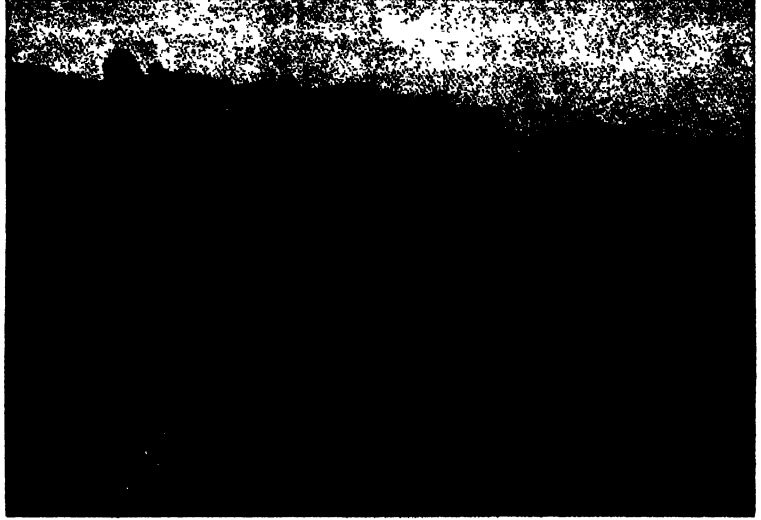
মাল্‌টা

ভূমধ্যসাগরের ইতিহাসের কথা ছেড়ে দিলেও মালটার ইতিহাস অত্যন্ত কৌতূহলপ্রদ। ইংরেজদের আসবার
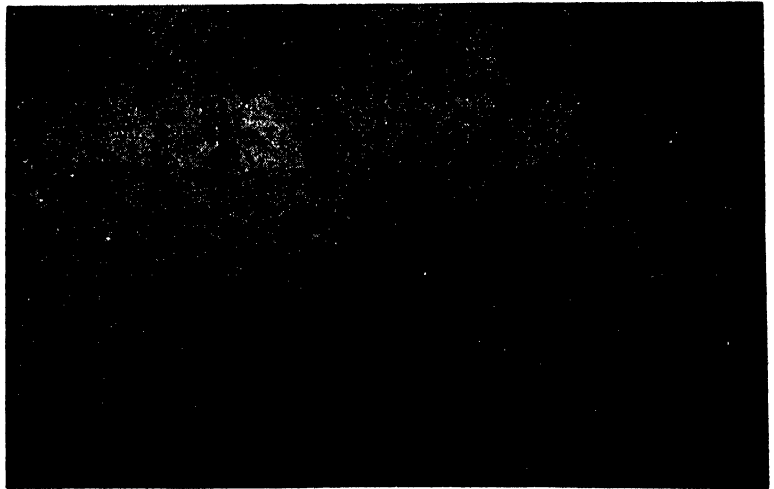
'রাওলপিণ্ডি' জাহাজ

আগে মাল্‌টা কখনও গ্রীক্‌, কখনও রোমক, কখনও বা মুসলমানদের (Moors) দখলে এসেছিল। শেষে সেণ্ট্‌ জনের বীরেরা এই দ্বীপটি হস্তগত করেন। তাঁদের কাছ থেকে আবার নেপোলিয়ন এটাকে কেড়ে নেন। শেষে নেপোলিয়ন যখন ইংরেজদের কাছে পরাজিত হলেন, সেই সময় থেকে আজ পর্যন্ত দ্বীপটি ইংরেজদের রাজ্যভুক্ত হয়েচে এবং ইংরেজেরা একে একটি অপরাজেয় দুর্গের মত গড়ে' তুলেছেন।

জাহাজ অল্পক্ষণ থাক্‌বে, কাজেই আমরা বেশি কিছু দেখতে পেলাম না। অনেক জাহাজ এখান থেকে কয়লা বোঝাই করে' নেয়। এই কয়লা বোঝাই ব্যাপার এরা এত নৈপুণ্যের সঙ্গে করে যে অভাবনীয় অল্প সময়ের মধ্যে বড় বড় যুদ্ধ জাহাজ এরা কয়লা ভর্ত্তি করে দেয়।

সেদিন জোছনার রাত ছিল, দেখলাম সমুদ্রের কিনারা থেকে বড় বড় বাড়ী উঠেছে। এইটাই হলো মাল্‌টার হারবার বা পোতাশ্রয়। এখানে জাহাজ নিরাপদে থাকতে পারে এবং জাহাজ মেরামতের কাজও খুব শীঘ্র ও সুন্দররূপে সম্পন্ন হয়। বস্তুতঃ মাল্‌টা এই জাতীয় কাজের জন্য বিশ্ববিখ্যাত। মালটার জমি উঁচু নীচু। এখানে পাহাড়ও আছে। কিন্তু তত উঁচু নয়। সমস্ত দ্বীপটাই দক্ষিণ পশ্চিম দিকে ঢালু হয়ে সমুদ্র স্পর্শ করেছে। রাস্তাগুলি উচুনীচু বলে' সিঁড়ি দিয়ে উঠ্‌তে হয়; সিঁড়ির রাস্তা আমাদের একেবারে অনভ্যস্ত নয়—কাশীর বাঙ্গালী টোলায় যেমন মাঝে মাঝে সিঁড়ি দিয়ে রাস্তায় নামতে হয় বা উঠতে হয় কতকটা সেই রকম। সিঁড়ির রাস্তা সহরেই বেশি। এখানে ট্রাম আছে কিন্তু সব শুদ্ধ ১৪।১৫ মাইলের বেশি নয়। রেলগাড়ীও চলে; তার বিস্তার আট মাইলের কম।

মালটা পাহাড়ের দেশ বলে' ততটা উর্বর নয়। কিন্তু তাহলেও চাষবাসের সুন্দর ব্যবস্থা আছে। আশ্চর্য এই যে চাষের জমিগুলিকে আগ্‌লাতে হয়েচে দেয়াল দিয়ে অর্থাৎ দেয়াল গেঁথে জমিগুলিকে ঘিরে এক অদ্‌ভুত দৃশ্য করে' ফেলেচে। ব্যাপারটা এই যে, জমিতে পাতলা পলিমাটী পড়লে তাতে শস্য হয়। কিন্তু ঝড়বৃষ্টিতে সে পলিমাটী যাতে ধুয়ে নিয়ে না যায়, তার জন্যে দেয়াল গেঁথে সেই লক্ষ্মীর আড়িকে রক্ষা করতে হয়েচে। এমন আর কোনও দেশে আছে কিনা জানি না। এ সব দেখলে বাংলা মায়ের শস্য-শ্যামলা করুণাময়ী মূর্ত্তি মনে না পড়ে পারে না। এখানে প্রকৃতি যেমন স্বভাব-কোমলা, এমন আর কোথায়ও কি আছে?

আজ বাংলামায়ের স্নেহক্রোড়ে বসে' ভাবছি, বোমার পর বোমা ফেলে, দিনের পর দিন আঘাত করে' করে' এই সব পাঁচিল ভেঙ্গে দিচ্চে যারা—তারা যে শুধু জীবন নাশ করে'ই ক্ষান্ত হচ্চে না, যারা বেঁচে থাক্‌বে তাদেরও মুখের গ্রাস কেড়ে নিচ্চে; একথা ভাবলে স্থির থাকা যায় না।

প্রথম শ্রেণীর ভোজনাগার (ডাইনিং সেলুন)

শুধু অন্ন নয়, পানীয় সম্বন্ধেও তাই। মাল্‌টায় নদী নেই বল্‌লেই চলে। বৃষ্টির জল সংগ্রহ করে' তাই সারা বছর পান করে মাল্‌টার লোকেরা। ঐ জল সংগ্রহ করবার জন্য বাড়ীগুলির ছাত এক একটি চৌবাচ্চার মত তৈরী হয়েচে—অর্থাৎ ঐ ছাতে যে জল বাধে মালটীজ-দের তাই পানীয়। সুতরাং বাড়ীগুলি ধ্বংস হ'লে পানীয় জলের অভাব ঘট্‌বে সন্দেহ নেই। ক্ষুধায় তৃষ্ণায় লক্ষ লক্ষ প্রাণী—মানুষ, ঘোড়া, মেষ, ছাগল—মরে' যাবে। বোমায় যারা মরবে না, তাদেরও যে বেঁচে থাকা ভার হবে, একথা মনে করলে আর দুঃখের অবধি থাকে না।

মালটায় অনেক ছাগল আছে। বাড়ী বাড়ী ছাগল দুয়ে গোয়ালিনীরা দুধ জোগান দেয়। মালটার মেয়েদের পোষাকে আর কোনও বৈশিষ্ট্য নেই, শুধু মাথার টুপী একটু অদ্‌ভুত রকমের। এই টুপী বোধ হয় প্রাচীনকাল থেকে ওরা পরে' আসছে। মেয়েদের চেহারা অনেকটা ইটালীয় রমণীদের মত। সোনালি রঙ, কালো চুল, টানা টানা চোখ—জোছনার রাতে ভূমধ্যসাগরের গাঢ় নীল জলের পাশে ভালই দেখিয়েছিল তাদের। পূর্বে এখানে এক রকমের জ্বর হ'ত; উহা 'মালটা জ্বর' নামে অভিহিত। বিদেশীয়েরা এই জ্বরের কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে

দেখ্‌লেন যে ছাগলের দুধ যারা খায় না, তারা এই জ্বরের কবলে পড়ে না। সেই থেকে আগন্তুকরা ছাগলের দুধ ব্যবহার করে না। কিন্তু ঐ দেশের অধিবাসীরা ছাগলের দুধই পান করে।

ছবিতে যে বড় বড় প্রাসাদগুলি দেখা যাচ্ছে, ওগুলি ইংরেজদের তৈরী নয়। ওগুলি ছিল সেই সেণ্ট জনের বীরদের (Knights of St. John) দুর্গ। এখন সেগুলি বড় বড় অফিসে পরিণত হয়েছে।

মাল্‌টার দুর্গ অত্যন্ত সুদৃঢ়, সেই জন্য এত আঘাতেও টিকে আছে—মনে হয় যেন বজ্রের মত কঠোর। এই দুর্গটির জন্য এবং জিব্রালটার ও আলেকজাণ্ড্রিয়ার দুর্গের জন্যই—ভূমধ্যসাগর ব্রিটিশদের পদানত। উত্তরে ইটালী, গ্রীস্, ফ্রান্স, পশ্চিমে স্পেন প্রভৃতি পরাক্রান্ত দেশ থাক্‌তেও এত দিন যে ভূমধ্যসাগরকে ইংরেজদের হ্রদ (British lake) বলা হয়ে থাকে, তা প্রধানতঃ এই দুর্গ তিনটির জন্য। জিব্রালটারের পাহাড়ী দুর্গ পশ্চিমের প্রবেশ পথ, আলেক্‌জাণ্ড্রিয়া পূর্ব্ব উপকূল এবং মাল্‌টা মধ্যস্থল পাহারা দিচ্ছে বলে' কারও টুঁ শব্দ করবার জো ছিল না। দেখা যাক্, আবার ভাগ্যের পটপরিবর্ত্তনে কোন নূতন চিত্র উদ্‌ঘাটিত হয়!

মাল্‌টায় রোম্যান ক্যাথলিকদের সংখ্যা বেশি। দ্বীপের মধ্যে পাহাড়ের উপর সেণ্ট পল্‌স্ গির্জ্জার গম্বুজ গগন চুম্বন করছে। এর আশে পাশে অনেক দুর্গ ও চত্বর আছে। কিন্তু গির্জ্জার উচ্চ চূড়া তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে বহুদূর পর্যন্ত ধর্মের গৌরব ঘোষণা করছিল। কিন্তু এখন কি আর তার চিহ্ন কিছুমাত্র আছে? মাল্‌টার এই ভীষণ দুর্দিনে সেই কথাই মনে পড়ছে বার বার।

আফ্রিকার উত্তর উপকূল দখল করতে হলে' মালটাকে নির্বীর্য করা দরকার। যতদিন মাল্‌টা শত্রুহস্তগত না হয়, ততদিন পর্যন্ত উত্তর আফ্রিকায় সৈন্য ও রসদ পাঠানো নিরাপদ্ হবে না, এরই জন্য মাল্‌টার উপর ক্রমাগত ধ্বংসলীলা চলচে। এখন যিনি মালটার সেনাধ্যক্ষ ও গভর্ণর
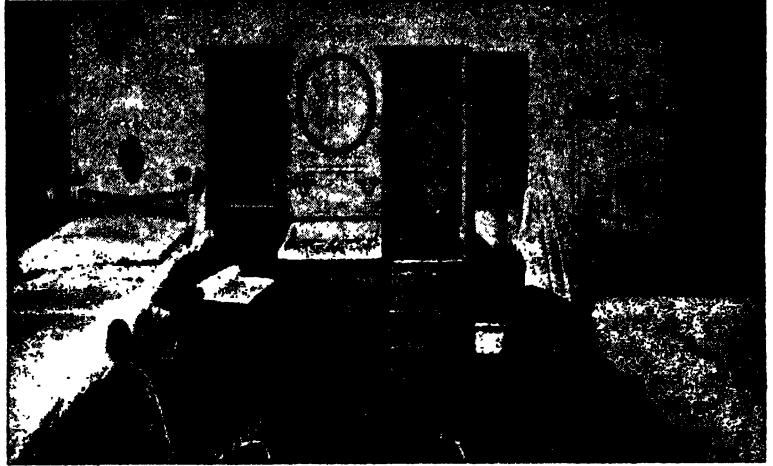
প্রথম সেলুন—শয়নাগার

তাঁর নাম লর্ড গর্ট। এই গর্ট একদিন বীরত্বের জন্য 'ব্যাঘ্র' উপাধি পেয়েছিলেন (Tiger Gort)। তিনি এর পূর্বে জিব্রালটার রক্ষার ভার পেয়েছিলেন। তাঁর অধিনায়কতায় মাল্‌টা কি টিকে থাকতে পারবে? ভগবান জানেন!

'রাওলপিণ্ডি' সন্ধ্যা সাড়ে আটটার সময় আবার ছাড়লো। সান্ধ্য ভোজনের পর আরোহীর দল ডেকে দাঁড়িয়ে মালটার শোভা দেখতে লাগলেন। যতদূর আলোকমালা দেখা যায়, ততদূর আমরা মাল্‌টার দিকে চেয়ে ছিলাম। তার পর চাঁদিনী রাতের নীরব দীর্ঘ অভিসার যাত্রা। সুনীল জলে দুধের ঢেউ তুলে জাহাজ চল্‌লো ভেসে ভেসে। চিন্তারও অপার সাগরে অগণিত ঢেউ উঠ্‌লো যতক্ষণ সুপ্তির কুহক চোখের পাতা জুড়ে দেয় নি।

ধ্বংসাতীত

শ্রীদীনেশচন্দ্র আচার্য্য

মৃত্যুদূত আসি নরে কহিল শাসিয়া—
মুহূর্তের মাঝে তোরে ফেলিব গ্রাসিয়া।

হাসিয়া কহিল নর—ভয় নাহি করি;
কীর্ত্তিমাঝে বেঁচে র'ব যুগযুগ ধরি।

বাঙ্গলার যাত্রাসাহিত্য ও গণ-শিক্ষা

শ্রীভূপতিনাথ দত্ত এম্-এ, বি-এল্

বাঙ্গলা ভাষা ও সাহিত্য আজ সভ্য জগতে অন্যতম শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছে ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ ও পঞ্চদশ শতাব্দীতে চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির রাধাকৃষ্ণের লীলাবিষয়ক মধুরভাব-গীতি—তৎপর বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের চৈতন্য ভাগবত, লোচনদাসের চৈতন্য-মঙ্গল এবং কবিরাজ গোস্বামীর চৈতন্য চরিতামৃত বাঙ্গলার ভাব ও ভাষা সাহিত্যের প্রথম সুদৃঢ় ভিত্তি। পরে নরোত্তমের প্রার্থনাসঙ্গীত বাঙ্গলা সাহিত্যের অপূর্ব্বদান ও আস্বাদ—যাহা অদ্যাপিও বাঙ্গলার কবি ও সাধককে অফুরন্ত আহার যোগাইতেছে। খৃষ্টীয় অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীর সমাজ সংস্কারক, বাগ্মী, সমালোচক, সাংবাদিক নাট্যকলা ও জাতীয়তার ভিতর দিয়া বাঙ্গলা সাহিত্যের ক্রমোন্নতি লক্ষ্য করা যায়। রাজা রামমোহন, কেশবচন্দ্র, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, প্যারিচাঁদ মিত্র, অক্ষয়কুমার দত্ত, কালীপ্রসন্ন সিংহ, চন্দ্রনাথ বসু, মনোমোহন বসু, রাজনারায়ণ বসু, স্বামী বিবেকানন্দ, মনীষী বঙ্কিম ও রমেশচন্দ্র দত্ত, মহাকবি মাইকেল মধুসূদন, নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্র ও গিরিশচন্দ্র ঘোষ, দেশপ্রেমিক হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, রঙ্গলাল, নবীন-চন্দ্র ও দ্বিজেন্দ্রলাল রায় এবং তাঁহাদের শিষ্যবর্গ ও শেষে রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র বাঙ্গলাভাষা ও সাহিত্যে যুগান্তর আনয়ন করিয়াছেন। বাঙ্গলা-সাহিত্যের ক্রমোন্নতির ইতিহাসে এই সুবৃহৎ জ্যোতিষ্কদের অন্তরালে আরও অনেক ছোট ছোট তারকারাজি মধুর ও স্নিগ্ধ আলোক দান করিয়াছেন যাহাদের উল্লেখ না করিলে ইতিহাস অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। নাট্যকার রাজকৃষ্ণ রায়, অমৃতলাল বসু, অমরেন্দ্র নাথ দত্ত, কবি রজনী-কান্ত সেন, ঔপন্যাসিক দামোদর মুখোপাধ্যায়, নারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, ঐতিহাসিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, রজনীকান্ত গুপ্ত, কবি কামিনী রায় ও গিরীন্দ্রমোহিনী, গল্পলেখক জলধর সেন, স্বর্ণকুমারী, অনুরূপা ও নিরুপমা দেবী, বৈজ্ঞানিক স্যার জগদীশচন্দ্র ও স্যার প্রফুল্লচন্দ্র এবং স্বর্গীয় রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী প্রমুখ বাঙ্গলাসাহিত্যের নীরব ও অক্লান্ত সাধক ও সাধিকা। ইঁহারা চতুর্দ্দিক হইতে সাহিত্যের এই উজ্জ্বল সম্পদকে প্রদীপ্ত রাখিয়াছেন। কবি গ্রেকে যেমন Elegy বা লোক সঙ্গীতটি অমর করিয়া রাখিয়াছে—তেমনি, 'স্বর্ণলতা' তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়কে, 'রায় পরিবার' সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তীকে এবং 'ধ্রুবতারা' যতীন্দ্রমোহন সিংহকে বাঙ্গলা সাহিত্যে চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছে।

বাঙ্গলা সাহিত্যের ক্রমবিকাশ ও উন্নতির ইতিহাস আলোচনা করিতে যাইলে উনবিংশ শতাব্দীর একশ্রেণীর লেখক ও গায়ক তাঁহাদের উজ্জ্বল প্রতিভা ও সমাজসেবার জ্বলন্ত ইতিবৃত্ত ও গৌরবময় কাহিনীসহ আমাদের দৃষ্টিগোচর হন। ইঁহারা বাঙ্গলা সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি ত করিয়াছেনই—অধিকন্তু গ্রামে গ্রামে—পাড়ায় পাড়ায়—অশিক্ষিত অর্দ্ধশিক্ষিত গ্রামবাসী, কৃষক, মজুর, গৃহী, ব্যবসায়ী ছাত্র-ছাত্রীর মনোরঞ্জন ও শিক্ষা উভয় উদ্দেশ্যই সাধন করিয়াছেন, আবাল-বৃদ্ধ বনিতার হৃদয় ইঁহারা ধর্ম্ম, ভাব, নীতি, ঈশ্বরভক্তি ও প্রেমে অনুপ্রাণিত করিয়াছেন, শিক্ষার যে উদ্দেশ্য ইঁহারা সাধন করিয়াছেন তাহা আজ অশীতি বৎসরেরও অধিক আমাদের কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এত বিরাট অর্থব্যয় ও পণ্ডিত মণ্ডলীর সাহায্যেও করিয়া উঠিতে পারিয়াছেন কিনা সন্দেহ। এই যাত্রাভিনয় লেখকগণ প্রায় সমস্ত উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধ ধরিয়া এবং বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ কাল পর্য্যন্ত লোকশিক্ষা ও আনন্দ দান করিয়া নানাভাবে বাঙ্গলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিয়াছেন। Mass Education বা গণ-শিক্ষা বলিলে আমরা যাহা বুঝি এবং যাহা আজ পৃথিবীর সমস্ত সভ্য সমাজ, রাষ্ট্র এবং নীতির চক্ষে এত বড় একটি আবশ্যক দেদীপ্যমান্ সমস্যারূপে নিজকে প্রকটিত করিয়াছে, সেই সমস্যার সমাধান পল্লীতে পল্লীতে গ্রামে গ্রামে বাজারে বন্দরে ইঁহারা প্রায় একশতাব্দী ধরিয়া সুন্দরভাবে সম্পন্ন করিয়া আসিয়াছেন। রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ ভাগবতাদি প্রাচীন গ্রন্থের ঘটনাবলী ও নায়ক-নায়িকাসম্বলিত অভিনয় ও প্রাণ-মনহারী চমৎকার সঙ্গীতে ইঁহারা সাধারণের মন বিশেষভাবে আকৃষ্ট করিতেন।

শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলা, মাথুরলীলা, কুরুক্ষেত্র লীলা, পরশুরামের মাতৃহত্যা, অজামিলের বৈকুণ্ঠলাভ, অভিমন্যুবধ, কর্ণবধ, ভীষ্মের শরশয্যা, গয়াসুরের হরিপাদপদ্ম লাভ, জয়দ্রথ বধ, দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ, কবচবধ, রুক্মাঙ্গদেবের হরিবাসর, সুরথ-উদ্ধার প্রভৃতি শতসহস্রবার অভিনীত হইয়া বাঙ্গলার পল্লীতে পল্লীতে পূজা উৎসবাদি উপলক্ষে কতই না আনন্দ ও শিক্ষা দান করিয়াছে। দিনের পর দিন মাঠে ঘাটে সকাল দুপুর-সন্ধ্যায় অভিনয়ের স্মৃতি, প্রাণস্পর্শী দৃশ্য ও সঙ্গীতগুলা হৃদয়ের তন্ত্রিতে ঝঙ্কৃত হইত এবং সর্ব্বত্র বালকযুবার মুখে তাহাদের আবৃত্তি শুনা যাইত। রাখাল গরু চরাইতে চরাইতে—বালক বিদ্যালয়ে যাইতে যাইতে—মাঝি নৌকা বাহিতে বাহিতে—কৃষক চাষ করিতে করিতে—সেই সুর—সেই তান—সেই ভাষা আবৃত্তি করিত। সকল কাজের ভিতর মনে সেই আনন্দের অফুরন্ত উৎস নিত্য জাগরূক থাকিত। দিনের পর দিন—মাসের পর মাস তাহারা প্রতীক্ষা করিত—কবে আবার আনন্দময়ীর পূজা আসিবে—যখন প্রকৃতির হাস্যময়ী মূর্ত্তিতে চতুর্দ্দিক উদ্ভাসিত হইবে—আবালবৃদ্ধ-বনিতা মায়ের আগমনে সমস্ত দুঃখ দৈন্য হাহাকার ভুলিয়া দেবীর আবাহন ও উৎসবে মাতিয়া উঠিবে—যখন তাহারা তাহাদের চির-আকাঙ্ক্ষিত সেই যাত্রা অভিনয় শুনিতে পাইবে।

যাত্রা অভিনয় প্রণয়ন করিয়া যাঁহারা বাঙ্গলা সাহিত্যে অমরত্বলাভ করিয়া গিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে ৺অঘোর কাব্যতীর্থ, ৺মতিরায়, ৺অন্নদা-প্রসাদ ঘোষাল, ৺অহিভূষণ ভট্টাচার্য্য, ৺ধনকৃষ্ণ সেন, ৺মতি ঘোষ, ৺হারাধন রায় ও ৺হরিপদ চট্টোপাধ্যায়ের নাম উল্লেখযোগ্য। অঘোর কাব্যতীর্থের হরিশ্চন্দ্র, অনন্ত মাহাত্ম্য, সপ্তরথী বা অভিমন্যু বধ, বিজয়-বসন্ত, শ্রীবৎস, প্রহ্লাদ-চরিত্র, গয়াসুরের শ্রীপাদপদ্মলাভ—৺মতিরায়ের বিজয়চণ্ডী, নিমাই-সন্ন্যাস, দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ, ভীষ্মের শরশয্যা, কর্ণবধ—কালীয় দমন, গয়াসুরের হরিপাদপদ্ম লাভ, রাবণ বধ, রামবনবাস প্রভৃতি, ৺অন্নদাপ্রসাদ ঘোষালের অজামিলের বৈকুণ্ঠলাভ, কার্ত্তবীর্য্য সংহার বা পরশুরামের মাতৃহত্যা, জয়দ্রথবধ, ৺ধনকৃষ্ণ সেনের রুক্মাঙ্গদেবের হরিবাসর, কর্ণবধ; ৺অহিভূষণ ভট্টাচার্য্যের সুরথউদ্ধার, উত্তরাপরিণয়, বামন ভিক্ষা; ৺মতি ঘোষের অভিমন্যু বধ, পরশুরাম, তারকাসুর বধ; ৺হারাধন রায়ের পার্থ-পরীক্ষা, নল-দময়ন্তী, দেবযানী; হরিপদ চট্টোপাধ্যায়ের প্রহ্লাদ চরিত্র, দাতাকর্ণ, ভক্তের ভগবান ও জয়দেব বাঙ্গলা সাহিত্যের অক্ষয় ও অতুল কীর্ত্তি। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে তাঁহাদের রচিত যাত্রাভিনয়সমূহ সমস্ত বাঙ্গলা দেশ ভরিয়া অভিনীত হইয়া বাঙ্গলা সাহিত্যে ও গণশিক্ষায় এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে।

এই সকল যাত্রাভিনয় প্রণেতাদিগের মধ্যে কেবলমাত্র ৺মতি রায় নিজ-রচিত পুস্তকাবলীর অভিনয় করিতেন। তিনি একাধারে গ্রন্থকার ও অভিনেতা উভয় হিসাবেই অশেষ খ্যাতি অর্জ্জন করেন। তাঁহার ন্যায় অপ্রতিদ্বন্দ্বী যাত্রাওয়ালা ও যাত্রাভিনয়-রচয়িতা আজ পর্য্যন্তও

কেহ জন্মগ্রহণ করেন নাই বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। মতি রায় সাধারণতঃ কলিকাতা এবং পশ্চিম বঙ্গেই নিজ রচিত গ্রন্থসমূহ সদলবলে অভিনয় করিতেন। আজও অশীতিপর বৃদ্ধেরা কলিকাতার মাঠে উদ্যানে সকাল সন্ধ্যায় তাঁহার অদ্ভুত শক্তি ও প্রতিভার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়া থাকেন।

স্বর্গীয় অঘোর কাব্যতীর্থ ও অহিভূষণের রচিত অভিনয়গুলি সমস্ত বাঙ্গলা জুড়িয়া প্রচার লাভ করিয়াছিল। ভগবৎলীলা, ঈশ্বরভক্তি, রাধাকৃষ্ণ প্রেম, শ্রীবৃন্দাবনমাধুর্য্য, শিবপার্ব্বতীর সাধন, ক্ষত্রিয় রাজাদের ধর্ম্মানুরাগ ও বীরত্ব, নারীর পতিভক্তি, গুরুজনে শ্রদ্ধা—আত্মত্যাগ সমস্ত অভিনয়ের অঙ্গ ও ভূষণ ছিল।

পূর্ব্ববঙ্গের যাত্রাভিনেতাদের মধ্যে উমানাথ ঘোষাল ও ব্রজবাসী নটের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইহা ব্যতীত দত্ত কোম্পানি, নবীনচন্দ্র দে প্রমুখ যাত্রাওয়ালাগণও বিশেষ খ্যাতি ও সম্মান লাভ করিয়াছিলেন। উমানাথ ঘোষাল ও ব্রজবাসী নট্ট প্রায় অর্দ্ধশতাব্দী ধরিয়া নিজেদের দলবল সহ পূজাপার্ব্বণাদি উপলক্ষে যাত্রাভিনয় করিয়া সহস্র সহস্র পল্লীবাসীকে আনন্দ ও শিক্ষাদান করিয়াছেন। উমানাথ ঘোষাল নিজে প্রায়ই রাজভূমিকায় অবতীর্ণ হইতেন। তাঁহার সবচেয়ে কৃতিত্ব ছিল—ছোট ছোট ছেলেদের প্রাণস্পর্শী সঙ্গীত ও নৃত্য শিক্ষায়। তাঁহার শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম—রাখাল বালক—অভিমন্যু-সুধীর ও অভীর—উত্তরা ও কুন্তী—যুধিষ্ঠির ও ভীষ্ম—পরশুরাম ও নারদ—সুরথ ও রুক্মাঙ্গ—মালি ও মালিনী—সখা সখী—দেব দেবী—গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরা—অসংখ্য কৃষ্ণভক্তির গান হৃদয়-আনন্দ-প্রেম ও ভক্তির বন্যায় আপ্লুত করিত! তাঁহার অভিনয় শুনিলে পাষাণ-হৃদয় বিগলিত হইত—পুণ্যে অনুরাগ ও উৎসাহ হইত এবং পাপের প্রতি ঘৃণা জন্মিত। ৺অহিভূষণ ভট্টাচার্য্য প্রণীত সুরথ উদ্ধার বোধ হয় সমস্ত যাত্রা সাহিত্যের ভিতর সর্ব্বোৎকৃষ্ট গ্রন্থ। উমানাথ ঘোষাল সুরথ উদ্ধার অভিনয় করিয়া বোধ হয় লক্ষাধিক টাকা উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। সুরথ উদ্ধারে যখন তাহার বালক ও জুরিগণ—

"এ মায়া প্রবঞ্চময়—এ মায়া প্রবঞ্চময়
এই ভব রঙ্গমঞ্চ মাঝে রঙ্গের নটবর হরি
যায় যা সাজান—সে তাই সাজে।
রঙ্গক্ষেত্রে জীবমাত্রে মায়াসূত্রে সবে গাথা ;
কেহ পুত্র কেহ মিত্র কেহ স্নেহময়ী মাতা।
কেহ বা সেজে এসেছেন পিতা—
কেহ রঙ্গের অভিনেতা—রঙ্গের নটবর হরি ;—
যায় যা সাজান সে তাই সাজে।
যার যখন হতেছে সাঙ্গ এই রঙ্গ অভিনয় ;
কাকস্য পরিবেদনা তখন আর সে কারও নয়।
কোথায় রয় প্রেয়সীর প্রণয়—কন্যাপুত্রের
কাতর বিনয় ;
শুনে না সে কারও অনুনয়—
চলে যায় এ শয্যা ত্যজি।"

এবং অভিমন্যু বধে যখন তাহারা

"দাদা অভীর—কেন যাবি—এ ঘোর অরণ্যে।
সে যে যুদ্ধক্ষেত্র নয়—মৃত্যুর আলয়
কত শত হত হয় সেখানে—ইত্যাদি
এবং দাদা কেবা কার পর কে কার আপন।
অসার সংসারে—আসা বারে বারে ;
কেহ নাই একারে অসার আশার স্বপন॥"

ইত্যাদি গান কয়টি গাইতেন তখন ৩০ হাজার শ্রোতাকে নিস্তব্ধতার ভিতর ঝরঝর অশ্রুবর্ষণ করিতে দেখা গিয়াছে। মেয়েদের এবং বর্ষীয়সী মহিলাদের উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে পর্য্যন্ত শুনা গিয়াছে। ধন্য উমানাথ—ধন্য তাঁহার অভিনয় শক্তি! ৺অহিভূষণ, অঘোরনাথ ও মতি ঘোষ প্রভৃতির অমৃতময়ী লেখনী-প্রসূত যাত্রাভিনয়সমূহ তাহার নিকট সার্থকতা লাভ করিয়াছিল। গণ-শিক্ষায় ৫০ বৎসর ধরিয়া পূর্ব্ব-বঙ্গের পল্লীতে তিনি সমাজের যে সেবা করিয়াছেন তাহার তুলনা নাই বলিলেই হয়। তিনি প্রতি বৎসর ভাওয়াল রাজবাটীতে অভিনয় করিতেন এবং ৮৩ বৎসর বয়সে বিখ্যাত ভাওয়াল সন্ন্যাসী মামলায় কুমারের পক্ষে ঢাকা আদালতে সাক্ষ্য দিয়াছিলেন।

উমানাথ ঘোষাল যেমন পৌরাণিক চরিত্রাবলী ও শ্রীকৃষ্ণলীলা অভিনয় করিয়া সকলকে আনন্দ ও শিক্ষাদান করিয়াছেন তেমনি স্বদেশী যুগ হইতে বরিশাল নিবাসী শ্রদ্ধেয় ঋষিকল্প ৺অশ্বিনীকুমার দত্ত মহাশয়ের অনুগত শিষ্য ৺মুকুন্দরাম দাস সমাজ-সংস্কারমূলক ও কালী-সাধনার গান ও যাত্রাভিনয়ে অক্ষয় কীর্ত্তি ও যশ অর্জ্জন করিয়া গিয়াছেন। তিনি স্বদেশ-প্রেমিক, সাধক ও সংস্কারক ছিলেন। মহাত্মা অশ্বিনীকুমারের পুণ্য-সংস্পর্শে মুকুন্দ দেশের ও সমাজের কল্যাণে নিজকে সর্ব্বতোভাবে নিয়োজিত করিয়া এবং অশ্বিনীকুমারের রচিত গান ও নাটকাবলী অভিনয় করিয়া সমগ্র বাঙ্গলার পল্লী ও নগরে নগরে এক উন্মাদনা ও প্রেরণা আনিয়াছিলেন। কর্ম্মযোগ, সংসার ও সমাজ অভিনয়ে তিনি স্বার্থপরতা—নীচতা এবং সমাজের মজ্জাগত পাপ-পঙ্কিল প্রবাহকে তীব্র কশাঘাত করতঃ তাহাদের কদর্য্যতার নগ্নমূর্ত্তি সমাজের চক্ষে ধারণ করিয়াছিলেন। বরপণ—কন্যাবিবাহ সমস্যা—গুরুজনের প্রতি অশ্রদ্ধা—পিতামাতার প্রতি অবজ্ঞা—ধর্ম্মবিমুখতা—নীতি আচার প্রতিকূলতা তিনি বিশেষ ভাবে নিন্দা করিয়াছেন। স্বদেশপ্রেম—জাতীয়তা—ঈশ্বরে অনুরাগ—দেশ ও সমাজের মঙ্গল সম্বন্ধে তিনি উৎকৃষ্ট গান গাহিয়া শ্রোতার মন অবিনশ্বর প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিতেন। তাঁহার কালী সাধনা ও সঙ্গীত এবং দৃঢ় ভক্তি ও বিশ্বাস নিতান্ত দুর্ব্বলকেও সাহসী ও সজীব করিয়া তুলিত!

শুনি মাভৈঃ মাভৈঃ বাণী মাভৈঃ মাভৈঃ।
অভয়ত হ'য়ে গেছি ভয় আর কই॥
বিপদ পাহাড়ের মত—আসুক না আস্‌বে কত।
ঐপদে হবে হত আমি হ'ব জগজ্জই॥
শুনি মাভৈঃ—মাভৈঃ বাণী মাভৈঃ মাভৈঃ। ইত্যাদি

আবার সাধনার মাধুর্য্য—

আমি যারে চাই—তারে কোথা পাই।
খুঁজি ঠাঁই ঠাঁই ঠিকানা না পাই॥
শুনি সর্ব্বঘটে ঘটে মঠে পটে।
রয় সে নিকটে দেখা নাহি পাই॥
কমল কাননে রবি শশী কোণে।
কাশী বৃন্দাবনে যমুনা পুলিনে।
(আমি) মাঝে মাঝে থাকি আঁখি মুদে বসি।
দেখি কালো শশী চুপি চুপি আসি॥
হৃদি কুঞ্জবনে মারে উঁকি ঝুঁকি।
আমি ধরি বলি গেলে যায় গো পালাই॥

আবার আধ্যাত্মিকতার চরম উৎকর্ষ—

"কুলকুণ্ডলিনী—তুমি কে?
ঘটে ঘটে আছে গো মা চৈতন্যরূপে
মমঘটে অচৈতন্য হ'লে কিরূপে"—ইত্যাদি

আবার সমাজকে বেত্রাঘাত—

"মা বেটী অভাগী শুদাম ভাড়া পাবে
বুড়ো বাপটা শুধু ব'সে ব'সে খাবে
আমার বৌয়ের কচি হাতে কি সয় বাটনা বাটা? ইত্যাদি

সমাজের নির্ম্মমতায় বড় দুঃখে বলিয়াছেন—

ভাইরে মানুষ নাই এ দেশে
ভাইরে মানুষ নাই এ দেশে
সকল মেকি সকল ফাঁকি যে জন মজে আপন রসে।
যে দেশ সকল দেশের সেরা
সে দেশের এমনি ধারা
দেখে শুনে ইচ্ছা হয় রে
চলে যাই বিদেশে।

আবার দেশ প্রেমোদ্দীপক স্বদেশী যুগের সেই প্রাণ মাতান গান—

"বাবু বুঝ্‌বে কি আর ম'লে—
বাবু বুঝ্‌বে কি আর মলে।
পমেটম্ like করিলি দেশী আতর ফেলে
সাধে কি দেয়রে গালি brute-nonsense শূয়ার ব'লে।
বাবু বুঝ্‌বে কি আর মলে—ইত্যাদি।

মুকুন্দ ইহজগতে নাই—কিন্তু তাঁহার বিরাট ব্যক্তিত্ব দেশের সর্ব্বশ্রেণীর লোকের মনে মৃত্যুহীন ছাপ রাখিয়া গিয়াছে।

বাঙ্গলার যাত্রা-সাহিত্যের অনুশীলন করিতে যাইলে কি ভাবে যাত্রা-গান এত প্রসার লাভ করিল এবং কোন্ কোন্ যাত্রাওয়ালাগণের অগ্র-পশ্চাৎ অভ্যুদয়ের দরুণ এই যাত্রাভিনয় এত জনপ্রিয় শিক্ষা ও আনন্দের সামগ্রীতে পরিণত হইয়াছিল তাহা অনুসন্ধান করিতে স্বভাবতঃই আকাঙ্ক্ষা হয়। যাত্রাগানের পূর্ব্বে সমস্ত অষ্টাদশ শতাব্দী ও উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে এদেশে কবি গানের বিশেষ প্রচলন ছিল। যে যাত্রা গান পরে উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে মতি রায় প্রমুখ দেশবিখ্যাত ব্যক্তিগণের হস্তে এত উৎকর্ষলাভ করিয়াছিল- তাহার তখন এদেশে জন্মও হয় নাই। যাত্রা গানের পূর্ব্বে এক শতাব্দী ধরিয়া কবিগান তাহার শক্তি সম্পূর্ণ অপ্রতিহত রাখিয়াছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে ভবানী বেণে, রামবসু, রামানন্দ নন্দী, নিধুবাবু প্রভৃতির নাম কবি গানের ইতিহাসে চির-প্রসিদ্ধ হইয়া থাকিবে। কবিগানের বিশেষত্ব ছিল যে ইহাতে নায়কগণ মুখে মুখে সভার আসরে কবিতা রচনা করিয়া প্রতিদ্বন্দ্বীকে পরাজিত করিতে চেষ্টা করিতেন এবং ইহাতে প্রায়ই কোন বেশভূষা বা পোষাক পরিচ্ছদ ছিলনা। কবিগান গণ-শিক্ষার দিক্ দিয়া যাত্রাগানের পূর্ব্বে সমাজের প্রভূত উপকার সাধন করিয়াছিল। ক্রমে যাত্রার মাধুর্য্যে ও সৌন্দর্য্যে লোক আকৃষ্ট হওয়ায় এবং ইহা আবালবৃদ্ধ-বনিতার অধিকতর বোধগম্য হওয়ায় কবিগান ক্রমশঃ ইহার প্রভাব ও জনপ্রিয়তা অল্পে অল্পে হারাইতে লাগিল।

যাত্রাওয়ালাগণের মধ্যে উনবিংশ শতাব্দীতে মদন মাষ্টারের দলই প্রথম খ্যাতিলাভ করে। ইনি মতি রায়ের পূর্ব্বে। ফরাসডাঙ্গায় ইঁহার বাড়ী ছিল এবং সেখানে ইনি নিজ দল গঠন করেন। তিনি নিজে অনেকগুলা যাত্রাভিনয়ও রচনা করিয়াছিলেন। রামবনবাস, গঙ্গামহিমা, রাবণবধ প্রভৃতি অভিনয় করিয়া তিনি অশেষ খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। শিয়ালদহ সার্পেণ্টাইন্ লেন—শিবতলা প্রভৃতি স্থানে বারোয়ারী পূজায় ইনি প্রতি বৎসর গান গাইতেন। ৭৮ বৎসর উন্নতির চরম সীমায় উঠিয়া ইনি পরলোকগমন করিলে বউ মাষ্টার নামে ইঁহার দল চালিত হইয়াছিল। বউ মাষ্টার দলের প্রহ্লাদ চরিত্র, ব্রজলীলা, গঙ্গাভক্তি-তরঙ্গিনী ও কালীয়দমন অভিনয় খুব প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল।

মদন মাষ্টারের সমসাময়িক নীলকণ্ঠ ও গোবিন্দ অধিকারী এবং বদন অধিকারীর দলও বিখ্যাত ছিল। ইঁহারা হুগলি জেলার খানাকুল কৃষ্ণনগরের নিকটবর্ত্তী স্থানের লোক ছিলেন। ইঁহারা কেবল রাধাকৃষ্ণের লীলা কীর্ত্তন করিতেন। গোবিন্দ অধিকারী যাত্রাগান করিয়া প্রভূত যশলাভ ও অর্থোপার্জ্জন করিয়াছিলেন। ইঁহার সময়ে পরমানন্দ ও জগদীশ গাঙ্গুলীর দলও বিখ্যাত ছিল। ইঁহারা সকলেই মতি রায়ের পূর্ব্ববর্ত্তীগণ।

বউ মাষ্টারের সমসাময়িক ব্রজ রায়ের দল, মতি রায়ের দল। রাজা রামমোহন রায়ের বংশধর হরিমোহন রায়ের দল, লোকনাথ দাস ওরফে লোকা ধোপার দল, গোপাল উড়ের দল, যাদব বন্দ্যোপাধ্যায়, যাদব চক্রবর্ত্তী, অভয় দাস, নারায়ণ দাস, নবীন ডাক্তার, মহেশ চক্রবর্ত্তী—তৎপর আশু চক্রবর্ত্তী, পীতাম্বর পাইন, বক্রেশ্বর পাইন, ত্রৈলোক্য পাইন প্রভৃতির দল এবং ইঁহাদের পরে অর্থাৎ বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে সতীশ মুখোপাধ্যায়, সত্যম্বর চট্টোপাধ্যায়, প্রসন্ন নিয়োগী, ভূষণ দাস, বউকুণ্ডু এবং পরে মথুর সাহা প্রভৃতির দল খ্যাতি ও সম্মান লাভ করিয়াছিল। এই সকল যাত্রাওয়ালাগণের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভাস্কর ৺মতিলাল রায়ের কথা পূর্ব্বেই আমরা বিশেষ ভাবে উল্লেখ করিয়াছি। কিন্তু লোকনাথ দাস ওরফে লোকা-ধোপা এবং গোপাল উড়ে প্রভৃতির সম্বন্ধে দু চারটি কথা লিপিবদ্ধ না করিলে প্রবন্ধ অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে।

লোকনাথ দাস ওরফে লোকা-ধোপা কমলে-কামিনী ও সাবিত্রীসত্যবান্ গাহিয়া মৃত্যুহীন ফল লাভ করিয়াছিলেন। ইঁহার দেবদুর্লভ কণ্ঠস্বর শ্রোতৃবর্গকে মুগ্ধ রাখিত এবং কথিত আছে যে স্বয়ং ভগবতী বৃদ্ধার বেশ ধারণ করিয়া ছদ্মবেশে ইঁহার গান শুনিতে আসিয়াছিলেন। কলিকাতা বেণে-পুকুরে ইঁহার বাড়ী ছিল এবং তিনি যাত্রাগান গাহিয়া প্রভূত বিষয় সম্পত্তির মালিক হইয়া একটি সুন্দর দেবালয় প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন।

গোপাল উড়ে অত্যন্ত প্রিয়দর্শন ও সুকণ্ঠ ছিলেন। কেবলমাত্র বিদ্যাসুন্দর অভিনয় করিয়া ইনি লক্ষাধিক টাকা রোজগার করিয়াছিলেন। স্ত্রীলোকের পাঠে ইঁহার অসাধারণ কৃতিত্ব ছিল, স্ত্রীলোক সাজিলে কেহই তাঁহাকে পুরুষ বলিয়া ধরিতে পারিত না।

ব্রজ রায় সমুদ্র মন্থন, রাজসূয় যজ্ঞ, কর্ণবধ ; মহেশ চক্রবর্ত্তী দক্ষ যজ্ঞ, রাবণবধ ; আশু চক্রবর্ত্তী কমলে-কামিনী, চন্দ্রহাস ; নবীন ডাক্তার দশরথের মৃগয়া, বালিবধ ; পীতাম্বর পাইন সত্যনারায়ণ-লীলা, দুর্য্যোধনের উরুভঙ্গ ; বক্রেশ্বর পাইন নরমেধ যজ্ঞ, ধ্রুব চরিত্র, ত্রৈলোক্য পাইন সতী-মাল্যবতী, অনুধ্বজের হরিসাধনা ; অভয় দাশের দল যুধিষ্ঠিরের স্বর্গারোহণ, প্রবীর পতন, নারায়ণ দাসের দল বামন ভিক্ষা, সুভদ্রা-হরণ, রুক্মিনী-হরণ ; ভূষণ দাসের দল অভিমন্যুবধ, তরণীসেন বধ, বউ কুণ্ডুর দল প্রহ্লাদ-চরিত্র, রাই উন্মাদিনী, মার্কণ্ডেয়-পুনর্জন্ম বাঙ্গলা দেশের সর্ব্বত্র অভিনীত হইয়া লোকের মনে অশেষ প্রভাব বিস্তার ও যুগান্তর আনয়ন করিয়াছিল। এতদ্ব্যতীত সত্যম্বর চট্টোপাধ্যায়ের দল কর্ত্তৃক অভিনীত ত্রিশঙ্কু, শর্ম্মিষ্ঠা, জড়ভরত, শশী অধিকারীর দলের বেদ-উদ্ধার, শশী হাজরার দলের দ্রোণ-সংহার, মা, মান্ধাতা, জয়দ্রথবধ, বীণাপাণি অপেরার দেবাসুর, রামের বনবাস, চাঁদসাগর, ষষ্ঠী অপেরা পার্টির কর্ম্মফল, অদৃষ্ট, মিবার কুমারী, ভীষ্মার্জ্জুন, রসিকচন্দ্র চক্রবর্ত্তী রায় গুণাকরের বালক সঙ্গীত সম্প্রদায় তাঁহার রচিত সীতা নির্ব্বাসন, প্রভাস যজ্ঞ ইত্যাদি অভিনয় করিয়া অক্ষয় কীর্ত্তি অর্জ্জন করিয়া গিয়াছেন।

যাত্রার প্রাচীন মাধুর্য্য ও সৌন্দর্য্য অনেকটা রূপান্তর হইল প্রথমতঃ আধুনিক যাত্রাওয়ালাদের প্রথম ধ্বজাবাহক মথুরানাথ সাহার হস্তে। ইনি যাত্রাদলের প্রধান অঙ্গ বালক ও জুড়ির গান উঠাইয়া দিয়া উহাতে অবিকল থিয়েটারের কনসার্ট আনয়ন করেন। বর্ত্তমানে সমস্ত যাত্রার দল ইহারই অনুকরণ করিয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। বালক ও জুড়ির প্রাণ-মাতান সঙ্গীত আর নাই—থিয়েটারি সুরে গান ও নাচ তাহাদের স্থান দখল করিয়াছে। প্রাচীন রাগ রাগিনী সম্পূর্ণ পরিহার করা হইয়াছে, কারণ তাহা নব্য-ধরণের শ্রোতার চক্ষুঃশূল। মথুর সাহার গণেশ অপেরা পার্টি নূতন ধরণে পদ্মিনী, শুকদেব ইত্যাদি অভিনয় করিয়া যশস্বী হইয়াছে।

যাত্রাকবি এখনও আছে—কিন্তু সে কবিও নাই—সে যাত্রাও নাই,

পরিতাপের বিষয় বাঙ্গলার পল্লী আজকাল আর সেই যাত্রাগানের আনন্দে মুখরিত হইয়া উঠে না। যে যাত্রাগানের নামে চতুর্দ্দিকের দশ বর্গ মাইলের লোক আসিয়া সমবেত হইত—যে মদন মাষ্টার, মতিরায়, ভূষণ দাস, উমানাথ, মুকুন্দ প্রভৃতি যাত্রাওয়ালাগণ অগ্রপশ্চাৎ প্রায় একশত বৎসর বা ততোধিক ধনী নির্ধন—দুঃখী গরীব—বালক বালিকা—যুবক যুবতী—বৃদ্ধ বৃদ্ধা—কৃষক মজুর—শিক্ষিত অশিক্ষিত সকলকে এত আনন্দ—ধর্ম্ম ও নীতি শিক্ষা দান করিয়াছেন তাঁহারা কোনও উপযুক্ত ও যোগ্য প্রতিনিধি রাখিয়া যান নাই। কাল যেমন পরিবর্ত্তনশীল—লোকের অভিরুচিও তেমনি। আজ যাহা কোন দেশের লোক ও সমাজ পছন্দ করে—ত্রিশ বৎসর পরে হয়ত তাহা করিবে না। বিলাতে যেমন Mysteries ও Miracles ক্রমশঃ উন্নীত হইয়া বর্ত্তমান নাটক ও নাট্যশালায় পরিণত হয়—এখানেও আড়ম্বরবিহীন সাদাসিদা যাত্রাগানের পরিবর্ত্তে লোক নাটক ও রঙ্গমঞ্চের উপর আকৃষ্ট হইয়া পড়িয়াছে। আবার ক্রমে তাহা অপেক্ষা বর্ত্তমান সিনেমা—বিশেষতঃ সবাক্ চলচ্চিত্র এমন কি নাট্যশালাকেও পশ্চাতে ফেলিয়া দিয়াছে। সুদূর পল্লীতেও এখন যাত্রাগানের পরিবর্ত্তে পূজা পার্ব্বণ উৎসবাদিতে থিয়েটার বায়স্কোপই সম্পূর্ণ সমাদর লাভ করিয়াছে।

কিন্তু এখনও বাঙ্গলার প্রাচীন জনসাধারণ যাত্রাগানের মাধুর্য্য ও স্মৃতি বিস্মৃত হইতে পারেন নাই। এত নাট্যকলা ও চলচ্চিত্রের উন্মাদনা ও জাঁকজমকেও পল্লীবাসী সেই অঘোর কাব্যতীর্থ, অহিভূষণ ভট্টাচার্য্য, মতি রায়, ভূষণ দাস, উমানাথ ঘোষাল, মুকুন্দ দাস প্রভৃতি যাত্রাগান রচয়িতা ও অভিনেতাদের ভুলিতে পারে নাই; সুরথ উদ্ধার, অভিমন্যু বধ, প্রহ্লাদ চরিত্র, ধ্রুব চরিত্র, রুক্মাঙ্গদের হরিবাসর, ভীষ্মের শরশয্যা প্রভৃতি যাত্রার অমর সঙ্গীতগুলা তাহাদের স্মৃতিপটে চিরদিনের জন্য অঙ্কিত হইয়া আছে। বাঙ্গলার গণ-শিক্ষায় এই যাত্রাওয়ালাগণ তাঁহাদের অভিনয় দ্বারা যে মহৎউদ্দেশ্য সাধন করিয়াছেন তাহা বিশ্ববিদ্যালয়ের মুষ্টিমেয় লোককে শিক্ষাদান কার্য্য হইতে অনেক বড়। এই যাত্রাভিনয়-সমূহ ও প্রাণ-স্পর্শী আধ্যাত্মিক ও সমাজসংস্কারমূলক গানগুলা বাঙ্গলা সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। যতদিন বাঙ্গলা সাহিত্য থাকিবে, ইঁহাদের মহৎ দান বাঙ্গালী কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণ করিবে।

পপি

শ্রীজনরঞ্জন রায়

সকালবেলা অভ্যাস মতো মা-কালী দর্শনে আসিয়াছি। এই পর্য্যন্তই আমার বেড়াইবার লিষ্ট আছে। আর পাল্লাও তো বড় কম নয়…কামারডাঙা থেকে কালীঘাট। শেষ বয়সে বেড়ানো ছাড়া করিবই বা কি? বেড়াইবার মুখে নানান জিনিস চোখে পড়ে। কিন্তু আজ যাহা দেখিলাম খুব নতুন। একটা পার্কের কাছে মোটরখানা আসিতেছিল ভারি জোরে। কড়কড় করিয়া ব্রেকের শব্দ হইল। কুকুরটাকে চাপা দিয়াছিল আর কি… একটা বাদামে রঙের ঝুমরো কুকুর। দাঁড়াইলাম। কুকুরটা নড়ে না… গাড়িটা ঘুরিয়া চলিয়া গেল। তাহার কাছে গেলাম… ট্রাম আসিতেছিল। কুকুরটা পাক্ খাইতে খাইতে ট্রাম লাইনের উপর গিয়া পড়িল। কণ্ডাক্‌টার ব্রেক্ কসিল। ঝাঁকুনি খাইয়া ট্রামটা দাঁড়াইল। ঢংঢংঢং…ঢংঢং—তবুও কুকুরটা ওঠে না! গাড়িশুদ্ধ লোক অতিষ্ঠ। অনেকে লাঠি নিয়া নামিল। হয়তো মারিয়াই ফেলিত। কিন্তু! সবাই ভাবিল সাহেবের কুকুর… লালমুখ বুঝি ঐ আসিতেছে দৌড়িতে দৌড়িতে। সবার হাতের লাঠি হাতেই থাকিল। কৌতূহল হইল…কুকুর আমি ভালবাসি… আমার সাহেবের কুকুরকে কত বিস্কুট দিতাম। এ কেন মরিতে চায়?…এত সুন্দর কুকুরটি… ভারি মায়া হইল। মুখ দিয়া বাহির হইল—পপি পপি! আশ্চর্য্য—দুই পায়ে সেটা খাড়া হইয়া দাঁড়াইল…আমার কোলে আসিয়া ঝাঁপাইয়া পড়িল! ইহার নামও কি পপি? আমার সাহেবের কুকুরের নাম ছিল তো পপি। তাহার মাথায় হাত বুলাইলাম। সরিয়া আসিলাম ট্রাম লাইনের কাছ হইতে। ট্রাম আবার চলিল। ট্রামের লোক আমায় বিদ্রুপ করিল—খুব কুকুরের টিক্ দেখালেন যা'হোক! কুকুরটা আমার হাত চাটিল…গা শুঁকিল। আবার সে ছুটিতে চায়…এবার বুঝি মরিবে। তাহার বগলশে কাপড়ের খুঁট বাধিয়া দিলাম…যাহার হয় দিয়া দিব…অপমৃত্যু তো বাঁচাই। সেটা ছুটিতেছে…আমিও ছুটিতেছি…টালিগঞ্জের দিকে একটা বস্তি…সদ্য-ভাঙা ঘর দোর। এক ঝাটকানিতে আমার পচা কাপড়ের খুট ছিঁড়িয়া নিয়া দিল দৌড়। কোথায় গেল দেখিতে পাই না…। দাঁড়াইয়া আছি…দাঁড়াইয়া আছি। পিছন হইতে মেয়েলী আওয়াজ—বাবুজী বাবুজী! ফিরিয়া দেখি নাক-থেবড়া এক ভুটিয়ানী…কোলে তাহার পপি…তাহার সোনার বেসর বহিয়া চোখের জল পড়িতেছে। তাহার পরেই আসিল তাহার পুরুষ…প্রৌঢ়…খুর্কি আঁটা…মাথায় টুপি। সে ভাঙা হিন্দিবাংলায় বলিল—বাবু তুমি আমাদের পপিকে বাঁচিয়েছো…তুমিই একে রাখো—আমরা তো চললাম…কোথায় জানি নে…ফিরবো কি-না জানিনে…সাহেব মেম বেবিরা ষ্টেশনে—আমাদের অপেক্ষা কোরছে। আজ যাবার আগে সাহেব নিজের কুকুরগুলোকে মেরে ফেলেছে… নিজে গুলি কোরে মেরে ফেলেছে…পপিকে কেন মারে নি? দারোয়ানের কুকুর ভেবে মারে নি। আমি ভুটান থেকে একে নিয়ে আসি এতটুকু…আমাদের দেশ থেকে নিয়ে আসি। আজ সে গাড়ির তলায় পড়ে' মরছিল…কেন জানো? জীবনে তার ধিক্কার হয়েছে। তার ষ্ট্রাপটা এনে দিচ্ছি বেঁধে নিয়ে যাও। ভুটিয়া লোকটি একটি চমৎকার ষ্ট্রাপ্ আনিয়া পপির বগলশের সঙ্গে বাঁধিয়া দিল। মাথার উপর তখন এক ঝাঁক উড়োজাহাজ গোঁ গোঁ শব্দে আকাশ তোলপাড় করিতেছে। বলিল—আর নয় বাবু… পালাও পালাও…ঐ বুঝি সাইরেন বাজে…আমরাও চলেছি… পালাও।

পপিকে নিয়া দৌড়াইতেছি…তাহার চোখ দিয়া বহিতেছে শ্রাবণের ধারা…।

পদকর্ত্তা—কৃষ্ণ দাস

স্বরলিপি—রায় বাহাদুর শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র সঙ্গীতরত্ন

ঝুলন লীলা

বিহঙ্গ নট্—ঝপতাল

আজু কুঞ্জে রাধামাধব ঝুলেরি।
সখীগণ মেলি করত গান,
ঘন ঘন ঘন মুরলী শান,
লোচনে লোচনে তোড়ই মান
নাসায় বেশর দোলেরি। (ক)

হিন্দোলা রচিত কুসুম পুঞ্জ
অলিকুল তাহে বিরহে গুঞ্জ
সারি শুক পিক বেড়ল কুঞ্জ
ঘেরি ঘেরি ঘেরি বোলেরি।

হিন্দোলা দোলয়ে অতিহুঁ বেগে
মনহি দুঁহুক আরতি জাগে,
মদন কদন দূরেহি ভাগে
হেরি তিনলোক ডোলেরি।

ঝুলনা ঝমকে চমকে রাই,
বিহসি নাগর ধরল তাই,
আনন্দে মগন পরশ পাই,
চাপি করত কোলেরি। (খ)

প্রিয় সহচরী টানত ডোরি,
অলসে অবশ হইলা গোরী,
ঘুমায়ল তহি রসে বিভোরি
দীন কৃষ্ণদাস গায়রি।

আখর

(ক) ঝুলিতে ঝুলিতে —১ম সুর
ঝুলনা উপরে ঝুলিতে ঝুলিতে —২য় সুর

(খ) বঁধু ব'লে —১ম সুর
আপন পরাণ বঁধু ব'লে —২য় সুর

র্সর্সা র্সর্সা I র্সা -নর্সর্রর্সর্রর্সা -ণর্সণধণধা | -পধপমপমা -গমপা -গা I -গা -া -া | -গা গা গমা I
আজু কুঞ্জে রা ০০০০০০ ০০০০০০ ০০০০০০ ০০০ ০ ০ ০ ০ ০ রা ধা০

রা -গা -া | মা ধপা মা I গগা -গা -গরা | সন্‌সা
মা ০ ০ ধ ০ ব ঝুলে ০ ০০ রি০ ০
১×

স্বর বিস্তার

সপা পা I পা -া -া | -পা -া {মা I মা -পা পা | -পা পা পা I
১× কুন্‌ জে রা ০ ০ ০ ০ আ জু ০ রে ০ কুন্‌ জে

পা -ণা -ধা | -পা -পা} গমা I রা -গা -া | মা -ধপা মা I
রা ০ ০ ০ ০ রাধা মা ০ ০ ধ ০ ০

গগা -গা -গরা | সন্‌সা -া (-া) I
ঝুলে ০ ০০ রি০০ ০ ০
২×

মা মপা I পা -া -া | পা -া পা I পা পা পা | -পা পা ধা I
২× রা ধা০ মা ০ ০ ধ ০ ব ঝু লে রি ০ রা ধা

ণা -র্সা -র্রা | র্সা -ণা ণধপা I পা পধপা মা | -গা গা মা I
মা ০ ০ ধ ০ ব০০ ঝু লে০০ রি ০ রা ধা

রা -া -গা | মা -ধপা মা I গগা -গা -গরা | সন্‌া -সা -সা I
মা ০ ০ ধ ০০ ব ঝুলে ০ ০০ রি০ ০ ০

-সা -সা (র্সা | র্সা র্সর্সা র্সা I
০ ০ আ জু কুন্‌ জে রাধা মাধব ইত্যাদি পুনরায় গাহিতে হইবে।

পা পা পা | মা গা মা I পা না না | না -া -না I
স খী গ ণ মে লি গা ও ত গা ০ ন

+ ০ + ০
র্সা র্সর্গা র্গা | র্রা র্সা র্সা I র্সা র্সর্রা র্রা | র্সনা -া র্সা I
ঘ ন ঘ ন ঘ ন মু র লী শা০ ০ ন

+ ০ [র্সা র্সর্গা র্রা ০
র্সা -া -া | -নর্সর্রর্সর্রা -র্সনধপা -ধপমপা I র্সা র্সা র্সা | র্সা র্সা র্সা I
রে ০ ০ ০০০০০ ০০০০ ০০০০ লো চ নে লো চ নে

+ ০ + ০
না না পা | পধনর্সা -না না I {মা পা পা | পা পা পধা I
তো ড় ই মা০০০ ০ ন না সা য় বে শ র০

+ ০ + ০
ণা -র্সর্রা র্সা | ণা -ধা -পা} I পা -ণা -ধা | -পা -মা -গা I
দো ০০ লে রি ০ ০ ই ০ ০ ০ ০ ০
১×

+ ০ + ০
-গা -গমা -পা | -মা -মা -পা I -মগা -গা -মা | -রা -রা -রা I
০ ০ ০ ০ ০

+ ০
-সা সা পা | -সা -সা -সা I

+ ০ + ০
সা সা সা | সা সপা পা I মপা পা পা | পা -া পা I
ঝু ল না ঝ ম০ কে চ ম কে রা ০ ই

+ ০ + ০
পা র্সা ণা | ধা ণা ধা I পা ধা পা | মা -গা মা I
বি হ সি না গ র ধ র ল তা ০ ই

+ ০ + ০
পা -া -া | পমা -া -া I মগা -া -া | রসা -া -া I
রে ০ ০ এ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

+
[সা র্সর্রর্গ রা ০ + ০
র্সা র্সর্সা র্সা | র্সা র্সা র্সা I না না পা | পধনর্সা -না না I
আ নন্ দে ম গ ন প র শ পা০০০ ০ ই

+ ০ + ০
মা -পা পা | পা পা পধা I ণা -র্সর্রা র্সা | ণা -ধা -পা I
চা ০ পি ক র ত০ কো ০০ লে রি ০ ০
১×

\+ ০ + •
পা -ণা -ধা | -পা -মা -গা I গা -গমা -পা | -মা -মা -পা I
ই ০ ০ ০ ০ ০ ই ০০ ০ ০ ০ ০

\+ ০ + •
মগা -গা -মা | -রা -রা -রা I -সা -সা -সা | -সা -সা -সা I
ই ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

আখর (ক)

\+ ০
I ণা ণা ণা | ধা পা পধা I
১× ঝু লি তে ঝু লি তে০
২×

\+ ০ + ০
মা পা পা | পা পা পধা I ণা ণা ণা | ধা পা পধা I
২× ঝু ল না উ প রে০ ঝু লি তে ঝু লি তে

\+ ০ + ০
মা পা পা | পা পা ধা I ণা -র্সা ণা | ণা -ণধা -ধপা I
"ঘরে" না সা য় বে শ র দো ০ লে রি ০০ ০০

\+ ০
পা -ণা -ধা | পা -মা -গা I
ই ০ ০ ই ০ ০ ইত্যাদি

আখর (খ)

\+ ০ + ০
ণা ণা -ণা | ধা পা -পধা I মা -পা পা | পা পা পধা I
১× বঁ ধু ০ ব' লে ০০ চা ০ পি ক র ত০
২×

\+ ০ + ০
মা পা -পা | পা পা ধা I ণা ণা -ণা | ধা পা -পধা I
২× আ প ০ ন প রাণ বঁ ধু ০ ব' লে ০০

"চাপি করত কোলেরি" ইত্যাদি গাহিয়া 'ঘরে' ঢুকিতে হইবে।

* আখর যেখানে ধরিতে হইবে, তাহা বুঝাইবার জন্য ১×, ২× এইরূপ সাঙ্কেতিক ব্যবহার করা হইয়াছে। ১× অর্থাৎ দ্বিতীয় স্তরের আখর সেই সেই স্থলে আরম্ভ করিতে হইবে।

নব প্রকাশিত 'কীর্ত্তনগীতি প্রবেশিকা' হইতে উদ্ধৃত

তৃতীয় পক্ষ

শ্রীসরোজকুমার রায়চৌধুরী

দ্বিতীয়া পত্নীর বিয়োগের পর রামহরি কয়েকটা দিন মুহ্যমান হয়ে রইল।

কিন্তু ওই কয়েকটা দিনই মাত্র। পি, ডবলিউ, ডি'র সাব-ওভারসিয়ারের তার বেশী শোক করার সময় নেই। গুড় সহযোগে খানকয়েক বাসি রুটি এবং এক পেয়ালা চা—এই খেয়ে রামহরি বাইসিকেল নিয়ে সকাল সাতটার আগেই বেরিয়ে যায়। জেলা বোর্ড থেকে কোথায় রাস্তা মেরামত হচ্ছে, কোথায় পুল তৈরী হচ্ছে, কোথায় পুকুর খোঁড়া হচ্ছে, সে সমস্ত তদারক ক'রে যখন সে ফেরে তখন কোনোদিন বারোটা, কোনোদিন বা একটা। তারপরে স্নানাহার করে একটুখানি নিদ্রা দিয়ে আবার তিনটের সময় বেরিয়ে পড়ে। এবারে আর রাস্তা তদারকে নয়, আফিসে। তারপরে সন্ধ্যার আগে আফিস থেকে বাসায় ফিরে একটু জলযোগ ক'রে দত্তদের আড্ডায় তাস খেলতে যায়। ফিরতে রাত্রি এগারোটা-বারোটা।

এই তার কাজ। মফঃস্বল শহরে এই আবেষ্টনীর মধ্যে এবং এই চাকুরীতে বেশী দিন শোক করার অবসর কোথায়?

তারপরে রামহরির বয়স হয়েছে পঞ্চাশের কাছাকাছি। ঘরে অনেকগুলি ছেলেমেয়ে। প্রথম পক্ষের তিনটি—বড়টি মেয়ে। বছর কুড়ি তার বয়েস। বছর চারেক আগে অনেক সমারোহ ক'রে রামহরি তার বিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু দু'বছরের মধ্যে সিঁথির সিন্দুর, হাতের শাঁখা খুইয়ে অভাগিনী অমলা বাপের বাড়ী ফিরে এল। সেই থেকে সে বাপের বাড়ীতেই আছে।

অমলার পরে যেটি, সুরেন, সে এবার ম্যাট্রিক দেবে। তার পরেরটি আরও নীচে পড়ে।

দ্বিতীয় পক্ষের দুটি মাত্র ছেলে। বড়টি স্কুলে পড়ে। ছোটটি বছরের পাঁচেকের মাত্র।

এই নিয়ে রামহরির সংসার।

রামহরি লোকটি আসলে মন্দ নয়। কিন্তু কুলি ঠেঙ্গিয়ে ঠেঙ্গিয়ে বাইরেটা একেবারে কাঠখোট্টা। বেশী কথা সে বলতে পারে না, যেটুকু বলে তাও গুছিয়ে নয়। তার চেহারাও ঠিক এরই সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেছে: মাথায় প্রশস্ত টাক, মুখে ঝাঁটার মতো এক গোছা গোঁপ। কাজের চাপে দাড়ি কামানোর সময় কচিৎ মেলে। সুতরাং সপ্তাহে অন্ততঃ পাঁচটা দিন খোঁচা-খোঁচা পাকা পাকা দাড়িতে মুখমণ্ডল সমাকীর্ণ থাকে। বাইরে ক্রমাগত ঘোরাঘুরি করার জন্যে শরীরে চর্বি জমার অবকাশ হয় না। শরীর দীর্ঘ এবং ক্ষীণ। গাল ভাঙ্গা।

দ্বিতীয়া স্ত্রী মারা যাবার পর অশৌচের ক'দিন তাকে কিছু কাতর এবং অন্যমনস্ক দেখাচ্ছিল। শ্রাদ্ধশান্তি মিটে যাবার পরের দিনই আবার সে সকাল বেলায় বাইসিকেল নিয়ে বার হ'ল।

অমলা একটু অবাক হ'ল। কিন্তু সেই সঙ্গে একটু খুশীও হ'ল। তার নিজের মা যখন মারা যায়, তখন তার জ্ঞান হয়েছে। তখন রামহরির মুখের উপর শোকের যে ছাপ পড়েছিল, কিছু কিছু এখনও তার মনে পড়ে। সে সময় রামহরি লম্বা ছুটি নিয়ে দেশে চ'লে গিয়েছিল। সেই দীর্ঘ অবকাশকাল এবং তারপরে কাজে যোগ দিয়েও রামহরি চুল দাড়ি সম্বন্ধে অমনোযোগী হয়ে উঠেছিল। মাথায় তেল দিত না, মাছ মাংস খেত না এবং তাসের আড্ডার আকর্ষণ ত্যাগ করে স্থানীয় রামকৃষ্ণ মিশনে যাতায়াত আরম্ভ করেছিল।

এক বছরের ঊর্দ্ধকাল এমনি চলেছিল। তারপরে মায়ের কান্নায়, আত্মীয়-স্বজনের অনুরোধে এবং বন্ধু-বান্ধবের জেদা-জেদিতে অবশেষে বাধ্য হয়েই সে বিবাহ করে।

অমলার বয়স তখন ন' বছর হয়েছে, কি হয়নি। কিন্তু এ সকল বিষয়ে স্ত্রীসুলভ স্বাভাবিক প্রাখর্যের জন্যেই হোক, অথবা যে কারণেই হোক, সে সব দিনের কথা আজও তার বেশ মনে পড়ে।

রামহরিকে গার্হস্থ্য জীবনে ফিরিয়ে আনতে সেবারে অতগুলি লোকের এক বছরেরও বেশী সময় লেগেছিল। আর এবারে দশটি দিন কাটতে-না-কাটতেই রামহরি অত্যন্ত সহজভাবেই নিজের স্বাভাবিক জীবনযাত্রায় ফিরে এল!

অমলার একটু বিস্ময় লাগে, তবু ভালোই লাগে। মনে-মনে তার আনন্দ হয় এই ভেবে যে, রামহরি তার মাকে যেমন ভালোবেসেছিল, এমন আর কাকেও নয়। পুরুষ মানুষ বেশীদিন নারীহীন থাকে না। কিন্তু তাই ব'লে সুদূর অতীত কালের রামহরির ভালোবাসার সেই সব প্রকাশকে কিছুই নয় ব'লে সে উড়িয়ে দেবে কি ক'রে?

নিজের মায়ের কথা মনে ক'রে অমলা বেশ গর্ব্ব অনুভব করলে।

আরও মাস তিনেক কেটে গেল।

নিজের মায়ের সব কথা অমলার ভালো মনে পড়ে না। রামহরির শোবার ঘরে তার মায়ের একটা বড় অয়েল পেন্টিং আছে। তার থেকে এই পর্য্যন্ত তার মনে পড়ে যে, সে মা ছিল ছোট-খাটো শ্যামবর্ণের একটি মেয়ে। চঞ্চল এবং চটপটে। চোখ থেকে সব সময় যেন কৌতুক ছিটকে পড়ত। মুখে সব সময় হাসি আর ছড়া।

কিন্তু এ মা ছিল উলটো। লম্বা, ফর্সা চেহারা। চোখের দৃষ্টি শান্ত। একে কখনও সে জোরে হাসতে শোনেনি, রেগে চীৎকার করতে শোনেনি, অভিমানে কাঁদতে দেখেনি। কোথাও যেন তার বাড়াবাড়ি ছিল না।

তার বেশ মনে পড়ে, রামহরি যেদিন ওকে নিয়ে এল তার পরের দিন সকালে সে চুপ করে দরজার পাশে দেওয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। বিয়ে বাড়ীর কর্ম্ম-কোলাহলের দিকে চেয়ে কি যেন তার মনে হচ্ছিল। কিন্তু সে বয়সে কিছুতেই সে বুঝতে

পারছিল না, কি তার মনে হচ্ছিল। হঠাৎ কোথা থেকে তার নতুন মা বেরিয়ে এসে তার সামনে দাঁড়ালো।

বললে, স্নান করোনি তুমি?

ও বললে, না।

—চলো তোমায় স্নান করিয়ে আনি।

তারপরে ওকে সাবান মাখিয়ে স্নান করিয়ে দিলে, ঘরে নিয়ে এসে স্নো-পাউডার মাখিয়ে দিলে, কপালে ছুটি ভ্রূর মাঝখানে একটা সিন্দুরের টিপ পরিয়ে দিলে, যে বাক্সয় ওর জামা থাকে, সে বাক্স থেকে জামা বের করে পরিয়ে দিলে।

বললে, এইবার খেলা করগে যাও।

সেদিন থেকে গত দশ বৎসরের মধ্যে অমলা তার নতুন মায়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ করবার একটা কথাও খুঁজে পায়নি। সেই কথা স্মরণ করে তার নিজের মায়ের জন্তে গর্ব্ব করতে গিয়ে অমলা মনে মনে একটু লজ্জাই পেলে। স্থির করলে, যেখানে তার নিজের মায়ের অয়েল পেন্টিং টাঙানো আছে, তার পাশেই তার নতুন মায়েরও একটা অয়েল পেন্টিং টাঙিয়ে রাখা উচিত।

কিন্তু সে কথা তার বাবাকে বলতে লজ্জা করে। সে স্থির করলে, আসেছে মাসে তার বাবার কাছ থেকে সংসার খরচের জন্তে যে-টাকা পাবে তাই থেকে সে নিজেই একটা অয়েল পেন্টিং করিয়ে নেবে। নিতান্তই যদি বেশী খরচ পড়ে তাহ'লে টাকাটা দু'তিন মাসে অল্প অল্প করেই দেবে।

ক'দিনেই অমলা বুঝতে পারলে, তার নতুন মা এই সংসারে কি খাটুনীই না খাটতো। একটা ঠিকা ঝি আছে। সে বাসন ক'খানা মেজে দেয়, মসলাটা পিষে দেয়, আর বালতি দুই জল তুলে দেয়। বাকি সমস্ত কাজ একা নতুন মা করত। কোনোদিন তাকে কুটোখানা ভেঙে দুটো করতে হয়নি।

সে কি সহজ কাজ!

রান্না, তাও দু'প্রস্থ। এক প্রস্থ ছেলেদের স্কুলের, আর এক প্রস্থ সকলের। এর উপর ঘর পরিষ্কার থেকে আরম্ভ ক'রে ছেলেদের নাওয়ানো-খাওয়ানো, বিছানা তোলা, বিছানা পাতা, পান তৈরী থেকে রামহরির তামাক সাজা পর্য্যন্ত সবই আছে। এর সমস্তটুকুই তার নিজের হাতে করা চাই।

অমলার ভয় হ'ল, এত কাজ করা তার পক্ষে সম্ভব হবে কি? নতুন মার মতন অমন পরিপাটি করে কাজ কি সে করতে পারবে? নতুন মার হাতের রান্না যে খেয়েছে, সে আর ভুলতে পারেনি। তেমনি ক'রে সে কি রাঁধতে পারবে? কোনোদিন তাকে নতুন মা কোনো কাজ করতে দেয়নি। সে নিজেও যেচে কখনও কোনো কাজ করেনি। শুধু বসে বসে শেলাই করেছে, আর নভেল পড়েছে। এখন একসঙ্গে এত কাজের চাপ সে সামলাবে কি ক'রে?

—বড়দি, রান্না হ'ল? দশটা বেজে গেছে।

অমলা রান্নাঘরে হাতা নিয়ে খটর খটর করে। সকাতরে বলে, আর দু'মিনিট দাঁড়া না ভাই। তরকারিটা নামিয়েই তোদের জন্তে গরম গরম মাছ ভেজে দিচ্ছি।

—রোজ লেট হচ্ছি বড়দি। আজকে যদি লেট হই নির্ঘাৎ বেঞ্চের উপর স্যার দাঁড় করিয়ে দেবে।

কথাটা সত্যি। অমলা রান্না ঘরে ব্যস্তভাবে ছুটোছুটি করতে পারে, কিন্তু ওদের লেট বাঁচাতে পারে না। রোজই ওরা লেট হয়, রোজই স্কুলের সময় অভিযোগ করে। কোনোদিন হয়তো শুধু দই দিয়ে দু'টি ভাত খেয়ে স্কুলে যায়। অমলা রোজই চেষ্টা করে যাতে ওদের দেরী না হয়। রোজই আরও সকালে ওঠে। তবু দেরী হয় এবং কি ক'রে যে দেরী হয় কিছুই বুঝতে পারে না।

কেবল অভিযোগ আসে না রামহরির কাছ থেকে। রামহরি যথানিয়মে কাজ তদারক ক'রে ফেরে। স্নান ক'রে আহারে বসে। অমলা সামনে বসে খাওয়ায়। কিন্তু বাবার মুখ দেখে বুঝতেই পারে না, রান্না কেমন হয়েছে, খেতে তার কোনো কষ্ট হচ্ছে কি না। অথচ মুখ ফুটে সে-কথা জিগ্যেস করতেও তার সাহস হয় না। মাঝে মাঝে নতুন মা'র মতো দু'একটা নতুন রান্না সে রাঁধতে চেষ্টা করে। রামহরি কখনও খায়, কখনও খায় না। অমলা বুঝতে পারে না, সে রান্না রামহরির ভালো লাগে কিনা।

মোট কথা, তিন মাসের মধ্যেই অমলার চেহারা শুকিয়ে আধখানা হয়ে গেল। ভোর পাঁচটায় সে ওঠে। রান্নাঘরের কাজ মিটতে আড়াইটে বেজে যায়। ফের সাড়ে তিনটেয় আবার কাজ সুরু হয়।

ছেলেরা দশটায় এক রকম না খেয়েই স্কুল যায়। সন্ধ্যাই হাঁ হাঁ করতে করতে আসে। তখন আর তাদের দেরী সয় না। সুতরাং তারা সাড়ে চারটেয় ফেরবার আগেই অমলাকে তাদের খাবার তৈরী ক'রে রাখতে হয়। ওদের জল খাওয়া শেষ হ'লে আসে রামহরি। তিনি চা খেয়ে চলে গেলে রাত্রের রান্না চাপে। সেও দু'প্রস্থ। এক প্রস্থ ছেলেদের জন্তে, আর এক প্রস্থ রামহরির জন্তে। রামহরি তাস খেলে ফেরে বারোটা-একটায়। তখন তার জন্তে গরম-গরম লুচি ভেজে দিতে হয়।

এত পরিশ্রম অমলার সয় না। এত পরিশ্রমে সে অভ্যস্ত নয়। তার নতুন মা কখনও তাকে কোনো পরিশ্রমের কাজ করতে দেয়নি। শুধু কি তাই? তিন মাস ধরে অবিশ্রান্ত খেটে অমলার শরীর দিন দিন শুকিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু সেদিকে আজও কারও চোখ পড়ল না,—রামহরিরও না। অথচ নতুন মা তার মাথা ধরলেও কি ক'রে যেন টের পেত।

নতুন মা'র কথা মনে ক'রে অমলার চোখে জল এল।

একদিন সকালে অমলার এমন হ'ল যে, মাথা তুলতে পারে না। তবু পড়ে থাকার উপায় নেই। একটু পরেই ছেলেদের স্কুল যাবার সময় হবে। তাকে উঠতেই হ'ল।

সেই শরীরেই সমস্ত দিন কাজ কর্ম্ম করলে। রাত্রি ন'টায় ছেলেদের খাইয়ে যখন শুইয়ে দিলে তখন তার শরীর যেন ভেঙে পড়ছে। ভাবলে, রামহরির আসতে তো রাত্রি একটা। ছেলেদের সঙ্গে একটু বরং জিরিয়ে নিয়ে তারপর উঠবে। ময়দা তো মাখাই রয়েছে। দু'খানা লুচি ভেজে দিতে আর কতক্ষণ! নীচে রামহরির গলার সাড়া পেলেই উঠে পড়বে।

কিন্তু নীচে নয় উপরেই রামহরির গলার সাড়া যখন পেলে তখন তার ওঠবার শক্তি নেই। একবার ওঠবার চেষ্টা করলে,

পারলে না। শুধু তার জবাফুলের মতো টকটকে লাল চোখের কোণ বেয়ে দু'ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়লো।

রামহরি ভয় পেয়ে গেল। তাড়াতাড়ি ওর ললাটের উত্তাপ পরীক্ষা ক'রে থমকে গেল!

এ যে ভীষণ জ্বর! গা যেন পুড়ে যাচ্ছে!

রামহরির একটা বিশেষত্ব এই যে, সহজে সে ব্যস্ত হয় না। অথবা হলেও বাইরে থেকে তা বোঝা যায় না।

সে জামা খুলে ফেলেছিল, আবার গায়ে দিলে। ওঘর থেকে বড় ছেলে সুরেশকে ঘুম থেকে তুললে।

বললে, তোর দিদির খুব জ্বর। ওঘরে তার কাছে বসে মাথায় একটু জলপটি দে। আমি আসছি।

আধ ঘণ্টা পরেই রামহরি ডাক্তার নিয়ে ফিরলো।

ডাক্তার টেম্পারেচার নিলেন, নাড়ী দেখলেন, বুক, জিভ পরীক্ষা করলেন। বললেন, আজকে ওষুধ বিশেষ কিছু দোবো না। একটা alkali mixture দিচ্ছি। মনে হচ্ছে, ভোগাবে। এদিকে-ওদিকে দু' একটা টাইফয়েড হচ্ছে, দু' একটা বসন্তের কেসও পাওয়া যাচ্ছে। খুব সাবধানে রাখবেন।

ডাক্তার মিথ্যা অনুমান করেননি। দিন দশেক অমলাকে ভোগালে। তবে টাইফয়েডও নয়, বসন্তও নয়, এইটুকুই সুখের বিষয়।

রামহরি একটা ঠাকুর রাখলে।

অমলার আপত্তি করার উপায় ছিল না। শুধু বললে, আমি যে ক'দিন না সেরে উঠি থাক সে ক'দিনের জন্যে।

রামহরি হাসলে। বললে, ক'দিন! তোমার হার্ট মোটেই ভালো নয়। দু'টো মাসের আগে তোমার উনোনের ধারে যাওয়াই চলবে না। তারপরেও···

রামহরি চুপ ক'রে গেল।

বাবার কাছে এত কথা এক সঙ্গে সে জীবনে শোনেনি। কখনও কারও জন্যে তাকে উদ্বেগ প্রকাশ করতেও দেখেনি। রোগশয্যায় শুয়ে বাপের এই কথাগুলি তার ভারি ভালো লাগল।

বললে, দুটো মাস না ছাই! এই পূর্ণিমাটা কেটে যাক, তার পর···

বললে, হার্টে আমার কিছু হয়নি। ডাক্তারে অমন বলে। আপনি ভাববেন না।

রামহরি চুপ ক'রে রইল।

অমলা বললে, সুরেশ বলছিল, ঠাকুরের রান্না নাকি অতি বিশ্রী। সে নাকি মুখে দেওয়া যায় না। আপনার খেতে নিশ্চয় খুবই কষ্ট হচ্ছে।

রামহরি জবাব দিলে না। আস্তে আস্তে জামাটা গায়ে দিয়ে বেরিয়ে গেল।

এর কয়েকদিন পরে রামহরি একদিন এসে বললে, আমি একটু বাইরে যাব অমলা। ফিরতে দু' তিন দিন দেরী হবে। সাবধানে থাকবে সব।

ভয়ের কোনো কারণ ছিল না। তবু তিন দিনের মধ্যে রামহরিকে না দেখে অমলা উদ্বেগ বোধ করছিল। বাইরে যাওয়ার প্রয়োজন তার বড় একটা হয় না। হ'লেও এত দেরী হয় না। বিশেষ নতুন মা মারা যাবার পরে রামহরি একটা দিনও বাইরে কোথাও যায়নি।

সূর্যাস্তের আর দেরী নেই। একটু আগে এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে। পাশের জাম গাছের জলে-ধোয়া চিকণ পাতায় পড়ন্ত সূর্যের আলো ঝিকমিক করছে।

অমলা এখন গায়ে অনেকটা বল পেয়েছে। ঠাকুরকে জবাব দেবার মতো বল অবশ্য নয়। তবে ঠাকুরের চুরি অনেকটা কমাতে পেরেছে। তরকারীগুলো সেই কুটে দেয়। কোন্ তরকারী কতখানি হবে ব'লে দেয়। মাছ তার সামনে ঝি কুটে দেয়। অমলা ঠাকুরকে বুঝিয়ে দেয়, কাকে ক'খানা দিতে হবে। মাঝে মাঝে নীচে গিয়ে রান্না শিখিয়েও দেয়।

দোতলার পশ্চিমের বারান্দায় বসে অমলা তখন তরকারী কুটে একখানা থালায় পরিপাটি ক'রে সাজিয়ে রাখছিল। এমন সময় তাদের দরজায় একখানা ঘোড়ার গাড়ী এসে থামলো ব'লে মনে হ'ল।

অমলা তখন রামহরির কথা ভাবছিল। গাড়ী থামার শব্দে সে ব্যস্তভাবে রাস্তার দিকের বারান্দায় এসে ঝুঁকে দাঁড়ালো।

দেখলে, রামহরি, তার পিছনে একটি অর্ধাবগুণ্ঠিত স্ত্রীলোক। উপর থেকে তার মুখ সে দেখতে পেলে না। কিন্তু এই ভেবেই আশ্বস্ত হ'ল যে, রামহরি ফিরেছে এবং অসুস্থ দেহে ঘোড়ার গাড়ীতে নয়।

শুনতে পেলে, রামহরি স্ত্রীলোকটিকে বললে, ভিতরে গিয়ে ডান দিকেই সিঁড়ি।

রামহরি নিজে গোটা দুই বাক্স নামিয়ে গাড়ী ভাড়া মিটিয়ে দিতে লাগল।

অমলা তাড়াতাড়ি নীচে নেমে এল। অর্ধেক দূর যখন নেমেছে তখনই মেয়েটিকে দেখতে পেলে। তার মাথার ঘোমটা অনেকখানি স'রে এসেছে। চকিত দৃষ্টিতে চারিদিক দেখে নিচ্ছিল।

মধ্যপথেই অমলা থমকে গেল। নিজের মাকে তার ভালো মনে পড়ে না। যতখানি মনে পড়ে এবং ছবি দেখে আর কল্পনার সাহায্যে মায়ের মুখের যে ছবি সে নিজের মনে এঁকে নিয়েছে, এই মেয়েটি'র মুখ অবিকল সেই রকমের। তেমনি ছোট ললাট, চটুল চোখ, তীক্ষ্ণ ঠোঁটের উপর তেমনি ধারা হাসির রেখা বাঁকা ভাবে আলগোছে ছুঁয়ে আছে। তেমনি শ্যামবর্ণ ছোটখাটো চেহারা।

অমলা অবাক হয়ে গেল। দু'জনের চেহারার এমন আশ্চর্য্য মিল হ'তে পারে তা সে ভাবতেই পারে না।

মেয়েটি তখন তার কাছ পর্য্যন্ত উঠে এসেছে।

ওর একটি হাত ধরে হেসে বললে, তুমি অমলা?

অমলা ওকে নিয়ে উপরের ঘরে আসতে আসতে বললে, হ্যাঁ। তুমি কি আমাকে চেন?

—চিনি।

ব'লে মেয়েটি আশ্চর্য্য ভঙ্গিতে হাসলে। অমলার বুকের ভিতর পর্যন্ত সে হাসিতে দুলে উঠল।

এ যে অবিকল তার মায়ের হাসি!

মহাকালের স্রোত পেরিয়ে আবার কি তারই বিস্মৃত তরঙ্গ-রেখা ওর স্মৃতির ঘাটে এসে ঘা দিলে!

অমলা বললে, তুমি কে ?

—আমি ?

মেয়েটি একবার নিজের চারিদিকে একবার ঘরের চারিদিকে চেয়ে তেমনি ক'রে আবার হেসে উঠলো।

এমন সময় নীচে রামহরির গলা পাওয়া গেল : ঠাকুর, একটু চায়ের জল চড়াও তো।

মেয়েটি হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে উঠলো।

বললে, দাঁড়াও, ওঁর চা'টা ক'রে দিয়ে আসি।

অমলার বিস্ময়ের আর সীমা রইল না।

বললে, বাবার চা ক'রে দিতে তুমি যাবে ?

মেয়েটি আবার হেসে ফেললে। বললে, সেই জন্যেই তো আমায় এনেছেন ভাই !

বলেই তাড়াতাড়ি জিভ কেটে ফেললে : এই যাঃ ! তোমায় 'ভাই' বলে ফেললাম। হিঃ হিঃ !

মেয়েটি আর দাঁড়ালো না। তর্ তর্ ক'রে নীচে নেমে গেল।

অমলা অবাক হয়ে চেয়ে দেখলে, অবিকল তার মায়ের মতো হাঁটন ! চলায় তেমনি আনন্দের ছন্দ।

অমলা ভাবতে লাগলো, কে এই মেয়েটি ? মেয়েটি যে খুব গরীবের তা বোঝা যায়। করপ্রকোষ্ঠে দু'গাছি শাঁখা ছাড়া আর কিছুই নেই। শক্ত করতল, শক্ত আঙুল এবং মলিন নখ দেখলেই বোঝা যায়, মেয়েটি চিরকাল সংসারের সমস্ত শক্ত কাজ ক'রে এসেছে। কিন্তু এখানে এল কেন ? রামহরি কোথা থেকে ওকে নিয়ে এল ?

কিন্তু বেশ সপ্রতিভ। কত বয়স হবে ? অমলার চেয়ে ছোট নিশ্চয়ই। কি অল্প ছোট, কিম্বা সমবয়সীই হবে হয় তো।

কিন্তু কে ও ?

মিনিট পোনেরো পরে মেয়েটি ফিরে এল। হাতে এক বাটি চা।

অমলা জিজ্ঞাসা করলে, কার চা ? আমার ?

—হ্যাঁ।

—আমি চা খাই না তো।

—একেবারেই না ?

—না।

অন্য সময় হ'লে অমলা এইখানেই থেমে যেত। কিন্তু কি জানি কেন, তার কেবলই নিজের মা এবং নতুন মা'র কথা মনে পড়ছে।

বললে, আমার নতুন মা মেয়েদের চা খাওয়া পছন্দ করতেন না। তিনি নিজেও খেতেন না, আমাকেও খেতে দিতেন না।

মেয়েটি এক মুহূর্ত্ত ওর মুখের দিকে থমকে চেয়ে রইল। তার পর জিজ্ঞাসা করলে, তোমরা বুঝি তাঁকে খুব মানতে ?

—খুব।

—তিনি কি খুব রাগী ছিলেন ?

এবারে অমলা হেসে ফেললে। বললে, মোটেই না। তিনি কখনও কাউকে কড়া কথা বলতেন না। কিন্তু ভারী রাশভারী ছিলেন। সবাই সেইজন্যে তাঁকে ভয় করতো।

—উনিও ?

অমলা চমকে উঠল। বললে, 'উনি' কাকে বলছ ? বাবা ?

মেয়েটির ঠোঁটের কোণে বিদ্যুৎ খেলে গেল। বললে, হুঁ ?

অমলা অস্ফুটস্বরে বললে, কি জানি। হয়তো করতেন।

তারপরে বললে, কিন্তু তুমি কে বলবে ?

মেয়েটি প্রথমে চুপ ক'রে রইল। তারপরে বললে, উনি কি তোমাদের কিছুই বলেন নি ?

অমলার মনে এতক্ষণে ব্যাপারটা যেন স্পষ্ট হ'ল। প্রাথমিক হতচকিত ভাবটা কাটতেই সে হো হো ক'রে হেসে ফেললে। বললে, বোধ হয় বলার দরকার বোধ করেন নি। বোধ হয় ভেবেছিলেন, তোমাকে দেখেই চিনতে পারব।

—তার মানে ?

—তার মানে তোমাকে দেখাই এস।

অমলা ওকে টানতে টানতে বাবার শোবার ঘরে নিয়ে গেল। সেখানে বড় অয়েলপেন্টিংটার দিকে আঙুল দেখিয়ে বললে, তার মানে বুঝলে ?

মেয়েটি অস্ফুট স্বরে বললে, অনেকটা আমার মতো, না ?

—হুবহু। তোমায় দেখে আমি চমকে উঠেছিলাম।

—তোমার নতুন মা ?

না। আমার নতুন মা সকল বিষয়ে সকলের থেকে স্বতন্ত্র। তাঁর জোড়া হয় না। ইনি আমার নিজের মা।

এতক্ষণ পরে হঠাৎ অমলার খেয়াল হ'ল, এই মেয়েটি এসে পর্য্যন্ত পা ধুতেও পায় নি।

বললে, ছিঃ, ছি ! তোমার এখনও গা ধোয়া হয়নি ! না হ'ল তোমাকে জলের ধারা দিয়ে বরণ ক'রে নেওয়া, না হ'ল শাঁখ বাজানো। কি আশ্চর্য্য ! শাঁখটা বাজাই বরং।

মেয়েটি তাড়াতাড়ি ওর হাত চেপে ধরলে। বললে, ছিঃ ! সে আমার ভারী লজ্জা করবে। কিন্তু তোমাকে আমার ভারী ভালো লাগছে। হাত পা' ধুয়ে আসি দাঁড়াও। তার পরে গল্প করা যাবে।

ও ফিরে এসে দেখলে, অমলা ওর জন্যে একখানা রঙীণ শাড়ী বের ক'রে বসে আছে।

বললে, এইখানা পরো।

কমলা লেবু রঙের শাড়ী। খোলা জানালা দিয়ে সূর্য্যাস্তের আভা এসে পড়ায় আরও সুন্দর দেখাচ্ছিল। অমলা ওকে স্নো মাখিয়ে দিলে। তার পরে বাক্স থেকে গহনা বের ক'রে একটি একটি ক'রে ওকে পরিয়ে দিলে।

মেয়েটি বাধা দিলে। বললে, না, না। ও কার গহনা ?

—আমার। তোমায় দিলাম।

অমলার চোখের দিকে চেয়ে ও আর কিছু বলতে সাহস করলে না।

অমলা বলতে লাগল : মায়ের ছবির দিকে চাইতাম আর মনে মনে বলতাম, তুমি যেন আমার মেয়ে হয়ে ফিরে এস। তোমাকে দেখার সাধ আমার মেটেনি। আজ মনে হচ্ছে, আমার প্রার্থনা যেন তিনি রেখেছেন। কিন্তু মেয়ে হয়ে তো এলে না।

—মেয়ে হয়েই তো এলাম অমলা। তোমার কোলে আমি মেয়ে হয়েই এলাম। নন্দরাণী নাম দিয়েই মা আমার মারা যান। গরীবের ঘরের মেয়ে, জন্মে কখনও কোল পাইনি। এতদিনে কোল পেলাম।

সন্ধ্যে হয়ে গেছে! ছেলেরা খেলা সেরে বাড়ী ফিরলো।

অমলা বললে, সুরেশ, মণি, এঁকে প্রণাম কর ভাই। ইনি আমাদের ছোট মা।

ওরা বোকার মতো ফ্যাল ফ্যাল ক'রে চেয়ে রইল।

—প্রণাম কর।

একে একে সবাই প্রণাম করলে। নন্দরাণী ছোটটিকে কোলের কাছে টানতেই সে হঠাৎ ফুঁপিয়ে কেঁদে হাত ছাড়িয়ে ছুটে পালিয়ে গেল।

এমন সময় রামহরির গলা পাওয়া গেল: ওরে অমলা, ইয়ে হয়েছে।

বলতে বলতে রামহরি একেবারে দরজার কাছে এসেই স'রে গেল। একেবারে তার গলা পাওয়া গেল, ওদিকে ছেলেদের পড়ার ঘরে: পড়তে বোসো, পড়তে বোসো। আর দু'দিন পরেই সেকেণ্ড টার্মিনাল। মনে আছে তো?

নন্দরাণী মুখে আঁচল চাপা দিয়ে হেসে উঠল: কি রকম লজ্জা পেলেন দেখলে?

অমলাও হেসে ফেললে। বললে, কি বলছিলেন শুনে আসি।

নন্দরাণী আবার হাসলে। বললে, কিছু বলেননি। তুমি বোসো।

তখনি নীচে রামহরির গলা পাওয়া গেল: ঠাকুর, দরজাটা বন্ধ ক'রে দিয়ে যাও। আমার ফিরতে দেরী হতে পারে।

সে কথা শুনে ওরা আর একবার হাসলে।

প্রথম দৃষ্টিতেই দুজনে দুজনকে ভালোবেসে ফেললে।

কিন্তু নন্দরাণীর সঙ্গে অমলার মায়ের চেহারার আশ্চর্য্য সাদৃশ্য থাকা সত্ত্বেও সম্পর্কটা কিছুতেই শেষ পর্যন্ত মা-মেয়ের মতো দাঁড়ালো না। নন্দরাণী কিছুতেই ওকে মা ব'লে ডাকতে দেবে না। তার নাকি লজ্জা করে। হিসাব ক'রে দেখা গেছে, নন্দরাণী ওর চেয়ে দু'বছরের ছোট এবং বৈধব্যের জন্যেই হোক, আর যে কারণেই হোক, ওকে নন্দরাণীর চেয়ে আরও অনেক বেশী বড় দেখায়। সুতরাং নন্দরাণীই ওকে বলে ছোট মা, আর নন্দরাণীকে ও ডাকে বৌমা ব'লে। কিন্তু আসল এবং অন্তরের সম্পর্ক দাঁড়ালো সখিত্বে।

নন্দরাণী ওকে সব কথা বলে। প্রথম-প্রথম অমলা সে-সব কথা শুনতে চাইতো না, তার লজ্জা করত। পরে অভ্যাস হয়ে গেল। দু'জনে সে-সব কথা নিয়ে নিজেদের মধ্যে রসিকতা করতেও আর বাধে না। তাতে আর লজ্জাও করে না।

বিকেলে অমলা নিজের হাতে ওর চুল বেঁধে ওকে সাজিয়ে দেয়। ও কোন শাড়ীটা পরবে এবং তার সঙ্গে কোন ব্লাউজটা, তা ঠিক করবার মালিক অমলা। সে বিষয়েও সে খামখেয়ালী। কখনও নন্দরাণীকে সাজিয়ে দেয়, এলো খোঁপা বেঁধে, ভ্রূ এঁকে, মুখ পেণ্ট ক'রে, হালকা কয়েকখানা গহনা দিয়ে মডার্ণ মেয়ের মতো। কখনও বা মাথার চুল টেনে বেঁধে, গায়ে এক গা গহনা চাপিয়ে, গলায় বেলফুলের মালা দিয়ে সেকালের মেয়ের মতো সাজিয়ে। নন্দরাণীর ক্ষমতা নেই তার উপর একটা কথা বলে। এমন কি পায়ের তোড়া ঝমর ঝমর শব্দ করলেও তার সাধ্য নেই খোলে। শুতে যাওয়ার আগে অমলাকে একবার দেখা দিয়ে সব যে ঠিক ঠিক আছে তা বুঝিয়ে যেতে হয়।

খাটে শুয়ে রামহরি ওর তোড়ার শব্দে চমকে ওঠে।

—ও আবার কি!

নন্দরাণী লজ্জিতহাস্যে মুখ নীচু ক'রে বলে, কি করব? ছোটমার কাণ্ড! না বলবার উপায় নেই।

নন্দরাণীর উপর অমলার এই স্নেহ রামহরির ভালো লাগে। কিন্তু লজ্জাও করে। অমলা যেন অনেক বড় হয়ে গেছে। ওকে আর নিজের মেয়ের মতো ভাবতে পারে না। অমলার সামনে গিয়ে দাঁড়াতেও ওর লজ্জা করে। অমলাকে কিছু বলবার থাকলে প্রায় নন্দরাণীর মারফৎই জানায়। কখনও যদি নিজে জানাতে হয়, সামনে গিয়ে মাথা নীচু ক'রে কথাটা জানিয়েই স'রে পড়ে। বাপের গাম্ভীর্য সে আর রাখতে পারে না। তার বয়স যেন নন্দরাণীর বয়সে নেমে এসেছে।

অমলার অবস্থাও একই প্রকার। বাপের সামনে সে সহজে পড়তে চায় না। কখনও দু'জনে সামনাসামনি প'ড়ে গেলে দু'জনেই ত্রস্তভাবে স'রে যায়।

অসুবিধা হয়নি কেবল নন্দরাণীর। রামহরি তার স্বামী, অমলা তার বন্ধু।

অমলা মাঝে মাঝে ভাবে, এ যেন ঠিক হচ্ছে না। নন্দরাণী তার মা, তার বাপের বিবাহিতা স্ত্রী, দেখতে অবিকল তার নিজের মায়ের মতো। তার সঙ্গে বয়সের বিচারে সখিত্বের সম্পর্কটা ঠিক হচ্ছে না। কিন্তু নন্দরাণী তার নতুন মায়ের মতো গম্ভীর নয়। তার হাসি চাই, গল্প চাই, আনন্দ চাই। অমলার কাছে সে সম্পূর্ণ রকমে আত্মসমর্পণ করেছে। কিন্তু এই খানটায় অমলাকেও তার কাছে আত্মসমর্পণ করতে হয়েছে।

আসল কথা দু'জনে দু'জনকে ভালোবেসেছে। আর তাদের মধ্যেকার যোগসূত্র রামহরি মিলিয়ে গিয়ে সাধারণ মানুষে পরিণত হয়েছে। এইটে যখন ভেবে দেখে, তখন রামহরি কিম্বা অমলা কেউই খুসি বোধ করতে পারে না। অথচ এর জন্যে তারা কার উপর যে রাগ করতে পারে তাও খুঁজে পায় না।

এমনি ক'রে দিন যায়।

এই শহরে সিনেমা হাউস হয়েছে অনেক কাল। কিন্তু অমলারা কখনও সিনেমায় যায়নি। নতুন মার এ বিষয়ে কোনো আগ্রহ ছিল ব'লে কখনও বোঝা যায়নি। আর তার নিজের এ কখনও ছিল না যে মুখ ফুটে রামহরিকে বলে।

নন্দরাণী বললে, যাবে একদিন?

অমলা সভয়ে বললে, ওরে বাবা!

—কেন?

—বাবা সিনেমার উপর ভারী চটা।

নন্দরাণী মাথা নেড়ে বললে, ওঁর কথা আমি বুঝব। তুমি যাবে কি না বল না?

—নিয়ে গেলে আর যাব না কেন?

—বেশ। এই কথা রইল।

সামনের শনিবারে রামহরি দুপুর বেলাতেই আফিস থেকে ফিরল। এমন সময় বড় একটা সে ফেরে না।

নন্দরাণী হাসতে হাসতে এসে বললে, কোন শাড়ীটা পরব ছোটমা, বলে দাও?

—হঠাৎ দুপুর বেলায় এ খেয়াল!

—বারে! আজ সিনেমা যাবার কথা ছিল না?

—সত্যি?

—হ্যাঁ। উনি তিনখানা টিকিট কিনে এনেছেন। বললেন, তিনটের শো'তে যেতে হবে। সন্ধ্যায় ফিরে এসে রান্না-বাড়া হবে।

ওরা সিনেমায় গেল। তিনজনে পাশাপাশি বসলো। মধ্যে নন্দরাণী, তার দুপাশে দু'জন। ছবি দেখতে দেখতে নন্দরাণী হাসে, কত কি পরিহাসের কথা বলে। বিপদ হ'ল রামহরি আর অমলার। তারা কাঠের মতো শক্ত হয়ে বসে থাকে।

এর পরে যেদিন আবার ওরা সিনেমায় গেল, অমলা গেল না। ভীষণ মাথা ধরেছে বলে শুয়ে রইল।

অমলার কি যেন হয়েছে।

ঠাকুর তো কবেই ছাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু রাঁধে অমলা। বলে, এখন তার শরীরে বেশ বল পেয়েছে। নন্দরাণী নিজে রাঁধবার জন্যে কত সাধাসাধি করেছে। কিন্তু অমলা তাকে কিছুতে রাঁধতে দেয়না। নন্দরাণীর নিতান্ত যখন অসহ্য হয়ে ওঠে, বলে, তাহ'লে আমি কি করব বল? একা-একা উপরে বসে থাকতে ভালো লাগে?

মন ভালো থাকলে অমলা হেসে বলে, তাহ'লে বরং ওই টুলের উপর ব'সে ব'সে বইখানা পড়, আমি রাঁধি আর শুনি।

রামহরি কাজকর্ম্মের ফাঁকে আজকাল মাঝে-মাঝেই বাড়ী আসে। অমলা তখন নন্দরাণীকে ঠেলে উপরে পাঠিয়ে দেয়। বলে, কি বলছেন, শুনে এস।

নন্দরাণী লজ্জা পায়, হাসে, কিন্তু উপরে যায়।

ফিরে এসে নন্দরাণী নিজের থেকেই বলে, কি একটা দরকারী কাগজ ফেলে গিয়েছিলেন।

অমলা হাসে। বলে, বাবা আজকাল ক্রমাগতই দরকারী কাগজ ফেলে যাচ্ছেন। পেয়েছেন তো?

নন্দরাণীও হাসে। বলে, জানি না।

অমলা উঠে এসে ওর গাল টিপে দিয়ে বলে, জানি না বললে হবে কেন? না পাওয়া গেলে আবার কষ্ট করে ফিরে আসতে হবে তো?

—আসুক।

অসীম স্নেহভরে অমলা ওর মুখখানি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে কি যেন দেখলে। আপন মনেই একটু হাসলে। তারপর আবার নিজের কাজে মন দিলে।

নন্দরাণী বললে, কি বলছিলেন জানো?

—কি?

—বলছিলেন, ক'লকাতা থেকে নাকি ভালো থিয়েটার এসেছে। এক টাকা ক'রে টিকিট। আমি ব'লে দিলাম, যাব না।

—সে আবার কি!

ঠোঁট ফুলিয়ে নন্দরাণী বললে, কি করতে যাব? তুমি তো যাবে না।

—যাব না কে বললে?

—আমি জানি। তুমি যাবে বলবে, কিন্তু ঠিক যাবার সময়ে বলবে মাথা ধরেছে। আমি প্রতিজ্ঞা করেছি, আর কোথাও যাব না।

অমলার মুখে ধীরে ধীরে যেন ছায়া নেমে এল। ধীরে ধীরে সে নন্দরাণীর ঘাড়ের উপর একখানা হাত রাখলে। মনে হ'ল, কি যেন বলবে। কিন্তু কিছুই বলতে না পেরে চুপ ক'রে রইল।

কিন্তু অমলার কি যে হয়েছে কেউ বুঝতে পারে না। নন্দরাণী কিছুতে ওকে রাঁধতে দেবে না এবং তাই নিয়ে কখনও যা করেনি তাই করেছে। অমলার সঙ্গে ঝগড়া করেছে। কিন্তু তবু পারেনি।

অমলা রাঁধবেই। নন্দরাণীর হাত থেকে কাজ কেড়ে নিয়ে সব কাজ সে একাই করবে। তাকে কেউ বাধা দিতে পারে না। নন্দরাণী রেগে কথা বন্ধ করে। বিকেলে অমলা তাকে কত সাধ্যসাধনা ক'রে শান্ত করে।

রামহরি আজকাল যখন-তখন হুট ক'রে বাড়ী আসে। অমলা তার ঘরে বড় একটা যায় না। নন্দরাণীকে নিজের ঘরে টেনে নিয়ে আসে।

নন্দরাণী বলে, ধন্য মেয়ে তুমি মা! তোমাকে কেউ পারবেনা।

ভোর বেলার চাঁদের মতো অমলা হাসে। বলে, সত্যি। আমি নিজে নিজেই বুঝতে পারি, আমি যেন নতুন মায়ের মতো শক্ত হচ্ছি।

—এত শক্ত হওয়া কি ভালো?

—নয়ই তো। খুব শক্ত মেয়েরা বেশী দিন বাঁচে না। আমার নতুন মা সেইজন্যেই—

নন্দরাণী ঝাঁপিয়ে উঠে ওর গাল টিপে ধরল: মুখপুড়ী, যা বলতে নেই সেই কথা!

অমলা নিজেকে মুক্ত ক'রে নিলে না! শুধু ওর রক্তহীন, শ্রান্ত চোখের কোণ বেয়ে দু'ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ল।

কয়েক মাসের মধ্যেই অমলা শক্ত অসুখে পড়লো।

ডাক্তার বললেন, সেই হার্টটা। তার উপর এত টেম্পারেচার। কি হয় বলা যায় না। সামনের দু'তিনটে দিন যদি কাটে, তাহ'লে এ যাত্রা বেঁচে যাবে।

নন্দরাণী বললে, এই বিছানা ছেড়ে এই দু'তিনটে দিন আমি এক পা নীচে নামছি না। তুমি ঠাকুরের ব্যবস্থা কর। তুমি নিজেও ক'দিনের ছুটি নাও।

সে কথা রামহরি আগেই ভেবেছে। বললে, আজকেই দরখাস্ত করব।

ছুটি পেতে রামহরির কোনোই অসুবিধা হ'ল না।

প্রথম রাত্রে টেম্পারেচারটা আরও বাড়লো। সেই সঙ্গে রোগিণীর ছটফটানিও।

নন্দরাণী বললে, সিভিল সার্জ্জনকে ডাকো।

রামহরি একটু বিব্রতভাবে ওর দিকে চাইলে।

নন্দরাণী বললে, কতটাকা কি ?

—বোধ হয় ষোলো, কিম্বা রাত্রি ব'লে বত্রিশও নিতে পারে।

—তা হোক, ডাকো তাঁকে।

রামহরি দ্বিধা করতে লাগল।

নন্দরাণী বললে, টাকা আছে। তুমি ডাকো।

রামহরি তবু দ্বিধা করছে দেখে নন্দরাণী বললে, সত্যি টাকা আছে। সুরেশকে দিয়ে আমি সেই তোমার দেওয়া নতুন হারগাছা বিক্রি করেছি। সকালে ডাক্তার এসে যখনই বললে।

নন্দরাণী আঁচলে চোখ মুছলে।

সিভিলসার্জন এলেন, প্রেসক্রপশান ক'রে ফি নিয়ে ব'লে গেলেন, কেমন থাকে সকালে খবর দিতে।

ভোরের দিকে টেম্পারেচার একটু নামলো। ছটফটানিও কম মনে হ'ল।

অমলা একবার চোখ মেলে চাইলে। অস্ফুটস্বরে বললে, বৌমা!

নন্দরাণী ওর মুখের উপর ঝুঁকে প'ড়ে বললে, এই যে আমি! একটু ভালো বোধ হচ্ছে ?

সে-কথার অমলা উত্তর দিলে না। বললে, আমার গহনাগুলো তোমাকে দিলাম।

একটু পরে বললে, তোমায় বলেছি না, শক্ত মেয়েরা বেশীদিন বাঁচে না! দেখলে তো ?

—আবার সেই কথা বলছ ?

অমলা আবার বললে, গহনাগুলো পোরো। দুঃখ কোরো না। বাঙ্গালীর ঘরের বিধবা মেয়ে, তার জন্যে দুঃখ করতে নেই।

সে চোখ বন্ধ করলে।

একটু পরে আবার বললে, সুরেশ কোথায় ? ছেলেরা ?

ওরা দিদির কাছে এসে দাঁড়ালো।

—বাবা কই ?

রামহরির গলার স্বর বন্ধ হয়ে এল। একটা কথাও সে বলতে পারলে না।

অমলা ওর দিকে চাইলে। হঠাৎ তার চোখ যেন কৌতুকে ঝলমল ক'রে উঠলো। ঠোঁটের কোণে একটুখানি বাঁকা হাসি খেলে গেল।

তারপরে চোখ বন্ধ করলে।

সেইদিন দুপুরে অমলার বৈধব্য-জীবনের অবসান হ'ল।

নূতন

শ্রীবীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

হে নূতন, বার বার আস তুমি, তাই এই চির-পুরাতন,
নিখিল ভুবন ভ'রে রয় রূপে, রসে, গানে ;
বর্ষে বর্ষে বসন্তের ব্যাকুল আহ্বানে
আজো দেয় সাড়া।
জগতের নরনারী আজো আত্মহারা
পুরাতন মদিরার নূতন নেশায় ;
মাথায়ে নূতন রং পুরাতন জীর্ণ পেয়ালায়
নূতন পানীয় ঢালে।
ভাঙ্গাচোরা দীর্ণ পান্থশালে
নূতন সাকীর সাথে করে আজো নব পরিচয়।
জরাময়, মৃত্যুময়
পুরাতন জীবনের বিশুষ্ক অঙ্গনে প্রাণপণে
তাই আজো র'চে চলে নূতনের সবুজ দীপালি।
হাতে লয়ে শতছিন্ন ডালি,
প্রতিদিন ভ'রে তোলে সদ্য-ফোটা রঙীণ কুসুমে ;
পুরাণো অধর খানি নূতন নেশায় নিত্য চুমে।
হে নূতন, তুমি আছ তাই,
পুরাতন বসন্তের ফুল-বাগিচায়
আজো চলে আনন্দের মত্ত হোলি খেলা।
কাটে বেলা বাজায়ে নূতন গান পুরানো বাঁশীতে ;
হাসিতে হাসিতে আজিও পরাতে হয় নব তার পুরাণো বীণায়,
প্রভাতী গোলাপে গাঁথা অম্লান মালায়,
সাজাইতে হয় কণ্ঠ নব-প্রণয়ীর, পুরাণো বাসর ঘরে ;
আনন্দে রচিতে হয় নব কাব্য পুরাণো অক্ষরে।
পুরাণো ছন্দেতে তাই দিকে দিকে ভ'রে তোলে নবীন গীতালি,
পুরাণো প্রদীপে তাই নূতন আলোক দাও জালি।
হে নূতন, তুমি নিত্য পুরাতন ব্রহ্মাণ্ডের বুকে,
হাসিমুখে এঁকে দাও নূতন মহিমা ;
পুরাণো সূর্য্যের বুকে প্রতি প্রাতে রচ তুমি নবীন রঙিমা ;
পুরানো চন্দ্রের বুকে জ্বাল রোজ নবীন কৌমুদী,
পুরাতন গ্রহে গ্রহে বহাইয়া দাও নব সুন্দরের হাসির অম্বুধি।
তুমি নিত্য চির-রিক্ত শ্মশানের পাশে,
অনায়াসে গ'ড়ে তোল জীবনের নবীন-ভূমিকা ;
নূতন জন্মের শিখা
জ্বালাইয়া তোল নিত্য কঙ্কালের শেষ-চিতা-ধূমে।
কাল-কলঙ্কিত এই ধরণীর বৃদ্ধ-নাট্য-ভূমে
নিত্য নব নাটকের কর অভিনয় ;
পুরাতন ঝুলি হ'তে ঝাড় নিত্য নূতন সঞ্চয়।
হে নবীন, তুমি নিত্য পুরাতন কন্দর্পের হাতে
হেলাতে খেলাতে পলে পলে তুলে দাও নব পুষ্প-ধনু ;
অতনু তোমার বরে লভে নিত্য নব নব তনু।
চিরচেনা প্রণয়ীর পুরাণো হৃদয়ে, নূতন প্রণয়ে
বহাইয়া দাও তুমি দুরন্ত প্লাবন ;
পুরাণো কণ্ঠেতে নিত্য পরাইয়া পুরাতন বাহুর বাঁধন,
পুরাতনে পুরাতনে রচ নিত্য নব আলিঙ্গন।
পুরাতন রমণীরে সাজাইয়া তুমি নিত্য নূতন যৌবনে,
পুরাতন স্বর্ণে-গড়া নব আভরণে,
তুলে দাও মানুষের পুরাতন বুকে, নূতন কৌতুকে।
তাই আজো ধূলি-কলঙ্কিত এই মানবের পুরাতন গেহে,
নবীন জীবন বাড়ে, পুরাতন স্নেহে।

কালিদাস

(চিত্রনাট্য)

শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

ফেড্ ইন্।

অবন্তীর বিশাল রাজমন্ত্রাগারের একটি বৃহৎ কক্ষ। প্রায় পঞ্চাশজন মসীজীবী অনুলেখক সারি দিয়া ভূমির উপর বসিয়াছে। প্রত্যেকের সম্মুখে একটি করিয়া ক্ষুদ্র অনুচ্চ কাষ্ঠাসন ; তদুপরি মসীপাত্র ভূর্জ্জপত্রের কুণ্ডলী প্রভৃতি।

স্বয়ং জ্যেষ্ঠ-কায়স্থ একটি লিখিত পত্র হস্তে লইয়া অনুলেখকগণের সম্মুখে পাদচারণ করিতেছেন এবং পত্রটি উচ্চকণ্ঠে পাঠ করিতেছেন ; অনুলেখকগণ শুনিয়া শুনিয়া লিখিয়া চলিয়াছে—

জ্যেষ্ঠ-কায়স্থ :······আগামী মধু-পূর্ণিমা তিথিতে মদন মহোৎসব-বাসরে—হুম্ হুম্—সভা কবি শ্রীকালিদাস বিরচিত—অহহ—কুমার সম্ভবম্ নামক মহাকাব্য অবন্তীর রাজ সভায় পঠিত হইবে।—অথ শ্রীমানের—বিকল্পে শ্রীমতীর অহহহ—চরণ-রেণুকণা স্পর্শে অবন্তীর রাজসভা পবিত্র হোক—হুম্—

ওয়াইপ্।

মন্ত্রগৃহ। বিক্রমাদিত্য বসিয়া আছেন। তাঁহার একপাশে স্তূপীকৃত নিমন্ত্রণ-লিপির কুণ্ডলী ; মহামন্ত্রী একটি করিয়া লিপি রাজার সম্মুখে ধরিতেছেন, দ্বিতীয় একটি কর্ম্মিক দ্রবীভূত জতু একটি ক্ষুদ্র দর্ব্বীতে, লইয়া পত্রের উপর ঢালিয়া দিতেছে, মহারাজ তাহার উপর অঙ্গুরীয়-মুদ্রার ছাপ দিতেছেন।

বিক্রমাদিত্য :······উত্তরাপথে দক্ষিণাপথে যেখানে যত জ্ঞানী গুণী রসজ্ঞ আছেন—পুরুষ নারী—কেউ যেন বাদ না পড়ে—

ওয়াইপ্।

উজ্জয়িনী নগরীর পূর্ব্ব তোরণ। তোরণ হইতে তিনটি পথ বাহির হইয়াছে ; দুইটি পথ প্রাকারের ধার ঘেঁষিয়া উত্তরে ও দক্ষিণে গিয়াছে, তৃতীয়টি তীরের মত সিধা পূর্ব্বমুখে গিয়াছে।

প্রায় পঞ্চাশজন অশ্বারোহী রাজদূত তোরণ হইতে বাহিরে আসিয়া সারি দিয়া দাঁড়াইল। পৃষ্ঠে আমন্ত্রণ-লিপির বস্ত্র-পেটিকা ঝুলিতেছে, অস্ত্রশস্ত্রের বাহুল্য নাই।

গোপুরশীর্ষ হইতে দুন্দুভি ও বিষাণ বাজিয়া উঠিল। অমনি অশ্বারোহীর শ্রেণী তিন ভাগে বিভক্ত হইয়া গেল ; দুই দল উত্তরে ও দক্ষিণে চলিল, মাঝের দল ময়ূরসঞ্চারী গতিতে সম্মুখ দিকে অগ্রসর হইল।

ডিজল্ভ্।

কুন্তলের রাজভবন ভূমি। পূর্ব্বোল্লিখিত সরোবরের মর্ম্মর সোপানের উপর রাজকুমারী একাকিনী বসিয়া আছেন। মুখেচোখে হতাশা ও নৈরাশ্য পদাঙ্ক মুদ্রিত করিয়া দিয়াছে ; কেশবেশ অযত্নবিন্যস্ত। বাঁচিয়া থাকিবার প্রয়োজন যেন তাঁহার শেষ হইয়া গিয়াছে।

সরোবরের জল বায়ুস্পর্শে কুঞ্চিত হইয়া উঠিতেছে ; রাজকুমারী নীলাকমলের পাপড়ি ছিঁড়িয়া জলে ফেলিতেছেন ; কোনটি নৌকার মত ভাসিয়া যাইতেছে, কোনটি ডুবিতেছে।

অদূরে একটি তরুশাখায় হেলান দিয়া বিদ্যুল্লতা গান গাহিতেছে ; তাহার গীত কতক রাজকুমারীর কানে যাইতেছে, কতক যাইতেছে না।

বিদ্যুল্লতা :

ভাস্‌ল আমার ভেলা—
সাগর-জলে নাগর-দোলা ওঠা-নামার খেলা
সেথা ভাস্‌ল আমার ভেলা।
অকূলে—কূল পাবে কিনা—কে জানে ?
বাতাসে—বাজবে প্রলয় বীণা ?—কে জানে ?
কে জানে আসবে রাতি, হারাবে সাথের সাথী
আঁধারে ঝড়-তুফানের বেলা
—ভাস্‌ল আমার ভেলা।

গান শেষ হইয়া গেল। রাজকুমারী তাঁহার ভাসমান পদ্মপলাশগুলির পানে চাহিয়া ভাবিতেছেন—

রাজকুমারী : দিনের পর দিন···আজকের দিন শেষ হল···আবার কাল আছে···তারপর আবার কাল···কালের কি অবধি নেই—?

রাজকুমারীর পশ্চাতে অনতিদূরে চতুরিকা আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল ; তাহার হাতে কুণ্ডলিত নিমন্ত্রণ লিপি। ক্ষুদ্ধমুখে একটু ইতস্তত করিয়া সে রাজকুমারীর পাশে আসিল, সোপানের পৈঠার উপর পা মুড়িয়া বসিতে বসিতে বলিল—

চতুরিকা : পিয়সহি, অবন্তী থেকে আমন্ত্রণ এসেছে—তোমার জন্যে স্বতন্ত্র লিপি—

নিরুৎসুকভাবে লিপি লইয়া রাজকুমারী উহার জতুমুদ্রা দেখিলেন, তারপর খুলিয়া পড়িতে লাগিলেন। চতুরিকা বলিয়া চলিল—

চতুরিকা :—মহারাজ সভা থেকে পাঠিয়ে দিলেন। তাঁরও আলাদা নিমন্ত্রণ-লিপি এসেছে কিন্তু তিনি যেতে পারবেন না। বলে পাঠালেন, তুমি যদি যেতে চাও তিনি খুব খুশী হবেন।—

লিপি পাঠ শেষ করিয়া রাজকুমারী আবার উহা কুণ্ডলাকারে জড়াইতে লাগিলেন ; যেন চতুরিকার কথা শুনিতে পান নাই এমনিভাবে জলের পানে চাহিয়া রহিলেন। কিয়ৎকাল পরে ঈষৎ তিক্ত হাসি তাঁহার মুখে দেখা দিল ; তিনি লিপি জলে ফেলিয়া দিবার উপক্রম করিলেন। কিন্তু ফেলিলেন না। চতুরিকার দিকে ফিরিয়া অবসন্ন কণ্ঠে কহিলেন—

রাজকুমারী : পিতা সুখী হবেন ? বেশ—যাব।

উজ্জয়িনীর পূর্ব্ব দ্বার ; পুষ্প, পল্লব ও তোরণ মাল্যে শোভা পাইতেছে। আজ মদন মহোৎসব।

তিনটি পথ দিয়া পিপীলিকা শ্রেণীর মত মানুষ আসিয়া তোরণের রন্ধ্রমুখে অদৃশ্য হইয়া যাইতেছে। রাজন্যগণ হস্তীর গলঘণ্টা বাজাইয়া মন্দ-মন্থর গমনে আসিতেছেন, সঙ্গে যোদ্ধৃবেশধারী পদাতি, অশ্ব, এমন কি উষ্ট্রও আছে। মাঝে মাঝে দু'একটি চতুর্দ্দোলা আসিতেছে ; সূক্ষ্ম আবরণের ভিতর লঘু মেঘাবৃত শরচ্চন্দ্রের ন্যায় সম্রান্ত আর্য্যমহিলা।

একটি দোলা তোরণ মধ্যে প্রবেশ করিল ; সঙ্গে সহচর কেহ নাই।

দোলায় ক্ষীণাবরণের মধ্যে এক সুন্দরী বিমনা ভাবে করতলে কপোল রাখিয়া বসিয়া আছেন ; দূর হইতে দেখিয়া অনুমান হয়—ইনি কুন্তলের রাজকুমারী।

কাট্।

রাজসভার প্রবেশদ্বার। দ্বারে মহামন্ত্রী প্রভৃতি কয়েকজন উচ্চ কর্মচারী দাঁড়াইয়া আছেন। অতিথিগণ একে একে দুয়ে দুয়ে আসিতেছেন, মহামন্ত্রী তাঁহাদের পদোচিত অভ্যর্থনাপূর্ব্বক তিলক চন্দন ও গন্ধমাল্যে ভূষিত করিয়া সভার অভ্যন্তরে প্রেরণ করিতেছেন।

নেপথ্যে বসন্তরাগে মধুর বাঁশী বাজিতেছে।

কাট্।

সভার অভ্যন্তর। বক্তার বেদী ব্যতীত অন্য সব আসনগুলি ক্রমশ ভরিয়া উঠিতেছে। সন্নিধাতা কিঙ্করগণ সকলকে নির্দ্দিষ্ট আসনে লইয়া গিয়া বসাইতেছে।

ঊর্দ্ধে মহিলাদের মঞ্চেও অল্প শ্রোত্রী সমাগম হইতে আরম্ভ করিয়াছে ; তবে মহাদেবীর আসন এখনও শূন্য আছে।

কাট্।

কালিদাসের কুটীর প্রাঙ্গণ। কালিদাস সভায় যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন, মালিনী তাহার ললাটে চন্দন পরাইয়া দিতেছে। মালিনীর চোখদুটি একটু অরুণাভ। যেন সে লুকাইয়া কাঁদিয়াছে। সে থাকিয়া থাকিয়া দন্তদ্বারা অধর চাপিয়া ধরিতেছে।

কুমারসম্ভবের পুঁথি বেদীর উপর রাখা ছিল ; তাহা কালিদাসের হাতে তুলিয়া দিতে দিতে মালিনী একটু হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিল—

মালিনী : এতদিন তুমি আমার কবি ছিলে, আজ থেকে সারা পৃথিবীর কবি হলে। কত লোক তোমার গান শুনবে, ধন্যি ধন্যি করবে—

কালিদাস সলজ্জে একটু হাসিলেন।

কালিদাস : কী যে বল ! আমার কাব্য লেখার চেষ্টা বামন হয়ে চাঁদের পানে হাত বাড়ানো।—সবাই হয়তো হাসবে।

তাঁহার বিনয়-বচনে কান না দিয়া মালিনী বলিল—

মালিনী : আজ পৃথিবীর যত জ্ঞানী-গুণী সবাই তোমার গান শুনবে, কেবল আমিই শুনতে পাব না—

কালিদাস সবিস্ময়ে চোখ তুলিলেন।

কালিদাস : তুমি শুনতে পাবে না !—কেন ?

মালিনী : সভায় কত রাজা রাণী, কত বড় বড় লোক এসেছেন, সেখানে আমাকে কে যায়গা দেবে কবি ?

কালিদাসের মুখের ভাব দৃঢ় হইয়া উঠিল ; তিনি মালিনীর একটি হাত নিজের হাতে তুলিয়া ধীর স্বরে কহিলেন—

কালিদাস : রাজসভায় যদি তোমার যায়গা না হয়, তাহলে আমারও যায়গা হবে না। এস।

মালিনীর চক্ষুদুটি সহসা উদ্গত অশ্রুজলে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, অধর কাঁপিয়া উঠিল।

ডিজল্‌ভ্।

রাজসভা। সকলে স্ব স্ব আসনে বসিয়াছেন, সভায় তিল ফেলিবার স্থান নাই। রাজ বৈতালিক প্রধান বেদীর উপর যুক্ত করে দাঁড়াইয়া মহামান্য অতিথিগণের সাদর সম্ভাষণ গান করিতেছে। কিন্তু সেজন্য সভার জল্পনা গুঞ্জন শান্ত হয় নাই। সকলেই প্রতিবেশীর সহিত বাক্যালাপ করিতেছে, চারিদিকে ঘাড় ফিরাইয়া সভার অপূর্ব্ব শিল্পশোভা দেখিতেছে, স্বেচ্ছামত মন্তব্য প্রকাশ করিতেছে।

উপরে মহিলামঞ্চও কলভাষিণী মহিলাপুঞ্জে ভরিয়া উঠিয়াছে। কেন্দ্রস্থলে মহাদেবীগণের স্বতন্ত্র আসন কিন্তু এখনও শূন্য।

বৈতালিক স্তবগান গাহিয়া চলিয়াছে।

মহিলামঞ্চের দ্বারের কাছে মহাদেবী ভানুমতীকে আসিতে দেখা গেল। তিনি কুন্তলরাজকুমারীর হাত ধরিয়া হাস্যালাপ করিতে করিতে আসিতেছেন। কুন্তলকুমারীও সময়োচিত প্রফুল্লতার সহিত কথা কহিতেছেন। মনে হয় উৎসবের আবহাওয়ায় আসিয়া তাঁহার অবসাদ কিয়ৎপরিমাণে দূর হইয়াছে।

তাঁহারা স্বীয় আসনে গিয়া পাশাপাশি বসিলেন। রাজবংশজাতা আর কোনও মহিলা বোধ হয় আসে নাই, একা কুন্তলকুমারীই আসিয়াছেন। সেকালেও মহিলা-মহলে বিদ্যা-চর্চ্চার সমধিক অসদ্ভাব ছিল বলিয়া অনুমান হয়। তাই যে দুই চারিটি বিদুষী নারী দেখা দিতেন, তাঁহারা অতিমাত্রায় সম্মান ও শ্রদ্ধার পাত্রী হইয়া উঠিতেন।

বৈতালিকের স্তুতিগান শেষ হইয়া আসিতেছে।

মালিনী ভীরু-সসঙ্কোচপদে মহিলামঞ্চের দ্বারের কাছে আসিয়া ভিতরে উঁকি মারিল। ভিতরে আসিয়া অন্যান্য মহিলাগণের সহিত একাসনে বসিবার সাহস নাই ; সে দ্বারের কাছেই ইতস্তত করিতে লাগিল। তাহার হাতে একটি ফুলের মালা ছিল ; অশোক ও যূথী দিয়া গঠিত ; খানিকটা লাল, খানিকটা শাদা। মালাগাছি লইয়াও বিপদ—পাছে কেহ দেখিয়া ফেলে, পাছে কেহ হাসে। অবশেষে মালিনী মালাটি কোঁচড়ের মধ্যে লুকাইয়া দ্বারের পাশেই মেঝের উপর বসিয়া পড়িল। এখান হইতে গলা বাড়াইলে নিম্নে বক্তার বেদী সহজেই দেখা যায়।

বৈতালিকের গান শেষ হইল। সঙ্গে সঙ্গে ঘোর রবে দুন্দুভি বাজিয়া উঠিয়া সভাগৃহ মধ্যে তুমুল শব্দ তরঙ্গের সৃষ্টি করিল।

ওয়াইপ্।

সভা একেবারে শান্ত হইয়া গিয়াছে, পাতা নড়িলে শব্দ শোনা যায়।

কালিদাস বেদীর উপর বসিয়াছেন ; সম্মুখে উন্মুক্ত পুঁথি। তিনি একবার প্রশান্ত চক্ষে সভার চারিদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন, তারপর মন্দ্র কণ্ঠে পাঠ আরম্ভ করিলেন—

কালিদাস : কুমারসম্ভবম্।—

'অস্ত্যুত্তরস্যাং দিশি দেবতাত্মা হিমালয়োনাম নগাধিরাজঃ—'

মহিলামঞ্চের মধ্যস্থলে কুন্তলকুমারী নির্নিমেষ বিস্ফারিত নেত্রে নিম্নে কালিদাসের পানে চাহিয়া আছেন। এ কে ? সেই মূর্ত্তি, সেই কণ্ঠস্বর ! তবে কি—তবে কি—?

কালিদাসের উদাত্ত কণ্ঠস্বর ক্ষীণ হইয়া ভাসিয়া আসিতেছে—হিমালয়ের বর্ণনা—

কালিদাস :—'পূর্ব্বাপরৌ তোয়নিধীবগাহ্য স্থিতঃ পৃথিব্যাং ইব মানদণ্ডঃ।'

ডিজল্‌ভ্।

তুষারমৌলী হিমালয়ের কয়েকটি দৃশ্য। দূর হইতে একটি অধিত্যকা দেখা গেল ; তথায় একটি ক্ষুদ্র কুটীর ও লতা বিতান। পতিনিন্দা শুনিয়া সতী প্রাণ বিসর্জ্জন দিবার পর মহেশ্বর এই নির্জ্জন স্থানে উগ্র তপস্যায় রত আছেন।

কালিদাস শ্লোকের পর শ্লোক পড়িয়া চলিয়াছেন, তাঁহার অস্পষ্ট কণ্ঠস্বর এই দৃশ্যগুলির উপর সঞ্চারিত হইতেছে।

কাট্।

রাজসভার দৃশ্য। বিশাল সভা চিত্রার্পিতবৎ বসিয়া আছে; কালিদাসের কণ্ঠস্বর এই নীরব একাগ্রতার মধ্যে মৃদঙ্গের ন্যায় মন্দ্রিত হইতেছে।

মহিলামঞ্চে কুন্তলকুমারী তন্দ্রাহতার মত বসিয়া শুনিতেছেন; বাহ্যজ্ঞান বিরহিত, চক্ষু নিষ্পলক; কখনও বক্ষ ভেদ করিয়া নিশ্বাস বাহির হইয়া আসিতেছে, কখনও গণ্ড বহিয়া অশ্রুর ধারা নামিতেছে; তিনি জানিতেও পারিতেছেন না।

ওয়াইপ্।

হিমালয়ের অধিত্যকায় মহেশ্বরের কুটীর। লতাগৃহদ্বারে নন্দী প্রকোষ্ঠে হেমবেত্র লইয়া দণ্ডায়মান। বেদীর উপর যোগাসনে বসিয়া মহেশ্বর ধ্যানমগ্ন।

মহেশ্বরের আকৃতির সহিত কালিদাসের আকৃতির কিছু সাদৃশ্য থাকিবে; কাব্যে কবির নিজ জীবন বৃত্তান্ত যে প্রচ্ছন্নভাবে প্রবেশ করিয়াছে ইহা তাহারই ইঙ্গিত।

বনপথ দিয়া গিরিকন্যা উমা কুটীরের পানে আসিতেছেন; দূর হইতে তাঁহাকে দেখিয়া কুন্তলকুমারী বলিয়া ভ্রম হয়। হস্তে ফুল জল সমিধপূর্ণ পাত্র।

বেদীপ্রান্তে পৌঁছিয়া উমা নতজানু হইয়া মহেশ্বরকে প্রণাম করিলেন। শঙ্কর ধ্যানমগ্ন।

ডিজল্‌ভ্।

মেঘলোকে ইন্দ্রসভা। ইন্দ্র ও দেবগণ মুহ্যমানভাবে বসিয়া আছেন। মদন ও বসন্ত প্রবেশ করিলেন। মদনের কণ্ঠে পুষ্পধনু; বসন্তের হস্তে চূত-মঞ্জরী।

ইন্দ্র সাদরে মদনের হাত ধরিয়া বলিলেন—

ইন্দ্র: এস বন্ধু, আমাদের দারুণ বিপদে তুমিই একমাত্র সহায়।

কৈতববাদে স্ফীত হইয়া মদন সদর্পে বলিলেন—

মদন: আদেশ করুন দেবরাজ, আপনার প্রসাদে, অন্যে কোন ছার, স্বয়ং পিণাকপাণির ধ্যানভঙ্গ করতে পারি।

দেবতাগণ সমস্বরে জয়ধ্বনি করিয়া উঠিলেন। মদন ঈষৎ ত্রস্ত ও চকিত হইয়া সকলের মুখের পানে চাহিলেন। সত্যই মহাদেবের ধ্যানভঙ্গ করিতে হইবে নাকি?

কাট্।

রাজসভা। কালিদাস কাব্য পাঠ করিয়া চলিয়াছেন; সকলে রুদ্ধশ্বাসে শুনিতেছে।

মহিলামঞ্চে কুন্তলকুমারীর অবস্থা পূর্ব্ববৎ—বাহ্যজ্ঞানশূন্য। ভানুমতী তাহা লক্ষ্য করিলেন, কিন্তু কিছু না বলিয়া কাব্য-শ্রবণে মন দিলেন।

ওয়াইপ্।

হিমালয়। সমস্ত প্রকৃতি শীত জর্জ্জর, তুষার কঠিন। বৃক্ষ নিষ্পত্র, প্রাণীদের প্রাণ-চঞ্চলতা নাই।

মহেশ্বরের তপোবনের সন্নিকটে একটি শাখাসর্ব্বস্ব বৃক্ষ দাঁড়াইয়া আছে। মদন ও বসন্তের সূক্ষ্ম-দেহ এই বৃক্ষের উপর দিয়া ভাসিয়া গেল। অমনি সঙ্গে সঙ্গে বৃক্ষটি পুষ্পপল্লবে ভরিয়া উঠিল।

দূরে সহসা কোকিল-কাকলি শুনা গেল। হিমালয়ে অকাল-বসন্তের আবির্ভাব হইয়াছে।

সহসা-হরিতায়িত বনভূমির উপর কিন্নর মিথুন নৃত্যগীত আরম্ভ করিল; পশুপক্ষী ব্যাকুল বিস্ময়ে ছুটাছুটি ও কলকূজন করিয়া বেড়াইতে লাগিল। প্রমথগণ প্রমত্ত উদ্দাম হইয়া উঠিল।

নন্দী এই আকস্মিক বিপর্য্যয়ে বিব্রত হইয়া চারিদিকে কঠোর দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল; তারপর ওষ্ঠের উপর অঙ্গুলি রাখিয়া যেন জীবলোককে শাসন করিতে চাহিল—'চপলতা করিও না, মহেশ্বর ধ্যানমগ্ন।'

মহেশ্বর বেদীর উপর যোগাসনে উপবিষ্ট। চক্ষু ভ্রূমধ্যে স্থির, শ্বাস নাসাভ্যন্তরচারী; নিবাত নিষ্কম্প দীপশিখার মত দেহ নিশ্চল।

রুম ঝুম মঞ্জীরের শব্দ কাছে আসিতেছে; উমা যথানিয়ত পূজার উপকরণ লইয়া আসিতেছেন। নন্দী সসম্ভ্রমে পথ ছাড়িয়া দিল।

মহেশ্বরের ধ্যাননিদ্রা ক্রমে তরল হইয়া আসিতেছে; তাঁহার নয়ন পল্লব ঈষৎ স্ফুরিত হইল।

লতা বিতানের এক কোণে লুকাইয়া মদন ধনুর্ব্বাণ হস্তে সুযোগ প্রতীক্ষা করিতেছে। পার্ব্বতী আসিতেছেন—এই উপযুক্ত সময়।

পার্ব্বতী আসিয়া বেদীমূলে প্রণাম করিলেন, তারপর নতজানু অবস্থায় স্মিত-সলজ্জ চক্ষু দুটি মহেশ্বরের মুখের পানে তুলিলেন। মদনের অদৃশ্য উপস্থিতি উভয়ের অন্তরেই চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করিয়াছিল; মহাদেবের অরুণায়ত নেত্র পার্ব্বতীর মুখের উপর পড়িল।

মদন এই অবসরের প্রতীক্ষা করিতেছিল, সাবধানে লক্ষ্য স্থির করিয়া সম্মোহন বাণ নিক্ষেপ করিল।

মহেশ্বরের তৃতীয় নয়ন খুলিয়া গিয়া ধক্ ধক্ করিয়া ললাটবহ্নি নির্গত হইল—কে রে তপোবিঘ্নকারী! তিনি মদনের দিকে দৃষ্টি ফিরাইলেন।

হরনেত্রজন্মা বহ্নিতে মদন ভস্মীভূত হইল।

ভয়ব্যাকুলা উমা বেদীমূলে নতজানু হইয়া আছেন। মহেশ্বর বেদীর উপর উঠিয়া দাঁড়াইয়া চতুর্দ্দিকে একবার রুদ্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন।

তাঁহার প্রলয়ঙ্কর মূর্ত্তি সহসা শূন্যে অদৃশ্য হইয়া গেল।

কাট্।

মদনভস্ম নামক সর্গ শেষ করিয়া কালিদাস ক্ষণেকের জন্য নীরব হইলেন; সভাও নিস্তব্ধ হইয়া রহিল। এতগুলি মানুষ যে সভাগৃহে বসিয়া আছে শব্দ শুনিয়া তাহা বুঝিবার উপায় নাই।

কালিদাস পুঁথির পাতা উল্টাইলেন; তারপর আবার নূতন সর্গ পড়িতে আরম্ভ করিলেন।—

রতি বিলাপ শুনিয়া কুন্তলকুমারীর চক্ষে অশ্রুর ধারা বহিল। ভানুমতী আবার নূতন করিয়া কাঁদিলেন। দ্বারপার্শ্বে মেঝের বসিয়া মালিনীও কাঁদিল। প্রিয়-বিয়োগ ব্যথা কাহাকে বলে এতদিনে সে বুঝিতে শিখিয়াছে।

ক্রমে কবি উমার তপস্যা অধ্যায়ে পৌঁছিলেন।

ডিজল্‌ভ্।

হিমালয়ের গহন গিরিসঙ্কটের মধ্যে কুটীর রচনা করিয়া রাজনন্দিনী উমা কঠোর তপস্যা আরম্ভ করিয়াছেন। পতিলাভার্থ তপস্যা; পর্ণ—অর্থাৎ আপনা হইতে ঝরিয়া পড়া গাছের পাতা—তাহাও পার্ব্বতী আর আহার করেন না, তাই তাঁহার নাম হইয়াছে—অপর্ণা।

কৃচ্ছ্রসাধন বহুপ্রকার। গ্রীষ্মের দ্বিপ্রহরে তপঃকৃশা পার্ব্বতী চারি কোণে অগ্নি জ্বালিয়া মধ্যস্থ আসনে বসিয়া প্রচণ্ড সূর্য্যের পানে নিষ্পলক চাহিয়া থাকেন। ইহা পঞ্চাগ্নি তপস্যা। আবার শীতের হিম-কঠিন রাত্রে সরোবরের জলের উপর তুষারের আস্তরণ পড়ে; সেই আস্তরণ ভিন্ন করিয়া উমা জলমধ্যে প্রবেশ করেন; আকণ্ঠ জলে ডুবিয়া শীতরাত্রি অতিবাহিত হয়। সারা রাত্রি চন্দ্রের পানে চাহিয়া উমা চন্দ্রশেখরের মুখচ্ছবি ধ্যান করেন।

এই ভাবে কল্প কাটিয়া যায়। তারপর একদিন—
উমার কুটীরদ্বারে এক তরুণ সন্ন্যাসী দেখা দিলেন; ডাক দিলেন—

সন্ন্যাসী: অয়মহং ভোঃ!

উমা কুটীরে ছিলেন; তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিয়া সন্ন্যাসীকে পাদ্য অর্ঘ দিলেন।

সন্ন্যাসীর চোখের দৃষ্টি ভাল নয়; লোলুপনেত্রে পার্ব্বতীকে নিরীক্ষণ করিয়া কহিলেন—

সন্ন্যাসী: সুন্দরী, তুমি কী জন্য তপস্যা করছ?

পার্ব্বতী নতনয়নে অনুচ্চ কণ্ঠে বলিলেন—

পার্ব্বতী: পতি লাভের জন্য।

সন্ন্যাসী বিস্ময় প্রকাশ করিলেন।

সন্ন্যাসী: কী আশ্চর্য্য! তোমার মত ভুবনৈকা সুন্দরীকেও পতি লাভের জন্য তপস্যা করতে হয়!—কে সেই মূঢ় যে নিজে এসে তোমার পায়ে পড়ে না? তার নাম কি?

পার্ব্বতী সন্ন্যাসীর চটুলতায় বিরক্ত হইলেন, গম্ভীর মুখে বলিলেন—

পার্ব্বতী: তাঁর নাম—শঙ্কর চন্দ্রশেখর শিব মহেশ্বর।

সন্ন্যাসী বিপুল বিস্ময়ের অভিনয় করিয়া শেষে উচ্চ ব্যঙ্গ-হাস্য করিয়া উঠিলেন।

সন্ন্যাসী: কী বললে—শিব মহেশ্বর! সেই দিগম্বর উন্মাদটা—যে একপাল প্রেত-প্রমথ নিয়ে শ্মশানে মশানে নেচে বেড়ায়। তাকে তুমি পতিরূপে কামনা কর! হাঃ হাঃ হাঃ!

সন্ন্যাসীর ব্যঙ্গ-বিস্ফুরিত অট্টহাস্য আবার কাটিয়া পড়িল। পার্ব্বতীর মুখ ক্রোধে রক্তিম হইয়া উঠিল; সন্ন্যাসীর প্রতি একটি জ্বলন্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া কহিলেন—

পার্ব্বতী: কপট সন্ন্যাসী, তোমার এত স্পর্দ্ধা তুমি শিবনিন্দা কর!—এখানে আর আমি থাকব না—

পার্ব্বতী কুটীরের পানে পা বাড়াইলেন।
পিছন হইতে শান্ত কোমল স্বর আসিল—

মহেশ্বর: উমা, ফিরে চাও—দেখ, আমি কে!

উমা ফিরিয়া চাহিলেন। যাহা দেখিলেন তাহাতে তাঁহার রোমাঞ্চিত তনু থরথর কাঁপিতে লাগিল। শিলারুদ্ধগতি তটিনীর মত তিনি চলিয়া যাইতেও পারিলেন না, স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিতেও পারিলেন না।

সন্ন্যাসীর স্থানে স্বয়ং মহেশ্বর। তিনি মৃদু মৃদু হাস্য করিতেছেন। পার্ব্বতীর কণ্ঠ হইতে ক্ষীণ বাষ্পরুদ্ধ স্বর বাহির হইল—

পার্ব্বতী: মহেশ্বর—!

ডিজল্‌ভ্।

গিরিরাজ গৃহে হর-পার্ব্বতীর বিবাহ।

মহা আড়ম্বর; হুলস্থূল ব্যাপার। পুরন্ধ্রীগণ হুলুধ্বনি শঙ্খধ্বনি করিতেছেন; দেবগণ অন্তরীক্ষে স্তুতিগান করিতেছেন; ভূতগণ কলকোলাহল করিয়া নাচিতেছে।

বিবাহ মণ্ডপে বর-বধূ পাশাপাশি বসিয়া আছেন। রতি আসিয়া মহেশ্বরের পদতলে পড়িল। গৌরী একবার মহেশ্বরের পানে অনুনয়-ব্যঞ্জক অপাঙ্গ-দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন।

আশুতোষ প্রীত হইয়া রতির মস্তকে হস্ত রাখিলেন; অমনি মদন পুনরুজ্জীবিত হইয়া যুক্তকরে দেব দম্পতীর সম্মুখে আবির্ভূত হইল।

বাদ্যোদ্যম, দেবতাদের স্তবগান ও প্রমথদের কলনিনাদ আরও গগনভেদী হইয়া উঠিল।

দীর্ঘ ডিজল্‌ভ্।

অবন্তীর রাজসভা। উপরিউক্ত কলকোলাহল রাজসভার জয়ধ্বনিতে পর্য্যবসিত হইয়াছে। কালিদাস কুমারসম্ভব পর্ব্ব শেষ করিয়াছেন।

কালিদাসের মস্তকে মাল্য বর্ষিত হইতেছে; ক্রমশঃ তাঁহার কণ্ঠে মালার স্তূপ জমিয়া উঠিল। তিনি যুক্তকরে নতনেত্রে দাঁড়াইয়া এই সম্বর্দ্ধনা গ্রহণ করিতেছেন।

উপরে মহিলামঞ্চেও চাঞ্চল্যের অন্ত নাই। কুঙ্কুম লাজাঞ্জলি পুষ্পাঞ্জলি কবির মস্তক লক্ষ্য করিয়া নিক্ষিপ্ত হইতেছে! মহিলাদের রসনাও নীরব নাই, সকলেই একসঙ্গে কথা কহিতেছেন। সভা ভাঙ্গিয়াছে; তাই মহিলারাও নিজ নিজ আসন ছাড়িয়া উঠিয়াছেন কিন্তু আশু সভা ছাড়িয়া যাইবার কোনও লক্ষণই দেখা যাইতেছে না। ভানুমতীও মাতিয়া উঠিয়াছেন, পরম উৎসাহভরে সকলের সহিত আলাপ করিতেছেন।

এই প্রমত্ত আনন্দ-অধীর জনতার এক প্রান্তে কুন্তলকুমারী মূর্চ্ছাহতার মত বসিয়া আছেন। তাঁহার বিস্ফারিত চক্ষে দৃষ্টি নাই, কেবল অধরোষ্ঠ যেন কোন অর্দ্ধোচ্চারিত কথায় থাকিয়া থাকিয়া নড়িয়া উঠিতেছে।

কুন্তলকুমারী। আমার স্বামী—আমার স্বামী—

মালিনীর অবস্থাও বিচিত্র; সে একসঙ্গে হাসিতেছে কাঁদিতেছে; একবার ছুটিয়া মঞ্চের প্রান্ত পর্য্যন্ত যাইতেছে, আবার দ্বারের কাছে ফিরিয়া আসিতেছে। তাহার দিকে কাহারও দৃষ্টি নাই। মালিনী একবার চারিদিকে চাহিয়া দেখিল, তারপর সাবধানে কোঁচড় হইতে মালাটি বাহির করিয়া কালিদাসের শির লক্ষ্য করিয়া ছুঁড়িয়া দিল।

মালাটি চক্রাকারে ঘুরিতে ঘুরিতে কালিদাসের মাথা গলিয়া গলায় পড়িল। কবি একবার স্মিত চক্ষু উপর দিকে তুলিলেন।

ডিজল্‌ভ্।

রাজসভা শূন্য হইয়া গিয়াছে। নীচে একটিও লোক নাই; উপরে একাকিনী কুন্তল-কুমারী বসিয়া আছেন, আর মালিনী দ্বারে ঠেস দিয়া দাঁড়াইয়া ঊর্দ্ধমুখে কোন দুর্গম চিন্তায় মগ্ন হইয়া গিয়াছে।

সহসা চমক ভাঙিয়া কুন্তলকুমারী দেখিলেন তিনি একা, সকলে চলিয়া গিয়াছে। তিনি উঠিয়া দ্বারের দিকে চলিলেন; সকলে হয় তো তাঁহার ভাব-বিহ্বলতা লক্ষ্য করিয়াছে; কে কী ভাবিয়াছে কে জানে!

দ্বারের কাছে পৌঁছিতেই মালিনী চট্‌কা ভাঙিয়া সোজা হইয়া দাঁড়াইল, সসম্ভ্রমে বলিল—

মালিনী: দেবি, আমার ওপর মহাদেবী ভানুমতীর আজ্ঞা আছে, আপনি যেখানে যেতে চাইবেন সেখানে নিয়ে যাব!

কুন্তলকুমারী নিঃশব্দে মাথা নাড়িয়া বাহির হইয়া গেলেন। কিছুদূর গিয়া কিন্তু তাঁহার গতি হ্রাস হইল; ইতস্ততঃ করিয়া তিনি দাঁড়াইলেন, তারপর মালিনীর দিকে ফিরিয়া আসিলেন।

কুন্তলকুমারী: তুমি কি মহাদেবী ভানুমতীর কিঙ্করী?

মালিনী: হ্যাঁ দেবি, আমি তাঁর মালিনী।

কুন্তলকুমারী আসল প্রশ্নটি সহজভাবে জিজ্ঞাসা করিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু গলা বুজিয়া গেল; অতিকষ্টে উচ্চারণ করিলেন—

কুন্তলকুমারী: তুমি—তুমি—কবি শ্রীকালিদাস কোথায় থাকেন তুমি জানো?

মালিনী চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া চাহিল; কিন্তু সহজ সম্ভ্রমের সুরেই বলিল—

মালিনী: হ্যাঁ দেবি, জানি।

আগ্রহের কাছে সঙ্কোচ পরাভূত হইল, কুন্তলকুমারী আর এক পা কাছে আসিলেন।

কুন্তলকুমারী: কোথায় থাকেন তিনি?

মালিনীর মুখে একটু হাসি খেলিয়া গেল।

মালিনী: সিপ্রা নদীর ধারে নিজের হাতে কুঁড়ে ঘর তৈরি করেছেন, সেইখানেই তিনি থাকেন। তাঁর খবর নিয়ে আপনার কি লাভ, দেবি? কবি বড় গরীব—দীনদরিদ্র, কিন্তু তিনি বড় মানুষের অনুগ্রহ নেন না।

কুন্তলকুমারী আর এক পা কাছে আসিলেন।

কুন্তলকুমারী: তবে কি—তুমি কি—তাঁর সঙ্গে কি তোমার পরিচয় আছে?

তিক্ত হাসিতে মালিনীর অধরপ্রান্ত নত হইয়া পড়িল।

মালিনী: আছে দেবি—সামান্যই। তিনি মহাকবি, আমি মালিনী—তাঁর সঙ্গে আমার কতটুকু পরিচয় থাকতে পারে।

কুন্তলকুমারী কিছু শুনিলেন না, প্রবল আবেগভরে সহসা মালিনীর হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিয়া উঠিলেন—

কুন্তলকুমারী: তুমি আমাকে তাঁর কাছে নিয়ে যেতে পার?

মালিনীর চোখ হইতে যেন ঠুলি খসিয়া পড়িল। এতক্ষণ সে ভাবিয়াছিল, রাজকুমারীর জিজ্ঞাসা কেবলমাত্র কৌতূহল-প্রসূত। এখন সে সন্দেহ-তীক্ষ্ণ চক্ষে তাঁহার পানে চাহিয়া রহিল, তারপর সহসা প্রশ্ন করিল—

মালিনী: তুমি কে? কবি তোমার কে?

অধরে অধর চাপিয়া কুন্তলকুমারী দুরন্ত বাষ্পোচ্ছ্বাস দমন করিলেন—

কুন্তলকুমারী: তিনি—আমার স্বামী।

অতর্কিতে মস্তকে প্রবল আঘাত পাইয়া মানুষ যেমন ক্ষণেকের জন্য বুদ্ধিভ্রষ্ট হইয়া যায়, মালিনীরও তদ্রূপ হইল। সে বিহ্বল ভাবে চাহিয়া বলিল—

মালিনী: স্বামী—স্বামী!

তারপর ধীরে ধীরে তাহার উপলব্ধি ফিরিয়া আসিল। সে ঊর্দ্ধমুখে চক্ষু মুদিত করিয়া অস্ফুট স্বরে বলিল—

মালিনী: ও—স্বামী! তাই! বুঝতে পেরেছি—এবার সব বুঝতে পেরেছি। দেবি, তিনি আপনার স্বামী, বুঝতে পেরেছি। তা, আপনি তাঁর কাছে যেতে চান?

কুন্তলকুমারী: হ্যাঁ, আমাকে তাঁর কাছে নিয়ে চল।

মালিনীর বুকের ভিতরটা শূলবিদ্ধ সর্পের মত মুচ্‌ড়াইয়া উঠিতেছিল; সে একটু ব্যঙ্গ না করিয়া থাকিতে পারিল না।

মালিনী: দেবি, আপনি রাজার মেয়ে, সেখানে যাওয়া কি আপনার শোভা পায়? সে একটা খড়ের কুঁড়ে ঘর···সেখানে কবি নিজের হাতে রেঁধে খান। এসব কি আপনি সহ্য করতে পারবেন রাজকুমারী?

রাজকুমারীর ভয় হইল; মালিনী বুঝি তাঁহাকে লইয়া যাইবে না। তিনি ব্যগ্রভাবে হাতের কঙ্কণ খুলিতে খুলিতে বলিলেন—

কুন্তলকুমারী: তুমি বুঝতে পারছ না—আমি যে তাঁর স্ত্রী—সহধর্ম্মিণী। এই নাও পুরস্কার। দয়া করে আমাকে তাঁর কুটীরে নিয়ে চল।

কুন্তলকুমারী কঙ্কণটি মালিনীর হাতে গুঁজিয়া দিতে গেলেন, কিন্তু মালিনী লইল না, বিতৃষ্ণার সহিত হাত সরাইয়া লইল; ফিকা হাসিয়া বলিল—

মালিনী: থাক, দরকার নেই; এইটুকু কাজের জন্যে আবার পুরস্কার কিসের। আসুন আমার সঙ্গে।

রাজকুমারীর জন্য প্রতীক্ষা না করিয়াই মালিনী চলিতে আরম্ভ করিল।

ওয়াইপ্।

কালিদাসের কুটীর প্রাঙ্গণ। কুন্তলকুমারীকে সঙ্গে লইয়া মালিনী বেদীর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। কালিদাস নাই; কেবল বেদীর উপর মালার স্তূপ পড়িয়া আছে, যেন কবি ক্লান্তভাবে এই সম্মানের বোঝা এখানে ফেলিয়া গিয়াছেন।

মালিনী নিজেকে অনেকটা সামলাইয়া লইয়াছে; তাঁহার মুখের ভাব দৃঢ়। কুন্তলকুমারী যেন স্বপ্নলোকে বিচরণ করিতেছেন।

মালিনী ঘরের উদ্দেশ্যে ডাকিল—

মালিনী: কবি—ওগো কবি, তুমি কোথায়?

ঘরের ভিতর হইতে কিন্তু সাড়া আসিল না। কুন্তলকুমারী শঙ্কিত দীননেত্রে মালিনীর পানে চাহিলেন।

মালাগুলি জড়াজড়ি হইয়া বেদীর উপর পড়িয়াছিল। তাহার মধ্য হইতে মালিনী নিজের মালাটি বাহির করিয়া লইল; পর-পর লাল ও শাদা ফুলে গাঁথা মালা—চিনিতে কষ্ট হইল না।

মালাটি রাজকুমারীর হাতে ধরাইয়া দিয়া মালিনী সহজ স্বরে বলিল—

মালিনী: নাও—আমার সঙ্গে এস। উনি ঘরেই আছেন, হয়তো পূজোয় বসেছেন।

মালিনী অগ্রবর্ত্তিনী হইয়া কক্ষে প্রবেশ করিল; রাজকুমারী কম্প্রবক্ষে দ্বিধা জড়িত পদে তাহার পিছনে চলিলেন।

কুটীরে একটি মাত্র কক্ষ; আয়তনেও ক্ষুদ্র। এক পাশে কালিদাসের দীন শয্যা গুটানো রহিয়াছে; আর এক কোণে একটি দীপদণ্ড, তাহার পাশে অনুচ্চ কাষ্ঠাসনের উপর লেখনী মসীপাত্র ও কুমারসম্ভবের পুঁথি রহিয়াছে। কিন্তু কালিদাস ঘরে নাই।

কুন্তলকুমারীর দেহের সমস্ত শক্তি যেন ফুরাইয়া গিয়াছিল। তিনি পুঁথির সম্মুখে জানু ভাঙিয়া বসিয়া পড়িলেন, অস্ফুট স্বরে বলিলেন—

কুন্তলকুমারী: কোথায় তিনি?

মালিনী সবই লক্ষ্য করিয়াছিল; বুঝি তাহার মনে একটু অনুকম্পাও জাগিয়াছিল। সে আশ্বাস দিবার ভঙ্গীতে কথা বলিতে বলিতে বাহির হইয়া গেল।

মালিনী: তুমি থাক, আমি দেখছি। বুঝি নদীতে স্নান করতে গেছেন—

মালিনী চলিয়া গেলে রাজকুমারী হাতের মালাটি কুমারসম্ভবের পুঁথির উপর রাখিলেন; তারপর আর আত্মসম্বরণ করিতে না পারিয়া পুঁথির উপর মাথা রাখিয়া সহসা কাঁদিয়া উঠিলেন।

কাট্‌।

সিপ্রার তীর। কালিদাস একাকী জলের ধারে বসিয়া আছেন; মাঝে মাঝে একটি নুড়ি কুড়াইয়া লইয়া অলস-হস্তে জলে ফেলিতেছেন। রাজসভার উত্তেজনা কাটিয়া গিয়া নিঃসঙ্গ জীবনের শূন্যতার অনুভূতি তাঁহার অন্তরকে গ্রাস করিয়া ধরিয়াছে। তাহার অন্তর্লোকে শ্রান্ত বাণী ধ্বনিত হইতেছে—কেন? কিসের জন্য? কাহার জন্য?

মালিনী নিঃশব্দে তাঁহার পিছনে আসিয়া দাঁড়াইল; কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া হ্রস্ব-কণ্ঠে ডাকিল—

মালিনী: কবি!

কালিদাস চমকিয়া মুখ তুলিলেন।

কালিদাস: মালিনী!

মালিনী: কি ভাবা হচ্ছিল?

কালিদাস একটু চুপ করিয়া রহিলেন।

কালিদাস: ভাবছিলাম—অতীতের কথা।

মালিনী কালিদাসের পাশে বসিল।

মালিনী: কিন্তু ভাবনা সুখের নয়—কেমন?

কালিদাস: [ম্লান হাসিয়া] না, সুখের নয়। কিন্তু এ জগতে সকলে সুখ পায় না, মালিনী।

মালিনী বহমানা সিপ্রার জলে একটি নুড়ি ফেলিল।

মালিনী: না, সকলে পায় না। কিন্তু তুমি পাবে।

কালিদাস ভ্রূ তুলিয়া মালিনীর পানে চাহিলেন, তারপর মৃদু হাসিয়া মাথা নাড়িলেন।

কালিদাস: কীর্ত্তি যশ সম্মান—তাতে সুখ সেই মালিনী। সুখ আছে শুধু—প্রেমে।

মালিনীর মুখে বিচিত্র হাসি ফুটিয়া উঠিল; সে কালিদাসের পানে একবার চোখ পাতিয়া যেন তাঁহাকে দৃষ্টি-রসে অভিষিক্ত করিয়া দিল। তারপর মুখ টিপিয়া বলিল—

মালিনী: প্রেমে জ্বালাও আছে কবি। নাও, ওঠ এখন; তোমাকে ডাকতে এসেছিলুম। একজন তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে—

মালিনী উঠিয়া দাঁড়াইল।

কালিদাস: ও—কে তিনি?

মালিনী: আগে চলই না, দেখতে পাবে।

কালিদাসও উঠিবার উপক্রম করিলেন।

সিপ্রার পরপারে সূর্য্যদেব তখন দিগ্বলয় স্পর্শ করিতেছেন।

কাট্‌।

প্রাঙ্গণ-দ্বারে পৌঁছিয়া কালিদাস দ্বার ঠেলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিলেন; মালিনী কিন্তু ভিতরে আসিল না, চৌকাঠের বাহিরে দাঁড়াইয়া রহিল। কালিদাস তাহার দিকে ফিরিয়া চক্ষের সপ্রশ্ন ইঙ্গিতে তাহাকে ভিতরে আসিবার অনুজ্ঞা জানাইলেন, মালিনী কিন্তু অধর চাপিয়া একটু ফিকা হাসিয়া মাথা নাড়িল।

এই সময় কুটীরের ভিতর হইতে শঙ্খ-ধ্বনি হইল। কালিদাস মহা-বিস্ময়ে সেই দিকে ফিরিলেন। মালিনী এই অবকাশে ধীরে ধীরে দ্বার বন্ধ করিয়া দিল; তাহার মুখের ব্যথা-বিদ্ধ হাসি কবাটের আড়ালে ঢাকা পড়িয়া গেল।

ওদিকে কালিদাস দ্রুত অনুসন্ধিৎসায় কুটীরের পানে চলিয়াছিলেন—তাঁহার ঘরে শঙ্খ বাজায় কেন? সহসা সম্মুখে এক মূর্ত্তি দেখিয়া তিনি স্থাণুবৎ দাঁড়াইয়া পড়িলেন। এ কি!

কুটীর হইতে রাজকুমারী বাহির হইয়া আসিতেছেন; গললগ্নীকৃত অঞ্চলপ্রান্ত, এক হস্তে প্রদীপ, অন্য হস্তে মালা। কালিদাসকে দেখিয়া তাঁহার গতি শ্লথ হইল না; স্থিরদৃষ্টিতে স্বামীর মুখের পানে চাহিয়া তিনি কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেন। চোখ দুটিতে এখন আর জল নাই; অধর যদিও থাকিয়া থাকিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে, তবু অধরপ্রান্তে যেন একটু হাসির আভাস নিদাঘ-বিদ্যুতের মত স্ফুরিত হইতেছে। তিনি প্রদীপটি বেদীর উপর রাখিলেন; তারপর দুই হাতে স্বামীর গলায় মালা পরাইয়া দিয়া নতজানু হইয়া তাঁহার পদপ্রান্তে বসিয়া পড়িলেন; অস্ফুট কণ্ঠে বলিলেন—

কুন্তলকুমারী: আর্য্যপুত্র—

কালিদাস জড়মূর্ত্তির মত দাঁড়াইয়া ছিলেন; যাহা কল্পনারও অতীত তাহাই চক্ষের সম্মুখে ঘটিতে দেখিয়া তাঁহার চিন্তা করিবার শক্তিও প্রায় লোপ পাইয়াছিল। এখন তিনি চমকিয়া চেতনা ফিরিয়া পাইলেন; নত হইয়া কুমারীকে দুই হাত ধরিয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়া বিহ্বলকণ্ঠে বলিতে লাগিলেন—

কালিদাস: দেবি—দেবি—না না এ কি—পায়ের কাছে নয় দেবি—

কুন্তলকুমারী স্বামীর মুখের পানে মুখ তুলিয়া দেখিলেন, সেখানে ক্ষমা ও প্রীতি ভিন্ন আর কিছুরই স্থান নাই, এতটুকু অভিমান পর্য্যন্ত নাই। যে অশ্রুকে তিনি এত যত্নে চাপিয়া রাখিয়া ছিলেন তাহা আর বাঁধন মানিতে চাহিল না, বাঁধ ভাঙিয়া বাহির হইবার উপক্রম করিল।

কালিদাস তাঁহাকে হাত ধরিয়া তুলিতেই দু'জনে মুখোমুখি দাঁড়াইলেন। সঙ্গে সঙ্গে মহাকালের মন্দির হইতে সন্ধ্যারতির শঙ্খ ঘণ্টা ধ্বনি ভাসিয়া আসিল।

ডিজল্‌ভ্‌।

কিছুক্ষণ কাটিয়াছে। ভাব-প্লাবনের প্রথম উদ্দাম উচ্ছ্বাস প্রশমিত হইয়াছে। উভয়ে বেদীর উপর উঠিয়া দাঁড়াইয়াছেন; তাঁহাদের হাত এখনও পরস্পর নিবদ্ধ।

কালিদাস মিনতি করিয়া বলিতেছেন—

কালিদাস: কিন্তু দেবি, এ যে অসম্ভব। এই দীন কুটীরে—না না তা হতে পারে না—

কুন্তলকুমারী: যেখানে আমার স্বামী থাকতে পারেন সেখানে আমিও থাকতে পারব।

কালিদাস: না না, তুমি রাজার মেয়ে—

কুন্তলকুমারী: আমার ও পরিচয় আজ থেকে মুছে গেছে—এখন আমি শুধু মহাকবি কালিদাসের স্ত্রী।

কালিদাসের মুখে ক্ষোভের সহিত আনন্দও ফুটিয়া উঠিল।

কালিদাস: কিন্তু—এই দারিদ্র্য—তুমি সহ্য করতে পারবে কেন? চিরদিন বিলাসের মধ্যে পালিত হয়েছ—রাজদুহিতা তুমি—

কুন্তলকুমারী ঈষৎ ভ্রূভঙ্গ করিয়া চাহিলেন।

কুন্তলকুমারী: আর্য্যপুত্র, আপনার উমাও তো রাজদুহিতা

—গিরিরাজ সুতা ; কিন্তু কৈ তাঁকে মহেশ্বরের দীনকুটীরে পাঠাতে আপনার তো আপত্তি হয় নি ! তবে ?

কালিদাসের মুখে আর কথা রহিল না।...রাজকুমারীর দক্ষিণ হস্তটি ধীরে ধীরে উঠিয়া আসিয়া তাঁহার বামস্কন্ধের উপর আশ্রয় লইল।

সন্ধ্যা হইয়া আসিতেছে ; সিপ্রার পরপারে দিগন্তের অন্তচ্ছটা ক্রমশ মেদুর হইয়া আসিতেছে। সেই দিকে চাহিয়া কালিদাস সহসা নিস্পন্দ হইয়া রহিলেন। কুমারীও কালিদাসের দৃষ্টি অনুসরণ করিয়া সেই দিকে দৃষ্টি ফিরাইলেন।

এক শ্রেণী উষ্ট্র সিপ্রার কিনারা ধরিয়া চলিয়াছে !

কুমারী কালিদাসের পানে একটি অপাঙ্গ দৃষ্টি প্রেরণ করিলেন ; নিরীহভাবে প্রশ্ন করিলেন—

কুন্তলকুমারী : ওকি, আর্য্যপুত্র ?

কালিদাসের মুখেও একটু হাসি খেলিয়া গেল ; তিনি গম্ভীর হইয়া বলিলেন—

কালিদাস : ওর নাম—উষ্ট !

কুন্তলকুমারী : কি—কি বললেন আর্য্যপুত্র ?

কালিদাস তাড়াতাড়ি নিজেকে সংশোধন করিলেন।

কালিদাস : না না উষ্ট নয়, উষ্ট নয়—উট্র ! !

উভয়ে একসঙ্গে কলহাস্য করিয়া উঠিলেন। রাজকুমারীর যে-হস্তটি স্কন্ধ পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল তাহা ক্রমে কালিদাসের কণ্ঠ বেষ্টন করিয়া লইল। কালিদাসও কুমারীর মাথাটি নিজের বুকের উপর সবলে চাপিয়া ধরিয়া উর্দ্ধে আকাশের পানে চাহিলেন।

পূর্ব্ব দিগন্ত উদ্ভাসিত করিয়া তখন বসন্তপূর্ণিমার চাঁদ উঠিতেছে !

এইরূপে এক মধুপূর্ণিমার তিথিতে স্বয়ম্বর সভায় যে কাহিনী আরম্ভ হইয়াছিল, আর এক পূর্ণিমার সন্ধ্যায় সিপ্রাতীরের পর্ণকুটীরে তাহা পরিসমাপ্তি লাভ করিল।

সমাপ্ত

প্রতিঘাত

শ্রীসুমথনাথ ঘোষ

ভালো জামা কাপড় পরে কোথায় বেরুন হচ্ছে শুনি ? কমলা জিগ্যেস করলে তার স্বামীকে। কণ্ঠে তার তীব্র ঝাঁজ।

অরুণ একটু থতমত খেয়ে বললে, না এমনি একটু বেরচ্ছি—সমস্ত দিন ত বাড়ী বসে আছি—ছুটির দিনে যেন ভালো লাগে না, কিছুতেই বেলা কাটতে চায় না।

তাই নাকি ! আপিসের সাহেবকে তবে বললেই পারো—রবিবার খুলে রাখতে। এই বলে এমনভাবে কমলা অরুণের দিকে তাকাল যে তার বুকের মধ্যেটা টিপটিপ ক'রে উঠলো। কথাটা যে নিছক রহস্য নয়, তার মধ্যে তীব্র বক্রোক্তি রয়েছে—এটা বোধ হয় সে স্ত্রীর কণ্ঠস্বর থেকেই বুঝতে পেরেছিল। তাই একটা ঢোক গিলে এবং বার দুই কাশবার চেষ্টা ক'রে অরুণ বললে, তুমি ত এখন রান্নাঘরে ব্যস্ত কাজ নিয়ে, আমি চুপচাপ বসে কি করি বলো ?

তার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে কমলা বললে, থাক ওকথা বলে আর আমাকে ভোলাতে হবে না, কোথায় যাওয়া হচ্ছে তা আমি জানি !

স্ত্রীর অনুমান কতটা সত্য জানি না, তবে তাই শুনে মুহূর্ত্তে অরুণের মুখ লজ্জায় লাল হ'য়ে উঠলো এবং সেই প্রসঙ্গটাকে চাপা দেবার জন্যে তাড়াতাড়ি বিছানার একপ্রান্তে বসে পড়ে' বললে, চা করেছো নাকি ?

করেছি—বলে রান্নাঘর থেকে কমলা এক পেয়ালা চা ও খান চারেক লুচি একটা রেকাবীতে ক'রে এনে তার সামনে ধরলে। অরুণ তার হাত থেকে চায়ের পেয়ালাটা নিয়ে বললে—কমল তোমার চা-ও এখানে নিয়ে এসো। একসঙ্গে বসে খাওয়া যাক্।

থাক, এত সোহাগ আমার সহ্য হবে না—এই কথা বলতে বলতে কমলা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

অরুণের মুখে চা তেতো হয়ে উঠলো। নিঃশব্দে সমস্তটা গলাধঃকরণ করবার পর সে চুপ করে বসে রইল। একবার ভাবলে জামা কাপড় খুলে রেখে একখানা বই নিয়ে শুয়ে শুয়ে পড়ে—কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তার মনে হলো—না তা হ'লে হয়ত কমলা মনে করবে যে তার অনুমানটাই সত্যি, তার ভয়েই সে গেল না। তা হবে না। তার পৌরুষে বাঁধল। সে উঠে দাঁড়াল এবং আয়নার সামনে গিয়ে আর একবার চুলটা ঠিক করে নিতে লাগল।

ইত্যবসরে অরুণ কি করছে দেখবার জন্য একটা কাজের অছিলায় কমলা ব্যস্তভাবে ঘরে এসে ঢুকলো ; তার এই অপ্রত্যাশিত আগমনে অরুণ ঈষৎ লজ্জিত হয়ে আয়নার সামনে থেকে সরে গেল। তারপর ধীরে ধীরে কমলার সামনে গিয়ে বললে, চলো কমল, আজ আমরা একটু 'লেকে' বেড়িয়ে আসি। তার কণ্ঠস্বরে অপরাধীর মত ভয় ও সঙ্কোচ জড়ানো।

গম্ভীরভাবে কমলা শুধু বললে, না। তারপর চায়ের পেয়ালাটা হাতে তুলে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার জন্যে যেমন পা বাড়াল এমনি অরুণ তার পথ আগলিয়ে বললে, না মানে ?

না মানে—না—আবার কি ?

তার মানে যাবে না আমার সঙ্গে এই ত ?

হ্যাঁ তাই। এই বলে কমলা আবার যাবার জন্যে উদ্যত হ'লো।

কেন যাবে না জিগ্যেস করতে পারি কি ? অরুণের কণ্ঠে দৃঢ়তা ফিরে এলো।

কমলা বললে, তুমি জিগ্যেস করতে পারো, কিন্তু আমি বলতে পারি না।

অর্থাৎ ?

অর্থাৎ সে কথা শুনতে তোমার ভাল লাগবে না।

অরুণ বললে, ভালো না লাগুক, তবু তোমায় বলতে হবে। সত্য অপ্রিয় হলেও আমি শুনতে চাই।

কমলা বললে, আমায় সঙ্গে নিয়ে 'লেকে' বেড়াতে গেলে লোকে তোমায় কি বলবে ?

হেঁয়ালী ছাড়ো কমল—স্বামীর সঙ্গে স্ত্রী কি বেড়াতে যেতে পারে না ?

কণ্ঠে বিদ্রূপ ঢেলে কমলা বললে, না পারে না—সে যুগ এখন কেটে গেছে।

আরো স্পষ্ট ক'রে বলো, আমি কিছু বুঝতে পারছি না তোমার কথা—অরুণ বললে।

আরো স্পষ্ট ক'রে বলতে গেলে এই বলতে হয় যে—বর্ত্তমান যুগে 'লেকে' বেড়াতে গেলে স্ত্রীকে সঙ্গে নিলে লোকে নিন্দে করে। পরস্ত্রীকে পাশে নিয়ে যেতে হয় অর্থাৎ ইন্দ্রাণীর সঙ্গে তোমার বেড়াতে যাওয়া উচিত—এই বলে কমলা দ্রুতপদে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

তাড়াতাড়ি কমলার পেছনে পেছনে বারান্দা পর্য্যন্ত ছুটে গিয়ে তার একটা হাত ধরে অরুণ তাকে ঘরে নিয়ে এলো; তারপর দরজাটা বন্ধ ক'রে দিয়ে বললে, আজ আমি এর একটা মীমাংসা করতে চাই। বহুদিন থেকে আমি লক্ষ্য করছি, তুমি আমায় ইন্দ্রাণীর কথা বলে খোঁচা দাও। যদি আমি আজ তোমায় স্পষ্ট ক'রে বলি যে আমি ইন্দ্রাণীকে ভালোবাসি, তাহ'লে তুমি আমার কি করতে পারো ?

কঠিনদৃষ্টিতে একবার স্বামীর আপাদমস্তক লক্ষ্য করে সে বললে, যে দেশের মেয়েদের পেটের ভাত নির্ভর করে তাদের স্বামীর অনুগ্রহের ওপর, তারা আবার কি করতে পারে! তবে শুধু এইটুকু আমি বলতে চাই যে তোমার মত একজন শিক্ষিত ব্যক্তির পক্ষে জেনেশুনে আমায় বিয়ে করা উচিত হয় নি। পথ ছাড়ো। এই বলে সদর্পে কমলা দরজা খুলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

অরুণ একথার ওপর আর কিছু বলতে পারলে না। স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। কিছুক্ষণ এইভাবে কেটে যাবার পর শুধু একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে ঘর থেকে বেরিয়ে সে একেবারে সোজা ইন্দ্রাণীদের বাড়ীর পথ ধরলে।

ইন্দ্রাণীর বাপের বাড়ী ভবানীপুর, দুবছর পরে সে সেখানে এসেছে। তার স্বামী পশ্চিমের কোন পোষ্ট অফিসে চাকরী করেন; আগে বছরে অন্ততঃ একবার ক'রে তারা কলকাতায় বেড়াতে আসতো; কিন্তু এবার যে দুবছর দেরী হ'লো তার কারণ ইন্দ্রাণী নিজে। গত বছর যে সময় তার স্বামী ছুটী পেয়েছিল তখন ইন্দ্রাণী আঁতুড় ঘরে। দু' বছর পরে এই প্রথম সে সন্তানের মুখ দেখলে। ছেলে হবার আগে পর্য্যন্ত মধ্যে মধ্যে ইন্দ্রাণী অরুণকে চিঠি লিখতো, কিন্তু ছেলে হবার পর থেকে আর সে তার কোন চিঠি পায় নি। তাই ইন্দ্রাণী এখানে এসেছে খবর পেয়ে অরুণ তার সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছিল। অরুণ নিজেই ইন্দ্রাণীর আগমন-সংবাদ কমলাকে দিয়েছিল কয়েকদিন আগে। কমলা জানতো যে অরুণের সঙ্গে ছেলেবেলায় ইন্দ্রাণীর খুব ভাব ছিল, এমন কি বিয়ে পর্য্যন্ত হবার কথা হয়েছিল। অবশ্য এসব অরুণই তাকে গল্প করেছিল। কিন্তু এ নিয়ে তাদের স্বামীস্ত্রীর মধ্যে ইতিপূর্ব্বে কোন দিন কোন কলহের সৃষ্টি হয় নি। তবে আজ যে হঠাৎ কেন এমনটা হ'লো তা বোধ করি একমাত্র ঈশ্বরই জানেন!

যাই হোক্ অরুণ গিয়ে ইন্দ্রাণীদের বাড়ীর কড়া নাড়তেই চাকর এসে দরজা খুলে দিলে। পকেট থেকে রুমাল বার করে' মুখটা বারবার মুছতে মুছতে অরুণ বাড়ীর মধ্যে ঢুকলো।

ইন্দ্রাণীর বাবা তাকে দেখে চীৎকার ক'রে উঠলেন—ওরে ইন্দু তোর অরুণদা এসেছে। তারা দুজনেই আশা করেছিল ওই কথা শুনে ইন্দ্রাণী এখুনি ছুটতে ছুটতে আসবে। কিন্তু মিনিট পনেরো ধরে ইন্দ্রাণীর বাবার সঙ্গে তাঁর শারীরিক অসুস্থতা ও বার্দ্ধক্যজনিত নানাপ্রকার ব্যাধি ও তার প্রতিকারের উপায় আলোচনা করবার পরও যখন ইন্দ্রাণী সেখানে এলো না তখন তার পিতাই অরুণকে বললেন, যাও না তুমি, সে ওপরের ঘরে আছে।

অরুণ যেন এই কথাটির জন্ম এতক্ষণ অপেক্ষা করছিল; তাই বলামাত্র সে সেখান থেকে উঠে পড়লো এবং সোজা ইন্দ্রাণীর ঘরে গিয়ে ঢুকলো।

ইন্দ্রাণী তখন ছেলেকে জামা পরাচ্ছিল। আঁচলের প্রান্তটা বুকে টেনে দিতে দিতে বললে, এসো অরুণদা, কেমন আছো ?

কেমন আছি তুমি ত আর খবর নাও না, এক বছরের ওপর হ'য়ে গেল, আমায় দু'লাইন চিঠি লিখতেও তোমার মনে থাকে না।

কি করি বলো সংসার নিয়ে এবং স্বামীপুত্তুরের ফরমাস খাটতে খাটতে এক মুহূর্ত্তও সময় পাই না। এতটুকু ছেলে হ'লে কি হয়—বাপ্ কি বিক্রম!

তার মানে তোমার এই ছেলেটাই আমার প্রতিদ্বন্দ্বী হ'য়ে দাঁড়িয়েছে এই বলতে চাও তো ? এই বলে সে নিজেই হো হো ক'রে হেসে উঠলো। ইন্দ্রাণীর কিন্তু সে হাসি পছন্দ হ'লো না, সে কঠিন হয়ে রইল। তারপর আরো কিছুক্ষণ তারা খুচ্‌রো আলাপ করলে। কিন্তু এ সমস্ত কথাবার্ত্তার মধ্যে অরুণ লক্ষ্য করলে ইন্দ্রাণী ও তার মধ্যে একটা দারুণ ব্যবধান—সে যেন সর্ব্বদা একটা দূরত্ব রক্ষা করে চলেছে। তার কণ্ঠে আর সে আকুতি নেই, অরুণদাকে বলবার জন্ম নির্ঝরিণীর মত বাক্যস্রোত আর বেরিয়ে আসছে না ওষ্ঠ ভেদ করে। অথচ এর আগের বারে যখন সে শ্বশুর বাড়ী থেকে এসেছিল তখনো কত কথা! সেকথা মনে করতে গিয়ে অরুণের কণ্ঠ শুষ্ক হয়ে উঠলো; সে বার দুই ঢোক গিলে ইন্দ্রাণীকে প্রশ্ন করলে, সরোজ কোথায় ? সরোজ তার স্বামীর নাম।

ইন্দ্রাণী বললে, ফিটন ডাকতে গেছে—'লেকে' বেড়াতে যাবে বলে'। ও আবার মোটর দু'চোক্ষে দেখতে পারে না—বলে বেড়াতে যাচ্ছি, সেখানে ত আপিসের 'হাজ্‌রে' দিতে হবেনা! স্বামীর কথা বলতে বলতে ইন্দ্রাণীর চোখ মুখ উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে।

অরুণ তাই লক্ষ্য ক'রে কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে, অথচ পাছে সেকথা ইন্দ্রাণী বুঝতে পারে সেইজন্য তাড়াতাড়ি বলে উঠলো, বেশ ত' চলো একসঙ্গেই যাওয়া যাবে, আমিও বেরিয়েছি লেকে যাবো বলে।

ইন্দ্রাণীর মুখ নিমেষে ফ্যাকাশে হয়ে গেল। সে চট ক'রে বলে ফেললে, কিন্তু আমাদের গাড়ীতে ত জায়গা হবে না!

অরুণ বললে, কেন, এখানেও কি তোমার এই ছেলেটি আমার প্রতিদ্বন্দ্বী? অরুণ প্রথমে মনে করেছিল হয়ত ইন্দ্রাণী তার সঙ্গে ঠাট্টা করছে; কিন্তু যখন সে আবার গম্ভীরভাবে বললে, তাদের নীচের তলার ভাড়াটে বৌ ও তার ছেলে যাবে, তাদের পূর্ব্বেই কথা দেওয়া হ'য়েছে—তখন অরুণ আর অপেক্ষা না ক'রে সেখান থেকে বেরিয়ে পড়লো। একাকী লেকের পথে চলতে চলতে তার মনে হতে লাগল কতদিন সেইপথ দিয়ে ইন্দ্রাণীকে সঙ্গে নিয়ে সে বেড়াতে এসেছে!

রবিবার, লেকে ভীড়ে ভীড়। অরুণ খানিকটা গিয়ে থমকে দাঁড়াল—তার মধ্যে গিয়ে আরো ভীড় বাড়াবে কি ফিরে যাবে ভাবছে—এমন সময় তার দৃষ্টি পড়লো একটা চলন্ত ফিটনগাড়ীর ভিতর। ইন্দ্রাণীর কোলে ছেলে, সে তার স্বামীর গা ঘেঁসে বসে আছে একটা 'সিটে'—তাদের উভয়ের মুখ হাস্যোজ্জ্বল; কিন্তু আর একটী সিট একেবারে খালি তাতে অন্য কোন লোক নেই। সপাং করে কে যেন অরুণের পিঠের ওপর সজোরে এক ঘা চাবুক বসিয়ে দিলে! অরুণের মাথা ঝিম ঝিম করতে লাগল। সে দাঁড়িয়ে থাকতে পারলে না, ঘাসের ওপর বসে পড়লো। ইন্দ্রাণী যে মিথ্যে কথাটা জানিয়ে বলেছিল সেটা তার মাথায় এসে তখন প্রশ্ন তুললে—কেন, কি তার সার্থকতা! তবে কি তার সম্বন্ধে কোন বিশ্রী ধারণা অধুনা ইন্দ্রাণীর মনে জেগে উঠেছে? তাকে এড়াবার জন্যেই কি তবে···

না, না, তা হতে পারে না। ইন্দ্রাণী ভাল করেই জানে যে তাদের এই সম্প্রীতির মধ্যে কোন রকম আবিলতা নেই, জানত বলেই বিয়ের পরও সে অরুণকে অসঙ্কোচে বরাবর চিঠিপত্র লিখে এসেছে, সহজভাবে মিশতে পেরেছে। আজকের এই মিথ্যাচারের মধ্যেও স্বামী-সাহচর্য্যের আকর্ষণটাই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, অরুণের সুশিক্ষিত মন এইভাবে সান্ত্বনা খুঁজতে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে মনে জাগল স্ত্রী কমলার কথা। নিমেষে যেন সমস্ত পৃথিবী তার চোখের সামনে দুলে উঠলো। সে আর সেখানে বসে থাকতে পারলে না। সামনে একখানা ট্যাক্সি দেখতে পেয়ে তাতে উঠে বসলো এবং বাড়ী ফিরে গেল।

সন্ধ্যা তখনো হয়নি। কমলা গা ধুয়ে এসে তার বৈকালিক প্রসাধন করছিল। বড় আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে সে তার ধনুকের মত বাঁকা ভ্রূকুটীর মধ্যে সিঁদুরের টিপ আঁকছে এমন সময় তার পিছনে আয়নার মধ্যে অরুণের মূর্ত্তি ফুটে উঠলো। মাথায় কাপড়টা টেনে দিতে দিতে কমলা বললে, কি হ'লো ইন্দ্রাণী বুঝি তাড়িয়ে দিলে? তার কণ্ঠের শ্লেষ যেন অরুণ শুনতেই পেলে না। তার দুই চক্ষু তখন কমলার সদ্যস্নাত মুখের উপর নিবদ্ধ। অপলকনেত্রে সেইদিকে তাকিয়ে সে ভাবতে লাগল; সঙ্গে সঙ্গে অরুণের চোখের সামনে ভেসে উঠলো ইন্দ্রাণীর মুখ, কিন্তু আজ প্রথম তার মনে হ'লো ইন্দ্রাণীর চেয়ে অনেক বেশীরূপ কমলার!

কমলা পিছন ফিরে আবার বললে, কি দেখছো, আমার চেয়ে ইন্দ্রাণীকে দেখতে ভাল কিনা? এই কথাগুলো শুনে তার সম্বিৎ ফিরে এলো। সে বললে, কমলা চলো আমরা 'লেকে' বেড়িয়ে আসি।

কমলা বক্রস্বরে বললে, কিন্তু ইন্দ্রাণী যদি দেখতে পায়।

আমি ত তাই চাই। সে জানুক, আমিও এমন স্ত্রীর স্বামী, যে আমাকে সত্যই ভালবাসে। কথাগুলো বলে ফেলেই অরুণ নিজেকে সামলে নিয়ে আবার বললে, কমলা লক্ষীটি চলো। এ অনুরোধ আমার রাখো।

কমলা এরকম ক'রে আর কখনো তার স্বামীকে অনুরোধ করতে শোনেনি, তাই সঙ্গে সঙ্গে তার মনটা নরম হয়ে গেল এবং সে রাজী হলো। অরুণ তখন আলমারী খুলে তার পছন্দমত সাড়ী বার করে দিলে কমলাকে পরবার জন্য। স্বামীর এই অপ্রত্যাশিত ভালবাসায় কমলা মনে মনে উৎফুল্ল হয়ে উঠলো। বিবাহিত জীবনে সে এই প্রথম স্বামীর কাছ থেকে সত্যিকারের আদর পেলে।

অরুণ একটা ট্যাক্সি ডেকে আনলে। কমলা সেজেগুজে স্বামীর পাশে গিয়ে বসলো। 'লেকে' পৌঁছে অরুণ ড্রাইভারকে খুব ধীরে ধীরে মোটর চালাতে বললে। গাড়ী মন্থর গতিতে লেক পাক দিতে লাগল। একবার, দুবার, তিনবার। অরুণ উদগ্রীব হয়ে চারিপাশে চায়। তার ইচ্ছা অন্ততঃ একবার ইন্দ্রাণীর সঙ্গে তার চোখোচোখি হয়। কিন্তু ভগবানের ইচ্ছা বোধহয় অন্যরূপ; তাই বারবার ঘোরা সত্বেও অরুণ তার দেখা পেলে না। এদিকে কমলা অত্যন্ত অধৈর্য্য হ'য়ে উঠলো। একই স্থানে বার বার ঘুরতে তার ভালো লাগে না। সে বললে, রাত হয়ে গেল, বাড়ী চলো।

অরুণ বললে, আর একবার।

এমন সময় ইন্দ্রাণীদের গাড়ীটা হঠাৎ অরুণের চোখে পড়লো। ইন্দ্রাণী তার স্বামীর সঙ্গে গল্পে এমন উন্মত্ত যে তাকে দেখতে পেলে না। উজ্জ্বল বৈদ্যুতিক আলোতে অরুণের দৃষ্টি অনুসরণ করতেই কমলা দেখতে পেলে ইন্দ্রাণীকে। সঙ্গে সঙ্গে অরুণের হাতটা তার কোলের ওপর থেকে নামিয়ে দিয়ে সে বললে, বাড়ী চলো। অরুণ মিনতি ক'রে বললে, আর একবার লক্ষীটি!

না, আর একবারও নয়! দৃঢ়কণ্ঠে কমলা বললে।

অরুণ জিজ্ঞাসা করলে, বুঝতে পারলে কিছু?

কমলা উত্তর দিলে, বোঝবার কিছু নেই, বাড়ী চলো।

মিনতির সুরে অরুণ বললে, লক্ষীটি, আমার অবস্থাটা তোমাকে বুঝতে হবে, নৈলে কিছুই খোলসা হবে না যে কমল? আমি তোমাকে ছুঁয়ে বলছি—বিশ্বাস করো, ইন্দ্রাণীর ওপর আসক্তি ছিল না, তার সঙ্গ আমায় দিত আনন্দ, তারি আকর্ষণ আমাকে টানতো।

স্বচ্ছ দৃষ্টিতে স্বামীর মুখের পানে তাকিয়ে কমলা বললে, আর আজ সে তোমার চোখে আঙুল দিয়ে জানিয়ে দিয়েছে, স্বামী সঙ্গেই তার আনন্দ বেশী?

পাল্টা জবাবে তাই আমাকেও আনন্দময়ীর আবাহন করতে হয়েছে—বলেই সে পার্শ্ববর্ত্তিনী পত্নীর প্রসন্ন-গম্ভীর মুখখানির পানে তাকালো।

গাড়ী ফিরলো বাড়ীর দিকে। পথে কেউ কারুর সঙ্গে একটা কথা পর্য্যন্ত বললে না। দু'জনেই যেন কোন গভীর চিন্তায় মগ্ন।

কি সে চিন্তা তা তারাই জানে।

জুতোর জয়

(নাটিকা)

অধ্যাপক শ্রীযামিনীমোহন কর

পরিচয় লিপি

পদ্মলোচন	...	জনৈক জমীদার
মীনাক্ষী	... ...	তাঁর মেয়ে
অমিতা	... ...	" ভাগনী
কমলেশ	... ...	" ভাগনী জামাই
ননীবালা	... ...	শ্যালিকা
তপনকুমার	... ...	জনৈক যুবক। বোস-কোম্পানী নামক জুতোর দোকানের মালিক। ওরফে মার্ত্তণ্ডনন্দন বসু।
কপিঞ্জলপ্রসাদ	... ...	জাল মার্ত্তণ্ডনন্দনের জাল পিতৃব্য। আসল নাম শিরীষ নন্দী
জয়কান্ত	... ...	অলীকপুরের কুমার বাহাদুর
বিশ্বম্ভর	... ...	তাঁর মামা
ভূপেন	... ...	পদ্মলোচনের খাস ভৃত্য

পুরোহিত, মীনাক্ষীর বান্ধবীগণ, চাকর ইত্যাদি

"রাধাকৃষ্ণ" অভিনয়ের চরিত্রলিপি

শ্রীকৃষ্ণ	... ...	তপনকুমার
শ্রীরাধা	... ...	মীনাক্ষী
বৃন্দা	... ...	কেয়া দেবী
ম্যানেজার	... ...	শিরীষ

সখিগণ, অন্যান্য অভিনেতা অভিনেত্রী ইত্যাদি। পাবলিক ষ্টেজের দু'জন সীন শিফ্‌টার।

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

ষ্টেজ। প্রাচ্য ললিতকলা সমিতি নামক সৌখীনদলের ড্রেস রিহার্সাল চলছে। কুঞ্জবন। রাধিকা বেদীতে বসে। তাঁর চরণ ধরে শ্রীকৃষ্ণ মাটিতে বসে গান গাইছেন। সখিরা তাদের ঘিরে দাঁড়িয়ে।

শ্রীকৃষ্ণ — গান

সুন্দরী! কাহে কহসি কটু বাণী।
তাহারি চরণ ধরি — শপথ করিয়ে কহি
তুহুঁ বিনে আন নাহি জানি॥
তুয়া আস আশে — জাগি নিশি বঞ্চনু
তাহে ভেল অরুণ নয়ান।
মৃগ মদ বিন্দু — অধরে কৈছে লাগল
তাহে ভেল মলিন বয়ান॥
তোহে বিমুখ দেখি — ঝুরয়ে যুগল আঁখি
বিদরয়ে পরাণ হামার।
হামারি মরম তুহুঁ, — ভাল রীতে জানসি
অব কাহে হেন ব্যবহার॥

রাধিকা বিরক্ত ভাবে মুখ ফিরিয়ে বসলেন

সখিগণ — নৃত্যগীত

সুন্দরী! ত্যজহ দারুণ মান।
সাধয়ে চরণে রসিকবর কান॥
আজু যদি মানিনী ত্যজবি কান্ত।
জনম গোঙায়বি রোয়ি একান্ত॥

রাধিকা তবুও মুখ ফিরিয়ে রইলেন

শ্রীকৃষ্ণ — গান

এ ধনি মানিনি ত্যজ অভিমান।
তোয়ারি বিরহে নহে ত্যজিব পরাণ।

রাধিকা তবুও চুপ করে রইলেন

কোন কহে কোমল অন্তর তোয়।
তুয়া সম কঠিন হৃদয় নাহি হোয়॥

আমি তোমার চরণ ধরে সাধছি, তবু তুমি অভিমান ত্যাগ করলে না। মুখ ফিরিয়ে রইলে। তুমি যদি আমার প্রতি বিমুখ হও, আমার সান্নিধ্য তোমার পছন্দ না হয়, তবে আমার আর এখানে থাকবার প্রয়োজন কি? আমি চলে যাচ্ছি, কিন্তু মনে বড় ব্যথা নিয়ে গেলুম।

শ্রীকৃষ্ণের প্রস্থান

একটু পরে রাধিকার যেন চমক ভাঙ্গল। শ্রীকৃষ্ণকে না দেখতে পেয়ে ব্যাকুল হয়ে চীৎকার করে উঠলেন।

রাধিকা। সখি, সখি—আমার শ্যাম কই! সে কি সত্যই চলে গেল?

কিছুক্ষণ পর তিনি আবার বলে উঠলেন

আমার নিজের দোষেই প্রিয়তমকে হারালুম। অভিমান করে চলে গেছে আর কি সে ফিরবে?

গান

সজনী! কাহে মোর দুরমতি ভেল?
দগধ মান মঝু — বিদগধ মাধব
রোখে বৈমুখ ভৈ গেল॥
গিরিধর মোহে — বাহু ধরি সাধল
হাম নাহি পালটি নেহার।
হাত কো লছমী — চরণ পর ডারনু
আর কি করব পরকার॥
সো বহু বল্লভ — সহজেই দুর্লভ
দরশন লাগি মন ঝুর।

বৃন্দা। বৃন্দা দাসী যব — যতনে মিলায়ব
তবহি মনোরথ পূর॥

১ম। বিউটীফুল, সুপার্ব!

১মা। মীনাক্ষীদি যা গাইলেন—অপূর্ব্ব।

২য়। ওয়াণ্ডারফুল কম্বিনেশন। যেমন মীনাক্ষী দেবী তেমনিই তপনবাবু।

ম্যানেজার। এইবার এর পরের সীনটা আরম্ভ করা যাক। কি বলেন মীনাক্ষী দেবী? না আপনারা ক্লান্ত, একটু চা টা—

মীনাক্ষী। না, চলুক—

ম্যানেজার। তপন কি বলিস? শুধু গানগুলো—

তপন। আমার কোন আপত্তি নেই শিরীষদা। একেবারে শেষ করে দেওয়া যাক।

ম্যানেজার। বনপথের সীনটা দিতে বলে দাও তো অনাদি। "রাইকো সংবাদ" গানটা—

সীন বদলে দেওয়া হল। শ্রীকৃষ্ণ গান গাইতে গাইতে ঢুকলেন

শ্রীকৃষ্ণ। গান

রাইকো সংবাদ কো আনি দেয়াব
এমন ব্যথিত কেহ নাই।
মান ভরম ভরে হাম চলি আয়নু
প্রাণ রহিল তছু ঠাঁই॥
রাই, আপন বিপদ নাহি জানি।
হামারি অদর্শনে রাই কৈছে জীয়া
ধনি জানি তেজয়ে পরাণি॥
গুরুজন গঞ্জন অঞ্জন লেয়ল
নিজপতি বিবিধ বিধানে।
হামারি কারণ ধনি এত দুখ সহতহি
তেজব এ পাপ পরাণে॥

অন্য দিক দিয়ে গাইতে গাইতে বৃন্দার প্রবেশ

বৃন্দা। গান

মাধব! কত পরবোধব রাধা।
কহতহি বেরি বেরি হা হরি! হা হরি!
অব জীউ করব সমাধা॥
অরুণ নয়ন লোর তিতিল কলেবর
বিলুলিত দীঘল কেশা।
মন্দির বাহির করইতে সংশয়
সহচারী গণতহি শেষা॥
কি কহিব খেদ ভেদ জনু অন্তর
ঘন ঘন উপজত শ্বাস।
শুন কমলাপতি সোই কলাবতী
জীবন বাঁধল আশাপাশ॥

ম্যানেজার। চমৎকার! কেয়াদেবী, ভারী দরদ দিয়ে এ গানটী আপনি গেয়েছেন।

২য়া। তপনবাবু, মীনাক্ষীদেবী আর কেয়াদেবী এঁরা স্টেজ মাতিয়ে দেবেন, কি বলেন?

৩য়। নো ডাউট অ্যাবাউট ইট। অডিয়েন্স একেবারে স্পেল-বাউণ্ড হয়ে বসে থাকবে।

ম্যানেজার। এবার মধ্যিখানের সীনগুলো বাদ দিয়ে একেবারে লাস্ট সীনের গান ক'টা করে ফেলা যাক।

তপন। বেশ তো, যদি মীনাক্ষীদেবীর আপত্তি না থাকে—

মীনাক্ষী। কিছু না। আই অ্যাম এ গেম।

ম্যানেজার। কেয়াদেবী, আপনি কি একটু রেস্ট নেবেন—

কেয়া। না, না, কোন দরকার নেই। আই অ্যাম ও, কে।

ম্যানেজার। ওহে অনাদি, রাধিকার কুঞ্জের সীনটা দিতে বল।

সীন বদলে দেওয়া হল

তপন, তুই এইখানটায় দাঁড়া। বেটার এফেক্ট হবে। না, না, ওখানে নয় মীনাক্ষীদেবী। রাধিকা শ্রীকৃষ্ণের পায়ের কাছে বসে। সখিরা দাঁড়িয়ে। দ্যাট'স্ রাইট। রাধিকার গান। "মাধব! এক নিবেদন তোয়।" রেডী—স্টার্ট।

নির্দ্দেশমত সকলে স্ব স্ব স্থান অধিকার করলেন

রাধিকা। গান

মাধব! এক নিবেদন তোয়।
মরম না জানিয়ে মানে তোয়ে দগধিনু
মাপ করো সব মোয়॥
মাধব! বহুত মিনতি করি তোয়।
দেই তুলসী তিল, দেহ সমর্পিনু
দয়া করি না ছোড়বি মোয়॥

শ্রীকৃষ্ণ রাধিকাকে হাত ধরে দাঁড় করালেন। উভয়ে যুগলরূপে দণ্ডায়মান। তাঁদের ঘিরে সখিদের নৃত্যগীত।

সখিগণ। নৃত্যগীত

অপরূপ রাধা মাধব সঙ্গ।
দুর্জ্জয় মানিনী মান ভেল ভঙ্গ॥
সখিগণ আনন্দে নিমগণ ভেল।
দুহুঁজন মনোমাহা মনসিজ গেল॥
দুহুঁজনে আকুল দুহুঁ কোরে কোর।
দুহুঁ দরশনে আজু সখিগণ ভোর॥

২য়। এক্সকুইজিট! ডিভাইন!!

ম্যানেজার। সমালোচক এবং রসপিপাসু সকলেই আনন্দ পাবেন এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। আই অ্যাম ফীলিং সো প্রাউড দ্যাট আই উইল প্রেজেন্ট ইউ।

১ম। এঁদের গান আর অভিনয় প্রাণে শিহরণ এনে দেয়। মনে হয় যেন আমরা বৃন্দাবনে ফিরে গেছি—

একজন যুবকের প্রবেশ

যুবক। জল খাবারের বন্দোবস্ত করা হয়ে গেছে। চা ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে।

ম্যানেজার। চলুন সকলে। আর দেরী নয়।

সকলের প্রস্থান

স্টেজে দু'জন শিফ্‌টারের প্রবেশ

১ম। কি রে পাঁচু, কি রকম দেখলি ?

২য়। ছাই। আমাদের সখির ব্যাচ এদের চেয়ে অনেক ভাল। হ্যাঁ, তবে রাধাকৃষ্ণের চেহারা মন্দ নয়। দিব্যি মানাবে। কি বলিস্ রে গদা ?

১ম। চেহারা যত ভাল পারে হোক তবে গলা বিশেষ সুবিধের নয়। আমাদের পটলি ওর চেয়ে ঢের ভাল গায়।

২য়। য্যা, য্যা, পটলির গান তো নয় যেন নাকি কাঁদুনী। হ্যাঁ, গলা বটে হাবির—

১ম। আহাহা, হাবির গলা যেন ভাঙ্গা কাঁসি। কিসের সঙ্গে কি—তা যাক্, ব্যাপারটা কি রকম গড়াবে বুঝতে পারছিস্ ?

২য়। হ্যাঁ, এতদিন এই লাইনে কাজ করছি আর এই সোজা জিনিষটা বুঝতে পারবনা। সেই পুরোনো কাসুন্দি।

১ম। প্রেমে ওরা পড়বেই—

২য়। আলবৎ। দেখে লিস্।

১ম। কিন্তু মাইরী, মেয়েটা দেখতে বেশ।

২য়। তাতে তোর কি। চল্, একটু বিড়ি খাওয়া যাক। অনেকক্ষণ মৌতাত হয় নি, মেজাজটা খারাপ হয়ে গেছে।

উভয়ের প্রস্থান

একটু পরে তপন ও মীনাক্ষীর প্রবেশ

তপন। অপূর্ব্ব আপনার কণ্ঠ মীনাক্ষীদেবী। এমন মিষ্টি গলা শোনবার সৌভাগ্য আমার খুব কমই হয়েছে।

মীনাক্ষী। কি যে বলেন। আপনার কাছে আমি দাঁড়াতেই পারি না। আপনার গলার কাজ যেমন চমৎকার তেমনই সূক্ষ্ম।

তপন। আপনি কি এখনই বাড়ী যাবেন ?

মীনাক্ষী। হ্যাঁ। একটু তাড়াতাড়ি ছিল। কিন্তু আমার গাড়ী এখনও এসে পৌছয় নি। এতক্ষণ আসা উচিৎ ছিল—

তপন। যদি কিছু মনে না করেন, আমার গাড়ীতে আপনাকে পৌছে দিলে—

মীনাক্ষী। মনে করব কি ! আই উড বী সো গ্লাড—

তপন। তবে চলুন। শিরীষদাকে বলে আমরা যাই।

উভয়ের প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য

পদ্মলোচন পালের বাটী। পদ্মলোচন ও কমলেশ কথা কইছেন

পদ্মলোচন। বুঝলে কমলেশ, আমার এই যে বিছানায় শুলে পিঠ ব্যথা করে আর বসলে বৃদ্ধি হয়, এতে রাস্‌টক্স অথবা পালসেটিলা দেওয়া প্রশস্ত। তোমার কি মত ?

কমলেশ। আজ্ঞে হ্যাঁ।

পদ্মলোচন। আর দেখেছ মুখটা কি রকম লাল হয়ে উঠেছে, অথচ দাঁড়ালে একেবারে ফ্যাকাশে হয়ে যায়, এটা অ্যাকেনিটাম ন্যাপেলাসের সিম্পটম। কি বল ?

কমলেশ। আজ্ঞে হোমিওপ্যাথী আমার পড়া নেই।

পদ্মলোচন। কি বিপদ ! পড়া না থাকে পড়বে। আজই আরম্ভ করে দাও। আমার লাইব্রেরীতে অনেক বই আছে। হোমিওপ্যাথী অতি ভাল জিনিষ। সকলেরই পড়া উচিত। আর হ্যাঁ—কি বলছিলুম—ক'দিন থেকে গলায় কি রকম করছে। নিশ্চয়ই ফ্যারাঞ্জাইটিস। এতে এস্কুলাস হিপোক্যাস্টেনাম বিশেষ ফলপ্রদ।

অমিতার প্রবেশ

অমিতা। মামা, তোমাদের কি সম্বন্ধে কথা হচ্ছে ?

পদ্মলোচন। বস মা। আমার শরীরটা ভয়ানক খারাপ যাচ্ছে। বাঁচি কিনা সন্দেহ। আজ সকালে ডায়াগনোসিস নামে একটা বই পড়ছিলুম। নতুন আনিয়েছি। পড়ে দেখি,—কি বিপদ ! আমার শরীরে অনেক রোগ। সব অসুখের সিম্পটম্‌স্ আমার সঙ্গে মিলে যাচ্ছে।

অমিতা। (কম্পিত উৎকণ্ঠায়) তাই নাকি ! ভারী ভয়ের কথা তো !

পদ্মলোচন। অ্যাপোপ্লেক্সি, ব্লেফারাইটিস, ক্যানসার, ডিসপেপ্‌সিয়া, এপিসট্যাক্সিস গ্যাস্ট্রিক আলসার, হাইড্রোথোর‍্যাক্স, লারিঞ্জাইটিস, ফেরিঞ্জাইটিস, মেনিঞ্জাইটিস, অটালজিয়া, পেরিকার্ডাইটিস, স্ট্র্যাঙ্গুরী, টনসিলাইটিস, আর্টিকেরিয়া, ভার্টিগো—সব রোগের পূর্ব্বলক্ষণ আমার শরীরে দেখা দিয়েছে। আমি আর বাঁচব না।

অমিতা। একবার ডাক্তারকে ডাকলে হোত না ?

পদ্মলোচন। হুঁ। কমলেশ, যাও তো বাবা। একবার সরকার মশাইকে—না, থাক্, তুমি বস আমিই যাচ্ছি।

উঠতে যাচ্ছেন এমন সময় মীনাক্ষীর প্রবেশ

মীনাক্ষী। কোথা যাচ্ছ বাবা ?

পদ্মলোচন। ডাক্তার সর্ব্বাধিকারীর কাছে।

মীনাক্ষী। কেন ?

পদ্মলোচন। কি বিপদ ! প্রশ্ন করছ কেন ! তুমি কি দেখতে পাচ্ছ না মীনা আমার কি ভয়ানক অসুখ। হয়ত' আর বাঁচব না।

মীনাক্ষী। তোমার অসুখ করেছে ? কই আমি তো কিছু জানতে পারি নি।

পদ্মলোচন। তা জানবে কোত্থেকে মা। তুমি তো তোমাদের প্লে নিয়েই ব্যস্ত থাক। এদিকে আমি যে মরতে বসেছি—

মীনাক্ষী। তোমার কি-অসুখ করেছে বাবা ? কিছু সিরিয়াস—

পদ্মলোচন। কি বিপদ! কি অসুখ আমার হয় নি তাই জিজ্ঞেস কর।

অমিতা। ডাক্তারী শাস্ত্রে যত কিছু অসুখের নাম আছে, মামার প্রায় সবই হয়েছে।

পদ্মলোচন। আমি এখনই ডাক্তার সর্ব্বাধিকারীর কাছে যাচ্ছি—

মীনাক্ষী। কিন্তু আজ যে তপনবাবুর আসবার কথা আছে বাবা—

পদ্মলোচন। তপনবাবু? কি বিপদ! সে আবার কে?

অমিতা। যিনি মীনাক্ষীদের "রাধাকৃষ্ণ" প্লেতে কৃষ্ণের পার্ট করেছিলেন। মীনার আর ওঁর অভিনযের সুখ্যাতি কাগজে জনসাধারণে খুব করেছে।

কমলেশ। কাল 'প্লের' পর তপনবাবুর সঙ্গে পরিচয় হ'ল। মীনা করিয়ে দিলে। বেশ লোক।

পদ্মলোচন। হুঁ। তা তোমাদের সেই তপনবাবু করেন কি?

মীনাক্ষী। তাঁর মস্ত ব্যবসা।

পদ্মলোচন। ব্যবসা! কিসের?

মীনাক্ষী। জুতোর।

পদ্মলোচন। কি বিপদ! জুতোর ব্যবসা! মুচি?

মীনাক্ষী। মুচি কেন হতে যাবেন। ব্যবসা করলে কি মানুষ মুচি হয?

কমলেশ। এই ধরুন "বাটা"—

পদ্মলোচন। "বাটা"র কথা থাক্। এখন তোমাদের সেই তপনবাবু না কে, তার কথা হোক। কি বিপদ! বাঙ্গালীর ছেলে, জুতোর কাজ করে—সে মুচি ছাড়া আর কি হতে পারে।

অমিতা। ওঁর কারবার। মুচিরা কাজকর্ম্ম করে। উনি শুধু দেখা-শোনা করেন।

পদ্মলোচন। ও একই কথা। নিজের হাতে কাজ করাও যা, দাঁড়িয়ে থেকে দেখিয়ে দেওয়াও তাই। কি বিপদ! এত রকম কাজ কর্ম্ম থাকতে জুতোর কাজ বেছে নেওয়াতেই তো ওর মনের পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে।

মীনাক্ষী। কিন্তু ব্যবসা তো ওঁর বাবার। তিনি গত হতে উনিই এখন চালাচ্ছেন।

পদ্মলোচন। কি বিপদ! তা হলে তো ওরা জাত মুচি। আরও খারাপ। বাপ ছেলে বংশ পরম্পরায় মুচির কাজ করছে—নাঃ, আমার নার্ভসে ভয়ানক ষ্ট্রেন পড়ছে। যে কোন মুহূর্ত্তে হার্টফেল করতে পারে। আমি চললুম ডাক্তারের বাড়ী।

অমিতা। তোমার এখন যাওয়া হতেই পারে না মামা। ভদ্রলোক তোমার সঙ্গে দেখা করতে আসছেন—

পদ্মলোচন। কি বিপদ! কেন আসছেন? আমি তো ওঁর সঙ্গে দেখা করতে চাইনি। ওসব মুচিটুচির সঙ্গে আমি দেখা করব না।

কমলেশ। কিন্তু ব্যবসা করার মধ্যে দোষের কি আছে?

পদ্মলোচন। ব্যবসা,দোকানদারী করবে মাড়োয়ারীরা। আমরা বাঙ্গালী হয় চাকরী করব না হয় বাপের পয়সায় অথবা জমীদারীতে বসে বসে খাব। বেনের সঙ্গে জমীদারদের খাপ খায় না।

কমলেশ। বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী—

পদ্মলোচন। নাঃ, শরীরটা যেন বড্ড খারাপ ঠেকছে। আমি চললুম। সে ভদ্রলোক কতক্ষণ থাকবেন?

অমিতা। চা খেতে আসবেন। ঘণ্টাখানেক—

পদ্মলোচন। কি বিপদ! তবে আমি ঘণ্টা দু'য়েক পরে আসব। উঃ, কোমরে যা ব্যথা—

পদ্মলোচনের প্রস্থান

মীনাক্ষী। তা হলে কি হবে? বাবা তো তপনবাবুর সঙ্গে দেখা পর্য্যন্ত করতে রাজী নন। ভদ্রলোক আসবেন, ঠিক সেই সময় বাবা বেরিয়ে গেলেন—

কমলেশ। একটু দৃষ্টিকটু হল বই কি।

অমিতা। শরীর খারাপ, ডাক্তারের কাছে গেছেন বললে বিশেষ বেমানান হবে না। অবশ্য দোষ ধরলে ধরা যায়, (হাসিয়া) তবে তপনবাবুর দোষ ধরবার মত মনের অবস্থা এখন নয়।

মীনাক্ষী। মানে?

অমিতা। কিছু নয়।

একটা কার্ড নিয়ে বেয়ারার প্রবেশ

মীনাক্ষী। (কার্ড দেখে) তপনবাবু এসেছেন। আমি গিয়ে তাঁকে এখানে নিয়ে আসছি।

মীনাক্ষী ও বেয়ারার প্রস্থান

অমিতা। তোমার কি মনে হয়?

কমলেশ। কিসের?

অমিতা। মীনাক্ষীর সম্বন্ধে। বোধ হয় মীনা তপনবাবুকে ভালবেসে ফেলেছে।

কমলেশ। কি করে জানলে?

অমিতা। কথা বার্ত্তায় তো বোঝা যায়।

কমলেশ। যায় নাকি? কই আমি তো কিছু বুঝতে পারিনি।

অমিতা। সকলে তো আর তোমার মত বোকা নয়। আমি কিন্তু ঠিক ধরেছি। অবশ্য তপনবাবুরও অবস্থা তদ্রূপ। দু'দিন রিহার্স'ল দেখতে গিছলুম। দেখলুম সব সময় মীনার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে বেড়াচ্ছে। দেখে মায়া হয় আবার হাসিও পায়। আহা বেচারা!

মীনাক্ষী ও তপনের প্রবেশ

অমিতা। আসুন তপনবাবু।

তপন। নমস্কার।

কমলেশ। নমস্কার। বসুন।

সকলের উপবেশন

অমিতা। আপনার আর মীনার অভিনয়ের ও গানের প্রশংসায় সর্ব্বত্র মুখর। ইট ওয়াজ সিম্পলী সাপ্লাইম।

তপন। সমস্ত প্রশংসাই মীনাক্ষী দেবীর প্রাপ্য। ওঁর অভিনয়েই আমি যা কিছু ইন্সপিরেশন পেয়েছিলুম—

মীনাক্ষী। ডোণ্ট লাই। আপনার অভিনয় আমার চেয়ে অনেক ভাল হয়েছিল—

তপন। না, না, আপনি বিনয় করে বলছেন, কিন্তু রিয়েলী—

অমিতা। আপনারা দু'জনে তো দিব্য মিউচুয়াল অ্যাডমিরেশন সোসাইটী গড়ে তুললেন। গরীব আমরা দু'জন যে এক কোণে পড়ে আছি—

তপন। আই অ্যাম সো সরি। প্লীজ এক্সকিউজ মী—

কমলেশ। নট অ্যাট অল। আমাদেরও আপনাদের মত বয়স ও দিন ছিল। উই কোয়াইট আণ্ডারস্ট্যাণ্ড—

মীনাক্ষী। যান্, আপনি ভারী অসভ্য। আমি আপনাদের চা আনতে বলি—

মীনাক্ষীর প্রস্থান

অমিতা। সত্যি, আপনাদের অভিনয় এত সুন্দর হয়েছিল—আই ওয়াজ সিম্পলি ক্যারেড অ্যাওয়ে।

কমলেশ। ইট ওয়াজ চার্মিং। আমি অনেক নৃত্য-গীতানুষ্ঠান দেখেছি কিন্তু নন্ ইকোয়াল টু ইয়োর্স।

তপন। থ্যাঙ্ক ইউ। ইউ আর সো কাইণ্ড—

অমিতা। সেদিন আপনি সকলকে আনন্দ দেবার জন্য গান গেয়েছিলেন, আজ শুধু আমাদের শোনাবার জন্য গান একটা ধরুন।

কমলেশ। খুব ভাল আইডিয়া।

তপন। মীনাক্ষী দেবীকেও কিন্তু গাইতে হবে।

অমিতা। তাকে গাওয়াবার ভার আপনি নিন।

তপন। আমি আপনার শরণাপন্ন কমলেশবাবু।

কমলেশ। আমি অভয় দিচ্ছি। আপনার মনস্কামনা পূর্ণ হবে।

মীনাক্ষীর প্রবেশ। সঙ্গে চায়ের সরঞ্জাম হাতে বেয়ারা।

মীনাক্ষী। কার মনস্কামনা পূর্ণ হবে দত্ত মশাই?

কমলেশ। তপনবাবু আজ কেবল আমাদের শোনাবার জন্য গান গাইতে রাজী হয়েছেন, তবে এক সর্ত্তে—

মীনাক্ষী। সর্ত্তটা কি?

কমলেশ। তোমাকেও একটা গান গাইতে হবে। আমি কথা দিয়েছি—

মীনাক্ষী। অতএব অন্যথা করবার উপায় নেই। কেমন?

কমলেশ। এগ্‌জ্যাক্টলি! তুমি হলে আমার—

মীনাক্ষী। থাক্, আর ঠাট্টায় কাজ নেই।

বেয়ারা টেবিলে চায়ের সরঞ্জাম সাজিয়ে দিয়ে চলে গেল
মীনাক্ষী চা তৈরী করতে লাগলেন

তপন। মিস্টার পালকে—

অমিতা। মামার শরীরটা অত্যন্ত খারাপ। প্রায় রোজই বিকেলে ডাক্তারখানায় যান।

তপন। ভেরী স্যাড। খুব সিরীয়াস কিছু—

কমলেশ। ডাক্তাররা এখনও রোগটা ঠিক ধরতে পারেন নি।

মীনাক্ষী। তপনবাবু, আপনার চা'য়ে ক' চামচে চিনি দেব?

তপন। দু' চামচে।

চা পরিবেশন হল। সকলে খেতে লাগলেন

মীনাক্ষী। চা ঠিক হয়েছে?

তপন। ফার্স্ট ক্লাস হয়েছে। আচ্ছা, মিস্টার পাল কতদিন থেকে ভুগছেন?

অমিতা। তা অনেক দিন হ'ল বই কি!

তপন। চেঞ্জে গেলে হয় ত' কিছু উপকার হ'তে পারে।

অমিতা। আমিও ক'দিন থেকে এই কথাই সাজেস্ট করব ভাবছিলুম। দেখি ডাক্তাররা কি বলেন। মামা আবার ডাক্তারের মত না নিয়ে এক পা চলেন না।

মীনাক্ষী। আপনাকে আর এক টুকরো কেক দেব?

তপন। না, না। আপনি কি মনে করেন আমি রাক্ষস।

অমিতা। খাবার রাক্ষস না হলেও দেখবার রাক্ষস। আমরা এত লোক থাকতে মীনার দিকে যে রকম ঘন ঘন কাতর দৃষ্টিতে চাইছেন—

মীনাক্ষী। ছোড়দি, তুমি ভারী অসভ্য। আমি তাহলে উঠে যাব।

অমিতা। রাগ করছিস কেন? ভদ্রলোককে সতর্ক করে দিলুম। আমরা না হয় কথাটা চেপে যাব, দেখেও দেখব না, কিন্তু যদি আর কেউ দেখে? তোদের ভালর জন্যই বলছি।

কমলেশ। তোমাদের দুই বোনে সব সময়ই ঝগড়া। মাঝে থেকে মুস্কিল হয় আমার। কোনদিকে রায় দিই। সামনে কামান, পিছনে ট্যাঙ্ক।

অমিতা। তপনবাবু, আপনার যদি চা খাওয়া শেষ হয়ে থাকে, তবে—

কমলেশ। তুমি দেখছি ভদ্রলোককে ধীরে সুস্থে খেতে পর্য্যন্ত দেবে না।

তপন। না, না, আমার চা খাওয়া হয়ে গেছে।

অমিতা। ঠিক করে বলুন নইলে আবার মীনার কাছে আমায় গঞ্জনা শুনতে হবে।

মীনাক্ষী। আবার ছোড়দি—

তপন। না, না, সত্যই আমার হয়ে গেছে।

অমিতা। বেশ। তবে এইবার আপনার মধুর কণ্ঠ হতে সুরের ধ্বনি নিঃসরিত হোক।

তপন। আপনার আদেশ শিরোধার্য্য।

অর্গ্যানে উঠে গেলেন

গান

মানস পুরীতে, তুমি সুচরিতে, ছিলে যে অলকনন্দা।
আজ তুমি নাই, নামিয়াছে তাই, আকুল বেদন সন্ধ্যা॥
মোর কাননের যত ফুলদল,
পরশ আশায় হত চঞ্চল,
তুমি গেছ চলি, তারা পড়ে ঢলি, যেন যতি হীন ছন্দা॥
জলদ সঘন, ঘিরেছে গগন, চমকে তীব্র দামিনী।
চাঁদিমা লুকায়, মেঘ মাঝে হায়, ভয় কম্পিতা যামিনী॥
কপোত কপোতী করে না কূজন,
কার বিরহেতে ব্যথিত দু'জন,
শুষ্ক ধরণী, শুষ্ক রজনী, হৃদি ভরা শুধু দ্বন্দ্ব॥

অমিতা। ডিভাইন! ভারী মিষ্টি গলা আপনার।

তপন। এ আপনি বাড়িয়ে বলছেন। মীনাক্ষী দেবী আমার চেয়ে অনেক ভাল গান করেন।

কমলেশ। আমরা তো ওর গান রোজই শুনি। ওস্তাদ তো নই অতএব কে যে বেটার মীমাংসা করতে পারব না। আপনি বলেন মীনা আপনার চেয়ে ভাল গায়, আবার ওদিকে মীনা বলে আপনি তার চেয়ে ভাল গান। আমি বলি আপনারা দু'জনেই দু'জনের চেয়ে ভাল গান।

তপন। এবার মীনাক্ষী দেবী যদি—

অমিতা। যদি কেন? গাইতেই হবে।

কমলেশ। কণ্ট্রাক্ট হয়ে গেছে।

মীনাক্ষী। ওঁর পর আমার গান কি ভাল লাগবে।

অমিতা। নে, নে, বিনয় রাখ্। তৃষিত চাতককে বারি দান কর্, পুণ্য হবে।

মীনাক্ষী। যাও, তুমি ভারী ইয়ে—

অর্গ্যানে গিয়ে বসলেন

গান

ক্লান্ত নয়নে পথ পানে চেয়ে কেটে গেছে কত বিভাবরী
বিফল আশায় কুসুমের ডোরে বাঁধিয়া শিথিল কবরী॥
দেহের দেউলে দীপ নিভে যায়,
রূপ যৌবন মাগিল বিদায়,
অশ্রু বাদল গগন ঘিরেছে, জেগে বসে আছে শবরী॥
কত বসন্ত এসে চলে গেল, তুমি তো এলে না তবু।
প্রতীক্ষা তবে ব্যর্থ হবে কি আসিবে না মোর প্রভু॥
নিরাশার বুকে ঝরে শতদল,
চোখের জলেতে ভেজে অঞ্চল,
জীবন থাকিতে এস প্রিয়তম, থেকোনা আমারে পাসরী॥

তপন। ওয়াণ্ডারফুল! কি গলা দেখছেন! কি সূক্ষ্ম কাজ! অপরূপ!

অমিতা। একটা অভিধান এনে দেব?

তপন। অভিধান! কেন?

অমিতা। বিশেষণ খুঁজবেন।

তপন। কি যে বলেন।

কমলেশ। কাল বিকেলে আপনি কি বিজি?

তপন। না। কেন বলুন তো?

কমলেশ। ফ্রী থাকলে আমরা চারজনে কাল ইভনিং শোতে সিনেমা যেতে পারি।

তপন। মোস্ট গ্ল্যাডলি। কোথায় মীট করব?

কমলেশ। আপনাকে ফোনে পরে জানাব। কোথাকার টিকিট পাওয়া যাবে ঠিক নেই তো।

তপন। থ্যাঙ্ক ইউ। দ্যাট উইল বী ও, কে। আমি আজ তবে উঠি।

অমিতা। এর মধ্যে।

তপন। দু' একটা দরকারী কাজ আছে।

অমিতা। আপনার আসল হোস্টেসের কাছ থেকে বিদায় নিন।

মীনাক্ষী। তুমি ছোড়দি কখনও কি সিরীয়াস হতে পার না।

অমিতা। তোর চেয়ে না হয় বড়ই, তাই বলে বুড়ী তো নই।

তপন। (উঠে দাঁড়িয়ে) আমায় ক্ষমা করবেন। আরও থাকতে ইচ্ছে ছিল, কিন্তু—

অমিতা। আমরা থাকার জন্য থাকা বিফল।

তপন। না, না, সে কি কথা—

অমিতা। কাল কিন্তু কোন এনগেজমেণ্ট করে ফেলবেন না।

তপন। সার্টেনলি নট। নমস্কার।

অমিতা। নমস্কার।

তপন ও কমলেশের প্রস্থান

অমিতা। মন্দ হ'ল না। কি বলিস্?

মীনাক্ষী। জানি না।

অমিতা। তোর ভগ্নিপতির কিন্তু বেশ বুদ্ধি আছে। তোদের জন্য কাল কেমন একটা গ্যালা ইভনিংএর বন্দোবস্ত করে দিলে।

মীনাক্ষী। তুমি বড্ড যা তা বল।

পদ্মলোচনের প্রবেশ

পদ্মলোচন। যাক্, গেছে বাঁচা গেছে।

অমিতা। তুমি কখন এলে মামা।

পদ্মলোচন। কখন এলে মানে? আমি তো বাড়ী থেকে বারই হই নি। সিঁড়ির পাশের ঘরে লুকিয়ে

বসেছিলুম। কমলেশ যখন একে নিয়ে গাড়ীতে তুলে দিলে, গাড়ী চলে গেল, তখন ঘর থেকে বার হলুম। কি বিপদ! ছোকরা যেতেই চায় না।

অমিতা। ছেলেটী কিন্তু বেশ। ভারী অমায়িক।

পদ্মলোচন। ছাই। জুতোর দোকান যার সে কখনও ভাল হতে পারে? সে তো মুচী। কি বিপদ! তোমরা তাকে প্রশ্রয় দিচ্ছ না কি?

মীনাক্ষী। ভদ্রতার খাতিরে চা খেতে বলাতে যে তুমি অসন্তুষ্ট হবে বাবা, একথা জানলে আমরা তাঁকে চা'য়ে নিমন্ত্রণ করতুম না।

পদ্মলোচন। কি বিপদ! মীনা, ভাল কথা বললে তুমি তার উল্টো মানে কর কেন? নাঃ, আমি আর বাঁচব না। বাঁচতে চাই না। যার একমাত্র মেয়ে তার একমাত্র বাপকে দেখতে পারে না—উহুঁ হুঁ, বুঝি জ্বর আসছে। মাথা ঘুরছে। অমি, আমায় ধর। শোবার ঘরে নিয়ে চল। মীনা, সরকার মশাইকে বল ডাক্তারকে ডাকতে। আজ বোধ হয় হার্টফেল করবে। বোধ হয় কেন নিশ্চয়ই করবে। বড্ড রুড শক্ দিয়েছ মীনা।

অমিতা। তুমি এখন উঠ না মামা। আগে একটু জিরিয়ে নাও। মীনা, চট করে ওডিকলোন আর স্মেলিং সল্ট নিয়ে আয়।

মীনার প্রস্থান

পদ্মলোচন। তুমিই বল অমি। একে আমার শরীর খারাপ তার ওপর আবার কেউ যদি আমার কথার উল্টো মানে করে, অনর্থক আমায় বকায়, তাহলে আমি আর কি করে বেঁচে থাকি। কি বিপদ! ভূপেন, ভূপেন—

অমিতা। কি দরকার মামা?

ভূপেনের প্রবেশ

পদ্মলোচন। কি বিপদ! এতক্ষণ কোথায় ছিলে ভূপেন? দেখছ সন্ধ্যা হয়ে এল। এখুনি ঠাণ্ডা লেগে যাবে। ব্রঙ্কাইটিস, নিউমোনিয়া, পালমোনারী এফেক্‌টেশান অফ লাঙ্গস, এমন কি স্ট্যাঙ্গুলেশান অফ দি রেসপিরেটারী অর্গ্যান্স পর্য্যন্ত হতে পারে, আর এই সময় কিনা তোমার দেখা নেই। যাও, আমার কম্ফর্টার, টুপী, গরম মোজা আর একটা বালাপোষ নিয়ে এস।

ভূপেন। আজ্ঞে কোন বালাপোষটা?

পদ্মলোচন। কি বিপদ! ভূপেন, নিজের বুদ্ধি কি একটুও খরচ করতে পার না। আজকের অ্যাটমসফেরিক কণ্ডিশনে পাতলা বালাপোষ হলেই চলবে। যাও, আর দেরী কোরো না।

ভূপেনের প্রস্থান

অমিতা। মামা, তুমি যে সেদিন তোমার সেই বন্ধুর গল্প বলছিলে—

পদ্মলোচন। বন্ধু! কোন বন্ধু? কি বিপদ! অমি, তুমি একটা লোকের নাম পর্য্যন্ত মনে রাখতে পার না? আমাকে ভাবাবে তবে ছাড়বে। জান, এতে আমার ব্রেনে কি ভয়ানক স্ট্রেন পড়ে।

মীনাক্ষীর প্রবেশ

মীনাক্ষী। বাবা, এই নাও তোমার স্মেলিংসল্ট।

পদ্মলোচন শিশি নিয়ে ঘন ঘন শুঁকতে লাগলেন

মীনাক্ষী। কপালে একটু ওডিকলোন লাগিয়ে দেব?

পদ্মলোচন। উহুঁহুঁ। কি বিপদ! মীনা, তোমার কি একটু বুদ্ধি-শুদ্ধি নেই। সব কথা আমাকে বলতে হবে। দেখছ সূর্য্য অস্ত গেছে। এখুনি ঠাণ্ডা লেগে একটা অনর্থ হোক আর কি!

বালাপোষ ইত্যাদি নিয়ে ভূপেনের প্রবেশ

পদ্মলোচন। নাও, ঠিক করে পরিয়ে দাও। তাড়াতাড়ি কোরো না।

ভূপেন মোজা পরাতে লাগল

অমিতা। হ্যাঁ মামা, মনে পড়েছে। সেদিন কপিঞ্জল বাবুর কথা হচ্ছিল।

পদ্মলোচন। কপিঞ্জল! হুঁ! তার কথা আর বলে শেষ করা যায় না। আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিল। আমরা এক ক্লাসে পড়তুম। সাহিত্যে তার বিশেষ অনুরাগ ছিল। যেমন বাঙ্গলায় তেমনি ইংরাজীতে। জনসন, ঈশ্বরচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র ইত্যাদির সে বিশেষ ভক্ত ছিল। সে বলত, বাঙ্গলা দেশ আজ উচ্ছন্নে গেছে শুধু কোমল সাহিত্যের জন্য। ভাষা যত বেশী শক্ত এবং যত কম বোধগম্য হবে জাতি তত শক্ত এবং উন্নত হবে।

অমিতা। তিনি বুঝি এসব খুব পড়তেন?

পদ্মলোচন। না। সে বলত, যাকে ভক্তি শ্রদ্ধা করা যায় তার সঙ্গে খুব বেশী মেলামেশা করা উচিৎ নয়। তাই সে এদের কোন বই পড়ত না।

অমিতা। তুমি এখন তাঁকে দেখলে চিনতে পার?

পদ্মলোচন। বোধহয় না। সে প্রায় পঁয়ত্রিশ বছর আগেকার কথা। এখন হয়ত' তার চেহারা একেবারে বদলে গেছে। তবে হ্যাঁ, তার ভাষা শুনলেই চিনতে পারব। অমন ভাষার উপর অদ্ভুত দখল আমি আর কারও দেখিনি। "পাখী সব করে রব রাতি পোহাইল" কবিতা পড়ে সে বললে, এতে ছেলেরা কি করে মানুষ হবে? এই পেলব ভাব—সর্ব্বনাশ হবেনা তো কি? তাই সে এর প্যারালাল একটী কবিতা রচনা করেছিল। প্রথম দু'এক লাইন এখনও মনে আছে—

"পক্ষ বিশিষ্ট প্রাণীদল, তীব্রধ্বনি কল কল
ত্রিযামা হইল এবে গতায়ু
উদ্যান অরণ্য ভরি, পুষ্পকুটমল কুঁড়ি,
প্রস্ফুটিত উন্মিষিতায়ু।"

অমিতা। তিনি এখন কোথায় আছেন ?

পদ্মলোচন। জানিনা। তবে তার অনেক জমীদারী। বিশেষ করে সিংহলে এত প্রপার্টি যে সেখানকার একজন রাজা বললেও অত্যুক্তি হয় না।

অমিতা। সিংহল আর কপিঞ্জল, মিলেছে ভাল!

পদ্মলোচন। মানে? কি বিপদ! কোন কথা কি সোজা ভাবে বলতে পারনা অমি। উঃ! ভূপেন, পা'টা আমার ভাঙ্গবে তবে ছাড়বে। আস্তে আস্তে মোজা পরাতে পার না। জান পায়ে চোট লাগলে স্প্রেন, রিউমেটিজম, ল্যাম্বাগো, ফ্র্যাকচার, অ্যাম্পুটেশন—

মীনাক্ষী। বাবা, স্মেলিং সল্ট শুঁকে এখন কি একটু ভাল মনে করছ ?

পদ্মলোচন। কি বিপদ! মীনা, তুমি বড্ড বাজে বক। জান আমার অসুখ অত্যন্ত অ্যাকিউট, যাকে বলে সাংঘাতিক। স্বয়ং সম্রাটের সম্পর্কীয় সম্বন্ধীর একবার হয়েছিল। কিন্তু বাঁচল না। দু'মাসের মধ্যে শেষ হয়ে গেল। সেই অসুখ সারবে কিনা সামান্য স্মেলিং সল্টে। তুমি যদি আমাকে একটুও ভালবাসতে তা হলে এ কথা বলতে পারতে না।

অমিতা। আচ্ছা মামা, কিছুদিন কোন স্বাস্থ্যকর স্থানে চেঞ্জে গেলে হয় না।

পদ্মলোচন। তাই যাব মনে করছি।

একটা হাত তুললেন। ভূপেন দেখতে পেল না।

ভূপেন, দেখছ হাত তুলেছি। মানে এখন উঠব। ধরতে পারছ না। কি বিপদ! সব কথা কি তোমাদের মুখ ফুটে বলতে হবে। নিজের থেকে কিছু করতে পার না।

অমিতা। আমি আর মীনা মামাকে ধরে নিয়ে যাচ্ছি। তুমি ততক্ষণ মামার ওভালটিনটা করে আন।

ভূপেন। আজ্ঞে হ্যাঁ।

পদ্মলোচন। হ্যাঁ, দেখ ভূপেন, ওভালটিনের সঙ্গে দু' চামচে ভাইনাম গ্যালিশিয়া মিশিয়ে দিও। শরীরটা ভয়ানক খারাপ যাচ্ছে। ডিপ্রেশান অফদি হার্ট, বুঝলে অমি। কি বিপদ! ভূপেন, এখনও দাঁড়িয়ে রয়েছ। যাও—

ভূপেনের প্রস্থান

অমিতা। তুমি মামা আমার কাঁধে ভর দাও। মীনা ওদিকটায় ধর্।

দু'জনকে ধরে পদ্মলোচন উঠে দাঁড়ালেন

পদ্মলোচন। উঃ, কি বিপদ! মীনা, অত তাড়াতাড়ি করছ কেন? জান, রোগা শরীর। তোমাদের প্রাণে কি একটু দয়ামায়া নেই—

সকলের প্রস্থান

(ক্রমশঃ)

ভেবে যদি দেখো

শ্রীজ্যোতির্ম্ময় ভট্টাচার্য্য এম্, এস্-সি

ধীরে কথা কও ; আজি রহ অচঞ্চল—
জীবনে পাথেয় করি' তব অশ্রুজল
বসে থাকো কিছুক্ষণ। জীবনে কেবল
হা-হুতাশ, ব্যথা-নিরাশা, তারি সম্বল
এই বেলা করে লও।
                চেয়ে দেখ পিছে
তুমি যাহা গড়েছিলে, মিথ্যা তাহা কি-যে
তোমার স্বপন-সৌধ, তোমার কামনা
হৃদয়-প্রশান্ত-নীরে বসন্ত বাসনা
চেয়ে দেখ নিভে গেছে ;
                চেয়ে দেখ আগে
মিথ্যার বেসাতি আজ প্রাণময় জাগে
চারিদিকে স্বপ্নময়, স্বর্ণময় আলো
যাহা কিছু চোখে লাগে, সব লাগে ভালো
প্রাণ যেন পূরে ওঠে, হৃদি বেগবান্
চোখে কিসে লাগে নেশা ; এই বর্ত্তমান—
তুমি আছ, আমি আছি, মায়াময়ী নিশি
আছে প্রেম, ভালোবাসা, আলোময় দিশি।
কিন্তু ভেবে যদি দেখ, এমনি অতীতে
বসন্ত এসেছিল তব জীবন নিভৃতে
এমনি সকল ছিল, এমনি মোহন
এমনি ভালোবাসায়, এখন যেমন,
ছিল সর্ব্বলোক ; গেয়েছিল পাখী
জীবন সফল হ'তে নাহি ছিল বাকী।
এসেছিল প্রিয় তব, মোহন মধুর
বেজেছিল বাঁশী তার অতীতে সুদূর।
ছিল ফুল, ছিল মালা, কণ্ঠভরা গান
প্রিয়ের পরশ লভি' সুখী ছিল প্রাণ।
সে যে মিথ্যা কতদূর আজ তুমি জানো
সে যে শুধু ছলময় তব প্রিয়-প্রাণও ;
আজো চেয়ে দেখ, এখনো তো ফোটে ফুল
সেই অলিদল এখনো করে ভুল
এখনো বসন্ত বায় বহে যে ধরায়
এখনো প্রিয়ের লাগি' কাঁদে সবে হায়।
কিন্তু তুমি উঠে এসো, ধরাপৃষ্ঠ হ'তে
তব দুঃখ-দৈন্যভার ঝাড়ি নিজ হাতে
সগর্ব্বে সম্মুখে চাহ। যদিও সেখানে
কেহ নাহি গান গায়, সুমধুর তানে—
তবু সত্য বলি তারে আজি সাথে লও
জীবন অশ্রুর মালা—ধীরে কথা কও।

গণদেবতা

পঞ্চগ্রাম

শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

(চৌত্রিশ)

আষাঢ়ের বর্ষণমুখর অপরাহ্ণে ঘরের দাওয়ায় বসিয়া পাতু মুচী আকাস পাতাল ভাবিতেছিল। অনিরুদ্ধ কর্ম্মকার জেলে গিয়া সংসারের ভাবনায় নিশ্চিন্ত হইয়াছে, দেবু ঘোষ জেল হইতে অব্যাহতি পাইয়া ধর্ম্মঘট লইয়া মাতিয়া উঠিয়াছে; পাঠশালার চাকরী তাহার গিয়াছে কিন্তু দেবু ঘোষকে সংসার লইয়া বিব্রত হইতে হয় নাই। তাহার জমি-জেরাত আছে, ঘরে ধান আছে, পূর্ব্বের সঞ্চয়ও কিছু আছে। কিন্তু পাতু একেবারে নিঃসম্বল, তাহার জমি গিয়াছে, হালের বলদ গিয়াছে, ভাগাড় যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চামড়ার কাজ গিয়াছে, নিজের দেহের সামর্থ্য ছাড়া তাহার আর সম্বল কিছু নাই। ওই সামর্থ্যটুকুকেই মূলধন করিয়া সে অনিরুদ্ধের সঙ্গে ভাগে চাষ করিতে নামিয়াছিল। ভরসা ছিল—বর্ষা কয়মাস ভাগের জমির মালিকের কাছে ধান ধার লইয়া সংসার চালাইবে—তারপর ফসল উঠিলে ধার শোধ দিয়া উদ্বৃত্ত যাহা থাকিবে—সেইটুকুকেই মূলধন করিয়া আবার জীবন আরম্ভ করিবে। কল্পনা ছিল অনেক। উদ্বৃত্ত ধান হইতে কিছু বিক্রী করিয়া গোটা দুয়েক ছাগল কিনিবে। একটা ছাগল বৎসরে দুইবার বাচ্চা দেয়, এবং এক-একবারে দুইটা করিয়া বাচ্চা হয়। দুইটা ছাগল হইতে বৎসরে আটটা বাচ্চা পাওয়া যাইবে। আটটা বাচ্চার দাম অন্ততঃ চব্বিশ পঁচিশ টাকা। ঐ টাকাতে সে একটা ভাল গরু কিনিবে। গাইটা যদি দৈনিক দুই সের দুধ দেয় তবে জল মিশাইয়া সেই দুধ আড়াই সের দাঁড়াইবে—আড়াই সের দুধের দাম দৈনিক দশ পয়সা। দৈনিক দশটা পয়সা উপার্জ্জন হইলে তাহার সংসার সুখের সংসার হইয়া উঠিবে। উপরন্তু বাছুরটা লাভ। এমনি করিয়া তাহার হিসাবে তৃতীয় বৎসরে হালের বলদ কিনিবার কল্পনা ছিল। কিন্তু সে কল্পনার সমস্ত ইমারত এক ধাক্কায় মাটিতে পড়িয়া ধূলা হইয়া মাটির সহিত মিশিয়া গেল। এখন কয়েক দিন বোন দুর্গার অনুগ্রহেই সংসার চলিতেছে। একদিন সে বোনের স্বৈরিণীর আচরণে ঘৃণা করিত, তাহার উপার্জ্জন হইতে কাণাকড়ি গ্রহণ করিতেও অপমান বোধ করিত, কিন্তু আজ তাহারই অন্ন সে নির্ব্বিকার চিত্তে দুই বেলা গিলিয়া চলিয়াছে। পাতুর সেই বিড়ালীর মত মোটা-সোটা ঝগড়াটে বউটা এখন দুর্গার পোষা বিড়ালীর মতই দুর্গার গায়ে ঘেঁষ দিয়া চব্বিশ ঘণ্টা আদর লইয়া ফেরে। মধ্যে মধ্যে পাতুর লজ্জা হয় আপনাকে সে আপনি ধিক্কার দেয়। আজ অপরাহ্ণের দিকে মেঘাচ্ছন্ন আকাশ এবং রিমি ঝিমি বর্ষণের মধ্যে তেমনি একটি মানসিক অবস্থা লইয়া পাতু বসিয়াছিল।

উঠানের ও-প্রান্তে দুর্গার ঘরের দাওয়ায় বসিয়া পাতুর মা ভাত রাঁধিতেছিল, ভাত রাঁধিতেছিল আর আপন মনেই সে আপন অদৃষ্টকে উপলক্ষ করিয়া দুর্গা, পাতু, পাতুর বউ সকলকেই গাল পাড়িতেছিল।

—হাতের 'লক্ষ্মী' পায়ে ঠেলে ইয়ের পরে নাকের জলে চোখের জলে একাকার হবে; লোকের দোরে দোরে ভিখ করে খেতে হবে। রক্তের ত্যাজে আজ বুঝছে না ইয়ের পরে বুঝবে।

কথাটা দুর্গাকে বলিতেছিল। দুর্গার আর উপার্জ্জনের নেশা নাই; দেহের রূপ যৌবন লইয়া ব্যবসায়ে তাহার একটা অরুচি ধরিয়াছে। ছিরু পালের সঙ্গে যখন তাহার প্রীতির সম্বন্ধ ছিল তখন ছিরু তাহার পেটের ভাতের ধান এবং কাপড়ের খরচটা যোগাইত। তা' ছাড়াও তখন মধ্যে মধ্যে কঙ্কণার বাবুদের ডাক ছিল, জংসন সহরের চাকুরে এবং গদীওয়ালা শেঠদের ওখানেও যাওয়া-আসা চলিত। ছিরু পালের সঙ্গে ঝগড়া করিয়া মেয়ে অনিরুদ্ধকে লইয়া পড়িল; তাহার পর আসিল ওই নজরবন্দী। হতভাগী মেয়েটার কি যে হইল কে জানে—দাসী-বাঁদীর মত অহরহ তাহার ওখানেই পড়িয়া থাকিতে আরম্ভ করিল। তা-ও যদি সে তাহাকে চোখে পাড়িত!

দুর্গার-মা শ্লেষ-ভরা কণ্ঠে আপন মনেই বলিয়া উঠিল···পিরীত। আসনাই! গলায় দড়ি! মরুক গলায় দড়ি দিয়ে মরুক। সরমের ঘাটে মুখ আর ধোয় নাই। ছি-ছি-ছি!

এই সময়টিতেই দুর্গা আসিয়া বাড়ী ঢুকিল। বৃষ্টিতে তাহার সর্ব্বাঙ্গ ভিজিয়া গিয়াছে। মায়ের গালিগালাজের অনেক কথাই তাহার কানে গিয়াছিল, কিন্তু সে কথা দুর্গা গ্রাহ্যই করিল না। ওসব তাহার শুনিয়া শুনিয়া সহিয়া গিয়াছে। সে আসিয়াই ভাইয়ের পাশে বসিয়া বলিল—গোটা গাঁ ঘুরে এলাম দাদা।

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া পাতু বলিল—কি হ'ল?

—কিছুই হ'ল না। সবাই বললে—মুজুর নিয়ে কি করব? দুর্গা গিয়াছিল পাতুর জন্য কোন একটা কাজের সন্ধানে। চাষের সময় কেহ যদি চাষের কাজের জন্য মজুর নিযুক্ত করে তবে বর্ষাটা কোন রকমে কাটিয়া যায়।

ও-দিকে দুর্গার মা দাঁতে দাঁত চাপিয়া কঠিন কণ্ঠে বলিল—বলি—ওলো ও দাদা-সোহাগী, ভিজে কাপড় ছাড় লো—ভিজে কাপড় ছাড়। মাথা মোছ। অসুখ করলে মরবি যে।

দুর্গা কঠিন দৃষ্টিতে মায়ের দিকে চাহিল। মা সে দৃষ্টিকে ভয় করে, ইহার পরই নিষ্ঠুর ভাষায় দুর্গার বলিবার কথা—'আমার বাড়ী থেকে বেরো তুই।' কিন্তু পাতু বলিল—কাপড়খান ছাড় দুগ্‌গী, মা মিছে কথা বলে নাই।

দুর্গা বলিল—আমার জন্যে দরদে মরে যাচ্ছে হারামজাদী। ছুতোনাতা ক'রে কেবল আমাকে গাল দেওয়া।

—ছেড়ে দে ও-কথা। কাপড় ছেড়ে গা হাত মাথা মুছে ফেল।

দুর্গা আপনার ঘরের দিকে যাইতে যাইতে হঠাৎ ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—কামার বউ গাঁ থেকে চলে গেল দাদা।

—চলে গেল? কোথা?

—মহা গেরাম; দেবু ঘোষ ঠাকুর মশায়ের বাড়ীতে কাজ

ঠিক ক'রে দিয়েছে। ঠাকুর মশায়ের নাত বউয়ের কাছে থাকবে, পাটকাম করবে—খেতে পাবে মাইনে পাবে। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া সে আবার বলিল—তা বেশ হয়েছে।

পাতুও বলিল—হ্যাঁ—তা বেশ হয়েছে বৈ কি।

দুর্গা আবার বলিল—ঠাকুর মশায়ের নাতিকে সেদিন দেখলাম দাদা। আহা-হা একবারে রাজপুত্তের মত চেহারা।

পাতু দুই হাত কপালে ঠেকাইয়া বারবার প্রণাম করিয়া বলিল—দেবতা, দেবতা, দুগ্‌গী—বিশুবাবু সাক্ষাৎ দেবতা। কি মিঠে কথা, তেমুনি কি দয়া। কলকাতা থেকে খবর পেয়ে ছুটে এসে আমাদিগে খালাস ক'রে নিয়ে এল।

দুর্গা উপরে চলিয়া গেল।

দুর্গার মা বেশ ভাল করিয়া দেখিয়া দুর্গার অনুপস্থিতি সম্বন্ধে নিশ্চিত হইয়া নিম্ন কণ্ঠে বলিল—রাজপুত্তু। এইবার রাজপুত্তুর সঙ্গে পিরীত করতে যাও। বলিয়াই আবার ব্যঙ্গ-ভরা সরস কণ্ঠে সে ছড়া কাটিয়া উঠিল—

"বিন্দে সখি, বল কি কারণ—
কালো জল দেখিলে আমার ঝম্প দিবার মন!"

* * *

দুর্গার মা যে ছড়াটা কাটিল—তাহার অর্থ রূপবান-যুবা দেখিলেই দুর্গা প্রেমে পড়িবার জন্য উন্মুখ হইয়া উঠে। শুধু দুর্গার মা নয়—তাহাদের পাড়া প্রতিবেশী সকলেই ওই এক কথা বলে। পূর্ব্বে সে পুরুষ ভুলাইয়া তাহাকে আয়ত্ত করিত। তখন তাহার উপার্জ্জনের নেশা ছিল; পুরুষকে ভুলাইয়া আয়ত্ত করিয়াই তৃপ্ত হইত না, তাহার নিকট হইতে সম্পদও শোষণ করিত। কিন্তু অনিরুদ্ধ এবং অনিরুদ্ধের পর ওই নজরবন্দী যতীনকে আয়ত্ত করিতে গিয়াই তাহার একটা অদ্ভুৎ পরিবর্ত্তন ঘটিয়া গিয়াছে। যতীনের জন্য তাহার বেদনা আছে সত্য—সে তাহাকে ভালও বাসিয়াছিল—কিন্তু সে বেদনা এবং ভালবাসা তাহার চরিত্রকে আচ্ছন্ন করিতে পারে নাই। যেদিন পাতু খালাস হইয়া আসিল—সেইদিন সে বিশ্বনাথকে প্রথম দেখিল—বিশ্বনাথকে আয়ত্ত করিবার জন্য তাহার সেবা করিবার জন্য সেই দিন হইতেই সে অন্তরে অন্তরে উন্মুখ হইয়া উঠিয়াছে। দুর্গার মায়ের কথাটা সত্য।

উপরে আসিয়া কাপড় ছাড়িয়া, মাথা চুল মুছিয়া, জানালার ধারে সে শুইয়া পড়িল। বুকে বালিশ দিয়া উপুড় হইয়া শুইয়া জানালার ওপারের রিমিঝিমি বর্ষণমুখর বাহিরের দিকে চাহিয়া রহিল।

কিছুক্ষণ পর পাতু আসিয়া সিঁড়ি হইতে ডাকিল—দুগ্‌গা!

দুর্গা উত্তর দিল না।

—ঘুমুলি নাকি?

বিরক্তিভরেই দুর্গা বলিল—না, কি বলছ?

পাতু আসিয়া কাছে বসিয়া বলিল—কামার বউ—

কামার বউয়ের নামে দুর্গা অকারণে জ্বলিয়া উঠিল—তার নাম আমার কাছে ক'র না। ভারী বজ্জাত মাগী। এত উপকার আমি করেছি—তা' আমার সঙ্গে একবার দেখা ক'রে গেল না। জিজ্ঞেসা করলে না।

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া পাতু আবার বলিল—বিশুবাবুর কাছে একবার যাব নাকি বল দেখি? মুনিষ মান্দের যদি রাখে!

—না।

পাতু মনে মনে বিরক্ত হইয়া উঠিল। দুর্গার এমনি ধারার মেজাজ সে সহ্য করিতে পারে না। কিন্তু বর্ত্তমান ক্ষেত্রে না সহিয়া উপায় ছিল না। দুর্গা যদি খাইতে না দেয় তবে তাহাকে উপবাসী থাকিতে হইবে। বিরক্তিভরেই সে উঠিয়া চলিয়া আসিল—নীচে আসিয়া দাঁতে দাঁত টিপিয়া কঠিন আক্রোশভরে আপন মনেই বলিয়া উঠিল—প্যাটে ছোরা ঢুকিয়ে এ-ফোঁড় ওফোঁড় ক'রে দিতে হয়। প্যাটই হ'ল মানুষের শত্তুর।

—শোন্, দাদা শোন্। চাপা গলায় দুর্গা সিঁড়িতে দাঁড়াইয়া ডাকিল।

—কি?

—শোন্, মজা দেখে যা।

—মজা?

—হ্যাঁ মজা।

পাতু বিরক্তি ভরেই উপরে উঠিয়া গেল।

—কি?

—ওই দেখ। ওই খেজুর গাছগুলার ভেতরে। দুর্গা খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল।

পাতুর সমস্ত দেহে যেন আগুন ধরিয়া গেল। রিমিঝিমি বর্ষণের মধ্যে অদূরবর্ত্তী খেজুর গাছগুলির ঘন সন্নিবেশের অন্তরালে পাতুর সেই বিড়ালীর মত বধূটি একটি পুরুষের সহিত হাস্যপরিহাস করিতেছে। পুরুষটা তাহার আঁচল ধরিয়া আছে, কিছুতেই তাহাকে আসিতে দিবেনা, বউটা কাপড় টানিতেছে, আর হাসিয়া যেন ভাঙিয়া পড়িতেছে। পাতু ঠাওর করিয়া দেখিল—পুরুষটা হরেন্দ্র ঘোষাল। পাতু লাফ দিয়া উঠিয়া পড়িল, কিন্তু দুর্গা তাহার হাতখানা খপ করিয়া ধরিয়া বলিল—খেপেছিস না কি?

—ছেড়ে দে দুর্গা, দু'জনাকেই আমি খুন করে ফেলাব।

—না। খুন করলে খুন দিতে হয় জানিস?

—ফাঁসী যাব আমি। পাতু মোচড় দিয়া হাতটা ছাড়াইয়া লইল, কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই দুর্গা আবার তাহার হাত ধরিয়া টানিয়া বলিল—মরণ। বোস বলছি—বোস।

এমন কঠিন কণ্ঠে দুর্গা তাহাকে কথা কয়টা বলিল যে পাতু কিছুক্ষণের জন্যও যেন কেমন হইয়া গেল। সেই সুযোগে দুর্গা নামিয়া আসিয়া সিঁড়িতে শিকল লাগাইয়া দিল। শিকল টানিয়া দিয়া সে হাসিতে বসিল। হাসিয়া তাহার তৃপ্তি হয় নাই।

মা বিরক্ত হইয়া বলিল—হাসছিস কেনে? কালামুখে আর হাসিস না বাপু।

—ওই দেখ।

—কি?

দুর্গা মাকে লইয়া ঘরের কোনের আড়াল হইতে ব্যাপারটা দেখাইয়া দিল। সঙ্গে সঙ্গে দুর্গার মা হনহন করিয়া সেইদিকে আগাইয়া গেল। হরেন্দ্র ঘোষাল ছুটিয়া পলাইল, কিন্তু দুর্গার মা বউকে ধরিয়া ফেলিল। বউটার সর্ব্বাঙ্গ ভয়ে অবশ হইয়া গিয়াছিল, শাশুড়ী নীরবে খুঁজিয়া-পাতিয়া তাহার কাপড়ের খুঁট হইতে একটা টাকা খুলিয়া লইয়া চলিয়া আসিল। কয়েক-পা আসিয়াই সে আবার ফিরিয়া দাঁড়াইল, আঙুল দিয়া দুর্গার

কোঠার জানালাটা দেখাইয়া বলিল—পাতু সব দেখেছে, কেটে ফেলাবে তোকে। মাটীতে মুখ রগ্‌ড়ে রক্ত তুলে দেবে!

বউটা এবার হঠাৎ যখন সম্বিৎ ফিরিয়া পাইল, সঙ্গে-সঙ্গে সে ছুটিয়া পলাইল।

ওদিকে সিঁড়ির দরজায় পাতু বারবার ধাক্কা মারিতেছিল। দুর্গা ধমক দিয়া বলিল—আমার দোর কি তুই ভেঙে দিবি—না কি?

—খুলে দে দরজা।

—না। দরজা খুলে যাবি কোথা?

—যেখানেই যাই, খুলে দে দরজা।

দুর্গা কথা না বলিয়া এবার দরজায় একটা তালা লাগাইয়া দিয়া চলিয়া গেল। ফিরিল সে অনেকক্ষণ পর। তালা খুলিয়া উপরে গিয়া দেখিল পাতু ভাম হইয়া বসিয়া আছে। হাসিয়া দুর্গা বলিল—মেজাজ ঠাণ্ডা হ'ল?

পাতু মুখ তুলিয়া চাহিল, তাহার চোখে জল, ঠোঁট দুইটা থরথর করিয়া কাঁপিতেছে।

দুর্গা বলিল—কাঁদছিস কেনে? মরণ আর কি!

কোন মতে আত্মসম্বরণ করিয়া পাতু এবার বলিল—ওর মুখ আর আমি দেখব না।

—দেখবি না? দুর্গা হাসিল।

—না।

—আমার মুখ? আমার মুখ দেখবি না?

পাতু দুর্গার মুখের দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে ফিরিয়া চাহিল।

—তোর মায়ের মুখ? মায়ের মুখও দেখবি না?

পাতু এবার দুর্গার কথার অর্থ বুঝিয়া মাথা হেঁট করিয়া মাটির দিকে চাহিয়া রহিল।

—তোর মায়ের মা, তোর বাবার মা? এই ছোটলোক পাড়ার কে বাদ আছে বল্? হ্যাঁ—বাদ আছে, ওই যে হনুর মত উপু হয়ে হাঁটে, মুখ দিয়ে লাল পড়ে—ওই হাড়িদের কামিনী, ওই বাদ আছে। ভদ্দনোকে ওর দিকে চাইতে পারে না বলে বাদ আছে।

পাতু চুপ করিয়া রহিল।

দুর্গা আবার বলিল—বউটার এখনও বয়েস আছে। দু-পাঁচ টাকা রোজকার যদি করতে পারে—তারই সুসার হবে—বলিয়া সে নীচে নামিয়া গেল, কিছুক্ষণ পর ফিরিয়া আসিয়া দুই আনা পয়সা দিয়া বলিল—যা মদ খেয়ে আয়। মন খারাপ করিস না।

পাতু দু-আনিটা নাড়াচাড়া করিতে করিতে এক সময় উঠিয়া চলিয়া গেল।

* * * *

বসিয়া থাকিতে থাকিতে দুর্গার মনে দুষ্ট বুদ্ধি জাগিয়া উঠিল। সে চলিল—হরেন্দ্র ঘোষালের বাড়ী। ঘোষালের কাছে যাহা পাওয়া যায় আদায় করিয়া লইতে হইবে। বিব্রত ঘোষালের সকরুণ মুখভঙ্গি এবং সকাতর অনুনয় কল্পনা করিয়া সে মৃদু মৃদু হাসিতেছিল। চণ্ডীমণ্ডপের কিছু আগেই দেবু ঘোষের বাড়ী। সেখানে বেশ একটি জনতা জমিয়া ছিল। সে থমকিয়া দাঁড়াইল। শুধু শিবকালীপুরেরই নয়, আশ-পাশের কয়েকখানা গ্রামেরও দুই চারিজন করিয়া চাষী সেখানে উপস্থিত ছিল। দাওয়ার মধ্যস্থলে একটি মোড়ায় বসিয়াছিল বিশ্বনাথ।

হরেন্দ্র ঘোষালও সেখানে উপস্থিত ছিল—জনতার মাঝখানে সে বেশ জাঁকিয়াই বসিয়াছিল; দুর্গাকে দেখিবামাত্র সে চট করিয়া উঠিয়া জনতা ঠেলিয়া যথা সম্ভব দ্রুত বাহির হইয়া চলিয়া গেল। দুর্গা একটু হাসিল কিন্তু সে তাহাকে ধরিবার জন্য আদৌ ব্যস্ত হইল না। একটু উঁচু গলায় সে ডাকিল—ঘোষ মশায়! পণ্ডিত মশায় গো!

দেবু মুখ তুলিয়া চাহিয়া দুর্গাকে দেখিয়া বলিল—কে—দুর্গা?

—আজ্ঞে হ্যাঁ গো!

শ্রীহরি ঘোষের সঙ্গে মামলার প্রারম্ভে দুর্গা অযাচিত ভাবে ত্রিশ টাকা দিয়া সাহায্য করিয়াছিল—সে কথাটা দেবুর মনে একটা গভীর রেখাপাত করিয়াছিল। দুর্গার সকল অপরাধ সত্ত্বেও সে তাহাকে স্নেহ করে। সেই কথাটা সে বিশ্বনাথকেও বলিয়াছে। তাই বিশ্বনাথকে তাহার পরিচয় দিয়া বলিল—এই সেই দুর্গা। মুচীদের মেয়ে।

কথাটা বিশ্বনাথেরও মনে পড়িল। সে হাসিয়া দুর্গাকে বলিল—তুমিই দুর্গা?

পথের উপরেই ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া দুর্গা সলজ্জ হাসিমুখে নতদৃষ্টিতে মাটির দিকে চাহিয়া রহিল। (ক্রমশঃ)

হাতছানি

শ্রীসুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়

ভেসে আসে আজ অতীত তীরের হাওয়া
হাতছানি দিল কত না রঙীণ দিন
সুরু হল ফের গান গাওয়া সুরে সুরে
ফিরে ফিরে বাজে রিণ্ রিণ্ নূপুরের!

ঘরছাড়া মন ঘর বেঁধেছিল কত
নতুন বাতাসে ভেঙেচুরে সব গেল
ফাল্গুনে যারা এসেছিল পাশে উড়ে
উড়ে গেল ফের চৈত্রের নিশ্বাসে!

ছেঁড়া স্মৃতি-ঝুলি খুলি শুধু বারে বারে
বিস্মৃতি-কীট কেটে দিল কত সুতো
অতীতের কত চোখ মুখ হাসি গান
নিয়ে গেল হায় সকলই সময়-সাপ!

রাঙা খাঁচা মোর ভেঙে পড়ে আছে আজ
ঝাঁকে ঝাঁকে কত নীল পাখী উড়ে যায়!

চলতি ইতিহাস

শ্রীতিনকড়ি চট্টোপাধ্যায়

সুদূর প্রাচী

গত চার সপ্তাহে সুদূর প্রাচ্যের যুদ্ধ একাধিক কারণে উল্লেখ-যোগ্য ; সম্প্রতি জাপানের রণনীতির মধ্যে আসিয়াছে পরিবর্তন। জাপানের নৌবাহিনীকে আমরা ইতিপূর্বে দুইবার মিত্রশক্তির নৌবাহিনীর সহিত সজ্ঘর্ষে লিপ্ত হইতে দেখিয়াছি। উভয় স্থলেই মিত্রশক্তির নৌবাহিনী শত্রুপক্ষের ওপর প্রবল আঘাত হানিয়াছে। দুই সপ্তাহ পূর্বে জাপ নৌশক্তি আর একবার মিত্রশক্তির নৌবাহিনীর সহিত সংগ্রামে লিপ্ত হইয়াছিল—এই সজ্ঘর্ষ হইয়াছে প্রশান্ত মহাসাগরে, মিড্ওয়ে দ্বীপের নিকট।

যে কারণ এবং পরিবেশের জন্য বৃটেনের নৌশক্তি পৃথিবীতে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছে, সেই অবস্থা এবং সেই কারণেই জাপানকেও মনোযোগী হইতে হইয়াছে নৌশক্তি বৃদ্ধির দিকে। জাপান জানে—মিত্রশক্তির বিরুদ্ধে চূড়ান্ত নিষ্পত্তি লাভ করিতে হইলে স্বীয় নৌবহর বৃদ্ধি তাহার পক্ষে অত্যাবশ্যক এবং বিশাল সাগরে স্বীয় আধিপত্য প্রতিষ্ঠা এবং রক্ষা করিবার নিমিত্ত বিরাট নৌবাহিনী তাহার পক্ষে নিতান্তই অপরিহার্য। জাপান যে এ বিষয়ে চেষ্টার ত্রুটি করে নাই মিত্রশক্তির বিরুদ্ধে জাপান যুদ্ধ ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গেই তাহা পরিস্ফুট হইয়াছে। যুদ্ধ ঘোষণার অব্যবহিত পরেই জাপান অতর্কিত আক্রমণে পার্ল বন্দর ক্ষতিগ্রস্ত করিয়াছে, গুয়াম এবং ওয়েক দ্বীপ দখল করিয়া লইয়াছে। গুয়াম ও ওয়েক দ্বীপের ব্যবধান হাজার মাইলেরও অধিক। এদিকে ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জেও জাপনৌবহর আক্রমণ পরিচালনা করিয়াছে, প্রবাল সাগরেও জাপ নৌবাহিনী সজ্ঘর্ষে লিপ্ত হইয়াছে। এই হাজার হাজার মাইল দূরবর্তী বিভিন্ন রণাঙ্গনে জাপ নৌবাহিনী আক্রমণ পরিচালনা করিয়াছে। কিন্তু শুধু সাময়িক আধিপত্য বিস্তারেই ইহার শেষ নহে, অধিকৃত অঞ্চল রক্ষা করার প্রশ্নও আছে। ওয়েক হইতে তের শত মাইল দূরবর্তী মিডওয়ে দ্বীপে জাপান হানা দিয়াছিল আমেরিকার সামুদ্রিক ঘাঁটি অধিকার করিয়া প্রশান্ত মহাসাগরে মিত্রশক্তির নৌবহরকে অধিকতর বিপন্ন করিবার জন্য বটে, কিন্তু তাহার উদ্দেশ্য সফল হয় নাই। প্রভূত ক্ষতি স্বীকার করিয়া জাপবাহিনী অপসরণ করিতে বাধ্য হইয়াছে। পার্ল দ্বীপের আক্রমণের ন্যায় এই অভিযান অতর্কিত হইতে পারে নাই। মার্কিন নৌবাহিনী পূর্ব হইতেই সতর্ক ছিল। পর পর তিনটি নৌযুদ্ধে জাপান সাফল্য লাভে যেমন অক্ষম হইয়াছে, তাহাকে নৌবহরের ক্ষতিও সেই পরিমাণে সহ্য করিতে হইয়াছে। ইহার পরে জাপান উত্তর প্রশান্ত মহাসাগরে অ্যালুসিয়ান দ্বীপপুঞ্জে অভিযান পরিচালনা করিয়াছে, কয়েক স্থানে কিছু সৈন্য নামাইতেও সমর্থ হইয়াছে।

এদিকে চীনেও জাপান আক্রমণ সুরু করিয়াছে প্রবলভাবে। চেকিয়াং এবং কিয়াংসি প্রদেশে লক্ষাধিক জাপবাহিনী চীনা-বাহিনীর প্রবল প্রতিরোধ সত্বেও যথেষ্ট অগ্রসর হইয়াছে। কিনহোয়া, ফুকিয়েন, নানচাং, চুশিয়েন প্রভৃতি যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল জাপ অধিকারে গিয়াছে। কিন্তু সম্প্রতি জাপ অভিযানের বেগ প্রশমিত হইয়াছে। স্থানে স্থানে চীনাবাহিনী জাপসৈন্যকে পশ্চাদপসরণে বাধ্য করিয়াছে এবং কয়েকটি জনপদ পুনরুদ্ধার করিয়াছে। জাপ সৈন্যদলের পিছনে চীনা গরিলা বাহিনীও শত্রুকে যথেষ্ট ব্যস্ত এবং ক্ষতিগ্রস্ত করিয়াছে। জাপানীরা উপলব্ধি করিয়াছে যে, সুদীর্ঘ চারিশত মাইল বিস্তৃত চেকিয়াং-কিয়াংসি রেলপথের সকল অংশ স্বীয় দখলে রাখা সম্ভব নয়। কাজেই জাপবাহিনী অধিকৃত অঞ্চলে প্রথমে স্বীয় আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করিতে ইচ্ছুক। ফলে চেকিয়াংএর জাপানীরা চুশিয়েন এবং কিয়াংসির জাপানীরা নানচাং-এর দিকে সরিয়া আসিতেছে। প্রকাশ, জাপান সাংহাই হইতে সিঙ্গাপুর পর্যন্ত রেলপথ নির্মাণে ইচ্ছুক। উদ্দেশ্য স্পষ্ট। মাঞ্চুরিয়া এবং কোরিয়ার সহিত জাপানের পূর্ব হইতেই রেলপথে যোগাযোগ আছে। সাংহাই-সিঙ্গাপুর পর্যন্ত যদি রেলপথে যোগাযোগ সাধনে জাপান সক্ষম হয়, তাহা হইলে সমুদ্রতীরবর্তী সমগ্র চীনদেশে জাপানের সরবরাহ ও সমরায়োজন প্রেরণের যথেষ্ট সুবিধা হইবে এবং মিত্রশক্তিকে প্রবলতর বাধাপ্রদানও তাহার পক্ষে অধিকতর সহজ হইবে।

কিন্তু জাপান চীনের কয়েকটি বিশেষ অঞ্চলের প্রতি অত্যধিক মনোযোগী হইয়া উঠিল কেন? এদিকে অ্যালুসিয়ান দ্বীপপুঞ্জের প্রতিও সে অবহিত। প্রথম দৃষ্টিতে জাপানের এই অভিযান যথেষ্ট আক্রমণাত্মক বোধ হইলেও প্রকৃতপক্ষে ইহা আত্মরক্ষা-মূলক যুদ্ধ। ভবিষ্যতে আক্রমণাত্মক যুদ্ধ পরিচালনার উদ্দেশ্যে জাপান পূর্ব হইতে সাবধানতা অবলম্বন করিতেছে। যতদূর ধারণা করা যায়, মার্কিন বিমান হইতে টোকিওর উপর বোমা বর্ষণের ফলেই জাপানের রণনীতি বর্তমান রূপ গ্রহণ করিয়াছে। সেইজন্য আমরা প্রবন্ধের প্রারম্ভেই বলিয়াছি,জাপানের রণনীতিতে আসিয়াছে পরিবর্তন। আমরা "ভারতবর্ষ"-এর বিভিন্ন সংখ্যায় একাধিকবার বলিয়াছি—জাপানের পরিবেশ এবং অবস্থান জাপানের প্রতিকূলে। সুদূর ফিলিপাইন, সিঙ্গাপুর, অষ্ট্রেলিয়া অবধি জাপান নৌবহর প্রেরণ করিয়াছে বটে, কিন্তু জাপান জানে—তাহার আপন গৃহ রক্ষার সমস্যাই অধিকতর জটিল। আধুনিক যুদ্ধে বিমানের গুরুত্ব যথেষ্ট এবং বিমান বহরের সাফল্য নির্ভর করে রণক্ষেত্রের দূরত্বের ওপর। মিত্রশক্তির বিমান বাহিনী যাহাতে অতর্কিতে জাপানে আসিয়া বোমা বর্ষণ করিতে না পারে সেই উদ্দেশ্যেই জাপানের এই সাবধানতা। এইজন্যই জাপান অ্যালুসিয়ান দ্বীপপুঞ্জে অভিযান পরিচালনা করিয়াছে, এই উদ্দেশ্যেই চীনের সমুদ্রোপকূলবর্তী অঞ্চল সকল জাপান অধিকার করিতে সচেষ্ট, যাহাতে মার্কিন বিমান পূর্ব চীনের কোন বিমান ঘাঁটি হইতে টোকিওর ওপর অভিযান চালাইতে সক্ষম না হয়।

কিন্তু আরও একটু বিপদ আছে রুশিয়াকে লইয়া। সাইবেরিয়ার একাধিক ঘাঁটি হইতে অতি সহজেই টোকিওতে বোমা বর্ষণ করিয়া বিমান দল স্বীয় ঘাঁটিতে প্রত্যাবর্তন করিতে পারে। চীনের কোন কোন মহলে তাই আশঙ্কা করা হইতেছে যে, জাপান অতি শীঘ্রই সাইবেরিয়ার বিরুদ্ধে অভিযান প্রেরণ

করিবে। আবার চুংকিং হইতে প্রাপ্ত সংবাদে প্রকাশ ব্রহ্মদেশ অধিকারে রাখিতে যত সৈন্যের প্রয়োজন তদপেক্ষা যথেষ্ট অধিকসংখ্যক সৈন্য জাপান ব্রহ্মদেশে সমবেত করিয়াছে। চীনের কোন কোন রাজনীতিক মহলের ধারণা ইহা জাপান কর্তৃক ভারত আক্রমণের আয়োজন। উত্তর-পূর্ব ভারতে মিত্রশক্তিও এ সম্বন্ধে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করিয়াছেন। প্রভূত সৈন্য এবং সমরোপকরণ পাঠাইয়া ঐ অঞ্চলের ঘাঁটিগুলি সুদৃঢ় করা হইতেছে অর্থাৎ ভারতবর্ষ এবং সাইবেরিয়া উভয় দেশেরই গুরুত্ব অনুপেক্ষণীয়, ফলে উভয় অঞ্চলেই জাপ আক্রমণের আশঙ্কা যে বর্তমান তাহা সুস্পষ্ট। আবার অষ্ট্রেলিয়ার গুরুত্বকেও অস্বীকার করা যায় না। ফলে জাপান যে কোন্ দিকে তাহার অভিযান পরিচালনা করিবে তাহা এখনও অস্পষ্টই রহিয়াছে—অনুমানের ওপরই নির্ভর। প্রশান্ত মহাসাগরে জাপ নৌবহরের আধিপত্য বজায় রাখিতে হইলে এবং ইঙ্গ-মার্কিন যোগসূত্র সমুদ্র পথে বিচ্ছিন্ন করিতে হইলে অষ্ট্রেলিয়া এবং তাহার পূর্ব দিকস্থ দ্বীপগুলি জাপানের দখল করা প্রয়োজন। আবার টোকিওর নিরাপত্তা রক্ষা করিতে হইলে সাইবেরিয়ার দিকে মনোযোগ না দিয়া উপায় নাই। তবে আমাদের মনে হয় জাপান হঠাৎ সাইবেরিয়া আক্রমণ করিবে না। জাপ-রুশ চুক্তি এখনও বলবৎ আছে এবং জাপান নূতন করিয়া রুশিয়াকে শত্রু করিতে বর্তমানে অনিচ্ছুক হওয়াই সম্ভব। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি এবং এখনও আমাদের বিশ্বাস যদি মিত্রশক্তি ইয়োরোপে দ্বিতীয় রণাঙ্গন সৃষ্টি করেন তাহা হইলে তাহা জার্মানীর প্রতিকূলে যাইবে। সেই অবস্থায় জার্মানীর পক্ষে আপনার উপর চাপ প্রশমিত করিবার উদ্দেশ্যে জাপানকে সাইবেরিয়া আক্রমণে প্ররোচিত করা আদৌ অসম্ভব নয়। স্বীয় মিত্রকে সেই বিপদে সাহায্যের জন্য এবং ঐ সুযোগে দীর্ঘ ঈপ্সিত ভ্লাদিভোষ্টক বন্দর লাভ ও টোকিওকে নিরাপদ করিবার উদ্দেশ্যে জাপান জাপ-রুশ চুক্তি ভঙ্গ করিয়া স্বীয় স্বার্থ সিদ্ধির উদ্দেশ্যে রুশিয়ার বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করিতে পারে।

উত্তর আফ্রিকা

উত্তর আফ্রিকায় জেনারেল রোমেলের বাহিনী মিত্রশক্তির বিরুদ্ধে যে অভিযান পরিচালনা করিয়াছে তাহা মিত্রশক্তির অনুকূলে যায় নাই। গাজালা হইলে শত্রু সৈন্য আক্রোমা, নাইটস্ ব্রিজ, এল্ আদেম ঘাঁটিতে আক্রমণ করিয়া বৃটিশ বাহিনীকে পশ্চাদপসরণে বাধ্য করে এবং তব্রুকও বিচ্ছিন্ন-সম্পর্ক হইয়া যায়। দীর্ঘ সাত মাস কাল তব্রুক অবরুদ্ধ অবস্থায় ছিল। কিন্তু জেনারেল রোমেল আক্রমণ আরম্ভ করিবার সঙ্গে সঙ্গে মিত্রশক্তির ওপর যে প্রবল চাপ দেন তাহার ফলে মিত্রশক্তির পক্ষে লিবিয়া পরিত্যাগ ব্যতীত আর কোন উপায় থাকে না এবং এই প্রচণ্ড আক্রমণের নিষ্পত্তি হয় তব্রুকের পতনে। শত্রুপক্ষের সংখ্যাগরিষ্ঠ সৈন্য এবং প্রচুর সমরোপকরণের জন্যই জেনারেল রোমেল সাফল্য লাভ করিয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে। কিন্তু এই যুক্তি আজ নূতন নয়। মালয় এবং ব্রহ্মদেশের যুদ্ধেও আমরা বহুবার মিত্রশক্তির পশ্চাদপসরণের কারণ হিসাবে এই কথাই শুনিয়াছি। প্রাচ্যের রণাঙ্গনে ইহা ঘটা অসম্ভব নয়, কারণ জাপানের অতর্কিত আক্রমণের বিরুদ্ধে মিত্রশক্তিকে প্রতিরোধ প্রদান করিতে হইয়াছে। কিন্তু লিবিয়ার যুদ্ধ নূতন নয়, অতর্কিত আক্রমণের প্রশ্ন এখানে ওঠে না, মিত্রশক্তির সমরোপকরণ যে প্রতিদিন দ্রুত হারে বৃদ্ধি পাইতেছে তাহাও অস্বীকার করা যায় না, কিন্তু তবু যুদ্ধের পরিণতি হইল জেনারেল রোমেলের সাফল্য লাভে! বন্দর হিসাবেও তব্রুক যথেষ্ট উন্নত। অথচ নৌবাহিনী এখানে যুদ্ধের কোন অংশই গ্রহণ করে নাই। একবারে শেষ সময়ে তব্রুকের মধ্যে জার্মান ট্যাঙ্ক প্রবেশের সঙ্গে মিত্রশক্তির নৌবহর তব্রুক বন্দর পরিত্যাগ করিয়া নিরাপদ স্থানে সরিয়া যায়। জার্মান আক্রমণ প্রতিহত করিবার জন্য সমুদ্র পথে তব্রুকে যে নূতন সৈন্য বা সমরোপকরণ যুদ্ধের সঙ্কট কালে পৌছিয়াছে তাহাও নহে, এরূপ কোন সংবাদ পাওয়া যায় নাই। ভূমধ্য সাগরে মিত্রশক্তির নৌবাহিনীর প্রভাব এখনও একেবারে ক্ষুণ্ণ হয় নাই, অথচ জার্মান সেনার বিরুদ্ধে যুদ্ধরত লিবিয়ায় বৃটিশবাহিনী সময়মত সাহায্য লাভ করিতে পারিল না ; কোন কোন বৃটিশ মহলের অভিমত যে, লিবিয়ায় সমরোপকরণ ছিল যথেষ্ট, কিন্তু ১৩ই জুন যে ক্ষতি হয় তাহার পর শত্রুর রণসম্ভারের সহিত আর সমতা রক্ষা করা যায় নাই। দ্বিতীয়তঃ জুনের প্রারম্ভে মিত্রশক্তি আক্রমণের আয়োজন করিতেছিল কিন্তু রোমেলের বাহিনীকে আক্রমণোদ্যত দেখিয়া মিত্রশক্তি প্রতিরোধ পন্থা এবং আক্রমণ ব্যবস্থা অবলম্বন করে। কিন্তু আমাদেব বিশ্বাস যদি সময় মত নূতন সমর সম্ভার লিবিয়ায় আসিয়া পৌছিত তাহা হইলে ১৩ই জুনের ক্ষতি সহ্য করা কঠিন হইত না। দ্বিতীয়টি হইতেছে সমরনীতির কথা। প্রথম আক্রমণকারী যে যুদ্ধে যথেষ্ট সুবিধা লাভ করে ইহা নিঃসন্দেহ। রোমেলের বাহিনী প্রথমে আক্রান্ত হইলে যুদ্ধের অবস্থা এইরূপই থাকিত কি না বলা যায় না। আশা করা যায় ভবিষ্যৎ অনুসন্ধানে যে সব তথ্যাদি প্রকাশিত হইবে তাহাতে এই সকল সম্ভাব্য প্রশ্নের সন্তোষজনক সদুত্তর পাওয়া যাইবে। কিন্তু তব্রুকের ন্যায় বন্দরের পতনে একদিকে জেনারেল রোমেল সরবরাহের দিক দিয়া যেমন লাভবান হইলেন, তেমনি ভূমধ্য সাগরস্থ বৃটিশ নৌবাহিনীর উপরও ইহার যথেষ্ট প্রভাব পড়িল। মাল্টার সহিত সংযোগ রক্ষাও হইল অধিকতর বিঘ্নসঙ্কুল ; প্রকৃতপক্ষে মাল্টা হইতে মিত্রশক্তির নিকটতম ঘাঁটির ব্যবধান দাঁড়াইল আটশত মাইলেরও অধিক।

বর্তমানে জেনারেল রোমেলের বাহিনী মিশরে প্রবেশ করিয়াছে। আক্রোমা এবং এল্ আদেম হইয়া একটি পথ আসিয়াছে ফোর্ট কাপুজোতে। ডের্ণা হইতে গাজালা, তব্রুক, গাম্বাট প্রভৃতি হইয়া অপর একটি মোটর যান চলার উপযোগী পথ আসিয়া ফোর্ট কাপুজোতে মিলিয়াছে। এই দ্বিতীয় পথের উপরে সিদি আজিজ। সিদি আজিজ হইতে বার্দিয়া পর্য্যন্ত গুরু রণসম্ভার পরিচালনার উপযোগী রাস্তা আছে। বার্দিয়া পূর্ব হইতেই জার্মানীর অধিকারে। ফলে ফোর্ট কাপুজোতেও রোমেলের বাহিনীকে উপযুক্ত বাধা প্রদান সম্ভব হয় নাই। কাপুজো হইতে সাল্লাম হইয়া প্রথম পথটি গিয়াছে আলেকজান্দ্রিয়া অভিমুখে। হালফায়া গিরিপথ এই রাস্তার সহিত সংযুক্ত। সম্প্রতি সংবাদে প্রকাশ জেনারেল (অধুনা পদোন্নতি বলে ফিল্ড মার্শাল) রোমেলের বাহিনী মিশরের অভ্যন্তরে ৯৫

মাইল প্রবেশ করিয়াছে এবং ১৫ মাইল দূরে মিত্রবাহিনী মার্সা মাত্রুতে শত্রুপক্ষকে বাধাদানের জন্য প্রস্তুত হইয়া আছে। মিশরের প্রধান মন্ত্রী নিরপেক্ষতা ঘোষণা করিয়াছেন এবং বৃটেন যে তাহাকে জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্ররোচিত করিতে চাহিয়াছে তাহাও অস্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু তাহা হইলেও যুদ্ধ এখন মিশরের বুকের ওপর এবং নিরপেক্ষতা অবলম্বন করিলেও যুদ্ধের তাণ্ডব লীলার হাত হইতে মিশর আপনাকে রক্ষা করিতে পারে না, পথে ঘাটে রণদানবের কর স্পর্শে ধ্বংসের চিহ্ন দুষ্ট ক্ষতের মতই আত্মপ্রকাশ করিবে। জার্মান বাহিনীর এই অভিযানের লক্ষ্য কি, রুশ-জার্মান যুদ্ধের অবস্থা লক্ষ্যান্তে আমরা তাহার আলোচনা করিব।

রুশ-জার্মান সংগ্রাম

খারকভের যুদ্ধের অবস্থায় বিশেষ কোন পরিবর্তন আসে নাই। এই 'ইস্পাতের যুদ্ধে' রুশবাহিনীর প্রবল চাপ ব্যাহত করিবার উদ্দেশ্যে ফন বক্ যে ইজুম-বার্ভেঙ্কোভে অঞ্চলে প্রতি-আক্রমণ চালাইয়াছিলেন 'ভারতবর্ষ'-এর গত সংখ্যাতেই আমরা তাহার উল্লেখ করিয়াছি। ফন বকের এই কৌশল যে একেবারে ব্যর্থ হইয়াছে তাহা বলা যায় না, রুশসৈন্যের আক্রমণের বেগ যথেষ্ট মন্দীভূত হইয়াছে। তদুপরি আমরা উক্ত সংখ্যাতেই বলিয়াছিলাম যে, উভয় পক্ষের শক্তি এক সমতায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু শত্রুর বিরুদ্ধে চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করিতে হইলে অন্ততঃ তিনগুণ শক্তিশালী হওয়া প্রয়োজন। নাৎসী অথবা সোভিয়েট যে পক্ষ নূতন সৈন্য এবং সমরোপকরণ রণক্ষেত্রে আমদানি করিতে পারিবে যুদ্ধের অবস্থা তাহারই অনুকূলে যাইবে। বর্তমানে খারকভের যুদ্ধ এই অবস্থায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। প্রচুর সৈন্য এবং রণসম্ভার বিনষ্ট হওয়া সত্ত্বেও নাৎসী বাহিনী কয়েক ডিভিসন নূতন সৈন্য খারখভ রণাঙ্গনে প্রেরণ করিয়াছে। স্থানে স্থানে আক্রমণাত্মক যুদ্ধ পরিচালনা করিয়া নাৎসীবাহিনী রুশসৈন্যের ওপর প্রবল চাপ দিয়া অভ্যন্তরে প্রবেশ করিবার চেষ্টা পাইতেছে। খারকভের ৬০ মাইল দক্ষিণ-পূর্বে কুপিয়ানস্ক্-এ রুশবাহিনীর একাংশ পশ্চাদপসরণ করিয়াছে। জার্মানী এই সাফল্য লাভ করিয়াছে অপরিমিত ক্ষতির বিনিময়ে।

সেবাস্তোপোলেও জার্মান আক্রমণ চলিয়াছে প্রবল ভাবে। সহস্রাধিক বিমান এবং আট ডিভিসনের অধিক সৈন্য জার্মানী এই অঞ্চলে নিয়োগ করিয়াছে। তদুপরি প্রতিদিন নূতন সমরসম্ভার ও সৈন্য প্রেরিত হইতেছে। প্রতি ইঞ্চি জমির জন্য জার্মানীকে ত্যাগ স্বীকার করিতে হইতেছে প্রচুর। জার্মানী যে অঞ্চল দখলের জন্য অভিযান পরিচালনা করিয়াছে, অগণিত সৈন্য এবং অতুল রণসম্ভার বিনষ্ট করিয়াও সেই অঞ্চলে সাফল্য লাভে অগ্রসর হইতে পরাঙ্মুখ হয় নাই—নাৎসী রণনীতির ইহা একটি বৈশিষ্ট্য। সেবাস্তোপোলেও নাৎসী বাহিনী সেই একই নীতি পরিগ্রহ করিয়াছে। প্রকৃতপক্ষে স্থলপথে সেবাস্তোপোল এখন অবরুদ্ধ। কৃষ্ণসাগরস্থ সোভিয়েট নৌবহর দক্ষিণ ক্রিমিয়া দিয়া সংযোগ এবং রসদ সরবরাহ ব্যবস্থা রক্ষা করিতেছে। ককেশাসের বিভিন্ন ঘাঁটি হইতে কয়েকদল রুশসৈন্য জার্মানীর প্রবল বাধা প্রদান সত্ত্বেও দক্ষিণ ক্রিমিয়ার স্থানে স্থানে অবতরণ করিয়াছে। সেবাস্তোপোলের পূর্বে ইন্‌কারমন্‌-এ প্রবল সঙ্ঘর্ষ বাধিয়াছে। এই নূতন রুশবাহিনীকে বাধা দানের নিমিত্ত সিম্‌ফারোপোল এবং থিওডোসিয়া হইতে নাৎসীবাহিনী আনিতে হইতেছে।

কিন্তু খারকভ্‌, ক্রিমিয়া এবং উত্তর আফ্রিকায় জার্মানীর একসঙ্গে এত অধিক মনোযোগ দিবার কারণ কি? যতদূর অনুমান করা যাইতে পারে, হিটলারের প্রধান লক্ষ্য ককেশাশ। ক্রিমিয়াকে অক্ষত অবস্থায় পশ্চাতে রাখিয়া হিটলার ককেশাশে অভিযান পরিচালনা করিবেন এতটা বুদ্ধিহীনতা তাঁহার নিকট আশা করা অন্যায়। অধিকন্তু ক্রিমিয়ায় নাৎসী প্রাধান্য স্থাপিত হইলে কৃষ্ণসাগরস্থ সোভিয়েট নৌবহরের ওপর তাহার যথেষ্ট প্রভাব পড়িবে। এদিকে খারকভ হইতে রষ্টোভ ও আরও দক্ষিণ-পূর্ব পর্যন্ত নাৎসী বাহিনী যদি অগ্রসর হইতে পারে তাহা হইলে রুশিয়ার প্রধান ভূখণ্ডের সহিত ককেশাশের সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা যাইবে। ককেশাশস্থ রুশবাহিনীও মূলবাহিনী হইতে বিশ্লিষ্ট হইয়া পড়িবে। এদিকে আফ্রিকায় রোমেলের বাহিনী যদি সুয়েজ পর্যন্ত পৌছিতে পাবে তাহা হইলে ভূমধ্য সাগরে নাৎসী প্রাধান্য বিস্তার হইবে সহজ এবং দক্ষিণ দিক হইতে ককেশাশে সাহায্য প্রেরণ করাও কঠিন হইয়া দাঁড়াইবে। নাৎসী সাঁড়াশী বাহিনীর এক বাহুর এই সময়ে সিরিয়ার মধ্য দিয়া ইরাকে প্রবেশ করা অসম্ভব নয়। জেনারেল রোমেলের বাহিনী প্যালেষ্টাইন এবং সিরিয়ার মধ্য দিয়া অগ্রসর হইতে পারে বটে, কিন্তু তদপেক্ষা নৌবহরের সহযোগে নূতন সৈন্য নামাইয়া তাহার দ্বারা অভিযান পরিচালনা অধিকতর সম্ভব এবং সুবিধাজনক বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু কৃষ্ণসাগর ও ভূমধ্য সাগরে নাৎসী নৌশক্তির প্রভাব প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে এবং সিরিয়াব মধ্য দিয়া নূতন এক বাহিনী প্রেরণ করিতে হইলে ফ্রান্সের সহযোগ জার্মানীর পক্ষে অত্যাবশ্যক। জার্মানীকে সর্বতোভাবে সাহায্য করিবার জন্য মঃ লাভালের বক্তৃতা এই উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত জমি প্রস্তুতের প্রচেষ্টা হওয়া একেবারে অসম্ভব নয়। জার্মানীর পক্ষে বর্তমানে ককেশাশের প্রয়োজন কতখানি তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন। বর্তমান যান্ত্রিক যুদ্ধে তৈলের প্রয়োজন সর্বাগ্রে, সেই সঙ্গে আছে বিশাল বাহিনীর খাদ্যসংগ্রহের সমস্যা। ককেশাশ অধিকার করিতে পারিলে হিটলার এই দুই সমস্যার হাত হইতে নিস্তার পান। অন্ততঃ ককেশাশের তৈল নিজে লাভ করিতে না পারিলেও রুশিয়াকে তাহা হইতে বঞ্চিত করিতে পারিলেই যে রুশিয়ার সংগ্রামশক্তির ওপর তাহার যথেষ্ট প্রভাব পড়িবে তাহা হিটলার বোঝেন।

ইঙ্গ-রুশ চুক্তি

১৯৪২ সালে পৃথিবীর ইতিহাসে আর একটি বিশেষ স্মরণীয় ঘটনা ঘটিয়াছে। গত ২৬-এ মে বৃটেন ও রুশিয়ার মধ্যে এক সন্ধি হইয়াছে, আগামী দীর্ঘ বিশবৎসর কাল উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে প্রীতিবন্ধন দৃঢ়তর করাই ইহার উদ্দেশ্য। রুশিয়ার পক্ষ হইতে সন্ধিতে স্বাক্ষর করেন মঃ মলোটভ এবং মিঃ ইডেন স্বাক্ষর করেন বৃটেনের পক্ষে। এগার মাস পূর্বে ১৯৪১ সালের জুলাই মাসে বৃটেন ও রুশিয়ার মধ্যে সম্পাদিত হইয়াছিল সামরিক চুক্তি, কিন্তু এই চুক্তি উহা অপেক্ষা যথেষ্ট ব্যাপক। চুক্তির প্রধান সর্তাবলী হইতেছে: জার্মানী ও তাহার সহযোগী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধে

উভয় পক্ষ পরস্পরকে সামরিক সাহায্য প্রদান করিবে ; সহযোগীর সম্মতি ব্যতীত কোন পক্ষই কোন বর্তমান শত্রুরাষ্ট্রের সহিত কোন প্রকার চুক্তিতে আবদ্ধ হইবে না ; যুদ্ধাবসানের পর যদি জার্মানী কিংবা তাহার কোন সহযোগী রাষ্ট্র স্বাক্ষরকারী কোন পক্ষকে পুনরাক্রমণ করে, তাহা হইলে অপর সহযোগী তাহাকে সাধ্যমত সাহায্য প্রদান করিবে ; যুদ্ধোত্তর কালে কেহ পররাজ্য গ্রাস করিবে না এবং অন্য রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিবে না, উভয় পক্ষ পরস্পরকে সাধ্যমত সর্বরকমে আর্থিক সাহায্য প্রদান করিবে ; শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইলে উভয় পক্ষ ইয়োরোপে আর্থিক সমৃদ্ধি বৃদ্ধি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠার জন্য ঘনিষ্ঠ ও সৌহার্দ্দ্যপূর্ণ সহযোগিতা করিবে। এই চুক্তির ফল যে কিরূপ সুদূরপ্রসারী এবং বিশ্বজনগণের কোন্ শুভলগ্নের অদৃশ্য ইঙ্গিত ইহার মধ্যে রহিয়াছে পৃথিবীর ভবিষ্যৎ ইতিহাসই তাহা অনাবৃত করিয়া দেখাইবে। যুদ্ধ ও যুদ্ধোত্তরকালীন সন্ধি এক নয়, উভয়ের মধ্যে প্রভেদ যথেষ্ট। শান্তি প্রতিষ্ঠার পরেও বৃটেন এবং রুশিয়ার ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা অনাগত দিনের প্রতি মিত্রশক্তির মনোভাবের পরিচয় সূচিত করিতেছে। যুদ্ধাবসানে সাম্রাজ্যবাদী ভার্সাই সন্ধির প্রশ্ন নাই। পৃথিবীকে লইয়া ভাগ বাঁটোয়ারা করিবার ব্যবস্থা নাই, পররাষ্ট্র-বিজয় লিপ্সা পরিত্যাগ করিয়া স্বাধীন ইয়োরোপ গঠন ও ভবিষ্যৎ জগতের পুনর্গঠনই এই সন্ধির লক্ষ্য এবং সেই কারণেই ১৯৪২ সালের ২৬-এ মে পৃথিবীর ইতিহাসে একটি বিশিষ্ট দিন।

এই সঙ্গে আর একটি বিষয় আছে—নাৎসী শক্তির বিরুদ্ধে দ্বিতীয় রণাঙ্গন সৃষ্টি। দ্বিতীয় রণক্ষেত্র সৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা আমরা একাধিকবার বলিয়াছি, বৃটিশ জনগণও এই দাবী বারম্বার জানাইয়াছে—সম্প্রতি বৃটেন এবং সোভিয়েট রুশিয়ার সামরিক সাহায্যের ঘনিষ্ঠ সহযোগিতার মধ্য দিয়া নাৎসী বর্বরতার বিরুদ্ধে দ্বিতীয় রণক্ষেত্র সৃষ্টির প্রয়োজনীয়তার কথাই স্বীকৃত হইয়াছে। সম্প্রতি মিঃ চার্চিল আমেরিকায় গিয়া প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টের সহিত আলাপ আলোচনা করিয়া আসিয়াছেন। সুদূরপ্রাচী ও প্রতীচির রণনীতি, বিভিন্ন মিত্রশক্তির নিকট সমরোপকরণ সরবরাহের সমস্যা এবং নাৎসী শক্তির মূলে অচিরে কুঠারাঘাত করিবার উপায় সম্বন্ধেই আলোচনা এবং ব্যবস্থা হইয়াছে। মিঃ চার্চিল হৃষ্ট চিত্তেই ফিরিয়া আসিয়াছেন, কিন্তু অযথা বাগাড়ম্বর করেন নাই, কারণ ইহা তাঁহার স্বভাববিরুদ্ধ ; কিন্তু অদূর ভবিষ্যতেই যে দ্বিতীয় রণক্ষেত্রের সৃষ্টি হইবে মিঃ চার্চিলের স্বল্পোক্তির মধ্যেই তাহার স্পষ্ট প্রকাশ। প্রধান মন্ত্রীর লণ্ডনে প্রত্যাগমনের একঘণ্টা পরেই যে বিবৃতি বাহির হয় তাহাতে বলা হইয়াছে—

While our plans for obvious reasons can not be disclosed, it can be said that the coming operations which were discussed in detail at the Washington conferences between ourselves and our respective military advisers will divert German strength from the attack on Russia. আমাদের পরিকল্পনা প্রকাশ না করিবার কারণ স্পষ্ট হইলেও একথা বলা চলে যে, ওয়াশিংটনের আলোচনায় আমাদের এবং পরস্পরের সামরিক উপদেষ্টাদের মধ্যে যে কর্মপন্থা সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা হইয়াছে তাহার ফলে রুশিয়া আক্রমণে নিযুক্ত জার্মান সামরিক শক্তি শীঘ্রই অন্যত্র পরিচালিত হইবে। দ্বিতীয় রণাঙ্গন সৃষ্টির এই স্পষ্ট ইঙ্গিত যত শীঘ্র কার্যে পরিণত হইবে, নাৎসী শক্তির ধ্বংসের সময় ততই অগ্রবর্তী হইবে। ২৮-৬-৪২

স্ত্রী-ধন ও উত্তরাধিকার

শ্রীনারায়ণ রায় এম-এ, বি-এল

কয়েক দিন পূর্ব্বে এক ভদ্র মহিলা তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার স্বোপার্জ্জিত অর্থে ক্রীত সম্পত্তি কে পাইবে—এই সম্বন্ধে প্রশ্ন করিতেছিলেন। এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হইলে স্ত্রীধনের উত্তরাধিকারত্ব নির্ণয়ের যে বিশেষ ব্যবস্থা আছে তাহা জ্ঞাত থাকা প্রয়োজন। এইক্ষণে প্রশ্ন উঠিতে পারে স্ত্রীধন কি? নারদ, মনু, কাত্যায়ন প্রমুখ শাস্ত্রকারগণ তাহা বলিয়া গিয়াছেন ; বর্ত্তমান প্রবন্ধে তাহার বিশদ উল্লেখের প্রয়োজন দেখি না। বঙ্গদেশে প্রচলিত দায়ভাগ ও বঙ্গের বাহিরের মিতাক্ষরার মধ্যে আবার শাস্ত্রকারগণ কৃত শ্লোকের ব্যাখ্যার প্রভেদ দৃষ্ট হয়।

স্ত্রীলোকের সম্পত্তির উত্তরাধিকারত্ব নির্ণয় করিবার কালে আমরা দেখিতে পাই যে, কোন স্ত্রীলোকের মৃত্যুর পর তাঁহার স্বামীর উত্তরাধিকারীরাই তাহার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী কিন্তু স্ত্রীধনের পক্ষে এই নিয়ম প্রযোজ্য নহে। তাহার স্ত্রীধনের উত্তরাধিকারী তাহার নিজস্ব উত্তরাধিকারী। স্ত্রীধনে তাহার পূর্ণ অধিকার—ইহা জীবন স্বত্ব বা ঐ অনুরূপ কিছু নহে। স্ত্রীলোক নিব্যূঢ় স্বত্বে যাহা পায় তাহাই তাহার স্ত্রীধন। যদি এইরূপ ব্যবস্থা থাকে যে, কোন বিশেষ সম্পত্তির আয় হইতে তাহার জীবিকা নির্ব্বাহিত হইবে তাহা হইলে সেই সম্পত্তি বা তাহার পূর্ণ আয় তাহার স্ত্রীধন নহে ; কিন্তু জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য যে অর্থ সে পাইয়াছে তাহা তাহার স্ত্রীধন বা সেই অর্থের দ্বারা সে যদি কোন সম্পত্তি ক্রয় করিয়া থাকে তাহাও তাহার স্ত্রীধন (১)। যদি কোন স্ত্রীলোক কোন আত্মীয়ের নিকট হইতে কোন সম্পত্তি নিব্যূঢ় স্বত্বে পাইয়া থাকে তাহা তাহার স্ত্রীধন—অন্যথায় নহে। স্ত্রীলোকের স্বোপার্জ্জিত অর্থও তাহার স্ত্রীধন।

উত্তরাধিকার ব্যাপারে স্ত্রীধনকে দুইটী বিশিষ্ট ভাগে ভাগ করা হইয়াছে (ক) কুমারীর সম্পত্তি ও (খ) বিবাহিতার সম্পত্তি। দায়ভাগকার আবার আরও এক ধাপ উচ্চে উঠিয়াছেন। তিনি বিবাহিতার সম্পত্তি, যৌতুক-সম্পত্তি ও অযৌতুক-সম্পত্তি এইভাবে বিভাগ করিয়াছেন।

বিবাহকালে বা দ্বিরাগমনের সময়ে প্রাপ্ত ধনরত্ন বা সম্পত্তি যৌতুক স্ত্রীধন। অপরাপর সকল প্রকার স্ত্রীধন যথা নিকটাত্মীয়ের স্নেহের দান, স্বামীর দান, স্বোপার্জ্জিত অর্থ ইত্যাদি অযৌতুক-স্ত্রীধন।

বিবাহিতা নারীর স্ত্রীধন-এর উত্তরাধিকারী নির্ণয়ে মিতাক্ষরা ও দায়ভাগের মধ্যে গোলযোগ রহিয়াছে। বঙ্গদেশে দায়ভাগ প্রচলিত সুতরাং আমরা দায়ভাগ সম্বন্ধেই আলোচনা করিব। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে বিবাহিতা নারীর স্ত্রীধনকে দায়ভাগ দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছে যথা যৌতুক ও অযৌতুক। যৌতুক-সম্পত্তির উত্তরাধিকারীগণের উল্লেখ (তাহাদিগের দাবীর ক্রম হিসাবে) নিম্নে করা যাইতেছে :—

(১) সুব্রামনিয়ন বনাম অরুণাচলম ২৮ ম্যাড্রাস ১

(১) অবিবাহিতা কন্যা (২) বাক্‌দত্তা কন্যা (৩) বিবাহিতা কন্যা—বিবাহিতা কন্যাগণের মধ্যে সন্তানবতী বা যাহার সন্তান হইবার সম্ভাবনা আছে তাহার দাবী অগ্রে (৪) পুত্র (৫) দৌহিত্র (৬) পৌত্র (৭) প্র-পৌত্র ইহাদিগের পরে, ব্রাহ্ম, দৈব, আর্য, প্রাজাপত্য বা গান্ধর্ব্ব বিবাহ হইয়া থাকিলে (৮) স্বামী (৯) ভ্রাতা (১০) মাতা (১১) পিতা (১২) স-পত্নী পুত্র ইত্যাদি কিন্তু আসুর, রাক্ষস অথবা পৈশাচ বিবাহ হইলে (৮) মাতা (৯) পিতা (১০) ভ্রাতা (১১) স্বামী (১২) স-পত্নী পুত্র। বর্ত্তমানে অষ্ট প্রকারের বিবাহের প্রচলন নাই। প্রায় সর্ব্বত্র ব্রাহ্ম বিবাহই প্রচলিত সুতরাং শেষোক্ত ক্রমের কার্য্যকারিতা এ যুগে আর নাই।

অযৌতুক-স্ত্রীধনের উত্তরাধিকারীগণ নিম্নে ক্রম অনুসারে দাবী করিতে পারে।

(১) পুত্র ও অবিবাহিতা কন্যা (২) সন্তানবতী কন্যা বা যে কন্যার সন্তান হইবার সম্ভাবনা আছে (৩) পৌত্র (৪) সপত্নী পুত্র ও সপত্নী কন্যা একত্রে (৫) নিঃসন্তান কন্যা (৭) প্র-পৌত্র (৮) সহোদর ভ্রাতা (৯) মাতা (১০) পিতা (১১) স্বামী (১২) সপত্নী পুত্র

ইহাদিগের পরে যৌতুক বা অযৌতুক উভয় প্রকার সম্পত্তিরই উত্তরাধিকারীগণের ক্রম নিম্নরূপ :—

(১৩) স্বামীর অনুজ (১৪) স্বামীর ভ্রাতার পুত্র (১৫) ভগিনীর পুত্র (১৬) ননদিনী-পুত্র (১৭) ভ্রাতুষ্পুত্র (১৮) জামাতা (১৯) স্বামীর সপিণ্ড (২০) স্বামীর সাকুল্য (২১) স্বামীর সমানোদক (২২) পিতার সপিণ্ড (২৩) মাতার জ্ঞাতী ইত্যাদি।

প্রথম দৃষ্টিতেই ইহার অসামঞ্জস্য ধরা পড়ে। যে ভদ্র মহিলার কথা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি স্বামীর সহিত তাঁহার কোন সম্পর্ক নাই। স্বামী-গৃহের সহিত সকল সম্পর্ক চুকিয়া গিয়াছে, স্বামী পুনরায় বিবাহ করিয়াছেন ও পুত্রকন্যার জন্মদান করিয়াছেন। এই ভদ্র মহিলা পিতৃগৃহে লালিতাপালিতা হইয়া লেখাপড়া শিখিয়াছেন ও তাহারই সাহায্যে জীবিকা অর্জ্জন করিতেছেন—উদ্বৃত্ত অর্থে কিছু ভূ-সম্পত্তিও খরিদ করিয়াছেন। তিনি ভাবিতেই পারেন না যে তাঁহার অবর্ত্তমানে, যে ভ্রাতুষ্পুত্রকে তিনি সন্তানবৎ স্নেহ করিতেছেন সেই ভ্রাতুষ্পুত্রকে বিতাড়িত করিয়া তাঁহারই সম্পত্তি দখল করিবে তাঁহার সহিত সকল সম্পর্কহীন তাঁহার সপত্নী-পুত্র ও সপত্নী-কন্যা; ভ্রাতুষ্পুত্রের পূর্ব্বে ননদিনীর পুত্রই বা কিরূপে তাহার উত্তরাধিকারত্ব দাবী করিতে পারে তাহা বুঝিতে পারে না।

হিন্দুর বিবাহ-বিচ্ছেদ হয় না। হিন্দুনারী স্বামীর অর্দ্ধাঙ্গ সুতরাং স্বামীর সহিত তাহার বিচ্ছেদ ঘটিবার নহে—ইহলোকে বিচ্ছেদ হইলেও পরলোকে উহা নাকি পাটের ভিজা দড়ির গিরার মতই শক্ত থাকে—কোনক্রমেই খুলিবার নহে। বর্ত্তমানে এসকল যুক্তির কোন সারবত্তাই নাই। আদর্শবাদের যুগ চলিয়া গিয়াছে। বর্ত্তমানের কঠিন বাস্তবের সম্মুখে দাঁড়াইয়া শাস্ত্রের বাঁধা বুলি কপচাইবার আবশ্যকতা আর নাই। মুখে আমরা যত বড়াই করিনা কেন, যতই বলি না কেন নারীকে আমরা—হিন্দুরা যত সম্মান দিয়াছি এমন আর কেহ দেয় নাই, তাহাকে আমরা দেবীর আসনে স্থাপন করিয়াছি ইত্যাদি, একথা আমরা কোন মতেই অস্বীকার করিতে পারি না যে, আমাদিগের দেশে, আমাদিগের সমাজেই নির্য্যাতিতা নারীর সংখ্যা সর্ব্বাধিক। তাহাদিগকে ঘরে বাহিরে নির্য্যাতন সহ্য করিতে হয়। কত বালিকা শশুরালয়ের অকথ্য নির্যাতন সহ্য করিতে না পারিয়া আত্মহত্যা করে, কত বালিকা স্বামী শাশুড়ী ও ননদিনীর অত্যাচারে শশুরালয় ত্যাগ করিয়া, স্বামীগৃহ ত্যাগ করিয়া পিতৃগৃহে আশ্রয় লইতে বাধ্য হয় কে তাহার পূর্ণ সংবাদ রাখে! যাহারা পিতৃগৃহে আশ্রয় লয় তাহারাও সকলেই সুখে দিনাতিপাত করে তাহা বলিতেছি না। তবে তাহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ যে অন্ততঃ পিতা বা ভ্রাতার সম্পূর্ণ গলগ্রহ হইয়া না থাকিয়া কায়িক পরিশ্রমের সাহায্যে নিজ নিজ জীবিকা নির্ব্বাহ করে ইহাত সত্য? বর্ত্তমান শিক্ষা-বিস্তৃতি ও স্ত্রী-স্বাধীনতার যুগে স্বামীগৃহ হইতে বিতাড়িতা বহু স্ত্রীই স্বাধীনভাবে জীবিকা অর্জ্জন করিতেছে। জীবন-মরণের সম্পর্কে সম্পর্কিত স্বামী দেবতার আশ্রয় হারাইলেও পিতামাতা তাহাকে ত্যাগ করিতে পারে না; সুতরাং তাহাদিগের পিতৃগৃহে আশ্রয় লওয়াই স্বাভাবিক। যাহারা সন্তানবতী তাহাদিগের কথা স্বতন্ত্র; কিন্তু নিঃসন্তান স্ত্রীলোক এইরূপে বাধ্য হইয়া পিতৃগৃহে আসিয়া ভ্রাতার পুত্রকন্যাকে নিজ অঙ্কে তুলিয়া লয় ও পুত্রকন্যার মতই স্নেহ যত্ন করে।

পিণ্ড-সিদ্ধান্তের সাহায্যে হিন্দুর উত্তরাধিকারী নির্ণীত হয় কিন্তু পিণ্ড-সিদ্ধান্ত স্ত্রীধনের উত্তরাধিকারী নির্ণয়ে সাহায্যকারী নয়। সুতরাং স্ত্রীধনের উত্তরাধিকারী-ক্রমের পরিবর্ত্তন হইলে হিন্দুধর্ম্মের রসাতলে যাইবার কোন আশঙ্কাই নাই। কার্য্যতঃ হাইকোর্টের নজীরে দেখা যায় যে বিচারপতিগণ বহুক্ষেত্রে এই নির্দ্দিষ্ট ক্রমের পরিবর্ত্তন করিয়াছেন। বিচারপতি মুখার্জ্জী পূর্ণচন্দ্র বনাম গোপাললাল (২) মামলায় অযৌতুক স্ত্রীধনের উত্তরাধিকারী হিসাবে সপত্নীপুত্র হইতে কন্যার পুত্রকে অগ্রে স্থান দিয়াছেন। দাশরথী বনাম বিপিনবিহারী (৩) মামলায় স্বামীর ভ্রাতা হইতে সৎ-ভগিনীর পুত্রকে উচ্চাসন দেওয়া হইয়াছে।

যৌতুক-স্ত্রীধনের উত্তরাধিকারীত্বে আবার স্বামী যত নির্য্যাতনকারীই হ'ক না কেন তাহার স্থান ভ্রাতার অগ্রে—সে ভ্রাতা ভগিনীকে যতই স্নেহ যত্ন করিয়া থাকুক। স্বামীগৃহ হইতে বিতাড়িতা হইয়া ভ্রাতার গৃহে আসিলে সে ভ্রাতা উত্তরাধিকারী হইবে না—হইবে সেই দুর্ব্বৃত্ত স্বামী যাহার অত্যাচারে স্ত্রীর জীবন বিপন্ন হইয়াছিল।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি স্ত্রীধনের উত্তরাধিকার ব্যাপারে পিণ্ড সিদ্ধান্তের কোন হাত নাই; সুতরাং উহার ক্রমের পরিবর্ত্তনে ধর্ম্ম বিপন্ন হইবার কোন আশঙ্কাই নাই। আবার বলি যদিও উহা ধর্ম্মের ব্যাপার হইত তাহা হইলেও এই ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটিতে বাধ্য।

এক্ষণে প্রশ্ন এই যে, কি উপায়ে ইহার পরিবর্ত্তন ঘটান যাইতে পারে? স্ত্রীধন থাকিলেই যে সে স্ত্রীলোক স্বামীগৃহ হইতে বিতাড়িত হইবে তাহার কোন অর্থ নাই সুতরাং সাধারণভাবে উত্তরাধিকারীর ক্রম পরিবর্ত্তন করিলে সৌভাগ্যবতী যে সকল স্ত্রীলোক পিত্রালয়ের সহিত সম্পর্কশূন্য হইয়া পতিগৃহে বাস করিতেছে তাহাদিগের মৃত্যুর পর তাহাদিগের সুখ-দুঃখের সঙ্গী স্বামীকে বঞ্চিত করিয়া পিতৃগৃহের সম্পর্কে সম্পর্কিত কেহ আসিয়া তাহার সম্পত্তি দখল করিতে পারে। পরিবর্ত্তন এমন ভাবে করিতে হইবে যেন তাহার মধ্যে এইরূপ গলদ না থাকে—অন্যথায় এক কু-কে ত্যাগ করিতে যাইয়া অধিকতর কু-কে সঙ্গী করিতে হইবে।

সুতরাং এই সম্পর্কে আমাদিগের প্রস্তাব এই যে, স্বামীগৃহ হইতে বিতাড়িতা স্ত্রীলোকের স্ত্রীধন (যৌতুক ও অযৌতুক) সম্পর্কে নূতন বিধান বিধিবদ্ধ হউক—যে বিধান মাত্র স্বামীগৃহ হইতে বিতাড়িতা নিঃসন্তান স্ত্রীলোকের স্ত্রীধন সম্বন্ধে প্রযোজ্য হইবে। (নিঃসন্তান স্ত্রীলোকের কথা এই জন্য বলিতেছি যে, সন্তানবতী রমণীর উত্তরাধিকারী নির্ণয়ে কোনরূপ গোলযোগের আশঙ্কা নাই—তাহার কন্যা ও পুত্রের দাবীই সর্ব্বাগ্রে) ও যাহার দ্বারা ঐরূপ স্ত্রীলোকের স্বামী বা তৎসম্পর্কিত সকল ব্যক্তিই উহার স্ত্রীধনের উত্তরাধিকারত্ব হইতে বঞ্চিত হইবে।

অযৌতুক-স্ত্রীধনের উত্তরাধিকারত্ব নির্ণয়ে আরও গণ্ডগোল রহিয়াছে। পিতার দানের ফলে যে স্ত্রীধন তাহার উত্তরাধিকার ক্রম একপ্রকার, আর অপর প্রকার স্ত্রীধনের উত্তরাধিকার ক্রম আর এক প্রকার। শেষোক্ত প্রকার স্ত্রীধনের উত্তরাধিকারগণের মধ্যে স্বামীর দাবী হইতে ভ্রাতার দাবী অগ্রে। অথচ স্বামীর দান উক্ত প্রকার স্ত্রীধনের অন্তর্গত। এইপ্রকার স্ত্রীধনের উত্তরাধিকারী ক্রমের পরিবর্ত্তন আবশ্যক কিনা তাহাও ভাবিবার বিষয়।

(২) ৮ সি, এল, জে ৩৬৯ (৩) ৩২ ক্যালকাটা ২৬১

এই প্রবন্ধে উত্তরাধিকারীক্রমের যে তালিকা দেওয়া হইয়াছে তাহা অধ্যাপক হীরালাল চক্রবর্তী মহাশয়ের গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত

বৃত্তি নির্ণয়ে মনোবিদ্যা

শ্রীশচীন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ এম-এ

বাংলায় একটা চলতি প্রবাদ আছে—"যার কাজ তারই সাজে, অন্য লোকের লাঠি বাজে।" প্রবাদটি গ্রাম্য হলেও—বৈজ্ঞানিক স্বতঃসিদ্ধ। মানুষ তার বুদ্ধি ও মানসিক বৃত্তি অনুসারে বিভিন্ন। পৃথিবীতে সবাই সব কিছু হতে পারে না। প্রত্যেক মানুষই কতকগুলি বিশিষ্ট গুণ ও দক্ষতা নিয়ে জন্মায়। তাই আইনষ্টাইন ও রবীন্দ্রনাথ দুইএকজনই হয়। আপনারা হয়ত বলবেন "কাজে পড়লেই শিখে নেবে।" কিন্তু সব সময় ঠেকে শেখা যায় না। এই 'ঠেকে শেখার' নীতির উপর নির্ভর করে আমাদের অনেক জাতীয় শক্তি ও সময়ের অপচয় হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রেই আফিসের বড়বাবুর ছেলে বুদ্ধিতে ছোট হলেও বড় সাহেবকে ধরে হয়ত একটা বড় চাকরীর যোগাড় করে নেয়। কিন্তু চাকরী পাওয়া সোজা—বজায় রাখাই কঠিন। চাকরী বজায় রাখতে হ'লে এবং পদোন্নতি হতে হলে কতকগুলি বিশিষ্ট গুণের প্রয়োজন। সওদাগরী অফিসে ত্রিশ বৎসর চাকুরী করে ৪০৲ বেতন পায়, আবার তারই সমসাময়িক পদোন্নতি হয়ে ৩০০৲ উঠে যায়। এই অসমতার গোড়ায় রয়েছে পদোপযুক্ত দক্ষতার অভাব। পদোপযুক্ত বুদ্ধি ও দক্ষতার অভাব ছিল তাই পদোন্নতি হয় নাই।

অনেক শিল্প ও যান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানে শিক্ষানবিস (apprentice) রাখা হয়। শিক্ষানবিশীরকাল ২।৩ বৎসর ঠিক আছে। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় নির্দ্দিষ্ট সময় অতীত হওয়ার পুর্ব্বেই অনেকে কাজ ছেড়ে চলে গেছে। তারপর যারা থাকে তাদের ভিতরও ২।৪জন মাত্র প্রতিষ্ঠানের কর্মোপযোগী হয়। বাকী যারা থাকে তারা কোন প্রকারে কাজ চালিয়ে নেয়। তাদের দ্বারা প্রতিষ্ঠানের বিশেষ কোনও উন্নতি হয় না বরং অনেক সময় বিপত্তির সৃষ্টি হয়। অনুপযুক্ত (misfit) শ্রমিকই যান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের ধর্ম্মঘটও আপতনের (accident) কারণ। কিন্তু প্রতিষ্ঠানের মালিকদের এদের শিক্ষার জন্য প্রভুত অর্থ ব্যয়িত হয়। মালিকদের অর্থ এবং শ্রমিকদের শ্রম বৃথাই নষ্ট হয়। তার একমাত্র কারণ মালিকেরা যে সমস্ত লোক শিক্ষানবিশরূপে নিযুক্ত করেছিলেন তারা ছিল ঐ কাজের অনুপযুক্ত। তাদের নিয়োগ কোন নিয়মের উপর হয় নাই। অনেক ক্ষেত্রেই কেবলমাত্র শারীরিক পরীক্ষা (medical examination) করেই তারা শ্রমিক নির্ব্বাচন করেন। কিন্তু শারীরিক সামর্থ্য ছাড়াও মানুষের কতকগুলি মানসিক গুণ ও দক্ষতা রয়েছে। এর উপর আমাদের বৃত্তি নির্ভর করে। এই সব গুণ ও দক্ষতার পরিমাপ করে বৃত্তি নির্ণয় করলে অনেক সুফল হয়। এই কাজের জন্য একদল বিশেষজ্ঞ মনোবিদের প্রয়োজন। মনোবিদেরা মানুষের ব্যক্তিগত গুণ ও দক্ষতা অনুযায়ী বৃত্তি নির্দ্ধারণ করে থাকেন।

বর্ত্তমানে সমস্ত সভ্য দেশেই এই প্রচেষ্টা হচ্ছে। ইয়ুরোপে জার্মাণী, ফ্রান্স, ইংলণ্ড, রুশিয়া এবং আমেরিকা তাদের যুবকদের প্রাথমিক শিক্ষা শেষ হওয়ার সঙ্গেই প্রথমতঃ যথোপযুক্ত বৃত্তি নির্ণয় করেন। বৃত্তি নির্ণয় করবার পর তাদের সেই বৃত্তি অনুযায়ী শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। জাপানও এই নীতির অনুসরণ করেছে। জাপানে দুইটী বৃত্তি প্রতিষ্ঠান (Vocational Institute) গঠিত হয়েছে। এই সব প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য হচ্ছে জাপানী ছাত্র ও যুবকদের শারীরিক ও মানসিক পরীক্ষা করে' তাদের যথোপযুক্ত বৃত্তি বিষয় উপদেশ দেওয়া। ইয়ুরোপ আমেরিকা ও জাপানের কৃতকার্য বাংলাকে আকৃষ্ট করেছে। বহুদিন যাবৎ এইরূপ একটী প্রতিষ্ঠানের অভাব প্রচ্ছন্নভাবে আমাদের দেশে অনুভূত হয়েছিল। এই অনুভূতির মূলে ছিল বাংলার বেকার সমস্যা। বাংলার শিক্ষিত যুবকেরা যখন দলে দলে বেকার অবস্থায় বিশ্ববিদ্যালয় হতে বের হতে লাগল তখন কতৃপক্ষ কি করবেন স্থির করতে পারলেন না। তদানীন্তন বিভিন্ন ভাইস-চেন্সেলরদের মনে বিভিন্ন পরিকল্পনা হতে লাগল। একজন প্রবেশিকা পরীক্ষার পাশের সংখ্যা কমিয়ে সমস্যার সমাধান করতে স্থির করলেন। তখন শতকরা ৪০-৪২জন পাশ করতে লাগল; কিন্তু এতে সমস্যার কোনই সমাধান হ'ল না—বরং অযথা অভিভাবকদের প্রবেশিকা পাশের খরচ বেড়ে গেল। কোন দেশেই শিক্ষার সঙ্কোচন করে এই সমস্যার সমাধান হয় নাই। জাপান, জার্মাণী প্রভৃতি দেশে শিক্ষিতের হার অনেক বেশী। কিন্তু তবু সেখানে বেকার নেই বল্লেই চলে। তার কারণ তারা শিক্ষাকে সঙ্কোচ করে নাই, তাকে নিয়ন্ত্রিত করেছে। প্রাথমিক শিক্ষার পরেই তারা যুবকদের বৃত্তি নির্ণয় করে সেই অনুসারে শিক্ষার ব্যবস্থা করে। বাংলা দেশে তদানীন্তন ভাইস-চেন্সেলর শ্রদ্ধেয় ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জ্জি প্রথম এই সমস্যাটি অনুভব করেন এবং মনোবিদ্যা বিভাগের অধ্যক্ষ ডাঃ গিরীন্দ্রশেখর বসু ও তাহার সহকর্মী মন্মথনাথ ব্যানার্জির সাহচর্যে একটী প্রতিষ্ঠান স্থাপন করতে মনস্থ করেন। বিগত ১৯৩৮ সালের বিজ্ঞান সম্মেলনে লণ্ডনের National Institute of Industrial Psychologyর অধ্যাপক ডাঃ C. S. Myers কলিকাতা আসেন এবং তাদের চেষ্টাকে উৎসাহিত করেন। এইরূপে প্রতিষ্ঠানটির পরিকল্পন ও পরিবর্দ্ধন হয়। এই প্রতিষ্ঠান অল্প কয়েক বৎসরের মধ্যেই যথেষ্ট সুনাম অর্জ্জন করেছে। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ হতে বহু ছাত্র ও যুবকেরা তাদের বৃত্তি নির্দ্ধারণের জন্য এখানে আসছে। তারপর বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের (বোম্বাই, আলীগড়, মহীশূর প্রভৃতির) অধ্যাপকেরা সম্প্রতি প্রতিষ্ঠানের কার্য্যাবলীর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছেন। প্রতিষ্ঠানটি অল্পদিনের হলেও সাধারণ এর প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছেন এবং আশা করি ভবিষ্যতে আরো করবেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের এই বিভাগের প্রধান উদ্দেশ্য বাঙ্গালী ছাত্র ও যুবকদের গুণানুযায়ী বৃত্তি নির্দ্ধারণ। বাংলাদেশে বিভিন্ন বৃত্তি বর্তমান। কিন্তু বাঙ্গালী যুবকদের বৃত্তি এক প্রকার গতানুগতিক হয়ে উঠেছে। সওদাগরী অফিসের কেরাণীগিরি, ডাক্তারি, ওকালতি, জজিয়তি প্রভৃতি কয়েকটা বৃত্তিতেই তাদের জীবন সীমাবদ্ধ। অর্থনীতির একটি নিয়ম হল "Demand and Supply"—বাজারে কোন জিনিষের মূল্য নির্দ্ধারিত হয় তার চাহিদা ও সরবরাহ দিয়ে। জীবিকা ব্যাপারেও ঠিক তাই। একদিন ছিল যখন ওকালতির খুব চাহিদা ছিল। তখন উকিলের পেশা খুব লাভের ছিল। সবাই পাশ করে উকিল হতে লাগল এবং শেষে মক্কেলের চেয়ে উকিলের সংখ্যা বেশী হয়ে পড়ল। এইরূপে চাকরী, ডাক্তারী সব দিকেরই এক অবস্থা, চাহিদার চেয়ে সরবরাহ বেশী। তাই বিভিন্ন নতুন নতুন দিকে বাঙ্গালীর বুদ্ধি ও সামর্থ্যকে নিয়োজিত করা প্রয়োজন। সম্প্রতি শ্রীযুক্ত নবগোপাল দাস আই, সি, এস্ বাংলা সরকারের তরফ থেকে একখানি পাণ্ডুলিপি বের করেছেন। তাতে তিনি বাংলার বিভিন্ন কাজের একটি তালিকা দিয়েছেন। এ থেকে আমরা দেখি বহু কারখানাও যান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানে এমন বহু পদ রয়েছে যেখানে অনেক মধ্যবিত্ত, অল্প শিক্ষিত বাঙ্গালীর অন্ন সংস্থান হতে পারে; কিন্তু বাঙ্গালীর সিভিলিয়ান মনোভাব চিরদিনই তাকে বাধা দিয়ে এসেছে। তবে বর্তমানে সৌভাগ্যের বিষয় এই যে এই মনোভাবের পরিবর্তন দেখা দিয়েছে। বৃত্তি নির্ণয় সম্পর্কে বহু অভিভাবকের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ ও আলাপ আলোচনা হয়েছে। তাদের অনেকেই ছেলের

প্রাথমিক শিক্ষার পরে কোন প্রকার যান্ত্রিক শিক্ষা দিতে প্রস্তুত। অভিভাবকেরা এইরূপ মনোভাব নিয়ে বৃত্তি নির্ণেতাদের সঙ্গে সহযোগিতা করলে ভবিষ্যতে অনেক সুফল হতে পারে।

বৃত্তি নির্ণয়ের মোটামুটি অনেক পদ্ধতি প্রকাশিত হয়েছে। তাদের ভিতর তিনটি নিয়মই বিশেষ করে আমাদের চোখে পড়ে। প্রথমতঃ প্রত্যেক অভিভাবকই পুত্রের বিষয় সচেতন এবং তাদের জীবনে প্রতিষ্ঠিত করতে ব্যগ্র। তারা তাদের অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে' পুত্রদের বৃত্তি বিষয়ে উপদেশ দিয়ে থাকেন। তাদের উপদেশ অনেক ক্ষেত্রেই অবৈজ্ঞানিক এবং অকৃতকার্যকারী। তারা সাধারণতঃ মনে করেন পিতার অনুপাতেই পুত্রের বৃত্তি হবে। তাই ডাক্তারের ছেলেকে ডাক্তারি ও উকিলের ছেলেকে ওকালতি পড়তে দেখা যায়। পিতার পশার অনেক সময় পুত্রের সুবিধার কারণ হয় বটে, কিন্তু সব সময় নয়। পুত্রের বুদ্ধি ও মানসিক প্রকৃতি অনেক সময় পিতার বুদ্ধি ও মানসিক প্রকৃতির অনুরূপ হন না। তাই অনেক ডাক্তারের ছেলেকে ডাক্তারি পাশ করে "Life insurance"-এর দালালি করতে হয়। আর উকিলের ছেলেকে সওদাগরী অফিসের কেরাণীগিরির জন্য আফিস কোয়ার্টারে আনাগোনা করতে দেখা যায়। অতএব কেবল অর্থনৈতিক কারণই বৃত্তিনির্ণয়ের মাপকাঠি হতে পারে না।

তারপর আর একশ্রেণীর অভিভাবক আছেন যাঁরা পুত্রের রুচি অনুযায়ী বৃত্তি নির্বাচন করেন। তাদের প্রণালীটি কিছু বৈজ্ঞানিক বটে, কিন্তু সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক নয়। কৈশোরে রুচি ঠিক ভবিষ্যৎ জীবনের রুচি নাও হ'তে পারে। কৈশোরে ছেলেমেয়েদের রুচি অনেক স্থলেই ধার করা হয়। হয়ত বাড়ীতে কেউ চিত্রশিল্পী আছেন, তাকে দেখে ছেলের ইচ্ছা হ'ল চিত্রশিল্পী হ'তে। অথবা কেউ ইঞ্জিনিয়ার আছেন তাকে দেখে ইচ্ছা হ'ল ইঞ্জিনিয়ার হতে। আবার একই ছেলের বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রকমের ইচ্ছা প্রকাশ পায়। অতএব রুচিই বৃত্তি নির্ণয়ের নির্ভরযোগ্য বিষয় বস্তু নয়।

বৃত্তিনির্ণয়ের একটি বৈজ্ঞানিক প্রণালী এবং মানুষের বিভিন্ন গুণ ও দক্ষতার উপর নির্ভরশীল। মনোবিদেরা মানুষের বুদ্ধি বিশিষ্ট দক্ষতা ও মানসিক প্রকৃতি পরীক্ষার উপর বৃত্তি নির্ণয় করেন। এই পরীক্ষা প্রধানতঃ পাঁচ ভাগে বিভক্ত :—

(১) বুদ্ধি পরীক্ষা (Intelligence Test).
(২) বিশিষ্ট দক্ষতা পরীক্ষা (Special ability Test).
(৩) মানসিক প্রকৃতি পরীক্ষা (Temperamental Test).
(৪) শারীরিক পরীক্ষা (Physical examination).
(৫) সাক্ষাতে আলাপ ও আলোচনা (Interview).

জুপিটার ও ভেনাস্

শ্রীসুধাংশুকুমার ঘোষ বি-এস্‌সি

এ্যাপ্লোয়েড্ কেমিষ্ট্রীতে রিসার্চ্চ ক'রতাম। মাসে পঁচাত্তর টাকা জলপানিতে মোটামুটিভাবে সেল্‌ফ্-সাপোর্টিং হ'য়েছিলাম। আপনার লোক বা ডিপেন্‌ডণ্ট কেউ ছিল না। মেসে থাক্‌তাম এবং উদ্বৃত্ত অর্থে ইন্‌ষ্টলমেণ্ট সিষ্টেমে বই কিন্‌তাম। একদিন রাত্রে খুব গরম বোধ হওয়ায় মেসের সাম্‌নে হ্যারিসান রোডে পায়চারি ক'রছি। হঠাৎ একটা ধাক্কা খেয়ে প'ড়ে গেলাম। তারপর একটা তীব্র গন্ধ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই জ্ঞান হারিয়ে ফেলি।

তার পরের অনেক রোমাঞ্চকর বিবরণ বাদ দিলে দাঁড়ায়, পেনাল্-কোডের জঘন্য কয়েকটি ধারার অপরাধে আমি অপরাধী বিবেচিত হ'য়েছি। তার বিচারের জন্য আমার নামে ওয়ারেণ্ট্ ও 'হুলিয়া' হ'য়েছে এবং আমি নিজের নির্দ্দোষিতা সম্বন্ধে নিশ্চিত হ'য়েও আজ পলাতক।

মুখে গোঁপদাড়ির জঙ্গল হ'য়ে গেছে। পশ্চিমা ছাতাওয়ালার ছদ্মবেশ ধারণ ক'রেছি। কালার ভান ক'রে থাকি। হিন্দুস্থানীদের টানে ভাঙ্গা বাংলায় কথা বলি। লোকে চিৎকার ক'রে আমার সঙ্গে কথা কয়। বিনীতভাবে শুনে যাই। অতিশয় কষ্টে ছাতা মেরামতের কাজ ক'রে গ্রাসাচ্ছাদন করি।

একজন গৃহস্থের দ্বিতল গৃহের সিঁড়ির ধারে আমার বাস। ভদ্রলোকের নাম পরেশ সেন। পোষ্টাফিসে চাকরী ক'রতেন। তাঁদের ছোটখাট ফরমাস এক আধটা স্বেচ্ছায় খেটে দিতাম। পরেশবাবুর সংসারে তাঁর মা, ছোট ভাই রমেন, ছোট বোন সুন্দরী, তাঁর স্ত্রী এবং একটি পাঁচ বৎসরের ছেলে নাম বুলবুল— এই ক'জন লোক। রমেন মেডিকেল কলেজে পড়ে। সুন্দরী বিদ্যাসাগর কলেজে ফার্ষ্ট ইয়ারে আই-এস্ সি পড়ে।

রাত্রে আমি যখন অন্ধকারে সিঁড়ির তলায় প'ড়ে থাকতাম— তখন উপরের বারাণ্ডায় একটি ঘেরা যায়গায় সুন্দরী পড়াশোনা ক'রত। 'হুইট্‌ষ্টোন্ ব্রিজ', 'রিফ্ল্যাক্‌সান্ অফ্ লাইট' প্রভৃতি বিষয়—যখন সে ভুল প'ড়ত তখন আমার বড় অসোয়াস্তি বোধ হ'ত। কারণ তার ভুল পয়েণ্ট আউট কেউ ক'রে দিত না।

সুন্দরীর মায়ের তাগাদায় মধ্যে মধ্যে তার বিবাহের সম্বন্ধ এক একটা আসে। একবার একটা পাড়া গাঁয়ের জমীদারের ছেলের সঙ্গে তার সম্বন্ধ এসেছিল। ছেলে ম্যাট্রিক্ ফেল্। সুন্দরীকে পাত্রের বাপের পছন্দ হ'য়েছে—এখবর যেদিন এল— সেদিন তাকে আমি লুকিয়ে খুব কাঁদতে দেখেছিলাম। পরে তার বৌদির চেষ্টায় সে সম্বন্ধ ভেঙ্গে যায়। এই রকম মধ্যে মধ্যে সম্বন্ধ আসে ও ভাঙ্গে। একদিন সন্ধ্যায় আমি আলোর নীচে ছাতা সেলাই ক'রছি। ওপরে অনেকক্ষণ সিরিয়াস্ কথাবার্ত্তা হওয়ার শব্দ পেয়ে সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে বন্ধ দরজার ফাঁকে কাণ রেখে কথা শুন্‌তে আরম্ভ ক'রলাম।

সুন্দরীর একটা ভাল সম্বন্ধের কথা শুন্‌লাম। ছেলে ভাল চাকরী করে। ক'লকাতায় বাড়ী আছে। সুন্দরীকে পাত্রপক্ষের পছন্দ হ'য়েছে ; আগের দিন রাত্রে খবর এসেছিলো—পরেশবাবু শরীর ভাল না থাকায় শুয়ে প'ড়েছিলেন তখন। সেদিন সুন্দরী খুব ভোরে উঠেছিল। ভ্রাতুষ্পুত্র বুলবুলকে নিয়ে খুব আদর ক'রেছিল। একটা গানের কলি বারবার গেয়েছিল এবং স্নানের

ঘরে বেশীক্ষণ একলা ছিল। এসব ঘটনা থেকে তার বৌদি অনুমান ক'রেছিলেন, সুন্দরীরও ওই পাত্রকে পছন্দ হ'য়েছে। এই রিপোর্ট যখন সভায় সরমা দেবী (সুন্দরীর বৌদি) পেশ ক'রলেন—তখন সুন্দরী সেখান থেকে সুড়ুৎ ক'রে আড়ালে স'রে যাওয়ায় সকলেই সরমা দেবীর অনুমানে একমত হলেন। কিন্তু সমস্যা হ'ল—পাত্রপক্ষ পাঁচ হাজার টাকা পণ দাবী ক'রেছে। পরেশবাবুর আড়াই হাজার পর্য্যন্ত সাধ্য আছে। অতএব এমন ভাল পাত্র হাতছাড়া হওয়ার আশঙ্কায় বৃদ্ধা গৃহিণী দেশের বাড়ী মর্টগেজের প্রস্তাব ক'রলেন এবং সরমা দেবী তাঁর নিজের গহনা বিক্রীর প্রস্তাব ক'রলেন। পরেশবাবু সকলকেই ধম্‌কালেন; কিন্তু উপায় স্থির ক'রতে পারলেন না। এই রকম বিমর্ষ চিন্তার পর অবশেষে—রাত হ'য়েছে খাবার দাও—ব'লে পরেশবাবু প্রকারান্তরে কথাটা চাপা দেবার চেষ্টা ক'রলেন। সুন্দরী উঠে গেল। আমার অসহ্য বোধ হ'ল। দরজাটা একবার খুলুন ত'—ব'লে, দরজা খুলিয়ে সোজা ভগ্নোন্মুখ সভায় উপস্থিত হ'য়ে নিজের সত্য পরিচয় দিলাম এবং ব'ললাম আমি তাঁদের স্বজাতি ও পাল্‌টি ঘর। সুন্দরীকে নিজের বোনের মত জানি—তার বিবাহের যৌতুক সংগ্রহের একটা প্রস্তাবের দাবী তাঁদের কাছে ক'রে ব'ললাম—. আমার নামে ওয়ারেণ্ট ও 'হুলিয়া' আছে। আমি আত্মগোপন ক'রে আছি। যে আমাকে ধরিয়ে দেবে—সে গভর্ণমেণ্ট থেকে পাঁচ হাজার টাকা পুরস্কার পাবে। অতএব আমাকে তখনই যেন তাঁরা থানায় পাঠিয়ে দেন। আমার বিচার হ'য়ে গেলে পুরস্কারের পাঁচ হাজার টাকা দিয়ে এই পাত্রের সঙ্গে সুন্দরীর বিয়ে হ'তে পারে। পাত্রপক্ষকে এখন কথা দিয়ে হাতে রাখা হোক্। সুন্দরী ও সরমা দেবী আমি উপস্থিত হওয়া মাত্র ভিতরে চ'লে গেছলেন। পরেশবাবু ও রমেন আমার প্রস্তাব শুনে বিস্মিত ও নির্ব্বাক হ'য়ে গেলেন। কথা কইলেন আগে—তাঁদের মা। তিনি ব'ললেন—একজনের সর্ব্বনাশ ক'রে তাঁরা টাকা যোগাড় ক'রতে বা সে কথা ভাবতেও পারবেন না। আমি এ্যাপ্লায়েড্ কেমিষ্ট্রীর জ্ঞান সম্বন্ধে পরিচয় প্রমাণার্থে দু'একটা দিলাম এবং পরেশবাবুকে পুনরায় আমার প্রস্তাবে সম্মত হ'তে অনুরোধ ক'রলাম। সুন্দরী ও রমেন আমার মুখে 'ক্লোলোয়েড্ প্যারাফিনের সংযোগ শুনে বিস্ময়ে পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি ক'রতে লাগ্‌লো। পরেশবাবু ব'ললেন—আমাকে পুলিশে ধরিয়ে দেওয়া আউট অফ কোশ্চেন্। তবে অন্য উপায় ভেবে দেখবেন—যাতে আমার মুক্তি হয়। আমাকে রাত্রে তাঁদের সঙ্গে খেতে ব'ললেন। আমার খাওয়া আগেই হ'য়ে গিয়েছিল। অবসাদগ্রস্তভাবে আমি নীচে এসে সিঁড়ির তলায় শুলাম।

পরদিন প্রাতে পরেশবাবু আমাকে ব'ললেন—সুন্দরীকে ওপরে গিয়ে রোজ সকালে ও সন্ধ্যায় পড়াতে হবে এবং আমার ছাতা মেরামতের সরঞ্জামগুলি তাঁর স্ত্রীর নিকট কয়েক দিনের জন্য গচ্ছিত রাখতে হবে। আমি সম্মত হ'লাম। খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা ওপরেই হ'ল। প্রথম দিন পড়াতে ব'সে সুন্দরীকে ব'লে দিলাম 'কোইফিসেণ্ট্ অফ্ এক্‌স্‌প্যান্‌সান্' সম্বন্ধে তার ধারণা ভুল, 'রিফ্লাক্‌সান' সে ঠিক বুঝতে পারে নেই। সে চমৎকৃত হ'য়ে গেল। ক্রমশঃ আমার কাছে প'ড়ে সে বিষয়গুলি বেশ বুঝতে পার্‌লে।

পরেশবাবু তাঁর এক বন্ধুর সাহায্যে সংবাদ নিয়ে জান্‌লেন—আমার কল্পিত অপরাধের প্রকৃত অপরাধীরা ইতিপূর্ব্বে ধরা প'ড়ে কারা ভোগ ক'রছে। আমার সঙ্গে সে সকল অপরাধের কোনও সম্পর্ক নেই—তা পুলিশ বুঝেছে। তখন একটা ভাল উকীলের মারফৎ একটা দরখাস্ত দিয়ে আমি সারেণ্ডার্ ক'রলাম। যথারীতি তদন্তের পর আমার নামের ওয়ারেণ্ট ও 'হুলিয়া' প্রত্যাহৃত হ'ল। বিদ্যাসাগর কলেজে একটি লেক্‌চারারের চাকরী পেলাম। পরেশবাবু সুন্দরীর সঙ্গে আমার বিবাহ প্রস্তাব ক'রলেন। কয়েক দিন সুন্দরীকে পড়িয়ে তার সঙ্গে আমার 'কোইফিসেণ্ট অফ্ এক্‌স্‌প্যান্‌সান্' অনেক কম হ'য়ে গেছে। পরেশবাবুর প্রস্তাবে অসম্মত হবার কিছু কারণ আমি খুঁজে পেলাম না। বিবাহের পর আমি অন্যত্র বাসা ক'রতে চাইলাম। পরেশবাবুর মাতা অনুযোগ ক'রে ব'ললেন—তুমি চাকরী ক'রছো—তোমার এখানে থাকায় লজ্জার কারণ কি আছে? সুন্দরী কলেজে পড়া ছাড়তে চাইলে না। বিদ্যাসাগর কলেজে সে আমার ছাত্রী। আমার সঙ্গে তার ঝগড়া কোনদিন হ'লে আমি তাকে শাসাতাম—সামনের পরীক্ষায় আমার বিষয়ে তোমাকে নিশ্চয় ফেল ক'রে দেবো। সে ব'ল্‌ত', ইস্, ফেল ক'রো না—দেখ্‌বো কেমন এক্‌জামিনার হ'য়েছ—আমি পেপার রি-এক-জামীনের জন্য দরখাস্ত দেবো। পরীক্ষার সময় তার খাতা প'ড়ে আমার কিন্তু মনে হ'ত, তার উত্তরই সবচেয়ে ভাল হ'য়েছে অর্থাৎ আমার ক্লাসের লেক্‌চার সেই বেশ ভাল ক'রে বুঝতে পেরেছে। সরমা দেবীর সঙ্গে কোনও মতভেদ হ'লেই—তিনি বুল্‌বুলের হাত দিয়ে তার রঙিন একটি ছোট ছাতা আমার কাছে মেরামত করার জন্য পাঠিয়ে দিতেন।

বর্ষার ফুল

শ্রীবীণা দে

আজ ব্যথার বারিধারা পেয়ে
কোন্ পুলক-কদম ফুট্‌ল রে ?
কাঁটায় ঘেরা কোন কেতকী
শিউরে আজি উঠ্‌ল রে ?
জানিনে কোন্ সুখের আশায়
এই দুখের জোয়ার ছুট্‌ছে রে ?
জানি তবু নাই ঠিকানা,
চিনি, তবু যায়না চেনা
ওগো কোন্ সে নিধি যায়না কেনা
সাগর সেঁচি' উঠ্‌ছে রে ?
আজ বুকভাঙা এই ব্যথার টানে
কা'র চরণ-শিকল টুট্‌বে রে ?
এই মরণ-সাগর মথন করি'
কোন্ অমৃত উঠ্‌বে রে ?
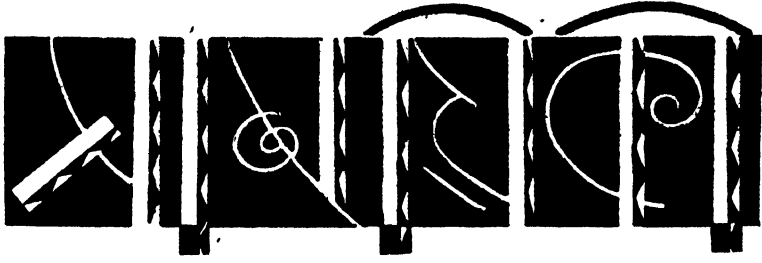
বঙ্কিমচন্দ্র স্মৃতিপূজা—

গত ২৮শে জুন কলিকাতায় বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ মন্দিরে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের বার্ষিক স্মৃতিসভায় সভাপতি হইয়া খ্যাতনামা সাহিত্যসমালোচক শ্রীযুত অতুলচন্দ্র গুপ্ত মহাশয় যাহা বলিয়াছেন, তাহা সকলেরই বিবেচনার বিষয়। পরিষদ হইতে বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থাবলীর মূল্যবান সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে বটে, কিন্তু সর্ব্বসাধারণের জন্য সুলভ সংস্করণ প্রকাশের ব্যবস্থা হয় নাই। সে ভার এতদিন পর্য্যন্ত পুস্তক-প্রকাশকগণই আমাদের দেশে গ্রহণ করিয়াছিলেন। এক সঙ্গে সাহিত্য সাধনা ও ব্যবসা উভয়ই চালাইয়া প্রকাশকগণ শুধু নিজেরা লাভবান হন নাই, দেশবাসী সকলকেও উপকৃত করিয়াছেন। কিন্তু কোন সাধারণ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে তাহা অপেক্ষাও সুলভ সংস্করণের ব্যবস্থা করা সম্ভব। সে বিষয়ে যদি কেহ কার্য্যে প্রবৃত্ত হন, তবে দেশের সত্যই উপকার করা হইবে।

খাদ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ—

চাউল, আটা, ময়দা, ডাল, চিনি, কয়লা, দেশলাই, কেরোসিন তৈল, সরিষার তৈল, লবণ প্রভৃতি সকল দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধির ফলে দেশে যে বিষম অবস্থা উপস্থিত হইয়াছে, আজ আর তাহা কাহাকেও বলিবার প্রয়োজন নাই। সরকার পক্ষ হইতে খাদ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা হইতেছে বটে, কিন্তু তাহা ফলদায়ক বলিয়া মনে হয় না। এ অবস্থায় একদিকে যেমন সর্ব্বসাধারণের দুঃখ দুর্দ্দশার অন্ত নাই, অন্যদিকে গভর্ণমেণ্টও যেন কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছেন। ব্যাপক ও কঠোরভাবে কেন যে এখন পর্য্যন্ত মূল্য নিয়ন্ত্রণ হইতেছে না, তাহা বুঝা কঠিন। সম্প্রতি কলিকাতার সন্নিহিত কারখানাবহুল স্থানগুলির জন্য গভর্ণমেণ্ট ৪টি কেন্দ্রে ৪জন নিয়ন্ত্রক কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিয়াছেন। তাঁহারা শ্রীরামপুর, টিটাগড়, কাঁকিনাড়া ও বজবজে থাকিয়া কার্য্য করিবেন। সাধারণ লোক যদি ঐ সকল কর্ম্মচারীর নিকট নিজ নিজ অভাব অভিযোগ জানাইবার সুবিধা পায়, তবেই ইহার মীমাংসা ও সহজ হইবে।

হিন্দু-মুসলমান মিলন সমিতি—

গত ২০শে জুন বাঙ্গালা দেশে হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের নেতারা কলিকাতা টাউন হলে সমবেত হইয়া মিলনের বাণী প্রচার করিয়াছেন। মুর্শিদাবাদের মহামান্য নবাব বাহাদুর ঐ সভায় সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন এবং প্রধান মন্ত্রী মিঃ ফজলল হক, ঢাকার নবাব হবিবুল্লা বাহাদুর, মিঃ সামসুদ্দীন আমেদ, শ্রীযুত সন্তোষকুমার বসু, মিঃ হাসেম আলি খাঁ, শ্রীযুত তুলসীচন্দ্র গোস্বামী, শ্রীযুত নির্ম্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুত নির্ম্মলচন্দ্র চন্দ্র, শ্রীযুত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, বর্দ্ধমানের মহারাজা উদয় চাঁদ মহতাব, সার বিজয় প্রসাদ সিংহ রায় প্রভৃতি সকল হিন্দু ও মুসলমান নেতা সভায় উপস্থিত থাকিয়া বক্তৃতা করিয়াছিলেন। বাঙ্গালাদেশে হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়কে পাশাপাশি বাস করিতে হইবে—উভয়ে পরস্পর বিবাদ করিলে পরস্পরের ক্ষতিভিন্ন কোন লাভই হইতে পারে না। একথা যদি উভয় সম্প্রদায়ের লোক বুঝিতে পারে, তাহা অপেক্ষা আর সুখের বিষয় কি আছে ? আমাদের বিশ্বাস, এইরূপ মিলনের ফলে দেশ হইতে সাম্প্রদায়িক বিবাদ একেবারে চলিয়া যাইবে।

হাওড়া মিউনিসিপালিটী—

গত ৬ই জুলাই হাওড়া মিউনিসিপালিটীর নবগঠিত সভায় প্রসিদ্ধ উকীল ও কংগ্রেসনেতা শ্রীযুক্ত বরদাপ্রসন্ন পাইন বিপক্ষ দলকে পরাজিত করিয়া চতুর্থবারের জন্য চেয়ারম্যান নির্ব্বাচিত হইয়াছেন এবং কংগ্রেস পক্ষের মৌলবী মহম্মদ সরিফখান ভাইস-চেয়ারম্যান নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। পাইন মহাশয় শুধু কর্ম্মী নহেন, বুদ্ধিমান। কাজেই তাঁহাকে পরাজিত করার সকল চেষ্টা তিনি ব্যর্থ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। হাওড়ার মত বিরাট মিউনিসিপালিটীর কার্য্যভার উপযুক্তভাবে সম্পাদন করিয়া তিনি সকলের মনোরঞ্জন করুন, ইহাই আমরা কামনা করি।

খাদ্যশস্য উৎপাদন বৃদ্ধি—

খাদ্য শস্য উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য মহীশূরে ও পাঞ্জাবে যে ব্যবস্থা হইয়াছে, তাহা উল্লেখযোগ্য। মহীশূরে আরউইন খাল অঞ্চলে অতিরিক্ত ৩০ হাজার একর জমী, তুলা চাষের জমীর ১৫ হাজার একরের মধ্যে ১০ হাজার একর জমী ও অতিরিক্ত ২৩ হাজার একর পতিত জমীতে ধান চাষের ব্যবস্থা হইয়াছে। পাঞ্জাবেও বহু সরকারী পতিত জমী চাষের জন্য পাওয়া গিয়াছে। বাঙ্গালা দেশে খাদ্যশস্য উৎপাদন বৃদ্ধির কি ব্যবস্থা হইল, তাহাই শুধু জানা গেল না।

দিনাজপুরে নিষ্পত্তি—

দিনাজপুরে প্রতিমা বিসর্জ্জন লইয়া যে সমস্যা গত কয়েক মাস ধরিয়া বর্ত্তমান ছিল, সম্প্রতি বাঙ্গালার প্রধান মন্ত্রী মৌলবী এ কে ফজলল হকের চেষ্টায় তাহার নিষ্পত্তি হওয়ায় গত ২৬শে জুন সকালে ৭টা হইতে ১১টার মধ্যে সকল প্রতিমা বিসর্জ্জন করা হইয়াছে। জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট, পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট এবং হিন্দু মুসলমান উভয় পক্ষের নেতাদের সাহায্যে এই নিষ্পত্তি সম্ভব হয়। কোন সমস্যাই মীমাংসার অতীত নহে। কাজেই সকল পক্ষ যদি মীমাংসা প্রার্থী হয়, তাহা হইলে যে কোন সমস্যারই সমাধান হইতে পারে।

খেয়া—তাম্রফলকে খোদিত শিল্পী—শ্রীমুকুল দে
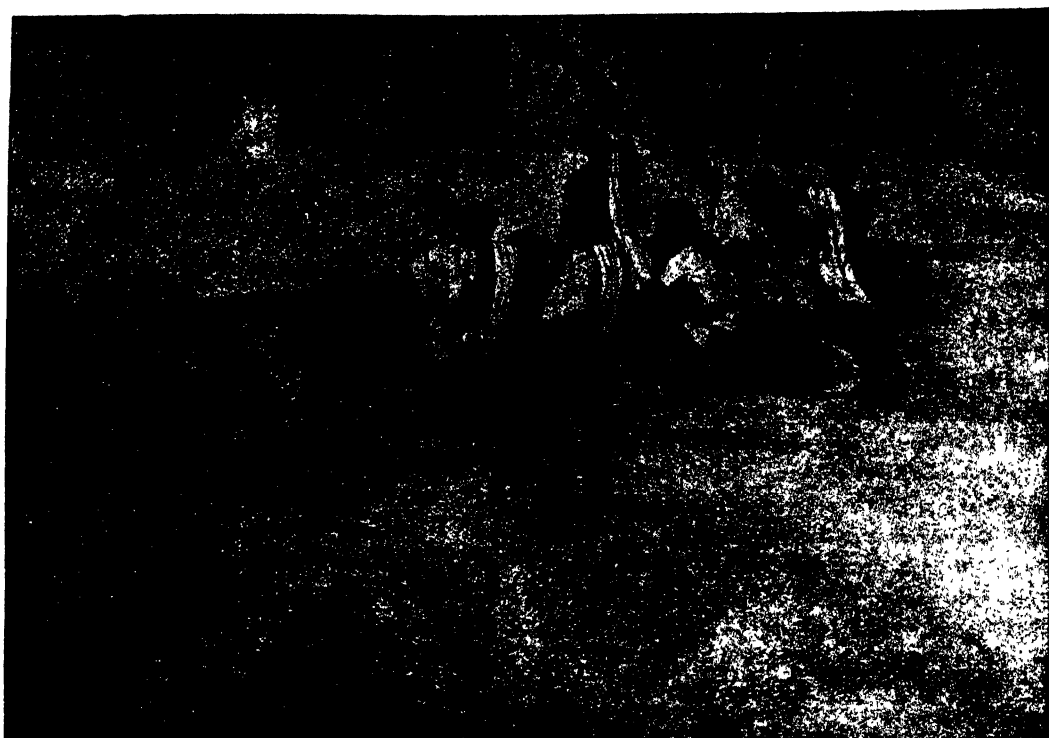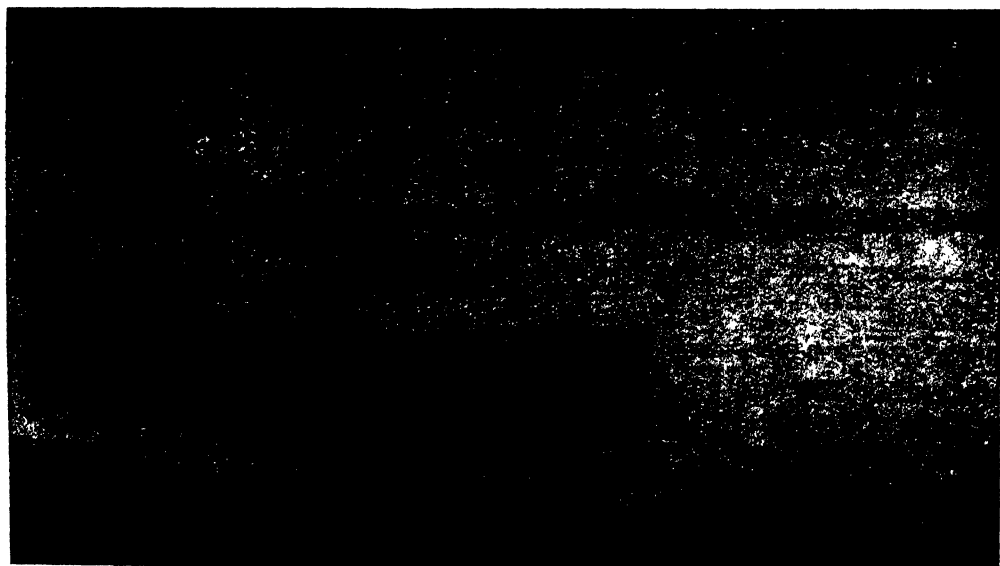
গঙ্গাবক্ষে—তাম্রফলকে খোদিত শিল্পী—শ্রীমুকুল দে

কুইনিনের অভাব—

বোমার ভয়ে এ বৎসর বাঙ্গালা দেশের বহু লোক সহর ছাড়িয়া মফঃস্বলবাসী হইয়াছেন। বর্ষা ঋতু আগত, বাঙ্গালা দেশে বর্ষার সঙ্গে সঙ্গে ম্যালেরিয়া জ্বরও আসিয়াছে। যাহারা গ্রামে বাস করে তাহারা ম্যালেরিয়ায় ভুগিয়া এ বিষয়ে একরূপ অভিজ্ঞ হইয়াই গিয়াছে। কিন্তু যাহারা গ্রামে নূতন গিয়াছে, তাহাদের ম্যালেরিয়া জ্বর ধরিলে তাহা সহজে ছাড়িতেছে না। ইহাই একমাত্র সমস্যা নহে। এবার দেশে কুইনিনের অভাব অত্যন্ত বেশী; যে কুইনিন ১২ আনা মূল্যে বিক্রীত হইত আজ সাড়ে ৪টাকা দাম দিয়াও তাহা পাওয়া যাইতেছে না। গভর্ণমেন্টের কুইনিন চাষের বিভাগ আছে বটে, কিন্তু এ দেশে বৎসরে যে কুইনিন ব্যবহৃত হয় তাহার ৪ ভাগের এক ভাগও এদেশে উৎপন্ন হয় না। জাভায় পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী কুইনিন পাওয়া যায়—সেই জাভা আজ শত্রুর কবলে। আমেরিকা হইতেও কুইনিন আসিত, কিন্তু তাহাও পর্য্যাপ্ত পরিমাণে আসিবে কিনা সন্দেহ। বৎসরে ভারতে যে ২১০ হাজার পাউণ্ড কুইনিন ব্যবহৃত হইত, তাহার মাত্র ৫০ হাজার পাউণ্ড এদেশে পাওয়া যায়। এ অবস্থায় ম্যালেরিয়াগ্রস্তদের পক্ষে বিনা কুইনিনে মৃত্যুবরণ করা ছাড়া গত্যন্তর নাই। অথচ বাঙ্গালা দেশে যে নাটার ফল প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়, তাহার জ্বর নিবারণের ক্ষমতা কুইনিনের অপেক্ষা কোন অংশে কম নহে। কিন্তু গভর্ণমেণ্ট কি লোককে কুইনিনের বদলে নাটার বীজ ব্যবহার করিতে পরামর্শ দিবেন? দেশের চিকিৎসকমণ্ডলী যদি এ বিষয়ে একমত হইয়া এবার নাটার বীজ ব্যবহারে অগ্রসর হন, তাহা হইলে ঐ সুলভ সহজপ্রাপ্য ঔষধের প্রতি লোকের বিশ্বাস বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া উহার ব্যবহারও বাড়িবে এবং লোকও সহজে জ্বরমুক্ত হইতে পারিবে। আমরা এ বিষয়ে চিকিৎসকমণ্ডলীর মনোযোগ আকর্ষণ করি।

কলিকাতায় নূতন হাসপাতাল—

গত ৭ই জুলাই সকালে বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্টের অন্যতম মন্ত্রী শ্রীযুত সন্তোষকুমার বসু কলিকাতা আলিপুরস্থ ব্রণফিল্ড রোডে একটি নূতন হাসপাতালের উদ্বোধন করিয়াছেন। হাসপাতালটির ইতিহাস অসাধারণ। বোম্বাই প্রদেশের ধারোয়ারের উকীল যশোবন্ত বাসুদেব পালেকার অল্পবয়সে পরলোকগমন করিলে তাঁহার বিধবা পত্নী শ্রীমতী রমাবাঈ সেবাব্রত গ্রহণ করিয়া সিষ্টার সরস্বতী নাম গ্রহণ করেন। তিনি স্বামী ও শ্বশুরের নিকট হইতে প্রাপ্ত সম্পত্তি দ্বারা এই হাসপাতাল করিয়া দিয়াছেন এবং নিজে উহার সেবার ভার লইয়াছেন। তথায় ভারতীয় মহিলা-দিগকে নার্স ও ধাত্রীর কার্য্য শিক্ষা দেওয়া হইবে। সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ্ ইণ্ডিয়া প্রদত্ত এক খণ্ড ভূমির উপর এই হাসপাতাল নির্ম্মিত হইয়াছে। সাধারণের চাঁদা এবং কলিকাতা কর্পোরেশন ও বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্ট প্রদত্ত অর্থে গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছে। একজন অবাঙ্গালী মহিলার দ্বারা এই প্রতিষ্ঠানের আয়োজনের জন্য আমরা বাঙ্গালী সমাজের পক্ষ হইতে তাঁহাকে আন্তরিক অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি।

চীন যুদ্ধের পঞ্চম বার্ষিক—

গত ৭ই জুলাই কলিকাতায় কয়েকটি সভা করিয়া জাপানের সহিত চীনাদের যুদ্ধের পঞ্চম বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে যুদ্ধরত চীনাদিগকে অভিনন্দিত করা হইয়াছে। চীনারা জাতীয় স্বাধীনতা রক্ষার জন্য গত কয় বৎসর ধরিয়া যেভাবে যুদ্ধ চালাইতেছে, তাহা শুধু চীনা জাতির পক্ষে নহে, জগতের যে কোন যুদ্ধমান জাতির পক্ষে বিস্ময়জনক। সম্প্রতি জাপান প্রাচ্যের অন্যান্য বহু দেশ গ্রাস করায় সকলের সহানুভূতি চীনাদের প্রতি গিয়াছে। সেজন্য চীনাদের জয়লাভের জন্য ঐ দিনে সকলে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করিয়াছেন।

নূতন উচ্চ উপাধি লাভ—

শ্রীযুত শান্তিরঞ্জন পালিত এম-এস সি ও শ্রীযুত নৃপেন্দ্র নারায়ণ দাস এম-এ সম্প্রতি যথাক্রমে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি-এস সি ও পি এচ ডি উপাধি লাভ করিয়াছেন জানিয়া আমরা আনন্দিত হইলাম। উভয়েই কৃতী ছাত্র এবং আমাদের বিশ্বাস, তাঁহাদের নব নব গবেষণার দানে দেশ সমৃদ্ধ হইবে।

হীরণলাল মুখোপাধ্যায়—

মুর্শিদাবাদের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট রায় বাহাদুর হীরণলাল মুখোপাধ্যায় গত ২৭শে জুন শনিবার সকালে সহসা মাত্র ৪৯ বৎসর বয়সে কলিকাতায় পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি অতি অল্প সময়ের জন্য বিশেষ কাজে কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। ১৯১৪ সালে সরকারী চাকরীতে প্রবেশ করিয়া তিনি যোগ্যতার সহিত বহু উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন এবং বাঙ্গালা সরকারের স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন বিভাগের সহকারী সেক্রেটারীর কাজ করিয়া ১৯৪১ সালে মুর্শিদাবাদের ম্যাজিষ্ট্রেট হইয়াছিলেন। আমরা তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

সরকারী দোকান প্রতিষ্ঠা—

কলিকাতা সহরে উপযুক্ত মূল্যে খাদ্য দ্রব্য বিক্রয়ের জন্য বাঙ্গালা সরকার গত ৩০শে মে তারিখে কয়েকটি স্থানে দোকান খুলিয়াছেন। ২০ গ্যালিফ ষ্ট্রীটে ও ২৬৭ আপার চীৎপুর রোডে দোকান খোলা হইয়াছে। মধ্য কলিকাতা ও দক্ষিণ কলিকাতায় আরও কয়েকটি দোকান শীঘ্র খোলা হইবে। এখন পর্য্যন্ত খাদ্যদ্রব্যের মূল্য নিয়ন্ত্রণের কোন ব্যবস্থাই হয় নাই। এ অবস্থায় এইরূপ সরকারী দোকান যত বেশী খোলা হয়, ততই কলিকাতার লোক লাভবান হইবে।

বৈমানিক শঙ্কর চক্রবর্ত্তী—

পাইলট অফিসার শঙ্কর চক্রবর্ত্তী কোহাটে বিমান দুর্ঘটনায় মাত্র ২২ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি কলিকাতায় বালীগঞ্জ গভর্ণমেণ্ট স্কুল ও সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজের ছাত্ররূপে নৌকাচালন, মুষ্টিযুদ্ধ প্রভৃতি ব্যায়ামে কৃতিত্ব দেখাইয়াছিলেন। ১৯৪০ সালে বিমান বাহিনীতে যোগদান করিয়া তিনি কর্ম্মক্ষেত্রেও কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়া সুনাম অর্জ্জন করিয়াছিলেন।

মিঃ এরাণ্ডলের পত্নী প্রসিদ্ধ নৃত্যকুশলা শ্রীমতী রুক্মিণী দেবী
পেন্সিল স্কেচ—শিল্পী শ্রীমুকুল দে

থিয়সফিকাল সোসাইটীর প্রেসিডেন্ট মিঃ জি-এস্ এরাণ্ডেল
পেন্সিল স্কেচ—শিল্পী শ্রীমুকুল দে
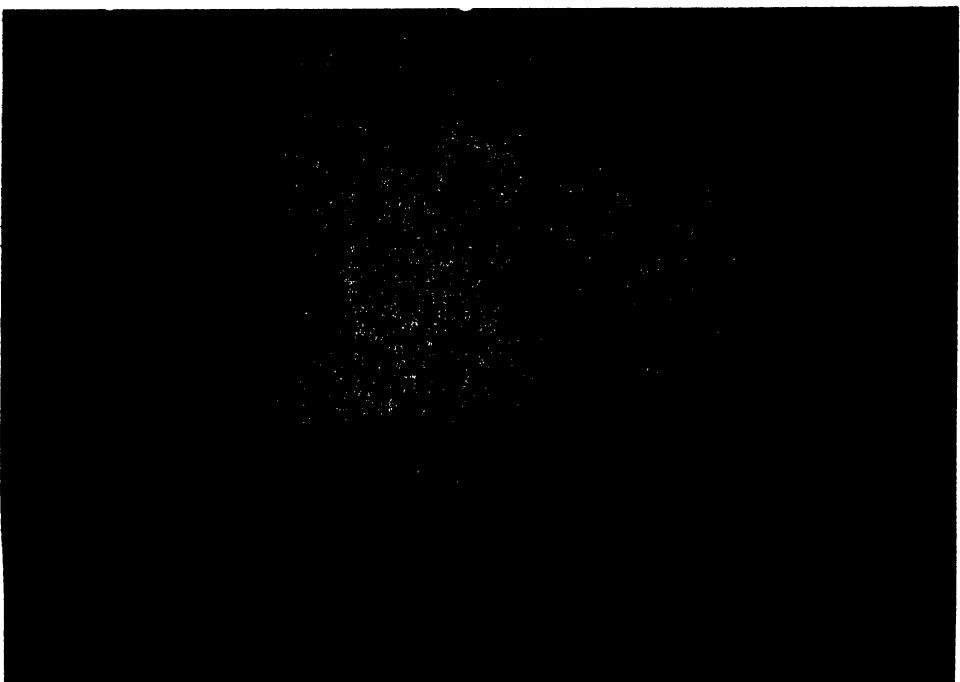
মাদ্রাজে রাজবন্দীর মুক্তি—

মাদ্রাজ গভর্ণমেণ্ট ঐ প্রদেশের মোট ১৬২ জন বন্দীর মধ্যে ১৩৮জনকে মুক্তি প্রদানের ব্যবস্থা করিয়াছেন। কিন্তু বাঙ্গালা দেশে এখনও সে সম্বন্ধে কোন সাড়া পাওয়া যাইতেছে না। অথচ বাঙ্গালা দেশেই রাজবন্দীর সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। আমরা এ বিষয়ে বাঙ্গালার জাতীয়তাবাদী মন্ত্রিমণ্ডলের দৃষ্টি আকর্ষণ করি।

বড়লাটের শাসন পরিষদ—

বড়লাটের শাসন পরিষদ বড় করিয়া সম্প্রতি তাহাতে ৫ জন নূতন ভারতীয় সদস্য নিযুক্ত করা হইয়াছে—(১) সার যোগেন্দ্র সিং—বয়স ৬৫ বৎসব (২) সার সি পি রামস্বামী আয়ার—বয়স ৬৩ বৎসর (৩) সার মহম্মদ ওসমান—বয়স ৫৮ বৎসর (৪) সার জে পি শ্রীবাস্তব—বয়স ৫৩ বৎসর ও (৫) ডাক্তার আম্বেদকর—বয়স ৪৯ বৎসর। ইহার পূর্ব্বেও কয়েকজন নূতন সদস্য গ্রহণ করা হইয়াছিল। যাঁহাদের গ্রহণ করা হইয়াছে ব্যক্তিগতভাবে তাঁহারা যোগ্য ব্যক্তি হইতে পাবেন, কিন্তু জাতির দিক দিয়া পরিষদ এইভাবে বড় কবায় কোনই লাভ হইল না। যদি সত্য সত্যই কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টের ক্ষমতা জনগণের উপর হস্তান্তরের ব্যবস্থা হইত, তাহা হইলে তদ্দ্বারা দেশবাসী সন্তুষ্ট হইতেন। এ ব্যবস্থায় যাঁহারা বড বড় চাকরী পাইলেন তাঁহারা বা তাঁহাদের আত্মীয় স্বজনগণই শুধু সন্তুষ্ট হইবেন।

ফরোয়ার্ড ব্লক বেআইনি—

গত ২২শে জুন ভাবত গভর্ণমেণ্ট ভারত রক্ষা আইনের ২৭ (ক) ধাবা অনুসারে এক আদেশ জারি করিয়া নিখিল ভারত ফরোয়ার্ড ব্লক ও তাহার সংশ্লিষ্ট সকল সমিতিকে বে-আইনি বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন ও ঐ সম্পর্কিত সকল লোককে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। ফরোয়ার্ড ব্লক নাকি শত্রুদেশের সহিত সম্পর্কিত ছিল।

পূর্ণচন্দ্র লাহিড়ী—

রায় বাহাদুর পূর্ণচন্দ্র লাহিড়ী গত ২৬শে জুন কলিকাতা ৫২ পুলিস হাসপাতাল রোডে ৭১ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনিই ভারতীয়গণের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম কলিকাতা পুলিসের ডেপুটী কমিশনার পদ লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার বিধবা পত্নী, এক কন্যা ও এক পুত্র বর্ত্তমান—পুত্র ক্যাপ্তেন প্রতুলচন্দ্র লাহিড়ী রয়াল আর্টিলারীতে কাজ করেন। আমরা তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

সিরাজ স্মৃতি দিবস—

গত ৩রা জুলাই কলিকাতা ইউনিভার্সিটী ইনিষ্টিটিউট হলে মাননীয় মন্ত্রী শ্রীযুত সন্তোষকুমার বসুর সভাপতিত্বে এক জন-সভায় নবাব সিরাজদ্দৌল্লার স্মৃতি দিবস পালন করা হইয়াছে। সভায় মন্ত্রী খাঁ বাহাদুর হাসেম আলি চৌধুরী, মন্ত্রী শ্রীযুত উপেন্দ্রনাথ বর্ম্মণ, শ্রীযুত যোগেশচন্দ্র গুপ্ত, মিঃ এ-কে-এম-জ্যাকেরিয়া, শ্রীমতী হেমপ্রভা মজুমদার প্রভৃতি বহু বক্তা বক্তৃতা করিয়াছিলেন। সিরাজের প্রকৃত ইতিহাস আলোচনার সময় এখন আসিয়াছে। হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ে মিলিয়া ইংরাজাধিকারের প্রথম যুগের প্রকৃত ইতিহাস রচনায় আজ যদি আমরা প্রবৃত্ত হই, তবে তাহার মধ্য দিয়া জাতীয়তারও উদ্বোধন হইবে। কাজেই এ সময়ে সিরাজের স্মৃতিপূজা করা প্রয়োজন।

শান্তিনিকেতনে আলোচনারত রবীন্দ্রনাথ—১৯৩৬ শিল্পী—শ্রীমুকুল দে

ডকটর রমেশচন্দ্র মজুমদার—

খ্যাতনামা ঐতিহাসিক ও অধ্যাপক ডকটর শ্রীযুত রমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় গত কয়েক বৎসর কাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলারের কাজ করার পর সম্প্রতি অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার ও সার যদুনাথ সরকার মহাশয়ের
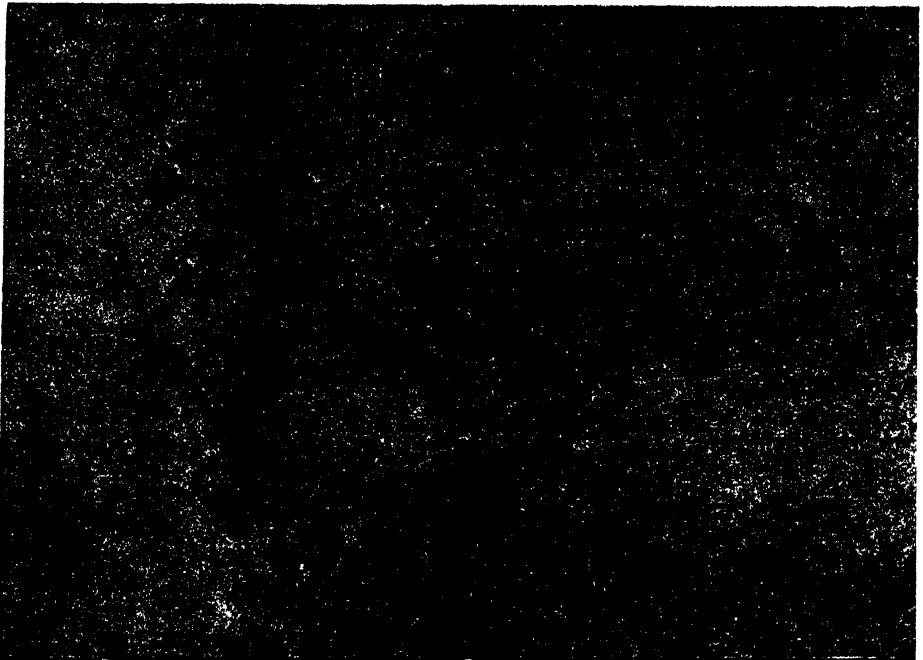
জাপান হইতে আমেরিকা যাইবার পথে রবীন্দ্রনাথ—১৯১৬

শিল্পী—শ্রীমুকুল দে

নিউ এম্পায়ার থিয়েটারে বসন্ত উৎসবে রবীন্দ্রনাথ—১৯৩১

শিল্পী—শ্রীমুকুল দে

পরিচালনাধীনে যে নূতন বাঙ্গালার ইতিহাস রচিত হইতেছে তাহা ইতিহাসে নূতন আলোকপাত করিবে সন্দেহ নাই। রমেশবাবু

বিচিত্রাগৃহে ডাকঘর অভিনয়ে প্রহরীর ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ—১৯১৭ শিল্পী—শ্রীমুকুল দে

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া পুনরায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্য্যে যোগদান করিলে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় লাভবান হইবে সন্দেহ নাই। দীর্ঘজীবন লাভ করিয়া রমেশচন্দ্র তাঁহার নূতন দানে দেশের জ্ঞানভাণ্ডার সমৃদ্ধ করুন, আমরা ইহাই প্রার্থনা করি।

মজুত চিনির পরিমাণ—

ভারত সরকারের এক বিবৃতি হইতে জানা যায়, গত ২০শে জুন পর্য্যন্ত বৃটীশ ভারতে অবস্থিত বিভিন্ন চিনির কলের মজুত চিনির পরিমাণ ৪ লক্ষ ২৪ হাজার টন বলিয়া মনে হয়। কারখানাসমূহের এই মজুত পরিমাণের সহিত বিক্রেতামহলের হাতে মজুত চিনির পরিমাণ যোগ করিয়া যে মোট পরিমাণ দাঁড়ায় তাহাতে আগামী বৎসরে বাজারে নূতন চিনির আমদানী পর্য্যন্ত উহার দ্বারা দেশের চিনির প্রয়োজন সম্পূর্ণ মিটান সম্ভব হইবে।—এ কথা সত্য হইলে বাজারে চিনির দর লইয়া এই ভাবে ছিনি-মিনি খেলা হইতেছে কেন?

নিরাশ্রয়দের জন্য আশ্রয় নির্ম্মাণ—

কলিকাতার নিরাশ্রয় ব্যক্তিদের জন্য বাঙ্গালা সরকার মুর্শিদাবাদে যে আশ্রয় নির্ম্মাণের পরিকল্পনা করিয়াছেন, তাহাতে সরকারের প্রায় ৯ লক্ষ টাকা ব্যয় পড়িবে। তাহা ছাড়া কাপড়-চোপড়, বিছানা ও আসবাবপত্র বাবদ ব্যয় হইবে অনুমান আরও ৩০ হাজার টাকা। কলিকাতার ভিখারীদের সংগ্রহ করিয়া তাহাদিগকে মুর্শিদাবাদে পাঠাইতে আরও ২০ হাজার টাকা ব্যয় করা প্রয়োজন হইবে। সরকারের এই পরিকল্পনা কবে সত্য সত্যই কার্য্যে পরিণত হইবে কে জানে?

কৃষি পণ্য বিক্রয় পরামর্শদাতা—

ডাক্তার নবগোপাল দাস আই-সি-এস দিল্লীতে ভারত সরকারের কৃষিপণ্য বিক্রয় বিভাগের পরামর্শদাতা পদে নিযুক্ত আছেন। সম্প্রতি নাকি তাঁহার স্থানে ঐ পদে একজন মার্কিন বিশেষজ্ঞকে আনয়ন করা হইবে। ভারত ও মার্কিনের কৃষি বা বিক্রয়ের অবস্থা একরূপ নহে। এ অবস্থায় কেন যে ডাক্তার দাসের স্থানে নূতন লোক আমদানী করা হইবে তাহা বুঝা কঠিন। ডাক্তার দাস পণ্ডিত ও বিচক্ষণ ব্যক্তি; আমাদের বিশ্বাস, তিনি ঐ কার্য্যের পক্ষে যোগ্য বলিয়া বিবেচিত না হইলেও তাঁহার কর্ম্মক্ষেত্রের অভাব হইবে না।

বীতানে উৎসব—

গত ৩১শে মে সন্ধ্যায় শ্রীযুত যতীন্দ্রনাথ মজুমদার মহাশয়ের ১নং চৌরঙ্গী টেরাসস্থ ভবনে গীত বীতান কর্ত্তৃক রবীন্দ্রনাথের জন্মোৎসব হইয়াছিল। অধ্যাপক শ্রীযুত কালিদাস নাগ মহাশয় উৎসবে পৌরোহিত্য করিয়াছিলেন। রবীন্দ্র সঙ্গীত প্রচারের উদ্দেশ্যেই

ডিমাপুর গভর্ণমেণ্ট ক্যাম্পে ব্রহ্ম প্রত্যাগতগণ নাম রেজেষ্ট্রীতে রত। ফটো—তারক দাস
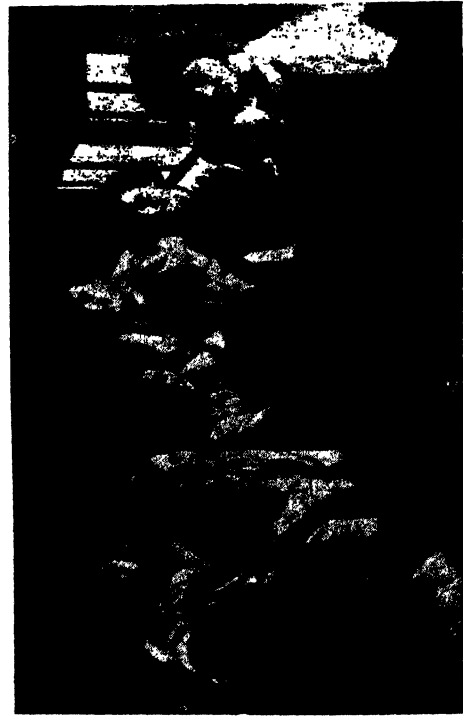
আসাম মেলে ব্রহ্মদেশ প্রত্যাগত ইউরোপীয় আশ্রয়প্রার্থী ফটো—তারক দাস

পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু কর্ত্তৃক কংগ্রেস কর্মীদের সহিত আলোচনা ফটো—তারক দাস

ব্রহ্ম প্রত্যাগত অসুস্থগণ—ডিমাপুরে ফটো—তারক দাস

গৌহাটীর পথে বৃষ্টির মধ্যে পণ্ডিত জহরলাল নেহেরুর বক্তৃতা ফটো—তারক দাস

এই অনুষ্ঠান করা হইয়াছিল। শান্তিনিকেতনের শ্রীযুত শৈলজানন্দ মজুমদার সঙ্গীত পরিচালনার ভার লইয়াছিলেন এবং কুমারী কণিকা মুখোপাধ্যায়, অরুন্ধতী গুহ ঠাকুরতা সুচিত্রা মুখোপাধ্যায়, নন্দিনী গুহ ঠাকুরতা মন্দিরা গুহ ঠাকুরতা, ও প্রণব গুহ ঠাকুরতা প্রভৃতি শান্তিনিকেতনের ছাত্রছাত্রীরা গান করিয়াছিলেন। কলিকাতার কুমারী মঞ্জুলা গুপ্তা, প্রতিমা গুপ্তা, গীতি মজুমদার, মায়া বসু, জ্যোতি বন্দ্যোপাধ্যায়, ভারতী বন্দ্যোপাধ্যায়, করুণা ঘোষ, রমা রায়, বিজয়া দাস, শুভ গুহ ঠাকুরতা, সুজিতরঞ্জন রায়, দেবব্রত বিশ্বাস, সোমেন গুপ্ত, সুনীলকুমার রায়, অরূপ মিত্র, নীহারবিন্দু সেন ও পঞ্চু বাগচী গান গাহিয়াছিলেন। ডাক্তার কালিদাস নাগ, শ্রীযুত প্রদ্যোৎ গুহ ঠাকুরতা ও কুমারী সুচিত্রা মুখোপাধ্যায় আবৃত্তি করিয়াছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের নামে পথ—

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর চন্দননগরে মোরান হাউস নামক অধুনালুপ্ত একটি বাড়ীতে বাস করিয়া তাহার শৈশব সঙ্গীত রচনা করিয়াছিলেন। সম্প্রতি চন্দননগর মিউনিসিপালিটী ঐ অঞ্চলের গোন্দলপাড়া রোডটির নাম পরিবর্ত্তন করিয়া 'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রোড' নাম দিয়াছেন। বাঙ্গালা দেশের বহু স্থান এইভাবে রবীন্দ্রনাথের সহিত সম্পর্কিত হইয়া আছে। সেই সকল স্থানেও এইভাবে স্থানগুলির সহিত রবীন্দ্রনাথের নাম সংযুক্ত করিয়া রাখিলে পরে লোক অতি সহজে রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধীয় সেই স্মৃতিটি মনে করিতে পারিবে।

রাজকুমার বর্ম্মণ—

কলিকাতা কর্পোরেশনের কাউন্সিলার, কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ নাগরিক শ্রীযুত মদনমোহন বর্ম্মণের একমাত্র পুত্র রাজকুমার বর্ম্মণ গত ৭ই জুলাই মাত্র ২৯ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। রাজকুমার অল্প বয়স হইতে দক্ষতার সহিত পিতার ব্যবসায় ও জমিদারী সংক্রান্ত কার্য্য পরিচালনা করিতেন। তাঁহার অল্পবয়স্কা স্ত্রী, এক পুত্র, এক কন্যা, বৃদ্ধ মাতাপিতা ও পিতামহী বর্ত্তমান।

হুগলী ব্যাঙ্ক—

হুগলী ব্যাঙ্ক লিমিটেডের ১৯৪১ সালের বার্ষিক কার্য্যবিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাতে দেখা যায়, ব্যাঙ্ক কর্ত্তৃপক্ষ স্থায়ী আমানতকারীদের দেয় সুদের পরিমাণ কমাইয়া, নানাদিকে ব্যাঙ্কের ব্যয়সঙ্কোচ করিয়া ও দাদনের হার হ্রাস করিয়া একদিকে ব্যাঙ্কের লাভের পরিমাণ বাড়াইয়া অন্যদিকে ব্যাঙ্কে নগদ টাকার স্বচ্ছলতা আনিয়াছেন। ফলে এই দুঃসময়েও ব্যাঙ্কের সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি দেখা যাইতেছে। আলোচ্য বর্ষে সাধারণ অংশীদারগণকেও শতকরা বার্ষিক ৯ টাকা হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছে। আমরা এই ব্যাঙ্কের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি।

মহাত্মা গান্ধী ও কংগ্রেস—

৬ই জুলাই হইতে প্রায় এক সপ্তাহ কাল ধরিয়া ওয়ার্দ্ধাগঞ্জে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশনে মহাত্মা গান্ধীর নূতন কার্য্যপদ্ধতি সম্বন্ধীয় প্রস্তাব বিবেচিত হইতেছে। বিষয়টি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া আলোচনা শেষ হইতে বিলম্ব হইতেছে। এদিকে শ্রীযুত রাজাগোপালাচারী ও শ্রীযুত ভুলাভাই দেশাই কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যপদ ত্যাগ করায় তাঁহাদের স্থানে আচার্য্য শ্রীযুত নরেন্দ্র দেব ও শ্রীযুত জয়রামদাস দৌলতরামকে নূতন সদস্য করা হইয়াছে। মহাত্মা গান্ধীর নূতন প্রস্তাবে কি কার্য্যব্যবস্থা আছে, তাহা জানিবার জন্য দেশবাসী সকলেই উদগ্রীব হইয়া আছেন। বর্ত্তমান অবস্থায় দেশবাসীর কর্ত্তব্য নির্দ্দেশের শক্তি যে ভারতে একমাত্র মহাত্মা গান্ধীরই আছে, সে বিষয়ে কাহারও সন্দেহ নাই।

রেল দুর্ঘটনা—

গত ৭ই জুলাই মঙ্গলবার সন্ধ্যায় বর্দ্ধমান ষ্টেশনে যখন এক খানি আপ ট্রেণ প্ল্যাটফর্ম্মে দাঁড়াইয়াছিল, তখন আর একখানি আপ ট্রেণ ষ্টেশনের ঐ প্ল্যাটফর্ম্মে প্রবেশ করিয়া প্রথম গাড়ীতে ধাক্কা মারায় দুর্ঘটনার ফলে ৮ জন নিহত ও বহু যাত্রী আহত হইয়াছে। ঘটনাটি এমন, যে কি করিয়া উহা হইতে পারে তাহা ভাবিয়া লোক আশ্চর্য্য হইতেছে। আজকাল রেল দুর্ঘটনার সংখ্যা এত বাড়িয়াছে যে তাহা যে কোন রেল কর্ত্তৃপক্ষের পক্ষেই লজ্জার কথা সন্দেহ নাই। যাহাতে রেল দুর্ঘটনা না হয়, সে বিষয়ে কোন ব্যবস্থা করা কি রেল কর্ত্তৃপক্ষের পক্ষে সম্ভব নহে? নানা কারণে ট্রেণ যথাসময়ে যাতায়াত করে না—সে বিষয়ে অভিযোগ করিয়াও কোন ফল পাওয়া যায় না। সেই বিলম্ব একটু বাড়িয়া যদি দুর্ঘটনা নিবারিত হয়, রেল কর্ত্তৃপক্ষের সে জন্য চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।

ওরিয়েণ্টাল এস্যুরেন্স প্রতিষ্ঠান—

১৯৪১ ইংরাজী অব্দের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে যে বৎসর শেষ হইয়াছে সুপ্রসিদ্ধ বীমা-প্রতিষ্ঠান ওরিয়েণ্টাল গবর্ণমেণ্ট সিকিউরিটি লাইফ এস্যুরেন্স লিমিটেড কোম্পানীর সেই বৎসরের আয়-ব্যয় ও কার্য্য-বিবরণীর যে 'রিপোর্ট' প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে প্রকাশ—আলোচ্য বৎসরে উক্ত প্রতিষ্ঠানে মোট ১১,৬৩, ১১, ৭০৮ টাকার জীবন বীমার প্রস্তাব পাওয়া গিয়াছিল। ঐ পর্য্যন্ত কোম্পানীর তহবিলে ২৯,৬৯,৩৬,৯৮৮ টাকা মজুত ছিল। আলোচ্য বর্ষে কোম্পানীর যে টাকা আয় হইয়াছে তাহার পরিমাণ ৫,৯৯,৫২,৮০৮ টাকা; তন্মধ্যে প্রিমিয়াম খাতেই ৩,৮৪,০৬,৭১২ টাকা আয় হইয়াছে। মোটের উপর গত বৎসর অপেক্ষা আলোচ্য বর্ষে শেষোক্ত প্রিমিয়াম খাতে ১১,২২,৬১০ টাকা বেশী আয় হইয়াছে। আলোচ্য বর্ষের মোট আয় হইতে ব্যয় হইয়াছে ২,৮৯,৫১,২২৭।৶/১০ এবং নিট আয়ের পরিমাণ ২,১০,১০,৫৭।১৫ টাকা! ইহা হইতেই এই প্রতিষ্ঠানটির সমৃদ্ধি ও নিরাপত্তা সম্পর্কে প্রতিষ্ঠার পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। বর্ত্তমান দুর্ব্বৎসরেও কর্ত্তৃপক্ষের কর্মপদ্ধতি এবং কর্মক্ষেত্র প্রসারের কৃতিত্ব যে বিশেষভাবে প্রশংসনীয় তাহা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

শ্রীক্ষেত্রনাথ রায়

ফুটবল লীগ ঃ

ফুটবল লীগ খেলা শেষ হতে চলেছে। প্রথম বিভাগের লীগের প্রথমার্দ্ধে শীর্ষস্থান অধিকারী ইষ্টবেঙ্গল দল এ পর্য্যন্ত প্রথম স্থান অধিকার ক'রে আছে। তারা লীগের প্রথমার্দ্ধে মাত্র মহমেডান দলের কাছে পরাজিত হয়ে ১২টা খেলায় ২২ পয়েন্ট করেছিল। দ্বিতীয়ার্দ্ধের খেলায় এ পর্য্যন্ত তিনটি খেলাতে 'ড্র' করেছে, হার একটাতেও হয় নি। ২২টা খেলায় তাদের ৩৯ পয়েন্ট হয়েছে। কালীঘাট এবং মোহনবাগানের সঙ্গে তাদের খেলা বাকি। এই দুটী খেলাতে তারা আর ২টি পয়েন্ট করলেই এ বৎসরের লীগ বিজয়ের সম্মান লাভ করবে। লীগের প্রথম থেকে ইষ্টবেঙ্গল যে ভাবে খেলে আসছে তাতে তারা যে এই দুটি খেলাতে ২টি পয়েন্ট অনায়াসে সংগ্রহ করতে পারবে সে সম্বন্ধে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। লীগের দ্বিতীয় স্থান অধিকারী করেছিল। পুলিশ দল হিসাবে অনেক দুর্ব্বল। লীগ তালিকায় তারা নবম স্থান অধিকার করে আছে। খেলায় কত যে অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটতে পারে তা এবার পুলিশদলই একা দেখিয়েছে। লীগ তালিকায় তারা স্পোর্টিং ইউনিয়ান, কালীঘাট এবং নীচের দিকে রেঞ্জার্স এমন কি লীগের সর্ব্ব-নিম্নস্থান অধিকারী কাষ্টমসের কাছে পরাজিত হয়েছিল। কিন্তু অন্য দিকে আবার লীগের উপরের দিকের প্রথম তিনটি দল যথা ইষ্টবেঙ্গল, মহমেডান স্পোর্টিং এবং মোহনবাগানের সঙ্গে অমীমাংসিত ভাবে খেলা শেষ করেছে এবং বি এণ্ড এ রেল-দলকে ৩-২ গোলে পরাজিত ক'রে খেলায় অপ্রত্যাশিত ঘটনার দৃষ্টান্ত দেখিয়েছে। এদের খেলার কোন ষ্ট্যাণ্ডার্ড নেই। শক্তিশালী দলের সঙ্গে এক একদিন চমৎকার খেলার পরিচয় দেয়।

বেণীপ্রসাদ

গড়গড়ি

সোমানা

আপ্পারাও

কে দত্ত

মহমেডান দলের এখনও ৩টি খেলা বাকি। এই বাকি খেলাগুলিতে তারা জয়লাভ করলেও ইষ্টবেঙ্গলের নাগাল পাবে না।

লীগের দ্বিতীয়ার্দ্ধের খেলার সূচনা ইষ্টবেঙ্গলের ভাল হয়েছিল। দ্বিতীয়ার্দ্ধের খেলায় ইষ্টবেঙ্গল ৬-০ গোলে ক্যালকাটাকে পরাজিত ক'রে প্রথমার্দ্ধের পয়েন্টে ২ পয়েন্ট যোগ করে। ডালহৌসি, কাষ্টমস এবং রেঞ্জার্সকে যথাক্রমে ৫-০ গোলে পরাজিত করতে ইষ্টবেঙ্গলের কোনরূপ বেগ পেতে হয় নি। কিন্তু তারা বি এণ্ড এ রেলদলের সঙ্গে ২-২ গোলে এবং পুলিশের সঙ্গে গোল শূন্য করে খেলা 'ড্র' করাতে ২টি মূল্যবান পয়েন্ট নষ্ট করে। লীগের প্রথমার্দ্ধের খেলায় ইষ্টবেঙ্গল ২-০ গোলে পুলিশকে পরাজিত

লীগের দ্বিতীয়ার্দ্ধে ইষ্টবেঙ্গল বনাম মহামেডানের খেলাটিতে কোন পক্ষই গোল দিতে না পারায় খেলাটি 'ড্র' হয়। এই নিয়ে তিনটি খেলায় ইষ্টবেঙ্গল 'ড্র' করেছে। পুলিশের সঙ্গে খেলায় ইষ্টবেঙ্গলের খেলার সমস্ত কিছু জৌলুষ নবাগত খেলোয়াড় পাগসলে নষ্ট করেছেন। একাধিক গোলের সুযোগ এই খেলোয়াড়টি নিজে হারিয়েছিলেন এবং আক্রমণভাগের সহযোগী খেলোয়াড়দের সর্ব্বপ্রকার সহযোগিতা থেকে বঞ্চিত করেছিলেন। পাগসলের পরিবর্ত্তে অন্য কেউ খেললে খেলার ফলাফল যে এইরূপই হ'ত তা কেউ জোর করে বলতে পারেন না। তবে পুলিশ তার স্বাভাবিক খেলার ষ্ট্যাণ্ডার্ড অপেক্ষা ঐদিন অনেক উন্নত ক্রীড়া চাতুর্য্যের পরিচয় দিয়েছিল।

ইষ্টবেঙ্গল দল হিসাবে বহুদিন থেকেই শক্তিশালী। দুর্ভাগ্য বশতঃ শক্তিশালী খেলোয়াড় নিয়েও এরা কয়েকবার দু' এক পয়েণ্টের জন্য লীগ বিজয়ের সম্মান লাভ করতে পারে নি। শীল্ড

দুই হস্তে গোলরক্ষকের 'Low-shot' প্রতিরোধের নির্ভুল পন্থা

খেলাতে তারা উন্নত ক্রীড়া চাতুর্য্যের পরিচয় দিতে এ পর্য্যন্ত পারে নি। কারণ কর্দমাক্ত মাঠে দলের দ্রুতগামী খেলোয়াড়রা তাদের সে ক্ষিপ্রগতি হারিয়ে ফেলে বিপক্ষ দলের সঙ্গে পেরে উঠত না। জলকাদায় খেলার অভ্যাস থাকলে তারা উন্নত ক্রীড়া চাতুর্য্যের পরিচয় দিতে পারত। আশার কথা ক্রমশঃ তাদের দলের খেলোয়াড়রা এইরূপ অবস্থায় খেলতে অভ্যস্ত হয়ে এসেছেন।

এ বৎসর লীগ খেলার প্রথম থেকেই এই দলটি লীগ বিজয়ীর মত ক্রীড়াচাতুর্য্যের পরিচয় দিয়ে এসেছে। যদিও দু' একটি খেলায় দলের স্বাভাবিক ক্রীড়া চাতুর্য্যের অভাব পরিলক্ষিত হয়েছিল। আর একটি উল্লেখযোগ্য দলের খেলোয়াড়েরা প্রায় সকলেই তরুণ। আমরা তৃতীয়বার আর একটি ভারতীয় দলকে লীগ বিজয়ের সম্মান অর্জ্জন করতে দেখে আনন্দ এবং গর্ব্ব অনুভব করছি। খেলোয়াড় সুলভ মনোবৃত্তি নিয়ে ভারতীয় দলের প্রতিবার এইরূপ বিজয়লাভ আমরা বার বার কামনা করছি।

লীগ তালিকার দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে মহামেডান দল। ২১ খেলাতে তাদের ৩৪ পয়েণ্ট হয়েছে। ১টা কম খেলে ইষ্টবেঙ্গলের থেকে ৫ পয়েণ্টের ব্যবধান। এখনও ৩টে খেলা এদের বাকি। সম্ভবত মহমেডান দলই লীগে রানার্স আপ পাবে। মহামেডান দল দলের পূর্ব্ব সুনাম অনুযায়ী এবার লীগ প্রতিযোগিতায় খেলতে পারে নি। লীগের এ পর্য্যন্ত খেলায় তারা একমাত্র মোহনবাগান দলের কাছে পরাজিত হয়েছে। 'ড্র' করেছে ৬টা খেলায়। লীগের দ্বিতীয়ার্দ্ধের খেলায় ক্যালকাটাকে মাত্র ২-০ গোলে পরাজিত করতে তাদের রীতিমত পরিশ্রম করতে হয়েছিল। খেলোয়াড়দের ক্ষিপ্রতা পূর্ব্বাপেক্ষা হ্রাস পেলেও একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে তাদের খেলোয়াড়দের মধ্যে বল আদান প্রদানে বুঝাপোড়া এবং দলের সঙ্ঘবদ্ধতা এখনও ক'লকাতার যে কোন দলের থেকে শ্রেষ্ঠ। লীগ খেলার প্রারম্ভেই তারা যদি অনুশীলনের সুযোগ লাভ করত তাহলে খেলার ষ্ট্যাণ্ডার্ড আরও উন্নত হতে পারত। কর্দমাক্ত মাঠে মহমেডান দল আজও যে শ্রেষ্ঠ তা মোহনবাগানের সঙ্গে দ্বিতীয়ার্দ্ধের

এক হস্তদ্বারা গোলরক্ষক শুয়ে পড়ে গোল বাঁচাচ্ছে—এই পন্থা ভুল

খেলায় প্রকাশ পেয়েছে। ঐ দিন মাঠের অবস্থা ভাল ছিলো না। কিন্তু মহমেডান দল সেই অবস্থায় নিজেদের প্রাধান্য সর্ব্বক্ষণই বজায় রেখেছিল। 'ফাষ্ট টিমের' সঙ্গে খেলায় মহামেডান সুবিধা করতে পারেনি। তারা দ্বিতীয়ার্দ্ধের খেলায় ইষ্টবেঙ্গলের সঙ্গে গোল শূন্য 'ড্র' করেছে।

লীগ তালিকায় মোহনবাগান দল তৃতীয় স্থানে আছে। ২০টা খেলায় তাদের ৩০ পয়েণ্ট। বাকি খেলা গুলিতে যদি কোন অপ্রত্যাশিত ফলাফল না হয় তাহলে এরা এই স্থানে থাকবে। লীগ চ্যাম্পিয়ানসীপ নিয়ে ইষ্টবেঙ্গলের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবার যেটুকু আশা ছিল তা মহামেডানদলের কাছে হেরে যাওয়াতে একেবারে শেষ হয়েছে। এখন লীগের রাণার্স আপ্ নিয়ে তাদের প্রতিযোগিতা চলবে মহমেডানের সঙ্গে। মহমেডান দলের সঙ্গে দ্বিতীয়ার্দ্ধের খেলায় মোহনবাগান নিঃকৃষ্ট খেলার পরিচয় দিয়েছে। পূর্ব্বে থেকেই দলের সেণ্টার ফরওয়ার্ডের সমস্যা ছিল এখন আবার সেণ্টার হাফ্। হাফ্ লাইনে বেণী ছাড়া কারও উপর নির্ভর করা চলে না। খেলায় সঙ্ঘবদ্ধতা একান্ত প্রয়োজন, তার অভাব যথেষ্ট পরিমাণে পরিলক্ষিত হয়। মোহনবাগান বহু পুরাতন ক্লাব, অর্থ এবং আভিজাত্যের দিক থেকেও অন্যতম। ভাল একজন ফুটবল শিক্ষকের হাতে খেলোয়াড়দের শিক্ষাদানের ভার দিলে খেলার উন্নতি যে হবে না এ কথা স্বীকার্য্য নয়। এই ব্যয়ভার বহন করতে মোহনবাগান ক্লাবকে কোন রকম বেগ পেতে হবে না। এই ব্যবস্থায় সভ্যরা ও সমর্থকরাও খুশী হবেন এবং অনেকটা নিশ্চিন্ত হতে পারবেন।

লীগ তালিকার চতুর্থ স্থানে ভবানীপুর ক্লাব। ২১টা খেলে ২৬ পয়েণ্ট হয়েছে। আক্রমণ ভাগের খেলা উন্নত হ'লে তালিকার উপর দিকে উঠতে পারতো। পুলিশ তালিকার নবম স্থানে থেকে লীগ খেলায় কি বিপর্য্যয় কাণ্ড করেছে তা পূর্ব্বেই উল্লেখ করেছি। কাষ্টমস সর্ব্বনিম্নস্থান অধিকার করেছে। এ পর্য্যন্ত তারা ১টি খেলায় 'ড্র' করেছে এবং মাত্র পরাজিত করেছে পুলিশের মত টিমকে। এ বছরের খেলায় এই বিজয় গর্ব্বই

তাদের একমাত্র সান্ত্বনা। আর সব থেকে ভরসা লীগ খেলার এবার ওঠা নামার হাঙ্গামা নেই।

দ্বিতীয় বিভাগের লীগে রবার্ট হাডসন একটা খেলাতেও না হেরে লীগবিজয়ী হয়েছে। ১৫টা খেলাতে তাদের ৩০ পয়েন্ট উঠেছে।

লীগে ব্যক্তিগত কৃতিত্ব ঃ

প্রথম বিভাগের লীগ খেলা এখনও শেষ হয় নি। এ পর্য্যন্ত যতগুলি খেলা হয়েছে তার মধ্যে শ্রেষ্ঠ গোলদাতা হিসাবে কে কিরূপ স্থান পেয়েছেন তার প্রথম কয়েকটি স্থান দেওয়া হ'ল।

সোমানা (ইষ্টবেঙ্গল)—২৪ ; বি কর (বি এণ্ড এ রেলওয়ে)—২২ ; সাবু (মহমেডান স্পোর্টিং)—১৯ ; সুনীল ঘোষ (ইষ্টবেঙ্গল)—১৬ ; তাহের (মহামেডান)—১৩ ; তাজ-মহম্মদ (মহামেডান)—১০।

খেলার ষ্ট্যাণ্ডার্ড ঃ

যুদ্ধের দরুণ অনেক ফুটবল খেলোয়াড় কলকাতার বাইরে চলে যেতে বাধ্য হয়েছেন। ফলে ফুটবল ক্লাবগুলি বিশেষভাবে দিয়ে খেলা 'ড্র' করেছে আবার সর্ব্বনিম্ন স্থান অধিকারী দলের কাছে পরাজয় বরণ করেছে। অবিশ্যি খেলায় অপ্রত্যাশিত ঘটনা পূর্ব্বেও ঘটেছে তবে এইরূপ উদাহরণ বিরল।

প্রবীণ ক্রীড়ামোদীদের মুখে শুনা যায় পূর্ব্বের তুলনায় খেলার ষ্ট্যাণ্ডার্ড অনেক নিকৃষ্ট হয়েছে। ফুটবল খেলার অতি পুরাতন ইতিহাসের প্রয়োজন নেই, বিগত ১০ বৎসরের খেলার ইতিহাস নিলেই দেখা যাবে সে সময়ের তুলনায় বর্ত্তমানে খেলার ষ্ট্যাণ্ডার্ড অনেক খারাপ হয়েছে। কয়েক বছর আগে যে সব খেলোয়াড় উন্নত ক্রীড়াচাতুর্য্যের পরিচয় দিয়েছিলেন তাঁদের খেলার মধ্যে উপস্থিত পুরাতন খেলার কোন জৌলুষই নেই। এত অল্প সময়ে খেলার অধঃপতন আশার কথা নয়। একদিকে যেমন খেলোয়াড়রা কয়েকবছর ভাল খেলে শেষে অবসর নেবার দাখিল হচ্ছেন ওদিকে তেমনি আবার নূতন খেলোয়াড় দিয়ে তাদের শূন্যস্থান পূরণ করতে ভাল খেলোয়াড় তৈরী করা হচ্ছে না। বাঙ্গলা দেশ ছেড়ে ফুটবল প্রতিষ্ঠানগুলি ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে খেলোয়াড় অন্বেষণে দালাল পাঠিয়েও সুস্থির হ'তে পাচ্ছেন না।

এই তিনটি ছবিতে দুই হস্ত দ্বারা গোলরক্ষকের 'Ground shot' ধরবার নির্ভুল পন্থা দেখান হয়েছে

ক্ষতিগ্রস্ত হ'য়েছে। এই ক্ষতি ইউরোপীয় ক্লাবগুলির বেশী। সামরিক দলও খেলায় যোগদান করেনি। এই সমস্ত বিবেচনা করে আই এফ এ এবৎসর ক্যালকাটা ফুটবল লীগ খেলায় উঠানামা বন্ধ রেখেছেন। এই ব্যবস্থার জন্য ফুটবল খেলোয়াড়দের যে উৎসাহ এবং উদ্দীপনা যথেষ্ট পরিমাণে হ্রাস পেয়েছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। লীগের যা কিছু আকর্ষণ তা উঠা নামার মধ্যে। লীগের উঠানামার মধ্যে যতখানি খেলায় বিজয়-লাভের উদ্যম পরিলক্ষিত হয় ততখানি এইরূপ ব্যবস্থায় সম্ভব নয়। দলের খেলোয়াড়দের মধ্যে যেন একটা নির্লিপ্তভাব এসে গেছে। লীগতালিকার মাঝখানে থেকে একটি ক্লাব তালিকার উপরের প্রথম কয়েকটি ক্লাবের সঙ্গে খেলে তাদের রীতিমত বেগ

আই এফ এ আইন ক'রে খেলোয়াড় আমদানী বন্ধ করবার চেষ্টা করেছেন। আইনের প্রয়োজন আছে কিন্তু একটি জিনিষের প্রয়োজন আরও বেশী। সেটি বাঙ্গালার ফুটবলের উপর বিভিন্ন ফুটবল প্রতিষ্ঠানের সদিচ্ছা এবং পরস্পরের মধ্যে সহযোগিতা। কলকাতার ফুটবল প্রতিষ্ঠানগুলি যদি খেলায় বিজয় লাভই একমাত্র কাম্য মনে করেন এবং বাঙ্গলা ফুটবলের ভবিষ্যত চিন্তা না ক'রে বাইর থেকে খেলোয়াড় আমদানী বজায় রাখেন তাহ'লে কোন দিনই বাঙ্গালী তরুণ খেলোয়াড় খেলায় যোগদানের সুযোগ পাবে না। ফলে বাঙ্গলার ফুটবলের এই ভুঁয়া মর্য্যাদা সামরিক ভাবে বিদেশী খেলোয়াড় দ্বারা রক্ষা হ'লেও অদূর ভবিষ্যতে সে সম্ভব আর হবে না। কারণ বিদেশ থেকে নামকরা

খেলোয়াড় আমদানী করেই পরিচালকমণ্ডলী হাঁফ ছেড়ে নিশ্চিন্ত হয়ে থাকেন। আর এদিকে অনুশীলন চর্চ্চার অভাবে সেই সব খেলোয়াড় যে কতখানি অকর্মণ্য তা শীঘ্রই প্রমাণ হয়ে যায়।

নামকরা খেলোয়াড়দের সহযোগিতা পেয়ে খেলায় জয়লাভও অনেক সময় হয় না। একথা আমরা কলকাতার কয়েকটী প্রতিষ্ঠাবান ক্লাবের দীর্ঘ দিনের অভিজ্ঞতা থেকেই বলছি। খেলায় অনুশীলন চর্চ্চার প্রয়োজন প্রধান। তারপর খেলোয়াড়দের মধ্যে সাধুতা এবং দলের সজ্ঘবদ্ধতা প্রয়োজন। Team works এবং Team spirit না থাকলে কোন দলই জয়ী হ'তে পারে না। এই দুইটির অভাব বর্ত্তমানে কলকাতার দু' একটি ছাড়া সমস্ত ফুটবল দলের মধ্যেই অনুভূত হয়। যে দলের মধ্যে উল্লিখিত গুণ দুটি বিদ্যমান তারা অতি নামকরা খেলোয়াড় দ্বারা সংগঠিত দলকেও পরাজিত ক'রে বিজয়ী হয়েছে। সে ইতিহাস খেলার মধ্যে বিরল নয়। ভবিষ্যতের চিন্তা ক'রে বিভিন্ন ক্লাবের পরিচালকমণ্ডলী এ বিষয়ে দৃষ্টিপাত করবেন বলে আমরা আশা করি।

যুদ্ধে খেলোয়াড়দের যোগদান ঃ

বর্ত্তমানে যুদ্ধ যে আকার ধারণ করেছে তাতে এই যুদ্ধকে কোন একটি বিশেষ জাতির বা দেশের বলা চলে না, এ যুদ্ধ পৃথিবীর স্বাধীনতাকামী ব্যক্তি মাত্রেরই। এক দিকে পরদেশ লোভী দলের আক্রমণ অপর দিকে শত্রুর হাত থেকে দেশকে রক্ষার জন্য স্বাধীনচেতা জনগণের সংগ্রাম। দেশের স্বাধীনতার সংগ্রামে খ্যাতনামা খেলোয়াড়রাও খেলা ছেড়ে দলে দলে যোগদান করছেন। ডবলউ এ (বিলি) ব্রাউন অষ্ট্রেলিয়ার একজন টেষ্ট খেলোয়াড়। তিনি রয়েল অষ্ট্রেলিয়ান বিমান বাহিনীতে যোগদান করেছেন। অষ্ট্রেলিয়ার ভূতপূর্ব্ব টেষ্ট খেলোয়াড় রিচার্ডসনও উক্ত বিমানবাহিনীতে যোগ দিয়েছেন। রিচার্ডসনের বয়স ৪৭। তিনি একজন নামকরা ব্যাটসম্যান এবং ফিল্ডস ম্যান হিসাবে তাঁর সুনাম সর্ব্বাপেক্ষা বেশী ছিল। সাউথ অষ্ট্রেলিয়া দলে বহু বৎসর তিনি অধিনায়কত্ব করেন এবং ১৯৩৫-৩৬ সালে সাউথ আফ্রিকাতে যে অষ্ট্রেলিয়ার ক্রিকেট দল গিয়েছিল তার অধিনায়ক হয়েছিলেন। প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেট খেলায় তিনি ১০,০০০ হাজারেরও উপর রান করেছিলেন।

ও'রেলী

শীর্ষস্থানে ও'রেলী ঃ

যুদ্ধের দরুণ অষ্ট্রেলিয়ায় প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেট খেলার ব্যবস্থা সম্ভব না হলেও খেলাধুলা একেবারে বন্ধ হয়ে যায়নি। সম্প্রতি একটি সংবাদে প্রকাশ, টেষ্ট খেলোয়াড় ও'রেলী অধিক সংখ্যক উইকেট নিয়ে ১৯১৬ সালের প্রতিষ্ঠিত আর্থার মেলের রেকর্ড ভঙ্গ করেছেন। মেলে ১০২টি উইকেট পেয়ে নূতন রেকর্ড করেছিলেন। ও'রেলী পেয়েছেন ১০৮টি উইকেট; তাঁর এভারেজ দাঁড়িয়েছে ৮·৯২।

এই নিয়ে ও'রেলী পর্য্যায়ক্রমে পাঁচবার বোলিংয়ে শীর্ষস্থান অধিকার করলেন; সর্ব্বসমেত তিনি ৯বার বোলিংয়ে শীর্ষস্থান অধিকার করেছেন। এই সমস্ত রেকর্ডগুলিই নিউ সাউথ ওয়েলস এসোসিয়েশন কর্তৃক অনুমোদিত।

ডোনাল্ড বাজের সাফল্য ঃ

আমেরিকার পেশাদার লন টেনিস চ্যাম্পিয়ানসীপ প্রতিযোগিতায় এবৎসর সকল পেশাদার খেলোয়াড় যোগদান করেননি। খ্যাতনামা টেনিস খেলোয়াড় ফ্রেড পেরী প্রতিযোগিতায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা থেকে বিরত থাকেন। প্রতিযোগিতার সিঙ্গলস ফাইনালে ডোনাল্ড বাজ এবং বেবী রিগস প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। অনেকেই আশা করেছিলেন বেবী রিগস শেষ পর্য্যন্ত পরাজিত হ'লেও ডোনাল্ড বাজকে জয়লাভ করতে রীতিমত বেগ দিবেন। কিন্তু খেলার প্রথম থেকেই রিগস ডোনাল্ড বাজের খেলার বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারেন নি, তাঁর স্বাভাবিক খেলা চাতুর্য্যের কোন বিকাশই হয়নি। বাজের বিভিন্ন মারের সম্মুখে রিগস সম্পূর্ণভাবে বিপর্য্যস্ত হয়েছিলেন। বাজ ষ্ট্রেট সেটে রিগসকে পরাজিত করেন। ডবলস ফাইনালে রিগস কিন্তু বাজের জুটী হয়ে ভাল খেলেছিলেন। প্রথম সেটটি কোভাক্স দল পান কিন্তু পরবর্ত্তী তিনটি সেটে পর্য্যায়ক্রমে বাজদলই বিজয়ী হ'ন।

ডোনাল্ড বাজ

ফলাফল ঃ

সিঙ্গলস ফাইনালে ডোনাল্ড বাজ ৬—২, ৬—২ গেমে ববী রিগসকে পরাজিত করেছেন।

ডবলস ফাইনালে ডোনাল্ড বাজ ও রিগস ২—৬, ৬—৩, ৬—৪, ৬—২ গেমে কোভাক্স ও বার্ণিসকে পরাজিত করেছেন।

জো'লুইয়ের সাফল্য ঃ

জো'লুই বর্ত্তমানে ইউনাইটেড ষ্টেটস আর্মিতে যোগদান করায় অনেকের ধারণা হয়েছিলো তিনি বুঝি আর মুষ্টি যুদ্ধে নিজের সম্মান রক্ষার্থে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হবেন না। কিন্তু জো'লুই সম্প্রতি তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী এব্ সাইমনকে পরাজিত করে মুষ্টিযুদ্ধে তাঁর পৃথিবীর সম্মান রক্ষা করেছেন। দীর্ঘ পাঁচ বৎসরে তাঁর

পৃথিবীর সম্মান অক্ষুন্ন রাখতে জো'লুইকে ২১জন মুষ্টিযুদ্ধের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বীতা করতে হয়েছিল। পৃথিবীর অপর কোন মুষ্টিযোদ্ধাকে এত অধিকবার নিজের সম্মান রক্ষার্থে প্রতিযোগিতায় নামতে হয়নি। প্রতিযোগিতার ফলাফল থেকে জো'লুই যে সর্ব্বকালের একজন শ্রেষ্ঠ মুষ্টিযোদ্ধা একথা আজ নিঃসন্দেহে বলা চলে।

জো'লুইয়ের প্রতিদ্বন্দ্বী এব্ সাইমন লম্বায় ৬ ফিট ৪ ইঞ্চি এবং ওজনে ১৮ ষ্টোন ছিলেন। জো'লুইয়ের ওজন ১৪ ষ্টোন ১১।০ পাউণ্ড। এই বিপুলকায় মুষ্টিযোদ্ধাকে পরাজিত করতে জো'লুইকে ৬ রাউণ্ড লড়তে হয়েছিলো। দেহের এই গুরুভারের সুযোগে সাইমন কখনও কখনও লুইকে দড়ির কোনের দিকে ঠেলে নিয়ে যাবার সুবিধা পেয়েছিলেন। খেলা শেষে লুই বলেছিলেন, "It was just another job and he contended that he would have finished it sooner had he not been over-anxious."

এই খেলায় টিকিটের মূল্য উঠেছিল ৩৩,১০৭ পাউণ্ড। এই অর্থ থেকে লুই যে অংশ পেয়েছিলেন তার সমস্তটাই যুদ্ধের তহবিলে দান করেছেন। আর তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী সাইমনও লাভের কিছু অংশ উক্ত তহবিলে প্রদান করেছেন।

খেলোয়াড়দের অফ্‌সাইড ঃ

খেলোয়াড়দের off-side positionএর ভাল জ্ঞান না থাকলে ফুটবল খেলায় গোল দেওয়ায় অনেক বিঘ্ন ঘটে। রেফারীও নির্ভুল হয়না। অফ্‌সাইড নিয়েই রেফারীদের বেশী ভুল হয়। যে সব দর্শক গোলের দিকের Touch লাইন বরাবর জায়গায় থেকে খেলা দেখেন তাঁদের অফ্‌সাইড আইন সম্বন্ধে ধারণা থাকলে রেফারীর থেকেও নির্ভুলভাবে খেলোয়াড়দের off-side position ধরতে পারেন।

খেলোয়াড়দের এবং ক্রীড়ামোদিদের সুবিধার জন্য কতকগুলি 'off-side diagram দেওয়া হ'ল।

'O' চিহ্নিতগুলি রক্ষণভাগের খেলোয়াড়। 'X' চিহ্নিতগুলি বিপক্ষদলের আক্রমণ ভাগের খেলোয়াড়। 'A' 'B' এবং 'C' বিপক্ষদলের আক্রমণ ভাগের তিনজন খেলোয়াড়ের নাম।

এই ৬টি চিত্রের প্রত্যেক চিত্রটির খেলোয়াড়দের Position এবং 'বলের গতি' পড়ে এবং দেখে দু' সেকেণ্ডেরও কম সময়ে 'B' অফ্‌সাইডে আছে কিনা বলবার চেষ্টা করুন।

বলের গতি ঃ

১। 'A' সোজা বল পাশ করছে 'B'কে।

২। 'A' বল পাশ করছে 'B'কে, 'B' সামনে ছুটে গিয়ে 'BI' স্থানে বল ধরেছে।

৩। বলটি 'B'এর কাছ থেকে 'A'এর কাছে গেছে; 'A' বলটিকে 'BI' স্থানে 'B'কে দিয়েছে।

৪ বলটি 'A'এর কাছ থেকে 'B'রের কাছে আসছে, 'B' পিছনে দৌড়ে এসে 'BI' স্থানে বলটি পেয়েছে।
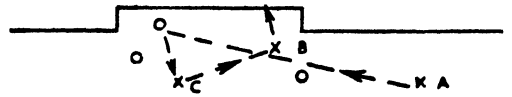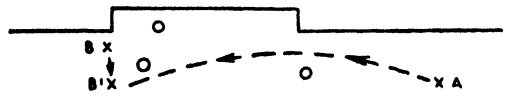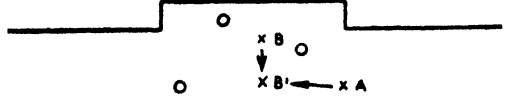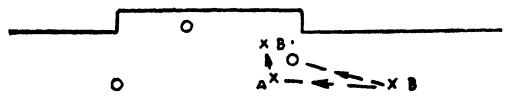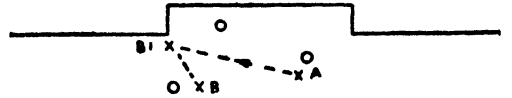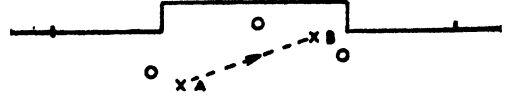
৫। 'A'এর কাছ থেকে 'B'এর কাছে বল যাচ্ছে, 'B' পিছনে এসে 'BI'তে বলটি ধরেছে।

৬। গোলরক্ষক 'A'এর সর্ট প্রতিরোধ ক'রে বলটি 'C'এর দিকে মেরেছে, 'C' বলটি 'B'কে দিয়েছে। ৮।৭।৪২

সাহিত্য-সংবাদ

নবপ্রকাশিত পুস্তকাবলী

শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত নাটক "দুই পুরুষ"—১৷০
"সমুদ্র" প্রণীত গল্প-গ্রন্থ "ডায়লেকটিক"—২৲
শ্রীবিজ্ঞানচন্দ্র ঘোষ প্রণীত স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান "আহার"—২৲
শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় প্রণীত শিশু-উপন্যাস "নীল-আলো"—৷০
শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী প্রণীত উপন্যাস "লক্ষ্মী-বরণ"—১৷০
শ্রীদিলীপকুমার রায় প্রণীত "অরবিন্দ প্রসঙ্গে"—১৷০
শ্রীঅনিলবরণ রায় সম্পাদিত "শ্রীমদ্ভগবদগীতা" (৭ম খণ্ড)—১৵০
শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত প্রণীত উপন্যাস "উঁচু-নীচু"—১৷০
শ্রীপ্রমদাচরণ কবিরত্ন সম্পাদিত "শ্রীনারদীয় রসামৃত"—১৷০
উমেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী প্রণীত "স্তোত্রগীতা"—১৲

সম্পাদক—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম্-এ

২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা ; ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শিল্পী—শ্রীযুক্ত বীরেশচন্দ্র গাঙ্গুলী

বুদ্ধ ও সারথী

ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

ভাদ্র—১৩৪৯

প্রথম খণ্ড | ত্রিংশ বর্ষ | তৃতীয় সংখ্যা

শক্তি ও বল

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত

পৃথিবীতে নানাদিকে চলেছে জীবনের প্রবাহ। একদিকে উদ্ভিদ্ আর একদিকে প্রাণিলোক; এর বাইরে রয়েছে অপ্রাণিলোক, ভূত ও ভৌতিক। পণ্ডিতেরা বলেন যে আদিম সূর্য্যপিণ্ডে তা'র আভ্যন্তরীণ উত্তাপের ফলে উত্তপ্ত বায়ুস্তর নিরন্তর দু'চার হাজার হিমালয়ের মত উঁচু হ'য়ে উঠ্‌তো। এই উঁচু স্তম্ভ থেকে গোটা কতক ছিট্‌কে পড়্‌লো সূর্য্যমণ্ডলের বাইরে, সম্ভবতঃ পার্শ্বচর অন্য কোন জ্যোতিষ্কের আকর্ষণে। এই ছিট্‌কে পড়া স্তম্ভগুলি চারিদিকে ছিট্‌কে পড়্‌লো বটে, কিন্তু তা'রা সূর্য্যের আকর্ষণের আক্রমণ থেকে আপনাদের মুক্ত কর্‌তে পার্‌লে না। প্রথম ছিট্‌কেনির ধাক্কায় তা'রা একদিকে ছুটেছিল, তা'র পিছনে ছুট্‌লো সূর্য্যের আকর্ষণ, ফলে তারা লাগ্‌ল সূর্য্যের চারিদিকে ঘুর্‌তে। দু'টো বিষম শক্তি বিপরীতদিকে টানাটানি কর্‌লে, যে জিনিষটার ওপর সেই শক্তির প্রয়োগ হয় সেটাকে সেই দু'টো শক্তির মাঝামাঝি একটা পথে ছুট্‌তে হয়। স্রোতে নৌকোকে টানে একদিকে, আর পালের হাওয়া তা'কে টানে অন্যদিকে, তাই পালের নৌকা চলে তের্‌ছা। চিল ওড়ে আকাশে, তা'র দুটো ডানায় লাগে হাওয়ার ঠেলা, তার মাঝপথে উড়ে' চলে চিল। এম্‌নি ক'রে পৃথিবী এবং গ্রহগুলি ছুট্‌তে লাগ্‌ল সূর্য্যের চারপাশে। সূর্য্য কর্‌লেন তাঁর সৃষ্টি; তিনি হলেন সবিতা, আর তাঁর আধিপত্য বিস্তৃত হ'ল তাঁর সৃষ্টিমণ্ডলে।

পৃথিবীর যা' কিছু জড়বস্তু, তা'র মধ্যে বিস্তৃত হ'য়ে আছে সবিতার মহাশক্তি। সেই শক্তির আদি পরিচয় কি—তা' নিয়ে বৈজ্ঞানিকেরা এক মায়ালোকের মধ্যে ঢুকেছেন, সে লোক থেকে বেরিয়ে এসে তাঁদের সিদ্ধান্ত তাঁরা যুক্তিসঙ্গত সহজ-বোধ্য ভাষায় প্রকাশ কর্‌তে পার্‌বেন এ ভরসার এখনও কোন কারণ দেখা যায় না। তবে তা' নিয়ে এখন আমরা কিছু বল্‌তে চাই না। এই জড়শক্তি মূলে হয় ত এক, কিন্তু তা'র প্রকাশ বহুধা বিভিন্নভাবে। এক সময় নিউটন্ মনে করে-ছিলেন যে বস্তুর স্বাভাবিক ধর্ম্ম হ'ল, যে বস্তু ব'সে থাকে, তা'কে কেউ না নড়া'লে নড়ে না, আর যে ছুটছে তা'র ছোটাকে কেউ বন্ধ না কর্‌লে তা'র ছোটা বন্ধ হয় না। যে মহাশক্তি সংসারে কাজ কর্‌ছে তার প্রকাশ হয় পরিমাণ ও দূরত্ব

অনুসারে পরস্পরের আকর্ষণে। এই আকর্ষণের একটা নির্দ্দিষ্ট পথ আছে, সে পথটা হচ্ছে একটি বস্তুর কেন্দ্র থেকে আর একটি বস্তুর কেন্দ্র পর্য্যন্ত সরল রেখা। এই সরল রেখাতেই সমস্ত আকর্ষণের শক্তি কাজ করে। এই আকর্ষণের ফলে কি ঘটে, কেমন করে' নানা আকর্ষণের প্রকাশ হয়, বস্তুপুঞ্জের দূরত্ব ও পরিমাণ অনুসারে নিউটন্ তা' ভাল ক'রেই দেখিয়েছিলেন এবং তা'র ওপরেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে গ্রহগুলির গতাগতির নিয়ম। কিন্তু মহাশূন্তে একটা বস্তু আর একটা বস্তুকে কেমন করে আকর্ষণ করে সে কথা নিউটন্ কিছু বল্‌তে পারেন নি। তবে মহাশক্তির এই পরিচয়ই তাঁ'র জানা ছিল। সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে মহামান্য বৈজ্ঞানিকেরা এই সত্য আবিষ্কার করে' নানা আস্ফালন করেছিলেন।

পরিশেষে আবিষ্কার হ'ল বিদ্যুৎ বা বৈদ্যুতিক শক্তি। বের হ'ল এর নানা রকম যাদু। বৈদ্যুতিক শক্তির আত্মপ্রকাশের দেখা গেল একটা নূতন পন্থা, সে শক্তি মাধ্যাকর্ষণ শক্তির ন্যায় কেন্দ্র থেকে কেন্দ্রে প্রবাহিত হয় না। নানা পরীক্ষায় তা'র গতির নব নব ভঙ্গী আবিষ্কৃত হ'তে আরম্ভ কর্‌ল। আবিষ্কৃত হ'ল চৌম্বকশক্তির সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা। বৈদ্যুতিক শক্তির বিকারে বা পরিবর্ত্তনে চৌম্বকশক্তির বিকার বা পরিবর্ত্তন ঘটে এবং চৌম্বক শক্তির বিকারে বা পরিবর্ত্তনে বৈদ্যুতিক শক্তির পরিবর্ত্তন ঘটে। পণ্ডিতেরা সিদ্ধান্ত করেছেন যে নিরালম্ব মহাশূন্তের মধ্যে বিনা সূত্রে কেউ কাউকে টানাটানি করে না। শক্তি রয়েছে বিস্তৃত হয়ে মহা-আকাশের মধ্যে। নানা অবস্থার পরিবর্ত্তনে ও নানা কারণে মহাকাশ নানা শক্তিজালে কণ্টকিত হয়ে' ওঠে এবং তা'রই ফলে শক্তির নানা রকম পরিচয় আমরা দেখ্‌তে পাই। সমস্ত জাগতিক বস্তু আর কিছুই নয়, কেবল মাত্র বৈদ্যুতিক শক্তিকণার সংঘাত বা সংহতি। আবার এই বৈদ্যুতিক শক্তি ফলতঃ মহাকাশেরই নানা অবস্থা। দাঁড়াল এই যে নানাশক্তিসন্নিবেশবিশিষ্ট মহাকাশই আমাদের সামনে জাগতিক রূপ হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। এ যদি মায়া না হয় তবে আর মায়া কা'কে বলা যায়!

কিন্তু এ বিষয়ে আমরা এখানে আলোচনা কর্‌তে বসি নি। জড়শক্তি যা'ই হোক্ না কেন, সেখান থেকেই শক্তি সঞ্চয় করেছে সমস্ত জীবলোক, উদ্ভিদ্ ও প্রাণী। এই জড়শক্তি থেকে জীব কেমন করে' উৎপন্ন হ'ল তা' আমরা জানি না, কোনকালে যে জান্‌ব তার বোধ হয় আশাও নেই। যে শক্তি জড় জগতে ছিল প্রয়োজনহীন বিস্তারে, জীবের মধ্যে সে শক্তি দেখা দিল একটা নূতন রূপে। সেখানে শক্তির মধ্যে এল সামঞ্জস্য, এল সৌন্দর্য্য। রবীন্দ্রনাথ তাঁ'র "বৃক্ষবন্দনা"য় বলেছেন :—

"অন্ধ ভূমিগর্ভ হ'তে শুনেছিলে সূর্য্যের আহ্বান।
প্রাণের প্রথম জাগরণে, তুমি বৃক্ষ আদিপ্রাণ,
ঊর্দ্ধশীর্ষে উচ্চারিলে আলোকের প্রথম বন্দনা
ছন্দোহীন পাষাণের বক্ষপরে ; আনিলে বেদনা
নিঃসাড় নিষ্ঠুর মরুস্থলে।.........

হে নিস্তব্ধ, হে মহাগম্ভীর
বীর্য্যেরে বাঁধিয়া ধৈর্য্যে শান্তিরূপ দেখালে শক্তির ;
....

ওগো সূর্য্যরশ্মিপায়ী,
শত শত শতাব্দীর দিন-ধেনু দুহিয়া সদাই
যে তেজে ভরিলে মজ্জা, মানবেরে তাই করিদান
করেছ জগৎজয়ী ; দিলে তারে পরম-সম্মান।"

বৃক্ষলোকে আমরা দেখ্‌তে পাই যে প্রকৃতির শক্তি সেখানে ধৈর্য্য ও সামঞ্জস্যে বিধৃত হয়েছে। তাই সে শক্তির সৃষ্টি আছে, কিন্তু আড়ম্বর বা দম্ভ নেই। শক্তি সেখানে এমন সামঞ্জস্যে দাঁড়িয়েছে যে, সে উৎপন্ন করেছে পরম শান্তি এবং পরম সুন্দর। আমাদের শাস্ত্র তাই বৃক্ষকে পরম পুরুষের সহিত উপমা দিয়ে বলেছেন—বৃক্ষ ইব স্তব্ধোদিবি তিষ্ঠত্যেকঃ—সেই পরম এক মহাকাশে বৃক্ষের ন্যায় স্তব্ধ হ'য়ে রয়েছেন, অথচ তিনি সর্ব্বশক্তির আকর।

তেম্‌নি সমস্ত প্রাণিলোকের আকর হচ্ছে উদ্ভিদ্‌লোক। উদ্ভিদ্‌লোক তার পত্রপুঞ্জ দিয়ে নিরন্তর রৌদ্ররসের মধ্য দিয়ে সবিতৃদেবের শক্তি নিয়ত আহরণ কর্‌ছে। দধীচির ন্যায় আত্মদানের সে সেই শক্তি অযাচিতভাবে বিতরণ কর্‌ছে নিরন্তর সমস্ত প্রাণিলোককে ; সে আপন অক্ষয়মন্ত্রে ঋতুতে ঋতুতে কর্‌ছে তার বেশ পরিবর্ত্তন। শীতে চল্‌ছে তার পত্রশাতন, বসন্তে চলেছে তার পল্লবের পুনরুদ্গম, সুগন্ধ মঞ্জরীতে সে আপনাকে কর্‌ছে সজ্জিত, প্রাণিলোককে দিচ্ছে তার ফল, আর প্রাণিলোকের ভোজনাবশিষ্ঠ পরিত্যক্ত বীজ দিয়ে সে কর্‌ছে আপনার নবীন সৃষ্টি, একরূপ সকলের অগোচরে, বিনা দম্ভে, বিনা আড়ম্বরে।

এই বৃক্ষলোক থেকে শক্তি সঞ্চয় ক'রে যখন নানা পর্য্যায়ের প্রাণিপুঞ্জ আবির্ভূত হ'তে লাগল তখন নানা স্তরে ক্রমশঃ স্ফুট হ'তে লাগ্‌ল আর একটা নূতন পর্য্যায়ের শক্তি। এ পর্য্যন্ত আমরা জানতুম বৈদ্যুতিক মহাশক্তি ও অনির্ব্বচনীয় প্রাণশক্তি। বৈদ্যুতিক শক্তির উপাদান নিয়ে প্রাণশক্তি কর্‌লে আপনাকে আবিষ্কার। সে তখন ছাড়িয়ে গেল বৈদ্যুতিক শক্তির সীমানা। তার মধ্যে উৎপন্ন হ'ল এমন একটা সামঞ্জস্যের কেন্দ্র, এমন একটি সম্বদ্ধ ব্যবস্থার পরিপাটী, যা'র ফলে সমস্ত শক্তি একটা ঐক্যের মধ্যে বিধৃত হ'ল। সে করলে বৃক্ষের দেহ রচনা, তা'র বল্কল, তা'র আঁশ, তা'র শাখা-প্রশাখা, তা'র মূল, তার পত্রপুঞ্জ, তা'র পুষ্প, তা'র ফল ও তা'র বীজ। তা'র অন্তর্নিহিত পরিনিষ্ঠিত ব্যবস্থার দ্বারা সে সূর্য্য থেকে করে রশ্মি পান, বায়ু দিয়ে করে নিশ্বাস-প্রশ্বাস, ভূমি থেকে আহরণ করে রস। তার আপন রাসায়নিক মন্দিরে সে সেই রস পরিবর্ত্তিত করে যোগযোগী

ধাতুতে, সে ধাতু সে সঞ্চারিত করে তা'র দেহের সর্ব্বত্র। তাকে আঘাত কর্‌লে তার ক্ষতস্থান সে আপনি আনে শুকিয়ে। যা' গ্রহণের তা' গ্রহণ করে, যা' বর্জ্জনের তা' বর্জ্জন করে, আপন জীবনের আত্মরক্ষায় সে সর্ব্বদা সচেষ্ট। আপনার অন্তর্নিহিত পরিনিষ্ঠিত ব্যবস্থাকে অজ্ঞাতরহস্যে সে সঞ্চারিত করে মৃতকল্প বীজের মধ্যে এবং সেই বীজের মধ্য দিয়ে সে আপনাকে নবতর, কল্যাণতর রূপে যুগযুগান্ত ধরে' আবর্ত্তিত করে' চলে। তা'র দ্বেষ নেই, ক্রোধ নেই, লোভ নেই। তা'র আছে ক্ষমাসুন্দর ছায়া, স্নিগ্ধ মধুর পুষ্পরাজি ও প্রাণিলোকের বাঞ্ছাফল। তা'র মধ্যে কোন স্বতন্ত্র ইচ্ছার পরিচয় আমরা পাই না; তার ইচ্ছা নিবিড় হ'য়ে রয়েছে তার অন্তর্নিহিত প্রাণশক্তির আত্মসংগঠন ক্রিয়ায়, মন্দানিলের মৃদু আন্দোলনে, পত্রকম্পনে, পুষ্পিত হওয়ার শিহরণে, ফলের গৌরবনম্রতায়, আলোছায়ার আকিরণ-বিকিরণের শোভা-সৌন্দর্য্যে।

উচ্চতর প্রাণিলোকে আমরা ইচ্ছার ক্রমপরিস্ফূর্ত্তি দেখ্‌তে পাই। এমন হ'তে পারে যে নিম্নতম প্রাণিস্তরে পারিপার্শ্বিক নানা শক্তির উত্তেজনায় প্রাণিদেহের মধ্যে স্বাভাবিক পরিবর্ত্তন ঘট্‌তে পারে, কিন্তু নিম্নতম প্রাণী এককোষী (unicellular) এ্যামিবার (amœbe) জীবনে দেখা যায় যে ঐ এ্যামিবা যখন জলে ভাসমান থাকে এবং জলে যদি তা'র উপযোগী খাদ্যকণার সহিত তা'র দেহাবয়বের সঙ্গে দু'চার বার সন্নিকর্ষ ঘটে, তবে ঐ এ্যামিবা যেদিকে ঐ খাদ্যকণা থাকে সেদিকে তার দেহকে চালিত করে। এ দিয়ে প্রমাণ হয় এই যে, এ্যামিবার দেহ কেবল একটি কোষ হ'লেও সেই কোষের মধ্যে এমন ব্যবস্থা আছে যা'তে তার জীবনে যা' ঘটে তা'র স্মরণ তা'র মধ্যে কোন না কোন রকমে উজ্জীবিত হ'য়ে থাকে। তা'দের হয় ত মাথা নেই, মন নেই, নাড়ীযন্ত্র নেই, তথাপি ফল দেখে' এইটে অনুমান কর্‌তেই হয় যে তা'র জীবনের অনুকূল ও প্রতিকূল ঘটনা তার শরীরব্যবস্থার মধ্যে কোন না কোন রকমের দাগ রেখে যায়। সেই অনুসারে তা'রা তা'দের জীবনরক্ষার অনুকূল বা প্রতিকূল চেষ্টা করে। তা' না হ'লে এ্যামিবাটি যেদিকে দু'চারবার খাদ্য পেয়েছে সেইদিকে কেন এগিয়ে যাবে? যেদিকে দু'একবার সে আহত হয় সে দিক থেকেই বা সে কেন সরে' যাবে? যাকে আমরা বলি স্মরণ বা চেতনা, যত গূঢ়ভাবেই হোক্ না কেন, তৎসদৃশ কোন একটা ছাপ তাদের মধ্যে জন্মে একথা না স্বীকার কর্‌লে ইষ্টানিষ্টের অভিমুখে ও বিপরীতে তাদের দেহ-যন্ত্রের অনুকূল বা প্রতিকূল চেষ্টার কোন সুসঙ্গত ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না।

কিন্তু উপরের স্তরের প্রাণীর মধ্যে এসে—যেমন কুকুর, বিড়াল, বানর,—আমরা দেখ্‌তে পাই যে প্রাণিলোকের ঊর্দ্ধগতির সঙ্গে চেতনার ক্রমশঃ ক্রমশঃ স্পষ্টতর সমুল্লাস হয় এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে সেই চেতনা তাদের ইঙ্গিতে জানায় যে কোন রকম শারীর চেষ্টার দ্বারা তা'রা তাদের দেহরক্ষায় ও সন্তান রক্ষার উপযোগী কার্য্য সম্পন্ন করতে পারে। সেই অনুসারে তা'রা এমন একটা শক্তি ব্যবহার কর্‌তে পারে যা'র ফলে তাদের শরীর সেই রকম চেষ্টা সম্পন্ন করতে পারে। এখানে দেখা যাচ্ছে এই কথা যে, জীবজগতে এসে আমরা দু'টো নূতন জিনিষের সন্ধান পাই। সে দু'টো হচ্ছে, প্রথমতঃ, চেতনার ক্রমশঃ ক্রমশঃ স্পষ্টতর সমুল্লাস; দ্বিতীয়তঃ, চেতনার মধ্যে সন্নিহিত এমন একটা ইঙ্গিত যা'কে চেতনার মধ্যে ধরা যায় না, অথচ যার ফল ধরা পড়ে শরীরের চেষ্টায়। প্যাভ্‌লভ্ (Pavlov) প্রভৃতি পণ্ডিতেরা দেখিয়েছেন যে শুধু শরীরযন্ত্রের মধ্যেও এমন একটা ব্যবস্থা আছে যা'তে বাইরের উত্তেজনা অনুসারে চেতনার ইঙ্গিত ব্যতিরেকেও শরীর-যন্ত্র আপনা আপনি অনেক কাজ করতে পারে। কিন্তু সে কথা আমাদের আলোচ্য নয়।

আমাদের আলোচ্য এইটুকু যে, উপরিতন প্রাণিস্তরে ও মানুষের চেতনার মধ্যের একটা ইঙ্গিত অনুসারে মানুষের দেহযন্ত্র চালিত হয়। এই ইঙ্গিতকে আমরা বলি—ইচ্ছা। এই ইচ্ছার একদিক নিবিষ্ট হ'য়ে আছে চেতনার মধ্যে, আর একদিক নিহিত হয়ে আছে শারীর শক্তির মধ্যে। এই জন্য ইচ্ছার স্থান কোথায় এই নিয়ে পণ্ডিতেরা নানা দ্বন্দ্বে পড়েছেন। কেউ বলেছেন যে এটা চেতনারই অন্তর্গত, চেতনারই প্রভাব বা শক্তি, কেউ বা বলেছেন যে এটা একটা শক্তি বিশেষ, কেউ বা বলেছেন এটা একটা বীর্য্যের বোধ (sense of innervation)। কিন্তু এ বিচারে আমরা এখন যা'ব না। আমরা এই প্রবন্ধে শুধু এই কথা বল্‌তে চাই যে চেতনার ইঙ্গিতে একটা নূতন পর্য্যায়ের শক্তি উপরিতন জীবলোকে প্রকাশ পেয়েছে। একেই বলে ইচ্ছাশক্তি। এই ইচ্ছা উচ্চতন প্রাণীরা প্রয়োগ করে তাদের শরীরকে প্রয়োজনানুরূপ কাজে প্রয়োগ করবার জন্য। শরীরের মধ্যে নিহিত আণবিক, বৈদ্যুতিক ও স্থিতিস্থাপকতামূলক যে সমস্ত জড়শক্তি আছে সেই শক্তিকে ব্যবহার করা হয় এই ইচ্ছার অনুকূলে। জড়জগতে বা উদ্ভিদ্‌জগতে এই নূতন শক্তিটির আমরা কোন পরিচয় পাই না। যেমন জড়শক্তি থেকে রহস্যময় উপায়ে প্রাণপ্রক্রিয়ার আবির্ভাব হয়েছে তেমনি প্রাণপ্রক্রিয়াকে অবলম্বন করে' সম্পূর্ণ রহস্যময় উপায়ে উদ্ভূত হয়েছে চেতনা ও তন্নিহিত ইচ্ছা। যখন থেকে এই ইচ্ছার উদ্ভব দেখা যায় তখন থেকেই এর মধ্যে আমরা পরিচয় পাই একটা নূতন রহস্যময় শক্তির; অথচ প্রাকৃত শক্তিকে আমরা যেভাবে শক্তি বলি এটা ঠিক তৎস্বজাতীয় শক্তি নয়। এটা সেই রকমের একটা শক্তি বা শক্তির ব্যবস্থাপক ধর্ম্ম, যা' দ্বারা মূঢ় ও অপ্রকটিত শক্তিকে প্রাণী আপন ব্যবহারের উপযোগী করে' সন্নুক্ষিত করে' তুল্‌তে পারে। সাধারণ প্রাণীরা তাদের ইচ্ছাশক্তির প্রয়োগ করতে পারে তাদের দেহযন্ত্রের ওপরে তাদের প্রয়োজনের অনুকূলভাবে, কিন্তু

মানুষ সেই ইচ্ছাশক্তিকে প্রয়োগ করে তাঁদের দেহের ওপরে, অপ্রাণি-লোকের ওপরে এবং সমস্ত জড় ও উদ্ভিদ জগতের ওপরে। এই জন্ম মানুষের বল এত বেশী।

তা হ'লে আমরা দেখ্‌তে পাই যে শক্তি ও বলের মধ্যে একটা পার্থক্য রয়েছে। শক্তি তাকেই বলা যায় যা' প্রবাহিত হয় আপন স্বতঃস্ফূর্ত্তভাবে। আপাতদৃষ্টিতে এ কথা কিছুতেই মনে হয় না যে তা'র পেছনে কোন ইচ্ছাশক্তি বা চেতনাশক্তি কাজ করে। সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে কোথায় গিয়ে পৌছোন যায় তা'র আলোচনা আমরা এখানে করব না। কিন্তু স্থূলভাবে আমরা এই কথাটি এখানে বলতে চাই যে, শক্তি দ্বিবিধ। একটি চেতনা বা ইচ্ছাশক্তি দ্বারা অনিয়ন্ত্রিত, স্বতঃস্ফূর্ত্ত। এইটির পরিচয় আমরা পাই উদ্ভিদলোক পর্য্যন্ত—একেই বলে শক্তি—জড়শক্তিও প্রাণশক্তি। অপরটি নিয়ন্ত্রিত হয় চেতনা বা ইচ্ছা দ্বারা। একে আমরা বলি—বল। এর রহস্য এখানে, যে এর স্বাভাবিক নিয়ন্ত্রণ জড়শক্তির মধ্যেও নেই, প্রাণশক্তির মধ্যেও নেই। ইচ্ছা ও চেতনা নামে মনুষ্যলোকে দু'জন নূতন দেবতা উদ্ভূত হয়েছেন। যে শক্তির নিয়ন্ত্রণ এই দুই দেবতার সমবায়ে নিষ্পন্ন হয় তা'কেই আমরা বলি—বল।

মানুষের মধ্যে একটা নূতন জাতীয় ঘটনাচক্রের ব্যবস্থা ঘটেছে। মানুষের একদিকে আছে দেহ, অপর দিকে আছে মন। ক্ষুদ্রতম পিতৃকোষ ও মাতৃকোষের (sperm and ova) সন্নিবিষ্ট একাত্মতায় উভয়ের সম্পিণ্ডনে একটি নবীন জীবকোষ উৎপন্ন হয়। মাতৃ-কুক্ষিতে চলে এই জীবকোষের আপন সন্ধিভাগের প্রচ্ছন্ন ব্যবস্থা। একটি সম্পিণ্ডিত জীবকোষ আপনাকে দু'ভাগে বিভক্ত করে; এর প্রত্যেক ভাগেই শরীর গঠনের উপযোগী মাতৃ-অংশ ও পিতৃ-অংশ সমভাগে বিভক্ত হয়। এ দু'টির প্রত্যেকটি থেকে চলতে থাকে লক্ষ লক্ষ তজ্জাতীয় জীবকোষের উৎপত্তি। এরা প্রত্যেকেই জীবিত এবং প্রত্যেকের সহযোগে চলে এদের জীবযাত্রার প্রয়োগপদ্ধতি, সঙ্গে সঙ্গে সজ্জিত হ'তে থাকে সম্পূর্ণ দেহের অনুক্রমে এই জীবকোষগুলির রচনাপ্রণালী। এই রচনা থেকেই উৎপন্ন হয় ধমনী, পেশী, স্নায়ু ও কণ্ডরা, অস্থি, তরুণাস্থি, মজ্জা, হৃৎপিণ্ড, ফুস্‌ফুস্‌, বুক্ক, যকৃৎ, প্লীহা ও মস্তিষ্কাভ্যন্তরবর্ত্তী মস্তলুঙ্গের (brain) বিবিধ সন্ধিভাগ; উৎপন্ন হ'তে থাকে বিবিধ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয় ও তা'দের অধিষ্ঠান। চলতে থাকে হস্তপদাদি অবয়বের সন্ধিভাগ। পৃষ্ঠাস্থির সঙ্গে আবদ্ধ হ'তে থাকে পেশীজাল ও নাড়ীজাল। এমনি ক'রে সম্পূর্ণাবয়ব মানুষ উৎপন্ন হয়। এইভাবে মানুষের জৈবক্রিয়া চলতে থাকে বৃক্ষাদি সদৃশ স্বাভাবিক জৈব নিয়মে। বৃক্ষাদিরা সূর্য্যালোক হ'তে আপনাদের উত্তাপ গ্রহণ করে এবং সেই উত্তাপের দ্বারা শরীরের মধ্যে দাহ উৎপন্ন করে' দাহাবশেষ নিঃসারিত করে। মানুষের পাকস্থলীতে খাদ্য প্রেরিত হ'লে সে খাদ্য থেকে যে তেজোভাগ ও অন্যান্য পরিপুষ্টিভাগ আছে তা শরীরে গৃহীত হয়ে, সমস্ত জীবকোষের মধ্যে পরিব্যাপ্ত হয়। তা'র ফলে চলে জীব-শরীরের দাহপ্রক্রিয়া (oxidation)। এই দাহাবশেষ, যা' শরীরের পক্ষে অপ্রয়োজনীয়, তা' শরীর থেকে হয় নিঃসারিত। এম্‌নিভাবে শরীরের মধ্যে প্রাণের কাজ চলতে থাকে শক্তির সংগ্রহে ও শক্তির পরিপাকে। দেহের মধ্যে এই যে শক্তির কাজ নিরন্তর চলতে থাকে তা'র জন্য সে অপেক্ষা করে না কোন মানুষের ইচ্ছা বা অনিচ্ছা।

মানুষের আভ্যন্তরিক দেহযন্ত্রের কাজের ওপর মানুষের ইচ্ছা বা অনিচ্ছার কোন হাত নেই। প্রাণশক্তির স্বাভাবিক ক্রিয়ায় চলে পেশী ও নাড়ীর কাজ, রাসায়নিক প্রক্রিয়া, রক্তের চলাচল। মানুষ বলতে পারেনা তা'র হৃৎপিণ্ডকে—"ওহে হৃৎপিণ্ড, তুমি একটু বিশ্রাম কর," কি তা'র রক্তের স্রোতকে—"হে শোণিতস্রোত, তুমি একটু স্তব্ধ হও।" মানুষের দেহযন্ত্রের কোন শক্তি তা'র কথা শোনে না, তা'র ইচ্ছা অনিচ্ছার কোন খবর রাখে না, অথচ মানুষের দেহযন্ত্রের এমন সব প্রক্রিয়া চলতে থাকে যা' হঠাৎ দেখ্‌লে মনে হয় যেন কোন বুদ্ধিমান লোকের কাজ। দৃষ্টান্ত স্বরূপ আমাদের দেহযন্ত্রস্থ বুক্কযন্ত্রের (kidney) কথা নেওয়া যেতে পারে। আমাদের শরীরের রক্তে যে সমস্ত পদার্থ আছে তার প্রত্যেকটিরই একটা নির্দ্দিষ্ট ভাগ আছে। সেই ভাগের কম বেশী ঘট্‌লে শরীরে পীড়া জন্মে। অথচ আমরা যখন আহার করি তখন আমরা ইচ্ছামত আহার করে' যাই; আমরা জানিনা সেই আহারের পরিণতিতে আমাদের হজমের ফলে যে সমস্ত ধাতু উৎপন্ন হ'বে তা'র মধ্যে রক্তের সেই নির্দ্দিষ্ট ভাগ রক্ষিত হবে কিনা এবং আমাদের রক্তের অনুপযোগী কোন ধাতু উৎপন্ন হ'য়ে আমাদের রক্তের সঙ্গে মিশ্রিত হ'ল কিনা। সমস্ত রক্তই বুক্কযন্ত্রের মধ্য দিয়ে গমন করে। বুক্কযন্ত্রের সংগঠনের মধ্যে রাসায়নিক প্রক্রিয়ার এমন ব্যবস্থা আছে যে তা'র ফলে অনিষ্টকর যা' কিছু রক্তের মধ্যে থাকে সমস্তই সেই বুক্কযন্ত্র দেহ থেকে নিঃসারিত করে' দেয়। শুধু তাই নয়, যতটুকু মাত্রায় যে বস্তু নিঃসারিত হওয়া আবশ্যক ঠিক ততটুকুমাত্রায় সেই বস্তু রক্ত থেকে নিঃসারিত হয়। যে বস্তু রক্তে যতটুকু থাকা প্রয়োজন সেটুকু রেখে বাকিটুকু বুক্কযন্ত্র রক্ত থেকে বের করে দেয়, সে জন্য আমাদের কোন চিন্তা করতে হয় না।

আমাদের শরীর আমাদের খালি জানিয়ে দেয়, ক্ষুধা হয়েছে, তৃষ্ণা হয়েছে। তারপরে আমরা খেয়ে নিই আমাদের রুচি অনুসারে। সেখানে প্রয়োগ করি আমাদের ইচ্ছা-শক্তি। কিন্তু দেহযন্ত্রের বহুধা বিচিত্র প্রয়োগব্যবস্থা, প্রয়োগপ্রণালী ও প্রয়োগনৈপুণ্যের ওপর আমাদের কোন হাত নেই। সে চলে তা'র স্বাভাবিক নিয়মে। যদিও দেহটি আমাদের, তথাপি চিকিৎসাশাস্ত্রের অতিবড় পণ্ডিতও তা'র পরিচয় অতি সামান্যই জানেন। এখানে দেখ্‌তে পাই, একান্ত যে আমাদের আত্মীয়, একান্ত যে আমাদের আপন,

যা'র সামান্য বিকারে আমাদের প্রাণচ্যুতি ঘটতে পারে, সে আমাদের কাছে অতি অপরিচিত।

আমাদের মনের সঙ্গে আমাদের দেহের যোগ প্রধানতঃ কতগুলি জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয়ের নাড়ীজালের ওপর। এই নাড়ীজালের ওপর আমাদের ইচ্ছাশক্তি কাজ করে, শুধু ততটুকু পরিমাণে যতটুকু পরিমাণে বহির্জ্জগতের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক রেখে চল্‌তে হয়। দেহের ওপর আমাদের ইচ্ছাশক্তির প্রয়োগের পরিসর এই জন্যই রয়েছে, যে বৃক্ষের মত আমরা একস্থানে দাঁড়িয়ে সূর্য্যের আলোবাতাস এবং ভূমধ্য হ'তে আমাদের প্রাণের কাজ সরবরাহ কর্‌তে পারি না। বহির্লোকে বিচরণ ক'রে, অনুসন্ধান করে' আন্‌তে হ'বে এ দেহযন্ত্রের উপযোগী আহার্য্য, বর্জ্জন কর্‌তে হ'বে এই দেহের যা' বর্জ্জনীয়। দেহযন্ত্র চল্‌বার জন্য প্রচুর ভৌতিক শক্তির আহরণ আবশ্যক। সেই শক্তি আহৃত হ'লে শরীরের আত্মোপযোগী ব্যবস্থার মধ্যে পড়ে' তা'র দেহযন্ত্র চল্‌বার উপযোগী হ'য়ে উঠ্‌বে, কাজেই দেহের মধ্যে যত শক্তির আহরণ, বর্জ্জন, বিস্তার, সংগঠন চল্‌ছে সেটা হ'ল শক্তি-রাজ্যের ক্ষেত্রে।

এ দেহ যখন মাতৃকুক্ষি থেকে নেমে আসে তখন নবজাত উষার কপালে যেমন থাকে শুকতারার টীপ্ তেমনি এ দেহযন্ত্রকে লক্ষ্য করে' আমাদের অন্তর্লীন অব্যক্ত আকাশে থাকে ম্লানভাবে চৈতন্যের একটি শিখা। প্রভাতের শুকতারাকে যেমন বলা যায় আলোর ব্যঞ্জক, তেমনি একটা চৈতন্যের ব্যঞ্জক-চিহ্ন পাওয়া যায় সদ্যোজাত শিশুর মধ্যে। বেলা যখন বেড়ে' ওঠে তখন প্রভাতের মঙ্গলঘটকে প্লাবন করে' দিগ্বিদিকে ছড়িয়ে পড়ে বিচ্ছুরিত হ'য়ে সূর্য্যালোক। তেম্‌নি যেমন মানুষ বয়সে বাড়্‌তে থাকে তেম্‌নি তার চৈতন্যের সমুদ্ভাস বৃদ্ধি পেতে থাকে। দেহযন্ত্রের ওপর প্রতিষ্ঠিত হ'য়ে রয়েছে এই মনোলোক বা চৈতন্যলোক, অথচ সে একান্তভাবে অতিক্রম করে' রয়েছে তা'র আত্মরচনায়, তা'র আত্মসংগঠনে, তা'র আত্মব্যবস্থায় সমস্ত দেহযন্ত্রের অনুষ্ঠান। শাস্ত্র বলেছেন, "অমৃতত্বের ঈশ্বর এই চৈতন্যময় অন্নময় লোক ও প্রাণময় লোককে অতিক্রম করে' রয়েছে।" এইখানেই এলো আরও গভীর রহস্যের কথা। বহির্জ্জগতের প্রাণময় ও শক্তিময় লোকের সহিত মিলিত হওয়ার জন্য উৎপন্ন হয়েছে এই দেহযন্ত্র। এই দেহযন্ত্রের ওপর মনোলোকের ততটুকুই প্রভুত্ব রয়েছে যতটুকু আবশ্যক এই দেহযন্ত্রকে বহির্লোকে ধাবিত করে' সেখান থেকে শক্তি সংগ্রহ করা যায়। এই যে মনোলোকের আধিপত্য রয়েছে দেহের ওপর, এই আধিপত্যের ফলে দেহের সকল শক্তি যখন ইচ্ছার অনুকূলে নিয়োজিত হয়, তখন আমরা তাকে বলি—বল। ইচ্ছার বলের দ্বারা আমরা দেহকে চালিত কর্‌তে পারি, নিবৃত্তও কর্‌তে পারি। কিন্তু মনোলোকের যেমন আধিপত্য রয়েছে দেহলোকের ওপর একটা বিশিষ্ট অংশ-ব্যবচ্ছেদে তেম্‌নি দেহলোকেরও আধিপত্য রয়েছে মনোলোকের ওপরে তার একটা বিশিষ্ট অংশ-ব্যবচ্ছেদে।

সাধারণতঃ দেখা যায় যে দেহের কল্যাণে অকল্যাণে আমাদের মনোলোক উৎফুল্ল ও বিপর্য্যস্ত হয়। সরহস্য সমগ্র বেদ শ্বেতকেতুর কণ্ঠস্থ ছিল। তাঁ'র পিতা কিছুদিনের জন্য তাঁ'র অন্নগ্রহণ বন্ধ করে' দিলেন। তা'র ফলে দেখা গেল যে তিনি সমস্তই বিস্মৃত হয়েছেন। কিন্তু শুধু যে এই একরূপেই দেহযন্ত্র মনোলোকের ওপর কাজ্ করে তা' নয়।

সংসারের নানা ঘটনার মধ্য দিয়ে প্রাণলোক যে মনুষ্য-যন্ত্রের মত এমন একটা বিচিত্র যন্ত্র নির্ম্মাণ করতে সক্ষম হয়েছে সেই পথের সাধনায় তা'র প্রধান সহায় ছিল তা'র আত্মপ্রতিষ্ঠার মন্ত্র ও অনাত্ম-আক্রমণের অভিভব। মনুষ্য-জন্মে যখন প্রাণলোক মনুষ্যের চেতনালোককে তার একান্ত উপকারী সুহৃৎরূপে ও একান্তভাবে সম্বদ্ধরূপে পেল তখন সে তা'র সেই আত্মপ্রতিষ্ঠার মন্ত্রটিকে প্রতিবিম্বিত করে' দিলে মনোলোকের মধ্যে। মানুষের মধ্যে আত্মপ্রতিষ্ঠাকে কেন্দ্র করে' যে সমস্ত প্রবৃত্তি জাগ্রত হয়ে' উঠেছে দেখ্‌তে পাই, সেগুলিকে দেহলোকেরই প্রতিবিম্ব বলে' মনে কর্‌তে আমরা বাধ্য হই। অসুরশ্রেষ্ঠ বিরোচন জ্ঞানের দেবতা প্রজাপতির নিকট উপস্থিত হ'য়েছিলেন আত্মলোক, মনোলোক বা চেতনালোক কা'কে বলে তা' জান্‌বার জন্যে। প্রজাপতি তাঁ'কে বলেছিলেন—দেহের যেমন প্রতিবিম্ব দেখ জলে, তেম্‌নি তা'র আর একটা প্রতিবিম্ব আছে, সেইটিই হচ্ছে আত্মা।

দেহকে প্রাণের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত রাখ্‌তে হ'বে, এ কথার অর্থ বোঝা যায়, কারণ দেহ রয়েছে বহির্জ্জগতের শক্তিপুঞ্জের মধ্যে মরণের সঙ্গে নিরন্তর দ্বন্দ্ব করে'। কাজেই তা'কে যত্ন ও উৎসাহের দ্বারা রক্ষা কর্‌তে হয় ও দৃঢ় কর্‌তে হয়। কিন্তু চেতনালোক তো বাহিরের শক্তিপুঞ্জের মধ্যে নেই, সে রয়েছে স্বে মহিম্নি প্রতিষ্ঠিতঃ—আপনার মহিমায় মাহাত্ম্যে প্রতিষ্ঠিত হ'য়ে চিদাকাশে। ইচ্ছাশক্তি বা বলপ্রয়োগের দ্বারা কিম্বা বহির্লোকের শক্তিপুঞ্জের দ্বারা তা'র কোন ইষ্টানিষ্ট করা যায় না। আমাদের চেতনালোকের যে অংশটি রয়েছে প্রাণলোকের আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রতিধ্বনি নিয়ে, নানা প্রবৃত্তির সংঘাতে কুটগ্রন্থিজালে সমাবৃত হ'য়ে, সেগুলি চঞ্চল হ'য়ে ওঠে প্রাণশক্তির অনুপ্রেরণায় আপনাদের স্বপ্রতিষ্ঠ করে' তোল্‌বার জন্যে। এগুলির প্রকাশ মনোলোকের মধ্যে, অথচ এরা অনুসরণ করে জীবলোকের পদ্ধতি।

শক্তি সঞ্চয় করে' দেহকে দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর করা যায়। এই দৃঢ়তা আমরা পরীক্ষা করে' নিতে পারি বহির্জ্জগতের শক্তির পরীক্ষাগারে। একটা বাঘ একটা গরুকে পিঠে করে' ছুট্‌তে পারে অনায়াসে, সাবলীল ভঙ্গীতে। একটা মানুষ হয় তো তার পেশীকে এমন সবল কর্‌তে পারে যে নিরস্ত্র অবস্থায় কেবল মুষ্টি-ব্যবহারে সে একটা বাঘ বধ কর্‌তে পারে। এখানে দেহশক্তির পরীক্ষা স্পষ্ট এবং চাক্ষুষ। কিন্তু

মানুষ যখন দম্ভ করে যে সে সমস্ত পৃথিবীর প্রভু হবে এবং যখন যথেষ্ট পরিমাণে সেই শক্তি অর্জ্জন করে, তখন এটা ভেবে পাওয়া কঠিন হয় সে আপনার কোন জিনিষটা বাড়াতে চায়। সে তা'র দেহের বল বাড়াতে চায় না, সে চায় তা'র ইচ্ছার বল এমন প্রবল হবে যে তা'র দ্বারা সে সর্ব্বপ্রাণীর দেহের ওপর ও জড়জগতের ওপর আপন আধিপত্য বিস্তার কর্‌বে। কিন্তু এই আধিপত্য জিনিষটা ভৌতিক নয়, এটি মানসিক; তথাচ ভৌতিক স্বভাব এতে অনুষক্ত হয়েছে, প্রতিবিম্বিত হয়েছে। সে বাড়তে চায় দেহের মত, জড়শক্তির মত। এইজন্য আমাদের এই বহির্মুখীন প্রবৃত্তিগুলিকে চেতনালোক ও দেহলোকের মধ্যবর্ত্তী বৈতরণী ঘাটের একটি প্রেতলোক ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না। মানুষের ইচ্ছা যখন এই প্রেত-প্রবৃত্তি-লোকের হাতে এসে পড়ে তখন সে তা'র চেতনাকে ও তা'র দেহকে প্রেরিত করে তা'র প্রবৃত্তির অনুকূল কার্য্য করার জন্য। এই প্রচেষ্টা আমরা দেখতে পাই আধুনিক কালে তথাকথিত সভ্যজাতির মধ্যে। এখানে চলেছে আধিপত্যের জন্য ইচ্ছাদ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও আহৃত বলের তাড়না, বলের সংগ্রাম।

মানুষের যথার্থ উন্নতি, তা'র চেতনালোককে যথাসম্ভব দেহলোক থেকে প্রতিবিম্বিত প্রবৃত্তির প্রেতপুঞ্জের হাত থেকে মুক্তি দিয়ে তা'র স্বমহিমায় তা'কে প্রতিষ্ঠিত করা। এই জন্যে ইচ্ছাশক্তিকে প্রয়োগ কর্‌তে হ'বে দুর্ব্বার ও দুর্দ্দাম প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রিত কর্‌বার জন্য। যা'রা শুধুই প্রবৃত্তিলোকে বিচরণ করে তা'দের পক্ষে আবশ্যক হয় নানাভাবে আপন প্রবৃত্তিকে সংযন্ত্রিত করা, তা' না হ'লে প্রবৃত্তিকেও স্বপ্রতিষ্ঠিত করা যায় না।

এই প্রসঙ্গে অনেক প্রশ্ন উঠ্‌তে পারে, তা'র সমাধান করা এ প্রবন্ধে সম্ভব নয়। কিন্তু আমরা এতক্ষণে এই প্রশ্নটির উত্তর দিতে পারি যে বল বিস্তারের বা বলপ্রসারের ক্ষেত্র কোথায়। দেহযন্ত্রের আভ্যন্তরিক ব্যাপারে ইচ্ছাশক্তির প্রয়োগ চল্‌তে পারে না, সেটা শক্তির ক্ষেত্র, বলের ক্ষেত্র নয়। দেহ-যন্ত্রের দ্বারা বহির্জ্জগতের প্রাণী ও অপ্রাণিলোকের ওপর আমরা যে প্রভাব বিস্তার করি সেইটেই বলের ক্ষেত্র। প্রাণী ও অপ্রাণিলোককে আমাদের ইচ্ছার অনুকূলে ব্যবহার কর্‌ব এইটেই বলের উদ্দেশ্য ও আকাঙ্ক্ষা। কিন্তু এই বল কেবল দেহযন্ত্রকে চালিত করে' উৎপন্ন হয় না। ইচ্ছা মনোলোকের বস্তু, কাজেই আমাদের চেতনাশক্তিকে, বুদ্ধিশক্তিকে আমরা যখন আমাদের প্রবৃত্তির অনুকূলে প্রয়োগ করি, জগতের অন্য পশুর বা মানুষের প্রবৃত্তিকে আমাদের অধীন কর্‌তে চাই এবং জড়জগতের সমস্ত শক্তিকে আমাদের অধীন করতে চাই, সেটাও হচ্ছে বলের ক্ষেত্র। তা' ছাড়া চেতনালোকের আত্ম-স্ফূর্ত্তির জন্য, কিম্বা আমাদের প্রবৃত্তিকে বা দেহকে জয়ী কর্‌বার জন্য যখন আমরা প্রবৃত্তির ব্যবহারকে সংযন্ত্রিত ও নিয়ন্ত্রিত কর্‌তে গিয়ে আমরা আমাদের ইচ্ছাশক্তিকে তদনুকূলে প্রেরণ করি, তখন এই সংযন্ত্রণ বা নিয়ন্ত্রণে যে শক্তি উৎপন্ন হয়, তা'কেও আমরা বল বল্‌তে বাধ্য। এই বলটাকে বল্‌তে হয় মানসিক বল। এই বলকে আমরা একদিকে যেমন প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রিত কর্‌বার জন্যে ব্যবহার কর্‌তে পারি তেমনি অপরদিকে প্রবৃত্তিকে বাড়িয়ে তোল্‌বার জন্যও ব্যবহার কর্‌তে পারি। পূর্ব্বেই বলা হয়েছে যে আমাদের কর্ম্মেন্দ্রিয়ের নাড়ীজালের মধ্য দিয়ে সেই ইচ্ছা দেহের বাহ্যিক কর্ম্ম নিয়ন্ত্রিত কর্‌তে পারে। এই দেহ-নিয়ন্ত্রণের ফলে দেহের কার্য্যের দ্বারা, কিম্বা দেহের সহিত সম্পর্কিত জড়লোক ও প্রাণিলোক মন্থন করে' যে বল উৎপন্ন হয় তাকে বাহুবল বা ভৌতিক বল বলা যেতে পারে। এই ভৌতিক বল দেহকে আশ্রয় করে' দেহের বহুকোটীগুণ শক্তি আহরণ কর্‌তে পারে এবং ইচ্ছার অনুকূলে প্রয়োগ কর্‌তে পারে। অতীতে ও বর্ত্তমানে মানুষের ইতিহাস অনেক পরিমাণে গড়ে তুলেছে মানুষের মনের বলাহরণের আকাঙ্ক্ষা। এ সম্বন্ধে অন্য প্রবন্ধে আলোচনা করা যা'বে। বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা এইটুকুই শুধু দেখিয়েছি যে শক্তি ও বলের পার্থক্য কোথায় এবং উভয়ের প্রয়োগের ক্ষেত্রের প্রভেদ কি

নবীন ভারত জাগো

শ্রীকনকভূষণ মুখোপাধ্যায়

প্রমত্ত বিশ্বের বক্ষে অবিশ্রাম নাচিছে দানব
উল্লসিয়া বিচ্ছুরিছে লেলিহান জ্বালার উদ্গার—
দহনের অন্ধকারে সভ্যতা সে মানে পরাভব
শিহরিছে মুহুর্মুহু শঙ্কাকুল কর্কশ ঝঙ্কার।

কামান গর্জ্জিছে দূর কম্পমান ম্লান গৃহাঙ্গনে
বোমার দাবাগ্নিধূমে বজ্রাহত সবে গৃহহীন—
গভীর অরণ্যে দেখি নিরাশ্রয় কাঁদে সঙ্গোপনে
তৃষ্ণায় বিশুষ্ক প্রাণ কাঁদে প্রিয়া পাশে বিমলিন।

পুষ্পের স্বর্ণাভ রেণু শিশুগণ মরণ-মুখর
মা'র তরে দুগ্ধহীন নিরুপণ উদর বসুধা—

কণ্টক-সঙ্কুল পথে প্রবাসীরা জ্বালায় জর্জ্জর
কেহবা মৃত্যুর অঙ্কে অকস্মাৎ মিটাইছে ক্ষুধা।

হে ভারত তব দ্বারে নির্য্যাতিত অযুত সন্তান
প্রশান্ত আশ্রয় লাগি দিকে দিকে হানে করাঘাত—
বিলুপ্ত ঐশ্বর্য্য সব বিশৃঙ্খল দাবদগ্ধ প্রাণ
আমার ঘনান্ধকারে স্তব্ধ যেন আলোক সম্পাত।

নৃত্যানন্দে মহাকাল প্রলয়ের ধ্বংসের লীলায়
সৃষ্টির রহস্যে কোন্ বাজাইছে সঞ্জীবনী সুর—
মৃত্যুর কঙ্কাল মাঝে আনন্দের জীবন বেলায়
নবীন ভারত জাগো তেজঃপুঞ্জ হে রুদ্র মধুর।

আধুনিকা

শ্রীসুবোধ বসু

দিল্লীর ঐতিহাসিক স্মৃতিচিহ্নগুলি আমাকে আকর্ষণ করে। হয়ত একটু বেশী রকমই আকর্ষণ করে। ইহাদের উপর ভিত্তি করিয়া আমি মোগল আমলে পৌছাইতে চেষ্টা করি; একটা আড়ম্বরপূর্ণ আবেষ্টনে, তরবারি-ঝঙ্কৃত শৌর্য্যময় যুগে, বড়যন্ত্রগন্ধী আবহাওয়ায় পৌছাইতে আমার মন সতত উৎসুক; নর্ত্তকীর নূপুর সিঞ্জিনী, শিরাজীর পাত্রের ঝঙ্কারে, পেটা ঘন্টিকায় প্রহর ধ্বনি, কত ওমরাহ, কত অর্থপ্রত্যর্থী, কত অশ্বখুর ধ্বনি, কত উদ্ধত উষ্ণীষের গর্ব্বিত সমারোহ, কত গুপ্ত দূতিয়ালী, কত গোপন অভিসার যে আসিয়া মনশ্চক্ষে উপস্থিত হয় তাহার ইয়ত্তা নাই। সে যুগে রং ছিল; বর্ত্তমান যুগটা অতি স্পষ্ট, অতি সহজধারায় প্রবহমান। আড়ম্বরে অত্যাচারে, উৎসাহে উদ্দামতায়, অকৃত্রিম স্বার্থপরতার, সতত সজ্ঘাতে, বড়যন্ত্রের অফুরন্ত ঊর্ণতন্তু জালে ইহা বিচিত্র নহে।

অবস্থা এমন হইয়া উঠিয়াছিল যে এক সময় আমার নিজেরই আশঙ্কা হইত, ক্ষুধিত পাষাণের মেহের আলীর মত আমার মাথা খারাপ হইয়া না যায়। তবে বাঁচোয়া ছিল এই যে, নৃত্যপরা, পেশোয়াজের ঘাগরা পরিহিতা, জড়োয়ার অলঙ্কার বিভূষিতা কোনও তাতার রমণী দৃষ্টি-গোচর হয় নাই। হইলে কি হইত বলা যায় না, কিন্তু হুমায়ুনের কবরের মত স্থানও তাহার করুণ গাম্ভীর্য্যে তাহার রহস্যগর্ভ নৈঃশব্দ্যের দুর্ব্বার ইঙ্গিতে আমাকে ভূতের মত কবর প্রাচীর ছায়ায় বহু দ্বিপ্রহর ও বহু সন্ধ্যায় ঘুরাইয়া ফিরাইয়াছে। রাতে শুইয়া স্বপ্নের মধ্যে পর্য্যন্ত তাহার আকর্ষণ বোধ করিয়াছি। কবরের বিভিন্ন ভূতপূর্ব্বেরা গোর হইতে উঠিয়া যেন হাত ইসারায় আহ্বান করিয়াছে—হুমায়ুন, হামিদা বেগম, দারা সাকো, জাহান্দর শা, দ্বিতীয় আলমগীর। বলিয়াছে—রঙ-হীন, রোমান্সহীন, গন্ধ বৈচিত্র্য-হীন যুগ হইতে চার শত বৎসর পিছাইয়া এখানে চলিয়া আইস—তোমার সহিত আমাদের আত্মার নৈকট্য আমরা উপলব্ধি করিয়াছি—তাই এই অনুগ্রহ-আমন্ত্রণ করিলাম। সহসা ফটাফট্ করিয়া পিস্তলের গুলি ছুটিল—শেষ মুঘল রাজা বাহাদুর শার দুই পুত্র ধূলায় লুটাইয়া পড়িল—আমি ধড়মড়িয়া জাগিয়া উঠিলাম। এমন বহুদিন হইয়াছে।

বন্ধুরা বলেন—ইহা আমার এক শোচনীয় ব্যাধি। বর্ত্তমানকে আমি সহ্য করিতে পারিনা, বাস্তবের সম্মুখীন হইতে আমি ভয় পাই, তাই পুরাতনের মধ্যে যাইয়া আশ্রয় খুঁজিয়া ফিরি।

কারণ যাহাই হউক, বিগত যুগ ও বিস্মৃত কালের জন্য আমার অসম্ভব মোহ আছে। আমার তো মনে হয়, বিংশ শতাব্দীর সভ্যতায়, পৌর-স্বাধীনতা ও যুক্তি ধর্ম্মিতার নির্ভরশীল ছত্রছায়ায় নিঃসঙ্গ জীবন কাটানোর চাইতে সদাশঙ্কিত, সদাবিচিত্র সদা পরিবর্ত্তনশীল পরিস্থিতি বহুগুণে আকাঙ্ক্ষিত। মুঘল যুগে আমি কত বড়যন্ত্রে যে যোগ দিতাম, কত গুপ্তঘাতক যে আমাকে অনুসরণ করিত, কত দীর্ঘ রাত্রির অন্ধকারে আত্মগোপন করিয়া কত হারেমবাসিনীর উচ্চাকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করিবার কার্য্যে সাহায্য করিবার জন্য যে আমাকে অনুরোধ করিতে আসিত, আমি মনে মনে কল্পনা করি। অকস্মাৎ আমার বড়যন্ত্র আবিষ্কার হইয়া গেল; রজ্জুবদ্ধ অবস্থায় আমি কুর্ণিশ করিতে করিতে বাদশাহের সকাশে দরবারী-আমের এক বিরাট স্তম্ভের নিকট হেঁট মস্তকে দাঁড়াইলাম। মঞ্চের উপর সম্রাট সমাসীন; সভা এমনই নিস্তব্ধ যে সূচ পড়িলে তাহার শব্দ শুনা যাইবে। ওমরাহেরা বাদশার দক্ষিণ ও বামে নিঃশব্দে বসিয়া আছে; নাটকের প্রথম অঙ্কের সূত্রপাত হইয়াছে। আমি অদ্ভুত গর্ব্ব অনুভব করিতে লাগিলাম। স্বয়ং শাহান শা বাদশাহ আমার বিচার করিবেন। ঘাতকের তরবারিতে আমার মুণ্ড স্কন্ধচ্যুত হইবে? বিষাক্ত সর্পের খাঁচায় আমাকে দংশিত হইবার জন্য পা বাড়াইতে হইবে? ভূগর্ভে অর্দ্ধ প্রোথিত অবস্থায় আমি ক্ষিপ্ত শৃগালের দ্বারা ভক্ষিত হইব? নিজেকে বিশেষ করিয়া মনে হইতে লাগিল—আমি ইতিহাসের অন্তর্ভুক্ত হইলাম। অকস্মাৎ দেখিলাম, রাজাসনের পিছনে এক বাতায়নের গজদন্তী জাফরির মধ্য দিয়া সুর্ম্মা-আঁকা এক জোড়া সজল চোখ। আর কোনও খেদ রহিল না। মনে মনে কহিলাম—হে সুন্দরী ইরাণী, আর আমার কোনও ক্ষোভ নাই—তোমার উচ্চাকাঙ্ক্ষার সাহায্য করিতে গিয়া আমাকে জীবন বিসর্জ্জন দিতে হইল বলিয়া দুঃখিত হইও না—যদি বাদশার প্রেয়সী হইতে পার, তবেই আমার এই আত্মবিসর্জ্জন সার্থক হয়। প্রার্থনা করি, চিরকাল যেন তোমাকে উপেক্ষিতা হারেমবাসিনীর অভিশপ্ত জীবন না কাটাইতে হয়।

এই সকল বিবরণ হইতেই আমার চিন্তার ধারা আপনারা বুঝিতে পারিবেন। আমি অতীতকে পছন্দ করি। বর্ত্তমানকে আমার কাছে বড়ই ছাপোষা মনে হয়। ইহার ঐশ্বর্য্য, আভিজাত্য ও আড়ম্বরের অভাব আমাকে পীড়া দেয়। এই অসুন্দর দারিদ্র্য হইতে আমি মণিমুক্তা ঝলসিত, নূপুর গুঞ্জরিত, তরবারি-ঝঙ্কৃত অতীতে পালাইয়া যাইতে চাই। বিংশ শতাব্দীর লোক না হইয়া আমি ষোড়শ শতাব্দীর দিল্লীর নাগরিক হইতে চাই।

ইহা সকলই কল্পনার কথা।

এখন নিম্নলিখিত ঘটনাটি শুনুন।

হুমায়ুনের পুরানা কেল্লায় সারাটা দ্বিপ্রহর কাটাইয়াছি। এখনও সন্ধ্যা হইতে বাকী আছে। যারা চড়ুইভাতি করিতে আসিয়াছিল, একে একে বিদায় হইতেছে। আমি দুর্গ-প্রাচীরের সংলগ্ন ভগ্ন কক্ষগুলির পাশ দিয়া প্রায় একটা প্রেতের মতো ঘুরিয়া বেড়াইতেছি। আমার বন্ধুরা বলে, পুরানা কেল্লার তৃণাচ্ছাদিত অঙ্গনগুলি নাকি সর্ব্বাপেক্ষা আকর্ষণীয় জিনিষ। আমি ওগুলিকে এড়াইয়া চলি। মুঘল যুগের অশ্বশালা হইতে হ্রেষাধ্বনি ও হস্তি-শালা হইতে বৃংহতি নহবতের ইমনের আলাপের সহিত মিশিয়া যায়, দাসী মহলের কর্ম্মচাঞ্চল্যের অন্ত নাই, বেগমেরা কেউবা হারামের হামামে আতরজলে স্নান সমাপন করিতেছেন, কেউ বা স্নানান্তে প্রসাধনে ব্যস্ত। বাদশাহ এইবার অন্তঃপুরে আসিবেন। সমস্ত পৃথিবী শুধু ইহা সম্ভব করিবার জন্যই চলিতেছে; সর্ব্বতন্ত্রী

সঙ্গীত-যন্ত্র চম্পক অঙ্গুলির স্পর্শের অপেক্ষায় লোলুপ হইয়া রহিয়াছে; স্ফটিক দীপগুলি একটু পরেই আলোর পদ্মের মত জলিয়া উঠিবে। তখন আর আমার এখানে থাকিবার অধিকার থাকিবে না—আমি বিংশ শতাব্দীর হতভাগ্য মানুষ!

হাঁটিতে হাঁটিতে প্রায়ান্ধকার কক্ষ ও বারান্দা দিয়া উত্তরপূর্ব্ব দিকের এক গম্বুজের তলায় আসিয়া উপস্থিত হইলাম। এই অলিন্দে দাঁড়াইয়া কত রাজপ্রেয়সী জোৎস্না উপভোগ করিয়াছেন, কত বঞ্চিতা হারেমবাসিনী যমুনার দিকে চাহিয়া চাহিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে ইরাণের দ্রাক্ষাকুঞ্জের স্বপ্ন দেখিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। আমিও দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া বিশীর্ণ যমুনার স্রোত-ধারার দিকে চাহিয়া রহিলাম। সে-যুগের ন্যায় যমুনাও আজ দূরে সরিয়া গিয়াছে; গুপ্তসুড়ঙ্গ পথে কোনও বিপন্ন বাদশাহ যে এই দুর্গ হইতে পলাইয়া যমুনার উপস্থিত হইতে পারিবেন, তাহার আর উপায় নাই। প্রয়োজনও নাই। বর্ত্তমানের দিল্লীতে সভ্যতা বিরাজ করিতেছে; ঘটনা ঘটিবার আর অবকাশ নাই।

পার্শ্বে চাহিয়া দেখিলাম, বড় হইয়া চাঁদ উঠিয়াছে। বহু নিম্নের ভূমিখণ্ড হইতে ইট বহন করিবার গাড়ীর বিশ্রী লাইনগুলি নিশ্চিহ্ন হইয়া গেল, কুলিদের বস্তি বিলুপ্ত হইল, আধুনিক কালের যে সকল কুৎসিত বৈশিষ্ট্য রৌদ্রালোকে চতুর্দ্দিকে ছড়ান দেখা যায়, তাহা দৃষ্টিগোচর হইয়া আর চক্ষের পীড়া জন্মাইতেছে না।

আমার বড় ভালো লাগিতেছে। কিছুক্ষণ পূর্ব্বে দুর্গের বাহির হইবার ঘণ্টা ক্ষীণ হইয়া কানে প্রবেশ করিয়াছিল, তাহাতে আমি ভ্রূক্ষেপ মাত্র করি নাই। ঘণ্টার আদেশ মানিয়া কল্পনার জগত হইতে বাহির হইয়া আসিব, এমন মূর্খ আমি নই। আমি মুঘল যুগে আসিয়া পৌঁছিয়াছি। আমি মুঘল-প্রাসাদের জ্যোৎস্নালোকিত অলিন্দে আসিয়া দাঁড়াইয়াছি। চেষ্টা করিলে আমি কল্পনা হইতে কোনও সুর্ম্মাদীর্ঘ চটুলনয়না মুঘল অন্তঃপুরিকাকে কাছাকাছি টানিয়া আনিতে পারি। এমন জগত আমি ত্যাগ করিয়া যাইব কেন? আমি জাফরি-কাটা হ্রস্ব রেলিংটার ধারে বসিয়া পড়িলাম। হে অতীত, কথা কও, কথা কও। বাস্তবের কদর্য্য আবেষ্টন হইতে আমাকে ঐশ্বর্য্যদীপ্ত ইতিহাসের মধ্যে টানিয়া লইয়া যাও।

কতক্ষণ এমন বসিয়াছিলাম ঠিক বলিতে পারি না, সহসা পিছনে একটা শব্দ শুনিয়া চমকিয়া পিছনে তাকাইলাম। দেখিলাম, অন্ধকার আর অন্ধকার! মোগল অন্তঃপুরে জ্যোৎস্না প্রবেশ করিতে পারে না। একবার মনে হইল, ফিরিয়া যাইব কি করিয়া! এতক্ষণ পর্য্যন্ত এখানে থাকিয়া ভাল করি নাই। মোগলপ্রাসাদের কক্ষ ও স্তম্ভের অন্তহীন গোলকধাঁধা হইতে বাহিরে নির্গত হওয়া সহজ নহে। কিন্তু কেন? বাহির হইতে হইবে, এমন মাথায় দিব্যি কে দিয়াছে? একটা রাত কি এ অলিন্দে বসিয়া কাটাইয়া দিতে পারি না? তাহাতে কোন মহাভারত অশুদ্ধ হইবে?

আবার পদশব্দ হইল। মনে হইল, কে যেন অন্ধকারের মধ্য দিয়া নিঃশব্দে অগ্রসর হইয়া আসিতেছে! এ কি নূপুরের ধ্বনি না? যতই নিঃশব্দে অগ্রসর হও, নূপুরধ্বনি কি গোপন করা যায়? কিন্তু ব্যাপার কি? আমার কল্পনা কি বাস্তব হইয়া উঠিল? সত্যই তো, নূপুরের শব্দ তো স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। এইবার যদি কল্পনা মূর্ত্তি ধারণ করে? সর্ব্বনাশ! সর্ব্বনাশ! এ আমি কি করিয়াছি। এ রহস্যঘন দুর্গের ভগ্নস্তূপে কোন্ সাহসে আমি একাকী থাকিতে সাহস করিলাম? সহসা একটা অদ্ভুত হিমশীতল শিহরণ আমার মেরুদণ্ডের মধ্য দিয়া বিদ্যুতের মত ছুটিয়া গেল। মনে হইল অন্ধকার কক্ষ ও স্তম্ভের অরণ্যের মধ্য দিয়া চোখ বুজিয়া একটা ছুট দেই; মনে হইল, দুর্গ-অলিন্দ হইতে নীচে লাফাইয়া পড়ি। উঠিতে গেলাম; দেখি পা দুইটা অবশ হইয়া গেছে। দেওয়াল ধরিয়া উঠিতে চেষ্টা করিলাম। দেখিলাম হাত উঠাইতে পারি না। এ কি? কী হইল আমার? আমি কি মরিয়া গিয়াছি? এ দেহটা কি একটা মৃতদেহ?

উৎকর্ণ হইয়া শুনিতে লাগিলাম। নূপুরধ্বনি স্পষ্ট হইতে স্পষ্টতর হইয়া উঠিল। আমি কি চাহিয়া থাকিব? আমি কি চোখ বুজিয়া ফেলিব? হে রহস্যময়ী, আমি ভুল করিয়াছি, একান্ত ভুল করিয়াছি। আমি বিংশ শতাব্দীর মানুষ, আমি তোমার আবির্ভাব সহ্য করিতে পারিব না। আমার নাসিকায় মুঘল অন্তঃপুরের আতর গন্ধ প্রবেশ করিতেছে; নূপুর গুঞ্জনের সাথে আমি যেন চঞ্চল নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের শব্দ শুনিতেছি। হে রহস্যময়ী, হে গোপনচারিণী, আমি ইহার যোগ্য নই; আমি শুধু কল্পনা করিতে ভালবাসি—আমি সত্যকে সহ্য করিতে পারি না!

ঠিক আমার পিছনে আসিয়া নূপুরের শব্দ স্তব্ধ হইল। অত্যন্ত মোলায়েম মসৃণ কণ্ঠে আহ্বান আসিল, "ফরিদ খাঁ!"

ভয়ে ও বিস্ময়ে একেবারে হতভম্ব হইয়া গেলাম।

আবার আহ্বান্ আসিল। আমার শব্দযন্ত্রটা যেন বিগড়াইয়া গিয়াছে। কিন্তু প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া তাহা হইতে একটু শব্দ বাহির করিতে সক্ষম হইলাম। আমি যেন বাঁচিয়া গেলাম। ভয়ে ভয়ে কহিলাম, "গোস্তাকি (মুঘল দরবারে এইরূপই বলা হইত) মাপ করিবেন, এই অধীন ফরিদ খাঁ নয়। এখানে আমি অনধিকার প্রবেশ করিয়াছি, কিন্তু আমার কোনও দুরভিসন্ধি নাই।"

অকস্মাৎ পশ্চাৎবর্ত্তিনী উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিলেন। কহিলেন, রঙ্গ করিতে হইবে না। আমার দিকে চাহিয়া দেখ, আর নেকরা করিও না...

আমি বিনীত কণ্ঠে কহিলাম, "আপনি ভুল করিতেছেন। প্রকৃতই আমি ফরিদ খাঁ নই; আমি সামান্য বাঙালী ব্রাহ্মণ।"

রহস্যময়ী আবার হাসিয়া উঠিলেন। কহিলেন, "নূরটার কি করিয়াছ? সেটা দেখিতেছি না কেন? আর সেই সুন্দর গোঁফ জোড়ার কি হইল? ছি, কি বিশ্রী হইয়াছ! পুরুষে নাকি এই সব বাদ দেয়!"

নিজেরই সন্দেহ হইল হয়ত পূর্ব্বে নূর ও গোঁফ রাখিতাম; কিন্তু কবে তাহাদের বাহুল্য বলিয়া বাদ দিয়াছি মনে পড়িল না। কিন্তু অতি বিনীত কণ্ঠে কহিলাম, "এ-যুগে পুরুষেরা শ্মশ্রু গোঁফাদি বর্জ্জন করিয়াছে। ইহার সহিত সৌন্দর্য্যময় মুঘল যুগের তুলনা করিবেন না। সাহাজাদী, বর্ত্তমান কাল বড়ই গন্ডময়!"

চকিতে জবাব আসিল, 'সাহাজাদী! সাহাজাদী কে? আমি সাহাজাদী নই, আমি রসুইখানার বাঁদী। কত রঙ্গই যে শিখিয়াছ! আমাকে কি এখনও চিনিতে পারিতেছ না?"

বাঁদী! ইতিহাসের কালে রসুইখানায় বাঁদী বহু ছিল সন্দেহ

নাই, কিন্তু তাহার সহিত আমার দেখা হইবে কেন? আমি চিরদিনই শাহাজাদীর আবির্ভাবই কল্পনা করিয়াছি। ইনি নিশ্চয়ই পরিহাস করিতেছেন—মুঘল বাদশাজাদীরা বড়ই রহস্যপ্রিয় ছিলেন!

সহসা রহস্যময়ী অসম্ভব ভাবাবেগের সহিত কহিয়া উঠিলেন, "ছি, ছি, কী নিষ্ঠুর হও তোমরা পুরুষেরা। এতক্ষণে একবার মিষ্টি করিয়া ফরিদা বলিয়া ডাকিতেও পারিলে না—এতই পর হইয়া গিয়াছি! অথচ তোমার পথ চাহিয়া আমি বৎসরের পর বৎসর এই দুর্গের অন্ধকার কক্ষে কাটাইয়াছি।"

স্ত্রীলোকদের বুঝান প্রায় অসাধ্য ব্যাপার। এঁকে আমি এখন কি করিয়া বুঝাই যে আমি সে নই। মুঘল-যুগের সহিত আমার আত্মিক মিল থাকিলেও দৈহিক কোনও সম্পর্ক নাই। সহসা আমার সমস্ত শরীর শিহরিয়া উঠিল। মুঘল যুগের প্রতি আমার আনুরক্তির সুযোগ পাইয়া তবে কি মুঘল যুগের ভূত আমার স্কন্ধে চাপিয়া বসিল? অথবা ইহাও হইতে পারে যে, পূর্বজন্মে আমি সত্যই মুঘল অন্তঃপুরে যাতায়াত করিতাম। জন্মজন্মান্তরের মধ্য দিয়া চলিয়া আসিয়া আমি তাহা বিস্মৃত হইয়াছি, কিন্তু ঐতিহাসিক যুগের এই বন্দিনী সে ইতিহাস স্পষ্ট মনে করিয়া রাখিয়া প্রতীক্ষা করিয়া বসিয়া আছে!

কিন্তু তবু দৃঢ়তার সহিত কহিলাম, "আমি হিন্দু, ব্রাহ্মণ তনয়…"

ইরাণী মৃদুহাস্য করিয়া এইবার সস্নেহে কহিল, "রসুইখানা হইতে চুরি করিয়া যখন সিককাবাব খাওয়াইতাম, তখনও কি হিঁদুই ছিলে?"

এই যাবনিক পরিহাসের জবাব দিবার চেষ্টা না করিয়া আমি গোঁজ হইয়া বসিয়া রহিলাম। অতীতের এই ভগ্নস্তূপে রাত কাটাইবার দুর্বুদ্ধির জন্য মনে মনে নিজেকে ধিক্কার দিতে লাগিলাম। এতক্ষণে স্পষ্ট বুঝিতে পারিলাম, বাস্তবে এইরূপ অভাবনীয় ঘটনা কিছু ঘটিবে না বলিয়াই অতীতের কল্পনা করিয়া এতটা রস পাইতাম। অতীতের জন্য আমার প্রীতি, মুঘল যুগের জন্য আমার মানসিক বিলাস ছাড়া আর কিছুই নহে।

ইরাণী আরও নিকটে অগ্রসর হইয়া আসিল। মোলায়েম কণ্ঠে কহিল, "চুপ করিয়া আছ কেন? আমার সঙ্গ কি অসহ্য মনে হইতেছে? দোহাই তোমার, এমন অবজ্ঞা করিও না। আমি একেবারে ফেল্‌না নই, তুমি তাহা বেশ জান। নসিবে থাকিলে বাদশার বেগমও হইতে পারিতাম…"

রহস্যের গন্ধ পাইয়া সবিস্ময়ে তাহার দিকে চাহিলাম। ইরাণী বুঝিতে পারিল। কহিল, "মুঘল যুগে হামেশাই এইরূপ হইত। দেহের রূপ দেখিয়া বাদশাকে উপহার দিবার জন্য খোরাসানের দাসীহাট হইতে আমাকে কিনিয়া হিন্দুস্থানে লইয়া আসিল। আমি মুঘল হারেমে প্রবেশ করিলাম; অসূর্য্যম্পশ্যা হইলাম। দেহে বেগম হইবার উপযুক্ত রূপ ছিল; বাদশার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল। সঙ্গে সঙ্গে হারেমের ষড়যন্ত্র আমার চতুর্দ্দিকে জাল বিস্তার করিতে আরম্ভ করিল। আমার নাকের অর্দ্ধেকটা গুপ্ত ঘাতকের ছোরাতে উড়িয়া গেল, আঙ্গুরকলির মত রাঙা ওষ্ঠ সেঁকা দিয়া পুড়াইয়া দেওয়া হইল—বেগম[illegible] নিশ্চিন্ত হইলেন। বাদশার মনোরঞ্জনের একমাত্র মূলধন হারাইয়া রসুইশালায় আসিয়া বাসা বাঁধিলাম। বাঁদী ও বেগমের মধ্যে তফাৎ কতখানি!"

একটা দীর্ঘশ্বাসের শব্দ শুনিলাম। শুনিয়া দুঃখিত হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু সত্য কথা বলিতে কি, প্রায় নিজের অজ্ঞাতসারেই পুলকিত হইয়া উঠিলাম। এইবার অসংশয়ে বিশ্বাস করিলাম, ইনি সত্যই মুঘল যুগের মেয়ে, ঝুটা নহেন।

পুলক গোপন করিয়া কহিলাম, "উহা ভাবিয়া আর দুঃখ করিবেন না। মুঘল যুগের রীতিই ঐরূপ ছিল, ইহার জন্যই তো মুঘল যুগ এইরূপ রহস্যমধুর…"

ইরাণী ফোঁস করিয়া উঠিল। কহিল, "এইরূপ নিষ্ঠুর রীতির প্রশংসা করিতেছ? ধিক! ইহা বর্বরতার চূড়ান্ত। তবে সত্য কথা বলিতে কি, এই অঙ্গহানির জন্যই তোমার সহিত পরিচয় সম্ভব হইয়াছিল। তোমাকে পাইয়া প্রকৃতই আমি সকল দুঃখ বিস্মৃত হইয়াছিলাম, বেহেস্ত্‌ লাভ করিয়াছিলাম। কিন্তু নিষ্ঠুরের জাত, তুমিও নারাজ হইলে, একদিন আমাকে ত্যাগ করিলে…"

আমি প্রতিবাদ করিতে যাইতেছিলাম, কিন্তু তাহার পূর্ব্বেই ইরাণী আরম্ভ করিল, "আমাকে তোমার পছন্দ না হইবার কারণও আমি টের পাইয়াছি। তোমার দৃষ্টি একালের মেয়েগুলির দিকে; তাহাদের হাল-কায়দা দিয়া তাহারা তোমার মাথা ঘুরাইয়া দিয়াছে। প্রতিবাদ করিতে চেষ্টা করিও না, আমি সকলই বুঝি। সত্যই আমি বড় সেকেলে রহিয়া গিয়াছি…চারিশত যুগ পূর্ব্বের মুঘল যুগে এখনও আমি বন্দিনী, অথচ তুমি সম্পূর্ণ আধুনিক হইয়া উঠিয়াছ, ক্ষুর এবং গোঁফ বর্জ্জন করিয়াছ। কিন্তু ইহার প্রতিকার করা অসম্ভব নয়। আমার প্রস্তাব শোন।"

না শুনিয়া উপায় ছিল না, নীরবেই বসিয়া রহিলাম।

ইরাণী বলিতে লাগিল, "এই কেল্লায় বহু আধুনিক মেয়ে বেড়াইতে আসে। আমি অদৃশ্য থাকিয়া তাহাদের সাজ-পোষাক, হাল্‌চাল সবই নিরীক্ষণ করি। এখনকার মেয়েগুলির আব্রু নাই, সাজ-পোষাকেও আব্রু বড় কম। ইহারা পেশোয়াজ পরে না; আমাদের কালের বিচিত্র অলঙ্কার এবং তাহাদের কারুকার্য্যকে ব্যঙ্গ করিবার জন্যই সামান্য এবং সোজা অলঙ্কার পরে। চোখে ইহারা সুর্মা দেয় না, অথচ ওষ্ঠে রঙ লেপিয়া দেয়। ইহারা জরিদার নাগরা পরে না; ইহাদের জুতার গোড়ালি ঘোড়ার ক্ষুরের অনুকরণে তৈয়ারি। এও আবার সাজ! অথচ এই সাজ দেখিয়াই তুমি মুগ্ধ হইয়াছ। ইহাতে হাসিব না কাঁদিব, বুঝিতে পারিতেছি না, কিন্তু গরজ বড় বালাই। মনে হয়, উহাদের ধরণে সাজিলে হয় তো তুমি এমন উপেক্ষা করিবে না।" এই পর্য্যন্ত বলিয়া ইরাণী সামান্য দ্বিধা করিল, তারপর কহিয়া উঠিল, "দেখ, সত্য কথা বলিতে কি, মুঘল যুগ হইতে আমারও ছুটিয়া পালাইয়া আসিতে ইচ্ছা করে। মুঘল যুগ বড় বর্ব্বর, বড় নিষ্ঠুর। এত ঈর্ষ্যা, এত ষড়যন্ত্র, এত অত্যাচার, এত স্বার্থপরতা। অনুগ্রহ করিয়া আমাকে ইতিহাসের কারাগার হইতে উদ্ধার কর…আমি হারেম হইতে বাহিরে আসিতে চাই, সূর্য্যের মুখ দেখিতে চাই, স্বাধীনতার বাতাসে বায়ুকোষ পূর্ণ করিতে চাই…"

আমি কিছু বলিবার পূর্ব্বেই ইরাণী আবার আরম্ভ করিল, "আমার কাছে একশত আসরফি জমা আছে। উহা দিয়া আজই আমাকে আধুনিক কালের রূপার শাড়ী, শায়া, হাতকাটা জামা, সোনার কানবালা, খুরওয়ালা জুতা, আর ওষ্ঠ রাঙাইবার রংবাই

কিনিয়া আনিয়া দাও। দেখিও, কেমন আমি সুন্দরী হইয়া উঠি। তখন তুমিও আর অবজ্ঞা করিবে না। তোমার হাতে আমি আসরফিগুলি আনিয়া দিতেছি। তোমার পছন্দমত সাজ-পোষাকই কিনিও। তোমার জন্তই তো সাজসজ্জা করা। আসরফিগুলি সকলই ঘড়া করিয়া মাঠের তলায় পুঁতিয়া রাখিয়াছি। এখনই লইয়া আসিতেছি···"

অন্ধকারে নূপুর আবার গুঞ্জন করিয়া উঠিল। পদধ্বনি পিছনে সরিয়া যাইতে লাগিল, আতরের খোসবু মৃদু হইতে মৃদুতর হইল।

চাঁদ নাই, দুর্গ-প্রাচীর নাই; অন্ধকার, শুধুই অন্ধকার। কিছুই দেখিতেছি না, কিছুই শুনিতেছি না। মুহূর্ত্তের পর মুহূর্ত্তগুলি জীবন প্রাণীর মত সম্মুখ দিয়া হাঁটিয়া পার হইয়া যাইতে লাগিল; বহু যুগের ইতিহাস সম্মুখ দিয়া প্রবাহিত হইতে লাগিল। ক্রমে মগজের মধ্যটা পর্য্যন্ত ঝাপ্‌সা হইয়া উঠিল।

এইরূপ কতক্ষণ চলিল বলিতে পারি না, অকস্মাৎ চোখের উপর বিচিত্র আলোক-সম্পাত অনুভব করিলাম। চাঁদ যে এমন তীব্র আলো নিক্ষেপ করিতে পারে, জানিতাম না। বিস্মিত হইয়া চোখ মেলিলাম। দেখিলাম, সূর্য্য আকাশে, অন্তত ঘণ্টা দুই হয় ভোর হইয়াছে। চমকিয়া উঠিয়া বসিলাম। পিছনে চাহিয়া দেখিলাম, বিরাট স্তম্ভগুলির সারির মধ্য দিয়া ভিতরের অনেকটা পর্য্যন্ত দেখা যাইতেছে। শুনিয়াছি, এইটা নাকি বাদশাহের বাবুর্চিশালা ছিল। আর বিলম্ব করিলাম না, উঠিয়া দাঁড়াইলাম। দেখিলাম, তখনও হাত পা ঈষৎ কাঁপিতেছে—অসীম অবসাদে দেহ পূর্ণ, মাথার ঘোর তখনও কাটে নাই। কিন্তু চক্ষের পাতা অর্দ্ধেক বুজাইয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড় দিলাম। মুঘল যুগ হইতে ছুটিতে ছুটিতে বিংশ শতাব্দীতে আসিয়া পৌছাইয়া তবে আশ্বস্ত বোধ করিলাম।

ইঁহার পর হইতে আমি আর মুঘল স্থাপত্যের কাছে ঘেঁষি না। পুরাতন ভাঙা দালান-কোঠা দেখিলেই মেরুদণ্ডের ভিতরটা শিরশির করিয়া উঠে। এখন আমি ইম্পিরিয়াল সেক্রেটারিয়েটের উত্তর ও দক্ষিণ ব্লক দুইটির পাশ দিয়া বেড়াই, ভাইসরিগ্যাল লজের স্থাপত্য হৃদয়ঙ্গম করিতে চেষ্টা করি এবং কোনও ক্রমেই আর ইণ্ডিয়া ফটকের চাইতে দূরে অগ্রসর হই না।

কিন্তু সত্য কথা বলিতে কি, প্রতীক্ষমানা ইরাণীর হতাশার কথা ভাবিয়া যে একটু বেদনা অনুভব করি না, এমন নয়। পুরুষের অকৃতজ্ঞতা সম্বন্ধে এইবার সে দৃঢ়নিশ্চয় হইবে।

কেহ যদি ইরাণী বাঁদীটির আধুনিকা হইবার আকাঙ্ক্ষার প্রতি সহানুভূতি বোধ করেন, তবে একপ্রস্থ হালফ্যাসানের সাজ-পোষাক পুরানা কেল্লায় রাখিয়া আসিবেন। আধুনিকদের যাওয়া নিরাপদ নহে, কারণ ফরিদ খাঁ বলিয়া ইরাণী যদি পুনর্ব্বার আর কাহাকেও আটকাইয়া ফেলে, তবে সে কিছুতেই নিষ্কৃতি পাইবে না। তখন এ অজুহাতও খাটিবে না যে ইরাণী বড়ই সেকেলে; তখন সে তো সম্পূর্ণ আধুনিকা।

কোরিয়ায় জাপানের নীতি

শ্রীনগেন্দ্রনাথ দত্ত

আজ নানা কারণে কোরিয়ার কথা মনে পড়ছে, তার কারণ ভারতের মত কোরিয়াও একদিন এই অবস্থায় পড়েছিল এবং তার স্বাধীনতা হারিয়েছিল। কোরিয়ার স্বাধীনতার জন্ত একদিন জাপানের বড় মাথা-ব্যথা হয়েছিল, আজ যেমন ভারতের স্বাধীনতার জন্ত জাপানের মাথা ব্যথা হয়েছে। জাপান অবিরতই প্রচার করছে যে, তারা স্বাধীনতা আমাদের দেবে। ভারতের স্বাধীনতা ভারতবাসী ছাড়া অন্ত কেউ এনে দেবে এমন কল্পনা করাও পাপ, কারণ স্বাধীনতা দেবার জিনিষ নয়—অর্জ্জন করবার জিনিষ। ভারতবাসীরা জানে তারা নিজেরাই স্বাধীনতা অর্জ্জন করবে, এজন্ত কারুর কোন অভিভাবকত্বের প্রয়োজন আছে বলে স্বীকার করে না। জাপান এই গায়ে পড়া অভিভাবকত্ব নিয়ে কোরিয়ার কি অবস্থা করেছে—তাই একটু আলোচনা করব। কেননা ইতিহাসের যে মোড়ে কোরিয়া একদিন দাঁড়িয়েছিল ভারতও ঠিক সেই মোড়েই দাঁড়িয়েছে মনে হচ্ছে। কোরিয়াবাসীরা তার নিজের দেশকে বলে "Cho-sen" or "Land of the Morning Calm" আমরা বলতে পারি "প্রভাত প্রশান্তির দেশ"। কোরিয়া তার ভৌগলিক সংস্থিতির জন্তই বহির্জগতের কাছে বেশি অপরিচিত ছিল। কোরিয়াকেই বিদেশীরা বলত "The Hermit Nation." কথাটা সত্যিই। বড় আলসাভুবের জাত এরা, সাদাসিধে আরাম-জীবনটাই বেশ এদের পোষায়। তারি সুন্দর দেশ। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের অফুরন্ত ভাণ্ডার যেথায় সেথায় ছড়ানো রয়েছে এদেশে। শান্তিপ্রিয় জাত, কোন হাঙ্গামার মধ্যে নেই। অনেক সময় এমন হয় যে প্রাকৃতিক সম্পদই জাতির দুর্ভাগ্যের একটা কারণ হয়ে পড়ে, যেমন চীনের হয়েছে, কিন্তু কোরিয়ার বেলা একথা ঠিক খাটে না। কোরিয়ার প্রাকৃতিক সম্পদ তেমন বিশেষ কিছু নেই। সোনা, লোহা ও কয়লার খনি কিছু আছে বটে। কিন্তু তা দেখেই যে কোন বিদেশী লুব্ধ হতে পারে আপাতদৃষ্টিতে তা মনে হয় না। তা হলেও একটা কারণ নিশ্চয়ই আছে বলতে হবে; যাদের ক্ষমতা আছে তারা চুপ করে বসে নেই, তাদের ক্ষমতা প্রয়োগের একটা ক্ষেত্র চাই ত। সেই ক্ষেত্র হলো গিয়ে এই অভাগা দেশ কোরিয়া। চীন, জাপান, রাশিয়া সবাই চাইল, যে যার মত করে কোরিয়ার ওপর প্রভুত্ব বিস্তার করতে। এই শক্তিত্রয়ের মধ্যে জাপান একেবারে সবার সেরা। সে এই সব প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্যে হঠাৎ একদিন ষোড়শ শতাব্দীতে কোরিয়া আক্রমণ করে বসল। তার উদগ্র সাম্রাজ্যবাদ সেদিনও ছিল—কিন্তু অপরিস্ফুট ছিল—এই প্রভেদ বর্ত্তমানের সঙ্গে। জাপানে তখন ইম্পিরিয়াল রিজেন্ট হিদেওসির আমল। তিনি কোরিয়া আক্রমণ করলেন ও ছ'বছরের মধ্যে কোরিয়াকে শ্মশানে পরিণত করলেন। ঐতিহাসিকদের মতে "One of the most needless, unprovoked, cruel, and

desolating wars that ever cursed a country." কিন্তু আক্রমণকারী-মনের তৃষ্ণা ওতেও মেটেনি—আরও চাই। একটা জাতিকে কী রকম দুর্ভাগ্যের সামনে মুখোমুখি হয়ে দাঁড়াতে হয়েছিল তার প্রমাণ পাওয়া যাবে এই ক'টা কথার মাঝে "Over 185,000 Korean heads were assembled for mutilation and 214,000 for an "ear-'tomb' mounted at kioto."—এই হল সেই ষোড়শ শতাব্দীর কীর্ত্তি। একথা কোরিয়াবাসীরা ভুলতে পারে? এর পর ঠিক অর্দ্ধ শতাব্দী যেতে না যেতেই কোরিয়াবাসীরা আবার এক বিপদে পড়ল। এ বিপদ আসে ১৬২৮ থেকে ১৬৪৪-এর মধ্যে। মাঞ্চু সাম্রাজ্যবাদী চীন কোরিয়ার ওপর প্রভুত্বের হাত বাড়ালে এবং প্রভুত্ব কায়েমও করলে। এ প্রভুত্বের ধর্ম্ম ছিল অনেকটা অভিভাবকের ধর্ম্ম। চীন কোরিয়ার ঘরোয়া ব্যাপারে হাত দেয়নি। সেই থেকে ১৮৯৫ পর্য্যন্ত কোরিয়া চীনের মাঞ্চু সম্রাটদের রাজনৈতিক অভিভাবকত্ব মেনে এসেছে।

এই ত গেল প্রাচ্যের সাম্রাজ্যবাদীদের কোরিয়া সম্পর্কে মনোভাবের ইতিহাস। এর পর এলো কোরিয়া পাশ্চাত্য বণিক-স্বার্থের সংস্পর্শে। সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থ মূষিক-বাহনে—ব্যবসা নাম ধরে ঢুকল কোরিয়ায়। এর পেছনকার বণিক-স্বার্থ ও রাজনৈতিক স্বার্থ দুটোর সমন্বয় হল নব শক্তিরূপে। কোরিয়ার সামর্থ্য ছিল না যে এই নব জাগ্রত উদগ্র শক্তিকে হটিয়ে দেয়। পাশ্চাত্যের এই শক্তির সঙ্গে জাপানও হাত মেলালে। তাহলে আমরা এখন দেখতে পাব দুটো শক্তি—এক দিকে পাশ্চাত্য বণিক ও রাজনৈতিক স্বার্থ, অন্য দিকে প্রাচ্য বণিক ও রাজনৈতিক স্বার্থ। চীন বহু পূর্ব্ব থেকেই একটা অভিভাবকত্ব নিয়ে বসে আছে। সেও কিছু সুযোগ-সুবিধা লুফে নিলে। এদিকে পাশ্চাত্য জাতিগুলি এলো, তার সঙ্গে এলো জাপান। চীনের সঙ্গে কোরিয়ার যে রাজনৈতিক সম্পর্ক ছিল তাতে বহির্শক্তি কোরিয়ার দরজায় কড়া নাড়া দিলে সেটা চীনের দেখার কথা। কোন নোতুন শক্তিকে কোরিয়ার দরজায় ঘেঁষতে না দেওয়া চীনের কর্ত্তব্য—কোরিয়ার নয়। কোরিয়ার রাজনৈতিক ক্ষমতার এ দিকটা চীনের কাছে বাঁধা দেওয়া ছিল। কিন্তু চীন তখন একেবারেই দুর্ব্বল শাসনের আবাসভূমি। মাঞ্চু সাম্রাজ্য নিজেকে রক্ষা করাই ছিল কঠিন সমস্যা, তার পর আবার কোরিয়ার কথা ভাবা। জাপান চীনের ওপর চাপ দিয়ে—জাপান-কোরিয়া চুক্তি সম্পাদন করলে। এ চুক্তি সম্পাদিত হয়—১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে। ফুসন বন্দরটি জাপানী ব্যবসায়ীদের কাছে মুক্ত হল ব্যবসায় কার্য্যের জন্য। এ দিকে পাশ্চাত্য ব্যবসায়ীদের ভীড় বাড়তে লাগল, ওদিকে কোরিয়াও বাধ্য হতে লাগল বিদেশী ব্যবসায়ীদের কাছে তার নিজের বন্দরগুলি মুক্ত করে দিতে। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে ওনস্যান, গেনস্যাও, চেমালপু বন্দরগুলি মুক্ত হল বিদেশী বণিকদের নিকট। যুক্তরাষ্ট্র ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে কোরিয়ার সঙ্গে ব্যবসায় কার্য্য চালাবার জন্য এক চুক্তি সম্পাদন করলে। এর পরের বছর ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে গ্রেট ব্রিটেন ও জার্ম্মানী, ইতালী ১৮৮৪, ফ্রান্স ১৮৮৬ ও রাশিয়া ১৮৮৮—এই কটা বছরের মধ্যে পাশ্চাত্য জাতিগুলি পর পর কোরিয়ার সঙ্গে নানা প্রকার ব্যবসায় চুক্তিতে আবদ্ধ হল। কোরিয়া দায় ঠেকেই হোক অথবা ঘটনার অনিবার্য্য গতিচক্রেই হোক এক বিরাট আন্তর্জ্জাতিক অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্বার্থের সংঘাতের মাঝে এসে পড়ল। কোরিয়ার অবস্থা আরো চরমে পৌঁছালো। ক্রমশই তার আভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক দুর্ব্বলতা প্রকাশ হয়ে পড়তে লাগল। এই যে আন্তর্জ্জাতিক স্বার্থের খেলা কোরিয়ার বুকের ওপর চলছে তাতে জাপান মোটেই নিরপেক্ষ দর্শক মাত্র নয়। তার মনের চিন্তাটা তখন এই ভাবে ঘুরছে যে, তার স্বার্থ রক্ষা করা চাই। যে কোন ভাবেই হোক এই সব স্থানগুলির প্রতি একটা কায়েমী স্বার্থ রাখা প্রয়োজন।

"Three territories were particularly attractive to Japan : Formosa, which lay to the south of the Japanese Archipelago and which was an excellent source of food and agricultural products ; Korea, which lay close to the Japanese Islands, commanded the yellow Sea, and was a natural stepping stone to the continent, and Manchuria, with its timber and minerals." কাজেই জাপানকে আন্তর্জ্জাতিক স্বার্থের দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হতেই হল।

১৮৭০ খৃষ্টাব্দের পর পাশ্চাত্য জাতিগুলি কাঁচা মালের জন্য এশিয়া আফ্রিকা প্রভৃতি মহাদেশে অনুসন্ধান করতে লাগল এবং সঙ্গে সঙ্গে আবার শিল্প সম্ভারও যাতে কাট্‌তি হয় তার প্রতি কড়া নজর রাখতে লাগল। বণিকবৃত্তি দুই বিশেষ নীতির ফলেই পৃথিবীর বাজারে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পরিণত হয়। জাপান এই প্রতিদ্বন্দ্বিতায় যোগ দেয়। তার কারণ ১৮৬০ খৃষ্টাব্দের পর জাপানের শিল্পবিপ্লব এত দ্রুত ও ব্যাপক হয়ে পড়ে যে তাকে বাধ্য হয়ে পৃথিবীর বাজারে কাঁচা মালের সন্ধানে বের হতে হয়। এরই ফলে সে যেমন খুঁজতে থাকে কাঁচা মালের বাজার, তেমন খুঁজতে থাকে তার দাঁড়াবার মত ঠাঁই। কোরিয়া যে প্রাকৃতিক সম্পদে সম্পদশালিনী না হয়েও জাপানের কোপ দৃষ্টিতে পড়েছে তার কারণ হচ্ছে এই যে, (১) Korea, which lay close to the Japanese Island, (২) commanded the yellow Sea, (৩) and was a natural stepping stone to the continent, কোরিয়া জাপানের ঘরের কাছের ভুঁই, এখানে অন্য চাষী এসে ফসল ফলিয়ে ঘরে তুলবে এটা জাপান মোটেই বরদাস্ত করতে পারে না। অতএব কোরিয়া যাতে দখলে আসে তার চেষ্টা করা উচিত। আর শুধু কোরিয়াইবা কেন, যতটা পাওয়া যায় ততটাই লাভ। কোরিয়া এবং তার পার্শ্ববর্ত্তী এলাকা অধিকারে আনার মূল প্রতিবন্ধক হচ্ছে চীন। অতএব রণং দেহি।

—কোরিয়ার আভ্যন্তরীণ অবস্থার কথা না বলাই ভাল। কেন না বিদেশীদের প্রথম এবং প্রধান কাজ হচ্ছে দেশের অভ্যন্তরে বিরোধ সৃষ্টি করা। জাপান সেদিক থেকে কোন ত্রুটি করেনি। কোরিয়ার রাজনৈতিক প্রভুত্বকামী দুটো দল ছিল। একদল সংরক্ষণশীল, আর একদল উদারনৈতিক। রাণী মিন (Queen Min) সংরক্ষণশীল দলের নেতৃত্ব করতেন। পক্ষান্তরে ই হেইয়ুং (Yi Haewng) উদারনৈতিক দলের নেতা ছিলেন। এই দুই দলের মতভেদের সুযোগ জাপান নিলে এবং অবিরতই দেশের মধ্যে বিদ্রোহ বা রাজনৈতিক অধিকারের পথ প্রশস্ত করবার উপায় খুঁজতে লাগলে। এর ফলে ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে ই হেইয়ুং-এর প্ররোচনায় সিওউল-এ জাপানী দূতাবাস ও জাপানী প্রবাসীদের প্রতি আক্রমণ হয়। এর ফল ভাল হয় নি। চীন ই হেইয়ুংকে তিয়েনৎসিনে নির্ব্বাসনে পাঠিয়ে তবে দেশে শান্তি আনে, ই হেইয়ুং কিন্তু নির্ব্বাসন থেকে ফিরেই জাপানের পক্ষ অবলম্বন করেন। এতে জাপান একেবারে ঘরের মধ্যে বিরোধের কাঁটা পুততে সুযোগ পায়। রাণী মিন এদিকে জাপানের সঙ্গে বিরোধিতাই করে চলেছেন এবং তাঁর সমর্থ সহকারী দুজন যথাসাধ্য তাঁকে এই কার্য্যে সহায়তা করছেন। রাণী মিন-এর উক্ত সহকারীদ্বয়ের নাম নানা কারণে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কারণ এঁরাই সম্ভবত কোরিয়ার দুর্ভাগ্যের জন্য সব চেয়ে বেশী লড়াই করেছেন এবং দেশ যাতে জাপানীর কবলে না যায় তার জন্য যথাসম্ভব চেষ্টা করেছেন। এঁদের নাম কোরিয়ার ইতিহাসে অমর হয়ে থাকবে। এঁদের একজনের নাম হচ্ছে য়ুয়ান সি কেই (Yuan-Shih-Kai), আর একজনের নাম লি হুং চ্যাং (Li Huang chang)।

১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে টং হাক-এর বিদ্রোহের সুযোগ জাপান পুরোমাত্রায় নিলে। কোরিয়া চীনের কাছে সৈন্য চেয়ে পাঠাল। চীন দু'হাজার

সৈন্য চেয়ে পাঠায় ; এদিকে জাপানও বারো হাজার সৈন্য পাঠিয়ে দেশ আক্রমণ করে বসলে। জাপান এতদিন যে আভ্যন্তরীণ বিদ্রোহের প্রতীক্ষায় ছিল আজ তার সেই সুযোগ এলো। এটা মোটেই অস্বাভাবিক নয় যে চীন এই অবৈধ আক্রমণের প্রতিবাদ করবে। ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দের চীন জাপান যুদ্ধের এই হচ্ছে মূল কারণ। এটা অতি দুঃখের সহিত বলতে হচ্ছে যে চীনের ক্ষাত্রশক্তির অভাবই চীনের বর্ত্তমান দুর্ভাগ্যের কারণ। জাপান যে কোন প্রকারেই হোক নিজের ক্ষাত্র শক্তিকে বাড়াতে এতটুকু ত্রুটি করেনি এবং সেই ত্রুটি করেনি বলেই আজ জাপান এই অবস্থায় এসেছে। যাই হোক ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দের যুদ্ধের ফল চীনের পরাজয়। ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দের ১৭ই এপ্রিল তারিখে সিমোনো সেকির শান্তি সর্ত্ত-সম্পাদিত হয়। এই শান্তি সর্ত্ত চীনের পক্ষে যে কি অপমানকর তা বলার নয়। The terms were drastic—as terms imposed by conquering empires upon helpless victims usually are. China was forced to recognise the "independence' of Korea......China further surrendered to Japan the entire Liastung Peninsula (the gateway to Manchuria) ; to gether with Formosa and the Pes Cadores. In addition China agreed to pay Japan an indemnity of 200,900,000 taels (চীনদেশের মুদ্রা এক টলের মূল্য প্রায় ৵/০) and to open certain ports". এদিকে আবার জাপান কোরিয়ার পররাষ্ট্র সচিব কিম য়ুয়ান-সিককে Kim Yun-Sik) বাধ্য করলে এক চুক্তি করতে। এ চুক্তি সম্পাদিত হয় ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে। চুক্তির প্রতিপাদ্য বিষয় হচ্ছে চীনা বিতাড়ন ও কোরিয়ার স্বাধীনতা রক্ষা। কোরিয়া সম্পর্কে জাপানের নীতির একটা বিষয় বিশেষ লক্ষ্য করবার হচ্ছে এই যে, তাদের কোরিয়াকে স্বাধীনতা দেবার আগ্রহ। বাস্তবিক পক্ষে চীনের রাজনৈতিক অভিভাবকত্বের আওতায় যতদিন পর্য্যন্ত কোরিয়া ছিল ততদিন পর্য্যন্ত সে প্রায় সব ব্যাপারেই স্বাধীন ছিল। জাপানের মত সর্ব্বপ্রভুত্বকামী নীতি চীনের ছিল না। জাপান কেবলমাত্র শাসন সংস্কারের ওজুহাতে ও স্বাধীনতার ধুয়া তুলে কোরিয়ার সবচেয়ে বড় সর্ব্বনাশ করেছে। বলা বাহুল্য যে, আস্তে আস্তে জাপান ক্ষমতার বীজ রোপণ করে তার ফলের আশায় বসে রইল। জাপান হঠাৎ কোরিয়ার রাষ্ট্রের নিকট দাবী করলে যে তাদের উপদেষ্টারা যদি রাষ্ট্রে প্রতিনিধিত্ব করবার সুযোগ না পায় তাহলে রাষ্ট্র পরিচালনায় বিশেষ ত্রুটি দেখা দেবে। অতএব কোরিয়ার রাষ্ট্রে জাপানের প্রতিনিধি রাখতে হবে। জানি না কোন আত্মমর্য্যাদাসম্পন্ন জাতি এই দাবী মেনে নিতে পারে কিনা।

ইতিহাস এমন কথা বলে যে, কোরিয়ার নেতারা ও রাষ্ট্র কেউই এই ঘৃণ্য দাবী মেনে নেয়নি। এত সব ঘটনার আবিলতার মধ্যে একদিন শোনা গেল যে, কোরিয়ার রাণী মিন নিহত ও রাজা বন্দী। ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে ৮ই অক্টোবর রাজা বন্দী হন। পরে নানা কৌশলে রাশিয়ার দূতাবাসে গিয়ে পালিয়ে নিজের প্রাণ বাঁচান।

সিমোনো সেকির চুক্তির পর থেকে জাপান কোরিয়ায় যে-সব নীতি প্রয়োগ করেছে তার দৃষ্টান্ত আলোচনা করলাম। এবার দেখা যাবে বিগত রুশ-জাপান যুদ্ধের মূল কারণ কোথায় রয়েছে এবং তারপর কোরিয়ার অবস্থা কতটা চরমে পৌঁছেচে। একদিন যেমন ফরাসী ও ব্রিটিশ ভারতের প্রভুত্ব নিয়ে লড়াই করেছিল, কোরিয়ারও ঠিক রাশিয়া ও জাপান কোরিয়ার প্রভুত্ব নিয়ে লড়াই করেছে। এই দুটো শক্তি যে কোরিয়াকে কেন্দ্র করে যুদ্ধে নামবে তার প্রমাণ বহু আগেই পাওয়া গিয়েছিল। কেন না রাশিয়া কোরিয়ার পলাতক রাজাকে আশ্রয় দিয়েছিল। মাঞ্চুরিয়ার মধ্যে রাশিয়া তার অর্থনৈতিক প্রভাব বিস্তারে ব্যস্ত ছিল। এর ফলে কোরিয়ার ওপর কে প্রভুত্ব করবে—রাশিয়া না জাপান তাই নিয়ে এক দারুণ প্রতিযোগিতা সুরু হয়। ১৮৯৭ ও ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দের যে পারস্পারিক চুক্তি নিষ্পন্ন হয় তাতে বিধান থাকে যে রাশিয়া এবং জাপান উভয়েই কোরিয়ার স্বাধীনতার জন্য দায়ী থাকবে। এ রাজনৈতিক দায়িত্ব জাপান ও রাশিয়া উভয়ে মিলেই যুক্তভাবে বহন করবে। কিন্তু রাশিয়া চুক্তির সর্ত্ত মেনে চলেনি। সে কয়লা বোঝাইএর জন্য বন্দর ও কাঠ ব্যবসার জন্য এক বিশেষ অধিকার ভোগ করতে সুরু করলে। জাপান রাশিয়াকে তার ঘরের কাছে এতটা সুবিধা দেওয়ার জন্য প্রস্তুত ছিলনা। বিগত রুশ-জাপান যুদ্ধের এই হচ্ছে প্রকাশ্য কারণ। রাশিয়ার এই যুদ্ধে হেরে যাওয়া মানেই জাপানের প্রভুত্ব কোরিয়ার ওপর বেড়েই যাওয়া। এর পরেই কোরিয়ার দুর্ভাগ্যের ইতিহাস সুরু হয়। একদিন শান্তি ও শৃঙ্খলার নামে জাপান কোরিয়ার ওপর "Treaty of Annexation" চাপিয়ে দিলে। ১৯১০ খৃষ্টাব্দের ২২শে আগষ্ট এই সর্ত্ত স্বাক্ষরিত হয় এবং প্রচারিত হয় ২৯শে আগষ্ট ১৯১০ খৃষ্টাব্দে।

অস্ত-রবি

শ্রীঅনিলকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রাবণ আকাশ ঘেরিয়া সহসা—
নামিল শ্রাবণ-সন্ধ্যা !
ধূলি 'পরে মুখ, লুকালো কী লাজে—
সাঁঝের রজনী-গন্ধা ?
যে পথে চলিতে এত সেধেছিলে,
যাহারে লভিতে এত কেঁদেছিলে ;
সহসা কী এল সেই পথ হ'তে—
আশার অলোক-নন্দা ?
মোরা হেরি হায়, ধূলিতে লুটায়—
কিশোরী রজনী-গন্ধা !

আপনার মায়া, ঝরিল ধূলায়—
বিশ্ব-প্রভুর-ছায়াতে,
হেরিলে বিশ্ব-বাসনা—কাঁদিছে
তোমার গানের কায়াতে !
স্থলে, জলে, আর নীলে আজি তব,
শুনিতেছি বেণু, বাজে অভিনব,
তব প্রয়াণের ছায়া পথ ঘেরি—
নামে মধুময়-ছন্দা !
মোরা হেরি হায় ! অকালে লুটায়—
সাঁঝের রজনী-গন্ধা !

অসিতবাবুর বিশ্রাম গ্রহণ

শ্রীজগবন্ধু ভট্টাচার্য্য

তিনি যা' চেয়েছিলেন, এতদিনে তা' তিনি পেয়েছেন। আজ তিন বছর যাবত তিনি চেষ্টা কর্ছেন, কিন্তু কোম্পানী কিছুতেই তাঁকে বিশ্রাম দিবেনা। অথচ বিশ্রাম এতদিনে তাঁর পাওয়া উচিত ছিল—কেননা, শরীর তাঁর অক্ষম, মন তাঁর অসম্মত। দীর্ঘ আটাশ বছর যাবৎ সওদাগরী কোম্পানীতে তিনি চাকুরী করে' এসেছেন ২৮ টাকায় আরম্ভ, ২০৮ টাকাতে এবার শেষ হ'ল। এবার যে কোন স্থানে তাঁকে বিশ্রাম নিতে হবে। অবশ্য বড় কোন স্বাস্থ্যনিবাসে যাবার সঙ্গতি তাঁর নাই। পাড়াগাঁ গোছের ছোট একটা সহর, ছোট একখানা বাড়ি, চাকর এবং ঠাকুর·· মন্দ হয় না। ভোরবেলা খবরের কাগজ, বিকালে দাবার গুটি; মধ্যাহ্নে সুখকর নিদ্রা—আজ দশ বছর যাবৎ অসিতবাবু এমন একটা জীবনের কল্পনা করে' এসেছেন। কিন্তু কোম্পানী এমন একজন দক্ষ লোকের সেবা থেকে বঞ্চিত হতে চায় নাই।

সংসারে তেমন কোন বন্ধন তাঁর নাই। স্ত্রী বহুদিন হ'ল স্বর্গে গিয়াছেন। বড় ছেলে পাঞ্জাব সরকারে বড় চাকুরী করেন, দ্বিতীয় ছেলে মফঃস্বলের একটা কলেজে অধ্যাপক। বড় মেয়ে আছেন ওয়াল্টেয়ারে তাঁর স্বামীর কাছে—ছোট মেয়ে পাড়াগাঁয়ে স্বামীর ঘর কর্ছেন। মোটের উপর অসিতবাবু সুখী। নিশ্চিন্ত ত বটেই।

কোম্পানী থেকে হুকুম এল যেদিন, অসিতবাবু অস্থির হয়ে উঠ্লেন। ইচ্ছা হ'ল সবাইকে ডেকে বলেন, এবার তাঁর বিশ্রাম মিলেছে। কিন্তু ছেলেরা ত কেউ কাছে নাই, মেয়েরা ও সব দূরে।

বাসার চাকরটা কি যেন একটা কাজে যাচ্ছিল, অসিতবাবু ডাক্লেন—শোন্।

টেবিলটার সামনে এসে হরকুমার দাঁড়াল। অসিতবাবু তার দিকে চোখ না তুলেই বল্লেন: কি রান্না হচ্ছে আজ?

সে জবাব দিবার আগেই তিনি বলে চল্লেন: আজ থেকে রান্নাবাড়ার তত্ত্বতদ্বির সমস্তই আমি কর্ব—তোমাদের ও-সমস্ত ছাই-পাঁশ গিল্তে আমি আর পারিনা।

হরকুমার কথাটা শুনে নিয়ে বাইরে যাচ্ছিল, অসিতবাবু ডাক্লেন—শোন্, এদিকে আয়—

আবার সে সামনে এসে দাঁড়াল। অসিতবাবু বল্লেন: আমার সঙ্গে বাইরে যেতে রাজি আছিস্ ত? ছ'মাসের জন্য আমি কল্‌কাতার বাইরে যাচ্ছি।

হরকুমার রাজি হ'ল। যেখানেই হউক, বাবুর সঙ্গে সে যাবেই।

বিশ্রাম তাঁর দরকার, নিরবচ্ছিন্ন বিশ্রাম। অফিসের এ সকল বিরাট খাতাপত্র, টাকা পয়সা দু-আনা চার আনার হিসাব থেকে দূরে যে জীবন আছে অসিতবাবু তাই চান্। কাব্য তিনি কর্তে জানেনওনা—কর্বেনওনা। শুধু ইজিচেয়ারে বসে পড়ে থাকা, এক-আধপাতা ইংরাজী উপন্যাস পড়া বা না-পড়া—জীবনটাকে শুধু কেবলমাত্র স্পর্শ করে' যাওয়া। আর কিছু নয়—জীবনে সুখশান্তি, কলরব এবং কলহ, এতদিন তিনি যথেষ্টই আস্বাদ করেছেন। এবার জীবনে বেঁচে থাকা শুধু জানালার পাশে বসে' নীচের রাজপথে তিনি শোভাযাত্রা দেখ্বেন—কিন্তু নেবে আসবেন না কদাপি। নিরপেক্ষ এবং নির্ব্যক্তিক দর্শক তিনি জীবনের।

নীচের তলায় যখন হরকুমার জিনিষপত্র বেঁধে নিচ্ছে, উপর তলায় অসিতবাবু এই স্বপ্নই দেখ্ছেন।

অবশেষে একদিন বাক্স-প্যাটরা, কুকার এবং ষ্টোভ, ঠাকুর এবং চাকর নিয়ে অসিতবাবু এলেন ষ্টেসনে।—কোথাকার টিকিট কিনব?—জিজ্ঞাসা কর্ল হরকুমার।

অসিতবাবু যেন ঘুম থেকে জেগে উঠ্লেন। তাইত, টিকিট কিনতে হবে! একমুহূর্ত্ত তিনি যেন কি চিন্তা কর্লেন, তারপর বল্লেন:

—তাইত, টিকিট একটা কিন্তে হ'বে—আচ্ছা, পুরুলিয়ার টিকিটই কিনে নিয়ে এসো। কাছেই যাই এবার, পরে বরং আবার দূরে পাড়ি দোবো।

ট্রেণ চল্ছে। দুধারের গ্রাম, মাঠ, নদী এবং খাল বিলকে এক করে' দিয়ে ট্রেণ চল্ছে। বাইরের আকাশে কৃষ্ণাপঞ্চমীর চাঁদ তার নিঃসঙ্গ একাকীত্বে এতক্ষণে গ্রাম-রেখার উপরে উঠে এসেছে। অসিতবাবু সেদিকে তাকালেন। কি যেন তিনি ফেলে যাচ্ছেন—তিনি ঠিক মত বুঝতে পাচ্ছেন না। দুই পাশের বিলীয়মান রাজপথ, নিঃসঙ্গ কুটিরের শ্রেণী তাঁকে কত যেন করুণায় এবং মমতায় ফিরে ডাক্ছে। জীবনের এক অধ্যায় থেকে আর এক অধ্যায়ের যাত্রাপথ যে এত করুণা এবং বেদনার কাহিনী নিয়ে আস্তে পারে, এ কথা ত এতদিনে কেউ তাঁকে বলে দেয় নাই।

অসিতবাবু জানালাটা বন্ধ করে দিয়ে চোখ বুজে পড়ে রইলেন। হয়ত বা একটু ঘুমও এসেছিল—কিন্তু অকস্মাৎ তিনি জেগে উঠে হাঁক ডাক সুরু করে' দিলেন।

—হরকুমার, ঘরের দেয়াল থেকে অপিসের কর্ম্মচারীদের গ্রুপ ফটো ত আনা হয় নি! এ তোরা করেছিস কি? নাঃ নিজে খেয়াল না কর্লে কিছু 'কি আর হ'বার আছে? আরে হতভাগা, বিশ্রাম নিলেই কি সকলের সাথে সম্বন্ধেরও শেষ হয়ে গেল?

হরকুমার কিছু বল্লনা: চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। কী যে অদৃশ্য মায়াময় বাঁধন আজ অসিতবাবুকে বারবার পেছনের দিকে ডাক্ছে—তা' বুঝবার ক্ষমতা হরকুমারের নাই।

ট্রেণ চল্ছে। নিষ্ঠুর নিয়তির মত তার গতিবেগ—ঊর্দ্ধের আকাশ আর নিম্নের পৃথিবী এই যান্ত্রিক দানবের দাপটে শুধু বারবার কাঁপছে—কিন্তু প্রতিবাদ কর্তে পাচ্ছে না।

—সবাই মিলে ফটো তোলা হল', জীবনে এঁদের সাথে হয়ত আর দেখা হবেওনা—ক্ষতি ছিল কি একখানা ফটো নিয়ে আসতে? এ ত আর এমন কিছু বোঝাও নয়।

ভোরে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে ট্রেণ আবার এগিয়ে চল্ল।

নূতন যায়গায় এসে অসিতবাবুর প্রথম কাজ হ'ল, আত্মীয়, স্বজন, বন্ধু এবং বান্ধবদিগকে জানিয়ে দেওয়া যে এতদিনে তিনি বিশ্রাম পেয়েছেন। হাঁ; বাঙ্গালার বাইরে এ সহরটিতে বসে বাকি জীবনটা নির্লিপ্তভাবে কাটিয়ে দেওয়াই যে তাঁর সব চাইতে বড় সাধ একথাও কারু কাছে তিনি গোপন রাখলেন না।

সব যায়গা হতেই এক জবাব এল—"আমাদের এখানেও ত আপনি বিশ্রাম কর্তে পারতেন"—

কিন্তু অসিতবাবু এত সহজে ভুলবার পাত্র নন্। তিনি কি জানেন না, ছেলে মেয়ে বা যে কোন বন্ধুর বাড়িতেই তিনি যান্ না কেন, দুদিন পরে সে সংসারের সকল ঝক্কি তাঁর ঘাড়ে এসে পড়বেই।

বড় ছেলের বৌকে আদর করে তিনি লিখলেন—যাই বল না কেন, তোমাদের প্রলোভনে আমি আর ভুলব না।

বিশ্রাম তিনি চান। এতদিনে কি সেটা তাঁর পাওনা হয় নাই।

পুরুলিয়ার তাঁদের এ বাসাটা সহর থেকে খানিকটা দূরে—আর একটু দূরে মাঠের ওধারে একটা পাহাড় দেখা যায়। বাসার পাশ দিয়ে কাঁসাই নদীর শুকনো বালুচর—আর বামদিকে প্রশস্ত রাজপথ। নির্জ্জন দ্বিপ্রহরে কোথাও কেউ নাই। অসিতবাবু বারান্দায় এসে বসেন একটু, বেশ লাগে তাঁর। পাহাড়ের দিকে মুখোমুখি বসে তার প্রাণ যেন কত কথা বলে উঠে—! কে বলে পাহাড়ের প্রাণ নাই! কে বলে পাহাড় কথা বলতে পারে না?

এ পৃথিবীতে যা যত নীরব তাতেই বেশী কথা কয়। তাই না নির্জ্জন, নিরুপদ্রব নিঃসঙ্গ দ্বিপ্রহরের জন্ম তিনি লালায়িত হয়ে থাকেন; তাই না দিবাবসানে আকাশের এক একটি নক্ষত্রের সঙ্গে তাঁর প্রাণেও এক একটি ফুল ফুটে উঠে।

কিন্তু অসিতবাবু মোটেই কবি নন্। সারাজীবন, সিকি দুয়ানি, ক্যাস আর চেক্ নিয়ে কারবার করে তিনি কি অবশেষে কবি হয়ে যাবেন?

একদিন বার থেকে ঘুরে এসে বারান্দায় ইজিচেয়ারে ঢলে পড়লেন তিনি—আর অশান্তভাবে হাঁক ডাক সুরু করে দিলেন।

হরকুমার সঙ্কুচিতভাবে পাশে এসে দাঁড়াল।

—যাও, এখ্খুনি কলকাতায় চিঠি লিখে দাও, আমার হোমিওপ্যাথী বাক্স, বই সমস্ত যেন অবিলম্বে পাঠিয়ে দেয়।

অকস্মাৎ বাবুর যে কেন এ সকল জিনিষের দরকার হয়ে উঠল, হরকুমার বুঝল না। তথাপি "আচ্ছা দেব" বলে সে বেরিয়ে গেল। অসিতবাবু হঠাৎ চেয়ার থেকে উঠে পড়লেন। বারান্দায় পায়চারী কর্তে কর্তে বল্লেন, "না, এ আমি কিছুতেই হ'তে দেব না, বিনা ওষুধে, বিনা চিকিৎসায় মৃত্যু আমার চোখের সামনে কিছুতেই হতে পারে না।

দিন চারেক পরে ওষুধপত্র এসে হাজির হ'ল। অসিতবাবু একটা প্রকাণ্ড কোট সেদিন গায়ে দিলেন, কানে নিলেন ষ্টেথিস্কোপ। হরকুমারকে ডেকে বল্লেন: দেখ্ত, কেমন মানায় আমাকে—ইচ্ছে কর্লে আমি ডাক্তারও হতে পার্তাম—কি বলতে চাস তুই?

হরকুমারের উত্তর আসবার পূর্ব্বেই তিনি পথে বেরিয়ে পড়লেন। তারপর কোন দিক দিয়ে যে তিনি গাঁয়ের পথে এগিয়ে গেলেন, ঠিক বুঝা গেল না।

সারাদিন অসিতবাবুর এম্নিই চল্ছে। ওষুধপত্র, রোগী এ সকল নিয়েই তাঁর কারবার।

একদিন দুপুরে বাড়ি ফিরতেই হরকুমার চেয়ারখানা এগিয়ে দিয়ে বল্ল: ছোট বৌমা লিখেছেন, তাঁদের পাড়াগায়ের বাড়িতে···। অসিতবাবু উচ্ছ্বসিত হাসিতে ঢলে পড়লেন:

—আরে পাগল, আমি যাব কোথায়? সারাজীবনের পরে এই একটু বিশ্রাম আমি পেলাম, আর তা' আমি নষ্ট কর্ব এ সকল ছেলেপিলের কাছে গিয়ে? তুই জানিস না হরকুমার। একবার যদি আমি সেখানে যাই, তবে আর রক্ষে আছে? কোথায় থাকবে আমার বিশ্রাম?

দুদিন পরে একদিন সত্য সত্যই ছোট বৌমা এসে হাজির হলো। কিন্তু অসিতবাবু তখন হোমিওপ্যাথীর বাক্স নিয়ে এ গ্রাম থেকে ও গ্রামে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। দূর থেকে বৌমাকে ঘরের বারান্দায় দেখে অসিতবাবু বল্লেন বেশ একটু কড়া মেজাজেই—কেন এসেছ এখানে? যা' গরম—না, তুমি বিকালের ট্রেণেই চলে যাও বৌমা—।

বৌমা কোন জবাব না দিয়ে প্রণাম কর্তে গেলেন; অসিতবাবু আগেকার কথার জের টেনে বল্লেন, এ বিদেশে বিভূঁয়ে একটা অসুখ বিসুখ ডেকে এনে আমাকে বিপদে ফেলো না বৌমা। হঠাৎ দ্বিগুণভাবে চিৎকার ক'রে উঠে তিনি বলতে গেলেন: আমি বিশ্রাম চাই বৌমা, আমাকে কি তোমরা তাও দেবে না?

সুপ্রভা মানে ছোট বৌমা, এর কিছু জবাব দিলেন না—। কিন্তু এই প্রকাণ্ড কোট—কোটের পকেটে সতের রকমের ওষুধ, গলায় ষ্টেথিস্কোপ, পায়ে একহাঁটু ধুলো বালি, এ সমস্ত দেখে সে সত্য সত্যই কৌতুক বোধ কর্ছিল।

সেদিন বিকালের দিকে অসিতবাবুর আর বেরোন হল না। সুপ্রভার শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ কর্বার সাহস তাঁর মোটেই ছিল না। একখানা খবরের কাগজ হাতে নিয়ে এসে সে বল্লে: একটা লেখা পড়ে শুনাচ্ছি আপনাকে, বেশ লিখেছে কিন্তু—।

এর পর তাদের অনেক কথাই হ'ল। প্রাসঙ্গিক এবং অপ্রাসঙ্গিক বহু বিষয়ের অবতারণা করে সুপ্রভা আবহাওয়া অনেকটা হাল্কা করে নিল। তারপর অনায়াসেই সে বলে ফেল্ল: আমাকে কি এম্নিই ফিরে যেতে হবে? আপনার বিশ্রাম চাই—বেশ ত, আমাদের ওখানেই চলুন না কেন?

অসিতবাবু আগেকার মতই কথাগুলি উড়িয়ে দিলেন। বল্লেন: পাগল! আমি যাব কোথায়? কেমন নির্জ্জন, নিঃসঙ্গ একটা জীবন বেছে নিয়েছি—তা থেকে আবার যাব কোথায়?

সুপ্রভা একথায় কি জবাব দিলে বুঝা গেল না। কিন্তু অসিতবাবু নিজের উক্তিগুলিই মনে মনে আবার যাচাই করে দেখলেন। কোম্পানী আজ তাকে বিশ্রাম দিয়েছে—কিন্তু তা কি

ছেলেপিলে, নাতি-নাতনির তত্ত্ব তদ্বির কর্বার জন্যই ? না, অর্থাৎ সীমাতীত বিশ্রাম—অবিশ্রাম বিশ্রাম চাই তাঁর।

রাত প্রায় দশটা হবে। সকল ঘরেরই আলো নিবে গেছে। এঘরে বসে সুপ্রভার কাণে না পৌঁছায় এমনই ভাবে মৃদুকণ্ঠে অসিতবাবু হরকুমারকে জিজ্ঞাসা কর্লেন: হ্যাঁরে, ওষুধ নিতে কেউ এসেছিল কি ?

বাড়ির সামনে ছোট ফুলের বাগান। অসিতবাবুর নিজ হাতে তৈরী। সে বাগানেরই ছোট একটা সরুপথে এসে সুপ্রভাকে বল্লেন: জীবনে কাজ করাই কি কেবল বড় কথা ? কাজ না করা এবং সময় বুঝে কাজে ছেদ দেওয়া, ঠিক সমানই বড় কথা।

সারা দ্বিপ্রহর অসিতবাবু যে কোথায় ছিলেন, জানবার উপায় নাই। এমন কি সন্ধ্যেবেলা তাঁকে বাড়ির দিকে আসতে দেখে কারুর সাহস হল না যে এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা করে। অসিতবাবু নিজেই হাঁক ডাক দিয়ে সবাইকে অস্থির করে তুল্লেন।

রামরতন এসে পাশে দাঁড়াতেই তিনি বেশ কড়া সুরে হুকুম দিলেন: এখ্খুনি বারান্দা থেকে চেয়ার টেবিল সমস্ত সরিয়ে ফেলো—মাদুর বিছিয়ে দাও—কাল ভোরবেলা থেকে ইস্কুল বসবে এখানে—যাও—দাঁড়িয়ে রইলে কেন ? শুনতে পাওনি ?

রামরতনের সাহস ছিল না প্রতিবাদ করে—কিন্তু সুপ্রভা সামনে এসে দাঁড়াল। বল্ল: এই দুপুরের রোদে বিদেশে বিভূঁয়ে অসুখ বিসুখ করে যদি—।

অসিতবাবু জানিতেন, এই শাসনের বিরুদ্ধে তিনি একান্ত ভাবে অসহায়। বল্লেন: যা' বলবার বৌমা, পরে বলো—এখন ঠাণ্ডা সরবত নিয়ে এসো ত এক গ্লাস—

সুপ্রভা আর বিলম্ব মাত্র না করে' চলে গেল। কিন্তু সন্ধ্যার পর আবার স্কুলের কথা উঠতেই অসিতবাবু বল্লেন: স্থির করেছিলে বৌমা খুব শাসন কর্বে আমাকে, চোখ রাঙিয়ে স্কুল আমার বন্ধ করে দিবে—জোর করে আমার ষ্টেথিস্কোপ লুকিয়ে রাখবে—কিন্তু সব যায়গাতেই ঠকে গেলে; তোমায় শাসন কর্বার লোক যেমন দরকার হয়, তেমন শাসন মেনে চল্বার লোকেরও দরকার। নইলে সমস্তটা কি ওলট পালট হয়ে যায় না ?

ভোরবেলা স্কুল, দ্বিপ্রহরে বিশ্রাম এবং বিকেলের দিকে দূরের গ্রামে ডাক্তারী—অসিতবাবুর ইহাই প্রতিদিনের কাজ। সন্ধ্যার পরে সুপ্রভার সহিত বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা।

প্রতিদিন একই রুটিন—কোন ব্যতিক্রম নাই। কিন্তু সেদিন পাড়া থেকে ঘুরে আসতেই তিনি একটু চমকে উঠলেন। বারান্দায় জিনিষপত্র সমস্ত বাঁধা হয়েছে দেখে তিনি একটু বেদনাও বোধ কর্লেন। সুপ্রভা চলে যাচ্ছে। কথাটা মনে কর্তেও যেন কেমন একটা করুণ বেদনার সঞ্চার হয়। কিন্তু তাকে যেতেই হ'বে—ছোট ছেলেটার পেটের ব্যারাম যেন কিছুতেই সারছে না। তাই সুপ্রভাকে কাল ভোরবেলা যাত্রা কর্তেই হবে।

সন্ধ্যার পরে অসিতবাবু উঠে এলেন ছাদের উপরে, তাকালেন আকাশের দিকে। সব দিকে, পৃথিবী, আকাশ এবং অরণ্যের সর্ব্বত্র কেমন যেন একটা সকরুণ বিদায় যাত্রা! মৃত্যুর একটা সঙ্গীত যেন সকল জীবন এবং সকল সংসারকে অতিক্রম করে কোথায় কোন্ মহাশূন্যে ঢ'লে পড়ছে। উপায় নাই অসিতবাবুর এদিকে ফিরে তাকান্। কিন্তু হয়ত এ মুহূর্ত্তেই উর্দ্ধের আকাশে যখন মৃত্যু—নিম্নের মৃত্তিকায় তৃণাঙ্কুর উঠে আসছে·· জীবন এবং মৃত্যু···বিদায় এবং অভ্যুদয়······। তারা একে অন্যকে অবিচ্ছেদ্য আন্তরিকতায় জড়িয়ে ধরে রেখেছে।

অসিতবাবু দ্রুত পদক্ষেপে নিচে নেমে এলেন। সোজা সুপ্রভার ঘরে গিয়ে প্রবেশ করে তার মুখের পানে তাকিয়ে স্নেহার্দ্র কারুণ্যে জিজ্ঞাসা কর্লেন: বৌমা, কাল না গেলেই কি তোমার চলেনা ?

কিন্তু সুপ্রভা তখন গভীর নিদ্রায় অচেতন রয়েছেন।

পরদিন দুয়ারে গাড়ি এসে দাঁড়িয়েছে। সুপ্রভা যাবে। কিন্তু অসিতবাবু কোথায় ? অতি প্রত্যূষে তিনি যে কোথায় বেরিয়ে গেছেন, কেউ তা জানেনা। কিন্তু গাড়িরও আর বিলম্ব নাই। অগত্যা অসিতবাবুর সঙ্গে দেখা না করেই সুপ্রভাকে যাত্রা কর্তে হ'ল। গাড়ি প্রধান ফটক থেকে বেরিয়ে বাগানকে বাম পাশে রেখে বড় রাস্তা ধরবে—কিন্তু গোলাপ ঝাড়ের মধ্যে, একি অসিতবাবু নয় ?

সুপ্রভা গাড়ী থেকে নেমে এসে অসিতবাবুর সামনে দাঁড়াল। বল্লে: আমাকে এম্নি ফিরে যেতে হবে, এ আশঙ্কা করি নাই কোন দিন।

অসিতবাবু কথাটাকে এড়িয়ে গিয়ে বল্লেন: তোমার গাড়ি বোধ হয় আটটা পাঁচ মিনিটে—টাইম ও ত আর বেশী নাই। সুপ্রভা প্রণাম করে' উঠে দাঁড়াল। বল্লে: আমি দু'দিন পরেই আসব আবার।

অসিতবাবু বাধা দিয়ে বল্লেন: না, ও কর্ম্মটা করো না বৌমা, বর্ষার জল পড়তে আরম্ভ কর্লে এখানকার স্বাস্থ্য খারাপ হয়ে পড়বে, সে সময় আবার এসে আমাকে বিপদে ফেলো না। সুপ্রভা আবার কি যেন বলতে যাচ্ছিল—কিন্তু তা ফিরিয়ে নিয়ে নিঃশব্দে গাড়িতে এসে উঠল। তার দিকে লক্ষ্য করে' অসিতবাবু সকাতরে বল্লেন: ক্ষুধার্ত্তকে খাদ্য দেওয়া পুণ্যের কাজ, সকল শাস্ত্রেই ত তা' লেখা আছে—কিন্তু যে' বিশ্রাম চায়, তাকে বিশ্রাম না দেওয়া কি পাপ নয় মা ?

গাড়ি বড় রাস্তায় এসে বিদ্যুৎগতিতে এগিয়ে চল্ল। অসিতবাবুর ছোট বাড়ি, তার ছোট বাগানকে দৃষ্টির সীমানা থেকে টেনে হেঁচড়ে নিয়ে গাড়ি অদৃশ্য হয়ে গেল। অসিতবাবু অনেকক্ষণ সেদিকে তাকিয়ে রইলেন···যুগে যুগে এমনই কত বিদায় যাত্রার মধ্য দিয়ে জীবনের কত সমারোহ।

কিন্তু দুইটি গোলাপের কুঁড়ি আজ আকাশের দিকে তাকিয়েছে। হাওয়ার মধ্যে দুইটি রক্ত বিন্দু—মানুষের বুকে দুটি আশা। কি-ভাবে যে কি হয়, রহস্যময় মানব-জীবনে দু'টি ফুল—শুধু দু'টি ফুল হয়েই থাকেনা কেন ?

অসিতবাবু আর একটু নুয়ে পড়ে পাপড়িগুলিকে আদর কর্তে লাগলেন।

শেষ

রবীন্দ্রনাথ

শ্রীচিত্রিতা গুপ্ত

চার পাচ বছর আগেকার একটি শান্ত নির্মল সকাল বেলার কথা মনে পড়ছে। মোটা একটা আলখাল্লা গায়ে দিয়ে কবি বসে আছেন আমাদের ঘরের বারান্দায় একটা বড় সোফায়। পায়ের ওপর শাল চাপা দেওয়া—কী গম্ভীর ধ্যানমগ্ন মূর্ত্তি। ভোরের আলো তাঁর পায়ের ওপর, ধূসর রঙের জামার ওপর, রেশমের মত নরম সাদা চুলগুলির উপর এসে পড়েছে। চোখ দুটী ঈষৎ খোলা। কী আশ্চর্য্য সুন্দর—ঠিক এই প্রভাতেরই মত। প্রত্যহ সূর্য্যোদয়ের আগে তিনি মুখ হাত ধুয়ে প্রস্তুত হয়ে থাকতেন—তাঁর "আকাশের মিতাকে" অভ্যর্থনা করবার জন্তে। রোগের আক্রমণে অসমর্থ না হওয়া পর্য্যন্ত কখনো এ নিয়ম ভঙ্গ হয় নি। কী আশ্চর্য্য চুপ করে থাকতেন। কোন দিকেই লক্ষ্য রইত না। তখন বর্ষা সুরু হয়েছে—পাহাড়ের অসংখ্য পোকা-মাকড়ে বাড়ি ভর্ত্তি—কতদিন দেখেছি পিঠের ওপর ৪।৫টা বড় বড় পাহাড়ে কেন্নুই ঘুরে বেড়াচ্ছে। কোনোটা বা মাথায় উঠতে উদ্যত। একবার হাত দিয়েও সরিয়ে দিচ্ছেন না। ছোট বেলায় কল্পনায় বাল্মীকি মুনির যে ছবি এঁকেছি ঠিক যেন সেই রকম।

রোজই প্রায় ভোরবেলা তাঁর পায়ের কাছে একটা মোড়া নিয়ে বসে থাকতাম। কোন দিন বা দেখতে পেয়ে বলতেন—'আয় বোস্'—কোন দিন নজরেই পড়তাম না। তাঁর সরস মধুর কথাবার্ত্তা ও পরিহাস-প্রিয়তার কথা সকলেই জানেন। তাঁর কাছে আমাদের যা ইচ্ছা বলতে কোন বাধা ছিল না—কারণ তিনি সঙ্কোচের অবকাশ দিতেন না—এতই সহজে মিশে যেতেন সকলের সঙ্গে। তবু সেই সময় সমস্ত শরীর-মনের এই চেষ্টা ছিল, যেন আমার একটা নিঃশ্বাসও জোরে না পড়ে।

সেদিন কিন্তু কী হল, অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে প্রশ্ন করলুম—আপনি এত কী ভাবেন? আমার মুখের দিকে তাকিয়ে তাঁর সেই আশ্চর্য্য সুন্দর হাসিটা একটু হেসে চুপ করে রইলেন। তাহাই যথেষ্ট হোত। তারও চেয়ে বেশী মর্য্যাদা আমাকে দেবার কোনও প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু তিনি ত কাউকে ছোট বলে অবজ্ঞা করতেন না। এমন ভাবে আমাদেরও সঙ্গে আলোচনা করতেন যেন আমরা তাঁরই সমপর্য্যায়ের লোক—তাঁরই মত বিদ্যাবুদ্ধি। এতে তিনি তাঁর আসন থেকে এক কণাও নামতেন না, আমাদের তুলে ধরতেন উর্দ্ধে।

একটু চুপ করে দূরে পাইন বনের দিকে তাকিয়ে বললেন—"আমি কী ভাবি? আমার মধ্যে দুটো আমি আছে—সেই দুটোকে আমি মেলাতে চাই"।

বল্লাম—সে কী রকম?

"তোরা কী পারবি এখনি, এখনও যে বড় চঞ্চল—মনটা লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়ায়।"

তাঁর সেই হাসি আর হাতনেড়ে দেখান স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি চোখের সামনে। বল্লেন, "আমার একটা আমি আছে যে খায় দায় গল্প করে, তোদের সঙ্গে হাসিঠাট্টা করে—আর একটা আমি আছে এই সকলকে অতিক্রম করে। কোন দূরের সঙ্গীতে সে মেতেছে—অজানা সমুদ্রের আহ্বান সে শুনেছে—ওগো সুদূর বিপুল সুদূর, তুমি যে বাজাও ব্যাকুল বাঁশরী। সুদূরের বাঁশী বেজেছে আমার অন্তরে। আমার একটা আমি সে বাঁশীতে পাগল—সে ছুটে যেতে চায় আমার আর একটা আমির প্রাত্যহিক বন্ধন ছাড়িয়ে অনেক দূরে। আমি এই দুটো আমিকে মেলাতে চাই একই গানের সুরে। এই আমার জীবনের সাধনা।" বলেই আবার অন্যমনস্ক হয়ে গেলেন, গুন গুন করে গাইলেন বাউলের একটা লাইন—

"মনের মানুষ মনের মাঝে কর অন্বেষণ"।

"য আত্মা অপহতপাপ্মা বিজরো বিমৃত্যুর্বিশোকঃবিজিঘৎ সোঽপিপাসঃ সত্যকামঃ সত্যসংকল্পঃ। সোঽন্বেষ্টব্য স বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ।" এই মানুষকেই অন্বেষণ করে এসেছেন, এরই সঙ্গে মিলতে চেয়েছেন চিরদিন। এই মিলনের বেদনা ও আনন্দ, তপস্যা ও তপঃফল অসীম সৌন্দর্য্যে একসঙ্গে মিশে আছে তার কাব্যে, শিল্পে, সঙ্গীতে তাঁর পরিপূর্ণ বিকশিত জীবনের আনন্দে। আমার মধ্যে যে আত্মা আছেন জরামৃত্যু ক্ষুধাতৃষ্ণার অতীত তাঁকে জানতে হবে—আমারই অন্তরে। আমার ক্ষুদ্র আমি, আমার খণ্ড আমি, যা "অহং"এর বেড়া দিয়ে ঘেরা, আমার বৃহৎ আমিকে, মুক্ত আমিকে, মহা-মানবের আমিকে জানবে। তাঁকে জানা মানেই তাঁতে পরিণত হওয়া। নদী যখন সমুদ্রকে জানে তখন সমুদ্রই সে হয়। তার জানা আর হওয়ার মধ্যে কোন তফাৎ থাকে না। "সোঽহম্" বা I & my Father are one and the same. এই কথা কেবল কৃষ্ণ বা খৃষ্টের পক্ষেই সত্য নয়। এ সমস্ত মানুষেরই কথা। আমিই সেই—আমার মধ্যেই আমার পিতা আছেন—সমুদ্র যেমন আছে নদীর মধ্যে। কবি বহু যায়গায় এই উপমাটা ব্যবহার করেছেন। সেই বৃহৎ আমির আহ্বানকে বলেছেন মহাসমুদ্রের ডাক।—এর প্রথম পরিচয় পাই "প্রভাতসঙ্গীতে"—যখন তাঁর বয়স ১৮ কিম্বা ১৯—

"ডাকে যেন ডাকে যেন সিন্ধু মোরে ডাকে যেন
ওরে চারিদিকে মোর এ কী কারাগার হেন—
ভাঙ ভাঙ ভাঙ কারা আঘাতে আঘাত কর—
ওরে আজ কী গান গেয়েছে পাখী এসেছে রবির কর"।

এই কারাগার—নিজেরি কারাগার। নিজের অহঙ্কার, নিজের শত তুচ্ছ প্রবৃত্তির বেড়া দিয়ে ঘেরা। নিজের মধ্যেই বন্দী। এই আত্মকারাগার ভেঙে ফেলে মহাসাগরের দিকে অর্থাৎ মহামানবাত্মায় মিশে যেতে চায় প্রাণ। জীবনস্মৃতি ও অনেক যায়গায় সেই দিনটার কথা বলেছেন—যেদিন "নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ" লেখা হয়—তার দু একদিন আগে—ভোরবেলা বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখলেন—কলকাতার অসংখ্য বাড়ির ওপর থেকে সূর্য্যোদয়। আগে ও পরে আরও বহুবার সূর্য্যোদয় দেখেছেন—কিন্তু সেদিন আলোয় ভরে উঠল সমস্ত মন—ঐ প্রভাতেরই মত। এমন অদ্ভুত আশ্চর্য্য আনন্দ লাভ করলেন—যা জীবনে বোধ হয় আর কচিৎ কখন পেয়েছেন। সেদিন রাস্তা দিয়ে যে মুটে দুটো যাচ্ছিল পরস্পরের কাঁধে হাত দিয়ে—তাদের দেখে অনির্ব্বচনীয় আনন্দে মন ভরে উঠল। স্বাতন্ত্র্যের আবরণ খসে পড়ল।—মুক্ত দৃষ্টিতে মানবের অন্তরাত্মাকে দেখলেন আনন্দে বিলীন।

—"হৃদয় আজি মোর কেমনে গেল খুলি
জগৎ আসি সেথা করিছে কোলাকুলি।"

বোধ হয় এইটেই তাঁর জীবনের প্রথম আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা। প্রভাত সঙ্গীতে ভাষার লাবণ্য তত নেই হয়ত—কাব্যের টেক্‌নিকেরও অভাব আছে—কিন্তু অন্তরের সত্যে তা পরিপূর্ণ। সেই প্রথম নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ হল—তারপরে তাঁর জীবন ঝরণা থেকে নদীতে পরিণত হয়েছে—কত বিচিত্র অভিজ্ঞতা ও নব নব বেদনার মধ্য দিয়ে মহাসাগরে এসে মিলেছে তার পরিচয় তাঁর সমস্ত কাব্যে। তাঁর জীবননদী সেই প্রভাতসঙ্গীতের কাল থেকে মৃত্যুর দিনটী পর্য্যন্ত মহাসাগরের দিকে একাগ্র আন্তরিক আকাঙ্ক্ষায় ছুটে চলেছিল। আমার অভিসারে মন চলেছে ছুটে—

"দুর্দ্দিনের অশ্রুজলধারা মস্তকে পড়িবে ঝরি
তারি মাঝে যাব অভিসারে,
তার কাছে, জীবন সর্ব্বস্বধন অর্পিয়াছি যারে।
কে সে? জানি না কে চিনি নাই তারে—
শুধু এইটুকু জানি, তারি লাগি রাত্রি অন্ধকারে,
চলেছে মানবযাত্রী যুগ হতে যুগান্তের পানে।
শুধু জানি, যে শুনেছে কাণে, তাহার আহ্বান গীত,
ছুটেছে সে নির্ভীক পরাণে সঙ্কট আবর্ত্ত মাঝে
দিয়েছে সে বিশ্ববিসর্জ্জন
নির্য্যাতন লয়েছে সে বক্ষপাতি
মৃত্যুর গর্জ্জন শুনেছে সে সঙ্গীতের মত।

*   *   *   *   *

তারি পদে মানী সঁপিয়াছে মান
ধনী সঁপিয়াছে ধন—বীর সঁপিয়াছে আত্মপ্রাণ।
তাহারি উদ্দেশে কবি বিরচিয়া লক্ষ লক্ষ গান—
ছড়াইছে দেশে দেশে॥"

অভিসারিকার বাসনা সফল হয়েছে। জীবনের মধ্যে জীবনদেবতার আসন পেতেছেন, আসন সীমাবদ্ধ অন্তরে, সার্বভৌমিক মানবাত্মার আনন্দ উপলব্ধি করেছেন—

"ওগো অন্তরতম
মিটেছে কী তব সকল তিয়াস
আসি অন্তরে মম॥"

আত্মার সঙ্গে এই যে মিলন একে তিনি বিবাহের মতই একান্ত পরিপূর্ণ করে দেখেছেন। আমাদের মন উমার মত বহু তপস্যায় বহু আরাধনায় শাশ্বত কল্যাণ শিবে মিলিত হয়। কিন্তু এই তপস্যা তাঁর সঙ্গে মিলবারই তপস্যা, আপনাকে বিলুপ্ত করবার তপস্যা নয়। আমার মন, আমার কল্পনা, আমার অনুভূতি, আমার সীমার মধ্যেই তাঁকে জানবে, তাঁকে দেখবে, তাতে আনন্দ পাবে।

"সীমার মাঝে অসীম তুমি বাজাও আপন সুর
আমার মধ্যে তোমার প্রকাশ তাই এত মধুর॥"

কী রকমভাবে আমার মধ্যে তাঁর প্রকাশ হবে? যখন প্রিয়জনের প্রেমে আমরা সব ত্যাগ করব, যখন নিজের জীবন বিপন্ন করে পরের জীবন বাঁচাব, যখন "দূরকে করিব নিকট বন্ধু পরকে করিব ভাই", তখনি আমার মধ্যে মানবাত্মা প্রকাশিত হবেন। কারণ তখন মানবের কল্যাণে আমরা জীবস্বভাবেরও প্রতিকূলে যাব—নিজের ক্ষতি করব। তখনি জীবাত্মার বিশ্বাত্মা বিকশিত হবেন। যাকে ভালবাসি তাকে সুখী ক'রে, তার আনন্দ-মুখখানিতে উজ্জ্বলাত্মার পরমানন্দময় রূপটাই প্রতিফলিত হতে দেখি।

"তারি বিশ্ববিজয়িনী পরিপূর্ণা প্রেমমূর্ত্তিখানি
বিকাশে পরমক্ষণে প্রিয়জনমুখে।"

কারণ, তখনি আমি আমার স্বার্থময় ক্ষুদ্র আমির বন্ধন অতিক্রম করে অপরের মধ্যেও আমার সত্ত্বাকে উপলব্ধি করি আনন্দে।

কবির মতে এর জন্যে অরণ্যে গুহায় যাবার দরকার নেই। আপনাকে সর্ব্বপ্রকারে নিষ্পিষ্ট করবার কোন প্রয়োজন নেই। আমরা নিজের ক্ষেত্রে, নিজের অনুভূতিতে, নিজের কল্পনায়, যদি আমাদের ক্ষুদ্রতা, তুচ্ছতা, লোভ, অহঙ্কারের বেড়াগুলি ভেঙে ফেলি, মোহের আবরণ খসিয়ে ফেলি, তাহলেই স্বাধীন মুক্ত আত্মার স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারি।

"আয়রে ঝঞ্ঝা পরাণ বঁধুর আবরণরাশি করিয়া দে দূর
করি লুণ্ঠন অবগুণ্ঠন বসন খোল।
প্রাণেতে আমাতে মুখোমুখি আজ চিনি লব দোঁহে
ছাড়ি ভয় লাজ।
বক্ষে বক্ষে পরশিব দোঁহে ভাবে বিভোল
স্বপ্ন টুটিয়া বাহিরিছে আজ দুটো পাগল।

আমার চারিদিকের সব সৌন্দর্য্য, সব আনন্দের মধ্যে আত্মার আনন্দ বিকশিত থাকবে অর্থাৎ যখনি যে বিষয়ে আমি অন্তরে সত্য আনন্দ লাভ করব তখনি সেইখানে আত্মার আনন্দও মিশে থাকবে। শাশ্বত আনন্দেই আমার আনন্দ। অথবা আমার আনন্দই শাশ্বত আনন্দ।

"যে কিছু আনন্দ আছে দৃশ্যে, গন্ধে, গানে,
তোমার আনন্দ রবে তার মাঝখানে॥"

জীবন দেবতাকে গ্রহণ করব আমারি জীবনের আনন্দে। এই জীবন দেবতাই বাউলের মনের মানুষ। এই দেবতার অভিসারে কবিচিত্ত ছুটে চলেছিল সেই তাঁর প্রথম যৌবনের দিনটা থেকে মৃত্যুর দিন পর্য্যন্ত। কখনও তাঁকে একান্ত ভাবে আপন অন্তরের স্বামী বলে জেনেছেন—বলেছেন—

লেগেছে কি ভাল হে জীবননাথ
আমার রজনী আমার প্রভাত
আমার নর্ম, আমার কর্ম, তোমার বিজন বাসে।"

সেই আনন্দস্বরূপ অভিজ্ঞতাটা কতবার হারিয়ে ফেলেছেন সংসারের আবর্তে। যখনি বিরাট সত্ত্বা থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখেছেন—নিজের সুখদুঃখকেই একান্ত করে দেখেছেন, তখনি জীবন দেবতাকে হারিয়ে ফেলেছেন। তখন বিরহে মন ব্যাকুল হয়েছে। ব্যথিত কণ্ঠে বলেছেন—

"যে সুরে বাঁধিলে এ বীণার তার
নামিয়া নামিয়া গেছে বার বার
হে কবি, তোমার রচিত রাগিনী আমি কি গাহিতে পারি!"

কিন্তু যতবারই সুর নেমে নেমে যাক্ আবার তিনি উঁচু করে বেঁধেছেন বীণার তার। তখন শত মিথ্যা, শত অন্ধকারের মধ্যেও দেখতে পেয়েছেন চিরজ্যোতি।—

"দুঃখ পেয়েছি, দৈন্য ঘিরেছে—
অশ্লীল দিনে রাতে
দেখেছি কুশ্রীতারে—
তবুত বধির করেনি শ্রবণ কভু
বেসুর ছাপায়ে সুর কে দিয়েছে আনি—
কলুষ পরুষ ঝঞ্ঝায় শুনি তবু চিরদিবসের
শান্ত শিবের বাণী।

এই শান্ত শিবকেই কখনও বলেছেন—জীবন দেবতা, কখনো মহাসমুদ্র, কখনো মহামানব। মহামানব অর্থাৎ যিনি ব্যক্তিগত মানবকে অতিক্রম করে "সদা জনানাং—হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ"। তিনি চিরকালের সকল মানুষের মানুষ। তাঁর প্রকাশ সকল মানুষের কল্যাণে—তাঁরই আবির্ভাবে মানুষের চিন্তায়, কর্ম্মে, জ্ঞানে বিশ্বভৌমিকতা দেখা যায়। তাঁর ছায়া দেখতে পাই, কবির কাব্যে, শিল্পীর শিল্পে, বীরের ত্যাগে ও প্রিয়ার প্রেমে।

এই মহামানবের আহ্বানে প্রথম যৌবনে একদিন সুখ কল্পনা ও আলস্য-জড়িত চিন্তা ত্যাগ করে পথে বেরিয়েছিলেন—তারপরে দীর্ঘজীবনের কত বিচিত্র কর্ম্মে ও সাধনায় নিজেকে অনবরত তাঁর দিকে প্রবাহিত রেখে আজ তাই তাতেই বিলীন সত্ত্বা লাভ করেছেন—তাঁর মধ্যে এই কবিতা আজ সম্পূর্ণ সার্থক—

শুধু জানি সে বিশ্বপ্রিয়ার প্রেমে
ক্ষুদ্রতারে দিয়া বলিদান—
বর্জ্জিতে হইবে দূরে জীবনের সর্ব্ব অসম্মান।
সম্মুখে দাঁড়াতে হবে উন্নত মস্তক উর্দ্ধে তুলি
যে মস্তকে ভয় লেখে নাই লেখা, দাসত্বের ধূলি
আঁকে নাই কলঙ্ক তিলক।
তাহারে অন্তরে রাখি জীবন-কণ্টক পথে
যেতে হবে নীরবে একাকী—দুঃখে সুখে ধৈর্য্য ধরি,
বিরলে মুছিয়া অশ্রুআঁখি—
প্রতিদিবসের কর্ম্মে প্রতিদিন নিরলস থাকি
সুখী করি সর্ব্বজনে।
তারপরে দীর্ঘপথশেষে জীবযাত্রা অবশেষে
উত্তরিব একদিন শ্রান্তিহরা শান্তির উদ্দেশে
প্রসন্ন বদনে মন্দ হেসে পরাবে মহিমালক্ষ্মী
ভক্তকণ্ঠে বরমাল্যখানি।
করপদ্ম পরশনে শান্ত হবে সর্ব দুঃখগ্লানি—
হয় ত ঘুচিবে দুঃখনিশা—
তৃপ্ত হবে এক প্রেমে জীবনের সর্ব্বপ্রেমতৃষা।

বেতালা

শ্রীপ্রবোধ ঘোষ

দোতলায় পাশাপাশি দু'টি ঘর নিয়ে আমার বাসা। ঘরের সামনে চওড়া টানা বারান্দা যার রাস্তার দিকের ধারে ওপরে ওঠবার সিঁড়ি আর তার পাশেই স্নানের ঘর। তেতলার ছাদের ওপরে টিনের ছাওয়া একটা ঘর আছে যেটাকে আমরা রান্নাঘর হিসেবে ব্যবহার করি। বাড়ীটা মোটের ওপরে ভালই, যদিও দু'একটা ছোট বড় অসুবিধা তারও আছে।

নীচের একতলাটা কিছুদিন খালি পড়ে'ছিল। চার পাঁচ দিন হ'ল একজন নূতন ভাড়াটে এসেচেন। আলাপ হয়নি এখনো তাঁর সঙ্গে, কারণ ও-ব্যাপারে আমি তেমন করিৎকর্ম্মা নই। আরো বোধহয় ও-পক্ষেরও অবসর কম, কারণ দেখি যে সকালে আমার আগেই উনি বেরিয়ে যান এবং ফেরেন সন্ধ্যারও পরে। সেদিন শনিবার। সকাল সকাল আপিস থেকে ফিরে একখানা বই নিয়ে বারান্দায় বসলাম কিন্তু পড়া আমার হল না; কারণ নীচের গিন্নি একটু আগে থেকেই বকাবকি আরম্ভ করেছিলেন এবং তাঁর বক্তৃতার বিষয় এই ছিল যে আমাদের ওপর থেকে নীচের তাঁর উঠোনে আমের আঁটি ফেলা হয়েচে। বিষয়টার বিশেষ কোন আকর্ষণী ছিলনা, আর বক্তৃতাও তেমন মুখরোচক হয়নি—তবু আমাকে সেই বক্তৃতা শুনে যেতে হচ্ছিল, কারণ ইচ্ছা করলে যদিও আমরা চোখ বুজাতে পারি কিন্তু কান বন্ধ করতে পারিনে।

ছেলেটা কাঁদতে কাঁদতে সামনে এসে দাঁড়াল। তাকে জিজ্ঞাসা করলাম—কি হয়েচে—কাঁদচিস কেন?

মা মেরেচে বলে সে আরো কাঁদতে লাগল।

অত্যন্ত সহজ সাধারণ ব্যাপার—মা মেরেচে ছেলেকে। মা ত ছেলেকে মারেই মারবেই, নইলে মা'র সঙ্গে মার কথাটার এমন প্রায় অভিন্ন সম্পর্ক কেন? কিন্তু মুসকিল এই যে ছেলে সে মারের প্রতিবাদ করে। তবু মনে হ'ল যে ছেলেকে সমঝে দেওয়া দরকার যে মা তাকে অকারণে মারে নি। উলটো দিক থেকে তাই তাকে জিজ্ঞাসা করলাম—আম খেয়ে তার আঁটি তুমি নীচেয় ফেলেছিলে কেন?

সে সাফ জবাব দিল—আমি ফেলিনি।

ব্যাপারটা যে কি হয়েচে ঠিকই বোঝা গেল, কিন্তু সেই সঙ্গে আমাকে বুঝতে হ'ল যে চোখে আঙুল দিয়ে যা দেখিয়ে দেওয়া যায় না তা নিয়ে ছোট একটা ছেলের কাছেও জোর করে একটা কথা বললে চলে না। তবু মনে হ'ল যে আঁটি ফেলার কথা যে ও অস্বীকার করেচে তার মানে এই যে—মনে মনে ও বুঝেচে যে ও-কাজটা ঠিক নয়—অন্যায়। উপস্থিতের মত এই পরোক্ষ বোধটাই যথেষ্ট বলে' ধরে' নিতে' হল অগত্যা।

ছেলেটার দিকে চেয়ে বোধ হল যে হয়ত একটু আদর পাবার আশা করেই সে এসে দাঁড়িয়েচে আমার কাছে। সঙ্গে সঙ্গে তার হাত ধরে তাকে কাছে বসিয়ে পিঠে একটু হাত বুলিয়ে দিতে সেইখানেই বেচারি শুয়ে পড়ল এবং ঘুমিয়ে গেল সেই অবেলাতেই। একবার ভাবলাম জাগিয়ে দিই ওকে, কিন্তু আবার মনে হ'ল তা'তে কি লাভ হবে? তার চেয়ে বরং ও একটু ঘুমুক —চাইকি ভুলে যাবে হয়ত মারের কথাটা অন্তত তার ব্যথাটা।

তার পিঠে হাত দিতেই কিন্তু বুঝেছিলাম যে মার সামান্য হয়নি—সমস্ত পিঠটা দাগড়া দাগড়া হয়ে ফুলে উঠেচে জায়গায় জায়গায়। খুব সম্ভবত এতটা মার ছেলের পিঠে পড়ত না যদি না নীচের গিন্নির বক্তৃতার সঙ্গে তাল রাখবার একটা দরকার বোধ করতেন তার মা। মনটা খারাপ হয়ে গেল তাই।

এতক্ষণ লক্ষ্য করিনি, কিন্তু অতঃপর বুঝলাম যে নীচের বক্তৃতা তখনো চলচে যদিও জোর তার কমে' এসেচে। আরো কিছুক্ষণ ঐ ঢিমে তেতালা ভাবে চলার পরে হঠাৎ একসময়ে লক্ষ্য করলাম যে নিঃশব্দ হয়ে গিয়েচে নীচেটা। মনটা কুতূহলী হয়ে উঠল এবং নীচের তলায় পুরুষ মানুষের গলার আওয়াজ পেয়ে বুঝলাম যে ছেলে ফিরে এসেচে আপিস থেকে এবং সে অসন্তুষ্ট হ'তে পারে মনে করেই মা তাঁর বক্তৃতা কম করেচেন। সে যাই হোক —বেঁচে গেলাম আমরা কাঁকতালে! তারপরে বেশ কিছুক্ষণ শান্তভাবে কেটে গেল। হাতের বইখানার কয়েকপাতা পড়ে' ফেললাম সেই সুযোগে—যদিও ইতিমধ্যে এক ফাঁকে ঝড়ের মত এসে গৃহিণী জানিয়ে দিয়ে গিয়েচেন যে আর থাকতে পারবেন না তিনি এ বাড়ীতে—এত ঝামেলা সহ্য হবে না তাঁর। আকস্মিক সেই উৎপাতে আমার বই পড়ার ব্যাঘাত কিছু হ'ল বটে কিন্তু আগেকার দিনের মত বিচলিত করতে পারলেন না তিনি আমাকে; কারণ ইতিমধ্যে প্রমাণ হয়ে গিয়েচে যে ওটা একবার ফাঁকা আওয়াজ। গল্পটা দিব্যি জমে' আসছিল কিন্তু হঠাৎ আবার নীচের গিন্নির গলা তারস্বরে বেজে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে ছেলের গলাও শুনতে পাওয়া গেল—বিরক্তভাবে ভদ্রলোক ডাকলেন—মা।

মা সাড়া দিলেন না কিন্তু চুপ ক'রে গেলেন। সম্ভবত হিসাব করে তিনি বুঝেছিলেন যে হাত পা ধুয়ে' ঠাণ্ডা হয়ে' ছেলে তাঁর বেরিয়ে গিয়েচে অন্যদিনের মত এবং তাঁর মুলতুবী বক্তৃতাটা আরম্ভ করে' দিয়েছিলেন তিনি সেই ফাঁকে। এদিকে যে ছেলে উঠোনে চাঁদের আলোয় মাদুর বিছিয়ে শুয়ে পড়েচে, রান্নাঘরের কোণে বসে' সে খবর তিনি পান নি।

একতলা আবার শান্ত হয়ে গেল। আমিও আমার গল্পে মনোনিবেশ করলাম। কিন্তু কি একটা অভদ্রা পড়েছিল যেন সেদিনকার আমার গল্প পড়ার মধ্যে, নইলে সেই অসময়ে আমার নীচের দোরের কপাট খট্ খট্ করে' উঠবে কেন? কে এলরে আবার এই রাত্রে?

নীচের নেমে দোর খুলতে গিয়ে দেখলাম একতলার ভদ্রলোকটি দাঁড়িয়ে রয়েচেন। আমাকে দেখে নমস্কার করে' তিনি বললেন—মাপ করবেন মশাই, বুড়ো মানুষ মা আমার; একটু বেশি বকেন এবং অসম্ভব অন্যায় কথা তিনি বলেন অনেক।

ঠিকই বলেচেন ভদ্রলোক, কিন্তু সামনে দাঁড়িয়ে তাকে ত বলতে পারলাম না সে কথা—চুপ করে গেলাম অগত্যা। ভদ্রলোক কিন্তু চুপ করে থাকতে পারলেন না, আবার আরম্ভ করলেন—দোষ আপনাদের হয়নি—সে আমি জানি—

কিন্তু আম খেয়ে তার আঁটিগুলা আপনার উঠানে ফেলাটা ঠিক হয়নি নিশ্চয়—

আরে—সে ত ফেলেচে আপনার ঐ তিন বছরের ছেলে—ভাল মন্দ বোঝবার সময় হয়েচে কি ওর?

শুধু ওর নয় আমাদেরও সময় হয়নি যে বোঝবার—হ'লে পিঠটা ওর দেগে দেওয়া হ'ত না পাখার বাঁট দিয়ে—

মাথা নাড়তে নাড়তে ভদ্রলোক বললেন—না না না ঠিক হয়নি, সে—ঠিক হয়নি।

হয়ত ঠিক হয়নি, কিন্তু হয়ে গিয়েচে যা না-হবার—

ঐ ত হয়েচে মুস্কিল মশাই—ঐ হয়েচে বিপদ—মা তাঁর ছেলেকে মারবেন বা বকবেন অকারণে, প্রতিবাদ করবার যো নেই আমাদের—

আপনারও এই ভাবের একটা গোলমাল আছে, কারণ বোধহয় পরশু সমস্ত রাত ধরে' বকেচেন আপনার মা—

হাঁ, আমার স্ত্রীর সঙ্গে কি নিয়ে মায়ের কথান্তর হয়। আর আমার অপরাধের মধ্যে আমি মা'কে চুপ করে' যেতে বলেছিলাম—

সে আমরা শুনেচি—আপনারও গলা আমরা পেয়েচি অনেক বার—

সে যা হোক আমার মা—আমাকে এ সবই সহ্য করতে হবে, কিন্তু আপনারা সহ্য করবেন কেন? আপনাদের অসন্তুষ্ট করতে চাইনে আমরা, কারণ বিশেষভাবে আপনাদের ভরসা করেই এ বাসাটা নিয়েচি আমরা—

কিন্তু আমাদের সঙ্গে ত পরিচয় ছিলনা আপনাদের—

ছিলনা বটে কিন্তু আজ হয়ে গেল ত পরিচয়—

হাঁ, আমের আঁটি ফেলার একটা ভাল ফল হ'ল তাহ'লে—

আমের আঁটির ব্যাপারে মা যা বলেচেন সে অত্যন্ত অন্যায় হয়েচে তাঁর, কিন্তু মা আমার দেশে চলে যাবেন দু'চার দিনের মধ্যে—

কেন—এরই মধ্যে তিনি দেশে যাবেন কেন? এইত সেদিন আপনারা এলেন—

দেশের বাড়ীতে নারায়ণ-শীলা আছেন—তাঁরই পূজার্চ্চনায় অষ্টপ্রহর কেটে যায় মায়ের। এই প্রথমবার বলে' তিনি এসেচেন আমাদের সংসার গুছিয়ে দিতে—

কিন্তু একলা থাকবেন আপনার স্ত্রী—

একলা কি বলচেন? ওপরে আপনার স্ত্রী থাকবেন—আর ঐ ত একটি তাঁর ছেলে। তাঁর কাছে গিয়ে বসবে গল্পগুজব করবে—মানুষ হয়ে উঠবে আস্তে আস্তে—কথাটা তাঁর শেষ হবার আগেই ভদ্রলোকের ঘরের শিকল ঠন্ঠন্ করে' উঠল এবং সেদিকে আমি তাঁর মনোযোগ আকর্ষণ করলে তিনি বললেন—হাঁ আমারই দোরের শিকল নড়চে—অর্থাৎ এইবার আমাকে যেতে হবে, কারণ মা এখনি ফিরবেন।

বুঝতে পারলাম না আপনার কথাটা—কোথায় গিয়েচেন আপনার মা?

ঠাকুর প্রণাম করতে গিয়েচেন এই কাছেই কোথাও। আমাদের ইচ্ছা নয় যে তিনি দেখেন—আমি আপনার সঙ্গে কথা কইচি! কারণ দেখলে তিনি হয়ত ভাববেন যে তাঁর কথাই আলোচনা করচি আমরা এবং যদি সে বিশ্বাস তাঁর হ'য়ে যায় তাহ'লে সমস্ত রাত আর তাঁর বকুনি থামবেনা। যাই মশাই! বলে নমস্কার করে ভদ্রলোক চলে গেলেন। তিনি চলে যেতে হঠাৎ মনে হ'ল—তাইত—নাম জিজ্ঞাসা করা হল না ত? এবং সেই না হওয়ার জন্য বেশ একটু কৌতুক বোধ করতে লাগলাম মনে মনে। মুখের সে হাসি আমার নিমেষে মিলিয়ে গেল যখন দেখলাম, সিঁড়ির ওপরে দাঁড়িয়ে রয়েচেন স্বয়ং গৃহিণী। আমাকে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—কি বলছিলেন উনি?

সে ত তুমি শুনেই চ—

না শুনিনি। শেষের দু'টো চারটে কথা কানে গিয়েচে বটে কিন্তু মানে তারও সব বুঝতে পারিনি—যে ইংরিজি বুকনি তোমাদের কথার মধ্যে!

বৃথা সময় নষ্ট না করে' ভদ্রলোক যা বলে' গেলেন সব বুঝিয়ে বললাম তাঁকে। বলবার মধ্যেই কিন্তু বুঝতে পারলাম যে খুসি উনি মেটেই হন নি সব শুনে—শেষ পর্য্যন্ত ত ভেংচে বলে উঠলেন—কি আমার সাতপুরুষের কুটুম রে—শিখিয়ে পড়িয়ে মানুষ করে' দিতে হবে গেঁয়ো ভূতকে—আহ্লাদ আর ধরে না যে দেখচি—

কিন্তু যা বলবে আস্তে বল—শুনতে পাবে যে ওরা? গৃহিণীকে সাবধান করে দেবার জন্য চাপাগলায় আমি বলে উঠলাম।

উনি কিন্তু সে সতর্কবাণী গ্রাহ্যও করলেন না—তেমনি জোর গলায় বলে' উঠলেন—শুনল ত বড় বয়েই গেল! যা বলব তা চেঁচিয়েই বলব—কেন, আস্তে বলব কেন? ভয়ে? ভয় তুমি করগে, আমি করিনে।—বলতে বলতে রীতিমত দুম্ দুম্ করে' পা ফেলে উনি তেতলায় উঠে গেলেন। আমি হতভম্ব হয়ে তাঁর সেই চলার পথের দিকে হাঁ করে চেয়ে রইলাম।

সেতুবন্ধ রামেশ্বর

শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত

বদরিকাশ্রম হ'তে রামেশ্বরম্‌, দ্বারকা হ'তে চন্দ্রনাথ—এর মাঝে পুণ্য-ভূমি আর্য্যাবর্ত্তের অসংখ্য তীর্থ। এই বিস্তৃত ভূ-খণ্ড পরিভ্রমণ কর্ব্বার আশা, শিশুকাল হ'তে চিরকাল, হিন্দু-সন্তান নিজের হৃদয়ে পোষণ করে। আমার জননীর পুণ্য-স্মৃতির সঙ্গে সেতুবন্ধ রামেশ্বর তীর্থ-যাত্রার আকাঙ্ক্ষা আমার হৃদয়ে বদ্ধমূল। আমার পাঠ্যাবস্থায় রামেশ্বর যাত্রা কর্ব্বার সময় আদর ক'রে মা বলেছিলেন—"বড় হয়ে অনেক দেখবে বাবা" (।) আর ফিরে এসে উচ্ছ্বসিত প্রাণে অন্তরাত্মা হ'তে সানন্দে বলেছিলেন—"আঃ! কি দেখলাম বাবা।" সেইদিন হ'তে রামেশ্বর মহাদেবের দর্শনের উচ্চাশা ছুটির দিনে আমার হৃদয়কে এই মহাতীর্থের দিকে টানতো। কিন্তু যাঁর দর্শনে ধন্য হব, তিনি "নাহি দিলে দেখা, কেহ কি দেখিতে পায়"? এবার তাঁর দয়ায় এ মহাতীর্থ ভ্রমণ ক'রে, অনেক প্রান্ত হতে অসংখ্য পর্য্যটক এই তীর্থ-দর্শন করেছে। যে ছোট দ্বীপের উপর রামেশ্বর মন্দির প্রতিষ্ঠিত, তারই এক প্রান্তে ধনুষ্কোটি—ভারতবর্ষের দক্ষিণ-পূর্ব্ব সিংহদ্বার। রাবণ কোন্‌ পথে এসেছিল জানি না। সিংহল হ'তে বিজয়ী শ্রীরামচন্দ্র এই পথে প্রত্যাবর্ত্তন করেছিলেন। তারপর কত কোটি লোক এই পথে আমাদের মহাদেশে শত্রু, মিত্র, তীর্থ-যাত্রী, শাসক ও শোষকরূপে প্রবেশ করেছে, কে সে কথার ইয়ত্তা করে। আপাততঃ ধনুষ্কোটি দক্ষিণ ভারত রেলপথের চরম ঘাঁটি।

কোনো আজানা অতীতে এই দ্বীপ হ'তে লঙ্কা অবধি যে একটি সংযোজক পথ ছিল, তার যথেষ্ট প্রমাণ আজিও বিদ্যমান। সমুদ্রের ভিতর মাথা গুঁজে দাঁড়িয়ে আছে এক সারি শৈল-শির—স্তম্ভের মত। এঁদের মাথার উপর
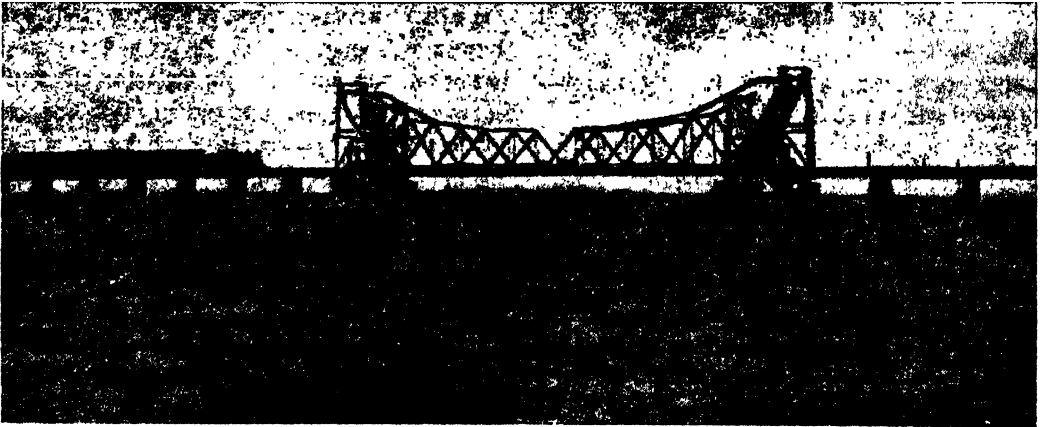
পাম্বান সেতু

কথা বুঝলাম (।) অসীম চিত্ত-প্রসন্নতা অনিবার্য্য স্মৃতি উত্তেজক। আমি এ-কথা বল্‌ছি—সকল পর্য্যটকের প্রতিনিধিরূপে।

সেতুবন্ধ রামেশ্বর তীর্থের নামের সঙ্গে যেমন পুণ্য-স্মৃতি জড়ানো, তেমনি এ তীর্থে অজানা রহস্যের নির্দ্দেশ আছে। দূরত্ব, জনশ্রুতি এবং শিশু কল্পনার রেশ একত্র মিলে এই রহস্যের সৃষ্টি করে। শ্রীরামচন্দ্র, মা জানকী, লছমন ভাই—এঁরা শৈশবেই প্রত্যেক হিন্দুর মনো-মন্দিরে অধিষ্ঠিত হন। কারণ এঁদের জীবন-লীলা যেমন করুণ, তেমনি রোমাঞ্চকর। সেতুবন্ধের নামে কিষ্কিন্ধ্যা, হনুমান, জাম্বুবান, গন্ধমাদন, সাগর লঙ্ঘন, কুম্ভকর্ণ প্রভৃতি স্মৃতি-ভাণ্ডার হ'তে মুখ তুলে চেতনায় জাগে। বহু-যুগ পুণ্য-ক্ষেত্র ভারতবর্ষের সকল আপাততঃ সাগরের নোনা জল তরঙ্গায়িত। কোনো যন্ত্র-বিশারদ এইগুলিকে কায়েমিভাবে সংযুক্ত করতে পারলেই ভারতবর্ষ ও সিংহলের মাঝে একটি স্থায়ী সেতু সৃষ্টি হ'তে পারে।

ভারতবর্ষের দক্ষিণ-পূর্ব্ব ভূ-খণ্ড, রামেশ্বর দ্বীপের সাথে একটি ছোটো পুলের দ্বারা সংযুক্ত। তার নাম পাম্বান সেতু। লৌহ-বর্ম্মে সেই সেতুর উপর দিয়া রেলগাড়ি যায় রামেশ্বর আর ধনুষ্কোটি। এ পুল ইংরাজ সেতু-নির্ম্মাতার হাতে গড়া। সে মাত্র ঐ রকম সমুদ্রের জলে মাথা গোঁজা একসারি শৈল-শিরকে সংযুক্ত করেছে। পাহাড়ের মাথা কেটে কে থাম গড়েছিল, সেকথার বিচার প্রসঙ্গে নানা গবেষণা-মূলক যুক্তি শোনা যায়। একদল বলেন, ঐ স্থলে

গন্ধমাদন পর্ব্বত ছিল। হনুমানের বিশল্য-করণী খুঁজে বার করবার ধৈর্য্য ছিল না, কিন্তু তার বীর্য্য ছিল সমস্ত গন্ধমাদন পর্ব্বতটাকে উপড়ে নিয়ে যাবার। কবিরাজ সুষেণ তখন রাজকুমার লক্ষ্মণের শক্তিশেলজনিত মোহের চিকিৎসারত। পরে কিষ্কিন্ধ্যা রাজত্বের প্রান্তের সঙ্গে রামেশ্বরকে সংযুক্ত কর্ব্বার বাসনায় বানর সেতু-নির্ম্মাতা এই পুল গড়েছিলেন। কালের অত্যাচার আর সাগর তরঙ্গের আক্রমণে সে পোল ধ্বংস হয়েছে। বাকী ছিল মাত্র পাহাড়ের মাথা কাটা থামগুলি। চিত্তাকর্ষক কাহিনী হিসাবে এ কিম্বদন্তী মনোরম। কিন্তু রূপ-কথা ইতি-কথা নয়। কোনো কোনো ভূ-তাত্ত্বিক বলেন জল, বায়ু এবং ভূমিকম্প ভারত ও রামেশ্বর এবং রামেশ্বর ও লঙ্কার সংযোগ ছিন্ন করেছে। থামের মত শৈলশিরগুলি প্রাকৃতিক নিয়মে রচিত। এ যোজকের ভিত্তি যে কীর্ত্তিমানেরই কীর্ত্তি হ'ক, এর উপর দিয়ে রেলে চড়ে যেতে যে আনন্দ, উত্তেজনা, হৃদ্‌কম্প ইত্যাদি ইত্যাদিতে হৃদয় ভরে ওঠে, তার মূল্য হিসাবের বাহিরে।

দেশ-ভ্রমণে বাহির হবার পূর্ব্বে অনেকে নূতন দেশে বাসার বন্দোবস্ত ক'রে গৃহ ছাড়ে—বিশেষতঃ পথে বিবর্জ্জিতা নারী সঙ্গিনী হলে! আমার মতিগতি কিন্তু চিরদিন এ ব্যবস্থার প্রতিকূল। যাত্রাফল সুখের হ'লে অনির্দ্দেশের যাত্রা-পথের পথিক অনির্ব্বচনীয় সুখ পায়। আমাদের রামেশ্বর যাত্রার মধ্য-পথে সে ব্যবস্থার ব্যত্যয় ঘটেছিল। রায় বাহাদুর পিল্লে নামক এক ভদ্র-লোককে আমাদের ট্রেণের কামরায় সহ-যাত্রীরূপে পেলাম। বেশ গৌরবর্ণ চেহারা, গায়ে সার্টের উপর গরদের কোট তার উপর জরি-পাড় মাদ্রাজী চাদর। মাথায় জরির পাগড়ি। পাকা আমটির মত সুদর্শন ও মধুর। আমরা বাঙলা ভাষায় সিদ্ধান্ত করছিলাম যে পাণ্ডারা তীর্থ-স্থানের কাঁটা, রামেশ্বরে গিয়ে যেখানে থাকি, পাণ্ডা-গৃহে অতিথি হব না। রায় বাহাদুর অবসরপ্রাপ্ত একাউণ্ট অফিসার। কর্ম্মের দিনে কিছু কাল কলিকাতায় ছিলেন। তিনি গায়ে পড়ে আমাদের সঙ্গে আলাপ করলেন। পাণ্ডা-দ্রোহী সিদ্ধান্তে একমত হ'লেন। বোঝালেন যে রামেশ্বরের পাণ্ডার নির্দ্দেশ মত আমাদের শ্রীমন্দিরের ভিতর সাতটি প্রাচীন কূপের জলে স্নান করতে হবে, যার অনিবার্য্য ফল হবে ম্যালেরিয়া ব্যাধি।

তিনি রবীন্দ্রনাথ, বেলুড় মঠ, স্বামীজি প্রভৃতির
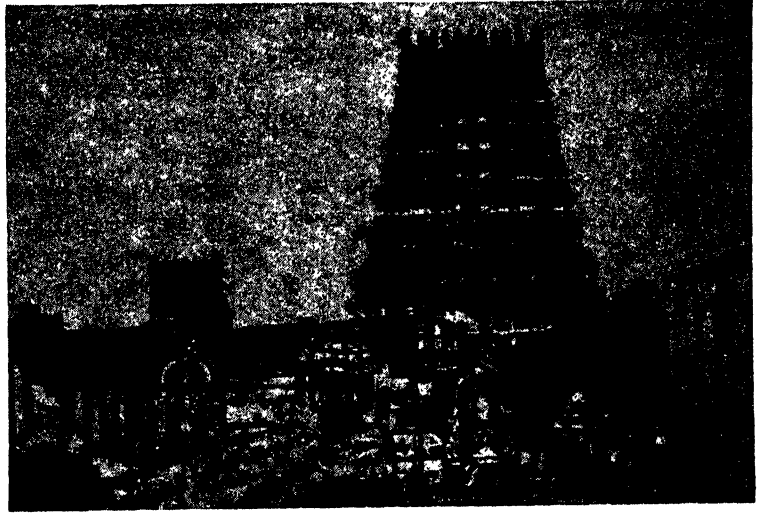
পূর্ব্ব গোপুরমে শোভাযাত্রা

সুখ্যাতি ক'রে বন্ধুত্ব জমিয়ে নিলেন। শেষে বল্লেন—আমি দেখছি, রামেশ্বর মন্দিরের অতিথি না হ'লে আপনাদের, বিশেষ আমার এই মেয়েটির, তীর্থ-যাত্রা পণ্ড-শ্রম হবে।

—কিন্তু সে আতিথ্য জুটবে কোন্ ভাগ্যবলে?

ভদ্রলোক ঈষৎ হেসে আমার স্ত্রীর নিকট একটুকরা কাগজ নিয়ে চলতি গাড়িতে বসে এক পত্র লিখলেন। আমাকে বল্লেন—ট্রেণ থেকে নেমেই এই পত্র ডাকে দেবেন। তাহ'লে মন্দিরের কোষাধ্যক্ষ মিঃ কোদণ্ডরাম আয়ার বি-এ আপনাদের জন্য মন্দিরের অতিথিশালায় থাকবার বন্দোবস্ত করবেন। কারও সঙ্গে কোনো সম্পর্ক থাকবে না। বিজলী বাতি আছে। পরিচ্ছন্ন পরিষ্কার।

নূতন দেশ দেখার উত্তেজনায় পত্রখানি ডাকে দেওয়া হ'ল না। রামেশ্বর যাবার সময় হঠাৎ চেটিনাদ ষ্টেশনে রায় বাহাদুরের সঙ্গে সাক্ষাৎ হ'ল। সত্য কথা শুনে তিনি হাসলেন। বল্লেন—আমি জানতাম। আমি চিঠি লিখেছি। আবার আজ টেলিগ্রাফ্ করছি।

আমি বল্লাম—আমি তার করছি।

তিনি হেসে বল্লেন—না এ ষ্টেশনে তার করা যায় না। আমি সহর থেকে করব। কেবল দয়া ক'রে ভদ্রলোকের নামটি ভুল উচ্চারণ করবেন না। আপনারা বাঙ্গালীরা মাদ্রাজী নাম নিয়ে তাল-গোল পাকান্ (মেক্ এ হ্যাস্), অথচ সংস্কৃত পড়েন।

তার পর তিনি আমাকে তিনবার স্পষ্ট স্পষ্ট বলালেন—

কো-দণ্ড-রাম-আয়ার। এমন সময় চেটিনাদের রাজবধূ—বিশ্ব-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাতা দান-বীর রাজা আন্নামালাই চেটীর পুত্রবধূ—নয়নপথে পড়লেন। ভদ্রলোক তাঁর দিকে ধাবমান হ'লেন। রাজ-বধূর অতি সাধারণ পোষাক এবং আগে পিছে শোভাযাত্রার অভাব দেখে আমার সহধর্ম্মিণী বল্লেন—রায় বাহাদুর ভুল করেছেন। ইনি ষ্টেশন মাষ্টারের আত্মীয়া। রাজার আত্মীয়া হ'তে পারেন না।

আমাদের এক সহযাত্রিণী বল্লেন—না ইনি রাজ-বধূ। খুব সুশিক্ষিতা। সরল, অমায়িক।

নিঃসন্দেহ হয়ে দার্শনিক জবাব দিলাম—দর্জ্জি, তন্তুবায় বা স্বর্ণকার সম্ভ্রান্ততা সৃষ্টি করতে পারে না। সেটা সহজাত অথবা কৃষ্টি-মূলক।

আমরা ত্রিচিনোপল্লী হ'তে রামেশ্বর গিয়েছিলাম। অতি ভোরে স্বপ্ন-জড়ানো চোখে বোট এক্‌সপ্রেসে উঠ্‌লাম। গাড়িতে দু'জন মহিলা ছিলেন। মিসেস্ রেড্ডি পণ্ডীচেরির মাদ্রাজী খৃষ্টীয় নারী। মিসেস কাদের আফ্রিকার অর্দ্ধ-শ্বেত অধিবাসিনী, আপাততঃ সিংহলের মিঃ কাদেরের সহধর্ম্মিণী।

মন্দিরের বিমান

শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমের কথা পণ্ডিচারীর লোকের গর্ব্বের প্রসঙ্গ। মিসেস্ রেড্ডির ভ্রাতা আশ্রমে যাতায়াত করেন। কিন্তু আশ্রমের মাতা মহিলাদের সহজে আশ্রম দর্শন করবার অনুমতি দেন না। তাই আমাদের সহযাত্রিণীরা আশ্রম দেখেন নাই। মায়াবরমে এক ব্রাহ্মণের গ্র্যাজুয়েট কন্যাও ঐ অভিযোগ করেছিলেন। পূর্ব্বাহ্ণে অনুমতি সংগ্রহ না ক'রে মেয়েছেলে নিয়ে পণ্ডিচারী ভ্রমণ পণ্ডশ্রম হ'তে পারে।

ত্রিচিনপল্লী হ'তে রামনাদ অবধি দেশ ঠিক্ বাঙ্‌লার মত। জলে ভাসা মাঠ, ধানের ক্ষেত, মাঝে মাঝে অনতিউচ্চ-ভূমিতে বাগান। প্রধান বৃক্ষ আম, তাল, কদলী ও নারিকেল। তাল পাতায় দরিদ্র কৃষক কুটির ছায়। রামেশ্বরের সম্পত্তি দেখাশুনা এবং পূজা-পার্ব্বণ নিয়ন্ত্রণ কর্ব্বার জন্য একটি পঞ্চায়েত আছে। রামনাদের রাজা পুরুষানুক্রমে তার সঙ্ঘপতি। বহু অট্টালিকায় পূর্ণ রামনাদ। ট্রেণ যখন রামনাদ ছাড়লো, মিসেস কাদের বল্লেন—এবার থ্রিলের জন্য প্রস্তুত হন। মিসেস রেড্ডিরও এই পথে প্রথম যাত্রা। ইতিমধ্যে তাঁরা আমার স্ত্রীকে সিংহল পর্য্যটনে সম্মত করেছিলেন। আমি মনে মনে হাসলাম। বসন্ত এবং বিসূচিকার টীকার সার্টিফিকেট না দেখালে কেহ লঙ্কায় যেতে পারে না। ঐ দুই পদার্থের অভাবে বোধ হয় মহাবীরের মহা-লক্ষর ব্যবস্থা।

চষা ভূমি ছেড়ে ট্রেণ প্রান্তরে প্রবেশ করলে। বালিয়াড়ির উপর মাটির পলী পড়েছে। প্রান্তরে খোলা ছাতার আকারের বাবলা গাছ ছড়ানো। মাঝে মাঝে প্রকাণ্ড ফণী-মনসার জঙ্গল। ভূমি সমতল নয়—বালীর ঢিপি দিকে দিকে। দিগন্তে নীল আকাশের নীচে চক্‌চকে তরল নীল সমুদ্র। ডাহিনে সাগর, বামে সাগর। এক-দিকে মান্নার উপসাগর, অন্য-দিকে পক্ প্রণালী। হাওয়া প্রবল কিন্তু এলোমেলো।

ক্রমশঃ দু'দিকের জলধি কাছে সরে আসছিল। আরো কাছে। আরো কাছে। উভয় সমুদ্রেই তরণী নাচছে—কাটামারাণ, জেলে ডিঙ্গি, মহাজনী ভড়। যখন উভয় সাগর আধ মাইলের ভিতর এলো—দেখলাম উভয়ের বেলা-ভূমিতে তরঙ্গের পর তরঙ্গ আছড়া-আছড়ি করছে। জলের ফেনা আর ক্রমঃবর্দ্ধমান গর্জ্জন সকলকে উত্তেজিত কর্‌লে। মনে হচ্ছিল দাম্ভিক বাষ্পযান ধ্বংসের মুখে ছুট্‌ছে। শঙ্খ-চীল আর গাল ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ছিল। তাদের মুখে করুণ গান। যেখানে উভয় সমুদ্র একত্র হবে, ধাবমান শকটের সলিল-সমাধি বুঝি অনিবার্য্য।

উভয় জলধি যখন অতি-নিকট, কতকগুলি টালি ঢাকা পাকা কুটীর পড়লো দৃষ্টিপথে। ট্রেণ থামলো। আমরা নিঃশ্বাস ফেললাম। এ ষ্টেসনের নাম মণ্ডপম। সিংহল যাত্রীদের এখানে দেহ-পরীক্ষা হয়। ভারতবর্ষের দ্বার সবার পক্ষে চির-অবারিত। কিন্তু সিংহল ভারতবাসীকে সহজে ফটকে প্রবেশ কর্ত্তে দেয় না। এ ব্যবস্থার বিচারে লজ্জা সম্বন্ধে মাদ্রাজী মহিলা বল্লেন—ননসেন্স্। মেম বল্লেন—ফানী। মিসেস গুপ্ত বল্লেন—অপরূপ!

উভয়ে নিঃসন্দেহ হ'লেন যে হাসি এবং তর্কে চিকিৎসক ও দ্বারপালকে পরাস্ত ক'রে সার্টিফিকেট-বিহীন গুপ্ত-দম্পতিকে তাঁরা সাগর পারে নিয়ে যাবেন। সেই গুরু

অলিন্দ
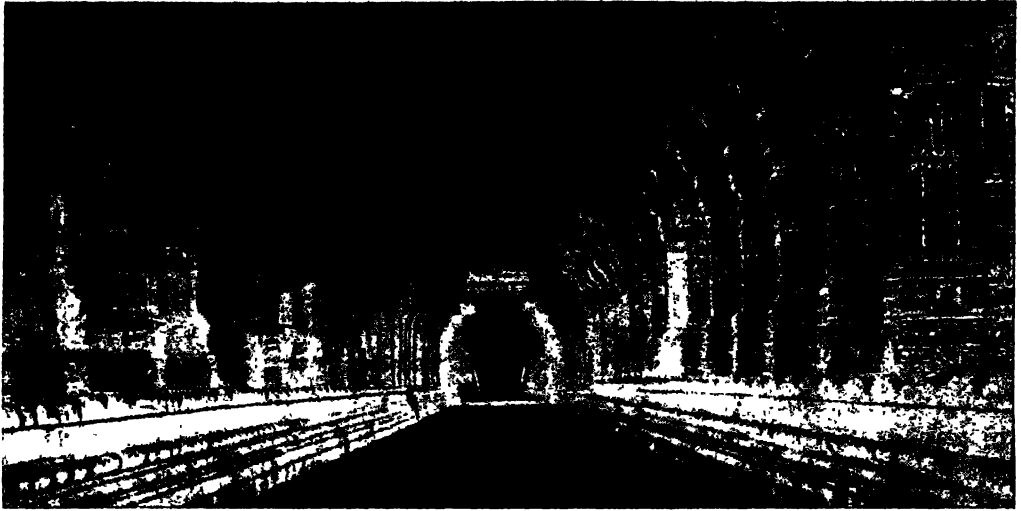
আলোচনার মধ্যেই নারী-সুলভ গৃহস্থালীর কল্যাণ কামনায় তাঁরা দুখানা কুলো আর গোটাকতক ধুচুনী কিনে ফেললেন। দীর্ঘ-পথ স্মরণ ক'রে আমার সহধর্ম্মিণী ধুচুনী-লালসা সম্বরণ করলেন।

তাঁরা এক নবীন চিকিৎসককে গেরেপ্তার করে আনলেন। আমাদের সু-স্বাস্থ্য, সচ্চরিত্রতা এবং সামাজিক অবস্থা সম্বন্ধে মহিলাদ্বয় সাক্ষ্য দিলেন। অধুনা সিংহল-বাসিনী কাদের-জায়া আমাদের জামিন হ'তে সম্মত হ'লেন। কিন্তু যেত্না করো যাদুটোনা, বাবুয়া বৈঠে ওহি কোনা। ডাক্তার ভবী ভুললেন না। তিনি আইনের ঘাড়ে আতিথ্য-বিরূপতার দোষ চাপিয়ে আমাদের ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। অবশ্য মণ্ডপমে মাত্র ৪৮ ঘণ্টা বাস করা আমাদের গ্লানিকর মনে হ'ল। তা না হ'লে এ যাত্রায় লঙ্কা-দর্শন হ'ত।

ট্রেণ ছাড়লো। প্রায় সব আরোহীর মুণ্ড গাড়ির গবাক্ষের ভিতর হতে, আর চক্ষের তারা চক্ষু-কোটর হ'তে নির্গত হ'ল। সত্যই থ্রিল্। দুদিকে সাগর হ'তে মিলন-মুখর সঙ্গীত শোনা যাচ্ছিল। মাঝের ভূমি ক্রমশঃ সঙ্কীর্ণ হ'তে সঙ্কীর্ণতর হ'ল। মরণ-প্লাবন আশঙ্কা ক'রে যেন শকট মন্থর-গতি হ'ল—তার শ্বাসের ঝাপটায় বাব্‌লা ও ঝাউ কাঁপতে লাগলো। এলো! এলো!

শেষে দু'টি সমুদ্র এক হ'ল। মধুর মিলন। তরঙ্গ নাই, নিস্পন্দ। মহাবীর হনুমান ও কুম্ভকর্ণের মিলনের হুড়াহুড়ি নাই। দুই কলেবরের আন্তরিক মিলনের একপ্রাণতা, এক স্রোতে বহা। তাদের শান্ত বুকের উপর ছোট বড় তরণী ভাসছে।

লৌহ-পথে মন্থর বেগে ট্রেণ গড়িয়ে চল্‌লো। দুই দিকে দিগন্তে নীল সাগরের সাথে নীল আকাশ আর সাদা মেঘের সুখ-স্পর্শ। নীচে জল। যেন জাহাজে চড়ে সাগর পার হ'চ্চি। পরপারের যত সন্নিকটে যাই, মুমূর্ষুর জীবনকে আঁকড়ে থাকার অনুরূপ ভাব জাগে মনে। পথ যেন না ফুরিয়ে যায়। কিন্তু সসীম জগতে অফুরন্ত নয় কোনো পথ। সেতুও শেষ হ'ল। ওপারে পাম্বানে নামলাম। ট্রেণ গেল ধনুষ্কোটি। আমরা ছোট গাড়িতে গেলাম রামেশ্বরম্।

মিঃ কোদণ্ডরাম খুব কর্ম্ম-কুশল চটপটে লোক। তাঁর এক পরিচর আমাদের মালপত্র ঠেলা গাড়িতে নিয়ে গেল। আমরা মোটরে গেলাম সমুদ্রের দিকের গোপুরমের পাশে ছোট অতিথি-শালায়। এ বাঙ্‌লাটি একেবারে নূতন। আমরাই প্রথম গৃহ-প্রবেশ কল্লা'ম।

কিন্তু কমলী নেহি ছোড়তা। তীর্থ-ভ্রমণের ট্রেণের উদ্যোক্তা পি-সেটের মালিক আমার বাল্য-বন্ধু। তাঁদের পাণ্ডা মিঃ বিশ্বনাথকে তিনি পত্র দিয়েছিলেন। বিশ্বনাথবাবু সে দেশের অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট্। ইনি অচিরে এসে সাক্ষাৎ কল্লে'ন, গৃহ-সজ্জা করে দিলেন, আমাদের একজন হিন্দুস্থানী ছড়িদার ছিলেন এবং আমাদের কলিকাতার চাকর শিবুকে নিয়ে নিজে গেলেন বাজারে। তখন বেলা দুইটা। আমরা সাগর-স্নান করতে গেলাম।

আমাদের বাড়ির সামনে একটা কুটীরে স্থানীয় কংগ্রেস অফিস। তার ভিতর দিয়ে সাগরের নীল জল দৃষ্টি-পথে পড়ছিল। কিন্তু স্নানের ঘাটে যেতে হয় হাতীশালা আর

গোটাকতক বাড়ি পার হ'য়ে। হস্তী-দর্শনে স্ত্রীর নাতি-নাতিনীর জন্য মন-কেমন করে উঠ্‌লো। আহা! বেচারারা এলে বেশ হাতী দেখ্‌তো।

রামেশ্বরমে সাগর-বেলা অর্দ্ধচন্দ্রাকার। এক কোণে ধনুষ্কোটি। জলধি স্থির, ধীর, হিল্লোল-চঞ্চল নয়। যেন সীমা-হীন গোলদিঘি। মনের সাধে সাঁতার কেটে দেহ শীতল ক'রে যেমনি উপরে উঠ্‌লাম, একঘেয়ে নাকি সুরে এক পাল ছোকরা হাত পেতে ঘিরে দাঁড়ালো। দেওয়ালী পোকার মত দক্ষিণের ভিখারী কোথায় লুকিয়ে থাকে—মরসুম বুঝে আত্ম-প্রকাশ করে। এদের হাত নেড়ে বোঝা-লাম সঙ্গে পয়সা নাই। কিন্তু তারা অবুঝ। শেষে ভয় দেখাবার জন্য সঙ্কেতে তাদের বুঝিয়ে দিলাম যে আর জ্বালাতন করলে তাদের ধরে জলে ফেলে দেব। উল্টা বুঝলি রাম। তারা সকলে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে পয়সা ফেলতে সঙ্কেত করলে।

দক্ষিণে ভীষণ ভিক্ষুকের প্রাদুর্ভাব। তাদের গলার সুর শুনলে সন্দেহ থাকে না যে তারা পেশাদার ভিক্ষুক। ভারতবর্ষ দরিদ্রের দেশ এবং হিন্দু মুসলমানের ধর্ম্মানুষ্ঠানের অঙ্গ দান। কাজেই এ শ্রেণীকে "পুওর লর" অনুরূপ ব্যবস্থায় নির্মূল করা যায় না। কলিকাতায় শ্রাদ্ধের সময় কাঙ্গালী-বিদায় কর্ত্তে গেলে সরদারদের থোক্ থাক্ কিঞ্চিৎ দিলে তবে ভিখারী পাওয়া যায়। রোমজানের সময় মুসলমান গৃহস্থের পক্ষে ভিক্ষা দান প্রথা বোধহয় আদেশ।

সমুদ্রের দিকের গোপুরম্ শ্রীরামেশ্বর ও শ্রীমতী পার্ব্বতী দেবীর পীঠস্থানের প্রবেশদ্বার। দ্বারে প্রবেশ করবার সময় আবার থ্রীল্। এ পুলক-শিহরণ অতীতকে জাগিয়ে তুললে —কত জ্ঞানী, কত গুণী, কত মহাপুরুষ, কত ভক্ত আর তার সঙ্গে আমাদের মত কত সংসারের জীব, এ দ্বার পার হ'য়ে দেব দেবী দর্শনে ধন্য হয়েছে। তাদের পুণ্য-জ্যোতি নিশ্চয় আজও অলক্ষ্যে অনুন্নত মনকে আসল-পথ দেখিয়ে দেয়।

রামেশ্বর সহর

পাশ্চাত্যে ক্লেয়ারভয়ানসী নামক এক প্রকার শক্তির সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। অপরাধী গেরেপ্তার করবার জন্য সে শক্তি নিয়োজিত হয়। এর মূল বিচার হচ্চে যে মানুষ যখন কোনো পদার্থ ব্যবহার করে, অলক্ষে তার ব্যক্তিত্বের ছাপ রেখে দেয় তার ব্যবহৃত বস্তুর উপর। যার শক্তি আছে—সেই পদার্থ স্পর্শ করলে, সেই পদার্থের সঙ্গে জড়ানো ভাবরাশি শক্তিশালীর মনে সাড়া দেয়। তাই হত্যাকারীর পরিত্যক্ত লাঠি, জুতা বা টুপি স্পর্শমাত্রে শক্তি-সম্পন্ন ব্যক্তি হত্যাকারীর বর্ণনা দিতে পারে। এ-কথা সত্য হলে তীর্থ-ভূমিতে মানুষের মনে ভক্তির উদ্রেক কেন হয়, বহুবার তীর্থ-দর্শন করলে কেন আত্মোন্নতি সম্ভবপর, তার আধুনিক বিলাতী যুক্তি পাওয়া যায়। তীর্থস্থানে সাত্বিক মন নিয়েই মানুষ যায়! তার ব্যোমে, জিনিস-পত্রে, দেওয়ালের গায়ে এবং বেদীমূলে ভক্তপ্রাণের প্রতিচ্ছবি রেখে আসে। মনকে চিন্তাশূন্য করলে, বেদীমূলে বা মন্দির প্রাঙ্গণে মন মধুর ভক্তিরসে ভরে ওঠে। এ ভক্তি-উচ্ছ্বসিত হৃদয় সর্ব্বত্র প্রতিদিন অনুভব করতে পারা যায়। কাশীধামে সকল তীর্থযাত্রী বাবা বিশ্বনাথের অঙ্গ স্পর্শ করতে পারে। এই নবীন বিজ্ঞানের নিয়মে, বিশ্বনাথ বিগ্রহ, সাধুদের স্পর্শে অসংখ্য ভক্তের উচ্ছ্বাসের ভাণ্ডার হয়। পরবর্তী যাত্রী স্থির-চিত্ত হ'লে তার মনে সেই ভক্তি সঞ্চারিত হয়। অবশ্য আমাদের শাস্ত্রে তীর্থযাত্রার সুফলের অন্য কারণের নির্দ্দেশ আছে। প্রাচীন জগতে আধুনিক জাতীয়তাবাদ মানুষের সঙ্ঘ-জীবন নিয়ন্ত্রিত করত না। সহধর্ম্মী নিয়ে সম্প্রদায় গড়ে উঠেছে। পৃথিবীর বিভিন্ন অংশ হ'তে একধর্ম্মীর একত্র মিলনে, সামাজিক জীবনে সৌজন্য ও শিষ্টাচার সম্প্রসারিত হয়। বিভিন্ন প্রদেশের লোকের তীর্থ, মিলনক্ষাতিত্ব ও ভ্রাতৃত্ব বন্ধন পুষ্ট করে। ইসলামের হজ্‌ আন্তর্জাতিক মুসলমানের মিলনক্ষেত্র। ভাবের আদান-প্রদানে প্রত্যেক সংহতি উন্নত হয়। স্বধর্ম্মে বিশ্বাস বাড়ে।

গোপুরমের নীচের প্রকাণ্ড কক্ষ ভাগ ক'রে দুটি পথ করা হয়েছে। বলা বাহুল্য এই বিশাল মন্দির ভূমির এমন কোনো প্রাচীর বা স্তম্ভ নাই, যেখানে মূর্ত্তি কিম্বা ফুল, লতা, পাতা, হাতী, ঘোড়ার

চিত্র উৎকীর্ণ হয় নাই। সমুদ্র-মুখ গো-পুরম হ'তে মন্দির প্রাঙ্গণের প্রবেশ পথে দেওয়ালের গায়ে পাথরের মানুষের মূর্ত্তি আছে। একদিকে কলিকালের পুরুষের নারী-সেবার চিত্র। অন্যদিকে সত্যযুগের নারীর পুরুষ-সেবার চিত্র। কলির মানুষ নিজে খর্ব্ব-দেহ। কিন্তু সু-সজ্জিতা নারীকে কাঁধে নিয়ে চলেছে। সত্যযুগের নারী পুরুষের পদ-সেবা করছে। এ সুলভ রসিকতার পরিকল্পনা, দেউলের অনুচ্চ প্রধান শিল্প-উৎসের প্রতিকূল। কোনো ভূপতির রস-প্রিয়তা চরিতার্থের জন্য এ-সব পুতুল খোদাই হয়েছিল। বিশাল মন্দির ও অট্টালিকা শক্ত পাথরের। এই আবৃত মন্দির-ভূমির বিশালতার ধারণা এর প্রথম অলিন্দ পথের পরিমাণ থেকে বুঝতে পারা যায়। গোপুরম ও বাহিরের প্রাচীরের গায়ের একসারি কক্ষের পর এই অলিন্দ পথ। প্রায় বিশফিট চওড়া বারান্দা। এক একদিকে ১০০০ ফিট লম্বা। এই বারান্দায় পার্ব্বতী দেবীর ভোগ-মূর্ত্তির শোভাযাত্রা গর্ভ মন্দিরের মহাদেবকে প্রদক্ষিণ করে। সে শোভাযাত্রায় থাকে পাশাপাশি দুটি প্রকাণ্ড হাতী। তার পিছনে লোক লস্কর বাদ্যকার পুরোহিত দর্শক প্রভৃতি। উচ্চেও অলিন্দ প্রায় পঁচিশ ফিট। একবার প্রদক্ষিণ করলে প্রায় এক মাইল পথ হাঁটা হয়।

এই অলিন্দের সুখ্যাতি বহু শতক পূর্ব্বের পাশ্চাত্য পর্য্যটকদের পুস্তকে প্রচারিত। এর দুদিকের থামের সারি মানুষের শিল্প-চাতুর্য্যের উৎকৃষ্ট নিদর্শন। প্রত্যেক অংশে দক্ষ শিল্পীর নিপুণ হাতে মূর্ত্তি ও চিত্র খোদাই। পূর্ব্বে মাদুরা, শ্রীরঙ্গম প্রভৃতির বর্ণনায় যে সব মূর্ত্তি ও চিত্রের উল্লেখ করেছি, রামেশ্বরমে সেই সব মূর্ত্তি ও চিত্র উৎকীর্ণ। কিন্তু এত বিশালতার মধ্যে, চারু-শিল্পে প্রতি টুকরো সাজিয়ে সমস্ত হর্ম্ম্যের শিল্প-সামঞ্জস্য এবং ওজন রাখা যেমন কঠিন তেমনি নিপুণতা সাপেক্ষ। সামঞ্জস্য সৌন্দর্য্যের প্রাণ—এ ভাবে বিচার করলেও রামেশ্বর মন্দির সুন্দর। হিন্দু স্থাপত্যে সামঞ্জস্যের অভাব—এ সমালোচনা অনেক আধুনিক পাশ্চাত্য গুরুর মুখে শুনতে পাওয়া যায়। কোনো অট্টালিকার একদিক, অন্যদিকের হুবহু অনুরূপ হওয়া উচিত, সৌন্দর্য্যের মাত্র এই লক্ষণ কিনা, সে বিষয়ে সুন্দরের সকল উপাসক একমত নয়! দেশে দেশে যুগে যুগে সুন্দরের বহিরাবরণের রুচি পরিবর্ত্তিত হয়। যে পাশ্চাত্যবাসী হর্ম্ম্যে সিমেট্রী ও সমাবয়ব ছন্দ দেখবার জন্য ব্যস্ত, সঙ্গীতে সেই পাশ্চাত্যবাসী তাল-লয়ে বাঁধা ভারতীয় সঙ্গীতের রস উপভোগ করতে পারে না। তাল লয়ের বজ্র-বাঁধনের কবল হতে মুক্ত সুরই কেবল সঙ্গীত নামের যোগ্য···এ অভিমত যে শিল্প-সমালোচকের, সে-ই আবার অট্টালিকায় ছন্দের বজ্র-বাঁধন না দেখলে তুষ্ট হয় না। মানুষের কৃষ্টি এবং প্রীতিকর প্রভৃতির পার্থক্যে তুষ্টি বিভিন্ন। অনুভূতির পার্থক্যে তুষ্টির উপাদান বিভিন্ন। ভিন্ন রুচির্হি লোকাঃ।

ঐ অলিন্দের বেষ্টনীর মাঝের আরও কয়েকটি দর-দালানে মন্দির বিভক্ত। মাঝে একদিকে পার্ব্বতী দেবীর গর্ভ-মন্দির, অন্যদিকে রামেশ্বর মহাদেবের।

পার্ব্বতী দেবীর নাট-মন্দির প্রকাণ্ড। মহাদেবের নাট-মন্দির ততোধিক বিরাট। বস্তুতঃ এ নাট-মন্দিরগুলি এক একটি হল। গর্ভমন্দিরে দ্বারের দু'পাশে এবং উপরে দিবা-রাত্র অসংখ্য ছোট ছোট প্রদীপ জ্বলে। মন্দিরে অধিষ্ঠিত বিগ্রহ অন্ধকারের ভিতর হ'তে মূর্ত্ত হ'য়ে ওঠেন। এখন সকল দালান বিদ্যুতের আলোকে উদ্ভাসিত। কিন্তু মন্দিরের ভিতর বিজ্‌লী বাতি না দিয়ে কর্ম্মকর্ত্তারা ভাল ব্যবস্থা করেছেন।

পার্ব্বতীকে এঁরা মানবী করেছেন। আমার মনে হয় এঁর মাতৃত্ব ভুলে এরা এঁকে কন্যা ক'রে রেখেছেন। ঘণ্টায় ঘণ্টায় তাঁর বেশ-পরিবর্ত্তন, নবীন ভূষণ, নানাপ্রকার ভোগ, পূজা, আরতি—পূজারীদের কাজ। কবির কথা মনে হয়—

> দেবতারে যাহা দিতে পারি, দিই তাই
> প্রিয় জনে—প্রিয় জনে যাহা দিতে পাই
> তাই দিই দেবতারে; আর পাব কোথা।
> দেবতারে প্রিয় করি, প্রিয়েরে দেবতা।

অবশ্য আমরা নবরাত্রি উৎসবের সময়ে সে দেশে ছিলাম। রাত্রে হাতীরা সেজে, ঘোড়ারা নেচে, সমারোহে দেবীর ভোগ মূর্ত্তির সমৃদ্ধি বাড়ায়। মীনাক্ষী মন্দিরে যেমন মহিলাদের ভিড়, এ মন্দিরেও তেমনি নারী-ভক্তের ভিড়। ভারতীয় নারী—সুতরাং তাদের সঙ্গে ছেলে মেয়ে আছেই।

অনেকের সংশয় হয়, বিশ্ব-শক্তিকে মানুষ ক'রে পূজা করা মানুষের অভিব্যক্তির অনুকূল না প্রতিকূল। হার্ব্বার্ট স্পেনার প্রভৃতি এরূপ পূজাকে মানব-জাতির শিশু-মনের তৃপ্তি ও ভ্রান্তি ব'লেছেন। যাঁরা নিরাকার চৈতন্যের ধ্যানকে মাত্র উপাসনা বলে মানেন, তাঁরা এরকম অ্যানথ্রপমর্‌ফিজম পরিকল্পিত মূর্ত্তি-পূজাকে নিম্ন-শ্রেণীর পুতুল পূজা মনে করেন। অবশ্য দেব-বিগ্রহের পুতুলকে কেহ পূজা করে না—তাকে পরমাত্মা বা বিশ্ব-শক্তির প্রতীক ভেবে লোকে আরাধনা করে। কিন্তু মানুষের চিত্তবৃত্তি, মান-অভিমান, স্নেহ এবং শ্রদ্ধা প্রভৃতি গুণ জড় ক'রে, দেবী পরিকল্পনা, নারীর সাজ, মানুষের প্রিয় ভোগ, পরব্রহ্মের পরা-শক্তির ঢাক-ঢোল বাজিয়ে অর্চ্চনা—আত্মার মুক্তির পথে অগ্র-গতির পরিপন্থী কি না, এ কথা ভাববার।

পূজার একটা আধ্যাত্মিক দিক্‌—নিবেদন। মানুষ জড়িয়ে পড়ে পঞ্চেন্দ্রিয়-লব্ধ অলীক জ্ঞানের মোহে। সদ্‌গন্ধ, মিষ্ট স্বর, সুখ-স্পর্শ উপাদেয় ভোজ্য এবং সুদৃশ্য পদার্থ—যদি বিশ্ব-শক্তিকে প্রত্যর্পণ করা যায়, মানুষ সর্ব্বস্ব দিয়ে নিঃস্ব হতে পারে। বাকী থাকে মাত্র আত্মা। সে শুদ্ধ হয়, নির্ম্মম নিরহঙ্কার হ'য়ে, বিশ্ব-সত্য উদ্বোধনের ভূমি হয়। আমি

সংক্ষেপে বল্লাম—বিশ্ব-শক্তির কাছে নিবেদন মানে ইন্দ্রিয়ের শক্তি নিবেদন। রূপ, রস, শব্দ, স্পর্শ, গন্ধের আধারে শক্তির প্রতীক—দেবীর আরতি হয়।

কিন্তু স্বীকার করি যে এ ভাবে কেহ আরতি দেখে না। বিগ্রহের অলঙ্কার দেখে অতি অল্প লোকই ভাবে, যে সকল রত্নের আকর বিশ্ব-শক্তি—রত্ন তাঁর মায়া-মূর্ত্তির সাজ। এ রত্নে মানুষের চরম প্রয়োজন নাই। তাঁর রচা খেল্না তাঁকে ফিরিয়ে দেবার তাই আয়োজন। আসল কথা বিগ্রহকে প্রাণবন্ত ঈশ্বরী ভেবে ভক্ত তাঁর মাঝে নিজের মাতা বা কন্যার রূপ দেখে। আবার কবির কথায় বলি। তিনি "বৈষ্ণব-কবিতা"য় বলেছিলেন—

এ গীত-উৎসব মাঝে
শুধু তিনি আর ভক্ত নির্জ্জনে বিরাজে ;
দাঁড়ায়ে বাহির-দ্বারে মোরা নরনারী
উৎসুক শ্রবণ-পাতি শুনি যদি তারি
দুয়েকটি তান—দূর হ'তে তাই শুনে
তরুণ বসন্তে যদি নবীন ফাল্গুনে
অন্তর পুলকি উঠে ; শুনি সেই সুর
সহসা দেখিতে পাই দ্বিগুণ মধুর—
আমাদের ধরা ;······ইত্যাদি।

ভক্ত নিজের প্রিয়জনকে দেখে বিগ্রহে—এ-কথা অস্বীকার কর্‌বার উপায় নাই এবং বিগ্রহের প্রতি ভক্তি গাঢ় হ'লে, প্রথমে প্রিয়জনের মাঝে, পরে বিশ্বে, ইষ্টদেবতার সান্নিধ্য উপলব্ধি করে। সে জনে জনে ঈশ্বর দেখে। দেবতাকে মানুষের মত ক'রে অর্চনার অনিবার্য ফল ভক্তি।

মানুষের শিশু-আত্মা খেলা চায়। সে নাচ্‌তে চায়, গাহিতে চায়। সে শোভাযাত্রা চায়, বীরপূজা চায়। প্রত্যেক সমাজে এমন শিশু-আত্মা চিরদিন বিদ্যমান। মহিলার কোমর ধরে হুলা হুলা নৃত্য অপেক্ষা—বল মাধাই মধুর স্বরে—ব'লে নৃত্য করা, ব্যায়াম এবং সামাজিক ও নৈতিক ভাবের পুষ্টি হিসাবে ভাল। মানুষ-মারা—বীর রোমক সেনাপতির দন্তের শোভাযাত্রা, ট্রায়াম্ফের, পৃথিবীর ইতিহাসে এখন আর স্থান নাই। কারণ সে মিথ্যা। সে দন্তের জয়যাত্রা। কিন্তু কাঠের পাথরের বা মাটির, দেবতা-আত্মা-সঞ্চারিত পুতুল নিয়ে শোভাযাত্রা, সেই রোমেই আজিও বিদ্যমান। কারণ প্রথমটা নিছক তামসিক, আর শেষোক্তটি সত্ত্বজ্ঞানের উদ্বোধক। সভ্যতার যে বিষ আজ হিট্‌লার—মুসোলিনী—টোজো ছড়িয়েছে, সে সভ্যতার উপর মানুষ বিশ্বাস হারিয়েছে। ছেলে-খেলা নিয়ে মানুষ ভুলে থাক্‌বেই। ট্যাঙ্ক, ডিনামাইট আর বিষ-বায়ু নিয়ে খেলা করা অপেক্ষা টোটেম, ঠাকুর এবং তাজিয়া নিয়ে খেলা, অন্ততঃ সমাজকে রুধির-সিক্ত পথ হ'তে সরিয়ে রাখে।

আমার মতে মানুষের আদর্শে ঠাকুর পূজায়—চিত্তশুদ্ধি হয় সোজা সরল পথে। যে মার্গের চরম প্রান্তে ভক্তি, তুচ্ছ ছেলে-মেয়ের প্রতি ভালবাসা সেই পথেরই গোড়ায়। স্বামী-স্ত্রীর প্রেমের প্রথম অবস্থায় কামনা থাকে সত্য। কিন্তু ক্রমে সে প্রেম ভগবদ্‌প্রেমের পথে মানুষকে নিয়ে যায়। তাই রাধা-কৃষ্ণের প্রেমের মন্দিরে অর্ঘ্য দিয়ে কোটি কোটি জীব মোক্ষ লাভ করেছে। বিল্বমঙ্গলের প্রেম প্রথম কলুষিত ছিল। কিন্তু প্রেম প্রেম। তার শেষ মুক্তি। আমি জগন্নাথদেবের মন্দিরে ভক্তিমতী মহিলাকে তাঁর সঙ্গে গল্প করতে শুনেছি। যেন প্রাণবন্ত প্রিয়জনের সঙ্গে আন্তরিক কথা। কিন্তু শেষ ভিক্ষা—"আমায় চরণে স্থান দিও ভগবান।" ধীরে ধীরে এ মনোবৃত্তি জন্মানো অনিবার্য্য। যে যাকে ভালবাসে সে তাকে খাওয়ায়, সাজায়, কোলে ক'রে নিয়ে যায়। এতে চিত্ত শুদ্ধ হয়, প্রেম ক্রমে শুদ্ধ ভক্তিতে পরিণত হয়। ক্রমশঃ প্রেম আত্ম-প্রতিষ্ঠা ক'রে নিজের মধুর রসে আপনি মজে—অকৈতব ভক্তি মানব হৃদয়কে উন্নত ও সম্প্রসারিত ক'রে, ভক্তকে অনন্তের পথে পৌঁছে দেয়।

(আগামী বারে শেষ)

ঐশ্বর্য্য

শ্রীঅশ্বিনীকুমার পাল এম্-এ

তুমি মোরে দিও শুধু স্থান
ওই তব আসনের তলে,
জীবনের মান অভিমান
ভেসে যাক নয়নের জলে।

যা কিছু আমার বলে জানি
ধন মান ঐশ্বর্য্য বৈভব,
কেড়ে লও সব তুমি রাণী
চূর্ণ করি' অর্থ-কলরব।

সর্ব্বশূন্য মোরে শেষে তুমি
পূর্ণ করো তব প্রেমদানে,
অধর-অমৃত-তল চুমি'
অন্তর-ঐশ্বর্য্য ঢালো প্রাণে

বিয়ের রাতে

শ্রীজনরঞ্জন রায়

বিয়ের রাতে বিশ বোতল খাবো…মেয়ের বিয়ে তাতে না হয় আমার বড়ই এলো-গেল।

পাত্র বিলেত-ফেরতা, মাতলামি দেখিয়াছে অনেক। মদ খাওয়াটাকে সে দোষের মধ্যেই গণ্য করে না। সে চায় সুন্দরী পাশ-করা আপ্-টু-ডেট্ মেয়ে। তাহা যখন মিলিয়াছে তখন শ্বশুর যেই হোক না কেন। তাহার বিলাতী মেজাজ ঠিকই আছে। মেয়ের বাপের কথায় সে মোটেই ঘাবড়াইল না। তবে তাহার আত্মীয় দল কিছু ঘোঁট পাকাইয়া তুলিয়াছে।

পাত্রটি বিলাতী স্বপ্নে দিশেহারা হইয়া পড়িয়াছে। মেয়ের দাদুর ঘটকালিতে সে মেয়েটিকে কলেজে যাইবার পথে দুই তিনবার দেখিয়াছে। কিন্তু তাহার উপর নির্ভর করিয়া কি সভ্য-লোকের ম্যারেজ হইতে পারে? কোনো কোর্টসিপ্ হইল না… তাহার হৃদয়ের সঙ্গে পরিচয়ই হইল না—এ কি! সে যেন নিজের কাছে নিজে ছোট হইয়া পড়িতেছিল। তাই সকালে উঠিয়া কনের বাড়ি যাইতে সে বাসে উঠিল। প্রজাপতি বা রতিপতি—যিনিই ছোক্‌রাকে টানিয়া থাকুন তিনি যে খুব পাকা লোক তাহা আমাদের স্বীকার করিতেই হইবে।

এইরূপ হঠাৎ পাত্রের আবির্ভাব কালে রঙ্গমঞ্চে চারিজন নট-নটীকে দেখা গেল। এক—মেয়ে, দুই—মেয়ের বাপ, তিন—মেয়ের মা, চার—মেয়ের পাতানো দাদু। দাদুর পরিচয়—তিনি পাড়ার একজন প্রবীণ জানাশোনা লোক। শুধু পাড়ার নয়, যেন দেশশুদ্ধ ছোটবড় লোকের সঙ্গেই তাঁহার পরিচয়। এই মেয়েটি তাঁহার নাতনীর সহিত কলেজে পড়ে, দুইজনে কাশ্মীর-স্বপ্ন পাতাইয়াছে। তাই দাদুর এত প্রিয় পাত্রী। মেয়েটিকে সঙ্গে নিয়া তাহার পছন্দ-মত দুই চারিটা সাজসজ্জার জিনিষ কিনিতে তিনি বাহির হইতে ছিলেন এমন সময় সিঁড়ির কাছে পাত্রটি দেখা দিল! চকিতের মধ্যে পাত্রীটি উইংস্ অর্থাৎ পাশের দরজা দিয়া অন্তরালে প্রস্থান করিল। দাদু তাহাকে আপ্যায়িত করিয়া আনিয়া সোফায় বসাইলেন। পাত্রীর মা চা-জলখাবার পাঠাইবার জন্য বেয়ারাকে ডাকাডাকি করিতে লাগিলেন। পাত্রীর বাপ যিনি গত রাত্রে এই বিবাহের যৌতুকাদির ফর্দ্দ নিয়া উপরোক্ত বাকী তিন নট নটীর মুণ্ডপাত শুধু বাকী রাখিয়াছিলেন এবং শেষে রণক্লান্তি অপনোদনের জন্য অজ্ঞান প্রাপ্তি পর্য্যন্ত বোতল সেবার পর সদ্য একটু জাগিয়া উঠিয়াছেন, তিনি নীচের এই সোরগোল শুনিয়া বুঝিলেন সবকিছু যোগসাজোস্। অর্থাৎ ছোকরাকে ইহারাই আনিয়া ফেলিয়াছে। তাহাতে তাঁহার মন সুতিক্ত হইয়া উঠিল এবং পাত্রের পর পাত্র গলাধঃকরণ করিতে লাগিলেন। তীব্র রসের ক্রিয়া হইতে বিলম্ব হইল না। ত্রিতল হইতে তাঁহার জড়িত কণ্ঠ বেশ উচ্চ গ্রামে শোনা যাইতে লাগিল—চোপরাও শা…আমার কাছ থেকে নেবে! কেউ আমায় দিয়েছে—বাপ, দাদা, শ্বশুর—কেউ?… আমি জোচ্চোর—মাতাল…। পরিবার ঘেন্না করে…মেয়ে ঘেন্না করে। সুখী…একটা মেয়ে…আমার বাড়িতে সুখী?…চোপ্‌রাও…

পাত্র ছোকরা যদিও শুনিয়াছিল তাহার শ্বশুর তাহার বিবাহের রাত্রে বিশ বোতল মদ খাইবে বলিয়াছে কিন্তু আজ শ্বশুরের অভিনয়ের এই দাপট্‌টা তাহার মাথা ঘুরাইয়া দিল। বেচারার কোর্টসিপের স্বপ্ন মাথায় উঠিয়া গেল। চোখমুখ লাল হইয়া উঠিল। দাদু পাকা লোক। চট্ করিয়া তিনি উঠিয়া গেলেন। নেপথ্যে গিয়া দেখিলেন মেয়েটির গোলাপী চোখ দুইটি দিয়া মুক্তার প্লাবন বহিতেছে। দাদু গিয়া বলিলেন—কলেজে এক্টিং কোরে না-কি মেডেল্ পেয়েছ…আজ এক্টিংয়ে যদি হাত দেখাতে পারো তবে মুক্তোর সেলি প্রেজেণ্ট কোরবো। ঐ ছোক্‌রা লভ কোরতে এসেছে। ছুটে গিয়ে তার বুকের ওপর পড়তে হবে। গলা জড়িয়ে ধরে গালে গাল রেখে বল্‌তে হবে। কি বলতে হবে তা'ও বোলে দেবো নাকি! তাহার পর গভীর কণ্ঠে দাদু বলিলেন—যা-যা-দিদি… ছোক্‌রা যে উঠে চলে যায়, এখনো যদি আট্‌কাতে পারিস্ চেষ্টা কোরে দেখ্—আর এমন পাত্র যে মিলবে না কোনো দিন…

ওদিকে পাত্রটির রূপগুণে সে যে তাহাকে প্রাণ দিয়া বসিয়াছে। সে বলিল—কিন্তু দাদু যদি সে…

দাদু তাহাকে ঠেলিয়া দিয়া বলিলেন—মুনির ধ্যান ভেঙে যায়… সে তো সে। নেই…আর তুই তো বাগদত্তা বিট্রোথড্…

মেয়েটি পাগলের মতোই ঘরে গিয়া ঢুকিল। তাহার পর এত জোরে কাঁদিয়া ফেলিল যে সব কথা তাহার বলাই হইল না… দু'জনের স্পর্শে দু'জনেই বিভোর হইয়া গিয়াছে। সম্বিৎ ফিরিয়া পাইলে সে বুঝিতে পারিল ছেলেটির বুকের উপরে সে পড়িয়া আছে। তাহার বাহুবন্ধন ছাড়াইয়া দারুণ লজ্জায় সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িল। মাই ডার্লিং—মাই ফিয়াসে বলিয়া ছোকরাটি আবার হাত বাড়াইতেছিল। কিন্তু দাদু আর এ অভিনয় বড় করিতে দিলেন না। কারণ ওদিকে মেয়ের বাপের স্বর আবার সপ্তমে উঠিয়াছে।

একটু কাশিয়া দাদু ছোট করিয়া বলিলেন—আমি কি আসতে পারি? দুইজনেই হাসিয়া উঠিল। যুবকটি তাড়াতাড়ি দাদুর কাছে আসিল। তাহার সঙ্গে দাদুও বাহির হইয়া পড়িলেন।

ঠিক দিনের দিনই বিবাহ হইয়া গেল অর্থাৎ পুরোহিত মন্ত্র পড়িলেন, কোনো মতে স্ত্রী-আচার ও সিন্দূর দান সারিয়া সকলে নিঃশব্দে বাসর ঘরে চলিয়া গেল। পাত্রীর বাপ সাক্ষীর মতো বসিয়াই রহিল—মন্ত্রও পড়িল না, দানও করিল না। বিবাহ শেষে তাহার দুইটি বন্ধু তাহাকে ধরিয়া উপরে নিয়া যাইতে যাইতে বলিল—খবরদার বে-এক্তার হবে না…লোক খাওয়ানোর সব কাজটাজ আমরাই সেরে নিচ্ছি।

সকলেরই মনে হইল রাতটা বুঝি ভালয় ভালয় কাটিবে। কিন্তু মেয়েটি উৎকর্ণ হইয়া আছে। তাহার স্বামী কতই বলিয়া যাইতেছে—হনিমুনের রাতে তুমি হতাশ কোরছ কেন ডার্লিং… তাহার কথা যেন ফুরায় না। কিন্তু মেয়েটির কান পড়িয়া আছে উপর তলায় বাপের সোডার বোতলের আওয়াজের দিকে।

রাত্রি বেশী নাই, সকলেই ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু বাসর ঘরে লাথির পর লাথির শব্দে সবাই জাগিয়া উঠিল। পাত্রীর বাপ জড়িত স্বরে বলিতেছে—খুন কোরবো শা…সুখী হবে…

পাত্রটি সাবলীল ভঙ্গিতে মাথা খাড়া করিয়া দাঁড়াইল। তখনি একটা পড়িয়া যাওয়ার শব্দ পাইয়া সে দরজা খুলিয়া বাহির হইল। তাহার শ্বশুর পা টলিয়া পড়িয়া গিয়াছে। মাথাটায় খুব লাগিয়াছে। তবুও গোঙাইয়া বলিতেছে—চো-প-রা-ও…

বৈদিক-দর্শনে একবাক্যতা

শ্রীঅশোকনাথ শাস্ত্রী

মহর্ষি বাদরায়ণ-বিরচিত 'ব্রহ্মসূত্র' ব্রহ্মতত্ত্ব-প্রতিপাদক। এই ব্রহ্মের স্বরূপ কি তাহা জানিতে হইলে ব্রহ্মসূত্রের সমগ্র প্রথম অধ্যায় ও দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম ও দ্বিতীয় পাদের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ বিশেষ প্রয়োজন। প্রথম অধ্যায়ের প্রথম পাদের প্রথম সূত্র ("অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা"—ব্রঃ সূঃ ১।১।১) হইতে আরম্ভ করিয়া দ্বিতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদের অন্তিম সূত্র ("বিপ্রতিষেধাচ্চ"—ব্রঃ সূঃ ২।২।৪৫) পর্য্যন্ত যথারীতি আলোচনা করিলে উপলব্ধি হয় যে এই ব্রহ্ম "একমেবাদ্বিতীয়ম্"—আত্মা হইতে অভিন্ন—অদ্বৈত-স্বরূপ। এই অদ্বৈত ব্রহ্মাত্মৈক্য-বিজ্ঞানের অপরোক্ষ অনুভূতির তিনটি সাধন—শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন। বৃহদারণ্যক উপনিষদে (অঃ ২। ব্রাঃ ৪। খঃ ৫) আত্মদর্শনের উপায়-স্বরূপে এই শ্রবণ-মনন-নিদিধ্যাসন প্রক্রিয়া তিনটি উপদিষ্ট হইয়াছে(১)। 'শ্রবণ' বলিতে বুঝায়—গুরুমুখ হইতে শ্রুতির 'তত্ত্বমসি' প্রভৃতি অদ্বৈততত্ত্ব-প্রতিপাদক মহাবাক্যবলীর শ্রবণ। উক্তরূপে শ্রুত উপনিষদ্-বাক্যগুলির যুক্তিদ্বারা অর্থ-বিচারই 'মনন'। আর শ্রুত বেদান্তবাক্যের(২) অদ্বৈততত্ত্ব সম্বন্ধে মনন-দ্বারা নিঃসন্দেহ হইয়া তদ্বিষয়ে একাগ্রচিত্তে ধ্যানাবলম্বনই 'নিদিধ্যাসন'। এই ত্রিবিধ সাধন অভ্যাস-দ্বারা দৃঢ়তা প্রাপ্ত হইলে অদ্বৈত ব্রহ্মাত্মতত্ত্বের সাক্ষাৎকার মুমুক্ষু সাধকের পক্ষে সম্ভব হইয়া থাকে। এই অপরোক্ষ অদ্বৈত ব্রহ্মাত্মৈক্য-বিজ্ঞান বা ব্রহ্মাত্মতত্ত্ব-সাক্ষাৎকার পুরুষতন্ত্র নহে; অর্থাৎ—উহা কোন পুরুষ-কর্ত্তৃক স্বেচ্ছাবশে উৎপাদিত হইতে পারে না—অথবা, শ্রুতিপ্রমাণ ও শ্রুতিদ্বারা অনুগৃহীত তর্ক ব্যতীত কেবল স্বতন্ত্র তর্ক-দ্বারাও উক্ত অপরোক্ষ বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠা হওয়া সম্ভব নহে।

মহাভারতের শান্তি-পর্ব্বে পঞ্চবিধ স্বতন্ত্র জ্ঞান-ধারার পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে—(ক) সাংখ্য, (খ) যোগ, (গ) পাঞ্চরাত্র, (ঘ) বেদ ও (ঙ) পাশুপত সম্প্রদায়(৩)। ইহাদিগের মধ্যে তৃতীয় স্বতন্ত্র সম্প্রদায় 'বেদ'ই অদ্বৈত-দর্শন-সম্প্রদায়ের ভিত্তিস্বরূপ।

কিন্তু শুধু মুখেই ইহা বলিলে ত চলিবে না। কারণ মহর্ষি কপিলের মতাবলম্বিগণ বলিয়া থাকেন যে কাপিল-সাংখ্য-দর্শনও বেদমূলক। আবার ভগবান্ পতঞ্জলির ভক্তগণ বলেন যে পাতঞ্জল-যোগদর্শনও বৈদিক শাস্ত্র(৪)। ওদিকে পাঞ্চরাত্র আগমে অনুসারিগণ ও পাশুপত-মতানুগামিগণও নিজ নিজ সম্প্রদায়কে ঠিক বেদমূলক না বলিলেও বেদের অবিরোধী বলিয়া প্রতিপাদনের চেষ্টা করিয়া থাকেন। তাহা যদি হয়, তাহা হইলে বিচার করিয়া দেখা উচিত—এই সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে কোন্‌টি যথার্থ বেদানুগত ও কোন্‌গুলি নহে।

সাংখ্য-যোগ-পাঞ্চরাত্র-পাশুপত—এই চারিটি দর্শন-সম্প্রদায়ের প্রত্যেকটিই সর্ব্বতোভাবে বেদানুগত হইতে পারে না। কারণ—প্রথমতঃ, এই সম্প্রদায় চারিটি পরস্পর বিরোধী; অতএব উহাদিগের কোনটি যদি বেদমূলক হয়, তবে অপরগুলি আর বেদমূলক হইতেই পারে না। দ্বিতীয়তঃ, এই চারিটি সম্প্রদায়ের কোনটিই যথার্থ বেদানুসারী নহে; যেহেতু উহাদিগের প্রত্যেক সম্প্রদায়টিই কোন কোন বিশিষ্ট সিদ্ধান্ত-বিষয়ে বেদবিরোধী মত পোষণ করিয়া থাকে। এই কারণে পাঞ্চরাত্রাগমের অনুসারিগণ ইহা স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন যে, পাঞ্চরাত্র-সিদ্ধান্ত ও বৈদিক সিদ্ধান্ত-সমূহের মধ্যে সর্ব্ববিষয়ে ঐক্য অসম্ভব—তবে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে কোন কোন অবান্তর বিষয়ে আংশিক সাম্যনিবন্ধন কোনরূপে একটি একবাক্যতা স্থাপন করা সম্ভব।

কিন্তু অদ্বৈতদর্শন-সম্প্রদায়ের আচার্য্যগণ এইরূপ প্রণালীতে এক-বাক্যতা-করণের বিরোধী। দুইটি দর্শন-সম্প্রদায়ে মূল সিদ্ধান্তগুলির অনৈক্য থাকা সত্ত্বেও কয়েকটি মাত্র অবান্তর বিষয়ে আংশিক সাম্যবশতঃ কোনওরূপে একবাক্যতা স্থাপন করা একবাক্যতার রীতিবিরুদ্ধ। যদি দুইটি সম্প্রদায়ের মূল ও অধিকতর মূল্যবান্ সিদ্ধান্তগুলিতে সাম্য থাকে (কেবল অবান্তর সিদ্ধান্তগুলির ঐক্য থাকিলেই চলিবে না), তাহা হইলে বরং একবাক্যতা করা সম্ভব। এই একবাক্যতার পদ্ধতি ব্রহ্মসূত্রের "তৎ তু সমন্বয়াৎ" (ব্রঃ সূঃ ১।১।৪) ও "গতিসামান্যাৎ" (ব্রঃ সূ. ১।১।১০) সূত্রদ্বয়ে(৫) স্বয়ং মহর্ষি বাদরায়ণ-কর্ত্তৃক সূচিত হইয়াছে। এই 'সমন্বয়' ও 'গতি-সামান্য' ন্যায়ানুসারে বিচার করিলে দেখা যাইবে যে, একদিকে সাংখ্য-যোগ-পাঞ্চরাত্র-পাশুপত ও অপর দিকে বেদ—এই উভয় শ্রেণীর চিন্তাধারার মধ্যে সর্ব্বতোভাবে সামঞ্জস্য বিধান অসম্ভব। কারণ, মহাভারতের পূর্ব্বোক্ত কারিকাটিতে উক্ত হইয়াছে যে, জ্ঞানধারা পাঁচ প্রকার—(ক) সাংখ্য, (খ) যোগ, (গ) পাঞ্চরাত্র, (ঘ) বেদ ও (ঙ) পাশুপত; আর এই পঞ্চ জ্ঞান-সম্প্রদায় পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী—বিভিন্নমতাবলম্বী ('নানামতানি জ্ঞানানি')। অতএব, ইহাদিগের একটি সম্প্রদায় (বেদ) অপর চারিটির সাধারণ মূল উৎস হইতে পারে না; হইলে বলা উচিত ছিল—সাংখ্য-যোগ-পাঞ্চরাত্র-পাশুপত—এই চারিটি দর্শন-সম্প্রদায়ই বেদমূলক।

---

(১) ইহাই আত্মজ্ঞান ও তাহার ফলভূত অমৃতত্বের প্রার্থিনী নিজ উপযুক্ত সহধর্ম্মিণী মৈত্রেয়ীর প্রতি ব্রহ্মিষ্ঠ ঋষি যাজ্ঞবল্ক্যের সুপ্রসিদ্ধ উক্তি—'আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ" ইত্যাদি (বৃহঃ উপঃ ২।৪।৫ ও ৪।৫।৬)।

(২) 'বেদান্ত'-শব্দের আক্ষরিক ও মুখ্য অর্থ—উপনিষদ্। উপনিষদ্ বেদের অন্ত (অর্থাৎ—পরিশিষ্টাংশ ও সারভাগ—উভয়ই বটে)। 'বেদান্ত'-শব্দের গৌণ অর্থ বেদান্ত-দর্শন বা ব্রহ্মসূত্র ও উহার ভাষ্য-টীকা-প্রকরণ-গ্রন্থাদি।

(৩) "সাংখ্যং যোগঃ পাঞ্চরাত্রং বেদাঃ পাশুপতন্তথা।
জ্ঞানান্যেতানি রাজর্ষে বিদ্ধি নানামতানি বৈ"॥—মহাভারত,
শান্তি-পর্ব্ব, অঃ ৩৪৯ শ্লোক ৬৪, বঙ্গবাসী সংস্করণ।

(৪) "তৎ কারণং সাংখ্যযোগাধিগম্যম্"—শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্ (৬।১৩), ইত্যাদি বহুবিধ বচন। শ্বেতাশ্বতরের দ্বিতীয় অধ্যায়ে যোগ-সম্বন্ধে নানা কথা আছে।

(৫) "তৎ তু সমন্বয়াৎ"—এই অধিকরণের সারাংশ হইতেছে এই যে, সকল বেদান্তবাক্য (অর্থাৎ—উপনিষদের বচন) একবাক্যে ব্রহ্মে সমন্বিত (অর্থাৎ—বিভিন্ন উপনিষদের বিভিন্ন উক্তি একবাক্যে ব্রহ্মকেই পরমতত্ত্ব-রূপে প্রতিপাদন করে)। "গতিসামান্যাৎ"—এই অধিকরণের মূল বক্তব্য এই যে, সকল বেদান্তবাক্য একবাক্যে এক চেতন তত্ত্বকেই পরম কারণ বলিয়া স্বীকার করে; এই কারণে বলা যায়, সকল বেদান্ত-বাক্যেরই গতি (অর্থাৎ—চরম উদ্দেশ্য) একরূপ (সমান = সাধারণ)। বিভিন্ন উপনিষদে সৃষ্টিক্রম, ব্রহ্মপ্রাপ্তির উপায়ভূত সাধন প্রভৃতি বিষয়ে অবান্তর ভেদ দৃষ্ট হইলেও উপেয় ব্রহ্ম সম্বন্ধে কোন ভেদ দৃষ্ট হয় না। উপায়ভূত সাধনাদি ব্যাবহারিক—উহাদের ভেদ বা বৈচিত্র্য থাকাই স্বাভাবিক; কিন্তু উপেয় ব্রহ্ম পরমার্থ সত্য—উহা এক অখণ্ড স্বরূপ—উহাতে কোন ভেদ থাকিতে পারে না। এইরূপে ভেদের মধ্য দিয়া অভেদের প্রতিষ্ঠাই বৈদিকদর্শনোক্ত একবাক্যতা-ন্যায়ের মূল উদ্দেশ্য।

মহাভারত শান্তি-পর্ব্বের কারিকাটি দর্শনে এই যে সিদ্ধান্তে অনায়াসে উপনীত হওয়া যায়, তাহার সমর্থন পাওয়া যায় ব্রহ্মসূত্রের দ্বিতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদে। উক্ত স্থলে সাংখ্য-যোগ-পাঞ্চরাত্র-পাশুপত এই চারিটি দর্শন-সম্প্রদায়ের বেদবিরোধী সিদ্ধান্তসমূহ খণ্ডিত হইয়াছে। ইহাতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, ব্রহ্মসূত্রকার উক্ত সম্প্রদায়-চতুষ্টয়ের বেদবৎ সর্ব্বাংশে প্রামাণ্য স্বীকার করেন না। পক্ষান্তরে শাস্ত্রযোনিত্বাধিকরণে ব্রহ্ম-সূত্রকার দেখাইয়াছেন যে, ব্রহ্মের অস্তিত্ব-নিরূপণ একমাত্র বেদপ্রমাণ-দ্বারাই করা সম্ভব ; আর সমন্বয়াধিকরণে(৬) প্রদর্শিত হইয়াছে যে, সকল উপনিষদের উক্তি একবাক্যে ব্রহ্মকেই একমাত্র পরমতত্ত্বরূপে লক্ষ্য করিয়া বর্ত্তমান আছে। ইহা হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, বাদরায়ণ-কৃত ব্রহ্মসূত্র বা বেদান্ত-দর্শন একমাত্র বেদেরই অনুসরণে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে—সাংখ্যযোগ—পাঞ্চরাত্র-পাশুপত-দর্শন সম্প্রদায়গুলির সমর্থন ইহাতে নাই।

পূর্ব্বোক্ত পঞ্চবিধ চিন্তাধারার মধ্যে বেদ একদিকে একাকী বর্ত্তমান ও অপরদিকে অবশিষ্ট চারিটি সম্প্রদায়—সাংখ্য-যোগ-পাঞ্চরাত্র-পাশুপত। এই উভয় শ্রেণীর মধ্যে মূল পার্থক্য কোথায় তাহা ঈষৎ অনুসন্ধান করিয়া দেখিলেই বুঝা যায়। প্রথম শ্রেণীভুক্ত বেদ অপৌরুষেয় জ্ঞানের আকর, অর্থাৎ—উহা কোন শরীরী পুরুষ-কর্ত্তৃক কোন দিন রচিত হয় নাই। পক্ষান্তরে সাংখ্যজ্ঞানের প্রথম প্রবর্ত্তক মহর্ষি কপিল—স্বয়ং হিরণ্যগর্ভ (কার্য্য ব্রহ্ম) যোগসম্প্রদায়ের আদি বক্তা ও ভগবান পতঞ্জলি উহার অনুশাসন-কর্ত্তা—পাঞ্চরাত্রাগমের আদি কর্ত্তা হয়শীর্ষ (বিষ্ণু) ও নারদাদি উহার ব্যাখ্যাতা—আর পাশুপত শৈবাগমের মূল বক্তা স্বয়ং শিব (সগুণ ঈশ্বর) ও অভিনব গুপ্ত-শ্রীকণ্ঠ শিবাচার্য্য প্রভৃতি ইহার পরবর্ত্তী প্রচারক। কপিল, হিরণ্যগর্ভ, বিষ্ণু ও শিব—ইঁহারা সকলেই শরীরী পুরুষ—নির্বিশেষ স্বপ্রকাশ চেতনস্বরূপ মাত্র নহেন। অতএব, ইঁহাদিগের প্রবর্ত্তিত শাস্ত্রকে অপৌরুষেয় বলা চলে না। বেদ নিত্য স্বতঃসিদ্ধ প্রমাণ, যেহেতু ইহা পুরুষ-মতি-প্রভব নহে—নিত্যসিদ্ধ স্বপ্রকাশ জ্ঞানস্বরূপ পরমাত্মার বাঙ্ময়ী মূর্ত্তি মাত্র। আর সাংখ্য-যোগাদি শাস্ত্র কপিল-হিরণ্য-গর্ভাদি পশ্চিমসিদ্ধ পুরুষের বুদ্ধিপ্রসূত—অতএব, স্বতঃসিদ্ধ স্বপ্রকাশ জ্ঞানের আকর হইতেই পারে না। বেদের প্রামাণ্য কোন পশ্চিমসিদ্ধ পুরুষের প্রামাণ্যের উপর নির্ভর করে না—কিন্তু সাংখ্যাদি শাস্ত্রের প্রামাণ্য এইরূপ পুরুষের মাহাত্ম্যের উপর নির্ভর করিয়াই প্রচারিত হইয়াছে। আবার সাংখ্য-যোগ-পাঞ্চরাত্র-পাশুপত সম্প্রদায়-চতুষ্টয়ের প্রত্যেকটিই নিজ নিজ সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তক সিদ্ধ পুরুষের প্রামাণ্যকেই সর্ব্বোত্তম বলিয়া দাবী করিয়া থাকেন, অথচ কোন সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তকের সিদ্ধান্তগুলি অপরসের সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তকদিগের সিদ্ধান্তসমূহের সহিত সর্ব্বাংশে বা সর্ব্বতোভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ নহে ; অর্থাৎ—এক কথায়—এই সকল চিন্তাধারা অন্ততঃ আংশিকভাবেও পরস্পর বিরোধী বিভিন্ন প্রস্থান। মহাভারতের উক্ত কারিকাটিতে 'নানামতানি' পদটি দ্বারা এই বিষয়টিই সূচিত হইয়াছে। এরূপ অবস্থায় কোন একটি সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তক সিদ্ধপুরুষ ও তৎপ্রবর্ত্তিত সম্প্রদায়টির পরিপূর্ণ প্রামাণ্য স্বীকার করিলে অবশিষ্ট তিনটি সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক সিদ্ধপুরুষগণের সম্পূর্ণ না হউক অন্ততঃ আংশিক অপ্রামাণ্য স্বীকার করা ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। আর তাহা হইলে তত্তৎ পুরুষ-প্রবর্ত্তিত দর্শন-সম্প্রদায়গুলিরও আংশিক অপ্রামাণ্য আপনা হইতেই আসিয়া পড়ে।

সাংখ্য-যোগ-পাঞ্চরাত্র-পাশুপত সম্প্রদায়-চতুষ্টয়ের এইরূপ মতানৈক্যের ফলে উহাদিগের মধ্যে যথার্থ একবাক্যতা করা অসম্ভব। যদি কোন সম্প্রদায়ের কোন বিশিষ্ট-বিষয়ক সিদ্ধান্তকে মুখ্য স্থান প্রদান-পূর্ব্বক অপর সম্প্রদায়গুলির অনুরূপ বিষয়ঘটিত সিদ্ধান্তগুলিকে গৌণ স্থান দিয়া সম্প্রদায়গুলির মধ্যে এক-বাক্যতা স্থাপনের চেষ্টা করা যায়, তাহা হইলে যে যে সম্প্রদায়ের সিদ্ধান্তগুলিকে গৌণ স্থান প্রদত্ত হইবে সেই সকল সম্প্রদায়ভুক্ত চিন্তাশীল মনীষিগণ কখনও আপনাদিগের এই অযথা অপমান বিনা বিচারে স্বীকার করিতে চাহিবেন না ; বরং যে সম্প্রদায়টির সিদ্ধান্তকে মুখ্য স্থান প্রদত্ত হইবে তাহার মতবাদ-খণ্ডনে প্রবৃত্ত হইবেন। পক্ষান্তরে, বৈদিক দর্শন-সম্প্রদায়কে এই মুখ্য আসন প্রদত্ত হইলে অপর চারিটি সম্প্রদায়ের আপত্তি করিবার কিছুই থাকিতে পারে না। কারণ, বেদের মুখ্য প্রামাণ্য স্বীকার না করিয়া কোন আস্তিক আর্য্য-দর্শন-সম্প্রদায়ের উপায়ান্তর নাই। শারীরক-মীমাংসা-দর্শনে মহর্ষি বাদরায়ণ এই বিষয়টিই পরিষ্কাররূপে বুঝাইয়াছেন। একমাত্র অপৌরুষেয় বেদেরই সর্ব্ববিষয়ে মুখ্য প্রামাণ্য—আর বেদের অবিরোধী অংশে পৌরুষেয় সাংখ্য-যোগাদি সম্প্রদায়ের গৌণ প্রামাণ্য ; পক্ষান্তরে, সাংখ্যাদি শাস্ত্রের যে যে অংশ বেদবিরোধী, তাহা অপ্রমাণ বলিয়া শিষ্টগণের উপেক্ষার যোগ্য। এই প্রসঙ্গে ইহা বক্তব্য যে বাদরায়ণের ব্রহ্মতত্ত্ব-প্রতিপাদক বেদান্ত-দর্শন বা ব্রহ্মসূত্র খাঁটি বৈদিক দর্শন বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। কারণ, ব্রহ্মসূত্র প্রতিপাদন করিতে চাহেন যে, শ্রুতিবাক্য-মাত্রই এক ব্রহ্মকে পরমতত্ত্বরূপে লক্ষ্য করিতেছে। বাদরায়ণের বেদান্ত-দর্শন স্বতন্ত্রভাবে কোন নূতন তত্ত্ব প্রতিষ্ঠার প্রয়াসী নহেন। ইহাতে কেবল ইহাই প্রদর্শিত হইয়াছে যে, একমাত্র বেদই সকল মৌলিক তত্ত্বের স্বতন্ত্র উৎস-স্বরূপ—বেদান্ত-দর্শন শ্রুতিবাক্যের দার্শনিক ব্যাখ্যা মাত্র ; অর্থাৎ—বেদই স্বতন্ত্র জ্ঞান-সম্প্রদায়—আর ব্রহ্মসূত্র এই স্বতন্ত্র বৈদিক দর্শনের প্রথম ঋষিপ্রণীত ভাষ্য।

এই প্রসঙ্গে পুনরায় প্রশ্ন উঠিতে পারে যে বাদরায়ণের বেদান্ত দর্শন যদি বৈদিক দর্শনরূপে পরিগণিত হইতে পারে, তাহা হইলে সাংখ্য-যোগাদি দর্শনও বৈদিক দর্শনরূপে গণ্য হইবে না কেন? কারণ, সাংখ্যাদি দর্শনও শ্রুতির প্রামাণ্য স্বীকার করেন—এমন কি নিজ নিজ সিদ্ধান্ত সমর্থন করিবার উদ্দেশ্যে বহু স্থলে শ্রুতিবাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন। অতএব বৈদিক সিদ্ধান্তের সহিত সাংখ্যাদির আংশিক সামঞ্জস্য থাকা হেতু বেদ ও সাংখ্যাদিশাস্ত্রের একবাক্যতা সম্ভব হইবে না কেন? ইহার উত্তরে বাদরায়ণ বলিয়াছেন—আংশিক সাম্য-দ্বারা একবাক্যতা-করণ যুক্তিযুক্ত নহে। এরূপ একবাক্যতার ফলে সাংখ্য-যোগ-পাঞ্চরাত্র-পাশুপত এই চারিটি দর্শনই যদি নির্ব্বিশেষে বৈদিক-দর্শনরূপে আপনাদিগকে প্রচার করিতে চাহেন, তাহা হইলে সাঙ্কর্য্য দোষের উৎপত্তি হওয়া সম্ভব। আর তাহা হইলে মহাভারতে সাংখ্য-যোগ-পাঞ্চরাত্র-পাশুপত দর্শনকে পরস্পর বিভিন্ন মতবিশিষ্ট বলিয়া উল্লেখের সার্থকতা কোথায় থাকে? এরূপ ক্ষেত্রে চারিটি দর্শনের নাম না করিয়া 'জ্ঞান-ধারা একটি মাত্র—উহাই বৈদিক দর্শন'—এইরূপ বলিলেই ত অধিকতর সঙ্গত ও শোভন হইত। মহাভারতে এই চারিটি দর্শনের পৃথক্ পৃথক্ উল্লেখ, আর তাহা ছাড়াও একটি পঞ্চম বেদ-সম্প্রদায়ের নাম দর্শনে ইহাই অনুমিত হয় যে সাংখ্যাদি-দর্শন-চতুষ্টয় পরস্পর বিভিন্ন ও ইহাদের প্রত্যেকটি হইতে বৈদিক দর্শন সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। এই বৈদিক দর্শন যে বেদের আরণ্যক ও উপনিষদ্ ভাগ, তাহাও মহাভারতের পূর্ব্বোক্ত প্রকরণের প্রারম্ভেই উক্ত হইয়াছে। (৭)

উক্ত আলোচনা হইতে ইহাই বোধ হয় যে আবহমান কাল ধরিয়া

(৬) অধিকরণ—বিষয়, সংশয়, পূর্ব্বপক্ষ (প্রতিবাদীর মত), উত্তর-পক্ষ (বাদীর মত) বা সিদ্ধান্ত ও সঙ্গতি—এই পাঁচটি অবয়ব-বিশিষ্ট 'ন্যায়'কে 'অধিকরণ' বলা হয়। এক কথায়—এক অধিকরণে একটি বিশিষ্ট প্রশ্নের আলোচনা থাকে। অধিকরণ—বিষয় (topio)। শাস্ত্রযোনি-ত্বাধিকরণ—শাস্ত্র যাঁহার অস্তিত্ব-নিরূপণে একমাত্র প্রমাণ (যোনি)—তিনিই শাস্ত্রযোনি ব্রহ্ম। অথচ ব্রহ্মই আবার শাস্ত্রের যোনি অর্থাৎ—প্রথম প্রকাশের কেন্দ্র—একারণেও ব্রহ্ম শাস্ত্রযোনি। "শাস্ত্রযোনিত্বাৎ" (ব্রঃ সূঃ ১।১।৩) সূত্রে এই কথাই বলা হইয়াছে।

(৭) "সাংখ্যং যোগঃ পাঞ্চরাত্রং বেদারণ্যকমেব চ।
জ্ঞানান্যেতানি ব্রহ্মর্ষে লোকেষু প্রচরন্তি হ"।—মঃ ভাঃ, শান্তিপর্ব্ব, ৩৪৯ অঃ, ১ম শ্লোক, বঙ্গবাসী সংস্করণ।

বৈদিক বাক্যগুলির অর্থব্যাখ্যার দুইটি বিভিন্ন পদ্ধতি এদেশেই প্রচলিত ছিল। তন্মধ্যে একটি পদ্ধতিতে প্রকরণ-বিচ্ছিন্ন এক একটি বেদবাক্যের ব্যাখ্যা করা হইত; অর্থাৎ—যে কোন স্থল হইতে একটি বা একাধিক বেদবাক্য পৃথক্ করিয়া লইয়া অন্য কোন তৎসদৃশ বা তদ্বিরোধী শ্রুতি-বাক্যের সহিত তুলনা ব্যতিরেকেই কেবল ব্যাকরণের সাহায্যে উহার অর্থ নিরূপণ করা হইত। এই পদ্ধতিতে কোন শ্রুতিবাক্যের সহিত অপর কোন শ্রুতিবাক্যের কোনরূপ অন্তর্নিহিত সম্বন্ধ বা সঙ্গতি থাকিতে পারে—ইহা স্বীকার করা হয় না। প্রত্যেকটি শ্রুতিবাক্য যেরূপ শব্দ-যোজনার দিক্ দিয়া স্বয়ং সম্পূর্ণ, অর্থগত যোজনার দিক্ দিয়াও ঠিক সেইরূপ আপনাতে আপনি পরিপূর্ণ—অপর কোন শ্রুতিবাক্যের সহিত সংযোগের কোন অপেক্ষা রাখে না। একটি শ্রুতিবাক্যের সহিত আর একটি বা একাধিক সদৃশ (৮) শ্রুতিবাক্যের যোগসাধন-পূর্ব্বক এইরূপে মিলিত বাক্যসমষ্টি হইতে একটি সম্পিণ্ডিত অর্থ সংগ্রহ করা এই পদ্ধতির বিরোধী।

পক্ষান্তরে বৈদিক কর্ম্মকাণ্ডের প্রতিপাদক মহর্ষি জৈমিনি ও বৈদিক জ্ঞানকাণ্ডের প্রবক্তা মহর্ষি বাদরায়ণ উভয়েই পূর্ব্বোক্ত পদ্ধতির অনুমোদন করেন না। প্রকরণাদি হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া বিভিন্ন শ্রুতিবাক্যকে সম্পূর্ণ পৃথগ্‌ভাবে গ্রহণ-পূর্ব্বক কেবলমাত্র ব্যাকরণের সাহায্যে উহার অর্থ-নির্ণয় উভয় মহর্ষিরই অনভিপ্রেত। উঁহারা উভয়েই একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন যে, বেদবাক্যের অর্থ-নিরূপণে 'সমন্বয়' অথবা 'গতি-সামান্য' প্রক্রিয়া অনুসারে বিভিন্ন সদৃশ বেদবাক্যের একত্র সংগ্রহ-পূর্ব্বক এক-বাক্যতা-করণ একান্ত প্রয়োজনীয়।

এই একবাক্যতা-পদ্ধতি সুপ্রসিদ্ধ 'নন্দিকেশ্বর-কারিকা'র 'প্রত্যাহার'-পদ্ধতি বলিয়া নূতন নামে উল্লিখিত হইয়াছে। এই প্রত্যাহার-পদ্ধতি অনুসারে চতুর্দ্দশ 'শিবসূত্রে'র একটি মাত্র চরম অখণ্ড অর্থ নিরূপিত হইয়া থাকে। মহর্ষি পাণিনি তাঁহার 'অষ্টাধ্যায়ী' ব্যাকরণসূত্র-গ্রন্থের প্রারম্ভে চতুর্দ্দশটি 'শিবসূত্র' বা 'মাহেশ্বর-সূত্র' সমুদ্ধৃত করিয়াছেন। যদি সাধারণ ব্যাবহারিক দৃষ্টি অবলম্বনে এই চতুর্দ্দশ শিবসূত্রের প্রত্যেকটিকে পৃথক্ পৃথগ্‌ভাবে ব্যাখ্যা করা যায়, তাহা হইলে আপাতদৃষ্টিতে বোধ হইবে যে সূত্রগুলিতে কেবল কয়েকটি স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণের নামোল্লেখ আছে মাত্র। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত একবাক্যতা-পদ্ধতি-মূলক মহাপ্রত্যাহার-প্রক্রিয়া অবলম্বন করিলে দেখা যাইবে যে এই সূত্রগুলি সম্মিশ্রভাবে প্রত্যগাত্মা হইতে অভিন্ন পরমাত্মাকেই যথার্থ অর্থরূপে লক্ষ্য করিতেছে।(৯)

নন্দিকেশ্বর-কারিকায় এই প্রত্যাহার-পদ্ধতিই বেদান্ত-দর্শনে 'সমন্বয়'-পদ্ধতি বা 'গতি-সামান্য'-পদ্ধতি নামে কথিত হইয়াছে। এক কথায় ইহা একবাক্যতা-করণের প্রক্রিয়া। ব্রহ্মসূত্রে এই একবাক্যতা-পদ্ধতির বলে সকল বেদান্ত (উপনিষদ্) বাক্যের একমাত্র চরম লক্ষ্য যে এক অখণ্ড অদ্বিতীয় স্বপ্রকাশ বস্তুভূত পরব্রহ্ম—ইহাই প্রতিপাদিত হইয়াছে। কর্ম্মকাণ্ডেও মহর্ষি জৈমিনি এই পদ্ধতির অনুসরণ করিয়া সন্দিগ্ধ শ্রুতি-বাক্যের অর্থ-নিরূপণে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

পক্ষান্তরে, সন্দিগ্ধ শ্রুতিবাক্যের যথার্থ অর্থ-নিরূপণ যাঁহাদিগের অভিপ্রেত নহে—কিন্তু আপনাদিগের কোন কল্পিত সিদ্ধান্তের সমর্থনকল্পে যাঁহারা প্রকরণচ্যুত এমন কি খণ্ডিত শ্রুতিবাক্যও সমুদ্ধৃত করিয়া থাকেন—অথবা কেবল অভিধান-কোষও ব্যাকরণাদি শব্দশাস্ত্র অবলম্বনে যে কোন বিচ্ছিন্ন শ্রুতিবাক্যের অর্থনির্ণয়ে অগ্রসর হইয়া থাকেন—পূর্ব্বোক্ত প্রকার একবাক্যতা-পদ্ধতি তাঁহাদিগের নিকট উপেক্ষিত, এমন কি অবজ্ঞাতও হইয়া থাকে।

সাঙ্খ্যাদি দর্শনের সর্ব্বাংশই যে বেদবিরোধী—তাহা নহে। যে যে অংশে সাঙ্খ্যাদি দর্শন বেদ মানিয়াছেন, সেই সেই অংশের প্রামাণ্যের বিরুদ্ধে বাদরায়ণ কিছুই বলেন নাই। সাঙ্খ্যাদি সম্প্রদায় কোন কোন ক্ষেত্রে তাঁহাদিগের সিদ্ধান্ত যে বেদানুমোদিত—তাহা প্রতিপাদনের উদ্দেশ্যে নিজ নিজ মতের পরিপোষকরূপে শ্রুতিবাক্যও সমুদ্ধৃত করিয়াছেন (১০)—একথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। ঐ সকল অংশ যে প্রামাণিক তদ্বিষয়ে কাহারও সন্দেহ বা বিপ্রতিপত্তি থাকা উচিত নহে। কিন্তু ঐ সকল সম্প্রদায় তাঁহাদিগের চিন্তাধারার সর্ব্বাংশই যে বেদানুসারী তাহা বলেন নাই বা বলিতে পারেন নাই। এই কারণে, তাঁহাদিগের সম্প্রদায়ে একবাক্যতা ন্যায়ের অভাব পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। তথাপি বাদরায়ণ এই সকল জ্ঞানধারাকে সর্ব্বাংশে বর্জ্জনের উপদেশ দেন নাই—আংশিক পরিমার্জ্জনের ব্যবস্থাই দিয়াছেন।

পক্ষান্তরে, বেদান্ত-দর্শনে এরূপ আংশিক শ্রুত্যনুকূলতা মাত্র নাই—আছে সর্ব্বাংশে শ্রুতির অনুসরণের প্রচেষ্টা। সমন্বয়াধিকরণে এই একবাক্যতা-বীজ উপ্ত হইয়াছে। পরে ব্রহ্মসূত্রের সকল অধিকরণেই দেখা যায় যে, শ্রুতি-সিদ্ধান্ত উপেক্ষা করিয়া বা শ্রুতির সহিত বিরোধ করিয়া বাদরায়ণ একটিও নিরপেক্ষ স্বতন্ত্র মত প্রচারের চেষ্টা করেন নাই। তাঁহার দর্শন সর্ব্বাংশে শ্রুতির অনুগামী। অতএব বাদরায়ণের ব্রহ্ম-মীমাংসা-দর্শনই একমাত্র 'বৈদিক দর্শন' আখ্যালাভের যোগ্য। মহর্ষি জৈমিনির কর্ম্মমীমাংসা-দর্শনও অবশ্য সর্ব্বতোভাবে বেদানুগামী। কিন্তু তাহার মধ্যে ক্রিয়ার প্রতিপাদনেই অধিক প্রয়াস লক্ষিত হয়। এই ক্রিয়ার বৈচিত্র্যবশতঃ ফলেরও বিভেদ আসিয়া পড়ে। অর্থাৎ—একটিমাত্র তত্ত্বে সমন্বয় পূর্ব্বমীমাংসা-দর্শনেও সম্ভব হয় নাই। কিন্তু উত্তরমীমাংসা এই ফলবৈচিত্র্যকেও ব্যাবহারিক বা মিথ্যা বলিয়া প্রতিপাদন করিয়াছেন। এই মতে—পারমার্থিক ফল বিচিত্ররূপ নহে—কিন্তু এক ও অখণ্ড। সকল শ্রুতিবাক্যেরই চরম লক্ষ্য এই পরমার্থ অখণ্ড বস্তুতত্ত্ব—ইহাই পরমাত্মা পরব্রহ্ম প্রভৃতি বিভিন্ন নামে কথিত হইয়া থাকে। এই কারণে বেদান্ত-দর্শনই একমাত্র মুখ্য বৈদিক-দর্শনরূপে পরিগণিত হইবার যোগ্য।

পরিশেষে ইহাও বক্তব্য যে, মহাভারতের পূর্ব্বোক্ত প্রকরণে এক-বাক্যতা ন্যায় অবলম্বনে সাঙ্খ্য-যোগ পাঞ্চরাত্র-বেদ-পাশুপত—

---

(৮) এই সাদৃশ্য অর্থগত সাদৃশ্য। এই সাদৃশ্য-বলে ভিন্ন প্রকরণ এমন কি ভিন্ন উপনিষদ্ হইতেও বাক্যসংগ্রহপূর্ব্বক একবাক্যতা ন্যায়ানু-সারে সমন্বয় করা হইয়া থাকে।

(৯) প্রথম শিবসূত্র—'অ ই উ ণ্'; দ্বিতীয়—'ঋ ৯ ক্'; তৃতীয়—'এ ও ঙ্'; চতুর্থ—'ঐ ঔ চ্'। প্রথম সূত্রের প্রথম বর্ণ 'অ'। চতুর্থ সূত্রের অন্তিমবর্ণ 'চ্'। প্রত্যাহার নিয়মানুসারে 'অচ্' বলিলে বুঝায়—অ, ই, উ, ঋ, ৯, এ, ও, ঐ, ঔ—অর্থাৎ সবগুলি স্বরবর্ণ। ঠিক এইরূপে ধরা যাউক—প্রথম সূত্রের প্রথম বর্ণ 'অ'। অন্তিম সূত্রের ('হল্') অন্তিম বর্ণ 'হ'। [যদিও বলা উচিত 'ল্'; তথাপি প্রতি সূত্রের শেষ হসন্ত বর্ণগুলি 'ইৎ' (লোপপ্রাপ্ত) বলিয়া উহাদিগের বিশেষ কোন মূল্য দেওয়া হয় না। এই জন্য যথার্থ অলুপ্ত অন্ত্যবর্ণ 'হ'।] এইবার মহাপ্রত্যাহার-পদ্ধতি অনুসারে সকল শিবসূত্র একত্র করিয়া আদিসূত্রের আদ্যবর্ণ ও অন্তিমসূত্রের অন্ত্যবর্ণ পাশাপাশি সাজাইলে দাঁড়ায়—'অহ'। এই 'অহ'ই—'অহম্', 'সোঽহম্' বা 'শিবোঽহম্'। ইহার অর্থ—জীব ও ব্রহ্মের অভেদ প্রতিপাদন।

অকারঃ সর্ব্ববর্ণাগ্র্যঃ প্রকাশঃ পরমেশ্বরঃ।
আদ্যমন্ত্যেন সংযোগাদহমিত্যেব জায়তে॥

তদ্ব্যতীতঃ পরঃ সাক্ষী সর্ব্বানুগ্রহবিগ্রহঃ।
অহমাত্মা পরোহল্ স্যামিতি শম্ভুস্তিরোদধে॥

—নন্দিকেশ্বর-কারিকা।

(১০) একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে। সাঙ্খ্য প্রকৃতিতত্ত্ব সম্বন্ধে প্রমাণরূপে নিম্নোক্ত শ্রুতি বাক্যটির উদ্ধার করিয়াছেন—"অজামেকাং লোহিতশুক্লকৃষ্ণাম্" ইত্যাদি (শ্বেতাশ্বতর উপ ৪।৫)

এই পঞ্চবিধ চিন্তাধারার মধ্যেও সমন্বয় স্থাপন করা হইয়াছে। বলা হইয়াছে—ইহারা ভিন্ন প্রস্থান (নানামতানি) বটে; কিন্তু ভেদেই ইহাদিগের পরম তাৎপর্য্য নহে। সাংখ্য-যোগ-পাঞ্চরাত্র পাশুপত বেদের প্রামাণ্য যতক্ষণ অতিক্রম না করে (অর্থাৎ—যতক্ষণ স্পষ্টতঃ বেদবিরোধী সিদ্ধান্ত ইহারা স্থাপন না করে), ততক্ষণ ইহাদিগেরও প্রামাণ্য অব্যাহত। আর ইহাদিগের পরম তাৎপর্য্যভূত বিষয় একমাত্র পরমাত্মাই। অতএব ইহাদিগের ভেদেই চরম তাৎপর্য্য—ইহা যাঁহারা মনে করেন, তাঁহারা যথার্থ তত্ত্ববিৎ নহেন। দৃষ্টান্তস্বরূপে বলা চলে—পাঞ্চরাত্র পুরুষপ্রণীত ও বহু স্থলে বেদবিরুদ্ধ। কিন্তু ইহার কোন কোন অবান্তর সিদ্ধান্ত বেদ-বিরুদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও ইহার পরম তাৎপর্য্য বেদের অবিরোধী—উহা হইতেছে পরমাত্মার প্রতিপাদন। অন্যান্য সম্প্রদায়গুলির সম্বন্ধেও ঠিক এই কথাই প্রযোজ্য। অতএব, সম্প্রদায়গুলির মধ্যে অবান্তর তাৎপর্য্যে পরস্পরের ভেদসত্ত্বেও সকল সম্প্রদায়েরই পরম তাৎপর্য্য এক পরমাত্মতত্ত্বে পর্য্যবসিত—ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।(১১)

(১১) "সর্ব্বেষু চ নৃপশ্রেষ্ঠ জ্ঞানেষ্বেতেষু দৃশ্যতে ॥৬৮॥
যথাগমং যথাজ্ঞানং নিষ্ঠা নারায়ণঃ প্রভুঃ।"
—মঃ ভাঃ শাঃ পঃ, ৩৪৯ অঃ।

"আগমং বেদং জ্ঞানমনুভবং চানতিক্রম্য এতেষাং সর্ব্বেষাং নিষ্ঠা; পরমতাৎপর্য্যবিষয়ীভূতোঽর্থস্তু নারায়ণঃ পরমাত্মৈবেতি···অত্র ভিন্নপ্রস্থানত্বাভিমানো মূঢ়ানামেব···তেন পাঞ্চরাত্রস্য পুম্প্রণীতত্বং বেদবিরুদ্ধত্বঞ্চ সূচিতম্; তথাপি অবান্তরতাৎপর্য্যভেদেঽপি পরমতাৎপর্য্যং স্বেকমেবেত্যাহ"—নীলকণ্ঠ-টীকা।

"সর্ব্বৈঃ সমস্তৈশ্চ ঋষিভির্নিরুক্তো নারায়ণো বিশ্বমিদং পুরাণম্" ॥৭৩॥

"ইদং বিশ্বং নারায়ণ ইতি 'ইদং সর্ব্বং যদয়মাত্মা' 'ব্রহ্মৈবেদং সর্ব্ব-'মিত্যাদিশ্রুতেরর্থো ব্রহ্মাদ্বৈতরূপো দর্শিতঃ" ॥—নীলকণ্ঠ-টীকা।

রুদ্র-দৃষ্টি

শ্রীমতী হেমলতা ঠাকুর

রুদ্র! তোমার দৃষ্টির পানে
সৃষ্ট আমরা ভয়ে তাকাই,
রাখিবেনা কিছু মানব-কীর্ত্তি
সবই কি পুড়ায়ে করিবে ছাই!
রুদ্র, তোমারে ডাকি'—শুধাই।

তোমার সৃষ্ট মৃত্তিকা জল,
শূন্য আকাশ, বায়ুমণ্ডল,
আলো আঁধিয়ার মিত্র-যুগল
ধ্বংসিবে কেহ সাধ্য নাই;
রুদ্র, তোমারে ডাকি'—শুধাই।

তবে কি শুধুই মানব মরিবে
মানবের প্রাণ মানব হরিবে
অপযশ অপকীর্ত্তি রহিবে
জগতে মানব পাবেনা ঠাঁই?
রুদ্র, তোমারে ডাকি'—শুধাই।

ক্ষম ক্ষম প্রভু, মানবের দোষ
অবুঝের সম যত আপ্‌শোষ
মস্তকে তার রুদ্রের রোষ
পড়ে নাকো যেন মাগি দোহাই;
রুদ্র, তোমারে ডাকি'—শুধাই।

জগতে তোমার প্রেম-মুখ-ছবি
ধরে নি মানব—গায়নি কি কবি?
তব প্রেমে নব নব রূপে রবি
উঠেনি কি হেথা—বলনা তাই?
রুদ্র, তোমারে ডাকি'—শুধাই।

প্রলয়-বহ্নি জ্বলে তব ভালে
জয় জয় রব উঠে কালে কালে
জড়িত কণ্ঠে ধ্বংসের তালে
শিব-সুন্দর বন্দনা গাই।
শিব শিব শিব মন্ত্রটী চাই॥

পরীক্ষা

শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ ঘোষ

পৌষ মাস। সেদিন রবিবার। অপরাহ্ণটা ঘরেও কাটে না, বাহির হইবার তো সম্পূর্ণ অনিচ্ছাই। গৃহিণী সুন্দর আবৃত্তি করিতে পারিতেন। বহু অনুনয় করিয়া সেদিন রাজি করাইতে পারিলাম। মণীষা অদূরে একখানা চেয়ারে বসিয়া কবিতা পাঠ সুরু করিল, আর আমি সর্ব্বাঙ্গে লেপ মুড়ি দিয়া মুদ্রিতনেত্রে বিছানায় শুইয়া শুইয়া শুনিতে লাগিলাম। ছোট্ট একটা কবিতা শেষ হইয়া গেল। স্পষ্ট উচ্চারণ, সুললিত কণ্ঠস্বর, উপযুক্ত স্থানে জোর দিয়া এবং না-দিয়া পড়িবার যথেষ্ট প্রশংসা করিলাম এবং সমস্ত কবিতাটি যে চোখের সম্মুখে স্পষ্ট-মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া উপস্থিত হইয়াছে, শুধু পাঠের গুণেই, তাহাও পরিশেষে বলিলাম। কিন্তু একটা অনুযোগ না-করিয়া পারিলাম না যে, আর একটা শুনিতে পাই না কেন? কাজেই বাছিয়া বাছিয়া একটা বড় কবিতাই মণীষাকে পড়িতে হইল। লেপটা মুখের উপর টানিয়া দিয়া একান্ত ভাবে শুনিতে লাগিলাম। এমন অখণ্ড মনোযোগের সহিত কতক্ষণ পাঠ শুনিয়াছি জানি না, তবে শক্ত রকমের একটা ধাক্কায় তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিলাম, তারপর?

মণীষা বলিল, আর তারপরে কাজ নেই, খুব হোয়েচে কাব্যিপণা! আজকের একথা যেন মনে থাকে।

আমি শঙ্কিত হইয়া উঠিলাম—সমস্তই ধরা পড়িয়া গিয়াছে।

তাড়াতাড়ি বলিলাম, আচ্ছা—সত্যি বল্‌চি, আমি ঘুমোইনি; তুমি বরঞ্চ জিগ্যেস্ কোরেই দেখো—বলতে পারি কিনা, কোন্ অব্‌ধি পড়েচো।

স্মিতহাস্যে মণীষা বলিল, আহা রে, তবু যদি নাক না ডাকৃতো। ঢের হোয়েচে মশাই, আর কখনো আবৃত্তি কোরতে বোলো। এখন দেখো, কে ডাকৃচে।

মুখটা বোধহয় কাঁচুমাচু হইয়া থাকিবে। অন্ততঃ মনটা যে হইয়াছিল, তাহা আমি নিজেই বুঝিতে পারিয়াছিলাম। তাই যেই বলিলাম, এ তোমার অন্যায় মণীষা, জেগে জেগে বুঝি কেউ নাক ডাকাতে পারে না—মণীষা মুক্ত ঝরণার মতো খিল্‌খিল্ শব্দে একেবারে ভাঙিয়া পড়িল।

বারান্দা দিয়া মুখ বাড়াইয়া দেখি, আফিসের পিওন।

একখানা লম্বা খাম হাতে দিয়া সে নীরবে প্রস্থান করিল। পাঠ করিয়া বুঝিলাম, কোনো অজ্ঞাত কারণে সদাগরী আফিসের আশী টাকা বেতনের চাকরিটি গিয়াছে। তবে যথাসময়ে সংবাদটি জানাইতে পারা যায় নাই বলিয়া, দুই মাসের পুরা বেতন বিনাকর্ম্মেই মিলিয়া যাইবে। আফিস হইতে কিছু টাকা ধার লইয়াছিলাম প্রতি মাসে অল্প অল্প করিয়া সেটা শোধ হইয়া আসিতেছিল। তখনও প্রায় শ'খানেক বাকী।—এই ঋণের টাকা বাদ দিয়া বাকী যাট্‌টি মুদ্রা দুই দিবসের মধ্যে গিয়া না লইয়া আসিতে পারিলে ভবিষ্যতে গোলোযোগে পড়িতে হইবে, ইহাও জানান হইয়াছে। অকস্মাৎ চাকরি হইতে মুক্তি দিবার কোন হেতু জানাইতে পারিবেন না বলিয়া সাহেব বিশেষ দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন। পরিশেষে, আমার মঙ্গলের জন্য ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা জানাইবেন, তাহাও পড়িলাম।

খোলা চিঠিখানা সম্মুখে লইয়া আবিষ্টের মতন অনেকক্ষণ কাটিয়া গেল।

মণীষা কাছে আসিয়া বলিল, কোথা থেকে এলো?

অল্পক্ষণ মণীষার মুখের দিকে শুষ্কদৃষ্টি মেলিয়া বিরস বদনে চাহিয়া রহিলাম। পরক্ষণেই একটু হাসিয়া উঠিলাম। আমার ভাবভঙ্গী লক্ষ্য করিয়া মণীষার সম্ভবতঃ দুশ্চিন্তা উপস্থিত হইয়া থাকিবে। তাই হাত বাড়াইয়া চিঠিখানা হস্তগত করিবার উদ্যোগ করিল। আমি তৎক্ষণাৎ সেটা বালিশের তলায় চাপিয়া রাখিলাম।

সহাস্যে বলিলাম, বলো দেখি, কিসের?

বলিয়া সশব্দে টেবিল চাপড়াইয়া দিলাম।

নিতান্ত বিরক্তির সুরে মণীষা বলিল, কি যে করো, মা সারাদিন পরে সবে একটু ঘুমিয়েচেন।

আমি কঠিন হাসি হাসিয়া বলিলাম, হুঁ মা আবার শুনতে পাবেন—যে বদ্ধ কালা হোয়েচেন, এখন কানের কাছে ঢাক পিটলেও বোধহয় কিছু শুনতে পাবেন না। তুমি বলো না কোথা থেকে চিঠি এলো।

মণীষা চুপ করিয়া রহিল।

চাপা হাসির ভঙ্গিতে আমি বলিলাম, লটারীর একখানা টিকিট কিনেছিলুম মনে আছে? তাতে এক লাখ টাকা পাওয়া যাচ্চে। বালিগঞ্জ টালিগঞ্জের মতন কোনো একটা ফাঁকা জায়গায় একটা বাড়ি প্রথমেই কোরতে হবে কি বলো, ছোট্টো একটা বাগানও থাকবে, একটু হাঁপ ছেড়ে বাঁচা যাবে, উঃ! সহরটা কি হোয়ে উঠেচে—ঠিক যেন নরক, আর কতকগুলো পোকা কিল্‌বিল্ কোরচে। আচ্ছা মনু, একখানা মোটর তো কিনতে হবে, কোন্ মডেল? কিছু জায়গা জমি কিনলে মন্দ হয় না, তবু জমিদার বোলবে লোকে, কি বলো? আমার হিসেবপত্তোর মনে মনে এক রকম সবই ঠিক কোরে ফেলেচি। এখন তুমি বেশ মাথা ঠাণ্ডা কোরে তোমার হিসেবের খস্‌ড়াটা তৈরি কোরে ফেলো দেখি। এরপর টাকা একবার খরচ হোতে আরম্ভ হোলে, কোথা দিয়ে যে কি হোয়ে যাবে তার ঠিকানা রাখাই কঠিন। তখন কিন্তু এটা চাই ওটা চাই কোরলে, আমি কিছুই কোরতে পারবো না। বুঝলে।

আমার এই একটানা বলিয়া যাওয়ায় মণীষা বাধা দিল। আমার হাতে একটা নাড়া দিয়া বলিল, কি সব বোলচো যে—।

একটু অবাক হইয়া গেলাম, মণীষার মুখের ভাব দেখিয়া। সে বিন্দুমাত্র উৎসাহিত না হইয়া বরং ভীত হইয়াছে মনে হইল। আমি যে অভিনয় করিলাম, সে যে অভিনয় নয়, সত্যকার স্ফুরণই—একথা মনে হইল মণীষা যেন স্বভাবজ শক্তিতে বুঝিয়া লইয়াছে।

তাহার চোখের কালো তারার পাশ দিয়া ছুঁচের আগার মতন সূক্ষ্ম একটা আলোর তীব্রতা দেখিলাম। তবু বলিলাম, বিশ্বাস হোলো না, এই দেখ।

হতবুদ্ধি মণীষার মুখ দিয়া বাহির হইল, চাকরির জবাব—।

উচ্চ হাস্তে ঘর ফাটাইয়া আমি বলিলাম, ধ্যেৎ, লাখ্-পতি হবার পর কেউ কখন আশী টাকার চাকরি করে? এটা ওদের ভুল! চাকরিতে তো আমিই ইস্তফা দোবো ভাব্‌ছিলুম, ইতিমধ্যে ওরা এতো কষ্টো কোরতে গেলো কেন, তাই ভাবি।

আচ্ছন্নের মতো মণীষা জিজ্ঞাসা করিল, চাকরি কেন গেলো?

তিক্তকণ্ঠে বলিলাম, তোমার কাছে জোড়হাতে নিবেদন কোরচি, আর আমাকে বিরক্ত কোরো না, দয়া কোরে একটু একলা থাকতে দাও, দোহাই তোমার। যাও। অমন ফ্যাল ফ্যাল কোরে চেয়ে থাকতে হবে না, জানি তোমার চোখ তিলোত্তমা উর্ব্বশীকেও হার মানায়, এ গরীবের প্রতি ও-বাণ নিক্ষেপ আর নাই কোরলে। আমার কাছে কি তোমার দরকার তাতো বুঝতে পারচি না, কি চাই তোমার? যাও, কোনো কথা শোনবার আমার সময় নেই।

তাড়াতাড়ি আসিয়া আবার সেই লেপ আপাদমস্তক মুড়ি দিয়া শুইয়া পড়িলাম।

(২)

পরদিন সকাল সকাল স্নানাহার করিয়া বাহির হইয়া পড়িলাম। আফিসবাড়ীর দোতলায় উঠিতেই বড়োবাবুর সহিত সাক্ষাৎ। আমার চাকরি-জীবনের গর্ব্ব ইনি। তাই আমার প্রতি তাঁর অহৈতুক স্নেহ ছিল। তিনি দ্রুতপদে কাছে আসিয়া বলিলেন, কারণটা তো ভাই এখনও জানতে পারলুম না।

হাসি আসিল। বলিলাম, জানাজানিই যদি হবে, তাহলে কি আর আপনি ছাড়া পান।

কথাটায় দেখি বিশেষ কাজ হইল। ভদ্রলোক বার দুইতিন, কেন-কেন করিয়া অপরাধীর মতন সরিয়া পড়িলেন। আমার চাকরির ওপর যে বড়োবাবুর একটি চোখ ছিল, তাহা মনে মনে জানিতাম। আর আজ দেখিলাম অন্ধ চোখটি তাঁর দ্বিতীয় পক্ষের তৃতীয় শ্যালকের ভাগে।

ছোটো সাহেবের ঘরে প্রবেশ করিয়া বলিলাম, আমার চাকরি যাওয়ার কারণ জানতে চাই।

প্রত্যুত্তরে সাহেব চুরুট্ নামাইয়া আম্‌তা আম্‌তা করিতে লাগিল।

আমি রুখিয়া উঠিলাম। বলিলাম, তুমি তোত্‌লা তা জানতুম না। কিন্তু কারণ আমি জানতে চাই-ই।

স্পষ্টই বুঝিলাম, এ যে আমাকে ভালোবাসে সেই সত্তাটুকু বাঁচাইয়া চলিতে চায়। আমি তো ভুলি নাই, বড়োদিনের সময় ভালো ভালো কেক্ উপহার দিয়াছে, পূজার পোষাকের নামে টাকা উপহার দিয়াছে। বিলাতি ক্যালেণ্ডার, ডাইরি—এমনি কতো কি ছোটোখাটো জিনিষ আমাকে ডাকিয়া সাধিয়া দিয়াছে। সেই লোকেরই হাতে আমার গলা টিপিয়া ধরিবার ভার পড়িয়াছে।

আরো খানিকটা ইতঃস্তত করিয়া সাহেব বলিল, মিষ্টার চ্যাটার্জ্জি কিছু মনে কোরো না, তোমার বিরুদ্ধে অভি-যোগ জুয়াচুরির।

বুকের ওপোর যেন সমুদ্রের ঢেউ ভাঙিয়া পড়িল। টেবিলের পাশের খালি চেয়ারটায় কাদার তালের মতন বসিয়া পড়িলাম। কি জুয়াচুরি করা আমার পক্ষে সম্ভব, কথাটা সেদিক দিয়া ভাবিবার চেষ্টাই করিলাম না; কারণ বুঝিলাম অন্যের জুয়াচুরিতেই আমার চাকরি গিয়াছে। উত্তেজনার প্রথমাংশটা কাটিয়া গেলে, দৃঢ়ভাবে বলিলাম, সাহেব তোমার উক্তির সপক্ষে প্রমাণটা জানতে পেলে খুসী হোয়ে বাড়ি চোলে যাই।

সাহেব অনড়ভাবে সামনের দোয়াতের পানে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল।

বলিলাম, সাহেব, আমার ধারণা ছিলো, তোমাদের জাত স্বভাবত ন্যায়পরায়ণ, উদার। আমাকে হাতপা বেঁধে মারতে চাও। আত্মরক্ষায় জন্যে প্রস্তুত থাকতে না দিলে কাপুরুষতা হয় একথা কি স্মরণ কোরিয়ে দেওয়া দরকার। তোমাকে আজ থেকে আমি ঘৃণা কোরবো।

সাহেব বিদ্যুৎবেগে বড় সাহেবের ঘরের দিকে চলিয়া গেল।

চাকরী যাওয়ার দুঃখ ঠিক যেন মনে লাগিতেছিল না। কিন্তু অভাবজনিত দুর্দ্দিনের কথা কল্পনা করিয়া একটা অজ্ঞাত আতঙ্কে মন ক্রমশই কিরকম অসম্বৃত হইয়া আসিতে লাগিল।

সাহেব ফিরিয়া আসিয়া বলিল,মিষ্টার চ্যাটার্জ্জি,ওপোরওয়ালার হুকুম, তোমাকে যা বলেচি তার অতিরিক্ত আর কিছু বলা যাবে না। তুমি এই দুটো খাতায় সই কোরে দাও, টাকা দুদিন পরে নিয়ে যেও।

রোখ চাপিয়া গেল, বলিলাম, ওসব দুদিন চারদিন বুঝি না, আমার এখুনি চাই, বিশেষ দরকার।

সাহেব বলিল, তোমার জন্যে আশাকারি অল্প সময়ের মধ্যে একটা কাজ জোগাড় কোরে দিতে পারবো, অনেক ফার্ম্মের সঙ্গে আমার জানা আছে।

ধন্যবাদ জানাইয়া উঠিয়া পড়িলাম। আর কি বা করিব। ক্ষমতাই বা কতোটুকু! কোনপথ দিয়া চলিলে ক্ষমতা অর্জ্জন করা যায়! ত্যাগের না ভোগের, কিম্বা মধ্যপন্থা, কোন্‌টা? ভগবানই তো সর্ব্বশক্তিমান। এই বৈজ্ঞানিক যুগে এক্‌স্-রে, রেডিয়ম-রে প্রভৃতি কতো কি উপকারি হিতকরী বিষয় আবিষ্কৃত হইতেছে, আর ভগবান-রে হয় না। তাহা হইলে তো একটা ক্লিনিকে যাইয়া খানিকটা গড্-রে শরীরে প্রবেশ করাইয়া লওয়া চলিত। তারপর ওসব সাহেবই আসুক আর যেই আসুক ইয়ারকিটি চলিত না। ইয়া শক্তিমান পুরুষ হইয়া গড়ের মাঠ সুশোভিত করিতে পারিতাম।

লালদীঘির জলে মুখহাত ধুইয়া লইতে আরাম বোধ হইল। একটি নির্জ্জন বৃক্ষতল অনুসন্ধান করিয়া আশ্রয় লইলাম। পোষ্টাপিসের ঘড়িটার দিকে নজর পড়িল, তোপধ্বনি শুনিয়া। খগেনের কথা মনে পড়িয়া গেল। ঐ বাড়িটার মধ্যেই তো তাহার আফিস। আমার বন্ধু সে, আর একদিন কি সাহায্যই না তাহাকে করিয়াছি। আর সেইগুলাই ঠিক ফিরাইয়া লইবার দিন আসিল আমার, হায় ভগবান! দাঁতে দাঁত চাপিয়া তাহাকে অভিশাপ দিলাম, কেন সে হতভাগ্য আমার সহায়তা গ্রহণ

প্রত্যাখ্যান করে নাই। আর এ ঘটনা বৈচিত্র্যের যে কর্ত্তা তাহার পিণ্ডের উদ্দেশ্যে হাত কচলাইয়া তাল পাকাইতে লাগিলাম, এই মনে করিয়া যে কি দরকার তাহার অত নিক্তির ওজনে সর্ব্বস্বকে তৌল করিবার! আমাকে দিয়া যদি এই পৃথিবীর কণামাত্র কাজ হইয়া থাকে, তবে সেটুকু সুদেআসলে ফিরিয়া পাইবার মত সঙ্কটে আমাকে পড়িতে হইল কেন! শুভেন হতভাগ্যকে ঋণমুক্ত করিবার জন্তই তো! তাহাকে ঋণীই বা করিয়াছিলে কেন নারায়ণ। সর্ব্বাঙ্গ রাগে দুঃখে অভিমানে জলিয়া যাইতে লাগিল। হঠাৎ মনে পড়িল ঘরের কথা। দূর সম্পর্কের দুইটি ভগ্নী ও তাহাদের গুটি দশেক ছেলেমেয়ে আজ প্রায় তিন মাস হইল, এইখানেই আছে। আর একটি মামাত বিধবা ভগ্নী ছোট ছেলেটির অসুখ সারাইতে আসিয়াছে, সেও প্রায় একমাস হইল। তাহার উপর শ্রবণশক্তিহীন বাতে পঙ্গু জননী, স্ত্রী এবং আমি। একটি পয়সা উপায় রহিল না কিন্তু পাত পাতিবার জন্ত এতগুলি বর্ত্তমান। ভাবিয়া দেখিলাম, অতঃপর ভগ্নীগুলিকে যথাসম্ভব শীঘ্র সরাইয়া ফেলাই চাই। কিন্তু উপায়ের কথা মনে আসিতে দিশেহারা হইয়া পড়িলাম। মুখের উপর, চলিয়া যাও, বলা চলে না—কিম্বা সত্য ঘটনা ব্যক্ত করাও সম্ভব নয়। তাহা হইলে সমগ্র জ্ঞাতিগোষ্ঠির দল আহা-উহু করিয়া ছুটিয়া আসিবে এবং সহৃদয়তার বাক্যবর্ষণ করিয়াই দানের গর্ব্বে স্ফীত হইয়া উঠিবে যে, সে সহ্য করা আমার দেহে প্রাণ থাকা পর্য্যন্ত সম্ভব হইবে না তো। অথচ উপায়ই বা কি। শরীরের মধ্যে রক্তস্রোত চঞ্চল হইয়া উঠিল। গাছের গায়ে হেলান দিয়া মনে মনে বলিতে লাগিলাম, কই গো, বিশ্বের দেবতা, তোমার নিক্তিটা ক্ষণিকের জন্ত একবার খালি কর না, এই দিককার একটু বিচার না হয় এইবার চলুক্, দেখি তোমার অদৃশ্য শক্তি কেমন পৃথিবীর তুচ্ছ মানুষকে বল দেয়। হঠাৎ একটা লোক দুইখানা খাম লইয়া মিনতি সহকারে ঠিকানা লিখিয়া দিতে বলিল: দিলাম। সঙ্গে সঙ্গে একটা পরামর্শ মনে জাগিল। কথাটা ভাবিয়া দেখিয়া পুলকিত হইয়া উঠিলাম। মাটিতে মস্তক ঠেকাইয়া মনে মনে মার্জ্জনা ভিক্ষা করিলাম। কিন্তু প্রাণ খুলিয়া মার্জ্জনার নিবেদন জানাইবার ধৈর্য্য রহিল না, পরামর্শটা এমনই পুলকিত করিয়া তুলিল। উঠিয়া দ্রুতপদে অগ্রসর হইলাম খানকয়েক পোষ্টকার্ড কিনিবার জন্ত। ফিরিয়া আসিয়া সেই গাছ তলাটা আশ্রয় করিয়া কলমটা খুলিয়া লইলাম।

প্রথমখানায় লিখিলাম।—

শ্রীচরণেষু—মা, ডিসেম্বর মাস পড়ে গেছে, আমাদের স্কুলের পরীক্ষার আর মাত্র তিনদিন বাকি আছে। তুমি এখানে না থাকাতে আমাদের খুব অসুবিধা হচ্ছে। মামাবাবুকে বলে তুমি যতো শিগ্‌গির পারো চলে এসো। আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম নিও। ইতি।—

স্নেহের কমল।

দ্বিতীয়খানায় লিখিলাম।

পূজনীয় দাদা, আপনাদের সংবাদ কুশল আশাকরি। আপনার ভগ্নীটির সহিত ছোট রকমের একটা কলহ মাস তিনেক পূর্ব্বে ঘটিয়া গিয়াছিল। অদ্যাবধি ক্রমাগত পত্র চালাচালি করিয়াও তাহার কোন মীমাংসা হয় নাই। আশাকরি তিনি এবার ফিরিয়া আসিলেই একটা নিস্পত্তি হইয়া যাইবে। আমরা সকলে ভাল আছি। প্রণাম লইবেন। ইতি—সেবক—নিশিকান্ত

তৃতীয়খানায় লিখিলাম।

পূজনীয়া বৌদি, প্রায় মাসাধিক হইল ওখানে গিয়াছ। কাজেই যতশীঘ্র সম্ভব চলিয়া আসিবে। ছোট বৌয়ের অম্বলের অসুখটা, এই গত একমাসকাল রান্না করিয়া, আগুনতাত লাগিয়া অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিয়াছে। তুমি না আসিলে আমাদের দোকানের খাবারের উপর নির্ভর করিয়া দিন চালাইবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। আশাকরি অনুকূলের অসুখ ইতিমধ্যে সারিয়া গিয়াছে। ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি, সে দীর্ঘজীবী হউক। আমার প্রণাম লইও এবং গুরুজনদিগকে দিও। ইতি—

স্নেহের দেবর—মুকুল।

প্রথম ও শেষ এই দুইখানা পত্রে দুই ভগ্নীর এবং দ্বিতীয়খানার উপরে নিজের নাম লিখিয়া ফেলিলাম।

পত্রের ভিতরকার তথ্যগুলি মণীষার নিকট হইতে নিতান্ত অনিচ্ছুকভাবেই কোন না কোন সময়ে শুনিয়াছিলাম। কিন্তু তাহারাই যে আমার এতবড় কর্ম্মসম্পাদনের সহায়—ক্ষণেকের জন্তও হইতে পারে, একথা মনে করিয়া বিস্মিত হইলাম। মনে মনে কলমটির উপরে কৃতজ্ঞ হইয়া উঠিলাম এই মনে করিয়া যে, কি অপরূপ কৌশলে সে শব্দের পর শব্দ যোজনা করিয়া গিয়াছে। কিন্তু হঠাৎ জড় কলমটির উপরে কৃতজ্ঞতার আভাবে নিজের প্রতি বিস্মিতভাবে চাহিয়া দেখিতে চেষ্টা করিলাম। কৃতজ্ঞ হওয়া প্রকৃতপক্ষে উচিত সেই লোকটির প্রতি যে খামের উপরে এইমাত্র ঠিকানা লিখিয়া লইয়া গেল। কিন্তু টলষ্টয়ের গল্পের সেই মুচির মতন আমি নররূপী নারায়ণ দেখিবার জন্ত তো উদ্‌গ্রীব হইয়া ছিলাম না। তবে কি এই লোকটি ভগবানের উপলক্ষ অর্থাৎ এজেন্ট! হাসি আসিল। ভাবিলাম, বড়ই ফস্‌কাইয়া গিয়াছে, এখন তাহাকে পাইলে ভগবানের দপ্তরে বেকার-ইনসিওরেন্‌স্‌-এর একখানা দরখাস্ত তাহার হাতে পাঠাইয়া দিতাম। কিন্তু স্বাস্থ্য ভালো দেখিয়া তো ডিস্‌কোয়ালিফাই করিয়া দিত। ফেল হইয়া তো পৃথিবীতে পড়িয়াই আছি, আবার স্বর্গেও। ত্রিশঙ্কুর অবস্থা। দূর ঘোড়ার ডিম—মানুষের কথা সময় সময় বিরক্তিকর লাগে, কিন্তু মনের এ সব গজ্‌গজানি যে একেবারে অসহ্য।—কেউ বলে, তুমি তাহলে কিছু বোঝনি, সে মঙ্গলময়ীকে। তিনি মা, আমরা ছেলে। খেলতে পাঠিয়েছেন। খেলনা যেই দিচ্ছেন, আমরা হাসচি; যেই কেড়ে নিচ্ছেন, আমরা কাঁদ্‌চি। যদি কেউ এর উত্তরে প্রশ্ন করে যে ছেলেকে অমন নিষ্ঠুরভাবে কাঁদিয়ে মার লাভ কি? উত্তরটা তো, অদৃশ্য সুতোর চাঁদের গা থেকে ঝুলে ভারতবর্ষের ওপোর দোল খাচ্চে। প্রথমতঃ হাসিকান্নার তার অনুভূতি স্পষ্ট হোলো। দ্বিতীয়ত, পেয়ে হারালো বোলেই বাস্তিত্বকে চিনতে পারলে। একমাত্র এতেই তার ক্রমবিকাশ সম্ভব। আর শেষত, এমনি কোরে ক্রমাগত পাওয়া ও না-পাওয়ার আশা ও নৈরাশ্যে, ছেলের মন নিস্পৃহ হোয়ে আসবে। তখন তার ঘাড়ে চাপাতে গেলে নেবে না, জোর কোরতে গেলে ত্যাগ কোরবে। তারপর যতই আত্মসচেতন হোয়ে উঠবে ততোই বুঝবে, এখন বড়ো হোচ্চি প্রতিদিন, আর হাত-পাতার ধারনা করা ভালো দেখায় না। তখন সে তার স্বাধীন উপায়ে

সখ মেটাতে চায় এবং সখ মিটলে পর তার মার দিকে নজর পড়ে। বুঝতে বাকি থাকে না, কি চাওয়া চেয়ে ও পেয়ে এসেচে। ভালো কোরে ভেবে দেখে ঋণের ভার কতোটা! এতো বেশী মনে হয় যে প্রতিদানের ইচ্ছাই পূজোর রূপ নিয়ে তখন প্রকাশ পায়। পূজোর উপকরণ খোঁজে, পায় না, তাই সবই অতৃপ্ত থেকে যায়। এই অতৃপ্তি যুগ যুগ মানুষের রক্ত-স্রোতের ভেতর বেঁচে বেঁচে আসচে।

কথাটা মনে করিয়া অবাক হইয়া গেলাম যে এই সামান্য একটা বাসনা মানুষ ঘুচাইতে পারে না। আমি পারি, বনফুল আছে, কাঁচা ফল আছে, দূর্ব্বাঘাস আছে,একান্ত মনে এই উপহার দিলেই তো চুকিয়া যায়। আজ নূতন করিয়া মনে হইল পৃথিবীর মানুষগুলা নিতান্তই বোকা, তাই অনর্থক এবং অকারণ যুগ যুগ ধরিয়া একই কথা উল্টাইয়া পাল্টাইয়া বলিয়া মরে। মানুষের বুদ্ধির ঘরে যে একটি বৃহৎ শূন্য বর্ত্তমান, আজ তাহা স্পষ্ট বুঝিলাম। পৃথিবী শূন্যে ঘুরিতে ঘুরিতে সেই শূন্যের অংশ যে মানুষের মাথায়ও ঢুকাইয়া দিয়াছে, একথা ভাবিয়া রীতিমতই আনন্দ বোধ হইল।

একটা লোক পাশে আসিয়া কখন বসিয়াছিল, বলিল, মশায়ের কি সব বলা হচ্ছিল।

আমি কট্‌মট্‌ করিয়া তাহার দিকে চাহিয়া বলিলাম, কি আবার বলা হবে। বলা হচ্ছিল ম'শায়ের বুদ্ধিটি গোলাকার, মাথাটিও তাই এবং গোলের ওপোর দাঁড়িয়ে সবই গোলমাল কোরে ফেলেচেন। কাকে কি বোলতে হয়, তা জানা নেই।

এমন সময় একটা ভিখারী আসিয়া হাত পাতিল। পকেটে যাহা কিছু ঠেকিল ভিখারিটার হাতের উপর এমনভাবে ঝনাৎ করিয়া ফেলিয়া দিলাম—যেন টাকাপয়সাগুলা সেই গোলমালে লোকটার গোল গোল সাদা চোখের উপর পড়িল।

তাহার বিস্মিত দৃষ্টি দেখিয়া সকৌতুকে বলিলাম, অক্রুর বটব্যালের নাম শুনেছো বাপু, বিরেশী লাখের মালিক, থাকে গরীব দুঃখীর মতন কিন্তু দান ধ্যান করে অজস্র, অধম সেই শর্ম্মা, বুঝলে।

লোকটা একেবারে বিস্ময়বিস্ফারিতনেত্রে আমার দিকে চাহিয়া রহিল। আমি উঠিয়া দাঁড়াইয়া ঈষৎ গর্ব্বের' ভাবে বলিলাম, তুমি যদি কিছু চাও, তোমায়ও দিতে পারি।

তাহাকে দিবার আশায় পকেটে হাত পুরিলাম। শূন্য পকেট অনুমান হইতেই ঝাঁ করিয়া মনে পড়িয়া গেল, ঘরে চা ফুরাইয়াছে। তৎক্ষণাৎ নক্ষত্রবেগে ভিখারিটার দিকে দৌড় দিলাম।

তাহাকে পিছন হইতে প্রচণ্ড এক ধাক্কা ও ধমক দিয়া বলিলাম, পয়সা কই ? শিগ্‌গির দেখি বলচি !

লোকটার বয়স হইয়া গিয়াছে। দৈন্য ও দুঃখের কালি মাখান মুখখানা তাহার। অত্যন্ত সঙ্কোচের সহিত নিষ্প্রভ চোখ দুইটা তুলিয়া নীরবে আমার দৃষ্টির সম্মুখে পাতিয়া রাখিল। আমার বুকের ভিতরটা ধড়াস্ করিয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে শরীরের রক্তস্রোত দ্বিগুণ প্রবাহে বহিতে লাগিল। পয়সাভরা হাতখানা তাহার ফিরাইয়া দিয়া যথাসাধ্য মিষ্টকণ্ঠে বলিলাম, দিয়ে কি কেউ কখন ফিরিয়ে নেয়! তুমি যাও।

পথে বাহির হইবার সময় পকেটে গোটা দুই টাকা ছিল। বাসভাড়া ও পোষ্টকার্ড এই দুইটি খরচ বাদে সমস্তই ভিখারীকে দিয়া ফেলিয়াছিলাম। লোকটা আমার হাত হইতে মুক্তি পাইয়া যথাসম্ভব দ্রুতপদে অদৃশ্য হইয়া গেল। আমি তাহার শঙ্কিত-চলিয়া যাওয়ার পানে দৃষ্টি মেলিয়া নীরবে চাহিয়া রহিলাম। কি আর করিব।

(৩)

বাড়ির দরজায় আসিয়া পৌঁছিলাম তখন সবে সন্ধ্যা হইয়াছে। চৌকাঠের উপর একটা পা দিয়াই মনে পড়িল, চা আনা হয় নাই। তৎক্ষণাৎ ফিরিয়া রাস্তায় নামিতে হইল। কারণ এই দুর্দ্দিনের প্রারম্ভে সকালবেলা দুইটা টাকা পকেটে লইয়া সন্ধ্যার সময়ে শুধু হাতে এবং খালি পকেটে ঘরে ফিরিয়া চা কিনিবার পয়সার জন্য গৃহিণীর নিকট হাত পাতিবার মুখ ছিল না। কাজেই দরজার ভিতরদিকটা একবার উঁকি মারিয়া দেখিয়া লইলাম এবং পরক্ষণেই লম্বা লম্বা পদবিক্ষেপে বড়ো রাস্তায় আসিয়া পড়িলাম। যেখানটায় থামিলাম, সেখানে আবার একটা চায়ের দোকান। মনটা খুঁৎ খুঁৎ করিতে লাগিল। পকেটে যে কিছুই ছিল না তাহা ভুলি নাই, তথাপি মনে হইল পকেটটা হাতড়াইতে আপত্তি কি! গোটা দুই ঝিনুকের বোতাম, একটা সেফ্‌টিপিন্ এবং দুইদিক কাটা একটুক্‌রা উড্‌পেন্সিল হাতে ঠেকিল। মনে হইল, আমি কি! পয়সার অভাবে ডাল্‌হৌসী স্কোয়ার হইতে হাঁটিয়া বাড়ি ফিরিলাম, তবুও পয়সার সন্ধানে পকেট হাত্‌ড়াইবার মানে! চায়ের দোকানটাকে আর কিছুতেই মন হইতে তাড়াইতে পারিলাম না। অথচ সেখান হইতে চলিয়া যাইতেও মন চাহিল না। বাক্স সম্মুখে লইয়া পয়সা-কুড়ানী লোকটাকে দেখিয়া মন বিরক্তিতে পূর্ণ হইয়া গেল। মানুষটার যেমন প্রকাণ্ড মস্তক তেমনি ক্ষুদ্র দুইটা চক্ষু—তাহাতে আবার যেন সর্পের দৃষ্টি। লোকটা যেন বুদ্ধিহীন, খল। বেশ দোকানটি, চমৎকার বিক্রয় কিন্তু সম্ভবত মুর্খটার ব্যবসা বুদ্ধি কিছুই নাই। মনে হইল লোকটার কান মলিয়া দুইটা উপদেশ পরামর্শ দিয়া আসি। তোর দোকানে তো ভদ্রলোকেরই যাতায়াত। এমন তো প্রায়ই হয়, খাইতে বসিয়া শেষ পর্য্যন্ত হিসাব ঠিক থাকে না, পয়সা কম পড়ে, কিম্বা কোন ভদ্রলোকের তখন সমস্ত পয়সা খরচ হইয়া গিয়াছে, অথচ এই শীতের দিনে অন্তত এক পেয়ালা চা পান না করিলে নয়—সে সময় ভদ্রলোক কি এই তুচ্ছ কয়টা পয়সার জন্য ফিরিয়া যাইবে। ওরে মূর্খ, অপদার্থ ভদ্রলোকদের নাম ঠিকানাগুলা লিখিয়া রাখিয়া তাহাদের যত্নপূর্ব্বক পানাহার করাইয়া দে, দেখ, ছয় মাসে তুই মোটর হাঁকাইতে পারিস কিনা। সকলেই ভদ্রসন্তান, তোর দুইচারি আনা পয়সা সত্যই আর কেহ মারিয়া লইতেছে না। তবে তাহাদের বিস্মরণের কথা বলা যাইতে পারে বটে। কিন্তু ওরে হস্তিমূর্খ, মনে কর দেখি, যেদিন এই ঋণের কথা তাহাদের মনে পড়িয়া যাইবে, তখন কি ব্যাপার! লজ্জায় তাহাদের মাথা কাটা যাইবে কি না? তৎক্ষণাৎ তোর দোকানে আসিয়া এ-বিস্মৃতির দণ্ড-স্বরূপ নগদ-মূল্যে দুই পেয়ালার স্থানে চার পেয়ালা চা পান করিবে কিনা বল। তবে! বিপরীত দিকটা ভাবিয়া দেখিবার আছে বটে। যেমন, অনেক চ্যাংড়া ছোকরা

গিলিয়াই যাইবে এবং উপুড়-হস্ত করিবার কথা ইচ্ছা করিয়াই ভুলিবে। তাহাতে দোকানের ক্ষতি বটে। তবে ভাবিয়া দেখিতে গেলে এটা দোকানের পক্ষে মস্ত বিজ্ঞাপন বৈকি। কারণ দলে দলে লোক তোমার দোকানে যাইতেছে দেখিলে পথিক ভদ্রলোকদের কি ধারণা জন্মিবে! ইহার আরো একটা দিক আছে সেটা আধ্যাত্মিক—অত্যন্ত উঁচুদরের সব কথা, মূর্খটার মাথায় এ সব প্রবেশ করিবে কি! ভদ্রলোকদের এইভাবে বিশ্বাস করার পরিণামে যদি বা কেহ প্রবঞ্চনা করিতে চেষ্টা করে, তাহা হইলে সে মাত্র দুই একদিন, তাহার বেশী সে কিছুতেই পারিবে না, পারিবে না। কারণ তাহারও তো বিবেক বলিয়া একটা বোধ আছে। তবে? দিনের পর দিন এই প্রবঞ্চনার জীবন কাটাইয়া কি সেই ভদ্রলোকের অনুশোচনা ক্ষণেকের জন্যও বোধ হইবে না! তখন? এমনি করিয়াই তো প্রবঞ্চনা অচল হইয়া পড়িবে, কি উন্নতির কথা! জনসমষ্টি গঠনের কি অভিনব উপায়! ইহা তো দেশের সেবা। চাকরি গিয়াছে ভালই হইয়াছে, আমি দোকানই করিব। পথের লোককে ডাকিয়া সাধিয়া খাওয়াইব। নূতন আদর্শের পত্তন করিব। কিন্তু দোকানের একটা লোক প্রকাণ্ড এক টুকরা কেক্ ঠাসিয়া মুখের ভিতর পুরিল যে! মন খারাপ হইয়া গেল। আমার ক্ষুধা বোধ হইল। দ্রুতপদে বাড়ির দিকে অগ্রসর হইলাম।

দরজার কাছে আসিতে ভিতর হইতে একটা গোলোযোগ কানে আসিয়া পৌছিল। তাই হঠাৎ ভিতরে যাইতে সাহস হইল না। আমাদের বাড়িটার উত্তর গায়ে একটা পচা সরু গলি ছিল, দিনের বেলাতেও সেটা যথেষ্ট অন্ধকার। সেই দিকটায় আবার আমাদের রান্নাঘর। যত রাজ্যের ফেন জল এবং তরকারীর খোসা পচিয়া জমা হইয়া থাকিত। রান্নাঘরেই চায়ের আয়োজন হইয়া থাকে, কাজেই প্রকৃত সংবাদটা গলির ভিতর হইতেই পাইবার সম্ভাবনা। তাই সেইদিকে অগ্রসর হইলাম। অল্পক্ষণ কান পাতিয়া বুঝিলাম, দাদার আশায় থাকিয়া অবশেষে বিমলাই চা আনাইবার বন্দোবস্ত করিল; কারণ মণীবার অত্যন্ত শিরঃপীড়া হওয়ায় সে শয্যাগত হইয়াছে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বাহিরের দরজার কাছে পদশব্দ স্পষ্ট হইয়া উঠিল। গ্যাসের অল্প একটু আলো গলিটায় ঢুকিবার চেষ্টা করিয়াছে মাত্র। এই আবছায়া অন্ধকারে আমাকে দেখিয়া পাছে ঝিটা ভয় পাইয়া চীৎকার করিয়া ওঠে এই আশঙ্কায় দুই হাতে দুই দিকের দেয়াল ধরিয়া ভিতরের গভীর অন্ধকারের দিকে অগ্রসর হইলাম। প্রতি পদক্ষেপের সঙ্গে সঙ্গে বুঝিতে পারিতেছিলাম যে পচা পাঁকে জুতার অর্দ্ধেকটা করিয়া বসিয়া যাইতেছে। ঝি বাহির হইয়া গেল। জানলার ফাঁক দিয়া উঁকি মারিয়া দেখি, সকলেই এক একটা কলাইকরা গেলাস বাটি মগ পাথরের বাটি প্রভৃতি লইয়া বসিয়া গিয়াছে। আর বিমলা প্রত্যেকটায় একটু একটু গুড় ফেলিয়া দিতেছে এবং ছেলেরা তর্জ্জনীর প্রান্তভাগ গুড়ে এবং জিহ্বায় বারংবার স্পর্শ করাইতেছে। আমার বাড়ির সব অতিথিগুলিই গুড় দিয়া চা পান করিতেন। চিনিতে নাকি চা মিষ্ট হয় না। তাহাদের মুখে আরো শুনিয়াছি যে চায়ের সঙ্গে খাঁটি দুধটায় অনেক সময়ে উদরে বায়ুবৃদ্ধি করে, কিন্তু দুধের সহিত অল্প করিয়া জলসাগু মিশাইয়া লইলে সে চা পান অত্যন্ত উপকারি হয়।—ইহাই নাকি তাহাদের গ্রামের রেওয়াজ। উপরন্ত খরচও কম হয়।

দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া মনে হইতে লাগিল যেন জুতার তলায় শত শত ছিদ্র হইয়াছে। অল্প উপায়ে চা আসিয়া গেল দেখিয়া মনে মনে খুশী হইয়া উঠিলাম। মনে হইল এমন উপযুক্ত সময়ে ঘরে ফিরিতে পারিলে, এই ঠাণ্ডার রাত্রে এক পেয়ালা গুড়-চা না-মিলিয়া যায় না। দরজায় পা দিয়াই মনে হইল, ছিঃ! সামান্ত চা, তাহাও ইহাদের দিতে পারি নাই; যদিবা তাহারা নিজেদের উপায়ে সংগ্রহ করিয়া আনিল, আমি কোন মুখে তাহার ভাগ লইতে যাইতেছি! নিজের ভাবী দিনের কথা চক্ষের সম্মুখে ভাসিয়া উঠিল। ঠাণ্ডা যতই পড়ুক না কেন, ইহারা চলিয়া যাওয়ার পরমুহূর্ত্তেই যে এ বাড়িতে চা ছাড়াও আরো অনেক আয়োজনের শেষ করিতে হইবে। কাজেই চা পানের আশা ত্যাগ করিতে হইল। মনে হইল, দিন ত আমার আসিতেছে, দুই বেলা দুই মুঠা অন্ন জুটিবে কিনা সন্দেহ। কাজেই ক্ষুধা পাইলেই তৎক্ষণাৎ পাইবার বাসনা আমার পক্ষে অত্যন্ত অন্যায় বৈকি। বুঝিলাম, আর অল্পক্ষণ গা ঢাকা দিয়া থাকিতে পারিলেই চা-পর্ব্বটা শেষ হইয়া যায়। গলি হইতে সন্তর্পণে বাহির হইয়া পড়িলাম। সম্মুখের প্রকাণ্ড বাড়িখানা দেখিয়া হঠাৎ একটা কথা মনে জাগিল। এই ধনী লোকগুলা কি অসহায়, পঙ্গু! একদিন যদি মোটরে দূরে কোথাও গিয়া উপস্থিত হয় এবং পথশ্রমে নিতান্ত তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া যদি দেখে যে চা-পূর্ণ কাচের বোতলটি ভাঙিয়া গিয়াছে, বেচারি কি করিবে! কিন্তু আমার? আর দিনকতক পর হইতে কোন কষ্টই গায়ে লাগিবে না। কি মুক্তি! ভগবান মানুষকে কি অপরূপ শিক্ষার সুযোগ দেন, তাই ভাবি। মানুষকে মানুষ বানাইবার, পুতুল হইবার নয়, কি অপরূপ কৌশল তাঁহার। নমস্কার করিতে ইচ্ছা করে। লম্বা লম্বা পা ফেলিয়া বড়ো রাস্তার দিকে অগ্রসর হইলাম।

(৪)

মাত্র দুইটা দিবসের মধ্যে আমাদের সংসারে যথেষ্ট পরিবর্ত্তন ঘটিয়া গেল। ভগ্নী তিনটি পত্র পাইয়া এমনি ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন যে, নিতান্ত সকরুণ মিনতির সহিত আমার কাছে অনুমতি ভিক্ষা করিতে হইল।

গম্ভীরভাবে বলিলাম, যাবার জন্যে যখন ব্যস্ত হয়েচো, যাও!

আমার কথা শুনিয়া বেচারীরা কাঁদিয়া আকুল হইল। এ দৃশ্যে আমি কিন্তু মনে মনে সন্তুষ্টই হইলাম। গোছগাছ বাঁধা-ছাঁদায় বাড়ি চঞ্চল হইয়া উঠিল। সমস্ত দিন বসিয়া বসিয়া তাহাই দেখিতে লাগিলাম। তাহাদের নিতান্ত পীড়াপীড়িতে বলিলাম, তোরা আজ যাবি, তাই আর আফিসে গেলুম না।

ঘরে বসিয়া শুইয়া এ-চাঞ্চল্যের মধ্যে আমিই শুধু যেন জাগ্রত রহিলাম। অবশেষে প্রস্তুত হইয়া তাহারা যখন আমার পদধূলি লইতে আসিল, আমি আর সামলাইতে পারিলাম না। জুয়াচুরি করিয়া তাহাদের তাড়াইয়া দিবার সে যন্ত্রণা কোনদিনই ভুলিবার নয়। তাহাদের আশীর্ব্বাদ করিতে ভুল হইয়া গেল। কি জানি কেমন করিয়া দুই ফোঁটা জল আমার চোখ ছাপাইয়া উঠিল। দেখিয়া তাহারা ব্যথিত হইল, ব্যস্ত হইয়া উঠিল। আমি

নিজেও কম বিস্মিত হইলাম না। কারণ আমার চোখে জল আসা অত্যন্ত কঠিন, তাই জানিতাম। যাহাই হোক, তাহারা চলিয়া গেল। সেই হট্টগোলের বাড়ি একেবারে নিশুতি রাতে পরিণত হইয়া গেল।

যে পঞ্চাশটি মুদ্রা আফিস হইতে মিলিয়াছিল তাহার প্রায় অর্দ্ধেকটা মুদীর দোকানের ঋণ পরিশোধ করিতে বাহির হইয়া গিয়াছিল। গোটা দশেক ভগ্নীগুলির গাড়ীভাড়া প্রভৃতি—বাকি হাতে ছিল বিশ। দশটি মুদ্রা আফিস হইতে পরে মিলিবে কথা ছিল। বাকি টাকাগুলি গৃহিণীর হাতে তুলিয়া দিলাম।

বেচারি এমন করিয়া প্রশ্ন করিল, এই শেষ—যে তাহারই চক্ষু ফাটিয়া জল বাহির হইল।

গৃহিণীর পরামর্শে সে বাড়ি ছাড়িয়া বার টাকার একতালায় দুইখানি ঘর ভাড়া পাইয়া উঠিয়া আসিতে হইয়াছে। মা চোখে ভাল দেখেন না, কানেও শোনেন কম। কাজেই বাড়ি পরিবর্ত্তনের মিথ্যা একটা কারণ তাঁহাকে বুঝাইতে বিশেষ বেগ পাইতে হয় নাই। এ বয়সে তাঁহাকে আর কষ্ট দিতে মন উঠিল না। তাই ভবিষ্যতের কথা ভাবিয়া চিন্তিত হইয়া উঠিতেছিলাম।

ছোট্ট বাড়ি, সম্পূর্ণ একতলাটা আমাদের। দ্বিতলে বাড়িওয়ালা এবং তৃতলে একটি ভাড়াটিয়া। তিন গৃহস্থের সম্পর্কের মধ্যে গতায়াতের পথটি, তাও বে-আব্রু নয়। সে যাহাই হোক, ভাড়ার বারটি টাকা অগ্রিম দিতে হইয়াছে এবং আরো ছয়টি টাকা অগ্রিম দিয়া রাখিবার কথা লইয়া গৃহিণীর সহিত মনান্তর ঘটিয়া গিয়াছে।

মণীষা বলিল, কুড়িটা তো টাকা, তার মধ্যে আঠারোটাই যদি ভাড়ায় দেবে, খাওয়া দাওয়া হবে কোথা থেকে!

বলিলাম, খাওয়াটার চেয়ে থাকবার জায়গার দরকার আগে। ঘরে শুয়ে উপোষ করে মাসখানেক চল্‌তে পারে, কিন্তু মাকে, আর তোমাকে নিয়ে পথে বসায় অপমান আছে, তা আমি পারবো না, পারবো না। পরে ঘরভাড়ার টাকা আর জোটে কিনা, তারই ঠিক কি!

বহু তর্কবিতর্কের পর, ছয়টা টাকা আরো পনেরো দিনের জন্য অগ্রিম না-দিবারই স্থির হইল। গৃহিণী কথাটা বলিয়াছিল মিথ্যা নয়।—আমরা দু'পয়সার মুড়ি খেয়ে দিন কাটাতে পারবো কিন্তু মা, তাঁকে তো প্রতিদিন ঠকাতে হবে! আগের মতন খাওয়া দাওয়ায় তাঁর তরিবৎ করতেই হবে, তো!

মণীষাকে একটু আদর করিয়া বলিলাম, তুমি আর আমার এই কলম, এই দুই তো লক্ষ্মী সরস্বতী—এ যতোদিন রইল আমি কাউকে ডরাই ভেবেচো। তোমরা না থাকলে আমি তো ভুয়ো।

গৃহিণী আমার দিকে বিহ্বল-দৃষ্টি মেলিয়া চাহিয়া রহিল।

(৫)

সেদিন সারা মধ্যাহ্নটা ঘুরিয়া ঘুরিয়া ঘরে ফিরিলাম তখন সবে সন্ধ্যা হইয়াছে। সদর দরজায় পা দিয়াই মনে হইল ঝির কাজ শেষ হইয়াছে, সে এখনই বাহির হইয়া যাইবে। একটা মৎলব চট্ করিয়া মনে আসিল। অত্যন্ত সন্তর্পণে দরজার পাশে অন্ধকারে অপেক্ষা করিতে লাগিলাম এবং নিজের বুদ্ধি ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের তারিফ করিতে করিতে মনে মনে উৎফুল্ল হইয়া উঠিলাম। ক্রমেই দরজার দিকে একটা পদশব্দ অগ্রসর হইয়া আসিতে লাগিল। যথাসাধ্য চেষ্টায় দেয়াল ঘেঁসিয়া আমি প্রায় নিশ্বাস বন্ধ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। অস্পষ্ট মূর্ত্তিটা দরজার কাছাকাছি আসিতে আমি চাপা গলায় তাহাকে থামিতে বলিলাম। বুকের ভিতরটা ঢিপ্ ঢিপ্ করিতে লাগিল।

ব্যস্তভাবে নিম্নকণ্ঠে বলিলাম, অন্ধকারে ভয় পেয়ে চেঁচিয়ে উঠো না যেন। আমার একটা জরুরি কাজ ক'রে দিতে পারলে বখশিস্ মিলবে। বুঝ্‌লে।

গায়ের শালখানা তাড়াতাড়ি খুলিয়া লইয়া বলিলাম, শুনচো ঝি, এই শালখানা তোমার বিক্রি করে দিতে হবে। বেশী দামের জিনিষ নয়, বিক্রি যদি একান্তই না হয়, অন্তত বন্ধক রেখে কাল সকালেই আমাকে কিছু টাকা এনে দিতে হবে, বুঝলে। নইলে, কাল তোমার মাইনের টাকা দিতে পারবো না। কিন্তু দেখো, কেউ যেন এর বিন্দু বিসর্গও জানতে না পারে! বুঝলে! চুপ করে রইলে যে! আচ্ছা না হয় পুরো একটা টাকাই জল খেতে দেবো। কিন্তু খুব সাবধান। আরে সাড়া দিচ্ছ না কেন? এরকম ভাবে দাঁড়িয়ে থাকা ঠিক নয়, তুমি তাহলে যাও।

শালখানা তাহার গায়ের উপর ফেলিয়া দিলাম। ভাবিলাম, কাচিতে দিয়াছি, এই কথা মণীষাকে বলিলে চলিবে। তারপরে ভাবনা কি, কাল্পনিক শাল-ওয়ালার কাছে হাঁটাহাঁটি করিব এবং একদিন প্রচার করিব যে সে দোকান উঠিয়া গিয়াছে, শালওয়ালা ফেরার। ব্যাস্। মণীষার চোখে ধূলা দেওয়া এমন কি আর কঠিন।

অস্পষ্ট মূর্ত্তিটা শালখানা গ্রহণ করিল বটে কিন্তু সে সদর দরজাটা ভেজাইয়া দিয়া অন্দরের দিকে অগ্রসর হইল। ভয়ে আমার বুক শুখাইয়া উঠিল। গৃহিণী এ-সংবাদ পাইলে কি আর রক্ষা আছে। মরিয়া হইয়া গেলাম। দ্রুতপদে অগ্রসর হইয়া তাহাকে ধরিয়া ফেলিলাম। বলিলাম, যাচ্চো কোথায়?

মধ্যপথে তাহাকে রোধ করিতে সে এমনভাবে মাথা ঘুরাইয়া আমার পানে চাহিল যে দ্বিতলের কোথা হইতে অল্প এক টুক্‌রা আলো আসিয়া তাহার চোখের উপর পড়িল। দেখি মণীষা। আমার ধরা আল্‌গা হইয়া গেল। গৃহিণী কিন্তু আমাকে শক্ত করিয়া ধরিয়া লইয়া অগ্রসর হইল। আমার মাথাটা যেন কেমন ঘোলাইয়া গেল।

বিছানার উপর বসাইয়া দিয়া মণীষা আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। দুই একবার চোখে চোখ মিলিয়া গেল। আমি নতমুখে বসিয়া রহিলাম। কাজটা যথাসম্ভব গোপনে সারিবার বাসনা ছিল, কিন্তু কোথা দিয়া যে কি হইয়া গেল, ভাবিয়া কিনারা করিতে পারিলাম না। অল্পক্ষণ পরে মুখ তুলিয়া একটু হাসিবার চেষ্টা করিলাম। গৃহিণী বাহির হইয়া গেল। কি জানি, হয়তো অশ্রুরোধ করিতে। মনটা নিতান্তই খারাপ হইয়া গেল। নিজের অনবধানতায় সমস্তই জট্ পাকাইয়া গেল।

চামড়ার ছোট একটা বাক্‌স লইয়া মণীষা ফিরিয়া আসিল। গয়নাগুলা আমার সামনে মেলিয়া ধরিয়া অস্বাভাবিক দৃঢ়তার সহিত বলিল, এসব থাকতে, তোমার গায়ের কাপড় বিক্রি করবার দরকার হয় কেন!

বলিতে বলিতেই তাহার চক্ষু ছাপাইয়া জল ঝরিয়া পড়িল।

গায়ের কাছে টানিয়া লইয়া বলিলাম, ছিঃ মনু, তোমার আমার জিনিষ কি আলাদা। এ গয়নার তুলনায় গায়ের কাপড়

তুচ্ছ নয় কি! তাছাড়া ব্যস্ত হোচ্চো কেন, ওসবে হাত একদিন তো পড়বেই। কাজেই শাল দিয়ে সুরু মন্দ কি! তাছাড়া সত্যিকথা বলতে কি মণি, এই দুর্দ্দিনে আমি তো তোমার মুখচেয়ে এখনো সোজা হোয়ে দাঁড়িয়ে আছি। তা নৈলে তুমি কি ভাবো, আমি পুরুষ মানুষ হোয়ে দুটো লোকের মুখে দুমুঠো অন্ন তুলে দেবার ক্ষমতা নেই বলে শাল বিক্রি কোরতে যাচ্ছি, এর আত্মগ্লানি আমার লাগে নি! এরপর আমার আত্মহত্যা করা উচিত হয় নি কি! সমাজের চোখে আমার কোনো মূল্য না থাকতে পারে, নিজের কাছে আমি তো অপরাধী হোয়েই আছি। কিন্তু তোমার চোখে আমাকে ছোটো হোতে দিও না, তাহলে বাঁচবো না। আমি যেমন কোরেই পারি, আমাকে আমার সংসার চালাতে দাও, বাধা দিও না। চোর যে সেও তার পরিবার ভরণপোষণ করে। হ'তে দাও আমাকে চোর, কিছুদিনের জন্যে। আমার নিজের জিনিষ যদি আমি চুরি কোরে তোমাদের উপোষ থেকে বাঁচাতে পারি, তাতে আঙুল বাড়িয়ে নির্দ্দেশ কোরতে যেও না। মাকে কষ্ট থেকে বাঁচাবার জন্যে মিথ্যে অভিনয় কোরে আসচি, তোমাকেও ছলনা কোরতেই হবে। সমাজের চোখে চোরের মাথা নীচু হোতে পারে কিন্তু তার স্ত্রীপুত্রের কাছে সম্ভবত তার আত্মমর্য্যাদা বজায় থাকে। আমার হীনতাকে কাজেই হীনতর কোরো না। পয়সা রোজগারের ভাবনা চিরদিন তো আমি একাই ভেবে এসেচি, এখন দুর্দ্দিন দেখে তার মধ্যে তোমার বুদ্ধির দৌড় দ্যাখানো মোটেই সমীচীন হবে না। তুমি আমায় দয়া করো।

মণীষা নির্ব্বাক বিস্ময়ে আমার দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার এই আকুল অসহায় চাহিয়া থাকা যেমনি আশ্চর্য্য সুন্দর, তেমনি করুণার, স্নেহের, ভালোবাসার।

তাহার মাথাটা কোলের উপর টানিয়া লইয়া কপালের উপর হইতে লতানো চুলগুলা সরাইয়া দিলাম। দুইপাশের চুলগুলা সরাইয়া কেশাচ্ছন্ন কান দুইটা বাহির করিয়া ফেলিলাম। মণীষার কান কি সুন্দর, অথচ অহর্নিশ ঢাকিয়াই রাখিয়াছে। আশ্চর্য্য, ভুলিয়া যাইতে বসিয়াছিলাম যে মেয়েদেরও কান থাকে। আমার নির্ব্বাক ভাবভঙ্গি এবং মৃদু হাসির রেখায় হয়ত বা মণীষা অবাক হইয়া থাকিতে পারে। কিন্তু তাহাতে আমার কি যায় আসে। আমি আঙুল দিয়া তাহার চোখের পাতা দুইটি নামাইয়া চোখ বন্ধ করিয়া দিলাম এবং পরক্ষণেই তাহার বাসিগোলাপের মতন ম্লান অধরওষ্ঠে আমার দুঃখের হাসি মিলাইয়া দিলাম। মণীষা লজ্জা পাইল না, আপত্তি করিল না, নীরবে শুধু একবার, ক্ষণেকের জন্য আমার গলাটা জড়াইয়া ধরিল।

বিজয়ীর মতন বলিলাম, বুঝলে তো, আমার জিনিষ যখন আমি চুরি কোরবো, তখন তুমি অন্তত চোখ বুজিয়ে থাকতেও পারো। আমার মাঝে মাঝে কি মনে হয় জানো মণীষা, ভগবান বুঝি আমাদের দু'জনকে পরীক্ষা কোরচেন, কতোটা সইতে পারি। কি জানি, ভগবানে বিশ্বাস হয় না, এই কথা ভেবে যে আমাদের মতন নির্ব্বিবাদী ভালো লোকদের কষ্ট দিয়ে তাঁর কি লাভ, অথচ তাঁর কথা না ভেবে তো পারি না। ঈশ্বর বেঁচে আছেন, মানুষের সংস্কারে। কি বলো—?

মণীষা চলিয়া যাইতেছিল। তাহাকে ধরিয়া বসাইলাম।

বলিলাম, এই দুর্দ্দিনে তোমাদের চণ্ডী-ভগবানের সহায় তুমি হবে, না আমার? যদি আমার মুখ চাইতে শিখে থাকো, তাহলে এই গয়নাগুলো কখনো আমার সাম্‌নে এনো না। আমার লোভ হয়। বুঝেচো। আর একটা কথা শোনো, যেটা বলছিলুম। আমার কথার মাঝখানে রসভঙ্গ কোরে সোরে পড়বে, তা হয় না; সবটা শুনতেই হবে, ভালো না লাগে তোবুও বলছিলুম যে, আমার যখন ছেলে হবে, তাকে এমন শিক্ষার আওতায় রাখবো যাতে তোমাদের ভগবানের নামোল্লেখ পর্য্যন্ত থাকবে না। ইতিহাস, দর্শন, সাহিত্য, এইসব পড়তে না দিলেই হবে, শুধু বিজ্ঞান শিখবে। তখন দেখো, সে কেমন ছেলে হয়। কিন্তু মুস্কিল, ছেলেটা স্কুলে যেতে পাবে না, পাড়া-প্রতিবেশীর সঙ্গে মিশতে পারবে না—তাহলেই তো সব গণ্ডোগোল—মাথায় ধর্ম্ম, ভগবান, এসব ঢুকবেই। বাঙ্গালা দেশে রাখাও তো বিপদের কথা, বারো মাসে তেরো পার্ব্বণ লেগেই আছে। যখন জিগ্যেস কোরবে, ও কিসের বাজ্‌না, ও কিসের পুতুল, কি বোলবো তখন! কিন্তু ভারতবর্ষের যেখানেই যাক্, সব জায়গাতেই তো ধর্ম্মাধর্ম্মের ব্যাপার লেগেই আছে। তাহলে, যায় কোথায়! সমস্যা বটে! যাক্‌গে, একথা আর একসময়ে ভাবা যাবে।

মণীষা জিজ্ঞাসা করিল, চা খাবে?

একেবারে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলাম। বলিলাম, একটা গল্প বলি শোনো। একবার বরযাত্রী হয়ে হরিনাভির ঐদিকে নেমন্তন্ন খেতে গিয়েছিলুম। আফিস সেরে বিকেলের ট্রেণ ধোরতে পারলুম না, কাজেই রাত্তির হোয়ে গেলো। ষ্টেশনে একটি ভদ্রলোক হ্যারিকেন নিয়ে শেষ ট্রেণটা দেখে যাবার অপেক্ষায় ছিলেন। কাজেই পথ চিনে বিয়ে বাড়ি পৌঁছোবার কোনো হাঙ্গামাই রৈলো না। বেশ গল্প কোরতে কোরতে যাচ্ছি, তখন বোশেখ মাস, হঠাৎ কালবৈশাখীর ঝড় বৃষ্টি। ভিজে একেবারে ঢব ঢবে। বিয়ে বাড়ির লোকেরা বড়ই খাতির কোরলে, কি চাই, কি চাই কোরে। আমি এক পেয়ালা চা ভিক্ষে কোরলুম। চা এলো। খেতে একেবারে উৎকট। মনে করলুম, পাড়াগেঁয়ে লোকের চা খাওয়া, এই রকমই হয় বোধহয়। হঠাৎ চায়ের একটা পাতা মুখের মধ্যে। কি জানি কি মনে করে সেটা চিবিয়ে দেখলুম। তারপরে মুখ থেকে বার কোরে দেখতে লাগলুম, চায়ের পাতা কিনা। ঠিক বুঝতে পারলুম না, তবে যে চা নয় এটা বেশ বুঝ্‌তে পারলুম। এমন সময় বিয়ে বাড়ির ব্যস্ততায় একটি ভদ্রলোক, যেখানে আমরা বসেছিলুম, সাঁ কোরে সেখানে এসে উঠ্‌লেন। তাঁর মাথায় লেগে চালের বাতা থেকে ভিজে গোলপাতা ভেঙে পোড়লো। গোটাকতক টুকরো আমার চায়ের বাটিতে। মিলিয়ে দেখলুম, চা খাচ্চি না, খাচ্চি গোলপাতা সেদ্ধ, যে গোলপাতায় মেটে ঘর ছায়! শেষে জানা গেলো কনেকর্ত্তা লোকটা ভীষণ জোচ্চোর। সে যাক্ গে, তুমি কি আমায় তেম্‌নি চা খাওয়াবে! তাতে আমি রাজী নই মশাই! হোয়েচে মন্দ নয়, তুমি আর আমি যেন দুই চোর, তবে মাসতুতো ভাই নয়। কি বলো।

আবার হাসিতে লাগিলাম। মণীষা বাহির হইয়া গেল।

ক্রমশঃ

গান

স্থর ঃ—সঙ্গীতাচার্য্য শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র দে

স্বরলিপি ঃ—শ্রীযুত পঙ্কজকুমার মল্লিক, স্থরসাগর

কথা ঃ—শ্রীস্থনীলকুমার দাশগুপ্ত

এসেছে শ্রাবণ সন্ধ্যা,
তুমি জাগো, তুমি জাগো—
সুন্দর রজনীগন্ধা।
নাচে ময়ূরী গাহে কেকা
আপন হারায়ে মেঘ কাঁদিছে একা,
তুমি যে গো মায়ামৃগ—
তুমি স্থর-মধু-ছন্দা।

যে ব্যথা লুকায়ে ছিল
তারায় তারায়
ভাসালো কোন্ সে নিঠুর
মেঘের ভেলায়;
আজি এ বাদল সাঁঝে
তোমার স্থরভি রাজে
তুমি বাদলের গান যে গো
তুমি যে অলকনন্দা॥

{ া র্সা র্রা র্সা | ণা -ধণা মা পা | না -া র্সা -া | (-ণা -পা -মগা -মা) }
{ ॰ এ সে ছে শ্রা ॰॰ ব ণ সন্ ॰ ধা ॰ ॰ ॰ ॰॰ ॰ }

৩ ॰ ১ + ৩
-া -া ণা পা I মা -া -পধা -মপা | মজ্ঞা -া মা মা | সরা -া সা -া ¦ -া -া -া -া I
॰ ॰ তু মি জা ॰ ॰॰ ॰॰ গো ॰ তু মি জা ॰ গো ॰ ॰ ॰ ॰ ॰

॰ ১ + ৩
সা -রা মা পা | নর্সা -র্জ্ঞা র্রা র্সা | না র্সা র্সা -া | -ণর্সা -ণধা -পমা -পা II
সু ন্ দ র র॰ ॰॰ জ নী গ ন্ ধা - ॰॰ ॰॰ ॰॰ ॰

৩ ॰ ১ + ৩
া া া া II { া মা পা পা | ণা -পা পনা -া | -া না র্সা না | র্সা -া -া -া I
॰ ॰ ॰ ॰ { ॰ না চে ম য়ূ ॰ রী ॰ ॰ গা হে কে কা ॰ ॰ ॰

০ ১ +
পা পর্রা র্রা র্রা | র্রা গজ্ঞা র্রা -র্সা | না র্সা না দা | পা -া -া -া } I
আ প ন হা রা য়ে মে ঘ্ কাঁ দি ছে এ কা ০ ০ ০

০ ১ +
{ দা পমা দা পা | মা গা সা -ঋা | (গমা -া -া দা | পর্সা -া -া -া) } I
{ তু মি০ যে গো মা য়া মৃ ০ গ ০ ০ তু মি ০ ০ ০

মা -া -া -া | -া -া া া I সা রা মা পা | নর্সা -রজ্ঞা র্রা -র্সা |
গ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ তু মি সু র ম০ ০০ ধু ০

না র্সা র্সা -া | -ণর্সা -ণধা -পমা -পা II
ছ ন্ দা ০ ০০ ০০ ০০ ০

০ ১ + ৩
া া া া II সা সমা মা মা | পা পা দা পা | মা রমা -পদা মপা | গজ্ঞা -া -া -া I
০ ০ ০ ০ যে ব্য০ থা লু কা য়ে ছি ল তা রা০ ০য়্ তা০ রা ০ ০ য়্

০ ১ + ৩
জ্ঞা মা পা -া ণা ধা পা -া | পা জ্ঞা জ্ঞা র্রা | র্সা -া -া -া I
ভা সা লো ০ ভা সা লো ০ কো ন্ যে নি ঠুঁ ০ ০ য়্

০ ১ + ৩
না র্সা না দা | পা -দা মা -া | পা দা মা পা | পর্সা -া -া -া I
মে ঘে র ভে লা ০ য়্ ০ মে ঘে র ভে লা ০ ০ য়্

০ ১ + ৩
{ া মা পা পা | ণা -পা না না | র্সা -া র্সা -া | -া -া -া -া I
{ ০ আ জি এ বা ০ দ ল সাঁ ০ ঝে ০ ০ ০ ০ ০

০ ১ + ৩
পা পর্রা র্রা গজ্ঞা | র্রা র্সা পণা -পণা | ণা -া পা -া | -া -া -া া } I
তো মা র সু র ভি রা০ ০০ জে ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

০ ১ + ৩
{ দা পমা দা পা | মগা -মা সা ঋা | (গমা -া -া পা | পর্সা -া র্সা র্সা) } I
{ বা দ০ লে র গা০ ০ ন্ যে গো ০ ০ তু মি ০ তু মি

+ ৩ ০ ১
গমা -া -া -া | -া -া া া I সা রা মা -পা | নর্সা -রজ্ঞা র্রা র্সা |
গো ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ তু মি যে ০ অ০ ০০ ল ক

+ ৩
না র্সা র্সা -া | -ণর্সা -ণধা -পমা -পা II II
ন ন্ দা ০ ০০ ০০ ০০ ০

শিল্পী—শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ সেন　　　দুপুর বেলা　　　ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

ক্ষতি

ভাস্কর

ইভ্যাকুয়েশনের গোলমালে আমার ঘড়িটি হারাইয়াছে। কোথায় কি ভাবে গেল, তাহা এখনও নির্ণয় করিতে পারি নাই। ট্রেণ হইতে নামিয়া নূতন বাসায় পৌঁছিয়া জিনিষপত্র গুছাইয়া, বাজার করিয়া, কোন মতে আহারাদির ব্যবস্থা করিয়া, ক্লান্ত শরীর ও মন লইয়া একটু বিশ্রাম করিতেছি—আর আমার ঘড়িটার কথাই ভাবিতেছি।

মনে পড়ে, প্রায় তের বৎসর আগে ডালহাউসি স্কোয়ারের একটা বড় দোকানে গিয়া, ক্যাটালগ ঘাঁটিয়া, অনেক পছন্দ করিয়া, আধুনিক ডিজাইনের একটা আঠারো-ক্যারাট সোনার ঘড়ি কিনিয়া বাঁ-হাতের কব্জিতে পরিয়াছিলাম। ঘুরাইয়া ফিরাইয়া, নাড়িয়া চাড়িয়া, দেখিয়া শুনিয়া কত আনন্দ কত তৃপ্তি সেদিন পাইয়াছি। তারপর হইতে এই দীর্ঘ তের বৎসর কখনও ঘড়িটিকে হাত-ছাড়া বা কাছ-ছাড়া করি নাই।

বাড়ীতে বসিয়া কাজ করিবার সময়ে ঘড়িটিকে টেবিলের উপরে চোখের সামনেই রাখিয়াছি। অফিসের বেলা হইবে ভয়ে সাড়ে নয়টার পরে ঘন ঘন ঘড়ির কাঁটার দিকে চাহিয়াছি। কখনও কদাচিৎ ঘড়ির কাঁটা অচল দেখিলে, দম দেওয়া হয় নাই বলিয়া নিজেকে ভর্ৎসনা করিয়াছি। প্রতিদিন বেলা একটার সময়ে তোপের সঙ্গে নিয়মিত সময় মিলাইয়াছি।

এখন মনে করিলে হাসি পায়, দিনের পর দিন চিঠি ডেলিভারির সময় নিকট হইলে, ক্রমাগত ঘড়ির কাঁটা এবং পথের পিয়নের দিকে নির্নিমেষ চোখে চাহিয়া থাকিতাম। বৈকালে চিঠি ডাকে দিতে পাছে বিলম্ব হয়, এই ভয়ে ক্রমাগত ঘড়ির দিকে চাহিয়া সময় কাটাইয়াছি। প্রতি শনিবার বৈকালে ট্রেণ ফেল করিবার আশঙ্কায় হাতের কব্জির দিকে চাহিয়াছি, আর ট্রাম বাস ধরিতে ছুটিয়াছি। ট্রেণে উঠিবার পূর্বে যে ঘড়ির কাঁটা অত্যন্ত তাড়াতাড়ি চলিতেছিল, ট্রেণে উঠিয়া মনে হইত, ঘড়ির কাঁটা যেন অত্যন্ত আস্তে আস্তে চলিতেছে।

নিজের বাড়ীতে এবং অন্যান্য প্রতিবেশীর বাড়ীতে সন্তানাদি হইবার সময়ে আমার ওই ঘড়িটা কত কাজে লাগিয়াছে। জন্মের সময় ঠিকমত নির্ধারণ করিতে আমার ওই উৎকৃষ্ট ঘড়িটি কতজনে আদর করিয়া চাহিয়া লইয়া গিয়াছে। আবার মৃত্যুর সময় নির্ণয় করিতেও বহুবার আমার ঘড়িটি বহুস্থানে ব্যবহৃত হইয়াছে। দুইটি বা ততোধিক ঘড়ির সময়ের অমিল হইলে অনেক সময়ে আমার ঘড়িটিই সগর্বে জয়লাভ করিয়াছে।

বাড়ীতে কারো অসুখ হইলে আমার ঘড়িটি হাতে বাঁধিয়া রোগীর পাল্‌স্ গণিয়াছি, থারমোমিটার দিয়া তাপ দেখিয়াছি। ডাক্তারের ঔষধ ও পথ্য ব্যবস্থা ঘড়ি দেখিয়াই নিয়ন্ত্রিত করিতে হইয়াছে।

এই দীর্ঘ তের বৎসরের মধ্যে কতবার ষ্ট্র্যাপ বদলাইয়াছি। কালো, ব্রাউন, চকলেট কত প্রকার চামড়ার ষ্ট্র্যাপ, আবার সাদা কালো কাপড়ের ষ্ট্র্যাপ ওই ঘড়িটাকে পরাইয়াছি, কত পছন্দ করিয়া, কত যত্ন করিয়া! কতবার দোকানে দিয়াছি-অয়েল করিতে এবং অস্থির উদ্বিগ্ন মনে উহার প্রত্যাগমনের প্রত্যাশায় পথ চাহিয়া দিন কাটাইয়াছি। পুরাতন বিশ্বস্ত চাকরের অসুখ হইলে মনের যে অবস্থা হয়, দোকান-বাসী ঘড়ির অনুপস্থিতিতেও তেমনি অস্বস্তিবোধ করিয়াছি।

যাত্রার সময় স্থির করিতে, বিবাহের লগ্ন নির্ণয় করিতে, আরতির সময় স্থির করিতে, সন্ধ্যায় শঙ্খধ্বনি করিতে আমার ওই ছোট্ট বন্ধুটির মুখের দিকে বহুবার চাহিয়া চাহিয়া অনুমতি লইতে হইয়াছে। মাসিমার গঙ্গাস্নানের সময়, পিসিমার অম্বুবাচী নিবৃত্তির সময়, জ্যেঠাইমার গ্রহণ-স্নানের সময় ঠিক করিয়াছি আমার ওই ঘড়ির কাঁটা দিয়াই।

কতবার কত স্পোর্টসের সময়ে দৌড় লাফ প্রভৃতির নির্দিষ্ট সময় স্থির করিয়াছি আমার ঘড়িটির দিকে চাহিয়া। কতবার কত রেফারি আমার ঘড়িটি হাতে বাঁধিয়াই বিভিন্ন দলের ভাগ্য-বিচার করিয়াছে। কতদিন খেলার মাঠে স্বকীয় দলের হারজিতের সম্ভাবনায় উদ্বিগ্ন ও উত্তেজিত মনে ঘন ঘন ঘড়ির দিকে চাহিয়াছি। সিনেমা বা থিয়েটার দেখিতে গিয়া কতবার ঘড়ির দিকে চাহিয়াছি, সমাপ্তির আশায় বা আশঙ্কায়। গাড়ী চালাইবার সময়ে কতবার ঘড়ি দেখিয়াছি, গাড়ীর বেগ নির্ণয় করিতে অথবা পথের দৈর্ঘ্য মাপিতে।

কয়েক বৎসর পূর্বের কথা। একবার গয়া ষ্টেশনে নামিয়া দেখি, মণিব্যাগটি অন্তর্হিত হইয়াছে। আমার ওই সোনার ঘড়িটি ষ্টেশন-মাষ্টার মহাশয়ের নিকট গচ্ছিত রাখিয়া কিছু অর্থ-সংগ্রহ করিয়া উপস্থিত বিপদ হইতে রক্ষা পাইয়াছিলাম। আমার এই বন্ধুটি আজ এই বিপদের দিনে আমাকে ছাড়িয়া গিয়াছে।

দীর্ঘ তের বৎসর যাবৎ ওই ঘড়িটি আমার পরম আত্মীয়ের মত সুখে দুঃখে আমার জীবনের সঙ্গে মিশিয়াছিল। কত সময় কত কষ্ট পাইয়াছে সে, তবু আমায় পরিত্যাগ করে নি। ঘামে ভিজিয়াছে, রৌদ্রে পুড়িয়াছে, বাতাসে কাঁপিয়াছে, বাসে, ট্রামে, গাড়ীতে, ট্রেণে কত ঝাঁকানি সহিয়াছে, পড়িয়া গিয়া কাঁচ ভাঙিয়াছে, সোনার ডালায় টোল খাইয়াছে, দম অভাবে নিষ্পন্দ হইয়াছে, ছেলেমেয়ের দৌরাত্ম্য সহিয়াছে, কিন্তু তবু সে আমারই হাতে একান্ত নির্ভয়ে নিজেকে বাঁধিয়া রাখিয়াছে।

আমার এই পুরাতন বন্ধুটির অভাব আজ সারাদিন অনুভব করিয়াছি। এখনও বসিয়া বসিয়া তাহারই কথা ভাবিতেছি। রাত্রি কত হইল? কেমন করিয়া বলিব? হাতের কব্জিতে ষ্ট্র্যাপের দাগটি এখনও রহিয়াছে, কিন্তু কিছুই টিকটিক করিতেছে না। ঝির ঝির করিয়া বাতাস বহিতেছে। চারিদিক প্রায় নিস্তব্ধ। আমার ঘড়িটির শোকে মুহ্যমান হইয়া তন্দ্রা আসিবার উপক্রম হইয়াছে। হঠাৎ, ও কি! একটি তরুণীর করুণ আর্তনাদ না? উৎকর্ণ হইয়া উঠিলাম।

এ অঞ্চলটায় প্রায় সকলেই ইভ্যাকুয়ী। আমার বাসার পাশেই আর একটি ইভ্যাকুয়ী পরিবার আসিয়াছেন। শুনিয়াছিলাম, ইহাঁরা বর্মা হইতে আসিয়াছেন। নানা ঝঞ্ঝাটে ও বাড়ীতে গিয়া অন্য কোন সংবাদাদি লইতে পারি নাই। নূতন সংগৃহীত চাকরটাকে ডাকিলাম। জিজ্ঞাসা করিলাম, 'ও বাড়ীতে কাঁদে কে?' এমন সময় পুনরায় আর্তনাদ শুনিলাম, 'ওরে আমার বাছারে, আমার সোনারে, তুই কোথায় আছিস রে'—ইত্যাদি। চাকরটা জানাইল, বর্মা হইতে আসিবার পথে উহার একমাত্র সন্তান, একটি শিশুপুত্র হারাইয়া গিয়াছে।

অবসন্ন শরীর মন আরো অবসন্ন হইয়া পড়িল। কোনমতে শরীরটাকে টানিয়া লইয়া বিছানায় শুইয়া পড়িলাম। ঘড়ির শোক ভুলিয়াছি। মেয়েটির আর্তনাদ এখনও কানে আসিতেছে।

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ

গত ১৩ই আষাঢ় রবিবার বগুড়া ও দিনাজপুর জেলার সন্ধিস্থলে অবস্থিত খাসপাহনন্দগ্রামে ভারত সেবাশ্রম-সঙ্ঘের উদ্যোগে স্থানীয় মিলন-মন্দিরে এক শুদ্ধিযজ্ঞ ও হিন্দু-সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। উহাতে ২৯৫ জন সাঁওতাল খৃষ্টান হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ করে। প্রায় ৬০ বৎসর পূর্ব্বে

হিন্দু-সম্মেলন—স্বামী অদ্বৈতানন্দজীর বক্তৃতা

ইহাদের পিতা বা পিতামহগণ পশ্চিম সাঁওতাল পরগণা হইতে আসিয়া উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলার পল্লী অঞ্চলে বসতি স্থাপন করে। তাহার পূর্ব্বে ঐসকল স্থানে বহু জমি পতিত বা জঙ্গলাকীর্ণ ছিল। সাঁওতালরা জঙ্গল কাটিয়া চাষ আবাদ করিতে থাকে। এক কৃষিকার্য্যই উহাদের জীবিকা নির্ব্বাহের প্রধান উপায়রূপে পরিগণিত হইয়াছে।

জন-সমষ্টিকে আপনার করিয়া লইয়া হিন্দু-সমাজের পুষ্টি-সাধনের চেষ্টা এতদিন পর্য্যন্ত কেহ করেন নাই। স্থানীয় ধনী সম্প্রদায়, নেতৃবৃন্দ বা হিন্দুজনসাধারণ কেহই ইহাদের শিক্ষা-দীক্ষার জন্য মাথা ঘামায় নাই। কোন ধর্ম্ম-প্রতিষ্ঠান ইহাদের মধ্যে হিন্দুধর্ম্মের প্রচার-প্রসারে আত্মনিয়োগ করেন নাই, কোন হিন্দুসমাজসংস্কারক কোনদিনই ইহাদের ব্যক্তিগত, পারিবারিক তথা সামাজিক জীবনযাত্রা প্রণালীর উন্নতি সাধনের চেষ্টা করেন নাই। হিন্দুসমাজের এই ঔদাসীন্যের সুযোগে খৃষ্টান মিশনারীগণ এতদঞ্চলে তাঁহাদের প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছেন। একমাত্র ধামরইর, পাঁচবিবি ও জয়পুরহাট থানার মধ্যেই তাঁহারা পাঁচটী কেন্দ্র

মিলন-মন্দিরের স্বেচ্ছাসেবকবৃন্দ
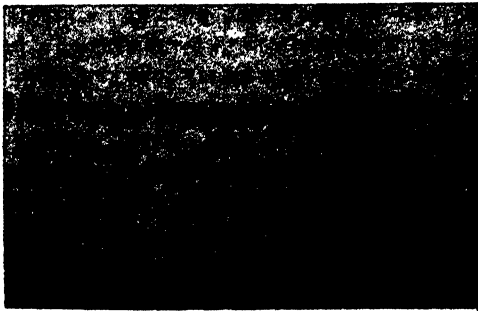
স্থাপন করিয়াছেন। সেবা, দয়া, প্রেম এবং সাহায্য ও সহানুভূতির দ্বারা মুগ্ধ করিয়া সহস্র সহস্র সাঁওতালকে তাঁহারা খ্রীষ্টধর্ম্মে দীক্ষাদান করিতেছেন। ফলে বাংলা দেশে হিন্দুর সংখ্যা হ্রাস ও অহিন্দুর সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে। এদেশে খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচারের জন্য মিশনারীগণ কোটী কোটী টাকা অকাতরে ব্যয় করিতেছেন কিন্তু হিন্দুধর্ম্মের প্রচারের জন্য আমাদের আদৌ কোন চেষ্টা নাই; তজ্জন্যই এইরূপ সম্ভব হইয়াছে। যাহা হউক, সম্প্রতি ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ হইতে উক্ত জেলার বিভিন্ন পল্লীতে এ পর্য্যন্ত মোট ৬৯টী মিলন-মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া একদিকে যেমন বিভিন্ন শ্রেণীর হিন্দু জনসাধারণকে বিবিধ মিলনানুষ্ঠানের মধ্য দিয়া প্রেম-প্রীতি, ঐক্য-সখ্য ও সহযোগিতার সূত্রে আবদ্ধ করিয়া এক অখণ্ড হিন্দু-সংহতি প্রতিষ্ঠার চেষ্টা চলিতেছে, অন্যদিকে তেমনি খৃষ্টান সাঁওতালগণকে হিন্দুধর্ম্মে ফিরাইয়া আনিয়া হিন্দু-সম্মত আচার-অনুষ্ঠান ও শিক্ষাদীক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা হইতেছে। উক্ত কেন্দ্রগুলি হইতে প্রণালীবদ্ধ প্রচারকার্য্য ও অন্যান্য বহু চেষ্টার ফলে সম্প্রতি প্রায় তিনশত খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী সাঁওতাল পুনরায় হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণে আগ্রহ প্রকাশ করে। স্থানীয় সাঁওতাল নেতা শ্রীমান্ চারুচন্দ্র সিংহ, সিদোপ. সরেন এই কার্য্যে উদ্যোগী হইয়া শুদ্ধিযজ্ঞের অনুষ্ঠানে সঙ্ঘের সন্ন্যাসীদেবকে সর্ব্বপ্রকারে সাহায্য করেন। এই শুদ্ধিযজ্ঞ ও হিন্দুসম্মেলনে ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের সভাপতি স্বামী সচ্চিদানন্দজী স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন। তিনি গত ১৩ই আষাঢ় প্রাতে সঙ্ঘের সহ-সভাপতি স্বামী বিজ্ঞানানন্দজী, সম্পাদক স্বামী বেদানন্দজী ও অন্যান্য বিশিষ্ট সন্ন্যাসীগণসহ জয়পুরহাট ষ্টেশনে পৌঁছিলে স্থানীয় নেতৃবৃন্দ ও চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী
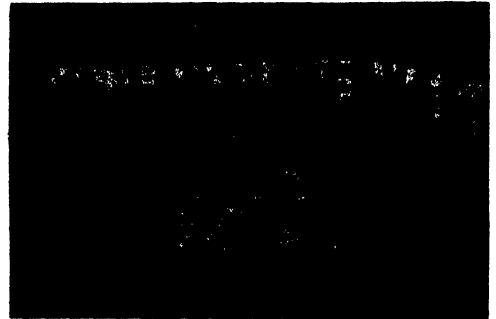
যজ্ঞবেদীর চতুর্দ্দিকে সমবেত দীক্ষার্থী সাঁওতাল খ্রীষ্টানগণ

মিলন-মন্দিরের প্রতিনিধিগণ তাঁহাদিগকে মাল্যভূষিত করেন। অতঃপর সঙ্ঘনেতা স্বর্গীয় স্বামী প্রণবানন্দজী মহারাজের সুসজ্জিত প্রতিকৃতি লইয়া এক বিরাট শোভাযাত্রা স্বামীজীদিগকে উৎসব ক্ষেত্রে লইয়া যাওয়া হয়। প্রায় ৫শত সাঁওতাল, কূর্ম্মি, রাজবংশী, ঋষি, ঢাল-সড়কী, তীর-ধনুক, লাঠি প্রভৃতি বিবিধ অস্ত্রশস্ত্র এবং খোল-করতাল, মাদল ও ঢাক-ঢোল প্রভৃতি বাজাইয়া এই শোভাযাত্রায় যোগদান করে। শ্রীমান গণপতি মহতো এই শোভাযাত্রা পরিচালন করেন। বিরাট সভামণ্ডপের মধ্যস্থলে প্রকাণ্ড যজ্ঞবেদী সুসজ্জিত করা হইয়াছিল। স্বামী বেদানন্দজীর পৌরোহিত্যে দ্বিপ্রহরে যজ্ঞ আরম্ভ হয়। দীক্ষার্থী সাঁওতালগণ সন্ন্যাসীগণের সহিত যজ্ঞবেদীকে কেন্দ্র করিয়া সকলের সম্মুখভাগে উপবেশন করে। তাহাদের পশ্চাতে প্রায় ১০ সহস্র দর্শক উপস্থিত ছিলেন। যজ্ঞান্তে সাঁওতালদিগের মস্তকে শান্তি বারি সিঞ্চন ও ললাটে হোম-তিলক আঁকিয়া দেওয়া হয়। অতঃপর স্বামী সচ্চিদানন্দজী তাঁহার সাধন-কুটীরে উপবেশনপূর্ব্বক একে একে সাঁওতালগণকে ডাকাইয়া লইয়া ব্যক্তিগত-ভাবে উপদেশ ও বৈদিক মন্ত্রে দীক্ষা প্রদান করেন। দীক্ষান্তে তাহাদিগের প্রত্যেককে একখানি করিয়া গীতা ও একটী করিয়া রুদ্রাক্ষের মালা প্রদান করা হয়। কানপাড়া, নামুজা, জগদল, মণ্ডা, পাহনন্দ, ভুটিয়াপাড়া,

পাঁচবিবি, খঞ্জনপুর প্রভৃতি গ্রাম হইতে আগত ২৮৫জন খৃষ্টান সাঁওতাল হিন্দুধর্ম্মের সেবকরূপে আজীবন কাটাইবে বলিয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়। দীক্ষাপ্রাপ্ত সাঁওতালগণ যজ্ঞবেদীকে প্রদক্ষিণপূর্ব্বক মাদল ও বাঁশি বাজাইয়া দলবদ্ধভাবে নৃত্য-গীত আনন্দোল্লাস ও তীর ধনুকের কৌশল প্রদর্শন করে।

পরে হিন্দু সম্মেলনের অধিবেশন হয়। প্রথমে সাঁওতাল নেতা শ্রীমান্ চারুচন্দ্র সিংহ, সিদোপ্ সরেন সাঁওতালী ভাষায় প্রায় অর্দ্ধঘণ্টার অধিককাল বক্তৃতা করিয়া হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব, হিন্দুদিগের সহিত সাঁওতালদিগের সম্বন্ধ পরধর্ম্ম গ্রহণের অপকারিতা এবং বহু বাস্তব ঘটনার উল্লেখ করিয়া বিশেষভাবে বুঝাইয়া দেন। স্বামী অদ্বৈতানন্দজী হিন্দুধর্ম্মের বৈশিষ্ট্য, হিন্দুধর্ম্মের উদারতা শুদ্ধির প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বাংলাভাষায় বক্তৃতা করেন। স্বামী বিজ্ঞানানন্দজী সঙ্ঘপ্রবর্ত্তিত মিলন মন্দির ও রক্ষীদল আন্দোলনের উপযোগিতা সকলকে বুঝাইয়া দেন।

অতঃপর গুরুপূজা, হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন, ভোগ আরতি প্রভৃতি ধার্মিক অনুষ্ঠান সুসম্পন্ন হইলে পর সমাগত প্রায় সহস্র নরনারীকে পরিতৃপ্তি সহকারে খিচুড়ী প্রসাদ বিতরণ করা হয়। সাঁওতাল রাজবংশী ও অন্যান্য সকল শ্রেণীর হিন্দু জাতিবর্ণ নির্ব্বিশেষে একত্র বসিয়া প্রসাদ গ্রহণ করে।

স্থানীয় সাঁওতাল ও রাজবংশীগণ উৎসবক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় গৃহ ও সভা-মণ্ডপ নির্ম্মাণ কূপখনন, কাষ্ঠ সংগ্রহ ও অন্যান্য শারীরিক শ্রমসাধ্য সমুদয় কার্য্য নিজেরাই সম্পাদন করে। উক্ত অঞ্চলের হিন্দু জনসাধারণ উৎসবের জন্য যাবতীয় চাউল ডাউল ইত্যাদি দান ও সংগ্রহ পূর্ব্বক অনুষ্ঠান সাফল্য মণ্ডিত করেন। মাননীয় মন্ত্রী ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এই শুদ্ধিযজ্ঞে ১০০৲ টাকা সাহায্য করিয়াছেন।

এই যজ্ঞানুষ্ঠান ও হিন্দু সম্মেলন যাহাতে সুশৃঙ্খলভাবে অনুষ্ঠিত হয় তজ্জন্য শ্রীযুত নিতাই গোবিন্দদাসের নেতৃত্বে পাহুনন্দ ভুটিবাপাড়া ও জাহানপুর মিলন মন্দিরের ২০০জন রক্ষী লইয়া এক বিরাট স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠিত হইয়াছিল।

এই একটিমাত্র শুদ্ধি যজ্ঞানুষ্ঠানের দ্বারা উক্ত অঞ্চলে যে উৎসাহ উদ্দীপনার সৃষ্টি হইয়াছে তাহাতে মনে হয় প্রণালীবদ্ধভাবে এই কার্য্য পরিচালন করিতে পারিলে সহস্র সহস্র খ্রীষ্টান সাঁওতালকে অত্যল্পকালের মধ্যেই হিন্দুধর্ম্মে ফিরাইয়া আনা যায়। কিন্তু শুধু যজ্ঞানুষ্ঠানের মধ্যেই কর্ত্তব্য শেষ করিলে চলিবে না। ইহাদিগের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার করা একান্ত আবশ্যক। তজ্জন্য অসংখ্য অবৈতনিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা চাই। হিন্দুয়ানী আচার অনুষ্ঠান ও ধর্ম্মশিক্ষার জন্য স্থানে স্থানে স্থায়ী ধর্ম্মমন্দির প্রতিষ্ঠা করার প্রয়োজনীয়তাও এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ মিলন মন্দিরের মধ্য দিয়া সার্ব্বজনীন উপাসনা পূজা উৎসব হিন্দু শাস্ত্রসমূহের পাঠ ও আলোচনা প্রভৃতির ব্যবস্থা করায় অন্য মন্দিরের অভাব কতকাংশে দূরীভূত হইয়াছে। আপাততঃ বৃহৎ বৃহৎ মন্দির না থাকিলেও মিলন-মন্দিরের মধ্য দিয়াই যাবতীয় ধর্ম্মশিক্ষার কার্য্য চলিতে পারে—ইহাই সঙ্ঘের অভিজ্ঞতা। মিলন-মন্দিরের মধ্য দিয়া কার্য্য করার ফলে ইতিমধ্যেই জামালপুর, মথুরাপুর, শ্রীরামপুর, রামকৃষ্ণপুর, সমশাবাদ, নওদা, মালিদহ প্রভৃতি

সমবেতভাবে প্রসাদ গ্রহণ

সাঁওতাল অধ্যুষিত গ্রামসমূহে বহু সাঁওতাল পরিবার প্রত্যেকের বাড়ীতেই তুলসী বৃক্ষ রোপণ করিয়াছে, পচাই বা ধেনো মদ পান যাহাতে নিরোধ হয় তজ্জন্য বিশেষভাবে চেষ্টা করা হইতেছে। মিলন মন্দিরের যাবতীয় ধর্ম্ম ও সামাজিক অনুষ্ঠানে সাঁওতালগণ যোগদান করিয়া থাকে। কখন কখন মিলন-মন্দিরের সভ্যবৃন্দ সাঁওতালদিগের বাড়ী বাড়ী যাইয়া কীর্ত্তনাদি করিয়া থাকে।

সম্প্রতি উক্ত অঞ্চলসমূহে কতকগুলি প্রাথমিক অবৈতনিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য সঙ্ঘ হইতে চেষ্টা চলিতেছে। হিন্দু জনসাধারণের

সাঁওতালগণকর্ত্তৃক তীর ধনুক খেলা প্রদর্শন

ঐকান্তিক সাহায্য ও সহানুভূতি পাইলে, সঙ্ঘ এই কার্য্য অধিকতর দ্রুত ও ব্যাপকভাবে পরিচালন করিতে সমর্থ হইবে।

কিশোরী-লক্ষ্মী

শ্রীসুরেশ বিশ্বাস এম-এ, ব্যারিষ্টার-এট্-ল

হেরিলাম স্নিগ্ধশ্যাম অবারিত মাঠ
সন্ধ্যারাগে ঝিলিমিলি করে কিশলয়,
নবোদ্গত শস্যপুঞ্জ নয়নরঞ্জন
সুদূর দিগন্তে মেশে হরিত-নিলয়।
সন্ধ্যা হেরি' পল্লীবালা ত্রস্তে গোষ্ঠ হ'তে
ফিরাইয়া আনে তার ধেনুটি গোহালে,
হে লক্ষ্মী, অঞ্চল তব তারে অনুসরি'
সুকোমল শস্যাকীর্ণ প্রান্তরে বিছালে ?
সুবর্ণ-শস্যের কবে হবে আবির্ভাব
সে দিন সাজিবে তন্বী রূপে রাজেন্দ্রাণী,
আজি হেরিলাম লক্ষ্মী শ্যামলী কিশোরী,
লাবণ্য ছাইয়া আছে সারা অঙ্গখানি।

স্বীকারোক্তি

শ্রীগৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্য

মানবজীবনটা গল্প উপন্যাসের মত ধরা-বাঁধা পদ্ধতির সীমানা কানুন মানে না। তার গতি আঁকাবাঁকা উঁচুনীচু ছোটবড় ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে অনির্দ্দিষ্ট অস্পষ্ট কঙ্করাকীর্ণ পথে। মানুষ চালাতে চায় আপনার মনকে, কিন্তু কোথায় যে তার বল্গা আল্গা হ'য়ে গেল সে খবরও সে সব সময় পায় না।—যাকৃগে দার্শনিক তত্ত্ব নিয়ে বেশি ঘাঁটাঘাঁটি করলে অনেক কথাই ব'ল্তে হয়। আপাততঃ আমি একটা কথাই বলবার জন্যে ব'সেছি।

বসন্ততিলক অফিসের পথে হাঁটা দিল। দাবা ব'ড়ে, তাস পাশা আর সহ্য হয় না। আজও ছুটি আছে, কালও ছিল—এই ছুটির জেরটা অরুচিকর ব্যাপার। তাই কাজ না থাকা সত্ত্বেও বসন্ত আপিস বেরুলো। পাখার হাওয়ায় দুপুরটা ভালোই কাটবে—অন্ততঃ শান্তি পাওয়া যাবে খানিকটা।

কিন্তু পাখার হাওয়াটা যেন বসন্ততিলকের আজ ভালো লাগ্‌ছে না। ওপাশের চেয়ারে বাঁড়ুয্যের টিপ্পনী নেই, ঘোষালের পান-খেয়ে পোকাধরা জরদার দাগে কালো-হ'য়ে-যাওয়া দাঁতের স-কলরব বিকাশ নেই, আর ঘোষজার গম্ভীর মুখের মুখরোচক ব্রজবুলিও নেই।—এ যেন শ্মশান। রামরিশকে ঘরে তালা দিতে ব'লে সে অফিস থেকে বেরিয়ে আবার পথ ধরল।

মাথার উপর ঝাঁ ঝাঁ করছে বৈশাখের প্রখর রৌদ্র। কলকাতার রাস্তাগুলো যেন হাওয়া বাতাসের সঙ্গে বিবাদ ক'রে ব'সেছে—কোথাও এতটুকু হাওয়া নেই, মাঝে মাঝে এক আধটা বাস যাচ্ছে কতকগুলো ধূলো চোখে মুখে ছড়িয়ে দিয়ে।

লালদীঘির একটা বেঞ্চে একটু বিশ্রাম নেবার জন্যে বস্‌তেই বসন্তকে উঠে দাঁড়াতে হ'ল পত্রপাঠ—এটা বেজায় তেতে গেছে। "দূর ছাই" ব'লে সে দীঘির ধারে এক গাছ তলায় ব'সে পড়ল। কিন্তু তাও বেশিক্ষণ নয়। "নাঃ—এও ভালো লাগে না।"

'অবিনাশের বাড়ী যাওয়া যাক্।' প্রায় সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে গেল, হতভাগাটা আবার বাড়ী নেই। কিন্তু তাতে কি হ'য়েছে, যাওয়াই যাক্‌না একটুখানি।...একবার সে জেনারেল পোষ্ট-অফিসের ঘড়িটা দেখে কী ভেবে উঠে পড়্‌ল।

পার্ক সার্কাসের কাছে একটি ইঙ্গবঙ্গ পল্লীতে বসন্ত এসে পড়ল। হাতের জলন্ত সিগারেটটায় শেষ টান মেরে সেটা ফেলে দিলে এবং সেটা পায়ে চেপে মাটিতে ঘষে দিয়ে আস্তে আস্তে একটা গলিতে ঢুকল।

* * * *

একটি তরুণী এসে দরজা খুলে দিয়ে তাকে দেখে বলল, "ও, আপনি! দাদা ত বাড়ী নেই,আপনি জানেন না বুঝি? আপনাকে দাদা বলেনি কিছু?—দেখুন ত' দাদার কাণ্ডখানা। এই দুপুর রোদ্দুরে হায়রাণি। যাক্ গে এখন একটু থেমে ব'সে যান।"

বসন্ত মালতীর কথাগুলো হজম ক'রে গেল। সে বল্‌তে পারলে না যে অবিনাশ নেই সেকথা জেনে শুনেই সে এসেছে। সে সাহস পেলে না একথাটা ব'ল্‌তে। সাফ মিথ্যেটাও মুখে এল না,—অথচ কিছু একটা বলা চাই,তাই সে গাঁইগুঁই ক'রে ব'ললে, "কালই চলে গেছে বুঝি! আমাকে কি একটা ব'লেছিল বটে, ঠিক মনে পড়ছে না। তা, তাই ত।" বলে সে কোন রকমে ঢোক গিলে সাম্‌লে নিলে সে ঝোঁকটা। তারপর ইতস্ততঃ করে ভাবলে, থেকে যাবে, কি চ'লে যাবে। পরক্ষণে মালতী যখন আবার বল্‌লে, "উপরে চলুন।" তখন সে নীরবে তাকে অনুসরণ ক'রে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে গেল।

অবিনাশের দিদি খুব মিষ্টি লোক—যাকে বলে মজ্‌লিসি মেয়ে। বসন্তকে পেয়ে তিনি যেন হাতে স্বর্গ পেলেন। "আরে এস, এস," ব'লে তিনি পানের বাটা থেকে গোটা কয়েক পান বার ক'রে দিলেন বসন্তকে; বল্‌লেন, "দোক্তা দেবো?"

বসন্ত মাথা নেড়ে বল্‌লে, "না, মাথা ঘোরে, ওটা আমার সয়না"।

দিদি খানিকটা দোক্তা আপনার মুখেই চালান দিলেন,তারপর ভারি গলায় বল্‌লেন, "ও মালতী, জানলা দিয়ে রেবাকে একবার ডাক্ না, বহুদিন তাস খেলিনি।"

সুতরাং তাস শুরু হ'ল, আর তার সঙ্গে চল্‌ল যত রাজ্যের গল্প। বসন্ত মাঝে মাঝে খেলার ফাঁকে মালতীর দিকে তাকায়—আড়চোখে সকলের নজর বাঁচিয়ে। মালতী যে সুন্দর তা নয়, তবে সুশ্রী বলতে যা বোঝায় মালতী তাই।

বেলা পড়ে এলো, কাজেই রেবা চ'লে গেল। দিদি কাপড় কাচতে গেলেন। বসন্ত এবারে উঠি উঠি করছে কিন্তু ফাঁকা ঘর কেউ কোথাও নেই, মালতীও কোথায় যেন চ'লে গিয়েছে। সে ফিরতেই বসন্ত আলস্য ছেড়ে বললে, "আজ তা হ'লে উঠি।—অবিনাশ কবে ফিরবে?"

মালতী কতকটা অভিমানে আহত সুরেই বলে, "কে বারণ ক'রেছে, যান না। আর থাকবেনই বা কেন, দাদা ত নেই। দাদাই ত সব, আমরা কেউ নই।"

একথার পর চ'লে যাওয়া চলে না। বসন্ততিলক কোন উচ্ছ্বাস ক'রলে না, প্রতিবাদও করলে না, শুধু নিঃশব্দে মালতীর মুখের পানে চেয়ে রইল এবং শেষ পর্য্যন্ত চায়ের পর্ব্ব শেষ ক'রে একেবারে সন্ধ্যার দিকে বিদায় নিল সেদিনের মত।

সে থাকে ঢাকুরিয়াতে, এক সস্তার মেসে কম খরচার অজুহাতে। ভাবলে একটু হাঁটাই যাক্। চায়ের আনুষঙ্গিক আহার্য্যের পদগুলো পাছে পেটের মধ্যে গিয়ে বিপদ বাধায় এই ভয়ে সে মরিয়া হ'য়ে হাঁটাও দিলে লেকের দিকে, কিন্তু পেট্‌টা বেজায় বোঝাই থাকার ফলে সংকল্পটা ত্যাগ ক'রে বাসের শরণাপন্ন হ'তে হ'ল।

বসন্ততিলক যখন লেকের সামনে এসে দাঁড়াল তখন সন্ধ্যার গাঢ় অন্ধকার চারিদিক ছেয়ে দিয়েছে। হঠাৎ উঠল ঝড়—প্রবল ঝড়। কালবৈশাখীর সে কী তাণ্ডবলীলা। ধূলো বালি শুরকি-

গুলো গায়ে মুখে মাথায় এসে ক্ষণে ক্ষণে বিদ্ধ করতে লাগল। যাঁরা বেড়াতে এসেছিলেন তাঁরা প্রকৃতির এই অপ্রকৃতিস্থতা দেখে পাল্লা দিয়ে পালাচ্ছেন।…বসন্ত অনেক চেষ্টা ক'রেও এক পা এগুতে পারলে না, মাথা নত ক'রে দৈন্য স্বীকার ক'রতে হ'ল তাকে। ঝড়ের ঝাপ্‌টা এমনভাবে চোখে মুখে আছাড় খেয়ে পড়তে লাগ্‌ল যে শেষ পর্য্যন্ত সে পিছু হঠতে দিশে পেলেনা। কিন্তু তা মুহূর্ত্তের জন্য, তারপর পূর্ব্ব পরিকল্পনানুসারে অগ্রগমনোদ্যত হ'য়ে, সে 'যুদ্ধং দেহি' ব'লে কালো আশফাল্টের রাস্তা দিয়ে একগুঁয়ের মত এগুতে লাগল।

কোথাও মিট্‌মিট্‌ ক'রে দূরে একটু আলোর ব্যাহত রশ্মিরেখা মানুষের শাসনের কড়া পাহারা এড়িয়ে গোপনে রাস্তার দিকে চেয়ে আছে। ঝড়ের ভয়ে তাও যেন কেমন ম্লান দেখাচ্ছে। লেকের স্থির নিস্তরঙ্গ জলের মধ্যেও একটা আলোড়ন দেখা দিয়েছে। তারা সবেগে এসে ধাক্কা মারছে তৃণবহুল তটকে। গাছপালা-গুলোর শোঁ-শোঁ শব্দের সঙ্গে জলের ছলাৎ-ছলাৎ কলধ্বনি মিশে চারিপাশের জনবিরল অন্ধকার পথরেখাকে ক'রে তুলেছে রহস্যাচ্ছন্ন। এর মধ্যে বিভীষিকার আভাস আছে। কিন্তু বসন্তর মনে নূতন সাহসের সঞ্চার হ'ল।

সে এগিয়ে চলেছে। ঝড়ের বেগে তার গতি রুদ্ধ হ'য়ে আস্‌ছে, তবু সে দম্‌বে না, থাম্‌বে না। আকাশে জমেছে ঘন কালো মেঘ—এখানে থেমে গেলে উপায়! সে চল্‌তে চল্‌তে একথা সেকথায় মনকে ব্যস্ত রাখবার চেষ্টা করল।

মালতীকে বসন্তর বেশ ভালো লাগে। এই ঝড়ের বেগের আড়াল থেকে তার অবাধ্য চূর্ণ-কুন্তল-মণ্ডিত মধুর মুখচ্ছবি সজীব হ'য়ে উঠল। বসন্ত লক্ষ্য ক'রছে মালতী যখন হাসে তখন তার কোমল মসৃণ গালে অল্প টোল খেয়ে যায়! আজ খেলার মাঝে মালতী বার বার মারাত্মক ভুল ক'রেছে এবং যখনই বসন্ত তাকে সতর্ক করবার জন্যে মৃদু তিরস্কার ক'রেছে তখনই মালতী উচ্ছল হাস্যে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। পথ চল্‌তে চল্‌তে বসন্ত দেখলে ফিরোজা রঙের ডুরে শাড়ী-পরা সেই মেয়েটি যেন চলেছে তার সঙ্গে। …মালতী যখন তাকে চা দিতে এসেছিল তখন বসন্ত অকারণে তার চুড়ীর নক্সা, গড়ন সম্বন্ধে দু' একটা প্রশংসাসূচক মন্তব্য ক'রে টেনে নিয়েছিল কাছে মালতীর হাতখানা। গড়ন হিসাবে হাতটারই প্রশংসা পাওয়া উচিত। তার হাতটা আপনার হাতে নিয়ে বসন্ত তা অনুভব ক'রেছে বই কি! সত্যি কী নরম আর সুন্দর নিটোল বাহু তার।…আবার সমস্ত ছবিটা ভেসে ওঠে।

অকস্মাৎ বিদ্যুৎ চমকে উঠ্‌লে যেমন প্রান্তর এক প্রান্ত হ'তে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত এক ঝলকে অতি সহজেই দেখ্‌তে পাওয়া যায়, তেমনি হঠাৎ বসন্তর মনে হল সে মালতীর কথা চিন্তা করছে। সে আবিষ্কার করলে নিজেকে।…আপনার কাছে ধরা পড়লে মানুষ সবচেয়ে বেশি উপলব্ধি ক'রে আপনার অপরাধের গুরুত্বটা।

সে এবারে আপনার মধ্যে ডুব দিয়ে দেখবার চেষ্টা করলে।… আকাশে জমেছে ঘন কালো মেঘ—আর বসন্ততিলকের মনের আকাশে উঠেছে ঝড়—উদ্দাম ঝড়, সে এই তমসাচ্ছন্ন নির্জ্জনতার সুযোগ নিয়ে আপনাকে বিচার করতে লেগে গেল।

…আজ, অফিস যাবার কি প্রয়োজন ছিল? কিছু না—নইলে সেখান থেকে চলে এল কেন সে! তারপর সিনেমায় না গিয়ে বন্ধুর অনুপস্থিতিতে তার বাড়ী সে কেন গেল—আর কোনও দিনই ত' এমনভাবে সে কারও বাড়ী যায়নি এর আগে।…সে আপনার মনের পানে সন্দিগ্ধভাবে তাকায়। কোনদিনই স্বেচ্ছায় কোন মেয়ের দিকে মনোযোগ দেওয়া তার অভ্যাস নয়। তবে কি সত্যিই মালতীর আকর্ষণটা তার মনের মধ্যে এতটা বড় হ'য়ে উঠেছে! সে কি মনের মধ্যে গোপনে ওই রকম একটা আচ্ছন্ন ইচ্ছা নিয়েই দুপুর বেলা বেরিয়েছিল…?

বসন্ততিলক একবার বাইরের দিকে চোখ মেলে দেখবার চেষ্টা করলে। চারিদিকে গাঢ় অন্ধকার, কিছুই ভালো ক'রে দেখা যায় না। ওপাশে চিক্‌চিক্‌ করছে কালো জল। কতকগুলো নারিকেল আর তালগাছ ভীড় ক'রে উঁচু মাথা নিয়ে দৈত্যের মত দাঁড়িয়ে আছে, শিরীষ গাছটা খুব দুলছে! এর বেশি আর বসন্ত দেখ্‌তে পায় না কিছু। পথের দিকে চেয়ে সে দেখ্‌লে—এ কি! এতক্ষণ ধ'রে মোটেই সে এগুতে পারেনি! আপনার গতিকে তৎপর ক'রে, জমাট অন্ধকারে পা যেন চলে না—তবু সে চলে…।

* * * *

নিজের ঘরে পা দিতেই মনটা আবার ঠিক হ'য়ে গেল। সে শুধু আপনার মনকে শাসন ক'রে দিলে, আর কখনও অমন অন্যায় কাজ ক'র না।…তারপর ধুলোবালি ঝেড়ে বিছানাটা পেতে হাত পা ছড়িয়ে ক্লান্তি নিরসনের চেষ্টায় একটা মধ্যবিত্ত গোছের নিদ্রা দিয়ে যখন সে উঠ্‌ল তখন সবাই খেতে ব'সেছে। খড়মটা পায়ে গলিয়ে খাবার ঘরের দিকে চোখ মুছতে মুছতে এগুলো বসন্ত।

হরিচরণবাবু ঠাকুরের উদ্দেশে পিণ্ডদানে ব্যস্ত ছিলেন, কারণ সে নাকি কোন্ শতাব্দীর মধ্যমশতকে ভাত দিয়েই উধাও হ'য়েছে, ব্যস্ তারপর ভাত হজম হ'য়ে গেল অথচ পরবর্ত্তী পদগুলোর পাত্তা নেই! হঠাৎ বসন্তকে দেখে তিনি বল্লেন, "আরে আমাদের দার্শনিক এসো। দাদা গো তোমার বিরহে আমরা বড়ই কাতর ছিলাম। হাঁ, তোমার চিঠি আইসে, দেখস্ নাই!"

"কোথা থেকে?"

"খাম নহে পোষ্টকাঁঠাল, তাই কই পরে ত্যাখ্‌লেও চল্‌বে অহন। গিন্নির লেখা আমরা চিনি। সারা ম্যাসের মদ্দি তোমারই অল্প বয়স—বোঝনে, তোমার সে চিঠির চেহারা জানা আছে। বস, বস। আরে ও-ঠাউর বসন্তবাবুরে ত্যাও ছাই।"

চিঠি লিখেছে বুড়ী অর্থাৎ বসন্তর বোন। তার ছেলের গোটা কয় জামা চাই, মায়ের বাতের ওষুধ, বাবার একটা ছাতা আর ছোট বোনের একখানা শাড়ী আটহাতী—"হাতী ঘোড়া সব চাই, কিন্তু কোথায় পাই এতটাকা। পাত্র-পাত্রী চাইয়ের মধ্যে কেবল পাত্র'ই চাই দেখা যায়। এখানেও সবার মূলে কেবল চাই বা সে হ'চ্ছে টাকা। স্নেহ, ভালোবাসা কিছু না—টাকা।" বসন্ত রেগে চিঠিখানা রাখ্‌তে যাচ্ছিল এমন সময় নজরে পড়ল—"বৌদিয়", তখন মনে হ'ল "দেখি তাঁর আবার কী চাই।"

কিন্তু সে যা দেখ্‌লে তাতে মাথাটা ঘুরে গেল। এতটুকু

এক কোনে লেখা আছে, 'বৌদির দিন দশবারো হ'ল জ্বর হ'চ্ছে রাম ডাক্তার দেখ্‌ছে।'...অলকার অসুখ ক'রেছে? কি অসুখ? আগে কেন তাকে জানানো হয়নি?—এই ছুটিতে সে অনায়াসে দেখ্‌তে যেতে পারত! বাড়ীর সব কাণ্ড দেখত!...আরে এই ত পরশু অলকার চিঠি এসেছে।...তাতে কই অসুখ বিসুখের কথা কিছু নেই। বসন্ত তাড়াতাড়ি বাক্সটা খুলে একগাদা চিঠি বার ক'রে ঘাঁটতে লাগল।...নাঃ বেশ পরিষ্কার লেখা কোথাও একটু বেঁকে যায়নি, অসুখের আভাস মোটেই নেই অলকার চিঠিতে।

তারপর তার নিজেরই উপর রাগ হ'ল। অসুখ হ'য়েছে অথচ কেন সে গেল না। না জানার অজুহাতটা সে মেনে নিতে পারল না। সত্যিই এ তার অন্যায়। তার স্ত্রী নিঃশব্দে রোগযন্ত্রণা সইছে—পাছে সে জান্‌তে পেরে ব্যস্ত হয়, মনে মনে অশান্তি ভোগ করে—আর সে নিজে পরকীয়া প্রেম ক'রে বেড়াচ্ছে। আপনাকে ধিক্কার দিতে লাগল বসন্ত।

বিছানায় প'ড়ে প'ড়ে অনেক কথাই সে ভাবে। অনুতাপে অনুশোচনায় তার অন্তর দগ্ধ হ'তে থাকে। চোখে ঘুম নাই। অবশেষে সে স্থির করলে অলকার কাছে অকপটে সমস্ত অপরাধ স্বীকার ক'রে ক্ষমা চাইবে। আপনাদের দাম্পত্য জীবনের মধ্যে এমনি ক'রে ব্যবধান রচনা করায় আত্মার কী অবনতিই ঘটে।... রাত্রে সে ঘুমের ঘোরে বারবার অলকার কাছে ক্ষমা চেয়েছে। কতবার ঘুম ভেঙ্গে গেল।

রাত তখনও শেষ হয়নি। বসন্ত উঠে হাতমুখ ধুয়ে পায়খানা গেল। কতক্ষণ যে সেখানে ব'সে ব'সে সাত পাঁচ এলো মেলো ভাবে ভেবেছে ঠিক নেই। হঠাৎ মনে হল বাইরে কে যেন ঘুরে বেড়াচ্ছে। একবার দরজাটায় কে যেন ধাক্কাও দিল। সে তাড়াতাড়ি হাতের পোড়া বিড়িটা ফেলে দিয়ে একটা খুবরিতে দেশলাইয়ের খোলটা গুঁজে রেখে বেরিয়ে পড়ল। সম্মুখে হরিচরণদা, হেসে বল্লেন, "কিরে ঘুমিয়ে পড়েছিলি না কি?"

"না,...বৌটার আবার অসুখ ক'রেছে। তাই..."

"বাড়ী যাবি ভাবছিলি?"

"টাকা কই, দিতে পারেন গোটা পনেরো টাকা?"

"পারি ভাই, কিন্তু টাকায় এক আনা সুদ..."

"এ-ক আ-না?" ব'লে সে ঢোক গিলে ঘরের দিকে এগুলো। তারপর ঘরে গিয়েই আবার তার চোখের উপর ভেসে উঠ্‌ল অলকার রোগপাণ্ডুর মুখচ্ছবি—তার সঙ্গে আপনার অপরাধী মূর্ত্তি। সে দৌড়ে এসে হরিচরণের ঘরের সাম্‌নে দাঁড়াল—এক আনা সুদ? আচ্ছা তাই, তাই দেবো। আজ সকালের গাড়ীতেই যেতে হবে। অলকার নীরব প্রেম তার মত অযোগ্য পাত্রের ভাগ্যে বর্ষিত হয়েছে তার জন্য বসন্তর খেদের অন্ত নাই। তবু যদি তার কাছে গিয়ে কিছুটা শান্তি দিতে পারে তাকে! তার কাছে তুচ্ছ হোক্—তবু অলকা হয় ত সুখী হবে। তার নিজের অপরাধের ভারস্বীকার যদি কিছু লাঘব হয় সেটাও ত লাভ। সে যাবে।

* * * *

অলকার অসুখ ক'রেছে। বেশ ভালো রকমেই সে কাহিল হয়েছে। সে বারবার নিষেধ ক'রেছে বসন্তকে সংবাদ দিতে। কিন্তু হঠাৎ তাকে দেখে অলকার চোখেমুখে হাসি উছলে উঠ্‌ল; কেবল একবার মৌখিক প্রতিবাদ জানিয়ে অনুযোগের সুরে ক্ষীণ কণ্ঠে বল্‌লে, "কেন এতগুলো টাকা খরচ করলে গো!"

বসন্ত অলকার কাছে এসে মনে করল তার সব ভয় কেটে গেছে। এখন ত সে নিরাপদ, কোনো মালতীই তাকে ছুঁতে পারবে না আর। তবে সেদিনের সেই ব্যাপারটা মনের মধ্যে খচ্‌খচ্‌ করতে লাগল। যত তাড়াতাড়ি পারা যায় অলকাকে ব'লে ফেলা চাই।

কিন্তু সে যতখানি সাহসে বুক বেঁধে এসেছিল ক্রমশঃ তা যেন একটু একটু ক'রে কর্পূরের মত উপে যাচ্ছে। সে কিছুতেই ভরসা ক'রে বলতে সাহস পাচ্ছে না অলকাকে—অথচ সে ঠিক ক'রে এসেছিল যে বাড়ীতে পা দিয়েই অলকাকে ব'লে ফেলবে সব কথা। বার বার মনকে চাবুক মেরে দাঁড় করাবার নিষ্ফল চেষ্টা ক'রছে বসন্ত।

সেদিন সন্ধ্যায় রোগিনীর শয্যাপার্শ্বে তখন আর কেউ ছিলনা। বাতায়নের পথ দিয়ে এক ঝলক চাঁদের আলো এসে প'ড়েছে অলকার রোগশীর্ণ মুখের উপর। বসন্ততিলক চুপ ক'রে বসে আছে তার পাশে।

অলকা তাকে প্রশ্ন করে, "তুমি কবে যাবে গো? তোমার কাজের ক্ষতি হ'চ্ছে না।"

"তোমার অসুখটা তাড়াতাড়ি সারিয়ে নাও তাহ'লে আমি ছুটি পাই।"

অলকা তার দিকে ডাগর চোখদুটি মেলে দিয়ে বল্‌লে, "দেখ এ যাত্রায় আমার বুঝি আর বাঁচন নেই।"

বসন্ত অলকার মাথায় হাতবুলিয়ে দিচ্ছিল, রাগ করে হঠাৎ মাঝপথে সেটা থেমে যায়। সে বলে, "আজই আমি চ'লে যাবো।"

অলকা শান্তকণ্ঠে বলে, "যাও না দেখি। তোমার মনটা আমার কাছেই র'য়ে যাবে যে গো।" তারপর উচ্ছ্বসিতভাবে সে ব'লে যায়, "দেখ এখন আর আমার মরতে ভয় হয় না—মরণরে তুঁহু মম শ্যাম সমান—ওগো তোমার কাছে আমি যা পেয়েছি তার তুলনা নেই। আর আমার বাঁচবার দরকার নেই।...এত ভালোবাসা বুঝি কেউ কাউকে বাসে না। ওই ত প্রতিমাদির বর তার আজ পাঁচ মাস অসুখ ক'রেছে ক'দিন তাকে দেখ্‌তে এসেছে শুনি?...আমি মরলে দুঃখু নেই এতটুকু, তোমাকে যেমন ক'রে পেলাম জীবন ভ'রে এমনটা শুনিনি।"

বসন্তর মনের মধ্যে সেদিনকার কথাটা মোচড় দিয়ে যায়। সে চুপ ক'রে থাকে—ব'ল্‌তে গিয়েও পারে না।

অলকা আবার বল্‌তে থাকে, "দেখ আমি ম'রে গেলে তুমি বিয়ে ক'র। নইলে আমার স্বর্গে গিয়েও শান্তি নেই। তুমি বাউণ্ডুলে হ'য়ে ঘুরে বেড়াবে এ আমি সইতে পারব না। না, না, ওগো আপত্তি ক'র না। আমায় ভালোবেসেছ ব'লে আর কাউকে বাস্‌বে না এ কেমন কথা! তাতে আমার মর্য্যাদা কমবে না বরং বাড়বে। আমি ত জানি তুমি আমায় কত ভালোবাসো। ধর আজই যদি দেখি অন্য কাউকে তুমি ভালোবাসো তাতে আমার রাগ হবে না তোমার ওপর, তোমাকে আমি বিশ্বাস করি। ওতে কিছু যায় আসে না। লোকে

বাপু এটা নিয়ে বড় বাড়াবাড়ি করে অকারণে। কী হ'য়েছে, আমার যদি মনের সম্পদ থাকে দশজনকে ভালোবাসবার মত—তবে কেন—।"

বসন্তর কানে কথাগুলো যায় না, সে অবাক হ'য়ে অলকার পানে তাকায়—মানবী না দেবী। আর সে নিজে?—হঠাৎ যেন কে তার পিঠে চাবুক কশিয়ে দেয়। তার চোখে কি জল ছল ছল ক'রছে?—সে অন্য দিকে ফিরে তাকায়।

সে অলকার হাতদু'টো চেপে ধ'রে বলে "অলকা পারবে আমায় ক্ষমা করতে? পারবে গো, তুমিই পারবে নিশ্চয়।"

তারপর সে এক নিঃশ্বাসে সেদিনকার সমস্ত ব্যাপারটা খুলে ধরল অলকার সাম্‌নে সরলভাবে। অবশেষে ক্ষমা চাইবার জন্য চোখ তুলে অলকার মুখের চেহারা দেখে সে ভয় পেয়ে গেল। তার চোখ দিয়ে যেন আগুন ঠিক্‌রে পড়্‌ছে। সেখানে রয়েছে হিংসার লেলিহান অগ্নিশিখা··· একী···সে স্তব্ধ হ'য়ে গেল, একবার জোরে ডাকল, "অলকা—অলকা—।"

অলকা আপনাকে জোর ক'রে ঠেলে সোজা হ'য়ে উঠে ব'সল, তারপর বল্‌ল "ও—ও এই তুমি? যাও, যাও—।"

সে বসন্তকে দুহাত দিয়ে ঠেলে দিলে। তার অন্তরের মূলধন নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতার সংগ্রাম হ'য়েছিল তবে! সে বল্‌ল, "থাক্‌ আর সাফাই গাইতে হবে না।"

সামান্য এই ক'টি কথাই বিষোদ্গারের পক্ষে যথেষ্ট। অলকা যেন ছুটে চ'লে যেতে পারলে বাঁচে, সমস্ত অন্তরটা অভিমানে বিদ্রোহী হ'য়ে উঠেছে। সে একবার উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করল কিন্তু প'ড়ে গেল, বসন্ত চট্‌ ক'রে ধরে ফেলে আপনার কোলে তুলে নেয় অলকাকে।

বসন্ত কতক্ষণ হতবাক্‌ হ'য়ে ব'সে রইল। এতক্ষণ ধ'রে অলকার মহত্ত্বের যে স্তম্ভ কল্পনায় খাড়া ক'রেছিল একটা সামান্য আঘাতেই তা ধূলিসাৎ হ'য়ে গেল। এই তার যথার্থ প্রায়শ্চিত্ত। সে চেয়েছিল আপনাদের দাম্পত্য জীবনে কোথাও কিছু গোপন না রেখে একটা সরল স্বচ্ছ প্রেমলোক রচনা ক'রতে—একী হ'ল! অলকার আসল রূপটা এম্‌নি অতর্কিতে নির্মমভাবে ধরা দিল? এ টুকু গোপন থাকলেই ছিল ভালো। তার স্বপ্ন কল্পনার মায়াজাল এম্‌নি ভাবেই ছিঁড়ে গেল!

অকস্মাৎ অস্বাভাবিক রকমের একটা অট্টহাস্যে বসন্ত অলকাকে চমকিত করে। অলকা তার পানে চাইল—"হাস্‌লে কেন?"

বসন্ত তার গালটা সাদরে টিপে দিয়ে বলে, "ও মা এই তোমার দৌড়? তোমার বুক্‌নীর বহর দেখে একবার তলিয়ে দেখবার চেষ্টা করলাম কতখানি খাদ বাদ দিতে হবে। ইস্‌, একেবারে সবটাই ফাঁকি, মেকী, ভুয়ো। একটা চালেই কুপোকাৎ তোমার বাণীর মহাসমুদ্র! তোমার মরা হ'লনা—কবে আবার ম'রে ভূত হবে, তার চেয়ে জ্যান্ত ভূত সওয়া যায় বাপু।"

অলকা লজ্জায় স্বামীর কোলে মুখ লুকায়।

সবই হ'ল, তাদের প্রণয়ের তরী ঠিক ঝড়ের ঝাপটা কাটিয়ে ভেসে চল্‌ল। শুধু আদর্শবাদী বসন্ততিলকের উগ্র নিষ্ঠার নেশাটা বিবেকের বদ্ধ দরজায় গুম্‌রে মরতে লাগল।

বিদায়-নমস্কার

শ্রীঅসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়

চারিদিকে ওই ঘনায় অন্ধকার!
যাবার তাগিদ আসিল রে এইবার।
সারাদিন ধরে ঘিরিয়া সকলে ছিলে।
কতনা আদর প্রেম ভালবাসা দিলে।
ঝুলিটি আমার তা'তেই গিয়াছে ভরি'।
—কোনখানে তা'র নাহিরে শূন্য নাই।
শ্রেষ্ঠ সে দান বুকেতে চাপিয়া ধরি'
গোধূলি বেলায় এইবার চলে যাই।

* *

অস্ত-আকাশে রংয়ের দীপালী ফোটে।
বিদায়-পূরবী চারিদিকে বেজে ওঠে।
বাতাস আসিয়া কানে-কানে ক'য়ে যায়—
'লগ্ন এসেছে, আয় আয়—ওরে আয়।'
শ্রান্ত হোয়েচে মনের মুখর পাখী।
কণ্ঠে তাহার থামিয়া গিয়াছে বাণী।
মুদিয়াছে তা'র চঞ্চল দু'টি আঁখি।
আঁধারে ছেয়েচে সাধের কুলায়খানি।

জীবনের পথে আলো ও ছায়ার খেলা।
কতনা সুখের, কতনা দুখের মেলা।
কত আনন্দ, কত আতঙ্ক, ভীতি,
কত ব্যথা, কত উৎসব, কত গীতি।
তা'ই নিয়ে মোর কেটে গেছে সারাক্ষণ,
তা'রি মায়াজাল রেখেছিল সদা ঘিরে।
আজি দিনান্তে খুলে গেল বন্ধন,
আঁধারের দ্বার খুলে গেল ধীরে ধীরে।

* *

পথে থেকে মোরে তোমরা আনিলে ডেকে।
আদরে যতনে তোমরা রাখিলে ঢেকে।
প্রতিদানে তা'র কিছু দিতে পারি নাই।
পথের ভিখারী—কি আছে তাহার ভাই!
যাবার বেলায় তোমাদের শুধু খুঁজি।
তোমাদেরি কথা মনে জাগে বার বার
তোমাদেরি দান আমার পাথেয়-পুঁজি।
তোমাদের সবে জানাই নমস্কার।

শ্রীঅরবিন্দের জীবনের সত্তর বৎসর

শ্রীপ্রমোদকুমার সেন

আগামী ১৫ই আগষ্ট শ্রীঅরবিন্দের জীবনের সপ্ততিতম বৎসরের পূর্ত্তি হইবে। বঙ্গবাসীর পক্ষে এ বিচিত্র জীবনের আলোচনা বিশেষ প্রীতিপদ, কারণ গত শত বৎসরের মধ্যে বাঙ্গালা দেশে যে সকল দিক্‌পাল জন্মগ্রহণ করিয়াছেন শ্রীঅরবিন্দ তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম। বাঙ্গালী জাতির পক্ষে শ্রীঅরবিন্দের ব্যক্তিত্ব আরও আকর্ষণীয় এইজন্য যে, ভারতের রাজনীতি-ক্ষেত্রে তিনিই সর্ব্বপ্রথম পূর্ণ স্বাধীনতার বাণী শুনাইয়াছিলেন। তখনকার দিনের রাজনীতিকগণ colonial self-government অর্থাৎ তদানীন্তন বৃটিশ সাম্রাজ্যের আদর্শ উপনিবেশিক স্বায়ত্ত শাসনের অধিক আর কিছু কল্পনা করিতে পারিবেন না। শ্রীঅরবিন্দ আদর্শ দিলেন—চাই পূর্ণ স্বাধীনতা। এই আদর্শেই কালক্রমে সমগ্র ভারতবর্ষ উদ্বুদ্ধ হইয়াছে।

জাতিকে মহান আদর্শ দিলেও পন্থা সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দ অনেকটা বাস্তববাদী ছিলেন; অর্থাৎ তাঁহার লক্ষ্য ছিল যাহাতে জাতি সামর্থ্য অনুযায়ী ধীরে ধীরে লক্ষ্যে পৌঁছিতে পারে। এ বিষয়ে তাঁহাকে মহারাষ্ট্রের নেতৃবৃন্দ লোকমান্য তিলক প্রভৃতির সহিত তুলনা করা চলে। এককথায়, তাঁহাদের নীতি হইতেছে শাসক সম্প্রদায়ের নিকট হইতে যাহা লাভ করা যায়—তাহার সদ্ব্যবহার করা এবং পরবর্ত্তীর উন্নত স্তরের জন্য অনলসভাবে কাজ করা। আমাদের স্মরণ আছে যে, যখন মণ্টেগু-চেম্‌সফোর্ড-রচিত শাসন সংস্কার প্রবর্ত্তিত হয়, তখন দেশের অধিকাংশ লোক তাহা বর্জ্জনের পক্ষপাতী ছিলেন; কিন্তু লোকমান্য তিলক ১৯১৯ খৃষ্টাব্দের অমৃতসর কংগ্রেসে তাহা গ্রহণ করিয়া কার্য্য করিবার পরামর্শ দেন। ঘটনাচক্রে গান্ধীজী অসহযোগ আন্দোলন সুরু করায় তিলকের নীতি পরীক্ষা করার সুযোগ হয় নাই, কিন্তু পরে কয়েকবার উগ্রপন্থী কংগ্রেসকেও কাউন্সিলে প্রবেশ করিয়া ও মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিয়া এই নীতি অনুসারে চলিতে হইয়াছে।

আমাদের আরও স্মরণ আছে যে, বাঙ্গালার অন্যতম রাজনীতিক ধুরন্ধর, শ্রীঅরবিন্দের অন্তরঙ্গ বন্ধু, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয় প্রথমে অসহযোগ আন্দোলনের বিরোধী ছিলেন। পরে অবশ্য তাঁহাকে জাতীয় প্লাবনে গা ভাসাইতে হইয়াছিল, কিন্তু কিছুদিন পরেই তাঁহাকে রাজ-নীতির মোড় ঘুরাইতে হইয়াছিল এবং এজন্য কিছুদিনের জন্য তাঁহাকে খোদ কংগ্রেসের ও গান্ধীজীর সহিত লড়াপেটা করিতেও হইয়াছিল। তিনি শক্তিমান পুরুষ ছিলেন, তাই অল্পদিনের মধ্যে কংগ্রেসকে স্বীয় মতানুবর্ত্তী করিতে পারিয়াছিলেন। তাহার ফল কি হইয়াছিল তাহা আমরা ১৯২৪-২৮এর রাজনৈতিক ইতিহাসে পাই। Dyarchy বা দ্বৈত-শাসনের ব্যর্থতা তিনি সমগ্র জগতের সমক্ষে প্রতিপন্ন করিয়া-ছিলেন। তাঁহার জীবনদীপ নির্ব্বাণের কিছুকাল পূর্ব্বে তিনি ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের সহিত একটা আপোষের চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং নিসংশয়ে ইহা বলা যাইতে পারে যে তাঁহার আকস্মিক তিরোভাব না ঘটিলে ভারতের রাজনীতিক ইতিহাসের ধারা অন্যরূপ হইত।

সম্প্রতি স্যর ষ্টাফোর্ড ক্রিপ্‌স্ বৃটেন ও ভারতের মধ্যে রাজনৈতিক আপোষের যে প্রস্তাব আনিয়াছিলেন তাহা সমর্থন করিয়া শ্রীঅরবিন্দ রাজনৈতিক দূরদর্শিতারই পরিচয় দিয়াছেন। নানা কারণে স্যর ষ্টাফোর্ডের দৌত্য ব্যর্থ হইল, কিন্তু ইহা সত্য যে একটা আপোষ হইলে তাহা ভারত ও বৃটেন উভয়ের পক্ষে মঙ্গলজনক হইত। অনেকে মনে করেন যে, ঐরূপ আপোষ হইলে ভারতের পক্ষে কোনদিন পূর্ণ-স্বাধীনতা লাভ সম্ভবপর হইত না, কিন্তু আমরা ভুলিয়া যাই যে স্বাধীনতা লাভ জাতির শক্তির উপর নির্ভর করে। একথা অনুমান করা অসঙ্গত নয় যে, এই মহাযুদ্ধের অবসানে সমগ্র জগতের রাজনীতিক রূপ একেবারে বদ্‌লাইয়া যাইবে। তাহাতে সাম্রাজ্যবাদের চিহ্ন থাকিবে বলিয়া মনে হয় না। কাজেই এই সন্ধিক্ষণে যদি বৃটেন ও ভারতের মধ্যে কোন প্রকারে রাজনীতিক বিরোধের অবসান হইত, তাহা হইলে তাহা বিশ্বের মঙ্গলের কারণ হইত। বোধহয় এইভাবেই অনুপ্রাণিত হইয়া স্বাধীনতার পূজারী শ্রীঅরবিন্দ স্যর ষ্টাফোর্ড ক্রিপ্‌সের প্রচেষ্টার সমর্থন করিয়াছিলেন।

প্রশ্ন হইতে পারে যে, যিনি রাজনীতিক্ষেত্রে কংগ্রেসকে মধ্যপন্থীদলের প্রভাব হইতে মুক্ত করিতে লোকমান্য তিলক প্রভৃতি জাতীয়বাদী নেতৃ-বর্গের সহিত বিশেষভাবে প্রচেষ্টা করিয়াছিলেন, তিনি কেন আপোষের জন্য উন্মুখ হইলেন। ইহার উত্তর এই হইতে পারে যে, বৃটেন স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া আপোষের চেষ্টা করিয়াছিল, কাজেই ভারতের পক্ষে সহজভাবে স্বাধীনতা লাভের সুযোগ হইয়াছিল। এ সুযোগ ত্যাগ করা কতদূর সঙ্গত হইয়াছে তাহা ভবিষ্যৎ ঘটনাবলী নির্ণয় করিবে। শ্রীঅরবিন্দের বোধহয় ইচ্ছা ছিল যে, এ সুযোগের সদ্ব্যবহার করিয়া বিভিন্ন রাজনীতিক দল একযোগে কার্য্য করিবে এবং ভারতের স্বাধীন রাষ্ট্র-গঠনের ভিত্তি স্থাপন করিবে। এই ভিত্তির উপরই কালক্রমে স্বাধীনতার সৌধ গড়িয়া উঠিবে। দুর্ভাগ্যের বিষয় সে আশা সফল হয় নাই। এক্ষণে কংগ্রেস যে পন্থা অনুসরণ করিলেন এবং মুসলিম লীগ যে জিদ্ ধরিয়াছেন তাহার ফল কি হইবে ভগবান জানেন!

দ্বিতীয়ত,বর্ত্তমান কাল জগতের ইতিহাসে একটা সন্ধিক্ষণ। যে নিদারুণ যুদ্ধ চলিয়াছে তাহার উপর মানব সভ্যতার ভবিষ্যৎ নির্ভর করিতেছে। এই দ্বন্দ্বে শ্রীঅরবিন্দ জগতের অন্যান্য মণীষিদের মত ফ্যাসিবাদের বিরোধী। শ্রীঅরবিন্দের এই মত নূতন নহে। বিগত মহাযুদ্ধের সময়ে জগতের সামগ্রিক ইতিহাস বিশ্লেষণ করিয়া শ্রীঅরবিন্দ কয়েকটী অভ্রান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন, তাহা Psychology of social Development এবং Ideal of Human unity-শীর্ষক "আর্য্যে" প্রকাশিত প্রবন্ধাবলীতে লিপিবদ্ধ আছে। তাহা পাঠ করিয়া প্রতীতি জন্মে যে, ফ্যাসিবাদের উদ্ভব হইবার বহুপূর্ব্বে শ্রীঅরবিন্দ ইহার সূচনা দেখিয়াছিলেন, ইহার আসল তত্ত্বধারক রাষ্ট্রের অর্থাৎ জার্ম্মাণীর, দিকে অকুণ্ঠভাবে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন এবং ইঙ্গিত করিয়াছিলেন ভাবী যুদ্ধের বিষয়ে। শ্রীঅরবিন্দের নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে আধুনিক জাতি-গুলির স্বরূপ ধরা পড়িয়াছিল। তাই বর্ত্তমান যুদ্ধে তিনি প্রকাশ্যভাবে মিত্রশক্তিগুলির পক্ষাবলম্বন করিয়াছেন। ইহার অর্থ এই যে, শ্রীঅরবিন্দের প্রতীতি জন্মিয়াছে বর্ত্তমান যুদ্ধে ফ্যাসিবাদ জয়ী হইলে মানব সভ্যতার বিশেষ ক্ষতি হইবে, তাহার আধ্যাত্মিক প্রগতি ব্যাহত হইবে। এ বিষয়ে তর্কজাল বুনিবার প্রয়োজন নাই, কারণ যাঁহারা গত ২০ বৎসর যাবৎ ফ্যাসিবাদের ফল পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছেন তাঁহারাই জানেন মানুষের আত্মিক বিকাশের পক্ষে ইহা কি সর্ব্বনাশা নীতি।

এক্ষেত্রে ভারতের কি কর্ত্তব্য? ভারতের নেতৃবর্গ, শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অধিকাংশ, আজ নূতন করিয়া নয়, বহু বৎসর যাবৎ ফ্যাসিবাদের বিরোধী। ইয়ুরোপীয় শক্তি বিশেষ যখন পরোক্ষভাবে ফ্যাসিবাদের পরিপুষ্টিসাধন করিতেছিল, তখন সমস্ত ভারতীয় সংবাদপত্র তাহার তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছে। কিন্তু ভারতের সহিত বৃটেনের অনৈক্যের জন্য রাজনীতিক ভারত বৃটেনের পক্ষাবলম্বন করিয়া অকুণ্ঠ চিত্তে বৃটেনকে সমর্থন বা সাহায্য করিতে পারে নাই। স্যর ষ্টাফোর্ড যে

প্রস্তাব আনিয়াছিলেন, তাহার সম্বন্ধে সুমীমাংসা হইলে ভারত ও বৃটেন একই আদর্শ প্রণোদিত হইয়া গণতান্ত্রিক যুদ্ধ চালাইতে পারিত। এই কারণেই শ্রীঅরবিন্দ ভারত ও বৃটেনের মধ্যে একটা বুঝাপড়ার জন্য বিশেষ আগ্রহান্বিত হইয়াছিলেন। এককালে তিনি ভারতকে বৃটেনের কবল হইতে মুক্ত করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছিলেন; এতদিন পরে তাঁহার সে আশা ফলবতী হইবার উপক্রম হইয়াছিল। ভারতের দুর্ভাগ্য, বৃটেনের দুর্ভাগ্য তাহা হইল না। মানুষের পক্ষে মানসিক সংকীর্ণতা অতিক্রম করা সহজ নহে। যে অরবিন্দকে ইংরাজ একদিন দারুণ বৃটিশ-বিদ্বেষী বলিয়া মনে করিত, সে আজ তাহাকে পরম বন্ধুরূপে পাইয়াছে। তাহার কারণ শ্রীঅরবিন্দ রাগদ্বেষের অতীত—তাহার কাম্য—সত্য ও শুভ।

* * * *

দীর্ঘ ত্রিশ বৎসরের মৌন ভঙ্গ করিয়া (তিনি ১৯১০ খৃষ্টাব্দে রাজনৈতিক ক্ষেত্র হইতে চলিয়া গিয়াছিলেন) শ্রীঅরবিন্দ যে রাজনীতি বিষয়ে কথা বলিয়াছেন ইহাতে অনেকেই আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছেন। অধিকাংশ লোকেরই ধারণা ছিল যে, তিনি শুধু ধ্যানধারণা লইয়া আছেন, জগতের সহিত তাঁহার কোনই সম্বন্ধ নাই। বার বার তাঁহাকে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ফিরাইয়া আনিবার চেষ্টা ইতঃপূর্ব্বেই ব্যর্থ হইয়াছে। ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে কংগ্রেস সভাপতি মনোনীত করিয়াও তাঁহাকে যোগাসন হইতে টলাইতে পারে নাই। এমন কি ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে শ্রীরামকৃষ্ণ শত বার্ষিকী উপলক্ষে কলিকাতায় যে বিরাট ধর্ম্মসভার অনুষ্ঠান হইয়াছিল, তাহাতেও পৌরহিত্য করিতে তিনি স্বীকৃত হ'ন নাই। এখনও অনেক লোক তাঁহাকে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ফিরিয়া পাইতে চাহে, কিন্তু কি কারণে তিনি তাহাতে সম্মত নহেন তাহা আমরা পরে দেখিব।

সাধারণতঃ প্রশ্ন শুনা যায়, তিনি এতকাল ধরিয়া সুদূর পণ্ডিচারীতে কি করিতেছেন? তাঁহাকে কেন্দ্র করিয়া একটা বিরাট আশ্রম গড়িয়া উঠিয়াছে। সেখানে অনেক বিশিষ্ট ও অবিশিষ্ট নরনারী সাধনার জন্য আশ্রয় লইয়াছেন। বৎসরের তিনদিন ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে বহু নরনারী তাঁহার দর্শনার্থী হইয়া পণ্ডিচারীতে উপস্থিত হয়। যাহারা দর্শনার্থী হইয়া পণ্ডিচারীতে উপস্থিত হয়। তাহারা দর্শন করে তাঁহার সৌম্য মূর্ত্তি, জ্যোতিষ্মান রূপ, কমনীয় কান্তি, গভীর আয়ত লোচন—যাহা বিকীর্ণ করিতেছে শান্তির কিরণ। চক্ষু তৃপ্ত হয়, প্রাণ ভরিয়া উঠে বৈ কি! তাঁহাকে দেখিয়া আমরা সকলে হয়ত রবীন্দ্রনাথের মত বলিতে পারি না—"প্রথম দৃষ্টিতেই বুঝ্‌লুম,—ইনি আত্মাকেই সব চেয়ে সত্য ক'রে চেয়েছেন, সত্য ক'রে পেয়েছেন। সেই তাঁর দীর্ঘ তপস্যার চাওয়া ও পাওয়ার দ্বারা তাঁর সত্তা ওতপ্রোত। আমার মন বল্‌লে, ইনি এঁর অন্তরের আলো দিয়ে বাইরের আলো জ্বাল্‌বেন।"—তবে আমরা সকলেই রবীন্দ্রনাথের মত দেখিতে পাই "তাঁর মুখশ্রীতে সৌন্দর্য্যময় শান্তির উজ্জ্বল আভা।"

শুধু বহির্দৃষ্টি দিয়া শ্রীঅরবিন্দকে বুঝা আমাদের পক্ষে দুঃসাধ্য, কারণ বাল্যকাল হইতেই তাঁহার জীবন অন্তর্মুখীন। এই অন্তর্মুখিতা তাঁহার প্রকৃতি—পারিপার্শ্বিক অবস্থা তাঁহাকে আরও অন্তর্মুখী করিয়াছে। বাল্যে তিনি সাধারণ বালকের মতন মাতাপিতার স্নেহে লালিত পালিত হ'ন নাই —অতি অল্প-বয়স হইতে শিক্ষার জন্য সুদূর বিলাতে থাকিতে হইয়াছে। বাল্যকাল ও প্রথম যৌবন জ্ঞানার্জ্জনেই অতিবাহিত হইয়াছে।

আমরা সাধারণভাবে জানি যে, আই. সি. এস্ পরীক্ষায় অপূর্ব্ব সাফল্যলাভ করিয়াও ঘোড়ায় চড়ার পরীক্ষায় অকৃতকার্য্য হওয়ার জন্য তিনি সরকারী চাকুরী পান নাই। কিন্তু বাস্তবপক্ষে তিনি ইচ্ছা করিয়াই ঐ পরীক্ষা দেন নাই, কারণ তাঁহার আদর্শ ছিল ভিন্ন। তাঁহার পিতার একান্ত আগ্রহেই তিনি আই, সি, এস্ পরীক্ষা দিয়াছিলেন। শ্রীঅরবিন্দ আই, সি, এস্ চাকুরি পাইলেন না বলিয়াই তাঁহার পিতা ভগ্নহৃদয়ে দেহত্যাগ করিয়াছিলেন।

ভবিষ্যৎ জীবনে স্বাধীনতা সংগ্রামে অগ্রণী হইবেন বলিয়াই বোধহয় শ্রীঅরবিন্দ সরকারী চাকুরি গ্রহণ করেন নাই। ছাত্রাবস্থায় তিনি বিলাতে রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগদান করিতেন বলিয়া শুনা যায়। স্বাধীনতাকামী ভারতীয় ছাত্রদিগের সহিত তিনি একযোগে কার্য্য করিতেন। তবে বিলাতে তিনি কিভাবে চলিতেন তাহার বিবরণ জানা যায় না, কারণ তিনি কখনই কাহাকেও নিজের কথা বলিয়াছেন বলিয়া শুনা যায় না।

বরোদায় শিক্ষকতা করিবার সময় লোকচক্ষুর অন্তরালে শ্রীঅরবিন্দ স্বাধীনতাযজ্ঞের পৌরহিত্য করিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন, এ খবরও তাঁহার কয়েকজন অন্তরঙ্গ ছাড়া আর কেহ রাখিত না। কেহ কি তখন জানিত যে, সৌম্য, শান্ত, স্বল্পভাষী, জ্ঞান-তাপস শ্রীঅরবিন্দের মধ্যে জাতীয় জীবন প্রদীপ্তকারী অগ্নি প্রচ্ছন্ন ছিল? তাই যেদিন তিনি দীপ্ত সূর্য্যের মত ভারতের রাজনৈতিক গগনে উদিত হইলেন সেদিন দেশবাসী বিস্ময়বিমুগ্ধ নয়নে তাঁহার দিকে তাকাইল, তাঁহার বিরাট ত্যাগে তাঁহার নিকট মস্তক অবনত করিল—তাঁহাকে শুধু রাজনৈতিক নেতারূপে নয়, দেশগুরুরূপে বরণ করিল।

বরোদায় প্রবাস শ্রীঅরবিন্দের সাহিত্যসৃষ্টির যুগ, কিন্তু তাহার পরিচয় তখনকার দিনে অল্প লোকেই পাইয়াছিল। একমাত্র স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় তাঁহার সাহিত্যিক প্রতিভা উপলব্ধি করিয়া উচ্ছ্বসিতভাবে তাঁহাকে অভিনন্দিত করিয়াছিলেন। কিন্তু সে অভিনন্দন লোকচক্ষুর অন্তরালেই হইয়াছিল। তেম্‌নি শ্রীঅরবিন্দের রাজনীতিক প্রতিভা উপলব্ধি করিয়াছিলেন স্বর্গীয় মহামতি রাণাডে। বরোদায় থাকিতে তিনি বোম্বাইএর "ইন্দুপ্রকাশ" নামক সাময়িক পত্রে কংগ্রেসের আবেদন-নীতির বিরুদ্ধে যেরূপভাবে লেখনী পরিচালনা করিতেছিলেন, তাহাতে রাণাডে চঞ্চল হইয়া উঠেন যে এইরূপ আলোচনার ফলে কংগ্রেস জনপ্রিয়তা হারাইবে। তাই তিনি শ্রীঅরবিন্দকে ওরূপ লেখা বন্ধ করিতে বলেন। শ্রীঅরবিন্দ তাঁহার কথা উপেক্ষা করিতে পারিতেন, কিন্তু তাঁহার প্রকৃতি সেরূপ নহে—তিনি রাণাডের মর্য্যাদা রক্ষা করিলেন।

কিন্তু কয়েক বৎসর পরে শ্রীঅরবিন্দকে শুধু কংগ্রেসের আবেদন-নীতির বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করিতে হইল না—তাঁহাকে প্রকাশ্যভাবে জাতীয়দলের নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়া কংগ্রেসে স্বাধীনতার আদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্য আন্দোলন চালাইতে হইল। তাহার ফলেই কংগ্রেসে গরমপন্থী ও নরমপন্থীদলের সংঘর্ষ এবং সুরাট কংগ্রেসে দক্ষযজ্ঞ। তখন এই কারণেই অনেক কংগ্রেসী নেতা শ্রীঅরবিন্দের বিরোধী হইয়া উঠিলেন এবং তখনকার গবর্ণমেণ্ট ধরিয়া লইলেন যে শ্রীঅরবিন্দই বিপ্লববাদের মুখপাত্র। ইহার পরিণামেই আমরা শ্রীঅরবিন্দকে বোমার দলের আসামী শ্রেণীভুক্ত দেখিতে পাইলাম। অবশ্য এক্ষণে আমরা সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারি যে, ঐ সংঘর্ষের ফলেই উত্তরকালে কংগ্রেস শক্তিমান হইয়া উঠিয়াছিল।

সেদিন একজন লিখিয়াছেন যে, শ্রীঅরবিন্দ কোনদিন Practical politics করেন নাই, তাই তাঁহার ক্রিপস্ প্রস্তাব সম্বন্ধে কিছু বলার কোন অধিকার নাই। তিনি বোধহয় ভুলিয়া গিয়াছিলেন শ্রীঅরবিন্দ সুরাটে কংগ্রেসের অধিবেশনে, তাহার পূর্ব্বে মেদিনীপুরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনে এবং জেল হইতে বাহির হইয়া হুগলীতে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনে কিরূপ রাজনৈতিক শক্তিমত্তার পরিচয় দিয়াছিলেন। তিনি ভুলিয়াছেন বোধহয় "বন্দেমাতরম্," "কর্ম্মযোগিন্" ও "ধর্ম্ম" পত্রিকায় শ্রীঅরবিন্দের মর্ম্মস্পর্শী লেখাগুলি। তবে ইহা সত্য শ্রীঅরবিন্দ politician ছিলেন না, ছিলেন statesman। Politicianএর উপজীবিকা হইতেছে politics, তাঁহার লক্ষ্য দলের প্রতিপত্তি; আর statesman হইতেছেন বিজ্ঞ, দেশের মঙ্গলকামী, জগতের মঙ্গলকামী, মানব-বন্ধু।

শ্রীঅরবিন্দ যখন বরোদায় মোটা মাহিয়ানায় চাকুরি ছাড়িয়া, অতি সামান্য বেতনে কলিকাতায় জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যোগদান করেন,

তখন তাঁহার লক্ষ্য ছিল না politics। তিনি চাহিয়াছিলেন দেশাত্মার উদ্বোধন করিতে, জাতিকে আত্মপ্রতিষ্ঠ, স্বাধীনতাকামী করিতে। তাঁহার বিশ্বাস ছিল আত্মশক্তিতে—বন্দুকে, তরবারিতে নয়। তাই তিনি বাংলায় আসিয়া জাতি গঠনের, জাতীয় শিক্ষার নবধারা প্রবর্ত্তনের ভার লইয়াছিলেন। ঘটনাচক্রে তাঁহাকে রাজনীতি ক্ষেত্রে আসিতে হইয়াছিল, "বন্দেমাতরম" সংবাদপত্রের সম্পাদকতা গ্রহণ করিতে হইয়াছিল এবং জাতীয় দলের পুরোভাগে যাইতে হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহার লেখা ও বক্তৃতায় পাই ভারতের সনাতন আধ্যাত্মিক বাণী। তিনি শুধু দেশের রাজনৈতিক মুক্তি চা'ন নাই, স্মরণ করাইতে চাহিয়াছিলেন ভারতের আধ্যাত্মিক আদর্শ, প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিয়াছিলেন রাষ্ট্রকে, সমাজকে আধ্যাত্মিক ভিত্তির উপর। মুক্ত করিতে চাহিয়াছিলেন ভারতকে, পাশ্চাত্যের নিছক জড়বাদের নাগপাশ এবং আমাদের অধঃপতনের যুগের তামস-তন্দ্রা হইতে।

তিনি যদি রাজনীতিক নেতৃত্ব লইয়া তুষ্ট থাকিতে চাহিতেন, তাহা হইলে দেশের অধিকাংশ লোকই আনন্দিত হইত। উত্তরকালে তাঁহাকে জাতি আবার রাজনৈতিক নেতারূপে চাহিয়াছিল—এখনও চাহে। কিন্তু শুধু রাজনৈতিক মুক্তি তাঁহার আদর্শ নয়, ব্যক্তিগত আধ্যাত্মিক মুক্তিও তাঁহার আদর্শ নয় (তিনি বলিয়াছেন যে সেরূপ মুক্তি যদি তিনি চাহিতেন তাহা হইলে তাহার জন্য বাঁধা সড়ক প্রস্তুত ছিল)—তাঁহার লক্ষ্য আরও সুদূরে। তাঁহার সমগ্র জীবনই একটা বিরাট তপস্যা। জীবনের পরিবর্ত্তনের সহিত তাঁহার তপস্যার ক্ষেত্র পরিবর্ত্তিত হইয়াছে এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাঁহার তপঃশক্তি বিকশিত হইয়াছে।

* * * *

শ্রীঅরবিন্দের এই তাপসজীবনের বিষয় উপলব্ধি না করিলে আমরা তাঁহার পণ্ডিচারী প্রয়াণের রহস্য বুঝিতে পারিব না। এ বিষয়ে আমাদের দেশে এককালে জল্পনার অন্ত ছিল না। অনেকে মনে করিতেন যে, রাজনীতিক ঝড় ঝাপ্‌টা সহ্য না করিতে পারিয়া তিনি স্বেচ্ছা-নির্ব্বাসনে গিয়াছিলেন। অপর কেহ কেহ মনে করেন যে জীবনের তিক্ততা হইতে মুক্তি পাইবার জন্য তিনি কর্ম্মক্ষেত্র ত্যাগ করিয়াছেন। এরূপ ভাব যাঁহারা এখনও পোষণ করেন তাঁহাদিগকে একবার শ্রীঅরবিন্দের স্বলিখিত "কারাকাহিনী" পড়িতে অনুরোধ করি। কিরূপ অম্লান-বদনে, প্রফুল্লচিত্তে তিনি তখনকার দিনের কারাক্লেশ সহ্য করিয়াছেন তাহা পাঠ করিলে আমাদের মর্ম্মস্থল আন্দোলিত হইয়া উঠে। কারাগারেই তাঁহার যোগীমূর্ত্তি ফুটিয়া উঠিয়াছে—দুঃখে উদাসীন, সুখে বিগতস্পৃহ। জাগতিক সুখ তিনি কোনদিনই চাহেন নাই, হেলায় যশ মান সম্পদ সমস্তই উপেক্ষা করিয়া তিনি বাল্যকাল হইতেই প্রচ্ছন্ন সন্ন্যাস লইয়াছিলেন। প্রয়োজন হইলে রাজনৈতিক কারণে আরও দুঃখ বরণ করিতে পারিতেন।

কিন্তু সন্ন্যাসও তাঁহার জীবনের লক্ষ্য ছিল না—লক্ষ্য ছিল সত্য উপলব্ধি করা। আমাদের দেশে তাঁহার মর্ম্মকথা বহুকাল পূর্ব্বে বোধহয় একমাত্র রবীন্দ্রনাথই উপলব্ধি করিয়াছিলেন। "অরবিন্দ রবীন্দ্রের লহ নমস্কার"—শীর্ষক কবিতায় এই কথাগুলি তাহার সাক্ষ্য :—"আছ জাগি' পরিপূর্ণতার তরে সর্ববাধাহীন।" প্রথম জীবনে শ্রীঅরবিন্দের তপস্যা হইয়াছে ব্যক্তিত্বে পরিপূর্ণতার জন্য, মধ্যজীবনে জাতির পরিপূর্ণতার জন্য, এবং শেষ জীবনে সমগ্র মানবজাতির পরিপূর্ণতার জন্য।

সমগ্র জীবন দিয়া তিনি পরম সত্যকে চাহিয়াছেন—সত্যের একটা বিশিষ্টরূপে সন্তুষ্ট থাকেন নাই। আমরা ধর্ম্ম, দর্শন, বিজ্ঞান, শিল্প, সাহিত্য প্রভৃতি যে কোন একটিতে বুৎপত্তি লাভ করিলে কৃতার্থ মনে করি ; তাহার প্রত্যেকটিতেই শ্রীঅরবিন্দের গভীর জ্ঞানের পরিচয় আমরা তাঁহার বিভিন্ন লেখায় পাই। কিন্তু তাঁহার লক্ষ্য হইতেছে সমগ্র জীবনের, সমগ্র বিশ্বের জ্ঞান—তাই তিনি অল্পে তুষ্ট থাকিতে পারেন নাই। জ্ঞানের সকল স্তরে তাঁহার অবিরাম গবেষণা ও উপলব্ধি চলিয়াছে—তাহার ফলেই আজ আমরা তাঁহার নব্যবেদ, "দিব্য-জীবন" মহাগ্রন্থ পাইয়াছি।

ভগবানকে তিনি চাহিয়াছেন সমগ্রভাবে—জ্ঞানের পথে, ভক্তির পথে, কর্ম্মের পথে—সর্ব্বোপরি যোগের পথে। কিন্তু তিনি মানব-জ্ঞানের কোন দিকই উপেক্ষা করেন নাই। বাল্যকাল হইতে পাশ্চাত্যে শিক্ষালাভ করিয়াও তিনি শুধু ইয়ুরোপীয় সাহিত্য ও দর্শনে সুপণ্ডিত হ'ন নাই, তিনি নব্য বিজ্ঞানের সহিত সুপরিচিত হইয়াছেন। দর্শনের বিভিন্ন মতবাদও তিনি ঐকান্তিকভাবে স্বীয় জীবনে পরীক্ষা করিয়াছেন। যিনি উত্তরকালে তাঁহার সহধর্ম্মিণীকে লিখিয়াছিলেন, "ঈশ্বর যদি থাকেন তাহা হইলে তাঁহার অস্তিত্ব অনুভব করিবার, তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার কোন না কোন পথ থাকিবে। সে পথ যতই দুর্গম হোক আমি সে পথে যাইবার দৃঢ় সংকল্প করিয়াছি"—তিনিই এককালে ঈশ্বরের অস্তিত্বে সন্দিহান ছিলেন। কিন্তু সে সন্দেহ তাঁহার অনুসন্ধিৎসা নিবৃত্ত করে নাই, কোন মতবাদের মোহে তিনি কোন দিনই নিজের সত্তাকে খর্ব্ব করেন নাই।

পণ্ডিচারীতে প্রথম তিনি একরূপ সঙ্গীহীন ভাবেই ছিলেন। শারীরিক ক্লেশও সহ্য করিতে হইয়াছে যথেষ্ট। ভবিষ্যৎ অজ্ঞাত—তবু তিনি যোগাসনে অটল। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন স্বয়ং তাঁহাকে ফিরাইয়া আনিতে গেলেন। শ্রীঅরবিন্দের উত্তর হইল যে, জীবনের রহস্য ভেদ করিয়া নবজীবন প্রতিষ্ঠার কৌশল আয়ত্ত না করিয়া তিনি আর গতানুগতিক জীবনে ফিরিবেন না। বিশ্বের দুঃখে দৈন্যে, মানব জীবনের গ্লানিতে তাঁহার হৃদয় ব্যথিত হইয়াছিল, তাই তিনি সন্ধান করিতেছিলেন চরম নিদান, অপেক্ষা করিতেছিলেন প্রকৃতির নব বিবর্ত্তনের ইঙ্গিতের, পরাপ্রকৃতির অবতরণের।

এই বৎসর তাঁহার যোগ সাধনার ৩৩ বৎসর পূর্ণ হইল। এই দীর্ঘকালে তাঁহার যে লেখাগুলি বাহির হইয়াছে তাহাই জ্ঞানক্ষেত্রে আমাদের পথপ্রদর্শক। আর তাঁহার দর্শন প্রজ্বলিত করে আমাদের হৃদয়ের আহিতাগ্নি। তিনি দেখাইয়া দিয়াছেন দিব্য-জীবন লাভের উপায়—বুঝাইয়াছেন কেন দিব্য-জীবন আমাদের আদর্শ। আমাদের মধ্যে অনেকে হয় ত এই আদর্শ লইবেন না, ইহা মানিতে চাহিবেন না, কিন্তু যে মহা-প্রকৃতির দ্বারা আমরা বিধৃত তাঁহার ইচ্ছায় যুগপরিবর্ত্তন, মানবপ্রকৃতির বিবর্ত্তন ঘটিবেই। যাহারা এই পরিবর্ত্তনের বিরোধী তাহাদের বিলোপ অবশ্যম্ভাবী—যেমন পুরাকালের অতিকায় জন্তুগুলির বিলোপ ঘটিয়াছে।

প্রকৃতির এই বিবর্ত্তনে আমাদের ব্যক্তিগত প্রচেষ্টাও অপরিহার্য্য, কারণ দিব্য-জীবন বিকাশ লাভ করিবে ব্যক্তিকে কেন্দ্র করিয়া। এই দিব্য-জীবনের অর্থ হইতেছে আত্মার জাগরণ, চেতনার পরিবর্ত্তন এবং বহির্জীবনে নবধারা। জীবনের প্রেরণা তখন সংকীর্ণ মানস জগত হইতে আসে না, তাহার ঊর্দ্ধমূল আমাদের চেতনায় অধিগম্য হয়। তখন আমাদের অস্তিত্ব বিশ্ব-চেতনায় বিকশিত হয় এবং আমরা উপলব্ধি করি যে রহস্যেভরা এই বিশ্বের ছন্দের একটা হিল্লোল আমাদের এই জীবন। চেতনার এই সম্প্রসারণে জ্ঞান-ভক্তি-কর্ম্মের ত্রিবেণী সঙ্গমে স্নান করিয়া আমাদের সংকীর্ণতা, খণ্ডতার গ্লানি দূর হয়।

আজ জগতে সংঘর্ষের কোলাহলেও শ্রীঅরবিন্দের বাণী অনেকের মর্ম্ম স্পর্শ করিতেছে। তবে ইহা হৈচৈ, sologan বা propagandaর জিনিষ নয় ; এক নূতন সম্প্রদায়, নূতন ধর্ম্ম-প্রচারের উদ্যোগ পর্ব্ব নয়—ইহা আমাদের ব্যক্তিগত জীবনে উপলব্ধি করিবার বাণী। ব্যক্তি গড়িয়া উঠিলেই সমাজ, রাষ্ট্র ও জাতি গড়িয়া উঠে। উপর হইতে রাষ্ট্রের জগদ্দল পাথর চাপাইলে ব্যক্তিত্ব বিনষ্ট হয় এবং তাহাই হইতেছে বৃহৎ ক্ষতি। এই কথা বহির্মুখী আধুনিক জগত বুঝিতে পারে নাই বলিয়া, বার বার নরমেধ যজ্ঞে তাহাকে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইতেছে।

গণদেবতা

পঞ্চগ্রাম

শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

দুর্গাকে বিশ্বনাথের ভাল লাগিল। তাহার শ্রীসম্পন্ন রূপ, পরিচ্ছন্ন বেশ, বিশেষ করিয়া তাহার কথাবার্ত্তার মার্জ্জিত ভঙ্গি দেখিয়া বিশ্বনাথ তৃপ্ত হইল। সে সস্নেহে হাসিয়া বলিল—দেবু আমাকে বলছিল তোমার কথা। খুব প্রশংসা করছিল তোমার। তুমি যদি সে-দিন টাকা না দিতে—

কথা শুনিতে শুনিতেই দুর্গার চোখ ভরিয়া জল আসিয়াছিল—সে উচ্ছ্বাসভরে কথার মাঝখানেই ঢিপ করিয়া একটা প্রণাম করিয়া উঠিয়া পড়িল। বলিল—পরে আসব ঘোষ মশায়, চল্লাম এখন। মজলিশ শেষ হোক আপনাদের।

—কি বলছিলি বলেই যা দুগ্‌গা; আমাদের মজলিশ শেষ হতে অনেক দেরী।

দুর্গা একটু বিব্রত হইয়া পড়িল; কি বলিবে সে? কিছু বলিবার জন্য তো সে আসে নাই, সে আসিয়াছিল অনাবশ্যক দুইটা কথা বলিতে, ঠাকুর মশায়ের নাতিকে একটা প্রণাম করিতে!

দেবুই আবার প্রশ্ন করিল—উঠে যাব? অর্থাৎ লোক-জনের সম্মুখে যদি বলিতে দ্বিধা হয় তবে সে উঠিয়া যাইতে প্রস্তুত আছে।

দুর্গার মনে পড়িয়া গেল দাদার কথা। সে হাসিয়া বলিল—আজ্ঞে না; আমি বলছিলাম আমার দাদার কথা। একটা হিল্লে ক'রে দেন; না-হলে সে খাবে কি?

—কে? তোমার দাদা কে? প্রশ্ন করিল বিশ্বনাথ।

—পাতু বায়েন। তারও চাকরাণ জমি গিয়েছে; বেচারার বড় কষ্ট হয়েছে আজকাল—উত্তর দিল দেবু।

—ও। যে চালান গিয়েছিল তোমাদের সঙ্গে?

—হ্যাঁ।

অত্যন্ত সহজ এবং স্বচ্ছন্দভাবেই মুহূর্ত্তে বিশ্বনাথ উত্তর দিল—ও-পারের জংসনে এতগুলো কল রয়েছে, সেখানে খাটলেই তো পারে পাতু।

—কলে?

—হ্যাঁ, কলে। যারাই বসে আছে, তারা সকলেই যেতে পারে কলে। ওই গদাই পাল, হিতু ঘোষ, এরাও তো যেতে পারে। খেটে খেতে দোষ কি?

সকলে চুপ করিয়া রহিল; কলে শ্রমিক-বৃত্তি অবলম্বনে পল্লী-সমাজে বিশেষ একটা অপমান আছে। কলে কাজ করিলে জাতি থাকে না, ধর্ম্ম থাকে না, মানুষ ম্লেচ্ছ হইয়া যায়, বলিয়াই ইহাদের ধারণা।

—দুর্গা, তুমি কাল সকালে এদের সঙ্গে করে জংসনে যাবে, আমি থাকব সেখানে; তোমাদের সকলের কাজ আমি ঠিক ক'রে দেব। তোমাদের তো মেয়েরাও খেটে খায়, মেয়েদেরও নিয়ে যাবে।

দুর্গা অবাক হইয়া বিশ্বনাথের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। ঠাকুর মশায়ের নাতি কি কলের কথা জানে না? জানিতে হয় তো না পারে, কিন্তু কাণেও কি শুনে নাই? মেয়েদের পর্য্যন্ত কলে যাইতে বলিতেছে! মেয়েরা তাহাদের ভাল নয়, কিন্তু তাই বলিয়া কলে যাইবে? যেখানে মেয়েদের ইজ্জৎ আস্তাকুঁড়ের উচ্ছিষ্টের মত কাকে কুকুরে লইয়া টানাটানি করে?

হাসিয়া বিশ্বনাথ বলিল—তোমাকে আমি মেয়েদের সর্দ্দারণী করে দেব, বুঝলে!

—আমাকে? মুহূর্ত্তে দুর্গার চোখে দূর-দিগন্তের বিদ্যুচ্চমকের মত একটা দীপ্তি খেলিয়া গেল।

—হ্যাঁ তোমাকে। কলের ম্যানেজারকে আমি বলে দেব।

দুর্গা এ কথার উত্তর দিল না, বিশ্বনাথকে একটি প্রণাম করিয়া আপনার পাড়ার দিকে পথ ধরিল। দুর্গার চলিয়া যাওয়ার ভঙ্গিটা এত আকস্মিক এবং দ্রুত যে, সকলেই সেটা অনুভব করিয়াছিল। বিশ্বনাথ দেবুকে প্রশ্ন করিল—কি হ'ল?

দেবু ব্যাপারটা বুঝিয়াছিল, সে বিশ্বনাথের কথার উত্তর না দিয়া দুর্গাকেই ডাকিল—দুর্গা—শোন।

দুর্গা ফিরিল না।

দেবু আবার ডাকিল—এই দুর্গা!

—কি? দুর্গা এবার ফিরিয়া দাঁড়াইল। পরক্ষণেই হাসিয়া বলিল—কি আর শুনব ঘোষ মশায়। কলের খাটুনীর লেগে তোমাদের ঠাকুর মশায় কলের ম্যানেজারকে বলে দেবে—এর আর শুনব কি বল? বরং ঠাকুরমশায় যদি রাজী থাকে তো কলের মালিককে বলে কলের ম্যানেজার করে দিতে পারি। বলিয়া মুহূর্ত্ত পরে খানিকটা হাসিয়া বলিল—তুমি তো জান গো!

মেয়েটা চলিয়া গেল। কিন্তু তাহার স্পর্দ্ধা দেখিয়া দেবু স্তম্ভিত হইয়া গেল। শুধু দেবু নয়, মজলিশের সকলেই।

বিশ্বনাথ এবার ব্যাপারটা কিছু বুঝিল, হাসিয়া সে প্রশ্ন করিল—কলে খাটতে বুঝি এদের আপত্তি?

দেবু কুণ্ঠিত ভাবেই বলিল; মজলিশের মধ্যে হিতু ঘোষ, গদাই পালও বসিয়াছিল, বিশ্বনাথ তাহাদেরও কলে খাটিবার কথা তুলিয়াছিল বলিয়া কুণ্ঠা বোধ না করিয়া দেবু পারিল না, বলিল—হ্যাঁ। মানে কলের ব্যাপার-স্যাপার তো বুঝছ! ওখানে গেরস্ত যারা, মান ইজ্জতের ভয় যারা করে—তারা যায় না।

বিশ্বনাথ বলিল—না-গেলে, এখানে উপোস ক'রে দিন কাটাতে হবে। অবিশ্যি এক উপায় আছে, ভিক্ষে। কিন্তু ভিক্ষে ক'জনকে দেবে? আর দেবেই বা কে?

দেবু চুপ করিয়া রহিল। কথাটা নিষ্ঠুর সত্য, কিন্তু তবু ইহাকে স্বীকার করিতে কোথায় যেন বাধে।

বিশ্বনাথ বলিল—যাক গে, ব'স। এদিকের কথা শেষ ক'রে ফেল। আমি কলকাতায় চিঠি দিয়েছি। শিগ্‌গির কাউন্সিলের মেম্বর একজন আসবেন। তোমাদের কথা লাটসাহেবের দরবারে পর্য্যন্ত উঠবে। তোমাদের কিন্তু শক্ত হতে হবে।

চাষী প্রজার দল এবার চারিদিকে জমাট বাঁধিয়া বসিল। কেবল উঠিয়া গেল জনকয়েক—গদাই পাল, হিতু ঘোষ, তারিণী পাল, বিপিন দাস।

ছিলিম দুই তামাক লইয়া বিপিন দাসই ধুয়াটা তুলিল—এস তারিণী, বেল পাক্‌লে কাকের কি? উঠে এস। তারিণী উঠিল —সঙ্গে সঙ্গে হিতু, গদাই।

পাঁচখানা গ্রামে—শিবকালীপুর, মহাগ্রাম, দেখুড়িয়া, কুসুমপুর, পাঠানপাড়ায় পাঁচটি স্বতন্ত্র প্রজাসমিতি গঠিত হইয়া গেল। কাজ শেষ করিয়া যখন বিশ্বনাথ উঠিল তখন সন্ধ্যা হইয়া গেছে। চাষীরা খুসী হইয়া উঠিল—তাহারা মনে মনে একটা আনন্দের উত্তেজনা অনুভব করিতেছিল—সে উত্তেজনা আগুনের শিখার মতই প্রদাহকর হিংস্র; হিংসার জ্বালাময় আনন্দের রূপান্তরিত একটা বস্তু তাহাতে সন্দেহ নাই। খুসী হয় নাই কেবল জগন ঘোষ ডাক্তার। জগনকে শিবকালীপুরের প্রজাসমিতির সভাপতি করা হইয়াছে তবুও সে খুসী হয় নাই। তাহার প্রস্তাব ছিল পাঁচখানা গ্রামে পাঁচটা স্বতন্ত্র সমিতি না করিয়া একটা সমিতি গঠন করা হোক। পাঁচখানা গ্রামের সমিতির সভাপতির আসনে বসিবার গোপন আকাঙ্ক্ষা তাহার পূর্ণ হয় নাই, তাই এই অসন্তোষ। কিন্তু সে অসন্তোষ কেহ গ্রাহ্য করিল না।

বিশ্বনাথ উঠিয়া বলিল—তা হ'লে আমি চলি দেবু ভাই।

দেবু একটা লণ্ঠন হাতে সঙ্গে সঙ্গে উঠিয়া বলিল—চল।

—তুমি আবার কষ্ট করবে কেন?

—না—চল তোমাকে বাড়ী পর্য্যন্ত রেখে আসব। বর্ষার সময়—রাত্রে নানান সাপটাপ থাকে, তা-ছাড়া—

—তা-ছাড়া?

নিম্নকণ্ঠে দেবু বলিল—ছিরু পালকে তুমি জান না ভাই।

দেবু একটু হাসিল।

* * * *

দুর্গা বাড়ী ফিরিয়া দেখিল—পাতু চুপ করিয়া বসিয়া আছে। দুর্গাকে দেখিয়াই সে দু-আনিটা তাহার দিকে ছুড়িয়া ফেলিয়া দিয়া বলিল—তোর দু-আনিটা।

—কিসের দু-আনি? দুর্গা ভ্রূকুটি করিয়া ভাইয়ের দিকে চাহিল।

—দিলি তখন।

—মদ খেতে যাস নাই?

—না।

—কেনে?

—পেটে ভাত নাই মদ খাবে? না।

—দুর্গা বুঝিল পাতু এখনও আঘাতটা সামলাইয়া উঠিতে পারে নাই। দু-আনিটা কুড়াইয়া লইয়া এ-দিক ও-দিক চাহিয়া দেখিয়া দুর্গা প্রশ্ন করিল—সে পোড়ারমুখী বুঝি এখনও ফেরে নাই?—বউ?

দুর্গার-মা ওঘরের দাওয়ায় এতক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়াছিল, সে এবার ঝঙ্কার দিয়া উঠিল—রাজকন্তে বাপের বাড়ী যেয়েছেন মা, বাপের বাড়ী যেয়েছেন। ছড়া কেটে বলে যেয়েছেন—'ভাত দেবার ভাতার লয় কো, কিল মারবার গোঁসাই' মার খেতে তিনি লারবেন।

বউটা তাহা হইলে পাতুর মারের ভয়ে পলাইয়াছে! দুর্গা একটু ম্লান হাসি হাসিল। অন্য সময় হইলে, এমন কি ঘোষেদের মজলিশে যাইবার আগে হইলে—সে খিল খিল করিয়া হাসিত। কিন্তু মনটা তাহার আজ ভারাক্রান্ত হইয়াছিল—সে সকৌতুকে উচ্চহাসি হাসিতে পারিল না। ঠাকুর মহাশয়ের নাতি-দেবতার মত মানুষ কলে খাটিবার নির্দ্দেশ দিল! ইজ্জৎ-ধর্ম্ম যেখানে; ক্রুদ্ধ অভিমানে দুর্গার বুকটা তোলপাড় করিয়া উঠিল। কই পদ্ম কামারণীকে তো কলে পাঠাইয়া দেন নাই ঠাকুর মহাশয়ের নাতি! একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া দুর্গা অকস্মাৎ বলিল—তোর ঠাকুর মশায়ের নাতি কি বললে জানিস্?

—কে?

—মহাগেরামের ঠাকুর মশায়ের নাতি; দেবতা বলে পেন্নাম করছিলি তখন!

—ঠাকুর মশায় এসেছিলেন নাকি?

—হ্যাঁ—ধম্মঘটের মজলিশ বসেছিল যে দেবু ঘোষের হোথা।

—কি বললেন ঠাকুর মশায়?

—আমি গেলাম তোর কাজের লেগে। তা বললেন—তোমরা সব কলে খাট গিয়ে।

—কলে?

—হ্যাঁ।

—কলে খাটতে বললে ঠাকুর মাশায়?

—হ্যাঁ। শুধু তোকে লয়, মেয়ে মরদ সবাইকে, মায় সদ্‌গোপেদের হিতু গদাইকে পর্য্যন্ত।

—তাই বললে ঠাকুর মশায়?

—হ্যাঁরে। বললে, বললে, বললে। মিছে কথা বলছি আমি?

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া পাতু বলিল—তা' ঠিকই বলেছেন ঠাকুর মাশায়। আর উপায়ই বা কি আছে বল্?

* * * *

মাঠের পথে বিশ্বনাথও দেবুকে ঠিক ওই কথাই বলিল—এ ছাড়া আর উপায়ই বা কি আছে দেবু ভাই?

বর্ষার জলভরা মাঠের পিছল আলপথে চলিতে চলিতে কথাটা তুলিল দেবু ঘোষ। সেই তখন হইতেই তাহার মাথায় কথাটা ঘুরিতেছিল। দুর্গার কথায় সে রুষ্ট হইয়াছিল, কিন্তু কথা তো দুর্গাকে লইয়া নয়। কোথাও না খাটিয়াই দুর্গার জীবন সুখে স্বচ্ছন্দে চলিতেছে, যতদিন তাহার রূপ আছে যৌবন আছে ততদিন তাহার দিন এমনই ভাবেই চলিবে। স্বেচ্ছাচারিণী দেহব্যবসায়িনী সে। দুর্ভিক্ষ মহামারী দেশের জীবনকে বিপর্য্যস্ত করিয়া দিলেও তাহার উপর কোন বিপর্য্যয় আসিবে না। অন্নহীন ক্ষুধার্ত্ত মানুষ বহুকষ্টে সামান্য কিছু সংগ্রহ করিয়াছে—সেই সংগ্রহও সে প্রবৃত্তির তাড়নায় ওই শ্রেণীর নারীর হাতে তুলিয়া দিয়াছে—এ তাহার প্রত্যক্ষ করা সত্য। একদিনের একটা কথা তাহার মনে পড়িয়া গেল। কঙ্কনার করালীকিঙ্কর বাবু একজন শিক্ষিত লোক—বি-এ পাস, অর্থশালী সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি; ইউনিয়ন বোর্ডের ভাইস প্রেসিডেন্ট, লোকাল বোর্ডের মেম্বর। সেবার কলেরায় করালীবাবুর একটিমাত্র সন্তান মারা গেল।

করালীবাবু দেওয়ালে মাথা ঠুঁকিয়া মাথাটা রক্তাক্ত করিয়া তুলিল। কিন্তু ঠিক তাহার পরদিন। পরদিন সন্ধ্যার পর দেবু কঙ্কনা হইতে ফিরিবার পথে বাগান বাড়ীতে ওই দুর্গাকেই অভিসারিকার বেশে প্রবেশ করিতে দেখিয়াছে। বাগানের ভিতর বাংলোর বারান্দার আলো জ্বলিতেছিল—সেখানে করালীবাবু বসিয়াছিল একটা ইজিচেয়ারে, দেবুর চিনিতে ভুল হয় নাই, স্পষ্ট পরিষ্কার সে তাহাকে দেখিয়াছে—চিনিয়াছে। সুতরাং কথা তো দুর্গাকে লইয়া নয়। কথা হিতু ঘোষ, গদাই পাল প্রভৃতি সদ্‌গোপদের লইয়া, জাতিতে মুচী হইলেও পাতুর মত যাহারা গৃহস্থ, সমাজের নিম্নস্তরে জন্মগ্রহণ করিয়া যাহারা মান মর্য্যাদাকে প্রাণপণে আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকিতে চায়, কথা তাহাদের লইয়া। কথাটা তখন হইতেই তাহার অন্তঃচেতনায় কাঁটার খোঁচার মত বিঁধিয়াছিল; এতক্ষণে অবকাশ পাইয়া সেটা চেতনার ভিতর বাহির ব্যাপ্ত করিয়া জাগিয়া উঠিল। অস্বাভাবিক নীরবতার সহিত সে পথ চলিতেছিল। বিশ্বনাথ প্রশ্ন করিল—কি ভাবছ বলত দেবু?

—ভাবছি? ভাবছি হিতুঘোষ, গদাই পাল, তারিণী পাল, বিপিন দাস, পাতু বায়েন এদের কি করা যায়! তুমি তখন বললে কলে খাটতে যেতে। কিন্তু কলের ব্যাপার কি তুমি জান না?

—জানি বৈকি। অত্যন্ত সহজ ভাবেই বিশ্বনাথ উত্তর দিল। বলিল—জানি বৈকি।

—জান? কলের কুলী ব্যারাকেই থাকতে হবে—তা জান?

—বেশ তো থাকবে সেইখানেই। মেয়েছেলে নিয়ে থাকতে আপত্তি হয়—একলাই থাকতে পারে ওরা। আমার মনে হয় মেয়েছেলে নিয়েই থাকা ভাল। তারাও কিছু কিছু রোজকার করতে পারবে।

দেবু যেন আর্ত্তভাবেই বলিয়া উঠিল—না—না—না, বিশুভাই তুমি ও কথা ব'ল না। তোমার মুখে ও কথা বের হওয়া উচিত নয়। না—না—না!

বিশ্বনাথ বলিল—দেখ দেবু, তুমি যদি কোন একটা কারণে হাঙ্গারষ্ট্রাইক ক'রে মর, তবে রোজ সকালে উঠে নলরাজা যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে তোমার নাম করব। কিন্তু পেটের ভাতের অভাবে যদি তুমি উপোস ক'রে মর তবে তোমার কথা মনে করতেও ঘেন্নায় আমার গা শিউরে উঠবে।

দেবু কিছুক্ষণ নীরব হইয়া রহিল, বোধহয় বিশ্বনাথের কথাটাই সে ভাবিতেছিল; কথার উত্তর না পাইয়া বিশ্বনাথই বলিল—কল হয় তো খারাপ জায়গা, সেখানে মানুষের অধঃপতন হয়, মেয়েরা সেখানে গেলে—। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বিশ্বনাথ আবার বলিল—কিন্তু গ্রামের মধ্যে থেকেও কি তার হাত থেকে নিস্তার আছে দেবু ভাই? আমিও তো এই গ্রামের মানুষ দেবু, এখানকার কথা তো আমার অজানা নয়।

দেবু এতক্ষণে বলিল—জান বিশ্বনাথ বাবু, কল থেকে মাসে দুটো তিনটে মেয়েছেলে অন্য পুরুষের সঙ্গে পালিয়ে যায়।

—খেতে না পেলে এখান থেকেও পালিয়ে যাবে দেবু। পালিয়ে না যায় কেউ এখানে থেকেই দুর্গার মত হবে, কেউ বা তোমাদের গাঁয়ের যে সদ্‌গোপদের মেয়ে দুটি কলকাতায় ঝি-গিরি করে তাদের মত হবে। ভালও অনেক আছে, দুঃখ কষ্ট সহ্য করেও মৃত্যু পর্য্যন্ত কেউ কেউ নিজেদের আদর্শ সংস্কার বাঁচিয়ে রাখে; সে তুমি ওই কল খুঁজলেও দু একজন না পাবে এমন না। তবে কলে দুষ্টের সংখ্যা হয় তো বেশী।

মনে মনে নিরুপায় হইয়া দেবু নীরবে নত মুখে পথ চলিতেছিল, অবশেষে হতাশ হইয়া বলিল—তা' হ'লে!—কথাটা সে শেষ করিতে পারিল না। কিছুক্ষণ পর আবার বলিল—কিন্তু আমি বলব কি ক'রে যে তোমরা কলে খাটতে যাও।

হাসিয়া বিশ্বনাথ বলিল—তোমায় কিছুই বলতে হবে না দেবু ভাই, তুমি চুপ ক'রে থাক; ওরা আপনাদের পথ আপনিই বেছে নেবে। চোখের সামনে কলেই যখন পয়সা রয়েছে, তখন আপনিই ওরা কলে খাটতে যাবে!

—আর কি—কোন—উপায় হয় না?

—আর কি উপায় আছে দেবু ভাই?

তারপর দু'জনেই নীরব। নীরবেই মাঠের পিছল পথ অতিক্রম করিয়া উভয়ে চলিয়াছিল। দু-পাশে জলভরা ক্ষেত; আকাশের প্রতিবিম্ব মাঠের জলে দিগন্তের বিদ্যুচ্ছটার প্রভায় মধ্যে মধ্যে ঝিক্‌মিক্ করিয়া উঠিতেছে। হাজার হাজার ব্যাঙের ডাকে চারিদিক মুখরিত। মধ্যে মধ্যে উঁচু মাঠ হইতে নীচু জমিতে জল ঝরিয়া পড়িতেছে—ঝরঝর শব্দে!

সহসা দেবু বলিল—এই নালা পর্য্যন্ত আমাদের শিবকালী-পুরের সীমানা বিশু ভাই।

—এর পরই তো আমাদের মহাগ্রামের সীমানা?

—হ্যাঁ। বলিয়াই কিন্তু দেবু পিছন ফিরিয়া চাহিল, প্রায় মাইল খানেক পিছনে পুঞ্জীভূত অন্ধকারের মত তাহাদের গ্রামের চিহ্ন দেখা যাইতেছে। সেইদিকে চাহিয়া দেবু বলিল—এ চাকলায় এতবড় মাঠ আর নাই। সঙ্গে সঙ্গে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—অথচ শিবকালীপুরের চাষীর ঘরে ভাত নাই। জমি যা কিছু সব কঙ্কনার ভদ্রলোকের।

বিশ্বনাথ হাসিল। গ্রামে তাহারা আসিয়া পড়িয়াছিল; বিশ্বনাথ বলিল—এইবার তুমি ফের দেবু ভাই।

হাসিয়া দেবনাথ বলিল—খেতে দিতে হবে ব'লে ভয় লাগছে না কি?

হাসিয়া বিশ্বনাথ বলিল—নাঃ, ভয় করছি খেয়ে গেলে তোমার বউ তোমার ওপর চটে যাবে। আমাকে অভিসম্পাত করবে।

—কে? বিশ্বনাথ? নাটমন্দির হইতে ন্যায়রত্নের কণ্ঠস্বর ভাসিয়া আসিল।

সসম্ভ্রমেই বিশ্বনাথ উত্তর দিল—হ্যাঁ দাদু, আমি।

ন্যায়রত্ন বোধহয় বিশ্বনাথের জন্যই উৎকণ্ঠিত হইয়া প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। বিশ্বনাথের পিছনে দেবুকে দেখিয়া বলিলেন—মণ্ডলমশাই!

প্রণাম করিয়া দেবু বলিল—আজ্ঞে হ্যাঁ। বিশুবাবুকে পৌঁছে দিতে এলাম।

ন্যায়রত্ন বলিলেন—রাজন্, দীর্ঘ অদর্শনে রাজ্ঞী শকুন্তলা কাতরা হয়ে পড়েছিল, বিশেষ রাত্রি সমাগমে উৎকণ্ঠিতা ভীতা হয়ে পথ চেয়ে বসে আছেন।

বিশু হাসিয়া দেবুকে বলিল—তুমি যেয়ো না দেবু, আমি

আসছি। ত্বরিতপদে সে ভিতরে দেবুর জন্ত খাওয়ার ব্যবস্থা করিতে চলিয়া গেল। ভিতরে আসিয়া উৎকণ্ঠিতা জয়ার দেখা সে পাইল না, কেবল একটা মৃদু গুঞ্জনধ্বনি কানে আসিল। একটু অগ্রসর হইয়া বুঝিল কণ্ঠস্বর জয়ার নয়। মনে পড়িয়া গেল কামার বউ পদ্মের কথা, মেয়েটি আপন মনে মৃদুস্বরে ছড়া গান করিতেছে—

"ওরে আমার ধন ছেলে, পথে ব'সে ব'সে কাঁদছিলে,
গায়ে ধূলো মাখছিলে, মা—মা বলে ডাকছিলে—
সে যদি তোমার মা হ'ত, ধূলো ঝেড়ে তোমায় কোলে নিত।"

মেয়েটি নীরব হইল;—পরক্ষণেই অজয়ের শিশু কণ্ঠ শোনা গেল—আবা কর। আবা গান কর। জয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে।

*   *   *

ন্যায়রত্ন দেবুকে বলিলেন—কেমন মিটিং হ'ল মণ্ডলমশাই?

দেবু বলিল—মিটিং নয়, তবে পাচখানা গাঁয়ের লোক মিলে—একটা পরামর্শ হ'ল। পঞ্চায়েৎ গড়া হ'ল।

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া ন্যায়রত্ন বলিলেন—সেদিন তুমি আমাকে যে কথা দিয়েছিলে মণ্ডল, তা' থেকে তোমাকে রেহাই দিলাম। আমিও রেহাই নিলাম।

দেবু চমকিয়া উঠিল। তাহার মনে পড়িল, সেদিন ন্যায়রত্ন মিটমাটের কথা তুলিয়াছিলেন, সেও তাহাতে সম্মতি দিয়াছিল; প্রতিশ্রুতি দিয়াছিল—ন্যায়রত্ন জবাব না দিলে ধর্ম্মঘট লইয়া আর সে অগ্রসর হইবে না। কিন্তু আজ পঞ্চমীতে হলকর্ষণ নিষিদ্ধ বলিয়া যখন পাঁচখানা গ্রামের লোক আসিয়া জুটিয়া গেল—তখন তাড়াতাড়িতে সব ভুলিয়া গিয়া বিশ্বনাথকে খবর পাঠাইল। এই উত্তেজনার মধ্যে এ কথা তাহার মনেই হয় নাই। সে হাত দুটি জোড় করিয়া বলিল—আমার অত্যন্ত অপরাধ হয়ে গেছে ঠাকুরমশাই।

হাসিয়া ন্যায়রত্ন বলিলেন—না—না মণ্ডলমশাই, অপরাধ তো তোমার নয়। এ হচ্ছে কাল ভৈরবের লীলা; আমি বেশ দেখতে পাচ্ছি। নইলে বিশু আমার পৌত্র, সে আমাকে প্রতিশ্রুতি দিয়ে ভুলে যাবে কেন?

দেবু চুপ করিয়া রহিল।

ন্যায়রত্ন বলিলেন—মনে রাখলেও ফল হ'ত না মণ্ডলমশাই। যারা এসে জমেছিল তারা তোমাদের মানত না। যাক—মুক্তি, তোমাদের মুক্তি দিলাম, আমিও মুক্তি নিলাম। তিনি অন্ধকার দিগন্তের দিকে—যেখানে বিদ্যুচ্চমকের আভাষ মধ্যে মধ্যে খেলিয়া যাইতেছিল, সেইদিকে চাহিয়া রহিলেন।

কিছুক্ষণ পর বিশু আসিয়া ডাকিল—দেবু!

দেবু কখন চলিয়া গিয়াছে। ন্যায়রত্ন চকিত হইয়া বলিলেন—এইখানেই তো ছিলেন মণ্ডলমশাই! (ক্রমশঃ)

রবি তর্পণ

শ্রীমানকুমারী বসু

দেব!
যুগযুগান্তের বৈশাখী আকাশে জাগিলা যখন তরুণ রবি,
কনক কিরণে হসিত অবনী, সোনালী ছটায় দীপিত সবি।
আগমনী গাহি কোকিল পাপিয়া মাতাইল দিক মধুর স্বনে,
সৌরভ মাখিয়া মলয় বাতাস দিগন্তে বহিল আনন্দ মনে।
ফুলে ফুলময়ী বসুধা রূপসী সরসে কমল খুলিল আঁখি,
শষ্পশিরে মণি মুকুতার মালা কে জানে কে যেন গিয়াছে রাখি।
লহরে লহরে স্বর্ণরেণু মাখা, জাহ্নবী ছুটিল জলধি পানে,
শুভাশীষ যেন পড়িছে উছলি জগতে দেবের করুণা দানে।
সেই পুণ্যমাসে সেই শুভক্ষণে তুমি উজলিলে মায়ের অঙ্ক
আনন্দে মঙ্গলে উঠিল বাজিয়া স্বরগে দুন্দুভি মরতে শঙ্খ
শুভ "ছয় রাত্রি" মার সনে ধাত্রী শিশুকোলে রহে যামিনী জাগি
বিধাতা পুরুষ লিখিবে ললাটে তাই দেব-দ্বিজ করুণা মাগি।
লিখিলা বিধাতা রাজটীকা ভালে লিখিলা প্রতিভা সর্ব্বতোমুখী
পরশ পরশে সোনা হবে মাটি সুকীর্ত্তি সুযশে সুভগ সুখী
অর্পিলা কিন্নর সুকণ্ঠ সঙ্গীত গন্ধর্ব্ব অর্পিলা মোহন বাঁশি,
কার্ত্তিকেয় দিলা শৌর্য্য তেজস্বিতা কন্দর্প
অর্পিলা রূপের রাশি।
হাসি বীণাপাণি অমর অমৃত, বীণাটার সাথে দিলেন করে,
সঁপিলা কমলা ধনরত্নসনে করুণা মমতা দুর্গত তরে
তাই—সবার বন্দিত নিখিল নন্দিত মধ্যাহ্নের সেই উজল রবি
আলোকে পুলকে দ্যুলোক ভূলোকে চমকিত চিত মোহিত সবি।
কবি কুলমণি রাজ রাজেশ্বর বঙ্গের আকাশে গৌরব সূর্য্য,
আমাদেরি মা'র অমূল্য রতন স্বদেশে বিদেশে বরেণ্য পূজ্য।
শান্তিনিকেতনে শান্তসৌম্য তুমি গড়িলে তাপস কতই শিষ্য
বিশ্ব-ভারতীর বিশ্বসেবাব্রত বিমুগ্ধ নয়নে হেরিলা বিশ্ব
এসেছিলে তুমি তাই ধন্য দেশ ধন্য মোরা আজি তোমার নামে,
বিরাজিছ তুমি অন্তরে বাহিরে কে বলে? গিয়েছ স্বরগ-ধামে
অনেক দিয়েছ অনেক পেয়েছ কৃতার্থ আমরা তোমারে স্মরি'
আজি দেব বেশে দাঁড়াও হে এসে নয়ন সলিলে তর্পণ করি।

কুল্যবাপের ভূমি-পরিমাণ

অধ্যাপক শ্রীদীনেশচন্দ্র সরকার এম-এ, পি-আর-এস, পিএচ-ডি

আজকাল বাংলা দেশে বিঘা, কাঠা, ছটাক প্রভৃতি ভূমিপরিমাণ বোধক শব্দগুলি সকলেরই পরিচিত। মুসলমান আমল হইতেই সরকারী কাগজপত্রে মৌলিক ভূমিমান হিসাবে বিঘার ব্যবহার চলিয়া আসিতেছে; ফলে বিঘার গৌরব যেরূপ উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতেছে, ভূমিমান-বোধক অনেক প্রাচীন শব্দ তেমনি বিঘাকে স্থান ছাড়িয়া দিয়া ধীরে ধীরে আত্মগোপন করিতেছে। কিন্তু বাংলা দেশের প্রাচীন তাম্রশাসনসমূহে বিঘা-কাঠার কোন উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। এদেশে আবিষ্কৃত গুপ্তযুগের শাসনাবলীতে যে সকল ভূমিপরিমাণ বোধক শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, উহাদের মধ্যে পাটক, কুল্যবাপ, দ্রোণবাপ এবং আঢ়বাপ উল্লেখযোগ্য। এইগুলির মধ্যে আবার কুল্যবাপ শব্দটির সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। আধুনিক একর কিংবা বিঘার ন্যায় সে যুগে কুল্যবাপ ভূমিপরিমাণের মূলস্থানীয় ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু এক কুল্যবাপের ভূমিপরিমাণ কত ছিল, এ পর্য্যন্ত কেহই তাহা স্থিররূপে নির্ণয় করিতে পারেন নাই।

বহুদিন পূর্ব্বে স্বর্গীয় পার্জ্জিটার সাহেব ফরিদপুর জেলায় আবিষ্কৃত ধর্ম্মাদিত্য ও গোপচন্দ্র নামক নৃপদ্বয়ের তাম্র শাসনসমূহ সম্পাদন করিতে গিয়া কুল্যবাপ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়াছিলেন। 'বাপ' শব্দটির অর্থ বীজবপন; সুতরাং তিনি সিদ্ধান্ত করেন যে এক কুল্য পরিমাণ বীজ যতটা ভূমিতে বপন করা যাইত, উহারই নাম ছিল কুল্যবাপ। বাংলা দেশের প্রধান শস্য ধান্য; অতএব এস্থলে এককুল্য পরিমাণ ধান্য বীজ বুঝিতে হইবে। আবার রঘুবংশ (৪।৩৭) হইতে জানা যায় যে প্রাচীনকালে এদেশে সাধারণতঃ ক্ষেত্রে ধানের চারা রোপণ করা হইত। এই কারণে পার্জ্জিটার স্থির করেন যে, যে-পরিমাণ ভূমিতে এককুল্য পরিমাণ ধানের চারা গাছ রোপণ করা যাইত, উহাকে কুল্যবাপ বলা হইত। এ পর্য্যন্ত সাহেবের যুক্তিতে আপত্তি করিবার মত কিছু নাই। কিন্তু পার্জ্জিটার সাহেব এককুল্য পরিমাণ ধান্যের ওজন জানিতেন না। তিনি একখানি অভিধানে দেখিয়াছিলেন যে আট দ্রোণে এক কুল্য হয়; দ্রোণের প্রকৃত অর্থ স্থির করিতে না পারিয়া তিনি সিদ্ধান্ত করিলেন যে এককুল্য ধান বড় বেশী ছিল না। আবার তৎসম্পাদিত শাসনসমূহে "অষ্টক-নবক-নলেনাপবিঞ্ছ্য" কথাটী দেখিয়া তাঁহার ধারণা হইল যে এক কুল্যবাপ জমির দৈর্ঘ্য ছিল নয় নল এবং প্রস্থ আট নল। তাঁহার বিবেচনায় এক নলের দৈর্ঘ্য আনুমানিক ষোল হাত এবং এক হাতের দৈর্ঘ্য আনুমানিক উনিশ ইঞ্চি ছিল। অতএব পার্জ্জিটারের মতে এক কুল্যবাপ জমি আধুনিক মাপের এক একর (কিঞ্চিদধিক তিন বিঘা) জমি অপেক্ষা সামান্য মাত্র বেশী ছিল। এস্থলে উল্লেখ করা যাইতে পারে, যে অপর একখানি তাম্রশাসনে কুল্যবাপের পরিমাপ সম্পর্কে "অষ্টক-নবক-নলেনাপবিঞ্ছ্য" কথার পরিবর্ত্তে "ষট্‌কনড়ৈরপবিঞ্ছ্য" কথাটী দেখিতে পাওয়া গিয়াছে।(১) পার্জ্জিটারের হিসাব অনুসারে বর্গ করিলে, এই স্থলে কুল্যবাপের ভূমিপরিমাণ প্রায় দেড় বিঘা হইয়া দাঁড়ায়। পরবর্ত্তী লেখকগণ সাধারণতঃ পার্জ্জিটারকে অনুসরণ করিয়াছেন।

ফরিদপুর জেলায় আবিষ্কৃত সমাচারদেব নামক অপর একজন নরপতির ঘুঘরাহাটী শাসন সম্পাদন করিতে গিয়া শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয় কুল্যবাপ সম্বন্ধে দুইটী নূতন কথা বলিতে চাহিয়াছেন। তাঁহার মতে কুল্যের অর্থ কুলা; সুতরাং একটা কুলাতে যতগুলি ধান ধরে, উহার বপন বা রোপণযোগ্য ভূমিই কুল্যবাপ; আর বিঘা অর্থে যে কুড়োবা শব্দের ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়, উহা কুল্যবাপ শব্দেরই অপভ্রংশ। সুতরাং দেখা যাইতেছে, যে পার্জ্জিটার সাহেব যে পরিমাণ ভূমিকে কুল্যবাপ বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন, ভট্টশালী মহাশয়ের কুল্যবাপ তাহার এক-তৃতীয়াংশ মাত্র। কিন্তু প্রবীণ ভট্টশালী মহাশয় লক্ষ্য করেন নাই, যে ফরিদপুরের তাম্রশাসনসমূহ অনুসারে এক কুল্যবাপ ভূমির মূল্য ছিল চার দীনার বা মোহর। গুপ্তযুগের লিপি হইতে জানা যায় যে সে যুগে বাংলা দেশে গুপ্ত সম্রাট্‌গণের স্বর্ণমুদ্রা দীনার ও রৌপ্যমুদ্রা রূপক নামে পরিচিত ছিল; আবার একটী স্বর্ণমুদ্রা ষোলটী রৌপ্য মুদ্রার সমান ছিল। সুতরাং এক কুল্যবাপ বাপক্ষেত্র বা আবাদী জমির দাম পড়িতেছে চৌষট্টি রৌপ্য মুদ্রা। এমন কি উত্তর বাংলার জেলা বিশেষে খিলক্ষেত্র বা পতিত জমিও দুই দীনার (বত্রিশ রূপক) ও তিন দীনার (আটচল্লিশ রূপক) মূল্যে বিক্রীত হইত। বর্ত্তমান মহাযুদ্ধের বাজারে দ্রব্যাদির দাম বাড়িয়াছে অর্থাৎ টাকার ক্রয়শক্তি অত্যন্ত কমিয়া গিয়াছে; কিন্তু এখনও ফরিদপুর জেলার সদর, গোয়ালন্দ ও গোপালগঞ্জ মহকুমায় ফরিদপুরের তাম্রশাসনগুলিতে যে অঞ্চলের ভূমির উল্লেখ করা হইয়াছে, এইরূপ মূল্য অত্যধিক বিবেচিত হইবে।

বর্ত্তমান যুগে শিল্পোন্নতির ফলে টাকার মূল্য কমিয়া গিয়াছে। কিন্তু যাঁহারা প্রাগ্‌ বৃটিশ যুগের দলিলপত্র ঘাঁটাঘাঁটি করিয়াছেন এবং আইন-ই-আকবরী নামক মুঘল আমলের সুবিখ্যাত গ্রন্থ পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারাই জানেন যে বৃটিশ রাজত্বের আরম্ভ পর্য্যন্ত টাকার ক্রয়শক্তি কত অধিক ছিল। আইন-ই-আকবরীতে প্রদত্ত হিসাবাদি হইতে মোরল্যাণ্ড সাহেব তাঁহার India at the Death of Akbar গ্রন্থে (p. 56) সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, যে বিগত ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দের হিসাবে অর্থাৎ প্রথম জার্ম্মান মহাযুদ্ধের পূর্ব্বেও আধুনিক টাকার ক্রয়শক্তি মুঘল সম্রাট্ আকবরের (১৫৫৬-১৬০৫ খ্রীষ্টাব্দ) সময়ের টাকার মাত্র ছয় ভাগের এক ভাগ দাঁড়াইয়াছিল, অর্থাৎ আকবরের সময়ের দশ টাকার মূল্য ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে প্রায় ষাট টাকার সমান ছিল। আমার কাছে ফরিদপুরের কতকগুলি পুরাণ দলিল আছে। উহা হইতে জানা যায়, যে এমন কি ৬০।৭০ বৎসর পূর্ব্বে আমার পিতামহের আমলে ফরিদপুরে এক বিঘা উৎকৃষ্ট আবাদী জমি ১০।১৫ টাকায় পাওয়া যাইত।(২) ভূমিজাত শস্যের মূল্যের সহিত

(১) আমি অন্যত্র এই কথাগুলির অর্থ আলোচনা করিতেছি।

(২) সম্প্রতি যুদ্ধের বাজারে পাটের মূল্যবৃদ্ধি হেতু জমির দাম বাড়িয়াছে। কিন্তু গত ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দেও আমি ফরিদপুর সহরের নিকটবর্ত্তী কোন গ্রামে প্রতি বিঘা ৩০৲ হিসাবে জমি জমা করিয়াছি। এই গ্রাম পাংসার নিকটবর্ত্তী ধুলট (তাম্রশাসনের ধ্রুবিলাটী) হইতে প্রায় ২৫ মাইল দক্ষিণে। ভট্টশালী মহাশয় কোটালীপাড়ার বিবরণ পাইলে খুশী হইবেন মনে করিয়া, আমি কোটালীপাড়া থানার অর্দ্ধমাইল দূরবর্ত্তী কাশাতলী গ্রামের স্বর্গীয় কবিরাজ রামদয়াল সেন মহাশয়ের পুত্র শ্রীযুক্ত ভবানীপ্রসাদ সেন মহাশয়ের নিকট হইতে ঐ অঞ্চলের ভূমিমূল্য যাহা জানিয়াছি, তাহাও লিখিলাম। সেন মহাশয় বলিলেন, যে কোটালীপাড়ে বিলা জমির বিঘা বর্ত্তমানে ২৫৲-৩০৲; যুদ্ধের পূর্ব্বে ছিল ১৫৲-২০৲; এবং ২৫।৩০ বৎসর পূর্ব্বে ছিল ১০৲। বিলডাঙ্গার জমি বর্ত্তমানে ৪০৲-৬০৲; যুদ্ধের পূর্ব্বে ৩০৲-৫০৲ এবং ২৫।৩০ বৎসর পূর্ব্বে ২০৲-৩০৲। ডাঙ্গাজমি বর্ত্তমানে ১০০৲; যুদ্ধের পূর্ব্বে ৭০৲-৮০৲ এবং ২৫।৩০ বৎসর পূর্ব্বে ৫০৲-৬০৲। ইহা হইতে গড় বাহির করা যাইতে পারে। কিন্তু তাহাতে কয়েকটী অসুবিধা আছে। প্রথমতঃ, যে গ্রামে কৃষকের সংখ্যা বেশী, সেখানে জমির যে দাম, ঐ গ্রামের ৩।৪ মাইল দূরের কোন কৃষকবিরল গ্রামে জমির দাম উহার অর্দ্ধেক দেখা যায়। দ্বিতীয়তঃ, জমির আষাঢ়মাসের (অর্থাৎ যখন কৃষকগণের অন্নকষ্ট উপস্থিত হয়) দাম

ভূমির মূল্যের সম্পর্ক আছে। যখন টাকায় আট মণ চাউল মিলিত, তখন জমির মূল্য যে এখনকার তুলনায় অনেক কম ছিল, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। প্রাচীন গুপ্তযুগের রৌপ্য মুদ্রার ক্রয়শক্তি মুঘল যুগের তুলনায় কম ছিল, এইরূপ সিদ্ধান্ত অসম্ভব; কারণ ফা-হিয়ান প্রমুখ চীন পরিব্রাজকগণের বিবরণে মগধ প্রভৃতি পূর্ব্বভারতীয় রাজ্যের সম্পর্কে যে আর্থনীতিক ইঙ্গিত পাওয়া যায়, তাহা ঐরূপ সিদ্ধান্তের বিরোধী। আমার বিবেচনায় কুল্যবাপের ভূমি পরিমাণ সম্পর্কে পার্জ্জিটার এবং তাঁহার অনুবর্ত্তিগণের সিদ্ধান্ত ভুল। কারণ গুপ্তযুগের চৌষট্টিটা রৌপ্য মুদ্রা কম পক্ষেও এখনকার পাঁচশত টাকার সমান ছিল এবং অত অধিক মূল্যে ক্রীত এক কুল্যবাপ ভূমির পরিমাণ এক একর বা এক বিঘা হইতে অবশ্যই অনেক অধিক ছিল।(৩) আসল কথা এই যে পূর্ব্বোক্ত প্রবীণ ব্যক্তিগণ এককুল্য ধান্য বীজের ওজন জানিতে চেষ্টা করেন নাই।

সংস্কৃত ভাষায় রচিত গ্রন্থাদি পাঠ করিলে এককুল্য ধান্যের ওজন জানা যায়। প্রায়শ্চিত্ততত্ত্বাদি রচয়িতা রঘুনন্দন, মনুস্মৃতির টীকাকার কুলূক ভট্ট (১৫শ শতাব্দী), শব্দকল্পদ্রুমের (মুষ্টি, পুষ্কল প্রভৃতি শব্দ দ্রষ্টব্য) সঙ্কলয়িতা প্রভৃতি বাঙ্গালী গ্রন্থকারগণ যে শস্য ওজন রীতির উল্লেখ করিয়াছেন, তদনুসারে "অষ্টমুষ্টির্ভবেৎ কুঞ্চি কুঞ্চয়োষ্টৌ চ পুষ্কলম্। পুষ্কলানি তু চত্বারি আঢ়কঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥ চতুরাঢকো ভবেদ্দ্রোণঃ" ইত্যাদি। অর্থাৎ ৮ মুষ্টিতে ১ কুঞ্চি; আট কুঞ্চিতে ১ পুষ্কল; ৪ পুষ্কলে ১ আঢ়ক, এবং ৪ আঢ়কে ১ দ্রোণ। মেদিনীকরের মতে এইরূপ ৮ দ্রোণে ১ কুল্য। শব্দকল্পদ্রুমের মতে এক আঢ়কে ব্যবহারিক ১৬ কিংবা ২০ সের। পঞ্চানন তর্করত্নমহাশয় মনুস্মৃতির বঙ্গানুবাদে "ধান্য-দ্রোণ" কথাটার অনুবাদে লিখিয়াছেন, "চারি আঢ়া বা এক দ্রোণ, অর্থাৎ প্রায় দুই মণ ধান্য"। এই হিসাবে এক দ্রোণ কমপক্ষেও আধুনিক ১ মণ ২৪ সের এবং কুল্য ১২ মণ ৩২ সেরের সমান ছিল। অবশ্য একথা স্বীকার্য্য, যে ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে শস্যাদি শুষ্ক দ্রব্য, ঘৃতাদি তরল দ্রব্য, বৈদ্যক ও স্বর্ণকারগণের মূল্যবান্ দ্রব্যাদির ওজনের জন্য বিভিন্ন মানের উল্লেখ দেখা যায়। এমন কি, একই শব্দ অনেক স্থলে বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হইত। কিন্তু লক্ষ্য করিতে হইবে, যে আমরা বাঙ্গালী গ্রন্থকারগণের মত অনুসরণ করিতেছি; এবং পূর্ব্বোক্ত ওজন প্রণালী অবশ্যই ধান্য সম্পর্কিত, কারণ মনুসংহিতার (৭।১২৬) উল্লিখিত "ধান্য দ্রোণ" কথার ব্যাখ্যা করিতে গিয়াই কুলূকভট্ট পূর্ব্বোল্লিখিত শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন। অতএব আমার বিবেচনায় ১২৮০ হইতে ১৬ মণ ধান্য বীজ যে পরিমাণ ভূমিতে বপন বা রোপণ করা যাইত, মূলতঃ উহারই নাম ছিল কুল্যবাপ।(৪)

যদি ৪ আঢ়কে ১ দ্রোণ এবং ৮ দ্রোণে এক কুল্য হয়, তবে অবশ্যই ৪ আঢ়কবাপ বা আঢ়বাপে ১ দ্রোণবাপ এবং ৮ দ্রোণবাপে ১ কুল্যবাপ হইবে। ইহা কেবল আমার আনুমানিক সিদ্ধান্ত নহে; প্রাচীন তাম্রশাসনে ইহার প্রমাণ আছে। পাহাড়পুরে আবিস্কৃত ১৫৯ গুপ্তাব্দের লিপিতে মোট জমির পরিমাণ "অধ্যর্দ্ধ-কুল্যবাপ" অর্থাৎ দেড় কুল্যবাপ লেখা হইয়াছে; কিন্তু সঙ্ক্ষেপতঃ অঙ্কে লেখা হইয়াছে "কু ১ দ্রো ৪" অর্থাৎ কুল্যবাপ ১ এবং দ্রোণবাপ ৪। সুতরাং ৮ দ্রোণবাপে ১ কুল্যবাপ সিদ্ধ হইতেছে। আবার ঐ লিপিতেই আড়াই দ্রোণবাপ বুঝাইতে বলা হইয়াছে "দ্রোণবাপদ্বয়মাঢ়বাপদ্বয়াধিকম্"। দুই আঢ়বাপে অর্দ্ধ দ্রোণবাপ; সুতরাং ৪ আঢ়বাপে ১ দ্রোণবাপ।

সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে আজিও বাংলাদেশের অনেক অঞ্চলে দ্রোণ এবং আঢ়া নামে দ্রোণবাপ এবং আঢ়বাপের ভূমিমান প্রচলিত আছে; কিন্তু পার্জ্জিটার এবং তদনুবর্ত্তিগণ উহার উল্লেখ করেন নাই। হাণ্টার সাহেবের সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ A Statistical Account of Bengal (প্রায় ৬৫ বৎসর পূর্ব্বে প্রকাশিত) পাঠ করিলে এই সম্পর্কে মূল্যবান্ তথ্য অবগত হওয়া যায়। অবশ্য এই দ্রোণ এবং আঢ়ার ভূমি পরিমাণ সর্ব্বত্র একরূপ নহে; তাহার কারণ এই, যে যে-নলে জমি মাপা হয় উহার দৈর্ঘ্য নানা পরগণায় নানা প্রকার দেখিতে পাওয়া যায়; আবার এক হাতের দৈর্ঘ্যও সকল পরগণায় সমান নহে। পুরাণ দলিলে প্রায়শঃ কোন নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তির হাতের মাপের উল্লেখ পাওয়া যায়। ঐরূপ বিভিন্ন ব্যক্তির হাতের মাপ সমান হইতে পারে না।

চট্টগ্রামে প্রচলিত দ্রোণের পরিমাণ কিঞ্চিন্ন্যূন ৭ একর অর্থাৎ প্রায় ২১ বিঘা। এই স্থানের হিসাবে ৩ ক্রান্তি = ১ কড়া; ৪ কড়া = ১ গণ্ডা; ২০ গণ্ডা = ১ কানী; এবং ১৬ কানী = ১ দ্রোণ। নোয়াখালী জেলার হিসাবে ২০ তিল = ১ কাগ; ৪ কাগ = ১ কড়া; ৪ কড়া = ১ গণ্ডা; ২০ গণ্ডা = ১ কানী; এবং ১৬ কানী = ১ দ্রোণ। কিন্তু নল এবং হাতের দৈর্ঘ্যের তারতম্য অনুসারে ভূমিপরিমাণ কমবেশী হইয়া থাকে। সাধারণতঃ ১৪ হাতের নল এবং ১৮ ইঞ্চির হাত প্রচলিত। তবে সন্দীপে হাতের দৈর্ঘ্য ২০½ ইঞ্চি এবং দ্রোণ কিঞ্চিদধিক ১০০ বিঘা। শায়েস্তানগর পরগণায় ২২ হাতের নল ব্যবহৃত হয় এবং এক দ্রোণের পরিমাণ কিঞ্চিদধিক ১৪৪ বিঘা দেখা যায়। কিন্তু আজকাল সরকারী ১৬ হাতের নল এবং ১৮ ইঞ্চির হাতের ব্যবহার একরূপ কায়েম হইয়া গিয়াছে; এই হিসাবে ৭৬ বিঘা জমিতে ১ দ্রোণ হয়। মৈমনসিংহ জেলার মৈমনসিংহ, সিন্ধা, দরজীবাজু, রায়দাম, সুসঙ্গ, হোসেনশাহী, নাসীর উজিয়াল, খালিয়াজুরী এবং বাউখণ্ড পরগণার হিসাবে ১৬ কাঠা = ১ আঢ়া এবং ১৬ আঢ়া = ১ পুরা। এস্থলে এক পুরার ভূমি পরিমাণ প্রায় পৌনে ছাব্বিশ একর; সুতরাং এক আঢ়া কিঞ্চিদধিক দেড় একর।

কার্ত্তিকমাসের (অর্থাৎ যখন পাট বেচিয়া কৃষক সাময়িকভাবে কিছু টাকা হাতে পায়) দামের তুলনায় অনেক কম (কোন কোন সময়ে অর্দ্ধেক বা এক তৃতীয়াংশ) দেখা যায়। এই সকল বিবেচনা করিয়া গড় করিলে দেখা যাইবে যে, বর্ত্তমান বৎসরেও ফরিদপুর সদর ও গোপালগঞ্জের এক বিঘা জমির গড় মূল্য ২০৲।২৫৲ টাকার অধিক নহে। তাম্রশাসনে সরকারী জমির কথা বলা হইয়াছে এবং এক জেলার সর্ব্বাঞ্চলের একটিমাত্র নির্দ্দিষ্ট মূল্যের উল্লেখ করা হইয়াছে। আমাদের হিসাবের স্বাভাবিক দাম অপেক্ষা ঐ সরকারী দাম অনেক কম থাকিতে বাধ্য। অবশ্য এখানে একটা কথা উঠিতে পারে যে আমাদের জমিগুলি সকর, আর তাম্রশাসনের উল্লিখিত জমিগুলি নিষ্কর ছিল। কিন্তু সেজন্য তাম্রশাসনে জমির মূল্য বৃদ্ধির কথা নাই; বরং আছে যে, যে-ব্যক্তি সদুদ্দেশ্যে উৎসর্গ করিবার জন্য জমি ক্রয় করিল, খাজনার বিনিময়ে রাজা উহার পুণ্যের ষষ্ঠাংশ লাভ করিবেন।

(৩) আমি এস্থলে গুপ্তরাজগণের, আকবরের এবং বর্ত্তমানকালের রৌপ্য মুদ্রার তুলনামূলক আলোচনা করিলাম না। কারণ মুদ্রাতত্ত্ববিদ্‌গণ স্বীকার করেন, যে প্রাচীন ভারতবর্ষে রৌপ্য দুর্লভ এবং দুর্ম্মূল্য ছিল।

(৪) শ্রীযুক্ত ভবানীপ্রসাদ সেন মহাশয়ের বিবরণ হইতে বুঝিতেছি যে ১ মণ ধান্যবীজ ছিটাইয়া বুনিলে ৩ বিঘাতে এবং রোপা লাগাইলে ১০ বিঘাতে বোনা যায়। রোপার হিসাব ধরিলে ১২৮০ হইতে ১৬ মণ ধান্যে ১৩০ বিঘা হইতে ১৬০ বিঘা জমি বোনা যায়। মূলতঃ এইরূপ ভূমিপরিমাণ থাকিতে পারে; কিন্তু পরবর্ত্তী কালে হাত ও নলের দৈর্ঘ্যের বিভিন্নতার ফলে ভূমিপরিমাণেও পার্থক্যের সৃষ্টি হইয়াছিল। অবশ্য এইরূপ হিসাবে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হইবার উপায় নাই; কারণ পরাশরের কৃষি সংগ্রহে দেখা যায় যে রোপা ক্ষেতে দুই পংক্তির মধ্যবর্ত্তী ফাঁক ছোট বড় হইত, সুতরাং ভূমিপরিমাণেও অবশ্যই কিছু কম বেশী হইত। বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে বিঘার ভূমি পরিমাণেও দ্রোণের অনুরূপ পার্থক্য দেখা যায়।

এই জেলার হাজরাদী, কাশীপুর, নওয়াবাদ, বাড়ীকান্দী, জোয়ার, হোসেনপুর, কুড়িখাই, তুলন্দর, বলরামপুর এবং ঈদঘর পরগণায় দ্রোণের মান প্রচলিত আছে। এস্থলে এক দ্রোণ কিঞ্চিদধিক সাড়ে পাঁচ একরের সমান। আবার নিকলী, জুয়ানশাহী এবং লতিফপুর অঞ্চলে যে দ্রোণ প্রচলিত, উহার পরিমাণ ১৬ কানী এবং ইংরাজী হিসাবে উহা প্রায় পৌনে সতর একরের সমান। বাংলা দেশের আরও কোন কোন অঞ্চলে দ্রোণের ভূমিমান প্রচলিত আছে। রঙ্গপুর জেলায় দ্রোণের আদিম ভূমিমান লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। (৫) হাণ্টারের গ্রন্থে ত্রিপুরা জেলায় প্রচলিত দ্রোণের কোন উল্লেখ নাই। যাহা হউক, পুর্ব্বোক্ত হিসাব এবং আলোচনা হইতে বোঝা যায় যে দ্রোণবাপের আদিম ভূমি পরিমাণ নিশ্চয়ই পাঁচ একর বা ১৫।১৬ বিঘার কম ছিল না। প্রকৃতপক্ষে তাম্রশাসনে উল্লেখিত দ্রোণবাপের পরিমাণ ইহা অপেক্ষা অনেক বেশী ছিল বলিয়াই বোধ হয়; কারণ কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র এবং উহার টীকা পড়িলে মনে হয়, যে যে-স্থলে ব্যবহারিক নলের দৈর্ঘ্য ৪ হাত মাত্র ছিল, সেখানেও দেবতা-ব্রাহ্মণাদিকে প্রদত্ত ভূমির পরিমাপের বেলায় ৮ হাতের নল ব্যবহৃত হইত। (৬) সুতরাং দ্রোণবাপের অষ্টগুণ যে কুল্যবাপ, উহার ভূমি পরিমাণ অন্ততঃ-পক্ষে ৪০।৪২ একর অর্থাৎ প্রায় ১২৫ বিঘার কম ছিল না। পাটকের ভূমিপরিমাণ ইহা অপেক্ষাও অধিক ছিল; কারণ গুণাইঘর লিপি হইতে জানা যায় যে এক পাটক ভূমি ৪০ দ্রোণবাপ বা ৫ কুল্যবাপের সমান ছিল। হেমচন্দ্রের অভিধানে পাটকের প্রতিশব্দ দেওয়া হইয়াছে গ্রামার্দ্ধ। বাংলা পাড়া কথাটী এই পাটক হইতে আসিয়াছে।

(৫) কিরূপে প্রাচীন দ্রোণবাপের উপর সরকারীবিঘার বিজয় নিশান উড়িয়াছে, এস্থলে তাহা পরিষ্কার বোঝা যায়; কারণ এস্থলে বিঘা এবং "দোন" সমার্থক। লোকেরা প্রাচীন মাপটীর মায়া ছাড়িয়াছে; কিন্তু নামটীর মায়া ছাড়িতে পারে নাই।

(৬) চট্টগ্রাম বিভাগে যে "সাঁই" কানী (দ্রোণের ষোড়শাংশ) নামক ভূমিমাপের প্রচলন আছে, উহা লক্ষ্য করিলে বোঝা যায় যে সাঁই কথাটী এস্থলে বৃহত্তর অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। "সাঁই" সংস্কৃত স্বামী শব্দের অপভ্রংশ। স্বামী অর্থ পণ্ডিত ব্রাহ্মণ; সুতরাং মনে হয় যে ব্রাহ্মণাদিকে প্রদত্ত জমি মাপিবার জন্যই "সাঁই" মাপের প্রয়োজন হইত।

যৌবন-মাথুর

কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায়

এ অঙ্গ লালিত্যহীন, দৃষ্টি হয়ে আসে ক্ষীণ,
খালিত্যে পালিত্যে ভরে শির,
ভ্রান্তি ঘটে প্রতি কাজে ক্লান্তি আসে কর্ম্ম মাঝে,
মতি আর রয়নাক স্থির।

নৈরাশ্যে হৃদয় ভরে শুধু দীর্ঘশ্বাস পড়ে
লইয়াছে বিদায় যৌবন,
শ্যাম গেছে মথুরায় প্রাণ করে হায় হায়,
অন্ধকার মোর বৃন্দাবন।

কুসুমে বসে না অলি পড়ে মধুধারা গলি,
যমুনা ধরে না কলতান।
গাহেনাক পিকপিকী নাচেনাক আর শিখী
শুকসারী গায়নাক গান।

যুগে যুগে দেশে দেশে যৌবন লীলার শেষে
মানবেরে করিয়া আতুর,
জীবনে জীবনে হায় উল্লাস মিলায়ে যায়
হানে বজ্র এমনি মাথুর।

শিথিল স্নেহের টান বন্ধুত্বের অবসান,
স্বপ্নবৎ প্রেম প্রেয়সীর,
অক্রুরের সাথে সাথে দাস্যভাবে সন্ধ্যাপ্রাতে
মন্দিরে প্রণত হয় শির।

জুতোর জয়

(নাটিকা)

অধ্যাপক শ্রীযামিনীমোহন কর

প্রথম অঙ্ক

তৃতীয় দৃশ্য

পার্ব্বত্য প্রদেশের স্যানিটোরিয়ামের বাগান। সামনে একটা বেঞ্চ পাতা রয়েছে। গায়ে শাল জড়িয়ে মীনাক্ষী ঢুকলেন

মীনাক্ষী। কই, এখনও তো কাউকে দেখছিনা। সাড়ে সাতটা বাজে। কতকগুলো বুড়ো, যাদের বাঁচবার কোন দরকার নেই, তারাই শুধু শরীর সারাবার জন্য ঘুরছে। ঐ যে—এইদিকেই আস্‌ছে। আমি যেন দেখতে পাইনি—

গান

কে এল মন মন্দিরে।
কোন অজানা, দিল যে হানা,
চেনা অচেনার সন্ধি রে॥
পথ ভুলে কোন সন্ধ্যা তারা
উঠ্‌ল ভোরে আপন হারা
অরুণ তপন, ছড়ায় কিরণ,
তোমার চরণ বন্দিরে॥
বাতাসে আজ কি সুর ভাসে,
উতল পরাণ কাহার আশে,
নূপুর ধ্বনি, হৃদয়ে রণি,
কোন অমরার ছন্দি রে॥

মীনাক্ষী গান গাইছেন, পিছন থেকে তপন ঢুক্‌লেন
গান শেষ হলে পর—

তপন। এই যে মীনা!

মীনাক্ষী। (কৃত্রিম চমকে উঠে) ওঃ তুমি! আমি একেবারে চম্‌কে উঠেছিলুম।

তপন। এখন আশ্বস্ত হয়েছ তো, যাক্‌। হ্যাঁ, তোমার বাবাকে আমার কথা বলেছিলে?

মীনাক্ষী। বল্‌বার চেষ্টা করেছিলুম। অতি সন্তর্পণে তোমার কথা পাড়ছি, এমন সময়—

তপন। কি?

মীনাক্ষী। বাবার ফিট্‌ হ'ল। সমস্তদিন বিছানায় শুয়ে কাটিয়ে দিলেন। বলা আর হ'ল না।

তপন। তিনি বড্ড তাড়াতাড়ি আপ্‌সেট হয়ে পড়েন। কারুর সঙ্গে কি কখনও দেখা করেন না?

মীনাক্ষী। করেন। কচিৎ কখন। তবে—

তপন। তবে আমার সঙ্গে দেখা করতে ওঁর এত আপত্তি কেন?

মীনাক্ষী। মানে—সত্যি কথা বলতে গেলে ব্যাপারটা হচ্ছে এই—অবশ্য আমি জানি তুমি কিছু মনে করবে না—বাবা বলেন, যে তোমাদের জুতোর ব্যবসা—যদিও আমি ওসব মানিনা—কিন্তু বাবার এরিস্টোক্র্যাসি সম্বন্ধে বড় সেকেলে ধারণা—

তপন। কিন্তু ব্যবসা করাটার মধ্যে দোষের কি আছে?

মীনাক্ষী। সে তো আমি জানি। বাবাকে বোঝাবার চেষ্টাও করছি। কিন্তু ঐ জুতো—(হাত ঘড়ি দেখে) আটটা বেজে গেছে। আমি যাই। দেরী হয়ে গেছে। এক্ষুণি বাবা আমার খোঁজ করবেন।

তপন। কিন্তু আমার কি করলে?

মীনাক্ষী। তুমি ভেবে চিন্তে একটা প্ল্যান ঠিক কর।

মীনাক্ষী চলে গেলেন। তপন সেইদিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন
পিছন দিক দিয়ে বিশ্বম্ভরবাবু ঢুকলেন

বিশ্বম্ভর। অয়স্কান্ত, অসি, আসু—(তপনকে দেখে) আরে, এ যে আমাদের তপনবাবু! নমস্কার। কুমার বাহাদুরকে দেখেছেন?

তপন। আমি আসবার সময় দেখলুম তিনি হোটেলের দরজাটাকে ক্রমাগত বন্ধ করছেন আর খুলছেন।

বিশ্বম্ভর। ঠিক হয়েছে। কাল রাত্রি দু'টোর সময় উঠে সে আমাকে বল্‌লে যে দরকার মত আপনা হতেই দরজা খোলা বন্ধর একটা প্ল্যান তার মাথায় এসেছে। অতি বুদ্ধিমান ছেলে। কিন্তু আমি তো সেখান দিয়ে এলুম। তাকে দেখ্‌তে পেলুম না তো।

তপন। আমি আধঘণ্টা আগেকার কথা বলছি।

বিশ্বম্ভর। (বাহিরে দেখে) ঐ যে ফিতে হাতে জমী মাপছে। এই দিকেই পিছু হাঁটতে হাঁটতে আসছে। আমাকে বোধহয় দেখতে পায় নি।

হোটেলের দিক থেকে পিছু হাঁটতে হাঁটতে কুমার বাহাদুরের প্রবেশ। হাফসার্ট আর ফুল প্যান্টপরা। হাতে মেজারিং টেপ

কুমার। (বাহিরের লোককে চেঁচিয়ে) পেছিয়ে, আর একটু পেছিয়ে যাও। ব্যস্‌! ঠিক হয়েছে। তুমি ঐ খানটায় একটা দাগ দাও। আমি এইখানটায় দিচ্ছি। (পকেট থেকে নোটবুক বার করে) ওধারটা ছিল সাড়ে তিপ্পান্ন গজ, আর এ ধারটা—

বিশ্বম্ভর। আসু, তোমায় আমি গরু খোঁজা কর্‌ছি—

কুমার। দাঁড়াও মামা। এখন ডিস্টার্ব কোরো না। একটা চমৎকার প্ল্যান মাথায় এসেছে—

বিশ্বম্ভর। কিন্তু কাজটা খুব জরুরী—

কুমার। এক মিনিট। এ দিকটা হ'ল গিয়ে উনআশী গজ। (হিসেব করে) হবে। নিশ্চয়ই হবে। হতেই হবে। মামা, এই হোটেলটাকে যেখানে সেখানে ইচ্ছামত ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়াবার একটা প্ল্যান মাথায় এসেছে।

বিশ্বম্ভর। সেটা বাবা পরে হবে, কিন্তু বংশীবদন বলছিল শেয়ারের কমিশনটা না বাড়ালে—

কুমার। বেশ তো। (হঠাৎ তপনকে দেখে) অ্যাঁ! মিস্টার বোস না? নমস্কার। শেয়ার নিচ্ছেন কবে? আমি শীগ্‌গিরই একটা পেটেণ্ট নেব মনে করছি। তাতে আপনা হতেই খোলবার সময় জুতোর হাঁ'টা বড় হয়ে যাবে, আবার পরা হয়ে গেলেই হাঁ বন্ধ হয়ে যাবে। শেয়ার হোল্ডারদের ১২½% অফ্ দেওয়া হবে। (বিশ্বম্ভরের প্রতি) হাঁা, কি বলছিলুম মামা, এই হোটেলে পদ্মলোচন পাল বলে কে এক বুড়ো ভদ্রলোক এসেছেন। কনফার্মড্ ইনভ্যালিড। তাকে আমাদের কোম্পানীর কিছু শেয়ার গছাতে হবে।

বিশ্বম্ভর। নিশ্চয়ই। কিন্তু প্রথমে তাঁর সঙ্গে আলাপ করা দরকার।

তপন। আপনারা পদ্মলোচন পালের সঙ্গে আলাপ করতে চান?

বিশ্বম্ভর। হ্যাঁ—কেন?

তপন। আমি চেষ্টা করতে পারি।

বিশ্বম্ভর। বেশ তো। কত কমিশন?

তপন। কমিশন কিসের?

কুমার। ইণ্ট্রোডাক্‌শান, সেল্‌সম্যানশিপের একটা অংশ। সেইজন্য বল্‌ছিলুম কত কমিশনে—

তপন। না, না, এমনি—

বিশ্বম্ভর। ধন্যবাদ।

কুমার। হ্যাঁ তপনবাবু, আপনি মাথায় কি মাখেন?

তপন। মাথায়!

কুমার। চুলে।

তপন। ওঃ! তেল।

বিশ্বম্ভর। কি তেল? সেইটাইতো আমরা জানতে চাই।

তপন। নারিকেল তেল।

কুমার। তা আগেই বুঝতে পেরেছিলুম। (হঠাৎ তপনের চুল টেনে) এই দেখুন, মাথায় কত ময়লা, মরামাস আর দুর্গন্ধ। আমাদের কোকো-পামো-তিলো-ক্যাস্ট্রো-লাইমজুসো-গ্লিসারিনো—হিমসাগর—মহাভৃঙ্গরাজ তৈল মেখে দেখবেন। শীঘ্রই মার্কেটে ছাড়ব।

বিশ্বম্ভর। ক্যাশ নিলে টেন পার্সেণ্ট কম।

কুমার। আর যদি গ্রোস হিসেবে নেন তো হোলসেল রেটের স্পেশাল কমিশন। শেয়ার হোল্ডারদের ২৫% অফ—

বলতে বলতে বিশ্বম্ভর ও কুমার বাহাদুরের প্রস্থান। অন্যদিক দিয়ে তপন চলে গেলেন। একটু পরে ইনভ্যালিড চেয়ারে পদ্মলোচনকে ঠেলতে ঠেলতে ভূপেনের প্রবেশ। সঙ্গে একজন চাকর। তার হাতে ফোল্ডিং টেবিল ও ওষুধের বাক্স।

পদ্মলোচন। আস্তে! আস্তে!! কি বিপদ!!! আর একটু হলে আমায় চেয়ার শুদ্ধ উল্টেছিলে আর কি। ইনভ্যালিড মানুষকে সাবধানে ঠেলতে হয় জান না? নাও, টেবিলের ওপর ওষুধগুলো সাজিয়ে ফেল।

চাকর টেবিল পেতে দিয়ে চলে গেল। ভূপেন ব্যাগ থেকে ওষুধ বার করে টেবিলের ওপর সাজাতে লাগল। মীনাক্ষীর প্রবেশ

মীনাক্ষী। বাবা, আজ কেমন আছ?

পদ্মলোচন। মীনা, কতকগুলো অর্থহীন কথা বলে কোন লাভ আছে কি? কোনদিন আমি ভাল থাকি যে আজ থাকব? কি বিপদ! তোমার এখনও ওষুধ সাজানো হ'ল না। নাও, আমাকে ধরে এই বেঞ্চটায় বসিয়ে দাও।

ভূপেন। আজ্ঞে দিই।

ভূপেন ও মীনাক্ষী ধরাধরি করে পদ্মলোচনকে বেঞ্চে বসিয়ে দিলেন

মীনাক্ষী। তবু অন্য দিনের চেয়ে আজ কি একটু ভাল বোধ করছ?

পদ্মলোচন। মীনা, আমায় ব্যতিব্যস্ত কোরো না। আমার হার্ট দুর্ব্বল, লাঙ্গস্ খারাপ, ব্রেন ফ্যাগ্‌ড্, নার্ভস্ একেবারে শ্যাটার্ড হয়ে গেছে। কোনদিন আমায় "আজকে একটু ভাল আছি" বল্‌তে শুনেছ?

মীনাক্ষী। কিন্তু ওরই মধ্যে—

পদ্মলোচন। কি বিপদ! তুমি কি আমায় মেরে ফেলতে চাও মীনা। ডাক্তার আমাকে কমপ্লীট রেস্ট নিতে বলেছে—আর তুমি—উহুঁহুঁ, ভূপেন, কম্বল—ঠাণ্ডা লেগে যাচ্ছে যে।

ভূপেন। আজ্ঞে এই কালোটা দেব?

চেয়ার থেকে একটা কম্বল তুলে দেখালে

পদ্মলোচন। কি বিপদ! ভূপেন তোমার কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে? বলিনি এ কম্বলটা বরফ পড়লে ঢাকা দিতে। এখন টেম্পারেচার কত?

ভূপেন। (চেয়ারে আঁটা থার্মোমিটার দেখে) চল্লিশ ডিগ্রী।

পদ্মলোচন। তবে? ঐ লালটা—মীডিয়ামটা দাও।

ভূপেন কম্বল পায়ে ঢাকা দিয়ে দিল

ভূপেন। ঠিক হয়েছে?

পদ্মলোচন। হুঁ। এইবার যেতে পার। আমাকে বাগানে ঘোরাবার সময়টা মনে থাকে যেন। দেরী না হয়, বুঝ্‌লে?

ভূপেন। আজ্ঞে হ্যাঁ।

ভূপেনের প্রস্থান

মীনাক্ষী। বাবা—

কুমার। নমস্কার। আপনার ইনভ্যালিড চেয়ারটা গেছে যে!

কুমারবাহাদুর চেয়ারে ধাক্কা দিলেন

পদ্মলোচন। উহুহু, গেছি, গেছি—কুমার বাহাদুর কিছু মনে করবেন না। শরীরটা খারাপ কিনা। আমার রোগের ক্রমবিকাশের একটা সিনপ্‌সিস করেছি। দেখলে আপনি নিশ্চয়ই খুব ইণ্টারেস্টেড ফীল করবেন।

কুমার। বইয়ের আকারে আমরা পাবলিশও করতে পারি। ৪০% রয়েলটী আপনাকে দিতে রাজী আছি। তবে ছাপাবার আর বিজ্ঞাপনের খরচ আপনাকে অ্যাডভান্স করতে হবে।

পদ্মলোচন। মীনা, যাও তো মা, কুমার বাহাদুরকে ছবিগুলো দেখাও। আর একটু চায়ের বন্দোবস্ত—

মীনাক্ষী। হ্যাঁ বাবা, যাই।

মীনাক্ষী ও কুমার বাহাদুরের প্রস্থান। তপনের রাগতভাবে পশ্চাদনুসরণ

বিশ্বম্ভর। আপনার সঙ্গে আলাপ করবার জন্য আমরা বিশেষ উৎসুক হয়েছিলুম।

পদ্মলোচন। ধন্যবাদ। মোস্ট কাইণ্ড অফ ইউ। আমার এই শরীরের জন্য একেবারে লোক সমাজের বাইরে চলে গেছি। আপনারা কি এখানে আরও কিছুদিন থাকবেন?

বিশ্বম্ভর। যতদিন ব্যবসার জন্য আটকে থাকতে হয়।

পদ্মলোচন। ব্যবসা?

বিশ্বম্ভর। আজ্ঞে হ্যাঁ। আমরা লোকজনের সঙ্গে আলাপ পরিচয় মেলামেশা যা কিছু করি সবই ব্যবসার প্রসারের জন্য।

পদ্মলোচন। কি বলছেন, কিছুই বুঝতে পাচ্ছি না।

বিশ্বম্ভর। কেন? জানেন না আমাদের কোম্পানী—

পদ্মলোচন। আপনাদের কোম্পানী!

বিশ্বম্ভর। হ্যাঁ। নাম শোনেন নি? মামা ভাগনে অ্যাণ্ড কোম্পানী, জেনারাল অর্ডার সাপ্লায়ার্স সিণ্ডিকেট। এখনও খুলিনি কিন্তু শীগ্‌গিরই খুলব।

পদ্মলোচন। ও!

বিশ্বম্ভর। আমাদের কে না চেনে? এ রকম অ্যাম্বিশাস্ স্কীম আর কেউ ভারতে কখনও ভাবেনি।

পদ্মলোচন। কিন্তু ব্যবসা—

বিশ্বম্ভর। আজকালকার ফ্যাশানই হ'ল ব্যবসা আর কোটেশন।

পদ্মলোচন। কোটেশন? কিসের থেকে? শেক্সপীয়ার, মিণ্টন, রবীন্দ্রনাথ—

বিশ্বম্ভর। না, না, সে সব সেকেলে হয়ে গেছে। আজ কাল কোটেশান বলতে বুঝোয় শেয়ার মার্কেট।

পদ্মলোচন। কিন্তু আপনাদের এসব কাজ খুব কষ্টকর মনে হয় না?

বিশ্বম্ভর। ও ডিয়ার, নো। আমাদের শরীর ভালই আছে। আর আসল জিনিষ হ'ল সিলভার টনিক। আমাদের সিণ্ডিকেটের শেয়ার বিক্রী করে বেশ দু' পয়সা আসছে। আপনাকে এখুনি একটা প্রস্পেক্টাস এনে দিচ্ছি।

প্রস্থান

পদ্মলোচন। উঃ! কি বিপদ! মীনার সঙ্গে কুমার বাহাদুরের আলাপ করিয়ে দেওয়াটাই অন্যায় হয়েছে।

ভূপেনের প্রবেশ

ভূপেন। ন'টা পঁয়তাল্লিশ। এবার আপনার দ্বিতীয় পাকের সময়।

পদ্মলোচন। হ্যাঁ, চল। আর দেখ, মীনাকে দেখতে পেলেই ডাকবে।

ভূপেন। আজ্ঞে হ্যাঁ।

চেয়ার ঠেলতে ঠেলতে ভূপেনের প্রস্থান। একটু পরে অপর দিক দিয়ে মীনাক্ষীর প্রবেশ

মীনাক্ষী। বাবা, বাবা—কই এখানে নেই তো। মুস্কিলে পড়া গেল। কোথাকার কে কুমার বাহাদুর—তাকে ছবি দেখাও, চা দাও—

পিছন পিছন কুমার বাহাদুরের প্রবেশ

কুমার। এই যে মিস্ পাল, আপনি হঠাৎ উঠে চলে এলেন কেন? কয়েকটা দরকারী কথা ছিল যে। আসুন, এই বেঞ্চে বসা যাক্। দেখুন, এই বেঞ্চে কাঠ আর লোহা ব্যবহার করা হয়েছে। রোদে জলে কাঠ পচবে, লোহায় মরচে ধরবে। আমি এক রকম নতুন "রাস্ট প্রুফ কেমিক্যাল মেটেলে"র বেঞ্চ বার করব। অর্ডিনারি বাগানে রাখবার মত সাইজের দাম পড়বে গিয়ে আঠারো টাকা সাড়ে সাত আনা। ডজন হিসেবে কিনলে ১২॥০% বাদ।

মীনাক্ষী। আপনি তো পৃথিবীর সব জিনিষই প্রায় ইমপ্রুভ করবেন ঠিক করেছেন। প্যারাসল থেকে আরম্ভ করে বাগানের বেঞ্চ অবধি। আর সব মুখস্ত, এমন কি দাম পর্য্যন্ত। আপনার অদ্ভুত স্মরণ শক্তি তো।

কুমার। ধন্যবাদ। হ্যাঁ—দেখুন, আপনি খুব ইণ্টেলিজেণ্ট। আপনাকে আমি—কিছু মনে করবেন না, এ স্রেফ বিজিনেসের দিক থেকে বলছি, অবশ্য আপনার যদি আপত্তি না থাকে—পার্টনার করতে চাই।

মীনাক্ষী। পার্টনার! কিসের?

কুমার। আমার ব্যবসার আর জীবনের। অবশ্য এভাবে—

মীনাক্ষী। আমার আগে থেকে—

কুমার। ও, সব ঠিক হয়ে গেছে। ভালই, অতি

উত্তম। ব্যবসায়ে কণ্ট্র্যাক্টের সম্মান রাখা খুব বড় জিনিষ। যদি আপনার আগে থেকে কণ্ট্যাক্ট হয়ে গিয়ে থাকে সেটা নিশ্চয়ই রাখবেন। আমি একটা অফার দিলুম মাত্র। আপনার সুবিধা হয় গ্রহণ করবেন, না হয় রিজেক্ট করে দেবেন।

পদ্মলোচনকে ঠেলতে ঠেলতে ভুপেনের প্রবেশ

পদ্মলোচন। এই যে মীনা! যাও তো মা, চট করে আমার ক্রিনস্থেনিলের শিশিটা নিয়ে এস।

মীনাক্ষী। আনছি বাবা।

মীনাক্ষীর প্রস্থান

কুমার। ক্রিনস্থেনিল? ওল্ড ফ্যাশাণ্ড! ওর চেয়ে ভাল ওষুধের সোল এজেন্সী আমাদের নেবার কথা আছে। সিণ্ডিকেটের শেয়ার হোল্ডাররা হাফপ্রাইসে পাবেন।

বিশ্বম্ভরের প্রবেশ

বিশ্বম্ভর। বাবা আসুন, মিস্টার পালকে আমরা যে "আইডিন স্যানিটারী আণ্ডার উইয়ার" বার করব, তার সম্বন্ধে কিছু বল।

কুমার। এই যে! মামা লেখ, আমি চট্ করে মাপটা নিয়ে ফেলি।

পকেট থেকে মেজারিং টেপ বার করে পদ্মলোচনকে মাপতে লাগলেন

চেস্ট আট চল্লিশ—

বিশ্বম্ভর। (নোট বইয়ে লিখতে লিখতে) চেস্ট আট চল্লিশ—

কুমার। ভুঁড়ি একশো পঁচিশ—

পদ্মলোচন। (চমকে) একশো পঁচিশ!

কুমার। সরি, চেয়ার শুদ্ধ মেপে ফেলেছিলুম। চুয়ান্ন—

বিশ্বম্ভর। চুয়ান্ন।

কুমার। গলা সতেরো—

বিশ্বম্ভর। সতেরো।

কুমার। ছাব্বিশ, আটাশ, বত্রিশ—

বিশ্বম্ভর। ছাব্বিশ, আটাশ, বত্রিশ।

কুমার। প্রস্পেক্টাস আপনাকে ছাপা হলে পাঠিয়ে দেব। জগৎকে আমরা চমকে দিতে চাই। ব্যবসা ক্ষেত্রে এমন নূতনত্ব আনব যে যুগান্তর ঘটে যাবে।

শিশি ও জল নিয়ে মীনাক্ষীর প্রবেশ

মীনাক্ষী। এই যে বাবা তোমার ওষুধ।

পদ্মলোচন। দাও। (ওষুধ খেয়ে) উঃ, কি ভয়ানক মাথা ঘুরছে। আজ একটা অনর্থ হয়ে যাবে। এমন শক্ অনেক দিন পাইনি। কি বিপদ! এই যদি রাজা-রাজড়াদের অবস্থা হয় তবে পায়ের ওপর পা দিয়ে বসে খাবে কারা?

বিশ্বম্ভর। লোকের অভাব হবে না। পরের স্কন্ধে বসে খাবার লোক এখনও পৃথিবীতে অনেক আছে। যাদের মান ইজ্জত নেই, চক্ষুলজ্জা নেই—হ্যাঁ অয়স্কান্ত, পদ্মলোচন-বাবুকে আমাদের শেয়ার সার্টিফিকেটের ফর্ম্ম—

কুমার। হ্যাঁ, হ্যাঁ। বটেই তো, বটেই তো! মিস্টার পাল, আমরা এখুনি আসছি—

কুমার বাহাদুর ও বিশ্বম্ভরবাবুর প্রস্থান

পদ্মলোচন। গেছে? উঃ, বাঁচা গেল! মীনা, এই তোমার কুমার বাহাদুর! কি বিপদ! অনেকক্ষণ তো তোমার সঙ্গে বক্‌বক্ করছিল। কি বললে?

মীনাক্ষী। এই সব, মানে—উনি বলছিলেন—

পদ্মলোচন। বলছিলেন! যা ভয় করেছিলুম তাই। উত্তরে তুমি কি বল্‌লে?

মীনাক্ষী। বললুম, বাবা যা বলবেন—

পদ্মলোচন। কি বিপদ! বাবা কিসের কি বল্‌বেন?

মীনাক্ষী। উনি বল্‌ছিলেন, আমায় পার্টনার করতে চান—

পদ্মলোচন। পার্টনার! কিসের?

মীনাক্ষী। ব্যবসার এবং জীবনের।

পদ্মলোচন। কি বিপদ! সারলে দেখছি। মীনা, এখুনি সরকার মশাইকে একটা টেলিগ্রাম করে দাও। আমরা আজই কলকাতায় ফিরে যাব। পাহাড়ে বেড়াতে এসে একি কর্ম্মভোগ, বিড়ম্বনা। আবার বলে কিনা শেয়ার কিনতে হবে। উহুহু—শীত করছে, হাত পা কাঁপছে, গা দিয়ে দরদর করে ঘাম বেরোচ্ছে। যে কোন মুহূর্ত্তে হার্টফেল অথবা কোল্যাপ্স করতে পারি। কি বিপদ! ভুপেন, দাঁড়িয়ে দেখছ কি? এই কি দাঁড়িয়ে থাকবার সময়। এক্ষুণি ওরা শেয়ার সার্টিফিকেটের ফর্ম্ম নিয়ে এসে পড়বে। তাড়াতাড়ি এখান থেকে ঠেলে নিয়ে চল—

পদ্মলোচনকে ঠেলতে ঠেলতে মীনাক্ষী ও ভুপেনের প্রস্থান

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

পদ্মলোচনের বাড়ী। পদ্মলোচন ও ননীবালা কথা কইচেন

পদ্মলোচন। বুঝলে ননী, আমি আর বাঁচব না। আমার শরীর ক্রমেই খারাপ হয়ে আসছে। তার ওপর মেয়েটার এই অবস্থা। আমি ভারী মুস্কিলে পড়েছি। কি যে করি—

ননীবালা। এই তো সেদিন পাহাড় থেকে ঘুরে এলেন।

পদ্মলোচন। তা তো এলুম, কিন্তু শরীর সারল কই? কি বিপদ! ভুপেন কোথায় গেল? ন'টা পাঁচ। আমার এক দাগ ওষুধ খাবার সময় হ'ল।

ননীবালা। আমি দিচ্ছি। কোন ওষুধটা বলুন ?

পদ্মলোচন। ঐ যে লাল রঙের। তাড়াতাড়ি কর। সময় যে উত্তীর্ণ হয়ে গেল।

ননীবালা ওষুধ দিলেন। পদ্মলোচন খেলেন

ননীবালা। একটু জল দেব ?

পদ্মলোচন। না, না, তাহলে পেটে গিয়ে ওষুধ ডাইলিউট হয়ে যাবে। অ্যাকশন্ কমে যাবে। হ্যাঁ, কি বলছিলুম—একবার টেম্পারেচারটা দেখবে ?

ননীবালা। (কপালে হাত দিয়ে) গা তো ঠাণ্ডাই মনে হচ্ছে—

পদ্মলোচন। কি বিপদ ! ননী, গায়ে হাত দিয়ে কি সবসময় জ্বর টের পাওয়া যায়। আমার এ ঘুষঘুষে জ্বর। থার্মোমিটার দিলেই উঠবে।

ননীবালা থার্মোমিটার দিলেন। পদ্মলোচন মুখে নিলেন

ননীবালা। পাহাড় থেকে ঘুরে এসেও যখন আপনার শরীর সারল না, তখন আমার মনে হয়, বড় বড় ডাক্তারদের কনসাল্ট করা উচিত। আপনার জন্য আমার যা ভাবনা হয়েছে। দিদি মারা যাবার পর থেকে বলতে গেলে আপনিই মীনার বাপ মা দুই। মার অভাব কোনদিন সে বুঝতে পারেনি। আপনি গেলে বেচারী—উঃ ! ভাবতেও কষ্ট হয়। নিন্, আধ মিনিট হয়ে গেছে।

পদ্মলোচন। (থার্মোমিটার দেখে) কি বিপদ ! ভূপেনকে বলেছিলুম আর একটা থার্মোমিটার কিনে আনতে—

ননীবালা। কেন ? এটা কি ভাঙ্গা ?

পদ্মলোচন। ভাঙ্গা না হলেও খারাপ। দেখছ', টেম্পারেচার উঠেছে মাত্র নাইন্টি এইট্। অথচ আমার যা শরীরের অবস্থা তাতে কম করেও ওঠা উচিত ছিল একশো এক।

ননীবালা। (থার্মোমিটার রেখে দিয়ে) আজই আর একটা কিনে আনতে পাঠাব।

পদ্মলোচন। ভাগ্যে তুমি ছিলে ননী, তাই এখনও বেঁচে আছি। নইলে আমার কি যে হ'ত ! একে আমার এই অবস্থা—তারপর আবার মেয়েটার অসুখ। তবু তো অমিতা এসে মধ্যে মধ্যে মীনাকে দেখে যায়। মেয়েটী বড় ভাল।

ননীবালা। মেয়ে জামাই দু'জনেই খুব ভাল।

পদ্মলোচন। মীনা বেচারী একলা পড়ে গেছে, তায় আমার শরীর খারাপ। আমাকে খুব ভালবাসে কিনা সেইজন্য বড় মন-মরা হয়ে গেছে। বুঝ্লে ননী, আমার আর বাঁচতে ইচ্ছে নেই।

ননীবালা। এসব কি বাজে কথা বলছেন পাল মশাই।

পদ্মলোচন। না, না, সত্যিই। এ রকম শরীর নিয়ে বেঁচে থেকে কি লাভ। শুধু সকলকে ভোগান। কিন্তু ভাবনা এই মেয়েটার জন্য। কি বিপদ ! ভূপেন, ভূপেন—

ননীবালা। কি হ'ল ? আমায় বলুন না।

পদ্মলোচন। তোমায় বড্ড কষ্ট দিচ্ছি ননী। স্মেলিং-সল্টের শিশিটা—

ননীবালা। এতে আর কষ্ট কিসের।

শিশিটা দিলেন

পদ্মলোচন। (শুঁকতে শুঁকতে) দেখ ননী, এই জীবনটা অতি অদ্ভুত ব্যাপার। একজন পৌরাণিক দার্শনিক যথার্থই বলেছেন যে দুঃখ কখনও একলা আসে না। এই ধর, তোমার বোন—তিনি আজ মৃতা।

ননীবালা। আহা, সতী সাধ্বী স্বর্গে গেছে—

পদ্মলোচন। সে আজ পরলোকে। তার অভাব আজ বড় বেশী করে বুকে বাজছে। তবু তুমি আছ বলে—(দীর্ঘনিঃশ্বাস) ভগবান আমাদের অনেকগুলি সন্তান দিয়েছিলেন, কিন্তু একে একে আবার সব নিয়ে নিয়েছেন। শুধু এই একটী মাত্র কন্যায় দাঁড়িয়েছে। তাকে নিয়ে আমার এই বুড়ো বয়সে বিপদ দেখ'—

ননীবালা। আপনি তো বুড়ো নন। এখন পঞ্চাশও পেরোয় নি। তবে মীনার জন্য আপনার চিন্তা হওয়াটা স্বাভাবিক।

পদ্মলোচন। একে আমার শরীরের এই অবস্থা, তার ওপর মেয়েটা দিন দিন শুকিয়ে যাচ্ছে—অথচ কোন রোগই ধরা পড়ছে না, এতে মানুষের ভাবনা হয় কিনা ব'ল ? পাহাড়ে গিয়েও কোন উপকার হ'ল না।

ননীবালা। হয়ত' কোন মানসিক রোগ—

পদ্মলোচন। রোগ আবার মানসিক কিসের ? ইচ্ছে করলেই কি মানুষের রোগ হয় না কি ? উহু, কি বিপদ ! সাড়ে ন'টা বেজে গেল। আমার যে এখন বাথটাবে শোবার কথা। ভূপেন, ভূপেন—

ভূপেনের প্রবেশ

ভূপেন। আজ্ঞে আমায় ডাকছিলেন ?

পদ্মলোচন। কি বিপদ ! সে কথা আবার জিজ্ঞেস করছ ? জান, সাড়ে ন'টা বেজে গেছে—

ভূপেন। আজ্ঞে হ্যাঁ। আমি নিজেই আসছিলুম—

পদ্মলোচন। ঐ দেখ ননী, মেয়ে আমার এই দিকেই আসছে। দেখছ, খালি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলছে আর আকাশের দিকে চাইছে। কি বিপদ ! ভূপেন, এখনও দাঁড়িয়ে রয়েছ—

ভূপেন। আজ্ঞে, আপনি কথা কইছিলেন—

পদ্মলোচন। তুমি কি আমায় মেরে ফেলতে চাও। জান, ডাক্তার বলেছে সময়ের নড়চড় যেন না হয়। নাও ধর—

ভূপেনের কাঁধে হাত দিয়ে পদ্মলোচন উঠে দাঁড়ালেন

কি বিপদ! অত তাড়াতাড়ি করছ কেন? লাগবে যে! এমন কি হার্টফেলও হয়ে যেতে পারে। পাহাড় থেকে বেশ সেরে এসেছিলুম। এখানে এসে আবার—কি বিপদ! আস্তে, ভূপেন আস্তে—

ভূপেনের কাঁধে ভর দিয়ে পদ্মলোচনের প্রস্থান। বিপরীত দিক দিয়ে অন্যমনস্কভাবে মীনাক্ষীর প্রবেশ

ননীবালা। মীনা, মা—

মীনাক্ষী। (চমকে) অ্যাঁ, মাসীমা—

ননীবালা। তোমার কি শরীর খারাপ হয়েছে মা?

মীনাক্ষী। কই, না তো।

ননীবালা। তবে সব সময়েই এমন উদাসভাব কেন?

মীনাক্ষী। (জোর করে হেসে) না, না।

ননীবালা। তোমার জন্য আমরা সকলেই বিশেষ চিন্তিত। এই রকম বিষণ্ণ হয়ে থাকবার কারণ জানলে আমরা তা দূর করবার চেষ্টা করি।

মীনাক্ষী। না মাসীমা, কিছু তো হয় নি।

ভূপেনের প্রবেশ

ভূপেন। মাসীমা, বাবু আপনাকে একবার ডাকছেন।

ননীবালা। কোন ওষুধপত্তর কিছু চাইলেন।

ভূপেন। আজ্ঞে না, শুধু ডেকে আনতে বললেন।

ননীবালা। বেশ, চল।

ভূপেন ও ননীবালার প্রস্থান

জানালা দিয়ে বাহিরের দিকে চেয়ে মীনাক্ষী গান গাইতে লাগলেন

গান

আমার, মনের গোপন কথা।
কহিতে না পারি, গুমরিয়া মরি
সহিয়া মরম ব্যথা॥
আঁধার গহিন রাতে,
নিদ নাহি আঁখি পাতে,
স্তব্ধ নিশিতে, উদাসী চাঁদেরে
বলি নিজ আকুলতা॥
ফুলেরে শুধায়, মলয় বাতাস,
কেন কাঁদ তুমি বল'না।
ফুল কেঁদে কয়, হেসে চলে যায়,
ভ্রমর করিয়া ছলনা॥
যারে জীবনে যাতনা পাওয়া,
তারি তরে তত চাওয়া,
ভালবাসা শুধু, নয়নের জল,
বুকভরা বিফলতা॥

অমিতার প্রবেশ

অমিতা। তুই এখানে? আমি সমস্ত বাড়ীময় তোকে খুঁজে বেড়াচ্ছি! কি করছিস?

মীনাক্ষী। এমনি দাঁড়িয়ে ছিলুম।

অমিতা। এইরকম করে থাকলে যে শরীরটা একেবারে নষ্ট হয়ে যাবে।

মীনাক্ষী। কি রকব?

অমিতা। সবসময় মন-মরা হয়ে থাকা—

মীনাক্ষী। কই?

অমিতা। হ্যাঁরে, আমার চোখে তুই ধুলো দিতে চাস মীনা।

মীনাক্ষী। সত্যি ভাই, তোমরা ভুল বুঝেছ।

অমিতা। মিথ্যে কথা বলিস্ নি। কি হয়েছে কাউকে জানাবি না আর সকলকে ভাবিয়ে মারবি—এটা তোর ভারী অন্যায়। মামাকে যদি বলতে লজ্জা করে—বেশতো, আমাকে বল্। তাতে তো আপত্তি করবার কিছু নেই। তোর কি চাই?

মীনাক্ষী। কিছু না।

অমিতা। কাকে চাই?

মীনাক্ষী। মানে?

অমিতা। তপনবাবু লোকটী বেশ। কি বলিস্?

মীনাক্ষী। হঠাৎ এ কথা কেন?

অমিতা। আমাদের মীনার সঙ্গে দিব্যি মানাবে—

মীনাক্ষী। ভাল হবে না বলছি ছোড়দি।

অমিতা। এই তো ধরা পড়ে গেলি। লজ্জায় গাল লাল হয়ে উঠ্‌ল। এ পেটে ক্ষিধে মুখে লাজের প্রয়োজন কি? আমাকে বললেই তো হ'ত।

মীনাক্ষী। কিন্তু বাবা যে—

অমিতা। সে ভার আমার। এম্‌নিতে হয় ভাল, নইলে একটা যা প্ল্যান করেছি—ঐ মামা আসছে, তুই যা।

মীনাক্ষী। তুমি কিন্তু ছোড়দি কাউকে কিছু—

অমিতা। তুই পাগল হয়েছিস্! কাউকে কিছু জানতে দেব না। নিশ্চিন্ত থাক্।

মীনাক্ষীর প্রস্থান

পদ্মলোচন। (নেপথ্যে) কি বিপদ! অত তাড়াতাড়ি ক'রছ কেন ভূপেন? ট্রেণ ফেল হয়ে যাচ্ছে না তো—

বলতে বলতে ভূপেনের কাঁধে ভর দিয়ে পদ্মলোচনের প্রবেশ

অমিতা। তোমার স্নান তো হয়ে গেল, এইবার একটু সুপ্—

পদ্মলোচন। আগে দু' চামচে নিউরো ফস্‌ফেট খেতে হবে। কি বিপদ! ভূপেন, আমাকে বসিয়ে দাও। জান তো ডাক্তার সম্পূর্ণভাবে আমাতে বিশ্রাম নিতে বলেছেন—

অমিতা ও ভূপেনকে ধরাধরি করে পদ্মলোচনকে চেয়ারে বসিয়ে দিলেন।

ভূপেন। আপনার ওষুধটা তবে নিয়ে আসি—

পদ্মলোচন। কি বিপদ! এখনও দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করছ? তাড়াতাড়ি যাও, আর ডাক্তার তালুকদারকে একবার বিকেলে—না থাক্, আমিই পরে টেলিফোন করে দেব।

অমিতা। মামা, আজ তুমি কেমন আছ?

ভূপেনের প্রস্থান

পদ্মলোচন। কি বিপদ! আমি, আমায় কি কোন দিন ভাল থাকতে দেখেছ' যে একথা জিজ্ঞেস করছ'। সব সময়ই শরীর খারাপ। পাহাড় থেকে একটু সেরে এসেছিলুম, কিন্তু এখানে এসে আবার দশগুণ খারাপ হয়ে গেছি। আমি বাঁচব না, বাঁচতে পারি না। মেডুলা অবলঙ্গাটায় যে পেনটা দেখা দিয়েছে—কি বিপদ! ভূপেন এখনও ওযুধ নিয়ে এল না। ভূপেন, ভূপেন—

ওষুধ হাতে ভূপেনের প্রবেশ

ভূপেন। আজ্ঞে, আপনার ওযুধ—

পদ্মলোচন। কি বিপদ! ভূপেন, তোমরা কি আমায় মেরে ফেলতে চাও। কখন ওযুধ খাবার সময় উতরে গেছে। দাও, দেখি—(ওযুধ খেয়ে) তোমাদের মাসীমাকে বল, একটু মশলা কিম্বা সুপারী—

ভূপেন। আজ্ঞে হ্যাঁ—

ভূপেনের প্রস্থান

অমিতা। ডাক্তার কি বলছে মামা?

পদ্মলোচন। ডাক্তার আর কি বলবে মা! এ রোগ শিবের অসাধ্য। মেডিক্যাল রিপোর্টে লিখছে স্বয়ং সম্রাটের সম্পর্কীয় সম্বন্ধীর নাকি একবার হয়েছিল। নিজের জন্য তো ভাবছিনা মা, আমি তো গিয়েই আছি। আমার বিপদ হয়েছে মীনাকে নিয়ে। দিন দিন মেয়েটা শুকিয়ে যাচ্ছে—

অমিতা। ওর ঠিক শরীর খারাপ নয়—

পদ্মলোচন। কি বিপদ! শরীর খারাপ নয়, অথচ মেয়েটা—

অমিতা। ওর মন খারাপ।

পদ্মলোচন! মন খারাপ। কি বিপদ! অমি, ওর মনটা আবার খারাপ হ'ল কি করতে? একে নিজের শরীর খারাপ নিয়ে অস্থির, তার ওপর আবার মেয়ের মন খারাপ। নাঃ, এরা আমায় বাঁচতে দেবে না। ডাক্তার বলেছে কোন রকম চিন্তা করা আমার পক্ষে বিপদজনক, অথচ পাঁচজনে মিলে আমাকে ভাবাবে তবে ছাড়বে। মন খারাপ কেন? কি হয়েছে? কি চায়? আমি তো ওর কোন অভাবই রাখিনি।

অমিতা। আমার মনে হয় ওর একটা বিয়ে দিলে—

পদ্মলোচন। কি বিপদ! বিয়ে!! কি বলছ অমি? এরই মধ্যে মীনার বিয়ে? আমার ঐ একটী মাত্র সন্তান, বিয়ে দিলেই তো পর হয়ে যাবে। তখন আমায় দেখবেই বা কে? আর বিয়ে বললেই তো বিয়ে হয় না। পাত্র দেখতে হবে—নাঃ, আমার আজ ব্লড-প্রেসার বাড়বেই। বা মেণ্টাল স্ট্রেণ যাচ্ছে—

অমিতা। পাত্র আমি একজন ঠিক করেছি, মীনারও পছন্দ হয়েছে—

পদ্মলোচন। পাত্রও ঠিক করা হয়ে গেছে? কি বিপদ! আমার মত নেওয়াও তোমরা দরকার মনে করলে না। অসুখ হয়েছে বটে কিন্তু একেবারে মরে তো যাই নি। তোমাদের নির্ব্বাচিত পাত্রটী কে শুনি।

অমিতা। বি-এ পাস, দেখতে ভাল, পয়সা কড়িও যথেষ্ট আছে—

পদ্মলোচন। কি বিপদ! এ রকম সাস্‌পেন্সে রাখছ কেন? এখনই নার্ভাস পোস্ট্রেশন হয়ে পড়বে। তোমরা কি আমায় মেরে ফেলতে চাও? পাত্রের নাম কি ব'ল না।

অমিতা। তপনকুমার বোস।

পদ্মলোচন। তপনকুমার বোস! সে আবার কে? কি বিপদ! আমাকে এমন করে ভাবাও কেন? জান, আমার ব্রেন ওয়ার্ক একেবারে বন্ধ। সেরিবেরাল ইনার্শিয়া—

অমিতা। বোস কোম্পানী, বিখ্যাত জুতোর কারবার—

পদ্মলোচন। অ্যাঁ—সেই মুচি। কি বিপদ! আমার মেয়ের মুচির সঙ্গে বিয়ে। ছিঃ, ছিঃ! সে ছোকরা পাহাড়ে গিয়ে আমার সঙ্গে দেখা করবার চেষ্টা করেছিল। নিশ্চয়ই তোমাদের ষড়যন্ত্র। আমার মেয়ে শেষে কিনা এক মুচির ছেলের সঙ্গে—ভাব্‌তেও লজ্জা করে। উহুঁহুঁ, অমি, আমার বুঝি জ্বর এল। তাড়াতাড়ি মাথায় একটু ওডিকলোন দাও।

অমিতার তথাকরণ

অমিতা। তোমার কি বড্ড কষ্ট হচ্ছে মামা?

পদ্মলোচন। কি বিপদ! এ কথা আবার জিজ্ঞেস করছ! উঃ, কি সিরীয়াস্ মেণ্টাল শক্ পেয়েছি। আমার মেয়ে, জমীদার পদ্মলোচনের মেয়ে, যাদের বাড়ীর কেউ কখনও পরের চাকরী পর্য্যন্ত করেনি, সে কিনা এক জুতোর দোকানের ছেলের সঙ্গে—নাঃ আর ভাবতে পারছি না। স্মেলিং সল্ট—উহুহু, হার্টফেল করবে! প্যালপিটেশন, রাপচার অফ দি পেরিকার্ডিয়াম—

অমিতা সল্টের শিশি দিলেন। ননীবালার প্রবেশ

ননীবালা। পাল মশাই, আপনার জাগ স্যুপটা কি আনতে বলব।

পদ্মলোচন। (স্মেলিং সল্ট শুঁকতে শুঁকতে) ননী, আর জাগ স্যুপ খেয়ে কি হবে? আমি বাঁচব না, বাঁচতে পারি না। এখুনি যা শুনলুম তাতে সুস্থ মানুষ মরে যায়, আর আমি তো একজন কনফার্মড্ ইনভ্যালিড্। অমি বলছিল যে মীনা নাকি তপন না কে একজন জুতোর দোকান করে, তাকে বিয়ে করতে চায়। ছিঃ ছিঃ! আমায় মেয়ে হয়ে এ কথা সে ভাবতে পারলে!

অমিতা। মীনা তো কিছু বলেনি, আমিই বলছিলুম।

পদ্মলোচন। মীনারও তো মত আছে। ননী, আমার হাত পা কাঁপছে। শীগ্‌গির এক ডোজ ভাইনাম গ্যালিসিয়া

দাও। অমি, তুমি ভূপেনকে একবার তাড়াতাড়ি আমার কাছে পাঠিয়ে দাও।

অমিতার প্রস্থান। ননীবালা ওষুধ ঢেলে দিলেন

ননীবালা। এই নিন।

পদ্মলোচন। দাও। ভাগ্যে তুমি আছ ননী।

ওষুধ খেলেন

ননীবালা। আপনি মিথ্যে মন খারাপ করবেন না পাল মশাই।

পদ্মলোচন। কি বিপদ! ননী, তুমি কি বলতে চাও আমি শুধু শুধু মন খারাপ করছি। আমি বেঁচে থাকতে আমাকে জিজ্ঞেস না করে বিয়ের ঠিকঠাক! মনে বড্ড আঘাত পেয়েছি, একি সারভাইভ করতে পারব? নিউরালজিয়া, লোকোমোটর অ্যাটাক্সিয়া—

ভূপেনের প্রবেশ

ভূপেন। আমায় ডাকছিলেন?

পদ্মলোচন। হ্যাঁ। তাড়াতাড়ি একটা আইসব্যাগ ভরে আন। মাথায় রক্ত চড়ে গেছে। কি বিপদ! এখনও দাঁড়িয়ে আছ? যাও, ছুটে যাও, দেরী কোরোনা—

ভূপেনের প্রস্থান

ননীবালা। শরীরটা কি বড্ড খারাপ লাগছে?

পদ্মলোচন। সে কথা আর জিজ্ঞেস কোরো না ননী। মাথায় যে কি কষ্ট হচ্ছে তা তোমায় কি বলব। মনে হচ্ছে কে যেন হাতুড়ী পিট্‌ছে—

ননীবালা। মাথায় একটু হাত বুলিয়ে দেব?

পদ্মলোচন। দেবে? দাও। তার আগে গোটা চারেক ভেগানিনের গুলি দাও। খেয়ে রেখে দিই। যদি মাথা ব্যথা একটু কমে।

ননীবালা গুলি দিলেন, পদ্মলোচন খেলেন

ননী, দেখ তো হাত পা ঠাণ্ডা হয়ে আসছে কি?

ননীবালা। (দেখে) কই না তো। আপনি সবসময় ভাববেন না। এতে শরীর আরও বেশী খারাপ হয়!

ননীবালা পদ্মলোচনের কপালে হাত বুলোতে লাগলেন

পদ্মলোচন। আঃ। ভাগ্যিস্ ননী তুমি ছিলে, নইলে আমার কি হ'ত? মেয়ে তো আধুনিকা হয়ে পড়েছেন। আধুনিকা মেয়েদের মত বাপ মার মত না নিয়ে পতি নির্ব্বাচন করছেন। সে কি আর আমায় দেখবে। আমি আর বাঁচব না ননী। যতদিন আছি তুমি আমায় ছেড়ে যেও না। (ননীবালার হাত ধরে) ব'ল, যাবে না।

ননীবালা। আপনার শরীর অসুস্থ, সুতরাং আপনাকে এ ভাবে ফেলে রেখে তো আমি যেতে পারব না।

পদ্মলোচন। আঃ! তুমি আমায় বাঁচালে ননী। যা ভাবনায় পড়েছিলুম—কি বিপদ! ভূপেন এখনও আইস্-ব্যাগ নিয়ে এল' না। ভূপেন, ভূপেন—

ভূপেন। (নেপথ্যে) আজ্ঞে আসছি—

আইসব্যাগ হাতে ভূপেনের প্রবেশ

পদ্মলোচন। কি বিপদ! এত দেরী করলে কেন? এ দিকে কতখানি ব্লাডপ্রেসার বেড়ে গেল। দাও—

ননীবালা। আমি মাথায় ধরছি।

ভূপেনের হাত থেকে ব্যাগ নিয়ে ননীবালা পদ্মলোচনের মাথায় ধরলেন

ভূপেনের প্রস্থান

ননীবালা। একটু আরাম বোধ করছেন কি?

পদ্মলোচন। তুমি আছ বলেই আমি এখনও বেঁচে আছি ননী।

একটা চিঠি হাতে অমিতার প্রবেশ

অমিতা। মামা, তোমার একটা চিঠি এসেছে।

পদ্মলোচন। কার চিঠি? কোত্থেকে এসেছে?

অমিতা। তোমার চিঠি। কাগভিপাগলা থেকে এসেছে।

ননীবালা। কাগভিপাগলা! সে আবার কোন দেশ?

অমিতা। ঢাকার কাছে কোথাও হবে। ঢাকার ছাপ রয়েছে। তবে যে দেশের কাকও পাগল, সে দেশের মানুষ না জানি কি?

পদ্মলোচন। কি বিপদ! অমি, তুমি যে আমায় বড্ড ভাবিয়ে তুললে। এমন অদ্ভুত নামের জায়গা থেকে কে লিখেছে?

অমিতা। খুলে দেখলেই বুঝতে পারবে।

পদ্মলোচন। কি বিপদ! তবে এতক্ষণ চিঠিটা খোল নি কেন! মিছিমিছি আমাকে এই মানসিক কষ্ট সহ্য করতে হ'ল। খুলে দেখ তো কে লিখেছে।

অমিতা। (চিঠি খুলে) এই নাও।

পদ্মলোচন। আঃ, কি বিপদ! দেখছ চোখে চশমা নেই—

ননীবালা। অমিতা, তুমিই পড় মা।

অমিতা। পড়ছি। (চিঠি পড়তে লাগলেন)

কাগভিপাগলা, ঢাকা

সোদরপ্রতিম সুহৃদ্বরেষু,

অত্যন্ত সঙ্কোচ ও শঙ্কাসহকারে এই লিপিখানি তোমার সমীপে প্রেরিত করিতেছি। তোমার স্মরণ-গগনে অথবা স্মৃতিপথে এই ক্ষুদ্র নগণ্য বন্ধুর অতি অল্প পরিসর স্থানও আছে কিনা, তাহা ঠিক হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেছি না। আমরা গোবর্দ্ধন সুন্দরী মহাকালী মাতা শিক্ষালয়ে সমসাময়িক ছাত্র ছিলাম। অতঃপর কাল প্রবাহে আমরা সুদূর ব্যবধান দ্বারা ছিন্ন হইয়া পড়ি। আজ বহুদিন পরে আমি বাঙ্গলা

দেশে সগুক্রীত ভূসম্পত্তি সুজলা শ্যামলা কাগডিপাগলা গ্রামে আসিয়া উপনীত হইয়াছি। তুমি যদি তোমার অমূল্য জীবনে আমার মূল্যহীন বন্ধুত্বকে অণুপরমাণুমাত্র পুনরুত্থান কর, তবে নিশ্চয়ই একদিন এ অধীনের দীন কুটীরে পদার্পণ করিয়া বিশেষ আনন্দ বর্দ্ধন করিবে। ইতি—

ভবদীয় স্নেহবদ্ধ চিরস্মরণকারী
কপিঞ্জলপ্রসাদ ভড়

পদ্মলোচন। ওঃ, আমাদের কপি লিখেছে। অনর্থক এতক্ষণ ভাবিয়ে মারলে। বুঝলে ননী, কপিঞ্জল ভারী চমৎকার লোক। অনেকদিন সিংহলে ছিল। সেখানে ওর মস্ত বড় জমীদারী আছে।

অমিতা। তোমার সেই বন্ধু না, যার গল্প আমাদের বলেছিলে। ভদ্রলোকের বাংলা ভাষার ওপর অদ্ভুত দখল আছে।

পদ্মলোচন। থাকবে না। আমাদের ক্লাসের ফার্স্ট বয় ছিল। ইংরাজীও জানে অসাধারণ। ইন্সপেক্টর ওর উত্তর শুনে মাস্টারদের আর কোন প্রশ্ন করতে সাহস করেনি। আড়ালে হেড মাস্টারকে জিজ্ঞেস করেছিল—এমনি ছেলে স্কুলে আর ক'টা আছে। তা ছাড়া অগাধ টাকার মালিক। রাজারাজড়া বললেও অত্যুক্তি হয় না।

অমিতা। তুমি ওঁদের ওখানে যাবে না কি ?

পদ্মলোচন। কি বিপদ! এ কথা আবার জিজ্ঞেস করছ'? পুরাণো বন্ধু যত্ন করে নিমন্ত্রণ করেছে—ননী, তুমি কি বল ?

ননীবালা। সে তো বটেই। যাওয়া উচিত বই কি। তবে আপনার শরীর ভাল নেই—

পদ্মলোচন। সে কথা আর বোলো না ননী। শরীরের যা অবস্থা দাঁড়িয়েছে তাতে যে বেশী দিন আর বাঁচব, তা মনে হয় না। তাই দু'দিন বন্ধুর কাছে গিয়ে—

অমিতা। তা ছাড়া চেঞ্জে গিয়ে আপনার শরীরটা একটু ইমপ্রুভ করতে পারে।

পদ্মলোচন। আজই কপিঞ্জলকে একটা চিঠি লিখে দাও যে পরশু নাগাদ আমি ওদের ওখানে গিয়ে পৌছব। কি বিপদ! কথায় কথায় ওষুধ খাবার সময় উতরে গেল যে। এখন দু' চামচে নিউরো ফসফেট খাবার কথা ছিল।

ননীবালা। দিচ্ছি।

ননীবালা উঠে গিয়ে ওষুধ দিলেন। পদ্মলোচন খেলেন

অমিতা। তুমি কি একলা যাবে মামা ?

পদ্মলোচন। কি বিপদ! আমাকে বাজে কথা কওয়াও কেন অমিতা? জান, বেশী কথা কওয়া আমার হার্টের পক্ষে খারাপ।

ননীবালা। ভূপেনকে সঙ্গে নিয়ে যাবেন।

পদ্মলোচন। ভাগ্যে তুমি কাছে আছ ননী, তাই এখনও বেঁচে আছি। এরা ছেলেমানুষ, আমার অসুখের গুরুত্ব বোঝে না। সঙ্গে কি কি ওষুধ যাবে তুমি সব নিজের হাতে গুছিয়ে দিও। কি বিপদ! নিউরো ফস্‌ফেট খাবার পর পাঁচ মিনিটের ওপর কেটে গেছে। এখনও জাগ্‌স্যুপ খাওয়া হ'ল না। ভূপেন, ভূপেন—

ননীবালা। চলুন, আমিই আপনাকে নিয়ে যাচ্ছি।

পদ্মলোচন। বেশ। অমি, তুমিও একটু ধর।

অমিতা ও ননীবালা দু'জনে পদ্মলোচনকে ধরে দাঁড় করালেন

আস্তে, অমি আস্তে! কি বিপদ! সব বিষয়ে এত তাড়াতাড়ি কর কেন? রোগা শরীরে, একটা সামান্য আঘাতে স্প্রেন, ফ্রাক্‌চার, প্যালপিটেশন, হার্টফেল—

সকলের প্রস্থান

ক্রমশঃ

মৃত্যু

শ্রীসুধাংশু রায় চৌধুরী

জীবনের যন্ত্ররূপ চাকা
ঘুরিয়া ঘুরিয়া আজ হ'য়েছে বিকল,
যৌবনের উষ্ণ-রক্ত ধারা
বার্দ্ধক্যের ম্লান সাঁঝে হ'ল সে শীতল।
আঁধার নামিছে বুঝি মৃত্যুমুখী ক্ষীণ চক্ষু'পরে
কাটোল ধ'রেছে মোর জরাজীর্ণ বার্দ্ধক্যের ঘরে।
মিছে মায়া, মিছে মোহ, মিছে ভালবাসা
ক্ষণ-ভঙ্গুর এ জীবনে মিছে শুধু আশা।

এই মন, এই দেহ, নিজেকে নিজেই আমি করিনা বিশ্বাস
মনে হয় প্রতি পদে এই বুঝি জীবনের শেষ নিশ্বাস;
মাটির পৃথিবী মাঝে বাঁচিবার করি নাক আশা
যৌবনের স্বপ্ন আজ অর্থহীন উন্মাদের ভাষা।
যে ফাগুন গেছে চ'লি অতীতের স্মৃতির মাঝেতে
তার তরে আক্ষেপ করি না আমি মৃত্যুর সাঁঝেতে,
আসুক নিয়তি আজি মৃত্যু দণ্ড হাতে করি শিয়রে আমার
ঘনাক আকাশ মাঝে কালরূপ মেঘের পাহাড়।

মূক-বধির শিক্ষা

শ্রীরণজিৎ সেনগুপ্ত

কি ব্যক্তিগত জীবনে, কি সামাজিক জীবনে—খুব কম ব্যক্তিই নিজেদের যৌবনের স্বপ্ন এবং শ্রম সাফল্যমণ্ডিত হোতে দেখেছেন। কিন্তু মূক-বধির বিদ্যালয়ের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন মজুমদারের জীবনে এর ব্যতিক্রম ঘটেছে। কলিকাতার মূক-বধির বিদ্যালয় ও মূকবধিরদের শিক্ষা বিষয়ে আন্দোলন ভারতবর্ষে জাতীয় সেবার এক নুতন পথের সন্ধান দিলে। আজ মূক-বধিরদের হতভাগ্য পিতামাতা তাঁদের প্রিয় সন্তানদের জন্য নতুনভাবে আশার আলো দেখতে পেয়েছেন। তাই, আজ মূক-বধিরদের বহু বিদ্যালয় দেশের বিভিন্ন স্থানে সমাজের এই শ্রেণীর হতভাগাদের মানুষ করবার বিরাট আদর্শ নিয়ে গড়ে উঠছে।

যে সময় মোহিনীমোহন তাঁর কয়েকজন বন্ধুকে নিয়ে এই মহৎ কার্য্যে ব্রতী হোলেন, তখন খুব কম ব্যক্তিই এই রকম বিদ্যালয়ের প্রয়োজনীয়তার কথা ভাবতে পেরে ছিলো—তা'ছাড়া সে সময়ে অনেকেই বিদ্যালয়ের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আস্থা রাখে নি। কিন্তু মোহিনীমোহন তাঁর আজীবনের সঙ্গীদের নিয়ে এই হতভাগ্যদের সেবার মানসে সর্ব্বান্তঃকরণে কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হোলেন। এখানে বলা বাহুল্য যে কলিকাতার মূক-বধির বিদ্যালয়ের মত বিদ্যালয় ভারতে বিরল। এই বিদ্যালয়ের বহুমুখী কার্য্যাবলীর জন্য মোহিনীমোহন ব্যতীত তাঁর প্রখ্যাত সঙ্গী, বিদ্যালয়ের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও বিদ্যালয়ের সর্ব্বপ্রথম অধ্যক্ষ স্বর্গীয় যামিনীনাথ

চলন্ত মেশিনে কার্য্যে-রত মূকবধির বালকবৃন্দ

কলিকাতা মূকবধির বিদ্যালয়

বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এস্থলে বিত্তালয়ের স্থাপনা বিষয়ে সর্ব্বপ্রথম উদ্যোক্তা স্বর্গীয় শ্রীনাথ সিংহ ও পুণ্যস্মৃতি উমেশচন্দ্র দত্তের নামও করা একান্ত কর্ত্তব্য।

এই বিত্তালয়ের তথা মূক-বধিরদের শিক্ষা সম্বন্ধে মোহিনীমোহনের বিশেষ কৃতিত্ব হোল—মূক-বধিরদের জন্ত বিত্তালয়ে শিল্প বিভাগ গঠন। মোহিনীমোহনই সর্ব্বপ্রথম উপলব্ধি করলেন যে কেবলমাত্র পুঁথিগত শিক্ষা এদের ভবিষ্যত-জীবনে খুব সহায়ক হবে না। এই বিশ্বাস নিয়েই তিনি প্রচণ্ড প্রতিকূলতার মধ্য দিয়েও শিল্প বিভাগ স্থাপন করলেন। এরফলে সন্দেহাতীতরূপে দেখা গেল যে এই হতভাগ্যদের জীবনে পুঁথিগত শিক্ষার সঙ্গে শিল্প শিক্ষাই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেয়ঃ। উপরন্তু, বিত্তালয়ের পাঠের সঙ্গে
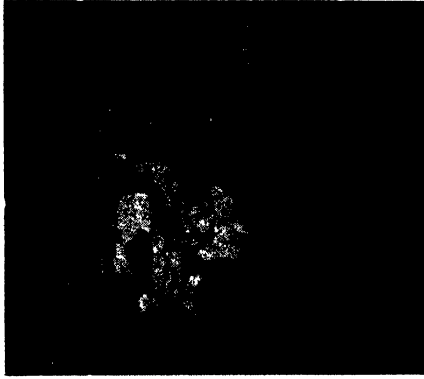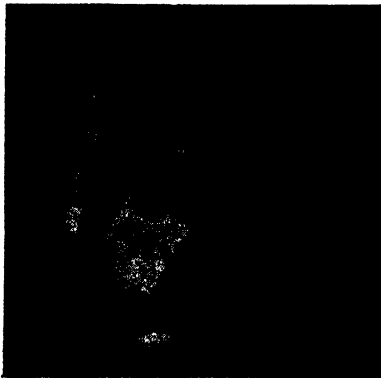
কাঠের কাজে মূকবধির বালক

ছাপাখানার যন্ত্র চালনে মূকবধির বালক
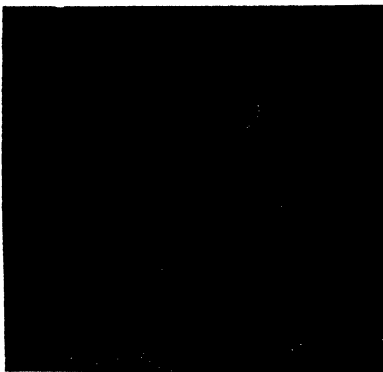
সেলাইএর কাজে মূকবধির বালক

শ্রীমোহিনীমোহন মজুমদার

দপ্তরীর কাজে মূকবধির বালক

শিল্প শিক্ষার উপযোগিতা সম্প্রতি মহাত্মা গান্ধী সাধারণ ছাত্রদের জন্যও তাঁর ওয়ার্দ্ধা পরিকল্পনায় বিবৃত কোরেছেন। এইদিক দিয়ে বিচার করলে অক্লান্তকর্মী মোহিনীমোহনের দূরদর্শিতার প্রশংসা না করে উপায় নেই। এই বিদ্যালয়ের বহু ছাত্র আজ তাঁদের জীবিকা শিল্পকর্মের দ্বারাই সংগ্রহ কোরছেন। এটা সামান্য কথা নয়।

মোহিনীমোহনের অপর একটী কীর্ত্তি হোল মূক-বধিরদের শিক্ষা বিষয়ক "মূক-শিক্ষা" নামে পুস্তক প্রণয়ন। এই পুস্তকখানিতে মূক-বধির পাঠ প্রণালী ও পৃথিবীর অন্যান্য স্থানের মূক-বধিরদের শিক্ষার ইতিহাস মনোরমভাবে বর্ণিত হয়েছে। সম্ভবতঃ আমাদের দেশে এ'ধরণের বই সম্পূর্ণ অভিনব।

এভাবে নানা দিক দিয়ে মোহিনীমোহনের নিকট মূক-বধির শিক্ষা আন্দোলন আজ ঋণী।

কবি-হারা

শ্রীসুবোধ রায়

মেঘের পুঞ্জ যেতে যেতে বলে,—
"ওরে, তোরা দাঁড়া, দাঁড়া ;
আজ একি দেখি, কবি-নিকুঞ্জে
নাই কেন কোনো সাড়া ?
আসাদের চির মৃদঙ্গ-ধ্বনিতে
কবি দেছে সাড়া সুরে-সঙ্গীতে,
ইন্দ্রধনুর বর্ণ-তুলিতে
এঁকেছে কতই ছবি !
কোথা গেল সেই বর্ষা-বিরহী
প্রাণ-প্রিয়তম কবি ?"

ব্যথা-মন্থর কেতকী কাঁদিয়া
বলে—"তারে খোঁজা মিছে,
শিহরি' শিহরি' বেণুবন ওই
বিলাপে মর্ম্মরিছে !
আমলকী বন বিষাদে মগন
আজি হাসিহারা পুষ্প ভবন
বাণীর বীণার ছিঁড়ে গেছে তার
কবি যে নিরুদ্দেশ !
উতলা পবন বিশ্বে খুঁজিয়া
পায় নাই উদ্দেশ।"

ঋতুরাজ বলে—"নীরব হইল
যখন কবির ভাষা,
জগৎ-সভায় এখন হইতে
বৃথা মোর যাওয়া-আসা।
রঙ্গশালার নৃত্যছন্দে
কেবা দিবে তাল নব আনন্দে,
'কুসুমে কুসুমে চরণ-চিহ্ন'
কে আর রাখিবে ধ'রে ?
অর্থবিহীন বিধির খেয়ালে
ফুল ফুটে যাবে ঝ'রে !

মৃন্ময়ী দীনা ধরিত্রী-মাতা
কেঁদে কেঁদে আজি কয়—
"কে বুঝিবে আর আমার মহিমা,
কে গাহিবে মোর জয় ?
প্রাণ-যজ্ঞের চিন্ময়ী শিখা
দিল সে আমার ভালে ললাটিকা,
বিশ্বের লোক অভিনব রূপ
হেরিল মাটির মা'র,
কোথা সে-শিল্পী, অমোঘ-দৃষ্টি
সুন্দর রূপকার ?"

গগনে-পবনে উথলিছে শোক
সবে দুখ-উতরোল,
ব্যথার তুফানে প্রকৃতির বুকে
উঠেছে প্রলয়-দোল !
স্তম্ভিত নর হেরিছে সে-ছবি,
শুনিছে কান্না—"কবি, কই কবি !"
সে-কাঁদন তার হিয়ার মাঝারে
গুমরি' গুমরি' উঠে।
গভীর ব্যথায় বুক ফেটে যায়,
মুখে ভাষা নাহি ফুটে !

কত গেল তার, কি যে হ'ল ক্ষতি,
কিবা হ'ল তার ক্ষয়,
ধারণা-অতীত এখনো তাহার
সে-ক্ষতির পরিচয়।
নয়নের জ্যোতি, বয়ানের ভাষা,
মরমীর প্রেম, মরমের আশা,—
চির-সুন্দর দেবতার সাথে
সবি হ'ল তার লয় ;
মৃত্যুর হাতে সীমাহীন এ যে
জীবনের অপচয় !

মূঢ়, অভিভূত, বিহ্বল নর
তাই চেয়ে আছে মূক,
জীবন তাহার অর্থবিহীন,
দৃষ্টি নিরুৎসুক।
মৃত্যুছন্দে তাল দিত যেই
মহাকাল-সাথী সে তো আজ নেই,
তাই ক্ষীণ-প্রাণ মানবের দল
আজি অসহায় ম্লান !
তুমি নাই কবি, কে বুঝিবে তার
এ ব্যথার পরিমাণ।

বিবাহের দিন

শ্রীকানাই বসু বি-এল্

আজ আবার সেইদিনটি আসিয়াছে।

সকাল হইতে প্রিয়নাথ লক্ষ্য করিতেছিল কখন কর্ত্তাকে একাকী পাওয়া যায়। সাধারণতঃ সকালের দিকে দোকানের কাজ একটু মন্দা থাকে, বৈকালে অফিসের বাবুদের ফিরিবার সময় হইতে রাত আটটা পর্য্যন্ত বিক্রয়ের বাহুল্য। তাহা ছাড়া, সন্ধ্যার পর হিসাবের চাপ এত বাড়ে যে প্রিয়নাথের মাথা তুলিবার সময় থাকে না। খরিদ্দার ও মহাজনের ভিড়ে সে সময়টা দোকানের মালিকেরও সবচেয়ে ব্যস্ততার সময়। এইসব কারণেই কাল কথাটা বলি বলি করিয়াও প্রিয়নাথ বলিবার সুযোগ করিয়া উঠিতে পারে নাই। তাহার উপর, কাল কী একটা হিসাবের ঝঞ্চাটে কর্ত্তার মেজাজও সুপ্রসন্ন ছিলনা।

রাত্রে বাসায় ফিরিয়া প্রিয়নাথ সঙ্কল্প করিয়া রাখিয়াছিল আজ সে বলিবেই। প্রায় তিন মাস কাজ করিতেছে, একদিন কামাই নাই, আজ এইটুকু অনুগ্রহ সে আদায় করিবেই, কর্ত্তার মেজাজ যেমনই থাকুক।

কিন্তু কর্ত্তার মেজাজ আজ ভালোই মনে হইল। মুখে কয়েকবার হাসিও দেখা গিয়াছে। এমন কি, মুরলী বলিয়া যে ছোকরাটি কাপড়ের দাম বলিতে প্রায়ই ভুল করে ও বকুনি খায়, তাহাকে কী কথা বলিতে বলিতে কর্ত্তা উচ্চকণ্ঠে হাসিয়াও ছিলেন। পরে এক সময়ে জিজ্ঞাসা করিয়া প্রিয়নাথ জানিল, মুরলী গোটা আষ্টেক টাকা মাহিনা বাবদ অগ্রিম চাহিয়াছিল। মুরলীর বিবাহ হইয়াছে বেশী দিন নয়। মাহিনার টাকা আজকাল আর কোনও মাসের শেষেই তাহার পুরা মেলে না। অগ্রিম তো মঞ্জুর হইয়াছেই, বরং মুরলীর বিবাহের পর হইতে খরচ বেশী হইবার কথার সূত্রে কর্ত্তা পরিহাসও করিয়াছেন। মুরলী হাসিয়া বলিল—"বুড়ো রসিক আছে, বুঝলেন? তবে লোক ভালো, কি বলেন প্রিয়নাথ-দা?"

প্রিয়নাথ ঘাড় নাড়িয়া সায় দিল। লোক সত্যই মন্দ নহেন। মেজাজ ভালো থাকিলে কর্ম্মচারীদের সুখ দুঃখের কথায় কান দিয়া থাকেন। দুপুরের কিছু আগে, এক সময়ে একলা পাইয়া প্রিয়নাথ তাহার আর্জ্জি পেশ করিল! এমন কিছু বাড়া-বাড়ির আর্জ্জি নয়। তবু প্রিয়নাথের মনে সঙ্কোচ ও সংশয় দুই-ই ছিল।

কিন্তু তাহার আর্জ্জিও মঞ্জুর হইয়া গেল। কর্ত্তা শুধু একবার জিজ্ঞাসা করিলেন—"আজ তো শনিবার নয়, প্রিয়নাথবাবু, এমন বেবারে বাড়ী যাবে কেন হে?"

মফঃস্বলের লোক সাধারণতঃ শনিবারে শনিবারেই বাড়ী গিয়া থাকে, সেই ধারণামতোই তিনি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। প্রিয়নাথ কবে দেশে যায় না যায়, তাহার খবর অবশ্য তিনি রাখিতেন না।

প্রিয়নাথ পরিষ্কার জবাব দিতে পারিল না। আজ তাহার বিবাহের বার্ষিকী, একথা এই বুড়া বয়সে বলিতে পারা শক্ত, বলিলেও ভালো শুনাইত না। মাথা চুলকাইয়া বলিল—"আজ্ঞে হ্যাঁ, একটু বিশেষ আবশ্যক হয়েছে।" তারপর মনিবের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—"আমি কালই আসব।"

—"তা এসো, দরকার অদরকার মানুষের আছেই। আচ্ছা।" কর্ত্তা প্রসন্নমুখেই অনুমতি দিলেন।

রাত্রি নয়টার আগে দোকানের ছুটী মেলে না। সেই জায়গায় ছ'টার সময় ছুটী পাওয়া যথেষ্ট অনুগ্রহ। প্রিয়নাথ নিজের আসনে ফিরিয়া আসিয়া খেরো বাঁধানো মোটা খাতা টানিয়া লইল।

কিন্তু হিসাব তাহার মাথায় আসিল না। খাতার পাতায় যে তারিখটি সে আজ সকালে আসিয়া ফাঁদিয়াছে, তাহাকেই অবলম্বন করিয়া মন তাহার একুশ বৎসর পিছাইয়া গেল। অথচ একুশ বৎসর পূর্ব্বের সেই দিনটিতে আর আজিকার এই দিনটিতে কোনও দিক দিয়াই কোনও সাদৃশ্য খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, কেবল মাত্র এই তারিখের মিল ছাড়া। সেদিনের রক্তমাংসের হৃদয় আজিকার শুষ্ক হৃদয় নয়; সেদিনকার চঞ্চল জগৎ আজিকার স্থবির জগৎ হইতে সহস্রযোজন দূরে সরিয়া গিয়াছে; সেদিনের প্রিয়নাথ আজিকার প্রিয়নাথকে দেখিলে চিনিতে পারিবে না।

নিজের কলমধরা হাতখানার দিকে চাহিয়া প্রিয়নাথের মনে হইল এই শিরা-বহুল, শীর্ণ, কুশ্রী হাত পাতিয়াই একদিন যে সে একটি পরম সম্পদ লাভ করিয়াছিল, তাহা কি বিশ্বাস হয়? ছোট একটি নিঃশ্বাস ফেলিয়া সে কলম দোয়াতে ডুবাইয়া লইয়া লিখিবার উদ্যোগ করিল।

মুরলী বলিল—"ও প্রিয়নাথ দা।"

প্রিয়নাথ চমকিয়া বলিল—"য়্যাঁ?"

মুরলী বলিল—"কী ভাবছেন বলুন তো? বার দশেক কলমে কালি নিলেন, কিন্তু একটা আঁচড়ও তো কাটেন নি। বসে বসে দেখছি তাই আপনার মজাটা। কী ভাবছেন এত?"

প্রিয়নাথ অপ্রস্তুত হইয়া দোয়াতে কলম ডুবাইতে ডুবাইতে বলিল—"না, কিছু ভাবিনি, এমনিই।"

মুরলী বলিল—"আমি বল্‌ব কি ভাবছিলেন?" বলিয়া উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া নিজের অন্তর্য্যামিত্বের পরিচয় দিল—"শুনলুম বাড়ী যাবেন। নিশ্চয়ই বৌদির কথা ভাবছিলেন, ঠিক কি না বলুন?"

প্রিয়নাথ বলিল—"না, ঠিক যে সেইকথাই ভাবছিলুম তা নয়—তবে, হ্যাঁ, তা-ও বটে।"

মুরলী হাসিয়া বলিল—"কি রকম ধরেছি বলুন? য়্যাঁ?"

খরিদ্দার আসিয়া পড়াতে মুরলীর আলাপে বাধা পড়িল। প্রিয়নাথ পুনরায় কলমে কালি লইয়া খাতায় মন দিবার চেষ্টা করিল।

তিনটার পর প্রিয়নাথ খাতা বন্ধ করিয়া কী ভাবিল। তারপর

মুরলীকে ডাকিয়া আস্তে আস্তে বলিল—"একখানা লালপাড় শাড়ী কত পড়বে, মুরলী ?"

মুরলী জিজ্ঞাসা করিল—"নক্সা পাড়, না প্লেন ?"

প্রিয়নাথ কহিল—"ধর—যদি নক্সা পাড়ই হয় ? তাহলে—"

—"তাহলে সাড়ে তিন—চার এই রকম হবে আর কি ?"

—"জোড়া ?"

মুরলী ঈষৎ হাসিয়া বলিল—"জোড়া! জোড়া আপনাকে দিচ্ছে। একখানা দাদা, একখানা। আর কি সেদিন আছে।"

প্রিয়নাথ মাথা নাড়িয়া বলিল—"নাঃ, ও নক্সা পাড় থাক ভাই, তুমি একটা প্লেন-পাড়ই দাও, টাকা দুয়েকের মধ্যে।"

মুরলী অন্তরঙ্গের মতো কানের কাছে মুখ আনিয়া গলা নামাইয়া জিজ্ঞাসা করিল—"বৌদির জন্যে তো? না দাদা, সে আমি পারব না। আজকালের এই এত রঙ্‌বেরঙের পাড়ের যুগে আমি প্লেন-পাড় শাড়ী দিয়ে গালাগাল খেতে পারব না। আপনাকে নক্সা-পাড়ই নিতে হবে।"

বলিয়া প্রিয়নাথকে কথা কহিবার অবসর না দিয়া চট্‌ করিয়া উঠিয়া গেল এবং বাছিয়া বাছিয়া একখানি লাল নক্সাপাড় শাড়ী আনিয়া মৃদুকণ্ঠে বলিল—"এই নিন্, দেখুন, কী চমৎকার ডিজাইনটা করেছে" এবং আবার কানের কাছে মুখ আনিয়া বলিল—"কারুকে বলবেন না দাদা, গত হপ্তায় এরই একখানি নিয়ে গেছি। তা, আপনার বৌমা একেবারে ড্যামগ্ল্যাড্‌।"

পাড়টি মনোহর বটে। প্রিয়নাথ দেখিতে দেখিতে বলিল—"কিন্তু—এর তো অনেক দাম হবে। না, এ তুমি রেখে দাও, বরং—"

মুরলী ওস্তাদ দোকানদারের ভঙ্গীতে বলিল—"দামের কথা থাক্ না দাদা, সে ভার আমার ওপর ছেড়ে দিন না। এতদিনের মধ্যে কখনো তো একটা শাড়ী কিনতে দেখলুম না; নিয়ে যান, নিয়ে যান, দেখ্‌বেন বৌদি কি রকম খুশী হন। আর অমনি বল্‌বেন যে তাঁর মুরলী ঠাকুরপো বেছে পছন্দ করে দিয়েছে।"

মুরলীর কথা শুনিয়া অতি দুঃখেও প্রিয়নাথের হাসি পাইল। তাহার বৌদিদির জন্য এই আর্ত্তি দেখিলে কে বলিবে যে মুরলী তাহার বহুদিনের পরিচিত বন্ধু নয়। অথচ এই কিছুক্ষণ আগেও ছোকরা বোধহয় জানিতই না প্রিয়নাথের বিবাহ হইয়াছে কি না।

মুরলীর আত্মীয়তার কথার প্রতিবাদ করিতে ইচ্ছা হইল না। কিন্তু তাহার অভয়দান সত্ত্বেও প্রিয়নাথ ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করিল—"কাপড় তো চমৎকার, কিন্তু এত টাকার মানুষ তো আমি নই ভাই। তাই বলছিলুম না হয়—"

কথা শেষ করিতে না দিয়া মুরলী বলিল—"এত টেত কিছু নয় দাদা, এত টেত কিছু নয়; সস্তায় হবে—মানে, একটু—সে কিস্যু নয়—অতি সামান্য একটু দাগী আছে। তাই মোটে দু'টাকা সাড়ে তেরো আনা দাম ফেলা আছে। তা সেও তো বাইরের লোকের দাম। আর তাছাড়া আপনাকে তো আর এক্ষুণি দাম দিতে হচ্ছে না। নিয়ে যান, বুঝলেন, সুবিধে আছে।"

বলিয়া মুরলী একটি চোখ বুজিয়া মাথা নাড়িয়া এক রহস্যময় সুবিধার ইঙ্গিত করিল। প্রিয়নাথ কহিল—"না, না, আমি নগদ্ দাম দোব, ও লেখাতে টেখাতে হবেনা।" সে চুপি চুপি দুইটাকা সাড়ে তেরো আনা মুরলীর হাতে গণিয়া দিয়া বলিল—"কারুকে বল্‌বার দরকার নেই। কাপড়টা তুমি একটা কাগজে মুড়ে রেখে দাও, যাবার সময় নিয়ে যাব। আর টাকাটা একসময় জমা করে দিও, বুঝলে ?"

কাহাকেও বলিতে নিষেধ করিয়া প্রিয়নাথ যে অপর সকলের থেকে তাহাকে পৃথক করিয়া দেখিল, ইহার মর্য্যাদায় মুরলী খুশী হইয়া মাথা নাড়িয়া বলিল—"সে আর আমাকে বলতে হবে না। আর, আমি একটা ক্যাশমেমোও করিয়ে রেখে দোব। কি জানি বেরোবার সময় যদিই কেউ কিছু বলে বসে। তখন, আপনি যতই বলুন নগদ দাম দিয়ে কিনেছেন, অথচ দোকানেরই লোক হয়ে, কেউ বিশ্বাসই হয়তো করবে না।"

ছয়টার সময়ে ছুটীর মঞ্জুর হইয়াছিল, কিন্তু উঠিতে উঠিতে প্রায় সাড়ে ছয়টা বাজিয়া গেল। কটায় ট্রেণ ছাড়িবে তাহা জানা নাই, তবে এখন ডেলি-প্যাসেঞ্জারদের ফিরিবার সময়, গাড়ীর অভাব হইবে না এরূপ আশা আছে। মুরলীর নিকট হইতে কাগজে মোড়া শাড়ীখানি লইয়া প্রিয়নাথ বাহির হইয়া পড়িল।

পাশেই বাজার। প্রিয়নাথ বাজারে ঢুকিল। বাহির হইয়া সামনেই দেখে সেই মুরলী। মুরলী চা খাইতে বাহির হইয়াছে। সাবধান হইবার সময় পাওয়া গেল না। মুরলী তাহার হাতের দিকে নির্দ্দেশ করিয়া প্রশ্ন করিল--"কি প্রিয়নাথদা, ফুল কিনলেন নাকি ?"

কলাপাতার মোড়ক দেখিলেই চিনিতে পারা যায়। তাহা ছাড়া মোড়কের কোণে কোণে ফুল উঁকি মারিতেছে। সুতরাং মুরলীর প্রশ্নের উত্তর দিবার দরকার করে না। উত্তর দিবার ইচ্ছাও প্রিয়নাথের ছিল না। মুরলীর কাছে ধরা পড়িয়া সে অপ্রস্তুত হইয়া তাড়াতাড়ি ফুলের মোড়কটি পকেটে পুরিল।

মুরলী আবার বলিল—"কি ফুল কিনলেন, দেখি ?"

প্রিয়নাথের দেখাইবার ইচ্ছাও ছিল না। সে কহিল—"ও এমন কিছু নয়। এই সামান্য—"

প্রিয়নাথের স্বাভাবিক নিস্পৃহ নীরবতার জন্য এতদিন তাহার সম্বন্ধে মুরলীর কোনও কৌতূহলই হয় নাই। আলাপও সাধারণ পরিচয়ের বেশী এগোয় নাই। অন্তরঙ্গ আলাপ হইবার কথাও নয়। দুইজনের মধ্যে বয়সের ব্যবধানও যত বেশী, প্রকৃতিগত পার্থক্যও তেমনি সুস্পষ্ট। কিন্তু আজ স্ত্রীর জন্য নক্সাপাড় শাড়ী কিনিয়া—যে শাড়ীর জোড়া মুরলীর তরুণী স্ত্রী ব্যবহার করিতেছে—প্রিয়নাথ যেন মুরলীর সম-পর্য্যায়ে নামিয়া আসিয়াছে। নব-বিবাহিত যুবক মুরলী, একুশ বৎসর পূর্ব্বে বিবাহিত, যৌবন-সীমান্তের প্রিয়নাথকে বন্ধুর মতোই জ্ঞান করিল।

কুণ্ঠিত প্রিয়নাথকে ভরষা দিয়া মুরলী বলিল—"ও কথা বলবেন না প্রিয়নাথদা, ফুলের আবার সামান্য আছে নাকি? দেখি, দেখি।"

তথাপি প্রিয়নাথের দেখাইবার গা নাই দেখিয়া সে বলিল—"অবিশ্যি আমি ছুঁলে যদি কিছু আপত্তি থাকে তো থাক্। মানে, সত্যনারাণ-টত্যনারাণ নয় তো ?"

অগত্যা প্রিয়নাথকে বলিতে হইল—সত্যনারায়ণ কিম্বা অন্য কোন দেবতার পূজার জন্য এ ফুল নহে এবং দেখাইতে যে আপত্তি নাই ইহা প্রমাণ করিবার জন্য সে বিষম আপত্তি সত্ত্বেও পকেট হইতে ফুলের মোড়কটি বাহির করিয়া দিল।

মুরলী দেখিয়া বলিল—"বাঃ বাঃ, চমৎকার মালাটি কিনেছেন তো।" ঘুরাইয়া ফিরাইয়া মালাছড়াটি দেখিয়া ও তাহার আঘ্রাণ লইয়া মুরলী তাহা কলাপাতায় মুড়িয়া বাঁধিতে বাঁধিতে বলিল—"পূজোর জন্যে নয়, তবে কার জন্যে দাদা? বলতেই হবে।" তাহার মুখে কৌতুকের হাসি ফুটিয়া উঠিল।

বৃদ্ধ-বয়সের এই পাগলামির, এই অর্থহীন শৌখীনতার কথা কাহাকেও বলা যায় না, মুরলীকে তো নয়ই। ছেলেমানুষের মতো এখনই না বুঝিয়া যা তা বলিতে থাকিবে। প্রিয়নাথ অপ্রতিভ মুখে চুপ করিয়া রহিল।

তাহার এই সলজ্জ সঙ্কোচ লক্ষ্য করিয়া মুরলী আপন প্রখর বুদ্ধি প্রয়োগ করিয়া অনুমান করিবার চেষ্টা করিল, এই মালা কাহার জন্য। মুখ টিপিয়া হাসিয়া প্রিয়নাথের লজ্জিত মুখের দিকে চাহিয়া মুরলী বলিল—"বোধহয় বুঝতে পেরেছি কার জন্যে। কিছু মনে করবেন না দাদা, আপনি বয়োবৃদ্ধ লোক, বলছি কি, আজকের শাড়ী আর ফুলের মালার যোগাযোগের কিছু কি বিশেষ কারণ আছে? অবিশ্যি যদি বলতে আপত্তি না থাকে।"

আপত্তি অতি গুরুতর রকমই ছিল এ সকল গল্প করিবার কথা নয় এবং মিথ্যা কিছু একটা বলিয়া চলিয়া গেলেও হইত, মুরলী বিশ্বাস করুক আর নাই করুক। কিন্তু আজিকার দিনটির সম্বন্ধে মিথ্যা কহিলে এই দিনটিকেই অস্বীকার করা হয়, প্রিয়নাথের ইহাই মনে হয়। এইজন্যই মুরলীর পীড়াপীড়িতে প্রিয়নাথকে অনিচ্ছার সহিত বলিতে হইল—আজ তাহার বিবাহের তারিখ ও সেই উপলক্ষেই এই শাড়ী ও ফুলের সমাবেশ। ইহার বেশী সে বলিল না। যদিও ইহাতে মুরলী ঠিক বুঝিবে না, তথাপি প্রিয়নাথ নিজের কাছে নিজেকে খাঁটী রাখিল। যে দিনটি তাহার জীবনের পরম স্মরণীয় দিন, সেই দিনটিকে সে অপরের দৃষ্টি হইতে লুকাইয়া রাখিতে চায় বটে, কিন্তু যদি কেহ স্পষ্ট জিজ্ঞাসা করিয়া বসে, তবে ইহাকে মিথ্যার আবরণে ঢাকা দিতেও সে রাজী নয়, অস্বীকার করিয়া ইহার মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ করিতেও সে পারে না।

মুরলী বলিল—"Wedding day! বাঃ বাঃ!"

ট্রেণের সময় হইয়া যাইতেছে জানাইয়া প্রিয়নাথ বিদায় লইল। মুরলী চোখ বড় করিয়া চলন্ত প্রিয়নাথের পিঠের দিকে চাহিয়া হাঁ করিয়া কয়েক মুহূর্ত্ত দাঁড়াইয়া রহিল।

দেশের ষ্টেশনে আসিয়া পৌঁছিতে প্রিয়নাথের রাত হইয়া গেল। ট্রেণ না জানা থাকায় হাওড়ায় আসিয়া অনেকক্ষণ বসিয়া থাকিতে হইয়াছিল। অত দেরীতে পল্লীগ্রামের ষ্টেশনে বেশী লোক আসে না। প্রিয়নাথ একাকী গ্রামের পথে অগ্রসর হইল।

শেষা শুক্লপক্ষের রাত্রি। পূর্ব্বদিকের গাছের মাথার উপর প্রায় পূর্ণ চাঁদ। ধূসর কঠিন মাঠের উপর স্নিগ্ধ আলো পড়িয়া তাহার কাঠিন্য চাপা পড়িয়াছে। কর্কশ মাটীর কাটল ডুবাইয়া সমস্ত মাঠটির উপর একটি তরল কোমলতার পলি পড়িয়াছে। প্রিয়নাথ জেলা-বোর্ডের পাকা রাস্তা ছাড়িয়া মাঠের আলের পথে নামিল।

এ পথে তাহার বাড়ী পৌঁছিতে সময় কম লাগে। বিবাহের পর একবার বিদেশ হইতে আসিবার সময়, অন্ধকার রাত্রে বর্ষায় এক হাঁটু জল ভাঙ্গিয়া এই মাঠের পথে সে বাড়ী আসিয়াছিল। বাড়ীতে পৌঁছিয়া ইহার জন্য নববধূ মালতীর কাছে তাহার অনেক তিরস্কার লাভ ঘটিয়াছিল। তিরস্কার জলের জন্য নহে; মাঠের জলে ধানক্ষেতে সাপ ভাসিয়া বেড়ায়; তাহাদের গায়ে পা পড়িলে তাহারা ছাড়িয়া কথা কহিত না, অন্ধকারে দেখিতে পাই নাই বলিলে ক্ষমাও করিত না। সাপকে মালতীর বড় ভয় ছিল।

মালতী রাগ করিয়া বলিয়াছিল—"পাকা রাস্তায় এলে চলত না? কেন, এতই কিসের তাড়া?"

প্রিয়নাথ হাসিমুখে উত্তর দিয়াছিল—"কিসের তাড়া জানো না? কার জন্যে ছুটে ছুটে আসি, বলব?"

গুরুজনের ভয়ে মালতীর গলা চড়াইবার উপায় ছিল না। চাপা গলায় ঝঙ্কার দিবার চেষ্টা করিয়া বলিয়াছিল—"আচ্ছা, আচ্ছা, আর বলতে হবে না, খুব হয়েছে। কিন্তু দশ মিনিট পরে এলে সে তো আর পালিয়ে যেতো না।" কিন্তু ঝঙ্কারে তাহার রাগের সুর ফোটে নাই, ফুটিয়াছিল একটি পরিতৃপ্ত অনুরাগ ও সলজ্জ আনন্দের সুর।

কৃত্রিম দুশ্চিন্তা ও উদ্বেগের স্বরে প্রিয়নাথ বলিয়াছিল—"কী জানি বাপু, যদিই পালিয়ে যায়! সেই ভয়েই তো কোথাও গিয়ে টিকতে পারি না।"

সত্যই তখন তখন প্রিয়নাথ গ্রাম ছাড়িয়া নড়িতে চাহিত না।

আজ অবশ্য বধূর পলাইবার ভয় আর নাই। তাড়াতাড়ির জন্য নহে, শুধু অভ্যাসবশেই প্রিয়নাথ মাঠের পায়ে-চলা পথ ধরিল।

অন্যমনস্ক হইয়া চলিতে চলিতে হঠাৎ আলের ধারে পা পড়িয়া পা পিছলাইয়া গেল। প্রিয়নাথ পড়িতে পড়িতে সামলাইয়া লইল। তাহার বাহুমূল হইতে নূতন শাড়ীর বাণ্ডিলটি খসিয়া পড়িল। সেটি উঠাইয়া লইয়া ধূলা ঝাড়িয়া প্রিয়নাথ সাবধানে চলিল। এতক্ষণ হাতে হাতে কাপড়ের উপরের কাগজটি স্থানে স্থানে ছিঁড়িয়া গিয়াছে। শাড়ীর টকটকে লালপাড়ের নক্সা চাঁদের উজ্জ্বল আলোতে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে। প্রিয়নাথের কাপড়টি সত্যই পছন্দ হইয়াছিল।

একবার, সেবারই বোধহয় তাহাদের প্রথম বিবাহ-তিথি, প্রিয়নাথ একখানি চওড়া লালপাড় শাড়ী কিনিয়া লুকাইয়া বাড়ী লইয়া গিয়াছিল। তখন এত বিচিত্র পাড়ের, এত লতাপাতার নক্সার চলন হয় নাই। মালতী সব পাড়ের চেয়ে লাল পাড়ই বেশী পছন্দ করিত। আর শুধু মালতীর পছন্দ বলিয়াই নহে, প্রিয়নাথের চোখেও মালতীর সুন্দর মুখশ্রী ঘোর লাল রঙের বেষ্টনীর মধ্যে যেমন শোভা পাইত এমন আর কোনও মূল্যবান ঝকঝকে শাড়ীতেও পাইত না।

গভীর রাত্রে, বাড়ী নিস্তব্ধ হইলে, নিদ্রালু প্রিয়নাথকে এই শখের দাম দিতে হইল। মালতীর নির্ব্বন্ধে ঘুমভরা চোখে তাহাকে খাট হইতে নামিয়া মাটিতে দাঁড়াইয়া থাকিতে হইল দুইটি পা জোড় করিয়া এবং মালতী বাহিরে গিয়া সেই নূতন

শাড়ী পরিয়া আসিয়া হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া তাহার জোড়া পায়ের উপর মাথা রাখিয়া প্রণাম করিল। কী তাহার প্রণামের ভঙ্গী! আর সেই সাদাসিধা লালপাড়েরই বা কী মাধুর্য্য! আঁচলটি ঘাড়ের উপর দিয়া ঘুরিয়া আসিয়া মাটীতে পড়িয়াছে, ছোট মাথাটি প্রিয়নাথের পা দুইটি ঢাকিয়া দিয়াছে, পায়ের উপর সেই অনুপম মুখখানির কোমল উষ্ণ স্পর্শ লাগিল। নির্ব্বাক প্রিয়নাথ সেই নিঃশেষ আত্ম-নিবেদনের মূর্ত্তির পানে চাহিয়া বিহ্বল হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। প্রণতা মালতীকে পায়ের উপর হইতে তুলিতেও সে ভুলিয়া গিয়াছিল।

চাঁদের আলোয় নিজের জীর্ণ জুতাপরা মলিন পায়ের দিকে দেখিতে দেখিতে প্রিয়নাথ চলিতে লাগিল। নূতন শাড়ীটি দুই হাতে চাপিয়া ধরিয়া সে ভাবিল, চিত্র বিচিত্র অনেক হইল, সৌন্দর্য্য তাহাতে হয়তো বাড়িলই, কিন্তু অলঙ্কারের আড়ম্বরহীন শান্ত লালপাড়ের সে মহিমা আর ফিরিয়া আসিবে না!

তাহাদের বাড়ীর আগে নবীন গাঙ্গুলীর বাড়ী। গাঙ্গুলী মহাশয়ের ঘরে আলো জ্বলিতেছে। পদশব্দ পাইয়া নবীন গাঙ্গুলী হাঁকিলেন—"কে যায়?"

প্রিয়নাথ শুনিয়াও শুনিল না, সাড়া দিল না। এতরাত্রে আসিয়া প্রতিবেশীদের সঙ্গে আলাপ আপ্যায়নের মতো তাহার মন ছিল না। গাঙ্গুলী আবার ডাকিলেন—"বলি কে চলেছ হে? সাড়া দাওনা কেন?"

অগত্যা প্রিয়নাথকে সাড়া দিতে হইল—"আজ্ঞে কাকা, আমি, প্রিয়নাথ।"

গাঙ্গুলী বলিলেন—"কে, আমাদের প্রিয়নাথ? প্রিয়নাথ এসেছ? দাঁড়াও, দাঁড়াও বাবা, যাচ্ছি। ওরে, দোরটা খুলে দে, আমাদের প্রিয়নাথ এসেছে।"

বৃদ্ধ গাঙ্গুলী যেন প্রিয়নাথেরই প্রতীক্ষায় বসিয়া ছিলেন এবং প্রিয়নাথেরও যেন আসিয়া এই বাড়ীতেই উঠিবার কথা। শশব্যস্তে লণ্ঠন হাতে করিয়া তিনি ছুটিয়া আসিলেন। উঠানের দরজার আগড় খুলিয়া লণ্ঠন উঁচু করিয়া ধরিয়া ডাকিলেন—"কই, ওখানে পথে দাঁড়িয়ে কেন বাবা? এসো এসো, ভেতরে এসো।"

ভিতরে আসিবার দরজা যে এইমাত্র খোলা হইল, ও যে ব্যক্তি পথ দিয়া যাইতেছিল তাহাকে দাঁড়াইতে বলিলে যে পথের উপরই দাঁড়াইতে হয়, ইহা বৃদ্ধের মনে হইল না। প্রিয়নাথও সে কথা বলিল না। বাল্যকাল হইতে এই সরল ব্রাহ্মণের কাছে সে আন্তরিক স্নেহ পাইয়াছে। সে স্নেহের আহ্বান সে উপেক্ষা করিতে পারিল না, ইচ্ছা না থাকিলেও ভিতরে যাইতে হইল। প্রণাম ও আশীর্ব্বাদের পর সুখ দুঃখের কথা উঠিল। প্রিয়নাথকে বেশী কিছু বলিতে হইল না। গাঙ্গুলীর দীর্ঘ জীবনে শোক ও দুঃখের ঝুলি পরিপূর্ণ। বহুদিন পরে দেখা হওয়ায় তাঁহার কথা আর ফুরাইতে চাহে না।

কথার ফাঁকে বার বার তিনি প্রিয়নাথকে দাওয়ার উপর উঠিয়া বসিতে বলিলেন, হাত পা ধুইয়া যৎকিঞ্চিৎ জলযোগের অনুরোধও একাধিকবার করিলেন। কিন্তু ইহার উপর আবার দাওয়ায় উঠিয়া বসিলে যে আজ রাত্রির অর্দ্ধেক গাঙ্গুলী বাড়ীতেই কাটিয়া যাইবে তাহা প্রিয়নাথ বেশ জানিত। তাই দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়াই সে বুড়ার কথা শুনিতে লাগিল।

বস্তুতঃ, কথা তো সে শুনিতেছিল না, বুড়াকে কথা কহিবার অবসর দিতেছিল মাত্র। তাঁহার বুকের জমানো ভার নামাইবার উপলক্ষ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।

ইতিমধ্যে প্রিয়নাথের হাতের দিকে দৃষ্টি পড়ায় গাঙ্গুলী মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন—"ওটা কি বাবা হাতে? কাপড় নাকি?"

প্রিয়নাথের আবার ভুল হইয়াছিল। কাপড়সুদ্ধ হাত লুকাইবার কথা তাহার মনে ছিল না। স্বীকার করিতে হইল উহা কাপড়ই বটে। গাঙ্গুলী লণ্ঠন আগাইয়া আনিয়া বলিলেন—"শাড়ী দেখছি যেন?"

অতএব প্রিয়নাথকে কাগজ খুলিয়া দেখাইতে হইল। কাপড় হাতে করিয়া লণ্ঠনের স্বল্প আলোর সাহায্যে ও ক্ষীণ দৃষ্টির দ্বারা তাহার পাড় ও জমী নিরীক্ষণ করিয়া গাঙ্গুলী বলিলেন—"দিব্যি কাপড়, খাসা পাড়। তা কত নিলে বাবা? একখানা আছে তো?"

প্রিয়নাথ বলিল—"আজ্ঞে হ্যাঁ, একখানাই। দু'টাকা সাড়ে তেরো আনা নিলে।"

অভাবের সংসারে দুই টাকা সাড়ে তেরো আনা অনেক পয়সা। দরিদ্র নবীন গাঙ্গুলী কাপড় ফিরাইয়া দিয়া বলিলেন—"তা নেবে বই কি? এমন সুন্দর কল্কার পাড় করেছে, পাড়েরই মেহন্নত কত।"

প্রিয়নাথ কাপড়টি আর কাগজে জড়াইল না। পাটসুদ্ধ পাকাইয়া হাতে ধরিয়া রহিল। সেই চক্‌চকে পাড়ের দিকে চাহিয়া একটি নিশ্বাস ফেলিয়া নবীন গাঙ্গুলী বলিলেন—"আমার খুকি জ্বরের ঘোরে খালি বলতো—'বাবা, আমার একটাও ফুলপাড় শাড়ী নেই। এবার আমায় একখানা ফুলপাড় শাড়ী কিনে দিতে হবে।' বড্ড জ্বরে ভুগ্‌ল কিনা। বিছানা ছেড়ে যে উঠবে সে ভরষা আর ছিল না। তা বলেছিলুম, মা ভালো হয়ে ওঠো, এবার জন্মদিনে যেখান থেকে পারি, একটা ফুলপাড় কাপড় তোমায় কিনে দেবই।"

আর একটি ছোট নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বৃদ্ধ বলিলেন—"কাল বাদে পরশু তার জন্মদিন, আর আজ আমার হাতে এমন পয়সা নেই যে একটা গামছা কিনে দি।—তা দাঁড়িয়ে রইলে বাবা, এতটা রাস্তা এসেছ, একটু বসবে না?"

প্রিয়নাথ হাতের কাপড়টা পাকাইতে পাকাইতে বলিল—"তা খুকি এখন বেশ সেরে উঠেছে তো?"

—"হ্যাঁ বাবা, তোমার বাপ মার আশীর্ব্বাদে তা সেরেছে বটে, তবে বড্ড কাহিল। ডাক্তার বলেছে—একটু বলকারক ভালো খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা করবেন গাঙ্গুলী মশাই।"

গাঙ্গুলী মহাশয়ের গলা ভারি হইয়া আসিল। কাশিয়া বলিলেন—"বলকারক। কোথায় পাব বাবা বলকারক? দিন চলে না তার ভালো খাওয়া দাওয়া। তুমিও যেমন।"

হাসিবার চেষ্টায় ঠোঁট দুইটি প্রসারিত করিয়া বলিয়া চলিলেন—"চোদ্দ বছর বয়স হলেও ছেলে মানুষ তো, তার ওপর সবে অসুখ থেকে উঠেছে। এক এক সময়ে বায়না করে। আবার নিজেই বোঝে, কি বুদ্ধি—এই আজই বিকেলে চোখ দুটি ছল ছল করে আমাকে বল্লে 'বাবা, এবারের জন্মদিনে ফুলপাড়

কাপড় কিনো না, আসছে বছর কিনে দিও। এখন আমি বড্ড রোগা, ভালো কাপড় নিয়ে পরতেই পারব না।' বুঝলে না, আমায় ভোলাচ্ছে? দেখ্‌ছে তো বাপের অবস্থা, আর যার আদরের জিনিষ ছিল, কোলের সন্তান ছিল, সেই তো চলে গেল, কার কাছে আবদার করবে, তাই বুড়ো ভিখিরি বাপকে ভোলাচ্ছে, বুঝলে?"

প্রিয়নাথ বুঝিতে লাগিল। মেয়ের কথা হইতে গাঙ্গুলীর স্বর্গগতা পত্নীর কথা আসিল। তারপর শেষ সম্বল কয় বিঘা জমী বন্ধক পড়িবার কথা আসিল। প্রিয়নাথ হুঁ, হাঁ, দিয়া একটির পর একটি সব বুঝিতে লাগিল। এই নিরন্ধ্র দুঃখের কাহিনীর জালে এমন ফাঁক পাইল না যে গলিয়া বাহির হইয়া আসে, অথচ জাল ছিঁড়িয়া আসিতেও কেমন যেন বাধে। কারণ, নবীন গাঙ্গুলীর দুঃখের কাহিনী শুধু দুঃখেরই কাহিনী। উহাতে কাহারও নিন্দা কুৎসা নাই, কাহারও বিরুদ্ধে নালিশ নাই, আপন দুর্ভাগ্যের জন্য কাহাকেও দায়ী করিবার প্রয়াসও নাই। আর নাই এই কাহিনী শুনাইয়া কোনও রকমের প্রার্থনার ইঙ্গিত। তাই, শুনিতে শুনিতে শ্রান্ত প্রিয়নাথ বিদায় লইবার জন্য চঞ্চল হইলেও তিক্ত বোধ করিল না। সে জানে যে পল্লীগ্রামের সমাজে বাস করিয়াও নির্ব্বিরোধ সরলতা ও অকপট ভালো মানুষির দোষে এই শান্ত ধর্ম্মভীরু ব্রাহ্মণের সঙ্গী কেহ ছিল না। দুঃখের বোঝা তাই ইহার অন্তরেই জমা হইয়া থাকে, অন্তরঙ্গ শ্রোতার অভাবে।

প্রিয়নাথ যখন নিজের বাড়ীর দরজায় আসিয়া দাঁড়াইল তখন পল্লীগ্রামের হিসাবে রাত যথেষ্ট হইয়াছে। জ্ঞাতি সরিকদিগের সঙ্গে একত্রে তাহার বাড়ী। সদর দ্বার ও উঠান এজমালি। জ্যেঠামহাশয়দিগের অবস্থাই ভালো, অধিকাংশ ঘরই তাঁহাদের। ছেলে, মেয়ে, লোকজন, গরু বাছুর লইয়া তাঁহারাই বাড়ী জমকাইয়া আছেন। উঠানে পা দিতে গোলা, মরাই, গোয়াল ভরিয়া যে লক্ষ্মীশ্রী চোখে পড়ে তাহা তাঁহাদেরই।

ডাকাডাকিতে কে একজন আসিয়া দরজা খুলিয়া দিয়া গেল। বুড়ী জ্যেঠাইমা এখনও বাঁচিয়া আছেন। বুড়ী রাত্রে ভালো দেখিতে পান না। প্রিয়নাথের মাথায়, গালে ও বুকে হাত বুলাইয়া কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন, শরীর রোগা হইয়া যাওয়ার জন্য দুঃখ ও অনুযোগ করিলেন এবং মেয়েদের ডাকিয়া প্রিয়নাথের জন্য ভাত বাড়িয়া দিতে বলিলেন।

আহারের স্পৃহা মোটেই ছিল না, অনেক কষ্টে প্রিয়নাথ সে উপরোধ এড়াইল। বলিল—"সন্ধ্যে বেলায় হাওড়া ষ্টেশনে খেয়েছি জ্যাঠাইমা, খাবার দাবার কিছু দরকার নেই।" হাওড়া ষ্টেশনে খাইবার কথা তাহার মিথ্যা নয়, এক কাপ চা সে সত্যই খাইয়া লইয়াছিল। কিন্তু জ্যেঠাইমা বুঝিলেন প্রিয়নাথ পেট ভরিয়া আহার করিয়া আসিয়াছে। তথাপি স্নেহময়ী বৃদ্ধা ছাড়িলেন না। হাত পা ধুইয়া তাঁহার সামনে বসিয়া তাঁহার হাতের নারিকেল-নাড়ু খাইতে হইল। তারপর প্রিয়নাথ নিজের ঘরে যাইবার জন্য উঠানে নামিল। বুড়ী জ্যেঠাইমা আঁচলে চোখ মুছিয়া আপন মনে বিড় বিড় করিয়া বলিলেন—"আমার অদেষ্টে কি মরণ লেখনি হরি? কী অখণ্ড পেরমাই নিয়েই এসেছিলুম, ভুষুণ্ডির কাগের মতন বসে আছি!"

আলো-ভরা বৃহৎ উঠান পার হইয়া নিজের জীর্ণ ঘরটির সামনে আসিয়া প্রিয়নাথের বিবাহ-বার্ষিকীর যাত্রা শেষ হইল।

চাবি খুলিয়া ঘরে ঢুকিয়া প্রিয়নাথ মেজের উপর শাড়ী রাখিল, পকেট হইতে বাতি বাহির করিয়া জ্বালিয়া মাটিতে মোমের ফোঁটা ফেলিয়া তাহার উপর বাতি বসাইল। তারপর নিজে মেজেয় বসিয়া ছোট চৌকিটি কাছে টানিয়া তাহার উপর হইতে মালতীর ছবিটি তুলিয়া লইল। ছবিটি লইয়া কোঁচার কাপড়ে তাহার ধুলা ঝাড়িয়া তাহাকে আবার চৌকির উপর স্থাপনা করিল। টেবিলে রাখিবার ফ্রেম, মালতীর শখেই কেনা। ছবি দাঁড়াইলে, প্রিয়নাথ ফুলের মালা বাহির করিয়া তাহার চারিদিকে জড়াইয়া দিল। এই হইয়া গেল তাহার বিবাহের স্মৃতি-উৎসব।

বার চারেক এ উৎসব অন্যরকমের হইয়াছিল। কিন্তু সে এ জগতের কথা নয়, সে মালতী চলিয়া গিয়াছে, সে প্রিয়নাথও বাঁচিয়া নাই। আর কিছু করিবার নাই। শাড়ীর কোনও ব্যবহার হইল না, তথাপি কেন যে শাড়ী কিনিয়া থাকে তাহা প্রিয়নাথ বলিতে পারে না। পাগলের পাগলামির অর্থ থাকে না। খাটের পায়াতে ঠেস্ দিয়া প্রিয়নাথ বসিয়া রহিল।

চোখে পড়িল দেয়ালের গায়ে লেখা সেই "ঝরা-মালতী"। তাহার উপরে লেখা "ঝরা মালতী", তাহারও উপরে আবার "ঝরা-মালতী"। সবার উপরে লেখা রহিয়াছে শুধু "মালতী"। এ সকল মালতীর দুষ্টামির চিহ্ন। বিবাহের বছর চারেক পরে প্রিয়নাথের একদিন ইচ্ছা হইল মালতীর নাম সে দেয়ালে লিখিয়া রাখিবে, যেন ঘুম ভাঙ্গিলেই ঐ নাম তাহার চোখে পড়ে। মালতী দুষ্টামি করিয়া তাহার নামের আগে লিখিল "ঝরা"। প্রিয়নাথ রাগ করিল এবং দেয়ালের আর একটু উপরে লিখিল "মালতী"। তাহার রাগ দেখিয়া মালতীর খেলা বাড়িল। সে ইহাকেও "ঝরা মালতী" করিল। আরও উপরে,—সেখানেও এই ছোট চৌকির সাহায্যে মালতীর হাত পৌঁছিল। প্রিয়নাথেরও রোখ চাপিল, সে বাক্স তোরঙ্গর উপর উঠিয়া অতি উঁচুতে লিখিল "মালতী"। তখন মালতীর দুষ্টামি হার মানিল—বাক্সর উপর প্রিয়নাথের নাম লেখা ছিল।

প্রিয়নাথ সেই "ঝরা মালতী"র পানে চাহিয়া রহিল। মাস কয়েকের ভিতরই মালতীর দুষ্টামি সত্য হইল। আসল মালতী যেমনই ঝরিল, সে ঝরা মালতীকে এক রাত্রিও কেহ ঘরে রাখিল না। আর এই লেখা 'ঝরা মালতী' আজ সাড়ে ষোল বৎসর দেয়ালের গায়ে ঠিক টিকিয়া আছে।

মধ্যে মধ্যে ভাঙ্গা জানালা দিয়া হাওয়া আসিয়া মালতীর ছবির মালা দোলাইয়া দিল, বাতির শিখা নাচিয়া নাচিয়া মালতীর ছবির ছায়াটিকে দেয়ালের উপর নাচাইতে লাগিল। ছবিটি ভিন্ন ঘরের সর্ব্বত্র নিরুপদ্রব ধূলির রাজত্ব। ক্লান্ত অবসন্ন দেহমন লইয়া প্রিয়নাথ বিমূঢ়ের মতো অনাবশ্যক ইতস্ততঃ দেখিতে লাগিল। হঠাৎ চোখে পড়িল ঘরের কোণে সাদা রঙের দীর্ঘ একটি কি বস্তু আঁকিয়া বাঁকিয়া পড়িয়া আছে। সাপের খোলস। মাঠে নহে, ধানক্ষেতে নহে, মালতীর এই ঘরেই সাপের গতিবিধি আছে। সৌভাগ্যবশতঃ প্রিয়নাথ এ ঘরে আর বাস করে না, তাই তাহাকে সাপে কামড়ায় না।

চাহিয়া চাহিয়া কখন এক সময় তাহার চোখের পাতা নামিয়া আসিল। কখন একসময় এক দমক হাওয়া আসিয়া বাতির লীলা শেষ করিয়া দিল! বাহিরে তখন উজ্জ্বল জ্যোৎস্নার প্লাবন বহিয়া চলিয়াছে, তাহার সহিত এ ঘরের কোনও সম্বন্ধ রহিল না। সে জ্যোৎস্না প্রিয়নাথের জন্য নহে। সে অন্ধকারে আপন গৃহের হারানো স্বর্গে বসিয়া ঘুমাইতে লাগিল।

* * *

মুরলী বলিল—"কি প্রিয়নাথদা, সত্যি আজই চলে এলেন? আমি কিন্তু মনে করেছিলুম—"

প্রিয়নাথ বলিল—"হ্যাঁ, আজ আস্‌বই, কর্ত্তাকে তো বলে গিয়েছিলুম।"

মুরলী মাথা নাড়িয়া বলিল—"তা বলেছিলেন বটে, কিন্তু আমি মনে করেছিলুম বৌদি কি আর আজই ছেড়ে দেবেন। তা দেখছি ছেড়ে দিয়েছেন, যাঁ্যা?"

প্রিয়নাথ খাতা খুলিতে খুলিতে ম্লান হাসিয়া কহিল—"হুঁ, তা ছেড়ে দিয়েছে।"

মুরলী বলিল—"হ্যাঁ, ভালো কথা, আসল কথাই যে জিজ্ঞাসা করা হয় নি, শাড়ী পছন্দ হয়েছে কি না বলুন দিকি।"

প্রিয়নাথ বলিল—"শাড়ী তো চমৎকার, পছন্দ তো হবারই কথা। খুব খুশী হয়েছে।"

তাহার চোখের উপর ভাসিল গাঙ্গুলীর ছোট মেয়ে খুকির আনন্দোদ্ভাসিত পাণ্ডুর শীর্ণ মুখখানি। সকালে আসিবার সময় প্রিয়নাথ খুকিকে ডাকিয়া তাহার হাতে শাড়ীটি দিলে দরিদ্র বালিকা বিহ্বল হইয়া চাহিয়া রহিল। দুইবার জিজ্ঞাসা করিয়াও যখন শুনিল এই আশাতীত অপরূপ সুন্দর শাড়ী তাহারই হইল, তখনও সে বিশ্বাস করিতে পারে নাই। বৃদ্ধ নবীন গাঙ্গুলীর চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল। গত রাত্রের কথা মনে করিয়া তিনি লজ্জার সহিত বলিলেন—"সত্যি বলছি প্রিয়নাথ, আমি তোমাকে তা মনে করে বলি নি বাবা।"

প্রিয়নাথ তাঁহাকে আশ্বস্ত করিল, সে কিছু মনে করে নাই। গাঙ্গুলী মহাশয় বলিলেন—"তবে কেন বাবা, অত দামের কাপড়টা ওকে দিয়ে নষ্ট করছ? তিন তিনটে টাকার একখানা কাপড়!"

গাঙ্গুলী অন্তর ভরিয়া আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন এবং প্রিয়নাথকে ছাড়িতে চাহিলেন না, ঘণ্টাখানেক বসিয়া যাহা হয় দুইটা শাকভাত খাইয়া যাইবার জন্য পীড়াপীড়ি করিলেন। জ্যাঠাইমার স্নেহের উপরোধ এড়াইয়া আসিয়াছিল, কিন্তু এই অনাত্মীয় গরীব ব্রাহ্মণের অনুরোধ প্রিয়নাথ হয় তো উপেক্ষা করিতে পারিত না; তাহাকে বসিতে হইত। কিন্তু গাঙ্গুলীর মেয়ে খুকি তাহাকে তাড়াইল।

বাঙ্গালা দেশের মেয়ের শিক্ষা বোধ করি তাহার অন্তর হইতে আসিয়া থাকে। প্রিয়নাথ দাদা হয়, গুরুজন। তাহার জন্ম-দিনের কাপড় কিনিয়া দিয়াছে। অতএব মাতৃহীনা খুকি, নিজের বিবেচনাতেই নূতন কাপড়টি পরিয়া লজ্জায় কুণ্ঠায় জড়োসড়ো হইয়া প্রিয়নাথের পিছনে দরজার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। প্রিয়নাথ দেখিতে পায় নাই, কিন্তু খুকির বাবা মেয়ের ইচ্ছা ও ভয় দুইই বুঝিয়াছিলেন। বলিলেন—"ভয় কি, এগিয়ে আয়। দাদা হয়, তোর নিজের দাদাই তো, লজ্জা কি রে? দেখ দেখ প্রিয়নাথ, এমন ভীতু মেয়ে দেখেছ কখনো। তোমাকে পেন্নাম করতে আসবে, তা দরজা পেরিয়ে আসতে পারছে না, এ কোথাকার বোকা মেয়ে গো।" অনাবিল আনন্দে বুড়া নবীন গাঙ্গুলী ছেলে মানুষের মতো হাসিতে লাগিল।

কিন্তু প্রিয়নাথ হাসিতে পারে নাই। ততক্ষণে তাহার পায়ের কাছে টক্‌টকে লাল পাড়ের আঁচলটি গলায় দিয়া খুকি প্রণতা হইয়াছে।

এ বিপদের সম্ভাবনার কথা প্রিয়নাথ ভাবিয়া দেখে নাই। তাহার পায়ে যেন কে সূচ ফুটাইল। ত্রস্ত চঞ্চল পদে, কী যেন জরুরী প্রয়োজনের কথা বলিতে বলিতে সে প্রায় ছুটিয়া বাহির হইয়া আসিয়াছিল। পিছনে বিস্ময়-বিমূঢ় বৃদ্ধ ও বালিকার দিকে ফিরিয়াও দেখে নাই।

মুরলী কি কাজে উঠিয়া গিয়াছিল, ফিরিয়া আসিয়া বলিল—"বৌদিকে বলেছেন তো যে তাঁর মুরলী ঠাকুর-পো পছন্দ করে জোর করে গছিয়ে দিয়েছে?"

প্রিয়নাথ খোলা খাতায় শূন্য দৃষ্টি স্থাপন করিয়া ঘাড় নাড়িল। তারপর হঠাৎ যেন জাগিয়া উঠিয়া একটু ইতস্তত: করিল, পরে খাতার পাতা ছাড়িয়া মুরলীর কৌতুকোজ্জ্বল মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—"মুরলীবাবু, কিছু মনে করো না ভাই, আমার স্ত্রী মারা গেছেন, আজ সাড়ে ষোল বছর হল। কাল আমাদের বিয়ের দিন ছিল, তা তো বলেছি। কিন্তু শাড়ীটাড়ী ফুলটুল কেন যে কিনি, তা নিজেও জানি না। ও আমার একটা পাগলামি।"

প্রিয়নাথ হাসিবার মতো মুখ করিয়া কলমে কালি লইয়া খাতায় দুর্গা নাম ফাঁদিতে সুরু করিল।

আর মুরলী অযথা হাসির কালিমা মুখে মাখিয়া তাহার কলমের পানে চাহিয়া রহিল।

জীবন-মরণ

শ্রীদেবনারায়ণ গুপ্ত

মায়া রজ্জুতে আমারে বেঁধেছ কেন?
জীবন-সন্ধ্যা প্রদীপ জ্বলিছে দূরে;
শত যন্ত্রণা বুকেতে বাজিছে যেন
জীবনের বাঁশী বাজিছে করুণ সুরে।

কেনা ও বেচার হাটের মাঝারে এসে,
বেচিয়াছি সব; কিছুই ত' কিনি নাই—
আপনার মাঝে আপনারে ভালবেসে
প্রেমের জুয়ারে ভাসিয়া চলেছি তাই।

আমারে ফিরাও—ফিরাও আমারে প্রিয়,
দু:সহ ব্যথা বহিতে পারিনা আর—
এবার তোমার সঙ্গী করিয়া নিও;
মরণ-ভেলায় করিব গো পারাপার।

চলতি ইতিহাস

শ্রীতিনকড়ি চট্টোপাধ্যায়

রুশ-জার্মান সংগ্রাম

বিগত একমাসে রুশ-জার্মান যুদ্ধের সর্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য ঘটনা সেবাস্তোপোলের পতন। ক্রিমিয়ার দুর্ভেদ্য দুর্গ দীর্ঘ আটমাস কাল শ্রেষ্ঠ যান্ত্রিক শক্তির বিরুদ্ধে অবরুদ্ধ অবস্থায় সংগ্রাম করিয়া অবশেষে নাৎসী বাহিনীর অধিকারে আসিয়াছে। কিন্তু এই বিজয়ের জন্য জার্মানীকে মূল্য দিতে হইয়াছে যথেষ্ট। অগণিত ট্যাঙ্ক, অসংখ্য বিমান, সংখ্যাতীত সৈন্য নিয়োগ করিয়া প্রতি পদক্ষেপে মৃত সৈন্যের দেহের উপর দিয়া নাৎসী বাহিনী সেবাস্তোপোলে প্রবেশ করিয়াছে। লাল সৈন্য যেভাবে শত্রুকে বাধা প্রদান করিয়াছে পৃথিবীর মহাযুদ্ধের ইতিহাসে তাহা অপূর্ব। নাগরিকগণের সুদৃঢ় নৈতিক শক্তিও প্রশংসনীয়। সেবাস্তোপোলের পতনের প্রায় দুই সপ্তাহ কাল পূর্বে বেসামরিক নাগরিকগণকে অপসারণ করা হয়। দীর্ঘ আট মাস ধরিয়া সেবাস্তোপোলের নরনারী যুদ্ধের ভয়াবহতার মধ্যে সৈন্যদের সহিত যুদ্ধের তীব্রতা ও কষ্টের অংশ সমানভাবে গ্রহণ করিয়াছে। সৈন্যদের জন্য শিবিরে প্রস্তুত আহার্যই তাহারা গ্রহণ করিয়াছে। প্রতি নাগরিককে একটি করিয়া হাত বোমা দেওয়া হইয়াছিল, শেষ শত্রুকেও যেন তাহারা চূর্ণ করিয়া আসিতে পারে। হিটলারকে এই দুর্গ বিজয় করিতে হইয়াছে অপরিমিত ক্ষতির বিনিময়ে। কিন্তু নাৎসী বাহিনীর যান্ত্রিক যুদ্ধে আমরা একাধিকবার লক্ষ্য করিয়াছি, জার্মান বাহিনী যে অঞ্চল অধিকারের জন্য অগ্রসর হয়, অপরিসীম দুঃখ এবং অপরিমেয় ক্ষতি স্বীকার করিয়াও তাহারা সেই অঞ্চল অধিকারের জন্য মরিয়া হইয়া অগ্রসর হয়; নাৎসী সমর-নীতির ইহা এক বৈশিষ্ট্য। ক্ষতির পরিমাণ প্রচুর হইলেও এই বিজয়লাভে হিটলার যথেষ্ট লাভবান হইয়াছেন। সামরিক দিক হইতে হিটলার সুবিধালাভ করিয়াছেন যথেষ্ট। ক্রিমিয়ার এই শেষ দুর্গ রুশ বাহিনীর হস্তচ্যুত হওয়ায় কৃষ্ণসাগরস্থ রুশ নৌবাহিনীর উপর ইহার যথেষ্ট প্রভাব পড়িবে। অথচ ককেশাশের তৈলখনির জন্য নাৎসী সৈন্যের অভিযানকালে কৃষ্ণ-সাগরস্থ রুশ নৌবহরের যে উল্লেখযোগ্য অংশ গ্রহণ করিতে হইবে ইহা পরিস্ফুট। দ্বিতীয়ত, ককেশাশের অভ্যন্তরে অভিযান পরিচালনাকালে সেবাস্তোপোলের ন্যায় সুদৃঢ় দুর্গ ও অঞ্চলকে অক্ষত অবস্থায় পিছনে ছাড়িয়া আসা যে সামরিক দিক হইতে কতখানি বিপজ্জনক ও অযৌক্তিক তাহা হিটলার বোঝেন। সেবাস্তোপোল অধিকার করিতে সক্ষম হওয়ায় এই বিষয়েও হিটলার নিশ্চিন্ত হইয়া স্বস্তির নিঃশ্বাস ত্যাগ করিতে পারিবেন।

জুলাই-এর প্রথমে নাৎসী বাহিনী কুরস্কে প্রবল আক্রমণ শুরু করে। কুরস্ক্-ভোরোনেশ্-রসোস্ অঞ্চলে প্রচণ্ড সংগ্রাম আরম্ভ হয়। শত্রু সৈন্যের প্রবল চাপে সংখ্যালঘিষ্ঠ লাল ফৌজ পশ্চাদপসরণে বাধ্য হয়। মস্কো হইতে যে রেলপথ রষ্টোভকে সংযুক্ত করিয়াছে সেই রেলপথই নাৎসী বাহিনীর লক্ষ্য। রেলপথের অপর এক অংশ অষ্ট্রাখান পর্যন্ত গিয়াছে। বর্তমানে সংগ্রাম চলিতেছে ডন নদীর নিম্নাঞ্চলে। রষ্টোভের ৩০ মাইল উত্তরে নভোচেরকাস্ক সোভিয়েট সৈন্য কর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়াছে। স্ট্যালিনগ্রাডের „১১৫ দূরে সিমলায়ানস্কায় প্রচণ্ড যুদ্ধ চলিতেছে। নাৎসী বাহিনী সকল শক্তি প্রয়োগ করিয়া দক্ষিণ ডন অতিক্রম করিবার জন্য সচেষ্ট। ইতিমধ্যেই জার্মানী দাবী করিয়াছে যে, নাৎসী সৈন্য রষ্টোভে পৌঁছিয়াছে। কিন্তু সোভিয়েট সরকার হইতে এই সংবাদ এখনও সমর্থিত হয় নাই। রয়টার কর্তৃক যে সংবাদ প্রেরিত হইয়াছে তাহাতে যুদ্ধের প্রকৃত অবস্থান বুঝা দুষ্কর। ২৫-এ জুলাই ভিসি হইতে প্রাপ্ত সংবাদে জানা যায় যে, প্রচণ্ড বিস্ফোরণে রষ্টোভের প্রকাণ্ড অট্টালিকাগুলি চূর্ণ হইয়া যাইতেছে। রুশ সৈন্যগণ বিশাল অট্টালিকাগুলিতে নির্দিষ্ট সময়ে বিস্ফোরণকারী বোমা রাখিয়া গিয়াছে এবং তাহাদের বিস্ফোরণে জার্মান বাহিনীর অগ্রগতি যথেষ্ট বাধা পাইতেছে। কিন্তু সোভিয়েট সৈন্য কর্তৃক সিমলায়ানস্কায়া পরিত্যাগের কোন সংবাদ এখনও আসে নাই। সিমলায়ানস্কায়া যদি নাৎসী অধিকারে আসে তাহা হইলে নদীপথে রষ্টোভের সহিত সংযোগ বিচ্ছিন্ন হইবে। অধিকন্তু পূর্ব হইতেই অপর দুইটি নাৎসী বাহিনী টালামরগে অবস্থান করিতেছে। পশ্চাদ্দিক হইতে এই বাহিনী রষ্টোভকে বিপন্ন করিতে পারে। যে কোন মূল্যে ফন্ বোক্ ককেশাশের দ্বারদেশে উপনীত হইতে ইচ্ছুক। অন্যূন ছয় লক্ষ সৈন্য এই অঞ্চলে নিয়োজিত হইয়াছে। দুই হাজার ট্যাঙ্ক এবং তদুপযুক্ত বিমান বহর এই রণাঙ্গনে প্রেরিত হইয়াছে। প্রতিদিন নূতন নূতন নাৎসী বাহিনী এই রণাঙ্গনে প্রেরিত হইতেছে। সেবাস্তোপোলের ন্যায় এই অঞ্চলেও নাৎসী বাহিনী আপন লক্ষ্যে পৌঁছিতে প্রয়াসী। কিন্তু অপরিমিত সৈন্য ও সমরোপকরণ ক্ষয়ের জন্য ফন বোক্ সম্প্রতি এক নূতন নীতি অবলম্বন করিয়াছেন। আমরা পূর্বে বহুবার লক্ষ্য করিয়াছি একাধিক অঞ্চল নাৎসী বাহিনী অধিকার করিয়াছে বলিয়া যখন জার্মানী হইতে ঘোষণা করা হইয়াছে, অন্যান্য সূত্র হইতে সেই সংবাদ কয়েক দিন পর পর্যন্ত সমর্থিত হয় নাই। এমন কি অধিকৃত হইয়াছে বলিয়া ঘোষণা করিবার পরেও নাৎসী বাহিনী যে সেখানে প্রবেশ করিতে পারে নাই এরূপ ঘটনাও রুশ-জার্মান যুদ্ধে একাধিক বার লক্ষ্য করা গিয়াছে। বিদ্যুৎগতি আক্রমণ যেমন জার্মান রণনীতির বৈশিষ্ট্য, তাহার দুর্বলতাও এইখানে। শত্রুপক্ষের কোন দুর্বল স্থান অনুসন্ধান করিয়া বাহির করিতে পারিলেই নাৎসী বিদ্যুৎ-বাহিনী প্রচণ্ড আঘাত হানিয়া সেই সঙ্কীর্ণ অংশ দিয়া স্বীয় ট্যাঙ্ক বাহিনীকে সম্মুখে চালাইয়া দেয়। মূল বাহিনী হইতে একটা অংশ বিচ্ছিন্ন হইয়া শত্রু বাহিনীর পিছনে বেগে প্রবেশ করে। কিন্তু পদাতিক বাহিনী তখনও বহু দূরে পশ্চাতে পড়িয়া থাকে। এই বাহিনীর লক্ষ্যে উপ-নীত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই জার্মানী ঘোষণা করে—উক্ত অঞ্চল অধিকৃত হইয়াছে। কিন্তু যে পর্যন্ত পদাতিক ও যান্ত্রিক বাহিনী

সেই স্থানে উপনীত হইয়া ঘাঁটি স্থাপন করিতে না পারে সে পর্যন্ত কোন অঞ্চলকে অধিকৃত বলিয়া ঘোষণা করা চলে না। একাধিক রণক্ষেত্রে রুশ বাহিনী নাৎসী সৈন্যের পুরোবর্তী ট্যাঙ্ক-বাহিনীকে ভিতরে প্রবেশ করিতে দিয়া পরে তাহাকে ঘিরিয়া ধরিয়া বিনষ্ট করিয়াছে। ফলে একদিকে যেমন জার্মানীর অধিকার ঘোষণা বিফল হইয়াছে, তেমনই ক্ষতিও স্বীকার করিতে হইয়াছে যথেষ্ট। ফলে ডনের নিম্নাঞ্চলে রষ্টোভের যুদ্ধে ফন্ বোক্ এই কৌশল পরিত্যাগ করিয়াছেন। প্রথমে বিমান আক্রমণ পরিচালনার পর পদাতিক বাহিনীকেই স্থলপথে প্রথম অগ্রসর হইতে হইয়াছে। পদাতিক বাহিনীর উপরে মস্তকে ছত্রাকারে বিমান বহর তাহাদিগকে রক্ষা করিতে করিতে অগ্রসর হইয়াছে। কিন্তু এই কৌশলের ফলে সৈন্যদের অগ্রগতি পূর্বের ন্যায় অতিশয় দ্রুত হইতে পারে না। দ্বিতীয়ত সৈন্য ক্ষয় হয় যথেষ্ট অধিক।

কিন্তু এইভাবে রষ্টোভ অধিকারে অগ্রসর হইয়া জার্মান বাহিনী যথেষ্ট বিপদের ঝুঁকি ঘাড়ে লইতেছে। রষ্টোভের পশ্চিমে টাগানরগে জার্মান সৈন্য আছে, উত্তর ও উত্তর-পূর্ব দিক হইতে রষ্টোভকে নাৎসী বাহিনী ঘিরিয়া ধরিবার চেষ্টা করিতেছে, যাহাতে রষ্টোভস্থ রুশ সৈন্যকে মূল সোভিয়েটবাহিনী হইতে বিচ্ছিন্ন করা যায়। এরূপ অবস্থায় রষ্টোভকে রক্ষা করা সম্ভব না হইলেও ভরোনেশে নাৎসীবাহিনী এই অঞ্চলের ন্যায় সমান কার্যক্ষম নয়। উক্ত অঞ্চলে সোভিয়েট সৈন্যই এখন আক্রমণাত্মক যুদ্ধ পরিচালনা করিতেছে। সোভিয়েট সৈন্য যদি এই অঞ্চলে জয়লাভ করে তাহা হইলে বগুচার, মিলেরোভো প্রভৃতি অঞ্চলের নাৎসীবাহিনী অসুবিধায় পড়িবে এবং জার্মান সৈন্যের পার্শ্বদেশের একাংশ রুশ আক্রমণের সম্মুখে উন্মুক্ত হইয়া পড়িবে। রণক্ষেত্রের এই অবস্থা লক্ষ্য করিয়া ইংলণ্ডস্থ অনেক সমালোচক বলিতেছেন যে, নাৎসীবাহিনী সম্ভবতঃ ষ্ট্যালিনগ্রাড পর্যন্ত অগ্রসর হইবে না। কিন্তু ককেশাশে অভিযান পরিচালনা করিতে হইলে স্ট্যালিনগ্রাড্ দখলে রাখা প্রয়োজন। কারণ ক্যাস্পিয়ানের সন্নিকটস্থ অষ্ট্রাখান পর্যন্ত যদি নাৎসীবাহিনী আপন বাহু বিস্তার করিতে না পারে, তাহা হইলে মূল সোভিয়েটবাহিনী হইতে ককেশাশস্থ রুশ সৈন্যকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করা জার্মানীর পক্ষে সম্ভব হইবে না। আর স্ট্যালিনগ্রাড্ অধিকার না করিয়া যদি নাৎসীবাহিনী অষ্ট্রাখান দখলে অগ্রসর হয় তাহা হইলে রুশবাহিনী স্ট্যালিন্‌গ্রাড্ হইতে জার্মানবাহিনীর উপর আক্রমণ চালাইতে সক্ষম হইবে; এ অবস্থায় অষ্ট্রাখানস্থ নাৎসী সৈন্যের মূল জার্মানবাহিনী হইতে বিচ্ছিন্ন হইবার আশঙ্কা যথেষ্ট বেশী।

উত্তর আফ্রিকা

'ভারতবর্ষ'-এর গত শ্রাবণ সংখ্যায় ফিল্ড মার্শাল রোমেলের বাহিনীর মিশরের অভ্যন্তরে ৯৫ মাইল পর্যন্ত অগ্রসর হইবার সংবাদ আমরা প্রদান করিয়াছিলাম। জার্মান বাহিনীর ঘাঁটি হইতে ১৫ মাইল দূরে মার্সা মাত্রুতে বৃটিশবাহিনী শত্রুপক্ষকে বাধা প্রদানের নিমিত্ত প্রস্তুত হইতেছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সঙ্ঘর্ষে মার্সা মাত্রু রক্ষা করা যায় নাই, রোমেলের বাহিনী মার্সা মাত্রু অধিকার করিয়া রেলপথ ধরিয়া পূর্বাভিমুখে অগ্রসর হইয়াছে, মার্সা মাত্রু হইতে আলেকজান্দ্রিয়া রেলপথের দ্বারা সংযুক্ত। কিন্তু তব্রুককে এবং যুদ্ধ মিশরের অভ্যন্তরে প্রবেশের পর যুদ্ধের যে অবস্থা সৃষ্টি হয়, তাহাতে জেনারেল অচিনলেক মিশরের যুদ্ধ পরিচালনার ভার এবং দায়িত্ব স্বয়ং গ্রহণ করেন। নাৎসী বাহিনীকে সাফল্যজনক বাধা প্রদানের নৈপুণ্য যে জেনারেল অচিন্‌লেকের আছে তাহা আরও একবার প্রমাণিত হইল। যুদ্ধের পরিচালনা ভার স্বয়ং গ্রহণ করিবার পর জার্মান-বাহিনীর অগ্রগতি বন্ধ হইয়া গিয়াছে। তব্রুকে যথেষ্ট সমরোপকরণ বিনষ্ট হওয়ার ফলে বৃটিশবাহিনী শত্রুপক্ষের তুলনায় অস্ত্রশস্ত্রে যে হীনবল হইয়া পড়িয়াছিল তাহা অনেকখানি পূরণ করা হইয়াছে। জেনারেল অচিন্‌লেকের সাফল্যই তাহার প্রমাণ। বৃটেন হইতে ভূমধ্যসাগর পথে এই সাহায্য আসা কঠিন এবং সময়সাপেক্ষও বটে, সম্ভবত পূর্বদিক হইতে আলেকজান্দ্রিয়ার পথে কিছু সাহায্য জেনারেল অচিন্‌লেক্ পাইয়া থাকিবেন। ফলে ফিল্ড মার্শাল রোমেলের অগ্রগতি যে শুধু বন্ধ হইয়াছে তাহা নহে, বৃটিশবাহিনী শত্রুপক্ষকে কয়েক মাইল পশ্চাদপসরণে বাধ্য করিয়াছে। বর্তমানে এল আলেমিনে যুদ্ধ চলিয়াছে। গত সপ্তাহে কয়েকদিন যুদ্ধ চলিয়াছিল প্রচণ্ড। একদিনে টেল-এল্-ঈশা তিনবার হাত বদল হয়। মধ্য রণাঙ্গনে রুবাইসৎ ও উহার কিঞ্চিৎ উত্তরে ডের এল্ সেইনে যুদ্ধ চলে। রুবাইসৎ এলাকায় জার্মানবাহিনী সামান্য অগ্রসর হইয়াছে। আফ্রিকার রণক্ষেত্রে জেনারেল অচিনলেকের বাহিনী শত্রুর বিরুদ্ধে আক্রমণ পরিচালনার সময় ফন্ বোকের বাহিনীর ন্যায় ছত্রাকৃতি বিমান বহরের সাহায্যে অগ্রসর হয়। উন্মুক্ত মরুভূমির যুদ্ধে বিমান বহরের প্রয়োজন ও কার্যকারিতা অত্যন্ত অধিক। আক্রমণকালে বিমান বহরই সাধারণতঃ প্রধান অংশ গ্রহণ করে। সম্প্রতি আফ্রিকায় যুদ্ধের তীব্রতা হ্রাস পাইয়াছে; উভয় পক্ষই অধিকৃত অঞ্চলে ঘাঁটিগুলি সুদৃঢ় করিতে অধিক মনোযোগী হইয়া উঠিয়াছে। বিমান হইতে এল ডাবায় দুইদিন বোমা বর্ষণ করা হইয়াছে। আলেকজান্দ্রিয়া হইতে প্রাপ্ত সংবাদে প্রকাশ, গত ২৪এ জুলাই বৃটিশ রণপোত মার্সা মাত্রুতে ষষ্ঠবার আক্রমণ পরিচালনা করে। প্রায় দুই হাজার গোলা মার্সা মাত্রুর উপর বর্ষিত হইয়াছে। শত্রুপক্ষের কয়েকখানি জাহাজ সলিল সমাধি লাভ করিয়াছে।

কিন্তু বর্তমানে যুদ্ধের তীব্রতা যথেষ্ট হ্রাস পাইয়াছে, উভয় পক্ষের স্থানীয় ঘাঁটিগুলি দৃঢ় করিবার চেষ্টা হইতে বোধহয় যে, উভয়েই আসন্ন প্রচণ্ড আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হইতেছেন। এই সময়ের মধ্যে নূতন সৈন্য ও সমরোপকরণ প্রাপ্তির সম্ভাবনাও উভয়ের মধ্যে সম্ভবত আছে। কোন কোন সমালোচকের ধারণা ডনের যুদ্ধ প্রবল আকার ধারণ করায় জার্মানীকে তাহার সমগ্র শক্তি ঐ অঞ্চলে নিয়োগ করিতে হইয়াছে। ফলে আফ্রিকায় উপযুক্ত সৈন্য ও সমরোপকরণের অভাবে ফিল্ড মার্শাল রোমেল বিশেষ সুবিধা করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। তাঁহাদের মতে রষ্টোভের যুদ্ধে নিষ্পত্তি হইলেই জার্মানী রোমেলকে নূতন সাহায্য প্রেরণে সক্ষম হইবে এবং তখন আফ্রিকায় জার্মানবাহিনী পুনরায় প্রবল শক্তিতে আক্রমণ শুরু করিবে। আপাতঃ দৃষ্টিতে ইহা সুযুক্তি বোধ হইলেও আমাদের ধারণা বিপরীত। তাহার কারণ, রষ্টোভের যুদ্ধে

জার্মানীকে সমগ্র শক্তি প্রয়োগ করিতে হইলেও ভবিষ্যতে রষ্টোভ যদি জার্মানী অধিকার করিতে পারে তাহা হইলেও সেই সময়ে রোমেলকে উপযুক্ত সৈন্য ও রণসম্ভার প্রেরণ করা জার্মানীর পক্ষে সম্ভব নহে। রষ্টোভের সংগ্রাম কোন যুদ্ধের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি নয়, উহা ককেশাশ যুদ্ধের আরম্ভ মাত্র। ককেশাশে অভিযান পরিচালনা করিবার সময় জার্মানীর আরও অধিক সৈন্য ঐ অঞ্চলে নিয়োগ করা প্রয়োজন। এতদ্ব্যতীত, কিছুদিন পূর্ব্বে মুসোলিনি আফ্রিকায় আসিয়া ঘুরিয়া গিয়াছেন। আফ্রিকার যুদ্ধের সহিত ইহা সম্পর্কশূন্য মনে করিবার কোন কারণ আমরা দেখি না। আমরা একাধিকবার বলিয়াছি, আফ্রিকার যুদ্ধ কোন খণ্ড, স্বয়ং-সম্পূর্ণ সংগ্রাম নয়, পৃথিবীর কোন সংগ্রামকেই বর্তমানে এই দৃষ্টিতে দেখিলে চলিবে না। আফ্রিকার যুদ্ধের সহিত রুশ-জার্মান যুদ্ধ বিচ্ছিন্ন সম্পর্ক নয়। আমাদের মনে হয়, জার্মানীর ককেশাশ অভিযান যখন আরম্ভ হইবে সেই সময়ে পূর্ব ভূমধ্যসাগর ও সুয়েজের প্রতি অবহিত হইবার আদেশ রোমেলের উপর আছে। সমুদ্রপথে সাহায্য প্রেরণ ব্যাহত করাই এই যুদ্ধের উদ্দেশ্য, সম্ভবত এই সময় লিবিয়ার মধ্য দিয়া কোন অভিযান প্রেরিত হইতে পারে। এতদ্ব্যতীত বর্তমানে মিত্রশক্তি রুশিয়াকে সাহায্যার্থ যে সকল রণসম্ভার প্রেরণ করিতেছে তাহার এক বিশেষ অংশ আসিতেছে পারস্যোপসাগরের মধ্য দিয়া। এই সরবরাহ-সংযোগ ক্ষুন্ন করাও প্রয়োজন। ফিল্ড-মার্শাল রোমেল হয়তো ইটালীয় সৈন্যের অপেক্ষা করিতেছেন এবং ককেশাশের যুদ্ধ কোন নির্দিষ্ট অবস্থায় উপনীত হইলে উত্তর আফ্রিকায় জার্মান অভিযান আবার প্রবল আকার ধারণ করিবে। আপন উদ্দেশ্য সাধনে সচেষ্ট রোমেলকে আমরা অচিরেই এই আক্রমণ পরিচালনে উদ্যোগী দেখিতে পাইব, কিন্তু জেনারেল অচিনলেকের উপযুক্ত নেতৃত্বে বৃটিশ প্রতিরোধের সম্মুখে তাঁহার এই মরুভূমি কুড়াইবার চেষ্টা কতটা সফল হইবে সে বিষয়ে সম্ভবত ফিল্ড মার্শাল ইতিমধ্যে নিজেই সন্দিহান হইয়া উঠিয়াছেন।

সুদূর প্রাচী

সুদূর প্রাচীর পরিস্থিতিতে কোন উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটে নাই। চীনের উপর আক্রমণের বেগ অনেকটা শিথিল হইয়া আসিয়াছে বলিয়াই বোধ হয় অর্থাৎ সুদীর্ঘ রণক্ষেত্রে একই সঙ্গে সমানগতি ও তীব্রতার সহিত অভিযান পরিচালনা করা জাপানের পক্ষে সম্ভব হয় নাই। ইহার প্রধান কারণ চীনা গরিলাবাহিনী। চীনা গরিলাবাহিনী সমস্ত দেশটিকে জালের মত ঢাকিয়া আছে। ফলে সেই জালের এক এক অংশে যে জাপ সেনা থাকে অন্যান্য সকল অংশের সহিত তাহার সংযোগ বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। আর এই উদ্ভ্রান্ত জাপবাহিনীকে চীনা যোদ্ধৃবাহিনী সহজেই হটাইয়া দিতে সক্ষম হয়। চেকিয়াং-কিয়াংসি রেলপথে যুদ্ধের প্রচণ্ডবেগ আর নাই, জাপবাহিনী এখানে আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধে প্রবৃত্ত। দক্ষিণ হোনানের অন্তর্গত সিন্‌যাং-এ চীন সৈন্যের প্রবল চাপ ক্রমশঃই বর্দ্ধিত হইতেছে। চেকিয়াং-এর অন্তর্গত পিংটে চীনসৈন্য পুনরুদ্ধার করিয়াছে। সম্প্রতি জাপান হোনান প্রদেশে যথেষ্ট সৈন্য সমাবেশ করিতেছে। লুংহাই রেলপথের পশ্চিম অংশে তাহারা সমবেত হইতেছে। লুংহাই রেলপথ ও পিপিং-হ্যাঙ্কাও রেলপথের সংযোগ স্থলে অবস্থিত চেংচাও সহরই তাহাদের আশু লক্ষ্য বলিয়া বোধ হয়।

এদিকে দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরে নিউগিনির অন্তর্গত পাপুয়াতে জাপবাহিনী অবতরণ করিয়াছে। পরপর দুইদিন ডারউইন সহরে তাহারা বিমান হইতে বোমাবর্ষণ করিয়াছে। অদূর ভবিষ্যতে জাপান অষ্ট্রেলিয়ার প্রতি যে অধিক মনোযোগী হইয়া উঠিবে ইহা তাহারই পূর্বাভাষ বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু আমরা একাধিকবার বলিয়াছি জাপান অতি শীঘ্র অষ্ট্রেলিয়া অধিকার করিবার জন্য যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবেনা। সমুদ্রপথে ইঙ্গ-মার্কিন যোগসূত্র বিচ্ছিন্ন করাই তাহার উদ্দেশ্য। মিত্রশক্তির নৌবহর ও স্থলবাহিনীর একাংশ যাহাতে সর্বদা উক্ত অঞ্চলে প্রস্তুত থাকে, অন্যান্য প্রয়োজনীয় স্থানে যাহাতে তাহাদের প্রেরণ করা সম্ভব না হয় ইহাও জাপানের লক্ষ্য। এই দুই উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত প্রভূত সৈন্য ও সমরোপকরণ আমদানি করিয়া দীর্ঘ সমুদ্রপথে সুদীর্ঘকাল ধরিয়া যোগাযোগ রক্ষা করিয়া অষ্ট্রেলিয়ায় অভিযান পরিচালনার প্রয়োজন নাই। যুদ্ধের এই সঙ্কটজনক মুহূর্তে জাপান এই অঞ্চলে অনতিবিলম্বে জুয়া খেলায় নামিতে পারে না। প্রবাল সাগরের যুদ্ধে পরাজয় জাপান বোধহয় এত শীঘ্র বিস্মৃত হয় নাই। উপরোক্ত দুই উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত জাপান অষ্ট্রেলিয়ার উত্তর-পূর্ব ও পূর্ব দিকস্থ দ্বীপগুলি অধিকার করিতে প্রয়াসী হইবে। অষ্ট্রেলিয়ার বন্দর ও নৌঘাঁটিগুলি যদি জাপান বোমাবর্ষণে ক্ষতিগ্রস্ত করিতে পারে এবং অষ্ট্রেলিয়ার পূর্বদিকস্থ দ্বীপগুলির উপর আধিপত্য বিস্তার করিতে পারে তাহা হইলেই ইঙ্গ-মার্কিন যোগসূত্রকে সাফল্যজনকভাবে ক্ষুন্ন করিবার আশা সে রাখে। এতদ্ব্যতীত আমাদের মনে হয়, জাপান হয়তো অন্য কোন রণাঙ্গনে অদূর ভবিষ্যতে আক্রমণ চালাইবার জন্য গোপনভাবে প্রস্তুত হইতে সচেষ্ট এবং সেইজন্যই মিত্রশক্তির দৃষ্টি অষ্ট্রেলিয়ার দিকে নিবদ্ধ রাখিয়া সে আপনার উদ্দেশ্য সফল করিতে ইচ্ছুক।

জাপান যখন অ্যালুসিয়ান দ্বীপপুঞ্জের প্রতি অবহিত হয় সেই সময়ে 'ভারতবর্ষ'-এর শ্রাবণ সংখ্যাতেই আমরা বলিয়াছিলাম ইহা জাপানের আক্রমণাত্মক যুদ্ধ নয়, প্রকৃতপক্ষে ইহা আত্মরক্ষামূলক সংগ্রাম। জাপান জানে, হাজার হাজার মাইল দূরবর্তী দেশে স্বীয় অভিযান পরিচালনা করিলেও তাহার আপন দেশের ভৌগলিক অবস্থান বর্তমান যুদ্ধে তাহার অনুকূলে নয়। আধুনিক সংগ্রামে বিমানের গুরুত্ব অনুপেক্ষনীয় এবং বিমানবহরের সাফল্য নির্ভর করে রণক্ষেত্রের দূরত্বের উপর। সেইদিক হইতে টোকিও জাপানকে কোন নিরাপত্তার আশ্বাস দেয় না। সেইজন্যই জাপানকে অ্যালুসিয়ান দ্বীপপুঞ্জের প্রতি অবহিত হইতে হইয়াছে। সম্প্রতি সংবাদে প্রকাশ, কিস্কা দ্বীপে জাপান সুদৃঢ় ঘাঁটি নির্মাণ করিতেছে। আপন গৃহরক্ষার সমস্যাই জাপানকে এই অবস্থায় আনিয়াছে। ভবিষ্যতে যদি আমেরিকার অভিযানে বাধা প্রদান করিতে হয়, অথবা আলাস্কা কিংবা সাইবেরিয়ায় অভিযান পরিচালনা করিতে হয় তাহা হইলে এই দ্বীপপুঞ্জের উপযোগিতা সেই ক্ষেত্রে অত্যন্ত অধিক। মার্কিন বিমান হইতে উক্ত দ্বীপে বোমাবর্ষিত হইতেছে। কিন্তু এই

অঞ্চলের সংবাদ এখনও অস্পষ্ট। এই অঞ্চলে জাপ-মার্কিন কার্য-কলাপ সম্বন্ধে রয়টারের সংবাদ এত অপর্যাপ্ত যে, সেই সংবাদের উপর নির্ভর করিয়া বিশেষ কিছু অনুমান করা কঠিন।

আবার একাধিক সূত্র হইতে সংবাদ প্রদত্ত হইতেছে যে, জাপান মাঞ্চুরিয়ায় প্রভূত সৈন্য সমাবেশ করিতেছে। মুকডেনের সকল কারখানায় প্রস্তুত অস্ত্রাদি মাঞ্চুরিয়াস্থ জাপবাহিনীর জন্য প্রেরিত হইতেছে। উদ্দেশ্য রুশিয়াকে আক্রমণ। কিন্তু জাপানের ভবিষ্যৎ অগ্রগতি সম্বন্ধে আমরা 'ভারতবর্ষ'-এর গত শ্রাবণ সংখ্যায় আলোচনা করিয়াছি; জাপানের পরিস্থিতিতে এখনও কোন পরিবর্ত্তন আসে নাই এবং আমাদের উক্ত মত পরিবর্ত্তন করারও কোন কারণ আজও ঘটে নাই বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস। ২৮. ৭. ৪২.

জন্মাষ্টমী

শ্রীবটকৃষ্ণ রায়

একদা অসুরের পীড়নের তাড়নায়
অমর- পরাজয়ে ধরা হ'য়ে অসহায়
শরণ লয়ে শেষে করে এসে নিবেদন
দেবতা- গণ সাথে জোড় হাতে "দয়াময়!
রক্ষা কর হরি জ্বলে মরি অনুখন
দৈত্য পদভার নিতি আর নাহি সয়"!

২

করুণা বিগলিত দেখি ভীত সুরগণ
কহিলা মৃদু হাসি আশ্বাসি নারায়ণ—
"হরিতে পাপভার বার বার পৃথিবীর
হয়েছি অবতার; উদ্ধার পীড়িতের
সাধিতে পুনরায় মথুরায় দেবকীর
জঠরে জনমিব হবে শিব জগতের"।

৩

তখন চারিধার বসুধার মধুময়,
হইল অনাবিল পঙ্কিল জলাশয়,
কূজন- মুখরিত সচকিত বনাগার,
কমল সরসীতে রজনীতে বিকশয়!
পুলক- বিহ্বল উচ্ছল পারাবার,
মলয়- সুশীতল মঙ্গল দিকচয়।

৪

সহসা ঋষিদের যজ্ঞের হোমানল
আবার ওঠে জ্বলি, দীপাবলী চঞ্চল—
যেন রে উদ্ভাসি ওঠে হাসি বার বার,
বায়ুতে সেথাকার মন্দার- পরিমল!
নুপুর রণ রণ বাজে ঘন পায়ে কার?
এল কি তাহাদের সাধনের সম্বল!

৫

রোহিণী সংক্রমি অষ্টমী ভাদরের
নিশীথ উপনীত সে অসিত- পক্ষের;
উদিত নিশ্চয়— সংশয় নাহি আর—
আলোকি সে আঁধার কারাগার কংসের
সকল সন্ত্রাস করি নাশ বসুধার
কারণ সেই অতি- দুর্ম্মতি ধ্বংসের!

আকাশে উত্থিত সঙ্গীত সুধাময়,
করিল দেবগণ বরষণ ফুলচয়,
বাহিরে ছিল যারা সেই কারা পাহারায়
ভুলিল রাজাদেশ; মোহাবেশ দুর্ব্বার
হরিল সম্বিত; বিমোহিত সে নিশায়
অরাতি জানিল না এ ছলনা যে মায়ার!

৭

শঙ্কা মনে ভেবে বসুদেবে জায়া তাঁর
কহিল "দেখ নাথ, চারি হাত এ কুমার
মোদের জনমিল; চারু নীল দেহ তার
শোভিত আভরণে, প্রহরণে দুই কর;
শঙ্খ অম্বুজে দুটি ভুজে ধৃত আর
কণ্ঠে অপরূপ কৌস্তুভ মনোহর!"

৮

আবার নিরখিল; জনমিল প্রত্যয়—
তাদের সন্তান ভগবান নিশ্চয়!
কহিল "বল প্রভু, এ কি কভু সম্ভব?
গোলক হ'তে আসি কারাবাসী আমাদের
তনয় নারায়ণ? দরশন দুর্ল্লভ
জানে যে মুনিগণ, দেবগণ ত্রিদিবের"!

৯

আসিল উত্তর— "দিনু বর একদিন
দোঁহার ঘোর তপে হ'ল যবে তনু ক্ষীণ—
বাসনা পুরাইতে পৃথিবীতে তোমাকার
তনয়- রূপে আসি পরকাশি আপনায়
করিব উদ্ধার এ ধরায় গুরুভার,
তারিব যারা আজ মরে লাজ- শঙ্কায়"।

১০

নিমেষে পুনঃ করি রূপ পরি- বর্ত্তন
স্বভাব- শিশু রাজে মা'র কাছে সুশোভন
কংস- ভয়ে যদি নিরবধি বেয়াকুল
লইয়া মোরে সাথে এ নিশাতে এইখন
নন্দ- রাজপুর যেথা দূর সে গোকুল
রাখিয়া এসো সেথা আছে যেথা গোপীগণ।

১১

সেথায় যোগমায়া ধরি কায়া তনয়ার
জনম লইয়া সে আছে কাছে যশোদার,
তাহারে তুলে লয়ে মোরে থুয়ে পুনরায়
আসিয়া হেথা ফিরে দেবকীরে করে দান
আমারি অংশজা সম্ভোজা কন্যায়;
হইবে কারাগার- দুখভার অবসান।

বনফুল

১৮

ভন্টু আপিস হইতে ফিরিতেছিল। আজ তাহার অনেক পূর্ব্বেই ফেরা উচিত ছিল কিন্তু কাজ সারিতে অনেক বিলম্ব হইয়া গেল। কাজ কি একটা যে তাড়াতাড়ি শেষ হইবে? মৃন্ময়ের জেল হওয়ার পর হইতে কাজের চাপ আরও বাড়িয়াছে। সমস্ত খুঁটিনাটি নিজে দেখিয়া ক্যাশ মিলাইয়া সমস্ত টাকা জমা দিয়া তবে তাহার ছুটি। ইন্দু কেমন আছে কে জানে। ইন্দুমতী আসন্নপ্রসবা, ক্রমাগত ভুগিতেছে। আজ সকালে বার দুই বমি করিয়া চোখ উল্টাইয়া এমন কাণ্ড করিয়া বসিয়াছিল যে পট্ করিয়া চল্লিশটি টাকা খসিয়া গেল। তাহাকে বাপের বাড়িতে যে ডাক্তার চিকিৎসা করিতেন তাহাকেই ডাকিতে হইল, তিনি নাকি উহার নাড়ি এবং ধাত ভাল বুঝেন। তাঁহার ফি বত্রিশ টাকা এবং যে সকল ঔষধ পথ্য তিনি ব্যবস্থা করিয়া গেলেন তাহার দামও আট টাকা। মুখটি বুজিয়া দিতে হইল। তিনি বলিয়া গেলেন যে প্রসবের পূর্ব্বে প্রসূতির যে সব পরিচর্য্যা প্রয়োজন, তাহার কিছুই করা হইতেছে না। আসন্ন-প্রসবার যে পরিমাণ দুধ ফল খাওয়া উচিত, যতটা বিশ্রাম এবং ব্যায়াম করা দরকার তাহার কিছুই হয় নাই। সত্যই হয় নাই। কি করিয়া হইবে? সংসারের নানাবিধ খরচ। দাদা আবার চেঞ্জে গিয়াছেন তাঁহাকে খরচ পাঠাইতে হয়, দাদার ছেলেরা স্কুলে পড়িতেছে তাহাদের সব খরচ দিতে হয়, বাকু অহিফেন এবং দুধের মাত্রা বাড়াইয়াছেন, বাবাজি আসিয়া জুটিয়াছেন। তাঁহার জন্ত খাঁটি গব্যঘৃত কিনিতে হইতেছে। ইহার উপর প্রসূতি-পরিচর্য্যার খরচ কি করিয়া জুটাইবে সে! তাহার মাহিনা বাড়িয়াছে বটে কিন্তু সংসার-খরচ তদপেক্ষা ঢের বেশী বাড়িয়াছে। ইন্দু এ বেলা কেমন আছে কে জানে। একবার ডাক্তার-বাবুর সহিত দেখা করিয়া গেলে কেমন হয়? কিন্তু ইন্দুর এ বেলার খবরটা না জানিয়া যাওয়া বৃথা। হঠাৎ ভন্টুর চিন্তাস্রোতে বাধা পড়িল, বাইকের ব্রেকটা সজোরে চাপিয়া ধরিয়া সে নামিয়া পড়িল। এ কি কাণ্ড! এ তো সে স্বপ্নেও ভাবে নাই।

"বল হরি হরিবোল—"

করালিচরণ বক্সি মড়া বহিয়া লইয়া যাইতেছে। করালি-চরণ বক্সি! কাহার মড়া? করালিচরণ দ্রাবিড় হইতে ফিরিয়াছেন না কি? কবে? ভন্টু কিছুই তো জানে না। সে গত ছয় মাস করালিচরণের কোন খোঁজই রাখে নাই। অবসরও ছিল না প্রয়োজনও হয় নাই। দুই বৎসর পূর্ব্বে সে হয়তো আগাইয়া গিয়া কুশল প্রশ্ন করিত, এমন কি তাহার সঙ্গে সঙ্গে শ্মশান পর্য্যন্ত গিয়া সমস্ত রাত কাটাইয়া আসিতেও হয় তো তাহার বাধিত না, আজ কিন্তু এসব করিবার কল্পনাও সে করিল না, পাশ কাটাইয়া সরিয়া পড়িল। বরং এই চিন্তাই মনে উদিত হইল—চামলদ আমাকে দেখিতে পায় নাই তো!

১৯

অনেক রাত্রে চিৎপুর রোড দিয়া শঙ্কর একা ফিরিতেছিল। এমন আনন্দময় উন্মাদনা তাহার জীবনে বহুকাল আসে নাই। তাহার দেহের প্রতি শিরা-উপশিরায় যেন সুধা তরঙ্গিত হইতেছিল। মনে হইতেছিল লোকনাথ ঘোষালের বিচারই কি ঠিক? প্রফেসার গুপ্তের শুচিবায়ুগ্রস্ত সাহিত্য রুচিই কি সাহিত্য-বিচারের একমাত্র মান-দণ্ড? তাহার মনের অস্বাভাবিক অবস্থা সম্বন্ধে সে হয় তো জ্ঞাতসারে সচেতন ছিল না, থাকিলে লোকনাথ ঘোষাল অথবা প্রফেসার গুপ্তের রসবোধে সন্দিহান হইতে সে হয় তো ইতস্ততঃ করিত। কিন্তু অবিমিশ্র প্রশংসার মদিরায় তাহার সমস্ত চিত্ত বিহ্বল, লোকনাথ ঘোষাল প্রফেসার গুপ্ত সব তখন তুচ্ছ হইয়া গিয়াছিল। অপূর্ব্বকৃষ্ণ পালিতের বিবাহবাসরে অকস্মাৎ অপ্রত্যাশিতভাবে একজন ভক্ত পাঠিকার সহিত দেখা হইয়া যাইবে ইহা কে কল্পনা করিয়াছিল! কুমারী নীরা বসাক সত্যই তাহাকে অবাক করিয়া দিয়াছে। সে তাহার সমস্ত লেখা শুধু যে পড়িয়াছে তাহা নয়, যত্নসহকারে বারম্বার পড়িয়াছে। তাহার কবিতা তো বটেই কিছু কিছু গদ্যও তাহার কণ্ঠস্থ, অনায়াসে মুখস্থ বলিয়া গেল! 'জীবন পথে' পুস্তকের নীহার তাহাকে মুগ্ধ করিয়াছে, 'উদ্বন্ধন' গল্পের নায়িকার দুঃখে সে অশ্রুপাত করিয়াছে, 'নাম-না-জানা' গল্পের সূক্ষ্মরসে সে অভিভূত। তাহার রুচি তুচ্ছ করিবার মতো নয়। টলষ্টয়-গোর্কি-পড়া মেয়ে। তাহার রসবোধ নাই এ কথা বলা চলে না। অতিশয় দক্ষতার সহিত সে পান্থ-নিবাসের যমুনা-চরিত্র বিশ্লেষণ করিল, তাহাতে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতার সমন্বয় দেখাইল। শঙ্কর সত্যই অবাক হইয়া গিয়াছে। কুমারী নীরা বসাকের মুখখানা বারম্বার তাহার মনে পড়িতে লাগিল। মেয়েটি দেখিতে কুৎসিৎ। সামনের দাঁতগুলি বড় বড়, গায়ের রং কালো, সামনের চুলগুলি প্রায় উঠিয়া গিয়াছে, চক্ষু দুইটিতেও তেমন কিছু সৌন্দর্য্য নাই। কিন্তু সাহিত্য-আলোচনা করিতে করিতে সে যখন উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল তখন সমস্ত কদর্য্যতাকে অবলুপ্ত করিয়া দিয়া তাহার চোখে মুখে যে রূপ উদ্ভাসিত হইয়াছিল তাহা দেহাতীত এবং সত্যই অনবদ্য। শঙ্করকে মুগ্ধ করিয়া দিয়াছে। শঙ্করের জীবনে অনেক নারী আসিয়াছে, কিন্তু ঠিক এমন মেয়ে শঙ্কর আর দেখে নাই। অধিকাংশ নারীর দেহটাই সর্ব্বপ্রথমে চিত্তকে আকৃষ্ট করে, কিন্তু নীরা বসাক রূপের অভাব সত্ত্বেও মনকে আকর্ষণ করে। সে যে নারী এ কথাটাই মনে থাকে না। এ কোথায় ছিল এতদিন? এই প্রসঙ্গে চুনচুনের কথাও শঙ্করের মনে পড়িল। চুনচুনেরও সাহিত্যপ্রীতি আছে, কিন্তু তাহা এত বেশী নীরব যে তাহার অস্তিত্ব সম্বন্ধে মাঝে মাঝে সন্দেহ হয়। চুনচুনেরও আজ বিবাহ হইয়া গেল। শঙ্কর যায় নাই, তাহার প্রবৃত্তিই হয় নাই। চুনচুন যে স্বেচ্ছায় পীতাম্বরবাবুকে বিবাহ করিতে পারে ইহা তাহার কল্পনাতীত ছিল। ওই লোভী লোমশ বৃদ্ধটার

মধ্যে সে কি এমন দেখিতে পাইল? যদি কোনদিন চুনচুনের সঙ্গে নির্জ্জনে দেখা হয় তাহা হইলে তাহাকে সে জিজ্ঞাসা করিবে পীতাম্বরবাবুর মাধুর্য্যটা কোথায়। হয় তো কিছু আছে যাহা শঙ্করের অনধিগম্য। সহসা শঙ্করের মনে হইল চুনচুনের সহিত এতদিনের পরিচয়, অথচ তাহার সম্বন্ধে সে কত কম জানে। যতীন হাজরার শোচনীয় মৃত্যুর রাত্রিটা মনে পড়িল। সেই গভীর রাত্রে গোপনে খিল খুলিয়া দেওয়া! সেদিনও চুনচুন যেমন রহস্যময়ী ছিল আজও তেমনি রহস্যময়ী আছে। তাহার অন্তরলোকের দ্বার আজও শঙ্কর খুলিতে পারে নাই। হঠাৎ তাহার মনে হইল খুলিবার প্রয়োজনটাই বা কি। সকলের অন্তরলোকের খবর যে তাহাকে রাখিতেই হইবে এমনই বা কি কথা আছে। সিগারেট বাহির করিবার জন্য সে পকেটে হাত পুরিল। হাত পুরিতেই বিবাহের প্রীতি-উপহারখানা হাতে ঠেকিল। একটা ল্যাম্প পোষ্টের নীচে দাঁড়াইয়া বহুবার-পঠিত সনেটটা সে আবার পড়িল। চমৎকার করিয়া ছাপাইয়াছে। অপূর্ব্ববাবুর রুচিটা যে সুমার্জ্জিত তাহাতে সন্দেহ নাই। অপূর্ব্বকৃষ্ণের উপর শঙ্করের বরাবরই বিতৃষ্ণা, আজ এই উপলক্ষে বিতৃষ্ণাটা যেন অনেক কমিয়া গেল। মনে হইল তাহার উপর এতদিন সে অকারণে অবিচার করিয়াছে। তাহার উপর রুষ্ট হইয়া থাকিবার ন্যায়সঙ্গত কোন কারণই তো নাই। কৃতবিদ্য মার্জ্জিতরুচি ভদ্রলোক, অতিশয় নিরীহ, কাহারও সাতে পাঁচে থাকিতে চান না, কাহারও উপকার ভিন্ন অপকার করেন না, সঙ্গীত বিষয়ে সত্যই গুণী। নারীজাতি সম্বন্ধে অবশ্য কিঞ্চিৎ দুর্ব্বলতা আছে। কিন্তু সে দুর্ব্বলতা কাহার নাই? বউটিও বেশ হইয়াছে। চমৎকার মেয়েটি। যেমন রূপ তেমনি গুণ। মেয়েটি কিছুকাল পূর্ব্বে অপূর্ব্বকৃষ্ণেরই ছাত্রী ছিলেন। গরীব ব্রাহ্ম ঘরের মেয়ে, অপূর্ব্বকৃষ্ণের সহায়তাতেই না কি ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করিয়াছেন, গান বাজনাও শিখিয়াছেন। হয় তো উহারা সুখেই থাকিবে।

কিছুদূর গিয়াই শঙ্কর কিন্তু অপূর্ব্বকৃষ্ণের কথা ভুলিয়াই গেল। পকেট হইতে সনেটটা বাহির করিয়া আর একটা ল্যাম্পপোষ্টের নীচে দাঁড়াইয়া আবার সেটা পড়িতে লাগিল। সকলেই কবিতাটার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়াছে। ক্ষণকাল ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া সে দাঁড়াইয়া রহিল, তাহার পর হঠাৎ বিডন ষ্ট্রীটে ঢুকিয়া পড়িল। বিডন ষ্ট্রীটের একটা গলিতেই লোকনাথবাবু থাকেন।

রাত্রি এগারোটা বাজিয়া গিয়াছিল, তবু লোকনাথবাবু জাগিয়াই ছিলেন। 'বঙ্কিমচন্দ্র' সম্বন্ধে বিরাট একটা প্রবন্ধ লিখিবেন বহুদিন হইতেই তাঁহার সঙ্কল্প ছিল। মফঃস্বলে সব বই পাওয়া যায় না বলিয়া লিখিতে পারেন নাই। কলিকাতায় আসিয়া লাইব্রেরী হইতে পুরাতন মাসিক ও নানা পুস্তক সংগ্রহ করিয়া তিনি প্রয়োজনীয় অংশগুলি টুকিয়া লইতেছিলেন। শঙ্করের ডাকে কপাট খুলিয়া দিলেন এবং এত রাত্রে শঙ্করকে দেখিয়া অবাক হইয়া গেলেন।

"এত রাত্রে কি মনে করে?"

"একটা বিয়ের নেমন্তন্ন খেয়ে ফিরছিলাম, ভাবলাম আপনি কি করছেন দেখে যাই।"

"আসুন আসুন! আমি বঙ্কিমকে নিয়ে পড়েছি। বঙ্কিম আধুনিক বঙ্গসাহিত্যের পুরোধা, অথচ তাঁর সম্বন্ধে ভাল করে' কোন আলোচনাই হয় নি এখনও। আমি ভাবছি আমার যতটুকু সাধ্য তা আমি করে' যাব। বঙ্কিমের ভাষার লিপিচাতুর্য্য প্রথমে দেখাতে চাই, বুঝলেন। বঙ্কিমের ভাষাটা—"

বঙ্কিম আলোচনা সুরু হইয়া গেল।

প্রায় ঘণ্টা দুই পরে শঙ্কর বাড়ি ফিরিল। বঙ্কিম সম্বন্ধে অনেক তথ্য সংগ্রহ করিয়া ফিরিল বটে কিন্তু মন তাহার অপ্রসন্ন। লোকনাথবাবু সনেটটির প্রশংসা তো করেনই নাই বরং ভর্ৎসনা করিয়াছেন, কবিতা লইয়া এরকম খেলা করিতে নিষেধ করিয়াছেন।

অমিয়া মেজেতে আঁচল পাতিয়া ঘুমাইতেছিল। পাশে থালায় পরোটা ঢাকা দেওয়া। শঙ্করের ডাকে অপ্রতিভমুখে সে উঠিয়া বসিল। শঙ্করও অপ্রতিভ হইয়া পড়িয়াছিল। তাহার যে আজ সন্ধ্যায় নিমন্ত্রণ ছিল একথা সে অমিয়াকে বলিতেই ভুলিয়া গিয়াছিল।

"যাই পরোটাগুলো গরম করি। ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।"

"মেজেতে শুয়ে ঘুমোচ্ছ কি করে', যা মশা।"

"মশারির ভেতর আলো ঢোকে না। এখানে শুয়ে শুয়ে পড়ছিলাম।"

তাহার পর মিটি মিটি চাহিয়া মুচকি হাসিয়া বলিল, "তোমারই বই পড়ছিলাম একখানা।"

"কোনটা"

"পান্থনিবাসখানা"

"কেমন লাগল"

"বেশ"

শঙ্কর কোটটা খুলিয়া চেয়ারে রাখিল।

"আবার ওখানে রাখছ? আলনা রয়েছে তাহলে কেন" —অমিয়া কোটটা তুলিয়া যথাস্থানে রাখিল। তাহার পর পাশের ঘর হইতে একটা কাপড় আনিয়া বলিল, "কাপড়টাও ছেড়ে ফেল, সমস্তটা দিন ওই এক কাপড়ে রয়েছ।"

কাপড় ছাড়া হইয়া গেলে অমিয়া বলিল, "হাত পা মুখ ধোবে না? বারান্দার কোণে জল গামছা সব ঠিক করে রেখেছি"

শঙ্কর হাত মুখ ধুইয়া আসিল।

"পান্থনিবাসখানা ভাল লাগল তাহলে তোমার"

"হ্যাঁ, বেশ তো। তবে—"

"আবার তবে কি"

"আমি সব বুঝতে পারি নি ভাল। আমার বিদ্যের দৌড় আর কতদূর—"

"কোনখানটা বুঝতে পার নি"

"ওই যমুনাকে। ওরকম মেয়ে আছে না কি, কি বিচ্ছিরি কাণ্ড, ওরকম করে না কি কেউ"

"করে বই কি"

"রাম রাম"

যমুনা মাতাল দুশ্চরিত্র স্বামীর আশ্রয় ত্যাগ করিয়া নানা বিপদ আপদের মধ্যে পড়িয়া অবশেষে নার্স হইয়া আত্মপ্রতিষ্ঠ

হইয়াছে এবং কালক্রমে একজন ডাক্তারের প্রেমে পড়িয়া উপলব্ধি করিয়াছে যে পৃথিবীতে প্রেমই একমাত্র কাম্য ধন। কিন্তু উক্ত ডাক্তার যখন তাহার প্রণয় ফাঁদে ধরা দিল না তখন যমুনার মনে হইল—কিছুই কিছু নয়, পৃথিবীটা একটা পান্থনিবাস মাত্র। ইহাই পান্থনিবাসের গল্প। এ সম্বন্ধে শঙ্কর নীরা বসাকের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা শুনিয়া আসিয়াছে, লোকনাথ ঘোষালের চুল-চেরা সমালোচনাও শুনিয়াছে। তাহার ইচ্ছা হইল অমিয়াকেও এই গল্পের আর্ট সম্বন্ধে সচেতন করে। কিন্তু অমিয়া হঠাৎ বলিয়া উঠিল; "তোমার গাল বালিশ করেছি আজ, দেখবে? একদিকে টক্‌টকে লাল শালু আর একদিকে কালো সাটিন—এই দেখ··· ভাল হয় নি? আমার ইচ্ছে ছিল এদিকটা নীল রঙের দিয়ে···"

"বেশ হয়েছে। পরোটা গরম কর"

"এই যে করি। খিদে পেয়েছে বুঝি, পাবে না, সেই কোন সকালে খেয়ে বেরিয়েছ। এতক্ষণ ছিলে কোথা"

"লোকনাথবাবুর কাছে"

আবার সনেটের কথাটা তাহার মনে পড়িয়া গেল।

২০

অপরাহ্ণ। সংস্কারক আপিসে শঙ্কর যথারীতি প্রুফ দেখিতেছিল। একটি নয় দশ বৎসরের বালক সসঙ্কোচে প্রবেশ করিল।

"শঙ্করবাবু কোথা"

"আমি শঙ্কর, কেন"

বালক একটি চিঠি দিল। ছবির চিঠি। ক্ষুদ্র পত্র।

ভাই শঙ্কর,

তিনদিন থেকে জ্বরে পড়ে আছি। শয্যাসঙ্গিনীও সঙ্গ নিয়েছেন। ঝি পলাতকা। সুতরাং বুঝতেই পারছ। তোমাকে লিখছি কারণ তোমাকে ছাড়া আর কাউকেই লেখবার নেই! কেউ ঠিক বুঝবেও না। সময় নষ্ট করে' তোমাকে আসতে বলছি না, কিন্তু যখন হয় একবার এসো ভাই। এটি আমার বড় ছেলে। যদি অসম্ভব না হয় এর হাতে, একটাকা না পারো, গণ্ডা আষ্টেক পয়সা দিও অন্তত। কাল থেকে সকলের অনাহার চলছে। ছবি

পত্রপাঠান্তে শঙ্কর বালকের দিকে চাহিল। ফরসা রং, শীর্ণ শরীর, জীর্ণ মলিন বেশবাস। পকেট হইতে ব্যাগ বাহির করিয়া দেখিল একটি মাত্র টাকাই আছে। "এই নাও। বাবাকে বোলো একটু পরেই যাচ্ছি আমি"—বালক চলিয়া গেল। প্রুফটা শেষ করিয়া শঙ্কর উঠিয়া পড়িল। চণ্ডীচরণবাবুর নিকট গিয়া বলিল, "গোটা দশেক টাকা আমার এখনই চাই।"

চণ্ডীচরণ বিনা বাক্যব্যয়ে শঙ্করের নামে খরচ লিখিয়া দশটি টাকা বাহির করিয়া দিলেন। শঙ্করের মনে পড়িয়া গেল যে সে আপিসের নিকট হইতে প্রায় দেড়শত টাকার উপর ধার করিয়া ফেলিয়াছে।

"আমি একটু বেরুচ্ছি, বুঝলেন, ছবির খুব অসুখ"

চণ্ডীচরণবাবু চাহিয়া দেখিলেন মাত্র, 'হাঁ' 'না' কোন জবাব দিলেন না। শঙ্করের মনে হইল চণ্ডীবাবুর কাছে সে বৃথা জবাবদিহি করিতে গেল কেন! নিজের উপরই এজন্ত সে চটিয়া গেল এবং আর কালবিলম্ব না করিয়া বাহির হইয়া পড়িল এবং যেমন তাহার স্বভাব অন্যমনস্ক হইয়া পথ চলিতে লাগিল। সহসা বেথুন কলেজের গেটের সম্মুখে চুনচুনের সহিত দেখা। চুনচুন ট্রামের জন্ত অপেক্ষা করিতেছিল। শঙ্করকে দেখিয়া চুনচুন মাথার কাপড়টা একটু টানিয়া দিল, একটি অতি ক্ষীণ মৃদু হাস্যরেখা অধর প্রান্তে ফুটিল কি ফুটিল না বোঝাও গেল না। শঙ্কর দাঁড়াইয়া পড়িল। না দাঁড়াইয়া উপায় ছিল না, কিন্তু কি বলিবে সহসা সে ভাবিয়া পাইল না। চুনচুনই কথা কহিল।

"অনেকদিন পরে দেখা হল। আজই ভাবছিলাম আপনাকে ফোন করব। সন্ধের দিকে আপনার কবে অবসর আছে বলুন তো,"

"কেন"

"উনি বলছিলেন একদিন আপনাকে নিমন্ত্রণ করে খাওয়াতে"

"আমার অবসর নেই"

চুনচুন ক্ষণকাল শঙ্করের মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া তাহার পর ঘাড় ফিরাইয়া লইল। কিছুক্ষণ পাশাপাশি নীরবে দাঁড়াইয়া থাকিবার পর শঙ্করের মনে হইল দৃশ্যটা শোভন হইতেছে না। বেশিক্ষণ অবশ্য এভাবে থাকিতে হইবে না, অদূরে চুনচুনের ট্রাম দেখা যাইতেছে।

বলিল, "আচ্ছা চলি তবে আমি"

"আপনি মিছিমিছি রাগ ক'রে আছেন"

"কি করে' বুঝলে রাগ করে' আছি"

চুনচুন চুপ করিয়া রহিল।

শঙ্করও কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া উত্তর দিল, "তোমার মতো মেয়ে যখন পীতাম্বরবাবুর মতো লোককে স্বেচ্ছায় বিয়ে করে তখন রাগ হয় না, আশ্চর্য্য লাগে, একটু দুঃখও হয়"

"আমার মতন সাধারণ একজন মেয়েকে আপনি অত বড় করে' দেখছেন কেন বুঝতে পাচ্ছি না"

"পীতাম্বর বাবুর কি আছে যে তাকে বিয়ে করলে তুমি"

"টাকা"

শঙ্কর ভাল করিয়া চুনচুনের মুখের পানে চাহিয়া দেখিল। না, ব্যঙ্গ নয়, উহাই তাহার মনের কথা! অবাক হইয়া গেল। "টাকা! টাকার জন্যে তুমি বিয়ে করেছ?"

শঙ্করের মুক্তোকে মনে পড়িল।

চুনচুন উত্তর দিল না, সম্মুখের দেওয়ালটার পানে নির্ণিমেষ চাহিয়া রহিল। শঙ্করের কি জানি কেন হঠাৎ যতীন হাজরার মুখটাও মনে পড়িয়া গেল, তাহার শেষ কথাগুলিও।

"যতীনবাবুকে নিশ্চয় তুমি টাকার জন্যে বিয়ে করনি"

"টাকার জন্যেই করেছিলাম। কিন্তু তিনি আমায় ঠকিয়েছিলেন, তাঁর সত্যি কিছু ছিল না।"

"টাকার জন্যেই বিয়ে করেছিলে তাঁকে -"

"মনে করুন করেছিলাম, তাতেই বা লজ্জা পাবার কি আছে। টাকা না হলে সংসার চলে না, আর আমাদের মতো মেয়ের—যার না আছে রূপ না আছে গুণ—বিয়ে করা ছাড়া ভদ্রভাবে টাকা সংগ্রহের তার আর কি উপায় আছে বলুন"

"তোমার সম্বন্ধে ঠিক এ ধারণা ছিল না আমার"

"কি ধারণা ছিল"

"আমার ধারণা ছিল একটা উচ্চ আদর্শের জন্ত তুমি অশেষ কৃচ্ছ্রসাধন করতে পার"

"আদর্শ বজায় রাখবার মতো সঙ্গতি নেই আমার। শুধু আমার কেন, অনেকেরই নেই। এই দেখুন না, আপনার মতো লোককেও টাকার জন্যে তুচ্ছ একটা চাকরি করতে হচ্ছে। ও কাজ কি আপনার উপযুক্ত? কিন্তু উপায় কি বলুন, সংসারে টাকাটা দরকার যে—"

ট্রাম আসিয়া পড়িল।

"আমি যাচ্ছি। আসবেন একদিন"

ট্রাম চলিয়া গেল।

২১

শঙ্কর কিছুদিন পূর্ব্বে 'হাতুড়ি' নাম দিয়া একটি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছিল। আধুনিক কাব্য হিসাবে পুস্তকটি অনেকের প্রশংসা লাভও করিতে সমর্থ হইয়াছিল। সেই সম্পর্কে ডাক্তার মুখার্জ্জির একটি পত্র আসিয়াছে, শঙ্কর ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া তাহা পড়িতেছিল।

শঙ্কর,

বলশেভিজম্ নিয়ে কবিতা লিখে তুমিও আধুনিক হবার চেষ্টা করছ দেখে কষ্ট হল। অনেকের কাছে বাহবা পেয়েছ নিশ্চয়। বাংলাদেশে সমঝদার জোটা একটা দুর্ব্বিপাক। এই সমঝদারের গুঁতোয় সত্যেন্দ্র দত্ত 'বাঙালী পল্টন' আর শরৎ চাটুয্যে বোধহয় 'শেষপ্রশ্ন' লেখেন। রবীন্দ্রনাথও আত্মরক্ষা করতে পারেন নি। তোমার লেখা যে সব জায়গায় খারাপ হয়েছে তা বলছি না, কিন্তু পপুলার এবং আধুনিক হবার 'আপ্রাণ' প্রয়াস রসিকের নিকট হাস্যকর। নিন্দা শুনতে যদি ভালবাস, তবলা বাঁধা হবার আগে গান আরম্ভ করে' লম্বকর্ণ শ্রোতাদের তাক লাগাবার প্রবৃত্তি যদি কম থাকে তো তোমার উচিত আমার কাছে এসে খানিকক্ষণ হাতুড়ির ঠকঠক সহ্য করা। কারণ আমার বিশ্বাস তোমার অন্য সমঝদারেরা একটু আধটু বেসুরে বিক্ষুব্ধ হন না এবং তুমিও সেই কুসংসর্গে পড়ে বেসুরে সুর-সাধনা আরম্ভ করেছ। কিন্তু এ আমি করছি কি! নাঃ—

চিঠিতে আর কাব্য সমালোচনা করব না। লিখতে লিখতে হঠাৎ ভয় পেয়ে যাই। বয়স পঞ্চাশোর্দ্ধ হল। শাস্ত্রের উপদেশ এখন বনং ব্রজেৎ। বনে যেতে হয় নি, চারদিকে আপনা-আপনি বন গজিয়ে উঠল। কালো চুল সাদা হ'ল, সাদা দাঁত কালো হ'ল, স্বচ্ছ চোখের মণি ঝাপসা হয়ে এল ক্রমশঃ। যে পৃথিবীতে পঞ্চাশ বৎসর কাটালুম সে তার রূপ বদলে ফেলল। পুরানো যা ছিল তা আর হাতের কাছে নেই, নতুন যা এলো তাকে চিনি না। সব বদলে গেল, বদলালো না শুধু 'সোহং দেবদত্ত' এই জ্ঞান। তাই মাঝে মাঝে হঠাৎ বক্তৃতা করে ফেলি। তারপর চমকে থেমে গিয়ে হাতড়ে দেখি আশে পাশে কেউ নেই। অতএব বক্তৃতা করিব না। যদি কখনো দেখা হয় আমার কথা বোঝাবার চেষ্টা করব। ইতি—

শুভার্থী

নীলমাধব মুখোপাধ্যায়

ক্রমশঃ

ভ্রম সংশোধন—গত শ্রাবণ মাসের ভারতবর্ষে 'বনফুল' লিখিত 'জঙ্গম' উপন্যাসের মধ্যে একটি মারাত্মক ছাপার ভুল হইয়াছে। ১২৫ পৃষ্ঠার প্রথম কলমের ষষ্ঠ লাইন হইতে দ্বিতীয় কলমের ত্রিংশ লাইন পর্য্যন্ত অংশটি যে স্থানে বসিয়াছে, সে স্থানে না বসিয়া ১২৬ পৃষ্ঠায় দ্বিতীয় কলমে ৩৮শ লাইনের পরে বসিবে। অর্থাৎ ১২৫ পৃষ্ঠার প্রথম কলমের ৫ম লাইনের পরই ষোড়শ পরিচ্ছেদ আরম্ভ হইবে। এই ভুলের জন্য আমরা বিশেষ দুঃখিত এবং পাঠকপাঠিকাগণকে 'জঙ্গম' পাঠের সময় এই ভুল সংশোধন করিয়া পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

উদ্বোধন

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত

যদি ভুলে' যাও, তবে ভুলে' যাও, পুঞ্জিত ব্যথা-ভার,
মোচড়ি' তোমার কঠিন ঘাতনে, ছিঁড়ে' দাও এই তার,
গ্রন্থি-বাঁধনে, মথনে মথনে, যাহা কিছু জমে' উঠে
নিষ্ফল তার সঞ্চয়ভার, সহজে যায় যে টুটে;
তবুও চিত্ত নিঃস্ব-বিত্ত, তারই পানে ছুটে' যায়,
কিছু নাই, তবু কুড়ায়ে কুড়ায়ে, পুঞ্জ বানা'তে চায়;
হোক্ সে দুঃখ, হোক্ সে বেদনা, হোক্ সে হাসির ধারা,
আপন রসেতে আপনি যে ফোটে, আপনাতে হয় হারা;
ফাগুন দিনের মন্ত্রণা জাগে, পল্লব-দল-মাঝে,
তারই আনন্দ গন্ধ জাগায়, পুষ্পের নব সাজে,
ফুল ফোটে আর ফুল ঝরে' যায়, কে জানে তাহার কথা,
পাতা ঝরে' নব পল্লব ওঠে, কে জানে তাহার ব্যথা;
তারই অন্তরে মোহন যন্ত্র তরুতে নৃত্য করে,
অজানা রাগিণী ঝঙ্কৃত সুরে অন্তবিহীন ঝরে;
তারই উল্লাসে কল্লোলি' ওঠে বনস্পতির ফল,
রস নির্ঝর সঞ্চরি' ফেরে উল্লাসে টলমল।
দিন আসে, দিন চলে' যায় দূরে, গান নাহি যায় শোনা,
প্রাণের ধর্ম্ম চঞ্চরি' উঠে' ফলে করে আনাগোনা;
এমনি প্রাণের শক্তি আপনা আপনি সৃষ্টি করে,
আমি অভাগ্য সঞ্চয় করি আপন ক্ষুধার তরে;
বুদ্ধিরে মম নিদ্রিত কর বুলায়ে তোমার মায়া,
প্রাণেরে আমার জাগ্রত কর অঞ্চলে টানি' ছায়া;
তিল তিল করি গুঞ্জন করা পুঞ্জিত মধু মিছে,
কালের হস্ত দক্ষিণে বামে ঘুরি'ছে তাহার পিছে;
যে বাণী তোমার প্রাণের ধর্ম্মে আপনি বাঁচিতে পারে,
তারে ছেড়ে' দাও বিশ্বের মাঝে সৃষ্টির নব-পারে;
শক্তি যেথায় নিজ রচনায় রচিবে নূতন সৃষ্টি।
সেথায় জননী আমারে ফেরাও খুলে দাও নব দৃষ্টি।

বর্ত্তমান জীবনধারণ সমস্যা

শ্রীকালীচরণ ঘোষ

সাধারণ ভারতবাসী নিরক্ষর। ভূগোলের কোনও জ্ঞান তাহাদের নাই। সুতরাং ইম্ফাল বা ভোরোসিলভগ্রাড কতদূর এ প্রশ্ন তাহাদের মনেই উঠে না, যুদ্ধ কতদূর তাহারা জানে না। সহরের তোড়জোড়ের কাহিনী শুনিয়া বা কেহ কেহ পিতৃপিতামহের ভিটা ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়া, কেহ বা জীবিকার্জ্জনের একমাত্র অবলম্বন নৌকাখানি পুলিশ হেপাজতে জমা দিয়া মনে করিতেছিল যুদ্ধ "অত্যাসন্ন" এবং খুব বেশী দিন লাগিলে মাসখানেকের মধ্যে সব নিষ্পত্তি হইয়া যাইবে। তাহারা ইংরেজ ছাড়া অপর কোনও জাতিকে যুদ্ধে জয়ী হইবার কথা শুনে নাই, সুতরাং মনে করে জাপান ও জার্ম্মাণদের মরিবার জন্য পাখা উঠিয়াছে, ইংরেজের তেজে নিমেষে ভস্মীভূত হইয়া যাইবে। আবার তাহারা সুখে স্বচ্ছন্দ্যে শান্তিতে বাস করিতে পারিবে—এই তাহাদের বিশ্বাস।

"দিনে দিনে দিন কেটে গেল", যুদ্ধ আসিল না, কিন্তু যুদ্ধ সরিয়া গিয়াছে তাহারও প্রমাণ নাই। বরং যতই দিন যাইতেছে এবার যুদ্ধ যেন ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে; নাই, নাই, রব উঠিয়াছে। পরিচারক দোকানে ফর্দ্দ লইয়া গেল, চিনি, গুড়, মুগের ডাল, নারিকেল তৈল, যোয়ান ও বড় এলাচ আনিবে। তাড়াতাড়ি আসিয়া বলিল—প্রথম চারটী দোকানে নাই, শেষের দুইটী দোকানদার দিবে কি না জিজ্ঞাসা করিয়াছে। পূর্ব্ব দিন অতি কষ্টে কিছু চাউল সংগ্রহ করা হইয়াছে, বলা বাহুল্য সরকারী বাঁধা দরের অনেক বেশী মূল্যে, তাহা যোয়ান খাইয়া হজম করিবার প্রয়োজন নাই; অভাবের তাড়নায় এমনিই নাড়ী হজম হইবার যোগাড় হইয়াছে। তাহার পর দিন এবং পর পর আরও কয়দিন ফর্দ্দের তালিকা বাড়িয়া চলিল, কোনও দ্রব্যই পাওয়া যায় না। যে দামে যাহা পাওয়া যায়, তাহা গৃহস্থের বাঁধা আয়ের শক্তির বাহিরে। চিনি, কেরোসিন প্রভৃতি নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য কিনিতে যে সময় লাগে এবং রৌদ্রে বৃষ্টিতে, গুমোট গরমে যে ভাবে যান বাহনের হাত হইতে আত্মরক্ষা করিয়া ঘরে ফিরিতে হয়, তাহা আর লিখিয়া বুঝাইবার প্রয়োজন নাই। রেল, সিনেমা ও ফুটবলের টিকিট কিনিতে সারিবদ্ধ-ভাবে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়াছি। ক্রমে নোট ভাঙ্গাইবার জন্য কারেন্সীর দ্বারে লোক জমিয়াছে। আজ চিনি কেরোসিন কিনিতে তাহা অপেক্ষা কম কসরৎ করিতে হয় না। যাহাদের অর্থ ছাড়া সবল লোকজন আছে, চিনি কেরোসিন তাহাদেরই প্রাপ্য; প্রমাণ হইতেছে ইহারা বসুন্ধরার ন্যায় বীরভোগ্যা।

যাহা এত শ্রমে আয়ত্ত করিতে হয় না, তাহার অধিকাংশই আজকাল সাধারণের ক্রয় শক্তির বাহিরে। তাহার উপর ব্যবসায়ীদের অত্যাচার বর্ত্তমান। রেলের আয় বাড়িতেছে, বিলাতে আমেরী সাহেব ভারতবাসীর সুদিন দেখিতেছেন। কি ভাবে কি কারণে এবং কি অবস্থায় লোকে এই টাকা যোগান দিতেছে, তাহাদের ঘরের অবস্থা যে কি, তাহার খবর কে রাখে। একদিন জমিদারের খাজনা যোগাইয়া যদি সাত দিন অনাহারে থাকিবার পর ঘটনাচক্রে এক মুঠা ভিক্ষা পাইয়া লোক বাঁচিয়া যায়, জমিদার মনে করিতে পারেন, প্রজার অবস্থা ভাল। এখানে অনাহারে লোক তিলে তিলে মরে, কিন্তু—"অনাহার মৃত্যুর কারণ" বলিলে সরকারী ইস্তাহার সঙ্গে সঙ্গে তাহা মিথ্যা বলিয়া ঘোষণা করেন। কত লোক এই দুর্দ্দিনে অন্ন বস্ত্র চিকিৎসা ও গমনাগমন উপলক্ষে নিঃস্ব হইতেছে, ভিটা মাটী বিক্রয় করিয়া পরমুখাপেক্ষী পরনির্ভর হইয়া ভিক্ষায়ে জীবনাতিপাত করিতে প্রস্তুত হইতেছে, তাহা আমেরী সাহেবের সংবাদ রাখার কথা নহে। মধ্যবিত্ত ঘরের ৪।০ হইতে ৬৸০ দরের চাউল ৯।৽-১০৲, কাপড় ১৸৵০ হইতে ২৲ স্থলে ৭৲ টাকা, মার্কিন থান ৬৸০ স্থলে ২৩।৵০, চিনি ৮৸০ স্থলে ২২৲ বা ২৩৲ টাকা, ।৵০ আনার সুপারি ১।।০, এক পয়সার দিয়াশলাই ⁄০ (আবার ৫ বিড়ি বা সিগারেট লইতে হইবে), জ্বরের কুইনাইন ১১৲ বা ১২৲ স্থলে ৮০৲ হইতে ১০২৲ টাকা, কেরোসিন ⁄১৫ বা ৵৫ স্থলে ।৵ বা ততোধিক ইত্যাদি হারে চলিতেছে। আমেরী সাহেব বলিয়াছেন ভারতবর্ষ স্বল্প মজুরির দেশ—অবশ্য ভারতের লাট, চার্চ্চিলের তিন গুণ, রুজভেল্টের প্রায় দেড়া, টোজোর দশগুণ, পেঁতার পনেরো গুণ, ষ্টালিনের বিশগুণ হারে মাহিনা লন। সেই স্বল্প মজুরির দেশে এই হারে মাল ক্রয় করিয়া জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হইলে কি অবস্থা হয়, তাহা আমেরীর বিচার্য্য নহে। তিনি জানেন প্রত্যেক ভারতবাসীর পিতৃপিতামহ অজস্র ধনরত্ন প্রতি ভিটার নীচে পুঁতিয়া রাখিয়া গিয়াছে, ভারতবাসী তাহাই তুলিতেছে এবং সুখে দিন কাটাইতেছে। এ কথা হয় ত দুইশত বৎসর পূর্ব্বে খাটিত, কিন্তু আমেরী সাহেবের পিতৃপিতামহ সেই মাটীর নীচে খালি মৃৎভাণ্ডটী রাখিয়া আর সবই লইয়া আমাদের ফতুর করিয়াছেন, সে কথা একবার স্মরণ করিলে ভাল হয়।

দ্রব্যাদি কেবল যে দুর্ম্মূল্য হইয়াছে তাহা নহে, দুষ্প্রাপ্যও হইয়াছে। দুর্ম্মূল্যতা যতদূর দূর করা যায়, তাহার জন্য মূল্য নিয়ন্ত্রণ হইতেছে। এই কার্য্যে সরকার কতদূর সফল হইয়াছেন তাহা তাঁহারাই বলিতে পারেন। লোকের যে কি কষ্ট হইতেছে, তাহা সেদিনও যাঁহারা কংগ্রেসের সভ্য হিসাবে বক্তৃতামঞ্চে হাততালি পাইয়া আসর সরগরম করিয়াছেন, পাঁচশত টাকার অধিক মাসিক বেতনের বিরুদ্ধে ঘোরতর আন্দোলন চালাইয়া জনপ্রিয় হইয়াছেন এবং সেই জনপ্রিয়তার খাতিরে 'মসনদ' লাভ করিয়া আজ পাঁচ শতের উপর মাত্র আর দুই হাজার টাকা (Vide Half-yearly Civil List—1st Jany. 1942) লইয়া কায়ক্লেশে দিন কাটাইতেছেন, তাঁহারা বুঝিতে পারেন না। তাঁহাদের সহিত যাঁহারা বাঙ্গলার "ডাল ভাতের" যোগাড় করিবার ব্যবস্থা করিতে মাতিয়াছিলেন তাঁহাদের কথাও মনে পড়ে। এই দুই দলের সংমিশ্রণে যে 'খিচুড়ি'র উদ্ভব হইয়াছে, তাহা বঙ্গবাসী বেশ উপভোগ করিতেছে।

এই মূল্য নিয়ন্ত্রণের অর্থ কি? সম্প্রতি কয়েক দিন পুলিশ আসিয়া দর প্রভৃতির সংবাদ লইয়া হৈ চৈ করিতেছে, কিন্তু তাহা এই বিরাট দেশের মধ্যে কতদূর কার্য্যকরী হইবে, তাহা ভাবিয়া দেখিবার কথা। মালের যোগান না থাকিলে দোকানী নিয়ন্ত্রিত দরে মাল পায় না এবং তাহাদের পক্ষে উহা বিক্রয় করা আরও দুঃসাধ্য। সহর বাঁচিয়া থাকে পল্লীর উপর। পল্লীর মধ্যে মাল চলাচল প্রায় বন্ধ। ধানের কেন্দ্র হইতে সহরে চাউল পৌঁছান পর্য্যন্ত নৌকা, গরুর গাড়ী, মোটর লরী ও রেল অপরিহার্য্য। সরকারী ব্যবস্থায় ইহার অনেকই এখন নিয়ন্ত্রিত, সুতরাং মাল আসিবে কোথা হইতে? বেওয়ারিশ রপ্তানি করিতে দিয়া দেশের লোকের নিকট সর্ব্বপ্রকারে জবাবদিহি হওয়ার কথা। শান্তশিষ্ট দেশ ভগবানের উপর ভাগ্যের উপর দোষ চাপাইয়া মৃত্যুর দিকে চাহিয়া থাকে। ১৯৪১-৪২ সালে দশ কোটী টাকার খাদ্য-শস্য রপ্তানি হইয়াছে। এই দুর্ব্বৎসরে সিংহলে ৩৬,০০০ টন চাউল রপ্তানি হইতেছে, অথচ সিংহল ভারতবাসীর সহিত সেদিনও যে ব্যবহার করিয়াছে, তাহা একেবারে ভুলিয়া যাওয়া ঠিক নহে। কাপড় নাই, ভারত বিবস্ত্র হইতে বসিয়াছে। শতকরা ৩০ ভাগ তাঁত যুদ্ধের আয়োজনে লিপ্ত রহিয়াছে। যান-বাহনের অসুবিধা আছে, তাহার

উপর অবাধ রপ্তানিতে সাহায্য করিয়া ভারত সরকার তুরস্ক প্রভৃতি জাতির সহিত সদ্ভাব সংস্থাপনে ব্যস্ত। গত ১৯৪১-৪২ সালে প্রায় ৩৪ কোটী টাকা মূল্যের পরিধেয় বস্ত্র রপ্তানি হইয়াছে; সাধারণতঃ ইহা আট কোটী টাকার অধিক হইত না। গত এপ্রিল ও মে মাত্র দুই মাসে প্রায় আট কোটী টাকা মূল্যের কাপড় রপ্তানি করিতে দেওয়া হইয়াছে। সারা পৃথিবী জুড়িয়া ইংরেজের প্রচার কার্য্য চলিতেছে, ভারতের সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পাইয়াছে। যদি কোন সরকারী কর্ম্মচারী পল্লীর দিকে যাইতে চান, দেখাইতে পারিব, কি ভাবে লজ্জা নিবারণ করিয়া গৃহস্থের রমণী দিনযাপন করিতেছে। সহরের আবহাওয়া ও সরকারী বাৎসরিক বিবরণী পৃথিবীর সকল চিত্রের প্রতিচ্ছবি নয়। গত বৎসর এপ্রিল মে মাসে রপ্তানি দেড় কোটী টাকা ছিল, তৎপূর্ব্বে ৩০ বা ৪০ লক্ষ টাকার অধিক ছিল না। যদি কৃত্রিম অসুবিধা সৃষ্টি করা না হইত, তাহা হইলে বস্ত্রের মূল্য এভাবে বৃদ্ধি পাওয়ার কথা নহে।

মূল্য নিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে আরও একটী কথা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। সরকারের তরফে বোধহয় সুচিন্তিত পরিকল্পনা কিছুই নাই এবং যে সংবাদের উপর নির্ভর করিয়া মূল্য নিয়ন্ত্রিত হয়, তাহা সম্পূর্ণ ভুল। সেই কারণে তাঁহারা যে ইস্তাহার জারি করেন তাহা লোকে সন্দেহের চক্ষে দেখে। চাউলের মূল্য নিয়ন্ত্রণ লইয়া একটি চলিত-কথা মনে হয় "সেই ত মল খসালি, লোকটা কেন হাসালি"—ছয় টাকা চার আনা দর বাঁধিয়া দিয়া বিক্রেতা ক্রেতার মধ্যে অসন্তোষ বৃদ্ধি পাইল, যাঁহারা নিয়ন্ত্রিত দরে চাউল খাইবেন বলিয়া বসিয়া রহিলেন, তাঁহাদের ভাগ্যে অনাহারও জুটিল। এক মাস যায় নাই, বরং আউসের চালান পাইবার সময় উপস্থিত হইল, চাউলের নিম্নতম পাইকারী দর ৬।০ স্থলে ৭।০ প্রতি মণ হইল—যেন ৬।০ ও ৭।০ মধ্যে পার্থক্য এক বা দুই আনা। সামান্য আয়ের লোকের পক্ষে প্রতি মণ চাউলের দাম এক টাকা বৃদ্ধি পাওয়া যে কি, তাহা আড়াই হাজার টাকা বেতনভোগী, যথেচ্ছা ফার্ষ্ট ক্লাস ভ্রমণকারী, সরকারী কর্ম্মচারী পরিবৃত মন্ত্রী মহোদয়গণ বুঝিতে পারেন না।

লিখিতে গেলে আরও অনেক কথা আসিয়া পড়ে। মোটকথা যদি সরকারী নীতির আমূল পরিবর্ত্তন সাধন করা না যায়, তবে নগরবাসীর দুঃখের অবধি থাকিবে না। সকাল ন'টার মধ্যে হাজিরা দিবার পূর্ব্বে দূর পল্লীতে চাউল, শিলঙে আলু, করাচীতে লবণ, ঝরিয়া বা রাণীগঞ্জে কয়লা, ডিগবয় বা এ্যাটকে কেরোসিন, কোচিনে নারিকেল তেল, বাখরগঞ্জ কুমিল্লায় সুপারি, জলপাইগুড়ি বা বিহারে খয়ের, কানপুরে চিনি, যুক্তপ্রদেশে আটা সরিষা প্রভৃতি, পশ্চিম ভারতে দিয়াশলাই, আহম্মদাবাদে কাপড় প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া অফিস কারখানায় যাইতে হইবে। এই সকল লোকই প্রকারান্তরে যুদ্ধায়োজনে লিপ্ত। শুনিতে পাই সৈন্যের রসদ, যুদ্ধের সরঞ্জাম বহনে সমস্ত যান-বাহন ব্যস্ত। সৈন্য ছাড়া কারখানার কারিগর, কমিসারিয়েটের কেরাণী, ইঞ্জিনীয়ারিং বিভাগের হিসাব রক্ষক, নূতন রাস্তা নির্ম্মাণের কুলি মজুর, যান বাহনের চালক, মিস্ত্রি ইত্যাদি অজস্র লোক যুদ্ধায়োজনে সহায়তা করিতেছে। সৈন্য ও রাজপরিষদের সভ্যরাই যে যুদ্ধরত তাহা মনে করা ভুল। দেশের মধ্যে অভাবের অশান্তি যুদ্ধপ্রচেষ্টা ব্যাহত করিবে। সৈন্যের হাতিয়ার কাড়িয়া লওয়া যেমন অপরাধ—সেইরূপ যুদ্ধায়োজনে যাহারা মুখ্যতঃ বা গৌণতঃ লিপ্ত, তাহাদের অনাহার বা অর্দ্ধাহার নিবন্ধন, শক্তিহীন হইতে দেওয়া বা জীবন ধারণের অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্য সংগ্রহে অযথা সময় নষ্ট করিতে বাধ্য করা সমপর্য্যায়ভুক্ত অপরাধ। ইহার প্রতিকারের ব্যবস্থা সামরিক বা অসামরিক রাষ্ট্রনিয়ন্তাগণের দ্রষ্টব্য বিষয়, তাহার একটা মীমাংসা হওয়া অতীব প্রয়োজন।

কেবল এই কারণেই পণ্য যাহাতে সহজপ্রাপ্য হয়, তাহার ব্যবস্থা করা এখনই দরকার।

শেফালিকা

শ্রীবীণা দে

রাতের আঁধারে ফুটে শেফালিকা
খোঁজে—কই মোর দেবতা কই ?
ভোরের আলোর পরশ-মুগ্ধা
মুগ্ধ হইয়া লুটাল ওই।

জানেনা সে মনে পাবে কি না পাবে
হারাবে না র'বে দেবতা তা'র—
ছোট বুকখানি বড় আশা ভরা—
দেবতার বুকে হ'বে সে হার।

বুকে ঠাঁই পাওয়া—সে তো সুদূরের—
হয় যদি স্থান দেবতা পায়—
তাহ'লেও ঝরাফুলের জীবন
ভরিয়া উঠিবে সফলতায়।

না হ'লে তেয়াগি শাখা-আশ্রয়,
তেয়াগি পাতার আড়ালটুক্;
ধরার কঠিন আঘাতে চূর্ণ,
দলিত হবে গো পেলব-বুক।

কেহবা ক্ষণিক সুখের আশায়
কেহবা শুধুই খেলার ছলে—
তুলি' ল'য়ে পুনঃ ফেলি' দিবে পথে
শত শত পদে যাবে গো দলে' !—

ঝরা কুসুমের দরদী-দেবতা
কিশোর কিশোরী ভরিছে ডালি
কুসুম-কামনা ক'রেছে সফল
দিয়ে মা'র পায়ে ঝরা-শেফালি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—
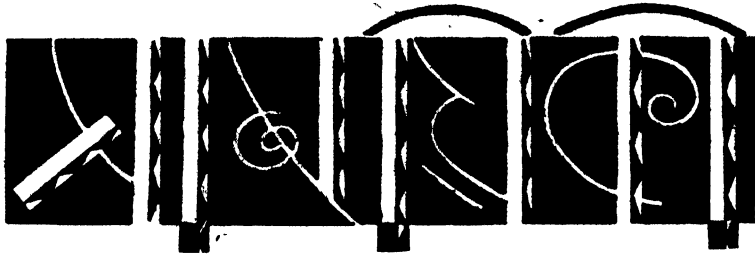
এক বৎসর পূর্ব্বে ১৯৪১ খৃষ্টাব্দের ৭ই আগষ্ট কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আমাদের মধ্য হইতে চলিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার ব্যক্তিত্ব এত বিরাট ছিল যে, আজও যেন আমাদের সে কথা বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না। তাঁহার রচনাবলীর মধ্যে তিনি চিরদিন আমাদের মধ্যে জীবিত থাকিবেন—শুধু আমাদের মধ্যে বলি কেন, বাল্মীকি, কালিদাস প্রভৃতি যেমন যুগযুগান্তর ধরিয়া তাঁহাদের কাব্যের মধ্যে জীবিত আছেন, রবীন্দ্রনাথও তেমনই ভাবেই পৃথিবীর সর্ব্বত্র জীবিত থাকিবেন। তাঁহার নশ্বর দেহ পঞ্চভূতে মিলাইয়া গিয়াছে মাত্র। কিন্তু দেশবাসী গত প্রায় ৭০ বৎসর ধরিয়া রবীন্দ্রনাথের নিকট ত অনেক দানই পাইয়াছিল—কিন্তু তাহার প্রতিদানে গত এক বৎসরে কি দিয়াছে, তাহাই আজ আমাদের আলোচনার বিষয়। তিনি যে বিশ্বভারতী ও শ্রীনিকেতন প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন, তাহা যাহাতে স্থায়ী হইয়া তাঁহার কীর্ত্তি ঘোষণা করে, সে জন্য সচেষ্ট হওয়া দেশবাসী মাত্রেরই কর্ত্তব্য বলিয়া আমরা মনে করি। উহার দ্বার সারা পৃথিবীর লোকের জন্য খোলা হইলেও উহা বাঙ্গালা দেশে অবস্থিত এবং বাঙ্গালীর নিজস্ব সম্পত্তি। কাজেই বাঙ্গালার ধনী সম্প্রদায়কে উহার রক্ষার ভার গ্রহণ করিতে হইবে। বাঙ্গালা দেশে ধনী দাতার অভাব নাই। তাঁহাদের অর্থ সাহায্য লাভ করিয়া বিশ্বভারতী ও শ্রীনিকেতন বাঙ্গালার গৌরব বর্দ্ধন করুক, আজ রবীন্দ্রনাথের মৃত্যু সাম্বৎসরিক দিবসে সর্ব্বান্তকরণে আমরা তাহাই প্রার্থনা করি।

পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ—

গত ২৬শে জুলাই কলিকাতা টাউন হলে কর্পোরেশনের ভূতপূর্ব্ব কর্ম্মসচিব শ্রীযুক্ত জে, সি, মুখার্জ্জির সভাপতিত্বে এক সম্মিলনে নিম্নলিখিত প্রস্তাবটি গৃহীত হইয়াছে—"অবিলম্বে নিয়ন্ত্রিত মূল্যে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি বিক্রয়ের জন্য সরকার কর্ত্তৃক প্রতি ওয়ার্ডে স্থানীয় আত্মরক্ষা সমিতির সহযোগিতায় অন্ততঃপক্ষে ৫টি করিয়া দোকান খোলা হউক। সরকার, খরিদ্দার ও দোকানদারদের তরফ হইতে সমান সংখ্যক প্রতিনিধি লইয়া প্রতি ওয়ার্ডে মূল্য নিয়ন্ত্রণ কমিটী গঠন করা হউক। কার্য্যকরীভাবে এই ব্যবস্থা পরিচালনা করিবার জন্য কমিটীগুলিকে সরকারের পক্ষ হইতে নির্দ্দিষ্ট ক্ষমতা দেওয়া হউক। ছোট ছোট দোকানদারের উপর যাহাতে অন্যায় চাপ না পড়ে সে জন্য নির্দ্দিষ্ট মূল্যে এইসব দোকানে মাল সরবরাহের ব্যবস্থা করা হউক। এই উদ্দেশ্যে সরকার কর্ত্তৃক পাইকারী দোকান খোলা হউক। কলিকাতা সহরে কর্পোরেশন নিয়ন্ত্রিত যে সব বাজার আছে, সেই সব বাজারে কেনাবেচা ও মাল সরবরাহের ব্যবস্থা করিবার জন্য আত্মরক্ষা সমিতি ও সরকারী প্রতিনিধি লইয়া কমিটী গঠন করা হউক।"

শান্তিনিকেতনে জলকষ্ট নিবারণ—

বোলপুর সহরে ও শান্তিনিকেতন অঞ্চলে মধ্যে মধ্যে দারুণ জলকষ্ট উপস্থিত হইয়া থাকে। শান্তিনিকেতনে স্কুল, কলেজ ও শ্রীনিকেতন প্রতিষ্ঠার ফলে এবং বহু লোক ঐ অঞ্চলে বসতবাটী নির্ম্মাণ করায় এখন ঐ স্থানের অধিবাসীর সংখ্যা আর অল্প নহে। অথচ জল সরবরাহের ব্যবস্থা করা দারুণ ব্যয়সাধ্য। আমরা জানিয়া আনন্দিত হইলাম—বাঙ্গালার অন্যতম জনপ্রিয় মন্ত্রী শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার বসু মহাশয় তথায় জল সরবরাহের ব্যবস্থায় মনোযোগী হইয়াছেন এবং সম্প্রতি কয়েকজন সরকারী কর্ম্মচারীকে সঙ্গে লইয়া স্থানটি দেখিতে গিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথ আজ নাই—তাঁহার প্রতিষ্ঠানটিকে বাঁচাইয়া রাখিয়া বড় করিবার চেষ্টা করা দেশবাসীমাত্রেরই অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া আমরা মনে করি। সন্তোষবাবুর এই চেষ্টা যাহাতে ফলবতী হয়, সকলেরই সে বিষয়ে অবহিত হওয়া উচিত।

ছাত্রদের আত্মরক্ষা শিক্ষাদান—

গত ১৭ই জুলাই কলিকাতায় আশুতোষ কলেজের প্রতিষ্ঠা দিবস উৎসবের সভাপতিরূপে ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ছাত্রদল গঠন সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহা সকলেরই প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলিয়াছেন—এখন হইতে সহরের কলেজগুলি খোলা থাকিবে ও নিয়মিতভাবে পড়া হইবে। কিন্তু এই বিপদের দিনে ছাত্রদের কি কোন কর্ত্তব্য নাই? ছাত্রদের সেজন্য উপযুক্ত শিক্ষা দিতে হইবে। কলেজে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই সেই শিক্ষা দেওয়া হইবে। এই ব্যাপারে কোন দলাদলি থাকিবে না—জাতির এই দুর্দ্দিনে সকল বিভেদ ভুলিয়া প্রত্যেক ছাত্রকে প্রত্যহ ২।৩ ঘণ্টা করিয়া আত্মরক্ষার উপায় শিক্ষা করিতে হইবে। কলেজে পড়ার সময়েই ঐ শিক্ষা দেওয়া হইবে। ইহার ফলে ছাত্ররা দেশের প্রকৃত হিতসাধনে সমর্থ হইবে। ডক্টর শ্যামাপ্রসাদের এই সাধু প্রস্তাব, আশাকরি সর্ব্বজনগ্রাহ্য হইবে।

যতীন্দ্রমোহনের স্মৃতি স্তম্ভ—

দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের মৃত্যু স্মৃতিবার্ষিকী গত ২২শে জুলাই দেশের সর্ব্বত্র সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়াছে। প্রায় দশ বৎসর পূর্ব্বে তিনি দেহত্যাগ করিয়াছেন বটে, কিন্তু এখনও পর্য্যন্ত কেওড়াতলা শ্মশানে যে স্থানে তাঁহার নশ্বর দেহ ভস্মীভূত হইয়াছিল তথায় কোন স্মৃতি স্তম্ভ স্থাপিত হয় নাই। আমরা জানিয়া আনন্দিত হইলাম, দক্ষিণ কলিকাতার প্রসিদ্ধ দেশকর্ম্মী শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় স্মৃতি স্তম্ভ যাহাতে সত্বর স্থাপিত হয়, সেজন্য কর্ম্মভার গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার চেষ্টায় সত্বর কার্য্যটি সম্পন্ন হইলে দেশবাসী চিরদিন তাঁহাকে শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করিবে।

ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেস—

আগামী জানুয়ারী মাসে লক্ষ্ণৌ সহরে ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের অধিবেশন হইবে স্থির হইয়াছে। যুক্তপ্রদেশের গভর্ণর সার মরিস হ্যালেট কংগ্রেসের উদ্বোধন করিবেন এবং পণ্ডিত জহরলাল নেহরু প্রধান সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। ডাক্তার এস-সি-ধর গণিত বিভাগে, ডাক্তার কে-বিশ্বাস উদ্ভিদ্ বিদ্যা বিভাগে, ডাক্তার এন, পি, চক্রবর্ত্তী পুরাতত্ত্ব বিভাগে সভাপতিত্ব করিবেন। বাঙ্গালার বৈজ্ঞানিকগণ এখনও ভারতের সর্ব্বত্র নানাক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত আছেন। তাঁহাদের কয়েকজন সম্মানিত হওয়ায় তাঁহাদের গৌরবে আমরাও গৌরবান্বিত বোধ করিতেছি।

লবণের অভাব—

নানা কারণে বর্ত্তমানে দেশে লবণের অভাব দেখা দিয়াছে। লবণের মূল্য ত বাড়িয়াছেই, তাহার উপর দাম দিয়াও অনেক স্থানে লবণ পাওয়া যায় না। গ্রামের কথা ছাড়িয়া দিলাম, কলিকাতা সহরেও এক এক দিন ১০খানা দোকানের মধ্যে ৯ খানাতে লবণ থাকে না। লবণ না হইলে আমাদের দেশের গরীব লোকেরা 'নুন ভাত'ও খাইতে পারে না। সে জন্য আমরা গভর্ণমেণ্টকে লবণ প্রস্তুত সম্বন্ধে আইনের কঠোরতা কমাইয়া দিতে বলিয়াছিলাম। কিন্তু পাছে তাহার ফলে গভর্ণমেণ্টের শুল্ক কমিয়া যায়, সে জন্য গভর্ণমেণ্ট এ প্রস্তাবে সম্মত হন নাই। তাঁহারা এক বিবৃতি প্রকাশ করিয়া এ দেশে বৎসরে কত লবণ উৎপন্ন হয় ও কত লবণ এখন ভারতে মজুত আছে তাহার হিসাব দেখাইয়া প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন যে ভারতে লবণের অভাব হইবে না। কিন্তু আমাদের ৪টাকা মণের লবণ ১০ টাকা মণ দরে কিনিতে হইতেছে এবং কোন কোন দিন পয়সা দিয়াও

দার্জ্জিলিংয়ে আশানটুলির বাড়ীতে রবীন্দ্রনাথ ও চীনা আর্টিষ্ট কাউ-জেন-ফু—১৯৩৪
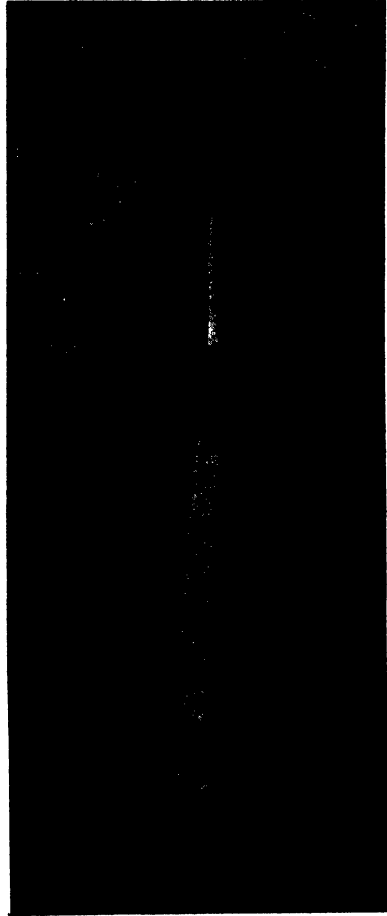
শিল্পী শ্রীমুকুল দের সৌজন্যে

ইয়োকোহামায় সিং টৌমিতারো হারা সায়োতানির বাড়ীতে রবীন্দ্রনাথ—১৯১৬　শিল্পী শ্রীমুকুল দের সৌজন্যে

লবণ পাইতেছি না—সে দুঃখের কথা কে শুনিবে? গৃহস্থের পক্ষে এই বর্ষার দিনে লবণ মজুত করিয়া রাখাও সম্ভব নহে—মজুত করিতে হইলে যে অর্থের প্রয়োজন তাহাও সকলের নাই। এ সকল কথা কি কেহ বিবেচনা করিয়া দেখিবেন না?

শিক্ষকগণের দুরবস্থা—

গত ১৮ই জুলাই বঙ্গীয় শিক্ষক-সমিতির উদ্যোগে এক সভায় কলিকাতা ও সহরতলীর শিল্পপ্রধান অঞ্চলের হাইস্কুলসমূহের ও প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণের দুরবস্থার কথা আলোচিত হইয়াছিল। বহু শিক্ষক কর্ম্মচ্যুত হইয়াছেন—অনেককে বাধ্য হইয়া অর্দ্ধ বা তদপেক্ষা কম বেতনে কাজ করিতে হইতেছে। গভর্ণমেণ্ট এ পর্য্যন্ত তাঁহাদের ক্ষতিপূরণের কোন ব্যবস্থা করেন

নাই। গভর্ণমেণ্ট ছাত্রাবাস নির্ম্মাণের জন্য যে ৩০ লক্ষ টাকা ব্যয় বরাদ্দ করিয়াছেন, তাহা এই সকল শিক্ষকের দুর্দ্দশা নিবারণের জন্য ব্যয় করা উচিত। সহর বা সহরতলীর স্কুলগুলি মফঃস্বলে তুলিয়া লইয়া গিয়া কোন সুফল হইবে না। তাহাতে বরং স্থানীয় স্কুলসমূহের ক্ষতি করা হইবে।

আমেরিকা হইতে ফেরত পথে জাপানে নারা পার্কে রবীন্দ্রনাথ—১৯১৭। শিল্পী শ্রীমুকুল দের সৌজন্যে

চাউলের দর নিয়ন্ত্রণ—

গত ২২শে জুলাই বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্ট এক ইস্তাহার প্রকাশ করিয়া চাউলের নিম্নলিখিত দর বাঁধিয়া দিয়াছেন—(১) মোটা চাউল—প্রতি মণ—মিলের দর—সাড়ে ছয় টাকা, গুদামের দর ছয় টাকা বার আনা, খুচরা দর সাত টাকা চারি আনা—প্রতি সের তিন আনা (২) প্রতি মণ মাঝারি চাউল—মিলের দর সাত টাকা, গুদামের দর সাত টাকা চারি আনা ও খুচরা দর সাত টাকা বার আনা—প্রতি সের তের পয়সা (৩) মোটা ধানের দর প্রতি মণ তিন টাকা দশ আনা—মাঝারি ধানের দর চারি টাকা। কিন্তু দুঃখের বিষয়, বাজারে অধিকাংশ দোকানে চাউল নাই—যাঁহাদের নিকট আছে, তাঁহারাও ঐ দরে বিক্রয় করিতেছেন না।

রবীন্দ্র সাহিত্যের সুলভ সংস্করণ—

রবীন্দ্রনাথের মহাপ্রয়াণের পর হইতে গত এক বৎসরকাল দেশের সর্ব্বত্র প্রায়ই রবীন্দ্রনাথের কথা ও তাঁহার সাহিত্য আলোচিত হইতেছে। ইহার ফলে রবীন্দ্র-সাহিত্যের প্রচার যে যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই। বিশ্বভারতীর কর্ত্তৃপক্ষও রবীন্দ্রনাথের রচনাবলী খণ্ডাকারে ক্রমে ক্রমে প্রকাশ করিতেছেন। কিন্তু প্রতি খণ্ডের সর্ব্বাপেক্ষা অল্প মূল্যের সংস্করণের দাম সাড়ে চার টাকা—এ পর্য্যন্ত সেরূপ প্রায় দ্বাদশ খণ্ড রচনাবলী প্রকাশিত হইয়াছে। কাজেই সাধারণ দরিদ্র ব্যক্তিদিগের পক্ষে রবীন্দ্র রচনাবলী পাঠ করাও সহজসাধ্য নহে। সে জন্য সর্ব্বত্রই এই কথা বলা হয় যে, বিশ্বভারতী যদি রবীন্দ্র রচনাবলীর সুলভ সংস্করণ প্রকাশ করেন, তাহা হইলে একদিকে যেমন রবীন্দ্র সাহিত্যের প্রচার বৃদ্ধি পায়, অন্যদিকে তেমনই উহা সর্ব্বসাধারণের পক্ষে সহজলভ্য হয়। আমরা এ বিষয়ে বিশ্বভারতী কর্ত্তৃপক্ষের মনোযোগ আকর্ষণ করি।

ব্রহ্ম প্রত্যাগতগণকে ক্যাম্বেল হাসপাতালে পরিচর্য্যা-রত কংগ্রেস-সেবকসেবিকাগণ

বি... ও পাঞ্জাব—

পাঞ্জাব গভর্ণমেণ্টের আদেশে পাঞ্জাবে বিক্রয়কর আইন প্রত্যাহার করা হইয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়

বাঙ্গালা দেশে এখনও তাহা বলবৎ রহিয়াছে। জিনিষপত্রের মূল্য-বৃদ্ধির ফলে লোকজনকে কিরূপ কষ্ট পাইতে হইতেছে, তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন। তাহার উপর বিক্রয় কর চাপিয়া সকলকে অধিক ভারগ্রস্ত করে। যে কারণে পাঞ্জাবে ঐ কর আদায় বন্ধ করা হইয়াছে, সে কারণ বাঙ্গালা দেশেও পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান।

শ্রীদেবীপ্রসাদ রায় চৌধুরী মাদ্রাজ গভর্ণমেণ্ট আর্ট স্কুলের প্রিন্সিপাল। তিনি তথায় ড্রইং রুমের সামনে একটি ছোট ছাদে প্ল্যাটফরম করিয়া একটি ছোট সখের বাগান করিয়াছেন। তাহার ছবি এই সঙ্গে দেওয়া হইল। ছবির তেঁতুল গাছটি মাত্র দেড় ফুট উচ্চ—বয়স ১৩ বৎসর। কুটীরগুলি সিমেণ্টএর তৈয়ারী—২ ইঞ্চির অধিক উঁচু নহে। শিল্পী দেবীপ্রসাদ এক যুগ ধরিয়া গাছের ডালগুলিকে ইচ্ছামত গঠন করিয়াছেন। বড়লাটপত্নী, মাদ্রাজের গভর্ণর, ত্রিবাঙ্কুরের মহারাজা প্রভৃতি বাগানটি দেখিয়া উহার শিল্প নৈপুণ্যে মুগ্ধ হইয়াছেন।

৭ই জুলাই বর্দ্ধমানে রেল দুর্ঘটনার দৃশ্য ফটো—তারক দাস

বাঙ্গালার মন্ত্রিবর্গ এ বিষয়ে অবহিত হইলে বিক্রেতা ও ক্রেতা উভয় পক্ষই লাভবান হইতে পারেন।

কলিকাতায় ট্রাম ধর্ম্মঘট—
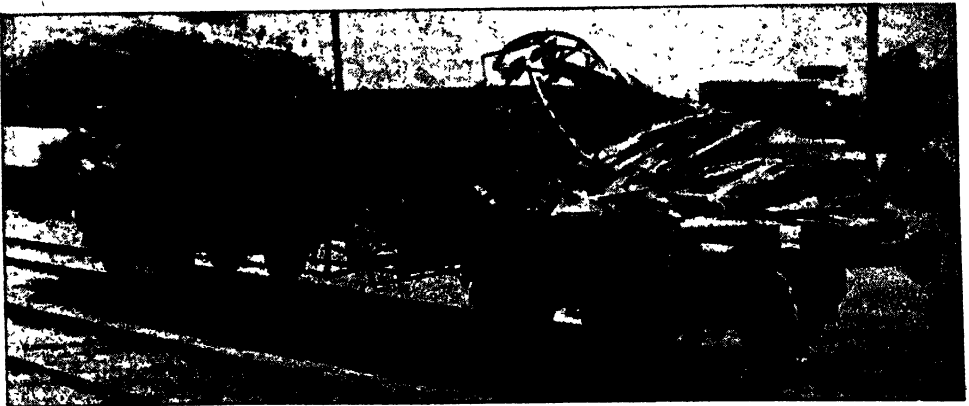
কলিকাতা ট্রাম কোম্পানীর কর্ম্মচারীরা তাহাদের অভাব অভিযোগ সম্বন্ধে কর্ত্তৃপক্ষের নিকট আবেদন জানাইয়া নিষ্ফল হওয়ায় দুইবার ধর্ম্মঘট করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। সম্প্রতি গভর্ণমেণ্টের হস্তক্ষেপের ফলে উভয়পক্ষের মধ্যে একটা সন্তোষজনক মীমাংসা হইয়া গিয়াছে। ট্রাম কোম্পানী প্রচুর অর্থ লাভ করে—কিন্তু

কোম্পানীর অল্প বেতনের কর্ম্মীরা বর্ত্তমানে এই দারুণ দুরবস্থার মধ্যে অনাহারে দিন কাটাইবে—ইহা কাহারও অভিপ্রেত হইতে

মিশর ও পার্শ্ববর্ত্তী অঞ্চল (যুদ্ধক্ষেত্র)

পারে না। ধর্ম্মঘটের ফলে দরিদ্র কর্ম্মীর দল যে কতকগুলি সুবিধা লাভ করিল, ইহাই সাধারণের পক্ষে আনন্দের বিষয়।

বাঙ্গলার জনস্বাস্থ্য—

বাঙ্গালা সরকারের ১৯৪০ সালের স্বাস্থ্য-বিবরণী আরও এক বৎসর পূর্ব্বে প্রকাশিত হইলে ভাল হইত। প্রায় সকল

নিউগিনি ও তৎসন্নিহিত দ্বীপপুঞ্জ (যুদ্ধক্ষেত্র)

পত্রিকাই এই বিলম্বের জন্য অনুযোগ করে; সম্ভব হইলে বৎসর শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বিবরণী প্রকাশ করা প্রয়োজন। তাহা না হইলে লোকের এই পুরাতন 'পঞ্জিকা' পাঠে আগ্রহ থাকে না। আলোচ্য বর্ষে প্রতি হাজার লোকের মধ্যে ২২.৩ জনের জীবনান্ত হইয়াছে; মোট সংখ্যা ১১,১১,০৮২। নবজাতের সংখ্যা ১৬,৮১,৮৪৬ অর্থাৎ প্রতি হাজারে ৩৩.৭ জন; ইহা পূর্ব্ব-পূর্ব্ব বৎসর হইতে কিছু বেশী। বাঙ্গালায় জন্ম ও মৃত্যুর হার দুই-ই অত্যন্ত বেশী। নভেম্বর মাসে জন্মসংখ্যা এবং ডিসেম্বর মাসে মৃত্যুসংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। প্রতি হাজার নবজাত জীবিত শিশুর মধ্যে এক বৎসরের মধ্যেই ১৫৭.৩ কালগ্রাসে পতিত হয়। ১০ হইতে ১৫ বৎসর বয়স্কদের মধ্যে মৃত্যুর হার

সর্ব্বাপেক্ষা কম, হাজারে ৬'৪ মাত্র। বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীর মধ্যে কৃশ্চান মরে হাজারে ১২'১, বৌদ্ধ ১৮'১, হিন্দু ২০'৮, মুসলমান ২৩'০। কৃশ্চানদিগের মধ্যে অভাব কম, শিক্ষিতের সংখ্যা বেশী এবং জীবনযাত্রার প্রণালী উন্নত। মৃত্যু-ঘটিত রোগের মধ্যে প্রতি শত লোকের ৬৪'৬ মরিয়াছে সর্ব্বপ্রকার জ্বরে, শ্বাসযন্ত্রের পীড়ায় ৭'৭, কলেরায় ২'০, বসন্তে '৫, আমাশয়ে ২'২৩, উদরাময়ে ১'৮৬, বাকী অন্যান্য রোগে। এ বৎসর জ্বর সম্বন্ধে একটু বক্তব্য আছে। সর্ব্বপ্রকার জ্বরে যত মরিয়াছে অর্থাৎ ৭,১৭,৫১৬, তন্মধ্যে ম্যালেরিয়া অর্দ্ধেক বা ৩,৬৯,৪৪৮। সমস্ত মৃতের মধ্যে ম্যালেরিয়ার অংশ ৩ ভাগের এক ভাগ। সংবাদপত্রে দেখা গেল, জাপান গত পাঁচ বৎসরের যুদ্ধে ২,৫০,০০০ লোক বলি দিয়াছে, আহত ও বন্দীর সংখ্যা অবশ্য স্বতন্ত্র। বাঙ্গালার ম্যালেরিয়া হইতে এক বৎসরের মৃত্যু সংখ্যা ইহা অপেক্ষা অনেক বেশী। এমন কি মহাসমরে হত জার্ম্মাণের সংখ্যাও আমাদের সংবাদদাতাদিগের মতে তিন লক্ষের অধিক নহে। এই সকল ঘটনার সহিত তুলনা করিলে আমাদের প্রকৃত অবস্থা হৃদয়ঙ্গম হয়। রোগের কারণ অনুসন্ধান করিলে দেখা যায়, অধিকাংশই নিবার্য্য ব্যাধি। মানুষের মৃত্যু কেহ রোধ করিতে পারে না, কিন্তু অকালে ও নিবার্য্য ব্যাধি হইতে লোক-ক্ষয় হইতে থাকিলে জাতির সর্ব্বনাশ। আমাদের মনে হয় এই সকল মৃত্যুর মধ্যে উপযুক্ত আহারের অভাবে অধিকাংশই অকালে মরিয়াছে; তাহার সহিত চিকিৎসার অভাব মনে করিলে অত্যধিক মৃত্যুহারের কারণ নির্দ্ধারণ করা কঠিন নহে। কেবলমাত্র স্বাস্থ্য-বিভাগই ইহা নিরাকরণে সমর্থ নয়, লোকে যাহাতে পেট পুরিয়া দু'মুঠা খাইতে পায়, তাহার ব্যবস্থা করাও সরকারের কর্ত্তব্য।

উত্তর ককেশাশ (যুদ্ধক্ষেত্র)

৭ই জুলাই বর্দ্ধমান ষ্টেশনে রেল দুর্ঘটনার দৃশ্য (আপ ডেরাডুন এক্সপ্রেসের সহিত আপ দিল্লী এক্সপ্রেসের সংঘর্ষ) ফটো—তারক দাস

কলিকাতায় আলুর অভাব—

অন্যান্য সকল জিনিষের মত কলিকাতার বাজারে এবারে আলুরও বিষম অভাব হইয়াছে। রেঙ্গুন হইতে যে প্রচুর আলু আসিত তাহা আর আসিবে না। মাদ্রাজ, সিমলা, নৈনিতাল প্রভৃতি স্থান হইতে মালগাড়ীর

অভাবে আলু আসিতেছে না। শিলংয়ে প্রচুর আলু জন্মিয়া থাকে। যদি গভর্ণমেণ্ট সে আলু প্রচুর পরিমাণে কলিকাতায় আনাইবার ব্যবস্থা না করেন, তাহা হইলে একদিকে লোক যেমন আলু খাইতে পাইবে না, অন্যদিকে তেমনই বীজের অভাবে আলুর চাষও কম হইবে। যাঁহারা অধিক খাদ্যশস্য উৎপাদনের আন্দোলন করিতেছেন, তাঁহাদের আলুর চাষের সুবিধা বিধানে মন দেওয়া উচিত।

রায় বাহাদুর হিরণলাল মুখোপাধ্যায় (গত মাসে ইঁহার মৃত্যুসংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। মুর্শিদাবাদে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের কাজ করিতে করিতে ইনি সহসা কলিকাতায় আসিয়া পরলোকগমন করিয়াছেন)

আচার্য্য সার প্রফুল্লচন্দ্র রায়—

গত ৩রা আগষ্ট আচার্য্য সার প্রফুল্লচন্দ্র রায় ৮৩তম বর্ষে পদার্পণ করিয়াছেন। তাঁহার কর্ম্মময় জীবনের কোন নূতন পরিচয় আজ বাঙ্গালীর কাছে দিতে যাওয়া ধৃষ্টতা হইবে সন্দেহ নাই। বৈজ্ঞানিক, ব্যবসায়ী, দাতা, দেশকর্ম্মী, বিদ্যোৎসাহী—
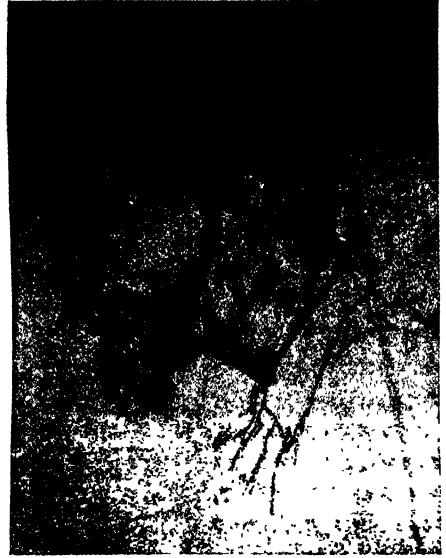
আচার্য্য সার প্রফুল্লচন্দ্র রায়—১৯১৭
শিল্পী শ্রীমুকুল দে অঙ্কিত

সকল দিক দিয়াই তাঁহার জীবন অসাধারণ ; আমরা শ্রীভগবানের নিকট প্রার্থনা করি, তিনি আরও সুদীর্ঘ কর্ম্মময় জীবন লাভ করিয়া বাঙ্গালী জাতিকে সঞ্জীবিত রাখুন।

খাদ্যদ্রব্য সরবরাহ ব্যবস্থা—

আমরা জানিয়া আনন্দিত হইলাম, বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্ট এতদিনে জনসাধারণকে ন্যায়সঙ্গত মূল্যে খাদ্যদ্রব্য সরবরাহের ব্যবস্থায় মনোযোগী হইয়াছেন। এই উদ্দেশ্যে একজন স্বতন্ত্র ডিরেক্টার নিযুক্ত করা হইবে এবং এখনই কাজ আরম্ভ করিয়া কয়েকদিনের মধ্যে যাহাতে সর্ব্বত্র লোক সকল জিনিষ পায় তাহার চেষ্টা করা হইবে। মূল্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ত নিষ্ফল হইয়াছে। এখন দেখা যাউক, নূতন ব্যবস্থার ফল কি হয়।

স্থানান্তরিতদিগকে ক্ষতিপূরণ দান—

সামরিক প্রয়োজনে যে সকল লোককে স্থানান্তরিত হইতে হইতেছে, বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্ট তাহাদিগকে ক্ষতিপূরণ প্রদানের ব্যবস্থা করিয়াছেন। সম্প্রতি পূর্ব্ব ব্যবস্থা পরিবর্ত্তন করিয়া লোক যাহাতে অধিক পরিমাণে ক্ষতিপূরণ পায় তাহার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এ ব্যবস্থায় অধিকাংশ লোক সন্তুষ্ট হইবে বলিয়া আশা করা যায়। বাঙ্গালার রাজস্ব সচিব আশ্বাস দিয়াছেন, প্রয়োজন হইলে লোকের অধিক সুবিধার জন্য বর্ত্তমান ব্যবস্থারও পরিবর্ত্তন করা হইবে। আমরা নূতন ব্যবস্থার জন্য কর্ত্তৃপক্ষের কার্য্যের প্রশংসা করি।

ষ্ট্যাণ্ডার্ড কাপড়—

বিভিন্ন রকমের সুলভ সাধারণ কাপড় বিক্রয়ের জন্ত বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্ট ৫৫জন পাইকারী বিক্রেতা স্থির করিয়াছেন। আপাততঃ মোটা রকমের ১৮ লক্ষ ধুতি ও সাড়ী এবং মাঝারি রকমের ৪২লক্ষ ধুতি ও সাড়ী বাজারে দেওয়া হইবে। জামার জন্ত আড়াই লক্ষ মোটা থান ও ৪ লক্ষ মাঝারি থানেরও ব্যবস্থা করা হইয়াছে। পূজার পূর্ব্বে এই সকল কাপড় বাজারে পাওয়া যাইবে এবং তাহার দামও সাধারণ কাপড়ের দাম অপেক্ষা কম হইবে। সংবাদটি মন্দের ভাল, সন্দেহ নাই।

কলিকাতা কর্পোরেশনের নির্ব্বাচন—

১৯৪৩ সালে কলিকাতা কর্পোরেশনের সাধারণ কাউন্সিলার নির্ব্বাচন হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু যুদ্ধের জন্ত অস্বাভাবিক অবস্থা উপস্থিত হওয়ায় নির্ব্বাচন এক বৎসরের জন্য পিছাইয়া দেওয়া হইয়াছে। নির্ব্বাচন ১৯৪৪ সালে হইবে বলিয়া স্থির হইয়াছে।

ফাল্গুনী রায়—

তরুণ কথা-সাহিত্যিক ফাল্গুনী রায় গত ১৯শে শ্রাবণ মুর্শিদাবাদ জেলার কান্দীতে দুরন্ত টাইফয়েড রোগে মাত্র ২৫ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। নানা সাময়িক পত্রে
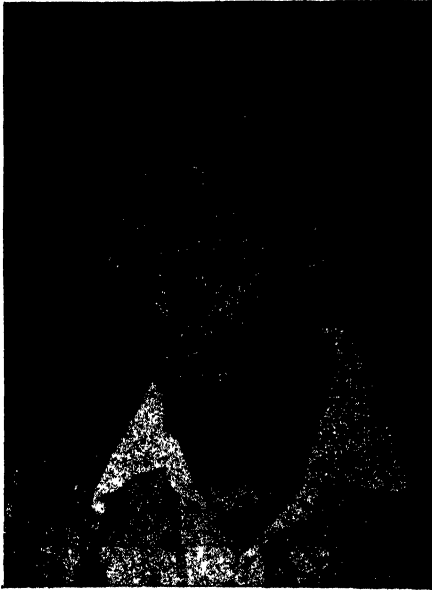
ফাল্গুনী রায়

তাঁহার বহু গল্প ও কবিতা প্রকাশিত হইয়াছিল এবং তাঁহার লেখা লোক আগ্রহের সহিত পাঠ করিত।

সার ফ্রান্সিস ইয়ং হাসব্যাণ্ড—

সম্প্রতি বিলাতে সার ফ্রান্সিস ইয়ং হাসব্যাণ্ডের মৃত্যু হইয়াছে। ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে তিনি এদেশে মুরী নগরে জন্মগ্রহণ করেন। স্যাণ্ডহার্ষ্টে শিক্ষা লাভ করিয়া তিনি ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে ভারতে চাকরী আরম্ভ করেন। ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে তিনি সৈন্য বিভাগ
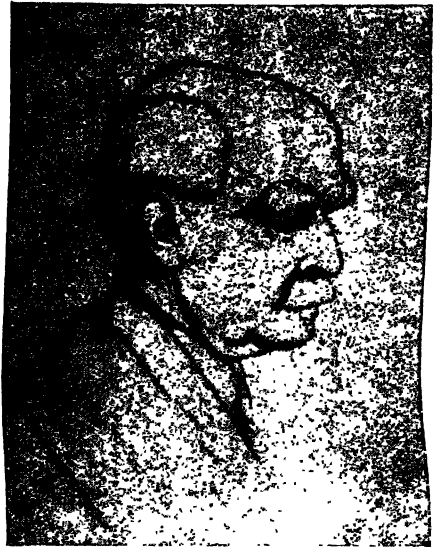
১৯৩৫এ রামকৃষ্ণ শতবার্ষিক উৎসব উপলক্ষে কলিকাতায় সার ফ্রান্সিস ইয়ংহাসব্যাণ্ড

শিল্পী—শ্রীমুকুল দে অঙ্কিত

হইতে রাজনীতিক বিভাগে বদলী হন। ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে তিনি মাঞ্চুরিয়ায়, ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে চীনা তুর্কীস্থান হইয়া পিকিং হইতে ভারতে, ১৮৮৯-৯১তে পামীরে ও ১৮৯২তে হুন্জায় ভ্রমণ করেন। ১৮৯৬-৯৭ সালে তিনি ট্রান্সভাল ও রোডেসিয়ায় ছিলেন। ইন্দোর, তিব্বত ও কাশ্মীরে তিনি কিছুকাল কাজ করেন। ভারত সম্বন্ধে তাঁহার অনেক পুস্তক আছে। রামকৃষ্ণ শতবার্ষিক উৎসব উপলক্ষে কলিকাতায় যে নিখিল জগৎ ধর্ম্ম-মহাসম্মেলন হইয়াছিল, তিনি তাহাতেও যোগদান করিয়াছিলেন।

নাবিকদিগকে শিক্ষাদান—

ভারতের বিশেষতঃ বাঙ্গালার বহু লোক সমুদ্রগামী জাহাজে নানা বিভাগে নানারূপ কাজ করিয়া থাকেন। তাঁহাদের অধিকাংশ লোক উপযুক্ত শিক্ষিত নহেন। বর্ত্তমান যুদ্ধের সময় শত্রুর আক্রমণে যে সকল জাহাজ ডুবিয়া যাইতেছে, তাহাতে বহু ভারতীয় নাবিকও প্রাণ হারাইতেছে। জাহাজ ডুবি হইলেও নাবিকগণ যাহাতে নিজ নিজ প্রাণ বাঁচাইতে পারে, সেজন্ত যাহাতে তাহাদের শিক্ষিত করা হয়, সম্প্রতি কলিকাতা টাউন হলে সার আবদুল হালিম গজনভীর সভাপতিত্বে নাবিকদিগের এক সভায় সেই দাবী উপস্থিত করা হইয়াছে। আমাদের বিশ্বাস, দরিদ্র নাবিকদিগের এই সঙ্গত দাবী উপেক্ষিত হইবে না।

জাপান ও মহাত্মা গান্ধী—

মহাত্মা গান্ধী তাঁহার 'হরিজন' পত্রে 'জাপানীদের প্রতি' শীর্ষক এক প্রবন্ধে জাপানের প্রতি তাঁহার মনোভাব ব্যক্ত

করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন—"আপনারা যদি বিশ্বাস করিয়া থাকেন যে আপনারা ভারতবাসীদের নিকট হইতে সাদর সম্বর্দ্ধনা পাইবেন, তাহা হইলে শেষ পর্য্যন্ত আপনাদিগকে নিরাশ হইতে

১৯২৮এর জানুয়ারী মাসে সবরমতী আশ্রমে মহাত্মা গান্ধী—রক্তের চাপ কমাইবার জন্য মাথায় কাদার প্রলেপ ধারণ
শিল্পী—শ্রীমুকুল দে

হইবে। এ বিষয়ে কোনরূপ ভ্রান্ত ধারণা পোষণ না করিতেই আমি আপনাদিগকে অনুরোধ করি। আপনাদিগকে এইরূপ ভুল সংবাদ দেওয়া হইয়াছে যে, জাপ কর্ত্তৃক ভারত আক্রমণ যখন আসন্ন হইয়া উঠিয়াছে, সেই সময়কেই মিত্রশক্তিকে বিব্রত করিবার পক্ষে উপযুক্ত বলিয়া আমরা স্থির করিয়াছি। আপনাদিগকে যে এরূপ সংবাদ দেওয়া হইয়াছে, তাহা আমি জানি। বৃটেনের বিপদের সুযোগ লইবারই যদি আমাদের ইচ্ছা থাকিত তাহা হইলে তিন বৎসর পূর্ব্বে যুদ্ধ আরম্ভ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই আমরা উহা লইতে পারিতাম।"

ভারত রক্ষার ব্যয়—

১৯৪০-৪১ খৃষ্টাব্দে ভারত গভর্ণমেণ্ট ভারত রক্ষার ব্যবস্থার জন্য মোট ১২৭ কোটি টাকা ব্যয় করিয়াছেন। তাহার মধ্যে ভারতের তহবিল হইতে ৭৩ কোটি টাকা খরচ করা হইয়াছে। বাকী টাকা বিলাতের গভর্ণমেণ্ট ব্যয় করিয়াছেন।

গ্লাসগোতে সার আজিজুল—

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব ভাইস-চ্যান্সেলার সার এম-আজিজুল হক ৩১শে জুলাই ভারতের হাই কমিশনাররূপে গ্লাসগোতে যাইয়া ভারতীয় নাবিক ও অন্যান্য কর্ম্মীদের এক সভায় ইসলামের শিক্ষা সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা মনুষ্যত্বের বিকাশক। সকল ধর্ম্মের নীতিই এক। লোক যদি ধর্ম্মান্ধ না হইয়া বিবেকের দ্বারা চালিত হয়, তাহা হইলে কোন ধর্ম্মের সহিতই কখনও অপর ধর্ম্মের কোন বিরোধ ঘটে না।

মহাত্মা গান্ধীর জন্মদিন—

আগামী ২রা অক্টোবর মহাত্মা গান্ধীর ৭৪তম জন্মদিন। ঐ দিনটি স্মরণীয় করিবার জন্য নিখিল ভারত কাটুনি সমিতি ঐ দিন মহাত্মা গান্ধীকে একটি ১০ লক্ষ টাকার তোড়া উপহার দিবেন। ঐ টাকা এদেশে খাদির উন্নতির জন্য ব্যয় করিতে বলা হইবে। কাটুনি সমিতির বিহার শাখা ৭৪ হাজার টাকা সংগ্রহ করিয়া দিবেন—গুজরাট শাখা তাহার ৫ গুণ টাকা সংগ্রহ করিবেন। বাঙ্গালা শাখাও ৭৪ হাজার টাকা সংগ্রহের চেষ্টা করিবেন।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ—

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবস উৎসব উপলক্ষে গত ২৬শে জুলাই পরিষদ মন্দিরে এক প্রীতিসম্মিলন হইয়া গিয়াছে। ঐ উপলক্ষে সঙ্গীত, ম্যাজিক, ব্যঙ্গাভিনয়, আবৃত্তি প্রভৃতির ব্যবস্থা ছিল। আগামী বর্ষে পরিষদের পঞ্চাশ বৎসর বয়স হইবে—সে সময়ে যাহাতে বিরাটভাবে পরিষদের উৎসব হয়,

শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ—পণ্ডিচেরী, ২১শে এপ্রিল ১৯১৯
শিল্পী—শ্রীমুকুল দে

পরিষদের বর্ত্তমান পরিচালকগণ এখন হইতেই তাহার উদ্যোগ আয়োজনে সচেষ্ট হইয়াছেন।

ব্রহ্ম প্রবাসীদের প্রত্যাবর্ত্তন—

নয়া দিল্লী হইতে প্রকাশিত এক সরকারী বিবৃতিতে প্রকাশিত হইয়াছে যে এ পর্য্যন্ত ৫ লক্ষেরও অধিকসংখ্যক লোক ব্রহ্মদেশ

হইতে আশ্রয়ের জন্ত ভারতবর্ষে আগমন করিয়াছে। প্রকাশ, ব্রহ্ম প্রবাসী ভারতবাসীদের প্রায় অর্দ্ধেকই ভারতে ফিরিয়া আসিয়াছে। আশ্রয়প্রার্থীরা জলপথে, স্থলপথে বা বিমান পথে আসিয়াছে। পথিমধ্যেও নানা কারণে বহু লোক মারা গিয়াছে। এই ৫ লক্ষাধিক লোক এ দেশে চলিয়া আসার ফলে এ দেশেও লোকের কষ্ট বাড়িয়াছে। মাদ্রাজ প্রভৃতি অঞ্চলে এত অধিক আশ্রয়প্রার্থী গিয়াছে যে সেখানে আর নূতন লোক পাঠাইতে নিষেধ করা হইয়াছে। কাজেই নিরাশ্রয়দের আশ্রয় সমস্যা উপস্থিত হইয়াছে।

ব্রহ্মপ্রত্যাগতদিগকে পানীয় হিসাবে প্রচুর সংখ্যায় ডাব (নারিকেল) প্রদান। ফটো—তারক[illegible]

ব্রহ্মপ্রবাসী ভারতীয়ের সংবাদ—

ব্রহ্মদেশ শত্রু কর্তৃক অধিকৃত হওয়ার পর যে সকল ভারতবাসী ব্রহ্মদেশ হইতে চলিয়া আসিবার সুযোগ পান নাই, তাঁহারা বর্ত্তমানে কেমন আছেন তাহা জানিবার জন্ত ভারতবাসী অনেক জন ব্যাকুল হইয়াছেন। ব্রহ্মে অবস্থিত ভারতীয়গণের সংবাদ পাইবার জন্ত ভারতগভর্ণমেণ্ট আর্জ্জেণ্টাইন বা সুইস গভর্ণমেণ্টের মারফত চেষ্টা করিতেছেন। যদি এই-ভাবে বা যে কোন প্রকারে হউক, ভারতবাসীদের সন্ধান করা যায়, তবে সে সংবাদে বহু ভারতবাসী অবশ্যই আশ্বস্ত হইবেন।

বৃদ্ধ লোকটিকে এইভাবে ব্রহ্মদেশ হইতে আনা হইয়াছে

লণ্ডনে মসজেদ নির্ম্মাণ—

লণ্ডনে একটি মসজেদ ও ইসলামিক সংস্কৃতি সৌধ নির্ম্মাণের জন্ত বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের উপনিবেশ অফিস হইতে অর্থব্যয় করা হইবে বলিয়া ১৯৪০ সালের নভেম্বর মাসে স্থির হইয়াছিল। যে জমিটির উপর ঐ সৌধ নির্ম্মিত হইবে তাহা কিনিতে ৬০ হাজার পাউণ্ড ব্যয় হইবে বলিয়া জানা গিয়াছে।

সিন্ধুদেশে বন্যা—

এবার সিন্ধুপ্রদেশে বন্যার ফলে স্থানীয় অধিবাসীবৃন্দের কিরূপ ক্ষতি হইয়াছে, তাহা বর্ণনার অতীত। শুধু শুক্কুর তালুকে ১৫ হাজার একর জমী জলমগ্ন হইয়াছে। লক্ষ লক্ষ লোক গৃহহীন ও অন্নহীন হইয়াছে। সিন্ধুর প্রধান মন্ত্রী খাঁ বাহাদুর আল্লাবক্স প্লাবিত অঞ্চলে ঘুরিয়া নিজে সাহায্যের ব্যবস্থা করিতেছেন এবং আবশ্যক অর্থ সংগ্রহ করিতেছেন। কি করিয়া ঐ স্থানে বন্যা নিবারণ করা যায়, তাহা সমস্যার পরিণত হইয়াছে এবং ঐ সমস্যা সমাধানে দেশের সকল লোকের সাহায্যের প্রয়োজন হইতে পারে।

বরেন্দ্রনাথ বসু—

বঙ্গীয় বয়স্কাউট সঙ্ঘের সম্পাদক, খ্যাতনামা ব্যারিষ্টার বরেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় গত ১৭ই শ্রাবণ সকালে মাত্র ৫২ বৎসর বয়সে সহসা পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি কলিকাতার বহু জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন এবং তাঁহার অমায়িক ও সরল ব্যবহারের জন্ত সকলেই তাঁহাকে ভালবাসিত।

বরেন্দ্রনাথ বসু

নেতৃবৃন্দ গ্রেপ্তার—

গত ৭ই ও ৮ই আগষ্ট বোম্বায়ে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটীর অধিবেশন শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ৯ই আগষ্ট রবিবার ভোরে ভারত গভর্ণমেণ্টের আদেশে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটী, নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটী প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান বেআইনি বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে এবং সঙ্গে সঙ্গে মহাত্মা গান্ধী, মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, পণ্ডিত জহরলাল নেহরু, শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু প্রমুখ সকল কংগ্রেস নেতাকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। বোম্বায়ে এক দিনেই প্রায় সকল নেতাকে গ্রেপ্তার করা হয়। সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্ত সকল প্রদেশে প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীগুলিকে বেআইনি বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে ও বহু প্রাদেশিক কংগ্রেস নেতাকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। গ্রেপ্তারের পর পুনা, বোম্বাই ও আমেদাবাদে রবিবারে (৯ই) যে হাঙ্গামা হয়, তাহাতে পুলিস গুলীবর্ষণ করে এবং ৭জন লোক নিহত হয়। সোমবারেও বোম্বাই, পুনা এবং আমেদাবাদে হাঙ্গামা হইয়াছিল এবং লক্ষ্ণৌ কানপুর প্রভৃতি স্থানে হাঙ্গামার ফলে পুলিস গুলীবর্ষণ করিয়াছে। বোম্বাই ও তাহার সহরগুলীতে হাঙ্গামা এত অধিক হইয়াছে যে পুলিসের সহিত সর্ব্বত্র বৃটীশ সৈন্ত মোতায়েন করিতে হইয়াছে।

শিল্পাচার্য্য অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর—

শিল্পাচার্য্য শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়কে তাঁহার ৭০তম জন্ম দিনে সম্বর্দ্ধনা করিবার জন্ত রবীন্দ্রনাথ তাঁহার মৃত্যুশয্যায় দেশবাসী সকলকে অনুরোধ জানাইয়া গিয়াছেন। আমরা জানিয়া আনন্দিত হইলাম, আগামী মাসে সেই সম্বর্দ্ধনা উৎসব কালকাতাস্থ গভর্ণমেণ্ট আর্ট স্কুলে অনুষ্ঠিত হইবে এবং অধ্যাপক ডক্টর শ্রীযুক্ত কালিদাস নাগকে সভাপতি করিয়া সেজন্ত একটি কমিটী গঠন করা হইয়াছে। অবনীন্দ্রবাবু এ দেশের শিল্পে নূতন আলোকপাত করিয়াছেন। কাজেই তাঁহাকে সে জন্ত সম্বর্দ্ধনা করিয়া দেশবাসী নিজেরাই ধন্ত হইবেন।

শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত—

প্রসিদ্ধ দেশকর্ম্মী খাদিপ্রতিষ্ঠানের প্রাণস্বরূপ শ্রীযুত সতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত নোয়াখালি জেলার ফেণীর দুর্গত লোকদিগকে সাহায্য করিবার জন্ত তথায় গমন করিয়াছিলেন। গভর্ণমেণ্ট কয়েকটি স্থান হইতে লোকাপসারণের ফলে লোকদিগের তথায় কষ্ট হইয়াছিল। জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট সতীশবাবুকে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে নোয়াখালী জেলা ছাড়িয়া যাইতে আদেশ দেন—সতীশবাবু সে আদেশ অমান্ত করায় ফেণীর মহকুমা হাকিমের বিচারে সতীশবাবুর ২ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড হইয়াছে।

কুমারেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—

জব্বলপুরের জনপ্রিয় শিক্ষাব্রতী কুমারেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সম্প্রতি পরলোকগমন করিয়াছেন। বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি তাঁহার আন্তরিক অনুরাগ ছিল। 'ভারতবর্ষে' তাঁহার বহু প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। অমায়িক, সাধুপ্রকৃতি, সংযতবাক্, বন্ধুবৎসল ও নীরব কর্ম্মী বলিয়া সকলে তাঁহাকে ভালবাসিত। জৈনধর্ম্মগ্রন্থ ও পুরাণ সাহিত্যে তাঁহার প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ছিল। প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মিলনের সহিতও তাঁহার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল।

শরৎকুমার চক্রবর্ত্তী—

কবিবর বিহারীলাল চক্রবর্ত্তীর পুত্র এবং কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জ্যেষ্ঠ জামাতা ব্যারিষ্টার শরৎকুমার চক্রবর্ত্তী মহাশয় সম্প্রতি তাঁহার মজঃফরপুরস্থ ভবনে পরলোকগমন করিয়াছেন। শরৎকুমার সুপণ্ডিত ছিলেন, হিন্দু আইনে তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল এবং তিনি কিছুকাল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঠাকুর আইন অধ্যাপক ছিলেন। অল্প বয়সে বিপত্নীক হইয়া তিনি আর বিবাহ করেন নাই।

নীরদচন্দ্র বসু মল্লিক—

কলিকাতা পটলডাঙ্গা বসুমল্লিক পরিবারের নীরদচন্দ্র বসুমল্লিক মহাশয় গত ৭ই আগষ্ট সন্ধ্যায় তাঁহার ১২নং ওয়েলিংটন স্কোয়ারস্থ বাসভবনে পরলোকগমন করিয়াছেন। তাঁহার পিতা হেমচন্দ্র বসুমল্লিক মহাশয় বহুদিন ধরিয়া জাতীয় আন্দোলনে সাহায্য দান করিয়াছিলেন এবং হেমচন্দ্রের ভ্রাতুষ্পুত্র রাজা সুবোধচন্দ্র মল্লিকের নাম বাঙ্গালায় সর্ব্বজনবিদিত। নীরদচন্দ্রও স্বদেশের কাজে সুবোধচন্দ্রের সহকর্ম্মী ছিলেন। তিনি ইউরোপের নানাদেশ ও জাপান পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন এবং কলিকাতার সম্ভ্রান্ত সমাজে বিশেষ আদৃত ছিলেন।
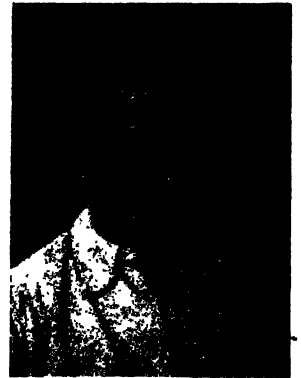
নীরদচন্দ্র বসু মল্লিক

পুষ্করিণী খনন ও সংস্কার—

বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্ট পশ্চিমবঙ্গের জেলাসমূহে পুষ্করিণী খনন ও উদ্ধারের জন্য ৬ লক্ষ টাকা ব্যয় মঞ্জুর করিয়াছেন। ঐ টাকায় ৫ শত পুষ্করিণী পরিষ্কার হইবে বলিয়া গভর্ণমেণ্ট আশা করেন। প্রচেষ্টা সাধু, সন্দেহ নাই। কিন্তু এই প্রসঙ্গে একটি গল্প মনে পড়িল—একটি জেলা বোর্ডের রিপোর্টে জানা যায়, কোন গ্রামে একটি পুষ্করিণী খননের জন্য জেলা-বোর্ডের তহবিল হইতে আবশ্যক অর্থব্যয় করা হইয়াছে। কিন্তু পরে সেই পুষ্করিণী আর খুঁজিয়া পাওয়া গেল না।

রাজাজীর পদত্যাগ—

শ্রীযুক্ত সি, রাজাগোপালাচারী মহাত্মা গান্ধীকে স্ব-মতে আনিবার চেষ্টায় বিফল হইয়া এখন পূর্ণ উদ্যমে প্রচার কার্য্য চালাইবার জন্য মাদ্রাজ ব্যবস্থা পরিষদের সদস্যপদও ত্যাগ করিয়াছেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার দলভুক্ত ডাক্তার টি-এস-এস-রাজন, এস-রমানাথম্, রত্নভেলু থাভের, সুব্রহ্মণ্যম্, বেঙ্কট রমণ আয়ার, বেঙ্কটচারী ও আবদুল' কাদেরও ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য পদত্যাগ করিলেন। ইহা তাঁহাদের সাহসিকতার পরিচয় বটে, কিন্তু দেশ কি ইহা দ্বারা প্রকৃত লাভবান হইবে।

প্রতিবাদ—

কলিকাতার প্রসিদ্ধ কাগজবিক্রেতা মেসার্স জন ডিকিনসন-কোম্পানীর বড়বাবু যতীন্দ্রকৃষ্ণ দত্ত মহাশয় গত ১১ই জ্যৈষ্ঠ পরলোকগমন করেন এবং পরদিন সকল দৈনিক সংবাদপত্রে তাঁহার মৃত্যু সংবাদের মধ্যে ইহাও প্রকাশিত হয় যে যতীন্দ্রবাবু আজীবন অবিবাহিত ছিলেন। আমাদের মত মাসিকপত্রকে সংবাদের জন্য অধিকাংশ সময়েই দৈনিক সংবাদপত্রের উপর নির্ভর করিতে হয়—আমরাও আমাদের ভারতবর্ষে প্রকাশ করিয়াছি যে তিনি 'আজীবন কুমার' ছিলেন। সম্প্রতি কলিকাতা ৫।১ খেলাৎ বাবু লেন নিবাসিনী শ্রীমতী বিনোদিনী দাসীর পক্ষ হইতে তাঁহার উকীল আমাদিগকে উক্ত সংবাদের প্রতিবাদে জানাইয়াছেন যে শ্রীমতী বিনোদিনী দাসী যতীন্দ্রবাবুর বিবাহিতা স্ত্রী এবং কুমারী তারা দত্ত ও কুমারী বেলা দত্ত নামে তাঁহার দুইটী কন্যা বর্ত্তমান। কুমারী তারা দত্ত এবার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আই-এ পরীক্ষা পাশ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ দাস—

শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ দাস উড়িষ্যার প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। কংগ্রেসের নির্দ্দেশে তিনি সে পদ ত্যাগ করিয়াছেন। সম্প্রতি একটি যুদ্ধ-বিরোধী বক্তৃতা করার অপরাধে কটক রোসেলকোণ্ডার মহকুমা হাকিমের বিচারে তাঁহার তিন মাস বিনাশ্রম কারাদণ্ড হইয়াছে। ইহাকেই বলে অদৃষ্টের পরিহাস।

সার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—

গত ৬ই আগষ্ট কলিকাতায় মন্ত্রী ডক্টর শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে ও বারাকপুরে প্রধান মন্ত্রী মৌলবী এ-কে ফজলল হকের সভাপতিত্বে জনসভায় রাষ্ট্রগুরু সার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বার্ষিক স্মৃতি উৎসব সম্পাদিত হইয়াছে। কলিকাতা গড়ের মাঠে সার সুরেন্দ্রনাথের মর্ম্মর-মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং একটি বড় রাস্তাও তাঁহার নামে নামকরণ করা হইয়াছে। কিন্তু যে বারাকপুরে তিনি প্রায় ৫০ বৎসর কাল বাস করিয়াছিলেন, তথায় তাঁহার স্মৃতিরক্ষার কোন ব্যবস্থাই করা হয় নাই। তাঁহার নাম যাহাতে তাঁহার বাসস্থানেও চিরস্মরণীয় হইয়া থাকে, সে বিষয়ে স্থানীয় জনগণের উদ্যোগী হওয়া বাঞ্ছনীয়।

পরলোকে পুটিয়ার মহারাণী—

পুটিয়ার মহারাণী হেমন্তকুমারী দেবী গত ২৭শে আষাঢ় কাশীধামে ৭৮ বৎসর বয়সে লোকান্তরিত হইয়াছেন। তিনি অতি অল্পবয়সে একমাত্র কন্যা লইয়া বিধবা হইয়াছিলেন। সারা জীবনে তিনি বহু সৎকার্য্যের জন্য বহু লক্ষ টাকা দান করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার কন্যা তাঁহার জীবিতাবস্থাতেই পরলোক-গমন করিয়াছিলেন। মহারাণীর জামাতা ও তিন দৌহিত্র বর্ত্তমান। দ্বিতীয় দৌহিত্র শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনারায়ণ সান্যাল বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার (উচ্চতর পরিষদ) সদস্য।

ভগবতীচরণ ঘোষ—

স্বামী যোগানন্দ আমেরিকায় যোগদা সৎসঙ্গ স্থাপন করিয়া ভারতের কৃষ্টির কথা তথায় প্রচার করিতেছেন। তাঁহার পিতা ভগবতীচরণ ঘোষ মহাশয় গত ১লা আগষ্ট সকালে ৯২ বৎসর বয়সে কলিকাতায় পরলোকগমন করিয়াছেন। তাঁহারা ২৪ পরগণা জেলার ইছাপুরের লোক। ভগবতীবাবুর অপর পুত্র প্রসিদ্ধ ব্যায়ামবিদ্ শ্রীযুক্ত বিষ্ণুচরণ ঘোষ।

স্মৃতি-তর্পণ

শ্রীকমলকৃষ্ণ মজুমদার

যে রবি গিয়াছে অস্ত অচল পারে
নিশি অবসানে ফিরিয়া পাব কি তারে ?
আপন প্রভায় যে ছিল সমুজ্জ্বল,
আলোক-প্লাবনে ভরাল ধরণীতল,
বঙ্গ-বাণীরে সাজাল মুকুতা হারে।
ফিরিয়া পাব কি তারে ?

বঙ্গ-হৃদয় মন্থিত ধন ওগো বাংলার রবি,
তোমার কিরণ মুকুরে দেখেছি ভুবন-ভুলানো ছবি।
নিবিড় আঁধারে ধরণী আজিকে ম্লান,
বিশ্ব-হৃদয়ে ওঠে ক্রন্দন-গান,
'—দেখা দাও পুনঃ উদয়তোরণ দ্বারে।'
এস উদয়-তোরণ দ্বারে।
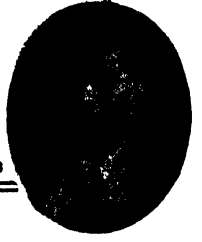
শ্রীক্ষেত্রনাথ রায়

ফুটবল লীগ ঃ

প্রথম বিভাগের ফুটবল লীগ চ্যাম্পিয়ান হয়েছে ইষ্টবেঙ্গল ক্লাব। এই দলটিকে যে শেষ পর্য্যন্ত লীগ তালিকার শীর্ষস্থান থেকে অপর কোন দল স্থানচ্যুত করতে পারবে না তা আমরা ৬৪টি গোল দিয়েছে। ইতিপূর্ব্বে লীগখেলায় এত বেশী পয়েন্ট সংগ্রহ করতে আর কোন ফুটবল ক্লাবকে দেখা যায় নি। অবশ্য পূর্ব্বে লীগপ্রতিযোগিতায় এতগুলি ক্লাব প্রতিদ্বন্দ্বিতা ক'রত না বলেই লীগে যোগদানকারী ফুটবল দলগুলি এখনকার তুলনায় সংখ্যায় কম খেলা খেলত

১ ২ ৩

গোলরক্ষকের হাঁটু এবং কোমরের মধ্যের বলগুলি ধরবার কৌশল :
প্রথম চিত্রটিতে গোলরক্ষকের নির্ভুলভাবে বল ধরা দেখান হচ্ছে। এই শ্রেণীর বল ধরবার জন্যে গোলরক্ষক প্রথমে সামনের দিকে ঝুঁকে কনুই দুটি দুপাশে চেপে হাত দুটি সামনে বলের দিকে ঝুলন্ত অবস্থায় রাখবে। তারপর বলটি পৌঁছলে গোলরক্ষক হাত দুটি ভিতরে এনে বলের গতিরোধ করবে। এইরূপে হাত এবং দেহের সাহায্যে বলটিকে একটি 'বাস্কেটের' মধ্যে আনা হয়। বল এলে গোলরক্ষক আঙুলগুলি বলের নীচে দিয়ে বলটিকে খুব তাড়াতাড়ি ধরবে। দ্বিতীয় চিত্রটিতে গোলরক্ষকের বল ধরবার ভুলপন্থা দেখান হয়েছে। তৃতীয় চিত্রটিতে শক্ত 'লো সট' ধরবার কৌশল গোলরক্ষক দেখিয়েছে। এই পন্থার একটা সুবিধা বল কখনও পায়ের মধ্যে দিয়ে চলে যাবে না। তবে অসুবিধা এই যে এই পন্থা আয়ত্বে আনতে বিশেষ অনুশীলনের প্রয়োজন।

গত মাসে খেলার আলোচনা করতে গিয়ে বলেছিলাম। ২৪টি খেলায় ইষ্টবেঙ্গল ৪৩ পয়েন্ট পেয়েছে আর মাত্র ৯টি গোল খেয়ে তৃতীয়বার আর একটি ভারতীয়দলকে লীগ চ্যাম্পিয়ান হ'তে দেখে আমরা আমাদের আন্তরিক আনন্দপ্রকাশ করছি।

লীগের দ্বিতীয় স্থানে আছে মহামেডানস্পোর্টিং ৪০ পয়েন্ট পেয়ে। এই দলটি ইষ্টবেঙ্গলের তুলনায় কিছু বেশী গোল খেলেও বেশী গোল দিয়েছে। উভয় দলই একটি খেলাতে হেরেছে।

ভলি (Volly) মারা শিক্ষার অনুশীলন

মোহনবাগান ক্লাব লীগের তালিকায় তৃতীয় স্থানে আছে। ইষ্টবেঙ্গলের থেকে এদের ৭ পয়েন্টের আর মহামেডানের থেকে ৪ পয়েন্টের তফাৎ।

ভবানীপুর ক্লাব চতুর্থ স্থান অধিকার করেছে। গোলরক্ষকের দক্ষতার জন্য এরা মোহনবাগানের থেকেও একটা কম গোল খেয়েছে। এ বৎসরের খেলায় এরাই সব থেকে বেশী খেলা 'ড্র' করেছে।

কাষ্টমস মাত্র ৩ পয়েন্ট পেয়ে লীগের সর্ব্ব নিম্নস্থান পেয়েছে। তাদের এই অবস্থা দেখলে সত্যই দুঃখ হয়। যুদ্ধের দরুণ অনেক খেলোয়াড় বাইরে চলে যাওয়ায় এই দলটি দুর্ব্বল হয়ে পড়েছে। লীগের ষষ্ঠস্থান অধিকারী একমাত্র পুলিশ দলকেই এবার তারা পরাজিত করেছিল। মাত্র ৯টি গোল দিয়ে ৮১টি গোল খেয়েছে।

দ্বিতীয় ডিভিসন লীগে রবার্টহাডসন ১৫টি খেলায় ৩০ পয়েন্ট করে লীগ চ্যাম্পিয়ান হয়েছে। একটি খেলাতেও 'ড্র' কিম্বা পরাজয় স্বীকার করেনি। লীগের খেলায় ইতিপূর্ব্বে কোন দলই এইরূপ কৃতিত্ব দেখাতে পারেনি। সালখিয়া ফ্রেণ্ডস ২১ পয়েন্ট পেয়ে রাণার্সআপ হয়েছে। এখানে উল্লেখযোগ্য এবৎসর নূতন ব্যবস্থার ফলে দ্বিতীয় ডিভিসনের লীগে কোন রিটার্ণম্যাচ খেলান হয়নি।

গত বৎসরের চতুর্থ ডিভিসনের লীগচ্যাম্পিয়ান ক্যালকাটা পুলিশদল এবার তৃতীয় ডিভিসনের লীগে চ্যাম্পিয়ান হয়েছে। জোড়াবাগান ক্লাব রাণার্স আপ হয়েছে।

ফুটবল লীগের চতুর্থ ডিভিসনে মিলন সমিতি এবং বাণী-নিকেতন একত্রযোগে সমান পয়েন্ট পেয়ে লীগ চ্যাম্পিয়ান হয়েছে।

নিম্নের তালিকায় প্রথম বিভাগ ফুটবল লীগে কোন দলের কিরূপ স্থান দেওয়া হ'ল :—

প্রথম বিভাগ লীগ

	খে	জ	ড্র	পরা	স্ব	বি	পঃ
ইষ্টবেঙ্গল	২৪	২০	৩	১	৬৪	৯	৪৩
মহঃ স্পোর্টিং	২৪	১৭	৬	১	৬৯	১৩	৪০
মোহনবাগান	২৪	১৬	৪	৪	৫৩	১৭	৩৬
ভবানীপুর	২৪	১০	৯	৫	২৯	১৬	২৯
বি এণ্ড এ আর	২৪	১১	৫	৬	৫৩	৪৫	২৭
পুলিশ	২৪	৯	৫	১০	৩২	৩২	২৩
এরিয়ান্স	২৪	৭	৭	১০	২৯	৩৮	২১
কালীঘাট	২৪	৭	৬	১১	২৯	৩০	২০
ক্যালকাটা	২৪	৭	৫	১২	২০	৫৭	১৯
স্পোর্টিং ইউঃ	২৪	৬	৬	১২	২৯	৪২	১৮
ডালহৌসী	২৪	৭	৩	১৪	২৫	৫৩	১৭
রেঞ্জার্স	২৪	৭	২	১৫	৩০	৩৮	১৬
কাষ্টমস	২৪	১	১	২২	৯	৮১	৩

একটি গতিশীল বলে ভলি মারার দৃশ্য
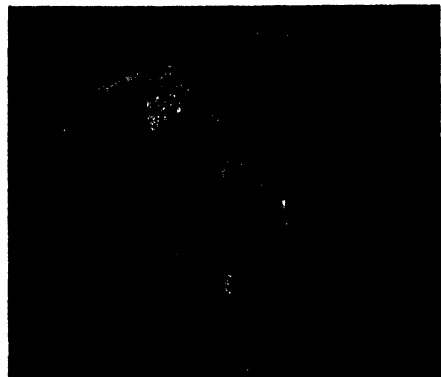
গতিশীল বলে ভলি মারার অপর আর একটি দৃশ্য

দ্বিতীয় ডিভিসন লীগের প্রথম দুইটি :

	খে	জ	ড্র	প	স্ব	বি	পয়েণ্ট
রবার্ট হাডসন	১৫	১৫	০	০	৪৬	৪	৩০
সালখিয়া ফ্রেণ্ডস	১৫	৯	৩	৩	২৪	৮	২১

ইষ্টবেঙ্গল ক্লাবের ইতিহাস

১৯১১ সালে প্রতিষ্ঠিত ইউনিয়ান ক্লাব পরবর্তী কালে ইষ্টবেঙ্গল ক্লাবে রূপান্তরিত হয়েছে। ১৯১৪ সালে এই দল ফুটবল খেলার সর্ব্বপ্রথম ব্যবস্থা করে। ইতিপূর্ব্বে এই ক্লাবের কোন ফুটবল টীম ছিলো না। তাজহাট ক্লাব দ্বিতীয় ডিভিসন থেকে অবসর গ্রহণ করলে ইষ্টবেঙ্গল ক্লাব দ্বিতীয় ডিভিসনে খেলবার সুযোগ লাভ করে। প্রথম বছরের লীগ খেলায় এই দলটিকে শক্তিশালী করবার জন্য দলের উদ্যোগীরা রীতিমত খেলোয়াড় সংগ্রহে মন দিলেন। নামকরা খেলোয়াড় দ্বারা গঠিত দল নিয়েও প্রথম বছর কিন্তু তারা লীগে তৃতীয় স্থান অধিকার করে।

দ্বিতীয় বিভাগে তাদের লীগ খেলার পঞ্চম বৎসরে ইষ্টবেঙ্গল তৃতীয় স্থান অধিকার করেও ১৯২৪ সালে প্রথম বিভাগের লীগ খেলায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবার সৌভাগ্য লাভ করে।

খেলোয়াড়দের 'হেড' করার ব্যায়াম

পুলিশ ক্লাব দ্বিতীয় বিভাগের লীগে চ্যাম্পিয়ানসীপ পেয়েও প্রথম বিভাগে খেলতে রাজী হয় না। আবার ক্যামেরোনিয়ান্স দলের 'এ' টীম প্রথম বিভাগে খেলতে থাকায় দ্বিতীয় বিভাগের দ্বিতীয় স্থান অধিকারী ক্যামেরোনিয়ান্স 'বি' টীম আইনত প্রথম বিভাগে খেলতে না পারায় তৃতীয় স্থান অধিকারী ইষ্টবেঙ্গল দলকেই ১৯২৪ সালে প্রথম বিভাগে খেলবার সুযোগ দেওয়া হয়।

তিন বছর প্রথম বিভাগের লীগে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ক'রে ১৯২৮ সালে ইষ্টবেঙ্গল দল দ্বিতীয় বিভাগে নেমে যায়। কিন্তু ১৯৩১ সালে দ্বিতীয় বিভাগের লীগ বিজয়ী হয়ে ১৯৩২ সালে তারা পুনরায় প্রথম বিভাগে প্রমোসন পায় এবং ঐ বৎসর মাত্র এক পয়েণ্টের ব্যবধানের জন্য প্রথম বিভাগের লীগ চ্যাম্পিয়ানসীপ থেকে তারা বঞ্চিত হয়। ১৯৩৩ ও ১৯৩৫ সালেও অনুরূপ ঘটনার জন্য তারা লীগ বিজয়ী হয়নি। ঐ কয়েক বৎসর ব্যতীত ইষ্টবেঙ্গল ১৯৩৭ ও ১৯৪১ সালের লীগেও রাণার্স আপ হবার সৌভাগ্য লাভ করেছিল।

ফুটবল খেলায় ইষ্টবেঙ্গল ক্লাব :—১৯২২ সালে কুচবিহার কাপে রাণার্স আপ হয়; ১৯২৪ সালে প্রথম বিভাগে প্রথম প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে।

১৯২৪ সালে কুচবিহার কাপ বিজয়ী হয়। ১৯২৮ সালে দ্বিতীয় বিভাগের লীগে নেমে যায়। ১৯৩১ সালে দ্বিতীয় বিভাগের লীগ বিজয়ী হয় এবং ১৯৩২, ১৯৩৩, ১৯৩৫, ১৯৩৭ ও ১৯৪১ সালে প্রথম বিভাগের লীগে রাণার্স আপ হয়। ১৯৩৪ ও ১৯৩৭ সালে ইয়ঙ্গার কাপে রাণার্স আপ হয়। ১৯৪০ সালে লেডী হার্ডিঞ্জ শীল্ড বিজয়ী এবং পাওয়ার লীগ চ্যাম্পিয়ান হয়। ১৯৪২ সালে প্রথম বিভাগের লীগ বিজয়ীর সম্মান অর্জ্জন করে।

আই এফ এ শীল্ড ঃ

১৯৪২ সালের আই এফ এ শীল্ড খেলা প্রায় শেষ হ'তে চলেছে। এ বৎসরের ফুটবল মরসুমের প্রারম্ভ থেকেই ক্রীড়ামোদীদের মনে একটা আতঙ্কের ছায়া দেখা গিয়েছিলো। পূর্ব্ব দিকের যুদ্ধের প্রভাব বুঝি কলকাতারও ময়দানে এসে তাঁদের খেলা দেখা থেকে বঞ্চিত করবে এ রকম আশঙ্কা তাঁরা সর্ব্বদাই করছিলেন। কিন্তু সেই কল্পিত আশঙ্কার মধ্য দিয়েও ১৯৪২ সালের শীল্ড খেলা নির্ব্বিঘ্নে শেষ হতে চলেছে। শীল্ড খেলার পর কলকাতার ফুটবল মরসুমের সমাপ্তি বলা চলে। আই এফ এর পরিচালনায় যে কয়েকটি প্রতিযোগিতা বাকী থাকবে তা ক্রীড়ামোদী এবং খেলোয়াড়দের ততখানি আকর্ষণ করবে না।

পূর্ব্বেকার তুলনায় ফুটবল খেলার ষ্ট্যাণ্ডার্ড যে নিম্ন শ্রেণীর হয়েছে তা শীল্ডের খেলাগুলি দেখলেই বোঝা যায়। পূর্ব্বেকার মত দুর্দ্ধর্ষ সৈনিক ফুটবল টীমকে আজ কয়েক বছর আই এফ এ শীল্ড প্রতিযোগিতায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে দেখা যাচ্ছে না।

গত নয় বছরে শীল্ড বিজয়ী ডি সি এল আই, ইষ্ট ইয়র্ক এবং শীল্ডের ফাইনেলে প্রতিদ্বন্দ্বী কে আর আর এবং ডারহামস্ যে উচ্চ শ্রেণীর ফুটবল খেলা দেখিয়ে গেছে তা ক্রীড়ামোদীদের মন থেকে সহজে অন্তর্হিত হবে না।

আলোচ্য বৎসরে ৩৮টি ফুটবল টীম শীল্ডের খেলায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছে। কলকাতার বাইরে থেকে যে সব টীম এসেছে তাদের খেলা মোটেই আশাপ্রদ নয়। বাইরের ফুটবল দলগুলির মধ্যে একমাত্র মাইসোর রোভার্স দলই সেমিফাইনালে খেলবার যোগ্যতা অর্জ্জন করেছে। ইষ্টবেঙ্গল ক্লাবের ভূতপূর্ব্ব খেলোয়াড় মুর্গেস এবং লক্ষীনারায়ণ এই দলে সহযোগিতা করছেন। শীল্ডের দ্বিতীয় রাউণ্ডের খেলাতে মাইসোর রোভার্স ৯-০ গোলের ব্যবধানে মধুপুরের তরুণ সমিতিকে পরাজিত করে। তৃতীয় রাউণ্ডে এ বৎসরের লীগের নিম্নস্থান অধিকারী কাষ্টমস দলকে মাত্র ১-০ গোলে এবং ৪র্থ রাউণ্ডে বার্ণপুর ইউনাইটেডকে ২-১ গোলে পরাজিত ক'রে সেমি ফাইনালে উত্তীর্ণ হয়। শীল্ড খেলার এক দিকের সেমি-ফাইনালে মাইসোর রোভার্স মহামেডান স্পোর্টিং দলের কাছে ৩-০ গোলে হেরেছে।

শীল্ডের অপর দিকের সেমি-ফাইনালে এ বৎসরের প্রথম ডিভিসন লীগবিজয়ী ইষ্টবেঙ্গল রেঞ্জার্স দলের সঙ্গে প্রতিযোগিতা চালাবে। রেঞ্জার্স শীল্ডের তৃতীয় রাউণ্ডে মোহনবাগান দলকে ৩-১ গোলে শোচনীয় ভাবে পরাজিত করেছে। সেই খেলার প্রথমার্দ্ধে মোহনবাগান বিপক্ষ দল অপেক্ষা অধিক গোল করবার

সুযোগ পেয়েও শেষ পর্য্যন্ত খেলায় জয়লাভ করতে পারে নি। এর জন্ত দায়ী যেমন আক্রমণ ভাগের খেলোয়াড়রা তেমনি রক্ষণ-ভাগের ব্যাকদ্বয়। অতি আকস্মিকভাবে বল পেয়ে রেঞ্জার্স দলের রাইট আউট রবার্টসন প্রথম গোল করেন এবং এক মিনিটের মধ্যেই পুনরায় একই ভাবে ব্যাকের দুর্ব্বলতার সুযোগ নিয়ে দ্বিতীয় গোলটি দেন। তৃতীয় গোলটিও একমাত্র তাঁর সহযোগিতার জন্যই সম্ভব হয়েছিল। রক্ষণভাগের ব্যাকদ্বয়ের খেলার বিচারের ভুলের জন্যই এই তিনটি গোল হয়েছে। গোলের সম্মুখে বল নিয়ে গিয়ে গোল না করার ব্যর্থতার যে স্তূপীকৃত রেকর্ড রয়েছে তা বোধ করি অন্য কোন দলই ভাঙ্গতে পারবে না। অন্য দলে উন্নত খেলা দেখিয়ে মোহনবাগান দলে এসেই সেই খ্যাতনামা খেলোয়াড়রা খেলার এরূপ নিকৃষ্ট পরিচয় দেন কেন? নিজের খেলার উপর খুব বেশী আস্থা স্থাপন ক'রে খেলায় কোনরকম গুরুত্ব উপলব্ধি না করার জন্যই এইরূপ শোচনীয় ব্যর্থতা। যেখানে একমাত্র গোলই দলের শক্তি-পরীক্ষার মাপকাঠি সেখানে ভাল খেলে এবং দর্শকদের চমৎকৃত ক'রে লক্ষ্যস্থানে পৌঁছে পদস্খলন অথবা শোচনীয় ব্যর্থতার পরিচয় প্রদানের কোন সার্থকতা নেই বরং দর্শকদের বিরক্তির কারণ ঘটায়। পুরুষকার কখনও কখনও মানুষের জীবনে ব্যর্থতা এনেছে সত্য কিন্তু ব্যর্থতা যাদের জীবনে মজ্জাগত হ'তে চলেছে তাদের কত বারই বা 'স্তোকবাক্য' দিয়ে উৎসাহিত করা যায়। মোহনবাগান ক্লাবের কোন একজন বিশিষ্ট খেলোয়াড় এবং সদস্যের কথা উদ্ধৃত ক'রে আমরাও বলছি—"মোহনবাগান ক্লাবকে বাঙ্গলার ক্রীড়ামোদীগণ জাতীয় ক্লাব মনে করে' এবং সেইজন্য···এতগুলি কথা বললাম।"

এ বছরের শীল্ডের স্মরণীয় খেলা মোহনবাগান ভেটারনস বনাম ইষ্টবেঙ্গল দলের দ্বিতীয় রাউণ্ডের খেলাটি। খেলার পূর্ব্বে প্রায় সকলেই ভেবেছিলেন ইষ্টবেঙ্গল দলের তরুণ খেলোয়াড়দের কাছে প্রবীণ খেলোয়াড়রা অতি শোচনীয় ভাবে পরাজয় স্বীকার করবে। কিন্তু ইষ্টবেঙ্গল দল ২-০ গোলে খেলাটিতে জয়লাভ করলেও তাদের অনেক উদ্বেগজনক মুহূর্ত্তের সম্মুখীন হ'তে হয়েছিল। বয়সের আধিক্যের জন্য এবং খেলায় বহুদিনের অভ্যাস না থাকায় প্রবীণ দল শেষ পর্য্যন্ত জয় লাভ করে নি এবং সেই সুযোগ নিয়েই তরুণের জয়যাত্রা। কিন্তু প্রবীণদলের খেলার বিচার বুদ্ধিকে কলকাতার সকল খেলোয়াড়ই স্বীকার করবেন। যৌবনোচিত শক্তির অভাব থাকা সত্ত্বেও কেবল বিচার বুদ্ধি দিয়ে তরুণ শক্তির সঙ্গে সমানভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা চালিয়েছিলো। ক্রীড়ামোদীরা এবং খেলোয়াড়রা এই খেলাটিতে অনেক শিক্ষণীয় বিষয়ের সন্ধান পেয়েছেন। বহুদিন পরে ক'লকাতার মাঠে মোহনবাগানের ভূতপূর্ব্ব বিখ্যাত সেণ্টার হাফ্ হামিদের খেলা দেখবার সুযোগ পাওয়া গেল। অভ্যস্ত স্থান হ'লেও অনভ্যস্ত অবস্থায় তিনি যেরূপ ক্রীড়াচাতুর্য্যের পরিচয় দিয়েছিলেন তা থেকে তাঁকে প্রথম শ্রেণীর দলে নিঃসন্দেহে স্থান দিতে পারা যায়। ব্যাকে ডাঃ মণি দেব উভয় দলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ব্যাক ছিলেন। বলাই চ্যাটার্জির সেণ্টার এবং কর্ণার সর্ট নিখুঁতভাবে দলের সহযোগীদের গোল করবার সুযোগ দিয়েছিলো। সামাদের খেলাও উল্লেখযোগ্য।

আই এফ এ শীল্ডের একদিকের সেমি-ফাইনালে রেঞ্জার্স বনাম ইষ্টবেঙ্গলের খেলাটি বাকি আছে। অপরদিকের সেমি-ফাইনালে মহামেডান স্পোর্টিং ৩-০ গোলে মহীশূরকে হারিয়ে ফাইনালে উঠেছে। ফাইনালে শীল্ড বিজয়ের কে সম্মানলাভ করবে তার ফলাফলের জন্য আর বেশী দিন ধরে অপেক্ষা করতে হবে না।

খেলোয়াড়দের অফ্ সাইড ঃ

খেলোয়াড়দের এবং ক্রীড়ামোদিদের সুবিধার জন্য আরও কতকগুলি 'off-side diagram' দেওয়া হ'ল।

'O' চিহ্নিতগুলি রক্ষণভাগের খেলোয়াড়। 'X' চিহ্নিতগুলি বিপক্ষদলের আক্রমণ ভাগের খেলোয়াড়। 'A' 'B' এবং 'C' বিপক্ষদলের আক্রমণ ভাগের খেলোয়াড়দের নাম।

এই ৮টি চিত্রের প্রত্যেক চিত্রটির খেলোয়াড়দের Position এবং 'বলের গতি' পড়ে এবং দু' সেকেণ্ডের কম সময়ে 'B' অফ্ সাইডে আছে কিনা বলবার চেষ্টা করুন।

বলের গতি ঃ
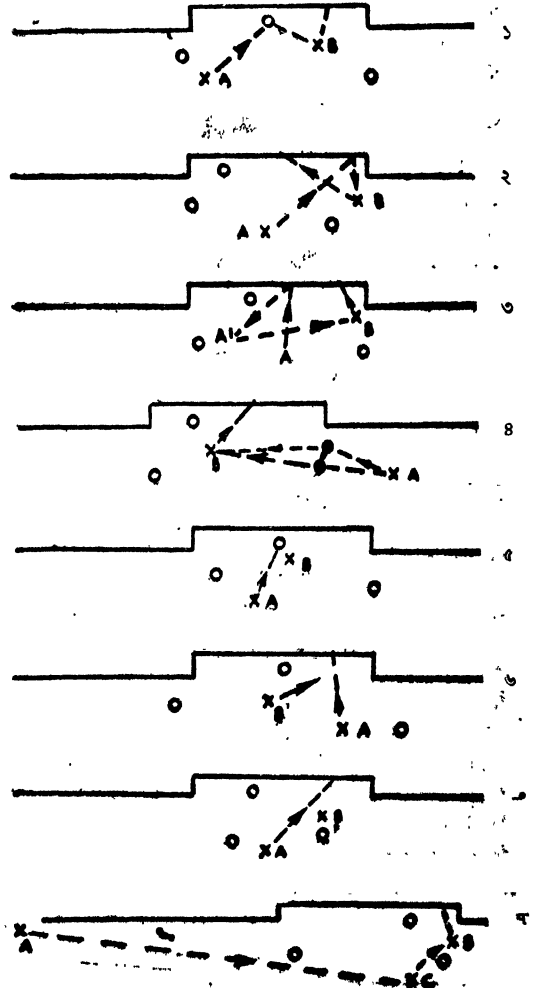
১। 'A'এর সট গোলরক্ষক প্রতিরোধ ক'রে বলটি 'B' এর দিকে মারলে 'B' বলটি গোল করে।

২। 'A' বলটি সট করলে পোষ্টে লেগে 'B'এর কাছে এসেছে। 'B' সেখানে পূর্ব্বেই দাঁড়িয়ে থেকে, বলটি পেয়ে গোল করেছে।

৩। 'A' বল সট করছে কিন্তু পোষ্টে লেগে ফিরে এসে 'B' এর কাছে পাশ করা হয়। 'B' গোল করেছে।

৪। 'A' সট' করেছে। 'O' বলটি ভুল করে 'B'কে দিয়েছে। 'B' পূর্ব্বেই দাঁড়িয়েছিল, বল পেয়ে গোল করেছে।

৫। 'A' যখন বল সট করেছে তখন 'B' চুপচাপ দাঁড়িয়েছিল।

৬। 'B', 'A'এর সামনে ছিল। 'A' সট করলে 'B' ভিতরে দৌড়ে আসে।

৭। 'B', 'A'-এর সামনে থেকে 'O'কে প্রতিরোধ করতে বাধা দিয়েছে।

৮। 'কর্ণার কিক'—'A' বলটি 'C'কে দিয়েছে এবং 'C' বলটি 'B'কে দিলে 'B' গোল করে।

আন্তর্জাতিক ফুটবল ঃ

১৯৪২ সালের আন্তর্জাতিক ফুটবল খেলায় ভারতীয় দল ২-০ গোলে ইউরোপীয় দলকে পরাজিত করেছে। ভারতীয় দলের পক্ষ থেকে এরিয়ান্স ক্লাবের সেণ্টার ফরওয়ার্ডস্ ডি ব্যানার্জি ২টি গোলই দেন।

আন্তর্জাতিক ফুটবল খেলা আরম্ভ হয়েছে ১৯২০ সালে। এ পর্য্যন্ত ভারতীয় দল ১৪ বার এই প্রতিযোগিতায় বিজয়ী হয়েছে। ১৯৩৬ এবং ১৯৩৯ সালে অমীমাংসিত ভাবে খেলা শেষ হয়েছিল। ১৯৩০ সালে কোন খেলা হয়নি। ইউরোপীয় দল এ পর্য্যন্ত ৮ বার বিজয়ের সম্মান পায়। ১৯২৪ সাল থেকে ১৯২৭ সাল পর্য্যন্ত উপর্য্যুপরি ৫ বার ভারতীয় দল বিজয়ী হয়।

দার্জ্জিলিংয়ে ব্যাড্মিণ্টন ঃ

দার্জ্জিলিং ডিষ্ট্রিক্ট ব্যাড্মিণ্টন চ্যাম্পিয়ানসীপ টুর্ণামেণ্টের তৃতীয় বার্ষিক প্রতিযোগিতার ফাইনাল খেলাগুলি শেষ হয়েছে। বাঙ্গলার খ্যাতনামা খেলোয়াড়রা উক্ত প্রতিযোগিতায় যোগদান করেছিলেন। সুনীল বোস পুরুষদের সিঙ্গলসের ফাইনালে বিজয়ী হয়েছেন।

ফলাফল ঃ

পুরুষদের সিঙ্গলসে সুনীল বসু ১১-১৬ এবং ১৫-১১ পয়েণ্টে ম্যাড্গাওকারকে পরাজিত করেন।

পুরুষদের ডবলসে ভি ম্যাডগাওকার ও সুনীল বসু ১৮-১৩, ১৫-১২ পয়েণ্টে এস ব্যানার্জ্জি ও পি ঘোষকে পরাজিত করেন।

মিক্সড ডবলসে আর ব্যানার্জ্জি (দার্জ্জিলিং নং ১) ও জয়া ভট্টাচার্য্য ১৫-১০, ১৫-৮তে সুনীল বসু ও করবী বসুকে পরাজিত করেন।

'বিল' টিলডেন ঃ

খ্যাতনামা টেনিস খেলোয়াড় 'বিল টিলডেন লস্ এঞ্জেলেব ইয়াঙ্কি টাউন হাউসে পেশাদার শিক্ষক হিসাবে নিযুক্ত হয়েছেন।

১২।৮।৪২

সাহিত্য-সংবাদ

নবপ্রকাশিত পুস্তকাবলী

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় প্রণীত গল্প-গ্রন্থ "পরকীয়া"—২৲
শ্রীঅশ্বিনীকুমার ঘোষ প্রণীত নাটক "পুরীর মন্দির"—১৲
শ্রীশশধর দত্ত প্রণীত রহস্যোপন্যাস "ব্যবসায়ী মোহন"—২৲
শ্রীসুধাংশুকুমার সান্যাল প্রণীত কাব্য-গ্রন্থ "প্রেম"—৷৷৵০
শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়-সম্পাদিত ডিটেক্টিভ উপন্যাস "যাদুকর ডাক্তার"—৸০
শ্রীসীতা দেবী প্রণীত রবীন্দ্র-কাহিনী "পুণ্য-স্মৃতি"—২৸০
শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী প্রণীত উপন্যাস "প্রেম ও পূজা"—২৲
মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী প্রণীত "ছোটদের শাহ্‌নামা"—৸০
শ্রীবুদ্ধদেব বসু প্রণীত শিশু-উপন্যাস "ভূতের মতো অদ্ভুত"—৷০
শ্রীসরসীলাল সরকার প্রণীত "রবীন্দ্র-কাব্যে ত্রয়ী পরিকল্পনা"—১৲
শ্রীগৌতম সেন প্রণীত নাটক "ডাক্তার"—১৷০
শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায় প্রণীত "ইশারা"—১৲, "নুতনরাধা"—২৲
"বনফুল" প্রণীত গল্প-গ্রন্থ "ভূয়োদর্শন"—২৷০
শ্রীরতিলাল দাশ প্রণীত "ঋগ্বেদ" প্রথম খণ্ড—১৲
শ্রীশচীন্দ্রনাথ অধিকারী প্রণীত "সহজ মানুষ রবীন্দ্রনাথ"—১৲
শ্রীরসময় দাশ প্রণীত কাব্য-গ্রন্থ "অন্তঃশীলা"—১৷০
শ্রীগিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী-সম্পাদিত দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের অপ্রকাশিত রচনা "শ্রীরামপ্রসাদ"—১৷০
৺রেণুকা বসু প্রণীত "মনোবিজ্ঞান ও শিশু শিক্ষা"—১৲
শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ভাদুড়ী প্রণীত কবিতা গ্রন্থ "পাদপাদপ"—১৷০
শ্রীঅজিতকুমার সেন প্রণীত কবিতা পুস্তক "সাঁজের ছায়া"—১৲
শ্রীনীহাররঞ্জন সিংহ প্রণীত কবিতার বই "রূপায়ন"—১৲
বুদ্ধদেব বসু প্রণীত উপন্যাস "কালো হাওয়া"—৩৲
শ্রীনবদ্বীপচন্দ্র ব্রজবাসী ও অধ্যাপক শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র এম-এ রায় বাহাদুর সম্পাদিত "শ্রীপদামৃত মাধুরী" চতুর্থ খণ্ড—৩৲

সম্পাদক—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম্-এ

২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা ; ভারতবর্ষ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শিল্পী—শ্রীযুক্ত অমূল্যগোপাল সেন　　কৃষ্ণ ও গান্ধারী　　ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

আশ্বিন—১৩৪৯

প্রথম খণ্ড ত্রিংশ বর্ষ সংখ্যা

শ্রীমদ্ভাগবত সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ

শ্রীসুধাংশুকুমার হালদার আই-সি-এস্

শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধ থেকে শ্রীকৃষ্ণকথা আরম্ভ। কুরুক্ষেত্রে দেখেছি তাঁর সংহারের অনন্তরূপ—সদৃংশুস্তে চূর্ণিতৈরুত্তমাঙ্গৈঃ। অর্জুনকে চালিয়ে নিয়ে চলেছেন ক্লৈব্য থেকে জয়ে। সে জয় পাণ্ডবের নয়, সে জয় দ্বাপরের নয়, সে সকল মানুষের সর্বকালের জয়, সে জয় গীতা। যিনি এমন আশ্চর্য্য, তাঁর শৈশব বাল্য কৈশোর কি ছিল? শ্রীমদ্ভাগবতের কবি বললেন, ছিল; সে-কাহিনী তোমাদের শোনাব। কিন্তু সে-কাহিনী ঐশ্বরিক, মানুষের কবি তাকে সম্পূর্ণ বলতে কি পারবে? তাই তাঁর রসনা একবার উৎকণ্ঠায় জড়ায়, আবার ভাবঘন বাণী উচ্চারণ করতে করতে চলে। একবার দ্বিধায় দোলে, আবার আশ্বাসে ভক্তিতে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে। একবার পরীক্ষিতের মুখ দিয়ে জাগে কবির সংশয়, আবার শুকদেবের উত্তরে তার সমাধান। শ্রীকৃষ্ণকথা তাই মনোহর—বেপথুমতী এই রচনা যেন শকুন্তলার মতো পতিগৃহে যাত্রা করেছে।

বিষয় সোজা নয়। তাজমহল গড়তে যেয়ে প্রথম পাথরটা যখন বসিয়েছিল, অমর শিল্পী তখন এমনি উদ্বেগে কেঁপেছিল। মানবশিশুরূপী ভগবানের লীলাগান গাইতে হবে! সমগ্র বিশ্বে যাঁকে ধরে না, তিনি এসেছেন মানুষের শিশু হয়ে, অতি ক্ষুদ্র এক মানবী মার কোলে। রাত্রের আকাশে যে-অগণিত তারা জ্বলে, তার একটিও কি আসে মানুষের মাটির আঙিনায় শিশু হয়ে খেলতে? অথচ এই কোটি সৌরলোকের সীমাহীন বৈচিত্র্য যাঁর পদনখেরও যোগ্য নয়, তিনি এলেন দেবকীর ছেলে হয়ে! তিনি এত বড়, তবু তিনি এত ছোট হয়ে এলেন? কবি বললেন, হ্যাঁ তিনি তবুও এলেন। এই যে তাঁর ছোট হয়ে আসা এই তো তাঁর লীলা। ভক্তি দিয়ে বুঝতে হবে, যুক্তি দিয়ে নয়। আর্ত্ত মানুষ যখন তাঁকে ডাকে, তুমি এসো—তিনি আসেন। কখনো আসেন মেরীর বুকে, কখনো দেবকীর।

তিনি আসেন যেখানে যত বেশী দুঃখ, যত বেশী অত্যাচার। এও তাঁর লীলা। তিরস্কার যেখানে তার বেত্র হানে, নিরীহ যেখানে ফেলে চোখের জল—সেইখানে তিনি

৪০

আসেন। দন্ত যেখানে পাঠায় নির্বাসনে, পীড়নের শীত হাত যেখানে গড়ে কারাগার—সেইখানে। কারাগার শুধু দেওয়ালে গাঁথা গারদ নয়, পীড়ন শুধু শারীরিক নয়। সভ্যযুগে মানুষের অসুর তীক্ষ্ণতর পীড়ন সব আবিষ্কার করেছে। সুসভ্য দৈত্যেরা এখন যে-কারাগার করেছে রচনা, দেওয়ালের পরিধি দিয়ে তাকে মাপা যায় না, সে-কারা দেশ বিদেশ জুড়ে নিরীহ মানুষের বুকে চেপে বসে আছে। অসভ্যদের অস্ত্রগুলো দেখলেই চেনা যেত, কিন্তু এখন আর অস্ত্র বলে চেনা যায় না, মালা বলে ভুল হয়। উপকথার রাজা মশাই তাঁর দুয়োরাণীকে হেঁটোয় কাঁটা মাথায় কাঁটা দিয়ে পুঁততেন। এখন আর তা করেন না। পীড়ন এখন জুতা মোজা পরে সভ্য।

কিন্তু পীড়নের ছদ্মবেশে তিনি ভোলেন না। বড় বড় বুলির বড় বড় বক্তৃতায় তিনি ঠকেন না। যেখানেই পীড়নের দুঃখ জমা হয়ে ওঠে, সেই পাহাড়স্তূপে তিনি আগ্নেয়গিরির মতো আসেন তাঁর পীড়ন-বিদারণ মন্ত্র নিয়ে।

তবু তাঁর মনে দ্বেষ নেই। অত্যাচার দমন কর্ত্তব্য বলেই করেন, হিংসা করে নয়, অসূয়ার বশে নয়। তাই পূতনা-বকাসুররা যখন অসুরলীলা সংবরণ করে, তখন তাঁর চরণাশ্রয় পায়। কিন্তু কেন? পীড়নই বা থাকবে কেন? তিনি তো সর্বস্রষ্টা, তবে পীড়নকে, পাপকে সৃষ্টি করেন কেন? তার কারণ, তিনিই পীড়ন, তিনিই পরিত্রাণ; তিনিই প্রভব, তিনিই প্রলয়, তিনিই মৃত্যু—আবার তিনিই অমৃত। "অমৃতঞ্চৈব মৃত্যুশ্চ সদসচ্চাহমর্জ্জুন"। প্রীতি আর হিংসা দুইই ভগবান হ'তে জাত, কিন্তু তিনি নির্গুণ বলে প্রীতিমান্‌ও নন, হিংস্রকও নন—

"যে চৈব সাত্ত্বিকা ভাবা রাজসাস্তামসাশ্চ যে।
মত্ত এবেতি তান্ বিদ্ধি ন ত্বহং তেষু তে ময়ি॥"

অনিবার্য্য সৃজন-ধ্বংসের মধ্য দিয়ে তাঁর লীলা যুগে যুগে, কালে কালে আবর্ত্তিত হচ্ছে। কারো স্থির থাকবার জো নেই। এই চলন্ত জগতে স্থির থাকার নামই মৃত্যু—তারপর আর এক জীবনের আরম্ভ। এক অধ্যায়ের শেষ, আর এক অধ্যায়ের শুরু। নক্ষত্র জগতে সৌরলোক নতুন ক'রে ভাঙছে আর গড়ছে। জগৎপিণ্ড নীহারিকা হয়ে গুঁড়িয়ে যাচ্ছে, আবার নীহারিকা থেকে দানা বেঁধে শত জগৎ গড়ে উঠছে। এই ভাঙাগড়ার সুর লেগেছে সৌরলোক থেকে মনুষ্যলোকে।

ভাগবত-কার গল্প বলে চলেছেন। শুধু কি গল্প! ভক্তিতে প্রোজ্জ্বল, তত্ত্বকথায় সমৃদ্ধ, কবিত্বে অতুলনীয়। তিনি যেন প্রণাম করতে করতে চলেন, নম হে নম, নম হে নম। তাঁর লেখনীমুখে যা বোরায় তা যেন তাঁর হতে স্বতন্ত্র, তা যেন আগেও ছিল, কিন্তু ছিল অব্যক্ত। তাই তাঁর অভিমান নেই, কেননা যা শাশ্বত, যা চিরন্তন, তিনি জানেন তিনি তাকে সৃষ্ট করতে পারেন না, দৃষ্ট করতেই পারেন। তাকে তিনি লেখক হ'য়ে লিখতে লিখতে পূজা করেছেন, পাঠক হ'য়ে শুনতে শুনতে করেছেন শ্রদ্ধা নিবেদন।

তারপর কবিত্ব। সাধারণতঃ আমরা যাকে কবিত্ব বলি, সংসারের মাপকাঠিতে তার একটা সীমানা আছে। কিন্তু ভাবনা যেখানে অনন্ত বিস্তারি, কবিতা সেখানে তার ডানা মেলে কল্পলোকে উড়ে চলে—তখন তাকে মাপবে কে? সকল কবিতার উৎস প্রেম। সকল প্রেমের উৎস ভগবৎ প্রেম। স্ত্রৈণের কাব্য তার নারীকে নিয়ে। তার গায়ের রঙ, আর চোখের চাহনি, তার মান-অভিমান আর বাসর শয়ন—অতি ক্ষুদ্র স্নেহমনে সীমা বাঁধা। যেমন ধরুন জন ডানের কবিতা, যাকে লুপ্তোদ্ধার ক'রে আজকাল মাতামাতি চলছে। কিন্তু এই এক টুকরা এই ধরণের কাব্য নিয়ে মানুষ বেশীক্ষণ ভুলে থাকতে তো পারবে না।

আমাদের এই প্রাচীনা পৃথিবী দেখে এসেছে যুগে যুগে নরনারীর কত প্রেম, কত বিরহমিলন—সন্তানবৎসলের কত স্নেহ। এ সবের মাধুর্য্যরস, যে রস-সমুদ্র থেকে আসে তার খবর কে জানে! মানুষের মন কূপের জলে, ডোবার জলে পাঁক ঘেঁটে ঘেঁটে তৃপ্তি পাবে না, একদিন না একদিন সে যাবেই যাবে মহাসাগরের বাণিজ্যে। ভাগবতকার এই মহার্ণবের নাবিক। তিনি দেখালেন মানুষকে, তাঁর দিগন্ত প্রসারি দৃষ্টি দিয়ে, সেই চিরন্তন মাধুর্য্যসিন্ধু, যে তার তরঙ্গ তুলে বসুন্ধরার অঙ্কে অঙ্কে, গ্রহে উপগ্রহে, সৌরলোকে, অনন্ত বিশ্বে প্লাবিত হয়ে আছে। তাই যা রাত্রি কয়েকেই নির্বাপিত—সেই অনিত্য আকর্ষণকে তিনি লক্ষ্য বলে ভুল করেন নি, তাকে উপলক্ষ ক'রে তাঁর কাব্যের তরণী বেয়ে চলেছেন, জানা থেকে অজানায়—এক নাম-না-জানা দেশে যেখানে গেলে নয়ন আর ফেরে না। সেই চিরসুন্দরের দেশে জরা নেই যে ম্লান করবে, মৃত্যু নেই যে বিচ্ছেদ আনবে, অবসাদ নেই যে মিলনকে তিক্ত করবে তুলবে।

খুব উঁচু সুরে তিনি তার বেঁধেছেন। সাধারণ মানুষ অত উঁচুতে উঠতে পারে না বলেই তার দুরপনেয় কলঙ্ক। ভাগবতকারের অসীম সাহস। সত্যের সন্ধান যে পেয়ে গেছে, পৃথিবীতে তার আর কিসের ভয়! 'নৈতি'র নীতিকে তিনি ডরান না, ক্ষুদ্রের শাসন তাঁকে রোখে না। ঈশ্বর যার মনকে টেনেছেন, তার আবার কিসের লজ্জা, তার আবার কিসের কলঙ্ক! তার আবার স্বামী কে, পুত্র কে, পরিজন কে? সতীর ভালবাসা তখনি সার্থক, স্বামী যখন তার কাছে নারায়ণের প্রতীক। এ জ্ঞান যার নেই, সে তো রূপমুগ্ধা স্বৈরিণী। ব্রজগোপীরা সব ছেড়েছিল নারায়ণকে পাবার জন্যে, সাধক যেমন সব ছাড়েন। স্বৈরিণী তো একজনকে ছেড়ে আর একজনে আকৃষ্ট হয়। সাধকের সঙ্গে তার বাইরের একটা স্থূল সাদৃশ্য আছে বটে, প্রত্যেক মহত্তর সঙ্গে প্রত্যেক তুচ্ছ বস্তুর যেমন থাকে, আসলের

সঙ্গে ভণ্ডামির যেমন থাকে। কিন্তু বৈরিণীর লক্ষ্য এক, আর সাধকের লক্ষ্য আর এক।

সৌন্দর্য্যের প্রতি সহজেই মন টানে। আর যিনি চির-সুন্দর, তিনি মানুষের মনকে টানবেন না! সুন্দরকে কামনা উপলক্ষ, চিরসুন্দরের বন্দনাই লক্ষ্য। দাম্পত্যপ্রেম, দেহজপ্রেম, সন্তান বাৎসল্য—সেও উপলক্ষ, এদেরি মধ্যদিয়ে লক্ষ্যে পৌছুতে হবে। কিন্তু মোহ যখন মানুষকে পথ ভোলায়, উপলক্ষই তখন লক্ষ্য হ'য়ে দাঁড়ায়। এ মোহ তো সোজা নয়, "দৈবীহ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।" তাই নানা নাগপাশ দিয়ে মোহ মনকে জড়ায়। পাছে ভুল ভেঙে যায়, তাই মোহগ্রস্ত মন নানা কৈফিয়ৎ দিয়ে, নানা বাক্যবিন্যাস, মিথ্যা কাব্য দিয়ে সেই মোহকে দৃঢ় করে। পুরুষ তার লাম্পট্যকে ধর্মের মুখোষ দিয়ে ঢাকে, নারী তার শৈথিল্যকে কত অভিনব নামেই না ডাকে! এসব ভণ্ডামি আর আত্ম-বঞ্চনা একদিন ভাঙবেই ভাঙবে—তখন থেকে হবে আবার নতুন পথে যাত্রা শুরু।

ভক্তি আর কাব্য চিরসুন্দরকে দেখবার দুটি চোখ। ভাগবতের মহাকবি তাঁর শ্রোতাদের বলছেন—এই দুটি চোখ তোমাদের হোক। গোপীদের গল্পচ্ছলে তিনি সেই সাধনার ইঙ্গিত করেছেন—যে-সাধনায় প্রাণধর্মী মানুষ তার সমস্ত কামনা-বাসনা একাগ্রভাবে ভগবানে সমর্পণ ক'রে মুক্ত হতে পারে। প্রাণের ক্ষুধা তৃষ্ণা দুষ্পূরণীয় অনলের মতো। মনোধর্মী মানুষের জন্যে জ্ঞানভক্তিকর্মযোগের পথ। প্রাণ-ধর্মী মানুষের কাছে সে পথ তো সোজা নয়। পথ তো অনেক আছে। মানুষের বেছে নেওয়া চাই, কোন্ পথ আমার কাছে সোজা। প্রাণধর্মী যে, তার এমন একটা আশ্রয় চাই, অবলম্বন চাই, যাকে প্রাণপণে আঁকড়ে ধরে সে উঠতে পারে, দাঁড়াতে পারে। সরু সরু পথ বেয়ে মরুর মাঝে ধারা হারালে চলবে না, ছোট ছোট ডোবার আর পাঁকের কূপে আবদ্ধ হ'য়ে থাকলেও চলবে না, তার বাঁধন-ভাঙা প্রাণের উৎসকে এমন একটা সুগভীর খাত বেয়ে চলতে হবে, যে-খাত দিয়ে তার কামনা-বাসনার আবেগবন্যা সব পঙ্কিলতা, সব আবর্জ্জনা নিয়ে ভৈরবগর্জনে সেই মহাসিন্ধুর মহামিলনে যেতে পারে। গীতায় বোধহয় একটা অভাব ছিল, তাই ভাগবতের পরিকল্পনা।

মানুষকে বেছে নিতে হবে। মনের ওপর জোর খাটে না, জুলুম চলে না, মন কারো শাসন মানে না। মানুষ নিজেকে বিশ্লেষণ ক'রে দেখুক, কোন্ ধাতু দিয়ে তার প্রাণমন গড়া। তার কাছে সবচেয়ে সহজ যে পথ, তাই তার নিজস্ব পথ। "উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং"। আমাকে আমার মঙ্গল আনতে হবে, আমাকে নিজেই ভেবে ভেবে ঠিক করতে হবে কোন্ পথ আমার সহজ পথ। ক্ষুরস্যধারা নিশিতা দুরত্যয়া—কে বলে এই ভয়ের কথা! ভয় কোরো না, ক্ষোভ কোরো না, লজ্জা কোরো না—এই অভয় বাণী মনে প্রাণে উঠুক বেজে। এই অভয়বাণী রক্তের কণায় কণায় আগুন ধরিয়ে দিক, প্রাণমনের যত কিছু কালো কুৎসিত, যত কিছু কঠিন অঙ্গার সব নির্ভয়ে নিঃসংশয়ে ভাস্বর হ'য়ে উঠুক জ্বলে। 'আগুনের পরশমণি ছোঁয়াও প্রাণে'। 'দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি'—হোক্ দুর্গম, তবু নির্ভয়। 'প্রত্যক্ষাব-গমং ধর্ম্ম্যং সুসুখং কর্ত্তুমব্যয়ম্'—এই আশ্বাসবাণী তো তিনিই দিয়েছেন। 'কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি'—এই আশীর্ব্বাদ সার্থক হোক্ প্রতি মানুষের জীবনে।

পৃথিবী, তোমারে ভালোবাসি

শ্রীভোলানাথ সেনগুপ্ত

চাহিনা স্বরগে হতে নন্দন বনচর
পৃথিবী, তোমারে ভালোবাসি—
আঁধারে আলোকে ভরা, জীবনে মরণে গড়া,
হরষ, বেদনা—ব্যথা, হাসি।

তপ্ত তপন তাপ—বনতল ছায়া,
নিষ্ঠুর অবহেলা—সুকোমল মায়া,
শ্যামল তৃণদলে বিছায়েছ অঞ্চল,
মরুতে রেখেছ বালুরাশি।

নন্দন বনজাত পারিজাত সুন্দর
চাহিনা হইতে আমি চির-অবিনশ্বর,
ফুটিয়া তোমারি গায়, লুটিয়া তোমারি পায়,
হাসিয়া, মরণ-কোলে ভাসি।

ভ্রমিতে ভ্রমিতে যবে এ চরণ শ্রান্ত,
জাগিয়া জাগিয়া যবে দু'নয়ন ক্লান্ত,
অসীম কামনা লয়ে, অধীর যাতনা বয়ে,
আবার ফিরিয়া যেন আসি।

অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য—

শ্রীঅশোকনাথ মুখোপাধ্যায় এম-এ

দুই বাঙ্গালে হাঁটা-পথে চলিয়াছি—অবশ্য আমাদের গন্তব্যস্থল যে দুইটি সমান্তরাল রেখার ন্যায় কখনই মিলিতে পারে না তাহা উভয়েই জ্ঞাত আছি। আমার দেশ ভাঙ্গায়, তাঁহার চিকন্দী, কিন্তু আমরা বিশুদ্ধ এবং পরস্পর একান্ত অপরিচিত যাত্রীও নহি—যাত্রার পূর্ব্বে আমাদের মনের পরিচয়ও কিছু ছিল।

যদি কেহ মনে করিয়া বসেন, আমরা প্রবাস যাত্রা করিয়াছি অথবা সখের ভূপর্য্যটন করিতেছি, তবে তিনি নিতান্তই ভুল করিয়াছেন। প্রকৃত ব্যাপার হইতেছে যে, বর্ত্তমান আন্তর্জ্জাতিক পরিস্থিতিতে আমাদের মধুমতীও বাষ্পাকারে ঊর্দ্ধে মিলাইয়া যাইতেছে। কাজেই জ্যৈষ্ঠের খর-রৌদ্রে বাষ্পীয়পোত তারাইল পৌঁছিয়া বাঁকিয়া বসিয়াছে—নদীতে জলের দ্রুত টান্ ধরিয়াছে—বোয়ালমারি পর্য্যন্ত যাইতে চায় না। আর ষ্টীমারের সারেঙ্গ আমাদের কিঞ্চিৎ মধু-বচন দিয়া বিদায় দিয়াছে এবং আমরাও সাময়িক নিষ্কামধর্ম্ম অবলম্বনপূর্ব্বক হাঁটিতেছি।

আমার মাথায় একটি পূর্ব্ববঙ্গীয় বোঁচকা-জাতীয় ভারী দ্রব্য, আমার সঙ্গী প-বাবুর হস্তে একটি পশ্চিমবঙ্গীয় বেতের সুট্‌কেশ। অপরাহ্ণ তিন ঘটিকা হইতে সন্ধ্যা সাড়ে ছয়ঘটিকা পর্য্যন্ত নির্ব্বিচারে হাঁটার পরে মধুমতীর পশ্চিমপারেই একটা ছোটখাটো গ্রাম পাওয়া গেল। নদীর পারে সুট্‌কেশটি নামাইয়া প-বাবু হঠাৎ বিদ্রোহ করিয়া বসিয়া পড়িলেন। আমি তখনও গোবর্দ্ধনপর্ব্বত ধারণের ন্যায় সেই পুঁটুলীটি মাথায় লইয়া দাঁড়াইয়া আছি।

বলিলাম, "বসে পোড়্‌লেন যে, এখনও ঘোষপুর পর্য্যন্ত গিয়ে তবে ভেটেপাড়ার ট্রেণে উঠ্‌তে হবে।"

প-বাবু নৈরাশ্য-ব্যঞ্জক সুরে কহিলেন, "বাপ্‌রে, কি বিচ্ছিরি পথ—এই পথ দিয়ে মানুষ হাঁটে কি করে?" প-বাবু খুলনায় পিচ্‌ঢালা রাস্তায় কিছুকাল ঘুরিয়া যে এরূপ খঞ্জ হইয়া পড়িয়াছেন তাহা দেখিয়া দুঃখানুভব করিলাম। অগত্যা নিরুপায় হইয়া পুঁটুলীটি নামাইয়া তাঁহারই পার্শ্বে বসিলাম।

সম্মুখের মধুমতী ইংরাজী বর্ণমালার এস্‌-আকারে আঁকিয়া বাঁকিয়া গিয়াছে। পশ্চিমাকাশের অস্তগমনোন্মুখ সূর্য্যকে দেখিয়া স্যার জেমস্ জিনস্‌এর মৃত্যুপথযাত্রী রবির ("Dying Sun") কথা মনে হইল। দিবাকরও যুদ্ধের আতঙ্কের জন্য পাংশুবর্ণ ধারণ করিলেন নাকি? বোধহয় পার্শ্ববর্ত্তী প-বাবুর ক্লান্তির কিছুটা অপনোদন হইয়াছিল। তিনি বলিলেন, "কি সুন্দর বাতাস! উঠতে ইচ্ছে কচ্ছে না।" যখন ত্রিশঙ্কুর মত অবস্থা, তখন কাব্যানুভূতি জাগিয়া উঠিলে আমার পঞ্জরাভ্যন্তরে চিরকালই টিপ্‌ টিপ্‌ করিতে আরম্ভ করে। কাজেই বলিলাম, "বাতাস খেলে কি পেট ভর্‌বে? নাড়িভুঁড়িগুলো ত চচ্চড়ি হবার যোগাড় হয়েছে।"

প-বাবু বোধকরি কিঞ্চিৎ আহত হইলেন। বলিলেন, "কি কর্ত্তে চান আপনি?"

কহিলাম, "ওই সাম্‌নের বাঁকটা ছাড়ালেই একটা খেয়া পাওয়া যাবে—সেইটে পার হয়ে গেলে আপাততঃ আশ্রয় পেতে পারেন।"

তিনি কহিলেন, "কেন এখানে? এই যে চরের উপর গ্রামটা রয়েচে—এরা কি এক রাত্রির জন্যেও থাক্‌তে দেবেনা।"

"দেবে না কেন? নিশ্চয়ই দেবে,"—আমার ধারণা ছিল—সভ্যতার আবহাওয়া যে স্থান এখনও স্পর্শ করেনি, বোধহয় অতিথি সৎকারের রেশটুকু সেখানে অনুসন্ধান করিলে মিলিতেও পারে।

আমি হাসিয়া বলিলাম, "প-বাবু! যিনি আজ খুলনা, কাল যশো'র, পোরশু ব্যারাকপুরে রাঙা রং-এর দিনগুলো কাটিয়ে এলেন, তিনি আজ এই মেঠো-গ্রামে থাকবেন কি করে?"

প-বাবু ভ্রূ-ভঙ্গী করিলেন, দেখিলাম তাঁহার সুন্দর নয়ন দুইটির দৃষ্টি একবার আমার উপর নিবদ্ধ করিয়া আনত হইল। সত্য কথা বলিতে কি তাঁহাকে বাক্যাহত আমি কোনদিনই করিতে পারি নাই। কাজেই, শুধু কটাক্ষ বর্ষণ করিয়া তিনি জিতিলেন এবং আমিই হারিলাম।

প-বাবুকে বলিলাম "একটু বসুন,—আস্‌চি"। তিনি মৃদু হাস্যে বলিলেন, "মন প্রাণ কিন্তু রাখাল রাজ্‌কেই আজ সমর্পণ করেচি—তিনি যা করেন।"

কৃত্রিম কোপ করিয়া বলিলাম, "বটে, সুন্দর বলে গর্ব্ব—আমাকে কালো বল্লেন।"—দুইজনেই উচ্চহাস্য করিয়া উঠিলাম। নির্জ্জন প্রান্তর; ধরণীর ধূসর গাত্রচ্ছটা গোধূলির আবির্ভাব জানাইয়া দিয়াছে। ওপারে ঘন গাছের সারি চলিয়া গিয়াছে। সারাদিন গুমোটভাবের পর সান্ধ্যসমীরণ বড়ই মিষ্ট বোধ হইল। আমার বড়ৈশ্বর্য্যময়ী বাংলার এত রূপ! কৈ এমনত কখনও দেখি নাই! ধীরে ধীরে গ্রামাভিমুখে চলিলাম।

(২)

"না ক্ষেপ্‌লে থ্যান্ চর দিয়া ঘুইরাই য্যাবৃতেন, কর্ত্তা,"—তামাকু টানিতে টানিতে বৃদ্ধ তাহার দাওয়ায় বসিয়া এই কথা কয়টি কাশিতে কাশিতে বলিল! আমি তাহার অদূরে একটি চৌকিতে একরূপ পাকাপাকিভাবে বসিয়া বৃদ্ধের বচন শুনিতেছি;—কিন্তু প-বাবু একটি চাটাইয়ের উপর বসিয়া নিতান্ত অসহায়ভাবে দূরাকাশের দিকে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া তাকাইয়া ছিলেন। প্রায় সাড়ে তিন ঘণ্টা বোঁচ্‌কারূপ গোবর্দ্ধনধারণের জন্য আমার গ্রীবাদেশ তখনও টন্ টন্ করিতেছিল।

বৃদ্ধ বলিয়া চলিল, "কর্ত্তা-গো বগোবালই ফিরাইয়া

দিছ্যেন্ ··· কিন্তু কি দিয়া যে অতিত্ সংকার কো-রুম তা ভাই-ঝাই পাইত্যাছি না।"

শশব্যস্তে বৃদ্ধকে বলিলাম, "না—না—সে কি? আমরা যে আশ্রয় পেয়েচি তারজন্যেই তোমাকে ধন্যবাদ দিচ্ছি, ত্রিলোচন—"

বৃদ্ধ আমার মুখের কথা বেমালুম কাড়িয়া লইয়া বলিল, "অ-ই সব কথা এ্যাখন্ থুইয়া দ্যেন—মুখ ছেখ্‌লেই বো—জ্‌ন যায় ··· কিছু খাইয়া সুস্থ হইয়া ল্যান্, পরে সবই শু-মুম।"

চীৎকার করিয়া সে ডাকিল, "অ-বিধু ··· বিধু-রে, শুই-না যা—া—া!"

ডাক শুনিয়া একটি ছেতোপড়া লণ্ঠন হস্তে একটি কিশোরী প্রবেশ করিয়া বৃদ্ধের নিকট নত-মস্তকে দাঁড়াইয়া রহিল।

"আ-রে দাঁড়াইয়া রই-ছ্যস্?—এ্যক বাল্‌তি জল আর এ্যক্-ডা গা-মোচ্ আ-ই-না (যা-া)" বৃদ্ধ কাশিতে লাগিল এবং একটু সামলাইয়া লইয়া আমাকে কহিল, "ক-র্‌তা, আমার বরো পোলা বো-য়ালমারি গ্যাছে—কাল বৈকালে আইবো—গত স-ন্ আমার বৌ-মা মইরা গ্যাছে—হেই মায়াটারে রাই-খা গ্যাছে—।"

আমি কহিলাম, "তোমার আর কেউ নেই, ত্রিলোচন?"

বৃদ্ধ কি একটু চিন্তা করিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিয়া বলিল, "হু—আ-ছে-না?—আ-ছে-ই-ত্য—ছো ট পোলা আছে—কিন্তু কি-ইবা কমু কর্‌তা—গত স-ন্ তার ইস্তিরি আর পোলাগো লইয়া পের-থক্ হইচে ··· থাউকগে—বগোবান তাদের বা-লোই কর্-বো।"—

হঠাৎ খুব শক্ত করিয়া আমার দক্ষিণ হস্ত ধারণপূর্ব্বক প্রবল ঝাঁকুনি দিয়া কহিল, "কিন্তু—কি জানেন কর্‌তা, আমি আমার বরো পোলা-রে ছার্-তেই পারি না—বোজ্-ছ্যেন—ছোটপোলা এত কইরা কইলেও পারুম না ··· না।"

বৃদ্ধের প্রবল ঝাঁকুনি খাইয়া বুঝিয়াছিলাম যে আমি ত কোন ছার চাকুরিজীবী বাঙ্গালী, বুড়া পশ্চিমসীমান্তবর্ত্তী একজন বলিষ্ঠ আফ্রিদীকেও ইচ্ছা করিলে চূর্ণ করিতে পারে।

"ও-নারুগো লইয়া আই-স্যান, অ-দাদু,"—এক অপূর্ব্ব বীণানিন্দিত কোমল কণ্ঠের আহ্বান শুনিলাম। অপরিচিত স্থান। চতুর্দ্দিকে কালো অন্ধকারের কেমন যেন একটা থম্-থমে ভাব। ওই ও-পাশের কুঁড়ে ঘর হইতে অস্পষ্ট আলোর একটুখানি রেখা দেখা যাইতেছিল। মধ্যে একটী প্রাঙ্গণ আছে বলিয়া মনে হইল—বৃদ্ধ আমাদের লইয়া চলিল।

প-বাবু এতক্ষণ কথাটিও বলেন নাই। কিন্তু সেই আঁধারেই তাঁহার মন্মথ সদৃশ কটাক্ষ নিমেষে চিনিলাম। ত্রিলোচন চলিতে চলিতে কহিল, "কর্‌তা, আপ-নের সংগী কি বরো-লোক?"

হাসিয়া বলিলাম, "কি করে বুঝেচো?"—"বো-জ্‌ন যায়-ই,"—মস্তক মৃদু সঞ্চালন করিয়া সে বলিল।

সে-ই লণ্ঠনটি হস্তে কিশোরী ঘরের একটি খুঁটি ধরিয়া দাঁড়াইয়াছিল। দাওয়ার একপাশে এক বাল্‌তি জল এবং চৌকির উপর একটি গামছা—আর এক পাশে একটা ছোট ঘড়া। সেই ঘড়াটিকে কেন্দ্র করিয়া একটি ছোট-খাটো ম্যাজিনো-লাইন দ্রুত তৈয়ারী করা হইয়াছে—অর্থাৎ দুই বাটি চিপিটক্, গোটা কুড়ি আম্র-ফল, দুটি কাঁঠাল, এক বাটি গুড় এবং তদুপযোগী দুই বাটি কানায়-কানায় পরিপূর্ণ দুধ।

"ওঃ—বাপ্‌রে,"—পার্লিয়ামেণ্টে প্রথম বক্তৃতায় তার প-বাবু তাঁহার "মে-ডেন্ স্পিচ"এর (Maiden Speech) [illegible] ঠিক করিবেন মনে হইল। কাজেই আমি একজন বিজ্ঞ পার্লিয়ামেণ্টেরীয়ানের ন্যায় সেই বক্তৃতার বাধা দিয়া কহিলাম, "প-বাবু, শিউরে উঠচেন যে···এই ম্যাজিনো-লাইন আপনাকেই ভাঙ্‌তে আদেশ কোরবো—বুঝেচেন?"

বৃদ্ধ ম্যাজিনো-লাইন বুঝিল না—তবে প-বাবুর আতঙ্কটা বোধহয় অনুমান করিয়া বলিল, "জ্যৈষ্ঠ মাসে ত্রিলোচন দাসের বাড়িতে বরো-লোক আস্-ছ্যান—কিন্তু কি আর কমু, বাবু··· বরো পোলা নাই যে তারে দিয়া-ও মিষ্ট আনাইবার পারি—।"

হাসিয়া তাহার কথার উত্তর দিলাম, "ত্রিলোচন, তোমার নাত্‌নী যা যোগাড় করেচে—এ আমাদের চারজনেও খেতে পারে না।"

হঠাৎ দাওয়ার পানে চাহিয়া দেখি দু'টি মিনতি-ভরা চক্ষু প-বাবুর দিকে চাহিয়া আছে। বুঝিলাম—এই বৃদ্ধ আর তার নাত্‌নীটি আমার বর্ণ এবং অঙ্গসৌষ্ঠব দেখিয়া ধারণা করিয়াছে যে খাওয়া লইয়া আমার তরফ্ হইতে কোনই আপত্তি উত্থিত হইবে না। কাজেই তাহাদের হইয়া আমি বলিলাম—"প-বাবু, ম্যাজিনো-লাইন আমি-ই ভাঙ্‌বো—আপনি কি সাহায্যটুকুও কোর্‌বেন না?"

দুজনেই প্রাণ-খোলা হাস্য করিলাম।

(৩)

কী ভীষণ বোমা-বর্ষণ আরম্ভ হইল! বাপ্‌রে, কি ভয়ানক ব্ল্যাষ্ট!! একটা প্রবল ধাক্কা খাইয়া উঠিলাম—ঘরের ভিতর যেন সহস্র বিদ্যুতের ঝলক্ খেলিয়া গেল।

"মরে গিয়েছিলেন না কি?",—প-বাবু আর একটা প্রবল ঝাঁকুনি দিয়া কহিলেন, "বা-া-বা, এমন ঘুম ত দেখিনি—কখনও।"

তখনও আমার ঘুম-ঘোর ভাল করিয়া কাটে নাই। দেখিলাম প-বাবু আমার মুখের উপর একেবারে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছেন—ঘরের বাহিরে তখন ঝোড়ো-হাওয়ার দাপা-দাপি চলিয়াছে। টিনের চালটা একবার ঝন্-ঝন্ শব্দ করিয়া উঠিল।

"ঝড় আরম্ভ হয়েচে, না কি,"—প-বাবুর পানে চাহিয়া দেখিতেই কড়্ কড়্ করিয়া একটা শব্দ যেন উন্মত্ত বাতাসে আঘাত করিয়া আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল।

"ভয় নাই কর্‌তা-বাবুরা,"—পার্শ্ববর্ত্তী ঘর হইতে বুড়া চীৎকার করিয়া বলিল, "কাল-বৈশাখী ওট্‌ছে···ধাইমা যাইবো।"

"না—না—ভয় পাচ্ছিনে,—ত্রিলোচন—," যতটা গলায় কুলায় ততটা চীৎকার করিয়া এই কথা কয়টি বলিলাম। আকাশের বক্ষ-বিদীর্ণ করিয়া যে আলোর মালা চলিয়া গেল তাহাতে দূরের মাঠ, চর, নদী পরিষ্কার দেখা গেল। ছড়্-ছড়্ করিয়া টিনের চালে অবিশ্রান্ত বৃষ্টির একটানা শব্দ চলিয়াছে—যেন শ্রুতিগ্রাহ্য আর কোন ধ্বনি শুনিবার আমাদের কোন অধিকার নেই।

কতক্ষণ কাটিয়া গিয়াছে! রুদ্র-দেবতা এই মেঠো গ্রাম ছাড়িয়া বিদায় লইতেছেন—মনে হইল। মধুমতীর ওই পারে তখনও গাছগুলি জোট্ পাকাইতেছে। ত্রিলোচন ঘরের দুয়ারে আসিয়া ডাকিল, "বাবুগোর ডর লাগে নাই ত?"

বলিলাম, "বেশ আছি,—তুমি শোও গিয়ে ত্রিলোচন।"

"আপনার লইগ্যা ত কই-ত্যাছি না···ওই যে বরো-লোকের কথা কই—", সে একটু কাশিয়া গলাটা পরিষ্কার করিবার পরে বলিল।

পার্শ্ববর্তী "বড়লোক"-টিকে একটু ঠেলা মারিয়া বলিলাম, "শুনচেন না?—আপনার কথাই যে জানতে চাইচে।"

তিনি হাসিয়া কহিলেন, "সকলেই কি আমাকে একেবারে নাবালক পেলেন না কি?"

বুড়াকে তাড়াতাড়ি বিদায় দিবার জন্য বলিলাম, "না—ত্রিলোচন, তিনি খুব ভাল আছেন।"

"হ, তাই ওইলেই ত র‍্যক্ষা পাই",—বুড়া শয়ন করিতে গেল। কিন্তু নিদ্রাদেবীর কৃপার কোনই লক্ষণ দেখিতেছি না যে! ঝড়ের পরে দুষ্টা সরস্বতী মাথায় চাপিল না কি?

ডাকিলাম, "প-বাবু—"

অস্ফুটস্বরে তিনি কহিলেন, "কি বোলছেন?"

"আচ্ছা—ধরুন, এই ত্রিলোচন দাস মাহিষ্যের বাড়িতে এই যে আপনি রাত কাটালেন—ধরুন—এই যে তার আপনার উপর—বুঝলেন কি না—একটু পক্ষপাতিত্ব,—এটা যদি আমি রং ফলিয়ে চিকন্দীর ঠিকানায় লিখে ফেলি—," আমার কথা শেষ না হইতেই তিনি আমার অরক্ষিত মুখটি সজোরে চাপিয়া ধরিলেন—বুঝিলাম আন্তর্জাতিক আইন লঙ্ঘন করিয়া তিনি অরক্ষিত স্থানে আঘাত করিলেন।

মিনতির স্বরে প-বাবু বলিলেন, "দোহাই চুপ করুন—হার মানছি, ত্রিলোচন এখনও জেগে আছে—।"

কি বিপদে পড়িলাম! কিছুতেই ঘুম আসে না যে! পূর্ব্বাকাশ ফর্সা হইতেছে না কি? দূরে মধুমতীর চরে বোধহয় একটা পাখী ডাকিতেছে—কোঃ, কোঃ, কোঃ,—মেঠো-হাওয়া ঘরটাকে রীতিমত দখল করিয়াছে। দেখিলাম তখনও প-বাবু আড়ামোড়া খাইতেছেন।

"কর্‌-তা ওঠ-ছেন্ না কি,"—ত্রিলোচনের ডাকে ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল—আমার পার্শ্বে ত প-বাবু নাই! কহিলাম, "তাই তো—খুব ঘুমিয়ে পড়েছি যে—সেই বাবু কোথায়, ত্রিলোচন?"

"ক-খয়ন্ উইঠ্যা গ্যে-ছেন—" "সে কি—!" আমি ধড়্‌মড় করিয়া উঠিলাম।

চক্ষুতে ফুল দেখিতেছি কেন? ভাল করিয়া চক্ষু রগ্‌ড়াইলাম! রাশি-কৃত বকুল ফুল দাওয়ার চৌকির উপর জড়ো করা রহিয়াছে। আমার মানসিক বিপর্য্যয় দেখিয়া বোধকরি বুড়া মনে মনে হাসিল।

কহিল, "দেখ্‌ছেন নি, কর্‌তা,—আমার বিধু এইগুলা যোগার করছে—।"

(৪)

আবার হাঁটিতেছি—এইবার দুইজন নহে—তিন জন। বুড়া কিছুতেই আমাদের একা ছাড়িয়া দিবে না। তাহাকে নিরস্ত করিবার বহু চেষ্টা করিয়াছি,—সে এ্যালেংখালির খেয়াঘাট পর্য্যন্ত যাইবেই—। আমার বোঁচ্‌কা সে মস্তকে লইয়াছে—দক্ষিণ হস্তে প-বাবুর-সেই স্যুট্‌কেশ!

সঙ্কীর্ণ পথ আঁকাবাঁকাভাবে চরের উপর দিয়া গিয়াছে। বুড়া সম্মুখে, প-বাবু মধ্যে—আমি পশ্চাতে। ওই যে দূরে খেয়াঘাট,—চরের সহিত ওপারের একটা ক্ষীণ যোগাযোগ রক্ষা করিতেছে। ত্রিলোচন ওই দিক্ অঙ্গুলি-নির্দ্দেশ করিয়া কহিল, "শোন-ছ্যেন নি, কর্‌তা,—নৌকাগুলি না কি সব কাই্‌-রা লইবো—জাপান আইত্যাছে—"

আমি বলিলাম, "না—না—কেড়ে নেবে কেন—রেজিষ্ট্রি হবে,—বুঝ্‌লে না,—নাম লিখিয়ে নেবে—।"

বৃদ্ধ বিজ্ঞের মত কহিল, "হ,—আমিও ত তাই—কই—কাইরা লইলে পারাপার হোমু ক্যামায়—।"

* * * *

খেয়া ছাড়িয়া চলিল। কিসের একটা ব্যথা অনুভব করিতেছি।

ত্রিলোচন কহিল, "প্যেন্নাম হই, বাবুরা—হেই পথে আবার আই-ব্যান।"

চক্ষুতে ময়লা পড়িল না কি? ধরা-গলায় বুড়াকে বলিলাম, "হঁ—।"

নৌকা চলিল—জলের ছলাং-ছলাৎ শব্দ শুনিয়া প-বাবু ওপারের দিকে মুখ ফিরাইয়া বসিলেন—তাঁহার ঠোঁট্ দুটি কাঁপিতেছে মনে হইল—সজোরে নৌকার পাটাতনের উপর অঙ্গুলি সঞ্চালন করিতে লাগিলাম।

কাঁদে জনগণ তোমারি তরে

কুমারী পীযূষকণা সর্ব্বাধিকারী

প্রতিভার রবি গিয়াছে ডুবিয়া বাণীর কুঞ্জ অন্ধকার,
চোখগেল পাখী কেঁদে কেঁদে সারা তোমারে ফিরিয়া পাবেনা আর
রবি কবি তুমি, হে মহাতাপস আপামর কাঁদে তোমার শোকে,
কাঁদিছে বাঙলা, কাঁদিছে ভারত, অশ্রু ঝরিছে বিশ্বলোকে।
কৃষ্টি-কলার হে মহাসাধক ধন্য করেছ বঙ্গভূমি,
জগৎ সভায় লভিয়া আসন বাংলা-বাঙ্গালী চিনালে তুমি।

প্রতিভা প্রতীক হে কবিতিলক তব জয়গান ঘোষিত বিশ্বে,
ছন্দমধুর কবিতা তোমার পান করে সদা ধনী ও নিঃস্বে।
বাল্মীকি তুমি এসেছিলে ফিরে অমর কবিতা তোমার দান,
প্রাচী ও প্রতীচি হরষে পুলকে জাগিয়া উঠিল শুনে সে গান।
মরধামে নাই নরসিংহ আজ, ঋষি অদর্শন চিতার ধূমে,
বাঙ্‌লা মায়ের প্রতিভা-দুলাল ভস্ম হয়েছে শ্মশানভূমে।

কণ্ঠ আজিকে হারায়েছে ভাষা, নয়নে কেবল অশ্রু ঝরে,
জনগণমন হে অধিনায়ক! কাঁদে জনগণ তোমারি তরে।

বিলাতের পথে *

অধ্যাপক শ্রীঅক্ষয়কুমার ঘোষাল এম-এ, পি-এইচ্-ডি

১৯৩৮ সালের সেপ্টেম্বর মাস—ইতিহাসের একটা যুগ সন্ধিক্ষণ। কিছুকাল হতে ইউরোপের রাজনৈতিক আকাশে যে মেঘ পুঞ্জীভূত হচ্ছিল তা থেকে একটা প্রলয়ঙ্করী কাল বৈশাখী উঠতে আর একেবারেই বিলম্ব নেই। সমস্ত জগৎ রুদ্ধ নিঃশ্বাসে আসন্ন 'Zero hour'এর প্রতীক্ষা করছে। একটা প্রলয়লীলা অভিনয়ের জন্য রঙ্গমঞ্চ প্রস্তুত—যে কোন মুহূর্তে যবনিকা উঠতে পারে। এই অনিশ্চিত অবস্থার মধ্যে ১২ই অক্টোবর তারিখে বোম্বাই থেকে শ্রীদুর্গা স্মরণ ক'রে বিলাতের পথে পাড়ি দেওয়া গেল।

জাহাজখানির নাম হচ্ছে 'কণ্টিভার্ডে।' খুব ছোটও নয়, খুব বড়ও নয়, ২০০০০ টন। তিন ভাগে ভাগ করা সামনের দিকটা II Econ আমাদের। মাঝখানটা প্রথম শ্রেণী। পিছনটা দ্বিতীয় শ্রেণী। আমাদের দেশে নদীতে যত জাহাজে চড়েছি তাতে সামনেই প্রথম শ্রেণী, আমার ধারণা ছিল এখানেও তাই হবে। সেই জন্য আমাদের তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের সামনে এগিয়ে দেবার অর্থটা প্রথমে বুঝিনি। আমাদের এত খাতির কেন! পরে শুনলাম mid ship এ অর্থাৎ জাহাজের মাঝখানে দোলুনি সবচেয়ে কম হয়, তাতে sea sickness হবার সম্ভাবনা কম; সেইজন্যই এই ব্যবস্থা। জাহাজে আমরা পাঁচজন বাঙ্গালী যাচ্ছি—ডাঃ নরেশ রায়, সিটি কলেজ ও ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক; ডাঃ এইচ্ রক্ষিত, কলিকাতা সায়েন্স কলেজের লেক্‌চারার; এঁর সঙ্গে বোম্বাই-এতে আলাপ হয়েছিল, মিঃ জে, এন্ দত্ত ইনি মীরাটে চাকুরি করেন মিলিটারি একাউণ্টে। প্রথম দুজন কলিকাতা ইউনিভার্সিটির ঘোষ ট্রাভ্‌লিং ফেলোশিপ্ নিয়ে যাচ্ছেন, তৃতীয় ভদ্রলোক যাচ্ছেন বেড়াতে। আমাদের কয়জনে বেশ খাতির জমে গেছে। ডাঃ রক্ষিত ও জে, এন্ দত্ত এক কেবিনে আছেন। ডাঃ রায় আছেন আমাদের পাশের কেবিনে। তাঁ'র কেবিনে আর দু'জন পার্শি ভদ্রলোক আছেন। আমাদের কেবিনে আমরা দু'জন ছাড়া একটী অতি বৃদ্ধ হায়দ্রাবাদি মুসলমান ভদ্রলোক উঠেছেন। তিনি পোর্ট সৈয়দে নেমে যাবেন। তাহলে আমরা দুজনে কেবিনটা পাব। তাঁকে আমরা ঠাকুরদা নাম দিয়েছি। তিনি সমস্ত সময়ই কেবিনে থাকেন, আর ধর্ম্মপুস্তক পড়েন। তাতে আমাদের খুব সুবিধা হয়েছে, আমাদের জিনিসপত্রের জন্যে ভাবতে হয় না। পঞ্চম বাঙ্গালী সুকুমারবাবুকে আমরা সর্ব্বসম্মতিক্রমে 'দাদা' করে নিয়েছি। তাঁর সর্ব্বদা একটা না একটা সমস্যা লেগে আছে এবং সব সময়েই ব্যতিব্যস্ত; তাঁকে নিয়ে আমাদের বেশ সময় কাটে। জাহাজে কতকগুলি ইতালীয় মেয়ে উঠেছে এবং কতকগুলি ইতালীয় বাজে লোক উঠেছে। এরা সময় সময় এমন বেহায়াপনা কাণ্ড করে যে মনে হয় যেন আমরা সভ্যজগতের বাইরে এসেছি। মেয়ে মানুষ যে এতটা নির্লজ্জ হ'তে পারে আমাদের দেশে তা ধারণা করা যায় না।

১৭।১০।৩৮ দুপুরের সময় আমরা সুয়েজ বন্দরে পৌঁছলাম; কিন্তু জাহাজ তীরে ভিড়লো না, খানিকটা দূরে নোঙ্গর করে রইল। আমরা নামবার অনুমতি পেলাম না; সুতরাং সাগরের উপর থেকেই সুয়েজকে অভিনন্দন জানাতে হোলো। সুয়েজে না নাম্‌লেও একটা মজার জিনিস এখানে দেখলুম—নৌকায় ও দোকানে নানা রকম জিনিসের বেচাকেনা, চামড়ার ভ্যানিটি ব্যাগ, মনি ব্যাগ, রূপার বালা ইত্যাদি। ঢাকার ভাগ্যকুলে পদ্মায় নৌকা করে মিষ্টি বেচার কথা মনে করিয়ে দিলে। আমাদের এবং অন্যান্য প্রাচ্য দেশের চিরাচরিত প্রথানুযায়ী দরাদরি, প্রত্যেক জিনিসটার ওপর দ্বিগুণ দর হাঁকা, তারপর যার কাছে যতটা আদায় ক'রতে পারে।

সুয়েজ সহর ছেড়ে কিছুদূর গিয়ে মনে হলো যেন দু'ধারেই মরুভূমি। খালটী অত্যন্ত স্বল্প পরিসর। একখানির বেশী জাহাজ একসঙ্গে যেতে পারে না। জাহাজ অত্যন্ত মন্থর গতিতে চলেছে। মাত্র ৩০।৪০ মাইল অতিক্রম করতে সমস্ত রাত্রি প্রায় লাগলো। ভোরের দিকে জাহাজ নোঙ্গর করল। বুঝলাম পোর্ট সৈয়দে পৌঁছেছি।

এখান থেকে ধীরে ধীরে ভূমধ্যসাগরে গিয়ে পড়লুম। দুই এক ঘণ্টার মধ্যেই আবহাওয়ার বেশ পরিবর্ত্তন বোঝা গেল, বেশ একটু ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা। বিকেলের দিকে দেখি জাহাজের সমস্ত ক্রুরা পোষাক পরিবর্ত্তন করে ফেলেছে, সব কালো গরম কাপড়ের পোষাক পরে ফেলেছে। আমরাও সব বেশ পরিবর্ত্তন করে ফেল্লুম। য়ুরোপের এলাকায় পড়লুম সেটা যেন ঘোষণা করা হ'ল। পরের দিন এক নাগাড়ে চলা। বেশ একটু ঠাণ্ডা হাওয়া চালিয়েছে। ডেকে আর বসবার উপায় নেই। যেন মানুষ উড়িয়ে নিয়ে যাবার মত। সব লাউঞ্জেতে বসে গল্প করছে অথবা কেবিনেই আছে। ক্রমেই সমুদ্রের ঢেউ বাড়তে লাগলো। ২১শে তারিখে সকাল থেকেই সুকুমারবাবুর অবস্থা একটু কাহিল হতে লাগলো, সকাল বেলা তিনি break fast খেতেও গেলেন না। সকাল থেকেই শোয়া। আমি দুপুর পর্য্যন্ত ঠিকই ছিলুম, কিন্তু তারপরই মাথা ঝিম্ ঝিম্, গা বমি বমি আরম্ভ হলো। ইতিমধ্যে আমাদের জাহাজ ব্রিণ্ডিসি—ইতালীর এক সহরে এসে থেমেছে। জাহাজ থেকে যা দেখা গেল সহরটী বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং সুন্দর লাগলো। এখানে সমুদ্রের জল ঘাসের মত সবুজ। এটা আড্রিয়াটিক উপসাগর। এখন আমাদের জাহাজ ইতালীয় কূলকে বামে রেখে চলেছে।

পরদিন সকালেই দূরে ভেনিস্ সহর দেখা গেল। কিন্তু ভেনিসে জাহাজ ভিড়তে ১৷০ ঘণ্টা লেগে গেল। ভেনিসটা একটা ভাসমান সহর বল্লেও অত্যুক্তি হয় না। ঢাকার মধ্যে যেমন মাঝে মাঝে খাল দেখা যায় ঐ রকম খাল যদি সর্ব্বত্র থাকে তবে ভেনিসের ধারণা করা যাবে। খালের মধ্যে দিয়ে একেবারে জাহাজ সহরের মধ্যে গিয়ে থাম্‌লো। সেখানে জাহাজেই customs পরীক্ষা হলো। বাক্স প্যাঁট্রা খুলে দেখানো হ'ল কোন duty দেবার মত জিনিস আছে কিনা। তারপর passport দেখানোর পালা। মুসোলিনীর রাজত্বে ঢুকেছি। এ সব শেষ হলে আমরা মোটর লাঞ্চে নামলুম। লাঞ্চ এখান সেখান ঘুরে ষ্টেশনে নিয়ে গিয়ে হাজির করলো, তখন বেলা প্রায় ১১-১৫। ১২-৭ মিনিটে আমাদের গাড়ী। সময় বেশী নেই। লাগেজ্ অন্য লাঞ্চে আগে পাঠিয়ে দিয়েছি। ষ্টেশনে এসে দেখলুম স্তূপাকার করে রেখেছে। আমাদের জিনিসপত্র বেছে নিয়ে গাড়ীতে গিয়ে উঠলুম। ট্রেণ ছাড়বার আর মাত্র আধ ঘণ্টা বাকী। সাম্‌নে ৩০ ঘণ্টার রাস্তা। ট্রেণে উঠে দেখি সমস্ত জায়গা ভর্ত্তি হয়ে গেছে। তৃতীয় শ্রেণীর অবস্থা সর্ব্বত্রই সমান। এখানে বারাণ্ডাওয়ালা গাড়ী, ঘরের ভেতর প্রত্যেক কামরায় ৮টা করে seat, প্রত্যেকটী নম্বর আঁটা। প্রত্যেকটীতে ঠিক একজন করে বসবে।

---

* ১৯৩৮ সনে অক্টোবর মাসে বিলাত যাবার পথে ও বিলাতে অবসর কাটানর জন্য কিছু কিছু দিনপঞ্জী লিপিবদ্ধ করেছিলাম। অবসর অভাবে সেগুলি একত্র করে প্রকাশ করা সম্ভব হয়নি, সেইজন্য কাহিনীটী প্রকাশ করতে বিলম্ব হলো। আশাকরি, সহৃদয় পাঠকবর্গ এই অনিচ্ছাকৃত ত্রুটী মার্জ্জনা করবেন।

আমাদের দেশের মত ৪০ জনের জায়গায়—গুঁতোগুঁতি করে আশীজন বসে না। বাকি লোক সব বারাণ্ডায় দাঁড়িয়ে থাকে। এমন নিয়মানুবর্ত্তিতা এদের যে একটা লোকও আর ভেতরে যাবে না, ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে যাচ্ছে। অনেক সময় ভেতরের লোক অনেকক্ষণের জন্ত উঠে যাচ্ছে, কিন্তু সেই ফাঁকে যে একজন এসে তার জায়গা মেরে দেবে তা কখন করে না। এইসব ছোট জিনিসেই একটা জাতির সারবত্তার পরিচয় পাওয়া যায়।

ইতালীর মধ্য দিয়ে যেতে যেতে বাংলা দেশের কথাই মনে পড়লো। ঠিক আমাদের দেশের মতই দেখায়। শুধু মেটে বাড়ী নেই এবং সর্ব্বত্র ইলেক্‌ট্রিক এবং একটু সহর হলেই ট্রাম বাস ইত্যাদি এই যা তফাৎ। খানিকটা দূর এসে পাহাড় দেখা যেতে লাগলো। বোধহয় আল্‌প্‌স্ পাহাড় শ্রেণী। ৩টা ৩॥০টার মধ্যেই বেশ ক্ষুধার উদ্রেক হলো। যদিও আর খাওয়া জোটে কি না জোটে বলে জাহাজে break fastটা একটু বেশী করেই খাওয়া হয়েছিল। ভেনিস থেকে কিছু কেক, বিস্কুট, আপেল ও আঙ্গুর নেওয়া হয়েছিল তাই সকলে ভাগ করে খাওয়া হলো এবং কিছু রেখেও দেওয়া হোলো যদি রাত্রে আবার দরকার হয় বলে। কিন্তু পানীয় কিছু সঙ্গে নেই। পরে একটা বড় ষ্টেশন আসতে অতি কষ্টে ইসারা ইঙ্গিতে কয়েকটা মিষ্ট জলের বোতল কেনা হোলো। কিছু ইতালীর মুদ্রা দেওয়া হোলো, দয়া করে যা ফেরৎ দিলে—বিনা বাক্যব্যয়ে তাই নিতে হলো। কেন না ভাষা বিভ্রাট। যাইহোক, কোন রকমে উদর পূর্ত্তি হোলো।

ক্রমে সন্ধ্যা হয়ে এলো। আর কিছু দেখা যাচ্ছে না। আজ কালী পূজার রাত্রি ঘোর অমাবস্যার অন্ধকার। একবার মনে হোলো দেশে খুব বাজী পোড়ানোর ধূম চলেছে। কিন্তু তার ৪ ঘণ্টা আগেই হয়ে গেছে; এখানে ঘড়ি আমাদের দেশের চেয়ে ৪ ঘণ্টা পেছনে। ইংলণ্ডে ৫॥০ ঘণ্টা পিছনে অর্থাৎ দেশে আমাদের যখন ঘুম ভাঙ্গে তখন সেখানের লোকে দুপুরের ঘুমের আয়োজন করছে। ষ্টীমার থেকেই আমাদের ঘড়ি পেছনো আরম্ভ হয়েছে। প্রায় প্রতি দিন রাত্তেই জাহাজে নোটিশ্‌ দিত কাল সকালে ঘড়ি আধঘণ্টা পেছিয়ে দেওয়া হবে। অর্থাৎ সকালের মধ্যে জাহাজ যে জায়গায় উপস্থিত হ'বে সেখানকার সময়ের সঙ্গে মেলানোর জন্তে। এইভাবে ইতালীতে আসতে আসতে বোম্বাই-এর সময় থেকে প্রায় ৪ ঘণ্টা—কলিকাতার সময় থেকে ৪॥০ ঘণ্টার তফাৎ হয়ে গেছে। বেচারা ঘড়ির ওপর নির্ম্মম অত্যাচার গেছে। আবার প্যারিসে এসে দেখি সময় আরও একঘণ্টা পেছনে। প্যারিস এবং লণ্ডনে অবশ্য আর তফাৎ হয়নি। একই সময়। রাত্রে আর কিছু দেখবার উপায় নেই—অথচ শোয়ারও সুবিধা নেই। ঠিক সোজা হয়ে বসে থাকা। এ এক ভয়ানক বিড়ম্বনা। মাঝে মাঝে একটা ষ্টেশন আসে, খানিকটা মুখ বাড়িয়ে দেখি। কোন সাড়া শব্দ কিছু নেই। কিছু যাত্রী ওঠে, কিছু নামে; নিঃশব্দে। ২।৩ মিনিটের মধ্যেই ছেড়ে দেয়, আবার অন্ধকারের পালা। ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসছে। নিজেদের মধ্যে ঘাড়ে ঘাড়ে বসে একটু ঢোলা হয়, একটু ঘুমের আমেজও আসে, কিন্তু এ অবস্থায় ঘুম যাকে বলে তা সম্ভব নয়। আবার "গণ্ডস্যোপরি বিস্ফোটকং"। তার ওপর আবার customsএর অত্যাচার। ইতালীর সীমানায় আসতেই একদল ইতালীয় কর্ম্মচারী এসে বাক্স প্যাঁটরা খুলে পরীক্ষা করে গেল। শুল্ক দেবার মত কিছু জিনিস আছে কিনা। অবশ্য সব খোলে না, মাঝে মাঝে একটা খোলে। আবার আর একদল এসে পাশপোর্ট দেখাতে বললে। এই অত্যাচার তিনবার হোলো। এই customs আর পাশপোর্টের অত্যাচারে প্রাণ যেন ওষ্ঠাগত হয়, তখন মনে হয় একেবারে সোজাসুজি জাহাজ আসাই ভাল ছিল। যদিও তাতে অনেক সময় লাগতো।

সুইটজারল্যাণ্ডের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের কথা অনেক শুনেছি ও পড়েছি, আমাদের দেশের ভূ-স্বর্গ কাশ্মীরের মত নাকি। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ সুইটজারল্যাণ্ড রাত্রেই পেরিয়ে গেল, অন্ধকারের অবগুণ্ঠনে ঢাকাই রয়ে গেল।

সুইটজারল্যাণ্ড পেরিয়ে ফ্রান্স পড়লো, তখনও রাত্রি। ভোর হোলো প্যারিস থেকে কিছু দূরে। এখানেও লাইনের দুধারে বড় বড় মাঠ ঠিক বাংলা দেশের মত। এখানেও নানা রকম তরী-তরকারির ক্ষেত, কিন্তু ইতালীর মত একেবারে প্রতি খণ্ড জমি আবাদ করার প্রয়াস নেই। কিছু কিছু জমী বিনা চাষে পড়ে আছে দেখা যায়। মাঝে মাঝে তৈয়ি করা বনানী বোধ হয় কাঠ সরবরাহের জন্তে, কিন্তু চারি-দিকেই একটা পরিপাটি ঠিক যেন ছিমছামভাব। মাঝে মাঝে লম্বা লম্বা রাস্তা গেছে, টার দেওয়া। মোটর যাবার মত সব রাস্তাই। সর্ব্বত্রই ইলেক্‌ট্রিক। অনেক জায়গায় ক্ষেতে ইলেক্‌ট্রিকে বা মেশিনে কাজ হচ্ছে। ৭টার সময় প্যারিস (লিয়ন) ষ্টেশনে গাড়ী থামলো। এখানে নেমে প্যারিসের আর একটা ষ্টেশন প্যারিস নর্ড (যেমন শিয়ালদা ও হাওড়া মাইল দুই তিন দূরে) থেকে আমাদের অন্ত গাড়ীতে উঠে ইংলিশ চ্যানেলের ষ্টেশন বুলোন অবধি যেতে হবে। আমাদের ঘড়ি অনুযায়ী মাত্র আধ ঘণ্টা সময়। তাড়াহুড়ো করে ট্যাক্‌সি নিয়ে উর্দ্ধশ্বাসে প্যারিস নর্ড ষ্টেশন গিয়ে দেখি একঘণ্টার ওপর গাড়ী ছাড়তে দেরি। বুঝ্‌লুম সময় বিভ্রাট হয়েছে।

সহরে ঢুকে ভাষা বিভ্রাটে পড়া গেল। কন্টিনেণ্টে ইংরাজীর বিশেষ চল নেই। ফ্রেঞ্চ বা জার্ম্মাণ প্রায় সকলেই বোঝে। এই ভাষা না জানাতে প্যারিসে আবার একবার দুর্দ্দশা ভোগ করতে হোলো। সমস্তদিন গাড়ীতে কাটবে। কালকার খাবার যা বাকী ছিল, সমস্তই নিঃশেষ হয়েছে। কিছু খাত্ত সংগ্রহ করা দরকার। সকলেই আমার ওপর ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত, কেউ নড়বেন না। তারওপর আবার সুকুমারবাবুর এক আত্মীয়াকে একটা কেব্‌ল্ করতে হবে ভিক্টোরিয়া ষ্টেশনে আসার জন্তে। একে ওকে ইসারা ইঙ্গিতে জিজ্ঞাসা করে অতি কষ্টে টেলিগ্রাফ অফিস বার করলুম। ভাগ্যক্রমে টেলিগ্রাফ মাষ্টারটী ইংরাজী বোঝেন। কিন্তু ইংরাজী বুঝলে কি হবে, টেলিগ্রাফের ফর্ম্ম লিখে ইংরাজী মুদ্রা দিতে বললেন, এতে হবে না—ফরাসী মুদ্রা চাই। এই ফরাসী মুদ্রা ভাঙ্গিয়ে এনে তার করা কিছুতেই সম্ভবপর হত না যদি ভাগ্যক্রমে ইংরাজীজানা এক ফরাসী ভদ্রলোকের সঙ্গে পথে পরিচয় না হ'ত। তাঁরই সৌজন্তে এই ভাষা বিভ্রাট থেকে কোনরকমে রেহাই পেয়ে ও কাজ সেরে ষ্টেশনে ফিরে এলুম।

গাড়ী ছাড়বার সময় হয়ে এলো। দেখলুম দলে দলে স্ত্রীপুরুষ সব ফুলের তোড়া ও একটা করে সুটকেশ নিয়ে চলেছে। এ জিনিসটা ইংলণ্ডেও দেখেছি। এরা সমস্ত সপ্তাহটা খাটে আর রবিবারে বাইরে বেড়াতে যায়। কেউ বা মফঃস্বলে আত্মীয় বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে দেখা করতে যায়, কেউ কেউ বা দল বেঁধে কোন দ্রষ্টব্য স্থান দেখতে বা পিক্‌নিক্ করতে যায়। প্রায় প্রত্যেক ষ্টেশনেই দলে দলে লোক উঠছে, নামছে। এই জিনিসটা শনিবারে ইংলণ্ডেও দেখা যায়। খুব কম লোকেই এদেশে ছুটি পেলে আমাদের মত ঘুমিয়ে বা তাস পাশা খেলে কাটায়। এই যে সপ্তাহে একদিন বাইরে ঘুরে আসে শরীর এবং মনের ওপর এর যে কতটা স্বাস্থ্যকর প্রতিক্রিয়া হয় তা বলা যায় না। এরা যে এত বয়স পর্য্যন্ত স্বাস্থ্য এবং কর্ম্মক্ষমতা বজায় রাখতে পারে, এটা তার একটা অন্যতম কারণ। অবশ্য দেশের জলবায়ু এবং পুষ্টিকর খাত্তই স্বাস্থ্যরক্ষার প্রধান কারণ। কিন্তু আসল কথা এই যে, এরা বাঁচবার মত বাঁচতে জানে। আমরা কোনরকমে দিন কাটিয়ে যাই। আর একটা জিনিস লক্ষ্য করলুম—এ সব দেশের লোকেদের সৌন্দর্য্যবোধ। এরা সুন্দরের উপাসক। কারুর বাড়ীর মধ্যে একফালি জমি থাকলে ছোট্ট একটী ফুলের বাগান করবেই। শাকসজির বাগানগুলি এমন সুন্দর করে

রাখে, দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়। ফুল এরা এত ভালবাসে বলা যায় না। বাজার করতে গিয়ে যেমন মাছ মাংস, তরি-তরকারী কেনে, সঙ্গে সঙ্গে ফুলও কিনে আনে। খাবার টেবিলে, ড্রইং রুমে এদের নিত্য ফুল চাই। প্রত্যেক রাস্তায় যত খাবার জিনিসের দোকান, ততই ফুলের দোকান। তাছাড়া মোড়ে মোড়ে ফুলের ফেরিওয়ালা। এ থেকেই এদের সৌন্দর্য্যবোধের পরিচয় পাওয়া যায়। সৌন্দর্য্যবোধটা কৃষ্টি এবং সভ্যতার দিক দিয়ে জাতির একটা মস্ত বড় গুণ। যে জাত সুন্দরকে উপাসনা করে না, সভ্যতার মাপকাঠিতে সে জাত অনেক পেছনে পড়ে আছে বলা যায়।

বেলা ১২॥টার সময় বুলোনে গাড়ী এসে পেঁছুলো। এটা ইংলিশ চ্যানেলের ওপর। কিছুদূর থেকে ধূ-ধূ করছে বালির পাহাড়শ্রেণী বহু দূর বিস্তৃত ; তার পেছনেই ফাঁকা—বোঝা গেল সমুদ্র কাছে। এখানটা গাড়ী যখন এগিয়ে আসছিল আমাদের দেশে ট্রেনে গোয়ালন্দ পৌঁছানর মুখে যেমন লাগে, ঠিক সেই রকম লাগছিল। আমাদের গাড়ী একেবারে জাহাজ ঘাটের গায়েই গিয়ে লাগল। কিন্তু তখনই জাহাজে উঠা গেল না। আধ ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হোলো, আবার সেই পাশপোর্ট পরীক্ষার পালা। আধ ঘণ্টা পরে সারিবদ্ধ হয়ে আবার সব দাঁড়াতে হোলো—একে বলে কিউ করে দাঁড়ানো। বিলাতে সমস্ত জায়গাতেই যথা—ষ্টেশনে টিকিট কেনা, সিনেমা, থিয়েটার, পোষ্ট অফিস, যেখানেই ভিড় হয় সেখানেই এই 'কিউ' বা সারিবদ্ধভাবে দাঁড়ানোর প্রথা। আমাদের দেশের মত ঠেলাঠেলি গুঁতোগুঁতি আর পকেট মারার ভয় নেই। এক একজন করে পর পর বেরিয়ে যাবে। এদের এমন শৃঙ্খলা জ্ঞান যে, কোন লোক পরে এসে আগে গিয়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করে না। যাইহোক, পাশপোর্ট দেখানো নির্ব্বিঘ্নে সমাধা হ'লে একে একে গিয়ে জাহাজে উঠা গেল।

জাহাজখানার নাম 'Maid of Orleans' একটা ইতিহাসপ্রসিদ্ধ নাম। ছোট জাহাজ। আমাদের গোয়ালন্দ ষ্টিমারের চেয়েও ছোট। প্রায় বেলা দুটা আন্দাজ জাহাজ ছাড়ল। এ কেবল খেয়া পার। ইংলিশ চ্যানেল অনেক সাঁতারু সাঁতরে পেরিয়েছে। মাত্র দেড় ঘণ্টার মামলা। কিছুক্ষণের মধ্যেই ইংলণ্ডের মাটি দৃষ্টিপথে পড়লো। প্রথম দর্শনে ইংলণ্ডের যে মূর্ত্তি চোখে পড়লো তা মোটেই সন্তোষজনক নয়। পদ্মার পাশে বর্ষাকালে যেমন ভাঙ্গন ধরা চড়া দেখা যায় সেইরকম, তবে তফাৎ এই—সেখানে সবুজ ঘাস ক্ষেত ইত্যাদি দেখা যায়, এখানে তা নেই, কেবল বালিয়াড়ি, মানুষের বাস আছে বলে মনেই হয় না। মনটা দমে গেল। মনে হে'ল সাত সমুদ্র তের নদী পেরিয়ে এ কোথায় এলুম। ক্রমে জাহাজ Folkstoneএর জেটিতে ভিড়ল। এখানেও আবার কিউ করে দাঁড়ানো। পাশপোর্ট পরীক্ষা ও কাষ্টমস্ অনুসন্ধান হবে। কাষ্টমস্এর একটা জিনিসের তালিকা দিয়ে জিজ্ঞাসা করল—এর মধ্যে কোন জিনিস এনেছ কিনা, এগুলির ওপর শুল্ক লাগে। বল্লুম—না। একটা বাক্স খুলতে বললে। উল্টে পাল্টে দেখ্‌ল তারপর সব বাক্সের ওপর একটা করে দাগ কেটে দিলে অর্থাৎ ছাড়পত্র মিলল। গাড়ী ছাড়বার আর বেশী দেরী নেই। তাড়াতাড়ি porter (মুটে)এর কাছে মাল দিয়ে চলেছি। একজন বাঙ্গালী ছোক্‌রা প্ল্যাটফর্ম্মে ঢুক্‌তেই জিজ্ঞাসা করলেন—"আপনিই কি মিঃ ঘোষাল ?" বল্লুম "হ্যাঁ, আপনি ?" তিনি বল্লেন "আমি চক্রবর্ত্তী।" বুঝলাম, সুকুমারবাবুর শ্যালক। কেবল্‌ পেয়ে ভগ্নিপতিকে এগিয়ে নিতে এসেছেন। বল্লেন "গাড়ী ছাড়বার দেরি নেই, আপনি উঠে পড়ুন এই গাড়ীতে ; আমি সব ঠিক করে দিচ্ছি।" মালের বন্দোবস্ত করে মুটেকে পয়সা দিয়ে বিদায় করে বল্লেন—"আপনার কিছু দরকার আছে কি ?" আমি বল্লুম "আমার এক বন্ধুকে লণ্ডনে একটা ফোন্ করতে চাই, যদি একটু দেখিয়ে দেন কোথায় ফোন আছে ?" বল্লেন "অত সময় নেই—আপনি থাকুন, আমাকে নম্বরটা দিন, দেখি যদি ফোন করতে পারি।" কয়েক মিনিট পরে এসে বল্লেন "আজ রবিবার ফোনে নম্বর পেতে বড় দেরি হবে দেখে আমি টেলিগ্রামই করে দিয়েছি, এক ঘণ্টার মধ্যেই তিনি পেয়ে যাবেন।" ঠিক এমন সময় গাড়ী ছেড়ে দিল। আমি নিজে করতে গেলে কিছুই হোতো না, হয়তো গাড়ীই ফেল্ হয়ে যেত। বহু ধন্যবাদ দিলুম। তিনি ও সুকুমারবাবু খানিকটা আগিয়েই বসেছেন। থার্ড ক্লাস গাড়ী, কিন্তু আমাদের দেশের ফার্ষ্ট ক্লাশের থেকে খুব বেশী তফাৎ নয়। গদি আঁটা সিট, গাড়ী একেবারে ভর্ত্তি, কিন্তু একটু শব্দ নেই। বেলা পড়ে এসেছে, যদিও মোটে সাড়ে তিনটে বেজেছে। বেশ পরিষ্কার আকাশ। ট্রেণে যেতে যেতে সূর্য্যাস্ত দেখা গেল। তখন বোধহয় সাড়ে চারটেও হয়নি। দু'পাশের দৃশ্য ফ্রান্সেরই মত। অনেক ডেয়ারি (Dairy) পোলট্রি (Poultry) ফার্ম্ম দেখলুম। এইদিক থেকেই লণ্ডনে দুধ ঘি মুরগী প্রভৃতি চালান যায়। অবশ্য এতে কিছুই হয় না, বেশীর ভাগই বিদেশ থেকে আমদানী হয় Cold storage করে। মাঝে মাঝে ছোট ছোট সহর—ট্রেণ থেকে চোখে পড়ল, ফোক্‌ষ্টোনও বেশ পরিষ্কার সহর, এখানেও লণ্ডনবাসীরা অনেক সময় রবিবার ও ছুটার দিন কাটাতে আসেন। ঠিক ৫-৫০ মিনিটের সময় লণ্ডনের ভিক্টোরিয়া ষ্টেশনে এসে গাড়ী থামল।

পোর্টের ডেকে মাল নামিয়ে প্ল্যাটফর্ম্মে দাঁড়িয়েছি এমন সময় দেখি প্রাণকুমারবাবু এসে উপস্থিত। বল্লেন "ঠিক আধ ঘণ্টা আগে আমার টেলিগ্রাম পেয়েছেন, আর একটু পরে পেলে সময়ে আসতে পারতেন না। আমরা ট্যাক্‌সিতে গিয়ে উঠলুম। রাস্তায় যেতে যেতে দেখলুম সব দোকান পাট বন্ধ, রাস্তায় লোকও নেই, যেন ছুটার দিনের ক্লাইভ ষ্ট্রীটের মত। লণ্ডন সহরের এরকম মূর্ত্তি আশা করিনি। সেদিন রবিবার। রবিবারে এখানে কেউ কাজ করে না। এক দু'চারটা রেঁস্তোরা ও ও তামাকের দোকান ছাড়া আর কোন দোকান পাট খোলে না এবং বেশীর ভাগ লোকই বাইরে চলে যায়, কাজেই রবিবারে রাস্তাঘাট প্রায় নির্জ্জন হয়ে থাকে।

আধ ঘণ্টার মধ্যেই ট্যাক্সি গন্তব্য স্থানে এসে থামল। মিটারে দেখা গেল ৪ শিলিং ৬ পেনি উঠেছে। প্রাণকুমারবাবু বল্লেন "৫ শিলিং দিয়ে দিন।" বাড়তি ৬ পেনি হ'চ্ছে tip অর্থাৎ বক্‌শিস্। এখানে এই জিনিসটা পদে পদে দিতে হয়। রেঁস্তোরায় খেতে গেলে ১ শিলিং যদি বিল হয় তাতেও ২ পেনি tip দিয়ে আসতে হ'বে। চুল ছাঁটতেও tip। এরা অবশ্য চাইবে না। কিন্তু না দিলে সেটা অত্যন্ত অভদ্রতা মনে করে। ট্যাক্সি ড্রাইভার good night Sir বলে মালগুলি বাড়ীর দরজায় নামিয়ে দিয়ে চলে গেল। মাল সেইখানে রেখেই আমরা ওপরের ঘরে চলে গেলুম। বাড়ীতে চাকরের পাট নেই ; নিজেদেরই মোটঘাট তুলে নিতে হয়। প্রাণকুমারবাবুর ঘরটা দেখলুম বেশ বড়। বাড়ীর সমস্ত আসবাব বাড়ীওয়ালা দেয়। খাট বিছানা লেপ কম্বল—ড্রেসিং টেবল, চেষ্ট অফ ড্রয়ার, কয়েকটা চেয়ার, একটা সোফা, একটা টেবল্, মেঝেতে গালচে বিছানো এ সব বাড়ীতেই থাকে। ঘর ভাড়া নেওয়া মানেই সমস্ত আসবাব সাজানো ঘর। এগুলি নিত্য ঝাড়া মোছা ও পরিষ্কার করার দায়িত্বও বাড়ীওয়ালার।

রবিবার বাড়ী-ওয়ালা সকালে ব্রেকফাষ্ট ছাড়া আর কোন খাওয়া দেয় না, কাজেই রাত্রে বাইরে গিয়ে খেয়ে আসতে হয়। আমরা তিন জনে বেরুলুম। কিছু দূরে একটা রেঁস্তোরায় ঢোকা গেল। ভয়ানক ক্ষিদে লেগে গিয়েছিল। মেনু (Menu) দেখে যে যা খাবে অর্ডার দিলে। একটা মাংস, কিছু আলু কপি, টোষ্ট মাখন ও এক কাপ কোকো, এইতেই দেখি ১ শিলিং ৯ পেনি বিল এসে হাজির, তার ওপর ২ পেনি টিপ্, অর্থাৎ প্রায় দেড় টাকার কাছাকাছি দিয়ে আসতে হোলো। তারপর থেকে সাবধান হয়ে গেছি। মেনুকার্ডটা খুব ভাল করে না দেখে শুনে অর্থাৎ প্রত্যেক জিনিষের পাশে ভাল করে দামটা না দেখে আর অর্ডার দিই না। যাইহোক, বাড়ী ফিরে এসে প্রাণকুমারবাবুর সঙ্গে আরও কিছুক্ষণ ঢাকার ও উনিভার্সিটির গল্প করে' শুয়ে

পড়লুম। তারপর ঘুম, কোথা দিয়ে যে রাত কেটে গেল টেরও পেলুম না।

লণ্ডন সহরকে একটা দেশ বল্লেও অত্যুক্তি হয় না। এখানে যারা দশ বৎসরও আছে তারাও সকল অংশ ভাল করে চেনে না। এমন কি এদেশের লোকেরাও প্রায়ই দেখেছি পুলিশকে বা ষ্টেশনের কর্ম্মচারিদের জিজ্ঞাসা করে তবে গন্তব্যস্থানের হদিস্ করতে পারে। প্রত্যেক বড় ষ্টেশনে একজন দু'জন লোক বসে আছে শুধু যাত্রীদের প্রশ্নের উত্তর দেবার জন্যে। রাস্তাঘাট সব জায়গাই ঠিক কল্‌কাতার চৌরঙ্গীর মত। চৌরঙ্গীকে লণ্ডনের একটা ক্ষুদ্র সংস্করণ বলা যেতে পারে। এখন কলকাতা, বোম্বাই, দিল্লী প্রভৃতি আমাদের দেশের বড় বড় সহরকে যে কত ছোট মনে হয় তা ঠিক নেই। এখানকার সাধারণ লোকের যানঃ বাহন হ'চ্ছে ট্যাক্সি, বাস, ট্রলিবাস, ট্রাম এবং টিউব। ট্রাম এবং ট্রলিবাস সব রাস্তায় নেই, যে সব রাস্তায় একটু কম ঝামেলা সেইসব রাস্তায় আছে। বাস প্রায় সব রাস্তাতেই আছে. প্রায় শ পাঁচেক রুট হবে। টিউব হ'চ্ছে মাটির তলা দিয়ে রেল লাইন, রাস্তার বহু নীচে সুড়ঙ্গ করে রেল তৈরি করেছে। জায়গায় জায়গায় চার পাঁচতলা নীচে। কোন কোন ষ্টেশনে নামবার জন্যে liftএর বন্দোবস্ত আছে। আবার কোথাও ইলেক্‌ট্রিকের সিঁড়ি আছে। এক দিকের সিঁড়ি অনবরত নেমে যাচ্ছে আর এক দিকে উঠছে, দু'রকমের যাত্রীদের জন্যে। প্রত্যেক সিঁড়িতে একটা দিক আছে যারা দাঁড়িয়ে থাকবে তাদের জন্যে, আবার আর একটা দিক যারা তাড়াতাড়ি যেতে চায়, তাদের জন্যে। নীচে প্ল্যাট-ফর্ম্ম প্রশস্ত। কিন্তু ষ্টেশন পেরুলেই ট্রেন চলে ঠিক ট্যানেলের মত সুড়ঙ্গের মধ্যে দিয়ে। চার পাঁচটা under ground লাইন আছে। এক ষ্টেশন থেকে অন্য জায়গায় যেতে হোলে অনেক জায়গায়ই দু'তিন জায়গায় গাড়ী বদল করতে হয়। ওপরে কিন্তু সহরের হৈ-চৈ। নীচে পাতাল-পুরীর মত। গাড়ীতে কোন শ্রেণী বিভাগ নেই। সবই সমান। গদি আঁটা সিট্, প্রত্যেকটী হাতল দেওয়া আলাদা। কোন টাইম টেব্‌লএর বালাই নেই; প্রত্যেক দু'মিনিট অন্তর ট্রেন আসছে। কিন্তু প্রত্যেক গাড়ীই সকালে ও বিকালে একেবারে ভিড়ে জমা হয়ে যায়। ষ্টেশনও প্রায় আধ মাইল অন্তর। বড় রাস্তার পাশে একটা গোলাকার করা, মধ্যে লেখা under ground। বুঝতে হবে' মধ্যে টিউব ষ্টেশন আছে। ভেতরে এমন চমৎকার সব নির্দ্দেশ লেখা আছে যে এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় যেতে হলে' কোন লাইনে এবং কোন প্ল্যাট্‌ফর্ম্মে যেতে হ'বে—যত আনাড়ি লোকই হোক না কেন, খুঁজে নিতে একটুও অসুবিধা হয় না। রাস্তায় যত বা মানুষের ভিড় তারচেয়ে বেশী যেন মোটর, বাস, লরী ইত্যাদির ভিড়। মাঝে মাঝে রাস্তার ওপর দু লাইন পিন্ পোঁতা আছে সেখান দিয়ে রাস্তা পেরুতে হয়। সেই পিনের মধ্যে কাউকে চাপা দিলে ড্রাইভারের অত্যন্ত বেশী সাজা হয়। প্রত্যেক মোড়ে অটোমেটিক্ ইলেক্‌ট্রিক সিগ্‌ন্যাল—মাঝে মাঝে আপনা আপনি বদলাচ্ছে লাল নীল আলো, মোটর বাস ইত্যাদিকে সেই আলো দেখে চলতে বা থামতে হয়। তাছাড়া ট্রাফিক্ পুলিশ আছে। লণ্ডন-পুলিশের ভদ্রতা বা জনপ্রিয়তা বিশ্ব-বিশ্রুত। আমাদের দেশে লাল পাগড়ী যেমন লোকের চক্ষে জুজুর মত এবং সবসময় রুক্ষ মেজাজ, এখানে ঠিক তার উল্টো। পথে যে কোন রকমের মুস্কিলেই পড়া যাক না কেন, পুলিশ সাহায্যের জন্য উন্মুখ হয়ে আছে।

এখন আবহাওয়া সম্বন্ধে একটু বলি। এমন খামখেয়ালি আবহাওয়া—বোধহয় খুব কম জায়গায় আছে। সকালে উঠে দেখা গেল বেশ পরিষ্কার রৌদ্র উঠেছে, আধ ঘণ্টার মধ্যেই হয় তো হয়ে গেল অন্ধকার, আলো জেলে তবে কাজ করতে হ'বে। আবার হয় তো আধ ঘণ্টা পরে এমন কুয়াশা হোলো যে রাস্তায় মোটর পর্য্যন্ত থেমে গেল; পর-ক্ষণেই আবার রৌদ্র উঠলো। আবার কিছুক্ষণ পরে হয়তো টিপ্ টিপ্ করে বৃষ্টি নামলো। আমাদের দেশের মত মুষলধারে বৃষ্টি এখানে খুব কম এবং নাগাড় অতক্ষণও হয় না। আর একটা জিনিস এখানে বর্ষাকাল বলে কিছু নেই, বৃষ্টি অল্পবিস্তর সব সময়েই হয়, বরং শীতকালেই বেশী হয়। এবারকার আবহাওয়া নাকি একটু অসাধারণ; নভেম্বর ডিসেম্বরে এত কম শীত নাকি কখনও হয় না। কিন্তু তবুও হাত পা যদি একটু খোলা থাকে অসাড় হয়ে যাবার মত হয়। এখানকার ঠাণ্ডা স্যাঁতা এবং কন্‌কনে। এখানে রৌদ্র এত মিষ্টি যে বলা যায় না। রৌদ্র এখানে খুব দুর্ল্লভ জিনিস, যদিও এবারে তা নয়। এইজন্যে এখানকার লোকে একটু রৌদ্র দেখলে এত খুশী হয় বলা যায় না। নিজেদের ভেতর প্রথম কথাই হবে, 'what a lovely day বা morning. ছুটীর দিন হলে' তো কথাই নেই, অমনি দলে দলে বেরুবে বেড়াতে বা খেলতে। এ দেশ সূর্য্যদেবকে কাবু করেছে। অনেক সময় কুয়াশার পেছনে লাল আলোর মত বেশ চাঁদের মতই দেখা যায়; চোখ ঝলসায় না। এখন সূর্য্য ওঠে বেলা ৮টায় এবং অস্ত যায় ৩-৪০ মিনিটে। এই কয় ঘণ্টা বাদ সমস্তই রাত্রি। আবার গ্রীষ্মকালে ১০টা (বিকালের) পর্য্যন্ত দিন থাকে। এ দেশের Summer (গ্রীষ্ম বল্লে ঠিক হবে না, আমরা যাকে গ্রীষ্ম বলি এখানে তা নেই) নাকি ভারী চমৎকার! তখন সমস্ত গাছ পালা ফল ফুলে ভরে যায়। এখন সব একেবারে ন্যাড়া; লোকে ১১টা ১২টা পর্য্যন্ত পার্কে বেড়ায়, খেলে। ঠাণ্ডা বেশ গা-সওয়া রকম।

এবার এদেশের মানুষ সম্বন্ধে কিছু বলি। ইতিমধ্যে এদের সম্বন্ধে জায়গায় জায়গায় কিছু কিছু মন্তব্য করেছি। সেগুলো সবই বোধ হয় গুণের কথাই বলেছি, তার কারণ সেগুলো আমাদের মধ্যে এত অভাব যে আমাদের অনভ্যস্ত চোখে চট্ করে ধরা যায়। তবে এদের যে সবই গুণ, দোষ নেই, সেকথা বল্লে মস্ত সত্যের অপলাপ হবে। আর তা কখন সম্ভবও হতে পারে না। যেমন প্রত্যেক মানুষ দোষে গুণে মিশিয়ে থাকে, প্রত্যেক জাতের সম্বন্ধেও সেই কথা খাটে। কেননা মানুষের সমষ্টি নিয়েই জাত তৈরি নয়। এদের জাতিগত চরিত্র সম্বন্ধে বেশ চুম্বুক করে বলতে হলে নেপোলিয়নের কথায় বলতে হয় "এরা পাকা দোকানদারের জাত।" কথাটা খুব খাঁটি সত্য কথা। অবশ্য ব্যবসাদার বলতেই আমাদের মনে বড়বাজারের মাড়োয়ারী বা বেনেদের কথা মনে পড়বে; অর্থাৎ কেবল জোচ্চুরি, পাটোয়ারী বুদ্ধি এইসব মনে আসবে। আমি কিন্তু সেভাবে বলছি না। ভাল ব্যবসাদার হ'তে গেলে যেসব গুণ থাকা দরকার—উদ্যোগ, সততা, অধ্যবসায়, ভদ্রতা, মিতব্যয়িতা এসব গুণ এদের প্রত্যেক লোকের মধ্যে আছে। আবার বেশী ব্যবসাদার হ'লে যে সব দোষ থাকে সেগুলোও আছে। সহৃদয়তার অভাব, অর্থসর্ব্বস্ব-ভাব, স্বার্থপরতা, কপটতা, তার ওপর এরা এখন সাম্রাজ্যবাদী হওয়ায় বর্ণ-বিচারও বেশ আছে। অবশ্য ঠিক ব্যবসাদারের মত সেটা মুখে প্রকাশ করে না কিন্তু ব্যবহারে বোঝা যায়। দুই একটা ছোট ছোট দৃষ্টান্ত দিই;—ভারতীয় বা কালা জাতদের সব বাড়ীতে নেয় না, যেসব বাড়ীতে নেয় সেখানে শুধু কালারাই থাকে; মার্কা দেওয়া বাড়ী, সাদা থাকবে না। কিন্তু অন্যসব বাড়ীতে যে স্পষ্ট লিখবে কালা থাকবে না বা নেবে না—তা নয়। হয়তো বিজ্ঞাপন দেখে যাওয়া গেল বাড়ী দেখতে—কিন্তু বাড়ীর মালিক যেই দেখলে কালা মূর্ত্তি অমনি বল্‌বে "অত্যন্ত দুঃখিত, আজই ভাড়া হয়ে গেছে, আর ঘর খালি নেই।" অনেক হোটেলেও ঐ অবস্থা। তা ছাড়া বাসে, টিউবে বা রেঁস্তোরায় দেখেছি, আমার পাশে হয়তো একটা সীট্ রয়েছে যদি অন্য জায়গা খালি থাকে তো পেরিয়ে গিয়ে সেইখানেই বসবে। নিতান্ত যখন জায়গা থাকে না তখন ভারতীয়দের সঙ্গে বসবে। রেঁস্তোরায় একটা টেবিলে হয়তো আমি একা বসেছি—আর তিনটে খালি আছে এমন সময় যদি কয়েকজন ঢুকে পড়ে তা হলে' আগে চারিদিক দেখবে অনেক দূরেও যদি একটা আধটা সিট্ খালি থাকে তো সেইখানেই

যাবে ; নিতান্ত না পেলে তখন আর কি করে। অবশ্য এতে আমার কোন মনস্তাপ নেই। বরং না বসলেই স্বস্তিতে থাকি। কেননা খাবার সময় আদব কায়দা ঠিক হয়তো দুরস্ত হবে না, একটা আড়ষ্ট হয়ে খেতে হবে, তারচেয়ে একা বসে বেশ নিঃসঙ্কোচে খাওয়া যায়। শুধু ওদের বর্ণ-বিচারের দৃষ্টান্ত হিসাবেই বলছি। তারপর পয়সাটা এরা এত চেনে যে, একজন land-ladyর বাড়ীতে যতদিনই থাকা যাক না কেন কড়ায় ক্রান্তিতে হিসাব করে পয়সা নেবে, যাবার সময় যদি একবেলার হিসাব ও ভুল হয় তো মনে করিয়ে চেয়ে নেবে। চক্ষুলজ্জা বলে জিনিষ এদের নেই। যতক্ষণ পয়সা ঠিক ঠিক দেওয়া যাবে ততক্ষণ অতি সুন্দর ব্যবহার করবে, কিন্তু পয়সার একটু এদিক ওদিক হলেই অন্য মূর্ত্তি। কিন্তু গুণও এদের এত আছে যে এগুলো চোখে পড়ে না। প্রথম বলি সততা। অবশ্য একেবারে অসাধু বা জোচ্চোর যে নেই এমন নয় কিন্তু সেটা নিয়মের ব্যতিক্রম। common honesty যাকে বলে সেটা অতি সাধারণ লোকের মধ্যেও, মুটেমজুরদের মধ্যেও আমাদের দেশের ভদ্রশ্রেণীর চেয়েও অনেক বেশী। ছোট ছোট কয়েকটা দৃষ্টান্ত দিলেই বোঝা যাবে।—রাস্তায় যেতে যেতে অনেক জায়গায় দেখি খবরের কাগজের হকার—কাগজগুলো কোন বারান্দায় বা ঐ রকমের কোন উঁচু জায়গায় রেখে কোন কাজে গেছে, এমন ১০।১৫ মিনিট দেখা নেই ; ইতিমধ্যে রাস্তার লোক একখানি করে কাগজ নিয়ে যাচ্ছে এবং একটি করে পেনি রেখে যাচ্ছে। আমাদের দেশে হলে কাগজওয়ালা ফিরে এসে কাগজগুলো ত সেখানে দেখতে পেতই না, যদি বা কোন বিবেচক লোক পয়সা রেখে কাগজ নিতো তো অন্য একজন এসে সেই কাগজগুলি এবং পয়সা সমস্তই আত্মসাৎ করতো নিশ্চয়ই। কিন্তু এখানে সেরকম প্রবৃত্তি রাস্তার ভিখারীরও হয় না। অথচ যে অভাবগ্রস্থ লোক নেই—এমনও নয়। আমাদের দেশের মত সংখ্যায় অত বেশী না হলেও পথে ঘাটে এমন দুঃস্থ লোক দেখা যায় যে কষ্ট হয়। শতছিন্ন পোষাক, অন্নক্লিষ্ট, একমুখ দাড়ি, চোখ কোটরে ঢুকে গেছে। কিন্তু এরকম লোকও অমন সুবিধে পেয়েও চুরি করে না।

এখানের নিয়ম কলেজ, লাইব্রেরী, ক্লাব বা মিটিং যেখানেই যাও cloak roomএ ওভারকোট, টুপি, ছাতা, ছড়ি সব রেখে যেতে হয় porterএর কাছে। ওভারকোটের পকেটে নির্ভাবনায় মনিব্যাগ, ঘড়ি বা মূল্যবান জিনিস রেখে যাওয়া যায় খোয়া যাবার ভয় নেই। অথচ এরা আমাদের বেয়ারা শ্রেণীর লোক ; কখন চেয়েও দেখে না। ঘরে দোরেও সব সময় তালা-চাবি দেবার প্রয়োজন হয় না।

এই রকম সততার আর একটা দৃষ্টান্ত দিই। বাসে যদি conductor কারও টিকিট দিতে ভুল করে, তবে সে কখন পয়সা না দিয়ে নামবে না, কিম্বা কেউ কখন অন্যের monthly ticket নিয়ে যাবে না। এই জিনিস-গুলো আমাদের দেশে হামেশা হয়ে থাকে। কিন্তু এরা এটা যে একটা খুব নৈতিক প্রেরণা থেকে করে তা নয়, এসব এদের একটা জাতিগত সংস্কারে দাঁড়িয়ে গেছে। এদের আর একটা গুণ হচ্ছে নিয়মানুবর্ত্তিতা বা শৃঙ্খলা জ্ঞান। গভর্ণমেন্ট বা মিউনিসিপ্যালিটির যে কোন আইনই থাকুক না কেন তারা ছেলে, বুড়ো, স্ত্রী, পুরুষ, ছোটলোক, ভদ্রলোক সকলে অক্ষরে অক্ষরে পালন করে। যেমন রাস্তায় জঞ্জাল ফেলা বারণ বা অনেক জায়গায় থুথু ফেলা নিষেধ থাকে। সবসময় বা সর্ব্বত্রই পুলিশ পাহারা থাকে না, ইচ্ছা করলে অবাধে এসব নিয়মের ব্যতিক্রম করা যায় এবং আমাদের দেশে তাই হয়ে থাকে, কিন্তু এখানে ছোট ছেলে পর্য্যন্ত জানে যে এসব করতে নেই এবং কখনও করবে না। রাস্তায় এমন কি অলিগলিতে পর্য্যন্ত কোথাও অপরিস্কার ময়লা নেই। এসব এখন এদের ধর্ম্মে দাঁড়িয়ে গেছে, এখন আর আইনের ভয় দেখাবার দরকার নেই। এই সব দেখলে আমাদের দেশের কথা মনে পড়ে, মনে হয় যে আমরা কোথায় আছি এখনও ! কাজের সময় এরা ফাঁকি দিতে জানে না। যে যে স্তরেরই লোক হোক না কেন, মুটে মজুর থেকে ছাত্র, মাষ্টার, কেরাণী, দোকানদার এমন কি প্রধান মন্ত্রী পর্য্যন্ত যার যা কাজ ঠিক বাঁধা সময় একটুও নষ্ট করবে না। আমাদের মধ্যে যে যত ফাঁকি দিতে পারে, সে তত বাহাদুরি পায়। ছাত্রদের মধ্যে একটা মস্ত বাহাদুরি আমাদের দেশে যে কত কম পড়ে ফাঁকি দিয়ে পাশ করতে পেরেছে। এখানে দেখি ছেলেরা পড়ার সময় একমনে পড়ে।

পড়াশুনা সাধারণতঃ লাইব্রেরীতেই হয়। লাইব্রেরী এখানে বারোমাস এক রবিবার ছাড়া এবং বৎসরে আর মাত্র ৮।১০দিন ছাড়া সব সময় সকাল দশটা থেকে রাত্রি সাড়ে নটা পর্য্যন্ত খোলা থাকে। ক্লাশ হয়ে গেলেই ছাত্রেরা লাইব্রেরীতে এসে বসে, মধ্যে হয়তো কিছু খেয়ে এলো, কি খানিকক্ষণ গল্পগুজব করে এলো, বিকালে গিয়ে খেলে এলো। কিন্তু লাইব্রেরীতে যে সময় থাকে, তখন একেবারে মগ্ন হয়ে থাকে পড়ার মধ্যে। এখানকার স্কুল কলেজের লাইব্রেরীর একটা আবহাওয়াই এমন যে যেই আসুক না কেন—না পড়ে থাকতে পারবে না ; এমন কি যার কখন পড়ার অভ্যাস নেই, তাকে এনে বসিয়ে দিলেও না পড়ে থাকতে পারবে না। শুধু যে সকলেই পড়ছে এবং নিঃশব্দ বলে তাই নয়, সমস্ত বই এমন চমৎকার গোছান ও সাজানো যে কোন বিষয়ে পড়তে ইচ্ছে করলেই বই বার করতে কোন অসুবিধা বা কষ্ট নেই। সব বই খোলা শেল্‌ফে থাকে, আলমারি বা চাবি বন্ধের পাট নেই, এ থেকেই বোঝা যায় ছেলেদের কতটা বিশ্বাস করে। আমাদের দেশে হ'লে একমাস পরে দেখা যেতো অর্দ্ধেক বই নিঃশেষ হয়ে গেছে বা পাতা ছিঁড়ে নিয়ে চলে গেছে। যে বই ইচ্ছে শেল্‌ফ থেকে নিয়ে পড়, স্লিপ দিয়ে আধ ঘণ্টা হাঁ করে বসে থাকতে হয় না। সব ঘরেই central heating বন্দোবস্ত, যতক্ষণ ইচ্ছে আরামে গরমের মধ্যে বসে পড়ার কোনরকম অসুবিধা নেই। পরিস্কার পরিচ্ছন্ন বাথরুম কাছেই। খিদে পেলেই রেঁস্তোরা। কাজেই বাড়ী যাবার কোন দরকার করে না, রাত্রি পর্য্যন্ত একটানা পড়া যায়। এখানে সকলেই তাই করে। সকালে break-fast খেয়ে সাড়ে নটা দশটার সময় যে বেরুলো—বাড়ী ফিরলো একেবারে রাত্রি ন'টা সাড়ে ন'টায়। বাড়ীর সঙ্গে কেবল রাত্রের সম্বন্ধ। সেইজন্যে কাজের সময় অনেক বেশী পাওয়া যায়। অবশ্য আমাদের দেশে এতটা সময় পেলেও একটানা কাজ করা সম্ভব নয়—আবহাওয়ার জন্যে। এখানে কিন্তু শারীরিক মানসিক যে কোন পরিশ্রমেই ক্লান্তি আসে না, এলেও দূর হ'তে বেশী সময় লাগে না। একটু বিশ্রাম নিয়েই আবার তাজা হয়ে কাজ করা যায়। যাক্ যে কথা বলছিলুম তা থেকে অনেক দূরে এসে পড়েছি।—এরা কাজের সময় ফাঁকি দেয় না, আবার কাজ হয়ে গেলে অবসর ভোগও করে চুটিয়ে। অবসর-বিনোদনের যে কতরকম পন্থা বার করেছে তার ঠিক ঠিকানা নেই। মানুষের যত রকম রুচি থাকতে পারে, সবরকম রুচি অনুযায়ী অবসর বিনোদনের উপায় আছে। যত রকমের খেলা ইন্‌ডোর বা আউটডোর, থিয়েটার, অপেরা, সিনেমা, বক্সিং, স্কেটিং, স্কি জাম্পিং, বল ড্যান্স, খোলা মাঠে বেড়ানো, দ্রষ্টব্য স্থান দেখতে যাওয়া, দুই একদিনের ছুটিতে কাছাকাছি বাইরে বেড়াতে যাওয়া ইত্যাদি। যেমন অফিসের কাজ শেষ হোলো তখন দলে দলে একটা কিছু recreation বেছে নেবে, বাড়ী ফিরবে ১১, ১২, ১টা রাত্রে। তারপর শুয়ে পড়বে। অবশ্য সকলেই যে বেশ সুরুচির পরিচয় দেয় তা নয়। অনেকে কুরুচিপূর্ণ আমোদ প্রমোদও করে, কিন্তু তার মধ্যেও এদের শৃঙ্খলা আছে, একেবারে হারিয়ে ফেলে না নিজেকে। পরের দিন কাজের সময় দেখা যাবে যে সে লোকই নয়। এদের দুর্নীতির মধ্যেও একটা প্রাণশক্তির প্রাচুর্য্য দেখা যায়। আমাদের মত নির্জীব হয়ে নীতিবাগীশ হয় না।

প্রতিশোধ

শ্রীমুরারিমোহন মুখোপাধ্যায়

নেশা নয়, নিছক পেশা-ই আমাকে সারাটা শীতকাল বরিশাল জেলাটার একপ্রান্ত হইতে অন্তপ্রান্ত পর্য্যন্ত জলপথে ঘুরাইতে থাকে। গ্রাম হইতে গ্রামান্তরের কত ঘাটেরই যে লবণ জল পেটে যায়! চলিতে হয় বজরায়—যেন ছোটখাট নবাব, টাকা বাহির করিতে হয় তাহাদেরই কাছ হইতে প্রকৃতই যাহাদের নাই। এমনি চমৎকার পেশা!

পেশার কথা থাক, এখন যাহা বলিতে চাহি বলি। অপূর্ব্ব প্রকৃতই অপূর্ব্ব শ্রী এই বরিশাল জেলা। কূলে কূলে ভরা কত নদী, কত অপরূপ তাদের চলার ভঙ্গি, কত গ্রাম—কি শ্যামকান্তি! এক ফোঁটা কবিত্ব যদি পেটে থাকিত তবে রবীন্দ্রনাথ না হইতে পারি অন্ততঃ বটতলার প্রেসওয়ালাদের কাজে লাগিতে পারিতাম। কিন্তু আপশোষ করিয়া লাভ কি, জোর করিয়া হিসাবের খাতাই লেখা যায়, কিন্তু কবিতা তো লেখা যায় না।

প্রতি বৎসরই বরিশালের দক্ষিণপ্রান্তে যখন যাই—একবার সমুদ্রদর্শনে যাই, এবারও আসিয়াছি। সত্য কথা বলিতে কি বরিশালের সমুদ্রকে আমি বড়ই ভালবাসি। বিরাট সমুদ্রের এমন প্রশান্ত স্নিগ্ধ মূর্ত্তি আমি আর কোথাও দেখি নাই। এ যেন ধ্যানী বুদ্ধমূর্ত্তি। তীরে বসিয়া কথা বলিতেও সাহস হয় না। সমস্ত মনপ্রাণ ইন্দ্রিয় যেন নীরব হইয়া বারবার শুধু বিরাটকে প্রণতি জানাইতে থাকে। এই জন্তেই বুঝি মগেরা এই স্থানটি বাছিয়া লইয়া অসংখ্য প্যাগোডা তৈয়ার করিয়া ইহাকে তাহাদের তীর্থ করিয়াছে।

সূর্য্যাস্তের বেশী বিলম্ব নাই। আমি সৈকতে এক বালিয়াড়ি হেলান দিয়া আধ-শয়ান অবস্থায় দেখিতেছি। কী সুন্দর! লীলায়িত ভঙ্গিতে দুলিতে দুলিতে ভানু নামিয়া আসিতেছেন। সমুদ্রের সাথে যেন তার খেলা। ধরা দেন, দেন না। তারপর সত্যই আর্দ্র জলে ধরা দিলেন। ক্রমে একটু গা ডুবাইলেন, তারপর আর একটু। হঠাৎ তার বিরাট গোলাকার মূর্ত্তি পরিবর্ত্তিত হইয়া অপূর্ব্ব সোনার এক মন্দির জলের উপর হেলিয়া দুলিয়া ভাসিতে লাগিল। ধীরে অতি ধীরে সোনার সেই মন্দির সমুদ্রের বুকে লুকাইয়া গেল। শুধু রক্তিম আভায় দিগন্ত রাঙিয়া আছে। আমি অপলক মুগ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া আছি। হঠাৎ কাণে আসিল "বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি—বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি—"। পিছনে চাহিয়া দেখি বালিয়াড়ির উপর দাঁড়াইয়া মুণ্ডিতকেশ এক ভিক্ষু। অস্তমিত সূর্য্যের রক্তিম আভায় তাঁহার হরিদ্রাবসন আরও উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। আমি চাহিয়া আছি দেখিয়া ভিক্ষু বালিয়াড়ি হইতে নামিয়া আমার নিকটে আসিয়া বসিলেন এবং হাসিয়া পরিষ্কার ইংরেজীতে বলিলেন "সমুদ্রের দিক হইতে দৃষ্টি এত শীঘ্র ফিরাইয়া পেছনের দিকে চাহিলে যে?" আমি মৃদু হাসিলাম, বলিলাম "দৃষ্টি তো চিরদিনই পেছনেই দিলাম, সমুদ্র দেখা তো আমাদের সাময়িক বিলাস।" ভিক্ষু হাসিলেন। তারপর ধীরে ধীরে কথা জমিতে লাগিল। জানিলাম তিনি জাতিতে জাপানী, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা লাভও করিয়াছিলেন, সৈন্য বিভাগে কাজ করিতেন, বর্ত্তমানে ভিক্ষুস্থানীয় প্যাগোডার মোহান্ত। এইখানে এমন উচ্চশিক্ষিত মোহান্ত। আমি অত্যন্ত কৌতূহল বোধ করিলাম। জিজ্ঞাসা করিলাম "পৃথিবীতে এত স্থান থাকিতে এই পাণ্ডববর্জ্জিত স্থানটি বাছিয়া নিলেন যে বড়?"

"প্রয়োজন বড় বালাই—নিতান্তই প্রয়োজন ছিল।"

"অতি উৎকট প্রয়োজন ব'লতে হ'বে কিন্তু।"

"একটুও না, নিতান্তই স্বাভাবিক।"

"আপত্তি না থাকলে শুনতে ইচ্ছে হয় এমন প্রয়োজনটি ঘট্‌ল কিসে? রোমান্টিক কারণ আছে নিশ্চয়ই। শুনেছি আপনার আগের মোহান্ত এই সমুদ্রতীরেই ঐ গাছটায় গলায় দড়ি দিয়ে মরেছিলেন।"

"কেন?"

"দারুণভাবে এখানকার এক মগ মেয়ের প্রেমে প'ড়েছিলেন। সন্ন্যাসধর্ম্ম যায় আর কি, তাই।"

"গাধা। বিয়ে ক'রে সরে পড়লেই হ'ত। না তেমন কিছু ভাগ্যে আমার এখনও ঘটেনি। হ'তে কতক্ষণ।"

"তবে?"

"না শুনলেই নয়?"

"আপত্তি থাকলে থাক।"

সন্ন্যাসী কতক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। তারপর বলিলেন "না আপত্তি কি? শুনতে চান শুনুন। জানেন নিশ্চয়ই চীনের নান্‌কিং এখন জাপানের তাঁবেদার। ঐ নান্‌কিং দখলের সময় আমি যুদ্ধে ছিলাম। যুদ্ধ যে কি তা হয়ত জানেন না। যারা করে তারাও অধিকাংশে জানেনা। অবশ্য যারা নিজের দেশ রক্ষা ক'রতে যুদ্ধ ক'রে তাদের কথা আলাদা। আমি তাদের দেখেছি। আমি তাদের নমস্কার করি···।"

সন্ন্যাসী চুপ করিলেন। কতক্ষণ পরে আবার বলিতে লাগিলেন—"নান্‌কিং দখলের সময় কতক চীনা আমার বন্দী হয়। তার ভেতর ছিল নারী, কিশোর, যুবক, প্রৌঢ় বৃদ্ধ সব। কি বিশ্বাস হ'চ্ছে না; সত্যিই নারী, কিশোর বৃদ্ধ এরাও ল'ড়েছে, সমস্ত শক্তি দিয়ে ল'ড়েছে।"—

সন্ন্যাসী আবার থামিলেন। যেন আবিষ্টের মত নান্‌কিংএর সেই লড়াইয়ের সেই ছবি তিনি অতল সমুদ্রের দিকে তাকাইয়া দেখিতে লাগিলেন। আমি বলিলাম—

"না—না···বিশ্বাস ক'রব না কেন, বলুন,—তারপর—?"

"তারপর? বন্দীদের তত্ত্বাবধান আমার অধীন লোকরাই ক'রত। কিন্তু আমাকে দিনান্তে একবার গিয়ে দেখ্‌তে হ'ত সব ঠিক আছে কি না। ক্রমে বন্দীদের মধ্যে বৃদ্ধ মাও সে তুং-এর সঙ্গে আলাপ হ'ল। কি অদ্ভুত মনীষী—কি জ্ঞান। সামনে যে সমুদ্র দেখ্‌ছেন ঠিক ওরই মত অতল। যুবক চুটের সাথে পরিচয় হ'ল। য়ুনানের এক চাষীর ছেলে। লেখাপড়া বিশেষ

জানে না। ইস্পাতের কুঞ্চিত পেশীতে গড়া মূর্ত্তি। কি শৌর্য্য, চীনের অভ্যুত্থানে কি সুদৃঢ় তার বিশ্বাস, সুদিনের তরে কি সে আকুল প্রতীক্ষা! কিশোর লিন্ চিয়র কথাও বলি। কচি মুখখানি, প্রতি অঙ্গে তার নূতন জীবনস্রোত ব'য়ে চ'লেছে। দেখা হ'লেই অফুরন্ত তার প্রশ্ন—আমরা এই চীনা ও জাপানীরা তো একই মঙ্গোলিয়ান জাতি, একই রক্ত—একই বুদ্ধের উপাসক, তবে কেন আমরা জাপানীরা তাদের খুন করতে চাই। চীনারা তো জাপানীদের কোন ক্ষতিই করেনি। তবে? এম্নি কত কি প্রশ্নই না সে ক'রতে থাকে, যার উত্তর আমার নেই। কারণ উত্তর যা আছে তা ঐ কিশোরকে বলারও নয়।"

ভিক্ষু আবার থামিলেন। ক্ষণকাল পরে বলিলেন "শেষ কথাটি বলে ফেলি শুনুন। একদিন সন্ধ্যায় উপরওয়ালার হুকুম এল আমাদের কতক বন্দীদের চীনা দস্যুরা গুলি ক'রে মেরেছে, তার প্রতিশোধ নিতে হবে আমার বন্দীদের স্ত্রী-পুরুষ নির্ব্বিচারে মেরে। আর সেই প্রতিশোধ—হুকুম পাওয়ামাত্র বিনা কৈফিয়তে তা তামিল করতে হবে। এ হুকুমের অর্থ আমি জানি—প্রতিপালন না করার অর্থও আমি জানতাম। কিন্তু কি ক'রে প্রতিপালন করি তাই সহসা ধারণা হ'চ্ছিল না। এমনও মনে হ'য়েছিল প্রতিপালন বুঝি সাধ্যাতীত। কিছু না, সৈনিকের কাছে সবই সম্ভব, সবই স্বাভাবিক। মানুষ মারতেই তো সৈনিকের আবশ্যক। কিশোর লিন্ চিয়র কথাটা মনে প'ড়ল, কেন জাপানীরা তা'দের খুন ক'রতে চায়। এই কেন'র দ্বিধা বেদনা তার আর বেশীক্ষণ সহ্য ক'রতে হবেনা। বৃথা চিন্তায় লাভ কি? উপরের হুকুম আমার লোক দিয়ে বন্দী শিবিরে জানালাম। তা'দের শেষ কোন ইচ্ছা থাকলে জানাতে ব'ললাম। কেন যেন আমার নিজের যেতে সঙ্কোচ হ'চ্ছিল। সঙ্কোচ? সেনানায়কের সঙ্কোচ তো অপরাধ। আর সে সঙ্কোচ রইলই বা কোথায়। সংবাদ শুনে বৃদ্ধ মাও সে তুং হাসতে লাগলেন। বল্লেন, এতো আমি জানতামই। শেষ ইচ্ছা আছে বৈ কি ভাই, আমি বুড়ো হ'য়ে গেছি তোমরা যে কেউ যে কোন ভাবে আমাকে মেরো। মৃত্যুই এখন এ দেহের ন্যায্য পাওনা। কিন্তু ভাই ঐ কিশোর ও সবলদের দেহে কাঁচা-হাতের আঘাত দিও না। এক আঘাতেই শেষ ক'রো। তোমাদের নায়কের যুদ্ধ আমি দেখেছি, চমৎকার! অব্যর্থ তাঁর সন্ধান। তাই সকলের পক্ষ থেকে বুড়ো মানুষ আমি ব'লছি তিনিই যেন ওদের দেহে আঘাত করেন—এই আমাদের শেষ ইচ্ছা।"

সন্ন্যাসী থামিলেন। বলিলেন, "আর বলবার কিই বা আছে? সবই তো এখন বুঝছেন—"

"তবু—"

"তবু শুনবেন? বেশ। শিবিরের পেছনে জলাভূমি ছিল। তারই পাশে গর্ত্ত তৈয়ার হ'ল। সেই গর্ত্তের পাশে সব সার দিয়ে দাঁড় করানো হ'ল। সেদিন অমাবস্যা ছিল বোধহয়। সে কী অন্ধকার। টিম্ টিম্ ক'রে একটা লণ্ঠন জলছে। তাতে সে অন্ধকার আরও দ্বিগুণ বাড়ছে। আমি নিজকেও নিজে চিনতে পারিনি। তবু সেই অন্ধকারই হ'ল আমার বন্ধু। অন্ধকারে যে কাজ সম্ভব, আলোতে তাই একান্ত অসম্ভব। সেই আঁধার ভেদ ক'রে বৃদ্ধ মাও সে তুং প্রশান্তভাবে ব'লে উঠল—বন্ধু, আমাকে আগে, আমি বৃদ্ধ, আমি আগে এসেছি, আমারই আগে যাওয়ার দাবী ভাই। অবিচার তুমি ক'রবে না জানি, তবু মিনতি জানাচ্ছি আমার সামনে যেন এদের যেতে না দেখি। ভগবান বুদ্ধ তোমার সহায় হউন।

বটে, ভগবান বুদ্ধই আমার সহায়! চমৎকার! হঠাৎ আমি অট্টহাসি হেসে উঠলাম। তারপর কোষ হ'তে তলোয়ার টেনে নিয়ে মাও সে তুং হ'তে আরম্ভ ক'রে নির্ব্বিচারে সকলকে শেষ ক'রলাম। এক একটি ক'রে মুণ্ড ছেদ হয়, আর দেহ গর্ত্তে সশব্দে পড়ে। যুবক চুটের কাছে আসতে সে ইস্পাতের মত সোজা হ'য়ে দাঁড়াল, মাথা একটুও নীচু হ'ল না। আর কিশোর লিয়চিয় অপলক দৃষ্টিতে সেই অন্ধকার ভেদ ক'রে শুধু স্নিগ্ধ দু'টো চোখ মেলে আমার মুখের দিকে চেয়ে ছিল।

উপরের হুকুম অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালিত হ'ল। একটুও নড়চড় হয়নি। অনর্থক গুলি ক'রে বারুদ নষ্ট না হয়, তলোয়ারই যেন ব্যবহার হয় এই ছিল উপরের নির্দ্দেশ। এদের জীবনের চেয়ে বারুদই যে যুদ্ধে অনেক বেশী মূল্যবান্।—

আর কি শুনবেন? আজও সেই অন্ধকার আমার ছাড়েনি। উপরওয়ালার হুকুমে অন্ধকারের কাজ তো নিখুঁতভাবে ক'রতে পেরেছি, এখন সবার উপরওয়ালার হুকুমের প্রত্যাশায় আছি—যদি আলোর কাজ কিছু থাকে।"

পল্লী দেবালয়ে কথা ও কাহিনী

কবিকঙ্কন শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

আধখানি চাঁদ নেমেছে নীরবে গন্ধ মদির বায়ে
নিশীথ রাতের প্রান্তরে ঘন বৃদ্ধ বটের ছায়ে।
অদূরে পল্লী-কুঞ্জ ভবন ছিল যে তখন ঘুমে অচেতন
প্রেমের তাপস ধেয়ানে মগন শূন্য দেউল মাঝে
স্বপন-রচিত বরণ-কুসুম পড়ে আছে তারি কাছে।
নিশাচরপাখী যেন কোথা কাঁদে শ্যামল নদীর পারে,
যেন কার আঁখি-পল্লব কাঁপে ব্যথার অশ্রু-ভারে!

কার অনাদরে হতাশ পথিক হারায়েছে তার জীবনের দিক
চলার পথের নাহি কোন ঠিক—সম্মুখে পারাবার,
ছায়া-আলোকের মাঝখানে কার গুমরিছে হাহাকার!

মর্ত্ত্য-কুসুম রমণীর প্রেম লজ্জিতে বক্ষে সে যে
সব সুখ সাধ দিয়েছে বিদায়—জানে না, তরুণী কে যে!
রূপের মাধুরী শ্রবণে পুলক দ্যুলোকে আজিকে চাহে সে ভূলোক,

প্রাণের আঁধারে মাগিছে আলোক অরূপেরে চাহে রূপে,
সে রূপ লাগিয়া প্রভুর আরতি করিছে চিত্ত-ধূপে।
অচেনা অজানা তরুণীর তরে স্বপন-বিভোল প্রাণ
জানে না তরুণী কোথায় জাগিছে তরুণের প্রেম গান !
মহেশের বর যাচিতেছে সদা, নাহি শোনা যায় দেবতার কথা
তবে কি তরুণ হৃদয়ের লতা আসিবে না হৃদি 'পরে ?
জীবনে কখনো দেখে নাই যারে ব্যাকুল তাহারি তরে।

মধুর আবেশে ঘুমায় রূপসী স্বপন-জড়িত পুরে,
সে কিগো জাগিয়া হবে চঞ্চল চিত্র হেরিয়া দূরে !
শুনেছে কি কভু তারি ভালবাসা একটি তরুণ জীবনের আশা—
ভাব বিহ্বল হারায়েছে ভাষা দেউলে সাধনরত,
গোপন ব্যথায় কাতর পরাণ দেবতার পদে নত।
অভিসার নিশা আসেনিক তার অতনুর ইঙ্গিতে,
মনে মায়া-মৃগ হয়নি উতল যৌবন-সঙ্গীতে !
এখনো ফোটেনি প্রেমের দীপিকা, ধিকি ধিকি
জ্বলে যৌবন-শিখা
এখনো তাহার কাব্য-লিপিকা পড়েনি প্রেমিক জন,
তার চপলতা নাহি আঁখি 'পরে নহেক তাতল মন।

কতদিন আর কত রাত ধরি' ডাকিছে ব্যাকুল হয়ে
'—ওগো দয়াময়, দয়া ক'র তুমি—' অনশন জ্বালা সয়ে'।
কতবার যেন পশিতেছে কানে—'উঠে যাও তুমি, বিফল পরাণে—
দিনগুলি তব বেদনার গানে ভরিয়া তুলো না ক্ষেপা !
এই সংসার মরীচিকা নিয়ে শান্তি পেয়েছে কেবা ?—'
তবুও তরুণ শোনে না সেকথা, উগ্র সাধনে রহে,
'—রূপের ভিখারী, অরূপেরে লহ—' কে যেন তাহারে কহে !
একমনে বসি ডাকিছে প্রভুরে—"দাও গো তাহারে
রেখো নাক দূরে,
বল, বল, প্রভু ! তারি হৃদিপুরে পাবো কি জীবনে ঠাঁই ?
সে যদি আমারে নাহি লয় কভু, এ পরাণে কাজ নাই।"

সহসা বিকট গর্জন সাথে বিদ্যুৎ ফণী জাগে,
ভীত কম্পিত মনে হয় ধরা ধ্বংসের পুরোভাগে।
প্রলয়ঝঞ্ঝা ভীমবেগে আসে, অট্ট অট্ট ভৈরব হাসে,
প্রেতের নৃত্য চলে চারিপাশে, ধ্বনিল বিষাণ রব,
ছুটে আসে মহা ধূর্জটিশূল কাঁপে দশদিক সব।
বিদ্যুৎকণা হেরিয়া তাপস মূর্চ্ছিত হোলো ভূমে,
পলে পলে যায় রাতের প্রহর কালের কপোল চুমে।
নিবেছে বাতাসে দেউলের বাতি, গহন আঁধারে ডুবে গেল রাতি
বাঁচাবে জীবন নাহি কোন সাথী—এসেছে মরণ বুঝি !
দয়িতার সাথে হোলোনা মিলন, বিলোচনে বৃথা পূজি।

চমকিল সেই তরুণ তাপস শিবের দেউল নড়ে,
পাদপীঠ হ'তে মঙ্গল ঘট ভূতলে ভাঙিয়া পড়ে ;
ভাবিতে ভাবিতে করে অনুভব দেউল-গাত্র খুলে যায় সব
আকাশ ভুবনে বিষাণের রব—পলাবে কোথায় ত্বরা ?
তরুবীথিকার আর্ত্তনিনাদে মূর্চ্ছিত হোলো ধরা।
দোলে হিন্দোলে শিবের দেউল ভেঙে যায় পাদপীঠ—
তীব্র কাঁপনে চৌদিক হ'তে পড়িতেছে ধূলা ইট
পলাবার নাহি বারেক সময় ফাটল ধরেছে জাগিতেছে ভয়
সেই ফাটলের ফাঁক দিয়ে বয় যত গৈরিক স্রাব
তাপসেরে ঘিরে ধূম্রশিখায় উঠিল উগ্রতাপ।
ফুটন্ত বারি ফোয়ারার বুকে মাটির ফাটলে বহে
তরুণ তাপস মৃত্তিকা তলে বহ্নির জ্বালা সহে
রসাতলে যায় প্রবাহে ভাসিয়া মৃত্যুর পথে নিমেষে আসিয়া
অচেতন প্রায়,—পিনাকী হাসিয়া ধরিল তাহার কর,
পূজার শঙ্খ ঘণ্টার রোলে জেগে ওঠে অন্তর।

পশিল শ্রবণে দেবতার বাণী—'কেন আর মন্দিরে
নিশিদিন তুমি র'হ উন্মাদ ! যাবে না কি ঘরে ফিরে ?
নবীন মনের যতেক কামনা সফল করিতে কেন এ বেদনা
বহিয়া আমার ক'র আরাধনা তরুণীর প্রেম লাগি !
কতবার তোরে জানাবো তরুণ মিছে হবে মোরে ডাকি।
কহিল তাপস—'ওগো দয়াময়, আমি যে তাহারে চাহি,
তব করুণায় সে কি গো আমার আসিবে না পথ বাহি' ? –
তুমি কি বারেক দেখাবে না তারে জীবনে দেবতা
দেখি নাই যারে
শুধু কথা যার গাঁথি' ফুলহার স'পিনু চরণে তব ?
চাহো না কি প্রভু ! তারে নিয়ে এবে করি সংসার নব !'

—'ওরে উন্মাদ' ভ্রান্ত সাধক ! ক্ষণিকের প্রলোভনে
হারায়োনা তব পরমসত্য নারী-ভুজ-বন্ধনে।
তরুণীর প্রেমে কিবা পাবে সুখ ? কেন শেষে পাবে লাঞ্ছনা দুখ
তার চেয়ে এবে প্রসারিয়া বুক ভাগবত প্রেম লহ,
অরূপের ঘরে লভিবে শান্তি, সুখ পাবে অহরহ।—'
কহিল তাপস—'ওগো দয়াময়,' ক্ষমা ক'র তুমি আজ,
দাও তারে এনে প্রাণভরে হেরি, চাহি তারে হৃদি মাঝ।'
সহসা আসিল প্রাণের তরুণী, হেরিল তাপস অরুণ বরণী
'এসেছে' আমার নয়নের মণি—' কহিতে কহিতে শেষে
নয়নের পানে মেলাতে নয়ন আনন আঁধারে মেশে।

তরুণের মহাক্রন্দন রোলে কহিল দেবতা শুধু—
'পাবে একদিন, কেঁদোনা পাগল, এই হবে তব বধূ।'
সেই ভরসায় বুক বেঁধে ঘরে, আসে উন্মাদ মেঠো পথ ধরে'
তরুণ-দয়িতা বহুদিন পরে বিস্মিত হোলো শুনি'
কতসাধ মনে !—হবে গো মিলন, রহিয়াছে কাল্ গুণি'
নিয়তির লেখা পারে কি মুছিতে কালের দেবতা হায় !
বধূবেশে এক তরুণী আসিয়া প্রণাম করিল পায় !
যাহা ছিল সাধ রহে অবসাদে, আজিও তরুণ নির্জ্জন রাতে
বিরলে বসিয়া ভাবে আর কাঁদে হতাশ-হৃদয়ে একা,
দেবতার বাণী তবে কি মিথ্যা ! কোথায় চিত্রলেখা !

প্রাচীন ও মধ্যযুগে পারসীক চারুশিল্পের ধারা

শ্রীগুরুদাস সরকার এম্-এ

কোনও প্রবন্ধে পড়িয়াছিলাম যে পূজ্যপাদ আচার্য্য অবনীন্দ্রনাথ তাঁহার শিল্পী-জীবনের প্রভাতে ইন্দো-পারসীক শিল্পধারার সহিত পরিচয় লাভ করিয়াছিলেন একখানি চিত্রিত পারসীক পুঁথি হাতে পাইয়া। ইরাণ হইতে আনা পারসীক পটুয়ার দ্বারা ইন্দো-পারসীক শৈলী প্রবর্ত্তিত হইলেও প্রাচ্য শিল্পের ইতিহাসে যাহা মোগল পদ্ধতি বলিয়া একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে তাহা পারসীক ও ভারতীয় শৈলীর—মিলন হইতে উদ্ভূত। পারসীক উপাদান এই নবোদ্ভাবিত শৈলীতে খুব যে যথেষ্ট ছিল না তাহা খুবই সত্য এবং ইহার যে বিশিষ্ট সত্ত্বা গড়িয়া উঠিয়াছিল তাহা যে দেশজ ও পারসীক এই উভয় পদ্ধতির কোনটারই শুধু অন্ধ অনুসরণের ফলে নহে ইহা প্রত্যক্ষভাবে মানিয়া লইতে হয়। প্রকৃত কথা এই যে এ শিল্প প্রবহমান স্রোতঃধারার ন্যায় নিজস্ব পথ নিজেই নির্ম্মাণ করিয়া লইয়াছিল। সুতরাং মোগল শৈলীতে পারসীক উপাদানের আভাস পাওয়া গেলেও পারস্যের ললিত কলার সন্ধান মোগল শিল্প হইতে পাওয়া যাইবে না; তাই কলারসিকের উদ্রিক্ত কৌতূহল মিটাইতে হইলে এজন্য ভারত ছাড়িয়া ইরাণের দিকেই অগ্রসর হইতে হইবে। শিল্পাচার্য্য অবনীন্দ্রনাথ, নিকট-প্রাচ্য ও সুদূর-প্রাচ্য এই দুইদিকেরই শিল্পধারার সহিত সুপরিচিত; পারসীক ও চৈনিক এই উভয় শৈলীরই প্রভাব তিনি অনুভব করিয়াছেন। কিন্তু পারসীক শিল্প যে তাঁহাকে একসময়ে বিশেষভাবে মুগ্ধ করিয়াছিল তাহা বুঝিতে পারা যায় তাঁহার প্রিয় শিষ্য শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু মহাশয়ের উক্তি হইতে। "অবনীবাবুকে দেখেছি ছবি আঁকছেন সামনে বিখ্যাত পারসীক শিল্পীদের ছবি রেখে··· ছবিখানা যখন শেষ হল তাতে দেখা গেল সস্তা নকলের গন্ধ নাই, তা সম্পূর্ণ অবনীবাবুর নিজস্ব হয়ে গেছে।" তাই মনে হয় বঙ্গের যে অভিনব শিল্পপদ্ধতি তাঁহারই তুলিকায় জন্মলাভ করিয়াছে তাহার ধারাবাহিক অনুশীলনের দিক দিয়াও পারস্যের চারুশিল্পের ইতিহাস অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। বাঙ্গালা এখন আর চিত্রশিল্পে তথা ললিতকলা ও কারুকৌশলে নিঃস্ব নহে।

মোগলযুগের পুস্তক চিত্রণে যে সকল পটুয়া নিযুক্ত হইতেন, তাহার মধ্যে পারসীক ও ভারতীয়, মুসলমান ও হিন্দু এই উভয় শ্রেণীর লোকই ছিলেন। ভারতীয় ক্ষুদ্রক (miniature) চিত্রাঙ্কনে পালযুগের বৌদ্ধ শিল্পের এবং পাহাড়ী রাজপুত শিল্পের অবদান অতুলনীয়, কিন্তু পুঁথির অলঙ্করণ (illumination) প্রথাটি নিছক পারসীক এবং উহা এদেশে পারস্য হইতেই আসিয়াছিল। যাঁহারা মোগল যুগের হাতে লেখা পারসী পুঁথির প্রথম ও শেষ পাতা এবং প্রত্যেক পৃষ্ঠার চারিপাশ ফুল ও লতার সুষ্ঠু অলঙ্করণে ভরিয়া দিতেন তাঁহারা অনেকেই ছিলেন যে ভারতপ্রবাসী পারসীক শিল্পী, একথা বিশ্বাস করিবার কারণ আছে। এরূপ পুঁথি অলঙ্করণের রেওয়াজ পূর্ব্বকালে ভারতে প্রচলিত ছিল না। খৃঃ নবম ও দশম শতাব্দীর তালপাতায় লেখা ক্ষুদ্রক চিত্র সম্বলিত পালযুগের যে সকল বৌদ্ধগ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে তাহার কোন কোনটির আদি ও অন্তে কিছু কিছু অলঙ্করণ দেখা গেলেও পারসীক পুঁথির ন্যায় ইহার কোনটিরই পাতায় পাতায় চারিদিক ঘেরা প্রসাধক অলঙ্কারের সৌষ্ঠব ছিল না।

পারস্যে কুতুবখানা (পুঁথিশালা) সম্পর্কিত শিল্পীদিগের মধ্যে শ্রম-বিভাগ প্রথা বহুপূর্ব্ব হইতেই প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। পুঁথি লিখিতেন একজন এবং গ্রন্থের অলঙ্করণ ও ছবি আঁকিবার জন্য অপর ব্যক্তিগণ নিয়োজিত হইতেন।

পারসীক চিত্রে রেখার বড় একটা স্থান আছে। সে দেশে ছবি লেখার সহিত হরফ লেখার সম্বন্ধ একটু ঘনিষ্ঠ রকমের। সাধারণ কথায় হাতের রেখার টানে টোনে যিনি পোক্ত নহেন, এ পদ্ধতির ছবি আঁকিতে তাঁহাকে নিরস্ত হইতে হইত। ভারতের চিত্রে আদরাই (outline) প্রধান অঙ্গ, আর পারসীক শৈলীতে রেখার দৃঢ়তাই ছিল বড় কথা। শিল্পধারা কোন দেশেই অবিমিশ্র থাকিতে পারে নাই, তাই পূর্ব্বপুরুষের পিতৃঋণ ছাড়া বৈদেশিক ঋণও সকল দেশের শিল্পেই অল্প বিস্তর গ্রহণ করিতে হইয়াছে। যে পারসীক শিল্পের সহিত ঘটনা সংঘাতে ভারতের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ঘটিয়াছিল তাহার একটা ধারাবাহিক বিবরণ আমাদের কাছে পৌঁছিয়াছে পাশ্চাত্য শিল্প সমালোচকদিগের কৃপায়। রসবোধের সহিত ইতিহাসের কাঠামো বজায় রাখিয়া প্রাচীন সাহিত্য ও পুরাতত্ত্বের প্রতি দৃষ্টি সন্নিবদ্ধ না করিলে কোন্ দেশের চারুশিল্প ও কারুশিল্প কি করিয়া গড়িয়া উঠিল তাহা ভালরূপ উপলব্ধি করা যায় না। এইজন্যই ঐতিহাসিক পটভূমির প্রয়োজনীয়তা। অতীতের ইতিহাস বাদ দিলে বর্ত্তমান নিতান্ত খাপছাড়া হইয়া পড়ে। শুধু ইতিহাস নয়, ভৌগলিক সংস্থানও বিশেষ-ভাবে পর্য্যালোচিত হওয়া প্রয়োজন। ভৌগলিক আবেষ্টনের কথা বিবেচনা করিলে প্রাচীন পারস্যের প্রান্তিক দেশগুলির মধ্যে আমরা পাই মেসোপটেমিয়া, আনান, দক্ষিণ ককেসাস্ ও সিন্ধুনদের উপত্যকা। পূর্ব্বে পড়ে মহাচীন আর দক্ষিণ পশ্চিমে নীলনদ বিধৌত মিশরের মধ্যাংশ। এই সকল দেশের মধ্যে কোন কোনটীর অতীত সভ্যতা অন্ততঃ খৃঃ পূঃ ৩০০০ বৎসর পর্য্যন্ত গিয়া পৌঁছে।

পারস্যের নিজস্ব সভ্যতার ঐতিহাসিক প্রতিষ্ঠা ৫৫০ খৃঃ পূঃ অব্দে মহানুভব সাইরাস্ (Cyrus the Great) কর্ত্তৃক একিমিনীয় সাম্রাজ্যের পত্তন হইতে। যাঁহার নামে এ বংশের নামকরণ হইয়াছে সেই হখামানিস্ বা একিমিনিস্ যে বিচ্ছিন্ন "কৌম" (tribe) অথবা দলগুলি একত্র সন্নিবদ্ধ করিয়া এক অখণ্ড জাতীয়তার সৃষ্টি করিয়াছিলেন ইহা অনুমিত হইবার প্রধান কারণ এই যে, তাঁহার স্মৃতি এতৎসম্পর্কে দেশবাসীর চিত্তে অদ্যাপিও ভক্তিভাবে জাগরূক রহিয়াছে। শুধু জনপ্রবাদ নির্ভরযোগ্য নহে তাই ঐতিহাসিক যুগের একটি প্রধান ঐতিহাসিক ঘটনা, সাইরাস্ কর্ত্তৃক একবাতানা অধিকার, এই নূতন যুগের গোড়ায় তারিখ বলিয়া ধরিয়া লইতে হইয়াছে। বস্তুতঃ এক্‌বাতানা (Ecbatana) অধিকার হইতেই একিমিনীয় সাম্রাজ্যের ভিত্তিস্থাপন ঘটে। সম্রাট দেরীয়ুসের (Darius) রাজত্বকালে গান্ধার বোধহয় কতকটা ইরাণীয় প্রভাবে প্রভাবান্বিত হইয়া থাকিবে। ইহা যে তৎকালে পারস্য সাম্রাজ্যের অন্তর্গত ছিল তাহার সাক্ষ্য দিতেছে খৃঃ পূঃ ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রথম পাদের বেহিস্তুন লিপি। বীরশ্রেষ্ঠ সেকেন্দার (Alexander the Great) কর্ত্তৃক খৃঃ পূঃ ৩৩০ অব্দে একিমিনীয় সাম্রাজ্যের ধ্বংস হইতে সাসানীয় যুগের প্রবর্ত্তন পর্য্যন্ত পারস্য সংস্কৃতির ইতিহাস অনেকাংশে অন্ধকারাচ্ছন্ন। এ অংশের লুপ্ত ইতিহাস উদ্ধার করিবার মত পর্য্যাপ্ত বৈজ্ঞানিক প্রমাণাদি এখনও সংগৃহীত হয় নাই।

একিমিনীয় যুগের শিল্পে মিশরীয় ঢঙের বাঁধা ছাঁচের (molifএর)—ছোঁয়াচ যে লাগে নাই তাহা বলা যায় না, আর ইহা যত ক্ষীণই হউক না কেন এই মিশরীয় ধারার সহিত আসিয়া মিশিয়াছিল প্রাচীন মেসোপটেমিয়ার শৈলী। এ ছাড়া য়ুনানীযুগের মৌলিক নমুনাগুলিও বোধহয় তখনকার দিনে অপরিজ্ঞাত ছিল না। বাহির হইতে যাহা আসিয়াছে পারস্য শিল্প তাহা শুধু গ্রহণ করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই অদ্ভুত

ক্ষমতার সহিত নিজস্ব রীতির অঙ্গীভূত করিয়া লইয়াছে। পার্সিপোলিসে (Persipolis) প্রাচীন শিল্পের টুকরা টাকরা আজিও একথার সত্যতা প্রমাণ করিতেছে।

একিমিনীয় যুগের শিল্প ছিল প্রকৃতই ভদ্র অভিধায়। ইহার বৈশিষ্ট্য ছিল ইহার স্ফুটতায় ও সমৃদ্ধিতে। বাহির হইতে কিছু কিছু গ্রহণ করিলেও ইহা আপনার ধাতুগত প্রকৃতি মোটেই হারায় নাই। সেকেন্দরের বিজয় অভিযান একিমিনীয় রাজ্যের পরিসমাপ্তি ঘটাইলেও পারস্যের তৎকালিক শিল্পের কোনও অনিষ্টসাধন করিতে পারে নাই, কিন্তু পরবর্ত্তীকালে পারদ (Parthian) রাজ্য প্রতিষ্ঠার পর গ্রীক-রোমক (Greeco-Roman) প্রভাব পারস্যে প্রায় বার আনা রকম জুড়িয়া বসিয়াছিল। পারদ যুগের (২৫৬ হইতে ২২৮ খৃঃ পূঃ) যে সকল পুরাকীর্ত্তি আজ পর্য্যন্ত খুঁজিয়া পাওয়া গিয়াছে সেগুলি এই কথাই প্রমাণিত করে।

শিল্পী যখন প্রাকৃতিক জীবনের দুর্ব্বার গতির দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া গড়ন পিটনের বাঁধাধরা নিয়ম ও পালিশ পলস্তারা লইয়া ব্যস্ত হয় তখন কেমন একটা যন্ত্রচালিতভাব স্বতঃই উদ্ভূত হইয়া সৌন্দর্য্য সৃষ্টি ও সৌন্দর্য্য সাধনাকে পঙ্গু করিয়া তুলে। বাঁধা নক্সা ও বাঁধা ঢঙের (molifএর) ব্যবহার সম্পর্কে পারদাধিকার কালে রোমের সহিত যতই ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক সংস্থাপিত হউক না কেন পারস্যের শিল্পী সংঘ একিমিনীয় ও মেসোপটেমীয় বাঁধা ছাঁচগুলি নিজেদের রক্ষণশীলতা গুণে সঞ্জীবিত রাখিতে সমর্থ হইয়াছিল, সেগুলির ব্যবহার পদ্ধতি বিস্মৃত হয় নাই। শক (Soythian) প্রভাব আসিয়া জান্তব মূর্ত্তি সমূহের পরিকল্পনাকে পরিপূর্ণতা প্রদান করে এবং শক প্রভাবেই এই সকল পরিকল্পনায় নূতন জীবনীশক্তি সঞ্চারিত হয়।

সাসানীয় যুগ (খৃঃ অ' ২২৬ হইতে খৃঃ অঃ ৬৫২) পারদ ও মুস্লিম যুগের মধ্যবর্ত্তী। মুস্লিম বিজয়ের পরবর্ত্তী যুগে সাসানীয় যুগ সম্বন্ধে অনেক অলীক ও অর্দ্ধভ্রান্ত ধারণা বিদ্যমান থাকিলেও শিল্পসাধক পারসীকেরা যে সাসানীয় শিল্প হইতেই শক্তি ও প্রত্যাদেশ লাভ করিয়াছিল তাহাতে আর সন্দেহ নাই। ইরাণের জাতীয় ভাবে অনুপ্রাণিত শিল্প ধারার ইহাই ছিল একমাত্র গোমুখী স্বরূপ। সাসানীয় যুগের শিল্পে প্রাচীন ও নবীন, দেশী ও বিদেশী, বিভিন্ন শিল্প ধারা সম্মিলিত হইলেও আসলে ছিল উহা দেশীয় শিল্পের বৈশিষ্ট্যগুণেই অলঙ্কৃত। এই সময়কার শিল্পে যে আশ্চর্য্য শক্তি, সংযম ও গাম্ভীর্য্য পরিলক্ষিত হয় তাহা শাঙ্কর্য্যের (hybridityর) মালিন্য ও দুর্ব্বলতা হইতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত।

শৈলপৃষ্ঠে উৎকীর্ণ বিশাল ভাস্কর্য্য নিদর্শনে দেখা যায়—কোথাও দেব হরমজ্‌দ রাজ মর্য্যাদাজ্ঞাপক চক্রাকৃতি বেষ্টনী (the royal circlet or cydaris) রাজার (সম্রাট শাপুরের) শিরোদেশে অর্পণ করিতেছেন, কোথাও রোমক আততায়ী (সম্রাট ভ্যালেরিয়ান) রাজসন্নিধানে হাঁটু-গাড়িয়া বশ্যতা স্বীকার করিতেছে, কোথাও নৃপতি (খস্রু) শীকার খেলায় মগ্ন রহিয়াছেন, বড় বড় দাঁতাল বরাহ তাঁহার লক্ষ্যভেদগুণে মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে। বিষয়বস্তুর গূঢ়ার্থের অভিব্যক্তির প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া এই সকল চিত্র রচিত হইয়াছে এবং শিল্পী কোথাও ব্যর্থকাম হন নাই। চিত্রনিহিত বৃহদাকার মূর্ত্তিগুলি প্রকৃতই রাজসিকগুণের প্রতীক—উহাদের গতি যেন দান্ত জীবনী শক্তি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। সাধ্য কি কোন রোমক শিল্প-পথিকের এরূপ ভাবোন্মেষ সাধনে সামর্থ্য ঘটে!

যে কৌশলে সাসানীয় শিল্পী পশু বা পক্ষীর জীবন্তভাবটি চিনিয়া লইয়া—সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে গঠন নৈপুণ্যের অদ্ভুত বিকাশ দেখাইয়াছেন পাশ্চাত্য কলাবিদেরাও তাহার ভূয়সী প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারেন নাই। উত্তরাধিকারসূত্রে লব্ধ সৌন্দর্য্য সৃষ্টির এই সুপ্রাচীন ধারা মুসলমান বিজয়ের পরেও ইরাণের শিল্প রাজ্য হইতে বিসর্জ্জিত হয় নাই।

সাসানীয় চিত্রের খাঁটি নিদর্শন এখন আর মিলে না। মনিচীয় সম্প্রদায়ের (Maniohaean) ধর্ম্মবিষয়ক চিত্রাদির যে অল্পসংখ্যক নমুনা এ যাবৎ পাওয়া গিয়াছে মুসলমান বিজয়ের পর পারসীক চিত্রের তাহাই প্রাচীনতম নিদর্শন। এ ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা মানি (Mani) প্রবাদমতে চিত্রবিদ্যায় অসাধারণ দক্ষতা লাভ করিয়াছিলেন। তিনি জন্মিয়াছিলেন সাসানীয় যুগে এবং চিত্রের সাহায্যেই নিজ ধর্ম্মমত প্রচার করিতেন। ধর্ম্মোপদেষ্টারূপে তাঁহার প্রথম আবির্ভাব ঘটে ২৪২ খৃঃ অব্দের ২০শে মার্চ্চ তারিখে, সম্রাট প্রথম শাপুরের (Shapur I) রাজ্যাভিষেক দিবসে।

সাসানীয় যুগের ব্রোঞ্জ নির্ম্মিত জন্তু মূর্ত্তিগুলি এখন পারসীক শিল্পের শ্রেষ্ঠ অবদান বলিয়া পরিচালিত; এ সময়কার যে সকল রৌপ্যনির্ম্মিত থালী (plate) এবং বাটি বা কটোরার ন্যায় পাত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহাতে সাসানীয় সম্রাট বারহাম উর (Barham Yur) (১) কর্ত্তৃক শরদ্বারা একটি মৃগের পদ ও কর্ণ একত্রে বিদ্ধকরণ এবং নৃপতির সিংহ শীকার, হরিণ শীকার প্রভৃতির চিত্র উৎকীর্ণ আছে। এই সকল চিত্রের পরিকল্পনা ও বিষয় বস্তু হইতে বুঝা যায় যে অনেক পরবর্ত্তীকালেও এ শিল্পরীতি কতকাংশে অব্যাহত ছিল। সাসানীয় রাজবংশের অভ্যুত্থানের সহিত একিমিনীয় যুগের গৌরব প্রায় পূর্ণমাত্রায় সঞ্জীবিত হইয়া উঠে এবং এই যুগেই পারস্যের সভ্যতা ও সংস্কৃতি যশঃসম্পদের সমুচ্চ চূড়ায় সমারূঢ় হয়।

১৯১৫ খৃঃ অব্দে পারস্যের পূর্ব্বভাগে ভ্রমণকালে সার অরেল ষ্টাইন (Sir Aurel Styne) কুহ্‌-ই-খুজার পারস্যের প্রথম মুস্লিম শিল্প বলিয়া পরিচিত কয়েকটি দেওয়াল চিত্র আবিষ্কার করেন। অনুমিত হয় যে সাকিস্তানের শাসন কর্ত্তাদিগের আদেশেই এ চিত্রগুলি অঙ্কিত হইয়া থাকিবে। বর্ত্তমানে সাসানীয় যুগের ললিত কলার ইহাই শ্রেষ্ঠতম নিদর্শন। ইহার কয়েকটিতে ভারতীয় বৌদ্ধ শিল্পের প্রভাব স্পষ্টরূপেই বিদ্যমান।

প্রকৃত জাতীয় শিল্পের অভ্যুদয়ের যুগে—চারুশিল্পের সহিত কারুশিল্প যে সমভাবে উন্নতি লাভ করিবে ইহা স্বাভাবিক বটে এবং সাসানীয় যুগে ঘটিয়াছিলও তাহাই। সাসানীয় রাজগণের পৃষ্ঠপোষকতায় নানাবিধ কারুশিল্প বিশেষ উন্নতি লাভ করিয়াছিল। রেশম শিল্প ইহার অন্যতম। রাজশক্তিকে কেন্দ্র করিয়াই রেশমশিল্পের প্রতিষ্ঠা হয় এবং রাজাই ছিলেন উহার প্রধান উৎসাহদাতা। বয়ন শিল্পের উন্নতির সহিত রেশমের কাপড়ে নানারূপ শোভন অলঙ্কার ও চিত্রাদি স্থান পাইতে থাকে। মিসরের কপ্টিক (Coptio) শিল্পের বয়ন কৌশল ও ব্যবস্থাপন পদ্ধতি ইহাতে কোনও কোনও অংশে সংক্রামিত হইলেও বর্ণ বিকাশের শক্তি-মত্তায় ইহাই শ্রেষ্ঠতর। কৌষেয় বস্ত্রে এই সকল প্রসাধক চিত্র ও নক্সা প্রভৃতির প্রবর্ত্তন সাসানীয় যুগে যে বিশেষভাবে আদৃত হইয়াছিল তাহা বুঝিতে পারা যায় খৃষ্টীয় ষষ্ঠ বা সপ্তম শতকের ডামাস্ক নামে পরিচিত বিচিত্র বস্ত্রের সুবিস্তৃত চাহিদা হইতে। এ কাপড় শুধু উত্তর পশ্চিম ইউরোপ খণ্ডে নহে, সুদূর প্রাচ্যে জাপানেও পাওয়া গিয়াছে। এই সকল বস্ত্র খণ্ডে অলঙ্করণাদির বিন্যাস কৌশলে যে সামঞ্জস্যের বিকাশ দেখা যায় সেই সামঞ্জস্যমূলক পদ্ধতি পারসীক চিত্রশিল্পে অপূর্ব্ব প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। মনে হয় এই সামঞ্জস্যের ছন্দের সহিত পারসীক মননশীলতার ও চিন্তাধারার বিশেষ একটা মিল ছিল—তাই এই বাঁধা ছাঁদের নক্সাগুলি পারসীক ললিত কলায় একটা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে। সাসানীয় যুগের বিশেষ লক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছে এই প্রণালীর চিত্র বিন্যাসে। চিত্রার্পিত অশ্বারোহিগণ প্রায়ই সমান দুই দলে বিভক্ত এবং মুখোমুখীভাবে পরিকল্পিত। অশ্বগুলির মস্তকও একই ভঙ্গীতে পরস্পরের প্রতি ফিরান। কোথাও বা দুইটী মোরগ একই ছন্দে গ্রীবা বাঁকাইয়া দুই দিক হইতে

---

(১) নৃপতি বারহাম বন্য গর্দ্দভ শীকারে সিদ্ধহস্ত ছিলেন তাই তাঁহার নাম হইয়াছিল বারহাম উর।"

পরম্পরের সমূখীন। এ ছাঁদের চিত্র ও নক্সা যে মুসলমান যুগেও বর্ত্তিয়াছিল বহু ক্ষুদ্রক চিত্র ও কারুশিল্পের নমুনা হইতে তাহা বুঝা যায়। ৬৩৭ খৃঃ অব্দে টেসিফন্ (Ctesiphon) নগরী বিজয়ী আরব বাহিনীর হস্তগত হইলে পর চশমাসাহী প্রাসাদে, স্বর্ণ, রৌপ্য ও রেশম সূত্রে গ্রথিত মণিরত্ন খচিত যে অপূর্ব্ব চৌবাগ কার্পেট পাওয়া যায় পারসীক উদ্যানের অভিনব সৌন্দর্য্য সুষমা তাহাতে যেন ইন্দ্রজালবলে চিরতরে আবদ্ধ হইয়াছিল। এই অনিন্দ্য-সুন্দর কার্পেটখানির বর্ণনা এখন যেন রূপ-কথার বৃত্তান্ত বলিয়াই মনে হয়।—যে সকল জ্যামিতিক (geometrical) ও লতামণ্ডল শ্রেণীর আবর্ত্তিত (Scrollwork) নক্সা মুসলমান (Saracenic) রাজ্যাধিকারে সুদূর স্পেন হইতে ভারতবর্ষ পর্য্যন্ত প্রসারিত হইয়াছিল, যে অলঙ্করণের সূক্ষ্ম পরিকল্পনা ও উদ্ভাবন শক্তির প্রাচুর্য্য রম্য সুষমায় বিদগ্ধ-জনের বিস্ময় উৎপাদন করে, পারসী-পটুয়া তাহার প্রভাব হইতে একেবারে বিমুক্ত হইতে না পারিলেও প্রাকৃত দৃশ্যের আকর্ষণ ও প্রণয়াত্মক মাধুর্য্যের স্বতঃস্ফূর্ত্ত উপহাস জাতীয় চরিত্রের বৈশিষ্ট্যরূপেই পরিকল্পনা ঘট ও পাত্রাদির প্রসাধনে প্রয়োগ করিয়া চারু-শিল্পীর চরম উৎকর্ষসাধন করিয়াছেন, তাঁহাদের বিশুদ্ধ রুচি বিভিন্ন আকৃতির তৈজসের যথোপযুক্ত মণ্ডণে অপূর্ব্ব সাফল্যের সহিত রস ও রূপের সমাবেশ করে তৎপর হইয়াছিল। নক্সার মাঝে মাঝে ফল, ফুল, লতা বৃক্ষ এবং বিশেষ করিয়া জীবজন্তু ও বিহগাদি চিত্রণে তাঁহাদের রসের উল্লাস পরম পরিতৃপ্তিলাভ করিয়াছিল। রেখার মাধুর্য্য ও গতির ছন্দই এ জাতীয় প্রসাধক নক্সার অদ্ভুত শক্তিমত্তার মূলে নিহিত। সাসানীয় যুগের শেষ শতক অর্থাৎ খৃঃ সপ্তম শতাব্দ হইতে মুসলমান যুগে খৃঃ ত্রয়োদশ শতাব্দের মধ্যে পারসীক কারুশিল্পের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শনগুলি সৃষ্ট হয় এবং তৎকালেই উহা লোকলোচনের গোচরে আসে। পারসীক শিল্পের ধারা সম্যকভাবে অনুবর্ত্তন করিতে হইলে শুধু প্রাচীন ও মধ্য যুগের শিল্পের পৌর্ব্বাপর্য্যের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিলে চলিবে না—এদেশে কারুশিল্পের সহিত চারুশিল্পের যে যুগব্যাপী ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক অবিচ্ছিন্নভাবে চলিয়া আসিতেছিল তাহার প্রতিও বিশেষভাবে মনোনিবেশ করিতে হইবে। আধুনিক বিশেষজ্ঞগণ এ বিষয়ে অবহিত বলিয়া কেবল পুঁথিতে আঁকা ক্ষুদ্রক চিত্র (miniatures) সমূহের ব্যাপক আলোচনা বা প্রশংসা তাহাদের কোনও শিল্পের ইতিহাসে একচেটিয়া অধিকার স্থাপন করিতে পারে নাই। সাসানীয় যুগের কথা না হয় ছাড়িয়া দিই, চিত্রশিল্পে সুসমৃদ্ধ মুসলমান যুগেরও শিল্প সমালোচনা সম্পর্কে পোড়ামাটির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মূর্ত্তি (terracotta Figurines) ও ফলক (plaques) বিভিন্ন নক্সা ও চিত্র সম্বলিত চীনা মাটীর পাত্র ও টালি (tiles) এবং রেশম বস্ত্র, মখমল ও গালিচার অপূর্ব্ব মণ্ডন-কলা যুগ পারম্পর্য্যে যেভাবে রূপায়িত ও রূপান্তরিত হইয়াছে আনুষঙ্গিক শিল্প হইলেও ললিত কলার দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া সেগুলির তুলনামূলক বিচারে প্রবৃত্ত না হইলে তৎকালীন চিত্রসমূহের মূল্যাবধারণ ও রসানুভূতি সুসম্পূর্ণ হইবে না।

সাসানীয় যুগে পূর্ব্বাগত শিল্পধারার সহিত শকশৈলী ও ভারতের বৌদ্ধশৈলী সম্মিলিত হইয়াছিল। এই ত্রিধারার যুক্তবেণী বাইজান্টাইন ভিত্তিমূলক আব্বাসীয় শিল্পের এবং বিশেষ করিয়া প্রবল চৈনিক প্রভাব-যুক্ত মোঙ্গল শিল্পের রুচির সঙ্গমে যে নবীন বল সঞ্চয় করে তাহাই ক্রমে উপচিত হইয়া বিহ্জাদ ও তাঁহার অনুবর্ত্তিগণের শিল্প তীর্থসমূহে পরম পরিণতি লাভ করিয়াছিল। সাসানীয় যুগ হইতেই ললিতকলা ও কারু-শিল্প বর্ণ যোজনায় সমৃদ্ধ। পারস্যের কার্পেটে, মিনা করা রঙিণ টালিতে, মসজিদ ও মাদ্রাসার প্রাচীর গাত্রে চুণ বালির (Stucco) মণ্ডনে ও দেওয়াল চিত্রে বর্ণিকাভঙ্গের অপূর্ব্ব নৈপুণ্য দেদীপ্যমান। মুসলমান যুগে শিল্পীর তুলিতে রঙের খেলা যেন সত্য সত্যই ভেকী লাগাইয়া দিত। মুসলমান ধর্ম্মের নির্দ্দেশ মতে মনুষ্য ও ইতর জীবের প্রতিকৃতি অঙ্কন নিষিদ্ধ হইলেও মুসলমান-বিজয় পারস্যকে এক সুবিস্তীর্ণ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিয়া শিল্পকলার অন্য সকল দিকের উন্নতি বিধান করিয়াছিল। উপাসনা গৃহ, সমাধি মন্দির প্রভৃতি পবিত্র স্থান হইতে নির্ব্বাসিত হইলেও খাঁটি চিত্র শিল্প টিঁকিয়াছিল রাজপ্রাসাদে এবং ধনী ও আভিজাত্য-বর্গের গৃহে আশ্রয় পাইয়া। আরবীয় বর্ণমালা গ্রহণ করিয়া পারস্য বড় কম লাভ করে নাই। বোগ্দাদে পারস্য প্রথায় পুঁথি লিখন ও মণ্ডন-চিত্রণের রেওয়াজ খৃঃ চতুর্দ্দশ শতাব্দ পর্য্যন্ত প্রচলিত ছিল। খৃঃ ১২৫৮ অব্দে বোগ্দাদ্ নগরী মোঙ্গলদিগের হস্তে পতিত হয়। যে সকল মোঙ্গল ইল খাঁ (Il khans) ও তৈমুরবংশীয় শাসক পারস্যের ভাগ্য বিধাতৃ-পদে উন্নীত হইয়াছিল তাহাদিগের জাতীয় শিল্পকলা বলিয়া কোনও কিছু ছিল না। তুর্কিস্থানের বৌদ্ধ সংস্কৃতি বহুপূর্ব্বেই পূর্ব্বাভিমুখে অপসৃত হইয়া চীন মহাদেশে আশ্রয় লইয়াছিল। সভ্যতার ও সুরুচির আগার বলিয়া চীনদেশ পারস্যে বহুকাল ধরিয়া সম্মানিত হইয়া আসিতেছে। তৈমুরবংশীয়দিগের রাজত্বকালে (খৃঃ অঃ ১৩৬৯-১৪৯৪) তাঁহাদের রাজসভায় চীনাপটুয়ার চিত্র ও তসবীর (portraits) যথেষ্ট আদৃত হইত। মোঙ্গল বিজয়ের ফলে পারস্যের দিক হইতে চীনের পথ উন্মুক্ত হইলেও সভ্যতার বেসাতী বড় সহজসাধ্য ছিল না। কৃষ্টির ক্ষেত্রে জেতৃগণ বিজিতের নিকট পরাভব স্বীকার করিয়াছে, একাধিক দেশের ইতিহাসে তাহার দৃষ্টান্ত দেখা যায়। তৈমুর বংশীয়েরাও সেইরূপ পারসিক সংস্কৃতির সংস্পর্শে আসিয়া সভ্যতার আভিজাত্য অর্জ্জন করিয়াছিল। ইহাদিগের আমলে বিবৃদ্ধ গৌরবে বিত্তশালী ওমরাহ পরস্পরের সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া বেতনভোগী চিত্রকর ও বৈজ্ঞানিক নিযুক্ত করিতেন। যাযাবর জীবনে অভ্যস্ত শিবিরবাসী উদারপরায়ণ তৈমুরও সমরকন্দ নগরে নিজ রাজধানী স্থাপন করিয়া মসজিদ ও উচ্চশ্রেণীর বিদ্যালয় নির্ম্মাণে সাড়ম্বরে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তৈমুরের রাজসভায় শুধু জামি, সুহেলি, আলি শিয়ার, আমীর প্রভৃতি কবি ও সাহিত্যিকগণ সম্মান লাভ করেন নাই, সমসাময়িক চিত্রকরেরাও রাজসকাশে সমাদৃত হইয়াছেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে পারস্যের শিল্প প্রতিভা বিদেশী তৈমুর বংশীয়দিগের সময়ে সমধিকভাবে প্রোজ্জ্বল হইলেও তৎপরবর্ত্তী পারস্যোদ্ভব সাফাভীয় রাজা-দিগের রাজত্বকালের কিঞ্চিদধিক অর্দ্ধাংশ ভাগ শেষ হইতে না হইতেই চিরতরে অবসানোন্মুখ হয়। সাফাভীয় গৌরবরবি শাহ প্রথম আব্বাস (১৫৮৭-১৬২৯ খৃঃ অঃ) পরলোকগমন করিলে পর পারস্যের ললিত-কলাও সঙ্গে সঙ্গে অস্তমিত হইতে থাকে। পাশ্চাত্য শিল্পপ্রথার প্রত্যক্ষ প্রশ্রয় দিয়া, পাশ্চাত্য চিত্রাঙ্কন-পদ্ধতি প্রসারের জন্য শিক্ষালয় (একাডেমী) সংস্থাপিত করিয়া, চিত্র শিক্ষার জন্য রোমে বৃত্তিভোগী ছাত্র পাঠাইয়া, তিনি দেশীয় শিল্পের প্রতি শুধু তাচ্ছিল্য প্রকাশ নহে—যে নিদারুণ আঘাত করিয়াছিলেন তাহার ফলেই পারস্যের শিল্পের দ্রুত অধঃপতন ঘটে।

একজন পাশ্চাত্য লেখক অনুমান করিয়াছেন যে যতদিন জাতীয় অন্তর্জীবন ম্লান হইয়া না পড়ে ততদিনই তাহার শক্তি শিল্পে ও যুদ্ধ বিগ্রহে সমভাবেই স্ফূর্ত্ত হইতে থাকে, কিন্তু উদ্যম ও ওজস্বিতা একবার হ্রাস হইতে আরম্ভ করিলে ক্রমবিবর্দ্ধমান দুর্ব্বলতা যতই জাতীয় একতা প্রতিষ্ঠার সহায়ক হউক না কেন মৌলিক শিল্প সৃষ্টির আর বিকাশ ঘটাইতে পারে না। রাজবংশের পরিবর্ত্তনের সহিত যে ব্যাপক অর্থনৈতিক বিপ্লব অবশ্যম্ভাবী, মনে হয় দেশীয় শিল্পের অপকর্ষের সহিত তাহারও অল্পাধিক সম্বন্ধ রহিয়াছে। আনুষঙ্গিক নৈতিক অধোগতির উল্লেখও না করিলে সত্যের অপলাপ হয়। রিজা-ই-আব্বাসী ও তৎপ্রবর্ত্তিত শিল্পী-গোষ্ঠী অলক লাঞ্ছিত কপোল, মদিরেক্ষণ, যে সকল তরুণ পরিচারকের মূর্ত্তি সমকালীন চিত্রপটে সন্নিবেশিত করিয়াছেন, তাঁহাদিগের করধৃত আসবপূর্ণ "কারাফা" সে যুগের অশেষ বিলাস বিভ্রমের বার্ত্তাই বহন করিয়া আনিয়াছে। একথা মিথ্যা নহে যে পারস্যে চিত্র শিল্পের ক্ষেত্র নানা কারণে বড়ই সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে এবং এ শিল্পকে নির্ভর করিতে হইয়াছিল প্রধানতঃ ধনিকের অনুকম্পার উপর। সাধারণ পারসীক

চিত্রকর ছিলেন লক্ষ্মীমন্তের ভৃত্য মাত্র। তাঁহাদের কাজ ছিল আবাস গৃহ ও স্নান-ঘরের দেওয়াল চিত্রণ, আর কদাচিৎ দুই এক খণ্ড ইতিহাস বা কাব্যগ্রন্থের চিত্র যোগান দিয়া সেগুলির শোভা সম্পাদন; রাজকীয় প্রসাদলাভের সৌভাগ্য যাঁহাদের ঘটিয়াছিল তাঁহাদের কথা অবশ্য স্বতন্ত্র। না বিষয় বস্তুতে, না বিশিষ্ট সমালোচকের সাহায্যে, এই দুয়ের কোন দিক দিয়াই সেকালের শিল্পীরা বিশেষ উদ্দীপনা লাভ করিতে সমর্থ হইতেন না। আধুনিক শিল্পীগণের তুলনায় এইখানেই তাঁহাদের অবস্থার বিশেষ পার্থক্য ছিল। তৎকালিক কবিদিগের গ্রন্থ পাঠ করিলে দেখা যায় যে পৌরাণিক (heroic) যুগের কয়েকটি রম্য কাহিনীই ছিল তাহাদের কাব্য মঞ্জুষার প্রধান সম্পদ। বিভিন্ন কবির কাব্য গ্রন্থে একই সন্দর্ভের সন্নিবেশ দেখা যায়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে এক ইউসুফ জুলেখা লইয়া কাব্য রচনা করিয়াছেন আবুল মুয়াইয়দ, বখ্তিয়ারী, ফারদৌসী, জামি ও নাধিম। সেইরূপ ফারহাদ ও শিরীণের প্রসঙ্গ লইয়া শুধু নিজামী নহেন তাঁহার প্রায় চারি শতাব্দীর পর সিরাজনগরীর উর্ফি ও তাঁহার সমকালীন আরও দুইজন কবি বাগ্‌দেবীর প্রসাদলাভের চেষ্টা করিয়াছেন। দ্বাদশ শতাব্দের শেষপাদে রচিত নিজামীর অপর যে একখানি কাব্য উজ্জ্বল চরিত্র চিত্রণ এবং প্রণয় ও হতাশার অভিব্যক্তির জন্য প্রাচ্য সাহিত্যে যশোলাভ করিয়াছে বেদুইন আরবদিগের প্রণয়মূলক সেই লয়লামজনুর কাহিনী লইয়াও বিভিন্ন কাব্যগ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন খুস্রী, হিলালী ও রুহ্ উলামিন নামক তিনজন কবি যথাক্রমে খৃষ্টীয় পঞ্চদশ, ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে। একই প্রকার সূচক চিত্র এইসকল বিভিন্ন হস্তলিখিত পুঁথির শোভাসম্পাদনের জন্য বার বার চিত্রিত হইয়াছে সুতরাং চিত্রকলায় এই অবাধ ও নিরঙ্কুশ পুনরাবৃত্তি যে সমঝদার ও প্রতিভাবান শিল্পী এই উভয়েরই মনে বিরক্তি জন্মাইবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? সনাতনী রীতির বাঁধাবাঁধির প্রভাব যখন স্বাভাবিক সীমা অতিক্রম করিয়া অতিরিক্ত রকম বাড়িয়া উঠে, তখনই উহা শিল্পের সাবলীল গতির পথে বাধা জন্মাইয়া শিল্পকে খাটো করিয়া ফেলে। পারস্য শিল্পে পুরাতনের প্রভাব এতদূর যায় নাই কিন্তু বিষয়-বস্তুর বাঁধাবাঁধি ও বাঁধাছাঁদের সূচক চিত্র অনুবৃত্তি ফলে দাঁড়াইয়াছিল এই, যে পারসীক চিত্রকর বরং নূতন বিষয় বস্তু অঙ্কনে অত্যন্ত ধারায় নিজ শিল্প কৌশল প্রয়োগ করিয়াছে তথাপি চিত্রাঙ্কণ প্রণালী সম্পর্কে পরীক্ষামূলক কোনও নব উন্মেষশালিনী প্রচেষ্টায় প্রশ্রয় দেয় নাই। খৃঃ ১৪০০ অব্দ পর্য্যন্ত পারসীক চিত্রকলা পাশ্চাত্য চিত্রশিল্পের পাশাপাশি-ভাবেই চলিয়া আসিতেছিল। ইউরোপে, প্রথম রেনেসাঁসে (Renaissance) যুগে শিল্পী কেবল বহির্জগতের সৌন্দর্য্যের আকর্ষণে ও শিল্পদক্ষতা বিষয়ক জ্ঞানের বিশিষ্ট গৌরবে মুগ্ধ ও আত্মতৃপ্ত হইয়া থামিয়া থাকে নাই। তাই পাশ্চাত্য শিল্প উন্নতির ক্রমোচ্চ সোপান অবলম্বন করিয়া বহুদূর অগ্রসর হইতে সমর্থ হইয়াছে, কিন্তু পারসীক শিল্পের গতি সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা বৈগুণ্যে পারিপার্শ্বিক আবেষ্টনে ব্যাহত হইয়া যে মধ্যপথেই থামিয়া গেল, ভাগ্যবিপর্য্যয় ছাড়া ইহাকে আর কি বলিব?

গ্রামের যাত্রা

শ্রীসত্যেন সিংহ

গ্রামের যাত্রা—গ্রামের লোকের দু' বৎসরের আশা, উৎসাহ দিয়ে গড়া যাত্রাগান আজ হবে, তাতে বুঝতেই পারা যাচ্ছে বুড়ো থেকে ছেলেরা সবাই এই আনন্দে যোগ দেবার জন্য ব্যস্ত, সকলের প্রাণেই আজ যেন কিসের ছোঁয়া লেগে নেচে উঠেছে। গ্রামের লোকের যাত্রা—তারাই করবে—তারাই দেখবে, আশে-পাশের গ্রামের লোককে দেখাবে তাদের কৃতিত্ব, বোঝাতে চাইবে তাদের যে, আমাদের যাত্রা কত ভাল, সেইসঙ্গে তোমাদের চেয়ে আমাদের গ্রাম কত উন্নত।

এই উৎসব, এই আনন্দ আগেও এই গ্রামে অনেকবার হয়েছিল কিন্তু তখন আনন্দটা দুঃখেরই হয়েছিল বেশী। যখন নীলু মণ্ডল রাবণ সেজে মদ খেয়ে নিজেকে সত্যই লঙ্কেশ্বর রাবণ ভাবল, আর ভাববেই তো, সে পেয়েছে ঝক্‌ঝকে রাজপোষাক, চক্‌চকে তরবারি, মচ্‌মচে নাগরা জুতো—তারপর চারিদিকে আলোর আলো—যেন স্বর্গের দেবতারা সব বন্দী, অপ্সরা, কিন্নরীদের রূপের ছটায় যেন চারিদিক ভরে গেছে—বাঁশীর বাজনা, বেহালা, তানপুরার সঙ্গে মিলে যেন রাবণ রাজকেই অভিনন্দন জানাচ্ছে—নীলু মণ্ডল পার্ট মুখস্থ করেছে তারপর তার পড়া আছে কৃত্তিবাসের ছেঁড়া রামায়ণখানা, আর পেয়েছে রঙিণ্ নেশা; কেন সে ভাববে না নিজেকে লঙ্কাপতি—দিয়েছিল বসিয়ে পদাঘাতের বদলে এক লাথি বিভীষণরূপী পরাণ নায়েকের পিঠে—শিরদাঁড়া গেল ভেঙে—দু' মাস ডাক্তারখানায়—নীলু মণ্ডল ২০০৲ টাকা গুণে তিন মাস জেল খেটে চলে এল—আর যাত্রার নাম তার সামনে যে করল তাকেই সে মারতে এল তেড়ে।

কিন্তু সে অনেক দিনের কথা তখন দল গিয়েছিল ভেঙে, এখন আবার দল গড়ে উঠেছে। এ দল নীলুর মত লোকেরই ছেলেপিলেদের—তারা তাদের বাপ-দাদাদের চেয়ে আরও ভাল দল করবে এবং করেছেও—সেই দলেরই হবে যাত্রা। পালা হবে কর্ণার্জ্জুন—রামায়ণের পালা আর তারা করবে না কখনও, কারণ ওটা ওদের সয় না, তাই তারা ধরেছে মহাভারত।

মাষ্টারের নাম কালধেনু—কালধেনু কালো ধেনু না হলেও কালো মানুষ বটে—তারওপর পান খাওয়া বড় বড় লাল দাঁত, তাল-গাছের মত লম্বা অথচ পেখাটার মত সরু চেহারা, বকের মত ঘাড়ে এসে পড়েছে বাব্‌রিওয়ালা চুল, লুঙ্গির মত করে একটা কাপড় সে সর্ব্বদা পরে থাকে আর গলায় থাকে একগাছা অতি ময়লা পৈতে। একটা অর্দ্ধনিঃশব্দ, অর্দ্ধশব্দমান হারমোনিয়ম এবং একটা ভাল তব্‌লা আর ফুটো ডুগি নিয়ে গরীবদের কয়েকটা কচি ছেলেকে সারারাত এক-দুই-তিন চার-পাঁচ; এক-দুই—এক-দুই-তিন্—এক-দুই-তিন্ করে নাচ শেখায় এবং এই বয়েস থেকেই নেশা ভাঙ্ অভ্যাস করায়। গরীবরা ছেলে তাদের কেন পাঠায়? কেউ যদি বলে তাহ'লে তারা বল্‌বে বামুনদের অর্ডার, বামুনের কথা কি অমান্য করা যায়; সাক্ষাৎ দেবতা তারপর মহাকালীর পাণ্ডা। ত্রিলোচন ঠাকুরই এই যাত্রার দলের সর্ব্বেসর্ব্বা, তিনিও এক্‌টিং করেন, আর করেন ছোট-লোকদের ধরে চাঁদা আদায়।

এতদিন ধরে সাড়ম্বরে মহলা দেওয়া "কর্ণার্জ্জুন" নাটকের আজ অভিনয় হবে। এখন কে কি পার্ট করবে সেটা একটু জানা দরকার অন্ততঃ মেন্ পার্টগুলো। শিবু নায়েকের পাঁচ ছেলে, তারা তাদের চিরদিনই পঞ্চপাণ্ডব মনে করে, তাই তারাই করবে

পঞ্চপাণ্ডবের পার্ট—আর নীলু মণ্ডলের তিন ছেলে সাধু, হারু, বিশু, এরা করবে যথাক্রমে কর্ণ, দুর্য্যোধন ও দুঃশাসন। দ্রৌপদী করবে আরগলি মিঞার ছেলে করিম এবং পদ্মা করবে ত্রিলোচন ঠাকুরের ছোট ভাই পদ্মলোচন।

এখানে আর একটা কথা বলা দরকার যে যখন কয়েক বছর আগে শিবু নায়েকের ছেলে বিভীষণরূপী পরাণ নায়েককে রাবণরূপী নীলু মণ্ডল লাথি মেরে হত্যা করেছিল তখন থেকেই এই দু'ঘরে সাপে-নেউলে। কিন্তু এই দুই ঘরের ছেলেরা একটু আধুনিক, কারণ তারা দু'চার বার সহরে গেছে, বাবুদের কাছে বড় বড় কথা শুনেছে, তাই ঘরে ঘরে ঝগড়া থাকলেও কলা-বিদ্যায় বা শিল্পক্ষেত্রে তারা বিবাদ রাখতে চায় না; নিজের নিজের পার্ট বলবে, চলে আসবে। তা ছাড়া তারা তো আর পরস্পর কথা বলছে না। নিলু, শিবু উভয়েই উভয়ের ছেলেদের যাত্রা করতে বারণ করেছিল কিন্তু ত্রিলোচন ঠাকুরের মদ আর গাঁজার লোভে কারুর ছেলেরাই তাদের বাপের কথা শোনেনি।

পেট্রোমেক্স বাতি চার পাঁচটা জ্বলে উঠেছে, বেহালা বাঁশী আর খোল তবলার বোলে আসর জমে উঠেছে। গানের মাষ্টার কালধেনু একটা ছয় আনা গজ সিল্কের লাল পাঞ্জাবী গায়ে দিয়েছে, বাবরিচুলগুলি আচ্ছা করে তেলে ভিজিয়েছে এবং একটা 'স্পোর্টশমেন' সিগারেট ধরিয়ে হাসিমুখে লাল দাঁতগুলো বের করে হারমোনিয়ামে গৎ বাঁধছে। চারিদিক লোকে লোকারণ্য, পাঁচ সাতটা গ্রাম ভেঙ্গে লোক এসেছে যাত্রা শুনতে—মেয়েরাও এসেছেন, তাঁদের জন্যে আলাদা চিকের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

চণ্ডীমণ্ডপের ভাঙ্গা ঘরটা গ্রীণরুম হয়েছে। সেখানে লোক গিস্‌গিস্ করছে, সবাই পোষাক পরবার জন্য ব্যস্ত। সাধু মণ্ডল কর্ণ সাজবে, সে তাড়াতাড়ি একটা বিড়ি ধরিয়ে গ্রীণরুমে ঢুকল, ঢুকেই একটু নাচের পোজ দিয়ে বলে উঠল—"কই কই কোন ক্ষুদ্র পতঙ্গম সাধ করে রণবহ্নি আলিঙ্গনে।" তারপরে বিষ্টু তাঁতির দিকে ফিরে বললে—"এটা হলো বড় ফণীর পোজ।"

আসরে ঢুকলেন শ্রীকৃষ্ণরূপী ভাগ্যরথ—আর সঙ্গে সঙ্গে মেয়েমহল থেকে তার বুড়ি মা বিন্দু কেঁদে উঠল—"ওমা, ভগু আমার যেন ঠিক কেষ্ট ঠাকুর—হে বাবা ঠাকুর! ভগু আমার তোমার মত সেজেছে, কত লোকে পেন্নাম করবে, তুমি যেন দোষ নিও না বাবা।" শ্রীকৃষ্ণ কিছুক্ষণ কুস্তির সঙ্গে পোজ-টোজ মেরে বেরিয়ে গেলেন। এম্‌নি করে সুন্দরভাবে পালা চলতে লাগল। নর্ত্তকীদের নাচের সময় কেবল একটা ছেলে নাচের একটু তাল কেটে ফেলেছিল, কিন্তু তা আমাদের কালধেনুর চোখ এড়ায়নি, তিনি নিজের কৃতিত্বটা একটু জোরেই প্রকাশ করে বললেন—"ধাঁড়রে, তোকে এত শিখিয়ে এই করলি বাবা।"

বোঝা যায় যাত্রা বেশ জমে উঠেছে, কর্ণ আর অর্জ্জুন ছাড়া আর সব কুরু-পাণ্ডবেরা নিজেদের পোষাকগুলো দেখাবার জন্যে শ্রোতাদের সঙ্গে এসেই বসে পড়েছেন এবং সেইসঙ্গে নিজেদের গুণ-কথা দু'এক কলকে গাঁজার বদলে পাশের গাঁয়ের লোকের মুখ থেকে শুনছেন।

এইবার শেষ দৃশ্য আরম্ভ হচ্ছে—কর্ণবধ—যুদ্ধ হবে, কর্ণ এবং অর্জ্জুন বড় বড় ধনুর্ব্বাণ নিয়ে ভীষণ গর্ব্বের সঙ্গে প্রবেশ করলেন, মনে বাধা উচিত যে এই কর্ণ আর অর্জ্জুনের বিরোধিতা শুধু অভিনয়েই নয়—বাস্তব জীবনেও। যাক্ তবে শেষ দৃশ্য বেশ জমে উঠল—কিন্তু জমবে তা আর কেউই ভাবতে পারেনি।

অর্জ্জুন মানে শিবু নায়েকের ছেলে কাড়া নায়েক ভীম কণ্ঠে চিৎকার করে উঠল—"ওরে রে দুরাচার, স্নেহময় ভ্রাতা মোর পরাণেরে তোর পিতা লাথি মারি করিল হত্যা যেইদিন, সেইদিন হতে প্রতিজ্ঞা মোর করহ স্মরণ, আসিয়াছে সময় এবে—লহ তার প্রতিশোধ।" কাড়া নায়েক ভেবেছিল যে শেষ সময় নীলুর ছেলেকে কিছু গালাগাল দিয়ে কয়েক ঘা বসিয়ে দেবে, তাতে কেউ বুঝতে পারবে না।

সাধুমণ্ডল মানে কর্ণ মহাবীর উত্তর দিল—"ওরে এত ছিল মনে তোর, হো হো বিশু দেতো মোরে লাঠিগাছা, তবে দেখাই শক্তি কার, কে কার লয় প্রতিশোধ।"

কাড়ানায়েক বা অর্জ্জুন তখন পূর্ণ বীরত্ব আরম্ভ করে বললেন—"কুকুরের সম সংহারিব তোরে, মিথ্যা নহে সে প্রতিজ্ঞা মোর।"

এতক্ষণ সকল লোক অবাক হয়েছিল, কারণ তারা ঠিক তখনও আসল জিনিষটা বুঝতে পারেনি, তারা আরও অবাক হোল যখন—নীলু মণ্ডলের দুই ছেলে দুর্য্যোধন আর দুঃশাসনরূপী হারু আর বিশু দুটো লাঠি নিয়ে বেগে আসরে প্রবেশ করে বসাল একলাঠি মহাবীর অর্জ্জুনের মাথার ওপর—সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার "শালা, আমার ভাইকে মারবি, তোর জান মেরে দেবো না।" ওদিকে কাড়ানায়েকের মাথা ফেটে রক্তের ফিন্‌কি ছুটেছে, অভিনয় বিপরীতভাবে সত্য হয়ে উঠেছে। এদিকে পঞ্চপাণ্ডবের এক ভ্রাতা ধরাশায়ী হওয়া মাত্রই তাদের জ্ঞান ফিরল গাঁজার কলকে থেকে; তারা কাড়াকে ধরাশায়ী হতে দেখেই হাতের কাছে কিছু না পেয়ে গ্রীণরুমের চালের দুটো রোলা টেনেই আসরে প্রবেশ করল এবং কৌরবদের সঙ্গে যুদ্ধ আরম্ভ করে দিল।

এই যুদ্ধে হত আর কেউ হলো না, তবে আহত হলো অনেকেই এমনকি স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ পর্য্যন্ত; কিন্তু কাড়াকে আর বাঁচান গেল না তাই কর্ণবধের বদলে হোল অর্জ্জুনবধ।

কালপুর গ্রামে আগেও তাই হয়েছিল। রাবণ বধের বদলে সেবার হয়েছিল সত্যিকারের বিভীষণ বধ—আর এবার হলো কর্ণবধের বদলে সত্যিকারের অর্জ্জুনবধ—সেবারেও শিবুনায়েকের প্রথম ছেলে গিয়েছিল—এবার গেল দ্বিতীয়। গাঁয়ের মুরুব্বিরা বলল পাকচক্র, কেউ বা বলল মায়ের লীলা—মা নরবলী চান, আবার কেউ কেউ বলল যাত্রা সয়না এ গ্রামে, এম্‌নি নীলুর তিন ছেলে গেল জেলে, এখন তারা জেলেই আছে; আর নীলু আর শিবু সন্ন্যাসী হয়ে বেরিয়ে গেল গ্রাম থেকে। কারণ এ দৃশ্য তারা আর দেখবেনা। যাত্রার দল ভেঙ্গে গেল।

আবার কি নীলুর ছেলেরা জেল থেকে ফিরবে? আবার কি নীলুর নাতিরা শিবুর নাতিদের যাত্রার দল গড়ে হত্যা করবে? হয়ত না হতেও পারে—কিন্তু বংশের রক্তের বীজ যাবে বলে তো মনে হয় না। বাংলার পল্লীতে প্রত্যেক বাপ ছেলেদের দু'বছর বয়েস থেকে শিক্ষা দেন যে কে কার শত্রু, এই বীজ এম্‌নি করেই রোপিত হয়। বাংলাদেশে এই আয়াসের কখন অবসান ঘটবে কে জানে?

শরৎ-সাহিত্য কি ব্রাহ্ম-বিদ্বেষী?

শ্রীরমা নিয়োগী বি-এ

Art for arts' sake নীতি অন্ত কোনও দেশে কতটা চলে তা ঠিক জানি না, কিন্তু আমাদের দেশে বোধ হয় একটুও চলে না। নিছক্ সাহিত্যের জন্তই সাহিত্য সৃষ্টির কথা এদেশে বুঝি কেউ ভাব্‌তেই পারে না। প্রাচীনকাল থেকে আমাদের দেশে didactic বা নীতিমূলক সাহিত্য সৃষ্টিই চলে আসছে, পশ্চিমের বর্ণ-সম্পাতে আমাদের অনেক জিনিষের রং বদলেছে, কিন্তু এই মূল মনোভাবটা বদলায়নি একটুও। আমাদের দেশের অধিকাংশ সাহিত্যিক ঔপন্তাসিক তাই আগে সমাজসংস্কারক রাজনীতিজ্ঞ ইত্যাদি, পরে মতবাদ প্রচারের জন্ত সাহিত্যিক ঔপন্তাসিক। নূতন কোন উপন্তাস হাতে পেলে আমরা বিচার করতে বসি কি উদ্দেশ্ত নিয়ে, নিজের কোন মতবাদটা প্রচার বা প্রমাণ করবার জন্ত লেখক এই উপন্তাসটা লিখেছেন—বই শেষ হলে লেখককে সনাতনী, সংস্কারক, বঙ্গসেবিক, ক্যাসিবাদী, সোস্তালিষ্ট এবং আরও পাঁচটা শ্রেণীর একটাতে ফেলে নিশ্চিন্ত হই।

শরৎ সাহিত্যকেও আমরা এইভাবেই বিচার করি। উপন্তাসিক শরৎকে আমরা হিন্দুসমাজ-সংস্কারক বলেই জানি। এই শ্রেণীর আলোচনারই জের টেনে অনেকে বলেন 'গৃহদাহ' ও 'দত্তা' এই দুটী উপন্তাসে শরতের ব্রাহ্ম-বিদ্বেষটা বিশেষভাবেই আত্মপ্রকাশ করেছে; ব্রাহ্ম ধর্মকে, সমাজকে দশের সামনে হীন প্রতিপন্ন করবার জন্তই নাকি তিনি এই দুটী উপন্তাস লিখেছেন; এই রকম সিদ্ধান্ত করে কেউ হয়েছেন গর্বিত, আবার কেউ বা হয়েছেন বিশেষ ক্ষুব্ধ। কিন্তু সংস্কারশূন্ত নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে বিচার করলে দেখা যাবে—কারুরই গর্ব বা ক্ষোভের কারণ শরৎ-সাহিত্যে সত্যই নেই।

'দত্তা' এবং 'গৃহদাহে'র কয়েকটা ব্রাহ্ম চরিত্রকে আমরা একটু শ্রদ্ধার চক্ষে দেখতে পারি না—সে কথা খুবই ঠিক। কূটকৌশলী, মিথ্যাচারী ভণ্ড প্রতারক রাসবিহারী আমাদের বিন্দুমাত্রও শ্রদ্ধা বা সহানুভূতি আকর্ষণ করতে পারে না। অস্থিরমতি হঠকারী অচলা নিজের মন না বুঝে একটার পর একটা ভুলের মধ্য দিয়েই যবনিকার অন্তরালে চলে গেছে; তার সে সব ভুলের জন্ত আমরা তাকে যতই অনুকম্পা করুণা করিনা কেন, শ্রদ্ধা তাকে করতে পারি না একটুও। সংকীর্ণচিত্ত সন্দিগ্ধ-মতি কেদারবাবুর দুর্ভাগ্যের কথা মনে পড়লে করুণা হয়ত হয় কিন্তু তাঁকে শ্রদ্ধা করার কথা একবারও মনে পড়ে না। উল্লিখিত বই দুটার আখ্যানাংশের উপর এ কয়টি চরিত্রের যথেষ্ট প্রভাব, কিন্তু তাতেই কি প্রমাণ হয়ে যায়, এ দুটি বই ব্রাহ্মবিদ্বেষী! স্রোতহীন ক্ষুদ্র জলাশয়ের বিকৃত পঙ্কিল জলরাশির মত আমাদের ধর্মান্ধ দৃষ্টিভঙ্গীও সংকীর্ণ বিকৃত হয়ে উঠেছে, ধর্মের ভোল আমরা বাইরে বদলাই বটে কিন্তু ভিতরে থেকে যায় সেই অনুদার বিকৃত দৃষ্টি। এই অনুদার বিকৃত দৃষ্টিই 'দত্তা' এবং 'গৃহদাহ' সামনে রেখে দেখে—রাসবিহারী, অচলা এবং কেদারবাবু মুখ্যতঃ ব্রাহ্ম; ভেবে দেখে না এরা আগে মানুষ, যে মানুষের মধ্যে ভাল মন্দ সৎ অসৎ সবই আছে, যে মানুষের সমষ্টিতে ব্রাহ্মসমাজ গঠিত বলেই সে সমাজেও ভাল মন্দ সাধু ভণ্ড সকল শ্রেণীর লোকই আছে। উপন্তাস পড়তে গিয়ে তাই তার চরিত্রগুলিকে হিন্দু মুসলমান ব্রাহ্ম খৃষ্টান প্রভৃতি ধর্ম বিভাগে না ফেলে ব্যক্তিগত চরিত্রের তারতম্য অনুসারে এক একটি মোটামুটি type বা শ্রেণীতে ফেলে বিচার করতে বসলে ভুল হবার অর্ধেক আশঙ্কা চলে যায়।

এই রকম মোহমুক্ত নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে দেখলে রাসবিহারী হিন্দু কি ব্রাহ্ম সে প্রশ্ন মনে ওঠে না; রাসবিহারী-চরিত্র Shakespearean Villain character গুলির মত একটা "চক্রী-চরিত্র"রূপেই আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে। বনমালীর জমিদারীর উপর তাঁর প্রথম থেকেই প্রচণ্ড লোভ ছিল, তাই বন্ধু জমিদারী রক্ষণাবেক্ষণের ভার নিয়ে, পুত্র বিলাসের সঙ্গে জমিদারকন্তা বিজয়ার বিবাহের সম্বন্ধ করে চারিদিক থেকেই আটঘাট বেঁধে রাখতে ভোলেননি। কিন্তু লম্বা-বিলাতী-খেতাব-ওয়ালা, ছন্নছাড়া ভোলানাথ নরেন ডাক্তারটি ছিল তাঁর হিসাবের সম্পূর্ণ বাইরে, ধূমকেতুর মত সহসা এসে পিতা পুত্রের যোগের হিসাবে যখন সে সবচেয়ে বড় বিয়োগের অঙ্কপাত করতে বসল তখন রাসবিহারীর ঝুনো মাথাও গেল ঘুলিয়ে। হিতাহিতজ্ঞানশূন্ত হয়ে তিনি বিজয়ার পয়সায় বিজয়ারই উপর চর নিযুক্ত করলেন এবং ঐ সংসারজ্ঞানহীন তুচ্ছ মেয়েটির হাতে ধরা পড়ে নাকালও বড় কম হলেন না। শেষ অবধি নরেন-নলিনী-দয়ালের ত্র্যহস্পর্শে রাসবিহারীর 'সাজান বাগান শুকিয়ে গেল', নরেন বিজয়ার মিলন হলো। রাসবিহারী চরিত্র আগাগোড়া আলোচনা করলে দেখা যায় ব্রাহ্মধর্মের কণামাত্রও তাঁর মধ্যে নেই, তিনি ব্রাহ্মধর্মের মুখোসধারী কুচক্রী ভণ্ড শয়তান মাত্র—ধর্মোচ্ছ্বাসটা তাঁর বাইরের ছদ্মবেশ মাত্র, তারই আড়ালে আত্মগোপন করে তিনি নেকড়ে বাঘের মত ওত পেতে বনমালীর জমিদারীর উপর চোখ রেখে বসেছিলেন।

'গৃহদাহে'র অচলা যে ব্রাহ্ম যে কথাই বা ওঠে কি করে? অচলা ব্রাহ্ম কি হিন্দু সেটা বড় কথা নয়, বড় কথা হচ্ছে সে মানুষ। একটাও ভুলচুক না করে পৃথিবীর সুদীর্ঘ পথ বেয়ে নিঃসঙ্কোচে হেঁটে যেতে যে পারে তার সৌভাগ্য অসীম; কিন্তু এতটা সৌভাগ্য নিয়েই ত সবাই জন্মায় না। ছোট বড় ভুল করে তারই পায়ে আত্মবলি যারা দেয় পৃথিবীতে তাদের সংখ্যাও বড় কম নয়, অচলা এদেরই একজন—আর ভুলের মাত্রাটা তার বড় বেশীই হয়ে গিয়েছিল। নরম, কাঁচা মাটি দিয়ে ইচ্ছামত বাঁদর ও শিব দুই-ই গড়া যায়, অচলা ছিল এমনি কাঁচা মাটি। মূলতঃ দুর্নীতিপরায়ণ সে ছিল না, কেবলমাত্র মহিমের আওতায় থাকতে পারলে সে হয়ত শেষেরটাই হতে পারত। দুর্ভাগ্যক্রমে তা হলো না, দুষ্টগ্রহের মত সুরেশের আবির্ভাব হলো তার জীবনে, আর যে পাহাড়ের আড়ালে দাঁড়িয়ে অচলার মনে দ্বিধাদ্বন্দ্ব কিছুই ছিল না, সেই দৃঢ় চরিত্র সংযত-বাক্ মহিম ক্ষুব্ধ অভিমানে একপাশে সরে দাঁড়াল: অনুকূল আবহাওয়ায় যে অচলা ফুলের মত ফুটে উঠতে পারত, প্রতিকূল আবহাওয়ায় সেই অচলাই আগাছার মত বেড়ে উঠে পৃথিবীতে আবর্জনা বাড়াল। এই অনুভূতিপ্রবণ মেয়েটির ভুলের শাস্তিও বড় কম হয়নি। ভুলটাকে ভুল বলে বোঝার পরও তার আর সংশোধনের উপায় রইল না। অচলা পৃথিবীর যে কোনও ধর্মাবলম্বী হতে পারত; কারণ ধর্মের প্রভাব তার জীবনে পড়েনি। অচলা চরিত্রে দেখান হয়েছে একটা অস্থিরমতি—হঠকারী, ভ্রমপ্রবণ দুর্বল শ্রেণীর চরিত্রের পরিণতি। এই শ্রেণীর চরিত্রের এই রকম বিকাশ ও পরিণতি আমাদের তৃপ্তি দেয় না; কিন্তু পৃথিবীতে এমনি অনেক কিছুই ঘটে থাকে। 'সাহিত্য জীবনের প্রতিচ্ছবি' একথা অনেক মনীষী বলেছেন, সেদিক দিয়ে দেখলে শরৎ সাহিত্যে অচলার অস্তিত্ব কিছুমাত্র খাপছাড়া ঠেকে না। অচলার পিতা কেদারবাবু সুরেশকে বলেছিলেন "আমরা ব্রাহ্ম বটে, কিন্তু সেরকম ব্রাহ্ম নই।" তিনি ছিলেন সুবিধাবাদী। 'গৃহদাহ' পড়তে পড়তে কেবলই মনে হয় ধর্ম জিনিষটাকে নিয়ে মাথা ঘামাবার বা তাকে নির্বিচারে ভালবেসে জড়িয়ে ধরবার সময় বা প্রবৃত্তি তাঁর ছিল না; তাই তাঁর ধর্ম নিয়ে মাথা ঘামাবার প্রয়োজন আমাদেরও নেই। কেদারবাবুকে মনে পড়লেই সেই সঙ্গে

Vicar of wake-fieldএর মা এবং Pride and Prejudiceএর মায়ের কথা মনে পড়ে ; অচলার মায়ের অভাবে তাঁকেই মায়ের কাজ করতে হয়েছিল। কেদারবাবুর মধ্য দিয়ে আমাদের সামনে ভেসে ওঠে একটি সংকীর্ণ স্বার্থপর সন্দিগ্ধমতি দায়িত্বজ্ঞানহীন চরিত্রের ছবি। তবু যে অবর্ণনীয় লজ্জা, দুঃসহ বেদনার ভিতর দিয়ে তাঁকে এ সবের প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়েছিল তা মনে করলে আমরা তাঁকে অনুকম্পা করুণা না করে পারি না।

এই কয়টি অশ্রদ্ধেয় চরিত্র দৈবাৎ (দৈবাৎ বলছি এইজন্য যে এরা বিশেষ করে ব্রাহ্ম না হলেও চরিত্র বিকাশে বাধা হতো না) ব্রাহ্ম হওয়ায় অনেকেই বলেন শরৎ-সাহিত্য ব্রাহ্ম-বিদ্বেষী। শরৎচন্দ্রের অল্প কয়েকটা উপন্যাস উল্টে গেলেই অভয়ার স্বামী (শ্রীকান্ত), বেণী, ধর্মদাস, গোবিন্দ, (পল্লীসমাজ), মনোরমা, বাড়ুজ্যে মশাই (বৈকুণ্ঠের উইল), বড় বৌ (মেজদিদি), নারায়ণীর মা (রামের সুমতি), কিরণময়ী (চরিত্রহীন) প্রভৃতি আরও অনেক অশ্রদ্ধের ঘৃণ্য হিন্দুধর্মাবলম্বী চরিত্রের দেখা পাই। যে দৃষ্টিভঙ্গীতে শরৎ-সাহিত্যকে ব্রাহ্মবিদ্বেষী বলা হয়—ঠিক সেই দৃষ্টিভঙ্গীতেই উল্লিখিত চরিত্রগুলি দেখে বলতে হয় শরৎ-সাহিত্য হিন্দুধর্ম-বিরোধী ; অথচ শরৎ সাহিত্য সম্বন্ধে এর চেয়ে হাস্যোদ্দীপক মন্তব্য আর কিছু হতে পারে না।

এই ত গেল নেতিমূলক বিচার। এবার শরতের উপন্যাসগুলির উপর চোখ বুলিয়ে গেলে কয়েকটি শ্রদ্ধেয় ব্রাহ্মচরিত্রও চোখে পড়বে। এই দত্তার কথাই ধরা যাক্ না। বনমালীকে উপন্যাসের একটা চরিত্র বলা যায় না, কারণ তিনি মারা যাবার পর থেকেই উপন্যাসের মূল ঘটনাবলী আরম্ভ ; অথচ সমস্ত উপন্যাসটার ভিতর দিয়ে অন্তঃসলিলা ফল্গুধারার মত যে জিনিষটা বইছে বলে আমরা অনুভব করি, সেটা এই পরলোকগত বনমালীরই অন্তিম ইচ্ছা আন্তরিক কামনা। এখানে ওখানে দু'একটা কালির আঁচড়েই তাঁর চরিত্র ফুটে উঠেছে। স্বল্পভাষী, দৃঢ়চরিত্র তীক্ষ্ণবুদ্ধি এই জমিদারটীর হৃদয়ে স্নেহমমতার অভাব ছিল না। ঔদার্য্যও ছিল তাঁর অসীম ; বাল্যবন্ধু মাতাল জগদীশের হতভাগ্য ছেলেটিকে তিনি নিজের ছেলের মতই দেখতেন এবং উপযুক্ত শিক্ষার জন্য তাকে বিলাতেও পাঠিয়েছিলেন। সবার উপর সবচেয়ে বড় রত্নের অধিকারী ছিলেন তিনি—ঈশ্বরে বিশ্বাস, নির্ভর, প্রেম ; তাঁর মতে এই ছিল "সব চেয়ে বড় পাওয়া ; সংসারের মধ্যে, সংসারের বাইরে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে এত বড় পাওয়া আর কিছুই নাই। এ যে পেয়েছে সংসারে আর তার কি বাকি আছে ?" এই উপন্যাসেরই আর একটি ব্রাহ্মচরিত্র আমাদের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে। দুঃসহ মানসিক দ্বন্দ্বের দিনে বিজয়া মন্দিরের আচার্য সৌম্যশান্ত মূর্ত্তি এই দয়ালকেই একান্ত আপনার বলে চিনে নিয়েছিল। তাঁর সাংসারিক অবস্থার কথা জানতে পেরে বিজয়া তাঁকে আপনার জমিদারীতে কাজ দিয়েছিল। আর্থিক অবস্থার জন্যই তাকে অনেক জায়গায় অত্যন্ত দীন সংকুচিত হয়ে থাক্‌তে হতো ; কিন্তু তাঁর সন্তোষ সহৃদয়তা ও অন্তরের শুচিতা অন্যের মনকেও অর্ধেক পরিষ্কার করে দিতে পারত। "ধর্ম সম্বন্ধে তাঁর পড়াশোনা ছিল যৎসামান্য, কিন্তু ধর্মকে তিনি প্রাণ দিয়ে ভালবাস্‌তেন আর সেই অকৃত্রিম ভালবাসাই যেন ধর্মের সত্য দিকটার প্রতি তাঁর চোখের দৃষ্টিকে অসামান্যরূপে স্বচ্ছ করে দিয়েছিল। কোনও ধর্মের বিরুদ্ধেই তার নালিশ নেই এবং মানুষ খাঁটি হলেই যে সকল ধর্মই তাকে খাঁটি জিনিষ দিতে পারে এ তিনি বিশ্বাস করতেন।" ধর্ম নিয়ে তাঁর তর্ক-বিতর্ক বিচার-বিরোধের আড়ম্বর ছিল না ; সহজ বিশ্বাসে তিনি সরল পথটাই খুঁজেছিলেন। মন্দিরের আচার্য হয়ে তিনি ব্রাহ্ম-কন্যার বিবাহ হিন্দুমতে দিয়েছিলেন—এ অনুযোগ একাধিক বার শুনেছি—কিন্তু এর উপযুক্ত উত্তরও নলিনীর মুখেই পাওয়া যায়। 'পরিণীতা'র গিরীনের চরিত্র অতি অল্প স্থান জুড়েই আছে ; তবু তারই মধ্যে তার নিঃস্বার্থ উপচিকীর্ষা নিষ্কাম প্রেম ও নিরাড়ম্বর বিরাট্ ত্যাগের অপূর্ব চিত্রে আমাদের মাথা শ্রদ্ধায় আপনি নত হয়ে আসে। এই অল্প কয়েকটি চরিত্রকেই নিরপেক্ষভাবে বিশ্লেষণ করার পর কেউ আর শরৎ-সাহিত্যকে ব্রাহ্মবিদ্বেষী বলার কারণ খুঁজে পাবেন না।

এই প্রসঙ্গেই শরৎ সাহিত্যের আরও একটা দিক দেখিয়ে দেওয়া একান্ত প্রয়োজন। সাহিত্যিক শরৎ ছিলেন সত্যসুন্দরের একনিষ্ঠ পূজারী ; পঙ্কের মাঝেও যখনই তিনি পদ্ম দেখেছেন তখনই তার দিকে দেশের সশ্রদ্ধ দৃষ্টি ফিরিয়ে দিয়েছেন তাঁর লেখনী সঞ্চালনে, আর সত্য-সুন্দরের বিরোধী যা কিছু দেখেছেন তাকেই তাঁর অমর লেখনীর সাহায্যে ফুটিয়ে তুলেছেন দশের চোখের তীব্র কশাঘাতের সামনে। বঙ্কিমচন্দ্র ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত সম্বন্ধে যা বলেছেন শরৎ সম্বন্ধেও তাই বলা যায়—"মেকীর উপর তাঁর ছিল বড় রাগ। ভণ্ড নকল কোনও কিছুই তিনি একটুও সইতে পারতেন না। তাই পাত্রাপাত্র জাতিধর্মনির্বিশেষে সব ভণ্ডকেই তার মেকীত্বের জন্য তিনি তীব্র কশাঘাত করে গেছেন, কাউকে ছেড়ে দেন নি। তথাকথিত হিন্দুকুলতিলক ব্রাহ্মণ সমাজপতি বেণী মুখুয্যের হীন কুটিল কুচক্রী মনোবৃত্তি দেখাতে শরৎ একবারও দ্বিধা করেন নি ; গোবিন্দ ধর্মদাসের তুচ্ছতা, কলহপ্রবণতা, কৃতঘ্নতার নিখুঁত চিত্র আঁকতেও তাঁর হাত কাঁপেনি। শুধু এই নয়—এই রকম আরও অনেক ধর্মধ্বজ সমাজপতি ধনী বকধার্মিকের ক্ষুদ্রতা হীনতার গোপন রন্ধ্রগুলি তিনি জনসমাজের সামনে তুলে ধরে তাদের প্রাপ্য অপমান বিদ্রূপের কশাঘাতটুকু দিতে ছাড়েন নি ; লোকের চোখে যেন আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন মানুষের রূপে এরা কত বড় অমানুষ, শয়তান, ভণ্ড। আমাদের দেশের অলিতে গলিতে এমনি মেকীত্বের ভণ্ডামির আবর্জনা জমে জমে বিরাট স্তূপ হয়ে আছে, তাই আজকের দিনে এই চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়াটার প্রয়োজনই বেশী। ঐ প্রয়োজনেই তিনি আরও দশটা চরিত্রের সঙ্গে রাসবিহারী চরিত্রও এঁকেছেন ; রাসবিহারী ব্রাহ্ম কি না তা তিনি দেখাতে চান নি—তিনি দেখিয়েছেন মানুষ হিসাবে রাসবিহারী মেকী, ভণ্ড, অপদার্থ।

অপরদিকে যা সত্য তা যতই সামান্য—যতই ছোট হোক না কেন, শরৎ তাকে অসামান্য করে গেছেন। দয়াল ধনে, মানে, বিত্তায় চাতুর্যে রাস-বিহারীর চেয়ে অনেক হীন ছিলেন কিন্তু তাঁর কাচের মত স্বচ্ছ মনটি ছিল সহজ সত্যের আলোয় প্রতিভাত ; তাই নরেনের মুখে শরৎ তাঁকে মানুষ হিসাবে অকৃত্রিম শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন। অশিক্ষিত মুসলমান আকবর সর্দার তার সরল সত্যনিষ্ঠার দৃঢ় মাধুর্যে, শরতের দৃষ্টিভঙ্গীতে ঐসব ধর্মান্ধ সমাজপতির অনেক উপরেই আসন পেয়েছে। এমনি অনেক দীনহীন আপাতো-ঘৃণ্য চরিত্রকে শরৎ অন্তরের সৌন্দর্যে, সত্যের দৃঢ়তায় ভূষিত করে আমাদের শ্রদ্ধেয় করে তুলেছেন। এ প্রসঙ্গে বিলাসবিহারীর কথা মনে পড়ে, এই উদ্ধত, দাম্ভিক, ধর্মোন্মাদ, রাগী ছেলেটির মধ্যে শ্রদ্ধা করবার মত কিছু আমরা সহসা খুঁজে পাই না। তারপর যতই এগিয়ে যাই ততই দেখি, সে আর যাই হোক রাসবিহারীর মত ভণ্ড প্রতারক নয়। রাসবিহারীর জীবনে যেন ভণ্ডামি ছাড়া সত্য আর কিছু ছিল না ; বিলাসের জীবনে কিন্তু একটা পরম সত্য ছিল—বিজয়াকে সে সত্যই ভালবাসত। রাসবিহারীর সমস্ত ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করে দিয়ে নরেন বিজয়ার যখন মিলন হলো, তখন এই বিফল-মনোরথ যুবকের তীব্র তিক্ত হতাশাকে শরৎ একটুও সহানুভূতি দেখান নি ; বরং দুর্মুখ নলিনীর তীক্ষ্ণ-তাকে উপহাসই করেছেন। অথচ যার সমস্ত ভালবাসা ব্যর্থ হয়ে গেল সবচেয়ে বেশী হারাল যে সেই বিলাসের নামও আমরা শেষের দিকে খুঁজে পাই না। তার জীবনের একমাত্র সুন্দর সত্যকে শরৎ বিদ্রূপ করেননি ; এমন কি সে সত্যকে খেলো করবার জন্যে শেষ মুহূর্তে তার প্রতি সহানুভূতি দেখাবার চেষ্টাও শরৎ করেননি। তার ব্যর্থতার বেদনা, সান্ত্বনাতীত হতাশাকে শেষ মুহূর্তে তার যবনিকার অন্তরালে রেখেই তার সেই চরম সত্যের প্রতি তিনি সমুচিত শ্রদ্ধা দেখিয়েছেন ; ব্রাহ্ম বলে বিলাসের উপর একটুকু অবিচারও শরৎ করেননি।

পরীক্ষা

শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ ঘোষ

(৬)

বাইশটাকার গায়ের কাপড়খানা অবশেষে পথের একটি লোকের কাছে আট টাকায় বিক্রয় করিতে হইয়াছে। ক্রমাগতই মা'র খাওয়া-পরায় গোলোযোগ ঘটিয়া যাইতেছিল। তাঁহার দৃষ্টিহীন চোখে নানা অভাবের ছায়া কতক কতক ধরা পড়িয়া গিয়াছে। তবে এইটুকু রক্ষা যে তিনি ইহাকে আর্থিক অভাবের কারণ বলিয়া ধরিতে পারেন নাই। বরং ইহাই তাঁহার ধারণা হইয়াছিল যে, তাঁহার শেষ-জীবনের কয়টা দিন ছেলে-বৌ নিজেদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে মজিয়া এদিকে আর ফিরিয়াও দেখে না। কাজেই বড় বেশী অনুযোগ মার কাছ হইতে আসিত না। আন্তরিক কষ্ট হইলে মা কেবল ঠাকুর-নাম জপ করিতেন। শুধু কাপড়গুলো ময়লা হইলে অসন্তুষ্ট হইয়া উঠিতেন, আর রজকের পিতৃ-পুরুষ উদ্ধার করিয়া গালাগালি বর্ষণ করিতেন। এই গালাগালি আমাকে আসিয়া লাগিত; কারণ এ বাড়িতে রজকের প্রবেশ নিষেধ আমিই করিয়াছিলাম। কিছুদিন এই অসন্তোষ নির্ব্বিবাদে হজম করিয়া অবশেষে বহুকষ্টে একখানি সাবান সংগ্রহ করিয়া আনিতাম, আর মণীষা নিঃশব্দে বস্ত্রখানা পরিষ্কার করিয়া দিত। কিন্তু বিপদ বাধিল যখন খাওয়ার ব্যাপারে আর আগের মতন আয়োজন রহিল না।

সেদিন মা আমাকে ডাকিয়া বলিলেন, হ্যাঁরে, তোরা কি আর ঘরসংসার কিছুই দেখ্‌বি না। চাকর বাকরেই রাজত্বি চালাচ্চে বুঝি। কি দিয়ে রোজ খাস, তাও কি চোখে পড়ে না—না মনে থাকে না কে বাজার করে?

মার প্রশ্নে আমার মাথায় যেন আকাশ ভাঙিয়া পড়িল। একটু আমতা আমতা করিয়া তাড়াতাড়ি বলিলাম, ঐ এক ব্যাটা চাকর জুটেচে, সেই তো সব করে। আচ্ছা, ওকে আমি ধমকে দেবো।

মা দুঃখ করিয়া নিজে নিজেই বলিতে লাগিলেন, আমি আজ অক্ষম হোয়ে পড়েচি, তাই না তোদের এই কষ্ট, কিন্তু আমি আর ক'দিন বাবা। একবার চোখ বুজলেই হোলো, তারপর আর কে-ই বা জিগ্যেস করবে, পেট ভরেচে কিনা! ও বৌমা, চাকরটাকে একবার এখানে পাঠিয়ে দাও তো মা, দেখি একবার মুখপোড়াকে।

দরজার পাশে দাঁড়াইয়া আমি সবই শুনিতেছিলাম, অস্পষ্ট পায়ের শব্দে ফিরিয়া দেখি মণীষা।

মলিন হাসিতে মুখখানি ভরাইয়া মণীষা বলিল, যাও চাকর সেজে।

কথাটা মনে লাগিল, কৌতুক বোধ হইল। কাপড়খানা গুটাইয়া লইয়া কোমর বাঁধিলাম। তারপর একটু দূর হইতে দুমদাম্ আসার শব্দ করিয়া ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িলাম। বিকৃত-কণ্ঠে বলিলাম, মা ডাক্‌তেছিলেন?

মা উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন। বলিলেন, কোথাকার যে-আক্কেলে লোক বাপু তুমি, একেবারে ঘরের ভেতোর ঢুকে এলে—কি জাত কিছুর ঠিক নেই—বলিয়া তক্তপোষের একান্তে লাল সালু মোড়া ছোট্ট একটা পুঁটুলি হাত দিয়া স্পর্শ করিলেন।

রুদ্ধকণ্ঠে বলিলেন, ও বৌমা দেখো দিকি, লক্ষ্মীর ঝাঁপি আমার ছুঁয়ে দেয় বুঝি।

লাল সালুর এই ছোট্ট পুঁটুলির মধ্যে যে লক্ষ্মীদেবীর বাসস্থান, একথা আজ প্রথম শুনিলাম। ও বাড়িতে এটাকে কখন দেখি নাই। বাড়ি বদলাইবার সময় মা ওটাকে যথাসাধ্য সন্তর্পণে এবাড়িতে আনিয়াছিলেন মনে আছে। এই উপলক্ষে মা এমন বকাবকি সুরু করিয়া দিলেন যে চাকরের বাজার করিবার কথা বিন্দুমাত্র মনে রহিল না। আমি ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিলাম প্রবল একটা হাসির বেগ লইয়া। নকল চাকর সাজিয়া মাকে যে রীতিমত ভুলাইতে পারিয়াছি, এই কথা মনে করিয়া হাসি আর থামিতে চায় না। মুখ নীচু করিয়া সে হাসির বেগ কোনরূপে দমন করিয়া সোজা রান্না ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। মণীষাকে অভিনয়ের ক্ষমতাটা উপলব্ধি করাইতে মুখ তুলিয়া চাহিলাম, কিন্তু মুখের উপর যেন বেত্রাঘাত হইল। দেখি মণীষার দু'চোখে জল টল্‌টল্ করিতেছে।

কিছুক্ষণ বিহ্বলের মত চুপ করিয়া রহিলাম। বুঝিতে চেষ্টা করিতে লাগিলাম, এমন সুন্দর একটা রসিকতার মধ্যে চোখের জল কোথায় আসে। মেয়ে-জাতটাই কি এই রকম। কথায় কথায় চোখের জল! এতো জল ওদের চোখে কেমন করিয়া আসিল, তাই ভাবি। শিবের জটায় বাঁধা পড়িয়া গঙ্গা তো কাঁদিয়া ভারত ভাসাইয়া দিল। শিব-মহারাজ গঙ্গাকে কষ্ট দিয়াছিল বৈকি। আমিও কি কষ্ট দিয়া মণীষার সেই অন্তঃসলীলা প্রবাহকে চোখ দিয়া টানিয়া বাহিরে আনিলাম। ছি ছি, আমি হতভাগ্য, মূঢ়।

ঘরে গিয়া মণীষা বলিল, কি হয়েছে, মা?

মা বলিলেন, দেখ্ দিকি মা, আমার লক্ষ্মীর ঝাঁপি ছুঁয়ে দিলে বুঝি। কি করি এখন।

মণীষা একটা গেলাসে কলের জল লইয়া আসিয়াছিল। বলিল, গঙ্গাজল এনেচি, ছড়া দিচ্চি।

মা সাগ্রহে বলিলেন, গঙ্গাজল! দে মা দে। আমার মাথায়ও একটু দিস্। তুই মা আমার লক্ষ্মী, ইদিকে আয় তো।

মণীষা সর্ব্বত্র কলের জল বর্ষণ করিয়া মার কাছে গিয়া বসিল। মা তাহাকে বুকের ভিতর টানিয়া লইলেন। গণ্ডের উপর একটা চুম্বন দিবার চেষ্টা করিলেন—কিন্তু সে আশীষ-চুম্বন গিয়া পড়িল চোখে।

দুঃখিতভাবে মা তাড়াতাড়ি বলিলেন, দেখ্‌লি তো মা, একটু যে আদর কোরবো, ভগবান সে উপায়ও রাখেননি। হাত পায়ের

কি আর কিছু ঠিক আছে! এমন কোরে আর বাঁচা কেন?

মণীষার মাথায় মুখে ও গায়ে হাত বুলাইয়া দিয়া বলিলেন, কী রোগা হয়েছিস বল দেখি! কেন রে? সত্যি কোরে বল দিকি, এইবারে মা হবি বুঝি!

মৃদু হাসিতে মণীষার মুখ ভরিয়া গেল।

মা বলিলেন, তা অমন সব্বাই হয়। দেখ, একটু ভালো কোরে খাসদাস। আহা! কেই বা তোকে দেখে। ভগবান, এমন কোরে আর যন্ত্রণা দিও না। আমার মনুর বাছার মুখ দেখে তবে মরবো।

মণীষাকে বুকের ভিতর একটু চাপিয়া ধরিলেন। বলিলেন, আচ্ছা মনু, তোর যদি খোকা হয়, কি রকম দেখতে হবে রে! শোন, আমি বলি।—চুল হবে, তোর মতন। কালো কুচকুচে—থোকা থোকা কোঁকড়া। চোথ পিট্‌পিট্‌ কোরে চাইবে। কার মতন চোখ হবে বলদিকি!

মণীষা গদগদ হইয়া বলিল—মা, তোমার মতন; তা না হোলে ছেলে আমি নোবো না।

মা বলিলেন, দুর্‌ পাগলি, নিবিনা তো কি ফেলে দিবি। কিন্তু ঠিক ধরেছিস তো। আমাদের যে গুরুপুরুত ছিলেন, তাঁকে তো তুই দেখিস নি। শোন তবে তাঁর গল্প বোলি। উদ্দেশ্যে নমস্কার করিলেন।

তিনি সিদ্ধ যোগী ছিলেন। আমাদের বাড়ীতে প্রথম এসে কি বোললেন জানিস? তখন আমি বৌ-মানুষ। বললেন, তুমি মা সাক্ষাৎ গৌরী। এই না বোলে ঠাকুর তো পা গুটিয়ে বোসলেন। আমার প্রণাম নেবেন না। বললেন, তুমি আমার মা, তোমার প্রণাম নিলে আমার পাপ হবে। তুমি তেত্রিশকোটি দেবতাকে প্রণাম করো, আমাকে নয়।

মণীষা বলিল, বলো কি মা, শুনলে যে গায়ে কাঁটা দেয়।

কথাটা রীতিমত উপভোগ করিয়া মা বলিলেন, হ্যাঁ রে পাগলী, এখনও সে সব যেন চোখের ওপোর দেখতে পাচ্চি।

মণীষা বলিল, ছেলের গায়ের রং কিন্তু মা, তোমার মতন হওয়া চাই।

মা সহাস্যে বলিলেন, কেন আর লজ্জা দিস মা, তোদের গায়ে যেন চাঁদের আলো।

কথাটা ফিরাইয়া দিয়া মণীষা বলিল, মা তুমি চট্‌ কোরে আহ্নিকটা সেরে নাও, আমি তেল মেখে দুটি মুড়ি আনি।

দরজার কাছেই আমি সর্ব্বক্ষণ বসিয়াছিলাম। মণীষা বাহির হইয়া আসিতে সহাস্যে নিম্নকণ্ঠে বলিলাম, চাঁদের আলো!

নিজের দেহের প্রতি একবার দৃষ্টিপাত করিয়া লইয়া ম্লানহাস্যে মণীষা বলিল, তা আর রৈলো কই!

কথাটা যেমনি সোজা তেমনি ছোট্ট। অন্ধকারে চলিতে চলিতে হঠাৎ যেন একটা ধাক্কা খাইলাম। মণীষা সত্যই অনেকটা মলিন হইয়া গিয়াছে। এই ছোট্ট কথাটি যেন আজ আমার চোখে আঙুল দিয়া দেখাইয়া দিল। সংসারের সমস্ত কাজ একেলা তাহাকে করিতে হইতেছে, ইহাতে কষ্ট আছে নিঃসন্দেহ। কিন্তু অহর্নিশি মিথ্যাকে সত্য বলিয়া চালাইয়া দিবার সংঘাত তাহাকে যে দিন দিন পিষিয়া মারিতেছে। আমারই অযোগ্যতায় মণীষা কষ্ট পাইতেছে, এই কথা আজ নূতন করিয়া মনে হইল। নিজের ওপর ধিক্কার জন্মিল। আজ স্পষ্টই বুঝিলাম, নিজের অক্ষমতার, অন্যায়ের ভাগ অপরের হইতেই পারে না। অতিরিক্ত পরিশ্রমে অনাহারে দুশ্চিন্তায় মণীষার দেহ ম্লান শীর্ণ হইয়া গিয়াছে। হায়, হায়, আমি কি তাহাকে তিলে তিলে ক্ষয় করিয়া আনিতেছি! আমি খুনী আসামী! আমার তো ফাঁসি হওয়া উচিত। যাহারা মানুষকে একবারে মারিয়া ফেলে, তাহারা তো সাধু। কিন্তু যাহারা তিলে তিলে শ্বাস রোধ করিয়া আনে, তাহাদের মতন অপরাধী মানুষ জগতে আর আছে কি! আমি যদি বলি, আমার ফাঁসিতে ঝোলাও, লোকে হাসিবে। হাসুক তারা, তাদের ন্যায়ের দণ্ড মিথ্যা দিয়া তৈরি। আমার শাসনকর্ত্তা আমি নিজে। আমি নিজেই নিজেকে ফাঁসিতে ঝুলাইয়া দিব, পাপের শেষ করিব। পয়সা না হয় রোজগার করিতে পারিতেছি না, কিন্তু মণীষাকে একটু আনন্দে রাখিতে কি পয়সার দরকার করে! তাহাও পারি না, ধিক্ আমাকে। আগে কতো পরিহাস করিতাম আর মণীষা খিলখিল করিয়া হাসিয়া একেবারে লুটাইয়া পড়িত। মনুটা তো একবার হাসিতে আরম্ভ করিলে থামিতেই পারিত না, ধমক দিলে আরো বেশী করিয়া হাসিত। আজ কতো দিন সেই মণীষার মুখে হাসি দেখি নাই। দেখি, আজ তাহার ঠোঁটের উপর দিয়া একটু হাসি ঝিক্‌মিক করিয়া ওঠে কিনা। রান্নাঘরের কাছে গিয়া দেখি মণীষা উনুনের উপর ঝুঁকিয়া রহিয়াছে আর পিঠের কাপড়ের প্রকাণ্ড একটা ছেঁড়ার ভিতর দিয়া ভিতরের অপরিষ্কার জামাটা দেখা যাইতেছে। মনটা সঙ্কুচিত হইয়া উঠিল।

স্বাভাবিক ম্লান এবং সলজ্জ হাসিতে মণীষা বলিল, কি?

মাথার ভিতর আনন্দের আগুন জ্বলিয়া উঠিল। মণীষার হাসি কি আশ্চর্য্য, কি সুন্দর। ও যদি এমন করিয়া হাসিতে পারে, তবে হাসে না কেন, আমি তো অবাক হইয়া যাই। মনে হয়, ভগবান পৃথিবীর সমস্ত সৌন্দর্য্য ছানিয়া ওর ঠোঁটের কোণে, চোখের কোণে, মুখের ভঙ্গিমায় মাখাইয়া দিয়াছেন, মন টলমল করিয়া উঠিল।

আনন্দের আতিশয্যে এবং মণীষাকে খুসী করিবার জন্য বলিলাম, মনু, তোমার ছেলে হবে!

মণীষা যেন অতীত যুগে দাঁড়াইয়া বলিল, আর বিদ্রূপ ডেকো না।

এমন সময় মা মণীষাকে ও ঘর হইতে ডাকিলেন। মণীষা আমার মুখের দিকে দীপ্তভাবে সোজাসুজি চাহিয়া বলিল, আমার ছেলে হোলে তোমার খুব আনন্দ হয়, না? তোমার মতন সে সকালে আলু ভাতে ভাত, আর রাত্তিরে হাওয়া খেয়ে মানুষ হবে বোধহয়।

মণীষা চলিয়া গেল। কিন্তু যাইবার সময় যেন আমারই গালে সজোরে একটা চড় মারিয়া গেল। হা, ভগবান।

(৭)

সাংসারিক কষ্টের কাছে নিজের মান অপমানকে আর বড়ো করিয়া দেখিতে পারিলাম না। তাই বহুকাল পরে বন্ধুবান্ধবদের উদ্দেশ্যে বাহির হইয়া পড়িলাম। বন্ধুদের কাহাকেও পাইলাম, কাহাকেও বা পাইলাম না। কোথাও চা খাইলাম, খাবিখাদির

কুশলাদির সন্ধান লইলাম, কোথাও বা রাষ্ট্রতত্ত্বের আলোচনা শুনিলাম, কিন্তু নিজের দৈন্যের কথা কোনোখানেই মুখ ফুটিয়া বলিতে পারিলাম না। অবশ্য বলিলেই যে কোনো উপকার হইত তাহার নিশ্চয়তা ছিল না। বরং মনে হইল, না বলিয়া ভালোই করিয়াছি। কারণ তাহারা আমাকে যে চোখে দেখিয়া আসিয়াছে, তাহাতে নিষ্ফল ধিক্কার, লজ্জা ও অনুশোচনা আছে।

তখন রাত প্রায় নয়টা। একটা স্বর্ণকারের দোকানে প্রবেশ করিলাম। গলা হইতে সোনার বোতামটা আগেই খুলিয়া লইয়াছিলাম। আমার বিক্রয় করিতে আসার ভঙ্গিতে স্বর্ণকার সেটাকে অসাধু উপায়ে সংগ্রহ বলিয়াই সিদ্ধান্ত করিল। কাজেই নিতান্ত উপেক্ষা দেখাইয়া সে গোটা আষ্টেক টাকা দিতে চাহিল। একবার মনে হইল বটে, বোতামগুলা আমি এককালে আটাশ টাকায় গড়াইয়াছিলাম। কিন্তু এখন এই আট্টা টাকাই আমার কাছে যেন অমন আট জোড়া বোতামের মূল্য বলিয়া মনে হইল। আমি রাজী হইয়া গেলাম। চারিটা বোতাম বিক্রয় করিয়া আট্টি মাত্র মুদ্রা পাওয়া যেন মস্ত একটা লাভ বলিয়া মনে হইল। টাকাগুলা বাজাইয়া লইয়া বাহির হইয়া পড়িলাম।

এই কয়টা টাকায় পকেটটা খুব ভারীই বোধ হইল। মনটা খুসীতে ভরিয়া গেল। মনে হইল পৃথিবীসুদ্ধ কিনিয়া লইয়া যাইতে পারি। দ্রুতপদে বাজারের দিকে অগ্রসর হইলাম। খাবারের দোকানটা প্রথমেই নজরে পড়িল। কাচের ফ্রেমে ঘেরা বিবিধ মিষ্টান্ন আজ সমুদ্রমন্থনের বিষ বলিয়া মনে হইল। কিন্তু বেশী নয় গোটা দুই মাত্র সন্দেশ খাইয়া দেখিলে ক্ষতি কি! আশপাশে একবার দেখিয়া লইলাম। উঃ, কতোদিন সন্দেশ মুখে পড়ে নাই। মনে হইল, আজ অন্ততঃ একটা সন্দেশ চাখিয়া দেখা উচিত, স্বাদটা মনে আছে কিনা। কি আশ্চর্য্য! সন্দেশের তার-টাও ভুলিয়া যাইতে বসিয়াছি, আমার অধঃপতনের আর বাকি কি! মানুষের অভাব-অনাটন থাক তাহাতে দুঃখ নাই, কিন্তু এই দৈন্যের জন্য সে কি একে একে জীবনের স্বাদ, পৃথিবীর মিষ্টতা ভুলিতে বসিয়াছে! দীনতায় মানুষ ক্রমে কি নিজেকেও ভুলিয়া যায়! এর প্রতিকার কি!

হঠাৎ দোকানদারের জিজ্ঞাসায় চমকাইয়া উঠিলাম। তাইতো, কোথায় সন্দেশ আর কোথায় কি সব হিজিবিজি ভাবিতেছি। একটা টাকা ফেলিয়া দিয়া বলিলাম, দাও দুটো সন্দেশ!

একটা টপ্ করিয়া মুখে ফেলিয়া চিবাইতে লাগিলাম। কি ভালই যে লাগিল তাহা বলিবার নয়। হঠাৎ নজর পড়িল স্তূপীকৃত ডালমুটের উপর। সঙ্গে সঙ্গে মণীষার মুখখানা মনে পড়িয়া গেল। সামান্য দুটিখানি ডালমুট যে কতো আহ্লাদ করিয়া খায়। মুখের ভিতরটা হঠাৎ অত্যন্ত তিক্ত বোধ হইতে লাগিল। অর্দ্ধভক্ষিত সন্দেশটা পথে ফেলিয়া দিয়া কলের জলে মুখ ধুইয়া ফেলিলাম। মুখের মিষ্টতা কিন্তু কিছুতেই গেল না। দোকানী আমার দিকে অবাক হইয়া চাহিয়া রহিয়াছে। বলিল, কি হোলো, বাবু।

বলিলাম, যা হোলো, তা হোলো চার আনার ডালমুট, জল্দি। ডালমুটের ঠোঙা হাতে লইয়া দোকান দেখিতে দেখিতে চলিতে লাগিলাম। একটা দোকানে ঢুকিয়া কুঙ্কুম কাঠি পশম কিনিলাম। হঠাৎ মনে পড়িল মণীষার শাড়ী ছিঁড়িয়া গিয়াছে, জামাটা অপরিষ্কার হইয়াছে। কাপড়, স্নোচ্ছতো এবং কাপড়কাচা সাবান তাড়াতাড়ি কিনিয়া বাড়ির দিকে অগ্রসর হইলাম। এতগুলি জিনিষ একত্র দেখিয়া মণীষার কি আনন্দ হইবে ভাবিয়া নিজেই উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিলাম। মার জন্য একটু মাখন কিনিয়া লইলাম।

পথে ঘড়িতে দেখিলাম দশটা বাজিয়া গিয়াছে। মণীষা হয়তো আমার অপেক্ষায় জানালাটার ধারে বসিয়া আছে। সারাদিনের পরিশ্রমে দৈন্যের ক্লান্তিতে হয়তো তাহার মাথাটা ঝুঁকিয়া আসিতেছে। আবার তৎক্ষণাৎ সজাগ হইয়া উঠিয়া পথের দিকটা একবার দেখিয়া লইতেছে, আমি আসিয়া দাঁড়াইয়া আছি কিনা।

দ্রুতপদে অগ্রসর হইলাম।

৮

মুখ টিপিয়া হাসিতে হাসিতে বাড়ি ঢুকিলাম। এতোগুলি জিনিষের আবির্ভাবে মণীষার বিহ্বলতা ভাল করিয়া লক্ষ্য করিতে হইবে, মনস্থ করিলাম। চোরের মতন ঘরে ঢুকিয়া জিনিষগুলা বিছানার চাদর দিয়া ঢাকিয়া রাখিলাম। তারপরে মণীষাকে রান্নাঘর হইতে ডাকিয়া আনিলাম, বলিলাম, চাদরটা তুলে দেখো তো, কি আছে!

মণীষা নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল।

ব্যস্তভাবে বলিলাম, যাঃ, দেরী কোরে সব আমোদটাই মাটি কোরলে দেখ্‌চি।

মণীষা ধীরে ধীরে চাদরখানা তুলিয়া বিছানার একপ্রান্তে রাখিয়া দিল। তারপর আমার চোখের দিকে একবার চাহিয়া মুখখানা আস্তে আস্তে ফিরাইয়া লইল। বাহির হইয়া যাইবার সময়ে নিতান্ত সহজভাবে বলিয়া গেল, খাবে এসো, অনেক রাত হয়েছে।

মণীষার ব্যবহারে ক্ষুণ্ণ হইলাম। দুম্‌দাম্ শব্দে রান্নাঘরে উপস্থিত হইয়া বলিলাম, এতো কষ্ট কোরে জিনিষগুলো আনলুম, তার—ভালো, মন্দ একটা কথা নেই। এসব তোমারই জন্যে আনা। আমার নিজের দরকার হোলে চার আনা আট আনার সন্দেশ রসোগোল্লা কি কিনে খেতে পারতুম না! তোমার রাগ নিয়ে তুমি থাকো গে, আমি আজ আর খাবো না।

মণীষা বলিল, রাগ করবার কি আছে এতে। মনটা শুধু খারাপ হোয়ে গেল, এই ভেবে যে আমাকে একটু আনন্দ দেবার জন্যে তুমি বোতাম বিক্রি কোরে এলে।

বলিলাম, আমার জন্যে তোমার এতো দরদ ভালো লাগে না, এসব জ্যাঠামি বই আর কি। তুমি আমার অধীন, একথা মনে রেখো। তোমাকে যেমন খুসী ব্যবহার আমি কোরবো। আমার জামাকাপড় জুতো সব বিক্রি কোরবো, আর তোমার সখের জিনিষ কিনে আনবো। এতে তোমার মুখ ভার করা দূরে থাক, হাসি মুখে সব নিতে হবে। মন প্রফুল্ল রাখতে তুমি বাধ্য। দু-পাতা ইংরিজি কোনকালে পড়েছিলে বলে ভেবো না তোমার স্বাধীনতা লাভ হোয়েচে। তোমাকে হাসতেই হবে, খুসী হোতেই হবে। মেয়েদের অতো চাল, বিজ্ঞতা আর পাণ্ডিত্য ফলানো আমি মোটেই পছন্দ কোরিনা। তোমার স্বাধীনতা খাটবে না, হিন্দু-আইনের বৌ তুমি, ডাইভোর্সের উপায় নেই। তোমাকে বেঁধে মারা হবে, একথা মনে রাখলে তোমারই উপকার হবে।

মণীষা একটু হাসিল। বলিল, বড্ডো ভয় দেখাও তুমি। তুমি কি সত্যি সত্যি আমার গায়ে হাত তুলতে পারো, আমার ইচ্ছের বিরুদ্ধে জোর করতে পারো! কখখন নয়।

মণীষার মতন মেয়ের নিরুপায়ভাবে আমারই দিকে চাহিয়া থাকা স্বাভাবিক। তাই বলিলাম, ভেবেচো কি? যা হাজারটা লোকে কোরে থাকে, তা আর আমি পারি না, খুব পারি।

কঠিন স্বরে মণীষা বলিল, না দেখলে বিশ্বাস কোরচি না। নাও এখন খেতে বোসো, ভাতগুলো ঠাণ্ডা জল হোয়ে যাচ্ছে। যাই বলো, তোমার বোতাম বিক্রি কোরে আমাকে খুশী করবার মতো জিনিষ কিনে আনার মধ্যে সার কিছু নেই। আমাকে যে তুমি ভালোবাসো, এ দেখাবার দরকার কি!

কি বলিব ভাবিয়া পাইলাম না। নিরুপায়ভাবে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। মণীষা ভাত বাড়িয়া দিয়া আমার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। অল্পক্ষণ আমার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া আমার একখানা হাত ধরিল। সঙ্গে সঙ্গে মৃদু হাসি মণীষার ঠোঁটের উপর খেলিয়া গেল। কিন্তু পরক্ষণে মুখখানা আমার দিকে তুলিয়া ধরিয়া হঠাৎ অত্যন্ত কাতরভাবে বলিল, তুমি আমায় বড্ডো কষ্ট দাও।

আরো কিছু বলিল না কেন, তাহা হইলে তো আসল কথাটা হাল্কা হইয়া যাইত। মণীষার সংযত ভাষণের ক্ষমতা আছে বটে। কি নিদারুণ মর্ম্মস্পর্শী কথা সে বলে!

নীরবে খাইতে বসিলাম। খাওয়ার উপকরণ নিতান্তই সংক্ষিপ্ত, কাজেই বহুক্ষণ ধরিয়া বসিয়া খাওয়ার উপায় নাই। মণীষার অলঙ্কার বিক্রয় দোষের, কিন্তু আমার বোতাম, ও অলঙ্কারের মধ্যেই পড়ে না—পুরুষের আবার অলঙ্কার কি—এই কথা কয়টা তাহাকে বুঝাইয়া দিবার অবসর খুঁজিতেছিলাম। একটা আলু সিদ্ধ, সকালের একটু ডাল ও কি একটা তরকারী—কতক্ষণ আর ইহা লইয়া খাওয়ার অভিনয় করা চলে। একটা সামান্য কথা উঠিবার সুযোগ উপস্থিত হয় না, তা বুঝাইব কি! মণীষা একেবারে চুপ করিয়া গিয়াছে। অবশেষে তরকারী মুখে তুলিয়া অকারণে মণীষার রন্ধন-প্রণালীর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়া উঠিলাম। তারপরে সুরু করিলাম, সবজীর খোসা ফেলিয়া দেওয়া উচিত নয়, কারণ আধুনিক মতে ঐগুলিই আসল। কিন্তু এ বক্তৃতাও বেশীক্ষণ চলিল না। মণীষা যেমন উনুনের দিকে ফিরিয়া বসিয়া ছিল, তেমনিই রহিল। লাভের মধ্যে, এই খাপ ছাড়া কথা এবং প্রসঙ্গ যেন নিস্তব্ধতার মধ্যে আটকাইয়া গিয়া আমাকেই বিদ্রূপ করিতে লাগিল।

বিছানায় শুইয়া ঘুম আসিল না। মাথাটা যেন কি রকম গরম বোধ হইতে লাগিল। মনে হইল, পায়ের রক্ত শন্‌শন্ করিয়া মাথার ভিতর পাক খাইয়া আবার পায়ে নামিয়া যাইতেছে। বাস্তবিকই মণীষার শরীর ক্রমশই খারাপ হইয়া পড়িতেছে। হঠাৎ মনে পড়িল, মার জন্ত মাখন কিনিয়া আনিয়াছি, মণীষাকে সেটুকু দিয়া আসি। আহা! দুই মুঠা ভাত হয়ত ভাল করিয়া খাইতে পার না। মার জন্ত কাল সকালে আবার কিনিয়া আনিলেই চলিবে। মাখন লইয়া উঠিয়া পড়িলাম।

রান্নাঘরের জানালা দিয়া দেখি, দুই তিন মুঠা আন্দাজ ভাত ও একটা আলু সিদ্ধ। ব্যাপারটা দেখিয়া আমার মাথাটা ঘুরিয়া গেল। অভাব যতই হোক, মার জন্ত দুই তিনটা তরকারী প্রতিদিন রান্না হইত-ই এবং তাহার পরিমাণ নিতান্ত অল্প হইলেও আমার পাতে দুই একটা পড়িতই। অথচ আর একজনের ভাগ্যে, তরকারী দূরে থাক, ক্ষুধার পরিপূর্ণ অন্ন কয়টাও জোটে না। হা ভগবান! একটা বিকৃত আওয়াজ গলা দিয়া অজ্ঞাতসারে বাহির হইয়া গেল।

ব্যস্তকণ্ঠে মণীষা বলিল, কে?

আমি কে, একথা বলিয়া আর তাহার কি উপকার করিব। ভাবিলাম, বলি, তোমার মৃত-স্বামী।

বাহির হইয়া আসিয়া মণীষা বলিল, তুমি এখানে?

হাতখানা ধরিয়া ভিতরে আনিয়া বলিলাম, এই মাখনটুকু দিয়ে ভাত কটা খাও, লক্ষ্মীটি!

দৃঢ়কণ্ঠে মণীষা বলিল, আমি লুকিয়ে ভালো খাই মনে করো, তাই চুরি কোরে দেখতে এসেচো।

মুখ হাত ধুইয়া মণীষা ঘরে চলিয়া গেল। আমি একেবারে বোকা বনিয়া গেলাম। সাধ্যসাধনা করিলাম, ফল হইল না।

বলিল, এক রাত্তির উপোষ দিলে, আর মরে যাব না।

বলিলাম, যাও খাও মনু, ওতো উপোষ-ই। তুমি দিনের পর দিন, তিলে তিলে নিজেকে এমন কোরে ক্ষইয়ে ফেলচো মনু, আমার নিরুপায় অবস্থার কথা মনে করে কি একটুও দয়া হয় না তোমার।

গায়ের উপরে লেপটা টানিয়া দিয়া সহজভাবে বলিল, উপোষ তো ক্রমেই সইয়ে নিতে হবে—যেদিন আসচে। তুমিই তো সেদিন বল্‌ছিলে, দুঃখে ভেঙে পোড়লে চোলবে না, সহজ হাসি হাসতে হবে। প্রতিদিন খেতে পাওয়া না-পাওয়াটাকে সূর্য্যের আলোর মতন সহজভাবে মেনে নিতে হবে।

এসব কথা সেদিন বলিয়াছিলাম বটে। সব যেন তালগোল পাকাইয়া গেল। কি বলিবে, বুঝিতে পারিলাম না।

৯

একখানা পাঁউরুটি কিনিয়া আনিয়া দেখি—মণীষা ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। ডাকিয়া তুলিলাম। বলিল, ওসব খাই না জানোই তো। তুমি শুয়ে পড়ো। আজ আর আমি কিছু খাবো না। খাবার ইচ্ছেই ছিলো না।

বিছানার একপ্রান্তে চুপ করিয়া বহুক্ষণ বসিয়া রহিলাম। মণীষা ঘুমাইয়া পড়িল। আমার কিন্তু ঘুম আসিল না। মাথার ভিতর যেন ঝিম্ ঝিম্ করিতে লাগিল। বুকের ভিতর হইতে একটা উত্তেজনা ক্রমশঃ যেন সারা মনে কাল-বৈশাখীর মেঘের মতন ছাইয়া ফেলিল। পরিত্যক্ত অন্ন কয়টা দেখিতে রান্নাঘরে আসিলাম। থালাখানার পাশে বসিয়া মণীষার রাগের কারণ ভাবিবার চেষ্টা করিলাম। কিন্তু ভাবিবার অবসর পাইলাম না, কারণ তাহাকে নিরন্ন করিবার দুঃখ সব ঝাপ্‌সা করিয়া দিল। হঠাৎ এই দুই মুঠা ভাতের প্রতি আমার মমতা বোধ হইল। জল দিয়া সেগুলাকে বারবার ধুইয়া লইলাম। কথাটা মনে পড়িল, যে ভাতগুলা দুঃখের দিনে ফেলিয়া দিবার উপায় নাই। কাজেই একটা বাটিতে ভাতগুলা ঢাকা দিয়া শুইবার ঘরের খাটের তলায় লুকাইয়া রাখিয়া আসিলাম। নহিলে মণীষা খাইবেই

দিবে না। আর দিবে নাই বা কেন, জোর নাকি? তাহার উচ্ছিষ্ট আমি খাইবই। অকারণ রাগ করা—এই দুর্দিনে আমাকে এমন করিয়া দণ্ডদান কিছুতেই সহ্য করিব না; প্রতিশোধ চাই, মণীবাকে কাল দেখাইয়া দেখাইয়া আমি তাহার উচ্ছিষ্ট খাইবই খাইব।

সামান্য দুই মুঠা অন্নের জন্য কি করিতেছি ভাবিয়া অবাক হইয়া গেলাম। মাথাটা গরম বোধ হইতে লাগিল। মনে হইল এই পৃথিবীতে যতো গোলোযোগের মূল এই অন্ন তো! আমার মতন কতো দুঃখী লোক আছে। কিন্তু কি তার প্রতিকার। সহরের সমস্ত লোকগুলাকে যদি রাত ভোর হইবার আগে টুঁটি চাপিয়া মারিয়া ফেলি, সকাল হইবে, সহর জাগিবে না, রূপকথার সেই ঘুমন্ত-পুরীর মতন সব ছমছম্ করিতে থাকিবে আর আমি একা বাঁচিয়া থাকিয়া এই সব দেখি।

দালানে মণীবার কাপড়খানা শুখাইতেছিল। সেখানা টানিয়া মুখহাত মুছিয়া লইলাম। হাত লাগিয়া ছেঁড়াটা বাড়িয়া গেল। মণীবার অনাহার, তাহার জন্য দুঃখ, ভবিষ্যতের চিন্তার উৎকণ্ঠা, অবস্থার আরো অবনতি—সব ছবির মতন চোখের উপর দিয়া একটার পর একটা দৌড়াইয়া চলিয়া গেল। সব তালগোল পাকাইয়া মনটা ভাবনায় একাকার হইয়া গেল। মণীবার বস্ত্রখানা লইয়া শেলাই করিতে বসিলাম। মনে একটা কৌতুক বোধ হইল। আহা, বেচারির শেলাই করিবার অবসর পর্য্যন্ত নাই। ছেঁড়ার দুইটা মুখ একত্র করিয়া ফোঁড় তুলিতে লাগিলাম। আহা, কি শেলাই! মোটা থাব্‌ড়া! হোক তবু তো কাপড়টা জুড়িয়া গেল। কাপড়ের যদি প্রাণ থাকিত! তাহা হইলে এইটুকু শেলাই করিবার জন্য নিশ্চয়ই ক্লোরোফর্ম ব্যবহার করিতেই হইত। কিন্তু সব চেয়ে মজা হইত যদি কাপড় জামারা সত্যাগ্রহ করিয়া বসিত, বলিত—পাঁচ মিনিটের জন্য আমরা ধর্ম্মঘট করিয়া মানুষের দেহ ছাড়িব। আর যদি কংগ্রেসের মতন পূর্ব্বাহ্ণে নোটিশ জারি না করিত, ও হোঃ হোঃ হোঃ, পথে ঘাটে লোকের কি বিভৎস বিপদই হইত! ভাগ্যিস্ ওদের প্রাণ নেই, হোঃ হোঃ হোঃ! জগদীশচন্দ্র গাছের প্রাণের কথা পর্য্যন্ত প্রমাণ করিয়াছেন, জড়েরও প্রাণ আছে বলিয়াছেন, কিন্তু যদি প্রমাণ করিতে বসিতেন, কি সর্ব্বনাশ! হোঃ হোঃ হোঃ। কি বিপদ, আমার হাসিতে মণীবার ঘুম ভাঙিয়া গেল নাকি! উঠিয়া দেখিয়া আসিলাম, অঘোরে বেচারি ঘুমাইতেছে। বাকিটুকু শেলাই হইয়া গেল। কিন্তু শেষকালে আঙুলে সুঁচ ফুটিয়া একটুখানি রক্ত বাহির হইল। হঠাৎ মনে পড়িল কতোদিন আগে একটা গল্প পড়িয়াছিলাম। যুদ্ধের সময় প্যারিসের উপর বোমা বৃষ্টি হইতেছে। জার্ম্মাণীর এক গুপ্তচর জনশূন্য রাস্তা দিয়া দ্রুতপদে চলিতেছে—আর মাঝে মাঝে দেয়ালের আড়ালে গা ঢাকা দিতেছে ও আবার চলিতেছে। আর ইহাকে অনুসরণ করিয়া ফ্রান্সের এক যুবতী নারী গুপ্তচর তাড়াতাড়ি আসিতেছে। হঠাৎ একটা বোমা ফাটিয়া জার্ম্মান গুপ্তচর রাস্তার একপাশে ছিট্‌কাইয়া পড়িল। নারী গুপ্তচর দ্রুতপদে আসিয়া তাহাকে সন্তর্পণে তুলিয়া লইল। বিশেষ কোনো আঘাত লাগে নাই। নারীটি তাহাকে নিজের ঘরে লইয়া গেল বিপদ হইতে বাঁচাইবার জন্য। পরস্পর পরস্পরকে স্বপক্ষের গুপ্তচর বলিয়া জানিয়াও রীতিমত খাওয়াদাওয়া ও স্ফূর্ত্তি করিতে লাগিল। একটানা আনন্দের ঢেউএ মেয়েটি গভীর রাতে আত্মবিস্মৃত হইয়া গেল। তাহার দেশাত্মবোধ নারীত্ব বোধে ঢাকা পড়িল। নারী যখন তাহার সর্ব্বস্ব দান করিয়া অবসাদে এলাইয়া পড়িয়াছে তখনই জার্ম্মাণ যুবকটি মেয়েটির চুলের পিন খুলিয়া লইয়া নবনীত দেহ ভেদ করিয়া ফুস্‌ফুস্ বিঁধিয়া দিল। বিন্দু-স্রোতে রক্তের ধারা নামিয়া আসিল, সুরাচ্ছন্ন আত্মবিস্মৃতা নারী মরণটাকে স্পষ্ট করিয়া জানিতেও পারিল না।—আঙুলের আগায় রক্তবিন্দু দেখিয়া মনে হইল, এমনি নৃশংসভাবে আমিও না হয় মণীবাকে ভবপারে পাঠাইয়া দিই। সকল জ্বালা যন্ত্রণা চুকিয়া যাক। কিন্তু ঘরে আসিয়া চাঁদের আলোয় মণীবার মুখখানা দেখিয়া অবাক হইয়া গেলাম। মনে হইল যেন প্যারিস-প্লাষ্টারের মুখ, একেবারে আন্তরিক যত্নে নিঁখুত করিয়া খুঁদিয়া বাহির করা। এই মণীবাকেই তো প্রতিদিন দুইবেলাই দেখিতেছি—কিন্তু কই, এমন নূতন বোধ তো কোনোদিনই হয় নাই। কাছে আগাইয়া আসিলাম, মনে হইল, দেখি দেখি, ভালো করিয়া আজ দেখিয়া লই, কাল পর্য্যন্ত এতরূপ অবশিষ্ট থাকিবে না হয়তো, কিম্বা আমার এমন করিয়া দেখিবার ক্ষমতা হয়তো কাল পর্য্যন্ত নাও থাকিতে পারে। ভোরে যে মানুষ সুন্দর, মধ্যাহ্নে সে কুৎসিত হইতে পারে তো? জাগ্রত ও নিদ্রিত মানুষের সৌন্দর্য্যে পার্থক্য অসামান্য বলিতে হইবে। কেন এমন হয়? জাগ্রত মানুষের কামনা বাসনা মিশ্রিত অভিব্যক্তি আর নিদ্রিত মানুষের শান্ত প্রবৃত্তির প্রকাশেই হয়ত এতো তফাৎ!

চাঁদের আলোটা ধীরে ধীরে সরিয়া গেল। অন্ধকারে কালো মুখখানা অস্পষ্টভাবে তখনো জাগিয়া রহিল। মনে হইল, এইবার মণীবাকে ডাকিয়া তুলি, বলি, তোমাকে কি আশ্চর্য্য দেখেচি। কিন্তু হাসি আসিল, মায়া হইল—দুঃখীর ঘরের বৌকে তাহার একমাত্র ক্লান্ত ক্লিষ্ট অবসন্ন জীবনের আরাম বিশ্রামে ব্যাঘাত ঘটাইতে। ঘর হইতে নিঃশব্দে বাহির হইয়া আসিলাম। মণীবার অপরিষ্কার কাপড়খানা সাবান দিয়া কাচিতে বসিলাম। এই ময়লা কাপড়খানা কাল পরিষ্কার দেখিয়া মণীবার কতদূর তাক লাগিতে পারে, তাহা ভাবিয়া রীতিমত উৎসাহ বোধ হইল। কাপড়খানা মেলিয়া দিয়া অতি সন্তর্পণে বাসনগুলা লইয়া মাজিতে বসিলাম। আহা, মণীবা তো একা, এতোটুকু সাহায্য করিবার কে আছে। বাসনগুলা যথাস্থানে মণীবার মতন করিয়াই সাজাইয়া গুছাইয়া রাখিলাম। মণীবার সামান্যমাত্র উপকারে লাগিলাম ইহা ভাবিয়া মনে তৃপ্তি বোধ হইল। চৌবাচ্ছার কাছে দাঁড়াইয়া মুখ হাত ধুইতে ধুইতে মাথা ধুইয়া ফেলিলাম, স্নান করিয়া ফেলিলাম, শরীরটা অত্যন্ত উত্তপ্ত বোধ হইতেছিল।

বিছানার প্রান্তে আসিয়া বসিলাম। মণীবার মুখখানা যেন কেমন আমাকে টানিতে লাগিল। ভোরের আলো ফুটিয়াছে, না মণীবার মুখ হইতে উষার স্নিগ্ধ আলো বাহির হইতেছে ঠিক আন্দাজ করিতে পারিলাম না। জাগ্রত মানুষ ডাকিয়া কাছে টানিয়া লইতে পারে, কিন্তু এই সুপ্তা, এ কেমন করিয়া আমাকে ডাকিতেছে! এমন যাদুকরীর ডাক এড়াইবার ক্ষমতা আমার আছে কি! আমি তো জীবিত আছি, চেতনা আছে, তবে এ আকর্ষণকে বাধা দিতে পারিতেছি না কেন?

১০

মণীবার ঘুম ভাঙিবার আগেই পথে বাহির হইয়া পড়িলাম। নানা চিন্তায় দেহমন অবসাদপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। পা যেন চলিতে চাহে না। রাত্রের কর্ম্মভোগ তখনও মাথার মধ্যে ঘুরিতেছে। কাল গভীর রাতের আঁধারে কে যেন আমাকে কাঁধে হাত দিয়া ডাকিল, ঘরের বাহিরে দালানে আসিয়া দাঁড়াইলাম। লোকটা আমার পিছনেই রহিল। নিঃশব্দে যাহা বলিল, বুঝিতে তিলমাত্র কষ্ট হইল না। ঘাড় ফিরাইয়া কতোবার তাহার মুখ লক্ষ্য করিবার চেষ্টা করিয়াছি, বোধহয় দুই একবার চোখাচোখিও হইয়া গিয়াছে। উৎকট পৈশাচিক হাসি। সে আমার দুঃখের অবসান করিয়া দিতে চায়। সব বুঝিবার চেষ্টা করি, কিন্তু মা, মনু, এরা যে নিতান্ত অসহায়—তবে আত্মহত্যা কেমন করিয়া সম্ভব। আত্মহত্যা করা দুর্ব্বলতা, কিম্বা সহ্যের সীমা অতিক্রম করিলে অসহায় মানুষকে এই পথে টানে। কিন্তু আমার এই জীবনের মূল্য আছে, এমন সুন্দর আমি, আর তো পৃথিবীতে না আসিতেই পারি, যখন আছি, তখন পরিণাম দেখিতে হইবে বৈকি। আমার দৈন্য সাময়িক। কাল হঠাৎ আমি ধনী হইয়াও ত যাইতে পারি।

বারে বারে ঘাড় ফিরাইয়া দেখিয়া লইতেছি। কে যেন আমার ঠিক পশ্চাতে আমার পদক্ষেপেই পা মিলাইয়া আসিতেছে। আমার যুক্তিগুলা যেন পিছন হইতে আমার ঘাড়ের কাছে মেনিন্‌জাইটিসের ইন্‌জেক্‌সনের মতন টানিয়া বাহির করিয়া লইতেছে। মনু বিধবা হইবে, ভিখারিণী হইবে এ কল্পনায় সে হাসিয়া উঠিল। যেন বলিল, তুমি ইহলোক ছাড়িলে মমতা-শূন্য হইবে, তখন এই যে তোমার পাশ দিয়া একটি ভিখারি লাঠি ঠুকিয়া ঠুকিয়া চলিয়া আসিতেছে, ইহাতে আর তোমায় মণীবাতে কোনো পার্থক্য থাকিবেনা, কেন মিথ্যা পরলোকের সহিত ইহলোকের জট্ পাকাইতেছ ? তাহাতে তোমার কর্ত্তব্যে ব্যাঘাত ঘটিতেছে, শক্তি ও শৌর্য্য কর্প্‌রের মতই ক্রমশঃ উবিয়া যাইতেছে। তুমি মানবদেহে জড়ে পরিণত হইতেছ, ভাল করিয়া ভাবিয়া দেখ। মুক্তির কি অপার আনন্দ, একবার এখানে আসিলে বুঝিবে। দুর্ব্বলতা পাপ, তাহা ত্যাগ করিয়া কঠোর কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়া ফেল। ভালো করিয়া বুঝিতে পারিলাম না, আত্মহত্যাই কি আমার একমাত্র কর্ত্তব্য। তবে একথা জলের মতন বুঝিলাম যে অন্ততঃ নিজে এই বিভৎস জীবনের হাত হইতে মুক্তি পাইতে পারিব।

একবার মনে হইল—কে যেন আমার আড়ালে থাকিয়া যুক্তি জোগাইতেছে। আবার বোধ হইল, সম্ভবতঃ নিজের মনকে আঁখি ঠারিতেছি, আত্মহত্যাকে পাপ বলিয়া অস্বীকার করিবার জন্যই। কথাটা ভালো করিয়া ভাবিতে হইবে বলিয়া গোটাকতক সিগারেট কিনিয়া একটা পার্কে ঢুকিয়া পড়িলাম। কিন্তু মনে হইল, বুদ্ধিটাকে তাতাইয়া ধোঁয়াইয়া তুলিতে হইলে, প্রথমতঃ চা দরকার। পরে সিগারেট। দুই পেয়ালা চা, বহুদিন পরে একসঙ্গে খাইয়া ফেলিলাম। গরম পানীয়টা গলা দিয়া নামিতে নামিতে শরীরটাকে বেশ চাঙ্গা করিয়া তুলিল। চিন্তা-উদ্বেলিতচিত্তে বাড়ীমুখো দুপুরের ট্রামে তড়াক করিয়া লাফাইয়া উঠিলাম। ক্রমশঃ

অভিমান

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী

দু'টি বোনই দেখি তারা হেন অভিমানী,—
সহিতে পারেনা কারো একবিন্দু বাণী !
দু'জনারই মুখভার কথায় কথায়,
নয়ন-অপরাজিতা জলে ভেসে যায়।

পরস্পরে এমনই গভীর ভালবাসা,
সবাই তা জানে, কেহ করেনা জিজ্ঞাসা।
একসাথে শোওয়া-বসা, একত্র আহার,
একই প্রাণ যেন, ভিন্ন দেহ সে দোঁহার।

অথচ একেরে যদি ডেকে কথা বলি,—
আদর দূরের কথা,—উঠে ছলছলি'
অমনই অন্যের চোখ যেন-বা ব্যথায় !
এ রহস্য তাহাদের বোঝাও যে দায়।

উপেক্ষা অবজ্ঞা জানি, জানি সে আদর,
অভিমান,—জানিনাক, কোথা তোর ঘর !

গোলপাতা *

অধ্যাপক শ্রীমণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ বি-এল্

দক্ষিণ বাংলার প্রায় সর্ব্বত্রই গরীবের গৃহনির্ম্মাণ কার্য্যে গোলপাতা বহুলভাবে ব্যবহৃত হয়। পঞ্চাশ ষাট বৎসর পূর্ব্বে যখন সস্তা দামের ছাতা এদেশে এতটা প্রচলিত হয় নাই, তখনও পর্য্যন্ত বাংলা দেশে গোলপাতার ছাতা পরম আদরে ব্যবহৃত হইত। গোলপাতা-নির্ম্মিত টোকার প্রচলন মফঃস্বল অঞ্চলে এখনও দেখা যায়।

বাংলা দেশে সাধারণ লোক গোলপাতায় আচ্ছাদন দেয়, কিন্তু চট্টগ্রামে গোলপাতার আরও একটি কাজ আছে। সেখানে গোলপাতা মানুষকে আচ্ছন্ন করে অর্থাৎ চট্টগ্রামে গোলপাতার গাছ হইতে তাড়ি প্রস্তুত করা হয়। গোলগাছ একটু বড় হইয়া গোটাকতক পাতা ফেলিবার পর মাটী হইতে এই পাতাগুলির মধ্য দিয়া নূতন একটি ডাঁটা বাহির হয়। এই ডাঁটার উপর গোলপাতার ফুল হয়। কক্সবাজার সাবডিভিসনে 'চকরিয়া সুন্দরবনে'র বোয়ালিরা (বোয়ালি অর্থে যাহারা জঙ্গলে কাজ করে; শব্দটি সুন্দরবন অঞ্চলে বিশেষভাবে প্রচলিত) গোলপাতার ফুল সম্পূর্ণরূপে ফুটিবার পূর্ব্বেই ধারালো অস্ত্রের সাহায্যে ডাঁটা হইতে ফুলটী কাটিয়া ডাঁটাটিকে বেঁকাইয়া উহার তলায় একটি হাঁড়ি পাতিয়া দেয়। তখন ঐ ডাঁটার কাটা মুখ হইতে বিন্দু বিন্দু করিয়া সুগন্ধী রস নিঃসৃত হইয়া হাঁড়িতে জমা হয়। একরাত্রে একটি গাছ হইতে এইরূপে একপোয়া আন্দাজ রস পাওয়া যায়। ভোরবেলায় উহা সুগন্ধী এবং তালরসের ন্যায় সুস্বাদু থাকে, কিন্তু সূর্য্যোদয়ের পর হইতে উহা বেলা হইয়া দুপুরের মধ্যেই তাড়িতে পরিণত হয়। তুলনামূলকভাবে বিভিন্ন তাড়ির আস্বাদ গ্রহণ করিবার সৌভাগ্য যে সমস্ত মহাশয় ব্যক্তিদের ভাগ্যে ঘটিয়াছে, তাহাদের মতে গোলপাতার তাড়ি তালের তাড়ি অপেক্ষা অধিক আনন্দদায়ক। কক্সবাজার সাবডিভিসনে এই তাড়ির সমধিক চাহিদা, বিশেষ করিয়া মগ ও স্থানীয় মুসলমানগণ ইহা যে কোন মূল্যে ক্রয় করে। গোলপাতা হইতে তাড়ি প্রস্তুত করিতে আবগারী শুল্ক দিতে হয়, কিন্তু শুল্ক দিলেও সব সময় তাড়ি করিবার অনুমতি দেওয়া হয় না; কারণ ঐরূপে গোল-গাছের ফুল কাটিয়া ফেলায় গাছের বিশেষ ক্ষতি হয় এবং ভবিষ্যৎ ফলন কম হইবার আশঙ্কা হয়। অবশ্য গোল গাছ হইতে তাড়ি করা এক চট্টগ্রাম অঞ্চলেই হইয়া থাকে, বাংলা দেশের অন্যান্য স্থানে ইহা সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞাত।

বাংলা দেশে গোলপাতা এইরূপে ব্যবহৃত হয় এবং ইহার জন্য সকলকেই সুন্দরবনের দিকে চাহিয়া থাকিতে হয়, কারণ সুন্দরবন ছাড়া অন্যত্র গোলপাতা হয় না। সুন্দরবনের কতকগুলি স্থানে নদী ও খালার ধারে ধারে গোলপাতা আপনা হইতেই জন্মে; সুন্দরবনের সাপ, বাঘ ও কামোটের ভয় তুচ্ছ করিয়া দক্ষিণ বাংলার বোয়ালিয়ারা গোলপাতা কাটিয়া নৌকা বোঝাই করিয়া বাহিরে আনে ও সুন্দরবন হইতে জলপথে যে সকল স্থানের সহজ যোগাযোগ আছে, সেই সকল স্থানে ইহা বিক্রীত হয়। বাংলা দেশের এই ব্যবসাটিতে সংগ্রাহক, বিক্রেতা ও ক্রেতা সকলেই বাঙ্গালী; ইহার আমদানী নাই রপ্তানীও নাই। সরকারী মতে গোলপাতা সুন্দরবনের একটি সামান্য পণ্য (minor product) মাত্র। কিন্তু সামান্য হইলেও সুন্দরবন বিভাগের সম্পূর্ণ রাজস্বের এক-পঞ্চমাংশ গোলপাতা হইতেই উঠিয়া থাকে। এখান হইতে প্রতি বৎসর কম বেশী পঁয়ত্রিশ লক্ষ মণ গোলপাতা কাটা হয় এবং বাংলার সরকারী বনবিভাগ গোলপাতা কাটিবার পরোয়ানা দিয়া বোয়ালীদের নিকট হইতে প্রতি বৎসর কম বেশী দেড় লক্ষ টাকা বনকর (Royalty) আদায় করেন।

গোলপাতা পাম জাতীয় গাছ। ইহার পাতাগুলি অনেকটা নারিকেল পাতার ন্যায়। একটি নারিকেল গাছের গুঁড়ি বাদ দিয়া কেবলমাত্র পাতার অংশটুকু কাটিয়া লইয়া যদি মাটিতে বসাইয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে উহা দেখিতে অনেকটা গোল গাছের ন্যায় হয়। দূর হইতে হঠাৎ গোলগাছ দেখিলে মনে হয় ছোট নারিকেল গাছ। গোল গাছের বর্ণনা প্রাচীন সংস্কৃতেও পাওয়া যায়। সংস্কৃতে রত্নমালা গ্রন্থে ইহার বিবরণ আছে। সম্ভবতঃ, এই গোল গাছই 'মদন বৃক্ষ' বলিয়া অন্যত্র উল্লিখিত হইয়াছে। গোল গাছের পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক নাম "Nipa Fruticans"।

গোল গাছের এই প্রকার 'গোল' নামের কারণ নির্ণয় করা অনুমান-সাপেক্ষ। সংস্কৃতে 'গাল' অর্থে 'গন্ধরস'। গোল গাছের ডাঁটা হইতে যে সুগন্ধী রস নির্গত হয়, তাহারই জন্য ইহাকে গোল গাছ বলে কি না, তাহা বলা যায় না। আবার তাল গাছের মতো দেখিতে বলিয়া 'গোল গাছ' নাম হওয়াও নিতান্ত অসম্ভব নহে। তবে নামের উৎপত্তি যেখান হইতেই হউক না কেন, নামটি বহু পুরাতন এবং সর্ব্বজনবিদিত। পশ্চিম বাংলার বর্ত্তমান কথ্য ভাষায় 'গোল পাতা' এবং 'গোপাতা' দুইটা শব্দই প্রচলিত আছে।

দক্ষিণ বাংলার পলস্তির (alluvion) সহিত গোলপাতার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। জল হইতে যে জমী নূতন আত্মপ্রকাশ করে, গোল গাছ তাহারই দ্বিতীয় সন্তান। নদীমাতৃক বাংলার উত্তরাখণ্ড হইতে অসংখ্য বিশালকায় নদ-নদী দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরে আসিয়া পড়িতেছে। আসিবার সময় এই সমস্ত নদীর স্রোতে উত্তর হইতে কোটী কোটী মণ মাটী, বালি ও আবর্জ্জনা আনীত হয়। বরাবর একটানা স্রোতে আনীত হইয়া এই সমস্ত মাটী বঙ্গোপসাগরের মুখে আসিয়া জোয়ার-ভাঁটার সংঘাতে জলের নীচেই স্থানে স্থানে স্তূপীকৃত হয় এবং জলনিম্নের স্তূপীকৃত পলিমাটী নূতন করিয়া বালি ও মাটী সংগ্রহ করিয়া ক্রমে ক্রমে চড়ার আকারে জলের উপর নিজেকে প্রকাশ করে। নদীর মধ্যে চড়া প্রকাশ পাইলেই নদীর জল উহার চারিদিকে প্রবাহিত হইয়া উহাকে দ্বীপের আকার দান করে। তখন চারিধারের জলস্রোত দিয়া যে সমস্ত বীজ অন্যত্র হইতে ভাসিয়া আসে, তন্মধ্যে ক্ষুদ্রাকৃতি ঘাসের বীজগুলি সর্ব্বাগ্রেই নূতন মাটীতে আটকাইয়া যায়। এইরূপে উদ্ভিদহীন চড়ায় প্রথম ঘাস জন্মে। গোল পাতার বীজ আকারে বড়, বেলের ন্যায়। এইগুলি জলে ভাসিয়া আসিয়া নূতন চড়ায়

---

* বাংলা দেশের আবগারী ও বন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মাননীয় শ্রীউপেন্দ্রনাথ বর্ম্মণ মহোদয়ের সহিত সুন্দরবন অঞ্চলে ব্যাপকভাবে ভ্রমণ করিবার সময়ে গোলপাতা-সম্বন্ধে যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ করিয়াছিলাম। প্রবন্ধ রচনার মূলে এই ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও দক্ষিণ বাংলার কন্‌সার্ভেটর অফ্ ফরেষ্টস্ শ্রীযুত এস্ জে কার্টিস সাহেবের লিখিত ও সাধারণ্যে অপ্রকাশিত Working Plan for the Forests of Sundarbans (১৯৩১-৫১) নামক তিন খণ্ডে সম্পূর্ণ গ্রন্থ হইতে যথেষ্টভাবে সাহায্য গ্রহণ করিয়াছি। এ-ছাড়া কলিকাতার ফরেষ্ট ইউটিলাইজেশন অফিসের সহযোগিতাও লাভ করিয়াছি। এ ছাড়া প্রবন্ধ রচনায় সাহায্য ও উৎসাহদানের জন্য মাননীয় মন্ত্রী বর্ম্মণ মহোদয়ের নিকট বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ ও অপর সকলের নিকট ঋণী রহিলাম।

—লেখক

ঘাসের মধ্যে বাঁধিয়া যায় এবং নদী ও চড়ার সংযোগস্থলে কাদার মধ্যে গোলপাতার গাছ হয়। এই জন্যই বলা যায় যে, নূতন মাটীর প্রথম সন্তান ঘাস, দ্বিতীয় সন্তান গোলপাতা। ঘাস ও গোলপাতায় চড়ার চারিদিকে এমনই একটা বাঁধন পড়িয়া যায় যে, কোন স্রোতই আর চড়াকে ক্ষয় করিতে পারে না, উপরন্তু নূতন নূতন মাটী আসিয়া চড়ায় জমিতে থাকে এবং উদ্ভিদ ও কীটের সাহায্যে প্রাকৃতিক নিয়ম অনুযায়ী চড়ার উপরে ও পাশে ক্রমাগতই মৃত্তিকার সঞ্চার চলিতে থাকে। এইরূপে চড়ার আয়তন বৃদ্ধির ফলে যে জলধারাটি চড়াটিকে মূল ভূখণ্ডের সহিত বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখে, সেই জল ধারাটি ক্রমেই শীর্ণ হইতে থাকে এবং শেষ পর্য্যন্ত এমনই সংকীর্ণ হইয়া পড়ে যে উহাতে আর কোন স্রোতই থাকে না এবং মূল ভূখণ্ড ও চড়া এই দুইধারের পাড় মধ্যের কাদার সহিত এক হইয়া যায়। পরে চড়াটিকে আর দ্বীপ বলিয়া পৃথক করা যায় না, মূল ভূখণ্ডের সহিত এক হইয়া যায়। এই সময়ে বা ইহার পূর্ব্ব হইতেই ইহার উপর স্রোতে, ঝড়ে বা পাখীদের সাহায্যে আনীত অন্যান্য বীজ হইতে নানাপ্রকার গাছ জন্মিতে আরম্ভ হয়। সুন্দরবন অঞ্চলে গোলপাতার পর সাধারণতঃ গেঁউয়া নামক গাছ জন্মে এবং ইহার পর সুন্দ্‌রী, গরাণ ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকার গাছের আবির্ভাব হয়। ইহার বহু বৎসর পরে সভ্য মানুষ গাছ কাটিয়া কৃষির প্রবর্ত্তন করে। সারা দক্ষিণ-বাংলার পাললিক অংশ এইরূপেই বঙ্গোপসাগর হইতে ক্রমে ক্রমে রূপগ্রহণ করিয়াছে।

গোলপাতা কাটা

গৃহ নির্ম্মাণের কার্য্যে গোলপাতার ব্যবহার অতি প্রাচীন কাল হইতেই চলিতেছে এবং সুন্দরবন হইতে গোলপাতা কাটার রীতিও সুপ্রাচীন। পূর্ব্বে অরণ্যের ব্যবস্থায় কোন বাঁধাবাঁধি ছিল না, বোয়ালিয়ারা নিজেদের খুসিমত কাজ করিত। ইংরাজগণ কর্ত্তৃক সুন্দরবন শাসনের কর্ত্তৃত্বভার গ্রহণ করিবার পরেও বোয়ালিয়ারা গোলপাতা কাটিবার পরোয়ানা লইয়া যে-কোন স্থানে খুসিমত কাটিতে থাকিত। কিন্তু দেখা গেল যে, উহাতে গোলগাছের বিশেষ ক্ষতি হয়। সরকারী বনবিভাগ গবেষণা করিয়া দেখিলেন যে, গোলগাছের বীজের অভাব নাই এবং সুন্দরবনের নূতন পলিমাটীতে এই বীজ পড়িলে সঙ্গে সঙ্গে গাছ হয়, অতএব যদি কোন উপায়ে যথেচ্ছ গাছ নষ্ট করা নিবারণ করা যায়, তাহা হইলে গোলগাছ বহুফলপ্রসূ হইতে পারে। সেই জন্য গোলগাছের সমূহ ক্ষতি না করিয়া পাতা সংগ্রহ করিবার জন্য কতকগুলি নিয়ম প্রবর্ত্তন করা হইয়াছে, যথা—

১। কোন একটি গাছ হইতে বৎসরে একবারের অধিক পাতা কাটা হইবে না। এ জন্য গোলপাতা কাটিবার জন্য প্রতিবৎসর স্থান (coupe) নির্ণীত হয় এবং সেই স্থান ছাড়া বোয়ালিরা অন্যস্থানে কাটিতে পায় না।

২। চারা গাছের পাতা এবং বড় গাছের 'মাঁঝি পাতা' অর্থাৎ মধ্যের সর্ব্বকনিষ্ঠ পাতাটি কোনমতেই কাটা চলিবে না।

৩। অনাবশ্যক কোন পাতা কাটা চলিবে না। পূর্ব্বে বোয়ালিয়া গোলগাছের সমস্ত পাতা কাটিয়া বিক্রয়যোগ্য পাতাগুলি গ্রহণ করিয়া বাকীগুলি ফেলিয়া দিত। ইহাতে গাছগুলি বিশেষ ক্ষতিগ্রস্থ হইত, অথচ সবপাতাই মানুষের উপকারে আসিত না, সেইজন্য এখন ঐরূপ কাটা আইনতঃ বন্ধ করা হইয়াছে।

৪। বর্ত্তমান ব্যবস্থায় যে স্থানটি গোলপাতার কূপ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইবে, সেইস্থানের সমস্ত গাছ হইতেই পাতা কাটিতে হইবে। পূর্ব্বে বোয়ালিয়া খালের ধারের গাছ হইতেই পাতা কাটিত; জঙ্গলের ভিতরে যে সমস্ত গাছ থাকিত সেদিকে যাইত না, কারণ ভিতরের গাছ হইতে পাতা কাটিয়া ঐ পাতা নৌকায় বহন করিয়া আনা সময় ও কষ্ট সাপেক্ষ। উপরন্তু জঙ্গলের ভিতরে গিয়া কাজ করা বিপজ্জনকও বটে, কারণ জঙ্গলের মধ্যে যে সমস্ত গোলপাতার ঝোপ থাকে, তাহাতে সাপ এবং সময় বিশেষে বাঘও থাকে। ইহাতে জঙ্গলের মধ্যের গাছগুলি পূর্ব্বে অকেজো অবস্থায় পড়িয়া থাকিত। এই অবস্থার প্রতিকার করিবার জন্যই অধুনা নিয়ম করা হইয়াছে যে, একটি 'কূপে'র সমস্ত গাছ হইতে পাতা কাটা না হইলে অন্য অঞ্চলে কাহাকেও পাতা কাটার পরোয়ানা দেওয়া হইবে না। এই আইনের ফলে বোয়ালিরা এখন ভাগাভাগি করিয়া কতক খালের ধারের গাছ এবং কতক ভিতরের গাছ কাটিয়া থাকে।

৫। এই সমস্ত নিয়ম ঠিকমত পালন করা হইতেছে কি না, তাহাই দেখিবার জন্য জঙ্গলের প্রত্যেক স্থান, বিশেষ করিয়া পাতা কাটার 'কূপ'গুলি বনবিভাগের কর্ম্মচারীরা সর্ব্বদাই পরিদর্শন করেন এবং ঐরূপ স্থানের নিখুঁত মানচিত্র ও বিবরণী প্রস্তুত করিয়া উর্দ্ধতন কর্ম্মচারীদের নিকট নিয়মিতভাবে দাখিল করেন।

৬। পূর্ব্বে পাতা কাটার কোনরূপ পরিকল্পনা না করিয়াই পাতা কাটার পরোয়ানা দেওয়া হইত। কিন্তু যদবধি 'কূপ' করার ব্যবস্থা করা হইয়াছে, তদবধি প্রতিবৎসর কোথা হইতে কত মণ পাতা কাটা হইবে, তাহার আনুমাণিক হিসাব সরকারী বনবিভাগ পূর্ব্ব হইতেই প্রস্তুত করিয়া সেই হিসাবমত পাতা কাটার পরোয়ানা দিয়া থাকেন। তবে এই হিসাব অক্ষরে অক্ষরে পালন করা চলে না, কারণ যাহারা পাতা কাটার কাজে থাকে, তাহারা প্রায় সকলেই কৃষক শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। যে বৎসর ধানের ফসল ভালো হয় না, সেই বৎসর পাতা কাটিবার জন্য অধিক ভিড় হয় এবং এইরূপ বৎসরে বনবিভাগ হিসাবের অতিরিক্ত পাতা কাটিবার পরোয়ানা দিয়া গরীব কৃষকদের সাহায্য করিতে বাধ্য হন। তেমনি যে বৎসর ধানের ফসল ভালো হয়, সে বৎসর পাতা কাটার চাহিদা কম থাকে ও পূর্ব্ব পরিকল্পনা মত কাটা হয় না, অনেক বাকী থাকিয়া যায়।

কৃষকদের মধ্যে যাহারা সুন্দরবনে পাতা কাটিতে আসে, তাহাদের মধ্যে অধিকাংশই ভূমিশূন্য কৃষক, হয় ভাগে চাষ করে, না হয়ত 'জনে'র কাজ করিয়া জীবনধারণ করে। অজন্মার বৎসরে 'জনে'র কাজ কম থাকে বলিয়া এই সকল বাহিরের কাজে তাহারা চলিয়া আসে। ইহারা প্রায় সকলেই সুন্দরবনের নিকটবর্ত্তী স্থানের বাসিন্দা এবং ইহাদের বংশের লোকেরা সুন্দরবনে আসিতে অভ্যস্ত। বাংলা দেশে এই একটি মাত্র কর্ম্মস্থান রহিয়াছে, যেখানে বিদেশী শ্রমিক আজও পর্য্যন্ত ঘেঁষিতে সাহস করে না।

সুন্দরবনের বোয়ালিরা দক্ষিণ বাঙ্গলার অধিবাসী। তাহারা গ্রামস্থ মহাজনের নিকট হইতে টাকা ধার করিয়া বা দাদন লইয়া, নিজেদের নৌকা না থাকিলে নৌকা ভাড়া করিয়া যতদিন জঙ্গলে থাকিবে বলিয়া মনে করে, ততদিনের উপযুক্ত আহার্য্য ও পানীয় লইয়া সুন্দরবনে প্রবেশ করে। গোলপাতা কাটিয়া বাহিরে লইয়া যাইবার জন্য ইহাদের প্রতি পঁচিশ মণে একটাকা করিয়া বনকর (Royalty) দিতে হয় (চলিত ভাষায় ইহারা বলে 'মন-শতকরা চারি টাকা')। এই বনকরের সামান্য অংশ জঙ্গলে প্রবেশ করিবার সময় অগ্রিম দিতে হয় এবং পাতা লইয়া ফিরিবার সময় যত পাতা সংগ্রহ করে, সেই হিসাবে করের বাকী অংশ শোধ করিয়া ফিরিয়া আসে। জঙ্গলে প্রবেশ করিবার সময় দেয়-বনকরের অগ্রিম অংশ নৌকার বহন ক্ষমতা হিসাবে গ্রহণ করা হয়। যথা :—

২৫ মণ কিম্বা তন্নিম্ন ওজনের মালবহনোপযোগী নৌকার জন্য অগ্রিম দেয় ।৶০

২৫ মণ হইতে ১০০ মণ মাল বহনোপযোগী নৌকার জন্য অগ্রিম দেয় ।০ ইত্যাদি।

এই প্রকার অগ্রিম দেওয়ার ব্যবস্থায় বোয়ালিদের তেমন কোন অসুবিধা নাই, কারণ কর ত দিতেই হইবে! তবে যদি কোন কারণে

প্রদত্ত করের উপযুক্ত মালও সংগ্রহ করিতে না পারে, তাহা হইলে করের যে অংশ দেওয়া হইয়া গিয়াছে তাহা আর ফেরৎ পাওয়া যায় না। এই মাত্র অসুবিধা, কিন্তু এরূপ ঘটনা নিতান্তই বিরল।

অর্থ, নৌকা, খাদ্য ইত্যাদি সংগ্রহ করিয়া বোয়ালিয়া দল বাঁধিয়া সুন্দরবনে প্রবেশ করে, নির্দ্দিষ্ট 'কূপে' যাইয়া পাতা কাটে, কাটা শেষ করিয়া বনকরের অবশিষ্ট অংশ হিসাবমত দান করিয়া বহির্গমনের অনুজ্ঞাপত্র গ্রহণ করে ও দেশে ফিরিয়া হাটে গোলপাতা বিক্রয় করিয়া ঋণ শোধ করে; নচেৎ যে মহাজনের নিকট হইতে দাদন লইয়া গিয়াছিল, তাহার নিকট পূর্ব্বেকার চুক্তিমত দরে সমস্ত মাল জমা দেয়। বিপদসঙ্কুল নির্ব্বান্ধব অরণ্যে দিনের পর দিন পরিশ্রম করিয়া, যৎসামান্য সম্বল লইয়া অর্দ্ধাশনে .একাদিক্রমে বহুরাত্রি ভিজিতে কাটাইয়া এই সমস্ত বোয়ালিদের দৈনিক গড় আয় চারি আনা হইতে ছয় আনা পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। গোলপাতা কাটিবার কার্য্যে প্রতিবৎসর প্রায় কুড়ি পঁচিশ হাজার বোয়ালি নিযুক্ত হইয়া থাকে।

সরকারী বনকরের ইতিহাস

১৫৮২ খৃষ্টাব্দে বাংলাদেশে জরিপ করিয়া টোডরমল্ল বাংলার যে রাজস্ব নির্ণয় করিয়াছিলেন তাহার পুনর্বিচার করিবার সময় ১৬৫৮ খৃষ্টাব্দে সুলতান সুজা সুন্দরবন হইতে আরণ্য-পণ্য সংগ্রহ করিবার জন্য সরকারী সেলামী দেওয়ার রীতি প্রবর্ত্তন করেন। তৎপূর্ব্বে জঙ্গল হইতে কোন কিছু গ্রহণ করিবার জন্য কাহাকেও সেলামী দিতে হইত না, কিন্তু একবার এইরূপ সেলামী দেওয়ার ব্যবস্থা আরম্ভ হওয়ার পর হইতে এই রীতিই চলিয়া আসিতেছে।

বৃটিশ শাসনের প্রারম্ভকালে বৃটিশ সরকার সুন্দরবন হইতে সেলামী গ্রহণের ব্যবস্থা ঠিকমত না করিলেও স্থানীয় জমিদারগণ ছাড়িতেন না, যাহা পারিতেন আদায় করিয়া লইতেন। এই অবস্থায় ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে ডাঃ ব্রাণ্ডিস্ সুন্দরবন পরিদর্শন করিয়া বনকর গ্রহণের পরামর্শ দেন ও তদনুসারে ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে বৃটিশ সরকার মোটা টাকা লইয়া ব্যক্তি বা সমবায় বিশেষকে কর গ্রহণের বাৎসরিক অধিকার বিক্রয় করিতে আরম্ভ করেন। প্রথম বৎসরে পোর্ট ক্যানিং কোম্পানি এবং আরও অন্যান্য ব্যক্তি কর গ্রহণের অধিকার ক্রয় করেন, কিন্তু দ্বিতীয় বৎসরে সমগ্র সুন্দরবন হইতে হইতে কর গ্রহণের অধিকার পোর্ট ক্যানিং কোম্পানি একাই ক্রয় করিয়াছিল। ইহার পর একাদিক্রমে আট বৎসর কাল ধরিয়া এই কোম্পানি প্রতি বৎসরই এই অধিকার গ্রহণ করিয়া সুন্দরবনে নিজেদের একচেটিয়া আধিপত্য স্থাপন করে। এই আটবৎসরের মধ্যে সরকার বাহাদুরও সুন্দরবন সম্বন্ধে নানারূপ অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করেন এবং পোর্ট ক্যানিং কোম্পানির যথেচ্ছভাবে জঙ্গল নষ্ট করায় বিরক্ত হইয়া ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দ হইতে কর গ্রহণের অধিকার বিক্রয় না করিয়া স্বহস্তেই রাখিয়া দেন এবং কি বাবদে কত কর লওয়া হইবে ও কিরূপে কি কাজ করিতে হইবে, সে সমস্তই নূতন করিয়া নিজেরা ব্যবস্থা করেন।

ক্যানিং কোম্পানীর অধীনে গোলপাতা কাটিবার জন্য মন-শতকরা ৷৶০ করিয়া রাজস্ব দিতে হইত।

বৃটিশ সরকারের অধীনে ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে প্রথম ব্যবস্থা হয় যে, সুন্দরী কাঠ ব্যতীত অপর সমস্ত জিনিষের জন্যই মণকরা ৫ এক পয়সা হিসাবে কর লওয়া হইবে অর্থাৎ গোলপাতার জন্য মন-শতকরা কর নির্দ্ধারিত হইল ১৷৵০।

১৯০৯—করের হার বৃদ্ধি হইয়া মণ-শতকরা ১৷৶০ ধার্য্য হইল।

১৯১৪—পুনরায় বৃদ্ধি হইয়া মণ-শতকরা ৩৷০ করা হইল, কেবল বাগের হাট ও খুলনা সাবডিভিসনে রাজস্বের হার রহিল মণ-শতকরা ৩৲ টাকা।

১৯২৯—পুনরায় বৃদ্ধি হইয়া সর্ব্বত্রই গোটা ও চেরা পাতার জন্য মণ শতকরা ৪৲ টাকা হারে কর ধার্য্য হইল এবং ছিলা বা ঝুরা পাতার * জন্য কর হইল মণ-শতকরা ৫৷৶০। পূর্ব্বে সমস্ত পাতার উপর এক হারে বনকর লওয়া হইত কিন্তু এখন হইতে চেরা ও ছিলা পাতায় পার্থক্য করা হইল।

বর্ত্তমানে বোয়ালিরা এই হিসাবে কর দিয়া পাতা গ্রহণ করে ও যে কয়দিন জঙ্গলে থাকে সেই কয়দিনের প্রয়োজনমত জ্বালানী কাঠ ভাঙ্গিতে ও ছিপে করিয়া মাছ ধরিতে পারে। আহারের নিতান্ত অভাব হইলে হরিণ কিম্বা অন্য ভক্ষ্য পশুও বধ করিতে পারে, তবে উহার মাংস, চামড়া, শিঙ বা অন্য কোন অংশই জঙ্গলের বাহিরে লইয়া যাইতে পারে না। কারণ, যে যাহা সংগ্রহ করিবার পরোয়ানা লইয়া আসে, সে তাহা ছাড়া অন্য কিছুই সঙ্গে লইয়া অরণ্যের সীমানা ছাড়িয়া বাহিরে যাইতে পারে না। কেবল গোলপাতার নৌকা বোঝাই করিয়া ফিরিবার সময় নৌকার ভারসাম্য রাখিবার জন্য যে তিন খণ্ড কাঠ ও নৌকার কিনারা বাঁধিবার জন্য যে দুই খণ্ড কাঠ লাগে তাহাই জঙ্গল হইতে সংগ্রহ করিয়া উপযুক্ত কর দিয়া লইয়া যাইতে পারে। ভার সাম্যের জন্য নৌকায় যে তিনখানি কাঠ দেওয়া হয়, তাহার একখানির নাম 'ডাব্বা' ও অপর দুইখানির নাম 'ঝুল'। 'ডাব্বা' নৌকার মধ্যে আড়াআড়িভাবে বাঁধিয়া দেওয়া হয়, এবং 'ঝুল' দুইখানি ডাব্বার দুই প্রান্ত হইতে এমনভাবে ঝুলাইয়া দেওয়া হয়, যাহাতে ঐ দুইটা কাঠ জলে ভাসিতে থাকে। নৌকার কিনারা বাঁধিয়া ভারী নৌকায় উপর দিয়া জল আসা নিবারণ করার জন্য যে দুইখানি কাঠ নৌকার দুইপাশে লাগাইয়া দেওয়া হয়, সেই দুটিকে 'মলম' বলে। মলমের সহিত নৌকার কিনারা অংশের সংযোগস্থলে যে ফাঁক থাকে, তাহা ইঁটেল মাটী দিয়া বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। মলম, ঝুল ও ডাব্বায় বড় কম কাঠ লাগে না; দুইটি ঝুলই ২৫ মণ করিয়া ওজনে ৫০ মণ হয় এবং ডাব্বাটির ওজন প্রায় পাঁচ ছয় মণ। কেবল মলম দুইটি পাৎলা কাঠের হয়। উপরন্তু এই কাঠগুলি খালি-নৌকায় লাগে না বলিয়া আসিবার সময় মাঝিরা ঝুল, ডাব্বা ইত্যাদি লইয়া আসে না, যাইবার সময় জঙ্গল হইতে কাটিয়া লইয়া যায়। অবশ্য এই কাঠগুলির জন্যও হাটে ক্রেতা পাওয়া যায়, এবং নির্দ্দিষ্ট বনকর দিয়া এগুলি লইয়া যাওয়ায় বোয়ালিদের ক্ষতি নাই, বরং লাভই হইয়া থাকে।

গোলপাতার হাট ও মূল্য

ব্যবহারিক কাঠ (Timber) ছাড়া সুন্দরবনের অন্যান্য সমস্তই ওজন দরহিসাব করা হয়, অথচ গোলপাতার হাটে গোলপাতা গুনতি দরে ক্রয় বিক্রয় হইয়া থাকে। গোলপাতার মত কাঁচা পাতা যতই শুষ্ক

---

* গোলপাতা নারিকেল জাতীয় গাছ। ইহার মধ্যে একটি মোটা শিরা থাকে ও শিরার দুইপাশে কতকগুলি করিয়া সরু সরু পাতা শ্রেণীবদ্ধভাবে সাজানো থাকে। পূর্ব্বে গোলপাতা গোটা গোটাই কাটিয়া আনিয়া হাটে বিক্রীত হইত, অধুনা মধ্যের শিরাটি লম্বালম্বিভাবে কাটিয়া পাতাগুলিকে 'চেরা পাতা' করা হয় চট্টগ্রাম ছাড়া বাংলা দেশের সর্ব্বত্রই চেরা পাতা উপর্য্যুপরি সাজাইয়া ঘর ছাওয়া হয়, বা খুঁটার সহিত বাঁধিয়া ঝুলাইয়া ঘরের অস্থায়ী দেওয়াল করা হয়। কিন্তু চট্টগ্রাম অঞ্চলে গোলপাতা এইরূপে ব্যবহৃত হয় না। তাহারা মধ্যের শিরাটা সম্পূর্ণরূপে বাদ দিয়া দুই পাশের সরু সরু পাতাগুলি মাত্র লইয়া ঘর ছাইয়া থাকে। সেইজন্য সেখানে মধ্যের শিরাটি বাদ দিয়া দুই পাশের সরু সরু পাতাগুলি আঁটি বাঁধিয়া হাজার দরে বিক্রীত হয়। গোলপাতার এইগুলিকে 'ছিলা পাতা' বা 'ঝুরা পাতা' বলে। চট্টগ্রামের বোয়ালিরা শিরা বাদ দিয়া ঝুরা পাতাই সুন্দরবন হইতে লইয়া যায়, কিন্তু অন্যান্যেরা চেরা পাতা আনিয়া থাকে।

হইবে, তাহার ওজনও ততই কমিয়া যাইবে, অতএব ইহার নির্দ্দিষ্ট ওজন বলিয়া কিছুই থাকে না, সেইজন্ত সরকারী বনবিভাগ গুনতি ও ওজনের মধ্যে একটা সামঞ্জস্ত নির্ণয় করিয়াছেন। প্রথমতঃ গোলপাতা সম্বন্ধে বাজার চলিত গুনতি হিসাব দেখা যাউক। ইহা এইরূপ :—

৪খানি পাতায় এক গণ্ডা,
এইরূপ ২০ গণ্ডায় এক পণ,
১৬ পণে এক কাহণ,
এবং ১৮ পণে এক পাতি।

হিসাবটি গোটা পাতার কি চেরা পাতার তাহা বলিয়া দিতে হইবে। এক কাহন গোটা পাতা সেই জাতীয় দুই কাহন চেরা পাতার সমান। তবে আজকাল গোলপাতার হাটে সর্ব্বদাই চেরা পাতার কারবার হয় বলিয়া 'চেরা পাতা' কথাটি উল্লেখ করিতে হয় না, তবে 'গোটা পাতা' হইলে উহা বলিয়া দিতে হয়। নিম্নে সরকারী নির্দ্দেশ অনুসারে 'চেরা পাতার' বাজার চলিত ওজন দেওয়া হইল :—

৫ হইতে ৬ ফুট লম্বা	এক কাহন পাতার ওজন	১৮ হইতে ২০ মণ ;
৭ ফুট লম্বা	" " " "	২৫ হইতে ৩০ মণ ;
৮ " "	" " " "	৪০ মণ ;
৯ " "	" " " "	৫০ হইতে ৫৫ মণ ;
১০ " "	" " " "	৬০ হইতে ৭০ মণ ;

বর্ত্তমানে গোলপাতার কতকগুলি বড় বড় হাট আছে। এক এক হাটে এক রকম পাতার চাহিদা আছে,মূল্যের সামান্ত পার্থক্যও দেখা যায়। সেগুলি নিম্নে যথাক্রমে দেওয়া গেল :—

১। কলিকাতা—কলিকাতায় গোলপাতার দুইটি মাত্র হাট আছে, একটি টালিগঞ্জে আদি গঙ্গার তীরে, অপরটি বেলেঘাটায় খালের ধারে। বলা বাহুল্য গোলপাতার সমস্ত হাটই নদী বা খালের ধারে হইয়া থাকে, কারণ সুলভে জলপথে ইহাকে বহন করিতে না পারিলে ইহার পড়্‌তা পোষায় না। কলিকাতার হাটে গত ফাল্গুন চৈত্র মাস পর্য্যন্ত গোলপাতার মূল্য ছিল ৫ হইতে ৬ ফুট লম্বা পাতা—পাইকারী এক পাতি ৫৲ হইতে ৮৲ টাকা ; খুচরা প্রতি পণ ।৵০ হইতে ।০ ।

২। বাদুড়িয়া, বসিরহাট, কলারোয়া এবং কালীগঞ্জে—১০ ফুট দৈর্ঘ্যের পাইকারী দর এক পাতি ৮৲ হইতে ১২৲ টাকা, খুচরা এক পাতি ১১৲ হইতে ১৬৲ টাকা। গড় দৈর্ঘ্য ৭ ফুট, পাইকারী দর একপাতি ৩৲ হইতে ৫৲ টাকা, খুচরা ৬৲ হইতে ১০৲ টাকা।

৩। বড়দল—৯ ফুট লম্বা, পাইকারী দর এক কাহন ১২৲ টাকা

৪। ডুমুরিয়া—৬ ফুট লম্বা, পাইকারী দর এক কাহন ৮৲ টাকা। ৮ ফুট হইতে ৯ ফুট লম্বা, পাইকারী দর এক কাহন ১০৲ হইতে ১২৲ টাকা। ১০ ফুট হইতে ১১ ফুট লম্বা পাইকারী দর এক কাহন ১৫৲ হইতে ১৬৲ টাকা।

৫। খুলনা—৮ ফুট লম্বা, পাইকারী দর এক কাহন ৭৲ হইতে ৯৲ টাকা।

৬। মরেলগঞ্জ—মাঠবাড়িয়া ও তুষখালি—৯ ফুট হইতে ১২ ফুট পাইকারী দর কাহন প্রতি ১২৲ হইতে ১৩৲ টাকা। খুচরা ১ পণ ১৲ টাকা

৭। বর্ধাকাঠী—৯ ফুট হইতে ১২ ফুট লম্বা, পাইকারী দর এক কাহন ৯৲ হইতে ১৪৲ টাকা ; খুচরা এক পণ ।৵০ হইতে ৸৵০ .

৮। চট্টগ্রাম—এখানে ছিলা পাতা বিক্রয় হয়। দেড় হাত হইতে দুই হাত লম্বা ছিলা পাতা হাজার-করা মূল্য ১০৲ হইতে ১৬৲ টাকা।

তবে এই বৎসর বৈশাখ মাসের পর হইতে এই দর আর নাই, কারণ যুদ্ধের জন্ত সুন্দরবন অঞ্চলে কাজ করা বিপজ্জনক বোধে গোলপাতা কাটা প্রায় বন্ধ হইয়া গিয়াছে।

বর্ত্তমাণ মূল্যের সহিত তুলনা করিবার জন্ত পূর্ব্বে গোলপাতার কি মূল্য ছিল তাহার আভাস দেওয়া গেল। এইগুলি Heinig ও Trafford সাহেবের Working Plan হইতে গৃহীত। প্রথমোক্ত প্লানে ১৮৯২ খৃষ্টাব্দের ও পরোক্ত বিবরণীতে ১৯১১ খৃষ্টাব্দের বাজার দর পাওয়া যায়।

১৮৯২—

কলিকাতা ও ২৪ পরগণায় গোটা-পাতা গুনতি দরে একশতের মূল্য ৸০ হইতে ১৲ টাকা।

খুলনা জেলায় ও বর্ধাকাঠীর হাটে গোটা পাতা একশতের দাম ।৷০ হইতে ৸০।

১৯১১—

গোটা গোলপাতা ১০০খানির মূল্য ।৷০

গোলপাতার ঘর

দক্ষিণ বাংলার প্রায় সব কয়টি জেলাতেই গোলপাতা দিয়া ঘরের চাল করার রীতি দেখা যায়। গোলপাতার ঘর একচালা বা দোচালা হইয়া থাকে। দোচালা ঘরগুলি সত্বর জল ঝরিয়া যাওয়ার জন্ত অধিক কাল স্থায়ী হয়, তবে দোচালা ঘরের মট্‌কা খড় দিয়া বাঁধিয়া দিতে হয়। একখানি ভালো দোচালা গোলপাতার চাল দশ বারো বৎসর পর্য্যন্ত স্থায়ী হয়, তবে তিন চারি বৎসর অন্তর ইহার খড় নির্ম্মিত মট্‌কা বদলাইয়া দিতে হয়। এক চালা ঘরের স্থায়িত্ব ছয় সাত বৎসর। দশ হাত প্রস্থ ও দশ হাত লম্বা একখানি ঘরের চালের জন্ত আনুমানিক এক কাহন গোলপাতা লাগে।

বাংলার ন্তায় গ্রীষ্মপ্রধান দেশে ঘরের চালের জন্ত খড় বা গোলপাতা বিশেষ উপযোগী। খড় ও গোলপাতার মধ্যে তুলনা করিলে উভয়েরই সমান খরচ বলিয়া মনে হয়। খড়ের জন্ত অধিক বাঁখারীর প্রয়োজন, ইহাতে ঘরামীর মজুরীও অধিক লাগে, ফলে খড়ের চালায় গোলপাতার চালার অর্দ্ধেক খরচ লাগে। কিন্তু গোলপাতার চালা খড়ের চালা হইতে আড়াই গুণ বা তিন গুণ অধিককাল স্থায়ী। সেই হিসাব লইলেও গোলপাতার চালের মট্‌কা বদলাইবার খরচ হিসাব করিলে মোটামুটি খড় বা গোলপাতা সমমূল্য বলিয়াই মনে হয়। বর্ত্তমান সময়ে খোলা, টালী খোলা, করোগেট টিন এবং এজ্‌বেষ্টস্ (করোগেটেড্‌, বা ট্রাফোর্ড) এই চারি জাতীয় উপকরণেও চাল ছাওয়া হয়, কিন্তু মফঃস্বলের গরীব অধিবাসীর নিকট এগুলি এখনও বিশেষ প্রচলিত হইয়া উঠিতে পারে নাই।

পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরে বাংলাদেশে গোলপাতার মোট উৎপাদন ও রাজস্ব

বাংলাদেশে গোলপাতার মোট উৎপাদন বলিতে সুন্দরবনের মোট উৎপাদনই বুঝায়। সুন্দরবনের রাজস্বখাতের হিসাব ১৮৭৫—৭৬ হইতে অর্থাৎ, যে বৎসর ব্রিটিশ সরকার স্বহস্তে কর গ্রহণ করিতে আরম্ভ করেন, সেই বৎসর হইতে পাওয়া যায়, কিন্তু উৎপাদনের পরিমাণের হিসাব ১৮৭৯-৮০ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে পাওয়া যায় না।

নিম্নের প্রদত্ত তালিকায় ১৯৩৯-৪০ সাল পর্য্যন্ত হিসাব দেওয়া হইল—

বৎসর	গোলপাতার পরিমাণ	গোলপাতা খাতে আদায়ীকৃত রাজস্ব
১৮৭৯—৮০ হইতে বাৎসরিক গড় ১৮৯২—৯৩ পর্য্যন্ত	৩১,০৮,৮২৬ মণ	১৮৭৫-৭৬ হইতে ১৮৯১-৯২ পর্য্যন্ত বাৎসরিকগড় রাজস্ব—৪১,৯৯৬ টাকা

		১৮৯২—৯৩ সালের রাজস্ব—৪৩,৪৩৮ টাকা
১৮৯৩—৯৪ হইতে ১৯০২—০৩ পর্য্যন্ত		
বাৎসরিক গড়	৩৮,৯৩,৮৮৭ „	৬০,৮৪২ টাকা
১৯০৩—০৪ হইতে ১৯০৯—১০ পর্য্যন্ত		
বাৎসরিক গড়	৪২,৬৮,৬৫৯ „	৭০,৩৫৮ টাকা
১৯১০—১১	৩৫,১৮,৯০০ „	৯৪,৬৬৪ ”
১৯১১—১২	৩৭,০৭,৯৭৫ „	৭৬,১৩৯ ”
১৯১২—১৩	৪৪,৮৪,৭৫০ „	১,০০,৫৯২ ”
১৯১৩—১৪	৫৩,৩৭,৮০০ „	১,৪৪,৪০৯ ”
১৯১৪—১৫	৪৬,২২,১৩০ „	১,৪৪,৮২৩ ”
১৯১৫—১৬	৪০,৬০,৩২৫ „	১,২৩,৬০১ ”
১৯১৬—১৭	৪৮,৯০,৫২৫ „	১,৩৭,৭৮৯ ”
১৯১৭—১৮	৪০,০১,৮৪৫ „	১,৪৬,৫৬০ ”
১৯১৮—১৯	৪৪,৬৬,৮০০ ”	১,৪৫,৭৯৬ ”
১৯১৯—২০	৫০,৫৪,৯৫০ „	১,৬৭,৬৭৮ ”
১৯২০—২১	২৫,৯৮,৫২৫ „	১,৪০,৬৫৬ ”
১৯২১—২২	৩৫,০৩,০২৫ „	১,২৩,৩৬৬ ”
১৯২২—২৩	৪৪,০১,২২৫ „	১,৫৪,৮৩৫ ”
১৯২৩—২৪	৫৪,৬০,৫৩২ „	১,৯১,৯১৬ ”
১৯২৪—২৫	৫৭,৯৫,০৯৩ „	২,১৩,১২৮ ”
১৯২৫—২৬	৫৪,৬৯,৬২৪ „	২,১৯,৪২০ ”
১৯২৬—২৭	৫৮,০১,৮০০ „	২,৩২,৫৬১ „
১৯২৭—২৮	৪৬,৩৩,৬৪৮ „	১,৮৫,৯১৫ ”
১৯২৮—২৯	৪১,০৮,১৭৫ „	১,৬৪,৭৯৭ ”
১৯২৯—৩০	৪০,৯৬,৩৩০ „	১,৬৪,৪৩৫ ”
১৯৩০—৩১	৪৪,৪৭,৪১১ „	১,৭৮,৮৫২ ”
১৯৩১—৩২	৪৫,১১,৬৮৮ „	১,৮১,১৮৯ ”
১৯৩২—৩৩	৩৮,৯০,৯৯৩ „	১,৫৬,৭৪৮ ”
১৯৩৩—৩৪	৪০,০৫,৪৩১ ”	১,৬১,৫৬৫ ”
১৯৩৪—৩৫	৩৬,২০,৭৮০ „	১,৪৪,৬২৪ ”
১৯৩৫—৩৬	২৫,৭৩,২১৮ „	১,০২,৯২৫ ”
১৯৩৬—৩৭	২০,৩৪,৫৪১ „	৮২,৩৫২ ”
১৯৩৭—৩৮	৩১,৫২,৭৭৫ „	১,২৮,১০১ ”
১৮৩৮—৩৯	৩৫,১১,১০০ „	১,৪২,৫৮৪ ”
১৯৩৯—৪০	৩৩,৬৪,৮৫১ „	১,৩৭,১৫৬ ”

১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে কার্টিস সাহেব স্থন্দরবনের কুড়ি বৎসরের (১৯৩১—৫১) পরিকল্পনা গঠন করিয়া বলিয়াছিলেন যে, সেই সময় গোলপাতা খাতে বাৎসরিক গড় আয় ছিল ১,৭১,৭২৯৲ টাকা এবং তাঁহার পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করিলে ভবিষ্যতে রাজস্বের পরিমাণ আরও বৃদ্ধি পাইবে। কিন্তু তালিকাটি লক্ষ্য করিলে দুঃখের সহিত স্বীকার করিতে হয় যে, যেদিন হইতে পরিকল্পনা গৃহীত হইয়াছে, সেদিন হইতে গোলপাতা কেবলই মন্দার দিকে চলিয়াছে। 'বিশ্বব্যাপী মন্দা'র দোহাই দিয়া ইহার কৈফিয়ৎ দেওয়া হইবে, কি বাঙ্গালী ধনী হইতেছে বলিয়া গোলপাতার ব্যবহার কমিতেছে, অথবা চালে গোলপাতা দিবার সঙ্গতি নাই বলিয়াই আর গোলপাতা কিনিতে পারিতেছে না এ সব প্রশ্নের আনুমানিক উত্তর আছে একাধিক, কিন্তু অনুমানকে এ প্রবন্ধে আদৌ স্থান দেওয়া হয় নাই বলিয়া সে বিষয়ের গবেষণা হইতে নিরস্ত রহিলাম।

রুদ্ররাজ

শ্রীমন্মথনাথ রায়

সৃষ্টি হয়েছে সমাধান আজি ধ্বংস করেছি সুরু
ভৈরব-তালে বাজিছে ডমরু গুরু গুরু গুরু গুরু !

ঝঞ্ঝা আসিছে কাঁপায়ে মেদিনী বজ্র তাহার করে,
হাহাকার গায় নরকের গীত মত্ত প্রলয় ভরে !

মৃত্যু নিয়ত ভৃত্য আমার পশ্চাতে রহে ঐ
বিভীষিকা সে যে চরণের দাসী নাচিছে তাথৈ থৈ !

বিপ্লব মম মারণ মন্ত্র ব্যভিচার তার সঙ্গী
মহামারী মম বিদূষক প্রিয় করিছে ভ্রূকুটী ভঙ্গী !

অনুচর মম হাসে দাবানল ছারেখারে দিবে বিশ্ব,
শোণিত সিচিয়া নিভাব অনল নিজেরে করিয়া নিঃস্ব।

শঙ্কিত জীব কম্পিত ত্রাসে ছুটিবে প্রাণের ভয়ে,
ফেলিয়া তাহায় চরণের তলে দলি প্রমত্ত হয়ে।

প্রমথে বিলাব মুণ্ড ছিঁড়িয়া খেলিবে তাহারা ভাঁটা
ডাকিনী যোগিনী ভ্রমিবে ভুবন চড়িয়া স্কন্ধকাটা !

চর্ব্বণ তরে কঙ্কাল রাশি করিতে রক্তপান
হৃষ্ট করিয়া পিশাচে রক্তে হবে সবে অবসান !

সাগরের বারি সিঞ্চন করি, শোণিতে রাখিব ভরে
সহচরী মম ছিন্নমস্তা পিপাসা শান্তি তরে।

অট্টহাস্যে কাঁপিবে শূন্য, কক্ষ ত্যজিয়া তবে
খসিয়া পড়িয়া জ্যোতিষ্ককুল অতলে ডুবিয়া রবে।

গরলে বাহির করিব নিজের কণ্ঠ করিয়া ছিন্ন
সারাটী বিশ্ব করিয়া প্লাবিত করিব জীবন দীর্ণ।

স্বর্গে ফেলিয়া দিব রসাতলে মর্ত্ত্যে ছুড়িব শূন্যে
দেবতা দানবে ঐক্য সাধিব মিশাব পাপে ও পুণ্যে !

অসীম শ্মশানে নিবিড় আঁধারে জীবের জীবন লয়ে
সিদ্ধি ঘুঁটিয়ে পিয়ে রব পড়ি ব্যোম্ ভোলানাথ হয়ে !

খণ্ড প্রলয় দেখেছি অনেক এ মহাপ্রলয় ক্ষণে
বক্ষ জুড়িয়া উল্লাস নাচে রক্ত নিশান সনে !

স্রষ্টা করুক পুনঃ সৃষ্টি সংহার মম কাজ,
আবার উঠিয়া করিব ধ্বংস আমি যে রুদ্র-রাজ !

এ নহে নূতন এই সনাতন বিশ্বের ইতিহাস—
জীবন-মরণ যুগল-মিলন একই ঘরে সহবাসে।

গণদেবতা

পঞ্চগ্রাম

শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

ন্যায়রত্ন অন্ধকার দিগন্তের দিকে চাহিয়া মোহগ্রস্তের মতই ওই বিদ্যুচ্চমকের আভাষ দেখিতেছিলেন। কোন অতি দূর-দূরান্তের বায়ুস্তরে মেঘ জমিয়া বর্ষা নামিয়াছে, সেখানে বিদ্যুৎ খেলিয়া যাইতেছে, তাহারই আভাষ দিগন্তে ক্ষণে ক্ষণে ফুটিয়া উঠিতেছিল। মেঘ গর্জ্জনের কোন শব্দ শোনা যাইতেছিল না। শব্দশক্তি এ দূরত্ব অতিক্রম করিয়া আসিতে আসিতে ক্ষরিত এবং ক্ষীণ হইয়া নিঃশেষে নৈশব্দের মধ্যে মিলাইয়া যাইতেছে। ইহার মধ্যে অস্বাভাবিক কিছুই ছিল না। ঋতুতে সময়টা বর্ষা। কয়েক-দিন আগে পর্য্যন্ত এই অঞ্চলেই প্রবল বর্ষা নামিয়াছিল; জলঘন মেঘে আচ্ছন্ন আকাশে বিদ্যুৎ চমক এবং মেঘ গর্জ্জনের বিরাম ছিল না; আজ মাত্র দিন পাঁচেক মেঘ কাটিয়াছে। তবুও খণ্ড খণ্ড বিচ্ছিন্ন মেঘপুঞ্জের আনাগোনা চলিয়াছেই, চলিয়াছেই। দিগন্তে এ সময়ে মেঘের রেশ থাকেই এবং চিরদিনই এ সময় দূর দূরান্তের মেঘভারের বিদ্যুৎলীলার প্রতিচ্ছটা রাত্রির অন্ধকারের মধ্যে দিগন্ত সীমায় ক্ষণে ক্ষণে আভাবে ফুটিয়া উঠে। সমস্ত জীবন ভোরই ন্যায়রত্ন এ খেলা দেখিয়া আসিয়াছেন। কিন্তু আজ তিনি এই ঋতুরূপের স্বাভাবিক বিকাশের মধ্যে অকস্মাৎ অস্বাভাবিক অসাধারণ কিছু দেখিলেন যেন। তাঁহার নিজের তাই মনে হইল।

গভীর শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন নিষ্ঠাবান হিন্দু তিনি; বাস্তব জগতের বর্ত্তমান এবং অতীতকালকে আঙ্কিক হিসাবে বিচার করিয়া সেই অঙ্ক ফলকেই ধ্রুব ভবিষ্যৎ অকাট্য সত্য বলিয়া মনে করিতে পারেন না। তাহারও অধিক কিছু অতিরিক্ত কিছুর অস্তিত্বে তাঁহার প্রগাঢ় বিশ্বাস; মধ্যে মধ্যে তিনি তাহাকে যেন প্রত্যক্ষ করেন, ইন্দ্রিয় দিয়া পর্য্যন্ত অনুভব করেন। আকস্মিকতার মত অপ্রত্যাশিতভাবে জটিল রহস্যের আবরণের মধ্যে আত্মগোপন করিয়া সে আসে; বাস্তববাদের যোগবিয়োগ গুণভাগের মধ্যে আসিয়া পড়িয়া অঙ্কফল ওলট-পালট বিপর্য্যস্ত করিয়া দিয়া যায়। একদিন বিশ্বনাথকে তিনি সে কথা বলিয়াছিলেন। অতিমাত্রায় বাস্তববাদী বিশ্বনাথ, কার্য্য এবং কারণের গণিত বিজ্ঞানে বিশ্বাসী সে, সে হাসিয়া বলিয়াছিল—দুই আর দুই কিম্বা তিন আর এক মিলে চার হবেই দাদু, তিনও হবে না, পাঁচও হবে না।

ন্যায়রত্ন হাসিয়া বলিয়াছিলেন—নিশ্চয়; গণিত শাস্ত্র অভ্রান্ত রাজন, সে তো আমি অস্বীকার করিনে। তবে মুস্কিল কি জান, তুমি দিলে দুই, আমিও দিলাম দুই, হওয়ার কথাও চার; কিন্তু যোগের সময় দেখা গেল মধ্যের যোগ চিহ্নটা কি একটা জটিল রহস্যে বিয়োগ চিহ্নে পরিণত হয়েছে, কিম্বা কোনও একটা দুই শূন্যে পরিণত হয়েছে, ফলে ফল দাঁড়িয়ে গেল শূন্য কিম্বা দুই। চার কিছুতেই দাঁড় করাতে পারলে না তুমি।

বিশ্বনাথ হাসিয়া আকস্মিক ঘটনায় অপ্রত্যাশিত আকস্মিকতাকে দৈব বা রহস্য মনে করার মানসিকতা বিশ্লেষণে উদ্যত হইয়াছিল। কিন্তু ন্যায়রত্ন হাত তুলিয়া বাধা দিয়া তাহাকে চুপ করিতে ইঙ্গিত করিলেন, তারপর বলিলেন, দাদু একটা গল্প বলি শোন। গল্প নয়, ইতিহাসের কথা—অবাস্তব কল্পনা নয়, বাস্তব জগতে যা ঘটেছিল তারই ইতিবৃত্ত। ভাস্করাচার্য্যের নাম, তাঁর গণিতে জ্যোতিষে অসাধারণ পাণ্ডিত্যের কথা অবশ্যই জান। তাঁর কন্যা লীলাবতী; কন্যাকেও তিনি জ্যোতিষে গণিতে পারদর্শিনী বিদুষী ক'রে তুলেছিলেন। সেই লীলাবতীর—

বিশ্বনাথ মধ্য পথেই বলিল—লীলাবতীর বৈধব্যের গল্প আমি জানি দাদু। লগ্ন গণনার জলঘড়িতে লীলাবতীর কানের দুলের ছোট একটি মুক্তা পড়ে গিয়ে ছিদ্রপথকে সংকীর্ণ করে তুললে—ফলে—লগ্ন গণনায় ভুল হয়ে লগ্ন উত্তীর্ণ হয়ে গেল। কিন্তু তুমি তাকেই বলছ—

দৃঢ়স্বরে ন্যায়রত্ন বলিলেন—হ্যাঁ বলচি। কর্ণ-ভূষার ক্ষুদ্র মুক্তাটি যে সময়-পরিমাপক জলযন্ত্রের ছিদ্র পথে ফেলেছিল—সে গণিতশাস্ত্র জ্যোতিষশাস্ত্র সকল শাস্ত্রের গণ্ডীর বাইরে অবস্থান করে দাদু। সে কারও স্বীকার অস্বীকারের অপেক্ষা রাখে না।

নিষ্ঠাবান হিন্দু ব্রাহ্মণের সংস্কারের বশেই যে ন্যায়রত্ন এ কথা বলিতেছেন—সে বিশ্বনাথ বুঝিল, তাঁহার সে সংস্কার ছিন্নভিন্ন করিয়া দিবার মত তর্কযুক্তিও তাহার আছে, কিন্তু স্নেহময় বৃদ্ধের হৃদয়ে আঘাত দিতে তাহার প্রবৃত্তি হইল না। সে চুপ করিয়াই রহিল, কেবল একটু হাসি তাহার মুখে ফুটিয়া উঠিল।

ন্যায়রত্ন সেদিকে লক্ষ্য করিলেন না, নীরবে কিছুক্ষণ উদাস দৃষ্টিতে সম্মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন—তারপর অকস্মাৎ বলিলেন—তুমি যে তাকে স্বীকার কর না দাদু—সেও তারই রহস্যের খেলা। তোমার অনুভূতিতে সে আত্মপ্রকাশ করবে—তারই ইঙ্গিত। যে তাকে সংস্কারবশে স্বীকার করে দাদু, তার শুধু স্বীকার করাই হয়—তাকে অনুভব করার ভাগ্য কখনও ঘটে না। যে স্বীকার করে না, সেই তাকে অনুভব করে একদিন। অবশ্য সংস্কার বশে স্বীকার করা অন্ধত্বের মত, স্বীকার না-করাটাও যেন অন্ধ এবং গতানুগতিক না হয়। দাদু একদিন আমিও তাকে স্বীকার করি নাই। আশ্চর্য্য হচ্ছ? সত্যি কথাই বলছি আমি। তখন আমি সংস্কারবশে স্বীকার করার ভাণে তাকে অস্বীকারই করতাম। তাকে প্রণাম করতে গিয়ে তার পথরোধ ক'রে দাঁড়ালাম। তোমার—মানে আমার শশী যখন তার নতুন রূপের আভাস দিলে—তখন তাকে আমি স্বীকার করতে পারলাম না। কিন্তু শশীর মৃত্যুর মধ্য দিয়ে অদৃশ্য গণিতাতীত আমাকে তার গতিবেগের আঘাতে তার অস্তিত্ব আমাকে জাগিয়ে দিলে, পথ থেকে সরিয়ে দিলে। তাই তোমার কাজে আমি বাধা দিই না। নইলে আমি তোমাকে ইংরিজী শিখতে দিতাম না দাদু। কুলধর্ম্মকে ছেড়ে যুগধর্ম্মকে বড় বলে মানতে পারতাম না।

বিশ্বনাথ এবার স্তব্ধ বিস্মিত হইয়া গেল।

দাদু আবার বলিলেন—তাকে স্বীকার করতে যদি পারতে ভাই—তবে মর্ম্মান্তিক দুঃখ থেকে রেহাই পেতে। তার আকস্মিক স্পর্শ বড় কঠোর, বড় নিষ্ঠুর, ভীষণ মর্ম্মান্তিক।

বিশ্বনাথ তাহাকে অনুভব করিতে পারিল না, স্বীকারও করিল না, কিন্তু এই মুহূর্ত্তে অকস্মাৎ দাদুকে প্রণাম না করিয়া পারিল না।

আজিকার এই বর্ষার সন্ধ্যায় দিকচক্রবালের আকাশে বিদ্যুচ্ছটার মধ্যে ন্যায়রত্ন আবার যেন তাহার আভাস অনুভব করিলেন।

সন্ধ্যার পূর্ব্বে উন্মুক্ত মাঠে তিনি বেড়াইতে গিয়াছিলেন, সেইখানেই তিনি খবর পাইয়াছিলেন ধর্ম্মঘটের আয়োজন বন্ধ হয় নাই। গ্রাম গ্রামান্তরের লোক তাঁহারই চোখের সম্মুখ দিয়া শিবকালীপুরের দিকে যাইতেছিল। তাহাদের চোখে মুখে একটা উত্তেজনা, হিংস্র আনন্দ, পদক্ষেপে একটা দর্পিত অধীরতা দেখিয়া তিনি বিষণ্ণ শঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাঁহার শঙ্কা—তাঁহার বিষণ্ণতা জয়ার জন্য—অজয় অজুমণির জন্য। বিশ্বনাথ আর কি মুহূর্ত্তের জন্য দাঁড়াইয়া পিছন ফিরিবার অবকাশ পাইবে? যাহাদিগকে সে ডাক দিয়া পথে বাহির করিয়াছে—তাহাদের ভিড় ঠেলিয়া পিছনে ফিরিয়া আসিবার উপায় কি আর আছে?

একবার আক্ষেপের অন্তরালে প্রচ্ছন্ন ক্রোধ জাগিয়া উঠিল নিজের উপরেই। কেন তিনি বিশ্বনাথকে বৈদেশিক শিক্ষায় শিক্ষিত করিয়া তুলিলেন?

অকস্মাৎ মনে পড়িল শশীর কথা। শশীকে তিনি ইংরাজী শিক্ষার অনুমতি দেন নাই। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া আপনার মনেই তিনি হাসিলেন।

* * *

ন্যায়রত্ন অনেক ভাবিয়া দেখিয়াছেন।

'ধর্ম্মের গ্লানি অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হইলেই ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি আবির্ভূত হন।' গীতার এই মহাবাক্যকে ভরসা করিয়া যাঁহারা বাঁচিয়া আছেন—তাঁহাদের অধিকাংশেরই বিশ্বাস—এই অধর্ম্মের যুগকে ধ্বংস করিয়া সেই প্রাচীন যুগের আদর্শ ই পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইবে। ন্যায়রত্ন গীতার বাক্যে বিশ্বাস করেন কিন্তু প্রাচীন যুগের পুনঃপ্রতিষ্ঠার ভরসার উপর তিনি নির্ভর করেন না। শশীর মৃত্যু তাঁহাকে একটা অদ্ভুত উদারতা একটা প্রশান্ত গভীর দূরদৃষ্টি দিয়া গিয়াছে।

বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম আজ বিনষ্টপ্রায়; জাতিগত কর্ম্মবৃত্তি মানুষের হস্তচ্যুত; কেহ হারাইয়াছে, কেহ ছাড়িয়াছে। দেশ দেশান্তরের নূতন কর্ম্ম নূতন বৃত্তি আনিয়া দেশ-দেশান্তরের মানুষ ডাক দিতেছে, এ-দেশের মানুষের বৃত্তি কর্ম্ম তাহারা কাড়িয়া লইয়াছে। বৃত্তিহারা বুভুক্ষু মানুষের জগতে আজ শূদ্রের বেদই একমাত্র শাস্ত্র। জড়বিজ্ঞানের উপাসনায় পৃথিবী আজ কঠোর তপস্যায় মগ্ন।

একটা বিপর্য্যয় যেন আসন্ন, ন্যায়রত্ন তাহার আভাস মধ্যে মধ্যে স্পষ্ট অনুভব করেন। নূতন কুরুক্ষেত্রের ভূমিকা এ। অভিনব গীতার বাণীর জন্য পৃথিবী যেন উন্মুখ হইয়া আছে।

তবু তিনি বেদনা অনুভব করেন—বিশ্বনাথের জন্য। সে এই বিপর্য্যয়ের আবর্ত্তে ঝাঁপ দিবার জন্য অধীর আগ্রহে উন্মুখ হইয়া উঠিতেছে।

জয়ার মুখ অজয়ের মুখ মনে করিয়া তাঁহার চোখের কোণে অতি ক্ষুদ্র জল বিন্দু জমিয়া উঠে। পরমুহূর্ত্তেই তিনি চোখ মুছিয়া হাসেন।

ধন্য সংগ্রাম ধর্ম্মের প্রভাব! মহামায়াকে তিনি মনে মনে প্রণাম করেন।

চণ্ডীমণ্ডপে বসিয়া আজিও সন্ধ্যায় তিনি অনেকক্ষণ ভাবিয়া দেখিলেন। বিশ্বনাথ বলিল—রাত্রি যে অনেকটা হ'ল দাদু।

—হ্যাঁ। তোমার খাওয়া হয়নি তো এখনও।

—না।

হাসিয়া ন্যায়রত্ন বলিলেন—তুমি কিন্তু প্রেমিক হিসেবে ব্যর্থ রাজন। জয়া কখন থেকে রান্না সেরে তোমার পথ চেয়ে বসে আছে—আর তুমি এত রাত্রে বাড়ী ফিরছ!

গম্ভীরভাবে বিশ্বনাথ বলিল—জয়া আমার সঙ্গে কথাই কইলে না দাদু, ভয়ানক অভিমান। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে।

—কাঁদছে?

—হ্যাঁ। আমার বিরক্তি বোধ হ'ল। চলে এলাম।

—চলে এলে? কি বিপদ! এস, আমার সঙ্গে এস।

ন্যায়রত্ন সঙ্গে সঙ্গে উঠিলেন। বাড়ীর ভিতরে আসিয়াই শুনিলেন মৃদুগুঞ্জনে বিনাইয়া বিনাইয়া কে যেন কাঁদিতেছে। তিনি বিরাক্তপূর্ণ সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে পৌত্রের দিকে চাহিলেন।

বিশ্বনাথ বলিল—ও নয়। ও সেই কামারদের মেয়েটি, অজয়কে ছড়া বলে ঘুম পাড়াচ্ছে। জয়া ও ঘরে। আসুন।

ঘরে আসিয়া বিশ্বনাথ আঙুল দেখাইয়া বলিল—ওই দেখ। বিরহতাপে জর্জ্জরিতা রাজ্ঞী তোমার গভীর ঘুমে নিশ্চিন্ত আরামে নাক ডাকাচ্ছেন!

সত্য সত্যই জয়ার নাক ডাকিতেছিল। বর্ষার সজল বাতাসের আরামে গভীর ঘুমে সে আচ্ছন্ন। আলোটা বাড়াইয়া দিয়া বিশ্বনাথ বলিল—দেখ—দেখ, বিরহতাপে রাজ্ঞী তোমার এমন বাহ্যজ্ঞান শূন্য যে মশা পঙ্গপালের মত মুখের ওপর বসে আছে, তবুও চেতনা নাই।

ঘুমন্ত জয়ার মুখের উপর কতকগুলা মশা নিশ্চিন্ত আরামে দংশন করিয়া বসিয়া ছিল, বিশ্বনাথ জয়ার গালে মৃদু একটা চড় বসাইয়া দিল, মশাগুলা রক্ত খাইয়া এমন স্ফীতোদর হইয়াছিল যে দ্রুত নড়িবার শক্তি আর ছিল না। বিশ্বনাথের হাতটা দলিত মশার রক্তে চিত্রিত হইয়া গেল। সে হাসিয়া বলিল—এই দেখ।

চড় খাইয়া জয়া উঠিয়া বসিয়াই স্বামী ও দাদাশ্বশুরকে দেখিয়া লজ্জায় ব্যস্ত হইয়া উঠিল।

হাসিয়া বিশ্বনাথ পিতামহকে কি বলিতে গিয়া বিস্মিত হইয়া উঠিল। ন্যায়রত্নের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হইয়া উঠিয়াছে, ললাটে জাগিয়া উঠিয়াছে ভ্রূকুটি! ন্যায়রত্ন একাগ্রচিত্তে শুনিতেছিলেন ওই কামার মেয়েটির ছড়া। সে সুরকে তিনি কান্নার সুর বলিয়া ভ্রম করিয়াছিলেন। সেই সুরে মেয়েটি গাহিতেছে—

গায়ে ধূলো মাখছিলে—মা-মা বলে ডাকছিলে,
সে যদি তোমার মা হ'ত—ধূলো ঝেড়ে তোমায় কোলে নিত—

ন্যায়রত্ন ডাকিলেন—অজয়!

—ঠাকুর!

—এস—আমার কাছে এস।

—ঠাকুর যাই। ঠাকুর যাব।

পরক্ষণেই সে কাঁদিয়া উঠিল, যেন কেহ তাহাকে চাপিয়া

ধরিয়াছে ; পীড়িত কণ্ঠস্বরে কাঁদিয়া উঠিয়া অজয় বলিল—না—না —ঠাকুর যাব। ঠাকুর—

ন্যায়রত্ন নিজেই অগ্রসর হইয়া অজয়কে লইয়া আসিলেন। কামার-বউ সত্যই তাহাকে বুকে সজোরে চাপিয়া ধরিয়া বসিয়াছিল। ফিরিয়া ন্যায়রত্ন বলিলেন—বিশ্বনাথ।

—দাদু!

—কাল একবার মণ্ডলকে ডাকবে তো!

—দেবুকে?

—হ্যাঁ।

—কি ব্যাপার?

—প্রয়োজন আছে। অজয়কে কোলে করিয়া তিনি চলিয়া গেলেন। কিছুক্ষণ পর তিনি আবার যখন ফিরিয়া আসিলেন—তখন বিশ্বনাথের খাওয়া প্রায় শেষ হইয়াছে। ন্যায়রত্ন আসিয়া অতি নিকটে দাঁড়াইলেন। বলিলেন—মাসিক ধান যা লাগে আমি দেব। টাকাও দু'টা ক'রে দেব। কামার বউ তার নিজের বাড়ীতেই থাকবে।

জয়া বলিল—না দাদু, আমার ভারী সুবিধে হয়েছে। বেশ তো এখানে রয়েছে—

—না। ন্যায়রত্ন দৃঢ়স্বরে বলিলেন—না।

বিশ্বনাথ সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে পিতামহের দিকে চাহিল।

ন্যায়রত্ন বলিলেন—আমি স্থির ক'রে ফেলেছি। তুমি মণ্ডলকে বরং জানিয়ে দিয়ো। তিনি এসে যেন বউটিকে নিয়ে যান।

* * * *

ঘরের মধ্যে পদ্ম চুপ করিয়া বসিয়াছিল।

ঠাকুর মহাশয় অজয়কে যেন কাড়িয়া লইয়া গেলেন, সেটা সে অনুভব করিয়াছিল। এতক্ষণে পিতামহ ও পৌত্রের কথাবার্ত্তা শুনিয়া বিশ্বাস তাহার দৃঢ় হইয়া গেল। তাহার বড় বড় অস্বাভাবিক সাদা চোখের দৃষ্টি কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য প্রখর হইয়া উঠিল, পর মুহূর্ত্তেই সে নিঃশব্দে দরজা খুলিয়া খিড়কীর দুয়ারের অন্ধকার পথ দিয়া সকলের অলক্ষিতে বাহির হইয়া আসিয়া দাঁড়াইল—সদর রাস্তার উপর।

মাথার উপরে আকাশে পাতলা মেঘস্তরের উপর পশ্চিম দিগন্ত হইতে ঘন একস্তর মেঘ নিঃশব্দ সঞ্চারে বিস্তৃত হইতেছিল। দিগন্তে যে বিদ্যুৎ-লেখা কেবল আভাসে চমকিয়া উঠিতেছিল—এতক্ষণে সে দিগন্তকে অতিক্রম করিয়া মাথার উপর প্রখর নীল দীপ্তিতে অন্ধকার চিরিয়া ঝলসিয়া উঠিল—সঙ্গে সঙ্গে গর্জ্জন। কিছুক্ষণ পরই বর্ষণ আরম্ভ হইয়া গেল। প্রচণ্ড বর্ষণ।

তিন দিন ধরিয়া প্রচণ্ড বর্ষণ। মাঠ ঘাট ঘোলা জলে ঢাকিয়া একাকার হইয়া গেল। ও-দিকে বাঁধের ওপাশে ময়ূরাক্ষী কানায় কানায় ভরিয়া উঠিয়াছে। এই দুরন্ত দুর্য্যোগের মধ্যেও বিশ্বনাথ আশপাশ গ্রামে কামার বউয়ের খোঁজ করিয়া আসিয়াছে। ন্যায়রত্ন নিজে বাহির হইতে উদ্যত হইয়াছিলেন, কিন্তু বিশ্বনাথ তাঁহাকে বাহির হইতে দেয় নাই। ন্যায়রত্ন মহাশয় যেন বড় বেশী বিচলিত হইয়া পড়িয়াছেন। বিশ্বনাথ বলিল—তুমি কেন এত ব্যস্ত হচ্ছ দাদু? সে মেয়েটি নিজেয় ইচ্ছেয় গিয়েছে, কোন অবজ্ঞা কিম্বা কোন কটূ কথা আমরা বলি নি, তাড়িয়েও দিই নি।

ন্যায়রত্ন কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন—তারপর বলিলেন—মেয়েটি বোধ হয় অন্তরে আঘাত পেয়েছে দাদু। আমার মনে হচ্ছে আমিই তাকে আঘাত দিয়েছি।

—তুমি?

—হ্যাঁ আমি। আবার কিছুক্ষণ স্তব্ধ থাকিয়া ন্যায়রত্ন বলিলেন—সেদিন রাত্রে আমি অজয়কে তার কোল থেকে নিলাম। সে বোধ হয় ভেবে থাকতে পারে আমি তার কোল থেকে অজয়কে কেড়ে নিচ্ছি।

বিশ্বনাথ বলিল—ভেবে থাকলে সে অন্যায় ভেবেছে।

—মেয়েটি বন্ধ্যা, সন্তানহীনা বিশ্বনাথ। তার পক্ষে ওই রকম ভাবাই স্বাভাবিক।

বিশ্বনাথ চুপ করিয়া রহিল। একটা দীর্ঘনিশ্বাস না-ফেলিয়াও পারিল না। কথাটা নিষ্ঠুর অথচ সকরুণ সত্য। মানুষের মনের এই অবুঝ দিকটার মত দীনতার এমন আশ্রয়স্থল আর নাই। না-থাকার অভিমান, বঞ্চনার ক্ষোভ অতিমাত্রায় স্পর্শকাতর দৈন্যকে টানিয়া আনে ব্যাধির মত, ব্যাধিগ্রস্তের মতই মানুষ তিলে তিলে দগ্ধ হয়—সমস্ত জীবন সংক্রামক ব্যাধির বিষের মত বিষ ছড়াইয়া ফেরে। অপ্রাপ্তি হইতে যাহার উদ্ভব—প্রাপ্তি ভিন্ন তাহার প্রতিষেধক নাই। একদিন বিজ্ঞান বলে মানুষ হয় তো ইহার প্রতিকার করিবে। হয় তো নয়, নিশ্চয় হইবে। পরিপূর্ণ প্রাপ্তি যেদিন হইবে—সেইদিন আসিবে মানুষের চরম সার্থকতা। বন্য বর্ব্বর আদিম মানুষের অন্ধকার গুহা হইতে মানব জীবন অরণ্য, পর্ব্বত, তৃণাচ্ছাদিত চারণভূমি, পল্লীগ্রাম অতিক্রম করিয়া এই বিংশ শতাব্দীর নগরী মহানগরীর রাজপথে আসিয়া পৌঁছিয়াছে এবং আরও সম্মুখে চলিয়াছে—সে তো—তাহার সেই সব-পেয়েছির দেশ লক্ষ্যে তাহার যাত্রা-অভিযান। যুগে যুগে এই পূর্ণপ্রাপ্তির দেশের সন্ধান না পাইয়া মানুষ অপ্রাপ্তির মধ্যেই তাহার চরম সার্থকতাময় অবস্থা কল্পনা করিয়া এই অভিমান—এই ক্ষোভ হইতে বাঁচিতে চাহিয়াছে, জীবনের যাত্রাপথে থামিতে চাহিয়াছে, কিন্তু জীবন থামে নাই—সে চলিয়াছে।

ন্যায়রত্নও এতক্ষণ চুপ করিয়াছিলেন—তিনি আবার বলিলেন—হয় তো সে অন্যায়ও ভাবে নি দাদু। অত্যন্ত সংযত শান্ত-ভাবেই আমি তার কোল থেকে অজয়কে নিয়েছিলাম। তবুও অস্বীকার করব না ভাই—অজয়কে কেড়ে নেওয়াই ছিল আমার অভিপ্রায়।

বিশ্বনাথ সবিস্ময়ে দাদুর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

ন্যায়রত্ন বলিলেন—মেয়েটি বন্ধ্যা। সে অজয়কে বুকে নিয়ে সুর করে ছড়া বলছিল—আমার মনে হ'ল কে যেন কাঁদছে। তারপর ছড়াটা আমার কানে এল। বলছে—'সে যদি তোমার মা হ'ত, ধুলো ঝেড়ে তোমায় কোলে নিত'। আমার মনে হ'ল—সে বলছে জয়া তোমার মা নয়, আমিই তোমার মা। তুমি আমার কাছে এস। আমি আর আত্মসম্বরণ করতে পারলাম না।

বিশ্বনাথ কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া ম্লান হাসি হাসিয়া বলিল—তোমার অনুমান ভুল নয় দাদু। তার সে ছড়াগান আমিও শুনেছি। আমারও প্রথম ভুল হয়েছিল কান্নার সুর ব'লে।

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া ন্যায়রত্ন বলিলেন—সেইজন্তেই আমার বার বার মনে হচ্ছে দাদু, মেয়েটির চলে যাওয়ার জন্তে আমিই দায়ী। যদি তার কোন বিপদ ঘটে—তবে তার—

বিশ্বনাথ সহসা চকিত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল—উৎকর্ণ হইয়া কিছু শুনিবার চেষ্টা করিয়া বলিল—একটা যেন গোলমাল উঠছে বলে মনে হচ্ছে।

—গোলমাল ?

—হ্যাঁ। কাছে নয় অনেকটা দূরে।

ন্যায়রত্নও একাগ্র উৎকর্ণ হইয়া শুনিবার চেষ্টা করিলেন; কলরবের একটা ক্ষীণ আভাসও তাঁহার কানে আসিয়া পৌঁছিল। তিনি বলিলেন—হ্যাঁ।

বিশ্বনাথ বলিল—অনেক লোকের চীৎকার !

ন্যায়রত্ন আকাশের দিকে চাহিলেন—তারপর সম্মুখের পুকুরের দিকে দৃষ্টি ফিরাইলেন, পুকুরটা ছাপাইয়া দুই দিক দিয়া জল বাহির হইয়া চলিয়াছে। রাস্তার উপর জল জমিয়াছে বন্যার জলের মত। তাঁহার মনে পড়িল ময়ূরাক্ষীর কথা। তিনি বলিলেন—বান এসেছে।

—বান ?

—ময়ূরাক্ষীতে হঠাৎ বোধহয় বান প্রবল হয়ে উঠেছে। হয় তো—

বিশ্বনাথ উদ্‌গ্রীব হইয়া পিতামহের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

ন্যায়রত্ন বলিলেন—হয়তো বাঁধ ভেঙেছে।

—আমি তাহ'লে চলাম দাদু, দেখে আসি কোন প্রতিকার করা যায় কি না! বিশ্বনাথ বাহির হইয়া যাইতেছিল। ন্যায়রত্ন বলিলেন—ছাতা—ছাতা! ছাতাটা লইয়া তিনি নিজেই অগ্রসর হইয়া বিশ্বনাথের হাতে তুলিয়া দিলেন।

(ক্রমশঃ)

মধু-স্মৃতি

শ্রীমানকুমারী বসু

দেব বলিব কি আর

চির-শ্রান্ত ক্লান্ত তুমি
মহাঘুমে আছ ঘুমি
জাগিবে কি চাহি মুখ আমা সবাকার।

আজি মোরা কোন লাজে
এসেছি তোমার কাছে
জানি তব ক্ষমা দয়া অসীম অপার।

সেই যে তোমার বাড়ী
যশোরে সাগর দাঁড়ী
স্নেহামৃত মাখা সেই সোনার সংসার।

অনায়াসে পরিহরি
প্রাণে মহা লক্ষ্য ধরি
ভারতীর পদাম্বুজ করেছিলে সার।

হাসিয়া মা বীণাপাণি
দিলা নিজ বীণাখানি
শিরে দিলা রাজটীকা দেবকাম্য যার।

বিমোহিলে বিশ্ব-সৃষ্টি
দেবে করে পুষ্পবৃষ্টি
উদারা মুদারা তারা একত্রে ঝঙ্কার।

কমলা রুষিয়া হায়
ঠেলিলা কমলোপায়
তাই ফুরাইল তব কুবের ভাণ্ডার।

সে কি দৈন্য সে কি ব্যথা
ভাষায় আসেনা কথা
ভিখারী সাজিয়ে দিল রাজরাজেশ্বরে।

সে কলঙ্ক সে কালিমা
দিতে আর নাহি সীমা
বঙ্গের ললাটে জাগে চিরদিন তরে।

মর্ম্মর পাষাণে গড়ি
স্মৃতি স্তম্ভ পূজা করি
তবু সে কলঙ্ক কালি নহে ঘুচিবার।
অনুতাপ অশ্রুধারা নহে মুছিবার।

*　　*　　*

আজি ঘুমাইছ সুখে
জননী মহীর বুকে
পাশে পতিব্রতা সতী সঙ্গিণী তোমার।

আজি মোরা দীন ভক্ত
আনিয়াছি হৃদি রক্ত
দিতে পদে শ্রদ্ধাঞ্জলি ধর একবার
তব দয়া তব ক্ষমা অসীম অপার।

প্রাচ্য ও প্রতীচ্য

শ্রীসাধনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

ঋষি উদাত্তকণ্ঠে বলে গেছেন, এক আত্মা ব্যতীত অন্ত কিছুই নাই। আত্মা সত্য। এতদ্ব্যতিরিক্ত সবই অমূলক। এই আত্মার সন্ধানেই অসংখ্য শাস্ত্র ব্যুৎপন্ন। আত্মজ্ঞানই নিঃশ্রেয়স্ আশ্রয়। একেই বলে প্রাচ্যের অধ্যাত্ম-চেতনা। ইহাই প্রাচ্যের অধ্যাত্ম-বিজ্ঞান-রহস্ত। প্রাচ্যের প্রাচীনতা আত্মজ্ঞান নিয়ে। সমীচীন প্রাচীন প্রাচ্য আজও বৃহৎ মহান বাণী প্রচার করে চলেছে। দুর্বল আত্মজ্ঞান পায় না। সবল সফল না হলে অধ্যাত্মবিজ্ঞানী হওয়া অসম্ভব। প্রাচ্যের প্রচারসার ইহাই।

প্রতীচ্য প্রত্যক্ষ জ্ঞানকেই বিজ্ঞান ভিত্তি করে অধ্যাত্মচেতনা বা নিছক প্রাচ্যের আত্মজ্ঞানকে প্রায় অগ্রাহ্য করছে। মূলীভূত সত্য বা মূলবিষয় এক হলেও দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য অনেকখানি। প্রতীচ্য প্রত্যক্ষ-জ্ঞানকে বিজ্ঞানের মাপকাঠি করে নিয়েছে। প্রাচ্য অতীন্দ্রিয়কে মানতে চায় বেশী। ইন্দ্রিয়কে সতেজ সবুজ রেখে বিশ্বকে ভোগদখল করাই প্রতীচ্যের কৃষ্টিগত লক্ষ্য। প্রতীচ্যের দৃষ্টিপথ 'নেতি' মার্গে বিসর্পিত হয় নি। প্রতীচ্য positiveকে বাস্তবকে আঁকড়ে ধরে বৃহত্তর বিশ্বের সন্ধানে বিজ্ঞানোন্মত্ত। প্রাচ্য negativeকে বা অবাস্তবকে আশ্রয় করে অনন্ত সত্তার সন্ধানে নির্বাণোন্মুখ। এইখানেই দৃষ্টিদ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়েছে। যুগপ্রগতির সমস্যা ও সমাধান এই মূলপার্থক্য নিয়ে। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের তীব্র মিলনই হবে সর্বদ্বন্দ্বের সমাধানের একমাত্র সোপান। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের কৃষ্টীভূত সামঞ্জস্যই এ যুগের গতিবিধি নিরূপিত করবে। অধ্যাত্মবিজ্ঞান আলিঙ্গন করবে বস্তুবিজ্ঞানকে। মূল বিজ্ঞানের ইহাই মর্মার্থ। বিজ্ঞানের অধ্যাত্মস্বরূপ এবং বস্তুস্বরূপের বাস্তবিক পার্থক্য নাই।

সোপানের পার্থক্য বা মার্গের বৈষম্য কোনদিনই মূল অভিজ্ঞানের ক্ষতি করতে পারবে না। যে সোপানে যাই না কেন, মূল সত্যের আবিষ্কার অনিবার্য মাত্র। মূল সত্যকে পেতে গেলে যে কোন সোপানে যাওয়া যায়। 'নেতি' মার্গেও মহাসত্যের দর্শন লাভ হবে ও হয়। বস্তু-দর্শনেও সত্য সাক্ষাৎকার সম্ভব। মোটকথা সত্য ও বিজ্ঞান কৃষ্টির মূল লক্ষ্য হওয়া চাই।

প্রাচ্য চেয়েছিল—আজও চায় ঐকান্তিক শান্তি, সাম্য ও মৈত্রী। এক অখণ্ড আত্মাকে আদর্শ করে প্রাচ্য গড়ে তুলতে চায় মানবসভ্যতা ও মনুষ্য-সমাজ। প্রতীচ্যের আদর্শ বিপরীত। খণ্ড খণ্ড বিশ্বরাজ্য নিয়ে দ্বন্দ্ব করে প্রতীচ্য। প্রতাপ পরাক্রম প্রভুত্ব ও আধিপত্য লক্ষ্য করে অশান্ত চঞ্চল প্রতীচ্য চলেছে—যুদ্ধের পর যুদ্ধ রচনা করে। সমস্যার পর সমস্যা বেড়ে চলেছে। আশা, সমাধান হবেই পরিশেষে। প্রতীচ্য সমস্যা দিয়ে সমস্যার সমাধান সমাধা করে। প্রাচ্য নিত্য সমাধানের পশ্চাতে চলেছে চিরতরে সমস্যামুক্ত হবার জন্ত। উভয়েরই লক্ষ্য সমাধান। পথ বিভিন্ন। মত বিচিত্র। ফল এক।

প্রাচ্য ঈশ্বরকে মাঝখানে রেখে জ্ঞান, ভক্তি, প্রেম প্রভৃতির চর্চা ও অনুশীলনা করে আসছে। বিবেক বৈরাগ্য আনন্দ শান্তি এবং সাম্যকে অবলম্বন করে মানসিক সমাধির মার্গে প্রাচ্য চলেছে সচ্চিদানন্দের অভিমুখে। সংসারে সন্ন্যাসই হল তার লক্ষ্য। ভোগে ত্যাগই হল সাধনা। কর্মে ফলবৈরাগ্যই হল তার বৈশিষ্ট্য। রাজ্যে মোক্ষই হল তার উপলক্ষ। প্রতীচ্য এইখানেই বিমুখ ও বিরোধী। প্রতীচ্য বাক্যত বা বাহৃত ঈশ্বরকে মানলেও, কার্যত বা বস্তুত ঈশ্বরকে ধরে চলে না। একটা অন্ধ জড় মূক প্রকৃতিকে মাঝখানে রেখে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রত্যক্ষ জ্ঞানকে অবলম্বন করে প্রতীচ্য চলেছে—বুদ্ধিব্যবসায়ী বিজ্ঞানকে আশ্রয় ভেবে। বুদ্ধিব্যবসায়ী বিজ্ঞান যা বলে, প্রতীচ্য তাই মেনে চলে। আবিষ্কার করে তদনুসারে।—সুখস্বাচ্ছন্দ্য অধিকার করে তারই আশ্রয়ে। প্রতীচ্য জড় নিয়ে নিশ্চিন্ত। প্রাচ্য চেতনার উপাসক। প্রাচ্য চেতনবাদী। প্রতীচ্য জড়বাদী।

বস্তুতঃ বিশ্বব্যাপী প্রাণশক্তি বা জীবন জড় বা চেতন নয়। ইহা সত্যময়। ইহা শক্তিময়। এককথায় চিন্ময়। সুতরাং চিন্ময়বিশ্বে বাস করে, প্রাচ্য ও প্রতীচ্য নিয়ে দ্বন্দ্ব করা সমীচীন কি? সত্যময় বিশ্বে শক্তিময় বিশ্বে, এককথায় চিন্ময় বিশ্বে, আমরা সবাই সত্যময়, শক্তিময় বা এককথায় চিন্ময়। প্রাচ্য বা প্রতীচ্য বিশেষণ নিয়ে বিশেষ্য বিশ্বটাকে উড়িয়ে দেওয়া অসঙ্গত! নয় কি? প্রাচ্যের চেতনা বা প্রতীচ্যের চেতনা পৃথক কিছুই নয়। এক অখণ্ড চেতনাই সকলের অন্তরে ও বাহিরে। এই চিৎশক্তির তত্ত্বালোচনাই যুগধর্ম বা এ কালের কথা।

বস্তু বিজ্ঞান বা প্রতীচ্য শাস্ত্র বিশ্বসভ্যতাকে সুখ সুবিধা আনন্দ ও স্বাচ্ছন্দ্যের অনেকাংশ দান করেছে সত্য। বস্তুবিজ্ঞান মানব সমাজের প্রচুর উপকারসাধন করে আসছে নিঃসন্দেহ। বস্তুবিজ্ঞানের প্রভাবে মানব অনেক উন্নত ও সভ্যতার আসনে আসীন। সে বিষয়ে দ্বিধা কই? অপর পক্ষে, অধ্যাত্ম-বিজ্ঞান বা আত্মদর্শন মনুষ্য-সভ্যতাকে অনির্বচনীয় আনন্দের সন্ধান দিয়েছে, কে অস্বীকার করবেন? অধ্যাত্মবিজ্ঞান বা আত্মদর্শন প্রাচ্যের অপূর্ব কীর্তিমেখলা রচনা করে এসেছে, কারও অস্বীকার্য নয়। প্রাচ্যের অধ্যাত্মশাস্ত্র মানবচরিত্রকে এক সুমহান্ আদর্শে বিমণ্ডিত করেছে, বিশ্ববাসী জানেন। তথাপি, দ্বন্দ্ব কেন? ঝগড়া কোথায়? গরমিলটা নিয়ে কি?

প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মিলনতীর্থে আচার্য পরমহংসদেবকে প্রণাম করি। তাঁর 'যত মত তত পথ' অবলম্বন করে আমরা অনায়াসে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য বিজ্ঞান জগতে বিচরণ করব। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মহামিলনপূজারী বিবেকানন্দের মহানন্দের সুরে আমরা বিজয়-গৌরবে বস্তুবিজ্ঞান ও অধ্যাত্ম-বিজ্ঞানকে জয়সম্মিলিত করব। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের দৃষ্টি-মিলনের তীর্থে আমরা যুগকবি রবীন্দ্রনাথকে প্রণাম করি। এ যুগের লক্ষ্য প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের ঘনমিলন। ধীময়ী নিত্য সমাধানস্বরূপা বিশ্বপ্রকৃতির গর্ভে অনন্ত সত্য ও শক্তির সন্ধানই এ যুগের বিজ্ঞানসাধ্য। সর্বসত্তাস্বরূপিণী চিন্ময়ী বিশ্বপ্রকৃতির রহস্তজাল উদ্ঘাটিত করে জনকল্যাণ-বিধানই এ যুগের শাস্ত্রমর্ম। সর্বজাতির মিলন বা এক বিশ্বব্যাপী মহাজাতির প্রতিষ্ঠাই এই যুগের কল্পনা। বস্তু, অবস্তু, নেতি, প্রত্যক্ষ, সবই এক মহানুভূতির অঙ্গ মাত্র। দৃষ্টির ধাপে ধাপে বিচিত্র প্রতীতি মাত্র প্রতিভাত হয়। তাতে মূল সত্যের ক্ষতি বা অপলাপের সম্ভাবনা নাই। জড়-অজড় নির্বিশেষে এক মহাবিজ্ঞানই সর্ববিশ্ববিজ্ঞানকে আলিঙ্গন করে রয়েছে। এই মহাবিদ্যা বা মহাবিজ্ঞানই পারে সমগ্রের সন্ধান দিতে। আর তাই নিয়েই শুধু মানুষ হতে পারে সর্বজ্ঞ ও সর্বক্ষম। সর্বজ্ঞতা ও সর্ব-ক্ষমতাই মানবের চিরন্তন কামনা ও সাধনার বিষয়। এ ক্ষেত্রে মতভেদ কার? প্রাচ্য ও প্রতীচ্য কে না চায় সর্বজ্ঞ ও সর্বক্ষম হতে?

অবচেতন

(নাটিকা)

শ্রীসমরেশচন্দ্র রুদ্র এম-এ

একটি সুসজ্জিত বড় কক্ষ। গৃহকর্ত্রী সুচারু বসে সেলাই করছেন। বয়সে প্রায়-বৃদ্ধা, বিধবা, সামনে একটা ফুলদানি-দেওয়া টেবিল, কাছে ও দূরে কয়েকটা চেয়ার ও কৌচ রয়েছে। সুচারুর উপস্থিতি লক্ষ্য না করে তাঁর দৌহিত্রী মঞ্জু ও তার বন্ধু তপন প্রবেশ করল। আকারে ইংগিতে প্রণয়-লক্ষণ দেখা যাচ্ছে।

তপন। (প্রবেশ করতে করতে) কাল তোমার জন্তে সেই বাস-ষ্ট্যাণ্ডের কাছে আমি হাঁ করে দাঁড়িয়ে; কখন আস, কখন আস, এই চিন্তা। সময় তো চলে গেল—সু-সময় তো বহুপূর্বেই গেছে—এমন কি অ-সময়ও চলে গেল।

মঞ্জু। (সহাস্তমুখে) অ-সময়ও চলে গেল?

তপন। না গিয়ে তো আর আমার মত হাঁ করে বাস-ষ্ট্যাণ্ডের কাছে বোকার মত দাঁড়িয়ে থাকতে পারেনা।

সুচারু এদের ব্যাপার দেখে অবাক হয়ে চেয়ে রইলেন; আশ্চর্য, একজন অবহিলা ঘরে উপস্থিত রয়েছেন, প্রণয়-কোলাহলে সেটুকুও কি লক্ষ্য করবার সময় নেই?

মঞ্জু। তাহলে নিজেকে বোকা বলে স্বীকার করছ?

তপন। শ্রীমতীর হাতে যখন পড়েছি, তখন বুদ্ধির জমা আর কিছু আছে বলে মনে হচ্ছেনা। কিন্তু মন্থরা গেলেন কোথায়?

মঞ্জু। বুঝতে পারছি না, বোধহয় শুয়েছেন।

তপন। যতক্ষণ শুয়ে থাকেন, ততক্ষণই ভাল; নাহলে তো উন্নত্তবাসা হয়ে কেবল খবরের কাগজে পাত্রের বিজ্ঞাপন দেখবেন, আর বলবেন, তপন, তুমি বড় চাকরী কর না, ব্যাংক গৌরবাম্বিতও নও, তোমাকে—

মঞ্জু। অন্ত কোন বস্তু দান করা যেতে পারে বটে, কিন্তু কন্তাদান করা চলেনা।

সুচারুর বিস্ময়ের ব্যবধান রইল না। তাঁর মঞ্জু—হতে পারে তার এখন আঠার উনিশ বছর বয়স হয়েছে—এসব বলে কি!

তপন। হাঁ, দেখ মঞ্জু, চল একটু সিনেমা দেখে আসি মিড্‌ডে ট্রিপে।

মঞ্জু। দিদিমণি জেগে উঠলে কি হবে তখন?

তপন। জেগে তো উঠবেনই, সন্ধ্যে হয়ে যাবে ফিরতে, আর জেগে উঠবেন না? চিরকাল তো আর ঘুমিয়ে থাকতে পারেন না, আহা, তাই যদি হত!

মঞ্জু। দেখ, কি সুন্দর একটা মালা গেঁথে রেখেছি, দেখবে?

তপন। দেখতে পারি একটা সর্তে।

মঞ্জু। কি সর্ত?

তপন। সব চেয়ে যার গলায় ভাল মানায়, অবশ্য এই কক্ষের ভেতর, তাকে পরাতে হবে।

মঞ্জু। তাহলে তো আমার নিজেকেই পরতে হয়।

তপন। মরি, মরি, কি কথা! নিয়ে এস, যে সুদুর্লভ রত্ন তুমি পাচ্ছ, তাকে কুসুমডোরে বেঁধে রাখ।

সর্বনাশ! সুচারুর মাথা ঘুরে যাবার জোগাড়। সামান্ত একটু কেশে নিজের উপস্থিতি না জানালে দুর্যোগ এসে পড়তে পারে। ফুলের মালা পরাণই শেষ নয়, তার পুরস্কার প্রদানও যে একটি অবশ্য কর্তব্য, তা এই অবিবেচকটিও জানে বলে মনে হয়। সুচারু কাসলেন। মঞ্জু ও তপন চমকে উঠল।

মঞ্জু। দিদিমণি!

সুচারু। কলেজের বুঝি ছুটী হয়ে গেল?

মঞ্জু। হাঁ।

সুচারু। (তপনের প্রতি) তোমার বুঝি আজ অফিস নেই?

তপন। (হঠাৎ গম্ভীরভাবে) না, নেই। আমি একটা জরুরী কথা বলবার জন্তে আপনার কাছে এসেছি।

সুচারু। কি কথা।

তপন। আমি মঞ্জুকে বিয়ে করতে চাই।

সুচারু। আশ্চর্য! এই হল তোমার জরুরী কথা! একথা তো অনেকবার হয়ে গেছে।

তপন। হয়ে গেলেও আমি নতুন করে উত্থাপন করছি।

সুচারু। তাতে ফল কি হতে পারে আশা কর?

তপন। আশা করার কথা নয়, মত আপনাকে দিতেই হবে। আমার কি ত্রুটি দেখে আপনি আপত্তি করছেন?

সুচারু। তাও তোমার অজানা নেই। তোমার আয় যথেষ্ট বলে আমি মনে করিনা।

তপন। এই দুর্দিনে কয়েকটি ভাগ্যবান ছেলে ছাড়া—অবশ্য তারা যথোপযুক্ত গুণী বলে নয়, কারণ তাদের মত গুণী, এমন কি তাদের চেয়ে বেশী গুণীও অল্প আয়ের জন্তে যথেষ্ট কষ্ট পাচ্ছে—শতকরা নিরানব্বই জন শিক্ষিত ছেলে আমার মতই উপায় করে। সেই মুষ্টিমেয় ভাগ্যবানকে না দিতে পারলে আর কাকে দেবেন তাহলে? তাছাড়া এই পরিবর্তনের যুগে যদি আইন করে অত্যধিক আয় করার পথ বন্ধ করে দেওয়া হয়, তাহলে কি হবে? আমার আয় অল্প বলে, আমার যোগ্যতাকে অল্প বলে প্রতিপন্ন করতে পারেন না।

সুচারু। তোমার সংগে আমি তর্ক করতে চাই না।

তপন। তা তো আপনি চাইবেনই না। আসলে মঞ্জুকে আমার হাতে দেওয়ার বাধা আমার আয় নয়, বাধা আপনার প্রবৃত্তি।

সুচারু। (বিস্মিতভাবে) তার মানে?

তপন। তার মানে আপনি সুখী দম্পতি দেখতে পারেন না, আপনার ঈর্ষা আসে।

সুচারু। এসব তুমি কি বলছ!

তপন। বলছি যা, তা সত্যি! কিছুদিন আগে পাশের বাড়ীর দুটো বিয়ে আপনি ভেঙে দিয়েছিলেন, তা খেয়াল আছে আপনার?

সুচারু। তার তো অন্য কারণ ছিল।

তপন। অন্য কোনো কারণই থাকেনি। শুধু শুধু এক পক্ষের নিন্দে করে আপনি বিয়ে ভাংগবার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন।

সুচারু। তাতে আমার লাভ ?

তপন। লাভ এই যে—সে কথা বলতে গেলে কুৎসিত কথা পাড়তে হয়।

সুচারু। হোক্ তা কুৎসিত, তুমি বল, এমন বিশ্রী অভিযোগ আমি কিছুতেই বরদাস্ত করবনা, বল তুমি।

তপন। আপনার বয়স হয়েছে বটে, কিন্তু এখনও আপনি বুভুক্ষু। কারুর কোন সুখ আপনি সইতে পারছেন না।

সুচারু। (সামান্য দমে গিয়ে) তোমার ইংগিত অত্যধিক নীচ।

তপন। আপনি জানতে চাইলেন, তাই বললুম, কিন্তু আপনি কি সত্যকে এড়াতে পারেন ? আমার ইংগিতের দোষ না দিয়ে আপনার মনকে পরীক্ষা করে দেখুন।

সুচারু। তোমার কথা আমি ভেবে দেখব।

তপন। চল মঞ্জু, একটু বেড়িয়ে আসি আমরা।

সুচারু। দাঁড়াও, একটা কথা—তুমি কি ভগবানে বিশ্বাস কর ?

তপন। (হাসিমুখে) করি।

সুচারু। কেন কর ?

তপন। পৃথিবীতে অসীম অশান্তি, গ্লানি—তাঁর কল্যাণময় শক্তিতে বিশ্বাস না করলে মনে বল পাইনা।

সুচারু মুখ নীচু করে চিন্তিত মনে এক হাতের উপর আর এক হাত ঘষতে লাগলেন। কিছুক্ষণ সমস্ত স্তব্ধ

সুচারু। তাহলে কি তুমি বলতে চাও, পুরুষের সবচেয়ে বড় পরিচয় তার আয় নয়, বড় পরিচয়—

উত্তরের আশায় তপনের মুখের দিকে চাইলেন

তপন। আপনিই বলুন।

সুচারু। বড় পরিচয় তার সংস্কৃতি।

তপন। (আনন্দিত হয়ে) সংস্কৃতি! কি সুন্দর কথা বললেন আপনি।

সুচারু। হুঁ, বড় পরিচয় তার আয় নয়, বড় পরিচয় তার সংস্কৃতি।

তপন। আর আমার কোনও চিন্তা নেই। (হঠাৎ একটা রিভালবার বার করে) এটা আপনার কাছে রাখুন।

সুচারু। (বিস্মিত হয়ে) একি! কি হবে ?

তপন। কিছু না ; ছেলেমানুষি করে সংগে এনেছিলুম।

সুচারু। তার মানে ?

তপন। তার মানে এই যে আপনি মত না দিলে আপনার সামনেই একটা গুলি ছোঁড়া হয়ে যেত।

সুচারু। সর্বনাশ! তুমি আমাকে গুলি করতে নাকি ?

তপন। আপনি আমাকে এতটা হীন মনে করেন ? আপনাকে গুলি করব আমি! (সামান্য হেসে) নিজের মাথাটাই উড়িয়ে দেব ভেবেছিলুম, কি ছেলেমানুষি বলুন তো।

সুচারু। নিশ্চয়, পুরুষমানুষের এত দুর্বলচিত্ত হলে চলে!

তপন। খুব ঠিক কথা ; এ রকম ভাবপ্রবণতা যথেষ্ট নিন্দনীয়। কিন্তু হঠাৎ মনটা কেমন খারাপ হয়ে গিয়েছিল, তাই বেরোবার সময় সংগে নিয়েছিলুম। একটা গুলি ভরা আছে, দেব ফায়ার করে ?

সুচারু। কাকে ফায়ার করবে ?

তপন। ওই মঞ্জুর ছবিটাকে। (দেয়ালে-টাংগান মঞ্জুর একটা বড় ফটো দেখিয়ে) দেব মঞ্জু ?

মঞ্জু। (হাসিমুখে) হঠাৎ ওটার ওপর ঝোঁক গেল কেন ?

তপন। এমনি। দিই ? (ফায়ার করে দিলে)

হঠাৎ সুচারুর ঘুমটা চমকে ভেঙে গেল। চমকে উঠবার সময় হাত লেগে সামনের টেবিলের কাঁচের ফুলদানিটা মেজেয় পড়ে চুরমার হয়ে গেল। সুচারু কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে চেয়ে দেখে, মঞ্জুর ফটোটা আগের মতই হাসছে।

মঞ্জু প্রবেশ করল

মঞ্জু। দিদিমণি।

সুচারু। কি ? কলেজের—

মঞ্জু। (হাসিমুখে ফুলদানিটা দেখিয়ে) এটা বুঝি পড়ে গিয়ে ভেঙে গেল ? ঢুলছিলে বুঝি ?

সুচারু। তপন কদিন আসেনি কেন বল্‌তো ?

মঞ্জু। কি জানি।

সুচারু। চল্, আজ একটু সিনেমা দেখে আসি। যাবার পথে তপনকে ডেকে নেব।

মঞ্জু। (ঈষৎ আশ্চর্যান্বিতভাবে) তাকে আবার কেন ?

সুচারু। তোরা আমাকে সবাই এতদিন ভুল বুঝে এসেছিস, আমি যদি না রাশ টেনে রাখতুম, তাহলে তোরা যে কোথায় গিয়ে এতদিন হাজির হতিস, তাই আমি ভাবি। (সামান্য হাসতে লাগলেন)

মঞ্জু। (কথার ঠিক মানে বুঝতে না পেরে) কি বলছ তুমি দিদিমণি ?

সুচারু। বলছি যা, তা এই সাম্‌নের মাঘ মাসে বুঝতে পারবি।

মঞ্জু। তার মানে ?

সুচারু। তার মানে, মাঘ মাসে বুড়ী দিদিমণির ঘর ছেড়ে কুমার তপনের ঘর আলো করবি। সেই তোর বর হবে, একথা কি আমি আজ ঠিক করেছি ? পুরুষের সবচেয়ে বড় পরিচয় তার আয় নয়, বড় পরিচয় তার সংস্কৃতি। কেমন বল্, খুসী হয়েছিস তো ? বড় একটা মালা গেঁথে রাখ্‌বি নিজের হাতে ; ফুলশয্যার রাতে যখন পরাবি তার গলায়, আমাকে চুপি চুপি ডাকবি। (দাঁড়িয়ে উঠে) চল্ চল্, সিনেমার সময় হয়ে গেল, বড় তাড়াতাড়ি ; তপনকে আবার তুলে নিতে হবে।

আচার্য্য চরক

কবিরাজ শ্রীইন্দুভূষণ সেন আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রী

"চরক" আর্যযুগের গ্রন্থ এবং বর্ত্তমান সময়ে আয়ুর্ব্বেদ সম্বন্ধে প্রামাণ্য সংহিতা। আয়ুর্ব্বেদ সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিতে হইলে চরক সংহিতা পাঠ করিতেই হইবে। সুতরাং এই চরক কে ছিলেন এবং তাঁহার গ্রন্থে কি আছে জানিবার আগ্রহ স্বাভাবিক। চরকের পরিচয় সংগ্রহ করা অতীব কঠিন। আমরা চরকের ইতিবৃত্ত যতদূর জানিতে পারিয়াছি নিম্নে তাহা প্রদান করিলাম।

আত্রেয় পুনর্বসু অগ্নিবেশ, ভেল, জতুকর্ণ, পরাশর, হারীত ও ক্ষারপাণি এই ছয়জন শিষ্যকে আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা দিয়াছিলেন। ইঁহারা প্রত্যেকে স্ব স্ব নামে এক একখানি সংহিতা রচনা করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে অগ্নিবেশসংহিতা অধুনালুপ্ত হইলেও উহা চরকাচার্য্য কর্ত্তৃক সংস্কৃত হইয়া 'চরক সংহিতা' নামে সুপ্রসিদ্ধ হইয়াছে। এই চরক সংহিতাই আমাদের অন্যতম প্রধান এবং প্রামাণ্য বৈদিক গ্রন্থ। চরক কে এবং কোথায় ও কখন প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিলেন এ বিষয়ে বহু মতভেদ দৃষ্ট হয়। আমরা পর পর আলোচনা করিতেছি।

চরক শব্দটার উল্লেখ বিভিন্ন গ্রন্থে দেখা যায়। যথা—

(১) কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদের অন্যতম শাখা চরক নামে প্রসিদ্ধ। ইহা শতপথ ব্রাহ্মণে উল্লেখ দেখা যায়।

(২) ললিতবিস্তারের ১ম অধ্যায়ে—'অন্যতীর্থিক-শ্রমণ-ব্রাহ্মণ-চরক-পরিব্রাজকানাম্'—এই বচনে শ্রমণাদি শ্রেণীর মধ্যে চরক শব্দ পাওয়া যায়।

(৩) বৃহজ্জাতকে বরাহমিহির প্রব্রজ্যাযোগ বর্ণনা প্রসঙ্গে চরক শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। (১৫-১)

(৪) নৈষধ চরিতে শ্রীহর্ষ চরঃ অর্থাৎ গুপ্তচরের ন্যায় এইরূপ চরক শব্দের অর্থ প্রয়োগ করিয়াছেন। (৪।১১৬)

(৫) তৈত্তিরীয় সংহিতার চরকাচার্য্য পদের ব্যাখ্যায় ভাষ্যকার সায়ন উহার নট বিশেষ অর্থ করিয়াছেন।

(৬) ভাবপ্রকাশে চরককে শেষ অবতাররূপে বর্ণনা করা হইয়াছে।

(৭) বৃহজ্জাতকের টীকায় টীকাকার রুদ্র চরক শব্দের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন যে, ইনি বৈদ্য বিদ্যায় বিশেষ পণ্ডিত ও ভিক্ষাবৃত্তিধারী হইয়া গ্রামে গ্রামে বৈদ্য বিদ্যার উপদেশ ও ঔষধ দিয়া লোকের উপকার করিতেন। গ্রামে গ্রামে চরণশীল বলিয়া ইঁহার নাম চরক। ইনি অগ্নিবেশ সংহিতার সংস্কার করিয়াছিলেন।

(৮) ন্যায়মঞ্জুরীর জয়ন্ত ভট্ট সমস্ত পদার্থতত্ত্বে জ্ঞানবান বলিয়া চরকের সম্মান করিয়াছেন।

(৯) চক্রপাণি তাঁহার চরকীয় টীকায় (আয়ুর্ব্বেদ দীপিকা) প্রথমে চরক ও পতঞ্জলির নাম একত্র উল্লেখ করিয়াছেন।

(১০) শুক্ল যজুর্ব্বেদের ৩০ অধ্যায়ে পুরুষমেধ প্রকরণে ১৮ মন্ত্রে 'দুষ্কৃতায় চরকাচার্য্যম্' এই পাঠ আছে। ইহা দেখিয়া এই চরকই বৈদ্যাচার্য্য, অতএব ইহা অতি প্রাচীন এ কথা কেহ কেহ বলেন। কিন্তু দুষ্কৃত দেবতার উদ্দেশে সমর্প্যমান চরকাচার্য্যও দুর্বৃত্তমান হইবার কথা। সুতরাং এই চরকাচার্য্য বৈদ্যকগ্রন্থ চরকাচার্য্য নহেন।

(১১) পাণিনি ব্যাকরণে দুই স্থানে চরক শব্দের উল্লেখ দেখা যায়। এক হইতেছে—'কঠচরকাল্লুক' (৪-৩-১০৭)। অপরটি হইতেছে—'মানবক চরকাভ্যাং খঞ্' (৫-১-১৪) এই সমস্ত প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া চরকের সময় সম্বন্ধে প্রধানতঃ তিনটী মত দেখা যায়—

(ক) পাণিনির "কঠ চরকাল্লুক"—এই সূত্র দৃষ্টে কেহ কেহ বলেন যে যেহেতু পাণিনি চরক শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন অতএব চরক পাণিনি অপেক্ষা পূর্ব্ববর্ত্তী। মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ শ্রীযুত গণনাথ সেন, নেপাল রাজগুরু পণ্ডিত হেমরাজজী প্রভৃতি পণ্ডিতগণ দেখাইয়াছেন যে, উক্ত মত বিচারসহ নহে। কারণ পাণিনিবর্ণিত কঠ ও চরক যজুর্ব্বেদের শাখা বিশেষের প্রবক্তা দুইজন ঋষি। সেই চরক শুধু প্রতিসংস্কর্ত্তা চরকের কেন—আত্রেয় অগ্নিবেশাদির অনেক পূর্ব্ববর্ত্তী। আর পাণিনির অপর সূত্রে 'মাণবক চরকাভ্যাং খঞ্' এই চরক শব্দও চরকশাখার অপর চরককেই সূচনা করে।

(খ) চক্রপাণির 'পাতঞ্জল মহাভাষ্য চরক প্রতিসংস্কৃতৈঃ' বাক্যের জন্য অনেকে বলেন যে, মহাভাষ্যকার পতঞ্জলি, যোগসূত্রকার পতঞ্জলি ও অগ্নিবেশ সংহিতার প্রতিসংস্কর্ত্তা চরক—একই ব্যক্তি। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুত গণনাথ সেন মহাশয় এই মত সমর্থন করিয়া লিখিয়াছেন, "আমাদের মতে ভগবান্ পাতঞ্জলিই চরক সংহিতার প্রতিসংস্কর্ত্তা চরক মুনি। পতঞ্জলি কেবল অগ্নিবেশ সংহিতার প্রতিসংস্কর্ত্তা নহেন, রসশাস্ত্র সম্বন্ধেও তাঁহার কথিত অনেক উপদেশ দেখিতে পাওয়া যায়। কথিত আছে শেষাবতার পতঞ্জলি মনুষ্যের মনের রোগ দূর করিবার জন্য পাতঞ্জল দর্শন, বাক্যের দোষ নিবারণার্থ মহাভাষ্য ও শরীরের দোষ নিবারণের জন্য চরক সংহিতা প্রভৃতি বৈদ্যক গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন।" কিন্তু নেপাল রাজগুরু পণ্ডিত হেমরাজ শর্ম্মা বহু বিচার করিয়া প্রমাণ করিয়াছেন যে, এই মত বিচারসহ নহে। তিনি দেখাইয়াছেন যে, ভাণ্ডারকরের মতে পতঞ্জলির সময় ২০০ শত খৃঃ পূর্ব্ব। ত্রিপিটক দৃষ্টে চরককে কণিষ্কের সমসাময়িক বলিলে সময়টা আরও ২।৩ শত বৎসর পরে হয়। যোগশাস্ত্রে ও ব্যাকরণেই পতঞ্জলির নাম প্রসিদ্ধ। বৈদ্যকে উহার উল্লেখ নাই। মহাভাষ্যে পতঞ্জলি নিজেকে গোনর্দীয় বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন অর্থাৎ তাঁহার বাসভূমি গোনর্দ দেশে ইহাও মনে রাখিতে হইবে। কাশিকাকৃত ব্যাখ্যায় গোনর্দ দেশকে পূর্ব্বদেশান্তর্গত করা হইয়াছে। ভাণ্ডারকর ইহাকে গোণ্ডা প্রদেশ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কেহ কেহ কাশ্মিরকেই গোনর্দ বলেন। যদি চরক ও পতঞ্জলি এক হন তাহা হইলে চরক নিজেকে গোনর্দ দেশীয় বলিলেন না কেন? চরকে পাঞ্চাল, পঞ্চনদ, কাম্পিল্য প্রদেশের উল্লেখ আছে। কিন্তু কোথাও গোনর্দ প্রদেশের উল্লেখ নাই।

পতঞ্জলির ভাষা দুর্ব্বোধ্য। কিন্তু চরকের ভাষা অতি সরল ও প্রাঞ্জল। পতঞ্জলি সূত্রাকারে যোগশাস্ত্র ও মহাভাষ্য গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। তিনি নিজের নাম না দিয়া কেন অপরের নামের গ্রন্থের প্রতিসংস্কার করিতে যাইবেন। শিবদাস ও চক্রপাণির টীকায় তদুক্তং পতঞ্জলেঃ এই বচন যেখানে আছে তাহা রসবিষয়ে। সুতরাং এই পতঞ্জলি রসবৈদ্যক তন্ত্রকার অন্য কোন পতঞ্জলি হইবেন বলিয়া মনে হয়। যদি এই পতঞ্জলিই চরক হন তবে রসায়নাচার্য্য পতঞ্জলি চরক সংহিতায় রস ও ধাতুঘটিত ঔষধ বিষয় বলেন নাই কেন? তবে আমার রসবিষয়ক গ্রন্থে বিশদ বলা হইয়াছে এরূপ কোন উল্লেখও করেন নাই।

চরক নিজে প্রতিসংস্কারক দৃঢ়বল, প্রাচীন টীকাকার ভট্টারক হরিচন্দ্রাদি, বাগ্‌ভটাদি আচার্য্য প্রভৃতি সকলেই চরককেই উল্লেখ করিয়াছেন। পশ্চাদ্বর্ত্তী টীকাকার চক্রপাণি ও নাগেশাচার্য্য পতঞ্জলির কথা বলিয়াছেন। চক্রপাণির বচনে যে চরক প্রতিসংস্কৃতৈঃ বাক্যটী আছে তাহার অর্থ চরক সংহিতার প্রতিসংস্কারক অথবা নাগেশাচার্য্যের 'চরকে পতঞ্জলিঃ' ইহার দ্বারাও পতঞ্জলিই যে চরক ইহা প্রমাণ হয় না।

সন্ন্যাসী গায়ে পড়িতে চরণ থামিল বাসবদত্তা

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শিল্পী—শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ দাস

ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

আর এক কথা—ইহাও ঠিক যে, যিনি যে বিষয় বা দেশকে বিশেষভাবে জানেন উহা তাহার হৃদয় মধ্যে গ্রথিত হইয়া যায় এবং বার বার মনে আসে। যেমন মহাভাষ্যে পাটলিপুত্রের ভূয়শঃ উল্লেখ থাকায় বুঝা যায় যে গ্রন্থকার ঐ নগরের সহিত পরিচিত ছিলেন। একব্যক্তি নানা গ্রন্থ প্রণয়ন করিলে অনেক সময় উল্লেখ করেন যে—"এই বিষয়টী আমি অমুক গ্রন্থে প্রতিপাদন করিয়াছি। সেই হিসাবে যদি মহাভাষ্যকার পতঞ্জলি ও চরকাচার্য্য একই ব্যক্তি হন তবে চরকে যেখানে মহাভাষ্যগত বিষয় আছে অথবা মহাভাষ্যে যেখানে চরকীয় বিষয় আছে তাহার বর্ণনা প্রসঙ্গে আমরা উহাদের এক ব্যক্তিত্ব বুঝিতে পারিতাম। কিন্তু সেরূপ উপলব্ধি হয় না, পাণিনির 'উদঃ স্থা স্তম্ভোঃ পূর্ব্বস্য' (৮-৪-৬১) সূত্রের ভাষ্যে পতঞ্জলি "উৎকন্দক" রোগের উল্লেখ করিয়াছেন। আবার "হ্বঃ সংপ্রসারণম্" (৬-১-৩২) সূত্রের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন—"দধিত্রপুষং প্রত্যক্ষোজ্বরঃ, জ্বর নিমিত্তমিতি গম্যতে নড়্‌লোদকং পাদরোগঃ" ইত্যাদি। অথচ চরকে দধি ও ত্রপুস জ্বরের কারণ বলিয়া কোথাও উল্লেখ নাই বা নড়্‌লোদক পাদরোগের কারণ এ কথাও নাই। আবার ভাবপ্রকাশাদি গ্রন্থে উৎকন্দক নামক রোগের উল্লেখ থাকিলেও চরকে নাই। মহাভাষ্যে পাটলিপুত্র নগরের বহু উল্লেখ থাকিলেও চরকে একবারও উহার উল্লেখ নাই। ইহা ছাড়া চরকোক্ত যোগশাস্ত্রের বর্ণনা পাতঞ্জল যোগশাস্ত্র হইতে পৃথক। ইহাতেও বুঝা যায় যে, যোগসূত্রকার পতঞ্জলি ও চরকাচার্য্য এক ব্যক্তি নহেন।

পণ্ডিত যাদবজী ত্রিকমজীও চরক ও পতঞ্জলি যে এক ব্যক্তি এই মত সমর্থন করিতে পারেন নাই। তিনি লিখিয়াছেন যে—

"চরক প্রতি অধ্যায়ের শেষে অগ্নিবেশকৃতে তন্ত্রে চরক প্রতিসংস্কৃতে' এই পাঠ করিয়াছেন, কোথাও 'পতঞ্জলি প্রতিসংস্কৃতে' এরূপ পাঠ নাই।

দৃঢ়বলও চিকিৎসাস্থানের এবং সিদ্ধিস্থানে চরকসংস্কৃত অগ্নিবেশতন্ত্রে এরূপ লিখিয়াছেন, পতঞ্জলির নাম করেন নাই।

চরক সংহিতার ব্যাখ্যাকারের মধ্যে ভট্টারহরিচন্দ্র সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন ইহা সকলেই স্বীকার করেন। ইনি চরক ব্যাখ্যায় প্রথমেই চরককে প্রণাম করিয়াছেন, পতঞ্জলির নাম করেন নাই। বাগভটও চরক-সুশ্রুতের প্রতি প্রীতি রাখিতে বলিয়াছেন, পতঞ্জলির নাম করেন নাই। যদি ইঁহাদের সময়ে চরক ও পতঞ্জলি একই ব্যক্তি এই মত প্রচার থাকিত, তবে নিশ্চিত তাঁহাদের লেখায় কোথাও না কোথাও ইহার আভাষ পাওয়া যাইত।

(গ) ত্রিপিটক গ্রন্থের প্রমাণের বলে অনেকে বলেন যে, মহারাজ কনিষ্কের রাজবৈদ্য চরকই অগ্নিবেশতন্ত্রের প্রতিসংস্কর্ত্তা। সিলভাঁ লেভি সাহেব 'Journal Asiatique' নামক পত্রিকায় এই মত বিশেষভাবে প্রচার করেন। হর্নলে সাহেবও তাহার 'Osteology' পুস্তকে উল্লেখ করেন যে চরক মহারাজ কনিষ্কের রাজবৈদ্য ছিলেন। কিন্তু মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুত গণনাথ সেন মহাশয় এই মত সমর্থন করেন নাই। তিনি লিখিয়াছেন যে, "এই চরকই যে বর্ত্তমান চরক সংহিতার লেখক তাহা বোধ হয় না ; কেন না তাহা হইলে কাশ্মিরের রাজতরঙ্গিণী নামক ইতিহাসে অবশ্য কনিষ্ক প্রসঙ্গে প্রতিসংস্কর্ত্তা চরকের নাম উল্লিখিত হইত।" ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত মহাশয় তাঁহার History of Indian Philosophy নামক গ্রন্থে মহামহোপাধ্যায়ের এই মত সমর্থন করেন নাই। তিনি যুক্তিসহ লিখিয়াছেন যে, রাজতরঙ্গিণী রাজাদের ইতিহাস। তাহাতে যে রাজবৈদ্য চরকেরও উল্লেখ থাকিবে এমন কোন কথা নাই। দাশগুপ্ত মহাশয়ের মতও প্রতিসংস্কারক চরকই কনিষ্কের রাজবৈদ্য চরক। আমরাও এই মত সমীচীন বলিয়া মনে করি যে প্রতিসংস্কারক চরকাচার্য্য কনিষ্কের রাজবৈদ্য ছিলেন।

ঐতিহাসিকদিগের মতে কনিষ্কের সময় ৭৮-১১৯ খৃষ্টাব্দ। অতএব দেখা যাইতেছে যে, প্রায় আঠারশত বৎসর পূর্ব্বে চরকাচার্য্যের প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল।

দৃঢ়বল—চরকাচার্য্যের প্রসঙ্গে দৃঢ়বলের কথা আসিয়া পড়ে। কারণ প্রচলিত চরকসংহিতার মূলের পাঠ হইতে (চিকিৎসিত স্থান অধ্যায় ৩০ এবং সিদ্ধিস্থান অধ্যায় ১২) আমরা দেখিতে পাই যে, চিকিৎসিত স্থানের শেষ ১৭টী অধ্যায় এবং কল্প ও সিদ্ধিস্থান দৃঢ়বল কর্ত্তৃক প্রতি-সংস্কৃত হইয়াছিল। অর্থাৎ চরক প্রতিসংস্কৃত অগ্নিবেশতন্ত্রে বা চরক-সংহিতার অঙ্গহানি ঘটিলে আচার্য্য দৃঢ়বল তাহা পূরণ করেন।

দৃঢ়বল উক্ত অধ্যায় দুইটীতে কাপিলবলি অর্থাৎ কপিলবলের পুত্র এবং পঞ্চনদপুরে জাত বলিয়া নিজের পরিচয় দিয়াছেন। রাজতরঙ্গিণী দৃষ্টে আমরা জানিতে পারি যে, এই পঞ্চনদ কাশ্মির দেশের অন্তর্ভুক্ত ছিল। কেহ কেহ বলেন যে, পঞ্চনদ বলিতে পঞ্জাবকে বুঝায়। বাগভট দৃঢ়বলসংস্কৃত চরকসংহিতা হইতে বহু পাঠ উদ্ধৃত করিয়াছেন দেখিয়া আমরা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি যে, দৃঢ়বল বাগভটের পূর্ব্ববর্ত্তী ছিলেন।

চরকসংহিতার টীকাকারগণ—চরকপ্রণীত চরকসংহিতা এমন একখানি বিরাট গ্রন্থ যে বহু পণ্ডিত ইহার টীকা রচনা করিয়াছিলেন। চরকসংহিতার টীকাকারগণের মধ্যে আমরা নিম্নলিখিত নামগুলি দেখিতে পাই। যথা—(১) ঈশান দেব (২) শ্রীহরিচন্দ্র (৩) বাপ্যচন্দ্র (৪) বকুল (৫) আচার্য্য জীরদত্ত (৬) ভিষক ঈশ্বর সেন (৭) মৈত্রদত্ত (৮) জিন দাস (৯) গুণাকর। কিন্তু দুঃখের বিষয় ইঁহাদের লিখিত টীকা অধুনা পাওয়া যায় না।

নিম্নলিখিত টীকাকারগণের টীকা সুপ্রসিদ্ধ।

	চরকের টীকাকার			টীকার নাম
(১)	ভট্টারক হরিচন্দ্র	...	...	চরকন্যাস
(২)	জেজ্জট	...	...	নিরন্তরপদব্যাখ্যা
(৩)	চক্রপাণি	...	...	আয়ুর্ব্বেদ দীপিকা
(৪)	শিবদাস সেন	...	...	তত্ত্ব প্রদীপিকা
(৫)	মহাত্মা গঙ্গাধর	...	...	জল্পকল্পতরু
(৬)	বৈদ্যরত্ন যোগীন্দ্রনাথ সেন এম-এ	...		চরকোপস্কার

চরকসংহিতার সম্যক জ্ঞানলাভ করিতে হইলে উক্ত টীকাগুলি পাঠ করা একান্ত প্রয়োজন। নতুবা চরকের গভীর তথ্যসমূহ হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভব নহে।

চরকের উপদেশ—মহর্ষি আত্রেয় অগ্নিবেশকে যে উপদেশ দিয়াছিলেন তাহাই চরকসংহিতার প্রতি ছত্রে ছত্রে প্রকটিত। তাই চরক বলিতেছেন যে,—

ধর্ম্মার্থকার্থকামার্থমায়ুর্ব্বেদো মহর্ষিভিঃ।
প্রকাশিতো ধর্ম্মপরৈরিচ্ছদ্ভিঃ স্থানমক্ষরম্।
নাত্মার্থং নাপি কামার্থমথ ভূতদয়াং প্রতি ॥
বর্ত্ততে যশ্চিকিৎসায়াং স সর্ব্বমতিবর্ত্ততে।

—ধর্ম্মপরায়ণ মহর্ষিগণ ধর্ম্মার্থকাম ও মোক্ষ লাভার্থে আয়ুর্ব্বেদ প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাঁহারা নিজের স্বার্থ বা কাম চরিতার্থ করিবার উদ্দেশে আয়ুর্ব্বেদ প্রচার করেন নাই। তাঁহাদের স্বার্থ ভূতগণের প্রতি দয়া। অতএব যিনি চিকিৎসাতে প্রবৃত্ত হইবেন, তাঁহাকে সর্ব্বোপরি বর্ত্তমান থাকিতে হইবে। এই জন্যই তিনি বলিয়াছেন যে—

কুর্ব্বতে যে তু বৃত্ত্যর্থং চিকিৎসাপণ্যবিক্রয়ম্।
তে হিত্বা কাঞ্চনং রাশিং পাংশুরাশিমুপাসতে ॥

—যাঁহারা বৃত্তির জন্য চিকিৎসারূপ পণ্য বিক্রয় করেন, তাঁহারা কাঞ্চন-রাশি পরিহার করিয়া পাংশুরাশির উপাসনা করেন।

পরো ভূতদয়াধর্ম্ম ইতি মত্বা চিকিৎসয়া
বর্ত্ততে যঃ স সিদ্ধার্থঃ সুখমত্যন্তমশ্নুতে ॥"

—প্রাণীদিগের প্রতি দয়াই পরমধর্ম্ম, এই মনে করিয়া যিনি চিকিৎসা কার্য্যে প্রবৃত্ত হন, তিনি সকলপ্রযত্ন হইয়া পরম সুখভোগ করিয়া থাকেন।

কারণ ও কার্য্যের পরিভাষা নির্দ্দেশপূর্ব্বক ধাতুর সাম্য বা অরোগিতার বিচার করিয়া চরকসংহিতা রচিত। চরকের মতে ইহাই চিকিৎসার প্রধান সূত্র। এই সূত্র বুঝিতে হইলে দর্শনশাস্ত্রে প্রগাঢ় অধিকার থাকা চাই। চরকের সূত্রস্থান সেই ষড়দর্শনের মীমাংসায় প্রকটিত।

চরক বলিয়াছেন যে, যে গুণ সর্ব্বদাই পুরুষের অনুবর্ত্তী হয়, তাহাকেই মন বলে। ইন্দ্রিয় সকল মনের অনুবর্ত্তী হইয়াই বিষয় গ্রহণে সমর্থ হয়। দৃষ্টি, শ্রবণ, ঘ্রাণ, রসন ও স্পর্শন—এই পঞ্চ ইন্দ্রিয়। এই পঞ্চেন্দ্রিয়ের উপকরণদ্রব্য যথাক্রমে জ্যোতিঃ, আকাশ, ক্ষিতি, জল ও বায়ু। এই পঞ্চেন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠান বা আশ্রয় স্থান যথাক্রমে অক্ষিদ্বয়, কর্ণদ্বয়, নাসাদ্বয় জিহ্বা ও ত্বক। এই পঞ্চেন্দ্রিয়ের ভোগ্য বিষয় যথাক্রমে—রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস ও স্পর্শ। এই পঞ্চেন্দ্রিয়ের বুদ্ধি বা বোধ যথাক্রমে দর্শনবোধ, শ্রবণবোধ, ঘ্রাণবোধ, স্বাদবোধ ও স্পর্শবোধ। ইন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয়ার্থ, মন ও আত্মা একযোগ হইলেই তত্তৎবোধের উদয় হয়। সেই বুদ্ধি ক্ষণিকা ও নিশ্চিয়াত্মিকা ভেদে দ্বিবিধ। মন, মনের বিষয়, বুদ্ধি ও আত্মা—এই কয়টাই শুভাশুভ প্রবৃত্তির হেতু। পুরুষের ক্রিয়া দ্রব্যাশ্রিত, এজন্য ইন্দ্রিয় সকল পঞ্চমহাভূতের বিকার। তেজ চক্ষুতে, আকাশ কর্ণে, ক্ষিতি ঘ্রাণে, জল রসনে ও বায়ু স্পর্শনে বিশেষরূপে বিদ্যমান। যে ইন্দ্রিয় যে মহাভূতে নির্ম্মিত, সেই ইন্দ্রিয় তদভাবাপন্ন বলিয়া সেই মহাভূতোকরণ বিষয়েরই অনুসরণ করে। সেই বিষয়ের অতি যোগ, অযোগ ও মিথ্যাযোগ হইলেই মন ও ইন্দ্রিয় বিকৃত হয়। এক কথায় রোগ ইহারই নামান্তর। দেহীদিগের শরীরে এইরূপভাবে যাহাতে রোগাক্রমণ না ঘটিতে পারে—মহর্ষি চরক সেজন্য উপদেশ দিয়াছেন যে, "অসাত্ম্য বিষয় পরিহারপূর্ব্বক অসাত্ম্য বিষয়ের অনুসরণ করিবে, সমীক্ষ্যকারিতা সহকারে দেশ, কাল ও আত্মার অবিরুদ্ধ ব্যবহার করিবে, সর্ব্বদা মন স্থির রাখিয়া সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিবে। এই সকল কার্য্য করিলেই যুগপৎ আরোগ্য-লাভ ও ইন্দ্রিয় জয়ে সমর্থ হইবে। চরকীয় চিকিৎসায় ইহাই হইল মুখ্য অভিপ্রায়। চরকের এই অভিপ্রায় বুঝিয়া যিনি চিকিৎসা কার্য্যে ব্রতী হন, তাঁহারই চিকিৎসাবৃত্তি সার্থক। রোগ হইলে রোগ প্রতিকারক উপায় করিবে—ইহা তো সকল দেশের চিকিৎসা শাস্ত্রই নির্দ্দেশ করিয়াছেন, কিন্তু প্রাণীজগতে যাহাতে রোগের আক্রমণ না হইতে চরক গ্রন্থারম্ভের প্রথমেই তাহার উপদেশ দিয়াছেন।

চরক স্বাস্থ্যরক্ষা ও দীর্ঘজীবন লাভের উপায় সম্বন্ধে যে সকল সদ্বৃত্তের কথা বলিয়াছেন তাহাপেক্ষা কোন নূতন উপদেশ কেহই দেন নাই। এই উপদেশের পর ত্রিবিধ এষণার উপদেশ দিয়াছেন। এষণা শব্দের অর্থ চেষ্টা বা অন্বেষণ। তাঁহার উপদেশ হইতেছে এই—পুরুষের উচিত যে, মন, বুদ্ধি, পৌরুষ ও পরাক্রম অব্যাহত রাখেন এবং ইহ-পরলোকে মঙ্গলার্থী হইয়া তিনটী এষণার অনুসরণ করেন। ঐ তিনটী এষণার নাম প্রাণৈষণা, ধনৈষণা ও পরলোকৈষণা। ইহার মধ্যে প্রাণৈষণা বা প্রাণরক্ষার চেষ্টা সর্ব্বাগ্রে অনুসরণীয়। এইজন্য সুস্থ ব্যক্তির উচিত স্বাস্থ্যের অনুপালন করা এবং পীড়িতের উচিত পীড়ার শান্তি বিধান করা। ইহার পরই দ্বিতীয় এষণা বা ধনৈষণার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। কারণ ধন না থাকিলে পাপী হইতে হয় ও দীর্ঘায়ু লাভ হয় না। তিনি ধনোপার্জ্জনের উপায় নির্দ্দেশে বলিয়াছেন যে ধনোপার্জ্জনের জন্য কৃষি, পশুপালন, বাণিজ্য, রাজসেবা প্রভৃতি অবলম্বন করা উচিত। তদ্ভিন্ন সাধুদিগের অনিন্দিত অন্যান্য কর্ম্মও নির্দ্দিষ্ট আছে। তদ্দ্বারা বৃত্তি ও পুষ্টিলাভ হইয়া থাকে। এই সকল কর্ম্ম করিলে যাবজ্জীবন সম্মানের সহিত কালযাপন করিতে পারেন। তাহার পর তৃতীয় এষণা বা পরলোকৈষণার অনুসরণ করিতে হয়। ইহলোক হইতে চ্যুত হইলে পুনর্ব্বার কিরূপে উৎপন্ন হইব কিংবা উৎপন্ন হইব কিনা এ সম্বন্ধে কাহারও কাহারও সংশয় আছে। সংশয়ের কারণ এই যে পুনর্জ্জন্ম অপ্রত্যক্ষ। এই সম্বন্ধে চরক বহু বিচার করিয়া বলিয়াছেন যে, ক্ষিতি, অপ, তেজঃ, মরুৎ ও ব্যোম এবং আত্মার সমবায় হইতে গর্ভের উৎপত্তি হয় এবং আত্মার সহিত পরলোকের সম্বন্ধ আছে। কর্ত্তা ও কারণ এই উভয়ের যোগেই ক্রিয়া হয়। কৃতকর্ম্মের ফল আছে, অকৃত কর্ম্মের ফল নাই, বীজ না থাকিলে অঙ্কুরের উৎপত্তি হয় না। যেমন কর্ম্ম সেইরূপই ফল হইয়া থাকে। এক বীজ হইতে অন্য অঙ্কুরের উৎপত্তি হয় না। এজন্য পরজন্ম স্বীকার না করিয়া থাকা যায় না। পরজন্ম স্বীকার করিতে হইলে ধর্ম্মবুদ্ধিপরায়ণ হইতে হইবে। পারলোকিক এষণা তাহারই জন্য অনুসরণ করা কর্ত্তব্য। চরকের প্রতি ছত্র এইরূপ উপদেশ পূর্ণ।

দুপুরের ট্রেণে

শ্রীশ্যামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ

দুপুরের ট্রেণে কখনো কি তুমি চড়েছ রাণী ?
ভরা জ্যৈষ্ঠের পাথর ফাটানো অগ্নিশেল,
বুড়ো সঙ্গীর বিরামবিহীন শুনেছ বাণী,
শপথ করে কি হাসিমুখে যেতে চেয়েছ জেল ?
গল্পই বলি, প্রেমের কথাতো অনেক হ'ল,
থার্ড ক্লাস গাড়ি, ট্যাঁকের খবর আছেতো জানা !
সুখের দুপুরে ঘুমটুকু শুধু অকালে মোলো,
বেঁচে থাকে ঠিক পাহাড়প্রমাণ আম ও ছানা।

বোনগাঁর ট্রেণ, তাম্বুলবাহী উড়ের ভিড়ে,
গুঁড়ো কয়লায়, জমাট আগুনে, ভারি বাতাস ;
জগন্নাথের রাজ্য আবার এলো কি ফিরে,
জাপানীরা আসে—শূন্যে মিলায় দীর্ঘশ্বাস।
"বাঙ্গালীর দেশ, বুঝলে হে ভায়া, এরাই খেলে,"
পাশের শতায়ু বলেন চেঁচিয়ে অবাক মানি ;
মনে মনে ভাবি, ভগবান চাও চক্ষু মেলে,
গরীব ব'লে কি করুণাও নাই—একটুখানি ?

চড়চড়ে রোদ বাইরে ভিতরে হাটের ভিড়,
স্বপ্নের চোখ গ'লে যায়, চোখে নামে তিমির।

সেতুবন্ধ রামেশ্বর

শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত এম-এ, বি-এল

শ্রীমন্দির ঘিরে সহর। তার ক্রিয়া-কলাপ, চিন্তা-প্রবাহ, এমন কি চলা-ফেরার কেন্দ্র পার্ব্বতী-পরমেশ্বর। তীর্থযাত্রী মন্দিরের মাঝে দিন কাটায়, দোকানদার তার প্রত্যাশায় বিপনী সাজিয়ে বসে থাকে, পুরোহিত, ব্রাহ্মণ, এমন কি ভিক্ষুক, মন্দিরের মুক্ত বা রুদ্ধ দ্বারের প্রতীক্ষায় নিজ নিজ দৈনিক কর্ত্তব্যের নির্ঘণ্ট নিয়ন্ত্রণ করে।

কাশীর ঘাটের জমজমাট, রঙের খেলা বা বাক-প্রগল্ভতায় মুখরিত নয় কোনো তীর্থের ঘাট। শ্রীক্ষেত্রের সাগরকূলের উত্তেজনা বা বিলাসিতা নাই এখানে। রামেশ্বরের সমুদ্র তীরে লোকে পিতৃ-তর্পণে ব্যস্ত। যারা স্নান-বিলাসী তারা নীরবে অবগাহন করে, সাঁতার কাটে কিম্বা এক বুক জলে দাঁড়িয়ে দিগন্তপ্রসার নীলের বিরাট গাম্ভীর্য্যে মুগ্ধ হয়। সাহিত্যা-মোদী তীরে দাঁড়িয়ে দেখে—

দূরাদয়শ্চক্রনিভস্য তন্বী
তমালতালীবনরাজিনীলা।
আভাতি বেলা লবণাম্বুরাশে-
র্ধারা নিবদ্ধেব কলঙ্করেখা॥

কালিদাসের অয়শ্চক্রনিভ উপমার মাধুরী হৃদয়ঙ্গম হয়, এই অৰ্দ্ধ-চক্রাকার সমুদ্র-বেলায় দাঁড়িয়ে কুলের দিকে তাকালে। উপরে তমাল-তালীর রূপ ক্রমশঃ ক্ষীণ হ'তে ক্ষীণতর হ'য়ে রেখায় পরিণত হয়েছে। অয়শ্চক্রের প্রান্তের কলঙ্ক-রেখা সৃষ্টি করেছে বালি আর ক্ষুদ্র উপল। সীতা-দেবীকে উদ্ধার ক'রে সেতু-বন্ধের সেতু দেখিয়ে শ্রীরামচন্দ্র বলেছিলেন—

বৈদেহি পশ্যামলয়াৎ বিভক্তং
মৎসেতুনা ফেনিলমম্বুরাশিম্।
ছায়াপথেনেব শরৎপ্রসন্ন
মাকাশমধিকৃত-চারুতারম॥

"রামাভিধানো হরির" "মৎসেতুনা" কথার আমিত্ব দোষ যাতে তাঁকে স্পর্শ না করে, সেই উদ্দেশ্যে বোধ হয়, মল্লিনাথ বলেছেন—"হর্ষাধিক্যাচ্চ মদ্‌গ্রহণম।" মাত্র সাহিত্য-রসিক কেন ? + মানুষ মাত্রেরই মনে আনন্দ জাগে এই রত্নাকরের রত্ন-রঙীণ উপকূলে দাঁড়িয়ে। শ্রীশঙ্করাচার্য্য, শ্রীচৈতন্য প্রভৃতি ভারতের বহু মহামানবের পদধূলি পূত এই বেলাভূমি।

শ্রীচৈতন্য সেতুব যাবার পথে দক্ষিণ-মথুরায় এক ব্রাহ্মণের আতিথ্য গ্রহণ করেছিলেন। বিপ্র শ্রীরামের ভক্ত। তাঁকে প্রভু সীতাহরণের আসল তথ্য বুঝিয়েছিলেন। ঈশ্বর-প্রেয়সী সীতা—চিদানন্দ মূর্ত্তি। নর বা রাক্ষসের সাধ্য কি তাঁকে স্পর্শ করে। রাবণ-দর্শনেই সীতা অন্তর্ধ্যান কল্লে'ন। রাবণ মায়া-সীতা হরণ ক'রে নিয়ে গেল। পরে মহাপ্রভু সেতুবন্ধে এসে, ধনুস্তীর্থে স্নান ক'রে, রামেশ্বর দর্শনের পর, বিপ্র-সভায় সীতা-হরণের বৃত্তান্ত শুনেছিলেন। রাবণের আক্রমণ হ'তে রক্ষা কর্ব্বার জন্য অগ্নি সীতাকে আবরণ
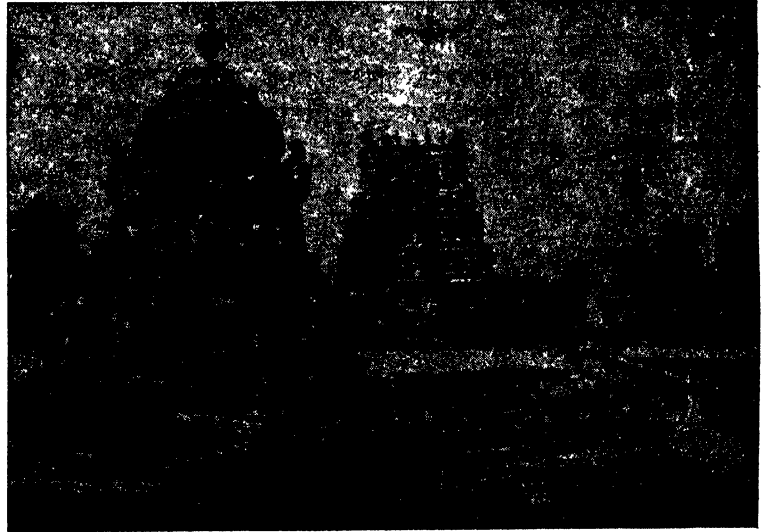
রামেশ্বরম্ মন্দির

করলেন। রাবণ মায়া-সীতা হরণ করলে। অগ্নি সীতাকে পার্ব্বতীর নিকট রাখলেন। পরে—

রঘুনাথ আসি যবে রাবণে মারিল
অগ্নি-পরীক্ষা দিতে সীতারে আনিল।
তবে মায়া-সীতা অগ্নো কৈল অন্তর্ধান।
সত্য-সীতা আনি দিল রাম বিদ্যমান।*

* কূর্ম্মপুরাণের যে শ্লোকের ভিত্তিতে অগ্নি-পরীক্ষার এই চমৎকার তথ্য, সে শ্লোক দুটিও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আছে। মধ্যলীলা, নবম পরিচ্ছেদ, ২১১-২১২ শ্লোক।

দক্ষিণের গৃহস্থবধূ আলপনা-নিপুণা। সকালে উঠে তারা প্রত্যেকে নিজ নিজ গৃহের সামনে চিত্র আঁকে। সেতুবন্ধ রামেশ্বরে সমুদ্রের পথে ব্রাহ্মণদের কুটীর। প্রত্যুষে সাগর-স্নান ক'রে কুলবধূরা গৃহদ্বারে চারুশিল্পের আলেখ্যে কমলার আবাহন করে। কিন্তু চঞ্চলা চিত্রের লোভে পথ ভুলে সে সব কুটীরে রত্ন-করঙ্ক নিয়ে প্রবেশ করেন ব'লে বোধ হয় না। তবে তুষ্টি যদি লক্ষ্মীশ্রী হয়, তাহলে এ গৃহস্থরা হরি-প্রিয়ার কৃপালাভে বঞ্চিত নন। রামেশ্বর মন্দিরের মাঝে ব্রাহ্মণেরা দেহি, দেহি ক'রে ভক্তের চিত্তের একাগ্রতা পরীক্ষা করেন না। শ্রীজগন্নাথদেবের রত্নবেদীর নীচে চোখ বুজে দাঁড়িয়ে দেখেছি, পাণ্ডা-ব্রাহ্মণ ধাক্কা মেরে বলেন—"হঃ বাবু প্রভুকে কিছু দাও। মালা দাও ফুল দাও।" তাতে আপত্তি করলে বলেন—"হা হা হা হা ছিঃ ছিঃ। তোমার ধরম করম নাই। ছিঃ!"

দক্ষিণ ভারতের মন্দিরে তীর্থ-যাত্রী এ অত্যাচার কিম্বা ধৈর্য্য পরীক্ষার কবল হ'তে নিষ্কৃতি লাভ ক'রে যতক্ষণ ইচ্ছা দর্শন করতে পারে। বিশাল নাট-মন্দিরের যে কোনো কোণে বসে সে ধ্যান করতে পারে। বিশিষ্ট তীর্থ-যাত্রী যাত্রা-শেষে দক্ষিণা দিতে চাহিলে পাণ্ডারা অতি সামান্য দক্ষিণা চায়। পূজারী-ব্রাহ্মণরা তা' পেয়ে অকাতরে আশীর্ব্বাদ করে। সেই দক্ষিণা দ্বাদশটি ব্রাহ্মণ-পরিবারের মধ্যে ভাগ হয়।

রামেশ্বরের বাজার অতি দীন। কাশীর বাজারে ঘুরে বক্ষ-মহিলাও নিঃস্ব হ'তে পারে। এখানে কেনবার বিশেষ কিছু নাই। মহিলারা শুনলে রাগ কর্বেন, কিন্তু আমার বিশ্বাস এটা আরও একটা কারণ মন্দিরের অলিন্দে অলিন্দে ঘোরবার। বারাণসীর মত প্রাচীনত্বের গর্ব্বে কিন্তু রামেশ্বর গর্ব্বিত। এখানে মহাদেবের অর্চ্চনা ক'রে শ্রীরামচন্দ্র জানকী উদ্ধার করতে যাত্রা করেছিলেন। আবার ফেরবার সময় বায়ুতরীতে বসে বৈদেহীকে সেতু এবং এই মহাতীর্থ দেখিয়ে বলেছিলেন—"তোমার জন্য আমি নলের সাহায্যে লবণ সাগরের জলে এই সুদুষ্কর সেতুবন্ধন করেছিলাম।... সীতে! এই দেখ এই স্থানে আমি সেনানিবেশ করেছিলাম। এই স্থানে দেবদেব মহাদেব আমার প্রতি প্রসন্ন হয়েছিলেন। এই অগাধ অপার সাগরে সেতুবন্ধ নামক ত্রিলোকপূজ্য বিখ্যাত তীর্থ দৃষ্টিগোচর হচ্চে। এই তীর্থ পরম পবিত্র ও মহাপাতক নাশন।*

ধীর-বুদ্ধিতে শ্রীরামচন্দ্রের এ বিবৃতি হৃদয়ঙ্গম না করলে রঘুনন্দনের উপর হীন অহমিকা আরোপ করা যেতে পারে। তাঁর পূজাই এ তীর্থকে পবিত্রতা দিয়েছে, নিশ্চয় একথা দাশরথি বলেননি। রামায়ণের এক মূলতত্ত্ব এ সমাচারে ব্যক্ত হয়েছে!

শ্রীরামচন্দ্র লঙ্কা অভিযানের প্রাক্কালে ছিলেন—পার্থিব ঐশ্বর্য্যবিহীন। রাজশ্রী-বঞ্চিত এবং লক্ষ্মী-স্বরূপিণী বৈদেহী-বিরহী। নিজে নিঃস্ব—মানুষ বন্ধুহীন, সম্পদহীন। অন্য দিকে বিশ্বের পশু-শক্তির প্রতীক উগ্র অহমিকার ভীম-মূর্ত্তি দশমুণ্ড রাবণ। লক্ষ্মীর দেহ তার অশোক-কাননে বন্দী। নির্ধন শ্রীরামচন্দ্রের সহায় অযোধ্যা রাজ্যের প্রজা-সঙ্ঘের আত্মার সম্মিলিত শুভ-কামনা, সীতাদেবীর শুদ্ধ আত্মার শক্তি, আর বানরচমূর চাতুরী এবং দেহের বল। শ্রীরাম-আত্মা পরমাত্মার সঙ্গে শিব-পূজায় মিলিত হ'ল। বিশ্বের আত্মিক শক্তি অভিযান করলে, অহং-জ্ঞানী রাবণের আত্মাকে নিজের প্রসারতায় নিজের মধ্যে সংগ্রহ করতে। অহং-জ্ঞানী জীবাত্মার কামনা নিঃশেষ হ'ল রাবণ বধে। স্বার্থ-পরতার বাঁধন-মুক্ত হলেন বিশ্ব-লক্ষ্মী সীতা। সে আত্মা শ্রীরামচন্দ্রের আত্মায় বিলীন হ'ল। যুক্ত আত্মা পৃথিবীর উপরে উঠ্‌লেন। ব্যোম-বিহারী যুক্ত-আত্মা রামেশ্বর ভূমিকে পৃথিবীর পরমতীর্থ ব'লে নির্দ্দেশ করলেন। কারণ এইখানে অবতারের জীব-আত্মা পরমাত্মার সঙ্গে যুক্ত হ'য়ে মুক্ত হয়েছিল। তারপর আবার সেতু-বেঁধে জীবাত্মায় অবহিতি। "সর্ব্বব্যাপী স ভগবান তস্মাৎ সর্ব্বগত শিবঃ"—সর্ব্বব্যাপী ভগবান অতএব তিনি শিব। মানুষের থাকে দুটো সত্তা—অহং আর আত্মা। এই অহং-প্রধান মানুষটি বাহিরের বিষয়ী মানুষ—দেহাভিমানী, পরিদৃশ্যমান জগতের অংশ, পঞ্চভূতের বিবিধ সংমিশ্রণে গড়া, পঞ্চ-ইন্দ্রিয়ের সেবায় অসংখ্য উপভোগ্যের উপভোগী। কিন্তু তার আত্মা এই উপভোগ-প্রিয় অহং-সত্তাকে অতিক্রম করে। এই হ'ল মানবতা। অন্তরের সে আসল মানব মুক্তি-কামী। ঐশ শক্তি তার মুক্তির সহায়ক। "তমেবৈকং জানথ আত্মানম্"—সেই একেকে জানতে চায় আত্মা। শিব উপহিত হন জীবে। এই অবহিতির জন্য তিনিই সেতু রচেন। তাই রামেশ্বরের আরাধনায়, মুক্ত আত্মা-শক্তি মোহাসুরের বন্দী আত্মার ভূমিতে পৌছিবার জন্য সেতু-বন্ধন করেছিলেন। ব্যোম-পথে, বিমান হ'তে অগ্নি-পরীক্ষিত মুক্ত জানকীকে শ্রীরামচন্দ্র "মৎ-সেতু" এবং পরম পবিত্র রামেশ্বর তীর্থ দেখিয়েছিলেন। সন্ন্যাসী শঙ্করাচার্য্য, মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য ও বহু পুণ্যবান এই মহাতীর্থে ভ্রমণ করেছিলেন।

আবরিত বিশাল সৌধের অভ্যন্তরে আলোকের ব্যবস্থা করা প্রাচীনকালের বিশেষ সমস্যা ছিল। প্রখর সূর্য্যের আলোয় যে দেশ সদা দগ্ধ, সে দেশে স্বল্প আলোক আকাঙ্ক্ষার বিষয়। রামেশ্বরের বিশাল মন্দিরে, ছাদের নিম্নে গবাক্ষের ভিতর দিয়ে অলিন্দে এবং নাট-মন্দিরে যথেষ্ট আলোক প্রবিষ্ট হয়। সুবৃহৎ গোপুরম এবং বহু গবাক্ষের পথে সাগরের শীতল হিল্লোল, মন্দির পর্য্যটকের শ্রম অপনোদন করে। প্রাচীন যুগে রাত্রে নিশ্চয় মশালের রশ্মি অলিন্দপথ সমুজ্জল করত। রামায়ণের স্বর্ণলঙ্কার

* রামায়ণ যুদ্ধ-পর্ব্ব একশত পঁচিশ অধ্যায়।

বর্ণনায় দীপের প্রাচুর্য্যের উল্লেখ আছে। এরোপ্লেনের ব্যবহার বর্ণিত হয়েছে, কিন্তু সে পুষ্পক রথ সত্য বায়ু-পথের কোনোপ্রকার যান, না মনোরথ, এ কথার উত্তর দেওয়া অসম্ভব। আমার নিজের বিশ্বাস যে বায়ু-যানগুলি কবি-কল্পনা। কিন্তু বিজলীর কল্পিত বা বাস্তব দীপের কোনো বর্ণনা প্রাচীন কবিরা করেন নি। মেঘনাদ ইন্দ্রজিত হয়েছিলেন। কিন্তু তিনি ইন্দ্রের বজ্র-শক্তিকে রাজ-পথ সমুজ্জ্বল কর্‌বার প্রয়োজনে ব্যবহার করেননি। আজ নবীন বিজ্ঞান ইন্দ্রের সে শক্তি হস্তগত করেছে।

রামেশ্বর মন্দিরের সরোবরের কূলে বিজলী শক্তি উৎপাদনের কারখানা। বন্দোবস্ত মন্দিরের কর্ত্তৃপক্ষ করেছেন। বিদ্যুতের রশ্মিতে গর্ভ-মন্দিরগুলি ব্যতীত মন্দিরের সকল অংশ আলোকিত হয়। এই শক্তি-গৃহ হ'তে রামেশ্বর নগরেও শক্তি সরবরাহ করা হয়। আপাততঃ ব্ল্যাক-আউটের দিন—আলো জেলে আলো ঢাকবার সময়। রাবণের যেমন দর্প খর্ব্ব করেছিল ভারতবর্ষ, আশাকরি এই পুণ্য-দেশই জাপানী অসুরকে হীন-দর্প করবে।

শ্রীক্ষেত্রে, মাদুরায়, রামেশ্বরে বস্তুতঃ সকল তীর্থ ভূমিতে, মন্দিরের দেব-পীঠ সম্যক তীক্ষ্ণ আলোকে প্রভান্বিত না করার ব্যবস্থা সমীচীন। গর্ভ-মন্দিরে অবস্থিত পাষাণ বা ধাতুর দেবতা প্রতীক মাত্র। আবেষ্টনের সাহায্যে ধীরে ধীরে মনকে ভক্তি-রসে না ভেজালে ভগবদ্-প্রীতি জাগে না। পরমহংস দেব বলেছিলেন—তোমরা টাকা-কড়ি, স্বাস্থ্য, উন্নতি, সকলের জন্য আকাঙ্ক্ষা কর, কষ্ট কর, ছট্‌ফট্ কর। কিন্তু ভগবান্‌কে দেখ্‌বার জন্য তো পরিশ্রমও কর না, মনকে ব্যাকুলও কর না। তা করলে ঈশ্বর দর্শন হবে।

আমার মনে হয় ধীরে ধীরে এই ব্যাকুলতা ও অধীরতা জাগিয়ে তোলবার জন্য "ডিম্ রিলিজাস্ লাইটে"র ব্যবস্থা। ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বহির্জ্জগতকে জানবার প্রলোভনকে শুদ্ধ ক'রে, মনকে অন্তর্ম্মুখ করতে গেলে তার পাঁচটি সংগ্রাহককে একটু বাঁধতে হয়। তাই বড় বড় ঋষিরাও সংসারের বাহিরে অরণ্যানীর নিঝুম নিস্তব্ধতার আশ্রয় গ্রহণ করতেন। পরেশনাথ পাহাড়ের উপর বসে আমরা সিদ্ধান্ত করেছিলাম যে ভগবান পরেশনাথও প্রকৃতি জয় ক'রে অর্হ্যৎ হবার জন্য প্রকৃতিরই সাহায্য নিয়েছিলেন। লোভ, মন্দিরের নিস্তব্ধতা নষ্ট ক'রে মালা, সিঁদুর, প্রসাদ বা প্রদীপ বেচ্‌তে চায়। তার জন্য দায়ী কিন্তু প্রাচীন-ভোলা নবীন যুগের বিষয়-বুদ্ধি। দেব-মন্দির বা প্রার্থনা-গৃহ, যাঁরা রচনা করতেন তাঁরা মানব-প্রকৃতি উপেক্ষা করতেন না। এখনও সুদক্ষ গায়কেরা রাগ-রাগিণীকে প্রাণবন্ত করবার জন্য সুর ভেঁজে নেয়। জ্যোৎস্না আঁকবার জন্য চিত্রকর মুগ্ধ-নয়নে একাগ্রমনে চাঁদের কিরণচ্ছটা পর্য্যবেক্ষণ করে। ভক্তকে অনন্যমন কর্‌বার জন্য ধর্ম্ম-গৃহের আঁধারের ভিতর হ'তে ভাসকং ভাসকানামের উপলব্ধির আয়োজন। কবির কথায় বলি—বৈজ্ঞানিক বলেন, "দেবতাকে প্রিয় বললে দেবতার প্রতি মানবতা আরোপ করা হয়। আমি বলি মানবত্ব আরোপ করা নয়, মানবত্ব উপলব্ধি করা।"

সেতুবন্ধ রামেশ্বর নগরে কলের জলেরও বন্দোবস্ত আছে। যারা অতি-প্রাচীন রীতি মানে, তারা বাড়ির কূপের জল পান করে। কিন্তু আমার মনে হয়, নবীন কালে নলের জলকে অধিক লোক অপবিত্র ভাবে না।

পশ্চিম ভারতের তীর্থ-স্থানের অনুরূপ ভোজনের ব্যবস্থা দক্ষিণ-ভারতে নাই। কারণ ওদেশের লোকের রুচি বিভিন্ন এবং ভোজ অনাড়ম্বর। কাজেই আর্য্যাবর্ত্তের ভোজন-বিলাসী যাত্রীকে রসনার সুখ হ'তে বঞ্চিত হ'তে হয়। কিন্তু যে পর্য্যটনের উদ্দেশ্য তীর্থ, সে ক্ষীর, সর, নবনীর ক্ষুধাকে নিশ্চয় মন্দ করতে পারে। মাত্র নারিকেলে ক্ষুধা ও তৃষ্ণা উভয়ের উপশম সম্ভব।
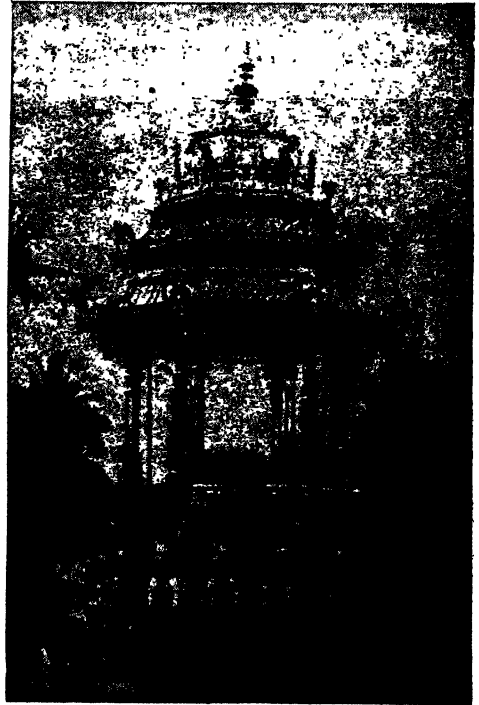
রামেশ্বরম্ রথ-যাত্রা

মহাদেবের পূজার জন্য আমরা কলিকাতা হ'তে এক কলসী গঙ্গাজল নিয়ে গিয়েছিলাম। তামার ক্ষুদ্র কলসী—মুখ ঝাল দিয়ে বন্ধ। মন্দিরের কর্ম্মচারীরা ঘট পরীক্ষা ক'রে পাঁচ টাকা মাসুল নিলেন। সে ঘট রামেশ্বর মহাদেবের প্রভাতের প্রহরীর হস্তে পৌঁছিল, রামেশ্বর বিগ্রহের পূজার

পূর্ব্বে বিশ্বনাথ লিঙ্গের পূজা করতে হয়। সে শিবলিঙ্গ প্রধান গর্ভ-মন্দিরের পাশে এক ছোট মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত।

লঙ্কা-অভিযানের পূর্ব্বে শ্রীরামচন্দ্র রামেশ্বর অর্চ্চনা ক'রে সেতু পার হ'য়েছিলেন। রামায়ণে বর্ণনা আছে শ্রীরামচন্দ্র ভক্ত হনুমানের পৃষ্ঠে এবং লক্ষ্মণদেব অঙ্গদের পৃষ্ঠে বসে শত যোজন লম্বা সেতুর পরপারে অবস্থিত স্বর্ণলঙ্কায় পৌছে-ছিলেন। তখন রামেশ্বর ছিল বালির চর মাত্র। তাই শিব-লিঙ্গ বালুকাস্তূপের মধ্যে লুপ্ত হয়েছিলেন। বিজয়ী শ্রীরামচন্দ্র তাঁকে খুঁজে না পেয়ে যখন মর্ম্মাহত, ভক্ত-প্রধান হনুমান বিমান পথে বারাণসী পৌছে, কাশীর বিশ্বনাথকে রামেশ্বর দ্বীপে আনলেন। রামেশ্বর লিঙ্গও বালিয়াড়ির মধ্যে পাওয়া গেল। তখন ভক্তবৎসল শ্রীরামচন্দ্র আজ্ঞা দিলেন—সেতুবন্ধে প্রতিষ্ঠিত বিশ্বনাথ পূজার পর রামেশ্বর-লিঙ্গ

রামেশ্বরম্ দ্বীপে একটি রাস্তা

পূজিত হবেন। তাই অগ্রে বিশ্বনাথ মন্দিরে বাবার মাথায় জল দিয়ে তবে রামেশ্বর আরাধনার ব্যবস্থা। এ কথা রামায়ণে পাই না—তবে এ ঐতিহ্য। এ ঐতিহ্য বারাণসী ও সেতুবন্ধ দুই মহাতীর্থকে একত্র সমাবিষ্ট ক'রে শৈব-উপাসনার ঐকান্তিক একতা প্রচার করেছে। আর প্রমাণ করেছে আর্য্যবর্ত্ত এবং দ্রাবিড় ভারতবর্ষের অন্তরাত্মা এক।

প্রভাতে ঈশ্বরের মন্দিরে তপস্যা-গম্ভীর ভক্তি-প্রীত-মুখ, ললাটে ভস্মরাগ মাখা, বহু দর্শন-প্রয়াসী দ্রাবিড় ব্রাহ্মণ উপস্থিত ছিলেন। নাট-মন্দিরে অন্য প্রান্তেরও যাত্রী ছিল। তাদের মধ্যে বিশেষভাবে দৃষ্টি-আকর্ষণ করছিল কাবুলী পোষাকে সুস্থ সবলকায় লাল-মুখ এক হিন্দু কাবুলী পরিবার। অ-গঙ্গার দেশে মহাদেবের গঙ্গাজলে স্নান এক অভিনব ব্যাপার। জাহ্নবী-জল-ভরা ছোট ছোট আতরের কুপা শিশি এক টাকা চার আনায় বিক্রয় হয়। বাবার মাথায় এক ঘট গঙ্গাজল বর্ষিত হবে, এ সমাচারে বহু যাত্রী একত্র হ'ল। সবাই নির্ব্বাক। সকলের আকাঙ্ক্ষা গঙ্গাধরের শিরে গঙ্গাবারি বর্ষণে ধরায় শান্তির বারি বর্ষিত হ'বে। মানুষের অন্তরাত্মা চায়—শান্তি। তাই তার সূচনা, শান্তির সঙ্কেত, কল্যাণকর।

অসংখ্য ক্ষুদ্র দীপে গর্ভ-মন্দিরের প্রবেশ দ্বার আলোকিত। আমরা দ্বারের দুপাশে দাঁড়ালাম। ক্ষুদ্র মন্দির-কক্ষে অনতি-উচ্চ বেদীর উপর অন্ধকারের অন্তর ভেদ ক'রে শিবলিঙ্গ আত্ম-প্রকাশিত। পুরোহিত ব্রাহ্মণ একটি কর্পূরের দীপ জ্বেলে শিব-লিঙ্গ উদ্ভাসিত করলেন। যুগ-যুগান্তের স্মৃতি, গভীর মনের সুপ্ত অনাদি চেতনা, মুহূর্ত্তের তরে দপ্ করে জ্বলে উঠ্‌লো। বিশ্বের বিরাট রহস্য লুপ্ত হ'ল। সত্যই তো ব্রহ্মাণ্ডের অসীম ভেদজ্ঞান অখণ্ড অসীম একতায় সমাহিত! সার সত্যের বিদ্যুত ঝলকে, অখণ্ড অসীম একতায় সসীম ভেদজ্ঞান এবং অনিত্যের আবরণ মুহূর্ত্তে খ'সে পড়লো। একজন পুরোহিত ধীরে ধীরে শিবের মাথায় গঙ্গাজল বর্ষণ করলেন, স্বর্গের শান্তিধারা, সৃষ্টির মূল কারণের শিরে। জলস্থলের ভেদাভেদ এক অনন্ত চেতনায় বিলুপ্ত হ'ল। সমবেত নরনারীর অন্তরতম হৃদি-মন্দির হ'তে বম্ বম্ ধ্বনি উঠ্‌লো—মাথার হাত উঠ্‌লো। বহু ভিন্ন চিত্তে এক অনুভূতি, সমষ্টির এক চেতনা। অন্ধকার নাই—দিব্য আলোক - কিছু নাই—আছে সব—এক বিস্তৃত হ'তে বিস্তৃত অনন্ত সীমাশূন্য প্রকাশ। সুখ নাই, দুঃখ নাই —মাত্র আনন্দ আদ্যন্তহীন। জীবন নাই - আছে অনন্ত স্থিতি। বম্ বম্ শব্দ তাও নাই—ভূমি নাই, জল নাই, বহ্নি নাই, বায়ু নাই। জাগ্রতি, সুষুপ্তি, দ্বেষ, রেষ কিছু নাই।

যুগ-যুগান্তের গোপন সংস্কার পর্য্যুষিত হ'ল একমাত্র জ্যোতির্ম্ময় সংস্কৃতিতে—

অজং শাশ্বতং কারণং কারণানাং
শিবং কেবলং ভাসকং ভাসকানাং
তুরীয়ং তমঃ পারমাদ্যন্তহীনং
প্রপদ্যে পরং পাবনং দ্বৈতহীনম্।

কে জানে পরিণাম-প্রদায়িনী মহাকালীর কত ক্ষুদ্র কলা কত নগণ্য কাষ্ঠা জুড়ে এ গুপ্ত অনুভূতি অনন্তের সন্ধান দিলে। চমক ভাঙ্গলো। আবার অন্ধকার ঘিরলো, ডুবো আমি প্রচণ্ড বেগে চেতনায় ভেসে উঠ্‌লো—আমার নত-শির, ভূলুণ্ঠিতা আমার স্ত্রী, আমার শিব, আমার আরাধনা, স্বদেশ-বাসী আমার সম-ধর্ম্মী। ঘিরলো আঁধার—যে তিমিরে ছিলাম আবার মমত্বের সেই মহা-গহ্বরে আশ্রয়লাভ করলাম।

তবু যখন এই আমিত্বের কর্ম্মবন্ধনের মাঝে তেমন সব শুভ-মুহূর্ত্ত স্মরণ করি, প্রাণের কে জানে কোন্ রুদ্ধ কবাট খুলে যায়। তার অন্তরের ঘুমানো ফুল জেগে ওঠে—কে জানে সেই কুসুম আপনা হ'তে কোন্ জ্যোতিতে জ্বলে ওঠে—আর কে জানে অন্তরের কোন্ অনাবিষ্কৃত কক্ষ হ'তে সঙ্গীত ওঠে—

শিবং শঙ্করং শম্ভুমিশানমীড়ে।

মায়াময় জগৎ

শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত

জগৎটি যে কতখানি মায়াময় তা প্রাচীন যুগের বৌদ্ধ যোগাচারী বা সৌতান্ত্রিক হতে আধুনিক যুগের বৈজ্ঞানিক অবধি প্রমাণ করে দিয়েছেন। প্রাচীনকালে এক আধ্যাত্মিক দৃষ্টির কাছে জগৎ যে মিথ্যা মরীচিকা মতিভ্রম—দার্শনিকের কথায়, বিজ্ঞান বিজৃম্ভন মাত্র—তা আমাদের বেশ জানা ছিল। বৈজ্ঞানিকেরা সেই দলে নূতন যোগ দিয়েছেন। এডিংটন বলছেন, এই যে ব্রহ্মাণ্ড দেখছ, এই যে প্রকৃতি, সেখানে এই যে সব রূপ ও ক্রিয়া ও বিধান সবই মনের রচনা—মনের দর্পণে যে সে সমস্ত প্রতিফলিত হয়েছে তা নয়, মন হতেই তা উৎসারিত এবং প্রক্ষিপ্ত হয়েছে। মনের বাহিরে একটা কিছু স্বাধীন স্বতন্ত্র সত্তা ও সৎবস্তু থাকতে পারে কিন্তু তার পরিচয় পাই না, মনের মধ্যে আমরা আবদ্ধ—বৌদ্ধ শ্রমণের সাথে একসুরে আমাদের গাহিতে হয়—মনো পুব্বঙ্গমা ধম্মা মনো সেঠ্ঠা মনোময়া। এডিংটন তাই বলছেন কবি যে রকমে তাঁর কাব্য রচনা করেন, কাব্যের অস্তিত্ব যেমন কবির মস্তিষ্কে ছাড়া অন্য কোথাও নাই, ঠিক সেই রকম—অন্ততঃ অনেকখানি সেই রকম—এই বিশ্বও রয়েছে মানুষের মনে, স্রষ্টার দৃষ্টির মধ্যে—দুইএর মধ্যে পার্থক্য খুব বেশি নাই।

বৈজ্ঞানিক জগৎকে বলছেন অবাস্তব কল্পনাত্মক—এ কি কথা? কথা কিন্তু দাঁড়িয়েছে তাই। বৈজ্ঞানিক অর্থাৎ জড়বিজ্ঞানবেত্তা অন্য জগতের খবর রাখেন না, তাদের সম্বন্ধে কিছু বলতে পারেন না, কিন্তু তাঁর নিজের জগৎ, স্থূলভৌতিক জগৎ তাঁর চোখে এই রকমই হয়ে উঠেছে—গাণিতিক সূত্রে পর্য্যবসিত হয়েছে। বৈজ্ঞানিক যে রকম জোর করে স্থূল হস্তে প্রকৃতিকে চেপে ধরেছিলেন এই বলে যে কঠিন কঠোর জড় ছাড়া এ আর কিছু নয়, তেমনি অকস্মাৎ সভয়ে তিনি দেখতে সুরু করলেন কখন কি রকমে তাঁর আঙ্গুলের ফাঁক দিয়ে সে কঠিন নীরেট পদার্থ ক্রমে গলে তরল হয়ে, বাষ্প হয়ে উবে যাচ্ছে, অশরীরী হয়ে ভাবের বস্তু হয়ে গিয়েছে; বিশ্ব তৈরী হয়েছে বিরানব্বইটি মূল জড় পরমাণু দিয়ে নয়, তৈরী হয়েছে আসলে "সম্ভাবনার ঢেউ" দিয়ে—চিন্তার আঁশ দিয়ে।

কি রকমে, একটু বুঝিয়েই বলা যাক। ব্যাপারটি দুদিক থেকে আক্রমণ করা যেতে পারে। প্রথম, যাকে বলি বাস্তব বা বিষয়, তাকে বিশ্লেষণ করে আর দ্বিতীয় হল বিষয় নয় বিষয়ীকে, জ্ঞেয় নয়, জ্ঞানের স্বরূপকে বিশ্লেষণ করে। প্রথমটি হল বিজ্ঞানের পথ, দ্বিতীয়টি দার্শনিকের পথ—তবে শেষোক্ত ধারাটি আজকাল অনেক বৈজ্ঞানিককে কিছু না কিছু অবলম্বন করতে হয়েছে, বৈজ্ঞানিক গবেষণা বৈজ্ঞানিককে অবশেষে এমন কোণঠেসা করে ধরেছে যে বাধ্য হয়ে তাঁকে দার্শনিক বনে যেতে হয়েছে। সে যা হোক, প্রথমে প্রথম ধারাটির কথা বলা যাক—

তার সুরু হল বিজ্ঞান যখন একান্তই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসরণ করে চলল। জগৎটা কি দেখতে গিয়ে, বিজ্ঞান প্রথমে অবশ্য স্বীকারই করে নিলে, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ তোলারই অবকাশ ছিল না, যে জগৎ হল স্থূল নীরেট জিনিষ, আমাদের অর্থাৎ মানুষের প্রত্যয়ের বাহিরের জিনিষ, অকাট্য সত্য সে, বাস্তব সে, নিজের মধ্যে সে নিজে প্রতিষ্ঠিত। বিজ্ঞানের পদ্ধতি হল তাই নীরেট বস্তুটাকে ভেঙ্গে দেখতে ওর ভিতরে কি আছে। স্থূল মোটা রূপ বা আকার সব ভেঙ্গে প্রথমে বের হল অণু (molecule), তারপর অণুকে ভেঙ্গে ফেলা হয়, বের হল পরমাণু, পরমাণুকেও ছাড়িয়ে যাওয়া হয়েছে, পরমাণু ভেঙ্গে আবিষ্কার করা হয়েছে বৈদ্যুতিক কণা বা মাত্রা। কিন্তু এখানেই শেষ নয়—শেষ হলে কোন গোল ছিল না—যত বিপত্তির আরম্ভ এইখান থেকেই। বৈদ্যুতিক মাত্রা জিনিষটা কি? কয়েক রকমের বা শ্রেণীর মাত্রা ধরা গিয়েছে (১) যোগ মাত্রা (প্রোটন) (২) বিয়োগ মাত্রা (ইলেকট্রন) (৩) যোগ বিয়োগ মাত্রা (নিউট্রন) (৪) যৌগিক বিয়োগমাত্রা (পজিট্রন) (৫) বিয়োগধর্ম্মী যোগমাত্রাও সম্প্রতি নাকি আবিষ্কৃত হয়েছে।* এই মাত্রাদের স্বরূপ কি স্বধর্ম্ম কি? বলা হয়েছে এরা হল তরঙ্গ—একদিকে কণা হলেও কণার বৃত্তি হল ঢেউএর বৃত্তি (সোনার পাথর বাটি?)। এই ঢেউ যে কেবল ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র তা নয়, একেবারেই অদৃশ্য, তাদের ক্রিয়াফল দেখে তাদের অস্তিত্ব অনুমান করা হয়। এতদূর তবুও না হয় বোঝা গেল, জগৎটা তবুও বাহ্য স্থূল জগৎই রয়েছে স্বীকার করা গেল (সে স্থূল যত সূক্ষ্মই হোক না); কিন্তু এখন আবার বলা হয়, এই যে সব তরঙ্গ এরা (অর্থাৎ প্রত্যেকে আলাদা আলাদা ব্যষ্টি হিসাবে) বস্তুর বা বাস্তব তরঙ্গ নয়, তরঙ্গের সম্ভাবনা মাত্র—কি রকম? বিজ্ঞানের বনিয়াদ, তার সর্ব্বপ্রধান ও প্রায় একমাত্র মূল-সূত্র হল পরিমাণ নির্ণয় এবং এ জন্য অবশ্য-প্রয়োজন যে আদি প্রকরণ তা হল স্থিতি নির্ণয়। জিনিষের ওজন, ও জিনিষের স্থান-কাল এই নিয়েই ত বিজ্ঞানের সমস্ত গবেষণা। কোন জিনিষ (কতখানি ওজনের) কখন কোন স্থানে এই হিসাব ছাড়া বিজ্ঞান নাই এবং এই হিসাবের পুঙ্খানুপুঙ্খতাও একেবারে নির্ভুল যাথার্থ্য বিজ্ঞান দিতে পারে বলেই বিজ্ঞানের মাহাত্ম্য। কিন্তু দেখা যাচ্ছে জগৎটা যতদিন নিউটনীয় ছিল অর্থাৎ মোটা অণু বা পরমাণুরও সমষ্টিমাত্র ছিল ততদিন গোল উপস্থিত হয় নাই। কিন্তু যে মুহূর্ত্তে এসে পড়া গেল বৈদ্যুতিক মাত্রার রাজ্যে তখন সবই বিভ্রান্ত ও বিপর্য্যস্ত হয়ে গেল প্রায়। কারণ এ রাজ্যে নিউটনীয় পরিমাণ হিসাব আর চলে না। এখানে বস্তুর বস্তু পরিমাণ (mass) অপরিবর্ত্তনীয় কিছু নয়—গতির সঙ্গে তা পরিবর্ত্তিত হয়ে চলেছে—আবার গতির পরিমাণ যদি মাপা যায়, স্থান নির্দ্দেশ করা যায় না, স্থান আবিষ্কার করলে গতির বেগ তার ঠিক হয় না। সবই অনিশ্চিত। শুধু তাই নয়, এ অনিশ্চয়তা কেবল মানুষের অসম্পূর্ণ জ্ঞান প্রসূত নয়—বস্তুর গড়নেরই মধ্যে রয়েছে এ অনিশ্চয়তা। পাশার দানের ফলে যে অনিশ্চয়তা সেই ধরণের কিছু। অনিশ্চয়তা অর্থ এটিও হতে পারে, ওটিও হতে পারে অর্থাৎ সম্ভাবনার খেলা। সুতরাং বৈজ্ঞানিক জগৎ শেষ বিশ্লেষণে হয়ে উঠল সম্ভাবনা-রেখাবলি-সমন্বিত একটা ক্ষেত্র।† আর নির্দ্দিষ্ট একটা বস্তু হল কতকগুলি যদৃচ্ছার (chance) সমষ্টি। দৃষ্টির মধ্যে যখন বস্তু আসে তখন সে একটা স্থির স্ফুট পরিচ্ছিন্ন নিঃসন্দেহ নীরেট রূপ নিয়ে আসে—কারণ সে তখন একটা সমষ্টি, সমাহার, গড়পড়তা রূপ—তার মূল উপাদানে বিশ্লিষ্ট নয়। দৃষ্টির বাহিরে, স্বরূপতঃ, মূলতঃ তা হল অনিশ্চিত সম্ভাবনা। সুতরাং জড়-

---

* (১) Proton—যে বিদ্যুৎকণার ভার (mass) আছে আর মাত্রা (charge) আছে, আর সে মাত্রা হল যোগাত্মক (positive); (২) Electron—যার ভার নাই প্রায়, মাত্রা আছে, সে মাত্রা বিয়োগাত্মক (negative); (৩) Neutron—যার ভার আছে কেবল, কোন মাত্রা নাই; (৪) Positron—যার ভার নাই আর মাত্রা হল বিয়োগাত্মক; (৫) Meson—যার ভার আছে কিন্তু মাত্রা বিয়োগাত্মক।

† আইনষ্টাইনীয় দৃষ্টিতে জড় ও জড়শক্তি এত অপরূপ পরিণতি, প্রায় পরিনির্ব্বাণ লাভ করেছে—জড় ও জড়শক্তিধারা এখানে হল দিক্-কাল-গ্রথিত নিরবচ্ছিন্ন অবকাশে বক্রতা মাত্র (a curvature in space-time continuum.)

জগৎটা হল বস্তুরও ঢেউ নয়—সম্ভাবনার ঢেউ মাত্র। আর বৈজ্ঞানিক এই সম্ভাবনার ঢেউ সম্বন্ধে যা জানতে বা জানাতে পারেন তা হল একটা ছক বা গাণিতিক সূত্র মাত্র। পদার্থবিদ্যার সমস্যা হয়ে উঠেছে অঙ্কের সমস্যা অর্থাৎ নিছক মানসরচনার জিনিষ। জগৎ আর ভৌতিক নয়, বাস্তবিক কিছু নয়, তা হল নির্বস্তুক, তাত্বিক কিছু। অবশ্য বলা যেতে পারে, পদার্থবিদ্যা যা দেয় তা হল বস্তুতে বস্তুতে সম্বন্ধের জ্ঞান, সে সম্বন্ধ একটা সাধারণ নির্বস্তুক তাত্বিক জিনিষ হবেই কিন্তু তার অর্থ নয় বস্তু নাই বা বস্তুকে অস্বীকার করা হয়েছে। কিন্তু ফলে ঘটেছে তাই—কারণ আমরা শুধু সম্বন্ধকেই জানি—সম্বন্ধ ছাড়া সম্বন্ধের বাহিরে বস্তু কি তা জানিনা, জানবার উপায় নাই। বৈজ্ঞানিকের জগৎ তা হলে গণিতকারের মস্তিকগত চিন্তাতরঙ্গ ছাড়া আর কি?

জিনিষটি আবার অন্যদিক দিয়ে দেখা যাক—অর্দ্ধ-বৈজ্ঞানিক ও অর্দ্ধ-দার্শনিক। বিজ্ঞান যখন সর্ব্বপ্রথম এই রূপরসস্পর্শগন্ধময় নীরেট জগতের বাহ্য ত্বকটি পার হয়ে একটু নীচে বা ভিতরে দৃষ্টি দিতে নিরীক্ষণ করতে শিখল এবং দার্শনিকও যখন বৈজ্ঞানিকবুদ্ধি প্রণোদিত হয়ে জগৎ সম্বন্ধে তার সিদ্ধান্ত বিশ্লেষণ করতে আরম্ভ করল তখন গোড়াতেই একটা মায়ারচনা তাদের চোখে ধরা পড়ল। পদার্থের জড়ের স্বরূপ নির্ণয় করতে গিয়ে তারা দেখলে যে পদার্থ বলতে আমাদের স্থূল দৃষ্টি যে গুণসমষ্টি নির্দ্দেশ করে, সে গুণরাশির সবগুলিই যে পদার্থের নিজস্ব, পদার্থের মধ্যে নিহিত তা বলা চলে না। সকলের প্রথমেই ধরা পড়ল বর্ণ রহস্য। রঙ্ জিনিষটাকে প্রাকৃত বুদ্ধি ও সহজবোধ বস্তুরই নিজস্ব গুণ বলে দেখে। কিন্তু বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার করলেন যে বিশেষ রঙ্ হল একটা বিশেষ মাত্রার—দৈর্ঘ্যের—ঢেউ মাত্র (এক সময়ে বলা হত ঈথর বলে এক রকম সূক্ষ্ম জড়ের ঢেউ। আজকাল বলা হয় বৈদ্যুতিক-চৌম্বক ঢেউ); দ্রষ্টার চোখের পর্দ্দায় বিশেষ ঢেউ বিশেষ রঙের বোধ জন্মায়। জিনিষ থেকে উঠে আসে যা তা একটা বঙ্কিম রেখায় চালিত ধাক্কা মাত্র—তাতে রঙ বলে কিছু নাই ওটি চোখের সৃষ্টি। সেই রকম গন্ধ, আস্বাদ, শীতোষ্ণ (বা কোমল কঠোর) এই সব গুণও পদার্থের মধ্যে নাই, তার অস্তিত্ব বিষয়ীর নাসিকায়, জিহ্বায় ও ত্বকে। প্রথমে তাই বস্তুর গুণাবলী দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়েছিল—মুখ্য আর গৌণ। উপরে যে গুণগুলির কথা বলা হল তারা গৌণ—তারা বিষয়ীর চেতনার জিনিষ। আর এক শ্রেণীর গুণ আছে—যথা, বস্তুর আকার আয়তন ওজন ভার—এসব হল মুখ্য গুণ, এগুলি বস্তুরই অঙ্গ—এগুলি হল নিত্যগুণ, অপরগুলিকে বলা যেতে পারে নৈমিত্তিক গুণ। কিন্তু অনতিবিলম্বেই স্বীকার করতে হল এই যে পার্থক্য, এটি ভ্রান্তি মাত্র, সংস্কারের জের মাত্র। দার্শনিকেরা যে রকমে এ পার্থক্য দূর করে দিয়েছেন, তা পরে বলছি, বৈজ্ঞানিকেরাও ক্রমে আবিষ্কার করেছেন যে মুখ্য ও গৌণ গুণের মধ্যে ভেদরেখা টানা যায় না। আজ আপেক্ষিকবাদ আমাদের স্পষ্টই দেখিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছে যে জিনিষের আকার, যাকে মনে করি জিনিষের অঙ্গীভূত স্থির নির্দ্দিষ্ট গুণ, তাও নির্ভর করে দ্রষ্টার স্থান বা দৃষ্টিকোণের উপর। একই জিনিষ তেরছা, বাঁকা, চেপ্‌টা, কাৎ, সোজা, ক্ষীণ, স্থূল, কত ভাবে যে দেখা যায়—অন্য সব আকারকে গৌণ বিবেচনা করে, একটা বিশেষ আকারকে—অর্থাৎ একটা বিশেষ স্থান হতে দৃষ্টি দিয়ে দৃষ্ট আকারকেই বলি বস্তুর মুখ্য নিজস্ব আকার। কিন্তু তা কেন? সব দৃষ্টিকোণেরই ত সমান মূল্য—সত্যের দিক হতে; আমাদের কর্ম্মজীবনের জন্য হয়ত একটা বিশেষ দৃষ্টিকোণই সুবিধার হতে পারে। আবার জিনিষের গতির সঙ্গে তার আকার বদলায়; একটা বিশেষ বস্তুকে যে বিশেষ আকার দেই তা তার একটা বিশেষ গতির সাথে সংযুক্ত; গতির সঙ্গে বস্তুর ভার—বস্তুপরিমাণ (mass)ও বদলায়—তবে কোন রূপটিকে, কোন ভারটিকে নিজস্ব গুণ বলব? সুতরাং যাকে বলা হয় মুখ্য গুণ সে সবও নির্ভর করে দ্রষ্টার বা বিষয়ীর স্থিতি, গতি, দৃষ্টিভঙ্গির উপর—তা হলে দেখা যাচ্ছে এ ক্ষেত্রেও বস্তুর গুণ লেগে রয়েছে দ্রষ্টার চোখের পর্দ্দায়। চোখের পর্দ্দায় কতকগুলি তরঙ্গের ধাক্কা এসে পড়ে—এই তরঙ্গের ধর্ম্ম বা তার ধাক্কার ধর্ম্ম দিয়ে একটা বহির্জগৎ বহির্জগতের ছক আমরা সৃষ্টি করি।

বিজ্ঞান এইভাবে সব জিনিষকে জগৎকে স্পন্দনে পরিণত করেছে। কিন্তু প্রশ্ন করা যায়—বৈজ্ঞানিকেরাই বাধ্য হয়ে এ প্রশ্ন তুলেছেন এবং এ রকমে দার্শনিক হয়ে উঠেছেন—স্পন্দন কিসের? কোথায় ঘটে? অবশ্য মোটা রকমে বলা যেতে পারে (এবং বিজ্ঞানের পাঠ্যপুস্তকে বলা হয়) বাতাসে স্পন্দন, আকাশে (ঈথর) স্পন্দন, আলোর স্পন্দন, বিদ্যুতের স্পন্দন—বেশ; কিন্তু এ সব ঘটছে কোথায়, এ সবের হিসাব পরিচয় রাখছে কে? বৈজ্ঞানিকের স্নায়ুমণ্ডলী নয় কি? স্নায়ুমণ্ডলীর প্রান্তে যে প্রতিক্রিয়া ঘটে তারই ছক বৈজ্ঞানিক আঁকছেন—তা ছাড়া আর বেশি কিছু পারেন না—আর এই প্রতিক্রিয়া প্রতীতি, মস্তিষ্কের বৃত্তি বই ত আর কিছু নয়।

দার্শনিক তাই বলছেন এতখানি গবেষণার কোন প্রয়োজন ছিল না। বস্তুজগৎ যে মস্তিষ্কের বৃত্তি তা সহজ জ্ঞান, প্রমাণ করবার কিছু নয়। জগৎটা যে আছে বলছি, কারণ তা আমার অনুভূতির বিষয়; কিন্তু সেই অনুভূতি ছাড়া পৃথক জগৎ কি আছে? আমার অর্থাৎ বিষয়ীর প্রত্যয় ও চিন্তার একটা সাজান-গোছানই ত জগৎ। বিষয়ীবর্জ্জিত বা বিষয়ী-নিঃসম্পর্কিত বিষয় আছে কি না, থাকলে আসলে কি রকম তা জানা সম্ভব নয়; কারণ জানা অর্থই ত বিষয়ীর চিন্তার অন্তর্গত ও গ্রস্ত করা। আমাদের মগজের অনুভবটি আমরা ঐ মগজসৃষ্ট দেশ ও কালের মধ্যে ফেলে আমাদের বাহিরে যেন নিক্ষেপ করি, আমাদের হতে পৃথক স্বাধীন অস্তিত্ব তাদের আছে বোধ করি, কিন্তু এটি মায়ারচনা—বার্কলে হতে এডিংটন বা মর্গান অবধি একে বলছেন objeotivisation, বৌদ্ধেরা এরই নাম দিয়েছে প্রতীত্যসমুৎপাদ।*

বৈজ্ঞানিকে দার্শনিকে মিলে এইভাবে জগৎকে মায়াময়, ভ্রান্তিময় বলে ঘোষণা করছেন। স্বপ্রতিষ্ঠ স্বরূপস্থ জগৎকে জানা যায় না—সে রকম কিছু আছে কি না তাও জ্ঞান-বহির্ভূত জিনিষ। উর্ণনাভের মত আমরা আমাদের নিজেদের ভিতর হতে রচিত জালের মধ্যে—চিন্তাজালের মধ্যে ঘুরে ফিরে চলছি।

এ সিদ্ধান্ত দারুণ যুক্তিসঙ্গত বলে বোধ হয় বটে, মনে হয় বিচার বিতর্কের পথে যদি চলি তবে অন্য সিদ্ধান্তের কোন অবকাশ আর নাই। কিন্তু এ সিদ্ধান্তে মানুষ কখন তুষ্ট নয়—এর মধ্যে ফাঁক কোথাও রয়েছে মানুষে অনুভব করে, কিন্তু সকল সময়ে বুঝাতে পারে না। অবশ্য কাণ্ডজ্ঞানীদের (commonsense sohool) পথ আলাদা—টেবিলে ঘুষি মেরে তারা প্রমাণ করে দেয় জগৎ আছে, জড় পদার্থ আছে—কঠোর কঠিন নীরেট বাস্তব হিসাবে! তাঁরা বলছেন অতি জ্ঞানের দরকার নাই, কাণ্ডজ্ঞান রাখ। জগৎটা যেমন দেখছ, সেইভাবেই সে আছে—তেমনি রূপরঙ নিয়ে। বৈজ্ঞানিক দার্শনিকেরাও মোটামুটি আজ ঐ ধরণের কথাই বলছেন, ও রকম স্থূল ভাষায় হয়ত নয় কিন্তু ঐ সিদ্ধান্তই একটু সূক্ষ্মভঙ্গীতে। এডিংটন বলছেন জগৎটা যে বাহিরে বাস্তবিকই আছে আমরা যে রূপে দেখি প্রায় সেই রূপেই এটা হল বিশ্বাসের কথা—an aot of faith—বিশ্বাস ছাড়া (অধ্যাত্ম-ক্ষেত্রের

* "নাম ও রূপ উভয়ই পরমার্থতঃ অস্তিত্বহীন; উহাদের অন্তরালে অনির্ব্বাচ্য অজ্ঞেয় কিছুই নাই; উহা কেবল ক্ষণিক বিজ্ঞানের সমষ্টি ও পরম্পরামাত্র; উহারা ঐরূপ দেখায় মাত্র; কিন্তু উহাদের প্রকৃত স্বরূপ স্বপ্নের মত; এইটুকু বলাই প্রতীত্যসমুৎপাদের তাৎপর্য্য।"—প্রতীত্য-সমুৎপাদ, শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ("জিজ্ঞাসা")।

মত) এ ক্ষেত্রেও উপায়ান্তর নাই। আর কেউ কেউ (যথা, নববস্তুতান্ত্রিক সম্প্রদায়—Neo-Realists) আবার এই প্রসঙ্গে natural piety'র সঙ্গে সব গ্রহণ করার কথা বলছেন। বার্ট্রাণ্ড রাসেলও এই সমস্যা ও বিপত্তির মধ্যে এসে পড়েছেন—তিনি বলছেন জগৎটাকে, বাহ্যবস্তুকে স্বীকার করে নিতে হয় স্বীকার্য্য হিসাবে—working hypothesis হিসাবে; বস্তু-জগৎটাকে স্বীকার করে নিলে বস্তুজগতের সব ব্যাখ্যা সুসঙ্গত হয়, অন্যান্য সমস্যারও একটা সুরাহা হয় তাই বস্তুজগৎ সত্য।

কিন্তু এ সব রকম ফন্দীতে জগতের উপর মায়ার bar sinister—কলঙ্কচিহ্ন রয়েই গেল। সত্যকার উদ্ধারের পথ নাই? দার্শনিকদের মধ্যে কাণ্টও একটা পথ বাতলে দিয়েছেন—বিচারের পথ ঐ রকম গোলমেলে বটে, কিন্তু মানুষের আরও অন্যদিক আছে, যে দিক দিয়ে জগতের বা বিচারাতীত জিনিষের অস্তিত্ব বা বাস্তবতা গ্রাহ্য। কথাটা সহজ কিন্তু গভীর, সমস্যাপূরণের পথ ঐ দিক দিয়ে—তা বলছি। জগৎ যে আছে, আমাদের বাহিরেই আছে আর জগতের যে রূপ আমাদের কাছে প্রকাশ পায় তা যে জগতেরই, তা যে সত্য ও বাস্তব, কেবল মন-গড়া নয়, এ কেবল বিশ্বাসের, স্বীকার্য্যের বা অনুমানেরও কথা নয়। দার্শনিকের তথা বৈজ্ঞানিকের ভুল এইখানে যে জগতের সাথে পরিচয় বা সম্বন্ধের মাত্র একটি পথ আছে ধরে নিয়েছেন—মনের বুদ্ধির বিচারের পথ। কিন্তু তা নয়—কাণ্ট অন্তত অন্য একটি রাস্তার কথা বলেছেন; সম্বোধিবাদীরাও (Intuitionist) যুক্তিবাদীদের "নান্যঃ পন্থা" মন্ত্র স্বীকার করেন না।

আসল কথা হল এই। সত্য যে সত্য, বস্তু যে বাস্তব তার একমাত্র প্রমাণ হল প্রত্যক্ষ বা সাক্ষাৎকার। তবে এই সাক্ষাৎকারের বিভিন্ন পর্য্যায় বা স্তর আছে, বস্তুর বা বাস্তবের স্তর হিসাবে। স্থূল ইন্দ্রিয় জগৎকে যে দেখে ও যে ভাবে দেখে তা একটা প্রত্যক্ষবোধ, সাক্ষাৎকার, একাত্মানুভব। ইন্দ্রিয় স্থূল বস্তুকে অনুমান করে নেয় না, তাকে স্পর্শ করে, তার সাথে একীভূত হয়ে, তার সত্যতার পরিচয় ও প্রমাণ পায়। দেশ আছে, কাল আছে, বস্তু আছে বাহ্য সত্য হিসাবেই তারা মনের চিন্তার রচনামাত্র নয়—এ সকল বিষয়ের সম্বন্ধে ইন্দ্রিয়ের হল অপরোক্ষ-জ্ঞান ও উপলব্ধি। তাদের সত্যতা সম্বন্ধে সন্দিহান হয়ে উঠি তখন—যখন তার সমপর্য্যায়ের করণ দিয়ে নয়, ভিন্ন পর্য্যায়ের করণ দিয়ে—মনের বিচার যুক্তির সহায়ে—তাদের পরিচয় লাভ করতে চাই; তখন তারা স্বভাবতই গৌণ প্রত্যয়ের জিনিষ, অনুমানের জিনিষ হয়ে পড়ে। মন সাক্ষাৎ ভাবে দেখে, প্রত্যক্ষ করে, একাত্মতার ফলে সত্যবস্তু বলে জানে মনের জিনিষকে, মনের বিবিধ বৃত্তিকে। মন বুদ্ধি তার নিম্নতর জিনিষের সম্বন্ধে যেমন সাক্ষাৎপরিচয় পায় না তেমনি তার ঊর্দ্ধতর জিনিষ সম্বন্ধেও—যথা, আত্মা, ভগবান প্রভৃতি—সাক্ষাৎ পরিচয় পায় না। সেই রকমে প্রাণও তার নিজের স্তরের সত্যকে দেখে—সাক্ষাৎভাবে, অপরোক্ষ-ভাবে, তার সাথে একীভূত একাত্ম হয়ে। বের্গসঁএর সমস্ত দর্শনই হল এই প্রাণস্তরের সাক্ষাৎ দর্শনের কথা এবং তাঁর ইনটুইশন (Intuition) এই প্রাণময় একাত্মতা; এই জন্যই জড়ের পৃথক অস্তিত্ব তিনি দেখতে পারেন নাই এবং তাঁর ভগবান বা উচ্চতর অধ্যাত্ম সত্যগুলি এই প্রাণময় অনুভূতিরই বিভিন্ন রূপায়ন মাত্র। প্রাণের নিরবচ্ছিন্ন গতি যেখানে ব্যাহত হয়েছে, থেমে গিয়েছে (অন্তত বুদ্ধি তাই বোধ করে) সেখানেও তখন দেখা দেয় যাকে বলি জড়। আধ্যাত্মিক মুক্তি বা স্বাধীনতা হল প্রাণের এই নিরবচ্ছিন্ন গতির সাথে এক হয়ে যাওয়া।

স্থূল ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ করে বস্তু জগৎ, প্রাণপুরুষ প্রত্যক্ষ করে প্রাণ জগৎ, মনঃপুরুষ প্রত্যক্ষ করে মনোজগৎ—আর আত্মা সাক্ষাৎ করে আধ্যাত্মিক জগৎ। প্রত্যেক জগৎই সত্য, সকলেই সত্য—তবে কথা এই, প্রত্যেকে সত্য তখন—যখন প্রত্যেকে আপন ক্ষেত্রেরই মধ্যে আবদ্ধ অর্থাৎ সংযত থাকে, অন্য ক্ষেত্রের মধ্যে অনধিকার প্রবেশের চেষ্টা করে না। ফলতঃ একটি স্তরের দৃষ্টি দিয়ে আর একটি স্তরকে দেখতে গেলেই যা ছিল প্রত্যক্ষ তা হয়ে পড়ে পরোক্ষ—ইন্দ্রিয়ের দৃষ্টি দিয়ে যদি মনকে দেখতে যাই (Behaviourist নামক মনস্তাত্ত্বিকেরা যা করেন) তবে মনের স্বাধীন স্বতন্ত্র সত্য লোপ পায়, সেই রকম মনের দৃষ্টি দিয়ে যদি ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া দেখি (rationalistরা যা করেন) তা হলে ইন্দ্রিয় হয়ে পড়ে একটা গৌণ-অবাস্তব-প্রকরণ। আরো বলা যেতে পারে একটি স্তরের প্রত্যক্ষকে আর একটি স্তরের প্রত্যক্ষ দিয়ে বাতিল বা অস্বীকার নয় তবে সংশোধন করে, সংশোধন হয় ত ঠিক নয়, সীমাবদ্ধ করে বা যথাসন্নিবিষ্ট করে ধরা যায়—আর সাধারণতঃ তা করা যায় নিচেরটিকে ঊর্দ্ধতরটি দিয়ে। ক্ষুদ্র সীমানার অন্তর্গত সাক্ষাৎলব্ধ সত্যকে সার্ব্বভৌম সত্য বলে ধরাই হল ভ্রান্তি ও প্রমাদ—আধুনিক আপেক্ষিক-তত্ত্বও এই কথাই বলছে; কিন্তু তাই বলে যে সত্য আপেক্ষিক অর্থাৎ স্থানকাল-পরিচ্ছিন্ন তা যে অসত্য তা নয়। মায়াবাদী (বৈজ্ঞানিক মায়াবাদী হৌন বা দার্শনিক মায়াবাদী হৌন বা আধ্যাত্মিক মায়াবাদী হৌন) যে ভুল করেন তা ঠিক এইখানে! খণ্ড সত্য আছে, খণ্ড বাস্তব আছে, পূর্ণ অখণ্ড সত্য হল তা'ই যার মধ্যে সে-সকলের সমন্বয় সামঞ্জস্য হয়েছে, এমন নয় যেখানে একটিমাত্র সত্য আছে অন্য সব কিছু বিলোপ হয়ে গিয়েছে।

আমরা বলেছি নীচের সাক্ষাৎকারকে তার উপরের সাক্ষাৎকার দিয়ে সংশোধিত বা পরিচ্ছিন্ন করে নিতে হয়—কিন্তু এ কাজটি সর্ব্বতোভাবে সুষ্ঠু হওয়া সম্ভব নয়। কারণ ইন্দ্রিয় প্রাণ মন-বুদ্ধি, এরা সকলেই মোটের উপর একান্তই সীমাবদ্ধ অজ্ঞানের বা অর্দ্ধজ্ঞানের রাজ্যে। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে এই রকম একটা সংশোধন ও সংস্কারের প্রক্রিয়া আছে বটে। বৈজ্ঞানিক প্রথমে ইন্দ্রিয়জ সাক্ষাৎ-জ্ঞানকে আশ্রয় করে, তার সত্যতায় নির্ভর করে তাঁর যাত্রা সুরু করেন—কিন্তু এর সঙ্কীর্ণতা সংশোধন করে নিতে চেয়েছেন মনের—বিচার বিতর্কের-যুক্তির সহায়ে; কিন্তু এ কাজটি সহজ নয়, কতখানি বিপদজনক তা আমরা দেখেছি—ইন্দ্রিয়প্রত্যয়কে সংশোধন করতে গিয়ে সংহার করেছেন। প্রথমে ইন্দ্রিয়কে অতিমাত্র করে ধরেছেন, শেষে মনের বিচার বিতর্ককে অতিমাত্র করে ধরেছেন। উভয়ের সামঞ্জস্য বা সংযোগ খুঁজে বার করতে পারেন নাই।

এই সামঞ্জস্য ও সংযোগ রয়েছে আরও ঊর্দ্ধতর এক চেতনার ক্ষেত্রে এক অধ্যাত্ম সাক্ষাৎকারই পূর্ণ জ্ঞানের রাজ্যে তুলে ধরে। তবে এ রাজ্যেও একটা আশঙ্কা আছে—একটা চোরাগলি (cul-de-sac) আছে। ইতিপূর্ব্বে তাকে আমি মায়াবাদীর আধ্যাত্মিকতা নাম দিয়েছি। কারণ এটি হল বিশুদ্ধ নিষ্ফল সমাধিগত আধ্যাত্মিক চৈতন্যের কথা—এর মধ্যে জ্ঞানের অনুভূতির প্রত্যয়ের আর কোন অঙ্গ থাকে না। অপরার্দ্ধগত দেহ-প্রাণ-মনের অনুভূতিরই মতনই এর অনুভূতি একদেশদর্শী।

এই রকমের এক অখণ্ড সামঞ্জস্যপূর্ণ সাক্ষাৎকার আছে—যেখানে ইন্দ্রিয় দেখে সাক্ষাৎভাবে, প্রাণ দেখে সাক্ষাৎভাবে এবং মনও দেখে সাক্ষাৎভাবে—যুগপৎ; কারণ এরা সকলে একটা গভীরতর ঊর্দ্ধতর বৃহত্তর চেতনার অঙ্গীভূত তখন। এ চেতনা একটা আধ্যাত্মিক দৃষ্টি বটে, কিন্তু মায়াবাদীর আধ্যাত্মিক দৃষ্টি নয়, একে ছাড়িয়ে সে গিয়েছে। শ্রীঅরবিন্দ এই তত্ত্বের বা ভূমির নাম দিয়েছেন অতিমানস বা চিন্ময় বিজ্ঞান। এ দৃষ্টিতে সমস্ত সৃষ্টি বাস্তব হয়ে উঠেছে। দেহ প্রাণ মন আত্মা তাদের প্রত্যেকের স্ব স্ব বাস্তবতায় প্রতিষ্ঠিত এবং একটা পূর্ণ ও সমগ্র সমন্বয়ে বিধৃত।

জুতোর জয়

(নাটিকা)

অধ্যাপক শ্রীযামিনীমোহন কর

দ্বিতীয় অঙ্ক

দ্বিতীয় দৃশ্য

কাগজিপাড়া গ্রামে কপিঞ্জলপ্রসাদের প্রাসাদ। একখানা অতি বৃহদাকার পুস্তকপাঠে কপিঞ্জল নিমগ্ন। মধ্যে মধ্যে কি সব টুকে নিচ্ছেন। এমন সময় ভূপেনের কাঁধে ভর দিয়ে পদ্মলোচনের প্রবেশ

পদ্মলোচন। আস্তে, ভূপেন আস্তে। কি বিপদ! অত তাড়াতাড়ি করছ' কেন? ট্রেণ ফেল হয়ে যাচ্ছে না তো? জান রোগা শরীর, একটুতেই নার্ভাস প্রোস্ট্রেশন হয়ে যায়। আমায় একটা চেয়ারে বসিয়ে দাও—

ভূপেনের তথাকরণ

কপিঞ্জল। তারপর পদ্মলোচন, অত্রস্থান তোমার শরীর ও স্বাস্থ্যের পুনর্গঠনের জন্ত কিরূপ প্রতীত হচ্ছে?

পদ্মলোচন। জায়গাটা তো ভালই, কিন্তু এ শরীর কি আর সারবে? কাল রাতে পেটে একটা ব্যথা মত হয়েছিল। বোধ হয় অ্যাপেণ্ডিসাইটিস অথবা ইন্টেস্টিনাল অবস্ট্রাকশন্ কিংবা গ্যাস্ট্রিক্ আল্‌সার। তুমি জোর করে চিংড়ীর কাটলেট্—

কপিঞ্জল। ঈষৎ জোয়ানের আরক—

পদ্মলোচন। তাতে কি আমার অসুখ সারে। এ রকম অসুখ স্বয়ং সম্রাটের সম্পর্কীয় সম্বন্ধীর একবার হয়েছিল। দু'মাসের বেশী টিঁকল না। শিবের অসাধ্য রোগ। আমি তাই এখনও কোন মতে ট্রাগল্ করছি। কি বিপদ! ভূপেন, এখনও তুমি দাঁড়িয়ে আছ? জান এখন আমার মিনাডেক্স সিরাপ উইদ লিভার এক্সট্র্যাক্ট খাবার সময়।

ভূপেন। আজ্ঞে এখুনি আনছি—

ভূপেনের প্রস্থান

কপিঞ্জল। তোমার দেহযন্ত্রের এইরূপ অসুস্থতার স্থায়িত্ব কত কালের?

পদ্মলোচন। সে কথা আর বোলো না। কত দিন থেকে ভুগছি তার কি আর কোন হিসেব আছে। কলকাতার যত বড় বড় ডাক্তার সকলেই দেখেছে, কিন্তু কিছু করতে পারে নি। ব্রিটিশ ফার্মাকোপিয়ায় এমন কোন ওষুধ নেই যা আমি খাই নি। আমি, বলতে গেলে, মার্টার টু দী কজ হয়ে গেছি।

ওষুধ হাতে ভূপেনের প্রবেশ

ভূপেন। আপনার ওষুধ এনেছি।

পদ্মলোচন। দাও।

ভূপেন ওষুধ দিল। পদ্মলোচন খেলেন

কপিঞ্জল। ভূপেন, আমাদের চা এইখানেই পাঠিয়ে দিতে ব'ল।

ভূপেন। যে আজ্ঞে।

ভূপেনের প্রস্থান

পদ্মলোচন। কি বিপদ! চলে গেল নাকি? ভূপেন, ভূপেন—

ভূপেনের পুনঃ প্রবেশ

ভূপেন। আজ্ঞে, আমায় ডাকছেন?

পদ্মলোচন। ডাকছি কিনা আবার জিজ্ঞেস করছ'? বিলক্ষণ ডাকছি। চা'য়ের সঙ্গে আমার ক্রুশেন সল্টের শিশিটা পাঠাতে ভুল' না।

ভূপেন। আজ্ঞে না, আমার মনে আছে।

ভূপেনের প্রস্থান

পদ্মলোচন। সব সময় সব কথা মনেও রাখতে পারি না। এই শরীর—

কপিঞ্জল। তোমার একজন অভিভাবক প্রয়োজন। যদি উদ্বাহ বন্ধনে—

পদ্মলোচন। কি যে বল! এই বুড়ো বয়সে—

কপিঞ্জল। পুরুষ মানুষের দার পরিগ্রহের বয়স চিরকালই থাকে। লক্ষ্য করলে অনুভূতি করবে যে তাতে চিত্ত এবং শরীর উভয়ই পুষ্ট হবে এবং উন্নতি লাভ করবে।

একজন ভৃত্য চা দিয়ে গেল। উভয়ে খেতে লাগলেন

পদ্মলোচন। তোমার সাহিত্যচর্চ্চা আজকাল কি রকম চলছে?

কপিঞ্জল। মন্দ নয়। বুঝলে পদ্মলোচন, আমাদের দেশের বিশেষ করে বাঙ্গালী জাতির অবনতির প্রকৃত কারণ হচ্ছে—স্ত্রী-সুলভ সাহিত্য, সঙ্গীত এবং সজ্জা।

পদ্মলোচন। সে তো বটেই।

কপিঞ্জল। বসন্ত সম্বন্ধে অনেক কবি অনেক রচনা করে গেছেন। সবই পেলব ভাবরসে সিক্ত। আমি এই সম্বন্ধে একটী কবিতা রচনা করেছি। অনুধাবন ও শ্রবণ কর।

> দুর্দ্দান্ত দুরন্ত, অশান্ত বসন্ত, আক্রান্ত করিল মহিমণ্ড।
> কন্দর্প অন্ধ, টানিয়া কোদণ্ড, নিক্ষিপ্ত বিক্ষিপ্ত শর কাণ্ড।
> সুপর্ণ বিটপি নাড়িছে মুণ্ড,
> ঐরাবতের যেন দুলিছে শুণ্ড,
> ধাবমান দৈত্য, অস্থিভঙ্গ শৈত্য, স্খলিত বিধ্বস্ত যেন শৌণ্ড।
> বিহার পাদপে, ছিন্ন না আলপে, পত্র পুষ্প ফল খণ্ড।
> অধুনা ত্রিভঙ্গ, তারে বিকলাঙ্গ, ভুলিল উদর প্রচণ্ড।
> মেঘ চিত্রক সম প্রেমে অগণ্ড,
> বিরহ খাণ্ডবানলে হ'ল লণ্ডভণ্ড,
> মটমট দুষ্ট, ব্রজগোপিনী পুষ্ট, ঘূর্ণিত মস্তিষ্ক মেঘাণ্ড

কি রকম শ্রবণ করলে? ভাষার শক্তি, শৌর্য্য, বীর্য্য লক্ষ্যণীয় বস্তু। জাতিকে উন্নত, দুর্দ্ধর্ব, বীরত্বপূর্ণ করে তুলতে হলে তাদের চিন্তাধারা ও ভাষাপ্রণালীকে পৌরুষব্যঞ্জক করতে হবে।

পদ্মলোচন। বটেই তো।

মার্ত্তণ্ডনন্দন ওরফে তপনকুমারের প্রবেশ

কপিঞ্জল। এই যে মার্ত্তণ্ড, এস। তোমার এঁর সঙ্গে চাক্ষুষ পরিচয় নেই বটে, কিন্তু এঁর নাম আমার মুখে বহুবার শ্রবণ করেছ। ইনিই হলেন সুবিখ্যাত ভূস্বামী শ্রীযুক্ত পদ্মলোচন পাল মহাশয়। আমার বাল্যবন্ধু। অবশ্য মধ্যে অন্যূন প্রায় পঁয়ত্রিশ বৎসর কালের উপর আমাদের সাক্ষাৎ সন্দর্শনের সৌভাগ্য লাভ ঘটেনি। পদ্ম, এ হ'ল আমার সম্পর্কীয় ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীমান মার্ত্তণ্ডনন্দন বসু। এর পিতৃদেব একজন ছোটখাট নৃপতি ছিলেন বললেও অত্যুক্তি হয় না। গলগলিয়া, গোরুমহিষাণি, চরনড়চড়, ভগ্নহরকাঁদি, রামবক্সজালতিপুর ইত্যাদি অনেক স্থানেই এদের ভূসম্পত্তি আছে।

মার্ত্তণ্ডনন্দন পদ্মলোচনের পায়ের ধুলো নিলেন

পদ্মলোচন। বেঁচে থাক বাবা। তোমাকে দেখে ভারী তৃপ্ত হয়েছি। আজকাল বনেদী জমীদার আর চোখে পড়ে কই। তাছাড়া সরকারের নতুন আইনে জমীদারী রাখাই দায় হয়ে পড়েছে।

মার্ত্তণ্ডনন্দন। আজ্ঞে হ্যাঁ। আমার বার্ষিক ট্যাক্স পড়ে গিয়ে প্রায় সাড়ে সতের হাজার টাকা। আয়ও অনেক কমে গেছে। তবু বার্ষিক একলক্ষ হয়—

পদ্মলোচন। বেশ, বেশ। তোমার বিবাহ হয়েছে?

মার্ত্তণ্ডনন্দন। আজ্ঞে না।

কপিঞ্জল। ওর মস্তিষ্কের উপর অন্য কোন গুরুজন জীবিত নেই। আমিই ইদানীং ওর অভিভাবক। শীঘ্রই একটা বিবাহ ব্যবস্থা করে আমার কর্ত্তব্য সুসম্পন্ন করতে হবে। দু' একটী কন্যা দেখেছি কিন্তু আমার পছন্দ হয় নি। তোমার সন্ধানে যদি কোন সদ্বংশজাতা, সদ্‌গুণসম্পন্না, সুদর্শনা, সুলক্ষণা, স্বাস্থ্যবতী পাত্রী থাকে তো আমাকে সে বিষয়ে জানালে আমি সাতিশয় কৃতজ্ঞ হব। আমার ভ্রাতুষ্পুত্রের বিবাহের বয়স হয়েছে। এতদিন যে এই শুভকার্য্য সুসম্পন্ন হয় নি ইহাই বিলক্ষণ দুঃখের বিষয়। তবে আর কালক্ষেপ করা উচিত নয়। শুভস্য শীঘ্রম্। তোমারও নিশ্চয়ই এই মত।

পদ্মলোচন। নিশ্চয়ই। আমার হাতে একটী পাত্রী আছে। তোমার মনোমত হবে বলেই আমার ধারণা। তবে—

মার্ত্তণ্ডনন্দনের দিকে চাইলেন

কপিঞ্জল। মার্ত্তণ্ডনন্দন, এক্ষণে তুমি নিজ কক্ষে গিয়ে কিছুকাল বিশ্রাম করে হস্তমুখাদি প্রক্ষালন কর। আর গমনকালে একজন ভৃত্যকে আমার সমীপে প্রেরণ করবে।

মার্ত্তণ্ডনন্দনের প্রস্থান

এইবার তুমি যে পাত্রীটির কথা উল্লেখ করেছিলে—

পদ্মলোচন। পাত্রী আমারই একমাত্র সন্তান মীনাক্ষী। তুমি তাকে দেখলেই পছন্দ করবে এই আমার বিশ্বাস।

কপিঞ্জল। তোমার কন্যা! তাকে দেখে পছন্দ করতে হবে! দৃষ্টিপথে আনবার পূর্ব্বেই আমি তাকে মার্ত্তণ্ডনন্দনের বধূরূপে গ্রহণ করতে স্বীকৃত হলুম। অবশ্য তোমার যদি আমার ভ্রাতুষ্পুত্রকে পছন্দ হয়, তবে—

পদ্মলোচন। পছন্দ তো হয়েই রয়েছে। চমৎকার ছেলে। তোমাদের মত হবে কিনা সেইজন্য একটু কিন্তু—

কপিঞ্জল। এতে কিন্তু নাই। আমি এইক্ষণে পুরোহিতকে দিনস্থির করবার জন্য আহ্বান করছি।

একজন ভৃত্যের প্রবেশ

ভৃত্য। আজ্ঞে, আপনি ডাকছিলেন?

কপিঞ্জল। হ্যাঁ। আমার সঙ্গে যে পুরুত মশাই এসেছেন তাঁকে এইখানে পাঠিয়ে দাও। সঙ্গে পাঁজী আনতে বোলো। বুঝলে?

ভৃত্য। আজ্ঞে হ্যাঁ।

ভৃত্যের প্রস্থান

পদ্মলোচন। তুমি যে আমায় কতখানি আনন্দ দিলে তা ভাষায় প্রকাশ করা যায়না।

কপিঞ্জল। তুমি আমার আবাল্য সুহৃদ্। আমি যে তোমায় ঈষৎ আনন্দ দান করতে সক্ষম হয়েছি তজ্জন্য নিজেকে অতিশয় সৌভাগ্যবান মনে করছি। তোমার সঙ্গে কুটুম্বিতা—এর চেয়ে সুখকর ব্যবস্থা আর কি হতে পারে। হ্যাঁ, তোমার শিরঃপীড়া এখন কীদৃশ অবস্থায় আছে। কল্য রাত্রে তুমি যে প্রকার ক্লিষ্ট—

পদ্মলোচন। ভাগ্যিস মনে করিয়ে দিলে। এতক্ষণ সে কথা ভুলেই ছিলুম। উঃ, কি ভীষণ ব্যথা। ভূপেন—ভূপেন— কি বিপদ! দরকারের সময়—

ভূপেনের প্রবেশ

ভূপেন। আজ্ঞে, আমায় ডাকছেন?

পদ্মলোচন। কি বিপদ! ভূপেন, তুমি কি একটা কথা মনে রাখতে পার' না? জান, আমার এখন পটাসিয়াম্ পারম্যাঙ্গানেট দিয়ে গরম জলে গার্গেল্ করবার কথা—

ভূপেন। আজ্ঞে, সব ঠিক করে আপনাকে ডাকতে আসছিলুম।

পদ্মলোচন। কি বিপদ! তবে দাঁড়িয়ে আছ কেন? জল যে ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। কপিঞ্জল, আমি এখুনি আসছি।

ভূপেনের কাঁধে ভর দিয়া উঠে দাঁড়ালেন

কপিঞ্জল। উত্তম। তোমার উষ্ণবারি দ্বারা কণ্ঠনালী ধৌত ও তাহার পরিচর্য্যা সমাপ্ত হলে অত্রস্থানে পুনরাগমন করবে। তোমার সহিত কিঞ্চিৎ প্রয়োজনীয় বাক্যালাপ আছে।

ভূপেনের কাঁধে ভর দিয়ে পদ্মলোচনের প্রস্থান। একটু পরে এদিক ওদিক চাহিতে চাহিতে অতি সন্তর্পণে তপনের প্রবেশ

তপন। ব্রেভো, শিরীষদা! তুমি যে এত বড় অভিনেতা তা আমি জানতুম না।

শিরীষ। চুপ, চুপ। তুই ফাঁসাবি দেখছি। যদি বুড়ো কোন রকমে জানতে পারে যে আমি কপিঞ্জল নই, তা হলে সব পণ্ড হয়ে যাবে। বিয়ে ঢু ঢু। তোর জন্য কপিঞ্জল মার্কা ভাষা বলতে বলতে আমার চোয়াল ব্যথা করছে।

তপন। কিছু এগিয়েছে?

শিরীষ। মেরে এনেছি। এখুনি পুরুত আসবে দিনস্থির

কর্মতে। ভাগ্যে সঙ্গে করে রমেশকে পুরুত সাজিয়ে এনেছিলুম। এখানকার পুরুত কি বলতে কি বলে বসবে তখন এক ফ্যাঁসাদ।

তপন। পায়ের ধুলো দাও, শিরীষদা।

শিরীষ। খবরদার এখানে শিরীষদা বলিস নি। আমি তোর কাকা কপিঞ্জলপ্রসাদ ভড়।

তপন। অমিতাদির বাহাদুরী আছে বলতে হবে। এবুদ্ধি আমার মাথায় আসত' না।

শিরীষ। ভালয় ভালয় বিয়েটা হয়ে গেলে তাঁর পাদোদক খাস্। এখন পালা। কখন বুড়ো এসে পড়বে—

তপনের প্রস্থান। একখানি মোটা বই নিয়ে কপিঞ্জল পড়তে লাগলেন

জানামি ধর্ম্মং ন চ মে প্রবৃত্তি
জানাম্যধর্ম্মং ন চ মে নিবৃত্তি
ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন
যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি।

ভুপেনের কাঁধে ভর দিয়া পদ্মলোচনের প্রবেশ

পদ্মলোচন। কি বিপদ! ভুপেন, সবতাতেই এত তাড়াতাড়ি কর কেন? জান, আমার শরীর খারাপ। যে কোন মুহূর্ত্তে হার্টফেল করতে পারে। নাও, চেয়ারটায় বসিয়ে দাও। (ভুপেনের তথাকরণ) হ্যাঁ, দেখ, আর আধঘণ্টা পরে আমার চোখে হেমোট্রপিন হাইড্রোক্লোর দেবার কথা। যেন ভুলে যেও না।

ভুপেন। আজ্ঞে না, ভুলব না।

ভুপেনের প্রস্থান

কপিঞ্জল। কণ্ঠনালী ধৌত করে এখন কি অপেক্ষাকৃত ভাল বোধ করছ?

পদ্মলোচন। আমার আর ভাল থাকাথাকি। এ ব্যাধি তো আর সারবার নয়। স্বয়ং সম্রাটের সম্পর্কীয় সম্বন্ধীর একবার হয়েছিল। দু'মাসের মধ্যে শেষ হয়ে গেল। আমি তাই এত দিন যুঝছি।

কপিঞ্জল। তোমার পুত্রীর বিবাহ না দিয়ে মৃত্যুর করাল কবলে পতিত হলে জীবনের কর্ত্তব্য পথ হতে ভ্রষ্ট হবে।

পদ্মলোচন। সেই জন্তই তো বেঁচে আছি। নইলে এতদিনে—

পাঁজী হাতে পুরোহিতের প্রবেশ

কপিঞ্জল। (উঠে, পায়ের ধুলো নিয়ে) আসুন পুরোহিত মহাশয়, আসন গ্রহণ করুন।

পুরোহিত। (বসে) শুভমস্তু।

পদ্মলোচন। (হাত তুলে প্রণাম করে) আমার সাইটিকা, লাম্বাগো, রিউমেটিজ্‌ম্ ও স্পাইনাল ডিসপ্লেসমেন্টের জন্ত আমি আপনাকে ঝুঁকে প্রণাম করতে পারলুম না। ক্ষমা করবেন।

পুরোহিত। কিছু না, কিছু না। মনের ইচ্ছাই আসল। তা ছাড়া শাস্ত্রেই বলেছে, "রুগ্নশরীরে কিঞ্চিৎ দোষাঃ নাস্তি"। ভগবান আপনার মঙ্গল করুন, মনস্কামনা পূর্ণ করুন।

কপিঞ্জল। পুরোহিত মহাশয়, মদীয় ভ্রাতুষ্পুত্র মার্ত্তণ্ডনন্দনের সহিত বন্ধুবর পদ্মলোচনের সুপুত্রীর শুভবিবাহের ইচ্ছা আছে।

পুরোহিত। অতি সদুদ্দেশ্য। "সময়ং বিবাহং দত্বা অক্ষয়-স্বর্গং লাভতে" অর্থাৎ যোগ্য পুত্রকন্তার উপযুক্ত সময়ে বিবাহ দিলে অক্ষয় স্বর্গ লাভ হয়।

কপিঞ্জল। শুভ আশীর্ব্বাদ ও বিবাহের দিনস্থির করে—

পদ্মলোচন। ঠিকুজি, কোষ্ঠী—

পুরোহিত। দিন স্থির করবার পর কোষ্ঠী মেলান যাবে। সৎকার্য্য মনে হওয়া মাত্রই করে ফেলা উচিৎ। (পাঁজী দেখে) আজই আশীর্ব্বাদের পক্ষে অতি উত্তম লগ্ন রয়েছে। শাস্ত্রেই লিখছে—

"লগ্নে তদ্ পঞ্চমে তুর্য্যে নবমে দশমে তথা
গুরুভৃগুর্ব্বা দোষঘ্নো বিবাহে বর্দ্ধতে সুখম্।"

অর্থাৎ এই যে সপ্তগ্রহের মিল, শুভ বিবাহের পক্ষে এটা অতি বাঞ্ছনীয়। সর্ব্বদিক দিয়ে সুখবৃদ্ধি হয়।

কপিঞ্জল। তবে অদ্যই শুভ আশীর্ব্বাদের উদ্যোগ করা যাক।

পুরোহিত। নিশ্চয়ই।

কপিঞ্জল। পদ্মলোচনের কোনরূপ আপত্তি—

পদ্মলোচন। না, আপত্তি কিসের। তবে এত তাড়াতাড়ি, বাড়ীতে কেউ জানল না—

কপিঞ্জল। আনন্দের আতিশয্যে আমি অত্যন্ত ভ্রমপূর্ণ কার্য্য করে ফেলেছিলুম। মার্ত্তণ্ডনন্দন সম্বন্ধে উত্তমরূপে খোঁজ খবর না গ্রহণ করে তার হস্তে তোমার কন্তা সমর্পণ করা সুবিবেচনার কার্য্য হবেনা। তবে আমার দিক দিয়ে বাক্যদান করা রইল।

পদ্মলোচন। পাত্রেরও তো একটা মতামত আছে?

কপিঞ্জল। আমার ভ্রাতুষ্পুত্র আমার বাক্য কদাপি লঙ্ঘন করবে না।

পুরোহিত। আশীর্ব্বাদ হলেই যে বিবাহ দিতে হবে এমন তো কোন মানে নেই। শাস্ত্রেই বলেছে যে যুক্তি বিচার দ্বারা কাজ করবে। সব সময় পুঁথির কথার ওপর নির্ভর করা চলে না।

কপিঞ্জল। পদ্মলোচন, তুমি প্রয়োজন মত সকল বিষয়ে সন্ধান গ্রহণ করবার পর তথ্যসমূহে সন্তোষ লাভ করলে সন্তুষ্ট-চিত্তে এই শুভ বিবাহে স্বীকৃত হতে পারবে। আমার মনে হয় কোন বিষয়ে দ্রুত মতস্থির করা সুধীজনের কর্ত্তব্য নয়।

পুরোহিত। অতি ন্যায্য কথা।

কপিঞ্জল। উত্তম। আপনি তাহলে এখন আসতে পারেন। দিন কিন্তু স্থির করে রাখবেন। যেখানেই হউক, এই মাসের মধ্যেই আমি মার্ত্তণ্ডনন্দনের বিবাহ দেব স্থির করেছি।

পুরোহিত। আজ সন্ধ্যায় আপনাকে খবর দেব।

পদ্মলোচন। (ব্যস্তভাবে) আজ যখন ভাল দিন রয়েছে, আশীর্ব্বাদ না হয় আজই হয়ে যাক—

কপিঞ্জল। তোমার হৃদয়ে যদি কণামাত্র সন্দেহ অথবা দ্বিধা থাকে তবে এখনই এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ কোরোনা। অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করে কোন কার্য্য সম্পন্ন করলে পরে ক্ষোভের কারণ হতে পারে।

পদ্মলোচন। তোমার ভাইপো—এর ওপর আমার আর কিছু বলবার নেই।

কপিঞ্জল। বেশ, তবে তাই হউক। পাত্রের আশীর্ব্বাদ অদ্যই হয়ে যাক্। পাত্রীর আশীর্ব্বাদ না হয় কয়েক দিবস পরে

সম্পন্ন হবে। কি বলেন পুরোহিত মহাশয়, কোন দোষ অথবা ত্রুটী হবে না তো ?

পুরোহিত। কিছু না। শাস্ত্রে সম্পূর্ণরূপে এ ব্যবস্থাকে স্বীকার করেছে।

কপিঞ্জল। তা হলে আর দেরী নয়। কার্য্যে পবিত্রচিত্তে অগ্রসর হওয়া যাক। আমি মার্ত্তণ্ডনন্দনকে এই শুভ সমাচার জ্ঞাপন করিগে।

পুরোহিত। আমিও ওদিককার বন্দোবস্ত করে ফেলি।

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

পদ্মলোচনের বাটী। কমলেশ ও অমিতা কথা কইছেন
কমলেশের হাতে একটা চিঠি

কমলেশ। (পড়ে) তপন লিখেছে ব্যাপারটা বেশ এগোচ্ছে। মামাবাবু তাকে আশীর্ব্বাদ পর্য্যন্ত করে ফেলেছেন। শিরীষবাবু কপিঞ্জলের পার্ট অদ্ভূত করেছেন। মামাবাবু মোটেই ধরতে পারেন নি।

অমিতা। ধরবেন কি করে? প্রায় পঁয়ত্রিশ বছর আগে মামা আর কপিঞ্জলবাবু সহপাঠী ছিলেন। সে কি আজকের কথা। ভাগ্যিস কথায় কথায় আমাকে একদিন কপিঞ্জল এবং তাঁর বাঙ্গালা ভাষার ওপর অদ্ভুত দখলের গল্প মামা করেছিলেন তাই তো আজ কাজে লেগে গেল। প্ল্যানটা কিন্তু আমার। তোমার মাথায় কোনদিন—

কমলেশ। ব্যস্, আর বলতে হবে না। হ্যাঁগা, তোমার দৌলতেই যে আমি করে খাচ্ছি, সে কি আর বুঝি না। মামাবাবু তো আজই আসছেন—

অমিতা। হ্যাঁ, এলেন বলে। সরকার মশাই ষ্টেশনে গেছেন। সেই জন্যই তো তাড়াহুড়ো করে তোমায় আসবার জন্য টেলিফোন করেছিলুম। খুব মজা হবে বলে মনে হচ্ছে।

মীনাক্ষীর প্রবেশ

মীনাক্ষী। ছোড়দি—(কমলেশকে দেখে) এই যে জামাই-বাবু! কখন এলেন ?

কমলেশ। অনেকক্ষণ এসে তোমার পথ চেয়ে বসে আছি দেবী, কিন্তু তোমার দর্শনসুখলাভে এ অভাগা এতক্ষণ বঞ্চিত ছিল।

মীনাক্ষী। কি মিথ্যুক আপনি! এসেছেন ছোড়দিকে দেখতে, এখন আবার কথা ঘুরিয়ে নেওয়া হচ্ছে।

কমলেশ। বিশ্বাস কর, তোমার সঙ্গে দেখা করবার জন্য মনটা চঞ্চল হয়ে উঠেছিল বলেই এসেছি। ওঁকে জিজ্ঞেস কর, এসে অবধি কেবল তোমার কথাই বলছিলুম।

মীনাক্ষী। আমায় ডেকে পাঠান নি কেন ?

কমলেশ। পাছে তোমার ধ্যানভঙ্গ হয়ে যায়, সেই ভয়ে—

মীনাক্ষী। ধ্যান আবার কার করব ?

কমলেশ। জুতোর।

মীনাক্ষী। জুতোর!

কমলেশ। হ্যাঁ গো হ্যাঁ, বিখ্যাত জুতো-ব্যবসায়ী শ্রীযুক্ত তপনকুমার বসু মহাশয়ের।

মীনাক্ষী। যান্, কি যে বলেন। আপনি ভারী—

অমিতা। তোমরা দু'জনে তাহলে গল্প কর, আমি যাই।

কমলেশ। তোমার বোনের হিংসে দেখছ ?

অমিতা। হবেই বা না কেন ?

মীনাক্ষী। যাও ছোড়দি, তুমি যেন কি! হ্যাঁ, যে জন্য এসেছিলুম। বাবা এখনও আসছেন না—

অমিতা। সরকার মশাই আর দরোয়ান ষ্টেশনে গেছে। ভয়ের কিছু নেই। মামা বুড়ো মানুষ, তাই সব গুছিয়ে আনতে একটু দেরী হচ্ছে।

নেপথ্যে হর্ণ-ধ্বনি

মীনাক্ষী। ঐ বোধহয় বাবা এলেন। আমি যাই—

মীনাক্ষীর প্রস্থান

কমলেশ। তপনবাবু আর শিরীষবাবুও এই ট্রেণেই কলকাতায় আসছেন। তপন তাই লিখেছে।

অমিতা। খুব সামলে জাল গুটোতে হবে। মামা আবার কিছু সন্দেহ না করেন।

কমলেশ। না, না, ভয়ের কিছু নেই। ওদের অভিনয় নিখুঁত হচ্ছে। তাছাড়া মামাবাবু চট করে কিছু বুঝতে পারেন না। নিজের শরীর খারাপের ম্যানিয়া নিয়েই উনি মশগুল্।

অমিতা। তপনবাবুরা কিন্তু সত্যিই জমীদার।

কমলেশ। সে তো জানি। অবশ্য তপন বলে নি, শিরীষ-বাবুর কাছ থেকে আমি শুনেছি। কিন্তু তপনের মতে হাত গুটিয়ে জমীদার সেজে বসে থাকা মরে থাকারই সমান। তাই সে ব্যবসা করে বড় হবার চেষ্টা করছে।

অমিতা। মামা যে তপনবাবুর সঙ্গে কখনও দেখা করেন নি, এ একটা ভাগ্য। এখন কাজে লেগে গেল। চোখে দেখলে তপনকুমারকে মার্ত্তণ্ডনন্দন বলে চালানো মুস্কিল হ'ত।

পদ্মলোচন। (নেপথ্যে) উঃ, কি বিপদ! ভূপেন—

অমিতা। ঐ মামা আসছেন। খুব সাবধান। কথায় কথায় যেন সব ফাঁস করে দিও না।

কমলেশ। পাগল আর কি!

পদ্মলোচনের প্রবেশ। সঙ্গে মীনাক্ষী ও ননীবালা। পিছনে আইস্‌ব্যাগ হস্তে ভূপেন

পদ্মলোচন। ননী, আমায় বসিয়ে দাও।

মীনাক্ষী ও ননীবালা ধরাধরি করে পদ্মলোচনকে চেয়ারে বসিয়ে দিলেন

নিশ্চয়ই ব্লড্‌প্রেসার বেড়েছে। মাথা একেবারে খসে যাচ্ছে। কি বিপদ! ভূপেন, দাঁড়িয়ে দেখছ' কি? আইস্-ব্যাগটা মীনাকে দাও। আর দেখ, সরকার মশাইকে বল, একবার ডাক্তার তরফদারকে—না থাক্, তুমি এখন যাও। আমার স্মেলিং সল্টের শিশিটা নিয়ে এস।

ভূপেনের প্রস্থান

অমিতা। মামা, শরীরটা কি বড্ড খারাপ লাগছে?

পদ্মলোচন। কি বিপদ! অমি, এ বাজে প্রশ্ন করবার কি উদ্দেশ্য। দেখতে পাচ্ছ আমার এখন যাই তখন যাই অবস্থা। এই অসুস্থ শরীরে ট্রেণে আসা—

অমিতা। কিন্তু তোমার তো একটা ফার্ষ্ট ক্লাস কুপে রিজার্ভ করা ছিল।

পদ্মলোচন। তা ছিল, কিন্তু তাতে তো শরীরের অসুস্থতা কমে না। অবশ্য কপিঞ্জল আর তার ভাইপো মার্ত্তণ্ডনন্দন আমার খুবই যত্ন করেছে। তবে নার্ভসগুলো ভয়ানক এক্সাইটেড ছিল কিনা—(মীনাক্ষীকে দেখে) কি বিপদ! মীনা, তুমি এখানে আছ—

মীনাক্ষী। আমি যে তোমার মাথায় আইসব্যাগ দিচ্ছি।

পদ্মলোচন। অমি দিক। তুমি আমার জন্ত একটু ফস্ফো-লিসিথিন দিয়ে বেশ ভাল এক কাপ গরম ওভালটিন করে আন।

মীনাক্ষীর প্রস্থান

অমিতা। হ্যাঁ মামা, তোমার নার্ভস্ হঠাৎ এক্সাইটেড হয়ে উঠল কেন? কাগভি-পাগলা স্থানটি তো নামের মতনই মনোরম এবং ওরা মানে কপিঞ্জলবাবু আর তাঁর ভাইপো তোমায় যথেষ্ট বন্ধুআত্তিও করেছেন—

পদ্মলোচন। তা করেছেন, কিন্তু শরীর খারাপ হ'ল মীনার জন্ত ভেবে ভেবে। তুমি যে বলেছিলে মীনার রোগটা মনের, একটা বিয়ে দিলে সেরে যেতে পারে, তাই মনোমত পাত্র দেখে, তবে—

ননীবালা। আপনি কি একেবারে পাত্র ঠিক করে এসেছেন নাকি?

পদ্মলোচন। (একগাল হেসে) তা আর আসি নি। ছেলেটি যেমন দেখতে তেমনি বিনয়ী। বেশ বড় ঘরের ছেলে। অগাধ বিষয়সম্পত্তি, জমীদারী। মানে, রাজা বললেও অত্যুক্তি হবে না।

কমলেশ। পাত্রটী কে?

পদ্মলোচন। কপিঞ্জলপ্রসাদের ভাইপো, মার্ত্তণ্ডনন্দন বসু। আমাদের পাল্টা ঘর—

ননীবালা। বাপের বড় ছেলে?

পদ্মলোচন। ঐ এক ছেলে। কেন?

ননীবালা। যদি কুল করতে চায়—

পদ্মলোচন। না, না, সে ভয় নেই। ছেলের বাপ নেই। কাকাই অভিভাবক। সে বলেছে, কোন আপত্তি নেই। আমি একেবারে আশীর্ব্বাদ করে এসেছি। এক ট্রেণেই আমরা এলুম। কালই তারা মীনাকে আশীর্ব্বাদ করতে আসবে।

অমিতা। আজকালকার ছেলে। মেয়ে না দেখে—

পদ্মলোচন। বনেদী ঘরের ছেলে। কাকা যা বলবে তাতে সে না করবে না। আজকাল ছেলেরা গুরুজনদের সম্মান করে না। তাই তো সমাজের এই অবস্থা। কি বল কমলেশ?

কমলেশ। আজ্ঞে হ্যাঁ, সে তো বটেই।

ভূপেনের প্রবেশ

পদ্মলোচন। আমাদের দেশে চিরকাল বাপ মাই বিয়ের বন্দোবস্ত করে থাকে। আজকাল কি যে এক বিলিতী ঢেউ এসেছে—

ভূপেন। আজ্ঞে আপনার ওষুধ—

পদ্মলোচন। কি বিপদ! ভূপেন, তুমি কি কোনদিন আদব-কায়দা শিখবে না। দেখছ এখন কথা কইছি—

ভূপেন। একটু পরে নিয়ে আসব—

পদ্মলোচন। কি বিপদ! ভূপেন, তোমার কি কখনও বুদ্ধি-শুদ্ধি হবে না। ওষুধ কি যখন-ইচ্ছে খেলেই হ'ল। তার একটা নির্দ্দিষ্ট সময় আছে তো। দাও—

ওষুধ নিয়ে খেলেন

ননীবালা। আমি আপনার রান্নার জোগাড় দেখি গে। নতুন বামুন এসেছে—

পদ্মলোচন। নতুন! কেন? পুরোনোটা তো বেশ ছিল। তার আবার কি হ'ল?

অমিতা। সে দেশে গেছে। বিয়ে করতে।

পদ্মলোচন। বিয়ে করতে? ব'ল কি! আরে, সে যে আমার চেয়ে বড় হবে—

ননীবালা। পুরুষদের আবার বিয়ের বয়স যায় নাকি?

পদ্মলোচন। তা বটে। কপিঞ্জলও ঠিক এই কথাই আমায় বলছিল। কি বিপদ! ভূপেন, তুমি এখনও এইখানে দাঁড়িয়ে আছ? আমার স্নানের জল—

ভূপেন। আজ্ঞে সব ঠিকঠাক করে রেখে এসেছি।

পদ্মলোচন। আচ্ছা, যাও। আমি একটু জিরিয়ে তবে যাব।

অমিতা। মামার শরীরটা আজ ভাল নেই। ট্রেণে এসেছেন। তুমি বাজার থেকে এক শিশি হিমসাগর তেল কিনে আন।

ভূপেনের প্রস্থান

পদ্মলোচন। তাহলে এদিকের সব এক রকম ঠিকঠাক হয়ে গেল। কি বল?

অমিতা। কোন দিকের?

পদ্মলোচন। কি বিপদ! অমি, কোন কথা কি তুমি চট করে বুঝতে পার না। আমাকে বকাবে তবে ছাড়বে। জান, এতে আমার কি ভয়ানক ষ্ট্রেণ হয়—

ননীবালা। আপনি মীনার বিয়ের কথা বলছেন তো?

পদ্মলোচন। হ্যাঁ। তোমার মত যদি সকলের বুদ্ধি থাকত' ননী। এখন ভালয় ভালয় চার হাত এক হয়ে গেলে নিশ্চিন্ত হওয়া যায়।

ননীবালা। সে তো বটেই।

অমিতা। কিন্তু মীনার মতটা—

পদ্মলোচন। কি বিপদ! তুমি কি ক্ষেপে গেছ অমি? মীনার মত! তার আবার মত কি? আমি তার বাপ, আমি ভাল বুঝব না, বুঝবে সে। আমার চেয়ে কি সে বয়সে বড়, না তার বুদ্ধি বেশী? কি বল, কমলেশ?

কমলেশ। আজ্ঞে হ্যাঁ, তা তো বটেই। আপনি যা করবেন তার ওপর কি আর কথা চলতে পারে।

ননীবালা। আমি এখন যাই। রান্নার বন্দোবস্ত নিজে দাঁড়িয়ে না করলে আবার আপনার খাবার অসুবিধা হবে।

পদ্মলোচন। আমাকে তুমি একটু ধর ননী। আমি গিয়ে

স্নানটা করে ফেলি। কমলেশ, খেয়ে উঠে তোমার সঙ্গে একটু পরামর্শ করতে হবে। কাল ওরা মীনাকে আশীর্ব্বাদ করতে আসবেন।

কমলেশ। বেশ। আপনার যখন সুবিধা হবে এ বিষয়ে একটা কথাবার্ত্তা কওয়া যাবে।

ননীবালার কাঁধে ভর দিয়ে পদ্মলোচনের প্রস্থান

অমিতা। কি রকম মনে হচ্ছে?

কমলেশ। ও, কে। তবে আমার মনে হয় ব্যাপারটাকে ন্যাচুরাল করতে হলে মীনার দিক থেকে প্রথমে একটু আপত্তি থাকা দরকার।

অমিতা। (সানন্দে) তারপর আমরা বোঝাব। শেষে অনিচ্ছা সত্ত্বেও রাজী হবে। (হাততালি দিয়া) কি মজা!

কমলেশ। অনেকটা মার্টার ভাব। তাতে মামাবাবু আরও ইমপ্রেস্‌ড্‌ হবেন। সন্দেহ করবার তো কোন ফাঁকই থাকবেনা, তার ওপর আবার মীনা আপত্তি করছে শুনলে তিনি মার্ত্তণ্ডনন্দনের সঙ্গে বিয়ে না দিয়ে কিছুতেই ছাড়বেন না।

অমিতা। ভারী ইণ্টারেষ্টিং ব্যাপার হবে।

কমলেশ। তারপর আমার একমাত্র শ্যালিকা কল্যাণীয়া মীনাক্ষীদেবীর শুভপরিণয় ক্রিয়া চুকে গেলে, তোমার মামার একটা—

অমিতা। মামার!

কমলেশ। হ্যাঁ গো, তোমার মামার। শুনলেনা, কি রকম করুণভাবে বললেন, "হ্যাঁ কপিঞ্জলও বলছিল বটে, পুরুষ মানুষের বিয়ের বয়স যায় না।"

অমিতা। এই বয়সে পাত্রী খুঁজে বিয়ে করতে মামার লজ্জা করবে না।

কমলেশ। মোটেই না। কারণ পাত্রী খুঁজতেই হবেনা। হাতের কাছেই আছেন।

অমিতা। কে?

কমলেশ। তোমার মাসীমাতা ঠাকুরাণী।

অমিতা। তোমার নজর তো খুব।

কমলেশ। তোমারই ট্রেণিং।

অমিতা। মানে—

ওভালটিন হাতে মীনাক্ষীর প্রবেশ

মীনাক্ষী। বাবা কোথায় গেলেন?

অমিতা। স্নান করতে।

মীনাক্ষী। যাই, ওভালটিনটা দিয়ে আসি।

কমলেশ। ক্ষণেক দাঁড়াও সখি। যে ক'দিন পার, গরীবকে দর্শন সুখ থেকে বঞ্চিত কোরোনা। তারপর তো—

মীনাক্ষী। (অবাক হয়ে) কি বলছেন—

কমলেশ। ঠিকই বলছি। তোমার যে বিয়ে।

মীনাক্ষী। যান্, সব সময় ঠাট্টা—

অমিতা। ঠাট্টা নয়। মামা বিয়ের সব ঠিক করে এসেছেন।

কমলেশ। পাত্র কপিঞ্জলপ্রসাদের ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীমান মার্ত্তণ্ডনন্দন বসু, ওরফে শ্রীতপন কুমার।

মীনাক্ষী। আঃ, আপনি ভারী—

অমিতা। মনে মনে তুই খুব খুশী হয়েছিস, অথচ মুখে—

মীনাক্ষী। ছোড়দি, তুমিও শেষে ওঁর পক্ষ হলে—

কমলেশ। আমার স্ত্রী আমার পক্ষ হবেনা তো কি তোমার পক্ষ হবে। এখন কথা হচ্ছে এই, যে মনে যতই খুশী হও, মুখে বিলক্ষণ আপত্তি জানাবে। তাতে মামা আরও কনভিন্‌স্‌ড্‌ হবেন, আর বিবাহটাও চট্ করে হয়ে যাবে।

অমিতা। একটু কান্নাকাটি, আহার নিদ্রাত্যাগ—

কমলেশ। (চাপাগলায়) চুপ, তোমার মাসী আসছেন। (চেঁচিয়ে) তুমি শরীরের প্রতি একটু যত্ন নাও মীনা। দিন দিন যে রকম রোগা হয়ে যাচ্ছ—

ননীবালার প্রবেশ

ননীবালা। কমলেশ, কালকের কাজকর্ম্মের ভার সবই তোমায় নিতে হবে বাবা। পালমশাইয়ের যে রকম শরীর—

কমলেশ। আপনি কিছু ভাববেন না মাসীমা। আমার যতটুকু ক্ষমতা নিশ্চয়ই করব।

অমিতা। মীনা, তোর যে কাল আশীর্ব্বাদ।

মীনাক্ষী। যাঃ।

ননীবালা। হ্যাঁ মা। তোমার বাবা কাগজিপাগলা থেকে বিয়ের যে সমস্ত ঠিকঠাক করে এসেছেন। পাত্র ওঁরই বন্ধু কপিঞ্জলপ্রসাদ বাবুর ভাইপো মার্ত্তণ্ডনন্দন বসু। শুনলুম যেমনি দেখতে তেমনি বড়লোক।

মীনাক্ষী। না মাসীমা, আমি বিয়ে করবনা। বাবাকে বলে তুমি এ বিয়ে বন্ধ করে দাও।

ননীবালা। সে কি কথা মা! তা কি হয়? তোমার বাবা তাঁদের কথা দিয়েছেন, এখন না করলে তাঁর অপমান হবে যে!

মীনাক্ষী। (কৃত্রিম দুঃখ ও ক্রোধে) না, না, মাসীমা, আমি এ বিয়ে করতে পারব না, পারব না, পারবো না।

বেগে প্রস্থান

ননীবালা। এ মেয়ে আবার এক ফ্যাঁসাদ না বাধিয়ে বসে। অমি, তুমি কোন রকমে ওকে রাজী করাবার চেষ্টা কর মা।

অমিতা। আপনি কিছু ভাববেন না মাসীমা। আমি যেমন করে পারি রাজী করাব।

ভূপেনের প্রবেশ

ভূপেন। মাসীমা, বাবু আপনাকে একবার ডাকছেন—

ননীবালা। মীনা কি বললে তাই বোধহয় জানতে চাইছেন। আমি তাহলে অমি, মীনার কোন আপত্তি নেই—বলি। নইলে ওঁর আবার শরীর খারাপ করবে।

অমিতা। হ্যাঁ বলুন। যাবার সময় মাসীমা মামার ওভালটিনটা নিয়ে যাবেন। মীনা এখানে রেখে চলে গেছে।

ভূপেন ও ওভালটিন নিয়ে ননীবালার প্রস্থান

অমিতার মুখে কাপড় চাপা দিয়ে হাসি

কমলেশ। মীনা যা অভিনয় করলে—চমৎকার। না জানা থাকলে আমারই মনে হ'ত যে ওর আপত্তি আন্তরিক।

অমিতা। মেয়েরা ইচ্ছে করলে কত উঁচুদরের আর্টিষ্ট হতে পারে দেখ।

কমলেশ। সেই জন্তই তো শাস্ত্রে বলেছে, "দেবা না জানন্তি কুতো মনুষ্যাঃ।"

অমিতা। যাক্, এবার কাজ প্রায় হাসিল হয়ে এল বলা চলতে পারে।

কমলেশ। নিশ্চয়। আচ্ছা, একটা কথা জিজ্ঞেস করব? না থাক্—

অমিতা। কি বল' না।

কমলেশ। তুমি রাগ করবে না?

অমিতা। না বললে রাগ করব।

কমলেশ। আচ্ছা, তোমার মাসীমা এতদিন বিয়ে করেন নি কেন?

অমিতা। ইনি হলেন মামীমার সব ছোট বোন, বাড়ীর ছেলেমেয়েদের মধ্যে সব চেয়ে ছোট। মামা সব চেয়ে বড় বোনকে বিয়ে করেছিলেন। তারপর এই মাসীমা যখন বড় হলেন তখন ওঁর মা মারা গেছেন। ওঁর বাবা ওঁকে স্কুলে তার পর কলেজে পড়ান। উনি বোর্ডিং-এই থাকতেন। বি-এ পাস করেছেন। অবশ্য দেখলে বোঝা যায় না। তারপর ওঁর বাবাও মারা গেলেন। উনি আর বিয়ে করেন নি। ওর বয়স কিন্তু খুব বেশী নয়। আমার চেয়ে জোর বছর তিনেকের বড়।

কমলেশ। তা তো দেখেই বোঝা যায়। তা হলে এবার জোড়া বিয়ের সম্ভাবনা দেখছি।

অমিতা। আগে মীনারটা তো হোক।

উভয়ের প্রস্থান

তৃতীয় অঙ্ক

দ্বিতীয় দৃশ্য

বাসরঘর। বরবধূবেশে তপন ও মীনাক্ষী। মীনাক্ষীর বান্ধবীরা গল্প ঠাট্টা করছেন

১মা। বেশ মানিয়েছে।

২য়া। ঠিক যেন রাধাকৃষ্ণ।

৩য়া। থিয়েটারের রাধাকৃষ্ণ এখন সত্যিকারের রাধাকৃষ্ণ হল।

৪র্থী। তা হ'লে এবার একটা গান ধরা যাক্।

৫মা। যা বলেছিস্। অভিনন্দন জানাবার এর চেয়ে যুতসই প্রথা আর কি হতে পারে।

১মা। কি গান হবে।

৪র্থী। আমরা মুখে মুখে একটা নতুন গান তৈরী করে গাইব।

২য়া। তুই ধর ভাই কেয়া। বৃন্দা সেজেছিলি, তোরই আরম্ভ করবার অধিকার বেশী।

৩য়া। বেশ ধরছি।

বান্ধবীদের গান

প্রথমে কোরাসটী ৩য়া গাইবেন, পরে সকলে এক সঙ্গে গাইবেন

(কোরাস) অভিনব এই বিবাহ বাসর
কচিৎ কখন এমন হয়
আজি এ সভায় গাও সবে মিলি
জয় জয় ওগো জুতোর জয়

৪র্থী রাধাশ্যাম সেজে করি অভিনয়
হীরো হীরোইনে হ'ল পরিচয়

৫মা কভু মনে আশা কখনও নিরাশা
পাব কি পাবনা সদা এ ভয়

(কোরাস) অভিনব এই…

১মা দুহুঁ অন্তরে মিলনের সাধ
জুতো তাতে হায় সাধিল যে বাদ

২য়া জুতো বেচা ছাড়ি, কিনে জমিদারী
হ'ল গো শেষেতে শুভ পরিণয়

(কোরাস) অভিনব এই…

৩য়া (তপনের প্রতি) মেয়েরে মজালে করি মন চুরি
শ্বশুরে ভোলালে করি জোচ্চুরী

(মীনাক্ষীর প্রতি) এতদিনে বিধি মিলাইল নিধি
অঞ্চলে বাঁধি রাখিও তায়

(কোরাস) অভিনব এই…

৫মা অমিতাদি কোথায়?

২য়া তাই তো! তিনিই তো এই বিবাহের বড় পেট্রন।

৩য়া প্রামার ভুল হ'ল।

৪র্থী কি গো মীনাক্ষী, কেমন লাগছে?

১মা এ লাগা কি আর ভাবায় বর্ণনা করা যায়।

অমিতার প্রবেশ

২য়া। এই যে অমিতাদি, আসুন। আপনার কথাই হচ্ছিল।

অমিতা। আমার কথা কেন ভাই? এমন তোফা বরবউ থাকতে—

৩য়া। আপনার জন্তই তো সম্ভব হ'ল।

অমিতা। আমি আর তোমায় আপনি, তপনবাবু, এসব বলতে পারব না।

৪র্থী। আপনি বলতে যাবেন কেন? বরং তপনবাবুই আপনাকে আপনি, মশাই বলবেন।

৫মা। আমার মনে হয় কৃতজ্ঞতার নিদর্শনস্বরূপ তপনবাবুর আর মীনার অমিতাদিকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করা উচিৎ।

মীনাক্ষী ও তপন প্রণাম করতে উদ্যত

অমিতা। থাক্, থাক্। আর প্রণাম করতে হবে না। অতি ভক্তি চোরের লক্ষণ। এর পর কি আর আমাদের কথা মনে থাকবে?

১মা। এবার আমরা আবার রাধাকৃষ্ণ প্লে করব। পার্ট খুব ন্যাচুরাল হবে।

২য়া। আবার বেশী ন্যাচুরাল না হয়ে যায়। অন্ত সব প্লেয়ারদের কথা ভুলে গেলেই ফ্যাসাদ।

৪র্থী। কি তপনবাবু, আপনি এত গম্ভীর কেন?

৩য়া। আপনার মতলব আমরা বুঝি। ওঁর গম্ভীর মুখ দেখে আমরা সরে যাই, আর আপদরা বিদায় হলেই ওঁরা দু'জনে মনের সুখে কপোত-কপোতীর মত বকবকুম করেন।

তপন। না, না, তা নয়—তা নয়। আমি ভাবছি।

অমিতা। কি ভাবছ? মীনার মুখ। সে তো চিরকালই ভাববে। ভাববে আর—নেহাৎ মীনার বড় বোন তাই কিছু বললুম না।

মীনাক্ষী কিল দেখাইলেন

তপন। না, তা নয়। আমি ভাবছি সব জানাজানি হয়ে গেলে ব্যাপারটা কি রকম দাঁড়াবে।

৫মী। একটা খুব উঁচু দরের ফার্স হবে। এর বেশী আর কি? কি বলেন অমিতাদি?

অমিতা। আবার কি! তবে মামার আইস, ওডিকলোন ইত্যাদির খরচ একটু বেড়ে যাবে।

১মা। সে জন্য এখন বর-বউয়ের গান শোনা তো বন্ধ থাকবে না।

তপন। আমাদের গান তো আপনারা শুনেছেন।

২য়া। ও বাবা, এরই মধ্যে এত! একবচন ছেড়ে দ্বিবচন ধরেছেন।

৩য়া। বছর খানেকের মধ্যে আর দ্বিবচনে কুলোবে না।

মীনাক্ষী তাকে ঘুসি দেখাইলেন

৪র্থা। এবার মীনা, তুই একটা গান কর। কোন ওজর আপত্তি আমরা শুনব না।

মীনাক্ষী চুপ করে রইলেন

৫মী। অমিতাদি, আপনি একটু বলুন না। এখানে আপনিই তো এদের গুরুজন এবং গার্জেন।

অমিতা। নে মীনা, একটা গেয়ে ফেল্।

মীনাক্ষী। আমার ভারী লজ্জা করছে।

অমিতা। লজ্জা করছে? কাকে? তপন তো আর নতুন লোক নয়। ওর সঙ্গে এই প্রথম আলাপও নয়। তবে যদি মনে করিস্ এখন থেকে শুধু ওকেই গান শোনাবি, সে অবশ্য অন্য কথা। কিন্তু আজকের দিনটা না হয় আমাদেরও একটু মনে রাখলি। একটা দিন বই ত' নয়।

মীনাক্ষী। যাও, তুমি ভারী অসভ্য। আমি গান করছি, তুমি থাম।

গান

তুমি গো আমার বাঞ্ছিত প্রিয়, চির সাধনার ধন।
আবেগ কামনা আকুলতা দিয়ে চেয়েছিল মোর মন॥
যুগে যুগে আমি পুজেছি তোমায়,
কথা গীতি সুরে ছন্দ লীলায়,
হৃদয় অর্ঘ্য তোমারি চরণে করেছি সমর্পণ।
আমার স্বর্গ জীবন দেবতা, ধ্যান জপ আরাধন॥

নেপথ্যে পদ্মলোচনের কণ্ঠস্বর

অমিতা। মামা আসছে। খুব রেগেছে মনে হচ্ছে।

পদ্মলোচন ও ননীবালার প্রবেশ

পদ্মলোচন। না, আমি কোন ওজর আপত্তি শুনব না—

ননীবালা। কিন্তু পাল মশাই বাসর ঘরে—

পদ্মলোচন। হোক বাসর ঘর। আমার সঙ্গে জোচ্চুরী। (তপনকে) তোমার নাম কি?

তপন। মার্ত্তণ্ডনন্দন বসু।

পদ্মলোচন। মিথ্যা কথা। তোমার নাম তপনকুমার বসু।

তপন। আজ্ঞে হ্যাঁ। সহজভাষায় তপনকুমার আর মার্ত্তণ্ডনন্দন তো একই।

পদ্মলোচন। মানে? ননী, এরা আমায় মেরে ফেলবে তবে ছাড়বে। প্রত্যেক জিনিষের যদি আমায় ভেবে ভেবে মানে করতে হয় তাহলে কতদিন বাঁচব।

ননীবালা। কমলেশ তো তপনের কাকাকে ডাকতে গেছে। তাঁকে জিজ্ঞেস করলেই সব কথা পরিষ্কারভাবে জানা যাবে।

পদ্মলোচন। তা যাবে। কি বিপদ! ননী, কমলেশ এখনও আসছে না কেন? অনেকক্ষণ তো গেছে।

ননীবালা। যেতে আসতে সময় লাগবে তো। আপনার শরীর খারাপ। উত্তেজনা—

পদ্মলোচন। কিন্তু কি করব বল? এরা কি আমার কথা ভাবে?

ননীবালা। ভূপেন, ভূপেন—অমি, যাও তো মা, তোমার মামাবাবুর জন্য একটা চেয়ার নিয়ে এস।

অমিতা। আনছি।

অমিতার প্রস্থান

পদ্মলোচন। মীনা নিশ্চয়ই সব জানত'।

ননীবালা। না, না, ও ছেলেমানুষ। এ সব কি জানে। তা ছাড়া এ বিয়েতে তো ও আপত্তিই করেছিল।

চেয়ার নিয়ে অমিতা ও ভূপেনের প্রবেশ

অমিতা। মামা, তুমি চেয়ারটায় বস।

পদ্মলোচন বসলেন

ননীবালা। ভূপেন, বাবুর বোধ হয় ওষুধ খাবার সময় হ'ল।

পদ্মলোচন। তাই তো। কি বিপদ! এই সব গণ্ডগোলে আমার ওষুধ পর্য্যন্ত খাওয়া হয় নি। ভূপেন, শীগ্গির আমার জন্য এক ডোজ সিরাপ কর্ডিয়ালিস নিয়ে এস।

ননীবালা। ও কি ঠিক আনতে পারবে। আমি যাই।

ভূপেন ও ননীবালার প্রস্থান

পদ্মলোচন। এ সমস্ত তোমাদের ষড়যন্ত্র। অমি, তুমি নিশ্চয়ই সব জানতে—

অমিতা। কি জানতুম মামা?

পদ্মলোচন। কি বিপদ! কোন কথা কি নিজে বুঝতে পার না অমি? সব কথা খুলে বলতে হবে। জান, আমার শরীর খারাপ। বেশী এগ্জারশানে যে কোন মুহূর্ত্তে হার্টফেল অথবা কোল্যাপ্স করে যেতে পারি। তুমি সেই বকাবে তবে ছাড়বে। তুমি কি জানতে না যে মার্ত্তণ্ডনন্দন আর তপনকুমার একই লোক।

অমিতা। আমি কি করে জানব? অবশ্য যখন দেখলুম যে মার্ত্তণ্ডনন্দনকে ঠিক তপনকুমারের মত দেখতে, তখন মনে একটা সন্দেহ হয়েছিল। তারপর ভাবলুম দু'জন লোক এক রকম দেখতেও তো হতে পারে। আমরা তো এখনও ওকে মার্ত্তণ্ডনন্দন বলেই জানি। উঃ ভয়ানক ঠকিয়েছে তো।

ননীবালার প্রবেশ

ননীবালা। এই নিন পালমশাই, ওষুধটা খেয়ে ফেলুন।

পদ্মলোচন। (ওষুধ খেয়ে) আঃ! ভাগ্যে তুমি আছ ননী,

নইলে এতদিনে এরা আমাকে মেরে ফেলত'। আমিএকে বুড়ো-মানুষ, তার রুগী—

অমিতা। আচ্ছা মামা, তপনকুমার আর মার্ত্তণ্ডনন্দন যে একই লোক, তুমি কি করে ধরলে?

পদ্মলোচন। নীচে এক গাদা জুতোর প্যাকেট এসেছে, আর তার সঙ্গে এই চিঠি।

অমিতা (চিঠি নিয়ে পাঠ) "শ্রীচরণেষু, আপনার শ্রীচরণ শোভিত করার উদ্দেশ্যে আমার দোকানের বিভিন্ন প্যাটার্নের একজোড়া করে বিনামা পাঠালুম। সেবক—শ্রীতপনকুমার বসু ওরফে মার্ত্তণ্ডনন্দন বসু।"

ননীবালা। হ্যাঁ বাবা, এ তোমার চিঠি?

তপন। আজ্ঞে হ্যাঁ। ওঁর শ্রীচরণ সেবা করবার লোভ সামলাতে না পেরে—

পদ্মলোচন। দেখেছ ননী। এর পর আর সন্দেহের কিছু আছে। কি বিপদ! এখনও কমলেশ এল না।

কমলেশ ও কপিঞ্জলের প্রবেশ

কমলেশ। এই যে মামাবাবু এসে পড়েছি। অতখানি যাওয়া আসা, তার ওপর কপিঞ্জলবাবু শুয়ে পড়েছিলেন—

পদ্মলোচন। আচ্ছা কপিঞ্জল, তোমার ভাইপো মার্ত্তণ্ডনন্দন যে তপনকুমার, তা জানতে?

কপিঞ্জল। আজ্ঞে হ্যাঁ, তা জানতুম।

পদ্মলোচন। কি বিপদ! জানতে অথচ ব'লনি!

কপিঞ্জল। আপনি তো জিজ্ঞেস করেন নি।

পদ্মলোচন। ও জমীদার?

কপিঞ্জল। হ্যাঁ। ওর অনেক জমীদারী আছে। ব্যাঙ্কে অগাধ টাকা। কাগডিপাগলার বাড়ী, ঘর, জমীদারী ওসব ওর। তবে ওর একটা জুতোর ব্যবসাও আছে, আর তাতে বিলক্ষণ আয় হয়।

পদ্মলোচন। কি বিপদ! তোমরা পাঁচজনে মিলে আমায় ঠকিয়ে শেষে সেই জুতোর সঙ্গেই মীনার বিয়ে দিলে।

কপিঞ্জল। আজ্ঞে, পাত্র তো আপনিই পছন্দ করেছিলেন। জুতোর কথা ছেড়ে দিলে পাত্র সম্পূর্ণরূপে আপনার মনোমত।

পদ্মলোচন। হুঁ। হ্যাঁ হে কপিঞ্জল, তুমি আমাকে হঠাৎ আপনি বলছ' কেন? তা ছাড়া তোমার কথাবার্তাও যেন কি রকম সন্দেহজনক ঠেকছে। কপিঞ্জল তো এরকম ভাষায় কথা কইত না।

কপিঞ্জল। (মাথার পরচুল খুলে ফেলে) তার কারণ আমি তো কপিঞ্জল নই। তপনকুমার আমার বন্ধু। তার বিবাহের ব্যবস্থা করবার জন্ত কিছুদিনের জন্ত কপিঞ্জল সেজেছিলুম মাত্র।

পদ্মলোচন। কি বিপদ! তোমরা সবাই জোচ্চোর। আমাকে ঠকিয়ে—

একগাদা জুতোর বাক্স নিয়ে ভূপেনের প্রবেশ

ননীবালা। এসব কি?

ভূপেন। জুতো।

পদ্মলোচন। আঃ, ওসব এখানে আনলে কেন?

কপিঞ্জল। আমি আনতে বলেছিলুম। ভূপেন, তুমি এখন বাইরে যাও।

ভূপেনের প্রস্থান

পদ্মলোচন। তুমি বলেছিলে! কেন?

কপিঞ্জল। একবার দেখুন আপনার পছন্দ হয় কিনা?

পদ্মলোচন। (কট্‌মট্‌ করে কপিঞ্জলের দিকে চেয়ে) তোমার নাম কি হে?

কপিঞ্জল। শিরীষকুমার নন্দী।

পদ্মলোচন। শিরীষ। এটা আসল নাম, না নকল?

শিরীষ। এটা আসল পৈতৃক নাম।

জুতোর বাক্স খুলে সবগুলি সাজিয়ে রাখলেন

পদ্মলোচন। হুঁ। তা শিরীষ, জুতোগুলো কিন্তু দেখতে বেশ।

শিরীষ। আজ্ঞে হ্যাঁ। একটা পায়ে দিয়ে দেখুন না।

পদ্মলোচন। আরে আমার পায় ফিট্‌ করবে কেন?

মীনাক্ষী। ঠিক ফিট্‌ করবে বাবা। তোমার জুতোর মাপেই যে তৈরী।

পদ্মলোচন। (হেসে) ওঃ! জোচ্চুরী করে মাপও নিয়েছিস্‌। (একটা জুতো পরে) তাই তো রে! দেখছ' ননী, এ যে ঠিক ফিট্‌ ক'রেছে।

ধীরে ধীরে যবনিকা পতন

বয়োবৃদ্ধ

শ্রীকমলাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

যবে বয়োবৃদ্ধ হবে,
শ্লথ-গ্রীবা কম্পমান,
ধীর কণ্ঠে প'ড়ে যাও,
মনে করো গত-দিন,

শুভ্রকেশ শ্রান্ত নিদ্রাতুর,
অগ্নি-পার্শ্বে ব'সে বই হাতে
নয়নের স্বপন-মায়াতে
দৃষ্টি তব ছায়া-পরিপুর।

সানন্দ সুন্দর ক্ষণে
সত্য কিম্বা মিথ্যা প্রেম
অপবর্ত্ত আননের
একজনও বেঁধেছিল

কে কে ভালোবেসেছিল তোরে,
অর্ঘ্য দিল রূপের পূজায়;—
দুঃখ-শোকে, মনবেদনায়
পথিক-আত্মার প্রেম-ডোরে।

উজ্জল শিখার পার্শ্বে
চিন্তা করো একমনে,
নভোচুম্বী গিরিমালা,
প্রেম মুখ লুকায়েছে

ঈষৎ-আনত হ'য়ে দুখে
পলাতক প্রেম সে কোথায়;
সেথা তারে খুঁজে পাওয়া যায়?
অগণিত তারকার বুকে।

(—উইলিয়ম বাটলার ইয়েটস্‌ হইতে)

হাঙ্গর

শ্রীসুরেশচন্দ্র ঘোষ

মানুষ মাছ খাইতে ভালবাসে। নিত্য নানারকম মাছ রসনাতৃপ্তিকর খাদ্যে পরিণত হইয়া মানুষের ক্ষুন্নিবৃত্তি করে। কিন্তু এমন মাছ আছে যাহারা মানুষকেই খায়। মানুষ কোন কারণে তাহাদের করাল কবলে পড়িলে আর রক্ষা নাই। তখন তীক্ষ্ণতম দন্তে খণ্ড খণ্ড করিয়া তাহারা তাহাকে বুভুক্ষু রাক্ষসের মত ভক্ষণ করে। মানুষ যাহাদিগকে খাদ্যরূপে চিরদিন সাদরে উদরে স্থান দিয়েছে, সেদিন তাহাকে খাদ্যাকারে তাহাদেরই উদর-কন্দরে প্রবেশ করিতে হয়। বিধাতার বিচিত্র ব্যবস্থা বটে। ঘটনাচক্রে ভক্ষক ভক্ষ্যে এবং ভক্ষ্য ভক্ষকে পরিণত হয়। এই জাতীয় মৎস্য কুম্ভীর অপেক্ষাও ভয়ানক। ধারালো করাতের মত অত্যন্ত তীক্ষ্ণ দাঁতের জন্যই এই মাছের সান্নিধ্যের কথা কল্পনা করিলেও মানুষ শঙ্কায় শিহরিয়া উঠে। এই মাছই হাঙ্গর আখ্যায় অভিহিত হয়। তিমিকে মাছ বলা হয় বটে, কিন্তু স্তন্যপায়ী-জীব তিমি, মাছ হইতে পারে না। অথচ হাঙ্গরকে মাছ ছাড়া অন্য কোন প্রাণীর পর্য্যায়ে ফেলা যায় না। আমরা যে মাছ নিত্য খাই—আকারে এবং প্রকারে হাঙ্গর সেই মাছ ছাড়া আর কিছু নহে।

সুদূর অতীতের বহু জাতি আজ পৃথিবীতে নাই। ইতিহাসের বুকে বিষাদ-করুণ স্মৃতি-রেখা আঁকিয়া রাখিয়া তাহারা যবনিকার অন্তরালে চিরতরে অদৃশ্য হইয়াছে। শুধু মানুষের নয়, মনুষ্যেতর প্রাণীর সম্পর্কেও সেই কথা বলা চলে। কত বিশালকায় বিচিত্রপ্রাণী সুদূর প্রাগৈতিহাসিক যুগে জন্মিয়াছিল, কিন্তু পরে তাহারা জীবনযুদ্ধে জয়ী হইতে না পারিয়া সম্পূর্ণরূপে বিলোপপ্রাপ্ত হইয়াছে। যেমন অতীতে আবির্ভূত ও তিরোহিত জাতিদের অভ্যুদয় ও পতনের বিচিত্র বৃত্তান্ত ইতিহাস বহন করিতেছে তেমনই বিলোপপ্রাপ্ত প্রাগৈতিহাসিক প্রাণীদের অদ্ভুত জীবন-কথা ভূগর্ভস্থ অস্থি বা প্রস্তরীভূত পঞ্জরের বুকে লিখিত রহিয়াছে বলিলে ভুল হয় না। এই সকল প্রস্তরীভূত অস্থি বা পঞ্জর প্রকৃতি দেবীর বিশাল সংগ্রহশালা স্বরূপ ভূগর্ভে যুগের পর যুগ সঞ্চিত ছিল, পরে সত্যানুসন্ধিৎসু পণ্ডিতদের প্রবল প্রচেষ্টায় আবিষ্কৃত হইয়া প্রাগৈতিহাসিক প্রাণীদের অদ্ভুত জীবনযাত্রার বিচিত্র চিত্র আমাদের সম্মুখে প্রসারিত করিতেছে। ভূস্তরে অবস্থিত প্রস্তরীভূত পঞ্জরপুঞ্জ পর্য্যবেক্ষণপূর্ব্বক পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন—মানবাবির্ভাবের বহুপূর্ব্বে (পরে বিলোপ-প্রাপ্ত) প্রাগৈতিহাসিক প্রাণিবর্গের বিভিন্ন শ্রেণী সুদূর অতীতের সমুদ্র সমূহের সলিলরাশিতে প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল। সেই সকল জীবের প্রস্তরীভূত অস্থি সেই বারিধিগুলির গর্ভে বিক্ষিপ্তভাবে বিদ্যমান রহিয়াছে। প্রাচীনকালের কোন কোন সমুদ্র পরে শুকাইয়া গিয়াছে এবং ভূকম্পনাদি প্রাকৃতিক বিপ্লবে তাহাদের তলদেশ উত্তোলিত হওয়ার দৃষ্টান্তও দৃষ্ট হইয়া থাকে। যেখানে সুদূর প্রাগৈতিহাসিক যুগে সমুদ্র বিরাজিত ছিল, এইরূপ প্রাকৃতিক বিপ্লবের ফলে তথায় পৃথিবীর উচ্চতম পর্ব্বত হিমাদ্রি উত্থিত হইয়া বিস্ময়কর নৈসর্গিক পরিবর্ত্তনের বার্ত্তা বিজ্ঞাপিত করিতেছে। হিমাদ্রি-ক্রোড়ে সমুদ্রচর প্রাণীর প্রস্তরীভূত পঞ্জর প্রাপ্ত হইয়া পণ্ডিতগণ এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন।

কোন কোন পণ্ডিত আমাদের দশাবতারকে বিবর্ত্তবাদের দিক দিয়া বিচার করিতে চেষ্টা করেন। সৃষ্টির আদিতে পৃথিবী জলময় ছিল এবং সেই আদিম জলরাশির বক্ষে মৎস্যজাতি রাজত্ব করিত। মীনাবতার সেই আদিম মৎস্য-প্রাধান্যের বার্ত্তা বহন করিতেছে। পরে সেই অপার ও অগাধ বারিরাশি হইতে স্থলভাগ জাগিয়া উঠিবামাত্র এরূপ জীব জন্মিল যাহা জলে বাস করে এবং আবশ্যক হইলে স্থলেও থাকিতে পারে। কূর্ম্ম বা কচ্ছপ এই জাতীয় জীব। সে যাহা হউক এ বিষয়ে সংশয় নাই যে সুদূর অতীতে এক জাতীয় মৎস্যই সমুদ্রসমূহে আধিপত্য করিত। এই সকল মৎস্যের শরীর একপ্রকার উজ্জ্বল বর্ম্মাকার আবরণে আচ্ছাদিত রহিত। এই উজ্জ্বল ও কঠিন আবরণের জন্যই পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ পরে ইহাদিগকে 'গ্যানোয়িড' আখ্যায় অভিহিত করিয়াছেন। ইহাদের দেহের (প্রস্তরীভূত অবস্থায় প্রাপ্ত) সুকঠিন অংশগুলি দেখিয়া পণ্ডিতরা অনুমান করেন ইহারা বর্ম্মাবৃত দেহ লইয়া যুদ্ধার্থী সৈনিকের ন্যায় সদম্ভে সমুদ্রবক্ষে বিচরণ করিত। গ্যানোয়িডদিগের পূর্ব্বে 'অষ্ট্রাসোডার্ম্মস্' নামক একপ্রকার (কতকটা মৎস্যাকার) প্রাণীর প্রাধান্য প্রাথমিক যুগের অপার পারাবারসমূহের বক্ষে প্রতিষ্ঠিত ছিল। বিবর্ত্তবাদী প্রতীচ্য পণ্ডিতদের অনুমান ইহারা প্রকৃতির মৎস্য সৃষ্টি করিবার প্রথম প্রচেষ্টার ফল। ইহারা মৎস্যের মত সন্তরণ করিত না, তীরে বা জলতলে বুকে হাঁটিয়া বেড়াইত। ইহাদের দেহে আত্মরক্ষার উপযুক্ত বিশেষ কোন অস্ত্র ছিল না বলিয়া বর্ম্মাবৃত দেহ বলশালী গ্যানোয়িডগণ অতি অল্প দিনেই উহাদিগকে প্রায়ই নিঃশেষ করিয়া ফেলিল। বর্ত্তমানে বিভিন্ন শ্রেণীর যে সকল মৎস্য সারা পৃথিবীর জলরাশিতে দেখা যায় তাহাদের অধিকাংশই সেই গ্যানোয়িডগণের বংশধর। কতকগুলি বংশধর বহু পূর্ব্বের পিতৃপুরুষদের ন্যায় অসীম জলধিবক্ষে যাযাবর জীবন যাপন করিতেছে এবং অপরেরা এরূপ জীবন পরিত্যাগ করিয়া কর্দ্দমাদির বক্ষে বাস করিতে আরম্ভ করিয়াছে।

হাঙ্গরদিগের আবির্ভাব ও অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে গ্যানোয়িডগণের প্রাধান্য পরিসমাপ্ত হইল বলিলে ভুল হয় না। এই স্থানে বলিলে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে ভূতত্ত্বের সহিত প্রাণিতত্ত্বের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। ইহার কারণ প্রাগৈতিহাসিক প্রাণিগণের প্রস্তরীভূত পঞ্জর ভূগর্ভের বিভিন্ন স্তরেই অবস্থিত। ভূতত্ত্ববেত্তা পণ্ডিতরা যাহাকে নিম্ন ডিভোনিয়ান যুগ বলেন সে সময় হাঙ্গরগণ প্রাধান্য প্রসারিত করিতে আরম্ভ করিয়াছে। এই যুগ বহু কোটি বৎসর পূর্ব্বে বিরাজিত ছিল। ইংলণ্ডের ডিভনশায়ার কাউন্টিতে প্রাগৈতিহাসিক প্রাণিগণের প্রস্তরীভূত পঞ্জরপূর্ণ অতি প্রাচীন প্রস্তর স্তর আবিষ্কৃত হইয়াছে। প্রস্তরীভূত অস্থিপূর্ণ এইরূপ ভূস্তর (লাল বালুকা প্রস্তরের স্তর) ওয়েলস ও স্কটল্যাণ্ডেও দৃষ্ট হয়। ডিভোনিয়ান যুগকে প্যালিয়োজোয়িক যুগের অন্তর্গত বলিয়া ধরা চলে। ভারতের ভিতর দক্ষিণাপথে সেই অতি প্রাচীন কালের ভূস্তর দৃষ্ট হয়। এই ভূভাগের ভূস্তরে সুদূর প্রাগৈতিহাসিক যুগের স্থলচর ও জলচর প্রাণীদের প্রস্তরীভূত পঞ্জর পাওয়া গিয়াছে। এক সময় দক্ষিণ ভারত দক্ষিণ আফ্রিকা, মধ্য আফ্রিকার কিয়দংশ, মাদাগাস্কার, অষ্ট্রেলিয়া, এণ্টার্কটিকা এবং সম্ভবতঃ দক্ষিণ আমেরিকার সঙ্গেও স্থলপথে সংযুক্ত ছিল।

ভূতত্ত্ববেত্তারা পৃথিবীর এই প্রাচীনতম প্রকাণ্ড ভূখণ্ডকে 'গণ্ডওয়ানা-ল্যাণ্ড' আখ্যা দান করিয়াছেন। গণ্ডওয়ানা দক্ষিণভারতের প্রাচীন নাম। অনার্য্য গণ্ড জাতির বাস-স্থলী বলিয়া এই নাম দেওয়া হইয়াছে। ভারতের উত্তর হইতে আফ্রিকার উত্তর পর্য্যন্ত এক বিশাল বারিধি বিস্তৃত ছিল। দূর অতীতের এই মহাসমুদ্রকে ভূতত্ত্ববেত্তারা টেথিস্ নামে অভিহিত করেন। বর্ত্তমান ভূমধ্যসাগর উহারই অবশেষ। এখন যেখানে গিরিরাজ হিমাদ্রি দণ্ডায়মান তখন তথায় এই মহাসমুদ্র বহিয়া যাইত। দক্ষিণ ভারত বা দক্ষিণ আফ্রিকার অভ্যন্তরভাগে মৎস্যাদি সামুদ্রিক-জীবের প্রস্তরীভূত পঞ্জর পাওয়া যাইলে জানা যাইবে তাহারা

প্যালিয়োজোয়িক যুগেরও পূর্ব্ববর্ত্তী সময়ের। পণ্ডিতগণের অনুসন্ধানের ফলে এই প্রাচীনতম ভূখণ্ডেও সামুদ্রিক মৎস্যের প্রস্তরীভূত অস্থি পাওয়া গিয়াছে। মৎস্য জাতি সৃষ্টির প্রত্যুষে কোন সুদূর অতীতে প্রকৃতিমাতার রহস্যতিমিরাবৃত গর্ভ হইতে প্রথম প্রসূত হইয়াছে তাহা নির্দ্ধারণ করা দূরের কথা, কল্পনা করাও কঠিন।

অতি প্রাচীনকালের সেই হাঙ্গরগুলি আকারে-প্রকারে বর্ত্তমান যুগের হাঙ্গরদিগের মত নাও হইতে পারে। ক্রম-বিকাশের ফলে প্রাগৈতিহাসিক হাঙ্গরগণ বর্ত্তমান আকারের হাঙ্গরে পরিণত হওয়া অসম্ভব নয়। 'হোরার্ক' নামক একপ্রকার মৎস্য এখনও দেখা যায়। অনেকে মনে করেন আদিম যুগের হাঙ্গরগুলির প্রকৃত বংশধর ইহারাই। সমুদ্রসমূহে হাঙ্গরগণের আধিপত্য কিছুকাল প্রতিষ্ঠিত থাকিবার পর অতি বিশাল শরীর সামুদ্রিক সরীসৃপগণ তাহাদিগকে পরাভূত করিয়া বারিধিবক্ষে আপনাদের প্রাধান্য প্রসারিত করে। ইহাকে সরীসৃপের যুগ (Age of the Reptiles) বলা হয়। এই সময় বিচিত্রাকৃতি সরীসৃপ শুধু জলে নয়, স্থলে এবং অন্তরীক্ষেও আধিপত্য করিত। মৎস্যের সহিত সরীসৃপের সাদৃশ্য অস্বীকার করা যায় না। এমন মৎস্য আছে যাহারা প্রায় সর্পের মত। সুতরাং আদিম মৎস্যদিগেরই কোন কোন শ্রেণী বিবর্ত্তবাদের নিয়মে সরীসৃপাকারে পরিণত হইয়াছিল কিনা তাহা ভাবিবার বিষয় বটে। হাঙ্গরদিগকে পরাজিত করিয়া যে সকল বিচিত্রাকার সরীসৃপ মহাসমুদ্রসমূহে প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ হইয়াছিল তাহারা নানা শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। তাহাদিগের মধ্যে প্লীয়োসাউরাসরা ৪৫ ফিট লম্বা হইত। ইক্‌থিয়োসাউরাসরা দৈর্ঘ্যে ৪০ ফিট ছিল। প্রথমোক্ত সরীসৃপদের গলা লম্বা হইত কিন্তু শেষোক্ত সরীসৃপগুলির গলা ছিল না বলিলেই হয়। জলে বেড়াইবার জন্য ইহাদের দেহে নৌকার দাঁড়ের মত প্রত্যঙ্গ ছিল। ইহাদের বদন-বিবর বড় হইত। মাছ গিলিয়া খাইত বলিয়া দাঁতগুলি বলশালী ছিল না। তৎকালের আর একজাতীয় মৎস্যভুক্ সামুদ্রিক সরীসৃপকে 'মোজাসাউরাস' নাম দেওয়া হইয়াছে। এই সকল সলিলবাসী সরীসৃপের আকৃতি কতকটা মৎস্যের মত এবং কতকটা টিকটিকির ন্যায় বলিয়া প্রাণি-তত্ত্ববেত্তারা ইহাদিগকে 'ফিশ-লিজার্ড' আখ্যা দিয়াছেন।

কালচক্র অবিরাম আবর্ত্তিত হইয়া এমন অবস্থা আনিল যখন ঐ সুপ্রকাণ্ড সামুদ্রিক সরীসৃপগুলি আর রহিল না। নানা প্রকার প্রতিকূল কারণে তাহারা কালের কুক্ষিতলে চির-লুক্কায়িত হইল। বিশ্বের বিচিত্র রঙ্গ-মঞ্চ হইতে তাহারা বিদায় লইল, শুধু সাক্ষীরূপে রহিল তাহাদের দেহের প্রস্তরীভূত অস্থিগুলি। আবার হাঙ্গরের যুগ আসিল। ইয়োসিন ও মায়োসিন যুগের অপেক্ষাকৃত উষ্ণতর সমুদ্রসলিলে পুনরায় তাহাদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হইল। এই যুগদ্বয় টার্টিয়ারি বা কেনজোয়িক নামক যুগের অংশ। অলিগোসিন ও প্লীয়োসিন নামক যুগ দুইটিও ঐ যুগেরই অন্তর্গত। সম্ভবতঃ মায়োসিন যুগে হিমাদ্রির জন্ম হইয়াছিল। টার্টিয়ারি যুগের প্রথমাংশে প্রচণ্ড শৈত্যের জন্য বহু প্রাণী প্রণষ্ট হইয়াছিল। পরে পৃথিবী পুনরায় উষ্ণতা প্রাপ্ত হইলে নানাজাতীয় জীব আবার জন্মলাভ করিয়াছিল। এই সময় হাঙ্গরদিগেরও পুনরাবির্ভাব ঘটে। স্তন্যপায়ী জীবের জন্মও এই যুগে হইয়াছিল বলিয়া পণ্ডিতগণ অনুমান করেন।

এই যুগে যে সকল হাঙ্গর জন্মিয়াছিল তাহাদিগকে তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা চলে। কতকগুলি হাঙ্গর আকারে ক্ষুদ্র ছিল এবং তাহাদের দাঁতগুলিও তেমন দৃঢ় ছিল না। এই দাঁতের সাহায্যে তাহারা ছোট ছোট মাছ ছাড়া আর কিছু ধরিতে পারিত না। আকারে ক্ষুদ্র কিন্তু তীক্ষ্ণ দন্তশালী আর এক শ্রেণীর হাঙ্গরও এই সময় বিদ্যমান ছিল। এই দুই প্রকার ব্যতিরেকে বিশালকায় আর এক জাতীয় হাঙ্গরও ছিল যাহারা বিস্তৃত বদন ব্যাদান করিয়া বর্ত্তমানের যে কোন বৃহত্তম মৎস্যের সমগ্র ভাগকে অনায়াসে গিলিয়া ফেলিতে পারিত। এই সকল বিপুল বপু হাঙ্গরের দন্ত-শ্রেণী প্রস্তরীভূত অবস্থায় প্রাপ্ত হইয়া পণ্ডিতগণ তাহাদের আকৃতি ও প্রকৃতি সম্বন্ধে অভিজ্ঞতালাভ করিয়াছেন। এই সকল মৎস্যের কঙ্কাল একপ্রকার তন্তুজালে জড়িত ছিল বলিয়া তাহাদের পঞ্জর প্রস্তরীভূত অবস্থা প্রাপ্ত হইবার পূর্ব্বেই ধ্বংস হইয়াছিল। কোন প্রাগৈতিহাসিক প্রাণীর কঙ্কাল বা পঞ্জর সুদীর্ঘকাল ধরিয়া ভূগর্ভস্থ প্রস্তর-স্তরে প্রোথিত থাকার ফলে উহা কালক্রমে জীর্ণ হইয়া ঐ প্রস্তরের সহিত মিশিয়া যায়। পঞ্জরের উপাদান প্রস্তরের সহিত জড়িত হইয়া স্থায়িত্ব লাভ করে। ইহাকেই প্রস্তরীভূত পঞ্জর বা ফসিল বলা হয়। ইহা ছাড়া আর একপ্রকার প্রস্তরীভূত পঞ্জর আছে। প্রাণীর কঙ্কাল সম্পূর্ণরূপে নষ্ট হইয়াছে কিন্তু উহা প্রস্তর-গাত্রে আপনার যে আকৃতি উৎকীর্ণ করিয়াছে তাহা অবিকৃত রহিয়াছে। কতকগুলি ফসিল এইরূপ। অতীতের হাঙ্গরদের ন্যায় বর্ত্তমান যুগের হাঙ্গরদের কঙ্কালও একপ্রকার তন্তুজালে আচ্ছন্ন। হাঙ্গরের এই বৈশিষ্ট্যের জন্যই বোধহয় সংস্কৃত ভাষায় ইহাদিগকে নাগ-তন্তু ও তন্তুনাগ নাম দেওয়া হইয়াছে।

হাঙ্গর সামুদ্রিক জন্তু সুতরাং সমুদ্রের সন্নিহিত দেশগুলির সঙ্গেই উহার সম্পর্ক অধিক। সমুদ্র হইতে দূরবর্ত্তী ভূভাগের অধিবাসীরা হাঙ্গরের সহিত পরিচিত নহে বলিলেও চলিতে পারে। ইংলণ্ড প্রভৃতি বারিধি-বেষ্টিত রাষ্ট্রের লোক হাঙ্গর বা শার্কের সহিত যতখানি পরিচিত আমাদের পক্ষে ততখানি হওয়া সম্ভব নয়। সেইজন্য হাঙ্গর প্রসঙ্গে আমাদিগকে পাশ্চাত্য প্রাণিতত্ত্ববেত্তা পণ্ডিতদিগের সাহায্য গ্রহণ করিতেই হইবে। ভারতীয় ভাষায় বিশেষ বাঙ্গালায় 'হাঙ্গর' শব্দ বর্ত্তমানে ব্যবহৃত হইলেও সংস্কৃত সাহিত্যে এই জাতীয় মৎস্য বা জল-জন্তুর আখ্যারূপে এই শব্দ দৃষ্ট হয় না। জৈন পণ্ডিত হেমচন্দ্র তাঁহার 'অভিধান চিন্তামণি' নামক কোষ-গ্রন্থে ইহার ছয়টি নাম উল্লেখ করিয়াছেন—"গ্রাহে তন্তুস্তন্তুনাগোঽবহারো নাগ-তন্তুণৌ"—গ্রাহ, তন্তু, তন্তু-নাগ, নাগ এবং তন্তুণ। প্রাচীন পুস্তকে 'গ্রাহ' নামটিই অধিক ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়। অবশ্য সংস্কৃত সাহিত্যে জলজন্তুদিগের মধ্যে মকরের উল্লেখই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। মহাকবি কালিদাস রঘুবংশের ত্রয়োদশ সর্গে লঙ্কা হইতে পুষ্পকরথে অযোধ্যা-প্রত্যাবর্ত্তনরত শ্রীরামের মুখ হইতে যে সমুদ্র বর্ণনা বাহির করিয়াছেন তাহাতে আমরা 'তিমযঃ' ও 'মাতঙ্গ-নক্রৈঃ' অর্থাৎ তিমিসমূহ এবং মাতঙ্গের মত জলজন্তুসকল এইরূপ উল্লেখ দেখিয়া থাকি। রঘুবংশ অপেক্ষা প্রাচীনতর কাব্যসমূহে এবং পুরাণাদিতে মকরের উল্লেখই পুনঃ পুনঃ পাওয়া যায়।

মকরও একপ্রকার মৎস্য সন্দেহ নাই। গীতায় বিভূতিযোগ নামক দশম অধ্যায়ে শ্রীভগবান অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন—'ঝষানাং মকরশ্চাস্মি'—অর্থাৎ মৎস্যগণের মধ্যে আমি মকর। ইহাতে বুঝাইতেছে মৎস্যের মধ্যে মকরই শ্রেষ্ঠ। এই শ্রেষ্ঠত্বের জন্যই মোক্ষদা গঙ্গা মকরবাহনা বলিয়া বর্ণিতা। কিন্তু মকরের যে চিত্র আমরা সাধারণতঃ অঙ্কিত দেখি, তাহা সম্পূর্ণ বস্তুতান্ত্রিক না হইয়া কতকটা কল্পিত সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। মকর একপ্রকার হাঙ্গর সে বিষয়ে সংশয় থাকিতে পারে না। মকর যে হিংস্র জলজন্তু তাহা হেমচন্দ্রাদি কোষকারগণও স্বীকার করিয়াছেন। গবেষণা বা অনুসন্ধান ও বিচার করিয়া পণ্ডিতগণ মকরকে শৃঙ্গবিশিষ্ট হাঙ্গর বা 'হর্ণড শার্ক' বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। হাঙ্গর বহু প্রকারের। একরকম হাঙ্গরের মাথার দুইধার কতকটা শৃঙ্গাকারে প্রসারিত রহিয়াছে। আমাদের বিশ্বাস উহারাই মকর। হাতুড়ির ন্যায় মস্তক-বিশিষ্ট এক জাতীয় হাঙ্গর সমুদ্র সলিলে এখনও দেখা যায়। পাশ্চাত্য ভাষায় ইহারা 'হ্যামার-হেড' আখ্যায় অভিহিত হয়। হইতে পারে মকরও কতকটা এই ধরণেরই হাঙ্গর। এক সময় শৃঙ্গের ন্যায় অঙ্গবিশিষ্ট হাঙ্গর গঙ্গায় প্রচুর ছিল বলিয়াই বোধহয় গঙ্গাদেবীকে মকরবাহনা বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। আজকাল গঙ্গায় হাঙ্গরের সংখ্যা অধিক নহে।

বর্ত্তমানের কোন-কোন হাঙ্গরকে দূর অতীতের বিরাটকায় হাঙ্গর-

দিগের সন্তান বলিয়া বেশ চেনা যায়। একপ্রকার হাঙ্গরকে 'গ্রেট হোয়াইট শার্ক' বা 'বিশাল শ্বেত হাঙ্গর' বলা হয়। ইহাদের শরীর সুবিশাল ও শুভ্রাভ বলিয়াই এইরূপ নাম। এই সকল হাঙ্গর দেখিলে মহাকবি কালিদাসের 'মাতঙ্গ-নক্রৈঃ' শব্দ স্মৃতিপথে সমুদিত হওয়া অসম্ভব নয়। এখানে নক্র বলিতে কুম্ভীর না বুঝাইয়া জলজন্তু বুঝাইতেছে। ইহারা তিমি নহে, কারণ কবি তিমির নাম স্বতন্ত্রভাবে উল্লেখ করিয়াছেন। সুতরাং আমাদের বিশ্বাস প্রকাণ্ড হাঙ্গরদিগকে উদ্দেশ করিয়াই 'মাতঙ্গ-নক্র' শব্দ প্রয়োগ করা হইয়াছে। বৃহৎ শ্বেত হাঙ্গর ৪০ ফিট পর্য্যন্ত লম্বা হইতে পারে। ইহাদের এক একটি দাঁতের দৈর্ঘ্য সওয়া ইঞ্চির কম নয়। অবশ্য ইহাদের পূর্ব্বপুরুষরা আরও প্রকাণ্ডকায় এবং দীর্ঘদন্তবিশিষ্ট ছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। প্রাগৈতিহাসিক 'মেগালোদন' নামক হাঙ্গরদের এক একটি দাঁত ৩ হইতে ৫ ইঞ্চি পর্য্যন্ত লম্বা হইত। তাহাদের প্রস্তরীভূত দন্ত ভূস্তরে পাওয়া গিয়াছে। দাঁতের আকার অনুসারে হিসাব করিলে বুঝা যায় মেগালোদন হাঙ্গরদের দেহের দৈর্ঘ্য মোটামুটি ১শত ২০ ফিট পর্য্যন্ত হইত। খুব কম করিয়া ধরিলেও আমরা বলিতে বাধ্য যে তৎকালের বৃহদাকার হাঙ্গরগুলি ৭৫ হইতে ১শত ফিট পর্য্যন্ত দীর্ঘ অবশ্যই ছিল। সুতরাং আমরা প্রাচীন কাব্য ও পুরাণাদিতে বিরাট বা বিকটকায় যে সকল জল-জন্তুর উল্লেখ দেখিতে পাই তাহারা একান্ত কবি-কল্পনা নহে।

সুদূর অতীতে টার্টিয়ারি বা কেনজোয়িকযুগের উষ্ণ সমুদ্রসলিলে অতি বিশাল শরীর হাঙ্গর দলে দলে বিচরণ করিত। আমেরিকার অন্তর্গত ফ্লোরিদা উপদ্বীপের কোন কোন অংশের ভূগর্ভে এইরূপ বৃহদাকার হাঙ্গরের প্রস্তরীভূত দন্ত প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। দন্তের পরিমাণ এত অধিক যে ঐ অঞ্চলের অধিবাসীরা ভূগর্ভ হইতে বাহির করিয়া উহাদিগকে সাররূপে ব্যবহার করে। এ বিষয়ে সংশয় নাই যে এখন যেখানে ফ্লোরিদা উপদ্বীপ, প্রাগৈতিহাসিক যুগে তথায় সমুদ্র প্রসারিত ছিল। প্রশান্ত মহাসাগরের তলদেশ হইতেও বহু দন্ত উত্তোলিত হইয়াছে। ইহাতে প্রমাণিত হয় দূর প্রাগৈতিহাসিক যুগে এই মহাসমুদ্র বক্ষেও অগণিত হাঙ্গর বাস করিত।

কতকগুলি কারণে প্রাগৈতিহাসিক যুগের সেই অতি প্রকাণ্ডকায় হাঙ্গরগুলি ক্রমশঃ বিনাশপ্রাপ্ত হইয়াছিল। তাহাদের অস্তিত্ব সম্পূর্ণরূপে বিলোপ পাইয়াছিল বলিলে ভুল হয় না। তবে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রাকার হাঙ্গরগুলি প্রতিকূল অবস্থাকে অতিক্রম করিয়া জীবিত থাকিতে সমর্থ হইয়াছে। আমরা প্রাণি-তত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করিলে এই সত্য উপলব্ধি করি যে কোন প্রাণীর শরীর বিশেষ বিশাল হইলে তাহার পক্ষে জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ সেরূপ সহজ হয় না। সুতরাং অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রাকার জীবের পক্ষে জীবন-যুদ্ধে জয়ী হইবার সম্ভাবনা বেশী। ক্ষুদ্র জীব অল্প আহার্য্যেই শক্তি-সামর্থ্য বজায় রাখিতে পারে। ইহা ছাড়া ক্ষুদ্র দেহ প্রাণীরা যেরূপ কর্ম্মক্ষম ও ক্ষিপ্রগামী হইতে পারে বিশালকায় প্রাণীর পক্ষে তাহা হওয়া সম্ভব নয়। অতি প্রকাণ্ডকায় প্রাগৈতিহাসিক শ্বেত হাঙ্গরদের পরিবর্ত্তে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র দেহ যে সকল শ্বেত হাঙ্গর পরে জন্মগ্রহণ করিল তাহারা আজিও জীবিত রহিয়া যোগ্যতার পরিচয় প্রদান করিতেছে। বর্ত্তমান যুগের হাঙ্গরগণের মধ্যে এই শুভ্রবর্ণ হাঙ্গরগুলিই সর্ব্বাপেক্ষা ভীষণ। এই জাতীয় হাঙ্গরদিগকে বৃটেনের চারিদিকে বারিধি বক্ষে এবং ভারতবর্ষের পার্শ্ববর্ত্তী সমুদ্র সলিলেও বিচরণ করিতে দেখা যায়।

যে সকল হাঙ্গর সমুদ্র হইতে গঙ্গায় আসিয়া ইহার বক্ষে বাস করে তাহাদিগের লাটিন নাম 'করচারিয়াস্ গ্যাঞ্জেটিকাস' অর্থাৎ 'গ্যাঞ্জেটিক শার্ক' বা 'গাঙ্গ-হাঙ্গর'। তবে হাঙ্গররা নদ-নদীর স্বল্পপরিসর বক্ষ অপেক্ষা মহাসাগরের সুদূর প্রসারিত সলিলরাশিতে বাস করিতে অধিক ভালবাসে সে বিষয়ে সংশয় থাকিতে পারে না। এক স্থানে বাস করা ইহারা পছন্দ করে না, যাযাবর জাতিদের মত ভ্রমণ করাই ইহাদের স্বভাব। এক শ্রেণীর হাঙ্গর গভীর জল-তলে বাস করে। যেখানে রবি-রশ্মি রেখা কখনও প্রবেশ করে না তাহারা সেই চিরতিমিররাজ্যের অধিবাসী। এই চিরতিমিরের দেশে নানাপ্রকার বিচিত্রাকার মাছ আছে। কোন কোন মাছের দেহ হইতে দীপ-শিখার ন্যায় আলোক রেখা বাহির হইয়া
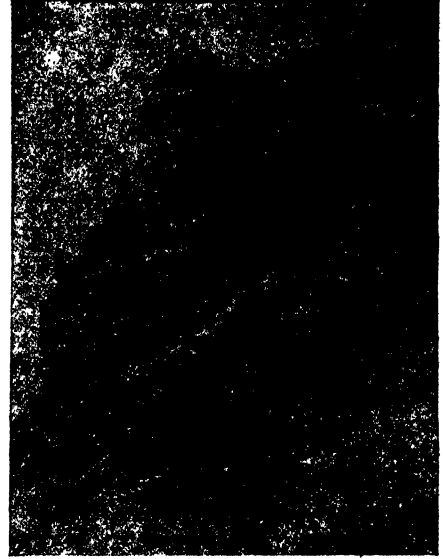
জল-তলস্থ চির-তিমির রাজ্যের অধিবাসী একজাতীয় হিংস্রস্বভাব মৎস্য। ইহাদের দীর্ঘাকার দেহে সারি-সারি বিরাজিত বহু সংখ্যক আলোকাধার হইতে এক প্রকার রশ্মি-রেখা নির্গত হইয়া তমসাবৃত জল-তল আলোকিত করে

তিমিরাবৃত জল-তলকে আলোকিত করে। তবে জল-তলবাসী হাঙ্গর-দিগকেও অনেক সময় খাদ্যের খোঁজে জলের ঊর্দ্ধাংশে আসিতে হয়।

যে সকল হাঙ্গর তীরভূমির নিকট অবস্থান করে তাহাদের আকার অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রতর হইয়া থাকে। ইহারা বেলায় পার্শ্বস্থ সলিলের
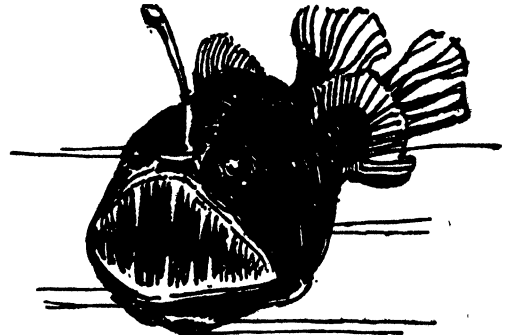
এই বিস্ময়কর বিচিত্রাকৃতি মৎস্য সমুদ্র-সলিলের আট হাজার ফিট নীচে বাস করে; মাথার উপর দণ্ডায়মান দণ্ডটি হইতে নির্গত আলোক-রশ্মির দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া অন্যান্য মৎস্য ইহাদের দংষ্ট্রা-করাল বদন-বিবরে প্রবেশ করে

তলদেশে বাস করে এবং ছোট ছোট মাছ এবং জল-তলচারী অন্যান্য সামুদ্রিক প্রাণী খাইয়া জীবন ধারণ করে। ইহারা মানুষকে আক্রমণ করে না এবং সেরূপ সামর্থ্যও নাই। তবুও ধীবররা ইহাদিগকে ভয় করে। এই ভয়ের কারণ অন্যান্য মাছ ধরিবার জন্য জাল ফেলিলে সময়ে সময়ে সেই জালে ইহাদের দেহ জড়াইয়া যায়। ফলে সেই জাল ছিঁড়িয়া নষ্ট হয়। যে সকল হাঙ্গর সৈকতের পার্শ্ববর্ত্তী সলিলে বাস করে তাহাদের অন্তর্গত একটি শ্রেণীকে 'হাউণ্ড' আখ্যায় অভিহিত করা হয়। ইহাদের লাটিন নাম 'মুষ্টেলাস'। ইহারা আকারে সেরূপ বড় নয়। ইহাদের দন্তরাজি ঘন-সন্নিবিষ্টভাবে বিরাজিত। দেখিলে মনে হয় যেন কোন শিল্পী দাঁতগুলিকে সারি সারি সাজাইয়া রাখিয়াছে। দাঁতের সংখ্যা খুব বেশী, কিন্তু উহারা আদৌ ধারাল নয়। সমুদ্রসৈকত পার্শ্ববাসী আর এক জাতীয় হাঙ্গরকে 'ডগ-ফিশ' বা 'কুকুর-মাছ' বলা হয়। লাটিন নাম স্কিলিয়াম্। মৎস্যের নামকরণে পাশ্চাত্য প্রাণিতত্ত্ববেত্তারা বিভিন্ন স্থলচর জন্তুর নাম গ্রহণ করিয়াছেন। স্বভাব অথবা মুখাকৃতি বা অন্য কোন অঙ্গের সহিত কিঞ্চিৎ সাদৃশ্যের জন্যই এরূপ করা হইয়াছে সন্দেহ নাই। ডগ-ফিশ শ্রেণীর হাঙ্গর গ্রীষ্মমণ্ডল ও নাতিশীতোষ্ণ উভয় অঞ্চলের সমুদ্রেই দেখা যায়।

সৈকত সন্নিহিত সলিলরাশির অধিবাসী হাঙ্গরগণের মধ্যে এক শ্রেণীর বিচিত্রবর্ণ আছে। ইহাদিগকে টাইগার-শার্ক বা ব্যাঘ্র হাঙ্গর নাম দেওয়া হইয়াছে। ইহাদের স্বভাব ব্যাঘ্রের মত উগ্র বলিয়া এরূপ নাম দেওয়া হইয়াছে ইহা যেন কেহ মনে না করেন; ব্যাঘ্রবৎ বর্ণ-বৈচিত্র্যই এইরূপ নামের কারণ। ইহাদের বর্ণ হরিদ্রাভ বাদামী এবং গায়ে বাঘের ন্যায় কালো ও বাদামী বিচিত্র রেখারাজি। মাদ্রাজ-উপকূলের পার্শ্বে ইহাদিগকে প্রায়ই দেখা যায়। শামুক, কাঁকড়া, চিংড়িমাছ প্রভৃতি তীরচারী বা অল্প সলিলবাসী প্রাণী ইহাদের আহার্য্য। সৈকত পার্শ্ববাসী এই সকল হাঙ্গর মধ্যে মধ্যে ধীবরদিগের দ্বারা ধৃত হয়। ইহাদের চর্ম্ম মূল্যবান বলিয়াই ধরা হয়। এই জাতীয় হাঙ্গরের দেহে আঁইশ নাই। আঁইশের পরিবর্ত্তে অস্থির ন্যায় একপ্রকার অকোমল পদার্থে ইহাদের দেহ আচ্ছাদিত। এই পদার্থকে 'শ্যাগ্রিন' বলা হয়। হাঙ্গরের অপরিষ্কৃত চর্ম্মও এই নাম প্রাপ্ত হয়। এই অকোমল ও অসমান আবরণের জন্য হাঙ্গরের চর্ম্ম কতকটা স্যাণ্ড-পেপারের ন্যায় রুক্ষ। হাঙ্গরের অঙ্গকে

তিনটি হাঙ্গর ও একটি সমুদ্রবাসী কচ্ছপ। মধ্যবর্ত্তী বৃহত্তম হাঙ্গরটি বার ফিট দীর্ঘ একটি ব্যাঘ্র-হাঙ্গর বা টাইগার শার্ক। ব্যাঘ্র হাঙ্গরটি কচ্ছপটিকে আক্রমণ করিতেছে

উৎকৃষ্ট চর্ম্মে পরিণত করিতে হইলে এই শ্যাগ্রিন বা অস্থিবৎ কঠিন পদার্থগুলি অপসৃত করা প্রয়োজন। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে হাঙ্গরের চর্ম্ম হইতে লেদার প্রস্তুত করিবার প্রকৃত প্রযত্ন প্রথম করা হয়। উদ্ভিদের সাহায্যে ট্যান করা (হাঙ্গরের) চামড়া হইতে শ্যাগ্রিন অপসারিত করিবার প্রকৃষ্ট প্রণালী যিনি প্রথম প্রবর্ত্তন করেন তাঁহার নাম কহলার। এই প্রণালী এ বিষয়ে অনেক সুবিধার সৃষ্টি করিয়াছে। হাঙ্গরের চামড়া হইতে উৎকৃষ্ট লেদার প্রস্তুত হইতে পারে বলিয়া চামড়ার চাহিদা দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে বটে কিন্তু হাঙ্গর-চর্ম্ম যোগাড় করা সেরূপ সহজ-সাধ্য ব্যাপার নহে।

কোন-কোন বিষয়ে সাধারণ মৎস্যদের সহিত হাঙ্গরগণের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগত পার্থক্য লক্ষ্য করিবার বিষয়। অধিকাংশ মৎস্যের চোয়াল একপ্রকার চামড়ায় আচ্ছাদিত। এই চামড়াই চোয়াল হইতে আগাইয়া যাইয়া মৎস্যের মাংসময় ওষ্ঠে পরিণতি পায়। অবশেষে এই চামড়াই মুখের অভ্যন্তর-ভাগে প্রবেশ করিয়া কোমল বা মোলায়েম শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি-সমূহে রূপান্তরপ্রাপ্ত হয়। কিন্তু হাঙ্গরের বেলায় লক্ষ্য করিলে দেখা যায় ইহাদের মুখের বাহির এবং ভিতর উভয় স্থানের চামড়াই একই প্রকার। বাহিরের চামড়া মুখের ভিতরে প্রবেশ করিয়াও কোমলতা প্রাপ্ত হয় নাই। এমন কি দন্ত পংক্তির চারিদিকেও এই চর্ম্ম বহির্ভাগের মতই শক্ত বা কোমলতা শূন্য। হাঙ্গরের দৃঢ় ও দীপ্তিমান দন্তশ্রেণী এক প্রকার শক্ত শল্ক বলিলেও ভুল হয় না। যে চর্ম্ম চোয়ালের অস্থিগুলিকে আচ্ছাদিত করিয়াছে দন্তপংক্তি উহা হইতেই উদ্গত হইয়াছে। হাঙ্গরের অঙ্গে যে অস্থিবৎ শ্যাগ্রিন নামক পদার্থ আছে দাঁতগুলি তাহাদের সদৃশ না হইলেও স্বজাতি সন্দেহ নাই।

স ফিশ বা করাত-মৎস্য নামক একপ্রকার মাছ আছে। করাতের মত দাঁত বলিয়াই এইরূপ নাম। হাঙ্গর ও করাত মৎস্য উভয়েই স্বজাতি। করাত-মৎস্যের উভয় পাটির দাঁতগুলি দেখিলেই বুঝা যায় উহারা একপ্রকার আঁইশ ছাড়া আর কিছু নহে। হাঙ্গরের এক বা একাধিক দাঁত ভাঙ্গিয়া গেলে তৎক্ষণাৎ উহাদের স্থানে নূতন দাঁত দেখা দেয়। সুতরাং শিকার করিবার প্রধান অবলম্বন দন্তরূপ অস্ত্রগুলি সর্ব্বদা কার্য্যক্ষম অবস্থায় প্রস্তুত থাকে। আমরা হাঙ্গরের চোয়ালের অভ্যন্তর পরীক্ষা করিলে দেখিতে পাইব উহাদের দাঁতগুলি শ্রেণীবদ্ধভাবে সজ্জিত রহিয়াছে। একটি শ্রেণীর পশ্চাতে আর একটি শ্রেণী ঠিক যুদ্ধার্থ সজ্জিত সৈন্য-দলের ন্যায় দাঁড়াইয়া থাকে বলিলে ভুল হয় না। সম্মুখস্থ সৈন্যদলের মধ্যে কেহ বিনষ্ট হইলে যেমন পশ্চাদ্বর্ত্তী সৈন্যদল কয়েকটি সৈন্য আগাইয়া গিয়া তাহাদের স্থান অধিকার করে তেমনই বিনষ্ট দন্তের শূন্য স্থান নূতন দন্তের দ্বারা অবিলম্বে পূর্ণ হয়। সুদক্ষ সেনাধ্যক্ষের দ্বারা সুসজ্জিত যুদ্ধক্ষম বাহিনীর ন্যায় সম্মুখস্থ সৈন্যদলের সংখ্যা সর্ব্বদা অব্যাহত থাকে। যুগপৎ পুরোবর্ত্তী ও পশ্চাদ্ভাগের দন্তশ্রেণীর কতিপয় দন্ত বিনষ্ট হইলে অভ্যন্তর হইতে দন্তরাজি বাহির হইয়া তাহাদের স্থান গ্রহণ করে। অবশ্য এইরূপ দন্ত সম্পূর্ণ কর্ম্মক্ষম হইতে কিঞ্চিৎ বিলম্ব ঘটে।

নদীনীরবাসী অপেক্ষা বারিধিবক্ষবিহারী হাঙ্গরগুলি বৃহত্তর হওয়াই স্বাভাবিক। তবে যতই বৃহৎ ও হিংস্র হউক উহাদিগকে দেখিলে খুব

বড় মাছ ছাড়া আর কিছু মনে হইবে না। কোন কোন শ্রেণীর হাঙ্গর এত বড় হয় যে তিমি ব্যতিরেকে অন্য কোন জলজন্তুর সঙ্গে আকৃতির দিক দিয়া তাহাদের তুলনা চলিতে পারে না। আকারে একমাত্র তিমিই তাহাদিগকে অতিক্রম করিতে পারে। তবে বারিধিবক্ষবাসী হাঙ্গরগুলি বৃহদাকার হইলেও জলতলে দ্রুতগতিতে যাওয়া-আসা করিতে সমর্থ। আমরা তিমিকে হস্তীর সহিত এবং হাঙ্গরকে অশ্বের সহিত তুলনা করিতে পারি। তিমি তাহার পর্ব্বতপ্রমাণ দেহ সহজে সঞ্চালিত করিতে পারে না, কিন্তু হাঙ্গরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এরূপ যে উহা সঞ্চালন করিতে তাহাদিগকে বিশেষ বেগ পাইতে হয় না। মহাকবি কালিদাস উল্লিখিত 'মাতঙ্গ-নক্রকে' আমরা অতি বৃহদাকার হাঙ্গর বলিয়া বিশ্বাস করি। বৃহৎ হইলেও ইহারা বেগবান তাহা কবির "সহসা উৎপতদ্ভিঃ" বাক্যের দ্বারা বুঝা যায়।

হাঙ্গরের মস্তক বা মুখ সাধারণতঃ সূক্ষ্মাগ্র এবং শরীর গোলাকার। শরীরটি সরু হইয়া অবশেষে শক্তিশালী পুচ্ছে পরিণতি পাইয়াছে। 'ম্যাকেরেল শার্ক' আখ্যায় অভিহিত হাঙ্গরগুলি অতি দ্রুত গতিতে অগ্রসর হইতে পারে এবং উহাদের বুভুক্ষাও সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। ম্যাকেরেল নামক সামুদ্রিক মৎস্যের মত আকৃতি বলিয়াই ইহাদিগকে এই নাম দেওয়া হইয়াছে। এই শ্রেণীর হাঙ্গর-দিগের পুচ্ছের নিম্নাংশ একটির পরিবর্ত্তে দুইটি সূক্ষ্মাগ্র প্রান্তে পরিণত হইয়াছে। ম্যাকেরেল জাতীয় মৎস্যেও এই বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। 'টুনি' ম্যাকেরেল জাতীয় মৎস্যের অন্যতম। টুনি মাছ দশ ফিট পর্য্যন্ত লম্বা হইতে দেখা যায়। পুচ্ছবিষয়ক এই বৈশিষ্ট্যের জন্য এই সকল হাঙ্গর অতি দ্রুত গতিতে সন্তরণ করিতে পারে। শুধু ইহারা নয়, সব হাঙ্গরই পুচ্ছের সাহায্যে আগাইয়া যায়। যদি কেহ সমুদ্র সলিলে সন্তরণরত হাঙ্গর দেখিয়া থাকেন তাহা হইলে তিনি বুঝিতে পারিবেন তাহারা পুচ্ছের সহায়তায় কিরূপে সমগ্র শরীরটিকে অগ্রে ঠেলিয়া দিতে সমর্থ হয়। সে সজোরে শক্তিশালী লেজটি নাড়ে এবং তাহার দীর্ঘ দেহটি তরঙ্গায়িত হইয়া সর্পিল গতিতে আগাইয়া যায়। বক্ষ এবং উদর-দেশের পাখনাগুলিও ইহাদিগকে দেহটিকে লম্বভাবে আগাইবার পক্ষে সাহায্য করে এবং পশ্চাতের পাখনাগুলির সহায়তায় ইহারা শরীরকে সোজা রাখিতে সমর্থ হয়।

সিন্ধুসলিলবাসী হাঙ্গরদিগের মধ্যে কার্চারিয়াস শ্রেণীর হাঙ্গরগুলিই সংখ্যায় সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। আমরা ভ্রমণ-কাহিনী উপন্যাস বা রূপকথায় যে সকল হাঙ্গরের কথা পাঠ করি তাহাদের অধিকাংশই এই শ্রেণীভুক্ত। ইংলণ্ডের উপকূলের পার্শ্ববর্ত্তী সমুদ্রগর্ভে এই জাতীয় হাঙ্গর-শিশুদিগকে দলে-দলে বিচরণ করিতে দেখা যায়। বয়ঃপ্রাপ্ত হাঙ্গরগণ সমুদ্রের গভীরতর অংশে ঘুরিয়া বেড়ায়। সময়ে সময়ে এই শ্রেণীর হাঙ্গর দলবদ্ধ হইয়া পোতের পশ্চাতে পশ্চাতে বহু দূর পর্য্যন্ত গমন করে। জাহাজের আরোহীরা ভুক্তাবশিষ্ট বা অব্যবহার্য্য মাংস প্রভৃতি আহার্য্য প্রায়ই সমুদ্রসলিলে ফেলিয়া দেয়। ইহারা উহাই আহার করিবার জন্য পোতগুলিকে অনুবর্ত্তন করে। অবশ্য কোনরূপে জলে পড়িলে সেই হতভাগ্য আরোহীও ইহাদের আহার্য্যে পরিণত হওয়া অসম্ভব নয়। এই সকল হাঙ্গরের চোয়াল অতিশয় শক্ত ও শক্তিশালী এবং চোয়ালের অভ্যন্তরে অবস্থিত দন্তশ্রেণী দীর্ঘ ও ত্রিকোণাকৃতি এবং অত্যন্ত তীক্ষ্ণ। দাঁতগুলি সমতল অথবা করাতের মত উচ্চ-নীচও হইতে পারে।

ভারতবর্ষের পার্শ্ববর্ত্তী সমুদ্রবক্ষে যে সকল হাঙ্গর আছে তাহাদিগের মধ্যে পূর্ব্বোক্ত 'গাঙ্গ হাঙ্গর' বা 'গ্যাঞ্জেটিক শার্ক' সর্ব্বাপেক্ষা ভয়ঙ্কর। জোয়ারের সময় ইহারা নদী-বক্ষে প্রবেশ করে। কলিকাতার গঙ্গাতেও স্নানরত ব্যক্তি হাঙ্গর কর্ত্তৃক ধৃত হওয়ার সংবাদ আমরা মধ্যে মধ্যে শুনিতে পাই। ঐ সকল হাঙ্গর এই শ্রেণীর। এই গাঙ্গ-হাঙ্গরদিগকে ব্রহ্মদেশের পার্শ্ববর্ত্তী সমুদ্রেও দেখা যায়। এই জাতীয় হাঙ্গর অত্যন্ত হিংস্রপ্রকৃতির এবং স্নানার্থীদিগকে আক্রমণ করিবার জন্য নানা প্রকার কৌশল অবলম্বন করে। আর এক শ্রেণীর হাঙ্গরকে 'জি গ্রেপেরি' আখ্যায় অভিহিত করা হয়। ইহারাও অতিশয় হিংস্র ও ভীষণ এবং বিশেষ কৌশলী বা ধূর্ত্তও বটে। ইহারা সময়ে সময়ে শরীরকে স্ফীত করিয়া মৃত প্রাণী বা প্রাণশূন্য জান্তব পদার্থের প্রকাণ্ড পিণ্ডের মত ভাসিয়া যায়। অন্যান্য মৎস্যগণ উহাদের আহার্য্য মনে করিয়া লোভবশতঃ সেই পিণ্ডাকার পদার্থের নিকটে যাইবামাত্র ধূর্ত্ত হাঙ্গর স্বরূপপ্রকাশ করিয়া তাহাদিগকে উদরস্থ করে। একবার ১৩ ফিট লম্বা এই জাতীয় একটি হাঙ্গর ধৃত হইয়াছিল। হাঙ্গরটির পেট চিরিলে (নাবিকদের ব্যবহৃত) একখানি ছুরি, একটি বেল্ট বা কোমরবন্ধ এবং মনুষ্যহস্তের অস্থি পাওয়া যায়। কোন নাবিক হাঙ্গরটির দ্বারা আক্রান্ত ও ভক্ষিত হইয়াছিল সন্দেহ নাই। নরনারী হাঙ্গরদের দ্বারা হতাহত হইবার যে সংবাদ পাওয়া যায় তাহাদের মধ্যে কতকগুলি ধীবরদিগের দ্বারা হাঙ্গর ধৃত হইবার পরও ঘটিয়া থাকে। হাঙ্গরকে জল হইতে তুলিবার কালে বা জাল হইতে বাহির করিবার সময় উহাদের তীক্ষ্ণ দন্তের দ্বারা ধীবর বা দর্শক আহত হওয়া অসম্ভব নয়।

হ্যামার-হেড বা হাতুড়ির ন্যায় শীর্ষবিশিষ্ট হাঙ্গরের নাম আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। হাঙ্গরদিগের মধ্যে আকৃতিতে ইহারাই সর্ব্বাপেক্ষা বিচিত্র। আমাদের মতে প্রাচীন কাব্য-পুরাণাদি বর্ণিত মকরনামক মৎস্য

হ্যামার-হেড হাঙ্গর

এই শ্রেণীর অন্তর্গত ইহাও বলা হইয়াছে। ইহাদের দেহ সাধারণ হাঙ্গরদের মতই, তবে মস্তকের উভয় পার্শ্ব হাতুড়ির আকারে দুই দিকে প্রসারিত। সেই প্রসারিত অংশদ্বয়ে চক্ষুদ্বয় সন্নিবিষ্ট বলিয়া ইহারা অধিকতর বিস্ময়কর বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হইয়াছে। মকরের বর্ণনা পাঠ করিলে এবং এই জাতীয় হাঙ্গরদিগকে দেখিলে ইহারাই যে মকর সে বিষয়ে সন্দেহ থাকে না। সুতরাং মকরকে শৃঙ্গবিশিষ্ট হাঙ্গর বলা আদৌ অসঙ্গত হয় নাই। প্রাচীন চিকিৎসা-শাস্ত্র মতে মকরের মাংস অশ্মরী প্রভৃতি মূত্রাশয়গত রোগ আরোগ্য করে। হাঙ্গরের মাংসও মূত্রাশয়গত রোগের ঔষধ। বহুমূত্রের প্রসিদ্ধ ঔষধ 'ইনসুলিন' আজকাল এক জাতীয় হাঙ্গরের পিত্ত হইতে প্রস্তুত হইতেছে। শুধু রামায়ণ মহাভারতাদি মহাকাব্যে নয়, যোগবাশিষ্ঠের ন্যায় অধ্যাত্মতত্ত্ব গ্রন্থেও আমরা মকরের উল্লেখ পুনঃ পুনঃ প্রাপ্ত হই। সুতরাং এক সময় এই জাতীয় হাঙ্গর গঙ্গায় এবং বঙ্গোপসাগর ও ভারত মহাসাগরের জলরাশিতে প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান ছিল সন্দেহ নাই। ভারতবর্ষের পশ্চিমোপকূলে অর্থাৎ আরব সাগরে একপ্রকার হ্যামার-হেড হাঙ্গর প্রায়ই দেখা যায়। ইহারা 'জিজায়েনা ব্লচিরি' আখ্যায় অভিহিত হয়।

ল্যামনিড বা ম্যাকেরেল জাতীয় হাঙ্গরদের মধ্যে কতকগুলি এমন হাঙ্গর আছে যাহাদের আকারগত বৈশিষ্ট্য দৃষ্টি আকৃষ্ট করে। বিপুল বপু শ্বেত হাঙ্গর ইহাদেরই অন্যতম। আমরা ইহাদের কথা পূর্ব্বেও বলিয়াছি।

এই হাঙ্গররা ৪০ ফিট পর্য্যন্ত দীর্ঘ হইয়া থাকে। এই সকল প্রকাণ্ডকায় শ্বেতহাঙ্গরদের বংশ ক্রমশঃ বিলোপ প্রাপ্ত হইতেছে এইরূপ আশঙ্কা করিবার কারণ আছে। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি অতি বৃহৎ অপেক্ষা অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রাকার প্রাণীর পক্ষে জীবনযুদ্ধে জয়ী হইবার সম্ভাবনা অধিক। সুদূর টার্টিয়ারি যুগের হাঙ্গরদিগের মধ্যে ইহারাই অবশিষ্ট রহিয়াছে। ভারতবর্ষের পার্শ্বস্থ সমুদ্রসলিলে ইহারা দৃষ্ট হয় না।

এক জাতীয় হাঙ্গরকে 'বাস্কিং শার্ক' বা রৌদ্রসেবী হাঙ্গর বলা হয়। ইহাদের মধ্যে খুব বড় হাঙ্গরও আছে। ইহারা বিশাল রৌদ্রসেবী হাঙ্গর বা 'গ্রেট বাস্কিং-শার্ক' নাম প্রাপ্ত হয়। এই জাতীয় হাঙ্গর পূর্ণ পরিণতি প্রাপ্ত হইলে ৪০ ফিট পর্য্যন্ত লম্বা হইয়া থাকে। আকারে এইরূপ প্রকাণ্ড হইলেও ইহারা আদৌ হিংস্রস্বভাব নহে। ইহারা অলস-ভাবে মন্থরগতিতে ঘুরিয়া বেড়ায়। বিশেষ বিস্তৃত বলিয়া ইহাদের ব্যাদিত বদনবিবরের ভিতর বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র মৎস্য যুগপৎ স্থান লাভ করিতে পারে। ইহারা ঐ সকল মাছকে গিলিয়া ফেলে। ইহাদের দেহ বিশাল হইলেও দাঁতগুলি ক্ষুদ্র। ইহারা আহার্য্য-গ্রহণে দাঁতের সাহায্য লয় না বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। এই সকল হাঙ্গর প্রধানতঃ ইউরোপের উত্তরাংশের সাগরসমূহে বাস করে। আয়র্লণ্ডের পশ্চিমোপকূলে এক প্রকার তৈলের জন্য এই সকল হাঙ্গর শিকার করা হয়। এই জাতীয় এক একটি হাঙ্গরের যকৃৎ হইতে এক টন হইতে দেড় টন পর্য্যন্ত তেল পাওয়া যাইতে পারে। হিংস্র প্রকৃতির না হইলেও এই শ্রেণীর হাঙ্গর শিকার করা সম্পূর্ণ নিরাপদ নহে। ইহারা প্রকাণ্ড পুচ্ছের আঘাতে বড় বড় নৌকাও উল্টাইয়া দিতে পারে। ঋতুবিশেষে ইহাদিগকে দলবদ্ধভাবে শান্ত-সুন্দর সমুদ্রের উপরিভাগে ভাসিয়া রৌদ্র-সেবন করিতে দেখা যায়। সেই সময় ইহাদের গোলাকার পৃষ্ঠদেশের উপর সমুজ্জ্বল সূর্য্যকর প্রতিফলিত হইয়া একপ্রকার চিত্তচমৎকারী দৃশ্য প্রকাশিত করে। এইরূপ দৃশ্য দেখিয়াই পর্য্যটক ও প্রাণিতত্ত্ববেত্তা পণ্ডিতরা ইহাদিগকে রৌদ্রসেবী হাঙ্গর আখ্যা দান করিয়াছেন। 'হোয়েল-শার্ক' বা তিমি-হাঙ্গর অনেক বিষয়ে রৌদ্র-সেবী হাঙ্গরদের মতই, তবে আকারে বৃহত্তর। আকারে প্রায় তিমির মত বলিয়াই ইহারা তিমি-হাঙ্গর নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। হাঙ্গরদের মধ্যে ইহারাই বৃহত্তম। ইহাদিগকে দেখিলেও কবিশ্রেষ্ঠ কালিদাসবর্ণিত 'মাতঙ্গ-নক্র' মনে পড়ে। পূর্ণবয়স্ক তিমি-হাঙ্গর ৭০ ফিট পর্য্যন্ত লম্বা হয়। উত্তমাশা অন্তরীপের নিকটে এই জাতীয় হাঙ্গর প্রায় দেখা যায়। রৌদ্রসেবী হাঙ্গরদের মত ইহারাও অলস প্রকৃতির এবং ব্যবহারের অভাবে ইহাদের দাঁতগুলিও দুর্ব্বল। আমাদের বিশ্বাস ইহারা প্রকাণ্ডকায় প্রাগৈতিহাসিক হাঙ্গরদের বংশধর।

ভূমধ্যসাগরে একপ্রকার হাঙ্গর সর্ব্বদা দৃষ্টিপথে পতিত হয়। ইহাদিগকে 'ফক্স শার্ক' বা 'খেঁক শিয়ালী হাঙ্গর' বলা হয়। দীর্ঘপুচ্ছের জন্য এইরূপ নাম। ইহাদিগকে 'থ্রেসার শার্ক'ও বলা হইয়া থাকে। আহার্য্য গ্রহণের সময় ইহারা দীর্ঘ পুচ্ছটিকে জলের ভিতর ইতস্তত সঞ্চালিত করে বলিয়া 'থ্রেসার' আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। খাদ্যস্বরূপ অন্যান্য মৎস্যগুলিকে চারিদিক হইতে বিতাড়িত করিয়া সম্মুখে বা মুখের নিকট আনিবার জন্য পুচ্ছটিকে সঞ্চালিত করা হয় সন্দেহ নাই। যেখানে ছোট ছোট মাছ ঝাঁকে ঝাঁকে থাকে সেখানেই এই সকল হাঙ্গর লেজ নাড়িয়া চক্রাকারে ঘুরিয়া বেড়ায়। ফলে মৎস্যগুলি পলাইবার পথ না পাইয়া ইহাদিগের বদন বিবরে প্রবেশ করিতে বাধ্য হয়।

অনেকে হয় তো জানেন স্ত্রী-মৎস্য ডিম পাড়িবার পর পুং-মৎস্য একপ্রকার পদার্থ জননেন্দ্রিয় হইতে নিঃসৃত করিয়া ঐ ডিমগুলিকে সঞ্জীবিত করিয়া তুলে বা মৎস্যরূপে পরিণত হইবার পক্ষে সহায়ক হয়। ইহাকে 'উর্ব্বরতা সম্পাদন' বলা হয়। অধিকাংশ হাঙ্গরে এবং অপর কোন কোন মৎস্যে এই ক্রিয়া মাতার জঠরেই সম্পাদিত হয়। এইরূপ ক্ষেত্রে স্ত্রী-হাঙ্গরের গর্ভ হইতে ডিমের পরিবর্ত্তে শাবক প্রসূত হয়।

এই জাতীয় হাঙ্গরদিগের মধ্যে স্ত্রী ও পুং মৎস্যে প্রকৃত যৌন-সম্মিলন সঙ্ঘটিত হয়। কোন কোন শ্রেণীর হাঙ্গর সাধারণ মৎস্যের মতই ডিম পরিত্যাগ করে। কোন কোন হাঙ্গরের ডিম বক্রাকার এবং কোন কোন হাঙ্গর সোজা বা লম্বা ডিম প্রসব করিয়া থাকে।

ভারতবর্ষে অতি দরিদ্র ব্যক্তি ব্যতীত হাঙ্গরের মাংস কেহ খায় না। তবে হাঙ্গরের পাখনা পণ্যরূপে ব্যবহৃত হয়। এই পণ্য প্রধানতঃ চীনারা ক্রয় করে। চীনে হাঙ্গরের পাখনা খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হয় এবং চীনারা ইহা হইতে 'জিলেটিন' নামক পদার্থও প্রস্তুত করে। সাদা এবং কালো দুইপ্রকার পাখনা ব্যবসায়ীদিগের দ্বারা পণ্যরূপে
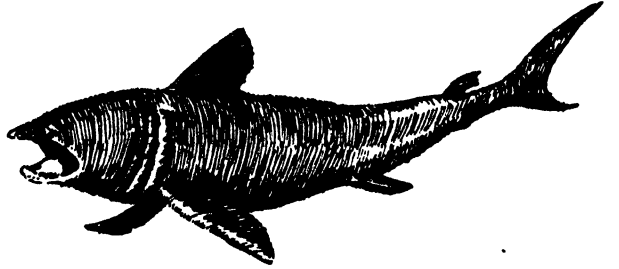
বিশাল রৌদ্র-সেবী হাঙ্গর বা গ্রেট বাস্কিং শার্ক

ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়। সাদাগুলি হাঙ্গরদের পৃষ্ঠ দেশের এবং কালোগুলি তাহাদের পেট ও বুকের পাখনা। সাদা পাখনা হইতে উৎকৃষ্ট জিলেটিন তৈয়ারি হয়। পুচ্ছের পাখনা কোন কাজে লাগে না। পাখনাগুলি দেহের খুব কাছাকাছি অংশ হইতে কাটিয়া লইতে হয়। ইহাদিগকে চূণে ভিজাইয়া রৌদ্রে শুকাইয়া না লইলে কার্য্যোপযোগী হয় না। বোম্বাই হইতে পাঁচ বৎসরে ৮ লক্ষ টাকার পাখনা (উহার সহিত কিছু অন্যান্য অংশও) চালান গিয়াছিল। সিন্ধুপ্রদেশের উপকূলে হাঙ্গর শিকার নিয়মিতভাবে অনুষ্ঠিত হয়। এখানে একপ্রকার হাঙ্গর 'মহর' আখ্যায় অভিহিত হয়। ইহারা জলের উর্দ্ধাংশে যখন রৌদ্র সেবন করে তখন (তিমি মারিবার প্রণালীতে) হার্পুণ নামক অস্ত্রের দ্বারা বিদ্ধ করিয়া ইহাদিগকে ধরা হয়। হাঙ্গর জালের সাহায্যে ধরার প্রথাও প্রচলিত আছে। এক একটি জাল সিকি মাইল বা তদপেক্ষাও দীর্ঘ হওয়া দরকার। সুদৃঢ় সূত্র বা রজ্জুর দ্বারা এই জাল প্রস্তুত হয়। জালের এক একটি ছিদ্রের আয়তন প্রায় ৬ ইঞ্চি। জালের উর্দ্ধাংশে লঘুভার কাষ্ঠখণ্ড ভাসাইয়া রাখা হয় এবং নিম্নাংশে জালকে ভারি করিবার জন্য বড় বড় শিলাখণ্ড রাখিতে হয়। সমুদ্র সলিল যেখানে ৮০ হইতে ১ শত ৫০ ফিট পর্য্যন্ত গভীর, সেইখানে জাল প্রসারিত করিতে হয়। ২৪ ঘণ্টা প্রসারিত রাখিবার পর জাল পরীক্ষা করা বা গুটাইয়া লওয়া হয়। পূর্ব্বের এক বৎসরে ৪০ হাজার হাঙ্গর জালের সাহায্যে ধরা হইয়াছিল।

অসাধু ব্যবসায়ীরা একপ্রকার হাঙ্গরের তৈলকে কডলিভার অয়েলের সহিত মিশাইয়া বিক্রয় করে। সাধারণ 'ডগ-ফিশ' জাতীয় হাঙ্গরের যকৃৎ হইতে এই তৈল পাওয়া যায়। পণ্ডিতগণের গভীর গবেষণায় কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ভূমধ্যসাগরবাসী নীল হাঙ্গর বা ব্লু শার্কের যকৃৎ হইতে বহুমূত্র রোগের মহৌষধ 'ইনসুলিন' আবিষ্কৃত হওয়ায় ফলে রোগার্ত্ত মানব জাতির বিশেষ কল্যাণ সাধিত হইয়াছে সন্দেহ নাই। ইনসুলিন যকৃতের গ্রন্থিবিশেষ (প্যানক্রিয়াটিক গ্ল্যাণ্ড) হইতে নিঃসৃত একপ্রকার রস (হর্মোণ)। এই পদার্থের অভাব হইলেই বহুমূত্র রোগ জন্মায় বলিয়াই পণ্ডিতগণ মনুষ্যেতর প্রাণীর যকৃৎ হইতে উহা লইয়া সেই ক্ষতি পূরণ করিতে চাহিয়াছেন। প্রথমে গো-ছাগাদির যকৃৎ হইতে ইহা গ্রহণ করিয়া মনুষ্য দেহে প্রয়োগের ব্যবস্থা হইয়াছিল। কিন্তু হাঙ্গরের যকৃৎ হইতে প্রাপ্ত ইনসুলিনই সর্ব্বোৎকৃষ্ট।

বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ

শ্রীকালিকাপ্রসাদ দত্ত এম-এ

গত কয়েকদিন গরমটা যেন একটু বেশী পড়েছে…

যে ঘরটায় অনীশ থাকে, সে ঘরটায় হাওয়া আসে সবচেয়ে কম। সারাটী রাত্রি একরূপ বিনিদ্রভাবে যাপন করে—সন্তর্পণে দরজাটা খুলে অনীশ ছাদের খোলা হাওয়ায় এসে বসল। ভোরের স্নিগ্ধ হাওয়ায় তার দেহমন কতকটা সুস্থ হ'ল। আঁজলা ভরে জল নিয়ে সে চোখমুখ ধুয়ে নীচে থেকে খবরের কাগজখানা নিয়ে এসে পূর্ব্বস্থানে ফিরে এল। সবার আগে যুদ্ধের খবরের পাতাটা খুলে বেশ অভিনিবেশ সহকারে পড়তে লাগল। পড়তে পড়তে একরূপ তন্ময় হয়ে গিয়েছে, এমন সময় চাকর এককাপ চা দিয়ে গেল। অন্যমনস্কভাবে চা পান করতে করতে তার পড়া চলতে লাগল।…

কতক্ষণ এইভাবে কেটে গিয়েছে তা বলা কঠিন। সহসা অনীশের চমক ভাঙ্গল তার স্ত্রী নন্দার আহ্বানে!

"শুনছ?…"

মুখ না তুলেই অনীশ বল্লে—"হ্যাঁ! বল…"

নন্দা ঈষৎ ঝঙ্কার দিয়ে বল্লে—"একবার মুখটা তোলই না! সেই কখন ত কাগজ নিয়ে বসেছ…"

কাগজখানা ভাঁজ করে পাশে সরিয়ে রেখে অনীশ বল্লে—"হ্যাঁ…কি বলছিলে বল…"

ধুপ্ করে তার ঠিক সুমুখেই বসে পড়ে বড় বড় চোখ দুটো তুলে বল্লে—"কি করে টাকা রোজগার হবে বলতে পার?"

ভোরের স্নিগ্ধ বায়ুর স্পর্শে দেহের যে ক্লান্তিটুকু অপনোদিত হয়েছিল, স্ত্রীর বাক্যবাণে তা যেন দ্বিগুণভাবে দেহের জড়তা বৃদ্ধি করল। সামলে নিয়ে ঈষৎ অপ্রতিভভাবে অনীশ বল্লে—"সে কথা আমিও ভাবছি নন্দা!"

ঠোঁট উল্‌টিয়ে নন্দা বল্লে—"ছাই!…কতক্ষণ আমি তোমার পাশে দাঁড়িয়েছিলাম বলত?" তারপর একটু থেমে বল্‌তে লাগল—"সত্যি বল্‌ছি…তোমরা পুরুষ মানুষ হয়ে কি করে হাতপা গুটিয়ে বসে থাক তা জানি না!…আমি মেয়েমানুষ…কিন্তু দেখে শুনে আমার গা রিযরিষ করে!"

পৌরুষে আঘাত লাগাতে অনীশের মুখজ্যোতিঃ ঈষৎ ম্লান হয়ে গেল। কষ্টার্জ্জিত হাসি হেসে সে বল্লে—"রাত্রে কি মনে মনে রিহার্শাল দিয়েছিলে নন্দা?…তাই ঘুম থেকে উঠেই আক্রমণ সুরু করলে!"

নন্দা বল্লে—"আক্রমণ আর কি?…যা নিছক সত্যি…তাই বল্‌ছি!…নির্ভর ত ঐ মাসে দুশো টাকা পেন্‌সন্!…সব বিষয়ে কি আর বাবার ওপর জুলুম করা চলে…না উচিৎ? তা তুমিই বলনা!…"

অনীশ লজ্জিতভাবে বল্লে—"বল্‌বার আর কি আছে বল?…কিন্তু তুমি ত জান নন্দা আমি কি রকম আপ্রাণ চেষ্টা কর্‌ছি, যাতে ঘরে দুটো পয়সা আসে…এইত সেদিন ক্রস্‌ওয়ার্ডের দরুণ পঁচিশ টাকা পেলাম! বল পাইনি? আরও খুচ্‌খাচ্ দু'পাঁচটাকা আন্‌ছিও ত!…"

নন্দা বল্লে—"আন্‌ছ ত জানি! কিন্তু এতে কি হবে বল?…সত্যি বল্‌তে কি পুরুষ মানুষ চেষ্টা করলে যে ঘরে টাকা আনতে পারেনা, তা' আমি মোটেই বিশ্বাস করিনে!"

অনীশ বল্লে—"সব জেনেশুনেও কেন যে তুমি মাঝে মাঝে খোঁচাও…তা বুঝতে পারিনে!…লোকে বিপাকে পড়্‌লে তাকে উৎসাহিত করে জাগিয়ে তোলে তার স্ত্রী-ই! পৃথিবীর বেশীর ভাগ বড়লোকের, মানে শুধু আমি ধনবানদের কথা বলছিনে…উন্নতির মূলে আছে তার স্ত্রীর অনুপ্রেরণা…উৎসাহের সঞ্জীবনী সুধা!…"

নন্দা শ্লেষ করে বল্লে—"বাপ্‌রে! এযে দেখছি কবিত্ব এনে ফেল্লে!…তুমিও ওদের মত বড় হও…আমিও তখন তোমার পাশে দাঁড়াব!"

"যখন দরকার খুব বেশী রকমের, তখনই যদি তুমি না এলে…তাহলে সে আসায় লাভ?"

অনীশ উঠে পড়ে বল্লে—"যাই!…নিকাশীপাড়া থেকে একটু ঘুরে আসি!…ভবেশদা বল্‌ছিলেন কোন্ কাগজে নাকি গল্প ছাপালে টাকা দেয়!…দেখি খোঁজটা নিয়ে আসি!…খুকুদের একটু নজরে রেখো…বুঝ্‌লে?"…রণে ভঙ্গ দিয়ে সে অদৃশ্য হ'ল।

নন্দা বল্লে—"খুকীরা মার কাছে আছে!…ঘুম ভাঙতেই তাদের ডেকে নিয়েছেন!"

সেদিন রাত্রেই নিম্নলিখিতভাবে কথাবার্ত্তা চলছিল। বিষয়বস্তু এবং পাত্র-পাত্রী একই। তথাপি তা' যেন ভিন্ন রঙের ছোপ লাগানো।…অনীশ জিজ্ঞাসা করল—"খুকুরা ঘুমিয়েছে?"

নন্দা ঘাড় নেড়ে সায় দিয়ে অনীশের পাশটীতে এসে বসে মৃদুভাবে বলতে লাগল—"দেখ! কবে যে আমাদের স্বচ্ছল অবস্থা হবে, যে একটু নড়ে চড়ে বেড়াব!…এই একঘেয়ে জীবন যেন মাঝে মাঝে অসহ্য হয়ে ওঠে!…হ্যাঁগা! কবে তুমি মুঠো মুঠো টাকা ঘরে আনবে গো?"

অনীশ ভাবাবিষ্টের ন্যায় বল্লে—"তোমাদের সুখী করা কি আমার জীবনের কাম্য নয় নন্দা? আমারও কি মনে কোন সাধ-আহ্লাদ নেই বলতে চাও? আমি কি পাষাণ?"

নন্দা বল্লে—"হ্যাগা! সেদিন কি আসবে না কোনকালে?"

অনীশ বল্লে—"কেন আসবে না নন্দা?…বিধাতা পুরুষ যে দরজাটা বন্ধ করে চাবি হারিয়ে ফেলেছেন, সেই দরজাটা ভাঙ্গবার জন্যই আমি উঠে পড়ে লেগেছি!"

নন্দা বল্‌তে লাগল—"ওগো তাই হোক্…তোমার চেষ্টা সফল হোক্!…দেখ…আমার কুমারী জীবনে কত সাধ ছিল!…ফলেফুলেভরা বাগান আমার চিরকালের বাসনা!…আমার স্বামী তার কাজ নিয়ে এত ব্যস্ত থাকবে যে কোন দিকে তার হুঁস্ থাকবে না…এমন কি নাওয়া খাওয়ারও না!…লোকজন জিনিষপত্রে ঘরবাড়ী গম্‌গম্ করবে!…সত্যি বল্‌ছি, এখনও সে স্বপ্ন আমি দেখি!"

অনীশ বল্লে—"কোনদিন যদি তোমার স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দিতে পারি, তবেই বুঝ্‌ব আমার সাধনা সিদ্ধিলাভ করল!"

নন্দা বল্লে—"দেখ! তোমরা শুধু বর্ত্তমানটা নিয়েই আঁকড়ে পড়ে থাক, আমার কিন্তু মন তাতে সন্তুষ্ট থাকতে পারে না!... দূরে...অনেক দূরে চলে যায়! ভবিষ্যতের জন্যই না মানুষ যা কিছু করে!...আমার একটা কথা রাখবে? হ্যাঁগা!...বলনা?"

অনীশ বল্লে—"তুমি অমন করে বলছ কেন নন্দা?"

নন্দা বল্লে—"আমার ইচ্ছে, এখন থেকে তুমি যা রোজগার করবে, তা থেকে কিছু কিছু নিয়ে পুঁটু, মণ্টুর জন্য গয়না গড়িয়ে রাখি...ওরা বিয়ে করুক নাই করুক...অন্ততঃ বিয়ের দরুণ টাকাটা ক্রমে ক্রমে সঞ্চিত করি।...মানে ওরা বড় হয়ে যেন আমাদের কোন খুঁত্‌ ধরতে না পারে!...আর দেখো, আমার এখন থেকেই ওদের দানের বাসন গড়িয়ে রাখ্‌তে সাধ যায়!..."

অনীশ উৎসাহিতভাবে বল্লে—"হবে গো হবে! তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হবে!...বর্ত্তমানের ভিত্তিতে আমরা ভবিষ্যতের সৌধ গড়ে তুলব!"...

অনুকূল বায়ুতে সুবৃহৎ তরণী তৃণখণ্ডের মত অবাধ গতিতে জলস্রোতে ভেসে যায়। কিন্তু বায়ু প্রতিকূল হ'লে সামান্য তৃণটীও জলস্রোতে বাধা পায়।...

বিধাতা পুরুষ ক্ষণেকের জন্য বোধ করি অনীশের ওপর সদয় হলেন।...সেদিন বিকালে দু'খানা খাম হাতে করে অনীশ আনন্দোচ্ছল কণ্ঠে ডাকল "নন্দা! নন্দা"...

"কি গো? ...ব্যাপার কি?" নন্দা তার সামনে এসে দাঁড়াল।

পুলক-ভরা কণ্ঠে অনীশ বলতে লাগল—"সেই যে উত্তরপাড়া আর বরিশাল...এই দুটো কলেজে ইতিহাসের লেক্‌চারারের পদের জন্য দরখাস্ত করেছিলুম...তার জবাব এসেছে!..."

উদ্বিগ্নভাবে নন্দা বল্লে—"কি লিখেছেন তাঁরা?"

অনীশ বল্লে—"দেখা করতে লিখেছেন...সঙ্গে ঠিকানাও দেওয়া আছে!...প্রথমটার ইণ্টারভিউ পরশু...দ্বিতীয়টার দিন হচ্ছে আসছে সোমবার!..."

নন্দা কতকটা নির্লিপ্ত স্বরে বল্লে—"দেখ কি হয়!"

অনীশ বল্লে—"তোমার মুখে হাসি নেই কেন নন্দা?..."

নন্দা বল্লে—"দেখ!...তোমার উন্নতিতে আমার গর্ব্ব... কিন্তু কি জান...দেখে শুনে সব জিনিষের ওপরই বিশ্বাস হারিয়েছি! শেষটা হয়ত সবই ভণ্ডুল হয়ে যাবে!"

অনীশ বল্লে—"আমি বলছি তুমি দেখে নিও...নিশ্চয়ই একটা না একটা বরাতে জুটবেই!..."

যথাসময়ে অনীশ উত্তরপাড়ায় দর্শন দিয়ে এল।...তাঁরা জানিয়েছেন, আগেই হয়ে গিয়েছে! আজ দ্বিতীয়টীর দিন!... উৎফুল্লভাবে ঘরের সামনে এসে দাঁড়িয়ে অনীশ বল্লে—"দাঁড়াও নন্দা!...বাবা মাকে খবরটা দিয়ে আসি!"

কিছুক্ষণ পরেই সে ঘরে ফিরে এল। নন্দা বল্লে—"হ্যাঁগা! ভগবান মুখ তুলে চাইবেন ত?"

অনীশ বল্লে—"আশা ত ষোল আনাই করছি নন্দা!...উত্তরপাড়া ফস্কে গেলেও বরিশালের কাজে আমায় কেউ ঠেকিয়ে রাখ্‌তে পারবে না!..."

নন্দা দু'হাত জোড় করে কপালে ছুঁইয়ে বল্লে—"এখন মা সর্ব্বমঙ্গলার দয়া!" তারপর একটু থেমে বল্‌তে লাগল—"দেখ, এবার কিন্তু আমায় কিছু বলতে পারবে না...তা' আমি আগেই বলে রাখছি! যেখানেই কাজ করনা কেন...৮৫৲ টাকার কমে কেউ দেবে না!...আর গল্প ছাপালে কোন না দশটা কি পনেরটা টাকা পাবে!...তাছাড়া একজামিনের কাগজ দেখার দরুণ য়ুনিভার্সিটির টাকাও পাবে!..."

অনীশ বল্লে—"হ্যাঁ...তা কি হয়েছে তাতে?..."

নন্দা বল্লে—"এবার আমি কাণপাশা গড়াব...আমার অনেক-দিনের সাধ!...আর মেয়েদের জন্য একেবারে বছরের পোষাকী ও আটপৌরে জামা তৈরী করে রাখব...কি বল?"

অনীশ গদগদ কণ্ঠে বল্লে—"এ পর্য্যন্ত তোমার কোন সাধই আমি মেটাতে পারিনি!...যা' করে তুমি তৃপ্তি পাও...তাই কোরো!..."

* * * *

দিন যায়, দিন আসে।...

কালের চাকা অবিরাম গতিতে ঘুরছেই!...কিন্তু অনীশের ভাগ্যোদয় যোগ ঘট্‌ল না। অতি আশা করেছিল বলেই বোধ হয় হতাশার বোঝা পাষাণের মত বুকে তার চেপে বসল।...ক্লিষ্ট ও আশাহত মন তার, বজ্রাহত তরুর সাথে তুলনীয়!...যথেষ্ট গুণাবলী থাকতেও অনীশ উত্তরপাড়া বা বরিশাল কলেজের কোনটীতে ঠাঁই পেল না। কেন এমন হ'ল? খোঁজ নিয়ে জানতে পারল যে উক্ত দুটী প্রতিষ্ঠানেই কর্তৃপক্ষ মণ্ডলীর কোন বিশিষ্ট সদস্য মহোদয়ের পরিচিত ও নিকট-আত্মীয়রাই পদে বাহাল হয়েছেন!...ভাগ্যের বিরূপতার দোহাই ছাড়া সে অন্য কোন-ভাবে মনকে সান্ত্বনা দিতে পারল না।...

অনীশ আজ নন্দার সঙ্গে মুখ তুলে কথা কইবে কি করে? সে বেচারী যে তারই মুখ চেয়ে আছে। আরও মজার কথা হ'ল এই যে সম্প্রতি তার গল্পটীও অমনোনীত হয়ে ফেরৎ এসেছে।...সকল প্রচেষ্টাই তার নিষ্ফল হ'ল। মমতা-ময়ী নন্দা অনীশের অশান্ত মনকে প্রবোধ দেয়। বলে— "মিছে ভেবে আর কি কর্ব্বে বল?...যা' হবার তা' হয়ে গিয়েছে!...তোমরা পুরুষ মানুষ...এত সহজে অধৈর্য্য হ'লে চলবে কেন?...আর যাই হোক...একজামিনের টাকাটা ত পাবে!..."

সত্যই ত!...একথা তার মনেই ছিল না।...কঠোর পরিশ্রমের পুরস্কার স্বরূপ ন্যায়সঙ্গত প্রাপ্যটুকু থেকে কেউ তাকে বঞ্চিত করতে পারবে না।...কি হবে ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে? ডুবে থাক তা' অনাগত যুগের অতল গর্ভে।...বর্ত্তমানের জীব সে—বর্ত্তমান নিয়েই কারবার!...মনে মনে হিসাব করে দেখল, সে একজামিনারের কি বাবদ অন্যূন দেড়শ টাকা আন্দাজ পাবে!...তা' থেকেই সে তৈরী করাবে নন্দার জন্য কাণপাশা এবং কিছুদিনের মত কিনবে মেয়েদের পোষাক, কিসের দুঃখ তার? আপাততঃ চিন্তার হাত হতে সে মুক্তি পাবে ত... বর্ত্তমানের দাবী ত মিটুক...থাকুক ভবিষ্যৎ গভীর অন্ধকারের মাঝে অথবা উজ্জলতার গর্ভে!

কথা—শ্রীবিনয়ভূষণ দাশগুপ্ত　　　সুর ও স্বরলিপি—শ্রীবীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী এম-এল-সি

জন্মাষ্টমী

(ধ্রুপদ)

* জয়েৎশ্রী—তেওরা

তিমির ঘোর রজনী ভেদি'
　　জাগো হে কৃষ্ণ কেশব হরি
ধরণী ধন্যা পুলক বন্যা
　　বহুক নিত্য জীবন ভরি'।
দেবকী অঙ্কে কারার কক্ষে
এস হে সৌম্য নিখিল বক্ষে
প্রেমের বন্যা বহুক চক্ষে
　　যতেক চিত্ত তোমারে স্মরি'।

নাশিতে শত্রু ধর হে চক্র
　　হে চির চক্রী বাহুর বলে
অশিব দ্বন্দ্ব সুশিব ছন্দে
　　পড়ুক মূর্চ্ছি চরণ তলে।
মানব আর্ত্ত ধরার দুঃখে
দলিত দৈন্যে ভীষণ রুক্ষে
অভয় কণ্ঠে বিঘোষি' মন্ত্র
　　এস হে কৃষ্ণ হৃদয়ে ধন্যি'।

+ ২ ৩ + ২ ৩
II পা জ্ঞপা গা | পজ্ঞা -পা | পা -া I পা পর্সা না | পদা -া | পা -জ্ঞা I
তি মি৹ র ঘো৹ ৹ র ৹ র জ নী ভে ৹ দি ৹

+ ২ ৩ + ২ ৩
গজ্ঞা -গা গা | পা -জ্ঞা | দা পা I গা পা গা | গা -ঋা | সা -া I
জা৹ ৹ গো হে ৹ কৃ ষ্ণ কে শ ব হ ৹ রি ৹

+ ২ ৩ + ২ ৩
সা র্সা না | র্সা -া | র্সা -া I না ঋর্সা না | পদা -া | পা -জ্ঞা I
ধ র ণী ধ ৹ ন্যা ৹ পু ল৹ ক ব৹ ৹ ন্যা ৹

+ ২ ৩ + ২ ৩
পা র্সা না | পদা -া | পা -জ্ঞা I গা পা গা | গঋা -া | সা -া II
ব হু ক নি৹ ৹ ত্য ৹ জী ব ন ভ৹ ৹ রি ৹

* জন্ম সময় উপলক্ষে রচিত হিন্দুস্থানী রাগগীতি সকল জয়েৎশ্রী রাগিণীতে রচিত হওয়ার প্রচলন পূর্ব্বে ছিল। জয়েৎশ্রী রাগিণীর আরোহী—সা জ্ঞা পা ণা র্সা, অবরোহী—র্সা ণা দা পা জ্ঞ পা ঋা সা।

\+ ২ ৩ + ২ ৩
II ন্‌া সা সা | ঋা -গা | গা -া I সা গা সা | গঋা -পা | পা -া I
দে ব কী অ ং কে ০ কা রা গ্‌ র০ ০ কে ০

\+ ২ ৩ + ২ ৩
ঋা পা ঋা | পঋা -গা | গা -া I গা ঋা গা | সঋা -া | সা -া I
এ স হে লো০ ০ ম্য ০ নি খি ল ব০ ০ ক্ষে ০

\+ ২ ৩ + ২ ৩
গা ঋা পা | না -র্সা | র্সা -া I র্গা র্ঋা র্গা | র্সর্ঋা -া | র্সা -া I
প্রে মে র ব ০ ন্যা ০ ব হু ক চ০ ০ ক্ষে ০

\+ ২ ৩ + ২ ৩
পা র্সা পা | র্সা -না | দা -পা I গা ঋা গা | ন্‌া -সা | গঋা -পা II
য তে ক চি ০ ত্ত ০ তো মা রে স্ম ০ রি০ ০

\+ ২ ৩ + ২ ৩
II নঋা ঋা ঋা | ঋা -া | ঋা -া I সা ন্‌া দ্‌া | প্‌া -সা | সা -া I
না শি তে শ ০ ক্র ০ ধ র হে চ ০ ক্র ০

\+ ২ ৩ + ২ ৩
সা গা গা | পা -ঋা | পা -গা I গা ঋা গা | সঋা -া | সা -া I
হে চি র চ ০ ক্রী ০ বা হু র ব০ ০ লে ০

\+ ২ ৩ + ২ ৩
গা ঋা পা | না র্সা | র্সা -া I র্গা র্ঋা র্সা | র্সনা- র্ঋা | র্সা -া I
অ শি ব দ্ব ০ ন্দ্ব ০ সু শি ব ছ০ ০ ন্দে ০

\+ ২ ৩ + ২ ৩
র্সা র্গা র্গা | র্পা র্পা | র্পর্গা -র্পা I র্গা র্ঋা র্সা | পা -ঋপা | র্সনা র্সা I
প ড়ু ক সূ র ছি০ ০ চ র ণ ত ০০ লে০ ০

\+ ২ ৩ + ২ ৩
র্গা র্ঋা র্সা | র্ঋা -না | দা -পা I দা ঋা গা | পা -ঋা | পা -া I
মা ন ব আ ০ র্ত্ত ০ ধ রা র দুঃ ০ খে ০

\+ ২ ৩ + ২ ৩
গা পা সা | গা -পা | র্সা -া I গা ঋা গা | ঋা -ঋা | গা -া I
ল লি ত দৈ ০ ন্যে ০ ভী ষ ণ রু ০ ক্ষে ০

\+ ২ ৩ + ২ ৩
গা ঋা ঋা | ঋা -া | ঋা -া I না দা পা | ঋা -গা | র্সা -া I
অ ভ য় ক ০ ণ্ঠে ০ বি ঘো ষি ম ০ ন্ত্র ০

\+ ২ ৩ + ২ ৩
পা ঋা গা | পঋা -দা | পা -ঋা I গা ঋা সা | ন্‌া -সা | গঋা -পা II II
এ স হে কৃ০ ০ ষ্ণ ০ হৃ দ য়ে ধ ০ রি০ ০

হিন্দু-বিবাহ-বিধি সংশোধন

শ্রীনারায়ণ রায় এম্‌-এ, বি-এল

হিন্দুর সংস্কারগুলির মধ্যে বিবাহ অন্যতম। বিবাহকে ধর্ম্মের সহিত যোগ করিয়া হিন্দু তাহাকে একটা সুন্দর ও মঙ্গল রূপ দিয়াছে। পাশ্চাত্য জগৎও মুখে যতই বড়াই করুক না কেন, বিবাহকে যতই চুক্তির পর্য্যায়ে আনিয়া ফেলুক না কেন, গীর্জ্জা, পাদরী, বাইবেল ও বাতির একত্র সমাবেশে সাময়িকভাবেও অন্ততঃ বিবাহকে সুন্দর করিয়া তুলে। বর্ত্তমান জগৎ বিবাহকে নূতন দৃষ্টিতে দেখিতে শিখিয়াছে, আজ Companionate Marriage-এর বার্ত্তা দিকে দিকে বিঘোষিত হইতেছে, বিচারপতি বেন লিণ্ডসে বলিতেছেন বর্ত্তমানের এই বিবাহ পদ্ধতি, এই ধর্ম্মগ্রন্থ, গীর্জ্জার ঘণ্টা ও বাতির যুগ ফুরাইয়া গিয়াছে—এসব চলিবে না(১)। এ প্রসঙ্গের আলোচনা পরে করিব—বর্ত্তমান প্রবন্ধে উহা আমাদিগের আলোচ্য বিষয়বস্তু নহে।

বলিয়াছি হিন্দুর বিবাহ ধর্ম্মের ব্যাপার। হিন্দু নারীর সতীত্বের মর্য্যাদা অতি বেশী—তাহার সমাজে বহু-পতিত্ব অচল—এমন কি স্বামীর মৃত্যু হইলেও এক দল লোক বিধবার পত্যন্তর গ্রহণে বাধা দেন।

হিন্দু সমাজ হিন্দু বিধবার পত্যন্তর গ্রহণে বাধা দিলেও পুরুষের এক স্ত্রী বর্ত্তমানে অপর পত্নী গ্রহণে বাধা দেয় না। বর্ত্তমানে শিক্ষিত সম্প্রদায় কিন্তু এককালীন একাধিক পত্নীত্বের বিরোধী। অনেকে আবার বিপত্নীকের পুনরায় বিবাহেরও পক্ষপাতী নহেন, তাঁহাদিগের সপক্ষে অবশ্য যুক্তি অপেক্ষা ভাবপ্রবণতাই বেশী। একজনকে ভালবাসিলে অপরকে নাকি ভালবাসা যায় না—কিন্তু সে কথা যাউক, উহাও আমাদিগের আলোচ্য নহে।

একই কালে একাধিক পত্নী থাকা শিক্ষিত ও সুরুচিসম্পন্ন মহলে যে লজ্জার বিষয় তাহাই বলিতেছিলাম। এই যে একই কালে একাধিক পত্নী থাকায় আইনের সম্মতি, ইহাকে অনেকেই সুদৃষ্টিতে দেখেন না। আমার ব্যক্তিগত মতামত যাহাই হউক না কেন ইহা যে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অনেকেরই চক্ষুশূল তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। বস্তুতঃ বহুপত্নীত্বের প্রয়োজনীয়তা কয়েকটী পরিস্থিতিতে মাত্র স্বীকার করিতে পারা যায়, অন্যত্র নহে।

দেশে তুলনামূলকভাবে পুরুষ হইতে নারীর সংখ্যা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে পুরুষের বহু বিবাহের প্রয়োজন ঘটিতে পারে নচেৎ সেই দেশে বা সমাজে বহু স্ত্রীলোক অবিবাহিতা থাকিয়া যায় ও দেশের সমাজের জনসংখ্যা বৃদ্ধি না পাইয়া ক্রমশঃ কমিতে আরম্ভ করে।

হিন্দু সমাজ বিবাহ-বিচ্ছেদ স্বীকার করে না বটে কিন্তু ক্ষেত্র বিশেষে স্বামী ও স্ত্রীর চিরকাল পৃথক থাকার নীতি সমর্থন করে—যেমন চরিত্রহীনা স্ত্রী বা নির্য্যাতনকারী স্বামী প্রভৃতির ক্ষেত্রে। এইরূপ স্থলেও অর্থাৎ স্ত্রী চরিত্রহীনা হইয়া গৃহ ত্যাগ করিলে বা ইচ্ছাপূর্ব্বক যে কোনও কারণে স্বামীগৃহ পরিত্যাগ করিলে পুরুষের অপর পত্নী গ্রহণ সমর্থন করিতে পারা যায়।

১৯৪১ সালের ২৫এ জানুয়ারী হিন্দু আইনের কয়েকটী দিক বিবেচনা করিবার জন্য একটি কমিশন প্রস্তাবের দ্বারা একটা গঠিত হয়। এই কমিটি অর্থাৎ "রাউ কমিশন" কালে উহার মতামত প্রকাশ করিয়াছে। গত ৩০শে মে ১৯৪২ তারিখে প্রকাশিত "ইণ্ডিয়া গেজেট" পঞ্চম 'পার্ট'-এ দেখি যে হিন্দু আইনের সংশোধন কল্পে একটি "বিল" আনয়ন করা হইয়াছে। ইহারই কিয়দংশ বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমাদিগের আলোচ্য।

আইন সভায় ১৯৪২ সালের ২৭ সংখ্যক 'বিল'-এর চতুর্থ ধারার 'এ' চিহ্নিত অংশ সম্বন্ধে প্রথমে আলোচনা করিব।

এই বিল আনয়ন করা হইয়াছে হিন্দু বিবাহকে লিখিত আইনের গণ্ডীর মধ্যে ফেলিবার উদ্দেশ্যে। যে কোন বিষয়ই হউক না কেন, সে সম্বন্ধে লিখিত আইন থাকাই যুক্তিসঙ্গত, কিন্তু লিখিত আইন আইন-সভার অনুমোদন লাভ করিবার পূর্ব্বে দেখা প্রয়োজন যে আনীত প্রস্তাবের মধ্যে দোষ ত্রুটী রহিল কি না।

আলোচ্য বিলে হিন্দুকে আনুষ্ঠানিক বিবাহ ও রেজেষ্টারীকৃত বিবাহ এই দ্বিবিধ বিবাহের অধিকার প্রদান করা হইয়াছে। আনুষ্ঠানিক বিবাহ সম্বন্ধে ৪র্থ ধারায় যাহা বলা হইয়াছে(২) তাহার মর্ম্ম নিম্নরূপ :—

ধারা ৪—যে কোন দুইজন হিন্দুর মধ্যে নিম্নলিখিত সর্ত্তে আনুষ্ঠানিক বিবাহের অনুষ্ঠান হইতে পারে :—

(এ) বিবাহকালে কোনও পক্ষের স্বামী বা স্ত্রী জীবিত থাকিবে না

(বি) উভয় পক্ষ একই বর্ণের অন্তর্গত হইবে

(সি) গোত্র ও প্রবর সম্পন্ন বর্ণের অন্তর্ভুক্ত হইলে উভয়ে সম-গোত্র বা সম-প্রবরের হইবে না

(ডি) উভয় পক্ষ কেহ কাহারও সপিণ্ড হইবে না

(ই) পাত্রী ষোড়শ বর্ষ অতিক্রম না করিয়া থাকিলে তাহার বিবাহ ব্যাপারে অভিভাবকের সম্মতি থাকা চাই।

বিবাহকালে কাহারও স্বামী বা স্ত্রী জীবিত থাকিলে সেইরূপ হিন্দু পুনরায় বিবাহ করিতে পারিবে না, আপাতদৃষ্টিতে ব্যবস্থাটী অতিসুন্দর। সত্যই ত' স্বামী বা স্ত্রী জীবিত থাকিলে কেন সে পুনরায় বিবাহ করিবে? স্ত্রীলোকের সম্বন্ধে হিন্দু সমাজে এ বিষয়ে কোন প্রশ্ন না উঠিলেও পুরুষের ব্যাপারে ইহা নিত্যকার প্রশ্ন। এক স্ত্রী বর্ত্তমান থাকিতে দ্বিতীয় বা তৃতীয় বা চতুর্থ বা আরও বেশী দার পরিগ্রহ করার উদাহরণ ত' প্রায়ই দেখা যায়। এই কুসংস্কারের ফলভোগ করিতে বাধ্য হয়, মূক বধূর দল। এইরূপ নানা দিক বিবেচনা করিয়া বলিতে হয় এই আইনের সার্থকতা আছে।

---

(১) Companionate Marriage by Judge Ben. B. Lindsay.

(২) A sacramental marriage may be solemnized between any two Hindus upon the following conditions namely :—

(a) neither party must have a husband or wife living at the time of Marriage ;

(b) both the parties must belong to the same caste ;

(c) if the parties are members of a caste having *gotras* and *pravaras* they must not belong to the same *gotra* or have a common *provara* ;

(d) the parties must not be *sapindas* of each other ;

(e) if the bride has not completed her sixteenth year, her guardian in marriage must consent to the marriage.

(Section 4 of the L. A. Bill No. 27 of 1942)

কিন্তু একক যুক্তি দুইয়াই ইহার বিচার করিলে চলিবে না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি ইহাকে বিভিন্ন দিক হইতে দেখিতে হইবে। এই প্রস্তাবিত আইনে কি গলদ কোথাও নাই? আছে।

হিন্দু সমাজ বা আইন বিবাহ-বিচ্ছেদ স্বীকার করে না। মাত্র কয়েকটী ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম আছে যে স্থলে বিবাহ বাতিল হয় সেগুলির আলোচনা আমরা পরে করিব। কয়েকটী ক্ষেত্রে আদালত স্বামী ও স্ত্রীকে পৃথক থাকিবার অনুমতি দেয় কিন্তু এগুলিকে বিবাহ-বিচ্ছেদ বা Divorce বলা চলে না। সুতরাং প্রদত্ত যুক্তি ব্যতিতও দেখা যাইতেছে যে হিন্দুর একবার বিবাহ হইলে উহা অবিচ্ছেদ্য। আদালত হইতে পৃথক থাকিবার অনুমতি দিলেও তাহারা স্বামী স্ত্রী-ই রহিয়া যায়।

কোন হিন্দুর স্ত্রী দুশ্চরিত্রা হইল, সে স্বামী গৃহত্যাগ করিয়া অপরের বিলাস-সঙ্গিনী হইল অথবা সে স্বেচ্ছায় গৃহত্যাগ না করিলেও স্বামী তাহাকে গৃহ হইতে বহিষ্কার করিতে বাধ্য হইল—পরে আদালতের বিচারে স্ত্রীর স্বামীর উপর দাবী অননুমোদিত হইল ও স্বামী তাহার জীবনধারণের জন্ত কোনরূপ সাহায্য করিতে বাধ্য রহিল না, সম্পূর্ণ সম্পর্ক শূন্ত হইয়া তাহারা পরস্পরকে পরিহার করিয়া বাস করিতে লাগিল। এই ক্ষেত্রে আদালতের আইন সম্মত বিচারে তাহারা পৃথক হইলেও তাহাদিগের বিবাহ-বিচ্ছেদ হইল না অর্থাৎ আইনের ভাষায় Judicial separation হইলেও Divorce হইল না। ইহার অর্থ দাঁড়াইল এই যে তাহারা আপাতদৃষ্টিতে সম্পর্ক শূন্ত হইলেও আইনের বিচারে স্বামী-স্ত্রীই রহিয়া গেল।

প্রস্তাবিত আইন বলিতেছে এক স্ত্রী জীবিত থাকিলে দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণ করিতে পারিবে না; সুতরাং দেখা যাইতেছে প্রস্তাবিত আইন কার্য্যে পরিণত হইলে উপরোক্ত অবস্থাতে স্বামীর পুনরায় বিবাহের উপায় থাকিবে না।

আমাদিগের মনে হয় নূতন আইনকে এই নূতন দৃষ্টিভঙ্গীর সাহায্যে বিচার করিলে সমর্থন করিতে পারা যায় না।

আসলে যে দেশে Divorce বা বিবাহ-বিচ্ছেদ নাই সে দেশে সে সমাজে এক পত্নীত্ব বা monogamy চলিতে পারে না। আমাকে এক-পত্নীত্বের বিরোধী বলিলে আমি অপমানিত বোধ করিব কিন্তু যেভাবে এক পত্নীত্বকে কায়েম করিবার চেষ্টা করা হইতেছে আমি উহার বিরোধী।

হিন্দু-বিবাহ বিচ্ছেদ আইনসম্মত নহে বটে, (অবশ্য বিশেষ ক্ষেত্রে বিশেষ সম্প্রদায়ের মধ্যে বিশেষ প্রথা থাকিলে সে কথা আলাদা) কিন্তু হিন্দুর বিবাহ বিচ্ছেদ স্থান বিশেষে আইন স্বীকার করে। বিশেষ-বিবাহ-বিধি বা Special Marriage Act অনুসারে যাঁহারা বিবাহ করেন তাঁহাদিগের বিবাহ বিচ্ছেদ Indian Divorce Act অনুসারে হইয়া থাকে (৩)। প্রস্তাবিত বিলেও ঐ ব্যবস্থা অনুসৃত হইয়াছে (৪)। Indian Divorce Act অনুসারে যে বিবাহ-বিচ্ছেদ-এর ব্যবস্থা আছে তাহারও মধ্যে গলদ রহিয়াছে (৫)। পরে সেবিষয়ে তাহার আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

---

(৩) Ref. Section 17 special Marriage Act.

(৪) Ref. Section 21 of the L. A. Bill No. 27 of 1942.

(৫) Ref. Section 10 of the Indian Divorce Act.

মুক্তি

কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায়

বাহিরে মিলেনা মুক্তি
মুক্তি কেহ নাহি পারে দিতে।
মুক্ত হ'তে হয় নিজে
অন্তরের বন্ধন হইতে;
মুক্তারে করিয়া মুক্ত
শুক্তি যথা চিরমুক্তি লভে,
তরুলতিকার মুক্তি
যথা ফলে কুসুমে পল্লবে।
সন্তানেরে জন্ম দিয়া
স্তন্ত দিয়া মুক্তি লভে মাতা।
ভিক্ষুরে সবার দাবি
মুক্ত হতে মুক্ত হয় দাতা।
কর্ম্মবীর মুক্তি লভে
উদ্‌যাপিয়া আপনার ব্রত,
সর্বস্ব সমুদ্রে সঁপি
নদী মুক্তি লভে অবিরত।
নিঃশেষে করিয়া ভোগ
ক্লান্ত দেহে মুক্ত হয় ভোগী,
মায়ার বন্ধন হ'তে
মুক্তি লভি মুক্ত হয় যোগী।
যত আশা ভালবাসা
যত ভাব, যত অনুভূতি,
যত স্মৃতি যত প্রীতি
সত্য, স্বপ্ন, প্রাণের আকূতি
কবির গভীর মর্ম্মে
নিশিদিন মাগিছে প্রকাশ,
কল্পনার নীহারিকা
ভরে রয় মনের আকাশ,
ছন্দে সুরে রসে রূপে
তাহাদের মূর্ত্তি করি দান,
মনের বন্ধন হ'তে
তাহাদের দিয়া পরিত্রাণ,
কবি নিজে লভে মুক্তি
করে না সে কারো আরাধনা,
ইহাই কবির মুক্তি,
জীবনের ইহাই সাধনা।

চোর

শ্রীরাধাগোবিন্দ চট্টোপাধ্যায়

পঞ্চাশ টাকা সই করিয়া ত্রিশ টাকা পাই ; তাহাও নিয়মিত নয় এবং এককালে নয়। আজ দুই, কাল পাঁচ, পরশু সাত, এমনি করিয়া মাসকাবারে কোনক্রমে ত্রিশ টাকা শোধ হয়। তবু টিকিয়াছিলাম—কিন্তু আর বুঝি পারা গেল না। হেড্‌মাষ্টার যা চটিয়াছেন তাহাতে এবার যে চাকুরী টিকিবে এমন ভরসা নাই।

ইহাকেই বলে গ্রহের ফের। নতুবা এত লোক থাকিতে এই দুরূহ কর্ম্মের ভার বিশেষ করিয়া আমারই ঘাড়ে পড়িবে কেন? স্কুলের পশ্চিম দিকে লম্বা ঘরটা পাকা করিতে যাহা খরচ হইবে তাহার অর্দ্ধেক সরকার বাহাদুর বহন করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। হাজার পাঁচেক টাকা খরচ হওয়ার কথা। কিন্তু কাগজপত্রে দশ হাজার টাকা খরচ দেখাইয়া দিতে পারিলে সব টাকাটাই সরকারী তহবিল হইতে আদায় করিয়া লওয়া যায়। তাই সম্পাদক মহাশয় কাজটি যাহাতে নির্ব্বিঘ্নে এবং সুচারুরূপে সম্পাদিত হয় সেজন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন। বিপিন সাহার কাঠের গুদাম হইতে ছয় শত টাকার কাঠ আসিয়াছে। কিন্তু ছয় শতের পরিবর্ত্তে হাজার টাকা দাম লিখাইয়া লইতে পারিলেই থোক চার শত টাকা আসিয়া যায়। এই কাজটির ভার লইয়াই সকাল বেলায় বাহির হইয়াছিলাম, বেলা দশটায় হতাশ হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছি। ধূর্ত্ত বিপিন তাহার কালীমাতার মন্দির প্রতিষ্ঠার জন্য দুই শত টাকা চাঁদা দাবী করে। পাপক্ষয়ের কোন একটা বিলিব্যবস্থা না করিয়া সে ছয়শত টাকার কাঠ বিক্রয় করিয়া হাজার টাকা লিখিয়া দিতে নারাজ। ঘটনার বিবরণ শুনিয়া হেড্‌মাষ্টার একবারে অগ্নিশর্ম্মা! শিষ্ট ভাষায় নানাবিধ অশিষ্ট ইঙ্গিত করিয়া স্নানান্তে কতকগুলি ভাত ডাল গিলিতে নির্দ্দেশ দিয়াছেন। কি বিপদেই পড়া গেল!

*   *   *   *

অগ্রহায়ণের মধ্য ভাগ, স্কুলে বার্ষিক পরীক্ষা চলিতেছে। বিকালের দিকে আমাকে পরীক্ষার হলে খবরদারী করিতে হইবে। সাড়ে বারটার সময় লাইব্রেরীর সামনের বারান্দা দিয়া যাইবার সময় শুনিতে পাইলাম হেড্‌মাষ্টার সম্পাদক মহাশয়কে বলিতেছেন, "শ্যামবাবুকে মাইনে দিয়ে রাখা আর টাকা জলে ফেলে দেওয়া একই কথা। শুধু এই ব্যাপারে নয়, সব কাজেই ঐ রকম। এই দেখুন না কেন, পরীক্ষার হলে কত ছেলে চুরি করে বই দেখে উত্তর লিখে দিচ্ছে। সকল মাষ্টারই দু' চারজনকে ধরে ফেলচেন, জরিমানা হচ্ছে, স্কুলের আয় হচ্ছে; কিন্তু ঐ শ্যামবাবু যদি পাঁচ বছরের মধ্যে একটা ছেলেকেও ধরতে পারতেন তবু বলতাম যে হ্যাঁ......। একেবারে অকেজো, ওকে বিদেয় করে দেওয়াই দরকার।" কথা কয়টা শুনিয়া বেলা সাড়ে বারটার সময়ও হাড়ে যেন কাপুনি ধরিয়া গেল। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলাম আজ যে করিয়া হউক দু' একটা ছেলের চুরি ধরিতেই হইবে। আমি যে একবারে অকেজো নই তাহার একটা প্রমাণ উপস্থিত করা চাই-ই। নহিলে ইজ্জৎ থাকে না, চাকুরীও থাকে না। বিপিনকে রাজী করিতে পারি নাই বলিয়া কি দুগ্ধ-পোষ্য বালকগুলির সঙ্গেও পারিয়া উঠিব না? আমি কি এমনি অপদার্থ?

*   *   *   *

পরীক্ষার হলে বেলা দুইটা হইতে খুব হুসিয়ার হইয়া ওৎ পাতিয়া রহিলাম। ঘণ্টাখানেক পরে মনে হইল অদৃষ্ট যেন আজ সুপ্রসন্ন। গোবর্দ্ধন অমন উস্‌খুস্ করিতেছে কেন? মধ্যে মধ্যে চোরের মত চারিদিকে চাহিতেছে কেন? নিশ্চয়ই বই দেখিয়া লিখিতেছে। আজ আমি মরিয়া; একবারে বাজের মত গিয়া গোবর্দ্ধনের ঘাড়ের উপর পড়িলাম। দেখি সত্য সত্যই সে ধর্ম্মবুদ্ধি পাপবুদ্ধি উপাখ্যানের নীতি-কথাটি অর্থপুস্তক দেখিয়া অর্দ্ধেক লিখিয়া ফেলিয়াছে।

গোবর্দ্ধনকে হিড়্ হিড়্ করিয়া টানিয়া একবারে হেড্‌মাষ্টারের খাস কামরায় লইয়া গেলাম। সদর্পে বলিলাম, "ধরেচি, স্যর্। ছোঁড়া বই দেখে লিখ্‌ছিল; এই দেখুন বই।" সৌভাগ্যের বিষয় সম্পাদক মহাশয়ও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি সবেমাত্র বিপিন সাহার হস্তলিপির অবিকল অনুকরণে একখানি হাজার টাকার রসিদ লিখিয়া বিপিন ও তাহার কালীমাতাকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শনের ব্যবস্থা সুসম্পূর্ণ করিয়াছিলেন এবং হেড্‌মাষ্টার মহাশয় সপ্রশংস দৃষ্টিতে তাহাই নিরীক্ষণ করিয়া তারিফ করিতে-ছিলেন। আমার কথা শুনিয়াই তিনি আরক্ত চক্ষে গোবর্দ্ধনকে কহিলেন, "অ্যাঁ, ইস্কুলে তোমার এই বিদ্যে হচ্ছে? এই বয়সেই এতদূর! ভবিষ্যতে যে গুণ্ডা—ডাকাত—জালিয়াৎ হবে! পরীক্ষা বাতিল, আর দু' টাকা জরিমানা।" এই বলিয়াই তিনি খস্‌খস্ করিয়া জরিমানার হুকুম লিখিতে লাগিলেন। গোবর্দ্ধন ভয়ে ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল। এইবার সে হাউ-মাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। হেড্‌মাষ্টারের পা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, "স্যর্, আর কখনো করব না স্যর্, আর কখ্‌খনো করব না। এটা নবীনের বই; সে আমার পাশে বসে বই দেখে লিখ্‌ছিল, আমি তাই থেকে—।" হেড্‌মাষ্টার গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন, "চুরির উপর আবার মিথ্যে কথা, আবার সাফাই! গেট্ আউট্।" গোবর্দ্ধন কাঁদিতে কাঁদিতে বাহির হইয়া গেল। সম্পাদক মহাশয় নিতান্ত মর্ম্মাহত হইয়া বলিতে লাগিলেন, "হায়! হায়! এরাই নাকি আমাদের ভবিষ্যতের আশা-ভরসার স্থল! কি দুর্দ্দিন এল! এই সব ছেলে পুলিসে, আদালতে, রেল কোম্পানীতে, ব্যবসা-বাণিজ্যে ঢুকে দেশটাকে রসাতলে দিলে!"

*   *   *   *

রাত্রিবেলা বোর্ডিংএর ভাঙ্গা খাটে শুইয়া বিড়ি টানিতে টানিতে দিনের ঘটনাগুলি মনে মনে পর্য্যালোচনা করিতে-

ছিলাম। সত্য বলিতে কি, সাফল্যের আনন্দটা একবারে অবিমিশ্র হইল না। গোবর্দ্ধন ছোঁড়াটা নিরীহ এবং বোকাটে। বইটা নবীনের বটে ; স্বচক্ষে দেখিয়াছি মলাটে নবীনচন্দ্রের নাম লেখা ছিল। নবীন যে নিয়মিত নকল করিয়া পরীক্ষায় পাশ করিয়া আসিতেছে তাহা আমরা সকলেই জানি। কিন্তু নবীনচন্দ্র একে বকাটে, তায় সম্পাদকের ভাগিনের তাই তাহাকে কেউ ঘাঁটায় না। ভুখোড় নবীন কৌশলে দায়টা গোবর্দ্ধনের ঘাড়ে চাপাইয়াছে—অসম্ভব নয়। যাক্‌, অত ভাবিতে গেলে চলে না। চুরি অনেকেই করে কিন্তু যে ধরা পড়ে সেই মরে, ইহাই আইন।

এই সকল আজগুবি চিন্তায় অপব্যয় করিবার মত সময় ছিল না। খাতায় সব ছেলের নাম থাকিলে পাশের শতকরা হার বড় বেশী দেখায়। তাই যাহাদের পাশ করিবার কোন আশাই নাই এমন কতকগুলি হস্তীমূর্খের নাম বাদ দিয়া পূর্ব্বাহ্নেই একখানি নূতন খাতা তৈয়ারী করিয়া বিশ্ববিদ্যালয় ও ইনস্‌পেক্টারের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপের আয়োজন করিতেছি। রাত্রি প্রায় এগারটা। এমন সময় লণ্ঠন ও লাঠি হস্তে গোবর্দ্ধনের বাপ হারাণ পাল আসিয়া উপস্থিত। শুনিলাম গোবর্দ্ধন তখনো বাড়ী ফিরে নাই, তাহার খোঁজ পাওয়া যাইতেছে না। শুনিয়া ক্রোধের উত্তাপে আত্ম-প্রসাদের শেষ কণাটুকুও বাষ্প হইয়া গেল। চুরি করিয়া ধরা পড়িয়াছে বলিয়া একেবারে গৃহত্যাগ করিতে হইবে—এ যে বড় অন্যায় কথা বাপু! হারাণ পাল অনেক খুঁজিয়াও সেই রাত্রিতে গোবর্দ্ধনের কোন সন্ধান পাইল না।

* * * *

পরদিন জানিলাম গোবর্দ্ধন সন্ধ্যা পর্য্যন্ত গ্রামের প্রান্তে নির্জ্জন ঝিলের ধারে একা বসিয়াছিল। অন্ধকার হওয়ার পর চুপি চুপি ফিরিয়া আসিলেও বাড়ী ফিরিতে সাহস করে নাই। বাড়ীর অদূরে বেত-ঝোপের পাশে চাদর মুড়ি দিয়া পড়িয়াছিল। অগ্রহায়ণের হিমে সারা রাত্রি বাহিরে পড়িয়া থাকার ফলে বুকে ঠাণ্ডা লাগিয়া তাহার জ্বর হইয়াছে। সাত দিন পরে শুনিলাম গোবর্দ্ধন নিউমোনিয়ায় প্রাণত্যাগ করিয়া, চৌর্য্যের প্রায়শ্চিত্ত করিয়া মুক্তিলাভ করিয়াছে।

হেড্‌মাষ্টার মহাশয় শুনিয়া বলিলেন, 'কাউয়ার্ড।'

কুল্যবাপের পরিমাণ

ডাঃ শ্রীনলিনীকান্ত ভট্টশালী এম-এ, পি-এইচ্‌-ডি

ভাদ্রের ভারতবর্ষে ডক্টর শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সরকার মহাশয়ের লিখিত এই বিষয়ের এক প্রবন্ধ পড়িলাম। পূর্ব্ববর্ত্তীগণের লেখা সম্যক পড়িয়া প্রবন্ধ লিখিতে বসিলে পূর্ব্ববর্ত্তীগণ পরবর্ত্তীগণের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকিতে পারেন।

ভূমির মূল্য বা মাপ বাঙ্গালা দেশের সর্ব্বত্র সমান নহে। সমৃদ্ধির সময় উহার মূল্য বাড়ে, অবনতির সময় মূল্য কমিয়া যায়। বিক্রমপুরে ভিটিভূমি মিরাশ বিঘা প্রতি ৫০০\—১০০০\ দাম। নাল ভূমি অর্থাৎ কৃষি-যোগ্য ভূমি ২০০\—৩০০\ মূল্যে অদ্যাপি সর্ব্বদাই ক্রয় বিক্রয় হইতেছে। এই সমস্ত অস্থির ভিত্তির উপর কোন গবেষণার কুটিরও নির্ম্মিত হইতে পারেনা, প্রাসাদের তো কথাই নাই।

সমাচার দেবের ঘুঘরাহাটি শাসন সম্পাদনকালে (Ep. Ind. XVIII P. 74ff) কুল্যবাপ শব্দের পাদটীকায় লিখিয়াছিলাম (পৃঃ ৭৯) :—

(Kulyavapa) As much land as could be sewn by a *Kula*—(wiknowing basket) Full of seed. The term Kudava, equivalent to Bigha, the most current land measure in Bengal, appears to be a corruption of the term *Kulyavapa*. The name survives in the form of *kulabaya* (কুলবায়) the name of the standard load-measure in the Sylhet district.

ইহার পরে ১৩৩৯ সনের সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় ৮৮, ৮৯, ৯০ পৃষ্ঠায়—"প্রাচীন বঙ্গের ভৌগোলিক বিভাগ" নামক বিস্তৃত প্রবন্ধে প্রাচীন আমলে ভূমির মূল্য ও ভূমির মাপ লইয়া অনেক আলোচনা করিয়াছি। তাহা হইতে কয়েক ছত্র উদ্ধৃত করিতেছি :—(৯০ পৃঃ)

"পাহাড়পুর শাসন হইতে জানা গিয়াছে, ৮ দ্রোণে এক কুল্যবাপ হইত। কাছাড় জেলায় এই কুল্যবাপ মাপ আজিও কুলবায় বলিয়া পরিচিত। কুলবায়ের অপর নাম হাল (শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র গুহ প্রণীত কাছাড়ের ইতিবৃত্ত, ১৫২ পৃষ্ঠা) কুলবায় কুড়বাতে পরিণত হইয়া পরবর্ত্তীকালে বিঘার সমানার্থক বলিয়া গণ্য হইত। প্রাচীন কুলবায় কিন্তু পরিমাণে বর্ত্তমান কালের বিঘা হইতে অনেক বড় ছিল।"

কুল্যবাপ যে বিঘা হইতে অনেক বড় এবং সেই সম্বন্ধে যে "প্রবীন" ভট্টশালী মহাশয় অচেতন ছিলেন না, আশাকরি উপরের উদ্ধৃত লেখায় তাহা সপ্রমাণ হইবে। ডক্টর সরকার কুল্যবাপের পরিমাণ নির্দ্দেশ করিতে অনুমানের পর অনুমান আশ্রয় করিয়া সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে চেষ্টা করিয়াছেন। কাছাড়ের ইতিবৃত্তে শ্রীযুক্ত গুহ মহাশয় স্পষ্ট নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে বর্ত্তমান কালের ১৪ বিঘা এক কুল্যবাপের সমান। অদ্যাপি কাছাড়ে এই মাপ প্রচলিত। এইক্ষেত্রে অনুমানের আশ্রয় গ্রহণ করা একেবারেই অনাবশ্যক।

আমার পূর্ব্বোদ্ধৃত লেখা ছুটিতে আসল গলদ রহিয়াছে কুল্যবাপ বা কুলবায় হইতে কুড়বা—বিঘা শব্দটির উৎপত্তি নির্দ্দেশ করা। ল রতে পরিণত হয়, ড় কখনও হয় না। কুড়বা—বিঘা প্রকৃতপক্ষে ভিন্ন মাপ। উহা কুড়ব নামেই প্রাচীনকালে পরিচিত ছিল, শুভঙ্করও সেই নামই জানিতেন। অধুনা উহার সমানার্থক বিঘা শব্দ অধিকতর পরিচিত। লীলবতীর প্রথম পরিচ্ছেদে নিম্নরূপ আর্য্যা দেওয়া আছে :—

৪ কুড়ব—১ প্রস্থ
৪ প্রস্থ—১ আঢ়া
৪ আঢ়া—১ দ্রোণ

কাজেই ৬৪ কুড়ব—১ দ্রোণ। এই কুড়বই বর্ত্তমানে কুড়বা বা বিঘা। ৮ দ্রোণে প্রাচীনকালে ১ কুল্যবাপ হইত, কাজেই ৫১২ কুড়বে এই মতে কুল্যবাপ হওয়া উচিত। কিন্তু কাছাড়ে দেখা যায় উহা মাত্র ১৪ বিঘার সমান। এত পার্থক্যের কারণ কি, তাহার মীমাংসার স্থান ইহা নহে।

লক্ষ্মীছাড়া

শ্রীরাজ্যেশ্বর মিত্র

আমাকে সকলেই বলে লক্ষ্মীছাড়া। না বলিবার কারণ নাই। কাকা এবং দাদা মোটর হাঁকাইয়া আফিস করেন—আমি তেমন কিছুই করি না। দেশের বাড়ীতে থাকি, একতারা বাজাইয়া বাউল গান করি এবং কয়েক জোড়া দেশী কুকুর পালন করিয়া তাহাতেই আন্তরিক অপত্যস্নেহ ঢালিয়া দিয়াছি। একেবারে কিছুই যে করিনা তাহা নহে। বাড়ী সংলগ্ন কয়েক বিঘা জমি আবাদ করিয়া ফসল করিতেছি—কয়েকটি গরু পালন করিয়া তাহার দুধও বিক্রয় করিতেছি—অর্থাৎ এক কথায় একেবারে চাষা হইয়া গিয়াছি।

অথচ বাল্যকাল এইভাবে কাটে নাই। সহরেই মানুষ হইয়াছি—লেখাপড়াও শিখিয়াছি—কিন্তু সহসা স্বাদেশিকতার বন্যায় ভাসিয়া গেলাম। সেই সময় হইতেই দাদা এবং কাকার সহিত বিরোধ বাধিল। বছর খানেকের জন্য জেলে গেলাম—ফিরিয়া আসিয়া শুনিলাম আমি কাছে থাকিলে নাকি দাদা এবং কাকার চাকুরি লইয়া টানাটানি লাগিতে পারে। সুতরাং বিনা-বাক্যব্যয়ে কিছু পৈতৃক পুঁজি লইয়া একদিন দেশে আসিয়া হাজির। দু এক বৎসর ম্যালেরিয়ায় ভুগিয়াও হাল ছাড়িলাম না, দেশের মাটি কামড়াইয়া পড়িয়া রহিলাম। এখন দেখি মন্দ লাগে না—এক সংসার ছাড়িয়াছি বটে কিন্তু আমি একটি সংসার গড়িয়া তুলিয়াছি, উহাতে গরু আছে, ছাগল আছে, কুকুর আছে, আর কিছুর প্রয়োজন নাই।

ভোর বেলা অর্থাৎ প্রায় রাত্রি থাকিতে উঠিতে হয়। প্রথম কাজ দুধ দোয়ানো। রাইচরণ পুরাণো গোয়ালা—বাঁটে হাত দিলে দুধ যেন আপনা হইতে ঝরিয়া পড়িতে থাকে। বহুদিন ভাল গরুর বাঁটে হাত দিতে পারে নাই। এক একটি গরু দোয়ানো হইলে ভরা বাল্তির দিকে চাহিয়া তাহার কত আনন্দ। আলো ফুটিতে ফুটিতে দেখা দেয় হাসির মা, খেঁদির মা, পচার পিসি ইত্যাদি। হাতে এক একটি করিয়া পাত্র, বেশী দুধ কেহই লয় না; ইহাদের গৃহে শিশু আছে তাহাদের জন্য যেটুকু দরকার সেইটুকু মাত্র। দু একজন মিঠাইওয়ালা কিছু বেশী দুধ কেনে তাও প্রতিদিন নয়। এই দুগ্ধ বিতরণের ফাঁকে অনেকের সাংসারিক খবর পাওয়া যায়—মাঝে মাঝে দুধ ছাড়া কিছু ঔষধও বিতরণ করিতে হয়, অবশ্য বিনামূল্যে। সকলের দুধ বিতরণ শেষ হইলে বাকী দুধ-টুকুর ব্যবস্থা করিতে হয়। রাইচরণের নাতির জন্য কিছু দুধ বিনামূল্যে বরাদ্দ—যেদিন যেমন থাকে সেই পরিমাণে। বৃদ্ধ প্রতিদিন আমাকে আশীর্ব্বাদ করে। এই একটি লোকই বলে আমার নাকি লক্ষ্মীলাভ হইবে। কোন কোন দিন ফুলগাছির জমীদারের লোক আসে অতিরিক্ত দুধ বা ঘৃত মাখনের ফরমাস্ লইয়া। জমীদার আমার প্রতি প্রসন্ন। ঘৃত দুগ্ধে খুসি হইয়া কথা দিয়াছেন, আমাকে একটি ভাল বৃষ উপহার প্রদান করিবেন। সুতরাং তাঁহার কাজ সাধ্যমতো করিতে হইতেছে। গোয়ালের কাজ মিটিলে রাইচরণ বাকি দুধ লইয়া নিকটবর্ত্তী সহরে যায় বিক্রয় করিতে—সহর ছাড়া গ্রাম অঞ্চলে সব দুধ বিক্রয় করিবার কোন উপায় নাই। তার নাতি বরাদ্দ দুগ্ধ পান করিয়া গরু লইয়া চরাইতে যায় মনের সুখে।

ইতিমধ্যে আমি কিছু গলাধঃকরণ করিয়া মাঠে আসিয়া উপস্থিত হই। জনচারেক মজুর বাঁধা আছে তাহার মধ্যে তিনজন স্থানীয়, একজন সাঁওতাল, নাম পাহান্। মজুর লইয়া হাঙ্গাম কম নয়—এই চারিজনের মধ্যে আবার একজন করিয়া প্রায়ই অনুপস্থিত থাকে—কোনদিন জ্বর, কোনদিন পেটের অসুখ ইত্যাদি। কাহাকে কোন কাজে লাগাইব আগে থাকিতে ভাবিয়া রাখি—কেহ যায় ডোঙ্গা দিয়া কপির ক্ষেতে জল দিতে—কাহাকেও নিযুক্ত করিতে হয় চারাগুলির পরিচর্য্যা করিতে। ধান পাকিয়াছে—কিন্তু কাটিবার লোক কম। পাহান্ আসে নাই মদ খাইয়া পড়িয়া আছে। লোকটা খাটিতে পারে খুব কিন্তু ওই এক দোষ—মদ খাইয়াই মাসের অর্দ্ধেক দিন কাটাইয়া দেয়। সম্প্রতি কয়েকজন লোক ধানের ক্ষেতে লাগাইয়াছি বটে কিন্তু তাহাতে কুলায় না—আমি নিজেই লাগিয়া পড়ি। বেশীক্ষণ কাজ করা সম্ভব হয় না, কেননা সব দিকেই নজর রাখিতে হয়। আমাদের দেশের মতো এমন ফাঁকিবাজ মজুর দুনিয়ায় কোথাও মিলিবে না—আধঘণ্টা পরে পরেই ইহাদের তামাক খাওয়া চাই এবং সে তামাক খাওয়া ধমক না দেওয়া পর্য্যন্ত থামিবে না। আশ্চর্য্য হইয়া ভাবি যাহারা এত গরীব তাহারা এত অলস হয় কেমন করিয়া। কাজ করিতে করিতে রবীন্দ্রনাথের সেই গান গাহিতে থাকি—

> "আয়রে মোরা ফসল কাটি
> মাঠ আমাদের মিতা ওরে আজ তারি সওগাতে
> ঘরের আঙন সারা বছর ভরবে দিনে রাতে
> তাই যে কাটি ধান তাই যে গাহি গান
> তাই যে সুখে খাটি।"

বলাই বলে "চৈতন মণ্ডলের গান শুনেছেন দা-ঠাকুর—আনন্দপুরীর চৈতন মণ্ডল। হ্যাঁ গলা বটে—তার সঙ্গে জুড়ি ধরতে কেউ পারলাম না।"

কৌতূহলী হইয়া বলি, "একদিন শোনাও না বলাই।"

"হ্যাঁ শোনাব বৈ কি" বলাই উৎসাহিত হইয়া ওঠে "কিন্তু যা ম্যালেরিয়া ধরলো—কাল থেকে খুব জ্বর।"

ইহার অর্থ বুঝিতে কষ্ট হয় না। আমাকেই ছুটিতে হয় চৈতনের চিকিৎসার ব্যবস্থা করিতে।

চৈতন সারিয়া ওঠে। একদিন পূর্ণিমা রাত্রে শুনাইতে আসে আমাকে তাহার গান। সারেঙ্গির সহিত তাহার মধুর কণ্ঠ জ্যোৎস্নার প্লাবনে যেন প্লাবিত হইতে থাকে।—শ্রীরাধিকার মিলনের গান দিয়া আরম্ভ করে এবং শেষ করে সেই চির বিরহের কাতর গাথায়।

সকালের কাজ শেষ করিতেই দ্বিপ্রহর উপস্থিত হয়। ঘরে

ফিরিয়া শ্রান্ত দেহে বারান্দায় বসি। রাইচরণ এখনও ফিরে নাই—আরও খানিক পরে ফিরিবে সে, তারপর রান্না চড়িবে। আমাকে দেখিয়া তাড়াতাড়ি ছুটিয়া আসে কুকুরগুলি—টিটি, বাচ্চু, ভোঁদা আর বেদুইন্। প্রভুর পায়ের ওপর থাবা দুইটি তুলিয়া দিবার জন্ত সকলেরই আগ্রহ—ইহারই জন্ত মারামারি লাগিয়া যায়। বেদুইনের গায়ে জোর একটু বেশী এবং মেজাজ একটু চড়া—সেই জন্তই নাম রাখিয়াছি বেদুইন্। সে অপর দুই সঙ্গী টিটি এবং ভোঁদাকে অনায়াসেই স্ব-স্থানচ্যুত করে। বাচ্চু দেহটিকে প্রক্ষিপ্ত করিতে পারে না—পাকানো লেজ নাড়িয়া আনন্দ প্রকাশ করে, মুখ দিয়া বাহির হয় অস্ফুট কুঁই কুঁই শব্দ।

ছাগনন্দনের নাম রাখিয়াছি "রাসভারি" এবং সে বস্তুতই রাসভারি। এই ছাগনন্দনটি কোথা হইতে এখানে আসিয়া পড়িয়াছিল এবং কুকুরের তাড়নায় তাহাকে অত্যন্ত বিব্রত দেখিয়া আমি তাহাকে রক্ষা করিয়াছিলাম। অতঃপর এই ছাগনন্দন আমারই গৃহে কায়েমি বন্দোবস্ত করিয়া লইয়াছে। কুকুরের জন্ত ছাগনন্দন বেচারী আমার কাছে আসিতে পারে না—দূর হইতে আমার প্রতি চাহিয়া গ্রীবা বাঁকাইয়া আওয়াজ করে "ব-অ-অ"—অর্থাৎ আমার কাছে একবার আসিতেছ না কেন ?

বেশীক্ষণ বসা চলে না। রাইচরণের নাতিকে উনুন ধরাইতে আদেশ দিয়া গরুগুলির গা ধোয়াইতে যাই এবং ধবলি, সুরভি প্রভৃতি ধেনুগুলির পরিচর্য্যা করিয়া যে যথেষ্ট পুণ্যসঞ্চয় করি ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। ফিরিয়া আসিয়া স্নানাহার করিতে করিতে দ্বিপ্রহরও গড়াইয়া যায়। তারপর আবার কাজ সেই গোশালা এবং ক্ষেতের ফসল। গৃহস্থের ঝঞ্ঝাট অনেক, কিন্তু শান্তিও আছে। রাত্রিটা সম্পূর্ণ অবসর। অনেক সময় একা বসিয়া ভাবি—জীবনের সুরু হইয়াছিল কি ভাবে, আজ আসিয়া দাঁড়াইলাম কোথায় এবং শেষে কি হইবে কে জানে।

দিন এইরূপেই চলিতেছে—হঠাৎ একদিন কাকা আসিয়া উপস্থিত। বহুদিন আমার খোঁজ পান নাই—কি করিতেছি দেখিতে আসিয়াছেন। বাড়ী, বাগান এবং গোশালা দেখিয়া কাকা সন্তুষ্ট হইলেন এবং তাঁহার সেই বিলাতের ফার্ম্মগুলির কথা মনে হইল—আমি নাকি আরও হাজার দশেক টাকা খরচ করিলে কতকটা সেই রকম হইতে পারি, আর তাহা না হইলে যেরূপ চলিতেছে সেইরূপ হ্যাণ্ড টু মাউথ্ ছাড়া বেশী কিছুই হইবে না। আমার সেই লক্ষীছাড়া ভাবটা যায় নাই দেখিয়া কাকা ঈষৎ ক্ষুণ্ণ হইলেন। নেড়ি কুত্তা তিনি দুচক্ষে দেখিতে পারেন না—বেচারা বেদুইন্‌কে পদাঘাত করিয়া তাঁহার আলসেসিয়ান্ টেবির কথা অনেক বলিলেন এবং আমার ছাগনন্দনকে দেখিয়া তো হাসিয়াই অস্থির।

যাই হোক আমার কর্ম্মপ্রণালী দেখিয়া তিনি সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। যে দুচারদিন তিনি ছিলেন দুগ্ধে তাঁহাকে পরিতৃপ্ত করিয়াছিলাম। অবশেষে কলিকাতায় ফিরিবার আগের দিন তিনি আসল কথাটা পাড়িলেন। আমার কর্ম্মের এবং উদ্যমের প্রশংসা করিয়া বলিলেন "তুমি যে কাজ কোরচো সেটা ভালো সন্দেহ নেই, তবে লেখাপড়া শিখে এভাবে 'রাষ্টিক্' হোয়ে যাওয়াটা আমি পছন্দ করিনা।"

পছন্দ অপছন্দ সম্বন্ধে বলিবার কিছুই নাই সুতরাং উত্তর দিলাম না। কাকা বলিলেন "আমার বন্ধু মণিমিত্তিরকে তুমি জানো—তাঁর মেয়ে মিনিকেও দেখেছ। তোমার সঙ্গে তার একটী বিয়ের প্রস্তাব তিনি কোরেছেন।"

কথাগুলি আমার উপর কিরূপ ক্রিয়া করিতেছে, দেখিবার জন্ত আমার দিকে একবার তাকাইলেন—তারপর কহিলেন "এতে তোমার ভবিষ্যৎ খুব ভালো, ওরা অনেক দেবে থোবে। এখন তুমি কি বোল্‌তে চাও—আমি দেশে এসেছি তোমাকে এই কথাটাই বলবার জন্ত।'

সর্ব্বনাশ! কাকা যে আমার জন্ত এত ভাবিয়াছেন এবং কষ্ট স্বীকার করিয়াছেন তাহা বুঝিতে পারি নাই। কিছু বলিতেই পারিলাম না। কাকা বলিলেন "আজকের রাতটা ভেবে দেখ, কাল তোমার ওপিনিয়ন চাই। তবে এইসব বাজে হাবিট্‌গুলো তোমাকে ছাড়তে হবে—ওঁরা খুব পলিশ্‌ড্ সোসাইটির লোক।"

ওঁরা যে বিলক্ষণ পালিশকরা তাহা জানিতাম, কিন্তু উঁহাদের পালিশে নিজেকে চকচকে করিতে আমার যে খুব আগ্রহ ছিল তাহা নয়। কাকার আদেশমত সমস্ত রাত ভাবা আমার পক্ষে সম্ভব নয় এবং ভাবিবার বিশেষ কিছুই ছিল না। পরদিন সকালে বেশ পরিষ্কার বলিয়া ফেলিলাম বিবাহে আমার মত নাই।

কাকাও এইরূপ আশা করিয়াছিলেন তবু বলিলেন "কেন ?"

কাকার দিকে না চাহিয়াই উত্তর দিলাম, "কেন ঠিক বল্‌তে পারিনে তবে আমার সাহস নেই।"

"সাহস নেই" কাকা হাসিয়া উঠিলেন "এত কিছু কোরতে পারলে আর বিয়ের বেলায় সাহস নেই।"

কথাটা ঠিক। বাঙালীর ছেলে উপযুক্ত পাত্রী মিলিলে কে বিবাহ করিতে বিমুখ হয় ? তথাপি সাহস যখন সত্যই নাই তখন তাহা স্বীকার করাই ভাল। আমিও তাহাই স্বীকার করিলাম।

কাকা বলিলেন "বেশ তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমার কিছুই বল্‌বার নেই। যদি এইভাবে জীবন কাটাতে চাও তাই করো।"

নতমুখে নিরুত্তর রহিলাম। কাকা মনোক্ষুণ্ণ হইয়াই ফিরিয়া গেলেন। আমি আবার নিজের কাজে মন দিলাম। লক্ষীছাড়া তো অনেকদিনই হইয়াছি—আর একটি সম্ভ্রান্তবংশের কন্তাকে গৃহলক্ষ্মী করিয়াই বা কি হইবে। উহাতে আমার ঘরের লক্ষ্মীর আসন পাকা হইবে কিনা কে বলিতে পারে, হয়তো বা এই লক্ষীছাড়ার সামান্ত যাহা কিছু আছে তাহাও ছাড়িয়া যাইবে। ঘরছাড়া প্রবৃত্তি লইয়া এতদিন চলিয়াছি—খুব বেশি ঠকি নাই—কিন্তু ঘর বাঁধিতে গিয়া ঠকিব না এমন কথা কে বলিতে পারে। আর লক্ষীছাড়া থাকিলেই বা ক্ষতি কি, লক্ষ্মীকে কেহ কি চিরকাল ধরিয়া রাখিতে পারিয়াছে ?

একজন খবর দিল কুকুরের বাচ্চা হইয়াছে। গিয়া দেখি নর্দ্দমার ধারে একটা নিভৃতস্থানে কুকুরী তাহার শাবকগুলিকে বেষ্টন করিয়া দুধ দিতেছে। সে তাহার প্রভুকে দেখিয়া পরম আশ্বাসভরে অস্ফুট শব্দ করিয়া উঠিল।

চলতি ইতিহাস

শ্রীতিনকড়ি চট্টোপাধ্যায়

রুশ-জার্মান সংগ্রাম

বিগত একমাসে রুশ-জার্মান যুদ্ধের প্রথম উল্লেখযোগ্য ঘটনা নাৎসীবাহিনী কর্তৃক রষ্টোভ অধিকার। রষ্টোভ অভিমুখে জার্মান বাহিনীর অগ্রগতির কৌশল ও লাল ফৌজের সেনা সন্নিবেশ-স্থানের অসুবিধা লক্ষ্য করিয়া আমরা 'ভারতবর্ষ'-এর গত সংখ্যাতেই রষ্টোভের পতন আশঙ্কা প্রকাশ করিয়াছিলাম। রষ্টোভ অধিকারের পর নাৎসীবাহিনী সাঁড়াশীর আকারে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলাভিমুখে অগ্রসর হয়। স্ট্যালিনগ্রাড ও উপেক্ষিত হয় নাই। প্রচুর সৈন্য, সমরোপকরণ, ট্যাঙ্ক সহযোগে জার্মান বাহিনীর একাংশ এই ট্যাঙ্ক-সহর অভিমুখে যথেষ্ট ক্ষতি স্বীকার করিয়াও অগ্রসর হইতে সচেষ্ট। রষ্টোভ অঞ্চলে যুদ্ধ পরিচালনার সময় ইংলণ্ডের বহু সমালোচক অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, নাৎসীবাহিনী সম্ভবত: স্ট্যালিনগ্রাড্ পর্যন্ত অগ্রসর হইবেনা। কিন্তু ককেশাশে অভিযান পরিচালনা করিতে হইলে যে স্ট্যালিন-গ্রাড্‌কে অবহেলায় পাশে ফেলিয়া রাখা সামরিক কৌশলের দিক হইতে আত্মহত্যার নামান্তর ইহা আমরা 'ভারতবর্ষ'-এর গত সংখ্যাতে বিশদভাবে আলোচনা করিয়া উক্ত অভিমতের অসারতা প্রদর্শন করিয়াছি। আমাদের ধারণা মিথ্যা হয় নাই, নাৎসী-বাহিনী স্ট্যালিনগ্রাডের প্রতি যথেষ্ট অবহিত হইয়া উঠিয়াছে। ২৬-এ আগষ্ট মধ্যরাত্রির সোভিয়েট ইস্তাহারের ক্রোড়পত্রে প্রকাশ যে, নাৎসীবাহিনী স্ট্যালিন্‌গ্রাডের ৩০ মাইলের মধ্যে উপনীত হইয়াছে। ইলোভলিয়া এবং কাচালিনস্ক-এর মধ্যস্থলে ডনের বাঁকে জার্মানরা সেতুস্থাপনে সক্ষম হইয়াছে বলিয়া আশঙ্কা করা হইতেছে। দুই ডিভিসন নূতন সৈন্য এবং প্রচুর সমর সম্ভার জার্মানবাহিনী গত একমাসে ঐ অঞ্চলে সন্নিবেশ করিতেছে। সোভিয়েট সংবাদপত্রাদিও ইহা অযথা গোপনের চেষ্টা করে নাই। কারণ ককেশাশের অভিযানে স্ট্যালিন্‌গ্রাডের গুরুত্ব যথেষ্ট। স্ট্যালিনগ্রাড অধিকার করিতে পারিলে একদিকে যেমন এই 'ট্যাঙ্ক-সহর' ধ্বংস করার ফলে সোভিয়েট সমর-সম্ভার উৎপাদনের উপর আঘাত হানা সম্ভব হইবে, তেমনই এই সামরিক গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখলে আসিলে ককেশাশে অভিযান পরিচালনার পথ নাৎসীবাহিনীর পক্ষে আরও উন্মুক্ত ও সহজতর হইয়া পড়িবে। রেলপথ এবং ভলগা নদীর অববাহিকা ধরিয়া জার্মান সৈন্য অষ্ট্রাখান অভিমুখে অভিযান পরিচালনায় সক্ষম হইবে। অষ্ট্রাখান রুশিয়ার দক্ষিণাঞ্চলে একটি গুরুত্বপূর্ণ শিল্পকেন্দ্র। ইহা অধিকার করিতে পারিলে রুশিয়ার সমরশক্তির উপর যেমন আঘাত আসিয়া পড়িবে, তেমনই কাস্পিয়ান হ্রদের তীরস্থ এই বন্দর শত্রুপক্ষের করতলগত হইলে কাস্পিয়ানস্থ সোভিয়েট নৌবহরকেও কিছু অসুবিধায় পড়িতে হইবে। কিন্তু ইহাই শেষ নহে। স্ট্যালিন্‌গ্রাড্ হইয়া অষ্ট্রাখান অবধি যদি নাৎসীবাহিনী আপন অধিকারে আনিতে সক্ষম হয় তাহা হইলে সমগ্র ককেশাশ অঞ্চল রুশিয়ার প্রধান ভূখণ্ড হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইবে। ওডেসা, সেবাস্তোপোল প্রভৃতি বন্দর পূর্বেই জার্মান অধিকারে যাওয়ায় কৃষ্ণসাগরস্থ সোভিয়েট নৌবাহিনীর শক্তি স্বভাবতই কিছু খর্ব হইয়াছে। এদিকে যদি ককেশাশ প্রধান ভূখণ্ড হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যায় এবং কাস্পিয়ানে সোভিয়েট নৌশক্তির প্রভাব ক্ষুণ্ণ হয় তাহা হইলে ককেশাশের যুদ্ধ পরিচালনা লালফৌজের পক্ষে আরও কষ্টকর হইয়া উঠিবে।

এদিকে সোভিয়েটবাহিনী কর্তৃক ক্রশনোডর পরিত্যক্ত হইয়াছে। কৃষ্ণসাগরস্থ নৌঘাঁটি নভোরসিস্ক-এর বিপদও যথেষ্ট বর্দ্ধিত হইয়াছে। মেইকপ্ নাৎসী সৈন্যের অধিকারে আসিয়াছে। অবশ্য সোভিয়েট হইতে পূর্বেই ঘোষণা করা হইয়াছে যে, মেইকপ্ শত্রু অধিকারে যাইবার পূর্বেই ঐ অঞ্চলের তৈল নিরাপদ স্থানে সরাইয়া লওয়া হইয়াছে এবং তৈলখনি ও যন্ত্রাদিতে অগ্নিসংযোগ করা হইয়াছে। তৈলাঞ্চল গ্রজনি হইতে ৮০ মাইল উত্তর পশ্চিমস্থ গুরুত্বপূর্ণ সহর প্যাটিগরস্ক নাৎসীসৈন্য অধিকার করিয়াছে। আশু লক্ষ্যস্থল গ্রজনি, শেষ লক্ষ্য বাকু। এদিকে নভোরসিস্ক-এর পর পৈতি, টুয়াপ্‌সে এবং তাহার পর তৈলকেন্দ্র ও নৌঘাঁটি বাটুম। নাৎসী সৈন্য প্রধানত ককেশাশের উত্তর প্রান্তস্থ সমুদ্রতীর ধরিয়া বর্তমানে অগ্রসর হইতে প্রয়াসী বলিয়া বোধ হয়। অবশ্য ইহার কারণও স্পষ্ট। পার্বত্য অঞ্চল ককেশাশের অভ্যন্তরে বিরাটবাহিনী পরিচালনের উপযোগী কোন পথ নাই। কৃষ্ণসাগর ও কাস্পিয়ানের তীর দিয়া যে দুইটি সঙ্কীর্ণ পথ গিয়াছে উহাই সহজগম্য। ককেশাশ অঞ্চলে জার্মানীর প্রচণ্ড আক্রমণ ও সোভিয়েটবাহিনীর তীব্র প্রতিরোধ প্রদানের মধ্যে যুদ্ধের বিশেষত্ব বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার।

ককেশাশের যুদ্ধে প্রথম লক্ষ্যের বিষয় নাৎসীবাহিনীর সংস্থান ও আক্রমণ পদ্ধতি। একটা অবিচ্ছিন্ন বিশাল সৈন্য-বাহিনীর প্রচণ্ড সংগ্রাম ককেশাশের কোন অঞ্চলেই হয় নাই। স্ট্যালিন্‌গ্রাড্, ক্রশনোডর, নভোরসিস্ক, প্যাটিগরস্ক প্রভৃতি বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্নবাহিনীর মধ্যে চলিয়াছে খণ্ড সংগ্রাম। সিঙ্গাপুর অভিমুখে অভিযান পরিচালনার সময় জাপান যেমন মালয়ে একাধিক স্থানে বহু বিভক্ত বাহিনী দ্বারা একই সঙ্গে সংগ্রাম পরিচালনা করিয়াছিল, ফন্‌বোকের অধীনস্থ নাৎসী-বাহিনীও তেমনই ককেশাশের একাধিক অঞ্চলে একই সময়ে আঘাত হানিয়া গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলগুলিকে অধিকার করিতে চাহিতেছে। এই রণকৌশলের ফলে সোভিয়েট বাহিনীর অসুবিধা হইয়াছে যথেষ্ট। হিটলার সমগ্র অধীন ইয়োরোপের বিভিন্ন অঞ্চলের সৈন্য রণক্ষেত্রে দিনের পর দিন প্রেরণ করিতেছেন, নূতন সমর সম্ভার প্রতিদিন নাৎসী সৈন্যের সাহায্যার্থ রণক্ষেত্রে আনীত হইতেছে। ফলে একাধিক অঞ্চলে তীব্র সংগ্রাম পরিচালনা হিটলারের পক্ষে এদিক হইতে এখনও যথেষ্ট আয়াস-সাধ্য হইয়া ওঠে নাই। কিন্তু সোভিয়েট বাহিনীর পক্ষে বিভিন্ন রণক্ষেত্রে প্রয়োজনমত উপযুক্ত সৈন্য ও রণসম্ভার প্রেরণ সম্ভব

হইতেছে না। মস্কো-রষ্টোভ রেলপথের বহুস্থান জার্মান-বাহিনী কর্তৃক পূর্বে অধিকৃত হওয়ায় সময়মত সাহায্য প্রেরণ করা রুশিয়ার পক্ষে কিছু কঠিন হইয়া পড়িয়াছে। নূতন সৈন্যশক্তি ও সমরোপকরণে পরিপুষ্ট সংখ্যাগরিষ্ঠ নাৎসীবাহিনীর সহিত দীর্ঘ-রণক্লান্ত সংখ্যালঘিষ্ঠ লালফৌজের সংগ্রাম সোভিয়েটের পক্ষে অধিকতর অসুবিধাজনক হইয়া উঠিতেছে। প্রতি ইঞ্চি জমি পরিত্যাগের পূর্বে লালফৌজ শত্রুর প্রচণ্ড ক্ষতিসাধন করিতেছে সত্য, কিন্তু অপরিমিত ক্ষতি স্বীকার করিয়াও আক্রান্ত অঞ্চল অধিকার করাই নাৎসী রণনীতির বৈশিষ্ট্য। সেবাস্তোপোল অধিকারের সময় জার্মানবাহিনীকে আমরা এই পদ্ধতি অবলম্বন করিতে দেখিয়াছি, রষ্টোভ অভিমুখে অভিযান পরিচালনাকালে এই একই কৌশল নাৎসীবাহিনী কর্তৃক অবলম্বিত হইয়াছে, স্ট্যালিনগ্রাড অভিমুখে অগ্রসর হইবার সময় ফণ্‌বোক সেই পুরাতন পদ্ধতিই অনুসরণ করিতেছেন। অসংখ্য সৈন্য ও অপরিমিত সমরোপকরণ বিনষ্ট করিয়াও নাৎসীবাহিনী গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলগুলি অধিকারের জন্য অগ্রসর হয় এবং শেষ সাফল্যলাভের ফলে সমরনীতির দিক হইতে সে যাহা লাভ করে তাহার জন্যই এই ক্ষতি শেষ পর্যন্ত তাহার পক্ষে সহ্য করা সম্ভব হয়। হিটলার অক্ষৌহিণী লইয়া সমরে অবতীর্ণ হন নাই সত্য, বিনষ্ট সমর সম্ভারের সহিত উৎপন্ন রণোপকরণের অনুপাতের উপরই এই ক্ষতি সহ্য করিবার শক্তি নির্ভর করিতেছে ইহাও সত্য, কিন্তু তথাপি একক রুশিয়ার প্রতি রোধশক্তির সম্মুখে সমগ্র ইয়োরোপের সংহত শক্তি লইয়া উন্মত্ত নাৎসী বর্বরতার এই নিষ্ঠুর নরবলিলব্ধ সাফল্যের গুরুত্ব উপেক্ষার নহে।

ককেশাসের যুদ্ধে অপর একটি প্রধান লক্ষ্যের বিষয় নাৎসী বাহিনীর আক্রমণ পদ্ধতি। সমস্ত সংহত শক্তি লইয়া অতর্কিতে প্রচণ্ডবেগে সমুদ্র তরঙ্গের ন্যায় একের পর এক আঘাত হানিয়া বিপক্ষকে পর্যুদস্ত করিবার সে পদ্ধতি আর নাই। ককেশাশের এই পার্বত্য অঞ্চলে সে বিদ্যুৎগতি আক্রমণ আর নাই, চমকপ্রদ সাফল্যও আর সম্ভব নয়। প্রকৃতপক্ষে সে বিদ্যুৎগতি আক্রমণের যুগ শেষ হইয়াছে। এখন চলিয়াছে দীর্ঘ স্থায়ী সংগ্রাম। সৈন্য সংখ্যা, নূতন সমরোপকরণ ও সৈন্য আমদানি, বিপক্ষের দুর্বল স্থান অন্বেষণ ও সুবিধা এবং সুযোগ লাভ করিয়া আঘাত হানা, —বর্তমানে যুদ্ধের গতি ও সাফল্য নির্ভর করিতেছে এই সকল অবস্থার উপর। বিগত শীতের অভিজ্ঞতা হিটলার ইহার মধ্যে নিশ্চয়ই ভুলিয়া যান নাই, ককেশাশের শীতের প্রচণ্ডতা সম্বন্ধেও তাঁহার ধারণা নিশ্চয় অভাব বোধক নয়, শীতের পূর্বেই যে তিনি এই ককেশাশ অভিযান সমাপ্ত করিতে ইচ্ছুক তাহা জার্মানীর আপ্রাণ প্রচেষ্টা হইতেই পরিস্ফুট: কিন্তু তবুও আশানুরূপ সাফল্যলাভ হিটলারের পক্ষে এখনও সম্ভব হইল না। লালফৌজের প্রতিরোধ শক্তির তীব্রতা যে কতখানি, ইহা হইতেই তাহা উপলব্ধি করা যাইবে। আর এই সঙ্গে পরিস্ফুট হয় নাৎসী-শক্তির অন্তর্নিহিত দৌর্বল্য। প্যাঞ্জার বাহিনীর ন্যায় নিপুণ সৈন্য হিটলারের আর উপযুক্তসংখ্যক নাই, বিভিন্ন রাষ্ট্রের বাহিনীর মিলিত সংগ্রামে সমতার অভাব আজ আর গোপন নাই, অধুনা উৎপন্ন সমরোপকরণের উৎকৃষ্টতা আর সকল ক্ষেত্রে প্রতিপন্ন হইতেছে না। আপনার শক্তির দুর্বল স্থান সম্বন্ধে হিটলার সজাগ, তাই আজ তিনি যত শীঘ্র সম্ভব ককেশাশের যুদ্ধ পরিসমাপ্তি করিতে আগ্রহান্বিত।

দ্বিতীয় রণক্ষেত্র

ককেশাশের যুদ্ধ দ্রুত পরিসমাপ্ত করিতে হিটলার ইচ্ছুক হওয়ার আর একটি কারণ মিত্রশক্তির দ্রুত ক্রমবর্দ্ধমান শক্তির সহিত সঙ্ঘর্ষ যদি আসন্ন হইয়া ওঠে তাহা হইলে অন্যান্য রণক্ষেত্র হইতে অবসরপ্রাপ্ত জার্মানীকে সেই শক্তির বিরুদ্ধে সর্বতোভাবে নিয়োজিত করাই হিটলারের অভিপ্রায়। রুশিয়া বহুদিন হইতে মিত্রশক্তিকে জার্মানীর বিরুদ্ধে দ্বিতীয় রণাঙ্গন সৃষ্টি করিতে দেখিতে ইচ্ছুক; বৃটেন, আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া এবং ভারতের জনসাধারণ বৃটিশ শাসকবর্গকে দ্বিতীয় রণক্ষেত্র সৃষ্টির দাবী জানাইতেছে—কিন্তু শাসকবর্গের কার্যকলাপ দুর্বোধ্য। নাৎসীবাদকে ধ্বংস করিবার জন্য ইঙ্গ-রুশ চুক্তির দ্বারা উভয় রাষ্ট্রের বন্ধন দৃঢ় করা হইল; প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের সহিত সাক্ষাতান্তে মিঃ চার্চিল লণ্ডনে প্রত্যাগমন করিয়া জানাইলেন যে, প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট এবং বৃটেন ও আমেরিকার অন্যান্য সামরিক উপদেষ্টাদিগের সহিত একত্র আলোচনান্তে যাহা স্থির হইয়াছে তাহা যুদ্ধের স্বার্থরক্ষার্থে প্রকাশ না করা যাইলেও অতি শীঘ্রই মিত্রশক্তির কার্যকলাপের ফলে রুশিয়ার উপর জার্মানী চাপ কমাইতে বাধ্য হইবে; হ্যারি হপ্‌কিন্স ও জেনারেল মার্শালের লণ্ডন আগমন ও কথাবার্তা, মিঃ কর্ডেল হালের বক্তৃতা, প্রতি ক্ষেত্রেই জনগণ আসন্ন দ্বিতীয় রণাঙ্গনের সৃষ্টি দেখিতে উন্মুখ হইয়া রহিল—কিন্তু ঐ পর্যন্তই! বৃটেনের শ্রমিক সঙ্ঘ সম্মিলিত আবেদন জানাইল, লণ্ডন এবং যুক্তরাষ্ট্রে দ্বিতীয় রণক্ষেত্র অবিলম্বে সৃষ্টি করা প্রয়োজন কি না সে সম্বন্ধে ভোট গ্রহণ করা হইল—বলা বাহুল্য অধিকাংশ ভোটই পাওয়া গেল অনুকূলে এবং জয়লাভ সম্বন্ধে তাহারা নিঃসন্দেহ—কিন্তু তবুও গবেষণা এবং আলোচনার শেষ হইল না। শ্রমিক মন্ত্রী মিঃ বেভিস তো জনসাধারণকে ধমক দিয়া বলিলেন—আর মাত্র ৮০ দিন! উৎপাদন ব্যবস্থায় আরও আন্তরিকভাবে আত্মনিয়োগ কর, যুদ্ধের কথা মুখেও আনিও না। অনেকে যুক্তি দিয়া বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন যে দ্বিতীয় রণক্ষেত্র সৃষ্টির সময় অসময় নির্ভর করে সমর নেতাদের বিবেচনার ওপর এবং তাঁহারা এখনই সৃষ্টি করিতে অনিচ্ছুক। কারণ, প্রথমত ইহার জন্য যথেষ্ট সৈন্য দরকার, সৈন্য ও সমরোপকরণ প্রেরণ ও সংযোগ রক্ষার্থে অনেক জাহাজের প্রয়োজন প্রভৃত রসদাদিও আবশ্যক। যথেষ্টসংখ্যক বিমানও এই উদ্দেশ্যে প্রয়োজন। তাহার উপর আক্রমণের সম্ভাব্য দিক সম্বন্ধেও বিচার করিতে হইবে। রাজকীয় বিমান বাহিনীর অবিরাম আক্রমণ পরিচালনায় ফ্রান্সের উপকূল ও জেটি প্রভৃতি বিধ্বস্ত, সৈন্যাদি অবতরণের পক্ষে তাহা বিশেষ অসুবিধার সৃষ্টি করিবে। এতদ্ব্যতীত যে অঞ্চলে অবতরণ করিয়া জার্মানীর বিরুদ্ধে আক্রমণ পরিচালনা করিতে হইবে সেই শত্রু এলাকার অধিবাসীদের মিত্রশক্তির পক্ষে সহযোগিতা প্রয়োজন। সামরিক দিক হইতে প্রত্যেকটি যুক্তিরই যথেষ্ট গুরুত্ব আছে এবং ঐ সকল প্রয়োজনকেও অস্বীকার করা যায় না; কিন্তু দ্বিতীয় রণক্ষেত্র সৃষ্টির পক্ষে ঐ সকল অসুবিধা কতখানি বাধার সৃষ্টি করিতে পারে তাহাই আলোচনা করা যাক।

প্রথমতঃ 'গণতন্ত্রের অস্ত্রাগার' হইতে গত কয়েক মাস শুধুই সমরোপকরণ নহে, সৈন্যও যথেষ্ট আসিয়াছে। বৃটেন এবং উত্তর আয়র্ল্যণ্ডে বহু মার্কিন সৈন্য এবং বৈমানিক বর্ত্তমানে উপনীত, বৃটেন রক্ষার জন্য যে ৫০ লক্ষাধিক সৈন্য সর্বদা প্রস্তুত ইহারা তাহা হইতে স্বতন্ত্র, আক্রমণাত্মক অভিযান পরিচালনার উদ্দেশ্যেই এই বাহিনী আনীত হইয়াছে। বৃটেন এবং বিশেষভাবে আমেরিকায় যে উৎপাদন ব্যবস্থা আরও সুসম্বদ্ধ ও অল্প সময়সাপেক্ষ হইয়াছে ইহা অস্বীকার করা যায় না; গত বৎসর, এমন কি বিগত ছয় মাস অপেক্ষা বর্ত্তমানে যে আরও অল্প সময়ে জাহাজাদি নির্মিত হইতেছে ইহা একাধিকবার জানান হইয়াছে, ইহার সত্যতা সম্বন্ধে কাহারও সন্দেহ নাই। সুতরাং দ্বিতীয় রণক্ষেত্র সৃষ্টি করিতে হইলে প্রয়োজনীয় জাহাজাদির অভাব বিশেষ তীব্রভাবে অনুভূত না হওয়াই সম্ভব। সমরোপকরণ সম্বন্ধে মিত্রশক্তির জন্য 'গণতন্ত্রের অস্ত্রাগার' যে প্রয়োজন মিটাইতে সক্ষম ইহাও নিঃসন্দেহ। আমেরিকাকে বাদ দিলেও বর্ত্তমানে বৃটেনের বিমান শক্তি যে যথেষ্ট বর্দ্ধিত হইয়াছে তাহার জন্য বাৎসরিক উৎপাদন সংখ্যা (statistics) দেখিবার প্রয়োজন হয় না, হাজার বিমানের শত্রু এলাকায় আক্রমণাত্মক অভিযান পরিচালনা হইতেই তাহা প্রকাশ। প্রায় দুই মাস পূর্ব বিমান উৎপাদন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী জানাইয়াছিলেন যে, নিকট ভবিষ্যত বিমান আক্রমণের দ্বারাই বৃটেন দ্বিতীয় রণক্ষেত্রের সৃষ্টি করিবে। এরূপ অভিমত বৃটেনে প্রকাশিত হইয়াছে যে, বৃটেন অচিরে শত্রু এলাকায় এরূপ বিমান আক্রমণ পরিচালনা করিবে যে, তাহার নিকট জার্মানীর বৃটেনের উপর অতীত আক্রমণগুলি নিতান্ত ছেলেখেলা বলিয়া বোধ হইবে। অবশ্য এ কথা স্বীকার্য যে স্থল সৈন্য পরিচালনা না করিয়া কেবল বিমান আক্রমণের দ্বারা একটা প্রবল শক্তিকে পঙ্গু করিয়া পরিষ্কার বিজয়সূচক জয়লাভ করা যায় না—বৃটেন নিজেই ইহার দৃষ্টান্ত। যুদ্ধারম্ভের পর হইতে এ পর্যন্ত বৃটেনের উপর বহুবার প্রবল বিমান আক্রমণ পরিচালনা করা হইয়াছে, কিন্তু তাহাতে বৃটেনের সামরিক শক্তি অথবা নৌশক্তি কোনটাই ক্ষুণ্ণ হয় নাই, দিনের পর দিন তাহার শক্তি ক্রমশই বর্দ্ধিত হইয়া চলিয়াছে। মাল্টাও অসংখ্য বার বিমান আক্রমণ সহ্য করিয়া আজও দাঁড়াইয়া আছে। তবে বিচ্ছিন্ন বিমান আক্রমণে আশানুরূপ ফললাভ সম্ভব না হইলেও দ্বিতীয় রণাঙ্গনে বিমানের প্রয়োজন ইহারা পূরণ করিতে পারে। আর বিধ্বস্ত উপকূলে সৈন্য অবতরণের অসুবিধা সম্বন্ধে এই কথাই বলা যায় যে, কোন রাষ্ট্রই শত্রুর আক্রমণের জন্য সুবিধাজনক ব্যবস্থা করিয়া রাখে না, যুদ্ধ পরিচালনার প্রাকৃতিক বাধা বহু স্থানে বহুভাবে থাকিবেই। মালয় এবং ব্রহ্মদেশের যুদ্ধে অরণ্য অঞ্চলের জন্য বহু স্থানে মিত্রশক্তির বাহিনীর পক্ষে সুসম্বদ্ধ অভিযান পরিচালনা সম্ভব হয় নাই, কিন্তু জাপ বাহিনী সেখানে আশ্চর্য রকম কৌশল প্রদর্শন করিয়াছে। রয়টার আমাদিগকে জানাইয়াছেন যে, জাপ বাহিনী এই সকল অঞ্চলের উপযোগী রণকৌশল পূর্বেই শিক্ষা করিয়াছিল। রণক্ষেত্রে প্রাকৃতিক বিপর্যয় পদে পদে। পশ্চাদপসরণকারী সৈন্যদল সেতু ভাঙ্গিয়া দিয়া সরিয়া যায়, কিন্তু তাহার জন্য শত্রু আবার কবে সেতু নির্মাণ করিয়া দিবে সেই আশায় অপেক্ষা করা চলে না; আক্রমণকারীকে নিজেই তাহার ব্যবস্থা করিতে হয়। সেতু নির্মাণ করিয়া অথবা সাঁতার দিয়াই সৈন্যদিগকে নদী পার হইতে হয়। ব্রহ্মের যুদ্ধে একাধিক স্থানে জাপ সৈন্য সন্তরণেই নদী পার হইয়াছে। তাছাড়া খানিকটা দায়িত্ব গ্রহণ করিতেই হইবে। মঃ লিট্‌ভিনফ ও তাঁহার সমর্থকেরা বহুবার বলিয়াছেন যে, দ্বিতীয় রণাঙ্গন সৃষ্টির পক্ষে কতক অসুবিধা থাকিবেই, কিন্তু সেইজন্য অনির্দিষ্ট কাল অপেক্ষা করা অসঙ্গত; যুদ্ধে জয়লাভের জন্য এবং নাৎসীবাদকে পৃথিবী হইতে নিশ্চিহ্ন করার জন্য খানিকটা দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হইবেই। শেষ বিরুদ্ধ যুক্তি সম্বন্ধেও আমরা এই কথা বলি যে, ফ্রান্সে দ্বিতীয় রণাঙ্গন সৃষ্ট হইলে মিত্রশক্তি স্থানীয় অধিবাসীর সহযোগিতা লাভ করিবেই। রয়টারের সংবাদেই প্রকাশ জুন এবং জুলাই মাসে ছয় সপ্তাহে ফ্রান্সে ১২,৮৫০ জন কম্যুনিষ্টকে গুলি করিয়া হত্যা করা হইয়াছে। কম্যুনিষ্টরা ফ্যাসিবাদের বিরোধী। জার্মান অধিকৃত ইয়োরোপের বহু রাষ্ট্রেই জার্মান শাসনবিরোধী গণশক্তি আছেই; বিক্ষোভ, বোমা নিক্ষেপ, গুপ্তহত্যা প্রভৃতি হইতেই তাহা পরিস্ফুট। প্রকৃত স্বদেশ প্রেমিকের অভাব কোন দেশেই হয় না। ফ্রান্সের হাজার হাজার নরনারী যে তাহাদের মুক্তি সংগ্রামে বৃটেনকে সাহায্য করিবে তাহা নিঃসন্দেহ। এই সকল কারণেই বৃটেন, মার্কিনযুক্তরাষ্ট্র, ভারতবর্ষ এবং অষ্ট্রেলিয়ার জনগণ অবিলম্বে দ্বিতীয় রণাঙ্গনের সৃষ্টি দেখিতে আগ্রহান্বিত। ফ্যাসিবাদ জনসাধারণের কাম্য নয়, মিত্রশক্তির হস্তে তাহার উচ্ছেদ দেখিতে বিশ্বের জনগণ তাই প্রতীক্ষায় অধীর। বৃটেনের জনসাধারণ যুদ্ধের ধ্বনি দিতেছে—'রুশকে সাহয্যার্থ আক্রমণ কর' (Attack in Support of Russia). রুশিয়ার জনসাধারণও বৃটেনের এই বিলম্বের জন্য চিন্তিত।

দ্বিতীয় রণাঙ্গন সৃষ্টির উদ্দেশ্য রুশিয়ার উপর জার্মানীর চাপ কমান এবং দুই রণাঙ্গনে জার্মানীর আক্রমণ-শক্তিকে দ্বিধাবিভক্ত করিয়া তাহার পরাজয়ের দিন দ্রুত আগাইয়া আনা। রুশিয়াকে বৃটেন এই যুদ্ধে কি ভাবে আরও কার্য্যকরী সাহায্য প্রদান করিতে পারে সেই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার জন্য মিঃ চার্চিল মস্কোতে মঃ ষ্ট্যালিনের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছেন। গত ১২ হইতে ১৫ই আগষ্ট পর্যন্ত আলোচনা চলে। আমেরিকার পক্ষ হইতে মিঃ হ্যারিম্যান, জেনারেল ওয়াভেল, মধ্য প্রাচ্যের বিমান বাহিনীর অধিনায়ক, মিশরস্থ মার্কিন বাহিনীর সৈন্যাধ্যক্ষ এবং আরও কয়েকজন এই আলোচনায় উপস্থিত ছিলেন। বর্তমান রণনীতি ও ভবিষ্যৎ রণপরিকল্পনা লইয়া যে আলোচনা হইয়াছে তাহা নিঃসন্দেহ। সেই জন্যই মধ্য প্রাচ্যের সৈন্যাধ্যক্ষদের উপস্থিতি। ককেশাশ অভিযানের সহিত মিশর এবং ইরাণ বিশেষভাবে জড়িত। এই প্রসঙ্গে মিশর এবং ইরাণের সৈন্যাধ্যক্ষদের পরিবর্তনও উল্লেখযোগ্য। মিশরে জেনারেল অচিনলেকের স্থলে নিযুক্ত হইয়াছেন জেনারেল আলেকজাণ্ডার, এবং রিচির স্থানে আসিয়াছেন মণ্টগোমারী। ইরাক এবং ইরাণের সম্মিলিত বাহিনীর অধিনায়করূপে নিয়োগ করা হইয়াছে জেনারেল উইলসনকে। অনেকে এই ধরণের সন্দেহ প্রকাশ করিতেছেন যে, বৃটেন অদূর ভবিষ্যতে যে দ্বিতীয় রণাঙ্গনে

ফ্যাসিশক্তিকে আক্রমণ করিবে অথবা ককেশাসের যুদ্ধে সোভিয়েট বাহিনীর সহিত রণক্ষেত্রে সক্রিয় সহযোগিতা করিবে তাহারই পরিচালনোদ্দেশে জেনারেল অচিন্‌লেককে নিয়োগ করা হইবে, জেনারেল ওয়াভেলকেও এইজন্যই মস্কো সম্মেলনে উপস্থিত থাকিতে হইয়াছিল।

চার্চিল-স্ট্যালিন আলোচনা শেষ হওয়ার পর চতুর্থ দিন ১৯-এ আগষ্ট ভোর ৪-৫০ মিনিটের সময় দিয়েপ বন্দরের নিকটস্থ ছয়টি স্থানে এক বৃহৎ 'কমাণ্ডো' আক্রমণ পরিচালনা করা হয়। এই আক্রমণ যে বিশেষ বিস্তৃত আকারে পরিচালিত হইয়াছিল তাহা যুদ্ধের ফলাফলেই প্রকাশ। জার্মানীর ৯১ খানি বিমান এই সংঘর্ষে ধ্বংস হয় এবং প্রায় ১০০ বিমান ক্ষতিগ্রস্ত হয়। মিত্রশক্তির নিরুদ্দিষ্ট বিমান সংখ্যা এক্ষেত্রে ৯৮। জার্মানীর দুইখানি জাহাজও ডুবাইয়া দেওয়া হইয়াছে এবং কয়েকখানি ঘায়েল হইয়াছে।

মার্কিণ পত্রিকাদিতে এই আক্রমণকে দ্বিতীয় রণাঙ্গনে সংগ্রামের মহড়া বলিয়া প্রচার করা হয়। কিন্তু 'ম্যানচেষ্টার গার্ডিয়ান' পত্রিকা জানাইলেন যে, যে সকল লোক দ্বিতীয় রণাঙ্গনের জন্য চীৎকার করিয়া গলা ফাটাইতেছে তাহারা এইবার চুপ করিবে। কিন্তু 'ম্যানচেষ্টার গার্ডিয়ান'-এর এই উক্তির অর্থ কি? বৃটেনে জনসাধারণের দ্বিতীয় রণক্ষেত্র সৃষ্টির দাবী যে ক্রমশ আন্দোলনের রূপ পরিগ্রহ করিতেছে তাহাকে দমাইবার জন্যই কি ইহা একটা অভিনয় মাত্র? মিঃ চার্চিল মস্কো গমনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে জানান যে, তিনি তাঁহার বক্তব্য বলিবার উদ্দেশ্যেই মস্কো গিয়াছিলেন। এ ক্ষেত্রেও উক্তি বিশেষ স্পষ্ট নয়। দ্বিতীয় রণাঙ্গন সৃষ্টি করাই যদি উদ্দেশ্য তাহা হইলে তাহা জানাইতে যাইবার বিশেষ আবশ্যক কি? সৃষ্টিতেই তো তাহার প্রকাশ। আর যদি আক্রমণের স্থান, সামরিক পরিকল্পনা প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনার জন্যই এই যাওয়া হয়, তাহা হইলে তাহাকে 'বক্তব্য বলিতে যাওয়া' না বলিয়া 'নির্দ্ধারিত পরিকল্পনা সম্বন্ধে আলোচনার উদ্দেশ্যে' গমন বলিলে বিষয়টি অধিক পরিস্ফুট হয়। দ্বিতীয় রণাঙ্গন সৃষ্টির দাবী বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জার্মানী হইতে জানান হয় যে, ইয়োরোপের পশ্চিম উপকূলে জার্মানী যথেষ্ট সৈন্য সমাবেশ করিয়া রাখিয়াছে এবং বৃটেনের যে কোন সম্ভাবিত আক্রমণ সাফল্যজনকভাবে প্রতিহত করিবার উপযুক্ত শক্তি ঐ বাহিনীর আছে। কিছুদিন পূর্বে ফ্রান্সের উপকূলস্থ ফ্যাসী বাহিনীর অধিনায়ক মণ্ডলীর মধ্যে কিছু পরিবর্ত্তনও সাধন করা হয়। বৃটেনের এই 'কমাণ্ডো' আক্রমণের উদ্দেশ্য ছিল শত্রুর উপকূল কতখানি সুরক্ষিত তাহা পরিজ্ঞাত হওয়া, উপকূলস্থ বেতার ঘাঁটিগুলি ধ্বংস করা। ভবিষ্যৎ বৃহৎ আক্রমণের পূর্বে ইহা একটা পরীক্ষা।

কিন্তু এই অভিযানে অনেকগুলি বিষয় বিশেষ স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। দ্বিতীয় রণাঙ্গন সৃষ্টির অসুবিধা সম্বন্ধে যে সকল কারণ প্রদর্শিত হয় সে সকল বাধা এড়াইয়া যাওয়া সম্ভব। বিমান বহর দ্বারা সুরক্ষিত নৌবহর যে শত্রু উপকূলের নিকটেও নিরাপদে অবস্থান করিতে পারে তাহা পরিস্ফুট। জার্মানীর আস্ফালন সত্ত্বেও আরও একটা বিষয় এই সঙ্গে প্রকাশ হইয়া পড়িল—পশ্চিম ইয়োরোপে শত্রুর কোন বিশেষ শক্তিশালী বাহিনী নাই। কিন্তু সকল অবস্থাই যখন দ্বিতীয় রণাঙ্গন সৃষ্টির অনুকূলে, তখন জনসাধারণের মনে এই প্রশ্নই ওঠে—রণাঙ্গন সৃষ্টিতে তবে বিলম্ব কেন? মিত্রশক্তির সহযোগী রুশিয়ার গুরু দায়িত্বের একাংশ গ্রহণ করিতে এত বিলম্বের কি প্রয়োজন? এই পরীক্ষার শেষ কবে?

সুদূর প্রাচী

বিংশ শতাব্দীর চতুর্থ দশকের যুদ্ধ যদিও সমষ্টি সংগ্রাম (Total war), কোন রণাঙ্গনই আজ পৃথক এবং স্বয়ং সম্পূর্ণ নয়, তাহা হইলেও সুদূর প্রাচীর সংঘর্ষকে আমরা আলোচনার সুবিধার্থে দুইটি পৃথক রণাঙ্গনে বিভক্ত করিয়া লইতে পারি: একটি চীন-জাপান সঙ্ঘর্ষ এবং অপরটি প্রশান্ত মহাসাগরীয় সংগ্রাম।

বিগত একমাসের চীন-জাপান যুদ্ধের ইতিহাস গত ছয় বৎসরের ইতিহাসেরই পুনরাবৃত্তি। সংখ্যা-গরিষ্ঠ সৈন্য এবং সমরোপকরণের সাহায্যে জাপান যাহা অধিকার করিতেছে চীন আবার তাহাই ধীরে ধীরে পুনরুদ্ধার করিয়া চলিয়াছে। পূর্ব কিয়াংসীর লিন্‌চুয়ান্ সহর চীনা বাহিনী কর্তৃক পুনরধিকৃত হইয়াছে। ঐ অঞ্চলের কিউইকি, সাংজাও এবং গুরুত্বপূর্ণ সহর কোয়াংকং পুনরায় চীন সৈন্যের হাতে আসিয়াছে। ওয়েনচাও হইতে জাপসৈন্য বিতাড়িত। চেকিয়াং-কিয়াংসি রেলপথ ধরিয়া অগ্রসরমান যে চীনা বাহিনীর কথা আমরা 'ভারতবর্ষ'-এর গত সংখ্যায় উল্লেখ করিয়াছিলাম তাহারা নানচাং-এর পূর্বে টুংশিয়াং অধিকার করিয়াছে। চীনা বাহিনীর প্রবল চাপে নানচাং-এর ২৮ মাইল দক্ষিণ-পূর্বস্থ চিন্‌সিয়েন হইতে জাপ বাহিনী পশ্চাদপসরণ করিয়াছে।

দক্ষিণ চেকিয়াং-এ সমুদ্রতীর হইতে চল্লিশ মাইল দূরবর্তী লিশুই অধিকার চীনাদের সাম্প্রতিক উল্লেখযোগ্য বিজয়। পূর্ব-চীনে লিশুই-এর স্থান বিমান ঘাঁটি হিসাবে দ্বিতীয়। প্রথম ও প্রধান বিমান ঘাঁটি চুশিয়েন জাপান কর্তৃক অধিকৃত হইয়াছিল, কিন্তু লিশুই অধিকারের পূর্বদিন ২৮এ আগষ্ট চীনাবাহিনী কর্তৃক চুশিয়েন বিমান ঘাঁটিও অধিকৃত হইয়াছে। লিশুই হইতে বিমানে টোকিওতে বোমাবর্ষণ করিয়া আসিতে পারা যায়এবং এই হিসাবে লিশুই-এর গুরুত্ব যথেষ্ট বেশী।

চীনের এই ক্রম বিজয়ে একদিকে যেমন গণশক্তির সাফল্য ঘোষণা করিতেছে, তেমনই চীনে সংগ্রামলিপ্ত জাপবাহিনীর দুর্বলতাও ইহার মধ্য দিয়া প্রকাশ হইয়া পড়িতেছে। চীন-ব্রহ্ম পথ আজ অবরুদ্ধ, রুশিয়া ব্যতীত স্থলপথে চীন বহির্জগতের সহিত বিচ্ছিন্ন সংযোগ, চীনের সমরোপকরণও যুদ্ধের প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রচুর, তবুও আজ জাপান চীনকে শায়েস্তা করিয়া তথায় আপন ঈপ্সিত 'শান্তি' প্রতিষ্ঠা করিতে সক্ষম হইল না। চীন, ব্রহ্ম, মালয়, প্রশান্ত মহাসাগরের বিভিন্ন দ্বীপপুঞ্জ—এই দীর্ঘ বিস্তৃত রণক্ষেত্র ও অধিকৃত স্থানে সমানভাবে শক্তি নিয়োগের ক্ষমতা যে জাপানের নাই, চীন যুদ্ধে তাহাই ক্রমশ পরিস্ফুট হইয়া উঠিতেছে।

দক্ষিণ পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরেও জাপ-নৌবহরের তৎপরতা দেখা গিয়াছে। অতি শীঘ্র অষ্ট্রেলিয়ার প্রধান ভূখণ্ডে যুদ্ধ আরম্ভ করা অপেক্ষা জাপান যে উক্ত অঞ্চলে ইঙ্গ-মার্কিন সমুদ্র-সংযোগ বিচ্ছিন্ন করিতেই অধিক তৎপর একথা আমরা বহুবার বলিয়াছি, এখনও জাপান সেই উদ্দেশ্যেই উক্ত অঞ্চলে নৌযুদ্ধে লিপ্ত।

আগষ্টের প্রথম দিকে মার্কিন নৌবহর সলোমনে আক্রমণ

সুরু করে এবং সৈন্য অবতরণ করিয়া দ্বীপের কিয়দংশ অধিকার করে। জাপ সৈন্য ক্রমশঃই অরণ্যাঞ্চলের দিকে পশ্চাদপসরণে বাধ্য হয়। জাপ রণতরী হইতে যুদ্ধরত জাপসৈন্যকে সাহায্যের জন্য নূতন সৈন্য অবতরণের প্রচেষ্টা মার্কিণ সেনার প্রবল প্রতিরোধে বাধাপ্রাপ্ত হয়। সলোমন দ্বীপ আক্রমণের ঠিক দশ দিন পরে গিলবার্ট দ্বীপপুঞ্জের অন্তর্গত মার্কিণ দ্বীপে মার্কিণ সৈন্য সাফল্যের সহিত অবতরণে সক্ষম হয়। ইহার পরেই নিউগিনির দক্ষিণে সামারিয়ার উত্তরে মিল্‌নে উপসাগরে জাপানের সহিত মার্কিণ সৈন্যের সঙ্ঘর্ষ আরম্ভ হইয়াছে। বিস্তারিত বিবরণ এখনও পাওয়া যায় নাই। কিন্তু এই আক্রমণে একদিকে যেমন মার্কিন নৌবহরের ক্রম আক্রমণাত্মক অভিযান পরিচালনার পরিচয় পাওয়া যাইতেছে, অপর পক্ষে তেমনই ম্যাকসার প্রবাল দ্বীপের এবং অ্যালুসিয়ান দ্বীপপুঞ্জে নৌসংঘর্ষের পর জাপ নৌবহর যে মার্কিন নৌশক্তির বিরুদ্ধে বিশেষ উল্লেখযোগ্য সাফল্যলাভ করিতে পারিতেছে না ইহাও স্পষ্ট।

জাপান অদূর ভবিষ্যতে কোন্‌দিকে আক্রমণ পরিচালনা করিবে তাহা লইয়া সম্প্রতি কূটনীতিক মহলে যথেষ্ট গবেষণা চলিয়াছে। চীনের একাধিক সংবাদপত্র এবং সমালোচকের অভিমত যে, জাপান অচিরে সাইবেরিয়া আক্রমণে প্রবৃত্ত হইবে। এ সম্বন্ধে আমরা 'ভারতবর্ষ'-এর একাধিক সংখ্যায় আমাদের অভিমত ব্যক্ত করিয়াছি, এক্ষেত্রে পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। অষ্ট্রেলিয়া আক্রমণ সম্বন্ধেও বহু গবেষক উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিয়াছেন। কিন্তু আমাদের অভিমত এক্ষেত্রেও পাঠকগণের অজ্ঞাত নাই। কেহ কেহ বলিতেছেন যে, জাপান ব্রহ্মদেশে যে সৈন্য আনিয়া রাখিয়াছে শুধু ব্রহ্মদেশ রক্ষার জন্য তাহা অতিরিক্ত। ভারত আক্রমণই জাপানের উদ্দেশ্য। তবে সিংহল আক্রমণের সময় এবং বঙ্গোপসাগরে নৌশক্তির সঙ্ঘর্ষে জাপান যে অভিজ্ঞতালাভ করিয়াছে তাহা সে এত শীঘ্র বিস্মৃত হয় নাই বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস। নূতন মার্কিণ সৈন্য ও সমরোপকরণ আনয়নের দ্বারা ভারতের সামরিক শক্তি সম্প্রতি যথেষ্ট বর্দ্ধিত হইয়াছে। তবে ভারতের আভ্যন্তরীণ অবস্থা বর্তমানে যে স্থানে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে তাহা বস্তুতই চিন্তার বিষয়। ভারতের জনসাধারণের প্রতিষ্ঠান কংগ্রেস হইতে আরম্ভ করিয়া প্রত্যেক দলই জাতীয় সরকারের দাবী জানাইতেছে। কংগ্রেস স্পষ্টই ঘোষণা করিয়াছে যে, সে জাপানকে সশস্ত্রে প্রতিরোধ প্রদানে করিতে ইচ্ছুক। কিন্তু এই প্রতিরোধ প্রদান করিতে হইলে এবং ভারতের জনগণকে আসন্ন ফ্যাসি আক্রমণের বিরুদ্ধে সঙ্ঘবদ্ধ করিতে হইলে প্রথমে তাহাদিগকে বোঝান প্রয়োজন যে, এই যুদ্ধ তাহাদেরই। এই শেষোক্ত উদ্দেশ্য সাধনের জন্য প্রয়োজন জাতীয় সরকার। এই জাতীয় সরকারের দাবী পূরণ না হইলে কংগ্রেসকে 'অহিংস সংগ্রামে' নামিতে হইবে—ইহাই গান্ধীজী, প্রমুখ কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত। কিন্তু এই 'সংগ্রামে' অবতীর্ণ হইবার পূর্বে কংগ্রেস মিঃ চার্চিল, প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট, বড়লাট এবং মার্শাল চিয়াংকাইশেকের নিকট কংগ্রেস-প্রস্তাবের নকল ও অভিমত প্রেরণের ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছে অর্থাৎ আলোচনার দ্বার এখনও উন্মুক্ত রাখিতেই কংগ্রেস ইচ্ছুক ছিল। কিন্তু ভারতসরকার অতি দ্রুত সর্বভারতীয় নেতাদের গ্রেপ্তার করায় এক বিশেষ অপ্রীতিকর অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে। ভারতবর্ষ মিত্রশক্তির সহিত ফ্যাসীবাদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র অবস্থায় সংগ্রাম করিতে যখন বদ্ধপরিকর, তখন ভারত সরকারের অনুসৃত নীতি সেই উদ্দেশ্যসাধনে বাধার সৃষ্টি করিবে কি না তাহা বিশেষ চিন্তার বিষয়। নেতৃবৃন্দের গ্রেপ্তারের প্রতিবাদ হিসাবে বহুস্থানে উত্তেজিত জনতা সমর প্রচেষ্টা ব্যাহত করিবার চেষ্টা করিতেছে। ভারত সরকারও কঠোর হস্তে এই অসংগঠিত আন্দোলন দমনে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। জনগণের বিক্ষোভের এই বহিঃপ্রকাশ যেমন বর্তমানে দেশের পক্ষে ক্ষতিকর, ভারত সরকারের দমন নীতির পন্থাবলম্বনও তেমনই ভারতের জনসাধারণের ফ্যাসী-বিরোধী মনোভাব জাগ্রত করিবার প্রতিকূল। চীনের, বিলাতের ও আমেরিকার বহু পত্রিকা এবং বিভিন্ন নেতারা আজ ভারতের এই সঙ্কটজনক মুহূর্তে বৃটেনের সহিত ভারতের একটা বুঝাপড়ার প্রয়োজনের কথাই উল্লেখ করিয়াছেন। আমরা আজ ভারত আক্রমণে উদ্যত ফ্যাসিশক্তিকে সর্বপ্রকারে বাধা প্রদানে ইচ্ছুক, সেই প্রচেষ্টায় সর্বতোভাবে সাহায্যের জন্য আমরা ভারত সরকারকে সহযোগিতার দাবী জানাই। এই সর্বগ্রাসী যুদ্ধে সাম্রাজ্য-বাদীরনীতি ও সমরকৌশল অচল, একমাত্র বিশ্ব-গণশক্তিই এই ফ্যাসিবাদকে প্রতিহত করিতে সক্ষম। ৩০।৮।৪২

শরৎ

কাদের নওয়াজ

শরতের ধান-ক্ষেত্, কাজলাপুকুর,
কৃষাণের মেঠো গান, মিঠে তার সুর।
কাশ-ফুলে, ঘাস-ফুলে ছাওয়া নদীতট,
উলুখড়-ঘেরা মাঠ, সেথা বুড়ো বট—
আকাশের পানে, চেয়ে আছে অনুখন,
শাখে তার ডাকে পাখী, হাওয়ার মাতন।
দীঘিতে কমল-বন, শাপ্‌লা-শালুক,
তীরে তার জল্‌-সাপ, ছাড়ে কঞ্চুক।

শঙ্খ-চিলেরা উড়ে প্রান্তর ছায়,
খঞ্জন, চেয়ে রয় নভো-নীলিমায়।
ভুঁই-চাপা নাচে—বনে সিউলি ফোটে,
হাসিয়া হিজল ফুল ধূলায় লোটে।
শরতের ঘুঘু-ডাকা মধুময়-ক্ষণ,
থাকি থাকি হিয়া মোর করে উচাটন।
মনে হয় কেশে মোর ধরে' নিক পাক্,
আজো আমি শিশু, তাই প্রজাপতি ঝাঁক

ধরিতে ছুটিয়া যাই, নেচে ওঠে মন,
শরৎ তোমারে কবি দেয় আবাহন।

পণ্ডীচেরীতে শ্রীঅরবিন্দ দর্শন

প্রিন্সিপাল শ্রীমুকুল দে

ইংরাজী ১৯১৯ সাল। আমি তখন মাদ্রাজে। বাংলাদেশের "টুয়েল্‌ভ্ পোর্ট্রেটস্" বইটা আমার ১৯১৭ সালে প্রকাশিত হ'য়েছে, তারপরই আমি বোম্বাই প্রভৃতি স্থান দক্ষিণ-ভারত ঘুরে মাদ্রাজে উপস্থিত হ'য়েছি। উদ্দেশ্য—ইংলণ্ড যাবার আগে নিজের দেশটা ভাল করে' দেখা এবং ইংলণ্ড যাবার পাথেয় উপার্জ্জন করা। তখনকার দিনের দক্ষিণ-ভারতে এমন কোন খ্যাতনামা লোক ছিলেন না—যাঁর পোর্ট্রেট্ আমি পেন্সিলে না এঁকেছি এবং তাঁদের বিশেষ সঙ্গ ও স্নেহলাভ না ক'রেছি।

আডেয়ারে থিয়োজফিক্যাল সোসাইটীর প্রচার বিভাগের প্রধান তখন মিঃ বি, পি, ওয়াডিয়া; মিসেস এনিবেসাণ্ট ও তিনি সব দেখে শুনে খুব খুশী ও উৎসাহিত হ'য়ে ব'ল্লেন—মুকুল দে, আমরাও এই রকম বই মাদ্রাজ থেকে বা'র ক'র্‌ব—শুধু তুমি পণ্ডিচেরীতে গিয়ে যদি কোনরকমে অরবিন্দ ঘোষের পোর্ট্রেট্‌টা এঁকে আন্‌তে পার। অরবিন্দের পোর্ট্রেট্ না হলে দক্ষিণ-ভারতের পোর্ট্রেট্ আঁকাতো সম্পূর্ণ হবেনা। আমি তখনি রাজী হ'য়ে গেলুম—নিশ্চয়ই করে' আন্‌ব। ক'রেও এনেছিলুম ঠিকই; ব্লকও কিছু কিছু তৈরী হ'য়েছিল জানি; কিন্তু আজ পর্য্যন্ত আডেয়ার হতে সে বই প্রকাশিত হয়নি বা তা'র দরুণ কোন ব্লক বা পয়সাও কিছু পাইনি। যাক্, তা'র চেয়ে বড়জিনিষ পেয়েছি।

মুখে তো বলে' এলুম—নিশ্চয়ই করে' আন্‌ব, ঘরে ফিরে ভাবনা হ'ল যে, যাই কি করে!—আবার পুলিশে সন্দেহ করে' পরে বিলেত যাওয়ার পাশপোর্ট বন্ধ করে' দেবে না তো? আমার ইংলণ্ড যাওয়াটা তখন আমি স্থির-সিদ্ধান্ত করে' ফেলেছি। যাইহোক্ ভেবেচিন্তে এক অদ্ভুত ধরণের খিচুড়ী পোষাকে সাজ্‌লুম—যাতে আমায় কেউ বাঙ্গালী ব'লে না চিন্‌তে পারে। মোজা জুতো, প্যাণ্ট, টাই, গায়ে লম্বা কোর্ট, তার উপর জাপান থেকে আনা আমার সেই স্পেশ্যাল টুপিটা—খানিকটা আজ-কালকার গান্ধীক্যাপের মত—পকেটে ভাঁজ করে' রাখা যায়, সময়মত মাথায় চড়ানো চলে। আমার চাল, চলন, পোষাক, পরিচ্ছদ দেখে লোকে আমায় গোয়ানীজ ভাব্‌ল, মাদ্রাজী ভাব্‌ল, কেউ বা ট্যাসফিরিঙ্গীও মনে ক'রল; কিন্তু বাঙ্গালী বলে' ভুল কেউই ক'র্‌ল না। কথা যা' দু' চারটে ব'লেছি—সবই মাদ্রাজীটানের ইংরাজী। এইভাবে তো ট্রেণটা নিরাপদে কাটিয়ে রাত প্রায় দশটা এগারটার সময় পণ্ডীচেরী ষ্টেশনে পৌঁছলুম। ষ্টেশনে পৌঁছেই ভাবনা—পৌঁছলুম তো—এখন উঠি কোথায়?—কেউ যদি ভাবে ভঙ্গীতে কথাবার্ত্তায় জান্‌তে পারে—আমি বিদেশী, অচেনা, নতুনলোক, বাঙ্গালী—তা হ'লেই তো মুস্কিল! আবার প'ড়্‌ব পুলিশের কবলে। সঙ্গে একখানি পরিচয়পত্র প্রশংসাপত্র, অনুমতি-পত্র কিছুই নেই। ভাব্‌বারও সময় নেই। তখনই যুক্তি ঠিক ক'রে নিয়ে মুখে চোখে খুব সপ্রতিভভাব এনে—যেন কতবার আসা যাওয়া ক'রেছি,—এম্‌নিভাবে ঘোড়ার গাড়ীর দিকে এগিয়ে গেলুম। গাড়োয়ানকে হুকুম ক'র্‌লুম—"চলো গ্র্যাণ্ড হোটেল ইউরোপীয়ান-ফরাসী হোটেল"—মনে আশা 'গ্র্যাণ্ড হোটেল' নিশ্চয়ই একটা থাক্‌বে।

গাড়োয়ান কিছুক্ষণ পরে ফণীমনসার কাঁটার ঝোঁপ্‌ওয়ালা বালির রাস্তা দিয়ে, একটা ইউরোপীয়ান হোটেলের সাম্‌নে এসে দাঁড়াল। ভাড়া চুকিয়ে দিয়ে হোটেলের ম্যানেজারকে চাইলুম—সবচেয়ে সস্তার একটা রুম। দৈনিক ছয় সাত টাকায় সবচেয়ে সস্তার রুমে এসে ঢুক্‌লুম। নীচের তলায় একখানি নীচুছাতের ঘর—ছাদ প্রায় মাথায় ঠেকে আর কি! যেমন অন্ধকার, তেম্‌নি স্যাঁৎসেঁতে, মাটী থেকে যেন জল উঠ্‌ছে,—দেয়ালগুলি সব নোনাধরা। ঘরে একটীমাত্র গোল ফুকর—ঘরে আলো হাওয়া আসার জন্য সেইটাই একমাত্র জানালা—সেই ফুকর দিয়েই সমুদ্রের হাওয়া একটু আস্‌ত, সমুদ্র দেখাও যেত। ঘরটা দেখ্‌তে যেন খানিকটা আমাদের এখানকার মিউজিয়মের গুদাম ঘরের মত। তখন সেই ঘরখানিতে ঢুকেই আমার আরামের নিঃশ্বাস প'ড়্‌ল—যাক্, একটা আস্তানা তো পাওয়া গেল!

কিন্তু যতক্ষণ না আসলকাজটা অর্থাৎ অরবিন্দ-অঙ্কন হ'চ্ছে, ততক্ষণ নিশ্চিন্ত নই—কাজেই রাতে ভাল ঘুম হ'ল না। ভোর হ'তেই উঠে পড়ে' তাড়াতাড়ি প্রস্তুত হ'য়ে একটু খেয়ে নিয়েই বেরিয়ে প'ড়্‌লুম রাস্তায়। পথে পথে ঘুরি, আর রাস্তা চিনি। বেশীরভাগ ঘুরি সমুদ্রতীরে—ভাবখানা যেন সমুদ্রতীরে হাওয়া খেতে এসেছি! কান রাখি কোথাও শ্রীঅরবিন্দের কোনকথা হ'চ্ছে কিনা, চোখ রাখি যদি সমুদ্রতীরে বেড়াতে বেরোন। কিন্তু কিছুই দেখতে শুন্‌তে পাইনা! ভয়ে কোন কথা কা'কেও জিজ্ঞেস ক'র্‌তেও পারি না—পাছে সব পণ্ড হয়। এইভাবে পথে পথে ঘুরে—রাস্তা চিনে—তিনদিন কেটে গেল।

চতুর্থ দিনে ২০শে এপ্রিল পেন্সিল পাত্‌তাড়ি বগলে সমুদ্রের ধারে ঘুরতে ঘুরতে একটা সেই দেশী আধা ভদ্রগোছের লোকের সঙ্গে আলাপ ক'র্‌লুম—পথ চ'ল্‌তে চ'ল্‌তেই। তারপর তাকে জিজ্ঞাসা ক'র্‌লুম—"অরবিন্দ ঘোষ লোকটা বেশ ভালই না? বেশ্ ঠাণ্ডা মেজাজের? কি বল তুমি?" সে বল্লে—"হ্যাঁ নিশ্চয়ই, সে খুবই ভাল লোক, আমার তো তাই মনে হয়। বেশ ঠাণ্ডা মেজাজ—কিন্তু কখনও বাড়ী থেকে সে বা'র হয়না, সেই পুরণো বাড়ীটার মধ্যেই সে রাতদিন থাকে।" তারপরই হঠাৎ বল্লুম—"এই দিকেই কোথায় বাড়ীটা না?" সে বল্লে—"না এদিকটায় নয়, ওদিকটায়, ঐ রাস্তায় বাড়ীটা"—আমি আর তাকে কোন প্রশ্ন না করে' বা প্রশ্ন করার সুযোগ না দিয়ে—তার গন্তব্যপথের একেবারে উল্টো পথটা ধ'র্‌লুম। ধরে'—একমনে ভগবানকে স্মরণ করে' শ্রীঅরবিন্দের বাড়ীর রাস্তা ধ'র্‌লুম। মনে ভয়, আশঙ্কা, উদ্বেগ—কী জানি দেখা হবে কিনা—পথে কোন বাধা পাব কিনা ইত্যাদি নানারকম।

তখন বেলা প্রায় এগারটা বারটা। চৈত্রমাসের দুপুর, রোদ ঝাঁ ঝাঁ ক'রছে, রাস্তায় জনমানব নেই বল্লেই হয়—খুব কম। আমি দুরু দুরু বুকে দুই একটা লোকের কাছে একটু আধটু জেনে নিয়ে বাড়ীটা ঠিক খুঁজে বা'র করলুম। ভাঙা পুরনো দোতলা একটা বাড়ী। দেওয়ালের রং কোন কালে হয়ত হ'লদে ছিল—এখন মাঝে মাঝে সবুজ শ্যাওলা ধ'রেছে—দেওয়ালের চুণ বালি খসে' পড়ে' মাঝে মাঝে লাল ইট বেরিয়ে প'ড়েছে। দোর জানালা সব খোলা হাঁ হাঁ ক'রছে। আস্তে আস্তে কম্পিত বুকে শঙ্কিত চোখে ভিতরে ঢ‍ুকলুম। উঠোনে কলাগাছ, পাতাগুলো সব ছেঁড়া; ঘাসে ও আগাছায় উঠোনে জঙ্গল এক হাঁটু। এখানে কয়লা, ওখানে কাঠ—জিনিষগুলো যেন ছড়ানো। কলাগাছের আশে পাশে দু' তিনটে বেড়াল ঘুমচ্ছে, ছাইগাদায় এখানে সেখানে চারদিকে বেড়াল, যেন বেড়ালের হোটেল!

একজন বাঙ্গালী পাত্‌লা মতন চেহারা—বোধ হয় রান্না কিংবা অন্য কোন কাজে ঘরের ভিতর ছিলেন। বেরিয়ে এসে জিজ্ঞাসা ক'র্‌লেন—"কি চাই আপনার?" আমি জিজ্ঞাসা ক'রলাম "এই বাড়ীতে কি শ্রীঅরবিন্দ থাকেন?" তিনি ব'ল্লেন "হ্যাঁ—থাকেন।"

আমি বল্লুম—"আমি তাঁর সঙ্গে একবার দেখা ক'রতে চাই। দেখা হবে কি?"

তিনি ব'ল্লেন—"আপনি কে? আপনি বাঙ্গালী?"

আমি বল্লুম—"হ্যাঁ আমি বাঙ্গালী, আমার নাম মুকুল দে।"

তিনি উপরে আমায় সঙ্গে করে' নিয়ে গেলেন।—

উপরে গিয়ে বারান্দায় একখানি কাঠের চেয়ারে বসিয়ে তিনি ব'ল্‌লেন—"আপনি বসুন, আমি খবর দিচ্ছি।"—চেয়ারটীও বহু কালের, বাড়ীটার মতই জীর্ণপ্রায় ভগ্নদশা—দেখ্‌লেই বোঝা যায় অনেক বয়স—রং পালিশের চিহ্নও নেই—সবটাই যেন ধুয়েমুছে ক্ষয়ে গেছে। বসে' আছি—বসে' বসে' আনন্দ, আশঙ্কা, উদ্বেগ কত রকমের দোলায় যে দোল খাচ্ছি, তা বলে' বোঝানো যায় না।

বসে' বসে' চারদিক দেখ্‌ছি। দেখি, দেয়ালে খান তিনেক ছবি ঝুলছে—মাসিকপত্রের পাতায় ছাপানো ছবি, কেটে বাঁধানো। দেখে মনে অনেকটা আশা ভরসা হ'ল—তা হ'লে ছবি ভালবাসেন। হঠাৎ দেখি বাঃ রে—তার মধ্যে একটা ছবি আমারই আঁকা, কোন মাসিকে বেরিয়েছিল—কলসী কাঁখে শ্রীরাধা জল আন্‌তে যাচ্ছেন—ছবির তলায় আমার নামটীও লেখা আছে। দেখে ভারী আনন্দ হ'ল—আচ্ছা যোগাযোগ তো! মনে একটা ভরসা ও সাহস হ'ল ছবিখানি দেখে। এই ছবিখানিই আমার পরিচয়পত্রের কাজ ক'র্‌বে। এসেছি যে—একেবারে অজানা অচেনা—সঙ্গে কারও লেখা একখানা পরিচয় পত্রও নেই।

এদিকে উনি তখন ধীরে ধীরে ঘর থেকে বেরিয়ে আস্‌ছেন। পরণে একখানি আট-হাতি লালপাড় ধুতি আধময়লা, হাঁটুর উপরে পড়েছে, কোঁচা নেই, আঁচলটী গলায় জড়ানো, খালি গা, খালি পা, মাথায় লম্বা চুল, মুখে দাড়ি, রোগা তপঃক্লিষ্ট চেহারা।—আমি দেখেই বুঝতে পার্‌লুম যে ইনিই শ্রীঅরবিন্দ—ঠিক যেন সেকালের ঋষি অথবা জীবন্ত যীশুখৃষ্টকে দেখলুম।

তিনি বল্লেন—"কী চাই আপনার?"

আমি বল্লুম—"আমার নাম মুকুল দে, আমি বাঙ্গালী, আপনার ছবি আঁক্‌ব বলে' এসেছি। আপনি তো ছবি ভালবাসেন?" বলে' দেওয়ালের ছবি দেখিয়ে ব'ল্‌লুম—"ওর মধ্যে আমার আঁকাও একটা ছবি আছে।"

একটু হেসে বল্লেন—"হাঁ ওটা আমার বেশ ভাল লাগে। আমি জানি।" তারপর আবার একটু হেসে বল্লেন—"তা বেশ, আমার কি ক'র্‌তে হবে?" আমি বললাম—"আপনাকে কিছুই ক'র্‌তে হবে না, শুধু চুপ্‌ করে' বসে' থাক্‌লেই হবে।"

"কতক্ষণ ব'স্‌তে হবে?"

"এই আধ ঘণ্টা, এক ঘণ্টা—"

"এখন বস্‌লে আঁক্‌তে পার্‌বেন?"

আমি একেবারে হাতে স্বর্গ পাওয়ার মত আনন্দে অভিভূত হ'য়ে—"হাঁ পারব" বলেই নিজের পাত্‌তাড়ি খুলে কাগজ পেন্সিল নিয়ে বসে' গেলুম। তিনিও একখানি পুরণো কাঠের চেয়ারে ব'স্‌লেন।
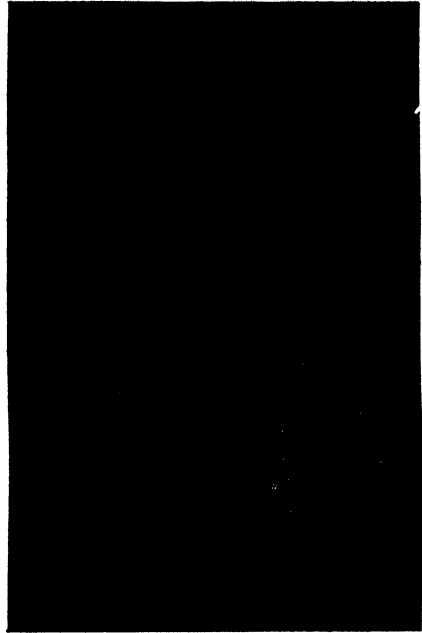
শ্রীঅরবিন্দ শিল্পী—শ্রীমুকুল দে অঙ্কিত

এত লোকের ছবি আমি এঁকেছি, কিন্তু আমার জীবনে আমি এমন ভাল সীটিং দিতে কা'কেও দেখিনি। পুরো একঘণ্টা আমি এঁকেছিলুম, তার মধ্যে একবার একটুও নড়েন নি, বা আমি একবারও তাঁর চোখের পলক পড়তে দেখিনি। চেয়ে আছেন তো চেয়েই আছেন, একভাবে একদিকে অপলক দৃষ্টিতে। বিস্ময়ে আনন্দে অভিভূত আমি প্রণাম করে', যা' আঁক্‌লুম তা' দেখালুম। বেশ খুসী হ'লেন। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখ্‌লেন। আমি ব'ল্‌তেই ইংরাজী বাংলায় নাম সই করে' দিলেন, তারিখ দিয়ে। আবার তার পরদিন আসব বলে' হোটেলে ফির্‌লাম। মনে যে সেদিন আমার কী আনন্দ, বিস্ময় ও পূর্ণতা তা' বলে' বোঝানো যায় না।

তারপর দিন ২১শে এপ্রিল। ভোরে উঠেই স্নান সেরে নিয়ে

একটু কিছু খেয়েই পেন্সিল কাগজ গুছিয়ে নিয়ে বেরিয়ে প'ড়লুম শ্রীঅরবিন্দ সকাশে। আর পথ খোঁজার কষ্ট নেই—চেনা পথে একেবারে সহজে তাঁর বাড়ী গিয়ে সোজা উপরে উঠে গেলুম। অবারিত দ্বার, সবই যেন খুব সহজ ও পরিচিত;—বারান্দার সেই চেয়ারটাতে গিয়ে ব'সলুম। একটু পরেই তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে এসে তাঁর চেয়ারটিতে বসলেন—তেমনি পাথরের মূর্ত্তির মত অনড় স্থিরভাবে—অপলক দৃষ্টিতে। এক ঘণ্টা সময়ে আমার আর একখানি হ'য়ে গেল। দেখ্‌লেন। নিজেই নাম সই করে' তারিখ দিয়ে দিলেন। আবার বিকেলে আস্‌ব বলে' বিদায় নিলুম। মনে আনন্দ—তিনদিক থেকে তিনখানা করে' নিয়ে যাব; নিশ্চয়ই তার মধ্যে সকলকে একখানা পছন্দ করতেই হবে।

আবার বিকেলের দিকে রওনা হ'লাম, নিজের পোর্টফোলিওটা বগলে করে'। নানান্ কথা মনে তোলাপাড়া ক'র্‌তে ক'র্‌তে। ইনিই সেই অরবিন্দ। কী আশ্চর্য্য—অদ্ভুত ইনি। বিলাত-ফেরৎ আই-সি-এস—বিপ্লব নেতা—কত গল্পই শুনেছি এঁর নামে—সে সবই কি সত্যি!—কী জানি···—

আবার সোজা বাড়ী ঢুকে, উপরের বারান্দায় আমার সেই চেয়ারটাতে ব'স্‌লাম—উনিও ঠিক একটু পরেই বেরিয়ে এলেন। তেমনি খালি গা, খালি পা, গলায় কাপড়, মুখে হাসি নিয়ে। উঠে প্রণাম করে' দাঁড়াতেই, হেসে গিয়ে নিজের চেয়ারটাতে ব'স্‌লেন। আমিও আঁক্‌তে আরম্ভ কর্‌লুম। এক ঘণ্টারও বেশী আঁক্‌লুম—কিন্তু আশ্চর্য্য, চোখের পলক প'ড়্‌তে দেখিনি! আঁকা হ'য়ে গেলে ওঁর কাছে নিয়ে এলুম। তৃতীয় খানিতেও নিজের নাম স্বাক্ষর করে দিলেন। মুখ তুলে আমার দিকে হেসে চাইতেই, আমি বল্লুম—"আপনাকে আমি দু' একটা কথা জিজ্ঞেস করব? আপনার সম্বন্ধে অনেক গল্প শুনেছি, খুব জান্‌তে ইচ্ছা করে। কিছু মনে ক'র্‌বেন না তো?"

হেসে ব'ল্লেন—"না, কি কথা বলুন, জিজ্ঞাসা করুন?"

আমি বল্‌লুম—"আপনি যখন বিলেতে ছিলেন, বিলেতে পড়াশোনা ক'রেছেন, তখন আপনার ইংরাজদের কি রকম লাগ্‌ত? ওদের উপর আপনার মনের ভাব তখন কি রকম ছিল?"

"তখন আমার মনের ভাব বন্ধুত্বপূর্ণ ও খুব ভালই ছিল। আমি ওদের সঙ্গে খুব মেলামেশা ক'রেছি। লণ্ডনে আমার অনেক বন্ধু ছিল।"

"তবে যে শুনেছি আপনি বাঙ্গালায় বিপ্লবী দলের নেতা ছিলেন? ভয়ানক ইংরাজ-বিদ্বেষী? এখন আপনার বৃটিশদের উপর মনোভাব কি রকম?"

"হ্যাঁ, যা শুনেছেন ঠিকই, আমি বিপ্লবী দলে ছিলাম। বিলাতে থাকার সময়েই আমি আমার নিজের দেশের কথা খুব ভাব্‌তাম। তারপর দেশে ফিরে এসে—আমার বৃটিশ-শাসন-নীতির উপর বিদ্বেষ হয়। কিন্তু এখন আমার বৃটিশের উপর বা কা'রও উপর কোন বিদ্বেষ নেই—রাগ নেই, এখন আমি বেশ শান্তিতে আছি।"

"আপনার রাগ দ্বেষ গিয়ে মনের এই পরিবর্ত্তন ও শান্তি কি করে' হ'ল?"

"আমি যখন দেশে বিপ্লবীদের সঙ্গে কাজ ক'র্‌তুম, তখন একজন সাধু মহাপুরুষের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। তাঁর কাছ থেকেই আমি যোগ প্রাণায়াম শিখি এবং অভ্যাস করি। তারপর আমি এখানে আসি এবং সকলের উপর থেকে রাগ দ্বেষ চলে' গিয়ে আমি এখানে বেশ শান্তিতে আছি।"

"আপনার যদি কোন রাগ দ্বেষ নেই কারও উপর, তো দেশে ফিরে চলুন না? শুনেছি আপনার স্ত্রী বেঁচে আছেন। তাঁর ছবি দেখেছি আমি, মনে হয় খুব সুন্দরী; তা' আপনি এখানে এরকম একা একা পড়ে' আছেন, দেশে ফেরেন না কেন? দেশে কি আপনি ফির্‌বেন না? কবে ফির্‌বেন দেশে?"

খানিকক্ষণ চুপ্ করে' থেকে ধীরে ধীরে বল্‌লেন—"হাঁ, ফির্‌ব। দেশ যখন বৃটিশ শাসন থেকে ফ্রী হবে।"

তারপর আর কোন কথা হয়নি। আমি তাঁর এত ভাল ভাল কথা শুন্‌তে পেয়ে এবং তিনটী ছবি আঁক্‌তে পেয়ে অন্তরের ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতাপূর্ণ প্রণাম করে' বিদায় চাইতেই তিনি বল্লেন—

"আপনার কাজ ও কথাবার্ত্তা আমায় খুব ভাল লেগেছে। আমি আশীর্ব্বাদ করছি—আপনার ভাল হোক।"

তাঁর পদধূলি ও আশীর্ব্বাদ মাথায় নিয়ে পরিপূর্ণ আমি, ঠিক একটী বিপুল সাম্রাজ্য জয় করার আনন্দ ও গৌরব নিয়ে সেই দিনেই পণ্ডীচেরী ছেড়ে মাদ্রাজের দিকে যাত্রা কর্‌লাম।

আমি যখন গিয়েছি, দেখেছি, তখন কোন কোলাহল, ভীড়, নিয়ম-কানুন, ভক্ত, পূজারি, পাণ্ডা, প্রতিহারী কিছুই ছিল না—দর্শনের জন্য কোন পরিচয়-পত্র প্রবেশপত্র লাগ্‌ত না। সবটাই ছিল সহজ, সরল, অনাড়ম্বর। সেদিনের প্রশ্ন ছিল অতি সরল, উত্তরও ছিল সহজ-সত্য।

আমি সেদিন পাণ্ডার পায়ে পড়ে' মন্দিরের দেবতা-দর্শন করিনি। আমি দেখেছি সত্য সুন্দরের উপাসক যোগী। আমাদের পুরণো ভারতের এক মহান্ ঋষি মূর্ত্তিকে। সেদিনের সেই ঋত্বিক মুখের হাসি ও প্রসন্ন দৃষ্টি আজও আমার ঠিক তেমনি অম্লানভাবেই মনে আছে।

শেষঘরে—শেষবাণী

শ্রীহেমলতা ঠাকুর

সময় আসিল পালা শেষ করিবার
বলি গেলে শেষ, যাহা ছিল বলিবার,
উচ্চারিলে শেষ বাণী ক্ষীণ কণ্ঠরবে—
"অক্ষয় শান্তির অধিকার লহ সবে"

দিলে নিজ সাধনার সর্ব্বশেষ ফল
সহজ বিশ্বাসে যার পথ সমুজ্জ্বল।
যে-জ্যোতিষ্ক আলো দিল, অন্তরের পথে—
চিনাইয়া দিলে তারে সমস্ত জগতে।

বলি গেলে—"তিনি শান্ত, শিব, অদ্বিতীয়,
তাঁর কাছে শেষ শান্তি নিও—চেয়ে নিও।"

জঙ্গম

বনফুল

২২

ছবির এবং ছবির স্ত্রীর টাইফয়েড হইয়াছে।

নিস্তব্ধ গভীর রাত্রি, শঙ্কর একা জাগিয়া বসিয়া আছে। শঙ্কর ছাড়া ইহাদের দেখিবার কেহ নাই। শঙ্করই ডাক্তার ডাকিয়াছে, ঔষধপত্র আনিতেছে, বেশী বাড়াবাড়ি হইলে রাত্রি জাগিয়া সেবাও করিতেছে। সমস্ত খরচও তাহারই, ছবি কপর্দ্দকহীন। ধার বাড়িতেছে। সেজন্য শঙ্কর ক্ষুব্ধ নয়, তাহার প্রধান ক্ষোভ লিখিবার সময় পাইতেছে না। রাত্রিটুকুই লিখিবার সময়। কিন্তু ছবিকে এমন অসহায় অবস্থায় ফেলিয়া যাওয়া যায় না। ছবির স্ত্রীও শয্যাগত। এ বাড়ির কেহই সুস্থ নয়। সাতটি সন্তান, কাহারও জ্বর, কাহারও সর্দ্দি, কাহারও চোখ উঠিয়াছে, কাহারও সর্ব্বাঙ্গে পাঁচড়া, একজনের হাঁপানি—অনাহারক্লিষ্ট রুক্ষ শীর্ণ সকলেই। দারিদ্র্যের ঠিক এই মূর্ত্তি বড় করুণ। যাহারা সমাজে সোজাসুজি গরীব বলিয়া পরিচিত তাহাদের দীনতা এমন মর্ম্মান্তিক নয়। কারণ তাহা প্রত্যাশিত সরল দীনতা। ইহা শুধু দীনতা নয়, ইহা দীনতা এবং দীনতাকে অপটুভাবে ঢাকিবার ব্যর্থ প্রয়াস বলিয়া অতিশয় করুণ। পচা জিনিসকে সুদৃশ্য আবরণ দিয়া ঢাকিবার চেষ্টা করিলে যাহা হয় ইহা তাহাই। তোষকের ছিট্‌টি সুন্দর, সুরুচির পরিচয় দিতেছে, কিন্তু সেই সুরুচির মর্য্যাদা রক্ষা করিতে গিয়া দ্বিতীয় তোষক প্রস্তুত করানো সম্ভবপর হয় নাই। এখন তাহা মলমূত্রে ভিজিয়া উঠিয়াছে; বাড়িতে দ্বিতীয় তোষক নাই, মলিন অংশটুকু কাপড় চাপা দেওয়া আছে, মাছি ভনভন করিতেছে। এমনি সব জিনিসেই। যে কাপটি দিয়া ঔষধপথ্য খাওয়ানো হইতেছে তাহা এককালে সুদৃশ্য ছিল, কিন্তু এখন তাহা হাতলহীন, ফাটা, ফাটার ফাঁকে ময়লা জমিয়া আছে। স্ত্রীর হাতে চুড়ি ঝকমক করিতেছে কিন্তু একটিও স্বর্ণের নহে, সমস্ত গিল্টি করা।

নিস্তব্ধ গভীর রাত্রি, শঙ্কর একা বসিয়া ভাবিতেছিল। লেখকেরা কাগজ কলম লইয়াই যে সর্ব্বদা লেখে তাহা নয় তাহারা মনে মনেও লেখে, শঙ্করও একা বসিয়া মনে মনে লিখিতেছিল। নূতনতম এক কাব্য-নীহারিকা তাহার মনের আকাশে ধীরে ধীরে মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিতেছিল।

ছবি প্রলাপ বকিতে লাগিল—ব্রাউনিঙের কবিতা! অসুখে পড়িয়াও বেচারি কবিতা ভোলে নাই। সহসা শঙ্করের মনে হইল এত সাহিত্যরস পান করিয়াও তাহার এই দুর্দ্দশা কেন? সব-দিক দিয়াই সে তো অমানুষ। মনে প্রশ্ন জাগিল সাহিত্য দিয়া সত্যই কি কাহারও উপকার করা যায়? অন্ধকারে আলেয়ার পিছনে অথবা উষর মরুভূমিতে মরীচিকার পিছনে ছুটিয়া যাহারা পথ হারাইয়া ফেলে সে-ও তাহাদেরই মতো একটা মিথ্যা আদর্শকে লক্ষ্য করিয়া ছুটিতেছে না তো?

২৩

ইন্দু সামলাইয়াছে বটে, কিন্তু সম্পূর্ণ সারে নাই। ইন্দুর মুখেই ভন্টু শুনিল যে এই সময়ে তাহার নাকি একটা কঠিন ফাঁড়াও আছে। ভন্টু আর স্থির থাকিতে পারিল না, করালিচরণের উদ্দেশ্যে বাইকে চড়িয়া বাহির হইয়া পড়িল। ঝামাপুকুরের গলিতে ঢুকিয়া সে দেখিতে পাইল পানওয়ালির দোকানটা খোলা নাই। খোলা থাকিলে সুবিধা হইত, তাহার নিকট হইতে করালিচরণের সম্বন্ধে কিছু তথ্য সংগ্রহ করিয়া তদনুসারে নিজেকে প্রস্তুত করিয়া লইতে পারিত। এতদিন পরে দেখা, বেফাঁস কিছু বলিয়া ফেলিলে চামলদ হয়তো খেপিয়া উঠিতে পারে। যা লোক, কিছুই বলা যায় না। ভন্টুর সাংসারিক অবস্থা যখন মন্দ ছিল, তখন সে করালিচরণকে অতিশয় ভয় ও সমীহ করিয়া চলিত। এখন অবশ্য ঠিক তাহার মনের সে ভাব নাই তবু করালিচরণের সম্মুখীন হইতে সে কেমন যেন ইতস্তত করিতেছিল। ইন্দুমতীর ফাঁড়ার খবরটা কর্ণগোচর না হইলে সে হয়তো আসিতই না।

সে ঢুকিতে ইতস্তত করিতেছিল, তাহার কারণ সে প্রতিশ্রুতি-রক্ষা করে নাই। সে করালিচরণকে কথা দিয়াছিল যে তাহার বাসার তত্ত্বাবধান করিবে, কিন্তু বহুকাল সে এদিকে আসে নাই। করালিচরণের কুড়িটা টাকাও তাহার কাছে আছে। আছে মানে পাওনা আছে। সঙ্গে নাই।

খানিকক্ষণ এদিক ওদিক চাহিয়া অবশেষে ভন্টু আগাইয়া গেল। দেখিল দরজা বন্ধ। ঠেলিবামাত্রই কিন্তু খুলিয়া গেল।

"কে—"

ভন্টু সবিস্ময়ে দেখিল করালিচরণ টেবিলটাকে ঘরের এক কোণে টানিয়া লইয়া গিয়াছেন। বোতলের মুখে মোমবাতি জ্বলিতেছে, টেবিলের একধারে একগাদা বই স্তূপীকৃত করা আছে। করালিচরণ ঝুঁকিয়া কি যেন করিতেছিলেন, শব্দ পাইয়া ঘাড় ফিরাইয়াছেন।

"আমি ভন্টু।"

করালিচরণ ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া একচক্ষুর দৃষ্টি দিয়া কিছুক্ষণ তাহার মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন। চিবুকটা একবার কুঞ্চিত ও প্রসারিত হইল।

"ভন্টু? ভন্টু কে—"

ভন্টু চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

"বাই নারায়ণ, দাঁড়িয়ে রইলেন কেন, এগিয়ে আসুন না, মুখখানা দেখি একবার—"

ভন্টু তাহার কথাগুলো ঠিক যেন বুঝিতে পারিতেছিল না।

তবু একটু আগাইয়া গেল।

ভন্টুর মুখের উপর একচক্ষুর দৃষ্টি আরও ক্ষণকাল নিবদ্ধ রাখিয়া করালিচরণ চুপ করিয়া রহিলেন। তাঁহার দৃষ্টিতে শঙ্কা ও ক্রোধ যুগপৎ ঘনাইয়া উঠিল।

"ও আপনি। বসুন।"

এইবার ভন্টু বুঝিতে পারিল কেন সে করালিচরণের কথা বুঝিতে পারিতেছিল না। করালিচরণের দাঁত নাই, সমস্ত মুখটাই যেন তুবড়াইয়া গিয়াছে।

ভন্টু প্রশস্ত চৌকিটির একধারে উপবেশন করিল।

"কিছু মনে করবেন না, নামটা আপনার মনে ছিল না। আপনি যদি শেক্‌সপিয়ার, মিল্টন, ডারবিন, ক্যারাডে বা ওদের মতো কেউ হতেন তাহলে হয়তো থাকতো"

একটু থামিয়া অস্ফুটকণ্ঠে পুনরায় বলিলেন, "বাই নারায়ণ" বিড়-বিড় করিয়া আরও খানিকটা কি বলিলেন ভন্টু বুঝিতে পারিল না। সে মনে মনে স্বগতোক্তি করিল—"চামলদ্‌ ভীমজালে ফেলবার অ্যারেঞ্জমেণ্ট করছে দেখছি—"

প্রকাশ্যে বলিল—"আমার নতুন বাসার ঠিকানা পানউলি জানত। আপনি যদি একটু খবর—"

"আমি যখন এলাম তখন ঠিকানা বলবার মতো অবস্থা ছিল না পানউলির। সে তখন বিকারের ঘোরে প্রলাপ বকছিল এই চৌকিতে পড়ে পড়ে। মুখে এক ফোঁটা জল দেবার লোক ছিল না কাছে—"

করালিচরণ যেন আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিলেন।

ভন্টু কি বলিবে ভাবিয়া পাইল না। করালি কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া সহসা আবার বলিয়া উঠিলেন, "বেশ হয়েছে, বেশ্যা মাগীর কাছে আসবে কে?"

চিবুক কুঞ্চিত ও প্রসারিত হইল। এক চক্ষুর প্রখর দৃষ্টি পুনরায় তিনি ভন্টুর মুখের উপর নিবদ্ধ করিলেন। ভন্টুর মনে হইল যেন তাহার কপালে কেহ শলাকা বিদ্ধ করিয়া দিতেছে।

ভন্টু বিস্ময় প্রকাশের ভান করিয়া বলিল, "পানউলির কাছে কেউ ছিল না?"

বিব্রতভাবটা সামলাইয়া লইয়া কোনক্রমে প্রশ্নটা করিল।

"মোস্তাক ছিল, কিন্তু মোস্তাক তখন একপাল কুকুর বাচ্ছা সামলাতে ব্যস্ত"

চৌকির অপর প্রান্তে পুঞ্জীভূত অন্ধকারটা হঠাৎ নড়িয়া উঠিল।

"না না তুমি ঘুমোও, তোমার কোন দোষ দিচ্ছি না। তুমি ঠিকই করেছিলে। একটা মরমর বুড়ি বেশ্যার মুখে দু'ফোঁটা জল দেওয়ার চেয়ে কচি কচি কুকুরবাচ্চা ঘাঁটা ঢের বেশী আর্টিষ্টিক। তুমি একজন আর্টিষ্ট। ঘুমোও তুমি, উঠো না"

মোস্তাক গুটি মারিয়া চুপ করিয়া শুইয়া রহিল, উঠিল না।

ভন্টুও চুপ করিয়াই রহিল, এই পরিবর্ত্তিত করালিচরণ বক্সিকে কোন কথা বলিতে তাহার সাহসেই কুলাইতেছিল না। অথচ একদিন ইহার সহিত তাহার কত হৃদ্যতাই ছিল। অনেক দিন আগেকার একটা ছবি ভন্টুর মনে পড়িল। নৈহাটি ষ্টেশনে বসন্ত রোগাক্রান্ত ভীড়পরিবৃত অসহায় করালিচরণের ছবিটা। কত অসহায়! ভন্টুই দয়াপরবশ হইয়া সেদিন তাহাকে তুলিয়া আনিয়া হাসপাতালে দিয়া আসিয়াছিল। অথচ ইহারই সহিত এখন কথা কহিতে সাহসে কুলাইতেছে না। তাহার মনে হইতে লাগিল চেহারা বদলাইয়া গেলে মানুষটাই বদলাইয়া যায় হয়তো। যাহার গোঁফদাড়ি ছিল না সে যদি বহুকাল পরে একমুখ গোঁফদাড়ি লইয়া হাজির হয় তাহা হইলে তাহার সহিত পূর্ব্বেকার সহজ সম্পর্ক পুনঃস্থাপন করিতে কেমন যেন বাধবাধ ঠেকে। করালিচরণের দন্তহীন তোবড়ানো মুখের পানে চাহিয়া ভন্টু চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

করালিচরণই কথা কহিলেন, "আচ্ছা, ভন্টুবাবু, কল্পনা বলে কোন বালাই আছে আপনার মধ্যে?"

"আজ্ঞে?"

"আপনি কল্পনা করতে পারেন?"

"একটু একটু পারি হয়তো"

"পারেন? কল্পনা করতে পারেন একটা কঙ্কালসার কদাকার বুড়ি বেশ্যা অনাহারে বিনাচিকিৎসায় মরছে, তার মৃত্যু সময়ে মুখে এক ফোঁটা জল দেবার লোক কেউ কাছে নেই? কদাকার মুখ ভাল করে দেখেছেন কখনও? গালের হাড় উঁচু, কপালের শির বার করা, বড় বড় দাঁত, তাতে আবার মিশি লাগানো—"

করালিচরণ হয়তো বর্ণনাটা আরও ফলাও করিয়া করিতেন কিন্তু কুঁই কুঁই করিয়া একটা শব্দ হওয়াতে তাঁহাকে থামিয়া যাইতে হইল। মোস্তাক তড়াক করিয়া লাফাইয়া উঠিল এবং নিঃশব্দে ঘরের কোনে আলমারির পাশটায় গিয়া ঝুঁকিয়া দেখিতে লাগিল। তাহার পর কাহাকেও কিছু না বলিয়া কোন দিকে না চাহিয়া রুদ্যমান বাচ্ছাগুলিকে বগলদাবা করিয়া সে বাহির হইয়া গেল।

"মা-টা আবার বোধহয় পালিয়েছে। বাই নারায়ণ!"

করালিচরণের চিবুক কুঞ্চিত ও প্রসারিত হইল।

ভন্টু ভাবিতেছিল কোনও ছুতায় এই ভীমজাল ছিন্ন করিয়া এইবার পলায়ন করা উচিত। কোষ্ঠীগণনা করাইবার আশা সে বহুপূর্ব্বেই বিসর্জ্জন দিয়াছিল। আর একদিন আসা যাইবে। আজ চাম্‌লদ বিরক্তি-মাউণ্টেনের তুঙ্গে আরোহণ করিয়া বসিয়া আছে।

হঠাৎ কর্কশকণ্ঠে করালিচরণ পুনরায় প্রশ্ন করিলেন, "দেখেছেন কখনও কদাকার মুখ? শুধু কদাকার নয়, তৃষিত, মুমূর্ষু, যে তার কুৎসিত হাসি আর কদর্য্য কটাক্ষ দিয়ে আজীবন লোক ভোলাবার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু একজনকেও ভোলাতে পারে নি, একটা লোকও তার আপন হয়নি, তার মৃত্যুকালে কেউ কাছে আসেনি—দেখেছেন এরকম কখনও?"

"মানে—আমি অবশ্য তাকে"

"মিছে কথা বলবেন না, আমি জানি আপনি দেখেন নি, আমিও দেখি নি। চোখ থাকলেই দেখা যায় না, চোখের সামনে থাকলেও না—"

"পানউলির কথা বলছেন তো?"

"ঠিক ধরেছেন। তাহলে শুধু আমার চোখে নয়, আপনার চোখেও সে কুচ্ছিৎ ছিল। বাই নারায়ণ, পৃথিবীতে কেউ ভাল চক্ষে দেখত না মাগীকে"

মরিচা-ধরা একটা টিনের কৌটা খুলিয়া করালিচরণ একটি আধপোড়া বিড়ি বাহির করিলেন এবং সেটি মোমবাতির শিখায় ধরাইয়া লইয়া নীরবে টানিতে লাগিলেন। তাহার পর সেটা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া বলিলেন, "ভালই হল, চলে যাবার আগে আপনার সঙ্গে দেখাটা হয়ে গেল"

"কোথা যাচ্ছেন আপনি"

"ঠিক করিনি এখনও"

"কবে যাবেন"

"তাও ঠিক করি নি"

কিছুক্ষণ চুপচাপ।

করালিচরণই পুনরায় কথা কহিলেন, "আজ হঠাৎ এলেন যে, কোন দরকার ছিল নিশ্চয়"

"একটা কুষ্ঠী দেখাতে এনেছিলাম"

"গণনা করা আজকাল ছেড়ে দিয়েছি। ও শাস্ত্রে আমার বিশ্বাস নেই। 'জ্যোতিষ শাস্ত্রের ব্যর্থতা' নাম দিয়ে একখানা বই লিখছি—এই দেখুন—"

একটা খাতা তুলিয়া দেখাইলেন।

"জ্যোতিষ শাস্ত্রে বিশ্বাস নেই ?"

"না"

করালিচরণের চক্ষুটা দপদপ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল।

"আপনি দ্রাবিড় থেকে ফিরলেন কবে ?"

করালিচরণ গুম হইয়া রহিলেন।

"হাত দেখে জন্মতারিখ বার করতে পারে এরকম জ্যোতিষী কোলকাতায় বেশী নেই। আপনি যদি—"

"চুপ করুন"

অপ্রত্যাশিত ধমক খাইয়া ভন্টু থামিয়া গেল।

করালিচরণ বলিয়া উঠিলেন, "কুষ্ঠি ফুষ্ঠী দেখে কচু হয়। ও সব ছিঁড়ে কুঁচিকুঁচি করে' নর্দ্দমায় ফেলে দিন গে যান। সব মিথ্যে, বাজে, রাবিশ—"

করালিচরণ প্রায় চীৎকার করিয়া উঠিলেন। টেবিলের বই গুলি দুই হাত দিয়া ঠেলিয়া মাটিতে ফেলিয়া দিতে দিতে রুদ্ধ আক্রোশে তর্জ্জন করিতে লাগিলেন "মিথ্যে, মিথ্যে, মিথ্যের স্তূপ সব, জঞ্জাল—"

ভন্টু ভয় পাইয়া দাঁড়াইয়া উঠিল।

"কি করছেন আপনি—বকসি মশাই"

"বকবক করবেন না, বাড়ি যান"

ভন্টু স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

"এখনও দাঁড়িয়ে আছেন যে"

"একটি কথা শুধু জানতে চাই যদি দয়া করে' বলেন"

"না, বলব না"

তাহার পর কি মনে করিয়া বলিলেন, "আচ্ছা কি বলুন"

"জ্যোতিষ শাস্ত্রে আপনার অবিশ্বাস হল কেন"

"বিশ্বাস অবিশ্বাসের আবার কেন আছে না কি"

"না, এতদিন যাতে আপনার অগাধ বিশ্বাস ছিল—যা আরও ভাল করে' শেখবার জন্যে আপনি দ্রাবিড় গেলেন—কাজ হঠাৎ—"

করালিচরণ বোমার মতো ফাটিয়া পড়িলেন।

"বেরিয়ে যান, বেরিয়ে যান, বেরিয়ে যান বলছি—"

করালিচরণের চোখমুখ এমন হইয়া উঠিল যে ভন্টু আর ঘরের ভিতর থাকা সমীচীন মনে করিল না, সভয়ে বাহির হইয়া গেল। করালিচরণ দড়াম করিয়া কপাটটা বন্ধ করিয়া দিলেন। ভন্টু বাহিরে আসিয়া দেখিল মোস্তাক একটা ল্যাম্প-পোষ্টের নীচে একটা কালো কুকুরীকে জোর করিয়া চাপিয়া শোয়াইয়া রাখিয়াছে, বাচ্চাগুলি মহানন্দে স্তন্যপান করিতেছে। ভন্টু ক্ষণকাল দাঁড়াইয়া দেখিল তাহার পর বাইকে চড়িয়া গলি হইতে বাহির হইয়া গেল। অপমানে তাহার কানের দুইপাশ গরম হইয়া উঠিয়াছিল। করালি যে তাহার সহিত এমন ব্যবহার করিতে পারে ইহা তাহার স্বপ্নাতীত ছিল।

কপাট বন্ধ করিয়া দিয়া করালিচরণ দ্বারে কান লাগাইয়া রুদ্ধশ্বাসে দাঁড়াইয়া ছিলেন। রাগ নয় তাঁহার ভয় হইতেছিল। ভন্টু হয়তো যাইবে না, এখনই হয়তো ফিরিয়া আসিয়া তাঁহার বিশ্বাস-অবিশ্বাসের নিগূঢ় রহস্যটি জোর করিয়া তাঁহার নিকট হইতে জানিয়া লইবে। কিছুতেই তিনি হয়তো বাধা দিতে পারিবেন না। দ্রাবিড়ে গিয়া করকোষ্ঠী হইতে নিজের জন্ম-তারিখ উদ্ধার করিয়া তিনি নিঃসংশয়রূপে জানিয়াছেন যে তাঁহার মা বেশ্যা ছিলেন। এই নিদারুণ কথা পৃথিবীতে আর কেহ জানিবে না। না, আর দেরী করা নয়, এখনই কলিকাতা ত্যাগ করিতে হইবে। এখনই হয়তো ভন্টুবাবু একদল চেনা লোক লইয়া হাজির হইবেন। ভন্টুকে তিনি মিথ্যা কথা বলিয়াছিলেন, তাহার নাম মোটেই তিনি বিস্মৃত হন নাই, তাহারই আগমন আশঙ্কায় অতি ভয়ে ভয়ে দিনপাত করিতেছিলেন। বাড়িটা বিক্রয় করিবার জন্যই কলিকাতায় আসা। নিদারুণ অর্থাভাব ঘটিয়াছে। সে ব্যাপার তো আজ চুকিয়া গেল। আর দেরী করিয়া কি হইবে। করালিচরণ হাতের কাছে যাহা পাইলেন একটা পুঁটুলিতে বাঁধিয়া লইলেন। তাহার পর সন্তর্পণে দ্বার খুলিয়া চাহিয়া দেখিলেন—কোথাও কেহ নাই, মোস্তাকও চলিয়া গিয়াছে। তিনি বাহির হইয়া পড়িলেন এবং প্রায় উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিতে লাগিলেন।

"এই ট্যাক্সি—"

ছুটন্ত ট্যাক্সিটা থামিতেই করালিচরণ তাহাতে চড়িয়া বলিলেন "হাওড়া, জল্‌দি"

হাওড়ায় পৌঁছিয়া দেখিলেন একখানা ট্রেণ ছাড়িতেছে। বিনা টিকিটেই তাহাতে তিনি চড়িয়া বসিলেন।

২৪

দিনকয়েক পরে ভন্টুর মনে পড়িয়া গেল শঙ্করের বাবার উইলটা তো করালিচরণের কাছে আছে। শঙ্করকে খবর দিয়া উইলটা অবিলম্বে উদ্ধার করিয়া আনা প্রয়োজন। তাহার নিজের আর করালিচরণের বাসায় যাইতে সাহস হইতেছিল না, প্রবৃত্তিও হইতেছিল না। লোকটার উপর সে বীতশ্রদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিল। লোকটা বিদ্বান হইতে পারে কিন্তু অত্যন্ত অভদ্র। ভন্টু এখন আর সে ভন্টু নাই। আপিসে তাহার পদোন্নতি হইয়াছে, নিম্নতন অনেক কেরাণী তাহাকে দুইবেলা ঝুঁকিয়া নমস্কার করে। যেখানে সেখানে যখন তখন আগেকার মতো অদ্ভুত বাক্যাবলী উচ্চারণ করিয়া সে আর ভাঁড়ামি করে না। তাহার চরিত্রে পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। হাজার হোক সে একটা ডিপার্টমেণ্টের বড়বাবু, জুলফিদার কন্যা ইন্দুবালার স্বামী। করালিচরণের সেদিনকার অপমানটা তাহার গায়ে লাগিয়াছিল। উইলটা কিন্তু উদ্ধার করিতে হইবে যেমন করিয়া হোক। শঙ্করকে অন্তত খবরটা দেওয়া দরকার। ইন্দুর জন্য একবাক্স ওভালটিন বিস্কুটও কিনিয়া আনা দরকার। ভন্টু বাইকে চড়িয়া বাহির হইয়া পড়িল।

শঙ্করের বাড়ির দরজায় নামিয়া ভন্টু খানিকক্ষণ বাইকের ঘণ্টা বাজাইল। শুধু ভন্টু নয় অনেকেরই ধারণা বাড়ির সামনে দাঁড়াইয়া বাইকের ঘণ্টা বা মোটরের হর্ণ বাজাইলেই বাড়ির ভিতর হইতে লোকজন ছুটিয়া বাহির হইয়া আসিবে; ডাকিবার

প্রয়োজন নাই। অনেকে বাহির হইয়া আসেও। শঙ্কর আসিল না, কারণ শঙ্কর বাড়িতে ছিল না। ভন্টুকে অবশেষে বাইকটি দেওয়ালে ঠেসাইয়া বারান্দার উপর উঠিয়া কড়া নাড়িতে হইল। অমিয়া খিড়কি হইতে জানালা ফাঁক করিয়া দেখিল এবং নিত্যানন্দকে মৃদুকণ্ঠে বলিল, "ভন্টুবাবু এসেছেন"

নিত্যানন্দ কয়েকদিন হইতে শঙ্করের বাসায় আসিয়া উঠিয়াছে। শঙ্কর ছবির বাসা হইতে ফেরে নাই।

"দাদা বাড়ি নেই"—নিত্যানন্দই গলা বাড়াইয়া বলিল।

"কোথা গেছে, কখন ফিরবে?"

"ঠিক জানি না। যদি কিছু বলবার থাকে বলে যান"

"সে অপরকে বললে চলবে না, তাকেই বলতে হবে। আচ্ছা আমি পরে আসব"

ভন্টু চলিয়া গেল।

নিত্যানন্দ অমিয়াকে বলিল, "কি যে একটা বাজে ব্যাপার নিয়ে দাদা সময় নষ্ট করছেন!—ক্রমাগত লোক এসে ফিরে যাচ্ছে।"

অমিয়া শুধু একটু হাসিল।

"কিচ্ছু ভাল লাগছে না, একটু চা কর দিকি বৌদি"

"করি"

ওভালটিন্ বিস্কুট কিনিয়া ভন্টুর মনে হইল ঝামাপুকুরটা একবার ঘুরিয়া গেলে হয়। ভিতরে না ঢুকিলেই হইল, বাহির হইতে চাম্‌লদের হালচালটা দেখিয়া যাইতে ক্ষতি কি। করালিচরণের বাড়ির সম্মুখে আসিয়া কিন্তু ভন্টুকে বাইক হইতে নামিতে হইল—বাড়িতে তালা বন্ধ, সম্মুখে "টু লেট" ঝুলিতেছে। মোড়ের পানের দোকানটা খোলা আছে বটে, কিন্তু সেখানে পানউলি নাই—ছোকরা গোছের আর একজন বসিয়া পান বেচিতেছে। তাহারই নিকট ভন্টু সমস্ত সংবাদ পাইল। দোকানটা পানউলির নিজস্ব ছিল না, অপরের দোকানে সে চাকুরি করিত। কিছুদিন পূর্ব্বে অসুখ হওয়াতে দোকানের মালিক তাহাকে ছাড়াইয়া দেয়। তখন পানউলি করালিচরণের বাসাতেই আশ্রয় লইয়াছিল। করালিচরণ যেদিন আসিয়া পৌঁছিলেন সেইদিনই তাহার মৃত্যু হয়। করালিচরণ-প্রসঙ্গে ছোকরাটি উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল।

"অমন লোক হয় না বাবু, বুঝলেন। কি ধুমধাম করে ছাদ্দটা করলে পানউলির, লোকজন কাঙাল গরীব কত যে খাওয়ালে! পানউলি মরে যাওয়াতে হাউ হাউ করে সে কি কান্না মশাই, যেন আপনার লোক মরেছে কেউ, নিজে কাঁধে করে' নিয়ে গেল, —লোক ছিল বটে"

তাহার নিকটই ভন্টু শুনিল করালিচরণ বাড়িটি বিক্রয় করিয়া চলিয়া গিয়াছে। কোথায় গিয়াছে কেহ জানে না।

ক্রমশঃ

মুহ্যমান

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

১

বংশী আমার ধূলি ধূসরিত
ভুলে গেছি গান গাওয়া,
পল্লী বাতাস দূষিত করিল
কোন 'ককেসাসী' হাওয়া।
উড়ো জাহাজের ঘর্ঘর ধ্বনি,
করে ভীতিময় স্নেহের অবনী,
ধ্বংস এবং মরণের লাগি
শঙ্কায় পথ চাওয়া।

২

রুদ্ধ হইয়া আসিছে কণ্ঠ,
চক্ষে ঝরিছে জল;
কে জানিত হবে যুগ সভ্যতা
এতখানি নিষ্ফল।
তাসের ঘরের মত ভাঙে সব,
যা ছিল মুখর আজিকে নীরব,
প্রলয় পয়োধি কল্লোলে কাঁপে
লাঞ্ছিত ধরাতল।

৩

নিতি নব নব দুখ যন্ত্রণা
উচাটন করে প্রাণ
আনো দয়াময় বিপদবারণ
জগতের কল্যাণ।
কর দম্ভীর ক্ষমতার লোপ,
অত্যাচারের পূর্ণবিলোপ,
কর সন্তোষ শান্তি ভক্তি
সেবা অধিকার দান।

৪

জীবন লইয়া চলেছে যে ঘোর
সমুদ্র মন্থন,
কি সুধা উঠিবে—মোরা ত জানিনে
তুমি জানো নারায়ণ।
হেরি চৌদিকে শুধু হলাহল,
দুর্ব্বল প্রাণ ভীত চঞ্চল,
হে নীলকণ্ঠ রক্ষ রক্ষ
কর পাপ বিমোচন।

বিচিত্র বেতার

শ্রীদেবপ্রসাদ সেনগুপ্ত

পঞ্চাশ বছর আগে কে একথা স্বপ্নে ভাবতে পেরেছিল যে, সাত সমুদ্র তেরো নদীর পারে কোথায় কোন দেশ, আর সেখানে কে বক্তৃতা দেবেন, কে গান গাইবেন, আর আমরা তাই দূরে বসে শুনতে পাব! এখন আর আমরা এতে আশ্চর্য্য হইনা, মনে হয় এটা না হলেই অস্বাভাবিক হত। এখন ঘরে ঘরে রেডিও, কত সহজে শুধুমাত্র একটা চাকা ঘুরিয়ে আমরা কখনও আমেরিকা থেকে প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টের কথা শুনছি, কখনও মস্কোর খবর শুনছি, আবার কখনও বা চীন দেশের গান শুনছি। বেতারের কল্যাণে দূর আজ আর দূর নেই। কিন্তু যার জন্য আজ কাল বেতারে সংবাদ আদান-প্রদান সম্ভবপর হয়েছে, সেই ইতালীয় বৈজ্ঞানিক মার্কোনির নিজেরও কিন্তু গোড়াতে যথেষ্ট সন্দেহ ছিল যে অনেক দূরে বেতারে সংবাদ দেওয়া-নেওয়া সম্ভব হবে কিনা। উনিশ শতকের একেবারে শেষভাগে তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, "আপনার বেতার যন্ত্রের সাহায্যে কতদূর পর্য্যন্ত খবরাখবর চলতে পারে বলে আপনি মনে করেন?" এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি যে জবাব দিয়েছিলেন তা শুনলে আজকে হয়ত অনেকেরই হাসি পাবে। তিনি বলেছিলেন, "বিশ মাইল পর্য্যন্ত।" "কিন্তু বিশ-মাইলেতেই আপনি সীমা নির্দ্দেশ করলেন কেন?" "কারণ তার বেশী দূরে যে বেতারে সংবাদ আদান-প্রদান বা কথাবার্ত্তা চলতে পারে তা আমি বিশ্বাস করিনা।" এই ছিল মার্কোনির উত্তর।

কিন্তু তিনি সেদিন বিশ্বাস না করলেও আজ আর অবিশ্বাসের কোন স্থান নেই। এই বেতার বিজ্ঞানের মূল কথাটি হ'ল ইলেকট্‌সিটি, বা বিদ্যুৎ। তাই বিদ্যুৎ সম্বন্ধে কয়েকটা দরকারী কথা আমাদের জানা প্রয়োজন। সত্য কথা বলিতে কী, এই বিদ্যুৎ জিনিষটি যে কী সে কথা বলা বড় শক্ত, হয়ত কেউই বলতে পারবেন না। তবে এর ব্যবহার বা প্রয়োগ সম্বন্ধে অনেক কথাই আজ আমরা জানতে পেরেছি।

শুক্‌নো-চুলে যদি হাড়ের চিরুণী দিয়ে বারবার আঁচড়ানো যায় তবে ঐ চিরুণীতে একটা বড় মজার গুণের আবির্ভাব হয়। ছোট ছোট কাগজের টুক্‌রোর সামনে চিরুণীটি ধরলে দেখা যাবে যে কাগজের টুকরাগুলি লাফিয়ে লাফিয়ে চিরুণীটির গায়ের উপর পড়ছে এবং পরক্ষণেই ছিট্‌কে বেরিয়ে যাচ্ছে। একটুক্‌রো এ্যাম্বারকে (Amber) যদি একখণ্ড ফার (fur) দিয়ে, কয়েকবার ঘষে' কাগজের টুকরায় সামনে ধরা যায়, তা' হ'লেও ঠিক একই ব্যাপার ঘটবে। কিন্তু কেন এমন হয়? বিজ্ঞানের ভাষায় বলা হয়, এদের উপর বিদ্যুৎ জমা হয়েছে। বৈজ্ঞানিকেরা স্থির করেছেন যে বিদ্যুৎ আছে দুই প্রকার—যেমন মানুষের মধ্যে রয়েছে পুরুষ এবং নারী। এদের নাম দেওয়া হয়েছে ধনবিদ্যুৎ বা পজিটিভ ইলেক্‌ট্রিসিটি এবং ঋণবিদ্যুৎ বা নেগেটিভ্‌ ইলেক্‌ট্রিসিটি। এদের আচার-ব্যবহারও অনেকটা মানুষেরই মত। ধনবিদ্যুৎ ধনবিদ্যুৎ-কে দেখতে পারেনা, অর্থাৎ কাছাকাছি এলে পরস্পর দূরে সরে যেতে চায়, বিকর্ষণ করে। ঋণবিদ্যুৎও ঋণবিদ্যুৎ-কে বিকর্ষণ করে। কিন্তু ধন-বিদ্যুৎ এবং ঋণবিদ্যুৎ পরস্পরকে আকর্ষণ করে—দূরে সরিয়ে দিলেও কাছে আসতে চায়। এখানে প্রশ্ন হ'তে পারে, বিদ্যুৎ কি একটা আলাদা জিনিষ, যা ঐ এ্যাম্বার বা চিরুণীর উপর জমা হ'য়েছিল, না শুধু একটা অবস্থা মাত্র! এই প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন বিলাতী বৈজ্ঞানিক উইলিয়ম ক্রুক্‌স্‌। তিনি দেখিয়েছেন, তাপের মত বিদ্যুৎ একটা অবস্থামাত্রই নয়, এ'র শারীরিক অস্তিত্ব রয়েছে।

এক্‌স্‌-রে (X-Ray) উৎপন্ন করতে হলে যেমন বায়ুশূন্য কাচের টিউবের ভিতর দিয়ে বিদ্যুৎ-প্রবাহ চালাতে হয়, গত শতাব্দীর শেষভাগে ক্রুক্‌স্‌ও তেমনই একটা ফাঁকা কাচের নলের মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ চালিয়ে পরীক্ষা করছিলেন। যতদূর সম্ভব নল থেকে বাতাস বা'র করে' নেওয়া হয়েছিল। যতক্ষণ বিদ্যুৎ চালান হচ্ছিল, ততক্ষণ ঐ নলের মধ্যে ঈষৎ লালাভ একটি আলোক-রশ্মি দেখা গিয়েছিল। ভোর বেলা দরজা, জানালার ফাঁক দিয়ে আমরা অনেক সময়ে সোজা আলোর রেখা দেখতে পাই। কিন্তু এই আলোক-রেখা এবং ঐ নলের মধ্যের আলো, তারা কখনও এক জিনিষ নয়। ক্রুক্‌স্‌ দেখেছেন যে কাচের নলের কাছে কোন চুম্বক নিয়ে গেলে আলোর রেখাটি বেঁকে যায়। কিন্তু ঘরের ফাঁকে আমরা যে আলোক-রেখা দেখি, তার কাছে কিন্তু হাজার চুম্বক আনলেও সে রেখা একটুও বাঁকা হবেনা। এই রকম আরও অনেক পরীক্ষা করে বৈজ্ঞানিকেরা সিদ্ধান্ত করেছেন, নলের ভিতর যে আলোক-রশ্মি দেখা যাচ্ছিল, তারা সাধারণ আলো বলতে আমরা যা বুঝি তা মোটেই নয়—ছোট ছোট এক রকম পদার্থ-কণিকা, যাদের নাম দেওয়া হয়েছে ইলেক্‌ট্রন।

জগতে যত জিনিষ আছে তাদের দু'ভাগে ভাগ করা যায়—মৌলিক পদার্থ এবং যৌগিক-পদার্থ। তাদেরই মৌলিক বলা যায়, যাদের ভিতর

সেই জিনিষ ছাড়া আর কিছুই নেই। যেমন সোনা বা রূপা, তাদের হাজার খুঁজি করে ফেল্লেও শেষ কণাটি পর্য্যন্ত তারা সোনা এবং রূপাই থাকবে। তাদের ক্ষুদ্রতম কণিকাটিকে বলা হয় পরমাণু। আর যৌগিক হ'ল তারাই, যারা একাধিক মৌলিক জিনিষ দিয়ে তৈরী। যেমন
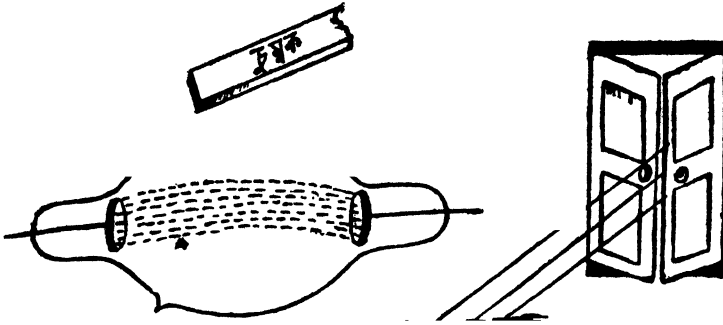
১নং চিত্র

জল। ক্ষুদ্রতম জলকণা, যার নাম জলের অণু, তাকে আরও ভাঙতে গেলে সে আর জল থাকবেনা, তা থেকে পাওয়া যাবে দু'টি মৌলিক জিনিষ—জলজান (Hydrogen) এবং অম্লজান (oxygen)। দু'টি জলজান পরমাণু এবং একটি অম্লজান পরমাণু মিলে হ'ল একটি জলের অণু। তাহ'লে দেখা যাচ্ছে যে জগতের মূল উপাদান হ'ল মৌলিক পদার্থরাই এবং আজ পর্য্যন্ত মাত্র বিরানব্বুইটি মৌলিক পদার্থ আবিষ্কৃত হয়েছে। এদের ভিতর সবচেয়ে হাল্কা হ'ল জলজান পরমাণু, আর সবচেয়ে ভারী হ'ল উরানিয়ম বলে একটি ধাতু।

কোন বড় সহরে যেমন ছোট, বড়, বিভিন্ন আয়তনের কোঠা বাড়ী দেখা যায়, তাদের চেহারা যেমন আলাদা, তাদের কাজও তেমনি বিভিন্ন। কিন্তু সব কোঠা বাড়ী ভাঙলেই দেখা যাবে তাদের মূল উপাদান মাত্র দু'তিনটি জিনিষ—ইট্, চুণ, বালি ইত্যাদি। সেইরকম বিভিন্ন পদার্থের পরমাণুরাও আকারে প্রকারে ওজনে এবং গুণে যতই আলাদা হোক না কেন, আসলে তারাও ওই রকম অল্প কয়েকটা মূল উপাদানেই তৈরী।

বৈজ্ঞানিকেরা স্থির করেছেন এই মূল উপাদানের একটি হ'ল ইলেক্ট্রন। এরা ঋণবিদ্যুৎ সম্পন্ন এবং ওজনে এত হাল্কা যে এদের কোনও ওজন নেই বলেই মনে হয়। আগেই বলা হয়েছে মৌলিক পদার্থের মধ্যে জলজান সবচেয়ে হাল্কা—আর এই ইলেক্ট্রনের ওজন জলজান পরমাণুর তুলনায় প্রায় দু'হাজার ভাগের একভাগ। পণ্ডিতেরা আরও বলেছেন যে এই ইলেক্ট্রনেরা সাধারণ পদার্থ-কণিকার মত নয়। এরা হ'ল বিদ্যুতের টুকরো। বিদ্যুতের টুকরো আবিষ্কার করা হয়েছে, কিন্তু বিদ্যুৎ জিনিষটি যে আসলে কী—সে কথা কেউ স্থির করতে পারেন নি। কোথাও ঋণবিদ্যুৎ দেখলেও আমরা বুঝতে পারব যে তারা শুধু কতকগুলি ইলেক্ট্রনেরই সমষ্টি। তেমনই ধনবিদ্যুতের ক্ষুদ্রতম কণিকা আবিষ্কৃত হয়েছে। তাদের বলা হয় প্রোটন। এরা কিন্তু ইলেক্ট্রনের মত হাল্কা নয়। এদের এক একটির ওজন একটি জলজান পরমাণুর সমান। ইলেকট্রন প্রোটন ছাড়াও পরমাণুর আর একটি উপাদান আছে, তার নাম হ'ল নিউট্রন। নিউট্রনের ওজন প্রোটনের সমান কিন্তু গায়ে কোন বিদ্যুৎ মাখান নেই।

পরমাণুর ভিতরের চেহারা অনেকটা আমাদের সৌরজগতের মতই। সৌরজগতের মাঝখানে রয়েছে সূর্য্য, আর সেই কেন্দ্রীণের (Nucleus) আকর্ষণের ফলে গ্রহেরা বিভিন্ন কক্ষে তাকে প্রদক্ষিণ করছে। পরমাণুর বেলাতেও তাই। পরমাণুদের কেন্দ্রীণ প্রোটন এবং নিউট্রনে তৈরী এবং এই কেন্দ্রীণের টানেই ইলেক্ট্রনেরা ঘুরছে তার চারদিকে, গ্রহদের মতই। কেন্দ্রীণ এবং তার চারিপাশে যে সব ইলেকট্রন ঘুরছে, তাদের মাঝখানটা একেবারে ফাঁকা। কেন্দ্রীণ এবং ইলেক্ট্রনদের তুলনায় অবশ্য এই ফাঁকটা বিরাট, কিন্তু আমাদের মানুষের মাপ কাঠিতে পরমাণুটি শুদ্ধ যে কত ছোট তা একটা উদাহরণ দিলেই বোঝা যাবে। এক ফোঁটা জলের মধ্যে কোটি কোটি জল কণা রয়েছে। ঐ জলের ফোঁটাটিকে যদি পৃথিবীর আকারের মত ম্যাগ্নিফাই করা যেত, তবে একটি জল-অণুর আকার হ'ত ছোট একটি কেম্বিসের বলের মত। তার ভিতরে আবার প্রায় সব জায়গাটাই ফাঁকা। কিন্তু অণু-পরমাণুরা অত ছোট বলেই তাদের ভিতরকার ফাঁকাটা আমাদের চোখে ধরা পড়ে না। কোন একটা বনের গাছপালাগুলির মধ্যে যথেষ্ট ফাঁক থাকে, কিন্তু অনেকদূর থেকে দেখলে কোথাও কোনও ফাঁকের চিহ্ন পর্য্যন্ত আছে বলে মনে হবে না। মনে হবে, যেন সবশুদ্ধ জমাট বেঁধে আছে।

জলযান পরমাণু যেমন সব চেয়ে হাল্কা তার গঠনও তেমনি সব চাইতে সরল। মাঝখানে রয়েছে একটিমাত্র প্রোটন, আর তার চারিদিকে ঘুরছে একটিমাত্র ইলেকট্রন। এখানে বলা দরকার ইলেক্ট্রন এবং প্রোটনের বিদ্যুৎ নেগেটিভ্ এবং পজিটিভ্ হলে, পরিমাণে তারা সমান। উরানীয়ম্ পরমাণুর ভিতরে বিরানব্বইটি ইলেক্ট্রন কেন্দ্রীণকে প্রদক্ষিণ করছে।

পরমাণুর ইলেকট্রনেরা কেন্দ্রীণের আকর্ষণে বাঁধা। কাগজ, অভ্র, ইবোনাইট প্রভৃতি এমন অনেক জিনিষ আছে, যাদের পরমাণুর ভিতরকার ইলেক্ট্রনেরা কিছুতেই পরমাণু ছেড়ে চলে যেতে পারে না। কেন্দ্রের

২নং চিত্র

কাছ থেকে খুব অল্প একটু দূরে সরে যেতে পারে মাত্র। কিন্তু আবার এমন সব জিনিষ আছে, যেমন তামা, লোহা প্রভৃতি, তাদের প্রত্যেকটি পরমাণুর ভিতরেই একটি দু'টি উচ্ছৃঙ্খল, ডানপিটে ইলেকট্রন থাকেই। এই ইলেকট্রনেরা সামান্ত একটু প্রলোভনেই কখনও বা এমনিতেই নিজ নিজ পরমাণু ছেড়ে অন্যান্ত পরমাণুর ভিতর গিয়ে ঢু মারে। সমস্ত পরমাণু-পাড়ায় হৈহৈ করে, ছুটাছুটি করে বেড়ায়। কোনও একটা নির্দ্দিষ্ট দিকে বা পথে যে তারা চলে তা নয়, কখনও একদিকে যাচ্ছে, কখনও বা অন্যদিকে। অনেক বাড়ীর ছেলেরা অত্যন্ত শান্ত, বাইরের টানে হয়ত বা জানালা দিয়ে মুখ বাড়ায় মাত্র, এর বেশী নয়। এরা হ'ল প্রথম জাতের। আবার অনেক বাড়ীতে ডানপিটে ছেলে থাকে,

তারা সারাদিন সমস্ত পাড়াময় এর বাড়ী ওর বাড়ী ঘুরে বেড়াচ্ছে। প্রথম জাতীয় পদার্থসমূহ যাদের পরমাণুর ইলেকট্রনদের ডিসিপ্লিন কড়া, তাদের বলা হয়—বিদ্যুৎরোধক পদার্থ (Non-Conductor)। আর শেষের জাতীয় জিনিষগুলির নাম দেওয়া হয়েছে বিদ্যুৎবাহক (Conductor) পদার্থ। ধাতুগুলি সবাই বিদ্যুৎবাহী।

অনেক সময় আমাদের বিদ্যুৎ জমা করে' রাখবার প্রয়োজন হতে পারে। কোনও জায়গাতে যদি কতগুলি ইলেক্‌ট্রন জড়ো করে রাখা হয় তবে পরস্পরের বিরাগ এবং বিকর্ষণের ফলে তারা ছট্‌ফট্ করতে থাকে। প্রত্যেকটি ইলেক্‌ট্রনই অন্যান্য ইলেকট্রনদের ঠেলে দূরে সরিয়ে দিতে চায় এবং কোনও প্রোটনের সঙ্গে মিলিত হতে চায়। পরস্পরের প্রতি বিকর্ষণ এবং প্রোটনের প্রতি আকর্ষণের জন্যই তারা ছুটে যেতে চায় প্রোটনদের কাছে। এই চাওয়ার ফলেই তাদের মধ্যে একটা প্রবল আবেগ জন্মায় যাতে সুযোগ পেলেই তারা তাদের সঙ্গীদের কাছে ছুটে যেতে পারে। এই আবেগ ও শক্তিকে ইংরাজীতে বলা হয়, পোটেন-সিয়াল। আমরা ইংরাজী শব্দটিই ব্যবহার করব। ইলেক্‌ট্রনেরা প্রোটনের তুলনায় অনেক হাল্কা, তাই তারা জানে যে আকর্ষণ যতই থাকুক না কেন, ইলেক্‌ট্রনদেরই প্রোটনের কাছে ছুটে যেতে হবে, প্রোটনেরা কখনও আসবেনা। তাই জড়ো-করা ইলেক্‌ট্রনদের প্রোটনের কাছে যাবার যে ইচ্ছা তার নাম দেওয়া হয়েচে নেগেটিভ্ পোটেন্‌সিয়াল।

তেমনি আবার কোথাও যদি প্রোটন অথবা সেইসব পরমাণু যাদের কাছ থেকে ইলেকট্রন ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে তাদের এক জায়গায় জমা করে রাখা হয়, তবে তারা অদৃশ্যবাহু মেলে ইলেকট্রনদের কাছে টানতে চাইবে। এদের এই ইচ্ছাকে বলা যেতে পারে পজিটিভ্ পোটেনসিয়াল।

এক জায়গায় যদি অনেকগুলি ইলেকট্রন জড়ো করে রাখা হয় আর তাদের যদি ইলেকট্রন-হারা-পরমাণু বা প্রোটনদের কাছে যাবার কোন পথ না থাকে তবে তাদের ছট্‌ফটেভাব ও অশান্তি আরও বেশী হয়। এখন আমরা কি করে অল্প জায়গায় অনেকখানি বিদ্যুৎ জমা করে রাখা যায়, অশান্তিও না বাড়ে, তাই বলব। প্রথমে একটা উদাহরণ দিলে বুঝতে সুবিধা হবে।

সমুদ্রের মধ্যে পাশাপাশি দুটি দ্বীপ—এক দ্বীপে কতগুলি পুরুষ, অপর দ্বীপে কতকগুলি নারী। যদি নারীরা অন্য দ্বীপটিতে না থাকত তবে পুরুষদের কোলাহল আরও বেড়ে যেত। তাদের পরস্পরের সঙ্গে ঝগড়া বিরোধ করা ছাড়া আর কোন কাজই থাকত না। কিন্তু যে মুহূর্তে অপর দ্বীপে নারীর আবির্ভাব হ'ল তখন তারা নিজেদের গোলমাল মিটিয়ে অন্যদ্বীপে যাবার জন্য ব্যস্ত হ'য়ে উঠল। এখন যদি আরও অনেক পুরুষ ঐ দ্বীপে এসে হাজির হয় তাহলেও অশান্তি এবং গোলমাল খুব বাড়বেনা, কারণ মনোযোগ তখন অন্যত্র। এবার যদি দুই দ্বীপের মাঝখানে চর পড়বার লক্ষণ দেখা যায়, তবে পরস্পরের মিলিত হবার আশা আরও বেড়ে যায়। সবাই তখন মনে করতে থাকে একবার যদি কোন মতে সামান্য একটু পথও পাওয়া যায়, তাহলেই হ'ল। এই অবস্থায় দু'টি দ্বীপেই বিনা গোলমালে আরও অনেক বেশী লোক আমদানী করা যেতে পারে। বিদ্যুতের বেলাতেও ঠিক এই রকমই ঘটে। কোন একটা ধাতু ফলকের উপর যদি কতকগুলি ইলেকট্রন জড়ো করে রাখা যায়, তবে তারা খুব ছট্‌ফট্ করতে থাকে। তাদের পোটেনসিয়াল হয় খুব বেশী। কিন্তু এখন যদি আর একটি ধাতুফলকের উপর কাণা পরমাণু (ইলেকট্রনহারা পরমাণু) বা শুধু প্রোটন জমা করে কাছে আনা যায়, তবে দু'পক্ষেরই গোলমাল অনেক কমে যাবে। আরও অনেক ইলেক্‌ট্রন এবং প্রোটন এনে রাখলেও তাদের ছট্‌ফটে ভাব খুব বাড়বে না। এবারে ধাতুফলক দু'টির মাঝখানে যদি হাওয়ার বদলে এমন কোন জিনিষ দেওয়া যায়, যাতে তাদের পরস্পরের মিলনের আশা আরও অনেকখানি বেড়ে যায়, তাহলে তাদের গোলমাল আরও কমে যাবে এবং আরও অনেক ইলেক্‌ট্রন-প্রোটন আমদানী করলেও বিশেষ অসুবিধা হবেনা। ধাতুফলক দু'টির মধ্যে হাওয়ার বদলে একখণ্ড কাঁচ কিম্বা ইবোনাইট ঢুকিয়ে দিয়ে, এই কাজটি করা যেতে পারে।
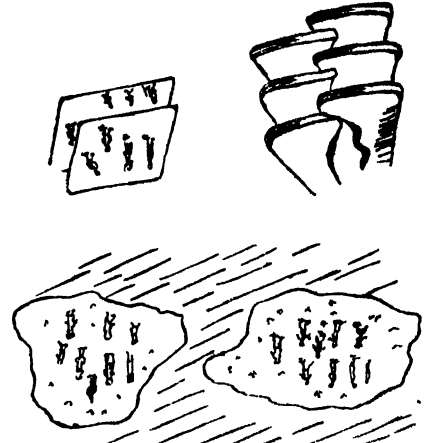
৩নং চিত্র

এই যে ধাতুফলকদুটি কাছাকাছি রেখে অল্প ঝঞ্চাটে বিদ্যুৎ জমা করে রাখবার কৌশল তাকে বলা হয় বিদ্যুৎ সংরক্ষণ এবং ধাতুফলক দুটিকে সম্মিলিতভাবে বলা হয় বিদ্যুৎ সংরক্ষক (Electrical Condenser)। সাধারণতঃ বেতার যন্ত্রে যে সব বিদ্যুৎ সংরক্ষকের চাকা ঘুরিয়ে আমরা বিভিন্ন ষ্টেশন শুনতে পাই তাদের গড়ন একটু আলাদা। দুটি ধাতু নির্ম্মিত চিরুণী—একটার কাঁটাগুলি অপরটির কাঁটাগুলির ফাঁকে ফাঁকে বসিয়ে দিতে হয়, এমনভাবে যেন কোথাও গায়ে গায়ে না লেগে যায়। একটা চিরুণী স্থির করে এঁটে রাখা হয়, অপর চিরুণীটিকে ঘুরান হয়। অল্প পোটেনসিয়ালে যত বেশী বিদ্যুৎ জমা করে রাখা যাবে, বিদ্যুৎ সংরক্ষকটিও হবে তত বড়। দেখা গেছে, ধাতুফলকগুলির আয়তন যত বেশী হবে এবং তাদের পরস্পরের ভিতর ফাঁকে থাকবে যত কম, বিদ্যুৎ জমা করে রাখা যাবে তত বেশী পরিমাণে অর্থাৎ সংরক্ষকটি হবে তত বড়।

এখানে বলা দরকার যে ব্যাটারী, ডাইনামো প্রভৃতি বিদ্যুৎ সৃষ্টি করেনা। তাদের কাজ হ'ল পরমাণুর কাছ থেকে ইলেকট্রনদের ছিনিয়ে নেওয়া এবং এইসব ইলেকট্রন এবং কানা পরমাণুদের ব্যাটারী বা ডাইনামোর দুই প্রান্তে জড়ো করে দেওয়া। ব্যাটারীর এক মাথায় ইলেকট্রনদের এবং অপর প্রান্তে কানাপরমাণুদের আড্ডা। এখন যদি দুই প্রান্তকে তার দিয়ে যোগ করে দেওয়া যায় তা'হলে ইলেকট্রনেরা প্রোটনদের কাছে ছুটে যাবে। ব্যাটারীর কাজ হ'ল অবিরত ইলেকট্রন যুগিয়ে যাওয়া। যতক্ষণ পর্য্যন্ত ব্যাটারীর এই ইলেকট্রন যোগাবার ক্ষমতা থাকে ততক্ষণ পর্য্যন্তই ইলেকট্রন প্রবাহ চলতে থাকবে। এই ইলেকট্রণ প্রবাহকেই বলা হয় বিদ্যুৎ প্রবাহ (electric current)। জলের স্রোতের সঙ্গে বিদ্যুৎ প্রবাহের বেশ মিল আছে। দু'টি পাত্রে জল রাখা হ'ল—একটার লেভেল অপরটির চাইতে উঁচু। এখন পাত্র-দুটিকে একটা নল দিয়ে যুক্ত করে দিলে, যে পাত্রের জল উঁচুতে ছিল, সেখান থেকে অন্য পাত্রে যেতে থাকবে। যতক্ষণ না এই লেভেল সমান হয় ততক্ষণ পর্য্যন্ত জলের স্রোত চলতে থাকবে। সমান হলেই জল-প্রবাহও বন্ধ হ'বে।

কিন্তু জলস্রোত অক্ষুণ্ণ রাখতে হলে দুই পাত্রের মাঝে পাম্প বসাতে হবে

—জল যেমন প্রথম পাত্র থেকে নীচের পাত্রে আসছে, তখনি তাকে পাম্প করে ফেরত পাঠাতে হবে তার আগের জায়গায়। বিদ্যুৎপ্রবাহের বেলাতে ব্যাটারীই ইলেকট্রনদের পাম্পের কাজ করছে। পাইপ দিয়ে যখন জল আসে তখন তাকে নানারকম বাধা (Resistance) অতিক্রম করে আসতে হয়। জলের নল কোথাও মোটা আবার কোথাও বা সরু। দেখা গেছে, পাইপ লম্বায় যত বড় হবে এবং বেড়ে যত ছোট হবে জলের ধারাও তত ক্ষীণ হবে। পাইপ মোটা হলে জলস্রোতও বেড়ে যায়। ইলেকট্রনদের বেলাতেও, যে তার বেয়ে তারা চলেছে, সেই তার যত বেশী লম্বা হবে এবং যত বেশী সরু হবে, সেই পথে ইলেকট্রনদের (অর্থাৎ বিদ্যুৎ প্রবাহ) সংখ্যাও হ'বে তত ক্ষীণ। সহরের সরু গলির মতই। পথ যত অপ্রশস্ত হবে সেই পথে লোকও চলতে পারবে তত কম। তবে পিছন থেকে কেউ লাঠি নিয়ে তাড়া করলে অবশ্য ঢের বেশী লোক তখন ঐ পথের ভিতর দিয়েই যাবে। বিদ্যুৎ প্রবাহের ক্ষেত্রেও ব্যাটারীর (জলের বেলা, জলের পাম্প) অর্থাৎ ইলেকট্রন-পাম্পের জোর বাড়িয়ে, প্রবাহ বাড়ানো যায়। ব্যাটারীই ইলেকট্রনদের লাঠি নিয়ে তাড়া করছে। সোজা কথায় বলা যেতে পারে, পথের বাধা যত কম হবে এবং পাম্পের চাপ হবে যত বেশী, বিদ্যুৎ প্রবাহও হবে তত শক্তিশালী।
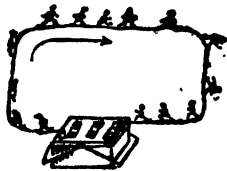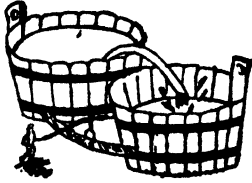
৪নং চিত্র

আমরা আগেই বলেছি বিদ্যুৎ প্রবাহ মানেই ইলেকট্রন স্রোত। কিন্তু ইলেকট্রনেরা যে সোজা সমান চলে যায়, তা নয়। পথে বিস্তর পরমাণু মাথা উঁচিয়ে আছে, পাহাড়-পর্ব্বতের মত। তাদের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে, কখনও এঁকেবেঁকে, ইলেকট্রনদের পথ চলতে হয়। সেনাপতির আদেশে অনেক সময়ে সৈন্যদের বনের মধ্য দিয়ে চলতে হয়। তাদের কখনও গাছপালা এড়িয়ে, কখনও হোঁচট্ খেয়ে এঁকেবেঁকে মার্চ্চ করতে হয়—কিন্তু সবশুদ্ধ বাইরে থেকে মনে হয় তারা একটা নির্দ্দিষ্ট দিকেই চলেছে। ইলেকট্রন স্রোতও ঠিক এই রকম। কিন্তু এই বন্ধুর পথে (electric Resistance) নানা বাধাবিপত্তির মধ্যে ধাক্কা খেয়ে, ঘেষাঘেঁষি করে ইলেকট্রনদের যখন মার্চ্চ করে যেতে হয়, ব্যাটারীর চাপে পড়ে, তখন ধাক্কা খেতে খেতে তাপ উৎপন্ন হয়—কোন বড় শোভাযাত্রার মতই। আমাদের ঘরে যে বিজলী বাতি জ্বলছে, তার মধ্যে যে তার রয়েছে, তা খুব সরু এবং সেই জন্যেই সেই তারের বিদ্যুৎ-প্রবাহকে বাধা দেবার ক্ষমতা যথেষ্ট। ফলে, সমস্ত তারটাই গরম হয়ে উঠে, এত গরম হয় যে তারটা সাদা হয়ে যায়, আর তাই থেকে আলো বেরুতে থাকে।

একটা ঘরের ভিতর কতগুলি লোক অত্যন্ত গম্ভীর হয়ে, মুখভার করে বসে আছে। বাইরে থেকে কোন লোক ঢুকলেই তার কাছে মনে হ'বে যেন সমস্ত আব-হাওয়াটাই থমথম করছে। কেউ তাকে বলেও দেয়নি, তবু তার এই রকমই মনে হবে, মনে হবে যেন পালাতে পারলেই বাঁচি। কেউ কোন কথা না বললেও, সমস্ত ঘরের মধ্যে তাদের মনের থমথমে ভাবটা ছড়িয়ে আছে। তবে এই ভাবটা বুঝতে পারবে তারাই, যাদের সেটা বুঝবার ক্ষমতা আছে। ঘরের মধ্যে একটি শিশু ঢুকলে, তার কাছে কিছু মনে হবে না। এই যে কারুর মনের ভাবটা অদৃশ্য হয়ে চারিদিকে একটা প্রভাব বিস্তার করে রয়েছে, সেই জায়গাকে আমরা বলতে পারি প্রভাবিত স্থান। (Sphere of influence or field of influence) সমভাবাপন্ন কেউ এলেই অভিভূত হয়ে পড়বে। বিদ্যুৎ এবং চুম্বকের বেলাতে ঠিক এই রকমই ঘটে থাকে। একটা চুম্বক বা খানিকটা বিদ্যুতের চারিদিকে তার প্রভাব ছড়িয়ে থাকে—অদৃশ্য হয়ে। অবশ্য যত দূরে যাবে চুম্বকের বা বিদ্যুতের প্রভাবও তত কমে যাবে। চুম্বকের প্রভাব শুধু চুম্বকজাতীয় জিনিষের (যেমন লোহা, চুম্বক ইত্যাদি) উপর। আবার বিদ্যুতের প্রভাব শুধু বিদ্যুতের উপরে। ঐ শিশুর মতই চুম্বকের কাছে বিদ্যুৎ নিয়ে এলে চুম্বক তার উপর কিছুমাত্র প্রভাব বিস্তার করতে পারবে না—অথচ একটা লোহার টুকরা নিয়ে এলে তখনই কাছে টেনে নেবে। এখানে বলা যেতে পারে সব চুম্বকেরই দু'টি মেরু (বা চলতি কথায়—মাথা) আছে—উত্তর এবং দক্ষিণ। বিদ্যুতের মতই স্বজাতীয় চুম্বক-মেরু পরস্পরকে বিকর্ষণ করে এবং ভিন্নজাতীয় মেরু আকর্ষণ করে।

আমরা বলেছি বিদ্যুতের অথবা চুম্বকের প্রভাব শুধু বিদ্যুতের এবং চুম্বকের উপরেই সীমাবদ্ধ। কথাটি সম্পূর্ণ ঠিক নয়। বিদ্যুৎ বা চুম্বক যতক্ষণ স্থির হ'য়ে থাকে ততক্ষণই এই কথা খাটে। চলমান বিদ্যুৎ বা চুম্বকের বেলা ব্যাপার দাঁড়ায় সম্পূর্ণ অন্যরকম। কোন তারের ভিতর দিয়ে যখন ইলেকট্রন স্রোত বইতে থাকে, তখন বিদ্যুৎবাহী তারটি চুম্বকের মত ব্যবহার করতে থাকে—তার চারিদিকে চুম্বকক্ষেত্র সৃষ্টি হয়। এই তথ্যটি আবিষ্কার করেন ক্রিশ্চিয়ান অরস্টেড্, একশ বছরেরও কিছু বেশী আগে। বিদ্যুৎপ্রবাহ যখন চলতে থাকে ততক্ষণই তাপ উৎপন্ন হতে থাকে। কিন্তু ব্যাটারীর সুইচ্ টিপে দেওয়া মাত্রই ইলেকট্রন স্রোত আর কিছু পুরাদমে বইতে সুরু করে না। ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে অর্থাৎ প্রবাহের মধ্যে ইলেকট্রনের সংখ্যা ক্রমেই বাড়তে থাকে। অবশেষে তারা স্থায়ী ইলেকট্রন স্রোতে পরিণত হয়। যতক্ষণ না পর্য্যন্ত এই স্রোত বেড়ে বেড়ে পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় ততক্ষণ পর্য্যন্তই চারিদিকের চুম্বকের প্রভাবও শক্তিশালী হতে থাকে এবং প্রবাহ স্থায়ী স্রোতে পরিণত হলে চুম্বকক্ষেত্রের বৃদ্ধিও বন্ধ হয়ে যায়। চারিদিকে চুম্বকের প্রভাব ছড়িয়ে দিতে খানিকটা শক্তিব্যয় প্রয়োজন। কিন্তু এই শক্তি জোগায় কে? ইলেকট্রনদের যে চালাচ্ছে এই শক্তির উৎসও সেই ব্যাটারীই। উনিশ শতকের শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক মাইকেল ফ্যারাডে বলেছেন, চুম্বক ক্ষেত্র রচনা করতে এই যে শক্তি ব্যয়িত হ'ল তা কিন্তু শূন্যে মিলিয়ে যায় না। সেই শক্তি জমা হয়ে থাকে চারিপাশের চুম্বকক্ষেত্রেই।

দেখা গেছে একটা তারকে জড়িয়ে কুণ্ডলী করে নিয়ে (solenoid) তার মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহ চালালে ঐ কুণ্ডলীর চারিদিকে যে চুম্বকক্ষেত্র সৃষ্টি হয়, তা অবিকল একটি সাধারণ চুম্বকেরই (Bar Magnet) মত। সুতরাং কোন বিদ্যুৎবাহী তারকুণ্ডল দিয়ে অনায়াসে চুম্বকের কাজ চালান যেতে পারে।

আমরা দেখেছি চলমান বিদ্যুতের চারিদিকে চুম্বকক্ষেত্র প্রকাশ পায়। এর ঠিক উল্টো প্রশ্ন হ'ল চলমান চুম্বকের সাহায্যে বিদ্যুৎপ্রবাহ সৃষ্টি করা সম্ভব কিনা। এ প্রশ্নেরও জবাব দিয়েছেন মাইকেল ফ্যারাডে। তিনি দেখলেন একটি তারের কাছে একটা চুম্বক নিয়ে এলে, তারটির মধ্যে ক্ষণিক বিদ্যুৎ প্রবাহের সঞ্চার হয়। আবার চুম্বকটি দূরে সরিয়ে নিয়ে গেলেও ক্ষণস্থায়ী বিদ্যুৎ স্রোত দেখা দেয় তারটির ভিতরে। তবে দ্বিতীয় বারে বিদ্যুৎ প্রবাহের গতি প্রথমবারের উল্টো দিকে। চুম্বকের পরিবর্ত্তে বিদ্যুৎবাহী তারকুণ্ডল দিয়েও ঠিক একই কাজ পাওয়া যাবে। চুম্বকটিকে স্থির রেখে তারটিকে কাছে আনলে অথবা দূরে সরিয়ে নিলেও ঐ একই ফল পাওয়া যাবে। চুম্বকের চারিদিকে তার প্রভাব ছড়িয়ে রয়েছে—যত দূরে যাবে প্রভাবও তত কম হবে। এখানে মোট কথা হ'ল তারটির কাছাকাছি চুম্বকের প্রভাব কমবেশী হ'লেই তাতে বিদ্যুৎ সঞ্চার হবে। চুম্বকটি কাছে এনে বা দূরে নিয়ে এই প্রভাব বাড়ানো কমানো যায়। যেখানে চুম্বকের বদলে তারকুণ্ডল দিয়ে কাজ চালান

হয়, সেখানে কিন্তু ব্যাপারটি আরও সহজে করা যেতে পারে। কিরূপ হ'ল, কুণ্ডলের ভিতর দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহ যত শক্তিশালী হবে, চারিদিকের চুম্বকক্ষেত্রের জোরও হবে তত বেশী। তাই তারকুণ্ডলটি স্থির রেখেও, তার ভিতরকার বিদ্যুৎ প্রবাহের জোর বাড়িয়ে কমিয়েই চারিদিকের চুম্বক ক্ষেত্রের প্রভাবও বাড়ানো কমানো চলে।

আমরা আগেই বলেছি, বৈদ্যুতিক চাবি (Electric Switch) টিপবার সাথে সাথেই ইলেকট্রন স্রোত পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় না। পূর্ণস্রোত হতে খানিকটা সময় নেয়। বিদ্যুৎ প্রবাহ যতক্ষণ বাড়তে থাকে, চারি পাশের চুম্বকক্ষেত্রও তত শক্তিশালী হতে থাকে (ক্রমে ক্রমে)। তাই নিকটে যদি কোন তার থাকে, তা'হলে যতক্ষণ এই চুম্বকের প্রভাব বাড়তে থাকে, ততক্ষণ ঐ তারটির মধ্যে বিদ্যুৎ প্রবাহ সঞ্চারিত হবে। আবার বৈদ্যুতিক চাবি বন্ধ করে দিলে (off the Switch) চুম্বক ক্ষেত্র যাবে মিলিয়ে —সঙ্গে সঙ্গে পাশের তারেও দেখা দেবে সঞ্চারিত প্রবাহ। প্রথম তারটিতে সুইচ 'অন' এবং 'অফ' করে দ্বিতীয় তারটিতে আমরা বিপরীত দিক্‌গামী বিদ্যুৎ প্রবাহ সৃষ্টি করতে পারি।

কিন্তু সঞ্চারিত বিদ্যুৎ (Induced electric current) থেকে কারুরই নিস্তার নেই। যে তারটিতে বিদ্যুৎ চলাচল আরম্ভ হলে বা বন্ধ হলে চারিদিকের চুম্বক ক্ষেত্রের জন্মমৃত্যু ঘটতে থাকে, সে নিজেও ত ঐ স্বরচিত চুম্বকক্ষেত্রের মধ্যেই রয়েছে। তাই তার প্রভাবে যদি অপর একটি তারে বিদ্যুৎ সঞ্চার সম্ভব হয়, তবে তার নিজের ভিতরেই বা হবে না কেন ? হয়ও তাই। এই বিদ্যুতের নাম দেওয়া যেতে পারে 'স্বয়ং সঞ্চারিত প্রবাহ' (Self-induced current)। কিন্তু মজা হ'ল এই যে স্বয়ং সঞ্চারিত বিদ্যুৎপ্রবাহ সর্বদাই আসল স্রোতের বিরুদ্ধাচরণ করে। তারই ফলে, আসল প্রবাহের বাড়তেও যেমন সময় লাগে বেশী, আবার বন্ধও হয় না সুইচ্‌ টেপা মাত্রই। কারণ প্রবাহ সুরু হবার সময়ে সে বাধা দেয় উল্টো দিকে ব'য়ে এবং বন্ধ হবার সময়েও বন্ধ হতে দেয় না, আসল স্রোত বন্ধ হলেও নিজেই চালিয়ে নেয় খানিকক্ষণ।

পাতলা মানুষের চাইতে মোটা মানুষের পথ চলা সুরু করতে যেমন কষ্ট হয়, সময় লাগে বেশী, তেমনি 'থামো' বল্লেই তারা তাই সহজে থামতে পারে না। থামি থামি করেও খানিকটা সময় নেয়। চলতে সুরু করবার সময়ে এই অলসতা এবং থামবার সময়ে এই মন্থরতা—এরজন্য দায়ী তার ভারী দেহ। ইংরাজীতে এ'কে বলে Inertia (অলসতা) মোটা মানুষের বেলায় তার ওজন যেমন বাধা, বিদ্যুৎপ্রবাহের বেলাতেও স্বয়ং সঞ্চারিত বিদ্যুৎও তেমনই বাধার কাজ করে। ফলে বিদ্যুৎপ্রবাহও পড়ে অলস হয়ে, বাড়তেও যেমন দেরী হয়, থামতেও পারে না সহজে। ওজনের সঙ্গে এর গুণের মিল দেখেই বৈদ্যুতিক অলসতারও নাম দেওয়া হয়েছে Electrical Inertia বা বৈদ্যুতিক-কুড়েমি। সাধু বাংলায় বলা যেতে পারে 'বৈদ্যুতিক জাড্য'। কোন তারকে কুণ্ডলের আকারে জড়িয়ে দিয়ে বিদ্যুৎ চালালে বৈদ্যুতিক কুড়েমি অনেকখানি বেড়ে যায়—ইলেকট্রনদের তখন কত ঘুর পথে আঁকাবাঁকা হয়ে পথ চলতে হয় !

ইলেকট্রনেরা যে পথে চলে, তাকে আমরা বলব বৈদ্যুতিক চলতি পথ, যার ইংরাজী নাম হ'ল 'Electric circuit'. ব্যাটারীর দুই প্রান্ত যখন তার দিয়ে জুড়ে দেওয়া হয় তখনই বিদ্যুৎপ্রবাহ বইতে থাকে। কিন্তু এই প্রবাহ একটানা, শুধু একদিকেই ব'য়ে চলেছে ব্যাটারীর নেগেটিভ প্রান্ত থেকে পজিটিভ্‌ প্রান্তের দিকে। এই জাতীয় স্রোত হ'ল একমুখী (unidirectional current). এইসব একমুখী স্রোতকেই ইংরাজীতে বলা হয়, ডি, সি (D. C). কখনও কখনও এই স্রোত ক্ষীণ হ'তে পারে, প্রবল হ'তে পারে। কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত ইলেকট্রনেরা শুধু একদিকেই ব'য়ে চলেছে ততক্ষণ পর্যন্তই আমরা তাকে বলব ডি, সি,। এবারে চলতি-পথের সঙ্গে ব্যাটারীর সংযোগ উল্টো করে দিলে বিদ্যুৎপ্রবাহের দিকও উল্টে যাবে অর্থাৎ এবারে ইলেকট্রনেরা আগেরবার যে দিকে মুখ করে চলছিল তার উল্টো দিকে চলতে থাকবে। তাই ব্যাটারীর সংযোগ বার বার পাল্টে দিয়ে আমরা চলতি-পথের মধ্যে যাতায়াতি প্রবাহ সৃষ্টি করতে পারি। অর্থাৎ ইলেকট্রনেরা একবার একদিকে ছুটল, পরক্ষণেই ছুটতে থাকবে তার বিপরীত দিকে। যত তাড়াতাড়ি আমরা ব্যাটারীর সংযোগ অদলবদল করতে পারব, তত তাড়াতাড়িই বাইরের চল-পথে বিদ্যুৎপ্রবাহ দিক্‌ পাল্টাবে। এদের বলা হয় যাতায়াতি প্রবাহ (Alternating current or A. C). তবে সাধারণতঃ ব্যাটারীর প্রান্ত-সংযোগ বদল করে যাতায়াতি প্রবাহ সৃষ্টি করা হয় না। যাতায়াতি প্রবাহ সৃষ্টির জন্য আলাদা যন্ত্রই আবিষ্কার করা হয়েছে। তাদের নাম দেওয়া হয়েছে (Alternator) অলটারনেটর্‌। ডাইনামো থেকে পাওয়া যায় একমুখী প্রবাহ বা ডি, সি। পাহাড়ে নদীতে যেমন জল শুধু একটানা একদিকেই প্রবাহিত হ'তে থাকে—এরা হল একমুখী জলপ্রবাহ, ডি, সি,র মতই। আবার যে নদীতে জোয়ার-ভাঁটা চলে—জল জোয়ারের সময়ে একদিকে যাচ্ছে, ভাঁটার সময়ে যাচ্ছে তার বিপরীত দিকে—তাকে তুলনা করা যেতে পারে যাতায়াতি প্রবাহ বা এ, সি'র সঙ্গে। অনেক সময়ে কিন্তু একমুখী প্রবাহ এবং যাতায়াতি প্রবাহ একসাথে মিশে থাকে।

আমরা আগেই বলেছি কোন চলতি-পথে বিদ্যুৎপ্রবাহ বাড়তে-কমতে থাকলে, নিকটের কোনও তারেও বিদ্যুৎসঞ্চার হয়। এই তথ্যটিকে কাজে লাগিয়ে এমন অনেক যন্ত্র আবিষ্কার করা হয়েছে, যাদের ছাড়া বেতার জগৎ হ'ত অচল। কোন চলতি পথে যাতায়াতি প্রবাহ বইতে থাকলে, কাছাকাছি কোনও তারের ভিতরেও যাতায়াতি প্রবাহ বইতে সুরু করে। আর একটু সূক্ষ্মভাবে বিচার করে দেখলে বলা যেতে পারে, নিকটের তারটিতে বিদ্যুৎ চলাচল করবার একটি আবেগ সৃষ্টি হয়েছে, যাকে বলা হয় বিদ্যুৎ-প্রবাহক-চাপ অথবা ইলেকট্রন-পাম্প-করাবার চাপ। একেই ইংরাজীতে বলে বৈদ্যুতিক চাপ, Electric pressure বা electric potential. ব্যাটারীর ভিতরে যেমন ইলেকট্রন পাম্প করবার চাপ ব্যাটারীর ভিতরেই লুকিয়ে থাকে, এখানে ত আর ব্যাটারী নেই, তাই প্রথম তারে বিদ্যুৎ চলাচলের ফলে দ্বিতীয় তারটিতে বিদ্যুৎ-চালনার যে বেগ জন্মায় তা ছড়িয়ে থাকে সমস্ত তারটিতে। প্রথম তারটির নাম দেওয়া হয়েছে প্রাইমারী তার (Primary) এবং দ্বিতীয়টির নাম হল সেকেণ্ডারী তার (Secondary) এবং দু'টির সম্মিলিত নাম, ট্রান্স্‌ফরমার (Transformer)

৫নং চিত্র
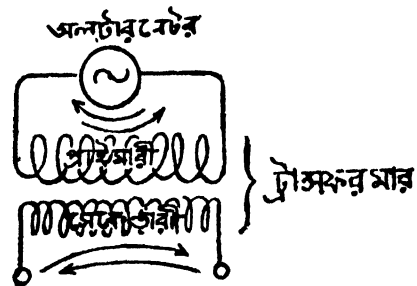
এই দু'টি তারকুণ্ডলের একটির ভিতরে যাতায়াতি প্রবাহ বহিলে দ্বিতীয়টির ভিতরেও যাতায়াতি প্রবাহ বইতে সুরু করে।

দেখা গেছে সেকেণ্ডারীতে জড়ানো তারের সংখ্যা যত বেশী হবে, সেখানে বৈদ্যুতিক চাপ হবে তত বেশী। কিন্তু মজা হ'ল এই যে বৈদ্যুতিক চাপ সেকেণ্ডারীতেযত বেশী হবে, বিদ্যুৎপ্রবাহ হবে তত ক্ষীণ। সেকেণ্ডারীতে তারের সংখ্যা দ্বিগুণ করে দিলে, বৈদ্যুতিক চাপও দ্বিগুণ হ'য়ে যাবে, কিন্তু বিদ্যুৎপ্রবাহ হ'বে আগের অর্দ্ধেকমাত্র। এই ট্রান্স্‌ফরমার দিয়ে, প্রাইমারী তারে যে পরিমাণ বৈদ্যুতিক চাপ ইলেকট্রনদের চালাবে, সেকেণ্ডারী তারে তার চাইতে বহুগুণ বেশী বৈদ্যুতিক চাপ সৃষ্টি করা যেতে পারে, শুধু মাত্র সেকেণ্ডারীর তারের সংখ্যা বাড়িয়েই। আরও একটা কথা, প্রাইমারীতে বিদ্যুৎ-চলাচলের চেহারা বা কায়দা (mode of electrical oscillation) যে রকম সেকেণ্ডারীতেও তার চেহারা হবে অবিকল তাই।

ক্রমশঃ
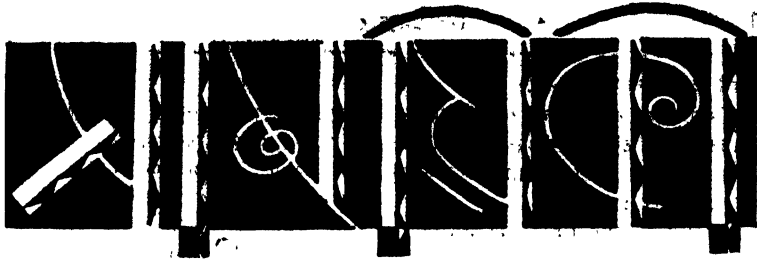
সমগ্র ভারতে অশান্তি ও অনাচার—

গত ৭ই ও ৮ই আগষ্ট বোম্বায়ে নিখিলভারত কংগ্রেস কমিটীর সভা হইয়াছিল। সেই সভা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ৯ই আগষ্ট ভোরে মহাত্মা গান্ধী, কংগ্রেস-সভাপতি মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, পণ্ডিত জহরলাল নেহরু প্রমুখ সকল কংগ্রেস নেতাকে বোম্বাইতেই গ্রেপ্তার করা হয় ও কংগ্রেসের সকল প্রতিষ্ঠানগুলি বে-আইনি বলিয়া ঘোষণা করা হয়। ইহার ফলে কংগ্রেস কর্ত্তৃক গৃহীত শেষ সিদ্ধান্ত প্রকাশিত হয় নাই বা মহাত্মা গান্ধী কোনরূপ আন্দোলন আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে সে বিষয়ে বড়লাটের সহিত পত্রালাপের যে সুযোগ খুঁজিতেছিলেন, তাহাও তাঁহাকে দেওয়া হয় নাই। কিন্তু অতি দুঃখের বিষয় এই যে নেতৃবৃন্দের গ্রেপ্তারের সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র দেশে বিষম অনাচার দেখা দিয়াছে। এই অশান্তি বা অনাচারের সহিত কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের বা কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানের কোন সম্পর্ক নাই বটে, কিন্তু অনেকস্থলে কংগ্রেসের নামে নানারূপ অনাচার অনুষ্ঠিত হইতেছে। বোম্বায়ে, আমেদাবাদে, সুরাটে, পুনায় সেই ৯ই আগষ্ট তারিখ হইতেই টেলিগ্রাফ ও টেলিফোনের তার কাটিয়া, রেলের লাইন তুলিয়া ফেলিয়া দিয়া, পোষ্টাফিস জ্বালাইয়া দিয়া, ব্যাঙ্ক লুঠ করিয়া দুর্ব্বৃত্তগণ তাহাদের নিষ্ঠুরতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছে। এই অনাচার ক্রমে সমগ্র ভারতে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। পুলিস শান্তিরক্ষার জন্য সকল স্থানেই গুলী চালাইতে বাধ্য হয় এবং তাহার ফলে বহু নরনারী আহত ও নিহত হইয়াছে। যুক্তপ্রদেশে কাশী, এলাহাবাদ, লক্ষ্ণৌ, কানপুর প্রভৃতি স্থানে গত প্রায় এক মাস ধরিয়া এই অনাচার চলিয়াছে এবং এখনও সুযোগ সুবিধা বুঝিয়া দুষ্কৃতের দল নানারূপ অত্যাচার করিতেছে। বিহারের ও মাদ্রাজের অবস্থা চরমে গিয়া দাঁড়াইয়াছিল—বিহারের রেল চলাচল বহুদিন ধরিয়া একেবারেই বন্ধ ছিল এবং এখনও পর্য্যন্ত বিহারের মধ্য দিয়া সাধারণ রেল চলাচল আরম্ভ হয় নাই। বহু সরকারী কর্ম্মচারীকেও দেশে শান্তি রক্ষা করিতে যাইয়া প্রাণ দিতে হইয়াছে। মাদ্রাজেও 'মাদ্রাজ ও দক্ষিণ মারহাট্টা' রেলপথ এমনভাবে নষ্ট করা হইয়াছে যে তাহা মেরামত করিয়া পূর্ব্বের অবস্থায় পরিণত করিতে কয়েকমাস সময় লাগিবে। বাঙ্গালা দেশের মফঃস্বলেও ইহা নানাস্থানে ছড়াইয়া পড়ে—ঢাকা সহরে কয়েকদিন বাজার, দোকান প্রভৃতি সবই বন্ধ ছিল এবং স্কুল কলেজগুলি কর্ত্তৃপক্ষ বহুদিন পর্য্যন্ত বন্ধ করিয়া দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। বাঙ্গালার মফঃস্বলের বহুস্থান হইতেও লুঠতরাজের সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। কলিকাতা সহরেও ১৩ই, ১৪ই ও ১৫ই আগষ্ট এমন অবস্থা হইয়াছিল যে সহরবাসীরা নিজ নিজ বাটি হইতে বাহির হইতে সাহস করে নাই। পথে বহুস্থানে পুলিস গুলী চালাইয়া শান্তিস্থাপন করিতে বাধ্য হইয়াছিল। অনেক ট্রামগাড়ী আগুন লাগাইয়া পুড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে। উক্ত তিন দিন কলিকাতায় গণ্ডগোল খুব বেশী হইলেও তাহার পর প্রায় এক পক্ষ কাল প্রতিদিন সহরের কোন না কোন স্থানে গণ্ডগোলের খবর পাওয়া গিয়াছে। মধ্যপ্রদেশে এবং কোন কোন দেশীয় রাজ্যেও এই অশান্তি ছড়াইয়া পড়ায় লোক বিষম ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। বিহারে ও যুক্তপ্রদেশে ডাক চলাচল একরূপ বন্ধই রহিয়াছে এবং ডাকের কর্ত্তৃপক্ষগণ এখন আর সাহস করিয়া মনিঅর্ডার বা রেজেষ্ট্রী পার্শ্বেল গ্রহণ করেন না। রেল চলাচল বন্ধ হওয়ার ফলে কলিকাতায় কয়লা, ডাল-কলাই, গম, আলু, সরিষার তেল প্রভৃতি আমদানী একেবারে বন্ধ হইয়া গিয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। গভর্ণমেণ্ট এই অশান্তি ও অনাচার বন্ধ করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছেন বটে, কিন্তু আগুন যখন চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে, তখন যেমন তাহাকে আয়ত্তাধীন করা সহজসাধ্য থাকে না, এই অনাচারও আজ তেমনই একেবারে দমন করা গভর্ণমেণ্টের পক্ষে বিশেষ কষ্টকর হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এদিকে গভর্ণমেণ্ট সন্দেহবশে সর্ব্বত্রই বহু নেতৃস্থানীয় কংগ্রেস-কর্ম্মীকে গ্রেপ্তার করিয়াছেন। তাঁহারা জেলের বাহিরে থাকিলে হয় ত তাঁহাদের চেষ্টায় এই অশান্তি অনেকটা হ্রাস করা সম্ভব হইত, কিন্তু বিনাবিচারে নেতৃবৃন্দকে আটক রাখার ফলে দেশের সাধারণ লোকের সহানুভূতিও দুষ্কৃতদিগের পক্ষে যাইতেছে। বহু বড় বড় ব্যবসায়ীকেও এই সম্পর্কে গ্রেপ্তার করার ফলে ব্যবসায়ী মহলে একটা বিক্ষোভের সৃষ্টি হইয়াছে এবং ব্যবসায়ীরা কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের অবিলম্বে মুক্তির জন্য বিশেষ আবেদন জানাইয়াছেন। অনাচারের ফলে শুধু যে গভর্ণমেণ্টের অসুবিধা ও ক্ষতি হইতেছে তাহা নহে, ব্যবসায়ীর ব্যবসা নষ্ট হইয়াছে, সহরবাসী নিত্য প্রয়োজনীয় খাদ্য দ্রব্যে বঞ্চিত হইয়াছে, শান্তিকামী ব্যক্তিদিগকেও নানাপ্রকার দুঃখ কষ্ট ভোগ করিতে হইতেছে। এতদিন পর্য্যন্ত ভারতবাসীরা অকুণ্ঠিতভাবে গভর্ণমেণ্টের যুদ্ধ প্রচেষ্টায় সাহায্য দান করিয়াছে, কিন্তু এই অনাচার শুধু বে-সামরিক ব্যক্তিদিগকেই বিব্রত করে নাই, সামরিক প্রচেষ্টার জন্য প্রয়োজনীয় কার্য্যও আর সম্যকভাবে সম্পাদিত হইতে পারিতেছে না। এ অবস্থায়, যাহাতে এই অশান্তি শীঘ্র দূর করা যায়, গভর্ণমেণ্টকে অবিলম্বে তাহার ব্যবস্থা করিতে আমরা অনুরোধ করি। এ সময়ে এ দেশে গোল টেবিল বৈঠক ডাকিয়া যদি এ সমস্যার মীমাংসা করা যায়, তাহাই সর্ব্বত্র সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপায় বলিয়া বিবেচিত হইবে। গভর্ণমেণ্টকে এ বিষয়ে পরামর্শ দিতে উৎসুক, দেশে এমন লোকেরও অভাব নাই।

যে সকল নেতাকে শুধু সন্দেহবশে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে, মহাত্মা গান্ধী প্রমুখ সেই সকল নেতাই এ সময়ে গভর্ণমেণ্টকে উপযুক্ত পরামর্শ দিতে পারেন। তাঁহাদের মুক্তি দেওয়া হইলে অচিরে দেশের লোকের মনোভাব পরিবর্ত্তিত হইবে এবং গান্ধীজি প্রমুখ নেতৃবৃন্দের প্রভাবের দ্বারা দেশ হইতে অনাচার দূর করাও সহজসাধ্য হইবে। মোটের উপর নিরীহ প্রজাবৃন্দের বর্ত্তমান দুর্দ্দশার কথা ভাবিয়া গভর্ণমেণ্টকে অবিলম্বে কার্য্যকরী ব্যবস্থায় মন দিতে হইবে।

সংবাদপত্রবন্ধ—

সংবাদপত্রে সংবাদ প্রকাশ লইয়া গভর্ণমেণ্ট যে সকল কঠোর বিধি প্রয়োগ করিয়াছিলেন, তাহার ফলে দৈনিক সংবাদপত্রগুলির পক্ষে আত্মসম্মান বজায় রাখিয়া সংবাদপত্র প্রকাশ করা অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছিল। তাহার ফলে গত ১৭ই আগষ্ট নিম্নলিখিত ১৫খানি দৈনিক সংবাদপত্রের সম্পাদক ও পরিচালকগণ বসুমতী-সম্পাদক শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ মহাশয়ের সভাপতিত্বে এক সভায় সমবেত হইয়া স্থির করেন যে ২১শে আগষ্ট হইতে তাঁহারা আর তাঁহাদের সংবাদপত্র প্রকাশ করিবেন না। সংবাদপত্রগুলির নাম—(১) অমৃতবাজার পত্রিকা (২) যুগান্তর (৩) হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড (৪) আনন্দবাজার পত্রিকা (৫) এডভান্স (৬) বিশ্বামিত্র (৭) মাতৃভূমি (৮) দৈনিক বসুমতী (৯) টেলিগ্রাফ (১০) ভারত (১১) লোকমান্য (১২) দৈনিক কৃষক (১৩) জাগৃতি (১৪) প্রত্যহ (১৫) সংক্ষিপ্ত আনন্দবাজার পত্রিকা।

ঐ সিদ্ধান্তের পর ২১শে আগষ্ট ঐ সকল দৈনিক পত্রিকা প্রকাশ বন্ধ করিলে ২১শে তারিখে বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্টের প্রধান মন্ত্রী মৌলবী এ-কে ফজলল হক সরকারী দপ্তরখানায় সংবাদপত্র প্রতিনিধি-দিগকে এক সম্মিলনে আহ্বান করেন। তথায় প্রধান মন্ত্রী ছাড়াও ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুত সন্তোষকুমার বসু, খাঁ বাহাদুর আবদুল করিম, শ্রীযুত প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও মৌলবী সামসুদ্দীন আহ্মদ—এই ৫ জন মন্ত্রী উপস্থিত ছিলেন। সংবাদপত্র সম্বন্ধে আদেশগুলি ভারত গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক প্রদত্ত—কাজেই প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টের সে আদেশ পরিবর্ত্তনের কোন হাত নাই। যাহা হউক, প্রধান মন্ত্রী সে বিষয়ে ভারত গভর্ণমেণ্টের সহিত পত্র ব্যবহার করিয়া আদেশের কঠোরতা হ্রাসের ব্যবস্থা করিতে প্রতিশ্রুতি দেন ও তাঁহার কার্য্যের ফল সংবাদপত্র-সমূহকে জানাইতে চাহেন। তৎপরে গত ২৯শে আগষ্ট সংবাদ-পত্র পরিচালকগণ এক সভায় সমবেত হইয়া স্থির করেন যে ৩১শে আগষ্ট হইতে সকলে সংবাদপত্র প্রকাশ করিবেন ও তদনুসারে সংবাদপত্রসমূহ প্রকাশিত হয়। ২৯শে তারিখের সভায় আনন্দ-বাজার পত্রিকার শ্রীযুত সুরেশচন্দ্র মজুমদার ও ভারতের শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার গঙ্গোপাধ্যায়ের গ্রেপ্তারের প্রতিবাদ করা হয়। সভায় নিম্নলিখিত সাংবাদিকগণ উপস্থিত ছিলেন—(১) বসুমতীর শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ—সভাপতি (২) আনন্দবাজার পত্রিকার শ্রীপ্রফুল্লকুমার সরকার (৩) এ্যাডভান্সের শ্রীজানকীজীবন ঘোষ (৪) বিশ্বামিত্রের শ্রীমূলচাঁদ আগারওয়ালা (৫) অমৃতবাজার

মৃত শিশু ও মরণোন্মুখ মাতা   শিল্পী—শ্রীদেবীপ্রসাদ রায় চৌধুরী এম-বি-ই নির্ম্মিত মূর্ত্তি

পত্রিকার শ্রীসুকোমলকান্তি ঘোষ (৬) হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ডের শ্রীপ্রমোদকুমার সেন (৭) যুগান্তরের শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার (৮) প্রত্যহের ডাঃ শ্রীঅজিতশঙ্কর দে (৯) টেলিগ্রাফের শ্রীসি-এস্ রঙ্গস্বামী (১০) লোকমান্যের শ্রীশ্রীরাম পাণ্ডে ও (১১) কৃষকের শ্রীরমেশ বসু।

ঘড়ির কাঁটা পরিবর্ত্তন—

১৯৪১ সালের অক্টোবর মাস হইতে ১৯৪২ সালের সেপ্টেম্বর মাস পর্য্যন্ত এই এক বৎসরের মধ্যে তিনবার সময় পরিবর্ত্তন করা হইল—অর্থাৎ প্রতিবারেই ঘড়ির কাঁটা সরাইতে হইল। গত বৎসর ১লা অক্টোবর প্রথম 'বেঙ্গল টাইম' প্রবর্ত্তন করা হইল। তৎপূর্ব্বে বাঙ্গালাদেশে যে 'কলিকাতা টাইম' ছিল তাহা তখনকার ইণ্ডিয়ান ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম অপেক্ষা ২৪ মিনিট অগ্রবর্ত্তী ছিল। বেঙ্গল-টাইম আবার কলিকাতা টাইমের ৩৬ মিনিট অগ্রবর্ত্তী করা হইল—অর্থাৎ ইণ্ডিয়ান ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম ও বেঙ্গল টাইমে ১ ঘণ্টা তফাৎ হইয়া গেল। তৎপরে গত ১৫ই মে হইতে 'বেঙ্গল টাইম' উঠাইয়া দিয়া সর্ব্বত্র 'ইণ্ডিয়ান ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম' চালান হইতেছিল। কিন্তু তাহাও কর্ত্তৃপক্ষের মনোনীত হইল না। এখন গত ১লা সেপ্টেম্বর হইতে যে নূতন ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম চলিতেছে, তাহা 'বেঙ্গল টাইমের' অনুরূপ—অর্থাৎ 'গ্রীণউইচ টাইমের' সাড়ে ৬ ঘণ্টা অগ্রবর্ত্তী; পূর্ব্বে 'ইণ্ডিয়ান ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইমের' সহিত গ্রীণউইচ টাইমের সাড়ে ৫ ঘণ্টা তফাৎ ছিল। এই পরিবর্ত্তনের যে কি কারণ, তাহা বুঝা কঠিন।

বীর সাভারকর—

নিখিল ভারত হিন্দু মহাসভার সভাপতি বীর বিনায়ক দামোদর সাভারকর শারীরিক অসুস্থতার জন্য সভাপতির পদ ত্যাগ করিয়াছিলেন। কিন্তু ভারতের বর্ত্তমান রাজনীতিক পরিস্থিতির সময় মহাসভার অন্যান্য কর্ম্মীবৃন্দের অনুরোধে তিনি সে পদত্যাগ পত্র প্রত্যাহার করিয়াছেন। তাঁহার অসাধারণ কর্ম্মশক্তির কথা যাঁহারা জানেন, তাঁহারা এ সংবাদে অবশ্যই আনন্দিত হইবেন।

গ্রেপ্তার ও মুক্তি—

'বসুমতী' সম্পাদক শ্রীযুত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ মহাশয় গত ১৮ই আগষ্ট মঙ্গলবার সকালে ৯টার সময় তাঁহাকে পুলিস তাঁহার গোয়াবাগান লেনস্থ বাটী হইতে গ্রেপ্তার করিয়া লইয়া গিয়াছিল। কিন্তু পরদিন বেলা ১টার সময় তাঁহাকে মুক্তি প্রদান করা হয়। ভারত রক্ষা আইনে তাঁহাকে গ্রেপ্তার করা হয়, কিন্তু গ্রেপ্তারের কারণ জানা যায় নাই। হেমেন্দ্রবাবুর মত বয়োবৃদ্ধ সাংবাদিককে এইভাবে একদিন আটক রাখার পর মুক্তিদান—কর্ত্তৃপক্ষের সুবিবেচনার অভাবই প্রকাশ করে।

খাদ্যসরবরাহের নূতন ব্যবস্থা—

লবণ, চিনি, চাউল প্রভৃতি খাদ্যদ্রব্য দুষ্প্রাপ্য হইলে গভর্ণমেণ্ট ঐ সকল দ্রব্যের মূল্য নিয়ন্ত্রণের জন্য 'মূল্য নিয়ন্ত্রণ কর্ম্মচারী' নিযুক্ত করিয়াছিলেন। সে ব্যবস্থা সাফল্যমণ্ডিত না হওয়ায় এখন আবার নূতন খাদ্য সরবরাহ ডিরেক্টর নিযুক্ত করিয়াছেন। মিঃ এল-জি পিনেল আই-সি-এস ডিরেক্টর নিযুক্ত হইলেন। মিঃ ডি-এল মজুমদার আই-সি-এসকে সহকারী ডিরেক্টর এবং মিঃ বি-কে আচার্য্য আই-সি-এসকে কলিকাতা ও শিল্পপ্রধান স্থানসমূহের ভারপ্রাপ্ত অফিসার নিযুক্ত করা হইয়াছে। দেখা যাউক, নূতন ব্যবস্থার ফল কিরূপ হয়।

রামস্বামী আয়ার—

স্যার সি-পি রামস্বামী আয়ার অতি অল্পদিন পূর্ব্বে বড়লাটের শাসন পরিষদের অন্যতম সদস্য নিযুক্ত হইয়াছিলেন। সম্প্রতি তিনি সে কাজ ত্যাগ করিয়া পুনরায় তাঁহার পূর্ব্ব কার্য্যে ফিরিয়া গিয়াছেন অর্থাৎ ত্রিবাঙ্কুরের মহারাজার দেওয়ান পদে নিযুক্ত হইয়াছেন।

সম্রাটের ভ্রাতার মৃত্যু—

ভারত-সম্রাটের কনিষ্ঠ ভ্রাতা 'ডিউক অফ কেণ্ট' গত ২৫শে আগষ্ট মঙ্গলবার স্কটল্যাণ্ডে এক বিমান দুর্ঘটনার সহসা মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। কেণ্ট রাজকীয় বিমান বাহিনীর ইন্সপেক্টার জেনারেলের অধীনে কার্য্য করিতেন এবং একটি কর্ত্তব্য সম্পাদনের জন্য তাঁহাকে আইসল্যাণ্ডে যাইতে হইতেছিল। মৃত্যুকালে ডিউকের বয়স মাত্র ৪০ বৎসর হইয়াছিল। তিনি ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে গ্রীসের রাজকন্যা মেরিনাকে বিবাহ করিয়াছিলেন এবং ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে এক পুত্র, ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে এক কন্যা ও গত জুলাই মাসে তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছে। সম্রাট পরিবারে ইতিপূর্ব্বে কেহই বিমান দুর্ঘটনায় মারা যান নাই। এখনও সম্রাট-জননী মেরী জীবিতা আছেন—আমরা রাজ-পরিবারের এই শোকে আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করি। সে দিন মাত্র সম্রাটের তৃতীয় ভ্রাতা ডিউক অফ গ্লোষ্টার ভারত পরিদর্শন করিয়া গিয়াছেন।

কলিকাতায় চাউল সরবরাহ—

বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্টের খাদ্য সরবরাহের ডিরেক্টার মিঃ এল-জি-পিনেল কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াই গত ১লা সেপ্টেম্বর কলিকাতার চাউল ব্যবসায়ীদিগকে এক সম্মিলনে আহ্বান করিয়াছিলেন। তাঁহাদের নিকট হাঁহাদের অভাব অভিযোগ সম্বন্ধে সকল কথা শুনিয়া তিনি এ বিষয়ে পরামর্শ-দানের জন্য একটি বেসরকারী কমিটি গঠনের প্রস্তাব করিয়াছেন। দেখা যাউক, নূতন ব্যবস্থার ফল কিরূপ হয়।

পাটচাষীর ভবিষ্যৎ—

১৯৪২ সালে বাঙ্গালার পাটচাষ সম্বন্ধে যে পূর্ব্বাভাষ প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে দেখা যায়, ১৯৪১ সালে বাঙ্গালায় ১৫ লক্ষ ৩২ হাজার ৮৫৫ একর জমীতে পাট চাষ হইয়াছিল এবং ১৯৪২ সালে ৩১ লক্ষ ৯০ হাজার একর জমীতে পাট বোনা হইয়াছে। ১৯৪১ সালে মোট ৫৪ লক্ষ গাঁট পাট উৎপন্ন হইয়াছিল—এবার ১৯৪২ সালে কম পক্ষে ১ কোটি ১০ লক্ষ গাঁট পাট উৎপন্ন হইবে। ১৯৪১এর জুলাই হইতে ১৯৪২এর জুন পর্য্যন্ত ১২ মাসে বাঙ্গালার পাটকলগুলিতে ৬৯ লক্ষ গাঁট পাট ব্যবহৃত হইয়াছে ও ১২ লক্ষ গাঁট বাঙ্গালা হইতে রপ্তানী হইয়াছে। ১৯৪০ সালে ১৯৪১ সালের প্রায় তিন গুণ

জমীতে পাট চাষ হওয়ার ফলে সেবার ৮০ লক্ষ গাঁট পাট উদ্বৃত্ত হয় ও তাহাতে পাটের দর খুব কমিয়া যায়—এবারও ঠিক সেই অবস্থা হইবে বলিয়া মনে হইতেছে। পাটের দর মণকরা ইতিমধ্যে দুই টাকা কমিয়া গিয়াছে—অথচ চালের দাম দ্বিগুণ বা তদপেক্ষা বেশী হইয়াছে। এ অবস্থায় পাটচাষী না খাইয়া মরিবে। গভর্ণমেন্ট যদি এখনই পাটের দর বাঁধিয়া দিয়া নিজেরা পাট ক্রয় করেন, তবেই এই দুঃসময়ে পাটচাষীদের রক্ষা করা যাইবে, নচেৎ তাহাদের ধ্বংস অনিবার্য্য।

ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার ফল—

এবার ১৯৪২ খৃষ্টাব্দে মোট ৪৩ হাজার ৩ শত ১৭জন ছাত্র কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার টাকা জমা দিয়াছিল। তাহাদের মধ্যে ১২৩জন অনুপস্থিত হয় ও ২৩জনকে পরে পরীক্ষা দিতে দেওয়া হয় নাই। মোট ৪২৫৭১জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ২৬৫৮৬জন পাশ করিয়াছে। তন্মধ্যে প্রথম বিভাগে ১৬৫১জন, দ্বিতীয় বিভাগে ৪৬২৭জন ও তৃতীয় বিভাগে ২০২৫৫জন পাশ করিয়াছে। ১৩৬জনকে পরীক্ষা কেন্দ্র হইতে বিতাড়িত করা হইয়াছে। এবার শতকরা ৬২·৫জন পাশ করিয়াছে—১৯৪১ সালে শতকরা ৫৫·১৬জন পাশ করিয়াছিল।

হুগলী চুঁচড়া মিউনিসিপালিটী—

বাঙ্গালা গভর্ণমেন্ট ভারতরক্ষা আইন অনুসারে হুগলী চুঁচড়া মিউনিসিপালিটীর কার্য্য ভার গ্রহণ করিয়া শ্রীযুত প্রসাদদাস মল্লিক নামক একজন মিউনিসিপাল কমিশনারকে মিউনিসিপালিটীর সকল কাজ চালাইতে আদেশ দিয়াছেন। সকল কমিশনারকে পদত্যাগ করিতে বলা হইয়াছে। এ বিষয়ে পূর্ব্বেই সরকারী ইস্তাহার প্রচারিত হইয়াছিল—কাজেই নূতন করিয়া বলিবার কিছুই নাই।

সিংহলে চাউল প্রেরণ—

সিংহলের স্বরাষ্ট্র বিভাগের মন্ত্রী সার ব্যারন জয়তিলক বাঙ্গালা দেশ হইতে সিংহলে চাউল লইয়া যাইবার ব্যবস্থা করিবার জন্ত কলিকাতায় আসিয়াছেন। সিংহলে চাউলের অভাবই অবশ্য এই আগমনের কারণ। কিন্তু যে সময়ে বাঙ্গালায় লোক ৫ টাকা মণের চাউল ১২ টাকা মূল্যেও পাইতেছে না, চাউলের অভাবে ও দুর্ম্মূল্যতার জন্ত বাঙ্গালার লোককে আধপেটা খাইয়া থাকিতে হইতেছে, সে সময়ে বাঙ্গালা হইতে বিদেশে চাউল প্রেরণ কি সম্ভব বা সঙ্গত হইবে? এ বিষয়ে গভর্ণমেন্ট কি করিবেন তাহা আমরা জানি না। তবে বোধহয় কোন বিবেচক ব্যক্তিই এ সময়ে দেশবাসীর জন্ত চাউলের বন্দোবস্ত না করিয়া সিংহলকে চাউল দিতে সম্মত হইবেন না।

চিনি ও লবণ—

গত ২৭শে আগষ্ট হইতে বাঙ্গালা গভর্ণমেন্ট চিনি ও লবণ সম্পর্কে মূল্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রত্যাহার করিয়া লইয়াছেন। গভর্ণমেন্টের বিশ্বাস, বাজারে প্রচুর চিনি ও লবণ থাকায় মূল্য নিয়ন্ত্রণ না করিলেও ক্রেতারা ন্যায্য মূল্যে ঐ সকল জিনিষ পাইবে। কিন্তু গত কয়দিনে বাজারে চিনি দশআনা সের দরে ও লবণ তিন আনা সের দরে বিক্রয় হইতেছে। ইহার প্রতিকারের ব্যবস্থা কে করিবে? গভর্ণমেন্টের এ বিষয়ে কি কর্ত্তব্য আছে, তাঁহারাই বলিতে পারেন।

বাঙ্গালীর সম্মান—

কলিকাতা পুলিশের সুপারিন্টেণ্ডেন্ট স্বর্গত রায় বাহাদুর ব্রজেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্র শ্রীযুত যতীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় সম্প্রতি 'কিংস কমিশন' পাইয়া কলিকাতার একজন
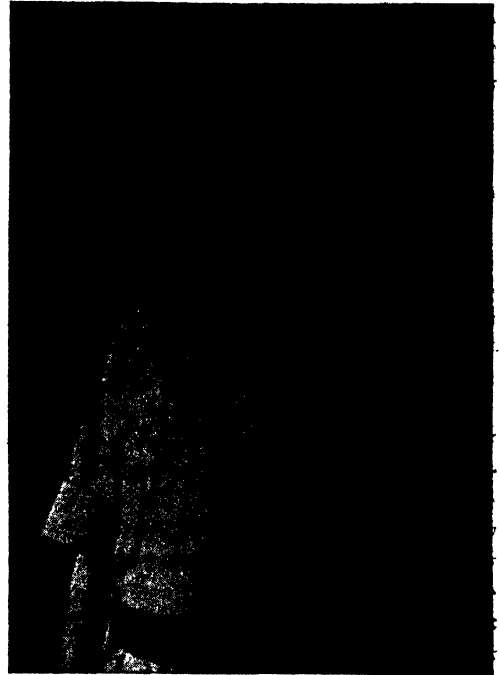
শ্রীযুত যতীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

'সেন্সার অফিসার' নিযুক্ত হইয়াছেন। উক্ত অফিসে তিনিই একমাত্র বাঙ্গালী। যতীন্দ্রবাবু কলিকাতার পানি মার্কেটে একজন খ্যাতনামা দালাল ছিলেন। আমরা তাঁহার দীর্ঘজীবন ও সাফল্য কামনা করি।

লোকাপসারণ ও জমীদারবর্গ—

যুদ্ধের প্রয়োজনে বাঙ্গালা দেশের বহু স্থানের অধিবাসীদিগকে গৃহচ্যুত করার প্রয়োজন হইয়াছিল। ঐ সকল স্থান সামরিক প্রয়োজনে গভর্ণমেন্ট গ্রহণ করিয়াছেন। গৃহহীন লোকদিগকে কি ভাবে আশ্রয় দান করা যায়, সে সম্বন্ধে আলোচনার জন্ত বাঙ্গালা গভর্ণমেন্টের অন্যতম মন্ত্রী মাননীয় শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় গত ১৮ই আগষ্ট বাঙ্গালার সরকারী দপ্তরখানায় জমীদারদিগকে লইয়া এক সভা করিয়াছিলেন। জমীদারগণ গৃহহীন লোকদিগকে জমী দিয়া সাহায্য

করিতে সম্মত হইয়াছেন। বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ বাহাদুর একা নিজ জমীদারীতে ৬০ হাজার একর খাস-দখলের জমী বিনা নজরে গৃহহীন লোকদিগকে বন্দোবস্ত করিয়া দিবেন। আমাদের বিশ্বাস, বাঙ্গালার অন্যান্য জমীদারগণও বর্দ্ধমানের আদর্শ অনুসরণ করিয়া দুঃস্থ লোকদিগের দুর্দ্দশা নিবারণে সাহায্য করিবেন। ইহার ফলে যদি পতিত জমীর উদ্ধার হয়, তবে তাহা দেশের সম্পদ বৃদ্ধি করিবে সন্দেহ নাই।

চিত্র পরিচিতি—

গত ভাদ্র মাসের ভারতবর্ষে সাময়িকীর মধ্যে পরলোকগত জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট রায় বাহাদুর হীরণলাল মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের চিত্র প্রকাশিত হইয়াছে। বালীগঞ্জের 'ইউনাইটেড্ আর্টিষ্ট' ঐ ফটোখানি আমাদিগকে দিয়াছিলেন।

আসামে নূতন মন্ত্রিসভা—

আসামে নিম্নলিখিতরূপ নূতন মন্ত্রি-সভা গঠিত হইয়াছে—(১) স্যার মহম্মদ সাদুল্লা প্রধান মন্ত্রীরূপে ইহা গঠন করিয়াছেন এবং নিজে স্বরাষ্ট্র ও সরবরাহ বিভাগের ভার লইয়াছেন। মোট ১০জন মন্ত্রী হইয়াছেন। (২) খাঁ বাহাদুর সৈয়দুর রহমন—শিক্ষা ও পূর্ত্ত বিভাগ (৩) খাঁ সাহেব মুদাব্বীর হোসেন চৌধুরী—সিভিল ডিফেন্স্ বা জনরক্ষা ও ব্যবস্থা বিভাগ (৪) মিঃ আবদুল মতিন চৌধুরী—অর্থ (৫) মৌলবী মুনাওয়আলি—রাজস্ব ও বন (৬) শ্রীযুত হীরেন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী—স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন, আবগারী ও শ্রম (৭) মিস্ মেভিস ডান—মেডিকেল ও স্বাস্থ্য (৮) ডাক্তার মহেন্দ্রনাথ স্যাইকিয়া—শিল্প ও সমবায় (৯) শ্রীযুত নবকুমার দত্ত—কৃষি ও পশু চিকিৎসা (১০) শ্রীযুত রূপনাথ ব্রহ্ম বিচার ও রেজিষ্ট্রেসন। ৮ মাস পূর্ব্বে ১৯৪১ সালের ২৫শে ডিসেম্বর আসামে মন্ত্রিসভা ভাঙ্গিয়া দিয়া গভর্ণর নিজেই শাসন ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু ৮মাস পরে ২৫শে আগষ্ট এই নূতন মন্ত্রিসভা গঠিত হইল। বলা বাহুল্য, এই মন্ত্রিসভা ব্যবস্থা পরিষদের সদস্যগণ কর্ত্তৃক অনুমোদিত হইবে কি না, সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ আছে। তবে যুদ্ধের সময় কাজ চালাইবার জন্য গভর্ণর এই নূতন ব্যবস্থা করিলেন। দেখা যাউক, শেষ পর্য্যন্ত কত দিন এই মন্ত্রিসভা স্থায়ী হয়। নূতন প্রধান মন্ত্রী অনেক আশা লইয়া কার্য্যে নামিয়াছেন; তাহা যদি ফলবতী হয়, তবেই ইহা আনন্দের বিষয় হইবে।

মহারাজা প্রদ্যোতকুমার—

কলিকাতা পাথুরিয়াঘাটার মহারাজা স্যার প্রদ্যোতকুমার ঠাকুর গত ২৭শে আগষ্ট কাশীধামে ৭১ বৎসর বয়সে পরলোক-গমন করিয়াছেন। তিনি রাজা স্যার সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের দ্বিতীয় পুত্র। স্বনামখ্যাত মহারাজা স্যার যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর তাঁহাকে পোষ্যপুত্ররূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। মহারাজা প্রদ্যোত-কুমার যৌবনাবধি নানা জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তিনি ১৮৯৯ হইতে ১৯১২ পর্য্যন্ত দীর্ঘকাল বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসন নামক জমীদার সভার সম্পাদক ছিলেন এবং পরে ১৯১৯ হইতে ১৯২২ পর্য্যন্ত ও ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে তিনি উক্ত এসোসিয়েসনের সভাপতি হইয়াছিলেন। তিনি বাঙ্গালার রয়াল এসিয়াটিক সোসাইটীর সদস্য এবং ইণ্ডিয়ান মিউজিয়ামের অন্যতম ট্রাষ্টি ও চেয়ারম্যান ছিলেন। শিল্পের প্রতি তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল ও তিনি বহু চিত্র সংগ্রহ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারই উৎসাহে 'একাডেমী অফ ফাইন আর্টস্' স্থাপিত ও চালিত হইয়াছিল। মহারাজা বনিয়াদী জমীদার বংশের সকল গুণের অধিকারী ছিলেন এবং তাঁহার গৃহে সর্ব্বদা অতিথি সমাগম হইত। তাঁহার 'মরকত কুঞ্জ' নামক বাগানবাটিতে ভারত, এমন কি ইউরোপেরও বহু সৌখীন ও ধনী ব্যক্তি বাস করিয়া গিয়াছেন।

পারস্য-ইরাক সেনাপতি—

স্যার হেনরী উইলসন সম্প্রতি বৃটীশ সম্রাট কর্ত্তৃক পারস্য ও ইরাকস্থ মিলিত বৃটীশ বাহিনীর সেনাপতি নিযুক্ত হইয়াছেন। ইহার ফলে মধ্য-প্রাচীর সেনাপতি জেনারেল আলেকজাণ্ডার শুধু প্যালেষ্টাইন ও সিরিয়ার সৈন্যদল পরিচালনা করিবেন এবং জেনারেল ওয়াভেলও ঐ অঞ্চল রক্ষার দায়িত্ব হইতে অব্যাহতি-লাভ করিলেন। আশা করা যায়, নূতন ব্যবস্থায় ককেশাসের মধ্য দিয়া জার্ম্মাণদের অগ্রগতি ব্যাহত হইবে।

সঙ্কট অবস্থায় কর্ত্তব্য—

বর্ত্তমান সঙ্কটজনক অবস্থায় দেশবাসীর কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করিয়া বাঙ্গালার প্রধান মন্ত্রী মিঃ এ-কে ফজলল হক যে আবেদন প্রচার করিয়াছেন, তাহা তিনি ভারতের বড়লাট, বৃটীশ প্রধান মন্ত্রী, প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট, মঁসিয়ে ষ্ট্যালিন ও মার্শাল চিয়াংকাইসেককেও জানাইয়াছেন। তাহাতে তিনি বলিয়াছেন—"আমি বাঙ্গালা দেশের জনসাধারণের সকল দল ও সম্প্রদায়ের নিকট সনির্ব্বন্ধ আবেদন জানাই যে—সকলে যেন এই প্রদেশে শান্তিপূর্ণ আবহাওয়া পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিয়া তাহা বজায় রাখার চেষ্টা করেন এবং বর্ত্তমান সঙ্কট অবস্থা দূর করিবার জন্য সর্ব্বপ্রকারে উদ্যোগী হন। শান্তিপূর্ণ ও সম্মানজনকভাবে সমস্যার মীমাংসা করিয়া বর্ত্তমান অচল অবস্থার অবসান করিবার জন্য ভারতবর্ষের সহিত অবিলম্বে আলোচনা আরম্ভ করা যে বৃটীশ গভর্ণমেণ্টের গুরুত্বপূর্ণ কর্ত্তব্য, আজ বৃটীশ গভর্ণমেণ্টকে তাহাই উপলব্ধি করিতে হইবে। দেশে যদি ব্যাপকভাবের অসন্তোষ বিদ্যমান থাকে (উহা সক্রিয়ই হউক, আর প্রচ্ছন্নই হউক) শত্রুর শক্তি প্রকৃতপক্ষে তাহাতে বৃদ্ধি পাইবে ও দেশের যুদ্ধপ্রচেষ্টাও ব্যাহত হইবে।" আমাদের মনে হয়, প্রধান মন্ত্রীর এই আবেদন, উচ্চতর কর্ত্তৃপক্ষ-গণের নিকট উপেক্ষিত হইবে না।

মহাদেব দেশাই—

মহাত্মা গান্ধীর সেক্রেটারী মহাদেব দেশাই গত ১৫ই আগষ্ট বোম্বায়ের যারবেদা জেলে সকাল প্রায় ৯টার সময় হঠাৎ পরলোক-গমন করেন। ৯ই আগষ্ট সকালে মহাত্মা গান্ধী প্রমুখ নেতৃবৃন্দের সহিত তাঁহাকেও গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল। মহাদেব গুজরাট প্রদেশের সুরাট জেলায় ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯১০ সালে বি-এ ও ১৯১২ সালে এল্-এল-বি পাশ করিয়া তিনি কিছুদিন বোম্বাই গভর্ণমেণ্টের সমবায় বিভাগে কাজ করেন। পরে চাকুরী ছাড়িয়া গান্ধীজির সেক্রেটারী হন।

গোলটেবিল বৈঠকের সময় তিনি গান্ধীজির সহিত বিলাত গিয়াছিলেন। মহাদেব সংস্কৃত, ইংরাজি, গুজরাটী ও বাঙ্গালা ৪টি ভাষাতেই পণ্ডিত ছিলেন এবং বহু বাঙ্গালা ও ইংরাজি পুস্তক গুজরাটী ভাষায় অনুবাদ করিয়াছিলেন। তিনি ইংরাজী ও হিন্দী 'ইয়ং ইণ্ডিয়া' ও 'নবজীবন' পত্রে বহু প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। কিছুদিন তিনি এলাহাবাদের 'ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট' পত্রের সম্পাদক ছিলেন এবং পরে 'হরিজন' পত্রের সম্পাদক হইয়াছিলেন। ১৯২১, ১৯৩০ ও ১৯৩২ সালে ধৃত হইয়া তিনি কারাদণ্ড ভোগ করিয়াছিলেন। তাঁহার মত সহৃদয় ও সদালাপী ভদ্রলোক অতি অল্পই দেখা যায়। তাঁহার বিধবাপত্নী ও পুত্র কন্যা বর্ত্তমান। গান্ধীজিকে তিনি যেমন পিতার ন্যায় শ্রদ্ধা করিতেন, গান্ধীজিও তেমনই তাঁহাকে পুত্রের ন্যায় দেখিতেন; তাঁহার মৃত্যুতে গান্ধীজির ও দেশের অপূরণীয় ক্ষতি হইল।

কলিকাতার ট্রাম কোম্পানী ক্রয়—

কলিকাতা ট্রামওয়ে কোম্পানীর সহিত কলিকাতা কর্পোরেশনের যে চুক্তি আছে, তাহার মেয়াদ আর ২ বৎসর পরে শেষ হইবে। সে সময় যাহাতে কর্পোরেশনের পক্ষ হইতে ট্রাম কোম্পানীর সকল জিনিষ ক্রয় করিয়া লওয়া হয় সে জন্য কর্পোরেশন কর্ত্তৃপক্ষ এখন হইতে চেষ্টা করিতেছেন। ট্রাম কোম্পানীর অংশীদারগণ প্রায় সকলেই বিদেশী এবং ঐ কোম্পানী বৎসরে প্রভূত টাকা লাভ করিয়া থাকেন। সে অবস্থায় যদি কর্পোরেশনের অধীনে নিজেদের ট্রাম হয়, তদ্বারা ধনী ও শ্রমিক উভয় সম্প্রদায়ই লাভবান হইবেন সন্দেহ নাই।

প্রতীকার ব্যবস্থা—

কলিকাতা ও মফঃস্বলে খাদ্য দ্রব্যের অভাব ও যানবাহনাদির অসুবিধা সম্বন্ধে জনসাধারণের অভিযোগ জানিয়া তাহার প্রতীকার করিবার জন্য বঙ্গীয় ব্যবস্থাপরিষদ ও ব্যবস্থাপক সভার 'প্রগ্রেসিভ কোয়ালিসন দল' হইতে একটি কমিটী গঠিত হইয়াছে। ঢাকার নবাব বাহাদুর কমিটীর সভাপতি ও মিঃ সৈয়দ বদরুদ্দোজা সম্পাদক হইয়াছেন। অভাব অভিযোগ কলিকাতা ১৯নং ইউরোপীয়ান এসাইলাম লেনে সম্পাদক মহাশয়কে জানাইতে হইবে।

গভর্ণর কর্ত্তৃক শোকপ্রকাশ—

গত ২৪শে আগষ্ট উত্তর-বিহারে সীতামারির মহকুমা হাকিম বাবু হরদীপ সিং পুপরী থানার অধীন মধুবান বাজারে জনতা কর্ত্তৃক নিহত হন। ঐ সঙ্গে পুলিশ ইন্সপেক্টর পণ্ডিত মূরত ঝা, হেড কনেষ্টবল বাবু শ্যামলাল সিং ও মহকুমা হাকিমের আরদালী পিওন নিহত হয়। ১৫ই আগষ্ট মজঃফরপুর জেলায় কাটরা থানা জনতা কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলে কনেষ্টবল মহম্মদ হাসিমও নিহত হইয়াছে। ১৬ই অগষ্ট মজঃফরপুর জেলার মিনাপুর থানা জনতা কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলে সাব ইন্সপেক্টর এল-এ ওয়ালারকে থানার উঠানে জীবন্ত পুড়াইয়া মারা হইয়াছে। বিহারের গভর্ণর বাহাদুর এক ইস্তাহার জারি করিয়া এই সকল দুর্ঘটনায় নিহত ব্যক্তিদের জন্য শোকপ্রকাশ করিয়াছেন। এই সকল হাঙ্গামার জন্য পাটনা সহরের অধিবাসীদের নিকট হইতে দুই লক্ষ টাকা পাইকারী জরিমানা আদায় করা হইবে স্থির হইয়াছে। এ দিকে বিহারে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য নেতৃস্থানীয় বহু লোকের স্বাক্ষরিত এক আবেদনপত্রও প্রচার করা হইয়াছে।

শ্রীযুক্তা সরলা দেবী চৌধুরাণী—

শ্রীযুক্তা সরলা দেবী চৌধুরাণী ৯ই সেপ্টেম্বর ৭০ বৎসর বয়সে পদার্পণ করিবেন। তদনুপক্ষে তাঁহার প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য অধ্যাপক ডক্টর শ্রীযুত কালিদাস নাগের নেতৃত্বে উদ্যোগ আয়োজন চলিতেছে। তাঁহার সাহিত্যিক খ্যাতি যথেষ্ট এবং তাঁহার দানে বাঙ্গলা সাহিত্য সমৃদ্ধ হইয়াছে। এক সময়ে তিনি 'ভারতী' পত্রিকার সম্পাদিকাও ছিলেন। রাজনীতিক্ষেত্রেও
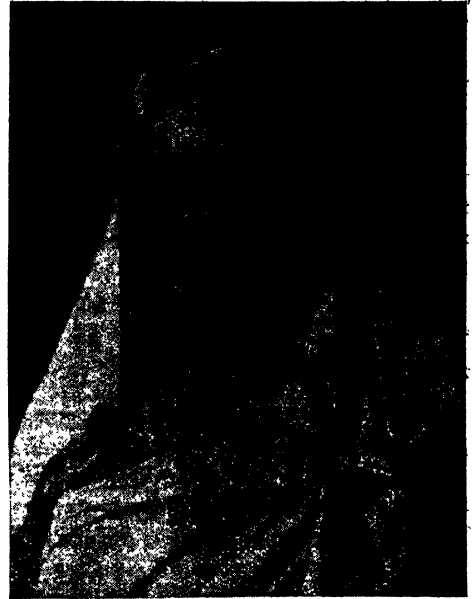
শ্রীযুক্তা সরলা দেবী চৌধুরাণী

তিনি যথেষ্ট কাজ করিয়াছেন। আমরা এই উপলক্ষে তাঁহাকে শ্রদ্ধাভিনন্দন জ্ঞাপন করি এবং আশা করি, দেশবাসী সকলে তাঁহার প্রতি উপযুক্ত সম্মান প্রদর্শনের ব্যবস্থা করিবেন।

গান্ধীজি প্রমুখ নেতৃবৃন্দ—

৩০শে আগষ্ট বোম্বাই গভর্ণমেণ্ট একখানি সরকারী ইস্তাহার প্রচার করিয়া মহাত্মা গান্ধী প্রমুখ নেতৃবৃন্দের স্বাস্থ্য-সমাচার প্রকাশ করিয়াছেন; তাহাতে বলা হইয়াছে—"গান্ধীজিকে একটি স্বতন্ত্র বাড়ীতে রাখা হইয়াছে, তথায় তাঁহাকে সকলপ্রকার সুখ-সুবিধা প্রদান করা হয় ও তিনি যেরূপ খাদ্য চাহেন, তাহা দেওয়া হয়। তাঁহার পত্নী তাঁহার সঙ্গে আছেন এবং নিজের ডাক্তার ছাড়াও তাঁহার কয়েকজন সঙ্গীকে গান্ধীজির নিকট থাকিতে দেওয়া হইয়াছে। ওয়ার্কিং কমিটীর সদস্যদিগকেও উপযুক্ত বাড়ীতে রাখা হইয়াছে ও প্রয়োজনীয় সুবিধার ব্যবস্থা করা হয়।

একজন আই-এম-এস ডাক্তার তাঁহাদের দেখা শুনা করেন। সকলকে নিজ নিজ পরিবারবর্গের নিকট ব্যক্তিগত বিষয় লইয়া পত্র লিখিতে দেওয়া হয় ও সংবাদপত্র পাঠ করিতে দেওয়া হয়। সকলেরই স্বাস্থ্য ভাল আছে।" যে সময়ে দেশের অধিকাংশ জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্রের প্রকাশ বন্ধ ছিল, সে সময়ে নেতৃবৃন্দের স্বাস্থ্য সম্পর্কে বহু ভয়াবহ গুজব শোনা গিয়াছিল। লোক যাহাতে সেই সকল মিথ্যা গুজবে বিশ্বাস না করে, সেইজন্যই গভর্ণমেণ্ট এইরূপ ইস্তাহার প্রকাশের ব্যবস্থা করিয়াছেন।

হিন্দুমহাসভার দাবী—

গত ১লা সেপ্টেম্বর দিল্লীতে এক সাংবাদিক সম্মিলনে বাঙ্গালার অন্যতম মন্ত্রী ও হিন্দুনেতা ডক্টর শ্রীযুত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় জানাইয়াছেন—"হিন্দু মহাসভার প্রধান দাবী এই যে, আজ শুধু দমননীতি দ্বারা ভারতবর্ষ শাসন করা যাইবে না। বর্ত্তমান অচল অবস্থার অবসান করিতে হইলে স্বয়ং বৃটীশ গভর্ণমেণ্টকেই অগ্রণী হইতে হইবে। সাধারণ শত্রুর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিবার জন্য কোন সুসংবদ্ধ পরিকল্পনা অনুসারে বৃটীশ সরকার ক্ষমতা ত্যাগ করিবার সিদ্ধান্ত করিলেই বর্ত্তমান সঙ্কট অবস্থার সমাধান হইতে পারে। ভারতের জনবল ও বিপুল সম্পদ যাহাতে ফলপ্রদভাবে সুসংবদ্ধ করা যায়, তজ্জন্য অবিলম্বে প্রতিনিধিমূলক জাতীয় গভর্ণমেণ্ট গঠন করিতে হইবে।" ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ যাহা বলিয়াছেন, এ বিষয়ে তাহাই যথেষ্ট। কিন্তু সে কথা আজ কেহ শুনিবেন কি?

জনরক্ষা ব্যবস্থা—

কলিকাতা কলেজ মার্কেটে কলিকাতা কর্পোরেশনের কমার্সিয়াল মিউজিয়াম হলে সম্প্রতি বাঙ্গালার অন্যতম মন্ত্রী শ্রীযুত সন্তোষকুমার বসু একটি এ-আর-পি-প্রদর্শনীর উদ্বোধন কালে যাহা বলিয়াছেন, তাহা সকলেরই প্রণিধানযোগ্য—'আমি আশা করি, ভারতের এবং বৃটেন, আমেরিকা ও চীনের নেতৃবৃন্দ ভারতীয় সমস্যার সমাধানে অগ্রসর হইয়া তাঁহাদের সম্মিলিত আলাপ আলোচনার দ্বারা এমন অবস্থার সৃষ্টি করিবেন, যাহাতে সকল দেশের সুনাম বর্দ্ধিত হইবে ও ভারতের আশা আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইবে। নূতন ব্যবস্থার ফলে শুধু যে ভারতই রক্ষা পাইবে তাহা নহে—তাহা এই চরম বিপৎকালে মিত্রপক্ষের উদ্দেশ্যকেও সাহায্য করিবে।"

কৃষ্ণনগরে দ্বিজেন্দ্রলাল উৎসব—

কৃষ্ণনগর সাহিত্য-সঙ্গীতির উদ্যোগে এবার গত ১৬ই আগষ্ট কৃষ্ণনগর ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে স্বর্গত কবি দ্বিজেন্দ্রলালরায় মহাশয়ের বার্ষিক স্মৃতি উৎসব হইয়া গিয়াছে। ভারতবর্ষ-সম্পাদক শ্রীযুত ফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় উৎসবের উদ্বোধন করিয়াছিলেন এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীযুত প্রিয়রঞ্জন সেন উৎসবে সভাপতিত্ব করেন। উৎসবে স্থানীয় জেলাজজ শ্রীযুত শৈবাল কুমার গুপ্ত, কৃষ্ণনগর কলেজের প্রিন্সিপাল শ্রীযুত জিতেন্দ্রমোহন সেন প্রমুখ বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। দ্বিজেন্দ্রলালের ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীযুত বীরেন্দ্রলাল রায় মহাশয় কবিবরের কয়েকখানি গান গাহিয়া ও একটি সুলিখিত প্রবন্ধ পাঠ করিয়া সকলকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন। কৃষ্ণনগরবাসীরা প্রতি বৎসর এই উৎসব সম্পাদনের দ্বারা দ্বিজেন্দ্রলালের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিয়া থাকেন।

ডক্টর শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর—

প্রসিদ্ধ শিল্পী ডক্টর শ্রীযুত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের সপ্তত্তিতম জন্মদিবস উপলক্ষে আগামী ১৭ই সেপ্টেম্বর কলিকাতায় এক অনুষ্ঠান করার কথা হইয়াছিল। কিন্তু কলিকাতার বর্ত্তমান পরিস্থিতির জন্য যে আয়োজন স্থগিত রাখা হইয়াছে। গত জন্মাষ্টমীর দিন তাঁহার গুণমুগ্ধ বন্ধুগণ তাঁহার বেলঘরিয়ার বাসভবনে উপস্থিত হইয়া তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করিয়াছিলেন।

বিমান আক্রমণে সতর্কতা—

কলিকাতার পুলিশ কমিশনার এক ইস্তাহার জারী করিয়া জানাইয়াছেন যে বিমান আক্রমণের সঙ্কেতধ্বনি হইবার পরও জনসাধারণ তাড়াতাড়ি নিরাপদ আশ্রয়স্থানে গমন করে না। এইভাবে আশ্রয় গ্রহণে বিলম্ব করিলে ফল যে বিপজ্জনক হইতে পারে, তাহা সকলের মনে রাখা উচিত। বিনা কারণে এখনও বিমান আক্রমণের সঙ্কেতধ্বনি করা হয় না—কাজেই বিপদের সময় সকলেরই উপযুক্ত সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত।

বাঁধা দরে চাউল বিক্রয়—

সরকার কর্তৃক নির্দ্দিষ্ট দরে চাউল বিক্রয় করিবার জন্য কলিকাতায় সম্প্রতি ৫০টি দোকান খোলা হইতেছে বলিয়া ৩রা সেপ্টেম্বর গভর্ণমেণ্ট এক ইস্তাহার প্রচার করিয়াছেন। ঐ সকল দোকানে মোটা ও মাঝারি চাউল বিক্রয় করা হইবে। প্রত্যেক লোককে ২ সের করিয়া চাউল দেওয়া হইবে ও কাগজের ঠোঙায় পূর্ব্ব হইতে চাউল ওজন করা থাকিবে। ঠোঙার জন্য অতিরিক্ত এক পয়সা দাম লওয়া হইবে। বেলা ৭টা হইতে ১১টা ও বিকাল ২টা হইতে ৫টা পর্য্যন্ত ঐ সকল দোকান খোলা থাকিবে। সহরের বিস্তৃতির তুলনায় দোকানের সংখ্যা অত্যন্ত কম। তাহার উপর নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সকল শ্রমিকের পক্ষে দোকানে যাওয়া ও সম্ভব হইবে না। কাজেই এ সকল বিষয়ে বিবেচনা করিয়া কর্তৃপক্ষের কাজ করা উচিত ছিল।

বিহারে পাইকারী জরিমানা—

৩রা সেপ্টেম্বর বিহার গেজেটে এক অতিরিক্ত সংখ্যায় প্রকাশ করা হইয়াছে যে পাটনা [illegible] মোকামা থানার ছয়টি গ্রামের অধিবাসীদের উপর এক [illegible] কা পাইকারী জরিমানা ধার্য্য হইয়াছে। পাটনা জেলার [illegible] ডায়া থানার অধীন ৭টি গ্রামের অধিবাসীদের উপরও ৪০ হাজার টাকা পাইকারী জরিমানা ধার্য্য হইয়াছে। তাহা ছাড়া বিভিন্ন কয়টি গ্রামে যথাক্রমে ১০, ৫ ও ৩ হাজার টাকা জরিমানা ধার্য্য হইয়াছে। কিন্তু বর্ত্তমানে এমনই দুর্দ্দিন যে অধিকাংশ লোক আধপেটা খাইয়া জীবিত আছে—তাহাদের নিকট পাইকারী জরিমানা আদায় কি সম্ভব হইবে?

শুধু আছে সংস্কার

শ্রীজনরঞ্জন রায়

তাহাকে যে জেলে দেখিতে আসিতে হইবে তাহা কোন দিন ভাবি নাই··· জেলে সে কেমন করিয়া আসিল তাহাও শুনি নাই···আর কোনো দিন সে যে আমাকে অভিভাবক করিবে তাহাও মনে করিতে পারি নাই !

ছেলেটি আমাদের পাড়ারই। ভাল করিয়া এম-এ পাশ করিল ·· কিন্তু সেই এলেখেলো স্বভাব নিয়াই ফিরিল···ছেঁড়া জুতা জামায় ভ্রূক্ষেপ নাই। কিন্তু পৈতা ফেলিয়া দিয়াছে···জাত মানে না। পানের মতো মুখখানি···লম্বা সুন্দর চেহারা · ধীর নম্রস্বভাব···আস্তে আস্তে কথা বলে। বোলপুর-ধরণের একটি মেয়ে-ইস্কুল করিতে চাহিল···আদর্শবাদ খুব··· আর পড়িতও খুব। বলিল সমাজকে বাঁচাইতে হইলে স্ত্রীশিক্ষা আগে দরকার। বিনা পয়সায় এমন মাষ্টার···ছাত্রী জুটিতে দেরী হইল না। তাহার স্তাবক জুটিল, আদর্শ চরিত্র বলিয়া খ্যাতিও রটিল। ক্রমে পাকাপাকি একটি মেয়ে ইস্কুল গড়িয়া উঠিল। একদিন সে উত্তেজিত হইয়া আমায় বলিল—বস্তু নেই শুধু আছে সংস্কার···দার্শনিক প্যাভ্লোভ্ বলেছেন 'কণ্ডিশন্ রিফ্লেক্সেস্'···খাবার সেই বাঁধা টাইমে কুকুরটার মুখ দিয়ে জল পড়ে—খাবার আসুক আর না-আসুক···কাঁসর ঘণ্টা বাজলেই আমরা মাথার হাত তুলি—দেবতার কোনো খোঁজ জানি আর না-জানি···বস্তু নেই আছে সংস্কার—ছায়ার মায়া !

পাঁচ বৎসর না-যাইতেই তাহার স্কুলের একটি মেয়ে ম্যাট্রিক পাশ করিল। শ্যামবর্ণ বেনেদের একটি মেয়ে···বয়স ষোল সতেরো। স্কুলের খুব সুনাম হইল। মেয়েরা এখন গান শিখিতেছে···বাজনা শিখিতেছে··· সেলাই, ছবি আঁকা—আরও কত কি শিখিতেছে। প্রতি পূর্ণিমা রাত্রে জল্‌সা হয়। সেই পূর্ণিমা সম্মেলনে মেয়েরা ছবি দেখায়, সেলাই দেখায়, আবৃত্তি-গান-একাঙ্ক নাটিকা অভিনয়—বীণা বাজনা করে। ছোঁড়ার দলের দারুণ ভিড় হয়···প্রগতির বহর দেখিয়া প্রবীণের দল যতই শিহরিয়া উঠুন তাঁহারাও আসিতেছেন। না আসিয়া উপায় কি ?···গিন্নীর দল স্কুলের এত বেশি গোঁড়া হইয়া পড়িলেন যে কর্ত্তাদের 'রা' করিবার জো থাকিল না। সেবার পূর্ণিমা সম্মেলনে সহর হইতে নারী প্রগতি সঙ্ঘের বিশিষ্ট কর্ম্মী মিস্ দে আসিলেন। সেদিন হাটবার। হাটের পথ দিয়া তাঁহাকে স্কুলের মেয়েরা শোভাযাত্রা করিয়া আনিল···তাহাদের অগ্রণী কালিদাসী। এই কালীদাসীই ম্যাট্রিক পাশ করিয়াছে। হাটশুদ্ধ লোক কালীদাসীর বাবা দে মহাশয়কে খুব বাহবা দিতে লাগিল। দে মহাশয় সানন্দে তিন চারিটা কলিকা ধরাইয়া সকলের হাতে দিলেন। সন্ধ্যায় স্কুলের জলসায় খোদ তর্কালঙ্কার মহাশয় সভাপতি···দেশশুদ্ধ লোকের চাপে বৃদ্ধ পণ্ডিত নিরুপায় হইয়া পড়িয়াছেন। মেয়েদের নাচ-গান-বাজনা···তর্কালঙ্কার অতিষ্ঠ হইয়া উঠিতেছিলেন···যখন কালীদাসী একটি কবিতা পড়িতে লাগিল তখন তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার দাঁড়ান কেহ লক্ষ্য করিল না···কবিতার শেষটুকু পর্য্যন্ত পড়া হইল—

শূদ্রকের রক্তবীজে উর্ব্বর ধরণী
প্রসবিল ধরাময় সন্তান-বাহিনী।
শান্তিভীতি···আর স্মৃতি-সূত্রে গাঁথা
পাশজাল ছিন্ন কোরে···মুক্তিমন্ত্র গেয়ে···
ধরার ভাণ্ডার লুটে হে ব্রাহ্মণ ! ঐ চলে তারা···
ঐ চলে শূদ্রদল···চলে সর্ব্বহারা···
পৃথিবীর সর্ব্বকেন্দ্রে মুক্ত করি পথ···
কোন অবতার আসি রুধিবে সে রথ ?

তর্কালঙ্কার মুক্ত কচ্ছ···কাঁপিতে কাঁপিতে তিনি বলিতেছিলেন—গর্ভস্রাব ব্রাহ্মণ-সন্তান জাতিনাশ ধর্ম্মনাশ-কেন্দ্র খুলেছে সমাজের বুকে···। তর্কালঙ্কার মহাশয়ের সঙ্গে বহু ভদ্রলোক উঠিয়া গেলেন···আসর ভাঙিয়া গেল।

বেনেদের ঘরে ম্যাট্রিক পাশ করা মেয়ে···তাহার ভাল ভাল পাত্র জুটিল···কিন্তু সে বিবাহের নামে লাফাইয়া ওঠে। শোনা গেল সে কলিকাতায় মেয়ে-কলেজে ভর্ত্তি হইয়াছে···তাহার পর শোনা গেল আমাদের এই এম-এ পাশ ছোকরাটিই প্রাক্তন ছাত্রীর খরচ যোগাইতেছে। ছাত্রীর খোঁজ খবর লইতে সে মাঝে মাঝে কলিকাতায় যাইতেছে— তাহাও শোনা গেল···আরো কত কি সব শোনা গেল। শেষে শোনা গেল তাহাদের ব্রাহ্ম-মতে বিবাহ হইয়া গিয়াছে। ব্রাহ্মণের সঙ্গে বণিক কন্যার বিবাহ···ছাত্রীর সঙ্গে মাষ্টারের বিবাহ ! স্কুল উঠিয়া গেল···মাষ্টার কলিকাতায় পলাইল। শোনা গেল সেখানে দুইজনেই মাষ্টারী করিতেছে। বছর দুই পরেই শোনা গেল কালীদাসী ক্ষয় রোগে মারা গিয়াছে। তাহার পর তিন চার বৎসর আর কোনো খবর পাই নাই···আজ খবর পাইয়া জেলে আসিয়াছি।

জেলের ছোটবাবু বলিলেন—সে আসার পরই মনে হইল তাহার মধ্যে একটা আসল মানুষ আর একটা নকল মানুষ আছে···তাহার সব কাজের হিসাব করাও শক্ত হইতেছিল...কিন্তু তাহার কাজ ও কথায় একটা সুরুচির পরিচয় ফুটিয়া ওঠে। সে সব কয়েদীরই বন্ধু, সবাইকেই সাহায্য করে। যে ঘানি টানিতে পারিতেছে না তাহাকে ঠেলিয়া দিয়া দশ পাক তাহার ঘানি ঘুরাইয়া দিয়া গেল···পাথর ভাঙিতে বসিয়া যাহার মাথা দিয়া ঘাম ঝরিতেছিল তাহার হাতুড়ি কাড়িয়া নিয়া পাথর ভাঙিতে বসিয়া গেল··· কেরাণীর কাজ করিতে করিতে ঝিমায় ঐ যে বৃদ্ধ কয়েদীটি তাহার কলম কাড়িয়া কত দিন সে তাহার কাজ করিয়া দেয়। সন্দেহবশে বন্দী বলিয়া যুবকটিকে অনেক স্বাধীনতা দেওয়া হইত। তবে জেলের শৃঙ্খলা ভঙ্গের অপরাধে তাহার ডাণ্ডাবেড়ি নির্জ্জন বাস প্রভৃতি কঠোর সাজা হইয়াছে··· শেষে ডাক্তার আসিয়া ধরিল সে বায়ুগ্রস্ত। চলুন না হাসপাতালে সে আছে দেখিবেন···পাগলকে আটকাইয়া রাখা দরকার নাই। হাসপাতালে দাঁড়াইয়া শুনিলাম সে বলিতেছে—তুমি চুমো দিলে···ঘণ্টা বেজেছে··· কলেজের গাড়ি এসেছে ?···আমিও তবে উঠি···আমাকেও বেরুতে হবে···। আমি বুঝিলাম—এও সেই 'বস্তু নেই আছে সংস্কার'। ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করিলাম—কি ঔষধ দিচ্ছেন ? তিনি বলিলেন— ব্রোমাইড্ মিক্‌স্‌চার।

গান

শ্রীমনোজিৎ বসু

পান্থ তোমার চরণ-চিহ্ন যাও রেখে,
আমার মনের অঙ্গনে।
সেথা জমবে নাকো পথের-ধূলি,
আমি রইব চেয়ে নয়ন খুলি,
তখন উঠ্‌বে বেজে রিনিঝিনি,
আমার হাতের কঙ্কনে॥

যখন নীল-আকাশে তারার মেলা,
হেসে ফুটবে ওগো সাঁঝের বেলা,
তখন সাজিয়ে দেব মনের-ফুলে, আমার হিয়ার চন্দনে॥
ওগো বর্ষা-দিনে শারদ-প্রাতে,
আহা, বৈশাখে কি ফাগুন রাতে
আমি আপন মনে রইব মেতে, তোমার চরণ বন্দনে॥

শ্রীক্ষেত্রনাথ রায়

আই এফ এ শীল্ড ঃ

১৯৪২ সালের শীল্ড খেলা শেষ হয়েছে। নির্ব্বিঘ্নে খেলা শেষ হয়েছে বলা যায় না। কারণ কয়েকটি প্রতিকূল ঘটনার জন্ত শীল্ড ফাইনালের দিন পরিবর্ত্তন করতে পরিচালকমণ্ডলী বাধ্য হয়েছিলেন। এবৎসর খেলার প্রারম্ভে ফুটবল মরসুম যে নির্ব্বিঘ্নে শেষ হবে এ আশা খুব কম লোকেরই ছিল। সকলেই আসন্ন বিপদের কথা স্মরণ ক'রে ফুটবল মরসুমের অকাল অবসানের সন্দেহ করেছিলেন। কিন্তু লীগের খেলাগুলি নির্ব্বিঘ্নে শেষ হওয়াতে সকলেই আশ্বস্ত হ'লেন এই ভেবে যে, শীল্ড খেলাটাও শেষ পর্য্যন্ত এই-ভাবে সমাপ্ত হবে। কিন্তু শীল্ডের একদিকের সেমি-ফাইনালে ইষ্টবেঙ্গল বনাম রেঞ্জার্স দলের খেলাটি বার-ম্বার অনুষ্ঠানের নির্দ্ধারিত দিন পরিবর্ত্তন হওয়াতে ক্রীড়ামোদীরা এমনভাবে অধৈর্য্য এবং হতাশ হয়ে পড়েছিলেন যে সকলেই প্রায় ফাইনাল খেলার আশা ত্যাগ করলেন। এই অবস্থায় নানা বাধা বিপত্তির মধ্যেও শেষ পর্য্যন্ত ফাই-নাল খেলাটির ব্যবস্থা ক'রে পরিচালকমণ্ডলী নিজেদের দায়িত্ব জ্ঞানের পরিচয় দিয়েছেন।

শীল্ডের ফাইনালে এবার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিল মহমেডান স্পোর্টিং এবং ইষ্টবেঙ্গল ক্লাব। মহীশূর দলকে ৩-০ গোলে সেমি-ফাইনালে পরাজিত ক'রে একদিক থেকে মহমেডান দল ফাইনালে উঠে। শীল্ডের অপর দিক থেকে রেঞ্জার্স দলকে ২-০ গোলে দ্বিতীয় দিনের সেমি-ফাইনালে পরাজিত ক'রে ইষ্টবেঙ্গল ফাই-নালে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবার এই প্রথম সৌভাগ্য লাভ করে। ইষ্টবেঙ্গল এবৎসরের প্রথম বিভাগের ফুটবল লীগ চ্যাম্পিয়ান্। লীগ খেলায় তাদের ক্রীড়াচাতুর্য্যের পরিচয় পেয়ে একদল ক্রীড়ামোদী আশা করেছিলেন ইষ্টবেঙ্গল তার পুরাতন প্রতিদ্বন্দ্বী মহমেডান স্পোর্টিংয়ের সঙ্গে খুব জোর প্রতিযোগিতা চালিয়ে ফাইনালে বিজয়ী হবে। কেহ কেহ ভেবেছিলেন শেষ পর্য্যন্ত ইষ্টবেঙ্গল বিজয়ী হ'তে না পারলেও ফাইনালে তারা একটা প্রথম শ্রেণীর ক্রীড়াচাতু-র্য্যের পরিচয় দিতে পারবে। কিন্তু ফাইনাল খেলায় ইষ্ট-বেঙ্গল ক্রীড়ামোদীদের আশা কোন দিক থেকেই পূরণ করতে পারেনি। ফাইনালে তারা কেবলমাত্র ১-০ গোলে পরাজিতই হয়নি খেলায় তাদের এবৎসরের স্বাভাবিক ক্রীড়া-চাতুর্য্যের পরিচয় কণামাত্র প্রকাশ পায়নি। মহমেডান দল যে সত্য সত্যই ভারত-বর্ষের অন্ততম শক্তিশালী ফুটবল প্রতিষ্ঠান তা ঐ দিনের খেলার মধ্যেও প্রমাণ দিয়েছে।

আই এফ এ শীল্ড

একটিমাত্র পেনাল্টি সটের সুযোগে তারা বিজয়ী হয়েছে বলে তাদের এই সাফল্যের উপর খুব বেশী গুরুত্ব আরোপ না করা অসঙ্গত হবে। এমন কি তারা একাধিক গোলে বিজয়ী হ'লে কিছু অসঙ্গত হ'ত না। অবধারিত গোল হ'তে দেখে সেই নিশ্চিত বিপদের হাত থেকে রক্ষার জন্ত ব্যাক পি চক্রবর্ত্তী কর্ত্তব্যবুদ্ধি না হারিয়ে হাত দিয়ে বলটিকে প্রতিরোধ করেন। আত্মরক্ষার জন্ত তিনি এরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ না করলে বলটিকে প্রতিরোধ করা গোল রক্ষকের

কোনই সাধ্য ছিল না। এই পেনাল্টি সট থেকে মহমেডান দল বিজয়ী হয়।

মহমেডান দলের আক্রমণভাগের খেলোয়াড়দের যথাসময়ে বল আদান প্রদান এবং সঙ্ঘবদ্ধ আক্রমণ কৌশলের বিরুদ্ধে ইষ্টবেঙ্গল দলের রক্ষণভাগ বিপর্য্যস্ত হয়েছিল। হাফ্ ব্যাক লাইনের দুর্ব্বলতা সর্ব্বক্ষণ চোখে পড়ে। কেবলমাত্র ব্যাকদ্বয় এবং গোলরক্ষকই রক্ষণভাগে নিজেদের কৃতিত্বের পরিচয় দেন। তাদের আক্রমণ ভাগের খেলাও আশাপ্রদ হয়নি। আক্রমণভাগে আপ্পা রাওয়ের খেলাই যা উল্লেখযোগ্য ছিল। খেলার শেষ পর্য্যন্ত মহমেডান দল যে উৎসাহ এবং উদ্দীপনার মধ্যে উপযুক্ত ক্রীড়াচাতুর্য্যের পরিচয় দিয়েছে তা নিরপেক্ষ ক্রীড়ামোদী মাত্রেই তাদের এই বিজয় গৌরবকে নিঃসন্দেহে স্বীকার করবেন।

অনুকূল আবহাওয়া এবং মাঠের ভাল অবস্থা সত্বেও ইষ্টবেঙ্গল দলের খেলার স্বাভাবিক ক্ষিপ্রগতি এই দিন একেবারে মন্দীভূত হয়ে পড়ে। মহমেডান দলের রক্ষণভাগের ব্যূহ ভেদ ক'রে গোল করবার সুযোগ তাদের খুব কমই মিলেছিল। গোলরক্ষক ওসমানকে এইদিন বিশেষ উদ্বিগ্ন হ'তে হয়নি। ব্যাকে তাজ-

সমস্ত পায়ের তলা দিয়ে স্থির বলকে (Still Ball) মারবার কৌশল শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে

মহম্মদের খেলাই অপেক্ষাকৃত ভাল হয়েছিল। মহমেডান দলের অধিনায়ক মাসুম এই দিন উভয় দলের মধ্যে উন্নত শ্রেণীর ক্রীড়াচাতুর্য্যের পরিচয় দিয়েছিলেন। ফাইনাল খেলা উপলক্ষে মাঠে বহু দর্শকের সমাগম হয়। আনুমানিক ১২০০০ টাকার টিকিট বিক্রয় হয়েছিল।

খেলোয়াড়দের ব্যক্তিগত দক্ষতা দলের জয়লাভের পক্ষে যেমন অত্যাবশ্যক তেমনি একান্ত প্রয়োজন বল আদান প্রদানের নির্ভুল অভ্যাস, সঙ্ঘবদ্ধভাবে বিপক্ষ দলের গোল সম্মুখে আক্রমণ করবার কৌশল শিক্ষা এবং সর্ব্বোপরি খেলায় জয়লাভের প্রচণ্ড উদ্দীপনা এবং উৎসাহ। দলের খেলোয়াড়দের মধ্যে এই সমস্তের অভাব থাকলে বিশিষ্ট খেলোয়াড় দ্বারা গঠিত দলকেও জয়লাভে বঞ্চিত হ'তে হয়। আমাদের দেশের ফুটবল প্রতিষ্ঠানের মধ্যে একমাত্র মহমেডান দলকেই এই সমস্তের অধিকারী দেখা যায়। আজ তারা একের পর এক প্রতিযোগিতায় বিজয়ী হয়ে ভারতের একটি শক্তিশালী ফুটবল প্রতিষ্ঠানের সম্মান লাভ করেছে। আমরা ভারতীয় প্রতিষ্ঠানের এই সাফল্য লাভে গৌরব অনুভব ক'রে আমাদের আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

মহমেডান স্পোর্টিং : ওসমান ; জুম্মা খাঁ ও তাজ মহম্মদ ;

পায়ের তলা দিয়ে 'ভলি' মারার দৃশ্য

বাচ্চি খাঁ, নুরমহম্মদ (বড়) ও মাসুম ; নুরমহম্মদ (ছোট), তাহের, রসিদ, সাবু ও সাজাহান।

ইষ্টবেঙ্গল : এ মুখার্জ্জী ; পি দাসগুপ্ত ও পি চক্রবর্ত্তী ; এন রায়, আমিন ও গিয়াসুদ্দিন ; নজর মহম্মদ, আপ্পারাও, সোমানা, এস ঘোষ ও এস চ্যাটার্জ্জী।

রেফারী—সার্জ্জেন্ট ম্যাক ব্রাইড।

আই এফ এ শীল্ডের ইতিহাস ঃ

আই এফ এ শীল্ড ভারতের ফুটবল খেলার ইতিহাসে একটি পুরাতন প্রতিযোগিতা। ১৮৯৩ সালে আই এফ এ শীল্ড খেলা প্রথম আরম্ভ হয়। শীল্ড খেলার প্রথম দু'বছর রয়াল আইরিস উপর্য্যুপরি দু'বার শীল্ড বিজয়ী হয়েছিল। শীল্ড খেলার প্রথম বছরে মাত্র ১৩টি দল প্রতিযোগিতায় যোগদান করে। শীল্ড খেলার দীর্ঘ দিনের ইতিহাসে ক্যালকাটা ফুটবল ক্লাবের সাফল্য ক্রীড়ামোদিদের স্মৃতি থেকে লুপ্ত হবে না। এ পর্য্যন্ত শীল্ডের

খেলোয়াড়রা বেড়ার মধ্যে এঁকে বেঁকে দৌড়ান অভ্যাস করছে। এই অনুশীলনে অভ্যস্ত হ'লে বল নিয়ে 'ড্রিবল' অভ্যাস করা হয়

খেলায় ক্যালকাটা ক্লাব ৯বার বিজয়ী হয়েছে। এত অধিকবার আর কোন ক্লাব শীল্ড বিজয়ের সম্মান লাভ করতে পারে নি।

গর্ডনস ১৯০৮-১৯১০ সাল পর্য্যন্ত উপর্য্যুপরি তিনবার শীল্ড বিজয়ী হ'য়ে শীল্ডের ইতিহাসে এক নূতন রেকর্ড স্থাপন করে। ইতিপূর্ব্বে উপর্য্যুপরি তিনবার শীল্ড অধিকারের সম্মান কোন দল পাইনি। অবশ্য পরবর্ত্তীকালে ক্যালকাটা ক্লাব ১৯২২-১৯২৪ সাল পর্য্যন্ত এবং দ্বিতীয় ব্যাটেলিয়ান সেরউড ১৯২৬-১৯২৮ সাল পর্য্যন্ত উপর্য্যুপরি তিনবার শীল্ড বিজয়ী হয়েছিল।

শীল্ড খেলার স্মরণীয় দিন ১৯১১ সাল। ঐ বৎসর প্রথম ভারতীয় দল মোহনবাগান ক্লাব শীল্ড বিজয়ী হ'য়ে জাতীয় অভ্যুত্থানের ইতিহাসকে গৌরবান্বিত করে।

১৯৩৬ সালে মহমেডান ক্লাব শীল্ড বিজয়ী হ'লে ভারতীয় দল দ্বিতীয়বার শীল্ড লাভের গৌরব অর্জ্জন করে।

১৯৪০ সালে এরিয়ান্স দল মোহনবাগানকে ফাইনালে পরাজিত ক'রে তৃতীয়বার ভারতীয় দলের গৌরব বৃদ্ধি করে। ১৯৪১ এবং ১৯৪২ সালে উপর্য্যুপরি দু'বার শীল্ড বিজয়ী হয়ে মহমেডান স্পোর্টিং ভারতীয় ফুটবল খেলার ইতিহাসকে সম্মানিত করেছে। মহমেডান দল এ পর্য্যন্ত তিনবার শীল্ড খেলায় বিজয়ী হয়েছে।

শীল্ড ফাইনালে মহমেডান দল :

খুলনা টাউনকে ৩—১ গোলে, এরিয়ান্সকে ৩—১ গোলে, খুলনা ইউনিয়ান স্পোর্টিংকে ২—০ গোলে, মহীশূর রোভার্সকে ৩—০ গোলে এবং ফাইনালে ইষ্টবেঙ্গলকে ১—০ গোলে পরাজিত ক'রে মহমেডান দল ১৯৪২ সালে শীল্ড বিজয়ী হয়েছে।

রেফারীং ঃ

রেফারীর সামান্য ভুল ত্রুটী উপেক্ষণীয়। কিন্তু যে সব রেফারী খেলা পরিচালনা করতে গিয়ে বারম্বার মারাত্মক ভুল
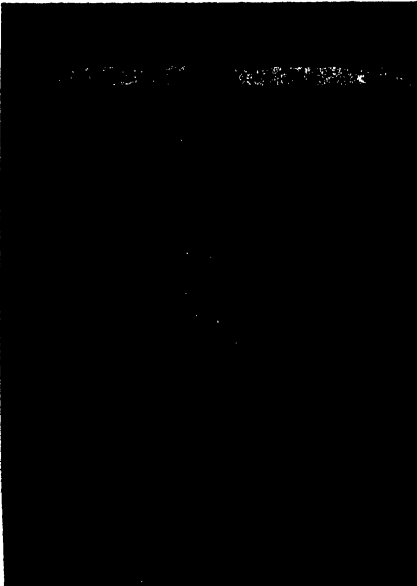
খুব উঁচু বল প্রতিরোধ করবার নির্ভুল পন্থা

ত্রুটীর পরিচয় দেন তাঁদের এই ভুল ত্রুটী প্রতিযোগিতার পরিচালকমণ্ডলীর নিকট উপেক্ষণীয় হ'লেও দর্শকদের তীব্র
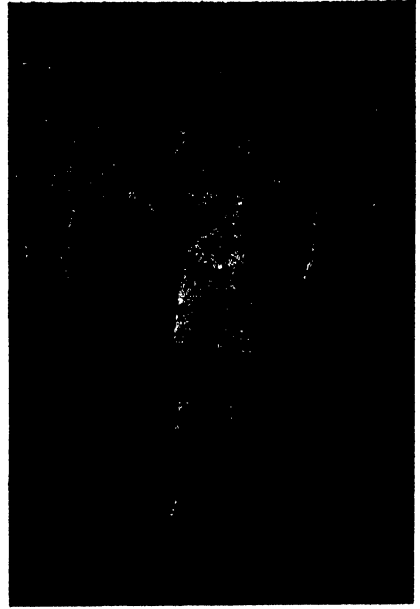
মাথার উপরের বলগুলি প্রতিরোধ করবার পন্থা

সমালোচনার হাত থেকে রক্ষা পায় না। আমরা শীল্ড-প্রতিযোগিতার অন্যান্য খেলার পরিচালনা সম্বন্ধে আর কিছু মন্তব্য করতে চাই না। কারণ আই এফ এ শীল্ডের সেমি-ফাইনালে ইষ্টবেঙ্গল বনাম রেঞ্জার্সের খেলায় পরিচালকমণ্ডলী এমন একজন রেফারীর খেলা পরিচালনা দেখবার সুযোগ দিয়েছিলেন যা অপর সমস্ত রেফারীর ভুল ত্রুটী অতিক্রম ক'রে আমাদের বিস্মিত করেছে।

ঐ দিনের খেলাতে রেফারী নিজে যে একজন নিরপেক্ষ পরিচালক নন—রেঞ্জার্স দলেরই সমর্থক তার পরিচয় দিয়েছিলেন। তা না হ'লে আই এফ এ শীল্ডের মত একটি প্রতিযোগিতার সেমি-ফাইনালে কোন দায়িত্বশীল পরিচালক এরূপ মারাত্মক ত্রুটীর পরিচয় দিতে লজ্জাবোধ করতেন। কিন্তু আমাদের জিজ্ঞাস্য কোন একটি দলের উপর নিজের আস্থা স্থাপন করা কি নিজের সম্মানের অপেক্ষাও বড়। মনের এই দুর্ব্বলতা যাঁদের, তাঁদের উপর কি কারণে যে পরিচালকমণ্ডলী খেলা পরিচালনার ভার ছেড়ে দেন তা আজও আমাদের নিকট সহজ হয়ে উঠেনি। ঐ দিনের খেলাটিতে রেফারীর পক্ষপাতিত্বপূর্ণ খেলা পরিচালনার জন্যই ইষ্টবেঙ্গল দলকে শেষ পর্য্যন্ত খেলা 'ড্র' করতে হয়েছিল।

মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের সাফল্য ঃ

মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের সুনাম ১৯৩৪ সালে বাঙ্গলাদেশের ক্রীড়াজগতে ছড়িয়ে পড়ে। ঐ বৎসর তারা প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েই প্রথম বিভাগ লীগ-বিজয়ী হয়। ইতিপূর্ব্বে কোন ভারতীয় দল এই সম্মান অর্জ্জন করতে সমর্থ হয়নি।

ভারতের শ্রেষ্ঠ ফুটবল প্রতিযোগিতায় মহমেডানদলের সাফল্যের তালিকা দেওয়া হ'ল—

১৯৩৪ সাল—লীগ খেলার প্রথম বৎসরেই প্রথম বিভাগ লীগ বিজয়ী হয়

১৯৩৫ সাল—প্রথম বিভাগ লীগ চ্যাম্পিয়ান হয়

বলকে হাতের মুঠি দিয়ে প্রতিরোধ করা হচ্ছে

১৯৩৬ সাল—প্রথম বিভাগ লীগ চ্যাম্পিয়ান এবং আই এফ এ শীল্ড বিজয়ী হয়

১৯৩৭ সাল—প্রথম বিভাগ লীগ চ্যাম্পিয়ান হয়

১৯৩৮ সাল—প্রথম বিভাগ লীগ চ্যাম্পিয়ানসীপ এবং আই এফ এ শীল্ডের রাণার্স আপ পায়।

১৯৪০ সাল—প্রথম বিভাগ লীগ চ্যাম্পিয়ান, ডুরাণ্ড কাপ এবং বোম্বাই রোভার্স কাপ বিজয়ী হয়

১৯৪১ সাল—প্রথম বিভাগ লীগ বিজয়ী এবং আই এফ এ শীল্ড বিজয়ী হয়

১৯৪২ সাল—আই এফ এ শীল্ড বিজয়ী

খেলার ষ্ট্যাণ্ডার্ড ঃ

ফুটবল খেলার ষ্ট্যাণ্ডার্ড যে পূর্ব্বেকার তুলনায় বর্ত্তমানে নিম্নস্তরে নেমেছে তার পরিচয় আমরা কয়েক বছরের ফুটবল খেলা থেকেই পেয়ে আসছি। কি কারণে খেলার ষ্ট্যাণ্ডার্ড খেলোয়াড়রা পূর্ব্বের মত বজায় রাখতে পারছেন না সে সম্বন্ধে আমরা একাধিকবার আলোচনা করেছি। সম্প্রতি মোহনবাগান ক্লাবের ভূতপূর্ব্ব খেলোয়াড় শ্রীযুক্ত গোষ্ঠ পাল 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে খেলার ষ্ট্যাণ্ডার্ড সম্বন্ধে কি বলেছেন তার কিছু কিছু উদ্ধৃত ক'রে দিলাম। গোষ্ঠবাবু কেবল একজন খ্যাতনামা খেলোয়াড়ই নন, তিনি একজন নিরপেক্ষ সমালোচক। তিনি দীর্ঘদিন খেলা-ধূলা চর্চ্চা ক'রে যে জ্ঞানলাভ করেছেন তার গুরুত্ব যথেষ্ট আছে।

খেলার ষ্ট্যাণ্ডার্ড সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন—"এই বৎসরের লীগের বিভিন্ন খেলা দেখিয়া আমি হতাশ হইয়াছি। খেলার উন্নতি হয় নাই নিম্নস্তরের হইয়াছে ইহা বলিতে আমার দ্বিধাবোধ হইতেছে না। এই বৎসরের ফুটবল খেলা যেরূপ নিম্নস্তরের হইয়াছে তাহা আমার ধারণাতীত ছিল। লোকে হয়তো বলিবেন যুদ্ধের জন্য ফুটবল খেলার এইরূপ অবস্থা হইয়াছে। কিন্তু তাঁহারা হয়তো জানেন না যে বর্ত্তমানের খেলোয়াড়দের যুদ্ধের জন্য কোন চিন্তা নাই বরং খেলিতে পারিলে তাহাদের সবদিক দিয়া সুবিধা অনেক। সুতরাং তাহাদের নিম্নস্তরের ক্রীড়ানৈপুণ্য প্রদর্শনের কোন কারণ নাই।"

মোহনবাগান ক্লাব সম্বন্ধে বলেন,—"মোহনবাগান ক্লাব এক সময় বাঙ্গলার ফুটবল খেলার আদর্শ ক্লাব বলিয়া পরিগণিত হইত। সেই ক্লাবের খেলা খুব নিম্নস্তরের হইয়াছে দেখিয়া দুঃখ হয়। এই ক্লাবের খেলোয়াড়ের অভাব নাই। শিক্ষক বা ট্রেণারের অভাব নাই। সুযোগ্য পরিচালকের অভাব নাই অথচ এইরূপ হইল কেন? এই দলে যে সকল খেলোয়াড়গণ খেলিয়া থাকেন তাঁহারা যখন অন্য দলে খেলিতেন তখন খেলা ভালই ছিল। কিন্তু যখন মোহনবাগান ক্লাবে খেলিতে আরম্ভ করিলেন তখন পূর্ব্বের ন্যায় খেলিতে পারেন না কেন?"

খেলোয়াড়দের খেলার দোষ ত্রুটী সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন—ব্যাক গোলরক্ষককে এইরূপভাবে কভার বা দৃষ্টিপথ অবরুদ্ধ করে যে, তাহার পক্ষে গোল রক্ষা অসম্ভব হইয়া পড়ে। অধিকাংশ দলের ব্যাক ঠিক কিরূপ খেলা উচিত তাহা জানে না। পেনাল্টী সীমানার সম্মুখে দাঁড়াইয়া খেলা যেন সাধারণ রীতিতে পরিণত হইয়াছে। এইজন্য প্রতিপক্ষ দলের ভাল ফরোয়ার্ডের খেলোয়াড় যখন তীব্রবেগে অগ্রসর হয় তখন ঐ সকল ব্যাকদের পক্ষে তাহার গতিরোধ করা সম্ভব হয় না। সব সময়ে ক্ষীপ্রতা বা

একই দিকে ছুটতে ছুটতে বলকে মারা ; বলটি মারবার ঠিক পূর্ব্বেকার দৃশ্য
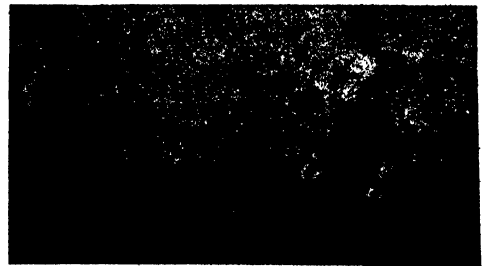
দৈহিক শক্তির বলে খেলা চলে না। বল কোথায় কখন আসিতে পারে এবং কোথায় দাঁড়াইলে ঐ বলের গতিরোধ করা সহজ হয়,

এই ধারণা প্রত্যেক ব্যাকের থাকা বাঞ্ছনীয়। কিন্তু বর্ত্তমানের ব্যাকদের মধ্যে ইহার অভাব বিশেষভাবেই পরিলক্ষিত হয়। আমার মনে হয়, এই অবস্থার পরিবর্ত্তন হইতে পারে যদি ব্যাকেরা যে কোন জায়গায় বল না থামাইয়া জোরে মারা অভ্যাস করে, দলের অগ্রবর্ত্তী খেলোয়াড়দের গতির সঙ্গে আগাইয়া চলে, অগ্রসরের সময় গোলরক্ষকের সঙ্গেও একটা বিশেষ বোঝাপড়া রাখে।

উপসংহারে বলেন—পূর্ব্বে বাঙ্গলা দেশে ফুটবল খেলা শিক্ষা দিবার জন্য বিভিন্ন ক্লাবে ট্রেণার বা শিক্ষক ছিল না। কিন্তু বর্ত্তমানে যখন তাহার অভাব নাই তখন আমাদের বাঙলা দেশের ফুটবল খেলা ভারতের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হওয়া উচিত নয় কি? খেলোয়াড় যাহাতে শীর্ষস্থান অধিকার করে ইহা কি পরিচালকগণেরও চিন্তার বিষয় নহে? এক সময়ে বাঙ্গলা দেশ ভারতবর্ষের মধ্যে ফুটবল খেলায় শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিল, সেইস্থান হইতে এখন পতিত হইয়াছে এবং তাহা পূর্ণ হইবে না কেন?

ট্রেডস কাপ ফাইনাল ঃ

ট্রেডস কাপের দ্বিতীয় দিনের ফাইনালে মোহনবাগান ক্লাব ৪-০ গোলে মহালক্ষ্মী স্পোর্টিংয়ের কাছে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়েছে। প্রথম দিনের খেলায় কোন পক্ষই গোল করতে না পারায় খেলাটি অমীমাংসিত ভাবে শেষ হয়। এই প্রতিযোগিতার প্রথম আরম্ভ ১৮৮৯ সালে। ঐ বৎসর ডালহৌসী ক্লাব প্রথম কাপ বিজয়ের সম্মান লাভ করে। সব থেকে বেশীবার বিজয়ী হয়েছে মেডিক্যাল কলেজ। তারা এ পর্য্যন্ত ৭বার কাপ পেয়েছে। ৫বার কাপ বিজয়ী হয়ে মোহনবাগান দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে। মোহনবাগানের উপর্য্যুপরি তিনবার কাপ বিজয়ের (১৯০৬-১৯০৮) রেকর্ড এ পর্য্যন্ত কেউ ভাঙ্গতে পারেনি।

সাহিত্য-সংবাদ

নবপ্রকাশিত পুস্তকাবলী

শ্রীমণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত "শ্রীকান্ত-পরিচিতি" (১ম পর্ব্ব)—১৷০
বিধায়ক ভট্টাচার্য্য প্রণীত নাটক "চিরন্তনী"—১৷০
গৌতম্ সেন ও শচীন্দ্রনাথ বসু প্রণীত উপন্যাস "পল্লবের চার অধ্যায়"—২৲
শ্রীনীহাররঞ্জন গুপ্ত প্রণীত শিশু-উপন্যাস "রাতের আতঙ্ক"—৷০
শ্রীবিধুভূষণ বসু প্রণীত স্ত্রী-ভূমিকা বর্জ্জিত নাটক "দুই বিঘা জমি"—৷৶০,
পুরুষ ভূমিকা বর্জ্জিত নাটিকা "মন্থরা"—৷৶০
শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় প্রণীত উপন্যাস "উপকণ্ঠ"—১৷০
শ্রীগণপতি সরকার প্রণীত নাটক "কালিদাস"—১৲
মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত উপন্যাস "ধরা-বাঁধা জীবন"—১৲
শ্রীশশধর দত্ত প্রণীত উপন্যাস "নারী-ত্রাতা মোহন"—২৲
চিন্তামণি কর প্রণীত "ফরাসী শিল্পী ও সমাজ"—২৲
শ্রীহেম চট্টোপাধ্যায় প্রণীত উপন্যাস "রাণুর দিদি"—১৷০
বনস্পতি সম্পাদিত উপন্যাস "রমেন ও রেখা"—১৷০
শ্রীবরদাচরণ মজুমদার প্রণীত "দ্বাদশ বাণী"—১৲

বিশেষ দ্রষ্টব্য—এবার ২১শে আশ্বিন—ইং শুক্রবার হইতে দুর্গোৎসব। সেজন্য **আশ্বিন** মাসের 'ভারতবর্ষ' ভাদ্র মাসের তৃতীয় সপ্তাহে বাহির করা হইয়াছে এবং **কার্ত্তিক** সংখ্যা আশ্বিন মাসে পূজার পূর্ব্বেই প্রকাশ করিবার আয়োজন চলিয়াছে। কার্ত্তিক সংখ্যার বিজ্ঞাপন **১৫ই সেপ্টেম্বর** বাঙ্গালা ২৯শে ভাদ্রের মধ্যে আমাদের আফিসে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিলে বাধিত হইব।

কার্য্যাধ্যক্ষ—ভা

সম্পাদক—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম্-এ

২০৩৷১৷১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা; ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

ছিলি আমার পুতুল খেলায়

শিল্পী—শ্রীযুক্ত পান্না সেন —রবীন্দ্রনাথ

ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

কার্ত্তিক—১৩৪৯

প্রথম খণ্ড | ত্রিংশ বর্ষ | পঞ্চম সংখ্যা

রবীন্দ্রনাথের গান

অধ্যাপক শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্-এ, রায় বাহাদুর

রবীন্দ্রনাথের গান সম্বন্ধে কিছু বলতে গেলেই তাঁকেই মনে পড়ে আগে। বিশেষতঃ আমরা যারা তাঁর সঙ্গ করবার সুযোগ পেয়েছিলাম, তাঁর প্রাণ-মাতানো গান শোনবার সৌভাগ্য যাদের হয়েছিল, তারা স্মৃতির আলোক-রেখা অনুসরণ না করে পারে না। টাউন হলের বিরাট সভায় শিক্ষাব্রতী রবীন্দ্রনাথের কথা বলেছিলাম। সেখানেও আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার উপরই নির্ভর করেছিলাম বেশি। রবীন্দ্রনাথের লোকোত্তর চরিত্রের বিশ্লেষণ এখনও চলেছে, এর পরেও চলবে বহুদিন ধরে'। কিন্তু যাঁরা তাঁর সম্বন্ধে কিছু কিছু হয়ত বলতে পারেন নিজ নিজ বিস্মৃতির প্লাবন থেকে বাঁচিয়ে, তাঁদের কথার একটা মূল্য আছে বলে' আমি মনে করি।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর পরিপূর্ণ যৌবনে যখন জনসভায় গান করতেন, সেদিনকার কথা যাঁরা জানেন, তাঁদের সংখ্যা ক্রমশঃ বিরল হয়ে আসছে। কিন্তু সে কথা শোনাবার মতো। সে ছবি আঁকতে যে কি আনন্দ, তা কেবল তাঁরাই বুঝতে পারবেন, যাঁরা তাঁর সেই সকল গান শুনেছেন। আমি যে সময়ের কথা বলছি তখনও রবীন্দ্রনাথের যৌবন অতিক্রান্ত হয় নি। স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্যের প্রতিমূর্ত্তি রবীন্দ্রনাথ যখন তাঁর সুললিত কণ্ঠে বক্তৃতা করতেন, তখন আমরা তরুণের দল ভীড় করে' ছুটেছি—তরুণীদের অভিযান তখনও সুরু হয় নি। বক্তৃতার শেষে জনতা যখন চীৎকার করতো 'রবিবাবু গান' 'রবিবাবু গান' তখন রবীন্দ্রনাথ শোভন বিনয়ের সঙ্গে অব্যাহতি-লাভের ক্ষীণ চেষ্টা করে' গান ধরতেন। সে যুগে অন্য কোনও বক্তা কি গায়ক শ্রোতাদের মন তেমন করে' মুগ্ধ করতে পারেন নি। ইদানীং রবীন্দ্রনাথ জনসভায় গান করা ছেড়ে দিয়েছিলেন। আমার বোধ হয় ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউটে প্রসিদ্ধ সঙ্গীতজ্ঞ এনায়েৎ খাঁকে সংবর্দ্ধনা করবার জন্য যে সভা হয়েছিল, সেই সভায় রবীন্দ্রনাথ বিশেষ অনুরুদ্ধ হয়ে গান গেয়েছিলেন 'তুমি কেমন করে' গান করগো গুণী, আমি অবাক্ হয়ে শুনি।' এই গানে যে ইন্দ্রজাল রচনা করেছিল, আমরা বহুদিন তার প্রভাব থেকে মুক্ত হতে পারি নি। সেই সভায় স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় উপস্থিত ছিলেন। সভা অন্তে তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, রবীন্দ্রনাথ কি

তখনই-তখনই গানটি রচনা করে' গেয়েছেন। এতই স্বাভাবিকভাবে তিনি গান করেছিলেন। জেনারেল এসেম্বিলিজ ইনষ্টিটিউশানে তিনি যখন সকলের অনুরোধ এড়াবার চেষ্টা করে' অকৃতকার্য হয়ে গান ধরেছিলেন—

আমায় বোলো না গাহিতে বোলো না।
একি শুধু হাসি খেলা প্রমোদের মেলা
শুধু মিছে কথা ছলনা।

তখনও অনেকের মনে ধারণা হয়েছিল, বুঝি কবি তখনই-তখনই গান রচনা করে' গেয়েছেন। এর পরে তিনি অনেক স্থানে আবৃত্তি এবং বহু অভিনয়ে, বর্ষামঙ্গলে, শারদোৎসবে গান করেছেন, কিন্তু জনসভায় বক্তৃতার আসরে বেশি গান করেছেন বলে' আমার মনে পড়ে না।

তখনকার দিনে রবীন্দ্রনাথ গানের মধ্য দিয়ে যে প্রভাব বিস্তার করেছিলেন, তা আমরা দেখেছি। তাঁর গানের সম্বন্ধে সেদিনও মতভেদ ছিল, এখনও যে নেই তা নয়। তবে আমাদের মনে আছে যে, আমি যে যুগের কথা বলছি, সে যুগে যেমন ব্রাহ্মমন্দিরে রবীন্দ্রনাথের গান নহিলে জমতো না, তেমনি বিবাহের আসরেও তাঁর গান ছাড়া চল্‌তো না, কোনও সভ্য মজলিসে তাঁর গানের চাহিদা অন্য গান অপেক্ষা বেশি ছিল। এমনই ভাবে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্য দিয়ে কবি এই বাংলা দেশে তাঁর গানের সুরের আসনখানি ধীরে ধীরে পেতে দিয়েছিলেন। এতে শুধু যে রবীন্দ্রনাথের স্বরচিত গানেরই আদর বেড়ে গেল তা নয়, বাংলা দেশ সঙ্গীতের মর্য্যাদা দান করতে শিখ্‌লো। সেদিন এইভাবে নবীন বাংলার সঙ্গীতের যে Renaissance এসেছিল, রবীন্দ্রনাথই তার প্রেরণা দিয়েছিলেন সব চেয়ে বেশী। সঙ্গীত যে অবহেলিত হবার জিনিষ নয়, মানুষের মনের স্বতঃস্ফূর্ত্ত আনন্দের অভিব্যক্তি যে সঙ্গীত, এ কথা নবীন বাংলা সেদিন মেনে নিয়েছিল। আর তারই ফলে সঙ্গীত সর্ববিভাগে এমন প্রসার লাভ করেছে। একজন সমালোচক একটু ব্যঙ্গ করে' বলেছিলেন যে রবিবাবু বাংলাদেশকে নাচিয়ে দিয়েছেন! আমি মনে করি এইখানে রবীন্দ্রনাথের দান সত্যই অমূল্য। মানুষের আনন্দের শ্রেষ্ঠ প্রকাশ যে নৃত্যগীত—তারই সুইচ্ টিপে দিয়ে বাঙ্গালীর জীবন তিনি আলোকোচ্ছ্বল করে' দিয়েছেন, এ সম্বন্ধে ভুল নেই।

রবীন্দ্রনাথের জীবনে প্রথম হতেই আমরা সঙ্গীতের প্রভাব দেখতে পাই। আমার মনে হয় তাঁর সারা জীবনের সাহিত্যসাধনা এক সুরের মোহে মাধুর্য ও ছন্দমণ্ডিত হ'য়ে উঠেছিল! তাঁর কাব্যে যে এত ছন্দের প্রভাব দেখতে পাওয়া যায়, তার কারণ সঙ্গীতের স্বাভাবিক প্রাচুর্য ও লালিত্য নিয়ে তাঁর কবিতা বিকশিত হতো। তিনি কবিতা লিখতে বসে' গান গাইতেন এবং গান গাইতে গিয়ে কবিতা রচনা করতেন। কবির জীবন সুরের নীহারিকার মধ্যে অগণিত কাব্য-তারকা আবিষ্কার করেছিল। সেই জন্যই তাঁর অনুপম কাব্যের নাম গীতাঞ্জলি, গীতিমাল্য, গীতালি। প্রকৃতি যেন তাঁর কাছে একটি গানের তানের মত অনবচ্ছেদে বয়ে চলেছে। কখনও সে নৃত্যপরা উর্বশীর তালভঙ্গ হয়নি, গানের বিচ্ছেদ হয় নি।

তিনি তাঁর জীবন-স্মৃতিতে বলেছেন 'আমাদের পরিবারে শিশুকাল হইতে গান চর্চার মধ্যেই আমরা বাড়িয়া উঠিয়াছি। আমার পক্ষে তাহার একটা সুবিধা এই হইয়াছিল, অতি সহজেই গান আমার সমস্ত প্রকৃতির মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল।' রবীন্দ্রনাথের জীবনেতিহাসে সঙ্গীতের যে তাগিদ আমরা দেখ্‌তে পাই, তার নিগূঢ় রহস্য এইখানে। তাঁর সমস্ত প্রকৃতি প্রথম হতেই গানের সুরে বাঁধা ছিল, তাই যখন তিনি যে তন্ত্রীটিতে আঘাত করেছেন, সেই তন্ত্রীটিই তাঁর অতি কোমল স্পর্শেই ঝঙ্কার করে উঠেছে।

এ এক অদ্‌ভুত রহস্য। কারণ রবীন্দ্রনাথ কখনও চেষ্টা করে' সঙ্গীত-বিদ্যা আয়ত্ত করেন নি, অথচ তিনি একজন Composer! জীবন-স্মৃতিতে তিনি স্পষ্টই বলেছেন যে 'চেষ্টা করিয়া গান আয়ত্ত করিবার উপযুক্ত অভ্যাস না হওয়াতে শিক্ষা পাকা হয় নি।' গানের যাদুকর, যিনি সারা বাংলাদেশকে গানে গানে মুগ্ধ করে' দিয়ে গেছেন, তিনি গানে কাঁচা ছিলেন, এ রহস্য বুদ্ধির অগম্য। কত বিচিত্র সুর-কারুকলা তাঁর গানের অন্তরঙ্গ রূপটিকে সজ্জিত করেছে—এ কেমন করে' সম্ভব হতে পারে তা আমরা বুঝতে পারি নে। ঈশ্বরদত্ত ক্ষমতাই বলি, স্বভাবজাত প্রতিভাই বলি, আর জন্মান্তর-সংস্কারই বলি—এই অশিক্ষিত পটুত্বের কথা চিন্তা করলে আমরা বিস্ময়ে অভিভূত না হয়ে পারি না।

রবীন্দ্রনাথ পাকাওস্তাদ না হয়েও যে নূতন নূতন সুর তৈরী করতে পেরেছিলেন, তার ইতিহাসটুকু এই যে—কবির দাদা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ একজন সুরেলা ব্যক্তি ছিলেন। তিনি অতি অল্প বয়স থেকেই পিয়ানোতে নূতন নূতন সুর উদ্ভাবন করতেন। কবি সেই সব সুরে গান বেঁধে জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ীতে যে সকল শ্রোতা আসতেন, তাঁদের মনোরঞ্জন করতেন। সে সময়ে তাঁদের বাড়ীতে অনেক ভাল ভাল ওস্তাদ আসতেন, আদি ব্রাহ্ম সমাজেও কয়েকজন ভাল ভাল গায়ক ছিলেন; এঁদের কাছে শুনে শুনে হিন্দুস্থানী গায়কী রীতি তিনি অনেকখানি আয়ত্ত করে' ফেলেছিলেন। সুর সম্বন্ধে তাঁর স্মৃতিশক্তি কি অসাধারণ ছিল, তার একটি গল্প এখানে বলি। একদিন সকালে আমি ও নেপালচন্দ্র রায় মহাশয় কবির দর্শনে গিয়েছিলাম। অন্যান্য কথার পর কীর্ত্তনের কথা উঠ্‌লো। আমি তাঁকে বল্‌লাম যে কীর্ত্তনে অনেক প্রাচীন সুর আছে যা ক্রমেই লোপপ্রাপ্ত হচ্চে। উদাহরণ-স্বরূপে গোষ্ঠলীলার একটি পদের উল্লেখ করলাম। পদটি এই—'যায় পদ রহিয়ে রহিয়ে রহিয়ে গো।' কবি তখনই উৎসাহ সহকারে বল্‌লেন, আচ্ছা দেখ দেখি—সুরটি আমার

ঠিক হয় কিনা! বলেই বিনা আড়ম্বরে গান ধরলেন। আমি দেখলাম সুরের খাঁটি রূপই তিনি আদায় করেছেন। আমি সে কথা বলতেই তিনি বললেন যে প্রায় ৩০ বৎসর পূর্বে রাজসাহীতে লোকেন পালিতের বাড়ী শিবু কীর্ত্তনীয়ার মুখে এই গানটি শুনেছিলাম। আমরা অবাক্! ভাবলাম এই কঠিন সুর তিনি ৩০ বছর আগে শুনে অবিকল মনে করে' রেখেছেন!

এর থেকে বুঝতে পারা যায় যে তাঁর সুরের কান যেমন তীক্ষ্ণ ছিল, তাঁর অনুভূতিও তেমনই প্রখর ছিল। একবার যা শুনতেন, তা আর ভুলতেন না। কাজেই ওস্তাদের কাছে মক্‌শো করে না শিখ্‌লেও তিনি খাস প্রকৃতির শিষ্য রূপে সঙ্গীত-বিদ্যায় অদ্‌ভুত পারদর্শিতা লাভ করেছিলেন অর্থাৎ আমরা সচরাচর যে সঙ্গীতকে ক্ল্যাসিক্যাল আখ্যা দিয়ে থাকি, তিনি গুরুকরণ করে' সে সঙ্গীত শিক্ষা না করলেও তাঁর প্রাণের অনুরাগ দিয়ে তিনি তাঁর নিজের জন্য সুরের যে অশেষ কারুকার্যময় নীড় প্রস্তুত করেছিলেন, তা অনুপম। ভাবে রসে প্রেরণায় সে সঙ্গীত এক নূতন আনন্দ-জগতের দ্বার খুলে দিল! বৈচিত্র্যে, মাধুর্যে ও উন্নত অনুভূতির জন্য সহজেই এর একটা অসামান্য মূল্য নির্দিষ্ট হয়ে গেল। আমরা এই সঙ্গীতকে 'ক্ল্যাসিক্যাল' পদ্ধতির তুলনায় বোধ হয় 'রোমান্টিক' বলতে পারি। আমি রোমান্টিক বলতে ঠিক কি বুঝি, তা হয়ত বলতে পারব না। রবীন্দ্রনাথ ইয়ুরোপীয় সঙ্গীত সম্বন্ধে যেমন বলেছেন, আমি সেইরূপ বলতে চাই: 'রোম্যান্টিকের দিকটা বিচিত্রতার দিক্, প্রাচুর্যের দিক্, তাহা জীবনসমুদ্রের তরঙ্গলীলার দিক্, তাহা অবিরাম গতিচাঞ্চল্যের উপর আলোক-ছায়ার দ্বন্দ্বসম্পাতের দিক্।' রবীন্দ্রনাথের গানে বেদনার এই আলো-ছায়ার দ্বন্দ্বলীলা যেমন দেখা যায়, এমন আর কোথায়ও দেখ্‌তে পাইনে। হৃদয়ের নিগূঢ়তম অনুভূতির, হাসি-অশ্রুর আলো ও ছায়া যে সঙ্গীতে প্রকাশ পায়, রবীন্দ্রনাথের গান সেই জাতীয় সঙ্গীত।

প্রথম প্রথম তিনি অন্তরের বিচিত্র ভাবকে ভাষা দেবার জন্য যে সকল গান লিখেছেন, তার সম্বন্ধে তাঁর মনে কখনও কখনও সন্দেহ দেখা দিত, হয়ত এগুলি মনের স্বারসিক ভাবচাঞ্চল্যে ভেসে আসা শৈবাল-দল। শৈবালের মতোই ভেসে চলে যাবে। একান্তই অনাবশ্যক ভাবে এদের আগমন।

মোর গান এরা সব শৈবালের দল,
বাসা নাই, নাইক সঞ্চয়।
অজানা অতিথি এরা
কবে আসে নাহিক নিশ্চয়॥

কিন্তু এরা সত্যই আপনি ভেসে আসা শৈবালদল নয়। এ গানগুলিতে তাঁর ভাবা যা বলতে বলতে থেমে গেছে, সুরের অশরীরী ব্যঞ্জনা তাকে পরিপূর্ণ করে' মুদ্রিত করে' দিয়েছে প্রাণের গভীর সত্তায়। অবশ্য 'খেয়া'র পরবর্তী যুগে এই ব্যঞ্জনা আরও নিবিড় অনুভূতির কোঠায় গিয়ে পৌঁছেচে। তখন কবির আত্মা গানের সুরের মধ্যে একেবারে মিলিয়ে যেতে চাইচে। ভক্ত ও ভগবানের মধ্যে যে যোগাযোগ চিরন্তন কালপারাবার অতিক্রম করে' নীরবে নিভৃতে চলেছে, সেই যোগাযোগ কবি আবিষ্কার করেছেন গানে:

একটি নমস্কারে প্রভু একটি নমস্কারে
সমস্ত গান সমাপ্ত হোক্ নীরব পারাবারে।

এই আধ্যাত্মিক সুরটি রবীন্দ্রনাথের গানকে এক অপার্থিব মহিমায় মণ্ডিত করেছে। গীতাঞ্জলির এই প্রাচ্যের নিজস্ব অথচ বিশ্বজনীন ভাবটি পাশ্চাত্য জগৎকে মুগ্ধ করেছিল। মুসলমান সুফীদের মতো তাঁর প্রেমের কবিতাও পার্থিব প্রেমকে ছাড়িয়ে এক উর্দ্ধ সুরলোকে প্রয়াণ করেছে। এই জন্যই রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীত বিশ্বের অন্তরাত্মাকে বিমোহিত করতে পেরেছে। এদের অন্তর্নিহিত বিশ্বজনীন আবেদন রবীন্দ্রনাথের কাব্য বিশেষতঃ গীতি কবিতাগুলিকে সমস্ত সম্প্রদায়, সমাজ, দেশ-কালের ব্যবধান থেকে মুক্ত করেছে। তিনি দীন ভক্তের মত ভগবানের চরণে কেবল এই প্রার্থনাই করেছেন:

বাজাও আমারে বাজাও।
বাজালে যে সুরে প্রভাত আলোরে
সেই সুরে মোরে বাজাও॥

আমার মনে হয় এই ভক্তিবাদই রবীন্দ্রনাথের সাঙ্গীতিক জীবনের প্রথম ও শেষ কথা। সকল ধর্মের মধ্যেই যে সুরটি বেশি করে' বাজে, সেই সুরে রবীন্দ্রের বীণা বাঁধা। কাজেই তিনি কোনও বিশেষ সঙ্গীত-রীতির অনুবর্ত্তন করতে পারেন নি। তিনি সকল সঙ্গীতেরই মূল কোরক যে সুর, তারই সাক্ষাৎ ভাবে সাধনা করেছিলেন। হিন্দু সঙ্গীতের রাগ-রাগিণীকে অস্বীকার না করেও তিনি সঙ্গীতের মূল উৎস-সন্ধানে ফিরেছিলেন। সমস্ত সঙ্গীতের মূলে যে মাধুর্য, যে লালিত্য, যে অব্যক্ত চারুতা, তারই উপর তিনি আপনার অনবদ্য কাব্য-সঙ্গীতের ভিত্তি স্থাপন করে' নিয়েছিলেন বলেই তিনি একটি নূতন পথের সন্ধান দিতে পেরেছিলেন।

যা মামুলি, যা গতানুগতিক তা যতই বড় হোক্, রবীন্দ্রনাথের সৃজনী প্রতিভাকে আবদ্ধ করতে পারতো না। তাই তিনি তাঁর এক পত্রে বলেছেন 'হিন্দুস্থানী গানকে আচারের শিকলে যাঁরা অচল করে' বেঁধেছেন সেই ডিক্‌টেটারদের আমি মানিনে···তাঁদেরই প্রতিবাদ করবার জন্য আমার মতো বিদ্রোহীদের জন্ম—সেই প্রতিবাদ ভিন্ন প্রণালীতে কীর্ত্তনকারীরাও করেছেন।' (শ্রীধূর্জটিপ্রসাদকে লিখিত পত্র, সুর ও সঙ্গীত ৮পৃঃ)

কিন্তু বাস্তবিক তিনি বিদ্রোহী নন, কীর্ত্তনকারীরা যে বিদ্রোহ করেছেন কবি তেমন কিছু বিদ্রোহও করেন নি। তিনি ভারতের মৌলিক সঙ্গীত-কলাকে কিরূপ প্রীতির চোখে

দেখতেন, তা তিনি ইউরোপীয় সঙ্গীতের সঙ্গে তুলনা করে' বলেছেন: 'আমাদের গান ভারতবর্ষের নক্ষত্রখচিত নিশীথিনীকে ও নবোন্মেষিত অরুণ রাগকে ভাষা দিতেছে; আমাদের গান ঘনবর্ষার বিশ্বব্যাপী বিরহ বেদনা ও নববসন্তের বনান্তপ্রসারিত গভীর উন্মাদনার বাক্যবিস্মৃত বিহ্বলতা।' বাক্যের সঙ্গে সুরের সম্বন্ধ তিনি যে ভাবে ব্যক্ত করেছেন, তা ক্ল্যাসিকাল সুরশিল্পীদের আত্মাভিমান একটুও ক্ষুণ্ণ করে না। তিনি বলেছেন: 'গান নিজের ঐশ্বর্য্যেই বড়ো—বাক্যের দাসত্ব সে কেন করিতে যাইবে? বাক্য যেখানে শেষ হইয়াছে, সেইখানেই গানের আরম্ভ। যেখানে অনির্বচনীয় সেইখানেই গানের প্রভাব। বাক্য যাহা বলিতে পারে না গান তাহাই বলে। এই জন্য গানের কথাগুলিতে কথার উপদ্রব যতই কম থাকে ততই ভাল।'

এর মানে অবশ্য এ নয় যে কথার কোনই মূল্য নেই। কথা এবং সুর পরস্পরকে সাহায্য করে বলেই তাদের মিলিয়ে ভাবের সুতোয় মালা গাঁথা হয়। সুরকে পশ্চাতে ফেলে' যদি কথাই সর্ব্বস্ব হয়, তবে সে কথকতা বা পাঁচালী হতে পারে, সে সঙ্গীত নামে অভিহিত হতে পারে না। আবার কথাকে বাদ দিয়ে যদি কেবল অব্যক্ত অস্ফুট স্বরে গান করা যায়, তবে তার মধ্যে ভাবকে রসকে ফুটিয়ে তোলা কঠিন—যেমন আলাপচারিতে। আলাপ বা আলপ্তি সঙ্গীতের অনিবদ্ধরূপ—তুম্‌-না-না বা আতানারি ইত্যাদি নিরর্থক অক্ষর সংযোগে 'আলাপ' করা হয়। এরূপ ভাবে কথাকে একেবারে বাদ দিয়ে সুরের আবেদনে রস বিস্তার করা সঙ্গীতের শ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তি হতে পারে, কিন্তু অনেক সময় তা হয় না। কবি নিজে এক চিঠিতে বলেছেন 'আলাপের কথা যদি বলো, তবে আমি বলবো আলাপের পদ্ধতি নিয়ে কেউ বা রূপ সৃষ্টি করতেও পারেন কিন্তু রূপের পঞ্চত্ব সাধন করাই অধিকাংশ বলবানের অভ্যাসগত। কারণ জগতে কলাবিদ্‌ কোটিকে গুটিক মেলে। বলবানের প্রাদুর্ভাব অপরিমিত।'

কথা ও সুরের দ্বন্দ্ব অফুরন্ত, কোনও কালে যে মিটবে তা মনে হয় না। তবে রবীন্দ্রনাথের চিত্তে সুরের মায়া যে কুহক বিস্তার করেছিল, তা তিনি বহুবার বহু স্থলে বলেছেন 'রাগিণী যেখানে শুদ্ধমাত্র স্বররূপেই আমাদের চিত্তকে অপরূপভাবে জাগ্রত করিতে পারে, সেইখানেই সংগীতের উৎকর্ষ।'—একথা তিনি মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করেছেন। কিন্তু তা হলেও তিনি সুরকে যন্ত্রবদ্ধ mechanical জড়পদার্থে পরিণত করতে ইচ্ছা করেন নি। তিনি কোনও প্রণালীকেই চরম সিদ্ধান্ত বলে' গণ্য করেন নি। তিনি কীর্ত্তন ও বাউল সুরে গান রচনাও করেছেন, কিন্তু সেখানেও তিনি তাঁর ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য অক্ষুণ্ণ রেখেছেন। কোনও প্রণালীর নিকট তিনি আপনাকে বিক্রয় করেন নি। তিনি যে কীর্ত্তন ও বাউলের সুর সৃষ্টি করলেন, তা খাঁটি কীর্ত্তন বা খাঁটি বাউল না হয়েও এত সুন্দর যে সহজেই মন মুগ্ধ করে। তিনি হিন্দু সঙ্গীতের রাগরাগিণীকে অঙ্গীকার করেও হিন্দুস্থানী রীতির হুবহু অনুবর্ত্তন করেন নি। একখানি পত্রে তিনি একথাও বলেছেন 'হিন্দুস্থানী সুর ভুলতে ভুলতে তবে গান রচনা করেছি। ওর আশ্রয় ছাড়তে না পারলে ঘরজামাইয়ের দশা হয়, স্ত্রীকে পেয়েও তার স্বত্বাধিকারে জোর পৌঁছয় না।' (সুর ও সঙ্গতি ৩য় পৃঃ)

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীত সম্বন্ধে প্রকৃত সমালোচনার সময় আসতে এখনও বহু বিলম্ব আছে। তবে এই কথাটি আমি শুধু বলতে চাই যে সমগ্রভাবে দেখতে গেলে এ সঙ্গীত এক অপরূপ সৃষ্টিলোকের সন্ধান দেয়। রবীন্দ্রনাথের গান তাঁর এক অনুপম সৃষ্টি এবং এক হিসাবে তাঁকে সঙ্গীতে যুগপ্রবর্ত্তক বলে' মনে করা যেতে পারে। তাঁর সৃষ্টির অভিনবত্ব কোথায়, তার বিশেষ রূপটি কি, তা একান্ত শ্রদ্ধা ও অনুরাগের সহিত দেখলে তবেই তা ধরা পড়বে। তিনি যে কথা ও সুরের অগণিত মালা গেঁথে বাঙ্গালী নরনারীর গলায় দুলিয়ে দিয়েছেন, তার মর্য্যাদা আমরা তখনই বুঝতে পারবো যখন আমাদের সঙ্গীতের ইতিহাসের ধারার সঙ্গে তাকে মিলিয়ে দেখবো।

বৈষ্ণব কবিদের পরিত্যক্ত আসন বহুদিন পরে তিনিই অলঙ্কৃত করেছিলেন। এই বৈষ্ণব কবিতার কোমলকান্ত সুরটি যে কাব্যকুঞ্জে তাঁকে গ্রীক কাব্যের সাইরেনের বাঁশীর মতো পথ দেখিয়ে নিয়ে গিয়েছিল, তা বোঝা যায় তাঁর ভানুসিংহের পদাবলী থেকে। তিনি এই পদাবলী রচনা করেই যশস্বী হতে পারতেন কিন্তু সৃষ্টির কৌতুকময়ী দেবতা যাকে হাতছানি দিয়ে ডাকেন, সে কি পারে অনুকরণের অন্ধ আবৃত্তিতে তুষ্ট থাকতে? কপিবুক দেখে দেখে হাতের লেখা পাকানো যায় বটে, কিন্তু কেউ কবি হতে পারে না। রবীন্দ্রনাথ একদিকে যেমন স্বভাব-কবি ছিলেন, অপর দিকে তেমনি স্বভাব-সুরশিল্পী ছিলেন। তাই তাঁর কবিতালক্ষ্মী যখন সুরের নীল উড়ানি উড়িয়ে আমাদের গৃহপ্রাঙ্গণে দেখা দিল তখন আমরা তাকে বরণ করে নিয়েছি মনে প্রাণে। জয়দেবের গীতলক্ষ্মী সেই কবে কোন মৌন স্নিগ্ধ মেঘমেদুর সন্ধ্যায় বাংলার শ্যামায়মান বনভূমিতে নেমে এসেছিলেন, তারপর থেকেই তার সুমধুর নূপুরধ্বনি বাংলার সঙ্গীত ও কাব্যকে মুখর মুগ্ধ করে রেখেছে। সেই থেকে আমাদের দেশের সব গানই কবিতা এবং প্রায় কবিতাই গান।

গানের ধারাকে যে রবীন্দ্রনাথ স্বাধীন, বন্ধন-মুক্ত করতে চেয়েছিলেন, তার সঙ্গে সকলে একমত না হতে পারেন। তাল না থাকলে সঙ্গীতের প্রতিষ্ঠা নেই, একথা স্বতঃসিদ্ধ। তিনি যে এই ধারণার মূলে আঘাত করে' সঙ্গীতকে মুক্তি দিতে চেয়েছিলেন, তার অন্য কোনও কারণ নাই, তিনি চেয়েছিলেন সঙ্গীতকে সর্ব্বজনপ্রিয় করতে—সঙ্গীতের আনন্দ কোনওখানে সীমাবদ্ধ না হয়ে সকলের মধ্যেই ঝর্ণাধারার

মতো ঝরে' পড়তে পারে, তাই তিনি চেয়েছিলেন। মাইকেল অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্ত্তন করে' চেয়েছিলেন কবিতাকে মিলের নিগড়-মুক্ত করবার জন্তে, আর রবীন্দ্রনাথ গানকে তার মৌলিক মাত্রার উপর প্রতিষ্ঠিত করে' মুক্তি দিতে চেয়েছিলেন তালের শতবন্ধন থেকে। আমার বোধ হয় ইউরোপীয় সঙ্গীতের আলোচনা থেকে তাঁর এই মনোভাব এসেছিল। তিনি দেখেছিলেন যে বিদেশী সঙ্গীতে আমাদের মত তালের গহন অরণ্যে প্রবেশ করবার প্রয়োজন হয় না। তাই থেকে হয়ত তাঁর এই ধারণা এসে থাকবে—কিন্তু এ আমার অনুমান মাত্র। তিনি ইউরোপীয় সঙ্গীতের দ্বারা যে এক সময়ে প্রভাবিত হয়েছিলেন, তা আমরা জানি। মূরের আইরিশ মেলডিজ্‌এর ছায়া নিয়ে তিনি বাল্মীকি প্রতিভা ও কালমৃগয়ার কিছু কিছু গান রচনা করেছিলেন সত্য, কিন্তু বেশিদিন এই বিদেশী প্রভাব তাঁকে অভিভূত করতে পারে নি। নিখিল বঙ্গ সঙ্গীত সম্মিলনে সঙ্গীতের স্বাধীনতা সম্বন্ধে তাঁর মতামত জোর দিয়ে বল্লেও তিনি ভারতীয় সঙ্গীতের মৌলিক প্রাধান্ত বহুবার স্বীকার করেছেন।

আমার মনে হয় রবীন্দ্রনাথ বেঁচে থাকবেন তাঁর সঙ্গীতে। কালের ঢেউএর উপর এই সঙ্গীতগুলি শত মাণিক জেলে বর্ত্তমান থাকবে। কিন্তু আজকাল 'রবীন্দ্র সঙ্গীত' বলে একপ্রকার গান বাজারে চল্‌ছে। এর মানে যদি হয় রবীন্দ্রনাথের গান, তাহলে কিছুই বলবার নেই। কিন্তু যদি এর দ্বারা এক বিশিষ্ট শ্রেণীর সুরপদ্ধতি বুঝায়, তা' হলে আমি তার লক্ষণ জানি না। এই রবীন্দ্র-সঙ্গীতে আমাদের তরুণের দল বিমোহিত তা জানি। কিন্তু এর লক্ষণ সম্বন্ধে কেউ যে কিছু নিশ্চয় করে' বলেছেন, তা আমি জানি না—যেমন রামপ্রসাদী সুর বলতে বা দাশুরায়ের সুর বল্‌তে আমরা একটা বিশিষ্ট সুর বা ঢঙ্‌ বুঝতে পারি। এখানে একটি কথা না বলে' পারছি নে—রবীন্দ্রনাথের গানের ইতিহাসে যুগ-পরিবর্ত্তন হচ্চে বড় দ্রুত। আগে তাঁর যে সকল গানে আমরা মুগ্ধ হতাম এখন সে সকল গান আর সচল নয়। সেই 'নয়ন তোমারে পায়না দেখিতে রয়েছ নয়নে নয়নে', 'কাঙ্গাল আমারে কাঙ্গাল করেছ আর কি তোমার চাহি', 'কেন বাজাও কাঁকন কন কন কত ছল ভরে'—এ সকল গান আর তেমন শুনতে পাওয়া যায় না। 'আমার মাথা নত করে' দেও হে তোমার চরণ ধূলার তলে' এমন কি 'মম যৌবন নিকুঞ্জে গাহে পাখী'ও বড় একটা শুন্‌তে পাই না। রুচির হাওয়া কখন কোন দিকে বয় কিছুই বলা যায় না। আবার হয়ত ঐ গানগুলির যুগ ঘুরে ফিরে আসবে—কিন্তু তখন আমরা হয়ত থাকব না।

রবীন্দ্রনাথ বীণাপাণির কাছে বর চেয়েছিলেন 'আমার করে তোমার বীণা লহগো লহ তুলে', বীণাপাণি সে প্রার্থনা শুনেছেন কিনা বল্‌তে পারিনে। তবে তাঁর বরহস্তের মোহন বীণাখানি তিনি যে আমাদের এই বড় আদরের কবির করে তুলে দিয়েছিলেন সে সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ নাই।*

* রবিবাসরের সাধারণ জনসভায় পঠিত।

শেষের নিবেদন

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী

একটি কথা তোমায় আমি বল্‌তে শুধু চাই।
আগের যাহা, রাখ্‌তে যদি না পারলে তো না-ই॥
নালিশ যতই থাক্‌না জমা,
তবু তোমায় কর্‌ব ক্ষমা
চিরকালের সহজ সুরে, যতই ব্যথা পাই॥

আমার পানে নয়ন তোমার নাই-বা চাইলে তুলে'।
অনেকদিনের অনেক কথা গেলেই না-হয় ভুলে'॥
যতই আমায় দূরে রাখো,
আমিও আর চাইব নাকো,
মর্ম্মমূলে রক্তধারা যতই উঠুক দুলে'॥

—মনে আছে? চাঁপার মালা পরিয়ে দিতাম কেশে!
সে ফুল ভালবাসো বলেই না-হয় নিতে হেসে॥
সে দিন তো আজ কথায় সারা,
সেই চাঁপারই একটি চারা
লাগিয়ো না-হয় তোমার-আমার প্রাচীর-সীমাদেশে॥

গ্রীষ্মদিনের দীর্ঘ দুপুর কাট্‌বেনা আর যবে।
সেই চাঁপারই গন্ধ আমার সঙ্গী হয়ে র'বে॥
তুমিও হয়তো চোখ্‌টি তুলে'
চাইতে গিয়ে, মনের ভুলে
সুদূর দিনের ক্ষণিক স্মৃতি হঠাৎ মনে হবে॥

বিদায়-বেলায় এটুকু মোর শেষের নিবেদন।
রাখ্‌তে পারো, রেখো সখি, এ দীন আকিঞ্চন॥
সেই চাঁপারই গন্ধ-পথে
কাট্‌বে সময় স্মৃতির রথে,
যতদিন না ফুরিয়ে আসে ব্যর্থ এ জীবন॥

পঞ্চগ্রাম

শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

জ্ঞায়রত্নের অনুমান সত্য। ময়ূরাক্ষীতে বন্যাই আসিয়াছে। কয়দিন হইতেই ময়ূরাক্ষী কূলে কূলে ভরিয়া প্রবাহিত হইতেছিল। তাহার উপর আবার যে প্রবল বর্ষণ হইতে আরম্ভ করিয়াছে—তাহাতে বন্যা আকস্মিকও নয় অস্বাভাবিকও নয়—কিন্তু সে বন্যা ধীরে ধীরে বাড়ে—কূল ছাপাইয়া নালা-বিল-খাল দিয়া ক্রমশঃ পরিধিতে বিস্তৃত হয়; তাহার জন্য লোকে বিচলিত হয় না, এমন ভাবে গ্রামে-গ্রামে কোলাহল উঠে না। সে বন্যার গতিরোধের জন্য গ্রামের মাঠের প্রান্তে মাটির বাঁধ আছে। এ বন্যা ভয়ঙ্কর আকস্মিক, দুর্নিবার। হড়পা বান—কেহ কেহ বলে ঘোড়া বান। হড় হড় শব্দে, উন্মত্ত হ্রেষাধ্বনি তুলিয়া প্রচণ্ড গতিতে ধাবমান লক্ষ লক্ষ বন্য ঘোড়ার মতই এ বান ছুটিয়া আসে। কয়েক ফিট উঁচু হইয়া এক বিপুল উন্মত্ত জলরাশি আবর্ত্তিত হইতে হইতে দুই কূল আকস্মিকভাবে ভাসাইয়া ভাঙিয়া দুই পাশের প্রান্তর, গ্রাম, ক্ষেত, খামার, বাগান পুকুর তছনছ করিয়া দিয়া যায়। সেই হড়পা বান—ঘোড়া বান পড়িয়াছে।

ময়ূরাক্ষীতে অবশ্য এ বন্যা একেবারে নূতন নয়। পাহাড়ীয়া নদীতে এ ধারায় কখনও কখনও বন্যা আসে। যে পাহাড়ে নদীর উদ্ভব সেখানে আকস্মিক প্রবল প্রচণ্ড বর্ষণ হইলে সেই জল পাহাড়ের ঢালু পথে বিপুল বেগ সঞ্চয় করিয়া এমনিভাবে ছুটিয়া আসে। ময়ূরাক্ষীতেও ইহার পূর্ব্বে পূর্ব্বে আসিয়াছে। এবার বোধহয় ত্রিশ বৎসর পরে আসিল। সে বন্যার স্মৃতি আজও ভুলিয়া যায় নাই। নবীনেরা, যাহারা দেখে নাই, তাহারা সে বন্যার বিরাট বিক্রম চিহ্ন দেখিয়া শিহরিয়া উঠে। শিবকালীপুরের নীচেই মাইল খানেক পূর্ব্বে ময়ূরাক্ষী একটা বাঁক ঘুরিয়াছে। সেই বাঁকের উপর বিপুল বিস্তার বালুস্তূপ এখনও ধূ ধূ করিতেছে। একটা প্রকাণ্ড বড় আমবাগান দেখা যায়—ওই বন্যার পর হইতে এখন বাগানটার নাম হইয়াছে গলা-পোঁতায় বাগান; বাগানটার প্রাচীন আমগাছগুলির শাখা-প্রশাখার বিশাল মাথার দিকটাই শুধু জাগিয়া আছে বালুস্তূপের উপর, সেই বন্যায় ময়ূরাক্ষী বালি আনিয়া গাছগুলার কাণ্ড ঢাকিয়া আকণ্ঠ পুতিয়া দিয়া গিয়াছে। বাগানটার পরই 'মহিষডহরের' বিস্তীর্ণ বালিয়াড়ি; এখনও বালিয়াড়ির উপর ঘাস জমে নাই। 'মহিষডহর' ছিল তৃণশ্যামল চরভূমির উপর একখানি ছোট গ্রাম—গোয়ালার গ্রাম। ময়ূরাক্ষীর উর্ব্বর চরভূমির সতেজ সরস ঘাসের কল্যাণে গোয়ালাদের প্রত্যেকেরই ছিল মহিষের পাল। 'মহিষডহর' গ্রামখানা সেই বন্যায় নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে—। ময়ূরাক্ষীরই দুকূল ভরা বন্যায় গোয়ালার ছেলেদের পিঠে লইয়া যে মহিষগুলা—এপার ওপার করিত, সেবারের সেই হড়পা বানে মহিষগুলা পর্য্যন্ত নিতান্ত অসহায়ভাবে কোনরূপে—নাক জাগাইয়া থাকিয়া ভাসিয়া গিয়াছিল। এবার আবার সেই বন্যা আসিয়াছে। শিবকালীপুরের মাঠের প্রান্তে ময়ূরাক্ষীর চরভূমির উপর যে বন্যারোধী বাঁধটা আছে, বন্যা সে বাঁধের বুক ছাড়াইয়া উঁচু হইয়া উঠিয়াছে; বাঁধের গায়ে ইন্দুরের গর্ত্ত দিয়া জল ঢুকিতেছে। গর্ত্তগুলা পরিধিতে ক্রমশঃ বড় হইয়া উঠিতেছে—দু এক জায়গায় ফাটলও দেখা দিয়াছে।

বিশ্বনাথ বাঁধের উপর উঠিল। এতক্ষণে তাহার চোখে পড়িল ময়ূরাক্ষীর পরিপূর্ণ রূপ। বিস্তীর্ণ বিশাল জলরাশি কুটিল আবর্ত্তে পাক খাইয়া প্রখর স্রোতে দ্রুততম লঘুতরঙ্গে নাচিতে নাচিতে ছুটিয়া চলিয়াছে। গাঢ় গৈরিক বর্ণের জল-প্লাবনের সর্ব্বাঙ্গে পুঞ্জ-পুঞ্জ সাদা ফেনা। বিশ্বনাথের মনে পড়িল—শিবপ্রিয়া সতীর পিতৃযজ্ঞে দক্ষালয়ে যাত্রার কথা। মহাকালকে ভয়ে অভিভূত করিয়া দুর্ব্বার গতিতে সতী এমনি সাজেই গিয়াছিলেন পিতৃযজ্ঞে; পরণে ছিল গৈরিক বাস—আর সর্ব্বাঙ্গে ছিল ফুলের অলঙ্কার।

ময়ূরাক্ষীর প্রচণ্ড কল-কল্লোল ধ্বনির মধ্যে মানুষের কলরব আর শোনা যায় না। বিশ্বনাথ সম্মুখের দিকে বাঁধের দৈর্ঘ্যপথে তীক্ষ্নদৃষ্টিতে চাহিল। ফিন ফিনে বৃষ্টিধারা কুয়াসার মত একটা আবরণ সৃষ্টি করিয়াছে। প্রচণ্ড বাতাসের বেগে—বিশ্বনাথকে টাল খাইতে হইতেছে। কিন্তু কৈ—কোথায় কে? মানুষেরা কি ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া বসিয়া কলরব করিতেছে? বাঁধের উপর দিয়াই সে খানিকটা অগ্রসর হইয়া চলিল। ঐ যেন কতকগুলা মানুষ দ্রুতগতিতে বাঁধের গায়ে চলাফেরা করিতেছে। একজন কেহ বাঁধের উপর দাঁড়াইয়া আছে। আরও খানিকটা অগ্রসর হইয়া বিশ্বনাথ দেখিল—লোকটার মাথা হইতে সর্ব্বাঙ্গ ভিজিয়া দরদর ধারে জল পড়িতেছে, তাহাতে তাহার ভ্রূক্ষেপ নাই, সে নীচের লোকদের উপদেশ দিতেছে নির্দ্দেশ দিতেছে—নিজে দাঁড়াইয়া আছে মূর্ত্তিমান দুঃসাহসের মত বাঁধের একটা ফাটলের উপর। ফাটলটার নীচেই একটা গর্ত্ত ধীরে ধীরে পরিধিতে বাড়িয়াই চলিয়াছে; বন্যার জল সরীসৃপের মত সেই গর্ত্ত দিয়া এ পাশের মাঠের বুকে আঁকিয়া বাঁকিয়া অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে কুটিল গতিতে—ক্ষুধার্ত্ত উদ্যত গ্রাসে।

* * * *

বাঁধের গায়ে গর্ত্তটার মুখ কাটিয়া ফেলিয়া বাঁশের খুঁটা ও তালপাতা দিয়া মাটি ফেলিয়া সেটাকে বন্ধ করিবার চেষ্টা চলিতেছিল। জন পঁচিশেক লোক প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছে। কতক মাটি কাটিয়া ভরিয়া দিতেছে, কতক ঝুড়িতে বহিয়া সেই মাটি ঝপাঝপ্ ফেলিতেছে গর্ত্তের মুখে। একাগ্র তীক্ষ্ন দৃষ্টিতে সেই গর্ত্তের দিকে চাহিয়া দেবু দাঁড়াইয়া আছে বাঁধের উপর। তাহার পিছনেই বাঁধের বুক পর্য্যন্ত গ্রাস করিয়া ময়ূরাক্ষী বহিয়া চলিয়াছে উন্মত্ত খরস্রোতে। মাথার উপর দিয়া বর্ষার জলো-বাতাস হু হু করিয়া বহিয়া চলিয়াছে। ফিন্ ফিনে বৃষ্টির ধারা ঘন কুয়াসার আবরণের মত ভাসিয়া চলিয়াছে। দেবুর মাথার চুল হইতে সর্ব্বাঙ্গ বাহিয়া জল ঝরিতেছে। বিশ্বনাথ মুগ্ধ হইয়া গেল! এই প্রচণ্ড দুর্য্যোগের মধ্যে দেবু ঘোষ অকস্মাৎ বিশ্বনাথের সকল কল্পনাকে অতিক্রম করিয়া বাড়িয়া গিয়াছে গল্পের যাদুকরের

যাদুমন্ত্রপূত বীজের অঙ্কুরের মত। বাঁধের উপর শাখা-প্রশাখার ছত্রচ্ছায়া বিস্তার করিয়া দাঁড়াইয়া আছে অনড় অক্ষয় বটের মত।

দেবুর পায়ের তলায় গর্ত্তের মুখের আরও খানিকটা মাটি খসিয়া গেল; মুহূর্ত্তে জলস্রোত ক্রুদ্ধ-নিশ্বাসে স্ফীত দেহ অজগরের মত মোটা ধারায় প্রবলতর বেগে প্রবেশ করিতে আরম্ভ করিল। সঙ্গে সঙ্গে কলরব উঠিল—গেল—গেল!

—চেঁচাস্ নে; মাটি নিয়ে আয়, মাটি। দেবু স্থির ভাবেই হাঁকিয়া বলিল—একসঙ্গে চার পাঁচ জনে মাটি ফেল। সতীশ, আমি খুঁটোর বেড়া ধরছি—তুইও যা মাটি নিয়ে আয়। সে নীচে নামিয়া জল স্রোতের মুখে গিয়া বাঁশের খুঁটা ও তালপাতার বেড়াটা ধরিয়া দাঁড়াইল। জলস্রোতের মুখে ওই বেড়াটা ঠেলিয়া ধরিয়া দাঁড়াইয়া ছিল তিন জন, তাহার মধ্যে সতীশ বাউড়ীর স্থান গ্রহণ করিয়া দেবু সতীশকে ছাড়িয়া দিল।

—আমি ধরি দেবু ভাই। তাহ'লে আরও একজন মাটি বইবার লোক বাড়বে। দেবুর পিছনে পিছনে বিশ্বনাথও আসিয়া খুঁটা ঠেলিয়া ধরিয়া দেবুর পাশেই দাঁড়াইল।

—দেবু বিস্মিত হইয়া বিশ্বনাথের দিকে চাহিল—বিশু, বিশু ভাই? তুমি কখন এলে?

—কিছুক্ষণ। পাশে এসে দাঁড়ালাম, তুমি জানতেই পারলে না। বিশ্বনাথ হাসিল।

গর্ত্তের মুখ দিয়া জল প্রবলতর বেগে এবার যেন আছাড় খাইয়া আসিয়া পড়িল, বেড়াটা থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতে আরম্ভ করিল—বাঁধের ফাটলটা আরও খানিকটা বাড়িয়া গেল। দেবু বলিল—আর রাখতে পারলাম না বিশুভাই, আর রাখতে পারলাম না। তারপর আক্ষেপ করিয়া বলিল—এ কি, এই বিশ-পঁচিশটা লোকের কাজ! সমস্ত গ্রাম ভেসে যাবে, ডুবে যাবে, কিন্তু গেরস্ত সম্পত্তিবান লোকে পুকুরের মুখে বাঁধ দিচ্ছে, পুকুরের মাছ বেরিয়ে যাবে। এ হতভাগাদের পুকুর নাই, জমি নাই, ওরাই কেবল এল আমার ডাকে।

বন্যার জলের বেগের মুখে ওই বেড়াটা ঠেলিয়া ধরিয়া রাখিতে হাতের শিরা পেশী মাংস কঠিন হইয়া যেন জমিয়া যাইতেছে, মনে হইতেছে বোধহয় এইবার ফাটিয়া যাইবে। দেবু দাঁতে দাঁত চাপিয়া চীৎকার করিল—মাটি! মাটি!

শ্রমিকের দল ওই কাদা ও জলের মধ্যে প্রাণপণে দ্রুতগতিতে আসিয়া মাটির পর মাটি ফেলিতেছিল কিন্তু বন্যার জলে কাদার মত নরম মাটি অধিকাংশই গলিয়া বাহির হইয়া যাইতেছে। দেবুর চীৎকারে দশ বারোজন শ্রমিক মাটি বোঝাই ঝুড়ি মাথায় ছুটিয়া আসিল, কিন্তু বাঁধের ওপারের দুর্ব্বার জলস্রোতের চাপে ততক্ষণে বাঁধের ফাটলটা ফাটিয়া গলিয়া সশব্দে নীচে পড়িয়া গেল; এবার উন্মত্ত জলস্রোতে ভাঙন পার হইয়া জল প্রপাতের মত আছাড় খাইয়া মাঠের উপর ভাঙিয়া পড়িল ঝড়ে অশান্ত সমুদ্রের ঢেউয়ের মত। বেড়া ছাড়িয়া দিয়া দেবু বিশ্বনাথের হাত ধরিয়া টানিয়া সরাইয়া লইয়া বলিল—চলে এস, সরে এস। জলের তলায় পড়লে মাটিতে গুঁজে দেবে। সরে এস।

হুড় হুড় শব্দে বন্যার জল মাঠে পড়িয়া চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িতেছিল; খানিকটা অগ্রসর হইতে হইতেই এক হাঁটু জল বাড়িয়া প্রায় কোমর পর্য্যন্ত ডুবাইয়া দিল।

—সরে এস। চকিত সবল আকর্ষণে দেবু বিশ্বনাথকে আকর্ষণ করিল।—সাপ, সাপ ভেসে যাচ্ছে।

কাল কেউটে একটা জলস্রোতের উপর সাঁতার কাটিয়া চলিয়াছে; জলপ্লাবনে মাঠের গর্ত্ত ভরিয়া গিয়াছে—সাপটা খুঁজিতেছে একটা আশ্রয়স্থল—কোন গাছ অথবা উচ্চভূমি; এ সময় মানুষ পাইলেও মানুষকে জড়াইয়া ধরিয়া বাঁচিতে চায়। জলস্রোত কাটিয়া তীরবেগে সাপটা পাশ দিয়া চলিয়া গেল। কীটপতঙ্গের তো অবধি নাই; খড়কুটা ডালপাতার উপর লক্ষ লক্ষ পিঁপড়ে চাপ বাঁধিয়া আশ্রয় লইয়াছে, মুখে তাহাদের সাদা ডিম—ডিমের মমতা এখনও ছাড়িতে পারে নাই।

দেবু প্রশ্ন করিল—সাঁতার জান তো বিশুভাই?

—জানি।

জল বুক পর্য্যন্ত ঠেলিয়া উঠিয়াছে।

—তবে সাঁতার দিয়েই পাশ কাটিয়ে গাঁয়ের দিকেই চল; ওই বকুলতলা—বাউড়ীপাড়া—মুচিপাড়ার ধর্ম্মরাজতলা—ওইখানে উঠতে হবে। বেশী কিছু করতে হবে না—গা ভাসিয়ে—ডানদিকের টান কাটিয়ে একটু সরে গেলেই—বানের টানে নিয়ে গিয়ে তুলবে। ওই দিক দিয়েই গাঁয়ে বান ঢোকে। এস—বলিয়া দেবু ভাসিয়া পড়িল। সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বনাথও সাঁতার কাটিতে আরম্ভ করিল।

* * * *

বকুলতলাতেও এক কোমর জল।

মুচিপাড়া বাউড়ীপাড়াটাই গ্রামের একপ্রান্তে সর্ব্বাপেক্ষা নিম্নভূমির উপর স্থাপিত। গ্রামের সমস্ত জল বাহির হইয়া ওই পাড়াটার ভিতর দিয়াই মাঠে যায়, মাঠের নালা বাহিয়া নদীতে গিয়া পড়ে; আবার নদীর বন্যা বাঁধ ভাঙিয়া—মাঠ ভাসাইয়া ওই পাড়াটাকে ডুবাইয়াই গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করে। আজ ইহারই মধ্যে বন্যা আসিয়া পাড়াটাকে কোথাও এক কোমর, কোথায় এক হাঁটু জলে ডুবাইয়া দিয়াছে। পাড়াতে জনমানব নাই। কেবল মুর্গীগুলা ঘরের চালার মাথায় বসিয়া আছে। গোটা দুয়েক ছাগল দাঁড়াইয়া আছে একটা ভাঙা পাঁচিলের মাথায়। কয়েকটা বাড়ীর দেওয়াল ইহারই মধ্যে ধ্বসিয়া পড়িয়া গেছে। বিশ্বনাথ উৎকণ্ঠিত হইয়া থমকিয়া দাঁড়াইল, দেবু যথাসম্ভব দ্রুতগতিতে জল ভাঙিয়া ভদ্রপল্লীর দিকে চলিয়াছিল।

বিশ্বনাথ পিছন হইতে ডাকিল—দেবু!

দেবু পিছন ফিরিয়া বলিল—দাঁড়িয়ো না, জল হু-হু করে বাড়বে। ময়ূরাক্ষী যা দেখলাম···তাতে এ পাড়া—একেবারে ডুবে যাবে।

—এ পাড়ার লোকজন গেল কোথায়?

—রতন দীঘির পাড়ে; ষষ্ঠীতলার বটগাছের তলায়। বান হলে চিরকাল ওরা ওইখানে গিয়ে ওঠে। আমাদের সঙ্গে যারা কাজ করছিল, তারা—দেখছ না—পাড়ায় কেউ এল না। ওরা একবারে ওখানে গিয়ে উঠেছে।

—এ পাড়ার ঘর একখানাও থাকবে না।

দেবু একটু হাসিল—বলিল—ঘর ওদের প্রায় বছর-বছরই পড়ে বিশু ভাই, বান না হ'লেও বর্ষায় পড়ে; আবার দুখ-মেহনত ক'রে করে নেয়। এস—এস—এখন চলে এস।

পাড়াটার প্রান্তে ভদ্রপল্লী প্রবেশের মুখে আসিয়া দুজনেই কিন্তু সবিস্ময়ে দাঁড়াইয়া পরস্পরের মুখের দিকে চাহিল। এই বন্যা প্লাবনের বিপর্য্যয়ের মধ্যে কেহ অতি নিকটেই কোথাও অতি মিঠা গলায় গান ধরিয়া দিয়াছে। চারিদিকে জল থৈ থৈ করিতেছে, ঘরগুলার মধ্যেও এক হাঁটু জল, এখানে এমন লোক কে? শুধু লোকই নয়—স্ত্রীলোক—নারী কণ্ঠের মিহি মিঠা সুর।—

এ-পারেতে রইলাম আমি—ও-পারেতে আর একজনা—
মাঝেতে পাথার নদী—পার করে কে—সেই ভাবনা—
কোথা হে তুমি কেলে সোনা?

দেবুর বিস্ময় মুহূর্ত্তের মধ্যে কাটিয়া গেল, সে একটু হাসিল—হাসিয়া সে একটা কোঠা ঘরের দিকে চাহিল। বিশ্বনাথ সবিস্ময়ে প্রশ্ন করিল—এ যে দেখি চক্রবাকী, কে···দেবু ভাই?

···দুর্গা। ওই দেখ। সে কোঠা ঘরের জানালার দিকে আঙুল দেখাইয়া বিশ্বনাথের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিল। সবিস্ময়ে বিশ্বনাথ দেখিল—কোঠা ঘরের উপরতলার জানালায় বসিয়া দুর্গা বন্যার জলের দিকে চাহিয়া আছে; দাঁতে চুলের ফিতা চাপিয়া ধরিয়া দুই হাতের নিপুণ ক্ষিপ্র অঙ্গুলি চালনায় এলো চুলে বেণী রচনা করিয়া চলিয়াছে।

দেবু ডাকিল—দুর্গা!

এতক্ষণে দুর্গার দৃষ্টি তাহাদের উপর পড়িল। সে একটু লজ্জিত হইল—বোধহয় গানের জন্য লজ্জিত হইল।

—কোঠার ওপর বসে আছিস—এর পর যে আর বেরুতে পারবি না।

বিনুনীটা শেষ করিয়া একটা খোঁপা বাঁধিয়া লইয়া দুর্গা বলিল—দাদা জিনিষপত্র সরাচ্ছে, কতকগুলা রাখতে গিয়েছে, আমি এ গুলা আগলে আছি।

—হড়পা বান এসেছে দেখতে দেখতে সব ডুবে যাবে। জিনিষের মায়া করে ওখানে আর থাকিস না—নেমে আয়।

দুর্গা ও-কথার জবাবই দিল না, সে প্রশ্ন করিল—সতীশ—রামু ছিদেম—যা'দিগে ডেকে নিয়ে গেলেন তারা ফিরল?

—হ্যাঁ ফিরেছে; তুই নেমে আয়।

হাসিয়া দুর্গা বলিল—আমার লেগে ভাবতে হবে না পণ্ডিত মশায়, আপনারা যান; জল আপনাদের কোমর ছাড়িয়ে উঠল।

এবার বিশ্বনাথ বলিল—নেমে এস দুর্গা—নেমে এস।

দুর্গা সলজ্জ মুখে চোখ নামাইয়া প্রত্যুত্তরে প্রশ্ন করিল—কামার বউ ফেরে নাই ঠাকুর মাশায়?

—না। কিন্তু তুমি আর থেকো না—নেমে এস।

ঘরখানার ওদিক হইতে কে এই সময় ডাকিল—দুগ্‌গা—দুগ্‌গা!

ব্যস্ত হইয়া দুর্গা এবার উঠিল—সাড়া দিল—যাই। তারপর দেবু ও বিশ্বনাথের দিকে চাহিয়া হাসিয়া বলিল—আপনারা যান পণ্ডিত মাশায়, ওই দাদা এসেছে, এইবার আমি যাব।

ভদ্র পল্লীর পথে জল অনেক কম, হাঁটুর নীচে অবধি ডুবিয়া যায়; কিন্তু জল অতি দ্রুতগতিতে বাড়িতেছে। ভদ্রপল্লীর ভিটাগুলি পথ অপেক্ষাও খানিকটা উঁচু জমির উপর অবস্থিত, পথ হইতে মাটির সিঁড়ি ভাঙিয়া উঠিতে হয়। ঘরগুলির মেঝে দাওয়া আরও খানিকটা উঁচু। সিঁড়িগুলা ডুবিয়াছে—এইবার উঠানে জল ঢুকিবে। গ্রামের মধ্যে প্রচণ্ড কলরব উঠিতেছে। স্ত্রী-পুত্র, গরু বাছুর, জিনিষপত্র লইয়া ভদ্র গৃহস্থেরা বিব্রত হইয়া পড়িয়াছে। ওই বাউড়ী হাড়ি ডোম মুচিদের মত সংসার বন্যা ঝুড়ির মধ্যে পুরিয়া বাহির হইবার উপায় নাই। গ্রামের চণ্ডীমণ্ডপটা মেয়েছেলেতে ভরিয়া গেছে।

গ্রামের নূতন জমিদার শ্রীহরি ঘোষ চাদর গায়ে দিয়া সকলের তদ্বির করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। মিষ্ট ভাষায় সকলকে আহ্বান করিয়া অভয় দিয়া বলিতেছে—ভয় কি—চণ্ডীমণ্ডপ রয়েছে, আমার বাড়ী রয়েছে, সমস্ত আমি খুলে দিচ্ছি।

শ্রীহরি ঘোষের এই আহ্বানের মধ্যে একবিন্দু কৃত্রিমতা নাই, কপটতা নাই। গ্রামের এতগুলি লোক যখন আকস্মিক বিপর্য্যয়ে ধন-প্রাণ লইয়া বিপন্ন—তখন সে অকপট দয়াতেই দয়ার্দ্র হইয়া উঠিল। সে তাহার নিজের বাড়ীর ঘর দুয়ারও খুলিয়া দিতে সংকল্প করিল। শ্রীহরির বাপের আমল হইতেই তাহাদের অবস্থা ভাল—ঘর দুয়ার তৈয়ারী করিবার সময়েই বন্যার বিপদ প্রতিরোধের ব্যবস্থা করিয়াই ঘর তৈয়ারী করা হইয়াছে। প্রচুর মাটী ফেলিয়া উঁচু ভিটাকে আরও উঁচু করিয়া তাহার উপরে আরও একবুক দাওয়া উঁচু শ্রীহরির ঘর। ইদানীং শ্রীহরি আবার ঘরগুলির ভিতের গায়ে পাকা দেওয়াল গাঁথাইয়া মজবুদ করিয়াছে, দাওয়া মেঝে এমন কি উঠান পর্য্যন্ত সিমেন্ট দিয়া বাঁধানো হইয়াছে। নূতন বৈঠকখানা ঘরখানার দাওয়া প্রায় একতলার সমান উঁচু। সম্প্রতি ঘোষ একটা প্রকাণ্ড গোয়াল ঘর তৈয়ারী করাইয়াছে—তাহার উপরেও কোঠা করিয়া দোতালা করিয়াছে—সেখানেও বহু লোকের স্থান হইবে, সে ঘরখানার ভিতও বাঁধানো। তাহার এত স্থান থাকিতে গ্রামের লোকগুলি বিপন্ন হইবে?

শ্রীহরির মা—ইদানীং শ্রীহরির গাম্ভীর্য্য আভিজাত্য দেখিয়া পূর্ব্বের মত গালিগালাজ চীৎকার করিতে সাহস পায় না এবং সে নিজেও যেন অনেকটা পাল্টাইয়া গেছে, মান-মর্য্যাদা বোধে সে-ও অনেকটা সচেতন হইয়া উঠিয়াছে; তবুও এ ক্ষেত্রে শ্রীহরির সংকল্প শুনিয়া সে প্রতিবাদ করিয়াছিল—না বাবা হরি, তা হবে না—তোমাকে আমি ও করতে দোব না। তা হলে আমি মাথা খুঁড়ে মরব।

শ্রীহরির তখন বাদ প্রতিবাদ করিবার সময় ছিল না, এতগুলি লোকের আশ্রয়ের ব্যবস্থা করিতে হইবে, তা ছাড়া—গোপন মনে সে আরও ভাবিতেছিল—ইহাদের আহারের ব্যবস্থার কথা। যাহাদের আশ্রয় দিবে—তাহাদের আহার্য্যের ব্যবস্থা না-করাটা কি তাহার মত লোকের পক্ষে শোভন হইবে? মায়ের কথার উত্তরে সংক্ষেপে সে বলিল—ছিঃ মা।

—ছিঃ কেনে বাবা, কিসের ছিঃ? তোমাকে ধ্বংস করতে যারা ধম্মঘট করেছে—তাদিগে বাঁচাতে তোমার কিসের দায়, কিসের গরজ?

শ্রীহরি হাসিল, কোনও উত্তর দিল না। শ্রীহরির-মা ছেলের সেই হাসি দেখিয়াই চুপ করিল—সন্তুষ্ট হইয়াই চুপ করিল, পুত্র-গৌরবে সে নিজেকে গৌরবান্বিত বোধ করিল। মনে মনে

স্পষ্ট অনুভব করিল—যেন ভগবানের দয়া আশীর্ব্বাদ তাহার পুত্র-পৌত্র, তাহার পরিপূর্ণ সম্পদ সংসারের উপর নামিয়া আসিয়া—আরও সমৃদ্ধ করিয়া তুলিতেছে।

শ্রীহরি নিজে আসিয়া চণ্ডীমণ্ডপে দাঁড়াইয়া সকলকে মিষ্ট-ভাষায় আহ্বান জানাইল, অভয় দিল—ভয় কি—চণ্ডীমণ্ডপ রয়েছে, আমার বাড়ী ঘর রয়েছে, সমস্ত খুলে দিচ্ছি আমি।

দেবনাথ ও বিশ্বনাথ চণ্ডীমণ্ডপের ভিটার নীচের পথের জল ভাঙিয়া যাইতেছিল। চণ্ডীমণ্ডপের উপরে লোকজনের কলরব শুনিয়া—ভিড় দেখিয়া দাঁড়াইল। শ্রীহরি সম্মুখেই ছিল, সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াই সে বলিল—বাঁধ রাখতে পারলে না পণ্ডিত?

দেবনাথ যেন দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল—বলিল—না। কিন্তু সে দায়িত্ব তো জমিদারের। বাঁধ মেরামতের ভার জমিদারের; সময়ে মেরামত করলে বাঁধ আজ ভাঙতো না। তা ছাড়া কই আজও তো তোমার একটা লোকও যায়নি বাঁধ রাখতে।

শ্রীহরি মুখে কথার জবাব না দিয়া ভ্রূকুটি করিয়া দেবুর দিকে চাহিল। তারপর ধীরে ধীরে আত্মসম্বরণ করিয়া দেবুকে উপেক্ষা করিয়াই সবিনয়ে হেঁট হইয়া বিশ্বনাথকে প্রণাম করিয়া বলিল—প্রণাম! আপনিও গিয়েছিলেন না কি বাঁধের ওখানে?

বিশ্বনাথ বলিল—হ্যাঁ।

শ্রীহরি বলিল—আমি আর যেতে পারি নি। কতকগুলো পুকুরের মুখের বাঁধ ভেঙে জল বেরিয়ে যাচ্ছিল—মাছ আছে প্রচুর, সেই বাঁধগুলো মেরামত করাতে হ'ল। তা' ছাড়া যে বন্যা এসেছে এবার, বাঁধ ভাল থাকলেও সে আটকানো যেত না। আর বাঁধের অবস্থা যে খারাপ, সে কথা প্রজারা কেউ আমাকে জানায়ও নি। না-জানালে কি ক'রে জানব বলুন।

বিশ্বনাথের পরিবর্ত্তে উত্তর দিল দেবু ঘোষ—প্রজাদের অন্যায় বটে। জমিদারের কর্ত্তব্য জমিদারকে স্মরণ করিয়ে দিতে হ'ত।

শ্রীহরি বিশ্বনাথকেই বলিল—আপনার ঠাকুরদাদা আমাদের ঠাকুর মশায় আমাকে ধর্ম্মঘটের ব্যাপারটা মিটমাট ক'রে নিতে আদেশ ক'রেছিলেন; আমি বলেছিলাম—আপনি যা' ক'রে দেবেন—আমি তাই মেনে নেবে। তা' আবার বলে পাঠিয়েছেন আমি ওতে নেই।

বিশ্বনাথ এবার হাসিয়া জবাব দিল—জানি সে কথা। ভালই ক'রেছেন তিনি। আমি প্রথমেই তাঁকে এর মধ্যে থাকতে বারণ করেছিলাম। রাজায় প্রজায় ধনীতে গরীবে ঝগড়া মেটে না, চিরকাল চলছে—চলবে, মধ্যে মধ্যে সাময়িক আপোষ হয় মাত্র।

—এ আপনি অন্যায় বলছেন বিশ্বনাথবাবু।

—না অন্যায় বলি নি, এই সত্য। আজ যে আপনি চাষী থেকে জমিদার হয়েছেন—সে আপনি জমিদারকে হিংসে করতেন বলেই হয়েছেন, গরীব যে বড়লোক হ'তে চেষ্টা করে সে কি শুধু পেট ভরাবার জন্যে? থাক্ গে—আমি এখন চলি।

জোড়হাত করিয়া শ্রীহরি বলিল—এই ভীষণভাবে ভিজেছেন, এইখানেই কাপড় চোপড় ছাড়ুন, একটু চা খান পণ্ডিত, তুমিও ব'স।

দেবু বলিল—না, আমাকে মাফ ক'র ছিরু, এখনও আমার অনেক কাজ। গ্রামের লোকের কে-কোথায় থাকল—

হাসিয়া শ্রীহরি বলিল—সব এইখানে আসছে পণ্ডিত, আমি সকলকে ব'লে পাঠিয়েছি।

—সবাই আসবে না।

—বেশ, ব'সে দেখ। না কি গো ঠাকুরমশায়?

—অন্ততঃ আমি আসব না। আমি চললাম। বিশুভাই থাকবে না কি?

বিশ্বনাথ নমস্কার করিয়া শ্রীহরিকে বলিল—আচ্ছা আমিও তাহ'লে আসি।

—না-না, তা' হ'বে না। আপনি আমাদের মাথার মণি, ঠাকুর মশায়ের নাতি, দেবুর জন্যে আপনি আমাকে বঞ্চিত করবেন—তা' হবে না। তা' হ'লে আপনার অধর্ম্ম হবে।

—আমার ধর্ম্মজ্ঞানটা একটু আলাদা ধরণের ঘোষ মশায়। বিশ্বনাথ হাসিল। তারপর আবার বলিল—দেবু আমার বন্ধু; তা' ছাড়া এই প্রজা-ধর্ম্মঘটে আমিও প্রজাদের সঙ্গে রয়েছি, সুতরাং আমার পায়ের ধুলোয় আপনার কল্যাণ বিশেষ হবে না। আমি চলি।

দেবু চণ্ডীমণ্ডপ হইতে পূর্ব্বেই পথে নামিয়াছিল, বিশ্বনাথ নামিয়া আসিয়া তাহার সঙ্গ ধরিল। শ্রীহরি পিছন পিছন আসিয়া চণ্ডীমণ্ডপের শেষপ্রান্তে দাঁড়াইয়া বলিল—আর একটা কথা বিশ্বনাথবাবু।

—বলুন।

—অনিরুদ্ধ স্বর্ণকারের স্ত্রীর কোন সন্ধান পেলেন?

—না।

অত্যন্ত বিনয় করিয়াও বীভৎস হাসি হাসিয়া শ্রীহরি বলিল—ব্যস্ত হবেন না তার জন্যে। সে আমার বাড়ীতে আছে।

—আপনার বাড়ীতে?

—হ্যাঁ। আমার বাড়ীতে। সেদিন সেই বর্ষাবাদলে ভিজে হাঁপাতে হাঁপাতে আমার বাড়ীতে এল, তখন প্রায় এগারটা। বলে—আমাকে ঝি রাখবেন? আমি খেটে খাব, কারু দয়ার ভাত খেতে পারব না। আপনার ছেলে মানুষ-করব আমি—বলিয়া আবার সেই হাসি হাসিতে হাসিতে বলিল—আমার বাড়ীতেই রয়েছে। আমার আর খবর দিতে মনে ছিল না। হঠাৎ মনে পড়ল—আপনাকে দেখে। আমার বাড়ীতে এক বুড়ী মা—ছেলে নিয়ে কষ্ট, তা থাক—ছেলেদের মানুষ করুক—তাদের মায়ের মতই থাক। আবার সে হাসিল।

বিশ্বনাথ ও দেবুর পাশ দিয়াই একটি পরিবার আসিয়া চণ্ডীমণ্ডপে উঠিল; শ্রীহরি সবিনয়ে তাহাদের আহ্বান করিয়া বলিল—মেয়েছেলেদের বাড়ীর ভেতরে পাঠিয়ে দিন—আমরা পুরুষরা সব—এই চণ্ডীমণ্ডপে গোলমাল ক'রে কাটিয়ে দোব।

কিছুদূর আসিয়া দেবু একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—অনিরুদ্ধ ফিরে এসে বউটাকে খুন করবে—নয়তো নিজে খুন হবে, আত্মহত্যে করবে।

পিছনে জলের আলোড়ন শব্দ শুনিয়া দুইজনেই পিছন ফিরিয়া চাহিল, দেখিল, একটা তক্তাপোষকে ভাসাইয়া তাহারই উপর রাজ্যের জিনিষপত্র চাপাইয়া বন্যার জলে ঠেলিয়া লইয়া

যাইতেছে দুর্গা ও পাতু। জিনিষপত্রের মধ্যে দুইটা ছাগলও দাঁড়াইয়া আছে। সপসপে ভিজা কাপড়ের আঁট-সাঁট পরিবেষ্টনীর মধ্যে দুর্গার দেহখানির সকল রূপ সুপরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। দুর্গা টুপ করিয়া বন্যার জলে আকণ্ঠ নিমজ্জিত করিয়া হাসিয়া বলিল—মরি নাই পণ্ডিত মশায়।

পণ্ডিত হাসিয়া বলিল—এ যে রাজ্যের জিনিষ চাপিয়েছিস রে। দেখিস্ কিছু পড়ে না যায়। ছাগলদুটো নড়ে চড়ে ফেলে না দেয়।

দুর্গা ঝঙ্কার দিয়া উঠিল—দেখুন কেনে—আসবার সময় বলি পাড়াটা ঘুরে দেখি—কেউ যদি কোথাও আটকিয়ে থাকে। তা' দেখি—কোন হতচ্ছাড়ার ছাগল ভাঙা পাঁচিলের ওপর দাঁড়িয়ে আছে। কেষ্টের জীব, গরীবের ধন—মলেই তো যাবে, তাই নিয়ে এলাম।

বিশ্বনাথ এখনও ভাবিতেছিল—পদ্মের কথা। দুর্গা বলিল—ঠাকুর মাশায়ের সাধের বিপদ দেখ দেখি, দিব্যি ঘরে শুকনোয় ব'সে বউ-ঠাকরুণের সঙ্গে গল্প করবে, না এই বানের জলে—ভিজে সারা! যান আপনি বাড়ী যান। বউঠাকরুণ কত ভাবছেন।

বিশ্বনাথ বলিল—আমাকে বলছ?

দুর্গা খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল।

দেবু বলিল—চল—চল, ষষ্ঠীতলায় আমরাও যাচ্ছি। দেখি—খাবার দাবার কি যোগাড় করতে পারি!

দুর্গা বলিল—ষষ্ঠীতলা থেকে আমরা চললাম।

—কোথায়? সবিস্ময়ে দেবু প্রশ্ন করিল।

—জংসনে, কলে খাটব, পাকা ঘরে থাকব। জলে ডুবে, আগুনে পুড়ে, পেটে না খেয়ে থাকব কেনে কিসের লেগে? আমাদের সব ঠিক হয়ে গিয়েছে।

—ঠিক হয়ে গিয়েছে?

পাতু হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল—ভগমান থাকতে দিলে না—পণ্ডিত মাশায়, ভগমান থাকতে দিলে না। পিত্তি-পুরুষের ভিটে—। তাহারা চলিয়া গেল।

(ক্রমশঃ)

এবার এসো নাকো—

শ্রীদেবনারায়ণ গুপ্ত

মাগো তুমি এবার এসো নাকো—
যেমন আছ; তেম্‌নি দূরে থাকো।

এবার ডামাডোলের বাজার
পথের বিপদ হাজার হাজার
গোলাগুলি উড়্‌ছে—লাখো লাখো;
মাগো তুমি এবার এসো নাকো—।

খড়্গ পাশের যুদ্ধ নহে,
বাতাসে আজ অগ্নি বহে—
তাইতে বলি: দূরেই সরে থাকো।
মাগো তুমি এবার এসো নাকো;—

কাঁদুনে সে গ্যাসের ধোঁয়ায়
দু'চোখ বেয়ে জল ঝরে হায়!
এই বিপদে, তোমার আসা উচিৎ হবে নাকো
মাগো! তুমি এবার দূরে থাকো—।

অন্তরীক্ষে, জলে, স্থলে
কেবল গোলাগুলি চলে
পাঁজীর পাতা পুড়িয়ে দিয়ে, চুপ্‌টী বসে থাকো।
মাগো! তোমার আস্‌তে হ'বে নাকো।

অর্থহীনের দেশে এবার
লক্ষ্মী তোমার কয়বে কি আর—
বাণীর ঘরেও—ঝুল্‌ছে তালা লাখো।
সবার ছুটী; আস্‌তে হবে নাকো।

তোমার ছেলের সিদ্ধি-যোগে
লোকে বেকার, রোগে ভোগে
মাগো এবার সপরিবার দূরেই সরে থাকো।
অপযশের ভাগ্যি নিয়ে আস্‌তে হবে নাকো;

কেশরী সে কেশর নেড়ে
যদি-ই বা চায় আস্‌তে তেড়ে
রক্ষা আইন আছে এবার, রক্ষা পাবে নাকো
মাগো তারে বুঝিয়ে তুমি, এবার ধরে রাখো।

ময়ুর ছেড়ে, ধনুক ফেলে—
এ, আর, পি-র কাজ শিখ্‌তে এলে
চাকরী দেওয়া কার্ত্তিকেরে শক্ত হবে নাকো—
পাঠিয়ো তারে; এবার না হয় তোমরা দূরে থাকো।

পরীক্ষা

শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ ঘোষ

(১১)

দপ্ করিয়া হঠাৎ আলো নিভিয়া গেলে ঘরের অন্ধকার যেমন ভয়ানক কালো হইয়া উঠে, বাড়ির দরজায় পা দিয়া আমার মনের ভিতরে তেমনি ভয়াবহ একটা গভীরতা ফুটিয়া উঠিল। কান্নাকাটির আওয়াজ কেন? যাক, তাহা হইলে মণীষাই মরিয়াছে, এ তো মা'র গলার কান্না! আমাকে শিক্ষা দিতেই কি সে আগে মরিল, না আমার মরার কল্পনাকে বিদ্রূপ করিল।

দরজার কাছে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া হঠাৎ যেন মণীষারই কথা শুনিতে পাইলাম। বলিতেছে—মা, একটু চুপ করুন, উনি এখুনি এসে পড়বেন ডাক্তার নিয়ে।—একি! আমি কি পাগল হইয়া গিয়াছি। তাড়াতাড়ি ঘরে আসিলাম। পায়ের শব্দে মণীষা বাহিরে আসিয়া বলিল, শিগ্‌গির একবার বিষ্ণু ঠাকুরপোর কাছে যাও, তাঁকে এক্ষুণি নিয়ে এসো, মার ভীষণ যন্ত্রণা হোচ্চে, চোখে-মাথায়।

দুইটা টাকা আমার হাতে দিয়া মণীষা বলিল, ট্রামে বাসে যেও, আসবার সময়ে ট্যাক্সিতে এসো, নয়তো দেরী হবে!

দরজার কাছে আসিয়া মনে পড়িল—কোথায় যাইতে হইবে এবং কি জন্য যাইতে হইবে। মণীষাকে জিজ্ঞাসা করিতে আসিলাম।

বলিল, বিষ্ণু দত্ত, ডাক্তার, তোমার বন্ধু, দেরী কোরো না।

বাসে বসিয়া বসিয়া মনে হইল বোধ হয় স্পীডের একটা নেশা লাগিয়াছে। মনটা নাড়াচাড়া দিয়া উঠিল, যেন একটু খুসী খুসী ভাব।

নিজের কথা ভাবিয়া অবাক। মণীষা মরিয়াছে ভাবিয়া আর যদি তখন বাড়ি নাই ঢুকিতাম। আবার টো টো করিয়া শেষ রাত্তিরে বাড়ি ফিরিতাম, কি হইত। হয়ত, মা মরিয়াই যাইতেন, একটু চিকিৎসার অভাবে। ছিঃ ছিঃ, ধিক্কার বোধ হইল।

ডাক্তারখানায় ঢুকিয়া ভাগ্যক্রমে বিষ্ণুর সাক্ষাৎ পাওয়া গেল।

বলিলাম, এই বিষ্ণু, তোর কাছে চাবুক টাবুক আছে, খুব ঘা কতক লাগাতে পারিস, এমন মারবি যেন অজ্ঞান হোয়ে যাই। অনেক বাঁদোর দেখেচি, কিন্তু আমার মতন এমন আর একটিও দেখলুম না, জানিস।

গম্ভীরভাবে বিষ্ণু বলিল, কে আপনি, কি চান?

একটু থতমত খাইয়া গেলাম। নিজের জামাকাপড়ের দিকে একবার দেখিয়া লইলাম। একগাল দাড়ি এবং এলোমেলো রুক্ষ চুলের উপর দিয়া একবার হাত বুলাইয়া লইলাম। পরে একটু ইতস্তত করিয়া বলিলাম, চিনতে পারলি না, আমি নিশীথ। তা, কি কোরে আর চিনবি, চাকরি গেছে, খেতে না পেয়ে, ভাবনায় চিন্তায়, রাতদিন রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্চি পাগলের মতন—আর মতন কেন, সত্যিই তো পাগল হোয়ে গেছি, জানিস—বলিয়া, হোঃ হোঃ শব্দে বহুদিন পরে প্রাণখোলা হাসি একদমে খানিকটা হাসিয়া লইলাম। পরে বলিলাম, নে, আমার চিকিৎসে পরে করিস, এখন একবার এক্ষুণি চল, মার বড় অসুখ। তোর কাজের বেশী ক্ষতি হবে না।

বিষ্ণু হাতের ঘড়িটা একবার দেখিয়া লইল এবং পরক্ষণে উঠিয়া গিয়া সামনে একখানা ঝকঝকে মোটরে উঠিল। চাকরে ওষুধের বাক্স প্রভৃতি তুলিয়া দিল।

ডাক্তার চলিয়া যায় দেখিয়া আমি তাড়াতাড়ি তাহার গাড়ির কাছে আসিয়া অত্যন্ত অনুনয় করিয়া বলিলাম, লক্ষ্মীটি ভাই চল, ভিজিট না হয় দোবো রে।

বিষ্ণু আস্তে আস্তে বলিল, বাজে বকিস নি, গাড়ীতে এসে ওঠ; তোদের বাড়ীতেই যাচ্চি। ব্যাস ওই পর্য্যন্ত। সমস্ত রাস্তা সে আর একটি কথাও কহিল না। শুধু একবার বলিল, রাস্তাটা ঠিক বোলে দে।

* * * *

চোখে কয়েক ফোঁটা ওষুধ ও একটা ইন্‌জেক্‌সন্ দিবার অল্পক্ষণ পরে মা শান্তভাবে ঘুমাইয়া পড়িলেন।

বিষ্ণু এ ঘরে আসিয়া বসিল। জিজ্ঞাসা করিলাম, কি দেখলি?

রাগতস্বরে বলিল, তোমার মাথা। এতোদিন কি গাঁজা খাচ্ছিলে? ষ্টুপিড! ছানি পেকে একেবারে পাথর। অন্ধ হবার জোগাড় আর কি।

বলিলাম, তাহলে উপায়?

মণীষা বাধা দিয়া বলিল, ছানি কাটাতে হবে, আর কি!

বিষ্ণু বলিল, এই সপ্তা'র মধ্যেই, দেরি করা চলবে না।

বলিলাম, এ সব কথা জানি, আমি জিগ্যেস কোরচি খরচের কথা।

বিষ্ণু বলিল, প্রায় দুমাস একটা বেড্ নিলে—এই তিনশ' সাড়ে তিন শ' আন্দাজ।

বলিলাম, তা তুই তো বড়লোক হোয়েছিস, মোটর কিনেছিস, টাকাটা আমাকে আপাততঃ ধার দে।

মণীষা বাধা দিয়া বলিল, আছে আছে, আমার কাছে, তোমাকে ভাবতে হবে না।

ম্লান হাসিতে জিজ্ঞাসা করিলাম, যে ক'খানা গয়না আছে, তাতে তিন চারশ টাকা পাওয়া যাবে?

মণীষা বিষ্ণুকে বলিল, ঠাকুরপো কতোদিন পরে তুমি এলে, কিন্তু ঘরে কিছু নেই যে একটু জল খেতে দিই। দোকান থেকে খাবার আনলে তুমি খাবে?

বিষ্ণু বলিল, বৌদি—জানোই তো বাজারের খাবার খাই না। কিন্তু তোমার একি দুরবস্থা!

হাসিয়া বলিলাম, কাপড়খানা ময়লা তাই বোলছিস?

মণীষার দিকে ফিরিয়া স্মিত হাসিতে বলিলাম, এ তোমার অন্যায় মন্নু, সাদা শাড়ী আর নাই বা থাকলো, বেনারসী, রেশমের শাড়িগুলো তো তোলা রয়েচে, তাই একখানা আজ পরতে পারো নি, জানতে তো, একজন বিশিষ্ট ভদ্রলোক আসছেন!

মণীষা বাধা দিয়া বলিল, আহা, কি বোলচো, ঠাকুরপো কখনো তা বলে নি।

বলিলাম, মন্নু, জানি তা। তার উত্তরে বোলতে হয় আজ ক-মাস এক বেলা পেট ভোরে শুধু ভাত, তাও খেতে পাও নি। জানিস ভাই বিষ্ণু, ওরা কেউ খেতে পায় নি, দু'টিখানি ভাত তাও জোগাড় কোরতে পারছি না—এমন হতভাগ্য আমি। জানিস, এদের সব তিলে তিলে আমি ক্ষয় কোরে আনছি। ভগবান!

গলাটা ভার হইয়া আসিল। সামলাইয়া লইয়া বলিলাম, জানো মন্নু, আজ তোমার বৈধব্যের ফাঁড়া কেটে গেছে। বিষ কিনতে বেরিয়েছিলুম। এ যন্ত্রণা আর সহ্য হচ্ছিল না। কিন্তু কেন মরলুম না সে এক আশ্চর্য্য ঘটনা, অন্য সময়ে বোলবো।—আজ সাত রাত্তির ঘুমোইনি, দালানে পাগোলের মতন পায়চারি কোরে বেড়িয়েছি—

বাধা দিয়া বিষ্ণু বলিল, তা আমার কথা বুঝি মনেই পোড়ল না।

বলিলাম, সত্যিই পড়ে নি ভাই। এটা খুব আশ্চর্য্য বটে। কিন্তু এই তো আমার জীবনের ট্রাজেডি। ঠিক সময়ে ঠিক কথাটি, উপযুক্ত যুক্তিটি যদি মনে পড়বে, তাহলে এতো পস্তাবো কেন।

বিষ্ণু স্তম্ভিতের মতন চাহিয়া আছে দেখিয়া বোধহয় মণীষা প্রসঙ্গটা বদল করিতে চাহিল। বলিল, বৌ কেমন আছে, ঠাকুরপো?

বিষ্ণু যেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। একটা নিশ্বাস ফেলিয়া, একটা আলিস্যি ভাঙিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। বলিল, সে রোদ্দুরে তে-কোণা কাচের মতন কেবল রং বেরং ছড়াচ্ছে, কি আর কোরবে। জামা, কাপড়, পর্দ্দা, ছবি, গান, বাজনা আর হাসি গল্প। আমিই না শেষে কোনদিন ছিটে-কোকিল হোয়ে যাই। প্রাণখোলা একটা হাসির হর্‌রা উঠিল। আঃ হাসিতে কি মিষ্টত্ব!

গাড়িতে উঠিয়া বিষ্ণু বলিল, সন্ধ্যের পরে একবার আসবো, থাকিস।

১২

বিষ্ণু আসিল ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যেই। মুখে একটা সিগারেট। চুলগুলো এলোমেলো। ম্লান হাসিয়া বলিল, চল্ জ্যাঠাইমাকে নিয়ে যাই। সব ব্যবস্থা করে রেখে এসেছি।

অবাক হইয়া গেলাম। চিরকাল এই বিষ্ণুকে প্র্যাক্‌টিক্যাল বলিয়া কতো ঠাট্টা করিয়া আসিয়াছি, বলিয়াছি, তোরা অনুসারক জাত, আমরা থিওরি বাতলাবো তোরা পালন করবি। তর্ক করিয়া ও প্রায় আমাদের হারাইয়াই আসিয়াছে, বলিয়াছে, পৃথিবী ওই তোদের থিওরি আর উপদেশে স্যাচুরেটেড্, আপাতত মানুষে যদি আর অন্ততঃ পঞ্চাশ বছর থিওরি উদ্ভাবন করা বন্ধ করে তো পৃথিবীর তিলমাত্র ক্ষতি হবে না। যা আপাতত আছে তার সিকির সিকি কাজ করতে পারলে পৃথিবী সুবোধ বালক হোয়ে যাবে। কিন্তু তাহাকে মেটিরিয়ালিষ্ট, ম্যাটার-অফ-ফ্যাক্ট্ প্রভৃতি বলিতে ছাড়ি নাই। কিন্তু এরাই যথার্থ কাজের। নিজের বুদ্ধি দিয়া যতটুকু বোঝে, কাজে খাটাইতে চেষ্টা করে এবং এই অভ্যাসের ফলে যে কাজেই হাত দেয়, কেমন সুচারু সুন্দরভাবে করে। আর আমার মতন লোক, বস্তুত পৃথিবীর জঞ্জাল। না আছে ভাবিবার অসাধারণ ক্ষমতা, যে ক্ষমতায় চিন্তাবীরের জন্ম, না আছে কর্ম্মদক্ষতা। আমরা অল্পমাত্র বুঝিতে শিখিয়া পৃথিবীর আদ্যশ্রাদ্ধ করিতে বসি, আর তার ইন্ধন হয় চা ও সিগারেট। বিষ্ণুর ওপর একটা শ্রদ্ধা হইল! আমরা তর্ক করিতাম, হৈ হৈ করিতাম, আর ও চুপ করিয়া বসিয়া থাকিত! আমরা ভালো করিয়া পরীক্ষায় পাস হইয়া গিয়াছি, আর ও সাধারণ-ভাবে পাশ করিয়াছে। অথচ জীবনের পরীক্ষায় ওই ভালো করিয়া পাস হইল, আমার মতন ভালো ছেলেই ঠেকিয়া গেল।

মণীষাকে বিষ্ণু বলিল, জানো বৌদি, মা তো আমাকে মারতে এলেন! বললেন, তোরই তো দোষ, তুই খোঁজখবর নিসনা কারো। বিয়ে কোরে অবধি সব ভুলেচিস, ওরে বাপ্ রে, সে কি মুখের তোড়!

মণীষা বলিল, কাকীমার সঙ্গে আপনি বড় ঝগড়া করেন।

বলিলাম, আমার কিন্তু বেশ লাগে, ওদের মা-পোয়ে ঝগড়া।

বিষ্ণু হাসিতে হাসিতে বলিল, শোন তারপরে কি হোলো। খুব মুখটুখ গম্ভীর কোরে বোললুম—কি বোললে? বৌ বৌ কোরে পাগল হোয়েছি, বেশ, এই চুনের ঘরে দাঁড়িয়ে তোমাকে সামনে রেখে দিব্যি করচি, আজ থেকে আর বৌয়ের মুখ দেখবো না। মা তো একেবারে তেলেবেগুনে জ্বলে উঠ্‌লেন। বোললেন—মুখপোড়া, হতভাগা ছেলে, আমি তাই বোলেছি, তুমি মেথর মুদ্দোফরাসের মড়া ঘেঁটে ঘেঁটে জাতধর্ম্ম খুইয়েছো, বোললুম তখন, গুরুদেব এসেছেন, মন্তর নে। আমি বোললুম—মন্তর তো নিয়েছি। মা অবাক হোয়ে আমার দিকে চেয়ে বোললেন—কখন নিলি। একটু হেসে বোললুম—তুমি তো আমার গুরু, আর এই যে এইমাত্র আমাকে দিয়ে শপথ করিয়ে নিলে, বৌয়ের মুখ দেখবো না, তোমার অনুমতি বিনে। মা একেবারে অবাক! চেঁচিয়ে ডাকলেন—ও বৌমা, শিগ্‌গির এদিকে এসো তো একবার। ওমা, এ কি বলে গো, আমি নাকি তোমার মুখ দেখতে বারণ কোরে দিয়েচি, বাবা—এটা খুনে ছেলে। বৌকে দরজার কাছে দেখে আমি বোললুম—হয় একগলা ঘোমটা দিয়ে ঘরে আসা হোক, না হয় পেছন ফিরে। তা নৈলে, এ ঘরের কাজের দিকে চোখ পড়ে যাবে। মার এখন কুটনো কোটা রান্নার জোগাড় কোরে দেবার মতন ঢের বয়েস রয়েচে। এসব কাজে হাত দিলে রং ময়লা হোয়ে যাবে, হাতপা ক্ষয়ে যাবে। তার চেয়ে ইজিচেয়ারে বসে একখানা উপন্যাস পড়লে বুদ্ধিটা সাফ হবে। বৌ বোললে—দেখচেন মা, আমি সকালে কুটনো কুটে দিলুম না। আপনিই তো আমাকে বললেন, ছবিগুলো নামিয়ে পরিষ্কার কোরতে। মা কুটনো কোটা বন্ধ করে হতভম্বভাবে আমার দিকে চেয়েছিলেন। বললেন—বাবা, তুমি একটি রায়-বাঘিনী ছেলে, কার মাথা খাই কার মাথা খাই কোরে বেড়াচ্চো। এতো হাড়-জ্বালানে কথা শিখলি কোথায়! এতক্ষণ আমার সঙ্গে হোলো, আবার বৌটাকে

নিয়ে পড়লেন। কেন ও কি কোরেচে, আ গ্যালো যা! ব্যাপারটা প্রায় শেষ হোয়ে আসছে দেখে বললুম—বেশ বাবা, শাশুড়ি বৌয়ে আমোদ-আহ্লাদ করো, আমি বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাই। মা চটে আগুন, বোল্লেন—তোর হ্যাক্‌রা রাখ বাপু, যা বলতে এসেছিলি বল, দিদির কি ব্যবস্থা করলি।

মণীষা তো হাসিয়া আকুল। বলিল—আপনি বড় ঝগড়াটে।

আমার মনে হইল যেন একটি সুন্দর কবিতা পড়িলাম।

দরজার কাছে গাড়ির আওয়াজে বিষ্ণু উঠিয়া দাঁড়াইল। বলিল—মা এলেন বোধ হয়।

আমাকে দেখিয়া কাকীমা ঈষৎ ঘোমটা টানিয়া দিলেন। হাসি আসিল। প্রণাম করিতে ঘোমটা সরাইয়া কি একটা অস্ফুট-ভাবে বলিলেন, বুঝিলাম না। বিষ্ণুর সঙ্গে চুপি চুপি কি কথাবার্ত্তা হইল। পরে সকলে মিলিয়া মাকে বোঝান হইল, ছানি কাটা আজকাল অত্যন্ত সহজ। আজ এখুনি হাসপাতালে যাইতে হইবে এবং দুই একদিন পরে অস্ত্র করা হইবে। মোটামুটিভাবে মনে হইল, আবার সব দেখিতে পাইবেন শুনিয়া যেন মার মনে একটু আনন্দ হইয়াছে।

মাকে গাড়িতে তুলিয়া দিয়া কাকীমা বিষ্ণুকে বলিলেন—হাসপাতালে পৌঁছে গাড়ি এখানে পাঠিয়ে দিবি বৌমাকে নিয়ে যাবো, অনেক বেলা হোয়ে গেছে। আর তোরা একখানা রিক্‌সা কোরে যাস, দেরি করিস নি।

বিষ্ণু হাসিয়া মণীষাকে বলিল—দেখলে তো বৌদি, মার একচোখোমি, ছেলেরা হোলো পর, আর যত আপন হোলেন এই পরের মেয়েগুলি। তবু রক্ষে, ভাগ্যিস্ বলেননি বাসে যাস, তাহলে অন্তত দশ মিনিট হাঁটতে হোতো।

১৩

দুই তিনটা দিন কোথা দিয়া কেমন করিয়া যে কাটিয়া গেল বুঝিতেই পারিলাম না। মার চোখের ছানি ভালোভাবে কাটা হইয়া গিয়াছে। স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়িলাম। বিষ্ণুর বাড়িতে সস্ত্রীক এই কয়দিনের আতিথ্য, আর কাকীমার নিরঙ্কুশ আত্মীয়তা জীবনে যেন মধুর প্রলেপ লেপিয়া দিল। বিষ্ণুর পয়সায় চুল কাটিলাম, দাড়ি কামাইলাম, তাহার সাবান মাখিলাম, তাহার জামা কাপড় পরিলাম। পরিচ্ছন্নতায় গায়ে যেন বসন্তের বাতাস লাগিল। পরিশেষে কাকীমার আদর যত্নে ভালোমন্দ পাঁচ রকম চাখিয়া খাইলাম, বিষ্ণুর টিন খালি করিয়া সিগারেট পোড়াইলাম; আর সময় অসময়ে, বিছানায়, শোফায় নিদ্রাদেবীর সাধনা করিলাম। মন যখন শান্ত হইয়াছে, পরিতৃপ্তির খাওয়ায় ও বিশ্রামে যখন মাথার মধ্যে নোতুন তাজা রক্ত স্রোতের প্রবাহ বহিতেছে তখন মনে পড়িল সভ্যতা ভদ্রতা ইজ্জতের কথা, আমার নিরুপায় অবস্থার কথা। অভাবে অভাবে মানুষের কি দশাই হয়। সমাজের যারা চোর শ্রেণী, অবিশ্বাসী, শঠ, তাদের সত্যিকার জীবনের মূলে হয়ত এই দারিদ্র্যই আছে! কিন্তু সমাজ সেই দিক হইতে ইহাদের বিচার করে না। যে চোর স্ত্রীপুত্রের ভরণপোষণের জন্য চুরি করে, তাহাকে জেলে আটক করা হয়, তাহার স্ত্রীপুত্রকে চোর কিম্বা ডাকাত করিবার জন্যই কি! আমিই হয়তো শেষ পর্য্যন্ত চোর হইয়া দাঁড়াইতাম। আর দাঁড়াইতাম কি, প্রায় তো হইয়াই গিয়াছিলাম। নিজের জিনিষ চুরি করিতাম, তারপরে মণীষার গয়নায় হাত পড়িত, শেষে অন্যত্র চেষ্টা যে না করিতাম তাহা কে বলিতে পারে।

মণীষা বলিল, এঁদের ঘাড়ে কতদিন চেপে থাকবো বলো।

বলিলাম, মণীষা, উপায় নেই! এখানে থাকতেই হবে যতদিন না কিছু একটা জোগাড় কোরছি। খাওয়া থাকার এই চিন্তা না থাকলে আমার মাথায় অন্তত বুদ্ধি জোগাবে না। তোমাকে অনেক কষ্ট দিয়েচি। কিন্তু ভেবে দেখো, খাওয়া পরার কষ্ট বড়ো, না বিষ্ণুর কাছে চিরজীবন কৃতজ্ঞ থাকার কষ্ট বড়ো।

কাকীমা ঘরে ঢুকিলেন। শেষের কথাটা তাঁহার কানে গিয়াছিল।

বলিলেন, ছিঃ বাবা কি বোলছো। তুমি কি আমার পর। তুমি আর বিষ্ণু চিরটাকাল একসঙ্গে মানুষ হোয়েছো। এবাড়ী ওবাড়ীর কি তফাৎ ছিলো বাবা। আর কৃতজ্ঞতার কথা বোলছো। বিষ্ণুই চিরদিন তোমাদের কাছে কৃতজ্ঞ থাকবে। তোমরা জানো না সেসব কথা। তোমার কাকা একবার অসুখে পড়লেন। প্রায় এক বছর শয্যাগত। উকিলের সামান্য পসারপ্রতিপত্তি সবই গেল। সংসার চলে না। তোমার বাবার চিকিৎসায় তিনি যে শুধু বাঁচলেন, তাই নয়, তাঁর টাকায় আমরা খেয়ে বাঁচলুম। তোমার কাকা তোমার বাবাকে কিছু টাকা দিতে গিয়েছিলেন, ধার শোধ বোলে। এই নিয়ে তিন মাস তিনি আর আমাদের মুখ দেখেন নি। শেষে আমরা গিয়ে তোমার মার কাছ থেকে টাকা ফিরিয়ে আনি, ক্ষমা চাই, তবে তিনি ঠাণ্ডা হন।

গল্পই হোক, আর সত্যই হোক, কথাটা শুনিয়া অবাক হইয়া গেলাম। ভাবিলাম, তাহা হইলে বিষ্ণুর বাড়িতে বসিয়া খাইবার অধিকার আছে। বলিলাম, কি বলছেন কাকীমা, আমরা কি তাই ভাবচি।

কাকীমা বলিলেন, কি জানি বাবা. তাঁরা ভালো ছিলেন, কি তোমাদের এই সঙ্কোচ ভালো, তা বুঝতে পারি না। তবে তুমি যে আমার ছেলে, সেইভাবেই চিরকাল ভেবে আসচি। এখন তোমরা যদি আঘাত দাও, সইতেই হবে, আর উপায় কি।

তাঁহার দুই চক্ষু সজল হইয়া উঠিল।

তাড়াতাড়ি বলিলাম—কাকীমা, আমি ভাবছি কি, এখনিই বেরিয়ে যাই। জিনিষপত্তোরগুলো গুছিয়ে নিয়ে আসি এখানে।

হঠাৎ দরজার কাছে বিষ্ণুর গলা পাইলাম। তাহার বৌ যেন-কাঁদিতেছে, আর কি বলিতেছে। বিষ্ণু বলিতেছে—তা তোমাদের যে বড়লোকের মত চাল, তাতে গরীব লোক খাপ খাওয়াবে কি কোরে।

আমি ত অবাক! মণীষা তাড়াতাড়ি দরজার দিকে আগাইয়া গেল। বিষ্ণু ঘরে ঢুকিয়া বলিল—কি রে, চল্লি নাকি?

বলিলাম—হ্যাঁ ভাই, জিনিষপত্তোরগুলো এখানে নিয়ে আসি, কাকীমার কাছে যা বকুনি খেলুম।

বিষ্ণু তেলে বেগুনে জলিয়া উঠিল। বলিল—মা, তোমার

বৌটি দেখ্‌ছি অত্যন্ত রসিকা হ'য়ে উঠেচেন এবং অভিনয়েও পাকা বোলতে হবে। কি কায়দা করেই চোখে জল এনে আমাকে আক্রমণ করলে, বোল্‌লে কিনা—এরা চলে যাচ্চে!

আমি শোধরাইবার চেষ্টা করিলাম। কিন্তু মণীষা বৌয়ের পক্ষ লইয়া বিষ্ণুকে কোণঠাসা করিবার চেষ্টা করিল। বলিল—বাবা, ঠাকুরপো তুমি ভাই ভারী ঝগড়াটে।

বিষ্ণুর পুরাতন দুর্ব্বলতা—মণীষার মুখের উপর কথা বলিতেই পারে না। বেচারি চুপ করিয়া গেল।

১৪

দিন দুপুর, কিন্তু যেন অত্যন্ত অসময়। ঘরের দরজা খুলিতে কয়েকটা ইঁদুর দৌড়াইয়া গেল, বিছানার উপরে একটা বিদ্‌ঘুটে বেড়াল শুইয়াছিল, সেটা জানলা টপ্‌কাইয়া চলিয়া গেল, গোটা-কতক আরশুলা অন্ধের মত এলোমেলোভাবে ঘরের মধ্যে উড়িতে লাগিল। কেমন যেন একটা অশুভ ভাব মনে হইল। একা থাকিলে হয়ত ভয় পাইয়া যাইতাম। কাজেই মণীষাকে ডাকিয়া তাড়াতাড়ি গোছগাছ করিয়া লইতে বলিলাম। বিপদ যখন আসিয়াই গিয়াছে, হাত দিয়া আর তাহাকে কিছু ঠেকাইয়া রাখিতে পারিব না। অতএব জট্‌ ছাড়াইতে গিয়া জট না পাকাইয়া ধীরে সুস্থে কিছু আলস্য উপভোগ করা যাক। বিশেষ করিয়া বিষ্ণুর বাড়িতে যখন আশ্রয় জুটিয়া গিয়াছে, তখন তো আমি রাজা। মনীষার হয়ত এমনভাবে পরাশ্রয়ে দিন কাটাইতে সঙ্কোচ বোধ হইবে। বেচারি যা দুঃখ পাইয়াছে, তার চেয়ে এ সঙ্কোচ, লজ্জা শতগুণে বাঞ্ছনীয়। ভুগুক কিছুদিন। তারপরে সূক্ষ্ম ও কোমল মনোবৃত্তির উপর মোটা চামড়ার প্রলেপ পড়িয়া যাইবে, আমি বাঁচিব, বেচারিকেও আর প্রতি মুহূর্ত্তের জন্য বুঝিতে হইবে না। সময় মত কথাটা মনীষাকে বুঝাইয়া দিতে হইবে।

জিনিষপত্র আমাদের এমন কিছুই ছিল না যা গুছাইয়া লইতে দুইজন লোকের অনেকক্ষণ লাগিতে পারে। তাহা ছাড়া মণীষা সুগৃহিণী। মুখ বুজিয়া কি আশ্চর্য্যভাবে একটার পর একটা কাজ করিয়া চলে, মনে হয়, ওর কাজ-করা বসিয়া বসিয়া দেখি। একটা আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটিয়া গেল। হঠাৎ বুঝিতে পারিলাম না, সত্যের আবির্ভাব, না ভাগ্যের বিদ্রূপ! মা যেখানে লক্ষ্মীর ঝাঁপি রাখিতেন, সেইখানকার অপরিসর জায়গায় এতো ধন কেমন করিয়া আসিল। ঘরের মেঝেতে একখানা মোহর সশব্দে বাজাইয়া দেখিলাম, আওয়াজটা সত্যই ধাতুর কি না। জানালার ধারে রোদের আলোয় আনিয়া নখ দিয়া চাঁচিয়া দেখিলাম। হাতে নাচাইয়া ভার আন্দাজ করিয়া দেখিলাম। একটা উত্তাপ মাথার ভিতর দিয়া সমস্ত শরীরের শিরা উপশিরাতে বিদ্যুৎবেগে নামা ওঠা সুরু করিল। হাত পা থরথর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। লক্ষ্মীর ঝাঁপি ও খুঁচি দুই হাতে আঁকড়াইয়া লইয়া মাটিতে বসিয়া পড়িলাম। লক্ষ্মীর আধার উল্টাইয়া দিলাম। একি! কতো! এ-তো,, কাঁচা সোনার আকবরী মোহর! দুই শ' মোহর, মা কোথা হইতে পাইলেন! কেনই বা এতদিন এমন সযত্নে লুকাইয়া রাখিয়া আসিয়াছেন! হে ভগবান! এই কি আমাকে বিশ্বাস করিতে বলো যে লক্ষ্মী থাকিতে আমরা উপবাস করিয়া দিন কাটাইলাম। একটা রুদ্ধ অভিমানের বেগ যেন বুকের ভিতর হইতে ঠেলিয়া আসিতে আসিতে মনের উত্তাপে চোখ দিয়া গলিয়া বাহির হইয়া পড়িল। কিন্তু কাহার বিরুদ্ধে অভিমান? চোখ মুছিয়া উঠিয়া পড়িলাম। রূপকথার মতই মোহরগুলা মেঝেতে পড়িয়া ঝকঝক করিতে লাগিল।

দরজার কাছে আসিয়া মণীষাকে ডাকিলাম। কি জানি, হয়ত গলার স্বর কাঁপিয়া গিয়া থাকিবে, কারণ ব্যস্তভাবে মণীষা আসিল। দরজার কাছে তাহাকে আটক করিয়া বলিলাম, এই ঘরে ঢোকবার সর্ত্ত আছে, যদি রাজী হও—পরে বোলবো!

মণীষা নীরবে আমাকে সুদ্ধ ঠেলিয়া ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল। ঘরের মেঝের মুদ্রাগুলা লক্ষ্য করিয়া সে আমার চোখের উপর চাহিয়া রহিল। কি বুঝিল, জানি না, কিন্তু আমার হাত দুইখানা ধরিয়া বিগলিত কণ্ঠের বিনয়ে বলিল—তুমি একটু বোসো, বিশ্রাম করো।

ধীরে ধীরে ঘটনাটী বর্ণনা করিলাম। বলিলাম—মনু, আমার আফিসে যাওয়ার সুট্‌ বার কোরে ফেলো—আর কোনো কথা নয়—সেলুনে গিয়ে চুলটা আর একবার ছেঁটে নিতে হবে, জুতোটা—আচ্ছা একটা মুচি ডাকি—কিছু পয়সা বার করো দেখি, সাবান আছে তো—গায়ে বোধহয় এক পুরু ময়লা জমেছে—বেশী নয়, খান দুই মোহর ভাঙাবো আজ, পরে আরগুলো দেখা যাবে—টাকাটা ভাঙিয়ে একবার পুরোনো আফিসের সাহেবের সঙ্গে দেখা করতেই হবে—বেচারি—নিশ্চয় বলবে, তোমার কত খোঁজ করলুম, ফের চাকরিতে বসাবো বোলে; দোষ তোমার ছিল না—ষড়যন্ত্র প্রকাশ হোয়ে গেছে—দুর্ব্বৃত্তের সাজা হোয়েছে, এখন সসম্মানে এসো—তোমাকে পুরস্কার দোবো—আগের মতো সামান্য কেরাণী থাকতে হবে না—তোমাকে যে এতদিন কষ্ট দিয়েচি তার জন্যে অনুতপ্ত—তুমি অবাক হোয়ো না মনু, এসব আমি চোখের ওপর দেখতে পাচ্ছি। দিন আমার ফিরেচে, জীবনের ওপর অবিশ্বাস আর রেখো না। দেখো ভালো কোরে সূর্য্যোদয়ের আলো দিয়ে, পাতার আগায় শিশির দুলচে, ভিজে ফুলের গন্ধ আসছে, আর ভেবো না, ভয় পেয়ো না।

দেখো মণীষা, আজ সেই অশরীরী সূক্ষ্মাত্মার কথা মনে হচ্ছে—তার গোত্র জানি না—কেন সে এসেছিলো আমাকে তোমাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যেতে জানি না, কিন্তু পরাজয় তারই হোক আর আমারই হোক—যে কথা সে বলে গিয়েছিলো তা আজ সত্যি হোলো দেখছি। দ্বিতীয় বিপদের সঙ্গে ফিরে এলো কি আমার পুরোনো দিন? মার অসুখ, আর এই দেখো মোহর। কি আশ্চর্য্য! মনু, কে সে, কি বৃত্তান্ত তার—কিছুই জানি না, বুঝি না; কিন্তু অবিশ্বাস কোরতেও তো পারলুম না। সে ভগবান না ভূত? কিম্বা আমারই বিকৃত মনের প্রতিচ্ছবি—মনু লক্ষ্মীটি একটিবার ওঠো—ঐ যে সেল্‌ফের বাঁ দিকে, শেষ বইখানার পাশে, ওই যে কালো চামড়া বাঁধানো ছোটো খাতা—ঐখানা দাও না—দেখাই তোমাকে ওর মধ্যে কি আছে।

তুমি যখন অঘোরে ঘুমিয়েছো, সেই সব রাত্তির আমি জেগে কাটিয়েছি—মাথার মধ্যে বোধ হয় তখন প্রলয়ের ঝড় বোয়ে গেছে—কতো রকমের যে ভাবনা ঢেউ তুলে আমার মনে আছাড় খেয়েছে তার আর ইয়ত্তা নেই। এতো দুঃখে পড়ে, তোমার আমার কথা মনে আসতো না, অন্য সব কথা, যা নিরর্থক—এমনিই সব কথার ভাবনার স্তূপ। ঐ স্তূপ শেষে ঢিবি হোয়ে পর্ব্বত হোয়ে আমাকে চেপে ধোরতো, কি যন্ত্রণা যে তখন পেয়েছি, কি বোলবো মনু। এর মধ্যে এক এক সময়ে ইচ্ছে হোতো পুরোনো দিনের নেশার মত শুধু লিখতে—পাতার পর পাতা, দিনের পর দিন। মনে আছে একদিন কি একটা লিখেছি, মনে তার আনন্দটা শুধু লেগে আছে, কি লিখেচি কিন্তু মনে পড়ে না; শুধু গ্রামোফোনের রেকর্ডের মতন হাতটা কাগজের ওপোর ঘুরে গেছে—এইটুকু মনে আছে। এই যে, শোনো—হাসবে না তো? দুঃখের মধ্যে কবিতা—এর নাম দেবো ভেবে রেখেছি, ভুঁইচাঁপা—যা মাটি ফেটে ফুটে ওঠে—এখন শোনো।

সেই সব লোক,
আহা, তাদের ভালো হোক,
যারা ঈশ্বরকে খুঁজে পেয়েছে।
সেই সব লোক,
যারা, জীবনের বাকি কটা দিন
ঈশ্বরের কাছ থেকে
দূরে পালিয়ে থাকতে
ভালোবেসেচে।
আহা, তাদের ভালো হোক।

*　　*　　*

আমি সেই লোক
যে অবিশ্বাস কোরে
নাম দিয়েছি—"ভাগ্য"।
আর—
যে নানারকম পরীক্ষার
ভেতর দিয়ে চলে এসেছে
ক্ষতবিক্ষত হোয়ে,
নোতুন আলোর জ্যোৎস্না
কখনো হঠাৎ দেখেছে।
আমি সেই লোক
যার সেই আলোক দর্শনের
ব্যাখ্যা করবার ক্ষমতা নেই,
নামকরণ করা স্বপ্নাতীত!
আমি সেই লোক
আহা, আমার ভালো হোক।

একি মনু, তোমার চোখে জল যে! কবিতা শুনে? এই তো চাই। পুরাকালে রাজারা গলার মণিহার কবিকে উপহার দিতেন। আর তুমি আজ তোমার সভা-কবিকে যে মুক্তো উপহার দিলে, তা অতুলনীয়।

দরজার কাছে গলার আওয়াজে উভয়েই সচকিত হইয়া ফিরিয়া দেখি, কাকীমা ও বিষ্ণু। মণীষা চক্ষু মুছিয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িল। কাকীমা, বিষ্ণু আর মণীষা, এদের মুখ দেখিয়া আমি অবাক হইয়া গেলাম। একি করুণামাখা!

কাকীমা বলিলেন, বাবা, তোমাদের দেরি হোচ্চে দেখে আমরা এসে পড়লুম। চল ঘরে যাই।—

মণীষা কাকীমার পায়ের কাছে উপুড় হইয়া প্রণাম করিল।

শেষ

অসহযোগ

শ্রীনরেন্দ্র দেব

শুয়েছিল ঘরে খিল এঁটে কাল, খোলেনি কিছুতে রেগে;
কত ডাকা-ডাকি, তবুও ওঠেনি; যদিও ছিল সে জেগে।
অপরাধ—কাল ফিরিছি বাড়ীতে একটু রাত্রি ক'রে!
কি করি ক্লাবে যে ছাড়লেনা কেউ, আটকে রাখলে ধরে!
'সীতা' নাটকের অভিনয় হবে 'বাল্মীকি' ভূমিকাটা
আমাকেই ওরা দিয়েছে যে ডেকে! তাই ত' এতটা আটা!
গোটা বইটার মহড়া সারতে যাবেই ত' দুটো বেজে;
চটে গিয়ে শেষে হুঁকোটা ফিরিয়ে নিলুম তামাক সেজে।
আদরে ডেকেছি—ধম্‌কে ডেকেছি—কিছুতে দেয়নি সাড়া;
চ'ল্‌ল না রাতে হাঁকডাক বেশী, জেগে ওঠে পাছে পাড়া!
অগত্যা এসে বৈঠকখানা করা গেল আশ্রয়;
থাক্‌না একলা একা ঘরে শুয়ে, পাবেই ভূতের ভয়!
এমন কি দোষ? একদিন যদি হয়ে থাকে রাত বেশী—
দোর খুলবেনা? একি একগুঁয়ে! এত রাগ কোন্ দেশী?
বারোমাস ওঁর খোশামোদ করে চলা ত' বিষম দায়;
সেই যে বলে না—'আদুরে বিবিরা যত পায় তত চায়!'
থাক্, তামাকটা পুড়ে গেল মিছে! হুঁকোটা নাবিয়ে কোণে
আজ থেকে রোজ বাইরেই শোবো—ঠিক করা গেল মনে।
পরদিন ভোরে ঘুম ভেঙে দেখি—কে কখন গায়ে মোর,
চাদরটি ঢেকে, মাথার শিয়রে ভেজিয়ে দিয়েছে দোর!

যাক্ ! তবে রাগ গেছে ভেবে হেসে বললুম—'শোনো' !···ওগো'···
রাত হবে আজও। তুমি শুয়ে পোড়ো। কেন মিছে জেগে ভোগো ?
কথা বললে না ! বুঝলুম ভাবে, রয়েছে ভীষণ চোটে।
চা' নিয়ে আজ সে যুদ্ধ-বারতা এলনা শুনতে মোটে।
ব্যাপারটা বুঝে করি নি আমিও উচ্চ-বাচ্য কিছু,
এতই কি জিদ্ ?···আমাকেই হবে প্রতিবারে হ'তে নীচু ?
ছাই তুলে মরি ! চা' এলনা আজ ! শেষটা বেরিয়ে গিয়ে
মোড়ের দোকানে খেলুম দু' কাপ নগদ পয়সা দিয়ে !
আমরা হলুম পুরুষ মানুষ !···জব্দ করবে ওরা ?
ঝি রাঁধুনী নিয়ে সারাদিন থাকে অন্দরে যারা পোরা !
একটু ওদের কড়া রাশে রাখা দরকার—লোকে বলে—
আস্কারা দিলে মাথায় ওঠেই ও-জাতটা নানা ছলে !

সকাল সকাল স্নানাহার সেরে অফিসে গেলুম চলে,
"ফিরতে আমার রাত হবে আজ।" এলুম চেঁচিয়ে বলে।
এ হেন সাহসে খুশী হ'য়ে নিজে ভাবলুম—'বীর আমি !'—
বুঝুক্ যে, তার—হেঁজি-পেঁজি নয়, জবরদস্ত্'অ স্বামী !
আমাদের বাড়ী গলির ভিতর, ট্রাম থেকে কিছু দূরে।
খেয়ে উঠে রোজ ছুটে যেতে হয় বাজারের মোড় ঘুরে।
ভোর থেকে দেখি সার দিয়ে খাড়া সেখানে পাঁচশো লোকে,
পোয়াটাক চিনি পাবার জন্য চায়ের নেশার ঝোঁকে !
ভীড় ঠেলে ঠুলে গলদ্-ঘর্ম্ম ট্রামে,গিয়ে উঠতেই,
কপালের ঘাম মুছব কি দেখি পকেটে রুমাল নেই !
কণ্ডাক্টর সামনে হাজির। মাথা নেড়ে বলি—"আছে";
তবু সে দাঁড়ায়, হাতটা বাড়ায় !—'মন্থ্লি' থাকেই কাছে,
তাই চটে উঠে নাকের ডগায় দেখাতে গিয়েছি যেই,
অবাক্ কাণ্ড ! কোথা গেল ? একি ! 'মন্থ্লি' পকেটে নেই !
কি করি তখন—উপায় কি আর টিকিট না-কেনা ছাড়া ?
কিন্তু···একি এ ! মণিব্যাগ কই ? গেল কি পকেট মারা ?
পাশে ছিল এক চেনা-শোনা লোক, ব্যাপারটা সাঁটে বুঝে
ট্রামের ভাড়াটা বার করে দেখি দিলেন পকেটে গুঁজে !
কৃতজ্ঞচিতে বলে উঠি—দাদা ! হয়েছিল মাথা হেঁট—
ভাগ্যে ছিলেন ! নিন—পান খান,···চলবে কি সিগারেট ?
দিতে গিয়ে পান দেখি ডিবে নেই, সিগারেট কেস্ খালি !
উদ্‌ভ্রান্তের মতো চেয়ে থাকি···মুখে নামে চুণ কালি !

অপ্রতিভের ম্লান হাসি টেনে কুণ্ঠিত হয়ে বলি—
"সবই ফেলে আজ এসেছি দেখছি ! কী করে যে পথ চলি !
আচ্ছা···আপনি···ট্রামে দেখা হয়—জানিনে ত' ঠিকানাটা—
বলুন ত' দাদা, থাকা হয় কোথা ? লিখে নিই···পয়সাটা—"

নেই নোট বুক ! ফাউন্টেন পেন উধাও পকেট থেকে !
ভয় হ'ল বড় ; পড়ে যায়নি ত ? এসেছি কি বাড়ী রেখে ?
হঠাৎ তখন পড়্‌ল নজরে জামার বোতাম খোলা !
এঁটে দিতে গিয়ে অপ্রস্তুত ! এতই কি মন-ভোলা ?
বোতাম ক'টাও সকালে সে আজ পরিয়ে রাখেনি মোটে !
হলেই বা রাগ তা' বলে এ কি এ ? গেলুম ভীষণ চোটে।
বেলা হয়ে গেল ! বেজেছে কি ন'টা ? বাঁ হাত ঘুরিয়ে দেখি
বাঁধা নেই হাতে হাত-ঘড়ি আজ ! তাই ত ! কী হ'ল···একি !
গাড়ী এসে গেল লালদীঘি ; উঠে, যেই নামা একধারে
ঠোক্কর খেয়ে ঠিক্‌রে এলুম ফুটপাথে একেবারে !
"আহা-হা-হা" করে উঠল পথিকে, কেউ বলে—"লাগেনি ত ?"
কেউ বলে—"বড় সাম্‌লে গেছে হে, এখনি প্রাণটা দিত !"
ব্যাপার কিছু না, জুতোর ফিঁতেটা দেয়নি সে বেঁধে আজ
ঝুল্‌ছিল পাশে, মাড়িয়ে ফেলেছি ; তাই পথে পেনু লাজ !
খোঁড়াতে খোঁড়াতে এলুম অফিসে ; হ'ল হুঁস দেড়টায়
টিফিন আজ তো দেয়নি সঙ্গে, কি দেব এ পেটটায় ?
ধার ক'রে খেতে মন সরল না, চাইলে এখনি মেলে
বাজারের কেনা খাবার আবার সয়না আমার খেলে !
কাজেই না-খেয়ে বাড়ী ফেরা গেল, পয়সা অভাবে হেঁটে—
ক্লাবে যাওয়া আজ বন্ধ রাখব—ঝগড়াটা যাতে মেটে !
একদিনে হ'ল আক্কেল খুবই ; অভিমান ট্যাকে গুঁজে
বাড়ী ফিরে তাকে উপর নীচেয় সব ঘর দেখি খুঁজে।
কোথাও সে নেই ! চাকরটা বলে "মা'জী ত গেছেন চ'লে !
ঠাকুরকে তিনি ছুটী দিয়েছেন খাবার হবে না ব'লে।"

মাথায় আকাশ ভেঙে এল যেন, চখেতে সর্ষে ফুল !
'মান ভঞ্জন' না ক'রে রাত্রে করেছি কি মহাভুল !
শুধানু "কোথায় গেছেন—ইষ্টুপিড্ ?" চোখ দুটো করে রাঙা,
বললে ভৃত্য "মামার বাড়ীতে—গেছেন চড়কডাঙা !"
তাড়াতাড়ি আমি হাত মুখ ধুয়ে জামা জুতো ফের পরে
হুকুম দিলুম—"ডেকে আন গাড়ী, যাতায়াত ভাড়া করে !"

পশ্চিম-আফ্রিকার সংস্কৃতি ও ধর্ম

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক)

১৯১৯ সালে ছাত্র-রূপে গুরুকুল-বাস করিবার জন্ত লণ্ডনে উপস্থিত হই। বাসা ঠিক করিয়া লইয়া বসিবার সঙ্গে-সঙ্গেই প্রথমেই লণ্ডনের সুবিখ্যাত সংগ্রহ-শালা ব্রিটিশ-মিউজিয়ম দেখিতে যাই। এই অপূর্ব সংগ্রহের মধ্যে অপ্রত্যাশিতভাবে একটী অনপেক্ষিত বস্তু-সম্ভারের সঙ্গে পরিচয় ঘটে—পশ্চিম-আফ্রিকার নিগ্রোদের শিল্প। আর পাঁচজনের মত আমিও ভাবিতাম, আফ্রিকার নিগ্রোরা জঙ্গলী বর্বর জাতি, তাহাদের মধ্যে সভ্য জাতির মত উচ্চ অঙ্গের চিন্তা ও ধর্ম এবং সভ্যতা ও শিল্প কিছুই নাই। কিন্তু পশ্চিম-আফ্রিকার Nigeria নাইগিরিয়া-দেশের দক্ষিণ অঞ্চলের Benin বেনিন্-জনপদের নিগ্রোদের কৃতি, চারি-পাঁচ শত বৎসরের পূর্বেকার তৈয়ারী ধাতুশিল্প—ব্রঞ্জের নৃমুণ্ড, মূর্তি ও মূর্তি-সমূহ, ব্রঞ্জের পাটায় ঢালা ও খোদিত মানব ও পশু-পক্ষীর চিত্র, এবং হাতীর-দাঁতের মূর্তি ও অন্ত কারুশিল্প—এ-সব দেখিয়া চোখ খুলিয়া গেল, একটা নূতন রাজ্যে যেন আমি প্রবেশ করিলাম। আফ্রিকার সম্বন্ধে, বিশেষ করিয়া পশ্চিম-আফ্রিকার সম্বন্ধে, কৌতূহল জাগরিত হইল; হাতের কাছে—ব্রিটিশ মিউজিয়মের পুস্তকাগারে আর অন্তত্র—এ বিষয়ে যাহা পাইলাম পড়িতে লাগিলাম। ক্রমে আফ্রিকার নানা আদিম জাতি ও তাহাদের ধর্ম, সভ্যতা ও শিল্প সম্বন্ধে একটা ধারণা করিতে সমর্থ হইলাম। দেখিলাম, রসগ্রাহী ইউরোপীয় শিল্পী আর কলাবিৎ পণ্ডিতের চোখে আফ্রিকার আদিম-প্রকৃতিক শিল্প-চেষ্টার সার্থকতা এবং সৌন্দর্য্য ধরা দিয়াছে। আফ্রিকার বিভিন্ন আদিম জাতির মধ্যে তাহাদের জীবনকে অবলম্বন করিয়া যে ধর্ম, সভ্যতা ও শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহার মধ্যে সত্য শিব ও সুন্দরের যে লক্ষণীয় প্রকাশ ঘটিয়াছে, তাহা বিশ্ব-মানবের নিকট গ্রহণযোগ্য। নানা প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও আফ্রিকার আদিম জাতির লোকেরা যাহা গড়িয়া তুলিয়াছে, অন্ত পাঁচটী জাতির সভ্যতায় যেমন, তেমনি ইহাতেও লজ্জা ও ঘৃণার জিনিস কিছু-কিছু থাকিলেও, গৌরব ও আদরের বস্তুও যথেষ্ট আছে। সব চেয়ে আনন্দের কথা এই যে, আফ্রিকার আদিম জাতির লোকেদেরও এ বিষয়ে চোখ ফুটিতেছে; তাহারা এখন সব বিষয়ে নিজেদের পশ্চাৎপদ, অসহায়, ও ইউরোপের প্রসাদ-পুষ্ট বলিয়া মনে করিতে চাহিতেছে না; অবশ্য, ইউরোপের হৃদয়বান্ উদার-প্রকৃতিক সত্য-কাম মনের প্রভাবেই তাহাদের চোখের পটী খুলিয়া যাইতেছে—ইউরোপের মিশনারিদের দ্বারা আনীত খ্রীষ্টানী সভ্যতা আর ইউরোপের যন্ত্র-শক্তির প্রভুত্বের মোহ কাটাইয়া এখন দরদের সঙ্গে, অন্তর্মুখী দৃষ্টির সঙ্গে নিজেদের সংস্কৃতির বিচার করিয়া দেখিতে শিখিতেছে—তাহাদের সব বিষয়ে (এমন কি নিজেদের দেশোপযোগী জীবন-যাত্রা সম্বন্ধেও) যে দীনতা-বোধ যে হীনতারভাব ছিল, তাহা হইতে নিজেদের মুক্ত করিতে সমর্থ হইতেছে। ইহা কেবল আফ্রিকার কৃষ্ণকায় অধিবাসীদের পক্ষে নহে, সমগ্র মানব-জাতির পক্ষে একটা আনন্দের সংবাদ।

১৯১৯ হইতে ১৯২১ পর্য্যন্ত ইংলাণ্ডে অবস্থান করি, তখন আফ্রিকার শিল্প ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে সচেতন হই। ঐ দুই বৎসরের মধ্যে পশ্চিম-আফ্রিকার নাইগিরিয়া-দেশের Lagos লেগস্-শহরের কতকগুলি ইংলাণ্ড-প্রবাসী নিগ্রো ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হয়, তাহাতে একটু অন্তরঙ্গভাবে এই অঞ্চলের নিগ্রোদের আচার-ব্যবহার ধ্যান-ধারণার সম্বন্ধে কতকটা ওয়াকিফ-হাল হইতে পারি—এই পরিচয়ের ফলে ইহাদের সম্বন্ধে মনে বিশেষ একটা শ্রদ্ধার ভাব উৎপন্ন হয়। সমগ্র আফ্রিকার মোটের উপরে সাতটী বিভিন্ন ও বিশিষ্ট জাতির লোক বাস করে। ইহারা হইতেছে [১] Semitic শেমীয়, [২] Hamitic হামীয়, [৩] Bushman বুশ্‌মান, [৪] Hottentot হটেণ্টট, [৫] Bantu বাণ্টু-নিগ্রো, [৬] বিশুদ্ধ-নিগ্রো ও [৭] Pygmy বামন-নিগ্রো। এই কয় জাতির মধ্যে [১] শেমীয় ও [২] হামীয় জাতিদ্বয় ভাষায় ও সম্ভবতঃ রক্তে পরস্পরের সহিত সম্পৃক্ত। হামীয় জাতি আফ্রিকার সমগ্র উত্তর-খণ্ডে প্রাগৈতিহাসিক কাল হইতে বাস করিয়া আসিতেছে। মিসরের সুসভ্য প্রাচীন অধিবাসীরা হামীয় ছিল। আলজিয়র্স্, ত্যুনিস ও মোরোক্কোর Berber বের্বের জাতির লোকেরা, সাহারা মরুর Tuareg তুআরেগ জাতি, পূর্ব-আফ্রিকার Somali ও Galla সোমালি ও গাল্লা জাতি—ইহারাও হামীয়। হামীয়েরা শ্বেতকায় মানবের শ্রেণীতে পড়ে। আরব-দেশ, পালেস্তীন ও সিরিয়া, এবং বাবিলন ও আসিরিয়া শেমীয়দের দেশ। পালেস্তীন ও সিরিয়া এবং পরে আরব হইতে শেমীয় জাতির লোকেরা উত্তর ও মধ্য আফ্রিকার গিয়া নিজেদের জাতি হামীয়দের মধ্যে উপনিবিষ্ট হয়, এবং হামীয়দিগকে বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত করে। বিশেষতঃ মুসলমান আরবেরা তো মুসলমান ধর্ম ও আরবী ভাষার প্রতিষ্ঠা করিয়া, মিসর হইতে মোরোক্কো পর্যন্ত সমগ্র হামীয় দেশকে নূতন আরব-দেশ বানাইয়া তুলিয়াছে। আফ্রিকার কৃষ্ণবর্ণ নিগ্রোদের সঙ্গে, জাতি ভাষা ও সংস্কৃতিতে, শ্বেতকায় সুসভ্য শেমীয়-হামীয়দের কোনও সম্পর্ক নাই। আমি এই শেমীয় ও হামীয়দের কথা বলিব না। হামীয়দের সঙ্গে দক্ষিণ সাহারায়—পশ্চিম সুদানে—বিশুদ্ধ নিগ্রোদের মিশ্রণের ফলে, Hausa হাউসা, Fulani, Fulbe বা Peul ফুলানি, ফুলবে বা প্যল্ প্রভৃতি কতকগুলি সঙ্কর জাতির সৃষ্টি হইয়াছে; তাহাদের কথাও বলিব না। [৩] বুশ-মান ও [৪] হটেণ্টট্ জাতি লোকেরা হামীয় ও শেমীয়দের মত পরস্পরের জাতি; ইহারা দক্ষিণ আফ্রিকায় বাস করে, ইহাদের সভ্যতা অতি নিম্ন স্তরের; ইহাদের কথাও উপস্থিত প্রবন্ধে আলোচ্য নহে। [৭] বামন-জাতীয় লোকেরা এক প্রকার খর্বকায় নিগ্রো, ইহাদের সভ্যতা বলিতে কিছুই নাই, জাতিতে ও সংস্কৃতিতে ইহারা বোধ-হয় পৃথিবীর সর্ব মানবের মধ্যে সব চেয়ে নীচ অবস্থায় বিদ্যমান; Congo কঙ্গো-দেশের ঘন জঙ্গলের মধ্যে ইহাদের কিছু-কিছু পাওয়া যায়। ইহারা অন্ত নিগ্রোদের থেকে পৃথক্ জাতি। খাস নিগ্রো বা কাফরী জাতি দুইটী বড় শ্রেণীতে পড়ে—মধ্য-ও দক্ষিণ-আফ্রিকার অধিবাসী বাণ্টু-নিগ্রো, এবং পশ্চিম-আফ্রিকা ও উত্তর-মধ্য-আফ্রিকার অধিবাসী শুদ্ধ-নিগ্রো। আকৃতিতে, প্রকৃতিতে এবং সংস্কৃতিতে ইহাদের মধ্যে অনেক

বিষয়ে মিল থাকিলেও, ভাষায় এবং সামাজিক রীতিনীতি, ধর্ম প্রভৃতি বিষয়ে ইহাদের মধ্যে লক্ষণীয় পার্থক্য দেখা যায়। পশ্চিম-আফ্রিকার শুদ্ধ-নিগ্রোরাই আফ্রিকার নিগ্রো-জগতের সব চেয়ে বিশিষ্ট প্রতিনিধি। এই শুদ্ধ-নিগ্রোরা আবার ভাষা হিসাবে অনেকগুলি উপজাতিতে পড়ে। পশ্চিম-আফ্রিকার শুদ্ধ-নিগ্রো উপজাতি-সমূহের মধ্যে এই কয়টী প্রধান—নাইগিরিয়ার Nupe নূপে, Ibo ইবো ও Yoruba য়োরুবা; Gold Coast বা 'স্বর্ণোপকূল' অঞ্চলের Chi বা Twi চী বা ত্বী জাতি—এই জাতির অন্তর্গত Ashanti আশান্টি বা Fanti ফান্টি, Ewhe এহ্বে প্রভৃতি কতকগুলি উপশাখা; এবং ফরাসীদের অধিকৃত পশ্চিম-আফ্রিকায় Baule বাউলে, Mandingo মান্দিঙ্গো, Mossi মোস্‌সি, Songoi সোঙ্গোই, Senufo সেনুফো, Wolof উওলোফ্ প্রভৃতি কতকগুলি উপজাতি। Yoruba য়োরুবা এবং Ashanti আশান্টি জাতির লোকেরা দৈহিক শক্তিতে, বুদ্ধিতে ও কর্ম-চেষ্টায় সমগ্র পশ্চিম-আফ্রিকার নিগ্রোদের অগ্রণী; ইহারা, এবং পূর্ব-আফ্রিকার Uganda উগাণ্ডা অঞ্চলের বাণ্টু-নিগ্রো-জাতীয় Baganda বাগাণ্ডারা, আফ্রিকার কৃষ্ণবর্ণ নিগ্রোজাতির মানুষের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উন্নত,—বিদ্যা, বুদ্ধি ও সংহতি-শক্তিতে ইউরোপীয়দের সঙ্গেও পাল্লা দিতে ইহারাই সমর্থ হইয়াছে।

আমার সঙ্গে যে নিগ্রো ভদ্রলোকগুলির আলাপ হয়, তাঁহারা সকলেই য়োরুবা জাতির। (একটা কথা জানাইয়া রাখি; ইংরেজী-শিক্ষিত নিগ্রোরা নিজেদের Black Man 'কালো মানুষ' বলিয়া উল্লেখ করিতে লজ্জা পান না, কিন্তু 'নিগ্রো' Negro শব্দের বিকৃত রূপ Nigger 'নিগার' ইংরেজীতে গালি-ব্যঞ্জক হওয়ায়, ইহারা নিজেদের সম্বন্ধে Negro 'নিগ্রো' শব্দ আর ব্যবহার করিতে চাহেন না,—যদিও এই শব্দগুলির মূল হইতেছে লাতীন ভাষার Niger 'নিগের' শব্দ, যাহার অর্থ 'কালো' অথবা 'কালো মানুষ' —African 'আফ্রিকান' শব্দই ইহারা এখন পছন্দ করেন, এবং সহানুভূতিসম্পন্ন ইউরোপীয়গণও African শব্দই ব্যবহার করেন)। ইহাদের কাছে শুনিলাম যে নাইগিরিয়া দেশের দক্ষিণ-পশ্চিম অংশ য়োরুবাদের দ্বারা অধ্যুষিত। য়োরুবারা সংখ্যায় ৩০ লাখের উপর। ইহাদের মধ্যে ১০ লাখ খ্রীষ্টান, ১০ লাখ মুসলমান, ও ১০ লাখ Pagan অর্থাৎ তাহাদের পুরাতন স্বভাবজ ধর্ম পালন করিয়া থাকে। ধর্মের জন্য ইহাদের মধ্যে আত্মকলহ নাই। খ্রীষ্টান ও মুসলমান ধর্মদ্বয় দ্বারা আক্রান্ত হইলেও, য়োরুবা ধর্ম এখনও বেশ জোরের সঙ্গে চলিতেছে। এই ধর্মের দেবতারা সাধারণ মন্দিরে ও তীর্থে এবং গৃহস্থের গৃহে যথারীতি পূজা পাইয়া আসিতেছেন। য়োরুবারা চাষ-বাস করে, যে অঞ্চলে ইহারা বাস করে সে অঞ্চলটা খুব ঘন-বসতি; নিজের জমীতে নারিকেল, তাল-জাতীয় এক রকম গাছের বীজের তেল, চীনা-বাদাম, কোকো, তূলা, মেহগনী কাঠ এই সব উৎপন্ন করিয়া ও রপ্তানী করিয়া এখানকার চাষী আর ছোট জমীদারেরা বেশ সমৃদ্ধ। য়োরুবা-দেশে বেশ বড়-বড় শহর আছে অনেকগুলি, যেমন Lagos লেগস্ (দেড়-লাখের উপর অধিবাসী), Ibadan ইবাদাঁ (প্রায় আড়াই-লাখ অধিবাসী), Ogbomosho ওবোমোশো (নব্বই হাজার), Ilorin ইলোরিঁ (পঁচাশী হাজার), Abeokuta আবেওকুটা ও Iwo ইবো (প্রত্যেকটী পঞ্চাশ হাজার করিয়া); এ ছাড়া পঞ্চাশ বা তিরিশ হাজার লোকের বাস অন্য শহরও কতকগুলি আছে। এই সব শহরে ইহাদের রাজা আছে, প্রাচীন পদ্ধতিতে নিজেরাই শহরের সব কাজ চালায়—আধুনিক, ইউরোপীয় রীতি কার্য্যকর মনে করিলে গ্রহণেও বাধা নাই। Ife ইফে-শহর ইহাদের ধর্মের কেন্দ্র। য়োরুবা দেশের পশ্চিমে Dahomey দাহোমে, আর Togo তোগো, আর তাহারও পশ্চিমে Gold Coast 'স্বর্ণোপকূল', যেখানে বিখ্যাত Ashanti আশান্টি নিগ্রো জাতির বাস; এই-সব দেশেরও বেশ সমৃদ্ধ অবস্থা।

শ্রীযুক্ত Nathaniel Akinremi Fadipe (বা Fadikpe) নাথানিয়েল্ আকিঁর‍্যামি ফাডিপে (বা ফাডিক্‌পে)—এই নামে একটী য়োরুবা ছাত্রের সঙ্গে তখন (১৯২০ সালে) লণ্ডনে আলাপ হইয়াছিল। পরে ১৯৩৮ সালে আবার ইংলাণ্ডে ইহার সহিত সাক্ষাৎ হয়। ফাডিপে-কে তাহার নামের অর্থ জিজ্ঞাসা করি—তাহার পূরা নাম তখন জানা হয় নাই। সে বলে যে Fadikpe নামটী Ifa-di-kpe এই তিনটী শব্দের সমবায়ে গঠিত, ইহার অর্থ, Ifa 'ইফা'-দেবতার দান, 'ইফা-দত্ত'। আমি তখন তাহাদের প্রাচীন ধর্মের কথা জিজ্ঞাসা করি। ফাডিপে নিজে ছিল খ্রীষ্টান, কিন্তু দেখিলাম, তাহাদের প্রাচীন ধর্ম সম্বন্ধে তাহার মনে কোনও জুগুপ্সার বা ঘৃণার ভাব নাই। Ifa ইফা-দেবতার সম্বন্ধে বলিল যে, এই দেবতার পুরোহিতেরা ভবিষ্যদ্বাণী করেন, Ife ইফে-শহর ইহার পূজার কেন্দ্র, ষোলটী সুপারী-জাতীয় ফল (ইহাকে Kola-nut 'কোলা-ফল' বলে) লইয়া পুরোহিতেরা ষোল বার গোল বা চৌকা আকারের একখানি কাঠের বারকোষে ফেলেন, কয়টী ফল হাতে রহিল কয়টী পড়িল তাহা ধরিয়া বারকোষের উপর ষোল বার দাগ কাটিয়া হিসাব করিয়া তাঁহারা দেবতার আদেশ বা অনুমোদন জ্ঞাপন করেন। ফাডিপের কথা শুনিয়া মনে হইল, খ্রীষ্টান হইলেও এইরূপ ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যে তাহার আস্থা আছে। তবে সে আমাকে খোলসা করিয়া বলিল, খ্রীষ্টান ঘরের ছেলে, প্রাচীন Pagan বা স্বভাবজ ধর্মের খবর সে ঠিক-মত সব জানে না; তবে তাহার জাতির এক তৃতীয়াংশ এখনও এই ধর্মকে জীবন্ত রাখিয়াছে। পরে একজন মুসলমান য়োরুবা রাজার সঙ্গে দেখা হয়, ইনি লণ্ডনে তাঁহার রাজ্য বা জমীদারী সংক্রান্ত মোকদ্দমার জন্য আসিয়াছিলেন। ইনি ইংরেজী জানিতেন না, তবে ইহার সেক্রেটারি Herbert Macaulay হর্বর্ট্ মেকওলে নামে একটী য়োরুবা ভদ্রলোকের সঙ্গে খুব পরিচয় হয়। শ্রীযুক্ত মেকওলের নামটী ব্রিটিশ হইলেও ইনি খাঁটী আফ্রিকান, এবং জাতীয়তাবাদী; ইনি য়োরুবাদের নিজস্ব সংস্কৃতির জন্য বিশেষ গৌরব বোধ করেন। শ্রীযুক্ত মেকওলে বিলাতে পাস করা ইঞ্জিনিয়ার বা পূর্তকার ছিলেন, স্বদেশের একজন বিশেষ প্রতিষ্ঠাপন্ন ব্যক্তি ছিলেন তিনি। ইহার কাছে য়োরুবা ধর্মও সমাজের রীতি-নীতির খবর কিছু-কিছু পাই। জনৈক য়োরুবা পাদ্রি য়োরুবা ভাষায় (য়োরুবাদের ভাষায় নিজস্ব লিপি ছিল না, ইউরোপীয় সংস্পর্শ ও প্রভাবের ফলে রোমান লিপি এখন য়োরুবাদের দ্বারা গৃহীত হইয়াছে) য়োরুবা ধর্ম সম্বন্ধে একখানি বই লিখেন, ইহার ইংরেজী অনুবাদ হইয়াছে, এই ইংরেজী বই ইহার কাছে ছিল, ইনি আমায় উহা পড়িতে দেন। বইখানি পড়িয়া খুশী হই, কারণ ইহাতে মিশনারি-সুলভ গোঁড়ামি ছিল না,

বিশ্বমাতা Odudua (ওডুডুআ)—পশ্চিম-আফ্রিকার Yoruba
যোরুবা জাতির দেবতা (কাঠের মূর্ত্তি)

চিত্র—১

চিত্র—২

চিত্র—৩

চিত্র—

চিত্র—৫

চিত্র—৬

গ্রন্থকার কতকটা দরদের সঙ্গে তাঁহার জাতির ধর্ম, পিতৃপুরুষের ধর্ম বুঝিবার ও বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। জাতীয় সংস্কৃতির প্রধান অঙ্গ ধর্ম-বিশ্বাস ও ধর্মানুষ্ঠান সম্বন্ধে এইরূপ সহানুভূতি-শীলতা বেশ ভালই লাগিল। য়োরুবা খ্রীষ্টান পাদ্রি, পূর্ব-পুরুষ যে খ্রীষ্টান বা ইহুদী ছিল না তজ্জন্য লজ্জিত নহেন; গোড়াতেই তিনি বলিয়াছেন যে সুসভ্য ইউরোপের লোকেরাও এক সময়ে Pagan ছিল, য়োরুবাদের ধর্মের মত ধর্মই তাহারা পালন করিত। য়োরুবা-দেশে অনেক সামন্ত রাজা আছেন, অন্য শিক্ষিত ভদ্রলোক আছেন, ইঁহাদের কেহ-কেহ আবার বিলাতে শিক্ষিত, কিন্তু ইঁহারা স্বধর্মের জন্য লজ্জিত নহেন, বরং সেই ধর্মকে রক্ষা করিতে চেষ্টিত। এই গৌরব-বোধ এবং রক্ষণশীলতা এই বিশিষ্ট আফ্রিকার জনগণের মানসিক শক্তিরই পরিচায়ক।

য়োরুবাদের জ্ঞাতি এবং প্রতিবেশী অন্য পশ্চিম-আফ্রিকান জনগণের মধ্যেও এই ভাব এখন দেখা যাইতেছে—বিশেষ করিয়া স্বর্ণোপকূলের Ashanti আশান্টি জাতির মধ্যে। Kumasi কুমাসী ও Accra আক্রা নগরদ্বয় আশান্টি জাতির রাষ্ট্রীয় ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র। মুসলমান এবং প্রাচীনধর্মী য়োরুবারা এবং বহু খ্রীষ্টান য়োরুবা ইউরোপীয় পোষাক পরে না, নিজেদের উষ্ণদেশোপযোগী ঢিলা জামা ও ইজার এবং গায়ের চাদর ব্যবহার করে; আশান্টিরাও তেমনি রাজা হইতে আরম্ভ করিয়া জন-সাধারণ পর্য্যন্ত সকলে পায়ে সাবেক চালের নিগ্রো চাপ্‌লি জুতা পরে, ও গায়ে নিজেদের জাতীয় পোষাক, রঙ্গীন ছাপা কাপড়ের চাদর, জড়াইয়া থাকে। কয়েক বৎসর পূর্বে আমেরিকার কোনও শহরে—খুব সম্ভব চিকাগো-তে,—একটী বিশ্বধর্ম মহাসভা হয়; ১৮৯৩ সালের সভা, যেখানে পুণ্যশ্লোক স্বামী বিবেকানন্দ বিশ্বজন সমক্ষে হিন্দু আদর্শের অন্যতম প্রধান কথা, ধর্ম-বিষয়ে উদারতার বাণীর প্রচার করেন, তাহার মত অত বিরাট ব্যাপার না হইলেও, এই সভায় নানা জাতি ও নানা ধর্মের প্রতিনিধি আসিয়া উপস্থিত হন। এই প্রতিনিধিদের নামের তালিকা কোথায় দেখিয়াছিলাম—দুঃখের বিষয় তাহা হইতে আবশ্যক তথ্যটুকু টুকিয়া লওয়া হয় নাই—এই তালিকায় একজন আশান্টি ভদ্রলোকের নাম দেখিয়াছিলাম; ইনি কুমাসী-নগর হইতে আমেরিকায় আন্তর্জাতিক-ধর্ম-সম্মেলনে অন্য পাঁচটা ধর্মের নেতাদের সমক্ষে গিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন,—তাঁহার আশান্টি-জাতির মধ্যে উদ্ভূত Paganism বা স্বভাবজ ধর্মকে তিনি আধুনিক যুগের সভ্য মানুষের উপযোগী বলিয়া মনে করেন, এই বোধের বশবর্তী হইয়া তিনি নিজ ধর্মের বাণী প্রচারের জন্য গিয়াছিলেন। এই সংবাদের পিছনে যে অখ্যাত অবজ্ঞাত অত্যাচারিত আফ্রিকান্ জাতির পুনরুজ্জীবনের সুসমাচারের মত কতখানি গুরুত্ব বিদ্যমান, সহৃদয় মানব-প্রেমী মাত্রেই তাহার উপলব্ধি করিবেন। আশান্টি ধর্ম কি, তাহার প্রতিষ্ঠা কোন্ দার্শনিক বিচার এবং আধ্যাত্মিক উপলব্ধির উপরে, তাহা আমরা জানি না। জগৎ সমক্ষে এতাবৎ কেবল ইহাই ঘোষিত হইয়াছে যে এই ধর্মের পরিপোষক নিগ্রোরা নরবলি দিত, এবং নৈতিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক জীবনে ইহারা অতি নিকৃষ্ট শ্রেণীর জীব ছিল। নরবলির কথা অস্বীকৃত হয় নাই এবং হইবারও নহে; কিন্তু ইহাদের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জীবন সম্বন্ধে এবং জাগ্রৎ বা সুপ্ত মানসিক শক্তি সম্বন্ধে, ইউরোপীয় মিশনারি ও অন্য ব্যক্তির উক্তি বহুশঃ একদেশ-দর্শী, স্বার্থান্ধ এবং মিথ্যা।

য়োরুবাদের নৈতিক জীবন সম্বন্ধে একটী কথা বলিব—ইহা হইতে বুঝা যাইবে যে অসহায় ও পশ্চাৎপদ জাতির মানুষের সম্বন্ধে কত অনুচিত ধারণা প্রচারিত হয়। হর্বট্ মেকওলে নামে যে য়োরুবা ভদ্রলোকটীর উল্লেখ করিয়াছি, তিনি একদিন কথা-প্রসঙ্গে আমায় বলিয়াছিলেন—"দেখুন মিস্‌টার চাটর্জি, আমাদের কালো মানুষ, জঙ্গলী, অসভ্য, বর্বর ব'লে ইউরোপীয় লোকেরা গা'ল দেয়, তারা আমাদের 'সভ্য' করবার জন্য 'উন্নত' করবার জন্য পাদ্রি পাঠায়। কিন্তু সত্য কথা এই যে, ওরা এসে আমাদের সাবেক চালের সঙ্গে আমাদের সামাজিক জীবন আর নৈতিক জীবন সব বরবাদ ক'রে দেয়। সেকেলে আফ্রিকানরা বাপ-পিতামহের কালের যে জীবন পালন ক'রে আস্‌ছিল, সেটা সভ্যতায় উন্নত না হ'তে পারে, কিন্তু তার মধ্যে চুরির আর মিথ্যা-কথা বলার আর সামাজিক অন্যায়ের স্থান ছিল না। এখনও সাবেক সত্যবাদিতা আর নীতিনিষ্ঠতা থেকে আমাদের পাড়াগাঁ অঞ্চলের লোকে ভ্রষ্ট হয়নি। আমাদের দেশে পল্লীগ্রামকে ইংরিজিতে bush বলে। দু-ধারে bush অর্থাৎ জঙ্গল, ক্ষেত, গ্রাম—তার মাঝখান দিয়ে বড় সড়ক গিয়েছে। রাস্তায় জলের কষ্ট, কুয়োর রেওয়াজ কম, water-hole অর্থাৎ ডোবা বা পুখুরও কম। দোকান-হাট, হোটেল, সরাইয়ের পাট বড় নেই। ভোরের বেলা গাঁয়ের কোনও স্ত্রীলোক মাথায় এক কলসী জল আর পিঠে এক কাঁদি না'রকল আর এক কাঁদি কলা নিয়ে, নিজের গ্রাম থেকে দু-পাঁচ মাইল হেঁটে বড় সড়কের ধারে একটা বড় গাছের তলায় সব রেখে দিলে। জলের কলসীর মাথায় একটা না'রকল মালা, তাতে তিনটে ঢিল; কলার কাঁদির উপরে দুটো ঢিল, আর না'রকলের কাঁদির গায়ে পাঁচটা কি সাতটা ঢিল—সাজিয়ে' রেখে দিলে। দিয়ে বাড়ী চ'লে গেল। ঢিল রাখার মানে, যদি রাহী লোকের তেষ্টা পায়, তবে গাছের ছায়ায় ঠাণ্ডায় জলের কলসী দেখে তা থেকে জল কিনে খেতে পারবে—এক মালা জলের দাম তিন কড়া—আমাদের দেশে এখনও কড়ি চলে; খাবার দরকার হ'লে, দু কড়া দিয়ে একটা কলা, পাঁচ বা সাত কড়া দিয়ে একটা না'রকল নিতে পারবে। সন্ধ্যের দিকে জল আর ফলের মালিক স্ত্রীলোক গ্রাম থেকে আস্‌বে, হিসেব ক'রে দেখবে, জল এতটা নেই, তার বদলে জলের কলসীর পাশে এতগুলি কড়ি; তেমনি না'রকল আর কলা পথ-চলতি লোকেরা যা নিয়েছে, তার বদলে হিসেব ক'রে কড়ি দিয়ে গিয়েছে। জল আর ফলের বদলে ঠিক হিসাব-মত কড়ি বুঝে পেয়ে, স্ত্রীলোকটী তার বাকী জিনিস নিয়ে খুশী মনে ঘরে ফিরে যায়। লোকচক্ষুর অগোচরে এই রকম বিকি-কিনিতে কেউ জুয়াচুরি করেনা—এখনও আমাদের এতটা নৈতিক অবনতি হয়নি। কিন্তু সভ্যতার ছোঁয়াচ লেগে অবনতির আরম্ভ হ'য়েছে।" শ্রীযুক্ত মেকওলে আরও বলিলেন—"দেখুন, আমাদের সমাজের বাঁধন ছিল, জন-মত ছিল; অন্যায় অনুচিত বা খুশী তা লোকে ক'রতে পারত না। এখন তা পারে, কারণ ইংরেজের আইনে বাধা দেবার কেউ নেই। কিন্তু আগে good form বা সুরীতি অনেক ছিল, তাতে ক'রে আমাদের ভালই হ'ত। এই ধরুন না, বিয়ের ব্যাপারে। কোনও উৎসবে, অথবা হাটের দিন হাটে, বিয়ের-বয়সের ছোকরা

একটী মেয়েকে দেখ্‌লে। তাকে বিয়ে করবার তার ইচ্ছে হ'ল। সে কোনও বন্ধুকে জানালে। বন্ধু গিয়ে ঠাকুরদাদা বা ঠাকুরমা সম্পর্কের আত্মীয়কে ব'ল্‌লে। তখন, মেয়ের ঘর যদি ভাল হয়, তা-হ'লে বাপ মা সম্বন্ধের জন্ম কথা পাড়লে, ঘটক দিয়ে। তার পরে পাত্র-পক্ষ আর পাত্রী-পক্ষ উভয় পক্ষ থেকে গোপনে অনুসন্ধান চ'ল্‌ল—অপর পক্ষের বাড়ীর লোকেরা কেমন, তাদের অবস্থা কেমন, আর পাত্র বা পাত্রীর ঊর্ধ্বতন কোনও পুরুষে এই তিনটী রোগ কারো কখনো হ'য়েছিল কিনা—উপদংশ, কুষ্ঠ আর উন্মাদ রোগ। এই অনুসন্ধানে দু-পক্ষ উত্‌রে গেলে,তবে ভদ্র আফ্রিকান ঘরে বিয়ের কথা পাকা হ'ত।" যাহাদের ব্যক্তি-গত আর সমাজ-গত নৈতিক ধর্ম এই রকম ভাবে গড়িয়া উঠিয়াছিল, বড়-বড় ইমারত খাড়া করিতে বা সাহিত্যে জ্ঞান-বিজ্ঞানে দর্শনে উন্নত হইতে তাহারা না পারিলেও, তাহাদের যে একটা উঁচু দরের সংস্কৃতি ছিল তাহা স্বীকার করিতে হয়।

কোনও জাতির মধ্যে উদ্ভূত ধর্ম, সেই জাতির মৌলিক প্রকৃতি, তাহার আধিভৌতিক পারিপার্শ্বিক, তাহার আজীবিকা ও জীবন-যাত্রার উপায়, প্রচুর অবসরের ফল-স্বরূপ তাহার চিন্তা, তাহার শিক্ষা, এবং অন্য চিন্তাশীল বা সুসভ্য জাতির সহিত সংস্পর্শ ও সংস্পর্শের জন্ম প্রভাব—এই সবের উপরে নির্ভর করে। পশ্চিম-আফ্রিকার দক্ষিণে সাগরোপকূল অঞ্চলের নিগ্রোদের সঙ্গে এখন হইতে সাড়ে-চারি শত কি পাঁচ শত বৎসর পূর্বে অন্য কোনও সুসভ্য জাতির সংস্পর্শ ঘটে নাই—ঐ সময়ে পোর্তুগীসদের সহিত বাণিজ্য-সূত্রে ইহাদের সংযোগ ঘটে। শিল্পের ক্ষেত্রে পোর্তুগীস প্রভাব পড়ে, কিন্তু ধর্মের ক্ষেত্রে কতটুকু পড়িয়াছিল তাহা বিবেচ্য; অনুমান হয়, বেশী পড়ে নাই। আরব ও অন্য মুসলমানদের আগমন ইহাদের মধ্যে ঘটে আরও অনেক পরে। ইহার পূর্বেই ইহাদের ধর্মের লক্ষণীয় সমীক্ষা ও অনুষ্ঠান, দেবতাবাদ ও পূজারীতি নির্ধারিত হইয়া গিয়াছিল, ইহাদের ধর্ম বিশিষ্টতা লাভ করিয়াছিল। সুতরাং এই অঞ্চলের আফ্রিকার ধর্মকে আফ্রিকান পারিপার্শ্বিকের মধ্যে আফ্রিকান জাতির অপ্রৌঢ় চিন্তা ও চেষ্টার ফল বলিয়াই ধরিতে হয়। ইবো, নুপে, য়োরুবা, এহ্বে, আশান্টি, বাউলে, মান্দিঙ্গো প্রভৃতি পশ্চিম-আফ্রিকার জাতিগুলির মধ্যে যে-সব ধর্ম-বিশ্বাস ও অনুষ্ঠান দেখা যায়, ভাষা ও উপজাতি হিসাবে সেগুলির মধ্যে কিছু-কিছু অবশ্যম্ভাবী পার্থক্য বিদ্যমান থাকিলেও, একই প্রাকৃতিক ও সাংস্কৃতিক আবেষ্টনীর মধ্যে সঞ্জাত বলিয়া ইহাদের ধর্ম-বিশ্বাসে ও অনুষ্ঠানে কতকগুলি সাধারণ লক্ষণ বা বৈশিষ্ট্য সহজেই নির্ধারিত করা যায়। তুলনা-মূলক আলোচনা করিব না, এ বিষয়ের অধিকারী আমি নই;—কেবল য়োরুবা জাতির ধর্মের স্থূল বা প্রধান কথাগুলি বলিবার চেষ্টা করিব। য়োরুবাদের ধর্ম লইয়া ইউরোপীয় পণ্ডিতদের হাতে যত আলোচনা হইয়াছে, পশ্চিম-আফ্রিকার অন্য কোনও জাতির বা জনগণের ধর্ম লইয়া অত আলোচনা হয় নাই। য়োরুবারাও নিজেদের ভাষায় এ সম্বন্ধে বই লিখিয়াছে। Colonel A. B. Ellis, R. E. Dennett, Leo Frobenius, Stephen S. Farrow—ইহাদের বই হইতে অনেক তথ্য পাইয়াছি। আফ্রিকার শিল্প সম্বন্ধে বই হইতেও কিছু-কিছু পারিপার্শ্বিকের খবর মিলিয়াছে। য়োরুবা ধর্মকে পশ্চিম-আফ্রিকার জনগণের ধর্মের প্রতিভূ-স্থানীয় বলিয়া গণ্য করিতে পারা যায়।

য়োরুবাদের মধ্যে ধর্মের প্রধান একটী অঙ্গ,দেবতাবাদ ও দেব-কাহিনী, খুব লক্ষণীয়-রূপে বিকাশ লাভ করিয়াছে। মনোজ্ঞ দেব-কাহিনী না হইলে সাধারণ্যে ধর্মের প্রচার বা প্রতিষ্ঠা হয় না। কিন্তু দেব-কাহিনী-রচনার উপযোগী কল্পনা ও রসবোধ সকল জাতির মধ্যে পাওয়া যায় না। মিসরীয়,মেসোপোতামীয়, ভারতীয়, গ্রীক, জরমানিক, কেল্‌টিক—এই কয়টী জাতি এদিকে যে অসাধারণ কৃতিত্ব দেখাইয়াছে, তাহা সর্বত্র মিলে না। সমগ্র আফ্রিকার বিভিন্ন জাতির মানুষের মধ্যে,—কেবল হামীয়-শ্রেণীর মিসরীয়দের পরেই—য়োরুবা জাতির মানুষেরা এ বিষয়ে সর্ব-প্রথম উল্লেখের যোগ্য। ইহাদের দেবজগৎ কতকগুলি ব্যক্তিত্বশালী দেব ও দেবী দ্বারা অধ্যুষিত; জগতের বা বিশ্ব-মানবের কল্পিত দেবলোকে, Pantheon অর্থাৎ 'সুধর্মা'-সভায়, স্বকীয় বৈশিষ্ট্য লইয়া য়োরুবা দেবতারাও স্থান পাইবার যোগ্য।

এইসব দেব-কাহিনীকে অবলম্বন করিয়া য়োরুবাদের ও তাহাদের সংপৃক্ত অন্য জাতির মধ্যে একটী বিশিষ্ট শিল্পকলার সৃষ্টি হইয়াছে—কাষ্ঠ, ধাতু ও মৃত্তিকা নির্মিত মূর্তি ও পাত্রাদিতে এই শিল্পকলা দৃষ্ট হয়। আফ্রিকান শিল্প-জগতে ইহার স্থান প্রথম শ্রেণীতে, এবং বিশ্বমানবের শিল্পের মধ্যেও সৌন্দর্য্য-গুণে ও সার্থকতায় ইহার নিজ স্থান স্বীকৃত হইয়াছে।

ইহুদী ধর্ম ও তৎসংপৃক্ত খ্রীষ্টান ও মুসলমান ধর্ম যাঁহারা মানেন, তাঁহাদের কেহ কেহ এই তিন ধর্মের বাহিরের লোকেদের সম্বন্ধে নানা তুচ্ছতাজ্ঞাপক শব্দের ব্যবহার করেন—যেন ঈশ্বরের সত্য স্বরূপ তাঁহাদেরই জ্ঞাত, আর কেহ জানে না বা জানিতে পারে না। এইরূপ মনোভাবের পরিচায়ক একটী ইউরোপীয় শব্দ হইতেছে Pagan, Paganism: যাহারা বাইবেল ও কোরানের আপ্ত বাক্য মানে না, তাহারা বর্বর, জঙ্গলী, ধর্মবিষয়ে পাঁড়াগেয়ে ভূত; pagan শব্দের মৌলিক অর্থ—'গ্রাম্য'। অন্য ভাবে বলা যায় যে,অভ্রান্ত বলিয়া বিবেচিত কোনও ধর্মগুরুর উক্তি যে-ধর্মের প্রতিষ্ঠা নহে, যে-ধর্ম অনাদিকাল হইতে কোনও দেশের প্রাকৃতিক আবেষ্টনীর ও সেই দেশের অধিবাসীদের হৃদয়, চিত্ত ও সংস্কৃতির প্রকাশ-স্বরূপ স্বাভাবিক ভাবেই আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, সেইরূপ স্বভাবজ ধর্মকে Paganism বলা যায়; এই অর্থে এই শব্দ প্রয়োগে আমাদের আপত্তি নাই। কিছুকাল হইল, বঙ্গদেশে ও উত্তর-ভারতে সুপরিচিতা গ্রীক মহিলা শ্রীযুক্তা সাবিত্রী দেবী, মুখোপাধ্যায়-জায়া, আমাদের ভারতীয় Paganism—আমাদের স্বভাবজ ধর্ম হিন্দুধর্ম স্বীকার করিয়া, হিন্দু-সংস্কৃতি সম্বন্ধে যে চিন্তাশীল ও অতি উপাদেয় পুস্তক A Warning to the Hindus লিখিয়াছেন, তাহাতে তিনি বিশেষ যোগ্যতার সঙ্গে Pagan, Paganism শব্দের এই সংজ্ঞা নির্দেশ করিয়াছেন। য়োরুবা ধর্ম এইরূপ এক স্বভাবজ ধর্ম।

আফ্রিকার জনগণের মধ্যে প্রচলিত এইরূপ স্বভাবজাত ধর্মের প্রকৃতি বা স্বরূপ বুঝিতে না পারিয়া, ইহার বাহ্য অনুষ্ঠানের একটা অঙ্গ বা দিক্ ধরিয়া, ইউরোপীয়গণ প্রথমটায় ইহার নাম দিয়াছিলেন Fetishism: fetish অর্থাৎ কোনও সৃষ্ট বস্তুতে দৈবী শক্তির আরোপ করিয়া সেই fetish-কে সম্মান করা, বা বিপদ্‌বারণ মাদুলী বা তাবিজের মত ধারণ করা। আফ্রিকার সাধারণ লোকে

হয় তো একটী প্রস্তর-খণ্ড, কিংবা কোনও ফলের বীজ, কিংবা বস্ত্র-খণ্ড, কিংবা জন্তুবিশেষের অস্থি-খণ্ড, বা পক্ষিবিশেষের পালথ, বা ধাতুর কোনও দ্রব্য, কাষ্ঠের কোনও মূর্তি, এইরূপ কোনও একটী বস্তুর সম্বন্ধে বিশ্বাস করিল যে, স্বাভাবিক ভাবে অথবা কোনও প্রক্রিয়ার ফলে ঐ বস্তুতে ঐশী শক্তির আবির্ভাব হইয়াছে; এবং সেই বিশ্বাস অনুসারে সেই বস্তুকে তাহারা পূজা করে, বা পবিত্র বলিয়া ধারণ করে। এইরূপ বিশ্বাস বা আচরণ কিন্তু আফ্রিকার বন্য জাতির মধ্যেই নিবদ্ধ নহে; সুসভ্য ইউরোপীয় লোকেদের mascot বা সৌভাগ্য-আনয়ন-কারী দ্রব্য ধারণ বা গৃহে রক্ষণ, এই Fetishism-এরই অন্তর্গত। সুতরাং, কেবল এই জিনিসের দিকে নজর করিয়া, আফ্রিকার জনগণের মধ্যে উদ্ভূত স্বভাবজ ধর্মকে Fetishism বলা চলে না। তেমনি, ইহা কেবল Animism অর্থাৎ 'দ্রব্যাত্মবোধ' ও নহে, প্রত্যেক বস্তু বা দ্রব্যের মধ্যে অন্তর্নিহিত এক আত্মিক শক্তি বিদ্যমান, কেবল এই বিশ্বাসও নহে।

নানা যুগে, নানা দেশে ও নানা জাতির মধ্যে উদ্ভূত এইরূপ বিভিন্ন স্বভাবজ ধর্মের আপসের মধ্যে ঝগড়া নাই—সকলেই পরস্পরকে পারমার্থিক সত্যের পথের পথিক বলিয়া শ্রদ্ধা করে। নিজেকে একমাত্র সত্যধর্ম বলিয়া ভাবিয়া অন্য ধর্মকে হেয় জ্ঞান করিয়া দেখিবার প্রবৃত্তি, কতকগুলি ঐতিহাসিক কারণে ইহুদী ধর্মে বিশেষ করিয়া দেখা দেয়; পরে এই ভাব খ্রীষ্টান ও মুসলমান ধর্মেও সংক্রামিত হয়। অন্য ধর্মের বিলোপ সাধন করিয়া নিজের ধর্মের প্রতিষ্ঠার চেষ্টার মূলে হইতেছে এইরূপ ধারণা। স্বভাবজ ধর্মগুলি এই পাপ হইতে মুক্ত। আর একটী জিনিস বিচার করিবার—ইহাদের মধ্যে বাহ্য নানা পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও, স্বভাবজ ধর্মগুলির আলোচনায় ইহা দেখা যায় যে,বিভিন্ন পরিবেশ সত্ত্বেও মানব বিভিন্ন দেশে ও কালে স্বাধীনভাবে কতকগুলি সাধারণ উপলব্ধিতে আসিয়া পহুঁছিয়াছে; যেমন, বিশ্বাত্মবাদ বা বিশ্বাত্মানুভূতি—সর্বভূতে ঐশী শক্তি বা শাশ্বত সত্তার অবস্থান; যেমন, কল্পনাতীত নির্গুণ পরব্রহ্ম ও তাহার সগুণ দেবতাময় প্রকাশ; যেমন, জন্মান্তরবাদ। এখানে যদি আমরা সর্বত্র ভারতের প্রভাব খুঁজি, তাহা হইলে আমাদিগকে জাতীয়তাদোষ-দুষ্ট বলিতে হয়, ধর্মের ক্ষেত্রে,"আমার জাতিই বড়, আমার জাতির মধ্যেই ঈশ্বরের বিশেষ কৃপাবর্ষণ হইয়াছে", এই চিন্তা, ঐশী শক্তির অপমান করে। চীনের 'তাও'-বাদ, ভারতীয় নির্গুণ-সগুণ ব্রহ্মের বা বিশ্বনিরন্তৃ ঋতের কল্পনার ছায়া নহে, উহা স্বতন্ত্র ভাবে চীনা ঋষির উপলব্ধিতে আসিয়াছে,—এই ভাবে দেখিলেই, আলোচ্য উপলব্ধির সহজ মানব-সাধারণত্ব সূচিত হয়।

য়োরুবারা আমাদের নির্গুণ ব্রহ্মের মত এক ঐশী শক্তিতে আস্থাবান্; এই শক্তির নাম Olorun 'ওলোরু'। পশ্চিম-আফ্রিকার অন্য জাতির লোকেরাও এইরূপ আস্থা পোষণ করে, তবে তাহাদের নিজ-নিজ ভাষায় তাহারা বিভিন্ন নামে তাঁহাকে আহ্বান করে। ওদেশে খ্রীষ্টানেরা তাহাদের যিহোবাকে ও মুসলমানেরা তাহাদের আল্লাহ্‌কে ওলোরুঁর সহিত অভিন্ন বলিয়া মনে করে, খ্রীষ্টান য়োরুবারা এই নামেই পরমেশ্বরকে ডাকে। ওলোরুঁ শব্দের অর্থ 'স্বর্গের স্বামী।' তাঁহার অন্য নামে তাঁহার মহিমা ব্যক্ত হয়—Eleda 'এলেদা' অর্থে 'স্রষ্টা', Alaye 'আলায়ে' অর্থে 'জীবনের স্বামী', Olodumare 'ওলোদুমারে' অর্থে 'সর্বশক্তিমান্', Olodumaye 'ওলোদুমায়ে' অর্থে 'স্বয়ম্ভু', Elemi 'এলেমি' অর্থে 'পরমাত্মন্', Oga-Ogo 'ওগা-ওগো' অর্থে 'মহামহিম', Oluwa 'ওলুবা' অর্থে 'প্রভু'। হিন্দুদের নির্গুণ ব্রহ্মের মত গভীর দার্শনিক তথ্যে বা তত্ত্বে য়োরুবাদের পঁহুছানো সম্ভবপর হয় নাই; তবে 'একমেবাদ্বিতীয়ম্', কারুণিক, ন্যায়কারী, পাপ-পুণ্যের বিচারক ঈশ্বরের ধারণা ইহারা ওলোরুঁর কল্পনায় করিতে পারিয়াছে।

এই সর্বশক্তিমান্, এক ও অদ্বিতীয় পরমেশ্বরকে কিন্তু সাধারণ ভাবে উপচার দিয়া পূজা করা হয় না। বাহিরের বিশ্বপ্রকৃতির ও মানুষের দৈনন্দিন সুখ-দুঃখের জীবনের পরিচালক হিসাবে ইহারা কতকগুলি Orisha 'ওরিশা' বা দেবতার কল্পনা করে। এই ওরিশাদের সংখ্যা কোনও মতে ২০১, কোনও মতে ৪০১, কোনও মতে ৬০০। অনেক য়োরুবার ধারণা, ওরিশারা প্রথমে মানুষ ছিলেন, পরে নিজ শক্তি বা গুণদ্বারা দেবতার পদে উন্নীত হন। কিন্তু য়োরুবা দেবকাহিনী বা পুরাণ-কথা মতে, ওরিশাদের উৎপত্তি ও ইতিহাস অন্য দেশের দেবতাদেরই মত। ওলোরুঁ পৃথিবী-পালনের জন্য একজন পুরুষ দেবের সৃষ্টি করিলেন—Obatala 'ওবাতালা' অর্থে 'সাদা-ঠাকুর', 'শ্বেতিমরাজ', বা 'জ্যোতিরীশ্বর'; এবং ওবাতালার পত্নী হইলেন Odudua 'ওদুদুআ' অর্থাৎ 'কৃষ্ণবর্ণা' বা 'কালী'—এই দেবী 'ওদুদুআ', ওলোরুঁর সৃষ্টা নহেন, তিনি প্রকৃতি, অনন্তকাল ধরিয়া পৃথক্ অবস্থান করিয়া আসিতেছেন। ওবাতালা-ওদুদুআ কতকটা আমাদের পুরুষ-প্রকৃতি বা শিব-শক্তির মত। ওবাতালাকে য়োরুবারা শুচিতার ও কল্যাণের দেবতা বলিয়া পূজা করে, তিনিই শিব বা মঙ্গলময়, মানবের স্রষ্টা ও ত্রাতা; কিন্তু ওদুদুআর চরিত্র ইহাদের হাতে ঘৃণ্যরূপে চিত্রিত হইয়াছে। ওবাতালা হইতেছেন দ্যৌষ্পিতা, ওদুদুআ পৃথিবী-মাতা,—তাই পৃথিবীর পাপ ও পঙ্কিলতা ওদুদুআর চরিত্রে আরোপিত হইয়াছে—ওদুদুআ পতি ওবাতালাকে ত্যাগ করিয়া মৃগয়াপ্রিয় জনৈক অন্য দেবতাকে আশ্রয় করেন। ওবাতালা ও ওদুদুআর এক পুত্র Aganju 'আগাঁজু' ও এক কন্যা Yemaja 'য়েমাজা'। ইহারা পরস্পরের সহিত বিবাহ-সূত্রে বদ্ধ হয়। ইহাদের দুই সন্তান Obalofun 'ওবালোফুঁ' অর্থাৎ 'বাক্‌পতি' এবং Iya 'ইয়া' অর্থাৎ 'মাতা' হইতেছে আদি মানব-মানবী। ইহাদের আর এক পুত্র Orungan 'ওরুঙ্গান'-এর দুর্বৃত্ততার ফলে য়েমাজার মৃত্যু হয়। য়েমাজার মৃত্যুর পরে তাহার দেহ স্ফীত হয়। দেহের রক্ত-মাংস-মেদ হইতে পনের জন প্রধান দেবতার উদ্ভব হয়। এই দেবতারা এখন য়োরুবা জাতির পূজিত। ইহাদের অনুরূপ দেবতা পশ্চিম আফ্রিকার অন্যজাতিগুলির মধ্যেও আছেন।

এই পনের জন দেবতার মধ্যে প্রধান হইতেছেন এই কয়জন।

[১] Shango 'শাঙ্গো'—ইনি বজ্রের দেবতা, য়োরুবারা ইঁহার খুবই পূজা করে। আকাশে মেঘের মধ্যে এক পিত্তলময় প্রাসাদে শাঙ্গো নিজ গণের দ্বারা পরিবৃত হইয়া বাস করেন; তাঁহার অসংখ্য ঘোড়া আছে। শাঙ্গোর রূপ মূর্তিতে প্রদর্শিত হয়—শ্মশ্রুমান্ দেবতা, ঘোড়ায় চড়িয়া যাইতেছেন। শাঙ্গোর তিন স্ত্রী—তিনজনেই য়েমাজার দেহ হইতে সম্ভূত,তিনজনেই তিনটী নদীর

অধিষ্ঠাত্রী দেবী ; ইঁহাদের মধ্যে প্রধানা হইতেছেন Oya 'ওইয়া', ইনি বিশাল Niger নাইগার নদীর দেবী। (৪৩৬ পৃষ্ঠায় চিত্র ৪,৫ ও ৬ দ্রষ্টব্য)। শাঙ্গো পাপের শাস্তি দেন। শাঙ্গোর অন্যতম অনুচর হইতেছে Oshumare 'ওশুমারে'বা'রামধনু'—ইহার কার্য হইতেছে পৃথিবী হইতে শাঙ্গোর পিত্তলময় প্রাসাদে মেঘমালার মধ্যে জল শোষণ করিয়া লওয়া। Double-axe বা যোড়ামুখ কুড়ালি শাঙ্গোর বিশেষ বর্ণ-চিহ্ন। শাঙ্গোর সম্বন্ধে এই স্তোত্রটী খুবই জনপ্রিয়—

> হে শাঙ্গো, তুমিই প্রভু !
> তুমি অগ্নিময় প্রস্তরখণ্ড-সমূহ হাতে করিয়া লও,
> পাপীদিগকে শাস্তি দিবার জন্ত !
> তোমার ক্রোধ প্রশমন করিবার জন্ত !
> ঐ প্রস্তর যাহাকেই লাগে, তাহার বিনাশ ঘটে ;
> অগ্নি বনানীকে খাইয়া ফেলে,
> বৃক্ষরাজি ভগ্ন হয়,
> সমস্ত প্রাণী বিনষ্ট হয়॥

[২] Ogun 'ওগূ'—লৌহ, যুদ্ধকার্য এবং শিকারের দেবতা। যে কোনও লৌহখণ্ডে ইঁহার অধিষ্ঠান। বৃত্তিতে যাহারা লোহার বা কামার এবং সিপাহী ও শিকারী, তাহাদের দ্বারায় বিশেষ ভাবে পূজিত। [৩] Orishako 'ওরিশাকো', Orisha Oko অথবা Oko 'ওকো'—কৃষির দেবতা, পুরুষ। অন্য নিগ্রো জনগণের মত য়োরুবাদের মধ্যে কৃষিকার্য্য মেয়েরাই করিত, সেইজন্ত 'ওকো'র পূজকেরা বেশীর ভাগই স্ত্রীলোক। [৪] Shopono 'শোপোনো' বা 'শ-প-ন'—বসন্ত-মারীর দেবতা। [৫] Olokun 'ওলোকুঁ' বা 'সাগর পতি'—সমুদ্রের দেবতা, বা বরুণ (৪৩৬ পৃঃ, ১ম চিত্র)। (৬) Ifa 'ইফা'—ভবিষ্যদ্বাণীর দেবতা—ইনি শাঙ্গো ও তৎপত্নী ওইয়া-র পরেই জনপ্রিয় দেবতা। (৭) Aroni 'আরোনি'—বনদেবতা ; ইঁহার সম্বন্ধে য়োরুবাদের কল্পনা বিশেষ কবিত্বময়। এতদ্ভিন্ন অন্য দেবতাদেরও পূজা আছে।

উপর্য্যুক্ত Orisha ওরিশা বা দেবতাদের পরেই হইতেছে প্রেত ও পিতৃপুরুষদের সম্মান। ইহাদের মধ্যে নানা প্রকারের প্রেতের কল্পনা আছে। পিতৃলোক হইতে প্রেতগণ পৃথিবীতে আগমন করে। এক শ্রেণীর লোক প্রেতের অভিনয় করিয়া ইহাদের শ্রাদ্ধের অনুরূপ ধর্মানুষ্ঠানে সাহায্য করিয়া, দক্ষিণা গ্রহণ করে। যাহারা প্রেত সাজিয়া আসে তাহাদের Oro 'ওরো' বলে। ইহারা রাত্রে সারা-গা-ঢাকা উলুখড়ের বা অনুরূপ বস্তুর পোষাক পরিয়া বাহির হয়, এবং ছিদ্র-যুক্ত ডিমের আকারের ছোট কাঠের ফিরকী বা ফলায় দড়ি বাঁধিয়া, সেই দড়ি দিয়া কাঠের ফলাটিতে বোঁ-বোঁ করিয়া ঘুরাইয়া তদ্দ্বারা এক অদ্ভুত আওয়াজ করিতে করিতে আসে। এইরূপ ঘুরনী-ফলার গায়ে কখনও-কখনও পুরুষ বা স্ত্রী-মূর্তি খোদা থাকে (চিত্র ২,৩)। এই ফলাগুলি ৬ ইঞ্চি হইতে ২॥ ফুট পর্যন্ত লম্বা হয়, এবং ঘুরাইবার কালে আকার অনুসারে ইহা হইতে সূক্ষ্ম বা গম্ভীর ধ্বনি নির্গত হয়। এইরূপ ঘুরনী-ফলাকে ইংরেজীতে Bull-roarer বলে ; অষ্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসীদের মধ্যে এবং অন্য বহু আদিম জাতির মধ্যে ধর্মানুষ্ঠানে ইহার রেওয়াজ আছে। আমাদের হিন্দু অনুষ্ঠানে এ জিনিস অজ্ঞাত। ইহাদের পূজার রীতিতে এমন অনেক উপকরণ ও ক্রিয়া প্রচলিত, যাহা কেবল ইহাদের মধ্যেই মিলে—সে-সকল ইহাদের ইতিহাস ও প্রাকৃতিক আবেষ্টনীর ফল।

দেবতা ও প্রেত ভিন্ন, য়োরুবারা পাপ-পুরুষ বা শয়তান Eshu 'এশু'র (অর্থাৎ 'অন্ধকারের রাজা'র) পূজা করে।

য়োরুবাদের শিশুকালেই পুরোহিতেরা ঠিক করিয়া দেন, কোন্ বিশেষ দেবতা তাহার ইষ্টদেবতা হইবে—সারা জীবন সেই দেবতাকে বিশেষ ভাবে পূজা করিতে হইবে। প্রভাতে উঠিয়া প্রত্যেক আস্তিক য়োরুবা নিজ ইষ্টদেবের নাম লইয়া তাঁহাকে প্রণাম করে। জলে নামিয়া স্নান করিবার সময়ে অনেকে দেবতার উদ্দেশে মন্ত্র বলিতে থাকে—মন্ত্র অবশ্য য়োরুবা ভাষায়। ইহাদের মন্দির খড়ের-চালে ঢাকা সাধারণ কুটীর মাত্র, যে রকম কুটীরে বা গৃহে ইহারা নিজেরা অবস্থান করে। সাধারণের জন্য বিভিন্ন দেবতার মন্দির থাকে, আবার সম্পন্ন বা দরিদ্র গৃহস্থের বাড়ীর আঙ্গিনায় বা ঠাকুর-ঘরে ঠাকুরের মূর্তি থাকে। আবার বৃক্ষরাজিময় কোনও পবিত্র স্থান মন্দিরের মত ব্যবহৃত হয়। গাছকে আশ্রয় করিয়াও পূজা হয়। সাধারণ খাদ্য-সম্ভার, ফল প্রভৃতি উৎসর্গ করিয়া, মদ ঢালিয়া, ডিম ভাঙ্গিয়া এবং নানা প্রকার পশু ও পক্ষী জবাই করিয়া পূজা হয়। আমরা যেমন দেবতাকে ফুল দিয়া পূজা করি, সেরূপ পুষ্পদানের রীতি ইহাদের পূজায় অজ্ঞাত। বিশেষ দেবতার পুরোহিতেরা বিশেষ প্রকারের বর্ণচিহ্ন ধারণ করে। যেমন, ওবাতালার পুরোহিতেরা কেবল সাদা রঙের কাপড় পরে, গলায় শ্বেতবর্ণের মালা ধারণ করে। ভূমিতে মাথা ঠেকাইয়া প্রণাম করার বিধি আছে। পশু-বধ করিয়া হয় সমস্ত অগ্নিসাৎ করা হয়, না হয় তাহার রক্ত লইয়া দেবতার দ্বারে মাখানো হয়। ফল ও খাদ্যের নৈবেদ্য ও বলির পশুর মাংস প্রসাদ-রূপে উপাসকদের দ্বারা ভক্ষিত হয়। সাধারণ-অনুষ্ঠান-মূলক পূজা ভিন্ন, ব্যক্তিগত প্রার্থনারও রীতি সুপরিচিত—ওলোরুঁ, শাঙ্গো, ইফা প্রভৃতি বিশেষ দেবতার নিকট রুচি-মত লোকে প্রার্থনা ও আত্মনিবেদন করে।

ইহাদের মধ্যে আত্মার অবিনাশিত্বের পুরা বোধ আছে।

য়োরুবাদের মতে মানুষ নিজ পাপপুণ্যের ফল-ভোগ করে। সঙ্গে-সঙ্গে পুনর্জন্মবাদও ইহারা মানে। তবে পারলৌকিক ব্যাপার সম্বন্ধে ইহাদের বিচার খুব গভীর নহে। মানবাত্মার শেষ বিশ্রাম-স্থান, Olorun ওলোরুঁ বা পরমেশ্বর।

দেখা যাইতেছে যে, সুদূর পশ্চিম-আফ্রিকার তথা-কথিত বন্য বর্বর নিগ্রো মানুষ আমাদেরই মত একই ভাবে আশা আশঙ্কা জুগুপ্সা আকাঙ্ক্ষার দ্বারা চালিত, এবং সহজ ও স্বাভাবিক ভাবে যে ধর্ম-মত তাহারা গড়িয়া তুলিয়াছে, তাহার সঙ্গে আমাদের ধর্ম-মতের অনেক সাদৃশ্য আছে। সুসভ্য, শিক্ষিত ও পরমত-সহিষ্ণু হিন্দুর দ্বারা প্রভাবান্বিত হইলে, ইহাদের আধ্যাত্মিক জীবন কিরূপ দাঁড়াইত, তাহা বলা কঠিন ; তবে এটুকু মনে হয়, আমাদের সংস্কৃতির মজ্জায়-মজ্জায় যে চিন্তাধারা বিদ্যমান, যে "যত মত, তত পথ," তাহার কল্যাণে, য়োরুবারা ও অনুরূপ অন্য আফ্রিকান জাতির লোকেরা, নিজের ধর্মের মধ্য দিয়াই আধ্যাত্মিক মুক্তির সন্ধান পাইত, এবং অন্য ধর্মের অন্ধ অসহিষ্ণুতার ফল-স্বরূপ আত্ম-দৈন্য-স্বীকারের অপমান হইতে বহুল পরিমাণে রক্ষা পাইত।

আত্মহত্যা

শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্র

শকুন্তলা প্রদীপটি জ্বালিয়া লইয়া ঘরে ঘরে সন্ধ্যা দিয়া বেড়াইতে-ছিল, সহসা সন্ধ্যা আসিয়া সংবাদ দিল, দিদি অমলদা আসছে !

মুহূর্ত্তের জন্ত শকুন্তলার মুখখানা লাল হইয়া উঠিয়াই একেবারে ছাইয়ের মত বিবর্ণ হইয়া গেল। চৌকাঠের উপরই দাঁড়াইয়া পড়িয়া সে কহিল, সে কি রে ?···ধ্যেৎ !

হ্যাঁ গো দিদি, সত্যি। ঐ গলির মোড় পেরোচ্ছে দেখে এলুম, তুমি জান্‌লা দিয়ে দেখো না, এতক্ষণে বোধহয় এসে পড়েছে—

কিন্তু জানলা দিয়া আর দেখিতে হইল না, প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই একটি অত্যন্ত সুপরিচিত কণ্ঠের ডাক শকুন্তলার কানে আসিয়া পৌঁছিল, আরে, এরা সব গেল কোথায়—ও সন্ধ্যা, বাড়ী ছেড়ে ভাগ্‌ল নাকি ?

শকুন্তলা অকস্মাৎ যেন ব্যাকুল হইয়া উঠিল, একবার নিজের পরণের কাপড়টার দিকে আর একবার আসবাবগুলার দিকে চোখ বুলাইয়া লইয়া চাপা-আকুল কণ্ঠে কহিল, সন্ধ্যা লক্ষ্মী দিদি আমার, ওকে একটু ছাদে বসা, হঠাৎ যেন ঘরে আনিস নি—যা ভাই! এবং পরক্ষণেই প্রায় ছুটিয়া আর একটা ঘরে গিয়া ঢ়ুকিল।

সন্ধ্যা কিন্তু তখনই নীচে নামিতে পারিল না, দিদির এই আকস্মিক ভাবান্তরের কোন কারণ খুঁজিয়া না পাইয়া কতকটা মূঢ়ের মতই দাঁড়াইয়া রহিল। অমল তাহার বড়দিদির দেওর এবং এ বাড়ীর সকলেরই প্রিয় অতিথি। বিশেষ করিয়া, সন্ধ্যা তাহার জ্ঞান হইবার পর হইতেই দেখিয়া আসিতেছে যে, এই প্রিয়দর্শন এবং প্রিয়ভাষী তরুণটিকে দেখিলে তাহার মেজদি একটু বেশীই খুশী হয়। তাহার জ্ঞান অবশ্য বেশী দিন হয়ও নাই—বছর দুই-তিন হইবে—কিন্তু তখন ছিল অমল কিশোর মাত্র, এখন সে যৌবনে পা দিয়াছে, যদিও তাহার মুখের মধ্য হইতে কৈশোরের কমনীয়তা এখনও বিদায় লয় নাই, দেখিলেই কেমন একটা স্নেহের সঞ্চার হয় মনে মনে। সন্ধ্যাও 'অমলদা'কে ভালবাসিত, সুতরাং সে অনেক দিন পরে তাহাকে দেখিতে পাইয়া খুশী মনেই দিদিকে সংবাদটা দিতে আসিয়াছিল—হঠাৎ দিদির এই অদ্ভুত আচরণে অত্যন্ত দমিয়া গেল—কেমন যেন একটা অপ্রস্তুতভাবে সেইখানেই দাঁড়াইয়া রহিল। ততক্ষণে অমলই উপরে উঠিয়া আসিয়াছে। আন্দাজে আন্দাজে ছাদটা পার হইয়া একেবারে দুয়ারের কাছে আসিয়া কহিল, এ কী রে, এখানে এমন চুপটী ক'রে দাঁড়িয়ে আছিস কেন? ভূত দেখেছিস নাকি? মাউই-মা কৈ? আর তোর মেজদি—?

সন্ধ্যা ঢোঁক গিলিয়া কহিল, মা গা ধুতে গেছেন আর মেজদি সন্ধ্যে দিচ্ছে—আ—আপনি বসুন না অমলদা। চলুন, আমি মাদুর পেতে দিচ্ছি ছাদে—

ইস! ভারী যে খাতির করতে শিখেছিস্ দেখছি। যা যা, আর মাদুর পাততে হবে না, আমি এখানেই বসছি।

সন্ধ্যা কোন প্রকার বাধা দিবার পূর্ব্বেই সে সেই প্রকাণ্ড ভাঙ্গা তক্তাপোষটায় অতিশয় মলিন শয্যার উপরেই বসিয়া পড়িল। কহিল, আমার জন্তে ব্যস্ত হ'তে হবে না, এখন তোমার মেজদিকে সংবাদ দাও, তিনি দয়া ক'রে আমাদের অন্ধকার থেকে আলোতে নিয়ে যান্। তাঁকে বলো যে এ ঘরটাও তাঁর সন্ধ্যে দেওয়ার এলাকার মধ্যে পড়ে—

কিন্তু ইহার পূর্ব্বের একটা ইতিহাস আছে; প্রায় সব গল্পেরই থাকে।

শকুন্তলার বাবা হরিপ্রসাদবাবুরা চার ভাই, তাহার মধ্যে হরিপ্রসাদ এবং তাঁহার মেজো ভাই জ্যোতিপ্রসাদ উপার্জ্জন করিতেন, আর দু-ভাই দেশের বাড়ীতেই বসিয়া খাইতেন। জমি-জমা যাহা কিছু ছিল তাহাতে ভাতটা হইত, বাকী হরিপ্রসাদ জ্যোতিপ্রসাদের অনুগ্রহে চলিত। হরিপ্রসাদ কাজ করিতেন ভালই, প্রায় শ'খানেক টাকা মাহিনা পাইতেন। কিন্তু মানুষটি খুব সৌখীন ছিলেন বলিয়া সঞ্চয় প্রায় কিছুই করিয়া যাইতে পারেন নাই। কলিকাতায় বাসা ভাড়া দিয়া, এখানে মাসিক দশ টাকা হিসাবে পাঠাইয়া, ভাল মাছ এবং ল্যাংড়া আম খাইয়া, ছেলেমেয়েদের ভাল কাপড-জামা পরাইয়া ও স্কুলের খরচ জোগাইয়া বরং প্রতি মাসে তাঁহার কিছু ঋণই হইত। বলা বাহুল্য যে জ্যেষ্ঠা কন্তার বিবাহে যে ঋণ তিনি করিয়াছিলেন তাহার কিছুই শোধ দিতে পারেন নাই। ভবিষ্যতে উন্নতির আশা ছিল, হয়ত বা সেই উন্নতির পথ চাহিয়াই নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়াছিলেন, ইহারই মধ্যে যে জীবনের অধ্যায়ে পূর্ণচ্ছেদ পড়িতে পারে তাহা তিনি ভাবেন নাই।

কিন্তু কার্য্যত তাহাই ঘটিল। হঠাৎ তিনদিনের জ্বরে যখন তিনি মারা গেলেন তখন শ্মশান খরচার জন্তই অলঙ্কার বাঁধা দিতে হইল। অফিসে যে ঋণ ছিল তাহাতেই প্রভিডেণ্ট ফণ্ডের টাকা শেষ হইয়া গেল। গৃহিণীর সামান্ত অলঙ্কার জ্যেষ্ঠা কন্তার বিবাহেই গিয়াছিল, কন্তাদের কাহারও ও বস্তু ছিলই না—সুতরাং ঘটি-বাটী বেচিয়াই, বলিতে গেলে, স্বামীর শ্রাদ্ধ শেষ করিয়া ভদ্রমহিলা দুই কন্তা ও এক শিশু পুত্রের হাত ধরিয়া দেশের বাড়ীতে ফিরিয়া আসিলেন।

হরিপ্রসাদের ভাইয়েরা অকৃতজ্ঞ নন্, তাঁহারা যথাসাধ্য যত্নের সহিতই ইঁহাদের গ্রহণ করিলেন বটে কিন্তু তাঁহাদের সাধ্য আর কতটুকু? জ্যোতিপ্রসাদ ভাইদের যা সাহায্য করিতেন তাহার উপর আর পাঁচটি টাকা বাড়াইয়া দিলেন, তাহার বেশী আর তাঁহার সাধ্য ছিল না। কিন্তু তাহাতে চারিটি প্রাণীর ভরণ-পোষণ চলে না। শকুন্তলা সেকেণ্ড ক্লাসে পড়িতেছিল তাহার আর সন্ধ্যার পড়াশুনা বন্ধ হইলই, তাহাদের ছোট ভাই অভয়েরও লেখাপড়া শিখিবার কোন সম্ভাবনা রহিল না। শুধু উদরান্নের জন্তই শকুন্তলা ও তাহার মায়ের অনেকগুলি ভাল-ভাল স্যাড়ী

আবার দোকানে চলিয়া গেল। শকুন্তলার ভগ্নিপতির অবস্থাও এমন কিছু স্বচ্ছল নয়, আর সেখানে হাত পাতাও তাহাদের আত্মসম্মানে বাধে।

এ আজ প্রায় মাস ছয়েকের কথা। ইহার মধ্যে জামাতা বিমল বার দুই ইহাদের খবর লইতে আসিলেও অমল আসিতে পারে নাই। তাহার পরীক্ষা ছিল সামনে, সেইজন্ত সে কলিকাতাতেই থাকিত, দেশে আসিবার তাহার প্রয়োজনও ছিল না। কলিকাতায় থাকিতে সে প্রায় নিয়মিতভাবেই ইহাদের বাড়ীতে আসিত, শকুন্তলার সহিত তাহার একটা বেশ সখ্যের সম্বন্ধই দাঁড়াইয়া গিয়াছিল। শকুন্তলার পড়াশুনায় আগ্রহ ছিল খুব বেশী, অমলের দ্বারা সেদিকে অনেকটা সাহায্য হইত, অমলেরও এই প্রিয়ভাষিণী বুদ্ধিমতী মেয়েটির সাহচর্য্য ভালই লাগিত—যদিচ রূপগৌরব শকুন্তলার বিশেষ ছিল না।

এ-হেন অমলকে আজ এতদিন পরে আসিতে দেখিয়া শকুন্তলা বিব্রত হইয়া পড়িল তাহার কারণও ঐ দারিদ্র্য। অমল ছেলেটিও সৌখীন, যেমন আর পাঁচজন কলেজের ছেলে হইয়া থাকে—সিল্কের পাঞ্জাবী—স্নো—পাউডার—হাতঘড়ির একটা পুতুল! বিশেষ করিয়া ইদানীং যখন সে শকুন্তলাদের বাড়ীতে আসিত তখন তাহার প্রসাধনের পারিপাট্য আর একটু বৃদ্ধি পাইত। সেই অমলকে এই অপরিসীম দারিদ্র্যের মধ্যে কল্পনা করিয়া শকুন্তলা লজ্জায় যেন মরিয়া গেল। শুধু কি তাই, তাহার নিজের পরণে যে কাপড়টা আছে সেটাও বোধ হয় পনেরো দিন সাবানের মুখ দেখে নাই—পয়সার অভাবে সোডা-সাজীমাটীও আনানো যায় নাই।

সে এপাশের ঘরে আসিয়া ব্যাকুলভাবে আলনার দিকে চাহিল। না, ভদ্র কাপড় একখানাও নাই। হয়ত এখনও বাক্সটা খুঁজিলে একখানা ফরসা কাপড় বাহির হইতে পারে কিন্তু তাহার চাবীও মায়ের কাছে, তাছাড়া মাকে কৈফিয়ৎই বা কি দিবে? মা যদি হঠাৎ বলিয়া বসেন যে, 'অমল ঘরের ছেলে, ওকে দেখে ফরসা কাপড় পরবার কি দরকার হ'লো?' তখন কি বলিবে সে?…

অকস্মাৎ শকুন্তলার আপাদমস্তক ঘামিয়া উঠিল। এপাশে একটা ঈষৎ জীর্ণ নীলাম্বরী সাড়ী আল্‌নার উপর কোঁচানো আছে বটে কিন্তু সেটাও কয়েক দিন ব্যবহারের পর তুলিয়া রাখায় ফলে ভেপে-ময়লায় দুর্গন্ধ ছাড়িয়াছে—অথচ যেটা সে পরিয়া আছে সেটা এতই ময়লা যে কোনমতে ঘরের লোকের কাছেও পরিয়া থাকা যায় না। নীলাম্বরীতে দুর্গন্ধ হইলেও ময়লা বোঝা যায় না, এই একটা সুবিধা—

পাশের ঘর হইতে অমলের কণ্ঠস্বর শোনা গেল, ব্যাপার কি? তোমার মেজদি আর নরলোকের মুখদর্শন করবেন না নাকি? হলা, সখি শকুন্তলে, দীনজনকে দয়া করো—এঘরেও একটা আলো দাও!

কানের কাছটা অকারণেই শকুন্তলার গরম হইয়া উঠিল। শকুন্তলা নামটা লইয়া অমল যতদিন, যতবারই ঠাট্টা করিয়াছে, ততবারই শকুন্তলা এমনি একটা উষ্ণতা অনুভব করিয়াছে—এবং কে জানে কেন ততবারই তাহার মনে হইয়াছে যে অমল নিজেকে দুষ্মন্ত বলিয়া পরিহাসটা সম্পূর্ণ করিতে চায় কিন্তু পারে না, লজ্জায় বাধে—

সে প্রায় মরিয়া হইয়াই নীলাম্বরীটা টানিয়া লইল। কিন্তু না, এ বড়ই দুর্গন্ধ, বহু দূর হইতেও পাওয়া যাইবে!…অগত্যা সে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া আরক্তমুখে লণ্ঠনটা লইয়া সেই অবস্থাতেই এ ঘরে পা দিল।

আরে, আসুন, আসুন, দেবী শকুন্তলে! তবু ভাল যে অভাজনদের মনে পড়ল—

কিন্তু এই চাপল্য এবং অমলের পারিপাট্যযুক্ত প্রসাধন এই আবহাওয়ার মধ্যে এতই বেমানান্ ঠেকিল, অন্তত শকুন্তলার কাছে যে, সমস্ত ব্যাপারটা যেন চাবুকের মত তাহাকে আঘাত করিল। জরাজীর্ণ প্রকাণ্ড ঘর, বোধহয় ত্রিশ বৎসরের মধ্যে তাহাতে চূণের কাজ পর্য্যন্ত হয় নাই—জানলা দরজার অর্দ্ধেক নাই—আর তাহারই মধ্যে পায়াভাঙ্গা বিরাট এক তক্তাপোষ কোন মতে সাজানো ইটের উপর দেহরক্ষা করিয়া ঘরের অর্দ্ধেকটা জুড়িয়া আছে। তাহার উপর কয়েকটা কাঁথা ও তোষকের অতিশয় মলিন একটা শয্যা এবং তাহারও উপরে অসংখ্য ছারপোকার দাগে কলঙ্কিত একটা শত-ছিন্ন মশারী খানিকটা ঝুলিয়া আছে। ঘরের মেঝেতে খানিকটা সিমেণ্টে ও খানিকটা খোয়াতে বিচিত্রিত। এ পাশে একটা ভাঙ্গা র‍্যাকে শকুন্তলার পিতামহের আমলের খানকতক পুঁথি ও বই কীটদষ্ট ও ধূলিমলিন অবস্থায় স্তূপাকার করা, ওধারে বিভিন্ন তাকে কতকগুলা ডেরো-ঢাক্‌না, ভাঙ্গা ফুটা জিনিষের বিচিত্র সমাবেশ। সমস্তটা জড়াইয়া এমনই শ্রীহীন এবং লজ্জাকর যে নিমেষমাত্র সেদিকে চাহিয়া লজ্জায় অপমানে শকুন্তলার মুখটা প্রথমে আরক্ত পরে বিবর্ণ হইয়া গেল। সে কিছুতেই মুখ তুলিয়া অমলের দিকে চাহিতে পারিল না; ঘরে ঢুকিবার সময়েই একবার শুধু সিল্কের পাঞ্জাবী সোনার বোতাম এবং রূপালী ঘড়ির একটা মিলিত দীপ্তি বিদ্যুৎ-ঝলকের মত চোখের সম্মুখ দিয়া খেলিয়া গিয়াছিল কিন্তু মানুষটার দিকে সে চাহিতে পারে নাই। সে লণ্ঠনটা ঘরের মেঝেতে নামাইয়া রাখিয়া কোনমতে ঢোক গিলিয়া শুষ্ককণ্ঠে কহিল, অমলদা, ভাল আছেন? বসুন, মাকে ডেকে দিচ্ছি—

তাহার পরক্ষণেই, অমল কোন কথা বলিবার পূর্ব্বেই সে দ্রুতপদে ঘর ছাড়িয়া বাহির হইয়া গেল। অমল অত্যন্ত বিস্মিত হইল, এই মেয়েটি বিশেষ করিয়া তাহার আগমনে খুশী হয়, খুশী কেন উজ্জ্বল হইয়া ওঠে, ইহাই সে জানিত, কিন্তু আজ এ কী হইল? সে যতটা সম্ভব পুরাতন দিনের কথা ভাবিয়া দেখিল, কৈ শকুন্তলার রাগ করিবার মত ত কোন ঘটনা ঘটে নাই।…সে তাহার দাদার মুখে ইহাদের অবস্থার কথা সবই শুনিয়াছিল, সুতরাং দারিদ্র্যের এই শোচনীয় রূপ তাহাকে আঘাত করিলেও বিস্মিত করিতে পারে নাই, কাজেই এইটাই যে শকুন্তলার ভাবান্তরের কারণ হইতে পারে, তাহা তাহার একবারও মনে হইল না।

শকুন্তলা নীচে নামিয়া আসিয়া কুয়াতলাতে গিয়াই মাকে সংবাদ দিল, মা, অমলদা এসেছেন।

কে এসেছেন? অমল? ও—আমাদের অমল! একজামিন দিয়ে দেশে এসেছে বুঝি!…বসাগে যা তুই, আমার হয়ে গেছে আমি যাচ্ছি—। কতদিন দেখিনি ছেলেটাকে!

শকুন্তলা তবুও দাঁড়াইয়া রহিল। মায়ের আর একটা দরকারী কথা মনে পড়িল, কহিলেন, ঘরে ত বিশেষ কিছু নেই। ভাখ্ দিকি, কৌটোটায় চারটি সুজি পড়ে আছে কিনা, তাহ'লে উনুনটা ধরিয়ে একটু সুজি ক'রে দে, আর এক পেয়ালা চা—। ভাগ্যিস্ খোকার দুধটা সাবুর সঙ্গে মিশিয়ে ফেলি নি—

অকস্মাৎ শকুন্তলার কণ্ঠস্বর তীব্র হইয়া উঠিল, তুমি কি পাগল হ'লে মা? ঐ ঘি-হীন সুজি, আর ঐ জঘন্য চা—ও আর খাওয়াবার চেষ্টা ক'রো না। ওসব হাঙ্গাম ক'রে কাজ নেই।

মা অবাক হইয়া কিছুক্ষণ মেয়ের মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া কহিলেন, পাগল আমি হয়েছি, না তুই হয়েছিস? অমল আমার পেটের ছেলের মত, ওর কাছে আবার লজ্জা কি? আর ও না জানেই বা কি?...ওর কাছে আমার ঢাকবার ত দরকার নেই কিছু।...মেয়ের যত বয়স বাড়ছে তত যেন ন্যাকা হচ্ছেন। যাও, যা বলছি তাই করো গে—

মায়ের মেজাজ শকুন্তলা জানিত, প্রতিবাদ তিনি একদম সহিতে পারেন না। অগত্যা রান্নাঘরে গিয়া উনানে আঁচ দিবার চেষ্টা করিতে হইল; কিন্তু তাহার যেন ইচ্ছা হইতেছিল ছুটিয়া কোথাও চলিয়া যায় কিংবা কূয়াতে ঝাঁপাইয়া পড়ে। তাহার মন, তাহার দেহ সব যেন কেমন স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিল। আর কিছুরই বোধ ছিল না, শুধু অনুভূতি ছিল একটা দুর্নিবার লজ্জার—

সে উনানে আগুন দিয়া বাহিরে আসিল না, ধোঁয়ার মধ্যেই বসিয়া রহিল। অমল বি, এ পড়িতেছে, খুব সম্ভব পাশও করিবে, সে সুশ্রী, সচ্চরিত্র—সুতরাং তাহার বাবা যে বিবাহে রীতিমত অর্থ দাবী করিবেন তাহা সুনিশ্চিত। শকুন্তলার সহিত তাহার বিবাহের যে কোন সম্ভাবনা নাই তাহা শকুন্তলা নিজেই জানিত; শুধু রূপা নয়, অমলের বাবা ছোট ছেলের বিবাহে রূপও চান। সে কথা কখনও বোধ হয় শকুন্তলা ভাবেও নাই, আশা করা ত দূরের কথা। তবু, তবু, আজ কে জানে কেন তাহার মনে হইতে লাগিল যে তাহার বুকের অনেকখানি যেন কে দলিয়া পিষিয়া নির্ম্মমভাবে নষ্ট করিয়া দিয়াছে। তীব্র একটা আশা-ভঙ্গের বেদনাতে তাহার চিত্ত যেন মূর্চ্ছাহত!

তবে কি, তবে কি মনের অজ্ঞাতসারে মনেরই কোন সঙ্গোপনে সে আশার স্বপ্ন দেখিয়াছিল? কলিকাতায় যখন অমল নিয়মিত তাহাদের বাড়ী আসিত, সেই সব দিনের কথা মনে পড়িল। অমলের কাছে সে পড়া বলিয়া লইত, অমল সেই পাঠচর্চ্চার সঙ্গে সঙ্গে চালাইত সাহিত্যচর্চ্চা! প্রকাশ্যে সকলকার সামনেই চলিত তাহাদের গল্প, ঘণ্টার পর ঘণ্টা। কৈ, কখনও ত প্রণয়ের আভাসমাত্র তাহাদের কথাবার্ত্তায় প্রকাশ পায় নাই। দুই-একবার সে অমলের সঙ্গে একা বেড়াইতেও গিয়াছে, একবার বোটানিক্যাল গার্ডেনে, আর একবার দক্ষিণেশ্বরে—কিন্তু তখনও ত কেহ রঙ্গীণ হইয়া উঠিবার চেষ্টা করে নাই। অমল তাহাকে বলিত—বন্ধু, সেই বন্ধুত্বেই তাহারা সুখী ছিল। তবে? কোথাও কি, কোন কল্পনাতে তাহার রঙ ধরে নাই?...

অকস্মাৎ তাহার গণ্ডকপোল উত্তপ্ত করিয়া বাবার অসুখের পূর্ব্বে শেষ নিভৃত দিনটির কথা তাহার মনে পড়িল। অনেক রাত্রে অমল বাড়ী ফিরিতেছিল, সে এক হাতে পান আর এক হাতে আলো লইয়া সদর দরজা পর্য্যন্ত তাহার সঙ্গে আসিয়াছিল। বিদায়ের আগে পান দিতে গেলে অমল হাত পাতিয়া লয় নাই, তাহার হাতটা ধরিয়া নিজের মুখের কাছে পানসুদ্ধ হাতটা তুলিয়া ধরিয়াছিল; অগত্যা শকুন্তলা পানটা তাহার মুখে পুরিয়া দিতে যায়, আর সেই সময় দিয়াছিল অমল তাহার আঙ্গুলে ছোট্ট একটি কামড়। সামান্য ঘটনা, ছেলেমানুষি ছাড়া আর কিছুই নয়, ছেলেমানুষি অমল অহরহই করিত—তবু শকুন্তলা সেদিন ঘামিয়া উঠিয়াছিল, বহুরাত্রি পর্য্যন্ত ঘুমাইতে পারে নাই।

ভাবিতে ভাবিতে আরও একটা কথা তাহার মনে পড়িল, ঐ শেষের দিকেই, আকস্মিক বজ্রপাতে তাহাদের সুখের বাসা পুড়িয়া যাইবার ঠিক আগেই, রসিকতার ছলে অমল দিয়াছিল তাহার বাহুমূলে সজোরে এক চিম্‌টি। তখন সে আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিয়াছিল বটে, মায়ের কাছে নালিশ করিতেও ছাড়ে নাই—কিন্তু তবু, তাহার বেশ মনে আছে, সেই বেদনাটা তাহার যেন ভালই লাগিয়াছিল এবং সেই কালশিরার দাগটা মিলাইয়া যাইতে সে যেন একটু ক্ষুণ্ণই হইয়াছিল—

সহসা তাহার স্বপ্নভঙ্গ হইল অমলেরই কণ্ঠস্বরে, কিন্তু এর আজ হ'লো কি?

পরক্ষণেই রান্নাঘরের দোরের সামনে আসিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, ও মা গো, এই একঘর ধোঁয়ার মধ্যে চুপটি ক'রে বসে আছে! পাগল নাকি? এবং উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া একটা হাত ধরিয়া তাহাকে হিড় হিড় করিয়া টানিয়া বাহিরে লইয়া আসিল। শকুন্তলা ইহার জন্য একেবারেই প্রস্তুত ছিল না, সে এই আকর্ষণের বেগ সাম্‌লাইতে না পারিয়া একেবারে গিয়া পড়িল অমলের ঘাড়ে। মুহূর্ত্ত মাত্র, তাহার পরই সে নিজেকে সম্বরণ করিয়া সোজা হইয়া দাঁড়াইল কিন্তু তাহার দেহ-মনের এই আঘাতের আকস্মিকতা তাহাকে ক্রুদ্ধ করিয়া তুলিল। সে অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া কঠিন স্বরে বলিল, আমরা গরীব ব'লে কি আমাদের মান-ইজ্জৎও থাকতে নেই মনে করেন?

এ কী হইল? অমল নিজেই ব্যাপারটার জন্য অপ্রতিভ হইয়া পড়িয়াছিল সত্য কথা, কিন্তু এতটার জন্য প্রস্তুত ছিল না। বিশেষত এমন ঘটনা আগেও বহু ঘটিয়াছে, শকুন্তলা রূঢ় কখনই হয় নাই। মৃদু অনুযোগ করিয়াছে, হয়ত বা একটা চড় চাপড়ও দিয়াছে, অধিকাংশ সময়েই উহাকে ছেলেমানুষী বলিয়া উড়াইয়া দিয়াছে। কিন্তু—

অমল আহত কণ্ঠে কহিল, ছি!...তোমার আজ হয়েছে কি বলো ত! এমন করছ কেন?

বহুক্ষণের অপমান, লজ্জা, বেদনায় তাহার কণ্ঠস্বর ভাঙ্গিয়া আসিতেছিল তবু সে প্রাণপণে নিজেকে সংযত করিয়া কহিল, কিছু হয়নি আমার, আপনি যান, ঘরে গিয়ে বসুন গে, আমি যাচ্ছি—

সে আবার রান্নাঘরে ঢুকিয়া পড়িল। উনান তখন প্রায় ধরিয়া আসিয়াছে, জোর করিয়া সে কাজে মন দিল—

একটু পরেই মা আসিয়া বলিলেন, ওরে সন্ধ্যা, তোর অমলদাকে এই ছাদেই একটা মাদুর দেনা, এখানে বসুক—ঘরে যা গরম!...চা হ'লো শকুন্তলা?

অমল মৃদুকণ্ঠে জানাইল, চা থাক্ না মাউই-মা, ওসব আবার হাঙ্গামা কেন ?

মায়ের কণ্ঠস্বর গাঢ় হইয়া আসিল, হাঙ্গামার আর সামর্থ্য কোথায় বাবা, এখন শুধু একটু চা দেওয়া, তাই কষ্টকর ! কিন্তু তাও যদি তোমাদের সামনে একটু না দিতে পারি ত বাঁচব কি ক'রে ?

অমল আর কথা কহিল না। মা রান্নাঘরে ঢুকিয়া কহিলেন, আর কত দেরী রে ?

শকুন্তলা ক্লান্তস্বরে কহিল, তুমি একটু ক'রে দাও না মা, আমার শরীরটা বড্ড খারাপ লাগ্‌ছে—

মা উদ্বিগ্নভাবে তাহার দিকে চাহিয়া কহিলেন, কি হ'লো আবার তোমার ? পারিনা বাবা ভাবতে—

শকুন্তলা কথার জবাব না দিয়াই ঘর হইতে বাহির হইয়া বিনাবাক্যে অমলকে পাশ কাটাইয়া নীচে নামিয়া গেল। মা হালুয়া ও চা প্রস্তুত করিতে করিতে অনেক কথাই বলিয়া যাইতে লাগিলেন, অমল কিন্তু একেবারে স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। সে কী ইহারই জন্য এই দীর্ঘ ছয়মাস দিন গণিয়াছে ! শকুন্তলা যে তাহার মনের কতখানি জুড়িয়া বসিয়াছিল তাহা এই দীর্ঘদিন বিচ্ছেদের আগে বুঝিতে পারে নাই ; তাহারা দেশে চলিয়া আসিবার পর কলিকাতার আকাশ-বাতাস যখন বিবর্ণ-বিস্বাদ ঠেকিল তখনই প্রথম বুঝিতে পারিল। কিন্তু তখন আর দেশে ফিরিবার কোন অজুহাতই ছিল না বলিয়া কোনমতে তাহাকে এই দিনগুলি কাটাইতে হইয়াছে। সবার গোপনে নির্জ্জনে বসিয়া সে দিনের পর দিন স্বপ্ন দেখিয়াছে, আবার কবে প্রথম এই মধুরভাষিণী মেয়েটির দেখা পাইবে ! অথচ—

সে অনেক ভাবিয়াও নিজের কোন অপরাধ খুঁজিয়া পাইল না। মনে পড়ে কলিকাতা ছাড়িয়া আসিবার দিনটিতে সে ষ্টেশন পর্য্যন্ত উহাদের সঙ্গে আসিয়াছিল। গাড়ীতে উঠিয়া বসিয়াও শকুন্তলা কত গল্প করিয়াছে, মায় সাহিত্যচর্চ্চা পর্য্যন্ত বাদ যায় নাই। শরৎবাবুর কী একখানা উপন্যাস দেশে ফিরিবার সময় অমলকে সংগ্রহ করিয়া আনিতে বলিয়াছিল অমল সেকথা ভোলে নাই, বই কিনিয়াই আনিয়াছে। বিদায়ের পূর্ব্বে অমলই যেন একটু মুষড়াইয়া পড়িয়াছিল, শকুন্তলা তাহা লক্ষ্য করিয়া নানা হাস্য-পরিহাসে শেষমুহূর্ত্তগুলিকে উজ্জ্বল ও সহজ করিয়া তুলিয়াছিল। কোথাও ত কোন অসঙ্গতি, কোন ছন্দপতন হয় নাই ! তবে ?

শকুন্তলার কাকীমা কোথায় বেড়াইতে গিয়াছিলেন ; তিনি ফিরিয়া আসিয়া অমলের পাশে বসিলেন, তাঁহার ছেলেমেয়েরাও ঘিরিয়া ধরিল। এই ছেলেটি এ বাড়ীর সকলেরই প্রিয়—অনেকদিন পরে তাহাকে পাইয়া তাঁহারা কলরব করিয়া উঠিলেন। কিন্তু অমলের তখন এসব অসহ্যবোধ হইতেছে, সে যেন পলাইতে পারিলে বাঁচে। কোথাও নির্জ্জনে বসিয়া তাহার একটু দম ফেলা দরকার—

চা ও খাবার শীঘ্রই আসিয়া পৌঁছিল, তাহার তখন খাইবার মত অবস্থা নয়, তবু পাছে সন্ধ্যার মা ক্ষুণ্ণ হন, তাই কোনমতে খানিকটা গলাধঃকরণ করিয়া উঠিয়া পড়িল

এরই মধ্যে চললে বাবা ?

হ্যাঁ মাউই-মা, আবার কাল আসব। আজই এসেছি, গরমে ট্রেণে বড় কষ্ট হয়েছে। সকাল করে শুয়ে পড়ব।

তাহ'লে এস বাবা, আর দেরী ক'রো না।

অমল একটু ইতস্তত করিয়া কহিল, শকুন্তলাকে ত দেখতে পাচ্ছি না, তার জন্যে এই বইটা এনেছিলুম—

কী জানি বাবা, তার আবার কি হ'লো আজ !...ওরে সন্ধ্যা, এই বইটা তুলে রাখ্‌ত—মেজদির বই।—আর বই, এখানে এসে ও পাট ত নে-ই একেবারে। এখন কি ক'রে যে জাতধর্ম্ম বাঁচবে তাই শুধু ভাবছি বাবা, একটা দোজ-বরে তেজ-বরে পেলেও বেঁচে যাই—

কথাটা সজোরে অমলকে আঘাত করিল। এ ব্যাপারটা সে ভাবেই নাই। সত্যই ত, শকুন্তলার বিবাহের বয়স ত অনেকদিনই আসিয়াছে—

সে 'তাহ'লে আসি' বলিয়া নীচের দিকে পা বাড়াইল। আশা ছিল বিদায়ের পূর্ব্বেও অন্তত শকুন্তলার দেখা মিলিবে, কিন্তু কোথাও তাহার কোন সম্ভাবনা রহিল না।

ওরে তোর অমলদাকে আলোটা দেখালি না ? মা কহিলেন।

না, আলোর দরকার নেই, আলো রয়েছে—

অমল তাড়াতাড়ি সিঁড়ি বাহিয়া নামিয়া আসিল। নীচের তলাটা যেমন অন্ধকার তেম্‌নি ভাঙ্গা ও স্যাঁৎসেতে। এখানে প্রায় কেহই থাকেনা, শুধু কাঠ-কুটা আবর্জ্জনা রাখা হয়। সেখানে সে কাহাকেও দেখিবার আশা করে নাই, কিন্তু একেবারে সদরের কাছে গলিপথটায় গিয়া দেখিল একটি কেরোসিনের ডিবা পাশে রাখিয়া দেওয়ালে ঠেস দিয়া চুপ করিয়া বসিয়া আছে শকুন্তলা, দৃষ্টি তাহার কম্পমান দীপ-শিখার উপর নিবদ্ধ।

অমল কাছে যাইতেই সে চমকিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। অমল আরও কাছে আসিয়া তাহার স্বেদসিক্ত হাত দুইটি জোর করিয়া নিজের হাতের মধ্যে ধরিয়া কহিল, কী হয়েছে কিছুতেই বলবে না কুন্তলা ? কেন তুমি এমন বিরূপ হয়ে রইলে আমার ওপরে ?

কুন্তলা ! অমলের আদরের ডাক। অকস্মাৎ একটা প্রবল কান্না যেন শকুন্তলার কণ্ঠ পর্য্যন্ত ঠেলিয়া উঠিল। ক্ষীণ আলোক, তবু তাহাতেই অমলের চক্ষু দুইটি বড় করুণ, বড় অসহায় ঠেকিল। শকুন্তলার বুক কাঁপিয়া উঠিতেছিল কিন্তু সেই করুণ দৃষ্টির পিছনে যে সিল্কের পাঞ্জাবী ও সোনার বোতাম ঝল্‌মল করিতেছিল সেটাও চোখে পড়িতেই সে আবার নিজেকে কঠিন করিয়া লইল। ধীরে ধীরে হাতটা ছাড়াইয়া লইয়া শান্ত, উদাসীনস্বরে কহিল, কিছুই হয়নি অমলদা। আমরা বড় গরীব, দিনরাত অভাবের সংসারে খাটতে হয়, তাই হয়ত সব সময়ে হাসিমুখ রাখতে পারিনা। তাতে যদি ত্রুটী হয়ে থাকে ত মাপ করবেন।

অমলের ওষ্ঠ দুইটি কিছুক্ষণ নীরবে কাঁপিবার পর স্বর বাহির হইল—বিনা অপরাধে কেন যে বারবার আঘাত করছ শকুন্তলা, বুঝতে পারছি না। থাক্—তুমি শান্ত হও, তারপর একদিন আমার যুক্তির কথা শুনব—

কিন্তু শুধু সে চলিয়া যাইতে পারিল না। শুধু শকুন্তলা

অহেতুক একটা ক্রোধে যেন জ্ঞান হারাইল, কঠিনকণ্ঠে কহিল, আর, আপনি যখন তখন আমার গায়ে অমন ক'রে হাত দেবেন না। আমরা বড় গরীব, মায়ের এক পয়সা পণ দেবার সামর্থ্য নেই তা ত জানেনই। কেউ যদি ভিক্ষা দেবার মত ক'রে গ্রহণ করে তবেই তিনি কন্যাদায়ে মুক্ত হবেন। তার ওপর যদি কোন বদনাম ওঠে, তাহ'লে ভিক্ষাও কেউ দিতে চাইবেনা, এটা আপনার বোঝা উচিত।

সেই শকুন্তলা! সংসারের কোন ক্লেদ যাহাকে কোনদিন স্পর্শ করে নাই। অমল আর দাঁড়াইতে পারিলনা। শুধু কপাটটা খুলিবার পূর্ব্বে একবার স্খলিতকণ্ঠে সে কহিল—কিন্তু আমার দ্বারা যে কোন সাহায্যের সম্ভাবনা নেই তাই বা কি ক'রে জানলে কুন্তলা? শুধু অনিষ্টই করতে পারি, উপকার কিছু করতে পারিনা?

না, না, না—চাপা গলায় শকুন্তলা যেন আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল—আপনি যান্—যাঞ্জী যান্। আমার উপকার করা আপনার দ্বারা সম্ভব নয়। আপনি যান্।

অমল বাহির হইয়া গেল। তাহার পদশব্দ কপাটের ওপারে মিলাইয়া যাইতে হঠাৎ যেন শকুন্তলার তন্দ্রা ভাঙ্গিল। সে চমকিত ব্যাকুলভাবে একবার বাহিরের দিকে চাহিল, সেখানে শুধুই অন্ধকার।…অমল সত্যই চলিয়া গিয়াছে।…

কপাটটা বন্ধ করিয়া দিয়া শকুন্তলা অনেকক্ষণ বজ্রাহতের মত স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, তাহার পর মাটির উপর লুটাইয়া পড়িয়া, অমল শেষ যেখানে দাঁড়াইয়া তাহার সহিত কথা কহিয়াছিল, সেইখানে মুখ রাখিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল। মনে হইল আজ সারারাতের মধ্যে এ কান্না যেন থামিবেনা।

উপরে তখন শকুন্তলার মায়ের উদ্বিগ্ন কণ্ঠস্বর শোনা যাইতেছিল।

আবাহন

শ্রীসুনীতি দেবী বি-এ

হে ভিখারী, হে নিঃস্ব শঙ্কর!
ভাল নাকি বাস তুমি
আঁধার শ্মশান ভূমি?
এস তবে বঙ্গদেশে, এই তব উপযুক্ত ঘর।
কোথা তুমি পাবে শূলপাণি
—খোঁজ যদি সারা ধরা—
এত শত শবে ভরা
কোথা পাবে ত্রিভুবনে,—এর বাড়া শ্মশান না জানি।
এ শ্মশানে শব সাধনায়
বসেছে যোগেতে যারা
ঐ শোন ডাকে তারা—
—এস তুমি সদাশিব, অশিবের মাঝে লভ কায়।
বলে তারা—দুর্ভাগা বাঙ্গালী
অলস স্বপনে ভাসি
শুনিতে চাহে না বাঁশী—
শুনাও বিষাণ তারে, জাগাও বাজায়ে করতালি।
তোমার প্রলয় নৃত্য তালে
বাঁচিয়া নাচিবে শব
মৃত্যু করি পরাভব

নির্ব্বাসিতা

জসীম উদ্দীন

সেই মেয়েটির কি হয়েছে আজ, রান্না-ঘরের ফাঁদে
টানিয়া আনিয়া বন্দী করেছে গগন-বিহারী-চাঁদে।
এখন তাহার গানের খাতায়, দৈনিক বাজারের,
জমা খরচের হিসাব লিখিয়া টানিতে হয় যে জের।
যে শিশিতে ছিল সুগন্ধী তেল এখন তাহার মাঝে,
খোকার ওষুধ ভর্ত্তি হইয়া আসিতেছে নানা কাজে।

ছবির খাতায় ধোপার হিসাব, কবিতার নোট ভরি,
খোকার জ্বরের টেম্পারেচার লেখা আছে জড়াজড়ি।
হারমোনিয়াম ইঁদুরে কেটেছে, সুরেলা বেহালাখানি
ফেটে যেতে, কবে দুধ জ্বাল দিতে আথায় দিয়েছে টানি।

নাচার মতন ভঙ্গী করিয়া আল্‌তা-ছোপান পায়
ইস্কুলে যেতে সারা পথখানি জড়াইত কবিতায়।
আজ সেই পায়ে এঘরে ওঘরে শ্রান্ত ক্লান্ত হয়ে
করে ছুটাছুটি দুধের কড়াই ভাতের হাঁড়িটি লয়ে।
সারাটি পাড়ায় ধরিত না যার চঞ্চল হাসি-হার
রুদ্ধ দেয়াল আঙিনার কোণে সময় কাটে যে তার।
সকাল সন্ধ্যা সূর্য্যের দেশ হ'তে সে নির্ব্বাসিতা

কথা, সুর ও স্বরলিপি—জগৎ ঘটক

আগমনী

বড় সাধ ছিল মা—আসবে এবার ঘরে।—
আনন্দে আজ ভবন আমার উঠ্‌বে আবার ভ'রে ॥
বর্ষা-শেষে দুঃখ-আঁধার
ঘুচ্‌বে ওমা মনে সবার ;
সোনার শরৎ হাসবে আবার—সোনার বরণ ধ'রে—
ওমা সে যে তোমার তরে ॥

ওমা ফুরিয়ে এলো দিনের আলো দিন না যেতে হায়—
ফোটার আগে আশা-মুকুল ঝ'রলো অবেলায়।
মহাকালের প্রলয় বিষাণ
গায় যে সদাই মরণ-গান—
আগমনীর সুর মা তোমার শুধুই কেঁদে মরে—
সেথা আজকে তোমার তরে ॥

{ গা গা II রগা -গপা মা | গরা সন্া -সা I সা -রা রা |
{ ব ড় সা॰ ॰ধ ছি ল॰ মা॰ ॰ আ স্ বে

গা রগা -মপা II ম গমা গা -া | -া } া া I গা গা পা | পা পা -া I
এ বা॰ ॰র্ ঘ॰ রে ॰ ॰ } ॰ ॰ আ ন ন্ দে আ জ্

I পা ন্ধা -পা | ধা না -র্না | ধা -না ধা | পা পা -গপা I গমা গা -া | -া গা গা II
ভ ব ন্ আ মা র্ উ ঠ্ বে আ বা ॰র্ ভ' রে ॰ ॰ ব ড়

া া II { গা -া গমা | গমা গরা -া I গা পা পা | ধা পধা -নর্সা I -ধা না -া | -া -া -া I
॰ ॰ { ব র্ ষা শে॰ ষে॰ ॰ দু ॰ খ আঁ ধা ॰॰ ॰ ॰ ॰ ॰ ॰ র্

[-া -া -া -া -া -া]
I পা -না না | র্সা সর্রা -া I র্সা র্সগা র্রগা | র্রা র্সা -া I -া র্সনা ধনধা | -পা -া -া) } I
ঘু চ্ বে ও মা ॰ ম নে ॰ ॰॰ স বা ॰ ॰ ॰॰ ॰॰ ॰ ॰ র্

I না না -া | র্সা র্সা -া I ণা পা ধপা | মা গা -া I সা ন্‌া গা | মা পা -া I জ্ঞা পা -া |
সো না র্‌ শ র ৎ হা স্‌ বে আ বা র্‌ সো না র ব র ণ্‌ ধ' রে •

-া গা মা I পা পনা -া | না র্সা -র্ I না র্সা -া | র্সনা ধা না I র্সা র্সা -র্গা | র্রা র্সা -র্রা I
• ও মা সে যে • তো মা র্‌ ত রে • • ও মা সে যে • তো মা র্‌

না র্সা -া | -া গা গা II সা সা II সা সমা মা | রা সা ণ্‌া I প্‌া পন্‌া সা | সা সা -া I
ত রে • • ব ড় ও মা ফু রি য়ে এ লো • দি নে• র্‌ আ লো • •

I প্‌া -রা রা | গা রগা ধপ ধপা I পমা -া -া | -া -া -া I মা মরমা -গমপা | পা পা -া I
দি ন্‌ না যে তে• • • হা• • • • • য়্‌ ফো টা• • র্‌ আ গে •

পা পর্সা -ণর্সণা | ধা পা -া I পা -পধা প ধপা | ধপা মগা পমা I গমা -রগা -সরা | -া -া -া I
আ শা• • • • মু কু ল্‌ ঝ' • র্‌ লো • • অ• বে লা• • • • • • • র্‌

I রা ররা -া | র্রা র্রা -া I র্রা র্রা -া | র্রা র্সর্রা -র্গা I -া -া -া | -র্রর্গর্রা -র্সা -া I
ম হা• • কা লে র্‌ প্র ল য়্‌ বি ষা • • • • • • • ণ্‌

র্সা র্রা র্সা | ধা ণা -া I পধা মা -পা | না না -র্স I -র্রসা -নর্সা -ধনা | র্সা -া -া I
গা য়্‌ যে স দা ই ম• র • ণ গা• • • • • • ন্‌

I র্সা র্সা -া | ধা ণা -ণ I পা -পধা ধাপ | মগা পমা -গরা I রা রা পা | মপমা মগা -রা I
আ গ • ম নী র্‌ সু • ষ্‌ মা তো• মা • র্‌ শু ধু ই কেঁ• দে• •

রগা গমগা -রগরা | -সা সা সা I রা -মা রা | মা পা -র্সণা I ণধা পা -া | -া গা মা I
ম• রে• • • • সে থা আ জ্‌ কে তো মা র্‌ ত রে • • ও মা

I পা -না না | না ধনা -র্সর্রা I র্সনা র্সা -া | -া গা গা II II
আ জ্‌ কে তো মা• • র্‌ ত রে • • ব ড়

তুমি আর আমি

শ্রীহীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়

তুমি আর আমি—অনন্ত কালের যাত্রী,
চলিয়াছি দিন রাত্রি
পাশাপাশি এই পথে ; তবু ব্যবধান !
এ কি শুধু অদৃষ্ট বিধান ?
আমার আকাশে যবে তন্দ্রাতুর ক্লান্তি নেমে আসে,
শীতের সুতীক্ষ্ণ দাঁত বীভৎস উল্লাসে
কানাড়া বাজায় এই মজ্জাহীন পঞ্জরের দ্বারে,
সঙ্কুচিত জীর্ণ কন্থা পথ্য তার নারে রুধিবারে—
প্রেতিনীর ছিন্ন কেশসম নগ্নদেহে আলস্যে এলায় :
অন্ধকার গৃহকোণে আয়ুহীন সন্ধ্যার প্রদীপ ধীরে নিবে যায়।
অথবা আচ্ছন্ন মেঘে অশ্রু অবিরল—
ঝরে যবে অশান্ত বাদল,
ভেকের উৎসব জাগে আমার অঙ্গনে,
রুগ্ন শিশু ভূমি শয্যা পাশে
সহসা চমকি' ওঠে ভয়ার্ত্ত ক্রন্দনে ;
আমি মুছি দিনান্তের অবসাদ তপ্ত অশ্রু সাথে।
তোমার পেয়ালাখানি ভ'রে ওঠে সুধা সোমরসে—
সে নিশুতি রাতে,
শুভ্র তব শয়নের পালক শিথানে লুটে মৃদুবাস,
অনন্ত বক্ষের তলে প্রেয়সীর কাঁপে লঘুশ্বাস
—পরশ-বিধুর মদিরায় ;
নাই ক্ষোভ হে বন্ধু, সে সম্ভোগের সুরত-সৌরভে
—তিলমাত্র ঈর্ষা মোর নাই।

পুতিগন্ধ সূতিকা আগারে অভ্যর্থনা হ'লো যে শিখায়,
নিবাতে পারে নি তারে অভাগিনী মাতা,
কর্ম ক্লিষ্ট অন্নহীন পিতা পারে নি করিতে প্রতিরোধ :
তাই সে আগুন শিরায় শিরায়
জ্বলেছে আজন্ম মোর, আমরণ জ্বলিবে তেমনি,
জঠরের অন্তস্তলে তিলে তিলে করি ভস্মীভূত
দৃঢ়পেশি, স্নিগ্ধ স্নায়ু, উদগ্র ধমনী !
জীবন প্রভাত হ'তে মরণের পানে
কালের-দুর্বার স্রোত বহিয়া উজানে—
আমি চলি দীর্ঘ পথ ধীরে পদক্ষেপে :
ললাটের বিন্দু বিন্দু স্বেদে ধরিত্রীর বক্ষ ওঠে কেঁপে।
আমার পরশে তাই খুলে যায় জননীর অমৃত ভাণ্ডার,
মোর রক্ত বিধৌনিত স্বেদে সিক্ত হয় মরু ও কান্তার ;
সবুজ ধানের শিরে দুলে ওঠে সুবর্ণের শীষ্ !
মৃত্তিকার মঙ্গল-আশীষ্ !
আমি তারে বাসি ভালো ;
ক্লান্ত মোর নয়ন প্রদীপে জ্বলে আনন্দের আলো।
তারপর অলক্ষ্যে কখন, জন্মান্তের অভিশাপ যত
ফেনিল গরল ধারা ঢালে অবিরত।
আমার সোনার ধান চকিতে মিলায় মোর হৃৎপিণ্ড হ'তে,
আমি অর্দ্ধ পথে—
বিমূঢ় বিস্ময়ে চেয়ে থাকি ; সে-সুবর্ণ রেখা
আচম্বিতে স্বপনের পারে—
বিগলিত ধারে,
তব শুভ্র পেয়ালায় নব নব রূপে দেয় দেখা।
রুগ্ন শিশু চেয়ে থাকে পাণ্ডুর নয়নে, মোর মুখপানে,
কাঁপে তার রক্ত শূন্য ম্লান ওষ্ঠপুট, মানে না সান্ত্বনা।
আমি তার মরণের সাথে ডেকে আনি ঘুম বর্গীদের গানে—
ক্ষুধার্ত পেশিরে তার করি অন্যমনা।

আমার স্বপন
—মিলায় এ ধরিত্রীর তপ্ত বালুচরে,
আমি শূন্য ঘরে—
চেয়ে থাকি অন্যমনা অনাগত ভবিষ্যের পানে ;
আমার বিধাতা নাহি জানে—
কোনখানে হবে তার শেষ,
আমার সমাধি-চিতা কোন্ তটভূমে
উড়াবে নিশ্চিহ্ন করি ক্ষুধিতের বিক্ষোভিত ক্লেশ !
তোমার প্রাসাদ কক্ষে ওঠে যবে সঙ্গীত ঝঙ্কার,
মোর প্রতিবেশী ওই ঝিল্লীদের সাথে মিলাইয়া সুর
—প্রতিধ্বনি তোলে বেদনার ;
সারাটি দিনের ক্লান্তি শ্রান্তি তার নিবে আসে ধীরে
লৌহ-যন্ত্র দানবের কর্কশ মর্মর ধ্বনি ঘিরে,
প্রভাতের কলগীতি হ'তে রজনীর স্তব্ধ ক্ষণব্যাপী
অস্থি মেদ পঞ্জরের চেতনা নিঙাড়ি ;
—অভিশপ্ত আত্মঅপলাপী।
সুরভিত সমীর হিল্লোলে ভেসে আসে তোমাদের বিশ্রব্ধ-আলাপ,
অথবা নিথর ক্ষণে নামে ঘুম আঁখির পাতায়।
তার লাগি নাই ক্ষোভ, হে বন্ধু, সে সুরত-সম্ভোগে
—তিলমাত্র ঈর্ষা মোর নাই।
এ আমার অদৃষ্ট বিধান !
একবার সেই ভাগ্য বিধাতার পাই যদি তিলেক সন্ধান,
এ ভাগ্যের মানদণ্ড তুলে লয়ে আপনার হাতে,
শাসনের দণ্ড তার চূর্ণ করি সহস্র আঘাতে,
শুধাব তাহারে শুধু আমি একবার
—কে তোমার ক'রেছে বিধান ?
পঙ্গু মূক নির্জীব পাষাণ !
বার্দ্ধক্যের জীর্ণতায় অক্ষম ও বাহুবল যদি নিতান্ত স্থবির,
রচ তবে এই বেলা আপনার সমাধি মন্দির ;
নব বিশ্ব সৃজনের ভার তুলে দাও মানুষের হাতে,
যে পারে করিতে চূর্ণ বিধাতার-বিধান নির্মম আঘাতে :
নরকের বন্দীশালা হ'তে
মুক্তি দিতে পারে যে-ই অগ্নিশুদ্ধ অমর আত্মারে
অগ্নিহীন পৃথিবীর গন্ধহীন সূতিকা আগারে।

বিচিত্র বেতার

শ্রীদেব প্রসাদ সেন গুপ্ত

(২)

এবারে বেতার বিজ্ঞানে একান্ত প্রয়োজনীয় দু'একটি জিনিষ, যেমন টেলিফোন, লাউড্‌স্পীকার প্রভৃতি তাদের কথা বলব। আমরা জানি কথা বলবার সময়ে জিভ্‌ নড়ে। মুখের কাছে হাত রেখে পরীক্ষা করলে দেখা যাবে, বাতাসও কাঁপছে। আমাদের জিভের ধাক্কায় বাতাসে ঢেউ সৃষ্টি হয়—সেই ঢেউ গিয়ে আঘাত করে কানের পর্দায়। পর্দাটি তালে তালে কাঁপতে থাকে, আর তাইতেই আমরা কথা শুনতে পাই। শ্রোতা যদি বক্তার কাছ থেকে অনেক দূরে থাকে তখন ব্যবহার করতে হয় টেলিফোন।

আসলে টেলিফোন যন্ত্রটির ভিতরে রয়েছে দু'টি জিনিষ—একটি কথা বলবার মাইক্রোফোন (Microphone) এবং অপরটি শুনবার টেলিফোন (Telephone Receiver) রিসিভার। লাউড্‌স্পীকারকে অনেকটা টেলিফোন রিসিভারেরই বড় সংস্করণ বলা যেতে পারে।

একটি সাধারণ মাইক্রোফোনের ভিতরে থাকে ছোট একটি ইবোনাইটের কৌটা (Ebonite box), কয়লার গুঁড়াতে (Carbon grannules) ভর্ত্তি। কৌটাটির মুখ বন্ধ করা হ'ল একটা টীনের পর্দা (Diaphragm) দিয়ে। এই পর্দাটির সামনেই কথা বলতে হয়। ব্যাটারীর এক মাথা জুড়ে দেওয়া হ'ল টীনের পর্দাটির সাথে। কৌটাটির পিছন থেকে, কয়লা গুঁড়ার ভিতর দিয়ে নিয়ে আনা হ'ল আর একটি তার—তাকে আবার জুড়ে দেওয়া হ'ল রিসিভারের জড়ানো তারের একপ্রান্তের সঙ্গে। ওই জড়ানো তারের অপর প্রান্ত জুড়ে দেওয়া হ'ল ব্যাটারীর সঙ্গে। তা হ'লে ইলেকট্রনদের চল্‌তি পথ হ'ল, ব্যাটারী থেকে কয়লার গুঁড়ার ভিতর দিয়ে, রিসিভারের জড়ানো তার পার হ'য়ে ব্যাটারীতেই ফিরে আসা।

৬নং চিত্র
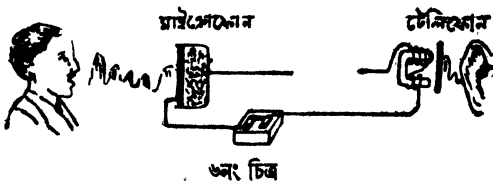
রিসিভারের ভিতরে রয়েছে ঘোড়ার নালের মত ছোট একটি চুম্বক, তারে তার জড়ানো এবং চুম্বকটির সামনে টীনের একটি পর্দা। যতক্ষণ মাইক্রোফোনের পর্দার সামনে কোনও শব্দ করা হচ্ছেনা ততক্ষণ পর্য্যন্তই একটানা ইলেকট্রন স্রোত বইতে থাকবে, রিসিভারে পর্দাটিও থাকবে চুম্বকের আকর্ষণে বাঁধা। কিন্তু কোনও কারণে যদি চুম্বকে জড়ানো তারের মধ্যে বিদ্যুৎপ্রবাহ কম-বেশী হতে থাকে, তা হ'লে চুম্বকের জোরও কম-বেশী হতে থাকবে। ফলে পর্দাটির উপরে চুম্বকটির টানের তারতম্য হবে—পর্দাটিও কম-বেশী আকৃষ্ট হবার ফলেই কাঁপতে থাকবে। পর্দার ধাক্কায় বাতাসে উঠবে ঢেউ।

এখন মাইক্রোফোনের পর্দাটির সামনে কোন রকম শব্দ করলে সেখানকার বাতাস কেঁপে উঠবে, সঙ্গে সঙ্গে কেঁপে উঠবে টীনের পর্দাটি। কিন্তু পর্দাটি কাঁপবার ফলেই ভিতরকার গুঁড়াগুলি কখনও জমাট বেঁধে যাবে আবার কখনও যাবে আল্‌গা হয়ে। সেগুলি যখন জমাট বেঁধে যায়, তখন সেই পথ দিয়ে ইলেকট্রনদের চল্‌তে খুব সুবিধা হয়, তাই বিদ্যুৎপ্রবাহ যায় বেড়ে। আবার সেগুলি আল্‌গা হয়ে গেলে ইলেকট্রনদের পথ চলতে বড়ো কষ্ট পেতে হয়, তাই বিদ্যুৎপ্রবাহও যায় কমে। এই বিদ্যুৎপ্রবাহের (ইলেকট্রন স্রোতের) হ্রাস বৃদ্ধির জন্যই রিসিভারের পর্দাটি কাঁপতে থাকে, তার আঘাতে বাতাসে ঢেউ সৃষ্টি হয় এবং আমরা শব্দের পুনরাবৃত্তি শুনতে পাই। কথা বলা মাত্রই যে শ্রোতা তা শুনতে পায় তার কারণ হ'ল ইলেকট্রনেরা মাইক্রোফোন থেকে রিসিভারে ছুটে যায় চক্ষের নিমেষে।

এবারে আমরা বলব লাউডস্পীকারের কথা। আমরা আগেই বলেছি, কোনও তারের মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হ'লে তার চুম্বকত্ব প্রকাশ পায়—চারিদিকে চুম্বকক্ষেত্র রচিত হয়। আরও দেখা গেছে, বিদ্যুৎপ্রবাহ কম-বেশী হতে থাকলে তার চুম্বকত্বেরও কম্‌তি-বাড়্‌তি হতে থাকে। লাউড্‌স্পীকার আছে অনেক রকম—আমরা আলোচনা করব শুধু মুভিং-কয়েল-লাউড্‌স্পীকারের কথা। কারণ সবদিক দিয়ে বিবেচনা করলে এইটিই শ্রেষ্ঠ বিবেচিত হবে এবং এ'টি ব্যবহৃতও হয় সব চাইতে বেশী। এই জাতীয় স্পীকারের ভিতরে থাকে কাগজের মত একটি চোঙ (cone), তার সরু মুখে জড়ানো থাকে তার কুণ্ডল। চোঙটিকে বসিয়ে দেওয়া হল একটি ঘোড়ার নালের মত চুম্বকের (Horse-shoe magnet) মাঝখানে। অর্থাৎ তাকে বসানো হ'ল বড়ো চুম্বকের প্রভাবের মধ্যে। তার কুণ্ডলের মধ্যে যখন বিদ্যুৎ প্রবাহিত হতে থাকে তখন সেটি চুম্বকের মতই ব্যবহার করে।

একটি চুম্বকের প্রভাবের মধ্যে আর একটি চুম্বক নিয়ে এ'লে যা হয়, এখানেও আসলে ব্যাপার দাঁড়াল তাই। তার কুণ্ডলের মধ্যে বিদ্যুৎপ্রবাহের হ্রাস-বৃদ্ধি হলে (যেমন হয় টেলিফোনের তারকুণ্ডলের মধ্যে) তার চুম্বকত্বেরও কম-বেশী হ'তে থাকে। তাই তার কুণ্ডল এবং বড়ো চুম্বকের পরস্পরের উপরে প্রভাবেরও পরিবর্ত্তন হতে থাকে। ফলে তার কুণ্ডলটি কখনও অল্প কখনও বেশী আকর্ষণের টানে প'ড়ে দুলতে থাকে—সঙ্গে সঙ্গে দুলতে থাকে চোঙ্‌টিও। বাতাসে ঢেউ উঠতে থাকে এই চোঙ্‌এর ধাক্কায়।
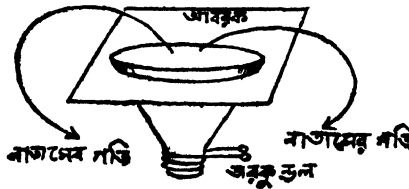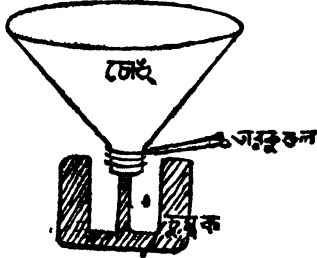
৭নং চিত্র

লাউড্‌স্পীকার থেকে ভালো আওয়াজ পেতে হলে আর একটি জিনিষের প্রতিও লক্ষ্য রাখতে হবে। চোঙ্‌টি যখন সামনের দিকে যায়, তখন তার ধাক্কায় সামনের বাতাস জমাট বেঁধে (Compressed) যায় এবং তার পিছনের বাতাস যায় পাতলা হয়ে (Rarefied) তাই সামনের বাতাস চোঙ্ পার হয়ে চলে আসতে চায় পিছনের ফাঁকা জায়গায়। তাতে চোঙের স্বাভাবিক গতি ব্যাহত হয়, ঠিক যেমনটি দোলা উচিত ছিল, তেমনটি দুলতে পারে না। এই বাধা এড়াইবার জন্যই চোঙ্‌টিকে একটা বড় কাঠের বোর্ডের সঙ্গে এঁটে দেওয়া হয়, বাতাস যাতে অত বড় বোর্ড পার হয়ে ঠিক সময়ে পিছনে গিয়ে বাধা ঘটাতে না পারে। অনেক সময়ে কেবিনেট বাক্সের ভিতরে লাউড্‌স্পীকারটিকে বসিয়েও এই কাজ করা যেতে পারে। এই বোর্ডটিকে বলা হয় আবরক—ইংরাজীতে যার নাম হ'ল Baffle। এখানে আর একটি কথা বলা দরকার ; লাউড্‌স্পীকারের বড়ো চুম্বকটি স্থায়ী চুম্বক হ'তে পারে অথবা বৈদ্যুতিক চুম্বকও (Electromagnet) হতে পারে।

বিদ্যুৎ এবং চুম্বকের গোড়ার কথা যতটুকু আমাদের জানা প্রয়োজন, তা' বলা এবার শেষ হ'ল। এখন আমরা দেখব এই মূল তথ্যগুলি কাজে লাগিয়ে কেমন করে বেতার-যন্ত্র নির্ম্মাণ করা সম্ভব হয়েছে এবং তাতে করে দেশ-বিদেশের কথাও শোনা যাচ্ছে।

বেতারযন্ত্রই হোক আর টেলিফোনই হোক, আমাদের উদ্দেশ্য হ'ল এই যে—একজনে কথা কইবে, গান গাইবে এবং আর একজন তাই শুনবে। জলেতে ঢিল ছুড়লে যেমন ঢেউ সৃষ্টি হয় এবং তারা চারিদিকে

৮নং চিত্র

ছড়িয়ে পড়ে, তেমনি আমরা যখন কথা বলি, আমাদের জিভের-ধাক্কা লেগে বাতাসও কাঁপতে থাকে, বাতাসের মধ্যেও ঢেউ সৃষ্টি হয়। জলের ঢেউএর মতই তারা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। তবে একটি পার্থক্য আছে, সেটি হচ্ছে এই যে, জলের ঢেউ শুধু জলের উপরিভাগেই Surface ছড়িয়ে পড়ে, আর আমাদের বাতাসের ঢেউ ছড়িয়ে পড়ে আশেপাশে, উপরে নীচে—সব দিকে (in all dimensions)। কিন্তু বাতাসের ঢেউ ত আর খুব বেশী দূরে যেতে পারেনা।

সচরাচর আমরা যে সুরে কথা বলি, তা কুড়ি পঁচিশ মাইল কি তার অল্প কিছু বেশী দূর পর্য্যন্তই শোনা যায়। কামানের গর্জ্জনের মত জোরে শব্দ হলে অবশ্য আট দশ মাইল, কী তার চাইতেই কিছু বেশী দূর পর্য্যন্ত শোনা যেতে পারে। কিন্তু তাই বা আর কতদূর! আমরা চাই পৃথিবীর এক-প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তের লোককে কথা শোনাতে। বাতাসের ঢেউ ত আর অতদূর যেতে পারবে না। তাই আমাদের অন্য উপায় অবলম্বন করতে হবে।

সাধারণত জলের সব ঢেউই দেখতে ঠিক একই রকম—কিন্তু বাতাসের ঢেউ তা নয়। তাদের চেহারা সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করছে, কী শব্দ করা হ'ল বা কী গান গাওয়া হ'ল তার উপরে। আমরা আগেই বলেছি, কথার (বাতাসের) ঢেউ বেশীদূর যেতে পারেনা। দূরে নিয়ে যাবার জন্য একজন বাহক চাই। তার গায়ে, গান-বা কথার পোষাক পরিয়ে দেওয়া হয়, বাহক তখন চলল ছুটে দিকে দিকে, শ্রোতা শেষে বাহকের কাছ থেকে গানের পোষাকটি খুলে নেয়। কথাটা আর একটু বিশদ করে বলা যাক। আমরা সবাই গ্রামোফোন যন্ত্র এবং তার রেকর্ড দেখেছি। রেকর্ডটির উপর রয়েছে অসংখ্য গোল-গোল আঁচড়। দেখতে তারা সাধারণ রেখার মত হলেও, তারা হ'ল গ্রামোফোন-পিনের চলতি পথ। এই পথ কিন্তু মোটেই সমতল নয়—উঁচুনীচু গর্ত্ত-খানা প্রভৃতিতে ভরা। এই অসমতল বন্ধুর পথের চেহারা অবিকল বাতাসের ঢেউ-এর চেহারার মত, যে ঢেউ থেকে (অর্থাৎ যে কথা বা গান) রেকর্ডটি তৈরী করা হয়েছে। ঐ উঁচুনীচু পথের উপর দিয়ে যখন পিনটি চলতে থাকে, তখন ঢেউ-খেলান পথের তালে তালে পিনটিও উঠানামা করতে থাকে—সঙ্গে সঙ্গে সাথের সাউণ্ড বক্সটিও ঐ একই তালে দুলতে থাকে। আর সাউণ্ড বক্সের ধাক্কায় বাতাসে ঠিক সেই রকম ঢেউ সৃষ্টি হতে থাকে, যা থেকে রেকর্ড প্রস্তুত করা হয়েছিল। এই শব্দের পুনরাবৃত্তির মধ্যে রয়েছে তিনটি মূলকথা।

প্রথমতঃ কথা বলার সময়ে বাতাসের ঢেউ দিয়ে পিনের চলতি পথকে ঢেউ খেলানো করে দেওয়া হ'ল। আসলে ত আর ঐ পথটিই শব্দ নয়। ঐ পথকে এমন ভাবে ছাপ মেরে দেওয়া হ'ল, যা' থেকে ফের কথার ঢেউ সৃষ্টি করা চলে। এই ছাপ মারাকেই ইংরাজীতে বলা হয় Modulation, বাংলায় বলা চলে স্বরায়ন।

কথার ঢেউ দিয়ে ছাপ মারা যে রেকর্ড তৈরী হল তাকে অবশ্য এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় নিয়ে যাওয়া চলতে পারে—কিন্তু এই নিয়ে যাওয়াতে যে সময়ের প্রয়োজন তা ভাবলেও মন দমে যায়। তাই বৈজ্ঞানিকেরা এমন একজনকে খুঁজে বা'র করেছেন, যার গায়ে কথা-বা-গানের ছাপ মেরে ছেড়ে দিলে সে মুহূর্ত্তের মধ্যে পৃথিবীর অপর প্রান্তে গিয়ে হাজির হবে। এই বাহকটি হ'ল ইথারের ঢেউ।

পৃথিবীর চারিদিকে যেমন বাতাস জড়িয়ে আছে, তেমনি সমস্ত

বিস্তারজাগুনয় ছড়িয়ে রয়েছে ইথার ব'লে এক রকম পদার্থ। একে পদার্থ বলা ঠিক হবে না। কারণ পৃথিবীর সবরকম পদার্থই আমরা কোনও না কোন ইন্দ্রিয় দিয়ে অনুভব করতে পারি। যেমন বাতাস আমরা দেখতে পাইনা বটে, কিন্তু স্পর্শ দিয়ে অনুভব করতে পারি। ইথার আমাদের সব অনুভূতির বাইরে। শুধু যে একে ধরা ছোঁওয়াই যায় না, তাই নয়; এর গুণের কথাও আমাদের অভিজ্ঞতার মাপ কাঠিতে ধরা পড়ে না। কিন্তু তবু এর থাকা দরকার। বৈজ্ঞানিকেরা স্থির করেছেন, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্র থেকে যে আলো, তাপ প্রভৃতি আমাদের কাছে আসছে, তারা আর কিছুই নয়, কতকগুলি ঢেউ মাত্র। ঢেউ ত হ'ল কিন্তু কিসের ঢেউ? যে শূন্যের ভিতর দিয়ে তাপ-আলো আমাদের কাছে আসছে, সেখানে ত পার্থিব কোনও জিনিষ নাই যার ঢেউ হ'য়ে এরা আসতে পারে। তখন পণ্ডিতেরা কল্পনা করলেন যে ব্রহ্মাণ্ড জুড়ে রয়েছে এক ধারণাতীত মধ্যম (Medium), তার নাম দিলেন তাঁরা ইথার (Aether)। ইথার যে শুধু শূন্যে পৃথিবীর চারিদিকেই ছড়িয়ে আছে তাই নয়, পরমাণুর ভিতরে, ইলেক্‌ট্রন—প্রোটনের ফাঁকে ফাঁকে রয়েছে এই ইথার। আলো আসছে ইথারের ঢেউ হয়ে সেকেণ্ডে ১৮৬০০০ মাইল বেগে। এমন জিনিষ ইথার যার ঢেউ এতবড় প্রচণ্ড বেগে চলতে পারে। এইজন্য বৈজ্ঞানিকদের কল্পনা করে নিতে হ'ল যে ইথার একদিকে যেমন কঠিন ইস্পাতের চাইতেও হাজার হাজার গুণ শক্ত, অন্য দিকে আবার এত পাতলা যে সে রকম পাতলা বা হাল্কা জিনিষ কেউ কোনও দিন কল্পনাও করতে পারে না। এত হাল্কা অথচ এত কঠিন, তাই এর চেহারাটা মনে মনে কল্পনা করে নেওয়া বোধহয় কঠিনতম কাজ। আলো-তাপ (Radiation), এরা সবাই ইথারের ঢেউ। কোনও ঢেউ বড়, কেউবা ছোট। আলোর ঢেউ তাপের ঢেউএর চাইতে অনেক ছোট। লাল-নীল বেগুনি প্রভৃতি আলোতে, যে পার্থক্য, তা'ও শুধু ঢেউএর ছোট বড় নিয়েই। এই ইথারসমুদ্রে পর্ব্বতপ্রমাণ ঢেউ তোলাও সম্ভব। কি করে, সে আলোচনা আমরা পরে ক'রব। ইথারসমুদ্রের এই বিরাট বিরাট ঢেউ—এরাই হল আমাদের বাহক, যার গায়ে রেকর্ডের মত কথার ছাপ মেরে দেওয়া হয়।

এখানে সংক্ষেপে বলা যেতে পারে কি করে এই ছাপ মারা হয়। আমরা আগেই বলেছি মাইক্রোফোনের সামনে কথা বললে, তার ভিতরকার বিদ্যুৎস্রোতের কমতি বাড়তি হ'তে থাকে, বাতাসের
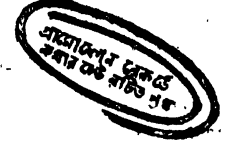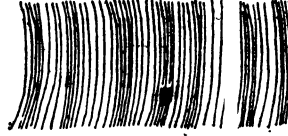
১০নং চিত্র

ঢেউ-এর তালে তালে অর্থাৎ বিদ্যুৎ স্রোতের উপর ঢেউ খেলতে থাকে, যে ঢেউএর চেহারা অবিকল কথার ঢেউএরই মত। এই তরঙ্গিত বিদ্যুৎপ্রবাহ দিয়েই ইথারবাহক-তরঙ্গের উপর ঢেউ খেলানো অর্থাৎ কথার ছাপ মারা হয়। তরঙ্গিত বাহক তরঙ্গ (Modulated carrier wave) ছুটে গেল সব দিকে। জলের ঢেউ যেমন যত দূরে যায় ততই ক্ষীণ হ'তে থাকে, কথার ঢেউএর (Sound waves in air) যেমন দূরে

৯নং চিত্র

যেতে যেতে জোর কমে যায়, ইথারের ঢেউও তেমনি অনেক পথ গিয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়ে। তার জোর যায় কমে। তাই বেতার-শ্রোতাকে প্রথমে ঢেউটিকে জোরাল করে নিতে হবে (Amplification), তারপর তা থেকে কথার ছাপটি খুলে নিয়ে ঢেউ খেলানো বিদ্যুৎস্রোত সৃষ্টি করতে হবে। এই তরঙ্গায়িত বিদ্যুৎপ্রবাহের জন্যই লাউড্‌-স্পীকারের পাতটি কাঁপতে থাকবে। ফলে পূর্ব্বের মত বাতাসে ঢেউ সৃষ্টি হবে, আমরা কথার পুনরাবৃত্তি শুনতে পাব।

বেতারে কথা বলা এবং শোনার ব্যাপারটি আরও ভাল করে বুঝতে হলে ঢেউ সম্বন্ধে আমাদের আরও কিছু জানা প্রয়োজন। ধানের ক্ষেতে হাওয়া লাগ্‌লে মাঠের একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত ধানের শীষগুলির মাথার উপর দিয়ে ঢেউ খেলে যায়। ঢেউটা দেখতে যত ভালো লাগে, ঢেউ জিনিষটি যে কি সেটি খুঁজে বার করতে অবশ্য তত ভালো লাগে না। ঢেউটি মাঠের একদিক থেকে আর এক দিকে আসছে। ধানের গাছগুলি কিন্তু নিজ নিজ জায়গা ছেড়ে ছুটে যায় না। অথচ চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি ঢেউ এগিয়ে আসছে। ঢেউটা তবে কী! কে আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে—ঢেউ চলে যাবার সময়ে গাছের মাথাগুলি দুলতে থাকে—একবার মাথা তুলছে আবার নীচু করছে। এই মাথা উঁচু নীচু করা—ঘাড় দোলানি—এই জিনিষটিই এগিয়ে আসছে আমাদের দিকে। একটার ধাক্কা লেগে আর একটা দুলছে, আবার তার ধাক্কা লেগে তার পাশেরটা দুলছে। এই দোলানিটাই ধানের শীষগুলির মাথায় পা দিয়ে এগিয়ে আসছে। সব রকম ঢেউএর বেলাতেই এই একই নিয়ম। জলেতে ঢিল ছুঁড়লে ঢেউএর সৃষ্টি হয়। ঢেউগুলি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। আসলে কিন্তু পুকুরের মাঝখানকার জল আমাদের দিকে ছুটে আসছে না। আমরা ঢিল ছুঁড়ে শুধু পুকুরের মাঝখানে খানিকটা জল দুলিয়ে দিয়েছিলাম। তার দোলা লেগে দুলতে লাগলো পাশের জল—তার দোলায় দুলল তার পাশের জল। এই রকম করে জলের দোলাটা এগিয়ে এল আমাদের দিকে। এই হ'ল ঢেউ। জল ঢেউয়ের জন্য এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় ছুটে যায় না, জলের উপর একটা সোলা বা ঐ রকম কিছু ভাসিয়ে দিলেই তা বোঝা যাবে। সোলার টুকরাটি জলের দোলায় নিজের জায়গায় বসে বসেই দুলতে থাকবে। ঢেউ হ'ল একটা অবস্থা মাত্র—কোন জিনিষ নয়। ঢেউ যখন থাকে না জল তখন থাকে শান্ত হয়ে, আবার ঢেউ হ'লে জলের অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটে, দুলতে সুরু করে। ছোট ছেলে যখন লাফাতে সুরু করে, তখন তার লাফানিটাকে কেউ একটা জিনিষ বলবে না, বলবে ওটা একটা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ভঙ্গী, একটা শারীরিক অবস্থামাত্র।

ঢেউএর ভিতর যেমন লম্বা লম্বা ঢেউ আছে, তেমন আবার খুব ছোট ছোট ঢেউও আছে। একটা ঢেউএর মাথা থেকে তার পাশের
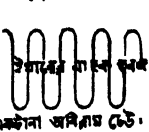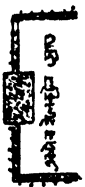
ঢেউএর মাথা পর্য্যন্ত মেপে দেখলে যতটা হয়, আমরা বলে থাকি ঢেউটা ততখানি লম্বা। সাধু বাংলায় বলা যেতে পারে "তরঙ্গ দৈর্ঘ্য।" ঢেউকে পুরোপুরিভাবে বিচার করতে হলে, আরও দু'একটি জিনিস আমাদের জানা দরকার। প্রত্যেক ঢেউএরই চড়াই-উৎরাই আছে, সারি সারি পাহাড়ের মত। ঢেউ বললেই কতখানি উঁচু সেকথা মনে পড়ে। স্বাভাবিক শান্ত অবস্থা (Position of rest) থেকে জল কতখানি মাথা উঁচিয়ে উঠছে (crest) বা কতখানি নীচে (trough) নেমে যাচ্ছে তাকে বলা যেতে পারে ঢেউএর বিস্তার (Amplitude)। এক সেকেণ্ডে যতগুলি ঢেউ সৃষ্টি হয় তাকে বলা হয় স্পন্দন সংখ্যা (Frequency)। আর একটি দরকারী কথা হ'ল ঢেউএর গতি। সব জিনিষের ঢেউই সমান বেগে এগিয়ে যায় না। জলের ঢেউ যে গতিতে চলে, বাতাসের ঢেউ এগিয়ে যায় তার চাইতে অনেক দ্রুত গতিতে। বাতাসের ঢেউ—অর্থাৎ আমাদের কথার ঢেউএর গতি সেকেণ্ডে প্রায় ১২০০ ফুট—এক মাইল পথ যেতে তার প্রায় চার সেকেণ্ড সময় লাগে। যত রকম ঢেউ আমাদের জানা আছে তাদের মধ্যে ইথার তরঙ্গই চলে সব চাইতে দ্রুতপদে। তাদের গতি হ'ল সেকেণ্ডে ১৮৬০০০ মাইল। আলাদীনের দৈত্যও বোধহয় এত তাড়াতাড়ি পথ চলতে পারত না। এখানে আর একটা কথা বলা দরকার। কোনও এক জিনিষের ঢেউ—তারা বড়ই হোক্ আর ছোটই হোক্—একই গতিতে চলে। যেমন বাতাসের ঢেউ, তারা যে আকারেই হোক না কেন, তাদের সবারই গতি বেগ সেকেণ্ডে ১২০০ ফুট।

১১নং চিত্র

হারমোনিয়মের ঘাট রয়েছে অনেক, কোনটা থেকে মোটা সুর বার হয়, আবার কোনটা থেকে বা সরু আওয়াজ পাওয়া যায়। প্রত্যেকটি ঘাট টিপলেই আলাদা আলাদা সুর শুনতে পাই। তার কারণ হ'ল এই যে বিভিন্ন ঘাট টিপলে যে বাতাসের ঢেউ সৃষ্টি হয়, তারা দৈর্ঘ্যে সবাই আলাদা। বিভিন্ন সুর মানেই বিভিন্ন দৈর্ঘ্যের ঢেউ।

ক্রমশঃ

কি দেখিলাম

১

ধূসর শ্যামল যাহা হোক ক্ষিতি
পাকা রঙ তার রাঙ্গা,
গঠন নরের খেয়াল—কিন্তু
পেশা তার ঠিক ভাঙ্গা।
ধ্বংসেই তার সেরা আনন্দ,
সব চেয়ে প্রিয় বারুদ গন্ধ
আলোক নিভায়ে আঁধার সে করে;
প্রাসাদ ভাঙিয়া ডাঙ্গা।

২

ধর্ম্মশাস্ত্র ন্যায়দর্শন
কাব্য এ সব ফাঁকা,
মানুষ রঙিণ আবরণ দিয়ে
হিংসাকে দেয় ঢাকা।
তার আদর্শ, তাহার যুক্তি,
আনে বন্ধন, আনে না মুক্তি।
স্বার্থের হেম মৃগ ধরিবারে
শুধু ফাঁদ পেতে থাকা।

৩

লজ্জার ধার ধারে না ইহারা
ন্যায়ের পতাকাধারী,
দর্পী সহায় চাহে ভগবানে,
হাসেন দর্পহারী।
ভুলেছে সত্য—ভুলেছে মমতা,
লাঞ্ছিত ভীত পতিতের ব্যথা।
গৃহ পুড়ে যায়—তবু দিবে নাক
বন্দী কপোতে ছাড়ি।

৪

কাছাকাছি ছিল নর নারায়ণ
এলো মন্বন্তর,
এক হলো শুধু প্রেত ও পিশাচ
দানব পশু ও নর।
এই জঘন্য আলেখ্যখান
দাও মুছে দাও তুমি ভগবান,
সব ঢেকে দিয়ে উজ্জ্বল হও
তুমি শ্যামসুন্দর।

জঙ্গম

বনফুল

২৫

ছবির শ্বাস উঠিয়াছে। পাশের ঘরে তাহার স্ত্রী কাদম্বিনীও অচৈতন্য হইয়া রহিয়াছে। ছবির শিয়রে শঙ্কর জাগিয়া বসিয়া আছে, কাদম্বিনীর কাছে আছেন তাহার বৃদ্ধ পিতা হরিনাথবাবু। ছেলেমেয়েদের অন্য একটি বাসায় সরাইয়া দেওয়া হইয়াছে। ছবির শ্বশুর হরিনাথবাবু কলিকাতার বাহিরে থাকেন, ইহাদের অসুখের সংবাদ শুনিয়া সপরিবারে আসিয়া অন্য একটি বাসায় উঠিয়াছেন। ছবির ছেলেমেয়েরা সেই বাসায় গিয়াছে। হরিনাথবাবু ব্রাহ্মধর্মাবলম্বী। আবক্ষ পাকা দাড়ি, কম কথা বলেন, উচিত কথা বলেন এবং যেটুকু বলেন বেশ গুছাইয়া বলেন। তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করিতে সাহস হয় না। হোমিওপ্যাথিতে তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস, সুতরাং হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা চলিতেছে। শঙ্করের বার বার মনে হইতেছিল যে বোধ হয় দারিদ্র্যের জন্যই হরিনাথবাবু এলোপ্যাথি চিকিৎসা বন্ধ করিয়া দিলেন—সে নিজে প্রয়োজন হইলে টাকা দিতে প্রস্তুতও ছিল—কিন্তু স্বল্পভাষ এবং মুখভাবে একটা নিষ্ঠার দৃঢ়তা প্রত্যক্ষ করিয়া শঙ্কর জোর করিয়া কিছু বলিতে পারে নাই। তাঁহার মতেই মত দিতে হইয়াছে। হরিনাথবাবুই ছবির আপন লোক, শঙ্কর ছবির কে! শঙ্কর এ কয়দিন বাড়ি যায় নাই, দিবারাত্রি কেবল ছবিকে লইয়াই আছে। তাহার কেমন যেন ধারণা হইয়া গিয়াছে এ বিপদে ছবিকে ফেলিয়া যাওয়া বিশ্বাসঘাতকতা হইবে। ছবির যতক্ষণ জ্ঞান ছিল শঙ্করের উপরই সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়াছিল। তাহার শ্বশুর আসিয়াছে—এই ওজুহাতে অজ্ঞান অবস্থায় এখন তাই তাহাকে ফেলিয়া যাইতে পারিল না। বিনা বেতনে এমন একজন সহৃদয় একনিষ্ঠ নার্স পাইয়া হরিনাথবাবুও অনেকটা নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন। ব্রাহ্ম হরিনাথবাবুর সহিত ব্রাহ্ম নিলয়কুমারের ধর্মগত যোগাযোগ থাকাতে আপিসের ছুটিও সহজেই মিলিয়াছিল।

গভীর নিস্তব্ধ রাত্রি। মুমূর্ষু ছবির শিয়রে একা বসিয়া বসিয়া শঙ্কর ছবির কথাই ভাবিতেছিল। ভাবিতেছিল ছবির সহিত তাহার পরিচয় কতটুকু? তাহার পূর্ব্বজীবনের কতটুকু সে জানে, উত্তর জীবনের কতটুকুই বা জানিবে। ছবির সাহিত্য-প্রীতি আছে—তাহারও আছে। পরিচয়ের সূত্র মাত্র এইটুকু। মনে পড়িল ছবির সহিত তাহার দেখাও খুব যে ঘন ঘন হইত তাহা নহে, কচিৎ কখনও হইত। মাঝে মাঝে আসিয়া সে টাকা ধার চাহিত, হয় তো বা কখনও কোন দিন মদ খাইয়া ঈষৎ মত্ত অবস্থায় আসিত, শেলি, কীট্‌স্‌, ব্রাউনিং, রবীন্দ্রনাথ আবৃত্তি করিতে করিতে উত্তেজনায় আবেগে টেবিল চেয়ার উল্টাইয়া হাসিয়া কাঁদিয়া অস্থির করিয়া তুলিত, কখনও বা নিজের দুঃখের কাহিনী বর্ণনা করিয়া সংসারের নিত্য-উদীয়মান অভাবের তালিকা দেখাইয়া পরামর্শ চাহিত এবং পরমুহূর্ত্তেই আবার নিম্নকণ্ঠে জানাইত যে রামবাগানে একটা মেয়ের গান শুনিয়া সে তাহার প্রেমে পড়িয়াছে—"মাইরি বলছি, অন্য কোন কারণে নয়, কেবল গানের জন্যে"—! তাহার মনের শিল্পবোধ ছিল, সৌন্দর্য্যের প্রতি পিপাসা ছিল এবং সেইজন্যই বোধহয় তাহাকে এত ভাল লাগিত। শুধু তাই কি? সুখদুঃখ নিষ্পিষ্ট মানুষটাকেও কি কম ভাল লাগিত! ছবির অতীত জীবনের যে ঘটনাগুলির খবর শঙ্কর জানিত ছায়াছবির মতো সেগুলি তাহার মানসপটে ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। খামখেয়ালী দুশ্চরিত্র মাতালটার এইবার শ্বাস উঠিয়াছে! আর কিছুক্ষণ পরেই সব শেষ হইয়া যাইবে! লোকটা সাহিত্যিক ছিল! পরাধীন দেশের সৌখীন সাহিত্যিক! কবিতা আওড়াইত, মদ খাইত, প্রেমে পড়িত! আস্পর্দ্ধা কম নয়!

সহসা শঙ্করের দুই চক্ষু জলে ভরিয়া আসিল। এ কি অকালমৃত্যু! প্রতিভার এ কি শোচনীয় অপচয়! এই ছবি কি না হইতে পারিত!......শ্বাস উঠিয়াছে। কি কষ্ট, কি নিদারুণ কষ্ট। শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য সমস্ত পেশীগুলি প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছে, চতুর্দ্দিকে বাতাসের অভাব নাই, কিন্তু তাহার ব্যায়ত আনন, বিস্ফারিত নাসারন্ধ্র, নীল ওষ্ঠাধর, ঘর্ম্মাক্ত কলেবর, আর্ত্ত ম্লানায়মান দৃষ্টি যেন সমস্বরে বলিতেছে—পাইলাম না, পাইলাম না, আকাশভরা এত বাতাস আমি কিন্তু এতটুকু পাইলাম না।

কপাট ঠেলিয়া পাশের ঘর হইতে হরিনাথবাবু আসিলেন, আসিয়া সন্তর্পণে কপাটটি আবার বন্ধ করিয়া দিলেন।

"কি রকম বুঝছেন—"

যাহা বুঝিতেছিল তাহা কি ব্যক্ত করা যায়? শঙ্কর চুপ করিয়া রহিল। হরিনাথবাবু ক্ষণকাল ছবির মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন, তাহার পর ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেলেন। ক্ষণপরে যখন তিনি প্রবেশ করিলেন—শঙ্কর সবিস্ময়ে দেখিল তাঁহার হাতে পিতলের তৈরি প্রকাণ্ড ভারী 'ওঁ'!

"ওটা কি হবে"

"ওটা ওর বুকের ওপর রেখে দেব। আমরা আর কি করতে পারি বলুন—সবই তাঁর ইচ্ছা"

একে বেচারার এই শ্বাস কষ্ট তাহার উপর বুকে এই ভারী জিনিসটা চাপাইয়া দিতে হইবে! কিন্তু সে বাধা দিতে পারিল না, বরং তাড়াতাড়ি বুকের চাদরটা সরাইয়া দিল—হরিনাথবাবু বুকের উপর পিত্তল নির্ম্মিত 'ওঁ'-টি স্থাপন করিয়া ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেলেন এবং বাহির হইতে সন্তর্পণে কপাটটি ভেজাইয়া দিলেন।

২৬

নিপু আসিয়াছিল। কয়েক দিন পূর্ব্বে আসিয়া সে শঙ্করকে স্বরচিত একখানি উপন্যাস দিয়া গিয়াছিল। সেই প্রসঙ্গেই কথা হইতেছিল। নিপুই বক্তা।

নিপু বলিতেছিল—"আমি চাই না যে তুমি আমার লেখাটার

প্রশংসা কর। প্রশংসা পেতে ইচ্ছে [illegible] রবীন্দ্রনাথের, প্রশংসাই আমি পেতে পারতাম। গবু সেবার যখন শান্তি-নিকেতন গিয়েছিল তখন সঙ্গে করে নিয়ে গেসল লেখাটা, অবশ্য আমার অজ্ঞাতসারে—"

"গবু কে?"

"গবুকে চেন না! ওরাই তো কামিং লাইট্! 'মজদুর দর্পণ' বলে একখানা কাগজও বার করেছে। হ্যাঁ, যা বলছিলাম —রবিবাবু এর গোড়ার দিকটা শুনেছিলেন, ভালই বলেছিলেন শুনলাম। ইচ্ছে করলে তাঁর প্রশংসা পেতে পারতাম, কিন্তু ও-সবে রুচি নেই আমার। তোমাকেও প্রশংসার জন্যে দিই নি, আমি এটা তোমাকে দিয়েছি নূতন যুগের নূতন সাহিত্যের নমুনা হিসেবে। আমি উপন্যাসে দেখাতে চেয়েছি নূতন যুগের নূতন সাহিত্যের রূপ কি—মানে নবতম রূপ কি—হয় তো হঠাৎ বেখাপ্পা বে-সুরো মনে হবে তোমার—আমি জিনিসটা ঠিক দেখাতে পেরেছি কি না তা-ও জানি না। ভাল করে' পড়ে' তবে সমালোচনা কোরো। মাঝখানটায় একটু হয় তো জটিল বলে' মনে হবে—মারক্সিজম্ সোজা জিনিস নয়—কতদূর পড়েছ"

"সবটা পড়িনি এখনও"

শঙ্কর মিথ্যা কথা বলিয়া ফেলিল।

"না, না, তাড়াতাড়ি পড়বার দরকার নেই, আমি এত তাড়াতাড়ি ছাপাতামও না—বঙ্গদেশের সাহিত্য সমাজে স্থান পাবার লোভ আমার মোটে নেই। কিন্তু ঘটনাচক্রে স্থান হয়ে গেল দেখছি—বিশ্বেশ্বরবাবুকে পড়তে দিয়েছিলাম, তাঁর প্রেস আছে তিনি একরকম জোর করেই ছাপিয়ে ফেললেন। ছাপার ভুলও বিস্তর থেকে গেছে—এ দেশের যেমন পাঠক সমাজ, তেমনি ছাপাখানা—"

ঠোঁট বাঁকাইয়া বাঁকাইয়া তিক্ত হাসি হাসিতে হাসিতে নিপু্র কথা-বলার একটা বিশেষ ধরণ আছে। কথা-শোনারও বৈশিষ্ট্য আছে তাহার। অপরে যখন কথা বলে' তখন সে মুখে একটা হাসি ফুটাইয়া অন্যদিকে চাহিয়া থাকে, বক্তার দিকে নয়। শঙ্কর একদৃষ্টে চাহিয়া দেখিতে লাগিল। নিপুর চোখের দৃষ্টিতে খ্যাতি লোলুপতা এবং তাহা গোপন করিবার ব্যর্থ প্রয়াস! গায়ে আড়ময়লা টুইলের শার্ট,পায়ে বার্ণিশহীন গ্রীসিয়ান স্লিপার, মাথায় চুল ছোট ছোট করিয়া ছাঁটা, মুখময় ব্রণ ও মুখভাবে বুভুক্ষার চিহ্ন! বে-রসিক অশিক্ষিত জনতার প্রতি অসীম অবজ্ঞার ভান, অথচ বই ছাপাইয়া তাহাদেরই দ্বারস্থ হইবার আকুল আগ্রহ, দ্বারস্থ হইয়াও নিজের স্পর্দ্ধিত গর্ব্বটাকে আস্ফালন করিবার হাস্যকর আড়ম্বর! সবই মানাইয়া যাইত যদি প্রতিভা থাকিত। কিন্তু হায় হায়, সেই বস্তুটিরই একান্ত অভাব। তাই কেবল নানা কৌশলে, নানা ছুতায়, প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে সর্ব্বত্র হুল্ ফুটাইয়া, কালী ছিটাইয়া, সকলকে ক্ষতবিক্ষত বিধ্বস্ত করিয়া দিয়া পরোক্ষে অপরোক্ষে নিজের নকল নূতনত্বের ঢাকটা পিটাইবার এই অদম্য অভিযান! কিন্তু ঢাকটাও ফাটা, বীভৎস বিকট আওয়াজ বাহির হইতেছে। সুর যে জমিতেছে না তাহা ইহারা জানে, তাই ইহাদের বুলি—আমরা বেসুরের সাধক, আমরা বিদ্রোহী, আমরা উল্টা কথা বলি, আমাদের এই নূতন ঢঙের অভিনব মর্য্যাদা—পুরাতনপন্থী তোমরা বুঝিবে না। কিন্তু ইহা যে ইহাদের [illegible] জমানো মৌখিক বুলি-মাত্র, মনের কথা নয়, তাহার প্রমাণ ইহারা বই লিখিয়া সর্ব্বাগ্রে সেটি পুরাতনপন্থীদেরই হাতে তুলিয়া দেয় এবং তাহাদের প্রশংসাবাক্য শুনিবার জন্য উৎকর্ণ হইয়া থাকে!

এ শ্রেণীর অনেক লেখকের সম্পর্কে শঙ্করকে আসিতে হইয়াছে, কিন্তু 'ক্ষত্রিয়' পত্রিকার সমঝদার হিরণদা'র বন্ধু নিপুদাও যে এই দলের তাহা শঙ্কর জানিত না, কল্পনাও করে নাই। নিপুদার সাহিত্যিক বুদ্ধির প্রতি তাহার আস্থা ছিল। তাহার ধারণা ছিল নিপুদা গোপনে গোপনে একটা বিরাট কিছুর সাধনা করিতেছেন। অন্ধকারে তাঁহার তপস্যা চলিতেছে। বাংলাভাষার ইতিহাস অথবা অভিধান অথবা ওই জাতীয় কিছু একটা সুসম্পন্ন করিয়া তিনি একদিন তাক লাগাইয়া দিবেন। নিপুদা যে শেষে এই কমিউনিষ্টিক কসরৎ দেখাইবেন তাহা শঙ্কর প্রত্যাশা করে নাই। কমিউনিজ্ম্ লইয়া প্রবন্ধ সহ্য হয়, কাল্পনিক কাব্যও হয়তো চলিতে পারে, কিন্তু রাশিয়ার সামাজিক ব্যবস্থাকে ভারতবর্ষের, বিশেষত বঙ্গদেশের বাস্তবজীবন মনে করিয়া উপন্যাস অসহ্য। যেন কতকগুলি বলশেভিক মতবাদ মনুষ্যমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া তর্কবিতর্ক করিতেছে এবং অবশেষে মার্কস্-লেনিনের জয়-গান করিয়া ক্যাপিটালিজ্মকে বিধ্বস্ত করিয়া ফেলিতেছে। নিপুদার উপন্যাসে মহারাজা মেথর সব সমান। মন্দির মসজিদ কিছু নাই, চতুর্দ্দিকে কেবল জনগণ পরিচালিত অসংখ্য ফ্যাক্টরি। সিনেমা এবং লাউডস্পীকারে একতার শিক্ষা বিতরণ চলিতেছে। লাঙ্গলের বদলে ট্র্যাক্টার, ধর্ম্মের বদলে কর্ম্ম, বিবাহের বদলে প্রেম এবং সন্তান। বঙ্গদেশের পল্লীতে পল্লীতে বিংশ শতাব্দীর রামহীন রামরাজত্ব সুরু হইয়া গিয়াছে! যে আদর্শ নিপুদা' খাড়া করিয়াছেন তাহা নিন্দনীয় নয়, কারণ সে আদর্শ মার্কস্ লেনিনের প্রতিভায় প্রদীপ্ত। নিপুদার তাহাতে কোন কৃতিত্ব নাই। নিপুদার যাহা নিজস্ব কৃতিত্ব—এই জগদ্দল উপন্যাসখানি—তাহা একেবারে রাবিশ। তাহার একটি চরিত্র জীবন্ত নয়, তাহাতে এতটুকু কবিত্ব নাই, জীবন-দর্শন নাই, কল্পনার প্রসার নাই। আছে কেবল বলশেভিজ্ম্!

সর্ব্বাপেক্ষা মর্ম্মান্তিক ব্যাপার শঙ্করকে ইহার প্রশংসা করিতে হইবে! যে 'ক্ষত্রিয়' কাগজের আদর্শ ছিল অ-সাহিত্যকে তাড়না করা সেই 'ক্ষত্রিয়' কাগজেরই পৃষ্ঠায় ইহার প্রশংসা করিতে হইবে। উপায় নাই। হিরণদার বন্ধু নিপুদা! তাহার সম্বন্ধে সত্যকথা বলা চলিবে না। বলিলেও রাখিয়া ঢাকিয়া বলিতে হইবে। তিক্ত সত্যটাকে প্রশংসার মিষ্টি প্রলেপে ঢাকিয়া দিতে হইবে।

২৭

নীরা বসাক ও তাঁহার বান্ধবী কুন্তলা মুখোপাধ্যায় হাস্য পরিহাস সহকারে যে আলাপে ব্যাপৃত ছিলেন তাহাকে ঠিক সাহিত্যালাপ বলা যায় না, যদিও আলাপের মূল বিষয় একজন উদীয়মান সাহিত্যিক—শঙ্কর সেবক রায়।

নীরার মুখ হাস্যোদ্ভাসিত, কুন্তলা গম্ভীর। "সেদিন সামান্য একটু প্রশংসা করবামাত্র লোকটা এমন গদগদ হয়ে পড়ল যে মনে হল সার্টিফিকেট কেন লোকটাকে দিয়ে থালি পর্য্যন্ত টানিয়ে

নেওয়া যায়। তার ওই ট্র্যাশ বইখানার এমন বাগিয়ে প্রশংসা করেছিলাম আমি—যে আমার নিজেরই তাক লেগে গেছল—"

"সার্টিফিকেট জোগাড় করেছিস্ ?"

"প্রথম দিনই কি সার্টিফিকেট চাওয়া যায়। জমিটা তৈরি করে রেখেছি, এইবার বীজ ছড়ালেই গাছ গজাবে"

নীরা বসাকের চোখমুখ পুনরায় হাস্য-প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল।

ঈষৎ ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া কুন্তলা বলিল, "আমার কিন্তু লোকটিকে অত বোকা বলে' মনে হয় না। তাছাড়া এ-ও আমার মনে হয় না যে সত্যি সত্যি তুমি ওঁর লেখাকে ট্র্যাশ বলে' মনে কর"

"কি তোমার মনে হয় শুনি"

"আমার মনে হয়, শঙ্করবাবুর লেখা সত্যি সত্যি তোমার খুব ভাল লাগে, কিন্তু যেহেতু আমার ভাল লাগে না এবং যেহেতু কুমার পলাশকান্তি আমার সম্বন্ধে সম্প্রতি কিঞ্চিৎ দুর্ব্বলতা প্রকাশ করছেন সেই হেতু তুমি আমার মন রেখে বানিয়ে বানিয়ে মিছে কথাগুলো বলছ"

নীরা বসাকের সমস্ত মুখ ক্ষণিকের জন্য বিবর্ণ হইয়া গেল, কিন্তু তৎক্ষণাৎ সে নিজেকে সামলাইয়া লইয়া বিস্ময়ের সুরে বলিল, "আচ্ছা, কি তুই কুন্ত !"

কুন্তলার গাম্ভীর্য্য এতটুকু বিচলিত হইল না। সে বাতায়ন-পথে চাহিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। একফালি রোদ বাঁ গালে পড়িয়া তাহার অনিন্দ্যসুন্দর মুখশ্রীকে সুন্দরতর করিয়া তুলিয়াছে—টানাটানা চোখ দু'টি যেন আবেশবিহ্বল হইয়া স্বপ্ন দেখিতেছে। এই অপরূপ সৌন্দর্য্যের পানে চাহিয়া চাহিয়া নীরা বসাকের সমস্ত অন্তঃকরণ সহসা যেন বিষাইয়া উঠিল। এ মেয়েটার সহিত কিছুতেই পারা গেল না। স্কুলে কলেজে এতদিন একসঙ্গে কাটিল, কিছুতেই কোন বিষয়ে ইহাকে আঁটিয়া ওঠা গেল না। কুন্তলা যদি অহঙ্কারী হইত তাহা হইলে সেই ছুতায় ইহার সহিত মনোমালিন্য করা চলিত। কিন্তু সে মোটেই অহঙ্কারী নয়। রূপে, গুণে, বিদ্যায়, বুদ্ধিতে, বংশগরিমায় সর্ব্ব-বিষয়ে সে অনেক বড়, অথচ তাহার নীচতা নাই, আত্মম্ভরিতা নাই, আস্ফালন নাই। আর নীরা বসাক ? তাহার রূপ নাই, গুণ নাই, অর্থও নাই। অর্থাভাবেই তাহার এম. এ. পড়াটা হইল না—অথচ কুন্তলা স্বচ্ছন্দে এম. এ. পড়িতেছে। কুন্তলার প্রেমের জন্য কুমার পলাশকান্তির মতো লোক উন্মুখ, আর সে অনিল সান্যালকেও ভুলাইতে পারিতেছে না। তাহার সমস্ত চিত্ত বিরূপ হইয়া উঠিল। সে উঠিয়া দাঁড়াইল। "আমি চললাম। কুমার পলাশকান্তিকে তোমার কিছু বলবার দরকার নেই"

"আমি বলেছি। কিন্তু আমার বলায় তোমার অনিলবাবুর চাকরি হবে না"

এই কথা শুনিবামাত্র নীরা বসাকের মনের মেঘ কাটিয়া গিয়া যেন আলো ঝলমল করিয়া উঠিল। সে আবার বসিয়া পড়িল।

"তুই বলেছিস ! হবে না কি করে' বুঝলি ?"

"কুমার পলাশকান্তিকে আমি বিদেয় করে' দিয়েছি—ইংরেজি ভাষায় যাকে বলে refuse করেছি—"

নীরা যেন নিজের কর্ণকে বিশ্বাস করিতে পারিল না। কুমার পলাশকান্তিকে কুন্তলা প্রত্যাখ্যান করিয়াছে—যে পলাশকান্তিকে গাঁথিবার জন্য শত শত সভ্য ছিপ সর্ব্বদা সমুদ্যত—যাহার করুণা-কণা লাভ করিবার জন্য, যাহার দামী মোটরে একবার চড়িবার জন্য অভিজাতবংশীয় যুবতী কন্যারা লালায়িত—তাহাকে কুন্তলা বিদায় করিয়া দিয়াছে !

সবিস্ময়ে সে প্রশ্ন করিল—"কেন, কি হল হঠাৎ"

"হবে আবার কি। তুই কি আশা করেছিলি আমি ওকে বিয়ে করব ?"

"করেছিলুম বই কি"

"করেছিলি ? আমার সম্বন্ধে তোর ধারণা যে এত হীন তা জানা ছিল না !"

"কেন, বিয়ে করতে আপত্তিটা কি"

"আমি অভিজাত ব্রাহ্মণ বংশের মেয়ে, হষ্টেলে থেকে না হয় এম, এ, পড়ছি, পাঁচজনের সঙ্গে মিশছি, হেসে কথা কইছি—তা' বলে' যাকে তাকে বিয়ে করব !"

"কুমার পলাশকান্তি যে সে লোক নয়"

"ও তো একটা বেনে ! ওর স্পর্দ্ধা দেখে আশ্চর্য্য হয়ে গেছি আমি। টাকা ছাড়া আর কি আছে ওর ? সে টাকাও আবার স্বোপার্জ্জিত নয় ?"

"তুই কাকে বিয়ে করবি তাহলে"

"আমার বাবা মা পছন্দ করে যাঁর হাতে আমাকে সম্প্রদান করবেন তাঁকে। তাঁরা অভিজাতবংশীয় ব্রাহ্মণকেই পছন্দ করবেন আশাকরি"

"ও বাবা, এত লেখাপড়া শিখেও তোর এখনও এত জাত-বিচার আছে তাতো জানতাম না"

"জাত যখন আছে তখন তা' মানতেই হয়। সোনার পাত দিয়ে মোড়া থাকলেও বাব্‌লাগাছকে আমগাছের মর্য্যাদা দিতে পারি না"

"সেকালের কুলীনরা একশো দুশো বিয়ে করত শুনেছি, তোর বাবা যদি সেই রকম কোন এক কুলীনকে পছন্দ করেন, বিয়ে করবি তুই ?"

নীরার দৃষ্টি সকৌতুকে নাচিতে লাগিল।

কুন্তলা গম্ভীরভাবেই উত্তর দিল।

"সে রকম কুলীন আজকাল দুষ্প্রাপ্য। তর্কের খাতিরে যদি ধরাই যায় যে, সে রকম কোন কুলীনের হাতে বাবা আমাকে সম্প্রদান করবেন ঠিক করেছেন, তাহলেও আমি আপত্তি করব না। বিবাহ সামাজিক ধর্ম্ম, ওতে নিজের মত চালাতে যাওয়া অন্যায়"

"ওরকম স্বামীকে ভক্তি করতে পারবি ?"

"ভক্তি করতে পারা না পারা নিজের ক্ষমতা অক্ষমতার ওপর নির্ভর করে। পাথরের নুড়ি, কদাকার বিগ্রহ এ সবকেও তো লোকে ভক্তি করতে পারছে"

নীরা বুঝিল তর্ক করা বৃথা। কুন্তলাকে সে তর্কে হারাইতে পারিবে না। তাহাকে সে কোনদিন বুঝিতে পারে নাই, আজও পারিল না।

ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া কুন্তলা বলিল, "এক স্বামীর এক স্ত্রী হওয়া আজকালকার রেওয়াজ—কিন্তু আমার মনে হয় ওটা দারিদ্র্যের চিহ্ন। সত্যি সত্যি যদি কোন পুরুষ একাধিক স্ত্রীর ভরণ-পোষণ-আবদার বহন করতে পারে তাহলে মানতেই হবে সে শুধু পুরুষ নয় পুরুষ-প্রবর। সে শ্রদ্ধেয়, হেয় নয়। একটি-

মাত্র স্ত্রী নিয়ে জোড়াজোবড়া হয়ে যারা প্রতিপদে হিমসিম খেতে খেতে নাকে কেঁদে মরে তারা অসমর্থ অপুরুষের দল, ওই একটিমাত্র স্ত্রীকেও তারা সম্পূর্ণ মর্য্যাদা দিতে পারে না—তারা অক্ষম, কৃপার পাত্র"

"আগেকার ওই কুলীনরা কি তাহলে—"

"আগেকার কুলীনেরা কি ছিলেন তর্কের বিষয় তা' নয়। যে পুরুষ একাধিক বিয়ে করে সে হেয় না শ্রদ্ধেয়—তাই নিয়েই কথা হচ্ছিল"

"মুসলমানদের হারেম তোর মতে তাহলে ভাল ?"

"সভ্যসমাজে আজকাল যা হচ্ছে তার চেয়ে ঢের ভাল। আজকালকার সভ্যসমাজের মেয়েরা সেজেগুজে রূপ-যৌবন ছলিয়ে হাটে বাজারে শস্তা পণ্যসামগ্রীর মতো নিজেদের যাচিয়ে বেড়াচ্ছেন ! কাক, কোকিল, ময়না, শালিক সবাই একবার করে' ঠুকরে যাচ্ছে ! " বাদশার হারেমে আর যাই থাক এ দুর্দ্দশা নেই। সেখানে একশো থাক দু'শো থাক প্রত্যেকেই বেগম, প্রত্যেকেরই স্বতন্ত্র মর্য্যাদা আছে, প্রত্যেকের কাছেই বাদশা আসেন—হয়তো বছরে একবার, কিন্তু সেই একবারের মহিমাই এত যথেষ্ট যে তার স্বপ্নে বাকী বছরটা কাটিয়ে দেওয়া যায়। একাধিক বারও তুমি বাদশাকে আকর্ষণ করতে পার যদি তোমার নিজের গুণ থাকে। সত্যিকার গুণের কদর হারেমে বাদশার কাছেই হয়। বাদশা বুভুক্ষু দরিদ্র নয় যে যা পাবে নির্ব্বিচারে হ্যাংলার মতো 'গিলে ফেলবে। বাদশা সমজদার সূক্ষ্ম রসের রসিক—তার কাছে ফাঁকি চলে না মেকি চলে না—"

"বাবা বাবা—থাম—এত বাজে বকতেও পারিস"

নীরা হাসিবার চেষ্টা করিল বটে কিন্তু তাহার একটি দীর্ঘশ্বাস পড়িল। সে আবার উঠিয়া দাঁড়াইল।

"সত্যি চললি না কি"

"হ্যা"

"অনিল সাণ্ডেলকে এত ভাল লেগেছে যে বিয়ে না করলে আর চলছে না ? ও যে তোর চেয়ে ছোট"

"বিয়ে করব কে বললে ! কুমার পলাশকান্তি যদি ওঁকে প্রাইভেট সেক্রেটারি করে নেন তাহলে—মানে—মিসেস ড্যানিয়েল বড় কষ্টে পড়েছেন আজকাল—তা ছাড়াও—"

"বুঝেছি"

কুন্তলার গম্ভীরমুখে হাসির আভাস ফুটিয়া উঠিল। ইহা দেখিয়া নীরা বয়স্ক ছেলেমানুষের মতো কিল তুলিয়া বলিল—"ভাল হবে না বলে দিচ্ছি—", তাহার পর কণ্ঠস্বরে যতটা আন্তরিকতা কোটান সম্ভব তাহা ফুটাইয়া বলিল—"পাগল নাকি, আমি বিয়ে করব ওই অনিলটাকে, কি যে ভাবিস তোরা আমাকে—"

কুন্তলা কিছু বলিল না, শুধু একটু হাসিল।

"বিশ্বাস হচ্ছে না আমার কথায়"

"হচ্ছে"

"আমি যাই তাহলে। শঙ্করবাবুর কাছে যেতে হবে একবার"

সত্যই যেন কুন্তলার মনে বিশ্বাস জন্মাইয়া দিয়াছে এমনই একটা মুখভাব করিয়া নীরা বাহির হইয়া গেল। সে নিজে জানে যে অনিল সান্ন্যালের একটা চাকরি যদি সত্যই জুটিয়া যায় তাহা হইলে অনিল তাহাকে বিবাহ করিবে। বেকার অবস্থায় মায়ের আদেশের বিরুদ্ধে যাইবার সাহস তাহার নাই। নীরাকে সে ভালবাসিয়াছে, নীরাকেই সে বিবাহ করিবে, কিন্তু তৎপূর্ব্বে একটা চাকরি পাওয়া দরকার। কিন্তু আাই, এ কেন অনিলের কিছুতেই চাকরি জুটিতেছে না। কুমার পলাশকান্তি মাসিক এতশত টাকা বেতনে একজন প্রাইভেট সেক্রেটারি রাখিবেন বিজ্ঞাপন দিয়াছেন। নীরা প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছে এই চাকরিটা অনিলের যাহাতে হয়। শঙ্করের সার্টিফিকেট এবং কুন্তলার সুপারিশ কুমার পলাশকান্তির নিকট মূল্যবান—তাই বেচারা এত ছুটাছুটি করিতেছে। সে নিজেও বেকার। ইচ্ছা করিলে একটা শিক্ষয়িত্রীর চাকরি অবশ্য সে জোগাড় করিতে পারে, কিন্তু সেরূপ ইচ্ছাই তাহার হয় না। সে সংসারী হইতে চায়, নীড় বাঁধিতে চায়। চাকরি করিবার প্রবৃত্তিই তাহার নাই। ভগবান তাহার রূপ দেন নাই, যৌবনও বিগতপ্রায়। পাত্র খুঁজিয়া তাহার বিবাহ দিবে এমন কোন অভিভাবকও তাহার নাই। তাহাকে নিজেই খুঁজিয়া লইতে হইবে। সে অনেক খুঁজিয়াছে, অনেক ছলনা, অনেক অভিনয় করিয়াছে—কেহই তাহাকে দেখিয়া মুগ্ধ হয় নাই—এক এই অনিল ছাড়া। কিন্তু তাহার প্রতিজ্ঞা চাকরী না জুটিলে কিছুতেই বিবাহ করিবে না। নীরা যেমন করিয়া হোক তাহার চাকরি জুটাইয়া দিবে। অনিলকে সে কিছুতেই হাতছাড়া করিবে না। বিবাহ হইয়া গেলে লোকে যদি নিন্দা করে করুক, কুন্তলা যদি টিটকারি দেয় দিক—সে গ্রাহ্য করিবে না। এখন কিন্তু একথা স্বীকার করিতে লজ্জা করে—কুন্তলার কাছেও লজ্জা করে। আহা, অনিলের চাকরিটা যদি হইয়া যায়। নীরার সমস্ত দেহমন যে পিপাসায় হাহাকার করিতেছে—কুন্তলা তাহার কতটুকু বোঝে !

নীরা দ্রুতবেগে পথ চলিতে লাগিল। ক্রমশঃ

যবনিকা

শ্রীশুদ্ধসত্ত্ব বসু

লোল চোখে ছানি পড়ে এল। পঞ্চাঙ্কের হলো শেষ ;
বিলম্বিত তেতালায় বিসর্জনী বাজে করতাল,
গোধূলির ভাঙা মেঘে অস্তমিত সূর্য্য লাগে লাল,
জীবনের পান্থশালে জাগে দেখি মৃত্যুর উন্মেষ।
নিঃশব্দ চরণ যত এঁকেছিল সরণী অঙ্কন—
মুছে যাবে তারা সব মুখরিত জনতার ভিড়ে,
বাজিবে না কোনো স্তুতি পুনরায় মোর চিহ্ন ঘিরে ;
খসে যায় রাজবেশ, হাত হতে সোহাগ-কঙ্কন।
শেষ হলো অভিনয়। নেপথ্যের পরেছি পোষাক,
ধীরে ধীরে চলে যাবো রঙ্গমঞ্চ ছেড়ে বহুদূরে,
চুকে যাবে জীবনের বেচাকেনা, লোকসান লাভ :
কোন্ দূর প্রান্ত দেশে যেথা হতে আসিয়াছে ডাক,
অপসৃত হয়ে যাবো—রহিবনা কারো স্মৃতি জুড়ে ;
নূতন মালিক এসে মুছে দেবে আমার হিসাব।

শিল্পী—শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার মুখার্জ্জি

রাজকুমারীর বিবাহ যাত্রা

ভারতবর্ষ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

মহিষমর্দ্দিনী

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

মহিষমর্দ্দিনী মূর্ত্তির পূজা বাঙ্গালা দেশ হইতে লোপ পাইয়াছে, একথা বলিলে অত্যুক্তি হয়না। আমি বাল্যকালে সে প্রায় চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে আমাদের বাসগ্রামে একবার মহিষমর্দ্দিনী পূজা হইতে দেখিয়াছিলাম, তারপর আর কোথাও দেখি নাই। এক সময়ে কিন্তু বাঙ্গালাদেশের প্রায় সর্ব্বত্রই মহিষমর্দ্দিনী মূর্ত্তির পূজা হইত, তাহার নিদর্শন স্বরূপ এখনও বাঙ্গালার বহু স্থান হইতে প্রস্তর-নির্ম্মিত মহিষমর্দ্দিনী মূর্ত্তি পাওয়া যাইতেছে। বৎসর দুই পূর্ব্বে এই "ভারতবর্ষ" পত্রিকায় "বিক্রমপুরের প্রত্ন-সম্পদ" নামক একটি প্রবন্ধে বিক্রমপুরে প্রাপ্ত কয়েকটি মহিষমর্দ্দিনী মূর্ত্তির চিত্র প্রকাশ করিয়াছিলাম। মহিষমর্দ্দিনী তন্ত্রোক্ত দেবীমূর্ত্তি। পুরাণে ও চণ্ডীতে মহিষমর্দ্দিনীর পৌরাণিক আখ্যান বর্ণিত হইয়াছে। তন্ত্রোক্ত দেবীর মধ্যে মাতৃকামূর্ত্তি, কালী, তারা, চামুণ্ডা, শিবদূতি, বারাহী, চণ্ডী, গৌরী, মহিষমর্দ্দিনী, সর্ব্বমঙ্গলা, কাত্যায়নী প্রভৃতি প্রধানা। শুধু বাঙ্গালা দেশে নহে, এক সময়ে ভারতবর্ষের নানা স্থানেও মহিষমর্দ্দিনী পূজা প্রচলিত ছিল। দাক্ষিণাত্য প্রদেশের মামল্লপুরম নামক স্থানের গুহাগাত্রে মহিষমর্দ্দিনী মূর্ত্তি খোদিত আছে। উহা আনুমাণিক একাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে নির্ম্মিত হইয়াছিল। পুরীর বৈতাল দেউলের গায়েও দুর্গা মহিষমর্দ্দিনী রূপে খোদিত রহিয়াছে। ঐ দেউলের বয়স আনুমানিক ১০০০ খ্রীষ্টাব্দ।

প্রথমে মহিষমর্দ্দিনীর পৌরাণিক আখ্যানটি বলিতেছি, তাহা হইলে পাঠক ও পাঠিকাগণের মহিষমর্দ্দিনী মূর্ত্তির প্রকৃত ইতিহাস ও মূর্ত্তি-পরিচয় বুঝিবার পক্ষে সহজ হইবে।

মহিষাসুরের জন্ম-কথা

পুরাকালে রম্ভ নামে এক দৈত্য ছিলেন, তিনি বহুকাল তপস্যা করিয়া মহাদেবের আরাধনা করেন। মহাদেব তাঁহার তপস্যায় অত্যন্ত প্রীতিলাভ করেন। মহাদেব তাঁহাকে দর্শন দিয়া বলিলেন—হে রম্ভ! আমি তোমার উপর প্রীত হইয়াছি; তুমি বর গ্রহণ কর। রম্ভ তখন প্রফুল্লমনে কহিল—"হে মহাদেব! আমি অপুত্রক, আপনার যদি আমার উপর অনুগ্রহ হইয়া থাকে, তবে তিন জন্মে আপনি আমার পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করুন এবং আমার পুত্র হইয়া সকল প্রাণীর অবধ্য, দেবগণের জেতা, চিরায়ু, যশস্বী, লক্ষ্মীবান্ এবং সত্যপ্রতিজ্ঞ হউন।"

দৈত্যের এইরূপ প্রার্থনা শুনিয়া মহাদেব বলিলেন ;—"তোমার এই বাঞ্ছা সিদ্ধ হইবে। আমি তোমার পুত্র হইব।' একথা বলিয়া মহাদেব অন্তর্হিত হইলেন।

রম্ভাসুর এই বর পাইয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। পথে যাইতে যাইতে রম্ভ একটি তিন বৎসর বয়স্কা ঋতুমতী বিচিত্রবর্ণা সুন্দরী মহিষীকে দেখিতে পাইলেন। সেই মহিষীকে দেখিয়া তিনি কামে মোহিত হইয়া তাহাকে হস্ত দ্বারা ধারণ করিয়া তাহার সহিতই রতিক্রীড়া করিলেন।—সেই মহিষীর সঙ্গমেই মহাদেব রম্ভের পুত্ররূপে জন্ম গ্রহণ করেন। পুরাণকার বলেন :

> "ত্রিহায়নীঞ্চিত্রবর্ণাং সুন্দরীমৃতুশালিনীম্।
> স তাং দৃষ্টাথ মহিষীং রম্ভঃ কামেন মোহিতঃ।
> দোর্ভ্যাং গৃহীত্বা চ তদা চকার সুরতোৎসবম্
> তয়োঃ প্রবৃত্তে সুরতে তদা সা তস্য তেজসা।
> দধার মহিষী গর্ভং জাতশ্চ মহিষাসুরঃ।
> তস্যাং যাংশেন গিরিশস্তৎপুত্রত্বমবাপ্তবান।
> ববৃধে স তদা রাজ্ঞি শুক্লপক্ষশশাঙ্কবৎ।

মহিষাসুর তাহার জন্ম হইতেই শুক্লপক্ষের চন্দ্রের ন্যায় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছিল। মহিষাসুরের জন্মকথা বলিলাম, এইবার তাহার বধের কথা বলিতেছি।

মহিষাসুরবধের কারণ

পূর্ব্বে কাত্যায়ন মুনির শিষ্য রৌদ্রাশ্ব নামে একটি অতিশয় সাধু চরিত্র ঋষি হিমালয়ে তপস্যা করিতেন। মহিষাসুর কৌতুকবশে অতুল সৌন্দর্য্যশালিনী দিব্য স্ত্রীরূপ ধারণ করিয়া সেই ঋষিকে মোহিত করেন। ঋষি বিমূঢ় হইয়া তৎক্ষণাৎ তপস্যা হইতে নিরত হন। কাত্যায়ন ঋষি সেই স্থানের অনতিদূরে অবস্থান করিতেছিলেন। তিনি মহিষাসুরের মায়া জানিতে পারিয়া তাঁহাকে শিষ্যের মঙ্গলের নিমিত্ত এই বলিয়া অভিশাপ দিলেন—"যেহেতু তুমি স্ত্রীরূপ ধারণ করিয়া আমার শিষ্যকে মোহিত করিয়া তাহার তপস্যা ভঙ্গ করিলে, সেই হেতু স্ত্রীজাতি তোমার বধ সাধন করিবে।" যথা :

> "যস্মাত্ত্বয়া মে শিষ্যোঽয়ং মোহিতস্তপসশ্চ্যুতঃ।
> কৃতস্ত্বয়া স্ত্রীরূপেণ তস্মাৎ স্ত্রী নিহনিষ্যতি।"

কাত্যায়ন মুনির শাপ পূর্ণ হইবার সময় উপস্থিত হইল এবং মহিষাসুর যখন দেখিলেন ও বুঝিতে পারিলেন যে জগন্ময়ী মহাদেবীর হস্ত হইতে তাঁহার আর বাঁচিবার কোনই সম্ভাবনা নাই, তখন বিপন্ন মহিষাসুর দেবীকে বলিলেন—"হে দেবি দুর্গে! আমি তোমার আশ্রয় লইয়াছি। আমার ভোগ-সুখ পর্য্যাপ্ত হইয়াছে, ইহলোকে এমন কিছু বাঞ্ছনীয় নাই, যাহা আমার অপূর্ণ রহিয়াছে। আমার শেষ প্রার্থনাটি পূর্ণ করিও—এই আমার মিনতি।" দেবী বলিলেন—'তোমার কি প্রার্থনা বল। তুমি যে বর প্রার্থনা করিবে তাহাই আমি পূর্ণ করিব।" তখন মহিষাসুর বলিলেন—"নিখিল যজ্ঞে আমি যাহাতে পূজ্য হই তাহাই করুন। যে পর্য্যন্ত সূর্য্যদেব বর্ত্তমান থাকিবেন, সেকাল পর্য্যন্ত আমি তোমার পদসেবা পরিত্যাগ করিব না।"

মহিষাসুর মূর্ত্তি পূজা

দেবী মহিষাসুরের প্রার্থনা শুনিয়া বলিলেন—"যজ্ঞের এমন একটি ভাগ নাই, যাহা এক্ষণে আমি তোমাকে দিতে পারি। কিন্তু হে মহিষাসুর! আমা কর্ত্তৃক যুদ্ধে নিহত হইয়াও তুমি আমার চরণ কোন কালে ত্যাগ করিবে না, এ বিষয়ে কোন সংশয় নাই। আর হে দানব! যেখানে যেখানে আমার পূজা হইবে, সেই সেই স্থানেই তোমার এই শরীরের পূজা হইবে, সে বিষয়েও কোন সন্দেহ নাই।" দেবীর এই বর শুনিয়া মহিষাসুর অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন :—"আপনার মূর্ত্তি অনেক, এই জগতের সমুদয় বস্তুই আপনার মূর্ত্তিভেদ। অতএব হে পরমেশ্বরী! আমি যজ্ঞে আপনার কোন্ কোন্ মূর্ত্তির সহিত পূজিত হইব যদি আমার উপর আপনার কৃপা হইয়া থাকে তবে ইহা কীর্ত্তন করুন।" তখন ভগবতী কহিলেন, উগ্রচণ্ডা, ভদ্রকালী, দুর্গা—এই তিন মূর্ত্তিতে তুমি সর্ব্বদা আমার পাদলগ্ন হইয়া মনুষ্য, দেব ও রাক্ষসগণেরও পূজ্য হইবে।" মহিষাসুরকে বধ করিবার জন্য দেবী যে রূপরঙ্গিণী মূর্ত্তিধারণ করিয়াছিলেন তাহাই 'মহিষমর্দ্দিনী' নামে পরিচিতা ও

পূজিতা হইয়া আসিতেছেন। তবে তিনি ভদ্রকালী মূর্ত্তিতে মহিষাসুরকে নিধন করেন। সেই মূর্ত্তি কিরূপ বলিতেছি। 'কালিকাপুরাণে' অতি সুন্দরভাবে দেবী দুর্গার এই মূর্ত্তির বর্ণনা রহিয়াছে। সে কথা বলিবার পূর্ব্বে এ সম্পর্কে অন্যান্য প্রয়োজনীয় দুই একটি কথা বলিতে হইতেছে।

ভদ্রকালী বা মহিষমর্দ্দিনী মূর্ত্তির রূপ

মহিষমর্দ্দিনী, কাত্যায়নী প্রভৃতি মূর্ত্তির প্রায় ত্রিশখানা ফোটোগ্রাফ আমার নিকট আছে। তাহার মধ্যে অধিকাংশ মূর্ত্তিই অষ্টভুজা ও দশভুজা। কিন্তু ষোড়শভুজা, অষ্টাদশভুজা, বিংশতিভুজা, মূর্ত্তি আমি দেখি নাই, সেইরূপ কোন মূর্ত্তির চিত্রও আমার কাছে নাই। আমি নিজে অষ্টভুজা, দশভুজা মহিষমর্দ্দিনী মূর্ত্তি অনেক দেখিয়াছি। বিক্রমপুরের বিভিন্নগ্রামে ভগ্ন ও অভগ্ন অনেক অষ্টভুজা ও দশভুজা মূর্ত্তি আমি প্রত্যক্ষ করিয়াছি। কোন কোন গ্রামে দশভুজা মহিষমর্দ্দিনী মূর্ত্তি নিয়মিতভাবে পূজিতা হইয়া আসিতেছেন। দেবী চণ্ডী বা দুর্গা, কাত্যায়নী, শূলিনী, ভদ্রকালী, অম্বিকা এবং বিন্ধ্যবাসিনী ও অন্যান্য নামে পরিচিতা হইয়া আসিতেছেন। 'কুলচূড়ামণি', 'শারদতিলক', মার্কণ্ডেয় পুরাণের অন্তর্গত 'দেবী মাহাত্ম্য' অধ্যায়ে এবং কালিকাপুরাণ, অগ্নিপুরাণ, মৎস্যপুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থেও মহিষমর্দ্দিনী মূর্ত্তির রূপ লিখিত আছে। 'অগ্নিপুরাণের' ও কালিকাপুরাণের' যথাক্রমে পঞ্চাশ অধ্যায় ও ষষ্টিতমোঽধ্যায়ে মহিষমর্দ্দিনীর অষ্টভুজা, দশভুজা ষোড়শভুজা, অষ্টাদশভুজা এবং বিংশতিভুজার উল্লেখ আছে।* দেবীর এই মহিষমর্দ্দিনী মূর্ত্তি সাধারণতঃ পাঁচপ্রকার দেখা যায়, কিন্তু মার্কণ্ডেয় পুরাণ—দেবী মাহাত্ম্যে সহস্রভুজা মূর্ত্তির উল্লেখও দেখিতে পাই। যথা :

এবমুক্ত্বা সমুৎপত্য সারূঢ়াতংমহাসুরম্।
পাদেনাক্রম্য কণ্ঠে চ শূলেনৈনমতাড়য়ং ॥
ততঃ সোঽপি পদাক্রান্তস্তয়ানিজমুখাৎততঃ।
অর্দ্ধনিষ্ক্রান্ত এবাতি দেব্যা বীর্য্যেন সংবৃতঃ।
ততো মহাসিনা দেব্যা শিরশ্ছিত্বা নিপাতিতঃ।

দেবী ভগবতী এই কথা বলিয়া এক পদে সেই মহিষের উপর আরোহণ করতঃ তাহার গলদেশে শূলাঘাত করিলেন। মহিষমূর্ত্তি, দেবীর শ্রীচরণ দ্বারা আক্রান্ত হইলে অসুর প্রকৃতরূপে মহিষ-বদন হইতে বহির্গত হইতে লাগিল। অর্দ্ধ নিষ্ক্রান্ত হইবামাত্র দেবী তাহাকে স্বীয় বীর্য্যে সংবৃত করিয়া অসির প্রহার দ্বারা তাহার শিরশ্ছেদ করিলেন।

ইহার পূর্ব্বে আছে—মহিষাসুর আসিয়া দেখিল :

"দিশো ভুজ সহস্রেণ সমন্তাদ্ব্যাপ্য সংস্থিতম্।

দেবী সহস্রভুজ দ্বারা দিঙ্মণ্ডল ব্যাপ্ত করিয়া আছেন।

ভাষ্য ব্যাখ্যা দ্বারা বুঝিতে পারিতেছি যে, "এই মহিষমর্দ্দিনী সহস্রভুজা; কিন্তু অষ্টাদশভুজারূপে ইঁহার উপাসনা করা যায়, ইহা বৈকৃতিক রহস্যে বলা আছে। * * সঠিক সহস্রভুজা মহিষমর্দ্দিনীর অষ্টাদশভুজা, দশভুজা ও অষ্টভুজা মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া পূজা করিতে পারেন, তাহার বিধি ব্যবস্থা গ্রন্থান্তরে আছে, ইঙ্গিতে সূচনা এই দেবী-মাহাত্ম্যে পাইতেছি।

আমি ঢাকার দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে বুড়ীগঙ্গার দক্ষিণ তীরে অবস্থিত শাক্তা গ্রামে একখানি অতি সুন্দর দশভুজা মহিষমর্দ্দিনী মূর্ত্তি দেখিয়াছিলাম। এই মূর্ত্তিখানির উল্লেখ বন্ধুবর ডক্টর নলিনীকান্ত ভট্টশালী, স্বর্গত সুপণ্ডিত রায়বাহাদুর রমাপ্রসাদ চন্দ প্রভৃতি চিত্রসহ আলোচনাও করিয়াছেন।† খিদিরপুরের চিত্রশালায় কয়েকটি অপূর্ব্ব মহিষমর্দ্দিনী মূর্ত্তি দেখিয়াছিলাম। এখানে তাহার একটির চিত্র প্রকাশ করিলাম।

বৈষ্ণব শাস্ত্রে সুপণ্ডিত এবং প্রত্নতত্ত্বানুরাগী বন্ধুবর শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় ১৩২২ সালের চৈত্রসংখ্যার মাসিক "গৃহস্থ" পত্রিকায় "বক্রেশ্বরে শ্রীশ্রীমহিষমর্দ্দিনী মূর্ত্তি" শীর্ষক প্রবন্ধে একটি অষ্টাদশভুজা মহিষমর্দ্দিনী মূর্ত্তির বিবরণ প্রদান করিয়াছেন। তিনি ঐ মূর্ত্তিটির পরিচয় দিতে গিয়া লিখিয়াছেন—"হেতমপুরের বিদ্যোৎসাহী মহারাজকুমার মহিমানিরঞ্জন চক্রবর্ত্তীর সহিত বক্রেশ্বর তীর্থ পরিদর্শন করিতে গিয়া ঐ মূর্ত্তিটির সন্ধান পাইয়াছিলাম। একজন পাণ্ডার বাড়ীর সমীপস্থ এক পুষ্করিণী গর্ভ হইতে অষ্টাদশভুজা মহিষমর্দ্দিনী মূর্ত্তিটি কুড়াইয়া পাওয়া গিয়াছিল। পাণ্ডার মুখে শুনিয়াই তাঁহাদের বাড়ীতে গিয়া দেখিতে ইচ্ছুক হওয়ায় দুই একজন পাণ্ডা আমাদিগকে তাঁহাদের বাড়ীতে লইয়া গেলেন। গিয়া দেখি এক অষ্টাদশভুজা দেবী মূর্ত্তি। অপূর্ব্ব সে মূর্ত্তি পরিকল্পনা। একখণ্ড কৃষ্ণপ্রস্তরে মূর্ত্তিটি নির্ম্মিত। মূর্ত্তিটিকে বেড়িয়া কৌমারী, বারাহী, বৈষ্ণবী প্রভৃতি শক্তি মূর্ত্তি চালচিত্রের মত শোভা পাইতেছেন।

'বক্রেশ্বরে মনঃপাতঃ দেবী মহিষমর্দ্দিনী
ভৈরবো বক্রনাথস্তু নদী তত্র পাপহরা।'

এই 'মহিষমর্দ্দিনী' এতদিন কেহ দেখিতে পাইত না। এইবার তিনি লোকলোচনের গোচরীভূতা হইয়াছেন। প্রাগুক্ত মূর্ত্তিটি যে ৮বক্রেশ্বর মহাপীঠাধিষ্ঠাত্রী মহিষমর্দ্দিনী দেবী, তদ্বিষয়ে আমাদের আর কোনও সন্দেহ রহিল না।"

অতঃপর হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় 'বোম্বাই নির্ণয়সাগরযন্ত্রে' হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত, হরেকৃষ্ণ শর্ম্মণা সম্পাদিত "দুর্গা সপ্তসতী বৈকৃতিক রহস্যে' প্রথমে মধুকৈটভবধাধিষ্ঠাত্রিযোগনিদ্রা মহাকালী দেবী বর্ণিতা হইয়াছেন। তৎপরে মহিষাসুরবধাধিষ্ঠাত্রী মহালক্ষ্মী মহিষমর্দ্দিনীর বর্ণনা আছে। যথা—

সর্ব্বদেব শরীরেভ্য আবির্ভূতামিতপ্রভা।
ত্রিগুণা সা মহালক্ষ্মী সাক্ষান্মহিষমর্দ্দিনী ॥
শ্বেতাননা নীলভুজা সুশ্বেতস্তনমণ্ডলা।
রক্তমধ্যা রক্তপাদা নীল জঙ্ঘোরুরুন্মদা ॥
সুচিত্র-জঘনাচিত্র মাল্যাম্বরবিভূষণা।
চিত্রানুলেপনা কান্তি রূপসৌভাগ্যশালিনী ॥
অষ্টাদশভুজা পূজ্যা সা সহস্রভুজা সতী।
আয়ুধান্যত্র বক্ষ্যন্তে দক্ষিণাধঃ করঃ ক্রমাৎ ॥
অক্ষমালাঞ্চ কমলং বাণোঽসি কুলীশংগদা।
চক্রং ত্রিশূলং পরশুঃ শঙ্খোঘণ্টা চ পাশকঃ ॥
শক্তির্দণ্ড চর্ম্ম চাপং পানপাত্রং কমণ্ডলু।
অলঙ্কৃতভুজা নেভীরায়ুধৈঃকমলাসনাং ॥
সর্ব্বদেবময়ীমীশাং মহালক্ষ্মীমিমাংনৃপ।
পূজয়েদ্‌সর্ব্বদেবানাং স লোকানাং প্রভুর্ভবেৎ ॥

বলা বাহুল্য যে আমাদের পরিদৃষ্ট মূর্ত্তিটির অষ্টাদশভুজে এই অষ্টাদশ প্রকার আয়ুধাদি বিদ্যমান আছে। তবে বহুদিনের পুরাতন ও

---

* বঙ্গবাসী সংস্করণ 'কালিকাপুরাণ' ও অগ্নিপুরাণ' দ্রষ্টব্য।

† বৃন্দাবন ভট্টাচার্য্য মহাশয় তৎপ্রণীত Indian Images নামক গ্রন্থে Indian Museum এ রক্ষিত দশভুজা মহিষমর্দ্দিনীর চিত্র প্রকাশ করিয়াছেন। ডক্টর ভট্টশালী Iconography of Buddhist and Brahmanical sculptures in the Dacca Museum নামক গ্রন্থের 194-197 পৃষ্ঠায় মহিষমর্দ্দিনী মূর্ত্তি বিষয়ে আলোচনা করিয়াছেন।

বহুদিন মৃত্তিকাগর্ভে নিহিত থাকায় মূর্ত্তিটি অনেকাংশে ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছে। অধুনা চিত্র বর্ণাদি হইতে বুঝিবার উপায় নাই।"

আমরা অষ্টাদশভুজা মহিষমর্দ্দিনী এই মূর্ত্তিটির পরিচয় পাইয়া বুঝিতে পারিতেছি যে এক সময়ে অষ্টভুজা, দশভুজা, ষোড়শভুজা, অষ্টাদশভুজা এবং বিংশতিভুজা ও সহস্রভুজা মহিষমর্দ্দিনী মূর্ত্তির পূজা বঙ্গদেশে অপ্রচলিত ছিল না। তবে সচরাচর অষ্টভুজা ও দশভুজা দুর্গা মূর্ত্তির পূজাই বেশী হইত। কেন না ঐরূপ মূর্ত্তির সংখ্যাই অধিক।

কোন্ মূর্ত্তি কিরূপ তাহাও বলিতেছি।

(১) সহস্রভুজামূর্ত্তি—এই মহিষমর্দ্দিনী মূর্ত্তি কৃষ্ণবর্ণ—সহস্র বাহু, আর অসুরও পদলগ্ন নহে।

(২) অষ্টাদশভুজা—উগ্রচণ্ডা মূর্ত্তি (৩) ষোড়শভুজা ও ভদ্রকালী মূর্ত্তি।

(৪) দশভুজা—তপ্তকাঞ্চনবর্ণা দুর্গা মূর্ত্তি।

(৫) নীলবর্ণা দশভুজামূর্ত্তি।

ভদ্রকালী মহিষমর্দ্দিনী মূর্ত্তি

এইবার দেবী মহিষাসুরকে বধ করিবার জন্য যে উগ্রচণ্ডা মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিলেন সে মূর্ত্তির কথা বলিতেছি। দেবীর মূর্ত্তি হইল অতি ভয়ঙ্করী :—মূর্ত্তির প্রভা, দলিত অঞ্জন সদৃশ; মূর্ত্তি দেখিতে প্রচণ্ড এবং সিংহবাহিনী, নেত্র রক্তবর্ণ, শরীরের আয়তন অতি বৃহৎ এবং অষ্টাদশবাহুযুক্ত। ভদ্রকালী দেবী মহিষাসুরকে তাঁহার উগ্রচণ্ডামূর্ত্তি প্রদর্শন করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি মহিষাসুরকে বধ করিয়াছিলেন, ভদ্রকালী মূর্ত্তিরূপে। সেই মূর্ত্তির বর্ণনা পুরাণকার যেরূপ করিয়াছেন তাহাই এইবার বলিব।

মহিষাসুরবধের কাল

পূর্ব্বকল্পে স্বায়ম্ভুব মনুর অধিকারে মনুষ্যদিগের ত্রেতাযুগের আদিতে মহিষাসুরের বিনাশ এবং জগতের নিমিত্ত যোগনিদ্রা যোগধাত্রী জগন্ময়ী মহাদেবী মহামায়া সমুদয় দেবগণ কর্ত্তৃক সংস্তুত হইয়াছিলেন। অনন্তর তিনি ক্ষীরোদ সমুদ্রের উত্তর তীরে অতি বিপুল শরীর ধারণ করিয়া ষোড়শভুজারূপে আবির্ভূতা হইয়া ভদ্রকালী নামে আবির্ভূত হন। তৎকালে তাঁহার বর্ণ অতসী পুষ্পের মত হইয়াছিল, কর্ণে উজ্জ্বল কাঞ্চনের কুণ্ডল ছিল এবং মস্তক জটাজুট, অর্দ্ধচন্দ্র এবং মুকুটে ভূষিত ছিল। তাঁহার গলদেশে নাগহারের সহিত সুবর্ণের হার বিরাজ করিয়াছিল। তিনি দক্ষিণ বাহুসমূহে শূল, খড়্গ, শঙ্খ, চক্র, বাণ, শক্তি, বজ্র এবং দণ্ডধারণ করিয়াছিলেন, তাঁহার দন্তগুলি সমুজ্জলরূপে বিকশিত হইয়াছিল। তাঁহার বাম হস্ত-নিচয়ে খেটক, চর্ম্ম, ঢাল, পাশ, অঙ্কুশ, ঘণ্টা, পরশু এবং মুষল শোভিত ছিল। তিনি সিংহের উপর আরোহণ করিয়াছিলেন এবং রক্তবর্ণ নয়নত্রয়ে উজ্জ্বলিত হইয়াছিলেন। সেই জগন্ময়ী পরমেশ্বরী দেবী মহিষকে বামপদের দ্বারা আক্রমণ করিয়া শূলের দ্বারা তাহার শরীর ভেদ করিয়াছিলেন। দেবগণ, পরমেশ্বরীর সেই মূর্ত্তি এবং মহিষাসুরকে নিহত দেখিয়া কিছুই বলিতে পারেন নাই—অর্থাৎ বিস্ময়াবেশে স্তম্ভিত হইয়াছিলেন।" পুরাণকার বলিতেছেন :—

'পুরাকল্পে মহাদেবী মনোঃস্বায়ম্ভুবেঽন্তরে।
নৃণাং কৃত যুগস্যাদৌ সর্ব্বদেবৈঃ স্তুতা সদা॥
মহিষাসুরনাশায় জগতাং হিতকাম্যয়া।
যোগনিদ্রা মহামায়া জগদ্ধাত্রী জগন্ময়ী॥
ভুজৈঃ ষোড়শভির্যুক্তা ভদ্রকালীতিবিশ্রুতা।
ক্ষীরোদস্যোত্তরে তীরে বিভ্রতী বিপুলাং তনুম্।
অতসীপুষ্পবর্ণাভা জ্বলৎকাঞ্চনকুণ্ডলা।
জটাজুট সখণ্ডেন্দু মুকুটত্রয়ভূষিতা॥
নাগহারেণ সহিতা স্বর্ণহার বিভূষিতা॥
শূলং চক্রঞ্চ খড়্গঞ্চ শঙ্খং বাণং তথৈব চ।
শক্তিং বজ্রঞ্চ দণ্ডঞ্চ নিত্যং দক্ষিণবাহুভিঃ।
বিভ্রতী সততং দেবী বিকাশিদশনোজ্জ্বলা॥
খেটকং চর্ম্মচাপঞ্চ পাশঞ্চাঙ্কুশমেব চ।
ঘণ্টাং পরশুঞ্চ মুষলং বিভ্রতী বামপাণিভিঃ॥
সিংহস্থা নয়নে রক্তবর্ণৈস্ত্রিভিরতিজ্বলা।
শূলেন মহিষং ভিত্ত্বা তিষ্ঠন্তী পরমেশ্বরী॥
বামপাদেন চাক্রম্য তত্রদেবী জগন্ময়ী।
তাং দৃষ্ট্বা সকলাঃ দেবাঃ প্রণম্য পরমেশ্বরীম্।
নোচুঃ কিঞ্চনতং দৃষ্ট্বা নিহতং মহিষাসুরম্॥
ততঃ প্রোবাচ দেবাংস্তান্ ব্রহ্মাদীন্ পরমেশ্বরী।
স্মিত প্রভিন্নবদনা বিকাশিবদনোজ্জ্বলা॥
গচ্ছন্তু ভোঃ সুরগণা জম্বুদ্বীপান্তরং প্রতি। ইত্যাদি।

মহিষমর্দ্দিনী মূর্ত্তি ভাস্করেরা ঠিক্ ধ্যানানুরূপই নির্ম্মাণ করিয়া আসিয়াছেন। আমরা যে দুর্গা মূর্ত্তি অর্চ্চনা করি এবং যে দুর্গা মূর্ত্তিকে

মহিষমর্দ্দিনী মূর্ত্তি—চন্দননগর

মহিষমর্দ্দিনীরূপে অভিহিত করি এবং যে ভাবে দুর্গা মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করি তাহার সহিত প্রকৃত মহিষমর্দ্দিনী মূর্ত্তির সাদৃশ্য নাই। কি বিংশতিভুজা, কি অষ্টাদশভুজা, কি দশভুজা, কি অষ্টভুজা সমুদয় মূর্ত্তির গঠন ও সাদৃশ্য

বাঙ্গলাদেশে প্রচলিত দুর্গা মূর্ত্তির মত নহে—অনেকটা রূপান্তরিত। এ রূপান্তর—কাল পরিবর্ত্তনে সম্ভবপর হইয়াছে।

মহিষমর্দ্দিনী মূর্ত্তির রূপান্তর

মহিষমর্দ্দিনী মূর্ত্তি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র মূর্ত্তি, তাহার সহিত লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্ত্তিক, গণেশ প্রভৃতি দেব-দেবীর সম্পর্ক নাই। ধ্যানে ইঁহাদের কোন কথাই নাই। 'কালিকাপুরাণ'দিতেও এ বিষয়ের কোন উল্লেখ নাই। এমন কি বাঙ্গলাদেশে দুর্গামূর্ত্তির হস্তের অস্ত্র সন্নিবেশও ধ্যানানুসারে প্রচলিত নহে। ধ্যানের সাহিত্য-মূর্ত্তি মিলাইলে ইহা সকলেই বুঝিতে পারিবেন। আমাদের বাঙ্গালায় শিল্পীরা যে সমুদয় দুর্গা মহিষমর্দ্দিনী মূর্ত্তি গড়িয়া জনগণের শ্রদ্ধা ও প্রশংসা অর্জ্জন করিয়া থাকেন, তাহা 'আর্ট' হইতে পারে, কিন্তু প্রকৃত ধ্যানানুমোদিত দুর্গা মহিষমর্দ্দিনী মূর্ত্তি নহে। তিনি একক মূর্ত্তি—মহাদৈত্য যুদ্ধে ব্রতিনী রণরঙ্গিনী মহিষমর্দ্দিনী মূর্ত্তির ভাব যে কিরূপ তেজব্যঞ্জক তাহা প্রস্তরনির্ম্মিত যে কোন একখানি মহিষমর্দ্দিনী মূর্ত্তি দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন। বিভিন্নভুজা, প্রত্যেক মহিষমর্দ্দিনী মূর্ত্তির নীচেই দেখিতে পাইবেন—দেবী মহিষমর্দ্দিনীর অধোভাগে ছিন্নমূর্দ্ধা ও পতিত মস্তক মহিষ। ঐ মহিষ ক্রোধভরে হস্তে অস্ত্রধারণ করিয়া আছে। উহার গ্রীবা হইতে এক পুরুষ উদ্ভূত হইয়াছে। তাহার হস্তে শূল, মুখে রক্ত বমন হইতেছে এবং তাহার কেশ, মাল্য ও লোচনযুগল রক্তবর্ণ; গলদেশ পাশবদ্ধ এবং ঐ পুরুষসিংহ কর্ত্তৃক আক্রান্তমান। চণ্ডীর দক্ষিণপদ সিংহের স্কন্ধে এবং বামপদ নীচগামী অসুরের পৃষ্ঠদেশে বিন্যস্ত। এই ত্রিনেত্রা, সশস্ত্রা ও রিপুমর্দ্দিনী দুর্গারূপিণী চণ্ডীকে নবপদ্মাত্মক স্থানে স্বমূর্ত্তিতে পূজা করা কর্ত্তব্য। যথা:

"আদর্শ মুদগরাণ্ হস্তেশ্চণ্ডী বা দশবাহুকা।
তদধো মহিষশ্ছিন্নমূর্দ্ধা পাতিত মস্তকঃ॥
শস্ত্রোদ্যতকরঃ ক্রুদ্ধস্তদ্ গ্রীবাসম্ভবঃপুমান্।
শূলহস্তো বমদ্রক্তো রক্ত স্রগ্মূর্দ্ধজেক্ষণঃ॥
সিংহেনা স্বাদ্যমানস্তু পাশবদ্ধোগলেভৃশম্।
যাম্যাঙ্ঘ্রিস্তু সিংহা চ সব্যাঙ্ঘ্রি নীচগাসুরে॥
চণ্ডিকেয়ং ত্রিনেত্রা চ সশস্ত্রা রিপুমর্দ্দনী।
নচ পদ্মাত্মকে স্থানে পূজ্যা দুর্গা স্বমূর্ত্তিতঃ॥

মহিষমর্দ্দিনী দুর্গা পূজা

মহিষাসুর নিহত হইলে পর দেবতারা যে মন্ত্রদ্বারা দেবীর পূজা করেন, দেবীও লোক সমাজে সেই ধ্যানানুগত মহিষমর্দ্দিনী মূর্ত্তিতেই বিখ্যাত হইয়াছেন। সেই অবধি লোকে সেই মূর্ত্তিরই পূজা করে। এজন্য মহিষমর্দ্দিনী মূর্ত্তিই প্রধানা। দেবতাদের বরদানহেতু এবং ব্রহ্মাদির উপযোগ হেতু ঐ মূর্ত্তি পূজিত হইয়া থাকেন। সেই মূর্ত্তির বর্ণনা এইরূপ:

"জটাজুটসমাযুক্তামর্দ্ধেন্দুকৃতশেখরাম্।
লোচনত্রয়সংযুক্তাং পূর্ণেন্দুসদৃশাননাম্॥
তপ্তকাঞ্চনবর্ণাভাং সুপ্রতিষ্ঠাং সুলোচনাম্।
নবযৌবনসম্পন্নাং সর্ব্বাভরণভূষিতাম্॥
সুচারু দর্শনাং তীব্রাং পীনোন্নতপয়োধরাম্।
ত্রিভঙ্গস্থানসংস্থানাং মহিষাসুরমর্দ্দিনীম্॥
মৃণালায়তসংস্পর্শদশবাহুসমন্বিতাম্॥" ইত্যাদি

এই যে দেবী চণ্ডী বা অম্বিকা তিনি যেমন মহিষাসুরকে বধ করিয়াছিলেন, তেমনি শুম্ভ নিশুম্ভকেও সংহার করিয়াছিলেন। চণ্ড মুণ্ডকে বধ করিয়া কালী চণ্ডিকা এবং চামুণ্ডা নাম ধারণ করেন, চণ্ডিকা দেবীই পরিশেষে নিশুম্ভ এবং শুম্ভকে বধ করিয়া দেবতাগণকে বিপন্মুক্ত করেন।

দেবী চণ্ডিকা মহা-অষ্টমী দিনে মহিষাসুরকে বধ করেন এজন্য অষ্টমীর দিন বিশেষ উপচারের সহিত পূজা করিতে হয়। 'কালিকাপুরাণ' মার্কণ্ডেয়কথিত উপপুরাণ। এই পুরাণের নির্দ্দিষ্ট মতেই বাঙ্গালাদেশে দুর্গাপূজা নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে।

Earnest A. Payne বলেন: "From the sixth century, and possibly earlier, comes the Devi-mahatmya or Chandi-mahatmya or Saptasati, which has been interpolated in the Markandeya Purana. It celebrates the mighty deeds of the goddess and refers to her daily worship and autumn festival. This work is still very popular and is described by Barth as 'the principal sacred text of the worshippers of Durga in Northern India.' *

কালিকাপুরাণের মতানুযায়ী আমাদের দেশে শক্তিপূজা হইয়া থাকে। ঐ পুরাণে নরবলির বিধানও যেমন আছে তেমনি পুরুষ বলিদানের বিধানও রহিয়াছে। অনেকে মনে করেন কালিকাপুরাণ প্রভৃতির ন্যায় কয়েকখানি তন্ত্রশাস্ত্রদ্বারা প্রভাবান্বিত,এই সব গ্রন্থ তন্ত্রশাস্ত্রের বা তান্ত্রিক বিধানানুযায়ী বর্ণনায়পূর্ণ। তান্ত্রিক ধর্ম্ম কতদিনের প্রাচীন বলা সম্ভবপর না হইলেও উহা দেড়হাজার বৎসরের অধিক প্রাচীন বলিয়া মনে হয় না। অবশ্য এ বিষয়ে নানাজনে নানারূপ মতাবলম্বী এবং আলোচনাও হইয়াছে অনেক।

তন্ত্রশাস্ত্রে রণরঙ্গিণী দেবী মহিষমর্দ্দিনীর বিষয় বিশদভাবে বর্ণিত আছে। 'কুলার্ণবতন্ত্র'ও শ্রীমল্লক্ষণ-দেশিকেন্দ্র বিরচিত 'শারদাতিলক' নামক নিবন্ধে মহিষমর্দ্দিনীর বর্ণনা আছে। এই নিবন্ধ আনুমানিক একাদশ শতাব্দীর সমসময়ে লিখিত হইয়াছিল। প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক স্বর্গত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় বলেন: "যেখানে যুদ্ধরাগ, সেখানেই মা মহিষমর্দ্দিনীর খেলা। স্নেহরাজ্যের শ্রেয়ঃ প্রেয়ের দ্বন্দ্ব-যুদ্ধই হউক; আর ধরারাজ্যের হিংসাদ্বেষপূর্ণ নরশোণিত পিপাসাই হউক; যেখানে জয়পরাজয়ের কলহ কোলাহল, সেখানেই মা মহিষমর্দ্দিনীর খেলা। এই খেলা সমগ্র সভ্য-সমাজকে উন্মত্ত করিয়া তুলিয়াছে। সেকালে আমাদের দেশে অনেক সময়েই এই খেলার আতিশয্য দেখিতে পাওয়া যাইত। কখনও বহিঃশত্রুর আক্রমণ, শক হূণ গুর্জ্জরগণের অভিযান—কখনও বা অন্তর্বিপ্লবের প্রবল প্রতাপ, দেশের মধ্যে যুদ্ধের প্রয়োজন, যুদ্ধ-কালের গৌরব চিরজাগরূক করিয়া রাখিত।" ‡

যুগে যুগে দেবদেবীর শ্রীমূর্ত্তি গঠনে ও পূজা পদ্ধতিতেও পরিবর্ত্তন যে ঘটিয়াছে তাহার সম্বন্ধে অনেক কথা বলা যাইতে পারে। যে কোন শিল্পানুরাগী ব্যক্তিই শ্রীমূর্ত্তি দর্শনে তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন। এ প্রসঙ্গে অক্ষয়বাবুর মতটিও অনুধাবনযোগ্য। তাঁহার মতে শ্রীমল্লক্ষণ দেশিকেন্দ্র কর্ত্তৃক যখন "শারদা তিলক' লিপিবদ্ধ হয় "তখন ভারতভাগ্য-স্রোতে ভাঁটার টান অনুভূত হইয়াছে— পঞ্চনদের পশ্চিমাংশে মুসলমানের নবশক্তি দিগ্বিজয়ের আয়োজনে ব্যাপৃত হইয়া পড়িয়াছে। তখনকার নিবন্ধে মা মহিষমর্দ্দিনী একটু পরিবর্ত্তিত আকারে উল্লিখিত।

গারুড়োপলসন্নিভাং মণি মৌলিকুণ্ডলমণ্ডিতাং
নৌমি ভাল-বিলোচনাং মহিষোত্তমাঙ্গ-নিষেদুষীম্।
চক্র-শঙ্খ-কৃপাণ-খেটক-বাণ-কার্ম্মুক-শূলকাং
তর্জ্জনীমপি বিভ্রতীং নিজ বাহুভিঃ শশিশেখরাম্॥

মা তখন 'গারুড়োপলবর্ণা'—কৃষ্ণবর্ণের মধ্যে চাকচিক্য ফুটিয়া উঠিয়াছে। জটামুকুটের পরিবর্ত্তে 'মণি মৌলি' প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। অস্ত্রশস্ত্রের

---

* The Saktas By Earnest Payne page 40.

‡ সাহিত্য ২৫শ বর্ষ ষষ্ঠ সংখ্যা। ৩৫৪ পৃষ্ঠা। মহিষমর্দ্দিনী অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়।

অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিয়া গিয়াছে। দুই হাতে দুইখানি খড়্গ নাই ; এক হাতে একখানি মাত্র কৃপাণ, আর একখানির পরিবর্ত্তে "খেটক", চর্ম্ম নাই, শঙ্খ আসিয়া রণনিনাদ মুখরিত করিতেছে। 'তর্জ্জন' তর্জ্জনী হইয়াছে।'

তাহার পর যখন দেশ মুসলমান-শাসনের অধীন, তখনকার প্রধান নিবন্ধকার শ্রীমৎ কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশও 'তন্ত্রসারে' এইরূপ ধ্যানই লিখিয়া গিয়াছেন। "কুলচূড়ামণির' প্রাচীন ধ্যান আর প্রচলিত নাই। "কুলচূড়ামণিতে একটি স্তোত্র সংযুক্ত হইয়াছে। তাহাতে দেখিতে পাওয়া যায় ;

"উর্দ্ধাধঃ কমসব্যবাম করয়োশ্চক্রং দরং কর্ত্তৃকাম্।
খেটং বাণধনু-স্ত্রিশূল-ভয় হৃন্মুদ্রাং দধানাং শিবাম্॥

এখানে দুইখানি খড়্গাই তিরোহিত, তাহার পরিবর্ত্তে কেবল একহাতে একখানি কাটারী (কর্ত্তৃকা) ; "তর্জ্জনী একেবারে অভয় মুদ্রায় পরিণত। * * মহিষমর্দ্দিনী মূর্ত্তির এই তিন প্রকার রণবেশ দেশের অবস্থার সামঞ্জস্য রক্ষা করিবার জন্যই যেন দুই হাতের দুই খড়্গ ছাড়িয়া একখানি রাখিয়াছিল ; পরে তাহাও কাটারীতে পরিণত করিয়া লওয়া হইয়াছিল। * * মনে হয় স্তোত্রটি কুলচূড়ামণির অন্তর্গত হইলেও 'কুলচূড়ামণির' মূলাংশের সহিত সামঞ্জস্য নাই।

আমরা এখানে যে অষ্টভুজা মহিষমর্দ্দিনী মূর্ত্তির চিত্র প্রকাশ করিলাম এই সুন্দর ব্রোঞ্জ নির্ম্মিত মূর্ত্তিটি চন্দননগরে ১৩৪৩ সালে বিংশ বঙ্গীয়-সাহিত্য সম্মিলনের সহিত শ্রদ্ধেয় বন্ধু এবং সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত হরিহর শেঠ মহাশয়ের যত্নে যে এক প্রদর্শনীর ব্যবস্থা হইয়াছিল তাহাতে প্রদর্শিত হয়। মূর্ত্তিটির অধিকারী শ্রীযুক্ত সিদ্ধেশ্বর মৌলিক, ইনিও চন্দননগর নিবাসী। ১৯১৪ খৃষ্টাব্দের পৃথিবী ব্যাপী মহাসমরে যুদ্ধার্থ চন্দননগর হইতে ইনি ফরাসী দেশে গিয়াছিলেন। আমি বন্ধুবর সিদ্ধেশ্বর বাবুর নিকট হইতে কিছুদিনের জন্য এই মূর্ত্তিটি চাহিয়া আনিয়া ইহার ফোটোগ্রাফ করিয়াছিলাম। এই মহিষমর্দ্দিনী মূর্ত্তিটি অষ্টভুজা। দৈর্ঘ্যে ১০½ ইঞ্চি পরিমিত। 'প্রপঞ্চসার তন্ত্রের' মতানুসারে অষ্টভুজা মহিষমর্দ্দিনী মূর্ত্তি প্রশস্ত। প্রপঞ্চসার খুব প্রামাণিক গ্রন্থ কিনা সেবিষয়ে মতভেদ আছে। কোন কোন পণ্ডিতের মতে— "The Prapanoha sara T., sometimes wrongly attributed to sankara but dated by Farquhar some centuries later' and desoribed as "rather a foul book" though it coutains, 'as J. W. Hauer notes, a profound philosophy of language." *

এই মহিষমর্দ্দিনী মূর্ত্তিটি এক গভীর অরণ্যের মধ্যে পাওয়া গিয়াছিল। ইনি নাকি একদল ডাকাতের অধিষ্ঠাত্রী দেবী ছিলেন।

এই মহিষমর্দ্দিনী মূর্ত্তির মুকুটটি উন্নত ও সুন্দর। গঠনেও অভিনবত্ব পরিদৃশ্যমান। দেবীর মুখমণ্ডল রণরঙ্গিণীরই মত ভয়ঙ্করী। ত্রিনেত্র দীপ্তিমান্—তীব্রজ্যোতিঃবিশিষ্টা। শ্রীঅঙ্গ যৌবনসম্পন্না। অঙ্গে বিবিধ আভরণ। প্রতি হস্ত প্রকোষ্ঠে বলয়, বাহুতে বাজু। স্তনদ্বয় পীন ও উন্নত। তিনি ত্রিভঙ্গক্রমে দণ্ডায়মানা। মহিষমর্দ্দিনী মূর্ত্তির দক্ষিণের সর্ব্বোপরি বাহুতে খড়্গ, তাহার নীচে একে একে তীক্ষ্ণবাণ, চক্র ও শূল। শূল দ্বারা মহিষাসুরের বক্ষঃস্থল বিদ্ধ। আর চারি বাম বাহুতে ঢাল, ধনু, পাশ এবং মহিষাসুরের কেশ একত্র করিয়া দেবী বাম হস্তে ধারণ করিয়াছেন। দেবীর পদনিম্নে ছিন্ন-শির মহিষ, ঐ মহিষের শিরশ্ছেদ হওয়াতে উহা হইতে একটি খড়্গপাণি দানব উৎপন্ন হইয়াছে। তাহার সর্ব্বশরীর মহিষের অস্ত্রে বিভূষিত। মহিষের রক্তে তাঁহার শরীর রক্তবর্ণ এবং চক্ষুদ্বয়ও আরক্ত। নাগপাশ তাহাকে বেষ্টন করিয়া আছে এবং তাহার মুখ ভ্রুকুটিতে কুটিল হইয়াছে এবং মুখ দিয়া রক্ত বমন হইতেছে। সিংহের উপর দেবীর দক্ষিণপদ বিন্যস্ত, বামপদ প্রত্যালীঢ় ভাবে ন্যস্ত—অঙ্গুষ্ঠ মহিষের মাথার উপর। দেবীর পরিধানের বস্ত্র আগুলফ্ পর্য্যন্ত বিলম্বিত। সূক্ষ্ম ডুরে শাড়ী, কটির নিম্নভাগের কতকটা একটু অন্যরূপে সজ্জিত।

এই মূর্ত্তির এক হস্তে খড়্গ, দুই হস্তে নহে। সর্ব্বনিম্নে পাদপীঠ। পাদপীঠ একটি বিকশিত শতদল। মূর্ত্তিটির গঠন নৈপুণ্য ও শিল্প নৈপুণ্যের দিক্ দিয়া মূর্ত্তিটি উচ্চশ্রেণীর নহে। বেশভূষা ও আয়ুধ ইত্যাদি দেখিয়া মনে হয় যে মূর্ত্তিটি ৩০০।৩৫০ সাড়ে তিনশত বৎসরের অধিক প্রাচীন নহে।
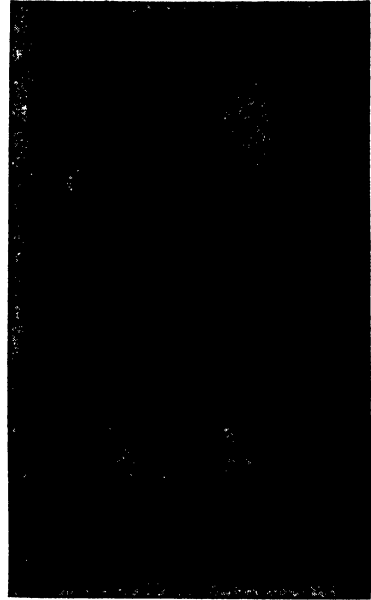
মহিষমর্দ্দিনী মূর্ত্তি—খিচিং চিত্রশালা

শ্রীশ্রীচণ্ডীতে, 'তন্ত্র সারে' এবং 'কুলচূড়ামণি তন্ত্রে' মহিষমর্দ্দিনীর যে স্তোত্রটি আছে তাহা ঐতিহাসিক অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয়ের মতে "এই স্তোত্রটি নানা ঐতিহাসিক তথ্যের আধার।" তিনি ইহাকে সেকালের সামরিক স্তোত্র এই আখ্যা দিয়াছেন।—"রচনা গৌরবে এই স্তোত্র যেরূপ শ্রুতিসুখকর, ভাবগাম্ভীর্য্যেও ইহা সেইরূপ চিত্তোন্মাদক। * * * যখন বাহুতে বল ছিল, তখন হৃদয়েও ভক্তির অভাব ছিলনা, তখন কণ্ঠ নিরন্তর বিজয় গাথাই গান করিত। এই স্তোত্রে তাহার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। সামরিক উচ্ছ্বাস পূর্ণ এমন স্তোত্র, স্তোত্রপ্রধান সংস্কৃত সাহিত্যেও বিরল। আধুনিক সভ্য সমাজ ও যুদ্ধ যাত্রাকালে ভগবচ্চরণে বিজয় প্রার্থনা জ্ঞাপন করিয়া থাকে, কেহই নরশক্তির উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে না। কিন্তু সে বিজয় প্রার্থনার ভাষা এবং এই স্তোত্রের ভাষা একরূপ নহে ; তাহা মনুষ্যকণ্ঠের ক্ষীণ অপরিস্ফুট দুর্ব্বল আর্ত্তনাদ ; ইহা দেবকণ্ঠের প্রবল পরাক্রান্ত বিজয়-বাণী। মা মহিষমর্দ্দিনী করুন—তাঁহার স্তোত্র পাঠের ফলশ্রুতি বর্ত্তমান জগদ্ব্যাপী যুদ্ধ-কলহের মধ্যে সফলতা লাভ করুক।' প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে অক্ষয়কুমার যে কথা বলিয়াছিলেন, আজ আমাদেরও সে কথারই পুনরুক্তি করিতে ইচ্ছা হয় ; তাই সেই বাণী উদ্ধৃত করিলাম।

* The Saktas By Earnest A. Payne page 54.

মহিষাসুরের সহিত যুদ্ধকালীন দেবীর রণরঙ্গিণী মূর্ত্তি

মহিষাসুরকে বধ করিবার জন্ত জগন্ময়ী আত্মাশক্তি পরমেশ্বরী যে ভয়ঙ্করী মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিলেন তাহা পড়িলে শরীর রোমাঞ্চিত হয়। মহিষাসুর যখন খুরক্ষেপে ভূতল কুট্টিত করত শৃঙ্গ যুগল দ্বারা দেবীর প্রতি, তুঙ্গ-পর্ব্বতরাজি নিক্ষেপ করিতে এবং গর্জ্জন করিতে লাগিল। তখন

'ততঃ ক্রুদ্ধা জগন্মাতা চণ্ডিকাপানমুত্তমম্।
পপৌ পুনঃ পুনশ্চৈব জহাসারুণলোচনা।'

অনন্তর জগন্মাতা চণ্ডিকা কুপিতা হইয়া উৎকৃষ্ট পেয় (মধু) পুনঃ পুনঃ পান করিলেন এবং পানপ্রভাবে রক্তনয়না হইয়া হাস্ত করিতে লাগিলেন। বলবীর্য্য মদে উদ্ধত মহিষাসুরও গর্জ্জন করিতে লাগিল, দেবীর পদভরে আক্রান্ত হইয়া নিজ (মহিষ মূর্ত্তির) মুখ হইতে অর্দ্ধ নিষ্ক্রান্ত হইবা মাত্র দেবীর মহাবীর্য্য প্রভাবে নিরুদ্ধ হইল। আর নিষ্ক্রান্ত হইতে পারিল না। সেই মহাসুর অর্দ্ধ নিষ্ক্রান্ত অবস্থাতেই যুদ্ধ করিতে করিতে সেই দেবীর মহাখড়্গপ্রহারে ছিন্ন মস্তক হইয়া ধরাশায়ী হইল।—তখন দৈত্যেরা হাহাকার করতঃ পলায়ন করিল। সকল দেবতারা পরম আনন্দপ্রাপ্ত হইলেন এবং তাঁহারা দেবীর স্তব করিতে লাগিলেন। সেই সুদীর্ঘ সুন্দর রণস্তোত্রটি আমরা এই দুর্দ্দিনে শ্রীশ্রীচণ্ডী হইতে প্রত্যেক পাঠক পাঠিকাকে ভক্তিভরে উচ্চকণ্ঠে পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

'বাঙ্গালা-সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব' লেখক সুবিখ্যাত পণ্ডিত স্বর্গতঃ রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয় ১৭৯৩ শকে (১৮৭১ খ্রীঃ অঃ) চণ্ডীর অনুবাদ প্রকাশ করেন। সে প্রায় ৭০ বৎসর পূর্ব্বের কথা। তাঁহার সেই অনুবাদ মূলের অনুগত প্রাঞ্জল ও সুখপাঠ্য হইয়াছিল। ১৩১৫ সালে ঐ অনুবাদ 'বঙ্গবাসী' কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত হইয়াছিল, আমরা সেই অনুবাদ হইতে দেবীর স্তোত্রটির কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া পাঠক-পাঠিকাগণকে উপহার দিলাম। তাঁহারা মূলের সহিত উহা মিলাইয়া পাঠ করিলে উপকৃত হইবেন।

"যে দেবীর শক্তিবলে সৃষ্ট এ ভুবন,
দেবগণ তেজে যাঁর শরীর গঠন ;
সর্ব্বদেব ঋষিপূজ্যা সেই সুরেশ্বরী,
কল্যাণ করুন মোরা তাঁরে নতি করি।

অতুল প্রভাব যাঁর আর দেহবল,
ব্রহ্মা বিষ্ণুমহেশ্বর বর্ণিতে বিকল,
জগৎপালনে আর অশুভের নাশে,
সে দেবীর মতি যেন সর্ব্বদা বিকাশে।

ধন্ত গৃহে লক্ষ্মী যিনি, পাপিষ্ঠ-আলয়ে
অলক্ষ্মী, বুদ্ধিরূপে বিজ্ঞের হৃদয়ে ;
কুলীনের হৃদে লজ্জা, শ্রদ্ধা সজ্জনের,
সেই দেবী তুমি, রক্ষা কর জগতের॥

অচিন্ত্য তোমার রূপ কি বর্ণিতে পারি,
প্রবল অসুর-সঙ্ঘ-গর্ব্ব খর্ব্বকারি,
তোমার সমর কার্য্য বর্ণে সাধ্যকার।
সুরাসুরগণ মধ্যে অতি দুর্নিবার॥

*   *   *   *

শব্দময়ী তুমি, ঋক্ যজুঃ আর সাম,
এ তিন বেদের তুমি উৎপত্তির ধাম ;
সংসারের শুভ আর দুঃখনাশ তরে,
বার্ত্তাশাস্ত্র রূপে তব মূরতি বিহরে।

মেধা তুমি, সর্ব্বশাস্ত্র স্মরি যার বলে,
দুর্গা তুমি, নৌকা দুর্গভবাম্বুধি জলে ;
লক্ষ্মী তুমি, নারায়ণ হৃদয়ে বসতি,
গৌরী তুমি শশি-মৌলি সহিত সঙ্গতি।

স্মিত কান্ত পূর্ণচন্দ্র সম সুবিমল,
দেখিয়া এ স্বর্ণকান্তি বদনমণ্ডল ;
আশ্চর্য্য ! কিরূপে প্রহারিল রোষ ভরে,
এহেন শরীরে দুষ্ট দৈত্য অকাতরে !

দেখিয়াও তব বক্র ভ্রূকুটি করাল,
নব শশধর সম যার রশ্মিজাল ;
আশ্চর্য্য ! মহিষ তবু রহিল জীবনে,
কেবা বাঁচে প্রকুপিত যম দরশনে ?

প্রসীদ, পরমা দেবী করহ কল্যাণ,
কুপিলে তোমার কাছে কারো নাহি ত্রাণ ;
এই যে মহিষবল বিক্রমে বিপুল,
ক্ষণমাত্রে তারে তুমি করিলে নির্ম্মূল।

*   *   *   *

দুর্গমে স্মরিলে তুমি হর তার ভয়,
সুস্থজনে শুভমতি বিতর নিশ্চয় ;
তোমা বিনা কেবা হরে দৈন্য-দুঃখ ভয়,
সকলের হিতে রত কাহার হৃদয় ?

এইরূপ সুললিত পদ্যে ন্যায়রত্ন মহাশয় স্তোত্রটির অনুবাদ করিয়াছিলেন।

আজ দেবী মহিষমর্দ্দিনীকে স্মরণ করিয়া আমরা মিলিত কণ্ঠে বলিতেছি :

কেনোপমাভবতু তেহস্য পরাক্রমস্য
রূপঞ্চ শত্রুভয়কার্য্যতিহারিকুত্র।
চিত্তে কৃপা সমরনিষ্ঠুরতা চ দৃষ্টা
ত্বয্যেব দেবি বরদে ভুবনত্রয়েঽপি॥

তোমার এই পরাক্রমের তুলনা কোথায় হইবে ? শত্রু ভয়প্রদ অথচ মনোহর রূপ আর কোথায় আছে ? হে বরদে দেবি ! মনে করুণা ও সমরে নিষ্ঠুরতা ত্রিভুবনমধ্যে একমাত্র তোমাকে দেখিতে পাইলাম।

শূলেন পাহি নো দেবি পাহি খড়্গেন চাম্বিকে।
ঘণ্টাস্বনেন নঃ পাহি চাপজ্যানিস্বনেন চ॥
প্রাচ্যাং রক্ষ প্রতীচ্যাঞ্চ চণ্ডিকে রক্ষ দক্ষিণে।
ভ্রামণেনাত্ম শূলস্য উত্তরাস্যাং তথেশ্বরি॥

দেবি ! শূল দ্বারা আমাদিগকে রক্ষা কর, মাতঃ। খড়্গ দ্বারা রক্ষা কর, ঘণ্টা-শব্দ ও শরাসন-জ্যা-শব্দে আমাদিগকে রক্ষা কর। চণ্ডিকে ! পূর্ব্ব দিকে ও পশ্চিমে রক্ষা কর। হে ঈশ্বরি ! আত্মশূল ভ্রমিত করিয়া দক্ষিণ ও উত্তর দিকে রক্ষা কর।

সৌম্যানি যানি রূপাণি ত্রৈলোক্যে বিচরন্তি তে।
যানি চাত্যর্থ ঘোরাণি তৈ রক্ষাস্মাংস্তথা ভুবম্॥
খড়্গশূলগদাদীনি যানি চাস্ত্রাণি তেঽম্বিকে।
করপল্লবসঙ্গীনি তৈরস্মান্ রক্ষ সর্ব্বতঃ॥

ত্রৈলোক্য মধ্যে তোমার যে সকল সৌম্য ও অত্যন্ত ভীতিপ্রদ রূপ বিরাজমান, তৎসমস্ত দ্বারা আমাদিগকেও পৃথিবীকে রক্ষা কর।

মাতঃ ! খড়্গ শূল গদা প্রভৃতি যেসকল অস্ত্র তোমার করপল্লবে বিরাজমান, তদ্দ্বারা আমাদিগকে সর্ব্বস্থান হইতে রক্ষা কর।'

জামাইবাবু

শ্রীসুধাংশুকুমার বসু

গৃহকর্ম্মে ব্যাপৃত থাকিয়া তপতী সতুর নালিশ শুনিয়া, গৃহদেবতা রাধা-শ্যামের পূজা-অর্চ্চনার যোগাড় দিয়া সারাদিন যে তাহার কোন্ পথে দিন কাটিয়া যায় মঞ্জুরী তাহা ঠাওর করিতেই পারে না। অবসর মত মঞ্জুভিলার দক্ষিণপ্রান্তের ছোট ফুলের বাগানের কেয়ারি করে, খাঁচায় পোষা টিয়াপাখীকে "হরিনাম" শেখায় এবং তপতীকে অঙ্ক কষায়।

তপতী-সতুর নিদারুণ দৌরাত্ম্যেও মঞ্জুরী ভুলিয়াও কখনও তাহাদের গায়ে হাত তোলে না। তপতী-সতুর ঝগড়া যখন খুবই প্রবল হইয়া উঠে এবং মঞ্জুরীর অসীম ধৈর্য্যের বাঁধও টলিতে থাকে তখন মুখে কৃত্রিম ক্রোধ প্রকাশপূর্ব্বক নদীপারের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া মঞ্জুরী কতদিন বলিয়াছে—"ওপারের ঐ শ্মশান দেখেছিস! দেখিস একদিন সকলে মিলে ঐখানে নিয়ে গিয়ে আমার দেহ পুড়িয়ে ছাই করে দেবে। তোদের এ ঝগড়া মারামারি আর আমার ভাল লাগে না। আর আমি সইতেও পারিনে।"

সতু তৎক্ষণাৎ মায়ের অঙ্গুলি সঙ্কেত অনুসরণ করিয়া নদীপারের দিকে স্বীয় অঙ্গুলি প্রকারিত করিয়া বলে—"মা, ওই বালিতে নিয়ে তোমাকে পুলিয়ে থাই কলে দেবে?"

মঞ্জুরী হাসিয়া জবাব দেয়—"আরে না, না। ওটা জমিদারের হাসপাতাল।"

"হাসপাতাল কি মা?"

"রোগ ব্যামো হলে ঐখানে লোকেরা যায় চিকিৎসা করতে।"

"লোগ্ ব্যামো কি মা?"

মঞ্জুরী সতুকে কোলে তুলিয়া নিয়া বলে—"তুই এত ম্যালেরিয়া জ্বরে ভুগিস আর রোগ ব্যামো কাকে বলে জানিস নে? সেই যে গা হাত পা কাঁপিয়ে শীত করে জ্বর আসে তোর মনে নেই?"

সতুর ঔৎসুক্য বাড়িয়াই চলে। সে আবার বলে—"জ্বল হলে লোক মলে দায়?"

মঞ্জুরীর সর্ব্বশরীর শিহরিয়া উঠে। সে সতুকে আর একবার বক্ষে চাপিয়া বলে—"না, মরবে কেন? খানিকটা কষ্ট ভোগ করে।

"সেদিন যে তোমলা বল্থিলে—দ্বিজু কাকার থেলে জ্বলে মলে গেথে?"

"কেউ কেউ মরে বৈকি? সে ম্যালেরিয়া জ্বরে নয়।"

সতু দুষ্টামি করিয়া বলে—"আমি মলে দাব?"

"বালাই! যাট্! ওকথা বলতে নেই।" মঞ্জুরী সতুকে বুকে চাপিয়া পুনঃপুনঃ মুখচুম্বন করে। সতু মায়ের বাহুপাশ হইতে নিজেকে কোনপ্রকারে মুক্ত করিয়া আগ্রহের সহিত আবার বলে—"তুমি যে বললে?"

ইত্যবসরে তপতী সতুকে কোল হইতে টান মারিয়া নামাইয়া দিয়া একপ্রকার নাচের ভঙ্গিতে অদ্ভুত সুর করিয়া বলে—"বুড়ো ছেলে কোলে উঠেছে—যেন্না, যেন্না। বুড়ো ছেলে কোলে উঠেছে ইত্যাদি ইত্যাদি—"

প্রকাশের পাকা বাড়ী। ছোট হইলেও সৌন্দর্য্যে সুষমায় কর্ণপুর গ্রামের সেরা বাড়ী। আধুনিক ধরণে আমেরিকান প্যাটার্ণে জুৎসই করিয়া প্রকাশের নিজের রোজগারি অর্থে তৈয়ারি বাড়ী—স্ত্রীর নামে নাম হইয়াছে "মঞ্জু-ভিলা"। মঞ্জুরী শহরের মেয়ে। কিন্তু শহরের হইয়াও পাড়াগাঁয়ের এই ছোটবাড়ীর আড়ম্বরহীন সরল সৌন্দর্য্যকে উপেক্ষা করিতে পারে নাই। সওদাগরী আপিসের বড় সাহেবের সহিত ঝগড়ার ফলে প্রকাশের যেদিন চাকরীতে জবাব হইয়া যায়, প্রকাশ সেদিন স্ত্রীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া দুঃখিত চিত্তে বলিয়াছিল—"চাকরী গেছে তাতে দুঃখ নেই মঞ্জু! তোমাকে আর তপতীকে দুটো ডাল-ভাত আমি দিতে পারবো। কিন্তু এই শহরে বসে নয়, আমার পিতৃ-পিতামহের বাসস্থান তীর্থক্ষেত্র পল্লীগ্রামে গিয়ে। পারবে তুমি শহর ছেড়ে পল্লীতে থাকতে?"

মঞ্জুরীও জোরের সঙ্গে বলিয়াছিল—"কেন পারবো না? নিশ্চয় পারবো। তোমার তীর্থক্ষেত্র আমারও তীর্থক্ষেত্র। এতে আর দুঃখ কি?"

"কিন্তু তুমি বড়লোকের মেয়ে। আজ চাকরী নেই, আজ আমি গরীব।"

মঞ্জুরী হাসিয়া জবাব দিয়াছিল—"বড়লোকের মেয়ে যেদিন ছিলাম সেদিন আমিও বড়লোকের মেয়ে বলেই পরিচয় দিতাম। আজ আমার পরিচয় 'মেয়ে' নয় 'বৌ।' আজ আমি তোমার বৌ। তুমি যদি গরীব, আমিও গরীব এবং এই আমার সত্যিকারের পরিচয়। এতে আমার এতটুকু লজ্জা নেই।"

"কিন্তু মাছ দইয়ের পরিবর্ত্তে যখন শাকান্ন খাবে, বায়স্কোপের পরিবর্ত্তে যখন মঞ্জুভিলার সুমুখ দিয়ে বয়ে যাওয়া ডুমুরী নদীর কালো জল দেখে দেখে চোখ ঠিকরে যাবে তখনও কি তুমি এই কথাই বলবে?"

মঞ্জুরী এবার কৃত্রিম ক্রোধপ্রকাশ করিয়া জবাব দিয়াছিল—"হ্যাঁ, বলবো।"

সে আজ সাত বছরের কথা। সাত বছর পূর্ব্বে প্রকাশ একদিন উনিশ বছরের স্ত্রী আর আড়াই বছরের একমাত্র কন্যা তপতীকে লইয়া স্বগ্রাম কর্ণপুরে আসিয়া মঞ্জুভিলায় আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল আর ফিরিয়া যায় নাই। এই সাত বছরে প্রকাশের সংসার রঙ্গ-মঞ্চে আর একটি অভিনেতার আবির্ভাব হইয়াছে। সে তপতীর একচ্ছত্র মাতৃস্নেহের অংশীদার ছোট ভাই সত্যব্রত ওরফে সতু। সতুর বয়স এখন চারের কোঠায় ঠেকিয়াছে। তপতী সতুকে হিংসাও যেমন করে তেমনি ভালও বাসে। ঝগড়ারও তাদের অন্ত নেই।

তপতী-সতুর ঝগড়া মারামারির শেষ মীমাংসা করিয়া ঘরকয়েক প্রজা এবং স্বল্প কিছু জমির তদারক করিয়া, মঞ্জুরীর একনিষ্ঠ পতিসেবায় প্রকাশের দিন একপ্রকার ভালই কাটিয়া যাইতেছিল, চাকরীর দিনের শহরবাসের কথা আর মনেই ছিল না। অসুবিধাও ছিল না।

সতু—"মা দেখচো" বলিয়া কাঁদিয়া উঠে এবং তারপর কান্না থামাইয়া মুখ ভেঙ চাইতে থাকে।

মঞ্জুরী ক্রোধপ্রকাশ করিয়া বলে—ছিঃ, তপতী। ছোট ভাইকে ওমনি করে? হিংসে করা পাপ তা জানিস? ওতে শরীর খারাপ হয়ে যায়।"

তপতী মুখ ফুলাইয়া জবাব দেয়—"ইস্ ও আমার ছোট ভাই না ছাই। ওকে হিংসে করতে আমার দায় পড়েছে।"

সতুর কান্না থামিয়া যায়। কারণ দিদির বাক্যের প্রত্যুত্তর দিতে হইবে। সে বলে—"তুই লাক্ষুসী, দিদি না হাতী।"

তপতী চট্ করিয়া সতুর গণ্ডদেশে এক চড় বসাইয়া ছুটিয়া পলায়। সতু চিৎকার করিয়া কাঁদিতে আরম্ভ করে। মঞ্জুরী তপতীর উদ্দেশে বকাবকি করিতে থাকে। সহসা তপতীর মনে কি হয়। সে ফিরিয়া আসিয়া নিজেই সতুকে কোলে তুলিয়া তার খেলাঘরের দিকে চলিয়া যায়। তারপর তার সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় পুতুলটি সতুর হাতে তুলিয়া দিয়া বলে—"সতু তুই এটা নে।"

সতু দুই হাতে পুতুলটিকে চাপিয়া ধরিয়া বলে—"দিদি খু-উ-ব ভালো। গোবিন্দতা ভালি পাদি।"

বৈকালে নদী কিনারে মায়ের হাত ধরিয়া সতু বেড়াইতে থাকে। মঞ্জুরী কলমির ডগা ছিঁড়িয়া কচুরী-পানার ফুল তুলিয়া সতুর দুই হাত ভরিয়া দেয়, আর কানে গুঁজিয়া দেয়। তপতীর তাহা দেখিয়া হিংসা হয়। সে গোবিন্দকে গিয়া বলে—"সতু একবারও পড়ে না। কেবল বায়না করে আর বেড়িয়ে বেড়ায়। আর আমি একটু না পড়লে তুই বলিস্—বাবুকে বলে বকুনি খাওয়াব। আর এর বেলায় বুঝি কিছু না?"

গোবিন্দ বলে—"ও খারাপ ছেলে, ওর লেখাপড়া কিছু হবে না। তুমি পড়ে শুনে পরীক্ষায় পাশ করবে আর ও গাধা হবে।"

তপতী ইহাতে খুশী হয় না। সে রাগিয়া বলে—"কেন, তুই বাবাকে বলে দিতে পারিসনে?"

গোবিন্দ এইবার বেকায়দায় পড়িয়া বলে—"ও ছেলে মানুষ। ওর কথা আলাদা।"

"হ্যাঁ, ওর বেলায় ছেলে মানুষ। মাও বলবে ছেলে মানুষ। আমি একটু কিছু করলে সকলে মিলে আমাকে বকে। আমি আর কক্খনও পড়াশুনা…" বলিয়া বিড় বিড় করিয়া কি বকিতে বকিতে তপতী চলিয়া যায়।

এমনি করিয়া তপতী-সতুর দিন কাটে। প্রকাশ মঞ্জুরী যতই তাহাদের শাসন করিবার চেষ্টা করে ততই তাহাদের হিংসা প্রবৃত্তি বর্দ্ধিত আকারে দেখা দেয়। কোন প্রকারেই তাহাদের হিংসার স্রোতে এতটুকু ভাঁটার টান দেখা গেল না।

প্রকাশ সেদিন সমস্ত সকালটা মাঠে ঘুরিয়া জমিতে কি প্রকার ধান্য হইয়াছে তাহা দেখিয়া গোটা তিনেক প্রজা বাড়ীতে হানা দিয়া বাড়ী ফিরিতেই তপতী একটি বড় আদুর পুতুলের মুণ্ডটা এক হাতে এবং কবন্ধটা অন্য হাতে ধরিয়া আনিয়া তাহার সম্মুখে ছুঁড়িয়া দিয়া একপ্রকার কাঁদিয়াই বলিল—"দেখ বাবা, তোমার আদুরে ছেলের কাণ্ড। আমার পুতুল যেখান থেকে পারে এনে দিক—নইলে আমি—"

তপতীর কথা সমাপ্ত হইতে পারিল না। সতু কোথা হইতে ঝড়ের বেগে ছুটিয়া আসিয়া বলিল…"না বাবা, থব মিছে কথা। আমি একটু খলেথিলাম আল ও তান মেলে থিলে দিলে।"

তপতী ধমকাইয়া বলিল—"চুপ কর্ মিথ্যেবাদী পাজি কোথাকার।"

সতু বেগতিক দেখিয়া প্রকাশের কোলের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল। প্রকাশ তাহাকে বক্ষে চাপিয়া ধরিয়া তপতীকে বলিল—"আমি তোমাকে আর একটা পুতুল কিনে দেব। ছেলে মানুষ ছিঁড়ে ফেলেছে, কি করা যাবে?"

তপতী মুখ চোখের এক অদ্ভুত ভঙ্গী করিয়া বলিল—"হ্যাঁ ছেলে মানুষ! সবাই বলে ছেলে মানুষ। আমি ওকে মেরে খুন করবো।" বলিয়া বকিতে বকিতে চলিয়া যায়।

সতু নিজে ঘুঁড়ি উড়াইতে পারে না কিন্তু ঘুঁড়ি উড়ান দেখিতে খুব পছন্দ করে। গোবিন্দ প্রায় প্রত্যহ ছাদে যাইয়া ঘুঁড়ি উড়ায়। সতু তাহা উৎসাহের সঙ্গে দেখে আর গোবিন্দ'র ছেঁড়া খোঁড়া ঘুঁড়িগুলি জড় করিয়া নিজের কাছে রাখে। একদিন গোবিন্দ সতুর প্রতি খুশী হইয়া একখানি নিখুঁত ভাল ঘুঁড়ি তাহাকে দিয়াছিল। সতু তাহা পরম যত্নে শোবার ঘরের তাকের উপর তুলিয়া রাখিয়াছিল। তপতীর সহিত ঝগড়ায় যখনি তাহাকে পরাজয় বরণ করিতে হইত অথবা তপতীর চীনামাটির কুকুর "ভুলুয়া'র" গায়ে হাত দিতে যাইয়া বকুনী খাইয়া ফিরিত তখনই সে অবিলম্বে তাহার সেই ঘুঁড়িখানি আনিয়া তপতীর সম্মুখে ধরিয়া বলিত—"এই দেখ্ আমাল্ ঘুঁলি। আমি থাদে দেয়ে গোবিন্দল মত ওলাব। তোকে দেব না।"

একদিন দুপুরে সকলে যখন ঘুমাইতেছিল সতু মায়ের কোল হইতে গোপনে উঠিয়া যাইয়া তপতীর পুতুলের বাক্স ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে সেই চীনামাটীর "ভুলুয়া"কে সশব্দে মেঝের উপর ফেলিয়া দিল এবং সেই আওয়াজে মঞ্জুরীর নিদ্রা ভাঙিয়া গেল। সতুকে কাছে দেখিতে না পাইয়া মঞ্জুরী দ্রুতবেগে পশ্চিমের কোঠায় যাইয়া দেখে সতু অপরাধীর মত দাঁড়াইয়া চোখ পিট্‌পিট্ করিতেছে এবং তপতীর সাধের ভুলুয়ার ছিন্ন ভিন্ন দেহ মেঝের উপর ইতস্তত লুটাইতেছে। মঞ্জুরী এই প্রথম সতুর পিঠে এক চড় বসাইয়া দিল। সতু চিৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। সেই চিৎকারে তপতীরও নিদ্রা ভাঙিল। সেও ঘটনা স্থলে উপস্থিত হইল এবং ভুলুয়ার এই অবস্থা দেখিয়া প্রথমটায় হতভম্ব হইয়া গেল; তারপর, মুহূর্ত্ত মধ্যে প্রকৃতিস্থ হইয়া, দৌড়াইয়া যাইয়া তাক হইতে সতুর ঘুঁড়িখানি নামাইয়া আনিয়া টুকরা টুকরা করিয়া ছিঁড়িয়া সতুর সম্মুখে টান মারিয়া ফেলিয়া দিল। দেখিতে দেখিতে দক্ষযজ্ঞ বাধিয়া গেল। সতুর চিৎকারে বাড়ীখানি কাঁপিয়া উঠিল। মঞ্জুরী এবং গোবিন্দ প্রাণপণ চেষ্টাতেও সতুর কান্না থামাইতে পারেনা। অবশেষে গোবিন্দর ভাণ্ডারের সব কয়খানি ঘুঁড়ি ঘুস্ দিয়া তবে সতুকে নিরস্ত করিতে হয়।

তপতী রাগিলেই বিড় বিড় করিয়া বকে। অভ্যাস মত সেদিনও বিড় বিড় করিয়া বকিতে বকিতে অন্যত্র চলিয়া গেল।

রাত্রে ভাত খাইবার সময় সকলেই আসিল কিন্তু তপতীর সাক্ষাৎ মিলিল না। গোবিন্দ ডাকিতে যাইয়া দেখিল ভূতের ভয় পর্য্যন্ত অগ্রাহ্য করিয়া পশ্চিমের কোঠায় একাকী ঘুমের ভান করিয়া পড়িয়া আছে। গোবিন্দ দিদিমণি বলিয়া ডাকিতেই

তপতী একেবারে তেলেবেগুনে জ্বলিয়া উঠিল—"যা হতভাগা, আমি খাব না। কানের কাছে ভ্যান্ ভ্যান্ করতে এলো।"

গোবিন্দর কাছে এই খবর পাইয়া মঞ্জুরী নিজে তাহাকে ডাকিতে আসিল। কিন্তু তপতী অটল। পরিষ্কার বলিয়া দিল ভাত সে খাইবে না। অবশেষে প্রকাশের কানেও এ খবর পৌঁছিল, প্রকাশ আসিয়া অনেক সাধ্যসাধনা করিয়া তাহাকে ভাত খাইতে রাজী করিল; কিন্তু সর্ত্ত হইয়া রহিল যে আগামী-কল্যই নবাবগঞ্জের হাট হইতে ভুলুয়ার মত একটা কুকুর কিনিয়া দিতে হইবে।

সতুকে তপতী নিজে ভালবাসে কিন্তু সে যে পিতামাতার স্নেহ ভাগ করিয়া লইতেছে ইহাই তাহার সহ্য হয় না। এই দুশ্চিন্তা তাহাকে কোনক্রমেই রেহাই দিতেছিল না। আজকাল যত খেলনা, যত পোষাক এবং যত খাবারই আসুক না কেন তাহার অর্দ্ধেক সতুর। মায়ের স্নেহও সতুর সঙ্গে ভাগ করিয়া উপভোগ করিতে হয়। বহুকাল ধরিয়া একাই উপভোগ করিয়া ইহার যে ভাগ দিতে হয় তপতী তাহা জানেই না।

এতদিন ধরিয়া মঞ্জুরী এই ঝগড়া বিবাদ হাসিমুখে সহ্য করিয়াছিল কিন্তু ইদানীং আর পারিয়া উঠিতেছিল না। কিছুদিন ধরিয়া ম্যালেরিয়া জ্বরে ভুগিয়া মঞ্জুরীর নিজের শরীরটাই শীর্ণ হইয়া পড়িতেছিল। আজকাল পূর্ব্বের চেয়ে অল্পতেই মঞ্জুরীর ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটে এবং যে ছেলেমেয়ের গায়ে সে ভুলিয়াও হাত দেয় নাই তাহাদেরও এক আধটা চড় চাপড়ও দিয়া বসে।

তাহার এই অবস্থা লক্ষ্য করিয়া প্রকাশ একদিন বলিল—"মঞ্জু, তুমি দিন কয়েক বরঞ্চ বাপের বাড়ী একটু ঘুরে এস। একটু চেঞ্জ হলেই হয়ত ম্যালেরিয়া জ্বর বন্ধ হবে। তোমার শরীর দিন দিনই ভেঙ্গে পড়ছে।"

"তুমি তো যেতে বলছো কিন্তু সতু-তপতীর এই ঝগড়া কি পরে সহ্য করবে? বাবা-মা না হয় করলেন, কিন্তু দাদা এবং বৌদি?"

"না হয় ওদের তুমি রেখেই যাও, পিসিমাকে আনিয়ে নেব।"

"সে আমি পারবো না। ওদের ঝগড়ার জন্য বকাবকি করি, আবার এক মুহূর্ত্ত না দেখলেই থাকতে পারিনে। ওদের দূরে রেখে থাকার চেয়ে ওদের ঝগড়াই আমার ভাল লাগে।"

"কিন্তু একটু চেঞ্জ না হলে তোমার শরীর তো সারবে না; তুমি শহরের মেয়ে। চিরকাল শহরের আবহাওয়ায় অভ্যস্ত, পল্লীগ্রামে তোমার দেহমন টিকছে না। শহরের বায়স্কোপ থিয়েটার দালান কোঠা এখানে কোথা?"

মঞ্জুরী সদাই হাস্যময়ী। তার সেই স্বাভাবিক স্মিতহাস্যে সে বলিল—"দেখ, তুমি যা ভাবছো তা নয়। শহরের বায়স্কোপ থিয়েটার ঘোড়ার গাড়ী হারিয়ে এখানে আমি কিছু কম পাইনি। দিনের কাজের অবসানে যখন সন্ধ্যায় আমরা ফুলবাগানের সম্মুখে ঐ লিচু গাছটার তলায় বসে খরস্রোতা ঐ ভুমরী নদীর জল কল্লোল শুনি, আর চাঁদনী রাতের রূপালী জ্যোছনায় ওর তরতর করে বয়ে যাওয়া দেখি—ক্ষিপ্ত হাওয়ায় ওর জল ঝক্‌ঝক্ করে নেচে ওঠে—তা দেখতে দেখতে দুনিয়া ভুলে যাই। কি ছার বায়স্কোপ, আর তোমার ঐ থিয়েটার!"

"কিন্তু তোমার মা-বাবাকেও তো অনেক দিন দেখনি?"

"মা-বাবা আমার কাছে চিরপূজ্য। তাঁদের আমি অন্তরে অন্তরে পূজো করি, আমার কাছে তাঁরা দেবতার সামিল। এখানে আমার ঐ খাঁচায় পোষা টিয়ে, এই ফুলের বাগান, তপতী-সতুর কলহ, গোয়ালে বাঁধা শ্যামলী গাই, তুলসী-তলা; সর্ব্বোপরি আমার রাধাশ্যাম—এ সকলই তো আমার দৈনন্দিন কাজের মধ্য দিয়া আমার সঙ্গে একেবারে অচ্ছেদ্য হয়ে আছে।"

প্রকাশ এবার একটু গম্ভীর হইয়াই বলিল—"তবে চল আমরা সকলেই গিয়েই না হয় দিন কয়েক কলকাতায় বাসা করে থেকে আসি। একটু হাওয়া পরিবর্ত্তন না হ'লে তোমার শরীর সারবে না, আমার এ সম্বন্ধে তুমি আর বাধা দিও না।"

বহুবাজারের কোন্ একটা গলিতে বাসা ভাড়া নিয়া তারা এক মাস থাকিয়া আসিল, কিন্তু মঞ্জুরীর স্বাস্থ্যের কিছু উন্নতি দেখা গেল না। এদিকে তপতী-সতুর কলহ পূর্ব্ববৎ লাগিয়াই আছে। কলিকাতা হইতে তপতী নিজে বাছিয়া কিনিয়া আনিয়াছে একটা বড় আলুর বেবী পুতুল—নাম দিয়াছে "জামাইবাবু"। সতু আনিয়াছিল একটি কাঠের ঘোড়া। দুই চারিদিন হট্ হট্ করিয়া সতু সেই ঘোড়া চালাইয়া বেড়াইল—কিন্তু সে ঐ দুই চারিদিনই, তারপরেই বারান্দার এক কোণে ভাঙ্গা খাটের খানকয়েক পায়া এবং ভাঙ্গা টেবিলের সঙ্গে কাঠের ঘোড়া অনাদরেই পড়িয়া রহিল। তপতী কিন্তু জামাইবাবুকে সাজাইয়া গুজাইয়া আরও দুই চারিটি পুতুলের সঙ্গে মিশাইয়া পাড়ার বন্ধুদের ডাকিয়া জামাইবাবুকে আশ্রয় করিয়া নানা ক্রীড়া অনুষ্ঠানে এক একটা দিন সরগরম করিয়া তোলে।

অবশ্য সতুও সকল অনুষ্ঠানেই নিমন্ত্রিত হয় কিন্তু কাদার সন্দেশ আর কাদা চেপ্টা করা লুচির চেয়ে তার লোভ বেশী ছিল ঐ জামাইবাবুর উপর, কিন্তু তপতীর ক্ষুরধার কথার ঝাঁজ, খর দৃষ্টি আর আগ্রহাতিশয্যের মধ্যে সতু এই পুতুলটিকে কিছুতেই আত্মসাৎ করিবার সুযোগ পাইতেছিল না।

হঠাৎ একদিন বন্ধু সন্ধ্যার বাড়ীতে পুতুলের বিয়ের একটা সত্যিকারের খাওয়া দাওয়ার অনুষ্ঠানে তপতীর নেমন্তন্ন হইল। প্রথমটায় তপতী সতুর ভয়ে যাইতেই রাজী হয় না। শেষে সন্ধ্যার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া মায়ের কাঁচের আলমারিতে "জামাইবাবুকে" বন্দী করিয়া তপতী মাত্র ঘণ্টা কয়েকের জন্য গেল সন্ধ্যার বাড়ীতে। এই কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই সতু মায়ের কাছে একশ' বার ধন্না দিল—জামাইবাবুকে একটিবারের জন্য বাহির করিয়া দিতে। মা তাহাতে রাজী না হওয়ায় সতু তাহার ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ করিল—কাঁদিয়া বাড়ী মাথায় করিল। অগত্যা মঞ্জুরী তাহার হাতে জামাইবাবুকে তুলিয়া দিয়া নিজেই তাহার উপর নজর রাখিয়া বসিয়া রহিল।

ইত্যবসরে সন্ধ্যার বাড়ী হইতে নিমন্ত্রণ সারিয়া তপতী বাড়ী ফিরিল এবং সতুর হাতে জামাইবাবুকে দেখিয়া একেবারে অগ্নি-মূর্ত্তি হইয়া উঠিল। ছোঁ মারিয়া সতুর হাত হইতে পুতুলটি কাড়িয়া নিয়া সে সতুর গণ্ডে এক চড় বসাইয়া দিল। সতুর কণ্ঠ আবার উচ্চগ্রামে উঠিয়া বাড়ী মাথায় করিল। মঞ্জুরীর শরীর ভাল ছিল না, সে বিরক্ত হইয়া সে স্থান ত্যাগ করিল।

গ্রামের উপকণ্ঠে একটি ক্ষুদ্র মাঠে একদল বেদুইন আসিয়া

তাঁবু ফেলিয়াছিল। ইহাদের কেহ কেহ গাঁয়ের মধ্যে আসিয়া নানা প্রকার খেলা দেখাইয়া মুখে হরেক রকম শব্দসহ পিঠ বাজাইয়া পয়সা রোজগার করিত। তপতী ইহাদের হাবভাব পোষাক পরিচ্ছদে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া গোবিন্দকে প্রশ্ন করিয়া জানিয়াছিল যে ইহারাই সেই ছেলেধরা—যাদের কথা বহুবার সে গোবিন্দর কাছে শুনিয়াছে। তপতী এক সময় চুপি চুপি গোবিন্দর কাছে যাইয়া তাহাকে বলিল—"গোবিন্দ! সতুকে তুই ঐ ছেলেধরার কাছে ধরিয়ে দিতে পারিস?"

গোবিন্দ কৌতুক করিবার জন্ত বলিল—"ধরিয়ে দিলে তুমি আমাকে কি দেবে?"

"এই দুই আনার পয়সা দেব?" এই বলিয়া হাতের মুঠি খুলিয়া একটা দো-আনি দেখাইল।

"এ পয়সা তুমি কোথায় পেলে?" গোবিন্দর উদ্দেশ্য তপতীকে অন্তমনস্ক করিয়া দিবে।

"সেদিন 'ভুলুয়া'র বদলে বাবা দিয়েছেন।"

গোবিন্দ বিস্ময়ের স্বরে বলিল—"বাঃ চমৎকার দো-আনি তো! একেবারে ঝক্‌ঝক্ করছে। এইটে দেবে তুমি আমাকে?"

"হ্যাঁ, তুই নে। নিয়ে সতুকে ধরিয়ে দে।"

"কেন? ও কি করেছে?"

তপতী চোখ কপালে তুলিয়া বলিল—"কি করেছে? তা জানিস্‌নে বুঝি? আমার জামাইবাবুকে শেষ করে দিয়েছিল আর কি! ও পুতুল ভাঙার যম।"

ইতিমধ্যে মঞ্জুরী আসিয়া পড়িল এবং গোবিন্দকে কেরোসিন আর দেয়াশালাইয়ের পয়সা হিসাব করিয়া দিতে দিতে বলিল—"কি রে তপতী? সতুকে ধরিয়ে দেবার ফন্দী হচ্ছে বুঝি?" তপতী ইহার কোন জবাব দিতে পারিল না। লজ্জায় মুখ নীচু করিয়া দাঁড়াইয়া অপরাধীর মত নখ্ খুঁটিতে লাগিল। মঞ্জুরী নিজকার্য্যে চলিয়া গেল।

ইহার খানিকক্ষণবাদে গোবিন্দকে আর একবার নিভৃতে পাইয়া তপতী বলিল—"গোবিন্দ! কাজ নেই সতুকে ধরিয়ে দিয়ে। আমি জামাইবাবুকে বাক্সে তুলে রেখেছি, ভয় করে, সতুকে ওরা যদি হাওড়ার পুলের তলায় ফেলে দেয়? শুনেছি ওরা ছেলে ধরে নিয়ে হাওড়ার পুলের তলায় ফেলে দেয়।"

গোবিন্দ তপতীর অন্তর বুঝিতে পারিয়া বলিল—"হ্যাঁ দিদি, কাজ নেই সতুকে ধরিয়ে দিয়ে। ও আর জামাইবাবুকে খুঁজে পাবে না।"

কলহের মধ্যেও তপতী-সতুর দিন একপ্রকার ভালই কাটিতেছিল; কিন্তু এই ভালটুকু বুঝি বিধাতার আর সহিল না। সহসা একদিন ভীষণ যন্ত্রণায় আর্ত্তনাদ করিয়া মঞ্জুরী শয্যা গ্রহণ করিল। ডাক্তার আসিল, ধাত্রী আসিল, কিন্তু অবস্থার উন্নতি হইল না। অবিলম্বে পাল্‌কি বেয়ারা আসিল। সকলে মিলিয়া ধরাধরি করিয়া মঞ্জুরীকে তাহাতে উঠাইয়া দিল। সতু চিৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। তপতী ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল। সকলেই মঞ্জুরীকে নিয়া ব্যস্ত। এই দুইটি বিষাদ-মলিন মুখের দিকে তাকাইয়া সান্ত্বনা দিবার কেহই ছিল না। প্রকাশও মঞ্জুরীর সঙ্গে গেল জমিদারের হাসপাতালে। তখন সন্ধ্যা হয় হয়, কিন্তু আঁধারে চারিদিক সমাচ্ছন্ন হইয়া যায় নাই।

সতু দিদির হাত ধরিয়া প্রশ্ন করিল—"দিদি! মাকে ওরা কোথায় নিয়ে দাখে?' তপতী এবার ভীষণভাবে চিৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। সতুর প্রশ্নের কোন জবাব দিতে পারিল না। বস্তুতঃপক্ষে তার নিজের কাছেও জিনিষটা অস্পষ্টই ছিল।

গোবিন্দ আসিয়া সতুকে কোলে করিয়া গোয়াল ঘরের দিকে যাইয়া শ্যামলীর শিঙে হাত দিতে দিতে সতুকে বুঝাইতে লাগিল—"দেখেছ কেমন ছোট্ট বাছুর হয়েছে। তোমারও অমনি ছোট্ট একটি ভাই আসবে।"

সতু গোবিন্দর কথায় সূত্র ধরিয়া বলিল—"ভাই আসবে?"

"হ্যাঁ, আসবে।"

"কখন আসবে?"

"আজ রাত্রে।"

সতু থামিল এবং একটু যেন আশ্বস্ত হইয়া গোবিন্দর কাঁধে মাথা রাখিয়া চোখ বুজিল।

এদিকে পরিশ্রান্ত তপতী কাঁদিতে কাঁদিতে মেঝের উপর শুইয়া সেইখানেই ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। দেখিতে দেখিতে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গেল। রাতের আঁধারে দিগদিগন্ত সমাচ্ছন্ন হইল। সতুকে কাঁধে লইয়া বুড়া বয়সেও ছেলেমানুষ গোবিন্দ উড়ন্ত বাদুড় গুণিয়া গুণিয়া তিনকুড়ি সাতে পৌঁছাইয়া আঁধারের প্রকোপে আর গুণিতে না পারিয়া ঘরে আসিয়া সন্তর্পণে সতুকে খাটের উপর শোয়াইয়া দিল। তারপর মেঝে হইতে উঠাইয়া তপতীকেও সেইখানে শোয়াইল।

তপতী-সতুর রাত্রিতে খাওয়া হইল না। আবার উঠিয়া খানিকটা কাঁদিয়া উভয়েই আবার ঘুমাইয়া পড়িল। সমস্ত খবরদারীর ভার আজ গোবিন্দর উপর। জমিদার এবং ডিষ্ট্রিক্ট-বোর্ডের সাহায্যপুষ্ট হাসপাতাল নদীর অপর পারে। রাত্রি অনেক হইয়াছে। প্রকাশ এখনও সেখান হইতে ফিরিল না।

তপতী ঘুমাইয়া ঘুমাইয়া স্বপ্ন দেখিতেছে—সদ্যজাত একটি ছোট শিশুকে কোলে করিয়া আসিয়া মা তাহাকে ডাকিতেছেন এবং সেই জীবন্ত পুতুল হাতে তুলিয়া দিয়া বলিতেছেন—"আলুর পুতুল নিয়ে আর সতুর সঙ্গে ঝগড়া করিসনে। এই পুতুল তুই নে। তোর জন্তে এনেছি।"

এমনি অবস্থায় তপতীর নিদ্রা সহসা ভাঙিয়া গেল, আর 'মা মা' করিয়া চিৎকার করিয়া উঠিল।

গোবিন্দও সঙ্গে সঙ্গেই বলিয়া উঠিল। "কি হয়েছে দিদিমণি? ঘুমোও। ভয় কি?"

"গোবিন্দ, মা এসেছিল?" তপতী ঘুমজড়িত চক্ষে প্রশ্ন করিল।

"দুর্গা দুর্গা'—ঘুমোও দিদিমণি।" এই বলিয়া সে নিজেই ঘুমের ঘোরে দুর্গা দুর্গা বলিতে লাগিল। তপতীর আর ঘুম আসে না। সে বিছানায় কাঠ হইয়া বসিয়া রহিল।

অতি প্রত্যূষে একটি ছোট শিশুর ক্রন্দন শুনিয়া তপতী ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল। যে ঘর হইতে সকলে তাহার মাকে ধরাধরি করিয়া পাল্‌কিতে তুলিয়া দিয়াছিল সেই ঘরে যাইয়া দেখিল একটি সদ্যজাত ছোট শিশুকে কোলে করিয়া একটি অপরিচিতা স্ত্রীলোক বসিয়া আছে। তাহার পিতা মাথায় হাত দিয়া ঘরের কোণে

বিমর্ষ হইয়া নীরবে বসিয়া আছেন। গোবিন্দর চোখ দিয়া জল পড়িতেছে। কাহারো মুখে কথা নাই। ছোট শিশু মাঝে মাঝে ট্যাঁ ট্যাঁ করিয়া কাঁদিতেছে।

তপতী প্রশ্ন করিল "গোবিন্দ! মা কোথায়?"

গোবিন্দ কোন কথা না বলিয়া নদীর ওপারের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিল, এই অস্পষ্ট জবাবের মধ্যেও তপতী যেন একটা বিরাট আশঙ্কার ছায়া দেখিতে পাইল।

সে এই নীরব জবাবে সন্তুষ্ট হইতে না পারিয়া প্রকাশের কাছে যাইয়া সন্তর্পণে তাঁহার গায়ে হাত দিয়া বলিল—"বাবা, মা কোথায়?"

প্রকাশ নীরব। পাথরের মত নিশ্চল হইয়া বসিয়া রহিল। ইহার কোন জবাব দিল না। তপতীর চোখে জল আসিল।

"ওপারের শ্মশানে নিয়ে গিয়ে লোকেরা আমার দেহ পুড়িয়ে ছাই করে দেবে" মায়ের সেই কথাই আজ তপতীর সহসা মনে পড়িল। সে কোন কথা না বলিয়া দোতলার সিঁড়ি বাহিয়া উপরে উঠিয়া গেল। ইত্যবসরে সতু উঠিয়া আসিয়াছে। গোবিন্দও তাহাকে কোলে করিয়া ছাদে উঠিয়া দেখিল—ঠিক যে স্থান হইতে ওপারের শ্মশান স্পষ্ট দেখা যায় তপতী নীরবে ঠিক সেইখানে দাঁড়াইয়া ওপারের দিকে তাকাইয়া আছে। তাহার দুই গণ্ডের উপর দিয়া অশ্রুর প্লাবন বহিতেছে।

সতু গোবিন্দর কোলে থাকিয়াই প্রশ্ন করিল—"দিদি, মাকে কি পুলিয়ে থাই করে দিয়েছে?"

তপতীর ক্রন্দন উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। কান্নার আবেগে সে যেন ভাঙিয়া পড়িল। তাহার কান্না শুনিয়া সতুও কাঁদিয়া উঠিল। মুহূর্ত্ত মধ্যে তপতী ছুটিয়া চলিয়া গেল নীচের তলায় এবং ক্ষণপরে ফিরিয়া আসিল—হাতে তাহার "জামাইবাবু।" পুতুলটি সতুর হাতে তুলিয়া দিতে দিতে বলিল—"সতু! এই নে, আর আমি ফিরিয়ে চাইব না। তুই কাঁদিস নে।"

সতু কান্না থামাইয়া পুতুলটি দুই হাতে চাপিয়া ধরিয়া বলিল—"দিদি খু-উ-ব ভালো।"

গৃহতরু

কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায়

নমি তোমা গৃহতরু, একদিন করিল রোপণ
তোমা মোর পিতামহ। বাল্যে আমি হেরেছি স্বপন
তোমার ছায়ায় শুয়ে। পত্রগুলি করিয়াছে খেলা—
শৈশব কল্পনা সনে মৃদুল সমীরে সারা বেলা।
বেড়েছি তোমারি সঙ্গে দিনে দিনে। মোর পরিচয়
প্রতিটি শাখার সাথে ঘনায়েছে, তব পত্রচয়
হয়েছে শ্যামল যত। তব ছায়ে পাতিয়া আসন
যৌবনে শুনেছি তব শাখে শাখে প্রণয়-কূজন।
তোমার অঞ্জলি হ'তে রবি-রশ্মি পড়িয়াছে গ'লে
এ প্রাঙ্গণে প্রতি পাতে। তব শ্যাম পল্লব হিল্লোলে
বুঝেছি বসন্ত এলো সাথে লয়ে দখিনা পবন,
হেরিয়াছি তব শাখা হস্তে ধরি বর্ষার নর্ত্তন।
প্রতি পত্রপুটে তব শরতের সোনার ফোয়ারা
সমগ্র প্রকৃতি সাথে রাখিয়াছে সংযোগের ধারা।
স্বজনবৎসল তুমি তরুবন্ধু, হেরেছি তোমারে
প্রিয় বিয়োগের দিনে স্তব্ধ তুমি শোকের আঁধারে।
হাতে চন্দ্রাতপ ধরি উৎসবের দিনে দিলে যোগ,
একই পাত্রে করিয়াছ চিরদিন সুখ দুঃখ ভোগ।
অকুণ্ঠিত তুমি তরু ছায়া ফুল ফল বিতরণে,
একি তব ঋণশোধ? কি যে ঋণ কারো নাই মনে।
তুমি যে মানুষ নও, তাই তব হেন ব্যবহার,
ঋণ ত ফুরায়ে গেছে পরিশোধ ফুরায় না আর।
কত ঘর ভেঙ্গে গেল—কারো হ'লো জনম নূতন
তারা যেন আসে যায়—আসে যায় পরিজনগণ।
একা তুমি ধ্রুব হ'য়ে এই ভিটা রয়েছ আগুলি।
হে নীরব চিরসাক্ষী, উর্দ্ধদিকে তুলিয়া অঙ্গুলি।
সহস্র বন্ধনে বাঁধা সাথে তুমি এই মৃত্তিকার
এর পরে মোর চেয়ে তোমারি ত বেশি অধিকার।
এ ভিটা তোমারি ভিটা, রহিব না আমি হেথা যবে
আমার স্মৃতির দাগা বুকে নিয়ে হেথা তুমি রবে।
তোমারি ছায়ায় বন্ধু একদিন মুদিব নয়ন,
সাশ্রুনেত্রে চেয়ে র'বে হে পিতৃব্য পূজ্য পরিজন।

ম্যঁপার্নাস্

শ্রীশৈলজ মুখোপাধ্যায়

প্যারিসের পুরোণো পল্লী "ম্যঁপার্নাস্"। গ্রীষ্মের ভোরের আলো সেন্ নদীর অপর তীরে নোতর্দাম্ গীর্জ্জার চূড়ায় প'ড়েছে; শীতল হাওয়া কুয়াশার ভিতর দিয়ে বইছে বুল্ভার্ড হতে বুল্ভার্ডে; সেন্ ব'য়ে চ'লেছে সেই লুর্ডারের পাশ দিয়ে ইফেলের গা বেয়ে'—চারিদিকে হাল্কা
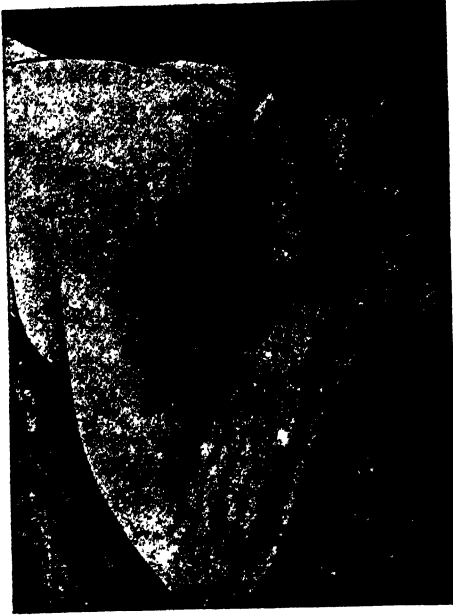
আধুনিক শ্রেষ্ঠ ফরাসী চিত্র-শিল্পী হেনরী মাতিস্ অঙ্কিত

বাতাস, ফরাসীর জাগরণীর সুরে ভেসে বেড়াচ্ছে। তখন সবে রাস্তায় লোক চলাচল সুরু হ'য়েছে। "Rue des carmes" গলিটি বেঁকে গিয়ে প'ড়েছে যেখানে সরবন্ বিশ্ববিদ্যালয়; লম্বা লম্বা পুরোণো বাড়ী—লাল ও নীল উজ্জ্বল্ বৈদ্যুতিক বিজ্ঞাপনী আলো তখনও দরজার মাথায় মাথায় জ্বলছে; যেন উৎসব রজনীর শেষ শিখা। তখনও প্রমোদাগারের নৈশ উন্মত্ততার শেষ বাজনা শুনতে পাচ্ছিলাম—লা—লা···টিট্টি—লা···টিট্টি··· টা···ডা···ড্ডা···আ···আ···কতকগুলি ক্লান্ত রমণী বাড়ী ফিরছে—চোখে কালি প'ড়ে গেছে—চোখ স্ফীত, বোধ হয় সুরার মাত্রায়···তরুণ পথে যেতে যেতে বলে "বঁ জুর মাদ্‌মোয়াজেল"—মাদ্‌মোয়াজেল হাত নেড়ে জানায় সু-প্রভাত। এতক্ষণে আমার ঘরের জানালার ফুল দেওয়া জালি পর্দ্দার ভিতর দিয়ে সূর্য্যের আলো এসে মেঝেয় সোনালী আঁক কাটছে। ফরাসীর নম্রতা-মাখা ঘরের পরিচারিকা প্রাতরাশ সাজিয়ে আমায় সেদিনের প্রাতের নমস্কার জানালে···আমি বল্লাম—"ম্যঁপার্নাস্ জাগছে" সে বল্লে "উই ম্যঁসিয়ে" বল্লাম "তুমি সুন্দরী, চিত্রকরের এক বান্ধবী—কল্পনা—আরও কত কি—সে মাথা নত করে দাঁড়িয়ে থাকল চুপটি ক'রে, মুখে হাসি নিয়ে। সেদিন রবিবার, নোতর্দামের ঘণ্টা জোরে মিঠে আওয়াজে বাজছে—এমন সময়ে আমার ঘরে ঘণ্টা বেজে উঠ্‌তে দরজার নিকটে এগিয়ে গেলাম। আমার ঘরে প্রবেশ করলেন চৈনিক অধ্যাপক দার্শনিক C. Mao মাদাম Mao। অধ্যাপক Mao প্যারিসে এসেছেন এক বিশেষ ফিলজফি-কংগ্রেস অনুষ্ঠানে চীনের বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিস্বরূপ—এঁরা আমায় স্নেহ করতেন এবং প্রবাসের পথের সঙ্গী ছিলেন। এঁরা আমার বিশেষ শ্রদ্ধার পাত্র। চীনের জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিল্প-ডাইরেক্টরের সহধর্ম্মিণী মাদাম লিন্ ছিলেন জাতিতে ফরাসী; এই ফরাসী রমণী মাদাম লিন্ আমায় প্যারিসে বিশেষ সাহায্য করেন। তিনি স্বয়ং একজন ফরাসীর শিল্পসমাজের সভ্যা ও শিল্পী। মাদাম লিন্ও আমায় বল্লেন "চলো আজ রবিবারের প্রার্থনায় নোত্‌-দামে। আমি অধ্যাপক Maoকে প্রশ্ন করলুম "বলুন ভগবান দর্শন মিলবে ওখানে" অধ্যাপক Mao হেসে বল্লেন "চলো মিল্‌তেও পারে একবার চেষ্টা ক'রে তাঁকে ডেকে দেখা যাক"; আমরা কফি পান শেষ ক'রে বার হলাম। বুলভার্ড St germain পার হ'য়ে সেন্ তীরে নোত্‌দামের দ্বারদেশে নতমস্তকে এই চীন—ফরাসী—ভারতীয় সম্মিলিত হৃদয়ে দাঁড়ালাম; অধ্যাপক বল্লেন "তোমার আর্ট"। আমি অবাক হ'য়ে দাঁড়িয়ে তাকিয়ে রইলাম সেই পুরাতন ফরাসীর ধর্ম্ম মন্দিরের পানে—পুরোণো কালো পাথরের গড়া বহু শতাব্দীর মূর্ত্তি খোদিত কারুকার্য্যময় প্রস্তর স্তূপ; এই কালো গির্জ্জার তোরণের শতাব্দী-মলিন পাথরের উপর কি অপরূপ আলোর রঙের খেলা; পাথরের প্রতিকণা আলো পান করছে—নোত্‌দামকে প্রভাতের রাঙা আলোয় রঙীণ অপরূপ পট বলে মনে হচ্ছিলো। মাদাম লিন্ বল্লেন "এটা আঁক্‌বার মত, কি বল?" ভেতরে প্রবেশ করলাম; তখন ভেতরের আব্‌ছা অন্ধকারে নোতর্দামের বিখ্যাত অবগ্যানের বাজনা সারা ঘরময় ছড়িয়ে পড়েছে—সে মিঠে আওয়াজ প্রাণে

রেণোয়া

নতুন সাড়া এনে দিলো। প্রথমে দরজায় পাশেই দাঁড়িয়ে গ্রীষ্মের হাল্‌কা পোষাকে গির্জ্জার Nunsরা—সরু সরু বাতি নিয়ে সকলকে দিচ্ছেন।

আমরা বাতি কিনলুম এবং ভগবানের উদ্দেশে সেগুলো জেলে দিলুম ; সেখানে অসংখ্য বাতি জ্বলছে, আর তারই আলোয় Nunদের দেখাচ্ছিলো -তাদের হাসিভরা অভ্যর্থনা—সৌম্য অবয়ব—সকলকে মুগ্ধ করে

দেগাস্

ফেলে। হাজার হাজার নরনারী মাথা নত ক'রে রয়েছে ভগবানের পায়ে —প্রার্থনা সুরু হ'য়ে গেছে—আমরাও নতমস্তকে সারিতে ব'সে পড়লাম ; অপূর্ব্ব সেখানকার অন্ধকার—বাতাস—আলোক—সুর—পরিচয় ; সূর্য্যের কিরণ একপাশ থেকে এসে রঙীণ কাঁচের ভিতর দিয়ে প'ড়েছে—একদিকের দেওয়ালে অদ্ভুতভাবে—অন্ধকারের মাঝে সে বলছে "আমি আছি" "পৃথিবী চ'লবে, কোনদিন স্তব্ধ হবেনা—এরা চলমান" "মানুষের ভাষা মানবীয় হ'য়ে ভগবানে রূপময় হ'য়ে উঠ্‌বে।" প্রার্থনা শেষে অধ্যাপক বল্লেন "কি,দর্শন পেয়েছ" ? আমি আর কিছুই বলতে পারলাম না—কেবল বল্লাম "heart is full" ; আমরা বাহিরে এসে দাঁড়ালাম—সামনেই ভিখারীর ভীড়—তারা তাদের চোখ দুটি দিয়ে জানাচ্ছে—তারা কিছু চায় ; স্বাধীন স্বতন্ত্র জীবনকে ক্ষুন্ন ক'রে মাথা নত ক'রে রয়েছে শুধু দুটো হাত বাড়িয়ে টুপিটা ধরে। কেউ তারা কথা বলে না—শুক্‌নো চেহারা দীর্ঘ উপবাসের প্রতীক্, হয়ত কত আশা নিয়ে সুরু হ'য়েছিলো এদের জীবন, কিন্তু কোথায় যেন জীবনের পথে চোট্ খেয়েছে, তাই আজ নিস্তেজ, নুয়ে প'ড়েছে—অসমাপ্ত জীবন সারি সারি দাঁড়িয়ে নোতর্দামের দরজায় এক আশীর্ব্বাদের আশায় শুধু বেঁচে আছে। এই ত বাইরের চেহারা, মানুষ উপবাসী। তারা যেন সব মানুষ-গিরগিটি, সেঁটে র'য়েছে এই গির্জ্জার গায়ে—পুলিস এসে তাড়িয়ে দেয়, ভয়ে তারা মাঝে মাঝে পালায়। এদের যেন বাঁচবার অধিকার আর পৃথিবীতে নেই, তাদের কোন দাবী আর মানুষ মঞ্জুর ক'রবে না—তাই তারা মানুষ থেকে আজ ক্ষুধার্ত্ত কুকুর হ'য়ে গেছে, মানুষেরই অত্যাচারে। মনে প'ড়ে গেল আমাদের দেশের লক্ষ লক্ষ ভিখারীর মুখ এখন তারা ধনীর হাতের ছুঁড়ে দেওয়া একখণ্ড রুটীর আশায় তাকিয়ে আছে।

আমরা সকলে এলাম আবার মঁ্যপার্নাস বাজারে ; বাজারটি হাটের মত—এই বাজার যেখানে ব'সে, সেইখানে একদিন ভোল্‌টেয়ার এক শ্রেষ্ঠ বিপ্লব জাগিয়ে ফরাসীকে মুক্ত ক'রেছিলো ; যেন বাজারের প্রতি কোণ থেকে প্রতিধ্বনিত হ'চ্ছে—"ভোল্‌টেয়ার।" বাজারটি সকালের দিকে খানিকক্ষণের জন্যে বসে, ঘণ্টা কয়েক পরেই আবার উঠে যায় ; পাশের গ্রাম থেকে চাষীরা আসে কত রকমের তরকারী নিয়ে ; কোথাও আলু, কোথাও ফল, কোথাও মাংস, কোথাও বা একেবারে সকল রকমের রাঁধা তরকারি অতি অল্প দামে বিক্রয় হয়—মাছের, মাংসের ও ডিমের তৈরী বহু রকমের খাবার পাওয়া যায় ; এখানকার ছাত্র, শিল্পী, নাট্যকার, ঔপন্যাসিক, সঙ্গীতজ্ঞ, সবাই গরীব। গরীবানা চালই বিশেষত্ব ও মঁ্যপার্নাসের ইজ্জৎ। এক পাড়ার গরীব কিন্তু ফুল কেনে—ছবি কেনে—তারা সৌখীন, তারা আবার একবেলা খেয়ে অপেরা দেখে, বন্ধুদের সাহায্যও করে। বড় বড় ছাতার তলায় বাজারটি ভারি সুন্দর লাগে দেখতে। কার্তিয়ে ল্যাতার চিত্রকরদের আড্ডা এই মঁ্যপার্নাসে। পৃথিবীর প্রায় সকল প্রদেশেরই চিত্রকর, গায়ক, নাট্যকার, কবি, লেখক ইত্যাদি এখানে জড়ো হয় ; কারণ আর্টের সমালোচনা, তর্ক, চিত্র-বিশ্লেষণ এইখানে চরমভাবে হয় ; চিত্রকরদের ভাগ্য এই কার্তিয়ে-ল্যাতার মঁ্যপার্নাস-এ গণনা হ'য়ে থাকে। এখানে চীনা, হিন্দু, জাপানী, স্কাণ্ডেনেভিয়ান, রাশিয়ান, পোল এবং প্রায় মধ্য-ইউরোপের সকল প্রদেশের প্রতিনিধি ঘুরে বেড়ায়। পৃথিবীর বিখ্যাত অভিনেতা—শিল্পী—ঔপন্যাসিক—তাদের নিজেকে এই স্থানের আবহাওয়ায় পরস্পর পরস্পরকে পরিচিত করে। আর্টের ইতিহাসের প্রধান শিক্ষা কেন্দ্র হ'চ্ছে এই মঁ্যপার্নাস। এই মঁ্যপার্নাসের গলিগুলিতে এক একটি প্রধান প্রধান গবেষণার আড্ডা ; এখানে অনেক কিছু জানবার সুবিধা হয়। কোন একটি পাড়ায় দেখা যায় মেয়েরা নাচের রিহার্সাল দিচ্ছে—কেউ বা অভিনয়ের পার্ট মুখস্থ ক'রছে বা শিখছে ; কেউ বা বাগানে বসে প্রবন্ধ লিখছে, চিত্রকর রাস্তার ধারে ছবি আঁকছে, আবার কত লোক সারাদিন ধরে সেন নদীতে ছিপ্ নিয়ে বসে মাছ ধরছে, মাঝে মাঝে স্ত্রী বা কন্যা এসে খাইয়ে যাচ্ছে কেউ কারুর কোন বাধার সৃষ্টি করে না। এক পাড়ার লোক আছে তারা যেমন কুঁড়ে, আবার তেমনি মেধাবী—এরাই

মানে কর্ত্তৃক অঙ্কিত চিত্র

প্যারিসের—Independante—এই পাড়ার বহু চিত্রকর যৌবনকালে ভীষণ দারিদ্র্যের মধ্যে কাটিয়েছেন ;—ভ্যানগগ্, গঁ্যপা—মানে—রেনোয়া—দেগা—সেজান্ এঁরা সকলেই এই পাড়ায় একদিন দারিদ্র্যের

ভিতর দিয়ে নিজেদের আদর্শের পূর্ণ বিশ্বাস ও আর্টের প্রতি অনুরাগের দৃঢ় প্রেরণা পেয়েছিলেন ; তাদের সাফল্যই এই ফরাসীর শিল্পের মুক্তি
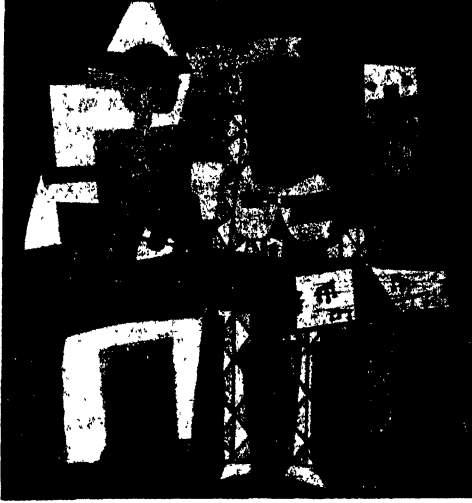
পিকাসো কর্তৃক অঙ্কিত চিত্র

এনে দিয়েছিলো। অনেক পয়সাওয়ালা লোক এখানে তাদের আদর্শের প্রতি লক্ষ্য রেখে সহজ ও সরল জীবন যাত্রার জন্য নিঃসম্বলভাবে বাস করেন। অনেক সময়ে ইঁহারা অন্যায়ভাবে অর্থগৃধ্নু ব'লে বদনামের ভাগী হন। যাতে চিত্রকর ও ঔপন্যাসিক আঁকবার বা রচনার যোগ্য খোরাক পান সেইকারণে সাধারণভাবে জীবনযাপন এঁরা ব্রতভাবে গ্রহণ করে থাকেন। আজকালকার চিত্রকরের বা লেখকের কিম্বা গায়কের জীবন-যাত্রার বিশেষ কোনও পরিবর্ত্তন হয় নি, কেবল লম্বা চুল ও আগেকার ধরণের চওড়া টুপী লীলায়িত "বো" বা ঢলঢলে পায়জামা এখন আর রেওয়াজ নেই। আধুনিক চিত্রকরকে দেখায় ঠিক খেলোয়াড়ের ন্যায়—পরণে ফ্লানেলের পায়জামা, সার্ট ও পুরোনো একটি স্পোর্ট কোর্ট। থাওয়া থাকার খরচ এখানে খুবই কম। এখানে অনেক চিত্রকর আছে—যাদের সবচেয়ে সস্তা ষ্টুডিও নিয়ে থাকবারও অবস্থা নেই—তারা চিলে কোঠায় থাকে ; কিন্তু Sky lightএর ভেতর দিয়ে প্যারিসের অতি রম্য এক স্থানের দৃশ্য সর্ব্বদা তাদের চোখের সামনে পড়ে। অনেক চিত্রকরই প্রায় একবেলা পেট ভরে খায় এবং অন্য সময়ে তাদের খাদ্য হচ্ছে—"কালো কফি" এবং "রুটী"। সময়ে সময়ে এই একবেলার খাওয়া জোটাতে তাদের ভালো ভালো ছবি ফুটপাথের ধারে সস্তায় বিক্রির জন্যে সারাদিন ব'সে থাকতে হয়—; এতে কিন্তু কার্তিয়ে ল্যাতার শিল্পীর "ইজ্জৎ" যায় না, বরং চিত্রকর নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করে থাকে। যদিও থাকা ও খাওয়া এখানে সস্তা, তবুও অনেক চিত্রকর সংসারযাত্রা ভালভাবে নির্ব্বাহ করতে পারে না। কিন্তু সবাই এক সঙ্গে থাকে বলে সময় সময় নিজেরা চিলে কোঠায় রেঁধে ভাগ করে খায়। অপরের অভাব আর একজন এমনি-ভাবে পূরণ ক'রে থাকে। এটা তাদের শিল্পী-সমাজের ধর্ম্ম মনে করে থাকে। এমন কি এখানকার চিত্রকরদের মডেলও শিল্পীদের নানা উপায়ে সাহায্য করে।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে অল্পবয়স্ক অজ্ঞাত কোন চিত্রকরের ছবি কেনার কথা কেউ ভাবতেই পারত না। উনবিংশ শতাব্দীর Impressionistদের মধ্যে কেবলমাত্র Cezane এরই টাকা ছিল, কারণ তাঁর বাবা ছিলেন Banker, কিন্তু তাঁর মতে এত টাকা থাকা চিত্রকরের জীবনযাত্রার অন্তরায়, তাই তিনি নিঃসম্বলভাবে থাকতেন। Independent school-এর জীবিত চিত্রকরদের মধ্যে একজন—যাঁর ছবি এখন শত শত পাউণ্ডে বিক্রি হ'চ্ছে তিনি বিশ্বাস করেন যে, যৌবনে দারিদ্র্যের মধ্যেই চরিত্রের দৃঢ়তা এবং চিন্তাশক্তির উর্ব্বরতার বৃদ্ধি হয়। চিত্রকর আঁকবার যোগ্য ছবি আঁকতে পারে। তাঁর মনে পড়ে যে, তিনি কোন সময়ে ৬ পেনী পকেটে ক'রে "Mont martre"-এ যান এবং সেখানে ৫ শিলিং-এ একখানি ছবি বিক্রি করে এক নিঃসম্বল চিত্রকরের সঙ্গে ভাগ করে খান। তাঁর প্রথম ছবির পৃষ্ঠপোষকের কথা ভোলবার নয়। তিনি একজন dealer-এর সন্ধান পেয়ে তাকে ধরেন। এই প্রথম পৃষ্ঠপোষকের কাছে তিনি পুনরায় আর একখানি ছবি বিক্রি করতে যান। ক্রেতা দু'খানা ছবি তার দু'শো ছবির গাদা থেকে বেছে নিলেন, কিন্তু যখন দাম জিজ্ঞাসা করলেন তখন চিত্রকর এক সমস্যায় পড়লেন। প্রত্যেকটা ১০ শিলিং বলবেন—না ২ পাউণ্ড বলবেন। তাই তিনি আমতা আমতা করে বললেন যে, প্রথম ছবির যা দাম নিয়েছিলেন এরও সেই দাম। যখন ৪০ পাউণ্ডের নোট তাঁর সামনে রাখা হোলো তখন তিনি নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারলেন না। একসঙ্গে এত টাকা তিনি আর কখনও দেখেন নি। টাকা পেয়েই তিনি তখনি বেরিয়ে পড়লেন এবং তার বান্ধবীর জন্য নূতন সাজসজ্জা ও এক প্রস্থ রং কিনে নিয়ে গেলেন গ্রামে। টাকাকড়ি নিঃশেষ ক'রে যখন ফিরে এলেন আবার প্যারিসে, তখন তার বগলে ত্রিশটি নতুন ছবি। এর আগে আর কখনও তিনি এমন উৎসাহে ছবি আঁকেন নি। তিনি বললেন—এইভাবেই চিত্রকর গড়ে ওঠে। এই ম্যঁপার্নাস্এ এমনও চিত্রকর আছে যাদের মাসিক তিন শিলিং খরচে থাকতে হয়। এরা শুধু রাত্রে চিলে কোঠায় শোয়, আর দিনে বাগানে বা ছবির গ্যালারীতে কাটায় কিন্তু বছরের শেষে পারিসের বিখ্যাত "গ্রাণ্ড স্যাঁলোয়" এদের ছবি প্রদর্শিত হয়ে থাকে। এরা আঁকে নব অঙ্কন পদ্ধতিতে আলোর লীলা, নারীর দেহ, সবুজ ঘাস-ভরা মাঠ, নদীর জলে আলোক কিরূপ প্রতিফলিত হ'য়েছে বা পাহাড়ের গায়ে রঙের ঝলমলানি বা

লালা কর্তৃক অঙ্কিত চিত্র

তরুণীর দীপ্ত শুভ্রতা বা আলোক প্রতিফলিত কতকগুলি রঙীণ ক্ষেত্র। ইম্প্রেসনিষ্ট—রীতির জন্ম এই ম্যঁপার্নাস্-এ।

নূতন ডাক্তারি পাস করিয়া ফ্যান্ ফোন্ সাজাইয়া সবে চেম্বার খুলিয়াছি, রোগীর এখনও ভীড় হয় নাই। ফোনের ঘণ্টা ক্বচিৎ কখন বাজে। এমন দিনে সকালের দিকে ঘরে একা বসিয়া আছি আর ফোন বাজিয়া উঠিল। চাকরটি চা করিতে গিয়াছিল, নিজেই ফোন ধরিলাম, —হ্যালো!

হ্যালো, কে ফ-রায়?

আজ্ঞে পি-রায়, ডক্টর পি রায়ের চেম্বার। কাকে চাইছেন?

ডাক্তারবাবুকে। থাকেন তো তাকে বলুন এখুনি একবার আসবেন। আপনার ঠিকানাটা—

হ্যাঁ, লিখেনিন, এন্-চকরবরটি, ৩৯৩।১০ আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট।

আচ্ছা, কয়েকজন রোগী বসে আছেন, এদের দেখেই ডাক্তারবাবু আপনার কাছে যাবেন।

ধন্যবাদ।

রিসিভারটি রাখিয়া টেবিল বাজাইতে লাগিলাম। আজ নির্ঘাৎ শুভদিন, চেম্বার খুলিতে না খুলিতেই কল্ আসিল। সদ্য-কলেজ-ফেরা মনও সংস্কার বশে সিদ্ধিদাতার উদ্দেশ্যে প্রণিপাত জানাইল। কাহার মুখ দর্শন করিয়া আজ গাত্রোত্থান করিয়াছিলাম স্মরণ করিতে লাগিলাম।

বেশী বিলম্ব করা বুদ্ধিমানের কাজ নয়, কেস জরুরি না হইলে কেহ আর সাত সকালে ডাক্তারকে ফোন করিতে যায় নাই। চা আসিলে খাইয়া পাৎলুন ঝাড়িয়া উঠিয়া পড়িলাম।

৩৯৩।১০ নম্বর বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া দেখি, একটি বছর ছয়েকের ছেলে লাট্টু ঘুরাইতেছে—তাহার কপালে, বাহুতে, হাটুতে, পিঠে নম্বর চিহ্নিত গোল গোল টিকিট লাগানো। তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, মিষ্টার 'চকর্‌বর্'টি আছেন?

ছেলেটি ন্যাংচাইতে ন্যাংচাইতে ছুটিল, সম্ভবতঃ তাহার বাবাকেই ডাকিতে গেল; যাইবার সময় আমাকে কিছুই বলিয়া গেলনা। কিছুক্ষণ পরে বাড়ীর ভিতর হইতে একটি চাকর দিব্যি খুসী মেজাজে পান চিবাইতে চিবাইতে বাহির হইয়া আসিল—বাজারে যাইতেছে। সে বাড়ীতে যে জরুরি কোনও রোগী আছে এমন কোন আভাস পাইলাম না, এমন কি ডাক্তারকে ব্যস্তভাবে ফোন করিয়া তাহাকে অভ্যর্থনা করিবার বেলা এতটা উদাসীনতায় সন্দেহ হইতেছিল ঠিকানা শুনিতে ভুল করিয়া থাকিব বা। দাঁড়াইব কি চলিয়া যাইব স্থির করিতে করিতে চাকরটি আসিয়া পড়ায় তাহাকেই পাকড়াও করিলাম এবং মিষ্টার চকরবরটির সংবাদ শুধাইলাম। তিনি দয়াপরবশ হইয়া অন্দরে অন্তর্ধান করিলেন এবং অচিরেই ছোট একটি নোটবুক হাতে করিয়া এক ভদ্রলোক প্রবেশ করিলেন। চোখের চশমায় তাহাকে বিজ্ঞ দেখাইতেছিল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনিই ডক্টর ফ-রায়? আসুন—আসুন—

বৈঠকখানা ঘরেই আসন গ্রহণ করিলাম। এতক্ষণে লক্ষ্য করিলাম, যে ছেলেটি বাহিরে লাট্টু ঘুরাইতেছিল, সেও তার বাবার পিছে পিছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। তাহাকে সম্মুখে আকর্ষণ করিয়া চকরবরটি বলিলেন, 'দেখুন ডক্টর ফ-রায়, ফোঁড়ায় পাঁচড়ায় এই ছেলেটিকে বড় ভোগাচ্ছে, একে দেখাতেই আপনাকে ডেকেছি।' এবার পুত্রের গাত্রের অংশগুলি নির্দেশপূর্বক কহিলেন, 'এই দেখুন অবস্থা, সব মিলে মিশে

মিষ্টার 'চকরবরটি' আছেন?
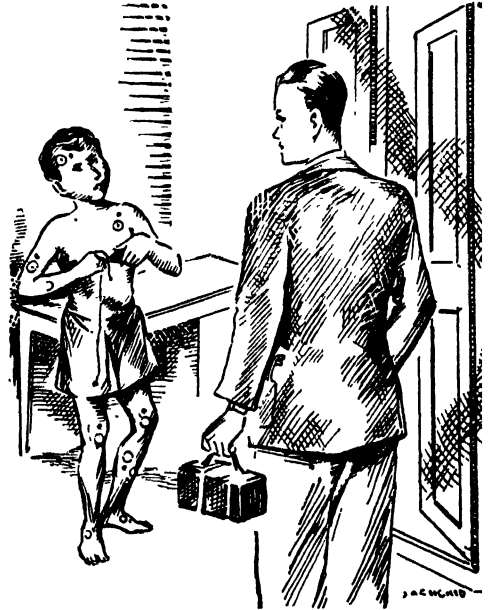
একাকার হয়ে আছে, এর মধ্যে কোনটা যে ফোঁড়াজাতীয় আর কোনটার জাতি যে পাঁচড়া তা সহসা বোধগম্য হবে না। তবে আমি অবশ্য এদের ক্রমবিবর্তন অনুধাবন করেছি এবং তার যথাযথ নোটও রেখেছি যাতে চিকিৎসার সময় রোগের ইতিহাস জানতে বেগ পেতে না হয়'—বলিয়া ভদ্রলোক আমার সম্মুখে তাহার হস্তের খাতাখানি প্রসারিত করিয়া ধরিলেন। দেখিয়া আমার নয়ন বিস্ময়ে বিস্ফারিত হইল। দেখিলাম,

লাল কালীতে নম্বর দেওয়া, আর নীল কালীতে গোটা গোটা অক্ষরে কত কি লেখা। মিষ্টার চকরবরটি মিষ্ট হাসিয়া বলিলেন, 'বুঝতে কোনো কষ্ট হচ্ছে না তো' ?

উত্তর দিবার অবকাশ পাইলাম না, নিজেই বলিয়া উঠিলেন, 'ধরুন এই এক নম্বর। বলিয়া তিনি ছেলেটিকে ঘুরাইয়া দাঁড় করাইয়া তাহার

ধরুন এই এক নম্বর—

বাহুর উপর আঠালাগানো একখানি কাগজ দেখাইলেন, কাগজে লাল কালীতে এক নম্বর লেখা, পাশেই একখানি পাঁচড়া হইয়াছে। এবার খাতায় এক নম্বরের বিষয় যাহা লেখা আছে তাহা পড়িতে লাগিলেন,—

"এক নম্বর। তেইশে কার্ত্তিক, ১৩৪৭, সন্ধ্যা সওয়া ছয়টার সময় এই যায়গাটি প্রথম চুলকাইতে সুরু হয়। রাত্রে ঘুমের ঘোরেও তিনবার চুলকায়। অনবধানবশতঃ সময় টুকিয়া রাখা হয় নাই এবং গভীর রাত্রেও দু একবার চুলকাইয়াছে কিনা জানা যায় নাই। চব্বিশে কার্ত্তিক উহার চতুর্দ্দিকের সমস্ত বিষাক্ত রক্ত শোষণ করিয়া একটি স্ফোটিকের অংকুর দেখা দেয়। পঁচিশে উহা জলে ভরিয়া উঠে এবং ছাব্বিশে উহা ¼ ইঞ্চি পরিমাণ বৃদ্ধি পায় এবং ঐ দিবস বৈকালেই বেদনা বৃদ্ধি হয়। রাত্রে ঘুম ঘোরে দুইবার উঃ এবং তিনবার আঃ করিয়াছিল"—কেমন খোকা সত্যি কিনা ?

খোকা বলিল—ইঃ।

ইঃ না, প্রথমে উঃ, তারপরে আঃ।

বুঝিলাম ইত্যাকারে চকরবরটি মহাশয় একের পর এক পাঁচড়ার জন্ম হইতে আনুপূর্ব্বিক ইতিহাস পরম ধৈর্য সহকারে বিশেষ গবেষণা করিয়া লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। কিন্তু সম্ভবত কিছুই ঔষধ লাগান নাই, পরিচ্ছন্নতার ব্যবস্থাও কিছু করেন নাই। ফলে পাঁচড়ার কীটবংশ অবাধে বিস্তার লাভ করিয়াছে এবং তিনিও পরম উৎসাহভরে পুত্রের সর্বাংগে সংখ্যাজ্ঞাপক কাগজ লাগাইতেছেন এবং ইতিহাস অনুধাবন করিতেছেন।

চিকিৎসা পিতার প্রয়োজন না পুত্রের প্রয়োজন চিন্তা করিতেছিলাম এমন সময় চকরবরটি খাতাখানি টেবিলের উপর সশব্দে রাখিয়া প্রশ্ন করিলেন—তারপর কি সিদ্ধান্তে পৌঁছুলেন ?

চর্ম রোগের একটা গালভরা নাম মনে মনে আওড়াইতে ছিলাম যাহাতে টিমু গ্লাণ্ড প্রভৃতির প্রসংগ উল্লেখ করিয়া শেষ পর্যন্ত এন্ডোক্রাইন চিকিৎসার অভীপ্সা পর্যন্ত প্রকাশ করা যায় কিনা। কিন্তু কিছুই জবাব দিতে পারিলাম না, ইতিমধ্যে অন্দর-প্রত্যাগত ভৃত্য বাজারে যাইবার পথে জানাইতে আসিল, ডিমের জোড়া ছয় পয়সার কম নয়, ডিম আনা হইবে কিনা।

চকরবরটি ঘুরিয়া বসিলেন, বলিলেন—বলিস কি রে ? ডিম্ ও যুদ্ধে যাচ্ছে না কি ? শায়েস্তা খাঁর সময় ডিম কত করে ছিল জানিস ?

উড়িয়ানন্দন ভুঁড়ি সামলাইতে সামলাইতে বলিল—শয়েস্তার বাজারের কথা ছাড়েন, তখন তিনোটো দুই পয়সাতে মিলাতে পারুচি।

চকরবরটি ইতিহাসের অনুশাসন উদ্ধার করিয়া শায়েস্তা খাঁর আমলে ডিম্বের একটা আনুমানিক দাম বলিয়া একটা অভূতপূর্ব আত্মপ্রসাদ লাভ করিলেন। তারপর আমার হাতে খাতাটি তুলিয়া দিয়া বলিলেন, এ কি অত সহজে চট্ করে জবাব দেওয়ার বিষয়। ঘরে নিয়ে যান, কাগজপত্র ঘরে নিয়ে নিবিষ্টভাবে পড়বেন, গভীরভাবে চিন্তা করবেন তবে না পৌঁছাবেন কোন সিদ্ধান্তে। তাড়াহুড়োয় কি গভীরভাবে ভাবা যায়, না—ভারডিক্ট্ দেওয়া যায়। খাতাটাই বরং বাড়ী নিয়ে গিয়ে পড়ে দেখুন।

গতিক দেখিয়া নিরাশ হইয়া পড়িতেছিলাম, কিন্তু নবীন উৎসাহ অনুভব করিলাম যখন চকরবরটি না বলিতেই ফি-এর টাকাটা দিয়া দিলেন। লোকটির মগজে যাই থাক মেজাজ দরাজ আছে।

পরদিন টালিগঞ্জে ট্রাম ধরিবার জন্য ষ্টপেজের কাছে দাঁড়াইয়া আছি, সহসা নজরে পড়িল, অদূরে গলির মোড়ে চকরবরটি দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া তাঁহার নোটবুকে কি টুকিয়া লইতেছেন। কৌতূহল হইল, নিকটে গেলাম কিন্তু তাহাকে দেখা দিলাম না। দেখিলাম, চকরবরটি লিখিয়া চলিয়াছেন, তাহার সামনে একজন কোচোআন ফুটপাথে বসিয়া বেগুনী ও চা সহযোগে মুড়ি ভক্ষণ করিতেছে এবং অদূরে একটি ঘোড়ার পায়ে 'নাল' পরানো হইতেছে। শুনিলাম, চকরবরটি জিজ্ঞাসা করিলেন,—গতবারে এ ক্ষুরটায় 'নাল' পরানো হয়েছিল তবে রমজানের চাঁদ দেখার দিন কেমন ? সে হ'ল গিয়ে অক্টোবরের একত্রিশে, আর আজ হ'ল জানুয়ারীর সাত তারিখ, পুরা দু-মাস ছ-দিন ন-ঘণ্টা। গোটা নয়েকের সময় 'নাল'টা পড়ে গেল,—কেমন তো ?

আজ্ঞা হাঁ, ওই নয়টা দশটার সময়।

নয়টা দশটা—সর্বনাশ ! এক ঘণ্টার তফাৎ। চকরবরটি চমকিয়া উঠিলেন। ঘোড়া একটি বৃহৎ চতুষ্পদ জন্তু, চলমান অবস্থায় তার পায়ের ক্ষুরের লোহার নাল খসিয়া গেল আর সময়টা লক্ষ্য করা গেলনা ! পথিপার্শ্বে প্রত্যেক পানের দোকানেও তো ঘড়ি থাকে !

চকরবরটির স্বগতোক্তি শুনিতে শুনিতে সম্ভবত নোটবুকটি দেখিবার উৎসাহে কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া পড়িয়াছিলাম, সহসা চকরবরটি চক্ষু তুলিয়া তাকাইয়া আমাকে দেখিয়া হতাশ সুরে মর্মবেদনা জ্ঞাপন করিলেন,—তা এদেরই বা দোষ দিই কি বলে, এরা অশিক্ষিত। আমাদের শিক্ষিত লোকেরাই কি খোঁজ রাখে, না খোঁজ রাখবার উৎসাহ আছে। পারে কোন শিক্ষিত লোক বলতে, একটা মহিষ কত বৎসর বাঁচে, কত মণ মাল বইতে পারে দুই মহিষের গাড়ীতে ? একটা মহিষের গাড়ী তৈরী করতে কত খরচ হয় বলতে পারেন কোন কলেজের অধ্যাপক ? পাঞ্জাবে এক একটি গরু বা মহিষের গাড়ীর কি বাহার, আর সে সব বলদই বা কি ! মহিষ কোথায় লাগে তার কাছে ! এ দেশের গরু বা মহিষের গাড়ীতে অত মাল টানতে পারেনা কেন জানেন ?

জানেন কেন এদেশের ঘোড়া দীর্ঘজীবী হচ্ছেনা? কারণ সহরের পথ পাথরে বাঁধান, না হয় কংক্রিট্ বা পিচ্ ঢালাই করা। ফলে পথের সাথে ঘর্ষণে ঘোড়ার পায়ের ক্ষুরের নালগুলি শীঘ্রই ক্ষয় হয় এবং দুই মাস সাত দিন নয় ঘণ্টার বেশী থাকে না। নতুন নাল পরাতে গেলেই খুরে নতুন কাঁটা পুঁততে হয়,ফলে বার কয়েক নাল বদলাবার পর আর কাটা মারবার মত যায়গা ক্ষুরে থাকে না, তখন বিনা নালে দুই চারদিন পথে চললেই ক্ষুর ক্ষয়ে যায় এবং ঘোড়ার ধনুষ্টংকার রোগ হয়ে সত্বর শিঙ্গা ফুকে মালিককে ফাঁকি দেয়। গত বৎসর এক কলকাতা সহরেই ঘোড়ার মৃত্যু সংখ্যা সাতশত তেরটি, তদনুপাতে জন্ম সংখ্যা মাত্র একশো উনাশী। এর রেসিও কসে দেখুন। দেশকে এই দুরন্ত অপচয়ের হাত হতে বাঁচাতে হলে, জাতিকে এই দুর্দিনে রক্ষা করতে হলে, একমাত্র উপায় রাজপথে

তা এদেরই বা দোষ দিই কি বলে

পুরু রবারের পাত বিছানো। আমি যদি কর্পোরেশনের কাউন্সিলার হতাম—আর নাইবা হলাম কাউন্সিলার, আমি গবেষণা করে এই সত্য জাতির সম্মুখে ধরে দেখাব তবেই হবে কাজ, কি বলেন?

সমর্থন সূচক ঘাড় নাড়িয়াই বিদায় নিতে হইল, ট্রাম আসিয়া পড়িয়াছে। ট্রামে উঠিয়াও দেখিলাম চকরবরটি কোচোয়ানকে আরও কি সব জিজ্ঞাসা করিতেছেন। হয়ত ঘোটকের জন্ম-মৃত্যু রেসিও ভেরিফাই করিতেছেন।

আর একদিন সকালে ফোনে ডাক আসিল, গলা শুনিয়া চিনিলাম, এবং স্মরণ হইল ফি-এর টাকাটি পকেটস্থ করিয়াছি কিন্তু রোগের বিবরণ পাঠ করা হয় নাই। খাতাখানি খুঁজিয়া লইয়া বাহির হইলাম। এক ভদ্রলোকের স্ত্রীর মেজাজ ক্রমশ খারাপ হইতেছে কেন, কোন রোগ সম্ভাবনা কিনা জানিতে আসিয়াছিলেন। ভদ্রলোককে অধিক বেতনের চাকুরী সংগ্রহের উপদেশ দিয়া মনে মনে অনুতাপ করিতেছিলাম। ডাক্তারের ডিউটি নির্মম বটে, আহা তবু যদি এতটা নির্মমভাবে একেবারে জাতের কথাটা না বলিয়া ফেলিতাম তবেই যেন ভালো হইত!

ভাবিতে ভাবিতে চকরবরটি ভবনে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। আজ মিষ্টার শিষ্টাচারে আপ্যায়িত করিয়া অভ্যর্থনা করিলেন। তারপর কানে কানে বলিলেন,—একখানি মূল্যবান চিকিৎসা বিষয়ক গ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে তাহাই দেখাইতে আমাকে ডাকিয়াছেন।

তাঁহার সহিত তাঁহার পাঠাগারে প্রবেশ করিয়া আমি স্তম্ভিত হইয়া গেলাম। কত গ্রন্থ, শিলালেখ, মূর্ত্তি, মডেল, ঝিনুক, শামুক, কত কি! এতগুলি মূল্যবান গ্রন্থাদি যাঁহার বাড়ী থাকে তাঁহার পাণ্ডিত্য সম্বন্ধে আমার তিলমাত্র সন্দেহ রহিল না।

একখানি তালপত্রের পুঁথি ম্যাগনিফাইং গ্লাস দ্বারা দেখাইয়া বলিলেন, পুঁথিটা কত পুরাতন মনে হয়?

যথাসাধ্য গম্ভীর হইয়া বলিলাম,—খৃষ্টপূর্ব হাজার দেড় হাজার বছরের কম নয়।

পরম বিস্মিত হইয়া চকরবরটি বলিলেন,—আমাদের জাতির এই অতি দুরপনেয় কলংক। আপনি একজন শিক্ষিত বাঙ্গালী, অথচ বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস জানা প্রয়োজন বোধ করেন না। এর মূলেও ঐতিহাসিক গবেষণার প্রতি আমাদের নিদারুণ শৈথিল্য।

অকুণ্ঠে অজ্ঞানতা স্বীকার করিলাম। তিনি বলিলেন,—ব্যাপারটা খুলে বলি। ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দের ১৩ই জানুয়ারি বৈকাল চারটার সময় হুগলীতে উলকিন্স্ সাহেব মুদ্রাযন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেন। অর্থাৎ কয়েকদিন পূর্ব হইতেই তোড়জোড় সুরু করলেও ১৩ই জানুয়ারি বৈকাল ৩টা ৫৩ মিনিট অর্থাৎ প্রায় চারটার সময় প্রথম কাগজখানি মুদ্রিত হয়েছিল। মেসিন চালিয়েছিল বাঙ্গালীতে, তৈরীও করেছিল বাঙ্গালী, অবশ্য অনেক অনুসন্ধানে সেই সুদক্ষ বাঙ্গালী কারিগরের বংশধরদের সন্ধান পাওয়া গেছে। তাদের একজন একটি সওদাগরি অফিসে কেরাণী। কিন্তু কেরাণী হলে কি হয়, পিতৃপুরুষের সঞ্চিত সেই প্রথম মুদ্রিত কাগজের একখানি রক্ষা করে আসছিলেন। অনেক সাধ্য সাধনা ও নগদ দক্ষিণা দিয়া তবে সেই কাগজখানি হস্তগত করা গেছে। বহু গবেষণায় পর মুদ্রণের প্রকৃত সময়ও নির্দিষ্ট করেছি—

অসহিষ্ণু হইয়া উঠিয়াছিলাম, বলিলাম, কিন্তু বর্ত্তমান পুঁথিখানি তো ছাপা নয়, তবে সে ছাপাখানার ইতিহাস শুনে কি হবে?

এবার চকরবরটি প্রসন্ন হাসি হাসিলেন, বলিলেন—ডক্টর, যাদের পেটে মানুষ মারা বিদ্যে গজ্‌গজ্ করছে, তাদের মগজে সোজা বুদ্ধি ঢুকবার পথ পায় না। ধরুন প্রথম মুদ্রাযন্ত্র স্থাপনের কাল যখন জানা গেল তখন অনায়াসে বোঝা গেল পুঁথিখানি তার পূর্বের রচনা। কারণ মুদ্রাযন্ত্রের প্রচলন থাকতে কেউ আর পুঁথি হাতে লিখে ফেলে রাখত না।

মন্তব্য শুনিয়া নির্বাক হইয়া গেলাম, কিন্তু আর প্রতিবাদ করিলাম না, কি জানি আবার কোন জাতীয় কলংক বাহির হইয়া পড়ে। শুনিলাম পুঁথিখানি চৈতন্য দেবের আবির্ভাবের পূর্বের রচনা—যেহেতু সমগ্র পুঁথি তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়াও চৈতন্যদেবের নাম পাওয়া যায় নাই। চৈতন্য পরবর্তী যুগে এ ঘটনা নাকি অসম্ভব।

পুঁথিখানির মূল বিষয়বস্তু কিন্তু বেশ আধুনিক মনে হইল। পুঁথিখানি চিকিৎসা সংক্রান্ত এবং ভূমিকা দৃষ্টে মনে হয় ঘটনাটি উইলিয়ম কেরীর জনৈক কর্মচারীর রোগবর্ণনা। চিকিৎসা নিদান অংশ পাওয়া যাইতেছে না।

কর্মচারীটীর নাম জন ওয়ান্ডার ফুল। একদা তিনি পাল্লা করিয়া বা লোভের বশবর্তী হইয়া কাটা চামচের সাহায্যে খাজা কাঁঠাল ভক্ষণ করিতে গিয়াছিলেন। ভ্রমক্রমে উহার একটি কোষের বীজ বিমোচন করা না থাকায় সাহেবের গলায় বাধিয়া যায়। তখন হোমিওপ্যাথি, এলোপ্যাথি, হাইড্রো-প্যাথি, ভাইটোপ্যাথি, ইলেকট্রোপ্যাথি, বায়োকেমিক, তান্ত্রিক, যান্ত্রিক, মান্ত্রিক, হাকিমি, কবিরাজী নানা বিদ্যাবিশারদ চিকিৎসকগণ আগমন করিলেন এবং বিবিধ প্রক্রিয়া সুরু হইল। কিন্তু গলায় কাঁঠাল কোষ কিছুতেই নামিতে চাহেনা।

এবার পুঁথি ছাড়িয়া চকরবরটি আমাকেই প্রশ্ন করিলেন,—এই রোগের ঔষধ কি ?

কিছুই মনে পড়িল না। কোষ্ঠবদ্ধতার চিকিৎসা জানি, গলায় মাছের কাঁটা বিঁধিলে সারিবার চমৎকার হোমিওপ্যাথিক ঔষধের নামও জানা আছে কিন্তু গলায় কাঁঠাল কোষ বদ্ধতার চিকিৎসা কোনও গ্রন্থে পড়ি নাই।

কি উত্তর দিব ভাবিতেছি এমন সময় বাড়ীর ভিতর হইতে খোকা চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। চকরবরটি ছুটিয়া যাইয়া 'ডক্‌টর', 'ডক্‌টর' বলিয়া ডাকিলেন। আমিও ছুটিয়া ভিতরে গেলাম। যাইয়া দেখি উঠানের কোণে পিছল যায়গায় পড়িয়া যাইয়া খোকা কাঁদিয়া উঠিয়াছে। তাহাকে ধরিয়া তুলিয়া দেখা গেল কনুইয়ের কাছে একখানা পাঁচড়ার মুখ থেঁৎলাইয়া রক্তক্ষরণ হইতেছে। রক্ত দেখিয়া চকরবরটির মাথা যত না ঘুরিয়াছে তাহাপেক্ষা বেশী ঘুরিয়াছে সেখানে লাগান টিকিট-খানা নাই দেখিয়া। আমি যাইতেই বলিলেন,—দেখুন তো কত নম্বর যা এটা। কি সর্বনেশে ছেলে, নম্বরের কাগজটা কর্‌লি কি ?

চট্ করিয়া বলিয়া ফেলিলাম—পনের নম্বর, আমার মনে আছে, পনের নম্বর ছিল ওটা। ভাগ্যবশতঃ আমার পকেটেই রোগের বিবরণের খাতা ছিল। সেটি চকরবরটিকে আগাইয়া দিলাম এবং তাহাতে যখন পনের নম্বরের শেষে রক্তক্ষরণের ইতিবৃত্ত লিখিত হইতেছে সেই অবসরে খোকার ক্ষতের মুখে একটু তুলা চাপিয়া দিয়া হাত ধুইয়া ফেলিলাম এবং একটি মলমের ব্যবস্থা লিখিয়া দিয়া সেদিন কোন রকমে বিদায় লইলাম।

পসার এখনও ভালো জমে নাই, তবু আর একদিন ফোনের আহ্বানে চকরবরটির গলার আওয়াজ পাইয়া বলিলাম—ডাক্তারবাবু কলে বাহির হইয়া গিয়াছেন। কখন ফিরিবেন স্থির নাই।

ফোন রাখিয়া ভাবিতে লাগিলাম চিকিৎসা কাহার করিব ? মনের না দেহের ?

তুমি ভালবাস

শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

তুমি ভালবাস বরষার মেঘ, সজল কাজল ছায়া
দিক্ দিগন্তে ঘনায়ে উঠিবে ঘন-গম্ভীর মায়া,
নীল সমুদ্র উথলি উঠিবে গলা পাহাড়ের জলে
মেঘ-ডম্বুরু বাজে গুরু গুরু উচ্ছল কল্লোলে।
পূবে পশ্চিমে ছোটে আসোয়ার উত্তরে দক্ষিণে
বিদ্যুৎ ধায় নিয়ে চলে' যায় বিদ্রোহী মেঘে ছিনে।
তুমি ভালবাস আলো ঢেকে আসা মেঘময় দিনগুলি
ঝরা বাদলের সুনিবিড় মোহে হৃদয় উঠিবে দুলি,'
সজল হাওয়ার সোহাগ পরশে দেহে শিহরণ জাগে,
মেদুর মেঘের মধুর মহিমা বিধুর নয়নে লাগে ;
ভীরু হিয়া তব কাঁপে দুরু দুরু বাতায়ন তলে বসি'
একেলা মনের বিরহ-বেদনা ওঠে শুধু উচ্ছসি'।

তুমি ভালবাস ঝরা বাদলের অলস দুপুর বেলা
কোনো কাজে মন লাগে না তাইত মন নিয়ে ছেলেখেলা।
বরষার মেঘ গাঢ় হয়ে আসে অবগাঢ় নীলিমায়
বলাকা পাখায় চঞ্চল মন উধাও হইয়া যায়।
কাজরী নাচের তালে তাল রেখে নাচিবে তোমার মন,
তুমি ভালবাস সে নিঝুম রাতে নিবিড় আলিঙ্গন।
বরষায় তুমি বহিতে পারনা অলস দেহের ভার
সহিতে পারনা দূরের বিরহ কাছে চাহ আপনার ;
শুধু কাছে নয়, একান্ত কাছে মুখোমুখী দুজনার
বসি' নির্জ্জনে শুধু ক্ষণে ক্ষণে এ উহার পানে চায় ;
অপলক আঁখি ভরিয়া কখন্ নামিবে বৃষ্টি ধারা
পরশ-রভসে তনু দেহে মন হইবে আত্মহারা,
বুকে মাথা রেখে পৃথিবী-ভুলিতে সজল বাদল রাতে
ভালবাস তাই মনে পড়ে তোমা' সুগভীর বেদনাতে
সেই বেদনায় আকাশে ঘনায় মলিন মুখের ছায়া
তোমার স্মৃতিতে ঢল ঢল করে মেদুর মেঘের মায়া।

ঈশা কস্যমিদং সর্বং

শ্রীসুধাংশুকুমার হালদার আই-সি-এস্

তোমায় দিয়ে ঢাকব প্রভু
তোমার যত দান।
চূর্ণ করো তুমি আমার
আত্ম-অভিমান।

চলন্ত এই জগৎ মাঝে
সকল ভাবে সকল কাজে
তোমার রসের ধারা বহে
ওঠে তোমার গান॥

এই তো আমার সবার বড়ো
আপনি যাহা দিলে,
পরের থাকুক যা আছে তাই,
তোমায় যেন মিলে।

কাজের দিনে দিয়ে ফাঁকি
আনবো না কো মৃত্যু ডাকি'
দাও আমারে বর্ষ শতের
আসক্তি-হীন প্রাণ॥

সূর্য্য-বিহীন অন্ধকারে
বদ্ধকারার ফাঁদে
আত্মঘাতীর আত্মা যে হায়
অনন্তকাল কাঁদে।

আপনারে তাই হানবো নাকো,
সর্বনাশা আনবো নাকো,
কাজের ধূলা লাগবে না গায়
চলব গেয়ে গান॥

এষণা *

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত

জীব মাত্রেরই বেঁচে থাকা, সন্তান উৎপাদন করা, এবং সন্তান রক্ষা করা,—এই তিনটি প্রধান কায। এর জন্য প্রয়োজন হয় তা'র উপযুক্ত আহারের এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থার নানা জাতীয় অনুকূলতা। জড়ের একটা প্রধান ধর্ম্ম হচ্ছে যে সে তা'র নিজের অবস্থায় টিঁকে থাকতে চায়। তা'র সন্তান সন্ততির বালাই নেই, তাই সে চায় নিজে সে যে ভাবে থাকে সেই ভাবেই যেন সে থাক্‌তে পারে। সে যদি স্থির অবস্থায় থাকে তবে কেউ জোর করে' চালিয়ে না দিলে আপ্‌না থেকে চল্‌তে সে চায় না। আর যদি সে ছোটা অবস্থায় থাকে, তবে কেউ তা'কে জোর করে' থামিয়ে না দিলে সে আপনা থেকে থামে না। কিন্তু জীব-সমাজ শুধু এই অবস্থায় থেকে খুশী নয়। সে চায় যা'তে সে আরো একটু ভাল অবস্থায়, সুখকর অবস্থায়, নির্ব্বিরোধ অবস্থায় থাক্‌তে পারে। যতদিন সন্তানসন্ততিরা অসহায় অবস্থায় থাকে অন্ততঃ ততদিন তা'দেরও যা'তে আরও ভাল অবস্থায় রাখ্‌তে পারে সে জন্যে তা'দের মধ্যে একটা স্বাভাবিক প্রেরণা আছে। সাধারণ প্রাণিলোকের পক্ষে পূর্ণরূপে ক্ষুৎপিপাসার দাবী মেটানোই ভাল থাকা। অবশ্য তা'র সঙ্গে তা'রা ইহাও চায় যে তা'রা যেন এমনভাবে থাক্‌তে পারে যা'তে তা'দের বা তা'দের সন্তানসন্ততিদের কোন প্রাণের আশঙ্কা না থাকে। এর অতিরিক্ত তা'রা আর কিছু চায় না।

প্রাণিজগৎ সম্বন্ধে যাঁ'রা আলোচনা করেছেন তাঁ'রা বলেন যে ক্রমশঃ ক্ষুদ্রতম প্রাণী থেকে নানা পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়ে উন্নততম প্রাণীর উদ্ভব হয়েছে। তা'র একটি প্রধান কারণ এই যে চাতুষ্পার্শ্বিক প্রাকৃতিক পরিস্থিতির মধ্যে থেকে প্রাণীরা নিরন্তর আপন আপন খাদ্য ও অনুকূল সুবিধা-সুযোগের অন্বেষণ করে' ফিরেছে, কিন্তু সব সময় সকলের পক্ষে অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন হয় নি। ফলে অনেকে গিয়েছে মারা, যা'রা বেঁচে ছিল তা'রা অপেক্ষাকৃত বলবত্তর ছিল, কিংবা তা'দের আকস্মিকভাবে এমন কিছু শারীরিক সুবিধা ছিল যা'র ফলে তা'রা অনায়াসে প্রাকৃতিক জগতের সঙ্গে লড়াই করতে সমর্থ হয়েছিল। তাদের সন্তান-সন্ততি-মণ্ডলীর মধ্যে যা'রা বলবত্তর হয়েছিল এবং শারীরিক যে সুবিধা থাক্‌লে পারিপার্শ্বিক জগৎ থেকে প্রয়োজনমত সুবিধা সংগ্রহ করা যায় যা'দের সেই রকম সুবিধা ছিল, তা'রাই বেঁচে গিয়েছে। বেঁচে থাক্‌বার জন্যে চেষ্টা করা—এটা হচ্ছে সমস্ত প্রাণীর সাধারণ ধর্ম্ম। এই প্রেরণার বিশেষত্ব এই যে ইহা প্রাণিলোককে তার চাতুষ্পার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে লড়াই কর্‌বার শক্তি দিয়েছে। লড়াই-এ যারা অসমর্থ প্রমাণিত হয়েছে তারা ধ্বংস পেয়েছে। এই চাতুষ্পার্শ্বিক পরিস্থিতির সঙ্গে বেঁচে থাক্‌বার লড়াইকে ইংরিজীতে বলে 'struggle for existence' (জীবন-সংগ্রাম), আর এ লড়াইর মধ্যে হীনবলেরা ধ্বংস পেয়ে বলবত্তরেরা বেঁচে রয়েছে, অর্থাৎ এই লড়াইর মধ্য দিয়ে আজ যা'রা বলবত্তর তাদেরই প্রকৃতি বাঁচবার অবসর দিয়েছে। একে ইংরিজীতে বলে—Law of natural selection (প্রাকৃতিক-নির্ব্বাচন-ন্যায়)।

এই নির্ব্বাচন ব্যাপারটা এমন সুশৃঙ্খলভাবে নূতন নূতন পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়ে নবতর, কল্যাণতর সৃষ্টি কখনই করতে পারত না যদি না চাতুষ্পার্শ্বিক পরিস্থিতি অনুসারে বা দেহযন্ত্রের ব্যবহার অনুসারে আকস্মিকভাবে প্রাণীদের মধ্যে নূতন নূতন পরিবর্ত্তন না ঘটত এবং সেই পরিবর্ত্তিত ধর্ম্ম তাদের সন্তানসন্ততিতে অনুসংক্রান্ত না হোত। এই যে চাতুষ্পার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে দ্বন্দ্বে প্রাণীদের জীবনধারণের উপযোগী নূতন নূতন পরিবর্ত্তন তা'দের দেহযন্ত্রের মধ্যে আবির্ভূত হয়েছে একে ইংরিজীতে বলে accidental variation (আকস্মিক পরিবর্ত্তন) এবং এই যে উত্তরাধিকারক্রমে বংশ্যেরা পিতৃমাতৃগত পরিবর্ত্তিত ধর্ম্ম তাদের দেহযন্ত্রের মধ্যে পেয়েছে ইংরিজীতে তাকে বলে heredity (দায়প্রাপ্ত ধর্ম্ম)। সাধারণতঃ পিতৃমাতৃগত স্বোপার্জ্জিত ধর্ম্মগুলি প্রায়ই সন্তানসন্ততিদের মধ্যে অনুষক্ত হয় না, কিন্তু যে ধর্ম্মগুলি প্রাণধারণের উপযোগী তা'র অনেকগুলি পিতামাতার বীজের মধ্যে প্রবেশ করে এবং সন্তানসন্ততিদের দেহযন্ত্রের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করে। এমনি করে' ক্ষুদ্রতম প্রাণী থেকে বিচিত্র প্রাণিপর্য্যায়ের উদ্ভব হয়েছে। এ সম্বন্ধে বহু কূট প্রশ্ন, কূট তথ্য আছে যা' আলোচনা করবার অবসর আমাদের এ প্রবন্ধে নাই। Spencer প্রভৃতি মনীষীরা Darwin এর জীব-বিজ্ঞান ব্যাখ্যা করতে গিয়ে দেখাবার চেষ্টা করেছেন যে জড়পরমাণুর সংশ্লেষবিশ্লেষের ফলে ক্রমশঃ ক্রমশঃ জড়শক্তির নানাপ্রকার ও নব নব স্তরের পরিণতির ফলেই এই জৈব প্রক্রিয়া প্রসারলাভ করেছে। Spencer এর বিরুদ্ধে অনেকে অনেক কথা বলেছেন এবং আজকাল জৈব-প্রক্রিয়া সম্বন্ধে Spencer এর মত একরূপ অপ্রমাণিতই হয়েছে, কিন্তু একথা এখনও অস্বীকার করা যায় না যে ভৌতিক আকাঙ্ক্ষা ও ভৌতিক জগতের সঙ্গে সংগ্রামের ফলেই প্রধানতঃ ভৌতিক দেহযন্ত্রের ক্রমপরিণতি হয়েছে। পূর্ব্বকালে ঘোড়াদের পিছন দিকে একটা ক্ষুর মাটী পর্য্যন্ত নামান ছিল। কিন্তু বন্যজন্তুরা যখন তা'দের তাড়া করত এবং তা'রা ছুটে পালাত তখন যে সব ঘোড়ার পিছন দিকে ক্ষুর থাকত তা'রা তেমন ছুটতে পারত না। বন্য জন্তুরা ধরে' তা'দের খেয়ে ফেলেছে, তাই তা'দের বংশও লোপ পেয়েছে। কিন্তু দৈবক্রমে যে সব ঘোড়ার পিছন দিকের ক্ষুর একটু ছোট থাকত তা'দের সন্তান-সন্ততিরা বেঁচে গিয়েছে। এমনি করে' ক্রমশঃ ঘোড়ার পিছন দিকের ক্ষুরটি এখন কেবলমাত্র চিহ্নে এসে দাঁড়িয়েছে। মুর্গী এখন ঘরের চাল অবধি উঠতে পারে এবং মানসগামী হংসেরা এখন কেবলমাত্র ডানার ঝাপট দিতে পারে। গৃহপালিত অবস্থায় ওড়ার দ্বারা তাদের আত্মরক্ষা করতে হয় না বলে' ওড়ার শক্তিটী তা'দের লয় পাচ্ছে। এমনি করে দেখা যায় যে ভৌতিক পারিপার্শ্বিকের মধ্যে থেকে ভৌতিক ও পারিপার্শ্বিক সুবিধার অন্বেষণে প্রাকৃতিক আকাঙ্ক্ষার পরিপূরণে ও তা'র অভাবে বিচিত্র জীবলোক বিচিত্র ধারায় উদ্ভূত হয়েছে। এই উদ্ভবের মূলে রয়েছে জড়শক্তির আকর্ষণবিকর্ষণের লীলা।

কথা হচ্ছে এই যে জীবলোকের বিবিধ দেহযন্ত্র যে জড়শক্তির সংশ্লেষ-বিশ্লেষ বা আতানবিতানের ফলে উৎপন্ন হয়েছে বলে' মনে করা হয়, মানুষের মধ্যেও বহুযুগ ধরে' যে সমাজের, যে ইতিহাসের ধারা ক্রমবিরচিত হয়ে এসেছে তাও ঠিক সেই এক প্রণালীতে হয়েছে কিনা। এখানে একথা বলে' রাখা আবশ্যক যে জীবলোকে প্রাকৃতিক শরীরযন্ত্রের বিবর্ত্তন যে কেবলমাত্র জড়শক্তির বিবিধ প্রচেষ্টাতে সংঘটিত হয়েছে, একথা আমি মানি না। কিন্তু এ সম্বন্ধে আমার এ প্রবন্ধে আলোচনা করা উচিত নয়। আমি এখানে তর্কচ্ছলে জড়বাদীদের মত স্বীকার করে' এই প্রশ্নটাই তুলতে চাই যে সমাজগঠনের পদ্ধতিতে অনেকে

---

* ইষ্যতে, ঋষ্যতে সাধ্যতেহনয়েত্যেষণা—যা' দ্বারা কিছু চাওয়া যায় এবং তা'র অনুসন্ধান করা যায়, ও সেই চাওয়ার জিনিষকে 'পাওয়া'তে পরিণত করা যায়, অন্তরের সেই ইচ্ছাত্মক বৃত্তিকে "এষণা" বলে।

যে বলেন, যে প্রাকৃতিক জগতে যেমন খাদ্য আহরণের চেষ্টায় ও খাদ্য আহরণের সংগ্রামের ফলে সমাজের ক্রমপরিবর্ত্তন ঘটেছে এবং সমাজের মধ্যে যে নানাপ্রকার শ্রেণীবিভাগ ও নানাপ্রকার ব্যবস্থা ও প্রতিষ্ঠান-বিভাগ ঘটেছে তা' সমস্তই কেবলমাত্র এই একটা কারণেই ঘটেছে কি না। আমি বলতে চাই যে সমাজের মধ্যে যে ক্রমপরিবর্ত্তন ঘটেছে তার মূলে আহারের জন্য সংগ্রাম যে নেই, তা' নয়, কিন্তু সেইটিই যে একমাত্র কারণ তা' স্বীকার করা যায় না।

এই মতের প্রধান পৃষ্ঠপোষক Karl Marx। তিনি একজন German দেশীয় ইহুদী ছিলেন। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দের ৫ই মে তাঁ'র জন্ম হয় এবং ১৮৮৪এর ১৪ই মার্চ্চ তিনি দেহরক্ষা করেন। এই ৬৫ বৎসরের জীবনে তিনি সমাজতত্ত্ব সম্বন্ধে যে সমস্ত গ্রন্থ লিখেছেন ও যে সমস্ত আন্দোলন করেছেন তা'র ফলে Europeএ একটা নূতন যুগ এসেছে। তাঁ'র প্রবর্ত্তিত নীতি সম্পূর্ণভাবে না হলেও আংশিক ভাবে অনেক পরিমাণে Russia গ্রহণ করেছে। সমস্ত পৃথিবীতে তাঁ'র মত ছড়িয়ে পড়েছে। ভারতবর্ষেও সেই মতের ঢেউ এসে লেগেছে। Europeএ বর্ত্তমানে নানাপ্রকার আন্তর্জ্জাতিক রাষ্ট্রীয় আন্দোলনের পিছনে এবং বর্ত্তমান আন্তর্জ্জাতিক সংগ্রামের পিছনেও Marxএর মন্ত্র গূঢ়ভাবে কাজ করছে। Marxএর পূর্ব্বে ইতিহাসের সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে Hegel বলেছিলেন যে চেতনা ক্রিয়াত্মক। মানুষের ইতিহাসের মধ্য দিয়ে আমরা ক্রমশঃ চেতনার উন্নততর অভিব্যক্তি দেখতে পাই। দর্শনে, ধর্ম্মে যেমন এই চেতনার নামাত্মক ও ভাবাত্মক দিকের ক্রমবিকাশ দেখতে পাই তেমনি সমাজ ও রাষ্ট্রের ইতিহাসে চেতনার ক্রিয়াত্মকদিকের ক্রমপরিস্ফূর্ত্তি দেখতে পাই। ক্রিয়াত্মক বৃত্তির স্ফূর্ত্তি প্রকাশ পায় স্বাধীনতার ক্রমপ্রাপ্তিতে, তাই Hegel তাঁ'র ইতিহাস তত্ত্বে দেখাতে চেষ্টা করেছেন যে আদিম কাল থেকে ইতিহাসে মানুষ নবতর এবং স্ফূর্ত্ততর উপায়ে কেমন করে' স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করেছে। স্বাধীনতা অর্জ্জন করতে গেলে ঘটে বলের সঙ্গে বলের সংগ্রাম। কোন সময় নরনারীর স্বাধীনতা ছিনিয়ে নিয়ে একা রাজা প্রভুত্ব করেছেন। কোন সময় বা প্রভুত্ব করেছেন রাজা ও মন্ত্রিসভা, কখনও বা কয়েকজন প্রধান ব্যক্তিরা। এমনি করে' নরসাধারণের স্বাধীনতা তা'র অধস্তন স্তর থেকে ক্রমশঃ উন্নততর হয়ে উঠেছে। নরচেতনা এইভাবে ইতিহাসে নানা সংগ্রামের মধ্য দিয়ে ক্রমশঃ ক্রমশঃ প্রবুদ্ধতর হয়ে উঠেছে। চেতনার আত্মপ্রবোধ-কামনাই নানা প্রাকৃতিক ঘটনার সঙ্গে দ্বন্দ্বে ক্রমশঃ চেতনাকে জয়ী করেছে। 'চেতনার জয়' অর্থ—সর্ব্ব মানুষের স্ব স্ব যথার্থ স্বাধীনতায় প্রবুদ্ধ হওয়া। ইতিহাসে আমরা দেশে দেশে, রাজায় রাজায়, রাজায়-প্রজায় নিরন্তর সংগ্রাম চলেছে দেখতে পাই, কিন্তু সে সংগ্রামের যথার্থ শক্তি হচ্ছে চেতনার আত্মপ্রবোধশক্তি। চেতনার আত্মপ্রবোধপ্রেরণাই ইতিহাসকে গড়ে তুলেছে। এই গড়ে তুলবার পন্থা হচ্ছে চেতনার প্রতিপক্ষের সঙ্গে দ্বন্দ্ব। দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়েই স্ফূর্ত্ততর বিকাশ সম্ভব হ'তে পারে। সংঘাত ও দুঃখ ব্যতিরেকে কখনও পূর্ণতর বিকাশ ঘটতে পারে না। তবেই মূল 'সিদ্ধান্ত হ'ল এই যে ইতিহাসের ক্রম-বিবর্ত্ত ও অগ্রগতির মূল শক্তি হচ্ছে চৈতসিক শক্তি। এই শক্তি আপনি উৎপন্ন করেছে তাঁ'র সংঘাতকে' তার দ্বন্দ্বকে, এবং দ্বন্দ্বকে ক্রমশঃ ক্রমশঃ অভিভূত করে' স্ফূর্ত্ততর বিকাশ লাভ করেছে।

Marx তাঁর প্রথম জীবনে Hegel-এর দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন, কিন্তু ইতিহাস ও সমাজের বিবর্ত্ত সম্বন্ধে তিনি চেতনা বা চৈতসিক শক্তিকে সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করলেন। তিনি বললেন সে শারীরিক ভোগ ও তৃপ্তিকামনাই ইতিহাসকে গড়ে' তুলেছে, কিন্তু এই গড়ার পদ্ধতিটা হচ্ছে দ্বন্দ্বের উপর প্রতিষ্ঠিত। দ্বন্দ্বের দ্বারাই যে ক্রমবিকাশ হয়, Hegelএর এই মতটা তিনি স্বীকার করেছিলেন। তাঁর Communist Manifesto, Poverty of Philosophy, এবং On the Critique of Political Economy, এই সমস্ত গ্রন্থে তিনি তাঁ'র এই মত আলোচনা করেছেন। The Eighteenth Brumaire গ্রন্থে, ফরাসী বিপ্লবের পরের ইতিহাসে তিনি তাঁ'র এই মত প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু কোন স্থলেই তিনি তাঁ'র এই মত সুষ্ঠুভাবে প্রমাণ প্রয়োগের দ্বারা সমর্থন করতে চেষ্টা করেন নি।

তাঁ'র প্রধান বক্তব্য এই যে, যুগে যুগে ঘটেছে মানুষের নানা পরিবর্ত্তন তা'র অধিকার সম্বন্ধে, আচার সম্বন্ধে, ধর্ম্ম সম্বন্ধে, রাষ্ট্র সম্বন্ধে, জমির স্বত্ব, বাণিজ্য, কারুশিল্প প্রভৃতি সম্বন্ধে। মানুষ করেছে যুগে যুগে নানাপ্রকার অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ও রাষ্ট্র-ব্যবস্থা; দেশ থেকে দেশান্তরে সে ভ্রমণ করেছে, যুদ্ধ করেছে, দ্বন্দ্ব করেছে। এর কারণ কি? মানুষের নানাবিধ চেষ্টার উৎস কোন্‌খানে? কি প্রেরণা তাকে অনুপ্রেরিত করেছে নানাজাতীয় মতের পরিবর্ত্তনে, নানাজাতীয় ব্যবহারে, নানাজাতীয় ধারণার, বিশ্বাসের ও নানাপ্রকার সমাজের বিপ্লব সৃষ্টি করতে? কোন মূল বস্তুর অনুসন্ধান Marx কোরতে চান নি। তিনি চেষ্টা করেছিলেন এইটি প্রমাণ করতে যে কিসের প্রেরণায় মানুষ সর্ব্বকার্য্যে অনুপ্রাণিত হয়েছে। কোন অতিপ্রাকৃতিক চেতনা বা অনুপ্রেরণা তিনি স্বীকার করেন না। তিনি বলেন যে মানুষের জীবনধারণের, ভৌতিক উপাদানের ব্যবস্থা থেকে এই প্রেরণা উদ্ভূত হয়েছে। যে সমস্ত পারিপার্শ্বিক প্রাকৃতিক পরিস্থিতিতে এবং যে সমস্ত সামাজিক মনোভাবের মধ্যে মানুষ থাকতে বাধ্য হয়েছে এবং যা' মানুষকে বাধ্য করেছে তার ভৌতিক জীবন যাপনের ব্যবস্থা করতে, তা'র জীবন ধারণ করতে, ধন উৎপাদন ও বিভাগ করতে, এবং বিবিধ ভোগের বিনিময়ে বিবিধ ধনের বিনিময় করতে, সেই কারণেই মানুষের সামাজিক সমস্ত ব্যবস্থা গড়ে' উঠেছে। সমস্ত ভৌতিক ব্যবস্থার প্রধান ব্যবস্থাই হচ্ছে জীবন ধারণের উপযোগী বস্তুনিচয় উৎপাদন করা। ভৌতিক ভোগের উপকরণ উৎপাদন করতে হলেই সেই উৎপাদনের শক্তির কথা ওঠে। সেই শক্তি দ্বিবিধ—নিয়ামক শক্তি হচ্ছে মানুষ এবং নিয়ন্ত্রিত শক্তি হচ্ছে জড়পদার্থ। জড়পদার্থ দিয়েই মানুষ জড়পদার্থ উৎপাদন করে। জড়শক্তি হচ্ছে মাটী, জল, বাতাস, বস্তুজাত এবং নানাবিধ যন্ত্র। উৎপাদন বা নিয়ামক শক্তির হিসাবে মনুষ্যশক্তির বিচিত্রতা আছে—যেমন শ্রমিক, বৈজ্ঞানিক, আবিষ্কারক, যান্ত্রিক, বিশেষ বিশেষ মনুষ্যনীতির বিশেষ বিশেষ দক্ষতা এবং সমাজের বিভিন্ন জাতীয় মানুষের বিভিন্ন জাতীয় দক্ষতা। এই মনুষ্য শক্তির মধ্যে প্রধানই হচ্ছে শ্রমিক। শ্রম দ্বিবিধ—মানসিক এবং কায়িক। ধনিক-সমাজে প্রধানতঃ ইহাদের চেষ্টা দ্বারাই বিনিময়যোগ্য ধনের উৎপাদন সম্ভব। এদের পরই হচ্ছে যন্ত্র-বিজ্ঞানের স্থান। বর্ত্তমান যুগে যন্ত্র-বিজ্ঞান ও যন্ত্র বৈজ্ঞানিকেরা কারুশিল্পের ক্ষেত্রে, এমন কি, সমাজের সমস্ত ক্ষেত্রে, যুগান্তর উপস্থিত করেছে।

এর সঙ্গে সঙ্গে ভাবতে হবে উৎপাদক ব্যবস্থার কথা। এই উৎপাদক-ব্যবস্থার মধ্যে আসে রাষ্ট্র ও বিবিধ প্রকারের নিয়মশৃঙ্খলা এবং সামাজিক শ্রেণীবিভাগ। এখানে উৎপাদ-ব্যবস্থা অর্থে বুঝতে হবে 'উৎপাদ-ব্যবস্থাপক হেতু' অর্থাৎ যে সমস্ত সামাজিক ব্যবস্থার উপর উৎপাদন নির্ভর করে। এই উৎপাদ ব্যবস্থাপক হেতুর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হল সামাজিক হেতু, অর্থাৎ যে সমস্ত নিয়মশৃঙ্খলার উপর নির্ভর করে স্বত্ব ব্যবস্থা। সামাজিক সম্বন্ধের উপর উৎপাদন নির্ভর করে। Marx বলেন যে, যেমন জড় উপাদান ও জড়শক্তির দ্বারা আমরা জড়বস্তু উৎপাদন করে' থাকি তেমনি উৎপাদক শক্তি সামাজিক বিভিন্ন জাতীয় লোকের মনের উপর যে বিভিন্ন জাতীয় প্রভাব বিস্তার করে' থাকে, তা'র ফলে উৎপন্ন হয় বিভিন্ন জাতীয় সামাজিক সম্বন্ধ, নানাপ্রকারের আইনকানুনের ব্যবস্থা, ধর্ম্মগত বিশ্বাস, নীতিগত বিশ্বাস এবং দর্শনের মত। Marx তাঁহার The Eighteenth Brumaire গ্রন্থে বলেছেন:

Men make their own history but not just as they

please. They do not choose the circumstances for themselves but have to work upon circumstances as they find them, have to fashion the material handed down by the past. The legacy of the dead generations weighs like an Alps upon the brains of the living. At the very time when they seem to be engaged in revolutionising themselves and things, when they seem to be creating something perfectly new—in such epochs of revolutionary crisis they are eager to press the spirits of the past into their service, borrowing the names of the dead, reviving the old war-cries, dressing up in traditional costumes, that they may make a braver pageant in the newly-staged scene of universal history.

—মানুষ তা'র নিজের ইতিহাস নিজেই গড়ে' তোলে, কিন্তু তা'র ইচ্ছামত তা'র ইতিহাসকে গড়ে' তুলবার সাধ্য তা'র নেই। কারণ ঘটনাচক্র ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা তা'দের নিজেদের হাতে নেই। প্রাচীনকাল থেকে যে ঘটনাচক্র, যে ইতিহাস, যে মনোভাব কালপরম্পরায় তাদের হাতে এসে পৌঁছেছে সেগুলির উপর নির্ভর করেই তারা নূতনকে নির্ম্মাণ করতে পারে। অতীত যুগ থেকে সমাজের উত্তরাধিকার সূত্রে যা আসে তা একটা হিমালয় পর্ব্বতের মত জীবিতদের মগজের উপর চেপে বসে। যখন মানুষ মনে করে যে সমস্ত বদলে দিয়ে সে একটা নূতন কিছু গড়ে তুলছে, যখন একটা মহা বিপ্লবের সন্ধিক্ষণ এসে উপস্থিত হয় তখন যথার্থভাবে নূতন কিছু না করে তখন মানুষ প্রাচীনেরই দোহাই দিতে আরম্ভ করে, প্রাচীনদের যুদ্ধ নিনাদই তাদের কর্ণ থেকে উৎঘোষিত হয়। পুরাতন পরিচ্ছদে সজ্জিত হয়ে মানুষ দেখাতে চায় যে সে জগতের ইতিহাসে একটা নবীন অভিনয় সুরু করেছে এবং সে অভিনয়ের গৌরব ও বীর্য্য প্রাচীনদের চেয়ে অনেক বেশী।

একথা বলার তাৎপর্য্য এই যে প্রাচীন কালের যে সমাজ ব্যবস্থায় যে প্রয়োজনে যে সামাজিক শ্রেণীবিভাগের উপর নির্ভর করে মানুষ এতদিন চলে এসেছে তারই ভিত্তির উপর মানুষ গড়ে তুলতে চায় তার নূতন সামাজিক ব্যবস্থার ইমারৎ, তার রাষ্ট্র, তার ধর্ম্ম, তার দর্শন তার বিজ্ঞান। সমস্ত সামাজিক ব্যবস্থার মূল ভিত্তি হচ্ছে ভোগ্য উপাদান সৃষ্টি করা, আর রাষ্ট্র ব্যবস্থাই বলুন, বা ধর্ম্ম নীতি প্রভৃতির ব্যবস্থাই বলুন সে সমস্তই হচ্ছে সেই ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ছোট ছোট প্রকোষ্ঠ। সেই ভিত্তির উপরই নির্ভর করে প্রকোষ্ঠগুলির গঠনপ্রণালী, তাদের দৃঢ়তা এবং ভবিষ্যতের প্রসার বৃদ্ধি। মূলভিত্তিটা হচ্ছে একান্তভাবে ভৌতিক, ভৌতিক আকাঙ্খার পরিপূরণ, ভৌতিক ভোগসাধন। আর যা কিছু মানসিক উন্নতি মানুষ কোরতে পারে সে সমস্তই হচ্ছে তার প্রতিধ্বনি মাত্র।

প্রাচীনকালে মানুষ দলবদ্ধ হয়ে থাকত তার আপন জাতিবর্গের মধ্যে। তাই দেখতে পাওয়া যায় যে সেকালের দেবদেবীও তারা সেই ছাঁচেই গড়ে তুলেছিল। তাদের সেই প্রাকৃতিক জীবনের একান্ত ভৌতিক ও পার্থিব প্রেরণাই তাদের সেই প্রাচীন মনোজগতের উপর যে প্রভাব বিস্তার করেছিল সেই অনুসারেই তাদের ধর্ম্মমত তারা সৃষ্টি করেছিল। তাদের ধর্ম্ম, তাদের নৈতিক জীবন, তাদের আইন-কানুন তারা সৃষ্টি করেছিল তাদের সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠি বন্ধনের রীতিতে। প্রাচীন কালে রাজা ছিলেন মণ্ডলেশ্বর এবং তাঁর মণ্ডলের অভ্যন্তরবর্ত্তী বড় বড় জমিদারেরা তাঁর অধীনে বড় বড় ভূখণ্ড ভোগ করত এবং সেই ভূখণ্ড তারা বিলি করে দিত ছোট ছোট ভূম্যধিকারীর নিকট। তারা সেগুলি বিলি করে দিত চাষীদের নিকট। যে নিয়মে ছোট ছোট নরপতিরা বাধ্য থাকত মণ্ডলেশ্বরের নিকট সেই নিয়মেই ভূম্যধিকারীরা ক্ষেত্রাধিপতিরা বাধ্য থাকত ছোট ছোট নরপতিদের নিকট। এই সামন্ত প্রথানুগত সমাজে ক্ষেত্রপতিরা ছিলেন জমির অধিকারী এবং কারুশিল্প ছিল ছোট ছোট কারু গোষ্ঠিদের হাতে। এই সামাজিক প্রথানুসারে প্রাচীন খৃষ্টধর্ম্ম গঠিত হয়েছিল। যে ধর্ম্ম ও নীতি এই সামাজিক ব্যবস্থার প্রতিকূল হোত, তার বিরুদ্ধে চিরকাল দ্বন্দ্ব ঘটে এসেছে। বর্ত্তমানকালে সম্পত্তি হয়েছে ব্যক্তিগত এবং বর্ত্তমানকালে চেষ্টা চলেছে সমস্ত সমষ্টিগত অধিকার দূর করে ব্যক্তিগত স্বাধীনতাকে প্রতিষ্ঠা করবার জন্যে এবং সেই অনুসারে সম্পত্তির ব্যবস্থা ও শ্রমের ব্যবস্থা নির্ণয় করবার জন্যে প্রাচীন সামন্ত প্রথা দূর হয়েছে, প্রাচীন চার্চ্চের ব্যবস্থা ও ভিক্ষুসঙ্ঘের ব্যবস্থা এখন আর নেই। স্বর্গে যাবার জন্যে এখন আর Popeএর চাবির দরকার হয় না। এখন মানুষ মনে করে, মানুষের সঙ্গে ভগবানের প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ, মানুষের বিবেকই তা'র ধর্ম্মাধর্ম্মের উপদেষ্টা, মানুষের ব্যক্তিগত অধিকারই যথার্থ অধিকার। প্রাচীন প্রথার ভগ্নাবশিষ্ট একরাজশক্তির (Monarchy) বিরুদ্ধে এখন জেগে উঠছে জাতি-শাসন-পদ্ধতি (National Government)। তার কারণ এই যে Nation বা জাতির উপর রাষ্ট্র-শাসনের ভার থাকলে বাণিজ্য ও শিল্পের সুবিধা হয়। সামন্তপ্রথার বিরুদ্ধে মানুষ এক রাজশক্তির পোষকতা করেছে, কিন্তু একরাজশক্তিকে খর্ব্ব করার জন্যে এখনকার মানুষ সৃষ্টি করেছে মন্ত্রী-পরিষদ, কিংবা Republic, বা সহতন্ত্র স্থাপনের জন্য ব্রতী হয়েছে। এটা যে ঘটেছে তা'র কারণ এ নয় যে মানুষের চেতনার একটা নবতর উদ্বোধনে মানুষ প্রেরিত হয়েছে, কিন্তু মানুষের সামাজিক ব্যবস্থা পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের ভোগের প্রসার বেশী হয়েছে এবং সেই ভোগ্যবস্তুর বণ্টনের জন্য নব নব ব্যবস্থার আবশ্যক হয়েছে। সেই ভৌতিক ভোগাকাঙ্ক্ষা ও তা'র পরিপূরণের নানা উপায় ও পদ্ধতি প্রতিবিম্বিত হয়ে নানাপ্রকার রাষ্ট্রব্যবস্থা ও ধর্ম্মবিশ্বাস, নীতিবিশ্বাসে পরিণত হয়েছে। মানুষ ভোগের সুবিধার জন্য যে রকম বিশ্বাস, যে রকম মত পোষণ করা আবশ্যক মনে করেছে, রাষ্ট্র-শৃঙ্খলার যে রকম ব্যবস্থা সঙ্গত মনে করেছে সেইগুলিকেই রাষ্ট্র ও ধর্ম্মানুগত বলে' বিশ্বাস করতে প্রবৃত্ত হয়েছে। যে কালে যে রকম ভাবলে ভোগের সুবিধা হয় সেই রকম চিন্তাকেই মানুষ ন্যায্য ও ধর্ম্ম্য বলে' মনে করেছে। ন্যায়বুদ্ধি, ধর্ম্মবুদ্ধি, বা নীতিবুদ্ধির, কোন স্বতন্ত্র প্রেরণা নেই। চেতনার সমুদ্বোধের বৈচিত্র্যে মানুষের সমাজ-ব্যবস্থা গড়ে' ওঠে নি, সমাজ ব্যবস্থা গড়ে' উঠেছে অবস্থার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে ভোগব্যবস্থার পরিবর্ত্তনে এবং সেই ব্যবস্থার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে গড়ে' উঠেছে নূতন নূতন ধর্ম্মবিশ্বাস, নূতন নীতিবুদ্ধি, নূতন রাষ্ট্রমত।

মানুষ জোর করে' সমাজব্যবস্থার পরিবর্ত্তন করতে পারে না, কারণ সমাজের ভিত্তি নিগূঢ় হয়ে রয়েছে পার্থিব ভোগাকাঙ্ক্ষায়, ভোগাহরণের চেষ্টায়, ভোগ-উৎপাদনের ব্যবস্থায় ও ভোগ-বণ্টনের ব্যবস্থায়। এ ব্যবস্থা সহজে ইচ্ছামত পরিবর্ত্তন করা যায় না, কিন্তু চিন্তাশীলতা, কর্ম্মশীলতা দ্বারা মানুষ এই নিয়ন্ত্রণের মধ্যে থেকেও অনেক পরিবর্ত্তন ঘটাতে পারে। Helvetius, বা Bentham প্রভৃতির ন্যায় Marx অবশ্য এ কথা মনে করেন না যে ব্যক্তিগত ভোগাকাঙ্ক্ষা বা ব্যক্তিগত স্বার্থই মানুষের প্রেরণার মূল উৎস। বরং তিনি এই কথাই বারবার বলেছেন যে অনেক ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত স্বার্থ বিসর্জ্জন করে'ও সাধারণের স্বার্থ সম্পন্ন করাই মানুষের প্রেরণার মূল উৎস। কিন্তু এই সাধারণের স্বার্থ পার্থিব স্বার্থ, এবং এই সমাজগত পার্থিব স্বার্থের নব নব উন্মেষে চিন্তাজগতে, ধর্ম্মজগতে ও নীতিজগতে নব নব উন্মেষ সাধিত হয়েছে।

দুইটী প্রধান কারণে সমাজে মানুষের ভোগব্যবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটেছে। যন্ত্রের উৎপত্তিতে ভোগোপাদানের উৎপাদন-ব্যবস্থা আমূল পরিবর্ত্তিত হয়েছে, তা'র সঙ্গে সৃষ্টি হয়েছে ধনিক ও শ্রমিকের দ্বন্দ্ব। এখনকার দিনে

নানা দেশে নূতন নূতন কাঁচামাল আবিষ্কৃত হয়েছে, বিক্রয়ের জন্ম পাওয়া গেছে নূতন নূতন স্থান, আবিষ্কৃত হয়েছে নানা রকমের নূতন নূতন যন্ত্র, নূতন নূতন শিল্প প্রণালী হয়েছে উদ্ভূত। বহু শ্রমিককে ও বহু যন্ত্রকে একত্রিত করে' গোষ্ঠিবদ্ধভাবে নিয়ম ও শৃঙ্খলানুযায়ী কাজ চালাবার ব্যবস্থা ঘটেছে। দেশে দেশে বাণিজ্যের ও ভোগ-বিনিময়ের নবতর পদ্ধতি ও নবতর উপায় আবিষ্কৃত হয়েছে। এই জন্ম সমাজের পূর্ব্বতন শ্রেণী-বিভাগ, পূর্ব্বতন নিয়ম-কানুন বা রাষ্ট্র-ব্যবস্থা এবং মানুষের মত ও বিশ্বাসের পূর্ব্বতন প্রণালী এখন অচল হয়েছে। ভোগোপাদানের উৎপাদনের এখন যে প্রাচুর্য্য ঘটেছে তা' বজায় রাখতে হলে এ সমস্তেরই পরিবর্ত্তন ঘটা আবশ্যক। তাই এ সমস্তেরই পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠেছে। যে সমস্ত শ্রেণীর লোক পূর্ব্বে ঘৃণিত ও অবমানিত হ'ত তা'রা এখন সমাজে স্থান পেয়েছে এবং আর্থিক বল সংগ্রহ করেছে। যারা পূর্ব্বে ছিল পূজনীয় তা'রা এসেছে নেমে। তবু প্রাচীন মত ও বিশ্বাস লোকে সহজে ছাড়তে পারেনা, তাই নূতন শক্তির সঙ্গে লেগেছে প্রাচীন মত-বিশ্বাসের দ্বন্দ্ব, সৃষ্টি হয়েছে মতে মতে সংঘর্ষ, শ্রেণীতে শ্রেণীতে বিরোধ, এবং উৎপন্ন হচ্ছে বিপ্লব। ধনিকে শ্রমিকে লেগেছে দারুণ সংঘর্ষ। পূর্ব্বকালে যখন জমিতে ব্যক্তিগত স্বত্ব ছিল না, তখন শ্রেণীবিভাগের বালাই ছিলনা। তখন পুরোহিত, চিকিৎসক এবং বিচারক—এ'রাই ছিলেন সমাজের নেতা; এবং পুরাতন ব্যবস্থার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে এবং জমিতে ব্যক্তিগত স্বত্ব স্বীকৃত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যখন বাণিজ্যের প্রসারে ধনবৃদ্ধি আরম্ভ হল তখন ধনিকেরা হয়ে উঠল বলবান এবং তা'দের স্বার্থসিদ্ধির জন্যে রাষ্ট্রকে করে' তুলল তাদের করায়ত্ত, তা'দের স্বার্থ-সিদ্ধির দ্বার।

ইতিহাসে দেখা যায় যে ভোগোপকরণের উৎপাদনব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গে সমাজের শ্রেণীতে শ্রেণীতে নানা দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়েছে এবং এই দ্বন্দ্বের ফলেই গড়ে' উঠেছে ইতিহাস। এই জন্যেই গড়ে' উঠেছে উপনিষদধর্ম্মের সঙ্গের বৌদ্ধধর্ম্মের বিবাদ, Baalএর সঙ্গে Jehovahর বিরোধ।

Marx এবং Engels তাঁদের Communist Manifestoতে বলেছেন :—Does it require deep intuition to comprehend that man's ideas, views and conceptions in one word, man's consciousness, changes with every change in the condition of his material existence, in his social relations and his social life ?

অর্থাৎ, একথা অতি সহজেই বোঝা যায় যে মানুষের পার্থিব অবস্থার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গেই তা'র মানসিক অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটেছে।

এ পর্য্যন্ত যা' বলা গেল তা'তে সমাজের বিবর্ত্ত সম্বন্ধে Marxএর মত সংক্ষেপে বিবৃত করতে চেষ্টা করা হয়েছে। Marxএর মতই প্রধানভাবে এই জন্যেই আলোচিত হয়েছে যে Laski প্রভৃতি বহু সুপ্রসিদ্ধ রাষ্ট্র-শাস্ত্রের মনীষীরা Marxএর মতের দ্বারা অনুপ্রাণিত। কিন্তু একটু চিন্তা করলেই Marxএর চিন্তাপ্রণালীর অসারত্ব বোঝা যাবে। সত্যি সত্যি Marx কি দেখিয়েছেন? Marx দেখাতে চেষ্টা করেছেন যে পার্থিব ভোগোপকরণের ব্যবস্থার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে ইতিহাসের সর্ব্বত্র চৈত্তিক বা চেতসিক ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটেছে। প্রথমতঃ তাঁ'র এই সিদ্ধান্ত যে সর্ব্বত্র সত্য নয় তা' প্রমাণ করা যেতে পারে। কিন্তু তর্কের খাতিরে এই সিদ্ধান্তের সত্যতা যদি মেনেও নেওয়া যায় তথাপি তাঁর আসলটা সিদ্ধ হয়না। তিনি বলেছেন এ কথা যে, যেহেতু পার্থিব ভোগ-ব্যবস্থার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে চৈত্তিক বা চেতসিক পরিবর্ত্তন ঘটে সেই জন্যেই পার্থিব ভোগব্যবস্থার পরিবর্ত্তনই চৈত্তিক বা চেতসিক পরিবর্ত্তনের কারণ। এই যুক্তিটী কি যথার্থ যুক্তিশাস্ত্রসম্মত হ'ল? দু'টি পরিবর্ত্তন যদি যুগপৎ সংঘটিত হয় তবে তা'র একটাকে কি অপরটার কারণ বলা যায়? যদি বলা যায় তবে বিপরীতভাবে এ কথাও বলা যায় যে চৈত্তিক বা চেতসিক পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গেই সমাজব্যবস্থা, ভোগাহরণব্যবস্থা, ভোগোৎপাদন, এই সব ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটেছে। কারণ, যদি দুই জাতীয় ঘটনা একত্রে ঘটে তবে তা'র কোনটিকে কোনটির কারণ বলে নির্দ্দেশ দেওয়া যায় না। কারণত্বের সঙ্গে পৌর্ব্বাপর্য্যের একটা নিয়ত সম্বন্ধ রয়েছে। যেটা কারণ সেটা পূর্ব্বে ঘটে, যেটা কার্য্য সেটা ঘটে পরে। শুধু পৌর্ব্বাপর্য্য থাকলেই কারণকার্য্যসম্বন্ধ স্থাপন করা যায় না। কেবল সেই পূর্ব্ববর্ত্তী কারণটি থাকলেই কার্য্য হয় যেটা না থাকলে কার্য্য হয়না। এইটি প্রমাণ করতে পারলেই কারণকার্য্যভাব প্রমাণ করা যায়, নচেৎ বিশ্লেষণ করে দেখাতে হয় যে কার্য্যের মধ্যে যে ভাব নিহিত রয়েছে তা'র ভিতরে প্রবেশ করলে এমন একটা বীজ পাওয়া যায় কিনা যে বীজের স্বাভাবিক বিস্তারে কার্য্যোৎপত্তির যথার্থ ব্যাখ্যা পাওয়া যায়।

বস্তুতঃ,তাঁ'র কারণ নির্ণয়ের প্রণালীতে তিনি যথার্থ বৈজ্ঞানিক বিচার-পদ্ধতি অবলম্বন করেন নি। মানুষের ব্যক্তিগত ও সমাজগত জীবনে বিবিধ জাতীয় অবস্থা ও ঘটনার চৈত্তিক ও দৈহিক বিবিধ ভাবপরম্পরার যে বিশিষ্টতা আছে সেদিকে তিনি দৃষ্টিপাত করেন নি। ঐতিহাসিক প্রণালী অবলম্বন করতে গিয়ে তিনি অবলম্বন করেছেন এমন একটা প্রণালী যা'তে সত্যের চেয়ে মনের বিশ্বাসকে যায়গা দেওয়া হয়েছে বেশী। তিনি ছিলেন জড়বাদী। চেতনাকে তিনি মনে করতেন জড়েরই একটা পরিণাম। তাঁ'র মতে এই জড়শক্তি পরিণত হয়েছিল সামাজিক চিত্ত-বৃত্তিতে। তাই ব্যক্তির চেয়ে সমাজ পেয়েছে বেশী স্থান, আর এই সামাজিক চিত্ত-বৃত্তিতে তিনি প্রধানভাবে দেখতে পেয়েছিলেন জড়সুখ ও ভৌতিক তৃপ্তি। তাই এই ভৌতিক তৃপ্তির প্রয়োজনেই মানুষের সমস্ত মত ও বিশ্বাস গড়ে উঠেছে এই কথা প্রচার করবার জন্যে তিনি ব্রতী হয়ে উঠেছিলেন। মানুষের ইতিহাসের সংগঠনে ভৌতিক তৃপ্তি ও ভৌতিক আকাঙ্ক্ষা ছাড়া আরও যে অনেক জাতীয় আকাঙ্ক্ষা ও প্রেরণা কায করতে পারে সে কথা তাঁর নজরেই পড়ে নি। ভৌতিক বুদ্ধির নীল চশমা পরে তিনি ইতিহাসকে দেখতে গিয়েছিলেন, তাই ভোগলালসা ছাড়া ইতিহাস উৎপাদনের আর কিছু তিনি দেখতে পান নি। ভারতবর্ষের জ্ঞান-বিজ্ঞান-ইতিহাসের কথা কিছুমাত্র না জেনে তিনি অনায়াসে বলতে পেরেছিলেন সে বুদ্ধের মত ও উপনিষদের মতে যে দ্বন্দ্ব হয়েছিল তার মূল কারণ হচ্ছে বিভিন্ন যুগের ভোগোৎপাদনব্যবস্থার বৈষম্য।

প্রাচীন বৈদিক যুগ ও উপনিষদ যুগ, এবং উপনিষদ যুগ ও বৌদ্ধযুগ—এই সময়ের মধ্যে এমন কোন ভোগোৎপাদনব্যবস্থা বা সামাজিক দ্বন্দ্বের কথা আমাদের জানা নেই যা-দ্বারা আমরা বলতে পারি যে তার ফলে এই মতবৈষম্য উৎপন্ন হয়েছিল। তা ছাড়া ভারতবর্ষের মনোজগতে সহস্র সহস্র বৎসর ধরে নানা মত ও বিশ্বাস উৎপন্ন হয়েছে এবং সেই মত ও বিশ্বাস আজ পর্য্যন্ত আমাদের কাছে চলে এসেছে। তারা পাশাপাশি রয়েছে, নূতনে পুরাতনে দ্বন্দ্ব হয়েছে, আবার তারা পরস্পরকে আলিঙ্গন করেছে, কিন্তু তারা একে অপরকে বিনষ্ট করে নি। কাজেই, এখানে দেখা যাচ্ছে যে অন্ততঃ ভারতবর্ষের ইতিহাস সম্বন্ধে Marxএর কথা কিছুই খাটে না। ইহুদীদের মধ্যে যে যিশুখ্রীষ্টের উদ্ভব হয়েছিল এবং যিশুখ্রীষ্ট যে নিজেকে ক্রুশবিদ্ধ করেছিলেন, বুদ্ধ যে রাজপুত্র হয়ে সংসার ত্যাগ করেছিলেন সর্ব্বপ্রাণীর কল্যাণের জন্য, তা কোন্ ভোগ-লালসার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিল? Alexander যে রাজপুত্র হয়ে সমস্ত ভোগোপকরণ থাকা সত্ত্বেও কঠোর ক্লেশ স্বীকার করেছিলেন বিজয়ী হ'বার গৌরব লাভের জন্য, সেখানে কোন্ 'ভোগ-লালসা' কাজ করেছিল? Galileo Newton Clarke Maxwell এবং Einstein প্রভৃতি মনীষীরা যে বিজ্ঞানের তথ্য আবিষ্কারের জন্য সমস্ত জীবন পাত করেছিলেন তার পিছনে কি পার্থিব দ্বন্দ্ব কাজ করেছিল? তা ছাড়া, Marx নিজেই স্বীকার করেছেন যে যন্ত্রের উৎপাদনে ভোগোপকরণের উৎপাদনব্যবস্থা সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হয়েছিল। কিন্তু যন্ত্র উৎপন্ন হ'ল

কেমন করে? যে সমস্ত মনীষীরা নানা বৈজ্ঞানিক সত্য আবিষ্কারের জন্য জীবনপাত করেছিলেন তাঁরা কি কারণে তা করতে গেলেন? যন্ত্রের উৎপাদনের পরে ভোগোপকরণের উৎপাদনব্যবস্থার পরিবর্ত্তন। সেই উৎপাদনব্যবস্থার পরিবর্ত্তন যদি যন্ত্রে ঘটে থাকে তবে উৎপাদন-ব্যবস্থার ফলে যন্ত্র উৎপাদন হয়েছে এ কথা বলা চলে না।

এ কথা আমরা অস্বীকার করি না যে, যে সমস্ত কারণে সমাজ ও রাষ্ট্র গড়ে উঠেছে আর্থিক কারণ তার মধ্যে অন্যতম। বরং একথা মানতেই হয় যে সমাজ ও রাষ্ট্র গঠনের একটা মূল উদ্দেশ্যই হচ্ছে প্রত্যেকের ব্যক্তিগত আত্মরক্ষা ও যথাসম্ভব অপরকে আঘাত না করে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করা। আদিম রাজা কেমন করে নির্ব্বাচিত হয়েছিলেন সে সম্বন্ধে নানা মত প্রচলিত আছে, কিন্তু 'মহাভারতে' Rousseauর Social Contractএর মত রাজনির্ব্বাচনের কথা দেখা যায়।

"অরাজকাঃ প্রজাঃ পূর্ব্বং বিনেশুরিতি নঃ শ্রুতম্।
পরস্পরং ভক্ষয়ন্তোমৎস্যাইব জলে কৃশান্
সমেত্য তাস্ততশ্চক্রুঃ সময়ান্ ইতি নঃ শ্রুতম্।

তারপর প্রজাবর্গ রাজা নির্ব্বাচন করে সকলকে রক্ষা করবার জন্যে তাঁকে কর দিতে এবং তাঁর কথা অনুসারে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হ'তে যাতে লোক পাওয়া যায় তার ব্যবস্থা করে এবং এইরূপে জাতবল রাজা যাতে সকল প্রজাকে সুখে রাখতে পারেন তার ব্যবস্থা করা হয়। এখনও দেখা যায় যে রাষ্ট্রমাত্রেরই এবং প্রজাতন্ত্রমাত্রেরই একটা প্রধান উদ্দেশ্য এই, সকলে যাতে সুখে থাকতে পারে। এইজন্য ভোগোৎপাদন বা সুখোৎপাদন-ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটলে তার সঙ্গে সঙ্গে যে সমাজ ব্যবস্থার বা রাষ্ট্র-ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটবে তা কিছুতেই অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু 'সুখৈষণা ধনৈষনা বা আর্থিক প্রয়োজনই যে সমাজ ও রাষ্ট্রগঠনের ও সর্ব্ববিধ সমাজব্যবস্থার, বিজ্ঞান, ধর্ম্ম, নীতি. দর্শন প্রভৃতি সর্ব্ববিধ উদ্যোগের একমাত্র কারণ এ কথা স্বীকার করা যায় না।

মানুষের জীবন পশুর জীবনের চেয়ে এখানেই পৃথক যে পশুর জীবনে কেবল দেহ-প্রয়োজনের এষণাটুকু মাত্র আছে। সেই এষণার বশবর্ত্তী হয়ে পশু আহার সংগ্রহ করে, সাধ্যমত উপায়ে আত্মরক্ষা করে, সন্তান উৎপাদন ও সন্তান রক্ষা করে। কিন্তু মানুষের মধ্যে শুধু যে বিবিধ এষণা আছে তা নয়, প্রত্যেক এষনাটিরই পরিধি অপরিমিতরূপে ব্যাপ্তি পেতে পারে এবং বিশেষ বিশেষ মানুষের মধ্যে তার প্রকৃতির বৈচিত্র্যে বিবিধ এষণী বলবান হয়ে ওঠে। 'এষণা' শব্দের ইংরিজি করতে গেলে আমি বলব—'Emotive Dynamic'। সর্ব্বমানুষের মধ্যে স্বাভাবিকভাবে ইন্দ্রিয়ৈষণা বা ভোগৈষণা রয়েছে, তাই অত্যন্ত ব্যাপকভাবে এই বৃত্তিটা সর্ব্ব নরনারীর মধ্যে দেখতে পাওয়া যায়। এই ভোগৈষণা অপরিমিতরূপে যখন বৃদ্ধি পায় তখন দেখা যায় যে সে বৃত্তির প্রেরণায় মানুষ নিরন্তর নানা ভোগ-বিলাসে আকৃষ্ট হয়। এই ভোগবিলাস আহরণ করবার জন্যে প্রয়োজন হয় বলের, কারণ বল না হ'লে প্রভূতভাবে প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রিত করে' প্রচুর ভোগ্যবস্তু আহরণ করা যায় না। ভোগ্যবস্তু আহরণ করতে যা' কিছু প্রয়োজন হয় তা' আহরণ করতে প্রয়োজন হয় অর্থের, সেইজন্য মানুষ অর্থকামী হয়। এই অর্থকামনা বা বিত্তৈষণার ফলে যে বল আহরিত হয় সেই বলের দ্বারা আরও অর্থ আহরিত করা যায়। এই বিত্তৈষণা-সম্ভূত বলকে বলা যায় Economic Power, অর্থাৎ আর্থিক বল। কিন্তু 'Man does not live by bread alone—বিত্তৈষণাই মানুষের একমাত্র এষণা নয়। সমস্ত এষণার মধ্য দিয়ে মানুষ তা'র আত্মার বিভূতি কামনা করে, অর্থাৎ নিজেকে বাড়াতে চায়। "আত্মা" শব্দের একটী অর্থ—দেহ। দেহেরই হয় ভোগ। এই দেহরূপী আত্মার চেষ্টাতে বিত্তৈষণার সীমাহীন বিস্তৃতি। কিন্তু আত্মাকে মানুষ কেবলমাত্র দেহ ভোগের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে নি। যে কোন বস্তুর সঙ্গেই মানুষ তা'র আত্মার ঐক্য দেখেছে, সেই বিষয়টিকেই মানুষ আঁকড়ে ধরেছে এবং তা'কে যথাসম্ভব বিস্তৃত করার জন্যে আর সমস্ত তুচ্ছ করতে পেরেছে। মানুষ যখন শুধু নিজের ইচ্ছাশক্তির মধ্যে নিজেকে সীমাবদ্ধ করে, দেখেছে তখন সে চেয়েছে তার ইচ্ছাশক্তিকে সম্পূর্ণ অক্ষুণ্ণ দেখতে। তা'র থেকে এসেছে তা'র ইচ্ছাশক্তির প্রেরণা। সেই প্রেরণা পরিণত হয়েছে নিছক বল কামনায় এবং বলসংশ্লিষ্ট গৌরব-কামনায়। এই প্রেরণাতেই বড় বড় বীরেরা সর্ব্বত্র আপনাদের আজ্ঞাশক্তি অক্ষুণ্ণ কোরতে, পৃথিবী বিজয় করতে প্রাণপণ চেষ্টা করেছেন, এবং তা'র ফলে এসেছে সমাজে এবং ইতিহাসে নানা পরিবর্ত্তন। আলেকজাণ্ডার, সীজার, হ্যানিবল, নেপোলিয়ন, প্রভৃতি তার দৃষ্টান্ত। তাঁদের চেষ্টা দ্বারা সমাজে ও ইতিহাসে যে নানা পরিবর্ত্তন ঘটেছে, তার কারণ ভোগৈষণা নয়। সত্য আবিষ্কার করবার জন্য নানা দেশে নানা পুরুষ তাঁদের সমস্ত চেষ্টা প্রয়োগ করেছেন, তাঁরা তাঁদের আত্মাকে অভিন্নভাবে দেখেছিলেন সত্যের সঙ্গে, তাঁদের সমস্ত মানস-বল ও অধ্যাত্মবল প্রয়োগ করেছিলেন, এই সত্য আবিষ্কারের জন্য। তার দৃষ্টান্ত আমরা দেখতে পাই Galileo, Newton, Clarke Maxwell, প্রভৃতির মধ্যে। আবার অনেকে প্রাকৃতিক সত্যকে মানুষের ব্যবহারের উপযোগী করবার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করে গিয়েছেন। তাঁরাই প্রধান প্রধান Technologist বা যান্ত্রিক। তাঁদের উদ্ভাবনের ফলেই নানা যন্ত্রের উদ্ভব হয়েছে এবং এই যন্ত্রের আবিষ্কার যে কি পরিমাণে সমাজে পরিবর্ত্তন এনে দিয়েছে সে সম্বন্ধে আলোচনার কোন আবশ্যকতা নেই। আবার সত্য ও মৈত্রীকে যাঁরা আত্মার সঙ্গে অভিন্ন ভাবে বুঝেছেন, মানুষের চরম উপের কি তারই আবিষ্কারের জন্য যাঁরা সমস্ত সুখভোগ তুচ্ছ করে আজীবন কঠোর তপস্যা করে গিয়েছেন, তাঁরা সৃষ্টি করে গিয়েছেন চিরন্তন আদর্শ। তাঁদের দৃষ্টান্ত হচ্ছেন উপনিষদের ব্রহ্মর্ষিরা, বুদ্ধ, যিশুখৃষ্ট, চৈতন্য, নানক প্রভৃতি। এঁরাই স্থাপন করে গেছেন সমাজের ও রাষ্ট্রের চিরন্তন আদর্শ। সে আদর্শ থেকে মানুষ ভ্রষ্ট হতে পারে, স্খলিত হতে পারে, কিন্তু সে আদর্শের জন্য এষণা ও প্রেরণা মানুষের মধ্যে চিরকালই কায করে যাবে, সে আদর্শ ব্যতিরেকে কোন সমাজ, কোন রাষ্ট্র টিঁকতে পারে না।

উপসংহারে আমাদের প্রধান বক্তব্য এই যে কতকগুলি প্রধান প্রধান এষণার দ্বারা মানুষের চৈত্তিক জগৎ সংগঠিত হয়েছে। এই এষণাগুলির মধ্যে বিত্তৈষণা সাধারণ এবং ব্যাপকভাবে থাকলেই বিবিধ প্রকৃতির মানুষের মধ্যে বিভিন্ন এষণা ফলবতী ও বলবতী হয়ে ওঠে এবং এই এষণাগুলিই সমাজে ও ইতিহাসে মানুষের অগ্রগতি নিরূপণ করেছে। কাজেই, ইতিহাসের ও সমাজের পরিবর্ত্তন ও অগ্রগতির তত্ত্ব নিরূপণ করতে গেলে মানুষের জীবনে এই এষণাগুলির কি স্থান, কি উচ্চনীচ-ভেদ, তা নির্ণয় করা আবশ্যক। সেই সমাজ ও সেই রাষ্ট্রই উন্নতির সীমান্তে উঠতে পারে যে সমাজে ও যে রাষ্ট্রে এই এষণাগুলি সামঞ্জস্যের সঙ্গে পরস্পরকে বাধা না দিয়ে বাড়তে পারে। যে সমাজে বা রাষ্ট্রে কোন একটা এষণা বলবতী হয়ে অন্য একটা এষণাকে তিরস্কৃত করবে, সেই সমাজ ও রাষ্ট্র ইতিহাসে হবে লাঞ্ছিত ও পরাজিত, হয়তো বা বিলুপ্ত হয়ে যাবে সংসারের দৃশ্যপট থেকে। আমাদের নীতিশাস্ত্রকারেরা বলেছেন :—

ধর্ম্মার্থকামাঃ সমমেব সেব্যাঃ
যোহ্যেকসক্তঃ সজনো জঘন্যঃ।

কল্কি

"বনফুল"

প্রথম অঙ্ক

[স্থান—মফঃস্বলের একটি সহর। ক্ষিতীশের বাসার বাহিরের ঘরে ক্ষিতীশ ও যতীন বসিয়া গল্প করিতেছে। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। ক্ষিতীশ প্রথমত প্রফেসার, দ্বিতীয়ত অবিবাহিত, তৃতীয়ত সৌখীন এবং চতুর্থত ধনীর সন্তান। বসিবার ঘরটি এই চতুর্ব্বিধ সম্মিলনের পরিচয় বহন করিতেছে। আসবাবের মধ্যে অধিকাংশই পুস্তক অথবা পুস্তকাধার—সমস্তই মূল্যবান। রেডিওটিও দামী। কিন্তু স্ত্রী-পর্য্যবেক্ষণ-বঞ্চিত বলিয়া সবই কেমন যেন শ্রীহীন। টেবিলে বই খাতা ইতস্ততবিক্ষিপ্ত, রেডিও ওয়াড়-শূন্য, শেলফে ধূলা জমিয়াছে।

উভয়েরই বয়স ত্রিশের কাছাকাছি। ডাক্তার যতীনও অবিবাহিত। চা-পর্ব্ব সবে শেষ হইয়াছে, উভয়েই সিগারেট ধরাইয়া আলোচ্য বিষয়টিকে দ্বিতীয়বার আক্রমণ করিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছে। যতীন সুরু করিল]

যতীন। (স্মিতমুখে) তোমার পিতৃবন্ধু যজ্ঞেশ্বরও আসছেন এখুনি—আমার সঙ্গে দেখা হয়েছিল মোড়ে।

ক্ষিতীশ। কেন?

যতীন। এই প্রস্তাব নিয়ে।

ক্ষিতীশ। আঃ, জ্বালাতন করে' তুললে দেখছি তোমরা।

যতীন। তোমার এতে আপত্তিটা কিসের? বিয়ে তো করতেই হবে একদিন।

[ক্ষিতীশ নীরবে সিগারেটের ধোঁয়ার রিং করিতে লাগিল]

জবাব দিচ্ছ না যে?

ক্ষিতীশ। বাবাকে জবাব দিয়েছি।

যতীন। তোমার সেই জবাব পেয়েই তিনি আমাকে আর যজ্ঞেশ্বরের মুন্সেফকে চিঠি লিখেছেন। সুতরাং তোমাকে আবার জবাব দিতে হবে। এবারেও তুমি যদি 'না' বল, তাহলে তোমার বাবা ক্ষেপে যাবেন। আর তিনি ক্ষেপলে না করতে পারেন এমন জিনিস নেই। সেকেলে জাঁহাবাজ জমিদার।

[ক্ষিতীশ নিরুত্তর]

ওসব পাগলামি ছাড়। সদ্বংশের সুন্দরী পাত্রী—

ক্ষিতীশ। সদ্বংশের হতে পারে; কিন্তু এক জাত নয় যে।

যতীন। কি রকম! তোমার বাবা অন্য জাতের মেয়ের সঙ্গে সম্বন্ধ করেছেন তোমার?

ক্ষিতীশ। আমি এম.এ., পি-এইচ. ডি.—মেয়েটি নিরক্ষর।

যতীন। ও! কাব্য করছ তুমি!

ক্ষিতীশ। কাব্য নয়, যেখানে এতখানি তফাৎ—

যতীন। আমি তো কোন তফাৎ দেখতে পাই না। টিয়াপাখী টিয়াপাখীই। বাঁধা বুলি কপচাতে শিখলেও টিয়াপাখী, না শিখলেও টিয়াপাখী।

ক্ষিতীশ। বায়োলজির জগতে হয়তো তাই, কিন্তু মনের জগতে আকাশ পাতাল তফাৎ।

যতীন। তোমার মতে তাহলে যে টিয়াপাখী রাধাকৃষ্ণ আওড়াতে পারে, সে বুনো টিয়াপাখীর চেয়ে বেশী বৈষ্ণব?

ক্ষিতীশ। বাজে কথা বল কেন! আমাদের আলোচনা মানুষ নিয়ে, পাখী নিয়ে নয়।

যতীন। তাহলে মানুষের কথাই বলি। তোমার সহকর্মী ওই ইতিহাসের অধ্যাপকটি আর আমার রামা চাকরে কি এমন তফাৎ আছে? দুজনেই মিথ্যেবাদী, দুজনেই স্বার্থপর, দুজনেই রোজ থলি নিয়ে বাজারে যায়, দুজনেরই অহরহ চেষ্টা কি করে' দু'পয়সা উপরি রোজকার হবে। তোমার ইতিহাসের অধ্যাপক ইতিহাস নিয়ে তন্ময় হয়ে নেই। তিনি প্রাইভেট ট্যুশনি করেন, লাইফ ইনসিওরেন্সের দালালি করেন, বড়লোকের খোসামোদ করেন। দুজনেই চাকর। একজন টেক্‌স্‌ট বুক পড়ায় আর একজন পোড়া কড়া মাজে। একজন বেশী মাইনে পায় বলে' বেশী ছিমছাম, আর একজন কম মাইনে পায় বলে' নোংরা। দুজনের সঙ্গেই আলাপ ক'রে দেখ—বিষয় এক হবে, হয় পর নিন্দা, না হয় সংসারের সম্বন্ধে হা হুতাশ। কোন তফাৎ নেই।

ক্ষিতীশ। (হাসিয়া) কোন তফাৎ নেই?

যতীন। আছে কিছু কিছু অবশ্য।

ক্ষিতীশ। যথা?

যতীন। রামাকে একটা কড়া কথা বললে সে তৎক্ষণাৎ তার পাঁচ টাকা মাইনের চাকরি ছেড়ে দিতে পারে—তোমার ওই প্রফেসারের মুখে লাথি মারলেও তিনি তা পারেন কি না সন্দেহ।

ক্ষিতীশ। বাজে কথা ছাড়। কটা বাজল? রেডিওটা খোলা যাক—ভাল লাগছে না কিছু।

[রেডিও খুলিয়া দিতেই গান সুরু হইয়া গেল]

আকাশের পানে চাহিয়া কাঁদিছে
মর্ত্ত্যভূমি
কোথায় তুমি, কোথায় তুমি, কোথায় তুমি!
সাগরে নদীতে ফেলেছ যে ছায়া
সে কি হায় শুধু স্বপনের মায়া
হায় রে,
দূর দিগন্তে মনে হয় যেন রয়েছ তুমি'।
কোথায় তুমি!

[গান শেষ হইবার পূর্ব্বেই ক্ষিতীশ উঠিয়া রেডিওটি বন্ধ করিয়া দিল]

যতীন। কি, বন্ধ ক'রে দিলে যে!

ক্ষিতীশ। ভাল লাগছে না কিছু। এ রকম পশুর মতো জীবন আর ভাল লাগে না।

যতীন। লাগত যদি পশু-জীবনের স্বাদটাও পুরোপুরি পেতে। আমাদের এ দুয়ের বার। তাই তো বলছি ষোলআনা মানুষের মতো বাঁচবার উপায় নেই যখন তখন, পুরোপুরি পশুর মতো বাঁচবার চেষ্টা করাই উচিত। স্ট্রাগ্‌ল্ ফর এগ্‌জিস্‌টেন্সে—

ক্ষিতীশ। আঃ—তোমার ওই বিলিতি বুলিগুলো ছাড় তো।

যতীন। ছাড়তে পারি, যদি ভাল বাংলা বুলি বল।

ক্ষিতীশ। নিছক পশুর মতো জীবন যাপন করা আমাদের আদর্শ নয়। আমাদের আদর্শ—ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ।

যতীন। ত্যাগ আমরা করি বইকি। সিগারেটের ধূমত্যাগ, নিষ্ঠীবন ত্যাগ—

[ক্ষিতীশ হাসিতে লাগিল]

হাসছ যে? এ ছাড়া আর কোন রকম ত্যাগ করেছ জীবনে কখনও?

ক্ষিতীশ। করি নি, কিন্তু করা উচিত।

যতীন। উচিত হলেও পারবে না, ক্ষমতা নেই।

ক্ষিতীশ। আমার ক্ষমতা নেই মিন্ করছ?

যতীন। আমি শিক্ষিত ভদ্রলোকদের সবাইকে মিন্ করছি। আমরা বড় বড় বই পড়েছি, বড় বড় বুলি আওড়াতে পারি—আর কিছু পারি না। আমরা স্বাধীনতার বক্তৃতা করি ন'টায়, সায়েবদের গিয়ে সেলাম করি সাড়ে ন'টায়। আমরা—

ক্ষিতীশ। বড় বড় বুলিরও একটা সার্থকতা আছে।

যতীন। নিশ্চয় আছে। বুলির চাট না থাকলে ফাটা কাপে পান্‌সে চা খাওয়া যেত না কি!

ক্ষিতীশ। বুলি অনেক সময় গুলির চেয়েও মারাত্মক।

যতীন। তাই সম্ভবত সমস্ত দেশটা মৃতপ্রায়।

ক্ষিতীশ। তোমার কি রুগি-টুগি নেই আজ?

যতীন। পাশের বাড়িতে একটা রুগি দেখতেই এসেছি, এখনও সেখানে যাওয়া হয় নি, এইবার যাব। তুমি তাহলে অটল হিমাদ্রিসম?

[ক্ষিতীশ মুচকি হাসিল]

মহা মুস্কিল হ'ল তো তোমাকে নিয়ে দেখছি! ভেতো বাঙালী আমরা, দেঁতো হাসি হেসে কোনক্রমে গা বাঁচিয়ে চলতে হবে আমাদের। চাকরিটি পেয়েছ—এইবার খেঁদি বুঁচি পটলি যাহোক একটা বিয়ে ক'রে কোথায় বংশবৃদ্ধি করে' যাবে, তা নয় তুমি আকাশকুসুমের মালা গাঁথতে বসলে!

ক্ষিতীশ। আমার মতো অবস্থায় পড়লে তুমিও গাঁথতে। আমার ঠিক অবস্থাটা তুমি জান না। তোমাকে সব কথা খুলে বলতে আপত্তি ছিল না, কিন্তু এখনও বলবার সময় হয় নি, ঠিক সময়ে জানতে পারবে।

যতীন। একটু একটু আন্দাজ করছি যেন। হাজার হোক লোকের নাড়ি টিপে খাই তো।

[ক্ষিতীশ সহসা উঠিয়া যতীনের দুটি হাত ধরিয়া ফেলিল]

ক্ষিতীশ। তুমি আমার বাল্যবন্ধু ভাই, আমায় সাহায্য কর—আমি—তুমি ঠিক বুঝবে না হয়তো—আমি—

[আবেগভরে গলার স্বর কাঁপিতে লাগিল]

যতীন। বুঝেছি। আচ্ছা, বেশ। কিন্তু ওই রিটায়ার্ড যজ্ঞেশ্বর মুন্সেফকে সামলাবে কি করে? ওকে চেনো তো?

ক্ষিতীশ। চিনি না মানে? উনি বাবার একজন বিশিষ্ট বন্ধু।

যতীন। শুধু তোমার বাবার নয়, উনি সকলের বিশিষ্ট বন্ধু। যেখানে এতটুকু স্বার্থের গন্ধ আছে, সেখানেই উনি বন্ধুত্ব করেন। উনি ডাক্তারের সঙ্গে বন্ধুত্ব করেন ফী দেবেন না বলে'; পুলিস অফিসারের সঙ্গে বন্ধুত্ব করেন; কামার, কুমোর, জেলে, ছুতোর, গয়লা সবার কাছ থেকে বিনা পয়সায় বা কম পয়সায় কাজ আদায় করতে পারবেন বলে'; এন্‌জিনিয়ারের সঙ্গে বন্ধুত্ব করেন তার ওয়ার্কশপে বিনা পয়সায় মোটর সারাবেন বলে'; রেলওয়ের লোকের সঙ্গে বন্ধুত্ব করেন নানারকম বে-আইনি সুবিধে পাবেন বলে'। ওঁর বন্ধুর সংখ্যা এত বেশী যে যখন উনি কোথাও যান, তখন কোন ষ্টেশনে কেউ দুধ নিয়ে, কোন ষ্টেশনে কেউ ফল নিয়ে, কোন ষ্টেশনে কেউ চা নিয়ে ওঁর সুবিধের জন্যে দাঁড়িয়ে থাকে। সবাই ওঁর বন্ধু—সবাইকে উনি চিঠি লিখেছেন। আমাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব আছে, তাই সেবার হঠাৎ কথা নেই বার্ত্তা নেই—রাত্রি দশটার সময় চোদ্দজন লোক নিয়ে আমাদের পুরীর বাড়িতে এসে উঠলেন। বন্ধুত্ব আছে, কিছু বলবার উপায় রইল না। বিশ্ববন্ধু উনি, উনি একটি কুমড়ো-গাছ। ফলাও সংসার করে' অনেকগুলি কুষ্মাণ্ড ফলিয়েছেন, কিন্তু সারাজীবন কাটাচ্ছেন পরের স্কন্ধে পরের সাহায্য নিয়ে নিয়ে—

ক্ষিতীশ। কি যে বল!

যতীন। একটু বাড়িয়ে বলি নি। কুমড়োগাছ বলতে যদি তোমার আপত্তি থাকে, অক্টোপাস্ বলতে পার। ওই সব-জান্তা লোকটা কেবলই বাগাবার চেষ্টায় ঘুরছে। ওকে সাবধান।

ক্ষিতীশ। ও আমার কি করবে?

যতীন। ও যখন তোমার এই বিয়ের ব্যাপারে লিপ্ত রয়েছে, তখন ও ওজন করে' দেখবে কোন্ দিকে থাকলে বেশী বাগানো যাবে। তোমার বাবার কাছে কিছু জমি না কি বাগিয়েছে ইতিমধ্যে, আরও কিছু বাগাবার আশা রাখে। সুতরাং তোমার আদর্শের মর্য্যাদা ও দেবে না, ও তোমার শত্রুপক্ষ। ভাবে গদগদ হয়ে সব কথা বলে' ফেলো না ওকে যেন।

ক্ষিতীশ। না না, আমি কাউকে কিছু বলব না।

(নেপথ্যে যজ্ঞেশ্বর)। ক্ষিতীশ বাড়ি আছ না কি?

যতীন। ওই এসেছে।

ক্ষিতীশ। আছি, আসুন।

[রিটায়ার্ড মুন্সেফ যজ্ঞেশ্বর প্রবেশ করিলেন। বেশ ঘাগি চেহারা]

যজ্ঞেশ্বর। আরে, ডাক্তারও যে এখানে! অনেকদিন বাঁচবে তুমি, এখ্খুনি তোমার নাম করছিলুম। সকাল থেকে তো তোমার পাত্তাই নেই। ওদিকে তোমার রুগীর টেম্পারেচার উঠে বসে' আছে।

যতীন। কত উঠেছে?

যজ্ঞেশ্বর। তা নাইন্টিনাইনের ওপর হবে।

যতীন। ও কিছু নয়। টাইফয়েডের ফোর্থ উইকে ও রকম একটু আধটু হবে এখন ক'দিন। কি খেয়েছে আজ?

যজ্ঞেশ্বর। তুমি তো গলাগলা ভাত খেতে বলে' এসেছিলে? কবরেজ মশাই এসে নাড়ি দেখে বললেন, চলবে না, আর দু'দিন যাক। (ক্ষিতীশকে) আমার হয়েছে উভয়সঙ্কট—গিন্নির ভক্তি

কবরেজের ওপর, অথচ আমার যতীনকে-নইলে চলে না। যতীন আমাদের ঘরের ছেলে বলে' রাগ করে না, অন্য কোন ডাক্তার হ'লে এভাবে চিকিৎসাই করতে রাজি হত না হয়তো। যতীন, তুমি ফেরবার পথে ছেলেটাকে দেখে যেও একবার। হ্যাঁ, আর একটা কথা—এখানকার স্কুলের হেড্ মাষ্টারের সঙ্গে আলাপ আছে তোমাদের কারো ?

ক্ষিতীশ। কেন বলুন তো ?

যজ্ঞেশ্বর। আমার মেজো ছেলেটা প্রমোশন পায় নি। ধরতে হবে ভদ্রলোককে একবার। একটা বছর তো নষ্ট হতে দেওয়া যায় না।

যতীন। আমার সঙ্গে তেমন আলাপ নেই।

যজ্ঞেশ্বর। তোমার সঙ্গে ? তুমিও তো এডুকেশনাল ডিপার্টমেণ্টের লোক।

ক্ষিতীশ। আমার সঙ্গে আলাপ আছে অবশ্য। কিন্তু এ রকম ধরণের অনুরোধ করতে কেমন যেন—

যজ্ঞেশ্বর। (সহসা উল্লসিত) হয়েছে, হয়েছে !—ঘোষাল স্কুল ইন্‌সপেক্টার হয়ে এসেছে না এখানে ?

ক্ষিতীশ। হ্যাঁ।

যজ্ঞেশ্বর। তার সঙ্গে আমার হরিহর-আত্মা। তোমাদের আর কিছু করতে হবে না।

[যতীন ক্ষিতীশের দিকে চাহিয়া গোপনে বাম চক্ষুটি ঈষৎ কুঞ্চিত করিল। যজ্ঞেশ্বর সহসা সঙ্কোচে প্রসঙ্গান্তরে উপনীত হইলেন]

ভারী দুঃসংবাদ পেলাম আজ একটা। এখানকার ম্যাজিষ্ট্রেট মিষ্টার ওয়াটসন নাকি বদলি হয়ে যাচ্ছেন। লোকটা আমার ভারী হিতকারী ছিল হে।

যতীন। তাঁর জায়গায় এল কে ?

যজ্ঞেশ্বর। এক চ্যাংড়া বাঙালী আই-সি-এস। হ্যাঁ, যে কথাটা বলতে এসেছিলাম বলি। যতীন তুমিও চিঠি পেয়েছ বোধ হয়। পুরন্দর আমাকেও লিখেছে।

যতীন। হ্যাঁ, পেয়েছি।

যজ্ঞেশ্বর। ক্ষিতীশকে বলেছ ?

যতীন। বলেছি। ও এখন বিয়ে করতে চাইছে না। একটা কিসের থীসিস্ লিখছে, না কি—

যজ্ঞেশ্বর। সে তো খুব ভাল কথা। কিন্তু বিয়ে করলে থীসিস্ লেখা আটকে যাবে ? আমাদের সময় ইউনিভার্সিটির যারা উজ্জ্বল রত্ন ছিল, তাদের তো কারো আটকায় নি বাপু।

ক্ষিতীশ। (সানুনয়ে) আমি পারব না। বাবাকে আপনি লিখে দিন।

যজ্ঞেশ্বর। লিখে দিতে আমার আপত্তি ছিল না, কিন্তু তোমার বাবাকে চেনো তো !

[ক্ষিতীশ চুপ করিয়া রহিল]

আচ্ছা, তাই লিখে দেব। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তোমাকে বিয়ে করতেই হবে, তা বলে' দিচ্ছি। পুরন্দর দাশগুপ্তকে থামানো শক্ত—হুঁদে লোক।

[স্থানীয় বালিকা-বিদ্যালয়ের সেক্রেটারী জনার্দন চক্রবর্ত্তী প্রবেশ করিলেন। পুরু ঠোঁট, ঘন ভ্রূ, পুষ্ট গোঁফ, ঘাড়ে গর্দানে জবরদস্ত ব্যক্তি। উকীল। বগলে একটা ফাইল আছে]

জনার্দন। নমস্কার, নমস্কার। এই যে হেঁ-হেঁ যজ্ঞেশ্বরবাবু, ডাক্তারবাবুও যে হেঁ-হেঁ।

যজ্ঞেশ্বর। ডাক্তারবাবুর খোঁজেই এসেছিলাম আমি। আপনি কি মনে করে' ?

জনার্দন। আমি ক্ষিতীশবাবুর কাছে এসেছি। একটু দরকার আছে ওঁর সঙ্গে।

ক্ষিতীশ। আপনারা বসুন। আমি চায়ের ফরমাসটা দিয়ে আসি।

[জনার্দন উপবেশন করিলেন। ক্ষিতীশ ভিতরে চলিয়া গেল]

যজ্ঞেশ্বর। আপনার মেয়ে-ইস্কুল চলছে কেমন ?

জনার্দন। চলে' যাচ্ছে এক রকম। ওয়াটসন সায়েবকে নিয়ে যেদিন আমরা মিটিং করেছিলাম, সেদিন আপনি মাসে মাসে চাঁদা দেবেন স্বীকার করেছিলেন। এক পয়সাও পাই নি কিন্তু আমরা এখনও।

যজ্ঞেশ্বর। হ্যাঁ, দেব বলেছিলাম। কিন্তু পরে ভেবে দেখলাম মেয়ে-ইস্কুল করে' আমরা দেশের সর্ব্বনাশই করেছি—ওতে সাহায্য করা অনুচিত।

জনার্দন। সর্ব্বনাশ করছি ! বলেন কি ?

[যতীন হাস্য গোপন করিল]

যজ্ঞেশ্বর। মেয়েগুলোর দফা নিকেশ হয়ে গেল।

জনার্দন। কি রকম !

যজ্ঞেশ্বর। কি রকম আবার কি। মেয়েদের যা কাজ—ছেলে ধরা, মাকে রান্নায় সাহায্য করা, বিছানা করা—তা কোনও ইস্কুলের মেয়েকে করতে দেখেছেন কখনও ? সকাল সন্ধ্যে পড়াশোনার ছুতোয় বই মুখে নিয়ে বসে' থাকবে, কুটোটি নেড়ে সংসারের উপকার করবে না। কিছু বলবার জো নেই—পড়াশোনার প্রত্যক্ষ ফল কি হয়েছে—বিলাসিতা, অহঙ্কার, স্বার্থপরতা, চরিত্রহীনতা, হিষ্টিরিয়া, টন্‌সিল—

জনার্দন। ও কথা বলবেন না। অশিক্ষিত মেয়েরাও কম বিলাসী, কম অহঙ্কারী, কম স্বার্থপর, কম চরিত্রহীন নয়। অশিক্ষিত মেয়েদেরও হিষ্টিরিয়া, টন্‌সিল হয়—কি বলেন ডাক্তারবাবু ?

যতীন। তা হয় বই কি।

যজ্ঞেশ্বর। হলেও এদের মতন হয় না—এদের যা হয় তা ভিরুলেণ্ট টাইপের।

জনার্দন। মাপ করবেন যজ্ঞেশ্বরবাবু, আমি জানি কেনই বা আপনি চাঁদা দিতে রাজি হয়েছিলেন, এখনই বা কেন দিতে আপত্তি করছেন ?

যজ্ঞেশ্বর। কেন ?

জনার্দন। আপনি চাঁদা দিতে রাজি হয়েছিলেন ওয়াটসন সাহেবের খোসামোদ করবার জন্যে। এখন ওয়াটসন সাহেব চলে' যাচ্ছেন, সুতরাং—

যজ্ঞেশ্বর। বাঃ, বলিহারি বুদ্ধি আপনার! এমন বুদ্ধি না

হ'লে উকীল হয়! শুনুন—স্ত্রীশিক্ষা স্ত্রীশিক্ষা করে' আমিও একদিন কম মাতি নি—কিন্তু এখন আমার মত বদলেছে—ডেফিনিট্‌লি বদলেছে।

যতীন। আহা, ঝগড়া-ঝাঁটি করবেন না আপনারা এই সামান্য ব্যাপার নিয়ে।

জনার্দ্দন। সত্যি যদি আপনার মত বদলে থাকে তাহলে তারও কারণ আমার জানা আছে।

যজ্ঞেশ্বর। কি কারণ?

জনার্দ্দন। যে কারণে ঈশপের গল্পে শেয়াল-আঙুরের সম্বন্ধে মত বদলেছিল। আপনি প্রাণপণে চেষ্টা করেও যখন আপনার একটা মেয়েকেও বাজে বাংলা নভেলের ঊর্দ্ধে নিয়ে যেতে পারলেন না, আর আপনার বন্ধুবান্ধবের মেয়েরা যখন টপাটপ বি-এ, এম-এ পাস করতে লাগল, তখন থেকেই আপনার মত বদলাল, তখন থেকেই আপনি প্রচার করতে লাগলেন স্ত্রী-শিক্ষা অতিশয় খারাপ। সব জানা আছে আমার—

যজ্ঞেশ্বর। আপনি বুদ্ধিমান লোক, আপনার সঙ্গে পারা শক্ত। (সহসা) আপনাদের নতুন যে হেড্‌মিস্ট্রেসটি এসেছেন, তাঁর সম্বন্ধে যে সব কানাঘুষো শুনছি, তা আপনিও শুনেছেন নিশ্চয়—

যতীন। ছি ছি, কি করছেন আপনারা? যজ্ঞেশ্বরবাবু, আপনি বাড়ি যান।

জনার্দ্দন। শুনেছি বইকি, কান থাকলেই নানাকথা শুনতে হয়।

যজ্ঞেশ্বর। ওসব শোনবার পরও বর্ত্তমান স্ত্রী-শিক্ষা সম্বন্ধে কোন ভদ্রলোকের উচ্চ ধারণা থাকতে পারে?

জনার্দ্দন। যারা পরের কথা শুনে একজন শিক্ষিতা ভদ্র-মহিলার চরিত্রে সন্দেহ করে, আমার মতে তারা ভদ্রলোকই নয়।

যজ্ঞেশ্বর। হাটে হাঁড়ি ভেঙে দি তাহলে।

যতীন। আঃ কি ছেলেমানুষি করছেন—যান আপনি—

জনার্দ্দন। কি হাঁড়ি ভাঙবেন ভাঙুন না। ওঁর বিরুদ্ধে সত্যি যদি কিছু জেনে থাকেন, আমি স্কুলের সেক্রেটারি—আমার তা জানবার অধিকার আছে।

যজ্ঞেশ্বর। আমি আপনাকেই রাত বারোটার সময় ওঁর কোয়ার্টার্স থেকে একলা বেরুতে দেখেছি—স্বচক্ষে। আমার সঙ্গে হিরণ বোসও ছিল, সেও দেখেছে।

যতীন। কি পাগলামি করছেন আপনি—যান আপনি, উঠুন। আমি আসছি একটু পরে।

[জোর করিয়া যজ্ঞেশ্বরকে দরজার বাহির করিয়া দিল]

জনার্দ্দন। ব্যাটা মিথ্যেবাদী ঘুঘু—

[যতীন গম্ভীর মুখে আসিয়া পুনরায় উপবেশন করিল। তাহার চক্ষু দুইটি হইতে হাসি উপচাইয়া পড়িতেছিল]

যতীন। বুড়ো গেল—এইবার প্রাণ খুলে কথা কওয়া যাক, আসুন। ব্যাপারটা কি?

[জনার্দ্দনের হঠাৎ ভাবান্তর হইল। তিনি মুচকি মুচকি হাসিতে লাগিলেন]

জনার্দ্দন। কাণ্ড দেখুন দেখি লোকটার।

যতীন। সত্যি মিথ্যে জানি না, আলাপও হয়নি আমার সঙ্গে, তবে দূর থেকে যতদূর মনে হয় মাষ্টারণী হবার মতন নিরামিষ চরিত্র নয় ঠিক, ভদ্রমহিলার একটু নুন ঝাল আছে বলে' মনে হয়—কি বলেন?

[জনার্দ্দন হা-হা করিয়া হাসিয়া উঠিলেন]

জনার্দ্দন। আপনিও দেখছি হা—হা—হা

[সহসা গম্ভীরভাবে, যেন রসিকতা ঢের হইয়াছে এইবার কাজের কথা বলিতেছেন]

সারাদিন মশাই পেটের ধান্দায় ঘুরতে হয়—কাছারি থেকে ফিরতেই তো সন্ধ্যে—তারপর দু'চারটে মক্কেলও আসে আপনাদের আশীর্ব্বাদে—সেই জন্যে সুলতা দেবীর কাছে যেতে একটু রাতই হয়ে যায় আমার, তা ঠিক। (আবার হাসিয়া) দেখুন দেখি বুড়োর কাণ্ড!

যতীন। হ'লই বা কাণ্ড! আমি মশায়, বৈজ্ঞানিক মানুষ, ওসব শুচিবাই নেই আমার। একটু আধটু প্রণয় করলে কি এমন চণ্ডী অশুদ্ধ হয়ে যায়?

জনার্দ্দন। আরে না না, কি যে বলেন আপনি?

[আবার হা-হা করিয়া হাসিলেন]

যতীন। চায়ের নাম করে' ক্ষিতীশ কোথা সরে' পড়ল?

জনার্দ্দন। আমারও ওঁর সঙ্গে দরকার আছে একটু।

যতীন। কেউ ফেল করেছে না কি?

জনার্দ্দন। (হাসিয়া) না। অন্য দরকার—প্রাইভেট।

যতীন। প্রাইভেট! ও বাবা, তাহলে উঠি আমি।

জনার্দ্দন। না না, আপনি উঠবেন কেন, আমিই না হয় আসব আর একদিন। এমন কিছু তাড়াতাড়ি নেই।

যতীন। আমাকে উঠতেই হবে, পাশের বাড়িতে একটা রুগী আছে, দেখে আসি তাকে।

[চলিয়া গেল। চলিয়া যাইবার সঙ্গে সঙ্গে জনার্দ্দনের মুখ গম্ভীর ও ক্রমশ ভ্রূকুটি কুটিল হইয়া উঠিল। টেবিলের উপর দুই কনুই রাখিয়া মুদিত নেত্রে তিনি কপালের উপর ধীরে ধীরে টোকা দিতে লাগিলেন। ক্ষণপরেই ক্ষিতীশ প্রবেশ করিল]

ক্ষিতীশ। এঁরা সব চলে' গেলেন না কি? চাকরটা বাজার থেকে ফেরে নি এখনও, চা হ'ল না। তারপর, আপনার কি খবর বলুন।

[চেয়ার টানিয়া বসিল]

জনার্দ্দন। (একটু ইতস্তত করিয়া) খবর, মানে—যদি কিছু মনে না করেন, একটা কথা আপনাকে বলতে চাই।

ক্ষিতীশ। কি বলুন?

জনার্দ্দন। হেড্‌ মিস্ট্রেসকে আপনি বাড়িতে বেশী আমল দেবেন না। চারিদিকে নানা রকম কানাঘুষো চলছে—

ক্ষিতীশ। (হাসিয়া) কানাঘুষো আপনার নামেও শুনেছি। তাহলে আপনাকেও আমল না দেওয়া উচিত।

জনার্দ্দন। আমার নামে? কি শুনেছেন আমার নামে?

ক্ষিতীশ। তা অকথ্য।

[জনার্দ্দনের সহসা আবার ভাবান্তর হইল]

জনার্দন। (হাসিয়া) বেশ বেশ, আমিও না হয় আসব না আপনার বাড়িতে—ইফ ইট হেল্‌প্‌স ইউ। (গম্ভীরভাবে) কিন্তু সত্যি বলছি প্রফেসার গুপ্ত, হেড মিস্ট্রেসকে আপনি প্রশ্রয় দেবেন না। কারণ মফস্বল জায়গা—অনেক কষ্টে স্কুলটা খাড়া করা গেছে—এর সুনাম যদি একবার নষ্ট হয়ে যায়—মানে ব্যক্তিগত-ভাবে অবশ্য হেড মিস্ট্রেসের সম্বন্ধে আমার কোনও খারাপ ধারণা নেই—

ক্ষিতীশ। কিন্তু 'আমল দেবেন না' 'প্রশ্রয় দেবেন না' আপনার এই সব উক্তি থেকে মনে হয় না যে তাঁর সম্বন্ধে আপনার ধারণা খুব উচ্চ।

জনার্দন। না—না—তা—মানে—(ফিক করিয়া হাসিয়া) সত্যি বলছি আমার ধারণা একটুও খারাপ নয়। কিন্তু তিনি যে রকম বাড়াবাড়ি আরম্ভ করেছেন, তাতে—

ক্ষিতীশ। আর কি করেছেন?

জনার্দন। এই দেখুন না, সেদিন তিনি একটা টমটম চড়েই ষ্টেশনে গেলেন। আমি বললাম—একটা বগি গাড়ি আনিয়ে দিই, তা শুনলেন না তিনি।

ক্ষিতীশ। টমটমে চড়লে ক্ষতি কি?

জনার্দন। ক্ষতি কিছু নেই—তবে দৃষ্টিকটু। টমটমে আরও দুটো লোক ছিল—বুঝলেন না—

ক্ষিতীশ। (হাসিয়া) নিজের মন যদি পবিত্র থাকে, তাহলে কিছুতেই কিছু এসে যায় না।

জনার্দন। ওঁর মন যে পবিত্র তাতে কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু দেখুন, (হাসিয়া) সকলের মন তো পবিত্র নয় এবং সেটা যখন জানা কথাই, তখন—

ক্ষিতীশ। যাকগে ওসব কথা। আপনার আর কোন দরকার আছে না কি?

জনার্দন। না, আমি শুধু এই কথাই বলতে এসেছি। ব্যাপারটা বেশী চাউর হয়ে গেলে আপনারও ক্ষতি হতে পারে। কলেজ কমিটিতে আপনার বাবার অবশ্য যথেষ্ট প্রতিপত্তি আছে, কিন্তু তিনি থাকেন বাইরে—এদিকে যজ্ঞেশ্বরবাবুর ছেলেটি এম্‌-এ পাশ করে এসেছে—আপনাকে কোনক্রমে সরাতে পারলে [নিম্নকণ্ঠে] যজ্ঞেশ্বরবাবু গোপনে গোপনে চেষ্টাও করছেন—একটা কোন ছুতো পেলেই—বুঝছেন না—

ক্ষিতীশ। কিন্তু আপনি যা বলছেন, তা আমি পারব না। কঙ্কি প্রাইভেটে এম-এ পড়ছে—সেই জন্যেই আসে আমার কাছে।

জনার্দন। কঙ্কি! কঙ্কি কে?

ক্ষিতীশ। সুলতার ডাক নাম। (ঈষৎ হাসিয়া) ছেলে-বেলা থেকে আলাপ আছে ওর সঙ্গে কিনা। ওর বাবা আমার বাবার বাল্যবন্ধু।

জনার্দন। (শুষ্ককণ্ঠে) ও।

ক্ষিতীশ। সামনে ওর পরীক্ষা—সেই জন্যেই রোজ আসে—আমি কি করে' মানা করি বলুন?

জনার্দন। (স্তম্ভিত) রোজ আসে!

ক্ষিতীশ। দু'মাস পরে পরীক্ষা যে তার।

[জনার্দন ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া একবার মাথা চুলকাইলেন]

জনার্দন। কিন্তু ভেবে দেখুন প্রফেসার গুপ্ত, আপনি ব্যাচিলার মানুষ—আপনার বাসায় দ্বিতীয় মেয়েমানুষ নেই—আপনি একটা কলেজের অধ্যাপক—আপনার সুনামে যদি কেউ—

ক্ষিতীশ। ও সব ঠুন্‌কো সুনামের আমি তোয়াক্কা করি না।

জনার্দন। আপনি না করতে পারেন, কিন্তু সুলতা দেবী মেয়েমানুষ, তিনি হয়তো—

ক্ষিতীশ। কঙ্কিও করে না।

[জনার্দন কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন]

জনার্দন। আপনি তাহলে ওঁকে কিছু বলবেন না?

ক্ষিতীশ। বলা অসম্ভব।

জনার্দন। আমাকেই তাহলে অপ্রিয় কাজটা করতে হবে।

ক্ষিতীশ। কি করবেন আপনি?

জনার্দন। স্কুলের সেক্রেটারি হিসেবে ওঁকে মানা করব, যেন উনি এখানে না আসেন—মানে, এমন কোন জায়গায় না যান, যাতে লোকের মনে সন্দেহ জাগতে পারে।

ক্ষিতীশ। এ রকম হুকুম করবার কি আপনার অধিকার আছে?

জনার্দন। স্কুলের সেক্রেটারি হিসেবে—পাবলিকের মঙ্গলের জন্যে—নিশ্চয়ই আছে।

[সহসা পাশের ঘরের দ্বার ঠেলিয়া সুলতা প্রবেশ করিল। শ্যামাঙ্গিনী তন্বী]

সুলতা। আপনার হুকুম আমি মানব না।

ক্ষিতীশ। তুমি বেরিয়ে এলে কেন? মানা করে' এলাম তোমাকে অত করে'।

জনার্দন। (বিস্মিত) আপনি এখানে!

সুলতা। হ্যাঁ, আমি এখানে।

জনার্দন। আমি আপিসের ফাইল নিয়ে আপনার বাসা থেকে ফিরে এলাম। এমন সময় আপনার এখানে থাকার মানে?

সুলতা। মানে কিছুই নেই, আমার খুশী। আপনার সঙ্গর চেয়ে ক্ষিতীশদা'র সঙ্গ আমি বেশী পছন্দ করি।

জনার্দন। আপনার সঙ্গলাভের লোভ আমার নেই। আমি আপনার কাছে গিয়েছিলাম স্কুলের কাজ করবার জন্যে।

সুলতা। অফিস-আওয়ারে যাবেন।

জনার্দন। আপনি জানেন, সে সময়ে আমার ছুটি নেই—

সুলতা। তাহলে সেক্রেটারিশিপ ছেড়ে দিন। আমি বাড়িতে আপনার সঙ্গে দেখা করব না।

জনার্দন। দেখা না করার হেতু?

সুলতা। আপনার মতো লোকের সঙ্গে নির্জ্জনে দেখা করতে আমার আপত্তি আছে।

[ক্ষিতীশ কি বলিতে গিয়া আত্মসম্বরণ করিয়া লইল এবং দুই হাতের দশটা আঙুল দ্বারা টেবিলে আলতো আলতো আঘাত করিতে করিতে নীরব উত্তেজনাভরে ইহাদের কথাবার্ত্তা শুনিতে লাগিল]

জনার্দন। আপত্তিটা কিসের? খুলেই বলুন না?

সুলতা। নিরাপদ নয়, সম্মানজনকও নয়।

জনার্দ্দন। সন্ধ্যের পর ক্ষিতীশবাবুর শোবার ঘরে লুকিয়ে এসে বসে' থাকাটা বুঝি বেশী নিরাপদ, বেশী সম্মানজনক ?

সুলতা। শিক্ষিত ভদ্রলোকের বাড়িতে আসায় কোন বিপদ নেই, কোন লজ্জা নেই। আমি লুকিয়েও আসি নি, সদর রাস্তা দিয়ে হেঁটেই এসেছি।

জনার্দ্দন। ক্ষিতীশবাবু শিক্ষিত ভদ্রলোক, আর আমি অশিক্ষিত ছোটলোক ?

সুলতা। আপনি যে কি, তা আপনার অন্তত অজানা নেই।

জনার্দ্দন। আপনি কি আমাকে কচি খোকা ঠাউরেছেন নাকি ?

সুলতা। আমি আপনার সঙ্গে কোন আলোচনা করতে চাই না, আপনি যান।

জনার্দ্দন। (অসংযতভাবে) আমি স্কুলের সেক্রেটারি, আপনি আমার সঙ্গে আলোচনা করতে বাধ্য।

সুলতা। (ক্ষিতীশকে) ক্ষিতীশদা, ওঁকে যেতে বলুন, আর বুঝিয়ে দিন যে আমি কারো ক্রীতদাসী নই।

[গমনোদ্যত]

জনার্দ্দন। (অসংলগ্নভাবে) কারও সেবাদাসীও নন আশা করি। (উঠিয়া দাঁড়াইয়া) বেশ, কাল আমি অফিস-আওয়ারেই স্কুলে যাব—দেখি আপনি—

[সুলতা ফিরিয়া দাঁড়াইল]

সুলতা। আমি কাল থেকে স্কুলে যাব না।

জনার্দ্দন। যাবেন না ?

সুলতা। না। যে স্কুলের সেক্রেটারি দাইয়ের মারফৎ প্রণয় নিবেদন করে, সে স্কুলে আমি চাকরি করি না।

[জনার্দ্দন এইবার সম্পূর্ণরূপে সংযমহারা হইয়া পড়িলেন]

জনার্দ্দন। দাইয়ের মারফৎ! মিছে কথা—আই চ্যালেঞ্জ। (তর্জ্জনী আস্ফালন করিয়া) ডিফামেশন কেস আনব আমি আপনার নামে—আমি জনার্দ্দন উকীল মনে রাখবেন।

সুলতা। (শান্ত কণ্ঠে) আপনিও মনে রাখবেন, আপনার চিঠি দু'খানা আমার কাছে আছে এখনও। আপনার দাইও আমার পক্ষে।

[জনার্দ্দন একটু থতমত খাইয়া গেলেও একেবারে দমিলেন না]

জনার্দ্দন। আমি—আমি কি করতে পারি, জানেন ?

ক্ষিতীশ। আপনি অনায়াসে অন্তত যেতে পারেন এখন।

জনার্দ্দন। আচ্ছা, দেখা যাবে—

[সক্রোধে বাহির হইয়া গেলেন। ক্ষিতীশ ও সুলতা হাসিমুখে পরস্পরের দিকে চাহিয়া রহিলেন]

ক্ষিতীশ। অতঃপর ?

সুলতা। অতঃপর বিয়ে করা ছাড়া আর উপায় কি ? ভেবেছিলাম পরীক্ষা দেবার আগে কিছু করব না, কিন্তু এখন দেখছি আর উপায় নেই।

ক্ষিতীশ। (সোৎসাহে) বেশ চল, কালই তাহলে—

সুলতা। আমাকে একবার বাবাকে জানাতে হবে।

ক্ষিতীশ। বাবাকে জানাবে ? তিনি কি মত দেবেন, তুমি আশা কর ? তোমার বাবা, আমার বাবা কেউ মত দেবেন না।

সুলতা। তবু আমাকে জানাতে হবে। তাঁকে আমি কথা দিয়েছি যে গোপনে কিছু করব না।

ক্ষিতীশ। কবে কথা দিলে ?

সুলতা। যখন কলেজে ভরতি হই। কথা না দিলে তিনি আমাকে পড়তেই দিতেন না।

ক্ষিতীশ। ভুল করছ কঙ্কি। বৈদ্য ব্রাহ্মণে বিয়ে এখনও চলিত হয় নি সমাজে—তিনি কিছুতেই মত দেবেন না।

সুলতা। তবু তাঁকে জানাতে হবে। আমি আজই চলে যাই।

ক্ষিতীশ। যদি তিনি রাজি না হন, না হওয়াই সম্ভব—

সুলতা। যদি রাজি না হন তবু আমি ফিরে আসব।

ক্ষিতীশ। ঠিক ?

সুলতা। ঠিক।

[ডাক্তার যতীন প্রবেশ করিল]

যতীন। ও—আই অ্যাম সরি।

[বাহির হইয়া গেল।

ক্ষিতীশ। শোন শোন যতীন, যেও না।

[যতীনের পুনঃপ্রবেশ]

যতীন। (সুলতাকে) নমস্কার।

সুলতা। নমস্কার।

ক্ষিতীশ। আর গোপন রেখে লাভ নেই, এস পরিচয় করিয়ে দিই—ইনি আমার ভবিষ্যৎ সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী কঙ্কি।

যতীন। ও! আমার আন্দাজ তাহলে ঠিক।

সুলতা। (হাতঘড়ি দেখিয়া) আর আধ ঘণ্টা পরেই ট্রেণ। আমি তাহলে সোজা ষ্টেশনে চললাম।

ক্ষিতীশ। যাবেই নির্ঘাৎ ?

সুলতা। হ্যাঁ, আমাকে যেতেই হবে। আমি চার-পাঁচ দিন পরে ফিরব।

ক্ষিতীশ। ঠিক ?

সুলতা। (হাসিয়া) ঠিক।

[চলিয়া গেল]

যতীন। (বিস্মিত) চলে' গেল যে! ব্যাপারটা কি ?

ক্ষিতীশ। চল, বলছি—ভেতরে এস।

[উভয়ে ভিতরের দিকে চলিয়া গেলেন]

দ্বিতীয় অঙ্ক

[স্থান কলিকাতা। সুলতার পিতা গোবর্দ্ধন চাটুয্যের বৈঠকখানা। ধরণ ধারণ সাবেকি চালের। একটি বড় চৌকিতে আড়ময়লা একটি চাদর বিছানো—তদুপরি কয়েকটি খেরোর তাকিয়া ইতস্ততবিক্ষিপ্ত। চেয়ার টেবিলও আছে। গোবর্দ্ধন স্বয়ং একটি আরাম কেদারায় বসিয়া ধূমপান করিতেছেন। সিগারেট অথবা পাইপ নয়—গড়গড়া। গোবর্দ্ধন বেশ প্রবীণ লোক। মাথায় টাক, গোঁফ দাড়ি কামানো ভারী মুখ। অতিশয় গম্ভীর ব্যক্তি। চৌকিতে বসিয়া আছেন নিবারণ—সুলতার মামা এবং সুকুমার—সুলতার মেসো। নিবারণের খাঁকড়া গোঁফ, চোখে

হাই-পাওয়ার চশমা। সুকুমার বেশ লম্বা ছিপছিপে, গোঁফ দাড়ি কামানো। ব্যাকরণ অশুদ্ধ না হইলে অনায়াসেই তন্বী প্রৌঢ় বলা চলে। গোবর্দ্ধনের ঠিক বিপরীত দিকে চেয়ারে বসিয়া আছেন, গাঙ্গুলী। ইঁহার বয়স চল্লিশের কিছু উপর হইবে। সম্প্রতি বিপত্নীক হইয়াছেন। সুলতার পাণিপীড়ন করিবেন অন্তরে এই আকাঙ্খাটি পোষণ করিতেছিলেন। গোবর্দ্ধনেরও বিশেষ আপত্তি ছিল না। কারণ গাঙ্গুলীর বংশ ভাল, কলিকাতায় বাড়ি আছে, ব্যাঙ্কের হিসাবও নিন্দনীয় নহে। পূর্ব্বপক্ষের কোন সন্তানাদি নাই। কিন্তু সুলতার ব্যবহারে গাঙ্গুলী মর্ম্মাহত হইয়া পড়িয়াছেন। গাঙ্গুলীর খাটারফ্লাই গোঁফ।

একটি মোড়ার এক ধারে বসিয়া পাড়ার ঠাকুরদা খেলো হুঁকায় তামাক টানিতেছেন। সময় প্রাতঃকাল]

ঠাকুরদা। গাঙ্গুলী, খুব কি বেশী বিষন্ন বোধ করছ ?

গাঙ্গুলী। এ ঠাট্টার সময় নয় ঠাকুরদা।

নিবারণ। এতে ঠাট্টার কি আছে ! গাঙ্গুলী যদি সুলতাকে বিয়ে করে, তাহলে সেটা সুলতার ভাগ্য বলতে হবে।

ঠাকুরদা। অবশ্য। আমি বলছি—

সুকুমার। থাক ওসব কথা এখন। উপস্থিত বিপদ থেকে কি করে' উদ্ধার পাওয়া যায় তাই ভাবা যাক। গোবর্দ্ধন, তুমি পুরন্দরকে খবর দিয়েছো তো ? আসবে কখন ?

গোবর্দ্ধন। যে কোন মুহূর্ত্তে এসে পড়তে পারে।

নিবারণ। মিস দত্তকে খবরটা দিয়ে ব্যাপারটা তুমি বেশ ঘোরালো করে' তুলেছ সুকুমার। ঘরের কথা বাইরে ঘাঁটাঘাঁটি করে' লাভ কি হবে ?

সুকুমার। কঞ্চি যদি কারো কথা শোনে তাহলে ওই মিস দত্তের কথাই শুনবে। মিস দত্ত শুধু যে ওকে পড়িয়েছেন তা নয়, ভালওবাসেন। মেয়েদের মধ্যে খুব পপুলার উনি, সেবার ওদের স্কুলের ষ্ট্রাইক উনিই মিটিয়েছিলেন। কঞ্চি ওঁকে খুব শ্রদ্ধা করে।

গাঙ্গুলী। তা ভালই করেছেন আপনি। একটা মীমাংসায় আসা দরকার, যা করে' হোক।

ঠাকুরদা। আমি বলছিলাম—না থাক—বাজে কথা বললে তোমরা চটে' যাবে আবার ?

নিবারণ। বলুনই না কি বলছেন ?

ঠাকুরদা। বলছি, একজন 'মিস্' নিয়েই তো অস্থির হয়ে পড়া গেছে, আবার আর একজন ! সামলাতে পারা যাবে কি দুজনকে একসঙ্গে ?

নিবারণ। আপনি মনে হচ্ছে এই গুরুতর ব্যাপারটাকে খুব লঘুভাবে উপভোগ করছেন।

ঠাকুরদা। ঠিক ধরেছ। আমার ভারী আনন্দ হচ্ছে।

নিবারণ। আনন্দ হচ্ছে ?

[ঠাকুরদা স্মিতমুখে তামাক টানিতে লাগিলেন]

গাঙ্গুলী। না না, বাজে কথায় বড় সময় নষ্ট হচ্ছে। এর মীমাংসা করতে হলে এইটে ঠিক করতে হবে যে, মিস চ্যাটার্জি যদি মত না বদলান, তাহলে আমাদের কি কর্ত্তব্য।

গোবর্দ্ধন। মত বদলাতেই হবে।

[ধীরে দৃঢ়তার সহিত কথা কয়টি উচ্চারণ করিয়া গোবর্দ্ধন পুনরায় গড়গড়ায় মন দিলেন]

নিবারণ। সুকুমার, তুমি যাই বল, তোমার ওই মিস দত্ত-ফত্ত—উহুঁ—সুবিধে বুঝছি না আমি।

সুকুমার। তুমি কি করতে চাও, বল ?

নিবারণ। ওকে ভাল করে' বোঝানোর দরকার এবং তা বাইরের লোক দিয়ে হবে না।

সুকুমার। বোঝাবার ত্রুটি হয় নি।

নিবারণ। তুমি আমি বোঝালে হবে না। ওর মা নেই, ওর ভাই বোন তারাও কেউ এখানে নেই, গোবর্দ্ধন গোঁয়ার গোবিন্দ—এ সব কি জোর-জবরদস্তি করে' হয় ?

গাঙ্গুলী। বলেন তো আমি আমার বোনকে পাঠিয়ে দিতে পারি।

ঠাকুরদা। অগত্যা।

গাঙ্গুলী। আমি এ বিষয়ে একটা মীমাংসায় আসতে চাই—অর্থাৎ আমি জানতে চাই যে, সুলতা যদি কিছুতেই রাজি না হন, তাহলে আপনারা কি করবেন।

গোবর্দ্ধন। সুলতাকে রাজি হতেই হবে।

[পুনরায় গড়গড়ায় মন দিলেন]

গাঙ্গুলী। তাহলে তো কোন কথাই থাকে না। কিন্তু যদি না হন—আমি জিনিসটা জানতে চাইছি, মানে—

ঠাকুরদা। তুমি একটু বিব্রত হয়েছ—অনুমতি দাও তো ব্যাপারটা খোলসা করে' বুঝিয়ে দিই এঁদের।

গাঙ্গুলী। দিন। আপনি তো সবই জানেন।

ঠাকুরদা। উনি অবিলম্বে পুনরায় দারপরিগ্রহ করতে চান। আর একটি ভাল সম্বন্ধও এসেছে, কিন্তু উনি সুলতাকে পেলে আর কাউকে বিয়ে করবেন না। তাই উনি একটা মীমাংসায় আসতে চাইছেন।

গাঙ্গুলী। এঁদের যদি কথা পাই, তাহলে অপেক্ষা করতেও আপত্তি নেই আমার।

নিবারণ। কথা দেওয়া সম্ভব নয়।

গাঙ্গুলী। কিন্তু এমনভাবে বেশীক্ষণ চলাও কি সম্ভব ? আমার মনে হয় আমার বোনকে একবার পাঠিয়ে দিলে, হয়তো—

সুকুমার। কিছু হবে না। যদি কেউ পারে, মিস দত্তই পারবেন।

নিবারণ। আমার মনে হচ্ছে কেউ পারবেন না। শেষ পর্য্যন্ত ওর মতেই মত দিতে হবে আমাদের।

গোবর্দ্ধন। দেব না। বদ্যির ছেলের সঙ্গে বামুনের মেয়ের বিয়ে কিছুতেই হতে পারে না।

নিবারণ। আইনত নিশ্চয়ই পারে। তোমার মেয়ের বয়স প্রায় সাতাশ হতে চলল। সে ইচ্ছে করলে, তিন আইন অনুসারে যাকে খুশী বিয়ে করতে পারে।

গোবর্দ্ধন। তিন আইন নয়, আমার আইন মানতে হবে তাকে। আমি তার বাবা।

[গড়গড়ায় মন দিলেন। ভিতরের দিক হইতে গুম গুম করিয়া একটি শব্দ হইল]

নিবারণ। ছি ছি ছি—

গাঙ্গুলী। আমার কেমন অস্বস্তি হচ্ছে—মনে হচ্ছে, আমরা যেন কোন বর্ব্বর যুগে বাস করছি।

[গোবর্দ্ধন একবার চোখ তুলিয়া গাঙ্গুলীর দিকে চাহিলেন এবং পরমুহূর্ত্তে আবার গড়গড়ায় মনঃসংযোগ করিলেন]

সুকুমার। বাধ্য হয়ে করতে হয়েছে, উপায় কি!

গাঙ্গুলী। যাই বলুন, ঠিক এ রকমটা এযুগে কল্পনা করাও শক্ত।

ঠাকুরদা। কিছু শক্ত নয়।

গাঙ্গুলী। আর কোথাও দেখেছেন আপনি?

ঠাকুরদা। তোমার মুখের উপরই দেখতে পাচ্ছি—অমন লতানো গোঁফকে নিষ্ঠুরভাবে ছেঁটেছ।

নিবারণ। ইয়ার্কি না করে' একটা উপায় বাতলান দেখি।

ঠাকুরদা। উপায় আপনিই হবে। যতক্ষণ না হচ্ছে, বসে' বসে' মজা দেখা ছাড়া আর কি করতে পারি বল?

সুকুমার। তার মানে, কঙ্কির মতেই আপনার মত?

ঠাকুরদা। আমার কোন মত নেই, যা হয় তাই বেশ।

[নিবারণ পকেট হইতে নস্য বাহির করিয়া এক টিপ নস্য লইলেন]

সুকুমার। কঙ্কি যদি পুরন্দরবাবুর ছেলেকে বিয়ে করে, তাও বেশ?

গোবর্দ্ধন। কঙ্কি পুরন্দরের ছেলেকে বিয়ে করবে না।

সুকুমার। তোমার মত তো শুনেছি সবাই। ঠাকুরদার মতটা শোনা যাক।

গাঙ্গুলী। একটা মীমাংসায় আসা দরকার কিন্তু। আমার আবার আপিস আছে আজ।

[ঘড়ি দেখিলেন]

নেপথ্যে। আসতে পারি।

সুকুমার। মিস দত্ত এসেছেন। আসুন—

[মিস দত্ত প্রবেশ করিলেন। বগলে—ছাতা, হাতে—ভ্যানিটি ব্যাগ, চশমা-পরা ব্যলঠাকৃতি মহিলা। ঠাকুরদা একবার কাসিলেন]

সুকুমার। আসুন, আসুন, নমস্কার।

মিস দত্ত। নমস্কার। আমার একটু দেরীই হয়ে গেল।

[সুকুমার তাড়াতাড়ি উঠিয়া কোঁচা দিয়া ঝাড়িয়া একটি চেয়ার তাঁহাকে আগাইয়া দিলেন। গোবর্দ্ধন হাত তুলিয়া নিয়মরক্ষা-গোছ একটা নমস্কার করিলেন মাত্র, যেন তিনি সুকুমারের খাতিরেই মিস দত্তের আবির্ভাব সহ্য করিতেছেন। সকলের সহিত নমস্কারাদি বিনিময়ের পর মিস দত্ত উপবেশন করিলেন]

সুকুমার। আমরা আপনার অপেক্ষাতেই আছি।

মিস দত্ত। ব্যাপারটা কি, সুলতা করেছে কি?

সুকুমার। ও মাষ্টারি করতে গিয়েছিল তা তো আপনি জানেন।

মিস দত্ত। হ্যাঁ জানি।

নিবারণ। (সক্ষোভে) তখনই মানা করেছিলাম। তখন যদি গোবর্দ্ধন আমার কথাটা শোনে, তাহলে আর—

[নস্য লইলেন। গোবর্দ্ধন নির্ব্বিকারভাবে তামাক টানিতে লাগিলেন]

মিস দত্ত। কেন, হয়েছে কি?

নিবারণ। হয়েছে আমার মাথা আর মুণ্ডু।

[পুনরায় সজোরে নস্য লইলেন]

সুকুমার। (মোলায়েম ভাবে) টেম্পার লুজ করে' তো লাভ নেই।

মিস দত্ত। কি হয়েছে, বলুন না?

সুকুমার। সেখানে ক্ষিতীশ দাশগুপ্ত—মানে গোবর্দ্ধনেরই এক বন্ধুর ছেলে প্রফেসারি করে। তার সঙ্গে ওর আলাপ ছিলই, সেই আলাপ ক্রমে—

[ঠিক কি বলিবেন ইতস্তত করিতে লাগিলেন]

ঠাকুরদা। প্রলাপ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

[এই কথায় মিস দত্ত ভ্রূকুঞ্চিত করিলেন ও উঠিয়া দাঁড়াইলেন]

মিস দত্ত। মাপ করবেন সুকুমারবাবু, আমি এ ধরণের আলোচনায় থাকতে চাই না। এই বিষয়ে আলোচনা করবার জন্যে আমাকে এতগুলি পুরুষের সামনে ডেকে আনবেন—এ অন্তত আপনার কাছে আশা করি নি সুকুমারবাবু। আমি চললাম।

[গমনোদ্যত]

সুকুমার। যাবেন না, শুনুন, উনি আমাদের ঠাকুরদা, তা ছাড়া—

ঠাকুরদা। তা ছাড়া আলোচনাটা বিবাহ-বিষয়ক। অশ্লীল কিছু নয়। ওর বিবাহপ্রসঙ্গ নিয়েই আলোচনা চলছে—

মিস দত্ত। ও, বিবাহপ্রসঙ্গ নাকি? (হাসিয়া) বিয়ে ওর? কবে?

[উপবেশন করিলেন]

গোবর্দ্ধন। বিয়ে হবে না।

[বলিয়াই গম্ভীরভাবে গড়গড়া টানিতে লাগিলেন]

মিস দত্ত। এই বলছেন—হবে, এই বলছেন—হবে না। আমি বুঝতে পারছি না ঠিক আপনাদের কথা!

[সুকুমারের দিকে চাহিলেন]

ঠাকুরদা। আমি সংক্ষেপে বুঝিয়ে বলি শুনুন। সুলতার ইচ্ছে ক্ষিতীশকে বিয়ে করা, এঁদের তাতে ঘোর আপত্তি। আপনাকে ডাকা হয়েছে সুলতাকে বাগ মানাবার জন্যে। সুলতা আপনার ছাত্রী, আপনার প্রতি ওর শ্রদ্ধা আছে, আপনি বুঝিয়ে বললে হয়তো আপনার কথা শুনতে পারে সে।

গাঙ্গুলী। আমরা অবিলম্বে একটা মীমাংসায় আসতে চাই। (ঘড়ি দেখিয়া ঈষৎ নিম্নকণ্ঠে) আমার আপিসের আবার দেরী না হয়ে যায়।

[মিস দত্ত ওষ্ঠদ্বয় দৃঢ়-নিবদ্ধ করিলেন। তাঁহার নাসা-রন্ধ্রদ্বয়ও যেন ঈষৎ বিস্ফারিত হইল। তিনি প্রত্যেকের মুখের পানে একবার চাহিলেন। নিবারণ নস্য লইলেন, গোবর্দ্ধন নির্ব্বিকারভাবে তামাক টানিতে লাগিলেন]

মিস দত্ত। আমি প্রথমেই জানতে চাই, একজন শিক্ষিতা সাবালিকার সুস্থ স্বাধীন সমাজ-সঙ্গত ইচ্ছার বিরুদ্ধাচরণ করবার স্বপক্ষে কি কি যুক্তি আছে আপনাদের?

নিবারণ। নাও, সুকুমার, জবাবদিহি কর।

সুকুমার। আমরা ব্রাহ্মণ, সেটা ভুলে যাবেন না মিস দত্ত।

ঠাকুরদা। নৈকষ্য কুলীন।

মিস দত্ত। কিন্তু কৌলীন্যের নিকষে যাচাই করলে আপনাদের ক'জনের ব্রাহ্মণত্ব টিকবে? আপনারা সবাই তো দাস। ওই অধ্যাপকটির মধ্যেই হয়তো কিছু ব্রাহ্মণত্ব পাওয়া যেতে পারে খুঁজলে।

গোবর্দ্ধন। আমি আমাদের স্বজাতি একজন দাসের সঙ্গেই আমার মেয়ের বিয়ে দিতে চাই।

ঠাকুরদা। এ ছোকরাও দাস, প্রকাশ্য নয়, গুপ্ত। বানানটা যদিও তালব্য 'শ' দিয়ে লেখে, কিন্তু অভিধানে মানে এক।

নিবারণ। দেখুন ঠাকুরদা, রসিকতার একটা সীমা আছে।

[ঠাকুরদা স্মিতমুখে হুঁকায় মন দিলেন]

সুকুমার। আপনি সুলতাকে একটু বুঝিয়ে বলুন মিস দত্ত, আমরা এ এক মহাসমস্যায় পড়েছি।

গাঙুলী। অবিলম্বে একটা মীমাংসায় আসা দরকার।

[ভিতর হইতে পুনরায় গুম গুম আওয়াজ হইল]

মিস দত্ত। ও কিসের শব্দ?

নিবারণ। (চাপা কণ্ঠে) ডিস্‌গ্রেস্‌ফুল!

মিস দত্ত। দেখুন, আমি স্পষ্ট কথা বলব। ব্যক্তিগতভাবে আমি স্বাধীনতার পক্ষপাতী। যে যুগে পুরুষেরা স্ত্রীলোকদের ছিনিমিনি খেলত, সে যুগ গত হয়েছে। এ যুগে শিক্ষা পেয়ে যারা নিজেদের পায়ে দাঁড়াতে শিখেছে, তাদের স্বাধীনতায় অকারণে হস্তক্ষেপ করবার অধিকার আপনাদের নেই। এই হাস্যকর কর্ত্তৃত্বের মোহ ত্যাগ করুন আপনারা।

[গোবর্দ্ধনের দিকে চাহিলেন। কিন্তু সেদিক হইতে কোন সাড়া পাওয়া গেল না। তিনি অবিচলিত গাম্ভীর্য্যভরে তামাক টানিয়া যাইতে লাগিলেন]

সুকুমার। অকারণে আমরা বাধা দিচ্ছি না, কারণ আছে।

মিস দত্ত। সেই কারণগুলোই শুনতে চাইছি।

[সুকুমার গোবর্দ্ধনের পানে চাহিলেন। গোবর্দ্ধন কেবল ধীরে ধীরে পা দোলাইতে লাগিলেন, কোন কথা বলিলেন না]

নিবারণ। শোনাতে আমাদের আপত্তি নেই, শুনে যদি আপনি সুলতাকে এ বিয়ে থেকে নিবৃত্ত করতে পারবেন প্রতিশ্রুতি দেন। তা না হ'লে শুধু শুধু আপনাকে আমাদের পারিবারিক কথা শুনিয়ে লাভ নেই।

মিস দত্ত। আমি আগে থাকতে কোন প্রতিশ্রুতি দিতে পারব না। আপনাদের পারিবারিক প্রসঙ্গ শোনবারও আগ্রহ নেই আমার। আমি তাহলে উঠলাম।

[উঠিয়া দাঁড়াইলেন]

গোবর্দ্ধন। সুকুমার, ওঁর ট্যাক্সি ভাড়াটা দিয়ে দাও।

সুকুমার। না না, যাবেন কেন! বসুন। এমন কোন গোপনীয় পারিবারিক কথা নয়, যা আপনাকে বলা চলবে না। নিবারণের কথায় কান দেবেন না, ও একটা গোঁয়ার।

[নিবারণ এক টিপ নস্য লইলেন]

ঠাকুরদা। আপনি চলে' গেলে আমরা একেবারে দিশাহারা হয়ে পড়ব। এতক্ষণ ধরে' আমরা তো কিছুই করতে পারি নি। আপনি আসাতে তবু একটু কূল দেখা যাচ্ছে। শাস্ত্রে বলেছে—আপনারাই শক্তি।

[মিস দত্তের অধরে ক্ষীণ একটা হাস্যরেখা যেন দেখা গেল]

সুকুমার। (সানুনয়ে) যাবেন না, বসুন!

[মিস দত্ত উপবেশন করিলেন]

মিস দত্ত। কিন্তু কারণগুলো না জানলে আমি কিছুই করতে পারব না।

সুকুমার। এই যে, শুনুন না। সুলতার দাদা সুব্রতর খুব ভাল বিয়ের সম্বন্ধ এসেছে একটা। পাত্রীটি লক্ষপতি পিতার একমাত্র কন্যা। বিয়ে হ'লে সুব্রতই বিষয়ের উত্তরাধিকারী হবে। সুলতা যদি বদ্যি বিয়ে করে, তাহলে এ বিয়ে হবে না, কারণ কন্যাপক্ষ ভয়ানক গোঁড়া। দ্বিতীয় কারণ, সুলতার ছোট বোন সুনীপার এখনও বিয়ে হয় নি। তারও বিয়ের গোলমাল হতে পারে এ নিয়ে। তাই আমরা বলছিলাম, সুলতাকে আপনি যদি বুঝিয়ে একটু বলেন—

[ভিতর হইতে আবার গুম গুম শব্দ হইল]

মিস দত্ত। শব্দটা কিসের হচ্ছে?

[কেহ কোন উত্তর দিল না। নিবারণ কেবল জ্বলন্ত দৃষ্টিতে একবার গোবর্দ্ধনের দিকে চাহিলেন। গোবর্দ্ধন নির্ব্বিকার]

গাঙুলী। এ কিন্তু আমার সহ্যের সীমা অতিক্রম করছে গোবর্দ্ধনবাবু।

গোবর্দ্ধন। করুক।

মিস দত্ত। ব্যাপারটা কি?

সুকুমার। ও কিছু নয়। সব তো শুনলেন এইবার আপনি কি বলছেন বলুন?

মিস দত্ত। বলেছি তো ব্যক্তিগতভাবে আমি স্বাধীনতার স্বপক্ষে—

নিবারণ। স্বাধীনতার খামখেয়ালীর জন্যে সমস্ত পরিবার-টাকে গোল্লায় দিতে পারব না আমরা।

মিস দত্ত। সেটা আপনাদের বিবেচ্য, আমার নয়।

সুকুমার। আপনাকেও একটু বিবেচনা করতে হবে বইকি।

ঠাকুরদা। উনি করবেন। ব্যস্ত হও কেন?

মিস দত্ত। (সহসা) হ্যাঁ, একটা কাজ করা যায়, কিন্তু নিজের বিবেকের বিরুদ্ধে না গিয়েও—

গাঙুলী। হ্যাঁ, যা হোক করে' একটা মীমাংসা করে' ফেলুন।

সুকুমার। কি করতে চান আপনি মিস দত্ত?

মিস দত্ত। সুলতাকে আমি অপেক্ষা করতে বলতে পারি।

ঠাকুরদা। তার কি তর সইবে?

মিস দত্ত। অনুরোধ করে' দেখতে পারি। আমার বিশ্বাস সে আমার অনুরোধ রাখবে। কিন্তু এ অনুরোধ করবার পূর্ব্বে আপনাদেরও আমি একটা প্রতিশ্রুতি চাই যে সুব্রত সুনীপার বিয়ে হয়ে গেলে আপনারা সুলতাকে বাধা দেবেন না।

গোবর্দ্ধন। বাধা দেব।

[সকলেই গোবর্দ্ধনের দিকে ফিরিয়া চাহিলেন। ক্ষণকালের জন্য একটা নিবিড় নীরবতা ঘনাইয়া উঠিল]

মিস দত্ত। সুব্রত সুনীপার বিয়েই তাহলে আসল বাধা নয় ?

গোবর্দ্ধন। না।

মিস দত্ত। বাধাটা কি তাহলে জানতে পারি কি ?

গোবর্দ্ধন। কোন সময়েই আমার মেয়ে আমার মতের বিরুদ্ধে বিয়ে করতে পারবে না।

মিস দত্ত। মেয়েকে লেখাপড়া শিখিয়েছেন, মেয়ে বড় হয়েছে এখনও আপনি তার দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা থাকতে চান ?

গোবর্দ্ধন। চাই।

[গড়গড়ায় টান দিলেন]

মিস দত্ত। স্ত্রী-স্বাধীনতায় আপনি বিশ্বাস করেন না ?

গোবর্দ্ধন। না।

মিস দত্ত। মেয়েকে তাহলে বিদেশে শিক্ষয়িত্রী করতে পাঠিয়েছিলেন কেন ?

গোবর্দ্ধন। ভুল করেছিলাম।

মিস দত্ত। (হাত উল্‌টাইয়া) সুকুমারবাবু, মাপ করবেন, তাহলে আর আমি কিছু করতে পারলাম না। ইনি এখনও সপ্তদশ শতাব্দীতে বাস করছেন, আমরা বিংশ শতাব্দীর মানুষ। মিল হওয়া সম্ভব নয়।

নিবারণ। (সক্ষোভে) আগেই জানতাম কিছু হবে না, বৃথা সময় নষ্ট হ'ল। আর ব্যাপারটা এইবার শহরময় চাউর হবে।

[মিস দত্ত চাহিয়া দেখিলেন, কিছু বলিলেন না]

গাঙুলী। (মিস দত্তকে সবিনয়ে) আপনি চেষ্টা করলে হয়তো একটা মীমাংসায় আসতে পারতেন।

মিস দত্ত। কি করে' করি বলুন ?

ঠাকুরদা। (সহসা) উঃ, খুব আনন্দ হচ্ছে আমার, আমি আর চেপে রাখতে পাচ্ছি না।

[সকলে তাঁহার দিকে চাহিতেই তিনি একবার মিটিমিটি চাহিয়া যেন অপ্রস্তুতভাবেই হুঁকায় মন দিলেন]

সুকুমার। আমার মনে হয় গোবর্দ্ধন, মিস দত্ত যা বলছেন তা—

গোবর্দ্ধন। তা হবে না।

গাঙুলী। কিন্তু এ রকম অনিশ্চয়তার মধ্যে কতক্ষণ থাকা যেতে পারে ?

নিবারণ। এ রকম নির্য্যাতনই বা কতক্ষণ করবে তুমি।

[ভিতর হইতে গুম গুম্ করিয়া পুনরায় শব্দ হইল]

মিস দত্ত। আমি চলি তাহলে।

সুকুমার। না না, এক মিনিট। একটা অনুরোধ রাখুন আমার, আমাদের খাতিরেও—কোন রকম সর্ত্ত না করে' তাকে একবার বলে' দেখুন, যদি সে মতটা বদলায়। বদলাতেও তো পারে। দেখাটা করে' যান অন্ততঃ। (নিম্নকণ্ঠে গোবর্দ্ধনকে) দাও, চাবিটা দাও।

গোবর্দ্ধন। না, দেব না।

মিস দত্ত। (বিস্মিত) চাবি মানে !

গাঙুলী। (আত্মবিস্মৃত হইয়া) একটা ঘরে সুলতাকে তালা বন্ধ করে' রেখেছেন, উনি আজ সকাল থেকে।

ঠাকুরদা। বন্দিনী সংযুক্তা।

মিস দত্ত। (আরও বিস্মিত) তালা বন্ধ করে' রেখেছেন !

গোবর্দ্ধন। (শান্তকণ্ঠে) না করলে এতক্ষণ পালিয়ে যেত।

মিস দত্ত। (ঘৃণায় যেন শিহরিয়া উঠিলেন) না, আমি আর এখানে দাঁড়াতে পাচ্ছি না—আমার গা ঘিন ঘিন করছে।

[কেহ কিছু বলিবার পূর্ব্বেই তিনি দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেলেন]

সুকুমার। শুনুন, শুনুন।

[ব্যাকুলভাবে তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করিলেন]

নিবারণ। এ লোকটা একেবারে উন্মাদ। ছুটল ওর পিছু পিছু !

[কিছুক্ষণ সকলেই চুপ করিয়া রহিলেন]

ঠাকুরদা। আমিও উঠি এবার, আহ্নিক সারা হয় নি এখনও। গাঙুলী বসবে নাকি ?

গাঙুলী। বসে' আর লাভ কি! কোন মীমাংসাই যখন হচ্ছে না। আপিসেরও বেলা হ'ল—যাই চলুন।

ঠাকুরদা। চল।

[ঠাকুরদা ও গাঙুলী চলিয়া গেলেন]

নিবারণ। মেয়েটাকে সকাল থেকে খেতে দিয়েছ কিছু ?

গোবর্দ্ধন। জানলা দিয়ে দেওয়া হয়েছিল, খায় নি।

নিবারণ। (স-ক্ষোভে) বাড়িতে এমন একটা মেয়েছেলেও নেই যে—(উঠিয়া) দেখি যদি আমি খাওয়াতে পারি কিছু—

[উঠিয়া ভিতরের দিকে চলিয়া গেলেন। গোবর্দ্ধন নীরবে বসিয়া পা দোলাইতে দোলাইতে গড়গড়ায় টান দিতে লাগিলেন]

নেপথ্যে পুরন্দর। গোবর্দ্ধন বাড়ি আছ নাকি ?

[গোবর্দ্ধনের মুখ প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল]

গোবর্দ্ধন। আছি, এস।

[জমিদার রায় পুরন্দর দাশগুপ্ত বাহাদুর প্রবেশ করিলেন। লোকটি বেঁটে খাটো—কিন্তু দেখিলে সমীহ না করিয়া পারা যায় না। দর্পিত মুখমণ্ডলে সুরক্ষিত কাঁচা-পাকা এক জোড়া গোঁফ, প্রদীপ্ত বড় বড় চক্ষু, বাম গণ্ডে একটি আঁচিল। গলায় পাকানো চাদর, গায়ে আদ্দির গিলে-করা পাঞ্জাবি, পরিধানে মিহি তাঁতের ধুতি, পায়ে দামী পাম্পশু, বাম হস্তে সিগার, দক্ষিণ হস্তে রূপা দিয়া বাঁধানো মোটা মালক্কা বেত। অনামিকায় যে অঙ্গুরীয়টি আছে, তাহাতে একটা প্রকাণ্ড হীরা দপদপ করিয়া জ্বলিতেছে]

পুরন্দর। এই যে বাইরেই আছ দেখছি। আরে, অমন করে আছ কেন ? এতে দমবার কি আছে! ওদের সঙ্গে যে একটা ওয়ার বাধবে, এ তো জানা কথাই। আমরাও পিছপাও হবার ছেলে নই। এখন সিচুয়েশনটা কি বল দেখি ?

গোবর্দ্ধন। সব তো লিখেইছি তোমাকে।

পুরন্দর। যা লিখেছ সব বর্ণে বর্ণে সত্যি ?

গোবর্দ্ধন। সব।

[পুরন্দর উপবেশন করিলেন ও ছড়িটি খুব ধীরে ধীরে টেবিলের উপর রাখিয়া চিন্তিত মুখে গুম্ফপ্রান্ত পাকাইতে লাগিলেন]

গোবর্দ্ধন। ভাবছ কি ?

পুরন্দর। ভাবছি, মেয়েটাকে কি উপায়ে ওখান থেকে

সরানো যায়। আগুনে ঘি পড়লেই দাউ দাউ করে' জলতে থাকবে কিনা! ঘিটা সরানো দরকার আগে।

গোবর্দ্ধন। কঙ্কি তো এখানে।

পুরন্দর। (সোল্লাসে) বাস্, তাহলে আর কোন ভাবনা নেই। ঠিক হয়ে যাবে সব। শ্রীকান্তকে আজই চিঠি দিয়ে ক্ষিতীশের কাছে পাঠানো যাক। ডিফেন্সিভ নয়, একেবারে অফেন্সিভ মুভ নিতে হবে, বুঝলে?

গোবর্দ্ধন। শ্রীকান্তটি কে?

পুরন্দর। আমার নায়েব। বেশ পাকা লোক।

গোবর্দ্ধন। আজকালকার ছেলেমেয়েগুলো, কি হ'ল বল দেখি?

পুরন্দর। বিচ্ছু বিচ্ছু—ডাঁশ এক একটি! তোমার মেয়ে কোথায়? এই বাড়িতেই নাকি?

গোবর্দ্ধন। হ্যাঁ, ঘরে তালা বন্ধ করে' রেখেছি।

পুরন্দর। বেশ করেছ।

[গুম গুম করিয়া শব্দ হইল]

গোবর্দ্ধন। ওই।

পুরন্দর। ডবল তালা দাও—না হ'লে ভেঙে ফেলবে। ইয়েল কিংবা চাব্‌স্ আছে তোমার? না থাকে আনিয়ে নাও। ওদের অসাধ্য কিছু নেই।

[বাহিরে দুয়ারে টোকা শোনা গেল]

নেপথ্যে। আসতে পারি?

গোবর্দ্ধন। কে এল আবার এ সময়ে! আসুন।

[দুইজন কনেষ্টবলসহ একজন পুলিস অফিসার প্রবেশ করিলেন]

অফিসার। আপনিই কি গোবর্দ্ধন চট্টোপাধ্যায়?

গোবর্দ্ধন। হ্যাঁ। কি চান আপনি?

অফিসার। আপনি কুমারী সুলতা চ্যাটার্জি নামে যে মেয়েটিকে অবৈধভাবে আটক করে' রেখেছেন, তাঁকে অবিলম্বে ছেড়ে দিন—তিনি একটু আগে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবকে ফোন করেছিলেন। ম্যাজিষ্ট্রেট হুকুম দিয়েছেন, তাঁকে উদ্ধার করে' তিনি যেখানে যেতে চান, সেখানে পৌঁছে দিতে।

গোবর্দ্ধন। (বিস্মিত) যেখানে যেতে চান, সেখানে দিতে!

অফিসার। হ্যাঁ। তিনি পুলিস প্রোটেক্‌শন চেয়েছেন। এই দেখুন ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের অর্ডার। এই কনেষ্টবল দু'জন তাঁকে সঙ্গে করে' তিনি যেখানে যেতে চান, নিয়ে যাবে।

গোবর্দ্ধন। সুলতা আমার মেয়ে মশাই।

অফিসার। তা আমরা জানি। আপনার মেয়ে না হ'লে হয়তো ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব আপনাকেও অ্যারেষ্ট করবার অর্ডার দিতেন। তাঁকে ছেড়ে দিন।

পুরন্দর। আমি এর মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পাচ্ছি না যে! এই বলছ মেয়েকে তালা দিয়ে রেখেছ—সে 'ফোন' করলে কি করে'?

গোবর্দ্ধন। যে ঘরে বন্ধ করেছি—সেই ঘরেই একটা 'ফোন' আছে। তখন জিনিসটা অত খেয়াল করি নি।

পুরন্দর। এঃ—তুমি চিরকেলে হাঁদা একটা—এঃ—ছ্যা ছ্যা —সব ভেস্তে দিলে দেখছি!

অফিসার। ছেড়ে দিন তাঁকে।

গোবর্দ্ধন। পুরন্দর, কি করি বল?

পুরন্দর। কি আর করবে, ছেড়ে দাও। এখন আর ফ্যাল ফ্যাল করে' চাইলে কি হবে?

গোবর্দ্ধন। উঃ, এতটা আমি আশা করি নি।

[গোবর্দ্ধন উঠিয়া গেলেন ও ক্ষণপরে সুলতার সহিত ফিরিয়া আসিলেন। সুলতার চোখে মুখে আগুন জ্বলিতেছে। সে কোন দিকে না চাহিয়া পুলিসদের সহিত চলিয়া গেল। ব্যস্ত-সমস্তভাবে নিবারণ বাহির হইয়া আসিলেন]

নিবারণ। কঙ্কি সত্যি সত্যি চলে' গেল পুলিসের সঙ্গে?

পুরন্দর। হ্যাঁ। বাঁশের চেয়ে কঞ্চি দড়। আচ্ছা, দেখা যাক তোমার বেটি জেতে, না আমি জিতি! সারাটা জীবন আমিও পুলিস চরিয়েছি। দেখা যাক—। পুলিস—অ্যাঁ?

তৃতীয় অঙ্ক

[স্থান—ক্ষিতীশের বাসার বাহিরের ঘর। দৃশ্য প্রথম অঙ্কে যেমন ছিল। ক্ষিতীশ ও যতীন রেডিওতে একটি বিলাতী বাজনা শুনিতেছে, কিন্তু উপভোগ করিতেছে বলিয়া মনে হইতেছে না। উভয়েরই মুখ চিন্তাকুল। ক্ষিতীশ হঠাৎ উঠিয়া রেডিও বন্ধ করিয়া দিল]

যতীন। অত অস্থির হচ্ছ কেন?

ক্ষিতীশ। বেশ ঘাবড়ে গেছি ভাই।

যতীন। (হাসিয়া) ভাবিতে উচিত ছিল প্রতিজ্ঞা যখন—

ক্ষিতীশ। অন্য কিছু নয়, কঙ্কির একটা খবর পেলে অনেকটা নিশ্চিন্ত হতাম।

যতীন। কঙ্কির সম্বন্ধে তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পার। আমি তার যতটুকু দেখেছি, তাতে বলতে পারি যে, তার দিক থেকে তোমার কোন আশঙ্কা নেই। তুমি চোট খাবে অন্য দিক থেকে। হে একচক্ষু হরিণ, নদীর দিকে লক্ষ্য রাখ।

ক্ষিতীশ। নদীর দিকে, মানে?

যতীন। তোমার বাবার দিকে।

ক্ষিতীশ। তিনি আর কি করবেন! বড় জোর—

[কথা শেষ হইল না, নায়েব শ্রীকান্ত মাইতি আসিয়া প্রবেশ করিলেন। গলা-বন্ধ কোট, গলায় চাদর, প্যানেলা জুতা, সুতা-বাঁধা চশমা—নায়েবোচিত সমস্তই আছে। মুখভাব অবর্ণনীয়, চাতুরি, গাম্ভীর্য্য ও বিনয়ের অবিশ্বাস্য সমন্বয়। হাতে ছোট একটি সুটকেস]

ক্ষিতীশ। নায়েব মশাই যে, কখন এলেন?

[নায়েব প্রভু-পুত্রকে ভক্তিভরে প্রণাম করিলেন]

শ্রীকান্ত। এই আসছি। কর্ত্তা মশাইও এসেছেন।

ক্ষিতীশ। বাবা এসেছেন? কই?

যতীন। আমার একটা রুগী দেখতে বাকি এখনও, আমি উঠি।

ক্ষিতীশ। থাম, থাম। (শ্রীকান্তকে) বাবা কোথায়?

শ্রীকান্ত। তিনি একবার থানার দিকে গেলেন।

ক্ষিতীশ। থানায় কেন?

শ্রীকান্ত। কি একটু দরকার আছে, আমি সঠিক জানি না।

যতীন। ব্যাপার ঘনীভূত হচ্ছে ক্রমশ। আমি ঘুরে আসি

ততক্ষণ, তুমি ব্যাপারটাকে, যাকে বলে—হৃদয়ঙ্গম, তাই কর। চিয়ার আপ।

ক্ষিতীশ। একটুখানি ব'স না।

শ্রীকান্ত। আপনাদের কলেজের প্রিন্সিপালের নামে একখানা চিঠি দিয়েছেন কর্ত্তা মশাই।

ক্ষিতীশ। প্রিন্সিপালের নামে? কি চিঠি?

শ্রীকান্ত। এই যে দি। আমার ওপর হুকুমই আছে আগে আপনাকে ওটা পড়িয়ে তারপর যেন প্রিন্সিপালকে দেওয়া হয়।

[ট্যাঁক হইতে চাবি বাহির করিয়া সুটকেস খুলিলেন]

এই নিন। আমি বড় পরিশ্রান্ত হয়েছি বাবু। ভিতরের দিকে কোন ফালতু ঘর আছে কি, দুদণ্ড বিশ্রাম করে' নিতাম তাহলে।

ক্ষিতীশ। যান না আপনি ভেতরে—ওই দিক দিয়ে সোজা ঢুকে যান—হ্যাঁ, ওইটেই দরজা। একটা খালি ঘর আছে।

[সুটকেস লইয়া শ্রীকান্ত চলিয়া গেলেন। পত্র পড়িতে পড়িতে ক্ষিতীশের ভ্রূ ক্রমশই কুঞ্চিত হইয়া উঠিতে লাগিল]

যতীন। ব্যাপার কি?

ক্ষিতীশ। (সক্ষোভে) রিডিকুলাস।

যতীন। খুলেই বল না।

ক্ষিতীশ। বাবা কিছু দিন আগে কলেজে এক লাখ টাকা দেবেন বলে' প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। তিনি প্রিন্সিপালকে জানাচ্ছেন যে, সে একটি সর্ত্তে টাকা দিতে তিনি এখনও প্রস্তুত।

যতীন। সর্ত্তটি কি?

ক্ষিতীশ। যদি আমাকে অবিলম্বে কলেজ থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়।

যতীন। বলেছিলাম আগেই, জ্যাঠামশাই চুপ করে' থাকবার লোক নন।

ক্ষিতীশ। ছি ছি, এই চিঠি যাবে প্রিন্সিপালের কাছে! ভাবতেও আমার কেমন লাগছে।

যতীন। কিন্তু আমি আর একটা কথা ভাবছি।

ক্ষিতীশ। কি?

যতীন। কেবল টাকার লোভে কলেজ তোমাকে বিনাদোষে তাড়িয়ে দিতে পারে কি? সম্ভব সেটা?

ক্ষিতীশ। দোষের কথাও বাবা উল্লেখ করে' দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন যে, তিনি আমার চরিত্রহীনতার নিঃসংশয় প্রমাণ পেয়েছেন। এ রকম চরিত্রহীন প্রফেসারকে কলেজ যদি রাখে, তাহলে তিনি টাকা দেবেন না—ছি ছি, বুড়ো হ'লে মানুষের।

যতীন। না না, ভুল করছ। ডাক্তার হিসেবে আমি বলতে বাধ্য—এ বার্দ্ধক্যের লক্ষণ নয়।

ক্ষিতীশ। কিসের লক্ষণ তাহলে?

যতীন। প্রতিভার। তিনি রীতিমত বিজ্ঞান-সম্মত পদ্ধতি অনুসারে যুদ্ধে নেমেছেন। প্রথমেই তিনি মালের রাস্তা বন্ধ করতে চান।

ক্ষিতীশ। বিয়ে করলে আমাকে বিষয় থেকেও বঞ্চিত করবেন তাহলে বোঝা যাচ্ছে।

যতীন। সে বিষয়ে সন্দেহ আছে।

ক্ষিতীশ। (চিন্তিতভাবে) তাহলে—কঙ্কিকে খবর দেওয়া দরকার।

যতীন। তা দরকার বইকি। আচ্ছা তুমি ভাব ততক্ষণ, আমি রুগীটাকে দেখে আসি তাড়াতাড়ি।

ক্ষিতীশ। খুব জরুরি রোগী নাকি?

যতীন। না। আমার একটা ব্যাগারি ক্রনিক রুগী, কাল যাওয়া হয় নি, আজ যেতে হবে একবার।

ক্ষিতীশ। তবে পরে যেও। শোন, আমি ভাবছি—

[কথা অসম্পূর্ণ রাখিয়া নাসাগ্রে তর্জ্জনী দ্বারা মৃদু মৃদু আঘাত করিতে লাগিল]

যতীন। কি ভাবছ বল।

ক্ষিতীশ। কলেজের প্রিন্সিপালকে গিয়ে সব কথা খুলে বললে কেমন হয়?

যতীন। কিছু হবে না। প্রথমত—তোমাদের প্রিন্সিপাল যজ্ঞেশ্বরের বন্ধু, দ্বিতীয়ত—জনার্দ্দন তোমার বিরুদ্ধে সমস্ত উকীলদের উত্তেজিত করেছে। কলেজ-কমিটির চারজন মেম্বার নাম-জাদা উকীল এবং বাকি সকলে তাঁদের কথায় ওঠেন বসেন। তৃতীয়ত—এক লক্ষ টাকা, এ বাজারে নেহাৎ তুচ্ছ করবার মতো জিনিস নয়। চতুর্থত—তোমার বাবা, যাঁর খাতিরে তুমি কলেজে চাকরি পেয়েছিলে, তিনি স্বয়ং তোমার বিরুদ্ধে। এ নিয়ে বিশুদ্ধ ইংরেজীতে খবরের কাগজে লেখালেখি করতে পার—অনেকের চায়ের আসর সরগরম হবে—আর কিছু হবে না। আমি চললুম।

ক্ষিতীশ। না না শোন, আমি ভাবছি তাহলে—

যতীন। ভাল করে' ভাব না—হড়বড় করে' লাভ কি। বিপদের সময় মাথা ঠিক রাখা দরকার।

[ক্ষিতীশ ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া অন্যদিকে চাহিয়া উত্তেজনাভরে দক্ষিণ জানুটা নাচাইতে লাগিল। সহসা জানু নাচানো বন্ধ করিয়া যতীনের দিকে ফিরিয়া চাহিল]

ক্ষিতীশ। দেখ, আমি ভাবছি বিয়েটা আপাতত স্থগিত রাখলে কেমন হয়?

যতীন। এত কাণ্ডের পর পৃষ্ঠপ্রদর্শন করাটা কাপুরুষতা হবে নাকি?

ক্ষিতীশ। পৃষ্ঠপ্রদর্শনের কথা কে বলছে, আমি বলছি স্থগিত রাখার কথা।

যতীন। এখন স্থগিত রাখা মানেই রণে ভঙ্গ দেওয়া! শত্রুপক্ষ হাসবে। ওই লুমো জনার্দ্দন উকীলটার হাসির খোরাক জোগানো কি আরামপ্রদ হবে?

[ক্ষিতীশ নিরুত্তর]

এ কথা মনে হচ্ছে কেন তোমার, এত সব করবার পর?

ক্ষিতীশ। বাবা যদি আমাকে ত্যাজ্যপুত্র করেন, আর কলেজের চাকরিটা যদি যায়, তাহলে আমি একেবারে নিঃসহায় কপর্দ্দকহীন হয়ে পড়ব যে! এ অবস্থায় বিয়ে করাটা কি ঠিক হবে?

যতীন। আমার ধারণা তুমি প্রেমে পড়েছ।

ক্ষিতীশ। অর্থাৎ?

যতীন। অর্থাৎ এমন একটা অবস্থায় পড়েছ যাতে মানুষের হিতাহিত-জ্ঞান লোপ পায়। কিন্তু এ তুমি যা বলছ, তা—

ক্ষিতীশ। আমি নিজের জন্যে ভাবছি না, কঞ্চির জন্যে ভাবছি। একজন নিঃস্ব লোককে সে হয়তো বিয়ে করতে রাজি না-ও হতে পারে। সে আমাকে যখন বিয়ে করতে রাজি হয়েছিল, তখন আমি নিঃস্ব ছিলুম না।

[দুইজন কনেষ্টবল সহ সুলতার প্রবেশ]

সুলতা। আমি এসেছি ক্ষিতীশদা। (হাসিয়া) উঃ, কি কাণ্ড করে' যে এসেছি।

ক্ষিতীশ। (সবিস্ময়ে) কঞ্চি! সঙ্গে পুলিস কেন—

[ভিতরের দরজা হইতে নায়েব শ্রীকান্ত সন্তর্পণে মুণ্ড বাড়াইয়া সুলতাকে দেখিলেন ও সঙ্গে সঙ্গে মুণ্ড ভিতরে টানিয়া লইলেন]

সুলতা। বলছি (কনেষ্টবলদের দিকে সহাস্য দৃষ্টিতে চাহিয়া) তোমাদের ছুটি এইবার। দাঁড়াও, চিঠি লিখে দি। ক্ষিতীশদা, তোমার প্যাডটা কোথা? এই যে।

[ক্ষিতীশের টেবিলে গিয়া তাড়াতাড়ি একটা চিঠি লিখিয়া ফেলিল]

ক্ষিতিশদা—দশটা টাকা আছে?

ক্ষিতীশ। আছে। বাঁ ধারের ওই ড্রয়ারটা টান, পাবে।

[ড্রয়ার টানিয়া টাকা বাহির করিয়া সুলতা পুনরায় কনেষ্টবলদের সহিতই কথা কহিল]

সুলতা। এই চিঠিটা ম্যাজিষ্ট্রেট সায়েবকে দিয়ে দিও—আর এই তোমাদের বকশিশ।

[কনেষ্টবল দুইজন সেলাম করিয়া চলিয়া গেল]

যতীন। পুলিসের ব্যাপারটা জানবার জন্যে আমার যদিও কৌতূহল হচ্ছে, কিন্তু আমি থাকলে হয়তো তোমাদের আলাপে বাধা হবে—আমি চলি।

ক্ষিতীশ। না না, যাবে কেন? (সুলতাকে) কঞ্চি, যতীন থাকলে আপত্তি আছে?

সুলতা। কিছুমাত্র না।

ক্ষিতীশ। ব্যাপারটা কি বল তো?

যতীন। সঙ্গে পুলিস কেন আপনার?

সুলতা। পুলিসের সাহায্য নিয়ে তবে আসতে পারলুম। বাবা আমাকে একটা ঘরে তালা বন্ধ করে' আটকে রেখেছিলেন।

ক্ষিতীশ। বল কি?

[নায়েব শ্রীকান্ত মাইতি সুটকেস-হস্তে বাহির হইয়া আসিলেন]

শ্রীকান্ত। আমার পকেট থেকে একটা আধুলি যেন কোথায় পড়ে' গেছে মনে হচ্ছে (এদিক ওদিক খুঁজিবার ভান করিয়া) একবার বাইরেটা দেখে আসি।

[চলিয়া গেলেন]

সুলতা। ইনি কে?

ক্ষিতীশ। আমাদের নায়েব। তারপর কি হ'ল বল?

সুলতা। অনেকক্ষণ কি করব ভেবেই পেলাম না। তারপর হঠাৎ নজরে পড়ল—ঘরে একটা ফোন আছে। কপাল ঠুকে ম্যাজিষ্ট্রেটকে দিলাম ফোন করে'। লোকটা ভদ্রলোক—পুলিস পাঠিয়ে আমাকে উদ্ধার করে' কনেষ্টবল সঙ্গে দিয়ে এখানে পাঠিয়ে দিলেন।

যতীন। রীতিমত নাটক করেছেন দেখছি।

ক্ষিতীশ। (সহসা উচ্ছ্বসিত) আমি যে কি বলব, ভেবে পাচ্ছি না কঞ্চি! তুমি আমার জন্যে—মানে, আমি ভাবছি, আমার এখন অধিকার আছে কিনা তোমাকে এমনভাবে—

যতীন। আবোল তাবোল না বকে' বিয়ের ব্যবস্থা কর।

সুলতা। (মুচকি হাসিয়া) জ্যাঠামশাই আর বাবা মিলে কি যে মতলব আঁটছেন এবার, কে জানে! জ্যাঠামশাই এসেছেন দেখে এলাম।

যতীন। জ্যাঠামশাই এখানে এসেছেন।

সুলতা। তাই না কি! তাহলে—

যতীন। বিয়ের ব্যবস্থাটা করে' ফেল চটপট।

ক্ষিতীশ। বিয়ের ব্যবস্থা করবার আগে সুলতাকে জানানো দরকার যে আমি নিঃস্ব। নিঃস্বকে বিয়ে করতে যদি রাজি থাকে—

[সুলতা ক্ষিতীশের দিকে চাহিয়া মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল]

হাসি নয়, বল ঠিক করে'।

সুলতা। তোমার টাকাকে আমি বিয়ে করতে চেয়েছি—এ কথা যদি তুমি ভেবে থাক, তাহলে আমাকে ভুল বুঝেছ তুমি। জ্যাঠামশাই যে তোমাকে বিষয় থেকে বঞ্চিত করবেন, সে তো জানা কথাই। চাকরিতে যা হয় তাতেই চালিয়ে নিতে হবে আমাদের।

ক্ষিতীশ। চাকরিও থাকবে কি না সন্দেহ। বাবা প্রিন্সিপালকে এক চিঠি লিখেছেন। এই দেখ—

[চিঠিখানা দিল। সুলতা ঈষৎ ভ্রুকুঞ্চিত করিয়া পত্র পড়িতে লাগিল]

যতীন। আমি এবার যাই, বুঝলে?

ক্ষিতীশ। সুলতার মতটা শুনেই যাও না।

[সুলতা গম্ভীরভাবে চিঠিটা পড়িয়া ফেরত দিল]

সুলতা। জ্যাঠামশায়ের এ অন্যায় কিন্তু।

যতীন। তিনি কোন কিছুতেই পিছপাও হবেন না। এখানে শুনছি এসেই থানায় গেছেন।

সুলতা। (সহসা যতীনকে) আপনার 'কার'টা একবার দেবেন?

যতীন। কেন, কোথা যাবেন?

সুলতা। ষ্টেশনে নেবেই একটা সু-খবর পেলাম—দেখি যদি কিছু করতে পারি। ঘুরে আসি চট করে' একবার—

ক্ষিতীশ। যাচ্ছ কোথা?

সুলতা। তা এখন বলব না (হাসিল)?

ক্ষিতীশ। তোমার মতটাও তো বললে না?

সুলতা। (ছদ্ম রোষভরে) বলব না, যাও। (যতীনকে) আপনার 'কার'টা নিয়ে চললাম তাহলে।

[উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া চলিয়া গেল]

ক্ষিতীশ। কোথা গেল বল তো?

যতীন। কি করে' বলব বল—তুমিও যে তিমিরে, আমিও সেই তিমিরে।

ক্ষিতীশ। যাক এবার আমি নিশ্চিন্ত। সমস্ত অবস্থা শুনেও সুলতার যখন মত বদলালো না, তখন আর কোন বাধাই মানব না আমি।

যতীন। আগে থাকতে আস্ফালন করাটা ঠিক নয়। বাধাটা যে কি জাতীয় হবে, তা এখনও অজ্ঞাত।

ক্ষিতীশ। এর বেশী কি আর করতে পারেন বাবা?

[দারোগা ও দুইজন কনেষ্টবল সহ পুরন্দরের প্রবেশ। পিছনে পিছনে যজ্ঞেশ্বর]

ক্ষিতীশ। (পদধূলি লইয়া) এতক্ষণ কোথায় ছিলেন?

পুরন্দর। ও সবে ভোলবার পাত্র আমি নই। (দারোগাকে) আপনার কর্ত্তব্য করুন।

দারোগা। মাপ করবেন প্রফেসার গুপ্ত—আমি আপনার বাড়িটা একবার সার্চ করতে চাই।

ক্ষিতীশ। (সবিস্ময়ে) কেন?

দারোগা। রায় বাহাদুর যজ্ঞেশ্বরবাবুকে একটা আংটি উপহার দিয়েছিলেন। সেই আংটিটি হারিয়েছে। যজ্ঞেশ্বরবাবুর সন্দেহ সেটি আপনি নিয়েছেন।

পুরন্দর। আমারও তাই সন্দেহ।

ক্ষিতীশ। ও! সার্চ করুন আপনারা, এই নিন চাবি।

[চাবি ফেলিয়া দিল]

দারোগা। সার্চের সময় একজন সাক্ষী থাকা দরকার।

ক্ষিতীশ। আমার চাকরটা বারান্দায় শুয়ে ঘুমুচ্ছে, তাকেই উঠিয়ে নিন গিয়ে।

[চাবি লইয়া কনেষ্টবল সহ দারোগা ভিতরে চলিয়া গেল]

যজ্ঞেশ্বর। তুমি যে শেষটা এ রকম করবে, তা আমি ভাবতেও পারি নি হে। এত বড় বংশের ছেলে হয়ে—

পুরন্দর। (ধমক দিয়া) তুমি চুপ কর। তুমি আমার পিছু পিছু ঘুরছ কেন বল দেখি! জনার্দ্দিন উকীলকে ডেকে এর বিরুদ্ধে কলেজ-কমিটিতে যে দরখাস্ত দেবার কথা হচ্ছে, সেইটের মুশবিদা কর গে না। তোমার সেজ ছেলের ব্যবস্থা করব আমি, বলেছি তো—

যজ্ঞেশ্বর। আচ্ছা, তাই যাই তাহলে।

[চলিয়া গেলেন। যতীন টেবিলের এক কোণে একটা চেয়ার টানিয়া বসিলেন ও ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া একটি পুস্তকের পাতা উল্‌টাইতে লাগিলেন]

পুরন্দর। তোমরা যখন মিলিটারি মেজাজ দেখিয়েছ, আমরাও দেখাতে কসুর করব না। (ক্ষিতীশকে) দেখ ক্ষিতীশ, এ বিয়ে আমি কিছুতেই হতে দেব না। আমি তোমাকে ত্যাজ্যপুত্র করব, তোমার চাকরি খাব, যতদিন না তোমার মত বদলায়, ততদিন তোমায় জেলে বন্ধ করে' রাখব।

ক্ষিতীশ। কিছুতেই আমার মত বদলাবে না।

পুরন্দর। দেখা যাক।

ক্ষিতীশ। এই প্রিন্সিপালের চিঠি—আমি পড়ে দেখেছি।

পুরন্দর। কিছু বলবার আছে তোমার?

ক্ষিতীশ। নিজের ছেলের নামে যিনি মিছে করে' চরিত্রহীনতার অপবাদ দেন, তাঁকে আমি কিছু বলতে চাই না।

পুরন্দর। জমিদারের ছেলের পক্ষে চরিত্রহীনতা একটা অপবাদ নয়, একটু আধটু কলঙ্ক না থাকলে চাঁদকে ঠিক মানায় না। তুমি একটা কেন, স্বচ্ছন্দে দশটা প্রেম করতে পার, তাতে আমার আপত্তি নেই। আমার আপত্তি যেখানে সেখানে বিয়ে করাতে। বিয়ে একটা সামাজিক জিনিস—কিন্তু তাতেও আমার আপত্তি ছিল না তত—বাট্ ইউ হ্যাড্ ডিক্লেয়ার্ড ওয়ার।

ক্ষিতীশ। ওয়ার ডিক্লেয়ার না করলে সমাজের নিয়ম ওলটানো যায় না।

পুরন্দর। তাকত্ থাকে উল্‌টে দাও—আই ডোণ্ট মাইণ্ড —কিন্তু আমরা বাধা দিতে কসুর করব না। উই উইল ফাইট্ ফিয়ার্স্‌লি অ্যাণ্ড ফাইট্ টু ফিনিশ্।

[ক্ষিতীশ চুপ করিয়া রহিল। পুরন্দর যতীনের দিকে চাহিলেন]

তুমিও নিশ্চয় এর দলে।

যতীন। (হাসিয়া) বিপদের সময় বন্ধুকে ত্যাগ করতে পারি? আপনি ত্যাগ করতে বলেন?

পুরন্দর। আমি কথায় কিছু বলি না, কাজে করি। দেখ, এ বিয়ে আমি কিছুতেই হতে দেব না। তোমরা পার তো—

যতীন। এই আংটির ব্যাপারটা কিন্তু একটু (হাসিয়া) বাড়াবাড়ি হচ্ছে।

পুরন্দর। তোমরা যদি বাড়াবাড়ি কর, আমাকেও কাউণ্টার অ্যাটাক করতে হবে।

[কনেষ্টবলগণ সহ দারোগার পুনঃপ্রবেশ]

দারোগা। একটা আংটি পাওয়া গেছে, এইটেই কি হারিয়েছিল?

[পুরন্দরের হীরার আংটিটি তুলিয়া দেখাইলেন]

পুরন্দর। হ্যাঁ, ওইটেই আমি যজ্ঞেশ্বরকে দিয়েছিলাম।

ক্ষিতীশ। আমাদের নায়েব শ্রীকান্ত এখুনি এখানে এসেছিল। আমি সন্দেহ করি, সেই—

দারোগা। আপনার যা বলবার, কোর্টে বলবেন। (পুরন্দরকে) এঁকে কি এখুনি অ্যারেষ্ট করে' নিয়ে যাব?

পুরন্দর। দেখ ক্ষিতীশ, এখনও যদি মত বদলাও সমস্ত মিটিয়ে ফেলতে পারি আমি। তুমি বিলেত যেতে চেয়েছিলে, আমি আপত্তি করেছিলাম—কিন্তু ঘুষ-স্বরূপ…তাতেও আমি রাজি আছি। কিন্তু যাবার আগে আমি তোমার জন্যে যে পাত্রীটি ঠিক করে' রেখেছি, তাকে বিয়ে করতে হবে। তোমার ওই কঙ্কির চেয়ে এ মেয়ে ঢের ভাল দেখতে। দেখ—ভেবে দেখ—

ক্ষিতীশ। আমি কঙ্কিকে ছাড়া আর কাউকে বিয়ে করব না।

পুরন্দর। (দারোগাকে) অ্যারেষ্ট করুন।

দারোগা। (ক্ষিতীশকে) আসুন তাহলে।

[দারোগা ও কনেষ্টবল সহ ক্ষিতীশ চলিয়া গেল]

পুরন্দর। যতীন, দারোগাটাকে ডাক তো একবার।

[যতীন দারোগাকে ডাকিয়া আনিল]

ছেলেটাকে কষ্ট দেবেন না যেন। হীরের টুকরো—বুঝলেন? খুব সাবধানে রাখবেন।

দারোগা। (কাচুমাচু ভঙ্গীতে হাসিয়া) আজ্ঞে হ্যাঁ নিশ্চয়ই, সে কথা আর বলতে!

[দারোগা চলিয়া গেল]

যতীন। এটা কি ভাল হ'ল জ্যাঠামশাই?

পুরন্দর। নাথিং ইজ্ আনফেয়ার ইন্ লাভ্ অ্যাণ্ড ওয়ার। আমি তোমাদের দৌড়টা দেখতে চাই।

যতীন। আপনার টাকা আছে, যা খুশী করতে পারেন।

পুরন্দর। যা খুশীই তো করছি। তোমরাও যা খুশী করে' আমাকে হারিয়ে দাও—আমি দুঃখিত হব না।

নেপথ্যে। আসতে পারি?

পুরন্দর। কে এল আবার?

যতীন। আসুন।

[ধুতি পাঞ্জাবি পরিহিত একটি যুবক প্রবেশ করিলেন]

যুবক। নমস্কার। এই যে ডাক্তারবাবু আছেন দেখছি।

যতীন। (বিস্মিত) নমস্কার। আপনি এখানে?

যুবক। আমি ক্ষিতীশবাবুর বাবাকে নিমন্ত্রণ করতে এসেছি। তিনি কি এই বাসাতেই আছেন?

যতীন। এই যে ইনিই ক্ষিতীশবাবুর বাবা।

যুবক। ও! নমস্কার।

যতীন। (পুরন্দরকে) ইনি এখানকার ম্যাজিস্ট্রেট মিষ্টার ঘোষ, নতুন এসেছেন।

পুরন্দর। ও। কিসের নিমন্ত্রণ।

যতীন। আমার বান্ধবী সুলতার সঙ্গে ক্ষিতীশবাবুর বিয়ে আজ।

পুরন্দর। বিয়ে! কি রকম?

ঘোষ। সুলতা আমার সহপাঠিনী ছিল। একটু আগে হঠাৎ সে হন্তদন্ত হয়ে আমার বাংলোয় এসে হাজির। বললে যে, সে এখানকার প্রফেসার ক্ষিতীশবাবুকে বিয়ে করতে চায়—কিন্তু কতকগুলো লোক গুণ্ডামি করে' তাতে বাধা দিচ্ছে—সাহায্য করতে হবে। আমরা এখানেই আসছিলুম—রাস্তায় ক্ষিতীশবাবুর সঙ্গে দেখা, তাঁর সঙ্গে দেখি দারোগা পুলিস! শুনলুম মিথ্যে একটা চার্জে ফেলে তাঁকে অ্যারেষ্ট করা হয়েছে। (হাসিয়া) দেখুন দেখি কাণ্ড!

যতীন। ওরা এখন কোথায়? বসুন আপনি।

ঘোষ। ওরা বাইরে আমার 'কারে' বসে' আছে। এখুনি বিয়ে হবে রেজেষ্ট্রি করে'। আমাকেই সব ব্যবস্থা করতে হবে, তাই এখন আর বসতে পারব না। সন্ধ্যে আটটায় খাওয়া-দাওয়া। যাবেন আপনি দয়া করে'—ডাক্তারবাবু, আপনিও।

যতীন। (হাসিয়া) আচ্ছা।

ঘোষ। চলি তবে, নমস্কার।

[চলিয়া গেলেন]

পুরন্দর। হেরে গেলাম, বুঝলে যতীন, হেরে গেলাম। বাহাদুরি আছে মেয়েটার (ক্ষণকাল পরে)—হেরে গেলাম কিন্তু একটুও দুঃখ হচ্ছে না। (সহসা সোল্লাসে) বাই জোভ্, আই অ্যাম গ্লাড্!

যবনিকা

শতাব্দী

শ্রীঅনিলকুমার ভট্টাচার্য্য

আজি বন্ধু শতাব্দীর তাণ্ডবের ধ্বংস স্তূপ হ'তে
কী গান শোনাবো বলো? শুধু আর্ত্ত হাহাকার রব!

সভ্যতার ব্যভিচারে ক্লিষ্ট প্রাণ মানবের দল
বাসুকী ধরিত্রী মাতা কাঁদে হায়! পাষাণী নিশ্চল!

যান্ত্রিক শকট চলে পৃষ্ঠে হানে তীব্র কষাঘাত
স্বার্থের সংগ্রাম মাঝে সংঘর্ষের তিক্ত হলাহল!

ধরণীর রন্ধ্রে রন্ধ্রে কেঁদে ওঠে যে ব্যথার শ্বাস
যুগের বিষাক্ত বায়ু মেঘে-লীন সঙ্কটের ত্রাস!

এ মাটি মৃত্তিকা নহে শ্যাম পুষ্প কাব্যের কানন,
কঠিন জঠোরে জাগে মৃত্যু-ক্ষুধা চিতাগ্নি অনল।

ভস্মীভূত শান্তি সুখ: হোমানল জাগে অনিবার,
অশান্তির কঙ্কালের অস্থিরূপ নগ্ন হাহাকার!

এ রাত্রি তিমিরতলে চলি মোরা যুগ যাত্রীদল,
ধরণীর ইতিবৃত্তে মোরা আনি নব ইতিহাস।

ক্লান্তি ক্লেদ পঙ্গু প্রাণ—অমৃতের নাহি অধিকার,
আমরা মানব শিশু বোঝা স্তূপ ব্যথা বেদনার!

তুমি বলো বন্ধু মোরে এরই মাঝে রচি কাব্য কলা,
বজ্রে বজ্রে বাঁধি বীণা গাহি গান অভিবন্দনার।

এ মহা শ্মশানভূমি হতাশের শবোপরি হতে,
আমি আনি নব সূর্য্য ভবিষ্যৎ ধরণীর পথে!

এসো বন্ধু বসি তবে দূরে ফেলি' অশান্তির বোঝা,
পিনাকী নাচুক রণে হাতে দেখি ডম্বরুর শিঙা।

নীলকণ্ঠে করে পান ধরণীর যত হলাহল
শতাব্দী হাসিছে হের—নবসূর্য্য পুণ্যের ফসল।

আমরা যুগের কবি সেই নব ভবিষ্যৎ লাগি'
উদয় সূর্য্যের তরে সূর্য্যমুখী মাথা নত করে,

বর্ত্তমান পৃথিবীর অন্ধকার অস্ত সবিতার
গাহি গান শতাব্দীর, মহাকাল মহাবন্দনার।

চলতি ইতিহাস

শ্রীতিনকড়ি চট্টোপাধ্যায়

রুশ-জার্মান সংগ্রাম

বিগত এক মাসে ককেশাশ অঞ্চলে দুর্দ্ধর্ষ নাৎসী বাহিনী তাহাদের প্রবল আক্রমণ পরিচালনা করিয়াছে স্ট্যালিনগ্রাডে। গত ২৬এ আগষ্ট জার্মান সৈন্য স্ট্যালিন্‌গ্রাড হইতে ৩০ মাইল দূরে উপনীত হইয়াছিল। তাহার পর প্রায় চার সপ্তাহ অতীত হইতে চলিল, কিন্তু আজও স্ট্যালিনগ্রাড্‌ আত্মসমর্পণ করে নাই। প্রবল নাৎসী আক্রমণের বিরুদ্ধে স্ট্যালিনগ্রাডের এই আত্মরক্ষার সংগ্রাম অপূর্ব। প্রতি ইঞ্চি ভূমি দখল করিবার জন্য জার্মান বাহিনীকে যথেষ্ট মূল্য প্রদান করিতে হইতেছে। ক্রিমিয়ার দুর্ভেদ্য দুর্গ সেবাস্তোপোল অধিকারের সময়ও যুদ্ধের অবস্থা দাঁড়াইয়াছিল ঠিক এই রকম। একের পর এক নাৎসী বাহিনী রণক্ষেত্রে আত্মবিসর্জন দিয়াছে, সমরোপকরণ ক্ষয় হইয়াছে বিস্তর—উপযুক্ত মূল্য প্রদানের পূর্বে সেবাস্তোপোল অধিকার করা জার্মানবাহিনীর পক্ষে সম্ভব হয় নাই। নাৎসী সমরনীতির ইহা এক অভিনব বৈশিষ্ট্য ! কোন সামরিক গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল অধিকারের জন্য যখন তাহারা উদ্যোগী হইয়াছে, তখন যে কোন মূল্যের বিনিময়ে তাহা অধিকার করিতে তাহারা সঙ্কোচ করে নাই ; অজস্র প্রাণ এবং রণ-সম্ভারের বিনিময়ে তাহারা সেই অঞ্চল হস্তগত করিয়াছে। রুশ-জার্মান সংগ্রামের দ্বিতীয় পর্ব সেবাস্তোপোল আক্রমণের সময় আমরা ইহা দেখিয়াছি, রষ্টোভ অধিকারের সময়ও সেই একই ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি।

সম্প্রতি নাৎসী বাহিনী স্ট্যালিন্‌গ্রাডের উত্তর পশ্চিম অঞ্চলে রাজপথেও প্রবেশ করিয়াছে, কিন্তু রুশ সৈন্যের প্রবল বাধার সম্মুখে তাহারা পূর্ব ঘাঁটিতে ফিরিয়া আসিয়াছে বলিয়া প্রকাশ। উত্তর-পশ্চিম, পশ্চিম এবং দক্ষিণ-পশ্চিম—এই তিন দিক দিয়া স্ট্যালিনগ্রাডের উপর নাৎসী-বাহিনী অভিযান পরিচালনা করিয়াছে। জার্মান সৈন্য সংস্থানগুলি রেখা দ্বারা সংযুক্ত করিলে দেখা যাইবে যে, নাৎসী বাহিনী অর্দ্ধ বৃত্তাকারে স্ট্যালিনগ্রাডকে ঘিরিয়া ধরিয়া তাহার বিরুদ্ধে অগ্রসর হইয়াছে। প্রকাশ, একমাত্র স্ট্যালিন্‌গ্রাড্‌ অঞ্চলেই ইতিমধ্যে নিহত নাৎসী সৈন্যের সংখ্যা প্রায় দেড়লাখ। বিমান, কামান এবং ট্যাঙ্কও ধ্বংস হইয়াছে সেই অনুপাতে। রয়টার প্রদত্ত সংবাদে প্রকাশ, আশাতিরিক্ত সৈন্য ও সমরোপকরণ ধ্বংসের জন্য নাকি ফন্‌ বোককে কৈফিয়ৎ প্রদানের নিমিত্ত জার্মানীতে তলব করা হইয়াছে এবং তাহার স্থানে সাময়িকভাবে নিযুক্ত হইয়াছেন জার্মান সেনামণ্ডলীর সর্বাধ্যক্ষ ফন্‌ কাইটেল। ফন বোককে কৈফিয়ৎ প্রদান করিতে হইয়াছে কি না তাহাই এক্ষেত্রে বড় কথা নয়, স্ট্যালিনগ্রাডে জার্মানীর সৈন্য ও রণসম্ভার যে যথেষ্ট ক্ষয় হইয়াছে, বিভিন্ন সূত্র হইতে প্রাপ্ত এই ধরণের বিবিধ সংবাদে এই সত্যই ক্রমশঃ অধিকতর পরিস্ফুট হইয়া উঠিতেছে।

স্ট্যালিনগ্রাড রক্ষার সমস্যা যে বর্তমানে যথেষ্ট গুরুতর হইয়া উঠিয়াছে ইহা অস্বীকার করা নিষ্প্রয়োজন। সৈন্যবাহী বিমানে করিয়া রণক্ষেত্রে প্রতি মুহূর্তে নূতন নূতন জার্মান সৈন্য আনীত হইতেছে। কামান এবং ট্যাঙ্ক প্রভৃতি সমরসম্ভারও নাৎসী-অধিকৃত সমগ্র ইয়োরোপ হইতে স্ট্যালিনগ্রাড রণক্ষেত্রে প্রেরিত হইতেছে। জার্মান সৈন্য সংখ্যার তুলনায় লালফৌজ এখানে যথেষ্ট সংখ্যালঘিষ্ট। মস্কো—ভরোনেশ রেলপথে রুশবাহিনী আনয়ন করা বর্তমানে দুষ্কর। ফলে প্রয়োজন মত যথাসময়ে উপযুক্ত পরিমাণ লালফৌজকে স্ট্যালিন্‌গ্রাড্‌ রণক্ষেত্রে নিযুক্ত করা সম্ভব হইতেছে না। রুশ সৈন্যকেও বিমানযোগে রণাঙ্গনে আনয়ন করিতে হইতেছে। যুদ্ধের এতাদৃশ বৈষম্যমূলক অবস্থায় শেষ পর্য্যন্ত স্ট্যালিন্‌গ্রাড রক্ষা করা সম্ভব না হইতেও পারে, শেষ পর্যন্ত নভোরসিস্ক-এর ন্যায় স্ট্যালিনগ্রাড জার্মান বাহিনীর অধিকারে যাওয়া একেবারে অসম্ভব নয়। কিন্তু যুদ্ধের অবস্থা যদি শেষ পর্য্যন্ত এই অবস্থায় পর্যবসিত হয় তাহা হইলে ইহা যে মিত্রশক্তির অনুকূলে যাইবে না ইহা নিঃসন্দেহ।

সম্প্রতি স্ট্যালিনগ্রাড রক্ষার জন্য সাইবেরিয়া হইতে নূতন সৈন্য রণাঙ্গনে আনীত হইয়াছে। গত শীতের সময় এই সাইবেরিয়ার বাহিনীই নাৎসী আক্রমণ হইতে মস্কোকে রক্ষা করিয়াছিল। এবারেও ককেশাস অঞ্চলে তুষারপাত আরম্ভ হইয়াছে।
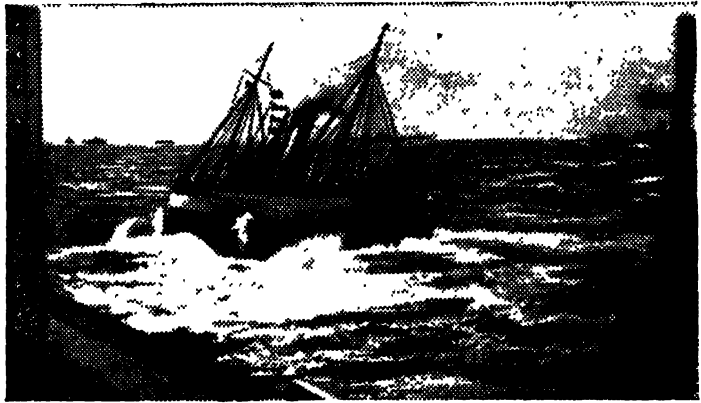
একটি বিরাট ব্রিটিশ কনভয় আতলান্তিক মহাসাগর অতিক্রম করিতেছে

মনে হয় এবারেও শীত পড়িবে পূর্ব বৎসরের ন্যায় এবং নিয়মিত সময়ের কিছু পূর্ব হইতেই এই তুষারপাত আরম্ভ হইয়াছে। এই সাইবেরিয়ার বাহিনী প্রচণ্ড শীতের সময় রণ পরিচালনার জন্য বিশেষভাবে শিক্ষালাভ করিয়াছে। ইয়োরোপীয় রুশিয়া এবং

ইতালিয়ান অফিসারগণকে বন্দীরূপে ব্রিটেনে আনা হইতেছে

সাইবেরিয়ার সৈন্য বাহিনী সম্পূর্ণ পৃথক। দুই বিভিন্ন রাষ্ট্রের দুই বাহিনীর ন্যায় রুশিয়ার উক্ত দুই অঞ্চলের সৈন্যদিগকে গড়িয়া তোলা হইয়াছে। সাইবেরিয়ার সৈন্য বাহিনীর সংরক্ষণ ব্যবস্থা, সমরোপকরণ, অধিনায়কমণ্ডলী প্রভৃতির সহিত পশ্চিম রুশিয়ার সমর বিভাগের বিশেষ কোন সম্বন্ধ নাই। সাইবেরিয়ার এই সৈন্যদিগের সর্বাধ্যক্ষ মার্শাল ব্লুচার। লালফৌজের এই তুষার-বাহিনী তাঁহারই সৃষ্টি। তদুপরি মার্শাল ভরোশিলভ ও মার্শাল বুদেনী গত কয়েকমাস হইতে এক বিশাল বাহিনীকে শীতের সময় যুদ্ধ পরিচালনার জন্য বিশেষভাবে শিক্ষা দিতেছেন। স্ট্যালিনগ্রাড রণাঙ্গনে এই নূতন সৈন্যদলের আগমনের পর রুশ বাহিনীর প্রতিরোধশক্তি যথেষ্ট বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে। স্ট্যালিনগ্রাড সহরের উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে সহরের রাজপথে প্রবিষ্ট জার্মান সৈন্যকে তাহারা বিতাড়িত করিয়াছে। এমন কি প্রতিরোধাত্মক যুদ্ধ হইতে আক্রমণাত্মক অভিযান পরিচালনা করিয়া তাহারা একটি গুরুত্বপূর্ণ টিলাও পুনরায় স্বীয় অধিকারে আনয়ন করিতে সক্ষম হইয়াছে। অবশ্য রুশবাহিনীর এই সাময়িক সাফল্য আশাপ্রদ হইলেও ইহাতে অত্যধিক উল্লসিত হইবার কোন কারণ নাই। একথা স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, বর্তমানে ককেশাসের যুদ্ধ বিদ্যুৎ-গতি আক্রমণের অবস্থা পার হইয়া স্থানিক যুদ্ধের পর্যায়ে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। এই অবস্থায় সংগ্রামের সাফল্য নির্ভর করে সৈন্য-সংখ্যা, রণসম্ভার, সংযোগ এবং সরবরাহ ব্যবস্থার সুবন্দোবস্ত প্রভৃতির উপর। এই দিক দিয়া বিচার করিলে স্ট্যালিনগ্রাডে সংগ্রামরত নাৎসীবাহিনীর সুবিধা যে বর্তমানে লালফৌজ অপেক্ষা অধিক ইহা অস্বীকার্য।

স্ট্যালিনগ্রাড ব্যতীত ককেশাসের অন্যান্য অঞ্চলেও লালফৌজ বর্তমানে বিশেষ সুবিধা করিতে পারে নাই। নভোরসিস্ক পরিত্যক্ত হইয়াছে—বর্তমানে পেতি, সুখুম, টুয়াপ্সে প্রভৃতি হইয়া বাটুম পর্যন্ত উপনীত হইবার জন্য নাৎসী বাহিনী সচেষ্ট। গ্রজনীর তৈলাঞ্চলের দিকেও জার্মানবাহিনী আরও কয়েক মাইল অগ্রসর হইয়াছে। রুশসৈন্য সাফল্য-লাভ করিয়াছে মস্কো এবং লেনিন-গ্রাড অঞ্চলে।

কিন্তু ককেশাসের যুদ্ধ বর্তমানে যে অবস্থায় উপনীত হইয়াছে উহা মিত্রশক্তির পক্ষে চিন্তার বিষয়। রুশিয়া, বৃটেন এবং আমেরিকার জনসাধারণ, ভারত ও অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি বিভিন্ন দেশের গণশক্তি যখন মিত্রশক্তিকে নাৎসী শক্তির বিরুদ্ধে দ্বিতীয় রণাঙ্গনের সৃষ্টি করিতে দেখিতে ইচ্ছুক, সেই সময় ককেশাসে তুষারপাত, শীতের আগমন ও প্রাকৃতিক সাহায্যের উপর নির্ভর করিয়া মিত্রশক্তির অপেক্ষা করার মধ্যে যে যথেষ্ট দৌর্বল্য নিহিত রহিয়াছে ইহা অস্বীকার করা যায় কেমন করিয়া? অথচ ককেশাস অঞ্চলে এই স্ট্যালিনগ্রাড যুদ্ধের গুরুত্ব অপরিসীম। রুশ সৈন্য যদি ভলগা অঞ্চল হইতে বিতাড়িত হয় তাহা হইলে ককেশাসস্থ সোভিয়েট বাহিনী রুশিয়ার মূল ভূখণ্ড হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইবে। ইহাতে শুধু ককেশাস রক্ষার প্রশ্নই গুরুতর হইয়া উঠিবে না, ভলগা হইতে রুশ সৈন্য বিতাড়িত হইলে মিত্রশক্তির পক্ষে দ্বিতীয় রণাঙ্গণ সৃষ্টির পরিকল্পনাও যথেষ্ট ব্যাহত হইবে; কারণ, নাৎসী সৈন্য যদি স্ট্যালিনগ্রাড দখল করিতে পারে, তাহা হইলে হিটলার তাঁহার সামরিক শক্তিকে পশ্চিম ইয়োরোপে আফ্রিকায় অথবা প্রয়োজনমত অন্য কোন রণাঙ্গনে নিযুক্ত করিতে পারিবেন। অধিকন্তু কৃষ্ণসাগর ও কাস্পিয়ান সাগরের তীর ধরিয়া বাটুম ও বাকু অভিমুখে অভিযান পরিচালনা করাও তখন হিটলারের পক্ষে অধিকতর সহজসাধ্য হইয়া উঠিবে। কিন্তু যুদ্ধের ঐ অবস্থায় মিত্রশক্তির পক্ষে উক্ত অঞ্চলে পৃথকভাবে জার্মান শক্তিকে অন্যত্র নিয়োজিত করা যেমন সম্ভব হইবে না, পশ্চিম ইয়োরোপ অথবা অন্য কোন স্থানে দ্বিতীয় রণক্ষেত্র সৃষ্টি করিয়া নাৎসী শক্তিকে দ্বিধা বিভক্ত করিয়া হীনবল করাও তখন তেমনই কঠিন হইয়া দাঁড়াইবে। কিন্তু ইঙ্গ-রুশ চুক্তি, চার্চিল-রুজভেল্ট সাক্ষাৎকার, চার্চিল-স্ট্যালিন আলোচনা, দিয়েপে 'কমাণ্ডো' আক্রমণ প্রভৃতি বিভিন্ন ঘটনাবলীর পর আজও যে মিত্রশক্তির দ্বারা কেন দ্বিতীয় রণাঙ্গন সৃষ্ট হইল না তাহা মিত্রশক্তির সমর্থক বিভিন্ন রাষ্ট্রের গণশক্তির নিকট আজও রহস্যাবৃতই রহিয়া গেল।

ম্যাডাগাস্কার

ম্যাডাগাস্কার সম্পর্কে অক্ষশক্তির তৎপরতা লক্ষ্য করিয়া গত মে মাসের প্রারম্ভে মিত্রশক্তি যে উহার বিরুদ্ধে আক্রমণ

পরিচালনা করেন, 'ভারতবর্ষ'-এর গত আষাঢ় সংখ্যাতেই তাহা উল্লিখিত হইয়াছে। সেই সময় বৃটিশ বাহিনী দক্ষিণ আফ্রিকাস্থ সৈন্যের সহযোগিতায় ম্যাডাগাস্কারের নৌঘাঁটি দায়েগো সুয়ারেজ অধিকার করে, বিমান ঘাঁটিও মিত্রশক্তির হাতে আসে। মিত্রশক্তির এই তৎপরতার যথেষ্ট সঙ্গত কারণ ছিল। সিঙ্গাপুর এবং আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ অধিকারের পর কলম্বো হইয়া জাপ নৌবাহিনী এই ফরাসী অধিকৃত দ্বীপে ঘাঁটি স্থাপনে উদ্যোগী হইতে পারে এই ধরণের আশঙ্কা করা গিয়াছিল। জাপান এবং ফরাসী সরকারের এই ধরণের উদ্দেশ্য সাধনের আভাসও সেই সময় মিত্রশক্তির অজ্ঞাত থাকে নাই। অথচ ম্যাডাগাস্কার অধিকার করিতে পারিলে জাপানের পক্ষে ভূমধ্য সাগর পথে জার্মানীর সহিত সংযোগ স্থাপন সম্ভব হইত। উত্তমাশা অন্তরীপ ঘুরিয়া ইংলণ্ডের সহিত ভারতের জলপথের সংযোগও জাপ নৌশক্তির পক্ষে ব্যাহত করা সম্ভব হইত। দক্ষিণ আফ্রিকার বন্দর এবং ভারতের পশ্চিম উপকূল শত্রুর আক্রমণ সীমার মধ্যে আসিত। এই সকল বিপদ নিবারণের জন্যই মিত্রশক্তি পূর্বাহ্নে ম্যাডাগাস্কার আক্রমণ করায় অক্ষশক্তির ঐ সকল উদ্দেশ্য অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়।

কিন্তু সম্প্রতি আবার ম্যাডাগাস্কারে সংগ্রাম আরম্ভ হইয়াছে। সমগ্র দ্বীপটি অধিকার করা মিত্রশক্তির উদ্দেশ্য ছিল না। শত্রুর তৎপরতা নষ্ট করাই ছিল মিত্রশক্তির লক্ষ্য। ফলে নৌ ও বিমান ঘাঁটিই বৃটিশ বাহিনী অধিকার করে। কিন্তু সম্প্রতি মিত্রশক্তি অবগত হইয়াছেন যে, ম্যাডাগাস্কারের অন্যান্য অঞ্চলে শত্রুর কার্যতৎপরতা গোপনে আরম্ভ হইয়াছে। আর ইহার জন্য সমগ্র দ্বীপটি বৃটীশ শক্তির প্রত্যক্ষ প্রভাবাধীনে থাকা প্রয়োজন। ভিসি সরকার এবং অক্ষশক্তির এই উদ্দেশ্য বিনষ্ট করার প্রয়োজনেই এই সঙ্ঘর্ষের সূচনা। মিত্রশক্তিবাহিনী যুদ্ধের প্রারম্ভে যে সামরিক বাধা লাভ করিয়াছে তাহা সামান্য। পূর্ব আফ্রিকার সৈনাধ্যক্ষের সংবাদে প্রকাশ—বৃটিশ বাহিনী ম্যাডাগাস্কারে একশত মাইলের উপর অগ্রসর হইয়াছে। ম্যাডাগাস্কারের রাজধানী য়্যান্টানানারিভোর অভিমুখে অগ্রসরমান সৈন্যদল অর্দ্ধ পথের অধিক অগ্রসর হইয়াছে। উত্তর পশ্চিম উপকূলে আমবানজা হইতে দক্ষিণে অগ্রসরমান বাহিনীর চাপে এবং মারোমানদিয়াতে অবতরণকারী সৈন্য-দলের সহযোগিতায় উক্ত অঞ্চলস্থ ফরাসী বাহিনী আত্মসমর্পণে বাধ্য হইয়াছে।

প্রকাশ অত্যধিক লোকক্ষয় নিবারণের উদ্দেশ্যে ম্যাডাগাস্কারের শাসনকর্ত্তা মঃ আনেৎ মিত্রশক্তির নিকট যুদ্ধ বিরতির প্রার্থনা জানাইয়াছিলেন। কিন্তু মিত্রশক্তি যুদ্ধ বিরতির জন্য যে সকল সর্ত্তাদি জানান মঃ আনেৎ কর্ত্তৃক তাহা গ্রহণযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হয় নাই। যুদ্ধ বিরতির সর্ত্তাদি সম্বন্ধে আলোচনার জন্য ফরাসী সরকার কর্ত্তৃক নিযুক্ত ব্যক্তিগণ মিত্রশক্তি প্রদত্ত সর্ত্তাবলী গ্রহণে অক্ষমতা জ্ঞাপন করিয়াছেন। ফলে পুনরায় সঙ্ঘর্ষ আরম্ভ হইয়াছে। ম্যাডাগাস্কারের পূর্ব উপকূলে নূতন সৈন্য অবতরণ করিয়াছে। প্রধান বন্দর তামাতাভ বৃটিশ সৈন্যের অধিকারে আসিয়াছে। বর্ত্তমানে রাজধানীর ৭৫ মাইল উত্তর-পশ্চিমে আম্বাজোভে যুদ্ধ চলিতেছে। কিন্তু এই সংগ্রামে সম্প্রতি ফ্রান্সের পক্ষে ম্যাডাগাস্কারে নূতন সৈন্যাদি প্রেরণ করা সম্ভব হইতেছে না, ফলে মিত্রশক্তি রণক্ষেত্রে যে বাধা পাইতেছে তাহা সামান্য।

যে মাসে ম্যাডাগাস্কারের নৌ ও বিমান ঘাঁটি অধিকারের পর মিত্রশক্তি ইচ্ছা করিয়াই অন্যান্য অঞ্চল আক্রমণে সচেষ্ট হইয়া ওঠেন নাই, ভিসি সরকারও মিত্রশক্তির সহিত সন্ধির আলোচনায় নিযুক্ত হয়। মিত্রশক্তির লক্ষ্য ছিল আসলে ফরাসী জনসাধারণ যাহাতে বৃটেনের প্রতি বিরুদ্ধ মনোভাব ধারণ না করে সেদিকে লক্ষ্য রাখা। কারণ মিত্রশক্তির অজানা নাই যে, আজ অথবা দুই দিন পরেই হউক—জার্মানীকে ফ্রান্স অথবা অন্য কোন অঞ্চলে নূতন এক রণাঙ্গনে আক্রমণ করিতে হইবে এবং সেই সময়ে ফ্রান্সের জনসাধারণের সহযোগিতা প্রয়োজন। সেইজন্য বৃটেনের লক্ষ্য ছিল প্রকৃতপক্ষে ম্যাডাগাস্কারে সংগ্রাম পরিচালনা অপেক্ষা সামরিক 'চাপ' প্রদানে কার্যসিদ্ধি করা। অপরপক্ষে ফ্রান্স সরকার কর্ত্তৃক দীর্ঘসূত্রতার নীতি গৃহীত হইয়াছিল। ভিসি সরকারের আশা ছিল কিছুদিন আলোচনা দ্বারা সময় কাটাইতে পারিলে তাহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে। ফন্ বোকের বাহিনী যদি ককেশাস অঞ্চলে আশানুরূপ সাফল্য লাভ করিতে পারে এবং ফিল্ড মার্শাল রোমেল সেই সময়ে ভূমধ্য-সাগরে স্বীয় প্রভাব বিস্তার করিয়া সুয়েজ পর্যন্ত অগ্রসর হইতে পারে তাহা হইলে ম্যাডাগাস্কারে নূতন সৈন্য ও সমরোপকরণ প্রেরণ করা যেমন ফ্রান্সের পক্ষে সম্ভব হইবে, তেমনই ভারত মহাসাগর পথে জার্মানী ও জাপানের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করাও সম্ভব হইবে। কিন্তু ফন্ বোকের অভিযান আশানুরূপ সাফল্য লাভ করে নাই। নির্দ্ধারিত সময়ের মধ্যে নির্দিষ্ট
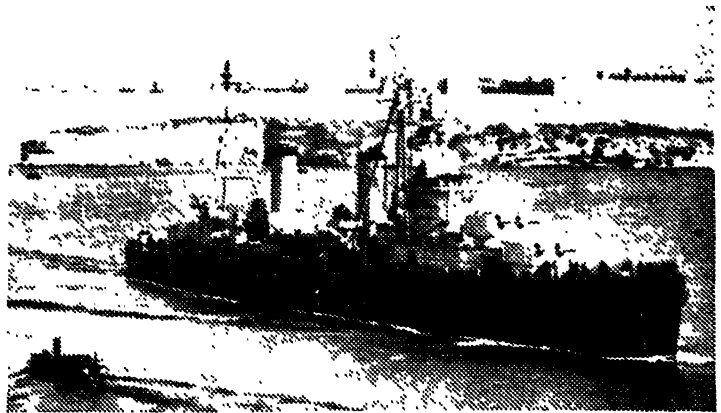
টরপেডো ও বিমান আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিয়া অতিকায় ব্রিটিশ ক্রুজার "পেইনলোপ্" মাল্টা বন্দরে প্রবেশ করিতেছে

অঞ্চলগুলি অধিকৃত হয় নাই, ইরাক অথবা ইরাণের মধ্যেও অভিযান প্রেরণ করা কল্পনার মধ্যেই রহিয়া গিয়াছে। কিন্তু মার্শাল রোমেলও ক্রান্সকে নিরাশ করিয়াছে। ফলে ম্যাডাগাস্কার সম্বন্ধে ভিসি সরকারের অন্তরে যে আশা পুষ্ট হইতেছিল

ব্রিটিশের বৃহৎ বোম্বার "ম্যাঞ্চেষ্টার" গোলা পরিপূর্ণ অবস্থায় জার্মানীর বিপক্ষে অভিযান করিয়াছে

তাহাতে তাহাকে নিরাশ হইতে হইয়াছে। কিন্তু মিত্রশক্তি কর্ত্তৃক ভারত মহাসাগর পথে জাপ-জার্মান সম্পর্ক ব্যাহত রাখিবার উদ্দেশে উপযুক্ত সময়ে কঠোর হস্তে ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছে।

সুদূর প্রাচী

গত কয়েক সপ্তাহের চীন-জাপান যুদ্ধের ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য কিছু থাকিলেও বিশেষত্ব কিছু নাই। দীর্ঘ দিন ধরিয়া জাপান চীনের যে সকল অঞ্চল অধিকার করিয়াছিল, ধীরে ধীরে চীন তাহা পুনরুদ্ধার করিয়া চলিয়াছে। গত কয়েক সপ্তাহের মধ্যে পশ্চিম চেকিয়াং এর ল্যাঙ্কি কয়েকবার হাত বদল হইয়াছে। কিছুদিন পূর্ব্বে ল্যাঙ্কির রেলষ্টেসন জাপান কর্ত্তৃক অধিকৃত হয়। কয়েকদিনের মধ্যেই চীন তাহা পুনরুদ্ধার করে। গত ৪ঠা সেপ্টেম্বর জাপ বাহিনী ঐ অঞ্চল আবার চীনের নিকট হইতে ছিনাইয়া লয়। চৌদ্দ দিন ধরিয়া সংগ্রামের পর প্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত সহর ল্যাঙ্কির উত্তর পশ্চিমে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পার্ব্বত্য অঞ্চল চীনাবাহিনী অধিকার করিয়াছে। চেকিয়াং-কিয়াংসি রেলপথ ধরিয়া যে চীনা বাহিনী প্রায় দুই মাস যাবৎ জাপ-প্রতিরোধশক্তির বিরুদ্ধে সাফল্যের সহিত ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছিল তাহাদের বর্ত্তমান সাফল্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য। রেল লাইন ধরিয়া উত্তর-পশ্চিম মুখে অগ্রসরমান চীনা বাহিনী কয়েক দিনের মধ্যে চেকিয়াং প্রদেশের রাজধানী কিনহোয়ার ১৭ মাইলের মধ্যে উপনীত হইয়াছে। কিনহোয়ার ১২ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে ল্যাঙ্কির সহরতলীতে আক্রমণরত জাপবাহিনী চীনসৈন্য কর্ত্তৃক বিতাড়িত হইয়াছে। চেকিয়াং-কিয়াংসি রেলপথ হইতে যে সকল জাপ সৈন্যকে অপসৃত করা হইয়াছে তাহাদের অধিকাংশকেই হ্যাংকাওতে সমবেত করা হইয়াছে। সম্প্রতি সাংহাইতেও দুই ডিভিসন জাপ সৈন্য রাখা হইয়াছে। কিন্তু এই জাপ বাহিনীর উদ্দেশ্য কি, চীনের কোন নূতন অঞ্চল আক্রমণ করিবার জন্যই তাহাদিগকে সমবেত করা হইয়াছে, অথবা দক্ষিণ-পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরের যুদ্ধে তাহাদিগকে প্রেরণ করা হইবে, তাহা এখনও স্পষ্ট হইয়া ওঠে নাই।

দক্ষিণ-পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরের যুদ্ধে জাপবাহিনী সর্ব্বাপেক্ষা তৎপর হইয়া উঠিয়াছে ওয়েন স্ট্যান্‌লি অঞ্চলে। মরেসবি বন্দর হইতে ৩২ মাইল উত্তরে জাপবাহিনী বর্ত্তমানে প্রবল চাপ দিতেছে। টিমর ও নিউগিনির মধ্যবর্ত্তী টেনিম্‌বার দ্বীপের নিকট মিত্র-শক্তি কর্ত্তৃক একখানি জাপ জাহাজ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। বুনা এবং রবাউলেও বিমান হইতে বোমা বর্ষিত হইয়াছে। বুনার নিকট অবস্থিত প্রায় সব কয়টি জাপ জাহাজই ধ্বংস অথবা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। রেকেতা উপসাগর এবং সলোমনের অন্তর্গত গিজোতেও বিমান হইতে বোমা বর্ষিত হইয়াছে। গুয়াডাল্‌ক্যানারের বিমান ঘাঁটি পুনরুদ্ধারে ব্যর্থ হওয়ার পর সেপ্টেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহের শেষ হইতে যুদ্ধে শত্রুপক্ষের তৎপরতা যথেষ্ট হ্রাস পাইয়াছে।

চীনের যুদ্ধে জাপানের ক্রম-অসাফল্য, চীন হইতে বহু জাপ সৈন্যের অপসারণ, মাঞ্চুকুয়োতে সৈন্য প্রেরণ, ব্রহ্মে যথেষ্ট সংখ্যক সৈন্যের অবস্থিতি প্রভৃতি বিবিধ বিষয় লক্ষ্য করিয়া কূটনীতিক মহলে জাপানের অদূর ভবিষ্যতের কর্ম্মপন্থা ও উদ্দেশ্য লইয়া যথেষ্ট গবেষণা চলিয়াছে। কোন কোন সমালোচকের মতে জাপান অদূর ভবিষ্যতে সাইবেরিয়া আক্রমণ করিবে। চীন এবং আমেরিকার অনেক সমালোচক জাপানের এই উদ্দেশ্যের কথাই বলিয়া আসিতেছেন। জাপান যে সাইবেরিয়া আক্রমণে ইচ্ছুক এই ধারণা পোষণ করিবার যথেষ্ট কারণও আছে। জাপান যে মাঞ্চুকুয়োতে প্রভূত সৈন্য সমাবেশ করিতেছে তাহা একাধিক সূত্র হইতে প্রাপ্ত সংবাদেই প্রকাশ। মুকুডেনের সকল কারখানায় প্রস্তুত অস্ত্রাদি মাঞ্চুরিয়াস্থ জাপ বাহিনীর জন্য প্রেরিত হইতেছে। ভ্লাদিভোষ্টক বন্দর উদ্যত ছোরার মতই জাপানের বক্ষে বিঁধিয়া আছে। যে কোন সময় এই স্থান হইতে খাস টোকিওতে বোমা বর্ষণ করা চলে। মার্কিন বিমান বহরও প্রয়োজন হইলে ইহাকে বিমান ঘাঁটি স্বরূপ ব্যবহার করিতে পারে। তদুপরি এই বন্দরের উপর জাপানের বহুদিন হইতেই লোভ আছে। সম্প্রতি অপর সংবাদে প্রকাশ যে, স্ট্যালিনগ্রাডের সংগ্রামে সাহায্যের জন্য সাইবেরিয়া হইতে সৈন্যদল আনীত হইয়াছে। আর বর্ত্তমান সংগ্রামে অক্ষশক্তির নিকট চুক্তিপত্রের মূল্যও যে কতখানি তাহার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। গত ১৯৩৯ সালেও মাঞ্চুকুয়ো-মঙ্গোলিয়া সীমান্তের সঙ্ঘর্ষে ৫০,০০০ জাপসৈন্য

হতাহত হইয়াছে। তদুপরি বর্তমান জাপ প্রধান মন্ত্রী টোজোর মনোভাব রুশিয়াকে আক্রমণের দিকে। একাধিকবার তিনি এই মনোভাব প্রকাশ করিয়াছেন। মাঞ্চুরিয়ার কুয়ানটাং বাহিনীর যে সেনানীমণ্ডলীর তিনি অধ্যক্ষ ছিলেন সেই দলের অভিমত ছিল চীনের বদলে ১৯৩৭ সালে জাপানের রুশিয়াকে আক্রমণ করা। এই সকল বিভিন্ন কারণে অনেকে মনে করিতেছেন যে, জাপান অদূর ভবিষ্যতে সাইবেরিয়া আক্রমণ করিবে। এই আক্রমণ সিঙ্গাপুরের ন্যায় ভ্লাদিভোষ্টককে মাঞ্চুকুয়ো হইতে এবং খাভারোভস্ক হইয়া পিছন দিক দিয়া আক্রমণ করিয়া উহাকে প্রধান ভূখণ্ড হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিবে। আক্রমণের সময় জাপান যে ভ্লাদিভোষ্টককে কেবল সম্মুখ হইতে আক্রমণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইবে না ইহা নিশ্চিত, কিন্তু উপরোক্ত কারণ সত্ত্বেও জাপান অতি শীঘ্র সাইবেরিয়া আক্রমণ করিবে কি না সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে। রুশ্‌ জাপ চুক্তি এখনও বলবৎ আছে এবং জাপান একাধিকবার সেই চুক্তির উল্লেখ করিয়া ঘোষণা করিয়াছে যে, রুশিয়া যদি চুক্তি ভঙ্গ না করে তাহা হইলে জাপান সেই চুক্তিকে মানিয়া চলিবে। সাইবেরিয়া হইতে স্ট্যালিনগ্রাডে সৈন্য প্রেরিত হইলেও জাপানের তাহাতে বিশেষ উৎসাহিত হইবার কিছু নাই। কোন্‌ সৈন্যদল প্রেরিত হইয়াছে সে সম্বন্ধে আমরা বর্তমান প্রবন্ধের যথাস্থানে উল্লেখ করিয়াছি। ইহার উপর রুশিয়াকে আক্রমণ করিলে সৈন্য, সমর সম্ভার, যোগাযোগ রক্ষার ব্যবস্থা প্রভৃতি সম্বন্ধে যেমন প্রশ্ন আছে, একসঙ্গে একাধিক রণাঙ্গনে যুদ্ধ চালাইবার দায়িত্ব গ্রহণের প্রশ্নও সেই সঙ্গে জড়িত। ইহার উপর আছে প্রকৃতি। সাইবেরিয়ার শীত বর্তমানে আসন্ন। সারা শীতকাল ধরিয়া সাইবেরিয়ার প্রচণ্ড শীতে জাপ বাহিনীর পক্ষে সংগ্রাম পরিচালন প্রয়োজনানুরূপ সম্ভব কি না তাহাও বিবেচ্য। চীন, প্রশান্ত মহাসাগর, মালয়, ব্রহ্মদেশ প্রভৃতি বিভিন্ন স্থানে জাপ সৈন্য ও সমরোপকরণ ছড়াইয়া আছে। তাহাদের সরবরাহ ব্যবস্থা, যোগাযোগ রক্ষা, নিরাপত্তা প্রভৃতি ব্যবস্থার প্রশ্নও আছে। এদিকে ভারতের বর্তমান রাজনৈতিক অবস্থায় জাপানের পক্ষে ভারত আক্রমণে প্রলুব্ধ হওয়া অস্বাভাবিক নয়। ২১।৯।৪২

ব্রিটিশ বিমান চালকেরা দিবা আক্রমণের জন্য গোলাগুলি লইয়া বিমানপোতের জন্য অপেক্ষা করিতেছে

জননী ফিরিয়া যাও

শ্রীকনকভূষণ মুখোপাধ্যায়

জননী ফিরিয়া যাও ব্যর্থ আজ তব আগমন
হৃদয়ের মরুভূমে অবলুপ্ত তোমার আহ্বান—
সুতীব্র দহনে ওঠে বঙ্গদেশ ভরিয়া ক্রন্দন
হে জননী কোথা তব শরতের আনন্দের গান?

জীবন আনন্দহীন; লেখনী সে চলেনাক আর
তবুও লিখিতে হবে মূল্যহীন কথা ও কবিতা—
অভাগা স্বদেশ মোর, দারিদ্র্যের দহন-সম্ভার
জ্বালিল নূতন রূপে লেলিহান জীবনের চিতা।

বেদনার কারাগারে আনন্দ পুড়িয়া হোল ছাই
মরণ আসিল যেন প্রলয়ের দীপশিখা জ্বালি—
অসংখ্য বঞ্চিত প্রাণ মুখে কথা শুধু নাই নাই
অশ্রু-উৎসব-সিক্ত আঙিনায় ঝরিছে শেফালি।

"জননী ফিরিয়া যাও" ক্ষীণ কণ্ঠে ওঠে কলরব—
দৈন্যের জীবন্ত গ্লানি মোরা সবে করি অনুভব।

জাতীয় দাবী—

ডক্টর শ্রীশ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয় দিল্লী ও লাহোরে যাইয়া ভারতের বিভিন্ন দলের রাজনীতিক নেতৃবৃন্দের সহিত আলোচনা করিয়া সকলের সম্মতি অনুসারে নিম্নলিখিত জাতীয় দাবী স্থির করিয়াছেন—(১) ভারতকে স্বাধীন বলিয়া ঘোষণা করিতে হইবে (২) যাহাতে ভারতে জাতীয় গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহাকে সকল অধিকার প্রদান করা হয়, সেজন্য বৃটীশ গভর্ণমেণ্টকে ব্যবস্থা করিতে হইবে (৩) সকল প্রধান দলের প্রতিনিধি লইয়া ভারতীয় জাতীয় গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে (৪) অধিকার প্রদানের ফলে 'ইণ্ডিয়া অফিস' তুলিয়া দিতে হইবে (৫) ঐরূপ একইভাবে প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্ট গঠন করিতে হইবে (৬) ভারতীয় জাতীয় গভর্ণমেণ্ট বিদেশের সহিত যুদ্ধ ঘোষণা করিবেন না এবং ঐ সকল শত্রুজাতির সহিত পৃথক সন্ধি করিতে পারিবেন না (৭) ভারতীয় জাতীয় গভর্ণমেণ্টের যুদ্ধনীতি বৃটীশ গভর্ণমেণ্টের যুদ্ধনীতির সহিত একই রূপ হইবে (৮) ভারতের জঙ্গীলাটই ভারতের সৈন্যদল পরিচালনা করিবেন (৯) ভারতীয় জাতীয় গভর্ণমেণ্ট এ দেশে সৈন্য সংগ্রহ করিবেন ও দেশে শিল্পপ্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করিবেন। (১০) জাতীয় গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক গঠিত প্রতিনিধিমূলক পরিষদ ভারতের ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্র স্থির করিবেন। যে সকল অল্পসংখ্যক জাতি উক্ত শাসনতন্ত্র পছন্দ না করিবেন, তাঁহারা আন্তর্জাতিক সালিশ বোর্ডে তাঁহাদের অভিযোগ জানাইয়া তাহার প্রতিকারের ব্যবস্থা করিতে পারিবেন।

জয়াকর ও সাপ্রু—

বোম্বায়ের প্রসিদ্ধ ব্যবহারাজীব ও রাষ্ট্রনেতা শ্রীযুত মুকুন্দরাম রাও জয়াকর ও এলাহাবাদের স্যার তেজবাহাদুর সাপ্রু এ সময়ে এক সংযুক্ত বিবৃতি প্রকাশ করিয়া তাঁদের মনের কথা প্রকাশ করিয়াছেন—তাঁহারা বলিয়াছেন—(১) মুসলিম্ লীগ, হিন্দু মহাসভা ও অন্যান্য রাজনীতিকদল লইয়া এখনই জাতীয় গভর্ণমেণ্ট গঠন করা দরকার। তাঁহাদের সহিত কংগ্রেস নেতাদের আলোচনার সুবিধা করিয়া দিতে হইবে; যদি জেলের মধ্যে বসিয়া কংগ্রেস-নেতারা আলোচনায় সম্মত না হন, তবে তাঁহাদের এখনই মুক্তি দিতে হবে। (২) এখন যে জাতীয় গভর্ণমেণ্ট গঠিত হইবে, তাহার সহিত সম্প্রদায় বিশেষের প্রতিনিধিত্বের কোন সম্বন্ধ থাকিবে না—স্থায়ী গভর্ণমেণ্ট গঠনের সময় প্রতিনিধি গ্রহণ স্থির করা হইবে। (৩) কংগ্রেস কর্মীরা তখনই সত্যাগ্রহ আন্দোলন প্রত্যাহার করিবেন—তাঁহারা তাহা না করিলে যে দল নূতন গভর্ণমেণ্ট গঠন করিবেন,সে দলকে বর্ত্তমান আন্দোলন প্রত্যাহারের দায়িত্ব লইতে হইবে (৪) যে দল জাতীয় গভর্ণমেণ্ট গঠন করিবেন, শত্রু আসিলে তাঁহারা শত্রুদের বাধা দিতে বাধ্য থাকিবেন, যুদ্ধের সময় সামরিক কার্য্যে সকলপ্রকার সাহায্য দান করিবেন ও লণ্ডনের সমর পরিষদের নির্দ্দেশ মত জঙ্গীলাট যাহা করিবেন, তাহাই সমর্থন করিবেন। (৫) এখনই বিলাতের ইণ্ডিয়া অফিস তুলিয়া দিতে হইবে (৬) যুদ্ধের পর অন্যান্য বিষয়ে ভারতের সহিত বৃটেনের বুঝাপড়া হইবে। (৭) এ সময়ে বৃটীশ প্রধান মন্ত্রী বা ভারতের বড় লাট যাহা বলিতেছেন তাহা আদৌ আশাপ্রদ নহে। তাঁহাদের মনের ভাব পরিবর্ত্তন করিয়া ভারতের সহিত মিটমাটের মত কথা বলিতে হইবে। বৃটীশ জাতি আয়ার্লণ্ড, ক্যানাডা প্রভৃতি দেশে বিদ্রোহী নেতাদের সহিত আপোষ করিয়াছেন। এদেশে তাহা না করিবার কোন কারণ নাই। কাজেই কারারুদ্ধ নেতাদের সহিতই সর্ব্বপ্রথম মিটমাটের কথা বলিতে হইবে।

নেতৃবৃন্দের আবেদন—

১০ই সেপ্টেম্বর নয়া দিল্লী হইতে নিম্নলিখিত নেতৃবৃন্দের স্বাক্ষরিত এক আবেদন প্রচারিত হয় (১) সিন্ধুপ্রদেশের প্রধান মন্ত্রী ও আজাদ মুসলেম সম্মিলনের সভাপতি আল্লা বক্স (২) বাঙ্গালার মন্ত্রী ও হিন্দু মহাসভার কার্য্যকরী সভাপতি ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় (৩) বাঙ্গালার প্রধান মন্ত্রী এ-কে ফজলল হক (৪) বাঙ্গালার মন্ত্রী ঢাকার নবাব কে, কে, হবিবুল্লা (৫) পাঞ্জাবের মন্ত্রী সর্দ্দার বলদেব সিং (৬) শিরোমণি গুরুদ্বার প্রবন্ধক কমিটীর সভাপতি মাষ্টার তারা সিং (৭) কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার সার এস-রাধাকৃষ্ণণ (৮) সার গোকুলচাঁদ নারাং (৯) বঙ্গীয় হিন্দু মহাসভার কার্য্যকরী সভাপতি শ্রীযুত নির্ম্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১০) পাঞ্জাব ব্যবস্থাপক সভার সদস্য জ্ঞানী কর্ত্তার সিং (১১) নিখিল ভারত মোমিন সম্মিলনের সভাপতি মোহম্মদ জাহিরউদ্দীন (১২) সীমান্ত প্রদেশ হিন্দু মহাসভার সভাপতি মেহের চাঁদ খান্না (১৩) যুক্ত প্রদেশ হিন্দু মহাসভার কার্য্যকরী সভাপতি রাজা মহেশ্বর দয়াল (১৪) আজাদ মুসলেম বোর্ডের সাধারণ সম্পাদক ডাক্তার এস-এস আন্সারী ও (১৫) কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য শ্রীযুত ক্ষিতীশচন্দ্র নিয়োগী। এই আবেদনে ভারতকে এখনই স্বাধীনতা প্রদান করিতে বলা হইয়াছে। বর্ত্তমান দুর্দ্দিনে ভারতকে প্রকৃত ক্ষমতা দেওয়া না হইলে ভারতের গণ্ডগোল মিটান যে অসম্ভব, তাহাও আবেদনে বলা হইয়াছে। তারযোগে আবেদনটি বিলাতে প্রধান মন্ত্রীর নিকট ও এখানে বড়লাটের নিকট পাঠান হইয়াছে।

মনীষী হীরেন্দ্রনাথ দত্ত—

সুধী মনীষী হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় গত ১৬ই সেপ্টেম্বর বুধবার দ্বিপ্রহরে তাঁহার কলিকাতা হাতীবাগানস্থ ভবনে ৭৫ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। গত ৭ই আগষ্ট

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রথম মৃত্যু বার্ষিক দিবসে তিনি টাউন হলের সভায় সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন। সাধারণ সভায় ইহাই তাঁহার শেষ যোগদান। যৌবনে কৃতিত্বের সহিত এম-এ, বি-এল পাশ করিয়া ও পি-আর-এস বৃত্তি লাভ করিয়া তিনি ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে এটর্নী হন। তদবধি প্রায় ৫০ বৎসর কাল তিনি আইনজীবীর কাজ করিয়াছেন। কিন্তু তিনি শুধু অর্থার্জ্জনে মন না দিয়া জ্ঞানার্জ্জনেও জীবনের প্রভুত সময় ব্যয় করিতেন। তিনি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা এবং বহুকাল উহার সম্পাদক ও সভাপতিরূপে উহার প্রাণ-স্বরূপ ছিলেন। তিনি জাতীয় শিক্ষা পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান পরিচালকরূপে বহু দিন উহার সেবা করিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথের বিশ্ব-

মণীষী হীরেন্দ্রনাথ দত্ত
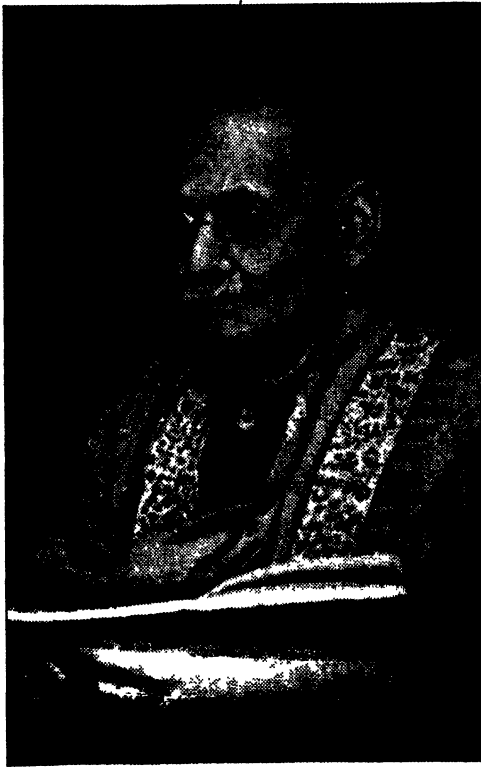
ভারতীরও তিনি অন্যতম সহ-সভাপতি ছিলেন। কংগ্রেস আন্দোলনের সহিত বহু বৎসর তাঁহার সংযোগ ছিল এবং ১৯২০ খৃষ্টাব্দে এনি বেসাণ্ট যখন কংগ্রেস ত্যাগ করেন তিনিও তখন উহা ত্যাগ করেন। তিনি বাঙ্গালা দেশে 'থিয়সফি' আন্দোলনের প্রধান সমর্থক ছিলেন এবং সে কার্য্যে এনি বেসাণ্ট মহোদয়ার প্রধান শিষ্য ছিলেন। তাঁহার মত সুপণ্ডিত ও সুবক্তা অতি অল্পই দেখা যায়। তিনি হিন্দু মহাসভার বাঙ্গালা শাখার সভাপতিরূপেও কিছুকাল কাজ করিয়াছিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে জগত্তারিণী পদক দান করিয়া ও কমলা অধ্যাপক নিযুক্ত করিয়া সম্মানিত করিয়াছিলেন। তাঁহার ৪ পুত্র, ৩ কন্যা ও বিধবা পত্নী বর্ত্তমান। কলিকাতার বহু জনহিতকর প্রতিষ্ঠান ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের সহিত হীরেন্দ্রবাবুর সংযোগ ছিল। তিনি গীতায় ঈশ্বরবাদ, উপনিষদ, বেদান্ত-পরিচয়, কর্ম্মবাদ ও জন্মান্তর, অবতারবাদ, প্রেম ধর্ম্ম, রাসলীলা প্রভৃতি বহু পুস্তক লিখিয়া গিয়াছেন।

যোগেশচন্দ্র চৌধুরী—

প্রসিদ্ধ নট ও নাট্যকার যোগেশচন্দ্র চৌধুরী মহাশয় ৫৫ বৎসর বয়সে গত ১৬ই সেপ্টেম্বর বুধবার বিকালে পরলোকগমন করিয়াছেন। যোগেশচন্দ্র ২৪ পরগণা জেলার গোবরডাঙ্গার অধিবাসী ছিলেন ও গোবরডাঙ্গা স্কুলে বহুদিন শিক্ষকের কাজ করিয়াছিলেন। বাল্যকাল হইতে অভিনয়ের প্রতি তাঁহার আগ্রহ ছিল। ১৩৩১ সালে তিনি শ্রীযুত শিশিরকুমার ভাদুড়ীর সহিত রঙ্গমঞ্চে অভিনয় আরম্ভ করেন। পরে শিশিরবাবুর প্রেরণায় তিনি যে 'সীতা' নাটক রচনা করিয়াছিলেন, তাহার সমাদরের কথা এখনও সকলের স্মরণ আছে। তাঁহার রচিত 'দিগ্বিজয়ী' 'বিষ্ণুপ্রিয়া' 'নন্দরাণীর সংসার' 'পরিণীতা' 'মহামায়ার চর' প্রভৃতি নাটক সমারোহের সহিত অভিনীত হইয়া ছিল। ১৯৩১ সালে তিনি শিশিরবাবুর সম্প্রদায়ের সহিত আমেরিকায় যাইয়া অভিনয় করিয়া আসিয়াছিলেন।

সার লালগোপাল মুখোপাধ্যায়—

এলাহাবাদ হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব বিচারপতি সার লালগোপাল মুখোপাধ্যায় মহাশয় গত ৯ই আগষ্ট এলাহাবাদে পরলোকগমন করিয়াছেন। ১৮৭৪ সালে তাহার জন্ম হয় এবং ১৮৯৬ সালে তিনি গাজিপুরে ওকালতী আরম্ভ করেন। মুন্সেফ, সাবজজ ও ভারত সরকারের ব্যবস্থা বিভাগের বড় চাকুরীয়া হইবার পর ১৯২৩ সালে তিনি এলাহাবাদ হাইকোর্টের জজ নিযুক্ত হন। ১৯৩২ সালে দুইবার তাঁহাকে প্রধান বিচারপতির কার্য্য করিতে হয় ও সেই বৎসরই তিনি সার উপাধি পান। ১৯৩৪ সালে অবসর গ্রহণ করিয়া তিনি কাশ্মীর রাজ্যে কিছুকাল চাকরী করিয়াছিলেন। তিনি বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের অনুরাগী ছিলেন এবং প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মিলনের কার্য্যে বিশেষ উৎসাহ দান করিতেন। কলিকাতায় প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মিলনের অধিবেশনে তাঁহাকে সভাপতি করা হইয়াছিল।

হতাহতের সংখ্যা—

১৬ই সেপ্টেম্বর নয়াদিল্লীতে কেন্দ্রীয় পরিষদে মিঃ আবদুলগণির প্রশ্নের উত্তরে স্বরাষ্ট্র সদস্য সার রেজিনাল্ড ম্যাক্সওয়েল জানাইয়াছেন—তখন পর্য্যন্ত পুলিসের গুলীতে ৩৪০ জন নিহত ও ৮৫০ জন আহত হইয়াছে। বিহারের অনেক স্থানের খবর তখনও দিল্লীতে পৌঁছে নাই। সে জন্য ঐ সংখ্যা সঠিক নহে। সৈন্যগণের দ্বারা মোট ৩১৮ জন নিহত ও ১৫৩ জন আহত হইয়াছে। জনতা দ্বারা ৩১ জন পুলিস নিহত ও বহু পুলিস আহত হইয়াছে। ১১ জন সৈন্য নিহত ও ৭ জন সৈন্য আহত হইয়াছে। রেল, ডাক, তার প্রভৃতি বিভাগেরও ৭জন নিহত ও ১৩ জন আহত হইয়াছে। জনতা কর্ত্তৃক তখন পর্য্যন্ত ৭০টী

থানা ও ফাঁড়ি আক্রান্ত হইয়াছিল, তন্মধ্যে ৪৫টি ধ্বংস করা হইয়াছে। অন্য ৮৫টি সরকারী বাড়ী আক্রান্ত হইয়াছে ও তাহার অধিকাংশই নষ্ট করা হইয়াছে। পুলিস বা সৈন্যদল কোন বাড়ী নষ্ট করে নাই।

প্রধান মন্ত্রীর উপাধি ত্যাগ—

সিন্ধু দেশের প্রধান মন্ত্রী খান বাহাদুর আল্লা বক্‌শ্‌ বৃটীশ গভর্ণমেণ্টের বর্ত্তমান শাসননীতির প্রতিবাদে খানবাহাদুর এবং ও-বি-ই উপাধি ত্যাগ করিয়াছেন। প্রধান মন্ত্রী জানাইয়াছেন যে তিনি একসঙ্গে সাম্রাজ্যবাদ ও নাৎসীবাদ উভয়ই ধ্বংস করিতে চান। সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস করা তাঁহার জন্মগত অধিকার—আর এসময়ে ভারতে কেহ আক্রমণ করিলে তাহাকে বাধা দেওয়া প্রত্যেক ভারতবাসীর কর্ত্তব্য। তিনি বড়লাটকে একখানি পত্র লিখিয়া উপাধি ত্যাগের কথা জানাইয়াছেন। প্রধান মন্ত্রী-রূপে তাঁহার এ কার্য্য সাহসের পরিচায়ক সন্দেহ নাই।

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান অধ্যাপক—

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট সভা নিম্নলিখিত অধ্যাপক-গণকে নিজ নিজ বিভাগের প্রধান অধ্যাপক পদে নিযুক্ত করিয়াছেন—অধ্যাপক নিখিলরঞ্জন সেন (ফলিত গণিত—৫ বৎসরের জন্য), অধ্যাপক মেঘনাথ সাহা (ফলিত পদার্থবিজ্ঞান—৫ বৎসরের জন্য), অধ্যাপক ফণীন্দ্রনাথ ঘোষ (ফলিত পদার্থ বিজ্ঞান—২ বৎসরের জন্য), অধ্যাপক বীরেশচন্দ্র গুহ (ফলিত রসায়ণ—৫ বৎসরের জন্য), অধ্যাপক এস পি আগারকার (উদ্ভিদ্‌ বিজ্ঞান—২ বৎসরের জন্য), অধ্যাপক প্রফুল্লচন্দ্র মিত্র (সাধারণ রসায়ন—১ বৎসরের জন্য), অধ্যাপক প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ (সংখ্যা বিজ্ঞান—১ বৎসরের জন্য)।

প্রধান মন্ত্রীর বিবৃতি—

গত ১৫ই সেপ্টেম্বর বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে প্রধান মন্ত্রী মিঃ এ-কে-ফজলল হক যে বিবৃতি দিয়াছেন, তাহাতে বর্ত্তমান রাজনীতিক অবস্থা সম্পর্কে বিশেষ কিছুই নাই। তিনি বাঙ্গালার লোকদিগের ভাত-ডাল সংগ্রহেও নিজের অক্ষমতা জ্ঞাপন করিয়াছেন। বিহারে রেলপথ নষ্ট হওয়ায় এবং অন্য প্রদেশ হইতে নিত্য প্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্যাদির আমদানীর প্রয়োজন থাকায় সরকার নিয়ন্ত্রিত মূল্যে মাল সরবরাহে অসমর্থ হইয়াছেন। যুদ্ধ উপস্থিত হইলে বা বোমা পড়িলে প্রজাদিগের দুঃখদুর্দ্দশা গভর্ণমেণ্ট কি ভাবে দূর করিবেন; সে ব্যবস্থার কথা বিস্তৃতভাবে বলিলেও প্রধান মন্ত্রী মহাশয় এখন লোক যে খাদ্যাভাবে না খাইয়া মরিবে, তাহার কোন ব্যবস্থা করিতে অক্ষমতা জ্ঞাপন করিয়াছেন। তাঁহার বক্তৃতায় হতাশ হইয়া পড়িতে হয়।

স্কুল-কলেজ বন্ধ—

গত ১২ই সেপ্টেম্বর বাঙ্গালা সরকারের দপ্তরখানায় শিক্ষামন্ত্রী খাঁ বাহাদুর আবদুল করিমের সভাপতিত্বে এক সম্মিলনে স্থির হইয়াছে যে ১৪ই সেপ্টেম্বর হইতে কলিকাতার সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান—স্কুল কলেজ প্রভৃতি পূজার ছুটীর শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত বন্ধ রাখা হইবে। সকল বে-সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকেও বন্ধ রাখিতে অনুরোধ করা হইয়াছে। যে সকল স্কুল কলেজ বন্ধ করা হইল, তাহাদের শিক্ষক ও অধ্যাপকগণকে সাহায্য দানের জন্য বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্ট ৫ লক্ষ টাকা ব্যয় মঞ্জুর করিয়াছেন। সে টাকা সকলের মধ্যে বিভাগ করিয়া দেওয়া হইবে স্থির হইয়াছে।

শ্রীযুত শরৎচন্দ্র বসুর স্বাস্থ্য—

দিল্লীতে ব্যবস্থা পরিষদে শ্রীযুত অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের প্রশ্নের উত্তরে স্বরাষ্ট্র সদস্য জানাইয়াছেন—শ্রীযুত শরৎচন্দ্র বসু গ্রেপ্তারের পূর্ব্ব হইতেই বহুমূত্র রোগে ভুগিতেছিলেন; তাঁহার স্বাস্থ্য কখনও সন্তোষজনক হইতে পারে না। মারকারার (ঐ স্থানে তাঁহাকে আটক রাখা হইয়াছে) ডাক্তার ছাড়াও গত জুলাই মাসে মাদ্রাজের একজন ডাক্তার তাঁহাকে পরীক্ষা করিয়াছেন; সে সময় তাঁহার দেহের ওজন ১৬০ পাউণ্ড ছিল; ডাক্তারের মতে ঐ ওজনই ভাল। পরে তাঁহার ওজন কিছু বাড়িয়াছে বটে, কিন্তু গ্রেপ্তারের সময় ওজন আরও অধিক ছিল। সন্ধ্যার দিকে তাঁহার উত্তাপ সামান্য বৃদ্ধি পায় বটে, কিন্তু ডাক্তারের মতে উহাতে ভয়ের কারণ নাই। মারকারায় বর্ষা অধিক বলিয়া বহুমূত্র রোগীর এ সময়ে তথায় স্বাস্থ্যহানি হওয়া স্বাভাবিক—বর্ষার পর তাঁহার স্বাস্থ্য ভাল হইতে পারে। গভর্ণমেণ্ট এখন তাঁহাকে অন্য কোথাও স্থানান্তরিত করিবেন না বা কার্সিয়াংয়ে তাঁহার পরিবার-বর্গের সহিত নিজবাটীতে তাঁহাকে থাকিতে দিবেন না। ইহাই শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে সর্ব্বশেষ সংবাদ।

রাজসাহীতে পদত্যাগ—

রাজসাহী মিউনিসিপালিটীর কমিশনার সংখ্যা ২১ জন। তন্মধ্যে ৭জন কংগ্রেস মনোনীত কমিশনার সম্প্রতি পদত্যাগ করিয়াছেন। কিন্তু তারপর?

পরলোকে ললিতা রায়—

রেঙ্গুনের ব্যারিষ্টার মিঃ আর-কে রায়ের পত্নী ললিতা রায় বি-এ, বি-টি গত ৩০শে আগষ্ট কলিকাতায় পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি কলিকাতা ব্রাহ্ম বালিকা বিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব প্রিন্সিপাল এবং সিমলা লেডী আরউইন কলেজের প্রতিষ্ঠাত্রী-প্রিন্সিপাল ছিলেন। বিবাহের পর রেঙ্গুনে যাইয়া তথায় 'সারদাসদন' নামে এক প্রকাণ্ড বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। পরলোকগতা ললিতার চেষ্টায় ৪০ হাজার টাকা ব্যয়ে সারদা সদনের নূতন গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছিল।

কৃতী ছাত্রদের নাম—

এবার ম্যাট্রিকুলেসন পরীক্ষায় নিম্নলিখিত ছাত্রবৃন্দ প্রথম কয়টি স্থান অধিকার করিয়াছেন (১) কলিকাতা টাউন স্কুলের ছাত্র শ্রীমান অশেষপ্রসাদ মিত্র (২) শিলচর গভর্ণমেণ্ট হাইস্কুলের ছাত্র রঞ্জনকুমার সোম (৩) বালীগঞ্জ গভর্ণমেণ্ট হাইস্কুলের অজিতকুমার দাশগুপ্ত (৪) রঙ্গপুর জেলা স্কুলের শান্তিব্রত ঘোষ (৫) নলবাড়ী গর্ডন হাইস্কুলের দীনেশচন্দ্র মিত্র (৬) শ্রীহট্ট গভর্ণমেণ্ট হাইস্কুলের হেমেন্দ্রপ্রসাদ বড়ুয়া (৭) বালীগঞ্জ গভর্ণমেণ্ট হাই স্কুলের সুনীল রায়চৌধুরী (৮) বালীগঞ্জ জগবন্ধু ইনিষ্টিটিউসনের কল্যাণকুমার ভট্টাচার্য্য ও কাশী এ্যাংলো...হাইস্কুলের

ধনঞ্জয় নন্দীপুরী (৯) শ্যামবাজার এ-ভি স্কুলের বনমালী দাস ও মহিয়াড়ী কুণ্ডুচৌধুরী ইনিষ্টিটিউসনের অমলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় —আমরা এই সকল ছাত্রের জীবনে সাফল্য কামনা করি।

রাজনীতিক বন্দীদের মুক্তি সমস্যা—

বাঙ্গালার রাজনীতিক বন্দীদের মুক্তিসমস্যা সম্বন্ধে আলোচনার জন্য গত মে মাসে একটি কমিটী গঠিত হইয়াছিল। কমিটীর সদস্য ছিলেন—কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি মিঃ প্যাংক্রিজ, ভূতপূর্ব্ব বিচারপতি সার শরৎকুমার ঘোষ ও অবসর প্রাপ্ত জিলা জজ মিঃ এস-এম-মটস, কমিটী ৩০০ রাজবন্দীর কথা বিবেচনা করিয়া গত আগষ্ট মাসের শেষে রিপোর্ট দাখিল করিয়াছেন। এখন ঐ রিপোর্ট বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্টের বিচারাধীন।

লবণ সমস্যা—

দিল্লীতে ব্যবস্থা-পরিষদে শ্রীযুত ক্ষিতীশচন্দ্র নিয়োগীর প্রশ্নের উত্তরে ভারত সরকার জানাইয়াছেন—যুদ্ধের দরুণ জাহাজের অসুবিধার জন্য এই বৎসরে গত ৭ মাসের মধ্যে কলিকাতায় পর্য্যাপ্ত পরিমাণে সমুদ্রজাত লবণ সরবরাহ করা যায় নাই। ফলে কলিকাতায় মজুত লবণের পরিমাণ যথেষ্ট কমিয়া গিয়াছে। ইহার ফলে জনসাধারণের কিঞ্চিৎ (?) অসুবিধা হইয়াছে। এ বিষয়ে বাঙ্গালা সরকার ও ভারত সরকারের চেষ্টার ফলে জাহাজের ব্যবস্থা হওয়ায় কলিকাতায় পর্য্যাপ্ত পরিমাণে (কই ?) সমুদ্রজাত লবণ আসিতেছে। রাজপুতানা, ইসারা খোদা ও খেওড়ায় যে বৎসরে প্রায় ১৪০ লক্ষ মণ লবণ উৎপন্ন হয়, তাহার সমস্তই মধ্য ও উত্তর ভারতের বাজারগুলিতে বিক্রীত হয়। ঐ সকল কেন্দ্রে অধিকতর লবণ উৎপাদন করা সম্ভব নহে। সাদা মিহি লবণও ঐ অঞ্চলে উৎপন্ন হয় না। রাজপুতানার মজুত লবণ এবং করাচী ও পশ্চিম ভারতের কেন্দ্রে উৎপন্ন লবণ—প্রয়োজন হইলে বাঙ্গালায় সরবরাহ করা যাইতে পারে। (সরকারের মতে কবে প্রয়োজন হইবে, তাহা আমরা জানি না। কলিকাতার বাজারে আজও সকল দোকানে লবণ নাই—যেখানে আছে সেখানে মূল্য মণ করা ৭ টাকার কম নহে।) রেলে মাল চালানের অসুবিধা হইতেছে। সমুদ্রপথ বন্ধ হইলে রেলে চালান দিতেই হইবে। বাঙ্গালা দেশে লাইসেন্স প্রাপ্ত ৭টি লবণের কারখানা আছে। ঐ কারখানাগুলিতে বৎসরে মাত্র ২৫ হাজার মণ লবণ উৎপন্ন হয়। বাঙ্গালার সমুদ্র তীরের গ্রামগুলিতে লবণ প্রস্তুতের সুবিধা দান সম্পর্কে একটি পরিকল্পনা আছে—বর্ষার পর তাহা কার্য্যে পরিণত করা হইলে বাঙ্গালায় কিছু বেশী লবণ তৈয়ার হইবে। সেই পরিকল্পনাটি কি, তাহাও জনসাধারণ এখনও জানিতে পারে নাই।

প্রাদেশিক হিন্দুসভার সিদ্ধান্ত—

গত ২৭শে সেপ্টেম্বর বঙ্গীয় প্রাদেশিক হিন্দু মহাসভার কার্য্যকরী সংসদের সভায় দুইটি বিশেষ প্রয়োজনীয় প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। প্রথম প্রস্তাবে শুধু হিন্দুদের উপর পাইকারী জরিমানা আদায়ের ব্যবস্থা হওয়ায় সে ব্যবস্থার নিন্দা করা হইয়াছে। কোন লোকই অশান্তিকে সমর্থন করেন না—হিন্দুরা যে শুধু ঐ অশান্তির জন্য দায়ী তাহা নহে—সে অবস্থায় শুধু হিন্দুদের নিকট হইতে জরিমানা আদায়ের ব্যবস্থা যুক্তিযুক্ত হয় নাই। দ্বিতীয় প্রস্তাবে—মন্ত্রী ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে ও অন্যান্য হিন্দু নেতাদিগকে বড়লাট গান্ধীজির সহিত সাক্ষাতের অনুমতি দেন নাই ; ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ সকল রাজনীতিক দলকে একত্র করিয়া গভর্ণমেণ্টের সহিত আপোষের চেষ্টা করিয়াছিলেন—গান্ধীজীর সহিত এ বিষয়ে পরামর্শ করিতে না পারায় তাঁহার চেষ্টা আর দ্রুত ফলবতী হইবে না—বড়লাটের এই ব্যবস্থারও নিন্দা করা হইয়াছে। গভর্ণমেণ্টের এই ব্যবহারে হিন্দুসভাও তাঁহাদের কার্য্যপদ্ধতি পরিবর্ত্তন করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন।

ভ্রম সংশোধন—

গত শ্রাবণের ভারতবর্ষে 'বাঙ্গালারযাত্রা সাহিত্য ও গণশিক্ষা' শীর্ষক প্রবন্ধে (১৫২ পৃষ্ঠা) ভ্রমক্রমে ৺অঘোরনাথ কাব্যতীর্থ ছাপা হইয়াছে। আমরা জানিয়া আনন্দিত হইলাম যে পণ্ডিত অঘোরনাথ কাব্যতীর্থ জীবিত। আমরা এই ভ্রমের জন্য দুঃখিত। শ্রীভগবানের নিকট প্রার্থনা করি, পণ্ডিত মহাশয় দীর্ঘজীবন লাভ করিয়া বঙ্গসাহিত্যের সেবা করুন।

গান্ধীজির সাক্ষাৎ মিলিল না—

হিন্দু মহাসভার নেতারা মহাত্মা গান্ধী ও অন্যান্য কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বর্ত্তমান রাজনীতিক অবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা করিবার অনুমতি চাহিয়াছিলেন। বড়লাট সে অনুমতি দেন নাই। সেজন্য ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুত নির্ম্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও মেজর পি-বর্দ্ধন গত ১৫ই সেপ্টেম্বর কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়াছেন।

কলিকাতায় মেশিন গান—

গত ২১শে সেপ্টেম্বর দিল্লীতে কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে শ্রীযুত অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের প্রশ্নের উত্তরে গভর্ণমেণ্ট হইতে জানান হইয়াছে—কলিকাতার পথে মেশিন গান চালাইয়া ১৫০ জন লোক নিহত হইয়াছিল বলিয়া যে গুজব রটিয়াছিল, তাহা ঠিক নহে। কলিকাতায় উড়োজাহাজ হইতে কাঁদুনে গ্যাস ও জ্বালানো বোমা ফেলা হইয়াছিল বলিয়া যে গুজব রটিয়াছিল, তাহাও সত্য নহে। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটীর সদস্যগণকে ভারতবর্ষ হইতে নির্ব্বাসিত করা সম্বন্ধেও গভর্ণমেণ্ট কিছু জানেন না। সংবাদগুলি পাইয়া লোক নিশ্চিন্ত হইবে।'

প্রধান মন্ত্রীর আপোষ চেষ্টা—

বাঙ্গালার প্রধান মন্ত্রী মিঃ এ-কে ফজলল হক অক্টোবর মাসের প্রথমে দিল্লীতে যাইয়া আপোষ চেষ্টা করিবেন। ভারতের সকল রাজনীতিক নেতার সহিত পরামর্শ করিয়া তিনি মিলিত দাবী স্থির করিবেন—সেজন্য তিনি ইতিমধ্যে বহু নেতার সহিত পত্র ব্যবহারও করিতেছেন। দেখা যাউক, ফল কি হয়।

পোড়ামাটি নীতি—

২৫শে সেপ্টেম্বর দিল্লীতে রাষ্ট্রীয় পরিষদে প্রশ্নোত্তরে জানা গিয়াছে যে প্রয়োজন মনে করিলে গভর্ণমেণ্ট শত্রুকে সকল সুবিধা-গ্রহণ হইতে বঞ্চিত করিবার জন্য পোড়ামাটী নীতি অনুসরণ করিবেন অর্থাৎ সমস্ত জিনিষ নিজেরাই জ্বালাইয়া দিবেন।

অবশ্য তাঁহারা জ্বালাইবার পূর্ব্বে জিনিষপত্র যতটা সম্ভব সরাইয়া ফেলিবেন। গভর্ণমেণ্ট হইতে আশ্বাস দেওয়া হইয়াছে যে সাধারণের সম্পত্তি নষ্ট না করিয়া গভর্ণমেণ্টের সম্পত্তিই জ্বালান হইবে।

আকাশ হইতে মেশিনগান চালানো—

২৫শে সেপ্টেম্বর দিল্লীতে রাষ্ট্রীয় পরিষদে পণ্ডিত কুঞ্জরু প্রশ্নের উত্তরে সরকার পক্ষ হইতে বলা হইয়াছে—নিম্নলিখিত ৫টি স্থানে উড়োজাহাজে করিয়া আকাশ হইতে জনতার উপর মেশিন গানের সাহায্যে গুলীবর্ষণ করা হইয়াছে—(১) পাটনা জেলায় বিহার সরিফ হইতে ১২ মাইল দক্ষিণে গিরিয়াকের নিকট রেলের উপর (২) ভাগলপুর জেলায় থুরসেলার ১৫ মাইল দক্ষিণে ভাগলপুর হইতে সাহেবগঞ্জ যাইবার রেল লাইনের উপর (৩) নদীয়া জেলায় কৃষ্ণনগরের ১৬ মাইল দক্ষিণে রাণাঘাটের নিকট (৪) মুঙ্গের জেলায় হাজিপুর হইতে কাটিহার লাইনে পাশরাহা ও মহেশখুণ্ডের মধ্যবর্ত্তী অস্থায়ী ষ্টেশনে (৫) তালচর রাজ্যে তালচর সহরের ২।৩ মাইল দক্ষিণে। আশ্চর্য্যের বিষয়, এই সকল গুলীবর্ষণের সংবাদ সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয় নাই।

চিনি সমস্যা—

২৫শে সেপ্টেম্বর বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে মন্ত্রী ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় জানাইয়াছেন—চিনির জন্য বাঙ্গালাকে বিহার ও যুক্তপ্রদেশের উপর নির্ভর করিতে হয়। গভর্ণমেণ্ট বিহার হইতে ২৮ শত টন চিনি আনিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। গোলমালের জন্য রেলগাড়ী পাওয়া যাইতেছে না—ষ্টীমারে আনার চেষ্টা চলিতেছে। তাহা ছাড়া আড়াই লক্ষ মণ চিনি সম্প্রতি আনা হইয়াছে। সরিষার তেল ও ডাল বিহার ও যুক্তপ্রদেশ হইতে আনিতে হয়। কাজেই ঐ সকল জিনিষও আনা যাইতেছে না। সত্বর ঐ সকল জিনিষ আনার জন্য গভর্ণমেণ্ট চেষ্টার ক্রটী করিবেন না। কিন্তু শুধু ঐ সকল কথা শুনিয়াই কি আমরা নিশ্চিন্ত হইব?

চীনদেশকে ভারতের দান—

গত ২৭শে সেপ্টেম্বর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারভাঙ্গা হলে মন্ত্রী ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সভাপতিত্বে এক সভায় চীনের কন্সাল জেনারেল ডাক্তার সি-জে-পাও সাহেবের মারফত চীনের জাতীয় গভর্ণমেণ্টকে রবীন্দ্রনাথের একখানি চিত্র উপহার দান করা হইয়াছে। শিল্পাচার্য্য ডক্টর অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর চিত্রখানির আবরণ উন্মোচন করিয়াছিলেন। ফেডারেশন অফ্ ইণ্ডিয়ান মিউজিক ও ড্যান্সিং হইতে চিত্র উপস্থত হইয়াছে। এই অনুষ্ঠান ভারতের সহিত চীনের সংস্কৃতির ঐক্যবন্ধন আরও দৃঢ় করিবে।

পাটের কাপড় প্রস্তুত—

গত ২৪শে সেপ্টেম্বর বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় (উচ্চতর পরিষদ) আলোচনা প্রসঙ্গে খান বাহাদুর সৈয়দ মোয়াজ্জামুদ্দীন হোসেন বলিয়াছেন—গভর্ণমেণ্ট যে সস্তা কাপড় বাজারে দিবার কথা বলিয়াছিলেন, সে কাপড় এখনও বাহির হয় নাই। তাহা কিরূপ সস্তা হইবে—পূর্ব্বে কাপড়ের যে দাম ছিল তাহা অপেক্ষা সস্তা হইবে কি না এবং সে কাপড় কবে পাওয়া যাইবে তাহাও জানা যায় না। এ অবস্থায় পাট হইতে যদি কোন সস্তা কাপড় প্রস্তুত করা হয়, তাহা হইলে দরিদ্র লোকগণ তাহা ব্যবহার করিতে পারে। এ বিষয়ে এখনই গভর্ণমেণ্টের ব্যবস্থা করা উচিত। এবার পাট প্রচুর উৎপন্ন হওয়ায় সুলভে পাওয়া যাইতে পারে। প্রস্তাবটি সময়োপযোগী—আশাকরি, কর্ত্তৃপক্ষ বিবেচনা করিয়া দেখিবেন।

সুরেশচন্দ্র পালিত—

কলিকাতা পুলিস আদালতের প্রসিদ্ধ উকীল সুরেশচন্দ্র পালিত মহাশয় গত ২৩শে সেপ্টেম্বর সকালে ৬২ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি কিছুদিন হইতে রক্তের চাপে ভুগিতেছিলেন। মাত্র তিনমাস পূর্ব্বে তাঁহার স্ত্রী-বিয়োগ হইয়াছিল। তিনি পল্লীর বহু জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন।

ভারতীয় সৈন্যদের খবর—

২৩শে সেপ্টেম্বর নয়া দিল্লীতে রাষ্ট্রীয় পরিষদে প্রশ্নোত্তরে জানা গিয়াছে—এ পর্য্যন্ত বিভিন্ন যুদ্ধক্ষেত্রে ২০৯৬ ভারতীয় সৈন্য নিহত ও ৪৫২১ আহত হইয়াছে। ৮৪৮৩৩ ভারতীয় সৈন্য শত্রুর হাতে বন্দী হইয়াছে। বিভিন্ন দেশে ভারতীয় সৈন্যের ক্ষতির বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল—

দেশের নাম	নিহতের সংখ্যা	আহতের সংখ্যা	বন্দীর সংখ্যা	নিখোঁজ
মিশর	৬০৫	২২৭৫	২৪৭৫	১২১৫৮
সুদান ও ইরিত্রিয়া	৬০৬	৩৯৪৩	১	৭ "
প্যালেস্তাইন ও সিরিয়া	৮১	২৮২	০	০
ইরাক ও ইরাণ	৫৯	৮৯	০	৪
সোমালিল্যাণ্ড	৯	২৮	০	০
ফ্রান্স ও ইংলণ্ড	৯	৮	৩২৭	০
ব্রহ্মদেশ	৪১৭	১১৭৩	১	৩৩২৭
সমুদ্রে	৪	১	০	১১৮
মালয়	২০৮	৭২১	১৬	৭০০০০
হংকং	০	১	০	৪১৮৭

ঠাকুর আইন অধ্যাপক—

গত ২৬শে সেপ্টেম্বর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট সভায় নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ 'ঠাকুর আইন অধ্যাপক' নিযুক্ত হইয়াছেন। ঐ অধ্যাপককে আইন সম্পর্কিত একটি বিষয়ে কয়েকটি ধারাবাহিক বক্তৃতা করিতে হয় ও সে জন্য তিনি বার্ষিক ৯ হাজার টাকা পারিশ্রমিক পাইয়া থাকেন—১৯৪২ সালের জন্য শ্রীযুত বলাইলাল পাল নিযুক্ত হইলেন। ১৯৩৬ সালের জন্য বিচারপতি শ্রীযুত বিজনকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে ও ১৯৩৮ সালের জন্য বিচারপতি শ্রীযুত রাধাবিনোদ পাল মহাশয়কে নিযুক্ত করা হইয়াছে; ঐ দুই বৎসরের জন্য যাঁহারা অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়াছিলেন, তাঁহারা যথাসময়ে আসিয়া বক্তৃতা করিতে পারেন নাই। বিচারপতি শ্রীযুত রাধাবিনোদ পাল ইতিপূর্ব্বে ১৯২৫ ও ১৯৩০ সালে ঠাকুর আইন অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

হিন্দু আইনের সংশোধন—

সম্প্রতি কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে হিন্দুর উত্তরাধিকার আইন সংশোধন ও হিন্দুর বিবাহ আইন সংশোধনের জন্য দুইটি বিলের আলোচনা চলিতেছে। নূতন দুইটী বিল সম্পর্কে সর্ব্বসাধারণের অভিমত গ্রহণ করা হইতেছে। ভারতবর্ষের গত জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়, শ্রাবণ ও আশ্বিন সংখ্যায় শ্রীযুত নারায়ণ রায় মহাশয় এ বিষয়ে আলোচনা করিয়াছেন। বঙ্গীয় প্রাদেশিক হিন্দু মহাসভাও একটি কমিটী নিযুক্ত করিয়া দেশের সাধারণের অভিমত গ্রহণপূর্ব্বক তাহা যথাস্থানে জানাইবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। উভয় আইনই আমাদের সামাজিক জীবনের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয় এবং সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্ত্তনের জন্য রচিত। এ বিষয়ে দেশে ব্যাপক আন্দোলন হইলে তদ্বারা দেশবাসী অবশ্যই উপকৃত হইবেন এবং যাঁহারা আইন রচনা করিবেন, দেশবাসীর প্রকৃত মনোভাব জানিয়া তাঁহারাও নিজেদের কর্ত্তব্য স্থির করিতে পারিবেন।

পূর্ণিমা সম্মিলনীতে অবনীন্দ্র সম্বর্দ্ধনা—

গত ৭ই আশ্বিন বৃহস্পতিবার কলিকাতা বালীগঞ্জের পূর্ণিমা সম্মিলনীর সদস্যগণ শিল্পাচার্য্য শ্রীযুত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বেলঘরিয়াস্থ বাগানবাটীতে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে মানপত্র দানে সম্বর্দ্ধনা করিয়াছিলেন। সম্মিলনীর সম্পাদক শ্রীসুব্রত রায়চৌধুরী ও সহ-সভাপতি অধ্যাপক শ্রীকালিদাস নাগ শিল্পাচার্য্যের গুণবর্ণনা করেন ও তাঁহাকে উপহার প্রদান করেন। ঐ উপলক্ষে তথায় কয়েকটি সঙ্গীত গীত হয় এবং কবিতা প্রবন্ধ প্রভৃতি পঠিত হয়। অবনীন্দ্রনাথ সকলকে নিজ বাল্যজীবনের কাহিনী বলেন এবং তাঁহার স্বরচিত একটি ছোট গল্প পাঠ করিয়া শুনাইয়াছিলেন।

নবদ্বীপ মিউনিসিপ্যালিটী—

নেতৃবৃন্দের গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে নদীয়া জেলার নবদ্বীপ মিউনিসিপালিটীর কংগ্রেস পক্ষীয় ৮জন কমিশনারের মধ্যে ৭জন পদত্যাগ করিয়াছেন। বহুস্থানেই এইভাবে মিউনিসিপাল কমিশনারগণ সরকারের সহিত সংশ্রব ত্যাগ করিতেছেন।

নলিনীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়—

কলিকাতা হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব বিচারপতি সার নলিনীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় গত ২০শে ভাদ্র বীরভূম জেলার পাঁচড়া গ্রামে স্বীয় পৈতৃক বাসভবনে পরলোকগমন করিয়াছেন। বিচারপতির পদ হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া তিনি আর কলিকাতায় বাস করেন নাই, গ্রামে যাইয়া বাস করিয়াছিলেন। কিছুদিনের জন্য তিনি বাঙ্গালার গভর্ণরের শাসন পরিষদের সদস্যের কাজ করিয়াছিলেন। তাহার স্বগ্রামের প্রতি ও ধর্ম্মের প্রতি অনুরাগ সকলের পক্ষে অনুকরণযোগ্য।

শ্বেতাঙ্গ সমিতি ও ভারতীয় দাবী—

কলিকাতা প্রবাসী শ্বেতাঙ্গদিগের সমিতির একটি অধিবেশনে এই মর্ম্মে এক প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইয়াছিল যে—বৃটীশ সরকার যে ভারতে এখনই জাতীয় গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠা করিতে উৎসুক, তাহা তাঁহাদের ঘোষণা করা উচিত। এই প্রস্তাব প্রকাশিত হওয়ার পর একদল শ্বেতাঙ্গ ইহার বিরুদ্ধে নিজ নিজ

স্বর্গত মহারাজা সার প্রদ্যোতকুমার ঠাকুর
ইঁহার মৃত্যু-সংবাদ গত মাসের 'ভারতবর্ষে' প্রকাশিত হইয়াছে

অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন বটে, কিন্তু অধিকাংশ শ্বেতাঙ্গ যে এখন ভারতের দাবী সমর্থন করেন, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

বিক্রয়কর ও ধর্ম্মপুস্তক—

গত বৎসর যে সময়ে বিক্রয় কর আইন কলিকাতায় প্রবর্ত্তন হয়, তখন বলা হইয়াছিল যে ধর্ম্মগ্রন্থগুলি ও প্রাথমিক শিক্ষার পুস্তকগুলি বিক্রয়কর আইনের আমল হইতে বাদ যাইবে। বহু দিন পরে সম্প্রতি কোন কোন পুস্তক ধর্ম্মগ্রন্থ বলিয়া বিবেচিত হইবে, তাহার একটি তালিকা সরকার হইতে প্রকাশ করা হইয়াছে। তাহাতে গীতা, চণ্ডী, রামায়ণ, মহাভারত, কোরাণ, ধর্ম্মপদ, বাইবেল, গ্রন্থ-সাহেব প্রভৃতি ২০ খানি পুস্তকের নাম আছে বটে, কিন্তু বহু ধর্ম্ম-পুস্তক তালিকা হইতে বাদ পড়িয়াছে। তন্মধ্যে পুরাণসমূহ, শ্রীমদ্-ভাগবত, চৈতন্যচরিতামৃত, হরিভক্তি-বিলাস প্রভৃতি বহু পুস্তকের নাম করা যাইতে পারে।—এ বিষয়ে কর্ত্তৃপক্ষের মনোযোগ দিয়া

তালিকাটি সম্পূর্ণ করার ব্যবস্থা হওয়া প্রয়োজন। প্রাথমিক শিক্ষার পুস্তক বলিতে গভর্ণমেণ্ট শুধু শিক্ষাবিভাগ কর্তৃক অনুমোদিত বইগুলিই ধরিয়াছেন। কিন্তু সে গুলি ছাড়াও বহু প্রাথমিক শিক্ষা পুস্তক কলিকাতা কর্পোরেশন, বিভিন্ন জেলাবোর্ড প্রভৃতির অনুমোদন লাভ করিয়া বাজারে প্রচারিত হইয়া থাকে। সে বইগুলিও প্রাথমিক শিক্ষার অন্যতম বাহন; সেগুলিকে কেন বাদ দেওয়া হইল, তাহাও বিবেচনা করিয়া দেখা কর্তৃপক্ষের কর্তব্য।

অধ্যাপক মেঘনাদ সাহা—

অধ্যাপক নিবারণচন্দ্র রায়ের মৃত্যুতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিণ্ডিকেট সভার যে সদস্য পদ খালি হইয়াছিল অধ্যাপক ডক্টর মেঘনাদ সাহা সেই পদে নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। যোগ্য ব্যক্তিকেই উপযুক্ত সম্মান প্রদান করা হইয়াছে।

ডক্টর হীরালাল হালদার—

সুপ্রসিদ্ধ অধ্যাপক ডক্টর হীরালাল হালদার মহাশয় গত ১৬ই সেপ্টেম্বর বুধবার সকালে কলিকাতায় ৭৬ বৎসর বয়সে পরলোক-গমন করিয়াছেন। তিনি বহরমপুর কলেজ ও সিটি কলেজে অধ্যাপনার পর ১৯২১ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক নিযুক্ত হন ও সার ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের পর বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনের প্রধান অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ১৯৩৩ সালে তিনি অবসর গ্রহণ করেন। দর্শন শাস্ত্র সম্বন্ধে তাঁহার নূতন গবেষণাপূর্ণ পুস্তকগুলি পৃথিবীর সর্ব্বত্র আদৃত হইয়াছে। তাঁহার এক পুত্র মিঃ এস-কে হালদার আই-সি-এস বর্দ্ধমান বিভাগের কমিশনার। ডক্টর হালদারের মত সুপণ্ডিত অধ্যাপক অতি অল্পই দেখা যায়।

ডাক্তার রাজেন্দ্রনাথ কুণ্ডু—

বীরভূম সিউড়ীর সিভিল সার্জ্জেন ডাক্তার রাজেন্দ্রনাথ কুণ্ডু এম-বি, ডি-টী-এম মহাশয় গত ২৬শে শ্রাবণ মাত্র ৫২ বৎসর

ডাক্তার রাজেন্দ্রনাথ কুণ্ডু

বয়সে তাঁহার কলিকাতার বাসভবনে পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি কলিকাতা মেডিকেল কলেজ, ঢাকা ও চট্টগ্রাম মেডিকেল স্কুলে শিক্ষকতা করার পর চট্টগ্রাম, ভোলা ও ব্রাহ্মণবেড়িয়ার মেডিকেল অফিসারের কাজ করেন। চিকিৎসা শাস্ত্রে তাঁহার প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ছিল।

সরকারী ক্ষতির পরিমাণ—

২২শে সেপ্টেম্বর দিল্লীতে রাষ্ট্রীয় পরিষদে বড়লাটের শাসন পরিষদের সদস্য সার মহম্মদ ওসমান বলিয়াছেন—৯ই আগষ্ট কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের গ্রেপ্তারের পর হইতে বোম্বাই, মাদ্রাজ, মধ্যপ্রদেশ, বাঙ্গালা, যুক্তপ্রদেশ ও বিহারে নানারূপ গণ্ডগোল চলিতেছে। পাঞ্জাব, সিন্ধু ও উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে বিশেষ কিছু হয় নাই। ক্ষতির পরিমাণ সাংঘাতিক। ২৫৮টি রেল ষ্টেশন ধ্বংস করা হইয়াছে—তন্মধ্যে ১৮০টি বিহারে ও বাকীগুলি যুক্তপ্রদেশে। ৪০খানি ট্রেণ লাইনচ্যুত করা হইয়াছে—তাহাতে ১জন রেল কর্ম্মচারী নিহত ও ২১জন কর্ম্মচারী আহত হইয়াছে। সরকারী কর্ম্মচারীদের মধ্যে ৩জন নিহত ও ৩০জন আহত এবং যাত্রীদের মধ্যে ২জন নিহত ও ২৩জন আহত হইয়াছে। রেলের ইঞ্জিন, রেলের পথ ও অন্যান্য গাড়ীসমূহেরও প্রচুর ক্ষতি হইয়াছে। মোট ৫৫০টি ডাকঘর আক্রান্ত হইয়াছিল—তন্মধ্যে ৫০টি একেবারে পুড়িয়া গিয়াছে ও ২০০ ডাকঘরের খুব বেশী ক্ষতি হইয়াছে। তখন পর্য্যন্ত সাড়ে তিন হাজার স্থানে টেলিগ্রাফের তার কাটা হইয়াছে। ডাকঘর হইতে প্রায় এক লক্ষ টাকার নগদ ও ষ্ট্যাম্প লুণ্ঠিত হইয়াছে এবং বহু চিঠির বাক্স স্থানান্তরিত ও নষ্ট করা হইয়াছে। ৭০টি থানা ও ফাঁড়ি এবং ১৪০টি সরকারী বাড়ী আক্রান্ত হইয়াছিল—তন্মধ্যে অধিকাংশই পুড়িয়া গিয়াছে। বহু মিউনিসিপালিটী ও ব্যক্তিগত গৃহও আক্রান্ত হইয়াছিল। রেল, ডাক ও তার বিভাগের ক্ষতি এবং বহু লোকের কর্ম্মচ্যুতি হিসাব করিলে দেখা যায় যে মোট এক কোটি টাকার উপর ক্ষতি হইয়াছে। মধ্য প্রদেশের শুধু নাগপুর জেলাতেই ১ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা ক্ষতি হইয়াছে—মধ্য প্রদেশের আর একটি স্থানে ৩ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা একটি ট্রেজারী হইতে লুণ্ঠিত হইয়াছে (পরে উহার এক লক্ষ টাকা পাওয়া গিয়াছে।)। যুক্তপ্রদেশে একজন ডাক্তারের ডাক্তারখানা হইতে ১০ হাজার টাকা লুঠ হইয়াছে। দিল্লীতে সরকারী গৃহের ক্ষতির পরিমাণ ৮লক্ষ ৮৬ হাজার ৬ শত ১ টাকা। ইহার জন্য পুলিস গুলী চালায় ও নানা স্থানে ৩৯০জন নিহত ও ১০৬০জন আহত হয়—পুলিসের ৩২জন নিহত ও বহু আহত হয়। দেশী ও বিদেশী সৈন্যদের গুলীতে ৩৩১জন নিহত ও ১৫৯জন আহত হয়। সৈন্যদের মধ্যে ১১জন নিহত ও ৭জন আহত হয়।

এ-আর-পিতে মুসলমান—

এ-আর-পি চাকরীতে উপযুক্ত সংখ্যক মুসলমান ও অনুন্নত শ্রেণীর লোক লওয়া হয় নাই বলিয়া অভিযোগ করিয়া ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রী মিঃ এইচ-এস-সুরাবর্দ্দি বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে একটি প্রস্তাবে বর্ত্তমান মন্ত্রিসভার নিন্দা করিয়াছিলেন। দুই দিন ধরিয়া ঐ বিষয়ে আলোচনার পর ২৩শে সেপ্টেম্বর প্রস্তাবটি পরিত্যক্ত হয়—উহার পক্ষে মাত্র ৪৫জন সদস্য ও বিপক্ষে ১০৮জন সদস্য ভোট দিয়াছিলেন। শ্বেতাঙ্গ সদস্যগণ ঐ সময়ে কোন পক্ষে ভোট দেন নাই। এই ঘটনা হইতে বর্ত্তমান মন্ত্রিসভার উপর পরিষদ

সদস্যগণের বিশ্বাসের পরিমাণ বুঝা যায়। মুসলমান ও অনুন্নত সম্প্রদায়ের প্রার্থীরাও যাহাতে এ-আর-পি চাকরী লাভ করে, মন্ত্রীরা সে বিষয়ে যথেষ্ট আশ্বাস দিয়াছিলেন।

কুইনাইন সমস্যা—

বাঙ্গালা দেশে কুইনাইন দুর্লভ হওয়ায় গভর্ণমেণ্ট এখন উহার বিক্রয় নিয়ন্ত্রণ করিবেন। পূর্ব্বে কোন ব্যবসায়ীর মারফত বাঙ্গালার সমস্ত কুইনাইন বিক্রীত হইত—এখন বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্ট নিজে সে কাজ করিবেন। যাহাতে অধিক পরিমাণে কুইনাইন উৎপন্ন হয়, সেজন্যও বাঙ্গালা দেশে বিশেষ চেষ্টা করা হইতেছে।

সরকারী সদস্যের অভিমত—

২৪শে সেপ্টেম্বর দিল্লীতে রাষ্ট্রীয় পরিষদে বড়লাটের শাসন পরিষদের সদস্য সার যোগেন্দ্র সিং বলিয়াছেন—"শাসক ও শাসিতের পরস্পরের প্রতি অবিশ্বাস, ভারতের বর্ত্তমান অশান্তির প্রধান কারণ। ইংলণ্ড যদি এখনই ভারতকে স্বাধীনতা দেয়, তাহা হইলে ভারতে অচিরে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে এবং ভারতবাসী সকলে বিদেশী আক্রমণের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিবে।" কিন্তু বড়লাট কি সরকারী সদস্যদের কথাও শুনেন না?

গান্ধীজি ও বড়লাট—

বোম্বায়ের সংবাদে জানা যায়—মহাত্মা গান্ধীর সহিত বড়লাটের পত্র ব্যবহার চলিতেছে। গান্ধীজি বড়লাটকে কি লিখিয়াছেন তাহা জানা যায় নাই বটে কিন্তু প্রকাশ, গান্ধীজি বৃটীশ গভর্ণমেণ্টকে কংগ্রেসের জাতীয় দাবী মানিয়া লইতে অনুরোধ জানাইয়াছেন। কিন্তু বড়লাট কি করিবেন? বৃটীশ প্রধান মন্ত্রী ও ভারতসচিব এ বিষয়ে উদাসীন।

কমিটী নিয়োগের প্রস্তাব—

২৪শে সেপ্টেম্বর দিল্লীতে ব্যবস্থা পরিষদের অধিবেশনে শ্রীযুত ক্ষিতীশচন্দ্র নিয়োগী একটি কমিটী নিয়োগের প্রস্তাব করিয়াছিলেন। সম্প্রতি দেশে যে অশান্তি দেখা দিয়াছে, তাহার মধ্যে পুলিস ও সৈন্যদল যে সকল স্থানে অত্যাচার করিয়াছে বলিয়া প্রকাশ, সে সকল বিষয়ে তদন্তের জন্য কমিটী নিয়োগ করিতে বলা হইয়াছিল। বিহার, বাঙ্গালা, মাদ্রাজ ও যুক্তপ্রদেশে কোন কোন স্থানে অত্যাচার করা হইয়াছে, সেগুলি নিয়োগী মহাশয় বিবৃত করিয়াছেন। ঐ প্রস্তাবের আলোচনা শেষ হইবার পূর্ব্বেই অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য পরিষদের সভা বন্ধ হইয়া যায়। প্রস্তাবটি বিশেষ প্রয়োজনীয় ছিল।

বাঙ্গালায় লবণ প্রস্তুতের ব্যবস্থা—

বাঙ্গালা দেশে সমুদ্রোপকূলবর্ত্তী স্থানসমূহে যাহাতে কুটীর শিল্প হিসাবে লবণ প্রস্তুত হয়, সে জন্য বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্ট উপযুক্ত ব্যবস্থা করিয়াছেন। ব্রহ্মদেশের লবণ উৎপাদন বিশেষজ্ঞ মিঃ জে-এম-রায়কে সেজন্য নিযুক্ত করা হইয়াছে। নভেম্বর মাস হইতে কাজ আরম্ভ হইবে। এখন কুটীরশিল্প হিসাবে বৎসরে ৮।৯ লক্ষ মণ লবণ উৎপন্ন হয়—নূতন ব্যবস্থায় আরও ৮।৯ লক্ষ মণ লবণ পাওয়া যাইবে। কিন্তু বাঙ্গালার চাহিদা আরও ৭০।৮০ লক্ষ মণ অধিক। তাহার ব্যবস্থা কি হইবে?

পরলোকে হরদয়াল নাগ—

বাঙ্গালার প্রবীণতম কংগ্রেস নেতা চাঁদপুরবাসী হরদয়াল নাগ মহাশয় গত ২০শে সেপ্টেম্বর রাত্রি সাড়ে ১০টার সময় ৯০ বৎসর
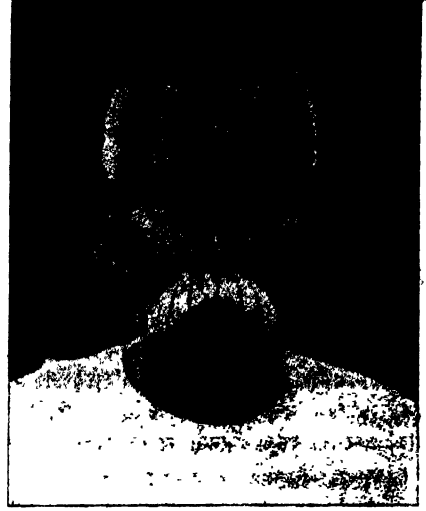
পরলোকে হরদয়াল নাগ

বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। মাত্র ১৫ই সেপ্টেম্বর তাঁহার বয়স ৯০ বৎসর হওয়ায় কলিকাতায় এক সভায় তাঁহার জয়ন্তী উৎসব করা হইয়াছিল। স্বদেশী আন্দোলনের সময় হইতে নাগ মহাশয় রাজনীতিক্ষেত্রে যোগদান করেন এবং গান্ধীজির আহ্বানে আইন ব্যবসা ত্যাগ করেন। জাতীয় শিক্ষার জন্য তিনি দীর্ঘকাল ধরিয়া প্রচুর অর্থ ব্যয় করিয়াছেন এবং চাঁদপুরে তাঁহার প্রতিষ্ঠিত জাতীয় বিদ্যালয় এখনও চলিতেছে। তাঁহার মত নিষ্ঠাবান স্বদেশ-সেবক অতি অল্পই দেখা যায়। দীর্ঘদিন ধরিয়া যেভাবে তিনি দেশের সেবা করিয়া গিয়াছেন, তজ্জন্য দেশবাসী চিরদিন তাঁহার নাম শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করিবে।

নূতন উপাধি লাভ—

বরিশাল জেলার অধিবাসী শ্রীযুত সুধীররঞ্জন দাশগুপ্ত সম্প্রতি দর্শনশাস্ত্রে গবেষণামূলক প্রবন্ধ লিখিয়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে পি-এচ্-ডি উপাধি লাভ করিয়াছেন। তিনি কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের এম-এ ও গ্রিফিথ স্কলার।

দুইটি প্রয়োজনীয় প্রস্তাব—

দিল্লীতে ব্যবস্থা পরিষদের ২৩শে সেপ্টেম্বর তারিখের অধিবেশনে দুইটি প্রয়োজনীয় প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে (১) দক্ষিণ আফ্রিকার ডারবান সহরে ভারতীয়দিগের অধিকৃত জমিগুলি দখল করিয়া ঐ সমস্ত জমি ইউরোপীয়দিগকে বিক্রি করিবার জন্য ডারবান সিটি কাউন্সিলের চেষ্টার নিন্দা করা হইয়াছে ও (২) সীমান্ত প্রদেশের আল্লামা মাসরিকী ও খাকসারদিগকে (যাঁহারা বন্দী আছেন) মুক্তি দিবার জন্য ভারত গভর্ণমেণ্টকে অনুরোধ

করা হইয়াছে। গভর্ণমেণ্টের ভারপ্রাপ্ত সদস্য স্বীকার করিয়াছেন যে খাকসারদিগের সহিত পঞ্চম বাহিনীর কোন সম্পর্ক নাই।

ক্যানাডায় গমের প্রাচুর্য্য—

এ বৎসর আমেরিকার ক্যানাডায় যত গম উৎপন্ন হইয়াছে, এত গম আর কখনও জন্মায় নাই। রুসিয়া ও গ্রীসে ঐ গম পাঠান হইবে। রুসিয়াকে ২৫ লক্ষ ষ্টার্লিং মূল্যের গম ধারে দেওয়া হইবে—ফলে রুসিয়া ৯০ লক্ষ বুসেল (১ বুসেল=৩২ সের) গম পাইবে। ক্যানাডা প্রতি মাসে গ্রীসকে ১৫ হাজার টন গম দিবে। ভারতে আটার মূল্য দ্বিগুণ হইয়াছে—এখানে কোন দেশ হইতে গম আমদানী করা যায় না ?

রাজা প্রভাতচন্দ্র বড়ুয়া—

আসাম গৌরীপুরের রাজা প্রভাতচন্দ্র বড়ুয়া গত ২৫শে সেপ্টেম্বর সকালে পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি বিদ্বান ও বিদ্যোৎসাহী জমীদার ছিলেন। রাজা বাহাদুর বহু সাহিত্য ও সঙ্গীত সম্মিলনে সভাপতিত্ব করিয়াছেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র কুমার প্রমথেশ বড়ুয়া সিনেমা ডিরেক্টার হিসাবে সর্ব্বজন-পরিচিত।

কুমারী জয়ন্তী চট্টোপাধ্যায়—

বর্দ্ধমান জেলার হাসপাতালের ডাক্তার বিনোদ বিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়ের দৌহিত্রী কুমারী জয়ন্তী চট্টোপাধ্যায় সম্প্রতি ১৬ বৎসর বয়সে অকালে পরলোকগমন করিয়াছেন। সাহিত্য ও সঙ্গীতের প্রতি তাঁহার একান্ত অনুরাগ ছিল এবং বর্দ্ধমান
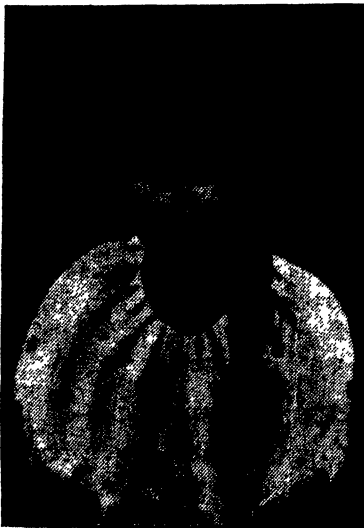
কুমারী জয়ন্তী চট্টোপাধ্যায়

সহর ও তাহার নিকটস্থ সকল সাহিত্য সভায় তিনি উপস্থিত থাকিয়া সঙ্গীতের দ্বারা সকলকে তৃপ্ত করিতেন।

নানাস্থানে হাঙ্গামা—

বিহারে জরিমানা আদায়—

বিহারে এ পর্য্যন্ত (পাটনা, ২৩শে সেপ্টেম্বর) নিম্নলিখিতরূপ পাইকারী জরিমানা ধার্য্য হইয়াছে—মজঃফরপুর—১ লক্ষ ২২ হাজার ২শত। পূর্ণিয়া—৩৯ হাজার। পাটনা—২লক্ষ ৯৮ হাজার। মুঙ্গের—২৫ হাজার। দারভাঙ্গা—৩ লক্ষ ৮৩ হাজার। ভাগলপুর—১ লক্ষ। সাহাবাদ—১২ শত। সারণ—২৫ হাজার ৫শত। গয়া—১লক্ষ ৮৫ হাজার। জরিমানা আদায়ও চলিতেছে। গত ২০শে সেপ্টেম্বর সমস্তিপুর মহকুমায় ২৬ হাজার ২শত ১৮ টাকা ১৪ আনা এবং মধুবাণী মহকুমায় ৩৬শত টাকা জরিমানা আদায় করা হইয়াছে। ভাগলপুর জেলার ঝাঙ্গাপুর গ্রামে ১০ হাজার টাকা এবং বিহপুর এলাকায় সারোয়ার গ্রামে ১৫ হাজার টাকার মধ্যে ১০ হাজার টাকা আদায় হইয়াছে। ১৯শে সেপ্টেম্বর সমস্তিপুর মহকুমায় মুরিয়াওর নামক স্থানে রেল লাইন নষ্ট হইলে ২০শে সেপ্টেম্বরই ঐ অঞ্চল হইতে ৬শত টাকা পাইকারী জরিমানা আদায় করা হইয়াছে।

মাদ্রাজে লবণের কারখানা আক্রান্ত—

গত ২১শে সেপ্টেম্বর মাদ্রাজের সরকারী সংবাদে প্রকাশ—জনতা বন্দুক ও ছুরি লইয়া মাদ্রাজের টিনাভেলী জেলার এক লবণের কারখানা আক্রমণ ও লুঠ করিয়াছে। কারখানা পোড়াইয়া দিয়া তাহারা লবণ বিভাগের সহকারী ইন্সপেক্টরকে হত্যা করিয়াছে।

গ্রেপ্তার ও কারাদণ্ড—

নাগপুরে ২৪শে সেপ্টেম্বর প্রাদেশিক ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের সভাপতি শ্রীযুত আর-এস-রুইকরকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। ২০শে সেপ্টেম্বর শিউড়ীতে শ্রীযুক্তা রাণী চন্দের ৬ মাস বিনাশ্রম কারাদণ্ড ও ২৫০ টাকা অর্থদণ্ড হইয়াছে—ইনি বোলপুরস্থ বিশ্বভারতীর প্রিন্সিপাল শ্রীযুত অনিলকুমার চন্দের পত্নী।

বর্দ্ধমান জামালপুরে বিক্ষোভ—

গত ১৯শে সেপ্টেম্বর বর্দ্ধমান জেলার জামালপুরের থানা, রেল ষ্টেশন, আবগারী দোকান, ডাকঘর প্রভৃতি জনতা কর্তৃক ভস্মীভূত হইয়াছে। থানার কাগজপত্র পোড়াইয়া রেল ষ্টেশন ও আবগারী দোকানের টাকা কড়ি লইয়া যাওয়া হইয়াছে।

ভাঙ্গায় দারোগা নিহত—

ফরিদপুর জেলার ভাঙ্গা নামক স্থানে কালীবাড়ীর নিকটে একটি জনতাকে ছত্রভঙ্গ করিতে যাইয়া ভাঙ্গা থানার দারোগা রোহিনীকুমার ঘোষ ১৯শে সেপ্টেম্বর শনিবার নিহত হইয়াছেন। পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, ফরিদপুর সদরের মহকুমা হাকিম, জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট প্রভৃতি তথায় যাইয়া শান্তি স্থাপন করিয়াছেন।

ডাকঘর অগ্নিদগ্ধ—

ঢাকা জেলার মুন্সীগঞ্জের পূর্ব্বসিমুলিয়ার সাব পোষ্টঅফিসে জনতা আগুন দিয়া কাগজপত্র প্রভৃতি পুড়াইয়া দিয়াছে। ফরিদপুর জেলার মাদারীপুর মহকুমার গোঁসায়ের হাট পোষ্ট-অফিসও জনতা পুড়াইয়া দিয়াছে। মুন্সীগঞ্জ টঙ্গীবাড়ী থানার পুঁড়ার আবগারী দোকান জনতা নষ্ট করিয়া দিয়াছে। মেদিনীপুর

তমলুকের নিকটস্থ সকল টেলিফোনের তার কাটিয়া দেওয়া হইয়াছে। গত ১৯শে সেপ্টেম্বর বিকালে বরিশালে চতুর্থ এডিসনাল জজকোর্টের নিকট একটি পট্‌কা ফাটাইয়া জনতা সকলকে সন্ত্রস্ত করিয়াছিল। চাঁদপুরের নিকট ইব্রাহিমপুরে ইউনিয়নবোর্ডের অফিস পোড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে।

পাটনায় পাইকারী জরিমানা—

পাটনা জেলার মানের ও বিক্রম থানার ২৬খানি গ্রামের অধিবাসীদের উপর ৫০ হাজার টাকা পাইকারী জরিমানা করা হইয়াছে। বিক্রম থানার শুধু রাজিপুর ও ধানে গ্রামের উপর ২৫ শত টাকা জরিমানা হইয়াছে।

পূর্ণিয়ায় পুলিস কর্ম্মচারী হত্যা—

গত ২৫শে আগষ্ট পূর্ণিয়া জেলার রূপাউলী থানায় ১০হাজার লোকের জনতার সহিত পুলিসের সংঘর্ষ হয়। ঐ সময়ে দারোগা মহেশ্বর নাথ এবং কনেষ্টবল গোরখ সিং ও কুর্ব্বল খাঁ অন্যান্য পুলিসের নিকট হইতে দূরে পড়ায় বিক্ষুব্ধ জনতা তাহাদের জীবন্ত দগ্ধ করিয়াছে। গভর্ণমেণ্ট ঐ সকল নিহত কর্ম্মচারীদের পরিবার-বর্গের প্রতিপালনের ব্যবস্থা করিয়াছেন।

ভাগলপুর জেলে দাঙ্গা—

গত ৪ঠা সেপ্টেম্বর বিকালে ভাগলপুর সেণ্ট্রাল জেলের বন্দীরা জেল কর্ম্মচারীদের উপর অত্যাচার করে। তাহারা জেলের মধ্যস্থ কারখানায় যাইয়া ডেপুটী সুপারিণ্টেডেণ্ট ও কার্ডিং মাষ্টারকে জীবন্ত দগ্ধ করে ও কারখানায় আগুন লাগাইয়া দেয়। পরে গুলী চালাইবার ফলে তিন জন জেল কর্ম্মচারী নিহত হয়—২৮জন বন্দী নিহত ও ৮৭জন আহত হইয়াছে। সরকারী ইস্তাহারে উপরোক্ত বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে।

বোম্বাই প্রদেশে পাইকারী জরিমানা—

বোম্বাই প্রদেশের পূর্ব্বখান্দেশ জেলার তামলনীর সহরে দেড়লক্ষ টাকা পাইকারী জরিমানা করা হইয়াছে—সেখানে রেলওয়ে ষ্টেশন, পোষ্টঅফিস ও দেওয়ানী আদালত পোড়াইয়া দেওয়া হইয়াছিল এবং রেলের মালপত্র নষ্ট করা হইয়াছিল—ক্ষতির পরিমাণ ৬০ হাজার টাকা। সুরাট জেলার জালালপুর তালুকে মাতোয়াদ, করাড়ী, মাছাদ ও কাঠানদী গ্রামে সর্ব্বসমেত ২০ হাজার টাকা পাইকারী জরিমানা করা হইয়াছে—তথায় জনতা থানা আক্রমণ করিয়াছিল ও পুলিস গুলী চালাইতে বাধ্য হইয়াছিল। থানা জেলার ডাহানু তালুকের চিলচাটন গ্রামে ৮ হাজার টাকা জরিমানা করা হইয়াছে। বেলগাঁও জেলায় নিপানী সহরে একলক্ষ টাকা, বাগেওয়াদি ও কিগুর প্রত্যেক গ্রামে ১০ হাজার টাকা করিয়া ও হোসুর গ্রামে ৫ হাজার টাকা পাইকারী জরিমানা করা হইয়াছে। মুসলমান অধিবাসী, সরকারী কর্ম্মচারী প্রভৃতিকে জরিমানা দিতে হইবে না।

যুক্তপ্রদেশে পাইকারী জরিমানা—

যুক্তপ্রদেশের কানপুর জেলার বিভিন্ন স্থানে ১ লক্ষ ২৪ হাজার ৮ শত ৫০ টাকা এবং মির্জ্জাপুর জেলার ১টি গ্রামে মোট ৬ হাজার ৯ শত ৭০ টাকা পাইকারী জরিমানা করা হইয়াছে। খেরী জেলায় মোট ৩০ হাজার টাকা জরিমানা করা হইয়াছে, তন্মধ্যে লখিমপুর তহশীলের ৮ স্থানে মোট ২০ হাজার টাকা, নিমগাঁও সার্কেলের পাইলা গ্রামে ২ হাজার টাকা এবং মোহামদী তহশীলের ৪টি স্থানে মোট ৮ হাজার টাকা জরিমানা ধরা হইয়াছে।

বিক্রমপুরে গুলি—

গত ১৫ই সেপ্টেম্বর বিকালে ঢাকা জেলার মুন্সীগঞ্জ মহকুমার বিক্রমপুর পরগণার তালতলা বাজারে পুলিসের গুলীতে তিন জন নিহত ও একজন আহত হইয়াছে। জনতা ডাকঘরের নিকট সমবেত হইলে পুলিস তাহাদের সরিয়া যাইতে বলে; ফলে পুলিসের উপর ইট নিক্ষিপ্ত হয় ও পুলিস গুলী চালাইতে বাধ্য হয়। পূর্ব্ব দিন জনতা একটি গাঁজার দোকান আক্রমণ করিয়া নষ্ট করিয়া দিয়াছিল।

বালুরঘাটে আদালত ভস্মীভূত—

১৫ই সেপ্টেম্বর ৫ হাজার লোক দল বাঁধিয়া দিনাজপুর জেলার বালুরঘাটের ডাকঘর, দেওয়ানী আদালত, সাব রেজেষ্টারী, সেণ্ট্রাল সমবায় ব্যাঙ্ক, ইউনিয়ন বোর্ড, ২টি পাটের অফিস, আবগারী দারোগার অফিস, রেল এজেন্সি অফিস, কয়েকটি আবগারী দোকান প্রভৃতি আক্রমণ করিয়াছিল। সকল অফিসের কাগজ পত্র পুড়াইয়া ও টেলিগ্রাফের তার কাটিয়া জনতা ৩ ঘণ্টা পরে চলিয়া যায়।

বর্ম্মা সেলের অভিনব উদ্যম—

বিশ্বব্যাপী তৈল-সরবরাহ ব্যাপারেই দেশবাসী এই সুপ্রসিদ্ধ প্রতিষ্ঠানটির সহিত পরিচিত। কিন্তু নিজস্ব বহুবিস্তৃত ব্যাপক ব্যবসায়ের সম্পর্কে এই প্রতিষ্ঠানের কর্ত্তৃপক্ষগণ শিক্ষা, চিত্রকলা, প্রচারশিল্প প্রভৃতি সাধারণের জ্ঞাতব্য বিষয়গুলির সহিত জনসাধারণের যোগসূত্রস্থাপনের যে সুরুচিসঙ্গত পরিকল্পনা করিয়াছেন তাহা যেমন অভিনব, কলা-শিল্পের দিক দিয়া তেমনই প্রশংসনীয়। প্রত্যেক ব্যবসায় কলা-শিল্পের সাহায্যে কি ভাবে একটি বিশিষ্ট রূপ ধারণ করিতে পারে, কলাশিল্পীদের অঙ্কিত চিত্র দ্বারা তাহা রূপায়িত করিবার উদ্দেশে এই প্রতিষ্ঠান গত ১৯৪১ অব্দ হইতে 'আর্ট ইন ইন্ডাসট্রি' নামে এক প্রদর্শনীর প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। এবার ফেব্রুয়ারী মাসে যে দ্বিতীয় বার্ষিক উৎসব হয়, তাহাতে বাঙ্গালার গভর্ণর স্যার জন হারবার্ট প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন। বহু শিল্পী তাঁহাদের শিল্পচাতুর্য্য প্রদর্শনের জন্য ইহাতে যোগদান করিয়াছিলেন। অক্ষরের পারিপাট্য, পোষ্টারের বৈচিত্র্য, ব্লটিং-এর সাহায্যে প্রচারকার্য্য, ক্যালেণ্ডার ও শো-কার্ডে নূতনত্ব প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকার প্রচার-শিল্পের কিরূপ উন্নতি হইয়াছে তাহা প্রদর্শিত হয়। প্রদর্শিত শিল্পগুলির বৈশিষ্ট্য কার্য্যক্ষেত্রেও যাহাতে পরিস্ফুট ও পরিচিত হইয়া সর্ব্বসাধারণের চিত্তাকর্ষণ করে তজ্জন্য বর্ম্মা সেলের কর্ত্তৃপক্ষগণপ্রদর্শিত চিত্রাবলী'আর্ট ইন্ ইনডাষ্ট্রি ম্যানুয়েল' নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত করিয়াছেন। তাঁহাদের প্রচার সচিব শ্রীযুক্ত দীনেশ দত্ত মহাশয় ইহার পরিকল্পনা করিয়াছেন।

অসঙ্গতি

শ্রীকালীচরণ ঘোষ

পৃথিবীতে এমন বহু ঘটনা হ'য়ে আছে বা প্রায়ই হচ্ছে যা আমাদের মনের মত নয়, বা সাধারণ বিচারের মানদণ্ডে একেবারে ফেলে দেবার মত না হ'লেও, চলতি কথায় বলা যায় বে-মানান্। অর্থাৎ যেমনটী হ'লে ভাল বলা যেত, তা নয়।

যেগুলো বেমানান্ হ'লেও কারও "সাতেও নেই পাঁচেও নেই" তা নিয়ে লোক মাথা ঘামায় কম। যেগুলো সামান্য ক্ষতিকারক সেগুলো নিয়ে কিছু আলোচনা চলে, আর যেগুলো অধিক লোকের ক্লেশের কারণ হয়, সেগুলো নিন্দনীয় বা পাকাপাকি আলোচ্যবস্তু হ'য়ে থাকে।

এই অসামঞ্জস্য ব্যাপারগুলো তিন ভাগে ভাগ ক'রে দেখা যেতে পারে। প্রথম দৈব, অর্থাৎ মানুষের কোনও হাত নেই; সুতরাং তা নিয়ে অসন্তোষ থাকলেও অশান্তি নেই। কতকগুলো ব্যাপার দৈবাদৈব, অর্থাৎ সাধারণ কথায় বলা যায়, মানুষে সাধামত চেষ্টা করলেও যখন রামের গুরু গড়তে গিয়ে রামভক্তের মধ্যে দ্বিতীয় শ্রেণী উর্দ্ধাধঃ রক্তবর্ণ সুপুরুষ জীবটী আত্মপ্রকাশ করতে থাকেন, তখন দৈবের ঘাড়ে কিঞ্চিৎ বোঝা চাপিয়ে নিজেকে proportionately অর্থাৎ অনুপাতে হাল্কা ক'রে নেওয়া যায়। আর তৃতীয় প্রকারটী নিছক মানবিক বা ভৌতিক। এখানে বিশেষ ঠেকায় না প'ড়লে দৈবকে কেউ মানতে চান না, বা ধ'রে আনলেও সাধারণ লোকের কাছে সেটা দোষ কাটাবার অছিলামাত্র।

দৈবের মারফত প্রাপ্ত বহু বেমানান্ বস্তু বা ঘটনার উল্লেখ মানুষ চিরকালই ক'রে আস্‌ছে এবং সৃষ্টি লোপ না পাওয়া পর্য্যন্ত করতে থাকবেই; বৈজ্ঞানিক এবং ভগবদ্বিশ্বাসী ভক্তেরা এর বহু জবাব দেবেন। কিন্তু তা ছাড়া যাঁরা এত সহজে মানে না এমন মূর্খ এবং পাষণ্ড ত বহু আছে, যাদের আদমসুমারি বা "সেন্‌সাস্" গ্রহণ করলে পৃথিবীতে তারা সংখ্যাগুরু বা "মেজরিটী" হ'য়ে পড়বে। তাদের যুক্তিতে বহু প্রচলিত কথার কয়েকটা উদাহরণ ধরা যেতে পারে।

পৃথিবীর যদি স্থলভাগ মোট পরিমাপের দুই সপ্তমাংশ না হ'ত এবং এই লবণাক্ত বিষ (হায়রে, এ সময় যদি চিনি গোলা থাকত) জলের ভাগটা পঞ্চসপ্তমাংশের কম হ'ত, তাহ'লে অন্ততঃ এই সময় এই মহামারীটা না হ'তেও পারত। খানিকটা মোটা গোছের জমি ছেড়ে দিয়ে—যেমন এক সময় ইংরেজরা আমেরিকা, কানাডা ও অষ্ট্রেলিয়ায় গিছল, তার মধ্যে থেকে খুঁড়ে কিছু লোহা, কয়লা প্রভৃতি বার করে দিয়ে, কিছু গম ভুট্টা ছ'ড়িয়ে চ'রে খাবার ফসল এবং ক্লান্ত হ'লে মাথা খোঁজবার স্থান করেছিল—দিতে পারলে নিশ্চয়ই জার্ম্মাণী ও জাপান এত শীঘ্র এই গোলমাল পাকাতো না। তারা এবং তাদের অপকর্ম্মের সঙ্গী ইটালী তিনটাতে মিলে অজস্র লোক বৃদ্ধির খুব উৎসাহ দিলে এবং আট বা ততোধিক সন্তান হ'লে রাজ সরকার থেকে পুরস্কার দেবে বললে। লোকে আদা জলের গুণকীর্ত্তন ক'রে পুরস্কার লাভ করতে লেগে গেল। তখন ভুষমণেরা বলে "আমাদের এত লোক রাখি কোথায়?" (রাশিয়াও এ প্রচেষ্টা ক'রেছে, সফলও হ'য়েছে কিন্তু তারা আমাদের বন্ধু। আর তাদের বিরাট সাম্রাজ্যে বহু জমি আছে, সুতরাং লোভী পরস্বাপহারী মৈত্রীর মত পেজোমি করে নি)। যদি পৃথিবীতে আরও কিছু স্থল থাকত তা হ'লে গণ্ডগোল হ'ত না। অবশ্য অষ্ট্রেলিয়া কানাডা প্রভৃতি দেশে বহু পতিত জমি আছে, কিন্তু সেখানে ভদ্রলোকে বাস করে, রাক্ষসগুলোকে কিছুতেই স্থান দেওয়া যায় না। রক্তবীজের মত বংশ বৃদ্ধি ক'রে সব দখল করে নেবে। সুতরাং অন্ততঃ আধাআধি বা fifty fifty জল স্থল হ'লে ঐ কটাকে খানিক যায়গা ছেড়ে দেওয়া যেত, আর আপনাআপনি কাটাকাটি ক'রে মরত। আমরা (অর্থাৎ ইংরেজ ও ইংরেজ সাম্রাজ্যভুক্ত আমাদের মত ভদ্র সব) দূরে দাঁড়িয়ে মজা দেখতাম, প্রাণ খুলে হাততালি দিতাম; ওদের কেউ হারলেই 'দুয়ো' দিতাম। কি করা যাবে দৈব ব্যাপার, উপায় নেই। গ্রীষ্মকালের এত গরম, আর শীতকালের শীত বেমানান্, সামঞ্জস্য ক'রে নিলে পারত; উপায় নেই, কিন্তু আপত্তি আছে। হাতির দেহের সঙ্গে চোখ, বটগাছের বিশালত্বের সঙ্গে ফল, সন্তানকামীর অষ্টকুঁড়িত্ব (বন্ধ্যাত্ব) এবং ডায়োনের (Dionne) ঘরে এক সঙ্গে পঞ্চ সন্তান লাভ (quintuplets) অনেক বেমানান ব্যাপার। ধনী নির্ধনীর ধনে, বলী রোগীর শক্তিতে, বীর ও ভীরুর শৌর্য্যে কত বে-মানান্। একই বাড়ীতে, একই পাড়ায়, দেশে, পৃথিবীতে পাশাপাশি দেখলে এগুলো বেমানান্ ব'লে মনে হবে, কিন্তু উপায় নেই।

দৈবাদৈব অর্থাৎ দেবতা মানুষে (যমে মানুষে নয়) টানাটানি একবার দেখা যাক্। যখন পিতামাতা পণ করেন যে তাঁদের সুশ্রী, সুদর্শন বিদ্বান্, আর্থিক স্বচ্ছল (না হ'তেও পারে) ছেলের জন্যে একেবারে গৌরাঙ্গী (জল খেলে গলার ভেতর দিয়ে জল নামা দেখতে পাওয়া যাবে), "প্রকৃত সুন্দরী" বা "অনিন্দ্য সুন্দরী", শিক্ষিতা "সম্ভ্রান্তবংশীয়া" (অর্থাৎ অভিভাবকের যথেষ্ট অর্থ আছে), "পাত্রীর পিতা অন্ততঃপক্ষে Gazetted Officer হওয়া চাই" (প্রভৃতি সকল বিশেষণগুলিই ছাপার অক্ষর থেকে নকল করা) ব'লে স্বগোত্রীয় যত রাজ্যের অনূঢ়া কন্যার খোঁজ করতে লাগলেন, কিন্তু টাকার বা বাড়ী (বা দুইয়েরই) লোভে, ছেলের ভাবী মঙ্গল চিন্তায় বড় চাকুরীর মোহে, আত্মীয়স্বজনের অনুরোধে (এটা বড়ই কম ঘটে), ছেলের লভে (love) বা প্রেমে পড়ার দরুণ, বা আইনের চাপে যখন একটী কুষ্মাণ্ডাকৃতি, স্থূলকায়া, মসীনিন্দিতা মহিলা (শিক্ষিতা সম্ভব) কপালে জোটে, তখন বড়ই বেমানান্ ব'লে মনে হয়। যখন মহাপণ্ডিতের গণ্ড-মূর্খ এবং শুদ্ধ সাত্ত্বিক লোকের লম্পট পুত্র হয়, তখন বেমানান হয়। দারোগার ঘরে চোর জন্মিলে, (নিতান্ত অভাব নেই), চাষীর বা গরীবের ঘরে "বাবু" আবির্ভাব হইলে দৈবাদৈব ব্যাপার। যাঁরা সসাগরা পৃথিবীর এক পঞ্চমাংশের অধীশ্বর যাঁদের রাজ্যে সূর্য্য কখনও অস্ত যান না—যাঁরা জ্ঞানে, গুণে, বীরত্বে, বাগ্মিতায়, কূটনীতিতে, শিল্পে, বাণিজ্যে জগৎকে শতাব্দীর পর শতাব্দী নাকে দড়ি দিয়ে ঘুরিয়েছেন ব'লে অহঙ্কার করেন, তাঁরা যখন কালা-আদমির ভার (blackman's burden) বইতে বইতে তাঁদেরই সঙ্গে I. C. S.-এর প্রকাশ্য পরীক্ষায় দাঁড়াতে না পেরে "ব্যাক্ ডোর" (back door) বা পশ্চাদ্দ্বার অর্থাৎ নমিনেশনে সিভিল সার্ভিসে স্থান লাভ করেন, তখন ঐ দৈবাদৈবর কথা মনে আসে। এখন আমরা তৃতীয় দফা বা মানবিক ঘটনার কথা ধরতে পারি। বাঙ্গালীর আয়ে ও ব্যয়ে এবং খাঁটী আর্থিক অবস্থার সঙ্গে উহার মৌখিক প্রকাশে বড়ই অসঙ্গতি। সুন্দর ঝরঝরে আদব কায়দার বাড়ীতে ছেঁড়া চট মনোরম নয়; মালিকের সুরুচির পরিচয় ত নয়ই; কিন্তু এ দেখা যাবে অনেকস্থলে। বাঙ্গালী ছাতি ছাড়ছে, অনেকের নেই, অনেকের বাড়ীতে (নিজের নয়) একটা ভাঙ্গা গোছের থাকে। হঠাৎ বর্ষা হ'লে সাহেবী বা ঝরঝরে সাজগোজের সঙ্গে সেই ছাতিটী বেমানান্। আপ্-টু-ডেট্ বেশে সজ্জিতা মহিলার সঙ্গে

সাধাসিধে (হয়ত আধময়লা) পোষাক পরা ভদ্রলোকটী যখন জাহাজের পিছনে বাঁধা ডিঙ্গির মতন সঙ্গে যান এবং দোকানে পছন্দ দরদস্তুর প্রভৃতি সকল কাজের সময় নির্ব্বাক থাকেন, আর হয়ত দাম দেবার সময়টা ব্যাগ থেকে টাকা বার করেন, তখন সরকার মশায় ব'লে মনে হ'লেও, ঘরে এসে তিনি মহিলার ভাগ্যবান—(কারণ হতভাগ্য বল্লে মার খাওয়ার সম্ভাবনা), পতি পরম-গুরু। যখন দু চার বছর কোর্টসিপ্ করবার পর, বিবাহ বাসরে দম্পতি পরস্পরে দোষ টের পেয়ে সকালে উঠেই বিবাহ-বিচ্ছেদের ব্যবস্থা করেন তখন মনে হয় মানুষের দৌড় কত। রোগা, চাবালির হাড়ের ওপর যখন গালপাট্টা জুল্পি, আর কচি মুখে যখন গোঁপের কোনও চিহ্ন নেই তখন সেখানে ক্ষুরের লক্ষণ বড় চল্‌তি। জরি পাড় কাপড়, সিল্কের চাদর, আদ্দির পাঞ্জাবীর মধ্যে দিয়ে যখন শতছিন্ন গেঞ্জিটি আত্মপ্রকাশ করে তখন মনে হয়, খালি গেঞ্জির ওপর ভদ্রলোকের মালিকানা সত্ব, বাকী তখনকার মত **lend lease.** যখন 'নামাবলী'খানা লুঙ্গির মত পরা থাকে তখন সেটা খুবই দৃষ্টিকটু। চৌদ্দ আনা দু-আনা চুলের সঙ্গে পশ্চাতে একটী লম্বা শিখা বা টিকি এবং সম্মুখে বাহারি টেরী দেখলে মনে হয় 'কাকে রাখি, কাকে ফেলি?" কোন্ দলকে খুসী করি? আর এর **synthesis** দিয়ে নিজেকে কি করে সুন্দর প্রতিপন্ন করি? বিদেশীর মধ্যে আছেই, এখন বাঙ্গালীর মধ্যে "ঘাটের মড়া" বৃদ্ধা যখন নিজেকে যুবতী সাজিয়ে বাইরে প্রকাশ করতে যায় তখন হাসি চাপবো না আলাপ জুড়বো—এই ভাবটা দর্শকের মধ্যে কিল্‌বিল্ করতে থাকে।

রাস্তায় চোখ খুলে চল্‌লে এর আরও অজস্র উদাহরণ দেখতে পাওয়া যাবে; এতে ক্ষতিবৃদ্ধি কারও খুব বেশী নয়। কিন্তু যখন মানুষ মনে-মুখে কাজে অসঙ্গতি দেখায়, আর সেটা যদি সামাজিক ও রাষ্ট্রিক ব্যাপারে হয়, তখন ত মুস্কিল। "দেশের মঙ্গলের জন্যে জীবনপাত কর" বলে অপরকে ডুবিয়ে নিজে স'রে পড়া, 'টাকার অভাবে কোনও কাজ হয় না' ব'লে চাঁদা তুলে নিজে হজম করা বড় চমৎকার নমুনা। কাগজে বক্তৃতায় গরম বুলি ঝেড়ে, গভর্ণমেণ্টকে চর পাঠিয়ে জানাতে যখন হয় "ওটা মুখের কথা, প্রভু, অন্তরের নয়," তখন অনেককেই আমরা চোখের সামনে ভেসে উঠতে দেখি। চাঁদা তুলতে কমিশন (**percentage**) রেখে ভাণ্ডারে জমা দেওয়া চারিদিকে জ্বলজ্বল্ করছে। মন যখন বলেছে, 'মরুক ব্যাটা," মুখ তখন বলে 'আহা, মশাই কি ভদ্রলোক।' মুখ যখন বলছে 'নিশ্চয়ই করব' মন ব'লছে "গেলে বাঁচি"। সামাজিক কাজে যেখানে অপরে ব্যস্ত, তখন কর্ম্মীদের ঘুরিয়ে মারা এখন প্রচলিত রীতি। যেখানে চাঁদা দেবে না, সেখানে দশ দিন ঘোরাবে, তারপর 'পেটের অসুখ' 'বিশেষ কাজে বেরিয়ে গেছে' ব'লে নির্দ্দিষ্ট দিন তারিখে আর দেখা করবে না। কাজের ভার না পেলে গোসা, আর নিয়ে কিছুতেই করবে না। যারা করতে চায়, তাদের হাত থেকে ভার নিয়ে, "শরীর খারাপ, বাড়ীর অসুখ, বড় কাজ, হবেখ'ন।" প্রভৃতি শুন্‌তে পাবে। লোককে সময় দিয়ে, সে সময় খেলা ক'রবে, আর না হয় অন্য কাজ করবে, প্রত্যাশী দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ফিরে যাবে, দিনের পর দিন। অভুক্ত, বেকার, লোককে আশা দেওয়া একটা ব্যবসা দাঁড়িয়েছে, এর ভেতর কর্ম্মকর্ত্তাকে, পার্টিকে চাঁদা দিতে হবে ব'লে যা হাতড়ানো যায়, তারও বাণিজ্য চলবে। ভোট যুদ্ধের সময়কার ভাষণ, বাণী বা প্রতিশ্রুতি, জয়ী হবার পর গঙ্গার জলে ডুবে স্বর্গলাভ করে। দেখা করতে গেলে তখন অমূল্য সময় নষ্ট করা হবে, অথচ তোমারই বাড়ীর ধারে যখন ঘণ্টার পর ঘণ্টা, দিনের পর দিন তীর্থের কাকের মত প'ড়ে থাকতে দেখা যেত, তখন সময়ের দাম, মনের পর্দ্দা ছিল অন্য রকম। যাকে ধরে উঠে থাকি, প্রথম সুযোগে তাকেই পায়ে ঠেলা,—মনেতে কাজেতে আধুনিক সঙ্গতি। উপার্জ্জনের পথ, মানের রাস্তা, প্রভাবপ্রতিপত্তির ভিত্তি দৃঢ় হ'লে সব ভুলে যাওয়া, অতীতকে কবর দেওয়াই ত উন্নতির সোপান।

ব্যবহারিক জীবনে লক্ষ কোটী এই জাতীয় ঘটনা প্রতিনিয়ত ঘটছে। এই মানবিক ব্যাপারে যেখানে লোকের হাত আছে, সেখানে এই অসঙ্গতি, বে-মানান অবস্থা বড়ই পরিতাপের। দৈব, দৈবাদৈব এবং মানুষের রুচি অনুযায়ী নিতান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার, কাকেও গুরু আঘাত করে না। কিন্তু যেগুলো ব্যষ্টি বা সমষ্টির সুখ সুবিধা, মঙ্গলামঙ্গলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, সেগুলোই অধিক মাত্রায় চোখে পড়ে। যাঁর যতটুকু শক্তি তিনি ততটুকু চেষ্টা করুন যাতে মনে—মুখে, মুখে—হাতে এবং মনে-মুখে-হাতে যতদূর সম্ভব তাল রাখ্‌তে পারেন। মানুষকে নিজের রূপে চিন্‌তে দেওয়ায় দোষ নেই, পাপ নেই। সব সময় নিজের আসল রূপ গোপন ক'রে অপরকে ভুল চিন্‌তে দেবার উপায় চিন্তা করা আর সেই চিন্তাধারা কার্য্যে পরিণত করাই দোষ, পাপ, অপকার্য্য।

এই সকল লোক, **Ibsen** বিদ্রূপ করে যাঁদের **"The Pillars of Society"** ব'লেছেন, তাঁরা ভণ্ড। নিজেরা বে-মানান কাজে পরিপক্ক এবং তাঁদের কথার ওপর নির্ভর করে যাঁরা অবস্থার গুণে অপরকে কথা দেন, সকলে মিলে দৈনিক জীবন যাত্রার সমতা স্বচ্ছন্দগতি নষ্ট ক'রছেন। যাঁদের কাছে যেতে হয়, মিত্র মনে করেই দরজায় দাঁড়াই কিন্তু শক্তি হ'লেই তাঁদের এ ভণ্ডামির মুখোস খুলে দিয়ে প্রকৃতরূপে চিনিয়ে দিতে হবে। আজ বৎসরান্তে, এই দুর্ব্বৎসরেও মায়ের আমরা যে বোধন বসিয়েছি, সে বোধনের বাজনা যেন অর্থহীন ফাঁকা না হয়। তার মধ্যে যেন আমাদের দৈনন্দিন জীবনের প্রার্থনা আন্তরিকভাবে বেজে ওঠে। খল, শঠ ও আত্মম্ভরিতার মিষ্টি হাসিতে বা বুলিতে আমরা যেন না ভুলি। আমরা যেন দ্বিজেন্দ্রলালের ভাষায় উচ্চকণ্ঠে ব'লতে পারি—

"মিত্র হ'ক ভণ্ড যে,
তাহারে দূর করিয়া দে ;
সবার বাড়া শত্রু সে,
আবার তোরা মানুষ হ'।"

"ভাস্কর"

তোমার কোমল অঙ্কে বসি' ভাবি মনে—
নিরলস অহর্নিশি চল পথ বাহি'
সাথে নিয়ে অকাতরে পরম যতনে
নর-নারী অগণিত—ভেদাভেদ নাহি।

দীন, ধনী, কৃশ, স্থূল, সবল, দুর্বল,
স্বদেশী বিদেশী সাথে মৌন পরিচয়
ক্ষণিকের তরে ; তবু সঙ্গ নিরমল
ধুয়ে নেয় মন হ'তে কালিমা-নিচয়।

নগরের বক্ষ 'পরে সর্পিল গমন
কঠিন বিবিক্ত পথে ; তুলি ধর আনি
ধাবমান নগরীর চঞ্চল মোহন
রূপ-রস-শব্দে ভরা দীপ্ত মুখখানি।

তড়িৎস্পন্দিত বক্ষ উন্নত কবরী,
করমের সাথী তুমি, নগরের তরী।

বঞ্চিত

(নাটিকা)

শ্রীসমরেশচন্দ্র রুদ্র এম-এ

পক্ষাঘাতরোগগ্রস্ত অশোকের কক্ষ। অশোক খাটের উপর স্তূপীকৃত কয়েকটি বালিশে হেলান-দিয়ে-শোয়া অবস্থায় রয়েছে। ডানদিকের সমস্ত অঙ্গটাই আড়ষ্ট হয়ে গেছে। বাঁ হাতে একখানা বই নিয়ে অশোক পড়ছে। অশোককে দেখলে বেদনা আসে, মনে হয়, একটা তাজা গোলাপ ফুল যেন আগুনের আঁচ লেগে কুঁকড়ে বিবর্ণ হয়ে গেছে। খাটের ধারে অশোকের বাঁ পাশে একটা ছোট টেবিল, তার উপর দু-চারটে সাময়িক ও দৈনিক পত্র এবং ইংরিজি বাংলা কয়েকখানা বই। বেলা ৯টা বাজে। পাশের বিয়ে বাড়ীর শানাই-এর শব্দ আসছে। অশোক পড়ায় মন বসাতে পারছে না, একটু পড়ছে, আবার কি ভাবছে। অশোকের জ্যাঠাইমা সান্ত্বনা প্রবেশ করলেন।

অশোক। জ্যাঠাইমা, বর কি এল নাকি ?

সান্ত্বনা। হাঁ।

অশোক। তুমি দেখতে গেছলে ? বৌ কেমন হয়েছে ?

সান্ত্বনা। বেশ দেখতে হয়েছে।

অশোক। রং ময়লা নয়তো ? চেহারা কেমন ?

সান্ত্বনা। বেশ সুন্দরীই হয়েছে, মুখ চোখও ভাল।

অশোক। লেখাপড়া কেমন জানে ?

সান্ত্বনা। শুনলুম তো একটা পাশ।

অশোক। ও, ম্যাট্রিক পাশ বোধহয়। কোন ডিভিসনে—না, সে আর তুমি কি করে জানবে, টাকাকড়ি কিরকম দিলে ?

সান্ত্বনা। খুব বেশী না দিলেও বেশ দিয়েছে। জয়ন্তর মা কি বলছেন জানিস, বলছেন, আমায় লক্ষ্মী দিয়েছে, আবার কি দেবে।

অশোক। চমৎকার কথা বলেছেন, প্রত্যেক মার এমন বলা উচিত। আমায় লক্ষ্মী দিয়েছে, আবার কি দেবে। চমৎকার কথা! তুমি তো জান জ্যাঠাইমা, জয়ন্ত আর আমি একসঙ্গে থার্ড ক্লাস থেকে ইণ্টার-মিডিয়েট পর্যন্ত পড়েছি, আমি হতুম ফার্ষ্ট, ও হত সেকেণ্ড। তারপর ও মেডিক্যাল কলেজে ঢুকল, আমি বি-এ-তে ভর্তি হলুম। ও আজ এম-বি পাশ করে ডাক্তার হয়ে বেরিয়েছে,—আমি বি-এ পাশ করলুম, এম-এ পাশ করলুম, ল-এর দুটো এগজামিন দিয়ে বাকীটা আর পাশ করা হল না,—আমার দুর্ভাগ্য—

সান্ত্বনা। ও সব কথা আর কেন বাবা।

অশোক। (অবনত মুখে) হুঁ। (হঠাৎ মুখ তুলে) জ্যাঠাইমা, আরশীটা একবার আমার এনে দাও তো।

সান্ত্বনা। দিই।

বেরিয়ে গিয়ে আরশী এনে দিলেন

অশোক। (আরশী নিয়ে দেখে) আমার চেহারা এ কি হয়েছে জ্যাঠাইমা! তুমি বুলুকে দিয়ে তাড়াতাড়ি একটা নাপিত ডাকাও তো। ছি ছি, এত দাড়ি হয়ে গেছে! মিহির কোথায় ?

সান্ত্বনা। ওখানে পড়ছে বোধহয়।

অশোক। একবার মিহিরকে ডেকে দাও না আমার কাছে।

সান্ত্বনা। যাই। এখন খাবার খাবি না ?

অশোক। আগে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে নিই, তারপর খাব। তুমি এখনই বুলুকে পাঠিয়ে দাও নাপিত ডাকতে। ছি ছি, কি হয়েছে!

সান্ত্বনার প্রস্থান।

আশোক আরশী নিয়ে মুখের এপাশ ওপাশ ফিরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে লাগলো। অশোকের ছোট ভাই মিহির প্রবেশ করল।

মিহির। দাদা, আমায় ডাকছ ?

অশোক। হাঁ ভাই, ডাকছি। আচ্ছা মিহির, আমি কি তোমার নিজের ভাই নই। আমি আজ এমন অবস্থায় পড়েছি বলেই কি তোমরা আমায় এমন অনাদর করবে ? এতটুকু স্নেহ, সহানুভূতি দেখাবে না ?

মিহির। এ সব তুমি কি বলছ দাদা, আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।

অশোক। তা তুমি পারবে না। আমি হয়েছি এখন একটা সংসারের ভার, আমাকে আর কারুর কোনও প্রয়োজন নেই, আমায় আর কেউ চায় না।

আবেগে স্বর রুদ্ধ হয়ে এল

মিহির। (কাছে এসে দাদার খাটের উপর বসে পড়ে) কি হয়েছে তোমার বলনা দাদা, কেন এমন রাগ করছ ? দাদা!

অশোক। আমায় আর তোমরা তেমন যত্ন করছ না, আমি আছি কি নেই, তা তোমাদের দেখার সময় হয় না।

মিহির। কি হয়েছে তোমার বল না।

অশোক। আমার চেহারা কি হয়েছে দেখেছ একবার ? কাপড় চোপড় সব ময়লা, কতদিন দাড়ি কামান হয়নি,··· ঘরের এক কোণে পড়ে রয়েছি বলেই কি আমার এসবেরও প্রয়োজন নেই ?

মিহির। দাদা, মিছে তুমি এজন্যে রাগ করছ। তুমি নিজেই তো এসব করতে গেলে বাধা দাও।

অশোক। বাধা দিই বলেই কি তা শুনতে হবে ? আমি অসুস্থ, আমার মনের কি কিছু ঠিক আছে ? তোমরা কি নিজে থেকে এগুলো করতে পার না ? রোগী ওষুধ খেতে না চাইলে কি ডাক্তারের সে কথা শোনা উচিত ?

মিহির। আচ্ছা আমি বুলুকে বলে দিচ্ছি।

অশোক। তাকে আমি বলে দিতে বলেছি, ততক্ষণ তুমি একটা কাজ কর, তোমার গিলে-করা আদ্দির পাঞ্জাবী একটা, আর কুঁচোন কাপড় একখানা নিয়ে এস আচ্ছা মিহির, কি পরব বলতো, আদ্দির না সিল্কের পাঞ্জাবী ? জয়ন্ত আর তার বৌকে একটু এখানে আসতে বলব কিনা ভাই।

মিহির। তা আজ্ঞিই পর না, আজ্ঞিতেই তোমাকে ভাল দেখায়।

অশোক। (সামান্য উৎসাহের স্বরে) ভাল দেখায়? আচ্ছা তাহলে তাই পরব। আচ্ছা মিহির, দেখ—সত্যি করে—হাঁ, সত্যি করে বল তো, এই—হাঁ, আমি কি বড় শুকিয়ে গেছি? রং কি আমার খুব ময়লা হয়ে গেছে?

মিহির। পাঞ্জাবী আর কাপড়টা তাহলে বার করে আনি?

অশোক। নিয়ে এস, মিহির ভাই, আমার কথায় রাগ করনি তো? কতকগুলো কড়া কথা বলে ফেলেছি রাগের মাথায়, মনে কিছু কোরো না। এসব রোগগ্রস্ত মানুষকে মানুষ সহ্য করে কি করে, আমি তাই ভাবি। আমাকে নিয়ে যদি তোমরা অস্থিরই হয়ে পড়, তাহলেও বোধহয় দোষ দেওয়া যায়না। জ্যাঠাইমা আর তুমি আজ এই একবছর ধরে আমাকে যে অসীম স্নেহে ধরে রেখেছ, তার ঋণ আমি কি করে শোধ করব।

মিহির। দাদা, কাপড়টা নিয়ে আসি?

অশোক। ভাই, আমি বড় অসহায়, বড় দুর্বল। আমার কথায় বা ব্যবহারে ত্রুটি নিওনা, তাহলে আমি কোথায় দাঁড়াব।

চাকর বুলুর প্রবেশ

পরামাণিক এসেছে বুলু?

বুলু। হাঁ বাবু।

অশোক। নিয়ে এস তাকে।

বুলুর প্রস্থান

মিহির। তোমার কামান শেষ হোক, আমি একটু পরেই জামাকাপড় নিয়ে আসছি।

অশোক। আচ্ছা এস।

মিহিরের প্রস্থান।

বুলুর সঙ্গে পরামাণিকের প্রবেশ

বুলু, ও আমাকে কামাক, তুমি ততক্ষণ ঘরটা একটু গুছিয়ে রাখ। তোমার কি একটু বিবেচনা নেই বুলু, যে ঘরটা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা উচিত?

পরামাণিক কামানর ব্যবস্থা করতে লাগল; বুলু কাপড়-চোপড় বই ইত্যাদি সাজিয়ে রাখতে লাগল। কিছুক্ষণ ধরে নিঃশব্দে কাজ চলতে লাগল।

বুলু!

বুলু। আজ্ঞে।

অশোক। আজ এই যে সাত আটদিন আমার দাড়ি কামান হয়নি, তা তোমার চোখে পড়েনি?

বুলু নিরুত্তর

তা পড়বে কেন! হ্যাঁরে, তোরাও এমন অকৃতজ্ঞ হবি! আমার দিকে একটু নজর দেবার সময় নেই তোদের?

পরামাণিক কামাতে লাগল। কিছুক্ষণ চুপচাপ

বুলু, ছোটবাবুর ক্রীমটা নিয়ে আয় তো। আর বৈঠকখানা থেকে দু'খানা ভাল চেয়ার নিয়ে এসে এই সামনে রাখ।

বুলু ক্রীম এনে দিয়ে বেরিয়ে গেল

(কামান শেষ হলে) এই ক্রীমটা মাখিয়ে দাও। দেখ, তুমি—হাঁ, তোমার নাম কি বলতো।

পরামাণিক। আজ্ঞে, আমার নাম সতীশ।

অশোক। ও, সতীশ, দেখ সতীশ, তুমি রোজ—আচ্ছা রোজ নয়, একদিন অন্তর এসে আমাকে কামিয়ে দিয়ে যেও, বুঝেছ?

পরামাণিক। আচ্ছা বাবু।

অশোক। ঠিক মনে থাকবে তো?

পরামাণিক। থাকবে।

অশোক। তোমার বাড়ী কোথায়?

পরামাণিক। নদীয়া জেলায়।

অশোক। বাড়ীতে কে কে আছে? বিয়ে করেছ তো?

পরামাণিক। না বাবু। বাড়ীতে শুধু মা আর একটি ছোট ভাই আছে।

অশোক। বিয়ে করবে না?

পরামাণিক। কি খাওয়াব বাবু?

অশোক। হুঁ, কি খাওয়াবে।

বুলু চেয়ার নিয়ে প্রবেশ করল

আচ্ছা, তুমি এখন এস। বুলু, একে পয়সা দিয়ে দিগে যা। বুঝেছ—হাঁ সতীশ, দেখ, ঠিক একদিন অন্তর এসে কামিয়ে দিয়ে যেও তাহলে।

পরামাণিক। হাঁ বাবু।

অশোক। বুলু, জ্যাঠাইমাকে অমনি একটু ডেকে দিও।

বুলুর ও পরামাণিকের প্রস্থান।

অশোক আরশী নিয়ে দেখতে লাগলো; একটু পরে আরশী রেখে বই টেনে নিলে।

সান্ত্বনা প্রবেশ করলেন

জ্যাঠাইমা, একটা কথা বলব?

সান্ত্বনা। কি? বল্‌না।

অশোক। জয়ন্ত আর তার বৌকে একবার একটু নিয়ে এসনা, দেখি কেমন হয়েছে।

সান্ত্বনা। বেশ তো।

অশোক। এখনই যাও তাহলে একটা গাড়ী করে, সেই গাড়ীতেই নিয়ে আসবে। তারা কিছু আপত্তি করবে না তো জ্যাঠাইমা?

সান্ত্বনা। তুই দেখতে চাচ্ছিস, আর আপত্তি করবে!

অশোক। না না, তা নয়, তবে কিনা কাজের বাড়ী—যদি—

সান্ত্বনা। তাহলেও আর এইটুকু এসে একবার তোকে দেখা দিয়ে যেতে পারবেনা? আচ্ছা যাচ্ছি আমি, নিয়ে আসি।

মিহির কাপড়-জামা নিয়ে প্রবেশ করল

মিহির। দাদা, এই এনেছি।

অশোক। রাখ।

মিহির খাটের উপর রাখলে

জ্যাঠাইমা, দেখতো, আমার এই বিছানার চাদরটা আর বালিশের ওয়াড়গুলো ময়লা হয়েছে কিনা।

সান্ত্বনা। এই তো পরশুদিন বদলান হয়েছে বাবা, ময়লাতো তেমন হয়নি।

অশোক। হয়নি? না? আচ্ছা, থাক তাহলে। তুমি যাও, নিয়ে এস তাদের। একটু খাবার আনিয়ে রেখে যাও।

সান্ত্বনা। যাই।

অশোক। হাঁ, দেখ জ্যাঠাইমা, জয়ন্তর স্ত্রীর নামটি কি, তা তো বললে না।

সান্ত্বনা। বৌ-এর নাম প্রতিমারাণী।

অশোক। প্রতিমারাণী, প্রতিমা—সুন্দর নাম তো। প্রতিমার মতই দেখতে বোধহয়। আচ্ছা যাও তুমি, নিয়ে এস, বেশী দেরী কোরো না যেন।

সান্ত্বনার প্রস্থান

মিহির, এবার আমাকে পরিয়ে দাও।

মিহির। দিই।

কাপড়-চোপড় পরিয়ে দেবার ব্যবস্থা করতে লাগল

অশোক। ওরা আসবে, তুমি একটু কাপড়জামাটা পাল্টে নেবেনা, মিহির?

মিহির। থাক, এতেই চলে যাবে।

অশোক। তা যাবে, তোমার স্বাস্থ্যই তোমার রূপ, যাদের রূপ নেই বা ফুরিয়েছে, তারাই সাজসজ্জা চায়। দেখ মিহির, জয়ন্তর জন্যে ভাবছি না, কিন্তু শ্রীমতী প্রতিমা যখন আসছেন, তাঁকে কিছু উপহার হিসেবে দেওয়া উচিত নয় কি?

মিহির। নিশ্চয়ই।

অশোক। কি দেওয়া যায় বলতো?

মিহির। তোমার একখানা বই দাও না দাদা।

অশোক। (আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে) আমার বই? তা কি ঠিক হবে?

মিহির। কেন ঠিক হবেনা? তোমার নিজের লেখা বই, এত লোকে প্রশংসা করেছে, কেন তা দেওয়া চলবে না?

অশোক। চলবে? (দ্বিধাভরে) আমি ভাবছি, যদি সামান্য বলে ভাবেন।

মিহির। সামান্য বলে ভাববেন? তিনি লেখাপড়া জানেন, সুতরাং উপহার কখনও সামান্য বলে ভাবতে পারেন? তাছাড়া তোমার নাম তো আর একান্ত অজানা নয়।

অশোক। কিন্তু কোন নাটকটা দেবে বলতো?

মিহির। 'বহ্নিমান'টা দাওনা।

অশোক। 'বহ্নিমান' ভাল হবে তো? ওটা ট্র্যাজেডি যে?

মিহির। তা হোক; ওটাই তোমার সবচেয়ে ভাল লেখা, ওটাই দাও।

অশোক। তাই দেব, ওখান থেকে দাও তো একটা কপি এনে।

মিহির একটা কপি এনে টেবিলের উপর রাখলে

লিখে দাও—আচ্ছা থাক, উনি আসুন আগে, তারপর লিখবে। আচ্ছা ওঁদের আসতে বড় দেরী হচ্ছে না?

মিহির। বেশী দেরী তো হয়নি, এই তো গেলেন জ্যাঠাইমা।

অশোক। ও—আমি ভাবছি বুঝি বড় দেরী হয়ে গেল, (ম্লানভাবে হেসে) দেরী—আমার কাছে আবার দেরী! আজ একটি বছর ধরে যে এই সঙ্কীর্ণ ঘরটির ভেতর, তার চেয়ে সঙ্কীর্ণ এই বিছানাটির উপর দিন আর রাত্রি, রাত্রি আর দিন করে তিনশো পঁয়ষট্টিবার গুণেছে, তার কাছে দেরী! উঃ, ভাবা যায় না, কত সহস্র ঘণ্টা, কত লক্ষ মিনিট! (সামান্য জোরে) ঘড়ি আমার শত্রু, ঘড়িই আমাকে পাগল করবে।

মিহির। দাদা, একটু এস্রাজ বাজাব?

অশোক। (অন্যমনস্কভাবে) কি বলছ? (হঠাৎ আবেগের সঙ্গে) আমি আর পারিনা, আমি আর পারছি না, আমি নিশ্চয় পাগল হয়ে যাব। উঃ! ভগবানের সঙ্গে আমার ভীষণ ঝগড়া করবার আছে। (সামান্য একটু চুপ করে থেকে কতকটা সহজভাবে) মিহির, ভাই!

মিহির। দাদা!

অশোক। আমি তোমার দাদা নই ভাই, আমি তোমার ছোট ভাই, ছোট ভায়ের একটা আবদার রাখবে? আমাকে সামান্য একটা জিনিস এনে দাও। ধন নয়, রত্ন নয়, সম্মান নয়, এমনকি আরোগ্যও নয়, শুধু একটু বিষ। (অতি আবেগে) আমাকে মৃত্যু দাও, আমাকে মৃত্যু দাও, মরে আমাকে বাঁচতে দাও। (ঘাড় হেঁট করে রইল)

মিহির। এস্রাজটা নিয়ে আসব দাদা?

অশোক। নিয়ে এস।

মিহির বেরিয়ে গিয়ে এস্রাজ নিয়ে এসে অশোকের বিছানার উপর বসে সুর দিতে লাগল

(মুখ তুলে) মিহির!

মিহির। দাদা!

অশোক। ওঁরা যখন আসবেন, তুমি আমার কাছে থেক।

মিহির। থাকব।

অশোক। কি জানি কেন, সবতাতেই যেন মনটা কেমন করে, যেন একটা ছমছমে ভাব, যেন—, বড় দুর্বল হয়ে পড়েছি বলে, না?

মিহির। কোন সুরটা বাজাব দাদা?

অশোক। আজ আর যেন বিশ্বাস করা যায় না, সে যেন অন্য কোন লোকের জীবনের কথা, যে আমি একসময় আমাদের ক্লাবের একজন ভাল সাঁতারু ছিলুম, ঘোড়ায় চড়তে ভাল পারতুম, শিকার করাতেও হাত খারাপ ছিল না, উঃ! মানুষের কি পরিবর্তন! মানুষ কি অসহায়! (সামান্য থেমে) মিহির, ভাই, আমি বড় দুর্বল, বড় অসহায়, আমাকে অবহেলা কোরো না, তুমি শুধু আমার ছোট ভাইটি নও ভাই, তুমি আমার বন্ধু, তুমি আমার একমাত্র সম্পদ, তুমি আমার ভরসা।

মিহির। দাদা, বাজাই না এবার?

অশোক। বাজাও।

মিহির। (ছড়ি টানতে টানতে) বাজাচ্ছি, তুমি মন দিয়ে শোনো, ভুল হলে বলা চাই।

অশোক। (ঈষৎ হাসিমুখে) ভুল হলে বলা চাই? ইচ্ছে করে ভুল কোরো না যেন। বাজাও, শুনছি।

মিহির বাজাতে লাগল, অশোক সেইদিকে চেয়ে রইল। বাজনা যখন প্রায় শেষ হয়ে এল, তখন দরজার বাইরে পায়ের শব্দ শুনে মিহির তাড়াতাড়ি এস্রাজ রেখে দিলে

মিহির। (খাট থেকে নেমে) ওঁরা বোধ হয় আসছেন।

অশোক। ও, আসছেন ?

সান্ত্বনা প্রবেশ করলেন

সান্ত্বনা। বাবা অশোক, ওরা এসেছে রে।

অশোক। এসেছে ?

সান্ত্বনা। (দরজার দিকে চেয়ে) এস মা এস।

নয়নলোভন বসনভূষণে শ্রীমণ্ডিত নবপরিণীত দম্পতির প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে কক্ষের ভেতর যেন যৌবনসমারোহ ফুটে উঠল ; মনোরম গন্ধে বাতাস যেন বিহ্বল হয়ে পড়ল

সান্ত্বনা। (চেয়ার দু'খানা দেখিয়ে) বস মা, বস।

প্রতিমা দাঁড়িয়ে রইল। জয়ন্ত অশোকের বিছানার উপর বসতে গেল

অশোক। এখানে নয়, ওই চেয়ারে গিয়ে বস। (প্রতিমার প্রতি) আপনিও বসুন। যাও জয়ন্ত, গিয়ে বস।

সান্ত্বনা। হাঁ বাবা, বস।

দু'জনে চেয়ারে বসল

অশোক। জ্যাঠাইমা, এঁদের খাবার বন্দোবস্ত করেছ ?

জয়ন্ত। এখন আবার খাবার কেন ?

সান্ত্বনা। একটু মিষ্টিমুখ করতে হয় বাবা। আমি আসি, তোমরা গল্প কর।

সান্ত্বনার প্রস্থান

অশোক। কি বলে ডাকব আপনাকে ভাবছি। ইংরিজি ধরণে বলতেও বাধ বাধ ঠেকছে, আবার নাম ধরে ডাকতেও কিন্তু কিন্তু হচ্ছে। জয়ন্ত, তুমি কি বল, শ্রীমতী বসুজায়া বলি ?

জয়ন্ত। (হাসিমুখে) তুমি লেখক, তোমার যে কথাটা পছন্দ হয়, সেটাই আমাদের মানতে হবে। দেখ, তোমার তিনখানা নাটকেরই তো একটা করে কপি আমাকে দিয়েছিলে, সেগুলো বাড়ীতে রয়েছে কিনা কে জানে।

অশোক। এমনিই যত্নশীল বন্ধু তুমি !

জয়ন্ত। তা নয় ভাই, কি করি বল ; এ-ও চেয়ে নিয়ে যায়, ফেরৎ নিতে মনে থাকে না।

অশোক। তাতেও তোমার অমনোযোগিতারই প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। দেখ জয়ন্ত, বিয়ে উপলক্ষে তোমাকে আর কিছু দিতে পারছি না, শ্রীমতী বসুজায়াকে সামান্য একটা জিনিস দিচ্ছি। দাও তো মিহির 'বহ্নিমান' একখানা।

জয়ন্ত। তোমার এমন সুন্দর নাটক 'বহ্নিমান' বুঝি সামান্য জিনিস হল ?

অশোক। দেখুন, কিছু মনে করবেন না, কোনও ত্রুটি নেবেন না। লেখকের নিজের রচনার অর্ঘ যাঁকে নিবেদন করা হচ্ছে, তাঁর কাছে সামান্য হলেও লেখকের কাছে সবচেয়ে বেশী মূল্যবান। মিহির, ভাই, উৎসর্গটা লিখে বইটি ওঁর হাতে দাও।

মিহির লিখে প্রতিমার হাতে দিল

আমার বিড়ম্বিত জীবনের কথা জয়ন্তর কাছে শুনবেন। জানেন, জয়ন্ত আমার ছেলেবেলাকার বন্ধু, একসঙ্গে থার্ড ক্লাস থেকে ইণ্টারমিডিয়েট পর্যন্ত পড়েছি। ক্লাসে আমি হতুম ফার্ষ্ট, ও হত সেকেণ্ড। তারপর ইণ্টারমিডিয়েট পাশ করে ও মেডিক্যাল কলেজে ঢুকল ; আজ ডাক্তার হয়ে বেরিয়ে আপনাকে পেয়ে জয়লক্ষ্মী লাভ করেছে। প্রতিমা শুধু আপনি নামেই নন দেখছি, আমার কথা একটুকুও বাড়িয়ে-বলা ভাববেন না—আপনি সত্যিই রূপে প্রতিমারাণী এবং মনে হয়, গুণেও এ নাম সার্থক করবেন। জয়ন্ত, তুমি ভাগ্যবান বলে নিজেকে বিশ্বাস কর তো ?

জয়ন্ত। তুমি যেমন করে বলছ তাতে ভাগ্যবান বলে বিশ্বাস করতে হচ্ছে বৈকি।

অশোক। তারপর আমার কথা শুনুন। বি-এ পাশ করলুম, এম-এ পাশ করলুম, দুটো 'ল-'এর এগজামিন দিলুম, তৃতীয়টা আর পাশ করা হল না—দুর্ভাগ্য এসে আমার জীবনটা নষ্ট করে দিলে। দেখুন, কত আশা ছিল আমার, কত বড় হব, দেশের একজন শ্রেষ্ঠ সন্তান হব, বাংলা সাহিত্যের একজন শ্রেষ্ঠ নাট্যকার হব, অক্ষয় কীর্ত্তি রেখে যাব, তা আর পূর্ণ হল না, আশার ফুলকে অকালে কে যেন টুকরো টুকরো করে দিলে।

জয়ন্ত। অশোক এখন কি আর মোটেই লেখ না ?

অশোক। না, সামান্য সামান্য লিখি। তুমি কোথায় ডাক্তারখানা খুলেছ ?

জয়ন্ত। এখনও খুলিনি, তবে শীগ্‌গির খুলব।

অশোক। যা বাজার, তাতে চালাবে কি করে ? আমি দু'চারজনকে জানি, যারা ডাক্তারখানা খুলে চালাতে না পেরে শেষকালে স্ত্রীর গয়না বিক্রি করে দেনা শোধ করেছে।

জয়ন্ত। মিহির, তোমার এস্রাজচর্চা কেমন চলছে ?

মিহির। (সামান্য লজ্জিতভাবে) চর্চা কোথায় আর, এমনি পড়ে আছে।

অশোক। দেখ জয়ন্ত, ডাক্তারখানা খোলার ব্যাপারে একটু বুঝেশুঝে চলো, এতগুলো টাকা খরচ হবে তো। পাঁচ জনের কাছে নাই হোক, অন্ততঃ শ্রীমতী বসুজায়ার কাছে যাতে সম্ভ্রমটা বজায় থাকে, তার চেষ্টা কোরো। মাসে কমপক্ষে তিরিশটা টাকা পকেটে পড়া দরকার।

জয়ন্ত। মিহির, তোমার একটু বাজনা শোনাও।

হঠাৎ চোখের পলকে যেন কি হতে কি হয়ে গেল। চকিতে অশোক বাঁ হাতে করে টেবিলের উপর থেকে কাঁচের পেপার-ওয়েটটা নিয়ে জয়ন্তর মাথা লক্ষ্য করে সজোরে ছুঁড়ে মারলে ; সেটা জয়ন্তর মাথায় না লেগে শুধু তার চশমাটাকে ছিট্‌কে ফেলে দিয়ে সামনের সার্শিটায় গিয়ে লাগল। সার্শির কাঁচটা ঝন্‌ঝন্ করে ভেঙ্গে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গেই অত্যধিক মানসিক চাঞ্চল্যে অশোক মূর্চ্ছিত হয়ে উল্টে মেজেতে পড়ে গেল।

খৃষ্টীয় শিল্পের আদি পর্ব

শ্রীচিন্তামণি কর

নদীর মোহনায় দাঁড়িয়ে উৎসের চিন্তা করলে, মনে নানা কল্পনা, নানা প্রশ্ন ভিড় করে জটিল সমস্যায় ফেলে দেয়। নদীর উৎসতো মোহনার মত এত বিরাট, এত উন্মুক্ত নয়; তাকে খুঁজে পেতে, বহু প্রান্তর, জনপদ, অজানা পর্ব্বত বনের ভিতর দিয়ে যেতে হয় কয়েকটি ক্ষীণ জলধারার সমীপে।

প্রাচীন গ্রীকভাস্কর্য্য, বাইজানতাইন শিল্প,রোমক ভাস্কর্য্য ও মোজায়েক নক্সাচিত্র এবং পুঁথিচিত্রের ক্ষীণ প্রবাহগুলির অবলম্বনে, ইয়োরোপীয় শিল্পকলা, নানা স্রোতাবর্ত্তের মধ্য দিয়ে, বহু শাখাপ্রশাখা বিস্তার করে, বিশাল পরিসরে বর্ত্তমান জগতে ব্যাপ্ত হয়েছে। খৃঃ পূর্ব্ব তিন কি দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে, ব্রোঞ্জ যুগে, এজিয়ান সভ্যতায় যে নিদর্শনগুলি পাওয়া গিয়াছে তাতে দেখা যায় ক্রীটে ঐ সময়ে অতি উচ্চাঙ্গের প্রাচীর চিত্র ও অলঙ্করণ চিত্রের চর্চ্চা ছিল। সে সময়ে অঙ্কিত, মানব ও অন্যান্য জীব ও বস্তুর নিপুণ, বাস্তব অনুকৃতি ও গতিভঙ্গী, সত্যিই অতীব সুন্দর। প্রাচীন গ্রীস এই সভ্যতার দ্বারা যথেষ্ট প্রভাবান্বিত হয়েছিল। পরে উত্তর গ্রীস হ'তে ক্রমাগত অভিযান ও যুদ্ধের ফলে এই সভ্যতা ধ্বংস হলেও এরই ধ্বংসাবশিষ্ট সংস্কৃতিকে অবলম্বন করে পরবর্ত্তী গ্রীক সভ্যতার বিকাশ হয়। প্রাচীন গ্রীসে, চিত্রণের কতখানি চর্চ্চা ছিল তার সঠিক বিবরণ দেওয়া শক্ত। পাথরের মূর্ত্তি যেমন প্রকৃতির অত্যাচারকে উপেক্ষা করে দীর্ঘকাল দাঁড়িয়ে থাকতে পারে, চিত্রণের আধার ও উপকরণ তত দীর্ঘকাল স্থায়ী উপাদানে গঠিত নয় বলেই হয়ত গ্রীক চিত্রণের নিদর্শনগুলি সম্পূর্ণ লুপ্ত হয়ে গেছে। গ্রীক ইতিহাসে উল্লিখিত খৃঃ পূর্ব্ব পঞ্চম শতাব্দীতে, পলিগনেটাস, মিসন, পানেনাস প্রভৃতি খ্যাতনামা চিত্রকরদের রচিত এথেন্স ও দেলফির মন্দির ও প্রাসাদের প্রাচীর চিত্রগুলির কাহিনী ছাড়া আর কিছুই পাওয়া যায় না। প্রাচীন গ্রীসের চিত্রিত পর্ব্বতগাত্রে যে চিত্র নিদর্শন পাওয়া যায় তাকে চিত্র অপেক্ষা চিত্রণের প্রাথমিক নক্সা বললেই ভাল হয়। পরে গ্রীস রোমকদের দ্বারা বিজিত হলে ইতালিতে গ্রীক সভ্যতা বিস্তৃতি লাভ করল। কিন্তু গ্রীক সভ্যতা প্রণোদিত রোমক সংস্কৃতির চিত্রণের দানও কালের কবলে লুপ্ত হয়ে গেছে। কয়েকটি মোজায়েক নক্সাচিত্র ও ভিসুভিয়াসের অগ্ন্যুৎপাতে বহুকাল ভূগর্ভে নিহিত শহর খননে প্রাপ্ত কয়েকটি প্রাচীর চিত্রের নিদর্শন অতি উচ্চাঙ্গের শিল্পকলা হলেও তার ধারা পূর্ব্বেই নিঃশেষ হয়ে যাওয়ায় বর্ত্তমান শিল্পধারার উৎসে তার সন্ধান পাই না। গ্রীকোরোমক শিল্পীরা শিল্পের যে উন্নতি সাধন করেছিলেন, পরবর্ত্তী যুগে তার ক্রমাগত অন্ধানুকরণ সে শিল্পধারাকে অপকৃষ্ট ও বিকৃত করেছিল। খৃষ্টধর্ম্মের অভ্যুদয়ে পেগানিসম অপসারিত হওয়ায় ইয়োরোপে এবং পরে ব্যাপকভাবে পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও ধর্ম্মনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনে যে এক বিরাট পরিবর্ত্তন হয়েছে, মানব সভ্যতার ইতিহাসে আজও সে রকম পরিবর্ত্তন দুর্লভ। যখন খৃষ্টধর্ম্ম নিরাপদে সাধারণ্যে স্থান পেল, খ্রীশ্চানদের প্রতি পূর্ব্ব অত্যাচারের প্রতিক্রিয়া হিসাবে খ্রীশ্চানগণ অখৃষ্টীয় সবকিছু বিধর্ম্মী ও অসার বলে ঘোষণা করে ধর্ম্ম আইনে তার বিকাশের পথ রুদ্ধ করে দিলেন। দেবতাদের মূর্ত্তি রচনা একেবারে নিষিদ্ধ হল। যে দেবমূর্ত্তি রচনা করতো, তাকে ধর্ম্মদীক্ষায় অনধিকারী, শয়তানের সাক্ষাৎ অনুচর বা দূত হিসাবে গণ্য করা হ'ত। পাছে খৃষ্টকে কেউ দেবরূপে এঁকে নিজেদের রূপসৃষ্টির অভিষ্টপূরণ করে তা রোধ কর্ত্তে অনেক ধর্ম্মযাজক রটালেন খৃষ্ট অতি কুৎসিত, বিকট দর্শন ছিলেন। বহুকাল পরে যখন এই প্রতিক্রিয়া রহিত হল এবং জনসাধারণ রূপালোকে ফের ফিরবার চেষ্টা করতে লাগল, তখন দেখা গেল যে, অপকৃষ্ট ও বিকৃত রোমক শিল্পের শেষ ক্ষীণ ধারাটি ধর্ম্মাত্যাচারে প্রায় নিঃশেষ হয়ে গেছে।

সম্রাট কনস্তানতাইন'এর সময় ইতালীতে খৃষ্টধর্ম্ম রাষ্ট্রীয় সমর্থন পাওয়ায় নতুনভাবে ধর্ম্মমন্দির ও প্রাসাদগুলি গড়ে উঠেছিল। যে চিত্রণের প্রাণধর্ম্ম সংগ্রামের আবর্ত্তে পড়ে রুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল তার প্রকাশ হ'তে লাগল মোজায়েক চিত্রের মধ্য দিয়ে। আদি খ্রীশ্চানদের চিত্রণের প্রতি বৈরীভাব থাকলেও মোজায়েক চিত্র তাঁদের কোপ দৃষ্টিতে না পড়ায়, অতি প্রাচীন খৃষ্টীয় ধর্ম্মমন্দিরগুলিতে ব্যাপকভাবে মোজায়েক চিত্রিত হয়ে এসেছিল। রোম এই ধরণের মোজায়েক অলঙ্কৃত গীর্জ্জায় পূর্ণ। এই ধর্ম্মমন্দিরগুলির গঠনকাল খৃষ্টীয় পঞ্চম ও নবম শতাব্দীর মধ্যে। অষ্টম ও নবম শতাব্দীর মোজায়েক চিত্রগুলির রচনা অতি নিকৃষ্ট, আড়ষ্ট ও প্রাণহীন। রোমের পর র‍্যাভেনার গীর্জ্জাগুলি ঐ সমসাময়িক মোজায়েক অলঙ্করণে বেশ ঋদ্ধিসম্পন্ন দেখা যায়। মোজায়েকের সমসাময়িক মিনিয়েচার চিত্রণ; ধর্ম্মমন্দিরের সেবার্থে রচিত হস্তলিখিত পুঁথিগুলির মধ্যে বিকশিত হচ্ছিল।

ইতালীতে অন্ধানুকরণাবশিষ্ট গ্রীকো-রোমক শিল্পের শেষ হওয়ায় কনস্তানতিনোপল থেকে বাইজানতাইন্ শিল্পীদের চিত্রকার্য্যের জন্ত আনা হ'ত। বহু প্রাচীনকাল থেকে বাইজানতিয়ুম সহর গ্রীক সভ্যতার অন্তর্ভুক্ত ছিল। এখানে গ্রীসিয় শিল্প, প্রাচ্য দেশীয় শিল্পের মিশ্রণে নতুন রূপ ধারণ করেছিল। সম্রাট কনস্তানতাইন, বাইজানতিয়ুমকে আরো বৃহৎ এবং সমৃদ্ধিশালী করে রোমক সাম্রাজ্যের রাজধানীতে পরিণত ও নিজনামে উৎসর্গীকৃত করায় কনস্তানতিনোপল শিল্প সংস্কৃতিতে বেশ উন্নত হয়েছিল। বাইজানতাইন শিল্পকলা খুব উচ্চাঙ্গের না হলেও গ্রীক ও রোমক শিল্পের সঠিক অনুকরণ করে প্রাচীন শিল্পের ধারাকে বাঁচিয়ে রেখেছিল। পরবর্ত্তীকালে বাইজানতাইন চিত্রণ এবং মোজায়েকের মিশ্রণে উদ্ভূত শিল্পের নবরূপই বর্ত্তমান ইয়োরোপীয় শিল্পধারার সূত্রধার। অষ্টম ও নবম শতাব্দীর শেষে কারোলিন্‌জিয়ান্ সম্রাটদের উৎসাহে বাইবেল ও ধর্ম্মসম্পর্কীয় পুঁথিগুলি সুচিত্রিত করবার প্রচেষ্টায় মিনিয়েচার চিত্রকররা বেশ উন্নতি ও প্রাধান্যলাভ করেছিলেন। সম্রাট শার্লমানের আদেশে অনেকগুলি উল্লেখযোগ্য চিত্রিত পুঁথির সৃষ্টি হয়েছিল। এই চিত্রগুলির প্রকাশে রূঢ়ভাব ও শরীর সংস্থানে অনুপাতদুষ্ট দেখা যায়। অঙ্কনশৈলীতে ঘন রঙ, প্রয়োগাধিক্যে পুরাণ ক্লাসিক অঙ্কন রীতিকে রক্ষা করার প্রচেষ্টা বেশ স্পষ্ট। এই চিত্রগুলি থেকে আমরা আদি খৃষ্টীয় শিল্পের শেষ পরিচয় পাই। এই সময় ইতালী গ্রীসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করায় এবং লোম্বার্ট ও কারোলিন্‌জিয়ানদের শাসন দাপটে, গ্রীসের শিল্প সংস্কৃতির সংযোগসূত্রটি বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। সাধারণ ও ব্যক্তিগত জীবনে ভীষণতম বিশৃঙ্খলা ও বিপর্য্যয় ঘটে, শিল্পকলার বহমান ধারাটিও সম্পূর্ণরূপে নিঃশেষ হয়ে গেল। দশম ও একাদশ শতাব্দীতে সৃষ্ট, বিকৃতাকৃতি ও বর্ণবৈরূপ্য বিশিষ্ট ইতালীয় চিত্রের দু' একটি নমুনাকে চিত্রকলার সংজ্ঞা দেওয়া যায় না।

বাইজানতাইন্ সাম্রাজ্যে, রাজসভা ও ধর্ম্মমন্দিরের উৎসাহ ও সহায়তা পেয়ে শিল্পের চর্চ্চা নিরবিচ্ছিন্নভাবে এগিয়ে চলছিল। প্রাচীন গ্রীস ও রোমের চিত্রণ শৈলীকে বাইজানতাইন্ শিল্পীরা বংশপরম্পরায় অনুকরণ করে বাঁচিয়ে রেখেছিলেন। তাঁদের দ্বারা অনুপ্রাণিত শিল্পপদ্ধতি পাশ্চাত্যে বিশেষ করে ইতালীতে ত্রয়োদশ শতাব্দীর শিল্পে নবজীবন এনেছিল। এই শিল্পধারা প্রাচীন শিল্পের অন্ধানুকরণ হলেও এক সময়ে সত্যিকার গভীর প্রেরণায় ও অকৃত্রিম স্বতঃস্ফূর্ত্ত সাধনায় প্রাণপূর্ণ থাকায় এর পক্ষে ভবিষ্যতের শিল্পীকে নতুন প্রেরণায় ও উপযুক্ত পথে চলতে শক্তি দেবার মত উপাদানে অভাবগ্রস্ত হতে হয়নি। বাইজানতাইন শিল্প বংশপরম্পরায় অনুকৃত হ'য়ে অধঃস্তন বংশে যে অবস্থায় পৌঁছেছিল, তাতে গতিভঙ্গী ও

রচনা-সমন্বয় ধারার পরিবর্ত্তন হয়ে অদ্ভুত রূপের সৃষ্টি হয়েছিল। মানবাকৃতি ভাবভঙ্গী, পোষাকপরিচ্ছদ ও নগ্নমূর্ত্তির বিচিত্র অঙ্কন তার প্রমাণ দেয়। এই সময়ের অঙ্কনে দেখা যায়, শরীর সংস্থানের প্রতি শিল্পীদের কোন লক্ষ্যই ছিল না, পরিধেয়ের সংস্থানে স্বাভাবিক প্রকাশ নাই বলিলেই চলে; কেবলমাত্র সরল সমান্তরাল রেখায় পরিধেয়রূপ আড়ষ্ট ও কুৎসিত। মুখের ভাবে ব্যক্তিত্বের কোন লক্ষণ নাই, ভাব-প্রকাশেও একই প্রকার কঠিন, ক্লিষ্ট ও প্রাণহীন রূপ।

দ্বাদশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে সম্রাট প্রথম ফ্রেদেরিক্-এর রাজত্বকালে সপ্তম অষ্টম ও নবম শতাব্দীর যুদ্ধ বিগ্রহের জ্বালা থেকে ইতালীয়গণ অব্যাহতি পেয়ে নতুন জীবন ও উদ্যমে স্বাধীনতার সাড়া এনেছিলেন। এই সময়ে বহু ধর্ম্মমন্দির ও প্রাসাদ নির্ম্মিত হয়েছিল। শিল্পের শুকানুকৃত অবয়বে নতুন প্রাণসঞ্চার করার আবেগ এই সময় বেশ পরিস্ফুট দেখা যায়। দেশীয় শিল্পের সম্পূর্ণ অবনতি ঘটায় ইতালীয়গণকে বাইজানতাইন শিল্পীদের নিযুক্ত করতে হয়েছিল এবং তাদের শিল্পাদর্শকে অবলম্বন করতে হয়েছিল। বারশ চার খৃষ্টাব্দে লাতিনরা কনস্তান্তিনোপল জয় এবং লুণ্ঠন করে বাইজানতাইন শিল্পসংগ্রহ ও শিল্পীদের ইতালীতে আনায়, শিল্পের রূপ কিছুকালের জন্য বিজিতদের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়। কিন্তু, সময়ের প্রয়োজনকে মেটাতে সভ্যতা ও সংস্কৃতির সঙ্গে তাল রেখে চলতে রূপাদর্শ ও শিল্প পদ্ধতির যে পরিবর্ত্তন আবশ্যক তা ধীরে ধীরে বিকাশ-লাভ করছিল। কনস্তান্তিনোপল অভিযানের পূর্ব্বেই ভেনিস প্রাচ্যের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট হওয়ায় বাইজানতাইন্ শিল্পীদের সহিত মিলনে অগ্রণী হয়েছিল। শিল্পের পুনর্বিকাশের পথে যে রচনাগুলি আত্মপ্রকাশ করেছিল, ভাবধারা ও আবেগে অভিনবত্বের আভাস দিলেও সেগুলি প্রাচীন ক্লাশিক্ শিল্পের সঙ্গেও বেশ সংযোগ রেখেছিল। খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষভাগেও আমরা শিল্প রচনার এই অভিব্যক্তি দেখতে পাই। এই সময়ের রচনাগুলিতে, প্রাচীন শিল্পের আগ্রহভরা অনুশীলনের পরিচয় পেলেও, শিল্পীরা প্রকৃতিকে সূক্ষ্মভাবে দর্শন করে, আকৃতির শুদ্ধ গঠন দেবার চেষ্টায় বাইজানতাইন শিল্প ঐতিহ্যে নতুন রঙ, নতুন সজ্জার সৃষ্টি করেছিলেন। ঐ সময়ে, যে সকল শিল্পীর রচনায় প্রকৃতি পর্য্যবেক্ষণ ও অনুশীলনের ফল পরিস্ফুটভাবে বিকাশ লাভ করেছে তার মধ্যে ভাস্কর নিকোলা পিসানোকে প্রথম স্থান দিতে হয়। সমসাময়িক দর্শন ও রাজনীতির বিকাশ ও পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে ইতালীয় শিল্পের নববিকাশের ফল ভাস্কর্য্যে বেশী পরিস্ফুট হলেও একই অনুপ্রেরণা চিত্রকরদেরও প্রভাবান্বিত করেছিল। তার প্রমাণ পাই ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষভাগে ও পরবর্ত্তী শতাব্দীর প্রথমভাগে রচিত চিত্রগুলিতে।

এই সময়ের শিল্পীদের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন সিমাবু বংশের ফ্লোরেন্তিন জিওভানিন্নি। ভ্যাসারির মতে তাঁর জন্ম হয় ১২৪০ খৃষ্টাব্দে এবং মৃত্যু হয় ১৩০০ খৃষ্টাব্দের অব্যবহিত পরেই। তাঁর কাজগুলির সঠিক সনাক্তকরণ আজও সন্দেহের বিষয়ীভূত হয়ে আছে। রচয়িতা হিসাবে, সিমাবুর নাম যে চিত্রগুলিতে উল্লিখিত হয়ে থাকে তার মধ্যে ফ্লোরেন্সে রক্ষিত দুইটি প্রকাণ্ড মাতৃমূর্ত্তির চিত্র সর্ব্বাপেক্ষা বিখ্যাত। তাঁর চিত্রগুলির মধ্যে যদিও বাইজান্তাইন প্রভাব অতিশয় স্পষ্ট, তথাপি অঙ্কনধারায়, স্বাধীনভাবে চিন্তা ও ভাবপ্রকাশের চেষ্টা সহজেই ধরা পড়ে। নক্সাগুলি, প্রকৃতির বাস্তব পর্য্যবেক্ষণে আঁকায়, এবং রঙ হাল্কা ও মোলায়েমভাবে সম্পাত করায়, তিনি যে পূর্ব্ব অঙ্কন প্রথায় আড়ষ্ট ও প্রাণহীন কাঠামোতে নতুন প্রাণ নতুন রূপের অবতারণা করেছিলেন, তা বেশ উপলব্ধি করা যায়। শোনা যায়, সিমাবুর মাতৃমূর্ত্তির ছবি আঁকা শেষ হলে শিল্পীর বাড়ী থেকে ছবিটি, যে ধর্ম্মমন্দিরে রাখা হয়, সেই গীর্জ্জা পর্য্যন্ত আনন্দমুখরিত এক বিরাট শোভাযাত্রা করে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। আসিসিতে সান্তোফ্রান্‌সেস্কো গীর্জ্জায় সিমাবুর রচনা বলে পরিগণিত বৃহৎ প্রাচীর-চিত্রগুলিতে আধুনিক চিত্রকলার ঐতিহাসিক ক্রমবিকাশের প্রথম উন্মেষ লক্ষণ প্রকাশ পেয়েছিল। গীর্জ্জাটি স্থাপত্য ইতিহাসে একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য উদাহরণ। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে বহু বিদেশী শিল্পী গীর্জ্জাটি নির্ম্মাণে নিযুক্ত হয়েছিলেন। এর গথিক ধরণের নির্ম্মাণ তৎকালীন ইতালীতে অতি বিরল। এই ধর্ম্ম-মন্দির যে ভক্তদের ভক্তিশ্রদ্ধাঞ্জলি লাভ করে পুণ্যতীর্থে পরিগণিত হয়েছিল তার ইঙ্গিত পাওয়া যায় ত্রয়োদশ ও চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে রচিত অসংখ্য চিত্রাবলীতে। গ্রীক শিল্পীগণ কর্ত্তৃক আরব্ধ গিউন্-দা-পিসা'র চিত্রগুলির কার্য্য পুনঃ সম্পাদন করতে সিমাবু আহূত হয়েছিলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে কালের ধ্বংসাবলেপনে গ্রীকশিল্পী ও সিমাবুর রচনা প্রায় সম্পূর্ণ মুছে গেছে। সামান্য যে কয়টি সিমাবুর রচনা রক্ষিত অবস্থায় পাওয়া গিয়েছে তার মধ্যে বাইজানতাইন শিল্পের যথেষ্ট প্রভাব থাকলেও, মূর্ত্তিগুলির সন্নিবেশ ও উদ্দেশ্য বিষয় নিপুণভাবে প্রকাশিত হয়েছে।

সিমাবুর শিল্পধারার অনুরূপ হলেও একজন সিয়েনিজ্ শিল্পী, দুক্‌চিয়োর রচনা অনেক উন্নতি ও পরিপূর্ণতার দিকে অগ্রসর হয়েছিল। প্রাপ্তব্য প্রমাণ সংগ্রহ থেকে মনে হয়, তিনি ১২৮২ খৃষ্টাব্দে সিয়েনা সহরে বেশ প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন শিল্পী ছিলেন এবং ১৩০৮ খৃষ্টাব্দে আরম্ভ করে ১৩১১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত কাজ করে দুয়োমের প্রধান বেদীর জন্য একটি বিরাট চিত্র রচনা করেছিলেন। দুক্‌চিয়োর চিত্রেও বাইজানতাইন রূপের যথেষ্ট প্রভাব। সিমাবুর ন্যায় তাঁর ছবিতে গভীর অনুভূতির প্রকাশ ছাড়াও সিমাবুর অপেক্ষা সজীব গতিভঙ্গী, পবিত্র ভাব ও সুসঙ্গত সমাবেশের প্রতি তাঁর বিশেষ আগ্রহের পরিচয় পাই। এই গুণগুলির সহিত তাঁর রচনায় সৌন্দর্য্য প্রকাশের উচ্চ প্রেরণা, হৃদয়গ্রাহী সারল্য, নগ্নতার সুরূপ সংস্থান ও সাজসজ্জার নিপুণ সম্পাদন, ঐ সময়ের শিল্পধারায় মানে আশাতীত বল্লে অত্যুক্তি হয় না। শুধু যে দুক্‌চিয়ো আধুনিকতা ও পরিপূর্ণতার দিকে অগ্রসর হয়েছিলেন তা নয়, চতুর্দ্দশ ও তৎপরবর্ত্তী শতাব্দীতে নানাভাবে শিল্পপারমিতা অর্জ্জনে বহু শিল্পীর উদ্যম, শিল্প-ইতিহাসে অনবলেপনীয় কীর্ত্তি রেখে গেছে। শিল্পের নববিকাশে শিল্পীর চরম লক্ষ্য ছিল, উদ্দেশ্য বিষয় বা কাহিনীর উপযুক্ত প্রকাশ, অকৃত্রিম অবতারণা ও যথাযথ অবয়ব করা। বস্তুকে উপেক্ষা করে বিষয়কে প্রধান করা বাহ্য ধর্ম্মোন্মাদনা প্রসূত ছিল। শিল্পী-অন্তরের রূপক্ষুধা এই সময় ধর্ম্ম ও শাস্ত্রের স্তূপ ঠেলে উপরে উঠবার চেষ্টা করছিল। অধ্যাত্মবাদ, পার্থিব সবকিছুকেই অসার, নশ্বর, ভঙ্গুর বল্লেও যাকে অবলম্বন করে বিষয় স্থূলভাবে আত্মপ্রকাশ করবে তার প্রতি সহানুভূতি দিন দিন শিল্পীর মন আকর্ষণ করছিল। শিল্পী তাঁর রচনায় পার্থিব ও অধ্যাত্মের বৈষম্য বিলুপ্ত করে জগতকে দেখালেন অপার্থিব বস্তুসম্পর্কবিহীন অমূর্ত্তের সহিত পার্থিব স্থূল বস্তুর মহামিলন। খৃষ্টীয় শিল্পের আদি পর্ব্বে এই মিলনের বিকাশ প্রতীয়মান হয়। এর পূর্ব্বে, বাস্তব ও কল্পনার যে আপাত-মিলনের রূপ শিল্পে মূর্ত্ত হচ্ছিল তা স্বতঃস্ফূর্ত্ত ছিল না। পরে শিল্পের আরো পরিণতি ঘটলে যথেচ্ছা মনগড়া ও অপ্রাকৃত প্রতীকের প্রকাশ শিল্পের উদ্দেশ্যকে সম্যক্ রূপ দিতে অক্ষম হল। উদ্দেশ্য বিষয়কে পরিপূর্ণভাবে ব্যক্ত করে এমন বাস্তব-প্রতীকের আবির্ভাব হ'তে লাগল। বস্তুতঃ তৎকালিন রোমান্টিক প্রবণতার উচ্চ বিকাশের প্রতি মনের স্বাভাবিক আসক্তি, শিল্প ও কাব্যে, ধর্ম্মাশ্রম-জীবন ও সিভ্যালরিতে, সেন্টদিগের অর্চ্চনা ও সৌন্দর্য্যের আরাধনায়, বহুমুখী জীবনের সকল মার্গে অদ্ভুত সঙ্গতি ও বিচিত্র ঐক্য সম্পাদন করছিল। আধুনিক শিল্প-ধারার গঠনে তাস্‌কানি সর্ব্বাপেক্ষা অগ্রসর হয়েছিল। এই সময়ে দুইটি প্রধান ভাবধারা শিল্পের অগ্রবর্ত্তী ক্রমবিকাশের পথে পরিস্ফুট দেখা যায়। একটি প্রজ্ঞাপ্রধান ও আর একটি অনুভূতিপ্রধান। প্রথমোক্ত বাস্তব দৃষ্টি বহির্ভূত, কল্পনাপ্রসূত বস্তুর রচনায় অনুসন্ধিৎসু ছিল, শেষোক্ত ধর্ম্মানুভূতির মধ্য দিয়ে পার্থিব বস্তুর রূপ প্রকাশে উৎসাহিত হয়েছিল। প্রথমোক্তটি ফ্লোরেনতাইন্ শিল্পীদের ও শেষোক্তটি, সিয়েনিজ্ শিল্পীদের অনুপ্রাণিত করেছিল।

ভাব ও ভাষা

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত

একটি বাক্যের মাঝে
আমারে নিঃশেষ করে' দেব
হেন শক্তি নাই ;
তাই শুধু বাক্য হ'তে বাক্যে ছুটে' যাই।
অনন্তের রথ অনন্তে রয়েছে তা'র পথ ;
তাই যত ছুটে' যাই তত পথ আরো থাকে বাকী।
বাক্য দিয়ে বোঝাব আমারে
চিত্ত জুড়ে' ঘোরে এই আকাঙ্খার ফাঁকি।
নিদাঘের খর সূর্য্যালোকে
লোকে লোকে আলোক বিস্তারে ;
জানাতে মহিমা আপনার, মহাকাশ
আলোকের ভাষা দিয়ে
মহাসূর্য্যে করেছে প্রকাশ—
সে প্রকাশ ঢেকে দিল তা'রে
আপন আলোর অহঙ্কারে,
সিত পীত নীল মরকত
বিচিত্রিত বর্ণের গৌরবে
সে ফিরিছে নানা কলরবে।
অঙ্কুরিয়া বৃক্ষ ওঠে
কুঞ্জে কুঞ্জে পুষ্পদল ফোটে গন্ধের সম্ভারে,
তবু সে গম্ভীর রহে সবাকার অগোচরে ;
প্রকাশের সর্ব্ব অবসর
রবি তা'র রশ্মিদলে হানে।
আকাশের মহিমারে
ক্ষুণ্ণ করি' রশ্মিভারে
আপন সুনীল বর্ণে দেয় তা'র মিথ্যা পরিচয় ;
সত্যের প্রকাশচ্ছলে মিথ্যা জাগে লইয়া প্রশ্রয়।
তাই মৌন মহাকাশ
আপনারে অন্ধকারে ঢাকে,
আপন মহিমা তা'র
আঁখি-তারকার ছলছলে
আপনা প্রকাশ করে
রসের উচ্ছল টলমলে।
তাই বলি, বাক্য থাক্,
সে পুরাক্ শুধু তা'র
মিথ্যার বঞ্চনাময় ফাঁক।
হে চিত্ত, নিস্তব্ধ তুমি রহ,
আপন নির্ব্বাকে তুমি
অনুভবে পরিপূর্ণ হয়ে
আপন অনন্তবাণী কহ।

রূপাতীত

শ্রীসুবোধ রায়

চোখের দেখাতো অনেক হ'য়েছে, খোলো না মনের আঁখি ;
দেখিবে, এখনো রূপের জগতে দেখিতে অনেক বাকী !
হৃদয়-দেউলে বিপরীত বায়ু স্নেহের আঁচলে ঢেকে
প্রীতির প্রদীপ তোমার লাগিয়া যে-জন জ্বালা'য়ে রেখে
মাগিছে নিভৃত দেবের আশীস্ সকলের অগোচরে,
তা'র ছায়াছবি দুলিছে নিয়ত তোমারি মানস-সরে।
যদি তব ধ্যান-মুকুরে তাহার না জাগে প্রতিচ্ছবি,
ব্যর্থ রূপের শত আয়োজন ; বৃথা গ্রহতারা রবি
তব তরে হেথা আলোকে-ছায়ায় রচিছে ইন্দ্রজাল।
রূপের পূজারী নহ তুমি তবে, অভাগা রূপ-কাঙ্গাল !

দেশে দেশে আর যুগে যুগে যত ত্যাগী ও বীরের দল
জীবন-মহিমা বাড়াইতে যা'রা বীর্য্যে অচঞ্চল,
মিথ্যা ভ্রূকুটি তুচ্ছ করিয়া সত্যের জয় লাগি'
ক্ষমাসুন্দর হাসির সঙ্গে মৃত্যু লইল মাগি'
গতানুগতিক জীবন-পর্ব্বে নবধারাস্রোত আনি'
রচে ইতিহাস, নবীন কাহিনী ; নবীন মন্ত্র দানি'
দলিত হতাশ মানুষের বুকে জাগায় বিপুল আশা
জ্বালায় হিংসা-কলুষ-আঁধারে উজ্জ্বল ভালবাসা,—
তা'দের অমর মহিমা,—ভেদিয়া দেশ-কাল-ব্যবধান,—
যদি নাহি হয় তব মনোলোকে পূর্ণ দীপ্যমান,
পুঁথির আখরে নয়ন তোমার বৃথাই অন্ধকারে
বন্দী হইল রূপময় জড় বস্তুর কারাগারে !

যত কবিদল লিখিল কবিতা প্রাণের মমতা দিয়া,
গেয়ে গেল যা'রা আনন্দ-গীতি দুঃখের বিষ পিয়া,
বুকের শোণিতে যতেক পটুয়া আঁকিল মোহন ছবি,
গড়িল মূর্ত্তি বহু সাধনায় মাটি-পাথরের কবি,
তা'দের সাধনা, পূজা-আরাধনা, মনের বীণার তারে
যদি নাহি তোলে নিতি নব ধ্বনি অপরূপ ঝঙ্কারে,—
বৃথা চোখে দেখা, আর কানে শোনা তাদের কীর্ত্তি, গাথা,
বৃথাই ভরানো মিথ্যা হিসাবে অহঙ্কারের খাতা !

এই ধরণীর শ্যামলিমা আর আকাশের নীলিমায়
প্রতিদিন রচে যে-মধুমাধুরী দিবসে ও সন্ধ্যায়,
মৃত্যুর মাঝে অমৃতে ভরে মাটির মর্ত্ত্য-গেহ
যেই অমর্ত্ত্য বন্ধুর প্রীতি মায়ের ভায়ের স্নেহ—
যাহার মনেতে এই অরূপের জ্বলিল দিব্য শিখা
তাহার ললাটে আপনার হাতে গৌরব-জয়-টীকা
লিখিল বিধাতা—সার্থক তার দরশ-পরশ-ক্ষুধা,
রূপ উৎসবে সেই পান করে অরূপ-মাধুরী-সুধা।

স্বামী স্ত্রীর মধ্যে বয়সের প্রভেদ

শ্রীনৃপেন্দ্রনারায়ণ দাস

আজকাল অর্থনৈতিক কারণে বাংলা দেশে মধ্যবিত্ত হিন্দুদের মধ্যে পুরুষ ও নারী উভয়েরই বিবাহের বয়স অত্যধিক বৃদ্ধি পাইয়াছে। কোন কোন ক্ষেত্রে পুরুষ ও নারী নিজেরাই নিজেদের পতি কিংবা পত্নী নির্ব্বাচন করিয়া লইতেছেন। এই সকল কারণে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে বয়সের পার্থক্য কখনও কখনও খুব বেশী হইতেছে (১) আবার কখনও কখনও খুব কম হইতেছে। এই পার্থক্যের উপর দম্পতির, সমাজের ও জাতির সুখশান্তি বহুপরিমাণে নির্ভর করে। এইজন্য স্বামী স্ত্রীর মধ্যে বয়সের প্রভেদ কত হওয়া উচিত, এই প্রশ্নের আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

এই প্রশ্নের বিচার নানা ভাবে করা যাইতে পারে। হিন্দুদের জীবনজন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত ধর্ম্মবেত্তাদের অনুশাসনের দ্বারা শাসিত। এ বিষয়ে প্রসিদ্ধ ধর্ম্মবেত্তা মনু বলেন—

"ত্রিংশদ্বর্ষো বহেৎ কন্যাং হৃদ্যাং দ্বাদশবার্ষিকীং।
ত্র্যষ্টবর্ষোঽষ্টবর্ষাং বা ধর্মে সীদতি সত্বর। (৯।৯৪)

ভাবার্থ—'ত্রিশ বৎসর বয়স্ক পুরুষ বার বৎসর বয়স্কা বালিকাকে বিবাহ করিবে। চব্বিশ বৎসর বয়স্ক যুবক আট বৎসর বয়স্কা বালিকার পাণিগ্রহণ করিবে। যদি ধর্ম্মহানি হয় তাহা হইলে সত্বর বিবাহ করিবে।" এখানে দেখা যাইতেছে যে মনুর মতে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে বয়সের প্রভেদ ১৬ বৎসর কি ১৮ বৎসর হওয়া উচিত।(২) আজকালকার এই বিজ্ঞানের যুগে মনুর বিধান অনেকেই নির্ব্বিচারে মানিয়া লইবেন না। মনুর বিধান অপেক্ষা বিজ্ঞানের বিধানকেই তাঁহারা অধিকতর সম্মান দিবেন। দাম্পত্য সুখ-শান্তির দিক দিয়া এই প্রশ্নের বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা করিতে হইলে প্রথমে বিবেচনা করিতে হইবে এই বিবাহ প্রথা কি উদ্দেশ্য সাধন করে। ইহা প্রধানতঃ পুরুষ ও নারীর শারীরিক ক্ষুধা ও মানসিক ক্ষুধা মিটাইবার সমাজসম্মত ব্যবস্থা মাত্র।

পুরুষ ও নারীর যৌন ক্ষুধা সমান নহে। পুরুষের যৌন ক্ষুধা নারীর অপেক্ষা অনেক অধিক ও অনেক প্রবল। এইজন্য স্ত্রীর অপেক্ষা স্বামীর বয়স অধিক হওয়া বাঞ্ছনীয়। এতদ্ব্যতীত সন্তানের জন্মের পর নারীর যৌন ক্ষুধা বহুপরিমাণে হ্রাস পায়, যদিও পুরুষের যৌন ক্ষুধার কোন বৈলক্ষণ্য দেখা যায় না। Forel, Kraft Ebing প্রভৃতি পণ্ডিতগণের মতে নারীর যৌন ক্ষুধা তখন মাতৃস্নেহের মধ্যে মগ্ন হইয়া যায়। Kraft Ebing স্পষ্টই বলিয়াছেন, যে সন্তান জন্মের পর স্ত্রী স্বামীর সঙ্গম স্বীকার করে স্বামীর ক্ষুধা মিটাইবার জন্য ও স্বামীর প্রেমের নিদর্শন স্বরূপ, নিজের সঙ্গমেচ্ছা পরিতৃপ্তির জন্য নহে।(৩) অতএব যে স্বামী স্ত্রীকে মাতা হইতে সাহায্য করিতে পারে তাহার পক্ষে স্ত্রী অল্পবয়স্কা হইলেই স্ত্রীর যৌন ক্ষুধা অপরিতৃপ্ত থাকিবে এরূপ মনে করিবার কোন কারণ নাই।

বিবাহের দ্বিতীয় উদ্দেশ্য হইতেছে মানসিক ক্ষুধার পূরণ। শরীর ধারণোপযোগী খাদ্য ও আশ্রয় দিলেই কোন মানুষ বাঁচিয়া থাকিতে পারে না। তাহার আরও কতকগুলি মানসিক ক্ষুধার পূরণ করা প্রয়োজন। মানুষের একটি প্রধান ও প্রবল মানসিক ক্ষুধা হইতেছে অপরকে ভালবাসিবার ও অপরের ভালবাসা লাভ করিবার ইচ্ছা। দাম্পত্য প্রেম ও সন্তান সন্ততির প্রতি স্নেহ এই ক্ষুধার প্রধান খাদ্য। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মনেরও অনেক পরিবর্ত্তন হয়। অল্প বয়সে আমাদের যে আশা আকাঙ্ক্ষা থাকে, যে সকল কার্য্যে আমরা আনন্দলাভ করি, অধিক বয়সে আমাদের সে সকল আশা আকাঙ্ক্ষা থাকে না ও সে সকল কার্য্যেও আমরা আনন্দ পাই না। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে বয়সের প্রভেদ অধিক হইলে, তাহাদের মনের মিল হওয়া দুরূহ হয় ও যেখানে মনের মিল নাই সেখানে দাম্পত্যপ্রেম তীব্র হইতে পারে না। এইজন্য স্বামী স্ত্রীর মধ্যে অধিক বয়সের প্রভেদ দাম্পত্য প্রেমের অন্তরায়।(৪)

---

(১) নিম্নশ্রেণীর হিন্দুদের মধ্যেও স্বামী স্ত্রীর মধ্যে বয়সের পার্থক আজকাল খুব বেশী হইতেছে। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র বলেন, "আমরা বৎসরের পর বৎসর প্রত্যক্ষ করিতেছি যে খুলনা জেলায় এমন কি সমগ্র বাঙ্গালায় হিন্দু সমাজের মেরুদণ্ড ধোপা, নাপিত, কামার, কুমার প্রভৃতি শ্রেণী একেবারে লোপ পাইতেছে। কায়স্থ ব্রাহ্মণ শ্রেণীর মধ্যে যেমন মেয়ের বিবাহ দেওয়া একটা দায় স্বরূপ হইয়াছে, উপরিলিখিত নিম্নশ্রেণীর মধ্যে আবার অধিক পণে কন্যা ক্রয় করিতে হয়। কাজেই ৪০।৪৫ বৎসর বয়সে ২ শত হইতে ৪ শত টাকা পণে ৯।১০ বৎসর বয়স্কা মেয়ে ক্রয় করিতে হয়। ইহারা অল্পদিন পরেই যুবতী বিধবা রাখিয়া ইহলোক হইতে বিদায় গ্রহণ করে।"—"পল্লীর ব্যথা"

মাসিক বসুমতী—জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৪।

(২) বর্ত্তমান যুগেরও দুই একজন হিন্দু সাধুপুরুষ বলেন যে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে বয়সের পার্থক্য পনের কুড়ি বৎসর হওয়া উচিত। পাবনা সৎসঙ্গ আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র মনে করেন যে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে বয়সের প্রভেদ অন্ততঃ পনের কুড়ি বৎসর হওয়াই ধর্ম্মপ্রদ।

—"চলার সাথী"—শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য সঙ্কলিত।

(৩) "Sensuality is merged in the mothers love. Thereafter, the wife accepts intercourse not so much as a sensual gatification than as a proof of her husband's affection."

—Kraft Ebing—"Psychopathic Sexuals.
12th Edition page 14.

(৪) দাম্পত্য প্রেম যে কেবলমাত্র স্বামী স্ত্রীর বয়সের প্রভেদের উপর নির্ভর করে তাহা নহে, তাহাদের দৈহিক রূপ, সাহচর্য্য, ব্যবহার, আর্থিক স্বচ্ছলতা প্রভৃতির উপরও বহুপরিমাণে নির্ভর করে। বয়সের প্রভেদ ব্যতীত অন্যান্য বিষয়ের আলোচনা, এই প্রবন্ধে অবান্তর হইবে, এইজন্য তাহা করা হইল না।

সমাজের দিক দিয়া বিচার করিলে দেখা যায় যে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে বয়সের প্রভেদ অধিক হইলে পুত্র কন্যা কম হইবার সম্ভাবনা বেশী। পরিবার ছোট হইলে পরিবারের আর্থিক স্বচ্ছলতা বৃদ্ধি পায়। এইজন্য যে সমাজে লোকসংখ্যা অসম্ভব বৃদ্ধি পাইয়াছে ও তাহার ফলে দারিদ্র্য দেখা দিয়াছে সে সমাজে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে বয়সের প্রভেদ একটু বেশী হওয়াই মঙ্গল। এ বিষয়ে কিন্তু আর একটু ভাবিবার কথা আছে। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে বয়সের প্রভেদ অধিক হইলে সমাজে বিধবার সংখ্যা যে বৃদ্ধি পাইবে তাহা সুনিশ্চিত। সমাজের পক্ষে সেটা আদৌ মঙ্গলকর নহে।

জাতি চায় সুস্থ সবল শিশু। শিশু সুস্থ হইলেই যে সবল হইবে এরূপ মনে করিবার কোন কারণ নাই। দুর্ব্বল শিশুও সুস্থ হইতে পারে। শুনিয়াছি ভারতীয় শিশুদের জন্মকালীন ওজন অপেক্ষা ইংরাজ শিশুদের জন্মকালীন ওজন বেশী, আবার আমেরিকান শিশুদের জন্মকালীন ওজন ইংরাজ শিশুদের অপেক্ষা অধিক। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে বয়সের প্রভেদ তাহাদের মিলন প্রসূত শিশুদের স্বাস্থ্যের উপর কিরূপ প্রভাব বিস্তার করে তাহা ঠিক জানা নাই। এ বিষয়ে গবেষণা হওয়া উচিত। আজকাল কলিকাতা সহরে বহু "প্রসূতি-আগার" Maternity Home প্রভৃতি স্থাপিত হইয়াছে। এই সকল প্রতিষ্ঠানের কর্ত্তৃপক্ষেরা যদি শিশুর জন্মের সময় তাহার ওজন, স্বাস্থ্য, পিতামাতার বয়স প্রভৃতি লিখিয়া রাখেন তাহা হইলে মূল্যবান তথ্য সংগৃহীত হইতে পারে এবং সেই সংগৃহীত তথ্যের বিশ্লেষণ করিয়া আমরা সত্য আবিষ্কার করিতে পারি।

শরতের ফুল

শ্রীবীণা দে

অপরাজিতা উঠ্‌ল ফুটি'
গভীরতায় রংটী নীল,
শেফালিকা প'ড়্‌ল লুটি'
খুলে দিয়ে হিয়ার খিল।

শ্যামের নীলে শিবের শাদায়
মিল হ'য়েছে আজ,—
শিউলি বোঁটা বৈরাগী সে
গৈরিক তার' সাজ।

নীলিম-সবুজ মাঠ-সাগরে
সাদা কাশের ঢেউ,
এমন দিনে বন্ধু বি'নে
থাক্‌তে কি চায় কেউ ?

কমল কলি উঠ্‌ল দুলি'
কালোর বুকে আলো,
নিখিলে আজ একটী কথা—
'বাসিতে চাই ভালো'।

হাসি

শ্রীগিরিজাকুমার বসু

শরতের পূর্ণিমার হিয়া-হরা হাসি
ফুটি তার মৃদু কালো চোখে,
তার রাঙা অধরের হাসি আছে ভাসি
বসন্তের বিকচ অশোকে,

তনুদেহে, তনু লগ্ন নব-নীলাম্বরে,
বিজলীর হাসি বরষার,
শুধু, এই সসাগরা বসুধার'পরে,
'হাসি'-নাম সার্থক তাহার ;

মরমের কোমলতা পড়ে গলি' তার
অচপল সত্যবাণী-মাঝে,
কপটতা, চতুরতা, ভাণ, ছলনার
লেশ কভু হৃদে ধরেনা যে,

বলি যবে, সবারেই দিয়াছি কহিয়া
খুব তুমি ভালোবাসো মোরে,
মুখপানে, অকুন্ঠিত সারল্যে চাহিয়া
"বাসিইতো" কহে মধুস্বরে।

সরিষার তৈল

শ্রীবীরেন সেনগুপ্ত

ভারতবর্ষে আমাদের প্রায় প্রতি ঘরেই সরিষার তৈল যে অপরিহার্য্য এ কথা বলাই বাহুল্য। বাঙ্গালী গৃহস্থদের পক্ষে সরিষার তৈল ছাড়া চলা এক কথায় অসম্ভব। বেশ বিন্যাসে, আলো জ্বালাইতে, বস্ত্রপাতিতে, আমরা সরিষার তৈল ব্যবহার করি; রং, ঔষধ ও গন্ধদ্রব্য তৈয়ারী করিতেও সরিষার তৈলের প্রয়োজন হয়। কিন্তু, সবচেয়ে বেশী ব্যবহৃত হয় রান্নায়,—বিশেষতঃ এই বাংলা দেশে। সুতরাং বাংলাদেশই সারা ভারতের মধ্যে সরিষার তৈলের প্রধান খরিদ্দার। বীজ হইতে তৈল বাহির করিয়া লওয়ার পর কিছু খাদ জমে,—ইহাকে 'খইল' বলা হইয়া থাকে। বেশ লাভজনকভাবে এই খইল জমির সার বা গরুর খাদ্য হিসাবে কাজে লাগান যায়।

বাংলা দেশে সরিষার তৈলের বেশীর ভাগ কলই কলিকাতা বা তাহার আশে পাশে স্থাপিত। ভারতবর্ষের মধ্যে যদিও বাংলা দেশই সরিষা উৎপাদনে বেশ উচ্চস্থানই অধিকার করে, তবু বিহার ও যুক্তপ্রদেশের তুলনায় এখানকার বীজ হইতে তৈল পাওয়া যায় কম। কি করিলে ভাল রাই, ভাল সরিষা জন্মান যায়—চাষীরা সে শিক্ষা পায় না—এ সম্বন্ধে ভাবিবার অনুসন্ধান করিবার লোক নাই, চাষ হয় বিক্ষিপ্ত, এলো মেলো—সুসংগঠিত আদৌ নয়। বীজ মজুত রাখিবার যে বিধি নিয়ম আছে তাহার অজ্ঞতা—এই সকল কারণে এই অবধি বাংলা দেশের তৈল-কলগুলিকে অন্য প্রদেশ হইতে রাই ও সরিষা আমদানী করিতে হইয়াছে।

সম্প্রতি বাংলা দেশ আর বিহার ও যুক্তপ্রদেশ হইতে আমদানী তৈলের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিতে পারিতেছে না। অবস্থার এই আকস্মিক পরিবর্ত্তনের আসল কারণ এই যে বিহার ও যুক্তপ্রদেশে বাংলা দেশের চেয়ে তৈল খুব কম খরচে হয়; তাহারা নিজ নিজ কলে নিজেরাই সরিষা পিষিয়া বাংলাদেশের বাজারে ভারে ভারে রপ্তানী করে, আর 'খইল'টুকু আপন আপন প্রয়োজন মিটাইবার জন্য রাখিয়া দেয়। ফলে দারুণ প্রতিযোগিতার মুখে পড়িয়া বাংলার বহু কলকে কাজ বন্ধ করিতে হইয়াছে।

এখন বাংলাদেশের উচিত, পল্লী অঞ্চলের ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত বীজ ব্যবসায়কে সুষ্ঠুরূপে গড়িয়া তোলা, আর যে সমস্ত জায়গায় প্রচুর পরিমাণে সরিষা জন্মায় সেই সমস্ত স্থানে তৈলের কল অথবা ঘানি (ওয়ার্দ্ধা * পরিকল্পনার বলদটানা উন্নত ধরণের ঘানি হইলেই ভাল হয়) বসান। ইহার ফলে বাংলাদেশ অন্য প্রদেশের রপ্তানী তৈলের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে পারিবে এবং যে সকল স্থানে সরিষা প্রচুর ফলে সে সকল স্থান নিজ নিজ প্রয়োজন মিটাইতে পারিবে। কলিকাতার উপকণ্ঠে স্থানে স্থানে অনেকগুলি শক্তি-চালিত ঘানি বসাইয়া আমদানী বীজ ও স্থানীয় বীজ মিশ্রিত করিয়া ব্যবহার করা যুক্তিসঙ্গত।

বলদের সাহায্যে চালিত ঘানি 'ঠাণ্ডা অবস্থায়' (cold drawn) চলে বলিয়া এই তৈলে সরিষার বিশিষ্ট গন্ধ ও বর্ণ বজায় থাকিতে পারে, আর খাদ্যরূপেও ব্যবহৃত হইতে পারে। কিন্তু শক্তি চালিত যন্ত্রের তৈলে ঐ গুণগুলি থাকে না; এইজন্য ঘানির তৈলের চেয়ে কলের তৈল বাজারে দাম পায় কম।

* ওয়ার্দ্ধা ঘানি বাংলাদেশে সাধারণতঃ যে ঘানি ব্যবহার হয় তাহারই উন্নত সংস্করণ। ইহা হইতে ১।০ ঘণ্টায় ১০ সের তৈল পাওয়া যায়।

সরিষা বাছাই ও মজুদ করা

সরিষার তৈল-শিল্পের সাফল্য নির্ভর করে ঠিক মত বীজ বাছাই, আর তাহা গুদামজাত করিবার উপর। সাধারণতঃ ফসল তোলার পরেই সরিষা হইতে খুব বেশী তৈল আর সবচেয়ে ভাল গন্ধ পাওয়া যায়। কিন্তু এমন সরিষা সব সময় যোগাড় করা সম্ভব নয়; অতএব বীজের তৈল ভাগ বাঁচাইতে হইলে চালান দেওয়ার সময় ও গুদামে রাখার সময় বিশেষ যত্ন লওয়া আবশ্যক। বীজগুলি আর্দ্র থাকিতে পারে এইরূপভাবে বস্তা ভর্ত্তি করিয়া আলো হইতে দূরে একটি শুষ্ক স্থানে উহা মজুদ করা যাইতে পারে। এই উপায়ে, বাজারে চলতি সরিষা হইতে বেশী পরিমাণে তৈল ও সুঘ্রাণ পাওয়া যায়। ইহাতে মণ করা /২ হইতে /৫ সের পর্য্যন্ত তৈল বেশী পাওয়া যাইতে পারে।

পরিষ্কার করা

সম্পূর্ণ খাঁটি, ভেজালহীন তৈল পাইতে হইলে বীজগুলিকে ঘানিতে দেওয়ার আগে পরিষ্কার করিয়া লওয়া দরকার। এই কাজ সাধারণতঃ দুটি চালুনি দিয়া করা যায়। একটি চালুনির জাল সরিষার দানা হইতে একটু ছোট ছিদ্রবিশিষ্ট ও অপরটী, দানা হইতে একটু বড় ছিদ্রবিশিষ্ট হওয়া চাই। ছোট ছিদ্রের চালুনিতে বীজগুলি যখন চালা হইবে তখন বীজ হইতে ছোট যত জঞ্জাল ও বাজে জিনিষ থাকিবে সব পড়িয়া যাইবে; আবার বড় ছিদ্রের চালুনিতে চালিবার সময় দানা হইতে বড় ময়লা চালুনিতে আটকা পড়িবে। এইভাবে সরিষা পরিষ্কার করিয়া লইলেই ঘানিতে দেওয়ার উপযোগী হয়।

প্রতি প্রদেশে রাই ও সরিষার আবাদী-জমি ও ফসলের পরিমাণ

প্রদেশ	জমির পরিমাণ একর	ফসল টন
আসাম	৪০৬ ০০০	৬৫,০০০
বাংলাদেশ	[illegible]৬২,০০০	১৪২,০০০
বিহার	৫০৫,০০০	১০৯ ০০০
বোম্বাই	১৩,০০০	২ ০০০
মধ্য প্রদেশ ও বেরার	৬৪,০০০	১১,০০০
দিল্লী	৬,০০০	——
উড়িষ্যা	২৭,০০০	৫,০০০
পাঞ্জাব	১,১০৭,০০০	১০৮ ০০০
সিন্ধুপ্রদেশ	২৩১,০০০	২৪,০০০
যুক্তপ্রদেশ	৩০১,০০০	৬৪ ০০০
	২,৫০২,০০০ (ক)	৫২৫,০০০ (ক)
অন্যান্য দেশীয় রাজ্য	৯২ ০০০	১১,০০০
মোট—ভারতবর্ষ	৬,১১৩,০০০	১,১২০,০০০

(ক) এই সংখ্যা দ্বারা মিশ্র ফসল বুঝান হইয়াছে, অর্থাৎ অন্য ফসলের সঙ্গে সরিষা বীজও বপন করা হইয়াছিল। মিশ্র ফসলের পরিমাণ অনুমানের উপর নির্ভর করিতেছে;—কাজেই তাহা পৃথক দেখান হইল।

ঘানিতে মাড়িবার নিয়ম

সরিষার বীজ ঘানিতে ফেলিয়া পিষিতে হয়। পিষিবার কাজ যখন চলে তখন ঘানিতে যে ছিদ্র রাখা হয় তাহা দিয়া তৈল চুঁয়াইয়া পড়িতে থাকে। পেষণ পুরাপুরি হইলে পরিত্যক্ত খইল উঠাইয়া লওয়া হয়। নাড়া চাড়া না করিয়া ২।৩ দিন ঐ তৈলকে পাত্রে থাকিতে দিলে গাদ ও ময়লা পাত্রের নীচে জমিতে থাকে। অতঃপর পরিষ্কার তৈল বাজারে বিক্রয় হয়।

পরিকল্পনা *

(শক্তি চালিত ঘানি)

নিম্নে একটি পরিকল্পনা দেওয়া হইল। ৩০০০৲ টাকা মূলধনে ৪টি শক্তি চালিত ঘানির দ্বারা এই পরিকল্পনা কার্য্যকরী করা যাইতে পারে। যে সকল স্থানে বৎসরের প্রায় সব সময়েই সরিষা যথেষ্ট পাওয়া যায়, সেই সকল গ্রামে, মহকুমা-সহরে অথবা পল্লী অঞ্চলে এই শিল্প খুব সুবিধাজনক ও লাভজনক হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

মোট ব্যয়

২ জোড়া ঘানি	৪৫০৲
১টি ৬ অশ্ব শক্তি বিশিষ্ট ইঞ্জিন (ইলেক্ট্রিকের অভাবে)	৬৫০৲
তৈলের আধার-পাত্রাদি, অন্যান্য উপকরণ ও যন্ত্রপাতি	১৫০৲
বিবিধ ব্যয়	৫০৲
১ মাসের ব্যবসায় চালাইবার খরচ	১২৫০৲
কারবারী মূলধন	৪৫০৲
মোট—	৩০০০৲

ঘানিগুলি ৮ ঘণ্টায় ৮/ মণ বীজ মাড়িতে পারিবে; তাহাতে ৩/ মণ তৈল ও প্রায় ৫/ মণ খইল পাওয়া যাইবে।

মাসে মাসে যে খরচ লাগে

(মাসিক ২৬ দিন কাজ চলিলে)

১ জন কর্ম্মচারী ও ২ জন শ্রমিকের মাহিয়ানা	৪০৲
সরিষার বীজ ২০৮/ মণ ৫।০ মণ দরে	১১৪৪৲
জ্বালানি তৈল অথবা ইলেক্ট্রিক	৪৫৲
বাড়ী ভাড়া	১৫৲
অন্যান্য ব্যয়	৬৲
মোট—	১২৬০৲

আয়

৭৮/ মণ তৈল ১৯৲ মণ দরে	১৪৮২৲	১৬৭৭৲
১৩০/ মণ খইল ।০ মণ দরে	১৯৫৲	
মাসিক উৎপন্ন দ্রব্যের মূল্য	১৬৭৭৲ (আনুমানিক)	

বাদ

ক্ষয় অপচয় ও মূলধনের সুদ	৫০৲	২২০৲
পাইকারের দালালী ১০% হিঃ	১৭০৲	
নীট খরচ	১৪৬০৲	
নীট লাভ	২৬০৲ (আনুমানিক)	

পরিকল্পনা

(ওয়ার্দ্ধা ঘানি)

১২০০৲ টাকা মূলধনে বলদ-চালিত তিনটি ওয়ার্দ্ধা-ঘানির সাহায্যে শিল্পটি কিরূপ হইবে—তাহারই একটি পরিকল্পনা নীচে দেওয়া হইল।

মোট ব্যয়

৩টি ওয়ার্দ্ধা-ঘানি প্রতিটি ৭০৲ হিঃ	২১০৲
৪টি বলদ	১২০৲
তৈলের আধার ও পাত্রাদি অন্যান্য উপকরণ সহ	১০০৲
এক মাসের ব্যবসায় চালাইবার খরচ	৬৩৫৲
কারবারী মূলধন	১৩৫৲
	১,২০০৲

১০ ঘণ্টায় তিনটি ঘানি ৪/ সরিষা পিষিতে পারে, ইহাতে এক মণ পনর সের তৈল ও দু মণ পঁচিশ সের খইল পাওয়া যাইবে।

ওয়ার্দ্ধা-ঘানি তৈয়ার করিবার অঙ্কিত নক্সা ও অপরাপর বিস্তৃত বিবরণ নিখিল ভারত পল্লী শিল্প সমিতি (All India Village Industries Association) ওয়ার্দ্ধা, মধ্যপ্রদেশ—এই ঠিকানায় পাওয়া যাইবে।

এখানেও ওয়ার্দ্ধা-ঘানি প্রস্তুত করান যায়। ইহাতে কিছুমাত্র জটিলতা নাই। গ্রাম্য ছুতারেরাও অনায়াসেই ইহা তৈয়ারী করিতে পারিবে। তাহাতে ঘানি প্রতি ৪৫৲ টাকার বেশী খরচ পড়িবে না।

মাসে মাসে যে খরচ লাগিবে

(মাসিক ২৬ দিন কাজ চলিলে)

২ জন শ্রমিকের মজুরী	৩২৲
সরিষার বীজ ১০৪/ মণ ৫।০ মণ দরে	৫৭২৲
৪টি বলদের খোরাকী	২০৲
বাড়ী ভাড়া	৫৲
অন্যান্য খরচ	৫
	৬৩৪৲

আয়

৩৬/ মণ তৈল ১৯৲ মণ দরে	৬৮৪৲	৮০৩৲
৬৮/ মণ খইল ১৸০ মণ দরে	১১৯৲	

মাসিক উৎপন্ন দ্রব্যের মূল্য ৮০৩৲ (আনুমাণিক)

বাদ

ক্ষয়, অপচয় ও মূলধনের সুদ	২৫৲	১০৫৲
বাজার দালালী	৮০৲	
নীট খরচ	৭৪০৲	
নীট লাভ	৬৩৲ (আনুমানিক)	

সরিষার তৈলের বাজার

নিত্য নৈমিত্তিক ব্যবহারে সরিষার তৈল অপরিহার্য্য, সুতরাং আমাদের দেশে ইহার বাজার সব সময়ই অবারিত—চাহিদা স্থায়ী। উৎপন্ন তৈল স্থানীয় খুচরা বিক্রেতাদের মারফতও বিক্রীত হইতে পারে।

* এই দামগুলি যুদ্ধকালীন নহে, বাজারের স্বাভাবিক অবস্থার অনুপাতে দাম ফেলা হইল।

শ্রীক্ষেত্রনাথ রায়

ফুটবল মরসুম ঃ

যে অনিশ্চয়তার মধ্যে ক'লকাতায় ফুটবল মরসুম আরম্ভ হয়েছিল তা নির্ব্বিঘ্নে শেষ হয়েছে। ক্রীড়ামোদীরা দারুণ উদ্বেগের মধ্যে খেলার মাঠে দিন কাটিয়েছেন, নিশ্চিন্ত মনে খেলা দেখার আনন্দ অন্যবারের তুলনায় এবার খুব কম লোকই উপভোগ করেছেন। জীবনের এ অভিজ্ঞতা যেমন এই সর্ব্বপ্রথম তেমনি অভিনব। বলের উপর লক্ষ্য রাখতে গিয়ে বোমার কথা বার বার মনে এসে চঞ্চল করেছে, রেফারীর বংশীধ্বনি সাইরেণের আর্ত্তনাদকে মনে পড়িয়ে দিয়েছে। মাথার উপর এরোপ্লেনের মহড়া অতি চমৎকার গোল দেখা থেকেও দর্শকদের বঞ্চিত ক'রেছিল। পূর্ব্বের তুলনায় খেলার জৌলুষ আর নেই, খবরের কাগজে প্রকাশিত খেলার রিপোর্ট পড়তে পড়তে ক্রীড়ামোদীরা এবার আর পরম উল্লাসে কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে কোন একটা অঘটনও বাধিয়ে বসেন নি; খেলার মাঠের অবস্থা পূর্ব্বের তুলনায় শান্ত, ধীর। বিজয়ের আনন্দে উৎকট চিৎকার, লম্ফ ঝম্প, গোলের মুখে সেই পরম উত্তেজনা সবই যেন কর্পূরের মত উপে গেছে। খেলোয়াড়দের মধ্যেও আগের মত উৎসাহ আর নেই। দেশের বর্ত্তমান পরিস্থিতিই কেবল তাদের নিরুৎসাহ করে নি। বাংলা দেশের ফুটবল খেলার ষ্ট্যাণ্ডার্ড আজ কয়েক বছর ধরেই তাঁরা পূর্ব্বখ্যাতি অনুযায়ী বজায় রাখতে পারছেন না। খেলার অনুশীলনের অভাব, একনিষ্ঠতার অভাব এবং জয়লাভের অদম্য উৎসাহের অভাবই এর প্রধান কারণ।

ট্রেডস কাপ ফাইনাল ঃ

ট্রেডস কাপ ফুটবল প্রতিযোগিতার ফাইনালে জুনিয়ার মহালক্ষ্মী স্পোর্টিং ক্লাব ৪-০ গোলে মোহনবাগান ক্লাবকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করেছে। মহালক্ষ্মী স্পোর্টিং দলের খেলোয়াড়দের এই কৃতিত্ব বিশেষ প্রশংসনীয়। এইখানে উল্লেখ করা যায় যে, ইয়ঙ্গার কাপ প্রতিযোগিতার ফাইনালেও মহালক্ষ্মী স্পোর্টিং ২-১ গোলে রয়েল এয়ার ফোর্সকে পরাজিত ক'রে কাপ বিজয়ী হয়েছে।

ট্রেডস কাপের ইতিহাস ঃ

১৮৮৯ সালে ট্রেডস কাপ প্রতিযোগিতা প্রথম আরম্ভ হয়। এই ফুটবল প্রতিযোগিতাটি ভারতের একটি প্রাচীনতম অনুষ্ঠান। ডালহৌসী প্রথম ট্রেডস কাপ বিজয়ী হয়। ক'লকাতার মেডিক্যাল কলেজ দল সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বার এই কাপ বিজয়ের সম্মান লাভ করে। মেডিক্যালের পর মোহনবাগান ক্লাবের নাম উল্লেখযোগ্য। একমাত্র মোহনবাগান ক্লাবই উপর্য্যুপরি তিনবার (১৯০৬-৮) এই কাপ বিজয়ী হয়ে চ্যাম্পিয়ান হয়েছে। এ পর্য্যন্ত অন্য কোন ক্লাব এই রেকর্ড ভাঙ্গতে পারে নি।

পশ্চাতে দণ্ডায়মান: জি সাহা, অসিত চৌধুরী, চিত্ত সরকার, চিত্ত মজুমদার (ফুটবল ক্যাপটেন) নিত্য সরকার, দ্বিজেশ গোস্বামী (সম্পাদক) যতীন কর, অন্নদা চক্রবর্ত্তী। মধ্যে উপবিষ্ট: রাখাল দত্ত (ক্লাব ক্যাপটেন) এবং সুধীন দত্ত (প্রেসিডেণ্ট)। নীচে উপবিষ্ট: নীরেন সরকার, কানাই ভট্টাচার্য। বামে: ট্রেডস্ কাপ, নরেন কর্মকার শীল্ড, উইলিয়াম ইয়ঙ্গার কাপ

মহালক্ষ্মী স্পোর্টিং ক্লাব ঃ

মহালক্ষ্মী কটন মিলের পরিচালকগণ তাঁদের মিলের কর্ম্মচারীদের উৎসাহে অনুপ্রাণিত হয়ে মহালক্ষ্মী স্পোর্টিং নামে একটি ক্লাব প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৩৯ সালে সর্ব্বপ্রথম এই ক্লাব ব্যারাকপুর চন্দ্রশেখর মেমোরিয়াল ফুটবল শীল্ড বিজয়ী হয়।
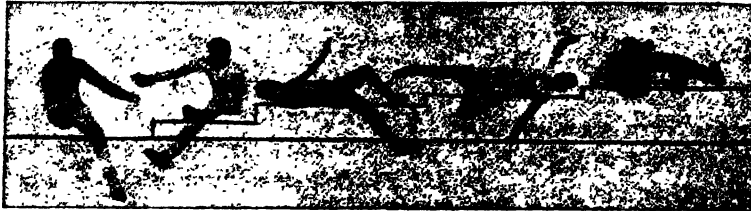
১ ২ ৩ ৪ ৫

হাইজাম্পের বিভিন্ন উন্নততর পদ্ধতি

১৯৪০ সালে বিভিন্ন ফুটবল প্রতিযোগিতায় যোগদান ক'রে উক্ত ক্লাব খড়দহের প্যারাগণ শীল্ডে রাণার্স আপ পায়। ১৯৪১ সালে হুইলার শীল্ড বিজয়ী হয়। বর্ত্তমান বৎসরে তারা আই এফ এ পরিচালিত কয়েকটি ফুটবল প্রতিযোগিতায় যোগদান ক'রে দু'টিতে সাফল্য লাভ করেছে। আমরা ইতিপূর্ব্বে কোন ভারতীয় মিলের কর্ম্মচারীদের খেলাধূলায় এরূপ উৎসাহ এবং সাফল্যের পরিচয় পাই নি। কর্ম্মচারীদের স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য এবং চিত্ত বিনোদনের জন্য খেলাধূলা একান্ত প্রয়োজন। সকল মিল কর্ম্মচারী এবং পরিচালকমণ্ডলীদের এ বিষয়টি আদর্শ হওয়া উচিত। আমরা মহালক্ষ্মী স্পোর্টিং ক্লাবের অন্যতম উৎসাহী ক্রীড়ানুরাগী শ্রীযুক্ত সুধাংশুনাথ দত্ত এবং শ্রীযুক্ত রাখাল দত্তকে তাঁদের এই সংযোগিতার জন্য প্রশংসা করছি।

লেডী হার্ডিঞ্জ শীল্ড ঃ

লেডী হার্ডিঞ্জ শীল্ডের ফাইনালে মোহনবাগান ক্লাব ৩-১ গোলে ইষ্টবেঙ্গল ক্লাবকে পরাজিত করে। বিজয়ী দলের এই বিজয়লাভ যে ন্যায়সঙ্গত হয়েছে তা দর্শকমাত্রেই স্বীকার করবেন।

হাই জাম্প ঃ

পৃথিবীতে কোন কিছু হঠাৎ একেবারে গড়ে ওঠে না; বিভিন্ন অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে স্তরে স্তরে উন্নতি লাভ হয়; খেলার ভিতরও আমরা দেখতে পাই সেই একই জিনিষ। ক্রীড়ার ক্রমোন্নতির পিছনেও দেখা যায় মানুষের নূতন নূতন প্রচেষ্টার রূপ। নীচে হাই জাম্পের পাঁচটি ছবি দেওয়া হ'য়েছে; এ থেকে বোঝা যাবে কেমন ক'রে প্রচলিত প্রথার পরিবর্ত্তনের ফলে মানুষ ক্রমোন্নতি ক'রতে সক্ষম হ'য়েছে। সবচেয়ে নীচে যে লম্বা লাইনটি আছে সেই উচ্চতাটুকু খুব সাধারণ পদ্ধতিতে লাফানো যায়। তার উপরের উচ্চতর লাইনগুলি কি কি বিভিন্ন পদ্ধতিতে অতিক্রম করা সম্ভব তা ছবিতে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। লাফানোর সময় খেলোয়াড়ের শরীরের ভারকেন্দ্র কোনখানে রয়েছে তা ছোট ত্রিভূজাকার চিহ্নটি থেকে বোঝা যাবে। সুরুতে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে ষ্টাইলের কোন হাঙ্গামা নেই। অতি সাধারণভাবে দৌড়ে এসে দেহকে বারের উপর দিয়ে চালনা করাই ছিলো তখন খেলোয়াড়দের একমাত্র কৌশল। পরের ছবিতে একটু উন্নতি হ'য়েছে। তৃতীয় ছবিতে Scottish Jumpএ আরো উন্নতি দেখা যাচ্ছে। খেলোয়াড় চিৎ হ'য়ে বারের উপর দিয়ে কৌশলে উচ্চতা লঙ্ঘন করছে। চতুর্থ চিত্রে খেলোয়াড়ের দেহ বারের সঙ্গে সমান্তরাল হ'য়ে লক্ষ্য অতিক্রম ক'চ্ছে। সর্ব্বশেষ পদ্ধতির নাম New Scissors Jump. এই নাম হবার কারণ খেলোয়াড় এতে ঠিক কাঁচির মতই পা দুটিকে খুলে আবার বন্ধ ক'রে ফেলে। ছবিগুলি একটু পর্য্যবেক্ষণ ক'রলে বুঝতে পারা যায় খেলোয়াড়দের শরীরের ভার কেন্দ্রটী ক্রমশঃ লক্ষ্য বস্তুর সন্নিকট হ'য়েছে। চতুর্থ ছবিতে ত্রিভূজটি বারের ঠিক উপর দিয়ে চ'লে গিয়েছে এবং পঞ্চম ছবিতে ভার কেন্দ্র বারের তলায় থাকলেও খেলোয়াড় অভিনব কৌশলে তার দেহকে বারের উপর দিয়ে অতিক্রম ক'রে নিয়ে গেছে।

মিঃ এইচ এম ওসবর্ন ওয়েষ্টার্ণ রোল পদ্ধতিতে উচ্চলম্ফন করছেন

হাই জাম্পের পক্ষে Western Roll (চতুর্থ চিত্র) অথবা New Scissorsএর কোনটি ভাল তা নিয়ে বিশেষজ্ঞদের ভেতর যথেষ্ট মতভেদ আছে। আমেরিকার ওসবর্ণ Western Roll

Styleয়ে ৬ ফিট ৮½ ইঞ্চি লাফিয়ে সরকারীভাবে পৃথিবীর রেকর্ড ক'রেছিলেন। আবার New Scissors Styleয়ে একজন খেলো-

উচ্চলম্ফনের উপযোগী পায়ের ব্যায়াম

য়াড় ৬ ফিট ৮¼ অতিক্রম ক'রতেও সক্ষম হ'য়েছেন। একাধিক কারণে আমাদের শেষোক্ত পদ্ধতিটি উন্নততর ব'লে মনে হয়।

যে সব খেলোয়াড়রা হাই জাম্পে পারদর্শিতা লাভ ক'রেছেন তাঁদের দৈহিক গঠন সম্বন্ধে কিছু ব'ললে বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না। বার্ড পেজ নামে যে খেলোয়াড়টি New Scissors Jumpএ ৬ ফিট ৫½ ইঞ্চি অতিক্রম ক'রেছেন তিনি দৈর্ঘ্যে মাত্র ৫½ ফিট। ওসবর্ণও ৬ ফিটের কম। অবশ্য সাধারণত যা দেখা যায় তাতে ভাল হাই জাম্পাররা লম্বায় একটু বেশী এবং অল্প কৃশ। আর মানুষের সঙ্গ পশুর অঙ্গের সঙ্গে তুলনা করা যদি অসঙ্গত না হয় তবে হরিণের সঙ্গে পায়ের যথেষ্ট সাদৃশ্য দেখা যায়। হাই-জাম্পারদের পাগুলি সাধারণত একটু বড় হয় যাতে শরীরের সঙ্গে ঠিক সামঞ্জস্য থাকে না।

কুচবিহার কাপ ফাইনাল ঃ

কুচবিহার কাপের ফাইনালে ইষ্টবেঙ্গল ক্লাব এক গোলে পুরাতন প্রতিদ্বন্দ্বী মোহনবাগান দলকে পরাজিত করেছে। ইতিপূর্ব্বে ১৯২৪ সালে এই দুই দল ফাইনালে আর একবার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলো। সে বৎসরও ইষ্টবেঙ্গল ক্লাব এক গোলে বিজয়ী হয়। আলোচ্য বৎসরের ফাইনাল খেলাটি মোটেই উচ্চাঙ্গের হয়নি। খেলাটি অতি সাধারণ শ্রেণীর হওয়ায় দর্শকরাও হতাশ হয়েছিলেন।

১৮৯৩ সালে কুচবিহার কাপের খেলা প্রথম আরম্ভ হয়। ফোর্ট উইলিয়াম আর্সনাল কাপ বিজয়ের সর্ব্বপ্রথম সম্মান লাভ করেছিল। এই প্রতিযোগিতায় মোহনবাগান সব থেকে বেশীবার কাপ বিজয়ের সম্মান পেয়েছে। এ পর্য্যন্ত মোহনবাগান ১৩বার কাপ বিজয়ী হয়েছে। এই রেকর্ডের পর এরিয়ান্স ক্লাবের নাম উল্লেখযোগ্য। ১৯৩২-৩৪ সাল পর্য্যন্ত উপর্য্যুপরি তিনবার এরিয়ান্স ক্লাব প্রতিযোগিতায় বিজয়ী হয়েছে। অবশ্য ইতিপূর্ব্বেই ১৮৯৭-৯৯ সাল পর্য্যন্ত পরপর তিনবার কাপ পেয়ে ন্যাশানাল ক্লাব প্রথম রেকর্ড করে। বর্ত্তমানে এই ক্লাবের কোন অস্তিত্ব নেই।

বোম্বাই রোভার্স কাপ ঃ

বোম্বাই রোভার্স কাপ ভারতের একটি অন্যতম ফুটবল প্রতিযোগিতা। আই এফ এ শীল্ডের পরই বোম্বাই রোভার্সের আকর্ষণ। ১৯৪০ সালে ক'লকাতার মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব ভারতীয় দলের মধ্যে তৃতীয় বার কাপ বিজয়ের সম্মান লাভ করে। ভারতীয় দলের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম কাপ বিজয়ী হয়েছিল

উচ্চলম্ফনে পা চালনার অভ্যাস এবং পায়ের ব্যায়াম

বাঙ্গালোর মুসলীম ১৯৩৭ সালে। ১৯৩৮ সালেও বাঙ্গালোর মুসলীম উক্ত প্রতিযোগিতার ফাইনালে বিজয়ী হয়ে ভারতীয়

দলের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম উপর্য্যুপরি দু'বার কাপ বিজয়ের সম্মান অর্জ্জন করে। বর্ত্তমান বৎসরে দেশের নানা অশান্তির মধ্যেও

লক্ষ্য বস্তু অতিক্রম করবার সময় কি ভাবে হাত এবং পায়ের ভঙ্গি হওয়া উচিত তার অনুশীলন করা হচ্ছে

এই প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয়েছে। তবে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে কোন বিশিষ্ট ক্লাব প্রতিযোগিতায় যোগ দেয় নি। মাত্র ১৪টি দল বর্ত্তমান বৎসরের প্রতিযোগিতায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে। সুদূর বোম্বাই প্রদেশে গিয়ে খেলায় যোগদানের ইচ্ছা সকলের থাকলেও ভ্রমণের অসুবিধা এবং দেশের বর্ত্তমান পরিস্থিতির কথা বিবেচনা ক'রে বেশীর ভাগ প্রতিষ্ঠানই যোগদান স্থগিত রেখেছে। বাঙ্গলা দেশ থেকে একমাত্র বাটা কোম্পানীর ফুটবল দল এই প্রতিযোগিতায় যোগ দিয়েছে।

বেঙ্গল জীমখানা ক্রিকেট লীগ ঃ

বাঙ্গলা দেশের ক্রিকেট খেলার ষ্ট্যাণ্ডার্ড উন্নত করার জন্য গত বৎসর বেঙ্গল জীমখানা তাঁদের পরিচালনাধীনে একটি ক্রিকেট লীগের ব্যবস্থা করেন। এই ব্যবস্থা বাঙ্গলা দেশে প্রথম। এইরূপ ব্যবস্থায় ক্রিকেট খেলোয়াড়েরা খেলায় অনুশীলন চর্চ্চার সুযোগ লাভ ক'রে উপকৃত হয়েছিলেন। কিন্তু বর্ত্তমান বৎসরে বেঙ্গল জিমখানার পরিচালকেরা অনিচ্ছাসত্ত্বেও একমাত্র বর্ত্তমান যুদ্ধের পরিস্থিতির কারণে এই লীগ খেলা স্থগিত রাখতে বাধ্য হয়েছেন। অনেকগুলি ক্লাবের ক্রিকেট ময়দানের সীমানা সংকীর্ণ হওয়ায় ময়দানের অভাবে লীগ খেলা স্থগিত থাকলেও জানা গেছে ক্রিকেট খেলা একেবারে বন্ধ থাকবে না। তবে ক্রিকেট খেলার উৎসাহ কিছু কমে যাবে।

পোল ভল্ট ঃ

অনেক দিন ধরে বিশেষজ্ঞরা আদর্শ পোল ভল্টারের এমনিতর একটা ছবি কল্পনা ক'রতেন, যে হবে খুব ক্ষিপ্র, যার কটিদেশের উপরিভাগ হবে খুবই শক্তিশালী তবে লম্বা ব'লতে যা বোঝায় সে ঠিক তা হবে না, আবার দৃঢ়তা হবে তার পক্ষে অপরিহার্য্য। ১৯২০ সালে Antwerpএ আমেরিকার ফ্রাঙ্ক ফস নামে যে খেলোয়াড়টি ১৩ ফিট ৫ ইঞ্চি লাফিয়ে অলিম্পিক ও পৃথিবীর রেকর্ড ক'রেছিলেন তাঁর শারীরিক গঠন উপরোক্ত গণ্ডীর ভেতর পড়ে। তবে পরবর্ত্তীকালে এঁরই স্বদেশবাসী সাবীন কার অথবা লী বার্ণস যাঁরা যথাক্রমে ১৪ ও ১৪½ ফিট লাফালেন, তাঁদের আর ঐ বাঁধা ধরার ভেতর রাখা গেল না; দৈর্ঘ্যে তাঁরা হলেন ছয় ফিটের কাছাকাছি। নরওয়ের চালর্স হফ্ ও আমেরিকার ফ্রেড ষ্টার্ডিকে দেখে বিশেষজ্ঞদের মত আরো পরিবর্ত্তন হ'লো। ১৪ ফিট যেমন অতি অনায়াসে এঁরা লাফালেন তেমনি আবার লম্বাতে ৬ ফিট সহজেই অতিক্রম ক'রে গেলেন। হফ্ আবার হ'লেন চৌখস্ খেলোয়াড়। Scandinavi ট্রাঙ্গুলার ইণ্টার ন্যাশানালের লঙ জাম্প এবং হার্ডলে প্রথম হয়ে তিনি পোল ভল্টে নূতন রেকর্ড ক'রলেন এবং সর্ব্বশেষে হফ্ ষ্টেপ এণ্ড জাম্পে বিজয়ী হ'য়ে প্রতিযোগিতা থেকে বিদায় নিলেন। তাঁর দৈহিক গঠন বিশেষজ্ঞদের হতাশ করলো।

১৯০৮ সালে অলিম্পিক বিজয়ী গিলবার্টের মতে, লম্বা খেলোয়াড়দের যথেষ্ট সুবিধা আছে যদি তাঁদের নিজেদের গঠন করবার ক্ষমতা থাকে বিশেষতঃ দেহের উপরিভাগকে যদি জিমনাষ্টিক বা অনুরূপ কোন শরীর চর্চ্চার দ্বারা গঠিত করা হয়। সাবীন কারের কৃতিত্বের মূলে আছে গিলবার্টের শিক্ষা। অবশ্য যাঁরা লম্বা তাঁদের খর্ব্বাকৃতিদের চেয়ে একটু বেশী সময় লাগে তবে আবার আয়ত্বে আনতে পারলে তাঁদের সুবিধা অনেক।

পোলভল্টের উপযোগী হাতের ব্যায়াম
হাতের উপর ভর দিয়ে বাঁশের উপর দিকে ওঠার অভ্যাস করা হচ্ছে

যাঁরা সত্য সত্যই ভাল পোল ভল্টার হ'তে চান, খুব বেশী ক্ষিপ্রতা থাকা তাঁদের একান্ত প্রয়োজন; কেননা দুটো জিনিষ এর

পোলভল্টের সাহায্যে ত্রিভুজাকার লক্ষ্যবস্তুটি অতিক্রম করবার পূর্ব্বে এবং পর অবস্থায় খেলোয়াড়ের বিভিন্ন ভঙ্গী

উপর খুব নির্ভর করে। লাঠির উপর ভর দিয়ে ওঠা এবং তারপর বারের উপর দেহ চালনা করা এই ক্ষিপ্রতার উপর নির্ভর করে। যে সব খেলোয়াড়রা লম্বায় বেশী, তাঁদের উপরোক্ত গুণ থাকলে তাঁরা অবশ্যই আদর্শ পোলভল্টার হ'তে পারেন। তবে একটা জিনিষ সব সময় মনে রাখতে হবে যে, দেহ ও পা যাঁদের লম্বা তাঁদের পক্ষে দেহকে ঠিক সংযত রাখা খুব শক্ত আবার দেহের ব্যালান্স হারান তেমনি সহজ। ভাল পোলভল্টার হ'তে গেলে কাঁধ, হাত, কব্জি ও আঙুল খুব শক্ত হওয়া দরকার। মুষ্টি হবে খুব জোর আর কব্জিকে আয়ত্বে রাখতে হবে। এর জন্য বিবিধ রকম ব্যায়ামের প্রয়োজন। যেমন পায়ের সাহায্য না নিয়ে দড়িতে ওঠা, পারারাল বারের উপর খেলা ইত্যাদি। এছাড়া হাতের সাহায্যে দাঁড়ান ও হাঁটা প্রভৃতি ব্যায়ামেরও প্রয়োজন।

গোলরক্ষকের বল মারার ভঙ্গী

খেলোয়াড়দের অফ্ সাইড ঃ

খেলোয়াড়দের এবং ক্রীড়ামোদীদের সুবিধার জন্য আরও কতকগুলি 'Off-side diagram' দেওয়া হ'ল।

'O' চিহ্নিতগুলি রক্ষণভাগের খেলোয়াড়।

'X' চিহ্নিতগুলি বিপক্ষদলের আক্রমণ ভাগের খেলোয়াড়। 'A' 'B' এবং 'C' বিপক্ষদলের আক্রমণ ভাগের খেলোয়াড়দের নাম।
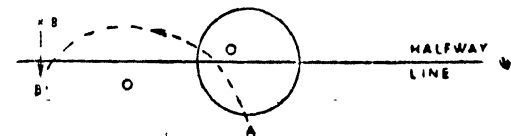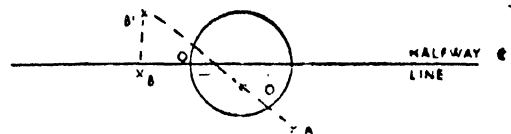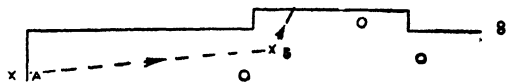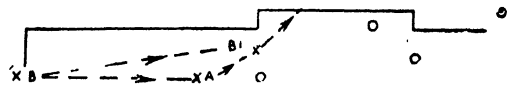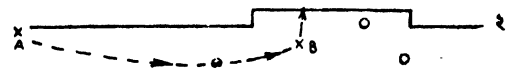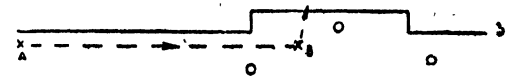
এই ৬টি চিত্রের প্রত্যেক চিত্রটির খেলোয়াড়দের Position এবং 'বলের গতি' পড়ে দু' সেকেণ্ডের কম সময়ে 'B' অফ্ সাইডে আছে কিনা বলবার চেষ্টা করুন।

বলের গতি ঃ

১। কর্ণার কিক্। 'A' 'B'-কে বল দিয়েছে, 'B' হেড্ দিয়ে গোল করেছে।

২। কর্ণার কিক্। 'A' সট করলে বলটি 'O'য়ের (ব্যাক) বাধা পেয়ে 'B'-য়ের কাছে যায়। সেই বল থেকে 'B' গোল দিয়েছে।

৩। থ্রো ইন। 'B' বলটি 'থ্রো' ক'রে 'A'কে দিয়েছে। 'A' বলটিকে পাশ করবার পূর্ব্বেই 'B' দৌড়ে এসে 'BI' স্থানে পৌঁছে।

৪। সোজাসুজি 'A' বলটি 'থ্রো' করে 'B'কে দিলে 'B' গোল করেছে।

৫। 'B' সামনে দৌড়ে গিয়ে BI-স্থানে 'A'য়ের পাশ করা বলটি ধরেছে।

৬। 'B' বিপক্ষদলের হাফ্ লাইন থেকে পিছনে দৌড়ে এসে 'BI' স্থানে বল ধরেছে।

ভ্রম সংশোধন ঃ

এবারের আই এফ এ শীল্ডের ফাইনাল খেলায় ইষ্টবেঙ্গলের ব্যাক পি দাশগুপ্ত হাণ্ডবল করায় পেনাল্টি হয়েছিল। গত-মাসে এ সম্পর্কে পি দাশগুপ্তের স্থানে পি চক্রবর্তীর নাম ছাপা হয়েছিল।

সাহিত্য-সংবাদ

নবপ্রকাশিত পুস্তকাবলী

শ্রীমায়াদেবী বসু প্রণীত উপন্যাস "ত্রিধারা"—২৲

শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত উপন্যাস "দ'খনৈ বাঘ"—২৷৹

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায় প্রণীত গল্পগ্রন্থ "আলেখ্য"—২৲

শ্রীকালিদাস রায় প্রণীত "প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্য" (১ম খণ্ড)—১৷৹

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র সাহা প্রণীত উপন্যাস "কামনার বহ্নিশিখা"—২৲

শ্রীহারাধন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত উপন্যাস "উচ্ছৃঙ্খল"—২৷৹

শ্রীশশধর দত্ত প্রণীত উপন্যাস "মুখোস মোহন"—২৲,

"কুমারের আবির্ভাব"—২৲

শিবপদ দাস প্রণীত উপন্যাস "শরৎচন্দ্রের পর"—১৷৹

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রণীত কাব্য গ্রন্থ "আলো-আঁধারি"—৷৹

হিরন্ময় ঘোষাল প্রণীত গল্প-গ্রন্থ "শাকান্ন"—১৶৹

শ্রীজ্যোতির্ম্ময় ঘোষ (ভাস্কর) প্রণীত গল্প-গ্রন্থ 'কথিকা"—১৲

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত নাটক "রঙ্গমঞ্চ"—৸৹

শ্রীমনোজ বসু প্রণীত গল্প গ্রন্থ 'একদা নিশীথকালে"—২৲

সুধীরকুমার সেন প্রণীত "বর্ত্তমান মহাযুদ্ধ"—১৷৹

শ্রীমণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত "অতীত বঙ্গ"—১৲

শ্রীপ্রবোধকুমার সান্যাল প্রণীত "দুরাশার ডাক"—১৲

শ্রীবিজয়কুমার ভট্টাচার্য্য সম্পাদিত "বাস্তব ও বঙ্গ"—১৷৹

শ্রীআশুতোষ ধর সম্পাদিত "বার্ষিক শিশু-সাথী"—১৸৹

শ্রীগৌরগোপাল বিদ্যাবিনোদ প্রণীত "পুরাণো গল্প"—৷৹

আবদুর রশিদ প্রণীত "আরবের গল্প"—৷৶৹, "প্রকৃতির পরাজয়"—৷৶৹

শ্রীনীহাররঞ্জন গুপ্ত প্রণীত "শঙ্কর"—৷৶৹

শ্রীননীগোপাল চক্রবর্ত্তী প্রণীত "হাবুলচন্দোর"—৷৶৹

বিনয়ভূষণ দাশগুপ্ত প্রণীত "বঙ্গোপসাগরে জলদস্যু"—৷৹

ডক্টর সুরেন্দ্রনাথ সেন-সম্পাদিত "প্রাচীন বাঙ্গালাপত্র সঙ্কলন"—৫৲

শ্রীঅমিলকুমার ভট্টাচার্য্য প্রণীত গল্পগ্রন্থ "নিশিগন্ধা"—১৷৹

ব্রহ্মচারী পরিমলবন্ধু দাস প্রণীত "শ্রীশ্রীজগবন্ধু হরিলীলামৃত"

প্রথম খণ্ড—১৷৹

শ্রীপবিত্রানন্দ স্বামী ব্যাখ্যাত "নারদ পরিব্রাজকোপনিষৎ"—১৷৹

প্রভাবতী দেবী সরস্বতী প্রণীত উপন্যাস "নিশীথের চাঁদ"—১৸৹

সম্পাদক—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম্-এ

২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা; ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শিল্পী—শ্রীযুক্ত তিলক বন্দ্যোপাধ্যায় স্বর্গারোহণ ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

অগ্রহায়ণ—১৩৪৯

প্রথম খণ্ড | ত্রিংশ বর্ষ | ষষ্ঠ সংখ্যা

রুশিয়া ও কম্যুনিজম্

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত

কার্ত্তিকের "এষণা" প্রবন্ধে Marxএর মতবাদ সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করা হয়েছে ; এই Marxএর মতবাদ নিয়ে গড়ে' উঠেছে বর্ত্তমান রুশিয়ার সোভিয়েট সর্ব্বস্বামিত্ববাদ (communism)। এর বিরুদ্ধে একদিকে রয়েছে গণতন্ত্রবাদী বৃটিশ, অপরদিকে রয়েছে মুখ্যস্বামিত্ববাদী ইটালির ফাসিষ্ট্ ও জার্ম্মানীর ন্যাশনাল সোস্যালিষ্ট্। সর্ব্বস্বামিত্ববাদী রুশদের রাষ্ট্রতন্ত্র সম্বন্ধে এই জন্যই এই আলোচনা করা আবশ্যক, যে তা'রা Marxএর মতকে কাজে ফলিয়ে তুলেছে বা ফলিয়ে তুলেছে বলে' মনে করে। জগতে এ পর্য্যন্ত Marx-এর মতানুবর্ত্তিতায় এই একটি মাত্র রাষ্ট্রতন্ত্র গড়ে' উঠেছে। সর্ব্বস্বামিত্ববাদীদের দল সব দেশেই এখন ছড়িয়ে পড়েছে। এমন কি, আমাদের দেশেও এখন এদের প্রচারের পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে এবং বর্ত্তমান যুদ্ধে রুশেরা যেরূপ বীর্য্যের সহিত জার্ম্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়েছে তা'তে তা'রা অনেকের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছে। কারণ, সাধারণতঃ মানুষ বলের উপাসক। বল নানারূপে পৃথিবীতে আত্মপরিচয় দিয়ে থাকে এবং যখনই সে বল একটা আতিশয্য লাভ করে তখনই মানুষ তা'র কাছে মাথা নোওয়ায়—তা' সে বল যে প্রকারেরই হোক না কেন। আমি এই প্রবন্ধে এই কথাটি বলতে চাই যে সর্ব্বস্বামিত্বের মন্ত্রটি যদিও Marxএর অর্থনৈতিক কার্য্যকরণপদ্ধতির উপর প্রতিষ্ঠিত বলে' সকলে মনে করেন—তথাপি সর্ব্বস্বামিত্বের যে মূর্ত্তিটি রুশীয় রাষ্ট্রতন্ত্রে আজ প্রকাশ পেয়েছে সেটি মুখ্যস্বামিত্ব বা মুখ্যনায়কতাবাদের রাষ্ট্রতন্ত্রের মতই বলসাধনারই একটি বিশিষ্ট পরিচয় নিয়ে আমাদের সামনে এসেছে। Marxএর মন্ত্রে প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রতন্ত্র ব্যক্তির স্বাধীনতা ও ব্যক্তির মঙ্গলকে আজ পঁচিশ বৎসরের মধ্যে রূপ দিয়ে উঠতে পারে নি। যে দিকে সে ছুটেছে তা'র পূর্ণপরিণতিতেও যে সে সর্ব্বমানবের বা স্বজাতির মঙ্গল ও স্বাধীনতার দিকে অগ্রসর হবে তা'রও প্রমাণ অন্ততঃ এখনও পাওয়া যায় নি। পাওয়া যাবে বলে' কেউ বিশ্বাস করতে পারেন কারণ বিশ্বাস নিরঙ্কুশ।

ত্রয়োদশ শতাব্দীর পূর্ব্বে রুশিয়ার কি অবস্থা ছিল তা' নিশ্চয় করে' বলা যায় না। এশিয়া থেকে তাতার ও মোগলেরা রুশিয়া অধিকার করে' দীর্ঘকাল রাজত্ব করেছিল। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে মোগলেরা রুশদেশ থেকে বিতাড়িত হয়। মস্কোর গ্রাণ্ড ডিউকেরা দীর্ঘকাল ধরে' মোগলদের অনুগ্রহভাজন হয়ে' বল সঞ্চয় করেছিল। পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে মস্কোর গ্রাণ্ড ডিউক দ্বিতীয় ভ্যাসিলি স্বতন্ত্র হয়ে' ওঠেন। তিনি ও তাঁর পরবর্ত্তীরা ক্রমশঃ অন্যান্য প্রধান ব্যক্তিদের বলপূর্ব্বক ধ্বংস করেন। ষোড়শ শতাব্দীর চতুর্থ ইভান 'জার' উপাধি গ্রহণ করেন এবং সেই অবধি তাঁ'র বংশধরেরা যথেচ্ছভাবে রাজ্যশাসন করে' আসতে থাকেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে পিটার দি গ্রেটের সময় থেকে রাজশক্তি অক্ষুণ্ণ রেখে প্রজাদের কিছু কিছু সুবিধাসুযোগ দেওয়া আরম্ভ হয়। পিটার দি গ্রেট ১৭৮১ খৃষ্টাব্দে 'সম্রাট' উপাধি গ্রহণ করেন। ক্রমশঃ রুশরাজ্য যত ব্যাপক হয়ে' উঠতে লাগল ততই রাজশক্তি দূরদর্শিতার অভাবে এবং অক্ষমতার জন্য একদিকে সৃষ্টি করল অরাজকতা এবং অপরদিকে সৃষ্টি করল যথেচ্ছচারিতা।

উনবিংশ শতাব্দীতে (১৮০১—১৮২৫) প্রথম আলেকজাণ্ডার রুশদেশে রাজত্ব করেন। তদানীন্তন প্রসিদ্ধ রাষ্ট্রনৈতিক কেরেন্স্কির সহযোগে জারের সভাপতিত্বে একটি পরিষদ গঠিত হয় এবং বিভিন্ন মন্ত্রীর হাতে বিভিন্ন-জাতীয় ক্ষমতা দেওয়া হয়। ১৮১০ সালের ১লা জানুয়ারী এই ঘোষণা বাহির হয় যে রাষ্ট্রসভাকৃত নিয়ম ও আইন অনুসারে সমস্ত দেশের শাসন সম্পন্ন হবে। রাষ্ট্রসভার কেবলমাত্র পরামর্শ দেবার ক্ষমতা ছিল, কিন্তু সম্রাট ছিলেন একেবারে স্বতন্ত্র। সম্রাট নিকোলাসের সময় (১৮২৫—১৮৫৫) ৫০খানি গ্রন্থে রুশিয়ার সমস্ত আইনকানুন লিপিবদ্ধ হয়। কিন্তু প্রজারা যতই রাষ্ট্রীয়-সচেতন হয়ে উঠতে লাগল ততই তা'রা আরও আরও ক্ষমতার দাবী জানিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করতে লাগল! সম্রাট দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডারের রাজত্ব-কালে (১৮৫৫—১৮৮১) রুশিয়া ক্রিমিয় যুদ্ধে পরাজিত হয়। এই সুযোগে প্রজাদের দাবী প্রবল হয়ে উঠল। চাষীরা স্বাধীনতা লাভ করল (১৮৬৪), বিচার-বিভাগ সংস্কৃত হ'ল (১৮৬৪), মিউনিসিপ্যালিটির আইনকানুন পরিবর্ত্তিত হল (১৮৭০) এবং জমিদার প্রভৃতি সকল শ্রেণীর লোককে যুদ্ধে যোগ দিতে হবে এই নিয়ম স্থাপিত হল। ইতিপূর্ব্বে বড়লোকের ছেলেদের যুদ্ধে যেতে বাধ্য করা হ'ত না। পরন্তু লোকে দাবী করতে লাগল যে রাষ্ট্রসভার সভ্যগণ জনমতের দ্বারা নির্ব্বাচিত হবে। এই উপলক্ষে গোপনে নানা ষড়যন্ত্র, নানা বিভীষিকার সৃষ্টি হতে লাগল এবং ১৮৮১ সালের ১লা জানুয়ারী তারিখে যেদিন দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডার প্রজাদের নূতন অধিকার দিতে সম্মতিদান করবেন বলে স্থির করলেন সেইদিনই তিনি ষড়যন্ত্রকারীদের হস্তে নিহত হন। তাঁর পুত্র তৃতীয় আলেকজাণ্ডার (১৮৮১—১৮৯৪) এবং তাঁর পুত্র দ্বিতীয় নিকোলাস (১৮৯৪—১৮১৭) কেহই প্রজাদিগকে নূতন অধিকার দেবার পক্ষপাতী ছিলেন না। তাঁ'দের আমলে কোতোয়ালের অত্যাচার ক্রমশঃ বাড়তে লাগল এবং সঙ্গে সঙ্গে গুপ্ত বিদ্রোহের অগ্নি চারিদিকে ধূমায়িত হয়ে উঠল। ১৯০৫ সালে রুশিয়া জাপানের সহিত যুদ্ধে পরাজিত হ'ল। চাষীরা বড়লোকদের বাড়ী ধ্বংস করে' জমি ভাগ করে' নিতে লাগল। মাঞ্চুরিয়ার সৈন্যেরা বিদ্রোহের চিহ্ন দেখাল এবং কুলিমজুরদের মধ্যে কর্ম্মনিবৃত্তি (strike) ঘটতে লাগল। ১৯০৫ সালে সম্রাট দ্বিতীয় নিকোলাস্ জনমতের দ্বারা নির্ব্বাচিত পরিষদ (State Duma) গঠনে রাজী হলেন, কিন্তু এই পরিষদকে মন্ত্রণা দেওয়া ছাড়া অন্য কোন অধিকার দিলেন না। ফলে বিদ্রোহের অগ্নি চারিদিকে জ্বলে উঠল এবং অক্টোবর মাসে শ্রমিকদের একটা বিপুলায়তন কর্ম্মনিবৃত্তি ঘটল এবং শ্রমিকেরা একটি নূতন পরিষদ গড়ে' তুলল। এই শ্রমিক-পরিষদের নাম হল 'সোভিয়েট'।

১৯০৫ খৃষ্টাব্দের ১৭ই অক্টোবর দ্বিতীয় নিকোলাস এই হুকুম জারী করলেন যে এখন থেকে প্রজাদিগকে বে-আইনী-ভাবে আর গ্রেপ্তার করা হবে না এবং তারা তাদের মত ইচ্ছা অনুসারে প্রকাশ করতে পারবে ও যে কোন সমবায় গঠন করতে পারবে এবং এই সঙ্গে তিনি মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা ঘোষণা করলেন। তা' ছাড়া এ কথাও স্বীকার করলেন যে এখন থেকে রাজপরিষদের সম্মতি ব্যতিরেকে কোন নূতন আইন রচিত হতে পারবে না এবং প্রজাদের মনোনীত প্রতিনিধিরা রাজকীয় কর্ম্মচারীদের শাসন করতে পারবে। এই সঙ্গে অনেক নূতন আইনও প্রণীত হল। এখন থেকে কোন আইন হ'তে হ'লেই তা'তে Duma এবং রাজ-পরিষদ ও সম্রাটের সম্মতি আবশ্যক হ'ত। কোন আইন-সভায় উপস্থিত করবার এবং মন্ত্রীসভাকে আহ্বান করবার বা মন্ত্রীসভা বন্ধ করবার ক্ষমতা কেবলমাত্র সম্রাটেরই ছিল এবং সম্রাট ইচ্ছা করলে Duma ও রাজপরিষদের (State Council) দ্বারা অনুমোদিত কোন আইন অগ্রাহ্য করতে পারতেন। কিন্তু রাজকর্ম্মচারী নিয়োগ বা তাদের পরিচালনার ভার সম্পূর্ণভাবে সম্রাটের উপর ছিল। যে কোন সময় বিপন্নতার ঘোষণা ক'রে তিনি সাধারণ আইন রদ করতে পারতেন এবং সৈন্যবর্গের উপর সম্পূর্ণ কর্ত্তৃত্ব তাঁরই ছিল। পররাষ্ট্রব্যাপারে তাঁরই ছিল একমাত্র কর্ত্তৃত্ব। রাজ-পরিষদের অর্দ্ধেক সভ্য রাজমনোনীত ও অর্দ্ধেক সমাজের বিভিন্ন উচ্চশ্রেণীর লোকের মধ্য থেকে জনমতের দ্বারা নির্ব্বাচিত হ'ত। রাজপরিষদের সভ্যগণের মধ্যে কতক ছিলেন কেবলমাত্র সভ্যনামধারী, আর কতক পরিষদের মন্ত্রণায় যোগ দিতে পারতেন। রাজা ইচ্ছা করলে পরিষদে যাঁরা যোগ দিতেন তাঁদের সংখ্যা রদ করতে পারতেন। এ

অবস্থায় তাঁ'রা নামমাত্রই সভ্য থাকতেন। পরিষদের জনমতের দ্বারা নির্ব্বাচিত সভ্যেরা বিশিষ্ট বিশিষ্ট ধনীসমাজের মধ্য থেকে নির্ব্বাচিত হতেন, কিন্তু Duma সভার সকলেই সাধারণ জনমতের দ্বারা নির্ব্বাচিত হতেন। এই জন্ম সম্রাট অনেক সময় অনেক Duma সভাকে বাতিল করে' দিতেন! এইরূপে ১৯০৬ ও ১৯০৭ সালে দুইবার Duma সভা নিষ্কাশিত হয়। এ ছাড়া সাধারণ জনমত যা'তে যথেচ্ছভাবে নির্ব্বাচনে প্রযুক্ত না হ'তে পারে সরকারপক্ষ থেকে সেজন্ম অনেক চাতুরী অবলম্বিত হ'ত। ফলে Duma দ্বারা নির্ব্বাচিত সভ্যগণকে যথার্থভাবে সমস্ত দেশের প্রতিনিধি বলে' গণ্য করা যেত না। অনেক সময় Dumaর সভ্যগণ রাজার বিরুদ্ধে মতামত প্রকাশ করলে দণ্ডিতও হ'ত। রুশদেশ বিপন্ন—এই অজুহাতে সাধারণ ব্যবহারবিধি সম্রাট অনেক সময় স্থগিত করতেন। পূর্ব্বে রুশজাতি কর্ত্তৃক অধিকৃত ইউক্রেন বাল্টিকরাজ্য অর্থাৎ লাটভিয়া এস্তোনিয়া ও লিথুয়ানিয়া এবং বেসারবিয়া ও রুশীয় পোল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশে তত্তদ্দেশীয় অনেক বিধিব্যবস্থা প্রচলিত ছিল, কিন্তু নিকোলাসের সময় থেকে এই সমস্ত রুশেতর জাতি দ্বারা অধিকৃত দেশগুলিও রুশীয় পদ্ধতিতে শাসিত হ'ত।

১৮৬৪ সালে রুশীয় বিচারপ্রণালীকে বিশুদ্ধতর করবার জন্ম যে সমস্ত জজ বা ন্যায়াধীশ নির্ব্বাচিত হতেন তাঁদের স্বতন্ত্রভাবে আইন অনুসারে কাজ করবার ক্ষমতা ছিল। প্রয়োজন অনুসারে Jury বা পরিষদও নিযুক্ত হত, কিন্তু পরে এই ক্ষমতা অনেক পরিমাণে হ্রাস করে' দেওয়া হল ও অনেকজাতীয় অপরাধের জন্য বিচারের ভার পড়ল রাজনিয়ন্ত্রিত ব্যক্তিদের উপর। তাঁরা অনেক সময় বিচারকার্য্য গোপনে সমাধা করতেন। এই ব্যবস্থা ১৯১৩ সালে সংশোধন করবার প্রস্তাব হয়, কিন্তু ১৯১৪ সালে মহাযুদ্ধ আরম্ভ হওয়াতে সে প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করা গেল না।

১৯১৭ সালের রুশীয় জনসমাজকে চারিভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে—জমিদার, পুরোহিত, জোতদার ও চাষী। পূর্ব্বে কেবলমাত্র জমিদার ও উচ্চশ্রেণীর জোতদারেরাই নিজেদের ইচ্ছামত স্থানে বাস করত, যেখানে ইচ্ছা ভ্রমণ করতে পারত এবং সরকারী কর্ম্ম গ্রহণ করতে পারত। ১৯০৬ সালে এই ক্ষমতা সকলেই ভোগ করতে পারবে বলে' নির্দ্দিষ্ট হয়। এ ছাড়া, প্রদেশে প্রদেশে কিছু কিছু স্বায়ত্তশাসনের ব্যবস্থাও ছিল এবং রাজপ্রতিনিধিরূপে প্রাদেশিক শাসক বা গভর্ণরও নিযুক্ত হতেন এবং মস্কোতে একজন প্রধান মহামাত্য বা গভর্ণরজেনারেল নিযুক্ত থাকতেন। রুশিয়ার অধিকাংশ লোকই ছিল দরিদ্র ও অধিকাংশই লিখতে বা পড়তে জানত না। সকল লোকের পাঠযোগ্য সংবাদপত্রও ছিল না এবং শিক্ষিত ও অশিক্ষিতের মধ্যে একটা বিরাট পার্থক্য ছিল।

যখন ১৯১৪ সালে রুশিয়া যুদ্ধঘোষণা করল তখন সেই সেনাবাহিনীর নায়ক হলেন স্বয়ং জার। তিনি নিজে ছিলেন ভীরু এবং যুদ্ধবিদ্যার কোন ধারই ধারতেন না। এদিকে রাজ্যের ভার রইল রাজ্ঞী আলেকজান্দ্রা ফেডোরোভনার উপর। এই দুর্ব্বলচিত্ত নারীটি ছিলেন রাস্‌পুটিন্ নামক এক ধূর্ত্তের ক্রীড়াপুত্তলী। রাজ্যে ঘটতে লাগল নানা বিশৃঙ্খলা। রাস্‌পুটিন্ নিহত হল ঘাতকের হস্তে। এদিকে সাধারণ লোকের উপর চলতে লাগল সৈনিকদের নানা অত্যাচার। সঙ্গে সঙ্গে যখন যুদ্ধে রুশীয়ার হার হতে লাগল তখন সমস্ত সাধারণ লোক ক্ষিপ্ত হয়ে উঠতে লাগল। সমস্ত রাজকার্য্য হল বন্ধ। Dumaর সভ্যেরা মিলিত হয়ে সরকার পক্ষের তীব্র প্রতিবাদ আরম্ভ করল। এদিকে যুদ্ধের জন্ম লোকের নিরন্নদশা আরও বৃদ্ধি পেল এবং নানা প্রকার অত্যাচারে সরকারের শাসনের উপর সকলে আস্থা হারাল। এদিকে জার রয়েছেন রণক্ষেত্রে, জনসমাজ খাদ্যের অভাবে ক্ষিপ্ত হয়ে বিদ্রোহী হয়ে উঠ্‌ল। Dumaর সভ্যেরা দূত পাঠালেন রণক্ষেত্রে দ্বিতীয় নিকোলাসের নিকট। নিকোলাস সই করলেন রাজ্যত্যাগের পরওয়ানা ১৯১৭ সালের প্রথম দিকে। দ্বিতীয় নিকোলাস্ তাঁর ভাইকে তাঁর স্থানে মনোনীত করেছিলেন, কিন্তু রুশিয়ার লোকেরা তখন এমনই ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে যে কাউকেই তারা রাজা বলে স্বীকার করতে রাজী হল না। এই সময় এই বিদ্রোহে পরাক্রান্ত হয়ে উঠ্‌ল শ্রমিক ও সৈনিকদের পরিষদ (Soviet)। ট্রট্‌স্কি নেতা। এই পরিষদ এদের নিজের হাতে রাজ্যভার তুলে' নিলে। এই বিদ্রোহ ঘটাবার মূলে ছিল শ্রমিকরা এবং সেই সমস্ত সৈনিক যারা রাজধানীতে উপস্থিত ছিল। দেশের জনসাধারণের এই বিদ্রোহে কোন হাত ছিল না। কেরেন্‌স্কি পেলেন বিচারের ভার। পূর্ব্বের যে Duma সভ্য ছিল তা' গঠিত হয়েছিল সম্রাটের নিজের হাতে। যদিও প্রথম শাসনভার তাদেরই কর্ত্তৃত্বে স্থাপিত হয়েছিল তথাপি অতি-বিদ্রোহী সৈনিক ও শ্রমিকসঙ্ঘ ক্রমশই এত বলবান হয়ে উঠতে লাগল যে তারা প্রাচীন Duma পরিষদকে ধূলিসাৎ করে' দিলে এবং নিজেদের হাতে রাষ্ট্রশাসনের ভার নেবার জন্যে উদ্যোগী হয়ে উঠ্‌ল। পূর্ব্বের সমস্ত শাসনপদ্ধতি নিষ্কাশিত হল। দেশময় নানা ছোট ছোট সমিতি ও পরিষদ গঠিত হতে লাগল। এই নূতন সোভিয়েট সম্প্রদায় জমিদারদের জমি কেড়ে নিয়ে চাষীদের মধ্যে বণ্টন করবার ব্যবস্থা আরম্ভ করল। অনেক সৈন্য এই বণ্টনের লোভে রণক্ষেত্র থেকে পালিয়ে এল। এই সময় দেখা দিলেন লেনিন্; লেনিনের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত যে সমস্ত নেতারা রাজ্যের ব্যবস্থা করবার জন্ম উদ্যোগী হয়েছিলেন তাদের সকলেরই ইচ্ছা ছিল গণতন্ত্র স্থাপন, কিন্তু লেনিন্ একটি সোভিয়েট রাজ্য স্থাপনের কল্পনা করলেন এবং এ কার্য্যে তাঁর সহায় হলেন ষ্টালিন ও ট্রট্‌স্কি।

প্রথমতঃ এই বলশেভিক দলের ক্ষমতা অতি অল্পই ছিল, কিন্তু লেনিন্ এই মন্ত্র প্রচার করতে লাগলেন যে ধনীরা দরিদ্রের ধন কেড়ে নিয়েছে, তাদের সকলের ধন অপহরণ কর। কারও ব্যক্তিগত সম্পদ থাকতে পারবে না। এই মন্ত্র প্রচারের ফলে দলে দলে দরিদ্র নিরন্ন লোক এসে সোভিয়েটের পক্ষ অবলম্বন করল। প্রধানতঃ এল কৃষকেরা। ফলে সোভিয়েট রাজ্য রুশিয়ায় আরম্ভ হল।

লেনিন্ ছিলেন Marxএর (১৮১—১৮৮৩) ও এঙ্গেলস্ (১৮২০—১৮৯৫)এর ভক্ত। Marx বিশ্বাস করতেন যে ভোগ্য উপাদান উৎপাদনের ব্যবস্থার বৈচিত্র্যের ফলে সমস্ত সমাজ ও সভ্যতা গড়ে' উঠেছে, সমাজের দীর্ঘ ইতিহাসে দেখা যায় ধনিক ও শ্রমিকের দ্বন্দ্ব। ধনিকের ধনবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ধনিকের সংখ্যা যায় কমে' এবং শ্রমিকের সংখ্যা যায় শতগুণ বেড়ে' এবং ফলে শ্রমিকের বিদ্রোহে ধনিকেরা হবে ধূলিসাৎ ও শ্রমিকেরা হবে নেতা। কিন্তু Marx মনে করতেন যে এই দ্বন্দ্বে স্বাভাবিকভাবে সমস্ত ক্ষমতা শ্রমিকের হাতে গড়িয়ে পড়বে, এতে কোন রক্তপাতের প্রয়োজন নেই। কিন্তু লেনিন্ এই সঙ্গে বললেন যে সাম্রাজ্যবাদী জাতির মধ্যে সাম্রাজ্য নিয়ে দ্বন্দ্ব অবশ্যম্ভাবী এবং ফলে ঘটবে অন্তর্বিদ্রোহ, সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন জাতির মধ্যে বিদ্রোহ, তারই ফলে মাথা তুলে' দাঁড়াবে সর্ব্বস্বামিত্ব মত, তার শাসন।

এঙ্গেল্স্ বলে গেছেন যে তথাকথিত গণতন্ত্র নামে যে শাসনপদ্ধতি নানা দেশে চলেছে সেগুলি যথার্থ হচ্ছে ধনিকতন্ত্র। যে সমস্ত ধনিক গণতন্ত্রের ছলে আপনাদের প্রভুত্ব স্থাপন করছে তারা সহজে তাদের অধিকার কখনই ছাড়বে না, কিন্তু কালে ইতিহাসের গতিতে সমস্ত শক্তি এসে পড়বে শ্রমিকদের হাতে, কারণ তাদের মধ্যে আছে সংযম, আছে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন, রাষ্ট্রতন্ত্র স্থাপিত হয়েছে ধনিক ও শ্রমিকের দ্বন্দ্বের উপর। শ্রমিক বিদ্রোহের যথার্থ উদ্দেশ্যই হচ্ছে এই রাষ্ট্রতন্ত্রকে ধ্বংস করা ও সমস্ত সমাজকে শ্রেণী বিভাগ থেকে মুক্ত করা। Marx বলেছিলেন যে শ্রমিকদের দ্বারা যে রাষ্ট্রতন্ত্র আরম্ভ হবে তা আরম্ভের সঙ্গে সঙ্গে ধ্বংসোন্মুখ হয়ে ধ্বংসে পরিণত হবে। লেনিন্ চাইলেন একটি শ্রমিক রাষ্ট্র গড়তে অর্থাৎ এমন একটি রাষ্ট্র গড়তে যে রাষ্ট্রের নায়ক হবে কেবলমাত্র শ্রমিকেরা এবং কালক্রমে এই রাষ্ট্র রাষ্ট্রত্বকে বিসর্জ্জন দেবে। তিনি এই কথা বিশ্বাস করতেন যে শ্রমিকতন্ত্র রাজ্য কালক্রমে অরাজকতায় পরিণত হবে। লেনিনের চোখে কেবলমাত্র ধনিকের অত্যাচারকে নিবৃত্ত করবার জন্য শ্রমিক রাষ্ট্রের প্রয়োজন। তিনি চাইলেন বাঁধা মাসোহারার সৈন্যদলের পরিবর্ত্তে সকল ব্যক্তিকে সশস্ত্র করা এবং রাষ্ট্র থেকে ভৃত্যতন্ত্রতা বর্জ্জন করা। তিনি মনে করেছিলেন রাষ্ট্রের ব্যবস্থা এত সহজ ও সরল হবে যে লিখতে পড়তে জানলেই যে কোন ব্যক্তি যে কোন কাজ চালাতে পারবে এবং বড় বড় কাজে যারা নিযুক্ত তারাও শ্রমিকদের চেয়ে বেশী বেতন পাবে না এবং সমস্ত কর্ম্মচারী জনমতের দ্বারা নির্ব্বাচিত হবে। তা ছাড়া, কোন এক ব্যক্তিকে এক কাজে বেশী দিন রাখা হবে না। যে কোন কাজই যখন যে কোন লোক করতে পারে তখন প্রত্যেক লোককেই ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সকল কাজে নিযুক্ত করা হবে। রাষ্ট্র ধ্বংস হতে কতদিন লাগবে সে সম্বন্ধে লেনিন্ কোন নির্দ্দেশ দিয়ে যান নি। ধনিক ধ্বংস হলেই রাষ্ট্র আপনি বিনষ্ট হবে।

এই শ্রমিক রাষ্ট্রের প্রধান কাজই হচ্ছে এই যে ভোগ্য বস্তু উৎপাদনের সমস্ত ভার নেবে রাষ্ট্র, যাতে কোন ব্যক্তিই প্রচুর অর্থ অর্জ্জন করতে না পারে। প্রত্যেক ব্যক্তিকেই পরিশ্রম করে' আহার অর্জ্জন করতে হবে এবং যে যে পরিমাণ পরিশ্রম করবে সে সেই পরিমাণ অর্থ পাবে। এই ব্যবস্থায় কোন শ্রেণী বিভাগ থাকবে না। ভোগ্যবস্তু উৎপাদনের যন্ত্র ছাড়া অন্য বস্তু সম্বন্ধে ব্যক্তিগত স্বত্ব স্বীকার করা যায় না। এই ব্যবস্থায় কায়িক পরিশ্রম ও মানসিক পরিশ্রমের কোন পার্থক্য স্বীকার করা হবে না, প্রত্যেকে আপন প্রয়োজন অনুসারে অর্থের ভাগ পাবে এবং এই রকম অবস্থায় রাষ্ট্র বলে' আর কোন জিনিষ থাকবে না। কিন্তু কবে এবং কি ভাবে এই অবস্থা হ'তে পারে সে সম্বন্ধে Marx বা লেনিন্ কোন নির্দ্দেশ দিয়ে যান নি।

১৯১৯ সালের সন্ধি অনুসারে রুশিয়ার নানা অংশ রুশিয়া থেকে ছিন্ন করা হয়, যথা—ফিন্ল্যাণ্ড, লিথুয়ানিয়া ইত্যাদি। Marx ও লেনিনের মতে বিভিন্ন ভাষাভাষী ও বিভিন্ন জাতীয় লোক যখন একটি দেশে বাস করে তখন তারা শ্রমিক-গণ-তান্ত্রিকতায় আপন আপন শাসনপদ্ধতির ব্যবস্থা করে' কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রের সঙ্গে স্বাভাবিক সহানুভূতি দেখাবে। সেইটিই হবে তাদের ঐক্যের যোগসূত্র। ১৯১৯ সালে কম্যুনিষ্ট সভায় এই সিদ্ধান্ত হয় যে সাম্রাজ্যবাদী জাতিরা যে যে স্থানে তাদের উপনিবেশ স্থাপন করেছে তাদের সকলেরই স্ব-স্বাধীনতার অধিকার আছে। তবে তাদের সকলেরই আপন আপন স্বায়ত্তশাসন অক্ষুণ্ণ রেখে সমগ্র মানব জাতির এক অখণ্ড শ্রমিকশাসনের অন্তর্ব্বর্ত্তী হবার জন্য চেষ্টা করা উচিত এবং অন্যান্য সকল জাতিকেও শ্রমিকতন্ত্রে দীক্ষিত করবার জন্য প্ররোচিত করা কর্ত্তব্য। ১৯৩০ সালে ষ্টালিন যে পরাধীন জাতিগুলির স্বতন্ত্র হওয়ার অধিকার আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির উপর নির্ভর করে এবং সেইরূপ স্বাধীনতা অবলম্বন করলে রুশিয়া ও শ্রমিকসঙ্ঘের কি উপকার হবে তার উপর নির্ভর করে। এইজন্য যদিও অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদী জাতিদের অধীনে যে সমস্ত জাতি আছে তারা স্বাধীনতা লাভ করুক ইহা রুশিয়ার মনোগত অভিলাষ, তথাপি রুশিয়ার অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন জাতিরা যেন স্বাধীন না হতে পারে। বোধ হয় এই মতের অনুবর্ত্তী হয়েই

রুশিয়া ফিন্‌ল্যাণ্ডকে আক্রমণ করেছিল ও পোল্যাণ্ড থেকে আপন বখরা আদায় করবার চেষ্টা করেছিল। ষ্টালিন বলেন যে ফিন্‌ল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশগুলির স্বাধীনতা পাওয়ার অর্থ সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির তাঁবেদার হওয়া।

Marxএর মতানুসারে এই শ্রমিকবিদ্রোহের যথার্থ ক্ষেত্র ছিল ধনিকপ্রধান দেশে, যথা ইংল্যাণ্ডে ও ফ্রান্স। রুশিয়ার ন্যায় কৃষিপ্রধান দেশে প্রথমে এরূপ শ্রমিক বিদ্রোহ হওয়া Marxএর মতের সম্পূর্ণ অনুপযোগী। তথাপি লেনিন্ প্রভৃতিরা বিশ্বাস করতেন যে, অল্পদিনের মধ্যেই অন্য সব দেশেও এইরূপ বিদ্রোহের সৃষ্টি হবে। এমনি করে' পৃথিবীর সমস্ত প্রধান প্রধান দেশে এইরূপ বিদ্রোহের সৃষ্টি হলে, ঘটবে একটা ভুবনব্যাপী বিপ্লব। সেই বিপ্লবে সর্ব্ব শ্রমিকের যে একটা সমগ্র অভ্যুত্থান হবে সেইখানেই হল কম্যুনিষ্ট মতের সার্থকতা। মাত্র একটি দেশে শ্রমিক-বিদ্রোহ অতি নগণ্য বস্তু এবং তার সহিত শ্রমিক আদর্শের কোন সঙ্গতি নেই। কিন্তু অন্যান্য দেশে যদিও শ্রমিক-বিদ্রোহের আরম্ভ দেখা দিয়েছিল তা সমস্তই নিরস্ত হয়েছে।

১৯২৪ সালের জানুয়ারী মাসে যখন লেনিনের মৃত্যু হয় তখন ট্রট্স্কি ও ষ্টালিনের মধ্যে কে আধিপত্য নেবে তাই নিয়ে ওঠে দ্বন্দ্ব। এই দ্বন্দ্বের মধ্যে যদিও ব্যক্তিগত স্বার্থ তীব্রভাবে কাজ করেছে তথাপি দুজনের মধ্যে একটা প্রধান মতভেদও ছিল। ট্রট্স্কির বিশ্বাস ছিল যে ভুবনব্যাপী বিপ্লব ছাড়া শ্রমিকের আদর্শ কখনও সিদ্ধ হতে পারে না। যদিও পূর্ব্বে ষ্টালিনও এই মতের পোষকতা করেছেন, তথাপি তিনি হঠাৎ মত পরিবর্ত্তন করেন। ষ্টালিন বললেন যে, কোন একটি বিশাল দেশে যদি এইরূপ শ্রমিকবিদ্রোহ হয় তবে সেই একটি দেশেও শ্রমিকতন্ত্রতা সাধিত হতে পারে। এই দ্বন্দ্বের ফলে ট্রট্স্কি পরাজিত ও নির্ব্বাসিত হন।

ষ্টালিনের এই মত যখন স্থাপিত হল যে, যে কোন একটি দেশে সর্ব্বস্বামিতন্ত্র বা রাষ্ট্রস্বামিতন্ত্র শাসন পদ্ধতি চলতে পারে, তখন থেকে অন্যান্য ধনিকপ্রধান জাতিগুলির সহিত মৈত্রী স্থাপনের চেষ্টা চলতে লাগল এবং স্বদেশে অর্থনৈতিক সমস্যা পরিপূরণের বিরাট আয়োজন চলতে লাগল। যে সর্ব্বস্বামিত্ববাদের আদর্শ ছিল যে সমস্ত পৃথিবীর মধ্যে বিপ্লব সৃষ্টি করে' সর্ব্বমানবের জন্য রাষ্ট্রবিহীন রাজ্যতন্ত্র স্থাপিত করে' মানুষের মঙ্গল করা হবে, সেটা নিবৃত্ত হয়ে তার জায়গায় দাঁড়াল আবার জাতীয়তাবাদের আদর্শ। Inter-nationalism বা আন্তর্জাতিক সম্মেলনের আদর্শের স্থানে nationalism বা জাতীয়তাবাদের পতাকা উড্ডীন হল।

১৮৯৮ সাল থেকে সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক্ লেবার পার্টি এই নামের অন্তর্ভুক্ত শ্রমিকদের স্বপক্ষ একটি দল গড়ে' উঠেছিল, তাদের সংখ্যা প্রথমে ছিল অত্যন্ত কম। প্রথম মিটিংএ তারা মাত্র ছিল ৯ জন। এই সভা প্রথম যখন রুশিয়ায় আরম্ভ হয় তখন লেনিন্ ছিলেন সাইবেরিয়াতে নির্ব্বাসিত। দ্বিতীয় অধিবেশন হয় ব্রাসেল্‌স্‌এ এবং তৃতীয় অধিবেশন হয় লণ্ডনে। এই দলের মধ্যে যারা সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল তাদের নেতা ছিলেন লেনিন্। 'বলশেভিক্' শব্দের অর্থ majority বা সংখ্যাগরিষ্ঠ। এর বিপরীত শব্দ হচ্ছে 'মেন্‌শেভিক্' অর্থাৎ সংখ্যালঘিষ্ঠ। এই সভায় সংখ্যা-গরিষ্ঠেরা অতি-বিদ্রোহী মত পোষণ করতেন। প্রথম প্রথম এদের উদ্দেশ্য ছিল কেবলমাত্র বিদ্রোহী মত প্রকাশ করা। ১৯১৭ সাল পর্য্যন্ত এই কথাই মনে করা যেতে পারত যে 'সোশ্যাল ডিমোক্রেটিক' দলের লোকেরাই আধিপত্য বিস্তার করবে। কিন্তু ১৯১৮ সালে বলশেভিক বা সংখ্যা-গরিষ্ঠেরা প্রধান হয়ে উঠল এবং তাদেরই নাম হল 'রাশিয়ান্ কম্যুনিষ্ট পার্টি অফ্ দি বলশেভিক্‌স্'। ১৯২২ সালে রুশিয়া এই দলের হাতে গেল এবং রুশিয়াকে বলা হত 'ইউনিয়ন অফ্ সোশ্যালিষ্ট সোভিয়েট রিপাব্লিক্‌স্'।

শ্রমিক ও চাষীদের প্রাধান্য ও নেতৃত্ব স্থাপন করাই কম্যুনিষ্ট পার্টির উদ্দেশ্য এবং ১৯৩৪ সাল থেকে যে বিধি চলে এসেছে তাতে শ্রমিক, চাষী, সৈনিক এবং প্রাইমারী-স্কুলের শিক্ষকগণ ছাড়া অন্য কেউ কম্যুনিষ্ট পার্টিতে প্রবেশাধিকার পেত না। বিশেষ পর্য্যবেক্ষণ না করে' কাহাকেও এই দলের মধ্যে প্রবেশ করতে দেওয়া হত না। দলে প্রবেশ করবার পূর্ব্বে দুই, তিন, এমন কি চার বৎসর উমেদার (candidate) অবস্থায় কাটাতে হত। এই উমেদার দলভুক্ত হওয়াও সহজ নয়। এই উমেদারদেরও একটি সঙ্ঘ আছে এবং কোন বিশিষ্ট বিশিষ্ট ব্যাপারে তারা মতামত দিতে পারে। এ ছাড়া আছে সহানুভূতিকারক-বর্গ। এরা পার্টির সাধারণ অধিবেশনে উপস্থিত থাকতে পারে। এই কম্যুনিষ্ট পার্টির ছোট ছোট সঙ্ঘ প্রত্যেক ব্যবসায়ক্ষেত্রে, কারখানায়, চাষবাসের ব্যবস্থায় উপস্থিত থেকে তার কর্তৃত্ব চালিয়ে থাকে। ১৯৩৯ সালে ১৩০৬০টি এইরূপ সঙ্ঘ ছিল। এই সঙ্ঘের লোকেরা দলের মতামত সর্ব্বত্র প্রচার করবেন এবং সমস্ত কার্য্যের ব্যবস্থা করবেন, এইটিই পদ্ধতি। ইহাদের উপরে ক্রমশঃ উচ্চতর সঙ্ঘ আছে এবং সকলের উপরে আছেন ষ্টালিন। এই সঙ্ঘগঠনপ্রণালী একটি পিরামিডের ন্যায়। প্রত্যেক সহরে ও জেলায় পাঁচ হইতে সাত জন সভ্য নিয়ে এক একটি উচ্চতর সঙ্ঘ আছে, আবার বড় বড় প্রদেশ নিয়ে আরও উচ্চতর সমাজ আছে। এই সভা (কংগ্রেস্ অফ্ দি ন্যাশন্যাল্ কম্যুনিষ্ট পার্টি অফ্ দি কন্স্‌টিটিউয়েণ্ট রিপাব্লিক্) দেড় বৎসরে অন্ততঃ একবার মিলিত হয়। ইহা ছাড়া একটা উচ্চতম কেন্দ্রসভা আছে। ইহাকে বলে দি অল্ ইউনিয়ন্ কংগ্রেস্ অফ্ দি পার্টি এণ্ড দি সেণ্ট্রাল্ কমিটি। নিম্নতর সঙ্ঘ উচ্চতর সঙ্ঘের অধীন এবং নিম্নতর সঙ্ঘের সমস্ত ব্যাপার উচ্চতর সঙ্ঘের অনুমতি ব্যতিরেকে স্থায়ীভাবে ঘটতে পারে না। নিয়মানুসারে উচ্চতম সমিতির উপরই সমস্ত কর্তৃত্বভার। কার্য্যতঃ

নেতারা যা উপস্থিত করেন কমিটি তাহাই পাশ করে' থাকে। মূল কংগ্রেস থেকে ৭০জন সভ্য দ্বারা গঠিত কেন্দ্রীয় সভা নির্ব্বাচিত হয়। এই কেন্দ্রীয় পরিষদের উপরই সমস্ত কার্য্যের প্রধান ভার। এই কেন্দ্রীয় সভা পরিচালনা করেন ষ্টালিন এবং তাঁহার কর্ম্মচারীবর্গ। ষ্টালিন এই সভার মূল সম্পাদক (সেক্রেটারী জেনারেল)। এ ছাড়া শাসন কার্য্যালয় (Political Bureau) ও ব্যবস্থা কার্য্যালয় (Organisation Bureau) নামে আরও ২টি ব্যবস্থাও আছে। এ ছাড়া দলকে শাসন করবার জন্যে আর একটি সভা আছে। তাকে বলে 'কমিটি অফ্ পার্টি কণ্ট্রোল্'। এই সভার পরিষদগণও মূল কেন্দ্রীয় সভা থেকে নির্ব্বাচিত হয়। প্রত্যেক সঙ্ঘের সভ্যদের কর্ত্তব্যই এই যে তারা দলের মত কার্য্যে পরিণত করবে। সাধারণ নিয়ম এই যে, কোন মত গৃহীত হবার পূর্ব্বে সভ্যেরা সেই মতের আলোচনা বা সমালোচনা করতে পারেন। কিন্তু ষ্টালিন এই ক্ষমতা অনেক পরিমাণে হ্রাস করে' দিয়েছেন। কেন্দ্রীয় সভা (Central Committee) ইচ্ছা করলে যে কোন বিষয়ের আলোচনা অনাবশ্যক বলে রদ করতে পারে। এই কেন্দ্রীয় সভা ষ্টালিনের অনুচরদের দ্বারা পরিপূর্ণ। কাজেই, কোন মতের আলোচনা বা সমালোচনা ষ্টালিনের অনভিপ্রেত হ'লে তা' ঘটতে পারে না। যাতে দলের অল্প-সংখ্যক লোকেরা তাদের মত জাহির করতে না পারে এইজন্যই এই বিধি স্থাপিত হয়েছে। কেন্দ্রীয় সভা ইচ্ছা করলে যে কোন ব্যক্তিকে দল থেকে নিষ্কাশিত করতে পারে। অনেক সময় এই রকম নিষ্কাশন ব্যাপার ঘটেছে। ১৯২১,১৯২৬,১৯২৭,১৯২৯ এবং ১৯৩৩ সালে বহু সভ্যকে দলচ্যুত করা হয়েছে এবং অনেকে ঘাতকের হস্তে প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়েছে এবং রুশীয় বিপ্লবের অধিকাংশ প্রধান নেতা দলের বিরোধী মত পোষণ করবার জন্য প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছেন। সরকারপক্ষ থেকে রুশীয় বিপ্লবের এক ইতিহাসও লেখা হয়েছে। এই ইতিহাসে বিপ্লবের অধিকাংশ নেতার নামও উল্লিখিত হয়নি এবং অনেকের বিরুদ্ধে অনেক তীব্র তিরস্কার করা হয়েছে। বর্ত্তমানকালে এই কম্যুনিষ্টদলের সভ্য হওয়ার নিয়মপ্রণালী অত্যন্ত কঠোর করা হয়েছে। যে কোন সভ্য যে কোন সভ্যের কার্য্য সমালোচনা করতে পারেন, কারও মনোনয়নে মত প্রকাশ করতে পারেন, তাঁর নিজের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ উপস্থিত হ'লে সেখানে উপস্থিত থাকতে পারেন এবং কোন বিষয়ে সংবাদ চাইতে পারেন। ১৯২২ সাল হইতে ১৯৩৯ সাল পর্য্যন্ত এই দলের সভ্য সংখ্যা ৪১০ হইতে ১৫৮৯ পর্য্যন্ত উঠেছে, এই দলের মধ্যে বর্ত্তমানে চাষীদের মধ্যে প্রায় কেহই সভ্য নির্ব্বাচিত হয়নি, প্রায় অর্দ্ধেকই সৈনিক-বিভাগের প্রধান কর্ম্মচারীরা দখল করে' আছেন এবং শতকরা ১৪ জন স্ত্রীলোক সভ্য আছেন। লেনিনগ্রাড্ থেকে শতকরা ১৩ জন ও মস্কো থেকে শতকরা ৯ জন সভ্য আছেন। এই জন্য লেনিনগ্রাড্ ও মস্কোই সভায় প্রাধান্য স্থাপন করতে পারে। ১৯৩৯ সালের আদমসুমারীতে রুশিয়ার জনসংখ্যা দেওয়া হয়েছে ১৭ কোটি। এই ১৭ কোটি লোকের মধ্যে ২৪ লক্ষ ৭৯ হাজার মাত্র কম্যুনিষ্ট সম্প্রদায়ভুক্ত, অর্থাৎ রুশিয়াতে শতকরা মাত্র ১॥০ দেড় জন লোক কম্যুনিষ্ট মতাবলম্বী। কিন্তু তথাপি এরাই রুশিয়া শাসন করছে। প্রায় সমস্ত চাকরীই এদের হাতে। ১৯৩৭ সালে রুশীয় পার্লামেণ্টের জন্য যে প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হয়েছে তার মধ্যে ৮৭০ জনই কম্যুনিষ্ট দলভুক্ত। রুশরাজ্য শ্রমিকতন্ত্র এবং এই শ্রমিকতন্ত্রতা সিদ্ধি করবার ভার কেন্দ্রীয় কম্যুনিষ্ট দলের উপর, যারা এই শ্রমিকদের নেতা।

ষ্টালিনের নেতৃত্বে সোভিয়েট সম্প্রদায় প্রথমতঃ পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন রাজ্যে যে ধনিক শাসন পদ্ধতি প্রচলিত আছে তাকে স্বীকার করে' নিল এবং ১৯২২ সালে জার্ম্মানী এবং ১৯২৪ সালে ইংল্যাণ্ড, ইটালি ও ফ্রান্স রুশিয়ার শাসন-পদ্ধতি স্বীকার করে' নিয়েছে। ক্রমশঃ ক্রমশঃ তারা টাকারও প্রবর্ত্তন করেছে এবং চাষীদিগকে উৎপন্নদ্রব্য বিক্রয় করবার ক্ষমতাও দিয়েছে। কিন্তু রুশিয়া এখনও কোন ব্যক্তিতন্ত্র ব্যবসা বা কলকারখানা খোলার ব্যবস্থা করে নি। ১৯২৭ সাল থেকে তারা প্রতি ৫ বৎসরে কি কি দ্রব্য কি ভাবে উৎপাদন করতে হবে তার খসড়া প্রস্তুত করে। ১৯১৮ সাল থেকে ১৯২৪ সাল পর্য্যন্ত যে শাসন-পদ্ধতি প্রচলিত হয় তাতে বিচার বিভাগ এবং কোতোয়ালী বিভাগ উভয়ই কেন্দ্রীয় সমিতির হাতে থাকে। বর্ত্তমানে যে পদ্ধতি প্রচলিত আছে তাতে সম্পদ উৎপাদনের সমস্ত যন্ত্রের উপর রাষ্ট্রেরই একমাত্র অধিকার। সমস্ত সম্পত্তি রাষ্ট্রের। সমস্ত জমি, নদনদী, অরণ্য এবং ব্যবসাবাণিজ্যের ও যানবাহনাদির উপরে রাষ্ট্রেরই পূর্ণ দখলী স্বত্ব। কিন্তু ছোটখাট ব্যবসা, যেমন নাপিত, কামার, কুমার প্রভৃতির কাজ অল্প পরিমাণে সাধারণ ব্যক্তিকে করতে দেওয়া হয়। হাঁড়ী, কলসী প্রভৃতি পারিবারিক দ্রব্য ও স্বীয় পরিচ্ছদাদি ও স্বীয় অর্জ্জিত অর্থের উপর ব্যক্তিগত অধিকার স্বীকৃত হয়েছে। এই সমস্ত ব্যক্তিগত অধিকার-বস্তু উত্তরাধিকার-সূত্রে পুত্রপৌত্রাদিরা ভোগ করতে পারে।

রুশীয় রাষ্ট্র ৩টি প্রধান উদ্দেশ্য সফল করবার জন্য ব্রতী হয়েছে—একটি রাষ্ট্রীয় সম্পদ বৃদ্ধি করা, দ্বিতীয় শ্রমিকদের লেখাপড়া শিখান ও তৃতীয় রুশিয়ার আত্মরক্ষা বিধানের জন্য সামর্থ্য অর্জ্জন। বর্ত্তমান সময়ে ক্ষমতা এবং শ্রমানুসারে সকলকে বেতন দেওয়ার ব্যবস্থাও রুশরাষ্ট্র স্বীকার করেছে।

রুশরাজ্যের মধ্যে এখন ১২টি স্বতন্ত্র রাজ্য স্বীকৃত হয়েছে। এই সমস্ত রাজ্যে পৃথক পৃথক ভাবে সোভিয়েট-দলের গণতন্ত্র প্রবর্ত্তিত হয়েছে এবং কতকগুলি ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সমিতির উপর অর্পিত হইয়াছে।

দেশের উন্নতিকল্পে প্রথম ৫ বৎসরের খসড়া অনুসারে বহু অনাবাদী জমি চাষ করা হল। পূর্ব্বে যেখানে শতকরা ১৭ ভাগ জমির চাষ হত তার স্থানে শতকরা ৮৪ ভাগ জমির চাষ করা হল। এই বিস্তৃত ও ব্যাপক ভাবে চাষের জন্য প্রয়োজন হ'ল বিদেশ থেকে যন্ত্রাদি আমদানী করবার এবং সঙ্গে সঙ্গে যানবাহনাদির সৌকর্য্যের জন্যে এবং খনির কাজ চালাবার জন্যে নানাবিধ যন্ত্র আমদানী করা। এই আমদানীর সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখবার জন্য বিদেশে ক্ষেত্রজাত শস্যাদি রপ্তানি করার ব্যবস্থা হল! কিন্তু এই রপ্তানি ব্যাপারে আশানুরূপ ফল পাওয়া গেল না। ১৯৩০ সালে যেখানে ১০৩ কোটি ৬০ লক্ষ রুব্‌লের মাল বিক্রয় হয়েছিল, ১৯৩২ সালে সেটা নেমে গেল ৫৭ কোটি ৫০ লক্ষ রুব্‌লে। এদিকে যন্ত্রাদি আমদানীর জন্য বহু খরচ হল। দ্বিতীয় ৫ বৎসর খসড়ায় সেইজন্য দেশেই নানাবিধ যন্ত্রাদি নির্ম্মাণের ব্যবস্থা হল। কিন্তু যদিও যন্ত্রপ্রস্তুত বিষয়ে খসড়ায় যা ছিল তার প্রায় দ্বিগুণ যন্ত্র উৎপন্ন হল, তথাপি খনিজ দ্রব্যের বিষয়ে আশানুরূপ ফল হয় নি। আশানুরূপ ফল না হলেও, যে ফল লাভ করা গেল তার বলেই শ্রমিক সংখ্যা অনেক বেড়ে গেল এবং দেশের কর্ম্মহীনতা এক প্রকার লোপ পেলে। দেশে অধিক অর্থ হওয়ায় দ্রব্য মহার্ঘ্য হল এবং শ্রমিকদের বেতনও কাজেই বাড়িয়ে দিতে হল। কিন্তু যেমন কতকগুলি বিষয়ে আশানুরূপ ফল হল, তেমনি অনেক বিষয়ে আশার চেয়ে অনেক কম ফল হওয়াতে খসড়া অনুসারে কার্য্যপ্রণালী চালানো অসম্ভব হল এবং সম্পদ উৎপন্ন করতে যে পরিমাণ খরচ হল সম্পদের দ্বারা যে লাভ হল তাতে ঘাটতি পড়ে' গেল অনেক বেশী। এই বাকী টাকার জন্যে ঋণ ছাড়া আর কোন গতি ছিল না। এই সঙ্গে আর একটি কথা বলা আবশ্যক। সর্ব্বস্বামিত্ববাদের নিয়ম অনুসারে সকলেরই এক প্রকার আয় হওয়া উচিত। বস্তুতঃ, বিভিন্ন প্রকার আয় হওয়ার জন্যই সমাজে শ্রেণী-বিভাগ ঘটেছে এবং আয়ের এই বৈষম্য দূর করবার জন্যই সোভিয়েট নীতির প্রতিষ্ঠা। কিন্তু এখন রুশ দেশেও এই আয়ের বৈষম্য পরিলক্ষিত হচ্ছে। ষ্টালিনের রিপোর্ট অনুসারে এই আয়ের বৈষম্য এই থেকেই দেখান যেতে পারে যে কেহ কেহ ৩৪৫০ রুব্‌ল্ পর্য্যন্ত মাসিক বেতন পান, আর কেহ কেহ ২৯০ রুব্‌ল্ পর্য্যন্ত বেতন পান। ৫ রুব্‌ল্ প্রায় আমাদের ৩৲ তিন টাকার সামিল। এই আয়ের বৈষম্যের জন্যই সমাজের বিভিন্ন লোকের অশন বসন প্রভৃতির বৈষম্য অনিবার্য্য হয়ে উঠেছে। সমস্ত পর্য্যালোচনা করলে দেখা যায় যে যদিও রুশদেশের শাসন প্রণালীতে ধনিক জাতির সম্পূর্ণ বিপরীত দিকে রাষ্ট্রশাসন গড়ে' তুলবার ব্যবস্থা করাই প্রধান কার্য্য বলে' স্থির হয়েছিল, ফলতঃ দেখা যাচ্ছে যে তারা রাষ্ট্রের সমস্ত বলপ্রয়োগ করে' ধনিক জাতিদের ন্যায়ই ধনসম্পদ বৃদ্ধির চেষ্টায় লিপ্ত হয়েছে, অথচ এত চেষ্টা সত্ত্বেও তারা ধনিক জাতিদের তুল্য ধনসম্পদ অর্জ্জন করতে পারে নি। এই ধনসম্পদ অর্জ্জনের চেষ্টার ফলে, যে শ্রেণীবিভাগ লোপ করা রুশ দেশের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল সেই শ্রেণীবিভাগ ক্রমশঃ গড়ে' উঠছে। তা' ছাড়া, একটি দলের হাতে সমস্ত রাষ্ট্রের শাসন পড়াতে এবং সেই দলের সংখ্যা শতকরা দেড়-এর বেশী নয়—এইজন্য লঘিষ্ঠের দ্বারা গরিষ্ঠের শাসন পদ্ধতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। Marxএর মত ছিল এই যে শ্রমিকেরা হবে গরিষ্ঠ, কাজেই তাদের হাতে এসে পড়বে শাসনপদ্ধতি। এখানে ফল হয়েছে ঠিক উল্টো। আজকালকার দিনে আত্মরক্ষা এবং পরপীড়ন এ দুটোকে পৃথক করা যায় না। এইজন্য দেখা যায় যে সামরিক বিভাগের জন্য রুশদেশ যা' খরচ করেছে ইংল্যাণ্ড বা ফ্রান্সের ন্যায় সাম্রাজ্যবাদীরাও তা' করে নি। তা' ছাড়া, সম্পদ উৎপাদনের যন্ত্রাদির বৈষম্য অনুসারে যে সমাজ গঠনের বৈষম্য হয় রুশরাজ্য থেকে তার কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না। ধনিকেরা যে সম্পদ উৎপাদনের ব্যবস্থা চিরকাল ধরে' করে আসছে তারা তারই অনুকরণ করছে। পরন্তু, লঘিষ্ঠ জনসাধারণ গরিষ্ঠকে শাসন করতে গেলে যে বলপ্রয়োগ নীতির নিরন্তর অনুসরণ করতে হয় রুশদেশ তা' বিশিষ্ট ভাবেই করে' চলেছে। একমাত্র ষ্টালিনের হাতে সমস্ত শক্তিচক্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং এইখানেই আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বলকামনা ও বলের দ্বারা আধিপত্য, এইটিই হয়েছে রুশ রাজ্যের প্রধান নীতি। অন্য লোকের কথা দূরে থাকুক, কেন্দ্রীয় সভার সভ্যেরাও ইচ্ছামত কোন মতের আলোচনা বা সমালোচনা কর্‌তে পারেন না। ব্যক্তিস্বাধীনতা সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়েছে এবং যান্ত্রিক ও সামরিক বলের দ্বারা সংখ্যালঘিষ্ঠেরা সংখ্যাগরিষ্ঠদের শাসন করছে। কাজেই, আমরা এই প্রবন্ধের পূর্ব্বে যে প্রস্তাব উপস্থিত করেছিলাম, রুশের দৃষ্টান্তে তা' সম্পূর্ণ প্রমাণিত হয়েছে। জারের রাজ্যশাসন অপেক্ষা কোন কোন বিষয়ে সাধারণের পক্ষে উপযোগী শাসন হয়ে থাকলেও প্রত্যুত জারের ন্যায়ই অসীম ক্ষমতাশালী হয়েছেন কম্যুনিষ্ট দলের অধিপতি ব্যক্তিগত স্বাধীনতা, ব্যক্তিগত মত ও বিশ্বাস অনুসারে চলা যে দেশে অসম্ভব হয়েছে এবং যেমন ধনিক জাতিদের মধ্যে ধনবলকে পশুবলে পরিণত করা হয়, এখানেও তেমনি স্থানবল ও নেতৃবলকে পশুবলে পরিণত করা হয়েছে এবং তার ফলে, যে সর্ব্বসাম্যবাদ প্রচারিত হয়েছিল তা' কার্য্যতঃ উচ্ছন্ন হয়েছে।

ফল্গু

শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার

বৃদ্ধস্য তরুণী বিষম তথ্যটা সূর্য্যবংশীয় রাজা দশরথের সময় হইতে জানে অনেকেই, কিন্তু বিয়ে অরুচি হইয়াছে খুব কম লোকেরই এবং নীলকণ্ঠ হইবার আগ্রহ নাই এমন বিপত্নীক বৃদ্ধের সংখ্যা আরও কম।

শিবশঙ্কর মিত্র বৃদ্ধবয়সে বিবাহ করিল এবং যাহাকে বিবাহ করিল সে প্রকৃত প্রস্তাবে তরুণী। কাজটা খুবই অন্যায়, তাহা সে'ও বুঝিল, অন্যেও বুঝাইল। বেশী করিয়া বুঝাইয়া দিল, তাহার কন্যা অলকনন্দা। বাপের বিয়ে অনেকেই দেখে নাই, সুযোগের অভাব বলিয়া; দুর্ব্বিপাকবশতঃ যদিই কাহারও সুযোগ ঘটে, সেও দেখিতে চায় না। অলকনন্দা ইহাদের একজন। বিবাহের দিন দুই আগে শ্বশুরবাড়ী হইতে অবরুদ্ধশ্বাসে পিত্রালয়ে আসিয়া, বাপের শয্যাগৃহ হইতে তাহার মায়ের ছবি ও ভাই আলোককে লইয়া অশ্রুরুদ্ধকণ্ঠে ফিরিয়া গেল। বাপের সঙ্গে দেখাটাও করিল না। শিবশঙ্কর একটা বিষম ধাক্কা খাইল বটে কিন্তু ফিরিল না। যাহারা সমুদ্রস্নান করে, তাহারা ধাক্কা খায়, নাকানি চুবানী খায়, উল্‌টিয়া পাল্‌টিয়া পড়ে, তবুও ঢেউ লইতে ছাড়ে না।

সুমিত্রা জানিয়াছিল, সপত্নীর গর্ভজাত এক কন্যা ও এক পুত্র আছে: কন্যার বিবাহ হইয়া গিয়াছে, বড় ঘরে পড়িয়াছে ইহাও সে শুনিয়াছিল; ছেলের বয়স ছ'সাত, ইহাও জানিয়াছিল। এ বাড়ীতে আসিয়া একটি হৃষ্টপুষ্ট সুকুমারসুদর্শন বালককে দেখিবার জন্য তাহার ঐকান্তিক আগ্রহের অবধি ছিল না। বড় লোকের বাড়ী, লোকজনের সমাগম মন্দ হয় নাই, কিন্তু স্বামীর চেহারার সঙ্গে মিলে, তাহার নিজস্ব কল্পনায় আঁকা সেই ছেলেটিকে কোথায়ও দেখিতে পাইল না। মেয়ের সম্বন্ধে তাহার সন্দেহ ছিলই। সে যে শ্বশুরালয় হইতে বিমাতা বরণ করিয়া লইতে আসিবে না ইহা জানা কথা। কিন্তু মাতৃহারা ঐটুকু শিশু যে বাপকে ছাড়িয়া কোথাও যাইতে পারে একথা সে কল্পনা করিতেও পারে নাই। আগ্রহ আকাঙ্খা যত প্রবলই হোক্‌, এ এমন একটা কথা যে মুখ ফুটিয়া কাহাকেও জিজ্ঞাসা করিতে সাহস হয় না। কি জানি যে-কথাটা শুনিতে আশঙ্কা, পাছে সেইটাই শুনিতে হয়। কত ছেলে ঘুরিতেছে, ফিরিতেছে, আসিতেছে, যাইতেছে, খাইতেছে, খেলা করিতেছে, কিন্তু ছুটিয়া গিয়া বুকে তুলিয়া লইতে ইচ্ছা জাগে, এমন ছেলে ত একটিও চোখে পড়িল না। সেদিনটা গেল, পরের দিন রাত্রে শিবশঙ্করের সহিত প্রথম আলাপ এইরূপ হইল: সুমিত্রা অত্যন্ত মৃদুকণ্ঠে কহিল—দিদির একটি ছেলে ছিল না?

শিবশঙ্কর বলিল: আলোকের কথা বলছ? সে তার দিদির বাড়ী গেছে।

সুমিত্রা জিজ্ঞাসা করিল: কবে গেল? দু'চারদিনের মধ্যে বোধহয়?

শিবশঙ্কর জবাব দিতে ইতস্ততঃ করিতেছে দেখিয়া পুনরায় কহিল: আমাকে দু'দশদিন দেখে ছেলেকে বাড়ী ছাড়া করলেই পারতে!—কথাগুলার মধ্যে আর যাহাই থাকুক না, নবপরিণীতা নারীর কোমলতা ছিল না। শিবশঙ্করের পক্ষে সত্য উত্তর ছিল, এ কথা বলিলেই পারিত যে, যে-লইয়া গিয়াছে তাহার মত না লইয়াই সে সেই কাজ করিয়াছে, এমন কি তাহার সহিত দেখা করার দরকার বোধও করে নাই। হয়ত এই জবাবই সে দিত কিন্তু শুনিবে কে? যাহাকে শুনাইবে, তাহার বক্তব্য শেষ করিয়া সে ওদিকে মুখ করিয়া শুইয়া পড়িয়াছিল। ফুলশয্যা নিশীথে এমন কাণ্ড অবাঞ্ছনীয় সন্দেহ নাই; কিন্তু ঘটিলেও, যে-কোন যুবকের পক্ষে মানিনীর মান ভঙ্গের জন্য দীর্ঘকাল ক্ষেপণ করিতে হয় না; কিন্তু শিবশঙ্করের নিকট কোন উপায়ই সহজ ও সুলভ ছিল না। কাজেই বেচারী বারকতক আজে বাজে কথায় আদর করিবার চেষ্টা করিয়া যখন শুনিল, সুমিত্রা অতি মাত্রায় নিদ্রা-কাতর হইয়া পড়িয়াছে, তখন দীর্ঘ নিঃশ্বাসটা সংগোপনে চাপিয়া ফেলিয়া আলো নিবাইয়া শুইয়া পড়িল।

প্রথম রাত্রিটা যে-ভাবেই কাটিয়া থাকুক, তাহার পর অন্তহীন সংসার সমুদ্রের এই দুইটি অসম যাত্রীর জীবন সম্পূর্ণ স্বাভাবিক গতিতেই প্রবাহিত হইয়াছে, এতোটুকু এদিক ওদিক হয় নাই। সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ভাবেই দপ্তরখানার হিসাবের খাতায় এবং শিবশঙ্করের ব্যাঙ্কের চেক বহিতে সুমিত্রা দেবীর সহিটাই একমেবাদ্বিতীয়ম্ হইয়াছে। সংসারে অনাবশ্যক বস্তুকেও যেমন ফেলিয়া দেওয়ার রীতি নাই, রাখিয়া দেওয়াই প্রথা, শিবশঙ্করকে কেহ ফেলে নাই। তিনি আছেন; কিন্তু ঐটুকু, আছেন মাত্র।

দুই

অষ্টাদশ বর্ষ অতীত হইয়াছে। এই আঠারো বৎসরে পৃথিবীর কত পরিবর্ত্তন, কত বিবর্ত্তনই হয়ত হইয়াছে, শিবশঙ্করের সংসারে তাহার পুত্র ও উত্তরাধিকারী সমরেশের আবির্ভাব ছাড়া অন্য পরিবর্ত্তন বিশেষ ঘটে নাই। আলোক অথবা অলকের কথা এ বাড়ীতে বড় আলোচিত হয় না—বাপ করেন না, বিমাতা ত নয়ই। তবুও একথা ঠিক, খবরটা দু'জনেই রাখে। কেমন, তাহা বলি।

সেবার যখন ম্যাট্রিক পরীক্ষার ফল বাহির হইল, সুমিত্রা একখানা খবরের কাগজ হাতে করিয়া স্বামীর ঘরে ঢুকিয়া আনন্দিতকণ্ঠে বলিল, আলোক স্কলারশিপ পেয়ে পাশ করেছে, দেখেছ?

শিবশঙ্কর বলিলেন, ক'দিন আগে তার চিঠি পেয়েছি।

সুমিত্রার হাসিমুখ অকস্মাৎ গম্ভীর হইল; বলিল, কৈ আমায় বল নি ত? চিঠি ত সব বাড়ীর ভেতরই যায়, তার চিঠি, কই দেখলুম না ত!

শিবশঙ্কর অপরাধীর মত বলিলেন, পাঠাই নি ভেতরে? তাহলে ভুল হয়ে গেছে।

ভুল স্বীকার করিলে অপরাধের খালন হয়। সুমিত্রাকে নীরব দেখিয়া শিবশঙ্কর বুঝিল, একটা ঝঞ্ঝা কাটিয়া গেল।

ইহার দুই বৎসর পরে একদিন সন্ধ্যাকালে শিবশঙ্কর বলিলেন, আলোক ইণ্টারমিডিয়েট পাস করেছে, ত্রিশ টাকা বৃত্তি পেয়েছে।

সুমিত্রা কহিল, শুনিছি, সরকার ম'শাই বলছিলেন।

সংবাদটা টেলিগ্রাফে আসিয়াছিল, সরকার তখন উপস্থিত ছিল। শিবশঙ্করের দুই বৎসর আগের কথা মনে ছিল, ঈষৎ অপ্রস্তুত হইলেন। সুমিত্রা কাটাঘায়ে নুনের ছিটা দিয়া বলিল, সরকার মশাই বোধহয় ভাবলেন কি জানি বাবু বলেন কি-না-বলেন, ভাল খবরটা বাড়ীর ভেতর দিয়েই দিই—বলিয়া চলিয়া গেল।

সরকারের উপর শিবশঙ্করের একটু রাগ হইল। তাহার কোনই অন্যায় হয় নাই তা ঠিক; কিন্তু—থাক্। সরকারকে অন্য কথা প্রসঙ্গে ধমক দিয়াই বলিলেন, তুমি তাড়াতাড়ি বাড়ীর মধ্যে গিয়ে সব তাতে সাওখুড়ি কর কেন হে! সরকার কথাটাও বুঝিল না, ধমকটার হেতুও নির্ণয় করিতে পারিল না। আজ তাহার দিনটা ভাল যাইবে ইহাই ধারণা ছিল। বাবুর বড় ছেলের পাসের খবর বাড়ীর মধ্যে দিয়া দশ টাকা পুরস্কার লাভ করিয়াছিল, বাহিরেও কিঞ্চিৎ আশা ছিল, তা না হইয়া ধমক খাইয়া লোকটা খানিকটা দমিয়া গেল। গৃহিণীমাত্রেই সংবাদ-লোলুপ, ইহা কে না জানে? চাকর বাকর সরকার গমস্তারাই তাঁহাদের নিকট যাবতীয় সন্দেশ বহন করিয়া থাকে, ইহাতে দোষও নাই, বৈচিত্র্যও নাই। সে বেচারা জানিবে কোথা হইতে যে এমন সংবাদ থাকিতেও পারে যাহা একটিমাত্র লোক ছাড়া অন্যে সরবরাহ করিলে অতীব শান্ত প্রকৃতির গৃহিণীরও বরদাস্ত হয় না।

সুমিত্রা আলোকের সংবাদ রাখিত ইহা জানা গেল; কিন্তু কখন্ হইতে কিরূপে ইহা সম্ভব হইয়াছিল তাহা জানাইতে হইলে আগের কথা একটু বলিতে হয়। বিবাহের বছর দেড়েক পরে তাহার সমরেশ জন্মগ্রহণ করে। প্রসবকালে তাহার জীবন সংশয় হইয়াছিল। শিবশঙ্করের আশ্রিত ও সম্পর্কিত পিসী কালীঘাটের কালীমাতার পূজা মানত করিয়াছিলেন; সুস্থ হইয়া সুমিত্রা কালীঘাটে আসিয়াছিল, সেই পিসী সঙ্গে ছিলেন।

একটা গলির মোড়ে, এক হিন্দুস্থানী দরোয়ানের হাত ধরিয়া একটি গৌরবর্ণ সুকুমার বালক দাঁড়াইয়াছিল। নজর পড়িবামাত্র পিসী বলিয়া উঠিলেন, ওমা, ঐ যে আলো, তোমার সতীনপুত!

সুমিত্রা যে কাণ্ড করিল তাহা আর বলিবার নয়! মোটর থামাইয়া, নামিয়া, ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া গিয়া বালককে বুকে তুলিয়া লইয়া, মুখের উপর তাহার মুখখানা চাপিয়া ধরিয়া অকস্মাৎ কাঁদিয়া ফেলিল।

তোমার নাম কি বাবা? কার সঙ্গে এসেছ মাণিক? আমি কে বল ত সোনা? তুমি কি পড় ধন আমার, এইরূপ একসঙ্গে এক শত প্রশ্ন করিয়া বালককে ত বিব্রত করিলই, পথচারীদেরও বিভ্রান্ত করিয়া তুলিল।

হিন্দুস্থানী দরোয়ানটা কলিকাতায় ছেলেচোর ঠগ জুয়াচোর-দের কথা অনেক শুনিয়াছিল, লাঠিটা বাগাইয়া ধরিয়াও ছিল; কিন্তু এই স্ত্রীলোকের রূপের বিভা, অলঙ্কারের শোভা—বিশেষ করিয়া চোখের জল দেখিয়া লাঠিসম্বদ্ধহস্তের মুষ্টি শিথিল না করিয়াও পারিতেছিল না।

আলোক সব ক'টা প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেও নাই, এমন সময়ে অলক আসিয়া মুহূর্ত্ত মাত্র স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া দৃশ্যটা পলকমাত্র দেখিয়া লইয়া, দৃঢ় গম্ভীরকণ্ঠে ডাকিল, আলোক, চলে এস।

পিসী নিকটেই ছিলেন, ওমা অলক এসেছিস্, তাই ত বলি, খোকা এলো কার সঙ্গে?

অলক সে কথার উত্তর দিল না, কাহারও দিকে চাহিল না, ভাইটির হাত ধরিয়া, লোকলস্করপরিবৃত হইয়া চলিয়া গেল।

সুমিত্রা তাহার দিকেও ধাবিত হইয়াছিল, অতি কষ্টে আপনাকে সম্বরণ করিয়া লইয়া, সামনের সরু গলিটায় ঢুকিয়া পড়িয়া হন্ হন্ করিয়া চলিতে লাগিল।

ও রাস্তা নয় বৌমা, ও রাস্তা নয়, গাড়ী যে এইদিকে গো—বলিতে বলিতে পিসী পশ্চাদনুসরণ করিলেন, সুমিত্রা সে কথা কানেও তুলিল না। একটু নির্জ্জনে চোখের জল ও রাজ্যের লজ্জা গোপন না করিয়াই বা পারে কেমন করিয়া?

অলকের একটা কথা তাহার কানে গিয়াছিল, তাই তাহাকে ধরিতে গিয়াও যায় নাই, থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িয়াছিল। আলোকের 'ও কে দিদি', 'ও কে দিদি', 'ও কাঁদছিল কেন দিদি' এই ব্যাকুল প্রশ্নের উত্তরে অলক বলিয়াছিল, কে আবার? কেউ না, ডাইনী!—ইহার পরে নারীর অন্তর্নিহিত সদাজাগ্রত মা'ও মরিয়া গিয়াছিল।

আলোক বলিয়াছিল, সে পঞ্চম শ্রেণীতে পড়ে। সুমিত্রা সেইদিন হইতে হিসাব রাখিতেছিল এবং যে বৎসর ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিবার কথা, সেই বৎসরের পরীক্ষার ফল কোন্ কাগজে বাহির হয় জানিয়া তাহার এক খণ্ড ক্রয় করাইয়া আনিয়াছিল।

একদিন শিবশঙ্করকে জিজ্ঞাসা করিল, আলোক ডাক্তারী পড়ছে?

শিবশঙ্কর সামনের ড্রয়ারটা খুলিয়া চিঠি খুঁজিতে খুঁজিতে বলিলেন, হ্যাঁ, তাই ত লিখেছে। চিঠিখানা গেল কোথায়?

চিঠি আমি দেখেছি, সকালের ডাকের সঙ্গে ভেতরেই গেছল।

শিবশঙ্কর স্বস্তি লাভ করিয়া বলিলেন, হ্যাঁ হ্যাঁ তোমাকেই পাঠিয়ে দিয়েছি বটে।

তুমি মত দিয়েছ?

আমার মত সে চায় নি ত!

তা চায় নি বটে কিন্তু যে কথাগুলো লিখেছে, তার উত্তরে তোমার বলবার কি কিছুই নেই?

কি কথা?

স্বাবলম্বী হতে হবে—স্বাধীনভাবে জীবিকা অর্জ্জন করতে হবে—

কথাগুলো ত অন্যায় নয়।

সুমিত্রা বলিল, কিন্তু জীবিকা অর্জ্জনের খুব দরকার পড়েছে কি তার?

শিবশঙ্কর নতনেত্রে ধীরে ধীরে বলিলেন, দরকার পড়ুক আর

নাই পড়ুক, উপার্জ্জনক্ষম হবার দরকার সকলেরই আছে। এ কথাটা ভুলে গিয়েই বাঙ্গালীর আজ এত অধঃপতন।

সুমিত্রা আর কোন কথা না বলিয়া উঠিয়া গেল। পরদিন সমরেশকে দিয়া আলোককে একখানা পত্র লিখাইল। চিঠিখানা সমরেশের হাতের লেখায়, তাহারই স্বাক্ষরে গেল বটে কিন্তু লেখক তাহার এতটুকু ভাব গ্রহণ করিতে পারিল না। সমরেশ লিখিল :

শ্রীচরণেষু,

দাদা, আমি ম্যাট্রিক পাস করিয়াছি আপনি বোধহয় তাহা জানেন না। কাগজে দেখিবেন, প্রথম বিভাগে কয়েকজনের নীচেই আমার নাম আছে। আমার ইচ্ছা যে আমাদের যে বিষয়সম্পত্তি আছে তাহা দেখি; আর পড়িয়া কি হইবে? এ বিষয়ে আপনি যাহা বলিবেন, তাহাই করিব। আপনি যদি পড়িতে বলেন, পড়িব; যদি না বলেন, তবে আমাদের বৈষয়িক কার্য্য দেখিব। আপনি আমার প্রণাম জানিবেন।

প্রণতঃ—সমরেশ

আলোক এই পত্রের যে জবাব দিল, তাহা পাঠে সমরেশের মনের ভাব কি হইল জানি না, তাহার জননীর মুখভাব অত্যন্ত কঠোর হইয়া উঠিল। আলোক লিখিল :

প্রিয় সমরেশ, এই সকল গুরুতর বিষয়ে আমার পরামর্শ তোমার কোন কাজেই লাগিবে না। তোমার মা যাহা বলিবেন, তাহাই করা উচিত।—আলোক

ইহার পরে পাঁচ বৎসর কাটিয়া গিয়াছে; এই সময় মধ্যে কেহ কাহারও খবর রাখিল কি না তাহা প্রকাশ নাই।

তিন

শিবশঙ্কর সদরে গিয়াছিলেন, মামলা-মোকর্দ্দমার জন্য প্রায়ই যাইতে হয়। যেদিন যান, সেই রাত্রেই ফিরিয়া আসেন। এবার তাহার ব্যতিক্রম ঘটিল। সন্ধ্যার সময় গৃহে এই মর্ম্মে 'তার' আসিল যে অভাবনীয় কারণে ফিরিতে পারিবেন না। ফিরিতে দু'তিনদিন দেরী হইতে পারে।

অভাবনীয় কারণটা কি তাহা অনুমান করিয়া লইতে বাড়ীর লোকের বিলম্ব হইল না। লক্ষ লক্ষ টাকার কারবার যাহাকে চালাইতে হয়, তাহার পক্ষে অভাবনীয় কারণে সদরে বিলম্ব হওয়াই স্বাভাবিক।

কিন্তু দিন চার পরে দেখা গেল, অত্যন্ত অস্বাভাবিক ও অভাবিত কারণেই এবার শিবশঙ্করকে বাহিরে আটকাইয়া পড়িতে হইয়াছিল। শিবশঙ্কর যখন গাড়ীবারান্দার নীচে মোটর হইতে নামিলেন, তখন তাঁহার আগে আগে যে ব্যক্তি নামিল, একান্ত অপরিচিত হইলেও, তাহার মুখের একটা দিকমাত্র দেখিয়াই সুমিত্রা আনন্দ কলরব করিতে করিতে নীচে নামিয়া গেল। কিন্তু সবটা যাওয়া হইল না, মধ্যপথে দাঁড়াইয়া পড়িতে হইল।

নবীন খানসামা ছুটিতে ছুটিতে আসিয়া বলিল, মা কর্ত্তাবাবুর বসবার ঘরের পাশের ঘরটার চাবীটা দিন—বড়দাদাবাবু এসেছেন, সেই ঘরে বাবু তাঁর জিনিষপত্র রাখতে বললেন। বড়দাদাবাবু সেই ঘরে থাকবেন।

সুমিত্রা কি যেন বলিতে চাহিল; কিসের যেন আঘাত সামলাইয়া লইয়া অতি ধীর শান্তকণ্ঠে বলিল, চাবির আলমারি চাবি আছে, ঘরের নম্বর দেখে চাবি নিয়ে যাও।

দেখে এসেছি কুড়ি নম্বর, বলিয়া নবীন চলিয়া গেল। সুমিত্রা কয়েকমুহূর্ত্ত সেইখানে নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। ত্রিপথগা জাহ্নবীর যে বিপুল স্রোতবেগ ঐরাবতের মতো তাহাকে ভাসাইয়া লইয়া যাইতেছিল, সে স্রোত স্তব্ধ হইয়া গেছে, তাই অচল পদার্থের মত দাঁড়াইতে হইল। কিন্তু সে'ও অল্পক্ষণের জন্য, তারপরই নিজেকে সংযত করিয়া বহির্ব্বাটির দিকে অগ্রসর হইল।

শিবশঙ্কর তাঁহার নির্দ্দিষ্ট আসনে বসিয়া পত্রাদি দেখিতেছিলেন, সুমিত্রা কক্ষে প্রবেশ করিল। শিবশঙ্কর মুখ তুলিয়া চাহিলেন, বলিলেন, আলোক এসেছে।

আলোক কক্ষবিলম্বিত আলোকচিত্রগুলি ঘুরিয়া ঘুরিয়া নিরীক্ষণ করিতেছিল, পিতার কণ্ঠস্বরে আকৃষ্ট হইয়া সুমিত্রাকে দেখিল; নিঃশব্দে অগ্রসর হইয়া আসিয়া অবনতমস্তকে প্রণাম করিল। চরণ স্পর্শ করিল না।

আজ আর সুমিত্রা প্রগলভার মত আচরণ করিল না। অত্যন্ত ধীর স্থিরভাবে আশীর্ব্বাদ করিল। পিতা কালীঘাটের দৃশ্য দেখেন নাই, আলোকেরও তাহা মনে ছিল না, মনে থাকিবার কথাও নয়, তথাপি পিতাপুত্র উভয়েরই মনে হইল, সম্বর্দ্ধনার যে সুরটি বাজিবার কথা, তাহা বাজিল না।

পিতা কাগজপত্রে মনঃসংযোগ করিলেন; পুত্র বিমাতার মুখের পানে না চাহিয়াই প্রশ্ন করিল, সমরেশ কৈ?

সুমিত্রা হাসিয়া বলিল, কোথায় বেরিয়েছে বোধ হয়, আসবে এখুনি। ঐ যে নাম করতে করতেই—সমর, তোমার দাদা এসেছেন।

সমরেশ ঘরে ঢুকিয়া দাদাকে প্রণাম করিতে আলোক বাম হস্তে তাহাকে জড়াইয়া ধরিল। সুমিত্রা বলিল, সমর দাদাকে ওপরে নিয়ে যাও।

চলুন দাদা, সমরেশ মুহূর্ত্তের জন্যও অপরিচয়ের দূরত্ব অনুভব করে নাই, একরূপ টানিতে টানিতেই আলোককে ভিতরের দিকে লইয়া গেল।

সুমিত্রা প্রসন্ন হাসিমুখে শিবশঙ্করের পানে চাহিতে শিবশঙ্করের মুখেও হাসি ফুটিয়া উঠিল; কিন্তু বড় ম্লান হাসি। বিশুষ্ক বনানী, লতায়-পাতায় তৃণে মৃত্তিকায়—সজীবতা শ্যামলতা কিছুই নাই—হাস্যে প্রাণ নাই। সুমিত্রাকে ইহা আঘাত করিল। একখানা কেদারায় বসিয়া পড়িয়া বলিল, তুমি বুঝি আলোককে আনতে গেছলে? তাই দেরী হলো বুঝি? সেই কথাটা টেলিগ্রাফে বললেই পারতে। আমি ক'দিন আকাশ পাতাল কত কি ভেবে সারা হচ্ছি।

শিবশঙ্কর ম্লানমুখে বলিলেন, আমি ত ওকে আনতে যাই নি।

সুমিত্রা সপ্রশ্ন দৃষ্টি মেলিয়া চাহিয়া রহিল, কিন্তু শিবশঙ্কর আর কোন কথাই বলিলেন না। তখন আবার প্রশ্ন করিতে হইল, তোমার সঙ্গে ওর কোথায় দেখা হোল?

শিবশঙ্কর বলিলেন, আমি নন্দীগাঁ গেছলুম।

নন্দীগ্রামে অলকের শ্বশুরবাড়ী।

স্বামীর এইরূপ এলোমেলো ও খাপছাড়া কথায় সুমিত্রা চটিয়া

উঠিয়া বলিল, আমিও ত তাই বলছি। কথা সোজা ক'রে বললে দোষটা কি হয় তা আমাকে বুঝিয়ে দিতে পারো তুমি ?

শিবশঙ্কর মলিন দুইটি চক্ষু তুলিয়া অত্যন্ত মৃদুকণ্ঠে কহিলেন, আমি আনতে যাই নি সেই কথাই বলেছি, আর ত কিছু বলি নি।

সুমিত্রা বলিল, গেলেই বা ! নিজের ছেলেকে বাড়ী আনতে যাওয়াটা দোষের না নিন্দের, শুনি ?

শিবশঙ্কর কি যেন বলিতে গেলেন. বার কতক ঠোট দু'খানা কাঁপিয়াও উঠিল, কিন্তু কিছু না বলিয়া চিঠি পড়িতে লাগিলেন।

সুমিত্রা দাঁড়াইয়া উঠিল, তাহার চোখ দু'টায় যেন আগুন ধরিয়া গেল, তীব্রকণ্ঠে কহিল, আলোক বাড়ী এসেছে ব'লে আমি অসন্তুষ্ট হয়েছি এই যদি তুমি ভেবে থাকো, মস্ত ভুল করেছ।—বলিয়াই বাহির হইয়া গেল। শিবশঙ্কর ব্যথাভরা দু'টি চক্ষু তুলিয়া চসমার ভিতর হইতে একবার সেদিকে চাহিয়া দেখিলেন মাত্র, কিন্তু একটা কথা বলিবার কিম্বা একবার ফিরিয়া ডাকিবার চেষ্টাও করিলেন না। কিন্তু সুমিত্রা আবার ফিরিয়া আসিল; বলিল, শুনছি এই পাশের ঘরটায় নাকি ওর থাকবার ব্যবস্থা হয়েছে ?

শিবশঙ্কর কোন কথা বলিবার পূর্ব্বেই সুমিত্রা আবার বলিল, বাড়ীর কর্ত্তা বাইরে থাকবেন, বড় ছেলে বাইরে থাকবে, আর আমরা পড়ে থাকবো এক কোণে, এই যদি পাকাপাকি ব্যবস্থা হয়, তাহ'লে খুলে বলো না কেন, আমার ছেলেটাকে নিয়ে আমি যেখানে খুসী চলে যাই।

শিবশঙ্কর নীরব। সুমিত্রার চোখের দৃষ্টি ক্রোধে অন্ধ না থাকিলে দেখিতে পাইত, লোকটা যেন পাষাণস্তূপে পরিণত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু সে তাহা দেখিল না, বুঝিল না। নিজের ঝোঁকেই বলিয়া যাইতে লাগিল, বিয়ের পর এবাড়ীতে ঢুকে শুনলুম, বোন্ এসে ভাইকে নিয়ে গেছে, বাপ জানেও না; আজ যদি বা বোন্ দয়া ক'রে ভাইকে বাপের সঙ্গে পাঠালে, বাপ তাকে আগলে রাখছেন, পাছে বিমাতা রাক্ষসী—বলিতে বলিতে তাহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গেল; বস্ত্রাঞ্চলে মুখ ঢাকিয়া দ্রুতপদে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

বহুক্ষণ পরে সে যখন উপরে তাহার মহলে প্রবেশ করিল তখন দুই ভাই জলযোগে বসিয়াছে। সমর অনর্গল বকিয়া যাইতেছে, আলোক গম্ভীরভাবে দু'একটি কথা বলিতেছে, অথবা হাঁ না কিম্বা ঘাড় নাড়িয়া যাইতেছে মাত্র। সমরেশ মা'কে দেখিবামাত্র বলিল, আমরা রোজ রাত্রে শুয়ে শুয়ে দাদার কথা বলাবলি করতুম না মা ?

সুমিত্রা কথা কহিল না, ঈষৎ হাসিল।

সমরেশ বলিল, সেবার ন'মামার বিয়েতে কলকাতায় গিয়ে, নিজে তুমি মেডিক্যাল কলেজে গিয়ে দাদার কত খোঁজ করলে, না মা ?

আলোক বিস্মিত চোখে বারেকমাত্র বিমাতার পানে চাহিয়া বলিল, তাই নাকি ?

এবারও সুমিত্রা কথা কহিল না, হাসিল।

সমরেশ বলিতে লাগিল, আমি যত বলি, মা, তুমি ত দাদাকে এতটুকুন বেলায় একটি দিন মাত্র দেখেছ, চিনবে কি ক'রে—মা তত বলে, তোর অত ভাবনার দরকার কি, তুই আমায় নিয়ে চল্ ত, তারপর চিনতে পারি কিনা দেখিস্।

আলোক বলিল, কবে বল তো ?

সমরেশ বলিল, গত বছর মে মাসে।

আলোক মনে মনে হিসাব করিয়া বলিল, এপ্রিল মে দু'মাস আমরা ছিলুম না, দিদিকে নিয়ে আলমোড়ায় ছিলুম।

সুমিত্রা বলিল, আলমোড়ায় কেন ?

আলোক মলিন মুখে কহিল, দিদির অসুখটা তখনই জানা গেল কিনা। আলমোড়া থেকে হলদোনি, সেখান থেকে মাদ্রাজে মদনপল্লী, মণ্ডপম, তারপর যাদবপুর—ঘুরে ঘুরে এই মাস খানেক ত দিদি ফিরেছিলেন মোটে।

সুমিত্রা রুদ্ধশ্বাসে প্রশ্ন করিল, তারপর ?

আলোক ব্যথিত সজলকণ্ঠে কহিল, এই শুক্রবারে সব শেষ !

সুমিত্রা স্তম্ভিত হইয়া গেল। শুক্রবারে শিবশঙ্কর সদরে যান, সেই রাত্রে টেলিগ্রাফ আসে, অভাবনীয় কারণে গৃহে ফিরিতে বিলম্ব হইবে।

সুমিত্রা ভয়ে ভয়ে আলোকের পানে চাহিয়া রহিল। আলোক বলিল, আদালতে জামাইবাবুর এক বন্ধুর কাছে খবর পেয়েই বাবা নন্দীগাঁ যান্; কিন্তু দিদিকে দেখতে পান্ নি। যদি আর আধ ঘণ্টা আগেও যেতেন, শেষ দেখাটা হোত।—আলোক এক মুহূর্ত্ত থামিয়া রুদ্ধপ্রায় কণ্ঠে বলিল, দিদি শেষ দুদিন কেবল বাবার নাম করেছে। তার ছেলেমেয়ের কথা নয়, জামাইবাবুর কথা নয়, কেবল বাবা বাবা করেছে, আর চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়েছে। বড্ড দুর্ব্বল হয়ে পড়েছিল কি-না, কাঁদতেও কষ্ট হোত !

আলোক থামিল, একটু পরে আবার বলিল, দিদির শেষ কথা, বাবা ক্ষমা করো।

থালায় অভুক্ত আহার্য্য যেমন্ পড়িয়াছিল, তেমনই পড়িয়া রহিল, আলোক আপনাকে আর সামলাইতে না পারিয়া উঠিয়া বারান্দায় চলিয়া গেল। সুমিত্রা অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত নীরবে বসিয়া রহিল; তারপর উঠিয়া গিয়া আলোকের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া বলিল, কিছুই ত খাওনি, যেমন খাবার তেমনই পড়ে আছে খাবে চলো।

আলোক ত্রস্তে সরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, আর খাব না।

সুমিত্রা আর পীড়াপীড়ি করিল না। পীড়াপীড়ি করিবার মতো মনের অবস্থা তাহারও ছিল না। তাহার মনের পটে বাহিরের ঘরে অনুষ্ঠিত দৃশ্যটা ফুটিয়া উঠিয়া শত বৃশ্চিক দংশন জ্বালায় অস্থির করিয়া ফেলিয়াছিল। সেই যে মানুষটা হিমালয়ের মত সমস্ত আঘাত নীরবে সহ্য করিল, তাহার ভিতরকার অগ্ন্যুত্তাপ, মর্ম্মভেদী হাহাকার ঘূণাক্ষরেও জানিতে দিল না, তাহার কথা ভাবিতে গিয়া সুমিত্রা আড়ষ্ট হইয়া গেল। সে কাছে যাইতে আলোক অশুচিভয়ে ভীত ব্যক্তির মতো যেভাবে সরিয়া গিয়াছিল, নারীর অন্তরে সে আঘাত নিতান্ত অল্প ছিল না কিন্তু ইহাও তাহার চিত্তে আসন পায় নাই ! সেই রাত্রে, ছেলেরা ঘুমাইলে নিঃশব্দ পদসঞ্চারে নীচে নামিয়া শিবশঙ্করের শয্যায় ঢুকিয়া তাহার পায়ের কাছে বসিয়া ধীরে ধীরে পায়ে হাত বুলাইয়া দিতে লাগিল। শিবশঙ্কর জাগিয়াই ছিলেন, বলিলেন, কিছু বলবে ?

সুমিত্রা বলিল, আমাকে তুমি ক্ষমা করো।

শিবশঙ্কর জিজ্ঞাসা করিলেন, একথা কেন?

সুমিত্রা সে কথার উত্তর দিল না, পুনশ্চ বলিল, আমাকে তুমি ক্ষমা করো।

শিবশঙ্কর বলিলেন, মুখে না বললে বুঝি ক্ষমা করা হয় না? তুমি ক্ষমা চাইবে, তবে আমি ক্ষমা করবো? আর কিসের জন্ত ক্ষমা বল ত! আমি কি কোনও দিন তোমার ওপর রাগ করেছি যে ক্ষমা চাইতে হবে? এ কি তুমি নিজেও জান না?

সুমিত্রা কাঁদিয়া উঠিল: বলিল, ওগো, সেই জন্তেই ত তোমার পা ধরে ক্ষমা চাইতে এসেছি। জানি তুমি রাগ কর না, তবু ক্ষমা চাই, আমার শত সহস্র অপরাধ চিরকালই তুমি ক্ষমা কর। তবু একটিবার মুখ ফুটে বল, ক্ষমা করলে!

শিবশঙ্কর ধীরকণ্ঠে বলিলেন, শুনলে সুখী হও? বেশ বলছি, ক্ষমা করলুম।

একথার পর সুমিত্রা যেন আরও ভাঙ্গিয়া পড়িল। স্বামীর ছু'টি পায়ের মাঝখানে মুখ গুঁজিয়া হু হু করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। শিবশঙ্কর কোন কথা বলিলেন না, নিরস্ত অথবা সান্ত্বনা করিবার চেষ্টাও করিলেন না। বহুক্ষণ এইরূপে উত্তীর্ণ হইয়া গেলে সুমিত্রা প্রকৃতিস্থ হইলে, শিবশঙ্কর বলিলেন, রাত হয়েছে, শোও গে।

সুমিত্রা সাড়াও দিল না, উঠিলও না, তেমনই পড়িয়া রহিল। এইবার শিবশঙ্কর উঠিয়া বসিলেন। চরণোপান্তোপবিষ্ট স্ত্রীর মাথাটি দুই হাতে তুলিয়া ধরিলেন। সুমিত্রা দক্ষিণ হস্তে তাঁহার গলবেষ্টন করিয়া কাঁধের উপর মাথা রাখিল—লতাটি সহকার অঙ্গে আশ্রয় লভিল। স্বল্পালোকিত কথা যেন উজ্জ্বল আলোকে ভরিয়া গেল।

ঘড়িতে ছু'টা বাজিল: সুমিত্রা উঠিয়া বসিল, দেখিল, শিবশঙ্কর সতৃষ্ণনয়নে তাহার পানে চাহিয়া আছেন। দেড় যুগ অতীত হইয়া গিয়াছে—যুগ ত নয়, যেন মন্বন্তর গিয়াছে—শিবশঙ্করের নয়নে এ দৃষ্টি সুমিত্রা দেখে নাই। এই দৃষ্টি যেন বহুদূর উত্তীর্ণ অতীত-কালের মধ্যে একটা অনাস্বাদিতপূর্ব্ব অতৃপ্ত যৌবন বারিধির মাঝখানে নিয়া গিয়া দাঁড় করাইয়া দিয়াছে। হায়! আকাশে নববরষার ঘনঘটা, চাতকী উপেক্ষা করে কেমন করিয়া? তাহার বুকও যে তৃষ্ণায় মরুভূমি হইয়া আছে। সোহাগে, স্নেহে, আদরে স্বামীর অঙ্গে হাত বুলাইতে বুলাইতে সুমিত্রা বলিল, আমাকে কিছু বলবে?

শিবশঙ্কর ক্ষুদ্র একটি দীর্ঘশ্বাস নিঃশব্দে গোপন করিয়া বলিল, কি বলবো?

তৃষিতা চাতকী কহিল, যা-হোক্ কিছু বলো।—আবার তাহার গলা কাঁপিয়া গেল; চোখের পাতা ভিজিয়া উঠিল। সুমিত্রা নয়ন গোপন করিল।

শিবশঙ্কর বলিলেন, বলবো?

বলো, বলিতে বলিতে সুমিত্রা সাগ্রহে, ব্যাকুল ছুটি আর্ত্ত চক্ষু তুলিয়া মেঘের পানে চাহিল। বড় আশা বারিদ বিফলে যাইবে না, বৃষ্টি হইবেই, তাই একেবারে মেঘের সামনে চাতকী তাহার অধরোষ্ঠ পাতিয়া রহিল। আমি কবি নহি, যদি কবি হইতাম, তবে সে সময়কার সেই রমণীর দৃশ্য কাব্যে বর্ণনা করিতাম। পৃথিবী যেন অবলুপ্ত, সংসার কোথায় তাহার ঠিকানা নাই, সর্ব্বস্ব ভুলিয়া নারী তাহার সর্ব্বস্বের নিকট সর্ব্বস্ব কামনা করিতেছে! ধরণী সুপ্তিমগ্না, নিঃশব্দ কক্ষ, তাহারই মাঝে সুপ্তিহীন জগৎ জাগ্রত মুখর হইয়া পরস্পরের পানে চাহিয়া আছে! আমি চিত্রকর নহি, যদি চিত্রকর হইতাম, তবেই এ ছবি আঁকিতে পারিতাম! দুঃখের বিষয় আমি চিত্রকর নহি। তা না হইতে পারি: কিন্তু চিত্র-বিচারে অক্ষম নহি। মনে হয় এমনই দৃশ্য কবে কোথায় যেন দেখিয়াছি! কোথায়, ঠিক মনে নাই। যমুনা পুলিনে কি? সেই যে এক চিরকিশোর ধীর সমীরে যমুনার তীরে বসিয়া বাঁশী বাজাইত, আর তাহার মুখের পানে চাহিয়া নবদূর্ব্বা-দলশয্যায় শুইয়া একটি কিশোরী সেই বেণু শুনিয়া আত্মচেতন হারাইয়া পড়িয়া থাকিত, সেই কি? কে জানে, হইতেও পারে! কিন্তু ইহারা ত কিশোর কিশোরী নয়। নাইবা হইল, কি বা আসে যায়? যেখানে প্রেম, সেখানেই চিরকৈশোর! যে ভাষায় সেই চাহনীর উত্তর দিতে হয়, বৃদ্ধ হইলেও শিবশঙ্করের তাহা অজ্ঞাত ছিল না। সুমিত্রা বুকের উপর মাথাটি রাখিয়া কয়েক মুহূর্ত্ত পড়িয়া রহিল, তারপর উঠিয়া বসিয়া বলিল, কৈ, বললে না?

শিবশঙ্কর আবার বলিলেন, বলবো?

সুমিত্রা সোহাগে গলিয়া বলিল, বলো।

শিবশঙ্কর স্মিতমুখে কহিলেন, আমার আলোককে তুমি নাও।

নিলুম, বলিয়া স্বামীর পায়ের কাছে মাথা রাখিল; তারপর ধূলিশূন্য চরণদ্বয় হইতে পবিত্রপদরেণু আহরণ করিয়া মাথায় দিয়া সীমন্তিনী ধীরে ধীরে কক্ষ ত্যাগ করিল। তখন ভোরের পাখী প্রভাত সঙ্গীত সুরু করিয়া দিয়াছে।

চার

কিন্তু আলোককে লইয়া সুমিত্রাকে যে এতটা মুস্কিলে পড়িতে হইবে সে তাহা কল্পনাও করে নাই। মানুষ যে মানুষ হইতে এমন পৃথক, এতটা বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকিতে পারে ইহা ভাবিতেও পারা যায় না। সুমিত্রা তাহাকে বিষয় আসয় বুঝাইয়া দিতে চাহিয়াছিল, উত্তর পাইয়াছিল—ওসব তাহার আসে না। সমরেশটা চিররুগ্ন, একটা না একটা রোগ লাগিয়াই আছে, তাহার চিকিৎসার ভারটাও সে লইল না, বলিল, পাশ করিয়া বাহির হইলেই যদি ডাক্তার হওয়া যাইত, তাহা হইলে কোন্ কালে বিধান রায়ের অন্ন মরিয়া যাইত। সুমিত্রা কোন দেশ দেখে নাই, কোন তীর্থ ভ্রমণ করে নাই, তাহার ইচ্ছা সমরেশের কলেজের গ্রীষ্মের ছুটি হইলে আলোক তাহাদের লইয়া উত্তর ও দক্ষিণ ভারত দেখাইয়া আনে। শিবশঙ্কর প্রস্তাব শুনিয়া উল্লসিত হইলেন; কিন্তু আলোকের মত হইল না। তাহার এখন সময় নষ্ট করিবার উপায় নাই। সময় এত মূল্যবান কিসে, তাহাও বুঝা দায়। কাজের মধ্যে ত বহুবার অধীত ডাক্তারী বইগুলা। ঐগুলার সাহায্যেই পাস করা গিয়াছে, আবার ওগুলা নাড়াচাড়ার কি অর্থ হইতে পারে? পাস করার পর কোন্ ছেলে আবার সেই পুরাণ বই মুখস্ত করে?

সমরেশের গ্রীষ্মের ছুটি হইল। বাপ-মায়ের নির্দ্দেশে সে এক জন সরকার ও একটি চাকর লইয়া দার্জ্জিলিং বেড়াইতে গেল। তাহার ছোটমামা দার্জ্জিলিঙে ঠিকাদারী কাজ করেন, নিজস্ব বাড়ী আছে, সমরেশ সেখানেই থাকিবে।

সুমিত্রা আলোকের ঘরে ঢুকিয়া বলিল, তুমিও দিনকতক ঘুরে এসো না কেন? যে গরম পড়েছে—

গরমে আমার কষ্ট হয় না—বলিয়া মেটিরিয়া মেডিকাখানা খুলিয়া ঘাড় গুঁজিয়া বসিল।

সুমিত্রা ইহা লক্ষ্য করিল; তবু ধীরস্বরে বলিল, গরমের সময় ঠাণ্ডা দেশে গেলে শরীরটা ভাল থাকে।

আলোক বলিল, ফিরে এসে গরমে আরও বেশী কষ্ট হয়। আর আমার শরীরটা চিরদিন ভালই থাকে, কখনও খারাপ হয় না—বলিয়া সগর্ব্বনেত্রে একবার নীরোগ বলিষ্ঠ দেহটা দেখিয়া লইল।

সুমিত্রা বলিল, ওঁর বড় ইচ্ছে ছিল আমিও সঙ্গে যাই—

কথাটা শেষ হইতে না দিয়াই আলোক বলিল, তা যান্ না।

সুমিত্রা উৎফুল্লকণ্ঠে বলিল, তুমি গেলে—

আমার যাওয়া অসম্ভব।

সুমিত্রা তাহার কথা কানে না তুলিয়াই বলিতে লাগিল, তুমি গেলে না, উনিও যাবেন না, তোমাদের ফেলে আমি যাই কেমন করে বলো? নইলে ঐ রোগা অলবড়ে ছেলেকে কি ছেড়ে দিই আমি একলা একলা। ওর মামা ঠিকেদারী করে, দিনে রেতে বাড়ী আসবার সময়ও পায় না, তার ওপর ওর ছোট মামা বিয়েই করে নি, বাড়ীতে মেয়ে ছেলেও কেউ নেই, কি যে করবে একা একা—

আলোক বলিল, আপনার যাওয়া উচিত।

সুমিত্রা কিছু বলিল না। আলোকের পুস্তকনিবদ্ধ মুখের পানে চাহিয়া নীরবে বসিয়া রহিল।

আলোক একবার মুখটা তুলিয়া বলিল, বাবার জন্যে আপনি একটুও ভাববেন না, আমি ত রইলুম! আপনি স্বচ্ছন্দে যেতে পারেন।

সুমিত্রা কোন কথা না বলিয়া নিঃশব্দে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। আলোক মুহূর্ত্তের জন্য মাথা তুলিয়া স্বচ্ছন্দগতি নারীর পানে চাহিয়া দেখিয়া, যেন স্বচ্ছন্দ হইয়া কেদারাটায় হেলান দিয়া হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। হিন্দু-সমাজের বিধানে এই নারী তাহার জননী, কিন্তু কেন যে কাছে আসিবামাত্র সে সঙ্কোচ-আড়ষ্ট হইয়া পড়িত, ইহা তাহার নিজের কাছেই কম দুর্ব্বোধ্য ছিল না। সমরেশের জননী হইলেও, নিরুপম সৌষ্ঠবশালিনী সুমিত্রাকে বয়সের চেয়ে অনেক কম দেখাইত। চিত্রে, পটে যে মাতৃমূর্ত্তি আমরা দেখি, সুমিত্রায় তাহারই পূর্ণাভিব্যক্তি দেখিয়াও কেন যে আলোকের মন সৌন্দর্য্যের বিরুদ্ধে, যৌবনের বিপক্ষে অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া উঠিত, সে তাহার হদিশ কিছুতেই পাইত না। ইহা তাহার বিকৃত মন ও রুচিরই পরিচয় ভাবিয়া নিজের উপর ক্রোধ না হইত, এমন নয়। আজও একবার রাগ হইল; তারপর নানাকথা ভাবিতে ভাবিতে ভুলিয়া গিয়া উঠিয়া বসিল। পরক্ষণেই, আলোক তাহার পুস্তকে মগ্ন হইল। শুধু পুস্তক নয়, ইদানীং সে আর একটা কাজ সুরু করিয়া দিয়াছিল। কতকগুলা খরগোস, গিনিপিগ, বানর ও ওষুধ পিচকারী প্রভৃতি লইয়া কি-যেন কি করিতেছে। বাগানের ধারে একটা ঘরে তাহার কারবার চলে। এমনও এক এক দিন হয় সেইখানেই তাহার খাবার পাঠাইতে হয়। প্রথম দিন, এ বাড়ীতে আসিয়া বাহিরের একটা ঘর সে-ই চাহিয়াছিল। কিন্তু পরে বুঝিল, পিতার বাসকক্ষের পার্শ্বে এ সব কাজ না করাই ভাল। বাগানের দিকে অনেকগুলা ঘর পড়িয়াছিল, সেইগুলা সাফসুতরা করাইয়া সে নিজের কাজ করিতেছিল। রাত্রে কোনদিন আসিত, কোনদিন তাহার ল্যাবরেটরীতে ক্যাম্প খাটে শুইয়া রাত কাটাইয়া দিত।

একদিন অপরাহ্নে তাহার শুইবার ঘরে বসিয়া বই পড়িতেছিল, সুমিত্রাকে তাহার জলখাবার লইয়া আসিতে দেখিয়া সাতিশয় বিস্ময়ের সহিত বলিয়া উঠিল, আপনি যান্ নি?

সুমিত্রা মৃদু হাসিল, কথা কহিল না।

আলোক বলিল, যাওয়া কিন্তু উচিত ছিল, যে রোগা ছেলেটি আপনার!

সুমিত্রা জলখাবার সাজাইয়া রাখিতে লাগিল, কথা কহিল না।

আমি বলি কি, বাবা যদি যেতে চান, ওঁকেও দিন কতক নিয়ে যান না। বাবারও শরীরটা ত ইদানীং ভাল যাচ্ছে না, তার ওপর দিদির শোকটা কিছুতেই সামলে উঠ্‌তে পারছেন না।

খবর রাখ?—সুমিত্রা জিজ্ঞাসা করিল।

চাবুক খাইয়া তেজস্বী ঘোটক যেমন ঘাড় ঝাড়া দিয়া ওঠে, আলোক সেই ভাবে গ্রীবা উন্নত করিয়া বলিয়া উঠিল, রাখি নে?—বলিয়াই থামিয়া গেল, আত্মসম্বরণ করিয়া লইয়া ধীরকণ্ঠে কহিল, আচ্ছা আমিই আজ বাবাকে বলবো'খন।

সুমিত্রা মৃদু হাসিয়া কহিল, তা বলো!—বলিয়া একটু থামিয়া আবার বলিল, তোমার বাবা যে তোমার বিয়ের কথা বলছিলেন।

বিয়ের কথা!—আলোক চমকিয়া উঠিল।

হ্যাঁ।

হঠাৎ?

হঠাৎ কি আবার! ছেলে বড় হয়েছে, কৃতী হয়েছে, বিয়ে দিতে হবে না? ওঁর ইচ্ছে এই সামনের আষাঢ় শ্রাবণেই—সুমিত্রা হাসিয়া কহিতে লাগিল।

আলোক ব্যস্তভাবে বলিয়া উঠিল, ও কথা থাক্।

সুমিত্রা প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল এখানে কোনমতেই ধৈর্য্য ও স্থৈর্য্য হারাইবে না। পূর্ব্বের মতই হাসিমুখে কহিল, তুমি ত বললে থাক্, বাপ মা'র মন তা শুনবে কেন?

আলোক সংক্ষেপে কহিল, আমি বাবাকে বলবো।

সুমিত্রা কি যেন বলিতে চাহিল, কি-যেন ভাবিল, না বলাই সঙ্গত বিবেচনা করিল, আবার কি ভাবিল, বলিল, তিনি পুরুষ মানুষ, যা-তা বলে তাঁকে না-হয় বোঝালে, আমাকে বোঝাবে কি বলে?

আলোক কোনদিকে না চাহিয়া অত্যন্ত সংক্ষেপে কহিল, ওসব কথা থাক্।—হঠাৎ ঘড়ির দিকে চাহিয়া ত্রস্তে উঠিয়া পড়িয়া বলিল, চললুম, আমার কাজ আছে।—বলিয়াই দ্বারের দিকে অগ্রসর হইল। সুমিত্রা তাহার আগে দ্বারের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, আমি যে এক ঘণ্টার ওপর এগুলো নিয়ে দাঁড়িয়ে আছি, সেটা বুঝি দেখ্‌তেই হোল না।

নিমেষমাত্র ছোট টেবিলটার পানে দেখিয়া লইয়া আলোক বলিল, বাগানে পাঠিয়ে দেবেন।—বলিয়া বাহির হইয়া গেল। সুমিত্রার মুখ ছাই হইয়া গেল। যে পথে আলোক গেল, সেই পথের দিকে চাহিয়া চাহিয়া তাহার মুখের ভাব ক্রমশঃ কঠোর হইয়া

উঠিল। তারপর একটা চাকর ডাকিয়া খাবারটা বাগানে পাঠাইয়া দিয়া নিজের কাজে চলিয়া গেল। কিন্তু কাজ, কতটুকু কাজই বা আছে সংসারের? স্বামীর কাজ, নাই বলিলেও হয়। যতটুকু আছে, বাহিরবাটীর খানসামা চাকরেই করে। সমরেশের কাজ কিছু কিছু ছিল, তাহাও যৎসামান্য, এখন সে'ও গৃহে নাই। আপনাকে আলোকের কাজে লাগাইবার জন্য কত ছল, কত কৌশলই সে করিয়াছে, সবই ব্যর্থ হইয়াছে। তাহার ঘরটার চর্য্যা নিজের হাতে করিবার জন্য বহু যত্ন করিয়াছে কিন্তু আলোক ঘরে চাবি দিয়া যায়; সে পথটিও থাকে না।

বহির্বাটীতে আসিয়া দেখিল, শিবশঙ্কর চোখে চশমা আঁটিয়া বিষ্ণুপুরাণ পাঠ করিতেছেন, অসময়ে বাহিরের ঘরে সুমিত্রাকে আসিতে দেখিয়া বিস্মিত হইয়া, বই বন্ধ করিয়া, চোখ হইতে চশমা খুলিয়া জিজ্ঞাসুনেত্রে চাহিলেন।

সুমিত্রা যতখানি সম্ভব শান্ত সংযত কণ্ঠে কহিল, বাগানের ঘরে সমস্ত দিন ও রাত কি করে বল ত?

শিবশঙ্কর কহিলেন, ডাক্তারী গবেষণা টবেষণা করে বোধ হয়।

মড়ার হাড় ফাড় আনে না ত?

শিবশঙ্কর হাসিয়া বলিলেন, আশ্চর্য্য নয়। মড়া, মড়ার হাড়, নর-কঙ্কাল এ সবই ত ওদের মুড়ি মুড়কী।

সুমিত্রা বলিল, না, না, ও সব বাড়ীতে না আনে, বারণ ক'রে দিয়ো।

তুমিই বলে দিও—শিবশঙ্কর হাসিলেন।

তুমি না পারলে, আমাকেই বারণ করতে হবে—কথাটা বলিয়া ফেলিয়াই মনে হইল, বড় রূঢ় হইয়া গেছে। নিজের কানেই যাহা রূঢ় ঠেকিল, অন্যের কানে যে আরো বহু গুণ রূঢ় ঠেকিবে তাহা বুঝিতে পারিয়াই লজ্জিত ভাবে বলিল, সমরার ইচ্ছে, দাদার মত ডাক্তারী পড়ে! মূর্খ হয়ে বসে থাক, সে'ও ভাল, মড়ার হাড় ঘাঁটা বিদ্যের দরকার নেই।

শিবশঙ্কর হাসিয়া চশমা জোড়া তুলিয়া পার্শ্বরক্ষিত রুমাল দিয়া কাচ দু'খানা মুছিতে লাগিলেন।

সুমিত্রা বলিল, যত অনাছিষ্টি কাণ্ড সব, বাড়ীর মধ্যে আবার হাড় গোড় আনা। না, না, হাসছ কি, বারণ করতেই হবে। কিন্তু তার দেখা পাওয়াই ত ভার, বারণ করি কখন্?

কেন? খেতে আসে না?

অর্দ্ধেক দিন বাগানে খাবার পাঠাতে হুকুম হয়। তোমার কাছেও আসে না বোধ হয়?

শিবশঙ্কর একটু ইতস্তত করিয়া বলিলেন, দিনের বেলা দেখি নে, রাত্রে রোজ একবার খোঁজ নিয়ে যায়।

আলোকের চমকের হেতু বুঝিয়া, অন্যমনস্কের মত সুমিত্রা কহিল, এলে একবার আমার কাছে যেতে বলো।

এই কথার সঙ্গে সঙ্গেই আলোক কক্ষে প্রবেশ করিল। সুমিত্রা তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িল দেখিয়া শিবশঙ্কর প্রশান্ত হাস্য-মুখে কহিলেন, মড়ার হাড়ের কথাটা বলে দাও না এইবেলা!

হঠাৎ সুমিত্রাকে যেন সেই আগেকার ভূতে পাইয়া বসিল। অকস্মাৎ রুষ্ট হইয়া বলিল, আমি কেন, বলতে হয় তুমিই বলো—বলিয়া ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেল।

আলোক কিছুক্ষণ নীরবে বসিয়া থাকিয়া বলিল, আমি কলকাতায় একটা ডিস্পেন্সারী ও একটা ক্লিনিক্ করবো মনে করছি।

শিবশঙ্কর বলিলেন, বেশ ত!

আলোক বলিল, কলকাতাতেই থাকতে হবে।

এখান থেকে যাওয়া আসা চলবে না?

না তাতে কাজের অসুবিধে হবে।

অসুবিধে হলে কলকাতাতেই বাসা করতে হবে বৈ কি!

আলোক আবার কিছুক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল; তারপর বলিল, আমার কিছু টাকার দরকার।

শিবশঙ্কর বলিলেন, ওঁকে বলো।

আলোক পিতার পানে চাহিল, তিনি বিষ্ণুপুরাণে চক্ষু নিবদ্ধ করিয়াছেন। কিছুক্ষণ ধরিয়া আলোক এটা ওটা নাড়াচাড়া করিয়া শেষে বলিল,—হাজার দশ বারো—

শিবশঙ্কর বলিলেন, উনিই দেবেন।

শিবশঙ্কর পাতা উল্টাইয়া এ পাতার শেষের সহিত ও পাতার প্রথমটা মিলাইয়া লইয়া বলিলেন, বললেই লিখে দেবেন।

আলোক উঠিল। বাগানের দিকেই যাইতেছিল, গেল না, অত্যন্ত বিমর্ষ ও চিন্তিতমুখে ফিরিয়া অন্তঃপুরে গেল। শুনিল, গৃহিণী স্নান-কক্ষে। শুনিয়া যেন তখনকার মত বাঁচিয়া গেল ভাবিয়া বাগানে চলিয়া গেল।

সুমিত্রা স্নান সারিয়া বাহিরে আসিলে, পিসী বলিলেন, তোমার কি ভাগ্যি বউ, আজ কার মুখ দেখে উঠেছিলে, বড়বাবু যে তোমার খোঁজে বাড়ীর মধ্যে এসেছিলেন গো!

এই শ্লেষ বিদ্রূপের প্রতি দৃকপাত মাত্র না করিয়া সুমিত্রা ব্যস্ত হইয়া বলিল, একটু বসতে বললে না কেন! যাই, বাগানেই গেছে বোধ করি—দেখি, কি বলে!

আলোক বাগানে বেশীক্ষণ থাকিতে পারিল না। মনের মধ্যে একটা দারুণ বিরুদ্ধতা মাথা খাড়া করিয়া উঠিয়াছিল। আজ তাহার দিদির কথা অক্ষরে অক্ষরে মনে পড়িয়া গেল। যখনই বাবার কথা উঠিত, দিদি বলিত, আমাদের বাবা কি আর আমাদের আছেন আলোক? আমাদের মা'র সঙ্গে বাবাকেও আমরা হারিয়েছি। কথাগুলা যে এমন কঠোর সত্য, আজিকার আগে একটিবারও আলোকের তাহা মনে হয় নাই। পিতার এইরূপ অসহায় অবস্থা তাহার বিরুদ্ধচিত্তে শান্তিবারি বর্ষণ করিল না ইহা বলাই বাহুল্য। ঘৃণামিশ্রিত করুণায় তাহার মন ভরিয়া গেল এবং পিতাকে যে লোক এইরূপ অসহায় অমানুষ করিয়াছে, এইমাত্র সে-যে তাহারই কাছে হাত পাতিতে গিয়াছিল ইহা মনে পড়িতেই নিজের উপর একটা ধিক্কার জন্মিল। সাধারণতঃ বাগানের ঘরগুলায় যে সকল কার্য্য সে করিত, আজ ঘরে ঢুকিয়াই বুঝিল, তাহাতে মনোযোগ দিবার চেষ্টাই বৃথা। ঘর বন্ধ করিয়া আলোক সাইকেল চড়িয়া বাড়ীর বাহির হইয়া গেল।

সুমিত্রা তাহাকে বাগানে না দেখিয়া ভাবিল, আলোক তাহার পিতার কাছে গিয়া থাকিতে পারে। সেখানে আসিয়া দেখিল, শিবশঙ্কর তখনও নিবিষ্টচিত্তে পুরাণ পাঠ করিতেছেন। সুমিত্রাকে দেখিয়া তিনি কেতাব বন্ধ করিলেন। সুমিত্রা বলিল, আলোক এসেছিল না এখানে?

হ্যাঁ! তারপর সে ত তোমার সন্ধানেই গেল!

শুনলুম বটে ; কিন্তু কোথায়ও নেই ত ! বাগানেও দেখলুম, ঘর বন্ধ।

শিবশঙ্কর বলিলেন, বাইরে গেছে বোধহয়, আসবে'খন।

সুমিত্রা আর কোন কথা না বলিয়া উঠিয়া গেল।

পরদিন বেলা বোধ করি ১২টা কি ১টা হইবে, আলোক পিতার ঘরে ঢুকিয়া বলিল, আমাকে এখনই কলকাতা যেতে হচ্ছে। জয়ন্ত্রথ সেন—আমরা একসঙ্গে ফাইন্যাল পাশ করেছিলুম —টেলিগ্রাম করেছে এখনি যেতে হবে।

শিবশঙ্কর বলিলেন, এখন কি কোন ট্রেণ আছে ?

আছে, দেড়টায়। সেইটাই ধরবো।

কবে ফিরবে ?

তা এখন কি ক'রে বলবো ? দু'চারদিনের মধ্যেই ফিরতে পারবো বলে মনে হয়।

সে উঠিতে উদ্যত হইয়াছিল, শিবশঙ্কর বলিলেন, তোমার মা'র সঙ্গে কাল কথা হয়েছিল ?

আলোক পিতার পানে না চাহিয়াই কহিল, না।

শিবশঙ্কর চিন্তাযুক্তস্বরে কহিলেন, এখন বোধহয় বাড়ী নেই, মণিবাবুর নাতির অন্নপ্রাশনে নেমন্তন্ন গেছে, ফিরতে হয় ত সন্ধ্যে হবে।

আলোক যেমন নীরবে বসিয়াছিল, তেমনই রহিল।

শিবশঙ্কর চশমার ফাঁকে পুত্রের দিকে চাহিয়া বলিলেন, কাল গেলে হয় না ?

আলোক বলিল, কেন ?

শিবশঙ্কর কতকটা সঙ্কোচের সহিত বলিলেন, টাকাটা তা'হলে নিয়ে যেতে পারতে।

আলোক একমুহূর্ত্ত কি চিন্তা করিল, তারপর বলিল, টাকা নেবার আমার ইচ্ছে নেই—বলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। বাহির হইয়া যাইতেছিল, থামিয়া দুই পা অগ্রসর হইয়া আসিয়া পিতার পাদস্পর্শ করিয়া প্রণাম করিয়া একটু দ্রুতপদেই বাহির হইয়া গেল। শিবশঙ্কর পুত্রের দীর্ঘ উন্নত বলিষ্ঠ মূর্ত্তির পানে চাহিয়া স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলেন। আলোক অদৃশ্য হইলে দীর্ঘনিঃশ্বাস মোচন করিয়া পাঠে মন দিতে গিয়া দেখিলেন, মুহূর্ত্তে চোখের দৃষ্টি লোপ পাইয়াছে, একটি অক্ষরও দেখা যায় না।

একটু পরে মোটর আসিয়া থামিল, জুতার শব্দ উত্থিত হইল, মোটর ষ্টার্ট লইয়া বাহির হইয়া গেল, বসিয়া বসিয়া সবই জানিলেন, মোটরে কে গেল, তাহাও অজ্ঞাত রহিল না। অন্তরের ভিতরে যে অন্তর, হৃদয়ের মণি-কোঠায় যাহার অধিষ্ঠান, বারম্বার কাকুতি মিনতি করিয়া তাহাকে হাত ধরিয়া ফিরাইয়া আনিতে পরামর্শ দিল ; কিন্তু শিবশঙ্কর সেই যে পক্ষাঘাতগ্রস্ত রোগীর মত অনড় নিশ্চল হইয়া বসিয়া রহিলেন, কিছুমাত্র ব্যতিক্রম হইল না।

রাত্রে নিমন্ত্রণ বাড়ী হইতে ফিরিয়া সুমিত্রা স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিল, আলোক এমন হঠাৎ চলে গেল যে !

শিবশঙ্কর যতটুকু জানিতেন, বলিলেন।

সুমিত্রার কৌতুহল সাধারণ স্ত্রীলোকের অপেক্ষা কম কিনা জানি-না কিন্তু কৌতুহল দমন করিবার শক্তি ছিল তাহার অসামান্য। আজ প্রথম অনুভব করিল, সে শক্তি তাহার লয় পাইয়াছে। বলিল, আমাকে কাল সে অনেকবার খুঁজেছিল, কেন বলতে পারো ?

পারি।

সুমিত্রা সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল।

শিবশঙ্কর বলিলেন, ও কিছু টাকা চায়।

সুমিত্রা বলিল, কত টাকা ?

দশ বারো হাজার ?

অত টাকা নিয়ে কি করবে ?

শিবশঙ্কর বলিলেন, ডিসপেন্সারী আর ক্লিনিক করবে।

সুমিত্রা একমুহূর্ত্ত ভাবিয়া লইয়া বলিল, তা' যা খুসী করুকগে ; কিন্তু টাকাটা তুমিই দিয়ে দিলে না কেন ?

আমি কোথা পাব ? বলিয়া শিবশঙ্কর হাসিলেন।

সুমিত্রার চিত্ত সে হাসিতে প্রফুল্ল হইল না ; বলিল, তুমি কি বললে তাকে ?

তোমার কাছে চাইতে বললুম।

সুমিত্রা আর বিরক্তি গোপন করিতে পারিল না ; অত্যন্ত পরুষ ও তিক্তকণ্ঠে কহিয়া উঠিল, আমার মাথাটি কিনলে !

শিবশঙ্কর অকস্মাৎ উষ্মার হেতু নির্ণয় করিতে না পারিয়া মূঢ়ের মতো চাহিয়া রহিলেন।

সুমিত্রা পূর্ব্বের মত উগ্রকণ্ঠে কহিল, ভারী পৌরুষ জাহির হোল, না ? একে দেখছ আমার কাছে ধরা ছোঁয়াই দেয় না, সে যাবে আমার কাছে টাকার জন্যে হাত পাততে ? বললেই পারতে, টাকা ত ঘরে থাকে না, ব্যাঙ্ক থেকে আনিয়ে দোব। ছিঃ ছিঃ কি ভাবলে সে মনে মনে !

শিবশঙ্কর নির্ব্বাক।

সুমিত্রা বলিতে লাগিল, তোমাকে যা ভাবলে, সে ত জানাই আছে, ছিঃ ছিঃ আমাকেও—সে স্তব্ধ হইয়া গেল।

শিবশঙ্কর বলিতে গেলেন, আহা, তাতে আর হয়েছে কি ! দু'চারদিন বাদেই ত আসছে, তখন টাকাটা না হয় আমিই হাতে করে দেবো'খন।

এলে ত !—কিন্তু কথাটা বলিয়া ফেলিয়াই মনে মনে শতবার জিভ কাটিয়া, সামলাইয়া লইয়া কণ্ঠস্বরে যতখানি দৃঢ়তা আনা সম্ভব তাহাই আনিয়া বলিল, নিলে ত ! মন তবু শান্ত হয় না ; অনুশোচনা তবু ঘুচে না। রাগটা নিজের উপরই হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু তা না হইয়া সব রাগ পড়িল বেচারা শিবশঙ্করের উপর। একটা দাবদাহী দৃষ্টিতে বৃদ্ধের বিকম্পিত দেহখানিকে আমূল আলোড়িত করিয়া সশব্দে বাহির হইয়া গেল। পুরাণ শিবশঙ্করের মগজ হইতে বহুকালপূর্ব্বেই নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছিল।

পাঁচ

দিন পনেরো কুড়ি পরে আলোক ফিরিয়া আসিল। ফিরিয়াই পিতার ঘরে ঢুকিল। এই ক'টা দিন শিবশঙ্করের অত্যন্ত উৎকণ্ঠাতেই কাটিয়াছে। যাহারা ভিতরের উৎকণ্ঠা বাহিরে প্রকাশ পাইতে দেয় না, সর্ব্ব দুশ্চিন্তা মনের মধ্যেই গোপন করিয়া রাখে, বাহিরের লোকে নাই বুঝুক, তাহাদের কষ্টের সীমা থাকে না। তুষের আগুন বাহিরে আসে কম, ভিতরেই গন্ গন্ করে। আলোক চরণ স্পর্শ করিতেই তাহার মাথাটা ধরিয়া

বুকের কাছে খানিকটা টানিয়া ছাড়িয়া দিলেন। এতটা ভাবাতিশয্য প্রকাশ, শিবশঙ্করের পক্ষে একেবারে নূতন।

আলোক বলিল, আমি একটা রয়াল কমিশন পেয়েছি।

বিষয়ী লোক, উকীল মোক্তাররাই কমিশন করে, শিবশঙ্কর তাহাই জানিতেন। বলিলেন, কমিশন? কিসের কমিশন? ডাক্তারেরা কমিশনারী করে নাকি?

আলোক মৃদু হাসিয়া কহিল, মেডিক্যাল কমিশন, যুদ্ধের কাজ!

শিবশঙ্কর চক্ষু কপালে তুলিয়া সভয়ে বলিলেন, তুমি যুদ্ধে যাবে নাকি?

আলোক বলিল, না, ঠিক যুদ্ধে নয়, তবে সৈন্যদলের সঙ্গে যখন থাকতে হবে, যেতে না হতে পারে এমন নয়।

শিবশঙ্কর স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলেন। কথাগুলা যেন মগজে ঘা মারিয়া সারা মস্তিষ্কটাকেই অসাড় করিয়া দিয়াছে।

আলোক বলিল, আমরা প্রায় সত্তর আশীজন এম্-বি যাচ্ছি। সকলে কমিশন পায় নি, আমরা তিনজন সিলেকসান্ পেয়েছি।

শিবশঙ্করের কানও বধির হইয়া গিয়াছিল, আলোক আরও কত কি বলিয়া গেল, তিনি তাহার একটি বিন্দুও শুনিতে পাইলেন না। শেষে আলোক যখন প্রস্থানোদ্যত হইয়াছে, তখন ব্যগ্রকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, আমি বুড়ো হয়েছি, আর ক'দিনই বা বাঁচবো? যে ক'টা দিন আছি—

না, না, ভয় পাবার কিছু নেই এতে!—বলিয়া সে চলিয়া গেল। শিবশঙ্কর নীরবে বসিয়া রহিলেন।

খবর চাপা থাকিবার নয়, থাকেও না, এক্ষেত্রেও রহিল না। অন্তঃপুরে পিসী আজ বহুকাল পরে আলোকের মাতার শোকে ডাক ছাড়িয়া কাঁদিয়া উঠিলেন—আবাগীর বরাতকে বলিহারী যাই, একটা নিলে যমে, আর একটা গেল যুদ্ধে।

খবর সুমিত্রাও শুনিয়াছিল। ধীরপদে স্বামীর কক্ষে প্রবেশ করিয়া বলিল, সত্যি?

শিবশঙ্কর ঘাড় নাড়িলেন। সত্য।

সুমিত্রা বলিল, বারণ করবে না?

শিবশঙ্কর এবারও ঘাড় নাড়িলেন তবে অন্যদিকে।

সুমিত্রা শিহরিয়া উঠিয়া বলিল, বারণ করবে না, বল কি? যুদ্ধ থেকে কেউ ফিরে আসে?

শিবশঙ্কর নীরবে দক্ষিণ হস্ত তুলিয়া ললাট নির্দ্দেশ করিলেন।

সুমিত্রা বলিল, না, না, ভাগ্যি টাগ্যি আমি মানি নে। তুমি বারণ করো; বলো, যেতে পাবে না।

শিবশঙ্কর শুষ্ক হাস্য করিয়া কহিলেন, কথা থাকবে না, কথা থাকবে না।

সুমিত্রা প্রবলবেগে মাথা নাড়িয়া বলিল, কে বললে থাকবে না? নিশ্চয় থাকবে, ডেকে ভাল ক'রে বুঝিয়ে বল দিকি, কেমন না কথা থাকে?

শিবশঙ্কর চুপ করিয়া রহিলেন। সুমিত্রা বলিল, বলবে ত?

কথা থাকবে না জানি। তবুও বলাতে চাও, বলবো। কিন্তু কথা থাকবে না—থাকবে না—থাকবে না।

হঠাৎ সুমিত্রার দু'চোখে জল আসিয়া পড়িল। অশ্রুব্যাকুলকণ্ঠে বলিল, কেন থাকবে না বলতে পারো? সে কি আমার জন্যে? আমি বিমাতা, তাই? বিমাতার সঙ্গে এক ঘরে বাস করতে হবে ব'লে যুদ্ধে যাওয়া? এই ত! কিন্তু বিমাতা যদি ঘর ছেড়ে চলে যায়, তাহ'লে—তাহ'লে ত আর যুদ্ধে যেতে হবে না?—বলিতে বলিতে সে চুপ করিল। আবার বাষ্পগদগদকণ্ঠে কহিল, তাই করো না গো, দাও না কোথায়ও পাঠিয়ে আমাকে? তাই দাও, তোমার পায়ে পড়ি, তাই দাও।

তখন সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছিল, বাহিরের চেয়ে ঘর অধিক অন্ধকার; ঘরে আলো নাই, তাই আরও অন্ধকার। তবুও শিবশঙ্কর হাত বাড়াইয়া সুমিত্রার একখানা হাত ধরিয়া মৃদুকণ্ঠে কহিলেন, আস্তে কথা বলো, চারদিকে চাকর বাকর ঘুরছে, তারা কি মনে ভাববে?

সুমিত্রা উচ্ছ্বসিত আবেগে বলিতে লাগিল, ভাবতে কি আর কারও কিছু বাকী আছে মনে করছ? যা ভাববার লোকে তাই ভাবছে। ভাবছে সৎমাই সতীনের ছেলেটিকে যমের দোরে ঠেলে দিলে! না, না তোমার পায়ে পড়ি, আমাকে কোথাও পাঠিয়ে দাও। পাঠিয়ে না দাও, দূর ক'রে দাও। তুমিও অক্ষম নও, এই পৃথিবীও ছোট নয়, একটা স্ত্রীলোকের জন্য যথেষ্ট ঠাঁই হবে।

মা!

সমরেশ মায়ের কণ্ঠস্বর শুনিয়াই এদিকে আসিয়াছিল, কক্ষ নীরব ও নিষ্প্রদীপ দেখিয়া ফিরিয়া যাইতেছিল, শিবশঙ্কর ডাকিয়া বলিলেন, সমর তোমার মা'কে নিয়ে যাও তো!

কই মা? মা!

এই সময়ে ভৃত্য আলো লইয়া আসিল। সুমিত্রার হুঁস ছিল না, থাকিলে উঠিয়া বসিত। ভৃত্য অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া চলিয়া গেল। সমর মায়ের পিঠের উপর হাত রাখিয়া ডাকিল, মা!

সন্তানের স্পর্শ, দেবদানবের যুদ্ধে মৃতসঞ্জীবনী সুরার মতো, সুমিত্রা মুখে কাপড় চাপিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া ছেলেকে কাছে টানিয়া বলিল, চলো বাবা।

শিবশঙ্কর বলিলেন, রাত্রে ছেলেরা যেন আমার কাছে বসে খায়, বলে দিয়ো।

রাত্রে কথাটা শিবশঙ্করই পাড়িলেন। যুদ্ধের বীভৎসতা, পাশবিকতা ও হৃদয়হীনতা সম্বন্ধে গুটিকত কথা বলিয়াই আসল কথা কহিলেন। শিবশঙ্কর বলিলেন, উনি বলছিলেন, তুমি যে সেই ক্লিনিক্ টি্নিক করবে বলছিলে, সেই ত ভাল।

আলোক বলিল, হাঁ, সে'ও ভাল।

শিবশঙ্কর কহিলেন, তবে তাই কেন কর না।

আলোক বলিল, এখন আর তা হয় না।

হয় না কেন?

কমিশন নিয়ে ফেলেছি।

একমুহূর্ত্ত থামিয়া কতকটা গর্ব্বদৃপ্তস্বরে বলিয়া উঠিল, বাঙ্গালী নির্বীর্য্য, বাঙ্গালী ভীরু, কাপুরুষ, বাঙ্গালী যুদ্ধের নামেই ভয়ে আঁৎকে মরে যায়, এ সকল কলঙ্ক বাঙ্গালীর আছেই, সেগুলো আর বাড়ানো কোন বাঙ্গালীরই উচিত নয়। কোথায় জাতির কলঙ্ক দূর করবো, তা নয়, বাড়াবো? আজ আমি পিছিয়ে গেলে

কলেজের প্রিন্সিপাল ভাববেন—ভাববেন কেন, বলবেন—তুমি বাঙ্গালী, সেই কালেই জানতুম, এই করবে! বাঙ্গালার বাইরে যারা শুনবে তারাও বলবে, আরে বাঙ্গালী ত এই রকমই করে। আজ যখন সুযোগ এসেছে, বাঙ্গালী যুবকদের দেশের জাতির কলঙ্ক ঘুচোতেই হবে।—বলিতে বলিতে তাহার মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল; সুগৌরকান্তি স্বর্ণবর্ণে রঞ্জিত হইয়া উঠিল।

শিবশঙ্কর পুত্রের পানে চাহিয়া নীরবে বসিয়া রহিলেন। তাঁহার কত কথাই বলিবার ছিল, এখনও আছে; কিন্তু এই উদ্দীপনার তেজে সমস্তই যেন নিষ্প্রভ হইয়া যাইতেছিল। কোন্ কথা বলিবেন অথবা কোন্ কথা বলিবেন না, ইহাই যেন ভাবিয়া পাইতেছিলেন না। অশক্ত দেহ, দুর্ব্বল মস্তিষ্ক, ধারণাশক্তিও অল্প, কথা মনে আসিলেও গুছাইয়া বলিবার ক্ষমতা অনেক সময়ই থাকে না।

সমরেশও দাদার পানে চাহিয়া বসিয়াছিল? তাহার ধমনীতেও শোণিত চঞ্চল হইয়া উঠিতেছিল; অঙ্গে প্রত্যঙ্গে যেন শিহরণ লাগিতেছিল। সমরেশের চোখে পলক ছিল না, একদৃষ্টে আলোকের বীর্য্যদৃপ্ত আননের পানে চাহিয়া সে'ও যেন নিজ দেহে বীর্য্য অনুভব করিতেছিল। আর একজন ছিল, সকলের অলক্ষ্যে বসিয়া একমনে কথাগুলো সেও গ্রাস করিতেছিল। কক্ষ নিস্তব্ধ, খাওয়ার কথা কাহারও মনে নাই, ইহা লক্ষ্য করিয়া আলোক হাসিয়া বলিল, পাঁচশ' হাজার বছর পরাধীনতা করার যা অব্যর্থ ফল, আমাদেরও তাই হয়েছে। যুদ্ধের নামেই আমাদের নাড়ী ছাড়ে; কেউ যুদ্ধে যাচ্ছে শুনলে আমরা আগে ধরে নিই, সে মরে গেছে। পৃথিবীর অন্য যে কোন দেশে যান্, দেখবেন, যুদ্ধের নামে তারা আনন্দ করে; যুদ্ধে যাবার জন্যে রিক্রুটিং আফিসের দরজায় হত্যা দেয়। আমাদেরও হয়ত একদিন সেদিন ছিল, কিন্তু সে বহু অতীতে। এখন যা দেখা যায়, তা ঠিক উল্টো। সমস্ত বাঙ্গালী জাতটাই যেন শশকের প্রাণ নিয়ে জন্মেছে, কোনওমতে কোথাও মাথাটি গুঁজে বেঁচে থাকাই তার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য, একটিমাত্র আদর্শ। ভারতের আর কোন জাতের এতখানি অধঃপতন হয় নি, যেমন আমাদের হয়েছে—বলিয়া সে অভুক্ত আহার্য্য ফেলিয়া উঠিয়া চলিয়া গেল। সমরেশও বিদ্যুতাকৃষ্টের মত তাহার অনুসরণ করিল।

শিবশঙ্কর একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া চক্ষু মুদিয়া আরাম কেদারায় এলাইয়া পড়িলেন। সুমিত্রা ওদিকের দরজার সামনে যেমন বসিয়াছিল, তেমনই বসিয়া রহিল। কতক্ষণ থাকিত কে জানে, ভৃত্য আহারের স্থান পরিষ্কার করিতে আসিয়া, থালা-গুলিতে সজ্জিত আহার্য্য অস্পৃষ্ট দেখিয়া বলিল, মা, থালাগুলো কি নোব? সবই ত পড়ে আছে—

সুমিত্রা উঠিয়া আসিয়া থালা দু'খানা দেখিয়া মৃদুকণ্ঠে কহিল, নিয়ে যাও, আর কি খাবে ওরা?

ভৃত্য চলিয়া গেলে বলিল, খাবার সময় ওসব কথা না তুললেই হোত, খাবার ছুঁলেও না, উঠে গেল।

শিবশঙ্কর কোন কথা কহিলেন না, চক্ষু মুদিয়া পড়িয়া রহিলেন। তাঁহার মনে হইতেছিল, আকাশের কোন এক অলক্ষিত প্রান্ত হইতে কে যেন মধুর করুণকণ্ঠে কাকুতি করিয়া বলিতেছে, ফেরাও, ওগো, ফেরাও। স্বর বড় পরিচিত। হৃদয়াভ্যন্তরের প্রত্যেকটি তারের সঙ্গে তাহার ঘনিষ্ঠ পরিচয়, যেন এক সুরে বাঁধা, এক তানে লয়ে গাঁথা! কাঁদিয়া বলিতেছে ফেরাও ওগো ফেরাও!

কেমন করে ফেরাব তুমিই বলো—যেন স্বপ্নের ঘোরে এই কথা বলিয়া শিবশঙ্কর চমকিয়া উঠিয়া বসিলেন। দুটি চোখ জলে ভরিয়া গিয়াছিল, উঠিয়া বসিতে নাড়া পাইবামাত্র ঝর্ ঝর্ করিয়া ঝরিয়া পড়িল। সুমিত্রা সামনেই দাঁড়াইয়াছিল, এ দৃশ্য দেখিল, তাহারও বুকের ভিতরে তুফান উঠিল—ইচ্ছা হইল অঞ্চল দিয়া স্বামীর চোখের জল মুছাইয়া দেয়, সান্ত্বনার কথা বলে কিন্তু, কি ভাবিয়া কিছুই না করিয়া, ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল।

কিন্তু শিবশঙ্করের চোখে-মনে এ পার্থিব দৃশ্যের স্থান ছিল না। অপার্থিব জগত হইতে কে দু'টি কাতর আঁখিতে চাহিয়া সকাতরে বলিতেছে, ফেরাও, ওগো আমার আলোককে ফেরাও; শিবশঙ্কর তাহাতেই মোহাবিষ্ট হইয়াছিলেন।

হঠাৎ শিবশঙ্কর আচ্ছন্নের মত বলিয়া উঠিলেন, যেয়ো না, যেয়ো না। যদিই যাও, আমাকে ক্ষমা করে যাও। তোমার কোন কথাই আমি রাখতে পারি নি। আমায় তুমি ক্ষমা করো। তোমার মেয়ে আগে তোমার কাছে গেছে, ছেলেও যাচ্ছে, আমি রাখতে পারি নি, তোমার গচ্ছিত ধন, তুমিই তার ভার নাও।

সুমিত্রা "যেয়ো না" শুনিয়াই দাঁড়াইয়া পড়িয়াছিল কিন্তু পরের কথাগুলা গলিত লৌহের মত তাহার কানের ভিতর দিয়া ঢুকিয়া তাহাকে অসাড় অচেতন করিয়া দিল। দুই হাতে সবলে কাণ চাপিয়া ধরিয়া ছুটিয়া যাইতেছিল, আবার কি ভাবিয়া ফিরিয়া আসিল।

এই ভয়ই সে করিয়াছিল। আসিয়া দেখিল, শিবশঙ্কর মূর্চ্ছিত। ঠিক মূর্চ্ছা নয়, অজ্ঞান-অচৈতন্য যাহাকে বলে তাহাও নয়, জ্ঞান-অজ্ঞানের মাঝামাঝি কিছু একটা! সুমিত্রা তাহা বুঝিয়াও কোনরূপ চাঞ্চল্য প্রকাশ করিল না, নিপুণা শুশ্রূষাকারিণীর ন্যায় ধীর হস্তে কখনও স্বামীর পায়ে, কখনও মাথায় হাত বুলাইতে লাগিল। শিবশঙ্করের যে বয়স, তাহাতে এই ধরণের কঠিন আঘাত সহ্য হইবার কথা নয়। যে কোন মুহূর্ত্তে যে কোন বিপদপাত হইতে পারে।

আলোক শুইতে যাইবার পূর্ব্বে নিত্য নিশীথে পিতার কাছে আসিয়া একটু সময় বসিত। আজ অত্যন্ত উত্তেজনা বশে চলিয়া গেলেও শয্যাপ্রবেশের পূর্ব্বমুহূর্ত্তে সে কথা মনে পড়িল। পিতার আবাস-মন্দিরে আসিয়াই পিতার হতচেতন ভাব লক্ষ্য করিয়া সুমিত্রাকে বলিল, কতক্ষণ এ রকম অবস্থায় আছেন?

সুমিত্রা কি বলিল বুঝা গেল না। আলোক ডাক্তার, তখনই নাড়ী ধরিয়া দেখিল, তারপর পাশের ঘর হইতে একটা চাকরকে দিয়া তাহার বুক-নলটা আনাইয়া যতটা সম্ভব পরীক্ষা করিয়া গম্ভীরমুখে বসিল। সুমিত্রা তাহাকে একটি কথাও বলিল না, আপন মনে যেমন সেবা করিতেছিল, তেমনই করিতে লাগিল।

অনেকক্ষণ পরে একসময়ে আলোক বলিল, আমি এখানে থাকি, আপনি শুতে যান্।

সুমিত্রা একথারও উত্তর দিল না।

আলোক তাহার অনুরোধ আর একবার আবৃত্তি করিল, তাহাতেও সাড়া পাওয়া গেল না।

আলোক ইহাতে বিরক্ত ও রুষ্ট হইয়া বলিল, ভাল, আপনিই থাকুন, পাশের ঘরটায় আমি রইলুম, দরকার হলে ডাকবেন।

আশ্চর্য্য এই নারী, এখনও একটি শব্দ উচ্চারণ করিল না, একবার তাহার মুখপানে চাহিয়াও দেখিল না। আলোক পাশের ঘরে ঢুকিয়া একটা সোফায় বসিয়া পড়িয়া সেই কথাই ভাবিতে লাগিল। বিমাতা বস্তুটি কি তাহা চিনিয়া লইবার সুযোগ এ পর্য্যন্ত তাহার হয় নাই। এই বাড়ীতে এতদিন সে আসিয়াছে,কিন্তু তাহার এই বিমাতার সহিত জগতের অন্যান্য স্ত্রীলোকের যে কোথায় কোনো পার্থক্য বা বিশেষত্ব আছে তাহা একটুও মনে হয় নাই। সেই জন্য তাঁহার প্রতি আকৃষ্টও যেমন সে হয় নাই, বিশেষ কোন রূপ বিদ্বেষের ভাবও তাহার মনে স্থায়িত্ব লাভ করে নাই। একদিন একবারের জন্য মনটা খুবই বিমুখ হইয়াছিল সত্য,আবার ভুলিতেও বিলম্ব হয় নাই। যেদিন পিতা বলিয়াছিলেন, টাকাটা বিমাতার নিকট চাহিতে, সেদিন পিতার উপর কতখানি রাগ হইয়াছিল ঠিক বলা যায় না, এই নারীটির বিরুদ্ধে বিদ্বেষের অগ্নি দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু পরে টাকাটার নাকি দরকারই পড়ে নাই তাই ঐ ঘটনাটিও মনে স্থায়ী আসন পাতিতে পারে নাই। আজ কিন্তু তাহার আচরণ আলোককে বিভ্রান্ত করিয়া দিয়াছিল। পিতার সর্ব্বস্ব গ্রাস করিয়াছে করুক, আলোক আদৌ তাহার প্রত্যাশী নয়, কিন্তু পিতার সেবার অধিকার হইতে পুত্রকে বঞ্চিত করিবার জন্য যে নারী এমন দার্ঢ্য অবলম্বন করিতে পারে তাহার প্রতি এতটুকু করুণাও তাহার চিত্তে রহিল না। রুগ্ন পিতার কক্ষমধ্যে কোন 'সিন্' করার ইচ্ছা তাহার থাকিতেই পারে না; কিন্তু কোন রকমে উহাকে পিতা-পুত্রের সম্পর্কটা সমঝাইয়া দিতে না পারিলেও সে যেন আর এতটুকু স্বস্তি পাইতেছিল না। পিতা-পুত্রের মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া যে নারী তাহার অস্তিত্বটাকে পর্য্যন্ত অস্বীকার করিল, কোন শাস্তিই যে তাহার পক্ষে কঠোর নয়, সে বিষয়েও আলোকের মনে বিন্দুমাত্র দ্বিধা রহিল না।

এই শাস্তির চিন্তামাত্রেই তাহার হাসি পাইল। তাহার অপরাধ অমার্জ্জনীয় ও গুরুতর তাহাতে সন্দেহ নাই, শাস্তির যোগ্যও বটে, কিন্তু আর কয়দিন পরে তাহাকে শাস্তি দিবার জন্য আলোক নিজেই কোথায় থাকিবে? এই ভাবিয়াই তাহার হাসি আসিল। রাত্রি গভীর হইতে গভীরতর হইল, বিত্তশালী ব্যক্তির বহুজন-মুখরিত গৃহও নীরব নিস্তব্ধ হইল, আলোক কখনও সোফায় বসিয়া, কখনও খালি পায়ে পায়চারি করিয়া বেড়াইয়া নিশা যাপন করিল।

পার্শ্বকক্ষে শিবশঙ্করের সেই অবস্থা। আর নারী, অভুক্ত, বিনিদ্র রজনী ঠিক সেই একভাবে তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া—যেন একা একশত হইয়া—বসিয়া রহিল। আলোক ইহাও দেখিল। শিক্ষিতা নিপুণা শুশ্রূষাকারিণীদের সেবা শুশ্রূষা ডাক্তারকে অহরহ দেখিতে হইয়াছে কিন্তু এমন নিরলস, এমন স্পন্দহীন, শ্রান্তিহীন নিষ্ঠা ডাক্তারের অভ্যস্ত চক্ষুতেও সচরাচর পড়ে না। তাই ভোর বেলা যখন আর একবার পিতার নাড়ী ও বক্ষস্পন্দন পরীক্ষা করিতে আসিল, তখন এই আনমিতানন নারীকে আজ শ্রদ্ধার চোখে না দেখিয়া পারিল না।

ছয়

পিতা ঔষধ খান্ না, খাইবেন না, ইহা আলোক জানিত। এলোপ্যাথী, হোমিওপ্যাথী, আয়ুর্ব্বেদীয় কোন ঔষধই তিনি খান্ না, এ সংবাদ পিতার খানসামাই তাহাকে দিয়াছিল। আলোকও পূর্ব্বে দুই একবার সামান্য অনুরোধ করিয়াছিল, শিবশঙ্কর হাসিয়া সে কথা চাপা দিয়া অন্য কথা পাড়িয়াছিলেন। আশী বৎসরের পুরাতন জীর্ণ পৃথিবীকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকিবার কণামাত্র ইচ্ছা যে তাঁহার নাই একথা তিনি সর্ব্বদাই সকলকে শুনাইতেন। পক্ষান্তরে পৃথিবীর কেন যে এত মায়া মমতা তাঁহারই উপর, সে কিছুতেই তাহাকে ছাড়তে চাহে না, ইহার জন্য ধরিত্রীর সুবিচার ও সুবিবেচনায় সন্দেহ প্রকাশেও তিনি বিরত ছিলেন না।

আজ সকালে আলোক আবার সেই কথাটাই জিজ্ঞাসা করিতে আসিয়াছিল। সামান্য একটু ঔষধ খাইলে অথবা ইন্‌জেক্‌সান লইলে যদি কষ্টটার লাঘব হয় তাহা করা সঙ্গত কি-না—ঘরে ঢুকিতেই দেখিল, পিতার আরাম কেদারার সম্মুখে হেঁটমুণ্ডে সমরেশ দণ্ডায়মান। পিতা অত্যন্ত নির্জ্জীব ও নিস্তেজভাবে আরাম কেদারায় শুইয়া আছেন—ইদানীং শুইয়াই থাকেন, পা হইতে গলা পর্য্যন্ত মখমলের একখানি সূক্ষ্ম চাদরে আবৃত। আরাম কেদারার পিঠে বালিশ উঁচু করিয়া তাহাতেই মাথা দিয়া শুইয়া থাকেন—এখন মাথাটি একটু তুলিয়া, সমরেশের দিকে চাহিয়া আছেন। কণ্ঠস্বর অত্যন্ত ক্ষীণ, অতি মৃদু, কাছে না গেলে কথা শুনিতে পাওয়া যায় না। আলোক কাছে আসিতে শুনিল, পিতা বলিতেছেন, তোমার মা'কে বলগে যাও, তিনি যা ভাল বুঝবেন, তাই হবে।

সমর বলিল, মা'কে বলেছি, মা মত দিয়েছেন।

শিবশঙ্কর অবসন্নের মত বালিশে মাথা ঠেসান দিয়া বলিলেন, মত দিয়েছেন, ভালই। যেতে পার। আমার কোনও আপত্তি নেই—বলিয়া তিনি আলোকের পানে চাহিলেন।

আলোক সমরেশের পানে চাহিয়া বলিল, কোথায় যাবে সমর?

সমর উত্তর দিবার আগেই শিবশঙ্কর বলিলেন, ও যুদ্ধে যাচ্ছে।

যুদ্ধে!

তাই ত শুনছি।

আলোক সরিয়া আসিয়া সমরেশের কাঁধে একটা ঝাঁকানি দিয়া বলিল, কি ব্যাপার বল ত হে!

সমরেশ নতমুখে বলিল, আমি আর-এ-এফ্-এ নাম দিয়েছি।

আলোক বলিল, নাম দিয়েছ, এই! ভয় নেই, তোমায় তারা নেবে না, আঠারো বছরের কম হলে নেয় না।

সমরেশ বলিল, আমার আঠারো হয়ে গেছে।

তুমি ত মোটে গত বছর ম্যাট্রিক পাস করলে—

শিবশঙ্কর মৃদুস্বরে কহিলেন, আঠারো হয়েছে। পড়াশুনো দেরীতে আরম্ভ হয়েছিল, নইলে দু'বছর আগে ওর পাশ করার কথা।

আলোক বলিল, তা হোক্, তোমায় দেখলে তারা বাতিল ক'রে দেবে। যে রোগা তুমি!

সমরেশ বলিল, মেডিক্যাল টেষ্টে আমি পাস করেছি।

এবার আর আলোকের বিস্ময়ের অবধি রহিল না; বলিল, এত কাণ্ড হলো কবে শুনি?

কাল। আমাদের কলেজ থেকে দশজন ছেলেকে সিলেক্ট করেছে।

আলোক নিকটস্থ চেয়ারখানায় বসিয়া পড়িয়া বলিল, এ সব করবার আগে আমাদের একবার বললেই পারতে! অন্ততঃ তোমার মাকে বলা উচিত ছিল।

সমর বলিল, মা জানেন।

পরে বলেছ ত?

না।

তবে?

মা'কে ব'লে তবে আমি সই করেছি।

আলোক যেন কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারিতেছিল না; বলিল, তিনি মত দিয়েছেন তোমাকে যুদ্ধে যেতে?

সমরেশ বলিল, হ্যাঁ।

আচ্ছা, আমি দেখছি তাঁকে জিজ্ঞেস্ ক'রে, কোথায় তিনি?—বলিতে বলিতে আলোক দ্রুতবেগে বাহির হইয়া গেল। সমরেশ সেইখানেই দাঁড়াইয়াছিল, শিবশঙ্কর ক্ষীণকণ্ঠে বলিলেন, তুমি যেতে পারো আমার আপত্তি নেই, তা ত তোমায় বলেছি।

বাড়ীর ঠিক পিছনে ছোট একখানি শব্জীবাগান, তাহার পাশ দিয়া একটা শীর্ণা নদী বহিয়া গিয়াছে। বর্ষাকালে নদীটার জলও বাড়ে, বক্ষও প্রশস্ত হয়, এখন জল নাই বলিলেও চলে। এক পাশ দিয়া একটি সূক্ষ্ম ধারা মুমূর্ষুর প্রাণবায়ুর মত জির জির করিয়া বহিয়া যাইতেছিল। পায়ের পাতাও ডোবে না, এতটুকু জল! ডোম ডোকলাদের দু'টা উলঙ্গ বালক বালিকা একখানা নেকড়া দিয়া সেই জলেই মাছ ধরিবার চেষ্টা করিতেছিল। দৈবাৎ চুনোচানা দু' একটা মাছ বোধ হয় পাওয়া যায়, তাহারাও পাইয়াছিল, নতুবা মাঝে মাঝে ততটা হর্ষ উল্লাস প্রকাশ পাইত না। অন্তঃপুরের একটা জানালার পটিতে বসিয়া সুমিত্রা ইহাই দেখিতেছিল। শিবশঙ্করের জন্য রেশমের একটা গলবন্ধ বুনিতে বুনিতে নির্জ্জনে জানালায় আসিয়া বসিয়াছিল, বোনা, রেশম, সুতা, সূঁচ সমস্তই কোলের উপর পড়িয়া আছে। সুমিত্রা জানালার একটা গরাদে ধরিয়া একদৃষ্টে সেই মাছধরার খেলা দেখিতেছিল।

আলোক ঘরে ঢুকিল। পদশব্দ কাহার তাহা সুমিত্রার অজ্ঞাত রহিল না; কিন্তু যেন কিছুই জানিতে বা বুঝিতে পারে নাই এই ভাবেই বসিয়া রহিল। কিন্তু তাহার অন্তর জানে আর অন্তর্যামী জানেন, দুইটি কান ও সারা বুকখানা পিপাসায় ফাটিয়া যাইতেছিল।

আলোক একমুহূর্ত্ত নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল, তারপর বলিল, আপনি নাকি সমরকে আর-এ-এফ-এ যোগ দিতে মত দিয়েছেন?

সুমিত্রা জানালা ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। অসতর্ক ছিল বলিয়াই বোধ করি সেলাই দ্রব্যগুলি মাটিতে পড়িয়া ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া গেল। সুমিত্রা নত হইয়া সেগুলা কুড়াইতে লাগিল।

আলোক আবার প্রশ্ন করিল, আপনি সমরেশকে যুদ্ধে যেতে অনুমতি দিয়েছেন শুনলাম?

এবার সুমিত্রা কথা কহিল। অত্যন্ত ধীর, সংযত ও শান্ত-কণ্ঠে কহিল, হ্যাঁ।

আলোক বলিল, যুদ্ধটা যে ছেলেখেলা নয়, সেটা বোধ করি আপনাদের জানা নেই।

সুমিত্রা একথার জবাব দিল না; আবার সেই জানালার বাহিরে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিল।

আলোক বলিতে লাগিল, যুদ্ধ থেকে খুব কম লোকই ফিরে আসে, তা জানেন না বোধ হয়। বিশেষতঃ এই আর-এ-এফ্-এর লোক হাজারে একটা ফেরে কি-না সন্দেহ।

সুমিত্রা এদিকে ফিরিল। আলোকের পানে না চাহিয়াই বলিল, জানি। একটু থামিয়া আবার বলিল, রোজই কাগজে পড়ি।

জেনে শুনেও আপনি অনুমতি দিয়েছেন।—আলোক বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া গিয়াছিল।—আবার বলিল, না, না এ হতেই পারে না, আপনি তা'কে নিরস্ত করুন, এ অসম্ভব।

সুমিত্রা ধীরে ধীরে মুখ তুলিল, আলোক দেখিল, তাহার দুইটি আয়ত নেত্রে জল টল টল করিতেছে, আর যেন ধরে না, এখনি উপচাইয়া পড়িবে। সুমিত্রা ধীরকণ্ঠে কহিল, অসম্ভব কেন? সমর কি বাঙ্গালী নয়? ওর প্রাণে কি জাতির কলঙ্ক আঘাত করে না? ও কি এতই হীন যে জাতির বীরত্বের গর্ব্ব, শৌর্য্যের [illegible] এ সকল উচ্চাশা ওর প্রাণে জাগে না?

আলোক বিস্মিত, স্তম্ভিত, নির্ব্বাক। কি আশ্চর্য্য নারী এই! দু'টি চক্ষু জলে ভাসিয়া যাইতেছে, অথচ এ কি অলৌকিক দৃঢ়তা! অনেকক্ষণ আলোকের মুখ দিয়া একটি কথাও বাহির হইল না। সুমিত্রা পুনরায় নদীর দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়াছিল। আলোক বিস্ময় বিমুগ্ধ নেত্রে সেই নিস্পন্দ নির্ব্বাক নিশ্চল নারী-মূর্ত্তির পানে চাহিয়া রহিল। একটু পরে বলিল, কিন্তু বাবার শরীরের কথাও ত ভাবতে হয়।

সুমিত্রা ওদিকে ফিরিয়াই ধীরস্বরে কহিল, তাঁকে বল গে, তিনি সমরকে নিরস্ত করুন। আমি মা হ'য়ে ছেলেকে এত বড় গৌরব থেকে বঞ্চিত করতে পারবো না।

গৌরব?

সুমিত্রা বলিল, সে রাত্রে তোমার কথা শুনেই ওর যুদ্ধে যাবার ইচ্ছে হয়েছে তা জানো। আমায় বলে, মা দাদা বাঙ্গালী, আমি কি বাঙ্গালী নই? এর পরে কোন্ মুখে আমি তাকে মানা করতে পারি?

কিন্তু আমি ভাবছি বাবার কথা!—বলিতে বলিতে সেই অতি-বৃদ্ধ, জরায় পঙ্গু, জীর্ণশীর্ণ পরলোকযাত্রী পিতার উদাস-করুণ দৃষ্টি যেন তাহাকে গ্রাস করিতে চাহিল। ছুটিয়া আসিয়া বিমাতার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া কাতরকণ্ঠে বলিল, না না, এ হতে পারে না। বাবা তাহ'লে একটি দিনও বাঁচবেন না। মা, আপনার পায়ে পড়ি, ওকে আপনি নিরস্ত করুন।

সুমিত্রার বুকের ভিতরটা যেন ধক্ করিয়া উঠিল। অমাবস্যার অন্ধ আকাশের বুকে কে যেন লাল-নীল ফুলকাটা রকেট্ ছুঁড়িয়া মারিল। মা! এতদিন পরে সে কি সত্যই মা বলিয়া ডাকিল, কিন্তু এ যে বিশ্বাস হয় না। সুমিত্রা নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। আলোক যেন ভাবের প্রবাহে ভাসিয়া যাইতেছিল, ক্ষুদ্র তৃণ

অবলম্বনও তাহার ছিল না। ক্ষণমাত্র অপেক্ষা করিতে না পারিয়া মাটীতে বসিয়া পড়িয়া সত্য সত্যই দু'হাতে সুমিত্রার দু'টি পা চাপিয়া ধরিয়া বলিল, মা, আপনার পায়ে পড়ি মা, আমার কথা রাখুন, বাবাকে মারবেন না।

যে জল এতক্ষণ চোখেই নিবদ্ধ ছিল, তাহাই এখন প্লাবনের রূপ ধরিয়া বাহির হইতে লাগিল—চোখের দৃষ্টি ঝাপসা হইয়া গেছে, চোখে দেখিতে পায় না—নত হইয়া দু'হাত বাড়াইয়া আলোককে ধরিয়া তুলিয়া সুমিত্রা তাহার মাথায় মুখে হাত বুলাইয়া দিতে লাগিল। একা সমরেশকে বুকে ধরিয়া এই স্থির-যৌবনা নারীর মাতৃত্বের আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত হয় নাই। ফুলের কুঁড়ির মধ্যে মধু, পাপড়ির গায়ে লুকানো রেণুর পরমাণুর মত অনন্ত আকাঙ্ক্ষা অন্তরের অন্তস্থলে লুকাইয়া ছিল। আজ সপত্নীপুত্রের মাতৃ-সম্বোধনে এক মুহূর্তে মাতৃত্বের সেই তৃষা যেন বর্ষাবারিধারায় চাতকের করুণ কর্কশ কণ্ঠের মত শান্ত, তৃপ্ত, কোমল হইয়া গেল। আলোকের হাতে মাথায় মুখে টপ টপ করিয়া বৃষ্টির ধারা ঝরিয়া পড়িতে লাগিল।

আলোক ভরসা পাইয়া বলিল, বলুন মা, আমার কথা রাখবেন? সমরকে নিরস্ত করবেন?

সুমিত্রা ধীরে ধীরে মুখ তুলিল। মুখে মাতার স্নেহ, চোখে মাতৃহৃদয়নির্ঝরিণীর পূত বারি, আলোকের ব্যাকুল মুখের পানে চাহিয়া রহিল।

আলোক আবেগভরা উত্তেজিত কণ্ঠে কহিল, মা!

সুমিত্রা চক্ষু নত করিল; কি যেন ভাবিল; কাপড়ের খুঁট তুলিয়া চক্ষু মার্জ্জনা করিল, তারপর ডাকিল, আলোক!

আলোক বলিল, বলুন মা।

তবুও সুমিত্রা বলিতে পারে না। মুখ তুলিতে চায়, আপনি নত হইয়া আসে; চক্ষু তুলিতে চেষ্টা করে, জলের ভারে চক্ষু নামিয়া পড়ে। কিন্তু আলোকের পক্ষে ধৈর্য্যধারণ করা অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছিল; সে আর ক্ষণমাত্র অপেক্ষাও করিতে পারিতেছিল না; অত্যন্ত ব্যাকুল কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, আপনার দু'টি পায়ে পড়ি মা, আমার কথা রাখুন! বাবার মুখ চেয়ে সমরকে আটকান।

হঠাৎ সুমিত্রার মুখের পানে চাহিয়া আলোক স্তম্ভিত হইয়া গেল। যে সুগঠিত সুকুমার মুখখানি এইমাত্র নয়ন সলিলে ভাসিয়া যাইতেছিল, তাহা এমন শুষ্ক ও অনিমেষ কিরূপে হইতে পারে দেখিলেও বিশ্বাস হয় না। আলোকের মনে হইল বুঝি তাহার নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের গতিও বন্ধ হইয়া গিয়াছে। আলোক ডাকিল, মা!

সাড়া না পাইয়া, সুমিত্রার একটা হাত ধরিতেই বুঝিল, দেহ সংজ্ঞাহীন! অতি সন্তর্পণে অশক্ত অবশ দেহখানিকে দুইহাতে বেষ্টন করিয়া পাশের ঘরে শয্যায় শোয়াইয়া দিয়া, আলোক চাকর ডাকিয়া বাগানের ঘর হইতে ঔষধের বাক্স আনিতে পাইল।

সুমিত্রা চক্ষু মেলিয়া চাহিতে আলোক ব্যগ্রব্যাকুলকণ্ঠে কহিল, মা, কি কষ্ট হচ্ছে আপনার, আমি ডাক্তার—আমায় বলুন মা।

সুমিত্রা বলিল, কষ্ট, কিছু না।

সমরকে ডাকবো?

না।

বাবাকে খবর দেবো?

না। শুধু তুমি! শুধু তুমি মা বলে ডাকো।

যৌবনের যে দৃপ্ত আভরণ দীপ্তিশালিনীকে দূরে রাখিয়া দিত, কোথায় গেল সে যৌবন? আলোক যে সে দেহে মাতৃত্ব ছাড়া আর কিছুই দেখিতে পায় না। আলোক ক্ষুদ্র শিশুর মত জড়াইয়া ধরিল, ডাকিল, মা, মা, মা!

সুমিত্রার চক্ষু মুদিয়া আসিল।

মৃত্যু-মাধুরী

শ্রীকৃষ্ণদয়াল বসু

(টুর্গেনিভের ছায়ায়)

আমার যবে মরণ হবে, হে সখা, রেখো স্মরণে,
হে প্রিয়তম, মিনতি মম,—ভুলো না—
স্মরিয়ো মনে,—বিদায়ক্ষণে বেদনারাঙা বরণে
বিরহ ছবি আঁকেনি কবি,—ভুলো না!

রূপে অতুল কত না ফুল উঠিবে হাসি' ফুটিয়া,—
আমারি লাগি রহিবে জাগি,—ভুলো না।
রবির কর সমাধি 'পর পড়িবে আসি লুটিয়া,—
আমারে আলো বাসিবে ভালো,—ভুলো না।

আকাশ জুড়ে মোহন সুরে উঠিবে বাজি বাঁশরী,—
গাহিবে পাখী আমারে ডাকি',—ভুলো না।
বিষাদ গান করুণ তান সকলি র'ব পাশরি',—
মরণে ল'ব জীবন নব,—ভুলো না।

ধরার হাসি পুলকরাশি—চিরবিদায় রাতেও
র'বে স্বপনে র'বে গোপনে,—ভুলো না।
প্রীতির গীতিমধুর স্মৃতি,—সেই তো হবে পাথেয়,—
প্রেমের বাঁশি ভালো যে বাসি,—ভুলো না।

আমারে চাওয়া ভোরের হাওয়া—মায়ের মুখে চুমা এ—
কপালে মুখে ঝরিবে সুখে,—ভুলো না।
সাঁঝের ছায়া বিছালে মায়া—মায়ের বুকে ঘুমায়ে—
রহিব জাগি, হে অনুরাগী,—ভুলো না॥

শরৎচন্দ্রের 'শেষের পরিচয়'

অধ্যাপক শ্রীমণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ, বি-এল

মৃত্যুর সময় শরৎচন্দ্র দুইখানি উপন্যাস অসমাপ্ত রাখিয়া গিয়াছেন, একখানি মাসিক বসুমতীতে 'জাগরণ', অপরখানি মাসিক ভারতবর্ষে 'শেষের পরিচয়'। অথচ এই শেষের পরিচয় গ্রন্থখানি তিনি স্বচ্ছন্দে শেষ করিয়া যাইতে পারিতেন।

শেষের পরিচয় উপন্যাসখানি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইবার আশ্বাসে ১৩৩৯ আষাঢ়ে ভারতবর্ষে প্রথম প্রকাশিত হয়। আশ্বিন পর্য্যন্ত প্রতিমাসে একটি করিয়া পরিচ্ছেদ প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহার পরে নিয়মিতভাবে বাহির হয় নাই। পঞ্চম পরিচ্ছেদ অগ্রহায়ণে ষষ্ঠ, সপ্তম, ও অষ্টম পরবর্ত্তী ফাল্গুন, চৈত্র ও বৈশাখ ১৩৪০-এ, নবম পরিচ্ছেদ আশ্বিনে, দশম অগ্রহায়ণে, একাদশ পরিচ্ছেদ পরবর্ত্তী বৎসরের অর্থাৎ ১৩৪১-এর আষাঢ়ে, দ্বাদশ শ্রাবণে, ত্রয়োদশ কার্ত্তিকে, চতুর্দ্দশ ফাল্গুনে এবং পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ ১৩৪২-এর বৈশাখে প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহার পরেও শরৎচন্দ্র প্রায় তিন বৎসর জীবিত ছিলেন (মৃত্যু ২রা মাঘ ১৩৪৪), কিন্তু শেষের পরিচয় পঞ্চদশ পরিচ্ছেদে এইরূপ অসমাপ্ত অবস্থাতেই থাকিয়া যায়। শরৎচন্দ্রের মৃত্যুর পর অপরাপর সাহিত্যিক ও প্রকাশক-বর্গের অনুরোধে সুসাহিত্যিকা শ্রীমতী রাধারাণী দেবীকে শেষের পরিচয় শেষ করিতে হয়। তিনি শরৎচন্দ্রের রচিত পনেরটি পরিচ্ছেদের পর আরও এগারটি পরিচ্ছেদ রচনা করিয়া মোট ছাব্বিশটি পরিচ্ছেদে ৪১৪ পৃষ্ঠায় উপন্যাসখানি সম্পূর্ণ করেন। গ্রন্থের প্রথম ২৩৪ পৃষ্ঠা শরৎচন্দ্রের রচনা, পরবর্ত্তী অংশ শ্রীমতী রাধারাণীর। শরৎচন্দ্রের মৃত্যুর একবৎসর পরে ১৩৪৫ সালের ফাল্গুন মাসে শেষের পরিচয় গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশিত হইয়াছিল। বর্ত্তমানে ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ চলিতেছে; শরৎচন্দ্রের মৃত্যুর পরে ইহা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হওয়ার জন্য শরৎচন্দ্রের রচিত অংশে কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই, পত্রিকায় যাহা প্রকাশিত হইয়াছিল, গ্রন্থেও অবিকল তাহাই রহিয়াছে।

সাধারণতঃ আমাদের জানা আছে যে. একই উপন্যাসে একাধিক লেখকের রচনা একত্রে গ্রথিত হইলে উপন্যাসের 'জমাটি-ভাব' ঠিকমত রক্ষিত হয় না এবং বর্ণিত চরিত্রগুলি অসঙ্গত না হইলেও রচনা সবদিক দিয়াই ব্যাহত হইয়া পড়ে। শরৎবাবুও নিজের অভিজ্ঞতা দিয়া এই সত্য উপলব্ধি করিয়াছিলেন। 'বিরাজ-বৌ' প্রকাশের পর শরৎচন্দ্র 'গুরুশিষ্য সংবাদ' নামক একটি লেখার প্রথমার্দ্ধ রচনা করিয়া অন্য একজন লেখকের উপর গ্রন্থখানি শেষ করিবার ভার দিয়াছিলেন, কিন্তু সমাপ্তির পর দেখা যায় যে রচনাটি একেবারেই সুখপাঠ্য হয় নাই। তদবধি তাঁহারও এই ধারণাই দৃঢ় হইয়াছিল যে, একাধিক লেখকের সমাবেশে আর যাহাই হউক না কেন, উপন্যাসগ্রন্থ হয় না। গ্রন্থাকারে সম্পূর্ণ শেষের পরিচয়ের প্রসঙ্গে ইহা উল্লেখ করিবার কারণ এই যে. শরৎচন্দ্র ও রাধারাণীর যুগ্ম চেষ্টায় রচিত এই উপন্যাসখানি পাঠ করিলে মনে হয়, ইহা উপরোক্ত সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম। ইহাও মনে হয় যে, শরৎচন্দ্র যদি ২৬ অধ্যায় সম্পূর্ণ শেষের পরিচয় নিজে দেখিয়া যাইতে পারিতেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই প্রীত হইতেন। মোট কথা, বর্ত্তমান গ্রন্থখানি আদ্যন্ত এমনই রূপে শরৎচন্দ্রের ভাবে ভাবান্বিত যে. আমরা এই উপন্যাসখানি যেন একজনেরই রচনা এই ভাবেই আলোচনা করিব। প্রবন্ধের শেষভাগে উভয় লেখকের রচনায় যেটুকু পার্থক্য দেখা যায়, তাহা সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত-ভাবে উল্লেখ করিলেই চলিবে।

গ্রন্থখানি বিশ্লেষণ করিবার পূর্ব্বে একথা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, এই উপন্যাস সম্বন্ধে প্রায় সমস্ত সমালোচকই নীরব আছেন। বাংলা উপন্যাস সাহিত্যের প্রবীণ সমালোচক অধ্যাপক শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন এবং শরৎসাহিত্যের খ্যাতনামা সমালোচক শ্রীসুবোধকুমার সেনগুপ্ত, শ্রীক্ষীরোদবিহারী ভট্টাচার্য্য ও রামগোপাল চট্টোপাধ্যায়, শ্রীপ্রমথনাথ পাল, শ্রীমোহিতলাল মজুমদার প্রভৃতি কেহই শেষের পরিচয় সম্বন্ধে কোন উল্লেখ করেন নাই। জীবনীকার শ্রীনরেন্দ্র দেব পুস্তকখানির নামটি মাত্র উল্লেখ করিয়াছেন এবং অধ্যাপক শ্রীমাখনলাল রায়চৌধুরী মহাশয় তাঁহার শরৎ সাহিত্যে পতিতা নামক সমালোচনা গ্রন্থে শেষের পরিচয়ের দুইটি চরিত্র লইয়া সামান্য মাত্র আলোচনা করিয়াছেন। এ ছাড়া এই উপন্যাসের উপর আর কোন সর্ব্বাঙ্গীন আলোচনা হইয়াছে বলিয়া আমার জানা নাই। অথচ এরূপ একটি গ্রন্থের উপর আলোচনা যে সবদিক দিয়াই রুচিকর হইবে, তাহা বলাই বাহুল্য।

শেষের পরিচয় উপন্যাসের মূল বিষয়বস্তু একটি ধর্ম্মভীরু ও সত্ত্বগুণাদর্শ মধ্যবয়স্ক পুরুষের সহিত তাঁহার রজোগুণপ্রধানা তরুণী স্ত্রীর সংসারিক দুর্ব্বিপাক। বহুবিত্তশালী ও ব্যবসায়ী ব্রজবাবু তাঁহার প্রথমা স্ত্রীর মৃত্যুর পর দ্বিতীয় পক্ষে সবিতাকে বিবাহ করেন। সবিতা অসীম রূপলাবণ্যবতী, পরোপকারী, দয়া ও দানশীলা এবং পরম বুদ্ধিমতী, তেজস্বিনী রমণী ছিলেন। একদিন তাঁহাকে তাঁহাদের এক দূরসম্পর্কীয়, ধনী আত্মীয় রমণীবাবুর সহিত এক কক্ষে দেখিতে পাইয়া অপরাপর আত্মীয়গণ কুৎসা রটনা করায় সবিতা সকলের সমক্ষেই রমণীবাবুর সহিত গৃহত্যাগ করেন। সে সময়ে সবিতার একটিমাত্র তিন বৎসর বয়স্ক কন্যাসন্তান বর্ত্তমান ছিল। সবিতার কুলত্যাগের পর ব্রজবাবু পুনরায় দারপরিগ্রহ করিয়াছিলেন।

উপন্যাসের আরম্ভ সবিতার কুলত্যাগের তেরো বৎসর পর হইতে। এই সময়ে সবিতার কন্যা রেণু পূর্ণবয়স্কা হওয়ায় ব্রজবাবুর তৃতীয় পক্ষের শ্যালক হেমন্ত রেণুকে এক ধনী পাত্রের হস্তে সমর্পণ করিবার উদ্যোগ করিয়াছিল, কিন্তু সবিতা জানিতে পারিয়াছিলেন যে, ঐ পাত্রের বংশে উন্মাদরোগ আছে, অতএব পাত্রেরও নিজেরও উন্মাদ হইবার যথেষ্ট আশঙ্কা রহিয়াছে। কন্যার এই বিবাহরূপ আসন্ন বিপদে সবিতার মনে যে মাতৃত্বের বিকাশ হইয়াছিল তাহা হইতেই গ্রন্থের আরম্ভ এবং সবিতার দিক দিয়া এই মাতৃত্বই তাঁহার শেষের পরিচয়। গ্রন্থকার এখানে এইটুকু স্পষ্ট দেখাইয়াছেন যে, নারী প্রথম বয়সে যেরূপই হউক না কেন, তাহার অন্তরে একবার মাতৃত্বের উদয় হইলে সেই মাতৃত্বের স্রোতে তাহার সকল গ্লানি ধুইয়া তাহার অন্তরের বিলাসচাপল্য মহিমা ও গৌরবে পূর্ণ হইয়া উঠে।

এইরূপে দেখা যায়—গ্রন্থের প্রধানা চরিত্র সবিতা। গ্রন্থকার এই সবিতার জীবনে তিনটি পুরুষকে আনিয়াছেন—প্রথম ব্রজবাবু সবিতার স্বামী, দ্বিতীয় রমণীবাবু সবিতার যৌবন সঙ্গী এবং তৃতীয় বিমলবাবু প্রৌঢ় সবিতার অন্তরঙ্গ। বাংলা উপন্যাস-সাহিত্যের ধারা অনুসরণ করিলে দেখা যায় যে,. বঙ্কিমচন্দ্রের 'চন্দ্রশেখরে' চন্দ্রশেখরকে শৈবলিনী ভক্তি করিত, শ্রদ্ধাও করিত, কিন্তু প্রতাপকে সে যেমন করিয়া ভালবাসিত, চন্দ্রশেখরকে তেমন ঘনিষ্ঠভাবে সে কোনদিনই গ্রহণ করিতে পারে নাই। ইঁহাদের যে সম্বন্ধ বঙ্কিমচন্দ্র অঙ্কন করিয়াছিলেন, শরৎচন্দ্রের চরিত্রহীনে কিরণময়ী ও হারাণবাবুর সম্বন্ধও অনেকটা সেইরূপ। সেখানে কিরণময়ী স্বামীর পাণ্ডিত্যের তারিফ করিত, 'দেবী চৌধুরাণী'র ব্রজেশ্বর যেমনভাবে জোর করিয়া পিতৃভক্তি অভ্যাস করিত, তেম্‌নি করিয়া কিরণময়ীও স্বামীকে চেষ্টা দরিয়া শ্রদ্ধা করিত, কিন্তু জীবনের পথে সুখ দুঃখের সাথী করিয়া স্বামীকে গ্রহণ করিতে পারে নাই। ইহাদেরই প্রায় অনুরূপ শরৎচন্দ্রের

স্বামী পুত্রকে ঘনশ্যাম ও সৌদামিনীর সম্বন্ধ। ঘনশ্যাম বৈষ্ণব, জগতের সকল দুঃখ, সকলের অবজ্ঞাই সে তুচ্ছ করিয়া থাকে। সৌদামিনী তাহাকে ভক্তি করে, অপরে তাহার উপর অত্যাচার করিলে সে ক্রুদ্ধ হয়, কিন্তু সম্পর্ক যেরূপই হউক না কেন, নরেনের ন্যায় বন্ধুভাবে সৌদামিনী স্বামীকে কোনদিনই গ্রহণ করিতে পারে নাই।

এই ঘনশ্যাম ও সৌদামিনীর সম্বন্ধই যেন আর একটু বাস্তবভাবে শেষের পরিচয়ে ফুটিয়া উঠিয়াছে। স্বামীতে ঘনশ্যামের সহিত সৌদামিনীর বিবাহ হইয়াছিল দ্বিতীয় পক্ষে, এখানেও সবিতা ব্রজবাবুর দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী। বিবাহিত দম্পতির মধ্যে উভয়ের বয়সের অধিক পার্থক্য থাকিলে বা স্বামী প্রবীণ এবং স্ত্রী তরল মনোবৃত্তিসম্পন্ন হইলে উভয়ের মধ্যে একটা গরমিল থাকিয়া যায়। ঘনশ্যাম নরেনের মতো হইতে পারিলে সৌদামিনী হয়ত নরেনকে ভুলিতে পারিত ; চন্দ্রশেখর 'ব্রাহ্মণ এবং পণ্ডিত' না হইয়া প্রতাপের ন্যায় রজোগুণসম্পন্ন হইলে শৈবলিনীর জীবনে কোন বিপর্য্যয় নাও ঘটিতে পারিত। ঠিক সেইরূপেই বলা যায় যে, সবিতা যদি ব্রজবাবুকে একেবারেই প্রবীণ সংসারীরূপে না পাইতেন, তাহা হইলে তাহার এই অধঃপতন নাও ঘটিতে পারিত। এই প্রসঙ্গে ইহা সর্ব্বতোভাবে অনুধাবনযোগ্য যে, কুলত্যাগের পূর্ব্বে বা পরে সবিতার স্বামীগর্ব্ব বড় কম ছিল না। কুলত্যাগ করিবার তেরো বৎসর পরেও তিনি রমণীবাবুকে ভৎর্সনার সুরে বলিতেছেন (পৃঃ ১১১), 'আমি যাঁর স্ত্রী তোমরা কেউ তাঁর পায়ের ধুলোর যোগ্য নও।' অন্যত্র সবিতা নিজ মুখে বলিয়াছিলেন (পৃঃ ৩৫০), 'স্বামীকে আমার মতো এতটা ভালবাসতেও হয়ত অন্য কেউ পারবে না…কিন্তু আজ শুধু এইটুকুই আমি বেশ বুঝতে পারছি, অন্তরের শ্রদ্ধাভক্তি এবং সংস্কারগত ধারণা—আর হৃদয়ের প্রেম একই বস্তু নয়।…নারী ও পুরুষের পরস্পরের মধ্যে ভিতর ও বাহিরের স্বাভাবিক মিল না থাক্‌লে প্রেম স্ফূর্ত্ত হলেও সুসার্থক হয় না…অনেক সময় শ্রদ্ধা ভক্তিকে মানুষ প্রেম বলে ভুলও করে।' মনে হয় যে সবিতার গৃহত্যাগের পশ্চাতে এই অভাববোধই প্রচ্ছন্নভাবে সবিতাকে বাহিরের দিকে ঠেলিয়া দিয়াছে। এ বিষয়ে গ্রন্থকার আভাস দিয়াছেন ৩২৭ পৃষ্ঠায়, 'পরিপূর্ণ যৌবনের উচ্ছ্বসিত বসন্তদিনে যখন জীবন স্বতঃই আনন্দ পিপাসাতুর, তাঁহাকে সেদিন উহা সম্পূর্ণ একাকী নিঃসঙ্গ বহন করিতে হইয়াছে। না মিলিয়াছে অন্তরের অন্তরঙ্গ সাথী, না পাইয়াছেন যৌবনের প্রাণবন্ত সহচর। সেই একান্ত একাকীত্বের মাঝে হঠাৎ একদিন কোথা হইতে কী যে আকস্মিক বিপ্লব হইয়া গেল, তাহা নিজেও স্পষ্ট বুঝিতে পারেন নাই'। ইহার পর হইতে তেরো বৎসর কাল তিনি রমণীবাবুর অধীনে রক্ষিতারূপেই বাস করিয়াছিলেন।

সবিতার জীবনে দেখা যায় তিনি স্বামীর গৃহে সকল তৃপ্তিই লাভ করিয়াছিলেন ; কেবল যৌবনের উপযুক্ত সঙ্গীর অভাব ছিল বলিয়াই তাঁহার পতন হইয়াছিল। ইহা সর্ব্বকালিক এবং চিরসত্য হইলেও আমাদের বর্ত্তমান সামাজিক সংস্কারে নিতান্তই লজ্জা ও ঘৃণার বিষয়। সেইজন্যই বোধ হয় সবিতা ঐরূপ বুদ্ধিমতী হইয়াও তাঁহার নিজের এই পরম সত্যটি আবিষ্কার, এমন কি অনুমান পর্য্যন্ত করিতে পারেন নাই। তিনি একবার বলিয়াছেন (পৃঃ ১৫২), 'পদস্খলন ঘটে আচম্‌কা সম্পূর্ণ নিরর্থকতায়'। অন্যত্র (পৃঃ ১৬৯), 'এ বিড়ম্বনা কেন যে ঘটিল, সবিতা আজও তাহার কারণ নিজে জানেন না। যতই ভাবিয়াছেন, আত্ম-ধিক্কারে জ্বলিয়া পুড়িয়া যতবার নিজের বিচার নিজে করিতে গিয়াছেন, ততবারই মনে হইয়াছে ইহার অর্থ নাই, হেতু নাই, ইহার মূল অনুসন্ধান করিতে যাওয়া বৃথা'। এই উপলক্ষে পাশ্চাত্য মনস্তাত্বিক ফ্রয়েডকে মনে পড়ে। তাঁহার মতে, যে বিষয়ে মানুষের আত্যন্তিক ঘৃণা থাকে, সে বিষয়টি মানুষ ভাবিতে বা মনে রাখিতে পারে না। সবিতাও এই জন্যই তাঁহার পতনের প্রকৃত কারণ নির্ণয় করিতে পারেন নাই। তেরো বৎসর পরে যখন সবিতার সহিত ব্রজবাবুর আকস্মিকভাবে দেখা হইয়া গেল, তখন কথাপ্রসঙ্গে ব্রজবাবু সবিতার গৃহত্যাগের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে সবিতা কোন উত্তর দিতে পারেন নাই এবং বলিয়াছিলেন (পৃঃ ৪২), এর কারণ তুমি সেই-দিন জানবে, 'যেদিন আমি নিজে জান্‌তে পারবো'। কিন্তু এই দিনেই সবিতার কার্য্যকলাপে কারণ যেন প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে। নারী যে উপযুক্ত পুরুষের দাবী বা জুলুম মিটাইতে পারিলে গৌরবান্বিত হয়, সবিতার কথাবার্ত্তায় তাহাই প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে। চাকর মারফৎ রমণীবাবু বাড়ী ফিরিবার জন্য কঠোর আহ্বান পাঠাইলে সবিতা যথাশীঘ্র প্রস্থান করিবার জন্য উঠিয়া ব্রজবাবুকে হাসির সুরেই বলিয়াছিল (পৃঃ ৪৮-৪৯), 'একি তুমি ডেকে পাঠিয়েছো যে জোর করে রাগ করে বল্‌বো এখন যাবার সময় নেই ? আমাকে যেতেই হবে। যাকে কখনো কিছু বলোনি, তোমার সেই নতুন-বৌকে আজ একবার মনে করে দেখো ত মেজকর্ত্তা, দেখো ত তাকে আজ চেনা যায় কিনা।' ইহা হইতেই মনে হয় যে, সবিতার নারী-হৃদয়ে যে মর্ষণকাম (masochism) ব্রজবাবুর পরিণত বয়সের উদারতায় অন্তরে অন্তরে ক্ষুন্ন হইয়া গুমরিয়া মরিতেছিল, রমণীবাবুর কঠোর আঘাতে তাহাই সাড়া দিয়া তলে তলে পুলকিত হইয়া উঠিতেছিল। নচেৎ ইহা যদি সত্যই সবিতার অন্তরকে দাসীবৃত্তি আঘাত করিত, তাহা হইলে তিনি কখনই এইভাবে মুখ ফুটিয়া বলিতে পারিতেন না, তাঁহার প্রত্যক্ষভাবের সহাস্য ভঙ্গী ও প্রচ্ছন্নভাবের সগৌরব উক্তি হইতে ইহাই অনুমিত হয়। অথচ বিষয়টিকে এত স্পষ্ট করিয়া সবিতা নিজেও জানেন না। তিনি সর্ব্বদাই বলিয়া থাকেন যে, রমণীবাবুর অভদ্র চেঁচামেচির হাত হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্যই তিনি এইরূপে তাঁহার আদেশ পালন করিয়া থাকেন। আমাদের মনে হয়, মানব মনের অন্তস্তলবিহারী, মনঃসমীক্ষক ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্র রমণীবাবুর প্রসঙ্গে সবিতার উচ্ছ্বসিত যৌবন-পিপাসাকে এইরূপে ভদ্র আবরণ দিয়া ফুটাইয়া তুলিয়াছেন।

কিন্তু তেরো বৎসর পরে এই রমণীবাবুর সঙ্গই সবিতার একেবারে অসহ্য হইয়া উঠিল কেন ? ইহাতেও আমাদের পূর্ব্ব ধারণাই দৃঢ়ীভূত হয়। রমণীবাবু ধনী মদ্যপায়ী, তাহার আলাদা বাড়ী এবং সংসার আছে। যৌবনের বিলাস-চাপল্যকে পরিতৃপ্ত করিবার জন্যই সবিতাকে একখানি স্বতন্ত্র বাটীতে তিনি রক্ষিতারূপে রাখিয়াছিলেন। কাজেই বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রীর সহিত স্বামীর যে মানসিক ভালোবাসা নিগূঢ়ভাবে অলক্ষিতে সঞ্চারিত হইতে থাকে, সবিতার সহিত রমণীবাবুর তাহা হয় নাই, কারণ রমণীবাবু যতক্ষণ পর্য্যন্ত কামুক ও ভোগী ততক্ষণই সবিতার নিকট থাকিতেন, বাকী সময় নিজের কারবারে ও বাটীতে চলিয়া যাইতেন। রূপসী সবিতা রমণীবাবুর বিলাসের উপকরণ হইয়া স্বামীগৃহে যে তৃপ্তি পান নাই তাহাই পাইতেছিলেন এবং প্রথম জীবনে সামান্য কয়েকদিন হয়ত ভোগ করিয়া পরবর্ত্তী বয়সে উহাকে অভ্যাসমত সহ্য করিতেছিলেন। এই অবস্থায় তেরো বৎসর পরে তিনি আবার যেদিন ব্রজবাবুকে দেখেন ও পুত্রপ্রতিম রাখালের প্রণাম গ্রহণ করেন, সেইদিন হইতেই নূতন করিয়া কলুষিত জীবনের গ্লানি তাহাকে মর্ম্মে মর্ম্মে পীড়া দিতে আরম্ভ করে। উপরন্তু এই সময় সবিতা পূর্ব্বের তুলনায় বহুগুণ প্রবীণা হইয়া ব্রজবাবুর অকৃত্রিম আন্তরিক ভালোবাসা সমস্ত অন্তর দিয়া উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ব্রজবাবুর উদারতা, অনাবিল বালকোচিত রসিকতা, সবিতার উপর পূর্ণ নির্ভরশীলতা, সবিতার চলিয়া আসার পর হইতে পান খাওয়া ছাড়িয়া-দেওয়া-রূপ গভীর ভালোবাসার দুই একটা অভ্রান্ত নিদর্শন দেখিয়া আবেগভরে ব্রজবাবুর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছিলেন, কিন্তু ব্রজবাবুর সংসারে গৃহিণীরূপে পুনঃ প্রবেশ করিবার জন্য এই সময়ে বিশেষ চেষ্টা করেন নাই। ইহার পর রেণুর পীড়ার সংবাদে সবিতার মাতৃত্ব যখন সহসা পরিপূর্ণ-ভাবে বিকসিত হইয়া উঠিল, তখন সবিতার বিলাসিনীরূপ সম্পূর্ণভাবে তিরোহিত হইল। নিজের সংসার, স্বামী ও সন্তানের নিকট তুচ্ছ দাসী হইয়া থাকিবার জন্য যে-মন উদগ্র হইয়া উঠে, সে মনে বিলাসের স্থান কোথায় ?

কাজেই বিলাসিনীর পূজারী রমণীবাবুকে চিরতরে বিদায় গ্রহণ করিতে হইল। সবিতার মনে মাতৃত্বের পূর্ণ জাগরণের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার এমনই মানসিক পরিবর্ত্তন হইয়া গেল যে, এই তেরো বৎসরকাল তিনি কিরূপে রমণীবাবুর সঙ্গ সহ্য করিয়াছিলেন, তাহা নিজেই বুঝিতে পারিতেছিলেন না। গ্রন্থকর্ত্তী শ্রীমতী রাধারাণী ইহার কৈফিয়ৎ দিয়াছেন এই বলিয়া যে (পৃঃ ৩২৮), 'গৃহত্যাগের পর সবিতার দিন যাইবার সঙ্গে সঙ্গে সেই কলুষিত আশ্রয়ের ক্লেদ ও কদর্য্যতায় তাঁহার দেহমন প্রতিদিন ঘৃণায় সঙ্কুচিত হইয়া উঠিয়াছে। জাগ্রত আত্মচেতনা প্রতি মুহূর্ত্তে অনুতাপের মর্ম্মান্তিক আঘাতে আহত ও জর্জ্জরিত হইয়াছে। তবুও এই অসহ ও অবাঞ্ছিত সঙ্কীর্ণ আশ্রয়টুকু ত্যাগ করিয়া আরও অনিশ্চিতের মধ্যে ঝাঁপ দিতে ভরসা পান নাই।' মনোবিজ্ঞানের দিক দিয়া দেখিতে গেলে এই সমস্ত কৈফিয়তের প্রয়োজন নাই, এগুলি নিতান্তই বাহ্যিক। তবে একথা ঠিক যে, রমণীবাবুর আশ্রয় হইতে দূরে আসিয়া সবিতা এ-ছাড়া অন্য কোন উপায়ে নিজের অনুশোচনাকে সান্ত্বনা দিতে পারে না।

মাতৃত্বের পূর্ণ উপলব্ধি লাভ করিবার পর সবিতা নিজের সংসারে ফিরিবার চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু প্রবেশাধিকার পান নাই। ব্রজবাবু সমাজে বাস করিয়া অসামাজিক কাজ করেন নাই। দূর হইয়া জননী-সবিতা কন্যা-রেণুকে ও স্বামী-ব্রজবাবুকে সাহায্য করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, নিজের সমস্ত সম্পত্তি, অলঙ্কার ও অর্থাদি রেণুর জন্য সঞ্চয় করিয়া রাখিতে প্রাণপণ করিয়াছেন, উন্মাদের সহিত বিবাহরূপ নিগ্রহ হইতে রেণুকে রক্ষা করিয়া রাখালের বন্ধু তারকের সহিত কন্যার বিবাহ দিবার বিষয় মনে মনে সংকল্প করিয়া নানাভাবে তারককে আপন করিয়া তাহার উন্নতিতে সাহায্য করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, ব্রজবাবু ও রেণুকে নানাভাবে সাহায্য করিতে অগ্রণী হইয়াছেন কিন্তু কিছুই সুবিধা হয় নাই; ব্রজবাবু তাহাকে অন্তরে ক্ষমা করিলেও সামাজিকভাবে দূরে রাখিয়াছিলেন, রেণু তাঁহাকে মাতৃসম্বোধনে তৃপ্ত করিলেও তাঁহার দান সর্ব্বথা প্রত্যাখ্যান করিয়াছে, যে আসন সবিতার একান্ত কাম্য ছিল সে আসন সবিতার নিকট হইতে বহু দূরেই রহিয়া গেল।

এইরূপে সবিতা যখন আপন মনেই গুমরিয়া মরিতেছিলেন, সন্তানের জননী হইয়া অন্তরে অন্তরে মাতৃত্বকে অনুভব করিয়াও মাতৃত্বের বাস্তব তৃপ্তি হইতে বঞ্চিত ছিলেন, তখন রেণুর জন্মদিনে ভিখারী মেয়েদের কাপড় ব্লাউজ দান করিয়া কথঞ্চিৎ শান্ত হইতে চেষ্টা পাইয়াছেন। অল্প পরিচিত লোকের নিকট নিজেকে 'রেণুর মা' বলিয়া পরিচিত করিয়াছেন। অথচ এইভাবে তাঁহার অন্তরের জননী কোনমতেই খুসী হইতে পারে নাই। যৌবনের শেষ সীমায় দাঁড়াইয়া নিজের বিগত জীবন স্মরণ করিয়া নিজেকে নিতান্ত ঘৃণিত তুচ্ছ বলিয়া মনে করিয়াছেন, পৃথিবীর উপর তাঁহার একটা বিতৃষ্ণা আসিয়া গিয়াছিল, তখন সেই সময়ে তিনি তৃতীয় পুরুষ বিমলবাবুর দর্শন পাইয়াছিলেন। বিমলবাবুও বয়স্থ। তিনি শান্ত প্রকৃতির, স্বল্পভাষী ও কুমার, তাঁহার পৃথিবীব্যাপী বাণিজ্য ছিল, অথচ আপন বলিতে সংসারে কেহই না। যৌবনে বহু নারীর সংস্পর্শেই তিনি আসিয়াছিলেন, কিন্তু অন্তর দিয়া গ্রহণ করিবার উপযুক্ত কোন নারীকেই তিনি দেখেন নাই। রমণীবাবুর বন্ধু হিসাবে বিমলবাবুর সহিত সবিতার প্রথম সাক্ষাৎ হয় এবং পরে উভয়ে উভয়ের অন্তরকে চিনিবার সুযোগ পান। সবিতার ইদানীন্তনের অবমানিত, আশাহীন মন পুনরায় শান্তি ও আশার বাণী শুনিতে পায়। সবিতা যখন ম্লান হইয়া বলিল যে, তাহার আর অবশিষ্ট কিছুই নাই, তখন বিমলবাবু পতিতা সম্বন্ধে আধুনিক উদার মতবাদ ব্যক্ত করিয়া বলিয়াছিলেন (পৃঃ ৩৫২) 'মানুষের যা কিছু মর্য্যাদা জীবনের কোন একটা আকস্মিক দুর্ঘটনায় নিঃশেষে ভস্ম হয়ে যায় না। যতক্ষণ বেঁচে থাকে মানুষ, ততক্ষণ তার সবই থাকে। কোন কিছুই ফুরিয়ে যায় না'। ক্রমে ক্রমে ইহাদের উভয়ের মধ্যে মানসিক পরিচয় ঘনিষ্ঠতা লাভ করিতে থাকে। পার্থিব প্রেম ও কামজ মোহের মাদকতা ও জ্বালা ইহার এতদুভয়েরেই ভোগ বা দুর্ভোগ করিয়াছিলেন বলিয়াই অতি সহজে সেই দৈবগসমূহ এড়াইয়া অতীন্দ্রিয় শুদ্ধ প্রেমের আস্বাদনে সমর্থ হইয়াছিলেন। সবিতা এই ভালোবাসাকে প্রথমে যেন বিশ্বাস করেন নাই প্রশ্ন করিয়াছেন (পৃঃ ১৭৭), 'সংসারে যে লোক এত দেখেচে, আমার সব কথাই যে শুনেচে, সে আমায় ভালবাসলে কি বলে? বয়স হয়েচে, রূপ আর নেই—বাকী যেটুকু আছে, তাও দুদিনে শেষ হবে—তাকে ভালবাসতে পারলে মানুষ কি ভেবে'। এর উত্তরে বিমলবাবু বলেছিলেন, 'ভালবেসেই যদি থাকি নতুন-বৌ, সে হয়ত সংসারে অনেক দেখেছি বলেই সম্ভব হয়েছে। বইয়ে পড়া পরের উপদেশ মেনে চললে হয়ত পারতুম না। কিন্তু সে যে রূপ যৌবনের লোভে নয় একথা যদি সত্যিই বুঝে থাকেন আপনাকে কৃতজ্ঞতা জানাই'।

কামভীতা, সংসারপ্রয়াসী সবিতা সেদিনই বিমলবাবুকে অকপটে গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহাই সাহিত্যে বর্ণিত Platonic love বা দেহ-কামনাবিরহিত (পৃঃ ৩৭৬) অতীন্দ্রিয় প্রেম। এই প্রেমের শিক্ষা উভয়েই আপন আপন অতীত জীবনের গ্লানি ও অভিজ্ঞতা হইতে লাভ করিয়াছে কিন্তু কোথা হইতে কতটুকু শিক্ষা করিয়াছে তাহা বিশ্লেষণের দ্বারা নির্ণয় করা সম্ভব নয় বলিয়া বিমলবাবু এক কথায় বলিয়াছেন (পৃঃ ১৭৫) 'ক্লাসে প্রহরে প্রহরে মাষ্টার বদল হয়েছে, তাদের কাউকে বা মনে আছে, কাউকে বা মনে নেই, কিন্তু হেড্‌মাষ্টার যিনি আড়াল থেকে এদের নিযুক্ত করেছেন তাঁকে ত দেখিনি, কি কোরে তাঁর নাম কোরব বলুন,' অর্থাৎ বিমলবাবুর মতে এ শিক্ষা যেন বিশ্বনিয়ন্তার দান। বিমলবাবু এই অতীন্দ্রিয় প্রেমের কারণও এইভাবে নির্ণয় করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন (পৃঃ ৩৫৪) 'তোমার জীবনের ইতিহাস আজ আমার নিজের জীবনের ক্ষোভ ভুলিয়ে দিয়েছে সবিতা। সংসারে আমারই অনুরূপ অনুভূতি ঘটেছে এমন মানুষ এই প্রথম দেখলাম, সে তুমি… অনুভূতির ক্ষেত্রে তুমি আমি একই জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছি। হয়ত এইজন্যই তোমার অন্তরের সাথে আমার অন্তরঙ্গতা যা সম্ভবপর ছিল না, তা সম্ভব শুধু নয়, সহজও হয়েছে।

সবিতা ও বিমলবাবুর অতীন্দ্রিয় প্রেমের বিকাশ ও পরিণতি গ্রন্থকার বড় সুন্দরভাবে দেখাইয়াছেন। এই সহজ ভালবাসায় (পৃঃ ৩৪৭) 'দুঃখের পীড়নে বিচলিতা, অতীত বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ ভাবনায় কাতরা আত্মচিন্তায় আত্মহারা' সবিতার জীবন এমনই এক মাধুর্য্যে পরিপ্লুত হইয়া গিয়াছিল যে, মনে হইল সবিতা যেন নূতন জীবন লাভ করিল। এই সময় হইতে সবিতা বিমলবাবুকে বন্ধুভাবে নাম ধরিয়া ডাকিবার অধিকার দিয়া দিল। ইহারও কিছুদিন পরে আরও ঘনিষ্ঠতর হইয়া সবিতা একদিন অকপটে স্বীকার করিয়া বলিল (পৃঃ ৩৫২), 'তোমাকে আমি বিশ্বাস করি, আমার মনে হয় সংসারে বুঝি কোন মেয়েই এমন করে কোনও নিঃসম্পর্কীয় পুরুষকে বিশ্বাস করতে পারে নি'। বিমলবাবুও ভাবগাঢ়কণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন (পৃঃ ৩৫৪), 'দেখ সবিতা, আর যার কাছে যাই হও, আমার জীবনে পরম কল্যাণরূপিণী তুমি। একথা মিথ্যা নয়। জীবনে ঘটেছে আমার বহু বিচিত্র নারীর সাক্ষাৎ, কিন্তু তোমার সাথে হোল সন্দর্শন। আমার মধ্যে যে সত্যি মানুষটি এতকাল ঘুমিয়েছিল, তুমিই তার ঘুম ভাঙ্গিয়ে জাগিয়ে তুললে'। উপন্যাসবর্ণিত এই প্রেম যেন চণ্ডীদাসবর্ণিত বিশুদ্ধ সহজিয়া প্রেমের মূর্ত্ত বিকাশ।

বিমলবাবু ও সবিতার এই প্রেমের শেষ পরিণতিতে গ্রন্থকার দেখাইয়াছেন যে, এই প্রেমের কোন মাদকতা নাই, কোন জ্বালা নাই, এখানে পার্থিব বিচ্ছেদ ও মিলনে কোনই পার্থক্য নাই, পরিণত বয়সের শুদ্ধ প্রেম দুঃখলেশহীন, সদানন্দময়। সবিতা বিমলবাবুর সহিত তীর্থ যাত্রা করিতে মনস্থ করায় বিমলবাবু তাঁহাকে লইয়া বহুস্থানে ভ্রমণ

করিলেন। বৃন্দাবনে আসিয়া সবিতা বলিলেন (পৃঃ ৪১০), 'তুমি আর কতদিন এখানে থাক্‌বে'। বিমলবাবু নিস্পৃহভাবে বলিলেন, 'যতদিন বলো'। সবিতা বৃন্দাবনেই রহিয়া গেলেন, বিমলবাবু বিদায় লইয়া চলিয়া গেলেন। আর কখনও সবিতার সহিত সাক্ষাৎ হইবে কি না ঠিক নাই, কিন্তু এই অবস্থায় সবিতাকে পত্র লিখিলেন (পৃঃ ৪১৩), 'আমি পৃথিবী ভ্রমণে চলিয়াছি। তোমার প্রতি বিন্দুমাত্র দুঃখ বা ক্ষোভ অন্তরে রাখিয়াছি এ সন্দেহ করিও না…তোমার প্রতি গভীর সহানুভূতি ও অসীম শ্রদ্ধা অন্তরে লইয়া তোমা হইতে বহুদূরে সরিয়া চলিলাম…যেদিন যখনই যে-কোন কারণে আমাকে তোমাদের প্রয়োজন হইবে টমাস কুক কোম্পানীর কেয়ারে টেলিগ্রাম করিয়া দিও ; জীবিত থাকিলে পৃথিবীর যে-কোন প্রান্তেই থাকি বিমানযোগে সত্বর প্রত্যাবর্ত্তন করিব। আর ইহাও জানি, এমন একজন মানুষ পৃথিবীতে রহিল, আমার শেষদিন সমাগত হইলে যে সকল বাধা তুচ্ছ করিয়া আমার পার্শ্বে উপস্থিত হইতে পারিবে'। গ্রন্থ শেষে গ্রন্থকার যেন এই সত্যই প্রচার করিলেন যে, কামজ প্রেম কামান্তে ঘৃণার উদ্রেক করে, অতীন্দ্রিয় প্রেম স্বর্গীয় বস্তু, আত্মার উপরেই তাহার প্রভাব, কিন্তু একমাত্র দাম্পত্য প্রেমই পৃথিবীতে স্থায়ী হয়। পৃথিবীর সাধারণ লোক ইহাই বুঝে এবং অন্য কিছু ঠিক ভাবে গ্রহণ করিতে পারে না। এমন কি বিমলবাবুর সহিত প্রথম পরিচয়ে সবিতাও সাধারণভাবে বলিয়াছিলেন (পৃঃ ১৮১), 'আমার বাপের বাড়ীতে যখন ছোট ছিলুম তখন কেন আসোনি বলত'। বিমলবাবু হাসিয়া উত্তর দিয়াছিলেন, 'তার কারণ আমাকে আজ যিনি পাঠিয়েছেন, সেদিন তাঁর খেয়াল ছিল না…কিন্তু এম্‌নি করেই বোধ করি সে বুড়োর বিচিত্র খেলায় রস জমে ওঠে'। স্রষ্টারূপে গ্রন্থকার বাস্তবিকই যে বিচিত্র রস জমাইয়াছেন, তাহা পাঠককে শুধু আনন্দ দেয় না, সমগ্র পরিবেশটি নিবিড় ও রসঘন করিয়া পাঠকের অন্তরকে নব নব চিন্তার ইঙ্গিত দিয়া সমৃদ্ধ ও পূর্ণ করে।

* * * * *

শেষের পরিচয় গ্রন্থের নায়ক ব্রজবাবু সম্বন্ধে একটু বিশদ আলোচনা প্রয়োজন, কারণ ব্রজবাবুকে হৃদয়ঙ্গম করা সহজ নহে। তাঁহাকে প্রথমেই আমরা ধর্ম্মভীরু ও সত্বগুণাদর্শ বলিয়া নির্ণয় করিয়াছি। ধর্ম্মভীরু শব্দটির ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন নাই, সত্বগুণাদর্শ অর্থে আমরা বলিতে চাই যে, ব্রজবাবু সেই লোক, যাঁহার জীবনের আদর্শ হইতেছে সত্বগুণ। তিনি গোবিন্দের সেবা করেন, প্রকৃত বৈষ্ণব হইবার জন্য মনে প্রাণে সাধনা করেন, এই সাধনায় তিনি অনেকাংশে সফলও হইয়াছেন, তবে পূর্ণ সিদ্ধি এখনো লাভ করিতে পারেন নাই। আপাতঃদৃষ্টিতে বলা যায়, ব্রজবাবু দুর্ব্বল, যখন যাহাদের নিকট থাকেন তখন তাহাদের নিকটই অসহায়ভাবে আত্মসমর্পণ করিয়া বসেন। একাধিক নারীর তিনি পাণিগ্রহণ করিয়াছেন কিন্তু স্ত্রীর উপযুক্ত মর্য্যাদা বা সম্মান তিনি কাহাকেও দিতে পারেন নাই। স্ত্রী সম্বন্ধে তিনি বিশেষ যত্নবান ছিলেন না। দূর সম্পর্কের আত্মীয়েরা সবিতার নামে কুৎসা রটনা করায় অভিমানী সবিতা যখন গৃহত্যাগ করিলেন তখন ব্রজবাবু জোর করিয়া স্ত্রীকে ফিরাইয়া আনিতে পারেন নাই অথচ দেশের বাড়ীতে গ্রামের লোকেরা যখন আপত্তি করিয়া বলিয়াছিল যে, গোবিন্দজীকে নিজ মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত করিলে পতিতার কন্যা রেণুকে ভোগ রাঁধিতে দেওয়া হইবে না, তখন পাছে কন্যার মনে দুঃখ হয় এই আশঙ্কায় ব্রজবাবু গোবিন্দজীকে মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত না করিয়া বাহির বাটীতেই রাখিয়াছিলেন। বলা যায় যে, ব্রজবাবু বৈষ্ণব হইয়া কেবল সবিতার বিষয়েই নির্লিপ্ত ছিলেন কিন্তু রেণুর মৃত্যুতে (পৃঃ ৫০৯) সংযম সাধনা ও ভগবদ্‌জ্ঞান ভুলিয়া শিশুর ন্যায় কাঁদিয়া মাটিতে লুটাইয়া পড়িয়াছিলেন। এই সব নানা দিক দিয়া ব্রজবাবুর খর্ব্বতা অনুমিত হইতে পারে। কিন্তু আমাদের মনে হয়, এত সহজে ব্রজবাবুকে বিশ্লেষণ করিলে তাঁহাকে আমরা চিনিতে পারিব না।

ব্রজবাবুকে দেখিতে গেলে একথা মনে রাখা প্রয়োজন যে, যৌবনে তিনি একজন বড় ব্যবসায়ী ছিলেন। সে হিসাবে তাঁহার বুদ্ধি, কর্ত্তব্যনিষ্ঠা, হিতাহিত নির্ণয় করিয়া কর্ত্তব্য সম্পাদন করিবার ক্ষমতা, লোক-চরিত্রে অভিজ্ঞতা এ সমস্তই ছিল। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ব্রজবাবু ক্রমে যে ধীরে ধীরে অর্থের মোহ কাটাইয়া পরমার্থের দিকে ঝুঁকিয়াছিলেন, গ্রন্থকার সেই পরিবর্ত্তনের সন্ধিক্ষণটি পাঠকের নিকট হইতে উহ্য রাখিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার পূর্ব্ব ক্ষমতার কিঞ্চিৎ আভাস আমরা পাইয়াছি। আত্মার উন্নতি লক্ষ্য করিয়া ধর্ম্মের পথে গমন করাই যেদিন তিনি সাব্যস্ত করিয়া ফেলিয়াছিলেন, সেইদিন হইতেই পরের দেনা-পাওনা শোধ করিবার জন্য তিনি ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। বৃদ্ধ বয়সে আয়ের পথ বন্ধ হইবার পরও এবং একমাত্র অনূঢ়া কন্যার পূর্ণ ভার নিজের উপর থাকা সত্ত্বেও যথাসর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া যাহার যাহা কিছু পাওনা আছে সকলকে কড়ায় গণ্ডায় মিটাইয়া দিতে পারে কয়জন? তাঁহার এই একমাত্র কার্য্যই তাঁহাকে কর্ত্তব্যনিষ্ঠ, শক্তিমান ও নিজের বিবেকের কাছে অটল বলিয়া প্রমাণিত করে।

সবিতা সম্বন্ধেও ব্রজবাবু যে ব্যবহার করিয়াছেন, তাহা হইতেও ব্রজবাবুর সুবিবেচনা ও শক্তিমত্তার সম্যক্ প্রমাণ পাওয়া যায়। ব্রজবাবু জানেন যে তিনি সমাজে বাস করেন, সে হিসাবে তাঁহার দুইটি পৃথক সত্তা আছে, একটি ব্যক্তিগত ব্রজবাবু অপরটি সামাজিক ব্রজবাবু। সামাজিক ব্যক্তি হিসাবে ব্রজবাবু দয়াশীল, পরোপকারী, সংসারে সকলের বন্ধু এবং কাহারও অন্তরে পাছে কোন আঘাত লাগে এই আশঙ্কায় সর্ব্বদাই তটস্থ। সবিতা যখন অনাথ বালক রাখালকে আনিয়া গৃহে স্থান দিয়াছিলেন, তখন ব্রজবাবু কোনরূপ আপত্তি করেন নাই ; সেইরূপ বহু আত্মীয়কেই সংসারে স্থান দেওয়া হইয়াছিল। এই আত্মীয়গণই যখন সবিতাকে হীন প্রতিপন্ন করিল এবং সবিতা যখন আত্মমর্য্যাদাকে নষ্ট করিয়া হীন ভিখারীর ন্যায় সংসারে না থাকিয়া তেজস্বিনীর ন্যায় গৃহত্যাগ করিয়াছিল, তখনও ব্রজবাবু কাহাকেও কিছু বলেন নাই এই কারণে যে আমাদের দেশে বিলাতী family বা স্বামীস্ত্রীর সংসার চলে না। এখানে গৃহিণীর উপর গৃহস্বামীর যতটা অধিকার, বাড়ীর অন্যান্য পরিজনদের অধিকার তদপেক্ষা কম নয়, হয়ত বা বেশী। ব্রজবাবু দেখিলেন যে, গৃহের সমস্ত পরিজনই যদি সবিতার উপর বিরূপ হয় এবং সবিতাই যদি স্বেচ্ছায় গৃহত্যাগ করেন তাহা হইলে তাঁহার বলিবার কিছুই নাই। তবে একটু বিচলিত হইয়াছিলেন শিশুকন্যা রেণুর কথা চিন্তা করিয়া। সেটা স্বাভাবিক। কিন্তু নিঃশব্দে এইভাবে বর্জ্জন করায় ব্রজবাবু কি বিপুল স্বার্থই না ত্যাগ করিয়াছেন! সমাজের নিকট অপরাধী সবিতাকে সামাজিক ব্রজবাবুর পরিত্যাগ করা হিন্দুর আদর্শ রাজা রামচন্দ্রের সীতাকে বনবাস দিবার মতোই মহনীয়। বাহ্যিক কঠোরতায় অন্তরকে নিষ্পেষণ করিয়া সবিতাকে দূরে ঠেলিয়া রাখিতে তাঁহার যে কষ্ট হইয়াছিল, সে প্রমাণ আমরা একবার মাত্র পাই ১২৬ পৃষ্ঠায়, 'ব্রজবাবু হঠাৎ চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিলেন, কিন্তু তৎক্ষণাৎ আত্মসংবরণ করিলেন'। সমাজে তিনি কোন অন্যায় আদর্শ স্থাপন করিতে পারিবেন না বলিয়াই নিজের ইচ্ছা সত্ত্বেও সবিতাকে কঠোরভাবে দূরে রাখিয়াছিলেন। পরবর্ত্তীকালে সবিতা একাধিকবার তাঁহাকে গ্রহণ করিবার প্রার্থনা করায় ব্রজবাবু বরাবরই একই উত্তর দিয়াছেন, বলিয়াছেন (পৃঃ ১৩২) 'এর মধ্যে আছে সংসার সমাজ পরিবার, আছে সামাজিক রীতিনীতি, আছে লৌকিক পারলৌকিক সংস্কার, আছে মেয়ের কল্যাণ অকল্যাণ মানমর্য্যাদা, তার জীবনের সুখ-দুঃখ'। কিন্তু নিজের কথা একবারও বলেন নাই, কারণ নিজে তিনি ব্যক্তিগতভাবে সবিতাকে ক্ষমা করিয়াছিলেন। এ কথার প্রমাণ স্বরূপ আমরা দেখিতে পাই যে, যখন ব্রজবাবু সমাজ পরিত্যাগ করিয়া বৃন্দাবনে বৈরাগী জীবন যাপন করিতেছিলেন, তখন যখন সবিতা তাঁহার সেবা করিবার অনুমতি চাহিয়াছিলেন, সেই সময় তিনি সবিতাকে কাছে

রাখিতে এতটুকুও দ্বিধা করেন নাই। এদিকে সবিতার কুলত্যাগের পর ব্রজবাবু যে বিবাহ করিয়াছিলেন তাহাতেও শুধু সংসার পালনই একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল। এ-যেন রামচন্দ্রের স্বর্ণসীতা পরিগ্রহণ। এ বিষয়টি সবিতাও ভালোরূপে জানিতেন। কথাপ্রসঙ্গে তিনি সারদাকে বলিয়াছেন (পৃঃ ৩৩৩), 'উনি বিবাহ করেছেন ওর গোবিন্দেরই জন্য'। ব্রজবাবুর জীবনে দেখা যায় যে তিনি হিন্দুশাস্ত্রবর্ণিত প্রাচীন আদর্শকে লক্ষ্য করিয়া চলিতেন। ইহা তাঁহার জীবনে সহজ ও স্বাভাবিক হইয়া গিয়াছিল এবং ধর্ম্মজগতের ছাত্র হিসাবে নিছক শুচিত্যাশুচিত্যের বিচার করিয়াই তাঁহার সকল কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতেন। অনূঢ়া ও পাপ সম্বন্ধে অনভিজ্ঞা কন্যাকে ভোগ রাঁধিবার অধিকার হইতে বঞ্চিত না করিয়া দেবতাকে মন্দিরে লইয়া না যাওয়ায় সেই শক্তিই বিশেষভাবে ফুটিয়াছে। কন্যা জন্মগ্রহণ করিবার পরবর্ত্তীকালে মাতার অপরাধে কন্যাকে অপরাধী করা অন্যায় বলিয়াই তিনি এই অন্যায়ের সমর্থন করেন নাই, উপরন্তু নাবালিকার নিষ্পাপ মনে পাছে কোন কাল্পনিক গ্লানি আসিয়া তাহাকে আবিল করে এই আশঙ্কাও যে ছিল না, তাহা নহে। ব্রজবাবুর এই শক্তিমত্তার পরিচয় পাই উন্মাদবংশীয় পাত্রের সহিত রেণুর বিবাহ সম্বন্ধ কাটাইয়া দেওয়াতে। তৃতীয় পক্ষের শ্যালক হেমন্তের মতের বিরুদ্ধে যাওয়া যে কি ভয়ানক ব্যাপার, তাহা রাখালের কথা হইতেই আভাস পাওয়া যায়, কিন্তু সেই কাজই ব্রজবাবু উচিত বলিয়া করিয়াছিলেন। এই সব বিষয়ের উল্লেখ করিয়া শরৎচন্দ্রের ভাষায় বলা যায় (পৃঃ ১৬৬), 'এই নিরীহ শান্ত মানুষটি যে এত কঠিন হইতে পারে, পূর্ব্বে একথা সবিতা কবে ভাবিয়াছিলেন'।

ব্যক্তিগতভাবে ব্রজবাবুকে সবিতার সম্পর্কে আলোচনা করিলে দেখা যায়, তিনি মনে প্রাণে কত উদার ছিলেন। তেরো বৎসর পরে কুলত্যাগিনী স্ত্রীর সহিত প্রথম সাক্ষাতেই তিনি এমনভাবে কথা কহিলেন যে, তাহাতে নিঃসন্দেহে বুঝা যায়, তাঁহার মনে কোন ক্ষোভ, অসূয়া বা ঘৃণার লেশমাত্রও ছিল না। সবিতাকে তাঁহারই দেওয়া অর্থসম্পদ তিনি যেন অছির ন্যায় রক্ষা করিয়া আসিতেছিলেন। 'ভট্‌চাযি্য মশায়ের ছোট মেয়েকে মোটা বিছে হার' দেওয়ার ব্যাপারে দেখা যায় যে সবিতার প্রত্যেকটি ইচ্ছা পূরণ করিবার জন্য তাঁহার কি ব্যগ্রতা। 'পাছে স্বামীর অভিশাপে সবিতার কষ্ট বাড়ে (পৃঃ ৪১) এই ভয়ও ব্রজবাবুকে পীড়া দিয়াছে। তৃতীয় পক্ষের শ্যালকের সহিত তুলনা করিয়া তিনি বলিয়াছেন (পৃঃ ৩৮) 'তারা শুনবে কেন···তারা ত পর, কিন্তু তুমিই কি কখনো আমার কথা শুনেছ? অর্থকষ্টে ও দুঃখের মধ্যে রোগশয্যাতেও ব্রজবাবু অকপটে বলিতেছেন (পৃঃ ২৮৯), 'তুমি ওদের (সবিতাকে) চেন না রাজু···নতুনবৌয়ের মত তেজস্বিনী, সৎপ্রকৃতির ও সৎচরিত্রের মেয়ে সংসারে অতি অল্পই হয়। এটা আমি যত ভাল করে জানি, এত আর কেউ জানে না। সবিতার উপর ব্রজবাবুর যে কত অগাধ বিশ্বাস ছিল তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় তেরো বৎসর পরেও সবিতার উপর ব্রজবাবুর নির্ভরশীলতা হইতে। ব্রজবাবু সদ্‌ব্রাহ্মণ ছাড়া অপরের স্পৃষ্ট অন্নব্যঞ্জন গ্রহণ করিতেন না বলিয়া কোন পাচক সংগ্রহ করিতে পারেন নাই শুনিয়া সবিতা বলিয়াছিলেন (পৃঃ ৩২১), আমি যদি কাউকে ধরে এনে বলি, রাখবে মেজকর্ত্তা: ব্রজবাবু বলিয়াছিলেন, নিশ্চয় রাখ্‌বো, কারণ যে যাই করুক, তুমি যে বুড়ো মানুষের জাত মারবে না তাতে সন্দেহ নেই। অন্যত্র যখন সবিতা ব্রজবাবুর সংসারে পুনঃ প্রবেশ করিবার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করিয়া বলিলেন—আমি জোর করে বাড়ীতে বসে থাকলে তুমি কি করবে, তখন ব্রজবাবু সহসা কিছু ঠিক করিতে না পারিয়া বলিয়াছিলেন (পৃঃ ৩৩২), 'এত বড় জিজ্ঞাসার জবাব তুমি ছাড়া কে দেবে বলত? আমার বুদ্ধিতে কুলুবে কেন?···কি করা উচিত আমি ত জানিনে নতুনবৌ, তুমিই বলে দাও।

ধর্ম্মজগতে আত্মার উন্নতির জন্য সাধককে প্রথম অবস্থায় বহু ত্যাগ ও দুঃখ স্বীকার করিয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে হয়। উপন্যাসবর্ণিত ব্রজবাবু এই কৃচ্ছ্রের পথ দিয়েই এই সময় অগ্রসর হইতেছিলেন। ব্রজবাবু যে স্তরে উঠিয়াছিলেন তাহা সাধকের পর্য্যায়ে নহে অথচ সাধারণ সংসারী হইতে কিছু উপরে। এ সময়ে তিনি সবিতার নিকট হইতে দান গ্রহণ করিতে প্রস্তুত, কিন্তু দানগ্রহণের প্রয়োজন আছে বলিয়া নহে (পৃঃ ১৩৫), 'শুধু সবিতার দান হাত পেতে নিয়ে পুরুষের শেষ অভিমান নিঃশেষ করে তৃণের চেয়েও হীন হয়ে সংসার থেকে বিদায় হবার জন্য—একথা বলার তাৎপর্য্য এই যে, পুরুষের অভিমান, অহংজ্ঞান এ সমস্ত তখনও পর্য্যন্ত তাঁহার মধ্যে পূর্ণ মাত্রায় ছিল, তবে তিনি এগুলির হাত হইতে অব্যাহতি পাইবার চেষ্টা করিতেছিলেন। অন্যত্র দেখি, তিনি শ্রীকৃষ্ণকে সমস্তই অর্পণ করিয়া বসিয়াছেন (পৃঃ ৩৬২), কিন্তু তবুও সাংসারিক সংস্কারবশে কন্যাদায়ের চিন্তায় বুদ্ধিবৃত্তি এতই ঘোলাটে করিয়া ফেলিয়াছেন যে, পাগলের মত বিমলবাবুর সহিত রেণুর বিবাহসম্বন্ধ আনিতেছেন। বৃন্দাবনে গিয়া মুখে বলিতেছেন (পৃঃ ৪০০), এখানে সবই তুঁহু তুঁহু'—কিন্তু একমাত্র কন্যার মৃত্যুতে শিশুর ন্যায় কাঁদিয়া ফেলিয়াছেন। রজগুণসম্পন্না সবিতা রেণুর শবদেহ দেখিয়া আত্মসংযমের দ্বারা নিজেকে সংবরণ করিয়াছিলেন, কিন্তু সত্ত্বগুণের সরল পথে যাহার গতি সেই ব্রজবাবু নিজের মনকে সকলের কাছে অকপটে অনাবৃত করিতেই অভ্যস্ত ছিলেন বলিয়া অন্তরের শোক যথাযথভাবে প্রকাশ করিয়াছেন। সবিতা অবশ্য রজগুণের অট্টালিকা হইতে ব্রজবাবুর এই সত্ত্বগুণের উন্মুক্ত মাঠকে সব সময় শ্রদ্ধার চক্ষে দেখেন নাই। রাগ করিয়া একবার বলিয়াছেন (পৃঃ ৩৬৩), 'আমার স্বামীর মতো আত্মসর্ব্বস্ব মানুষ সংসারে অল্পই আছে। নিজের স্ত্রী, নিজের সন্তানের উপরও যে মানুষ অচেনার মতো উদাসীন, এমন মানুষের কী প্রয়োজন ছিল বিবাহ করার'! বৃন্দাবনে ব্রজবাবু যখন বলিয়াছিলেন (পৃঃ ৩৯৯), 'আমার শেষের দিনগুলো গোবিন্দ তাঁর চরণছায়ায় টেনে এনে বড় করুণাই করেছেন. তখন সবিতা বিরক্ত হইয়া উত্তর দিয়াছে, 'এ যে তোমার রেসে হেরে সর্ব্বস্বান্ত হয়ে মদের নেশায় মশগুল থাকা। শেষে সমগ্র ধর্ম্ম এবং তীর্থের উপরেই সবিতার নিদারুণ অভিমান আসিয়াছিল। বিরক্ত হইয়া তিনি বলিয়াছেন (পৃঃ ৪০৫), 'মানুষের হাতে গড়া এই পুতুল খেলার তীর্থে ঘুরে ঘুরে শুধু ঘোরারই নেশায় খানিক সময় কাটে মাত্র, অন্তরের প্রকাণ্ড জিজ্ঞাসার উত্তর মেলে না. ইত্যাদি। শেষে অবশ্য (পৃঃ ৪০৯), 'শোকজীর্ণ ব্রজবাবুর সেবার সকল ভার সবিতা নিজহস্তে গ্রহণ করিয়া অহোরাত্র সেই কাজের মধ্যেই নিজেকে নিমগ্ন রাখিয়াছিলেন। সহধর্ম্মিণীর মধ্যে যে মাতৃকারূপ আছে, এখানে যেন সেই করুণাময়ীর মুর্ত্তিই ফুটিয়া উঠিয়াছে। সমাজ ও সংসারমুক্ত ব্রজবাবুও এখন ইহা অকপটে গ্রহণ করিলেন, সবিতাকে দূরে রাখিবার কোন প্রয়োজন আর বোধ করিলেন না, কারণ বৃন্দাবনে বৈরাগীদের কোন নিয়ম নাই। বাস্তবিক, উপন্যাসে ব্রজবাবুর যে পরিচয় আমরা পাই, তাহা সাহিত্যে অভূতপূর্ব্ব। ইহা চন্দ্রশেখর হইতে অধিক বাস্তব এবং হারাণবাবু বা ঘনশ্যামের তুলনায় অধিক জটিল অথচ পূর্ণতর। প্রৌঢ় বয়সে শরৎবাবু এই প্রৌঢ় চরিত্রটি অপূর্ব্ব ভাবেই সৃষ্টি করিয়াছেন, তবে শেষের দিকে যদি এই চরিত্রের কোন ত্রুটী ঘটিয়া থাকে তবে তাহা দ্বিতীয় লেখিকার অসাবধানতার জন্য।

প্রধান তিনটি পুরুষ চরিত্র সংক্ষেপে আলোচনা করার পর ইঁহাদের নামগুলি সম্বন্ধে যে অনুমানটি স্বতঃই মনে উদয় হয়, তাহা উল্লেখ করা প্রয়োজন। রমণীবাবু ও বিমলবাবু এই দুই নামের দ্বারা শরৎবাবু যেন তাঁহাদের বৈশিষ্ট্য ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। রমণীবাবুর নাম রমণীমোহন, এ উপন্যাসে রমণীকে মুগ্ধ করাই তাঁহার কাজ। বিমলবাবুর নাম হইতেই দেখা যায়, যাঁহার মালিন্য বিগত হইয়া বর্ত্তমানে যিনি নির্ম্মল হইয়াছেন। ব্রজবাবু মনে প্রাণে ব্রজধামেরই মানুষ। তিনটি চরিত্রকেই শরৎবাবু সার্থকনামা করিয়া গড়িয়াছেন।

উপন্যাসে ইঁহাদের ছাড়া আরও কয়েকটি অপ্রধান চরিত্র আছে। তাহারা যথাক্রমে রাখালরাজ বা রাজু, তারক, রেণু, ছোটবউ ইত্যাদি। রাখাল বা রাজু সবিতা ও ব্রজবাবুর দ্বারা পালিত ও তাঁহাদের পুত্রস্থানীয়। তারক রাখালের বন্ধু, রেণু সবিতার কন্যা, সারদা সবিতার বাড়ীর একতলার ভাড়াটে ও ছোট বউ ব্রজবাবুর তৃতীয় পক্ষের স্ত্রী। রাখাল স্পষ্টভাষী ও পরোপকারী, কিন্তু স্বার্থান্বেষী নয়, তারক রাখালের মতো উদার নহে এবং স্বার্থের জন্য কাহারও খোসামদ করিতে, আশ্রয় ভিক্ষা করিতে বা ঘরজামাই থাকিবার হীনতা স্বীকার করিতেও পশ্চাদ্‌পদ নহে। সবিতার নিকট হইতে নানাভাবে উপকৃত হইয়া, সবিতার অন্নগ্রহণ করিয়া ও তাহারই বাটীতে বাস করিয়া রেণুর সহিত বিবাহ সম্বন্ধে তারক গম্ভীরভাবে বলিয়াছিল (পৃঃ ৩৭৩) 'ঐ মেয়েকে আমি আমার পিতৃবংশে কুলবধূরূপে গ্রহণ করিতে পারিনে। গরীব হতে পারি, কিন্তু মর্য্যাদাহীন এখনো হইনি'। অথচ এই লোকই মুখে পরম উদারতা দেখাইয়া বলিয়াছিল (পৃঃ ১৮৫), 'মানুষকে মানুষ ছোট ভাবে কি করে, তাই ভাবি। আমি কিন্তু মানুষের পরিচয় একমাত্র মানুষ ছাড়া জাত গোত্র কুলশীল দিয়ে আলাদা করে ভাবতে পারি নে'। রেণুর চরিত্র সামান্য দু'চার কথাতেই অনেকটা স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। সে তেজস্বী ও স্বল্পভাষী সুখে দুঃখে পিতার সমদুঃখভাগিনী। উপন্যাসে তাহার প্রয়োজনীয়তা আছে প্রথমতঃ সবিতার মাতৃত্বের উদ্বোধন করিবার জন্য, দ্বিতীয়তঃ ব্রজবাবুর সামাজিক কর্ত্তব্যবোধকে দৃঢ় করিবার জন্য। এই দুইটি কাজ শেষ করাইয়া অর্থাৎ প্রধান চরিত্র দুইটিকে সম্যক্‌ভাবে বিকশিত করাইয়া গ্রন্থকার রেণুকে তাহার অভিমান ও আত্মগরিমার সহিত এ পৃথিবী হইতে সরাইয়া দিয়া পাঠককে যেন স্বস্তিই দিয়াছেন।

উপরোক্ত তিনটি চরিত্রের তুলনায় সারদা চরিত্রটি অপেক্ষাকৃত অধিক অনুধাবনযোগ্য। প্লটের দিক দিয়া সারদার কোন প্রয়োজন নাই, কিন্তু সবিতা যে সমস্যার উদ্ভাবন করিয়াছিলেন, অর্থাৎ পতিতার মনে মাতৃত্ব এবং সংসারের তৃষ্ণা জাগিলে সে বর্ত্তমান সমাজে কিরূপে উহা ভোগ করিতে পারে এই সমস্যা সমাধানের জন্য সারদা অপরিহার্য্য।

সারদা বালবিধবা ও কুলত্যাগিনী। সে রাখালকে ভালবাসিল। রাখাল তাহাকে ঠিক যে ভালবাসিয়াছিল তাহা নহে, তবে করুণা করিত। শেষে সারদার আগ্রহাতিশয্যে রাখালের যেন তাহার উপর সামান্য মায়াও পড়িয়াছিল। কিন্তু তাহাকে বিবাহ করিয়া সংসার করিতে রাখালের তেমন কোন আগ্রহ ছিল না, বিশেষ করিয়া গোড়া হইতেই নারীজাতির উপর রাখালের কেমন একটা বিতৃষ্ণার ভাব ছিল। অথচ সবিতার ন্যায় সারদাও সংসার-সুখ পাইবার জন্য নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু সবিতা সংসারে থাকিতে পারে নাই; সর্ব্বগুণসম্পন্না হইয়াও কুলত্যাগিনী বলিয়া সবিতা সংসারসুখ ও মাতৃত্ব হইতে বঞ্চিত হইয়া যে মানসিক বুভুক্ষা ও হাহাকারের ভিতর দিয়া দিন কাটাইতে বাধ্য হইয়াছিল, পতিতা সারদা অল্পগুণসম্পন্না হইয়া ও রাখালকে লইয়া সংসার পাতিবার জন্য বিশেষ ব্যগ্র হইয়াও শেষে ইহার উপযুক্ত মিমাংসা করিয়া সমস্যার সমাধান করিয়াছিল। স্বচ্ছ বুদ্ধির উদ্রেক হওয়ার পরে রাখালকে সে আর স্বামীরূপে গ্রহণ করিতে চাহে নাই, বলিয়াছিল (পৃঃ ৩৯৩), 'কোন মেয়েই চায় না, তার নিজের সন্তানের কপালে বাপ মায়ের কোনরকম কলঙ্কের ছাপ থাকুক। যে জন্যেই হোক্, আর যার দোষেই হোক, একথা ত কোনদিন ভুলতে পারিনে যে, আমার জীবনে অশুচির ছোঁয়া লেগেছে। নিজের স্বামী পুত্রকে খাটো করে নিজে স্ত্রী হবো—মা হবো—এতবড় স্বার্থপর আমি নই। নাই বা পেলাম স্বামী, সন্তান, যাঁকে অন্তরের সঙ্গে ভালবাসি, ভক্তি করি, তাঁর সন্তান কি নিজের সন্তানের চেয়ে কম স্নেহের? তাঁর সংসার কি নিজের সংসারের চেয়ে কম আনন্দের'? সারদা আরও বলিয়াছিল, 'আপনি বিয়ে করুন। আপনার বৌকে আমি ভালবাসতে পারবো…সেই যে আমাকে সব দেবে। আপনার সংসার—আপনার সন্তান—আমার আনন্দের সকল অবলম্বন যে তারই হাত থেকে পাবো। আমার জীবনের সত্যিকারের সার্থকতা, সে যে তারই দান'! উপন্যাসে ইহাই সারদার শেষ কথা, এইরূপেই সে যেন সবিতা সমস্যার সমাধান করিয়া দিয়াছে।

* * * * *

আলোচনান্তে কয়েকটি বিষয় সংক্ষেপে উল্লেখ করা উচিত। প্রথমতঃ পুস্তকের নামকরণ 'শেষের পরিচয়' হইল কেন? উত্তরে বলা যায় যে, গ্রন্থখানি সর্ব্বাঙ্গীনভাবেই 'শেষের পরিচয়'। সবিতা জীবনে যাহাই থাকুন না কেন, মাতৃত্বই তাঁহার শেষের পরিচয়। অপর নারীচরিত্র সারদারও সেই একই মানসিক আকাঙ্ক্ষা। সবিতাকে দিয়া এটুকু আরও দেখা যায় যে, ভালবাসার সম্বন্ধ যাহার সহিত যেরূপই থাক না কেন, দাম্পত্য সম্বন্ধই শেষ পরিচয়। সামাজিকভাবে ব্রজবাবু যতই কঠোর হউন না কেন, মানুষ হিসাবে সবিতাকে তিনি মার্জ্জনা করিয়াছিলেন, এই উদার মহত্বই ব্রজবাবুর শেষের পরিচয়। সামান্য চরিত্রগুলির পক্ষেও গ্রন্থের এই নামকরণ সমানে প্রযোজ্য। ব্রজবাবুর তৃতীয় পক্ষের স্ত্রী অশিক্ষিতা ও দরিদ্রের কন্যা, ব্রজবাবুর দানেই এখন তাঁহার স্বচ্ছল অবস্থা। তাঁহার শেষের পরিচয় এই যে, তিনি ব্রজবাবুর নিকট বৃন্দাবনে একদিনের অপেক্ষা দুইদিন থাকিতে পারেন না, কারণ স্বামীর কাছে তাঁহার নিজের প্রয়োজন ফুরাইয়াছে, অথচ বাড়ীতে তাঁহার বহু কাজ। স্বার্থপর তারকের শেষের পরিচয় ধনীর সাহায্যে অর্থের দিক দিয়া বড়ো হওয়া, কিন্তু প্রতিদানের জন্য কোন ত্যাগেই সে সম্মত নহে। এইরূপে বিভিন্ন ঘাত-প্রতিঘাতের দ্বারা মানুষের অন্তরকে উন্মুক্ত করিয়া এই উপন্যাস তাহাদের শেষের পরিচয় নির্ণয় করিয়া দিয়াছে।

এই সূত্রে শরৎ সাহিত্যের প্রধান বৈশিষ্ট্যটুকুরও উল্লেখ করা যায়। গ্রন্থকার নানাবিধ চরিত্রের অবতারণা করিয়া সকলেরই ভিতর-বাহির বিচিত্ররূপে অঙ্কিত করিয়া শেষ পর্য্যন্ত দেখাইয়াছেন যে, একমাত্র রাখালেরই প্রথম এবং শেষের পরিচয়ে কোন পার্থক্য নাই। সে দরিদ্র, পরোপকারী অথচ নিজে কাহারও নিকট হইতে উপকার গ্রহণ করে না। সবিতাও শেষ পর্য্যন্ত বলিয়াছেন যে, রাখালের কিছু করিতে পারিলাম না (পৃ. ৩৮৫)। শরৎ সাহিত্যে ইহাই শাশ্বতভাবে পাওয়া যায়। উদ্দেশ্যহীন ও সহায়সম্পত্তিহীন ভবঘুরেদের শরৎবাবু বরাবরই বেশ একটু প্রীতির চক্ষে দেখিয়াছেন, তাহাদের অন্তরের মহিমাকে বিশেষভাবে উজ্জ্বল করিয়া ফুটাইয়া তুলিয়াছেন।

* * * *

বর্ত্তমান উপন্যাস সম্বন্ধে আমাদের একটি প্রশ্ন আছে। প্রশ্নটি ১৮ পৃষ্ঠায় সবিতার গৃহত্যাগ সম্বন্ধে উল্লেখ করিয়া তারকের মুখ দিয়া আসিয়াছে, 'একখানা ইংরিজি উপন্যাসের আভাস পাচ্ছি'। ইহার দ্বারা শরৎবাবু কি সত্যই কোন ইংরাজি উপন্যাসের কথা মনে করিয়াছেন? বাংলা সাহিত্যে পাশ্চাত্য প্রভাব লইয়া যাঁহারা আলোচনা করিয়া থাকেন, তাঁহারা কি এ সম্বন্ধে কোন হদিস্ দিতে পারেন? তবে আমাদের মনে হয়, ব্রজবাবু এমনই ভাবে বাংলার নিজস্ব চরিত্র এবং উপন্যাসের ঘটনা-বিন্যাস এমনই ভাবে আমাদের ঘরের জিনিষ যে, ইহাতে কোন অনুকরণ থাকা সম্ভব নহে। এই সূত্রে শরৎবাবুর ভাষাগত একটি প্রয়োগের উল্লেখ করিব। ১৮৮ পৃষ্ঠায় শরৎবাবু লিখিয়াছেন, 'এ যে চায়ের পেয়ালায় তুফান তুললে, সারদা'। এরূপ প্রয়োগ শরৎ সাহিত্যে কদাচিৎ দেখা যায়। এরূপ উৎকটভাবে ইংরাজীর অনুকরণ সেকালে রমেশচন্দ্র দত্তের গ্রন্থে স্থানে স্থানে পাওয়া যাইত, আর একালের 'অতি আধুনিক কন্টিনেন্টাল সাহিত্যের' ভক্তগণ তাহাদের প্রথম যৌবনের রচনায় মাঝে মাঝে লিখিয়া থাকেন। শরৎবাবুর কি বৃদ্ধ বয়সে অতি আধুনিকের ছোঁয়াচ লাগিয়াছিল নাকি?

* * * *

প্রবন্ধের প্রথমে বলিয়াছি শ্রীযুক্তা রাধারাণী দেবী গল্পাংশ ও চরিত্রগুলি যতদূর সম্ভব শরৎবাবুর অনুরূপ করিয়া লিখিয়াছেন, কিন্তু হইলে কি হয় ভাষার দিক দিয়া সামান্য পার্থক্য মাঝে মাঝে চোখে পড়ে। ইহা অবশ্য অপরিহার্য্য। উদাহরণস্বরূপ ২৩৭ পৃষ্ঠার 'ওজনান্তে', ২৭১ পৃষ্ঠার 'অমৃতোপম', ৩২৭ পৃষ্ঠার 'পরিপূর্ণ যৌবনের ইত্যাদি অনুচ্ছেদটি শরৎচন্দ্রের ভাষার ব্যর্থ অনুকরণ বলিতে হইবে। ২৫৩ পৃষ্ঠার প্রথমে লেখিকা যেরূপে কতকগুলি ফুট্‌কী দিয়া প্রসঙ্গ পরিবর্ত্তন করিয়াছেন, শরৎচন্দ্র ঐরূপ কিছুতেই করিতেন না, তিনি এরূপক্ষেত্রে নূতন একটি পরিচ্ছেদ আরম্ভ করিতেন। মোটের উপর বলা যায় যে, গল্পের একটি অস্পষ্ট ছন্দ আছে, প্রত্যেক মানুষের যেমন আবয়বিক বিভিন্নতা আছে, সাহিত্যেও সেইরূপ প্রত্যেক লেখকের কিছু না কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। সে হিসাবে একজনের রচনার সহিত অপরের রচনা জোড়াতালি দিলে সেলাইয়ের চিহ্নগুলি বর্ত্তমান থাকিবেই। তবে এক্ষেত্রে ইহা বিশেষ গৌরবের বিষয় যে, দুজনের রচনা একত্রিত হইলেও গ্রন্থ হিসাবে শেষের পরিচয় ক্ষুণ্ণ হয় নাই, চরিত্রগুলি যতদূর সম্ভব সুস্পষ্টই আছে, ঘটনাচক্রও কোথাও ব্যাহত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না।

*   *   *   *

পরিশেষে আর একটি বিষয়ের উল্লেখ করিব। আমার বিশ্বাস, গ্রন্থকারের সহিত গ্রন্থের সম্বন্ধ অচ্ছেদ্য, বিশেষ করিয়া শরৎসাহিত্য সম্বন্ধে এই কথাটি সমধিক প্রযোজ্য। শিক্ষা ও পাণ্ডিত্য দিয়া শরৎবাবু গ্রন্থ রচনা করিতেন না, তিনি তাঁহার উপলব্ধি, ভূয়োদর্শন ও অভিজ্ঞতা দিয়াই তাঁহার সাহিত্যকে প্রাণবন্ত করিতেন। সেই দিক দিয়া শেষের পরিচয় গ্রন্থকারের নিজেরও শেষের পরিচয়—ইহা তাঁহার পরিণত বয়সের চিন্তাধারাকে রূপায়িত করিয়া তুলিয়াছে। শরৎচন্দ্র শেষ বয়সে রাধাকৃষ্ণ-ভক্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন, শেষের পরিচয়ে ব্রজবাবুর গোবিন্দভক্তি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। আমার মনে হয় যে, দরদী লেখক নিজেকে বিভিন্ন মূর্ত্তিতে গ্রন্থের বিভিন্ন ভূমিকায় বসাইয়া দেন ; শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে এই অনুমান বিশেষভাবে সত্য। তাঁহার প্রথম জীবনের রচনায় যে সমস্ত নায়ক ছিল, তাহারা সকলেই তরুণ, যথা সুরেশ, মহিম, দেবদাস, রমেশ ইত্যাদি। মধ্যবয়সের রচনায় জীবানন্দই সমধিক প্রসিদ্ধ। শেষ বয়সের রচনায় আশুবাবু, ব্রজবাবু, বিমলবাবু ইহারা যেন শরৎচন্দ্রের মানস-মূর্ত্তিরূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে। এ দিক দিয়া শ্রীকান্ত যেন শরৎচন্দ্রের দর্পণস্থ প্রতিবিম্ব ! গ্রন্থকারের মানসিক পরিবর্ত্তন শ্রীকান্তের প্রতি পর্ব্বেই দেখিতে পাওয়া যায়। তাই মনে হয় যে, তিনি যেন নিজেকেই বিভিন্নরূপে চিত্রিত করিয়া পাঠকদের নিকট নিজেকে পরিবেশন করিয়াছেন। সেইজন্যই বোধ হয় প্রৌঢ় বয়সের রচনা এই শেষের পরিচয়ে তরুণ-তরুণীর তেমন কোন স্থান নাই। গ্রন্থের মধ্যে রাখাল, তারক, সারদা বা রেণু স্থান পাইলেও তাহারা নিতান্তই প্রচ্ছদপটের সামগ্রী। মূলতঃ এই উপন্যাসে শরৎচন্দ্র ব্রজবাবু, রমণীবাবু, বিমলবাবু ও সবিতা এই কয়টিকে বিশদভাবে অঙ্কন করিয়া যেন বুড়া বয়সের মনস্তত্ত্বই ফুটাইতে চাহিয়াছেন। আলোচ্য গ্রন্থখানির বিশেষত্ব এই যে, ইহাতে গ্রন্থকার পরিণত বয়সের তিনটি পুরুষ চরিত্র ও একটি নারী-চরিত্র বাংলা সাহিত্যিকে দান করিয়াছেন।

বিজয়া

শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

সর্ব্বশেষের প্রণামটি মোর তোমার তরে
সবার আগে বলেই সে যে সবার পরে
লজ্জাবতী লতার মত নুয়ে গেল তোমার পায়ে।
লুকিয়ে এলাম অনুপায়ে
তোমার কাছে এই নিরালায়
ওরা এখন ঘুমিয়ে গেছে ; এস বসি এই জানালায়
মুখোমুখী আজ দু'জনে—
জানি আমি মনে মনে
তুমি, শুধু তুমিই আছ বুকের মাঝে এ সংসারে,
তবু কেন বারে বারে
কেঁপে ওঠে ভীরু মনের ব্যাকুলতা
হঠাৎ যেমন খাঁচার পাখীর চঞ্চলতা
এলোমেলো হাওয়ায় ওঠে কেঁপে কেঁপে
বনের ছায়া মনের ছায়া বেপে।
জেগে ওঠে অনেক কালের হারাণ সুর
কি যেন তার হারিয়ে যাবে ব্যথায় বিধুর
অনেক চাওয়া অনেক পাওয়ার সাথে—
এমন অলক্ষণে কথাও মনে আমার জাগ্‌ছে এমন রাতে ?

শেষের বলে' শেষ নহে এ চিরকালের প্রণাম
নিবেদনের নির্ভরতায় তোমার পায়ে দিলাম
আজ বিজয়ায় জ্যোৎস্না রাতের মাঝে ;
শূন্য পূজা-মণ্ডপে ওই সাহানাতে সানাই বুঝি বাজে ?
আমার পূজা-মণ্ডপে ত পূজার কোনো নাইক আয়োজন,
নিত্যকালের আমার প্রয়োজন
তোমার পূজার, নীরব পূজার—একান্ত নির্জ্জনে ;
তাই ত আমার আবাহনে বিসর্জ্জনে
মন্ত্র পড়া অর্ঘ্য দেওয়ার নাইক মাতামাতি,
দেবতা তুমি, প্রিয় তুমি, প্রিয়তম এই জীবনের সাথী !
দেবতা বলে' প্রণাম করি, প্রিয় বলে জড়িয়ে ধরি বুকে
আশীর্ব্বাদী ফুল যে তোমার ছড়িয়ে পড়ে আমার চোখে মুখে
তোমার পূজার তোমার সেবার ব্রত
চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ তারার গতির-ছন্দে চলচে অবিরত।
আজকে তবু প্রণামটুকু ঘিরে
নূতন করে' জ্বালিয়ে দিলাম সন্ধ্যারতির প্রদীপটিরে
সবার থেকে অনেক দূরে, সবার পরে
আজ নিরালায় আমার ঘরে।

যাদৃশী ভাবনা যস্য—

(নাটিকা)

অধ্যাপক শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

পরিচয়

ডাক্তার ভবদেব বাঁড়ুয্যে ডাক্তার হরনাথ চাটুয্যে	বাল্যবন্ধু
রমেশ	এলাহাবাদ বাংলা স্কুলের শিক্ষক
রঞ্জন	হরনাথের পুত্র
বিপিন, অক্ষয়, ডাক্তার, যন্ত্রীসজ্ঘ, ভৃত্য প্রভৃতি	
তারাসুন্দরী	ভবদেবের স্ত্রী
টুলটুল	ঐ কন্যা

প্রথম অঙ্ক

ভবদেবের বহুবাজারের বাটী

বৃহৎ হলঘর, আধুনিক দেশী মতে সুসজ্জিত, অর্থাৎ গালিচার উপর সাটিন ও রেশমি ওয়াড় দেওয়া তাকিয়া ইতস্তত: বিক্ষিপ্ত—ফরাসের মাঝামাঝি প্রধানত বরের আসর—বৈদ্যুতিক ঝাড়ের কিয়দংশ দেখা যায়।

জনসমাগম বিশেষ হয় নাই—মনে হয় সকলেই যেন কন্যাপক্ষীয়, কারণ কাহারো হাতে বোকে বা গলায় ফুলের মালা নাই—বরের আসরের পশ্চাতে "অবৈতনিক যন্ত্রীসজ্ঘ" সুবিধা ও সুযোগমত সুর বাঁধছে, মধ্যে মধ্যে তবলার চাঁটিও শুনা যায়।

দুচারজন হাল্কা চেহারার ছোকরা, নেটের গেঞ্জি ও আণ্ডারওয়্যারের উপর ফিন্‌ফিনে ধুতি হাঁটুর উপর তুলে, খুঁটিনাটির ত্রুটি সংশোধন কোরে বেড়াচ্ছে ও ভৃত্যদের পান সরবৎ সরবরাহ করাতে সাহায্য করছে।

অন্দর হ'তে মাঝে মাঝে টুকরো টুকরো একতরফা একটা হাঁক ডাক ভেসে আসে—"একে বলে মোল্লার চকের দই—ঘোল করে মাথায় ঢালব ব্যাটাদের, আগে ন্যাঠা চুকুক"—কিংবা "এনেছ, বেশ করেছ", অথবা "গেল—গেল—গেল, হুঁকোটা গড়িয়ে একেবারে নর্দমায় গেল যে রে ব্যাটা" ইত্যাদি। নেপথ্যের উক্তিগুলি খুব ভাব ব্যঞ্জক না হলেও বক্তার মানসিক অবস্থা সম্বন্ধে দর্শকদের যা' হোক একটা কিছু ধারণা করে নিতে বিশেষ ক্লেশ পেতে হয় না।

এবম্বিধ হট্টগোলের মাঝে অক্ষয় ও বিপিনের কথোপকথন চলেছে।

বিপিন। ভবদেবের মতলবটা কি বল দেখি? মানুষটা ত একেবারে সেকালের, কিন্তু মেয়েকে শিক্ষা দীক্ষা দিয়েছে পুরোদস্তুর একালের মত। গান, বাজনা এমন কি সময়ে অসময়ে অযথা সিনেমা দেখান, কিছুই ত বাদ রাখেনি, অথচ বে দিচ্ছে পাঞ্জাবের এক বাঙালী ভূতের সঙ্গে। বাঙালা দেশে কি সুপাত্রের দুর্ভিক্ষ হয়েছে?

অক্ষয়। কথাটা ঠিক তা' নয় হে বিপিন। আসলে এই বিয়েটাকেই লক্ষ্য রেখে, ভবদেব তার মেয়ের শিক্ষাদীক্ষার এমনি ব্যবস্থা করেছে। তা' না হলে জানাইত, এদের সংসারে মানুষ হয়ে মেয়েটা শিখত কেবলমাত্র বুড়োবুড়ির দাম্পত্য কলহের রীতি এবং নীতিটুকু।

বিপিন। তা'ত দেখতেই পাই। ভায়াকে ত বছরে অন্তত:- পক্ষে দুবার পশ্চিম যেতে হয় গিন্নীর মানভঞ্জন করতে।

অক্ষয়। তা বুড়োবুড়ি নিজেরা যাই করুক মেয়েটিকে তাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার মূল মন্ত্রটুকু শিখতে দেয়নি। তা'র কারণ ঐ যা' বলছিলাম—মেয়ের এই বিয়ে দেওয়াটাই হচ্ছে ভবদেবের মোক্ষ।

বিপিন। পাত্র হিসাবে ছেলেটি কি এমনিই লোভনীয়?

অক্ষয়। এ ক্ষেত্রে লোভ বা লাভের প্রশ্ন কোনও পক্ষ থেকেই উঠছে না। এটা এদের ছেলেমেয়ের বিয়ে নয় হে, এ যেন ঠিক ভবদেবের সঙ্গে হরনাথেরই—হা:—হা:—

বিপিন। বল কি হে—

শশব্যস্তে ভবদেবের প্রবেশ—বেশ গোল গাল. চেহারা, বেঁটে, মাথায় চুলের বিশেষ বালাই নেই। ডাক্তারির আবশ্যক হয় না, পিতৃ-সঞ্চিত অর্থেই দিব্য সংসার চলে, পরণে দশহাতি ধুতি, অঙ্গে হাওড়া হাটের ফতুয়া, চরণযুগল পাদুকাবিহীন।

ভবদেব। এই যে বিপিন, অক্ষয়, তোমরা সব এসেছ— বা:—বেশ···বেশ—তা' তোমরা সব বাইরে কেন ভাই? ঘরের লোক, ওদিকে একটু দেখাশুনা না করলে—আমি একাও আর—

অক্ষয়। আমরা এইমাত্র এসেছি। বিপিনকে এই বিয়েব ইতিবৃত্তটার একটু আভাষ দিচ্ছিলাম।

ভবদেব। হে—হে—হে—তা' দেবে বই কি ভাই—আর কিই বা আভাষ দেবে, বলবার এমন আছেই বা কি—বন্ধুত্ব হে বন্ধুত্ব—মান, সম্ভ্রম, পদমর্য্যাদা, ঐশ্বর্য্য, কোনও কালেই বন্ধুত্বের সামনে মাথা উঁচু কোরে দাঁড়াতে পারে না। এটা তুমি মনে রেখো অক্ষয়, কুরুক্ষেত্রে পাণ্ডবেরা কোনও মতেই জয়লাভ করতে পারত না যদি না তার মূলে থাকত শ্রীকৃষ্ণের বন্ধুপ্রীতি। বলে কিনা ওসব আজকাল অচল—ক্ষেপেছ, যদি তাই হবে ত এত বড় দুনিয়াটা চলছে কি কোরে শুনি, তোমরা বলবে যুদ্ধ কোরে, ওটা বাহ্যিক হে, একেবারে বাহ্যিক—আমি লিখে দিতে পারি অক্ষয়, যুদ্ধটা হচ্ছে বন্ধুত্বেরই একটা রূপান্তর সুখ, শান্তি, স্বাচ্ছন্দ্য, এই সব স্থাপনের জন্যই যুদ্ধ—কিন্তু ঐ যা—ভুলে গেলুম—তোমরা যেন আমায় কি জিজ্ঞাসা করছিলে—

বিপিন। কই কিছু মনে পড়ছে না ত।

ভৃত্যের প্রবেশ

ভৃত্য। মা ঠাকরুণ বললেন যে এই নিয়ে আপনি তিন তিনবার ভাঁড়ারের চাবি হারিয়েছেন, তাই, হয় চাবি তাঁর কাছে পাঠিয়ে দিন, কিম্বা ভাঁড়ারের সামনে টুল নিয়ে আপনি নিজেই বসে থাকুন।

ভবদেব। শুনলে—তোমরা একবার গিন্নীর স্পর্দ্ধাটা দেখলে! বলগে যা'—তোর মাঠানকে, যে তাঁর ভাঁড়ার পাহারা দেবার দারোয়ান আমি নই—এরা এসেছে যা' করবার সব এরাই করবে—তোর বা তোর মাঠানের কথামত ভবদেব

বাঁড়ুয্যে চলে না। দু' মিনিট স্থির হোয়ে কথা কইব ছুটো—না অমনি "মাঠাকরুণ বললেন"—

অক্ষয়। আহা—হা—কাজের বাড়ীতে অমন করলে চলবে কেন? চলো আমরাই না হয় সব ঐদিকে যাই, গল্প ও কায দুই-ই চলবে।

ভবদেব। কথখনো নয়, তুমি বললেই আমি শুনব? এই ত তোমরা এলে, কোথায় একটু জিরুবে, তামাক খাবে—তা' নয় অমনি চলো। বলি, তোকে যে আমি তামাক দিতে বলেছিলাম তিন ঘণ্টা আগে, তা'র কি করেছিস্ শুনি—?

ভৃত্য। আজ্ঞে সেই জন্তেই ত মাঠাকরুণ চাবি চাইছেন। তিনি তামাকটাকে পুরাণ তেঁতুল মনে কোরে ভাঁড়ারে তুলে ফেলেছেন. আমি এদিকে কলকে সাজতে গিয়ে দেখি তামাকের হাঁড়িতে তেঁতুল।

ভবদেব। তোমরা সব শুনে রাখলে ত? পরে কিন্তু আর আমায় কিছু বলতে পারবে না। তা—মাণিক, এই সামান্ত কথাটা গোড়াতেই বললে পারতে, আমায় মিছি-মিছি এত বকে মরতে হোত না। এই নাও—

চাবি দিতে গিয়ে. চাবি খুঁজে পান না, ফতুয়ার যে কটা পকেট আছে তা'তে ত নেই-ই, এমন কি ট্যাকও শূন্য

এ্যা—তাই ত—তাই ত—দেখলে, কাণ্ডটা, একবার দেখলে—এও যেন আমারই দোষ—কী যে সব করে—

এদিক ওদিক খুঁজতে খুঁজতে তবলাটা পায়ে লেগে পড়ে যাচ্ছিলেন, তা সামলাতে গিয়ে আবার জলতরঙ্গের বাটী ওলটালেন

এ-হে-হে, খেয়ালই ছিল না, কিছু মনে কোরো না ভাই, তোমার বাটীটা ভেঙ্গে ফেলেছি নাকি? ভাঙ্গে নি—? যাক্—তোমরা তা'হলে ততক্ষণ একটু—ও: আর একটু জল চাই?—(ভৃত্যকে) হাঁ কোরে দেখছিস কী? একটু জল এনে দিয়েও উপকার কোরতে পার না? না, তাও আমাকেই—

ভৃত্যের প্রস্থান

হ্যাঁ. কি বলছিলাম—? ও—বাজনা—বাজনা, তুমি জান না বিপিন কি সুন্দর এই ছেলেরা সব বাজায়! এই বুড়ো বয়সে আমারই যেন—

বিপিন। তা' বুঝতে পারছি—কিন্তু আর নেচে কায নেই। চাবিটা না পাওয়া—

ভবদেব। ও হো হো হো, ঠিক বলেছ, চাবিটা—চাবিটা না পাওয়া গেলে বড়ই যেন—

প্রস্থান

ঐক্যতান বাদন আরম্ভ হ'ল

বিপিন। অদ্ভুত! তাই মনে হয় এই নিরীহ মানুষটি শেষে বিয়ে নিয়ে একটা ফ্যাসাদে না পড়ে।

অক্ষয়। সে আশঙ্কা অন্ততঃ হরনাথবাবুর দিক থেকে কিছু নেই। লাহোরে চাকরি উপলক্ষে প্রায় দশ বছর বাস কোরে তাঁকে একটু ঘনিষ্ঠভাবেই চিনেছি। মানুষ হিসাবে দুই বন্ধুই একটু অধিক মাত্রায় খাঁটি' অর্থাৎ এ যুগে অচল। তা' না হলে মনে করো' না সেই কোন কালে মেডিক্যাল কলেজ থেকে বেরিয়ে, হয়ত বা খেয়ালেরই বশে, দু'জনে কি একটা প্রতিজ্ঞা কোরে ফেলেছিলেন, আর আজ পঁচিশ পঁচিশটা বছর কোথা দিয়ে গেল, তার ঠিক নেই—কিন্তু প্রতিশ্রুতির নড়চড় হল না।

বিপিন। তুমি কিন্তু যাই বল অক্ষয়, এটা একটু বাড়াবাড়ি। দুনিয়া যাবে পাল্টে, আর আমার প্রতিজ্ঞাটুকু থাকবে অটল—এর মধ্যে নীতি হয় ত আছে, কিন্তু যুক্তি একেবারেই নেই। ইতিমধ্যে এঁদের বোধ হয় আর দেখা সাক্ষাৎও হয় নি?

অক্ষয়। না—তা'র কারণ, হরনাথবাবু ভাগ্য অন্বেষণ কোরতে লাহোরে গিয়ে, পসারের চাপে, জীবনে নিঃশ্বাস নেবার ফুরসৎ পান মাত্র দু'বার—একবার, যেদিন তিনি বিবাহ করেন ও দ্বিতীয়বার, একেবারে সাত বৎসর পরে, যেদিন তাঁর স্ত্রী মারা যান পাঁচ বছরের শিশুটিকে রেখে। এসব তাঁরই মুখে শুনেছি। মাতৃহারা শিশুর লালনপালনের ভার পড়ল বিধবা পিসির ওপর। পিসির মাত্রাধিক আদরযত্ন ও পিতার অবহেলা, এই বিপরীত দু'ধারার মধ্যে, সচরাচর সন্তানের চরিত্র যেমন গড়ে ওঠে, এ ক্ষেত্রেও তা'র ব্যতিক্রম হোল না। রঞ্জন হোয়ে উঠেছে ভীষণ দুর্দান্ত ও খামখেয়ালী। আমিই দেখছি দশ বছরে সে তিন চার বার নিরুদ্দেশ হয়েছে।

বিপিন। পাঞ্জাবী খেয়াল আর কি! তা' হরনাথবাবু—এই বিয়েতে ধন্বুর্দ্ধর পুত্রের সম্মতি পেয়েছেন ত?

অক্ষয়। আমি লাহোর থেকে এসেছি এই মাস চারেক হোল, এর মধ্যে সম্মতি পেয়েছেন বলে ত মনে হয় না। কারণ, আমি থাকতে তিনি যথেষ্ট চেষ্টা করেও ছেলের সম্মতিলাভে সমর্থ হন নি। আপাততঃ হরনাথবাবু কলকাতায় এসেছেন, ছেলেকে যা' হয় একটা কিছু শেখবার জন্য বিলেত পাঠাবার বন্দোবস্ত করতে।

বিপিন। বুঝেছি, সেই সুযোগে হরনাথবাবু এই বিয়ের বিড়ম্বনাটুকুও ছেলেকে দিয়ে শেষ করিয়ে নিতে চান্, তা সে ছলে, বলে, কৌশলে, যেমন করেই হোক। তাই ত মনে হয় ছেলেমানুষী কোরে—

অক্ষয়। ছেলেমানুষীই হোক্ আর যাই হোক্, জেদ চাপলে হরনাথবাবু—কারুরই তোয়াক্কা রাখেন না।

হাসিতে হাসিতে ভবদেবের প্রবেশ

ভবদেব। ওহে—শুনেছ—চাবি ছিল তালাতেই লাগান—হাঃ—হাঃ—হাঃ—চোখ চেয়ে কেউ দেখে না—এ যে কার কীর্ত্তি তা' আর আমার জানতে বাকী নেই—কিন্তু মুখ ফুটে বলবার উপায় নেই—বলেছি কি অমনি বে থা উঠ্‌বে আমার মাথায়, আর উনি—যাক্ গে—অদৃষ্ট ত আর কেউ কারুর কেড়ে নিতে পারে না—কি বলো ভায়া?—হ্যাঁ—বিয়ের কথা কি যেন বল-ছিলুম—হ্যাঁ—শ্রীমান্ জানেন না যে তাঁর বে—হাঃ—হাঃ—সাধে কি বলি সাবাস হরনাথ, সাবাস—

বিপিন। তা এতে এত উৎফুল্ল হোয়ে ওঠবার কারণটা কি?

ভবদেব। ওহে শুধু তাই নয় হে—হরনাথ জানিয়েছে যে বরযাত্রী, নাপিত, পুরুত, কেউই সঙ্গে আসবে না, সবই আমাকেই—হে-হে-হে—

একজন ভৃত্য হাঁপাতে হাঁপাতে এসে সংবাদ দিল—"ইয়া বড় মোটর মোড়ের মাথায়"

এ্যা—তা'র মানে বুঝলে? এসে পড়েছে। বিপিন, অক্ষয়,

এখন কি করা যায়—এ্যাঁ—তাই ত—আচ্ছা, দাঁড়াও—(অন্দরাভিমুখে) ওগো, শাঁখ, ফুলের মালা—হ্যাঁ—আমরা গিয়ে বরং—চলো, চলো—ওঁদের নিয়ে আসি—না—না—তার চেয়ে তোমরা ভাই ততক্ষণ একবার মোড়ের মাথায়—আমি এলাম বলে—

ভবদেব অন্দরে ছুটলেন—ঐক্যতান সুর হল—অক্ষয়, বিপিন ও অন্য দু' চারজন বাইরে গেলেন—ভবদেব হাঁপাতে হাঁপাতে ফিরে এলেন—হাতে এক ছড়া গোড়ে মালা। এদিক ওদিক চেয়ে নিমন্ত্রিতের মধ্যে থেকে একটি ছোট মেয়েকে টেনে নিয়ে, তার হাতে ফুলের মালাটি দিলেন

পরিয়ে দিবি, গলায় পরিয়ে দিবি, কেমন মা? দেখিস্—বরের গলায় নয়, হরনাথের গলায়, কেমন? সেই বুড়োমানুষটির গলায়—বুঝলি বেটি—বুঝলি—কেমন—এ্যাঁ—?

বলতে বলতে ভবদেব বাইরের দিকে ছুটলেন এবং পরক্ষণেই বিপিন, অক্ষয়, হরনাথ ও রঞ্জনকে সাথে নিয়ে ফিরলেন।

হরনাথ দীর্ঘাকৃতি, বলিষ্ঠ ও শ্যামবর্ণ। গোঁফ কামান, তাই বয়স ঠিক অনুমান করা যায় না—বোধহয় ভবদেবেরই সমবয়সী—পরণে সাদাসিধা সাহেবী পোষাক।

রঞ্জনের দেহ ঋজু, ছিমছাম—নাসিকা উন্নত—রং বেশ ফর্সা—বয়স আন্দাজ পঁচিশ—দৃষ্টিতে একটা বিস্ময়ের ভাব ফুটে উঠেছে। বেশভূষার একটু বিশেষত্ব আছে—সিল্কের সালোয়ার ও সিল্কের উঁচু গলার পাঞ্জাবী।

প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গেই যন্ত্রীসঙ্ঘ ব্যতীত সকলেই দাঁড়িয়ে উঠলেন। অন্দর হ'তে শঙ্খধ্বনি শোনা গেল।

ভবদেব। সাবাস ভায়া, সাবাস, এই ত চাই—আমাদেরই দেশে সত্য পালনের জন্য রাম বনে গেছেন, ভীষ্ম চিরকুমারই রয়ে গেলেন—তা' তুমি আমি এমনই বা কি করছি—কি বল—হে-হে-হে। বলে পাত্রপাত্রীর মনের মিল। শুনেছ কখনও? আরে বাপু মিলনের আগেই মিল—? রামচন্দ্র! বছর ঘুরতে দেরী সইবে না ভায়া, ওটা আপসে হয়ে যাবে—কি বলো? ও হো-হো-হো বড্ড ভুল হয়ে গ্যাছে—আয় মা, আয়, পরিয়ে দে—

ভুল কোরে মেয়েটি কিন্তু মালা বরের গলাতেই পরিয়ে দেয়

আরে ছ্যা—ছ্যা—ছ্যা—না, না—তাই বা কেন—বাঃ বেশ হয়েছে—যা হবার তা'ত হবেই—তা' না হলে আজই বা কি কোরে এই যোগাযোগ হয়। আচ্ছা—তোমরা সব বোসো—আমি একবার ওদিকে—

প্রস্থান

ঐক্যতান চাপা সুরে বাজতে লাগল

হরনাথ। (রঞ্জনকে একটু ষ্টেজের সামনের দিকে টেনে এনে) এতে আশ্চর্য্য হবার বিশেষ কিছু নেই, বাল্যবন্ধুর বাড়ি নিমন্ত্রণ ত—বটেই, তবে কিনা একটু বিশেষ রকমের আয়োজন, এই যা। আমার আদেশ, অনুরোধ, কোন দিনই তুমি গ্রাহ্য করনি। রূপ, গুণ বা স্বভাব, কোনটাতেই তুমি ভবদেবের মেয়ের উপযুক্ত নও, এ কথাটা আমি তোমায় বুঝিয়ে উঠতে পারি নি। কাযে কাযেই আমার একটু ঘুরিয়ে পথ অবলম্বন কোরতে হোল।

রঞ্জন। (বিরক্তি সহকারে) কিন্তু বে যে আমায় কোরতেই হবে, তাই বা আপনি বুঝলেন কেমন কোরে?

হরনাথ। বোঝবার এমন কিছু আবশ্যক আমার নেই, কারণ ভবদেবের মেয়ের সঙ্গে তোমার বে আমাকে দিতেই হোত। তাই, এ ক্ষেত্রে, বে তুমি কোরছ না, আমি তোমার বে দিচ্ছি, দু'টোর মধ্যে যে একটু তফাৎ আছে, সেটা তোমার বোঝবার বয়স হয়েছে বলেই আমার মনে হয়।

রঞ্জন। (রাগে কাঁপতে কাঁপতে) আমি কোনও মতেই—

হরনাথ। মিছে বাড়াবাড়ি কোরো না—এত লোকের মাঝখান থেকে তুমি চেষ্টা করলেও পালাতে পারবে না। ঐ তোমার আসন, ভালছেলের মত ঐখানে গিয়ে বোসো, তা নইলে ভদ্রলোকদের সামনে একটা কেলেঙ্কারী হবে বলে রাখলাম।

কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় রঞ্জন বরাসনে বসল, হরনাথ রুমালে ঘাম মুছলেন—একটা মারাত্মক থমথমে ভাব—ভবদেবের শশব্যস্তে পুনঃ প্রবেশ

ভবদেব। একি? সব চুপচাপ? বাজনা বন্ধ কেন? ও—আচ্ছা, আচ্ছা, একটু সব জিরিয়ে নাও—শুনলে হরনাথ কেমন বাজায়—খাসা—নয়? গানও—শোনাব—না-না আমি নয়—আমি নয়—ওহে নরেশ শুনিয়ে দাও ত তোমার একখানা—কিন্তু দোহাই বাবাজী তোমার সেই রাগপ্রধানে কায নেই—আমরা বুড়োমানুষ রসপ্রধান হলেই চলবে, হরনাথ আমাদের পৈঁয়াজীদের দেশের লোক কিনা, রাগ অর্থে ক্রোধ বুঝে ফেলবে, হে-হে-হে—

সকলেই হেসে উঠলেন

হরনাথ। কিন্তু তার পূর্ব্বে আমি আপনাদের সকলকার নিকট ক্ষমা ভিক্ষা চাইছি আমার ত্রুটীর জন্য। বরযাত্রী এবং অন্যান্য আনুসঙ্গিকের ব্যবস্থা করবার সৌভাগ্য আমার কেন যে হয়নি তা' হয়ত আপনারা কতকটা অনুমান কোরতে পেরেছেন; আমাদের এই অপরূপ বেশভূষা দেখে, বাকিটুকু ভবদেব ও অক্ষয় আপনাদের সময়মত বুঝিয়ে দেবেন। তা' বলে অনুষ্ঠানের কোনও অঙ্গহানি হোলে আমি নিজেকে সত্য সত্যই বিশেষ অপরাধী মনে করব।

দশটাকার একখানি নোট পকেট থেকে বার কোরে

অক্ষয়, অন্ততঃ পক্ষে একটা টোপর ও রূপোর জাঁতি এনে দেবার ব্যবস্থা কর।

অক্ষয় নোটখানি জনৈক যুবকের হাতে দিলেন

আচ্ছা, এখন তা' হলে একটু গান বাজনা—

সকলে পুনরায় হেসে উঠলেন—থমথমে ভাবটা অনেকটা কেটে গেল। প্রৌঢ় ও যুবকেরা নিজেদের ছোট ছোট দল কোরে গল্পে মশগুল্ হল—গানও আরম্ভ হল। হরনাথ, ভবদেব, বিপিন ও অক্ষয় একেবারে রঞ্জনের কাছ ঘেঁসে বসে আছেন। হরনাথ কথার ফাঁকে ফাঁকে এক একবার রঞ্জনের দিকে চেয়ে দেখছেন।

রঞ্জনের বাহ্যিক কপট শান্ত-শিষ্টতার মধ্যে কিন্তু ফুটে উঠেছে তার অন্তরের বিপুল বিপ্লব—দৃষ্টি তার চঞ্চল, কখনো দক্ষিণে, কখনও বামে—কখনও বা পাগলের মত বৈদ্যুতিক আলোকের সাথে নিজের চক্ষুর জ্যোতি পরখ করে নিচ্ছে—পরক্ষণেই ক্লান্ত হোয়ে পার্শ্বের ফুলদানীর মধ্যেই যা' কিছু দ্রষ্টব্য যেন দেখতে পায়—সঙ্গীতের গতি তখন দুণ থেকে চৌদুণে।

সহসা কাঁচ ভেঙ্গে পড়ার ঝন্-ঝন্ শব্দের সঙ্গে সঙ্গেই চারিদিক প্রেক্ষাগৃহ নিবিড় অন্ধকারে নিমগ্ন হোয়ে যায়।

তারপর এক অভিনব হট্টগোলের সৃষ্টি হয়—যুগপৎ—"আলো" "টর্চ" "পুলিশ" "সদর দরজা বন্ধ কোরে দাও" ইত্যাদি চিৎকারের রোল ওঠে।

নেটের গেঞ্জী পরা যুবকদের মধ্যে একজন টর্চ নিয়ে এসে দেখে ঝাড়ের 'বাল্ব' চুরমার—বলে "বাথরুম থেকে বাল্বটা খুলে নিয়ে আয় রে।"

আলো জ্বলে কিন্তু পূর্ব্বেকার মত অত উজ্জ্বল নয়। স্বল্পালোকে দেখা যায় সব ওলট পালট, বস্ত্রীসজ্জ একেবারে সজ্জ বিচ্যুত, যে যার বস্ত্র সামলাচ্ছে—সকলেই চেয়ে আছেন, কিন্তু অনেকেই কিছুই দেখতে পাচ্ছেন না—বিশেষ কোরে ভবদেব। অন্দর থেকে একটা উঁকি-ঝুঁকির আভাষ বাইরে থেকে পাওয়া যায়।

হরনাথ দাঁড়িয়ে আছেন, তাঁর হাতের লাঠি ঠক্ ঠক্ কোরে কাঁপছে—অগ্নিময় দৃষ্টি নিবদ্ধ বাইরের দরজায়—অক্ষয় চেয়ে আছেন বরের আসনের দিকে—অবশ্য আসন শূন্য।

বিপিন হঠাৎ দেখতে পান ফুলদানীটা গড়াগড়ি যাচ্ছে

হরনাথ। (চিৎকার কোরে বলে ওঠেন) আমার চোখে ধূলো দিয়ে পালিয়ে যাওয়া যত সোজা, লুকিয়ে থাকাটা ঠিক ততটা সোজা নয়। আমি তোমাকে আবার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি ভবদেব, হয় তা'র বে দেব তোমারই মেয়ের সঙ্গে, আর না হয়—

কাঁপতে কাঁপতে প্রস্থান

ভবদেব এতক্ষণে সম্বিৎ ফিরে পান

ভবদেব। আহা—হা—হা—হরনাথ, কর কি, কর কি, না হয় নাই বা হোল। তা বলে কি, তুমি—

হরনাথকে অনুসরণ করে প্রস্থান

কারুর কোন সাড়া নেই—স্থির, নিস্তব্ধ। অন্দরে কিন্তু বিরাট কোলাহল।

দ্বিতীয় অঙ্ক

এলাহাবাদ বাংলা স্কুলের শিক্ষক রমেশের বাসা

পাশাপাশি দু'খানি ঘর। দক্ষিণেরটি অতি সাধারণ গৃহস্থের ড্রয়িংরুম—কমদামি একটা সোফা সুইট, একখানি টিপয়ের উপর একটা ফুলদানী ও দেয়ালে দেশ-নেতাদের দু' চারখানা মামুলি ছবি। আড়াআড়ি একখানা সতরঞ্চির উপর শ্রীমতী টুলটুল দেবী ও ওস্তাদ দোয়ারকানাথ গাঙ্গোলী কখনও সেতারের সঙ্গে তবলার, কখনও বা তবলার সঙ্গে সেতারের সুর বাঁধছেন। দক্ষিণের দরজায় পর্দ্দা ঝুলছে, বাইরে যাবা'র পথ। জানালা মাত্র একটি, বাইরের গাছপালা দেখা যায়।

পর্দ্দা টাঙান বাঁদিকের দরজা দিয়ে পাশের ঘরখানিতে যাওয়া যায়। পশ্চিমা নেওয়ারের খাটের উপর বিছানা দেখে মনে হয়, ঘরটি শোবার ঘর, যদিও খাটের দক্ষিণ দিক ঘেঁসে একটা রিভল্ভিং শেল্ফ, একখানা আধা-আরাম কুর্শি, প্রচুর বই; খবরের কাগজ, মাসিক পত্রিকা ইত্যাদি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত। ঘরখানির সামনের দরজা দিয়ে অন্দরে যাওয়া যায়, বাঁ দিকে বাথরুমের ছোট দরজা।

রমেশ খাটের ওপর চিৎ হোয়ে শুয়ে একখানা মাসিকের পাতা ওন্টাচ্ছিল অলসভাবে। বাঁদিকের দেয়াল ঘেঁসে, তারাসুন্দরী একটা ছোট মোড়ায় বসে সুপারি কাটছেন। তারাসুন্দরীর বয়স আন্দাজ চল্লিশ, বেশভূষা সাধারণ। রমেশের বয়স পঁয়ত্রিশ ছত্রিশ, রং সচরাচর বাঙালীর মত, তবে ললাট বেশ প্রশস্ত—গোঁফদাড়ি কামান। গায়ে গেঞ্জি, ধুতিখানি যেমন তেমন কোরে পরা।

বাপমায়ের আদুরে মেয়ে টুলটুলের নামে ও চেহারায় সামঞ্জস্য আছে। বয়স ষোল সতের, দৃষ্টি চঞ্চল, বেশভূষা একেবারে অত্যাধুনিক।

নেহাৎ একটা চুড়িদার পাঞ্জাবী ও ঢিলা পাজামায় সর্ব্বাঙ্গ আবৃত, তা' না হোলে ওস্তাদজীকে Anatomyর model বলেই মনে হোত অঙ্গের যেটুকু অনাবৃত তা' থেকে গায়ের রং সম্বন্ধে কিছু একটা সিদ্ধান্ত করা বেশ কঠিন, তবে "কৃষ্ণাভ তাম্র" বলা চলে। চোখ চেয়ে আছেন কি বন্ধ কোরে আছেন, তা' অবশ্য চেষ্টা কোরলে বুঝতে যে পারা যায় না এমন নয়—বয়স অনুমান করা ধৃষ্টতা। ক' পুরুষ আগে নাকি এঁরা পশ্চিমে আসেন; ইনি অবশ্য এখনো বাঙালীই আছেন কারণ হিন্দী তরজমা কোরে বাংলা বলতে এঁর কোনও কষ্টই হয় না কথায় একটু বিদেশী টান। আহারের ব্যবস্থা শুনতে পাওয়া যায় একবেলা একঘটি ভাং ও রাতে একখানা রুটি। সাহিত্যানুরাগের প্রমাণও বর্ত্তমান—হিন্দী দৈনিক "অর্জ্জুন"খানি পাশেই পাট কোরে রাখা।

সময় সন্ধ্যা হয় হয়।

ড্রয়িং রুম

ওস্তাদজী তবলা বাঁধিতেছিলেন, টুলটুল সেতারের সুর দিতেছে—সেতার ও তবলায় আপোষ হোতে প্রায় মিনিটখানেক সময় লাগল

পাশের ঘর

রমেশ। মাসি তোমাদের মানের পালাটা, এবার যেন একটু অস্বাভাবিক রকমের বলে মনে হচ্ছে!

তারা। বলিস কেন! বুড়ো মিন্সের যেন ভীমরতি ধরেছে; তা' না হোলে এই আড়াই মাস চুপ কোরে বসে থাকবার পাত্তর সে নয়। আমি কিন্তু তোকে সত্যি সত্যি বলে রাখছি রমু, এতোর পরও এবার যদি তোর মেসো এখানে এসে মাসের পর মাস হত্যে দিয়ে পড়ে থাকে, তাহলেও এ তারি-বাম্নির টনক কিছুতেই নড়বে না।

রমেশ। সে ত জানি মাসি, এবার নিয়ে কতবার যে দেখলাম, তা' আব গুণে বলতে পারি না।

মাসির জাঁতি ঘন ঘন চলিতে লাগিল, দৃষ্টি কিন্তু মাটির দিকে—রমেশ আড় চোখে চেয়ে দেখে যেন একটু ব্যথা পায়, মাসিক পত্রিকার পাতা ওন্টাতে লাগ্‌ল

ড্রয়িং রুম

ইতিমধ্যে এঁরা কখন কসরৎ আরম্ভ কোরে দিয়েছিলেন। তবলা থামিয়ে অনুযোগের সুরে ওস্তাদজী বল্লেন

ওস্তাদ। এম্‌নি কোরে ঘাব্ড়ালে চলবে কেন বেটি। সাধনা হো'চ্ছে, বুঝলে—নাও—

পুনরায় কসরৎ চলতে লাগল

পাশের ঘর

রমেশ। যাক্‌গে বাপু, তোমাদের কথায় আমার মাথা ঘামিয়ে লাভ কি বলো? যে কটা দিন তোমরা আমার কাছে আছ সুখে স্বচ্ছন্দে কাটিয়ে দি, তা' না হ'লে, ঠাকুর চাকরের পাতে খেয়ে খেয়ে ত পেটে চড়া পড়বার উপক্রম হয়েছে

তারা। তা' আর কি কোরব বলো বাছা। তোমার হোল' গিয়ে ধনুক ভাঙ্গা পণ। কেন যে বে করিস্ না—আর কিই বা যে ভাবিস তা' তুই জানিস্ আর ভগবান জানেন।

রমেশ। ওরে বাপ্‌রে, তুমি যে একেবারে দর্শন আওড়াতে আরম্ভ করলে মাসি। ঐটেই যদি বুঝবো, তবে আমার এমন দুর্দ্দশা কেন?

তারা। তোর কথায় না আছে মাথা আর না আছে মুণ্ডু।

জাঁতি ঠিক তেমনি চলতে লাগল

ড্রয়িং রুম

ওস্তাদজী তবলা ছেড়ে দিয়ে হতাশায় "হায়" "হায়" কোরে উঠলেন

ওস্তাদ। তোমার মগজে ঘিলু নেই, এত মেহনৎ আমি কোরছি আর তোমার, কি না, সেই ভুল!

তবলা ছেড়ে দিয়ে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন—টুলটুল মাথাটা একটু হেঁট কোরে সেতারটায় টুং টাং আওয়াজ করল

পাশের ঘর

"হায়" "হায়" শুনে রমেশ হাসতে লাগল—তারাসুন্দরী উঠে গিয়ে উঁকি মেরে দেখে এলেন, ফিরে এসে বল্লেন

তারা। তোকে আমি আগেই বলেছিলাম ঐ ডানপিটে মেয়ে কখনও সেতার শিখতে পারে?

রমেশ। কি করি বলো মাসি, ওর যা' আগ্রহ, তা'ই মনে করলাম, মন্দ কি—চুপচাপ বোসে না থেকে চটপট একটা ললিত-কলাই না হয় শিখে ফেলুক! ওরই মাথায় ত খেয়াল চাপল সেতার শেখবার। এখন দেখছি গোড়াতেই রঞ্জনের সঙ্গে ওকে মাঠে নামিয়ে দিলে ওর ভালই হোত।

তারা। তুই আর হাসাসনি বাপু, আমি মরছি নিজের জালায়—

ড্রয়িং রুম

ওস্তাদজী ধ্যানস্থ, টুলটুল অনুনয়ের সুরে বল্লে

টুলটুল। আর একবারটি আমায় দয়া কোরে দেখিয়ে দিন, এবার আমি নিশ্চয়ই পারব।

ওস্তাদ। আমার মুণ্ড পারবে। তোমার ধিয়ান নেই ত ফের বুঝবে কি? সামান্ত টুক্‌রাটুকু বুঝতে পার না—সোমের পর তিন মাত্রা গম খাও, ফের টুকরা নাও চার দুনি আধ—ফের খালি থেকে তিহাই—ধাতেরে কেটে তাক্ ধিন্, ধাতেরে কেটে তাক্ ধিন্, ধা তেরে কেটে তাক্—হা। ব্যস্ এতে আছে কি?

টুলটুল। বুঝেছি, আপনি তবলা ধরুন খুব পারব।

বিষণ্ণমুখে ওস্তাদজী তবলা ধরলেন—পুনরায় কসরৎ চলল—রঞ্জন সন্তর্পণে দুজনকারই দৃষ্টি এড়িয়ে প্রবেশ করল—হাতে তার টেনিস র‍্যাকেট পরণে উপযুক্ত পোষাক

পাশের ঘর

তারা। তা' আমি সত্যি বলব বাপু, তোর এ ছন্নছাড়া সংসার আমার মোটেই ভাল লাগে না। নেহাৎ রঞ্জনটা আসে যায় তা' নইলে ট্যাঁকা যেত না। এ ক'টা দিন বৈত নয়, কেমন নেটিপেটি, যেন কত আপনার—রোজ সন্ধ্যায় এসে বাড়িটাকে যেন হাসিখুশীতে ভরিয়ে দিয়ে যায়।

রমেশ। হ্যাঁ, ঠিক যেন দমকা একটা ঝড়। (বসবার ঘরে রঞ্জনের অট্টহাস্য) ঐ শোনো! অনেকদিন বাঁচবে তোমার ঐ পুষ্যিপুত্তুরটি।

তারা। একশ' বছর বাঁচুক—আমি চায়ের জলটা চাপিয়ে আসি।

তারাসুন্দরী অন্দরে গেলেন, রমেশ উঠে বসে বিরাট একটা হাই তুলে, বইএর সেলফে কি যেন খুঁজতে লাগল

ড্রয়িংরুম

টুলটুল পুনরায় ভুল করাতে ওস্তাদজী রেগে আগুন হোয়ে উঠলেন—বাঁয়ার ওপর সজোরে এক চপেটাঘাত কোরে বল্লেন

ওস্তাদ। দিমাগ নেই, মাথার মধ্যে তুঁস ভরা আছে—

রঞ্জন। (উচ্চৈঃস্বরে হেসে) ঐ কথাই আমি বহুবার ওকে বলেছি ওস্তাদজী, "দিমাগ নেই।" এখনো ভালয় ভালয় আমার কথা শোন টুলটুল—বাঁশী ছেড়ে অসি ধরো, যেটা তোমায় সাজে। হকি খেলা সুরু কোরে দাও—আজকাল মেয়েরা বেশ নাম কিনছে—তুমিও খুব উন্নতি করবে।

টুলটুল। সব সময় ইয়ারকি ভাল লাগে না, আমার যা' খুশী তাই করব কা'র তাতে কি?

রঞ্জন। কিছু না, মাত্র একটু সৎপরামর্শ দিচ্ছিলাম! সেতারের সৃষ্টি হয়েছে বলে যে দুনিয়ায় যত মেয়ে আছে সবাইকেই সেতার বাজাতে হবে, এমন ত কোনও কথা নেই। ফটো তোলবার সময় সেতার কাঁধে নিয়ে বসে ভঙ্গিমাটুকু মন্দ হয় না—কিন্তু ছবি ত আর মুখর নয়—মূক—তাই রক্ষে।

আবার হো হো কোরে হেসে উঠল। তারাসুন্দরী ফিরে এসে রঞ্জনকে তখনও শোবার ঘরে না দেখে একটু মুচকি হাসলেন—মাঝের দরজার কাছে এসে দাঁড়ালেন। রমেশ হাসিমুখে অন্দরাভিমুখে চলে গেল

ওস্তাদ। এ কথা মানলুম না বাবুজী। টুলটুল মাইর দিমাগে সুর আছে, জোর রিওয়াজ চাই—

রঞ্জন। ও—এইটুকু মাত্র ওস্তাদজী? তাহলে টুলটুল তোমার নিশ্চয়ই হবে—ওস্তাদজী আশ্বাস দিচ্ছেন তুমি পারবে। ওঁর অসীম ধৈর্য্য, তুমি শুধু ঐ "রিওয়াজ"টুকু ছেড়ো না—গাধা পিটিয়ে ঘোড়া তৈরী করার প্রক্রিয়াটা সঙ্গীতেও অচল নয় দেখছি।

ওস্তাদজী হেসে উঠলেন, টুলটুল কিন্তু তখন রাগে কাঁপছে—মাঝের দরজার মধ্যে থেকে মাসি ডাকলেন রঞ্জন। রমেশ ইতিমধ্যে শোবার ঘরে ফিরে এল, হাতে অন্য একটা মোটা বই,

যাই মাসি। আচ্ছা টুলটুল, তুমি তোমার রেওয়াজটা করো আমি আমারটা সেরে আসি—

রঞ্জন পাশের ঘরে চলে গেল। ওস্তাদজী টুলটুলকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করতে লাগলেন। টুলটুলের দু'চোখ বেয়ে জল পড়তে লাগল, উঠে জানালার কাছে দাঁড়াল, ওস্তাদজী ফ্যাল ফ্যাল কোরে এদিক ওদিক তাকাতে লাগলেন।

পাশের ঘর

তারা। কি কাণ্ড করিস বল দেখি! আস্ত বাঁদর একটা। নে এখানে বসে রমেশের সঙ্গে ততক্ষণ দুটো কথা ক'। আমি তোর জন্তে যা' হয় একটু কিছু নিয়ে আসি।

রঞ্জন। তাই করো মাসি, একটু হাত চালিয়ে কিন্তু।

হাসতে হাসতে তারাসুন্দরীর প্রস্থান

রমেশ। মাসিকে কি গুণে যে বশ করেছ তা' তুমিই জান। শেষে একটা কিছু বাড়াবাড়ি না কোরে ফেলেন তিনি।

রঞ্জন। মানে—? ও—তোমার যত সব বাজে কথা। আমার মত একটা অজ্ঞাতকুলশীল ভবঘুরেকে তাঁর যা' দেওয়া

কর্ত্তব্য তার চেয়ে তিনি ঢের বেশীই দিয়ে ফেলেছেন—তাঁর দয়া, মায়া, স্নেহ, মমতা—

রমেশ। বল কি হে রঞ্জন! তুমিও যে দেখছি ভীষণ আধ্যাত্মিক হোয়ে উঠলে—'দেওয়া', নেওয়া', সব বড় বড় কথা কইছ। আমায় দেখছি মাষ্টারি ছেড়ে এবার তোমারই সাগ্‌রেদী করতে হোল—

রঞ্জন। না, না, রমেশদা', ঠাট্টা নয়। তুমি জাননা, আমি যা' পাচ্ছি তা' আমার প্রাপ্য নয়।

রমেশ। অর্থাৎ এর চেয়ে মহান একটা কিছু পেতে চাও—যা' ছোঁয়া যায়, ধরা যায় না—বেঁধে রাখে না, কিন্তু পালিয়ে গেলে বাধা দেয়—অনেকটা এগিয়ে পড়েছ—ওরে টুলটুল—

রঞ্জন। সত্যি রমেশদা' ন্যায় অন্যায় বিশেষ কিছু বুঝি না, কোন দিন বোঝবার চেষ্টাও করিনি, তবে এটুকু বুঝতে পারছি যে নিজেকে ঠকানর মত অন্যায় আর কিছুই নেই। প্রতিদিন আমার প্রভাত হয়, এই সন্ধ্যাটুকুর আশায়—মাঠে খেলতে যাই শুধু ফেরার পথে তোমাদের কাছে এই আনন্দ তৃপ্তিটুকু পাবার লোভে—কিন্তু—

রমেশ। বটে—? অত্যন্ত শোচনীয় অবস্থা ত। আচ্ছা—ওরে টুলটুল—

রঞ্জন। ধ্যেৎ—কি যে করো—তোমার যত সব—তুমি বোসো আমি হাত মুখ ধুয়ে আসি—

পাশের বাথরুমে প্রবেশ করল—রমেশ হাসিমুখে বইটার পাতা ওল্টাতে লাগল

ড্রয়িংরুম

টুলটুল। (রমেশের ডাক শুনে) ওস্তাদজী আজ আর ভাল লাগে না, আজ আমায় ছুটি দিন—

ওস্তাদ। আচ্ছা, আচ্ছা, বেটি তাই হবে, কাল থেকে সুরু করা যাবে—আরে, রঞ্জনবাবু রসিক লোক হোচ্ছে, রাগ করে কি মাঈ—

টুলটুল নমস্কার করল, ওস্তাদজী চলে গেলেন। টুলটুল পাশের ঘরে গিয়ে রমেশের মাথার কাছে দাঁড়াল—

পাশের ঘর

রমেশ। (টুলটুলের হাতখানিতে একটু চাপ দিয়ে) তোর কি মাথা খারাপ পাগলি, রঞ্জনের প্রাণখোলা রসিকতাটুকু বুঝিস না—

টুলটুল। তুমি জন্মজন্ম বোঝো রমেশদা, আমি কিন্তু সেতার শিখব না—কিছুতেই শিখব না—

রঞ্জন তোয়ালেতে হাত মুখ মুছতে মুছতে বাথরুম থেকে বার হল—তার ঠোঁটে এখনও দুষ্টু হাসি

রঞ্জন। যাক্, বাঁচা গেল রমেশদা', তাহলে ও এবার হকি খেলাটা শিখে ফেলবে—

টুলটুল দুমদাম কোরে অন্দরে চলে গেল

রমেশ। তুই কিন্তু আজ একটু বাড়াবাড়ি করছিস রঞ্জন, ব্যাপারটা কি বল্ দেখি—? "কেভ্ ম্যান্ মেথড্" নাকি রে?

রঞ্জন। ছেলে পড়িয়ে পড়িয়ে তোমার বুদ্ধিটা হোয়ে গেছে ওলট পালট, তাই কোনও কিছুই সরলভাবে নিতে পারনা—সামান্য হাসি ঠাট্টার মধ্যেও অন্তর্নিহিত ভাব দেখতে পাও—

খাবারের রেকাবি হাতে তারাসুন্দরীর প্রবেশ, অপর হাতে জলের গেলাস

তারা। নে, বকামি থামিয়ে কিছু খেয়ে নে দিকিনি। ওদিকে খুকি গিয়ে ধরে বসেছে সেতার আর সে শিখবে না।

রঞ্জন কর্ণপাত না কোরে গোগ্রাসে খেতে লাগল

রমেশ। সত্যি রঞ্জন, ওকে অমন ভাবে ক্ষেপিয়ে ভাল করলে না—ওর খুবই সখ ছিল সেতার শেখে, আর পরিশ্রমও করছিল হাড়ভাঙ্গা—

রঞ্জন। রেখে দাও ওদের সখের কথা, কলের পুতুলের মত যেদিকে ঘোরাবে সেই দিকেই ঘুরবে—

দু' কাপ চা হাতে টুলটুলের প্রবেশ

আজ আমরা অর্থাৎ পুরুষরা যা' করছি সেইটাই হচ্ছে ওদের আগামীকালের কাম্য—দেখনি বাঙালী মেয়েরাও আজকাল কেমন পাত্‌লুন পরে ঘুরে বেড়ায়—আমরা করি অনুকরণ, আর ওরা শুধু ভ্যাংচায়।

নিজের রসিকতায় নিজেই হাসিল

তারা। তোর যত সব অনাছিষ্টি কথা—

রমেশ। কথাটা ও ঠিকই বলেছে মাসি, ও শুধু জানে না-যে কোন্ কথা, কোন্ সময়ে, কার কাছে, বলা যায়, বা না যায়—

টুলটুল ঠক কোরে এক পেয়ালা রমেশের কাছে আর এক পেয়ালা রঞ্জনের কাছে রেখে মুখ ফিরিয়ে—ড্রয়িংরুমে চলে গেল—

তারা। এ আবার কি কাণ্ড!

রমেশ। কিছু নয় মাসি, ও তুমি বুঝবে না। রঞ্জন, এখন যাও, ওঘরে গিয়ে দেখ, শ্রীমতী টুলটুল দেবী হয়ত এতক্ষণ রাগে সেতারটাকে ভেঙ্গে ফেলবার পাঁয়তারা কসছেন।

রঞ্জন। যা' বলেছ রমেশদা, র‍্যাকেটখানা আবার ওঘরেই পড়ে আছে। মাসির তৈরী কচুরী খাওয়াটার লোভ ত আর এত সহজে ছাড়তে পারি না

রুমালে হাত মুখ মুছতে মুছতে পাশের ঘরে প্রস্থান

তারা। ওরে হাত ধুয়ে যা—হাত ধুয়ে যা, ঐ হাতে আর জয়জয়কার করিসনি বাবা—নাঃ জাত জন্ম আর রইলো না

হতাশ হোয়ে মোড়াটায় বসে পড়লেন—মিনিট দু' তিন পরে

আর তুইও ত বাপু ছেলেটার বাপ-পিতেমর পরিচয়টা জানবার চেষ্টা করলি না।

রমেশ। আমি ত আগেই বলেছি মাসি, কথাটা ও এড়িয়ে যেতে চায়। তোমরা আসবার ক'দিন আগে ওর সঙ্গে খেলার মাঠে দেখা। পশ্চিমে বাঙালীর ছেলে এত ভাল খেলে, তাই খুব ভাল লাগ্‌ল, আলাপ করলাম, তারপর ত তুমি সবই দেখছ।

তারাসুন্দরী কি যেন ভাবলেন, খানিক পরে মাঝের দরজাটা সন্তর্পণে ভেজিয়ে দিলেন

ড্রয়িং রুম

রঞ্জন এসে দেখিল, টুলটুল দাঁড়িয়ে আছে পিছন ফিরে জানালার

কাছে—সে রঞ্জনকে দেখতে পেল না—যেন কিছুই হয় নি এমনি ভাবে রঞ্জন একটা সোফায় বসে পড়ল।

রঞ্জন। যাক্—এখনও ভাঙতে পারনি তাহলে? সাহায্য আবশ্যক হবে?

টুলটুল সারা দেহটাকে ঝাঁকুনি দিয়ে একবার ফিরে দাঁড়াল—চোখ তার জবাফুল, কিন্তু তা' বলে নির্ব্বাক নয়—তাই পুনরায় পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে জানালার বাহিরে তাকাল—রঞ্জন একবার মাথার চুলের মধ্যে আঙুল চালিয়ে দিল, যেন একটু লজ্জিত কিন্তু পরক্ষণেই বেশ নিশ্চিন্ত মনে একটা সিগারেট ধরিয়ে ফেল্লে—দু'চার টানের পরই স্মরণ হোল পাশের ঘরে মাসি, জীভ্ কেটে চট্ করে সেটা নিভিয়ে ফেল্লে।

পাশের ঘর

তারা। (রমেশের খুব কাছে এসে) তবে যে তুই বলছিলি ওর বাবা দিল্লীতে কি নাকি একটা বড় চাকরি করেন। ও এসেছে এলাহাবাদে এম্‌নি বেড়াতে!

রমেশ। তুমিও যেমন মাসি। ওসব ওর ধাপ্পাবাজি, কিছু একটা গণ্ডগোল আছে বলে মনে হয়। তবে একথা ঠিক যে ওর মনটা খুব উঁচুদরের।

অতর্কিতে তারাসুন্দরী একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেল্লেন, আনমনা হোয়ে অন্দরের দিকে যেতে ভুল কোরে বাথরুমের দরজায় এসে থম্‌কে দাঁড়ালেন, পরক্ষণেই ত্বরিৎপদে অন্দরে চলে গেলেন।

ড্রয়িং রুম

রঞ্জন। (সোফা থেকে উঠে এসে টুলটুলের পাশে দাঁড়িয়ে) আচ্ছা—আমি তোমায় রাগ করবার মত কি বলেছি বল দেখি, যে তুমি—

টুলটুল ঘুরে দাঁড়াল, একেবারে জলপ্রপাতের বেগে বলে উঠ্‌ল

টুলটুল। তুমি কিছু বলনি, কিছু করনি, তবে এটুকু জেনে রাখ আজ, যে কলের পুতুলের মত, সারা দুনিয়ার মেয়েজাতটাকে নাচাবার ক্ষমতা হয়ত তোমার আছে, আর গাধা পিটিয়ে ঘোড়া বানাবার ক্ষমতাও হয় ত ওস্তাদজীর আছে, কিন্তু সকলের সামনে এমনিভাবে অপমান সহ্য করবার ক্ষমতা আমার নেই। তুমি কি মনে করো তোমার মত একটা অসভ্য ইয়ের সংস্পর্শে এসে আমি ধন্য হোয়ে গেছি—?

রঞ্জন। নিজেকে ঠিক অতটা ভাগ্যবান আমি কোনও কালেই মনে করিনি টুলটুল—

টুলটুল। না কোরে থাক তাতে আমার কোনও ক্ষতি বৃদ্ধি নেই। আমি তোমার সঙ্গে যেচে ভাব করতে যাইনি, নিজেই গুণ্ডামী কোরে—

পাশের ঘরে রমেশের টনক নড়ল, চেয়ার ছেড়ে, হাই তুলে মাঝের দরজার কাছে এসে দাঁড়াল

রঞ্জন। তাইত ভাবি টুলটুল, গুণ্ডামী কোরে ডাকাতিই করা চলে, ভিক্ষা মেলে না।

টুলটুল। আমিও সেই কথাটা তোমাকে স্পষ্ট কোরেই জানিয়ে দিতে চাই।

দু হাত দিয়ে চোখ ঢেকে, মাঝ দরজার পথে রমেশকে প্রায় ধাক্কা দিয়েই টুলটুল চলে গেল অন্দরের দিকে—অন্দরের দরজায় ঠিক সেই সময়েই তারাসুন্দরীকে দেখা গেল—টুলটুল ঝাঁপিয়ে পড়ল তাঁর বুকে। রঞ্জন র‍্যাকেটখানা হাতে নিয়ে ধীরে ধীরে বাইরে চলে গেল—তারাসুন্দরী ও টুলটুলের অন্দরে প্রস্থান—রমেশ চেয়ে দেখলে—সহসা অট্টহাস্য কোরতে কোরতে বিছানার লম্বা হোয়ে শুয়ে পড়ল।

তৃতীয় অঙ্ক

এলাহাবাদ সিভিল হাসপাতালের একটি কেবিন

ছোট্ট কেবিন—দক্ষিণে বাইরে যা'বার দরজা, সামনাসামনি আর একটি দরজা দিয়ে বারান্দায় যাওয়া যায়, কেবিনটী আধুনিক রুচিসম্মত আসবাবে সুসজ্জিত। মীট সেফের ওপর একটা ফুলদানীতে টাট্‌কা কিছু ফুল। ঘরের এক কোণে একটা সুটকেশের ওপর একটা এ্যাটাচি। কেবিনটি বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন।

রঞ্জনের পরণে স্লিপিং সুট। শ্রী বেশ উজ্জ্বল, হাসপাতালে আসবার কারণটা অন্ততঃ তা'র চেহারায় প্রকাশ পায় না। একটা বালিশ বুকে দিয়ে উপুড় হয়ে পড়ে সাময়িকপত্রের ছবি দেখছে। তারাসুন্দরী নিকটেই একখানা কাঠের চেয়ারে আড়ষ্ট হয়ে বসে রঞ্জনকে বাতাস করছেন—দূরে টুলটুল ডেক চেয়ারের ডাণ্ডাটার উপর আধবসা অবস্থায় দাঁড়িয়ে রঞ্জনেরই দিকে চেয়ে আছে—চাহনিতে এবং সর্ব্বাঙ্গে তার দুষ্টামী মাখান। সময় সন্ধ্যা হয় হয়।

তারা। এখন ত বাপু বেশ সেরে উঠেছিস—এই পোড়া হাসপাতাল ছাড়বি কবে বল দেখি।

রঞ্জন। আমি ছাড়লেই ত এরা এখন ছাড়ছে না মাসি। সত্যি কথা বলতে কি আমারও নেহাৎ মন্দ লাগছে না—বাইরে গিয়ে যাবই বা কোথা?

টুলটুল। কেন? কেন? খেলার মাঠগুলো ত আর জলে ভেসে যায় নি।

তারা। খেলার মাঠ? ঐ খেলার মাঠই তোর কাল হয়েছে। কতবার বলেছি ও খুনে খেলা ছেড়ে দে, তা' কারুর কথা শোনা ত আর তোমার ঠিকুজিতে লেখেনি। বেশ না হয় খেল্‌লি বাপু, কিন্তু কথায় কথায় অমন মারামারিই বা করিস কেন?

রঞ্জন। ও এমন কিছু নয় মাসি, খেলতে গেলে অমন একটু আধটু চোট লাগে, বলে কত লোকের সেতার বাজাতেই আঙুল ভেঙ্গে যায়!

টুলটুল। হ্যাঁ, যায়ই ত, হাজার'বার যায়। ভেঙ্গে—মাঠে অজ্ঞান হোয়ে পড়ে থাকে, পরে লোকে দয়া কোরে হাসপাতালে নিয়ে এলে, জ্বরে বিভোর হোয়ে যা' তা' ছাই পাঁশ বকবক করে—লজ্জাও করেনা।

তারা। (টুলটুলকে) আচ্ছা, তোর শরীরে কি দয়া মায়া বলে কিছু নেই। কোথায় মানুষের দুঃখে বিপদে একটু আহা করবি তা' নয়—

রঞ্জন। বলত মাসি। বিশেষ কোরে আমার মত লোককে, যার দুনিয়ায় কেউ কোথায় আহা বলবার নেই—

তারা। ষাট, ষাট, অমন কথা মুখেও আনতে নেই।

টুলটুল। খোকা!

তারা। তুই কি একটুও চুপ করে থাকতে পারিস না বাছা? ও যে আমায় এই সাতদিনের মধ্যেই সেরে উঠেছে—এই আমার

ভাগ্যি, এখন ঘরের ছেলে ভালয় ভালয় ঘরে ফিরে যায় তা'হলেই আমি বাঁচি।

রঞ্জন। রক্ষে করো মাসি। ঐ আশীর্ব্বাদটুকু কোরো না। ঘরের ছেলে ঘরে ফিরলেই বিভ্রাট! বাবা আমায় খুঁজে পেলেই সে এক অনর্থের সৃষ্টি হবে।

তারা। তা' তুই বা অমন পালিয়ে পালিয়ে বেড়াস কেন? বাপের সঙ্গে ঝগড়া কোরে?

রঞ্জন। সব সময়েই যে ঠিক ঐ জন্যেই পালাই তা' নয়। কারণে অকারণে বাড়ি পালানটা একটা অভ্যাসের মধ্যে দাঁড়িয়ে গেছে!

টুলটুল। কোনও গুণেরই ঘাট নেই!

রঞ্জন। কারণ—আমার যে মাসির মত একটা পিসিও আছে টুলটুল।

তারা। দেখ্ দিকিনি এত সব তোর আছে অথচ মাথা খুঁড়ে মরে গেলেও বাপের নাম-ধামটা তুই কিছুতেই বলবি না—আমারই পোড়া অদৃষ্ট।

টুলটুল। তা' বই কি মা। উনি করছেন সখ কোরে অজ্ঞাতবাস, আর তোমার হোল পোড়া অদৃষ্ট।

তারাসুন্দরী টুলটুলের দিকে কাতরভাবে চেয়ে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন। রমেশের শশব্যস্তে প্রবেশ

রমেশ। মাসি, টুলটুল, শিগ্গির চলো—মেসো এইমাত্র কোলকাতা থেকে এলো।

তারা। এ্যাঁ—এসেছেন? (পরক্ষণেই অবহেলার স্বরে) ওঃ, ভারি আমার গুরুঠাকুর এসেছেন যে সাত তাড়াতাড়ি, কানে শুনতে না শুনতেই ছুটতে হবে! বলি সে কি আমায় খবর দিয়ে এসেছে? না, আমিই তার হুকুমে তোর কাছে এসেছি? কার তোয়াক্কা রাখি আমি?

টুলটুল। কেন মা, কালই ত বাবার চিঠি এসেছে, আমার কাছে লিখেছিলেন, আজকালের মধ্যে এসে আমাদেব নিয়ে যাবেন। আর তুমিই ত সে চিঠি আমাব গানের খাতার মধ্যে থেকে কুড়িয়ে পেয়ে আমায় দিলে। বারে—এমন বলছ—(রমেশ ও রঞ্জন হেসে উঠল)।

তারা। দেখ্—তুই বড্ড বাড়িয়েছিস, বাপের আদরে আদরে একেবারে উচ্ছন্ন গেছিস।

টুলটুল। চলো রমেশদা', মা'র যাবার ইচ্ছে নেই, আমার কিন্তু আর তর সইছে না, আমায় তুমি বাড়ি নিয়ে চলো—

তারা। তা' আর তুমি যাবে না। এখনি বাপের কাছে গিয়ে সব কথা না লাগাতে পারলে নিশ্চিন্দি হোচ্ছ কই? এদিকে ভরসন্ধ্যা বেলায় রুগী মানুষ একলাটি থাক!

রঞ্জন। (একটু দুষ্টু হেসে) তার চেয়ে বাপু তোমাদের কারুরই গিয়ে কাজ নেই, রমেশদা' তুমিই গিয়ে—

তারা। রঞ্জন শেষে তুই পর্য্যন্ত—এমনি কোরে—আমি তোদের কি করেছি—

অশ্রু তাঁর বাধা মানল না, আঁচলে মুখ ঢেকে ছুটে বাইরে চলে গেলেন

রমেশ। কি মুস্কিল! বুড়োবুড়িদের শাস্ত্রই বিভিন্ন। আমি যাই, মাসি নিশ্চয়ই গাড়িতে গিয়ে বসেছে, চল্ টুলটুল।

রমেশ ও টুলটুলের প্রস্থান। রঞ্জন একটা সিগারেট ধরাল। টুলটুল পরক্ষণেই ফিরে এল

রঞ্জন। (চম্‌কে উঠে) একি—? তুমি—? ফিরলে যে?

টুলটুল। রুগ্ন বোনপোকে ভরা-সাঁঝে মাসি একলা রাখতে চাইল না।

রঞ্জন। (উচ্চৈঃস্বরে হেসে উঠল) যাক্—তুমি তা' হলে নিজের ইচ্ছেয় ফিরে আসনি—তোমার ফিরে আসার জন্য তোমার মা-ই সম্পূর্ণ দায়ী।

টুলটুল। নিশ্চয়ই।

রঞ্জন। আমি কিন্তু বুঝেছি একটু অন্যরকম।

টুলটুল। সেটা তোমার স্বভাব। এমন অকারণে ঝগড়া করা, বুঝতে পারবে, যখন বাবা আমাদের কোলকাতায় নিয়ে চলে যাবেন।

রঞ্জন। আর এও ত হোতে পারে যে তা'র আগেই, আমার বাবা আমায় নিয়ে চলে যাবেন লাহোরে!

টুলটুল। বাজে কথা, তোমার বাবা জানেনই না যে তুমি এখানে। তা'ছাড়া তোমার বাবা থাকেন দিল্লীতে। এত মিছে কথাও বলতে পার।

রঞ্জন। খামকা, কখন কোন কথা যে বলে ফেলি, পরে তা' মনেও থাকে না—শেষে সত্যি মিথ্যেতে একটা জট পাকিয়ে যায়।

টুলটুল। যাক্, মধ্যে মধ্যে তাহলে তোমার অনুতাপও হয়।

রঞ্জন। ঠাট্টা নয় টুলটুল—দিন তিন চার হোল আমি পিসিমাকে চিঠি লিখেছি। সমুদ্র পথের হাত খরচটা এলাহাবাদেই খতম হোল—তা' ছাড়া আর ভালও লাগে না। প্রতিবারই আমার শেষ ভরসা এই পিসিমাটিকে দুঃখ কষ্ট ত কম দিই নি। তাই ভাবছি, সত্যি সত্যি এবার আর লাহোর ফিরব না। শুনেছি যুদ্ধে লোক নিচ্ছে, এখান থেকে সোজা পিণ্ডি যা'ব, পাঞ্জাবীর বেশে ফৌজে একটা চাকরি পাওয়া বিশেষ কঠিন হবে না। সৈনিক জীবনের শাসন ও নিয়মের বাঁধনে হয়ত বা একটা পরিবর্ত্তন আসবে। কে জানে, হয়তো অফুরন্ত তৃপ্তি ও আনন্দের আস্বাদ তাইতেই পাব—সংসারে সুখ বা শান্তি পাবার মত আমার ত কিছুই নেই—

টুলটুল। (একটু নিকটে সরে এসে) অনর্থক কেন যে দুঃখ কষ্টকে এমন ভাবে যেচে মাথা পেতে নিতে যাও—

রঞ্জন। অদৃষ্টের সঙ্গে কুস্তি লড়তে যাই টুলটুল, প্রতিবারেই এমনি ভাবে হাত পা' ভাঙ্গে, শেষে আত্মগ্লানি থেকে নিষ্কৃতি পাবার পথ খুঁজে পাই না। জান টুলটুল, বাবা আমার অমতে বিয়ে দিয়ে বিলেত পাঠাচ্ছিলেন, aviation শিখতে। বিপরীত-গামী হওয়া ছেলেবেলা থেকেই স্বভাবসিদ্ধ—তাই ভাবলাম, বিয়েটা বাদ দিয়ে বিলেত বেড়ানটা হয় কিনা। চিন্তার কূল কিনারা পেতে কোনও কালেই আমার দেরী সয় না—তাই বিয়েটা আর করা হোল না, উড়ে এসে পড়লাম বরের আসর বউবাজার থেকে সোজা Calcutta Club এলাহাবাদে—

টুলটুল। (অস্থিরভাবে) বরের আসর—? বউবাজার? কবে? কার বাসায়?

রঞ্জন। বাবার বাল্যবন্ধু ভবদেব বাঁড়ুয্যের বাসায়, প্রায় মাস তিনেকের কথা।

টুলটুল টল্‌তে টল্‌তে বারান্দার দিকে গেল

রঞ্জন। ওকি? কি হোল? হঠাৎ তুমি অমন করছ কেন?

টুলটুল সামলে নিল

টুলটুল। বদ্ধ ঘরে বসে দাঁড়িয়ে, অনবরত যদি তা হতোস্মি! শোনা যায় অমন একটু মাথা ঘুরে ওঠে। তুমি কিন্তু বেশ বুদ্ধিমানের কাজ করেছ রঞ্জনদা', যুদ্ধে যাবার আগে ঢাক ঢোল বাজিয়ে পিসিমাকে জানিয়ে যাওয়াটা আর যাই হোক অন্ততঃ বোকামির কাজ কেউ বলবে না।

রঞ্জন। তুমি বিশ্বাস করবে না টুলটুল, কিন্তু পিসিমাকে চিঠি পোষ্ট করবার পূর্ব্বে সত্যি সত্যিই ওদিকটা আমি একবারও ভেবে দেখবার অবকাশ পাই নি, এমনি একটা অবসাদ ও ক্লান্তিতে সারা দেহমন ছেয়ে ছিল।

টুলটুল। তা, এমন কি মন্দ কাজ করেছ, এখন ভালমানুষের মত ফিরে গিয়ে একটা বে থা কোরে—

রঞ্জন। কাণ্ড যা' করেছি শেষ পর্য্যন্ত হয়ত তাই করতে হবে। হোক্—যা' হবার তাই হোক্, নিয়তির বিরুদ্ধে আজ আমার কোনও অভিযোগ নেই—বিয়ে কেন—দ্বীপান্তর, ফাঁসি এমন কি পুনর্জন্ম কোনটাতেই আমার আপত্তি নেই।

টুলটুল। যাক্, আপাততঃ তোমার তাহলে যুদ্ধ যাত্রাটা বন্ধ হোল। আচ্ছা রঞ্জনদা' তুমি কি বুঝতে পার তুমি কি চাও?

রঞ্জন। হয়ত পারি না; কিন্তু তোমাদের সঙ্গে মেলামেশা কোরে, তোমার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হোয়ে, আমার এ ভয় অনেকবারই হয়েছিল যে হয়ত আবার একটা উৎকট কিছু কোরে ফেলব—গায়ের জোরে, খেয়ালের বশে, হয়ত তোমাকে নিয়েই নিরুদ্দেশ হ'ব।

অট্ট হাস্য কোরে বিছানায় লম্বা হোয়ে শুয়ে পড়ল—টুলটুল ধীর পদে বারান্দায় চলে গেল—পরক্ষণেই একটা সিগারেট ধরাল

—নাঃ—আজ আর সে ক্ষমতা বা উৎসাহ কোনওটাই নেই—(টুলটুলকে না দেখতে পেয়ে উঠে পড়ে) ওকি, বারান্দায়? আবার মাথা ঘুরূছে (রঞ্জন উঠে বারান্দার দিকে যাবার পূর্ব্বেই টুলটুল ফিরে এল) দিনরাত সেতার নিয়ে ঘেনর্ ঘেনর্ কোরলে—

টুলটুল। আর যাই হোক্—কারুকে নিয়ে পালাবার সৎসাহসটা হয় না; গায়ের জোরে কেউ কারুকে নিয়ে পালালে পুলিশে ধরে একথা জানবার বয়স তোমার নিশ্চয়ই হয়েছে।

রঞ্জন। (টুলটুলের একখানি হাত ধরে) কিন্তু মনের জোরে কেউ যদি কারুকে—

নেপথ্যে "Yes, Ranjan Chatterjee, thank you, thank you,—কণ্ঠস্বর শুনেই রঞ্জন চমকে উঠল—

না—না—টুলটুল ওদিকে নয়—বুঝতে পারছ না, বাবা—তুমি কোথাও একটু—কী বিপদ—

টুলটুল চট করে বারান্দায় চলে গেল। টাঙ্গাওয়ালার মাথায় একটা সুটকেশ ও বিছানা সমেত হরনাথের প্রবেশ

বাবা—? আপনি—?

হর। হ্যাঁ—আমিই—কেন ভূত দেখেছ নাকি?

টাঙ্গাওয়ালাকে একটা টাকা দিয়ে

যাও।

রঞ্জন পায়ের ধূলা নিল

থাক্ থাক্, ঢের হয়েছে, অত ভক্তিতে আর কাজ নেই। যাক্, মনে করেছিলাম একেবারে হাত-পা ভেঙ্গে পড়ে আছিস, তা' নয় বেশ শ্রীবৃদ্ধিই হয়েছে দেখছি।

একটা চেয়ার টেনে বসে পড়লেন। অন্তরালে টুলটুলের উপস্থিতিটা রঞ্জনকে চিন্তিত কোরে তুললে অনবরত বারান্দার দিকে চাইতে লাগল

কি? এদিক ওদিক কি দেখছিস্? পালাবার পথ খুঁজছিস্? কেন বলিনি তোকে, পালিয়ে যাওয়া যত সহজ, লুকিয়ে থাকা ততটা সোজা নয়?

রঞ্জন। আজ্ঞে না, তা নয়—মানে আপনি অতদূর থেকে আসছেন ক্লান্ত হোয়ে পড়েছেন—একটু চা' টা—আমি আস্তে আস্তে বাইরে গিয়ে, না হয়—

হর। বলি, এত পিতৃভক্তির পরিচয় পূর্ব্বে ত কখনও পাইনি, ভারি মুস্কিলে পড়েই নয়? কিন্তু আমি তোমায় চিনি—দয়া কোরে তোমায় আর বাইরে যেতে হবে না, তোমার পিছু পিছু ছোটবার ক্ষমতা আপাততঃ আমার নেই—তুমি এখন এইখানেই বসে থাক, চা টা আমি নিজেই আনিয়ে নিচ্ছি।

রঞ্জন। তা'লে—নীচে নেমেই ডানদিকে কীচেন, সেখানে বললেই সব বন্দোবস্ত—

হর। দেখ্ তোর ওসব চালাকি আমি বুঝি, যেমন কোরে হোক্ আমাকে এখান থেকে সরাতে চাস্—বড্ড ধরা পড়ে গেছিস্ নয়? আমি এখান থেকে এক পা আর নড়ছি না—তোকে সঙ্গে নিয়ে—

বেশ চেপে বসলেন

রঞ্জন। আজ্ঞে না, পালাবার শক্তি আর আমার নেই। এক রকম মরেই ত গিয়েছিলুম, নেহাৎ এঁরা সব ছিলেন—

হর। এঁরা? কারা?

রঞ্জন। রমেশদারা' মানে, তাঁর মাসি, মাসির মেয়ে—সকলেই দেখাশুনা করেন কিনা—বড় ভাল লোক—রমেশদা' বাংলা স্কুলে মাষ্টারি করেন—

হর। এঁ্যা—একেবারে সংসার পেতে ফেলেছিস যে? মাসি, বোন, দাদা! পিতৃহারা হোয়ে অনেক কিছুই পেয়েছিস দেখছি!

রঞ্জন। কিন্তু, একটু চা না পেলে ত আপনার বড় অসুবিধা হোচ্ছে। না হয় আমি বাইরে দরোয়ানকেই বলে আসি—

হর। আমার জন্যে আর অতটা কষ্টভোগ নাই বা করলে। শরীর ত বেশ ভালই দেখছি, এখনও discharge করেনি কেন?

রঞ্জন। ওরা ত যেদিন খুশী চলে যেতে বলেছে, আমিই—

হর। অপেক্ষা কোরছ, বাবা এসে আদর কোরে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে—নয়? ঘরে ফেরাটেরা এখন হোচ্ছে না—(চেয়ার

ছেড়ে দাঁড়িয়ে উঠে) আজ আর সময় নেই, কালই কোলকাতায় যেতে হবে, সোজা এখান থেকেই। আমি ভবদেবকে এখনই একটা তার কোরে দিচ্ছি, কিন্তু খবরদার—আচ্ছা (বাইরে থেকে দরোয়ানকে ডেকে আনলেন) ময় ইন্‌কা বাপ্‌কুঁ—যব্ তক্ ময় লেউট না আঁউ, দেখনা ইয়ে এঁহাসে ভাগে নহী (দরোয়ানের হাতে দু'টো টাকা দিলেন, সে সেলাম কোরে বাইরে গেল) বুঝ্‌লে? হাসপাতাল থেকে পালালে একেবারে পুলিশের হাতেই পড়তে হবে এ আমি তোমায় জানিয়ে দিচ্ছি। আমি এখনি ফিরে আসছি।

রঞ্জন। একটু বিশ্রাম না কোরে—এরই মধ্যে না হয় কালই হোত—

হর। কাল? যে তোমায় চেনেনা তা'কে ঐ কথা বোলো—বুঝলে? সামনেই তার ঘর—এখনি ফিরে আসছি—কিন্তু খবরদার—

বাইরে চলে গেলেন। টুলটুল ধীরে ধীরে বারান্দা থেকে ফিরে এলো, দুষ্টু হাসি তার ঠোঁটে—রঞ্জন চঞ্চল পদে ঘুরে বেড়াতে লাগল

টুলটুল। কেমন? গ্রেফ্‌তার? এইবার কী করবে? পালাবে নাকি?

রঞ্জন। (অস্থিরভাবে) আলবৎ পালাব। যেমন কোরে হোক্ পালাব। শুনলে ত সব, বাবার কাণ্ড—পালান ছাড়া অন্য কোনও পন্থা নেই এ থেকে রেহাই পাবার।

টুলটুল। তা' ত বুঝতেই পারছি। কিন্তু একটু আগে এই যে কী সব বলছিলে—"আত্মগ্লানি" "নিয়তি"। যাকগে ওসব, তোমার কথায় আমার কাজ কি। আমি ভাবছি, আমি এখন করি কি, এখনি ত উনি এসে পড়বেন।

রঞ্জন। তুমি? তুমি? তুমিও আমার সঙ্গে পালাবে—যেতেই হবে তোমাকে আমার সঙ্গে। ইচ্ছা হোলে, এখনও আমি অনায়াসে ঐ বারান্দা থেকে লাফিয়ে পড়তে পারি—

টুলটুল। কিন্তু আমি ত আর তা' পারি না—তা' ছাড়া তোমার মত একটা দস্যুর সঙ্গে—

রঞ্জন। টুলটুল, ঠাট্টা কোরছ? (হতাশ হোয়ে বসে) বেশ করো—আমি তোমাদের খুব জানি—আমি চিনেছি তোমাদের—

টুলটুল। তা' তুমি বেশ কোরেছ—কিন্তু তোমার বাবা ত এখনও আমাকে চেনেন নি। আমি শুধু ভাবছি, এ অবস্থায় আমাদের দেখলে, তোমারই বা কি হবে, আর আমারই বা কী হবে! অথচ তোমার পালিয়ে যাবার কোনও উপায়ও ত আমি দেখছি না।

রঞ্জন। (অস্থির হোয়ে) কি করি—কি করি—এমন বিপদেও মানুষ পড়ে—আমি না হয় পালালাম না, কিন্তু তোমার কি হবে? তাঁর রাগ তুমি জান না—তোমায় এখানে দেখে, কি যে একটা কাণ্ড বাধিয়ে ফেলবেন, তা' তুমি বুঝতেই পারছ না।

টুলটুল। বেশ ত, তুমিই বুঝিয়ে দাও আমি বসি। কিন্তু মনে থাকে যেন, বোঝাতে যত দেরী করবে, বিপদের আশঙ্কাও তত বেড়ে যাবে।

রঞ্জন। না—না—টুলটুল—তুমি বোসো না—তুমিই বরং পালিয়ে যাও—দরোয়ান ত তোমায় কিছু বলবে না—

টুলটুল। বারে—তোমায় একা ফেলে? আমি ত আর তুমি নই। তা' ছাড়া তোমার বাবাকে প্রণাম না কোরে পালালে মা রাগ কোরবে—

রঞ্জন। কি পাগলের মত বকছ—? তোমার কি একটুও—

রমেশ, তারাসুন্দরী ও ভবদেবের প্রবেশ, টুলটুল ছুটে গিয়ে ভবদেবের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ল

রমেশদা, সর্ব্বনাশ হয়েছে; বাবা এসেছেন—

রমেশ। দরোয়ানের মুখে সব শুনেছি, এমন কি তুমি যে অবরুদ্ধ তাও—(ভবদেবকে) মেসোমশাই, এই ইনিই আমার মাসির পুষ্যিপুত্তর—

ভবদেব অবাক হোয়ে চেয়ে রইলেন রঞ্জনের মুখের পানে—বাক্যহীন রঞ্জন প্রণাম করল

ভবদেব।—তুমি—? তুমিই ত? (তারাসুন্দরীকে) ওগো—দেখত—এঁ্যা—?

তারাসুন্দরী কিছু বুঝতে পারলেন না, দূরে দাঁড়িয়ে টুলটুল হাসতে লাগল

ওঃ—তুমি ত দেখনি—তাই ত—কি করি—

রঞ্জন। আপনি—? আপনাকে যেন—

ভবদেব। আমাকে যেন—? বল কী হে—? তোমার বাবা এসেছেন না বললে—কই—? কই—? কোথায়—?

টুলটুল। তোমায় তার করতে গেছেন।

ভবদেব। তার—? আমাকেই? বল্লিস কি রে? হ্যাঁ হ্যাঁ তা'ত করবেই, তা'ত করবেই, তা' সে কি কোরেই বা জানবে—

রমেশ। ব্যাপারটা ত' বুঝতে পারছি না—আগে থেকেই আপনাদের সব পরিচয় ছিল না কি?

ভবদেব। পরিচয়? হা-হা-হা—পরিচয়? (তারাসুন্দরীকে) ওগো—রমেশের কথা শুনলে? ওঃ তুমিও বুঝতে পারছ না—হা-হা-হা তা' কি করেই বা পারবে—পরিচয় ছিল বৈকি—একটু বিশেষভাবেই পরিচয়টা হয়—বলে কিনা পরিচয়—হা-হা-হা

তারা। এঁ্যা—তুমিই সেই গুণধর—(তাঁর চোখে জল, মুখে হাসি) খুকীর বে'র বিভ্রাটের কথা মনে পড়ে রমেশ—? তোকে সেদিন যা' বলেছিলাম? এই সেই ঝাড়ভাঙ্গা ছেলে—

ভবদেব। হা-হা-হা ঝাড়-ভাঙ্গা—যা' বলেছ তুমি—ঝাড়-ভাঙ্গা ছেলে—

রমেশ। বটে? Congratulation রঞ্জন—বাঃ—মাসি cum-শাশুড়ি—চালাক ছেলে।

ভবদেব। হা-হা-হা খাসা বলেছ রমেশ, একেবারে মাস্-শাশুড়ি—হো-হো-হো কিন্তু তার আগে আমি একবার হরনাথের খোঁজ নিয়ে আসি, তোমরা বোসো—আমি আসছি (যেতে যেতে ফিরে এসে) রমেশ, ওগো তুমিও, একটু নজর রেখো, দেখো যেন বাবাজী ফের উধাও না হন—(যেতে যেতে) ঝাড়ভাঙ্গা ছেলে—হা-হা-হা যা' বলেছে—

প্রস্থান

তারা। আচ্ছা, খুকী, বলি তোরও ত পেটে পেটে কম শয়তানি খেলে নি। সব জেনে শুনে, বাপের সঙ্গে সড় কোরে কেবল আমার কাছেই লুকোচুরি!

টুলটুল। দেখ, মিছি-মিছি তুমি আমায় যা' তা' বোলো না বলে দিচ্ছি। আমি কি জানি, বে করতে ভয় পেয়ে, আমিই বুঝি পালিয়ে গিয়েছিলুম? রমেশদা' তুমি আমায় বাড়ী রেখে আসবে চলো (রঞ্জন আড় চোখে চেয়ে দেখে) আমার বড্ড ঘুম পাচ্ছে—তা' ছাড়া কত কাজ। কালই ত কোলকাতায় ফিরতে হবে—

রমেশ। তা' ত বুঝতেই পারছি—কিন্তু যাবার পূর্ব্বে পুলিশের ব্যবস্থা না কোরলে ভায়া যদি আবার চম্পট দেন!

শশব্যস্তে ভবদেব ও হরনাথের প্রবেশ

হরনাথ। পুলিশ? চম্পট?

ভবদেব। (উচ্চৈস্বরে) পুলিশ? (রঞ্জনকে দেখে) ও—না—না—না—এই যে, হরনাথ (রমেশ, টুলটুলকে দেখিয়ে) এই রমেশ, টুলটুল।

রমেশ ও টুলটুল প্রণাম করল

হরনাথ। থাক্, থাক্, হয়েছে মা—

ভবদেব। ওহো হো—বড় ভুল হোয়ে গেছে (তারাসুন্দরীকে দেখিয়ে) ইনি—হেঁ—হেঁ—হেঁ—

হরনাথ। ওঃ এই যে বৌ'ঠান—আমারই ভুল (নমস্কার করে—রঞ্জনকে বলেন) ওঠো, এদিকে এসো। (টুলটুলকে দেখিয়ে) বৌমার হাত ধরে, একসঙ্গে বৌঠানকে প্রণাম করো। বলি, তোর মা যে আজ বেঁচে নেই, সে কথাটা কি তোর মনে আছে হতভাগা? আয়—এদিকে আয়—

রঞ্জন। (দৈহিক ব্যথার ভাণ করে) ওঃ কী ভীষণ ব্যথা, পা ফেলতে পারছি না—

ধীরে ধীরে উঠে

ভবদেব। আমার কাঁধে ভর দেবে বাবাজী? এগিয়ে এসো—

হরনাথ। তুমিও যেমন। দাঁড়াতে পারছে না! বকামি করবার আর যায়গা পায় নি। দেখছ না, কেদিনে বসে বসে বিয়ের rehearsal দিচ্ছিল—তা' না হোলে এ্যাদ্দিনে ও আর পালাবার ফুরসৎ পেত না! (রঞ্জনকে) অমনি না পার, এই লাঠিটার ওপর ভর দিয়ে যা' বলছি ভালয় ভালয় তাই করো, নইলে তোমায় হাজতে পাঠাব, আমার টাকা চুরি কোরে পালিয়ে আসার অভিযোগে!

ভবদেব প্রাণখোলা হাসি হাসলেন। রঞ্জনের মুখ চোখ্ খুশীতে ভরে গেল—রমেশ টুলটুলকে টেনে নিয়ে এসে, দুজনকার হাত নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে তারাসুন্দরীর নিকটে গেল—দুজনে এক সঙ্গেই ভবদেব, হরনাথ ও রমেশকে প্রণাম করলে

রমেশ। আরে—না—না—আমাকে নয়—মাসি—ইতরজনের মিষ্টান্ন কিন্তু আজই চাই—(হরনাথের প্রতি) ভয় হয় কাকাবাবু, যা' thankless job. শেষে যদি ফাঁকে পড়ে যাই—

হরনাথ রমেশকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন

ভবদেব। হরনাথ, সাধে কি বলি—যা' হবার তা' হবেই—আমরা হলাম উপলক্ষ হে, উপলক্ষ—নিয়তি কেন বাধ্যতে—হা—হা—হা—

বারান্দা থেকে হাসপাতালের ডাক্তার এসে বল্লেন

ডাক্তার। মাফ্ করবেন আপনারা, ন'টা বেজে গেছে, মাত্র একজন ছাড়া আর প্রত্যেককেই দয়া কোরে চলে যেতে হবে। অবশ্য বলা বাহুল্য, পুরুষদের Cabinএ স্ত্রীলোক attendant থাকবারঅনুমতি নেই। Good night, Good night.

ডাক্তার চলে গেলেন—কথাটা বুঝতে পেরে হাসি গোপন করতে—টুলটুল রঞ্জন মাটির দিকে চাইল—তারাসুন্দরী মাথার কাপড়টা একটু টেনে দিলেন—হরনাথ ও ভবদেব মুখ চাওয়াচাওয়ি করলেন—রমেশ কিন্তু হো হো কোরে হেসে উঠলে।

—যবনিকা—

স্পর্শ

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মৈত্র

আমি যত কথা ব'লে যাই
নিষেধ নয়নে তব জাগে,
তোমার সে মৌন অনুরাগে
ভাষার সন্ধান খুঁজে পাই।
বাণী যবে স্তব্ধ হ'ল মোর
মুদিলাম ক্ষুধিত নয়ন,
তোমার নিবিড় বাহু ডোর
দিল খুলি রসনা শ্রবণ।
বক্ষে বক্ষে মৌন ধুক্ ধুক্
শোন মোর, আমি শুধু শুনি
তরঙ্গে তরঙ্গে সুরধনী
দেয় খুলি রুদ্ধ উৎস মুখ।
ডুবে যাই প্লাবন গহনে,
দৃষ্টি বাণী ফোটে পরশনে।

অনেজদেকং মনসো জবীয়ঃ

শ্রীসুধাংশুকুমার হালদার আই-সি-এস্

অবাক্ লাগে গো!
তোমায় দেখে দেখে আমার
অবাক্ লাগে গো!
অচল তোমার চলার তালে
মন যে আমার পথ হারালে,
বাক্য দিয়ে পাইনে নাগাল,
সরম জাগে গো!
তোমার বীণার ঝঙ্কার—
বাতাস হ'য়ে দেয় বহায়ে
প্রাণের পারাবার।
চলছ তুমি, চলছ না যে,
কাছে দূরে বাঁশী বাজে—
অন্তরে বাহিরে রাঙা
পরশ রাগে গো!

হিন্দু-উত্তরাধিকার ও বিবাহ-বিধি সংশোধন

শ্রীনারায়ণ রায় এম-এ, বি-এল

হিন্দুর উত্তরাধিকারী নির্ণীত হয় পিণ্ড-সিদ্ধান্ত অনুসারে। দায়ভাগ ও মিতাক্ষরার মধ্যে এই পিণ্ড-সিদ্ধান্তের ব্যাখ্যার অনৈক্য বর্ত্তমান থাকিলেও উভয়েই পিণ্ড-সিদ্ধান্তেরই সাহায্য এই ব্যাপারে গ্রহণ করিয়াছেন। দায়ভাগকার মৃতের পারলৌকিক উর্দ্ধগতির সর্ব্বোত্তম সাহায্যকারীকেই তাহার শ্রেষ্ঠ উত্তরাধিকারী বলিয়া স্থান দিয়াছেন।

বর্ত্তমানে হিন্দুর উত্তরাধিকার সংক্রান্ত আইনের সংশোধনের প্রয়োজন ঘটিয়াছে। ইহা অবশ্যই স্বীকার্য্য যে হিন্দু আইনের এই দিক অতি সুন্দর—কিন্তু তাহা হইলেও এই সঙ্গে ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে বর্ত্তমানকালের যুগ-গতির সহিত সমান তালে চলিতে হইলে ইহার কোন কোন অংশের পরিবর্ত্তন বা সংশোধন আবশ্যক।

সম্পত্তির ব্যাপারে হিন্দু-নারীর যে অধিকার সে সম্বন্ধে অনেক কিছুই বলিবার রহিয়াছে। সম্প্রতি মৃতপুত্রের বিধবা সম্বন্ধে যে আইন ভারতবর্ষীয় আইনসভা বিধিবদ্ধ করিয়াছেন তাহা অনেকেরই সন্তোষ বিধান করিবে। প্রকৃতই বহুস্থলে দৃষ্ট হয় যে, কোন ব্যক্তির মৃত্যুর পর তাহার পূর্ব্ব-মৃতপুত্রের বিধবা সম্পত্তির বিশিষ্ট অংশ না পাওয়ায় চিরকাল দেবর ও ভাশুরের গলগ্রহ হইয়া অশেষ নির্য্যাতন সহ্য করিতে বাধ্য হন—সেইদিক দিয়া অবস্থার উন্নতি হওয়ায় অর্থাৎ পূর্ব্ব-মৃতপুত্রের বিধবা তাহার মৃত স্বামীর প্রাপ্য অংশ পাওয়ায় আনন্দিত হইবার যথেষ্ট কারণ রহিয়াছে।

'রাউ কমিশনের' মতামত অনুযায়ী ভারতীয় কেন্দ্রীয় আইন সভায় সম্প্রতি দুইটী বিল উপস্থাপিত করা হইতেছে। ২৬ সংখ্যক বিল-এ আছে হিন্দুর উত্তরাধিকার সংক্রান্ত আইনের ও ২৭ সংখ্যক বিল-এ আছে হিন্দুর বিবাহ সংক্রান্ত আইনের সংশোধনের উদ্যোগ (১)। ২৭ সংখ্যক বিল-এর একটী দিক সম্বন্ধে আমরা ইতঃপূর্ব্বে সামান্য আলোচনা করিয়াছি ও দেখাইয়াছি উক্ত বিল কেন সমর্থন করা যায়না (২)। বর্ত্তমানে ২৬ সংখ্যক বিল সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিব।

উক্ত বিলের খসড়ায় পঞ্চম ধারা অনুসারে উইল না করিয়া কোন হিন্দুর মৃত্যু ঘটিলে তাহার সম্পত্তি, তাহার প্রথম উত্তরাধিকারীরূপে গণ্য তাহার বিধবা, পুত্র, কন্যা, পূর্ব্ব-মৃতপুত্রের পুত্র, ও পূর্ব্বমৃতপুত্রের মৃত পুত্রের পুত্রের মধ্যে বন্টিত হইবে। আইনের ভাষায় ইহারা 'Simultaneous heirs.' ইহাদের একজনও জীবিত থাকিতে পরবর্ত্তী উত্তরাধিকারীতে সম্পত্তি বর্ত্তাইবেনা (৩)

মৃতের বিধবাকে সম্পত্তির অংশ দেওয়ার বিধিতে আমরা প্রশংসাই করি। মৃতের অন্য স্ত্রীলোক উত্তরাধিকারীদিগের মধ্যে আমরা কন্যাকেই মাত্র দেখিতেছি—অথচ ১৯৩৭ সালের আইন অনুযায়ী পূর্ব্বমৃতপুত্রের স্ত্রীও মৃতের পুত্রের ন্যায় অংশীদার। বর্ত্তমান সংশোধন প্রস্তাবে সেই বিধবা পুত্রবধূর কোন স্থান নাই। সরকার যাহাকে কয়েকবৎসর পূর্ব্বে সম্পত্তি পাইতে অধিকারী বলিয়া বিবেচনা করিয়াছিলেন আজ সে অনধিকারী হইল কেন? ইহার উত্তরে কমিটি বলিতেছেন যে কন্যা হিসাবে তাহাকে তাহার পিতার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী করিয়াছি পুনরায় তাহাকে তাহার স্বামীর পিতার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী করিবার প্রয়োজন নাই ("It will be remembered that under the Deshmukh Act, she shares equally with the widow and the son ; * * * But now that we are providing for her as daughter in her own father's family, it seems unnecessary to provide for her again in her father-in-law's family"—Explanatory note)

এই ব্যবস্থায় আমাদিগের আপত্তি রহিয়াছে। কন্যার বিবাহের সময় প্রচুর অর্থ দিয়া বিবাহ দিতে হয়, ইহাতেই বহু পিতাকে সর্ব্বস্বান্ত হইতে হয়, পুনরায় তাহাকে তাহার ভ্রাতার সহিত পিতার উত্তরাধিকারী নির্ব্বাচন করিবার প্রয়োজন কি? কন্যাকে পুত্রের সহিত একত্রে পিতার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী করিতে হইলে অগ্রে বরপণ প্রথার উচ্ছেদ করিতে হইবে।

দ্বিতীয় কথা এই যে, কন্যা পিতার সম্পত্তি পাইলে সেই সম্পত্তির কি অবস্থা হইবে? কন্যা তাহার স্বামীর আলয়ে স্বামীর সহিত বসবাস করিবে—এইটীই সাধারণ নিয়ম ও এইটী আশা করা যায়। পিতার সম্পত্তি তাহার উপর বর্ত্তাইলে সে যে আপনি আসিয়া সেই সম্পত্তি দেখাশুনা করিবে উহা আশা করা যায় না, ফলে সেই সম্পত্তি কার্য্যতঃ অন্যের পরিচালনাধীনে যাইবে ও অধিকারিণী আপনি দেখাশুনা না করিলে সম্পত্তির যে অবস্থা হয় সেই অবস্থাই হইবে। কিন্তু পুত্রবধূ সম্পত্তি পাইলে ইহার আশঙ্কা থাকে না।

বর্ত্তমান হিন্দু আইনেও অবিবাহিতা কন্যা সম্বন্ধে সুব্যবস্থা আছে। কমিটিরও নাকি সংকল্প ছিল যে অবিবাহিতা কন্যা ও

---

(১) এই দুইটী বিল-এর খসড়া ৩০শে মে তারিখে India Gazette Part. V-এ প্রকাশিত হইয়াছে।

(২) ভারতবর্ষ আশ্বিনসংখ্যা

(৩) Sec. 5. The following relatives of an intestate are his enumerated heirs.

Class I—Widow and descendants :—

(1) Widow, son, daughter, son of a pre-deceased son, and son of a pre-deceased son of a pre-deceased son (the heirs in this entry being hereinafter in this act referred to as "simultaneous heirs".

Sec. 6. Among the enumerated heirs, those in one class shall be preferred to those in any succeeding class ; and within each class, those included in one entry shall be preferred to those included in any succeeding entry, while those included in the same entry shall take together.

বিধবা পুত্রবধূকেই মৃতের সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী স্থির করিবেন, বিবাহিতা কন্যা কিছুই পাইবে না। কিন্তু তাঁহারা নাকি পরে বহু প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন আইন ব্যবসায়ীর গুরুত্বপূর্ণ যে মতামত পান, তাহার উপর নির্ভর করিয়া তাঁহারা প্রত্যেক কন্যাকেই পিতার সম্পত্তিতে অংশ দিয়াছেন ("under our original plan, the unmarried daughter and the widowed daughter-in-law were to share equally with the son and the widow, the married daughter getting no share. But the exclusion of the married daughter has been criticised by lawyers of weight, and is opposed to the view of the majority of those who answered our questionnaire last year. They considered that there should be no distinction between the married and the unmarried daughter in the matter of inheritance. We have accordingly proposed in the Bill that each daughter whether married or unmarried, should get half the share of a son."—Explanatory note)

পুত্র ও কন্যার একত্রে মৃত পিতার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হওয়া অনেকেই চাহেন ও বর্ত্তমানে তর্কের খাতিরে যদি আমরা সে দাবী স্বীকার করিয়াই লই তাহা হইলেও সমস্যার সমাধান হয় না।

কন্যা পিতার সম্পত্তির কতটুকু পাইবে? প্রস্তাবিত বিলের সপ্তম ধারার "ডি" উপধারায় বিধিবদ্ধ হইয়াছে যে, মৃতের প্রতি কন্যা অর্দ্ধেক অংশ পাইবে (Each of the intestate's daughters shall take half a share, whether she is unmarried, married or a widow, rich or poor; and with or without issue or possibility of issue.) এই যে "half a share"—ইহার অর্থ কি? খসড়ায় তাহা সুস্পষ্টভাবে নির্দ্দেশ করা উচিত ছিল।

এক্ষণে প্রশ্ন হইতেছে ইহাই যে, কন্যা যে সম্পত্তি পাইল তাহাতে তাহার কিরূপ অধিকার হইবে? দেখা যাইতেছে উহা তাহারা নিব্যূঢ় সত্বে পাইবে ও উহা তাহাদিগের স্ত্রীধনরূপে গণ্য হইবে। বিধবার পক্ষে কিন্তু ইহার ব্যতিক্রম হইয়াছে। ত্রয়োদশ ধারায় (এ) চিহ্নিত অংশে বলা হইয়াছে যে স্বামীর নিকট হইতে প্রাপ্ত সম্পত্তি তাহার মৃত্যুর পর তাহার স্বামীর উত্তরাধিকারীতে বর্ত্তাইবে [Property inherited by her from her husband shall devolve upon his heirs, in the same order and according to the same rules as would have applied if the property had been his and he had died intestate in respect thereof immediately after his wife's death—Section 13 (a.)] তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে, বিধবা মাতার মৃত্যুর পর, সেই বিধবা মাতা তাহার স্বামীর সম্পত্তির যে অংশ পাইয়াছিল পুত্রকন্যা জীবিত থাকিলে সেই সম্পত্তি পুনরায় তাহাদিগের মধ্যে বণ্টিত হইবে অর্থাৎ কন্যা পুনরায় অংশ পাইবে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি হিন্দুর সম্পত্তির উত্তরাধিকারত্ব নির্ণীত হয় পিণ্ড-সিদ্ধান্ত অনুযায়ী। কন্যা সম্পত্তি পায় এই কারণে যে দৌহিত্র হইতে মৃতের পারলৌকিক ঊর্দ্ধগতির সম্ভাবনা থাকে। এক্ষণে দেখা যাউক কন্যা তাহার পিতার মৃত্যুতে ও পরে তাহার বিধবা মাতার মৃত্যুতে যে সম্পত্তি পাইল তাহার কতটুকু অংশ সেই কন্যার পুত্র পাইল। কন্যা উক্তরূপে যাহা পাইল তাহা তাহার স্ত্রীধন। স্ত্রীধনের উত্তরাধিকারত্ব নির্ণীত হইবে প্রস্তাবিত বিলের ১৩(বি) ধারা অনুসারে। উক্ত ধারা অনুযায়ী স্ত্রীধনের উত্তরাধিকার ক্রম নিম্নরূপ:—

(১) কন্যা (২) কন্যার কন্যা (৩) কন্যার পুত্র (৪) পুত্র (৫) পুত্রের পুত্র (৬) পুত্রের কন্যা (৭) স্বামী (৮) স্বামীর উত্তরাধিকারীগণ (৯) মাতা (১০) পিতা (১১) পিতার উত্তরাধিকারী (১২) মাতার উত্তরাধিকারী।

অবস্থাটা দাঁড়াইতেছে এই যে পিতার নিকট হইতে কন্যা যে সম্পত্তি পাইল তাহাতে পিতার দৌহিত্রের অধিকার জন্মাইবার আশা সুদূর পরাহত কেন না দৌহিত্রী, দৌহিত্রীর কন্যা এমন কি দৌহিত্রীর পুত্রের দাবীও তাহার দৌহিত্রের দাবী হইতে অগ্রগণ্য। এই ধারায় স্পষ্টতঃই হিন্দু আইনের মূলনীতিকে উল্টাইয়া দেওয়া হইয়াছে। আমরা ইহাকে কোনক্রমেই স্বীকার করিয়া লইতে পারি না।

ভারতবর্ষ পত্রিকার গত শ্রাবণ সংখ্যায় "স্ত্রীধন ও উত্তরাধিকার" শীর্ষক প্রবন্ধে আমি কয়েকটী সমস্যার আলোচনা করিয়াছিলাম। বর্ত্তমান আইনের যে অংশে আমার আপত্তি জ্ঞাপন করিয়াছিলাম প্রস্তাবিত বিল-এ তাহার কোনরূপ প্রতিকার নাই। যে নিঃসন্তান স্ত্রীলোক স্বামী গৃহে নির্য্যাতিতা হইয়া স্বেচ্ছায় স্বামীগৃহ ত্যাগ করিয়া, অথবা বহিষ্কৃত হইয়া, পিতৃগৃহে বা ভ্রাতৃগৃহে আশ্রয় লইয়াছে ও উত্তরকালে স্বকীয় চেষ্টায় স্বোপার্জ্জিত অর্থে কিছু সম্পত্তি করিয়াছে, তাহাদিগেরও প্রথম উত্তরাধিকারী হইতেছে স্বামী ও স্বামী না থাকিলে স্বামীর উত্তরাধিকারিগণ অর্থাৎ হয়ত যে সপত্নীর জ্বালায় সে স্বামী গৃহত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিল সেই সপত্নী বা তাহার পুত্র-কন্যাগণ। এ ব্যবস্থার প্রতিবাদ আমরা পূর্ব্বেই করিয়াছি।

আমরা পুনরায় পঞ্চম ধারার আলোচনায় ফিরিয়া আসিব। পঞ্চম ধারায়

(১) বিধবা, পুত্র, কন্যা, পূর্ব্ব-মৃত পুত্রের পুত্র, পূর্ব্ব-মৃত পুত্রের মৃত পুত্রের পুত্র একত্রে

(২) দৌহিত্র

(৩) পৌত্রী

(৪) দৌহিত্রী—

ইহাদিগকে প্রথম শ্রেণীর উত্তরাধিকারীরূপে গণ্য করা হইয়াছে। ইহাদিগের মধ্যে পিতামাতার স্থান নাই। অর্থাৎ আমার মৃত্যুর পর অন্য উত্তরাধিকারী না থাকিলে আমার সম্পত্তি বরং আমার কন্যার কন্যা পাইবে তথাপি আমার বৃদ্ধ পিতামাতা যাহাদিগকে দেখিবার আর কেহই নাই তাহারা পাইবে না—এ ব্যবস্থা কিরূপে ন্যায়বিচার সঙ্গত তাহা আমাদিগের বোধগম্য হয় না।

পিতামাতাকে স্থান দেওয়া হইয়াছে দ্বিতীয় শ্রেণীতে। পিতা

ও পীতার মধ্যে মাতাকে স্থান দেওয়া হইয়াছে পিতার অগ্রে, কিন্তু কেন কমিটি এইরূপ করিয়াছেন তাহার যুক্তিস্বরূপ যাহা বলিয়াছেন তাহাতে তাঁহারা নিজেরাই উপহাসাস্পদ হইয়াছেন। কৈফিয়তের ভনিতায় বলিয়াছেন—মিতাক্ষরা মাতাকে অগ্রে, দায়ভাগ পিতাকে অগ্রে স্থানদান করে, শ্রীকর কিন্তু বলেন যে উভয়ের একত্রে পাওয়া উচিত—কমিটির যুক্তি কিন্তু যাজ্ঞবল্ক্য, মিতাক্ষরা, দায়ভাগ বা শ্রীকর কাহারও উপর নির্ভর করিয়া নহে, কমিটির যুক্তি কমিটির স্বকপোলকল্পিত। কমিটির মতে মাতার স্থান পিতার অগ্রে হওয়া উচিত এই কারণে যে, পিতা যদি পরে একটী যুবতী স্ত্রী পরিগ্রহ করেন ত' সেই পরবর্ত্তী স্ত্রীর প্রতি অনুরাগ বশতঃ মৃতের সম্পত্তির সুখ সুবিধা হইতে মৃতের মাতাকে বঞ্চিত করিতে পারে (৪)—যুক্তি উত্তম, কিন্তু ইহার স্থান কোথায়? ২৭ সংখ্যক প্রস্তাবিত বিল-এর (হিন্দু বিবাহ বিধি সংশোধন কল্পে—ইহার সংক্ষিপ্ত আলোচনা আশ্বিন সংখ্যায় করিয়াছি) চতুর্থ ধারা অনুযায়ী কেহত' এক স্ত্রী বর্ত্তমানে পুনরায় বিবাহ করিতে পারিবেনা, সুতরাং পিতা মৃতের মাতা বর্ত্তমানে পুনরায় 'যুবতী স্ত্রী' পরিগ্রহ করিবে কি প্রকারে?

প্রস্তাবিত বিলটীর সমগ্র আলোচনা করিতে হইলে সময়ের প্রয়োজন। বঙ্গীয় প্রাদেশিক হিন্দু মহাসভা কর্ত্তৃক নিযুক্ত হিন্দু-ল' রিফর্মস্ কমিটি তাহা করিতেছেন ও আশা করা যায় যে শীঘ্রই জনসাধারণের সমক্ষে উক্ত কমিটি তাঁহাদিগের মতামত খুঁটিনাটি বিচার করিয়া উপস্থাপিত করিবেন। আমি মোটামুটি বিচার করিয়া ইহাই বলিতে পারি যে প্রস্তাবিত বিল-এ হিন্দুর সম্পত্তিকে খণ্ড-বিখণ্ড করিবার আয়োজন করা হইয়াছে; সে আয়োজন সফল হইলে হিন্দুর আর্থিক অবস্থার অবনতিই হইবে ও পিতৃপুরুষের অর্থে ধনী হিন্দুর অস্তিত্বই থাকিবে না।
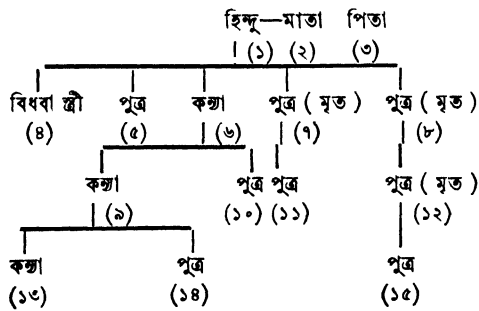
উক্ত হিন্দুর মৃত্যুর পর তাহার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইল ৪, ৫, ৬, ১১ ও ১৫ সংখ্যক উত্তরাধিকারী অর্থাৎ তাহার সম্পত্তির কিয়দংশ ৬ সংখ্যক উত্তরাধিকারীর হস্তে ন্যস্ত হইয়া অপর পরিবারে চলিয়া গেল। পুনরায় ৪ সংখ্যকের মৃত্যুর পর আরও কিছু অংশ ৬ সংখ্যকের নিকট গেল। ৫, ১১ ও ১৫ সংখ্যকের মৃত্যুর পরও এইরূপে কিছু অংশ পুনরায় অপর পরিবারে যাইবে। ৬ সংখ্যকের মৃত্যুর পরও তাহার উত্তরাধিকারী হইবে ৯ সংখ্যক, তাহার অবর্ত্তমানে ১৩ তদভাবে ১৪। আবার ৪, ৫, ৬, ১১ ও ১৫ সংখ্যক উত্তরাধিকারীদিগের কেহ না থাকিলে হিন্দুর সম্পত্তি পাইল ২ সংখ্যক যাহার উত্তরাধিকারী সেই হিন্দুর ভ্রাতা নহে—ভগিনী তদভাবে ভাগিনেয়ী (ভাগিনেয় নহে)।(৫)

এইরূপে দেখা যাইতেছে যে প্রস্তাবিত আইনের ফলে স্ত্রীলোকের সম্পত্তি স্ত্রীলোকই পাইবে কিন্তু পুরুষের সম্পত্তি স্ত্রী ও পুরুষ উত্তরাধিকারীদিগের মধ্যে বন্টিত হইবে—এইভাবে দুই তিন পুরুষ পরে দেখা যাইবে যে হিন্দু সমাজে সম্পত্তির মালিক স্ত্রীলোকই পুরুষ হইতে অধিক ও সমাজ পিতৃকর্ত্তৃত্বমূলক (Patriarchal) না হইয়া মাতৃকর্ত্রীত্বমূলক (Matriarchal) হইয়া যাইবে।

আমরা মনে করি ইহা দ্বারা হিন্দু সমাজের মূল উৎপাটিত হইবে।

২৭ সংখ্যক বিল সম্বন্ধে সামান্য আলোচনা করিয়াছি আশ্বিন সংখ্যায়।—বর্ত্তমানে তাহার পুনরালোচনার প্রয়োজন দেখি না। উক্ত বিলের আলোচিত অংশ ব্যতীত অন্যান্য বহু স্থলে আপত্তিকর অংশ আছে, প্রয়োজন বুঝিলে তাহার আলোচনা পরে করা যাইবে।

উক্ত বিলের চতুর্থ তপশীলে বলা হইয়াছে Special Marriage Actএর ২২ হইতে ২৬ ধারার সকল স্থান হইতে "হিন্দু" শব্দটী অপসারিত করা হইবে। জ্যৈষ্ঠের ভারতবর্ষে 'বিশেষ-বিবাহ-বিধি' শীর্ষক প্রবন্ধে অসবর্ণ বিবাহকারী হিন্দুর দুর্দ্দশা ও অসুবিধার কথা উল্লেখ করিয়া উক্ত আইনের ২২ হইতে ২৬ ধারা লোপ করিয়া দিবার প্রস্তাব করিয়াছিলাম। আলোচ্য বিলের চতুর্থ তপশীলে বর্ণিত ব্যবস্থার ফলে হিন্দুগণ আর উক্ত ধারাগুলির আমোলে আসিবে না—ইহাতে হিন্দুগণের পক্ষে উক্ত ধারাগুলি কার্য্যতঃ লুপ্ত হইয়াছে। এই ব্যবস্থায় আমরা আনন্দিতই হইয়াছি।

মোটামুটী ভাবে বিচার করিয়া আমরা ইহাই বলিতে চাহি যে, ২৬ সংখ্যক বিল অর্থাৎ হিন্দু উত্তরাধিকার আইনের সংশোধন বিল পুরাপুরি ভাবে সরকার প্রত্যাহার করিয়া লউন ও ২৭ সংখ্যক বিল অর্থাৎ হিন্দু বিবাহ বিধি সংশোধন বিল আবশ্যকমত সংশোধন করিয়া পরিবর্ত্তন করা হউক।

(4). "If the father happens to have married a second and younger wife, there is a chance of the deceased's own mother suffering"—Explanatory note.

(৫) সংখ্যাগুলি উত্তরাধিকার-ক্রম অনুযায়ী নহে।

যাতায়াত

শ্রীসুবোধ বসু
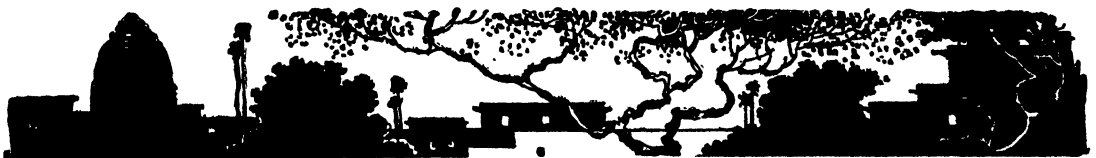
সত্যকথা বলিতে কি, দিল্লীটা ছাড়িয়া হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলাম। আমরা ম'শায় কলিকাতার লোক, এই রকম কাটখোট্টা দেশে দুইদিন থাকিতে হইলেও প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়। ভূগোলে পড়িয়াছিলাম, মরুস্থানের কথা ; তখন বিশ্বাস করি নাই। এখন দেখিতেছি, আস্ত একটা মরুভূমির মধ্যেই ঘাস গজান যায়। যেমন রোদ, তেমনি কটরমটর বুলি, তেমনি ম'শায় খাওয়া-দাওয়া। এখানকার ঘোড়ার গাড়ী দেখিয়া হাসিয়া তো আর বাঁচিনা। জিনিষপত্র অগ্নিমূল্য, মেয়ে মানুষের আব্রু নাই, দ্রষ্টব্যের মধ্যে বাদশা-বেগমের কবর। শরীরটা রী-রী করে। এই রকম পাণ্ডববর্জ্জিত স্থানে—(বেশ, না হয় পাণ্ডবেরা এখানে ছিলেনই, কিন্তু কলিকাতা দেখিলে নিশ্চয়ই কলিকাতায় চলিয়া যাইতেন) কি সুখে লোকে বাস করে! আমাদের কলিকাতা ম'শায় স্বর্গ। অথচ দিল্লীতে আমাকে গোটা একটা মাস কাটাইতে হইল।

আপনারা অবশ্যই বলিতে পারেন, যখন দিল্লীটা এমন খারাপ লাগিয়াছে তখন এতদিন থাকিতে গেলে কেন বাপু? উত্তরে আমি বিনীতভাবে জানাইয়া দিতে চাই, ইচ্ছা করিয়া এখানটায় থাকিতে আসি নাই, নেহাৎ স্বার্থের খাতিরে বাধ্য হইয়া আসিয়াছি। নইলে অন্তত আমি এ-হেন স্থানে একটা হপ্তাও থাকিতে পারিতাম না।

খবর পাই, সরবরাহ বিভাগ নারিকেলের খোলা চাহিতেছে। বড়ই অভিভূত হইলাম। ভূ-ভারতে এমন জিনিষ আর কে কবে চাহিয়াছে। আমি সংকল্প করিলাম, এ দ্রব্য আমিই সরবরাহ করিব। বড়বাজারের কাপড়িয়া পট্টিতে আমার কাটা কাপড়ের ব্যবসা। দেশে কিছু লগ্নী আছে, (তবে চুপে চুপে বলিয়া রাখি, নতুন আইনের দৌলতে তার অবস্থা সুবিধার নয়।) তবে কাপড়ের ব্যবসাটা আপনাদের কৃপায় মন্দ জমে নাই। এটা বাপ পিতাম'র ব্যবসা—রক্তের গুণ আছে তো। কিন্তু নারিকেলের খোলা সরবরাহ করিয়া যদি দশ পাঁচ হাজার কামাইতে পারি তো মন্দ কি! নানা রকম হিসাবপত্র করিলাম। নারিকেল ব্যবহারের পর খোলাগুলি কোথায় যায় সে সম্বন্ধে বিস্তর খোঁজ খবর লইলাম। জল খাইয়া যে হাজার হাজার নারিকেল কলিকাতার রাস্তায় ফেলিয়া দেওয়া হয় এবং যাহা কর্পোরেশনের জঞ্জাল ফেলা গাড়ীতে চড়িয়া স্থানান্তরিত হয় তাহা সংগ্রহ করা সম্ভব কিনা এবং তাহার মোট পরিমাণ কত এবং তাহার খোলা ব্যবহার করা চলিবে কিনা, এ সম্বন্ধে রীতিমত তত্ত্বতল্লাস করার পর আমিও টেণ্ডার দাখিল করিলাম। সেই সূত্রেই আপনাদের রাজধানীতে আসা ; মাথায় থাকুক রাজধানী, এখন নিজের ডেরাতে ফিরিতে পারিলে বাঁচি!

এইখানে আমি আপনাদের একটা ভ্রান্ত ধারণা দূর করিতে চাই। কাটা কাপড়ের ব্যবসার কথা শুনিয়া আপনাদের ধারণা হইয়াছে আমি মূর্খই হইব। কিন্তু বিনীত নিবেদন করিতে চাই, আমি তাহা নহি। আমি একজন গ্রাজুয়েট। মাত্র দুইবারের চেষ্টাতেই পাস করিতে সমর্থ হইয়াছি। সুতরাং আমার মতামত আমার স্বাধীন চিন্তারই ফল। দিল্লীর প্রতি আমার অভক্তিকে একটা কুসংস্কার মনে করিবেন না। আমি স্বাধীনভাবে চিন্তা করিয়াই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি।

গাড়ী চলিয়াছে। ইণ্টার ক্লাসের যাত্রীর অভাব হয় না। তবে সকলেই খোট্টা এবং কিড়িরমিড়ির ভাষা আওড়াইতেছে। একটা দিন কোনও মতে কাটাইয়া দিতে পারিলেই বঙ্গজননীর সুমধুর ভাষা শুনিতে পাইব ; ট্রাম এবং বাসে যাতায়াত করিতে পারিব এবং ইচ্ছামত কই ও ইলিশ মাছ কিনিয়া খাইতে পারিব। চোখ বুজিয়াই স্বদেশের অর্থাৎ কিনা বাংলা দেশের স্বপ্ন দেখিতেছিলাম এমন সময় আহ্বান আসিল, "কলকাতায় যাচ্ছেন? বাঙালী তো?"

চাহিয়া দেখিলাম এক বাঙালী ছোকরা। খদ্দর পরা, মুখে একটা চুরুটের এক-অষ্টমাংশ এবং চক্ষুতে বেশ একটা স্পষ্ট ডোণ্ট-কেয়ার ভাব।

একটু ঠিক হইয়া বসিয়া আমি কহিলাম—"আজ্ঞে হ্যাঁ। বসুন, বসুন। আমি ভাবলাম সারা গাড়ীই খোট্টায় ভরা—স্বদেশবাসী—"

"একটু ভুল করেচেন" ছোকরা চুরুটের ধোঁয়া ছাড়িয়া কহিল, "আপনার স্বদেশবাসী হবার যোগ্যতা আমার নাই—আপনার খোট্টাদেরও আমি স্বদেশবাসী বিবেচনা করি।"

একটু লজ্জিত হইয়া কহিলাম—ব্যাপক অর্থে তাই বটে, তবে কিনা—

"ব্যাপক অর্থে পৃথিবীর লোকই স্বদেশবাসী—সব ঠাঁই মোর ঘর আছে আমি সেই ঘর লব—রবি ঠাকুরের কথা।" ছোকরা পাশেই বসিয়া জানলা দিয়া চুরুটের টুকরাটা বাহিরে ছুঁড়িয়া ফেলিল এবং ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া কহিল, সিগারেট আছে?

পকেট হইতে সিগারেটের প্যাকেটটা বাহির করিয়া দিলাম।

আমার নিকট হইতেই দেশলাই চাহিয়া সে সিগারেট ধরাইল। কহিল, আমরা মশায় মানুষের ভৌগলিক পার্থক্য মানি না। এটা ডায়েলেকটিক্স্ সম্মত নয়। তবে এটা মনে করবেন না যে মানুষে মানুষে প্রভেদ নেই। আছে এবং সে বিভেদই গুরুতর। জগতে দুই জাত আছে—এক পুঁজিবাদী ও অপর সর্ব্বহারা—ক্যাপিটেলিষ্ট এবং প্রোলেটারিয়েট···

"আপনি কি?"

"হ্যাঁ, কম্যুনিষ্ট। আমি ডায়ালেকটিক্সের ছাত্র। শুধু তাই বিশ্বাস করি যা যুক্তিসহ। কোনও রকম ক্রিড্ মানি না। মার্কস্-এর বাণীকেই একমাত্র সত্য বলে মানি···আপনার কি করা হয়?"

"বড়বাজারে কাটা কাপড়ের ব্যবসা আছে।"

"আপনি একজন এম্প্লয়ার? লোক খাটান?"

"তা দশ পনেরজন কর্ম্মচারী আছে বৈকি।"

"অর্থাৎ দশ পনেরজন লোককে এক্সপ্লয়েট অর্থাৎ কিনা শোষণ করে' আপনি ব্যাঙ্কের হিসাব বাড়াচ্ছেন…আগে জানলে আপনার সিগারেটের লোভ সত্ত্বেও আলাপ করতে আসতুম কিনা সন্দেহ…"

"দশ পনেরটা লোকের অন্নের ব্যবস্থা করে 'কি এমন অন্যায় কাজটা করচি…"

"অন্যায় করছেন না মানে? কত টাকা এদের মাইনে দেন? ১০৲, ১৫৲, ৫৲, ৭৫৲ ব্যস্। নিজে কত লাভ করেন? পুঁজির সুবিধা নিয়ে নিজ ইচ্ছেমত সর্ত্তে এতগুলি লোককে খাটাচ্চেন, আর বলছেন অন্যায় কোথায়? প্রকৃত বুর্জ্জোয়ার মতই কথা হয়েচে। দিন্ দেখি আর একটা সিগ্রেট…"

মহা বখা ছোকরা। আমাকে গালাগালি করিয়া অম্লানবদনে আবার আমারই কাছে সিগারেট চাহিয়া বসে। কিন্তু না দিয়া উপায় কি? সিগারেটের বাক্সটা দিয়া প্রশ্ন করিলাম, "আপনার কি করা হয়?"

চোখ পাকাইয়া ছোকরা একমুহূর্ত্ত আমার চোখের দিকে চাহিয়া রহিল। তারপর প্রতিবাদের ভঙ্গীতে কহিল, আপনারা উপায় রেখেচেন কি কিছু করবার? ক্যাপিটিলিষ্টিক সোসাইটির সঙ্গে ওতঃপ্রোতভাবে জড়িয়ে রয়েছে আন্এমপ্লয়মেণ্ট…ষ্টেটের একমাত্র উদ্দেশ্য কতগুলি পুঁজিবাদীর সাহায্য করা, তাদের সম্পদের পরিমাণ স্ফীততর করতে সাহায্য করা। আপনি খেতে পারলেন না, আমি খেতে পারলুম না, তাতে এসে গেল কি? সোসাইটি, মানে আপনাদের সোসাইটি, শুধু মুষ্টিমেয়ের স্বার্থের জন্য গঠিত…লক্ষ লক্ষ লোক বেকার পড়ে রইলেও মিল-মালিকদের প্রফিটে ঘাট্তি পড়ে না…তাই আমি বেকার, আমার মত লক্ষ লক্ষ ছেলে বেকার…তাদের সমাজের কল্যাণকর কাজে নিয়োগ করবার কথা কারুর…দিন দেখি দেয়াশলাইটা, নিভে গেল…"

"দিল্লীতে চাকরির চেষ্টায় এসেছিলেন বুঝি?"

"হ্যাঁ, ঠিক বলেছেন, তবে নিজ ইচ্ছেয় আসিনি, বাবা জোর করে' পাঠিয়েছেন। আমি আণ্ডার প্রোটেষ্ট এসেছি। এই গমনোন্মুখ সমাজ ব্যবস্থার ক্রু বল্ট্ হ'তেও ঘৃণা বোধ করি… আমাদের cause-এর তাতে ক্ষতি হয়…"

cause, কিসের 'cause'? জিজ্ঞাসা করিলাম:

ছোকরা আমার দিকে হাঁ করিয়া কতক্ষণ চাহিয়া রহিল। এমন অবাক কথা যেন ইতিপূর্ব্বে আর কখনও শোনে নাই। অতঃপর প্রায় তাচ্ছিল্যের ভঙ্গীতে কহিল, "ধনিক-শ্রমিক সংগ্রামের কথা শুনেছেন? এ-ব্যবস্থা থাকবে না—থাকতে দেব না। মস্কো নামক একটা জায়গা আছে, নাম শুনেছেন? থার্ড ইণ্টার ন্যাশন্যালের নাম শুনেছেন? মার্কস্ বলেছিলেন, লেট্ দি বুর্জ্জোয়া বি রেডী ফর এ কম্যুনিষ্টিক রিভোলিউশন—নিশ্চয়ই এ-কথা পূর্ব্বে শোনেন নি। ভাল করে' শুনে রাখুন। সোভিয়েট রাশিয়ায় যা হয়েচে সর্ব্বত্রই তা হবে।"

"সর্ব্বনাশ" চিন্তিত হইয়া কহিলাম, "কবে হবে ম'শায়, বলতে পারেন। দু-চার দিন আগে থাকতেই দোকানটা বন্ধ রাখব। দাঙ্গা-হাঙ্গামার মধ্যে আমি নেই।"

ছোকরা কৃপাভরা দৃষ্টিতে চাহিয়া কহিল, হোপ্লেস্, আপনার দ্বারা কিছু হবে না। বুর্জ্জোয়া ট্রাডিশনে গড়ে উঠেচেন।… টিফিন বাক্সটায় কি এনেছেন? দেখব নাকি একটু খুলে। পেটটা ম'শায় রীতিমত আর্ত্তনাদ করতে আরম্ভ করেছে…

বুঝিলাম, সাম্যবাদের নীতিটা হাতে-কলমে পরীক্ষা করিতে আরম্ভ করিয়াছে। কোনও বাধা দিলাম না—বাধা দিবই বা কি করিয়া। শুধু এই কথা কল্পনা করিয়া আনন্দিত হইতে লাগিলাম, খাইয়াই বাছাধনকে পস্তাইতে হইবে। দিল্লীর লাড্ডু খাইয়া কে আর কবে আনন্দ লাভ করিয়াছে!

কিন্তু কি সর্ব্বনাশ, এক ডজন গলাধঃকরণ করিয়া ছোকরার উৎসাহ যেন অকস্মাৎ বাড়িয়া গেল। মার্কস, এঙ্গেল, লেনিন, ষ্টালিন, বিশ্বাসঘাতক ট্রটস্কিয়াইটস্, মস্কো, লেনিনগ্রাদ, কেরেনস্কি, অক্টোবর রিভোলিউসন, থার্ড ইণ্টার ন্যাশন্যাল, রেণ্ট, প্রফিট, মনোপলি, বুর্জ্জোয়া, প্রলিটেরিয়েট, পঞ্চ-বাৎসরিক পরিকল্পনা, 'মাস্' কনটাক্‌ট-বক্তৃতা আর থামেই না। আমি হাই তুলি, তুড়ি দেই, এদিকে তাকাই এদিকে তাকাই, প্যাঁটরাটা অনাবশ্যক ভাবে খুলি বন্ধ করি, কিন্তু বক্তা সামান্য মাত্র দমে না। দিল্লীর লাড্ডু খাইয়া ইহার বিদ্যার দরজাটা খুলিয়া গিয়া সকলই বাহির হইয়া আসিবার উপক্রম করিয়াছে।

"বুর্জ্জোয়া আর্ট, বুর্জ্জোয়া লিটারেচার, বুর্জ্জোয়া ফিলজফি" ছোকরা উৎসাহের সঙ্গে বলিতে থাকে, "মাসের' দাবীকে দাবিয়ে দেবার জন্য সৃষ্টি করা হয়েছিল। রিলিজান বা ধর্ম্মের উৎপত্তি জানেন তো? এক্স্প্লয়টেডদের বশে রাখবার মত বড় কৌশল আর নেই। অ্যাণ্ড হোয়াট্ আর্ ইয়র কংগ্রেস লিডার্স?…

নিরুপায় হইয়া বলিলাম, সঙ্গে কিছু ভাল আপেল আর কলা আছে, খাবেন কি?

ছোকরা বলিল, নিশ্চয়ই। কোথায়?

কিছুক্ষণের জন্য নিশ্চিন্ত।

তবেই বুঝুন, কি শুভক্ষণে আমি দিল্লী যাত্রা করিয়াছিলাম। এই সকল দুর্ঘটনা সত্ত্বেও যে টেণ্ডার মঞ্জুর হইয়াছিল, তাহা একমাত্র কালিঘাটের মা কালীরই দয়া। একটি মাত্র পাঁঠা ও সামান্য কিছু চালকলা সন্দেশেই তিনি অধম ভক্তের উপর এতটা প্রসন্ন হইয়াছিলেন, ইহাতে মায়ের উদারতা ও মহত্ত্বেরই লক্ষণ। তবে মনে মনে আরও মানত করিয়া রাখিয়াছি, মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইলে ফড়িং ধরিয়া খাও বলিয়া নিশ্চয়ই ফাঁকি দিব না। মার নিকট একটি আকুল প্রার্থনা জানাইয়াছি, আর যেন দিল্লীতে গিয়া বাস না করিতে হয়।

কলিকাতা সহরটাকে বিভিন্ন অঞ্চলে বিভক্ত করিয়া প্রতি ঘাঁটিতে ডাবের দোকানের উপর নজর রাখিবার জন্য লোক মোতায়েন রাখিয়াছি। ডাবের দোকানের মালিকেরা আনন্দিত হইয়া উঠিয়াছে; দোকানের সম্মুখে বাতিল ডাবের জঞ্জালকে আর স্ক্যাভেঞ্জারের গাড়ীর প্রত্যাশায় অপেক্ষা করিতে হয়না, আমার লোকেরাই চোখের পলকে তাহা উদ্ধার করিয়া লইয়া আসে। শুধু ডাব যারা পান করেন আমার লোকদের সতৃষ্ণ অপেক্ষা দেখিয়া তাঁহারাই কিছু বিরক্তি বোধ করেন। কিন্তু আমার তাতে কিছুই আসিয়া যায় না। আমি পুলকিতচিত্তে সরবরাহ বিভাগকে সরবরাহ করিতে থাকি।

ছয় মাস পরের কথা বলিতেছি। মা কালী বহু দয়া করিয়াছেন, কিন্তু পুরাপুরি মনোবাঞ্ছা পূরণ করা তাঁহার স্বভাব নহে—দেবতা বা মানুষ কাহারো স্বভাব নহে। সরবরাহ বিভাগ হইতে নারকলের খোলার নূতন টেণ্ডার আহ্বান করা হইয়াছে। শুনিলাম, কর্পোরেশনের কোন একজন চাঁই তাহার এক আত্মীয়ের জন্য তদ্বির তল্লাস করিতেছে। নারকেলের খোলা জোগাড় করা তাহার পক্ষে আরও সহজ তাহা অস্বীকার করিতে পারিলাম না। শঙ্কিত হইয়া উঠিলাম। সুতরাং পুনর্ব্বার বাধ্য হইয়া আমাকে মুসলমান বাদশাহের কবরখানা দিল্লী নগরীতে যাত্রা করিতে হইল।

গিন্নী বলিলেন, এত দূরের পথ। ইণ্টার ক্লাসে কষ্ট হয়। সেকেণ্ড ক্লাসে যাও। টাকার কথা স্মরণ করিয়া প্রতিবাদ করিতে যাইতে ছিলাম, কিন্তু তাহার পূর্ব্বেই তিনি বলিলেন, টাকা আর কিসের জন্য উপার্জ্জন করিতেছ? নিজের সুখই যদি না হইল ইত্যাদি। সুতরাং আর প্রতিবাদ করিলাম না। নিজে যে তীর্থ করিতে যাইবেন বলিয়া বায়না ধরেন নাই, ইহাই সৌভাগ্য। বায়না ধরিয়া বসিলে পতির পুণ্যে সতীর পুণ্য বলিয়া নিবৃত্ত করা যাইত না।

সত্যকথা বলিতে কি বয়স বাড়িয়া যাওয়ায় দেহটাও আমার অজ্ঞাতসারে আরাম চাহিতেছে; এইবার তাহা লক্ষ্য করিলাম। ভীড়, হট্টগোল, ছেলেদের জ্যাঠামি বা খোট্টামোট্টাদের এবং আজে-বাজে লোকের অপ্রীতিকর সান্নিধ্য এড়াইবার জন্যও নিজেরও কোনখানে বাসনা জমা হইয়াছিল। আমার মনে সেকেণ্ড ক্লাসে চড়ার স্বপক্ষে ও বিপক্ষে যে দ্বন্দ্ব চলিতেছিল, সকলেরই অবসান হইল। আমি টিকিট করিয়া গাড়ীতে চাপিয়া বসিলাম। গাড়ী দিল্লীর দিকে যাত্রা করিল—যে দিল্লীতে চাঁদনী চক ও সরবরাহ বিভাগ আছে।

সত্য কথা বলিতে কি, গদীতে শুইয়া বড় আরামে ঘুম আসিয়াছিল এবং ঘুম আসিয়াছিল বলিয়া অত্যধিক টাকা ব্যয়জনিত ক্ষতিটাও টের পাই নাই। অপর পার্শ্বে একজন ক্ষীণকায় মাদ্রাজী ছিলেন। সুতরাং জিনিষপত্রের এবং নিজের নিরাপত্তা সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম।

গাড়ীর জানলা দিয়া যতটা সম্ভব এলাহাবাদটা দেখিয়া লওয়া যায়, ততটাই লাভ। কারণ হাওয়া খাইতে বা তীর্থ করিতে আমি এই সকল খোট্টামোট্টার দেশে আসিব না, ইহা নিশ্চিত। কিন্তু বিছানা হইতে উঠিয়া সম্মুখে তাকাইতেই বুকটা ছ্যাৎ করিয়া উঠিল। এ কি ব্যাপার! মাদ্রাজী কোথায়? কোথায় এমন চুপ করিয়া নামিয়া পড়িল! অবলীলাক্রমে আমার দৃষ্টি আমার মালপত্রের দিকে ধাবিত হইল। আশ্বস্ত হইলাম, তাহারা ঠিকই আছে। কিন্তু তবু তালা টানিয়া, কোনটার বা ঢাকা খুলিয়া দেখিতে লাগিলাম। এমন সময় আমার দৃষ্টি পড়িল গাড়ীর দেওয়ালের ধারের পথটাতে। একটা লোক স্লিপিং সুট পরিয়া পা ছড়াইয়া অঘোরে ঘুমাইতেছে। এটা আবার কখন উঠিল? এমন নিশ্চিন্তভাবে ঘুমাইয়া তো ভাল করি নাই। আমার এই ঘুমের অবসরে কি না হইতে পারিত। জগতটা যে চোর জুয়াচ্চোর ও খুনেতে ভর্ত্তি- তাহা অস্বীকার করিয়া লাভ কি।

আবার বিছানায় গিয়া শুইয়া পড়িলাম।

অতঃপর অসংখ্য লোকের অসংখ্য প্রকার গুঞ্জনে এবং বিবিধ ফেরিওয়ালার বিবিধ প্রকার ডাকে যখন জাগিয়া উঠিলাম, তখন দেখি কানপুরে আসিয়া গিয়াছি। তাকাইয়া দেখি ইতিমধ্যেই ওদিকের সাহেব উঠিয়া পড়িয়াছেন। সাহেব মানে আমাদেরই দেশী সাহেব, তবে গাড়ীর মধ্যেও ড্রেসিং গাউন চাপাইয়াছেন, চটি পায়ে দিয়াছেন। সম্মুখে কেল্‌নারের চায়ের সরঞ্জাম, মুখে সিগার। মুখটা খবরের কাগজের দ্বারা আড়াল করা। ঘাড়টা বাঁকাইয়া, চোখটা তেরছা করিয়া মুখটা দেখিতে চেষ্টা করিয়া হতাশ হইলাম। অতঃপর চারপয়সা ব্যয় করিয়া একটা খবরের কাগজ কিনিব কিনা সে সম্বন্ধে খানিকক্ষণ দ্বিধা করিয়া একটা কিনিয়াই ফেলিলাম।

কানপুরে বিষম ধর্ম্মঘট চলিতেছে। ৫০ হাজার শ্রমিক কারখানাগুলি হইতে বাহির হইয়া আসিয়াছে। লাল ঝাণ্ডা উড়াইয়া শোভাযাত্রা হইয়াছে। যে মজুরেরা কাজ করিতে চায়, ধর্ম্মঘটিরা তাহাদের বলপূর্ব্বক বাধা দেওয়ায় বিষম চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। পুলিশকে দুইবার লাঠি চার্জ্জ ও একবার বন্দুকের ফাঁকা আওয়াজ করিতে হয়। অবস্থা আয়ত্তে আসে নাই, সর্ব্বত্র তুমুল চাঞ্চল্য লক্ষিত হইতেছে। জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট ১৪৪ ধারা জারি করিয়াছেন। ধর্ম্মঘটীরা বেতন বৃদ্ধি ও কাজের সময় কমাইবার দাবী করিতেছে। মিল মালিকেরা বলিয়াছেন, ধর্ম্মঘটীরা বিনা সর্ত্তে কাজে না ফিরিলে এ সম্বন্ধে বিবেচনা করা হইবে না… ফিরিলে নিশ্চয়ই সহৃদয়তার সঙ্গে বিবেচনা করিবেন…

"একবার জুলুমটা দেখেছেন—" চমকিয়া চাহিয়া দেখিলাম, সহযাত্রীর মুখের উপর হইতে খবরের কাগজের ঢাকনা সরিয়া গিয়াছে। এ যে চেনা মুখ। কোথায় যেন দেখিয়াছি, তাড়াতাড়িতে মনে করিতে পারিতেছি না।

আমি কহিলাম, কিন্তু শুধু মালিকদের দোষ দেওয়াই কি…

"কে মালিকদের দোষ দিচ্চে", সাহেব বলিলেন, "আমি কুলি ব্যাটাদের কথাই বলছি ম'শায়। দায়িত্ববোধহীন কতগুলি মজুর মর্জ্জি হ'ল—আর হুট্ করে' ষ্ট্রাইক্ করে বসল…

স্পষ্ট মনে হইল, ইহাকে কোথায় যেন দেখিয়াছি। ২৫।২৬ বৎসর বয়স। দাড়ি গোঁফ কামানো।

উত্তেজিত হইয়া সে বলিতে লাগিল: লেবার বা শ্রমিকেরা হচ্চে উৎপাদনের বিবিধ এজেন্সির একটি মাত্র। ইকনমিক্স নিশ্চয়ই পড়েন নি। তাতে স্পষ্ট করে' দেখান আছে। অর্থ-নীতির আইন অমোঘ। ইচ্ছে করলেই বদলান যায় না। ল্যাণ্ড, লেবার, ক্যাপিট্যাল আর অর্গ্যানিজেসনে। ডিমাণ্ড আর সাপ্লাইয়ের আইন দিয়েই প্রত্যেকের পারিশ্রমিক ঠিক হয়। বুঝেচেন?

কিছুই বুঝি নাই। তবু ঘাড় নাড়িলাম। ভাবিলাম, প্রতিবাদ করিলেই এ আরও চলিবে, সুতরাং সম্মতি জানানই ভাল।

ছোকরা কহিল, ছাই বুঝেচেন। বুঝবেনই যদি তবে চুপ করে' আছেন কেন? প্রতিবাদ করবেন। এজিটেটারদের পরামর্শে দেশের ইণ্ডাষ্ট্রিকে পঙ্গু করা সারা সমাজের বিরুদ্ধে অপরাধ। মাইনে বাড়ান? কোথায় এর শেষ শুনি। শেষ কোথায়। আজ মাইনে বাড়ালেন, কালই বদ্‌মাআবদার ধরে' আরও বাড়াতে

হবে? যাবেন কোথায়? সুতরাং বুঝতে পারচেন, অর্থনীতির আইনের বিরুদ্ধাচরণ করলে একটা বিশৃঙ্খলা অবশ্যম্ভাবী। আপনি বলতে পারেন, তবে এদের ন্যায্য দাবীর কি হবে? গঠন করুন একটা ট্রাইব্যুনাল। তারা প্রত্যেক প্রশ্নের বিচার করবে। অর্থনীতির আইন যাতে ভঙ্গ না করা হয়···কি ম'শায়, চুপ করে' আছেন যে···লেবার লিডার নন তো···

কহিলাম, আপনাকে ইতিপূর্ব্বে কোথায় দেখেচি মনে হচ্চে···

"তা দেখে থাকবেন কোথায়ও। আমিও ঘুরে বেড়িয়েচি, আপনারও চোখ আছে···"

"মশায়ের কি দিল্লীতে থাকা হয়?"

"থাকা হয় না, কিন্তু যাওয়া হচ্চে।"

"সরবরাহ বিভাগের টেণ্ডার সম্পর্কে কি?"

"টেণ্ডার!" ভদ্রলোক অবজ্ঞায় নাসিকা কুঞ্চিত করিলেন, "আজ্ঞে না, ওসব বৃহৎ ব্যাপার আসে না। ফিনান্স ডিপার্টমেণ্ট বলে ভারতসরকারের একটি আপিস আছে।"

"আজ্ঞে তা আছে বৈকি। কতদিন ধরে' কাজ করচেন?"

"ছ' মাস আগে পাব্লিক সার্ভিসের পরীক্ষায় বসেছিলাম, ক' বছর চাকরি আশা করেন? দেখে খুব বুড়ো মনে হচ্চে কি?"

ছয় মাস আগে পরীক্ষা দিয়াছে! এইবার অকস্মাৎ চিনিতে পারিলাম। ছ' মাস আগেই তো আমি দিল্লী ছাড়িয়াছিলাম। তখন ইহার গোঁফ ছিল। এখন গোঁফ ফেলিয়া দিয়াছে। এই জন্যই চিনিতে দেরী হইয়াছে। কহিলাম, "নমস্কার, ভাল আছেন তো?"

ছোকরা প্রতিনমস্কার না করিয়াই ওদিক ফিরিয়া বসিল।

জাফর

কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায়

উজীর জাফর দীনের বন্ধু ছিলেন পুণ্যশ্লোক,
দেবতা বলিয়া বন্দিত তাঁরে শহরের যত লোক।
বিপদ সাগরে ছিলেন জাফর ধ্রুব তারকার মত,
তাঁহার চরণ হইতে কখনো ফিরেনি শরণাগত।
বিদুরের মত ধনসম্পদ বিতরিয়া দীন জনে,
নিজে রহিতেন ফকিরের মত দীনদুখীদের সনে।
কেহ সান্ত্বনা কেহ উপদেশ কেহ বা পেয়েছে আশা,
বোগদাদবাসী সকলেই তাঁর পাইয়াছে ভালবাসা।
এ হেন জাফর প্রাণ হারালেন হায় কপালের দোষে,
সহসা গুপ্ত ঘাতকের হাতে পড়ি বাদশার রোষে।

জাফর নিহত সারা বোগদাদে পড়ে গেল হাহাকার,
ভয়ে চুপ সবে, মনে মনে কেহ ক্ষমিল না অবিচার।
ছয় মাস গেল তবু থামিল না জাফরের গুণগান,
ব্যর্থ রোষের আর্ত্তনাদের হলো নাক অবসান।
বাদশা তখন প্রজাদের পরে রাগিয়া গেলেন ভারি
করিলেন তিনি সারা বোগদাদে জরুরি ফতোয়া জারি।
যে করিবে এই শহরে আমার জাফরের গুণগান,
বন্দী হইবে, খঞ্জরে তার কাটা যাবে গরদান।
কোতলের ভয়ে জাফরের নাম কেহ আনিল না মুখে
দুখীর বন্ধু জাফর তখন রহিলেন বুকে বুকে।
গুপ্তচরেরা ঘুরিতে লাগিল সারাটি নগর ভরি'
যার মুখে শোনে জাফরের নাম তারে নিয়ে যায় ধরি'।
সবাই থামিল কাসেমের শুধু নাহি কোন ভয় ডর,
বুকে করাঘাত ক'রে কেঁদে কয় "হা জাফর হা জাফর"।
প্রতিদিন তাঁর দ্বারের নিকটে চীৎকার করি কয়,
"হে দাতা জাফর, হাতেম-তাইও তোমার তুল্য নয়।"
শহর কোটাল ধ'রে নিয়ে গেল তারে রাজদরবারে,
জাফরের গুণগান তার মুখে কমে নাক, তায় বাড়ে।

বাদশা দেখিল এই বীর পীর মৃত্যু করেছে জয়।
মৃত্যুরে জয় করেছে যে তার মৃত্যু দণ্ড নয়।
বলিল বাদশা "মরণে না ডরি' জাফরের গুণ গাও,
কেন সে তোমার 'কি করেছে বল', বল 'তুমি কিবা চাও?"
কহিল কাসেম "জাফরের গুণে অভাব আমার নাই,
জাফরের গুণ গাহিতে গাহিতে কেবল মরিতে চাই।
জাফর আমার পিতারো অধিক। বাঁচায়ে রেখেছে মোরে
তাঁহারি করুণা। সকল অভাব একে একে দূর ক'রে
আশা আশ্বাস দিয়াছেন তিনি দিয়াছেন মোরে প্রাণ,
তাঁরি গুণ গেয়ে এ প্রাণ নিবেদি' দিতে চাই প্রতিদান।"

কহিল বাদশা "জাফর তোমার অভাব করেছে দূর,
লাখপতি তোমা ক'রে দেব আমি বদলাও তব সুর।
লক্ষ টাকার এ মাণিক লও হাসিমুখে সঁপিলাম,
আজি হ'তে তুমি মোর গুণ গাও ছাড় জাফরের নাম।"
কহিল কাসেম ঊর্দ্ধে চাহিয়া মণিটিরে হাতে তুলি'
"হে জাফর, তুমি স্বর্গে গিয়াও আমারে যাও নি ভুলি'
বাদশার হাত হ'তে অলক্ষ্যে কেড়ে নিলে তরবার,
তব নাম গান পরম পুণ্য তারি এ পুরস্কার।
বাদশার হাত দিয়ে একি আজ পাঠাইলে গুণধাম।
তব দান বলি' এ মণি আমার মস্তকে থুইলাম।
বাদশা তোমার জল্লাদে ডাক, দেখুক সর্বলোক,
জাফরের নাম স্বর্গপথের পাথেয় আমার হোক।"
বাদশা তখন কহিল, রুমালে মুছি নয়নের জল,
"খড়্গ শাসন আমার বন্ধু হইয়াছে নিষ্ফল,
নগর হইতে ফতোয়া আমার করিনু প্রত্যাহার,
মরিয়াও সে যে বিজয়ী হয়েছে এমনি প্রতাপ তার।
অনুতাপ দাহ দগ্ধ করুক মম হৃদি অবিরাম,
তামাম শহর তোমার সঙ্গে গা'ক জাফরের নাম।"

চণ্ডীদাসের নবাবিষ্কৃত পুঁথি

অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ, পি-এইচ্-ডি

গত আষাঢ় সংখ্যার 'ভারতবর্ষে' পণ্ডিত-প্রবর শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ সাহিত্যরত্ন মহাশয় চণ্ডীদাসের একটী নবাবিষ্কৃত পুঁথির প্রাথমিক পরিচয় দিয়াছেন ও তৎসম্বন্ধে কিছু সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিয়াছেন। এই পুঁথির একটী নকল প্রায় দুই মাসাবধি আমার নিকট আছে। ইহা মনোযোগপূর্ব্বক পাঠ করিয়া আমার ধারণা হইয়াছে যে এই পুঁথিটী চণ্ডীদাস সমস্যা আলোচনার পক্ষে বিশেষভাবে প্রয়োজনীয় ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক প্রকাশিত ও শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রমোহন বসু কর্ত্তৃক সম্পাদিত 'দীন চণ্ডীদাসের পদাবলী'র সহিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্কান্বিত। বস্তুতঃ মণীন্দ্রবাবু বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথিশালার যে ২৩৮৯ ও ২৯৪ সংখ্যক দুইখানি খণ্ডিত পুঁথি অবলম্বনে উক্ত পুস্তকখানি সম্পাদন করিয়াছেন, আলোচ্য পুঁথিটী তাহার একটী পূর্ণতর আদর্শ বা অনুলিপি। 'দীন চণ্ডীদাসের পদাবলীতে' রাধাকৃষ্ণ প্রেমলীলার আখ্যায়িকায় যে ছেদ পড়িয়াছে, তাহার অনেক অংশ এই পুঁথি হইতে পূরণ করা যায়। আখ্যায়িকা-বিন্যাস ও পদগুলির ক্রম-নিরূপণের পক্ষেও ইহা হইতে অনেক প্রয়োজনীয় তথ্য সঙ্কলিত হইতে পারে। মণীন্দ্রবাবুর সংস্করণ-ধৃত অনেক দুর্ব্বোধ্য ও বিকৃত পাঠ এবং ইহার সাহায্যে আশ্চর্য্যভাবে সংশোধিত ও স্পষ্টীকৃত হয়। আখ্যায়িকার ফাঁক পুরাইবার জন্য তিনি যে চণ্ডীদাসের পদাবলী হইতে পদ উদ্ধারপূর্ব্বক একটা আনুমানিক পুনর্গঠন পদ্ধতির আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন, বর্ত্তমান পুঁথি হইতে তাহার সপক্ষে ও বিপক্ষে উভয় প্রকারেরই প্রমাণ মিলিবে। মোটকথা দীন চণ্ডীদাসের কবিত্ব ও কাব্য-পরিকল্পনার উপর এই পুঁথিটী যথেষ্ট নূতন আলোকপাত করিবে ও এই কবি পদাবলীর চণ্ডীদাসের সহিত অভিন্ন কি স্বতন্ত্র এই জটিল সমস্যা সমাধানের পক্ষে ইহা যে আরও প্রচুর উপাদান যোগাইবে তাহা নিঃসন্দেহে বলা যায়। সেইজন্যই বৈষ্ণব-সাহিত্য সম্বন্ধে আমার জ্ঞান নিতান্ত সীমাবদ্ধ হইলেও, যাহাতে যোগ্যতর ও অভিজ্ঞতর পণ্ডিত-মণ্ডলীর দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট হয়, সেইজন্যই এই পুঁথিখানির বিস্তৃততর আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতে সাহসী হইতেছি। আশাকরি আমার উদ্দেশ্য বুঝিয়া বিশেষজ্ঞগণ আমার এ দুঃসাহস ক্ষমা করিবেন।

পুঁথিটীর আবিষ্কার-সূত্র সম্বন্ধেও সাহিত্যরত্ন মহাশয় কিছু পরিচয় দিয়াছেন। ইহা বর্দ্ধমান জেলা বনপাশ গ্রামের শ্রীযুক্ত ত্রিভঙ্গ রায় মহাশয়ের গৃহে পাওয়া গিয়াছে। তাঁহার পরিবারে ইহা বহুকাল হইতে নিত্যপূজা পাইয়া আসিতেছে। ইহার হস্তলিপি আনুমানিক একশত বৎসর পূর্ব্বের বলিয়া মনে হয়—তবে ইহা যে কোন প্রাচীনতর পুস্তকের অনুলিপি তাহার প্রমাণ লিপিকারই গ্রন্থমধ্যে রাখিয়া গিয়াছেন। স্থানে স্থানে খণ্ডিত কোন একটী প্রাচীন পুঁথি হইতে ইহা নকল করা হইয়াছে ও যে যে স্থানে যে কয়পাতা হারাইয়াছে গ্রন্থমধ্যে তাহা স্পষ্টভাবে উল্লিখিত আছে। তবে আষাঢ়ের ভারতবর্ষে সাহিত্যরত্ন মহাশয়ের যে বিবৃতি প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে ব্যক্তিগত পরিচয় সম্বন্ধে একটু ভুল আছে। পুঁথিটী আবিষ্কার করিয়াছেন বীরভূম জেলার রাতমা গ্রামনিবাসী শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, পদাবলী সাহিত্যে সুপরিচিত পণ্ডিত প্রবর ৺সতীশচন্দ্র রায় নহেন। ইনি বীরভূম জেলা বোর্ডের মেম্বর ও বীরভূম সাহিত্য সম্মেলনের সম্পাদক ও এই সম্মেলনের পক্ষ হইতেই গ্রন্থটী আবিষ্কারের ভার তাঁহার উপর অর্পিত হয়। হরেকৃষ্ণ বাবু বলেন যে এই প্রমাদটুকু ভারতবর্ষের সম্পাদকীয় বিভাগের অনবধানতার জন্যই ঘটিয়াছে, তিনি যথার্থ পরিচয়ই দিয়াছিলেন।

এইবার পুঁথিটীর অন্তর্ভুক্ত বিষয়ের কিছু বিস্তৃত পরিচয় দেওয়া যাইতেছে। গ্রন্থারম্ভে দুইটী রসতত্ত্ব ঘটিত পদ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। রাধিকা রসের শাখা, ললিতা শাখার অন্যতম মুখ্য (মোক্ষ।) ডাল ও এই ডালের অধীন সপ্ত মঞ্জুরী। এক এক মঞ্জুরী এক এক রসের অধিষ্ঠাত্রী। ইঁহারা প্রেম উদ্দীপনের জন্য বিভিন্ন উপায় অবলম্বন করিয়া থাকেন। এই পদদ্বয় ক্রমিক সংখ্যায় চিহ্নিত হয় নাই। সুতরাং আখ্যায়িকার বর্ত্তমান স্তরে তাহাদের সন্নিবেশের কারণ দুর্ব্বোধ্য।

ইহার পরই অকস্মাৎ ৩১০ সংখ্যক পদের শেষার্দ্ধ আরম্ভ হইয়াছে। এই পদটী অক্রূর আগমনের অব্যবহিত পূর্ব্বে রাধার অমঙ্গল স্বপ্ন দর্শন ও তাহার ফলাফল জানিবার জন্য গণকের নিকট গমন বিষয়ক। ইহা মণীন্দ্রবাবুর পদাবলীর ২০৯ সংখ্যক পদের সহিত অভিন্ন। ইহার পর মণীন্দ্রবাবুর গ্রন্থসন্নিবিষ্ট পদাবলীর ক্রম অনুসরণ পূর্ব্বক ২৩২ সংখ্যক পদ পর্য্যন্ত উভয় গ্রন্থই একেবারে এক। মণীন্দ্রবাবুর ২৩৩ সংখ্যক পদটী পুঁথিতে নাই—সুতরাং ইহা আখ্যায়িকার ক্রম-বহির্ভূত বলিয়া মনে হয়। আবার ২৩৪ হইতে ২৪৩এর পঞ্চম পংক্তি পর্য্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয় সংস্করণ ও আলোচ্য পুঁথি পাশাপাশি অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে। এখান হইতে ২৫৮নং পদের ২০ পংক্তি পর্য্যন্ত পুঁথি খণ্ডিত। আবার ২৫৯ হইতে ২৯২ পর্য্যন্ত পুঁথি ও সংস্করণে হুবহু মিল পাওয়া যায়। ২৯৩ পদটী বর্দ্ধিত আকারে পুঁথিতে মিলে ও ইহা সেখানে ৩৯৩ ও ৩৯৪ এই দুই পদে বিভক্ত হইয়াছে। সুতরাং মণীন্দ্রবাবুর সংস্করণের ২৯৪ পদ পুঁথিতে ৩৯৫ ক্রমিক সংখ্যা বিশিষ্ট হইয়াছে। ২৯৪ হইতে ৩০০ পর্য্যন্ত পদ সন্নিবেশ উভয়ই এক; মণীন্দ্রবাবুর ব্রজবুলিতে লিখিত ৩০১নং পদ পুঁথিতে নাই। ৩০২ হইতে ৩৩৮ পর্য্যন্ত আবার মিল। ৩৩৯ হইতে ৫৫৪ পর্য্যন্ত পুঁথি খণ্ডিত; ৩৬১ সংখ্যক পদের সপ্তম পংক্তি হইতে ইহার পুনরারম্ভ, কিন্তু ৩৬১ পদ পুঁথিতে ৪৫৫ ক্রমিক নম্বরে চিহ্নিত হইয়াছে। এই সংখ্যা-বৈষম্য হইতে অনুমিত হয় যে শ্রীরাধার মাথুর বিরহান্তর্গত ৩৫১ হইতে ৩৬০ পর্য্যন্ত আক্ষেপানু-রাগের পদের মধ্যে কয়েকটী ক্রম বহির্ভূতভাবে অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। আবার ৩৬২ ও ৩৬৩ পদের মধ্যে পুঁথিতে আর একটী নূতন পদ সন্নিবিষ্ট দেখা যায়। ৩৬৭ পর্য্যন্ত উভয় গ্রন্থের

পদবিন্যাস একই রূপ—মণীন্দ্রবাবুর ৩৬৭ পুঁথিতে ৪৬২ সংখ্যায় চিহ্নিত। ৩৬৮ হইতে ৩৭৫ পর্য্যন্ত আক্ষেপানুরাগের পদগুলি পুঁথিতে নাই—মণীন্দ্রবাবু এগুলিকে যে যদৃচ্ছাক্রমে চয়ন করিয়া বিষয়-সাম্যের অনুরোধে আখ্যায়িকার অঙ্গীভূত করিয়াছেন তাহা পদগুলির আভ্যন্তরীণ প্রমাণ হইতে স্পষ্ট বোঝা যায়। ইহাদের মধ্যে দুইটী ব্যঙ্গাত্মক পদ "ধিক ধিক ধিক তোরে রে কালিয়া' ও 'ধিক ধিক ধিক নিঠুর কালিয়া" (৩৭৪ ও ৩৭৫) ধনঞ্জয়ের ভণিতায় পাওয়া গিয়াছে ও ইহারা সুর ও ভাব-ধারার প্রমাণে চণ্ডীদাস রচিত নহে বলিয়া মনে করিবার কারণ আছে। মণীন্দ্রবাবুর ৩৭৬ হইতে ৩৮৬ সংখ্যক পদ পুঁথিতে ৪৬৩ হইতে ৪৭৪ পর্য্যন্ত ক্রমিক সংখ্যা চিহ্নিত হইয়াছে ও শ্রীকৃষ্ণের বিরহ-ব্যাকুল ভাবব্যঞ্জক একটী নূতন পদ (৪৭১) এই প্রতিবেশে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ৩৮৭-৪২১নং অনুমান সন্নিবিশিত পদগুলির পরিবর্ত্তে পুঁথিতে ৪৭৫ হইতে ৪৭৯ পাঁচটী নূতন পদ পাওয়া যায়—এগুলি শ্রীরাধিকার খেদোক্তি, কিন্তু মণীন্দ্রবাবুর নির্ব্বাচিত পদগুলি অপেক্ষা আখ্যায়িকার সহিত নিবিড়তর সম্পর্কান্বিত ও ইহার সহিত আরও স্বাভাবিকভাবে গ্রথিত। মোট কথা মাঝে মধ্যে পদ-সংস্থাপন-বৈষম্য ও পুঁথি খণ্ডিত থাকার জন্য কয়েকটী পদের অপ্রাপ্তি-বাদ দিলে মোটামুটি বিশ্ববিদ্যালয় সংস্করণের ২০৯-৪২১ পদ আলোচ্য পুঁথিতে ৩১০—৪৭৯ সংখ্যক পদে পুনরাবৃত্ত হইয়াছে। এই পদাবলীর মধ্যে আখ্যায়িকা অক্রূরাগমন হইতে কৃষ্ণের মথুরা-প্রবাসের জন্য রাধার বিরহ শোকাভিব্যক্তি পর্য্যন্ত প্রায় অবিচ্ছিন্ন ধারায় অগ্রসর হইয়াছে। মণীন্দ্রবাবুর গ্রন্থ অপেক্ষা পুঁথিতে পদবিন্যাস রীতি যে অধিকতর প্রামাণিক তাহা পরবর্ত্তী আলোচনা হইতে সুস্পষ্ট হইবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্করণের দ্বিতীয় খণ্ডের প্রথম পদ ৪৮০ ক্রমিক সংখ্যায় চিহ্নিত—পুঁথিতেও ঐ পদটী ৪৮০নং। এই ক্রমিক সংখ্যার আশ্চর্য্য সৌসাদৃশ্য নিঃসংশয়িতভাবে প্রমাণ করে যে উভয় পুঁথিই এক আদর্শের অনুলিপি ও আখ্যায়িকাধারা উভয়ত্রই একই রীতিতে বিন্যস্ত। আলোচ্য পুঁথিটী ৪৯৯ পদের প্রারম্ভে খণ্ডিত ও ৫১৭ পদ হইতে আখ্যান আবার চলিয়াছে। মণীন্দ্রবাবুর সংস্করণ ৫৪৬ পদ পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়া আসিয়াছে—কিন্তু এই পুঁথিতে আরও পাঁচটী নূতন পদ সংগৃহীত হইয়া ৫৫১ সংখ্যা পর্য্যন্ত পৌঁছিয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয় সংস্করণে ৬২৭ পদের শেষাংশ হইতে ৬৭২এর প্রথমাংশ পর্য্যন্ত ও পুনরায় ৭২২এর শেষাংশ হইতে ৭২৬ প্রারম্ভ পর্য্যন্ত ধৃত হইয়াছে। ইহার পর সুদীর্ঘ ব্যবচ্ছেদের পর আবার ১০৪৫ সংখ্যক পদে আখ্যান পুনঃ প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। এই দীর্ঘ ফাঁকের অনেকাংশ বনপাশ পুঁথি হইতে পূরণ করা যায়—৭৩২-৯৬২ ও ৯৮১-১০১৭ সংখ্যক পদগুলি সৌভাগ্যক্রমে ইহার মধ্যে সন্নিবিষ্ট থাকায় মাথুর বিরহের পর দীন চণ্ডীদাসের পরিকল্পনার ভবিষ্যৎ পরিণতি সম্বন্ধে আমরা অনেকটা সুস্পষ্ট ধারণা করিতে পারি। ইহার পর মণীন্দ্রবাবুর সংস্করণে ১০৪৫-১০৫১ এই সাতটী পদ মিলে। পুঁথিতে আবার ১০৮৬ পদ হইতে ঘটনা বিবৃতির পুনরারম্ভ ও ১২০২ পদে শেষ। ইহার মধ্যে মুদ্রিত 'পদাবলীর' ১০৭৭ হইতে ১০৮৪ পদ পুঁথিতে ১০৯২-১০৯৭ ও ও ১০৯৯-১১০০ সংখ্যা চিহ্নিত। বনপাশ পুঁথির ১২০২ পদে পরিসমাপ্তি। বিশ্ববিদ্যালয় সংস্করণে আবার ১৮৬১-১৮৬৫, ১৯০৩-১৯০৭ ও ১৯৯৯-২০০২ পর্য্যন্ত ১৪টী পদ পূর্ব্বরাগ ও রাধার আক্ষেপানুরাগ বিষয়ে রচিত হইয়া দীন চণ্ডীদাস পরিকল্পিত আখ্যায়িকার পরিচয় সম্পূর্ণ করিয়াছে। লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, শেষ কয়েকটী পদে আখ্যায়িকা স্রোত বিপরীত-মুখী হইয়া উৎপত্তি স্থানের দিকে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছে।

(২)

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে এই নবাবিষ্কৃত বনপাশ পুঁথিতে মোটামুটি ৭৩২-৯৬২, ৯৮১-১০১৭ ও ১০৮৬-১২০২, (—৮) সর্ব্বশুদ্ধ ২৩১ + ৩৭ + ১০৯ = ৩৭৭টী নূতন পদের সন্ধান মিলিতেছে ও এই সমস্ত পদে আখ্যায়িকার মধ্যস্তরের পরিকল্পনা সম্বন্ধে অনেক প্রয়োজনীয় তথ্য পাওয়া যাইতেছে। ৫১৭ পদে উদ্ধবের দৌত্য নিয়োজনের কাহিনী আরম্ভ ও ৫৫১ পদে রাধার সন্দেশ বহন করিয়া তাহার প্রত্যাবর্ত্তন সূচিত হইয়াছে। ৫৪৭—৫৫১ পদগুলিতে রাধকৃষ্ণের প্রতি অগাধ প্রেম ও তাহার বিরহে অসহ্য জ্বালার কথা নিবেদন করিয়া প্রাণ বিসর্জ্জনের সঙ্কল্প জানাইতেছেন ও মৃত্যুর পর পুরুষজন্ম লাভ করিয়া প্রেমাস্পদকে অনুরূপ বিরহ-বেদনা অনুভব করাইবেন এইরূপ অনুযোগ করিতেছেন। ইহার পর মুদ্রিত সংস্করণে ৬২৭—৬৩৪ পদে কৃষ্ণের হংসদূত প্রেরণের কথা বিবৃত হইয়াছে। আবার ৬৬২—৬৭২ পদে রাধার কোকিল-দূত প্রেরণ, পূর্ব্বস্মৃতি উদ্দীপনে শ্রীকৃষ্ণের ব্যাকুল-উন্মনা ভাব ও বলরামের নিকট কৃষ্ণের আত্মগোপন চেষ্টার বর্ণনা মিলে। ৭১২—৭২৬ পদে সুবলের মথুরাগমন ও কৃষ্ণের সহিত মিলন, পূর্ব্বকথা আলোচনায় উভয়ের তন্ময়তা ও বলরামের অতর্কিত আগমনে রসভঙ্গের বিবরণ। বনপাশ পুঁথিতে ৭৩২ পদে সুবলের ব্রজে প্রত্যাবর্ত্তন উল্লিখিত হইয়াছে।

৭৩৩ হইতে ৭৪৪ পর্য্যন্ত আবার রাধার বিরহাবস্থা বর্ণিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে কতকগুলি পদের কবিত্ব প্রশংসনীয় ও চণ্ডীদাসের বিখ্যাত পদাবলীর সহিত উপমিত হইবার অযোগ্য নহে। ৭৪৫ নং পদে এক নূতন পরিচ্ছেদের সূচনা হইয়াছে। বিরহবেদনায় আকুল কৃষ্ণ মথুরায় বংশীবাদন আরম্ভ করিয়াছেন। সেই বংশীধ্বনি বৃন্দাবনে শ্রুত হইয়া গোপীগণের মনে প্রেমাস্পদের বৃন্দাবন প্রত্যাবর্ত্তন বিষয়ক ভ্রান্তি জন্মাইতেছে। ৭৫১—৭৫৪ পদে পবনদূত প্রেরণের প্রস্তাব হইয়াছে ও ৭৫৫—৭৭০ পদে পবনের মথুরা-গমন ও কৃষ্ণের প্রতি অনুযোগ ও ৭৭১—৭৭২ পদে কৃষ্ণের তদুত্তরে উচ্ছ্বসিত-প্রেম-নিবেদন বর্ণিত হইয়াছে। ৭৭৩—৭৭৪ পদে আবার বলরাম আবির্ভূত হইয়া এই রহস্যালাপে বাধা জন্মাইয়াছে ও শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার নির্জ্জনাবস্থানের কৈফিয়ৎস্বরূপ এক দ্ব্যর্থপূর্ণ কাহিনী বিবৃত করিয়াছেন। যশোদামাতার প্রদত্ত তাঁহার 'হিয়ার পদক' হারাইয়াছে ও তাহারই অনুসন্ধানে তিনি নির্জ্জন বনপথে ভ্রমণ করিতেছেন। ৭৭৫ পদে এই স্তোক-বাক্যে বলরামকে ভুলাইয়া কৃষ্ণ আবার পবনের নিকট ফিরিয়া আসিয়াছেন ও শীঘ্রই রাধার সহিত মিলিত হইবেন এই আশ্বাস-বাণীর সহিত তাহাকে প্রতিপ্রেরণ করিয়াছেন।

৭৭৬ পদে পবন রাধার নিকট ফিরিয়া শ্রীকৃষ্ণের অনুপম ও অপরিবর্ত্তনীয় প্রেমের বিস্তৃত বিবরণ পেশ করিয়াছে। কৃষ্ণ

মথুরায় বাস করিতেছেন কিন্তু তাঁহার হৃদয়ের অনু-পরমাণু বৃন্দাবন-লীলার স্মৃতি-সৌরভে ভরপুর। বৃন্দাবনের অনুকরণে তিনি মথুরায় যমুনাতটে কদম্বতরু রোপণ করিয়াছেন, সেখানে তিনি বৃন্দাবনলীলার প্রত্যেক অনুষ্ঠানের এমন কি রাসকেলির পর্য্যন্ত (৭৮৪) পুনরভিনয় করিয়া নিজ বিরহ-সন্তপ্ত হৃদয়ে কথঞ্চিৎ শান্তির প্রলেপ দিয়া থাকেন। পবন কৃষ্ণের ব্যবহারে কিছু দুর্ব্বোধ্য ভঙ্গীর ইঙ্গিত পাইয়া রাধাকে তাহার সমাধানের জন্য প্রশ্ন করিয়াছে। এক তমাল বৃক্ষের ফল এক অঞ্জন পক্ষীর দ্বারা কৃষ্ণের নিকট আনীত হইলে তিনি সে ফল ভাঙ্গিয়া তাহার অভ্যন্তরে কোন আশ্চর্য্য বস্তুর সন্ধান পাইয়া ভূতলে লোটাইতে লাগিলেন ও তাঁহার পায়ের নুপূর সুদূরে অন্তর্হিত হইল। ইহার অর্থ কি? এই জটিলতত্ত্ব প্রেম-বিকশিত-নয়না রাধিকার নিকট সুস্পষ্ট। নুপূর তাঁহাদের চিরন্তন প্রেমলীলার সাক্ষী ও দূতী স্বরূপ প্রবাসগত প্রিয়ের প্রত্যেকটী হৃদয়-স্পন্দন রাধার গোচর করে। পবন যাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছে তাহা ইতিপূর্ব্বেই এই অলৌকিক উপায়ে রাধার গোচরীভূত হইয়াছে। ফলের রহস্য এই যে ইহা রাধাকৃষ্ণের প্রেম-লীলার গোপন মাধুরী ও নিগূঢ় তাৎপর্য্যের প্রতীক্—ব্যাসদেবও ভাগবতে এই অপরূপ রহস্য ব্যক্ত না করিয়া কল্পতরু-রূপকের আবরণে প্রচ্ছন্ন রাখিয়াছেন। পবন প্রেমিক-প্রেমিকার ভাব-বিনিময়ের এই অলৌকিক রীতির বিষয় অবগত হইয়া বিস্ময়-স্তম্ভিত হইয়াছে ও

"এ কথা কে জানে প্রেমা॥
দোঁহে দোঁহ জান রীতি।
আন কি জানয়ে গতি॥"

প্রভৃতি বাক্যে রাধার প্রতি ভক্তি নিবেদনের দ্বারা নিজ দৌত্য-কার্য্য শেষ করিয়াছে। (৭৯০)

৭৯১—৮০০ পদে রাধার বিরহাবস্থা আবার বর্ণিত হইয়াছে। পদাবলীর এই অংশে বিরহখেদই মূল বা স্থায়ী সুর, দূত-প্রেরণ এই প্রজ্জ্বলিত অসহনীয় বিরহানলের দূরোৎক্ষিপ্ত অগ্নিস্ফুলিঙ্গ! রাধা-কৃষ্ণের লীলার নীরব সাক্ষী কদম্বতরুতলে রাধা বিষভোজনে বা জলে ঝাঁপ দিয়া বা অগ্নিকুণ্ড প্রজ্জ্বলিত করিয়া প্রাণ বিসর্জ্জনের সঙ্কল্প প্রকাশ করিতেছেন—এমন সময় ললিতা মথুরা গিয়া কৃষ্ণকে আনিয়া দিবেন এই প্রবোধ্য বাক্যে রাধাকে প্রতিনিবৃত্ত করিলেন। ললিতার মুখে রাধার দুরবস্থার কথা শুনিয়া কৃষ্ণ আবার মুখে বাঁশী পুরিলেন ও সেই বংশীধ্বনি শুনিয়া মথুরা-নাগরীদের মনে ব্রজ-গোপীদের অনুরূপ দুর্নিবার আকর্ষণ অনুভূত হইল। মথুরা-নাগরীদের মুখে কৃষ্ণের রূপ বর্ণনার মধ্যে যথেষ্ট কবিত্বশক্তির পরিচয় মিলে।

"মধুর মুরলী শুনিতে নাগরী
ধাওাএ দুসারি হয়্যা।
শ্রবণে পশিল চিত্তচোরা বাঁশী
রূপ নিরখয়ে চায়্যা॥
জলে পড়ু বাজ যে হউ সে হউ
দেখহ রূপের ছটা।
যেমত মাধল আকাশ হইতে
নব জলধর ঘটা॥" (৮০৩)

"কি হেন গড়ল বিধি হেন রূপ বৈদগধি
নিছিয়া রতন নীলমণি।
নিছিয়া রঞ্জন রাশি নীল পঙ্কজ রাশি (?)
কানড় কুসুম সম মানি॥
চাহিএ যে দিক ভাগে সেখানে নয়ন লাগে
আঁখি চাহে সদা পীতে রূপ।
নয়ন চাতক প্রায় মেঘরাশি সম চায়
সে হেন আনন্দ-রসকূপ॥" (৮০৫)

৮০৬ পদ হইতে আবার ভ্রমর-দূত প্রেরণের পরিকল্পনা কৃষ্ণের মনে জাগিয়াছে। ভ্রমরকে দেখিয়া রাধার মনোবেদনা আরও তীব্রতর হইয়াছে ও মর্ম্মভেদী শ্লেষাত্মক বাক্যে তিনি অবিশ্বাসী প্রেমিকের বিরুদ্ধে অনুযোগ জানাইতেছেন।

"কুটিল কি হয় সরল ধরণ
বিষ কি তেজয়ে সাপ?
কুজন সুজন না হয় কখন
তাপী কি বিসরে তাপ॥
মেঘ কি তেজয়ে ধারার বরিখা
চান্দ কি তেজয়ে সুধা
মধু কি তেজয়ে মধুর মাধুরী
ভ্রমর পিবই ক্ষুধা।" (৮১৬)

এই বিরহ-শোকোচ্ছ্বাস বর্ণনার ফাঁকে ফাঁকে কবি কিছু তত্ত্বকথাও আলোচনা করিয়াছেন। দীন চণ্ডীদাসের পদাবলীতে কৃষ্ণের সখাবৃন্দের মধ্যে সুবলের প্রাধান্য সর্ব্বত্রই সুপরিস্ফুট। ৮২২ পদে উক্ত হইয়াছে যে কৃষ্ণের বক্ষোভূষণ কৌস্তুভমণির রক্ষণাবেক্ষণের ভার সুবলের উপর অর্পিত হইয়াছে এবং এই বিষয়ে চণ্ডীদাসের স্বভাব-সিদ্ধ দুর্ব্বোধ্য হেঁয়ালিতে কয়েকটী পয়ার রচিত হইয়াছে। ৮২৩ পদে ভাগবতে রাধিকার অনুল্লেখের কারণ বিবৃত হইয়াছে। রাধা স্বয়ং শ্রীভগবানেরও আরাধ্যা ও অর্চ্চনীয়া—কাজেই ভগবানের ঐশ্বর্য্য ক্ষুণ্ণ হইবার আশঙ্কাতেই বোধ হয় ব্যাসদেব রাধাকে যবনিকার অন্তরালে রাখিয়াছেন। ৮২৪ পদে রসও অমিয়া সাগর মন্থন করিয়া রাধা নামের উৎপত্তি ও রাধাই যে কৌস্তুভমণিরূপে সর্ব্বদাই ভগবানের বক্ষে বিহার করেন এই তত্ত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে। ৮২৫—৮২৭, ৮৬৭—৮৬৮ পদে ভ্রমর কর্ত্তৃক রাধা-কৃষ্ণ-প্রেমের চিরন্তন মহিমা ও আধ্যাত্মিক তাৎপর্য্য ব্যাখাত হইয়াছে। ইহার সঙ্গে সঙ্গে ভ্রমর পূর্ব্বস্মৃতি-সিন্ধু মন্থন করিয়া কৃষ্ণের অনুপম, একনিষ্ঠ প্রেমের অনেক উদাহরণ উদ্ধৃত করিয়াছে। রাধার স্মৃতিতে কৃষ্ণ সর্ব্বদাই উন্মনা, তাঁহার চক্ষু অশ্রুপূর্ণ;

সজল নয়নে ধারা অনুক্ষণে
বসন ভিজিল জলে।
নীলমণি পরে মুকুতার পাঁতি
যেমন বাহিয়া চলে॥ (৮২৮)

মথুরা গমনকালে রথারূঢ় কৃষ্ণ যে ইঙ্গিত ও অঙ্গভঙ্গী সহকারে রাধিকার নিকট বিদায় লইয়াছিলেন, ভ্রমর তাহার গূঢ় অর্থ ব্যাখ্যা করিয়াছে।

৮৩১ পদ হইতে আলোচনা আবার বিরহের লৌকিক স্তরে নামিয়া আসিয়াছে, আবার মান অভিমান, অনুযোগ অভিযোগ,

শিল্পী—শ্রীযুক্ত শশাঙ্কভূষণ সরকার

ভিস্তী
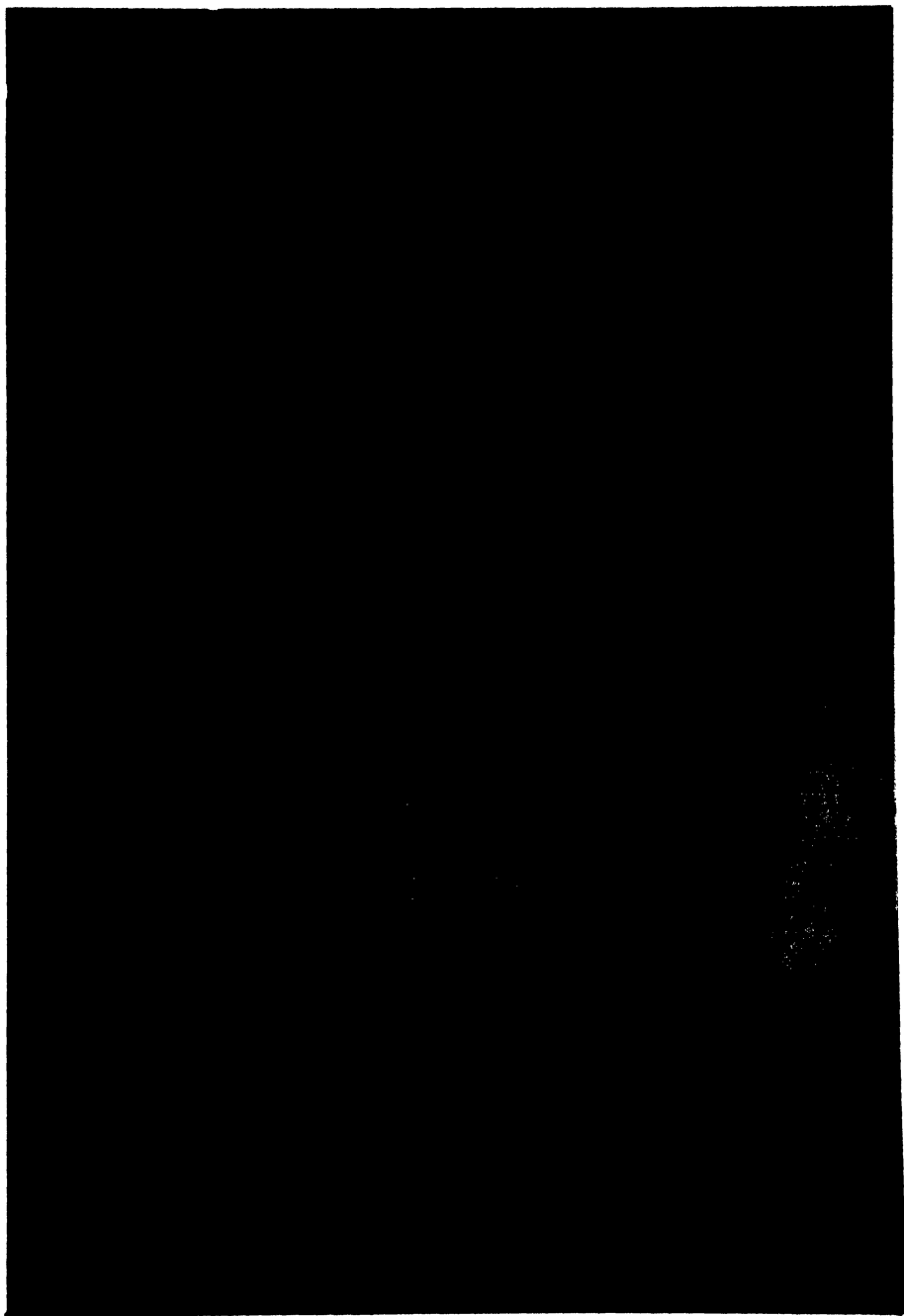
খেদ-বিলাপের পালা আরম্ভ হইয়াছে। রাধা ভ্রমর-দূতকে নিজ অসীম বিরহ-বেদনা ও কৃষ্ণের পূর্ব্ব প্রতিশ্রুতির কথা প্রেমাস্পদের চরণে নিবেদন করিতে অনুরোধ করিয়াছেন। ইহারই মধ্যে কৃষ্ণের বর্ত্তমান প্রেয়সী কুব্জার প্রতি নিদারুণ ঈর্ষ্যা উদ্গীরিত হইয়াছে।

শশধর হেথা উদিত গগনে
সকল ধবল মানি।
কোটি-লাখ তারা উদিত হইলে
কিসে বা তাহারে গণি॥
মুকুতার মালা গুঞ্জার সমান
সেগুলি হইতে চায়।
অসম্ভব অতি ইহা হয় কতি
বেদের বিহিত নয়॥
কাঞ্চন সমান গণিতে গণয়ে
যেনঞি তাম্বের কাঠি।
কোকিলের মাঝে কাকের পসার
যেন তার পরিপাটী॥
রাজহংস কাছে বকের মণ্ডলি
সে যেন নাহিক সাজে।
খঞ্জন কাছেতে চড়ুই পাখিয়া
সেহ রহে যেন লাজে॥
ময়ূর সম্মোহে উল্লুক শোভয়ে
চাঁদ-তারা যত দূর।
কর্পূরে কপোতে (?) যেমত আন্তর
তেমতি কুবুজা দূর॥ (৮৪৬)

ইহার পরে কয়েকটি দুর্ব্বোধ্য পদে কুব্জা কি গুণে শ্রীকৃষ্ণের মনোরঞ্জন করিয়াছে এই প্রশ্ন উত্থাপিত হইয়াছে। ভ্রমর ইহার উত্তর দিয়াছে যে সে কৃপাসিদ্ধি সাধনায় ভগবানকে পতিরূপে লাভ করিয়াছে ও ইহার পূর্ব্ব ইতিহাস প্রসঙ্গে জানাইয়াছে যে রাসলীলা-কালে শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলনে পতিকর্ত্তৃক বাধাপ্রাপ্তা এক গোপ-রমণী কৃষ্ণধ্যান করিতে করিতে প্রাণ ত্যাগ করে ও—

"আত্ম নিবেদিয়া বন্ধুয়া পাইল
দীন চণ্ডিদাস গায়॥" (৮৫০)
"ভ্রমর মুখেতে এ তত্ত্ব জানিয়া
দুগুণ উঠিল তাপ।
যেমত মন্ত্রের আলাপ পাইয়া
উঠে অজগর সাপ॥" (৮৫১)

৮৫২ পদে অলঙ্কার শাস্ত্র ঘটিত রসতত্ত্বের একটী সূক্ষ্ম আলোচনা লিপিবদ্ধ হইয়াছে। অবিশ্বাসী প্রেমিকের পুনর্দর্শন লাভে মান উথলিয়া উঠে ইহাই অলঙ্কার শাস্ত্রে মানের সাধারণ ইতিহাস—সুতরাং প্রেমিকের সাক্ষাৎ দর্শন উদ্বেলিত মানের পক্ষে অত্যাবশ্যক। এখানে কৃষ্ণ-দর্শন ব্যতিরেকে রাধার মনে কেমন করিয়া প্রবল মানের উদ্ভব হইল, এই সম্ভাবিত আপত্তির খণ্ডন স্বরূপ লেখক বলিতেছেন—

"ভাবের আগেতে ভবন (যাহা ঘটে, বা ভাবনার বিপরীভূত বস্তু) গোচর
নাহি অগোচর কিছু॥
এখানে মানের বিরহ-গমন
গোচর রহল পাছু॥
ভাবিতে লাগিলা হিয়ার ভিতরে
সেই নটবর কান।
তেঞি সে সাক্ষাতে ভাবের কাছেতে
গোচর করিয়া মান॥
অতএব হল ভাবিতে ভবনে
সাক্ষাতে আক্ষেপ হয়।
চণ্ডিদাস কহে ভকত হইলে
তবে তরতম কয়॥

৮৫৩ ও ৮৮৯—৮৯২ পদে চণ্ডীদাস সাহিত্যে সুপরিচিত 'পরকীয়া তত্ত্বের' সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ পাওয়া যায়।

কি রসে তেজল নিজপতি জনা
পরপতি সনে মেলা।
স্বকীয়া তেজল পরকীয়া সনে
হইল রসের খেলা॥
স্বকীয়া কিরূপে নিজপতি সনে
না করে রসের রঙ্গ।
পর আস্বাদনে রস পোষ্টা (পুষ্টি ?) লাগি
পরকীয়া করে সঙ্গ॥
চণ্ডিদাস বলে পর আস্বাদনে
বাড়ল অধিক প্রেমা।
নিবিড় রসেতে বন্ধুয়া আদরে
যতেক ব্রজের রামা॥ (৮৫৩)
এই কহি শুন পরকীয়া সুখ
স্বকীয়া থাকুক দূরে।
পরকীয়া সনে রস আস্বাদন
কহিলা মরম সরে॥
পরকীয়া বিনে নাহি আস্বাদন
লবণ বিহীনে স্বাদ।
চিনির কাছেতে কটু কষায়ন
সে যেন করয়ে বাদ॥ (৮৮৯)
এই সব কথা না কর বেকত
গুপতে রাখিবে ইহা।
বেকত করিলে সঙ্গত লাগয়ে ?
না পাই যুগল দেহা॥
এমতে রাখিবে মরমে ঢাকিবে
রসতত্ত্ব এই গতি।
যেমত মায়ের আচার লুবুধ ?
সঙ্গতি আনহি পতি॥ (৮৯০)

(ইহার অর্থ কি এই যে মাতার কলঙ্ক-কথা পুত্র যেমন সর্ব্ববিধ সাবধানতার সহিত গোপনে রাখে, সেইমত ইহা গোপনে রাখিবে ?)

এই পরকীয়া-তত্ত্বের মর্ম্ম-রহস্যটী কবি পরবর্ত্তী পদে উচ্ছ্বসিত গীতি-কবিতার ঝঙ্কার ও সার্ব্বভৌম ব্যঞ্জনায় ব্যক্ত করিয়াছেন।

নব নব রস নবীন রসিক
নৌতুন মধুর সনে।
নবীন ভ্রমর উড়িয়া ফিরিছে
না হয় সঙ্গতি মনে॥

নব নব রতি নব নব গতি
নব নব হব দেহা।
নব নব সুখে নব নব প্রীত
নব নব সুখ লেহা॥ (৮৯২)

ভ্রমর রাধার নিকট বিদায় লইয়া কৃষ্ণ-বিরহে গোকুলের সর্ব্বব্যাপী শোকাচ্ছন্ন অবস্থার মর্ম্মস্পর্শী বর্ণনা দিয়াছে। ৮৭১—৮৮৫ পদগুলি কবিত্ব শক্তি ও ভাব-গভীরতার দিক দিয়া প্রশংসনীয়। বৃন্দাবনের তরুলতা, মৃগ-পক্ষী, রাখাল-বালক, নন্দ-যশোদা ও কৃষ্ণের প্রণয়াস্পদ ব্রজগোপীগণ—সকলের উপরই দুর্ব্বিসহ শোক এক শীর্ণ পাণ্ডুর আস্তরণ বিস্তার করিয়াছে। মাধবীলতা গোপীদের অশ্রুজলে পুষ্ট, পল্লবিত; শরৎ-শীর্ণা যমুনা এই অশ্রু-প্লাবনে দুকূল-প্রবাহিনী। শোকবিবশা রাধার চিত্র এই পংক্তিগুলিতে চমৎকার ফুটিয়াছে।

সেখানে (মাধবী-তলায়) বসিয়া গৌরী রাধা চন্দ্রা ব্রজেশ্বরী
ধরিয়া তাহার এক ডাল।
দাতায়া মধুরা মুখে করাঘাত মারে বুকে
নয়নে গলয়ে বহু ধার॥
যেন স্বর্গ মন্দাকিনী গলিয়া পড়ল পাণি
বহিয়া চলয়ে হেন জানি।
তিতিয়া বসন-ভূষা নাহিক বিদিগ-দিশা
ক্ষণে রাধা লোটায় ধরণী॥ (৮৮৪)

এই শোক-বার্ত্তা শ্রবণে কৃষ্ণ কিরূপ অভিভূত হইয়াছেন তাহাও নিম্নলিখিতভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

মূর্চ্ছিত নয়নে দুসারি জল।
যেমত গলয়ে মুকুতা ফল॥
নীলগিরি হৈতে যেমন গঙ্গ।
তেন মতে তার সুধার রঙ্গ॥ (৮৮৫)

এই মর্ম্মভেদী করুণ চিত্রের পর আবার চণ্ডীদাসের স্বভাবসিদ্ধ দুর্ব্বোধ্য হেঁয়ালীতে তত্ত্বালোচনা আরম্ভ হইয়াছে। ইহার পরিণতি হইয়াছে পূর্ব্বোদ্ধৃত পরকীয়া-তত্ত্ব-প্রতিপাদনে (৮৮৬-৮৯২); এইখানে এই সুদীর্ঘ ভ্রমর-দৌত্য অধ্যায় শেষ হইয়াছে।

ক্রমশঃ

চেতঃ সমুৎকণ্ঠতে

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

১

স্নিগ্ধ বিগত সুখের দিবস স্মরি—
অতি নিদারুণ ব্যথায় গুমরি মরি।
দেশ দেশ হতে প্রীতি আহ্বান,
নিত্য ভাবের আদান প্রদান,
বেড়াতাম আমি জাতির গর্ব্ব করি।

২

উৎসব শেষ! ম্লান হলো দীপভাতি।
প্রেতত্ব লাভ করিল মানব জাতি।
কোথায় কাব্য, কোথা দর্শন?
বিষাক্ত হল মানবের মন,
হিংসা ও দ্বেষে হৃদয় উঠিল ভরি।

৩

নব সভ্যতা, কৃষ্টি, নব বিধান—
চূর্ণ করিল যুগের যুগের দান।
যাহা পবিত্র যাহা সুন্দর,
রাজলক্ষ্মীর প্রিয় অন্দর,
হয়ে ধূলিসাৎ ভূমে দেয় গড়াগড়ি।

৪

মানবের কাল রাত্রি এসেছে বুঝি
গর্ব্বের কিছু পাইনা'ক আর খুঁজি।
প্রভেদ যা ছিল নরে দেবতায়,
ব্যবধানে দেখি শুধু বেড়ে যায়,
ধরণী লভেছে গতি প্রলয়ঙ্করী।

৫

নাহি মহত্ব, হারায়েছে উদারতা,
শুধু দ্বিধা হল, হীন গম্ভীর কথা।
শুধু শক্তির অপপ্রয়োগ,
অসাধু মিলন, হেয় সংযোগ,
সহানুভূতির পরিবেশ গেল সরি'।

৬

মানব জাতির লাবণ্য ভাণ্ডার—
সে মায়া মমতা বিবেক নাহিক আর।
জ্যোতিঃপ্রপাতে হারাইয়া হায়—
হীরা অঙ্গার হলো পুনরায়!
দিব্যশক্তি বিধাতা লইল হরি'।

৭

মধুর প্রভাত, দুপুর কর্ম্মময়,
শান্ত সন্ধ্যা দুর্লভ মনে হয়।
ভগবানে সেই দৃঢ় বিশ্বাস,
তাঁরি কৃপাপূত প্রতি নিঃশ্বাস,
সে জগৎ ছিল জগবন্ধুরে ধরি।

৮

মনে পড়ে সেই জয় মঙ্গল রব,
জাতিতে জাতিতে মিলনের উৎসব।
শঙ্কা বিহীন নির্ম্মল মন
চিন্তামণির অণু চিন্তন,
কোথা গেল?—ভাবি অঘাটে ভিড়ায়ে তরী।

জঙ্গম

বনফুল

২৮

সকাল হইতে সুরু হইরাছে। বেলা বারোটা বাজিয়া গেল, আর কত বাকী আছে তাহা জিজ্ঞাসা করিবারও উপায় নাই। করিলেই লোকনাথ ঘোষালের আত্ম-সম্মান আহত হইবে। আহতপুচ্ছ গোক্ষুরকে বরং সহ্য করা যায় কিন্তু আহত-সম্মান লোকনাথকে সহ্য করা কঠিন। তাছাড়া ভালও লাগিতেছে, তাই শঙ্কর নিবিষ্টচিত্তেই সুদীর্ঘ প্রবন্ধটি শ্রবণ করিতেছে। সুদীর্ঘ হইলেও প্রবন্ধটি সুচিন্তিত এবং সুলিখিত। অমিয়ার কথা স্মরণ করিয়া এবং নিজের নানাবিধ কাজের কথা ভাবিয়া সে মাঝে মাঝে একটু অস্বস্তি বোধ করিলেও অবহিত মুগ্ধ চিত্তেই সে প্রবন্ধটি শুনিতেছে এবং ভাবিতেছে এই সুপণ্ডিত সুরসিক ব্যক্তিটিকে কেহ চিনিল না কেন। 'ক্ষত্রিয়' পত্রিকার প্রতি-সংখ্যায় শঙ্কর ইঁহার মূল্যবান প্রবন্ধ আজকাল বাহির করিতেছে কিন্তু পাঠকসমাজে তেমন কোন সাড়া পড়ে নাই তো। দুই চারিজন বিদগ্ধ ব্যক্তি প্রশংসা করিয়াছেন বটে কিন্তু অধিকাংশ পাঠকপাঠিকাই লোকনাথ ঘোষালের নাম দেখিলেই পাতা উল্টাইয়া যান। অথচ—দ্বার ঠেলিয়া একজন যুবক আসিয়া প্রবেশ করিল। যুবককে দেখিয়া শঙ্কর একটু যেন অপ্রতিভ হইয়া পড়িল। লোকনাথবাবুর সম্মুখে ভদ্রলোক না আসিলেই যেন ভাল হইত! কিন্তু আর উপায় নাই। স্মিতমুখে আহ্বান করিতেই হইল। যুবক প্রশ্ন করিল—"আপনি যাচ্ছেন তো তাহলে।"

"আপনাদের সভা কবে?"

"আগামী মঙ্গলবার"

"সেদিন আমার ছুটি নেই"

"কবে যেতে পারবেন বলুন, সেই রকমই ব্যবস্থা করব আমরা"

"রবিবারের আগে আমার অবসর নেই"

"বেশ তাই হবে। রবিবারেই একেবারে 'কার' নিয়ে আসব তাহলে। সভা পাঁচটায় হবে, বারোটা নাগাদ আসব, এতদূর যেতেও তো হবে—"

"বেশ তাই আসবেন"

নমস্কারান্তে যুবক চলিয়া গেল।

লোকনাথবাবু প্রশ্ন করিলেন, "কিসের সভা?"

"কোন্নগরে একটা সাহিত্য সভা হবে, তাতেই আমাকে সভাপতি করতে চান ওঁরা"

"ও"

লোকনাথ ঘোষালের মুখে কিসের যেন একটা ছায়া সহসা ঘনাইয়া আসিল। অনেকক্ষণ তিনি কোন কথাই বলিলেন না। তাহার পর হঠাৎ বলিলেন, "আজ উঠি। এটুকু আর একদিন হবে, বেলা অনেক হয়েছে আজ—"

উঠিয়া পড়িলেন এবং অধিক বাঙ্‌নিষ্পত্তি না করিয়া বাহির হইয়া গেলেন। তাঁহার পক্ষে আর বসিয়া থাকা সম্ভবপর ছিল না। তাঁহার অন্তরের অন্তস্তল হইতে কি যেন একটা মোচড় দিয়া উঠিতেছিল। জীবনে সাহিত্য ছাড়া তিনি আর কিছুই চাহেন নাই। ইহাই তাঁহার জীবনের একমাত্র আকর্ষণ। ইহার জন্য সংসার সমাজ পাপ পুণ্য পরলোক আত্মা এমন কি ভগবান পর্য্যন্ত তিনি তুচ্ছ করিয়াছেন। সাহিত্য ছাড়া আর কোন কিছুতে তাঁহার আস্থা নাই, আর কোন বিষয়ে তিনি আনন্দ পান না। এই সাহিত্যের মধ্যেই তিনি জীবন রহস্যের যে লীলাময় দেবতাকে, রসমূর্ত্ত যে সচ্চিদানন্দকে উপলব্ধি করিয়াছেন আজীবন বাণী সাধনায় আত্মহারা হইয়া তাহারই মহিমা-কীর্ত্তন তিনি করিতেছেন—কিন্তু কই তাঁহার কথা তো কেহ শুনিল না। কোন সাহিত্য সভা হইতে তাঁহার আহ্বান আসিল না তো! নাবালক শঙ্করের কথা সকলে শুনিতে চায় অথচ তাঁহাকে সকলে এড়াইয়া চলে—অধিকাংশ লোক চেনেই না। এই ছোকরা তো তাঁহাকে একটা নমস্কার পর্য্যন্ত করিল না! এই দেশে, এই সমাজে, আত্মীয়স্বজন পরিত্যক্ত হইয়া কাহার জন্য কিসের জন্য তিনি এই দুরূহ তপশ্চর্য্যা করিতেছেন? কেহই তো তাহার কথা শোনে না, জোর করিয়া শুনাইলেও শুনিতে চায় না। প্রবন্ধ পড়িতে পড়িতে শঙ্করের অস্বস্তি তিনি লক্ষ্য করিতেছিলেন। শঙ্করও স্থিরভাবে তাঁহার লেখা শুনিতে অপারগ! তবে এসব কেন—কেন—কেন?

দ্বিপ্রহরের প্রখর রৌদ্র মাথায় করিয়া লোকনাথ ঘোষাল কলিকাতার ফুটপাথ দিয়া চলিতে লাগিলেন। হাতে বিরাট প্রবন্ধের পাণ্ডুলিপি—চোখে বিদ্যুদ্দীপ্তি।

লোকনাথবাবুর আকস্মিক অন্তর্দ্ধানে শঙ্কর একটু হাসিল। লোকনাথবাবুর ব্যথা যে কোথায় তাহা তাহার অবিদিত নাই, কিন্তু সে ব্যথা দূর করা তাহার সাধ্যাতীত। কিছুক্ষণ শঙ্কর চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। নিজেকে কেমন যেন অপরাধী মনে হইতে লাগিল। আগে অনেকবার মনে হইয়াছে আবার মনে হইল যে নিষ্ঠা সহকারে সাহিত্যসেবা করা উচিত, সে নিষ্ঠা তাহার নাই—সে আদর্শভ্রষ্ট হইতেছে। মনে হইল লোকনাথ ঘোষালই নিষ্ঠাবান সাহিত্যিক—সে পল্লবগ্রাহী সুবিধাবাদী ব্যবসাদার। সঙ্গে সঙ্গে হঠাৎ মনে পড়িল অমিয়া তাহার অপেক্ষায় এখনও অভুক্ত বসিয়া আছে। উঠিতে যাইবে এমন সময় আর এক বাধা—নীরা বসাক আসিয়া প্রবেশ করিল। দৃষ্টি উদ্‌ভ্রান্ত—মাথার সামনের কেশবিরল অংশের অবিন্যস্ত চুলগুলা হাওয়ায় উড়িতেছে। মুখে হাসি ফুটাইয়া বলিল "আসতে পারি?"

"আসুন"

মুখমণ্ডলে শ্রদ্ধার আভাস বিচ্ছুরিত করিতে করিতে চেয়ার টানিয়া নীরা বসিল।

"এ সময় হঠাৎ"

"না এসে পারলাম না। এ মাসের 'সংস্কারে' 'অভ্যুদয়' কবিতাটার জন্তে আপনাকে অভিনন্দন জানাতে এসেছি"

"বস্থন"

"কি চমৎকারই লিখেছেন! সত্যি, আপনিই আধুনিক যুগের যুগপ্রবর্ত্তক কবি"

নীরা বসাকের চোখের দৃষ্টিতে ভক্তি শ্রদ্ধা যেন মূর্ত্ত হইয়া উঠিল। শঙ্কর অমিয়ার কথা ভুলিয়া গেল। কণ্ঠস্বরে একটু আবদারের আমেজ মাখাইয়া নীরা আবার বলিল—"কি করে' আপনি এমন লেখেন বলুন না, অবাক লাগে সত্যি"

শঙ্কর স্মিতমুখে বসিয়া রহিল—প্রতিবাদ বা সমর্থন কোনটাই করা শোভন নয়।

নীরা 'অভ্যুদয়' কবিতার খানিকটা আবৃত্তি করিয়া সোচ্ছ্বাসে বলিল, "এ সব কি করে' লিখছেন আপনি! এ যে আগুন"

"ওই ধরণের আর একটা কবিতা লিখেছি কাল"

"একটু শুনতে পাই না" সাগ্রহ মিনতিভরা-কণ্ঠে নীরা অনুরোধ জানাইল।

"হ্যাঁ, নিশ্চয়ই"

ড্রয়ার টানিয়া শঙ্কর কবিতাটি বাহির করিল এবং পড়িয়া শুনাইতে লাগিল। সুদীর্ঘ কবিতা। শেষ হইয়া যাইবার পর নীরার মুখ দিয়া খানিকক্ষণ কোন বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। ক্ষণকাল পরে মৃদুকণ্ঠে কেবল নিঃসৃত হইল—'চমৎকার'। খানিকক্ষণ উভয়েই চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

"আচ্ছা, এবার উঠি তাহলে, নমস্কার"

"নমস্কার"

দ্বার পর্য্যন্ত গিয়া হঠাৎ যেন কথাটা মনে পড়িয়া গেল।

"হ্যাঁ ভাল কথা, শুনেছি কুমার পলাশকান্তির সঙ্গে আলাপ আছে আপনার"

"আছে"

"যদি দয়া করে' তাহলে একটা কাজ করেন একটি দরিদ্র পরিবারের বড় উপকার হয়"

"কি বলুন"

আদ্যোপান্ত সমস্ত শুনিয়া শঙ্কর বলিল—"আমিও ওদের ভাল করে' চিনি। অনিল অখিলকে পড়াবার জন্তে মিসেস্ স্যানিয়ালের বাড়িতে আমি ছিলাম যে কিছুদিন"

নীরা সব জানিত, তবু বিস্ময়ের ভান করিল।

"ওমা, তাই নাকি। তাহলে দিন একটা চিঠি—"

"আমার আপত্তি ছিল না, কিন্তু কুমার পলাশকান্তির একটা অনুরোধ আমি রাখিনি, তিনি যদি আমারটা না রাখেন?"

ঠিক দুই দিন পূর্ব্বে কুমার পলাশকান্তির তাগাদায় অস্থির হইয়া শঙ্কর অবশেষে তাহাকে জানাইয়া দিয়াছে যে সে গল্প লিখিয়া দিতে পারিবে না, কুমার তাহাকে যেন ক্ষমা করেন, তাহার মোটে সময় নাই। সে ব্যস্ততার দোহাই দিয়াছিল বটে কিন্তু আসলে তাহার গল্প লিখিয়া দিবার ইচ্ছা ছিল না, বিবেকে বাধিতেছিল। সঙ্গে সঙ্গে আংটিটাও ফেরত দেওয়াতে প্রত্যাখ্যানটা একটু রূঢ়ই হইয়াছে। এত কথা সে অবশ্য নীরাকে বলিল না, চুপ করিয়া রহিল।

"দিতে পারবেন না তাহলে"

"সম্ভব হলে দিতাম"

নীরা বসাকের সমস্ত সপ্রতিভতা যেন দপ করিয়া নিবিয়া গেল। সে নির্ব্বাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

২৯

পরদিন একটা গল্পের পাণ্ডুলিপি লইয়া শঙ্কর কুমার পলাশ-কান্তির বাড়ির উদ্দেশ্যে ছুটিতেছিল। তাহার কেবলই ভয় হইতেছিল তিনি যদি বাড়িতে না থাকেন—সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে এ সময় প্রায়ই তিনি বাহির হইয়া যান। নীরা বসাকের বিবর্ণ ম্লান মুখচ্ছবি সে কিছুতেই ভুলিতে পারিতেছিল না। তাহার সমস্ত কাহিনী সে শুনিয়াছিল। কুন্তলার কাছে গোপন করিলেও শঙ্করের কাছে নীরা কিছুই গোপন করে নাই। কুন্তলা ঠিকই ধরিয়াছিল নীরা সত্যই শঙ্করের ভক্ত। লেখা পড়িয়াই সে শঙ্করকে এত ভক্তি করিত যে তাহার মহত্ব সম্বন্ধে তাহার বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না। তাহার রচনার ভিতর দিয়া সে যে সহৃদয় ব্যক্তিটিকে প্রত্যক্ষ করিয়াছিল তাহার নিকট অকপটে সমস্ত কথা ব্যক্ত করিতে সে দ্বিধা করে নাই।

শঙ্কর দ্রুতপদে পথ চলিতেছিল। হঠাৎ একটা কাপড়ের দোকানে চোখ পড়িতে সে একটু বিস্মিত হইয়া গেল। প্রফেসার গুপ্ত ও সুলেখা কাপড় কিনিতেছেন—একটি চমৎকার শাড়িরই পাট খুলিয়া উভয়ে সেটি নিরীক্ষণ করিতেছেন। সুলেখার উদ্ভাসিত মুখমণ্ডল দেখিয়া মনে হইতেছে না যে স্বামীর সহিত তাঁহার কিছুমাত্র অসদ্ভাব আছে। অত অপমানের পরও সুলেখা ঠিক আগেকার মতোই স্বামীর ঘর করিতেছেন, বিদ্রোহ করিয়া গৃহত্যাগ করেন নাই। হয়তো তাঁহারই আদরে আবদারে বিগলিত হইয়া প্রফেসার গুপ্ত তাঁহারই জন্ত শাড়ি কিনিতে আসিয়াছেন। প্রফেসার গুপ্তের চরিত্রও যে বিশেষ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে তাহা বলা যায় না। তাঁহার নিজেরই একটি ছাত্রীর সহিত তাঁহার নাম জড়াইয়া প্রফেসার মহলে যে কাণাঘুসা চলিতেছে—তাহা শঙ্কর শুনিয়াছে। সুলেখাও হয়তো শুনিয়াছে। সুলেখার হাস্যোজ্জ্বল মুখের দিকে আর একবার চাহিয়া শঙ্কর আগাইয়া গেল। একটু হাসিয়া মনে মনে বলিল—ইহাই জীবন।

অন্যমনস্ক ছিল বলিয়া শঙ্কর জীবনের আর একটি ছবি দেখিতে পাইল না। আসমি-দারজির পিতা নিবারণবাবু শঙ্করকে দেখিয়া তাড়াতাড়ি পাশের গলিতে ঢুকিয়া আত্মগোপন করিলেন। তিনি বাজার করিতে বাহির হইয়াছিলেন। কাঁকড়া, ভেট্‌কি-মাছ, মাটন প্রভৃতি নানারূপ সুখাদ্য তিনি কিনিয়াছেন। আসমি-সহ পলাতক মাষ্টার ফিরিয়াছে। স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া নয়, নিবারণবাবুর আহ্বানে। সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ জানাইয়া শুধু চিঠি নয় তিনি টেলিগ্রাম পর্য্যন্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু শঙ্করের কাছে তাহা স্বীকার করা অসম্ভব। সুতরাং শঙ্করকে দেখিয়া তাঁহাকে তাড়াতাড়ি অন্ধকার গলিটার মধ্যে ঢুকিয়া পড়িতে হইল।

অনিলের চাকরি জুটাইয়া দিবার জন্ত শঙ্কর ঊর্দ্ধশ্বাসে কুমার পলাশকান্তির বাড়ির উদ্দেশ্যে ছুটিতে লাগিল।

৩০

আসমিকে লইয়া তবলাবাদক মাষ্টার কপিলবাবু ফিরিয়া আসিয়াছেন। নিবারণবাবুর অন্তরের কথা নিবারণবাবুই সম্যকরূপে জানেন, বাহিরে তাহার যতটুকু প্রকাশ দেখা যাইতেছে তাহা পরিচিত মহলে কিঞ্চিৎ বিস্ময়েরই উদ্রেক করিয়াছে। আসমি ও মাষ্টারকে ঘিরিয়া নিবারণ-গৃহে প্রতিদিন একটা না একটা ছোট বড় উৎসব লাগিয়াই আছে। নিবারণ যে ইহাদের বিরুদ্ধে পুলিশে নালিশ করিয়াছিলেন অথবা কখনও ইহাদের মুখ-দর্শন করিবেন না বলিয়া উচ্চকণ্ঠে যে প্রতিজ্ঞা বাক্য উচ্চারণ করিয়াছিলেন তাহা তাঁহার বর্ত্তমান আচরণ দেখিয়া অনুমান করা কঠিন। দারজির আচরণও ঠিক পূর্ব্ববৎ আছে। দারজি সর্ব্বদা স্বল্পভাষিণী, সর্ব্বদা কর্ত্তব্যপরায়ণা। সে সহসা মিষ্ট কথায় গলিয়াও পড়ে না, রুষ্ট কথায় ফোঁস করিয়াও ওঠে না। যাহা তাহার ভাগ্যে জোটে তাহাই সে মানিয়া লয়। অদৃষ্টকে শান্তমুখে মানিয়া লইয়া সন্তুষ্ট চিত্তে অনাড়ম্বর জীবন-যাপন কৌশল সে আয়ত্ত করিয়া লইয়াছে। মনে হয় তাহার যেন কোন অভাব বোধই নাই। থাকিবে কি করিয়া। যে আনন্দের অভাব জীবনকে শুষ্ক করিয়া দেয় সে আনন্দ তাহার প্রচুর পরিমাণে আছে। সে শিল্পী। সূচীশিল্পে সে তন্ময় হইয়া থাকে, বাবাকে সে প্রাণ ভরিয়া ভালবাসে। আর কি চাই? তাহার বিশ্বাস সে ছাড়া তাহার বাবাকে আর কেহ চেনে না বোঝে না। আসমি আসার পর হইতে সে সর্ব্বদা সশঙ্কিত হইয়া আছে—কখন শঙ্করবাবু হঠাৎ আসিয়া পড়েন। শঙ্করবাবুর নিকট নিবারণবাবু আসমি ও কপিলবাবুর সম্বন্ধে যে সব গর্জ্জন করিয়াছিলেন তাহা দারজির অবিদিত নাই। তাই তাহার সর্ব্বদা ভয় হয় শঙ্করবাবু এখন যদি আসিয়া পড়েন কি ভাবিবেন। বাহিরের কোন লোকের নিকট তাহার বাবা অপমানিত বা অপ্রস্তুত হইলে তাহার বড় কষ্ট হয়। এই একটি জিনিসই তাহার পক্ষে সত্যসত্যই কষ্টদায়ক। অথচ বাবা এমন সব কাণ্ড করিয়া বসেন! সেদিনও একটি লোককে তিনি তাহার বিবাহের জন্য কি খোশামোদই না করিতেছিলেন—সে পাশের ঘর হইতে স্বকর্ণে শুনিয়াছে। কি দরকার তাহার বিবাহ করিবার! সে বাবাকে বলিয়া দিয়াছে যে তাহার জন্য আর পাত্র খুঁজিতে হইবে না। সে বিবাহ করিবে না। আসমি বিবাহ করিয়াছে, সে-ও যদি বিবাহ করে তাহার অসহায় বাবাকে দেখিবে কে। না, সে বিবাহ করিবে না।

সেলাইয়ের ফোঁড় তুলিতে তুলিতে সে ভাবিতেছিল শঙ্করবাবুর নিকট কি করিয়া বাবার মান বাঁচান যায়। সহসা তাহার মুখ উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল। সে ঠিক করিয়া ফেলিল শঙ্করবাবু যদি আসেনই তাহাকে আগেই আড়ালে ডাকিয়া সে বলিয়া দিবে যে বাবার নয় তাহারই আগ্রহাতিশয্যে আসমিরা আসিয়াছে। তাহারই অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া বাবা তাহাদের আসিতে লিখিয়াছিলেন এবং তাহারই মুখ চাহিয়া তাহাদের সহিত সদ্ব্যবহার করিতেছেন। ব্যাপারটার সমাধান করিয়া তাহার মুখ প্রসন্ন হইয়া উঠিল, হেঁট হইয়া সেলাইয়ের বাক্সের ভিতর উড্ডীয়মান শুক পক্ষীর পালকের উপযোগী সবুজ রঙের সূতা অন্বেষণে সে ব্যাপৃত হইল।

আসমি, মাষ্টার ও নিবারণবাবু আলিপুর চিড়িয়াখানায় গিয়াছেন। দারজি যায় নাই। সে কোথাও যায় না। নিস্তব্ধ দুপুরে একা বসিয়া সেলাই করিতেই তাহার ভাল লাগে।

ক্রমশঃ

ব্যবধান

গোপাল ভৌমিক

সেদিন হৃদয় ছিল কামনা-রঙীন—
দিগ্বলয়ে ছিল বুঝি রক্ত-ঝরা দিন:
স্বপ্রকাশ আনন্দের ছিল না ত যতি—
যে মুহূর্তে পাশে এসে দাঁড়ালে তপতী।

অনিচ্ছায় দূরে আজ স'রে গেছি জানি—
তবু মিথ্যা নয় কভু সেদিনের বাণী:
সেই চোখে চোখ মেলা চকিত বিদ্যুৎ—
মনে হয় রূপ-কথা, অপূর্ব অদ্ভুত।

সমাহিত আমি আজ, বিস্তৃত জীবন—
এ জগতে নও তুমি একমাত্র জন:
পৃথিবীর বক্ষে আজ যে বিপুল ঝড়—
চারিদিকে শুনি তার ভীত কণ্ঠস্বর।

আমি তাই ভুলে গেছি বিচ্ছেদের দাহ—
আমার হৃদয়ে আছে সিরক্কো প্রবাহ:
তুমি শুধু বদ্ধ-কূল এতটুকু নদী—
আমার সমুদ্রে ঝড় বহে নিরবধি।

প্রজাপতি-রাঙা পাখা মেলে' কামনারা—
দিগন্তে ঝড়ের চাপে ভয়ে হ'ল হারা:
তোমার নদীতে আজও চড়ে স্বপ্ন-হাঁস—
তোমারে উন্মনা করে আসঙ্গ-বিলাস।

যাদুবিদ্যা ও বাঙ্গালী

যাদুকর পি-সি-সরকার

ইংরাজীতে একটি কথা আছে যে "Facts are sometimes starnger than fiction" অর্থাৎ সময় বিশেষে বাস্তব ঘটনা উপন্যাসের গল্প অপেক্ষাও অধিকতর রোমাঞ্চকর হয়। যাদুকরদিগের অত্যাশ্চর্য্য ক্রিয়া দেখিলে এই উক্তির প্রমাণ পাওয়া যায়। সেই জন্যই যুগে যুগে পৃথিবীর সকল দেশে যাদুকরগণ দর্শকদিগের চক্ষু ধাঁধাইয়া নানারূপ অলৌকিক ক্রিয়া দেখাইয়া থাকেন। কিরূপে পথের বেদিয়া মাটিতে আমের আঁটি পুঁতিয়া মুহূর্ত্তে ফলসহ আম্রবৃক্ষ উৎপাদন করে, কিরূপে তাহারা খালি পায়ে জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডের উপর যাতায়াত করে ইহা যেমন কৌতুহলোদ্দীপক, ঠিক তেমনই বিস্ময়কর। বৈজ্ঞানিকগণ এই সমস্ত প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিতে পারেন না। হঠযোগ প্রভৃতি প্রক্রিয়াদ্বারা ভারতীয় যাদুকরগণ তীব্র বিষ, কাঁচ, পেরেক, নানাবিধ তীব্র এসিড এমন কি জীবন্ত বিষধর সর্প পর্য্যন্ত অনায়াসে খাইতেছেন, যাহা দেখিয়া পাশ্চাত্যের জ্ঞান-গবেষণামণ্ডলী একেবারে নীরব হইয়া গিয়াছেন। সেদিনও একজন ভারতীয় যাদুকর লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের সুক্ষ্মানুসন্ধান সমিতি (London University Council for Psychic Investigation)র সম্মুখে ৮০০ ডিগ্রি উত্তাপের জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডের উপর অনায়াসে যাতায়াত করিয়াছেন। এই ক্রিয়াটি অনুকরণ করিতে যাইয়া লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের জনৈক অধ্যাপক নিজের পদদ্বয় সাংঘাতিকভাবে পুড়াইয়া ফেলিয়াছিলেন। এই সমস্ত হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে যাদুবিদ্যায় ভারতবর্ষ এখনও অন্যান্য দেশের নিকট অনেকটা বিস্ময়ের স্থল। এই জন্যই তাঁহারা ভারতবর্ষকে 'যাদুকরের দেশ' বা "Home of Magic" নামে আখ্যা দিয়াছেন।

একদা ভারতের স্বর্ণযুগে আধ্যাত্মিক আধিভৌতিক এমন বিদ্যা ছিল না, যাহা নিষ্ঠা সহকারে অধীত বা আলোচিত হইত না। সে ছিল ভারতের জাগরণ যুগ! তারপর পতন-যুগের এক অশুভ মুহূর্ত্ত হইতে ভারতের সে সর্ব্বতোমুখী প্রতিভার প্রবাহে ভাঁটা ধরিল। জ্ঞানচর্চ্চা লোপ পাইল। সব কিছুকে গোপন রাখিবার প্রবৃত্তি জাগিল। বিস্তৃত ক্ষেত্র সঙ্কুচিত হইয়া নিবদ্ধ হইল বংশ বা গুরু-পরম্পরার মাঝে। বস্তুর বিজ্ঞান বিস্মৃতির অতলে ডুবিল এবং সংগোপনের প্রয়াস পাইল সেইস্থানে প্রাধান্য। সম্মানের সিংহাসনচ্যুত হইয়া ভারতীয় সাধনার যে সকল অমূল্য সম্পদের নিরাবরণ অস্তিত্ব আজও লক্ষ্যে পড়ে তন্মধ্যে সম্মোহন ও যাদুবিদ্যা অন্যতম। পথের বেদিয়ারা বা যাদুকরেরা নিছক অর্থোপার্জ্জনের উপায় স্বরূপেই এমন বহু জিনিষকে অবলম্বন করিয়া রাখিয়াছিল। প্রতীচ্যের বিজ্ঞানময় আলোকের চাকচিক্যে যে-সময়ে ভারতবাসী তার নিজস্বতাকে অবহেলা করিতে আরম্ভ করিল, সেই সময় হইতেই ইহার যতটুকু অবশেষ ছিল তাহাও উৎসাহের অভাবে অবলুপ্ত হইতে লাগিল। সমাহিত হইয়া এই সকল বিষয় চিন্তা করিলে, অতীতের সেই প্রতিভাদীপ্ত ভারতের জন্য ব্যথা-বেদনায় বুক হাহাকার করিয়া উঠে। প্রতীচীর জ্ঞান-গবেষণা মন্দিরের দ্বারে মাথা ঠুকিয়া আত্মসম্বিৎহারা জাতিই যদি কখন সচেতন হয়, তখনই আবার সে বুঝিবে, অনুতাপ করিবে যে তার কি ছিল আর এখন নাই। তুচ্ছ হইলেও, আমার আলোচ্য বিষয়টি হইতেই যাদুবিদ্যায় ভারতের সে-যুগ ও এ-যুগের উন্নতি-অবনতির কথঞ্চিৎ ধারণা করা সম্ভব হইবে। এখনও আমাদের মধ্যে অনেকে বিশেষ বয়স্কেরা বেদিয়াদের বহু আশ্চর্য্যকর যাদুর কথা স্মরণ করিতে পারিবেন। পথে ঘাটে মাঠে গৃহাঙ্গনে তাহারা এই অদ্ভুত বাজী দেখাইত বা এখনও দেখাইয়া থাকে। বাঁধা ষ্টেজের বালাই নাই। নিজে যাদুকর হইয়াও যখন ভাবি, এই সকল নগণ্য উপেক্ষিত পথের বাজীকরদের কথা, শ্রদ্ধায় বিস্ময়ে মাথা নত হইয়া পড়ে তাহাদের কৃতিত্বের কাছে। এই ভারতীয় বাজীকরেরা যে সকল খেলা দেখাইত তন্মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অদ্ভুত ছিল 'দড়ির খেলা'।

যাদুবিদ্যার ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে প্রাচীন ভারতবর্ষ, মিশর, আরব প্রভৃতি দেশে ইহা বহু যুগ হইতেই আলোচিত হইতেছে। যাদুবিদ্যার অপর বিভাগ 'সম্মোহন বিদ্যা' বা 'বশীকরণ বিদ্যা' ভারতবর্ষে ও মিশরে ধর্ম্মযাজকদের একচেটিয়া ছিল। ভারতীয় যোগশাস্ত্রের পুস্তকাদি আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, উহা তন্ত্রশাস্ত্রোক্ত মারণ উচাটন প্রভৃতি বিভাগের মধ্যে বশীকরণের অন্তর্ভুক্ত এবং অণিমা লঘিমা প্রমুখ অষ্টসিদ্ধির মধ্যে উহা 'বশিত্ব' সিদ্ধির পর্য্যায়ভুক্ত। এই 'বশিত্ব বা বশীকরণ' অর্থই যাদুবিদ্যা বা সম্মোহনবিদ্যা। যাদুবিদ্যা বর্ত্তমানে আরও ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়। কেহ কেহ বলেন, ইন্দ্রজাল, ভোজবাজী ইত্যাদি। ইহার দুইটি কারণ হইতে পারে। একদল লোক মনে করেন চক্ষু নামক প্রধান ইন্দ্রিয়ের উপর মায়াজাল বিস্তার করে বলিয়াই ইহার নাম 'ইন্দ্রজাল'। ম্যাজিকের কতকগুলি খেলা (sleight of hand) হাত সাফাই বা হস্তকৌশলে করা হয় বলিয়া ইহা ভুজ্‌বাজী বা 'ভোজবাজী'। ম্যাজিকের খেলা মানব মনে বিভ্রম সৃষ্টি করে কাজেই উহা 'ভান্ মতিকা খেল' যাহার অপভ্রংশ 'ভানুমতির খেলা' নামে বর্ত্তমানে প্রচলিত। ইঁহারা মনে করেন ভুজবাজী হইতেই ভোজবাজী এবং ভান্ মতিকা খেল হইতে ভানুমতির খেলা হইয়াছে ইত্যাদি। অপর দল মনে করেন যে এ উক্তি ঠিক নহে, পূর্ব্বকালে দেবরাজ ইন্দ্রের সভায় এই যাদুবিদ্যা প্রদর্শিত হইত, সেই হইতেই ইহা 'ইন্দ্রজাল' নামে পরিচিত। তাঁহারা বলেন, ইহা দেবসেনানী কার্ত্তিকেয় আবিষ্কৃত চুরিবিদ্যার অন্তর্গত কিন্তু ব্যাপারটি চুরি হইলেও তন্ত্রশাস্ত্রের অপরাপর বিভাগের ন্যায় বিশেষ সাধনাসাপেক্ষ। ভোজবিদ্যা বা ভোজবাজী সম্বন্ধে তাঁহারা বলেন যে, ইহা ভোজরাজার নাম হইতে আসিয়াছে। ভোজরাজ মালব দেশের অধীশ্বর ছিলেন। তাঁহার রাজধানী ছিল সুপ্রসিদ্ধ ধারা নগরী। প্রমার বংশীয় রাজগণের মধ্যে ইনি সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ। রাজা ভোজ যাদুবিদ্যা প্রমুখ অশেষ বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। অলঙ্কার, দর্শন, যোগ, স্মৃতি, জ্যোতিষ, রাজনীতি ও শিল্প-শাস্ত্রীয় যুক্তিকল্পতরু প্রভৃতি নানা বিষয়ের বহুসংখ্যক পুস্তক তাঁহার পৃষ্ঠপোষকতায় ও উৎসাহে রচিত ও প্রচারিত হয়। তিনিই মহারাজ বিক্রমাদিত্যের বত্রিশ সিংহাসন উদ্ধার করেন এবং পরে ১০৯২ খৃষ্টাব্দে কালগ্রাসে নিপতিত হন। এই ভোজরাজের নাম হইতেই ভোজবিদ্যা বা ভোজবাজী নাম হইয়াছে। যাদু ও সম্মোহন বিদ্যার ব্যাপারে আবিষ্কর্ত্তার নাম হইতে বিদ্যার নাম হওয়া বিচিত্র নহে। মেসমেরিজম্ নামক এই বিদ্যার অপর বিভাগ আলোচনা করিলে ইহা সুস্পষ্ট হইবে। 'এনিমেল ম্যাগ্নেটিজম্' বা জৈব আকর্ষণ বিদ্যাটি ইহার আবিষ্কর্ত্তা ভিয়েনা নগরীর ডাক্তার মেসমার সাহেবের নাম হইতে মেসমার-ইজম্ অর্থাৎ মেসমেরিজম্-এ পরিণত হইয়াছে। সেইরূপে ভোজরাজার বিদ্যা ভোজবিদ্যা বা ভোজবাজী হওয়াও অসম্ভব নহে। যাহা হউক, এই ভোজরাজের কন্যার নাম ছিল ভানুমতী। রাণী ভানুমতী সুপ্রসিদ্ধ বিক্রমাদিত্যের মহিষী ছিলেন এবং পিতার ন্যায় অশেষ গুণের অধিকারী ছিলেন। প্রসিদ্ধি আছে যে, যাদুবিদ্যায় তিনি তাঁহার পিতা অপেক্ষাও অধিক পারদর্শিতা অর্জ্জন করিয়াছিলেন। তাঁহার নাম হইতেই যাদুবিদ্যা বর্ত্তমানে ভানুমতীর খেলা বা ভানুমতির খেল নামে সুপরিচিত হইয়াছে। পাঠকবর্গ যে কোন

মতবাদই সমর্থন করুন না কেন তাহাতে আমাদের প্রাতিপাদ্য বিষয়ে কোনই অসুবিধা হয় না। উহা ইহতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, যাদুবিদ্যা এদেশে বহুশতাব্দী যাবৎ প্রচলিত। এই বিদ্যার প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করিলে আরও অসংখ্য প্রমাণ পাওয়া যায়। ইতিপূর্ব্বে বেদিয়াদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ খেলা হিসাবে ভারতীয় দড়ির খেলার কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। এই সূত্রক্রীড়া (Indian Rope Trick) বা দড়ির খেলা লইয়া বর্ত্তমানে সমগ্র পৃথিবীময় আলোচনা চলিতেছে। শ্রীশঙ্করাচার্য্য তাঁহার বেদান্ত দর্শনের ১৭শ শ্লোকের ভাষ্যে এই বিশিষ্ট যাদুবিদ্যার উল্লেখ করিয়াছেন এবং প্রকারান্তরে ইহার কৌশলও লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। রত্নাবলী প্রভৃতি নাটকে স্থানে স্থানে বহু ঐন্দ্রজালিকের লোমহর্ষণ ঘটনার কথা পাওয়া যায়। রাজা বিক্রমাদিত্য এই বিদ্যাকে আদর করিতেন এবং শুধু এই বিদ্যা নহে প্রায় সর্ব্ববিধ শাস্ত্র ও বিদ্যা তাঁহার প্রিয় ছিল বলিয়াই মহাকবি কালিদাস রাজা বিক্রমাদিত্যের গুণবর্ণনায় পঞ্চমুখ হইয়া "রাজাধিরাজ পরমেশ্বরঃ আসমুদ্র পৃথিবীপতি, সকল কলার্থ শ্লোক-কল্পদ্রুম" এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। কালিদাসরচিত অমর গ্রন্থ 'দ্বাত্রিংশৎ পুত্তলিকা'য় রাজা বিক্রমাদিত্যের সম্মুখে প্রদর্শিত একটি অত্যদ্ভুত যাদুবিদ্যার উল্লেখ করিয়াছেন। ইহা অনেকাংশে অধুনা প্রসিদ্ধ ভারতীয় দড়ির খেলা বলিয়া নিম্নে দ্বাত্রিংশৎ পুত্তলিকার বর্ণিত যাদু-ক্রিয়াটীর অবিকল বাংলা অনুবাদ দেওয়া যাইতেছে :—

"একদা রাজা বিক্রমাদিত্য সামন্ত রাজকুমারগণ কর্ত্তৃক উপাসিত হইয়া সিংহাসনে উপবিষ্ট আছেন, ইত্যবসরে এক ঐন্দ্রজালিক উপস্থিত হইয়া কহিল 'দেব! আপনি সকল কলাবিদ্যায় পারদর্শী, অনেক বড় বড় ঐন্দ্রজালিক আসিয়া আপনার নিকট নৈপুণ্য দেখাইয়াছেন; অদ্য প্রসন্ন হইয়া আমার ইন্দ্রজালবিদ্যার নৈপুণ্য প্রত্যক্ষ করুন। রাজা কহিলেন, 'এখন আমাদিগের অবসর নাই, স্নানাহারের সময় উপস্থিত, প্রভাতে দেখিব।' অনন্তর (পরদিন) প্রভাতে মহাকায়, দীর্ঘশ্মশ্রু, দেদীপ্যমান দেহ এক পুরুষ বিশাল স্কন্ধদেশে একখানি সমুজ্জ্বল খড়্গ স্থাপন পূর্ব্বক একটি সুন্দরী নারী সমভিব্যাহারে (সভাতলে) উপস্থিত হইয়া রাজাকে প্রণাম করিল। সভাস্থিত রাজপুরুষেরা এই ঘটনা দর্শনে বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'নায়ক! তুমি কোন্ স্থান হইতে আসিয়াছ?' সেই পুরুষ কহিল, 'আমি দেবেন্দ্রের পরিচারক. কোন সময়ে প্রভু আমাকে অভিসম্পাত করাতে আমি ধরাতলে অবস্থান করিতেছি। এইটি আমার পত্নী। সম্প্রতি দানবগণের সহিত দেবতাদিগের মহাসংগ্রাম বাধিয়াছে, সেইজন্য আমি তথায় যাইতেছি। এই বিক্রমাদিত্য রাজা পরস্ত্রীদিগের সহোদর স্বরূপ, এই বিবেচনায় ইঁহার নিকট পত্নীকে ন্যাস স্বরূপ রাখিয়া যুদ্ধযাত্রা করিব।' এই কথা শুনিয়া রাজা অতীব বিস্ময়প্রাপ্ত হইলেন। সেই ব্যক্তিও রাজার নিকট আপনার স্ত্রীকে রাখিয়া রাজাকে নিবেদন পূর্ব্বক খড়্গে নির্ভর করিয়া গগনমার্গে উত্থিত হইল, যেমন সে শূন্যমার্গে উঠিয়াছে, অমনি নভোমার্গে 'মার্ মার্ ধর্ ধর' এই প্রকার ভীষণ শব্দ শ্রুত হইতে লাগিল, সভাস্থ সকলে ঊর্দ্ধমুখ হইয়া কৌতুকের সহিত দেখিতে লাগিলেন। ক্ষণমাত্র পরেই নভোমণ্ডল হইতে রাজসভাতলে রুধিরপ্লুত একটি বাহু নিপতিত হইল; সেই বাহুতে খড়্গ সংযুক্ত রহিয়াছে। তদ্দর্শনে সকলেই কহিল, 'হায়! এই রমণীর বীরপতি সংগ্রামে প্রতিপক্ষ কর্ত্তৃক কর্ত্তিত হইয়াছে, তাহারই একটি বাহু ও খড়্গ পতিত হইল।' সভাস্থ সকলে এই কথা বলিতেছে, অমনি সেই বীরের ছিন্ন মস্তকও কিয়ৎক্ষণ পরেই কবন্ধদেহ নিপতিত হইল। তদ্দর্শনে সেই বীরের রমণী কহিল 'দেব! আমার পতি যুদ্ধক্ষেত্রে যুদ্ধ করিয়া প্রতিপক্ষ কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছেন, তাঁহার মস্তক, বাহু, কবন্ধ ও খড়্গ নিপতিত হইয়াছে; অতএব দিব্যবালারা আমার প্রিয় পতিকে বরণ করিবে। আমার এই দেহ পতির জন্যই বিদ্যমান, আমার পতি যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন; সুতরাং কাহার জন্য আর আমি এই দেহ ধারণ করিব?...এই বলিয়া সেই রমণী অগ্নিতে প্রবিষ্ট হইবার জন্য রাজার পাদমূলে পতিত হইল। রাজা তখন চন্দন কাষ্ঠাদি দ্বারা চিতাসজ্জা করাইয়া রমণীকে সহমরণে যাইবার আদেশ প্রদান করিলেন। সেই সতী নারীও রাজার আদেশ পাইয়া পতির শবদেহের সহিত অগ্নিগর্ভে প্রবিষ্ট হইল।

অনন্তর সূর্য্য অস্তাচলে গমন করিলেন। পরদিন প্রাতঃকালে রাজা সন্ধ্যাবন্দনাদি সমাপনান্তে সিংহাসনে উপবেশন করিলে, সামন্ত ও মন্ত্রীগণ তাঁহাকে পরিবেষ্টনপূর্ব্বক উপবেশন করিলেন। ইত্যবসরে সেই বিশালকায় নায়ক পূর্ব্ববৎ অসিহস্তে দেদীপ্যমান কলেবরে উপস্থিত হইয়া রাজার গলদেশে পুষ্পমাল্য প্রদানপূর্ব্বক তাঁহার নিকট সংগ্রাম বৃত্তান্ত বর্ণন করিতে প্রবৃত্ত হইল। তাহাকে উপস্থিত দেখিয়া সমগ্র সভা বিস্ময়ে স্তম্ভিত! নায়ক পুনরায় কহিল, রাজন্! আমি এই স্থান হইতে সুরপুরে উপস্থিত হইলে, দানবদিগের সহিত ইন্দ্রের ভীষণ যুদ্ধ বাধে। অনেক রাক্ষস তাহাতে বিনাশ প্রাপ্ত হয়, অনেকে পলায়ন করে। সংগ্রাম শেষ হইলে দেবরাজ প্রসন্ন হইয়া আমাকে কহিলেন, 'নায়ক! অদ্য হইতে তুমি আর ধরাতলে গমন করিও না, তুমি অভিশাপমুক্ত হইলে, আমি তোমার প্রতি প্রসন্ন হইলাম, এই বলয় গ্রহণ কর।' এই বলিয়া আপনার হস্ত হইতে রত্ন-খচিত মুক্তাবলয় খুলিয়া আমাকে প্রদান করিলেন। আমি পুনর্ব্বার তাঁহাকে কহিলাম— প্রভো! আমার পত্নীকে রাজা বিক্রমাদিত্যের নিকট ন্যাস স্বরূপ রাখিয়া আসিয়াছি, তাহাকে লইয়া ত্বরায় আসিতেছি।' দেবরাজকে এই বলিয়া আপনার নিকট উপস্থিত হইলাম। আপনি আমার পত্নীকে প্রত্যর্পণ করুন, তাহাকে লইয়া পুনরায় সুরপুরে যাইব।"

এই কথা শ্রবণমাত্র রাজা ও সভাস্থ সকলেই বিস্ময়ে অভিভূত হইলেন। রাজার সমীপবর্ত্তী লোকেরা কহিল 'তোমার পত্নী অগ্নিপ্রবেশ করিয়াছে।' নায়ক বলিল, "কেন?" সভাস্থ সকলে নিরুত্তর হইয়া রহিল। তখন নায়ক রাজাকে সম্বোধন করিয়া কহিল, "হে রাজশিরোমণে! হে পর-দারাসহোদর! হে লোককল্পমহাদ্রুম! আপনি ব্রহ্মার ন্যায় আয়ুষ্মান হউন, আমি জনৈক যাদুকর, আপনার সম্মুখে যাদুবিদ্যার নৈপুণ্য প্রদর্শন করিলাম।" এই কথা শুনিয়া রাজা প্রথমে বিস্ময়াপন্ন ও পরে তাহার প্রতি প্রসন্ন হইলেন। তৎপর অষ্টকোটি স্বর্ণ, ত্রিনবতিকোটি মুক্তাভার, মদগন্ধলুব্ধ মধুকরবেষ্টিত পঞ্চাশটি হস্তী, তিনশত ঘোটক ও চারিশত পণ্যনারী ইত্যাদি যাহা তিনি সেদিন পাণ্ড্যরাজ্যের করস্বরূপ পাইয়াছিলেন সমস্তই পুরস্কারস্বরূপ সেই ঐন্দ্রজালিককে দিলেন।"

ভারতীয় যাদুবিদ্যা যৌগিক ও আধ্যাত্মিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত এই সমস্ত বিদ্যার চরমোৎকর্ষ এই ভারতবর্ষেই হইয়াছিল, তৎকালে বহুবিধ যাদুবিদ্যা প্রদর্শন করিয়া ভারতীয় যাদুকরগণ দেশব্যাপী হুলস্থুলের সৃষ্টি করেন। কিন্তু আলোচনার অভাবে এই বিদ্যা ক্রমে ক্রমে আমাদের দেশ হইতে একেবারে লোপ পাইতে চলিয়াছে। কিন্তু আনন্দের বিষয় এই যে, কয়েকজন বাঙ্গালী যাদুকরের উৎসাহে ও চেষ্টায় পুনরায় এই বিদ্যার আলোচনা আরম্ভ হইয়াছে। যাদুবিদ্যায় বাঙ্গালীদের দান বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। মোগলরাজত্বকালে বাঙ্গালীগণ নানাবিধ যাদুবিদ্যা প্রদর্শন করিয়া সমগ্র দেশময় হুলস্থুলের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। বাদশাহ্ জাহাঙ্গীর পারস্য ভাষায় লিখিত আত্মজীবনী 'জাহাঙ্গীর নামা' বা Tarkish-i-Jahangir nama—Salimi (or Dwazda—Saha-Jahangiri) পুস্তকে অনেক পৃষ্ঠাব্যাপী এই বাঙ্গালী যাদুকরদের প্রশংসা করিয়াছেন। তাহাতে উল্লেখ আছে যে, একবার একদল বাঙ্গালী যাদুকরের খেলা দেখিয়া বাদশাহ্ জাহাঙ্গীর নিম্নোক্তরূপ লিখিয়া গিয়াছেন—

"আমি যে সময়ের কথা বলিতেছি, সেই সময়ে বাংলাদেশে কয়েকজন যাদুকর ম্যাজিক ও ভোজবাজীতে এরূপ দক্ষ ছিল যে, তাহাদের কাহিনী আমার এই আত্মজীবনীতে উল্লেখযোগ্য বলিয়া মনে করিতেছি।" তিনি আরও লিখিয়াছেন—"এক সময়ে আমার দরবারে সাতজন বাঙ্গালী যাদুকরের আবির্ভাব হয়। তাহারা তাহাদের ক্ষমতা সম্বন্ধে অত্যন্ত

বিশ্বাসী ছিল। আমাকে তাহারা গর্ব্ব করিয়া বলে যে, এমন খেলা তাহারা দেখাইতে পারে যে, মানুষের বুদ্ধি তাহাতে তাক্ লাগিয়া যাইবে। বস্তুতঃ তাহারা বাজী দেখাইতে আরম্ভ করিয়া এমনই অত্যদ্ভুত খেলা দেখাইল যে তাহা স্বচক্ষে না দেখিলে বিশ্বাস করা অসম্ভব। বাস্তবিকই কৌশলগুলি এমনই আশ্চর্য্যজনক ছিল যে, আমরা যে যুগে বাস করিতেছি সেই যুগে এমন বিস্ময়কর ঘটনা সম্ভবপর বলিয়া বিশ্বাস করা কষ্টসাধ্য।"

ইহার পর আর একজন বাঙ্গালী যাদুকরের উল্লেখ পাওয়া যায়। তাঁহার নাম আত্মারাম সরকার। আত্মারাম বাংলার বিখ্যাত ভোজবিদ্যা-বিশারদ ছিলেন। তাঁহার প্রাদুর্ভাবকাল সন তারিখ মিলাইয়া পাওয়া যায় না। ভারতবর্ষ পত্রিকায় শ্রীযুক্ত গঙ্গাগোবিন্দ রায় লিখেন যে, আত্মারাম "বনবিষ্ণুপুর মহকুমার অন্তর্গত প্রকাশছিলিম নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।" বহুদিন পূর্ব্বে উক্ত ভারতবর্ষ পত্রিকাতেই শ্রীযুক্ত জীবনকৃষ্ণ সরকার লিখিয়াছেন যে আত্মারাম সরকারের বাসস্থান হুগলী (বর্ত্তমান হাওড়া) জেলার অন্তর্গত কমলাপুর গ্রামে ছিল। মাধবরামের চারিপুত্র (১) বাঞ্ছারাম (২) আত্মারাম (৩) গোবিন্দরাম (৪) রামপ্রসাদ। এক বাঞ্ছারাম ব্যতীত অপর তিন ভ্রাতার বংশ নাই। আত্মারাম সরকার জাতিতে কায়স্থ এবং পূর্ব্বোক্ত জীবনকৃষ্ণ সরকার ও বর্ত্তমান প্রবন্ধ লেখক উভয়েই ঐ বাঞ্ছারামের বংশধর এইরূপ প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে।

আত্মারাম কামরূপ কামাখ্যা হইতে যাদুবিদ্যা শিখিয়া আসিয়াছিলেন এবং দেশে আসিয়া বাজীকরদের কৌশল ব্যর্থ করিয়া দিতেন বলিয়া,—বাজীকরেরা অদ্যাপি তাঁহাকে গালি দেয়। "যাঃ গুটি চলে যাঃ—আত্মারাম সরকারের মাথা খাঃ—ইত্যাদি।" আত্মারাম সরকার সম্বন্ধে অনেক অদ্ভুত গল্প শুনা যায়। তিনি চালুনি ও ধুচুনিতে জলস্থির রাখিতে পারিতেন এবং ভূতপ্রেত বশ করিয়া তাহাদের দ্বারা শিবিকা বহন করাইতেন। শেষে ভূতেরাই ছিদ্র পাইয়া তাঁহাকে মারিয়া ফেলে। আত্মারামের জ্যেষ্ঠভ্রাতা বাঞ্ছারাম সরকারও যাদুবিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিলেন। তবে তিনি আত্মারামের ন্যায় প্রসিদ্ধিলাভ করেন নাই এবং তাহার বিশিষ্ট কোন খেলারও বিবরণ পাওয়া যায় নাই।

ইংরেজ রাজত্বের প্রারম্ভে যাদুবিদ্যা এদেশ হইতে একেবারেই অন্তর্হিত হইয়াছিল। এককালে এই বাঙ্গালী যাদুকরগণ কত আশ্চর্য্য ক্রিয়াকৌশল প্রদর্শন করিয়া জনসমাজে অশেষ সম্মান ও প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। তাহা সত্য সত্যই সমগ্র ভারতবাসীর পক্ষে বিশেষ গৌরবের বিষয় ছিল। কিন্তু বিদেশী সভ্যতার সংস্পর্শে ও ইউরোপ আগত অতি আধুনিক মনোভাবে আমরা আমাদের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যকে বিসর্জ্জন দিয়া একেবারে নিঃস্ব হইয়া পড়িয়াছিলাম; আমাদের নিজস্ব এই বিদ্যাটিও ঐ বৈদেশিক আবহাওয়ায় ম্লান ও দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিল কিন্তু বড়ই সুখের বিষয় এতদিন যাহা অশিক্ষিত পথের বেদিয়াদের হাতে ছিল, আজ তাহা ক্রমে ক্রমে শিক্ষিত সমাজেরও হাতে আসিতেছে। এই নব পরিবর্ত্তন অতিশয় শুভদিনের ঘোষণা করিতেছে।

এষা*

শ্রীমুণীন্দ্রপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী

অ-ব্রাহ্মণ হে ব্রাহ্মণ[১], ব্রহ্মবিদ্যা আয়াসেতে আয়ত্ত করিয়া
চিনাইলে জনে জনে নিত্যানন্দ নিত্যসত্যে আপনি চিনিয়া!
হে গুপ্ত সাধক তুমি, "গীতায় ঈশ্বরবাদ[২]" ঘোষণা তোমার,
"অবতার-তত্ত্বে[৩]" সথে অভিনব তত্ত্বকথা করেছ প্রচার!
তব নব "প্রেমধর্ম্ম[৪]" মোহমগ্ন অ-জাগায় নিয়ত জাগায়,
অচেতন, সচেতন সম্বিৎ-সন্ধিনী পেয়ে অজস্র ধারায়!
প্রেমিক "বেদান্তরত্ন,[৫]" পাণ্ডিত্যের অম্বুনিধি, তুমি অতুলন,
মৃত্যু-সিন্ধু পার হ'য়ে অ-মরণে দেখাইলে নাহিক মরণ!
হিমাদ্রির "হিমানীতে[৬]" ক'রেছিলে নিমন্ত্রণ একাধিকবার,
যাই নাই ব'লে সখে, অভিমানে ভ'রেছিল হৃদয় তোমার!
আজ চাই প্রিয়[৭]-সঙ্গ, "দিলখুসা[৮]", "হিমানীতে" কর নিমন্ত্রণ,
দেখিবে, এবার যা'ব, তিনে[৯]এক হইবারে টুটায়ে বন্ধন!
তোমরা আজিকে নাই, আছে অফুরন্ত স্মৃতি, হে লোকবন্দিত,
মরলোক, অমরায়, কীর্ত্তির গাথায় সখে হও হে নন্দিত!

* অন্বেষণ।

১। কায়স্থ হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়কে বালি-উত্তরপাড়ার বহুবিশ্রুত স্বর্গত রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় ব্রাহ্মণ জ্ঞানে শ্রদ্ধা করিতেন।

২-৩-৪। হীরেন্দ্রনাথের সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থত্রয়। ৫। হীরেন্দ্রনাথের উপাধি। ৬। কালিম্পংস্থিত হীরেন্দ্রনাথের বাটী। ৭। স্বর্গত রায় বাহাদুর প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়। ৮। কালিম্পংস্থিত রায় বাহাদুর প্রিয়নাথের বাটী। ৯। হীরেন্দ্রনাথ, প্রিয়নাথ ও লেখক।

স্বপ্নাভিসার

শ্রীশক্তি চট্টোপাধ্যায়

মনে হয় প্রিয়ে দলিত দ্রাক্ষাসম,
ও তনু নিঙাড়ি ভরিবো পেয়ালাখানি।
শয়ন রচিব শুভ্র মেঘের দলে;
ভীরু কাশবন দূরে দেবে হাতছানি॥

উতরোল বায়ু বহিবে মন্দ তালে;
ভোরের তারকা চন্দন-লেখা আঁকিবে তোমার ভালে

শেষ হবে মোর সকল কামনা,
আপনার মনে হব আনমনা,
ছন্দ রচিবো মধুর মন্দ্রে এলায়িত তনু লয়ে;
পদতলে ওই বিপুলা ধরণী শিহরিবে রয়ে রয়ে।

আধখানি মুখ খুলিয়া কহিবে
আধো আঁখি পাতে চাহি;
সিক্ত শিশিরে প্রভাত পদ্ম, প্রেমনীরে অবগাহি।

হাসিবে নূতন শুকতারা সাথে,
নামায়ে বেদনাভার;
চেনা অচেনার বিস্ময় গানে,
শেষ হবে অভিসার।

এক ঘণ্টা মাত্র

শ্রীরাখাল তালুকদার

মাত্র এক ঘণ্টা।

তবু জায়গা ক'রে নিতে হবে। উঃ! বাব্বা, কী ভিড়! মানুষগুলো যেন নাকানি-চোবানি খাচ্চে উত্তরঙ্গ সমুদ্রে।

টিকিট ঘরের সামনে গিয়ে দেখি, সে এক দুঃসাধ্য ব্যাপার। আত্মরক্ষায় একমাত্র ভরসাস্থল আমার স্ত্রী, তাকেই হয়ত শেষ পর্য্যন্ত এগিয়ে দিতে হবে।

যে যাবে তিনঘণ্টা পর বা যার মেলট্রেণে যাবার কোন তাগিদ নেই, সেও এসে ধরনা দিয়েচে টিকিট ঘরের দরজায়। একটি কুলী চিলের মতো ছোঁ মেরে কখন যে মালপত্তর শিরোধার্য্য করে রেখেচে, আমার মনে নেই। বিপদ আমার আগে-পিছে, এগোতেও পারছি না, পেছু নিতেও পারছি না—একেবারে কাহিল অবস্থা।

—তোমরা বলো আমাদের সঙ্গ পথের মাঝে বিপত্তি সৃষ্টি করে, এখন দেখচি তোমরাই সেই বিপত্তি সৃষ্টির মূল কারণ।—নিঃশব্দে স্ত্রীর কটূক্তি যেন শুনলুম। কিন্তু কই! না, তার তো বাক্‌স্ফুরণ হয়নি এর ভিতর একবারও। দিব্যি তিনি ঘাড় ফিরিয়ে পাশেরই লোকটিকে চেয়ে দেখচেন। সহ্য হোল না, চেঁচিয়ে উঠলুম উত্তক্ত মনে, দেখছো কি?

আমাকে পাশে দাঁড় করিয়ে রেখে পর-পুরুষের দিকে নজর রাখা বরদাস্ত করতে পারলুম না। হাতখানা ধরে একটু ঝাঁকানি দিয়ে বললুম উত্তপ্ত কণ্ঠে, কী দেখছো তুমি অতো ক'রে?

সুমিতা হেসে ফেল্‌লে, বললে, চোখ যদি ওর দিকে না রাখি ত রাখবো কি তোমার দিকে? এ দিকে তাকাতে না তাকাতেই ও সট কে পড়বে। ফুরসৎ দেবে না—

—ওঃ, এই!—আশ্বস্ত হলুম যেন লোকটি 'দুশ্চরিত্রবান্' ব'লে। তা বেশ, থাকো তুমি এখানে দাঁড়িয়ে। আমি টিকিট ক'রে আনছি—ব'লে টিকিট ঘরেব দরজার দিকে পা বাড়ালুম।

মিনিট পনেরো মেহনত ক'রে টিকিট করা হয়ে গেল। মেল ট্রেণ; কুলীটা ব্যস্ত হয়ে পড়েচে। মাল নামিয়ে রেখে সে উধাও হোল কিছুক্ষণের জন্য।

যাত্রীদল কিলবিল করছে, সূচীভেদ করবার উপায় নেই। ভাগ্যের জোর এবং পুণ্যের বল—সর্ব্বোপরি স্ত্রীর ব্যবহারিক বুদ্ধির বলে জায়গা পাওয়া যাবে, নিশ্চিন্ত বিশ্বাসে মাথা গলালুম গেট দিয়ে টিকিট দেখিয়ে।

কুলীটা ছুটে এসে পড়লো এবং মাল দুটো টেনে-হেঁচ্‌ড়ে মাথায় তুলে ছুটে চল্‌লো মধ্যম শ্রেণীর খোঁজে। তার পেছনে ছুটছি অনেক আশা ক'রে আমরা দুটি সজীব প্রাণী। গাড়ি ছাড়বার পাঁচ মিনিট বাকি। সময় যাচ্ছে চ'লে, কোনো মতেই কোনো কামরাতেই ওঠা যাচ্ছে না। গাড়ির দরজায় প্রচণ্ড বাধা সৃষ্টি করছে উৎক্ষিপ্ত যাত্রী দল। পাঁচ মিনিটের দেড় মিনিট বাকি। একটা দরজা একটু খোলা পেয়ে কুলীটা উঠে পড়লো এবং তার সঙ্গে সঙ্গে আমার স্ত্রীও দ্বারবর্ত্তিনী হলেন কামরার।

কুলীটা আমার দিকে এগিয়ে এল, বল্‌লে, বকশিস্ বাবু—

—অ্যাঁ।—বিরক্তি বোধ করলুম! কুলীটার হাতে দুটো আনি দিয়ে ছুটে গেলুম এবং ছুটে গিয়ে সেই কামরারই অন্য পা-দানিতে ভর করলুম!

গাড়ি ছাড়ে-ছাড়ে। হাঁস-ফাঁস করছে ছাড়া পাবার জন্য। একটা লোক একটু অনুকম্পাভরে দরজাটা ঈষৎ উন্মোচন করে আমাকে ঢুকিয়ে নিলেন।

আমি ধন্যবাদ জানালুম এবং জানাতেই বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি সন্দিগ্ধ হয়ে জিগ্‌গেস করলেন, মশাই, এ ইণ্টার কেলাশ, টিকিট করেচেন তো?

নিরুক্তিসূচক ঘাড় নাড়লুম। বয়সে নবীন ব'লে বলতে স্পর্দ্ধা হোল না।

শুনতে পেলুম আমার কাছ ছাড়া হয়ে গিয়ে আমার স্ত্রী তাঁর সহযাত্রিণীকে বলছেন, সঙ্গে কে আছেন?—না, কেউ-ই না। এই আর কতোদূর। এক ঘণ্টার পথ—রাণাঘাটেই নামবো—

—রাণাঘাটে কে আছেন আপনার?

—রাণাঘাটে থাকি না, যাচ্ছি কেষ্টনগরে, দিনে দিনে পৌঁছে যেতে পারবো কি না। আমাব নিজেরও একলা বেশ চলা-ফেরার অভ্যেস আছে।

—স্বামী কোথায় থাকেন?

—কলকাতায়।

—কী করেন? চাকুরী নিশ্চয়ই।

—হ্যাঁ, তবে তার মায়া কাটাতে পারবেন না হাজার বোমা পড়লেও। আমাকে মায়া কাটাতে হয়েচে বলে তাই ছুট্ দিয়েচি—

—সত্যি, আমারও ওই ঝঞ্ঝাট। সংসারটি গোছগাছ ক'রে দু' বছর সেখানে টিঁকতে না টিঁকতেই বোমা। এতো বাপু কস্মিন্ কালেও শুনিনি। পড়লে বাঁচি—নইলে রেহাই নেই। কর্ত্তা তাই আমাকে দেশের বাড়িতে রাখতে যাচ্ছেন। ওই তো উনি ব'সে কাগজ পড়ছেন—ওই উনি—

সুমিতাব দৃষ্টি যেন বিভ্রান্ত হয়ে আমার দিকেই সম্প্রসারিত হোল। আমি হেঁট মুখে মুখটি লুকিয়ে ফেললুম এবং অলক্ষ্যে বেশ এক চোট হেসে নিলুম। সুমিতা ভেবেচে কী, ফষ্টিনষ্টির শেষ ধাক্কা কি-না আমার ওপর!

গাড়ি ছুটেছে উর্দ্ধশ্বাসে—কিছুক্ষণ বাদে ব্যারাকপুর এসে থেমে পড়লো। আমি জানালা গলিয়ে মুখ বের ক'রে দিলুম।

দরজার সামনে লোক জমতেই বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি জানাচ্ছিলেন কঠিন স্বরে, এখানে না—দেড়া ভাড়া। পরের গাড়িতে যাও—

এবং আমার দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন, অমন করে বাইরে মুখ বাড়াবেন না। দিন্ না জান্‌লার কবাট তুলে। কতক্ষণ আর দাঁড়িয়ে থাকবেন। বসুন না এখানেই—ব'লে তিনি বেঞ্চির ওপর থেকে পা নামিয়ে একটু সরে বসলেন।

—আপনার নিবাস? তিনি শুধালেন আমাকে।

—এই পরের ষ্টেশনেই নামবো। অপ্রত্যাশিত উত্তর দানে তিনি আবার শুধালেন, নাম?

নামটি জিগ্‌গেস করাতেই ভয়ানক চটে গেলুম। শুনেও শুনলুম না। বাক্‌নিস্পত্তি আমার দ্বারা সম্ভব নয়, এটা যেন সুপ্রত্যক্ষ হয়ে পড়লো আমার হাব-ভাবে।

হঠাৎ মাথায় বোমাঘাত হোল। এই যে মশাই টিকিট দেখান। বৃদ্ধের মুখে সকৌতুক হাসি সুপরিস্ফুট। স্পষ্ট দেখতে পেলুম, আমি স্তূপীভূত হয়ে স্লিট্‌ ট্রেঞ্চে প'ড়ে রয়েচি এবং আমাকে উদ্ধার তিনিই করলেন, যিনি রেল কোম্পানীর পঞ্চম বাহিনীর খাস দপ্তর জাঁকিয়ে বসেছিলেন আমাকেই শুধু নাস্তানাবুদ করবার মতলবে, এমনি আরও কতো কী কারণে!

আমি টিকিট দেখিয়ে দিলুম একজোড়া। এক ঘণ্টা মাত্র, রাস্তা তবু ফুরোতে চায় না। সুমিতা এবং আমার মধ্যে স্পষ্ট হয়েচে অনতিক্রম্য যোজন ব্যবধান। দূরত্বের বাঁধন আল্‌গা হয়ে গেল এক নিমেষের ধাক্কায়; সুমিতা কৌতুকোজ্জ্বল হাসি নিয়ে আমার মুখের দিকে তাকালো। আমি ভাবলুম, এ' রাস্তা শেষ হ'লে হাঁপ ছেড়ে দিয়ে বাঁচবো। কাঁহাতক আর কতক্ষণ—

গাড়ির একটানা উদ্দাম গতিবেগ। স'রে পড়ছে তড়িৎ-গতিতে মাটি-বন-পথ-নদী-নালা আবর্ত্তিত আকারে। একঘণ্টা মাত্র, তবু কেন গাড়িখানা থম্‌কে দাঁড়িয়ে রয়েচে, আর স'রে পড়ছে উদ্দাম উতরোল পৃথিবী।

মনে মনে আশঙ্কিত হয়ে পড়লুম আবার বোমার ভয়ে।—পড়তে তো পারে!

পরিবর্ত্তন

শ্রীসর্ব্বরঞ্জন বরাট বি-এ

সাঙ্গ হ'ল মধুর লীলা কৃষ্ণ চূড়ার মৃদুল দোল,
পলাশ গেছে বিলাস ল'য়ে আর পাপিয়ার মিষ্ট বোল।
ভোগের পরে ত্যাগের খেলা, নিদাঘ-তাপস ক'রছে যাগ,
ঈশান চোখে আগুন জ্বলে শীর্ণ দেহে ঝরছে রাগ!
পবন মুখে ফুটছে সুখে তপন দেবের অট্টহাসি,
নৃত্য করে নটের গুরু ছড়িয়ে মরণ অনলরাশি!
শুকায় ধরা, কাঁপায় বাপী, উড়ছে মরুর তপ্ত বালি,
জ্বালিয়ে চিতা শ্মশান ভূমে ক'রছে সাধন অংশুমালী।
হায় গো মরি, কাঁদছে পাখী, চোখ গেল তার কিসের তরে,
অশ্রু ঝরে কাদের লাগি', বক্ষ-বেদন করুণ স্বরে;
বাত্যা আজি বিশ্বজয়ে প্রলয় বিষাণ হান্‌ছে বেগে,
রথ চ'লেছে, কেতন উড়ে জর্দা বরণ ধূলির মেঘে।
দরদ-জাগা কিসের ব্যথা দীন উদাসীর আকুল গানে,
ঘুম-পাড়ানী মন্ত্র রচে একটানা সেই ঘুঘুর তানে!
জীর্ণ পাঁজর দীর্ণ করি' কোন্ দধীচির অস্থি যায়,
জীব-চাতকে জানায় নতি ঋষ্যশৃঙ্গ মুনির পায়!
শিউরে উঠে ফুল-কিশোরী গুঞ্জনে মন যায় না ভুলি,
আতপ-তাপে দহন ভয়ে গুণ্ঠন তার দেয় না খুলি'।
আমের ডালে হঠাৎ শুনি পিক্ বিরহীর করুণ গীতি,
কোন্ অভাগী আনছে ডেকে মৌ-যামিনীর মধুর স্মৃতি!

মশা-মাছির ঐক্যতানে কর্ণ বধির হয় বা বুঝি,
ঘর্ম্ম মাখি' এলায় দেহ কর্ম্ম অলস চক্ষু বুঁজি';
অধ্যাপকের বিপুল কায়া প্রজ্ঞাভরে দিচ্ছে দোল,
সরল কথা জটিল হ'য়ে মাথার ভিতর আন্‌ছে গোল!
ছাত্র আজি নীরব কবি জাগ্‌ছে হিয়ায় নিখিল রূপ,
উঠ্‌ছে ভেসে বইএর মাঝে তিলোত্তমার কপোল-কূপ।
নাইক ক্রেতা দোকানী তাই আশার নেশায় প'ড়ছে ঢুলে,
আলাদীনের প্রদীপ পেলে দোকানটি তার দেয় সে তুলে।
চপল শিশু শান্ত আজি সুপ্তি মায়ায় তৃপ্তি মাগে,
স্বপন মাঝে অরুণ মুখে মায়ের হাসির ছোঁয়াচ লাগে;
'বাঘা' কুকুর হাঁপায় শুধু, মাংসে তাহার নাইক রুচি,—
তৃষ্ণা নাশে লালার জলে নাই ভেদাভেদ ময়লা-শুচি।
বড় সাহেব শাসন হারা, কাজের পাহাড় গড়্‌ছে আজ,
প্রিয়ার' নামে প্রেমের লিপি লিখ্‌ছে বুড়োর নাইক লাজ!
গোলাপ গালে স্ফোটক রাজে কোন্ রূপসীর গরব নাশে,
এলিয়ে পড়ে শিথিল নীবি, মীনকেতু তায় মুচ্‌কি হাসে!
ছায়ায় ঘেরা কাদার জলে শুষ্ক পাতার নৌকা বয়,
করুণ চোখে হংস হেরে হংসী তাহার সুস্থ নয়।
মৌচাক সে আজকে বুঝি ময়রা ভায়ার কুটীরখানি,
রস-সায়রে গাহন করি' মৌমাছিগণ ধন্য মানি।

স্ফটিক রচা সৌধ মাঝে বস্‌রা গোলাপ দাও গো ভ'রে,
শতেক ধারে আতর আনি উৎস গুলাব পড়ুক ঝ'রে;
সিক্ত কর শয়ন বেদী ওড়না উড়াও আনার-কলি,
বাদ্‌শাজাদী আকুল আজি পেলব প্রসূন প'ড়ছে ঢলি'।
উর্ব্বশী সে নামুক এসে বাসব লোকের কুঞ্জ ত্যজি',
সুরের ঝোরা ঝরুক হেথা, ছন্দ তুলুক নূপুর রাজি।
খরমুজ সে রস-পিয়ালা কোন্ ইরাণীর অধর লাল,
শীতল যেন বক্ষ'পরে বেল-চামেলীর মোহন জাল!
সন্ধ্যা আসে মৌন পায়ে জ্যোৎস্না ধারায় রজত গলে,
পল্লীপথে কৃষকবালা কক্ষে কাঁকন দুলিয়ে চলে।
পাল তুলে দে চলুক তরী নৈশ আকাশ মুখর করি',
মুরজ-বীণা উঠুক বাজি, শ্রান্তি ঘুচুক কর্ম্মে বরি';
হাস্নুহেনা উঠ্‌ছে ফুটে আন্‌ছে পুলক কুসুম শরে,
পথিক বধূ অধির হ'ল দয়িত পরশ পাবার তরে।
মেঘ জমেছে থাম্‌রে মাঝি, মাঝ দরিয়ায় যাস্‌নে আর,
জলের সাথে ঝড়ের খেলা দেখুক ভবের কর্ণধার!
গ্রীষ্ম নহে শুধুই ঋতু রুদ্রাণীরূপ লক্ষ্মী মানি,
অগ্রদূতী বর্ষাবেশী কল্যাণী মার আশীষ্-বাণী!

ত্রিবেণীর কথা

শ্রীধ্রুবচন্দ্র মল্লিক

স্বল্পাধিক এক বর্গ মাইলের উপর ত্রিবেণীর অবস্থিতি। এই স্থানটুকু বাঁশবেড়িয়া স্বায়ত্বশাসনাধীন ও হুগলী জেলার অন্তর্গত। ইহার সীমানা প্রান্তে ছোট ছোট গ্রামের সারি। প্রাকৃতিক মনোরম শোভায় তাহারা

সরস্বতী সেতু

ঢাকা। স্থানে স্থানে ত্রিবেণীর সহিত গ্রাম্য সমতার রূপ সমাবিষ্ট। সেজন্য ডাক অফিসের সীমানা, ছোট ছোট গ্রামগুলিকে আপন এলাকার বাহিরে রাখিতে পারে নাই। ভালবাসিয়া যেন আপন করিয়া লইয়াছে। ইহাতে স্বায়ত্বশাসনাধীন ত্রিবেণী ও ডাক অফিসের পরিধি অন্তর্ভুক্ত ত্রিবেণীর কালি, প্রতিকূলতার সমদর্শী। ডাক অফিসের এলাকাতেই ত্রিবেণীর কালি, তাহাতে আর সন্দেহ থাকে না। এই স্থানটুকু ন্যূনাধিক আড়াই বর্গ মাইলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। বহু যুগদর্শী এই স্থান, ঘটনাপ্রসূত আবর্ত্তনে, কতদিনের অতীত স্মৃতি লইয়া আজ বাঙ্গালার বুকে মূর্ত্ত। সে সকল পুরাতন কথা, কিসের অনুপ্রেরণায় মানবের মনে বেতারের মত বাজিয়া উঠে। তাহাতে অসংখ্য নরনারী পুণ্য সঞ্চয়ের অভিলাষে স্নানার্থে ত্রিবেণী সঙ্গমে আগমন করে। অনুরূপ আগমন ত্রিবেণীর প্রসিদ্ধি

স্নানঘাটের দৃশ্য — ফটো : সন্তোষকুমার মোদক

পথে প্রস্ফূর্ত্তি আনিতে পারে নাই। আড়ম্বরহীন সত্য ছবির মত যেন অতীতের স্মৃতি লইয়া দাঁড়াইয়া আছে।

গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতী—ত্রিনদীর পুণ্য সঙ্গম স্থলের পশ্চিম উপকূলস্থ স্থানটার নাম ত্রিবেণী। এলাহাবাদে (প্রয়াগে) এই ত্রিনদীর মিলন, আর এইস্থলে তাহাদের পরস্পর ব্যবধান। যেন কত ভালবাসার পর কলহের সৃষ্টি। ত্রি-ভগিনী যেন ক্রোধ সম্বরে তিনদিকে চলিয়া গিয়াছে। সঙ্গম স্থল হইতে ভাগীরথী পশ্চিমে ছুটিয়াছে, সরস্বতী পশ্চিমে, আর যমুনা কাঁচড়াপাড়া খালাভিমুখে কিসের সন্ধানে বিলুপ্ত হইয়াছে। প্রয়াগে সরস্বতীর বিলীনতা ও হুগলী জেলার অন্তর্গত ত্রিবেণী সঙ্গমে

ত্রিবেণীর বাঁধান দুইটি ঘাট

যমুনার তিরোধান—কেমন যেন সমতার প্রতিরূপ। পূর্ব্বের সাকার রূপ যেন নিরাকারের ছবি আঁকিয়াছে।

ঐতিহাসিক সম্বন্ধ বিশিষ্টতায় ত্রিবেণীর প্রসিদ্ধি আছে। পাঠান শাসনের প্রারম্ভে এই স্থলের সমৃদ্ধিশালীনতার গুরুত্ব, ঐতিহাসিক তথ্যে সীমাবদ্ধ। পাঠান শাসনের সময় এই স্থান দুই একটী বিভিন্ন নামে অভিহিত হয়। সে নামের বৈশিষ্ট্য ত্রিপানি, সাকপুর ও ফিরুজাবাদ। ফিরুজাবাদ নামটী রাজা ফিরুজ তগলকেরই নামান্তর মাত্র। কিন্তু মহম্মদ তগলকের অত্যাচারের পর বাঙ্গালার পুনর্লব্ধ স্বাধীনতায় ফিরুজের লোলুপ দৃষ্টি রেখাপাত করিতে পারে নাই। সে কারণে ত্রিবেণীর ফিরুজাবাদ নামকরণ সন্দেহের রূপান্তর। তগলক-বংশীয় শাসনের মধ্যভাগে অর্থাৎ ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যবর্ত্তী সময়ের কিছু পূর্ব্বে, ত্রিবেণীর মুসলমান শাসনকেন্দ্র হইতে সপ্তগ্রামের বুকে তাহার সকল সমৃদ্ধিটুকু লইয়া যায়। ইহার দুই শত বৎসর পরে রাজা মুকুন্দদেবের আগমনে ত্রিবেণীতে ন্যূনাধিক সমৃদ্ধি রূপিত হয়। এই হিন্দু রাজার স্মৃতি আজও ত্রিবেণীর বুকে উদ্ভাসিত। স্থানীয় বড় ঘাটটায়

গরিমালোক রাজা মুকুন্দদেবেরই কীর্ত্তি সোপান। সেটুকু যেন অনির্ব্বাণ প্রদীপের মত জ্বলিতেছে।—চারিশত বৎসরের পুরাতন ঘাট। স্থানে

শ্মশান ঘাট

স্থানে ফাটাল ও গর্ত্তের রূপ সেওলার সবুজ রঙে রঙিয়া উঠিয়াছে। এমন প্রকৃতি প্রসূত দৃশ্যের উপর প্রভাতের রক্তিমালোকে ও জ্যোৎস্না স্নাত রজনীতে রূপের সুধা নামিয়া আসে। পুরাতন ঘাটের বিগত সৌন্দর্য্য, উপলব্ধিতে রেখাপাত করে। স্থপতি কারুশিল্পের সুগঠন অতীতের গৌরবে কি যেন কহিতে থাকে। এমন পরিস্থিতির আবর্ত্তনে ভান্তাড়া-নিবাসী শ্রীযুক্ত চকুরাম সিংহের নাম স্মরণীয়। তিনি ঘাটটার সংস্কার করিয়া ইহার ভবিষ্যৎ ন্যূনাধিক প্রদীপ্ত করিয়া গিয়াছেন। ইহা ছাড়া, ত্রিবেণী হইতে মহানদ পর্য্যন্ত সে উচ্চ বাঁধ বরাবর চলিয়া গিয়াছে, তাহা রাজা মুকুন্দদেবের কীর্ত্তি গরিমা। বাঙ্গালার সুলতান সুলেমান কাররানীর রাজত্বকালে ইহার পুনরুদ্ধার হয়। ত্রিবেণী ও বাঁশবেড়িয়ার (বংশবাটীর) জাহ্নবীতীরস্থ উচ্চতা, মানুষের আপন সুবিধা সুসম্পন্নের পরিচয় দেয়।

ইতিহাসের কাহিনীতে ত্রিবেণী একটা স্বাস্থ্য নিবাসের স্থান। বর্ত্তমানে সে কাহিনীর নিদর্শন মেলে না। সবই যেন প্রতিকূলতার প্রতিমূর্ত্তি। ষোড়শ শতাব্দীতে শ্রীচৈতন্যের কৃষ্ণপ্রেম কথা প্রচার—নবদ্বীপে নৈয়ায়িক রঘুনাথ শিরোমণির ন্যায়শাস্ত্র আলোচনা, কৃত্তিবাস ও কাশীরাম দাস কর্ত্তৃক বাঙ্গালা ভাষায় মহাকাব্য রামায়ণ ও মহাভারত অনুবাদ—অনুরূপ আবর্ত্তনপ্রসূত সময়ের পূর্ব্ব হইতে ত্রিবেণী একটি অতীতের শিক্ষা-লাভের কেন্দ্রস্থল ছিল। পূর্ব্বে ত্রিবেণীতে অনেকগুলি টোল ছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভেও সে টোলগুলি সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয় নাই। সে টোলগুলির ভগ্নাবশেষ আজও বৈকুণ্ঠপুর ও ভট্টাচার্য্য পাড়ার মধ্যবর্ত্তী স্থানের জঙ্গলে দেখা যায়। ইহারই সন্নিকটে সুপণ্ডিত জগন্নাথ তর্ক-পঞ্চাননের বাড়ী। তর্কপঞ্চাননের অক্ষয় স্মৃতি ত্রিবেণীর ভূষণ। তিনি এই স্থলে জন্মগ্রহণ করিয়া এক শত তের বৎসর কাল জীবিত ছিলেন। ইংরাজি ও ফরাসী ভাষায় সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ তর্কপঞ্চানন মহাশয় মাত্র একবার শ্রবণের পর ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্স নিবাসী দুই ব্যক্তির মধ্যে বাগ্‌বিতণ্ডার পুনরাবৃত্তি করিয়াছিলেন। "বিবাদভঙ্গার্ণবসেতু" ও "হিন্দু ব্যবস্থা" গ্রন্থ তাঁহার প্রণয়ন। ইহা ছাড়া তাঁহার লিখিত কতিপয় পুঁথী বংশধরদিগের নিকট রক্ষিত আছে, এমন কথা শুনিতে পাওয়া যায়।

রাজা মুকুন্দদেবের ঘাট ব্যতীত আর একটা চাঁদনী সংযুক্ত ঘাট আছে। ইহা হরিনারায়ণ মজুমদার নামক স্থানীয় এক ব্যক্তির অর্থে নির্ম্মিত। এই ঘাটটাও পুরাতন। হরিনারায়ণ মজুমদার মহাশয়ের বংশধর শ্রীজিতেন্দ্রভূষণ মজুমদার মহাশয় এই ঘাটটার পার্শ্বে আবাসগৃহ নির্ম্মাণ করিয়া সম্প্রতি বাস করিতেছেন। সময়ে সময়ে তিনি ঘাটটার ক্ষুদ্র সংস্কার করাইয়াছেন।

ত্রিবেণীতে হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়েরই আবাসস্থল। এখানে কপিলাশ্রম, মাতৃ-আশ্রম, যোগাচার্য্য আশ্রম, কালীবাড়ী, জফর গাজীর মন্দির ও সাধন কুঞ্জ—এই আশ্রমগুলির সেবা নিয়মিত পরিচালিত হয়। কপিলাশ্রমের নিয়ম পদ্ধতি স্বতন্ত্র। কপিল মুনির নিয়ম তন্ত্রের পন্থানুগামী ভক্তগণ আশ্রমটির কপিলাশ্রম নাম দিয়াছেন। এই আশ্রমটি প্রায় ষাট বৎসর পূর্ব্বে স্থাপিত হইয়াছে। হরিহরানন্দ তারণ্য মহাশয় ইহার স্থাপয়িতা। দুই একজন আশ্রমবাসী বৎসরের সকল সময়ে এই আশ্রমে বাস করেন। বাৎসরিক উৎসবের সময় অন্যান্য ভক্তগণের ও আশ্রমবাসীদের সমাবেশ হয়। আশ্রমটির প্রবেশ দ্বারের সম্মুখে একটি সূর্য্যঘড়ি আছে। তাহার নিকটেই কয়েকটি বিষ্ণুমূর্ত্তি সযত্নে রক্ষিত। এই মূর্ত্তিগুলি সরস্বতীর সেতু নির্ম্মাণের সময় ভূগর্ভ হইতে পাওয়া যায়। ইহারা অতি প্রাচীন।

সরস্বতী নদীর অনতিদূরে গাজীর মন্দির। মন্দিরের ভিতর দুইটি প্রাঙ্গণ। প্রাঙ্গণ দুইটার দ্বিতীয়টীতে—গাজী জাফর খাঁ, তাঁহার দুই পুত্র—আইন ও জাইন এবং জাফরের তৃতীয় পুত্র বারখান খাঁয়ের পত্নীর সমাধি—প্রথমটীতে বারখান এবং তাঁহার দুই পুত্র রহিম ও করিমের কবর। প্রথম প্রাঙ্গণটী আগ্নেয় প্রস্তরে সুনির্ম্মিত আর দ্বিতীয়টী বালুকা প্রস্তরের শীলাখণ্ডে গাঁথা। আগ্নেয় প্রস্তর খণ্ডগুলি উৎকীর্ণ হিন্দু বিগ্রহ ও চারু-শিল্পকলায় বিভূষিত। প্রস্তর স্তরের উপর খিলানগুলির বিশিষ্টতা হিন্দু স্থাপত্যের সুনিপুণ কর্ম্মদক্ষতার পরিচয় দেয়। আস্তানার পশ্চিমে আর একটী প্রাচীন ভগ্ন মসজিদ অতীতের স্মৃতি লইয়া দাঁড়াইয়া আছে। এই মসজিদটীও কোন মন্দির হইতে আনীত উপকরণে নির্ম্মিত বলিয়া মনে হয়। এমন বড় মসজিদের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত সমস্তই খিলানের উপর সংরক্ষিত। ছাদের স্থাপত্যে কোন অবলম্বন নাই। কতদিন চলিয়া গিয়াছে, কিন্তু এখনও শক্ত গাঁথুনি যেন পাথরের মত শক্ত হইয়া আছে। কয়েকটী গম্বুজ ও কতিপয় প্রস্তর স্তম্ভ ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে, কিন্তু গম্বুজগুলির একটী অপরটীর অবলম্বনে সুরক্ষিত হইলেও একটীর ক্ষতিতে অপরটীর সামান্য ক্ষতি করিতেও সমর্থ হয় নাই। ভগ্ন অবস্থাতেও ইহা যেন নির্ভয়ে দাঁড়াইয়া আছে। মসজিদের পশ্চিমদিকস্থ দেওয়ালে ছয়টী উৎকীর্ণ শীলাখণ্ড সংস্থাপিত। আস্তানার দ্বিতীয় প্রাঙ্গণেও দুইটী উৎকীর্ণ প্রস্তর খণ্ড রক্ষিত। ইহাদের উৎকীর্ণ হরফগুলির অধিকাংশ "তুঘ্রা" ভাষার পরিচয় দেয়। মসজিদের অভ্যন্তরস্থ উৎকীর্ণ হরফে নাকি জফর খাঁ নামক এক তুর্কী, এই মসজিদ ১২৯৮ সালে প্রতিষ্ঠা করেন—

সপ্ত মন্দির

অনুরূপ কাহিনী লিখিত আছে। প্রতিষ্ঠানের মাতোয়ালিদিগের নিকট সংরক্ষিত বংশ সূচীতে—জফর খাঁ সাহেব মুর্শিদাবাদ জেলার মান্নাগাঁও

গ্রাম হইতে আসিয়া এই মসজিদ প্রতিষ্ঠা করেন—এইরূপ লিপিবদ্ধ আছে শুনিতে পাওয়া যায়। ইহাও প্রবাদের কথা, যে জাফর খাঁ রাজা ভূদেবের সহিত যুদ্ধে নিহত হন।

দরাফ খাঁ নামক এক ধনী মুসলমান এই স্থানে সিদ্ধিলাভ করেন। সেজন্য এই স্থানটীর নাম "দরফাগাজী"। তাঁহার সিদ্ধিলাভের জনশ্রুতি বিস্ময়কর। গঙ্গার যে স্তবটা—"দরাফ খাঁ কৃতম্" বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে, সেটুকু সঠিক তাঁহারই রচিত কি না তাহা সন্দেহের অনুকূলবর্ত্তী। কারণ এমন কথাও শোনা যায়, যে গঙ্গার প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি ও বিশ্বাস দেখিয়া কোন বিমুগ্ধ সাধু দরাফ খাঁকে একটী স্তব লিখিয়া দিয়া অন্তর্হিত হন।

পূর্ব্বে বলিয়াছি যে আস্তানার ছাদ নাই। ইহার কারণ এইরূপ নির্দ্দেশিত হয় যে বিশ্বকর্ম্মা, এই সৌধ নির্ম্মাণের সময় প্রভাতের আগমন হইলে অন্তর্হিত হন। অন্ধকারে কুড়ুলের উপর পাথর বসাইয়া ছিলেন। সুতরাং সেই কুড়ুল সৌধে গ্রথিত হইয়া তাহার নিদর্শন দিতেছে। ইতিহাসের কথানুসারে এই কুড়ুল গাজী জফর খাঁর যুদ্ধাস্ত্র ছিল বলিয়া জানা যায়। কুড়ুলের কথা সম্বন্ধে উপরোক্ত কথার কোনটী সত্য, তাহা বলা কঠিন। কারণ যে কুড়ুল দুইটী, কুড়ুল বলিয়া অভিহিত হয়, সে দুটী প্রকৃত কুড়ুল কিনা তাহা সন্দেহজনক। লর্ড কার্জ্জনের পুরাতন স্মৃতি ও সৌধ সংরক্ষণ নিয়মানুযায়ী এই প্রতিষ্ঠান সরকারের তত্ত্বাবধানে সংরক্ষিত।

ত্রিবেণীর পশ্চিম সীমান্তে, মগরাগামী রাস্তাটির ধারে ডাকাতের কালী-মন্দির অবস্থিত। মন্দিরের ভিতরে একটি দীর্ঘকায়া কালীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত। ইহা ডাকাতদিগের স্মৃতি লইয়া চির নবীন। পূর্ব্বে ঘন জঙ্গলে প্রচ্ছন্ন মন্দিরটি রাস্তা হইতে দেখা যাইত না। কিন্তু এখন রাস্তা দিয়া অগ্রসর হইলেই ইহা চোখে পড়ে। সে সময় এই পথগামী যাত্রীগণের কত প্রাণ যে ডাকাতদিগের হস্তে বিনষ্ট হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই।

জাহ্নবীতীরস্থ ঘাটের পশ্চিমে প্রায় শতাধিক হস্তের মধ্যেই বেণী-

জাফর গাজীর মসজিদ

মাধবের মন্দির। সাতটি মন্দির পাশাপাশি তিন সারি দিয়া দাঁড়াইয়া আছে। ইহাদের মধ্যে মধ্যস্থ মন্দিরটি সর্ব্বাপেক্ষা বড়। ইহার ভিত্তি দ্বাদশ বর্গফুটের উপর এবং চূড়াটি ন্যূনাধিক তিরিশ ফিট উঁচু। কোন্ ধনী ব্যক্তি কবে এবং কোন্ সময়ে প্রত্যেক মন্দিরের অভ্যন্তরে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, সে ইতিহাসের সুস্পষ্ট কিনারা

বেণীমাধবের মন্দির ফটো : সন্তোষকুমার মোদক

পাওয়া যায় না। শ্রীযুক্ত শিবপদ বন্দ্যোপাধ্যায় বেণীমাধবের বর্ত্তমান সেবাইত।

বি-পি-আর, ত্রিবেণী ষ্টেশনের অতি নিকটে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের মঠ। এখানে প্রতি বৎসর ফাল্গুন মাসে পরমহংসদেবের জন্মোৎসব ও দরিদ্রনারায়ণ সেবা অনুষ্ঠিত হয়।

বাসুদেবপুরে জঙ্গলের মধ্যে চিত্তেশ্বরীর অধিষ্ঠিত মূর্ত্তি অতি প্রাচীন। এই চিত্তেশ্বরী দেবী সেওড়াফুলির রাজাদের স্থাপনা। তাঁহাদের ব্যবস্থানুক্রমে দেবোত্তর সম্পত্তি হইতে দেবীর সেবাকার্য্য হইয়া থাকে। কিন্তু এমন সুব্যবস্থা থাকিতেও বাতায়ন ও দুয়ারবিহীন দেবীর আবাসস্থল ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে।

ভুলিতে পারে নাই। কথিত আছে, কাপড় কাচিবার সময় নেতো ধোপানীকে তাহার শিশু সন্তান কাঁদিয়া বিরক্ত করিলে পুত্রের গালে সজোরে এক চড় মারে ও পুত্রটি মড়ার মত নিস্পন্দ হইয়া পড়িয়া থাকে। বাড়ী যাইবার সময় নেতো পুত্রকে পুনর্জ্জীবিত করিয়া সঙ্গে লইয়া যায়। বেহুলা সতী চম্পাই নগর হইতে মৃতপতিসহ কলার ভেলায় ভাসিতে ভাসিতে এই ত্রিবেণীতে আসেন ও নেতো ধোপানীর আশ্রয় লন। এই সম্বন্ধে সুস্পষ্ট কোন প্রমাণ না থাকিলেও স্বর্গীয় দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় রচিত বঙ্গভাষা ও সাহিত্য পুস্তকে সে সম্বন্ধবিশিষ্টতার

জাফর গাজীর পরিবারবর্গের সমাধিস্থল ফটো: সন্তোষকুমার মোদক

শ্মশান ঘাটের উত্তরে রেল কোম্পানীর রেল সীমানার কিছু আগে একখানি পাথর জাহ্নবীর উপকূলে পড়িয়া আছে। এই পাথরখানিতে নেতো নাম্নী এক ধোপানী কাপড় কাচিত। ধোপানীর নামানুসারে পাথরটাকে সকলে নেতো ধোপানীর পাথর বলে। পৌরাণিক ইতিহাস এই পাথরটার উপর ঢাকা। সেজন্য জনসাধারণ ইহার বৈশিষ্ট্য

যোগসূত্র আছে। চাঁদ সওদাগরের নিবাসভূমি ত্রিবেণী হইতে সুদূর প্রান্তরে ছিল না, তাহা সেন মহাশয়ের লিপিবদ্ধ গবেষণা হইতে সুস্পষ্ট হইয়া পড়ে।

অতীত ত্রিবেণীর উন্নত অবস্থা, মধ্যবর্ত্তী সময়ে যে কালের নিম্নস্তরে অবতরণ করিয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই।

লিপি

শ্রীপ্রভাতকিরণ বসু

শতাব্দী এটা চতুর্দ্দশ ত? বিংশ কি ক'রে বলো?
প্রেমে পড়া তুমি ঘুচিয়ে দিয়ে কি লভে পড়িতেই চলো?
কিন্তু তবুও লভ্ লেটারের সম্বোধনেই হার!—
সেই পুরাতন 'রাণী' আর 'রাণু' সেই ত 'আমি তোমার'!
সেই 'প্রিয়তমে' 'প্রিয়ে' ও 'মিষ্টি' 'দুষ্টু' যে ব'লে ফেলো!
'হৃদয়েশ্বরী' 'প্রাণের' 'সোনার' এলো বুঝি ফিরে এলো!

তবুও এমন আঁধার আকাশে শ্রাবণ ধারার মাঝে
মামুলী প্রেমের পত্র পাঠাতে কি জানি কোথায় বাজে!
পূর্ব্ব দুয়ারে জাপানী সৈন্য, পশ্চিমে এক্সিস্,
বাতাসে বাতাসে দূর কল্লোল আসিছে অহর্নিশ,
এমন চরম দুর্দ্দিনে যদি প্রেমছলোছলো চোখে
ডাকি নাম ধ'রে, শতাব্দী পরে কী বলো বলিবে লোকে?

বলিবে—দেখো ত এরা কারা ছিল হৃদয়হীনের দল,
রক্তে লোহিত পথে চলে যবে মানুষমারার কল,
জলে স্থলে ও গগনে যখন রাঙা আগুনের খেলা,
হাজারে হাজারে প্রাণ বলি হয়, মরণোৎসব মেলা
বনে প্রান্তরে সাগরে নগরে মরুভূমি পরে ধীরে
এরা ছায়াতলে বসে আর বলে—প্রিয়তম দেখো ফিরে!

তাই বলি সখি, কাজ নেই আজ প্রেমলিপি রচনায়!
ছিন্ন অংশ শতাব্দী পরে যদি কারো হাতে যায়,
সে লজ্জা পাবে, হয়ত ভাবিবে ত্রিভুবনব্যাপী রণে
দুর্ভাবনার মাঝখানে এ কি, প্রেম ছিল কার মনে?
ভালোবাসা তার ক্ষুন্ন হয়নি, ধ্বংসের মুখে এসে
চিঠি পাঠাবার সময় পেয়েছে সুদূর প্রিয়ার দেশে?

তার চেয়ে এসো বাদলসন্ধ্যা ভাবনায় ভ'রে তুলি।
দেহহীন প্রেম পূর্ণ করিবে প্রিয়হীন গৃহগুলি।
সারাদিন ধ'রে এই যে বৃষ্টি, সজল শ্যামল ছায়া,
মনের গভীরে যা করে সৃষ্টি করুণ কোমল মায়া,
সে ত ক্ষণিকের; অক্ষয় করি তারে আমাদের প্রেমে,
শতাব্দীপরে ধ্বনিতে পথিক পথ পরে যাবে থেমে।

গণদেবতা

(পঞ্চগ্রাম)

শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

একা শিবকালীপুর নয়—ময়ূরাক্ষীর বন্যারোধী বাঁধ ভাঙিয়া প্রবল জলস্রোতে অঞ্চলটা বিপর্য্যস্ত হইয়া গেল। ক্ষেতের চষা মাটি জলস্রোতে খুলিয়া গলিয়া ধুইয়া মুছিয়া চলিয়া গিয়াছে—সমগ্র কৃষিক্ষেত্রের বুকে জাগিয়া উঠিয়াছে কঠিন অনুর্ব্বর এঁটেল মাটি কঙ্কালের মত; স্থানে স্থান জমিয়া গিয়াছে রাশীকৃত বালি। এ অঞ্চলের বীজ ধানের চারাগুলি হাজিয়া পচিয়া গিয়াছে। পল্লীর প্রায় শতকরা পঞ্চাশখানা ঘর ধ্বসিয়া পড়িয়া ধ্বংসস্তূপে পরিণত হইয়াছে। ধানের মরাই ধ্বসিয়া ধান ভাসিয়া গিয়াছে। বলদ গাই কতক ভাসিয়া গিয়াছে—যেগুলি আছে—সেগুলিও খাদ্যাভাবে কঙ্কালসার শীর্ণ। মানুষের আশ্রয় নাই, খাদ্য নাই, বর্ত্তমান অন্ধকার ভাবী কালের ভরসাও গভীর নিরাশার শূন্যলোকের মধ্যে নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে।

শ্রীহরি ঘোষের নূতন দাওয়া উঁচু বৈঠকখানার সিমেণ্ট বাঁধানো খটখটে মেঝের উপর পাতা তক্তাপোষের উপর ধবধবে ফরাস। সেই ফরাসে বসিয়া তাকিয়া হেলান দিয়া ঘোষ গুড়গুড়ি টানিতেছিল। পাশে বসিয়া আছে দাসজী। ওপাশে—দাসজীর ভাইপো বসিয়া জমিদারী সেরেস্তার কাগজের কাজ করিতেছে। পাঁচধারার অর্থাৎ খাজনা বৃদ্ধির মামলার আরজীর ফর্ম্ম পূর্ণ করিতেছে। গ্রামের প্রতিটি লোকের উপর খাজনা বৃদ্ধির মামলা দায়ের করিবার প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করিয়াছে শ্রীহরি। আপোষ বৃদ্ধি টাকায় দুই আনার অধিক হয় না, হইলেও সে বৃদ্ধি আইন অনুসারে অসিদ্ধ হয়। কিন্তু মামলা করিলে টাকায় আটখানা পর্য্যন্ত বৃদ্ধি হইয়া থাকে। এ ক্ষেত্রে অবশ্য টাকাটাই বড় কথা নয়। গ্রামের লোক শুধু গ্রামের লোক কেন—এ অঞ্চলের প্রায় অধিকাংশ গ্রামের লোক আজ সমবেত হইয়া ধর্ম্মঘট করিয়াছে—বৃদ্ধি তাহারা দিবে না। শ্রীহরির সকল আয়োজন ওই ধর্ম্মঘটের বিরুদ্ধে। ওই ঘটটিকে সে ভাঙিয়া দিবে।

দাস হাসিয়া বলিল—ভাঙতে তোমাকে হবে না ঘোষ, ও ঘট ভগবান ভেঙেছেন; বানের জলে ঘটে লোনা ধরেছে, এইবার ফেঁসে যাবে।

শ্রীহরি হাসিল। পরিতৃপ্তির হাসি। সে কথা সে জানে। তাহার বাঁধানো উঁচু বাড়ীতে বন্যার জলে ক্ষতি করিতে পারে নাই। ধানের মরাইগুলি অক্ষত পরিপূর্ণ অবস্থায় তাহার আঙনা আলো করিয়া রহিয়াছে। সে কল্পনা করিল—পাঁচখানা, সাতখানা গ্রামের লোক তাহার খামারের ওই ফটকের সম্মুখে ভিক্ষুকের মত করযোড়ে দাঁড়াইয়া আছে। ধান চাই। তাহাদের স্ত্রী, পুত্র, পরিবারবর্গ অনাহারে রহিয়াছে, আষাঢ় মাসের দিন চলিয়া যাইতেছে—মাঠে একটি বীজ ধানের চারা নাই। তাহাদের ধান চাই।

শ্রীহরি নিষ্ঠুর হইবে না। সে তাহাদের ধান দিবে। সমস্ত মরাই ভাঙিয়া ধান দিবে। কল্পনা-নেত্রে সে দেখিল—লোকে অবনত মুখে ধান ঋণের খতে সই করিয়া দিল, টাকায় দুই আনা বৃদ্ধি দিয়া খাজনা বৃদ্ধি কবুলতিতে সই করিয়া দিল। আর মুক্তকণ্ঠে তাহার জয়ধ্বনি করিয়া—ঘোষণা করিয়া তাহারা আরও একখানি অদৃশ্য খত লিখিয়া দিল—তাহার নিকট আনুগত্যের খত।

দেবু ঘোষ, জগন ডাক্তার, সর্ব্বশেষে অবনত মস্তকে তাহার কাছে আসিবে। শ্রীহরির মুখের মৃদুহাস্য এবার বিস্ফারিত হইয়া উঠিল।

দাস মৃদু হাসিয়া বলিল—কি রকম, আপন মনেই যে হাসছ ঘোষ?

শ্রীহরি খানিকটা লজ্জিত হইল। মুহূর্ত্ত চিন্তা করিয়া সে বলিল—কাল গাঁয়ে শনি-সত্যনারাণ পূজোর ধুম দেখেছিলেন? সেই ভেবে হাসছি।

দাস শ্রীহরির কথার কিছু বুঝিল না, কিন্তু তবুও হাসিয়া বলিল—হ্যাঁ। আজকাল শনিসত্যনারাণের ধুম খুব হয়েছে বটে।

—কিন্তু কেন করে বলুন দেখি? কত বড় ভুল আপনিই বুঝে দেখুন তো?

—ভুল? দাস আশ্চর্য্য হইয়া গেল।

—ভুল নয়? শ্রীবৎস রাজার উপাখ্যানটা ভেবে দেখুন। শনি ঠাকুর আর লক্ষ্মী ঠাকরুণে ঝগড়া হ'ল। ইনি বলেন—আমি বড়—উনি বলেন—আমি বড়। তারপর শ্রীবৎস রাজা বিচার ক'রে দেখিয়ে দিলেন—লক্ষ্মী বড়। শনিঠাকুর দুর্দ্দশার আর বাকী রাখলেন না তার। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত কি হ'ল? শ্রীবৎস রাজা—আবার দুঃখ দুর্দ্দশা কাটিয়ে স্ত্রী পুত্র রাজ্য সব ফিরে পেলেন। তার মানে শনিঠাকুর খানিকটা দুঃখ দুর্দ্দশায় রাজাকে ফেললেও—রাজা—মা লক্ষ্মীর কৃপায় শেষ পর্য্যন্ত জিতলেন। শনি হেরে গেলেন। তখন শনিসত্যনারাণ না করে লোকের উচিত লক্ষ্মীর পূজো করা।

দুই হাত জোড় করিয়া সে মা লক্ষ্মীকে প্রণাম করিল। মা তাহার ভাণ্ডার পরিপূর্ণ করিয়াছেন। দিতে বাকী রাখিয়াছেন কি?—জমি, বাগান, পুকুর, বাড়ী;—শেষ পর্য্যন্ত তাহার কল্পনাতীত বস্তু জমিদারী—সেই জমিদারীও মা তাহাকে দিয়াছেন। গোয়ালভরা গরু, খামারভরা মরাই, লোহার সিন্দুকে টাকা, সোনা, নোট—তাহাকে দু'হাত ভরিয়া দিয়াছেন। তাঁহার প্রসাদে আজ তাহার সকল কামনা পরিপূর্ণ হইতে চলিয়াছে। দীর্ঘাঙ্গী কামারিণী—আজ তাহার ঘরে দাসী। গত রাত্রে সে অন্ধকারের আবরণে—যখন কামারিণীর ঘরে ঢুকিয়াছিল, তখন—কামারিণীর সে কি অদ্ভুত মূর্ত্তি! কিন্তু শ্রীহরির কাছে তাহার বিদ্রোহ কতক্ষণ?

এইবার দেবু ঘোষ—আর জগন ডাক্তার।

* * * *

শ্রীহরির উপলব্ধি—নিষ্ঠুরভাবে সত্য। দারিদ্র্য গুণরাশি-নাশী। শিশু-কন্যার হাতের জোয়ারের রুটি বিড়ালে কাড়িয়া খাইয়াছিল বলিয়া রাণাপ্রতাপ ভাঙিয়া পড়িয়াছিলেন।

সমস্ত অঞ্চলটায় দারিদ্র্য তাহার ভীষণতম মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া আত্মপ্রকাশ করিল। ভিজে স্যাঁত সেঁতে মেঝে—ভাঙা ঘর; কাঁথা বালিশ বিছানা ভিজিয়া আজিও শুকায় নাই—একটা দুর্গন্ধময় ভ্যাপসা গন্ধ উঠিয়াছে। ধান নাই, চাল নাই—যাহার যে কয়টা ছিল—সে গুলা ভিজিয়া গলিয়া মাটির চাপের মত ড্যালা বাঁধিয়া গিয়াছে। তাই শুকাইয়া সন্তর্পণে ভাঙিয়া চুরিয়া যে কয়টা চাল পাওয়া যায়—তাহা হইতে কোন মতে একবেলা এক মুঠা মুখে উঠিতেছে। মাঠের ঘাস বানে পচিয়া গিয়াছে—গরুগুলা অনাহারে পেটের জ্বালায় রিক্ত শূন্য মাঠে ছুটিয়া গিয়া—আবার ফিরিয়া আসিতেছে। তাদের দুধ নাই, শুকাইয়া গিয়াছে। এ সহ্য করিয়া মানুষ আর কয়দিন স্থির থাকিবে?

তাহারা গড়াইয়া গিয়া পড়িল শ্রীহরির দুয়ারে।

দেবু, বিশ্বনাথ ও জগনের চেষ্টারও ত্রুটি ছিল না। তাহারা নানা চেষ্টা করিতেছিল। সদরে ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে দরখাস্ত করিয়াছে—দেখা করিয়াছে। সাহেব সাহায্যের প্রতিশ্রুতিও দিয়াছেন। কিন্তু সে সাহায্য তদন্ত সাপেক্ষ। তদন্তের আয়োজন চলিতেছে।

সংবাদপত্রে এই প্রচণ্ড বন্যা এবং নিরীহ চাষীদের সর্ব্বনাশের সংবাদ পাঠাইয়া দেশবাসীর কাছে সাহায্যের আবেদন পাঠানো হইয়াছে। সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে, কিন্তু সে সংবাদ এত সংক্ষিপ্ত যে তাহাতে কাহারও মনে কোন রেখাপাত করিবে বলিয়া ভরসা হয় না।

অবনতমস্তকে দেবু আসিয়া ন্যায়রত্নের ঠাকুরবাড়ীর নাট-মন্দিরে উপস্থিত হইল।

ন্যায়রত্ন আপনার আসনটিতে বসিয়াছিলেন, তিনি হাসিয়া সম্ভাষণ করিলেন—এস পণ্ডিত।

ন্যায়রত্নকে প্রণাম করিয়া দেবু বলিল—বিশুভাই কোথায়?

এক অতি বিচিত্র হাসি হাসিয়া ন্যায়রত্ন বলিলেন—সে গেছে মেছুনীর ডালা থেকে নারায়ণ শিলা কিনতে।

দেবু কিছু বুঝিতে না পারিয়া বিস্ময়ে অবাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

ন্যায়রত্ন বলিলেন—সে গেছে তোমাদেরই গ্রামে। বায়েন পাড়ায় দুর্গা ব'লে একটি মেয়ের কলেরা হয়েছে তাই—

—কলেরা? দুর্গার কলেরা হয়েছে?

—বন্যা, দুর্ভিক্ষ, মহামারী এদের যোগাযোগও যে বহ্নি এবং বায়ুর মত পণ্ডিত। একের পর অন্যে আসবেই। তোমাদের গ্রামের পাতু বায়েন এসেছিল—ছুটতে ছুটতে। রাজনও ছুটতে ছুটতে চলে গেলেন।

দুর্গার কলেরা হইয়াছে। সে গত রাত্রিতে অভিসারে গিয়াছিল জংসন সহরে। তাহাদের পাড়ার সকলকে লইয়া সে কলে আশ্রয় লইবার সংকল্প করিয়া—একটা কলের ম্যানেজারের মনোরঞ্জনের জন্য সমস্ত রাত্রি সেখানে অতিবাহিত করিয়াছে। মাংস, তেলেভাজা প্রভৃতির সহ মদ লইয়া সে এক তাণ্ডব কাণ্ড। বাড়ী ফিরিয়া সে কলেরায় আক্রান্ত হইয়াছে। স্বৈরিণী দুর্গার বিচিত্র অভিলাষ। সে পাতুকে বলিল—তুই একবার মহাগেরামের ঠাকুরম'শায়ের নাতিকে খবর দে দাদা!

সংবাদ পাইবামাত্র বিশ্বনাথ জামাটা টানিয়া লইয়া বাহির হইয়া গেল।

জয়া বলিল, কোথায় যাচ্ছ?

—আসছি। শিগ্‌গির ফিরে আসব। শিবকালীপুরে বায়েন পাড়ায় কলেরা হয়েছে।

জয়া শিহরিয়া উঠিল। বিশ্বনাথ তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—কোন ভয় নেই—আমি শিগ্‌গির ফিরব। বন্যার পর কলেরা—সময়ে ব্যবস্থা না করলে—সর্ব্বনাশ হবে জয়া। দাদুকে তুমি ব'লো।

গ্রামে ফিরিয়া দেবু দেখিল—বিশ্বনাথ দুর্গার শবদেহের পাশে বিছানার উপরেই দাঁড়াইয়া আছে।

ম্লান হাসিয়া বিশ্বনাথ বলিল—দুর্গা মারা গেল।

দেবু একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল। হতভাগিনী মেয়েটার অনেক কথাই মনে পড়িল। সর্ব্বাগ্রে মনে পড়িল—সেই চল্লিশটা টাকার কথা, পুলিশকে প্রতারিত করিয়া যতীনবাবুকে—তাহাকে বাঁচাইবার জন্য সেই সাপে কামড়ানোর ছলনার কথা। দীর্ঘ-নিশ্বাস না ফেলিয়া সে পারিল না।

বিশ্বনাথ বলিল—অনেক কাজ দেবু ভাই। তোমাকে একবার জংসনে যেতে হবে। ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডে একটা টেলিগ্রাম করে দিতে হবে, কলেরার খবর জানিয়ে। কঙ্কনায় ইউনিয়ন বোর্ডে একটা খবর দিতে হবে। জংসনে স্যানিটারী ইন্সপেক্টার থাকেন—তাকেও খবর দিয়ো। সময়ে ব্যবস্থা না হলে—সর্ব্বনাশ হয়ে যাবে।

দেবু বলিল—এদিকের খবর শুনেছ। সব গিয়ে লুটিয়ে পড়েছে ছিরুর দোরে।

—জানি। বিশু হাসিল। খাজনা বৃদ্ধির কবুলতিতে সব দস্তখত টিপসই পর্য্যন্ত হয়ে গেল। কেবল এগারজন দেয় নি—ফিরে গেছে। আবার হাসিয়া বিশ্বনাথ বলিল—ভয় কি দেবু-ভাই, এগারজন তো আছে। তা ছাড়া যারা আজ খত লিখে দিলে—তারাই কাল আবার ও খত অস্বীকার করবে। জান—আমার এক বন্ধু, গায়ে তার ভীষণ জোর—ভয়ানক ঈশ্বর-বিশ্বাসী, আমি ঈশ্বর বিশ্বাস করি না বলে—আমার সঙ্গে তর্ক করেছিল, তর্কে সে আমাকে পারলে না, সুতরাং তারই উচিত ছিল—ঈশ্বরে অবিশ্বাস করা। কিন্তু সে আমার হাতখানা মুচড়ে ধ'রে বললে—ঈশ্বরে বিশ্বাস কর—নইলে হাত ভেঙে দোব। আমাকে তখন তাই বলতে হ'ল। কিন্তু ঈশ্বরের বিশ্বাসের নামে সেদিন থেকে আমার হাসি আসে। যাক—দেরী হয়ে যাচ্ছে ভাই! তুমি জংসনে চলে যাও।

দেবু বলিল—তুমি কিন্তু শিগ্‌গির ফিরো। ঠাকুর মশাই বসে আছেন তোমার জন্যে।

—ফিরতে আমার দেরী হবে দেবু ভাই। দুর্গার সৎকারের ব্যবস্থা না করে তো যেতে পারছি-না। তোমার গাড়ীখানা দেবে? এরা তো কেউ যেতে চাচ্ছে না। সব লুকিয়ে পড়েছে।

—লুকিয়ে পড়েছে।

—দোষ কি বল? প্রাণের ভয়! বিশু হাসিল।

দেবু বলিল—পাতুকে বল, আমার খামার থেকে নিয়ে আসুক গাড়ী।

—তাই যাও পাতু। গাড়ীতে চাপিয়ে নিয়ে যাবে।

পাতু শুষ্কমুখে বিশ্বনাথের দিকে চাহিয়া রহিল।

হাসিয়া বিশ্বনাথ বলিল—কি পাতু, ভয় করবে?

শিশুর মতই অকপটে স্বীকার করিয়া পাতু বলিল—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—আচ্ছা, চল—আমি তোমার সঙ্গে যাব।

—আপুনি? পাতু সবিস্ময়ে প্রশ্ন করিল।

—তুমি? দেবুরও বিস্ময়ের অবধি ছিল না।

—হ্যাঁ—আমি। বিশ্বনাথ হাসিল। তুমি আর দেরী কর না দেবু ভাই। চলে যাও। তবু দেবুর বিস্ময়ের ঘোর কাটিল না। মহাগ্রামের ন্যায়রত্নের পৌত্র—সে যাইবে এক মুচীর মেয়ের শবসৎকারে।

বিশ্বনাথ যখন বাড়ী ফিরিল তখন সন্ধ্যা। ন্যায়রত্ন বাড়ীতে ছিলেন না। বিশ্বনাথের একটা শঙ্কা কাটিয়া গেল। তাহার পিতামহকে সে জানে। বর্তমান ক্ষেত্রে তবু তাহার একটা আশঙ্কা হইয়াছিল। মুচীর মেয়ের শব-সৎকারে তাঁহার পৌত্রের অনুগমন তিনি কি ভাবে গ্রহণ করিবেন—সে বিষয়ে একটা সংশয় তাহার মনে জাগিয়া উঠিয়াছে। ঠাকুরবাড়ী অতিক্রম করিয়া সে বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিয়া ডাকিল—লো রাজ্ঞী শউন্তলে!

জয়ার কোন সাড়া পাওয়া গেল না, কিন্তু বাহির হইয়া আসিল খোকা অজয়—তাহার অজুমণি। দুই হাত বাড়াইয়া সে ছুটিয়া আসিল—বা-বা।

বিশ্বনাথ পিছনে সরিয়া আসিয়া বলিল—না—না, আমাকে ছুঁয়ো না।

বিশ্বনাথ সরিয়া যাইতেই অজয় আমোদ পাইয়া গেল, মুহূর্তে তাহার মনে পড়িয়া গেল লুকোচুরী খেলার আমোদ। সে খিল খিল করিয়া হাসিয়া দু-হাত বাড়াইয়া বাপকে ধরিবার জন্য ছুটিয়া আসিল। বিশ্বনাথেরও সঙ্গে সঙ্গে আমোদের ছোঁয়াচ লাগিল, সেও খেলার ভঙ্গিতে আরও খানিকটা পিছাইয়া আসিয়া বলিল—না। তারপর ডাকিল—জয়া! জয়া!

জয়া বাহির হইয়া আসিল—অভিমান স্ফুরিতাধরা। কোন কথা সে বলিল না। নীরবে আজ্ঞাবাহিনী দাসীর মত আদেশের প্রতীক্ষায় দাঁড়াইয়া রহিল। সমস্ত দিনটা সে গভীর উৎকণ্ঠায় কাটাইয়াছে। তাহার সর্ব্ব বিপদ—সকল শঙ্কার—একমাত্র অভয়ের উৎস পর্য্যন্ত আজ যেন রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। ন্যায়রত্ন আজ অস্বাভাবিক রকমের গম্ভীর। সমস্ত দিন তিনি গভীর নীরবতার মধ্যে কাটাইয়াছেন। কয়েকবার আসিয়া তাঁহার এই গম্ভীর মুখ দেখিয়া সে নীরবেই ফিরিয়া গিয়াছিল। অবশেষে আর থাকিতে না পারিয়া বলিয়াছিল—দাদু, আপনি তাকে বারণ করুন, শাসন করুন।

ন্যায়রত্ন মুখে কোন উত্তর দেন নাই, শুধু ঘাড় নাড়িয়া ইঙ্গিতে বলিয়াছিলেন—না।

তাহার পর সমস্তক্ষণটা সে কাঁদিয়াছে। জয়ার চোখ মুখ-ভঙ্গি দেখিয়া বিশ্বনাথ তাহার অভিমান অনুভব করিল। হাসিয়া বলিল—রাজ্ঞী, অভিমান করেছ?

জয়ার চোখের জল আর বাঁধ মানিল না। ঝর ঝর করিয়া সে কাঁদিয়া ফেলিল। বিশ্বনাথ বলিল—কেঁদো না—ছি!

ততক্ষণে খোকা ছুটিয়া তাহার কাছে আসিয়া পড়িয়াছে। বিশ্বনাথ আরও খানিকটা পিছাইয়া গিয়া বলিল—আরে—আরে, ধর ধর খোকাকে ধর। আমাকে গরম জল ক'রে দাও এক হাঁড়ি। হাত-পা ধুয়ে ফেলব। কাপড় জামাও ফুটিয়ে ফেলতে হবে। আগে খোকাকে ধর।

জয়া কোন কথা বলিল না, অজয়কে টানিয়া কোলে তুলিয়া লইল। ছেলেটি সকাল হইতে বাপকে পায় নাই, সে চীৎকার আরম্ভ করিয়া দিল—বাবা যাব। বা—বা—!

জয়া তাহার পিঠে দুম্ করিয়া একটা চড় বসাইয়া দিয়া বলিল—চুপ বলছি, চুপ—বলিয়া দুম্ করিয়া আবার তাহাকে মাটিতে বসাইয়া দিল।

বিশ্বনাথ এবার সস্নেহেই তিরস্কার করিল—ছি জয়া।

জয়া হু-হু করিয়া কাঁদিয়া উঠিল—এমন ক'রে দগ্ধে দগ্ধে মারার চেয়ে আমাকে তুমি খুন ক'রে ফেল। আমাকে তুমি বিষ এনে দাও।

বিশ্বনাথ উত্তর দিতে গেল, সান্ত্বনা মধুর উত্তরই সে দিতেছিল, কিন্তু দেওয়া হইল না, জিহ্বার প্রান্তভাগে আসিয়াও একমুহূর্তে কথাগুলি বজ্রাহত জীবনের মত মরিয়া গেল, সর্পস্পৃষ্টের মত সে চমকিয়া উঠিল। শিহরিয়া উঠিল। পিছন হইতে খোকা তাহাকে দুই হাতে জড়াইয়া ধরিয়া খিল খিল করিয়া হাসিতেছে। ধরিয়াছে, সে ধরিয়াছে, পলাতককে সে ধরিয়াছে! বিশ্বনাথ পিছন ফিরিয়া খোকার দুই হাত ধরিয়া ফেলিয়া আর্তস্বরে বলিল—শিগ্‌গির গরম জল জয়া, শিগ্‌গির। এখুনি হয়তো মুখে হাত দেবে।

—কয়েক মুহূর্ত্ত পরেই ন্যায়রত্নের খড়মের শব্দ ধ্বনিত হইয়া উঠিল। তিনি ডাকিলেন—বিশ্বনাথ!

বিশ্বনাথ শঙ্কিত হইয়া উঠিল। রাজন নয়, বিশ্বভাই নয়, বিশ্বনাথ আহ্বান শুনিয়া শঙ্কিতভাবেই উত্তর দিল—দাদু!

—তোমাকে ডাকছেন ভাই। বাইরে সব অপেক্ষা করে রয়েছেন।

বিশ্বনাথ তাঁহার নিকটে আসিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—আমার ওপর রাগ করেছেন দাদু?

—রাগ? ন্যায়রত্ন বিচিত্র হাসি হাসিলেন। বলিলেন—শশীশেখরের চিতাবহ্নিতে জল ঢেলে নিভিয়ে দেবার সঙ্গে সঙ্গেই—আমার জীবনের ক্রোধ বহ্নি নিভে গেছে দাদু।

—তবে?

—তবে কি বল দাদু? আজ সত্যিই আমি একটু বিচলিত হয়েছি। বোধশক্তি আজ আমার স্বাভাবিক নয়।

—সেই কথাই তো জিজ্ঞাসা করছি দাদু? কেন এমন হ'ল?

—দাদু মনে হচ্ছে। না দাদু থাক—ও প্রশ্ন আমাকে কর না তুমি। হয় তো এ আমার ভ্রান্তি। ন্যায়রত্ন বিশ্বনাথকে অতিক্রম করিয়া গেলেন। অজয় ছুটিয়া আসিল—ঠাকুর।

বাহিরে অপেক্ষা করিয়াছিল দেবু। তাহার সঙ্গে আরও কয়েকজন অল্পবয়সী ছেলে। দেবু টেলিগ্রাম করিয়াছে। ইউ-বি-তে খবর দিয়াছে। স্যানিটারী ইন্সপেক্টারকে জানাইয়াছে। দুর্গার মায়ের কলেরা হইয়াছে। তাহারা আসিয়াছে এই দুঃসময়ে সঙ্কটে বিশ্বনাথের পরিচালনায় কাজ করিবার জন্য।

বিশ্বনাথের মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সে রীতিমত একটি স্বেচ্ছাসেবকের দল গড়িয়া তাহার নিয়ম কানুন ছকিয়া দিল; বলিল—কাল সকালেই আমি যাব। জগন ডাক্তারকে ডেকে দুর্গার মায়ের চিকিৎসার ব্যবস্থা কর।

* * *

ভোর বেলাতেই দেবু বায়েন পাড়ায় আসিয়া হাজির হইল। দুর্গার মা এখনও মরে নাই। একা পড়িয়া চীৎকার করিতেছে। পাতুও পাতুর বউ পলাইয়াছে। পাড়ার আরও কয়েকজন পলাইয়াছে। বাউড়ী পাড়ায় রোগ প্রবেশ করিয়াছে। দুইজন সেখানে আক্রান্ত হইয়াছে।

জগন ডাক্তারের উঠিতে বেলা হয়। আটটার কম সে উঠে না। তবু সে জগনের ডাক্তারখানার দিকেই অগ্রসর হইল। ডাক্তারকে যদি আধঘণ্টা সকালেও তুলিতে পারা যায়। অন্ততঃ বিশ্বভাই আসিতে আসিতে জগনকে তুলিতেই হইবে। দেবুর ভাগ্য ভাল, ডাক্তার উঠিয়া বসিয়া আছে। একা জগন নয়—তাহার দাওয়ায় বসিয়া আছে—কঙ্কনার হাসপাতালের ডাক্তার। বোধহয় কোথাও কলে গিয়াছিল বা যাইবে।

দেবু দাওয়ায় উঠিতেই জগন বলিল—বিশ্বনাথের ছেলেটি কাল রাত্রে মারা গেছে দেবু ভাই।

বজ্রাহতের মত দেবু স্তম্ভিত হইয়া গেল।—মারা গেছে? কি হয়েছিল?

একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া জগন বলিল—কলেরা।

দেবু একরূপ ছুটিয়াই বাহির হইয়া গেল।

সর্বনাশী মহামারী মানব দেহের সকল রস নিঃশেষে শোষণ করিয়া জীবনীশক্তিকে নিঃশেষিত করিয়া দেয়। কিন্তু মহামারী বোধ করি বিশ্বনাথকে পাথরে পরিণত করিয়া দিয়া চলিয়া গেল। একা অজয় নয়, অজয়—অজয়ের পর জয়াও মারা গেল। প্রথম দিন অজয়, দ্বিতীয় দিন জয়া। চেষ্টার ত্রুটি হয় নাই। কঙ্কনার এম-বি ডাক্তার, রেল জংসনের বড় ডাক্তার দুইজনকেই আনা হইয়াছিল। কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় নাই।

বিশ্বনাথ অশ্রুহীন নেত্রে সব চাহিয়া দেখিল, শেষক্ষণ পর্য্যন্ত শুশ্রূষা করিল। দেবু অক্লান্ত পরিশ্রম করিল। তাহার ইচ্ছা করিতেছিল—সে চীৎকার করিয়া কাঁদে। নিজের কপালে—সে নিজে পাথর হানিয়া আঘাত করে। বিশ্বনাথ কলিকাতায় যাহা করিতেছিল—করিতেছিল, কিন্তু তাহার জেলের খবর পাইয়াই বিশুভাই এখানে আসিয়া তাহাদের কাজের সঙ্গে নিজেকে জড়াইয়া ফেলিয়াছে। কিন্তু কাঁদিতে সে পারিল না। বিশুভাইয়ের দিকে বিশেষ করিয়া ন্যায়রত্ন ঠাকুরের দিকে চাহিয়া সে কাঁদিতে পারিল না। বিশুভাই যেন পাথরের মূর্ত্তি, আর ঠাকুর যেন বসিয়া আছেন অকম্পিত স্নিগ্ধ দীপশিখার মত।

জয়ার সৎকার যখন শেষ হইল—তখন সূর্য্যোদয় হইতেছে। বিশ্বনাথের দিকে চাহিয়া দেবুর মনে হইল—বিশুভাইয়ের সুখ-দুঃখের অনুভূতি বোধ হয় মরিয়া গিয়াছে, অশ্রু শুকাইয়াছে, হাসি ফুরাইয়াছে, কথা হারাইয়াছে, তাহার মন অসাড়, দৃষ্টি শূন্য, শুষ্ক রসহীন বুক—সমস্ত পৃথিবীটাই তাহার কাছে আজ অর্থহীন খাঁ-খাঁ করিতেছে। তাহার সহিত কথা বলিতে দেবুর সাহস হইল না। বিশ্বনাথ নীরবেই বাড়ী ফিরিল।

নাটমন্দিরে প্রবেশ করিয়া ন্যায়রত্ন বলিলেন—এইখানে বস দাদু।

বাড়ীর দিকে চাহিয়া বিশ্বনাথ একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—দাদু!

ন্যায়রত্ন বলিলেন—দাদু ভাই!

বিশ্বনাথ বলিল—পাপ পুণ্যের সাধারণ ব্যাখ্যা আমি মানি না। আমি জানি—আমার মুহূর্তের ত্রুটির ফলে এগুলো ঘ'টে গেল। কিন্তু তবু আপনার কাছে আমার আজ জানতে ইচ্ছে করছে—আপনার ব্যাখ্যায় এটা কোন পাপের ফল?

পাপ?—ন্যায়রত্ন হাসিলেন। তারপর বলিলেন—একটা গল্প বলি শোন দাদুভাই। হয়তো ছেলেবেলায় শুনেছ—মনে থাকতে পারে। তবু আজ আবার বলি শোন। গল্প শুনতে ভাল লাগবে তো দাদু?

বিশ্বনাথ হাসিয়া বলিল—বলুন।

ন্যায়রত্ন আরম্ভ করিলেন—পুরাকালে এক পরম ধার্ম্মিক মহাভাগ্যবান ব্রাহ্মণ ছিলেন। পুত্র-কন্যা জামাতায়, পৌত্র-পৌত্রী দৌহিত্র-দৌহিত্রীতে সংসার ভরে উঠল—দেববৃক্ষের সঙ্গে তুলনীয়, ফলে—অমৃতস্বাদ গুণ, ফুলে—অগুরু চন্দনকেও লজ্জা দেয় এমন গন্ধ;—কোন ফল অকালে চ্যুত হয় না, ফুল অকালে শুষ্ক হয় না। পরিপূর্ণ সংসার, আনন্দে শান্তিতে সুখ-স্নিগ্ধ। ছেলেরাও প্রত্যেকে বড় বড় পণ্ডিত, জামাতারাও তাই। প্রত্যেকেই দেশদেশান্তরে স্বকর্ম্মে সুপ্রতিষ্ঠিত। কেউ কোন রাজার কুলপণ্ডিত, কেউ সভাপণ্ডিত, কেউ বড় টোলের অধ্যাপক। ব্রাহ্মণ আপন গ্রামেই থাকেন—আপন কর্ম্ম করেন। একদিন তিনি হাটে গিয়ে হঠাৎ এক মেছুনীর ডালার দিকে চেয়ে চমকে উঠলেন—শিউরে উঠলেন। মেছুনীর ডালায় একটি কালো রঙের সুডৌল পাথর, গায়ে কতকগুলি চিহ্ন। পাথর নয়—নারায়ণ শিলা শালগ্রাম। মেছুনীর ওই অপবিত্র ডালায় আমিষ গন্ধের মধ্যে নারায়ণ শিলা! তিনি তৎক্ষণাৎ মেছুনীকে বললেন—মা, ওটি তুমি কোথায় পেলে?

মেছুনী একগাল হেসে প্রণাম করে বললে—বাবা, ওটি কুড়িয়ে পেয়েছি, ঠিক একপো ওজন; বাটখারা করেছি ওটিকে। ভারী পয় আমার বাটখারাটির। যেদিন থেকে ওটি পেয়েছি—সেদিন থেকে আমার বাড়-বাড়ন্তর সীমে নাই।

সত্য কথা। মেছুনীর গায়ে একগা গহনা।

ব্রাহ্মণ বললেন—দেখ মা, এটি হ'ল শালগ্রাম শিলা। ওই আমিষের মধ্যে রেখেছ—ওতে অপরাধ হবে।

মেছুনী হেসেই সারা।

ব্রাহ্মণ বললেন—ওটি তুমি আমায় দাও। আমি তোমায় কিছু টাকা দিচ্ছি। পাঁচ টাকা দিচ্ছি তোমাকে।

মেছুনী বললে—না।

—বেশ, দশটাকা নাও।

—না বাবা, ও আমার অনেক দশটাকা দেবে।

—কুড়ি টাকা।

—না বাবা, তোমাকে হাতজোড় করছি।

—পঞ্চাশ টাকা।

—না।

—একশো।

—না গো, না।

—এক হাজার।

মেছুনী এবার ব্রাহ্মণের মুখের দিকে চেয়ে রইল। কোন উত্তর দিলে না। দিতে পারলে না।

—পাঁচ হাজার টাকা দিচ্ছি তোমায়।

এবার মেছুনী আর লোভ সম্বরণ করতে পারল না। ব্রাহ্মণ তাকে পাঁচ হাজার টাকা দিয়ে নারায়ণকে এনে গৃহে প্রতিষ্ঠা করলেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের কথা—তৃতীয় দিনের দিন ব্রাহ্মণ স্বপ্ন দেখলেন—একটি দুর্দ্দান্ত কিশোর তাঁকে বলছে—আমাকে কেন তুমি মেছুনীর ডালা থেকে নিয়ে এলে? আমি সেখানে বেশ ছিলাম। ফিরিয়ে দিয়ে এস আমাকে।

ব্রাহ্মণ বিস্মিত হইলেন।

দ্বিতীয় দিন আবার সেই স্বপ্ন। তৃতীয় দিনের দিন স্বপ্নে দেখলেন—কিশোরের উগ্রমূর্ত্তি। বললেন—ফিরিয়ে দিয়ে এস, নইলে কিন্তু তোমার সর্ব্বনাশ হবে।

সকালে উঠে সেদিন তিনি গৃহিণীকে বললেন। গৃহিণী উত্তর দিলেন—তাই ব'লে নারায়ণকে পরিত্যাগ করবে না কি? যা' হয় হবে। ও চিন্তা তুমি ক'রনা।

রাত্রে আবার সেই স্বপ্ন—আবার। তখন তিনি পুত্র-জামাতাদের এই স্বপ্ন-বিবরণ লিখে জানতে চাইলেন তাঁদের মতামত। জবাব এল—সকলেরই এক জবাব—গৃহিণী যা' বলেছিলেন তাই।

সেদিন রাত্রে স্বপ্নে তিনি নিজে উত্তর দিলেন—ঠাকুর, কেন তুমি রোজ আমার নিদ্রার ব্যাঘাত কর বলতো? কাজে কর্ম্মে আমার জবাব তুমি কি আজও পাওনি? আমিষের ডালায় তোমাকে দিতে পারব না।

পরের দিন ব্রাহ্মণ পূজা শেষে নাতি-নাতনীদের ডাকলেন—প্রসাদ নেবার জন্তে। সকলের যেটি ছোট—সেটি ছুটে আসতে গিয়ে অকস্মাৎ হুঁচোট খেয়ে পড়ে গেল। ব্রাহ্মণ তাড়াতাড়ি তাকে তুললেন—কিন্তু তখন শিশুর দেহে আর প্রাণ নাই। মেয়েরা কেঁদে উঠল। ব্রাহ্মণ একটু হাসলেন।

রাত্রে স্বপ্ন দেখলেন—সেই কিশোর নিষ্ঠুর হাসি হেসে বলছে—এখনও বুঝে দেখ। জান তো, সর্ব্বনাশের হেতু যার, আগে মরে নাতি তার।

ব্রাহ্মণ হাসলেন।

তারপর অকস্মাৎ সংসারে আরম্ভ হয়ে গেল মহামারী। একটির পর একটী—'একে একে নিভিল দেউটি।' আর রোজ রাত্রে ওই স্বপ্ন। রোজই ব্রাহ্মণ হাসেন।

একে একে সংসারের সব শেষ হয়ে গেল। অবশিষ্ট রইলেন—নিজে আর ব্রাহ্মণী।

স্বপ্ন দেখলেন—এখনও বুঝে দেখ। ব্রাহ্মণী থাকবে।

ব্রাহ্মণ বললেন—তুমি বড় ফাজিল ছোকরা, তুমি বড়ই বিরক্ত কর।

পরদিন ব্রাহ্মণী গেলেন। আশ্চর্য্য—সেদিন আর রাত্রে কোন স্বপ্ন দেখলেন না।

ব্রাহ্মণ শ্রাদ্ধাদি শেষ করে—একটি ঝোলায় সেই শালগ্রাম-শিলাটিকে বেঁধে গলায় ঝুলিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। তীর্থ থেকে তীর্থান্তরে, দেশ থেকে দেশান্তরে, নদ-নদী, বন-জঙ্গল, পাহাড়-পর্ব্বত অতিক্রম করে চলেন, পূজার সময় হলে একটি স্থান পরিষ্কার করে বসেন—ফুল তুলে পূজা করেন, ফল আহরণ করে ভোগ দেন—প্রসাদ পান।

অবশেষে একদা তিনি মানস সরোবরে এসে উপস্থিত হলেন। স্নান করলেন—তারপর পূজায় বসলেন। চোখ বন্ধ করে ধ্যান করছেন—এমন সময় দিব্য গন্ধে স্থান পরিপূর্ণ হয়ে গেল—আকাশমণ্ডল পরিপূর্ণ করে বাজতে লাগল—দেব-দুন্দুভি। কে বললে—ব্রাহ্মণ, আমি এসেছি।

চোখ বন্ধ করেই ব্রাহ্মণ বললেন—কে তুমি?

—আমি নারায়ণ।

—তোমার রূপটা কেমন বল তো?

—কেন! চতুর্ভুজ—শঙ্খ চক্র—

—উঁহু—যাও—যাও, তুমি যাও।

—কেন?

—আমি তোমায় ডাকিনি।

—তবে কাকে ডাকছ?

—সে এক ফাজিল ছোকরা। যে আমায় স্বপ্নে শাসাত, তাকে।

এবার স্বপ্নের সেই ছোকরার গলা তিনি শুনতে পেলেন—ব্রাহ্মণ, আমি এসেছি।

চোখ খুলে ব্রাহ্মণ এবার দেখলেন—হ্যাঁ, সেই।

হেসে কিশোর বললেন—চল আমার সঙ্গে।

ব্রাহ্মণ আপত্তি করলেন না। চল। তোমার দৌড়টাই দেখি। কিশোর দিব্য রথে এক অপূর্ব্ব পুরীতে তাঁকে আনলেন—এই তোমার পুরী। পুরীর দ্বার খুলে গেল—সর্ব্বাগ্রে বেরিয়ে এল—সেই সকলের ছোট নাতিটি—যে সর্ব্বাগ্রে মারা গিয়েছিল। তার পিছনে-পিছনে সব।

ন্যায়রত্ন চুপ করিলেন।

বিশু হাসিল।

দেবু হাসিল না। সে ভাবিতেছিল এই অদ্ভুত ব্রাহ্মণটির কথা।

ন্যায়রত্ন আবার বলিলেন—যেদিন থেকে তুমি গ্রামে এসে সাধারণকে নিয়ে কাজে নামলে ভাই, সেদিন আমার সন্দেহ হয়েছিল। তারপর যখন শুনলাম—বায়েনদের মেয়ের রোগশয্যায় তুমি দাঁড়িয়েছ, তার শব-সৎকার করতে শ্মশানে গিয়েছ, তখন আর আমার সন্দেহ রইল না; আমি বুঝলাম—মেছুনীর ডালার শালগ্রাম উদ্ধার করতে হাত বাড়িয়েছ তুমি। আচ্ছা—নারায়ণ, কিন্তু ভাই, ওই বাউড়ী—বায়েন-দেহকে যদি মেছুনীর ডালার সঙ্গে তুলনা করি—তবে যেন—আধুনিক তোমরা—তোমরা রাগ ক'র না।

এতক্ষণে বিশুর চোখ দিয়া কয়েক ফোঁটা জল ঝরিয়া পড়িল।

ন্যায়রত্ন চাদরের খুঁট দিয়া সে জল মুছাইয়া দিলেন। বিশুর মাথায় হাত দিয়া নীরবে বসিয়া রহিলেন।

* * *

হাঁপাইতে হাঁপাইতে ছুটিয়া আসিল হরেন ঘোষাল। সর্ব্বনাশ হয়েছে—বিশুবাবু সর্ব্বনাশ হয়েছে!

হাসিয়া ন্যায়রত্ন বলিলেন—বসুন ঘোষাল, বসুন। সুস্থ হয়ে বলুন কি হয়েছে।

ঘোষাল বসিল না, চোখ বড় বড় করিয়া বলিল—তিন চারখানা গাঁয়ের লোকের সঙ্গে শ্রীহরির দাঙ্গা লেগে গিয়েছে।

—দাঙ্গা?

—হ্যাঁ—দাঙ্গা। পুলিশে খবর দিয়েছে শ্রীহরি।

—দাঙ্গা লাগল কেন?

—ধান নিতে এসেছে সব, শ্রীহরি দেয় নি। তারা বলছে, ধান তারা জোর করে ভেঙে নেবে।

দেবু সঙ্গে সঙ্গে উঠিয়া পড়িল।

বিশ্বনাথ বলিল—দাঁড়াও দেবু ভাই। ধীরে ধীরে সে উঠিয়া ন্যায়রত্নকে বলিল—আমি ঘুরে আসি দাদু।

ন্যায়রত্ন হাসিয়া বলিলেন—যাও। তোমার থাকবার মধ্যে অবশিষ্ট আমি।

বিশ্বনাথ বলিল—দাদু!

ন্যায়রত্ন আবার হাসিয়া বলিলেন—আশীর্ব্বাদ করি, তোমার তপস্যা সফল হোক, নবযুগকে প্রত্যুদ্গমন করে নিয়ে এস তোমরা। আমার যাওয়ার এর চেয়ে সুসময় আর হয় না। তবে সে সুসময় কি আমার ভাগ্যে সম্ভব? যাও তুমি ঘুরে এস। আমি বলছি তুমি যাও।

বিশ্বনাথ অগ্রসর হইল।

বিশ্বনাথ চলিয়া গেলে—ন্যায়রত্ন তাঁহার আসনের উপরেই শুইলেন। শরীরটা বড় খারাপ করিতেছে। যেন একটু জ্বরভাব বোধ করিতেছেন।

* * *

ঘণ্টা দুয়েক পর সংবাদ আসিল—পুলিশ বিশ্বনাথকে গ্রেপ্তার করিয়াছে। একা বিশ্বনাথ নয়—দেবুকেও গ্রেপ্তার করিয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে আরও কয়েকজনকে। শ্রীহরি ঘোষ পুলিশ পাহারার মধ্যে আপনার সমস্ত সম্বল সঞ্চয় লইয়া জংসন শহরে উঠিয়া যাইতেছে। গ্রাম তাহার পক্ষে নিরাপদ স্থান নয়।

ন্যায়রত্ন দিগন্তের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া জ্বরক্লিষ্ট দেহে স্থির হইয়া যেমন শুইয়া ছিলেন—শুইয়া রহিলেন।

শেষ

গুপ্ত সম্রাটগণের আদিবাসস্থান

শ্রীধীরেন্দ্রচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় এম-এ, পি-এইচ্‌ডি

খ্রীঃ তৃতীয় শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্য্যন্ত গুপ্ত সম্রাটগণ প্রবল পরাক্রমে উত্তর ভারত শাসন করেন। গুপ্ত বংশের প্রতিষ্ঠাতা মহারাজ গুপ্ত। মহারাজ গুপ্তের রাজ্যাবসানে মহারাজ ঘটোৎকচ, মহারাজাধিরাজ প্রথম চন্দ্রগুপ্ত, মহারাজাধিরাজ সমুদ্র গুপ্ত, মহারাজাধিরাজ দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত প্রভৃতি নরপতিগণ ক্রমান্বয়ে সিংহাসনে আরোহণ করেন। পূর্ব্ববর্ত্তী গুপ্তসম্রাটগণের রাজধানী পাটলিপুত্র ছিল বলিয়া পণ্ডিতগণ অনুমান করেন। ইহার সঠিক কোন প্রমাণ নাই। মনে হয় পরবর্ত্তীকালে গুপ্ত রাজধানী অযোধ্যায় ছিল। বসুবন্ধুর পরমার্থচরিতে (গুপ্ত সম্রাট) বালাদিত্যের পিতাকে অযোধ্যার বিক্রমাদিত্য বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। গুপ্ত সম্রাটগণ ক্ষাত্রবলে পূর্ব্বভারত হইতে ক্রমশঃ মধ্য ও পশ্চিম ভারত পর্য্যন্ত আপনাদের সাম্রাজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন। তবে পূর্ব্বভারতের কোন্ অংশে গুপ্ত বংশের আদি নিবাস ছিল সেই সম্বন্ধে ঐতিহাসিকগণ এখনও একমত হইতে পারেন নাই। ভিন্সেন্ট স্মিথ সাহেবের মতে প্রথম চন্দ্রগুপ্ত বিবাহের যৌতুকস্বরূপ লিচ্ছবিদের নিকট হইতে মগধের সিংহাসন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সুতরাং প্রথম চন্দ্রগুপ্তের রাজপদে অভিষিক্ত হওয়ার পূর্ব্বে মগধ গুপ্তরাজ্যের বহির্গত ছিল। গুপ্ত রাজগণ সর্ব্বপ্রথম কোথায় রাজত্ব স্থাপন করেন স্মিথ সাহেব সেই সম্বন্ধে কোন মত প্রকাশ করেন নাই। কাশীপ্রসাদ জয়সবাল মহাশয় "কৌমুদী মহোৎসব" নামক গ্রন্থের সাহায্যে প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে প্রথম চন্দ্রগুপ্ত লিচ্ছবিদের সহায়তায় মগধরাজ সুন্দরবর্ম্মাকে পরাজিত করিয়া মগধের সিংহাসন অধিকার করেন। অত্যল্পকাল পরে প্রজাগণ প্রথম চন্দ্রগুপ্তকে সিংহাসন-চ্যুত করে এবং সুন্দর বর্ম্মার পুত্র কল্যাণ বর্ম্মাকে মগধের রাজা বলিয়া ঘোষণা করে। প্রথম চন্দ্রগুপ্তের পুত্র সমুদ্রগুপ্ত কল্যাণ বর্ম্মার বংশধর বল বর্ম্মাকে পরাজিত করিয়া পুনরায় মগধ অধিকার করেন। জয়সবাল মহাশয়ও প্রথম চন্দ্রগুপ্তের পূর্ব্ববর্ত্তী নৃপতিগণের রাজ্য কোথায় ছিল তাহার কোন উল্লেখ করেন নাই। জে, এলান সাহেব গুপ্তবংশের ইতিহাস রচনা করিয়া যশস্বী হইয়াছেন। গুপ্তবংশের আদিনিবাস সম্বন্ধে তিনি একটি বিশেষ মত পোষণ করেন। তাঁহার মতে চীনা পরিব্রাজক ইৎসিঙ্গের "কউ-কা-কও-সঙ্গ-চুয়েন" গ্রন্থে উল্লিখিত হইয়াছে যে ইৎসিঙ্গের ভারতভ্রমণের (খ্রীঃ ৬৭২—৬৯৩) পাঁচশত বৎসর পূর্ব্বে মহারাজ গুপ্ত বুদ্ধগয়ার সন্নিকটে মৃগস্থাপনে একটি বৌদ্ধ-বিহার নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। উপরোক্ত বিবরণানুযায়ী মহারাজ গুপ্ত খ্রীঃ ১৭২ এবং খ্রীঃ ১৯৩ অব্দের মধ্যে কোন একসময়ে সিংহাসনে আসীন ছিলেন। প্রথম চন্দ্রগুপ্ত খ্রীঃ ৩১৯ অব্দে রাজ্যভার প্রাপ্ত হন। চন্দ্রগুপ্তের পিতামহ মহারাজ গুপ্তের রাজ্যকাল খ্রীঃ তৃতীয় শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্দ্ধে নির্দ্ধারিত হইবে। ইৎসিঙ্গ মহারাজ গুপ্তের রাজত্বের তারিখ জনপ্রবাদ হইতে সংগ্রহ করিয়াছিলেন। সুতরাং যদিও আপাতঃদৃষ্টিতে ইৎসিঙ্গের মহারাজ গুপ্ত ও গুপ্তবংশের প্রতিষ্ঠাতা মহারাজ গুপ্তের রাজ্যকাল বিভিন্ন বলিয়া মনে হয় তাহারা যে একই ব্যক্তি ছিলেন তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। ইৎসিঙ্গের বিবরণ হইতে প্রমাণ হয় যে মহারাজ গুপ্ত মগধের রাজা ছিলেন। এলান সাহেবের এই মতটি অনেকেই

সমীচীন বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু ইৎসিঙ্গের বিবরণ সুক্ষ্মভাবে বিচার করিলে ইহা ভ্রমাত্মক বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে।

ইৎসিঙ্গের গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে যে *—"জনশ্রুতি হইতে জানা যায় যে পাঁচশত বৎসর পূর্ব্বে কুড়িজন চীনা পরিব্রাজক বুদ্ধগয়ায় মহাবোধি দর্শন করিতে গমন করেন। তাহাদের অবস্থানের জন্য মহারাজ শ্রীগুপ্ত মৃগস্থাপনে একটি বিহার নির্ম্মাণ করেন। এই বিহারের অধিবাসীদের ভরণপোষণের জন্য তিনি কুড়িখানা গ্রাম এবং জমি দান করেন। মৃগস্থাপনের বিহার নালন্দার মন্দির হইতে গঙ্গার তীর ধরিয়া চল্লিশ যোজন পূর্ব্বে অবস্থিত।" এই বিবরণের কয়েক পংক্তি পরেই বলা হইয়াছে যে "বোধগয়া হইতে নালন্দার মন্দির সাত যোজন উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত।" বোধগয়া হইতে নালন্দার সোজাসুজি ব্যবধান চল্লিশ মাইল। সুতরাং ইৎসিঙ্গ বর্ণিত প্রত্যেক যোজন ৫৪/৭ মাইলের সমান বা অধিক। এই হিসাবানুসারে নালন্দা হইতে মৃগস্থাপনের দূরত্ব দুইশত আশী মাইলের অধিক হইবে। নালন্দা হইতে গঙ্গার তীর ধরিয়া পূর্ব্ব দিকে দুইশত আশী মাইল অগ্রসর হইলে মালদহ (বরেন্দ্রী) অথবা মুর্শীদাবাদ (রাঢ়) জেলায় পৌঁছিতে হইবে। নেপালের একটি প্রাচীন গ্রন্থে লেখা আছে যে মৃগস্থাপন বরেন্দ্রীর অন্তর্গত ছিল। † ইৎসিঙ্গ বর্ণিত মৃগস্থাপন এবং বৌদ্ধগ্রন্থের মৃগস্থাপন অভিন্ন বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। এই প্রসঙ্গে ইৎসিঙ্গের আর একটি বর্ণনায় উপরোক্ত মত সমর্থিত হইতেছে। ইৎসিঙ্গ বলেন যে মৃগস্থাপন বিহারের অধিবাসী চীনা পরিব্রাজকদের ভরণপোষণের জন্য মহারাজ শ্রীগুপ্ত যে সমস্ত ভূমি দান করিয়াছিলেন তাহা খ্রীঃ সপ্তম শতাব্দীর শেষার্দ্ধে পূর্ব্ব ভারতের রাজা দেব বর্ম্মের রাজ্যভুক্ত হয়।

ইৎসিঙ্গের গ্রন্থ হইতে জানা যায় যে মগধ মধ্য ভারতে অবস্থিত। পূর্ব্বভারতের দক্ষিণ সীমা তাম্রলিপ্ত ও পূর্ব্ব সীমা হরিকেল। এই সময়ে খড়গ বংশীয় দেব খড়্গ পূর্ব্ব ভারতের অধিপতি ছিলেন। ডাঃ শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার মনে করেন যে দেব বর্ম্মণ ও দেব খড়্গ একই ব্যক্তি ছিলেন। খ্রীঃ সপ্তম শতাব্দীর শেষার্দ্ধে "পরবর্ত্তী গুপ্তবংশীয়" আদিত্য সেন মগধের সিংহাসনে আসীন ছিলেন। তিনি বা তাঁহার উত্তরাধিকারী পূর্ব্বভারতের কোন রাজার বশ্যতা স্বীকার করেন নাই। সুতরাং গুপ্তরাজ্যাংশ যাহা দেব বর্ম্মের করায়ত্ব হইয়াছিল তাহা পূর্ব্বভারতেই অবস্থিত ছিল।

উপরে উল্লিখিত প্রমাণাদি হইতে প্রতিপন্ন হয় যে বরেন্দ্রী অথবা ইহার পশ্চিমাংশ শ্রীগুপ্তের রাজ্যভুক্ত ছিল। শ্রীগুপ্তের রাজ্য বরেন্দ্রী মণ্ডলেই সীমাবদ্ধ ছিল অথবা উহা মগধ হইতে বরেন্দ্রী পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল এই প্রশ্নের সমাধান করা যাইতে পারে।

গুপ্ত লেখমালায় শ্রীগুপ্ত ও তাহার পুত্র ঘটোৎকচকে মহারাজ উপাধি দেওয়া হইয়াছে। ঘটোৎকচের পুত্র প্রথম চন্দ্রগুপ্ত ও তাঁহার বংশধরদের মহারাজাধিরাজ উপাধিতে ভূষিত করা হইয়াছে। ইহা হইতে পণ্ডিতগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে শ্রীগুপ্ত ও ঘটোৎকচ ক্ষুদ্র জনপদের অধিপতি ছিলেন। শ্রীগুপ্তের রাজ্য মগধ হইতে বরেন্দ্রী পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল বলিয়া ধরিয়া লইলে তাঁহার ক্ষুদ্র শক্তির পরিচায়ক মহারাজ উপাধি অর্থহীন হইয়া পড়ে। শ্রীগুপ্ত ও ঘটোৎকচের মগধে আধিপত্য বিস্তারের কোন প্রমাণ অদ্যাপি আবিষ্কৃত হয় নাই। এমতাবস্থায় গুপ্ত-বংশ সর্ব্বপ্রথম বরেন্দ্রীতে রাজ্য স্থাপন করিয়াছিল বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে।

শ্রীগুপ্তের পৌত্র মহারাজাধিরাজ প্রথম চন্দ্রগুপ্তের স্বর্ণমুদ্রায় প্রথম চন্দ্রগুপ্তের লিচ্ছবি রাজকুমারী কুমার দেবীর সহিত বিবাহানুষ্ঠান দেখান হইয়াছে। স্মিথ সাহেব মনে করেন যে প্রথম চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বের প্রারম্ভে লিচ্ছবি বংশ মগধের সিংহাসনে আসীন ছিল। লিচ্ছবি রাজকুমারীকে বিবাহ করিয়া প্রথম চন্দ্রগুপ্ত মগধের সিংহাসন প্রাপ্ত হন। এই বিবাহ বন্ধন গুপ্ত বংশের উন্নতির মূল কারণ বলিয়া ইহা স্বর্ণ মুদ্রায় প্রকাশ করা হইয়াছে। নেপালের একটি প্রাচীন লিপিতে খ্রীঃ দ্বিতীয় অথবা তৃতীয় শতাব্দীতে লিচ্ছবি বংশ মগধের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিল বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে।

এলাহাবাদ প্রশস্তির কয়েকটি শ্লোকে * সমুদ্র গুপ্তের ভারত বিজয়ের বর্ণনা আছে। একটি মধ্যবর্ত্তী শ্লোকে উল্লিখিত হইয়াছে যে সমুদ্রগুপ্ত কোতকুলজকে বন্দী করিয়া পুষ্পপুরে ক্রীড়া করিয়াছিলেন। পাটলিপুত্রের অন্য নাম পুষ্পপুর। পাটলিপুত্র গুপ্ত বংশের প্রাচীন রাজধানী ছিল এই ধারণা বিমুক্ত হইয়া উপরোক্ত শ্লোকটি আলোচনা করিলে ইহার অর্থ হইবে—'সমুদ্রগুপ্ত কোতকুলজের নিকট হইতে পাটলিপুত্র অধিকার করিয়াছিলেন'। এই ব্যাখ্যা যুক্তিসম্পন্ন বলিয়া গৃহীত হইলে সমুদ্রগুপ্ত গুপ্ত রাজগণের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম মগধ অধিকার করিয়াছিলেন বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতে হইবে।

বিষ্ণুপুরাণের একটি শ্লোকে আছে যে গুপ্ত বংশ গঙ্গার তীর ধরিয়া প্রয়াগ, সাকেত ও মগধ শাসন করিবে। অনেকে মনে করেন যে এই শ্লোকটি প্রথম চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যের সীমা বর্ণনা করিতেছে। ইহা সত্য হইলে সমুদ্র গুপ্তের পূর্ব্বে বাঙ্গালা দেশ গুপ্তরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল না বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে।

এলাহাবাদ প্রশস্তিতে উল্লেখ আছে যে সমতট (কুমিল্লা), ডবাক (কাছাড়), কামরূপ প্রভৃতি প্রত্যন্ত নৃপতিগণ সমুদ্রগুপ্তের বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিলেন। এই সব দেশ এবং বাঙ্গালা দেশ যে সমুদ্রগুপ্তের রাজ্যভুক্ত ছিল তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। এলাহাবাদ লিপিতে সমুদ্রগুপ্তের উত্তর ও দক্ষিণ ভারত-বিজয়ের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ আছে। তিনি বাঙ্গালাদেশ জয় করিয়া থাকিলে এলাহাবাদ প্রশস্তিতে নিশ্চয়ই তাহার উল্লেখ থাকিত। ইহাতে মনে হয় সমুদ্রগুপ্তের রাজ্যারোহণের পূর্ব্বেই বাঙ্গালা দেশ গুপ্ত রাজ্যভুক্ত হইয়াছিল। সুতরাং পুরাণোক্ত শ্লোকটির উপর নির্ভর করিয়া ইৎসিঙ্গের বিবরণ মিথ্যা বলা যুক্তিসঙ্গত হইবে না। পুরাণোক্ত বিবরণের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়া ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ায় যে যথেষ্ট ভুল হওয়ার সম্ভাবনা আছে তাহা ঐতিহাসিক মাত্রেই অবগত আছেন।

মিঃ এলাম এবং অন্যান্য পণ্ডিতগণ উপরোক্ত ইৎসিঙ্গের বিবরণ ঐতিহাসিক ভিত্তির উপর স্থাপিত বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। সুতরাং গুপ্ত বংশের আদি নিবাস যে বরেন্দ্রী ছিল তাহা নিঃসন্দেহে গ্রহণ করা যাইতে পারে।

---

* Chavannoo—Voyages des Pelerins Bouddhistes, p, 82.

† ফরাসী পণ্ডিত ফুঁশে ইহা তাঁহার গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন। শ্রদ্ধেয় ডাঃ শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় ইহার প্রতি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন।

* ...দণ্ডৈর্গ্রাহয়তৈব কোতকুলজং পুষ্পাহ্বয়ে ক্রীড়তা সূর্য্যে...

পাইলট

ভাস্কর

ভজহরির অফিস উঠিয়া গিয়াছে। বহু কষ্টে যে চাকুরিটি জুটিয়াছিল, তাহা চলিয়া গেল। অথচ ভজহরির কোন দোষ নাই। অদৃষ্ট এবং কর্মফল সম্বন্ধে মনে মনে গবেষণা করিতে

সিঁড়ির উপরে বেলার সঙ্গে দেখা

করিতে ভজহরি তদীয় বন্ধু নরহরির মেসে গিয়া উঠিল। নরহরি সংক্ষেপে বলিল, আবার বেকার?

ভজহরি সংক্ষেপে উত্তর দিল, হুঁ।

এবার কি করবি, ভাবছিস্?

ভাবছি না কিছুই। তবে, তোর দেনাটা—

থাম্। আমার দেনার কথা ভাবতে হবে না।

একটা কথা ভাবছি।

কি?

আকাশে উড়্ব। অর্থাৎ, পাইলট হব।

কাজটা বড় বিপজ্জনক। আমার মন সরে না।

হোক গে বিপজ্জনক। বিপদে আমার ভয় কি? আমার তো কোন দিকেই কোন টান নেই—এক তুই ছাড়া। তা, যদি মরেই যাই, না হয় একটু কাঁদবি। তুই আর আমাকে বাধা দিস নে। আমি শীগগিরই সব ঠিক করে ফেল্ছি। কিছু খরচপত্রের দরকার। তা এবার আর তোকে বিরক্ত কর্‌ব না।

ভাল করে ভেবে দেখ, কাজটা কিন্তু বড় রিস্‌কি।

তা হোক। কোন রিস্‌ক আমি গ্রাহ্য করি নে।

ভজহরির এক মাসী থাকেন বিবেকানন্দ রোডে। অবস্থা ভাল। ভজহরি বড় একটা সেখানে যাতায়াত করে না। বছরে হয় তো দুই একবার যায়, একটু জল খাইয়া প্রণাম করিয়া চলিয়া আসে।

ভজহরি স্থির করিল, মাসীর কাছে কিছু ধার করিবে। পরে পাইলটের লাইসেন্স লইয়া যখন চাকুরি করিবে, তখন শোধ করিয়া দিবে।

মাসির বাড়ি গিয়া ভজহরি সটান মাসীমাকে গিয়া প্রণাম

কিছুক্ষণ ধরিয়া ফিস্ ফিস্ ফুস্ ফাস্ চলিল

করিল। মাসী বলিলেন, কি রে, কি মনে করে? ভাল আছিস্ তো?

হ্যাঁ, ভালই আছি। তোমাদের ভজা আর মন্দ থাক্‌ল কবে?

বেশ, ভাল থাকলেই ভাল। বস একটু। ধোপা এসে বসে আছে। কাপড় চোপড়গুলো লিখে দিয়ে আসছি।

বেশ তো, এসো।

মাসিমা কাপড় লিখিয়া শেষ করিয়া মিলাইবার সময়ে দেখেন ধোপার গোনার সঙ্গে তাঁহার খাতার অঙ্ক মিলিতেছে না। দুই তিন বার চেষ্টা করিবার পর, বিরক্ত হইয়া খাতা আনিয়া ভজহরির নিকট ফেলিয়া দিয়া বলিলেন, দেখ তো বাপু—আমি তো কিছুতেই মেলাতে পারছি নে। ভজহরি খাতা হাতে করিয়া ধোপাকে বলিল, কাপড়গুলো সব আলাদা করে ফেল। আমি এক এক করে সবার কাপড় মিলিয়ে দিচ্ছি। ধোপা এক এক জনের কাপড় পৃথক্ পৃথক্ করিয়া স্তূপ করিল, ভজহরি মিলাইতে লাগিল। কাহারও সাড়ী সাতখানা, কাহারও দুখানা; কাহারও রুমাল আটখানা, কাহারও একখানা; কাহারও তিনটা পাঞ্জাবী, একবারের বেশী পরা বলিয়া মনে হয় না, কাহারও অত্যন্ত ময়লা সার্ট মাত্র একটি; কাহারও ব্লাউজ পাঁচটি, কাহারও একটি ময়লা সেমিজ; ইত্যাদি। কাপড় ধোপার হিসাবের সহিত মিলিয়া গেল। মাসীমাকে খাতা ফিরাইয়া দিয়া ভজহরি বলিল, এই নাও তোমার খাতা। দেখ, আমি আজ দশ বছর তোমাদের বাড়ী আসছি, কিন্তু তুমি ছাড়া বাড়ীর কারো সঙ্গে তেমন একটা পরিচয় হয় নি। কিন্তু আজ তাদের কাপড় মেলাতে গিয়ে তাদের আর্থিক অবস্থা, অভ্যাস, রুচি প্রভৃতির যে পরিচয় পেলাম, তা বোধ হয়, আরো দশ বছর এ বাড়ীতে আসা যাওয়া করেও পেতাম না। সে যাক্। আচ্ছা, ওর মধ্যে দেখ্‌লাম, দুখানা অত্যন্ত ময়লা তেলচিটে আটপৌরে থানধুতী। ও দুখানা কার?

কার আবার! ওই পোড়াকপালী বেলার।

বেলা কে?

ওই তো আমার বড় ননদের মেজ মেয়ের সেজ মেয়ে। আহা, হবার পরদিনই মা হারাল। বিয়ের পরদিনই বিধবা হ'ল। কোথাও দাঁড়াবার ঠাঁই পেল না। কি করব? এখানেই এনে রেখেছি।

ধোপার কাপড়ের নমুনা দেখিয়া ভজহরি নিঃসংশয়ে বুঝিল, দয়াময়ী মাসিমার বাড়ীতে একটি ঝির স্থান পূর্ণ করিয়াছে পোড়াকপালী বেলা। ইতিমধ্যে দেখা গেল, উক্ত পোড়াকপালী একখানি সাদা ধবধবে ধুতী পরিয়া দোতলার একখানি ঘর হইতে বাহির হইয়া সিঁড়ি দিয়া নীচে নামিয়া গেল। ভজহরি দেখিল, পোড়াকপালী হইলেও বেলা সুন্দরী ষোড়শী। হাতে দুইগাছি করিয়া সরু সোনার চুড়ি, গলায় একটি সরু মফ-চেন, পিঠের উপর একরাশ কালো চুল।

ভজহরি যেন একটু অন্যমনস্কভাবেই জিজ্ঞাসা করিল, মাসীমা, বেলা বিধবা হ'ল কেন?

শোন কথা! বিধবা হবার আবার কারণ থাকে না কি? কপাল—

ভজহরি মাসীমার নিকট আসল কথা পাড়িল এবং অনেক বুঝাইয়া সুঝাইয়া কিছু অর্থ সংগ্রহ করিয়া মাসীমাকে প্রণাম করিল। বলিল, দেখ না, আমি দু' তিন মাসের মধ্যেই পাইলট হ'য়ে তোমার টাকা ফিরিয়ে দেব।

তা দিস। মাঝে মাঝে আসিস্ কিন্তু—

নিশ্চয়ই আস্‌ব।

৩

ভজহরি এখন প্রায়ই আসে মাসীমার সঙ্গে দেখা করিতে। একদিন মাসীবাড়ি পৌঁছিয়া দোতলায় উঠিবার পথে সিঁড়ির উপরে বেলার সঙ্গে দেখা। একটি কুঁজা কাঁখে করিয়া বেলা
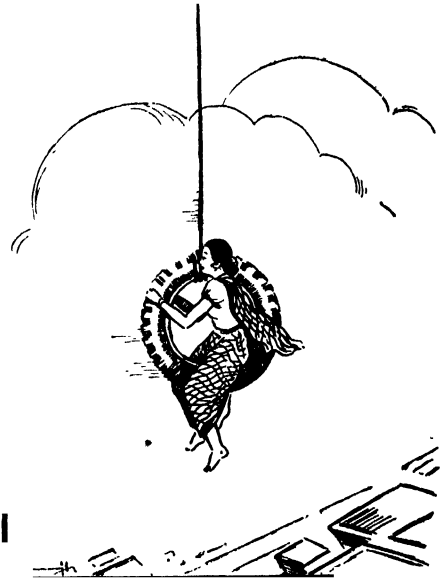
বেলা ক্রমশ মুক্ত আকাশে উঠিতে আরম্ভ করিয়াছে

নীচে নামিতেছিল। ভজহরি উপরে উঠিবার সময়ে কুঁজার গায়ে সামান্য একটু ধাক্কা লাগিয়া গেল।

ভজহরি পাইলট-গিরি শিখিতে যায়, ভায়া মাসীর বাড়ি। পাইলট-গিরি শিখিয়া ফিরিয়া বাসায় যায়, ভায়া মাসীরবাড়ি।

বেলা আগের চেয়ে যেন চঞ্চল হইয়াছে বেশী, কাজকর্ম করে বেশী, মাসীমাকে ভালবাসে বেশী, চুল বাঁধে বেশী, ছাদে যায় বেশী।

ভজহরি যখনই আসে, মাসীমার সঙ্গে গল্প করে, চা খায়, এরোপ্লেন-চালানোর কৌশল সম্বন্ধে বক্তৃতা করে। ফিরিবার সময়ে রান্নাঘর, ভাঁড়ার ঘর কিংবা কলতলার দিক দিয়া একটু ঘুরিয়া যায়। ইচ্ছা করিয়া হঠাৎ বেলার সম্মুখে পড়িয়া যায়। কখনও দু একটা কথা হয়, কখনও হয় না।

কিছুদিন পরে। ভজহরি মাসীমার সঙ্গে দেখা করিয়া ফিরিবার সময়ে রান্নাঘরের পাশে বেলার সহিত সাক্ষাৎ হইতেই,

ভজহরি বলিয়া ফেলিল, আমি চাকরি পেয়েছি। আমি তোমাকে এমন করে আর ঝি-গিরি করতে দেব না।

বেলা বলিল, তার মানে?

মানে আর একদিন বল্‌ব—বলিয়া ভজহরি বাহির হইয়া গেল।

আর একদিন। মাসীমার সহিত সাক্ষাতের পর বেলার সহিত সাক্ষাৎ হইতেই কিছুক্ষণ ধরিয়া ফিস্‌-ফিস্‌ ফুস্‌-ফাস্‌ চলিল। বড় বৌএর পায়ের শব্দ শুনিতেই ভজহরি আস্তে আস্তে বাড়ির বাহির হইয়া গেল।

বেলাকে ছাদে পাইয়া বসিয়াছে। চুল শুকাইতে ছাদে যায়, কাপড় মেলিতে ছাদে যায়, একবার গেলে আর শীঘ্র ফিরিতে চায় না। মাথার উপর দিয়া গোঁ গোঁ করিয়া এরোপ্লেন ওড়ে, বেলা চাহিয়া চাহিয়া দেখে। বৈকালে চিরুণী হাতে এলো চুলে ছাদে যায়, ঘুরিয়া ঘুরিয়া চুল আঁচড়ায়, আর কেবলই আকাশের দিকে তাকায়। মাসীমার ইচ্ছা, খুব বকেন, খুব শাসন করেন; কিন্তু বেলা ইদানীং মাসীমার সেবাযত্নের মাত্রা এত বাড়াইয়া দিয়াছে যে মাসীমা কোন কথা বলিবার অবসরই পান না। বরং বাড়ির অপর কেহ কিছু বলিলে বলেন, আহা! ছেলেমানুষ বই তো না। কিই বা বয়েস!

একদিন দুপুরে সকলের আহারাদির পর বেলা বলিল, মাসিমা, তোমার আমসত্ত্বের হাঁড়িটা দাও তো, রোদে দিয়ে আসি। আমসত্ত্বগুলো রোদ অভাবে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। যা কাকের উৎপাত। আমাকেই বসে বসে পাহারা দিতে হবে আর কি!

থাক না এখন। এই তো রান্নাঘর থেকে বেরুলে। একটু জিরিয়ে নাও।

না মাসীমা, তোমার আমসত্ত্বগুলো নষ্ট হ'বে আর আমি শুয়ে থাক্‌ব, সে কি হয়?

কর গে বাপু, যা খুসী—বলিয়া মাসীমা একটু গড়াইতে গেলেন। বাড়ীর অপর সকলেও, কেহ বাহিরে চলিয়া গিয়াছে, কেহ ঘরে বিশ্রাম করিতেছে।

বেলা ধুতী ছাড়িয়া ছোট বউয়ের আলনা হইতে একখানা চেক শাড়ী লইয়া পরিয়া ফেলিল এবং আমসত্ত্বের হাঁড়ি লইয়া ছাদে গিয়া একপাশে হাঁড়িটি নামাইয়া রাখিয়া, আকাশের দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল। দূরে একখানি এরোপ্লেনের শব্দ শুনিয়াই উঠিয়া দাঁড়াইয়া আঁচলটা শক্ত করিয়া কোমরে জড়াইয়া লইল! এরোপ্লেনখানি ক্রমশঃ যেন নীচের দিকে নামিয়া আসিতেছে। ক্রমে ক্রমে যখন প্রায় বেলাদের বাড়ীর নিকটে আসিয়া পড়িয়াছে, তখন দেখা গেল, এরোপ্লেনখানির নীচে একটি লম্বা দড়ি ঝুলিতেছে, দড়ির আগায় একটি মোটর-গাড়ীর টায়ার বাঁধা রহিয়াছে। আরো নিকটে আসিতেই এরোপ্লেনের শব্দটা যেন ক্ষণেকের জন্য বন্ধ হইয়া গেল, টায়ারটি ক্রমশঃ নীচে নামিয়া আসিতে লাগিল। টায়ারটি ছাদের উপর আসিয়া পড়িতেই বেলা চট্‌ করিয়া টায়ারটির ফাঁকের মাঝে ডান পা ঢুকাইয়া দিয়া বসিয়া পড়িল এবং দুই হাতে জোরে সামনের দিকে টায়ারটিকে জড়াইয়া ধরিল। ইতিমধ্যে এরোপ্লেনের এঞ্জিন আবার গোঁ-গোঁ আরম্ভ করিয়াছে। বেলা ক্রমশঃ মুক্ত আকাশে উঠিতে আরম্ভ করিয়াছে।

দড়িটি ক্রমশ ছোট হইতে লাগিল, অর্থাৎ ভজহরির এ্যাসিষ্ট্যান্ট এরোপ্লেন হইতে ক্রমশঃ দড়িটিকে টানিয়া তুলিতে লাগিল। বেলা দুলিতে দুলিতে টায়ার-সহ এরোপ্লেনে পৌঁছিল। বেলাকে টানিয়া তুলিয়া পাইলট ভজহরির ঠিক পিছনের সীটে বসান হইল। এ্যাসিষ্ট্যান্ট মহাশয় আর একটু পিছনে সরিয়া আসিয়া টায়ারের দড়ি কাটিয়া দিলেন।

টায়ারটি আসিয়া পড়িল দেশপ্রিয় পার্কে। আকাশ হইতে টায়ার পড়িতে দেখিয়া নিকটবর্তী অঞ্চল হইতে লোক ছুটিল কাতারে কাতারে। কেহ বলিল, নূতন টাইপের একটা বোমা পড়িয়াছে। কেহ বলিল, বোমা নয়, বোমার খোল। দূর হইতে অতি সন্তর্পণে বড় বড় হোস দিয়া জল ছিটান হইল। পরে একখানি লরীতে উঠাইয়া সামরিক যন্ত্র-বিশারদগণের নিকট পরীক্ষার্থ পাঠান হইল।

৪

এদিকে এরোপ্লেনে উঠিয়া বেলা ভজহরির পিঠ ঘেঁষিয়া বসিল। তাহার উষ্ণ নিঃশ্বাস ভজহরির কাঁধে সুড়সুড়ি দিতে লাগিল।

বেলা ভজহরির পিঠ ঘেঁষিয়া বসিল

ভজহরি বলিল, কেমন লাগছে?

খুব ভাল।

জানালা দিয়ে নীচের দিকে চেয়ে দেখ। ওই দেখ গঙ্গা, ওই দেখ কালীঘাটের গঙ্গা। ওই দেখ ঘর বাড়ীগুলো কেমন দেখাচ্ছে। ওই দেখ ক্ষেতের আলগুলি কেমন দেখাচ্ছে, যেন সবুজ রঙের চেক-শাড়ী। ওই দেখ জাহাজগুলো কেমন ছোট ছোট নৌকার মত দেখাচ্ছে। চাহিয়া চাহিয়া বেলা মুগ্ধ হইয়া গেল।

এরোপ্লেনের নাক এবং ভজহরির চোখ হরাইজন্‌ লক্ষ্য করিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে, মাঝে মাঝে উপরে ওঠার জন্য একটু দোলা লাগিতেছে, একটা অস্পষ্ট গোঁ-গোঁ শব্দ কানের সঙ্গে জুড়িয়া রহিয়াছে আর আরব্য উপন্যাসের ম্যাজিক কার্পেটের মত অনন্তের পথে আনন্দে ভাসিয়া চলিয়াছে—ভজহরি এবং বেলা। সম্মুখে ডায়ালে উচ্চতার কাঁটা আগাইয়া চলিয়াছে, তিন হাজার ফিট, চার হাজার ফিট, পাঁচ হাজার ফিট, বেলা আশ্চর্য্য হইয়া

নীচের পৃথিবীর ছবির দিকে চাহিয়া আছে। আট হাজার ফিট উপরে উঠিতেই বেলার শীত করিতে লাগিল। বলিল, আর
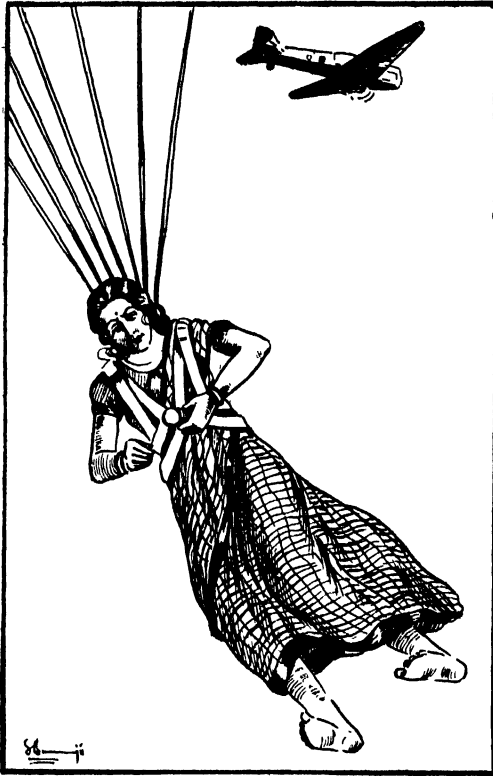
বেলা প্যারাস্যুটে নামিতেছে

উপরে উঠো না, বড় শীত করছে। আগে জানলে গরম জামা পরে আসতুম।

এ আর শীত কি? এতো প্রায় দার্জিলিংএর মত উঁচুতে উঠেছি। আমাদের বিশ-পঁচিশ হাজার ফিটও উঠতে হয়।

ওরে বাপ্। আজ তাই বলে আর উঠো না: আমি তাহলে শীতে জমে যাব।

হঠাৎ ভজহরি একটু চঞ্চল হইয়া উঠিল। বেলাকে বলিল, চুপ্। কিছুক্ষণ মাথায় ও কাণে বাঁধা বেতার শব্দ গ্রহণের যন্ত্রে মনোনিবেশ করিয়া বলিল, মাটি করেছে!

কি হ'লো?

বেতারে হুকুম এলো, আমাকে এখনই অন্যদিকে দূরে যেতে হ'বে, দরকারী কাজে।

কি কাজ?

কাউকে বলা নিষেধ।

আমাকেও বলবে না?

না, কাউকে না।

ইতিমধ্যে উহারা সমুদ্রের উপর আসিয়া পড়িয়াছে। সমুদ্র-তীরের অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিয়া বেলা মুগ্ধ হইয়া গিয়াছে। বিশাল নীল জলের রাশি, অগণিত ঢেউ, তীরভূমিতে সাদা ফেনের রাশি মাথায় করিয়া ঢেউয়ের পর ঢেউ আছাড় খাইয়া পড়িতেছে, যেন নীল শাড়ীর রূপালী জরির পাড় সূর্যের আলোয় ঝলমল করিতেছে। বেলা সমুদ্র হইতে দৃষ্টি তুলিয়া আনিয়া ভজহরিকে বলিল, আমাকেও নিয়ে চল না।

সে হয় না। চল, তোমাকে চট্ করে কলকাতায় রেখে আসি। তবে আমি কিন্তু এরোপ্লেনে নাম্‌তে পারবো না। তোমাকে প্যারাস্যুটে নামিয়ে দেবো।

এরোপ্লেনের মুখ ঘুরাইয়া বোঁ করিয়া ভজহরি কলিকাতায় ফিরিল। পিছনের অ্যাসিষ্টাণ্টকে বলিল, বেলার পিঠে প্যারাস্যুট বেঁধে দাও। প্যারাস্যুট বাঁধা হইল। দুইটি চওড়া ফিতা দুই বগলের নীচে দিয়া ঘুরাইয়া বাঁধা হইল, আর একটি চওড়া শক্ত বেল্ট বুকের উপর দিয়া বাঁধা হইল। তারপর একটি দড়ি বেলার ডান হাতে দিয়া বলা হইল, এইবার এইখান দিয়ে লাফিয়ে পড়। এরোপ্লেন থেকে বেরিয়েই ডান হাতের এই দড়িটা ধরে টান দেবে। তাহলেই প্যারাস্যুটটা ছাতার মত খুলে যাবে।

বেলা প্যারাস্যুট ধরিয়া লাফাইয়া পড়িল। ভজহরি এরোপ্লেনের হাল ঘুরাইয়া গন্তব্যস্থানে চলিয়া গেল।

বেলা প্যারাস্যুটে নামিতেছে। ক্রমশ পৃথিবীর ছবিটা স্পষ্ট হইতে স্পষ্টতর হইতেছে। বাতাসের চাপে পরণের শাড়ী

'দেখতে পাচ্ছ না, আমি মেয়ে মানুষ?'

ফুলিয়া উঠিতেছে। উহার নামিবার কথা দেশপ্রিয় পার্কে। কিন্তু বাতাসের জোরে ভাসিতে ভাসিতে ক্রমশ লেকের পাড়ে আসিয়া

পড়িল। আকাশ হইতে প্যারাসুট নামিতে দেখিয়া এ অঞ্চলে হুলস্থূল পড়িয়া গেল। লোক ছুটিল, গাড়ী ছুটিল, লরী ছুটিল, মোটর গাড়ী ছুটিল, মোটর বাইক ছুটিল। কেহ বলিল, এ নিশ্চয়ই জাপানী, এখনই গুলী কর। কেহ বলিল, না, যখন
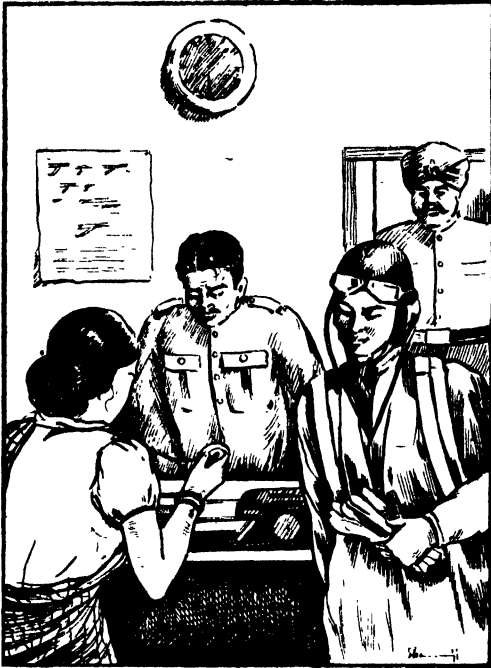
লকেটের ডালা খুলিয়া ভজহরির ফটো দেখাইয়া দিল

মাত্র একজন, তখন জ্যান্ত বন্দী করাই ভাল। এত লোকের মধ্যে একা, পালাতে পারবে না। সুতরাং গুলী না করাই স্থির হইল।

একটু পরে, মাটির কাছে আসিতে একজন বলিয়া উঠিল, যেন মেয়েমানুষ বলে মনে হচ্ছে।

আর একজন তৎক্ষণাৎ উত্তর দিল, ওটা ক্যামুফ্লেজ।

বেলা মাটিতে পা দিল। প্যারাসুটটা আস্তে আস্তে তাহার পিছনে মাঠের উপরে এলাইয়া পড়িল। চারিদিকে সমবেত জনতা অতি-সন্তর্পণে একটু একটু করিয়া বেলার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল।

বেলা প্রথমে একটু ভ্যাবাচ্যাকা খাইয়া পরক্ষণেই আত্ম-সমর্পণের ভঙ্গীতে দুই হাত তুলিয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইল এবং বলিল, তোমাদের চোখ নেই? দেখতে পাচ্ছ না আমি মেয়ে মানুষ?

জনতার মধ্যে একজন বলিল, গলার স্বরটা কিন্তু মেয়েলী-মেয়েলী। আর একজন বলিল, হ্যাঁ বেশ মিষ্টি-মিষ্টি। জনমণ্ডলীর বৃত্ত ক্রমশ ছোট হইতে হইতে একেবারে বেলার নিকটে আসিয়া পড়িল। তখন একজন বলিল, এ নিশ্চয়ই স্ত্রীলোক।

বেলা বলিয়া উঠিল, হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি স্ত্রীলোক. বাঙালী স্ত্রীলোক। আপনারা সরুন। আমাকে যেতে দিন।

এই কথা বলিতেই জনতার ভিতর হইতে দুইজন অগ্রসর হইয়া আসিয়া বেলাকে ধরিয়া মোটর লরীতে উঠাইয়া লইয়া টালিগঞ্জ থানায় জমা করিয়া দিল—তদন্ত ও সনাক্ত করিবার জন্য। আর একজন প্যারাসুটটি গুটাইয়া ভাঁজ করিয়া মোটরসাইকেলের পিলিয়নে বাঁধিয়া লইয়া অন্তর্হিত হইল। জনতা আস্তে আস্তে সরিয়া গেল। সমস্ত অঞ্চল নানাপ্রকার গবেষণায় মুখর হইয়া উঠিল।

সন্ধ্যার সময়ে ভজহরি নিজের কর্তব্য শেষ করিয়া এরোপ্লেন-খানি যথাস্থানে রাখিয়া পাইলটের পোষাক পরিয়াই মাসীমার বাড়ীর দিকে ছুটিল। দোতলায় উঠিয়া মাসিমাকে সম্মুখে পাইয়াই জিজ্ঞাসা করিল, বেলা কই?

কেন, এসেই বেলা কই, মানে?

না, এমনি!

এমনি! আমি তোকেই জিজ্ঞাসা করছি, বেলা কই? দুপুরে মেয়ে ছাদে গেল আমসত্ত্ব রোদে দিতে। আমসত্ত্বর হাঁড়ি যেমন তেমনি পড়ে আছে, মেয়ের আর দেখা নেই। ও বাড়ীর হিরু বলছিল, সে নাকি দেখেছে, বেলা আকাশে উড়ে যাচ্ছে। কি কাণ্ড! আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি নে।

ভজহরি মাসীমার বাড়ি হইতে বাহির হইয়া নিকটবর্ত্তী থানায় গিয়া কলিকাতার বিভিন্ন থানায় টেলিফোন করিতে লাগিল। টালিগঞ্জে ফোন করিতেই বেলার সন্ধান পাইয়া তৎক্ষণাৎ সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। থানার কর্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন, কি চাই?

বেলাকে চাই।

বেলা কে?

আজ বিকেলে যিনি প্যারাসুটে ক'রে লেকের ধারে নেমেছেন।

থানার কর্ত্তা ভিতর হইতে বেলাকে লইয়া আসিয়া ভজহরিকে দেখাইয়া বলিলেন, ইনি?

হ্যাঁ।

ইনি আপনার কে?

ইনি আমার স্ত্রী।

কপালে সিন্দুর নেই কেন?

আজ দুপুরে সাবান মেখেছিলেন, তার পরে আর চুল বাঁধবার সুযোগ পান নি।

আপনার স্ত্রী, তার প্রমাণ?

এই কথা শুনিয়াই বেলা তাহার গলার মফ-চেন টানিয়া বাহির করিয়া তাহার লকেটের ডালা খুলিয়া ভজহরির ফটো দেখাইয়া দিল।

ভজহরি ট্যাক্সি ডাকিল। ট্যাক্সিতে বসিয়া ভজহরি জিজ্ঞাসা করিল। ও লকেটে আমার ফটো রাখলে কি করে?

তোমার মাসিমার একটা বাক্সে একখানা পুরাণো বড় গ্রুপ-ফটোতে তোমার ছবি দেখেছিলাম। সেই পুরাণো ফটোখানা মাসিমার কাছে চেয়ে নিয়ে তারি থেকে—।

তাই নাকি!

ভজহরি আর একটু কাছে সরিয়া বসিল।

৬

বেলা সধবা হইয়াছে। সংবাদপত্রে পাইলট সরখেলের বিধবা বিবাহের সংবাদ বাহির হইয়াছে। মাসিমা খুসী হইয়াছেন।

ভজহরির একটা 'গতি' হইয়াছে দেখিয়া নরহরি আহ্লাদিত হইয়াছে। ভজহরি ও বেলা সেদিন নরহরিকে চুংওয়ায় নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াইয়াছে।

চলতি ইতিহাস

শ্রীতিনকড়ি চট্টোপাধ্যায়

রুশ-জার্মান সংগ্রাম

স্ট্যালিনগ্রাড—সুদূর য়্যাটল্যান্টিকের অপর পার হইতে ইয়োরোপের ক্ষুদ্রতম রাষ্ট্রটির পর্যন্ত লক্ষ্য আজ স্ট্যালিনগ্রাড। ১৯৪১ সালের ২২-এ জুন কলঙ্কময় বিশ্বাসঘাতকতার মধ্য দিয়া লোলুপ নাৎসী জার্মানীর ইতিহাসের যে নূতন অধ্যায় আরম্ভ হইয়াছে, আজও জার্মানী তাহার জের টানিয়া চলিয়াছে স্ট্যালিনগ্রাডে। স্ট্যালিনগ্রাডের ওপর জার্মানীর প্রথম আক্রমণ শুরু হয় গত ১৮ই জুলাই তারিখে। সেবাস্তোপোলে দিনের পর দিন লালফৌজ নাৎসী বাহিনীকে যে বাধা প্রদান করিয়াছে তাহার তুলনা হয় না। কিন্তু স্ট্যালিনগ্রাডের আত্মরক্ষা পৃথিবীর ইতিহাসে অতুলনীয়। ইতিহাসের ছাত্রদের নিকট গত মহাযুদ্ধের ভার্দুনের কথা উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু সমগ্র পৃথিবীর ইতিহাসে যেমন এই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের তুলনা মিলেনা, স্ট্যালিনগ্রাডের সহিতও তেমনই কাহারও তুলনা করা চলে না। একটি নগর দখলের জন্য এত অসংখ্য সৈন্য পূর্বে কোথাও ব্যবহৃত হয় নাই; প্রভূত সৈন্যক্ষয় সত্ত্বেও এমনভাবে শত্রুকে বাধা-ও কেহ প্রদান করে নাই, এত অধিক লোকক্ষয় এবং সমরোপকরণের ধ্বংস অন্য কোন রণাঙ্গনে কখনও হয় নাই। সুদীর্ঘ দিন ধরিয়া প্রতিটি মিনিটে নাৎসীবাহিনী তাহার সকল শক্তি লইয়া স্ট্যালিনগ্রাডে আক্রমণ চালাইয়া চলিয়াছে, প্রতি মুহূর্তে লালফৌজ তাহাদিগকে বাধাপ্রদান করিয়াছে। সোভিয়েট বাহিনীর প্রবল প্রতিরোধ সত্ত্বেও নাৎসী সৈন্য সহরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়াছে। বড় বড় রাস্তা এবং কারখানা অঞ্চলে আক্রমণ এবং প্রতিরোধ চলিয়াছে প্রবল ভাবে। সহরের অনেকাংশ নাৎসী বাহিনীর অধিকারে আসিয়াছে। কিন্তু প্রতি পথে প্রতিটি বাড়ি আজ সোভিয়েট দুর্গ। তবুও কামানের গোলা ও বিমান হইতে বোমাবর্ষণে বিধ্বস্ত 'ট্যাঙ্ক সহর'-এর প্রতি রাজপথে, শ্রমিক অবস্থান অঞ্চলে, কারখানা অঞ্চলে বিধ্বস্ত সমরোপকরণ ও মৃত সৈন্যস্তূপের উপর দিয়া জার্মান সৈন্য সকল শক্তিপ্রয়োগে অগ্রসর হইবার জন্য সচেষ্ট। নাৎসী বাহিনীর লক্ষ্য ভলগা।

প্রচণ্ড যুদ্ধ চলিয়াছে প্রধানত সহরের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে। সহরের অভ্যন্তরে নাৎসীবাহিনী স্থানে স্থানে অধিকার বিস্তার করিতে সক্ষম হইয়াছে বটে, কিন্তু মার্শাল টিমোশেঙ্কোর বাহিনী সমধিক সাফল্য লাভ করিয়াছে নগরের পশ্চিমাঞ্চলে। সহরের অভ্যন্তরস্থিত নাৎসী বাহিনীকে স্থানে স্থানে তাহারা মূল বাহিনী হইতে বিচ্ছিন্ন করিতে সক্ষম হইয়াছে, নাৎসী সৈন্যের একটি অংশকে ডন নদীর অপর তীর পর্যন্ত তাড়াইয়া লইয়া গিয়াছে। যে কোন মূল্যে স্ট্যালিনগ্রাডকে রক্ষা করাই যেমন সোভিয়েট বাহিনীর প্রথম ও প্রধান কার্য, যে কোন উপায়ে অবিলম্বে স্ট্যালিনগ্রাড দখল করিতে সমর্থ হওয়াই তেমনই নাৎসী জার্মানীর প্রধান সমস্যা হইয়া উঠিয়াছে। মস্কো-ভরোনেশ রেলপথ পূর্বেই নাৎসী বাহিনী কর্তৃক বিচ্ছিন্ন হইয়াছে, জেনারেল লিষ্ট-এর অধীনে গ্রজনী অভিমুখেও নাৎসীবাহিনী বহুদূর পর্যন্ত অগ্রসর, নভোরসিস্ক অধিকারের পর নাৎসী নৌ ও স্থল বাহিনী টুয়াপুসে বন্দর অভিমুখে অভিযান চালাইতে সচেষ্ট, একমাত্র স্ট্যালিনগ্রাডের পূর্বাঞ্চল এবং ভলগার দিক ব্যতীত রুশিয়ার সহিত স্ট্যালিনগ্রাডের অন্যান্য সকল সংযোগ পথই আর সরল নাই, বিমান পথে উভয় পক্ষই রণাঙ্গনে বহুবার নূতন সৈন্য আমদানী করিয়াছে। কিন্তু আজও সংগ্রামের চরম মীমাংসা হয় নাই। টিমোশেঙ্কোর বাহিনীর সাহায্যার্থ সাইবেরিয়া হইতে নূতন সৈন্য আসিয়াছে। সাইবেরিয়া হইতে আগত এই বাহিনীর বিবরণ আমরা 'ভারতবর্ষ'-এর গত সংখ্যাতেই প্রদান করিয়াছি, নূতন করিয়া তাহাদের পরিচয় প্রদান নিষ্প্রয়োজন। এই বাহিনীর আগমনের পর হইতেই লালফৌজের যুদ্ধের তীব্রতা বিশেষ বৃদ্ধি পাইয়াছে। স্থানে স্থানে আক্রমণাত্মক যুদ্ধ পরিচালনা করিয়া তাহারা নাৎসী বাহিনীকে পশ্চাদপসরণে বাধ্য করিয়াছে। গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি উচ্চভূমিও তাহারা অধিকার করিয়াছে। রয়টার প্রদত্ত সংবাদে প্রকাশ, বার্লিনের মুখপত্র এরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, আগামী দু'চার দিনের মধ্যে স্ট্যালিনগ্রাডের পতনের কোন আশা নাই, লাল অক্টোবর বাহিনীর প্রতিরোধ শক্তি এখন যথেষ্ট সুদৃঢ় আছে।

মধ্যপ্রাচী অঞ্চলে ব্রিটিশ সামরিক বেতার কেন্দ্রের কর্ম্মিগণ

এদিকে নাৎসী-অধিকৃত ইয়োরোপ অঞ্চলের সমগ্র শক্তি হিটলার

কর্তৃক স্ট্যালিনগ্রাড রণাঙ্গনে নিযুক্ত। কিন্তু তথাপি হিটলার এখনও স্ট্যালিনগ্রাড আয়ত্তে আনিতে পারিলেন না, ককেশাসের তৈলাঞ্চল হাতের সামনে আসিয়াও এখনও মুঠার মধ্যে আসিল না। ইহার কারণ নাৎসী শক্তির মূলে সোভিয়েট বাহিনী করিয়াছে কুঠারাঘাত। জার্মান বাহিনীর প্রধান বিশেষত্ব ছিল তাহাদের দক্ষতা। প্রতিটি জার্মান সৈন্য একদিকে যেমন দক্ষ সৈনিক, অপর দিকে তেমনই সে কারখানার নিপুণ শ্রমিক। রণাঙ্গন হইতে বিরাম কালে অথবা আহত হইয়া সুস্থ হইবার পর এই সকল সৈন্য কারখানায় উৎপাদনে সাহায্য করে, আর তাহাদের শূন্য স্থান পূর্ণ করে শ্রমিকরা। কিন্তু এখন এই দক্ষ শ্রমিকের স্থান পূরণ করিয়াছে ফ্রান্স, ইটালী প্রভৃতি দেশের শ্রমিকগণ। শ্রমিক হিসাবে ইহারা যে সকল জার্মান শ্রমিকদের ন্যায় সমান পটু তাহা নয়, অথচ যুদ্ধক্ষেত্রে ইহাদের দ্বারা সৈনিকের কার্য চালান যায় না, দক্ষ সৈনিকের স্থান ইহাদের দ্বারা পূরণ করা সম্ভব নয়। আবার রণক্ষেত্রে হিটলারের পদানত ইয়োরোপীয় রাষ্ট্রের বহু সৈন্যও আছে, তাহারা যথেষ্ট সমরকুশল হইলেও বিভিন্নদেশীয় বাহিনীর মধ্যে সমতা রক্ষা করা যেমন আয়াস সাধ্য, তেমনই জার্মান অথবা সোভিয়েট বাহিনীর মত অতটা পটুতা তাহাদের নাই। ফলে সৈন্য এবং শ্রমিকের কার্যের জন্য জার্মানীতে আজ বিভিন্ন দুই দলের আবির্ভাব হইয়াছে, আর হিটলারের সমস্যা হইল এইখানেই। প্রচুর উৎপাদনের জন্য হিটলারের বর্তমানে যথেষ্ট শ্রমিকের প্রয়োজন। এইজন্যই বেলজিয়ম হইতে জোর করিয়া জার্মানীতে শ্রমিক আনা হইতেছে। ফ্রান্সের নিকট তাই জার্মানী এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার শ্রমিক প্রেরণের দাবী জানাইয়াছে। আর এই দাবী লইয়াই ভিসি সরকারের সহিত ফ্রান্সের জনসাধারণের বিশেষ শ্রমিককুলের বিরোধ বাধিয়াছে। ভিসি সরকার এখনও জার্মানীর দাবী পূরণ করিতে পারে নাই, অথচ নানা প্রলোভন দেখান সত্ত্বেও শ্রমিকগণ ফ্রান্স পরিত্যাগ করিতে রাজী নয়। সম্প্রতি মঃ লাভালকে শ্রমিক সংগ্রহের জন্য আরও একমাস সময় দেওয়া হইয়াছে। এই ব্যাপারে বর্তমানে ভিসি সরকার ও জার্মানীর মধ্যে কি সম্পর্ক দাঁড়াইয়াছে তাহা লইয়া অনেকে নানারূপ সন্দেহ ও আলোচনা করিতেছেন। সেই সকল অভিমতের মূল্য বর্তমানে যাহাই হউক সম্প্রতি হিটলারের যে শ্রমিক-অভাব চলিয়াছে নিদারুণভাবে ইহা সুস্পষ্ট। আর এই অভাবের মূলে বর্তমান স্ট্যালিনগ্রাড।

চীনা-ব্রিটিশ যুদ্ধ জাহাজ "কারাস উইও"

এদিকে শীত ককেশাসে আসন্ন। তুষারপাত আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। অথচ স্ট্যালিনগ্রাডের জন্য জার্মানী ইতিমধ্যে যে মূল্য প্রদান করিয়াছে তাহা অপরিমিত। আপন শ্রমশক্তির অভাবও হিটলারের অজ্ঞাত নয়। অথচ এবারে শীতের পূর্বে ককেশাস অঞ্চলে প্রবেশাধিকার পর্যন্ত না পাইলে আসন্ন শীতে জার্মান বাহিনীকে যে কি বিপদে পড়িতে হইবে, তাহাও হিটলার বোঝেন। সেইজন্যই স্ট্যালিনগ্রাডে নাৎসী বাহিনীর চাপ চলিয়াছে প্রবল ভাবে। আসন্ন শীতের পূর্বে স্ট্যালিনগ্রাড সম্বন্ধে একটা বুঝা-পড়া করিতে না পারিলে এবারের শীতেও যে জার্মানীকে প্রতিকূল অবস্থার সম্মুখীন হইতে হইবে তাহা হিটলার অবগত আছেন। হিটলারের সাম্প্রতিক বক্তৃতায় আর সে দম্ভ নাই, নিমেষে শত্রুকে চূর্ণ করিবার বৃথা বাগাড়ম্বর নাই। রুশিয়া আক্রমণ করিয়া জার্মানী যে প্রকৃতই প্রবল শক্তিশালী শত্রুর বিরুদ্ধে অভিযান চালাইয়া চলিয়াছে, একথা হিটলার স্পষ্টই স্বীকার করিয়াছেন। শীতের পূর্বেই এই যুদ্ধ শেষ হইয়া যাইবে না, তাই রুশিয়ার দারুণ শীতে নাৎসী সৈন্যদের যুদ্ধে, বিশেষ প্রতিরোধে প্রস্তুত হইতে সাবধান বাণী প্রদান করিয়াছেন। হিটলার স্বয়ং সৈন্যদের উপযুক্ত গরম পোষাকের জন্য আবেদন জানাইয়াছেন। মার্শাল টিমোশেঙ্কোর বিরুদ্ধে অভিযানকারী সৈন্যদলের অধিনায়কের পদ হইতে ফন্ বোককে সরাইয়া লইয়া

কাইটেলকে নিযুক্ত করা হইয়াছে বলিয়াও সংবাদ প্রচারিত হইয়াছে। ফন বোকের অপসারণের সংবাদ রয়টার মারফৎ একাধিকবার আমাদিগকে পরিবেশন করা হইয়াছে। এদিকে স্ট্যালিনগ্রাডের যুদ্ধে অত্যধিক সমরোপকরণের প্রয়োজন হওয়াতে জেনারেল রোমেলকে প্রয়োজনমত রণসম্ভার প্রেরণ করা যাইতেছে না বলিয়া বৈদেশিক সূত্র হইতে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। বহু প্রচারিত কিন্তু অসমর্থিত সংবাদগুলি বর্জন করিলেও বর্তমানে আফ্রিকার যুদ্ধ ঐ সংবাদের সমর্থন করিবে। আফ্রিকার যুদ্ধে বৃটিশ বাহিনী আক্রমণাত্মক অভিযান পরিচালনা করিতেছে, শত্রুকে আত্মরক্ষা ও অগ্রবর্তী ঘাঁটি হইতে পশ্চাদপসরণ করিতে বাধ্য করিতেছে। ২৩-এ অক্টোবরের আক্রমণ জেনারেল রোমেল-এর নিকট অপ্রত্যাশিত না হইলেও অতর্কিত; তাহার উপর বৃটিশ বাহিনীর সমরোপকরণের সংখ্যাধিক্য এবং সরবরাহসূত্র রক্ষা করিবার অধিকতর সুবিধা থাকাতে রোমেল-এর বাহিনীকে পশ্চাদপসরণ করিতে হইতেছে। সম্ভবত জেনারেল রোমেল বৃটিশ বাহিনীকে প্রতিরোধার্থ সৈন্য সমাবেশের মনস্থ করিয়াছেন হালফায়া গিরিবর্ত্মে। তাহার পূর্বে হাজার মাইল ব্যাপী বিচ্ছিন্ন সরবরাহ সূত্রের উপর নির্ভর করিয়া বৃটিশ বাহিনীকে বাধা প্রদানান্তর আক্রমণাত্মক অভিযান পরিচালনার উপযোগী স্থানের একান্ত অভাব। এদিকে লাডোগা হ্রদস্থিত এক দ্বীপে জার্মাণ বাহিনী অবতরণ করিতে চেষ্টা করিয়া বিতাড়িত হইয়াছে। স্ট্যালিনগ্রাডের ক্ষুধা মিটাইয়া নাৎসী জার্মানীর পক্ষে অন্যান্য রণাঙ্গনে প্রয়োজন মত সৈন্য ও সমরোপকরণ সরবরাহ হইয়া উঠিতেছে ক্রমশই দুরূহ। ইহার পর আছে আসন্ন শীতে প্রতিকূল অবস্থার প্রশ্ন। স্ট্যালিনগ্রাড যদি অধিকার করিতে না পারা যায় তাহা হইলে লালফৌজের চাপের মুখে সেখানে আত্মরক্ষার সমস্যাও বৃহৎ হইয়া দেখা দিবে। 'ট্যাঙ্ক সহর' আজ বিধ্বস্ত, প্রতিটি আশ্রয় স্থান সোভিয়েট সৈন্যে পূর্ণ। শত্রুর আক্রমণের চাপে পশ্চাদপসরণ কালে অত্যল্প দূরত্বের মধ্যে আশ্রয় নির্মাণ করিয়া শীতের তিরোভাবের প্রতীক্ষায় অপেক্ষা করাও কঠিন হইবে। প্রচুর সমরোপকরণ ও অগণিত জীবনের বিনিময়ে যে স্থান দখল করিয়া নাৎসী সৈন্য অগ্রসর হইয়াছে, আর এক দফা রণসম্ভার ও জীবন বিসর্জন দিয়া সেই পথেই নাৎসী বাহিনীকে প্রত্যাবর্তন করিতে হইবে। ইহার পর স্ট্যালিনগ্রাড অধিকারে অক্ষম হইয়া জার্মান বাহিনীকে যদি আবার প্রত্যাবর্তন করিতে হয় তাহা হইলে গত শীতের শেষে আক্রমণারম্ভের পর পূর্ব বৎসরের তুলনায় জার্মানী এবৎসর কতটুকু সাফল্য লাভ করিয়াছে সে প্রশ্নও আছে। সেইজন্যই হিটলারের বক্তৃতার মধ্যে আর সে দম্ভোক্তি নাই, অচিরে যুদ্ধের চরম পরিণতি আনিয়া দিবার আশ্বাস বাণীরও আজ একান্ত অভাব। তাই হিটলারকে বলিতে হয় জার্মান সৈন্যের রণদক্ষতা, প্রতিকূল অবস্থার গুরুত্ব এবং সোভিয়েট বাহিনীর অপূর্ব আত্মত্যাগের কথা।

দ্বিতীয় রণাঙ্গন

আমেরিকা, বৃটেন, ভারতবর্ষ ও অষ্ট্রেলিয়ার জনসাধারণ বহুবার মিত্রশক্তির দ্বিতীয় রণাঙ্গন সৃষ্টির প্রয়োজনীয়তার কথা বলিয়া আসিয়াছে। মিত্রশক্তির সমর পরিচালকগণ এই প্রয়োজনীয়তার বিষয় অস্বীকার করেন নাই। কিন্তু উপযুক্ত সময় না আসার কারণ দর্শাইয়া ক্রমশই আক্রমণের সময় পিছাইয়া দিয়াছেন। সৈন্য, রণসম্ভার, সরবরাহ প্রভৃতি বিবিধ প্রশ্নের অবতারণা করা হইয়াছে। এই সকল প্রশ্নের যৌক্তিকতা লইয়া আমরা 'ভারতবর্ষ'-এর গত আশ্বিন সংখ্যায় বিশদভাবে আলোচনা করিয়াছি, পুনরালোচনা নিষ্প্রয়োজন।

দিয়েপে 'কমাণ্ডো' আক্রমণের সময় অনেকে তাহা দ্বিতীয় রণাঙ্গন সৃষ্টির সূচনা বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। আক্রমণের উদ্যোগপর্ব দেখিয়া তাহা মনে করা নেহাৎ অস্বাভাবিক ছিল না। কিন্তু মার্কিন পত্রিকাতেই তাহাকে 'মহড়া' বলিয়া অভিমত প্রকাশিত হয়, সে আলোচনাও আমরা গত আশ্বিন সংখ্যায় করিয়াছি। কিন্তু এই প্রচণ্ড আক্রমণ প্রারম্ভেই নীরব হইয়া গেল কেন সে বিষয় অনেকদিন রহস্যাবৃত হইয়াই ছিল। কিন্তু গত ৩০-এ সেপ্টেম্বর হাউস অফ কমন্স-এ মিঃ চার্চিলের উক্তিতে ইহা

৩। মাল্টায় ব্রিটীশ বিমান-ধ্বংসী কামানের ক্রুগণ

পরিস্ফুট হইয়াছে। মিঃ চার্চিল জানাইয়াছেন দিয়েপ আক্রমণ কালে মিত্রশক্তির যে ক্ষতি হইয়াছে তাহার পরিমাণ অত্যন্ত অধিক। সমগ্র শক্তির প্রায় অর্দ্ধাংশ নষ্ট হইয়া গিয়াছে। তবে শত্রুদের নিকট তথ্যাদি গোপন রাখিবার নিমিত্ত সংখ্যাদি উল্লিখিত হয় নাই। মিত্রশক্তির এই বিপর্যয় দুঃখের সন্দেহ নাই, কিন্তু জার্মানী যখন রুশিয়ার সহিত কঠিন সংগ্রামে নিযুক্ত, তখন ফ্রান্সের উপকূলে শত্রুর সৈন্যের নিকট এই বাধা প্রাপ্তিতে মিত্রশক্তির সামরিক দিক হইতে যেসকল অসুবিধা, দৌর্বল্য ও তথ্যাদি সম্বন্ধে বাস্তব অভিজ্ঞতালাভ হইয়াছে তাহার মূল্যও যথেষ্ট।

রুশিয়ার জনসাধারণও মিত্রশক্তির দ্বিতীয় রণাঙ্গনের সৃষ্টি দেখিতে উন্মুখ ছিল। মিঃ উইল্‌কির উক্তিতেই তাহা প্রকাশ। রুশিয়ায় পদার্পণের পর মিঃ উইল্‌কির কথা—আমি দ্বিতীয় রণাঙ্গন সম্বন্ধে ৫০ বার জিজ্ঞাসিত হইয়াছি। তাঁহার উক্তিতে ইহা স্পষ্টই বলা হইয়াছে—দ্বিতীয় রণাঙ্গন সৃষ্ট না হওয়ায় রুশরা নিরাশ হইয়াছে। তাহাদের অনেকেরই ধারণা, তাহাদের সাহায্যের জন্য আমরা যাহা এবং যতটা করিতে পারিতাম তাহা ততটা যেন করি নাই। মিঃ উইল্‌কি এত খোলাখুলি ভাবে এই প্রসঙ্গ লইয়া আলোচনা করিয়াছেন যে, তাঁহার আলোচনার স্পষ্টতা লইয়া মার্কিন সেনেটে প্রশ্ন পর্যন্ত করা হইয়াছে।

কয়েক দিন পূর্বে দ্বিতীয় রণাঙ্গনের প্রশ্নে ষ্ট্যালিন বলেন যে, সোভিয়েট বর্তমানে দ্বিতীয় রণাঙ্গনের প্রশ্নকেই সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া মনে করে। নাৎসী শক্তির আঘাত একক ভাবে গ্রহণ করিয়া সোভিয়েট মিত্রশক্তিকে যেভাবে সাহায্য করিতেছে, তাহার তুলনায় সোভিয়েটের প্রতি মিত্রশক্তির সাহায্য অতি অল্পই কার্যকরী হইয়াছে। বর্তমান জগতের শ্রেষ্ঠ রাজনীতিকের এই খেদোক্তি যে কোন্ মনোভাব হইতে উদ্ভূত তাহার ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন। আর এ কথা অবশ্যই স্বীকার্য যে, এই সমষ্টি যুদ্ধের চরম পরিণতির জন্য দ্বিতীয় রণাঙ্গনের সৃষ্টি আবশ্যক এবং আজ অথবা

দুইদিন পরেই হউক, মিত্রশক্তিকে আপন প্রয়োজনেই তাহা সৃষ্টি করিতে হইবে।

গত ২২ তারিখে ফিল্ড মার্শাল স্মাটস্‌ও বলিয়াছেন, আমরা যুদ্ধের চতুর্থ বৎসরে উপনীত হইয়াছি। আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধের অধ্যায় শেষ হইয়া গিয়াছে, এখন আসিয়াছে আক্রমণমূলক যুদ্ধ পরিচালনার পর্ব। একবার সুযোগ আসিলে দেরি করা মূর্খতা এবং তাহাতে হয়তো সুযোগ পর্যন্ত হারাইতে হইতে পারে: Once the time has come to take the offensive it would be a folly to delay and perhaps, miss the opportunity. Nor are we likely to do so. সোভিয়েটের সংগ্রাম ও মিত্রশক্তির সাহায্য প্রদান সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে ফিল্ড মার্শাল স্মাট্‌স্‌-এর উক্তি স্পষ্ট—আমাদের সম্মিলিত ভাবে বহনের বোঝার যে অংশ সোভিয়েট বহন করিতেছে তাহা উহার আপন অংশ অপেক্ষা অধিক। কিন্তু এই আক্রমণাত্মক অভিযান পরিচালনার সুযোগ মিত্রশক্তি কবে গ্রহণ করে, মিত্রশক্তির সমর্থক প্রতিটি রাষ্ট্র তাহারই জন্য আজ অপেক্ষা করিয়া আছে।

সুদূর প্রাচী ও ভারতবর্ষ

সুদূর প্রাচীর যুদ্ধে গত কয়েক দিবস যাবৎ দক্ষিণ-পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরে জাপানের বিশেষ তৎপরতা লক্ষিত হইতেছে। নিউগিনি ও সলোমন দ্বীপপুঞ্জে যে সকল জাপবাহিনী সংঘর্ষে লিপ্ত ছিল তাহাদের সাহায্যার্থ জাপান এক নৌবহর প্রেরণ করে। রণতরী, ক্রুজার, ডেষ্ট্রয়ার ছাড়াও বিমানবাহী জাহাজ এবং ট্যাঙ্ক প্রভৃতি স্থলযুদ্ধের উপযোগী প্রভূত রণসম্ভার এই নৌবহর বহণ করিয়া আনে। গত ২৫-এ অক্টোবর ট্যাঙ্ক যুদ্ধে চারবার জাপবাহিনী মার্কিণ ব্যূহ ভেদ করিবার চেষ্টা করে, কিন্তু প্রতিবারই অকৃতকার্য হয়। গুয়াদালকানারের উত্তর-পশ্চিম কোণে কিছু জাপসৈন্য অবশ্য অবতরণ করিতে সক্ষম হয়। নিউগিনির ওয়েন স্ট্যানলী অঞ্চলে এবং গুয়াদালকানার-এ কয়েকদিন যাবৎ প্রবল সঙ্ঘর্ষ চলিয়াছে। নৌবিভাগের ইস্তাহারে প্রকাশ সলোমনের যুদ্ধে গত ২৮ তারিখ পর্যন্ত হইয়াছে। সান্তাক্রুজ হইতে কিছুদূরে অক্ষশক্তি মার্কিনের ৪টি বিমানবাহী জাহাজ ও একটি যুদ্ধজাহাজ ডুবাইয়া দিবার যে দাবী করিয়াছে সে সম্বন্ধে কর্ণেল নক্স বলিয়াছেন যে, ইহা জাপানের আর একটি মাছ ধরা অভিযান। নিউগিনির যুদ্ধে মিত্রশক্তি কিছু সাফল্য লাভ করিয়াছে। ওয়েন স্ট্যানলী অঞ্চলে শত্রুপক্ষ পশ্চাদপসরণে বাধ্য হইয়াছে। মিত্রশক্তির বিমানবাহিনী রেকেতা উপসাগরস্থ শত্রু জাহাজের উপর বোমা বর্ষণ করিয়া আসিয়াছে। কোকোদার সাত মাইলের মধ্যে অবস্থিত আলোলা মিত্রশক্তির হাতে আসিয়াছে। মিত্রশক্তির বর্তমান গতি অক্ষুণ্ণ থাকিলে শীঘ্রই মিত্রশক্তির পক্ষে কোকোদায় উপনীত হওয়া সম্ভব। সলোমনের উত্তরাংশে বুনা অঞ্চলেও মিত্রশক্তির বিমানবহর বোমা বর্ষণ করিয়া আসিয়াছে। গত ৩১-এ অক্টোবর কর্ণেল নক্স ঘোষণা করেন যে সলোমন হইতে জাপ নৌবহর তাহাদের ঘাঁটিতে প্রত্যাবর্তন করিয়াছে। এই প্রত্যাবর্তনের সঙ্গে জাপ আক্রমণের প্রথম পর্যায় শেষ। কিন্তু এখনও ইহার ফলাফল ও উভয় পক্ষের ক্ষতির বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায় নাই।

এদিকে জাপানের সম্ভাবিত আসন্ন অভিযান সম্বন্ধে আমাদের ভবিষ্যদ্‌বাণী সফল হইয়াছে। ইয়োরোপ, আমেরিকা ও চীনের বিভিন্ন রাজনীতিক মহল যখন একাধিকবার স্থিরতার সহিত অভিমত প্রকাশ করিলেন যে, জাপ কর্তৃক সাইবেরিয়া আক্রমণ আসন্ন, আমরা তখন তথ্যাদি ও যুক্তি-সহকারে পাঠকবর্গকে জানাইয়াছিলাম ইহার সম্ভাবনা কত কম। কোন্ পারিপার্শ্বিক অবস্থায় এবং কিরূপ ঘটনাচক্রে জাপ কর্তৃক সাইবেরিয়া আক্রমণ সম্ভব সে সম্বন্ধে আমরা 'ভারতবর্ষ'-এর একাধিক সংখ্যায় বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছি। জাপানের অষ্ট্রেলিয়া আক্রমণের সম্ভাব্যতা লইয়া কূটনীতিক মহলে যে সকল গবেষণা চলিতেছিল সে সম্বন্ধেও আমরা পাঠকবর্গকে আমাদের অভিমত জানাইয়াছি। আমাদের মন্তব্য এবারও নির্ভুল হইয়াছে। যুক্তি ও তথ্যের আলোচনা বর্তমান প্রবন্ধাংশে অপ্রাসঙ্গিক না হইলেও 'ভারতবর্ষ'-এর অন্যান্য একাধিক সংখ্যায় আলোচিত হওয়ায় আমারা তাহার পুনরুল্লেখে বিরত রহিলাম।

ভারতবর্ষ সম্বন্ধে জাপানের অবহিত হওয়ার যে সম্ভাবনা আমরা সন্দেহ করিয়াছিলাম তাহা অবশেষে সত্যে পরিণত হইয়াছে। গত ২৫-এ অক্টোবর জাপ বিমানবহর ডিব্রুগড় অঞ্চলে বোমা-বর্ষণ করিয়াছে। প্রথম দিনের আক্রমণে ৫০টি বোমারু বিমান এবং ৪৫টি জঙ্গী বিমান যোগদান করিয়াছিল বলিয়া অনুমিত হয়। ডিব্রুগড়স্থ মার্কিন বিমান ঘাঁটিই প্রধানত লক্ষ্য ছিল। কয়েকটি মালবাহী বিমান ও ভূমির উপর স্থিত অন্তত ১০টি জঙ্গী বিমান ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। পরদিন ২৭টি জাপ বিমান ৫টি পর্যবেক্ষণকারী বিমানসহ পুনরায় আসাম বিমানঘাঁটিতে হানা দেয়। রাজকীয় বিমান বাহিনীর আক্রমণে অন্তত ৪টি শত্রু বিমান বিনষ্ট হইয়াছে।

গোলা বিস্ফোরণের মধ্য দিয়া অগ্রসরমান অতিকায় সোভিয়েট ট্যাঙ্ক

ভারতস্থ মার্কিনবাহিনীর চিফ্ পাবলিক রিলেশন অফিসার লেঃ জেনারেল বিসেল জানান যে, মিট্‌কিয়ানা, লোই-উইং এবং লাসিও হইতে জাপ বিমান-বহরের এই আক্রমণ পরিচালনা করা সম্ভব। অন্যান্য ঘাঁটি ভারত সীমান্ত হইতে আরও দূরে পড়ে। জাপ বিমান কর্তৃক আসাম সীমান্ত ও চট্টগ্রামের সন্নিকটস্থ অঞ্চল আক্রান্ত হইবার পর ২৪ ঘণ্টার মধ্যে

জাপানের ২খানি রণতরী সলিল সমাধি লাভ করিয়াছে এবং আরও তিনটি জাহাজ, একটি বিমানবাহী জাহাজ এবং দুইটি ক্রুজার ক্ষতিগ্রস্ত

রাজকীয় বিমান বাহিনী ঐ সকল অঞ্চলে বিমান আক্রমণ চালায়। গত ২৭ অক্টো: তারিখে ২৫টি বোমারু বিমান লাসিওতে শত্রুঘাঁটিতে আক্রমণ করে। জাপ বিমানবহর ভারত-সীমান্ত আক্রমণের দুইদিন পূর্বেই মার্কিন বিমান হংকং-এ বিমান হইতে বোমাবর্ষণ করিয়া আসে। আক্রমণের পর দিবস হংকং এবং ক্যান্টন-এ বিমান আক্রমণ পরিচালনা করা হয়। জাপানের এই আক্রমণ কোন বৃহত্তর আক্রমণের সূচনা কিনা এ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হইয়া লেঃ জেনারেল বিসেল বলেন যে, অদূর ভবিষ্যতে জাপান কোন বৃহৎ অভিযান পরিচালনার জন্য এখনও প্রস্তুত নয়। যে সকল অঞ্চলে মিত্রশক্তির ঘাঁটি স্থাপিত হইয়াছে, সেই সকল স্থান হইতে জাপ আক্রমণকে সাফল্যজনকভাবে বাধা প্রদান করা যথেষ্ট সহজ।

কিন্তু জাপানের এই ভারত সীমান্তে আক্রমণের কি প্রয়োজন? সামরিক এবং রাজনীতিক কারণ লইয়া আমরা 'ভারতবর্ষ' এ পূর্বে একাধিক সংখ্যায় আলোচনা করিয়াছি। জাপানের নিকট ভারতের গুরুত্ব বর্তমানে অত্যন্ত অধিক। ব্রহ্ম, মালয়, সিঙ্গাপুর প্রভৃতি পুনরুদ্ধার করিবার জন্য ভারতবর্ষই এখন মিত্রশক্তির প্রধান ঘাঁটি। ব্রহ্মে অভিযান করিতে হইলে ভারতবর্ষ হইতেই করিতে হইবে। চীনের যুদ্ধের সাফল্য বহু পরিমানে নির্ভর করিতেছে ভারতবর্ষের উপর। মিত্রশক্তির সাহায্য ভারত দিয়া চুংকিং-এ প্রেরণের ব্যবস্থা হইয়াছে, ভারতের পূর্ব সীমান্ত হইতে বিমান পথে সম্ভব মত রণসম্ভার সরবরাহ করা হইতেছে। আর্থিক লাভের দিক দিয়া বিচার করিলেও জাপানের নিকট ভারতের মূল্য যথেষ্ট। জার্মানীর সহিত সংযোগ রাখিতে হইলে একদিকে যেমন ভারত মহাসাগর দিয়া জলপথে সম্বন্ধ স্থাপন করা সম্ভব, অপর পক্ষে তেমনই স্থলপথে ভারত দিয়া সংযোগ রক্ষার ব্যবস্থা করা চলিতে পারে। ভারতের বর্তমান রাজনীতিক আন্দোলনও জাপানের অনুকূলে দাঁড়াইয়াছে। কংগ্রেস তথা সর্বভারতীয় নেতাদের গ্রেপ্তার করিয়া ভারত সরকার যে অবস্থার সৃষ্টি করিয়াছেন তাহা ভারতবাসীর অনভিপ্রেত। ভারতের জনসাধারণ চায় ভারতে জাতীয় সরকারের প্রতিষ্ঠা এবং অক্ষশক্তির সম্ভাব্য অভিযানে বাধা প্রদান। কিন্তু কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের গ্রেপ্তারের ফলে যে বিক্ষোভের সৃষ্টি হইয়াছে এবং সেই বিক্ষোভ দমন করিবার যে পদ্ধতি সরকার গ্রহণ করিয়াছেন তাহাতে ভারতের অবস্থা আরও খারাপই দাঁড়াইয়াছে। পঞ্চম বাহিনী এই আন্দোলনকে আপন স্বার্থসিদ্ধির অনুকূলে লাভ করিয়াছে। যুদ্ধ সাহায্যে ও সরবরাহে বাধা প্রদান করিয়া অক্ষশক্তির আসন্ন আক্রমণের সম্মুখে সংগঠনহীন আন্দোলনকারিগণ ভারতকে আরও অপ্রস্তুত অবস্থায় আনয়ন করিয়াছে। আন্দোলনকারীদিগকে এই প্রশ্ন—আড়াই মাস যাবৎ আন্দোলন চালাইয়া জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠার পথে তাহারা ভারতবর্ষকে কতখানি আগাইয়া দিয়াছে? ভারত সরকারকেও আমরা শুধাই, এই আন্দোলন দমনের যে মুষ্টিযোগ তাঁহারা আবিষ্কার করিয়াছেন তাহাতে অক্ষশক্তির আসন্ন আক্রমণে সাফল্যজনক বাধা প্রদানের উদ্দেশ্য সফল হইয়াছে কতখানি? জাতীয় সরকার গঠনের জন্য এবং অক্ষশক্তির আক্রমণের বিরুদ্ধে সর্ব ভারতীয় প্রতিরোধ প্রদানের জন্য প্রয়োজন,—জাতীয় ঐক্য। ইংলণ্ড, আমেরিকা ও চীনের বিভিন্ন রাজনীতিকগণ বৃটিশ সরকারকে অবিলম্বে ভারতের সহিত একটি সন্তোষজনক বোঝাপড়া করিতে উপদেশ দিতেছেন। ভারতের জনসাধারণও আজ জাপ আক্রমণ ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবিত জাপ অভিযানকে সাফল্যের সহিত প্রতিরোধে ইচ্ছুক।

অবশ্য একটা প্রশ্ন উঠিতে পারে, জাপান যদি বর্তমানে রুশিয়া আক্রমণে ইচ্ছুক না থাকে তাহা হইলে নমুরা এবং এব্-এর আঙ্কারা পরিভ্রমণের উদ্দেশ্য কি? জাপানের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা জানিতে হইলে জাপানের সহিত রুশিয়া ও ইয়োরোপের অন্যান্য রাষ্ট্রের সম্পর্ক কি সে সম্বন্ধে অবহিত হওয়া প্রয়োজন। রুশিয়ার সহিত জাপানের সম্পর্ক কি, সাইবেরিয়া জাপানের প্রয়োজন কেন এবং উহা লাভ করিলে তাহার কোন্ স্বার্থসিদ্ধ হয়, কেনই বা জাপান ইতিমধ্যে সাইবেরিয়া আক্রমণ করিল না; কোন্ অবস্থায় কিরূপ স্থান কালের সমন্বয়ে এই আক্রমণ সম্ভব—এই সকল বিষয় সম্বন্ধে আমরা ভারতবর্ষ-এর আশ্বিন ও অন্যান্য সংখ্যায় আলোচনা করিয়াছি। জাপানের সহিত ইয়োরোপের অন্যান্য রাষ্ট্রের কিরূপ সম্পর্ক তাহাও স্মরণ রাখা আবশ্যক। রুশিয়ার পশ্চিম প্রান্তস্থ ইয়োরোপীয় রাষ্ট্রগুলির সহিত জাপান সকল সময়ে একটা বন্ধুত্ব সম্পর্ক স্থাপন ও পোষণ করিয়া আসিয়াছে; ইহা তাহার রাজনীতিক কৌশলের অন্তর্গত। রুমানিয়া এবং পোলণ্ড সম্বন্ধে জাপান কোনদিন বিরুদ্ধ ভাব প্রদর্শন করে নাই। ভূতপূর্ব নৃপতি ক্যারল যুবরাজ অবস্থায় টোকিও পরিভ্রমণ করিয়া আসিয়াছিলেন। জাপানের এই হৃদ্যতা পোষণের উদ্দেশ্য—সে যখন রুশিয়া আক্রমণ করিবে (জাপান জানে একদিন রুশিয়ার সহিত তাহার বিরোধ বাধিবেই) সেই সময় রুশিয়ার পশ্চিম সীমান্তস্থিত ঐ সকল রাষ্ট্রের নিকট হইতে সে সাহায্য পাইবে। কিন্তু রাজনীতি অপরিচিতকেও শয্যাংশ প্রদান করে। রুশিয়া জাপান দ্বারা আক্রান্ত হইবার পূর্বেই অন্যান্য ইয়োরোপীয় শক্তি দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছে। ফলে একদিকে যেমন তাহার পূর্ব সৌহার্দ পোষণ নীতি তাহাকে ঐ সকল রাষ্ট্রের নিকট লোক প্রেরণে বাধ্য করিয়াছে অপরদিকে তেমনই অক্ষশক্তির প্রধান সহযোগী জার্মানীর অবস্থা সম্বন্ধে পরিজ্ঞাত হওয়াও তাহার পক্ষে প্রয়োজনীয় হইয়া পড়িয়াছে। জার্মানী শীতের পূর্বে ককেশাস কুক্ষীগত করিতে পারে নাই, রবার প্রভৃতি একাধিক কাঁচা মালের জন্য তাহাকে জাপানের মুখাপেক্ষী হইতে হইয়াছে, তুরস্ক এখনও নিরপেক্ষই রহিয়া গিয়াছে, তাহার উপর জার্মানী যখন রুশিয়ার সহিত জীবন-মরণ সংগ্রামে লিপ্ত, জাপান তখন মিত্রশক্তিকে অন্য রণাঙ্গনে ব্যাপৃত রাখুক এবং রুশিয়াকে পূর্বদিকে আক্রমণ করিয়া তাহার ভার কিছু লাঘব করিয়া
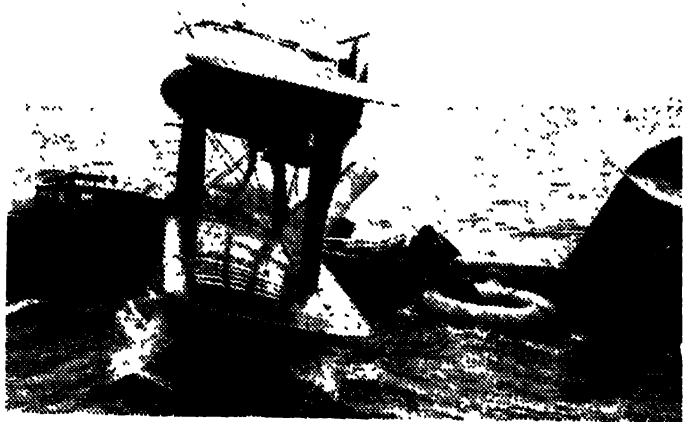
সমুদ্র বক্ষে ব্রিটিশ বিমান রক্ষী, বিমানবাহী চালকের প্রাণ রক্ষা করিতেছে

দিক—জাপানের নিকট জার্মানীর এই প্রত্যাশা অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু লোকসানের কারবারে কেহ টাকা ঢালিতে রাজী হয় না, অর্থ প্রদানের

পূর্বে কারবায়কে যাচাই করিয়া দেখিতে চায়, জাপানও তাহাই চাহিয়াছে। এই উদ্দেশ্যেই নমুরা এবং এব্‌-এর আঙ্কারা গমন। জার্মানীর সামরিক ও অর্থনীতিক শক্তি বর্তমানে কতখানি, যতটা সাহায্য জার্মানী তাহার নিকট প্রত্যাশা করে ততটা সাহায্য নিরাপদে তাহাকে করা চলে কিনা, তুরস্কের এই নিরপেক্ষতার অর্থ কি—এই সকল বিষয়ে তথ্যাদি পরিজ্ঞাত হইবার জন্যই বার্লিন ও রোমের জাপ নৌ-উপদেষ্টাদের আঙ্কারায় আগমন বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে। অবিলম্বে রুশিয়া আক্রমণের অসুবিধার কারণ আমরা বলিয়াছি, প্রাচ্যে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার স্বপ্নকে বাস্তবে পরিণত ও কায়েম করিতে হইলে ভারতে ও যে প্রভাব বিস্তার প্রয়োজন তাহাও জাপান জানে। এই উদ্দেশ্যেই ভারতের প্রতি অবহিত না হইয়া জাপানের উপায় নাই। ভারতের গুরুত্ব বর্তমানে কতখানি তাহাও পূর্বেই বলা হইয়াছে, আর ইহারই জন্য জাপানের পক্ষে ভারত আক্রমণ প্রয়োজন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বর্তমানে জাপান যে তাহার সীমাবদ্ধ শক্তি লইয়া ভারত আক্রমণ দ্বারা মিত্রশক্তির সহিত শক্তি পরীক্ষার উদ্যোগী হইতে পারে না তাহা জাপান জানে; কিন্তু প্রয়োজন কখনও যোগ্যতার অপেক্ষা করে না। বিশেষ জাপান ইহাও বুঝে যে ভারতে অভিযান পরিচালনা করিতে হইলে আগামী বর্ষার পূর্বেই তাহা শেষ করিতে হইবে। বর্তমানে জাপান এই দুই বিপরীতমুখী সমস্যার সম্মুখীন। তাই আজ ভারত সীমান্তে বিমান আক্রমণ পরিচালনার দ্বারা সে আপনার অভিপ্রায় সাধন করিতে প্রয়াসী। ইহাতে একদিকে যেমন মিত্রশক্তিকে প্রাচ্য রণাঙ্গনে ব্যাপৃত রাখিবার অজুহাত জার্মানীকে প্রদর্শন করান যাইবে, অপর দিকে তেমনই জার্মানীর দাবীমত সাহায্য প্রদান দ্বারা স্বখাত সলিলে আত্মনিমজ্জনের অনভিপ্রেত অবস্থা হইতে আপাতত আপনাকে রক্ষা করাও সম্ভব হইবে। তবে অক্ষশক্তির চুক্তি অনুযায়ী জার্মানীকে সাহায্যের জন্য মিত্রশক্তিকে আক্রমণ করা প্রয়োজন হইলেও জাপান জানে বর্তমানে তাহার আক্রমণাত্মক যুদ্ধ পরিচালনার ক্ষমতা নাই। টোকিও হইতে বহুশত মাইল দূরবর্তী স্থান সে অধিকার করিয়াছে, বিভিন্ন অঞ্চলে তাহার সামরিকশক্তি বর্তমানে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় অবস্থিত, বৃটিশ ও মার্কিণ সম্মিলিত শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম পরিচালনা এখন তাহার পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু মালয়, ব্রহ্মদেশ প্রভৃতি যে সকল অঞ্চল সে হস্তগত করিয়াছে সেখানে অধিকার প্রতিষ্ঠা ও রক্ষা করা তাহার প্রয়োজন, তদুপরি জেনারেল ওয়াভেল স্পষ্টই জানাইয়াছেন যে,
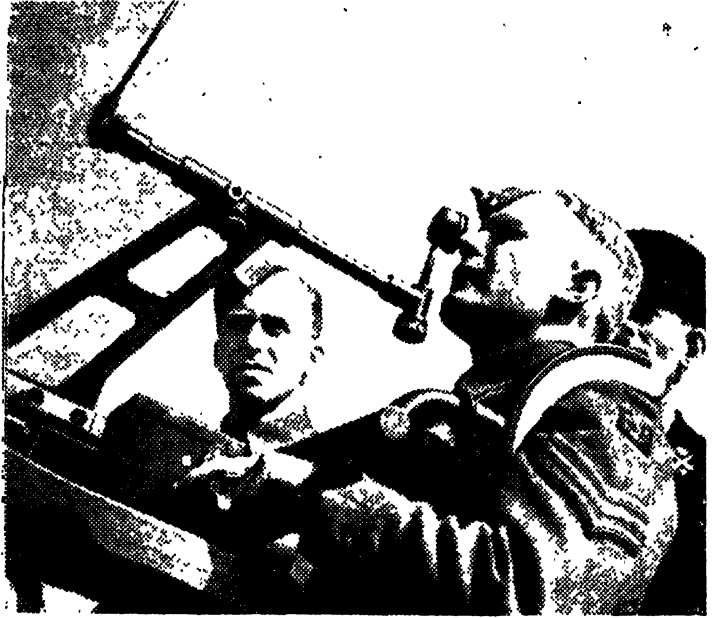
মালবাহী জাহাজ-রক্ষী বৃটিশ নৌবাহিনী

অদূর ভবিষ্যতে ভারত হইতে আক্রমণ পরিচালনা করিয়া ব্রহ্মদেশ পুনরায় উদ্ধার করা হইবে। এই সকল কারণে জাপান বর্তমানে স্নায়ুযুদ্ধের পন্থা গ্রহণ করিয়াছে। জাপান আশা করে এইভাবে স্নায়ুযুদ্ধ চালাইয়া সে যদি কিছুদিন কাটাইয়া দিতে পারে তাহা হইলে মিত্রশক্তিকে প্রাচ্যে দ্বিতীয় রণাঙ্গন সৃষ্টিতে বিঘ্ন সৃষ্টি করা সম্ভব। এই সময়ের মধ্যে একদিকে যেমন সে আপনার শক্তিকে সাধ্যমত সংহত করিয়া লইবার অবসর লাভ করিবে, অপরদিকে তেমনই ইয়োরোপের রণাঙ্গনে যুদ্ধের অবস্থার পরিবর্তন অনুযায়ী আপনার ভবিষ্যৎ পন্থাও সে নির্ণয় করিতে সমর্থ হইবে। কিন্তু ইয়োরোপের যুদ্ধের অবস্থা যদি অক্ষশক্তির প্রধান সহযোগী জার্মানীর প্রতিকূলে যায়, তাহা হইলে অক্ষশক্তির অন্যতম সহযোগী জাপানের ইতিহাস রণদেবতা কর্তৃক কি ভাবে লিখিত হইবে, অদূর ভবিষ্যৎই সেই রহস্য উদ্‌ঘাটন করিয়া দিবে। ১-১১-৪২

নিবেদন

শ্রীননীগোপাল গোস্বামী বি-এ

আমার সমাধি পরে না জ্বালিও ভুল করে,
সাঁঝের দীপালী-সাথীটিরে;
কি ফল তা' শোভিবার দিয়ে ফুল-মালা-হার
ভুলাতে অবোধ মনটিরে।

আর এক নতি আছে, তোমা সবাকার কাছে,
মাগি আমি, পুরায়ো কামনা,
বুল্‌বুলে ক'র মানা গান গেয়ে দিতে হানা,
ভ্রান্ত সে যে?—আমি শুনিব না।*

* লাহোরে নুরজাহানের সমাধি-গাত্র-খোদিত তাঁহার স্বরচিত পারসী কবিতা হইতে অনুদিত।

সমস্যার স্বরূপ

বর্ত্তমান যুদ্ধ সঙ্কটে এমন কয়েকটা ঘটনা ঘটেছে যার ফলে একটা গুরুতর সমস্যার আসল রূপটা আমাদের সামনে অনেকটা স্পষ্টভাবেই ধরা পড়েছে। সে ঘটনাগুলি সংঘটিত হয়েছে গত শীতের আরম্ভে এবং প্রায় সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে।

নূতন গ্রামের হাটবাজার, বাগান ও হ্রদের দৃশ্য

ফলে নিতান্ত দায়ে পড়ে বহু সহরবাসী গ্রামে গিয়ে বাস করতে বাধ্য হয়েছিলেন। বিস্মৃতপ্রায় পল্লীগ্রামের হৃতশ্রী পল্লীভবনের কথা স্মরণ করে অনেকে আবার গ্রামে না গিয়ে কলকাতার সুখ ও সুবিধা পাওয়া যায় এমন সব ছোটখাট মফঃস্বলের সহরে গিয়ে বাসা বাঁধলেন। আর একদল কলকাতার কাছাকাছি স্বাস্থ্যকর স্থান হিসাবে খ্যাত যে সব জায়গা, সেইখানে গিয়ে আস্তানা নিলেন।

সহরের ভাড়াবাড়ীগুলি প্রায় জনশূন্য হয়ে পড়ল; পথের দুধারে বাড়ীগুলির দরজা জানলা প্রায় বন্ধ; আলোক নিয়ন্ত্রণের ফলে সাহস পেয়ে চাঁদের আলো সহরের পথের উপর ছিটকে এসে পড়ল। সহর দেখতে দেখতে রূপকথার ঘুমন্ত রাজপুরীতে পরিণত হয়ে উঠল।

তারপর! আলোকনিয়ন্ত্রণের বিধিনিষেধের কোনো পরিবর্ত্তন হল না; পারিপার্শ্বিক অবস্থারও উন্নতি হ'ল না; কিন্তু তবুও যাঁরা সহর ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন বা স্ত্রী পুত্রকে সহরের বাইরে রেখে এসেছিলেন তাঁরা আবার ধীরে ধীরে সহরে ফিরে আসছেন ও স্ত্রীপুত্রকে সহরে ফিরিয়ে আনছেন। যে বিপদ আগে ছিল অনিশ্চয়তার দূরত্বের ব্যবধানে, সে বিপদ এখন অদূরত্বের নিশ্চয়তায় এগিয়ে এসেছে জেনেও? এর কারণ কি?

এর কারণ প্রধানতঃ—দু'টা। প্রথম যাঁরা গত ডিসেম্বর মাস থেকে সহর ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন, তাঁরা এই সহর ত্যাগ ও পল্লীগ্রাম বাস একটা সাময়িক ব্যাপার মনে করেছিলেন—যেমন লোকে পূজাবকাশে পশ্চিমে বা পাহাড়ে হাওয়া বদলাতে যায়। দ্বিতীয়ত পল্লীগ্রামে থাকতে গেলে যে সব অসুবিধা ও অস্বাচ্ছন্দ্যের সম্মুখীন হতে হবে, সেগুলি সম্বন্ধে আমাদের কিছু কিছু ধারণা থাকলেও সেগুলি অকাতরে সহ্য করতে আমরা আর প্রস্তুত নই। আসল কথা হল এই যে, বর্ত্তমান যুগ পরিবর্ত্তনের সঙ্গে আমাদের মানসিক ভঙ্গীরও পরিবর্ত্তন ঘটেছে

১ উদ্যান
২ গ্রামকেন্দ্র
৩ শিক্ষা ও শাসনকেন্দ্র
৪ শিল্পকেন্দ্র
৫ বাণিজ্য কেন্দ্র
৬ বাজার
৭ রেল লাইন
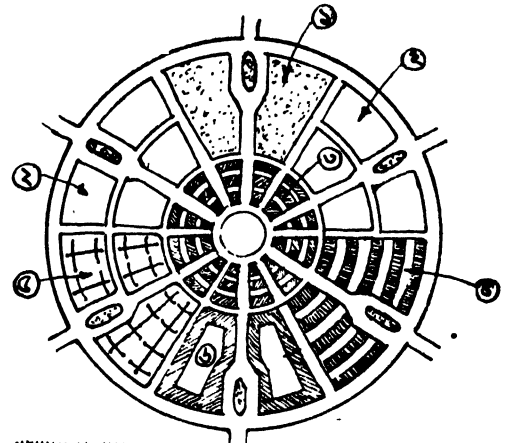
আধুনিক পল্লীসহরের পরিকল্পনা

অথচ আমাদের পুরাতন সেই পল্লীগ্রামগুলি অপরিবর্ত্তিতই রয়ে গিয়েছে। আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা যে ভাবে গ্রামে বাস করে গিয়েছেন, সহরবাসে অভ্যস্ত আমরা আর সেই ভাবে গ্রামে বাস করতে প্রস্তুত নই। সুতরাং শুধু "গ্রামে ফিরে চল" ধুয়া ধরে কিংবা সাময়িক চাপে পড়ে আমরা গ্রামে ফিরে যেতে পারি কয়েকদিনের জন্য; স্থায়ীভাবে নয়। স্থায়ীভাবে ফিরে পল্লীগ্রামে বাসের ব্যবস্থা করতে হলে আমাদের মানসিক ভঙ্গীর পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে পল্লীগ্রাম ও পল্লী সহরগুলিরও পরিবর্ত্তন করতে হবে এবং এই সঙ্গে সঙ্গে পল্লীগ্রাম ও পল্লীসহর বাসীরা যাতে স্বগ্রামে বারোমাস বাস করে অর্থোপার্জ্জন করতে পারে এমন সব ব্যবস্থা নিরূপণ করতে হবে।

ঠিক কি ধরণের ব্যবস্থা বর্ত্তমান যুগের উপযোগী হতে পারে সে আলোচনা করার পূর্ব্বে, বর্ত্তমান সঙ্কটের সুযোগ নিয়ে পল্লীগ্রাম ও পল্লী সহরগুলিকে সহরে ছাঁচে ঢালবার যে ব্যবস্থা করা হয়েছে ও হচ্ছে; সে গুলির ব্যবস্থা আলোচনা করা বোধহয় নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

গ্রামপথে যেতে যেতে রাস্তার পাশে অনাবাদী পোড়ো জমি অনেক সময় দেখতে পাওয়া যায় এবং আমাদের দেশে এই ধরণের "ডাঙ্গা" জমির পরিমাণও বড় কম নয়। বর্ত্তমান সঙ্কটের সুযোগে এই সকল "ডাঙ্গা" জমির মালিকেরা সেই পোড়ো জমিটাকে নিজের খুসী মতো ভাগ করে বিক্রী করার ব্যবস্থা করেছেন। কলকাতায় ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাষ্ট যেমন নক্সায় পথ ঘাট দেখিয়ে জমির টুক্‌রো বিক্রী করে এখানেও প্রায় সেই ব্যবস্থা; কাগজের নক্সায় রাস্তা, পুকুর, লেক, বেড়াবার বাগান প্রভৃতি দেখান আছে। সহরের বাসিন্দারা সেই নক্সা দেখে, অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করে, রীতিমত সেলামী দিয়ে অনেকে জমি কিনে ফেললেন এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বাড়ী তৈরী করার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়লেন।

গ্রামে ইমারতি দ্রব্যের সন্ধান নিতে গিয়ে দেখা গেল যে ইট যদি বা জোগাড় করা যায় বাকী জিনিসের জন্য কলকাতার মুখাপেক্ষী হওয়া ছাড়া উপায় নেই। তার উপর বাড়ী তৈরী করার জন্য যেটুকু জলের প্রয়োজন তার যোগাড় করতে গেলে কুয়া খুঁড়তে হবে এবং এই কুয়া খোঁড়ার লোকও নিতান্ত সুলভ নয়। অনেকে হাঙ্গামা দেখে বাড়ী তৈরীর কাজ বন্ধ রাখলেন। উৎসাহী যাঁরা তাঁরা আরও কিছুটা অগ্রসর হলেন, কুয়াও খোঁড়া হল। বাড়ীর ভিত্‌ কাটা সুরু করে দেখা গেল, ধূ ধূ মাঠ, নক্সায় দেখান রাস্তা কাগজেই আঁকা—বাস্তবে আছে কোদালে দাগান দুটী সমান্তরাল রেখা মাত্র। নক্সায় দেখান লেক্‌ বা বাগান তখনও অস্তিত্ব পরিগ্রহ করেনি। দু' একটী বাড়ীর ভিৎ বা খোঁড়া হল, সেখানে কাজ বেশী অগ্রসর হল না, খানিকটা মাল মশলার অভাবে, খানিকটা যানবাহনের অভাবে—আর খানিকটা লোকজনের অভাবে। মালমশলা যোগাড় করার হাঙ্গামা দেখে অনেকক্ষেত্রে কাজ বন্ধ হয়ে গেল। যে কটী বাকী রইল তার মালিকরা এই তেপান্তর মাঠে প্রায় একলা বাস করার কথা চিন্তা করে নিরুৎসাহিত হয়ে কাজ বন্ধ করে দিলেন।

নতুন বাড়ী করে গ্রামে বাস করার বা'না এইভাবে অঙ্কুরেই বিনষ্ট হল; এইবার দেখা যাক্‌ যারা গ্রামে নিজেদের বাড়ীতে বা বাড়ী ভাড়া করে সপরিবারে বাস কচ্ছিলেন তাঁদের কি অবস্থা হল!

শীতের সুরু থেকে বাংলাদেশের পল্লীগ্রামগুলির অবস্থা কিংবা সাঁওতাল পরগণার তথাকথিত স্বাস্থ্যনিবাসগুলির আবহাওয়া বেশ উপভোগ্য। কলকাতা ছেড়ে মেঠো দেশগুলির হাওয়া প্রথমটা বেশ ভালই লাগে। একটু আধটু অসুবিধা ততটা লোকে গ্রাহ্যই করে না। খাদ্য দ্রব্যের অপ্রতুলতা দুচার দিনের পর অনেকটা সহনীয় মনে হয়। যতদিন শীতের হাওয়া বয় ততদিন মোহাৎ মন্দ লাগে না, কিন্তু তারপর যখন শীতের হিমেল হাওয়া গ্রীষ্মের উষ্ণতায় রুষ্ট হয়ে দেখা দেয় তখন দেখা গেল কূপের জলের পরিমাণ গেছে কমে, জলের রঙ্‌ গেছে বদলে। মাঠের সবুজ ঘাস শুকিয়ে তামাটে হয়ে উঠেছে।

জলের অভাবের সঙ্গে সঙ্গে গ্রীষ্মকালের আনুসঙ্গিক রোগের উপদ্রব সুরু হল। এই সঙ্গে দেখা গেল জমাদারের (মেথরের) অনিয়মিত হাজিরার অসঙ্গত অজুহাত। লোকের মন ধীরে ধীরে পল্লীবাসের উপর বিরক্ত হয়ে উঠল।

এই সকল অসুবিধার উপর কালবৈশাখীর উৎপাতে পল্লীগৃহের অস্পষ্ট দুর্ব্বলতা সুস্পষ্ট হয়ে উঠল। ছাদের ফাটলে দেখা দিল জল, দেয়ালের ফাটলে দেখা গেল বিছা, আর জমির উপর দেখা গেল নানা বর্ণের সাপ। সহরবাসে অভ্যস্ত জনসাধারণ এ সকল অনভ্যস্ত দৃশ্য দেখে ভয়ে আতঙ্কিত হয়ে উঠল। এর পর সুরু হল বর্ষা, পল্লীপথের ভয়াবহ কর্দ্দমাক্ত অবস্থা এবং ম্যালেরিয়া জ্বরের পালা।......

ধীরে ধীরে সহরে প্রত্যাগমন সুরু হয়ে গেল।.........

প্রচুর অর্থনষ্ট, যাতায়াতের পথকষ্ট ও পল্লীবাসের অস্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করার পর আমরা আবার, যে এলাকা বিপদজনক ভেবে চলে গিয়েছিলাম সেইখানেই ফিরে এলাম; বাসস্থানের উপযোগী আশ্রয়ের অভাবে।

এখন তাহলে আসল সমস্যা দেখা যাচ্ছে এই যে, আমাদের সহরগুলি বিপদজনক এলাকার অন্তর্ভুক্ত হলে, সহরের অপ্রয়োজনীয় জনসংখ্যার জন্য বাসস্থানের একটা পাকাপাকি ব্যবস্থা করা সম্ভব কিনা এবং সেই সঙ্গে সম্পূর্ণ যুগোপযোগী করে নতুনভাবে পল্লীগ্রাম ও পল্লীসহর গঠন ক'রে তোলা যায় কিনা?

ওদেশে অর্থাৎ ইউরোপে এ বিষয়ে যে চেষ্টা ও ব্যবস্থা হয়েছে, এদেশে বোধহয় সেকথা উত্থাপন করাও নিরর্থক! কাজেই আপাততঃ সে কথা ছেড়ে একেবারে আমাদের দেশের কথা ধরা যাক্‌।

কলকাতা ও তার সহরতলী ধরে এখানকার লোকসংখ্যা প্রায় ত্রিশ লক্ষ। এখন কথা হচ্ছে যে এই ত্রিশ লক্ষের ভিতর কত লোক অপ্রয়োজনীয়। অপ্রয়োজনীয় বলতে ঠিক কাদের বোঝায় গভর্ণমেণ্ট সে সম্বন্ধে কোনো ফতোয়া জারী করেন নি। এর কারণ বোধহয় জরুরী অবস্থার তারতম্য হিসাবে "অপ্রয়োজনীয়" কথাটার সংজ্ঞাও পরিবর্ত্তনশীল। কাজেই আমাদের গভর্ণমেণ্টের ফতোয়ার কথা ছেড়ে, নিজেদের সাধারণ বুদ্ধি অনুসারে একটা হিসাব তৈরী করে নিতে হবে। খুব মোটামুটী-ভাবে বলতে গেলে অপ্রয়োজনীয় লোক তারা, যারা জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য নিজেরা পরিশ্রম করে না। এ শ্রেণীতে পড়বে প্রধানত শিশু ও স্ত্রীলোক, অবসরপ্রাপ্ত বৃদ্ধ এবং স্কুলকলেজের পড়ুয়া ছাত্র ও সহর-প্রবাসী মফঃস্বলের জমিদার সম্প্রদায়। জমিদার সম্প্রদায়ের কথা ছেড়ে দেওয়া যেতে পারে, কেননা তাঁরা ইচ্ছামতো তাঁদের আশ্রয়স্থান বেছে নিতে পারেন। আসল সমস্যা শিশু, স্ত্রীলোক, বৃদ্ধ এবং ছাত্রপ্রভৃতিদের নিয়ে অনুমান করে নেওয়া যেতে পারে যে কলকাতা ও সহরতলীতে এঁদের সংখ্যা প্রায় দশ লক্ষ। এই সংখ্যার অর্দ্ধেক হয়ত তাঁদের স্বগ্রামে ফিরে যেতে পারেন—এখন বাকী পাঁচলক্ষের উপায় কি? পাঁচ লক্ষ বলা ঠিক হল না কেননা যে পাঁচ লক্ষ গ্রামে ফিরে গেছেন তাঁদের দুর্দ্দশার কথা আগেই বলেছি, কাজেই তার ভিতর থেকে আরও দুলক্ষের কথা আমাদের মনে রাখতে হবে। এ ছাড়া ছাত্র সম্প্রদায়ের জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থা করতে হবে—প্রয়োজনীয় কিছু লোকেরও ব্যবস্থা করতে হবে। সুতরাং মোটামুটীভাবে সাড়ে সাত লক্ষ লোকের বাস-স্থানের কথা ধরা যেতে পারে।

সাড়ে সাত লক্ষ সংখ্যাটা এমন কিছু একটা বড় সংখ্যা নয় যে সারা বাংলা দেশে এদের ছড়িয়ে দিতে পারা যায় না। কিন্তু সমস্যা এই যে তা করা চলবে না। অপসারিত এই জনগণের ব্যবস্থা করতে হবে এমন

একটা আধুনিক গ্রামের পরিকল্পনা
প্রধান রাস্তা
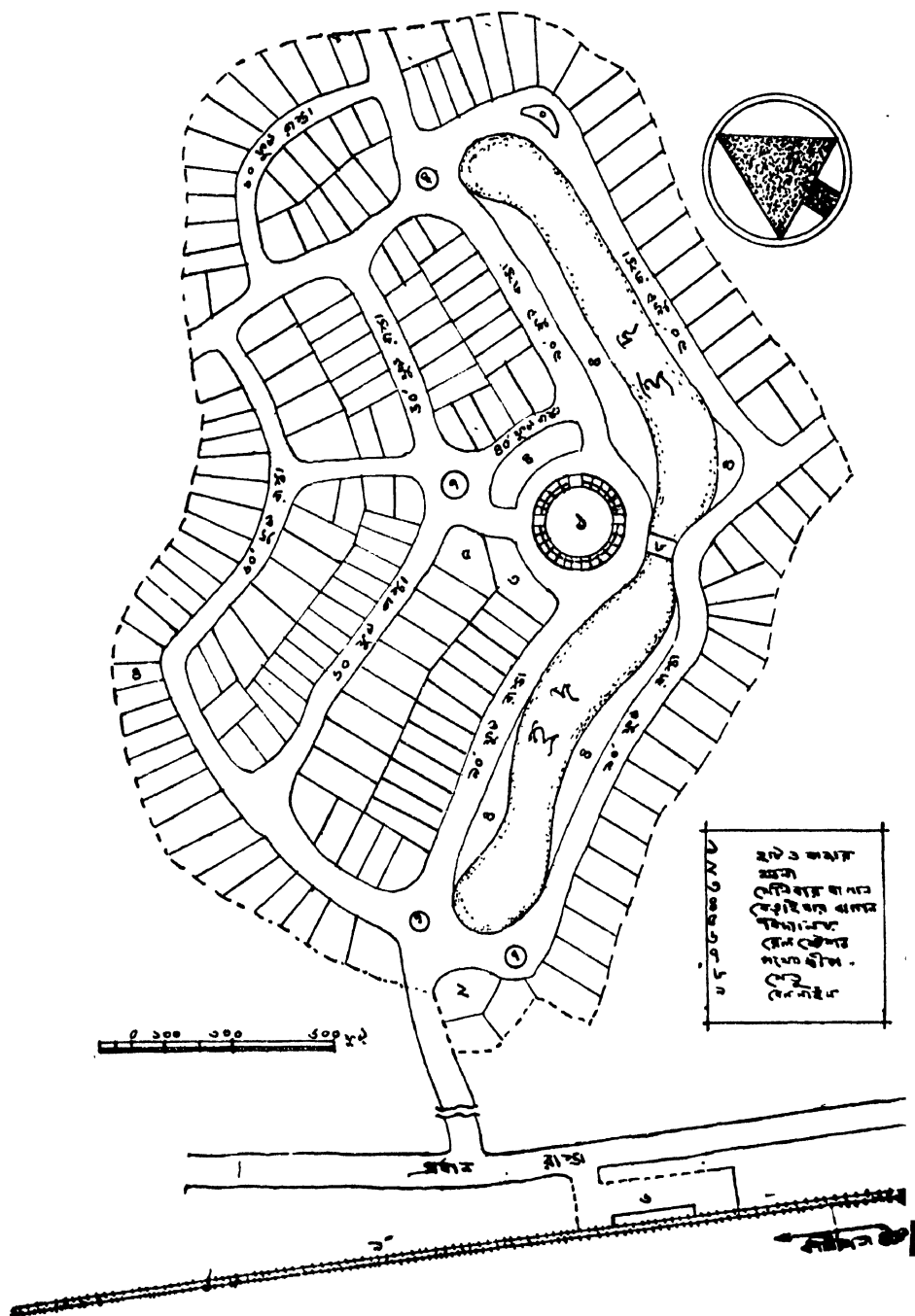
স্থানে—যেখানে ম্যালেরিয়া নেই, পানীয় জলের ব্যবস্থা সহজেই করা যায়, খাদ্যদ্রব্য সুপ্রাপ্য এবং কলকাতা থেকে রেলে এবং পথে সহজেই আসা যাওয়া করা যায়।

এখন এতগুলি বিধি নির্দ্দেশ মানতে হলে বাংলা দেশের অনেকখানি অংশ বাদ পড়ে যায়। প্রথম ধরুন ম্যালেরিয়া; বাংলা দেশে এমন কতগুলি মহকুমা আছে যেখানে ম্যালেরিয়া নেই অথচ যেগুলি কলকাতার কাছে! প্রথম ধরা যাক চব্বিশপরগণার কথা। চব্বিশপরগণার কতকগুলি মহকুমায় ম্যালেরিয়া নেই বটে, কিন্তু তার অধিকাংশই কলকাতার দক্ষিণে ডায়মণ্ডহারবারের নিকটে। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে ও অঞ্চলটার কথা বাদ দিতে হবে। হাওড়া, বর্দ্ধমান, হুগলী, বীরভূম, বাঁকুড়া, মুরশীদাবাদ, যশোহর, নদীয়া, মেদিনীপুর প্রভৃতি জেলার কতকগুলি মহকুমা ম্যালেরিয়া শূন্য এবং দূরত্ব কলকাতা হতে খুব বেশী নয়। কিন্তু কতকগুলি স্থানের দূরত্ব খুব বেশী না হলেও যাতায়াতের ভাল ব্যবস্থা নেই, ফলে সে স্থানগুলিতে যেতে যে সময় লাগে ও যে অসুবিধা ভোগ করতে হয়, তার চেয়ে অল্প সময়ে এবং সুবিধা মতো বাংলা দেশের অন্য জেলায় ও বাংলার বাইরে সাঁওতালপরগণা ও অন্যান্য প্রদেশের স্বাস্থ্যনিবাস হিসাবে খ্যাত দেশগুলিতে যাওয়া চলে। সুতরাং সেগুলিকেও অপসারিত জনগণের আশ্রয় স্থান বলে গণ্য করা যায়।

এখন সামান্য একটু হিসাব করলেই দেখা যাবে যে এইভাবে শ' চারেক গ্রাম নির্ব্বাচন করে, গ্রাম পিছু দেড় হাজার হতে দু'হাজার লোকের বাসের ব্যবস্থা করলেই সাড়ে সাত লক্ষ লোকের আশ্রয় স্থান স্থির হয়ে যায়। প্রতি পরিবারে যদি আটজন লোক ধরা যায় তাহলে ২০০ থেকে ২৫০টা পরিবারের বাড়ীর ব্যবস্থা করা হল। এই সঙ্গে অবশ্য দোকান, বাজার, স্কুল প্রভৃতিরও ব্যবস্থা করতে হবে। এখন বাড়ী পিছু যদি এক বিঘা জমি ধরা যায় তা'হলে রাস্তা ঘাট, বেড়াবার বাগান, বাজার, পুষ্করিণী প্রভৃতি ধরে সবশুদ্ধ একটা চার'শ বা পাঁচ'শ বিঘার মাঠ হলেই দু'হাজার লোকের স্থান সংকুলান হবে।

এই সঙ্গে আর একটা কথা বলা নিতান্ত দরকার যে, এই নতুন গ্রামগুলি বারোমাস বাসের উপযোগী করে তুলতে হলে এই গ্রাম পত্তনের সঙ্গে সঙ্গে ব্যবসা ও শিল্প কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাও করতে হবে যাতে লোকে গ্রামের বাইরে না গিয়েও নিজের জীবিকা উপার্জ্জন করতে পারে। আমাদের দেশের গ্রামগুলি যে ক্রমশ জনশূন্য হয়ে পড়ে তার কারণই হচ্ছে এই যে প্রত্যেক সমর্থ পুরুষই উপার্জ্জনের জন্য প্রথমে যায় সহরে এবং পরে সেখানে গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা হলে স্ত্রীপুত্র পরিবারকেও সহরে নিয়ে যায়। সুতরাং আমাদের নতুন ও পুরাতন গ্রামগুলিকে যদি আমরা সজীব রাখতে চাই, তাহ'লে আমাদের প্রয়োজন গ্রামে গ্রামে জীবিকা উপার্জ্জনের ব্যবস্থার জন্য শিল্প কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠা করা।

এইবার পল্লীগ্রাম ও পল্লী সহরগুলির পরিকল্পনার কথা।

আমাদের দেশে পুরাতন পল্লীগ্রামগুলি গড়ে উঠেছে সম্পূর্ণ অগোছালভাবে বাড়ীর মালিকদের নিজেদের খুসীমতো। পথের ঋজুতা, জমির ঢাল প্রভৃতির কথা ভাববার কারো সময় হয়নি। ফলে দেখা যায় দেশের রাস্তা সর্পিল গতিতে এঁকে বেঁকে চলেছে। যদৃচ্ছা মতো বাড়ী তৈরী হওয়ার ফলে বৃষ্টির জলনিকাশের পথে বাধা ঘটেছে; ফলে যেখানে সেখানে জল জমে, পচে এবং ম্যালেরিয়া মশকের জন্মহার বেড়ে চলে। নতুনভাবে গ্রামপত্তন করতে হলে এই সকল অব্যবস্থার মূলোচ্ছেদ প্রয়োজন।

গ্রামে যে সকল অনাবাদী জমি, পোড়ো মাঠ হিসাবে এতদিন পড়ে আছে, এখন সেখানে নতুন গ্রাম পত্তন করতে হ'লে প্রথম প্রয়োজন সেই মাঠটার ঢালুতা পরীক্ষা করা এবং সেই মতো পথের ব্যবস্থা করা। এই নতুন গ্রামের প্রধান পথটা অন্তত পক্ষে ৯০ ফুট এবং অন্যান্য পথগুলি ষাট্ ফুট চওড়া হওয়া উচিত। এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে পল্লীগ্রামে এত চওড়া পথের কি প্রয়োজন। একথার জবাব এই যে পাল্‌কি ও গো-যানের যুগ শেষ হয়ে, গেছে এখন সকল পথই মোটারকারের উপযোগী করে তৈরী করতে হবে। পথের দুধারে ফুটপাথ ও জলনিকাশের ড্রেনের ব্যবস্থা করবার পর দেখা যাবে যে ষাট ফুট রাস্তা হলে তবেই দুখানি মোটারকার স্বচ্ছন্দে যেতে পারে। এর উপর আর একটা কথা পল্লীগ্রামে জমির দর

আধুনিক বাসগৃহের নক্‌সা

কম ; সুতরাং রাস্তা চওড়া করে খানিকটা জমি খোলা রাখা। স্বাস্থ্যের দিক থেকে রৌদ্র ও বাতাস চলাচলের সুবিধার কথা ভাবলে, খুব সমীচীন ব্যবস্থা বলেই মনে হবে।

এইবার জমি বিভাগের কথা। সমস্ত জমি একই মাপে ভাগ করার কোনোও প্রয়োজন নেই। বরং আমার মনে হয় জমির অবস্থান হিসাবে জমির আয়তন বিভিন্ন প্রকারের হওয়া উচিত। যেমন যে জমির দক্ষিণে

১৫ ১৫

একতলা বাসগৃহের নক্সা দ্বিতল গৃহের নক্সা
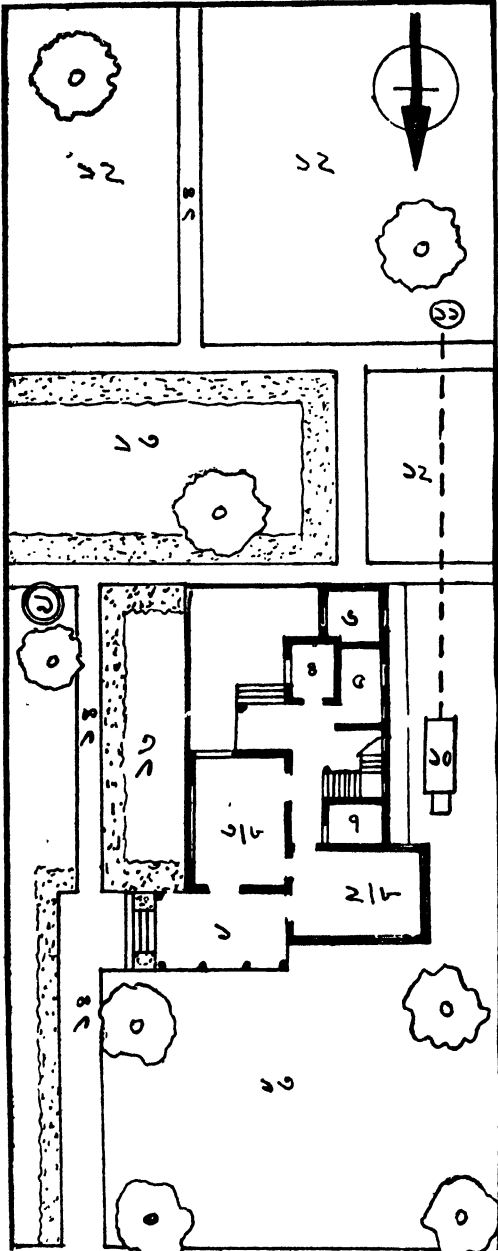
রাস্তা, সে জমি চওড়ায় ছোট হলেও প্রত্যেকটি বাড়ীই দক্ষিণের হাওয়া ও রৌদ্র পাবে। যে জমির উত্তরে রাস্তা সে জমি আয়তনে (চওড়া ও লম্বায়) বড় হলে দক্ষিণে বাগান রেখে সে বাড়ীর মালিক গৃহের দক্ষিণে হাওয়া ও রৌদ্রের ব্যবস্থা সহজেই করতে পারে। রাস্তার পূর্ব্বে ও পশ্চিমে অবস্থিত
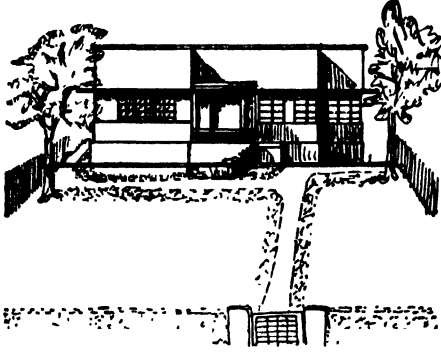
একটি একতলা গৃহের ছবি

জমিগুলি সম্বন্ধেও অনেকটা এইভাবে ব্যবস্থা করা যেতে পারে। জমি বিভাগ করবার সময় আমাদের লক্ষণীয় হওয়া উচিত যে এই জমিতে যে বাড়ী হবে, সে বাড়ী যেন সবদিক থেকেই যথেষ্ট পরিমাণ আলো ও হাওয়া পায়। কতকগুলি জমির আয়তন ছোট করার আরও কতকগুলি কারণ আছে। প্রথম বড় আয়তনের জমির উপযুক্ত ঘিরিবার ব্যবস্থা ব্যয়সাধ্য এবং সেই জমি ঠিকমতো পরিষ্কার রাখা ও বাগান করার জন্য বাৎসরিক খরচও যথেষ্ট। সুতরাং মধ্যবিত্ত অবস্থার লোকের উপযুক্ত জমির আয়তন অপেক্ষাকৃত ছোট হওয়াই যুক্তিযুক্ত। এখানে ছোট বলতে আমি একেবারে কলকাতার হিসাবে ২ কাঠা বা ৩ কাঠা জমির কথা বলছিনা। জমির দর হিসাবে যেখানে আড়াই শ টাকা বিঘা সেখানে ন্যূন পক্ষে একবিঘা এবং যেখানে পাঁচশ টাকা বিঘা সেখানে ন্যূন পক্ষে দশ কাঠা বা বারো কাঠা জমির আয়তন হলে ভাল হয়।

জমি বিভাগের সঙ্গে সঙ্গে হাট, বাজার, পোষ্ট আপিস, স্কুল ও বেড়াবার
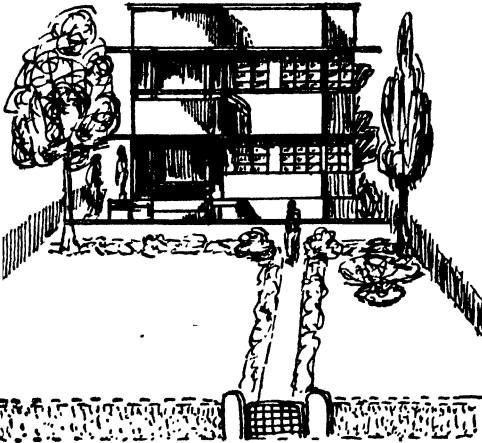
একটি দ্বিতল গৃহের ছবি

বাগান প্রভৃতির ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। জমিটী যদি নদীর ধারে না হয় তবে এই নূতন গ্রাম-পরিকল্পনার ভিতর একটী বড় জলাশয় বা হ্রদের স্থান হওয়া উচিত। এই প্রকারের বড় জলাশয়ের কয়েকটী প্রয়োজন আছে। জলকষ্ট নিবারণ ও মাছচাষের ব্যবস্থায় এই প্রকারের জলাশয় অমূল্য, তার উপর একটী বড় জলাশয় থাকার জন্য গ্রীষ্মকালে স্থানীয় আবহাওয়া কিছুটা ঠাণ্ডা থাকা খুবই সম্ভব। এছাড়া এই জলাশয় খনন করে যে মাটী উঠবে তার সাহায্যে অপেক্ষাকৃত নীচু জমিগুলিও উঁচু করে তোলা যাবে।

পল্লীগ্রাম ও পল্লীসহরের পরিকল্পনার ভিত্তির মূলসূত্রগুলি একই, তফাতের ভিতর এই যে পল্লীসহরের পরিকল্পনার মধ্যে বাণিজ্যকেন্দ্র, শিল্পকেন্দ্র ও শাসনকেন্দ্র প্রভৃতির অবস্থান নির্দ্দেশ করে দেওয়া প্রয়োজন, যাতে বাসকেন্দ্রের শান্তি, বাণিজ্য ও শিল্পকেন্দ্রের কোলাহলের চাপে বিনষ্ট না হয়। এই সকল বিভিন্ন কেন্দ্রের অবস্থান অথচ এমন হওয়া দরকার, যাতে পরস্পরের সঙ্গে একটা নিবিড় ও অদূর সংযোগ থাকে। পল্লীসহরে অবশ্য পল্লীগ্রাম হ'তে জমির দর বেশী, কিন্তু এখানেও বাস-কেন্দ্রের জমির আয়তন ও বিভাগ একই সূত্র হিসাবে হওয়া উচিত।

এই ভাবে বাস কেন্দ্রের জমি বিভাগের পর, সেই জমিতে গৃহনির্ম্মাণের কথা স্বতই মনে আসবে। গৃহ নির্ম্মাণ সম্বন্ধেও মোটামুটি কয়েকটি বিধিনিষেধ থাকা একান্ত দরকার—বিশেষ করে প্রত্যেক জমিতে কতটা
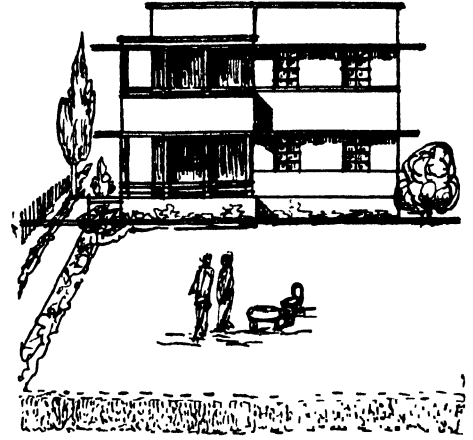
দ্বিতল গৃহের ছবি

খোলা জায়গা রাখা হবে সে বিষয়ে এবং জমির সীমানা হতে বাড়ীর দেয়ালের দূরত্ব সম্বন্ধে। এ সকল বিধিনিষেধ অবশ্য অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা সাপেক্ষ, তবে খুব সাধারণভাবে এইটুকু বলা চলে এই সকল নূতন পরিকল্পনার পল্লীগ্রামে জমির এক তৃতীয়াংশ মাত্র গৃহনির্ম্মাণের জন্য ব্যবহৃত হতে পারবে এবং জমির সীমানা হতে অন্ততঃ পক্ষে দশ ফুট দূরে গৃহনির্ম্মাণ করতে হবে।

কলকাতায় বাস করার ফলে একটি ব্যাপার লক্ষ্য করা গেছে যে, মধ্যবিত্ত বাঙালী পরিবারের জন্য রান্না, ভাঁড়ার ও বৈঠকখানা ছাড়া তিনটী শোবার ঘর প্রয়োজন। এই সকল ব্যবস্থা সম্বলিত একটী দোতলা বাড়ী দু'কাঠা জমির মধ্যেই হওয়া সম্ভব। বাড়ীগুলি আমি দোতলা হওয়া সমীচীন মনে করি নানাকারণে। প্রথম দোতলা বাড়ীর নির্ম্মাণ খরচ একতলা বাড়ীর নির্ম্মাণ খরচ অপেক্ষা ঘনফুট হিসাবে কিছু শস্তা। দ্বিতীয় দোতলার ঘর একতলার ঘর অপেক্ষা নিরাপদ ও আরামপ্রদ। তৃতীয় দোতলায় আলো ও হাওয়া বেশী এবং ধূলার দৌরাত্ম্য কম ; ফলে ঘরগুলি অধিকতর স্বাস্থ্যপ্রদ।

বাড়ীগুলি ঠিক কি ধরণের হওয়া উচিত এসম্বন্ধে প্রত্যেক গৃহস্বামীর বিভিন্ন রুচি ও মতের অস্তিত্ব থাকা সম্ভব। কারো পছন্দ আধুনিক

খাঁচের বাড়ী, কারো পছন্দ থামখিলানওয়ালা সাবেক খাঁচের বাড়ী, আবার কেউ কেউ হয়ত পছন্দ করবেন ভারতীয় ছাঁচের অনুকরণে গঠিত খাঁচের বাড়ী। আসল কথা "খাঁচটা" যে রকমই হোকনা কেন, আসল কথা হল এই যে ঘরের "উদ্দেশ্য"টা যেন ঠিক থাকে। ঘরে যেন প্রচুর আলো ও হাওয়া খেলতে পায়। "খাঁচের" মোহে আলো ও হাওয়া প্রবেশের ব্যতিক্রম করা চলবে না। দেশের অবস্থান হিসাবে মৌসুমী হাওয়ার দিক নির্ণয় করে, স্থপতির পরামর্শ অনুযায়ী গৃহ পরিকল্পনা করাই সর্ব্বাপেক্ষা যুক্তিযুক্ত। অনেকের ধারণা যে প্রাসাদোপম গৃহছাড়া ছোট গৃহনির্ম্মাণ ব্যাপারে স্থপতির পরামর্শ গ্রহণ নিরর্থক। এ ধারণা অত্যন্ত ভুল। আসল কথা আমাদের ব্যবহারিক ঘরগুলি কি ভাবে পাশাপাশি সাজান উচিত যাতে ঘরে সবচেয়ে বেশী আলো ও হাওয়া খেলতে পারে, রান্নাঘর, ভাঁড়ার ঘর, সিঁড়ি, স্নানঘর কি ভাবে সংস্থাপিত হলে আমাদের দৈনিক জীবনযাত্রা সুষ্ঠুভাবে চালিত হবে, এ সম্বন্ধে প্রকৃত পরামর্শদাতা হ'ল সুশিক্ষিত স্থপতি। সুশিক্ষিত স্থপতি পরিকল্পিত গৃহ শুধু সুদৃশ্য ও সুগঠিত নয়, নির্ম্মাণ খরচের দিক হতেও সেগুলি সুলভ। একটা কথা আমাদের ভুললে চলবে না যে স্থাপত্য গৃহের গঠনে—অলঙ্করণে নয়, যেমন সৌন্দর্য্য দেহের গঠনে, অলঙ্কারে নয়।

গৃহস্থাপত্যের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত আর একটা বিষয়ের কথা এখানে বলা উচিত—উদ্যান রচনা। অতি সাধারণ গৃহও উদ্যান

আধুনিক পল্লীগ্রামের রাস্তা

রচনার কৌশলে অতি রমণীয় মনে হয়। কলকাতায় জমির অভাবে অনেক সময়েই উদ্যান রচনার সাধ অপূর্ণ রাখতে হয়, কাজেই এটুকু আশা করা যায় যে এই নূতন পল্লীগ্রামের গৃহ রচনার সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেকেই কিছু না কিছু উদ্যান রচনার প্রয়াস পাবেন। পূর্ব্বেই বলেছি যে নূতন পল্লীতে গৃহরচনা জমির এক তৃতীয়াংশে মাত্র হতে পারবে, বাকী দুই তৃতীয়াংশ উদ্যান রচনার কাজে ব্যবহৃত হবে। বাড়ীটি যদি জমির মাঝামাঝি তৈরী করা হয় তবে সামনের জমিতে ফুলের বাগান ও পিছনের জমিতে তরকারির বাগান কর: যেতে পারে।

উদ্যান রচনার মূলসূত্র হচ্ছে যে খুব বেশী কিছু একত্রে করা উচিত নয়। কিছুটা জমি লন বা দুর্ব্বা ঘাস ছাওয়া বসবার জায়গা করে তারি ধারে ধারে মরসুমী ফুলের, গোলাপের, বেল, জুঁই, চামেলী, মল্লিকা প্রভৃতি ফুলের গাছ লাগান উচিত। উদ্যান রচনায় এমন একটা আনন্দ আছে যে একবার একাজে মন দিলে উৎসাহ ক্রমশ বেড়েই যাবে, উদ্যান-রচনার উৎকর্ষও সঙ্গে সঙ্গে সাধিত হবে।

উদ্যান রচনার জন্য প্রয়োজন জলের। শুধু উদ্যান রচনা কেন, প্রত্যেক গৃহস্থেরই নিজেদের ব্যবহারের জন্যও জলের প্রয়োজন। বাংলা দেশ নদী মাতৃক হলেও বাংলার পল্লীতে পানীয় জলের অত্যন্ত অসদ্ভাব। পানীয় জলের জন্য গভীর টিউবওয়েল বা নলকূপ সর্ব্বাপেক্ষা সন্তোষজনক হলেও সকল জায়গায় টিউবওয়েল হওয়া সম্ভব কিনা সন্দেহস্থল। এ ছাড়া টিউবওয়েল থেকে জল তোলবার একটি ছাড়া দুটী উপায় না থাকায়, শুধু টিউবওয়েলের উপর জলের জন্য নির্ভর করা খুব যুক্তিযুক্ত নয়। কেন না নলকূপ হতে জল তোলবার উপায় পাম্প এবং এই
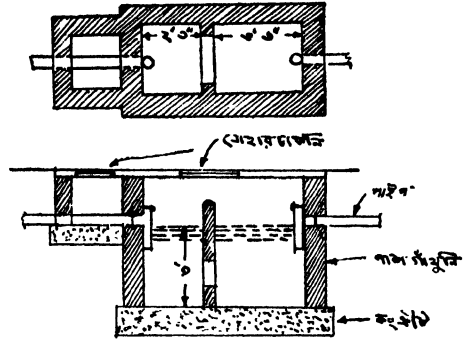
দশজনের মত সেপ্‌টিক ট্যাঙ্কের নক্‌সা

পাম্প মেরামত করার প্রয়োজন হলে মফঃস্বলে পাম্প সারাবার মিস্ত্রির অত্যন্ত অভাব। সমস্ত দিক বিবেচনা করলে পানীয় জলের জন্য নলকূপের পরিবর্ত্তে গভীর কূপখননই সমীচীন। গভীর কূপের কার্য্যকারিতা বাড়াবার জন্য কূপের মধ্যে একটা নলকূপ স্থাপন করা যেতে পারে।

পল্লীগ্রাম বাসের দ্বিতীয় সমস্যা জমাদারের। অনেক স্থানেই জমাদার (মেথর) পাওয়া যায় না এবং জমাদার পাওয়া গেলেও জনসংখ্যার অনুপাতে তা নিতান্ত নগণ্য। এ সমস্যার একমাত্র সমাধান প্রত্যেক বাটীতে সেপ্‌টিক ট্যাঙ্কের প্রবর্ত্তন। সেপটিক ট্যাঙ্ক ব্যাপারটির ভিতর কোনো রহস্য নেই। অত্যন্ত সাধারণভাবে বলতে গেলে এটি একটি দুই কামরাওয়ালা ঢাকা চৌবাচ্ছা। প্রত্যেক গৃহস্থের জনসংখ্যার অনুপাতে এই চৌবাচ্ছার আয়তন পরিবর্ত্তনশীল। শুধু একটি বিষয়ে সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত যে এই সেপটিক ট্যাঙ্কটা কোথায় বসান নিরাপদ ও কী ভাবে এই সেপটিক ট্যাঙ্কের দূষিত জল নির্গমের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। সাধারণত কাঁচা মাটির পাইপ বা কাঁচা কূয়ার সাহায্যে এই দূষিত জলটী মাটীতে ছড়িয়ে দেওয়া হয়। যে কাঁচা কূয়ায় সেপ্‌টিক ট্যাঙ্কের জল ছাড়া হয় বা যে জমিতে কাঁচা মাটীর পাইপের সাহায্যে এই
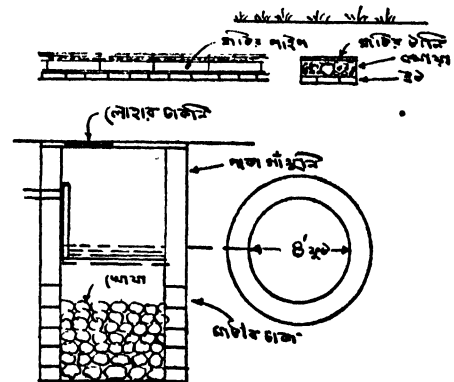
দূষিত জলশোষণের ব্যবস্থা

দূষিত জল সিঞ্চন করা হয় সে স্থানটী পানীয় কূয়া থেকে একশ ফুট দূরে হওয়া বাঞ্ছনীয়। রান্নাঘরের জল, ফেন প্রভৃতিও এইভাবে কাঁচা কূয়ায়

সাহায্যে বেশ সন্তোষজনকভাবে শেষ করে ফেলা যায়। তার ফলে দুর্গন্ধজনক নর্দ্দামার সৃষ্টি আর হবে না।

আসল কথা সহরবাসের সুখসুবিধাগুলি পল্লীগ্রামে ব্যবস্থা করা না হলে "গ্রামে ফিরে চল" ধুয়া কাজে পরিণত হবে না। আমরা সত্যই যদি গ্রামগুলিকে পুনর্জীবিত ও নূতনভাবে গঠিত করতে চাই, তাহলে এই সমস্যার আসল রূপটী সম্পূর্ণভাবে আবিষ্কার করতে হবে।

প্রকৃত সমস্যা বিপুল ও জটিল সন্দেহ নেই কিন্তু তার সমাধান দুঃসাধ্য নয়। এজন্য চাই প্রবল জনমত এবং সহানুভূতিশীল ও উৎসাহী রাজশক্তি। সর্ব্বপ্রথমে প্রয়োজন স্থপতি, পূর্ত্তবিদ, চিকিৎসক ও শিল্পপতি সমবায়ে গঠিত একটী অনুসন্ধান সমিতি। এই অনুসন্ধান সমিতির কাজ হবে নূতন গ্রামপত্তনের উপযুক্ত জমির অবস্থান স্থির করা, পুরাতন পল্লীসহর ও গ্রামগুলির উন্নতিবিধায়ক নির্দ্দেশ বিধান করা এবং এই সকল স্থানে কি ধরণের শিল্প ও বাণিজ্যকেন্দ্রের সাহায্যে দেশের লোক জীবিকা উপার্জ্জন করতে পারে সে সম্বন্ধে সুনির্দ্দিষ্ট পন্থার সন্ধান দেওয়া।

এই অনুসন্ধান সমিতির তদন্ত ফলের উপর নির্ভর করে দেশের ধনী ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলি (বিশেষতঃ বীমা প্রতিষ্ঠানগুলি) অগ্রসর হতে পারেন।

ঠিক এই ধরণের কাজের জন্য ইউরোপে গৃহনির্ম্মাণ সমিতি (Building Society) নামক একজাতীয় প্রতিষ্ঠান আছে এবং সেই সকল প্রতিষ্ঠান সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য এ কার্য্যের জন্য বিশেষভাবে লিপিবদ্ধ কতকগুলি বিধিনিষেধও আছে। আমাদের দেশে দু' একটী গৃহনির্ম্মাণ সমিতি আছে বটে, কিন্তু সুষ্ঠুভাবে তাদের কাজ পরিচালনার জন্য কোনো আইন না থাকায় গৃহনির্ম্মাণ সমিতির কাজ ততটা স্ফূর্ত্তিলাভ করেনি।

বর্ত্তমান যুদ্ধ সঙ্কটের ফলে আমাদের সহরগুলি বিপদজনক এলাকার অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় একটী পুরাতন সমস্যা লোকাপসরণের নূতন সমস্যার আকারে দেখা দিয়েছে। কাজেই এই নূতন সমস্যাটীকে শুধু একটী সাময়িক সমস্যা হিসাবে জ্ঞান না করে এর আসল রূপটী উদ্ঘাটনের জন্য আমাদের চেষ্টা করা উচিত এবং যত শীঘ্র সে চেষ্টা করা যায় ততই মঙ্গল।

বাংলার মেয়ে

শ্রীসতী দেবী

পুষ্পিতা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া এক সময়ে বলিয়া ওঠে—"বাঙালী ঘরের মেয়েদের কি জীবন! ভাবলে শিউরে উঠতে হয়! উঃ কী ভাগ্য!"

রাণী তাহার কথা শুনিয়া একটু হাসিয়া বলে, "এখানে ভাগ্যের দোষ দিলে চলে না পুষ্প। জেনে শুনে যদি রুগ্ন বয়স্ক লোকের সঙ্গে বিয়ে দেওয়া হয় তার ফল কী, তা বোঝা মোটেই শক্ত নয়।"

পুষ্পিতা বুঝিতে না পারিয়া চাহিয়া থাকে। রাণী বলে—"আমার বিয়ের কথা তুমি কি কিছুই শোন নি? ওঁর সঙ্গে আগে, আমার বড় দিদির বিয়ে হয়েছিল। বড় দিদি মারা যাবার পর, ফের বিয়ে দেবার জন্যে ওঁর দাদারা পাত্রী দেখছেন তখন উনি বলে বসলেন, আমার সঙ্গে যদি বিয়ে হয় তবেই আবার বিয়ে কোরবেন—তা না হলে বিয়ে কোরবেন না। আমার মায়ের কথা সবই জানো, তিনি ভাবলেন ঘর বজায় থাকবে, আর বড়দির ছেলেমেয়ে দুটো ভেসে যাবে না—"

"তুমি তখন একটুও অমত কোরলে না?" অধীরভাবে পুষ্পিতা জিজ্ঞাসা করে।

রাণী বড় দুঃখেই হাসে। "আমি অমত কোরবো! বাঙালী ঘরের মেয়েরা কলের পুতুল। তাদের মন নেই, সুখদুঃখ কিছু নেই। তারা কেবল—"

একটু থামিয়া পুনরায় বলে—"আমার যখন বিয়ে হোল, তখন ওর কত বয়েস জান? পঁয়তাল্লিশ।"

পঁয়তাল্লিশ! পুষ্পিতা শিহরিয়া ওঠে।

"আশ্চর্য্য হোচ্ছো? অনাথা বিধবার ১৫ বছরের মেয়ে যে কী গ্রহ, তা আমি তোমাকে বোঝাতে পারবো না, শুধু এই বলছি, মা তখন আমাকে বিদায় করবার জন্যে এত অস্থির হয়েছিলেন, যদি সেই সময়ে ৫০।৬০ বছর বয়সেরও পাত্র পেতেন, আমাকে হয়ত তার হাতে দিয়েই নিশ্চিন্ত হতেন। এ দিকে আমার কাকারা মাকে বুঝিয়েও ছিলেন, পঁয়তাল্লিশ বছর বয়স এমন বেশী নয়। আমার বয়সটাও তো কম হয়নি। জান পুষ্প, এক একজন জন্মায় দুর্ভাগ্য নিয়ে। আমি যখন জন্মেছি, বাবা তখন মারা গেলেন। তারপর দেখ আমার মাত্র বাইশ বছর বয়সে সব সুখের অবসান হোল। এই যে ছেলেটা জন্মেছে তাকে কি কোরে আমি মানুষ কোরবো ভেবেই পাই না। সব ভাবতে গেলে আমার প্রাণ ফেটে যায়।..."

পুষ্পিতা সর্ব্বহারা বিধবাকে সান্ত্বনা দিবার মত ভাষা খুঁজিয়া পায় না। কেবল ধীরে ধীরে বলে, "তুমি অত অস্থির হোয়ো না। তোমার দাদারা আছেন। তাঁরা নিশ্চয় তোমাকে দেখবেন।"

"না, আমি অস্থির হই'নি। আর দাদারা আছেন বোলছো? তাঁরা আমাকে দেখবেন কি না সেইটাই সমস্যা। যদি আজ আমার স্বামী ব্যাঙ্কে মোটা রকম টাকা রেখে যেতেন, কিম্বা আমার বড় লোকের বাড়ীতে বিয়ে হোত, তাহলে হয় তো, ভায়েরা বোনের জন্যে মাথা ঘামাতো। কিন্তু গরীব বোনের জন্যে ভায়েরা কোনদিনই মাথা ঘামায় না।......"

সন্ধ্যার অন্ধকার ধীরে ধীরে নামিয়া আসে—পৃথিবীর বুকে। প্রকৃতিদেবী যেন লজ্জায় অঞ্চলে নিজ মুখ ঢাকিলেন।
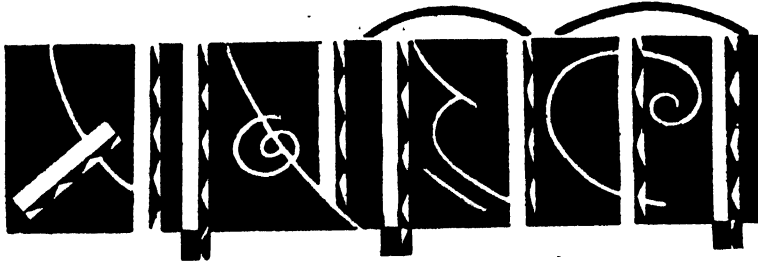
শ্রদ্ধাভিবাদন—

এবার মুসলমান সমাজের ঈদ উৎসব ও হিন্দুদিগের দুর্গোৎসব প্রায় একই সময়ে অনুষ্ঠিত হওয়ায় কয়েকদিন নানা দুঃখকষ্ট সত্বেও

ঢাকার জন্মাষ্টমী মিছিলের দৃশ্য ফটো—শ্যামমোহন চক্রবর্ত্তী

উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যেই আনন্দের প্রবাহ চলিয়াছিল ; আমরা এই উপলক্ষে উভয় সমাজের সকলকে যথাযথ অভিবাদন জ্ঞাপন করিতেছি। আজ এই দারুণ বিপদের মধ্যে পড়িয়া উভয়

ঢাকা জন্মাষ্টমী মিছিলের অপর একটী দৃশ্য ফটো—শ্যামমোহন চক্রবর্ত্তী

সম্প্রদায়ের লোকই যেমন সমান ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে, সম্পদের দিনেও যেন আমরা তাহা এইরূপ সমানভাবে ভোগ করিতে পারি, উভয় সম্প্রদায়ের উৎসবের মিলন আমাদিগকে তাহাই শিক্ষা দিতেছে। উভয় সম্প্রদায়কেই যখন একই দেশে বাস করিতে হইবে, তখন মিলনের কথা চিন্তা করাই আমাদের সর্ব্বপ্রথম কর্ত্তব্য।

কলিকাতায় অগ্নিযজ্ঞ—

মাত্র কয়েকদিন পূর্ব্বে মেদিনীপুরের প্রবল বাত্যায় শত সহস্র নরনারী স্বামী-পুত্রহারা, গৃহহারা হইয়া বিধাতার অভিশাপে হতাশ্বাসে দিন গুণিতেছে। এখনও তাহার মর্ম্মন্তুদ কাহিনী প্রতিদিন সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হইতেছে। তাহা পাঠে জনগণকে মর্ম্মাহত ও বিচলিত করিয়া তুলিয়াছে। এই প্রাকৃতিক বিপর্য্যয় বাংলা দেশের ইতিহাসে যেমন ভয়াবহরূপে লিখিত থাকিবে তেমনি গত ৮ই নভেম্বর কলিকাতা হালসীবাগানে
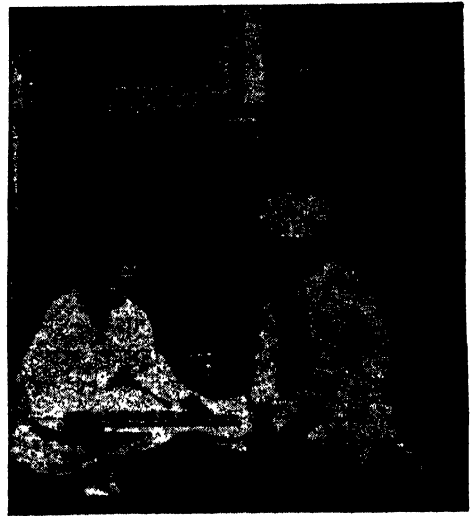
সন্তোষের মহারাজকুমার শিল্পী রবীন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী প্রদত্ত গালার চিত্রসমূহ কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ হইতে ভাইস-চ্যান্সেলার সার সর্ব্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন্ কর্ত্তৃক উপহারগ্রহণ

ফটো—সৈয়দ ব্রাদার্স, কাশী

সার্ব্বজনীন কালীপূজা প্রাঙ্গণের শোচনীয় কাহিনীর কথাও দেশবাসী আজীবন সভয়ে স্মরণ করিবে। মেদিনীপুর ও চব্বিশ পরগণার দুর্ঘটনা ঘটিয়াছিল মহামায়ার পূজার সময়, আর কলিকাতার এ দুর্ঘটনা ঘটিল তাহারই পক্ষকাল পরে—শ্যামাপূজার মহোৎসবে। কে বলিবে ভাগ্যবিড়ম্বিত জাতির ভাগ্যে

এর পরে আরও কি আছে? মাতা শিশুপুত্রকে কোলে লইয়া জীবন্ত দগ্ধ হইল—এ কথা চিন্তা করিলেও সর্ব্বশরীর শিহরিয়া ওঠে।

ক্রীড়া-মোদী চঞ্চল নয়নে বর্ষা নামিল! কত হাস্যোজ্জ্বল মুখে গগনভেদী ক্রন্দন রোল উত্থিত হইল—তাহার ইয়ত্তা নাই।

বিলাত যাত্রী শিক্ষার্থী 'বেভিন বয়' এর দল ফটো—তারক দাস

এই দুর্ঘটনার বিবরণে প্রকাশ পাইয়াছে—যে ১৪৩ জন লোক একস্থানে জীবন্ত-দগ্ধ হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছে। ইহা ব্যতীত বহু আহত ব্যক্তি—এখনও হাসপাতালের শয্যায়। বিবরণে এমনও প্রকাশ পাইয়াছে যে, একই মায়ের সাতটি সন্তান এই দুর্ঘটনায় জীবন্ত-দগ্ধ হইয়াছে—অভাগিনী মাতা বাঁচিয়া আছে দুর্ভাগ্যের বোঝা লইয়া। ইতিপূর্ব্বে এমন শোচনীয় ঘটনা এই সহরে আর কখনও ঘটে নাই। মাত্র ১৫ মিনিটের মধ্যেই এই অগ্নিযজ্ঞে এতগুলি লোক আত্মাহুতি দিল। এই দুর্ঘটনার ফলে সহরের উপর যে বিষাদ-মলিন ছায়া ঘনীভূত হইয়াছে—তাহার সান্ত্বনা নাই। দুর্ঘটনার ফলে যাহারা মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে তাহাদের মধ্যে অধিকাংশই শিশু, কিশোর-কিশোরী এবং নারী। কত কচি-কোমল প্রাণ মায়ের পদতলে লুটাইল! কত কৌতুক-

বেলঘরিয়া বাগান বাড়ীতে কবি ও সাহিত্যিক-পরিবেষ্টিত শিল্পাচার্য্য অবনীন্দ্রনাথ ফটো—সুনীল রায়

কাহার দোষে এমনতর দুর্ঘটনা ঘটিল তাহার তদন্ত চলিতেছে। কেন মণ্ডপের প্রবেশ করিবার এবং বাহির হইবার দ্বার খুলিয়া

পূর্ণিমা সম্মিলনীর সম্পাদক শ্রীযুত সুব্রত রায়চৌধুরী কর্ত্তৃক আচার্য্য অবনীন্দ্রনাথকে মানপত্র দান

ফটো—সুনীল রায়

রাখিবার ব্যবস্থা করা হয় নাই? কেন হোগলার মণ্ডপ নির্ম্মাণ করিবার অনুমতি দেওয়া হইল? কেন মণ্ডপের নিকট যথারীতি দমকলের ব্যবস্থা করা হয় নাই?—এমনিতর শত শত প্রশ্ন আজ নাগরিকদের মুখে মুখে ফিরিতেছে। কিন্তু এই সব প্রশ্নের মাঝে তবুও যেন মনের মাঝে বার বার এই প্রশ্নই জাগিতেছে যে মায়ের পূজায় আমাদের কি ত্রুটী হইল? কি ভ্রম হইল? যাহার জন্য মায়ের আশীর্ব্বাদের পরিবর্ত্তে আমরা আজ অভিশাপ কুড়াইতে বসিয়াছি? গ্রামকে গ্রাম অগ্নিকাণ্ডে ভস্মীভূত হইয়া যায়, কিন্তু মৃত্যুসংখ্যা এত অধিক হইয়াছে বলিয়া শোনা যায় না; কারণ

তাহাদের পলাইবার পথ থাকে উন্মুক্ত। কিন্তু এই বদ্ধ স্থানে অগ্নি লাগিলেও সামান্য বেড়া ঠেলিয়া শত শত লোকে পথ রচনা করিতে পারিল না! বিমূঢ় হইয়া রহিল! কোন্ মায়াবিনীর যাদুমন্ত্রে? কালো মেয়ে কি তার পায়ের তলায় ইচ্ছা করিয়াই আলো রচনা করিয়া শ্মশানভূমে পরিণত করিল? না জাতির অধিকতর দুর্দ্দিনের আভাস জানাইয়া দিল? এ প্রশ্নের কে উত্তর দিবে?

মেদিনীপুর অঞ্চলে ঝড়ে ক্ষতি—

গত ১৬ই অক্টোবর সপ্তমী পূজার রাত্রিতে ২৪ পরগণা, হাওড়া ও মেদিনীপুর জেলার দক্ষিণাংশের উপর দিয়া যে বিষম ঝড় হইয়া গিয়াছে, তাহা বাস্তবিকই অচিন্তনীয়। নিকটস্থ সমুদ্রের জল বাড়িয়া ১০।১২ মাইল পর্য্যন্ত উপরে গিয়াছিল—বহু গ্রামে একখানাও চালা বাড়ী রক্ষা করা যায় নাই। রেল লাইনের ক্ষতি হওয়ায় কয়দিন রেল চলাচল বন্ধ ছিল এবং টেলিগ্রাফের তার ও পথ নষ্ট হওয়ায় বহু দিন ডাক ও তার বিভাগের কাজ বন্ধ ছিল। বহু বাড়ীতে দুর্গোৎসব সম্পন্ন হইতে পারে নাই এবং বহু দরিদ্র লোকের যথাসর্ব্বস্ব নষ্ট হইয়া গিয়াছে। ঝড়ের পর মন্ত্রী ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুত প্রমথ নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও নবাব হবিবুল্লা সাহেব ঐ অঞ্চল দেখিতে গিয়াছিলেন; তাঁহারা ফিরিয়া আসিয়া জানাইয়াছেন—দশ সহস্রাধিক লোক মারা গিয়াছে ও অবিলম্বে ৫.৭ লক্ষ টাকা সংগ্রহ করিয়া ঐ অঞ্চলের লোকদিগকে সাহায্য দান না করিলে আরও বহু লোক মারা যাইবে। বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্ট মিঃ বি-আর সেন আই-সি-এসকে এই কার্য্যের জন্য বিশেষ কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিয়া মেদিনীপুরে প্রেরণ করিয়াছেন ও নানাভাবে সাহায্য দানের ব্যবস্থা করিতেছেন। বহু বে-সরকারী প্রতিষ্ঠান হইতেও সাহায্য দানের ব্যবস্থা করা হইতেছে। এক তো খাদ্য দ্রব্যের দুর্ম্মূল্যতার জন্য লোকের কষ্টের সীমা ছিল না—তাহার উপর দুইটি জেলার বহু অংশ এই ঝড়ের ফলে সর্ব্বস্বান্ত হইল। ঐ অঞ্চলেই প্রচুর ধান উৎপন্ন হইত—ক্ষেতের উপর দিয়া প্রবল স্রোত বহিয়া যাওয়ায় অধিকাংশ স্থানেরই ফসল নষ্ট হইয়াছে। তাহাতে যে শুধু ঐ অঞ্চলের ক্ষতি হইবে তাহা নহে, সারা বাঙ্গালায় চাউলের অভাব বৃদ্ধি করিবে। আশ্চর্য্যের কথা এই যে—ভারত গভর্ণমেণ্ট ঝড়ের পর দিনই অর্ডিনান্স জারি করিয়া সংবাদপত্রগুলিকে ঝড়ের খবর প্রকাশ করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন, মন্ত্রীত্রয় মেদিনীপুর হইতে ফিরিবার পূর্ব্বে লোক ঐ বিষয়ে বিস্তৃত বিবরণ জানিতে পারে নাই। বালেশ্বর জেলার একাংশেরও ঝড়ে ক্ষতি হইয়াছে। ক্ষতিগ্রস্ত লোকদিগকে সাহায্য করিবার জন্য আমরা বাঙ্গালার জনসাধারণকে নিবেদন জ্ঞাপন করি।

কলিকাতার গঙ্গাতীরে দুর্গা প্রতিমা নিরঞ্জনে জনতা ফটো—তারক দাস

মিঃ উইল্‌কির সাবধান বাণী—

গত ২৯শে অক্টোবর মিঃ ওয়েণ্ডেল উইল্‌কি আমেরিকায় এক বক্তৃতায় বলিয়াছেন—"ভারতই আমাদের সমস্যা; জাপান যদি ভারত অধিকার করে, তাহা হইলে আমাদের বিষম ক্ষতি হইবে। ফিলিপাইনও সেই একই কারণে বৃটিশের সমস্যা; আমেরিকা যদি ফিলিপাইনকে স্বাধীনতা না দেয়, তবে সমগ্র প্রশান্ত মহাসাগরস্থ
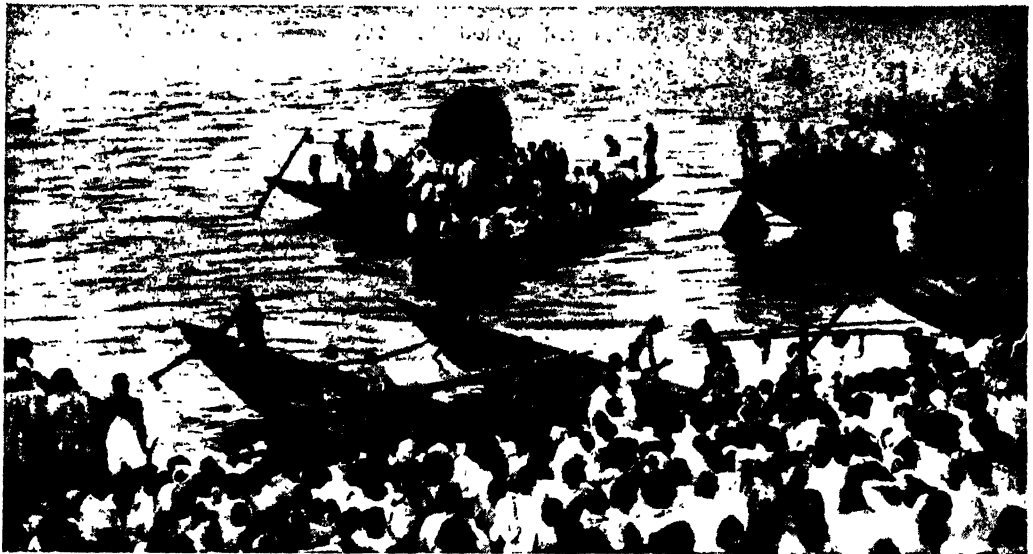
কলিকাতায় গঙ্গাবক্ষে দুর্গা প্রতিমা ফটো—তারক দাস

জগৎ ক্ষতিগ্রস্ত হইবে।" কিন্তু বৃটীশ জাতি কি মিঃ উইল্‌কির এই সাবধান বাণী শুনবে? ভারতকে রক্ষা করিতে হইলে এখনই ভারতবর্ষকে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন প্রদান করা প্রয়োজন। তাহা না দিলে জাপানের বিরুদ্ধে সমগ্র ভারত একত্র হইয়া যুদ্ধে অগ্রসর হইতে পারে না। ভারত বৃটীশের সহিত সংযুক্তভাবে জাপানের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে চাহে, তাহাকে সে সুযোগ প্রদানের অধিকার বৃটীশের হাতে। সেইজন্যই মিষ্টার উইল্‌কি আজ ভারতীয় সমস্যাকে এত বড় করিয়া দেখিয়াছেন।

পুলিস ও সৈন্যদের ব্যবহারের তদন্ত—

সারা ভারতবর্ষে পুলিস ও সৈন্যগণ কর্ত্তৃক যে সকল অনাচার অনুষ্ঠিত হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ, সেগুলি সম্বন্ধে তদন্ত করিবার জন্য নিখিল ভারত হিন্দু মহাসভা একটি কমিটী গঠন করিয়াছেন। বিহারের শ্রীযুত গৌরীশঙ্কর প্রসাদ, বাঙ্গালার শ্রীযুত আশুতোষ লাহিড়ী ও গুজরাটের শ্রীযুত খান্না ঐ কমিটীর সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। হিন্দুমহাসভার এই চেষ্টা প্রশংসনীয়।

কলিকাতায় শ্রীযুত রাজাগোপালাচারী

গত ১৫ই ও ১৬ই অক্টোবর মাদ্রাজের নেতা শ্রীযুত সি-রাজাগোপালাচারী কলিকাতায় আসিয়া বর্ত্তমান অবস্থায় কি ভাবে রাজনীতিক সমস্যার সমাধান করা যায়, সে সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া গিয়াছেন। ডক্টর শ্রীযুত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুত গগনবিহারী লাল মেটা, ডক্টর শ্রীযুত রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়, মিঃ আর্থার মুর প্রভৃতির সহিত তাঁহার আলোচনা হইয়াছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় আলোচনাতেই উহা শেষ হইয়াছে—বর্ত্তমান সঙ্কটে নূতন পথ দেখাইবার শক্তি কাহারও নাই।

বাগবাজার সার্ব্বজনীন লক্ষ্মীপূজা ফটো—তারক দাস

'রবীন্দ্র-তীর্থ' প্রতিষ্ঠা—

বিলাতের ব্রাউনিং সোসাইটীর মত কলিকাতায় রবীন্দ্র সাহিত্য আলোচনার জন্য 'রবীন্দ্র-তীর্থ' প্রতিষ্ঠার আয়োজন চলিতেছে। সেই উদ্দেশ্যে সম্প্রতি কলেজ স্কোয়ার মহাবোধি সোসাইটী হলে অধ্যাপক ডক্টর শ্রীযুত কালিদাস নাগের সভাপতিত্বে এক সভা হইয়াছিল। সভায় অধ্যাপক বিজন ভট্টাচার্য্য, অধ্যাপক জগদীশ ভট্টাচার্য্য, ডক্টর নীহাররঞ্জন রায় প্রভৃতি রবীন্দ্র তীর্থ প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে বক্তৃতা করিয়াছিলেন।

খাদ্য মূল্য নিয়ন্ত্রণ—

গভর্ণমেণ্ট যতই খাদ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করিতেছেন, ততই দেশে খাদ্য মূল্য বৃদ্ধি পাইতেছে। চিনির মূল্য নিয়ন্ত্রণের ফলে ৬ আনা সেরের চিনি বাজারে ১২ আনার কম দরে পাওয়া যায় না। ৮ টাকা মণের চাউল ১১ টাকায় কিনিতে হয়। নিত্য ব্যবহার্য্য আহার্য্য গুলি মানুষকে অবশ্যই ক্রয় করিতে হইবে—কাজেই তখন কোথায় সস্তায় পাওয়া যাইবে বলিয়া বসিয়া থাকা যায় না। কেরোসিন তৈলের অভাবে দরিদ্র জনসাধারণকে রাত্রিকালে অন্ধকারে থাকিতে হইতেছে। কয়লার দাম ৬ আনা মণের স্থানে সাত সিকা মণ—দিয়াশলাই পাওয়া যায় না। তৈল ঘৃত প্রভৃতিও দুর্ম্মূল্য। কাজেই সাধারণ গৃহস্থের ঘর সংসার পরিচালন অসম্ভব ব্যাপার হইয়াছে। রেলের অসুবিধার ফলে আলু কলিকাতায় ১৮ টাকা মণ দরে বিক্রীত হইতেছে। কিন্তু সরকারী মূল্য নিয়ন্ত্রণ কর্ম্মচারীরা এ সম্পর্কে কিছুই করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। টাকা আদায়ের সময় তাঁহাদের মধ্যে যে তৎপরতা দেখা যায়, এই সকল প্রকৃত হিতকর কার্য্যে যদি তাহার কথঞ্চিৎও দেখা যাইত, তাহা হইলে দেশবাসী সর্ব্বসাধারণকে আজ এরূপ কষ্ট পাইতে হইত না।

দর্শনশাস্ত্রে মহিলার কৃতিত্ব—

কলিকাতার ডাক্তার সৌরাঙ্গনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্যা কুমারী কনকপ্রভা এবার বি-এ পরীক্ষা দিয়া দর্শন বিভাগের অনার্সে প্রথম শ্রেণীর প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছে।

কুমারী কনকপ্রভা বন্দ্যোপাধ্যায়

ম্যাট্রিক ও আই-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণা ছাত্রীদের মধ্যেও সে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছিল।
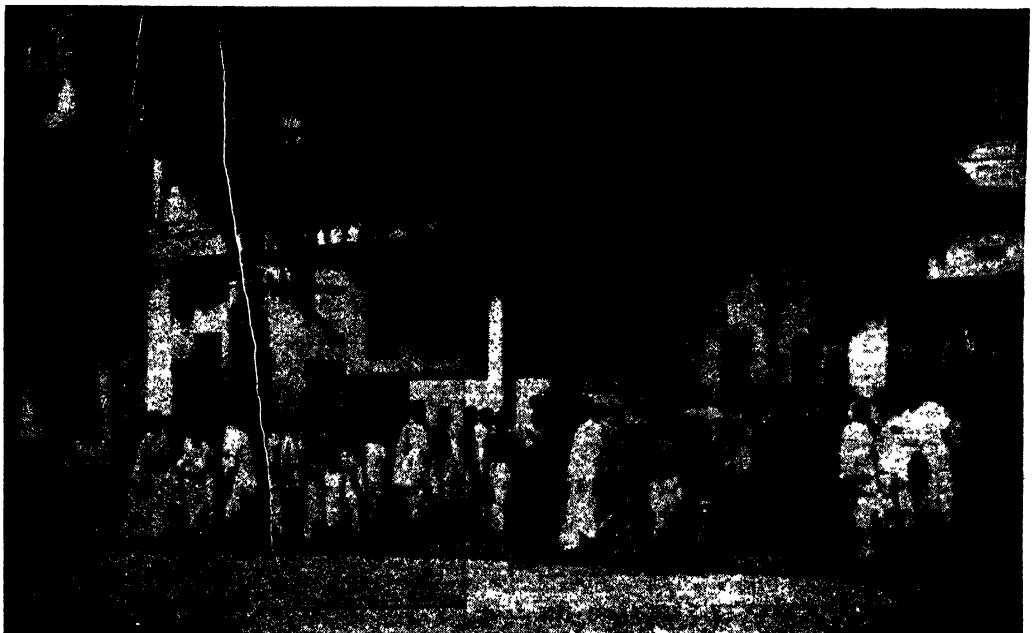
রুশিয়ায় ভারতীয় প্রতিনিধি প্রেরণ—

নিখিল ভারত সোভিয়েট সুহৃদ সঙ্ঘ হইতে রুশিয়ায় একদল প্রতিনিধি প্রেরণ করা হইবে স্থির হইয়াছে। ঐ দলে স্যার তেজবাহাদুর সাপ্রুর পুত্র মিঃ পি. এন, সাপ্রু, মাদ্রাজের ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রী ডক্টর পি-সুব্বারাওন, বোম্বাইয়ের শ্রীযুত বি-টি-আর-রাণাদে, কলিকাতার অধ্যাপক হীরেন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও শ্রীযুত স্নেহাংশু আচার্য্য যাইবেন স্থির হইয়াছে। শীঘ্রই ঐ দলকে পাঠান হইবে স্থির হওয়া সত্বেও যাতয়াতের অসুবিধার জন্য এখন তাঁহাদের যাওয়া হয় নাই।

বাহাদুরপুর বিলে নৌকা-বাচ, প্রতিযোগিতা —ভারত সেবাশ্রম সংঘ

ফরিদপুরে মহামারী—

খাদ্যাভাব ঘটিলে রোগবৃদ্ধি হওয়া স্বাভাবিক। কারণ উদরের জ্বালায় মানুষ তখন অখাদ্য কুখাদ্য খাইয়া জীবন ধারণ করিবার প্রয়াসী হয়। ফলে রোগ ও মহামারী স্বাভাবিকরূপে আসিয়া পড়ে। ফরিদপুর জেলার একটী সংবাদে প্রকাশ, তথায় একই সপ্তাহে কলেরায় আক্রান্ত হইয়া ৪৪৮ জন লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। ঐ জেলার ডিষ্ট্রিক্ট হেলথ্ অফিসার রোগের দ্রুত প্রসার বন্ধ করিবার জন্য চিকিৎসক ও ঔষধের সাহায্য চাহিয়াছেন। বাখরগঞ্জ জেলায়ও ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব হইয়াছে বলিয়া শোনা গিয়াছে। এই সকল অঞ্চলে অবিলম্বে যথারীতি সরকারী সাহায্যের প্রয়োজন।

পয়সার অভাব—

চাল, ডাল, লবণ, কেরোসিন তেল, চিনি প্রভৃতির অভাবের সঙ্গে সঙ্গে বাজারে 'পয়সা' নামক মুদ্রাটিরও দারুণ অভাব দেখা দিয়াছে। পয়সার অভাবে যাহার এক পয়সার 'শাক' ক্রয় করা দরকার তাহাকে দুই পয়সার 'শাক' ক্রয় করিতে হয়। আমাদের বিশ্বাস, গভর্ণমেণ্ট তৎপর হইলে এইরূপ মুদ্রার অভাব দেখা দিত না। কোথায় যে গলদ, তাহা বুঝিবার উপায় নাই। অথচ আমাদের মত দরিদ্র ব্যক্তিদের এ জন্য দুঃখ দুর্দ্দশার সীমা নাই। অধিক বেতনভোগী বড়বড় রাজকর্ম্মচারীরা বোধহয় এই দুঃখের কথা বুঝিতে পারেন না।

কুমারকৃষ্ণ মিত্র—

আহিরীটোলার সুবিখ্যাত ধনী ব্যবসায়ী কুমারকৃষ্ণ মিত্র মহাশয় গত অক্টোবর মাসের মধ্য ভাগে ৬৬ বৎসর বয়সে পরলোকগত
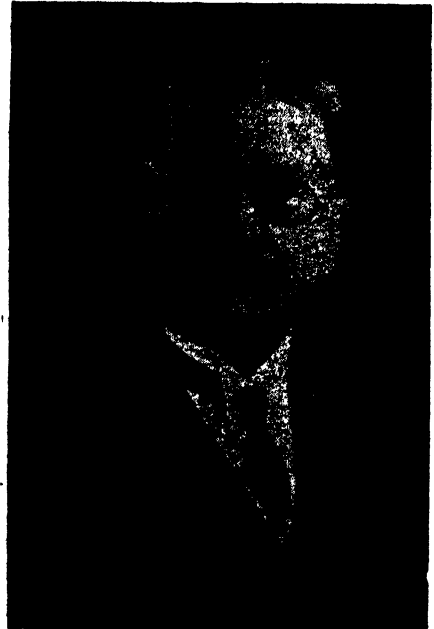
৺কুমারকৃষ্ণ মিত্র

ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের পৌরহিত্যে চীন সরকারকে রবীন্দ্রনাথের প্রতিকৃতি উপহার দান উৎসব　　ফটো—তারক দাস

হইয়াছেন। কুমারকৃষ্ণের পিতা ক্ষীরোদগোপাল মিত্রও ঐ পল্লীতে খ্যাতনামা ব্যক্তি ছিলেন। কৃষ্ণকুমারের রাজনীতিক আন্দোলনের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। ১৯০১ সালে তিনি স্বদেশী মেলার অন্যতম উদ্যোক্তা ছিলেন। স্বদেশী আন্দোলনের যুগে তিনি একটি কাপড়ের কল প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯২৩ সালে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয়ের সহিতও তিনি নানা ক্ষেত্রে কাজ করিয়াছিলেন। নিজে সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন এবং বহুকাল তিনি ভারত সঙ্গীত সমাজের সম্পাদক ছিলেন। নাট্য জগতে নূতনত্ব আনিয়া তিনি ও তাঁহার বন্ধুগণ আর্ট থিয়েটার লিমিটেড্ খুলিয়াছিলেন। করদাতা বান্ধব সমিতির মারফত তিনি কলিকাতাবাসীদিগের বিবিধ উপকার সাধন করিয়া গিয়াছেন। পাশ্চাত্যের নানা দেশ ঘুরিয়া তিনি যে জ্ঞান অর্জ্জন করিয়াছিলেন, তাহা দেশের লোকের উপকারের জন্য নিয়োগ করিতেন।

সত্যেন্দ্রচন্দ্র মিত্র—

গত ২৭শে অক্টোবর বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার (উচ্চতর পরিষদ) সভাপতি সত্যেন্দ্রচন্দ্র মিত্র মহাশয় মাত্র ৫৪ বৎসর বয়সে তাঁহার বালীগঞ্জ সাউথ এণ্ড পার্কস্থ বাসভবনে পরলোকগমন করিয়াছেন। প্রথম জীবন হইতেই তিনি রাজনীতিক আন্দোলনে যোগদান করেন এবং পূর্ব্ব ইউরোপীয় মহাযুদ্ধের সময় তাঁহাকে ভারতরক্ষা আইনে গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল। ৪ বৎসর পরে মুক্তিলাভ করিয়া তিনি দেশবন্ধু দাশের অধীনে অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করেন ও স্বরাজ্য দল গঠনে তাঁহার অন্যতম প্রধান সহায়ক হন। ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসুর সহিত তিনিও ধৃত

৺সত্যেন্দ্রচন্দ্র মিত্র—রবীন্দ্র মুখার্জ্জির সৌজন্যে

হইয়া মান্দালয়ে আটক ছিলেন। আটক অবস্থায় তিনি কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য নির্ব্বাচিত হন ও মুক্তির পর স্বরাজ্য দলের 'চিফ্ হুইপ' নিযুক্ত হন। পরে ১৯৩৭ সালে তিনি বাঙ্গালার উচ্চতর পরিষদের সদস্য ও সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন।

মন্মথনাথ বসু—

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভা (উচ্চতর পরিষদ)র সদস্য, মেদিনীপুরের জননায়ক রায় বাহাদুর মন্মথনাথ বসু গত ১৮ই অক্টোবর কলিকাতা বালীগঞ্জে ৭৫ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। মেদিনীপুর পিংলায় তাঁহার বাড়ী ছিল এবং তাঁহার পিতা হেমাঙ্গচন্দ্র বসু সাবজজ ছিলেন। মন্মথবাবু ২০ বৎসর মেদিনীপুর জেলা বোর্ডের সদস্য ও ১০ বৎসর মেদিনীপুর মিউনিসিপালিটীর চেয়ারম্যান ছিলেন। ১৯২৬-২৭ সালে মেদিনীপুর সাহিত্য সম্মিলনে তিনি অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ছিলেন। সমবায় আন্দোলনের প্রতি তাঁহার বিশেষ সহানুভূতি ছিল এবং মেদিনীপুর সেণ্ট্রাল সমবায় ব্যাঙ্ক, কলিকাতার বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল সমবায় ব্যাঙ্ক প্রভৃতির তিনি প্রাণস্বরূপ ছিলেন।

জ্ঞানানন্দ রায়চৌধুরী—

হুগলী জেলার সিমলাগড়ের জমীদার সুসাহিত্যিক জ্ঞানানন্দ রায়চৌধুরী মহাশয় গত বিজয়াদশমীর দিন তাঁহার কলিকাতা হরিঘোষ ষ্ট্রীটস্থ বাসভবনে ৮৫ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি ভারতবর্ষ, বসুমতী, উৎসব প্রভৃতি পত্রিকার নিয়মিত লেখক ছিলেন এবং মরণ-রহস্য, ধর্ম্মজীবন, পূজনীয় গুরুদাস প্রভৃতি বহু গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। তিনি বি-এ পাশ করিয়া ইণ্ডিয়া গভর্ণমেণ্টের অধীনে চাকরী করিতেন এবং গভর্ণমেণ্টের নির্দ্দেশে মহীশূর ও অযোধ্যার রাজপরিবারের ইতিহাস রচনা করিয়াছিলেন।

৺জ্ঞানানন্দ রায়চৌধুরী

দেশের দারুণ সমস্যা—

দিকে দিকে খাদ্য সমস্যা যেরূপ বিকট আকার ধারণ করিতেছে, তাহাতে মনে হয় ইহার পরিণতি অতি গুরুতর দুর্দৈব। দূর পল্লীর মধ্যে ময়মনসিংহ, কুমিল্লা, নোয়াখালি প্রভৃতি স্থানে প্রতি মণ চাউল ১৫৲ হইতে ২০৲ টাকা। কোনও স্থানে ১০।০ টাকা মণের কম মাঝারি, এমন কি মোটা চাউল পর্য্যন্ত পাওয়া যাইতেছে না। সাধারণ লোকের যে আয়, তাহাতে ১০।০ হইতে ২০৲ টাকা মণে চাউল খাইবার সঙ্গতি নাই। জীবনধারণের অন্যান্য জিনিষের কথা ছাড়িয়া দিলেও কেবল খাদ্য-সংক্রান্ত দ্রব্যাদির মূল্য অসম্ভব চড়িয়াছে; স্থানে স্থানে তাহা কেবল দুর্ম্মূল্য নয়, দুষ্প্রাপ্যও বটে। আলু প্রতি সের ।৵১০ হইতে ।/০, তরিতরকারি এই অনুপাতে বৃদ্ধি পাইয়াছে। রন্ধনের জন্য কয়লা ১।৵০ হইতে ২৲ মণ; কাঠ ভাল হইলে প্রতি টাকায় পৌনে দুই হইতে দুই মণ, আর আম প্রভৃতি হইলে আড়াই হইতে তিন মণ। লবণের দর সস্তা হইয়াছে বলিয়া রাজসরকার স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়িয়াছেন অর্থাৎ প্রতি সের ৵১০ বা ৵১৫ পয়সা, কিন্তু তাহাতে লবণের স্বাদ, সৈন্ধব হইতে শতকরা ৫০ ভাগ কম। দুগ্ধ, ঘৃত ক্রমশঃ লেখার অক্ষরে দেখিতে হইবে। সমস্ত জাতি—ধনী এবং যুদ্ধায়োজনে লিপ্ত ভাগ্যবান কণ্ট্রাক্টর, সাপ্লায়ার ব্যতিরেকে, আজ প্রতিনিয়ত শরীরের সঞ্চিত শক্তি ক্ষয় করিয়া দিনাতিপাত করিতেছে। ইহাতে রোগ-প্রবণতা বৃদ্ধি করিয়া চিকিৎসার ব্যয় বহুগুণ বৃদ্ধি করিবে। এদিকে বিদেশী ঔষধাদি দ্রব্যের মূল্যও অসম্ভব চড়িয়াছে। আজ জাতি বিনা যুদ্ধে আসন্ন মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইতেছে। এ ক্ষয় যে কত মারাত্মক, কত সুদূরপ্রসারী অমঙ্গলের আকর, তাহা জাতির হিতাকাঙ্ক্ষী মাত্রেই জানেন। দর নিয়ন্ত্রণ, খাদ্যাদি

হালসীবাগানে দুর্ঘটনার পর
গাড়ীতে করিয়া শব শ্মশান ঘাটে প্রেরণ ফটো—পান্না সেন

নিয়মিত সরবরাহ করা এবং সাধারণের নিকট পাইবার সুবিধা করিয়া দেওয়ার জন্য সরকার পক্ষের সকল চেষ্টা এ পর্য্যন্ত ব্যর্থ হইয়াছে। নূতন চাষের অবস্থাও আশঙ্কাজনক। অনারেবল্ শ্রীযুত নলিনীরঞ্জন সরকারের বিবৃতি অনুসারে বাঙ্গলায় ১৩ লক্ষ টন এবং অনারেবল্ ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের হিসাব অনুযায়ী ৪ লক্ষ টন চাউল বাঙ্গলায় উদ্বৃত্ত হইবার কথা অসার অলীক স্বপ্নমাত্রে পর্য্যবসিত হইতেছে। আজি এই মহা-দুর্দিনে অন্তরের অন্তরতম প্রদেশ হইতে কেবল আকুল ক্রন্দন ফুটিয়া উঠিতেছে

"অন্ন বিনে, মরে সবে প্রাণে,
অন্ন দে, মা
দে মা, অন্ন দে, অন্নদে!"

হালসীবাগান দুর্ঘটনায় নিহতদের দেখিবার জন্য নিমতলা শ্মশানে সমবেত জনতা—মধ্যস্থলে শববাহী গাড়ী ফটো—পান্না সেন

অবাধ রপ্তানী—

দেশের মধ্যে চাউলের জন্য যখন হাহাকার পড়িয়াছে, সেরূপ সময়েও চাউলের অবাধ রপ্তানী চলিতেছে। সরকারী হিসাব পত্রে দেখা যায় যে ১৯৪১-৪২ সালে প্রায় এক কোটী মণ চাউল এবং গম প্রভৃতি লইয়া প্রায় ১০ কোটী টাকার খাদ্য তণ্ডুল বিদেশে গিয়াছে। এ বৎসরও সিংহলে প্রতি মাসে ২০,০০০ টন চাউল রপ্তানীর চুক্তি সম্পাদিত হইতেছে। সার ব্যারণ জয়তিলকের গভর্ণমেণ্ট সেদিনও ভারতবাসীকে যেভাবে গালাগালি করিয়াছেন এবং বর্ত্তমানেও সিংহলপ্রবাসী ভারতীয় সম্বন্ধে যে সব বিধি-নিষেধ আছে, তাহা আলোচনা করিলে সিংহলকে চাউল বিক্রয় করা চলে না। সে সকল বিতণ্ডার বিষয় এখন পরিত্যাগ করিলেও ভারতের অবস্থা বুঝিয়া কেবল সিংহলকে ৬৬ লক্ষ মণ চাউল দেওয়া যায় না। আমরা এই ব্যবস্থার সহিত কোনও প্রকারে একমত হইতে পারিতেছি না।

টাকা-আধুলির প্রচার বন্ধ—

পঞ্চম জর্জ ও ষষ্ঠ জর্জের নামাঙ্কিত মুদ্রা আগামী ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দের ১লা মে'র পর হইতে আর বাজারে চলিবে না। যে সকল মুদ্রায় অধিক রৌপ্য আছে, সেগুলির প্রচার বন্ধ করিবার জন্য গভর্ণমেণ্ট এইরূপ আদেশ প্রচার করিয়াছেন। অক্টোবর মাসের শেষ পর্য্যন্ত ঐ সকল টাকা আধুলি গভর্ণমেণ্ট ট্রেজারি, পোষ্টাফিস ও রেল ষ্টেশনে গৃহীত হইবে। এই ব্যবস্থার ফলে আমাদের দেশের অশিক্ষিত দরিদ্র জনসাধারণকে যে কত অসুবিধা

হালসীবাগানে নিহত পুত্রকন্যা সহ মাতা—সকলেরই এক অবস্থা
ফটো—পান্না সেন

ও কষ্টভোগ করিতে হইবে, তাহা চিন্তা করিলে ব্যথা উপস্থিত হয়। আদেশটি যাহাতে ভাল করিয়া সর্ব্বসাধারণের মধ্যে প্রচারের ব্যবস্থা হয়, সে বিষয়ে গভর্ণমেণ্টের বিশেষ অবহিত হওয়া উচিত—তাহার ফলে হয় ত লোকের কষ্ট কম হইবে।

খাজা আবদুল করিম—

ঢাকার নবাব সার আবদুল গণির দৌহিত্র খাজা আবদুল করিম ৭৭ বৎসর বয়সে গত ১লা নভেম্বর ঢাকার আসান-মঞ্জিলে লোকান্তরিত হইয়াছেন। ১৯২১ খৃষ্টাব্দে তিনি কংগ্রেস ও খেলাফত আন্দোলনে যোগদান করিয়া কারাদণ্ড ভোগ করিয়াছিলেন। তিনি কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়া পণ্ডিত মতিলাল নেহরুর নেতৃত্বে স্বরাজ্য দলের হুইপ হইয়াছিলেন।

গ্রেপ্তার ও বিক্ষোভ—

গত ৮ই আগষ্ট বোম্বায়ে মহাত্মা গান্ধী প্রমুখ দেশনেতাদের গ্রেপ্তারের পর হইতে সমগ্র ভারতে জনগণের পক্ষ হইতে যে বিক্ষোভ প্রদর্শন আরম্ভ হইয়াছে, তাহা একইভাবে গত তিন মাসেরও অধিক কাল চলিতেছে। অথচ গভর্ণমেণ্ট বর্ত্তমান যুদ্ধের জন্য নানা কারণে বিপন্ন হইয়াও দেশ-নেতৃবৃন্দকে মুক্তি প্রদান করা যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে করেন নাই—পরন্তু প্রত্যহই নূতন নূতন কর্ম্মী ও নেতাকে বিভিন্ন স্থানে গ্রেপ্তার করিয়া বিনা বিচারে আটক করিয়া রাখা হইতেছে। প্রত্যহই সংবাদপত্রে ভারতের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ইহার প্রতিবাদে বিক্ষোভের সংবাদ প্রকাশিত হইতেছে। ডাকঘর, ইউনিয়ন বোর্ড অফিস, স্কুল, ডাকবাক্স, রেলষ্টেশন, টেলিগ্রাফের তার প্রভৃতি নষ্ট করিয়া বিক্ষোভকারীরা একদিকে যেমন গভর্ণমেণ্টের ক্ষতি করিতেছেন,

হালসীবাগানে নিহত গর্ভবতী রমণী—চিতাশয্যায় ফটো—পান্না সেন

অন্য দিকে দিনের পর দিন নূতন নূতন কর্ম্মীকে গ্রেপ্তার করিয়া গভর্ণমেণ্টও তেমনই জনসাধারণের মনে অসন্তোষ বাড়াইয়া দিতেছেন। এ অবস্থায় রাজনীতিক সমস্যার সমাধান ব্যতীত ইহার মীমাংসার অন্য উপায় নাই। কিন্তু সে দিকেও গভর্ণমেণ্টকে আদৌ সচেতন দেখা যাইতেছে না। শত্রু ভারতের দ্বারদেশে আসিয়া উপস্থিত—এ অবস্থাতেও যদি বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট জাতি-হিসাবে ভারতবাসীদিগের সহিত মীমাংসায় অগ্রসর না হন, তাহা

নিমতলা শ্মশানঘাটে সারি সারি চিতা শয্যায় হালসীবাগান দুর্ঘটনায় মৃত নরনারী ফটো—পান্না সেন

হইলে শেষ পর্য্যন্ত কি হইবে, তাহা ভাবিয়া আমরা শঙ্কিত হইয়াছি। বিদেশীর আক্রমণ কেহই পছন্দ করে না—কিন্তু সত্যই যদি কোন দিন শত্রু কর্ত্তৃক ভারত আক্রান্ত হয়, তখন যাহাতে সকলে সমবেতভাবে তাহাতে বাধাপ্রদান করে, সেজন্য সকলেরই পূর্ব্ব হইতে প্রস্তুত থাকা উচিত।

তপশীলভুক্ত জাতির দাবী—

গত ২৫শে অক্টোবর কলিকাতা টাউন হলে তপশীলভুক্ত জাতিসমূহের এক সম্মিলন হইয়াছিল। মন্ত্রী শ্রীযুত উপেন্দ্রনাথ বর্ম্মণ ঐ সম্মিলনে সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন এবং প্রধান মন্ত্রী মৌলবী এ-কে-ফজলল হক সম্মিলনের উদ্বোধন করেন। বাঙ্গালার মন্ত্রিমণ্ডলীতে যাহাতে আর একজন তপশীলভুক্তজাতির মন্ত্রী গৃহীত হয়, সম্মিলনে তাহাই দাবী করা হইয়াছে।

ষ্ট্যাণ্ডার্ড কাপড়—

কাপড়ের মূল্য অত্যধিক বৃদ্ধির ফলে লোক বস্ত্রাভাবে যে দারুণ কষ্ট পাইতেছে, তাহা আর কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না। এবার যাঁহারা পূজায় গ্রামে গিয়াছেন, তাঁহারা প্রত্যক্ষ করিয়া থাকিবেন, মধ্যবিত্ত গৃহস্থ গৃহেও মহিলারা লজ্জা নিবারণের জন্য বস্ত্র সংগ্রহ করিতে পারিতেছেন না। যে সাড়ীর দাম প্রতিজোড়া আড়াই টাকা ছিল, তাহা আজ প্রতি জোড়া ৮ টাকার কম পাওয়া যায় না। মধ্যে শুনা গিয়াছিল, গভর্ণমেণ্ট দরিদ্র জনগণের জন্য সুলভে ষ্ট্যাণ্ডার্ড কাপড় বাহির করিবেন, কিন্তু কয়েকমাস অতীত হইয়া গেল, এখনও বাজারে সে কাপড় বাহির হয় নাই। যে কারণেই কাপড়ের মূল্যবৃদ্ধি হইয়া থাকুক না কেন, উহার হ্রাসের ব্যবস্থা করা যে গভর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য সে বিষয়ে সকলেই একমত। গভর্ণমেণ্ট যে কেন এতদিনে ষ্ট্যাণ্ডার্ড সুলভ কাপড় প্রস্তুতের ব্যবস্থা করিলেন না, তাহাও আমাদের অজ্ঞাত। দরিদ্র জনসাধারণের প্রতি প্রকৃত দরদ থাকিলে নিশ্চয়ই এ বিষয়ে কর্ত্তৃপক্ষের চেষ্টা লক্ষিত হইত।

পাটচাষীকে ঋণদান—

এ বৎসর বাজারে পাটের চাহিদার একান্ত অভাব থাকা সত্ত্বেও পাটচাষীদের হিসাবের ভুলে গত বৎসর অপেক্ষা এবার অনেক বেশী পাট উৎপন্ন হইয়াছে। কাজেই পাট এখন বাজারে যে দরে বিক্রয় হইতেছে, সে দরে পাট উৎপন্ন করাই সম্ভব হয় না। ফলে পাটচাষীদের মধ্যে দুর্দ্দশার অন্ত নাই। পাট-চাষীদিগকে তাহাদের এই দুঃসময়ে সাহায্য করিবার জন্য বাঙ্গালার মন্ত্রীরা ভারত গভর্ণমেণ্টের নিকট অর্থসাহায্য চাহিয়াছিলেন। টাকা পাইয়া তাঁহারা বাঙ্গালার মফঃস্বলে এবার এক কোটি টাকা ঋণ দানের ব্যবস্থা করিয়াছেন। ঐ এক কোটি টাকার পঞ্চমাংশ অর্থাৎ ২০লক্ষ টাকা শুধু মৈমনসিংহ জেলার পাটচাষীদের মধ্যে ভাগ করিয়া দেওয়া হইবে। এই ঋণ দানে চাষীদের দুর্দ্দশা কতকটা কমিবে সন্দেহ নাই—কিন্তু পাটের মূল্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা আরও কঠোর করা না হইলে স্থায়ীভাবে পাটচাষীদের দুর্দ্দশার অবসান হইবে না। যে সকল মন্ত্রীর চেষ্টায় এই এক কোটি টাকা ঋণ দান সম্ভব হইল, তাঁহারা দেশবাসীমাত্রেরই ধন্যবাদের পাত্র।

অমরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য—

কলিকাতা নিমতলা ঘাট ষ্ট্রীটের সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসক ডাক্তার অমরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয় গত ১১ই নভেম্বর সকালে মাত্র ৪৬ বৎসর বয়সে সহসা পরলোকগমন করিয়াছেন জানিয়া আমরা মর্ম্মাহত হইলাম। অমরেশচন্দ্রের সহিত অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ কলেজ ও এ-আর-পি প্রতিষ্ঠানসমূহের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল এবং তিনি ঐ অঞ্চলে বেশ জনপ্রিয় হইয়াছিলেন। পিতা স্বর্গত সুচিকিৎসক সুরেশচন্দ্রের মত তাঁহার প্রতিষ্ঠাও দিন দিন বর্দ্ধিত হইতেছিল। আমরা তাঁহার শোক-সন্তপ্ত পরিবারবর্গকে আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

চাউলের মূল্য বৃদ্ধি—

বাঙ্গালার মফঃস্বলে এখনই চালের দাম বাড়িয়া কোথাও বা ১৬৲ টাকা মণ, কোথাও বা ১৮৲ টাকা মণ দরে বিক্রীত হইতেছে। ঝড়ে মেদিনীপুর, ২৪পরগণা, হাওড়া ও হুগলীর কতকাংশের ফসল নষ্ট হইয়াছে। তাহার উপর এক প্রকার পোকা লাগিয়া বীরভূম, বাঁকুড়া ও বর্দ্ধমানের বহু স্থানের ফসল নষ্ট হইয়া গিয়াছে। এ বৎসরের প্রথম দিকে আশানুরূপ বৃষ্টি না হওয়ায় অনেক স্থানে চাষ ভাল হয় নাই—তাহার উপর এই সকল দৈব দুর্ব্বিপাকে বাঙ্গালার ধান্য ফসলের বহু ক্ষতি হইল। ব্রহ্মদেশ হইতে যে চাউল আসিয়া এতদিন বাঙ্গালার চাহিদা মিটাইত, তাহাও আর আসিবে না। এ অবস্থায় এ বৎসর চাউলের দাম যে বাড়িবে, তাহা আর বিচিত্র কি? কিন্তু এদেশে চাউলই মানুষের প্রধান খাদ্য—সেই চাউল যদি দুষ্প্রাপ্য হয়, তাহা হইলে লোক বাঁচিবে কি করিয়া? এই সকল ভাবিয়া সকলেই এখন হইতে বিশেষ শঙ্কিত হইয়াছেন। এ বিষয়ে গভর্ণমেণ্ট কি ব্যবস্থা করিতেছেন, তাহা সাধারণকে জানাইয়া দেওয়া উচিত।

শ্রীক্ষেত্রনাথ রায়

রঞ্জি ক্রিকেট প্রতিযোগিতা ঃ

আন্তঃপ্রাদেশিক রঞ্জি ক্রিকেট প্রতিযোগিতা ভারতের একটি শ্রেষ্ঠ অনুষ্ঠান। বর্ত্তমান বৎসরে এই বিশ্বব্যাপী যুদ্ধের জন্য এই প্রতিযোগিতাটির অনুষ্ঠান হবে কিনা এখনও নিশ্চয় ক'রে তা কিছু বলা যায় না। এখনও সমস্ত প্রাদেশিক ক্রিকেট এসোসিয়েশনগুলি তাদের সিদ্ধান্ত ভারতীয় ক্রিকেট কণ্ট্রোল বোর্ডের কাছে পেশ করেনি। এ পর্য্যন্ত ছয়টি প্রাদেশিক এসোসিয়েশন প্রতিযোগিতায় যোগদান ব্যাপারে তাদের চরম সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। বোম্বাই, মহারাষ্ট্র ও মহীশূর এই তিনটি প্রদেশ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানের বিপক্ষে মত প্রকাশ করে প্রতিযোগিতায় যোগদান করবে না বলে প্রস্তাব গ্রহণ করেছে। অপরদিকে বাঙ্গলা, সিন্ধু ও দিল্লী প্রদেশের ক্রিকেট এসোসিয়েশন অনুষ্ঠানের স্বপক্ষে প্রস্তাব প্রকাশ করেছে। সুতরাং দেশের এই বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে এবং প্রাদেশিক ক্রিকেট এসোসিয়েশনের এইরূপ সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ভারতের শ্রেষ্ঠ রঞ্জি ক্রিকেট প্রতিযোগিতার অনুষ্ঠান হবে কিনা তা নিশ্চয় ক'রে এখনও কেউ বলতে পারে না। ভারতীয় ক্রিকেট কণ্ট্রোল বোর্ড বোম্বাই, মহারাষ্ট্র প্রভৃতির মত শক্তিশালী ক্রিকেট দলের সিদ্ধান্ত অগ্রাহ্য ক'রে এবং তাদের কোন সহযোগিতা লাভ না ক'রেই যে প্রতিযোগিতার আয়োজন

টেনিস খেলোয়াড় এইচ হেঙ্কল উইম্বলডন নং ৫

করবেন তা আমাদের মনে হয় না। ঐ সব ক্রিকেট দল প্রতিযোগিতায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা না করলে খেলার আকর্ষণ এবং জৌলুষও থাকবে না। আমাদের বক্তব্য, দেশের এই দুর্দ্দিনে যেমন অনেকগুলি আমোদ প্রমোদ পরিহার করা ব্যয় সঙ্কোচন এবং অন্যান্য দিক থেকে অবশ্য প্রয়োজনীয় তেমনি দেশের লোকের এই মানসিক

আর এল রিগস

দুর্যোগে তাদের কর্ম্মে শক্তি এবং প্রেরণা জাগরণের জন্য নির্দ্দোষ আমোদ অনুষ্ঠানের ব্যবস্থাও স্বীকার্য্য। শ্রেষ্ঠ প্রতিযোগিতাগুলি স্থগিত রাখা হ'লে দেশের লোকের মনে ত্রাসের সঞ্চার বৃদ্ধি পাবে, মানসিক দুর্ব্বলতার সুযোগে গুজব চারি পাশের স্বাভাবিক আবহাওয়া ব্যাহত করবে। প্রতিযোগিতা পরিচালনা একেবারে অসম্ভব হয়ে পড়লে অবশ্য উপায়ান্তর নেই; কিন্তু সে অবস্থা আমাদের দেশে এখনও উপস্থিত হয়নি, ভবিষ্যতের কথা স্বতন্ত্র।

বাঙ্গলার ক্রিকেট মরসুম ঃ

কলকাতায় ক্রিকেট মরসুম আরম্ভ হয়েচে। ময়দানের অভাবে অনেকগুলি ক্রিকেট ক্লাব অনুশীলন খেলার সুব্যবস্থা করতে পারেনি। অনুশীলনের অভাবে খেলার ষ্ট্যাণ্ডার্ডও খুব উচ্চাঙ্গের হচ্ছে না।

সিন্ধু পেণ্টাঙ্গুলার ক্রিকেট ঃ

সিন্ধু পেণ্টাঙ্গুলার ক্রিকেট খেলা এ বৎসর হবে কিনা এবিষয়ে সকলেরই যথেষ্ট সন্দেহ ছিল; কিন্তু নানাবিধ বাধা বিঘ্নের মধ্যেও করাচীতে সিন্ধু পেণ্টাঙ্গুলার ক্রিকেট প্রতিযোগিতার খেলা আরম্ভ হয়েছে। প্রতিযোগিতার প্রথম খেলাটিতে পার্শীদল ইউরোপীয়

দলকে পরাজিত করেছে। পার্শীদল খেলার সেমি-ফাইনালে মুসলীম দলের সঙ্গে খেলবে। প্রতিযোগিতার অপরদিকের সেমি-ফাইনালে হিন্দুদল অবশিষ্ট দলকে পরাজিত ক'রে ফাইনালে
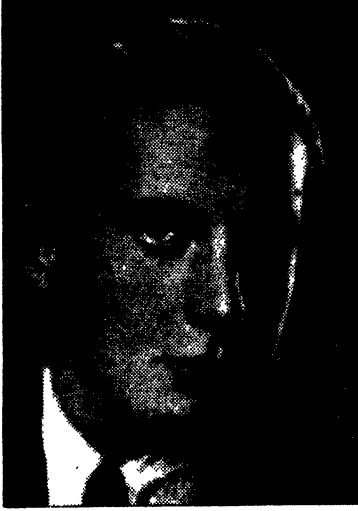
বিখ্যাত টেনিস খেলোয়াড় ভন্ মেটেক্সা

উঠেছে। এই খেলাতে হিন্দুদল কয়েকটি বিষয়ে নূতন রেকড করতে সমর্থ হয়েছে। হিন্দুদলের প্রথম ইনিংসের ৮ উইকেটে ৪৩৫ রান উঠেছে। এই রানসংখ্যা সিন্ধু ক্রিকেট খেলার ইতিহাসে নূতন রেকর্ড। পূর্ব্বের রেকর্ড ছিল পার্শীদলের ৪২৮ রান। ১৯২৮ সালে ইউরোপীয় দলের বিরুদ্ধে পার্শীরা ঐ রান তুলে রেকর্ড স্থাপন করেছিল। হিন্দুদলের পামনমাল নট আউট

পোলাণ্ডের টেনিস খেলোয়াড় জে জেডরে জজোয়াস্কা

২০৯ রান ক'রে সিন্ধু পেণ্টাঙ্গুলার ক্রিকেট ব্যক্তিগত নূতন রেকর্ড স্থাপন করেছেন। পূর্ব্বের ব্যক্তিগত রেকর্ড ছিল জেঠমল নওমলের ১৭০ রান। এই রেকর্ড ১৯৩৯ সালে স্থাপিত হয়। পামনমাল ১৮ বছরের একজন তরুণ ক্রিকেট খেলোয়াড়। তিনি ৬ ঘণ্টা ব্যাটিং ক'রে অপূর্ব্ব কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। আরও সব থেকে উল্লেখযোগ্য যে, তিনি এই বৎসর প্রতিযোগিতায় সর্ব্বপ্রথম অবতীর্ণ হয়েছেন। প্রথম বৎসরের খেলাতে যোগদান করেই ব্যাটিংয়ে এইরূপ সাফল্যের পরিচয় দিতে সিন্ধু পেণ্টাঙ্গুলার ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় আর কোন খেলোয়াড়কে এ পর্য্যন্ত দেখা যায়নি। পামনমলই এ বিষয়ে প্রথম রেকর্ড স্থাপন করলেন।

খেলার ফলাফল :

হিন্দুদল ঃ ৪৩৫ (৮ উইকেট)

অবশিষ্ট দল ঃ ১৭৫ ও ৭১ (৫ উইকেট)

পরলোকে রস গ্রেগারী ঃ

এই মহাযুদ্ধ ক্রীড়া জগতের বহু খ্যাতনামা খেলোয়াড়দের পৃথিবী থেকে অপসৃত করেছে। যাঁরা পৃথিবীর এই ক্রীড়া-

গ্রেগারী
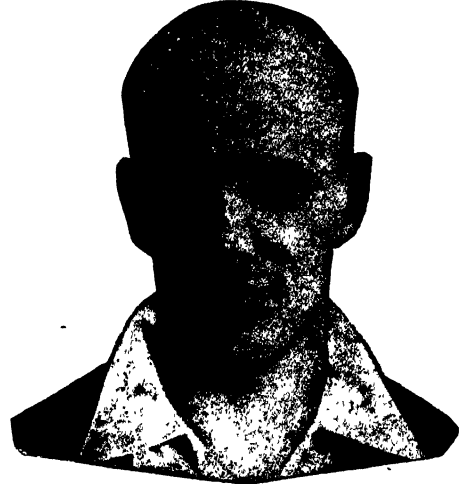
ক্ষেত্র থেকে চিরজীবনের মত অবসর নিয়েছেন তাঁদের মধ্যে অষ্ট্রেলিয়ার তরুণ ক্রিকেট খেলোয়াড় রস গ্রেগারীর অভাব ক্রীড়া-ক্ষেত্রে অপূরণীয়। রাজকীয় বিমান বাহিনীতে সার্জেণ্ট অবজার্ভার হিসাবে তিনি নিযুক্ত হয়েছিলেন। ১০ই জুন তারিখের বিমান যুদ্ধে মাত্র ২৬ বছর বয়সে রস গ্রেগারী পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছেন। ক্রিকেট খেলার সহস্র সহস্র দর্শকদের হর্ষ এবং আনন্দধ্বনির মধ্যে তিনি বহুবার বিদায় নিয়ে প্যাভিলিয়ানে ফিরেছেন, শুভানুধ্যায়ীদের কল্যাণ কামনায় তাঁর সাফল্যময় জীবনের শুভ দিনগুলি ক্রীড়া জগতে উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে। কিন্তু আজ সে সমারোহ নেই, করতাল ধ্বনি স্তব্ধ হয়ে গেছে বোমারু বিমানের আক্রমণে এবং কামানের গুরুগর্জ্জনের মধ্যে। এ বিদায় গ্রেগারীর চিরদিনের মত। ক্রীড়ামোদীদের মাথা আজ নত, মৌন অবলম্বন ক'রে দাঁড়িয়ে মৃতের সম্মান তারা দিচ্ছে। গ্রেগারী ছিলেন একজন চৌকস খেলোয়াড়। প্রধানত শ্লো বোলিংয়ের জন্য স্কুলের ছাত্র হিসাবে গ্রেগারী ভিক্টোরিয়া ক্লাবের

পক্ষে খেলেছিলেন। ব্যাটিংয়ে তাঁর সুনাম ছড়িয়ে পড়ে ১৯৩৬-৩৭ সালে যে সময়ে এম সি সি অষ্ট্রেলিয়াতে খেলতে যায়। তিনটি টেষ্ট খেলাতে তিনি ব্যাটিংয়ে অপূর্ব্ব কৃতিত্বের পরিচয় দিয়ে অষ্ট্রেলিয়ার টেষ্ট এভারেজের তালিকায় তৃতীয় স্থান লাভ করেন। ডন ব্র্যাডম্যান এবং স্তান ম্যাককাব যথাক্রমে প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান পেয়েছিলেন।

আমেরিকান পেশাদার টেনিস ঃ

পেশাদার লন টেনিস প্রতিযোগিতায় ভূতপূর্ব্ব উইম্বলডন এবং আমেরিকান চ্যাম্পিয়ান ডোনাল্ড বাজ এ বৎসর নিউ-ইয়র্কের ফরেষ্ট হিল সহরে সিঙ্গলস এবং ডবলসে আমেরিকান প্রফেসানাল চ্যাম্পিয়ান হয়েছেন।

সিঙ্গলসের খেলায় ডোনাল্ডবাজ ৬-২, ৬-২, ৬-২ গেমে ববি রিগসকে পরাজিত করেছেন।

ডবলসের খেলায় ডোনাল্ডবাজ ও ববি রিগস জুটী হয়ে ২-৬, ৬-৩, ৬-৪, ৬-২ গেমে ফ্রাঙ্ক কোভাক্স এবং ব্রুস বার্ণেসকে পরাজিত করেছেন।

বিখ্যাত টেনিস খেলোয়াড় টিলডনের বল মারার ভঙ্গি

এইখানে উল্লেখযোগ্য যে, কোভাক্স শীঘ্র মধ্যেই যুদ্ধে যোগদান করবেন।

ভূতপূর্ব্ব উইম্বলডন চ্যাম্পিয়ান সিডনি উড পুনরায় প্রতি-যোগিতায় যোগদান করেছেন। গত তিন বৎসরের আমেরিকান

ডোনাল্ড বাজ

লন টেনিস খেলোয়াড়দের প্রথম দশজনের নামের তালিকায় স্থানলাভ করবারও সৌভাগ্য তিনি পান নি।

ভূতপূর্ব্ব ডেভিস কাপ বিজয়ী এবং উইম্বলডন ডবলস বিজয়ী (১৯৩৬) জি পি হাগস রাজকীয় বিমান বাহিনীতে অস্থায়ী পাইলট অফিসারের কাজে যোগ দিচ্ছেন।

ইংলণ্ডের ডবলস খেলোয়াড় হিসাবে হাগসের যথেষ্ট খ্যাতি আছে। দেশের শান্তি অবস্থায় তিনি ৫০০,০০০ মাইলেরও অধিক পথ পরিভ্রমণ ক'রে পৃথিবীর প্রায় সমস্ত দেশেই টেনিস খেলে গিয়েছিলেন।

বৈদেশিক ক্রিকেট খেলোয়াড় ঃ

ইংলণ্ডের কয়েকজন খ্যাতনামা ক্রিকেট খেলোয়াড় সামরিক বিভাগের কাজে যোগদান ক'রে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে অবস্থান

ভেরিটি

করছেন। রঞ্জি ক্রিকেট প্রতিযোগিতা যদি শেষ পর্য্যন্ত আরম্ভ হয় তাহলে ঐসব খেলোয়াড়দের প্রতিযোগিতায় বিভিন্ন প্রাদেশিক দলের পক্ষ থেকে অবতরণ করতে দেখা যাবে। শুনা যায়, বিখ্যাত বোলার ভেরিটী নাকি বিহার দলের পক্ষে খেলবেন। এদিকে ব্যাটসম্যান হার্ডষ্টাফ এবং বোলার গর্ডাড নাকি বাঙ্গলা প্রদেশের হয়ে খেলবেন।

এই কয়েকজন ব্যতীত হার্টন, এডমাণ্ড, ব্রাউন প্রভৃতি কয়েকজন খ্যাতনামা খেলোয়াড় ভারতে অবস্থান করছেন বলে শুনা যাচ্ছে। কে কোন দলে খেলবেন এরূপ সংবাদ ওয়াকিবহাল-মহল থেকে প্রকাশ পায়নি। রঞ্জি প্রতিযোগিতা সত্যই যদি আরম্ভ হয় এবং এই সকল খেলোয়াড়রা যদি সত্যই প্রতিযোগিতায়
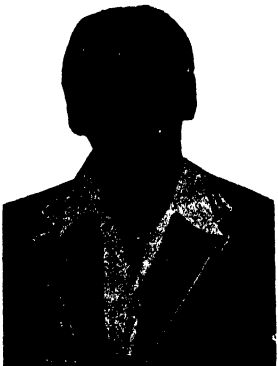
হার্ডষ্টাফ

যোগদান করেন তাহলে এইবারের রঞ্জি প্রতিযোগিতা স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

বাঙলা বনাম বিহার প্রদেশ ঃ

গত তিন বৎসর ধরে বাঙলা বনাম বিহার প্রদেশের আন্তঃ-প্রাদেশিক ক্রিকেট খেলাটি জামসেদপুরে অনুষ্ঠিত হয়ে আসছিল। এই বৎসর এই খেলাটি কলকাতায় হবে। কলকাতার ইডেন উদ্যানে আগামী ২৮শে, ২৯শে ও ৩০শে নভেম্বর খেলা অনুষ্ঠানের দিন ধার্য্য হয়েছে।

বর্ত্তমান বৎসরে বিহারদল বিশেষ শক্তিশালী হয়েছে। খ্যাতনামা ক্রিকেট খেলোয়াড় এস ব্যানার্জি বিহারদলের পক্ষে খেলবেন। গত বৎসরের খেলায় বিহার দল বাঙ্গালা দলের নিকট পরাজিত হ'লেও কিছু অগৌরবের ছিলনা। মাত্র একরানের ব্যবধানে বাঙ্গালা দল বিজয়ী হয়েছিল। খেলোয়াড় মনোনয়ন ব্যাপারে বিশেষ নিরপেক্ষতা নীতি অবলম্বন না করলে আমরা উচিত শিক্ষা লাভই করবো।

রোভার্স কাপ ফাইনাল ঃ

রোভার্স কাপ ফুটবল টুর্ণামেণ্টের ফাইনালে বাটা স্পোর্টস ক্লাব ৩-১ গোলে ওয়েষ্টার্ণ ইণ্ডিয়া অটোমোবাইল এসোসিয়েশন দলকে পরাজিত ক'রে কাপ বিজয়ীর সম্মানলাভ করেছে। স্থানীয় দল হিসাবে ক'লকাতার মহমেডান স্পোটিং ক্লাব সর্ব্বপ্রথম রোভার্স বিজয়ী হয়েছিল ১৯৪০ সালে। বাটা দলের এই বিজয় ন্যায়সঙ্গত হয়েছে। বোম্বাই চ্যাম্পিয়ানদল বিজয়ী দল অপেক্ষা গোল ক'রবার অধিক সুযোগ লাভ করে কিন্তু তাদের আক্রমণ ভাগের খেলোয়াড়দের মধ্যে বুঝাপড়ার অভাব থাকায় তারা সমস্ত সুযোগ নষ্ট করে। তাছাড়া অটোমোবাইল দলের এই পরাজয়ের জন্য গোলরক্ষক কাদের ভেলুকেই বেশী করে দোষ দেওয়া যায়। বিশ্রামের চার মিনিট পূর্ব্বে বাটাদলের সোমানা ৩৫ গজ দূর থেকে গোল সন্ধান ক'রে একটি সর্ট করলে গোলরক্ষক কাদের ভেলু বলটিকে প্রতিরোধ করতে গিয়ে বিনা বাধায় বলটিকে গোলে প্রবেশ করতে দেন।

এইরূপ গোল হওয়ায় অটোমোবাইল দলের খেলোয়াড়দের মধ্যে নৈরাশ্যজনক অবস্থার সৃষ্টি হয়। বিশ্রামের পর সোমানা দ্বিতীয় গোলটি করেন এবং বিজয়ীদলের রসিদ অতি চমৎকার ভাবে তৃতীয় গোলটি দেন। খেলার শেষ পাঁচ মিনিটে অটো-মোবাইল দল খুব জোর প্রতিদ্বন্দ্বিতা চালায়। তার ফলেই ভীমরাও একটি গোল পরিশোধ করেন!

বাটা স্পোর্টস ক্লাব : আর বোস ; এন বোস ও সিরাজুদ্দিন ; তাহের, মোহিনী ব্যানার্জি এবং চক্রবর্ত্তী ; নূরমহম্মদ, সোমানা, রসিদ, সাবু এবং ঘোষ।

ইণ্ডিয়া অটোমোবাইল দল : কাদের ভেলু ; সোলেমন ও রাথনাম ; হারায়েন, চন্দর ও গোবিন্দ ; স্বামী, ভীমরাও, মূর্ত্তী, টমাস ও ধাকুরাম।

মুষ্টিযোদ্ধা জো'লুই ঃ

পৃথিবীর হেভী ওয়েট চ্যাম্পিয়ান মুষ্টি যোদ্ধা জো'লুই আমে-রিকার সৈন্যদলে যে যোগদান ক'রেছেন এ খবর ক্রীড়ামোদীদের অজানা নেই। সৈন্যদলে যোগদান করা সত্ত্বেও জো'লুইয়ের মুষ্টি যুদ্ধ দেখবার সুযোগ ক্রীড়ামোদীদের হয়েছিল। সাধারণের

ধারণা ছিল জো'লুই একজন সাধারণ সৈনিক হিসাবেই সৈন্যদলে কাজ করবেন। কিন্তু সম্প্রতি একটা সংবাদে এ ধারণা ভেঙ্গে গেছে। সংবাদে প্রকাশ, তিনি বিমান বিভাগে যোগ দিয়ে বোমারু বিমান চালনা কৌশল শিক্ষা করেছেন। বিমান চালনায় এবং বোমা নিক্ষেপে তিনি ইতিমধ্যেই কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন।

যুদ্ধ অবসানে অক্ষত দেহে তাঁর সান্নিধ্য লাভের জন্য ক্রীড়ামোদীমাত্রেই উদ্‌গ্রীব হ'য়ে থাকবেন। আমরাও তাঁর জীবনের শুভকামনা করি।

রোভার্স কাপের ইতিহাস ঃ

রোভার্স কাপ ফুটবল প্রতিযোগিতা ভারতের ক্রীড়াক্ষেত্রে একটি অন্যতম প্রাচীন অনুষ্ঠান। ১৮৯১ সালে প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয়। প্রথম ব্যাটেলিয়ান ওরস্‌টার রেজিমেণ্ট প্রথম বৎসরেই কাপ বিজয়ী হয়েছিল। ১৮৯১ সালে রোভার্স কাপের জন্য সরকারীভাবে ঘোষিত হলেও প্রকৃতপক্ষে প্রতিযোগিতাটি আরম্ভ হয় ১৮৯০ সালে, কিন্তু ঐ বৎসর কোন কাপ প্রদান করা হয়নি। রোভার্স কাপের প্রচলন হয় ১৮৯১ সাল থেকে। রোভার্স কাপ প্রতিযোগিতা পরিচালনার জন্য উপযুক্ত তহবিলের ব্যবস্থা আছে। যাঁদের দানে তহবিল পুষ্ট হয়েছে তাঁদের মধ্যে মিসেস ব্রাডলের নাম উল্লেখযোগ্য। মিসেস ব্রাডলের পুত্র পার্শি ব্রাডলে একজন খ্যাতনামা ফুটবল খেলোয়াড় এবং চৌকস খেলোয়াড় ছিলেন। ১৯২৭ সালের ব্যাপক কলেরার আক্রমণে পার্শি ব্রাডলে মারা যান। তাঁর স্মৃতি রক্ষার্থে ওয়েষ্টার্স ফুটবল এসোসিয়েশনকে অর্থ প্রদান করা হয়। ঐ অর্থ থেকেই রোভার্স কাপ নূতন আঙ্গিক সৌষ্ঠবে নির্ম্মাণ করা হয় ১৯২৭ সালে।

রোভার্স কাপ প্রতিযোগিতার ইতিহাসে প্রথম ব্যাটেলিয়ান চেসায়ার রেজিমেণ্ট (১৯০২-০৪) এবং দ্বিতীয় ব্যাটেলিয়ান মিডলসেক্স রেজিমেণ্ট (১৯২৪-২৬) এই দুইটি দলই কেবল পর্য্যায়ক্রমে তিন বৎসর কাপ বিজয়ী হয়ে রেকর্ড স্থাপন করেছে। প্রথম ভারতীয় দল হিসাবে বাঙ্গলোর মুসলীম ১৯৩৭-৩৮ সালে পর্য্যায়ক্রমে দু'বছর কাপ বিজয়ের সম্মান লাভ ক'রে ভারতীয় দল হিসাবে রেকর্ড স্থাপন করেছে। ১৯৪০ সালে 'মহমেডান স্পোর্টিং দ্বিতীয় ভারতীয় দল হিসাবে রোভার্স কাপ পায়।

ক্রিকেট রেকর্ড ঃ

অষ্ট্রেলিয়া বনাম ইংলণ্ড ঃ

টেষ্টম্যাচ

প্রথম খেলার তারিখ	ইংলণ্ড জয়ী	অষ্ট্রেলিয়া জয়ী	ড্র	মোট
অষ্ট্রেলিয়াতে-১৮৭৬-৭৭	৩৪	৪১	২	৭৭
ইংলণ্ডে- ১৮৮০	২১	১৬	২৯	৬৬
মোট :	৫৫	৫৭	৩১	১৪৩

ইংলণ্ডের ইনিংসের সব থেকে বেশী রান : ৯০৩ (৭ উইঃ) ওভাল ১৯৩৮ সাল

অষ্ট্রেলিয়ার ইনিংসের সব থেকে বেশী রান : ৭২৯ (৬ উইঃ), লর্ডস, ১৯৩০ সাল

ইংলণ্ডের ইনিংসের সব থেকে কম রান : ৩৬, এজবাসটন, ১৯০২ সাল

ইংলণ্ডের ইনিংসের সব থেকে কম রান : ৪৫, সিডনী, ১৮৮৬-৮৭ সাল

ব্যক্তিগত সর্ব্বোচ্চ রান :

ইংলণ্ডের পক্ষে : ৩৬৪ রান—এল হাটন, ওভাল, ১৯৩৮ সালে

অষ্ট্রেলিয়ার পক্ষে : ৩৩৪ রান—ডন্ ব্র্যাডম্যান, লিডসে ১৯৩০ সালে

অষ্ট্রেলিয়ার রেকর্ড পার্টনারসীপ :

৪৫১ (সেকেণ্ড উইকেট) : ডবলউ এইচ পুনসফোর্ড এবং ডন জি ব্র্যাডম্যান, ওভাল ১৯৩৪

ইংলণ্ডের রেকর্ড পার্টনারসীপ :

৩৮২ (সেকেণ্ড উইকেট) : এল হাটন এবং লেল্যাণ্ড, ওভাল, ১৯৩৮

সাহিত্য-সংবাদ

নবপ্রকাশিত পুস্তকাবলী

শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত উপন্যাস "গণ-দেবতা" (চণ্ডীমণ্ডপ)—৩৷৷০
শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত প্রণীত গল্প-গ্রন্থ "ইনি আর উনি"—১৷৷০
শ্রীবিনোদবিহারী চক্রবর্ত্তী প্রণীত উপন্যাস "যূথভ্রষ্ট"—২৲
শ্রীশচীন্দ্রনাথ বসু প্রণীত রহস্যোপন্যাস "মায়াপুরী"—১৷৷০
শ্রীনরেন্দ্রনাথ সিংহ প্রণীত "মহাযুদ্ধের সপ্তরথী"—১৷০
শ্রীপ্রীতিময়ী কর প্রণীত গল্প-গ্রন্থ "দু'মুখী"—২৷০
শ্রীমৃণালচন্দ্র সর্ব্বাধিকারী প্রণীত গল্প-গ্রন্থ "মার্ত্তণ্ড রায়ের থিওরী"—১৷৷০
দীনেশচন্দ্র সেন প্রণীত উপন্যাস "পতি-মন্দির"—২৷৷০
চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত "রবীন্দ্রসাহিত্য-পরিচিতি"—১৷৷০
শ্রীদক্ষিণাচরণ ভট্টাচার্য প্রণীত ছেলেদের গল্প-গ্রন্থ "মালাই চপ্"—৷০
শ্রীমাণিক ভট্টাচার্য্য ও শ্রীসুবোধচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় লিখিত উপন্যাস "প্রশান্ত"—২৲
শ্রীগিরীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত ছেলেদের গল্প-গ্রন্থ "হুড়োহুড়ি"—৷৵০
শ্রীকালীপ্রসন্ন দাশ প্রণীত বঙ্গীয় জাতীয় শিক্ষা-পরিষৎ গ্রন্থাবলীর ৬ষ্ঠ খণ্ড "হিন্দু সোসিয়ালিজম্"—৫৲
শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় প্রণীত কাব্য-গ্রন্থ "ঘূর্ণীপাক"—৷৷৵০
শ্রীপঞ্চানন চট্টোপাধ্যায় প্রণীত কাব্য-গ্রন্থ "অশ্রু ও আকাশ"—৸০
বিমলেশ দে প্রণীত গদ্য-কাব্য "জনম অবধি"—১৷০
শ্রীবিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত উপন্যাস "প্রতিজ্ঞান"—২৲
মৌমাছি সম্পাদিত ছেলেদের বই "নাচ, গান, হল্লা"—১৷৷০
প্রতিভা বসু প্রণীত গল্পের বই "মাধবীর জন্য"—১৸০

সম্পাদক—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম্-এ

২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা ; ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত